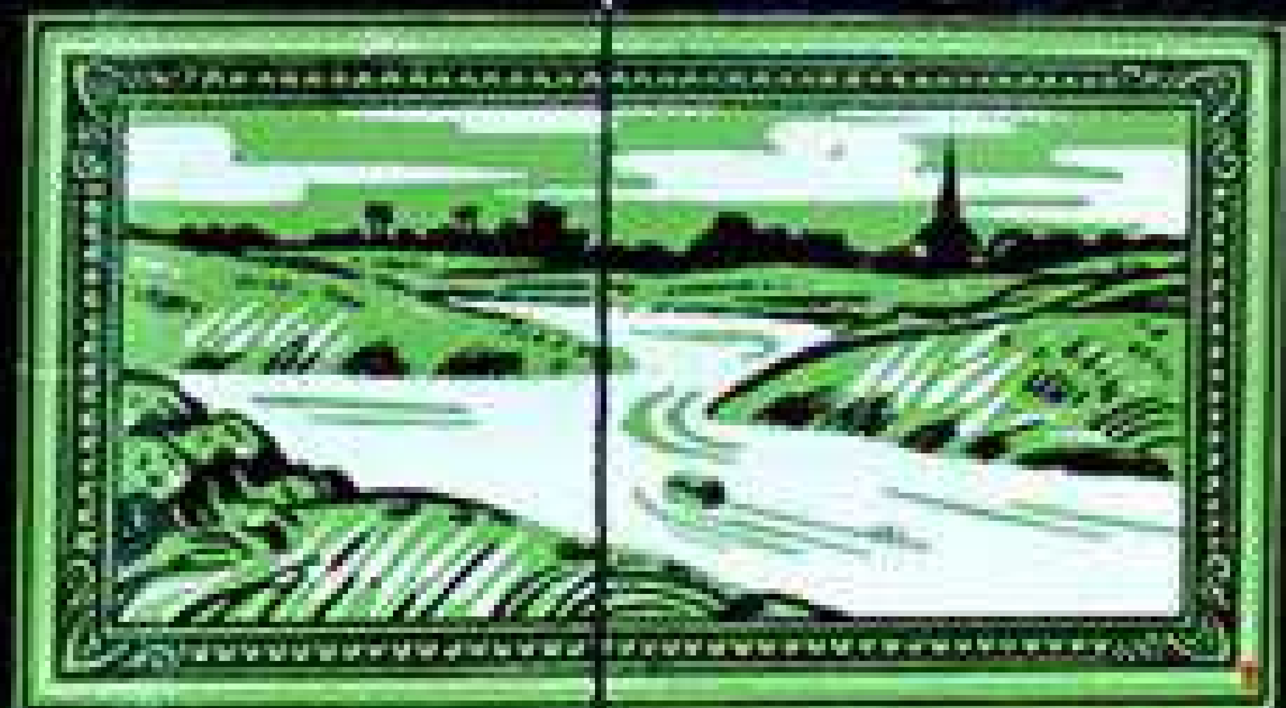
# কীর্তিহাটের কড়চা



## তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



# কীর্তিহাটের কড়চা

প্রথম খণ্ড

# আদি পর্ব

## কথারম্ভ

মধ্য কলকাতায় জানবাজার। রাণী রাসমনির ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত বিরাট বাড়ীখানির অনতিদূরে আর একখানা বড় বাড়ী। পুরনোকালের বাড়ী। এখানে এ বাড়ীখানাও এককালে সুপরিচিত ছিল। নাম ছিল রায়কুঠী। গত আটাশ বৎসরে বাড়ীখানা গৌরব হারিয়েছে। পনের বৎসরে বাড়ীখানা স্বামী-পরিত্যক্তার মত ম্রিয়মাণ এবং যেন নিজের পরিচয় গোপন করে বেঁচে আছে।

এই বাড়ীর সামনের দিকে যে পুরনো কালের সওয়াশো ফুট লম্বা এবং পনের ফুট চওড়া দীর্ঘ বারান্দাটা ঘিরে বড় বড় কাচের জানালা দিয়ে আধুনিককালের আমেজ এনে—ঘরে বা হলে পরিণত করা হয়েছে—সেই হলটায় উজ্জ্বল আলোর সারি জ্বলছিল। শীতকালের রাত্রি দশটায়—কাচের জানালাগুলো বন্ধ কিন্তু কাচে সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে ঘোষণা করছিল—এতকাল পরে আমি জেগেছি সেজেছি।

ঘরটায় বা ওই হলটায় মুখোমুখি বসে ছিল সুরেশ্বর রায় আর সুলতা ঘোষ। সুলতা অবাক হয়ে হলটায় দেওয়ালে টাঙ্গানো সারিবন্দী ছবির দিকে তাকিয়ে ছিল। উজ্জ্বল আলোর ছটায় তার মুখে-চোখে ফুটে ওঠা প্রশংসা এবং বিস্ময় গোপন ছিল না।

ছবিগুলি সুরেশ্বরেরই আঁকা। বাড়ীখানাও সুরেশ্বরের। শিল্পী হিসাবে সুরেশ্বর আঠারো বছর আগে খ্যাতি অর্জন করেছিল। শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও। তবে পাগল বা বিকৃতমস্তিষ্ক বা অতি খেয়ালী বেপরোয়া বিদ্রোহী বলত লোকে; যার যেমন ইচ্ছে। আঠারো বছর আগে মানে—১৯৩৫ সাল। যুগটাই বিদ্রোহের। কাজী নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার সেই বিধাতার বুকে লাথি মারার আস্ফালন করা বিদ্রোহীদের একজন। সৃষ্টির মধ্যেও তার পরিচয় ছিল—ছবির দুর্বোধ্যতায়। আঠারো বছর আগে—সে সুলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল; সুলতা তখন বি-এ পরীক্ষা দেবে। এই সময়েই সুরেশ্বর হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে ডুব মেরেছিল; সুলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতায়, তার সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পীজীবনে, কলকাতার স্বচ্ছন্দ এবং উত্তেজনাময় জীবনে সব কিছুতে ছেদ টেনে।

আঠারো বছর পরে আবার তাদের দেখা। এ-সম্পর্কে সুরেশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা উঠে—মিলিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ধ্বনি প্রতিহত হলেই প্রতিধ্বনি তোলে। না হলে ছড়িয়ে মিলিয়ে যায়। অপবাদের প্রতিবাদ না হলে পঙ্কতলের বায়ু-কণাগুলি বুদবুদ তুলে বাতাসে মিশে যায়—জলের তলায় পাঁক থিতিয়ে পড়ে। সুরেশ্বরের বেলায়ও তাই হয়েছে। লোকে বলেছে—সুলতাও বিশ্বাস করেছে, কীর্তিহাটের জমিদারপুত্রটি ও খেয়ালী শিল্পীটি—দুই সত্তাকে মিলিয়ে কীর্তিহাটের জমিদারীর পঙ্কপল্বলে—মহিষ ও বরাহ এই দুই জন্তুর মিশ্রণে একটি অভিনব জন্তুতে পরিণত হয়ে কণ্ঠ ডুবিয়ে পঙ্করস পান করছে এবং সেই পঙ্কে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সুলতা এখন অধ্যাপিকা। ছাত্রী হিসেবে সে কৃতী ছাত্রী ছিল। এম-এতে অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে অধ্যাপিকা হিসেবে চাকরি নিয়ে তার সঙ্গে রাজনীতির মন্ত্রদীক্ষা

নিয়ে বেশ আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গেই কাল কাটাচ্ছিল।

হঠাৎ এতকাল পরে দেখা।

সারি সারি ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে সুলতা দেখছিল আর ভাবছিল—না, জমিদার-সন্তান সুরেশ্বর মহিষ বা বরাহ যাই হোক—তার ভিতরের শিল্পী তো মরে নি!

ছবিগুলি সুন্দর। সুন্দর ছবি! এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চোখ বুলালেই ধরা পড়ে—ছবি-গুলির ধারা এক নয়। বর্ণবিন্যাসে রেখার ভঙ্গিতে নানান বৈচিত্র্য। টেকনিকও এক নয়। কিন্তু ছবিগুলির বিষয়বস্তুতে একটা ধারাবাহিকতা আছে। পরিবেশ যেন এক। নদী বন গ্রাম। এক নদী এক বন এক গ্রাম। মানুষও আছে। তারাও যেন—অনেকে বার বার ঘুরে ঘুরে এসেছে। রঙ-এর বিন্যাস ভারী সুন্দর। চোখকে যেন ভরে দেয়।

সুরেশ্বরের দিকে সে আবার তাকালে। না, শিল্পী সুরেশ্বর তো মরে নি। এই এতো ছবি সে এঁকেছে! সেই গ্রামে বসে—জমিদারী করতে করতে। চোখে একটা পরিবর্তন পড়ছে। স্পষ্ট পরিবর্তন। সেই খেয়ালী ঝড়ের মত দুরন্ত লোক তো নয়। এ যেন শ্রান্ত। শান্ত।

হঠাৎ সুরেশ্বর একটা ছড়ি দিয়ে প্রথম ছবিখানার ফ্রেমে ঠেকিয়ে বললে—এই আমার প্রথম ছবি। কংসাবতী বারিবিধৌততট বনচ্ছায়াশীতল কীর্তিহাট নামক গ্রাম। সেই গ্রামের পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের দৌলতে যিনি প্রথম জমিদার—তাঁর নাম সোমেশ্বর রায়। তিনি বিবাহ করে গ্রামে প্রবেশ করছেন।

ছবি একখানি গ্রাম্য পথের। তবে গোটা গ্রামের আভাস আছে। নদী আছে বন আছে—গ্রাম আছে পটভূমিতে—ছবির সম্মুখে গ্রাম্যপথ, সেই পথের উপর একখানা পাল্কী। পাল্কীর ভিতরে বর আর বধূ—বরের হাতে একখানা গুটানো কাগজ। পিছনে গ্রাম্য নরনারী!

সুরেশ্বর বললে—ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ—

সুলতা চমকাল এবার।—ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ? কি বলছে সুরেশ্বর? সুরেশ্বরের দৃষ্টিও কেমন কেমন হয়ে গেছে।—পাগল?

সুরেশ্বর সামলে নিলে নিজেকে। বললে—না, আমার ভুল হয়েছে। এখানে তো তুমি একা সুলতা—! কিন্তু আমার মনে হল কি জান? এই রকম হয়।—হ্যাঁ হয়।

শঙ্কিত হল সুলতা।

## পরিচয়

সুরেশ্বরের পরিচয় মনে পড়ল সুলতার। কীর্তিহাটের কড়চার রেখাচিত্রশিল্পী সুরেশ্বরকে না জানলে ওর কথার মানে ধরা যাবে না, সুলতার মনের আশঙ্কারও স্বরূপ নির্ণয় হবে না। কীর্তিহাটের কড়চারও স্বাদ পাওয়া যাবে না।

এই যে কংসাবতী বারিবিধৌততট—বনচ্ছায়াশীতল কীর্তিহাট গ্রাম—ওই গ্রামেরই জমিদার-বংশের সন্তান। সেই কোম্পানীর আমলের পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের কাল থেকেই ওরা জমিদার। ওদের বংশে যিনি প্রথম জমিদারী অর্জন করেছিলেন তাঁর নাম ছিল সোমেশ্বর

রায়। তাঁর বয়স তখন ষোল। দশ বছর বয়সেই জমিদার হয়েছিলেন সোমেশ্বর রায়। তাঁর বাপের নাম কুড়ারাম ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন গোমস্তা শ্রেণীর মানুষ। তবে যার তার গোমস্তা নয়—গোমস্তা ছিলেন কোম্পানীর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের—খাস গোমস্তা মুহুরী। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সঙ্গে কাগজ নিয়ে কলকাতায় কোম্পানীর সেরেস্তাখানায় কাজ করেছেন, দেওয়ানের পিছনে পিছনে বুড়ো লর্ড কর্ণওয়ালিশের ঘরে গিয়েছেন—কাগজ এগিয়ে দিয়েছেন। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আগে বাংলা বিহার উড়িষ্যার পরগণা-লাট-মৌজার তালিকা করেছেন—তাতে নম্বর বসিয়েছেন; সে সব লাট-মৌজার রাজস্ব নির্ধারিত করেছেন।

দেওয়ানজীর মাতৃশ্রাদ্ধ বাংলাদেশে মহাসমারোহের শ্রাদ্ধ। বাংলাদেশের জমিদারেরা এসে তাঁর কান্দীর বাড়ীতে শুধু আতিথ্যস্বীকার ক'রে ধন্য হন নি—শ্রাদ্ধে তদ্বির-তদারক ক'রে নিজেদের মাথা বাঁচিয়েছেন। দেওয়ানজী সরষের তেল রাখবার জন্যে একটা ডোবা পুকুর কাটিয়ে তাতে তেল ঢেলে রেখেছিলেন। ঘিয়ের কারবার তখন টিনে নয়—বড় বড় হাঁড়ির প্রচলন ছিল—দেওয়ানজীর মাতৃশ্রাদ্ধে একটা ঘর ঘিয়ের বড় বড় জালায় ভর্তি ছিল। কুড়ারাম ভট্টাচার্য ছিলেন ঘিয়ের ভাঁড়ারে। সেখান থেকে দেওয়ান তাঁকে হঠাৎ তলব ক'রে বলেছিলেন—কুড়োরাম, ও ভার নিয়ে তোমার আটকে থাকা চলবে না। তোমাকে নিযুক্ত করলাম কৃষ্ণনগরের কুমার শিবচন্দ্র রায় আসছেন তাঁর পরিচর্যার জন্যে। সাবধান—পান থেকে চুন না খসে।—শোনা গিয়েছিল কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অসুস্থ বলে আসতে পারবেন না। তিনি মার্জনা চেয়ে পত্র লিখেছিলেন—"দরবার অসাধ্য পুত্র অবাধ্য—ভরসা কেবল গঙ্গাগোবিন্দ।" কিন্তু তারপর কুমার হঠাৎ রাজী হয়ে এসেছিলেন নিমন্ত্রণ রাখতে। দেওয়ানজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় কুড়ারাম ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। দেওয়ানজী বলেছিলেন—কি কুমার, কেমন আয়োজন দেখছেন? কুমার শিবচন্দ্রের জিহ্বা ছিল প্রখর। ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধার। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—দেখলাম। প্রায় দক্ষযজ্ঞ!

অর্থাৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে পণ্ড হবে এই ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু দেওয়ানজী তার উপরেও প্রখর—তিনি বলেছিলেন—ভুল হল কুমার। দক্ষযজ্ঞের চেয়েও বেশী!

ভ্রূকুঞ্চিত করে শিবচন্দ্র বলেছিলেন—বলেন কি দেওয়ানজী, দক্ষযজ্ঞের চেয়েও বেশী? অর্থাৎ ঔদ্ধত্য তো কম নয়! কিন্তু দেওয়ানজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন—নিশ্চয়। বিবেচনা আপনিই করুন কুমার; দক্ষযজ্ঞে শিব আসেন নি প্রথমে—আমার যজ্ঞে স্বয়ং শিব উপস্থিত—যজ্ঞের আদিতেই।

অর্থাৎ কুমার শিবচন্দ্র নিজে এসেছেন।—এসেছেন দেওয়ানজীকে মান্য করেই এটা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

আসেন নি শুধু বর্ধমানের মহারাজা। বলেছিলেন—কি, আমি ক্ষত্রিয় হয়ে লালা—অর্থাৎ কায়েতের বাড়ী যাব নিমন্ত্রণ রাখতে? তার শোধ দেওয়ানজী নিয়েছিলেন। অন্য জমিদারদের খাজনা ধার্য তিনি করেছিলেন এগার ভাগের দশ ভাগ। বর্ধমানের মহারাজার পাঁচ হাজার বর্গমাইল জমিদারী—তাঁর উপর খাজনা ধার্য হয়েছিল ষোল আনা—অর্থাৎ এগার ভাগের পুরো

এগার ভাগ। অঙ্ক নিজে বসিয়েছিলেন কুড়ারাম ভট্টাচার্য মশায়। বাহান্ন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা।

কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল এই শ্রাদ্ধে। হ্যাঁ, তার আগে শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দে মাতৃশ্রাদ্ধে ন লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের দেববিগ্রহদের নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন ব'লে দেব উপাধি পেয়েছিলেন। সে গৌরব ম্লান করে দিয়েছিলেন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। এ সমস্ত কিছুর মধ্যে কুড়ারাম ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর বিশ্বাসভাজন কর্মচারী। সেখান থেকেই তিনি প্রচুর উপার্জন করেছিলেন। পাকা বাড়ী করিয়েছিলেন; জমিজেরাত অনেক কিনেছিলেন। কিন্তু জমিদারী কেনেন নি। জমিদারী কিনেছিলেন শেষ জীবনে—পুত্র সোমেশ্বরের নামে। সেটা আঠারশো এক সাল। জমিদারী তখন কেনা গেলেও চালানো সহজ ছিল না। এগার ভাগ আদায়ের দশ ভাগ দিতে হ'ত কোম্পানীকে। কিস্তি ছিল বারো মাসে বারো কিস্তি।

প্রজা খাজনা বাকী ফেলত। ইস্তফার পত্র লিখে জমিদারী কাছারীতে দিয়ে যেত, জমিদার নিতে চাইত না—প্রজা ফেলে দিয়ে পালাত। তাছাড়া পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের পর কোম্পানী সরকার জমিদারদের প্রজার উপর জুলুমবাজীর অধিকার খর্ব ক'রে আইন তৈরী করায় জমিদারী কিনে খাজনা সুসারে আদায় করা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ফলে পুরনো জমিদারদের জমিদারী রাজস্ব বাকীর দায়ে সূর্যাস্ত আইনে নিলেম হয়ে গেল। বীরভূমের মুসলমান আমলের নবাবদের জমিদারী নিলেম হল। বর্ধমানের মহারাজার মণ্ডলঘাট পরগণা নিলেম হয়ে গেল। এক বর্ধমানের রাজার এস্টেট থেকে তিরিশ হাজার বাকী খাজনার নালিশ দায়ের হল। তখন লর্ড কর্ণওয়ালিশ দেশে গিয়েছেন—লাটসাহেব হয়ে এসেছেন লর্ড ওয়েলেসলী। সব দেখেশুনে তিনি সপ্তম আইন—রেগুলেশন সেভেন তৈরী করে জমিদারদের ক্ষমতা দিলেন যে, বাকী খাজনার দায়ে জমিদার ক্ষেতের ফসল ক্রোক ক'রে নিলেম করাতে পারবে। সেটা ইংরিজী ১৭৯৯ সাল। সেই সময় কুড়ারাম ভট্টাচার্য একদিন দেওয়ানজীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

দেওয়ান তাঁকে দেখে বলেছিলেন—কি খবর ভটচায্?

—অধীনের একটা আর্জি আছে।

—বল!

—হুজুরের মেহেরবাণীতে সবই হয়েছে অধীনের। শুধু একটি সাধ পূর্ণ হতে বাকী।

—কি সে সাধ? ব্যক্ত কর।

—হুজুর, ভেবেছি মায়ের সেবা প্রতিষ্ঠা করব—

—এ তো সাধু সংকল্প হে! করে ফেল। তোমার অর্থের অভাব আছে বললে তো আমার অবস্থাই ফকিরের অবস্থা দাঁড়ায় হে।

—আজ্ঞে—তা নয়। তবে মা কি আমার কারুর অধীনস্থ রায়ত হয়ে আসবেন মাথা হেঁট করে?

—বেশ তো, লাখরাজ করে দিচ্ছি তোমার সম্পত্তি।

—আজ্ঞে ওর সঙ্গে আর একটুকু চাই।

—সেটা কি?

—কিছু জমিদারী না হলে মায়ের মাথায় মুকুট পরাব কোন্ লজ্জায়? গ্রামের লোকের উপর তাঁর হুকুম কায়েম হবে কি করে?

—বেশ, বল কোন্ লাট কিনবে? ষোলশো ষাট পরগণার হস্তবুদ কালেকটারী খাজনা তো তোমার কণ্ঠস্থ। টাকারও তোমার অভাব আমি রাখি নি।—বল!

—আজ্ঞে না হুজুর, সামান্য ব্যক্তি আমি, সাধ্য কম। তবে আমার গ্রাম কীর্তিহাট—লাট কীর্তিহাটের সামিল—ওই স্বগ্রামটুকু তার চারপাশে চারখানা গ্রাম—

বেশ, তা হবে। কীর্তিহাট এবার নীলামে উঠবে।

উঠতে বেগ বিশেষ পেতে হয়নি। কীর্তিহাটের জমিদারদের পাঠানো রাজস্ব সেবার পথেই লুঠ হয়েছিল। নিলাম ডেকে নিতেও প্রতিদ্বন্দ্বী জোটে নি। নিলাম ডাক হয়েছিল কুড়ারামের নামে নয়। পুত্র সোমেশ্বরের নামে। এবং উপাধি তাঁর ভট্টাচার্য নয়, হয়েছিল রায়। লেখা হয়েছিল নিলাম ক্রেতা শ্রীসোমেশ্বর রায়—পিতা শ্রীকুড়ারাম রায় ওরফে ভট্টাচার্য। তাই সুরেশ্বরদের বংশের জমিদারী জীবনের ইতিহাসে আদি পুরুষ সোমেশ্বর রায়। তাঁর উপাধির ক্ষেত্রে ওরফে ভট্টাচার্যও আর লেখা হ'ত না। সোমেশ্বর তারপর বিস্তৃত জমিদারী কিনেছিলেন। সোমেশ্বরের পর বীরেশ্বর রায়, তারপর রত্নেশ্বর রায়—তাঁর তিন ছেলে—বড় দেবেশ্বর রায়। তাঁর দুই ছেলে—বড় যজ্ঞেশ্বর, ছোট যোগেশ্বর রায়। সুরেশ্বর যোগেশ্বর রায়ের একমাত্র সন্তান। সে আমলের বিচারে বেশী বয়সের ছেলে সুরেশ্বর, জন্মেছিল ৫ই মার্চ ১৯১০ সাল।

সুরেশ্বর পুরনো জমিদার বাড়ীর ছেলে হলেও জন্মকাল থেকেই ওর কোন সংশ্রব ছিল না জমিদারীর সঙ্গে। সুরেশ্বরের বাবা যোগেশ্বর রায় জমিদারের ছেলে হয়েও পেশায় ছিলেন জার্নালিস্ট। তাঁরও জন্ম কলকাতায়। ছাত্রজীবনে তিনি উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাবা দেবেশ্বর রায়—রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র—জমিদারীতে ছ আনা অংশ পেয়েছিলেন, কিন্তু জমিদারী তাঁর ভাল লাগেনি। তিনিও ইংরিজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। হয়তো সম্পত্তির ক্ষেত্রে দেবতার সঙ্গে বাঁধা না থাকলে দেবেশ্বর ব্রাহ্মই হয়ে যেতেন। অনেকে বলে ক্রীশ্চান হতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু সম্পত্তি দেবত্র বলে তিনি তা পারেন নি। তিনি নামে জাত ও ধর্ম বজায় রেখে সম্পত্তির অধিকারই অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এবং ধর্মকর্ম ক্রিয়াকলাপের ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকবার জন্য কলকতাবাসী হয়েছিলেন যাতে তাঁর ইচ্ছামত আচরণ বিচরণের পথে কোন বাধা না-দাঁড়ায়। কলকাতায় তিনি ব'সে ব'সে ভোগ করেননি, কর্ম করেছিলেন। জমিদারীর সঞ্চিত অর্থে ব্যবসা করেছিলেন। অবশ্য চাল ডালের গদী গুদাম নয়, বড় স্টোরস নয়। করেছিলেন কলিয়ারী কিনে কয়লার ব্যবসা। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তার আগে কারঠাকুর কম্পানী করেছিলেন। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর খনি ছিল। দেবেশ্বর তাঁর পরবর্তীকালের মানুষ, তাঁর সময়ে কয়লায় নতুন ফিল্ড বেরিয়েছে—ঝরিয়া ফিল্ড। সেই ঝরিয়া ফিল্ডে তিনি কলিয়ারী কিনে কুঠীতে সাহেব ম্যানেজার এবং কলকাতায় আপিসে

সাহেব অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেখে ব্যবসা চালাতেন। ব্যবসা ভালই করেছিলেন। এর সঙ্গে তাঁর ইচ্ছে ছিল তিনি একখানা খবরের কাগজ করবেন। ইংরিজী খবরের কাগজ। এ ইচ্ছে তাঁর উৎসাহিত হয়েছিল যোগেশ্বরের ছাত্র জীবনের কৃতিত্ব থেকে। যোগেশ্বর ইংরিজীতে এম-এ পরীক্ষায় বেশ ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। চেষ্টা করলে অনায়াসে ডেপুটি হতে পারতেন, কিন্তু তার বদলে দেবেশ্বর ছেলেকে নিয়ে গিয়ে অমৃতবাজারের শিশিরকুমারের হাতে দিয়েছিলেন। দেবেশ্বর রায় ছিলেন সে আমলের নামী লোক। ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েশন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়া লীগ প্রভৃতি সমিতির সভ্য এবং কলকাতার অভিজাত সমাজে সমাদৃত মানুষ ছিলেন।

রত্নেশ্বর রায় বড় ছেলের প্রকৃতি বুঝেই তাকে কলকাতার জানবাজারের বাড়ীখানাও দিয়েছিলেন। অন্য ছেলেদের জন্যে স্বতন্ত্র বাড়ী কিনে দিয়েছিলেন—অপেক্ষাকৃত ছোট বাড়ী। দেবেশ্বর ব্যবসায়ে ব্যর্থ হন নি, তিনি ব্যবসায় করে কয়েকটা কলিয়ারী এবং বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয়ও করেছিলেন। মৃত্যু হয়েছিল তাঁর অকস্মাৎ—কিন্তু দেবেশ্বর তার আগেই উইল ক'রে রেখেছিলেন, বড় ছেলেকে দিয়েছিলেন কলিয়ারী এবং ছোট যোগেশ্বরকে দিয়েছিলেন জানবাজারের বাড়ী এবং নগদ এক লক্ষ টাকা যা থেকে যোগেশ্বর একখানা ইংরেজী কাগজ বার করতে পারবে।

যোগেশ্বর তখন নবযুবক। কালের দিক থেকে তখন উনবিংশ শতাব্দী সবেমাত্র শেষ হয়েছে। বড় ভাই যজ্ঞেশ্বর কলিয়ারী ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিয়ে করেছেন—তাঁর চালচলন—রুচির সঙ্গে যোগেশ্বরের রুচির তফাৎ হয়ে গেছে, তিনি স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন; যোগেশ্বর অমৃতবাজার ছেড়ে ইংলিশম্যানে নিজের জায়গা করে নিয়ে দস্তুত মত সাহেব হয়ে উঠেছেন।

জানবাজারের বড় বাড়ীটায় প্রেস করবে যোগেশ্বর কল্পনা করেই দেবেশ্বর বাড়ীটা ওঁকে দিয়েছিলেন। কিন্তু যোগেশ্বর বাড়ীর সামনের যেটা পোষাকী মহল সেটা নিজের জন্যে রেখে বাকীটা ভাড়া দিয়েছিলেন—বেছে বেছে সম্পন্ন ফিরিঙ্গী টেনেণ্ট দেখে। তাঁর নিজের বাড়ীতে তিনি নিজে চাকর বাবুর্চি নিয়ে থাকতেন। বিবাহ অনেক দিন পর্যন্ত করেন নি। অবশ্য সেকালের বিচারে অনেক দিন। নইলে একালে সাতাশ বছর বয়সকে কে বেশী বয়স বলবে। লোকে নানান কথা বলত। এমন কি তাঁর ভাই এবং জ্ঞাতিবর্গেরা প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করতেও শুরু করেছিল যে যোগেশ্বর ধর্মহীন বা জাতিচ্যুত হয়েছেন। যাতে তাঁদের দেবোত্তরের এজমালী সম্পত্তির সেবায়েত স্বত্ব থেকে আইন আদালত করে বঞ্চিত করা যায়। ঠিক এই সময়েই যোগেশ্বর বিয়ে করলেন—করলেন একেবারে ব্রাহ্মণের কন্যাকে—খাঁটি হিন্দুধর্ম মতে—টোপর চেলী প'রে বর সেজে নারায়ণ শিলা সম্মুখে রেখে।

২

একান্তভাবেই ঘটনাচক্রে ঘটল। নইলে যোগেশ্বর এ সব গ্রাহ্য করতেন না। জীবন-ধারণের পন্থায় তিনি সাহেব ছিলেন—মতামতে তিনি মডারেট ছিলেন। নিখুঁত সাহেবী

পোশাক পরে চুরুট মুখে সভায় পার্টিতে ঘুরতেন, রাত্রিকালে ফিটনে চেপে বেড়াতেন। হোটেলে মধ্যে মধ্যে খানা খেতেন। মদ্যপান ছিল নিয়মিত। এবং নামও তখন তাঁর ছড়িয়েছে। বিলেতের কাগজেও লেখা বের হয়। হঠাৎ বাঁধা পড়ে গেলেন সুরেশ্বরের মা হেমলতার কাছে। হেমলতার মামা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট, মাঝারি পশার, কিন্তু থাকতেন ব্যারিস্টারী চালে অর্থাৎ বিলেত-ফেরতের চালে। সেদিক দিয়ে যোগেশ্বরের সঙ্গে মিল ছিল। হেমলতার মা-বাপ দুই-ই ছেলেবয়সে মারা যাওয়ায় সে মামারই পোষ্য হয়ে ছিল, কিন্তু অবজ্ঞার পোষ্য নয়। মামা-মামী দুজনের কাছেই ছিল তার পরম সমাদর। মামী শুধু মামীই ছিলেন না, তিনি তার পিসীমাও ছিলেন—আপন পিসীমা। সুতরাং মামাও একাধারে মামা ও পিসেমশাই ছিলেন। হেমলতাকেই নিজের মেয়ের মত যত্নে মানুষ করেছিলেন। এবং বেশ বেশী বয়সে যখন তাঁদের সন্তান হল—তখন স্নেহ তার উপর পড়লেও হেমলতার উপর তাঁরা নির্দয় হননি। হেমলতা তখন এণ্ট্রান্স পাশ করে কলেজে পড়ছে। সেই সময় যেন ঠিক লগ্নটিতেই যোগেশ্বর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন। হেমলতার বয়স তখন ষোল। যোগেশ্বর হেমলতাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই হেমলতার মামাকে চিঠি লিখে জানালেন যে তিনি হেমলতাকে বিবাহ করতে চান, এবং পাত্র হিসাবে অযোগ্য নন। তাঁর আয় ব্যয় যা কিছু সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ দিয়ে লিখলেন—"হেমলতার মত নেবার ভার আপনার উপর। বিবাহ হিন্দুমতে হবে যখন, তখন এ পদ্ধতিটাও সেই মতানুযায়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

মামা খুঁত্-খুঁত্ করেছিলেন বয়েসের জন্য এবং যোগেশ্বর সম্পর্কে গুজবের কথা শুনে। কিন্তু হেমলতা যোগেশ্বরকে দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিল। সেকালে, এণ্ট্রান্স পাশ করা হেমলতা একালের এম·এ পাশ মেয়ের থেকেও প্রগতিশীলা। তার উপর বাড়ীর চালটাই ছিল বিলেত-ফেরত না হয়েও বিলেত-ফেরতদের মত। লোকে বলত,—সূর্যের তাপে বালি তাতে—তার চেয়েও বেশী তাতে উনোনের উপর আগুনের তাপে—খোলার বালি। কথাটা খুব রঙচড়ানো নয়। হেমলতা নিজেই মামীকে বা পিসীকে বলেছিল—বয়সের জন্য খুঁত্-খুঁত্ করতে বারণ করো পিসীমা। কি বয়েস? ওর যদি তিরিশে বয়স হয়ে থাকে তবে আমিও ষোল, আমারও তো তা হলে প্রায় বুড়ী হওয়ার কাল হয়ে এসেছে গো। এ দেশে তো কুড়ি পেরোলেই বুড়ি। আর মদ-টদ—অন্য কথা। ও সব আমার ওপর ছেড়ে দাও।

তার প্রমাণও সে দেখিয়ে দিয়েছিল। একখানা চিঠি যোগেশ্বরকে লিখেছিল—আপনার প্রস্তাবে আমি মত দেব ভাবছি মামাকে। কিন্তু আপনি আমার মামার সামনে মদ খাবেন—এটা আমার কেমন লাগছে। মদ-টদ কিন্তু চলবে না। এটার প্রমাণ পেলেই আমার মত মামাকে জানাবো।

যোগেশ্বর এতে অরাজী হননি। হাজার হলেও বাঙালীর ছেলে—জাল জাতের সঙ্গে ছেলেবেলায় এইসব সুলভ সৌজন্য এবং শ্রদ্ধা প্রকাশের আচরণগুলিতে অভ্যস্তও ছিলেন এবং এ-সবের একটা মিষ্টি-স্বাদ স্মৃতিতেও ছিল। তিনি প্রস্তাবটিকে রাবিশ বলেননি বা এতে তিনি নিজে খাটো হবেন একথাও তাঁর মনে হয়নি। সুতরাং সেদিন রাত্রেই সাড়ে আটটার পর কাগজের আপিস থেকে বেরিয়ে সটান হেমলতার মামার বাড়ীতে উঠে সিঁড়ির মুখেই চুরোটটা

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকছিলেন। হেমলতার মামা সামনে হুইস্কির গ্লাস রেখে বসে ছিলেন। যোগেশ্বরকে দেখেই বেয়ারাকে ডেকেছিলেন, "বয়, গ্লাস লে আও।" যোগেশ্বর বলেছিল—নো থ্যাঙ্কস। পেগ নয়—বরং চা এক কাপ! হেসে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—আপনি গুরুজন—মামাশ্বশুর হবেন। ওটা আর আপনার সামনে চলতে পারে না। আমরা হয়তন নই ইস্কাপন। ইস্কাপনী ধারাটাই ভাল। তার উপর বিয়ে হলে হবে খাঁটি হিন্দুমতে। রেজেস্ট্রীতে ডাইভোর্স আছে। বিধবা-বিবাহ আছে। জানেন—Spade is always a Spade—আপনাকে চিঠি লিখে অবধি রেজেস্ট্রী বিয়ের কথা ভাবতে গেলেই বুকটা রি-রি করে উঠছে। তার ওপর আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তি অনেক বড়, জ্ঞাতি-গুষ্টিরা শুনেছি খুঁত খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রেজেস্ট্রী বিয়ে করলে তাল ঠুকে নালিশ ক'রে বসবে! তবে এটার চেয়ে ওটা বড়। ভারী ভাবতে ভাল লাগছে—আমি মরে গেলেও হেমলতা আমার ফটোয় মালা পরাচ্ছে চন্দন দিচ্ছে।

সুতরাং বিয়ে হতে আর বিন্দুমাত্র বাধা হয়নি। তবে ওই শেষ কথাটার জন্যে হেমলতা রাগ করেছিল, না-ও বলেছিল। যোগেশ্বর রাগ ভাঙিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ও কথাগুলো আমি উইথড্র করছি। তার বদলে বলছি—তুমি মরলে আমি কাঁদছি, সিঁথিতে সিঁদুর ঢেলে দিচ্ছি—পায়ে আলতা—আমি না—অন্যকে দিয়ে পরিয়ে দিচ্ছি। বেনারসী কাপড় পরিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সমারোহ করে চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ করছি।—

হেমলতা হেসে ফেলেছিলেন—তুমি ইনকরিজিবল। থাম!

বিয়ে হয়েছিল ১৯০৯ সালে, মার্চে। সেদিক দিয়ে রোমান্টিক ছিলেন যোগেশ্বর। বসন্তকাল শুক্লপক্ষ দেখে দিন নির্বাচন করেছিলেন—যার কদিন পরেই হোলি। শোলার টোপর গরদের পাঞ্জাবী বেনারসী ধুতি-চাদর গোড়ের মালা চন্দনের তিলক-সজ্জা—বাকী কিছু রাখেননি। বিয়ের পর হোলির সময় দীর্ঘকাল পর কীর্তিহাটে গিয়ে এক সপ্তাহ থেকে মধুচন্দ্রিমা যাপন করে এসেছিলেন। এবং সেবার হোলিতে নিজের খরচে রাজরাজেশ্বরের নাটমন্দিরে কলকাতা থেকে বাঈজীর নাচ করিয়েছিলেন।

এর প্রায় এক বছরের মধ্যেই জন্ম হয়েছিল সুরেশ্বরের। ফাল্গুনের শেষে ওই হোলির দিনই সুরেশ্বরের জন্ম। হেমলতা ওকে ডাকতেন সেই জন্য ফাল্গুনী বলে। এমন সুন্দর নামটা—ভাল নাম হতে বাধা হবার কথা নয়—কিন্তু কীর্তিহাটের কুড়ারাম ভট্টাচার্যের ছেলে সোমেশ্বর রায় নাম গ্রহণ করার পর থেকে ঈশ্বর পরিশেষে যুক্ত না করে নাম রাখবার নিয়ম নেই। যোগেশ্বর যে যোগেশ্বর তিনি ছদ্মনামে লিখবার জন্য যে নাম নিয়েছিলেন তাও ঈশ্বরের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি—"ওমনি-পোটেন্ট" নামে লিখতেন। সেই কারণে ১৯১০ সালে বাংলাদেশের নেতা এবং সংবাদপত্র ক্ষেত্রে তখনকার সিংহ সুরেন্দ্রনাথের নামটাকেই অর্থাৎ সুর-ইন্দ্রকেই সুরেশ্বর করে নামকরণ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগেশ্বরের প্রবল মত-পার্থক্য ছিল—বেঙ্গলী আর ইংলিশম্যানের মতপার্থক্য—তবু তিনি অর্থাৎ যোগেশ্বর তাঁকে বলতেন লায়ন অব বেঙ্গল।

চাকর দারোয়ান ডাকত 'লাল' বাবু বলে। আসলে ফাগুলাল কিন্তু হেমলতার ভয়ে

লালবাবু হয়েছিল।

লাল সত্যই রূপের অধিকারী ছিল, এবং বাপের দুলাল ছিল। মা শাসন করতে চাইতেন কিন্তু বাপ দিতেন না।

মধ্যে মধ্যে এ নিয়ে বাগ্‌যুদ্ধ হত স্বামী-স্ত্রীতে। হেমলতা বলতেন—দেখ সব বিষয়ে তুমি আমাকে দাবিয়ে রেখেছ, ছেলের ক্ষেত্রে তা চলবে না, আমি মানব না।

যোগেশ্বর কপালে হাত ঠেকিয়ে বলতেন—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং।

—তার অর্থ ?

—অতি সরল। তোমাকে আমি দাবিয়ে রেখেছি এ অপবাদও শুনতে হল—এবং হ'ল-হ'ল তোমার মুখ থেকেই হল ?

—রাখনি দাবিয়ে ? তুমি আমার কোন কথাটা রাখ ?

বাধা দিয়ে যোগেশ্বর বলতেন—সে তুমি বললেও হবে না—আমি বললেও হবে না। সাক্ষী মান। বলুক তৃতীয় পক্ষ !

হেমলতা বলেছিলেন—তোমার চাকর-বাকর তো তোমাকে ভয় করে।

—বেশ তো ডাক না, এই বাড়ীর প্রায় সামনে শিককাবাবওলা আবদুল কি বলে—ডেকে জিজ্ঞেস কর !

—আবদুল ? কি বলে আবদুল ?

—আবদুল বলে—সাদী করকে রায়-সাহেব তো শের সে শিয়ার বন গয়া। সাদীকা পহেলে বারা-এক বাজেতক মায়দানমে ফিটনকে পর ঘুমতা, শেরকে মাফিক আওয়াজ দেতা। কনেষ্টবল লোক সেলাম দেতা। ঘরকে দরওয়াজা পর পৌঁছছ কর শেরকে মাফিক ফুকারতা—কেয়া বানায়া রে আবদুল ? আর সাদীকে বাদ দেখো—নও বাজতা আওর রায় সাহেব ঘর মে পৌঁছছ যাতা—, আবদুলকো ফুকারতা নেহি—কাবাব ভি খাতা নেহি—ঘর ঘুষ যাতা। বারা বাজতা বাতি বুত যাতা। পহলে—দো-তিন তক বাতি জলতা, রায় সাহাবকো আওয়াজ মিলতা—বোয় ! খানা টেবিলসে বর্ত্তন-উর্ত্তন ফেক দেতা—ঝন-ঝন-ঝন-ঝন—! বাস। আব বলো—ঠিক বোলা কি ঝুট বোলা ! নেকড়ানি ফিরিঙ্গী ছোকরী লোক তো রোতি হ্যায় উনকো লিয়ে !

হেমলতা এ সবের একটাও অস্বীকার করতে পারতেন না—মুখ টিপে হেসে বলতেন—লোকটাকে আমি বকশিস করব, কিন্তু তার জন্যে আপশোস হয় না কি ?

—একবারে হয় না বলতে পারিনে। তবে তার থেকে অনেক বেশী আনন্দ এবং আরাম তাতে সন্দেহ নেই। ছেলেবেলা কীর্তিহাটে চণ্ডী ভটচাজ ছিল তন্ত্রসাধক। দিন-রাত্রি মদ খেয়ে থাকত, টলত। তার ভায়ে অমর মুখুজ্জে গাঁজা খেতো। চণ্ডী ভটচাজ বলতেন—ওরে অমরা, আমি একদিন একছিলম গাঁজা খেয়েছিলাম—তিনদিন হুঁস ছিল না—সেই গাঁজা তুই ব্যাটা দিনে তিনবার টানিস ! তা দেখ, বিয়েও আমার কাছে তাই। ওই একবার খেয়ে যে বুঁদ হয়ে গেছি সে বুঁদ নেশা আর কাটল না। রাত্রি নটা হ'তে না হ'তে সেই বিয়ের রাতের চাঁদ ওঠে মনের মধ্যে। কলায় কলায় বাড়তে থাকে মিনিটে মিনিটে ! পূর্ণ চন্দ্র

দেখতে ছুটে এসে আমি হাঁ করে চেয়ে থাকি! তুমি ভেবো না, ব্যাটার ষোল বছর হতে-না-হতে বিয়ে দিয়ে দেব। আমি শেয়াল হয়েছি—ব্যাটা খরগোস হয়ে যাবে।

—কিন্তু তরিবৎ সহবৎ লেখাপড়া—এগুলো চাই না কি?

—ডোণ্ট ওরি—ডার্লিং, তুমি মা, আমি বাপ, আমার বাপ দেবেশ্বর রায় এম-এ, তার বাপ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় বি-এ, তার বাপ বীরেশ্বর রায়,—তিনি নীলকরদের ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন, পাদরী হিল সাহেবের কাছে ইংরিজী শিখেছিলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহী প্রভৃতির বিদ্যোৎ-সাহিনী সভায় তাঁর নেমন্তন্ন হত। রত্নেশ্বর মানুষ হয়েছিলেন পিসেমশাইয়ের কাছে। পিসেমশাই বিমলাকান্ত ছিলেন সংস্কৃতে ইংরিজিতে পণ্ডিত। সোমেশ্বর তাদের পূর্বপুরুষ—তিনি সংস্কৃত, পার্সী, উর্দু ভাল জানতেন। এ বংশের সুরেশ্বর তরিবৎ সহবৎ লেখাপড়া সব শিখবে।

যোগেশ্বরের অতিবাৎসল্যের আর একটু কারণ ছিল; সুরেশ্বরের জন্মের দু বছর পর হেমলতা আবার সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন এবং প্রসবের সময় মরণাপন্ন হন। বহু কষ্টে বহু অর্থব্যয়ে কলকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের অস্ত্রোপচারের ফলে মরা সন্তান কেটে বের করে দেওয়া হয়, এবং সেই সঙ্গে হেমলতারও আর সন্তান ধারণের শক্তি শেষ হয়।

যোগেশ্বর সেটা মনে পড়িয়ে দিতেন—আর তো হবে না। তাছাড়া আমরা যখন আমরা হয়েছি তখন ও-ও তাই হবে, মা ভৈঃ।

নিরস্ত হতে হ'ত হেমলতাকে। হয়তো স্বামী-গরবিণী অন্তরে অন্তরে পুলকিতও হতেন।

* * *

মা ভৈঃ বলতেন বটে যোগেশ্বর কিন্তু এগার বছর বয়সে তিনি ছেলেকে নিজেই ভয় পেলেন। তিনি যে চেয়ারটায় অনড় হয়ে বসেছিলেন ইংলিশম্যান আপিসে ১৯০৫ সাল থেকে, সেই চেয়ার-টায় ধাক্কা দিয়ে তাঁকে চমকে দিল এগার বছরের ছেলে সুরেশ্বর। অবশ্য তিনি নিজেই যেন চঞ্চল হয়ে অন্যমনস্ক ছিলেন, ঠিক শক্তভাবে নিজের পুরো চাপ দিয়ে বসে কর্মনিমগ্ন ছিলেন না। সেটা উনিশশো একুশ সাল—অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। যোগেশ্বর বরাবর ইংরিজীর ভক্ত, ইংরেজ শাসন ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। এর জন্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথকে তিনি মানেননি। বেঙ্গলীর এডিটোরিয়ালের জবাব লিখেছেন। ১৯০৫ সালে কোথায় এক-টিন বিলিতী বিস্কুট ভেঙ্গে ছড়িয়ে গুঁড়ো করার জন্য তিনি একটা প্যারা লিখেছিলেন—"একটি আবিষ্কার"। তাতে লিখেছিলেন—"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলাম যে, ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্যের স্বত্বের দলিল নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ বিস্কুটের টিনে প্যাক করে রেখে দিয়েছে। সেই সত্য আবিষ্কার করেছেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং তাঁর সহকর্মীরা। সম্প্রতি স্থানে স্থানে বিস্কুটের টিন পেলেই ভেঙে দেখা হচ্ছে দলিলখানা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কর্তারা বিস্কুটগুলো অপচয় করছেন কেন? সেগুলো খেলে তো পেট ভরে।"

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সরকার থেকে তিনি মেসোপোটেমিয়া ফ্রন্ট এবং ওদিকে ফ্রান্সে ভার্দুন পর্যন্ত ফ্রন্ট দেখে এসেছিলেন।

গান্ধী যখন কলকাতায় এসে ভূপেন বোসের বাড়ী অতিথি হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁকে

দেখেছেন—আলাপ করেছেন। তাঁর ভাল লাগেনি। বাড়ীতে হেমলতার সঙ্গে আলোচনায় বিদ্রূপ করেছেন। বিদ্রূপ করেছেন তাঁর বেশভূষার জন্য, বিদ্রূপ করেছেন তাঁর ফল খেয়ে থাকার জন্য, তাঁর অদ্ভুত মতবাদের জন্য। এবং যেদিন রাউলাট বিলের প্রতিবাদে হরতাল ডেকে শেষ পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগের মত মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটল সেদিন তাঁর যত ক্রোধ হয়েছিল ইংরেজের ওপর এমন কি সার মাইকেল ওডায়ার ও জেনারেল ডায়ারের উপর তার চেয়েও তাঁর ক্রোধ হয়েছিল গান্ধীর উপর। সেই—সেই ব্যক্তিই এর জন্য দায়ী। কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলেন ব্যক্তিটির ভারত চিত্ত অনুভবের শক্তি দেখে। এত তাপ এদেশের মাটির মত মানুষের মধ্যে সঞ্চিত ছিল ? তারপর ধীরে ধীরে যে বিচিত্র পরিচয়ে এই খর্ব কৃশকায় ব্যক্তিটি নিজেকে উদ্ভাসিত করেছিলেন এবং যার প্রতিচ্ছটায় ইংরেজের নতুন চেহারা দেখিয়েছিলেন, তাতে তাঁর বিস্ময় জেগে উঠছিল। কলকাতার কংগ্রেসে তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকটিকে দেখছিলেন। স্তিমিত কৃশকায় ছোট একটি মানুষ! তেমনি বেশভূষা! অথচ—!

এ নিয়ে ইংলিশম্যানের সম্পাদকীয় বৈঠকে আলোচনা হত। প্রথমদিকে তিনি ছিলেন প্রখর বক্তা। তারপর যত দিন গেল তত তিনি হয়ে উঠলেন নীরব থেকে নীরবতর। ইংলিশ-ম্যানের খোদ সম্পাদক মশায় ছিলেন যোগেশ্বরের বন্ধু এবং গুণমুগ্ধ। সব থেকে ভাল লাগত তাঁর যোগেশ্বরের শ্লেষভরা উক্তি!

তিনি একদিন প্রশ্ন করেছিলেন—মিস্টার রে—

যোগেশ্বর হেসে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন, কথা বলেন নি!

সম্পাদক বলেছিলেন—তুমি এমন নীরব চুপচাপ হয়ে যাচ্ছ কেন ?

চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চেয়ারের পিছন দিকে হেলান দিয়ে বসে যোগেশ্বর বলছিলেন —হয়ে যাচ্ছি, না ?

—কি হয়েছে ?

—ঠিক জানি না। তবে দেখ, আমার বাড়ীতে একটা কুকুর ছিল, কিছু দুর্ঘটনা ঘটবার হলে সেটা কেমন গুড়িগুড়ি পাকিয়ে কোণ খুঁজে বেড়াত আর মধ্যে মধ্যে মৃদু শব্দ করত। আমারও মনে হচ্ছে ওই কুকুরটার ছোঁয়াচ লেগেছে। **I am smelling something like that** —একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—**Something will happen.** —আমি যেন কারুর **footsteps** শুনতে পাচ্ছি!

—**Oh Ray**—তুমি যে মিস্টিক হয়ে পড়ছ—

—**Perhaps.** বলে হেসেছিলেন যোগেশ্বর।

তারপরও নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীর নন-কোঅপারেশন নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। হাওড়া প্ল্যাটফর্মে সি আর দাশের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলে আপিসে ফিরে খুব কড়া ভাষায় লিখেছিলেন সম্পাদকীয়। প্রবন্ধটা কড়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর যেটা বৈশিষ্ট্য—শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ সেটা ঠিক ছিল না তাতে। এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন কংগ্রেসের অধিবেশনে এই খর্বকায় কৃশতনু ব্যক্তিটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হবেন। কলকাতা কংগ্রেসে যে প্রস্তাব উপস্থিত হয়েছে তা নাগপুরে নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যাত হবে। সি আর দাশ তো সেজেই গেছেন ডেলিগেট নিয়ে।

কিন্তু আশ্চর্য! সি আর দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, লালা লজপত রায়, পণ্ডিত মালব্য, মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না, সভাপতি বিজয়রাঘব চারিয়া—সকলে এই ব্যক্তিটির প্রভাবে এক বাক্যে কলকাতায় গৃহীত প্রস্তাব কনফার্ম করে গ্রহণ করলে। যোগেশ্বরের বিস্ময়ের অবধি রইল না। যেদিন খবরটা আসে সেদিন তাঁকেই বলা হয়েছিল সম্পাদকীয় লিখবার জন্য। কিন্তু কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসে থেকে তিনি প্রধান সম্পাদককে স্লিপ পাঠিয়েছিলেন—আমার মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে। আজকের লীডার তুমি নিজে লিখো। আমি বাড়ী যাচ্ছি। দীর্ঘক্ষণ তিনি গঙ্গার ধারে বসে থেকে বাড়ী ফিরেছিলেন। এবং সে রাত্রে যে মস্তটুকু নিয়মিত খান তা খেয়ে উঠতে পারেননি—চিন্তার মধ্যে। এত ভুল হল তাঁর?

তারপর একুশ সালে আরম্ভ হল আন্দোলন। তিনি আপিসের রিভলভিং চেয়ারে বসে ঘুরতেন—এটা যেন নেশা হয়ে গেল তাঁর। তিনি মনে মনে ঘুরতেন চারিদিক। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটাকেও ঘোরাতেন।

একটা নতুন চেহারা। গোটা দেশটার একটা নতুন চেহারা। মণ্ডপ মদ ছাড়ছে। চাকুরে চাকরী ছাড়ছে। ছাত্ররা পরীক্ষার হলের সিঁড়িতে শুয়েছে, নিজেরা পরীক্ষা দেবে না—অন্যদের দিতে দেবে না। শোভাযাত্রীর উপর লাঠিচার্জ হচ্ছে। তাদের অ্যারেস্ট করে জেলে পাঠানো হচ্ছে; কিন্তু একদল যাচ্ছে আর একদল তার স্থান পূরণ করছে। মেয়েরা জেলে যাচ্ছে। বাসন্তী দেবী জেলে গেলেন দাশ মশায়ের পিছন পিছন। এ হ'ল কি?

ইংরেজরা গাল দিচ্ছে।

সুরেন্দ্রনাথ পিছিয়েছেন। তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি নিজে তাঁরও পিছনে অনেক পিছনে। তিনি ইংলিশম্যানে এডিটোরিয়াল লিখছেন। তাঁর পিতা দেবেশ্বর রায় বিপ্লবীদের সমর্থন করেছেন গোপনে - অর্থ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি? এমনিই অবস্থায় ওই ঘোরানো চেয়ারখানা কিসের ধাক্কায় যেন উল্টে যাই-যাই হ'ল। টেলিফোন বেজে উঠল। তিনি রিসিভার তুলে ধরে বলেন—রয়!

ওদিক থেকে কথা ভেসে এল—আমি হেম বলছি!

—কি? কি খবর?

—তুমি বাড়ী এস। গাড়ী গেল।

—এই তো ঘণ্টাখানেক বাড়ী থেকে এসেছি—

—সুরেশ্বর ইস্কুল থেকে ফেরেনি। গাড়ী ফিরে এল—তাকে পায়নি।

—মানে?

—সে টিফিনে বেরিয়ে চলে গেছে। ক্লাসের বন্ধুরা বলেছে—সে বড়বাজার গেছে পিকেটিং করতে!

—পিকেটিং করতে?

—হ্যাঁ।

যোগেশ্বর তৎক্ষণাৎ উঠে বেরিয়ে এসেছিলেন আপিস থেকে। সেই এসেছিলেন আর ঢোকেন নি।

রাত্রি হয়েছিল সুরেশ্বরকে বের ক'রে আনতে। সার্জেন্টের হাতে সে মার খেয়েছিল। থানার লকআপ থেকে বের করে আনতে হয়েছিল। তাতে সুরেশ্বর অপ্রতিভ হয়নি, লজ্জিত হয়নি, সগৌরবে ঘোষণা করে বলেছিল—আমি ওঁকে ইঁট মারতে পারতুম কিন্তু মারতে মানা। অহিংসার মানে কি হয় বাবা?

যোগেশ্বর আগে হ'লে বলতেন—কাউয়ার্ডিস। ভীরুতা হল এর মানে। কিন্তু সেদিন তা বলতে পারেননি। বেটনের ঘায়ে সুরেশ্বরের পিঠে কয়েকটা দাগ উঠেছিল। তিনি তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—

—মার খেয়ে তুমি বলেছিলে—আর করব না?

—না। সবেগে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করে সে বলেছিল—আমি বন্দে মাতরম বলেছিলাম!

—তুমি এখন শুয়ে পড়। এখুনি ডাক্তার আসবেন।

এরপর একলা ঘরে পায়চারি করেছিলেন। মধ্যে মধ্যে অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলেন—He is the man. Yes, He is the man.

চাকর হুইস্কির বোতল গ্লাস সোডা দিয়ে গিয়েছিল, প্লেটে মাংসের বড়া—হেমলতার নিজের তৈরী, দিয়েছিল, তার সঙ্গে স্যালাড এবং একটা কাটলেট। যা তাঁর নিত্যকারের খাদ্য। কিন্তু ও-সবের আকর্ষণেও তিনি চেয়ারে এসে বসেননি। সেই ঘুরেই বেড়াচ্ছিলেন। ছেলেকে ডাক্তার দেখিয়ে ঘুম পাড়িয়ে হেমলতা তাঁর ঘরে এসে ঢুকে সবিস্ময়ে বলেছিলেন—একি? এখনও ঘুরপাক খাচ্ছ? ভয় নেই, বস, সুরো ঘুমিয়েছে, ডাক্তার দেখে বললে—হ্যাঁ—মার খেলেই দাগ ওঠে। নাথিং—সিরিয়াস। হাসপাতালে একে বলে মাইনর ইনজুরি।

—হুঁ। আর একটা পাক ঘুরে আসতে আসতেই হেমলতার কানে তাঁর ওই He is the man কথাটা গিয়েছিল। বলেছিলেন—কি বলছ?

—ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, বল তো এদেশের সব থেকে বড়লোক—আই মীন গ্রেটেস্ট মেনদের নাম। ফাইভ অর সিক্স।

—কেন রামমোহন রায়?

—তাঁর নাম—কীর্তিহাটের লোকে জানে? তাছাড়া উনি তো টাটকা—। পাঁচ হাজার বছর পর যাদের নাম থাকবে—ফাইভ—বল!

—তা হ'লে—। শ্রীরামচন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ—

—ওঁরা অবতার।

—তা হলে—বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—

—দ্যাটস ইট। কারেক্ট। এদেশে রাজা রাজপুত্র বীর—এরা নয়—বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ দ্বিজ সন্ন্যাসীজ—এরাই বড়। এরাই বেঁচে থাকে। এবং If I am not wrong, একটু ভেবে বলেছিলেন—no—I am not wrong,—this man—this Mr. Gandhi

—he is one of them. লোকটা ঘরে থাকবে না। নিশ্চয় চলে যাবে ঘর ছেড়ে। দেখো।

—তোমার হ'ল কি? বস, খাও। খাবার জুড়িয়ে গেল—

—যাক। বোতল গ্লাস সোডা নিয়ে যেতে বল। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাও!

—না-না—পাগলামী করো না, এতদিনের অভ্যেস! বরং কমাতে পার।

—নো। মরদ কি বাত—হাতী কি দাঁত। আমি বন্য শূকর নই। শূকরেরও দাঁত থাকে—সে দাঁতে কোন কাজ হয় না!

খাননি মদ।

পরদিন সকালে উঠে চলে গিয়েছিলেন বাজারে, চীৎপুর বেন্টিক স্ট্রীট অঞ্চলে। হেমলতা বলেছিলেন—কোথায় যাচ্ছ?

—আসছি। ব্যস্ত হয়ো না।

ঘণ্টা দেড়েক পরেই ফিরে এসেছিলেন এক সেতার এবং এক বেহালা নিয়ে।

হেমলতা সবিস্ময়ে বলেছিলেন—ও মা! এ কি হবে?

—বাজাবো।

—এই বুড়ো বয়সে সারেগামাপাধানিসা? কি খেয়াল তোমার?—হেমলতা তাঁর বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গীতানুরাগের কোন পরিচয় পান নি। যোগেশ্বর হেসে বলেছিলেন—ক্ষণেক অপেক্ষা কর!

ব'লে বেহালাখানা নিয়ে সুর বেঁধে বাজিয়েছিলেন কিছু। এবং অতি নিপুণ সুন্দরভাবে বাজিয়েছিলেন।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন হেমলতা। কথা বলতে পারেন নি। সুরেশ্বরও এসে দাঁড়িয়েছিল। যোগেশ্বর হেসে প্রশ্ন করেছিলেন—কি বাজালাম জান?—

সুরেশ্বর বলেছিল—আমি বলব বাবা?

—পার বলতে? হ্যাঁ তা পারবার কথা। বল—

—একি রূপ হেরি হরি ধরেছ যোগীর বেশ—। বাগেশ্রী!

—রাইট। তারপর হেমলতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—গ্রামোফোনের সামনে ব'সে ওর গান শোনা এবং গলা মেলানো দেখ নি! কিন্তু গলা নেই। তবে সঙ্গীত রোখটা আমাদের রক্তে আছে বংশগত! শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষে একজন ছিলেন মস্ত বড় সাধক। আর গানে ছিলেন সিদ্ধহস্ত অর্থাৎ যন্ত্রী!

—কই, আমাকে তো কখনও বলনি?

—কি বলব? ছেলেবেলা কীর্তিহাটে ছিলাম ক' বছর। ঠাকুরদা তখন বেঁচে। তখন শিখেছিলাম। কিন্তু বাবা আমাকে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, ওটা তুমি শিখো না। তা হলে আর কিছু হবে না। বৃদ্ধ বয়সে ওটা নিয়ে বসো। তখন কল্যাণ হবে।

—সে বয়স এই চল্লিশ বছর বয়সেই হল?

—হ'ল বই কি! আজ থেকে বানপ্রস্থ।

এর অর্থটা ঠিক বুঝতে পারেন নি হেমলতা। মানে চেষ্টাই করেন নি। দুপুরবেলা খেয়ে শোবার সময় বলেছিলেন—দেখ আমাকে আজ আর ডেকে ঘুম ভাঙিয়ো না। মানে নট বিফোর ফোর। কোচম্যানকে বলে দিয়ো গাড়ী চাই না।

—আপিসে যাবে না?

—না, ওবেলাতেই চুকিয়ে দিয়েছি পাট!

—কি যে হেঁয়ালী কর—

—বলি নি তোমাকে, চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছ? বিস্ময়ের অবধি ছিল না হেমলতার। কারণ জালিয়ানওয়ালাবাগের সময় থেকেই সে বহুবার অনুরোধ করেছে সায়েবদের ইংরিজী কাগজ ছাড়তে। কিন্তু যোগেশ্বর ছাড়েন নি। বলেছিলেন—হেম, সেন্টিমেণ্ট ইমোশন বড় সর্বনাশা। ওর একসেস যখন হয় তখন আত্মহত্যার ঝোঁক চাপে মানুষের। পাথরে মাথা ঠোকে মানুষ—মাথা রক্তাক্ত হয়। পাথর ভাঙে না—মানুষের মাথা ভাঙে। এই পাথরে কাঁচা মাথা ঠুকে মাথা ভেঙে আত্মহত্যার সেন্টিমেণ্টাল ইমোশনালিজ্‌ম থেকে জাতটাকে বাঁচানো আমার মিশন। অন্যে না বুঝুক, তুমি অবুঝ হয়ো না! বিশ্বাস রাখ আমি বুঝি। অনেক বুঝি। এই ইংরেজ জাত যত বড় তত নিষ্ঠুর! আজ সেই লোক চাকরী ছেড়ে দিয়েছে শুনে হেমলতা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন!

যোগেশ্বর বলেছিলেন—অবাক হয়ে গেছ?

—তা হয়েছি!

—দুঃখিত হয়েছ?

—না। খুশী হয়েছি।

—সত্য কথা?

—তার থেকেও বেশী কিছু! বোঝাতে পারব না তোমাকে!

—তাহ'লে—

—কি—

—তা হলে—গিভ মি এ—

—পাগল! উন্মাদ! এত বড় ছেলে পাশের ঘরে!

—তা বটে। জান ওই ওরই জন্যে—না ওর জন্যে নয়, ও আমার একটা দুরন্ত ভয় ঘুচিয়ে দিয়েছে। আই ওয়াজ এ কাওয়ার্ড! ভয়ে বলতাম ইংরেজ পাথর। ও মাথা ঠুকে অক্ষত মাথা নিয়ে ফিরে এসে আমাকে দেখিয়ে দিল যে না তা নয়।

—যাক। তুমি ঘুমোও। আমি সুরোকে ঘরে বন্ধ করেছি। তার কাছে যাই! বিকেলে কিন্তু খদ্দর কিনতে যাব। সুরোকে কথা দিয়েছি।

—শোন—আর একটা কথা।

—কি?

—আমাকে ঘুম পাড়িয়ে মা-বেটা দুজনেই যেন বেরিয়ে পড়ো না পিকেটিংয়ে।

—ঠাট্টা হচ্ছে ?

—মোটেই না। বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছি। সুন্দরী প্রগতিশীলা লেখাপড়া জানা মেয়ে তুমি। তবুও কোনদিন বুড়ো বয়সের ব্যাধি যেটা সেটাকে প্রশ্রয় দিই নি। মানে সন্দেহ-বাতিক। আজ ভয় হচ্ছে—ছেলের কাছে ঘায়েল হয়ে কাত হয়েছি। তুমি তাতে পুলকিত। আনন্দে আটখানা হয়ে খদ্দর কিনতে যাচ্ছ। দেখো, উৎসাহবশে দোকান থেকে বেরিয়েই পিকেটিংয়ে নেমো না মা বেটায় !—জেলে যাও, কষ্টেস্থষ্টে বিরহ সইতে পারব। কিন্তু উদ্বেগের সীমা থাকবে না, মনে মনে কোন পিকেটিংরণ নিপুণপ্রদীপ্ত পুরুষকে জয়মাল্য দিলে !

হেমলতা সেকালের আধুনিকা। কালটা একদিকে যেমন ক্ষোভ আর রোষের যুগ তেমনি রসের যুগ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসে গৌড়ভূমি ভেসে গেছে। হেমলতা রাগ করেন নি। তিনি হেসে বলেছিলেন—দেখ, তোমার এই রসবোধের জন্যই বয়সের বার তের বছর তফাত সত্ত্বেও আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। তোমরা জমিদার, তুমি জার্নালিজমে নামী লোক, শৌখীন সাহেব মানুষ, তোমার ফ্রেঞ্চছাঁট দাড়ি আছে, সে জন্যে নয়। আজ এই চাকরী ছাড়লে মদ ছাড়লে এর জন্যে admiration—প্রায় ভক্তিবাদে এসে পৌঁচেছে। ভেবো না। ইন্দ্র হাতছানি দিয়ে শচীত্ব অফার করলেও আমি মরতে চাইব না। তোমাকে ফেলে ! বলে স্বামীর ঠোঁটের উপর ঠোঁট রেখেছিলেন।

যোগেশ্বর পরবর্তীকালে বলতেন—ওই দিনটি তাঁর জীবনে সর্বোত্তম সুখের দিন !

এর পর সেতার বেহালা নিয়ে পড়েছিলেন যোগেশ্বর। ওস্তাদ রেখেছিলেন। এবং শেখার সময় সুরেশ্বরকে কাছে রাখতেন। সুরেশ্বর জন্মাবধি যে সঙ্গীতবোধ নিয়ে জন্মেছিল—তাতে সে না-শিখেই বাঁয়া তবলা বাজাতে পারত। আর ছবি আঁকত যেখানে সেখানে।

সে বছর খানেক। এর মধ্যেই ক্রমে ভাঁটা পড়ে এল আন্দোলনে। জেলখানায় দেশবন্ধু দাশের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের কথা হ'তে হ'তে বন্ধ হল। গান্ধী রাজী হলেন না। অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন যোগেশ্বর।

হঠাৎ গানবাজনা বন্ধ ক'রে পড়াশোনায় মাতলেন। সুরেশ্বরকে ইস্কুল তিনি তখনই ছাড়িয়েছিলেন। বাড়ীতে মাস্টার রেখে পড়াচ্ছিলেন। সুরেশ্বর যদৃচ্ছ পড়ত। তার কোন বাধানিষেধ ছিল না। তিনি নিজে পড়তে লাগলেন—গীতা চণ্ডী থেকে শুরু করে রামায়ণ মহাভারত—উপনিষদ পর্যন্ত।

হেমলতা শঙ্কিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন—এ কি করছ তুমি ?

—একটা মীমাংসা খুঁজছি। An answer—

—কিসের ?

—বাঘ সাপের সামনে ননভায়োলেন্স—অহিংসার কিছু দাম আছে কিনা ? এবং মানুষের প্রকৃতির মধ্যে বাঘ সাপের প্রকৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় কিনা ? কথাটা বুঝেছিলেন হেমলতা। উত্তর দিতে পারার তাঁর কথা নয় কিন্তু তিনি বলতে পারতেন, কেন এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি ? স্বাভাবিক নিয়মে যা ঘটবার তা ঘটবেই ! বা এই ধরণের কোন কথা তিনি নিশ্চয় বলতে পারতেন কিন্তু তাও তিনি বলতে পারেন নি !

যোগেশ্বর বলেছিলেন—নর্থ পোল সাউথ পোলেও ছ মাস দিন—ছ মাস রাত্রি। ডার্কনেস অ্যাণ্ড লাইট। সমান অধিকার। সূর্যলোকে গেলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়! দ্যাট ইজ ডেথ। এ লোকটি ভুল করলে। গান্ধী! ইংরেজ নিজেকে ব্রিটিশ লায়ন বলে, কিন্তু আসলে সে বাঘ! এত বড় এম্পায়ার যে সে গড়েছে তাতে তার ক্যারেক্টারে সিংহের ক্যারেক্টারের স্ট্যাম্প নেই, আছে বাঘের। ব্রিটিশ জাস্টিস ততক্ষণ যতক্ষণ তার এম্পায়ার অনড় আছে। নতুন গড়া নতুন পাওয়া কোম্পানীর দেওয়ানীর মধ্যে প্রজার উপর অত্যাচার হয়েছিল, কটা রাজা রাণী বেগমের ওপর অত্যাচার হয়েছিল ব'লে হেস্টিংসের ইম্পীচমেন্ট হয়েছিল, বার্ক সেরিডনের কণ্ঠস্বর হেস্টিংসকে তিরস্কার করে পৃথিবীকে চমকে দিয়েছিল; কিন্তু আর তা হবে না, নিশ্চিত থাক। অক্টারলোনী মনুমেণ্টটাকে আমি আওয়াজের ধাক্কায় কাঁপতে দেখি! দিস ম্যান—আশ্চর্য ক্ষমতা কিন্তু এক ভুলে সব মাটি করে দিলে। আমি চোখে দেখছি!

হেমলতা এবার বলেছিলেন—তুমি কাগজ বের কর। লেখ।

—কাগজ?

—হ্যাঁ।

—উঁহুঁ—ও আমার দ্বারা হবে না। লিখতে পারলেই কাগজ বের করা যায় না!

—কেন—তোমার তো টাকার অভাব নেই!

কথাটা মিথ্যে ছিল না। তাঁর বাপ তাঁকে এক লাখ টাকা নগদ দিয়েছিলেন—কাগজ বের করবার জন্যেই। বড়ছেলেকে কলিয়ারী দিয়েছিলেন, তাঁকে দেন নি—তার জন্যে। এ ছাড়া এত বড় বাড়ীটা দিয়েছিলেন—সেও এরই জন্যে। নিচের তলায় প্রেস হবে। উপরতলায় আপিস। একদিকে কিছুটা নিয়ে তিনি থাকবেন; প্রয়োজন হলে তেতলায় ঘর তুলে নেবেন। কিন্তু যোগেশ্বর তা না ক'রে কাগজের আপিসে চাকরীই করেছেন। বাড়ীর নিচের তলাটা ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়া দিয়েছেন বড় বড় কোম্পানীকে। তারা গুদোম করেছে। চাল ডাল খাদ্যদ্রব্য যাতে ইঁদুর লাগে—তাদের দেন নি; পাটওয়ালাদের দেন নি আগুনের ভয়ে। দিয়েছেন হগ মার্কেটের, ধর্মতলার যারা স্টেশনারী জিনিস আমদানী করে তাদের। ভাড়ায় নিজের উপার্জনে শেয়ার ডিভিডেণ্ডে কীর্তিহাটের জমিদারীর অংশ বাবদ দেবখরচ বাদে উদ্বৃত্ত আয়ে তাঁর খরচ সংকুলান হয়েও বছর বছর অনেক সঞ্চয় হয়ে ওই এক লাখ টাকাকে স্ফীত করে প্রায় তিন লাখের কোঠায় নিয়ে গেছে। সুতরাং তিনি কাগজ বের করতে চাইলে অবশ্যই বের করতে পারেন।

যোগেশ্বর বললেন—টাকা—লেখা—বাড়ী এ তিনটে কাগজের পক্ষে বাইরে থেকে দেখতে খুব জরুরী। তার চেয়েও জরুরী হল ব্যবসার দিক। ওতে আমার মাথা খারাপ হয়।

—আমি দেখব!

—তুমি? হা-হা করে হেসেছিলেন যোগেশ্বর।

—তুমি হাসছ? আমি পারব না?

—পারবে না বলছি নে। কিন্তু আমার ভুল পলিসিতে কাগজ ডুবতে বসলে আমাকে নোটিস

দিতে পারবে ইওর সার্ভিস ইজ নো লংগার রিকোয়ার্ড বলে ?

শুধু হেমলতাই নয়। বন্ধুবান্ধব সকলেই বলেছিল। তারা সব বিশিষ্ট লোক। এবং সংবাদপত্র জগতের লোক অনেকে। দু-একটা কাগজ থেকে তাঁকে চাকরীও দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি নেন নি।

দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টি করে তাঁকে ডেকেছিলেন। দেশবন্ধু তাঁর থেকে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। অসীম শ্রদ্ধাও তিনি করতেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন—আমাকে নিয়ে আপনাদের চলবে না। আমি পারব না বনিয়ে চলতে!

—বেশ—তুমি লেখ।

—তা চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি!

চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। বলেছিলেন—হচ্ছে না!

—হচ্ছে না মানে কি ? এত বড় নামী লেখক তুমি—পারছ না ?

—বল পারছি না।

—পারবে। আমি ব্যবস্থা করছি।

এই কথা বলে হেমলতা মদ আনিয়ে বলেছিলেন—এতকালের অভ্যেস ছেড়ে দিয়ে তুমি দুর্বল হয়ে গেছ। খেয়ে দেখ তো পার কি না ?

—খাব ?

—খাবে, আমি বলছি।

খেয়েছিলেন এবং মিনিট কয়েক পরে বলেছিলেন—ঠিক বলেছ।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক গ্লাস খেয়ে কিছুক্ষণ পর কাগজ কলম টেনে বসেছিলেন লিখতে। গান্ধীজীর অহিংসা মতবাদকে বিদ্রূপাত্মক যুক্তির ধারালো ছুরিতে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে নিজের নাম দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজের ইংরিজী কাগজে। খুব মোটা হেডলাইন দিয়ে সমাদর ক'রে তারা ছেপেছিল। এতদিন পরে এই প্রথম লেখাটাই চারিদিকে বেশ সোরগোল তুলেছিল—শুধু বাংলাদেশেই নয়—গোটা ভারতবর্ষে। মাদ্রাজের হিন্দু বম্বের টাইমস অব ইণ্ডিয়া দিল্লীর কাগজ সর্বত্রই এ নিয়ে আলোচনা চলেছিল। লণ্ডনের টাইমস পত্রিকাতেও কিছু মন্তব্য করেছিল তারা।

প্রশ্নটা ওই অহিংসা নিয়ে। বলেছিলেন—হয় গান্ধী বলুন এটা তাঁর নেহাতই বাঘের স্বরূপের উপর নামাবলী, ভবিষ্যতে একদা নামাবলীখানা ফেলে দিয়ে ব্যাঘ্র মূর্তিতে দাঁড়াবেন অথবা তিনি নিতান্তই সেই হিতোপদেশের গল্পের মূষিক ? যে মূষিককে এক ঋষির বরে কয়েকদিনের জন্য লোকচক্ষে বাঘ বলে মনে হত এবং পরে যে আবার মূষিকই হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় বছর দেড়েক যে টেলিফোনটা কদাচিৎ বাজত সেটা সেদিন থেকে আবার মুখর হয়ে ওঠে প্রবলভাবে।

হেমলতা খুব খুশী হয়েছিলেন।

সুরেশ্বর তখন বারো বছরের। ইংরেজী সে বাপের কাছে পড়ত। সে বলেছিল—এ তুমি

কেন লিখলে বাবা ?

যোগেশ্বর তাকে স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা দেন নি, তিনি তাকে সাধ্যমত বুঝিয়েছিলেন। গল্প বলেছিলেন অ্যামেরিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের, ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনের, রাশিয়ান রেভল্যুশনের। সুরেশ্বর বয়সের তুলনায় পড়েছিল অনেক। গোগ্রাসে যাকে পড়া বলে। এবং তার খোরাক যুগিয়েছিলেন—যোগেশ্বর।

সেদিন গল্প বলতে বলতে তিনি সুরেশ্বরকেই বলেছিলেন—গেলাসে মদ ঢেলে দিতে। সুরেশ্বরই দিচ্ছিল। একসময় হেমলতা এসে বলেছিলেন—এ কি! ও কি হচ্ছে? তুমি কেন ঢালছ, সুরো ?

—বাবা বললে যে।

—হ্যাঁ আমি বলেছি।

—খুব ভাল! এর থেকে ভাল আর কিছু হ'তে পারে না।

হেসে যোগেশ্বর বলেছিলেন—দেখ, ওর বয়স আঠারো পার হলে আজ আমি ওকে খেতে শেখাতুম। খেতে তো শিখবেই। যার তার কাছে শিখবে কেন? বলে হা-হা ক'রে হেসেছিলেন।

হেমলতা রাত্রে বলেছিলেন—না-না—এত বাড়াবাড়ি করো না। দেখছি আমিই অন্যায় করেছি তোমাকে আবার ধরিয়ে।

—খুব যে অহঙ্কার!

—মানে ?

—তুমি না-দিলে, বোধহয় আমিই আনিয়ে শুরু করতাম! তুমি এলে মনের কথা নিয়ে মানসীর মত অথবা ডেস্টিনির মত।

তারপর কিছুদিন তিনি বিপুল উৎসাহে লিখলেন। প্রতিপন্ন করলেন—অন্তত তিনি তাই ভাবলেন, যে অহিংসার কল্পনা একটি রঙীন ফানুস ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এই ফানুস যখন ফাটে তখন তার যে গ্যাস বাতাসে ছড়ায় তাতে নিঃশ্বাস নেয় যে মানুষ তাদের একটা নেশা লাগে। বুদ্ধের পরে এই নেশায় গোটা দেশের মানুষ একটা ক্লীবের জাতিতে পরিণত হয়েছিল। দেশের বর্তমান এই যে ইংরিজী শিক্ষার প্রভাবে নতুন চেতনা—সে চেতনা সৎ কিন্তু বোকা। তুমি আর তোমার ধর্মের ধোঁয়া মেশানো অহিংসার নেশায় আবার নতুন করে ক্লীব ক'রে দিও না। ইংরেজের মত এত বড় একটা জাতের শিক্ষাদীক্ষা সব ব্যর্থ হবে। দুনিয়ার চাকা যখন স্টীম পাওয়ারে এবং ইলেকট্রিসিটিতে চলছে প্রচণ্ড ঘর্ঘর শব্দে তখন তুমি সেই পুরানো চরকাকে বের করে ঘ্যানর ঘ্যানর করে বিশ্বজগতে একটি অট্টহাস্যের সম্মুখীন করো না এই হতভাগ্য জাতিকে।

মদের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছিল, বলাই বাহুল্য। হেমলতা আপত্তি করলেন। তিনি বললেন—নো। আর শুনব না।

মান-অভিমান কাঁদাকাটির পর একটা আপোস হল। এরই মধ্যে ঘটল আর এক ঘটনা। এখানেও ঘটালেন হেমলতা। তাঁর মামাতো ভাই তখন ব্যারিস্টার এবং বেশ পসারওয়ালা

ব্যারিস্টার। তার ছেলের জন্মদিনে বাড়ীতে ছিল পার্টি ; সেখানে গিয়েছিলেন সুরেশ্বরকে নিয়ে ; গান-বাজনার আসর ছিল, সেই আসরে বাজিয়ের অভাব হচ্ছিল, বসিয়ে দিলেন ছেলেকে বাঁয়া তবলা বাজাতে। সে চমৎকার বাজাল। চৌদ্দ বছরে সবে পা দিয়েছে—সুন্দর চেহারা ; তারিফ সে পাওনার থেকে বলতে গেলে বেশীই পেলে। প্রশ্ন উঠল—ওমা, শিখলে কখন ?

পার্টিতে ছিলেন মামাতো ভাইয়ের বিশিষ্ট মক্কেলরা। তার মধ্যে ছিলেন ছোট নেটিভ স্টেটের ( যে নেটিভ স্টেটের আয় বাংলার বড় জমিদারী থেকেও কম ) রাজার এক বান্ধবী। সে আমলেও খাঁটি ইঙ্গ-বঙ্গের চেয়েও কড়া চাল তাঁর। বিলেতও ঘুরে এসেছেন একসময়। পরিচয় তাঁর তিনি রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাঁর সঙ্গে আলাপ হেমলতার পার্টির প্রারম্ভেই হয়েছিল। মিস্টার জে রয় এবং ওমনিপোটেন্টের নাম তিনি জানতেন। তিনি শুনে সবিস্ময়ে বলেছিলেন—সত্যি মিসেস রয় ? না এটা তোমার স্বামী-প্রেমের সুন্দর স্বপ্ন ?

হেমলতা বলেছিলেন—অর্থাৎ তুমি বলছ বাজনা আমি জেগে শুনি নি, স্বপ্নে শুনেছি ! যেমন তোমার মহারাজার শিকারের ঘটনাগুলো ঘরে শুয়ে শুয়ে দেখেছ ?

হেসে উঠেছিলেন মহারাজার বান্ধবী। বলেছিলেন—মহারাজার গুলির চেয়েও তোমার কথার টার্গেট অব্যর্থ এবং মারাত্মক। বেশ তো, আমি মহারাজার গুলির তাগ দেখাতে রাজী আছি, তবে শিকারে যেতে হবে। তুমি মিস্টার রয়ের অপরূপ বাজনা আমাকে শুনিয়ে দাও। আমি গান-বাজনা বুঝি। ভাল লাগে।

হেমলতা বলেছিলেন—কাল আমার ওখানে চায়ের নেমন্তন্ন তোমার।

তিনি আনন্দের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।

হেমলতা বিশেষ কিছু জানান নি যোগেশ্বরকে, বলেছিলেন—একজন বান্ধবীকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছি।

যোগেশ্বর লিখছিলেন। বলেছিলেন—বেশ !

৩

পরের দিন এলেন—মিস চন্দ্রিকা মালহোত্রা। মিশ্রিত রক্তের যে লাবণ্য লাল কালোয় মেশানো পপি ফুলে থাকে সেই লাবণ্যে লাবণ্যময়ী। দীর্ঘাঙ্গী। বড় চোখ। পুরু ঠোঁট। বাপ ছিলেন আর্মিতে ডাক্তার—লেফটেনাণ্ট কর্নেল।

জীবন কেটেছে ভারতবর্ষের বাইরে প্রথম দিকটায়। চন্দ্রিকার মা ছিলেন আসামের খাসিয়া ক্রীশ্চান মেয়ে, ওঁর অধীনে নার্স ছিলেন হংকংয়ে। বিয়ে হয়েছিল সেখানে। তারপর ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় ইণ্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে। তখন চন্দ্রিকা এবং তার মা ছিল দেরাদুনে। চন্দ্রিকা পড়ত সেখানে। দেরাদুন থেকে পাস করে এসেছিল কলকাতায়। ওদিকে তখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মালহোত্রার ইচ্ছে হয়েছিল হোমে বাস করবে। নিয়ে গিয়েছিল স্ত্রী কন্যাকে। চন্দ্রিকা বিলেতে গিয়েছিল ১৯১৯এ। বয়স তখন উনিশ কুড়ি।

কলকাতায় থাকতেই সে নিজের গায়ের রং বিচার ক'রে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছিল। এবং শাড়ী পরেই গিয়েছিল ইংল্যাণ্ড। সে শাড়ী-পরা সেখানে গিয়েও ছাড়ে নি। তার সঙ্গে চুল শ্যাম্পু করা—মুখ রঙ করার আর্টেও দক্ষ হয়ে মূর্তিমতী পূর্ব-পশ্চিমের মিশ্র সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। অন্ততঃ ওর ভক্তগণ বলতো তাই। তার মধ্যে ঔপনিবেশ-স্বপ্নাতুর ইংরেজ-সন্তানও ছিল।

ওদিকে ডাক্তার মালহোত্রা তখন শ্বেতপুষ্পে কালো ভ্রমরের মত মধুলোলুপ হয়ে উঠেছেন। এবং জুয়াতে মদে রেসের ঘোড়ার মত দৌড়াতে আরম্ভ করেছেন। তার ফলে একদা পড়লেন জালে জড়িয়ে। জুয়ার সঙ্গে জালিয়াতির এবং সুরার সঙ্গে নারীর সম্পর্ক আঙ্কিক হিসেবে নিবিড়। ওদেশে ডিম যেমন নিরামিষ—তেমন বিচারে ওদেশে এ দুটোর মধ্যেই এক ধরণের আধানিরিমিষ সত্তা আছে, সেটা এ-দেশী মালহোত্রার পক্ষে বজায় রাখা সম্ভবপর হয় নি, সুতরাং জালিয়াতির দায়ে এবং অ্যাডাল্‌ট্রির প্যাঁচে প্রায় একসঙ্গে পড়ে গেলেন। নিঃস্ব হয়েও যখন বাঁচবার সম্ভাবনা রইল না—তখন প্রায় পাগল হলেন। এই সময়েই এই ক্ষুদ্র করদরাজ্যের মহারাজটির সঙ্গে মালহোত্রা পরিবারের হল আলাপ। বয়স্ক ব্যক্তি। চন্দ্রিকার বাপ, কন্যাকে সামনে রেখে এই মহারাজাকে ধরেছিলেন পরিত্রাণের আশায়। তার ফল ভাল হয় নি; তার মা দাঁড়িয়েছিল পথরোধ ক'রে। পাগল আর্মি অফিসার, তাঁর পক্ষে এই পথের বাধা অপসারণে দিশেহারা হবার কথা নয়, পিস্তল বের করে স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন। এবং তারপরই মাথা ভাল হয়েছিল, তিনি নিজেও আত্মহত্যা করেছিলেন। চন্দ্রিকা একাকিনী। সে পথ খুঁজতে গিয়ে দেখেছিল, হয় হোটেলে বাসন ধুতে হয়, নয় ওয়েট্রেস হতে হয়, নয়—। কিন্তু সেখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিনী অনেক—যুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্মানী রাশিয়া থেকে অনেক মেয়ে ইংলণ্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বিয়ের বাজার থেকে পথে ঘাটে হোটেলে সর্বত্র দাম পড়ে গেছে মেয়েদের। সুতরাং মহারাজা যখন তাকে স্পেশ্যাল প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ দিলেন তখন সে নিতে দ্বিধা করে নি। সেই পদ নিয়ে সে মহারাজার সঙ্গে দেশে ফেরে। মহারাজা তার প্রতি অনুগ্রহে অকৃপণ। সে বিলিতী নাচ কিছু শিখেছিল—এখানে এসে তিনি তাকে গান বাজনা শিখিয়েছেন। বন্দুক ছুঁড়তেও শিখিয়েছেন। মহারাজার সঙ্গে গল্‌ফ খেলায় সে সঙ্গিনী। টেনিসেও তাকে দক্ষ করে তুলেছেন। মহারাজা এখন টেনিস খেলেন না, আগে ক্রিকেট টেনিসেও দড় না-হলেও তাঁর মহারাজত্বের গুরুত্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। তবে পোলোতে কখনও কখনও এখনও শখ যায়। গোটা কয়েক দেশী ভাষাতেও চন্দ্রিকাকে তালিম নিতে হয়েছিল—তার মধ্যে হিন্দী বাংলা ওড়িয়া অন্যতম। বাংলা সে কিছু আগে থেকেই বুঝত।

এই হল চন্দ্রিকা।

হেমলতা তাকে অভ্যর্থনা ক'রে এনে ঘরে বসিয়ে স্বামীকে ডেকেছিল।

—এস একবার। আমার বান্ধবী এসেছে।

—বান্ধবী? কালকের সেই মহারাজার নর্মসহচরী—বেগ ইওর পার্ডন, প্রাইভেট সেক্রেটারী, সুন্দরী!

বসে ছিলেন তিনি ঢিলেঢালা একটা আলখাল্লার মত জামা আর কোঁচানো ধুতি পরে। তাই প'রেই যাচ্ছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন—ও কি?

—কেন?

—পোশাক বদল কর। ও কি? ওই জামাটা—

—পোশাক? কি বিপদ! বলে পোশাক বদলের ঘরে গিয়ে নিজের স্যুটে হাত দিয়ে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর আলনা থেকে হেমলতার একখানা বেনারসী শাড়ী টেনে নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন।

হেমলতা বলেছিলেন—ওকি?

—কেন? শোনাতে হবে বাজনা—এটা কি তার পক্ষে বেমানান হল? খারাপ লাগছে?

তা বলতে পারেন নি হেমলতা। বলতে কি চমৎকার দেখাচ্ছিল যোগেশ্বরকে। রায় বাড়ীর পুরুষদের চেহারার জন্য খ্যাতি আছে। লম্বা চেহারা, মাজা রং, টিকালো নাক, বড় চোখ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সূচলো করে পাকানো গোঁফ, তার সঙ্গে লুটিয়ে পড়া কোঁচানো ধুতির সঙ্গে ওই ঢিলেঢালা ধবধবে শাদা মখমলের আলখেল্লার মত জামায় চমৎকার মানায় যোগেশ্বরকে। শৌখীন মানুষটি এসব করেন খেয়াল বলে নয়, অনেক হিসেব করে মানিয়ে দেখে। এখন তার উপর বেনারসী চাদরটার দুটো প্রান্ত গলায় বেড় দিয়ে দুপাশে পা পর্যন্ত ঝুলে পড়তেই মনে হল—বাঃ—এই যোগেশ্বরই আসল যোগেশ্বর, যার পিতামহ প্রপিতামহ জরি মখমলের পোশাক এবং পাগড়ি পরে আর্টিস্টের সামনে বসে অয়েলপেন্টিংয়ের সিটিং দিয়েছিলেন।

হেমলতাকে নিরুত্তর দেখে যোগেশ্বর বলেছিলেন—কি চুপ করলে যে?

হেমলতা হেসে বলেছিলেন—তোমাকে প্রণাম!

—কেন?

—এতও আসে মগজে!

—ভাল লাগছে তো?

—ওয়াণ্ডারফুল! কালই বেনারসীর চাদর কিনে আনব!

—রঙীন এনো! শাদা না! চল!

শ্যাম্পুকরা চুল—রঙকরা মুখ—পালিশকরা নখ; জর্জেট-পরা দীর্ঘাঙ্গী চন্দ্রিকা মালহোত্রা—সিগারেট খেতে-খেতে দেওয়ালের ছবি দেখছিল। ১৯২৪ সালের চৈত্র মাস। তখন অবনীন্দ্রনাথের পরে নন্দলাল অসিত হালদার এঁরা এসেছেন; যামিনী রায় তখনও ঠিক আসেন নি। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের ছবিরু দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল চন্দ্রিকা, হাতের আঙুলে সিগারেট পুড়ছিল!

—মিস মালহোত্রা—

ফিরে তাকিয়ে মিস মালহোত্রা সবিস্ময়ে চোখ বড় করে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। একেবারে কোমর থেকে ভেঙে নুয়ে বাউ করেছিলেন যোগেশ্বর।—গুড আফ্‌টার-নুন!

হেমলতা বলেছিলেন—আমার স্বামী!

হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল চন্দ্রিকা এবং বলেছিল—ও! হাউ ওয়াণ্ডারফুল ইউ লুক! আমি ভেবেছিলাম—

—এ বাজাওলা উস্তাদ ফ্রম ইউ পি অর পাঞ্জাব—

খিল-খিল করে হেসে উঠেছিল চন্দ্রিকা। বারবার বলেছিল—নো-নো-নো—আমি ভেবেছিলাম মুরশিদাবাদি নবাব-শাহীর কোন তনখা-পানেওলা আমীর—

—এই দাড়ির জন্যে? তা বলতে পার। কিন্তু আমরা হলাম পুরনো জমিদার! এই যে আলখেল্লাটা দেখছ এটা আমাদের বৈরাগীদের পোশাক। কোঁচানো ধুতি আর এই চাদর দিয়ে ভোগ এবং বৈরাগ্যের সমন্বয় হয়েছে।

—কি সুন্দর ব্যাখ্যা করলে তুমি! ওয়াণ্ডারফুল। ওয়াণ্ডারফুল। জান তোমার লেখার ভক্ত আমি। মহারাজাকে কাগজ পড়ে শোনাতে হয় আমাকে। কিন্তু লেখাতে তো তোমার এ পরিচয় নেই? সেখানে তো তুমি তলোয়ার খেল খাঁটি ইংরিজী ঢঙে।

হেমলতা বলেছিলেন—বসে কথা বললে ভাল হয় না?

—নিশ্চয়ই। আমি দুঃখিত—তোমাকে আমি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

বসে কথাবার্তা শুরু হয়েছিল। সুরেশ্বর এসে বসেছিল। হেমলতা শুনছিলেন, কিন্তু সুরেশ্বর চুপ করে শোনে নি, সে মধ্যে মধ্যে কথার মধ্যে কথা বলেছিল। এবং বেমানানভাবে বলে নি, বেশ মানানসই করে বলেছিল।

মিস মালহোত্রা বারবার তারিফ করেছিলেন সুরেশ্বরের কথায়। সে যা বলেছে তা আবোল-তাবোল নয়, হয়তো বলার ভঙ্গিটা ছেলেমানুষের প্রকাশ-চেষ্টায় আবোল-তাবোল মত শুনিয়েছিল। ঈশ্বর নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। যে তর্ক জগতে সব থেকে বেশী হয় এবং যে তর্কে নেই বললেও হারে না আছে বললেও হারে না—তারই মাঝখানে হেমলতা এক সময় বলেছিলেন—কেন এ সব তর্ক করছ বল ত? সে থেকেও তোমাকে দিক করে না, না থাকলেও তোমার বৃদ্ধি হয় না, তাকে নিয়ে কেন চায়ের পেয়ালার তুফান তুলছ?

সুরেশ্বর বলে উঠেছিল—God is nothing but botheration.

হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন সকলে। মিস মালহোত্রা বলেছিলেন—wonderful.

সুরেশ্বর অপ্রতিভ হয় নি। বলেছিল—তার থেকে তুমি বেহালা বাজাও না বাবা, মা বলছিল তুমি আজ বাজাবে!

—আন, তাই আন! কিন্তু কি বাজাব? আপ ফরমাইয়ে!

—আমি? না-না না—যা খুশি তোমার!

—সন্ধ্যে হয়ে আসছে, পূরবী বাজাও বাবা!

হেমলতা বলেছিলেন—না, তা হলে আর কিছু জমবে না এরপর।

ছড়ি টেনেছিলেন যোগেশ্বর। একটু বাজাতেই সুরেশ্বর বলেছিল—বসন্ত, না বাবা?

ছড়ি টানতে টানতেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলেন যোগেশ্বর।

* * *

মিস মালহোত্রা চলে গেলে যোগেশ্বর বলেছিলেন—এদের কেন ডাক?

—কেন ?

—নাঃ। এরা হল আলাদা জাত—এদের হল আলাদা ধাত!

একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন হেমলতা। কিন্তু পরের দিনই মহারাজার পুরুষ সেক্রেটারী এসে যোগেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন লাউডন স্ট্রীটের বাড়ীতে। একলা নয়—স্ত্রী-পুত্র সমেত যোগেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন চায়ে। চায়ের নিমন্ত্রণ শেষ করতে প্রায় ডিনারটাইম হয়ে গিয়েছিল। আগের কথায় বংশ-পরিচয় থেকে শুরু করে খেলা-শিকার-সঙ্গীত থেকে পলিটিক্স পর্যন্ত। এরই মধ্যে মহারাজা হঠাৎ বলেছিলেন, মিস্টার রয়, তোমার সঙ্গে আমার কিছু প্রাইভেট কথা ছিল। যদি আপত্তি না-থাকে তবে এস না, আমরা আধঘণ্টার জন্যে ওঘরে কথা বলে নিই। চন্দ্রিকা, তুমি মিসেস রয় এবং মাস্টার রয়কে দেখাও না সব।

ঘরে নিয়ে গিয়ে মহারাজা বলেছিলেন—দেখ রয়, তোমার লেখা আমি পড়ি। তা ছাড়া আমি চন্দ্রিকার কাছে তোমার কথা শুনে দু-চারজনের কাছে পরামর্শ নিয়েছি। তারা তোমার কলম সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। আমার স্টেট সম্পর্কে প্রজারা এই সব কংগ্রেসী লীডারদের উস্কানীতে সহায়তায় নানান নিন্দার কথা অশাসন-কুশাসনের কথা ভেণ্টিলেট করছে, দরখাস্ত পাঠাচ্ছে। পলিটিক্যাল এজেণ্ট এতে আমার উপর সুবিধে নিতে চাচ্ছে। আমি চাই আমি কি করেছি—সেই কথা প্রকাশ করতে। তুমি আমাকে হেল্প্ কর। কাজটার ভার নাও।

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন যোগেশ্বর। এ যোগেশ্বর জার্নালিস্ট যোগেশ্বর। যে যোগেশ্বর দেশের সুলভ মতামত উপেক্ষা করে দীর্ঘদিন ইংরেজ রাজত্বকে সমর্থন করে এসেছেন। যে যোগেশ্বর উনিশ শো একুশে চাকরী ছেড়েছেন। যে যোগেশ্বর নন-কোঅপারেশন মুভমেণ্টের ব্যর্থতায় হিন্দু শাস্ত্র সংহিতা পড়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলেছেন—"অহিংসা একটি মনোরম রোমাণ্টিক স্বপ্ন—প্রায় ঈশ্বরের মত। বাস্তবের সম্পূর্ণ বিরোধী। অবাস্তব বললেও যথেষ্ট বলা হয় না। মানবসমাজ এবং সভ্যতাকে ক্ষীণবল করে এতকালে বহুকষ্টে অর্জিত মনুষ্যত্বের বিকৃতি ঘটায় ক্লীবত্বে অর্থাৎ সভ্যতার বংশধারা বা স্রোতোধারায় ছেদ টেনে দেয়। এমন কি যদি সব দেশের সব মানুষ অহিংস হয়েই বসে, যুদ্ধও আর না হয়, তবে সেদিন দলবদ্ধভাবে বনের বাঘ সিংহ হিংস্র জন্তুরা মানুষকে আক্রমণ করে পরমানন্দে পশু-রাজত্বের সৃষ্টি করবে।"

এ লিখেও নিন্দাকে সমালোচনাকে ভয় করেন নি যে যোগেশ্বর সেই যোগেশ্বর। তিনি বলেছিলেন—মহারাজা, এ ভার নিচ্ছি এ কথা তো বলতে পারব না! যতক্ষণ সব না জেনেছি!

—বেশ, তোমাকে আমরা সব তথ্য দিচ্ছি। ফুল স্ট্যাটিস্টিক্স্ দিয়ে দেব আমি।

হেসে যোগেশ্বর বলেছিলেন—স্ট্যাটিস্টিক্স্ আর সত্য এক নয় মহারাজ।

—বেশ, তুমি এস আমার স্টেটে। দেখ সব!

—পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে দেখব সব ?

—নিশ্চয়!

—ভেবে বলব কাল!

—আমি তোমাকে বিলেতের কাগজে যে পেমেণ্ট করে, তাই করব। এবং সব খরচ আমি বহন করব। যদি মাইনে নিয়ে কাজ করতে চাও—

—না। ওদিকে আমি প্রথমটাতে রাজী! তবে ভেবে দেখব!

—তুমি একবার স্টেটে এসে সব দেখ রয়। প্লিজ। ফার্স্ট ক্লাস বাংলো—মোটর—এভরিথিং। তুমি মিসেস রয়কে নিয়ে ছেলেকে নিয়ে চল, দেখ।

—কাল বলব মহারাজা!

পথে ভাবতে ভাবতে এসেছিলেন, কথাটা হেমলতাকেও বলেছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন—দেখ!

—কি?

—কাল বলছিলে চন্দ্রিকার জন্যে যে ওকে কেন আনলে?

—হুঁ। বলেছিলাম।

—এখন?

—এখন?

—হ্যাঁ এখন?

—বলতে পারছি না! ভেবে দেখি।

* * *

কাজ নিয়েছিলেন যোগেশ্বর। চন্দ্রিকা নিজে এসেছিল মত জানতে। মত তিনি দিয়েছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন—এবার বল!

—কি?

—ডেকে ভাল করেছিলাম কি না?

—কর্মের একটা চক্র আছে হেম!

হেসে হেমলতা বলেছিলেন—তবু বলবে না যে ভাল করেছিলাম।

—নিশ্চয় বলব। তা বলব। যা ঘটবার তাই যখন ঘটে তখন সেই ভাল। যা ঘটবার নয় তা ঘটাতে গেলে বা ঘটালে পৃথিবীতে যতিভঙ্গ হয়—সুর কাটে। আমার মত জার্নালিস্টের পক্ষে এইটেই ঘটবার। আমি জমিদারের বংশধর। জার্নালিস্ট হয়েছি। ওই কংগ্রেসী সুরে সুর মেলাতে গেলে বেসুর বলতাম। সংসারে যারা বেসুর বলে এ-যুগে তাদের বলে বিদ্রোহী। তারা জিতলে দেবতা হয় হারলে অসুর নাম পায় ইতিহাসে। সে রিস্ক আমি নিতে নারাজ!

এক বছর পর হেমলতাকে বম্বে থেকে যোগেশ্বর যে চিঠি লিখেছিলেন তার গোড়াতেই এই কথাটার উল্লেখ করেছিলেন—তিনি চন্দ্রিকাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন ইউরোপ।

গোড়াতেই লিখেছিলেন—তোমাকে এই চন্দ্রিকা পর্বের গোড়াতেই বলেছিলাম তুমি ওকে কেন আনলে? তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে—কেন? দোষ কি হল? বলতে সেদিন পারি নি, আজ লিখে জানাচ্ছি—দোষ তোমার নয় দোষ আমার, আমি ওকে দেখে এক মুহূর্তে ক্লোরোফর্ম করা মানুষের মত চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ওর রূপসজ্জা, ওর ভঙ্গি, ওর শ্যাম্পুকরা

চুলের গন্ধ সত্যিই যেন ক্লোরোফর্মের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে একমাত্র তুলনীয়। তবু আমি প্রাণপণে লড়াই করে চেতনাকে জাগিয়ে রেখেছিলাম অনেকদিন। তুমি জান পরদিন চন্দ্রিকা এসেই আমার মত আদায় করে ছেড়েছিল। কি বলেছিল জান—বলেছিল—রয় প্লিজ, প্লিজ তুমি অমত করো না! প্লিজ! আমার চোখে নেশার ঘোর ছিল। সেই ঘোরের মধ্যেই বলেছিলাম, কেন? আমাকে নেবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? মহারাজাকে তুমি এত ভালবাস। সে বলেছিল—উল্টো! ঠিক উল্টো রয়। তুমি যদি স্টেটের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হও তবে আমি পরিত্রাণ পাই। আমার নিশ্চিত ধারণা আমি পরিত্রাণ পাব। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মানে কি বল তো? সে বলেছিল—রয়, আমাকে মহারাজা আসলে কিনেছে। আমার বাবা আমাকে বিক্রী করেছিল। আমি একটা সাংঘাতিক দলিলে সই করেছি। এক লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছি—আমার চাকরীর উপর! আমার এ থেকে পরিত্রাণ নেই। তুমি যদি এস রয়—আমি তোমাকে অনেক ফ্যাক্টস দেব প্রমাণ দেব, তার দাবীতে তখন হয়তো মুক্তি পেতে পারব। আমি বলেছিলাম—কিন্তু মহারাজা তো তোমাকে খুব সুখে রেখেছেন চন্দ্রিকা! চন্দ্রিকা বলেছিল—তার থেকে মৃত্যু ভাল। কিন্তু মরতে আমার ভয় করে। আমি নিজে উপরে দরখাস্ত করতে পারি না—আমাকে গুলী করে মেরে দেবে! তুমি এদের জান! তবু আমি বলেছিলাম, কিন্তু আর কি এখান থেকে মুক্তি নিয়ে সাধারণ জীবনে ফিরে যেতে পারবে? সে বলেছিল—রয়, আমি তখন সাধারণ মেয়ের মত সাধারণ মানুষের কাছে নিজেকে বিক্রী করেও বাঁচতে পারব। আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারি নি, বলেছিলাম—আমার ফার্স্ট অফার রইল। চন্দ্রিকা বলেছিল—আমি নিজেকে ইন এ্যাডভান্স তোমাকে দিয়ে রাখলাম। এনগেজমেন্টও করে গিয়েছিল: সেটা একটা বড় হোটেলে। মহারাজার সেদিন ডিনারে নেমন্তন্ন ছিল গভর্ণমেন্ট হাউসে।

থাক ওসব কথার বিশদ বিবরণে প্রয়োজনও নেই, আমার নিজেরও অপরাধবোধ মরে যায় নি। হেম, এ বোধহয় একটা ব্যাধি। এ বোধহয় নিয়ে জন্মেছিলাম। কারণ তার সংক্রমণের সূত্র আমি দেখতে পাচ্ছি আমার জন্মদাতার জীবন থেকে। তোমাকে বিবাহের পূর্বে এ ব্যাধি আমাকে প্রায় বাঁধা বন্য-জন্তুর মত বা জোতা-ঘোড়ার মত এই মুখে চালাচ্ছিল। চলতে তো আমার বাধা ছিল না। অর্থ ছিল। তার উপর সমাজের যেটা তাড়না বা ভয় তাতেও ছিলাম বেপরোয়া। কিন্তু বাবার একটা মেসেজ ছিল—আমার কাছে। দাদার কাছেও ছিল। সেটা শীলকরা কভারে তিনি দিয়েছিলেন—আমাদের অ্যাটর্নীকে। সেটা তাঁর উইলের সঙ্গে পেয়েছিলাম। লেখা ছিল—'পিতার যদি কোন অধিকার থাকে পুত্রকে উপদেশ দেবার তবে উপদেশ রইল নারী-বিলাস থেকে দূরে থেকো। যদি তা সম্বরণ করতে নাই পার, তবে বিবাহ করে সংসারী হয়ো না!' কারণটা অজানা ছিল না। আমার বাল্যকালে আমার এক মেম গভর্ণেস ছিল। তিনি তাঁর প্রেয়সী ছিলেন। আমাকে চড় মারার জন্য আমার দাদা তাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছিলেন! তারপর মেমসাহেব গেল চলে, বাবা তাকে অনুসরণ করে এসেছিলেন কলকাতায়। এটা প্রত্যক্ষভাবে জানতাম। তখন আমার পিতামহ বেঁচে। তখন থেকেই আমরা তাঁর থেকে স্বতন্ত্র বাস করেছিলাম। পিতামহের

মৃত্যুর পরও বাবা স্বতন্ত্র থেকেছিলেন কিছুদিন। তারপর তিনি অন্য মানুষ হ'তে চেয়েছিলেন। সে আত্মনির্যাতন আমি দেখেছি। এবং তখন আভাসও পেয়েছি—তাঁর প্রথম জীবনের উদ্দাম গতির বিচিত্র কথার। সেই কারণেই আমি দীর্ঘদিন বিবাহ করি নি—এবং উদ্দাম গতিতে ছুটতে গিয়েও ভয়ে নিজেকে সংযত রেখেছি। তারপর তুমি এলে জীবনে। তুমি দেখেছ প্রমাণ পেয়েছ আমি কি হয়েছিলাম বা হ'তে চেষ্টা করেছিলাম। ইদানীং ভাবতাম আমি সব সংকট পার হয়ে এসেছি। কিন্তু না।

পিতামহ ছিলেন পুণ্যবান পবিত্র চরিত্র মানুষ। অন্তত: চরিত্রের দিক থেকে। বিষয়ী হিসেবে তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপের পরিচয় চোখে দেখেছি। জীবনযাপনের ধারা দেখেছি। এ যুগে আমার শিক্ষানুযায়ী তাঁর জীবনকে বলব আত্মনির্যাতন। অর্থহীন আত্মনির্যাতন। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন—একটা কথা। শিখিয়েছিলেন সংসারে মানুষের জীবনে নারীর সঙ্গে সম্পর্ক দুটি। দুটি সম্পর্কের একটি ভেঙে আবার দুটি হয়েছে। এক পুরুষ আর প্রকৃতি। মানুষের জীবনে এই সম্পর্ক একটি পুরুষের সঙ্গে একটি নারীর। অন্যটি মাতা আর পুত্র। সেটা বয়স-ভেদে হয় কন্যা আর পিতা। এইটেই জগৎজোড়া। এর অন্যথায় তুমি স্বর্গ-নরক মানলে নরকে পড়বে, না-মানলে তোমাকে ফিরতে হবে জন্তুজীবনে। অথবা তাকে হতে হবে সেই পুরুষ যাকে পাপপুণ্য দেশ সমাজ কিছু স্পর্শ করতে পারবে না—তার নাগাল পাবে না।

কথাটা সত্য। চন্দ্রিকার সঙ্গে জীবনের গ্রন্থি লাগল। সেটা যদি মা বা কন্যার মন্ত্রে গ্রন্থি পড়ত! কিন্তু না, তা পড়ল না। আজ একটা বছর আমি নানান অজুহাতে মহারাজার স্টেটে কাটিয়েছি ঘুরেছি—সে কেবল চন্দ্রিকার জন্য। যখন চন্দ্রিকাকে জীবনে জড়িয়েছি তখন চেষ্টা করেছি ওই রকম পুরুষ হ'তে; পাপপুণ্যের দেশসমাজের ঊর্ধ্বের পুরুষ। কিন্তু তা পারি নি। সে সহজ নয়। সহজ সাধারণের মত অবস্থায় পড়লাম। ওদিকে মহারাজা, এদিকে তুমি এবং সুরেশ্বর। একদিকে ভয়, অন্যদিকে নিদারুণ অপরাধবোধ। মহারাজা জানতে পারলে গুলি ক'রে মারত! এদিকে তুমি জানলে কি হ'ত তা কল্পনাও করতে পারি নি। ফলে জন্তুর অধম চোরের মত তার সঙ্গে মিশেছি। আমার সম্পদ, আমার সহায়তা করেছে। বাঘের নখ আর দাঁতের মত মানুষের এই সম্পদ আর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আর গোপন রইল না। মহারাজা জেনেছেন। সুতরাং শিকারীর বনভাঙার শব্দে ভীত জন্তুর মত চন্দ্রিকাকে নিয়ে বিদেশ পালানো ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। আজই জাহাজ ছাড়বে। বম্বে থেকে চলে যাচ্ছি চন্দ্রিকাকে নিয়ে। ব্যাঙ্কের পাস বইয়ে তিন লক্ষ টাকা মজুত আছে। তার দু লক্ষ আমি নিলাম। এক লক্ষ টাকার চেক কেটে বাড়ীঘর সম্পত্তির দলিল তোমাদের নামে করে দিয়ে—বম্বের অ্যাটর্নীকে দিলাম—তারা যথাসময়ে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবে। সম্পত্তি যা পৈতৃক তা সুরেশ্বরের রইল—এ অধিকার ওর জন্মগত। তবে শর্ত রাখলাম যতদিন তুমি বাঁচবে ততদিন সব কাজে তোমার মত নিতে হবে। তোমাকে দিলাম আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আর এক লাখ টাকার অর্ধেক পঞ্চাশ হাজার নির্ব্যূঢ় স্বত্বে।

মার্জনা করতে বলব না। বলব অভিসম্পাতই দিয়ো। অন্য দেশের মত ডাইভোর্স নেই।

থাকলেও আমি বলতে পারতাম না। তোমাকে আমি আজও ভালবাসি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার কোন শক্তি আজ নেই, আমি ভেসে যাচ্ছি একটা দুর্দান্ত আকর্ষণে। কি মোহ এই মেয়েটার! ওঃ!

সুরেশ্বরকে বাঁচাতে চেষ্টা করো। কিন্তু তাকে বন্ধনেও বেঁধো না। মানুষ কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না হেম। মানুষ বাঁচে নিজে। তার বীজ থাকে তার চরিত্রে। সে চরিত্র আপনি গড়ে। অন্যে যেটা গড়ে দেয় সেটা খড়ের কাঠামোর উপর চাপানো মাটি আর রঙ। কালে ফাটে—জলে গলে।

ইতি—যোগেশ্বর রায়।

৪

সুরেশ্বরের বয়স তখন চৌদ্দ পনের। উনিশ শো চব্বিশের শেষ, পঁচিশের আরম্ভ। ষোল আনা বুঝবার বয়স না হলেও বারো আনা বুঝবার বয়স হয়েছিল। হেমলতা প্রথম কথাটা চাপাই রেখেছিলেন; বলেছিলেন, যোগেশ্বর ইয়োরোপ বেড়াতে গেছেন। সারা ইয়োরোপ বেড়িয়ে তবে ফিরবেন। স্বামীকে দায়ী করেন নি এমন নয়, তবে যতখানি করা উচিত তা করেন নি। করেন নি নিজের দৈহিক অক্ষমতার জন্য। দ্বিতীয় সন্তান মৃতকন্যা প্রসব করার পর থেকে তিনি স্বামীর মনের সঙ্গিনী ছিলেন, গৃহের গৃহিণী ছিলেন, তাঁদের জীবনের ধর্ম যেটা ছিল সে ধর্মানুযায়ী সহধর্মিণীও ছিলেন, কিন্তু নারী হিসাবে তো তাঁর কোন মূল্য ছিল না স্বামীর কাছে। মানুষের জীবনের তৃষ্ণা স্বভাবধর্ম: সেই তৃষ্ণায় যে-জল জমে বরফ নয়—পাথর হয়ে গেল, তার কোন মূল্য থাকে তৃষ্ণার্তের জীবনে? যোগেশ্বর তৃষ্ণাকে যদি জয় করতে পারতেন, তবে তাঁর চেয়ে সৌভাগ্যবতী কেউ হ'ত না। জীবনের অশ্বমেধ যজ্ঞ রাম করেছিলেন স্বর্ণসীতা নিয়ে। তা যদি যোগেশ্বর নাই পেরে থাকেন, তবে তাঁকে কোন দোষে দোষী করবেন? একান্ত নীরবে অটল ধৈর্যের সঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ঘটনাটিকে। এবং সংসার ও বিষয় এবং সুরেশ্বর এই দুটি তটের মধ্য দিয়ে সাগরসঙ্গমের অদূরবর্তিনী নদীর মত অনুচ্ছ্বসিতভাবে প্রবাহিত রেখেছিলেন নিজেকে।

কোন কিছুর বদল করেন নি। অর্থাৎ জীবনযাত্রার প্রণালীর। আক্ষেপের মালা নিয়ে জপ করতে বসেন নি। ছেলের ধ্যান-ধারণারও পরিবর্তন করতে চান নি। কিন্তু ছেলে বদলেছিল।

কথাটা হেমলতা চেপে ছিলেন, কিন্তু বাইরের লোকেরা চাপে নি। তারা প্রকাশ করেই দিয়েছিল। পনের বছরের সুরেশ্বরের কানে সেটা পৌঁচেছিল। স্বাভাবিকভাবে অনিবার্য আঘাতে সে আহতও হয়েছিল। তার ফলে সে হঠাৎ হতে চেয়েছিল গোঁড়া হিন্দুর ছেলে। অর্থাৎ মনে মনে সে এর কারণ হিসেবে স্থির করেছিল যোগেশ্বরের অহিন্দু অভারতীয় মনই এ অনর্থের মূল। নতুন করে ধরেছিল খদ্দর, চরকাও কিছুদিন কেটেছিল। এবং মাকে তাগিদ দিয়ে উপনয়নের ব্যবস্থা করে উপবীতধারী হয়ে বছরখানেক সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছিল,

নিরামিষ খেয়েছিল, খালি পায়ে হেঁটেছিল, বাড়ীতে খালি গায়েও থেকেছিল। সংস্কৃতও পড়েছিল। বছর খানেকের পর অনুভব করেছিল সন্ধ্যা-আহ্নিকে সময় যায় অনেক—সুতরাং সন্ধ্যা-আহ্নিক ছেড়ে—শুধু গায়ত্রীমন্ত্র জপ করত। সেটার আরম্ভ হল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার সময় থেকে। পরীক্ষা দিয়েছিল সে ষোল বছর বয়সে। কিন্তু পাস করতে পারে নি। ফেল হয়েছিল অঙ্কে। শুধু একবার নয়—পর পর দুবার ফেল ক'রে পড়া ছেড়েই দিল। এবং ছবি আঁকায় ঝুঁকল। চিত্রকর হবে সে। আদর্শ তার প্রথম নন্দলাল। তারপর যামিনী রায়। ভর্তি হল আর্ট স্কুলে। সেখানে বছর তিনেক পড়ে পরীক্ষা দিলে না—পড়া ছেড়ে দিলে এবং আবার ম্যাট্রিক দেবার জন্য পড়তে লাগল। অর্থের অভাব ছিল না। জমিদারীর আয়, কলকাতার বাড়ীভাড়া, এক লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ—এ সবের কল্যাণে তার বর্তমান জীবন কেন, আমরণ ভাবী জীবনের দিগন্তও কি করব এ নিয়ে একবিন্দু সমস্যা ও এক ফোঁটা কালো মেঘের ছিটে বা ছায়া বুলোতে বা ফেলতে পারে নি। তার মা হেমলতাও এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন নি কারণ তিনি এই কয়েক বছরে সম্পত্তি পরিচালনা ক'রে সম্পত্তিকে বাগিয়েই তুলেছিলেন, তার হানি করেন নি। তবে সে কেমন মানুষ হবে এ নিয়ে তাঁর চিন্তা ছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এমন কিছু কারণ ঘটেনি যাতে তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হয়।

এই বছরই খবর এসেছিল—ইউরোপে যোগেশ্বর মারা গেছেন। এতদিনের মধ্যে তিনি একখানা চিঠিও দেন নি। শেষ চিঠি এসেছিল—আমি হাসপাতালে। মরব কয়েকদিনের মধ্যে তাতে সন্দেহ নেই। একলা শুয়ে আছি। চন্দ্রিকা দেড় বছর আগে আমাকে ছেড়ে গেছে। আমি তাকে সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি তোমাকে ছেড়ে তাকে পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারি নি। একের পর যখন দুইয়ের দিকে মন ছোটে তখন সে দুয়েই বা থাকবে কেন? সে দশক পার হয়ে শতকের দিকে ছোটে। তারপর ডিজিটের পর ডিজিট বাড়ে। কিন্তু মজা কি জান—এক ডিজিট দু ডিজিটে, দু ডিজিট তিন ডিজিটে পরিণত যখন হয় তখন শূন্য বসিয়ে তা হয়। তার মানে আজ বুঝছি—ওর মূল্যটাই হল শূন্য। পূর্ণ ওই একটি সংখ্যা ওই এক। আর একটা সত্য বুঝলাম। সেটা সবার জীবনের কি না তা জানি নে, আমার জীবনের বটে। সেটা হল এই আমার প্রাক্তন—নারী হতে সর্বনাশ। আমার জন্য শোক করো না। আমি নিজে এর জন্য দুঃখিত নই। আমার অভিযোগ নেই আমার লজ্জা নেই—সংকোচ নেই ভয়ও নেই। এর জন্যে এক বছরের মধ্যে প্রহার খেয়েছি, জরিমানা দিয়েছি, জেলও খেটেছি মাস দুয়েক। তবু মরবার সময় মনে যেটা হচ্ছে সেটা কি তা ঠিক বলতে পারব না—ফ্রাস্ট্রেশন বললে আপত্তি করব না, তবে আমি তা মানি না। মনে হচ্ছে বুক জুড়ে রয়েছে শুধু বিরহ—অনন্ত বিরহ। ভেবে দেখেছি, তুমি যদি পাশে থাকতে তবুও তাই মনে হত। আমার কেউ নেই, আমি কাউকে পাই নি।

অনুরোধ করব আমার শ্রাদ্ধ তোমরা করো। কি জানি কল্পনা করে আনন্দ পাচ্ছি।

হেমলতা এতদিনে ভেঙে পড়েছিলেন। ঝড়ে যে গাছ ভাঙেনি সে গাছ একটি দমকা হাওয়ায় যখন একেবারে শুয়ে পড়ল—তখন দেখা গেল গোড়াটি ভিতরে ভিতরে একেবারে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে। মাটি বা মূলের সঙ্গে সংযোগ আর ছিল না।

আগের চিঠি পড়ে হেমলতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে ছিলেন। তারপর বিছানায় শুয়ে মনে মনে ভেবে নিয়ে উঠে বলেছিলেন—হঠাৎ ইয়োরোপ রওনা হয়েছেন মহারাজার কাজে। জানতে পেরেছিল শুধু অ্যাটর্নীরা—যাদের হাত দিয়ে দলিল এসেছিল। পরে হয়তো সবটাই প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু হেমলতা অস্বীকার করেছিলেন। সেই হেমলতা ওই চিঠি পড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। দিন তিনেক পর টেলিগ্রাম এসেছিল হাসপাতাল থেকে—যোগেশ্বর রায় মারা গেছেন……তারিখ। তখন দশদিনে শ্রাদ্ধ করতে হলে হাতে আছে চারদিন। সেদিন অজ্ঞান হন নি, বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ছিলেন মুখ গুঁজে। সুরেশ্বর ছিল বাড়ীতেই। তিনদিন আগে হেমলতা চিঠি পেয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে গেলেন তখনও সে বাড়ীতে ছিল। ঘরে বসে পড়ছিল সেকালের অতি-আধুনিক সাহিত্যের মাসিকপত্র; পরীক্ষা দিয়ে অবধি সে আধুনিক সাহিত্যের পাঠক হয়েছে। সময়টা চৈত্রের শেষ। তখনও পরীক্ষার খবর বের হয়নি।

যুগের হাওয়াটা তাকে কাঁচা সরল তরুণ বয়সের গাছের মত দোলা দিচ্ছে। তার চেহারায় এর ছাপ লেগেছে। তখন বিরোধ চলছিল সাহিত্য-ধর্ম ও সাহিত্যে অশ্লীল সত্যের সীমানা নিয়ে—যার পক্ষে শরৎচন্দ্র নরেশচন্দ্র বিপক্ষে শনিবারের চিঠির দ্বন্দ্ব চলছে। স্বয়ং কবিগুরু এতে মধ্যস্থতা করতে উদ্যত হয়েছেন। সে সময়টা একটা দারুণ উত্তেজনার কাল। সে উত্তেজনা তার রক্তেও সঞ্চারিত হয়েছে। ওই প্রবন্ধই পড়ছিল সে সেদিন। হঠাৎ ঝিয়ের চীৎকার শুনে ঘরে এসে মাকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে সে চিঠিখানা তুলে নিয়েছিল। চিঠিখানা পড়ে রেখে সে ডাক্তার ডেকেছিল। এবং সেইদিন থেকেই সে এই টেলিগ্রামের প্রত্যাশা করছিল। সে কাতর খুব হয় নি। বাপের উপর ক্রোধ তার একদিন হয়েছিল—আহ্নিক করেছে, খদ্দর ধরেছে, খালি পায়ে ঘুরেছে, নিরামিষ খেয়েছে—কিন্তু এখন সে খদ্দর ছাড়ে নি বটে, তবে বাকীগুলো ছেড়েছে এবং বলতে গেলে আর একরকম হয়ে গেছে। মনে মনে বাপকে সমর্থন করার পথ খোঁজে।

হয়তো তাতে তার পরিচয়ের গৌরবটা বৃদ্ধি পাবে—প্রগ্রেসিভ বাপের প্রগ্রেসিভ ছেলে বলে এটাও কিছুটা কারণ হতে পারে, কিন্তু সবটা নয়। ওর মধ্যে ঝড় আছে—সেটা এলোমেলোই বয় —কিন্তু যখন যেদিকে বয় তখন সেইদিকেই তার সমান গতি।

সে যাক। হেমলতা বেশীক্ষণ মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন নি। অল্পক্ষণের মধ্যেই উঠে বসে সুরেশ্বরকে ডেকেছিলেন—নায়েবকে ডেকেছিলেন।

নায়েব একজন আছেন, সে যোগেশ্বরের আমল থেকেই। একটা ছোট সেরেস্তাও আছে, কয়েকজন কর্মচারীও আছে। তাঁদের কলকাতায় বাড়ীভাড়া—দেশের জমিদারীর হিসেব-আদায় তার ব্যবস্থা করতে হয়; মামলা-মকদ্দমাও আছে। সব থেকে জটিল হ'ল জমিদারীর ব্যাপার। ছ'পুরুষ আগে জমিদারীর পত্তন—তা তিন পুরুষ ধরে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির মুখে চলেছিল এবং ভাগ-বাটোয়ারা হয় নি। প্রথম পুরুষ কুড়োরাম ভটচাজের পুত্র সোমেশ্বর ভটচাজ—এফিডেবিট করে রায় খেতাব নিয়েছিলেন—তাঁর এক ছেলে বীরেশ্বর রায়; বীরেশ্বর ছিলেন নিঃসন্তান—তিনি আপনার ভাগ্নে কমলাকান্তকে পোষ্যপুত্র নিয়ে নাম রেখেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। রত্নেশ্বরের তিন ছেলে—দেবেশ্বর, শিবেশ্বর, রামেশ্বর। দেবেশ্বরের দুই ছেলে—যজ্ঞেশ্বর, যোগেশ্বর।

শিবেশ্বরের তিন বিবাহে সন্তান ষোলটি—তার মধ্যে জীবিত দ্বাদশটি। ছয়টি পুত্র ছয়টি কন্যা। রামেশ্বর ব্যারিস্টার, থাকেন এলাহাবাদে। তিনি বংশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়েছেন ব্রাহ্ম হয়ে। অবশ্য দেবোত্তরের নিজের অংশের সম্পত্তি তিনি অতি সামান্য মুনাফা রেখে পত্তনী দিয়ে হস্তান্তর করেছিলেন অপর দুই ভাইকে এবং নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রী করেছিলেন মেজভাই শিবেশ্বরকে। ভগবানের অংশ বিক্রী করেছিলেন বড়ভাইকে। এসব করার পর ব্রাহ্ম হয়েছিলেন তিনি।

হেমলতা উঠে বলেছিলেন—এঁদের সকলকে খবর দিতে হবে। টেলিগ্রাম করুন।

নায়েব বলেছিল—তা দিচ্ছি। কিন্তু টেলিগ্রাম কেন? চিঠি দিলেই তো হয়। আজ লিখলে কাল পাবেন সব।

—না। টেলিগ্রাম করুন। সকলকে অশৌচান্তের কামানোর জন্য আসতেও লিখুন।

—বড়বাবুর ( অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বরবাবুর ) তো আসবার উপায় নেই—ইনসলভেন্সির কেস চলছে! তিনি ওয়ারেণ্টের ভয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে হার্টের রোগী সেজে পড়ে আছেন। ছেলেরা—কি—

—আমাদের কর্তব্য করুন। মেজ খুড়শ্বশুর গোঁড়া হিন্দু, ধার্মিক লোক—তিনি তো আসবেন।

নায়েব বলেছিল—তার থেকে চলুন না আমরাই কীর্তিহাটে যাই। সেখানেই কামানো হবে। ঠাকুরবাড়ীতে হবে। মানে—তাতে—

চুপ করে গিয়েছিল নায়েব। হেমলতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কথাটার শেষ শুনবার জন্য। নায়েবকে থামতে দেখে বলেছিলেন—বলুন।

—মানে, মেজকর্তা তো খুবই গোঁড়া। এখানে কামানো হলে না-আসতেও পারেন। পরে বলতে পারেন—অশৌচ আমরা নিই নি। ইউরোপে মরেছে—জাত গেছে—ক্রীশ্চান হয়ে গেছে এসব তো মাঝে মাঝে বলেন সেখানে—শুনতে পাই! উনি তো মামলাবাজ লোক। এর পর অশৌচ জ্ঞাতিরা নেয়নি সুতরাং দেবোত্তরের সেবায়েত স্বত্ব নিয়ে একটা কিছু বাধানো বিচিত্র নয়। ওখানে গেলে যা হয় মুখোমুখিই হয়ে যাবে। আর শ্রাদ্ধটা ঠাকুরবাড়ীতে বলে—উনি যাই করুন—টেঁকবে না!

হেমলতা অ্যাডভোকেট মামার কাছে মানুষ, কুড়ি বছর পর্যন্ত সেখানে মামলা মকদ্দমার কথা শুধু কানে এমনি শুনতেন না—চৌদ্দ বছর বয়স থেকে মামাকে তাঁর বরাত মত আইনের রেফারেন্সের বইও টেনে বের করে দিতেন। তারপর যোগেশ্বরের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে যোগেশ্বর তাঁকে জমিদারী আইন এবং বিশেষ করে তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তির মূল গ্রন্থির যে দলিল তার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। যোগেশ্বরের বিদেশ চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি নিজেই সব চালিয়েছেন। সুতরাং কথাটা তাঁর বুঝতে কষ্ট হল না।

সুরেশ্বরও বুঝেছিল। বুঝবার বয়সও তার হয়েছে। আইনমতে সে এখন সাবালক। একুশে পা দিয়েছে। এতদিন নাবালকের গার্জেন ছিলেন মা হেমলতা। কারণ যোগেশ্বর ইউরোপে যাবার সময় সব ছেলেকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা হল হিন্দু দেবোত্তরের সেবায়েত অহিন্দু হয়ে গেলে থাকতে পারে না, তখন সে অংশ এসে বর্তায় অন্য অংশীদারদের বয়সে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁর কাছে। সে হিসেবে মেজকর্তা শিবেশ্বর রায়ের ব্যগ্র হয়ে ওঠারই কথা। শিবেশ্বর রায়ের তিন বিয়ে, ষোলটি সন্তান—তার বারোটি বেঁচে এবং তার ছয়টি পুত্র। এবং শিবেশ্বর ইতিমধ্যে আকণ্ঠ ঋণে আবদ্ধ। ঋণের দায়ে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির সবটুকুই চলে যাবে তা সকলেই বোঝে। দেবোত্তর বিক্রী হয় না তবে পত্তনীবিলি-বন্দোবস্ত হয়—তাও তাঁকে করতে হবে, কিছু করেছেনও। এই অভিনব ফন্দিটি রামেশ্বরের আবিষ্কার। আইনের সূচী-ছিদ্রপথে যে চালাতে পারে সে হাতীও পার করে নিয়ে যায়। রামেশ্বর বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার আগে এই ফাঁকটি আবিষ্কার করেছিলেন। দেবোত্তর জমিদারীর আয় ছিল বত্রিশ হাজার টাকা। এই দেবোত্তরে ছ-আনা রকমের মালিক ছিলেন দেবেশ্বর এবং শিবেশ্বর রামেশ্বর পাঁচ আনা হিসেবে অংশীদার ছিলেন। দেবোত্তরে দেবসেবা ইস্কুল টোল দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির খরচ বরাদ্দ ছিল বারো হাজার টাকা। বাকী কুড়ি হাজার টাকা সেবায়েৎ অর্থাৎ এই বংশের ছেলেদের পড়াশুনা খাওয়াপরা এবং চিকিৎসাপত্রের ব্যবস্থা ছিল এবং শর্ত ছিল কোনপ্রকার অহিন্দুজনোচিত কর্মে বা ভোগে-বিলাসে ব্যয় করতে পারবেন না। দলিলকর্তা রত্নেশ্বর রায় ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—ইচ্ছামত ব্যয়ের অধিকারী হলেও এ থেকে দান-ধ্যান করেন এই তাঁর কাম্য। একটা ফাঁক তিনি রেখেছিলেন—ইচ্ছা করেই শর্ত রেখেছিলেন—ঈশ্বর-না-করুন যদি কোন সেবায়েতের অবস্থাবিপর্যয় ঘটে তবে কন্যার বিবাহ পুত্রদের শিক্ষা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের কালে অভাব ঘটিলে দেবসেবা প্রভৃতির বরাদ্দ বারো হাজার টাকা বজায় রাখিয়া উদ্বৃত্ত লাভ—যাহা আমার বংশধরেরা সেবায়েত হিসাবে ভোগ করিবার হকদার রহিলেন—তাহা অর্থাৎ কুড়ি হাজারের মধ্যে আপন লভ্যাংশ—পত্তনী দরপত্তনী দরাদর পত্তনী বিলি করিতে পারিবেন। কোন কারণে বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

রামেশ্বর এই ফাঁক দিয়ে ফাঁকি দিয়েছিলেন স্বর্গত পিতা রত্নেশ্বর রায়ের অভিপ্রায়কে। তিনি বিয়ে করে বিলেত গিয়েছিলেন—বিলেতে থাকতেই সে স্ত্রী মারা যান। একটি মাত্র কন্যা ছিল তাঁর। সেই কন্যাটির রাজপুত্র দেখে বিবাহ দেওয়ার অজুহাতে দেবোত্তর সম্পত্তি পত্তনী-বিলি করে মুনাফা বিক্রী করেন। সে সম্পত্তি নিয়েছিলেন তখন দেবেশ্বর এবং শিবেশ্বর। রামেশ্বর দেবেশ্বরকে কথাটা গোপন করেননি,—বলেছিলেন—আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করব, অসবর্ণ, তারা অবশ্য ব্রাহ্ম। কিন্তু সে হলে তো মেজদা আমাকে দেবোত্তরের সেবাইত থাকতে দেবে না। সুতরাং আমি যেটা পাব সেটা আমি নিয়ে নিতে চাই।

দেবেশ্বর বিচিত্র চরিত্রের লোক ছিলেন। বলেছিলেন—কর তুমি বিক্রী, আমি বাধা দেব না। কারণ সম্পত্তির অধিকারের জন্য স্বাধীনতা যাবে—তার সমর্থন কখনই করব না। আমার কাছে ধর্মের চেয়ে জীবন বড়—দেবতার চেয়ে মানুষকে বেশী ভালবাসি। তুমি যদি মেয়েটিকে ভালবেসেই থাক তবে নিশ্চয় বিয়ে করবে এবং তোমার অংশের মুনাফা সবই তুমি পত্তনী দেওয়ার মধ্যে দিয়ে বিক্রী করে দিতে পার। আমি আপত্তি করব না—প্রকাশও করব না।

কিনেছিলেন দেবেশ্বর অগ্রণী হয়ে। সুতরাং শিবেশ্বর পিছিয়ে থাকেন নি। দেবেশ্বর

অর্ধেক পত্তনী নিয়েছিলেন—শিবেশ্বরও অর্ধেক নিয়েছিলেন।

তারপর এই দীর্ঘকালের মধ্যে শিবেশ্বর অনেক সম্পত্তি ওই পথেই পত্তনী দর-পত্তনী বিলি করে করে এখন শুধু দেবোত্তরের আয়টুকুর উপর নির্ভর করে আছেন।

খরচ অনেক। তিনটি বিয়ে—বারোটি সন্তান বেঁচে—ছয় কন্যার বিয়ে দিয়েছেন—অনেক মামলা করেছেন। অনেক যাগযজ্ঞ করেছেন। প্রথম প্রথম উৎসবে কলকাতার থিয়েটার আনিয়েছেন। কীর্তিহাটে মহাকালী এ্যামেচার থিয়েটার খুলেছিলেন, নিজে নায়কের পার্ট করতেন, ড্যান্সিং ট্রুপ পুষতেন মাইনে দিয়ে—তিনটি গাইয়ে সুদর্শন ছোকরা রেখেছিলেন ফিমেল পার্টের জন্যে।

এখন সে-সব নেই, এখন আছে ছয় ছেলের সংসারে ছেলে-বউয়ে এগারজন, তাদের ছেলে-মেয়ে সতেরোজন। ছোট ছেলে অতুলেশ্বরের তখনও বিয়ে হয় নি। ছেলেরা প্রথম আমলে বাবু ছিলেন; ঘোড়ায় চড়তেন, শিকার করতেন, মদ খেতেন। হাতীও একটা কিনেছিলেন শিবেশ্বরবাবু। এখন হাতী-ঘোড়া নেই। ছেলেরাও লেখাপড়া কেউ ভাল শেখে নি। ছয়জনের মধ্যে দুজন এন্ট্রান্স পাশ করেছিল গ্রামের ইস্কুল থেকে। বাকীরা কেউ ফোর্থ ক্লাস—কেউ থার্ড ক্লাস—কেউ সেকেণ্ড ক্লাস অবধি, একজন ম্যাট্রিক ফেল।

নাতিরা কয়েকজন সুরেশ্বরের থেকে বড়, কয়েকজন সমবয়সী—বাকীরা ছোট। এরই মধ্যে সাতষট্টি বছর বয়সের শিবেশ্বর তৃতীয় পক্ষের ত্রিশ বছরের স্ত্রীকে নিয়ে ধর্মকর্ম যাগযজ্ঞ করেন। স্বতন্ত্র থাকেন ছেলেদের সংসার থেকে। জমিদারীতে বসেছিলেন, মামলা-মকদ্দমা ভাল বোঝেন, বাকী খাজনার প্যাঁচে গরীব প্রজার অনেক রায়তী জোত ছেলেদের নামে কিনে দিয়ে তাদের আলাদা করেছেন। দেবোত্তরে যে অন্নভোগ হয়—তা তিনি কমান নি, সেই ভোগের অন্ন ছেলেরা নাতিরাই খায়। মা-কালী আছেন—মৎস্যভোগ হয় নিত্য। এ ছাড়া তারা সব কিছুটা ভাজাভুজি করে নিয়ে সেইগুলি নিয়ে চলে যায় নাটমন্দিরে। থাকে থাকে বা আলাদা আলাদা সারিতে বসে। গৃহিণী বধূরা দাঁড়িয়ে থেকে আপন আপন সংসারকে খাওয়ান। নিজের নিজের তরকারি পরিবেশন করে দেন।

রাত্রের আহারটা শুধু বাড়ীতে।

শিবেশ্বর কিন্তু বাড়ীতেই খান। তিনি ছেলেদের থেকে পৃথক। থাকেন পৃথক খান পৃথক। ওই প্রসাদ আসে—পায়সান্নের প্রসাদ। রাত্রে শীতলে লুচির সঙ্গে ক্ষীর মিষ্টের ব্যবস্থা আছে—সেইটে তাঁর জন্যে যায়। আর যায় সকালে বাল্যভোগের ছানা-মিষ্টান্ন।

শিবেশ্বর নিজে বৈষ্ণব। বাড়ীতে কালী আছেন—আর রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা আছেন—খোদ আদিকর্তা সোমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত। তারপর রত্নেশ্বর রায় যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বংশ হিসাবে শাক্তের বংশ। কিন্তু শিবেশ্বর বৈষ্ণবমন্ত্র চেয়ে নিয়েছিলেন। তবু বাড়ীতে মা-কালী আছেন বলে মাছ-মাংস খান। মদ খান না। গাঁজা খান।

প্রথম যখন গাঁজা ধরেন তখন গাঁজা তৈরী করবার লোক ছিল। গোলাপজলে ভিজানো গাঁজা অগুরু-চন্দনের তক্তি বা ছোট্ট পাটার উপর রেখে কাটা হত। রূপোর কল্কে ছিল—

সেই কল্কেতে গাঁজা সেজে পরিচারক হাতে ধরত এবং শিবেশ্বর টানতেন মুখ লাগিয়ে। গাঁজা হাতে ধরে খেলে হাতে গন্ধ ওঠে—সেই জন্যে ওই ব্যবস্থা ছিল। তারপর আতর মাখতেন, গায়ের গন্ধ ঢাকতে।

এখন সে সব দিন নেই, এখন নিজে সেজে নিজের হাতে ধরেই খেয়ে থাকেন। নিজে তিলক ফোঁটা কাটেন—গলায় কণ্ঠী আছে। স্ত্রীকেও কাটতে হয় ফোঁটা তিলক। গলায় তুলসীর কণ্ঠীও পরতে হয়।

এই শিবেশ্বর রায়। যোগেশ্বরের খুড়ো। তিনি এখন বেঁচে, বেশ শক্ত হয়েই বেঁচে আছেন। আজও নিত্য সকালে মামলা সেরেস্তা নিয়ে বসেন।

সুতরাং হেমলতা একটু থমকে গিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—কিন্তু সে তো তাঁর বলতে গেলে নিজের এলাকা। সেখানে যদি গোলমাল করে সব পণ্ড করে দেন।

নায়েব বলেছিল—তা হোক মা তাঁর নিজের এলাকা। একটা কথা তাঁর এলাকাতেও সত্যি বলে সবাই জানে। সেটা হল তিনি ওখানকার লোকদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে রেখেছেন। ওখানে উনি ছাড়া আপনার আরও অনেক ক'ঘর দশরাত্রির জ্ঞাতি আছে। তাঁদের আপনাদের সঙ্গে বৈষয়িক শত্রুতা নেই। তাঁরা সব এসে কামান করবেন, খাবেন।

—আসবেন?

—আসবেন। হেসে নায়েব বলেছিল—আমি ওখানকার লোক, ব্রাহ্মণ, আপনাদের জ্ঞাতি নই—তবে আপনাদের জ্ঞাতিরা সবই আত্মীয় বন্ধু। আমি তাদের জানি। তা ছাড়া এতকাল জমিদারি সেরেস্তা চালালাম, কলকাঠি কিসে কোন প্যাচে নড়েচড়ে তাও জানি। কোন ভয় নেই চলুন। ক্রিয়া করতে হবে ভাল করে। সমারোহ করে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বিদায় করবেন মোটা করে। আর দরকার বুঝলে কোন কিছুতে একটা মোটা দান! বুঝলেন কালটা এখন আলাদা। এখন ঘোড়া হাতী পাল্কী পালঙ্ক দিয়ে দানসাগর থেকে কোন কিছুতে দান করলেই লোক খুশী। কিছুতে, ধরুন ইস্কুল কি ডিসপেন্সারি কি যাতে হোক হাজার পাঁচেক টাকা দান করুন—লোকে খুশী হয়ে যাবে। তাছাড়া ব্রাহ্মণদের মোটা ভোজন-দক্ষিণা। ছাঁদা। আর কাঙ্গালী বিদায়। খুড়োমশায় যত খেলুন সে খেলা চলবে না।

সুরেশ্বর বসে বসে অবাক হয়ে শুনছিল।

এই একুশ বছর বয়েসে তার চোখের উপর অনেক ওলোট-পালোট হল। ছেলেবেলা থেকে ইংরেজীনবীশ বাপের সঙ্গে ইংরেজীনবীশ হয়েই গড়ে উঠছিল। বাপ মদ খেয়েছে সে দেখেছে। মাকে নিয়ে খানা টেবিলে বসে খেয়েছে। বাপ তাকে গান-বাজনায় উৎসাহ দিয়েছেন। মন তার তৈরী হচ্ছিল—দেশী উনোনের উপর চড়ানো চাটুতে দেশী রুটির মত নয়, ইংরেজী অনুকরণে দেশী 'বেকারী'র তন্দুরিতে পাঁউরুটির মত। তারপর হঠাৎ একুশ সালে আধকাঁচা অবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনের ওলোট-পালোটে চড়ে বসেছিল দেশী উনোনে চড়ানো চাটুর উপর। কিন্তু সেখানেও সে পুরো তৈরী হবার আগেই ইওরোপের

নতুন নতুন বাদের জোয়ারে দেশী উনোনের আগুন গেল নিভে। তবুও তার বাপের শেষ আচরণের জন্য কিছুকাল ওই গরম চাটুর উপরেই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু চাটু ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে এবার আবার এসে ঢুকল খাস ইওরোপীয় বেকারীতে, যেখানে মানুষের হাতের ছোঁয়াচও নিষিদ্ধ—সবই মেসিনে হয়। যাকে বলে মেসিন মেড ব্রেড।

তবুও বলতে কি, কীর্তিহাটের পিতৃপুরুষের রাজরাজেশ্বর এবং রাধাগোবিন্দের ভোগের জন্য যে পদ্মপাতার মত পাতলা এবং ওই আকারের রুটি তৈরী হয় তার প্রতি একটা গোপন প্রশংসা তার মনে মনে ছিল। ধর্ম ভগবান এ নিয়ে একটা সপ্রশংস কিন্তু উৎসাহহীন আকর্ষণ তাকে টানত। মেজ ঠাকুর্দার ধর্মজীবন সম্পর্কে সে অনেক কথা শুনেছে। ভাল লাগত। কিন্তু মেজ ঠাকুর্দার তিনটি বিয়ে তার ভাল লাগত না। মামলা মকর্দমার কথাও শুনত। সে খানিকটা মন্দ লাগত, খানিকটা আবার ভালও লাগত। বিশেষ করে মামলাবাজ জোতদার প্রজাদের সঙ্গে এবং বর্ধিষ্ণুপত্তনীদের এবং প্রতিবেশী জমিদারদের সঙ্গে কঠিন জেদে মামলা করে জেতার গল্পগুলি খুব ভাল লাগত। কিন্তু সেদিন নায়েবের মুখের কথাগুলি তার কপালে প্রশ্নের কয়েকটি কুঞ্চন-রেখা তুলে দিল। সেগুলি কীর্তিহাটে গিয়ে ত্রিপুণ্ড্রক-রেখার মত দাগ টেনে স্থায়ী হয়ে গেল।

৫

কীর্তিহাটের বাড়ী ছিল রায়দের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এবং তার এগার আনা অংশ ছিল দেবেশ্বর রায়ের ছেলেদের অর্থাৎ সুরেশ্বরের বাপ-জেঠার। ছোট ভাই রামেশ্বর সবই বিক্রী করেছিলেন ভাইদের কাছে। দেবেশ্বর তাঁকে সম্পত্তি পত্তনী-বিলি করতে সহজ অনুমতি দিয়েছিলেন, শিবেশ্বরের অনুমতি ছিল শর্তসাপেক্ষ। তিনি শর্ত দিয়েছিলেন সম্পত্তি পত্তনী বিলি করতে হলে ভাইদের করতে হবে। বাড়ী বিক্রী করতে পারবেন না। কিন্তু দেবেশ্বর রামেশ্বরের জন্য শিবেশ্বরের বিরোধিতা করেই একলাই বাড়ীর অংশ কিনেছিলেন। তাতে শিবেশ্বর আপত্তি করেন নি। তিনি জানতেন—রামেশ্বর বা দেবেশ্বর বা তাঁদের ছেলেরা কেউ এখানে বাস করতে আসবেন না। তাই ভাইদের যাঁরই হোক সবটাই তিনি ইচ্ছে মত ভোগদখল করতে পারবেন। বাড়ীটার নিজের নিজের অংশ এঁরা মেরামত করতেন—তালা বন্ধও করে যেতেন—শিবেশ্বর সে তালা খুলে, প্রয়োজন হ'লে ভেঙে ব্যবহার করতেন, না-করে তাঁর উপায়ও ছিল না। কারণ পুত্র তাঁর ছয়টি, কন্যা ছয়টি—তাদের সন্তানসন্ততি ছেলেদের তরফে সতেরো জন। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীতেই থাকে—যখন আসে তখন কোলাহল সম্পর্কে নিজেই শিবেশ্বর বলেন—ওঃ, বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহসম উথলিছে সমুদ্রের মত। এবং গালাগাল করতেন ছেলেদের এত সন্তান-সন্ততির জন্য। কথাবার্তায় তাঁর আবেগ রণরণ করত। ওটা যেন তাঁর স্বভাবধর্ম ছিল। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাঁর থিয়েটারি অভ্যাস। প্রথম যৌবন থেকে তাঁর থিয়েটারে ছিল প্রবল আসক্তি। থিয়েটারে পার্ট ভাল করতেন। নায়ক সাজতেন। তাতেও আবেগের পার্ট হলে তিনি প্রায় মদমত্ত হস্তীর মত হয়ে উঠতেন।

সেই পারঙ্গমতা এবং স্বভাবগত আবেগবশে তিনি বলতে গেলে গোটা জীবনটাকেই নাটকের নায়কের ভূমিকা করে নিয়েছিলেন। ওই যে বলতেন—ওঃ বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহসম উথলিছে সমুদ্রের মত।—ঠিক নাটকের ঢঙে বলতেন। নাটকীয় ভঙ্গি এবং ঢঙেই তিনি সুরেশ্বর এবং হেমলতাকে অভ্যর্থনা করলেন, যখন তাঁরা যোগেশ্বরের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কীর্তিহাটে পৌছুলেন। নায়েব টেলিগ্রাম করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না—নিজে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে কীর্তিহাটে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কলকাতা থেকে কীর্তিহাট খুব বেশী দূর নয়; ট্রেনে পাঁচ ঘণ্টা লাগত তখন। শিবেশ্বরকে যোগেশ্বরের মৃত্যু-সংবাদ এবং সুরেশ্বর ও হেমলতা শ্রাদ্ধের জন্য এখানে আসছেন—সংবাদটা দিয়েই নায়েব আর উত্তরের অপেক্ষা করেনি—বেরিয়ে এসে দেবোত্তরের নায়েবের সঙ্গে গুটি কয়েক কথা বলে বেরিয়ে পড়েছিল গ্রামে। রায়বংশের দশরাত্রির জ্ঞাতি সাতপুরুষ উর্ধ্বে—কুড়ারাম ভট্টাচার্যের সহোদরদের বংশধর ভট্টাচার্যদের বাড়ী গিয়ে তাঁদের সঙ্গেও কথা বলে এসেছিল। ফিরে এসে আবার গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল শিবেশ্বর রায়ের সামনে।

শিবেশ্বর বসে ছিলেন—একখানা মোটা দলিলের উপর হাত রেখে নিরাসক্ত মুক্ত পুরুষের মত। নায়েব গলার সাড়া দিয়ে ভিতরে এসে তক্তাপোশের একপ্রান্তে বসে বলেছিলেন—তা হ'লে—

—কিছু বলছ? যেন চমক ভেঙে প্রশ্ন করেছিলেন শিবেশ্বর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজকেই তো মা আসছেন, সুরেশ্বরবাবুকে নিয়ে—

বাধা দিয়ে শিবেশ্বর বলেছিলেন, টেলিগ্রাম করে দাও আসতে নিষেধ করে।

—নিষেধ করে দেব?

—হ্যাঁ।

—এমন আদেশ কেন করছেন?

—আদেশ আমার নয়, আদেশ এবংশের প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বর রায়ের। এই তাঁর উইল—তারপর এটা হল স্বর্গীয় পিতা রত্নেশ্বর রায়ের। যারা স্বধর্মচ্যুত—বা ধর্মত্যাগী তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রায়বাড়ীর নাই। তুমি তো জান!

সুরেশ্বরের নায়েব বলেছিল—তা আমাদের স্বর্গীয় বাবু তো ধর্মত্যাগ করেননি।

—আর ধর্মত্যাগ কাকে বলে?

—কাকে বলে—তা জানি না। তবে তিনি কোনদিন ধর্মত্যাগ করেননি।

—আমার মতে ও বিচারে করেছিলেন। আমি এ অশৌচ নেব না।

—তা নেবেন না।

—নিশ্চয়, ধর্মই সনাতন, তাকে ত্যাগ আমি করতে পারি না।

আলোচনাটা কতদূর অগ্রসর হ'ত কেউ বলতে পারে না, তবে এইখানেই হাত নড়ে গিয়ে বাক্যের মাঝখানেই একটা দাঁড়ি পড়ে যাওয়ার মত রায়বংশের উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষের জ্ঞাতি ভট্টাচার্যবংশের দুজন মাতব্বর ভট্টাচার্য এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, একটা দাঁড়ি নয় দুটো দাঁড়ির মত। শিবেশ্বরেরই সমবয়সী।

—মধ্যম কন্যা রয়েছেন।

—কে? ও আপনারা! তা বেশ বেশ, এসেছেন ভালই হয়েছে। শুনেছেন তো যোগেশ্বর জার্মানীতে মারা গেছে। হাসপাতালে। জানেন তো সব, স্ত্রী-পুত্র ফেলে একটা ক্রীশ্চান মেয়েকে নিয়ে চলে গিয়েছিল ইয়োরোপ।

বার দুয়েক আক্ষেপের ভাব ও ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহ। পরিণাম দেখুন!

সঙ্গে সঙ্গে মুখ-চোখের ভাব পাল্টে গেল, দীপ্ত হয়ে উঠল, বললেন—আমার পুত্র হলেও আমি এমন পুত্রের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করতাম না, অশৌচ গ্রহণ করতাম না! তাই বল-ছিলাম—হরচন্দ্রকে। হরচন্দ্র, কি বলে তুমি এলে বলতে যে সেই ধর্মত্যাগী যোগেশ্বরের কামান-শ্রাদ্ধ এখানে হবে? এখনও চন্দ্র, সূর্য উদিত হচ্ছে, হরচন্দ্র। এখনও ধর্মের অন্তত একপাদও অবশিষ্ট।

তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে গোটা ঘরটা পায়চারি করে চিন্তিতভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে পিছন দিকে কোমরের কাছে হাত দুটি মুঠিতে আবদ্ধ ক'রে মধ্যে মধ্যে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলেছিলেন—হয় না, হয় না। এ হতে পারে না···অসম্ভব!

হঠাৎ নাটকের নাটকীয় গতিকে রূঢ় ভাবে ভেঙে দিয়ে শিবেশ্বরের জ্ঞাতি কাকা মহেন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছিলেন—আমরা কিন্তু অশৌচ গ্রহণ করব শিবেশ্বর।

শিবেশ্বর থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন—এবং নির্বাক হয়ে সবিস্ময় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হয়নি।

মহেন্দ্রের সঙ্গী জগবন্ধু মহেন্দ্রের ভাইপো, সুতরাং শিবেশ্বরের জ্ঞাতিভাই। তিনি বলেছিলেন—এমন কথা আপনি বলবেন আমরা ভাবিনি।

—ভেবে দেখুন!

—দেখবার কিছু নাই বাপু শিবেশ্বর। ও সব আলোচনা না করাই ভাল। দেখ, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে। থাক। আমরা সংবাদটা শুনে এসেছিলাম তোমার কাছে—আসতে হয়—তত্ত্ব-তল্লাস সামাজিক নিয়ম। আর—আর—নিয়মানুযায়ী অশৌচকালের মধ্যে যেমন আমাদের রাজ-রাজেশ্বরের অন্নপ্রসাদ বিধি আছে, তার ব্যবস্থামত এখনও সংবাদ পেলাম না কেন সেইটে জানতে। দেবোত্তরের নায়েবকে বলে এলাম। সে বললে—এখনও তো কত্তার হুকুম পাইনি, তবে আয়োজন আমি করছি—কিছুক্ষণ পরই কেউ গিয়ে ঘর ঘর বলে আসবে!

সোমেশ্বর রায় তাঁর দেবোত্তরের উইলে এই একটি ব্যবস্থা করে গেছেন। সেটা হল—তাঁর রায়বংশে এবং তাঁর পিতৃব্য দুজনের বংশের কারও মৃত্যু ঘটলে অশৌচের দশদিন তাঁরা রাজ-রাজেশ্বরের প্রসাদ পাবেন। অবশ্য যাঁরা ইচ্ছা করবেন। বলা বাহুল্য, এ ইচ্ছা এক যাদের বাড়ী বা পরিবারে মৃত্যু ঘটে তারা ছাড়া সকলেরই হয়। বাকী সকলেই এ প্রসাদ গ্রহণ করে থাকেন। কারণ অ-তৈল অ-সম্বরাব্যঞ্জন বা হবিষ্যান্নের পরিবর্তে দেবতার প্রসাদ বলে ঘৃত-তৈলসিক্ত ব্যঞ্জন কে না খেতে চায়? সুতরাং এটা প্রচলিত আছে। শিবেশ্বর

দেবোত্তরের ট্রাস্টি হিসেবে বেছে বেছে সাত পুরুষের বাইরে যারা তাদের বাদ দিয়েছেন। কিন্তু সাত পুরুষ পর্যন্ত এখনও ব্যবস্থা আছে। সেই নিয়মের কথা উল্লেখ করলেন মহেন্দ্র ভট্টাচার্য।

শিবেশ্বর তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। তিনি এক বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যোগেশ্বরের নায়েব বা ম্যানেজার হরচন্দ্রের দিকে।

হঠাৎ নিচে লোকজনের সাড়া উঠতেই হরচন্দ্র উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখে বললে—ও।

শিবেশ্বর তখনও তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হরচন্দ্র বললে—ঘরদোর পরিষ্কারের জন্য লোক পাঠাতে বলেছিলাম ঘোষালকে। এসে গিয়েছে দেখছি।

ঘোষাল এখানে দেবোত্তরের নায়েব।

শিবেশ্বর বললেন—হুঁ! তারপর বললেন—ঘরদোর পরিষ্কার করাবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁরা তো এখানে সন্ধ্যেতেই পৌঁছুচ্ছেন!

আবার শিবেশ্বর বললেন—হুঁ। সঙ্গে সঙ্গে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তাঁর। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার লোক তিনি নন, তাই পড়ল কথাটাই প্রযোজ্য।

হরচন্দ্র বললে—ওঁরা তো কলকাতার বাসিন্দে, ধরণ-ধারণ একটু পরিষ্কার-মরিষ্কার! ময়লা-টয়লা দেখতে পারেন না। তা ছাড়া রোগটোগকে ভয় করেন। গঙ্গাজলে ফিনাইল দিয়ে ধোবার হুকুম আছে।

কথাগুলি সাধারণ অর্থের অন্তরালে অনেক অর্থ ব্যক্ত করেছিল ইঙ্গিতে। সে ইঙ্গিত হল, যোগেশ্বরের তরফের যে ঘরগুলি শিবেশ্বরের পুত্রেরা দখল ক'রে বাস করছেন সেগুলি খালি ক'রে দিতে হবে। তারই একখানা ঘরেই কথা হচ্ছিল—শিবেশ্বর এই ঘরেই বৈঠকখানা করেন। তাঁর খাস বৈঠকখানা। এবং পাশের ঘর দুখানায় তাঁর কনিষ্ঠা গৃহিণী থাকেন।

যোগেশ্বর থেকে তাঁর বড় ভাই যজ্ঞেশ্বর কলিয়ারীর ব্যবসায়ে বেশী অর্থের মালিক হয়েছিলেন একসময়, তিনি কলকাতায়, কাশীতে, পুরীতে, দার্জিলিং-এ, শিমুলতলায় বাড়ী করেছিলেন, এখানকার বাড়ীও মেরামত তিনি করিয়ে রাখেন। কিন্তু যোগেশ্বর সায়েবী রুচির লোক ছিলেন, তিনি যেখানে গেছেন হোটেলে থেকেছেন, বাড়ী কোথাও করেননি। কিন্তু কলকাতার বাড়ী এবং কীর্তিহাটের বাড়ী মেরামত করিয়েছিলেন নিজের রুচি অনুযায়ী যথেষ্ট খরচ ক'রে। হেমলতাকে বিয়ে করবার ঠিক আগেই প্রথমবার। তখন তাঁর ইচ্ছে ছিল কীর্তিহাটে হানিমুন করবেন এবং তার পরেও মধ্যে মধ্যে আসবেন এখানে বিশ্রাম করবার জন্যে। কিন্তু তা কাজে পরিণত হয়নি। তবে কীর্তিহাটের বাড়ীর নূতন ঢঙ এবং রুচিকে তিনি বজায় রেখে এসেছিলেন নিয়মিত মেরামতে। এই যে-ঘর তিনখানা শিবেশ্বর এখন দখল ক'রে আছেন এ তিনখানা, যোগেশ্বর যতদিন দেশে ছিলেন অর্থাৎ চন্দ্রিকাকে নিয়ে ইয়োরোপ চলে যাবার পূর্ব পর্যন্ত, বন্ধই থাকত, শিবেশ্বরও জবর-দখল করতে সাহস পাননি। তিনি ইয়োরোপ চলে যাবার পর থেকে তিনি দখলে এনেছেন। নায়েব হরচন্দ্র নীচের লোকজনের সাড়ার দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁকে ইঙ্গিতে জানালো, ঘরগুলোকে হিন্দু মতে

গঙ্গাজলের সঙ্গে সায়েবী বা বিজ্ঞানসম্মত মতে ফিনাইল মিশিয়ে শুদ্ধ এবং ডিসইনফেকট ক'রে নিতে হবে।

মুখের দিকে তাকিয়েই ছিলেন শিবেশ্বর। তাঁর মুখখানা একবার রূঢ় কঠোর হচ্ছিল, তারপরেই আবার অসহায়ভাবে করুণ হয়ে উঠছিল। সব থেকে লজ্জা পাচ্ছিলেন জ্ঞাতিখুড়ো মহেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ভাই জগবন্ধু ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে।

হরচন্দ্র জানালার কাছে গিয়ে বললে—দাঁড়া দাঁড়া যাচ্ছি। তারপর শিবেশ্বরের দিকে তাকালে। তার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট।

শিবেশ্বর মহেন্দ্র ভট্টাচার্যদের দিকে এবার ফিরে তাকিয়ে বললেন—নায়েব ঘোষাল যখন আয়োজন করব, লোক পাঠাব বলেছে তখন লোক যাবে মহেন্দ্রকাকা। আর এ তো জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কারুর মৃত্যুতে অশৌচ নয়, এ যোগেশ্বর—রায়বংশের তিন শরিকের এক শরিক। তার মৃত্যুতে অশৌচ—এ বলতে হবে কেন?

মহেন্দ্র বললেন—হাঁ। সেই তো কথা। কিন্তু পুকুরে দেখলাম জাল পড়ছে। মাছ ধরছে তোমাদের বাড়ীর জন্যে। তোমার নাতিরা কজন বসে আছে। বলে—

—কি বলে? কেড়ে নিলেন কথাটা শিবেশ্বর। তারপর বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়লেন—হ্যাঁ, বড় ছেলে আমার ধুয়ো তুলেছে বটে। দাদা তো একটা ক্রীশ্চান মেয়ে নিয়ে ইউরোপ গিয়ে ক্রীশ্চান হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে অশৌচ কেন নেব আমরা? এ দলিলপত্র সে-ই তো বের করে দেখতে চাইলে! আমি দেখছিলাম। কিন্তু মাছ ধরাচ্ছে খাবে বলে এ তো জানিনে! অপগণ্ড আর কাকে বলে? মদ্য পান ক'রে সিঁদুরের ফোঁটা কপালে এঁকে তান্ত্রিক! তুমি যাও মহেন্দ্রকাকা, ম্যানেজার ঘোষালকে একবার পাঠিয়ে দিয়ে যাও!

মহেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং জগবন্ধু ভট্টাচার্য চলে গেলেন।

শিবেশ্বর বললেন—হরচন্দ্র!

—আজ্ঞে বলুন বাবু।

—আমি হেরে গেলাম।

—আজ্ঞে না বাবু! আপনি হারতে পারেন, না, আপনাকে কেউ হারাতে পারে? আপনি জিতলেন। আপনার ভাইপো—।

কথাতে কানই দিলেন না শিবেশ্বর, বললেন—দেখ, কথায় আছে পরভাতি হই সেও ভাল তবু পরঘরি না হই। ওঃ! ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার। অর্থাৎ নিজের অংশের বাড়ী মেরামত না করিয়ে ভাইপোদের বাড়ী দখল করে থেকে।

হরচন্দ্র অকারণে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে—আমি যাই বাবু। ওই বিবি-মহলটা বরং সাফ করিয়ে নিই। ওখানেই ওঁরা উঠবেন। বেশ নিরিবিলি থাকবেন। পাঁচজনের গোলমাল থাকবে না। সেই ভাল হবে।

রায়দের বাড়ী প্রকাণ্ড। ইমারত অনেক। প্রথম পুরুষ সোমেশ্বরকে সামনে রেখে তাঁর বাপ কুড়ারাম ভট্টাচার্য প্রথম একখানা চকমিলান দালান তৈরী করিয়েছিলেন। তারপর তার সামনে তৈরী করিয়েছিলেন কালীবাড়ী, নাট-মন্দির, কাছারী। তারপর সোমেশ্বর তৈরী করিয়েছিলেন

পিছন দিকে আর এক মহল, সেটা করেছিলেন তাঁর কন্যা-জামাতার জন্যে। তাঁর পুত্র বীরেশ্বর। তিনি করিয়েছিলেন মূল বাড়ী থেকে পৃথক করে একটু সরে এসে একেবারে কংসাবতীর ধারে, কিনারায় পোস্তা বেঁধে ছোট একটি সুন্দর বাড়ী। কিছুটা দোতলা কিছুটা একতলা। এই বাড়ীতে তিনি বিবাহের পর বাস করতেন স্ত্রীকে নিয়ে। তিনি ছিলেন সাহেবী মেজাজের লোক। তারপর স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে বাস করতেন এক কলকাতার বাঈকে নিয়ে। লোকে বলত বিবি। সেই নামে বাড়ীটারও নাম হয়ে গিয়েছিল বিবি-মহল। তারপর তার পরবর্তী পুরুষ রত্নেশ্বর—বীরেশ্বর রায়ের ভাগ্নে এবং পোষ্যপুত্র—তিনি করিয়েছিলেন অন্দরের দু'মহলের সঙ্গে যোগ করে আর এক মহল। তাঁর তিন ছেলে, তিন ছেলের জন্য হিসেব করে তিন মহল সম্পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর আমলে বিবি-মহল হয়েছিল সাহেব-মহল—তারপর নাম হয়েছিল গেস্ট-হাউস। পরবর্তীকালে দেবেশ্বর কিনেছিলেন এ বাড়ী দুই ভাইয়ের কাছ থেকে।

মহলটার দুর্নাম ছিল। মহলটায় নাকি দুর্ভাগ্যের বোঝা অদৃশ্যভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সুতরাং ইংরেজী উনিশশো সাল পড়ি-পড়ি সময়টায় শিবেশ্বরের মত লোক সানন্দেই বিক্রী করেছিলেন এবং রামেশ্বর ব্যারিস্টারি পড়তে যাবার সময় ওটার অংশ দাদাকে বেচেছিলেন অর্থের জন্য। দেবেশ্বরের বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর কলিয়ারী নিয়েছিলেন এবং দেবতা ধর্ম—এর প্রতি আসক্তি এবং বিশ্বাস যতই যুগধর্মে দুর্বল হোক ব্যবসার লাভ লোকসানের খাতিরে গ্রহ মানতেন—প্রবাল, গোমেদ, নীলাতে যথেষ্ট বিশ্বাস করতেন। তা ছাড়াও কোন সম্পত্তি বা কোন জিনিসের পয়-অপয় মানতেন। ইংরেজীনবীশ যোগেশ্বর সেটা মানতেন না। তাই মূল বাড়ীর অংশ কম নিয়ে তিনি এই বিবি-মহল নিতে আপত্তি করেননি। এই বিবি-মহলেই দেবেশ্বরের মৃত্যুর কারণ ঘটেছিল। কারণটা কি তা কেউ সঠিক জানে না, তবে দেবেশ্বর অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারপর জ্ঞান হয়ে তিনি নিজেই প্রায় উন্মত্ত বিভ্রান্তের মত ওখান থেকে বেরিয়ে এসে পড়েছিলেন ঠাকুরবাড়ীতে। সেইখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। আরও কিছু অপ্রিয় ঘটনার স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িত।

যোগেশ্বর যখন হেমলতাকে নিয়ে এখানে প্রথম আসেন তখন ইচ্ছা ছিল এই বাড়ীতে উঠবেন। কিন্তু স্টেশনে নেমে কেমন পরিবর্তন ঘটেছিল যোগেশ্বরের। তিনি ভিতর-বাড়ীতে এই ঘর কখানাতেই বাস করেছিলেন কয়েক দিন।

তিন মহল রায়বাড়ীতে উপরে-নীচে প্রত্যেক মহলে বারোখানা হিসেবে ছত্রিশখানা ঘর। দেবেশ্বর ছোট ভাই রামেশ্বরের অংশ কিনেছিলেন বলে তাঁর অংশে ছিল চব্বিশখানা ঘর দুটো মহলে মিলিয়ে। প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগের তৈরী বাড়ী—তার নীচের তলাগুলি স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠেছে। সে মেরামত সত্ত্বেও হয়েছে। এবং আগের আমলে এগুলিতে ছিল লক্ষ্মীর ঘর, ভাঁড়ার। তাছাড়া তরকারীর ঘর, পান সাজার ঘর, কাপড়-চোপড়ের ঘর, সূতিকাগৃহ, খাবার ঘর, চাকর-ঝিদের বাসের ঘর। শুধু লক্ষ্মীর ঘরের সামনে বড় দরদালানটি ছিল দিনের ভাগে অন্দরবাসিনীদের ব্যবহারের স্থান। সুতরাং এখন শিবেশ্বরকে যোগেশ্বরের অন্দর-মহলের শ্রেষ্ঠ ঘর তিনখানি ছেড়ে দিয়ে ওই বিবি-মহল ছাড়া

থাকবার যোগ্য স্থান আর ছিল না। অন্ততঃ এমন আরামদায়ক আর কোন ঘর যোগেশ্বরের অংশে ছিল না।

হরচন্দ্র সেই বিবি-মহলেই সুরেশ্বর এবং হেমলতার বসবাসের ব্যবস্থা করেছিল। সেইখানেই উঠেছিল সুরেশ্বর হেমলতার সঙ্গে।

৬

বিবি-মহলের দুর্নাম যাই থাক সে তার অবস্থান-গুণে গঠন-সৌন্দর্যে, কিন্তু বিবির মতই মনোহারিণী ছিল। এদেশে ইংরেজদের প্রথম আমলের কুঠীবাড়ীর মত সামনে গোল থাম-ওয়ালা বারান্দা ঘেরা দোতলা বাড়ী। তারও সামনে প্রশস্ত গাড়ীবারান্দার উপর ছিল বসবার বা আসর পাতবার জায়গা। চারিদিকে আলসেয় ঘেরা। তার মধ্যে মধ্যে জোড়া গোল থাম। থামের উপর দিকে শৌখীন কাঠের ঝিলিমিলি, তার উপর পাকা ছাদ। গাড়ী-বারান্দার পরই গোল থাম ঘেরা বারান্দা। তারপরই বড় হল। এই হলকে ঘিরে তিন দিকে তিনখানা ঘর। পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তরে। এর ফলে প্রতি ঘরেই তিন দিক ছিল অবারিত। শুধু কোলে কোলে টানা বারান্দা ছিল লোহার রেলিং ঘেরা। তাতে আলো-বাতাস বা সামনের দিগন্ত অবরোধ করেনি। গোটা বাড়ীখানা ছিল পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা, দক্ষিণ গায়ে কংসাবতী নদী। কংসাবতীর কিনারায় পোস্তা বাঁধিয়ে বাড়ীখানা তৈরী করা হয়েছিল। সদরে ওই গাড়ীবারান্দার দক্ষিণ গায়ে বাঁধানো ঘাট। আগে ওইখানে প্রকাণ্ড একটা দহ ছিল। পশ্চিম দিকে কংসাবতীর কূলে ঘন জঙ্গল একেবারে বাড়ীর প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে। কংসাবতীর ওপারেও জঙ্গল।

সুরেশ্বর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এখানে এসে।

সব থেকে ভাল লেগেছিল দক্ষিণ দিক। নিচেই কংসাবতী নদী, তার ওপারে ঘন জঙ্গল। ওই জঙ্গলের মধ্যে ছিল এক সিদ্ধ শক্তিপীঠ। একটা বিশাল শিমুল গাছ সকলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। আর তারই খানিকটা দূরে ওই কংসাবতীর বন্যার সীমা-রেখার ঠিক প্রান্তেই একখানি বিচিত্র গ্রাম। যেদিন রাত্রে সে এসেছিল সেদিন ছিল শুক্ল পক্ষের নবমী বা দশমী। জ্যোৎস্নার আবছা আলোর মধ্যে সে শিমুল গাছটার পত্রহীন শাখাগুলিকে আকাশের গায়ে ছবির মত দেখতে পেয়েছিল। নীল পটভূমিতে কালো রঙে এঁকে রেখেছে কোন শিল্পী। আর দেখতে পেয়েছিল ওই গ্রামখানায় এখানে-ওখানে জ্বলন্ত আলোকবিন্দু। বাড়ীর নীচেই চৈত্রের কংসাবতীর স্বল্প জলস্রোতে চাঁদের প্রতিবিম্ব, জ্যোৎস্নার ছটা বহুদূর পর্যন্ত একটা গলিত রূপোর স্রোতের মত মনে হচ্ছিল, তারপর সেটা কালো কৃষ্ণাভায় ঢাকা পড়ে গেছে।

এসেছিলেন অনেকে দেখা করতে। জ্ঞাতি ভট্টাচার্যেরা, দেবোত্তরের কর্মচারীরা, ইস্কুলের হেডমাস্টার, গ্রামের লোক অনেকে এসেছিলেন. রায়বাড়ীর জ্ঞাতিদের মধ্যে এখানে সকলেই শিবেশ্বরের বংশাবলী। তাদের মধ্যে শিবেশ্বরের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম অর্থাৎ

ছোটগুলি—কমলেশ্বর, বিমলেশ্বর, অতুলেশ্বর এসেছিল, তার সঙ্গে ছিল ধনেশ্বরের বড় ছেলে। সে সুরেশ্বরের থেকে বয়সে বড়। বেশ শৌখীন লোক। চেহারাটি ভাল। নাম ব্রজেশ্বর। সুরেশ্বরের সঙ্গে ঠিকাদারী করে। খোঁয়াড় ডাকে। তারা তরুণ। কমল, বিমল সুরেশ্বরের সমবয়সী, অতুলেশ্বর বয়সে ছোট। আরও এসেছিল পরবর্তী পুরুষের প্রায় সকলেই। ছোটদের মধ্যে রায়বংশের কোন ছাপ জ্যোৎস্নার মধ্যে সে দেখতে পায়নি। পোশাক-পরিচ্ছদ শুধু অপর্যাপ্তই নয়, অপরিচ্ছন্নও বটে। কয়েকটা পাঁচ-ছ বছরের ছেলে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে হি-হি করে হাসছিল। ওই হাসি দেখে তার এত কুৎসিত মনে হয়েছিল যে সে কোন মতেই ভাবতে পারেনি যে এরা তারই নিকট জ্ঞাতি খুড়তুতো ভাই। মন তার ছোটই হোক আর বড়ই হোক, মন বিদ্রোহ করে বলেছিল, না, এদের আত্মীয় আপনজন-একরক্ত এ স্বীকার করতে কষ্ট হচ্ছে, ঘৃণা হচ্ছে।

এরই মধ্যে হ্যারিকেন হাতে একটি ব্রাত্যশ্রেণীর মেয়ের পিছনে পরিচ্ছন্ন লালপাড় শাড়ীপরা এক অল্পবয়সী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছিলেন ভিড়ের ওপাশে।

ঝিটা বলেছিল—পথ দাও ক্যানে গো! মেজ-মা এয়েছেন। দেখছ না?

সকলে সম্ভ্রমভরে পথ করে দিয়েছিল।

মহিলাটি ভিতরে চলে গিয়েছিলেন তার মা হেমলতার কাছে। কিছুক্ষণ পরই সুরেশ্বরের কলকাতার চাকর রঘুয়া এসে তাকে ডেকেছিল—মা ডাকছেন ভিতরে।

নায়েব সুরেশ্বরের কাছেই ছিল, সে বলেছিল—যাও, মেজ-মা এসেছেন, তিনিই ডাকছেন। কথা তাই বটে; সুরেশ্বর ভিতরে গিয়ে দেখেছিল তার মায়ের পাশেই তাদেরই একখানা রাগ-জাতীয় কম্বলের উপর সেই লালপাড় শাড়ী-পরা মেয়েটি বসে আছেন।

হ্যাজাকের বাতি জ্বলছিল। উজ্জ্বল আলো। মহিলাটির মাথায় চুলের সামান্য অংশ বের করে ঘোমটাটি তোলা, লাল পাড়ের বেড়ের মধ্যে মুখখানি আশ্চর্য শান্ত, প্রসন্ন এবং মিষ্টি। বয়স তাঁর হেমলতার থেকে পাঁচ-সাত বছর কমই হবে। টকটকে রঙ, সুন্দর দুটি চোখ, নাকটি একটু খাটো কিন্তু তাতেই তাঁর রূপ যেন বেড়ে গেছে।

মা বলেছিলেন—মেজ-খুড়ীমা। তোকে দেখতে চাচ্ছিলেন।

সে অবাক হয়ে গিয়েছিল, এই তার মেজ-ঠাকুর্দার স্ত্রী! মেজ-ঠাকুর্দার বয়স তো সত্তরের কাছে!

তিনি বলেছিলেন—বস ভাই নাতি, বস। আমি তোমার ঠাকুমা, তুমি নাতি। সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি প্রণাম করতে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি তার হাতখানা ধরে ফেলে বলেছিলেন—না ভাই, অশৌচের সময় প্রণাম করতে নেই। বস। বস, এই কাছে বস। তোমাকে দেখি। তুমি বড় সুন্দর হে! বলে তার চিবুকে হাত দিলেন।

লজ্জা সুরেশ্বর পায় না। সে সুন্দর ঐ কথাটা সে নিজেই জানে। তার উপর লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি এ কথা তাকে নীরবে বার বার জানায়। কিন্তু এই অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েটি তার চিবুক ধরে এমন করে বলায় সে লজ্জা পেয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন—তা হবে না কেন? ভাশুরপো যোগেশ্বর যেমন সুপুরুষ ছিলেন, বউমার

তেমনি রূপ, তাদের গোপালের এমন রূপ হবে না তো হবে কার ?

হেমলতা একটু বিষণ্ণ হেসেছিলেন। হয়তো তাঁর রূপের ব্যর্থতার কথাই তার মনে হয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন—দুঃখ পেলে বউমা ? তা এ বাড়ীর বউ হলেই তাকে দুঃখ পেতে হয়। বলে আশ্চর্য হাসি হেসেছিলেন।

হেমলতা বললেন—না খুড়ীমা, দোষ আমি এ বংশকে দেব না। তাকে আমার থেকে ভাল কেউ জানে না। এমন কি এখান থেকে চলে গিয়ে দুখানা চিঠি তিনি লিখেছিলেন, তাতে তিনি একটি কথা গোপন করেননি। যা করেছেন তা তিনি অন্যায় করেছেন তাও আমি বলতে পারব না। দোষ আমার ভাগ্যের। একেবারে আমার ভাগ্যের। সুরোর পর ছেলে হয়ে মরতেই বসেছিলাম, মরাই ভাল ছিল, কিন্তু বাঁচলাম। সে ওই নামেই বাঁচলাম।

—শুনেছি বউমা। থাক ওসব কথা। এখন আমি যার জন্যে এসেছি, তাই কর। সুরেশ্বরকে আমার সঙ্গেই পাঠিয়ে দাও। মেজ কর্তার কাছে ওর এসে-এসে যাওয়াই ভাল, খুঁত যেন ধরতে না পারেন। তোমার নায়েবের খুব বুদ্ধি, প্রথম প্যাচেই কর্তাকে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও উনি বড় ছেলের সঙ্গে গজগজ করেছেন। তার উপর শুনলাম মেজ তরফের নিচের তলা থেকে সব কাল ঝাড়াই-মোছাই হবে। মানে দরকার হলে ওই বাড়ীতেই চলে যাবেন তোমাদের অংশ খালি করে দিয়ে। মতলব ভাল নয়। সুরেশ্বরের এখুনি যাওয়াই ভাল।

একটু—মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত - চুপ করে থেকে আবার বললেন—দেখ, মানুষটার মধ্যে এখনও একটা ভালমানুষ আছে। আমি তো দেখছি। হয়তো আসলে মানুষটা ভালই। বড় বাপের ছেলে, আমার শ্বশুর শুনেছি দেবতুল্য মানুষ ছিলেন। ধার্মিক চরিত্রবান। লোকে এখনও বলে আগুনে কালি আছে, তাঁর মধ্যে কালি ছিল না। ইনিও লেখাপড়া শিখেছিলেন, এফ-এ পাশ। প্রথম জীবন থেকে গোঁড়া ধার্মিক। গীতা ভাগবত কণ্ঠস্থ। আজও পড়েন। কিন্তু মা, বড়লোকের ছেলে জমিদারী জেদে মামলা করা ছাড়তে পারলেন না আর। একটু হেসে বললেন—সুরেশ্বর রয়েছে, বলতে লজ্জা করছে, ওই পরিবার বাতিক। মা, আমার বিয়ে হয়েছে তের বছর। এই তের বছরে একবার আমার বাবার মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধে গিয়েছিলাম। বাস, আর যাইনি। শুনেছি আমার বড় সতীন—ওঁর প্রথম পরিবার—পনের বছর বেঁচে ছিলেন, দশটি সন্তান হয়েছিল, সাতটি বেঁচেছে তিনটি মরেছে। তিনি মারা যাওয়ার এক মাসের মধ্যে আবার বিয়ে করেছিলেন। দ্বিতীয় সতীন কুড়ি বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর ছেলে-মেয়েতে ছটি, তার পাঁচটি বেঁচে। তিনি গেলেন, ওঁর তখন চুয়ান্ন বছর বয়স। সেই বয়সে টোপর চেলি পরে আমাকে বেনারসী চাদরে গলায় বেঁধে এনে ঘর বাঁধলেন। আমার একটা ভাগ্য আছে মা, ভগবানকে প্রণাম করি আর বলি, রক্ষে করেছ তুমি আমাকে। বাঁচিয়েছ। আমাকে সন্তান দাওনি। এতেই দুই পরিবারের ছেলেমেয়েতে বারোটি, ছয় মেয়ে ছয় ছেলে। এর উপর আমার গণ্ডাখানেক হলে ষোলকলায় পুন্নিমে হ'ত

মা। নাতি-নাতনীতে সতেরোটা। ওদের পেট ভরাতে বিষয় যেতে যেতে অভাবে স্বভাব মন্দ যাকে বলে তাই হ'ল। মধ্যে মধ্যে আপশোষ করেন। ভালোমানুষটা জাগে। কিন্তু কি করবেন? বড় বড় নাতিগুলো থেকে ছেলেরা একধার থেকে দায়ী করে ওঁকে। বলে—; সে জঘন্য কথা মা। সুরেশ্বরের সামনে বলতে বাধছে।

সুরেশ্বর উঠে গিয়েছিল। যেতে যেতেই শুনতে পেয়েছিল, মেজঠাকুমা বলছেন—বড় ছেলে বলে কি জান? বলে—ছয় পুত্র সন্তান থাকতে বিয়ে করেছিলেন, কেন করেছিলেন? যদি বিয়ে না করে না থাকতেই পেরেছিলেন তবে একটা রক্ষিতা রাখলেই পারতেন। একটা দুটো যটা ইচ্ছে। তবে সত্যি কথা বলব মা, ওই মামলা-মকদ্দমার নেশা, ও ওঁর গাঁজার নেশার চেয়েও বেশী। জ্বরজারি হলে গাঁজা খান না, ভাল লাগে না, কিন্তু মামলা-মকদ্দমার খোঁজ তার মধ্যেও না করে পারেন না। ওটা তো হিংসের কাজ, এ তো অস্বীকার করলে চলবে না! আর নারী ধ্যান-জ্ঞান এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, এই বা অস্বীকার করি কি করে?

হেমলতা বেশ বিস্ময়ের সঙ্গেই শুনছিলেন এই গ্রাম্য মেয়েটির কথা। মেয়েটি রায়বংশের বৃদ্ধের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়েছে নিতান্তই দুর্ভাগ্যবশে। খুবই দরিদ্রের মেয়ে, সম্ভবতঃ এমন দরিদ্র যে কন্যার বিবাহে সামান্য কিছু খরচ করবারও সঙ্গতি ছিল না, থাকলে এমন রূপসী মেয়ের বিয়ে একটা হয়ে যেতো। হয়তো বা জমিতে-জেরাতে কিছু পরোক্ষ মূল্য নিয়ে বিক্রীই করেছে। সেই মেয়ে এমন কথাবার্তা কইছে, সেটা তাঁকে কিছুখানি বিস্মিত করছে বইকি। সব থেকে আশ্চর্য লাগছে কথাগুলির মধ্যে ক্ষোভ নেই, বেদনা কিছুটা আছে, কিন্তু অপ্রসন্ন নয়। এবং বিচার আছে। এবং একটি ন্যায়বোধও রয়েছে।

মেজগিন্নীর হঠাৎ চোখে পড়ল হেমলতার বিস্মিত দৃষ্টি। তিনি কথা বলছিলেন হেমলতার চোখে চোখ রেখে বা মুখের দিকে তাকিয়েও নয়। তাঁর দৃষ্টি অধিকাংশ সময়েই তিনি নিবদ্ধ রেখেছিলেন তাঁর কোলের উপর পড়ে থাকা নিজের হাত দুখানির উপর। নিটোল দুখানি গৌর-বর্ণ হাতে শুধু দুগাছি শুভ্রবর্ণ শাখা ছাড়া কোন অলঙ্কার ছিল না। দু-একবার চোখ তুলে অনেকটা অন্যমনস্কের মত খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরের রাত্রির বায়ুমণ্ডল বা আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে সেই দিকেই তাকিয়ে থেকেছেন। এতক্ষণে হেমলতার চোখে চোখ পড়তেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বললেন—আমি তো মুখ্যু মেয়ে, গরীবের মেয়ে, যা মনে হয় তাই বললাম। কিন্তু কিছু অন্যায় বললাম মা?

হেমলতা বললেন—না খুড়ীমা। সেই তো আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম মা।

মেজগিন্নী বলেছিলেন—গরীব ঘরের মেয়ে, বাপ ছিলেন এঁদের বাড়ীর পুজুরী। চালকলা বাঁধা বামুন। কিন্তু ধর্মভীরু ছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে এ বিয়ে হ'ত না। বাবা মারা গেলেন, নিজের মা ছিল না! দেড় বছরের রেখে মা মরেছিলেন। সৎমা বিধবা হলেন, তখন বয়স আমার চৌদ্দ। গাঁয়ে ঘরে বিয়ের কাল পেরিয়েছে, গলায় কাঁটা লাগার মত লেগেছি। মেজকর্তা লোক পাঠালেন। পাঁচ বিঘে জমি দেবেন ভাইদের। বিয়ে হয়ে গেল। আমিও বাঁচলাম। লোকে বললে শিবের মত স্বামী হল। আমিও তাই ভাবলাম। বাপের কাছে শেখা পাপপুণ্য বোধ

ছিল। মেজকর্তাও তখন এমন ছিলেন না। তখনও থিয়েটার করতেন। ঘরে নাটক পড়তেন। তাঁর থেকে অনেক শিখলাম মা। কিন্তু যাঁর কাছে শিখলাম, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়ে সে-ই সব ভুলে গেল।

হেমলতা বললেন—ভারী ভাল লাগল মা আপনাকে!

খুশী হয়ে মেজগিন্নী বলেন—জান মা, কাল খবর পেয়ে অবধি কতবার মনে মনে বলেছি যোগেশ্বর ভাশুরপো না গিয়ে যদি ইনি যেতেন! আমি যদি বিধবা হতাম! কত দাম তার জীবনের, কত নাম! আর ইনিও দারিদ্র্য-দুঃখ থেকে রেহাই পেতেন!

—ও কথা বলে না খুড়ীমা। উনি বাঁচুন, অনেকদিন বেঁচে থাকুন। ওঁর দুঃখ ঘুচুক? ছেলেরা কাজ-কর্ম করুক—

—ছেলেরা? মা, বড় সতীনের ছেলেরাও তো বুড়ো হয়ে এল বলতে গেলে। বড় ধনেশ্বরের বয়স যোগেশ্বর ভাশুরপোর প্রায় সমান। ছেলেরাই সব উপযুক্ত। বড় ছেলে ব্রজেশ্বর, সুরেশ্বরের থেকে বড়। ধনেশ্বর সিঁদুরের ফোঁটা পরে, কালীমন্দিরে কালী-কালী করে, মদ খায়। লোককে শাসন করে বেড়ায়। ভাবে সেই আমলই বুঝি আছে। ধর্মের ষাঁড়কেও যে আজ-কালকার আইনে খোঁয়াড়ে দেওয়া যায় তা ভুলে যায়। সেজছেলে সুখেশ্বর একটু উপযুক্ত। এখানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। দু-চার টাকা এদিক-ওদিক থেকে রোজগার করে, তা নিজের কুলোয় না বাপ-ভাইকে কি দেবে? কত আর বলব মা, সব ছেলেই অপগণ্ড। দ্বিতীয় পক্ষের বড় ছেলে কমল—কমলেশ্বর বাপকে নেশার পয়সার জন্যে মধ্যে মধ্যে বলে—নেশার পয়সা দিতে পার না বাপ হয়েছিলে কেন? জন্ম দিয়েছিলে কেন? গাঁজা খায়। ছোট ছেলেটা অতুলেশ্বর একটু ভাল। লেখাপড়া করছে। তাও স্বদেশী বাতিক। বন্দেমাতরম করে বেড়ায়। নাতিগুলোও তাই! ওঁর কষ্ট দেখি আর ভাবি আরও কত কষ্ট উনি পাবেন! মধ্যে মধ্যে এমন কাণ্ড ঘটে বড় ছেলের বড়ছেলে আর অতুলের বড় বিমলকে নিয়ে, আর মেজ ছেলে জগদীশ্বরকে নিয়ে যে উনিও বলেন—হে গোবিন্দ, মৃত্যু দাও! পরিত্রাণ কর! অথচ মৃত্যুকে ওঁর বড় ভয়।

—কেন? কি করে? ওঁকে মারেটারে নাকি?

—না-না। সে সাধ্যি নাই। সে ভয় করে। উনি এখনও সব নিজের হাতে রেখেছেন তো! বন্ধ করে দেবেন সব! যা করে সে কেলেঙ্কারী। এখানে ছোটজাতের মেয়েদের নিয়ে—বিশেষ করে ওই নদীর ওপারে গোয়ানপাড়া ব'লে একটা ক্রিশ্চানপাড়া আছে, তাদের মেয়েগুলো খারাপও বটে, তাদের নিয়ে কেলেঙ্কারী করে। ওদের পুরুষ জাতটা আবার আমাদের ছোটজাতের মত নয়—তারা সব চোথোল-মুখোল, বদমাস, গুণ্ডা, তারা আসে মারমুখী হয়ে! ওঁকে তার ঝাপটা সইতে হয়। এক-একদিন বলেন—মেজবউ, আমার অজান্তে আমার ক্ষীর কি সন্দেশে বিষ মিশিয়ে দিতে পার? আর বাঁচতে আমি পারছিনে, চাইনে। কিন্তু জেনে, নিজে উদ্যুগ করে মরবার মত সাহস আমার নেই। মরণকে আমার বড় ভয়। জান, বি-এ পরীক্ষার সময় কলকাতায় প্লেগের হুজুগ হয়েছিল, কলকাতায় প্লেগ এসেছে। আমি পালিয়ে এসেছিলাম পরীক্ষা না দিয়ে। বাড়ীতে কেউ পাঁচবার দাস্ত করলে গাঁজা খাই। ঘর বন্ধ করে বসে থাকি।

কিন্তু এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হচ্ছে না।

আবার কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন—আগে শুনেছি দয়া ছিল মায়া ছিল। কেউ মারা গেলে হাউহাউ ক'রে কাঁদতেন—বটঠাকুর মানে তোমার শ্বশুর, ঠাকুরপো মানে ওঁর ছোট ভাই, বন্দুকে পাখী মারতেন, উনি কাঁদতেন। মিথ্যে কথা বলতেন না। সেই মানুষ ওই দুটো দোষে কি হয়ে গিয়েছে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস তিনিও ফেললেন, হেমলতাও ফেললেন। হেমলতা কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কি উত্তর দেবেন? একটু নিস্তব্ধ হয়ে রইল ঘরখানা। তারপরই মেজগিন্নী বললেন—তাহ'লে উঠি বউমা। তুমি সুরেশ্বরকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। ও একবার কাছে বসে মিষ্টি ক'রে বলুক, ঠাকুর্দা, আমার তো অভিভাবক আপনি। আপনার থেকে বড় অভিভাবক তো কেউ নেই। জ্যাঠামশাই তো সেই দূরে। আমি ছেলেমানুষ, আমাকে যেন আপনি দেখবেন। হয়তো···হয়তো কাজ কিছু হবে না। তবু বলা! বিষণ্ণভাবে হাসলেন মেজগিন্নী।

হেমলতা সচেতন হয়ে উঠলেন, তিনি যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন—এই তার চেয়েও কমবয়সী তাঁর শাশুড়ীটির জন্যে। সচেতন হয়ে উঠে বললেন—যাবে বৈকি সুরেশ্বর। যাওয়া উচিত ছিল। সুরো! সুরেশ্বর! রঘু, সুরো বোধহয় বাইরে—

সুরেশ্বর বাইরে যায়নি। পাশের ঘরেই ছিল। বাইরের ওই জঙ্গলের ও কংসাবতীর দিকের জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার ফুটফুটে রাত্রির আকাশ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ছিল। জঙ্গলে কোথায় দুটো কোকিল পাল্লা দিয়ে ডেকেই চলেছে। 'চোখ গেল' পাখীর ডাকও সে শুনেছে, পাপিয়া ওর নাম, জানবাজারে পাশের একটা বাড়ীতে কেউ পুষেছিল—ডাকত। আর একটা পাখী ডাকছে ভারী চমৎকার সুরেলা ডাক। নাম জানে না। ওই ডাকও শুনেছিল সে, আবার কথাও শুনছিল মেজঠাকুমার। সম্ভবতঃ মনটা মেজঠাকুমার কথার দিকেই আকৃষ্ট ছিল বেশী। পাখীর ডাক এবং গান কানের পাশ দিয়ে বেজে চলেছিল বাতাসের প্রবাহের মত, বৃষ্টির শব্দের মত, দুরান্তের কোলাহলের মত। ধ্বনিতেই তার পরিবেশন শেষ—কোন ব্যঞ্জনার স্বাদ নেই, কোন অর্থবোধের ঔৎসুক্য নেই।

মায়ের ডাকে সুরেশ্বরের যেটুকু মন বাইরে ছড়িয়েছিল, যেটুকু কথার মধ্যে মগ্ন ছিল সব একত্রিত হয়ে সজাগ হয়ে উঠল। সে সাড়া দিয়ে বললে—আমায় ডাকছ?

বলে সে এসে ঘরে ঢুকল।

—পাশের ঘরেই ছিলি বুঝি? বাইরে সব বসে রয়েছেন—

মেজগিন্নী বললেন—ভালই করেছে মা। ওর বাইরে গিয়ে গাঁয়ের লোকের কচ্‌কচি না শোনাই ভাল। এখানে খবর আসা অবধি এদের ছয় ভাইয়ের তো মুখের বিরাম নেই। নানান গল্পগুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে। বড় ছেলে তো সকাল থেকে মদ খেয়ে চাৎকার করছে। মেজকর্তার মন্দস্বভাবে সেটা ভাল লাগছে। তবে মধ্যে মধ্যে বলছেন, না—না। এ বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। যাক্, আজ উঠি—

—আপনি কিন্তু আসবেন খুড়ীমা। যে যা বলুক করুক আপনি যেন পরিত্যাগ করবেন না।

—আসব। আমার পথ কেউ আটকাতে পারবে না বউমা। তোমার শ্বশুর আমাকে ভয় করে। হাজার হলেও তৃতীয়পক্ষ তো।

বলে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন—কিন্তু একটি শর্তে।

—বলুন।

—শর্ত হল, তুমি মা আমাকে আপনি আজ্ঞে করো না। আমি তোমাকে তুমি বলছি, তুমিও আমাকে তুমি বলবে।

—সেকথা কেমন ক'রে বলব খুড়ামা—তাই কি পারি?

—মা, এখানে ছেলেরা মাকে তুই বলে। রাগলে বাপকেও বলে। সেকথা থাক্। তোমার সুরেশ্বর তোমাকে তো তুমি বলে। তুমিও আমাকে তুমি বলবে। কেমন লাগে মা। চাকর-বাকর ছাড়া কেউ তো আপনি বলে না। তাছাড়া বয়সে আমি তোমার থেকে ছোটই হব।

হেসে হেমলতা বললেন—বেশ, তাই বলব।

মেজগিন্নী বললেন—এস ভাই নাতি। চল, ঘুরে আসবে। দেখে আসবে ঠাকুরদাকে।

হেমলতা বললেন—ম্যানেজারবাবুকে বলে সঙ্গে লোক আর আলো নিয়ে যা।

নায়েব বা ম্যানেজার হরচন্দ্র একটু খুঁতখুঁত করলেন। কিন্তু যোগেশ্বরের এখানকার পুরানো কর্মচারী গোবিন্দ ঘোষ বললে—মেজমায়ের সঙ্গে যাচ্ছেন, কোন খুঁতখুঁত করবেন না। বলে তিনি ডেকে বলেন—ওরে ভিকু, তুই যা আলো নিয়ে।

একটি অদ্ভুত মূর্তি—অন্তত তাই মনে হল সুরেশ্বরের—আলো এবং লাঠি হাতে সেলাম করে দাঁড়াল। লোকটার গালপাট্টা আছে, পাকানো গোঁফ আছে, পরনে পাজামা আছে, গায়ে একটা ছেঁড়া কোট আছে। বাঙালী তো নয়ই—হিন্দুস্তানী বলেও মনে হয় না, কিন্তু মুসলমানের সঙ্গেও মেলে না।

মেজঠাকুমা বললেন—ভিকু!

—হাঁ মাইজী!

—বহাল হলি বুঝি?

—হাঁ মা। হলদির কাছে আদমী গিয়েছিল তিন আদমীর জন্যে—বুড়ী আমাকে রোজাকে ভেজেছে, কাল আর কোইকে ভেজবে। আচ্ছা আদমী ছাড়া তো দিবে না! হামারা তো নোকরী ঢুঁড়ে ঘুরছি মা, মিলছে না। আর নতুন হুজুর আইলেন, নোকরী মিলল!

সুরেশ্বর বললে—কি নাম তোমার?

—গোবিন্দ ভিক্‌কুরুজ! হামি লোক গোয়ান আছি হুজুর! হারমাদ ছিলাম হামরা! হুজুরেরা হামাদের এনে এখানে জমিন দিয়ে ঘর দিয়ে বৈঠালেন।

মনে পড়ল সুরেশ্বরের। পূর্বপুরুষ বীরেশ্বর রায়ের আমলে এরা এখানে এসে বাস করেছিল।

বাস করিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে। গোয়ানীজ পোর্টুগীজদের বংশধর। মনে পড়ল মেজঠাকুমা মাকে বলছিলেন গোয়ানপাড়ার মেয়েদের কথা। কিন্তু সেকথা নিয়ে কৌতূহল জাগবার মত তার মনের অবস্থা ছিল না। সে একটু শঙ্কিত হয়েই চলেছিল বিচিত্র মেজঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করতে। তার বাবাকে সে দেখেছে রায়বংশের প্রাসাদের একটি শ্বেতশুভ্র গম্বুজের মত মহিমায়। তাতে আকাশ থেকে অন্ধকারের কালি ঝরে কালো হয়ে যেতেও দেখেছে। তার চূড়ার কলসে কলঙ্ক ধরতেও দেখেছে। এখন চলেছে দেখতে আরও পুরনো এক গম্বুজ বা মিনারকে—যেটা ভূমিকম্পে ফেটে গেছে; ফাটলে ফাটলে সরীসৃপের বাস; যেটার তলায় দাঁড়ালে যে-কোন মুহূর্তে খানিকটা ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা, যেটার রং বিবর্ণ হয়ে কদর্য—হয়তো বা ভয়ঙ্কর—হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে গেল।

মেজঠাকুরমা বললেন—দাঁড়ালে ভাই?

ঠিক পথের ধারেই একটা গাছে যেন মাথার উপরেই সেই অজানা সুরেলা শিস্ দেওয়া পাখীটার ডাক শোনা যাচ্ছে। অত্যন্ত কাছে ঠিক মাথার উপরে বলেই মনটা যেন ছেলে-মানুষের মত ওরই কাছে ছুটে চলে গেছে। সে বললে—ওই পাখীটা! অনেকক্ষণ থেকে ডাক শুনছিলাম নদীর ওপারের জঙ্গলে। এখানে বোধহয় এই গাছটাতেই ডাকছে।

পাখীটা আবার ডেকে উঠল। মেজগিন্নী হেসে উঠলেন—বললেন—ওটা তোমার মেজঠাকুর্দা পাখী ভাই।

—মানে?

—বুঝতে পারলে না? ওকে বলে 'বউ কথা কও' পাখী।

—মেজঠাকুমা পাখীগুলো তাহ'লে কি বলে মেজঠাকুমা?

—হরি হরি হরি! তাও জান না! তারা ডাকেই না। পাখীদের মেয়েগুলো ডাকে না গো! যদি ডাকে—তবে নাতি কথা কও বলে!

তারপরই বললেন—এসে পড়েছি আমরা। দেখো, একটু সহ্য করে যেয়ো ভাই। বয়স সোত্তোরের কাছে, কিন্তু অভাবে অভাবে, আর স্বভাবেও বটে, মেজাজ মন বাহাত্তুরের অধম হয়েছে!

এতক্ষণে বাঁদিকের গাছটা থেকে ডানদিকে চোখ ফেরালে সুরেশ্বর। জ্যোৎস্নার মিষ্টি সাদা আলোয় শেওলাপড়া কালচে রঙের প্রকাণ্ড একটা ফটক। দুপাশে দুটো যেন কি? জানোয়ারের মূর্তি। দুটো সিংহ। ফটক দুটো কাঠের—ভাঙা-ভগ্ন। ওপাশে একরাশ কালো জমাট পাথরের মত বাড়ীখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ঢুকে মেজঠাকুমা বললেন—এটা ঠাকুরবাড়ী। প্রণাম করে যাবে ভেতরে।

প্রকাণ্ড নাটমন্দির। মোটা গোল থামের উপর ছাদ—চারপাশে ঢালু চারখানা আলাদা

টিনের চাল। উত্তরদিকে কালীমন্দির। প্রশস্ত চৌকো ঘরই একখানি—সামনে ঠিক মাঝখানে আলসের উপর তিনকোণা বা ত্রিভুজের মত একটি অলঙ্করণ। তার দু'পাশে দুটি হাতীর মাথা, তারা শুঁড় তুলে রয়েছে। মাঝখানে একটি পদ্ম—তার মধ্যে লেখা ওঁ। বারান্দা ঘর সব মার্বেল দেওয়া।

বারান্দায় গিয়ে সুরেশ্বর উঠল মেজঠাকুমার পিছন পিছন। কেউ একজন আসনে বসে নাক টিপে করগণনা করে জপ করছিল। সামনে মদের বোতল, পাশে নারকেলমালার পাত্র, একখানা শালপাতায় কিছু মুড়ি এবং আরও কিছু ভাজাভুজি উপকরণ। পিছন দিক থেকে লোকটিকে দেখে শুধু এইটুকু বুঝলে সুরেশ্বর যে লোকটি প্রৌঢ় এবং দেহখানা যেন ভাঙাভগ্ন, তবে লোকটি দীর্ঘাকৃতি; মাথায় টাক পড়েছে।

ভিতরে শ্বেতপাথরের গড়া বড় একটি সিংহাসন, যার মাথাতেও ছত্রি, সামনে সরু গোল ছোট থাম বা ডাণ্ডা, তার মধ্যে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি। মূর্তির রং ঠিক ঝকঝক করছে না, খসখসে মনে হল; এবং বুঝতেও পারলে যে মার্জনা বিশেষ হয় না।

মেজগিন্নী নিজে প্রণাম করলেন। সুরেশ্বর দাঁড়িয়েই রইল। মেজগিন্নী উঠে বললেন—প্রণাম কর।

প্রণাম করতে ঠিক অন্তরের ইচ্ছে ছিল কি না-ছিল তা সুরেশ্বর নিজেই ঠিক জানত না। সে মেজঠাকুমার কথায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রণাম করল। বাপের শ্রাদ্ধের জন্য এখানে আসার পিছনে তাদের যে মন রয়েছে সেটাও তাকে বোধহয় নির্দেশ দিলে—প্রণাম কর। তবে যুক্তির দিক থেকে তার বর্তমান মনের যুক্তিতে এতে সায় থাকবার কথা নয়, কিন্তু সংস্কারের প্রভাব একেবারে মুছে যায়নি।

মেজঠাকুমা পূজককে বললেন—চরণোদক দাও ঠাকুর সুরেশ্বরবাবুকে। পূজকঠাকুর তামার চরণোদকের পাত্র নিয়ে বেরিয়ে এল। মেজঠাকুমা বললেন, হাত পাত' ভাই।

ঠিক এই সময়েই উপাসক ব্যক্তিটির ধ্যানভঙ্গ হল—কালী কালী জয় কালী। কালী কলুষনাশিনী, কালী আনন্দময়ী—বলতে বলতে ফিরে তাকালে পিছন দিকে। সুরেশ্বরকে দেখে গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কে?

মেজগিন্নী বললেন—এই সুরেশ্বর, যোগেশ্বর ভাশুরপোর ছেলে! সুরেশ্বর, ইনি তোমার বড়কাকা—তোমার মেজঠাকুর্দার ছেলে ধনেশ্বর।

—অ—! সুরে-শ্বর। সুরের ঈশ্বর! তা চেহারাখানা তো বেশ! উঁ!

সুরেশ্বর বিব্রতবোধ করলে। কি করবে—কি বলবে ভেবে পেল না। হঠাৎ জুগিয়ে গেল, সে বললে—অশৌচে তো প্রণাম করতে নেই বলছিলেন মেজঠাকুমা।

—না, তা নেই।

মেজঠাকুমা বললেন, বিবিমহলে মনমরা হয়ে বসে ছিল। ওর মা—বউমা বলছিলেন এই বয়সে পিতৃহীন হয়ে বড় ভেঙে পড়েছে বেচারা। অভিভাবক নেই সাহস দেবার, ভয় নেই বলবার কেউ নেই। তা আমি বললাম, সে কি? ওর মেজঠাকুরদা বেঁচে, ওর শূর-বীরের মত কাকারা, ধনেশ্বর, সুখেশ্বর রয়েছে, অভিভাবক নেই সে কি কথা! চল, এখুনি চল। দেখবে

কাকারা বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলবে—কি ভয়, কিসের ভয়!

সে প্রায় উদাত্তকণ্ঠ যাকে বলে—সেই উদাত্তকণ্ঠে ধনেশ্বর বলে উঠল—নি-শ্চ-য়! বলে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত মেলে বললে—পুত্রের অধিক। যোগেশদার এক পুত্র সে আমার শতপুত্রের অধিক! ওঃ!

প্রচুর মদ্যপানে তার পা ঠিক থাকছিল না—টলছিল। এবং সর্বাঙ্গ দিয়ে দেশী মদের তীব্র গন্ধ নির্গত হচ্ছিল। টলতে টলতে এসে সুরেশ্বরকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধনেশ্বর কেঁদে ফেললে। ওঃ, কি মানুষই ছিল যোগেশদা! ওঃ! তুই তার ছেলে!

সুরেশ্বরের অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ক'রে উঠল। তার মনে হল যেন পৃথিবীর কুৎসিততম দুর্গন্ধ-যুক্ত একটা জন্তুতে তাকে আঁকড়ে ধরেছে। কি করবে সে তা ভেবে পেলে না! বহুকষ্টে আত্ম-সম্বরণ করেও একটা হাত দিয়ে ধনেশ্বরের বাহু বেষ্টনীতে একটু ঠেলা দিয়ে বললে—ছাড়ুন! আমাকে ছাড়ুন!

মেজগিন্নী বুঝেছিলেন, তিনি বললেন, ওকে ছেড়ে দাও বাবা ধনেশ্বর। তাছাড়া তুমি করলে কি? সন্ধ্যা শেষ না করেই আসন ছেড়ে উঠলে?

সুরেশ্বরকে ছেড়ে দিল ধনেশ্বর। তারপর বললে—তাই তো, অন্যায় হয়ে গেল! ফের গোড়া থেকে করতে হবে। তা তুমি ভেবো না বাবা! কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক করে দেব আমি। বিলকুল ঠিক করে দেব। সিধে ঠিক করে দেব!

বলেই আসনে বসে পড়ে গাঢ় প্রমত্ত-কণ্ঠে বলে উঠল—কালী কালী বল মন। কালী কালী কালী। কালী কল্যাণী। কালী করুণাময়ী।

মেজগিন্নী সুরেশ্বরকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে একটি দরজায় ঢুকে পড়লেন। বললেন—এ চত্বরটি রাজরাজেশ্বরের আর রাধাশ্যামের চত্বর। চত্বরটি স্বতন্ত্র; পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বলতে গেলে শাক্ত এবং বৈষ্ণবতন্ত্রের ক্ষেত্র দুটিকে তফাৎ ক'রে আলাদা ক'রে দেওয়া হয়েছে। শক্তি-মন্দিরের মদ্য এবং মাংসের গন্ধ যেন ওদিকে না যায়।

ওদিকে কালীমন্দিরের বারান্দায় বসে উচ্চ জড়িতকণ্ঠে ধনেশ্বর চীৎকার করছিল—কলকাতার বাবু, যোগেশ্বর ব্যাটা, ক্রীশ্চান-সাহেবের গোলাম—এঁটো-চাটার পুত্র। দেশী কুত্তার গায়ে খুসবু সাবান মাখায় সাহেবরা। তাই সাহেবের দেশী-কুকুর গাঁয়ের বাঘা কুকুরকে ঘেন্না করে! বাঘা কুকুর শ্মশানে ফেরে মশানে ফেরে। তার জাত আছে। জয়কালী জয়কালী। কেরেস্তান-দেবোত্তরের দায়ে শ্রাদ্ধ করতে এসেছে। আমি দেখছি—

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সুরেশ্বর।

তখনও বলে চলেছে ধনেশ্বর—হারামজাদা—শূয়ার কি বাচ্চা—তোর বাপ মদ খেত না? কেরেস্তান—! এ-ই ঠাকুর মন্দিরের বারান্দা গঙ্গাপানিসে নাথাল দেও। কেরেস্তান উঠেছিল। করাচ্ছি, তোমাকে শ্রাদ্ধ করাচ্ছি।

মেজগিন্নী এসে সুরেশ্বরের হাত ধরলেন—এস, ওসব শোনে না। ঠাকুরকে প্রণাম কর। করে চল মেজঠাকুরদাকে বলে চলে যাবে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুরেশ্বর।

—নাতি !

—আমি ফিরে যাই ঠাকুমা !

—না ! যেতে নেই। দেখ ভাই, তর্পণ যখন করবে তখন দেখবে—অবন্ধু,—শত্রু, বন্ধু, অন্যজন্মের বন্ধু সকলকে জল দিতে হয়। যাদের সন্তান নেই, যারা অপঘাতে মরেছে, তাদের জল দিতে হয়। শ্রাদ্ধে তাদেরও পিণ্ড দিতে হয়। এখন তোমার রাগ করতে নেই।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে স্থরেশ্বর বললে—আপনি সংস্কৃত পড়েছেন ঠাকুমা ?

—না ভাই। কে শেখাবে ? বাবা পূজারী বামুন ছিলেন, বলতেন, শুনে শিখেছি। তোমার ঠাকুরদা তর্পণ করেন, শুনেছি। বুঝি। হাজার হলেও বামুনের মেয়ে বামুনের বউ তো !

—চলুন। ঠাকুরদাকে দেখে আসি চলুন।

* * *

রায়বংশের পুরুষেরাই দীর্ঘকায়। মেজঠাকুরদার মধ্যে একটু পার্থক্য সে দেখলে। মেজ ঠাকুরদা ঈষৎ স্থূলকায়, বেশ একটি ভুঁড়ি আছে।

দোতলার বারান্দায় আসর পেতে বসে ছিলেন শিবেশ্বর। একদল তিলকধারী খোল নিয়ে বসে ছিল। আরও দুজন বৈষ্ণবও ছিল। শিবেশ্বর সবে গাঁজার কল্কেটি হাতে ধরেছেন। মেজ-গিন্নী স্থরেশ্বরকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ঠিক বারান্দার প্রান্তদেশে দাঁড়ালেন। এবং একটু থমকে গেলেন। গাঁজা শিবেশ্বর খান এ কথা তিনি হেমলতাকে বলেছেন, না-বলবার কারণও ছিল না, কারণ শিবেশ্বর অতি প্রকাশ্যভাবেই গাঁজা খেয়ে থাকেন। এবং স্থরেশ্বর বিবি-মহলে পাশের ঘরে থেকে এ সব শুনেছে তাও তিনি জানেন, তবুও যেন একটু লজ্জিত হলেন।

শিবেশ্বর গ্রাহ্য করলেন না। গাঁজার কল্কে মুখের কাছে ধরে টানতে লাগলেন। মেজগিন্নী বললেন—স্থরেশ্বর এসেছে।

গাঁজার ধোঁয়া ছেড়ে একটু দাবা গলায় শিবেশ্বর প্রশ্ন করলেন—কে এসেছে ?

—স্থরেশ্বর। তোমার কাছে এসেছে, তোমাকে দেখবে—দেখা করবে !

যোগেশ্বরের ছেলে ?

—হ্যাঁ।

—এস। এস। ভাই এস।

স্থরেশ্বর এগিয়ে গেল। শিবেশ্বর কল্কেটা খোল-বাজিয়ের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। স্থরেশ্বর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালে। আলো উজ্জ্বল নয়—হারিকেন জ্বলছে। তবু তার মনে হল, ঠিক সাধারণ নেশাখোর মানুষ তো নন। মুখে এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে।

সে বললে—মেজঠাকুমা বলেছিলেন, অশৌচের মধ্যে প্রণাম করতে নেই।

—না। নেই। কিন্তু প্রণামেরই বা দরকার কি ভাই ? যারা বুকে চড়ে মলমূত্র ত্যাগ করলে চন্দন লেপনের আনন্দ পায় মানুষ, তাদের কাছে প্রণাম কি প্রয়োজন ? বস।

অভিভূত হয়ে গেল সুরেশ্বর। নূতন কালের মানুষ সে। সবুজপত্রের যুগ সদ্য শেষ হয়েছে বা সবুজপত্র সদ্য উঠে গেছে; পেঁচিয়ে কথা বলে বক্তব্যটিকে বক্র ও তীক্ষ্ণ করে বলার রেওয়াজ উঠেছে; ভারের চেয়ে ধারের দাম বেশী হয়েছে; তাতে উল্লাস এবং কৌতুক দুইই আছে। এ কথা সে জাতের নয়—সে মেজাজের নয়; এ কথা সোজা কথা এবং হয়তো কিছুটা ভাবালুতা আছে, তবু সে অনুভব করলে, তার মন আনন্দে এবং আবেগে যেন ভরপুর হয়ে গেল।

শিবেশ্বর তাকে ধনেশ্বরের মত বুকে জড়িয়ে ধরলেন না, হাতে ধরে বললেন, বস। তোমার কম্বলের আসন কই? আনো নি? মেজবউ, আসন দাও। গালিচার আসন পেতে দাও!

তারপর হঠাৎ আলোটা তুলে নিয়ে তার মুখের সামনে ধরে তাকে দেখলেন। আবার আলোটা নামিয়ে চশমা বের করে চোখে দিয়ে দেখে বললেন—তাই তো ভাই। তুমি তো দেখি অপরূপ হে! রায়বংশে শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন তোমার পিতামহ। আমার জ্যেষ্ঠ দেবেশ্বর রায়। তাঁর অয়েলপেন্টিং নিশ্চয় দেখেছ। সে অবশ্য পরিণত বয়সের। প্রথম যৌবনের সে ছবি আমার মনে ভাসছে। তুমি হয়তো তাঁর থেকেও সুপুরুষ। প্রেমে পড়বার মত রূপ হে! আমি যে চিন্তিত হলাম ভাই! তুমি যে সাক্ষাৎ মদন হে!

লজ্জা পেয়েছিল সুরেশ্বর; সে লজ্জাকে জয় করে সে একটু পুলকিত কৌতুকেই বললে—কেন? এ যুগে আর তো শিবের তপোভঙ্গ করতে হবে না! চিন্তা করছেন কেন?

—ভাই! গম্ভীরভাবে বললেন শিবেশ্বর, ভাই, আমার যে তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী এবং সুন্দরী গৃহিণী! বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন।

—না ঠাকুরদা, আপনার গৃহিণী রতি নন—উনি সতী—না, সতী বলব না,—উনি গৌরী, উমা।

—বহুৎ আচ্ছা! সাধু-সাধু-সাধু! দীর্ঘায়ু হও। তার তুল্য খ্যাতিমান হও! চমৎকার বলেছ হে! ঠাকুরদাকে ঠকিয়ে দিয়েছ। এবং—। একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন—লজ্জিতও করেছ আমাকে। তুমি আমার সঙ্গে নিজে থেকে দেখা করতে এসেছ। যাওয়া তো আমারই উচিত ছিল। তুমি পিতৃহীন হয়েছ; আমি পিতামহ; তুমি পৌত্র—ভ্রাতুষ্পৌত্র, আমারই তো গিয়ে বলা উচিত ছিল—এস ভাই, কোন ভয় নেই তোমার, আমি যতক্ষণ আছি। তা আমি করিনি!

—কর নি, এবার কর! মেজগিন্নী সুযোগ পেয়ে মাঝখানে ঢুকে দিলেন।

—হুঁ। শুধু একটি হুঁ বলে শিবেশ্বর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

সংসারে বোধহয় অবস্থার আনুকূল্যে প্রসন্নতায় মানুষ মুখর হয়ে ওঠে—আবার প্রতিকূলতায় ক্ষোভে বিষণ্ণতায় কথা হারিয়ে ফেলে—বা কোনক্রমে দমন করে রাখে নিজেকে। সুরেশ্বরের মনে এবং মুখে কথা আপনি এসে গেল, সে বললে—আমাদের উপর কি রাগ করে আছেন আপনি?

—না। রাগ তো নয় ভাই। রাগ নয়। দেখ, আমি ধর্মে একটু গোঁড়া। সেই

কারণে সেই প্রথম যৌবন থেকে তোমার ঠাকুরদা'র মত কলকাতায় যাই নি, রামেশ্বরের মত বিলেত যাই নি। তিনবার বিবাহ করেছি—তবু পরদার করি নি। আজ বলতে গেলে নিঃস্ব হয়েছি। সেই ধর্ম। মানে তোমার বাবা—। থাক সে সব কথা। আমি ভাবছি। এখনও ভাবছি। ভাবছি বলেই এখনও দূরে দূরেই রয়েছি। তা ছাড়া আমিও তো বলতে গেলে ঠিক স্বাধীন নই। আমার ছেলেরা অপোগণ্ড, মূর্খ, মাতাল—তা ছাড়া অন্য দোষও তাদের আছে। তারা অমত করছে। তারা বিষয়ের জন্যে করছে। সে বলতে হবে। তবে কি জানো, আমার বিচারে তো তোমার বাপের সঙ্গে এদের তফাৎ খুব নেই। দুইই পচেছে। তাই হয়, বড় বড় বংশে তাই ঘটে। তোমার বাপ ইংরিজী মতে পচেছে, এরা দেশী মতে পচেছে। দেখ, আমার কাছে তোমার বাপের পচাটাই বেশী পচা। কারণ ইংরেজী মতে পচা মানেই জাত দিয়ে পচা। আমার ছেলেরা জাতটা রেখেছে। আমি ভাবছি!

সুরেশ্বর বললে—ভেবে দেখুন তা হলে। আমি আজ যাই!

—এস। কাল আমি যাব। বউমার সঙ্গে দেখা করে আসব। ওঁকে সেই বিয়ের সময় আর বিয়ের পরই সাতদিনের জন্য এখানে এসেছিলেন, তখন দেখেছি, আর দেখি নি। দেখে আসব। ইতিমধ্যে ভেবে দেখি। ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শও করি।

পরদিন সকালে শিবেশ্বর সঙ্গে সেজছেলে সুখেশ্বরকে নিয়ে নিজে এলেন। সুখেশ্বরের বয়স বছর চল্লিশেক। মেজ জগদীশ্বরের থেকে বেশ কয়েক বছরের ছোট। সুখেশ্বর বেশ ভদ্র। ম্যাট্রিক পাস। এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। কিছু ঠিকাদারি ব্যবসাও আছে। লোকে বলে—ইউনিয়ন বোর্ডের ইন্দারা, রাস্তার সাঁকো এ-সব বেনামীতে সুখেশ্বরই করে থাকে। ইউনিয়ন কোর্টেরও হাকিম। তাতেও নাকি কিছু কিছু আয় হয়। চেহারায় রায়বংশের ছাপ আছে, তবে রঙটা কালো।

শিবেশ্বর হেমলতাকে ডেকে অনেক সান্ত্বনা, অনেক উপদেশ দিলেন। পরিশেষে বললেন—কাল আমি সুরেশ্বরকে সব বলেছি মা। দেখ মা, আমার কাছে ধর্ম সবার উপরে। বুঝেছ! তা আমি আমার গুরুর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, এ অনুমতির কাজ নয়। বিচারের কাজ। যা তোমার বিচারে হবে তাই কর। সে বিচার আমি করছি। হ্যাঁ, করছি। মনে হয় দুপুর নাগাদ একটা সিদ্ধান্ত করতে পারব।

হেমলতা চুপ করে রইলেন।

শিবেশ্বর বললেন—হরচন্দ্র কাল সকালে গিয়েছিল, বলছিল, তোমাদের ইচ্ছে ছিল বসত-বাড়ীতে উঠবে। ইচ্ছেটা স্বাভাবিক বটে। বসত-বাড়ী—পৈতৃক ভদ্রাসন। আর ওগুলি দেবত্র নয়—সবই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মেরামতও করাও—

হেমলতা বললেন—না-না-না। এই তো আমরা এখানে বেশ রয়েছি।

—হ্যাঁ। এ বাড়ী ওখান থেকে অনেক আরামের। তবে ভদ্রাসন। তা—যদি প্রয়োজন হয় তা হলে আমি আজই খালি করে দেব। আমার বাড়ীটা জীর্ণ হয়েছে। তা হোক, পরিষ্কার এ বেলাতেই হয়ে যাবে। বিকেল চারটে নাগাদ খালি হয়ে যাবে! যদি চাও!

সুখেশ্বর এতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় চুপ করেই বসে ছিল, সে এবার বললে—এ সময় কথাটা বলা হয়তো অন্যায় হচ্ছে আমার। একটা ব্যাপার হয়ে আছে—সেটা আমি বলে রাখতে চাই বউদি!

—কি বলুন?

—আমাকে বলুন বলছেন কেন? আমি যোগেশদার চেয়ে দশ বছরের ছোট। হেসে মাথার ঘোমটাটা টেনে দিলেন হেমলতা।

সুখেশ্বর বললে—যোগেশদা তখন কলকাতায় ছিলেন, সে সময় আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম দেবোত্তরের একশো বিঘে ধানজমির একটা প্লট, আমরা আট ভাই বাবার অংশ রায়তী স্বত্বে বন্দোবস্ত নিয়েছিলাম। যোগেশদাকে বলেছিলাম, দাদা, তোমার তো অনেক আছে, কোন অভাব নেই, এটা বাবা যখন আমাদের খাজনা করে দিলেন তখন তুমিও আমাদের দাও। তা উনি বলেছিলেন—দিলাম! আমি ভুল করে দলিলটা নিয়ে যাই নি—তাই সই হয়নি। এই তারপরই উনি নেটিভ স্টেটে চলে গেলেন। উনি যখন বিলেত চলে গেলেন, তখন হরচন্দ্র সেটা অস্বীকার করলেন, বললেন—তা কি করে হবে? কই, আমরা তো কিছু জানি না! সেই তখন থেকে একটা গাঁট লেগে রয়েছে। সেটা, এদিকটা যখন মিটেই যাবে, তখন মিটে গেলে ভাল হয় না?

শিবেশ্বর বললেন—এ কি সুখেশ্বর! এ সময়ে ওকথা কেন?—এ কি?

হরচন্দ্র নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এবার হেমলতা কিছু বলবার আগেই বললে—না-না কর্তা। উনি ঠিক বলেছেন। সব গাঁট খুলে যাওয়াই ভাল।

তা—নিশ্চয়। স্বর্গীয় বাবু যখন বলে গেছেন, তখন দলিল আনবেন, সই করে দেবো।

## ৮

এরপরই মিটে গিয়েছিল সব। তবে শ্রাদ্ধে আসে নি বা অশৌচান্তে কামায় নি কেবল ধনেশ্বর।

সে বলেছিল—না।

সে না-কে হাঁ করানো যায় নি। তবে কোন গণ্ডগোলও করে নি। শিবেশ্বর তাকে কঠিন শাসন করেছিলেন। আর একজন কামায়নি—কামায়নি নয়—তাকে পাওয়া যায় নি সে সময়। সে ধনেশ্বরের তৃতীয় ছেলে গোপেশ্বর। সে নাকি একটু অসুস্থমস্তিষ্ক। দৈত্যের মত চেহারা। চৌদ্দ বছরের ছেলেকে মনে হয় আঠারো বছরের জোয়ান। আপন খেয়ালে চলে। মধ্যে মধ্যে চলে যায়, দুদিন-তিনদিন পর ফেরে।

কীর্তিহাটে এক মাসের উপর থেকে প্রথম মাসিক শ্রাদ্ধ সেরে কলকাতায় ফিরেছিল এবং ষষ্ঠ মাসে গিয়ে সপিণ্ডীকরণ শেষ করে সমারোহ করে শ্রাদ্ধ করে এসেছিল। তার সঙ্গে সে বিচিত্র মন নিয়ে এসেছিল।

গ্রামের মানুষদের দেখে দুঃখ হয়েছিল, ঘৃণাও হয়েছিল।

এদের দুঃখ দারিদ্র্য যত, নীচতা হীনতাও তত। অথবা তার থেকেও বেশী। একবিন্দু প্রেম বা এতটুকু শ্রদ্ধা বা ভালবাসার মত এক কণা পরিমিত সম্বলও সে পায় নি। কি লোভ! কি গোগ্রাসে আহার! সব থেকে বেশী খেয়েছিল রায়বংশের ছেলে ওই গোপেশ্বর। এবার সুরেশ্বর তাকে দেখেছিল। কথায় জড়তা। প্রকাণ্ড দেহ, ফর্সা রং। কটা চুল। কটা চোখ। অসুস্থ দৃষ্টি। ছেলেটি খেতে বসে দানবের মত খেয়েছিল। তারপর আর গোপেশ্বরকে দেখেনি। শুনেছিল তার মাথা গরম হয়েছে বলে তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। গভীর রাত্রে সে বীভৎস চীৎকার করত। সে চীৎকার সে শুনেছিল।

ঐখানকার ব্রাহ্মণেরাও চুরি করে; তার পিতৃশ্রাদ্ধে তারা লুচি মিষ্টি চুরি করলে; সে দেখলে। এবং পরস্পরের মধ্যে কুৎসিত কলহ করলে। সব থেকে খারাপ লাগল তার মেজ-ঠাকুমা পর্যন্ত বালতিতে ভরে মিষ্টি নিয়ে গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে চোখে পড়ল তারই। মেজ-ঠাকুমা অপ্রতিভ হলেন না, হেসে বললেন, নিয়ে যাচ্ছি ভাই। কলকাতার কাঁচা সন্দেশ তোমার ঠাকুরদা খেতে ভালবাসেন। চোখে পড়ল কাঙ্গালী বিদায়ে ব্রাত্য দরিদ্রেরা এল দলে দলে, এখানকার রায়বাড়ির ছেলেরা থেকে অন্য ভদ্রবাড়ীর ছেলেরা এমন কি ওদেরই স্তরের যারা পাইক পেয়াদার কাজ করে তারা তাদের যুবতী মেয়েগুলোকে নিয়ে সামান্য স্বাদু খাদ্য-মূল্যে ছিনিমিনি খেললে। নদীর ওপারে গোয়ানপাড়া—ওই ডিকুরুজদের বাড়ী—তারা লুঙ্গি পরে, পাজামা পরে, মেয়েরা সেমিজের মত ঢিলে জামা পরে বেড়ায়—তারা কাঙ্গালী খেতে আসেনি। কিন্তু এই দাঁড়িয়ে দেখলে আর ফিক-ফিক করে হাসলে। মেয়েগুলোকে দেখেই যেন মনে হয়-এরা স্বৈরিণী। এখানকার মুসলমানরাও আসেনি। এদের দুই সম্প্রদায়কে সিধে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন তার মা।

এখানকার ইস্কুলের হেডমাস্টার এসে তার কাছে হেঁট হয়ে নমস্কার করে ভিক্ষুকের মত কথা বললেন। তার কারণ ইস্কুলে পাঁচ হাজার টাকা দান করা হয়েছিল। তিনি হাতজোড় করে বললেন তার মাকে, স্কুলের ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে যে প্রথম হবে তাকে এক বৎসরের জন্য মাসিক একটা বৃত্তি বাবার নামে দেবার জন্য।

চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির ডাক্তার এলেন ডাক্তারখানা মেরামতের জন্য ভিক্ষা করতে। তিনি আক্ষেপ ক'রে বললেন—এই ডাক্তারখানার যে সব যন্ত্রপাতি ছিল সে সব দেখে মিস্টার পামবোর্ণ বলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উনিশশো আট সালে লিখেছিলেন এসব ইকুইপমেণ্ট সাবডিভি-শনাল হাসপাতালেও নেই। তার আর কিছু নেই। ডাক্তার এখানে থাকে না। কারণ বিনা ফিয়ে গোটা মেজ তরফকে দেখতে হয়। ডাক্তারখানা থেকে তাদের ওষুধ আগে আসে। ভাল ওষুধ অন্য পেশেণ্টদের দিতে নিষেধ আছে সুখেশ্বরবাবুর।

সুরেশ্বর ছিল নীরব শ্রোতা। তার অন্তরলোকে এসবের প্রতিটি বিচিত্র সংবাদ জলন্ত অঙ্গার-স্তূপে দাহ্যবস্তুর মত নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।

ফলে সে ফিরে এল জ্বলতে জ্বলতে।

শুধু রায় বংশ নয়, গোটা গ্রাম—হয়তো গোটা দেশের উপর অবজ্ঞা এবং ঘৃণা নিয়ে।

কলকাতায় তখন সে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে। ম্যাট্রিক পাস

সে সেবার করেছিল। কীর্তিহাট থেকে ফিরে সে আর কলেজে যায়নি—গিয়ে উঠেছিল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস আপিসে। এ রাজত্ব এ দেশ এ সমাজে বিপ্লবের আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিতে হবে। তখন ১৯৩০ সাল এসে পড়েছে।

মা বাধা দিয়েছিলেন। সে শোনে নি। একদিন মাকে না বলেই চলে গিয়েছিল মেদিনীপুর লবণ সত্যাগ্রহে। সেখান থেকে খবর এসেছিল—তার এক বছর জেল হয়েছে। কিন্তু এখানেও সে শান্তি বা স্বস্তি পায় নি। তখন জেলের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের ভিতর জটিল দলাদলির ফলে কুৎসিত ষড়যন্ত্র চলছে। তাছাড়া সাধারণ সত্যাগ্রহীদের সে যেন এক অসহনশীল উন্মত্ততা চলছে। এ দল ও-দলের লোককে বলে স্পাই। ও-দল বলে এ-দলের লোককে।

রাত্রে সারারাত্রি জলের ড্রাম আর থালাবাটি পিটে ব্যাণ্ড বাজায়, বিশ-পঁচিশ জনে মিলে চীৎকার ক'রে বেসুরে অসুরের মত গান করার নামে তাণ্ডব করে। তার বিছানার পাশের দেওয়ালটায় চারজন নস্য নিয়ে নাক ঝেড়ে ময়লা করে। সে প্রতিবাদ করায় তার নামে রটে গেল—সে স্পাই। তার সহ্য হল না। সে সেইদিনই জেলারের কাছে এসে জানালে যে সে সুপারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। সুপারের সঙ্গে দেখা হল এবং সে তাঁকে বললে—যে সে সত্যাগ্রহ করে এখন অনুতপ্ত। সে আর করবে না এই বণ্ড দিয়ে মুক্তি পেতে চায়। তখন তার এক বছর মেয়াদের মধ্যে ন-মাস গেছে। জেল নিয়মে রেমিশন পেয়ে মেয়াদ প্রায় এক মাস কম হয়ে যাবে। সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিস্মিত হলেন। বললেন—ভাল ক'রে ভেবে দেখেছেন?

—দেখেছি।

—আরও দুদিন ভাবুন।

—না। তারপর বলেছিল—আর না হয় দয়া করে আমাকে সেলে থাকবার ব্যবস্থা করে দিন, না-হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

—বেশ, লিখুন।

দরখাস্ত লিখে সে জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে দিয়ে চলে আসছিল। সুপার ডেকে বলেছিলেন—শুনুন।

—কি বলুন?

—আপনি বসুন। এখন থেকেই আপনি সেলে থাকবেন। আমি অর্ডার করে দিচ্ছি।

সে যেন বেঁচে গিয়েছিল।

তাইই ছিল। এবং বাকী মেয়াদের কালটা সেলের একটা দেওয়াল কয়লা দিয়ে ছবি এঁকে ভরিয়ে দিয়েছিল। এবং মাস দেড়েক পর খালাস পেয়ে জেল-গেট থেকে বেরিয়ে এসে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। কিন্তু এর জন্যে তার স্পাই অপবাদ এমন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল যে সেটা জেলের ভিতরেই আবদ্ধ ছিল না, বাইরেও ছড়িয়েছিল।

ছিল মফস্বলে—মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে। মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় বাড়ী পৌঁছে দেখেছিল, মা বিছানায় শুয়েছেন। তাঁর অসুখ হয়েছে মাসখানেক। নায়েব ম্যানেজার খবর দিতে চেয়েছিল, কিন্তু হেমলতা খবর দিতে দেন নি। ডাক্তার বলেছেন—হার্ট উইক হয়েছে।

তার জেলে যাওয়ার অনুশোচনা যেন বেড়ে গিয়েছিল। সেইদিনই সে স্টেটসম্যান আপিসে গিয়ে পিতৃপরিচয় দিয়ে এডিটার ওয়াটসাহেবের সঙ্গে দেখা করে একখানি চিঠি দিয়েছিল ছাপতে। নাম দিয়েছিল—বিদায় সত্যাগ্রহ! তাতে সে লিখেছিল—সে অনুতপ্ত। চিঠিখানা সারা দেশে একটা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

তার মা দুঃখ পেয়েছিলেন সে জেলে যাওয়ায়, কিন্তু এই পত্রের জন্য তার চেয়েও বেশী দুঃখ পেলেন। বললেন—তুই এ কি লিখলি? তোর লজ্জা হল না?

সে বললে—না।

শঙ্কিত হলেন হেমলতা। মনে হল যেন ওর পিছন থেকে যোগেশ্বর ওকে প্রম্পট করেছেন।

সে বললে, পরাধীনতা আমার নিজের পক্ষে অসহ্য বলেই দেশকে স্বাধীন করতে চাই। আমার যে মাথা অন্যের কাছে নিচু হয়ে আছে—সে মাথাকে তাদের সঙ্গে সমান উঁচু করবার জন্যেই আমি লড়াই করি। কিন্তু সেই লড়াই ক'রে যদি আমার থেকে নিচু যারা তাদের কাছে মাথা নিচু করতে হয় তা হ'লে সে লড়াই যে আমার মাথায় পাথর মারার সমান হয় মা। দেশের জন্যে আত্মবলিদান আত্মার মুক্তির জন্য, তার অপমান অসম্মানের জন্য নয়। আমার নামে অপবাদ রটনা করেছিল—আমি স্পাই। আমার সহ্য হ'ল না।

মা কিছু আর বলেন নি। পাশ ফিরে শুয়েছিলেন।

সুরেশ্বর কিছুদিন ছবি আঁকা নিয়ে পড়েছিল। নন্দলালের রেখা—যামিনী রায়ের পটপদ্ধতি সব ছেড়ে সে নিজের খুশিমত ছবি আঁকতে লাগল। তার সঙ্গে এস্রাজ বেহালা। যেগুলো তার বাবা কিনেছিলেন। সেগুলো নিয়ে নিজেই বাজাতে আরম্ভ করলে। এ না-করে তার উপায় ছিল না। সে তখন চিহ্নিত হয়ে গেছে ইংরেজের কাগজের অনুগত সাংবাদিক যোগেশ্বর রায়ের পুত্র হিসেবে। লোকে বলছে—জে রায়ের ছেলে তো সে, ঘরে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে ছবি আঁকতে আঁকতেও সে বুঝতে পারলে, সে শুধু সাধারণের কাছেই নয়, নিজের কাছেও অপরাধী হয়ে গেছে। এমনটা হবে সে ঠিক বুঝতে পারে নি। অর্থাৎ জেলে গেলে থাকা এবং বেরিয়ে এসে এই পত্র ছাপার ফল এমন হবে। বার বার সে চেষ্টা করলে শক্ত হবার, মনকে কঠিন করে মাথা উঁচু করে বাইরে বের হবার, কিন্তু সে তা পারলে না।

তখন বাংলাদেশে যেন একটা আগুন নিয়ে খেলার যুগ এসেছে। একটার পর একটা বিস্ফোরণ হচ্ছে। চট্টগ্রামে যে খেলার শুরু হয়েছিল তা যেন শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না। দেশব্যাপী হয়ে জ্বলে উঠবার মত উত্তাপকে নেভাতে ইংরেজের সমস্ত শক্তি যেন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পারবে না।

সে ঘরে ব'সে গ্রামোফোন রেকর্ড চাপিয়ে এস্রাজে ছড়ি টেনে সুরে সুর মেলাচ্ছিল। সন্ধে হয়ে আসছে। হঠাৎ কাগজের স্পেশাল নিয়ে হকার চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। —লাটসাহেবকে গুলি। লাটসাহেবকে গুলি। মেয়েছেলে গুলি করলে—

সে স্পেশালের হাঁক শুনে বারান্দায় বেরিয়েছিল। খবরটা শুনে চমকে উঠল। বুকখানা যেন ধড়াস করে লাফিয়ে উঠে থেমে যেতে চাইল। কিন্তু থামল না—মাথা কুটে চলল।

উনিশশো বত্রিশ সাল—৬ই ফেব্রুয়ারী। সেনেট হলে কনভোকেশনের আসরে—বীণা

দাস গভর্নর জ্যাকসনকে রিভলভার দিয়ে গুলি ছুঁড়েছে। গভর্নর মাথা সরিয়ে নিয়ে বেঁচেছেন। কর্নেল সুরাবর্দী বীণা দাসকে গলা টিপে ধ'রে অ্যারেস্ট করেছেন।

এরপর একের পর এক।

স্টেটসম্যানের সম্পাদক ওয়াটসনের উপর দুবার আক্রমণ হল। চট্টগ্রামে প্রীতিলতা ওয়েদেদার পাহাড়তলীর ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে মরণ-খেলা খেলে নিজে পটাসিয়াম সাইনাইড খেলেন। ডালহৌসি স্কোয়ার বম কেস হল। টেগার্ট বাঁচল। কিন্তু এদেশে থাকতে সাহস তার আর হল না। সে চলে গেল, পালাল। ওয়াটসন সাহেবও পালাল। ১৯৩৩ সালে ১২ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের প্রাণপুরুষ সূর্য সেনের ফাঁসি হয়ে গেল।

সুরেশ্বর নিঃসঙ্গ হয়ে দীর্ঘদিন ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ছবিও আঁকলে না। শুধু বাজনাটাই বাজাত। আর ভাবত—সে অপরাধ করেছে? ভুল করেছে?

একে অস্বীকার করে মাথা সে তুলতে পারত না।

হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

তাতেই যেন জীবনের সব লজ্জা ভাসিয়ে দিয়ে নির্লজ্জের মত মুখ তুলে বক্রহাস্য করলে। না। নির্লজ্জের মত ঠিক নয়। কঠিন ক্রোধে সে ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্তকে উপেক্ষা ক'রে দিলে একমুহূর্তে। অহিংস আন্দোলন সত্যাগ্রহের নামে অট্টহাস্য করতে ইচ্ছে হল তার। আর এই সশস্ত্র বিপ্লবীদের আত্মদান—? এ মহৎ না ব'লে উপায় নেই তার। কিন্তু এর ফলে যারা একদিন এদেশে আধিপত্য বিস্তার করবে—তারা? তারাও কি আজকের এদের মতন থাকবে? সে তাকালে তার পূর্বপুরুষ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ছবির দিকে। তারপর তাকালে আয়নার দিকে। যেখানে তার নিজের ছবি ফুটে উঠেছিল। এই হয়। হাসলে সে আবার। মনে যেন জোর পেয়েছে।

হঠাৎ একদিন কীর্তিহাট থেকে সংবাদ এল—একদিনে কীর্তিহাটের মেজতরফে বিপর্যয় ঘটে গেছে। শিবেশ্বর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। তার আগে তাঁর সেজছেলে সুখেশ্বর খুন হয়েছে। খুন করেছে ধনেশ্বরের তৃতীয় ছেলে গোপেশ্বর।

মনে পড়ল গোপেশ্বরকে। গভীর রাত্রে কিন্তু তার চিৎকার শুনেছিল সুরেশ্বর, ক্রুদ্ধ জন্তুর মত চিৎকার। তাকে বেঁধে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল তার অভিভাবকেরা। সেই গোপেশ্বর খুন করেছে সুখেশ্বরকে।

হেমলতা ম্যানেজার হরচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন। সুরেশ্বরকে যেতে বলেছিলেন, সে বলেছিল—না। হরচন্দ্র ফিরে এসে যে বিবরণ দিয়েছিলেন তাতে হেমলতা শিউরে উঠেছিলেন। সুরেশ্বর প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর তার মুখে ফুটে উঠেছিল একটি বাঁকা রেখায় অতি তিক্ত হাসি। সে হাসি তিক্ততার, সে হাসি ঘৃণার।

বিবরণ শুনে যে কোন লোকের মুখেই এই হাসি ফুটবে সন্দেহ এতে নেই। ওই গোপেশ্বর ছেলেটি তার বাল্যকাল থেকেই দানবের মত অতিকায়। তার চরিত্রের দানবিক প্রকৃতির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল আহারে। পরিমাণে তো প্রচুর খেতোই তার উপর ছিল তার কেড়ে খাওয়া স্বভাব। চুরি করে খাওয়া স্বভাব। ক্ষুধায় সে জন্তুর মত ক্রুদ্ধ চিৎকার করত।

অন্যের পাত্র থেকে কেড়ে খেয়ে নিতো। রায়বাড়ীর দেবতার ভোগের উপরেও মধ্যে মধ্যে ডাকাতের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ত।

বাপ ধনেশ্বর কালীসাধক—তার বিশ্বাস ছিল ছেলে সিদ্ধপুরুষ হবে। সিদ্ধপুরুষ সাধকদের বাল্য আচরণ শোনা যায়—তার সঙ্গে নাকি মিল দেখতে পেতো। ক্রমে কৈশোরে আর এক চেহারা দেখা দিল। সে বলির পাঠার সদ্যছিন্ন কণ্ঠ থেকে ফিনকি দিয়ে ঝরা রক্ত অঞ্জলি ভরে নিয়ে চুমুক দিত। রায়বাড়ীর আলসের ফাঁকে ফাঁকে বাস ছিল পাঁচ সাতশো পায়রার। এই পায়রা ধরে সে পুড়িয়ে মহানন্দে বিনা লবণেই খেতো। মধ্যে মধ্যে চলে যেতো চাষীদের তরমুজ ফুটির ক্ষেতে। সেখানে ভাই গোগ্রাসে খেয়ে গাছতলাতেই পড়ে থাকত। তারপর আজ বছরখানেক থেকে তার নতুন ব্যাধি দেখা দিয়েছিল। কামার্ত্ততার ব্যাধি। প্রথম সে পশুর পিছনে ফিরেছে, তারপর নারীর স্বাদ পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। এরপর আর ধনেশ্বরেরও পুত্রকে সাধক বলে ধারণা করবার সুযোগের সূচীছিদ্রও রইল না। তারা—বলতে গেলে ধনেশ্বর আর সুখেশ্বর—বংশের মর্যাদা ঘরের মর্যাদা রাখবার জন্য তাকে শাসন শুরু করেছিল। সে শাসন নির্মম এবং নিষ্ঠুর। তাকে বেঁধে ছড়ি বা চাবুক দিয়ে প্রহার করত। সে চিৎকারও করত কিন্তু সে যন্ত্রণায় বা ভয়ে নয়—রাগে গর্জন করত। ঘটনার দিন সে দোতলার ঘরে বন্ধ ছিল। দাঁড়িয়ে ছিল একটা জানলায়। সেখান থেকেই সে দেখতে পেয়েছিল বাড়ীর পিছন দিকে একটা জোয়ান মেয়ে কাঁধে একটা ঝুড়ি নিয়ে গোবর কাঠ-কুটো কুড়োচ্ছে। বাড়ীর পিছন দিকটা নির্জন। মুহূর্তে সে এই নির্জনতার সুযোগ ও অবকাশের মধ্যে নারীদেহের প্রলোভনে বাঘের মত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। পাগল সে, কিন্তু উন্মত্ত পাগল ছিল না। সে বন্ধ দরজায় পদাঘাতে নিজের উন্মত্ত লালসাকে ব্যক্ত করেনি। সে চেষ্টা করেছিল জানালার গরাদেটাকে ভাঙতে। সতেরশো পঁচানব্বই-য়ে জমিদারী কেনার আগে কুড়োরাম ভটচাজ এই অংশটা তৈরী করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ীও তার পরের ইমারত। বলতে গেলে এই অংশটাই বড় সব মহলের চেয়ে। এবং মাঝের মহল। জানলা-গুলো স্বাভাবিকভাবেই জীর্ণ হয়েছিল তা বুঝতে গোপেশ্বরের কষ্ট হয়নি। দানবের মত দেহ—দানবের মত শক্তিও ছিল তার। জানালার গরাদে ছাড়িয়ে ফেলতে খুব বেগ তাকে পেতে হয়নি। দু-তিনটে গরাদে ছাড়িয়ে ফেলে সে সেই ফাঁক দিয়ে গলে দোতলা থেকে বাড়ীর বাইরে বাগানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আঘাত পায়নি নয়, আঘাত পেয়েছিল হাঁটুতে হাতে—রক্তপাতও হয়েছিল। কিন্তু জীবনের আদিম আকর্ষণে সে তখন জ্ঞানশূন্য। বিশ্বজগৎ তখন তার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে উঠে আসা পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের আড়ালে ঢেকে যাওয়া আকাশের এবং সূর্যের মত। সে গাছের আড়ালে আড়ালে চতুর বাঘের মত চতুরতার সঙ্গে এগিয়ে এসে মেয়েটাকে আক্রমণ করেছিল। এসব মেয়েগুলি সম্পর্কে নানান অপবাদ আছে। এরা হয়তো নিশাচরী, এরা হয়তো স্বৈরিণী, হয়তো রাক্ষসীও বটে, কিন্তু গোপেশ্বর তার চেয়েও ভয়ঙ্কর—তাছাড়া নারী যাই হোক, যেমন চরিত্রেরই হোক, এ ধরণের আক্রমণে সে আত্মসমর্পণ করে না। সে গোয়ান মেয়ে, সে বাধা দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে চিৎকারও করেছিল। কিন্তু তাতে গোপেশ্বরের বিঘ্ন হয়নি। সে বাঘের

মতই তার বুকের উপর চেপে বসেছিল। মেয়েটা চিৎকার করেই চলেছিল। সেই চিৎকারে সর্বপ্রথম ছুটে এসেছিল কাকা সুখেশ্বর। এসে সে টেনেছিল গোপেশ্বরকে। কিন্তু তাকে টেনে ছাড়ানো ছিল তার সাধ্যের অতীত। প্রহার করেছিল হাত দিয়ে। সে গোপেশ্বর গ্রাহ্য করেনি। তখন সে একটা ভাঙা ডাল দিয়ে তাকে প্রহার করতে শুরু করেছিল।

এই প্রহারই গোপেশ্বরের অসহ্য হয়েছিল এবং মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে উন্মত্ত ক্রোধে সুখেশ্বরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে বসে বাঘের মত হাতের থাবায় তার গলা টিপে ধরেছিল। তারপর লোকজন এসে তাকে ধরে টেনে তোলে, কিন্তু তখন শ্বাসরোধে সুখেশ্বরের মৃত্যু ঘটেছে। ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। সারা রায়বাড়ী লজ্জায় দুঃখে বোবা হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা পালিয়েছিল। এই স্তব্ধতার মধ্যে অকস্মাৎ শিবেশ্বর দোতলার ছাদে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিচে কতকগুলো ভাঙা ইটের স্তূপের উপর। মাথা নিচু করে পড়েছিলেন, খুলিটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, ঘাড় ভেঙে গেছে। বিবরণ এই!

এ শুনে কার না ঘৃণা হবে, কার না লজ্জা হবে, কার না ক্রোধ হবে! সুরেশ্বরের কিন্তু ক্রোধ হয়নি। সে বক্র হাসি হেসে মনে মনে বলেছিল—রায়েরা সব পারে। ওই হাসিটুকু হেসেই সে নিজের ঘরে ঢুকেছিল। বসেছিল রঙ তুলি নিয়ে।

আঁকতে চেয়েছিল বীভৎস একটা কিছু। কিন্তু তা পারেনি। যত এবং যেমন বীভৎস সে আঁকতে চায় তা কি করে কোন্ কল্পনায় কোন্ রেখায় কোন্ রঙে ঠিক ফুটবে তা তার ধারণায় আসেনি।

আইভরি ব্ল্যাকের একটা বড় টিউব মোটা তুলি দিয়ে একখানা ক্যানভাসে লেপেছিল। কিন্তু তা মনে হয়েছিল যেন নিদ্রানিথর একটি শান্ত অমাবস্যার রাত্রি। সে তো বীভৎস নয়।

* * * *

ভেবেছিল অনেক! রায়বংশ এমন হল কেন?

অনেক ভেবে সে দায়ী করেছিল ধর্মকে এবং সম্পদকে। রায়বাড়ীর এই পরিণাম এই দুটোর জন্যে। শুধু শিবেশ্বর-ধনেশ্বর এবং গোপেশ্বরকেই তার মনে পড়েনি—তার বাবাকেও মনে পড়েছিল। তার জ্যেঠামশাই, জ্যাঠতুত ভাইদেরও মনে পড়েছে। জ্যাঠামশাই এখন প্রায় সর্বস্বান্ত। মদ্যপান করেন দিনরাত্রি। থাকেন কাশীতে। সম্বলের মধ্যে কাশীর বাড়ী। আর কিছু লুকনো অর্থ। জ্যাঠতুত ভাইরা কলকাতায় এসেছে। তারা দুই ভাই চেষ্টা করছে নূতন কিছু করবার। তাদের ইচ্ছে তারা কীর্তিহাটের দেবোত্তর পত্তনী দেওয়ার নামে বিক্রী করে, কিন্তু জ্যাঠামশায়ের অনিচ্ছায় তা পারে না। দিনের বেলা কয়লার আপিস মহলে ঘোরে, আর রাত্রে দুই ভাই এক সঙ্গে খোলার বস্তিতে রাত কাটায়। মধ্যে মধ্যে গাড়ী কেনে। মাঝে মাঝে খবর পায়--পাওনাদারেরা রাস্তার মধ্যে গাড়ী আটকে তাদের গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ী দখল করে নিয়ে চলে গিয়েছে।

নায়েবই এদের কথা মনে করিয়ে দিল সুরেশ্বরের। বললে—এই বিপদের মধ্যে বিপদ, বড়বাবুর কীর্তিহাটের বাড়ীর অংশ—যা মানে দেবোত্তর নয়,—তা মাড়োয়ারীরা ক্রোক

করেছে। নিলেমে তুলবে।

হেমলতা বললেন—না। তা তো হতে দিতে পারব না।

সুরেশ্বর উঠে চলে গিয়েছিল।

৯

সুরেশ্বরের জীবনকে কিন্তু এতে আর বিষণ্ণ বা বিমর্ষ করতে পারেনি। পাগলামি কিছুটা তারও আছে। সেটাই যেন বেড়ে গেল। পাগলামি বটে কিনা সেটা পাগল-বিশেষজ্ঞ-বলতে পারেন। সুরেশ্বর তা ভাবে না, কারণ মধ্যে মধ্যে নিজেরই যে মনে হয় সে একটু পাগল। পাগল সে ততক্ষণ হতেই পারে না, যতক্ষণ পাগলামিকে পাগলামি বলে নিজের সন্দেহ হয়। সে সন্দেহ তার হতো। শুধু সন্দেহ নয়—ভয়ও হতো। তাদের রক্তে যে পাগলামির মত, একটা দুরন্ত ব্যাধির মত কিছু আছে তাতে তার সন্দেহ ছিল না। সেগুলো মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পেতো নিজের অজ্ঞাতসারেই। এবার তাতে জোর ধরল। সব থেকে বেশী প্রকাশ পেতে লাগল সেটা তার বেশভূষা এবং স্টাইলের মধ্যে। হঠাৎ চুল-দাড়ি দুই রেখে ফেললে সে।

একেবারে প্রথমে সে তখন পাঁচ-ছ'দিন কামায়নি। মা তাকে দেখে বললেন—ও কি, কামাস নি কেন?

দাড়ির খোঁচায় হাত বুলিয়ে বললে—ও একটা ঝঞ্ঝাট।

—ঝঞ্ঝাট? কামানো?

—হ্যাঁ।

—তাই বলে কামাবিনে?

—দাড়ি রাখলে ভাল লাগবে না?

—বাপের মত?

—না। ফ্রেঞ্চকাট-টাট নয়। আদি ও অকৃত্রিম ইণ্ডিয়ান স্টাইল।

—না। দাড়ি রাখতে হবে না।

সুরেশ্বর বলেছিল—আমার সেল্‌ফ-পোর্ট্রেটে আমি দাড়ি-গোঁফ এঁকে দেখেছি আমাকে খুব ভাল মানাবে মা!

মা তবুও বলেছিলেন—না না! কামিয়ে ফেল!

—দোহাই মা। এই তো কিছুদিন হল সাবালক হয়েছি বলে একগাদা কাগজপত্রে সই করলাম। কিন্তু বিষয়কর্ম তোমার হাতে রয়েছে, থাকবে। ওখানে আমি নাবালকই থাকব। এই একটা জায়গায় আমাকে সাবালক হতে দাও।

—এ উদ্ভট খেয়াল তোর হল কেন বল তো?

—ওই যে মা, অশৌচ পালন করতে ক'দিন কামাইনি, দাড়ি-গোফ বেরিয়েছিল, তা থেকেই বুঝলাম, খুব ভাল মানাবে আমাকে দাড়ি-গোঁফে। তারপর পোর্ট্রেটে এঁকে দেখলাম। আর বিশ্বসুদ্ধ লোক দাড়ি কামাচ্ছে যখন, তখন এটা একটা অসাধারণ কিছু হবে।

মা কিছু আর বলেন নি। ছেলের সম্পর্কে রায়বংশের বংশধর বলে তাঁর মনে একটা আশঙ্কা আছে। ছেলে যা কিছু উদ্ভট-উৎকট করে, তাই দেখে তিনি শঙ্কিত হন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে ভয়ঙ্কর পথে পা না বাড়ায়, ততক্ষণ তিনি বলতে গিয়েও বলতে পারেন না।

তিনি শুধু একটা জায়গায় সতর্ক হয়ে আছেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত থাকতে চান। সেটা বিষয় ও অর্থের অধিকার। এটাই সব তা তিনি স্বীকার করেন না। তবে এটা যে অনেকখানি, তা তিনি উকিলের ভাগ্নী এবং জমিদারের বধূ হয়ে স্পষ্ট বোঝেন, তাঁর জীবন তাঁকে মর্মে মর্মে বুঝিয়েছে। একটা কথা যোগেশ্বর বলতেন তাঁকে। হেমলতা যখন তাঁকে কাগজ বের করতে বলেন, তখন বলেছিলেন ; তারপরও বলতেন। বলতেন—দেখ, কাগজ শুধু কাগজ নয়, ব্যবসায়ও বটে। তাই বা কেন, আগে ওটা ব্যবসা, পরে ওটা কাগজ বা কাগজের মতবাদ—দেশের কল্যাণ। ব্যবসা করে টাকা আসে। এবং সেইটেই বড় হয়ে দাঁড়ায় ক্রমে। তখন বাজনার তালে গায়কদের নিয়ে যাওয়া যায় না, গায়করা বেতালা গাইলেও তার সঙ্গেই তাল মানিয়ে চলতে হয়! তা টাকার তো প্রয়োজন নেই আমার। টাকা তো রয়েছে। অর্থ পুঞ্জীভূত হলেই অনর্থ এবং বিষয় বিপুল হলেই বিষ।

তাই বিষয় অর্থ তিনি ধরে রেখেছেন এই রোগশয্যায় শুয়েও। মধ্যে মধ্যে ভাবেন—ওই তিন লক্ষ টাকা সেদিন যদি যোগেশ্বরের নিজের হাতে না থাকত! একখানা চেক কেটে যদি ফরেন এক্সচেঞ্জে পরিণত করতে না পারতেন, তবে কি তিনি তিন-চারদিনের মধ্যে চন্দ্রিকাকে নিয়ে জাহাজে চড়তে পারতেন? তবে পাগলের মত দেশেই পালিয়ে বেড়ানো অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাতে কি চন্দ্রিকাই রাজী হত? হত না বলেই তাঁর ধারণা!

তাই ছেলে ছবি আর গান-বাজনা নিয়ে ঘরের মধ্যে মেতে আছে, তাতে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। এবং ছেলে দাড়ি-গোঁফ রাখছে—তা রাখুক। আপত্তি করেননি।

সুরেশ্বর বাড়ী থেকে বের হত না। ওই আর্ট একজিবিশন দেখতে যাওয়া, কখনও যামিনী রায়ের বাড়ী, কখনও হঠাৎ শান্তিনিকেতন যাওয়া, যাওয়ার গণ্ডীটা এর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দূর থেকে দেখেছে। কাছে যায়নি। একান্তভাবে যাত্রীর মতই যেত—চলে আসত। নিজেকে আর্টিস্ট বলেও কোথাও জাহির করত না। মধ্যে মধ্যে পায়ে হেঁটে বেড়াত গঙ্গার ধার থেকে চৌরঙ্গী পর্যন্ত। আর যেতো সে সাহিত্য-সম্মেলনে, যেখানে আধুনিক সাহিত্যিকরা সমবেত হতেন। পরিচয় গ্রুপের সুধীন দত্ত, নীরেন রায় এঁদের দেখেছে। অতুল গুপ্তকে দেখেছে। শরৎচন্দ্রের বাড়ী দেখে এসেছে। কখনও কখনও নব্যপন্থী কাগজের আপিসের সামনে দিয়ে ঘুরেও আসত। আর যেতো ভাদুড়ীমশায়ের থিয়েটারে নাটক দেখতে। আর্ট থিয়েটার তখন উঠে গেছে, রঙমহল হয়েছে, নাট্যনিকেতন হয়েছে, সেখানেও যেত। দক্ষিণ কলকাতায় আশুতোষ কলেজে কিছুদিন আগে প্রগ্রেসিভ রাইটার্স কনফারেন্সে সে সামনের সারিতে আসন সংগ্রহ করে সব বক্তৃতা মন দিয়ে শুনে এসেছে। বিবাহের চেয়ে বড় এবং প্রাচীর ও প্রান্তর বইখানার নাম তার খুব ভাল লেগেছে। এমনি মন তখন তার। হয়তো এর কারণ এই যুগের ছেলে, এই যুগের নিঃশ্বাস নেয়—তাও বটে ; গণবিপ্লবের ভূমিকা উনিশ শো তিরিশে—তার জেলের অভিজ্ঞতা ও তার কৃতকর্মও

বটে। তা ছাড়াও হয়তো গভীর অন্তস্তলে আরও কিছু আছে। নিজের বংশের ধারাকে সমর্থনও বটে আবার তার প্রতি বিদ্বেষও বটে। কারণ যাই হোক, ব্যাপারটা বলতে গেলে এককালের ল্যাংড়া গাছের মিষ্টি আম, স্বাদে টক হয়ে যাওয়ার মত ব্যাপার। কথাটা সুরেশ্বরের নিজের কথা। সে বলেছিল তার মামাতো ভাইবোনেদের। অর্থাৎ হেমলতার মামাতো ভাই ব্যারিস্টার প্রবীর চ্যাটার্জির ছেলে-মেয়েদের। মেলামেশা অর্থাৎ পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতাসূচক মেলা-মেশা এদের সঙ্গেই ছিল তার।

বাইরের অনেকে তাকে চিনত, সেও তাদের চিনত—সে শুধু চেনা-জানাই। সকলের দৃষ্টিই তার প্রতি নিবদ্ধ হত তার চেহারার জন্যে। সুপুরুষ দীর্ঘাকৃতি যুবক—চলায়ফেরায়, কথায়-বার্তায়, দৃঢ়তা এবং শীলতা, তার উপর বেশভূষার বৈচিত্র্য—এসব দেখে তাকে লোকে চিনতে চাইত এবং চিনে রাখতও। কিন্তু আলাপ সে ঘনিষ্ঠভাবে করতে চাইত না। তার কারণ ছিল—কীর্তিহাটের রায়বংশের নাম, আধুনিকদের কাছে খুব পরিচিত না হলেও, যোগেশ্বরের নাম অনেকে জানত এবং দেশদ্রোহিতার অপবাদে সে-নাম খুব প্রীতিপদ ছিল না। সে যখন জেল থেকে বণ্ড দিয়ে চলে আসতে চেয়েছিল, তখন সকলেই বলেছিল—জে রয়ের ছেলে যে! তাছাড়া তার বাপের চন্দ্রিকাকে নিয়ে ইয়োরোপ চলে যাওয়ার কথাটাও গোপন নেই। সুতরাং ঘনিষ্ঠ হতে সে চাইত না। তাতে সুবিধে এই যে, ভদ্রতার ঢালের আড়াল দিয়ে চলা যায় এবং তাতেও যদি কেউ ভদ্রনীতি উপেক্ষা করে আঘাত করে, তবে সেখানে তীরের বদলে ভল্ল নিক্ষেপে বাধা হয় না। সে-ক্ষমতা সে রাখে।

মেলামেশা তাই অতি নিকট-আত্মীয়তার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মামাতো বোন দুটি—একটির বয়স সতেরো, অন্যটি পনেরো, ভাইটি ছোট। সীমা-অসীমা-প্রদীপ। সীমা তাকে বলেছিল—তুমি কি হচ্ছ সুরোদা?

—আমি আমি হচ্ছি! যেমন তুমি তুমি হচ্ছ।

—হেঁয়ালি করছ!

—খেয়ালী মানুষের খেয়াল অনেক সময় হেঁয়ালী বলে সন্দেহ হয়।

—কথায় প্যাঁচ কষো না। দিন দিন কুনো হয়ে যাচ্ছ না?

—বন থেকে কোন নিরাপদ স্থান, আরামদায়কও বটে। আমি বন্য নই তো!

—বাবার কাছে একজন মক্কেল এসেছিল তোমার জাঠতুতো দাদাদের নামে নালিশ করতে। তারা বলছিল—রায়েরা আগাগোড়া হাড়ে হাড়ে টক হয়ে গেছে। তোমার নামও করছিল। আমিও তা সমর্থন করছি—কি বলার আছে তোমার?

সুরেশ্বর বলেছিল ওই কথা—ল্যাংড়া আম কালে স্বাদ বদলে টক হয়ে যায় নজীর আছে। হয়তো হয়েছি। কিন্তু তার উপায় কি? ওই লোকটি এসেছিল, আমার জ্যাঠামশায়ের শ্যালক। জ্যাঠাইমার সহোদর, এক মারোয়াড়ীর সঙ্গে কয়লার ব্যবসা করেন। তিনি দুবার এর আগে ইনসলভেন্সী নিয়েছেন। তাতে বেশ পোস্টাই হয়েছে। এবার জ্যাঠামশাই ইনসলভেন্সী নিয়েছেন। তাঁর টাকা ডুবেছে। তাই তিনি আমাদের কীর্তিহাটের ভদ্রাসন ক্রোক করে-

ছিলেন। কিন্তু আমার মা-র তা সয়নি। তিনি বাড়িটায় জ্যাঠামশাইয়ের অংশ কিনে বাঁচিয়েছেন। আমার কাছেও তিনি এসেছিলেন। সুতরাং আমাদের অম্লত্বের স্বাদ তিনি প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদন করেছেন। তবে কি জান সীমা, স্বাদের ব্যাপারটা জিহ্বার উপর নির্ভর করে। কেউ বলে হাড়টক। কেউ বলে অম্লমধুর।

—ওরে, বাপরে! আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ! তা ঘরে বসে আমার সামনে করলে কি হবে? বাইরে বেরিয়ে কর! তবে তো বুঝি! ছবি আঁকবে কাউকে দেখাবে না। গান গাইবে, বাজারে কাউকে শোনাবে না! এত অহংকার কেন তোমার?

—সে তো তোমার কাছে নেই। চল নতুন ছবি দেখাই। তারপর গান শোনাব। তবে বাইরের লোকের কাছে অহংকার আমার বেঁচে থাক—তাতে তোমার সঙ্গে কোঁদল করবার পথটা দিন দিন প্রশস্ত হবে।

সীমা আবদার করে তার হাত ধরে বলত—না, তোমার কথা কিছুতেই শুনব না। আমাদের বাড়ীতে, না আমাদের বাড়াতে হলে তোমার ছবি দেখানো হবে না, এই বাড়াতেই আমার বন্ধুদের একদিন নিমন্ত্রণ করব। তোমাকে ছবি দেখাতে হবে, গান শোনাতে হবে। হবেই হবে। আমার এক নাকউঁচু বান্ধবা আছে, সুলতা ঘোষ, তাকে একবার সব দেখাতে চাই।

—সুবিধে হবে না। আমি বৃক্ষটি ঠিক যাকে সহকার বলে তা নই। বলতে পার শাল্মলী বৃক্ষ। অর্থাৎ শিমুল গাছ।

—ওঃ, সুলতা নাম শুনেই ধরে নিলে আমি তোমাকে তার সহকার করে, তাকে কাঁধে চাড়িয়ে দিতে চাই?—সে লতা হলে যাকে বলে কণ্টকলতা তাই। বেতসলতা মশাই, তারও কাঁটা আছে। এবং তা দিয়ে যে আঘাত তাকে বলে বেত্রাঘাত!

—অথবা নিতান্ত মাঠে যে কুমড়ো খেঁড়োর লতা হয় তাই!

—বাবাঃ! হার মানলাম।

—আমি খুশী হলাম। চল আগে বাজনা শোন।

এইভাবেই সে গড়ে উঠেছিল আপনার আবেষ্টনীর মধ্যে—সে লোহার জাফরীঘেরা গাছের মতই হোক আর একান্তে একেবারে উন্মুক্ত প্রান্তরে একক একটি গাছের মতই হোক, মোটামুটি সোজা সিধে হয়েই উঠে চলেছিল।

এরই বছরখানেকের মধ্যে অর্থাৎ উনিশ শো চৌত্রিশ সালে হঠাৎ হেমলতার হার্টের অসুখ বেড়ে উঠে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

একটা কারণ ঘটেছিল। সুরেশ্বর বাড়ী ছিল না, সে গিয়েছিল একজন জাপানী আর্টিস্ট এসেছেন তাকে দেখতে। ইতিমধ্যে এসেছিল একটি মহিলা, সে সটান এসে বাড়ীর ভিতর অতি পরিচিতের মত একেবারে হেমলতার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। হেমলতা তাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন ভূত দেখার মত। যে এসেছিল সে চন্দ্রিকা। সে ভারতবর্ষে ফিরেছে। সে ক্ষমা চাইতে এসেছিল হেমলতার কাছে। তার কাছে সে বিশ্বাসঘাতিনী। হেমলতাই সমাদর করে তাকে নিমন্ত্রণ দিয়ে বাড়াতে এনে যোগেশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

সে যোগেশ্বরকে প্রলুব্ধ করে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। কথা এইটুকু। তার মূল্য চন্দ্রিকার গ্লানি থেকে মুক্তি কিন্তু হেমলতার কাছে তার মূল্য আরও অনেক। তার জন্য তার জীবন দিতেও আক্ষেপ হয়নি। চন্দ্রিকা বলে গেছে—দেখ, তোমাকে সিস্টারই যদি বলি, তবে ঘৃণা করে না বলো না। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করেছি তাকে সুখী করতে। বিলিভ মী। কিন্তু সে সুখী হয় নি। একদিনের জন্যও না। সে বলত কি জান? বলত—হেমলতা was my life, and you চন্দ্রিকা তুমি আত্মহত্যার মৃত্যু, তুমি অতি সুন্দরী, তুমি মনোহারিণী, আত্মহত্যার মত মনোহারিণী। মৃত্যুতে মানুষ শান্তি পায়, আত্মহত্যার মৃত্যুতে পায় না। If there is a life after death তবে, আত্মহত্যার মৃত্যুতে শান্তি পায় না—এটা শাস্ত্রের সত্য নয়, লজিকের সত্য। বেশী মদ খেলে কাঁদত। আমাকে মারত। আমি বলতে এসেছি—আমি তাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারিনি। ডাকাতি করেও পারিনি। শান্তি আমি পেয়েছি। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

এবং দিয়ে গিয়েছে কিছু কাগজপত্র। যেটা যোগেশ্বরের মৃত্যুর পর তার হাতে পড়েছিল। তাই সে দিয়ে গেছে। হেমলতা শুনেছিলেন আর কেঁদেছিলেন। চন্দ্রিকা চলে যাবার পরও পড়ে পড়ে কাঁদছিলেন, এরই মধ্যে উঠেছিল হার্টের রোগ।

রোগের এই আক্রমণেই হেমলতার মৃত্যু হল। পনের দিন অতি নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। দিনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকটা সময় কিছুটা সুস্থ থাকতেন, তাও একনাগাড় একটানা অর্ধেক দিন নয়। কিছুক্ষণ একটু ভাল, তারপরই আবার বুকের যন্ত্রণা উঠত।

চিকিৎসার ব্যবস্থার ত্রুটি তো ছিলই না—আতিশয্যই হয়েছিল বলতে হবে। ডাক্তার-নার্স বলতে গেলে মোতায়েন ছিল। বড় কনসাল্টিং ফিজিসিয়ান দিনে একবার নিয়মিত আসতেন। একজন অল্পবয়সী ডাক্তার প্রায় অর্ধেক দিনেরও বেশী থাকতেন। দিনে আসতেন দুবার। এবং রাত্রে ন'টার পর এসে এখানেই শুতেন। নার্স দুবেলা দুজন। রাত্রে একজন, দিনে একজন। সুরেশ্বর মায়ের পাশের ঘরেই শুতো। সে এসে বসে থাকত জানালার ধারে একটা চেয়ারে।

মা মধ্যে মধ্যে কাছে ডেকে বলতেন—যা, শুগে যা। এখন ভাল বোধ করছি।

বললেই সে চলে যেত। কিন্তু আধঘণ্টা বা একঘণ্টা পরই সামান্য শব্দ শুনলেই নিঃশব্দে মাঝের দরজাটি খুলে সেখানে দাঁড়াত। বিশেষ কিছু না হলে ফিরে যেত, না হলে ধীরে ধীরে এসে ওই চেয়ারখানিতে বসত।

এরই মধ্যে পনের দিনের দিন হেমলতা চলে গেলেন। বুঝতে তিনি পেরেছিলেন। ছেলেকে ডেকে কাছে বসিয়ে বলেছিলেন—আমাকে যেতে হবে রে। ভেঙে পড়িসনে যেন!

সুরেশ্বর আত্মসম্বরণ করেও করতে পারেনি। কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না, তা সে ভেঙে পড়বে না। কিন্তু চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল দুটি ধারায়।

হেমলতা বলেছিলেন—কাঁদছিস?

সে মাটির মূর্তির মত স্থির হয়ে বসেছিল। হেমলতা বলেছিলেন—চোখ মোছ।

একবার সে মুছেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ধারা নেমে এসেছিল; চোখ-মুখ মুছেও

তো আর উৎসমুখ বন্ধ করা যায় না!

হেমলতা বলেছিলেন—কোন কিছু বারণ আমি করে যাব না তোকে। শুধু একটি কথা—তোর নিজের বিচারে যা অন্যায় তা করিসনে!

ঘাড় নেড়েছিল সুরেশ্বর—হ্যাঁ।

হেমলতা আর বলেছিলেন—তোকে না বলে একটা কাজ করেছি, বলে যাই তোকে। আমাকে উনি যা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা থেকে আমি কীর্তিহাটে তোর জ্যাঠামশাইয়ের সবই কিনেছি। দেবোত্তর পত্তনী নিয়েছি, বাড়ী কিনেছি। ওখানকার খরচ যেন কমাসনে। আর মেজতরফ যেমন খেতে পায় তেমনি যেন পায়। মেজখুড়ীমাকে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠানো হয়। বন্ধ করিসনে। আমি জানি দেবতায় তোর বিশ্বাস নেই। কিন্তু ওটা পূর্বপুরুষের কীর্তি।

মৃত্যুর একদিন আগের কথা। পরের দিন সকাল নটায় তিনি আধবসা হয়ে বসে থাকতে থাকতেই প্রায় নিঃশব্দে চলে গেলেন। কেউ বুঝতেও পারলে না।

সুরেশ্বর দুবার শুধু ডাকলে—মা! মা!

মা স্থির নিথর। সে গায়ে হাত দিলে। নার্স ডাক্তারকে ডাকলে। সে পাশের ঘরেই ছিল—ইনজেকশন তৈরী করছিল। সে এসে দেখে বললে—একস্পায়ার্ড!

সুরেশ্বর সেই চুপ করে মায়ের গায়ে হাত দিয়ে মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

সেইদিন সন্ধ্যায় যখন সে ফিরল, তখন সে ভাঙা মানুষ। মায়ের শবদেহ যতক্ষণ ছিল তখনও পর্যন্ত সে যেন ব্যাপারটা ঠিক বোঝেনি। মায়ের দেহ চিতায় চাপাতেই সে কল্পনায় কি হবে তা বুঝে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। সৎকারে এসেছিল ব্যারিস্টার মামা এবং তার দুই জ্যেঠতুতো ভাই। আর তাদের কাছে সংবাদ পেয়ে এসেছিল ধনেশ্বরের বড় ছেলে ব্রজেশ্বর। সে নাকি এখন এক কোটীপতি শেঠের বাড়ী চাকরি করে।

ব্যারিস্টার মামা প্রবীর চ্যাটার্জি রুমালে চোখ মুছে তাকে ধরে বললেন—এ কি, এ কি, তুমি এমন করে কাঁদবে! না-না-না! আমি তো তোমাকে খুব স্ট্রং নার্ভ শক্ত মানুষ বলে জানতাম! ও-নো। ডোনট ক্রিয়েট এ সিন! লোকে বলবে কি? দেখ রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ যখন মারা যান। তখন তাঁর কথা তুমি জান। মা কি কারুর চিরকাল থাকে! ছি! চল এখন সরে গিয়ে দূরে বসবে চল!

—না। চোখ মুছে সে প্রায় নিষ্পলক দৃষ্টিতে মায়ের দেহ পুড়ে ছাই হতে দেখেছিল শেষ পর্যন্ত!

পাশে এসে বসেছিল খুড়তুতো ভাই ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বর তার থেকে বয়সে বছর তিনেকের বড়। ধনেশ্বর যোগেশ্বরের থেকে বয়সে বছর দুয়েকের ছোট হলেও বিবাহ করেছিল প্রায় পাঁচ বছর আগে।

ব্রজেশ্বর প্রিয়দর্শন। কিন্তু দেহে দুর্বল। সম্ভবতঃ অভাব তার কারণ। বেশ ছিমছাম ফিট-ফাট। সে এসে সুরেশ্বরের পাশে চুপ করে বসেছিল। প্রগল্‌ভতা করেনি। তাকে বোঝাতে চায়নি। শুধু বসেই ছিল। মধ্যে মধ্যে সিগারেট খাচ্ছিল।

হঠাৎ সে এক সময় গুন গুন ক'রে সুর ভেঁজে ক্রমে ক্রমে কণ্ঠস্বর উচ্চ করে গান গেয়ে উঠেছিল—"ছাড়িয়ে সংসার কোথা চলে যাও দীনহীন বেশ ধরিয়ে—!"

কণ্ঠস্বর তার সত্যকারের সুস্বর। গানটিও এই ক্ষেত্রের উপযোগী। "তখনকার কালে এ গানটির চল ছিল। সংসারের সব পিছনে ফেলে দীনহীনের বেশে কপালে তিলক নিয়ে কোথায় চলেছ তুমি? একবার পিছন ফিরে তাকাও। বলে যাও, কোথায় যাবে আপনার ব'লে যাদের বুকে ধরেছিলে এতদিন তাদের ফেলে!"

শ্মশানে গান সহজবুদ্ধি যাদের তারা হয় তো গায় না কিন্তু কীর্তিহাটের ধনেশ্বর রায়ের ছেলে ব্রজেশ্বর রায়ের পক্ষে সে কথা খাটে না। তাছাড়া গানটি এমন কালোপযোগী এবং এমন বেদনা দিয়ে সে গাইলে যে আবার সুরেশ্বরের স্তব্ধ হয়ে যাওয়া আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আবার তার চোখ দিয়ে দরদরধারে জল গড়াতে লাগল।

বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে উত্রে গিয়েছিল; নিম মুখে দিয়ে মিষ্টিজল খেয়ে সকলে চলে গেল; জ্যেঠতুতো ভাইরা চলে গেল, ব্রজেশ্বর শুধু বললে—বল তো আমি রাত্রিটা থেকে যাই ভাই সুরেশ্বর। একলা থাকবে?

সে বলেছিল—বেশ তো! থাকুন। বলেই উপরে চলে গিয়ে সে মায়ের ঘরের মেঝেতেই শুয়ে পড়েছিল কম্বল পেড়ে।

নায়েব ম্যানেজার হরচন্দ্র প্রাচীন, বহুদর্শী কর্মক্ষম বিশ্বস্ত লোক, সে যথাবিধি ব্যবস্থার খুঁত থাকতে দেয় নি। সুরেশ্বর বলেছিল—দেখবেন, যেন মায়ের অশৌচে শ্রাদ্ধে কোন খুঁত বা ত্রুটি আমার না হয়।

হরচন্দ্র বলেছিল—সে তুমি ভেবো না। সে কোন খুঁতই হবে না। ভাবছি হবিষ্যির জন্যে। কে রান্না করে দেবে?

—আমি নিজেই করে নেব। না-পারার মত কিছু নেই।

পরদিন সকালে উঠে চাও সে খায় নি। অপেক্ষা করেছিল পুরোহিতের জন্য, যার কাছে সব জেনে নেবে। এই সময় উপরে উঠেছিল ব্রজেশ্বর। বললে—তা হ'লে আমি চলি ভাইরাজা!

সুরেশ্বর সবিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালে। ভাইরাজা সম্বোধন শুনে সে বিস্মিত হয়েছে।

ব্রজেশ্বর হেসে বললে—খোসামোদ ক'রে বলি নি ভাই। ওটা স্বপ্ন হয় নি। তবে কাল তোমার যা মায়ের উপর টান ভক্তি দেখলাম—মনটির পরিচয় পেলাম—তাতে তুমি রাজা। তা ছাড়া চেহারাতেও তাই। পয়সার কথা বলব না,—জ্ঞাতিতে বললে হিংসে হয়। অন্যে বললে ভিক্ষে চাইবে মনে হয়। রাজা তুমি রূপে-গুণে মনে মেজাজে! তা ছাড়া ছোট তুমি, আশীর্বাদও করছি!

ব্রজেশ্বরের জিহ্বা এবং কণ্ঠস্বরে মধু আছে। ভাল লাগল সুরেশ্বরের। সে বললে—আসবেন আবার!

—নিশ্চয় আসব রাজা! বলতে গেলে কাল সব বুঝে তো বিনা খাজনার প্রজা হয়ে গিয়েছি। সেলাম দিতে নিশ্চয় আসব! এত দিন আছি আসি নি। পরিচয়টা ঠিক হয়

নি, তোমাকে ঠিক বুঝি নি, তাই আসি নি। ভেবেছিলাম কি জানি কাঁটায় ছড়ে যাবে কাছে গেলে। এ যে জুড়িয়ে গেল রাজা। শ্রাদ্ধ এখানেই করবে? না যোগেশ্বর জ্যাঠার শ্রাদ্ধের মত কীর্তিহাটে যাবে?

—না। এখানেই হবে!

—সেই ভাল! অনর্থক রাশি রাশি টাকা খরচ করে কতকগুলো লোভী বামুন খাইয়ে আর—। এইখানেই কর।

১০

মাতৃশ্রাদ্ধ তাকে যেন হঠাৎ একটা নতুন জীবনে নতুন রাজ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। অতি সাধারণ এবং ভাবসর্বস্ব মানুষ হ'লে সে নিশ্চয়ই ভাবত—তার মা মরজগতের ওপার থেকেই পরম স্নেহে তাকে হাত ধরে এনে এই জীবনে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন। দুঃখ ভুলিয়ে দিতেই করলেন এটা। কিন্তু সুরেশ্বর তা ভাবলে না। এটা হবেই সে এটা জানত, দুদিন আগে আর দুদিন পরে। এবং এর কারণ তার কাছে স্পষ্ট।

মায়ের শ্রাদ্ধ সে কলকাতাতেই করলে এবং সংক্ষেপে করতে গিয়ে করতে পারলে না শেষ পর্যন্ত। মনটা কেমন খচ খচ করতে লাগল।

নায়েব তাকে প্রথম দিনই তার আর্থিক এবং বৈষয়িক সম্পত্তির একটা পরিষ্কার হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছিল। কীর্তিহাটের সাড়ে আট আনা দেবোত্তর এখন তার হাতে এসেছে। তার পিতামহ ছোট ভাইয়ের পাঁচ আনা অংশের মহাল অর্ধেক পত্তনী নিয়েছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্ম হয়ে গেলে মূল স্বত্বেরও অর্ধেক তাঁতে বর্তেছিল। তাতে হয়েছিল তাঁর সাড়ে আট আনা! এর অর্ধেক চার আনা পাঁচ গণ্ডা ছিল তার জ্যেঠা মশায়ের। বৎসরখানেক পূর্বে তার মা হেমলতা দেবী ভাসুরের দেবোত্তরের মুনাফা পত্তনীর সামিল করে বন্দোবস্ত নেওয়ায় বলতে গেলে সাড়ে আট আনাই তার হয়েছে। বার্ষিক দেবখরচ বরাদ্দ বারো হাজার বাদে কুড়ি হাজার মুনাফার সাড়ে আট আনা এখন তার। এ ছাড়া কলকাতার বাড়ীভাড়া মাসিক তিন শো টাকা হিসাবে ছত্রিশ শো টাকা এবং কেনা শেয়ারের ডিভিডেণ্ড থেকে বার্ষিক চার পাঁচ হাজার আসে। নগদ টাকা তার অংশের পঞ্চাশ হাজার বেড়ে এখন পঁয়ষট্টি হাজারে পৌঁচেছে। তার মায়ের টাকা সামান্যই মজুদ আছে, হাজার আষ্টেক, বাকী টাকা অর্থাৎ ভাসুরের সম্পত্তি এবং বাড়ী তিনি কিনবার জন্য তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

হরচন্দ্র বলেছিল—বাবা, আয় এখন তোমার বিশ হাজার টাকা। এ যদি তুমি হিসেব করে চলতে পার তবে তোমার পর আর দুপুরুষ পর্যন্ত সুখে চলে যাবে। তোমার বাবা তাঁর নিজের জীবন নিয়ে বেহিসেবি চালে চলেছেন। সম্পত্তিতে বেহিসেব করেন নি। দু লাখ টাকা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিজে জীবনে কোনদিন বসে খান নি। দু হাতে রোজগার করেছেন! তোমার মা ছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তাঁর টাকা থেকে বড় কর্তার

ওই সম্পত্তি কিনে যে কাজ করে গিয়েছেন, তার তুলনা হয় না।

সুরেশ্বর বলেছিল—মায়ের টাকাটা দিয়ে আমি কীর্তিহাটে মেয়েদের জন্যে একটা ইস্কুল করে দিতে চাই। ম্যাট্রিক ওখানে চলবে না—এম-ই স্কুল এবং ওটা ফ্রি হবে। মায়ের সম্পত্তি থেকে খরচ চলবে।

হরচন্দ্র বলেছিলেন—খুব ভাল কথা। তিনি পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তোমার মা। তাঁর জন্যে করবে এ তো খুব ভাল কথা। আর শ্রাদ্ধ? সে কি রকম করবে? আজ খবর আমি দিলাম। অবশ্য কীর্তিহাটেই সকলে। এক বড়বাবু আর বড়মা, তাঁরা তো কাল ছেলেদের কাছে শুনলাম এখানে আসছেন। কি একটা গোলমাল করেছে ছেলেরা তাই মেটাতে আসবেন। তা ওখানেও টেলিগ্রাম করে দিলাম। আমাদের কর্তব্য করতে হবে তো! কীর্তিহাটে করতে গেলে অনেক ঝঞ্ঝাট, আমি বলি এখানেই কর। এখানকার মত ক'রে কর। কাল থেকে ভেবেছি। ছোটবাবু সায়েবী মেজাজের লোক ছিলেন। সামাজিক খুব ছিলেন না। এবাড়ীর সঙ্গে আগে কলকাতার বড় বড় বাড়ীর যোগাযোগ ছিল। পাইকপাড়ার রাজারা, ওঁরা বলতে গেলে এ বাড়ীর মূল পত্তন ক'রে দিয়েছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন সিংজী রায়রাঁয়া, তিনিই লাট কীর্তিহাট কিনিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁরা আসতেন। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ী, মহারাজার দেওয়ানবাড়ী এঁরা ছিলেন এক রকম অভিভাবক। বড়ই স্নেহ করতেন। রাণাঘাটের পালচৌধুরীরা আছেন ওঁরা খুব ভক্তি করতেন কর্তাদের। ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। পত্রাপত্র ছিল প্রায় সব রাজারাজড়াদের সঙ্গে। শুনেছি তোমার পিতামহ স্বর্গীয় দেবেশ্বর রায় মহাশয়ের বিবাহে দুটো বউভাত হয়েছিল। একটা কলকাতায় একটা কীর্তিহাটে। সব এসেছিলেন, এবং একটা ঘর ভরে গিয়েছিল জিনিসপত্রে। মূল্যবান মূল্যবান জিনিস দিয়েছিলেন। তারপর তোমার পিতামহ তো এখানে মহানামী মহামানী লোক ছিলেন। বড়বাবুর মানে তোমার জ্যাঠামশায়ের বিবাহেও এঁরা এসেছেন, তা ছাড়া বড় বড় সাহেব-সুবো এসেছেন। ছোটবাবু তোমার বাবাই এসব একরকম তুলে দিয়েছিলেন। কাগজে লিখতেন, কারুর খাতির করতেন না, যেতেন না বড় একটা কোথাও, ওই পার্টিটার্টি। তাতে তো সামাজিকতা বজায় থাকে নি। তা তুমি এবার সেটা কর। মায়ের শ্রাদ্ধে পুরনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নাও। কত খরচ হবে? শ্রাদ্ধে দশ হাজার টাকা খরচ করলে প্রচুর হবে। একবার কেবল নিজে যাওয়া। সে তো ভাল হবে, পরিচয় হয়ে যাবে!

•

সত্যই সে যেন এক নতুন জগতে এসে পড়ল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক তিরিশ সালে পার হয়েছে। আইন অমান্য আন্দোলন পার হয়ে গেছে। আন্দোলন সফল হয় নি এ কথা সত্য কিন্তু বছরের মধ্যে যেমন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু গাছের ফুল ফোটা শেষ হয়ে ফুলগুলি ঝরে, নতুন গাছে ফুল ধরে, নতুন ফসল ওঠে। মানুষের পরিচ্ছদ পাল্টায়, মন পাল্টায়, তেমনিভাবে আগেকার কাল, যে কালে এই সব বড় বড় বাড়ীর দিকে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়ে থাকত, সে কাল এখন বিগত ঋতুর মত; এই সব বাড়ী এই সব মানুষ

এখন শুকিয়ে আসা ফুলের মত আকর্ষণহীন। এদের সম্পর্কে সুরেশ্বরের নিজের মনোভাবও সুপ্রসন্ন নয়। তার কারণ সে জন্মাবধি তার সাহেবমনোভাবসম্পন্ন বাপের প্রভাবে প্রভাবান্বিত; তিনি সাংবাদিক হিসাবে ইংরেজকে সমর্থন করলেও এই সব দেশীয় জমিদার ধনীদের সমর্থক ঠিক ছিলেন না। এদের সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যা ছিল নিজের বংশাবলী থেকে তার সঙ্গে পরিচয়ও সুরেশ্বরের প্রত্যক্ষভাবে ঘটেছে কীর্তিহাটে গিয়ে। তা ছাড়া এই নতুন কালের বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া নতুন মানুষ সে। জমিদার বংশধর হয়েও—জমিদারীর সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকার জন্য তার মন জোর পেয়েছিল—মনে মনে অনুভব করত এর জন্যে কোন কালি কোন গ্লানিই তাকে স্পর্শ করে নি। বাপের জোর ছিল, তিনি খেটে খেতেন। এই মনের জোরে সে এদের থেকে নিজেকে আলাদা ভেবেছে—আলাদা থেকেছে এবং মনে মনে অবজ্ঞা ঘৃণাও করেছে। কিন্তু নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে এদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে সে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হল।

মুগ্ধ করলে তাকে তাদের সৌজন্য, তাদের শীলতা। বিস্মিত হল সে এই দেখে যে, তারাও তার চেয়ে কম আধুনিক নয়। ভাল লাগল তাদের রুচি। চমকে গেল সে এই দেখে যে এদের অবস্থার চারিদিকটা পুরনো আমলের ভারী অলঙ্কারের গড়নের মত বেমানান এবং স্থূল হয়ে গেলেও—জহরতের ছটায় ও শোভায় জৌলুসের মত একটা জৌলুস এখনও বুকে ধরে রেখেছে।

কিছু কিছু এ-সব মানুষের ধারা-ধরন চাল-চলনে দম্ভ আছে, বিলাসের উগ্রতাও আছে; অনেকের ব্যভিচার মদ্যপানের প্রকাশ্য অখ্যাতিও আছে, কিন্তু এদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা ধারালো ছুরির মত বুদ্ধিদীপ্ত। বিদ্যানুরাগী। এটা হল তার প্রথম অভিজ্ঞতা। প্রথম আত্মীয়বাড়ী নিমন্ত্রণ সেরেই সর্বাগ্রে সে গেল পাইকপাড়ার রাজবাড়ী। রাজা বিগত। তাঁর মা আছেন তিনি মানুষ করেছেন তিন পৌত্রকে। কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, কুমার অমরেশচন্দ্র সিংহ, কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ। কুমার বিমলচন্দ্রের সঙ্গে তার দেখা হল। তার থেকে কম বয়স। সদ্য ম্যাট্রিক পাস করে প্রেসিডেন্সীতে পড়ছেন। কাঁচা সোনার মত দেহবর্ণ। বুদ্ধিবিদ্যা-দীপ্ত মন। এই বয়সেই সুরসিক ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। কিছুদিন আগেই এ বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথকে এনেছিলেন—তাঁর সঙ্গে বসে ফটো তুলিয়েছিলেন—সেই ফটোটা সামনেই টাঙানো রয়েছে। যামিনী রায় নন্দলালের ছবি দেওয়ালে ঝুলছে।

মিষ্টভাষী মানুষটির মুখে হাসি লেগেই আছে। অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করলেন তিনি। বললেন—নিশ্চয় যাব। আপনাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তো অতিনিকট এবং খুব প্রীতির। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দুর্নাম দেশের লোক যাই করুক—সেদিন তিনি পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টের সময় এগার ভাগের দশ ভাগ রেভেন্যু করেছিলেন বলেই আজও গভর্ণমেন্ট দাঁড়িয়ে আছে। এবং যদি কোন দিন জমিদারী উচ্ছেদ হয় তবে সেদিন কম্পেনশেসন দেবার সময় এর উপকারিতা বোঝা যাবে। হেস্টিংস সাহেব যাবার সময় বলেছিলেন—**The regret which I cannot but feel, in relinquishing the service of my honourable employers, would be much embittered, were**

it accompanied by the reflection that I have neglected the merits of a man who deserves no less of them than of myself Gangagobinda Singh.

মস্ত বড় প্যাসেজ একটা। তা দেওয়ানজী রায়রাঁয়া বলতেন—হেস্টিংস সাহেব আমার জন্যে যা বলেছে আমাকে তাই বলতে হবে—কুড়ারাম ভট্টাচার্যের জন্যে।

আরও কয়েকজনের কাছেই সে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিল। আবার বেশ কয়েকটি বাড়ীতে প্রাচীনত্বের কড়াকড়ি এবং মনের স্থূলতা দেখে তিক্ত হয়েছিল মনে মনে। দু-একজন বলেছিলেন—তাই তো হে—তোমার বাবা তো সাহব বলে আমাদের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে নামকাটা সেপাই হয়েছিল। আমাদের গাল দিয়েই তো করে খেয়েছে বলতে গেলে। তা তুমি আমাদের খাতায় আবার নাম লেখাতে যাচ্ছ যে? তা বেশ বেশ!

এ ছাড়া সে তার কয়েকজন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রকেও নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছিল। শিল্পী যামিনী রায়, অতুল বোস এবং তার বাপের বন্ধু কয়েকজন নামজাদা সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, তুষারকান্তি ঘোষ, সত্যেন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও নিমন্ত্রণ করেছিল। শিল্পী যামিনী রায় তাকে স্নেহ করতেন। শিল্পরসিক তরুণ ছেলেটিকে ভাল লাগত তাঁর। অতুলবাবুও ভালবাসতেন।

এই যোগাযোগ বিচিত্রভাবে তাকে যেন অকস্মাৎ ফ্লাশলাইটের আলোর সামনে দাঁড় করিয়ে তাকে সুপরিচিত করে দিলে, খ্যাতিমান করে তুললে। সে ভাবে নি এমন ঘটবে।

ব্যাপারটা ঘটল এইভাবে। সভামণ্ডপে দুখানি অয়েল পেন্টিং কলকাতার আধুনিক রীতি অনুযায়ী মালা দিয়ে সাজিয়ে দুখানি কাঠের চৌকির উপর রাখা হয়েছিল। তার মায়ের এবং তার বাপের।

সুরেশ্বর মাথা কামিয়ে শ্রাদ্ধে বসেছিল—অভ্যর্থনা করছিলেন তার মামা। প্রায় প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ওই ছবি দু'খানির দিকে। ছবি দু'খানির বৈশিষ্ট্য হল—যেন জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল। প্রতিজনেই বললেন—বাঃ, ছবি দু'খানি তো সুন্দর হয়েছে! সুন্দর ছবি!

মামা প্রবীর চ্যাটার্জি প্রত্যেককেই বললেন—ও সুরেশ্বরের নিজের আঁকা।

অতুল বোস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে বললেন—খুব চমৎকার হয়েছে। মিস্টার রয়কে আমি দেখেছি। ছবি শুধু জীবন্ত নয়—তার সঙ্গে ক্যারেক্টার এসেছে। ওই যে হাসিটুকুতে ঠোঁট দুখানা অল্প একটু বাঁকা করে দিয়েছে একদিকে এবং চোখের তারা দুটোকে একটু করে একপেশে করে দিয়েছে তাতেই বলে দিচ্ছে What was he, ওর মাকে দেখিনি। বলতে পারব না—কিন্তু জীবন্ত হয়েছে। মনে হচ্ছে অসাধারণ ছিলেন তিনি। And তাই ছিলেন তিনি! কিন্তু সুরেশ্বর ছবি আঁকে নাকি? কই একদিনও তো বলে নি!

তারিফ সকলেই করলেন। এবং একটু করে মিষ্টমুখ করাতে উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রবীরবাবু বললেন—দেওয়ালে ছবিগুলোর অধিকাংশই ওর আঁকা!

যামিনীবাবু আসেন নি, তিনি ধ্যানী মানুষ এবং বেশী লোকসমাগমের মধ্যে তিনি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তা ছাড়া সেটা উনিশ শো চৌত্রিশ সালের শেষ—তখনও তাঁর সাধনার খ্যাতি বিস্তৃত হয় নি। জীবনের সঙ্গে তিনি যুদ্ধই করেছেন।

অতুলবাবু বললেন—যামিনীদাকে তো বলতে হবে!

কুমার বিমল সিংহ বললেন—একদিন এসে তো ভাল করে দেখতে হবে সব!

* * *

এরপর বেশীদিন লাগল না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার শিল্পী বলে খ্যাতি রটে গেল। যে আড়াল তার ছিল তার মা, তাঁর মৃত্যুর পর যেন শেষ আশীর্বাদে তাকে ঘুচিয়ে দিয়ে গেলেন। সে বিখ্যাত হয়ে গেল তার মায়ের ছবি থেকেই। এতকাল ধরে মায়ের বিষণ্ণ বেদনাময় জীবনের আবেষ্টনীর মধ্যে বাবার শেষজীবনের কৃতকর্মের গ্লানির জন্যে সে যে পলাতকের বা আত্মগোপনকারীর জীবন যাপন করছিল সেটা থেকে তার নিজের খ্যাতির আকর্ষণে বেরিয়ে প্রশংসার প্রসন্নদীপ্ত আলোকে এসে দাঁড়িয়ে উল্লসিত এবং কিছুটা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল।

মাস দুয়েকের মধ্যেই সে নিজের ছবির এক্‌জিবিশন করলে। উদ্বোধন করলেন যামিনী রায়। এবারে তিনি এলেন এবং প্রশংসা করে গেলেন। তিনি বক্তা নন তবে অকপটে সাদাসিধে কথায় বললেন—আমার ভাল লেগেছে। বেশ ভাল লেগেছে।

কাগজে প্রশংসা বের হল। কয়েকখানা ছবির ব্লক ছাপা হল। ভিড়ও হল। আলাপ হল নবীন শিল্পীদের সঙ্গে। কয়েকজন সাহিত্যিক এলেন, তাঁদের সঙ্গেও আলাপ হল। প্রবাসীর কেদার চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন অমল হোম। কেদারবাবু দুখানা ছবি প্রবাসীতে ছাপতে চাইলেন।

সেইদিনই; সকলে চলে গেলেন আর সদলে এসে তাকে আমন্ত্রণ করলে সীমা এবং অসীমা। সদল মানে সঙ্গে কয়েকজন বান্ধবী!

—কি মহাশয়?

হেসে একটি সিগারেট ধরিয়ে সুরেশ্বর বললে—এস। সুস্বাগতম। কিন্তু প্রশ্নটা কি?

ভ্রু কুঞ্চিত করে অসীমা বললে—সে প্রশ্ন যাই হোক আপাততঃ থাক। কিন্তু এটা কি? আঙুল দেখিয়ে মুখের সিগারেটটাকে দেখিয়ে দিল!

—ওটা সিগারেট। বেশ মূল্যবান সিগারেট। ফাইভ ফিফটি ফাইভ। গেস্টদের জন্য আনানো ছিল। তাঁরা খেলেন, আমার নাকে ধোঁয়াটা গেল, প্রশংসার মদ্যের নেশায় চিত্ত তৃষিত হল বস্তুটার জন্য। মনে হল নেশা জমবে বেশ! তাই আরম্ভ করলাম।

—ভাল! মাকে বলে দেব। সুরোদা, পিসীমার মৃত্যুর দু মাস না যেতেই সিগারেট ধরেছে!

—আর এক মাস পরে বলো। তখন কামানো দাড়ি আরও ঘন এবং চাপ বেঁধে বেরুবে এবং আমাকে একজন ঋষি বলে মনে হবে। সুতরাং বলবেন—না, এ ছেলে মহাপুরুষ ছেলে, একে কিছু বলা উচিত নয়। এর বদলে ঘুষ চাও তো খুব ভালো জর্দা অথবা বিলিতী দামী

লিপস্টিক যা চাও এনে দিতে প্রস্তুত আছি।

বলাবাহুল্য অসীমার মুখে পান ছিল—খুব সুবাসিত জর্দার গন্ধও উঠছিল এবং একটি বান্ধবীর ঠোঁটে লিপস্টিকের অনুরঞ্জনও ছিল।

লিপস্টিকমাখা মেয়েটি বললে—আপনার ছবি যত দুর্বোধ্য—আপনি কিন্তু তত সহজ এবং অকপট!

—আপনি সত্য বলেছেন। আপনার দৃষ্টি প্রখর।

—মিলিয়ে যাচ্ছি যে। আপনি সত্যই শাল্মলী তরু!

—হ্যাঁ। ভাগীরথীতটে কীর্তিহাট নামক গ্রামে বিশাল শাল্মলী তরু আছে একটি। আমি তারই চারা গাছ। কিন্তু আপনি মনে হচ্ছে বেত্রবতীতটের বেতসলতার সেই লতাটি যাকে সুলতা বলা চলে। যার আঘাতে শুধু কাঁটাই ফোটে না দাগও বসে! কালসিটে পড়ে কেটে রক্তও পড়তে পারে।

সীমা খিলখিল করে হেসে উঠল গরবিনীর মত। তার দাদার ঠিক মনে আছে, ঠিক ধরেছে এবং ওই একটি কথার উত্তরে দশটি কথা শুনিয়েছে! জয়টা তার। সুলতা উত্তর খুঁজছে, পাচ্ছে না।

সুলতা লাল হয়ে উঠেছিল। সে আধুনিকা। বি এ পড়ে। অতি আধুনিক মনের ব্যারিস্টারের মেয়ে। পোশাকে তার ছাপ আছে। পরনে তার খদ্দরের শাড়ী। ঠোঁটে তার লিপস্টিক, পায়ে স্যাণ্ডাল। মাথায় রুখু চুলে বেণী। গোপনে রাজনীতি করে বলে রটনা আছে। ছাত্র-আন্দোলন সবে যেটা তখন শুরু হয়েছে তাতে সে প্রকাশ্যে পাণ্ডা।

সুলতা বললে—ছবিতে আপনার ট্র্যাডিশন ভাঙার চেষ্টা সুস্পষ্ট কিন্তু সোশ্যাল কনসাসনেস নেই কেন?

—দুরূহ প্রশ্ন। সম্ভবতঃ আমার নিজের নেই বলে। না হলে ধরুন আর্টিস্ট হিসেবে আমি মনে করি ওটা ছবিতে না আসাই ভাল।

সুলতা তর্কোদ্যত হয়ে উঠেছিল। কেন?

কিন্তু কথায় বাধা পড়েছিল। একজন চাকর এসে বলেছিল—দুটি মেয়েলোক এসেছে, বলছে আপনার সঙ্গে দেখা করবে?

—ইডিয়ট। মেয়েলোক কিরে? মহিলা বলতে হয়। তা ডাক না এখানে।

—তারা বলছে একটু নিরিবিলি কথা বলবে।

—নিরিবিলি?

—হ্যাঁ।

—তা হলে?

সীমা বললে—আমরা বসি। তোমার বাজনা না শুনে যাব না। তুমি শুনে এস কে কি বলছে! কারা—মেয়েছেলে আবার কে?

—কি করে এখান থেকে বলব?

—যাও তা হলে শুনে এস! আমরা ছবি দেখছি, চা খাচ্ছি। যাও।

সুরেশ্বর বাইরে বসবার ঘরে এসে অবাক হয়ে গেল! একটা প্রৌঢ়া, একটা যুবতী! সুন্দরী। পোশাক-পরিচ্ছদে চেহারার মার্জনায় এমনি একটা ছাঁদ তাদের মধ্যে রয়েছে যে ঠিক তার এতকালের জানা-চেনা কারুর সঙ্গে মেলে না, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। না মেলে সামাদের সঙ্গে না মেলে কীর্তিহাটের বাড়ীর সঙ্গে, না মেলে সচরাচর কলকাতার পথে-ঘাটে রেলস্টেশনে যে সব বাঙালী মেয়েকে দেখা যায় তাদের সঙ্গে। এদের চেহারায় কোথায় প্রগল্‌ভতা আছে, মালিন্যের মত একটা কিছু আছে। প্রৌঢ়ার বিধবার সাজ কিন্তু হাতে সামান্য গহনা আছে। ফিতেপাড় কাপড় পরনে। গালে পানের একটা পুঁটলি, ঠোঁট দুটো কালো। মাথার চুলে আছে সে আমলের পাতা-কাটা! সুন্দরী যুবতী মেয়েটির পোশাক-পরিচ্ছদ এমন যে যৌবন রূপ সবকিছু একটা অত্যুগ্রতায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। না চিনলেও একটা আভাস যেন মিলছে, সবকিছু মিলিয়ে বলে দিচ্ছে দেহ এবং রূপ নিয়েই এদের কারবার।

তার ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সে বললে—কি বলুন! কি চাই আপনাদের?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে তারা একটু বিহ্বল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে—আমরা বাবুর সঙ্গে মানে সুরেশ্বর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি আমাদের চেনেন।

—আমার নামই সুরেশ্বর রায়।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তারা। প্রৌঢ়া আবার বললে—এ বাড়ীর মালিক।

—আমিই এ বাড়ীর মালিক।

—কিন্তু আপনি তো তিনি নন।

—তাহলে?

প্রৌঢ়া আবার বললে— নং জানবাজার সুরেশ্বর রায়। দেশ হল কীর্তিহাট।

—সে সব আমার পরিচয়!

—তাই তো বাবু! তবে কি জোচ্চুরি করে গেল কেউ?

যুবতীটি বললে—না-না জোচ্চোর সে নয়।

—হ্যাঁ। সুন্দর চেহারা। আপনার মত এমন সুন্দর নয়। তবে সুন্দর। একটু বয়স বেশী। তিরিশ বত্রিশ। গান-বাজনা জানে, সুন্দর কথাবার্তা—

সুরেশ্বর বললে—আপনারা কে?

—আমরা। আমরা বাবু—। একটু ভেবে নিয়ে বললে—বাবু, আমরা গান-বাজনা করে খাই। এ আমার মেয়ে। মিনার্ভা থিয়েটারে নাচত। আমরা থাকতাম বাবু রামবাগানে সেখানে এই বাবু থিয়েটারে একে দেখে বাড়ীতে এসেছিল। তারপর মাসখানেক খুব খরচপত্র করলে; আমোদ-আহ্লাদ করলে। নাম বললে সুরেশ্বর রায়। বাড়ী বললে এই ঠিকানা। আমরা অবিশ্বাস করি নি। তারপর হঠাৎ বললে—শেফিকে বাঁধা রাখবে। বাড়ী ভাড়া করবে। এখানে আসতে লজ্জা করে। বড়ঘরের ছেলে। বলে ভদ্রপাড়ায় বাড়ী ভাড়া করে মেয়েকে চাকরী ছাড়িয়ে রাখবে। তারপরে হঠাৎ আজ পনের দিন একেবারে

নি-পাত্তা! খোঁজ নেই খবর নেই। মেয়েটা অধীর হয়েছে। ওদিকে বাড়ীওলা ভাড়ার তাগিদ দিচ্ছে। আমাদের হাতেও পয়সা নেই। অগত্যা এসেছিলাম বাড়ীতে তার খোঁজ করতে। ভাবনাও হচ্ছিল। অসুখ-বিসুখ কিছু হল কিনা? তা আপনি তো—।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সুরেশ্বর।

মেয়েটি বললে—তাহলে আমরা যাই বাবু, কিছু মনে করবেন না। আমরা তো জানতাম না।

কি বলবে সুরেশ্বর ভেবে পেলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা দুজনে উঠে দরজার কাছে গেল। মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে বললে—মা!

—কি?

দরজার পাশে টাঙানো সুরেশ্বরের মায়ের শ্মশানে চিতায় তুলবার আগের একটা গ্রুপ ফটো টাঙানো ছিল। সেই ফটোর দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বললে—এই যে মা! এই দেখ! সে!

প্রৌঢ়া ঝুঁকে দেখে বললে—হ্যাঁ এই তো!

সুরেশ্বর এগিয়ে গেল।

তরুণীটি বললে—এই—এই! এই সে! সে আঙুল দেখালে।

সুরেশ্বর দেখলে। সে ব্রজেশ্বর, ধনেশ্বরের বড় ছেলে। সেই তাকে যে রাজা বলে তার প্রজাত্ব স্বীকার করেছে অত্যন্ত সহজ হাসিমুখে। যাকে তার মিষ্ট মনে হয়েছে। যার স্নেহ-প্রীতির মধ্যে এক বিন্দু কপটতা আছে সন্দেহ করে নি। যাকে সে মধ্যে মধ্যে আসতে বলেছে।

## ১১

ব্রজেশ্বর এসেছেও। অশৌচের সময় নিত্যই এসেছে। তার মায়ের শ্রাদ্ধে খেটেছে। এতটুকু কীর্তিহাটের প্রকৃতির পরিচয় পায় নি। কীর্তিহাটের বাড়ীর জ্ঞাতিদের ভার তার উপরেই ছিল। মেজঠাকুমা এসেছিলেন। তিন বছরে তিনি ম্লান হয়েছেন। চার বছর আগে দেখেছিল সে। তখন যে অপরূপ লাবণ্যটি ছিল সেটি ঝরে গেছে। একটু বিষণ্ণ হয়েছেন। ছেলেরা তাঁকে খেতে দেয় না। কোন খোঁজই করে না। এখান থেকে পঞ্চাশ টাকা মা পাঠাতেন, তাই তাঁর সম্বল। আর অন্ন, তাও এক বেলা মাত্র প্রয়োজন তাঁর—সে আসে রাজ-রাজেশ্বরেরও গোবিন্দজীর প্রসাদ থেকে। তিনি ব্রজেশ্বরের জন্য বলে গিয়েছিলেন—হ্যাঁ ভাই, ব্রজেশ্বর দেখি তোমাকে খুব রাজা রাজা করে, কি ব্যাপার?

সে বলেছিল—ব্রজেশ্বর-দা মোটের উপর লোক ভাল ঠাকুমা। কথাগুলি ভারী মিষ্টি, অন্তরটিও ভাল। আমাকে রাজা বলেন।

—হ্যাঁ। লোকের মন নিতে জানে। কিন্তু ভাই, মেলামেশা বন্ধুত্ব ওর সঙ্গে না হওয়াই ভাল।

একটু দুঃখিত হয়েছিল সে মনে মনে। মনে হয়েছিল, ঠাকুমা যেন সতীনের ছেলে নাতিদের প্রতি স্বাভাবিক ঈর্ষাবশে কথা বলছেন। তার কাছে বেশী আপন হতে চাচ্ছেন। সে বলেছিল—না। বন্ধুত্ব ঠিক ওঁর সঙ্গে আমার হতে পারে না ঠাকুমা। উনি চাকরী করেন, মারোয়াড়ী ধনীর বাড়ী তৈরী হচ্ছে তার তদ্বির তদারক করেন, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ। আলাপ আমার সঙ্গে মায়ের মৃত্যুর পর। আসেন, কিছুক্ষণ বসেন, চলে যান। টাকা কি কোন জিনিস তা চান নি। চাইলেও আমি দেব না। তবে চোর-টোর নন তো?

—না, তা নয়। তা বলতে পারব না।

—বেশ, তা হ'লেই হল। না-হলে নিকট-আত্মীয়, আপনারই নাতি, বারণ করব কি করে?

আর কোন কথা মেজঠাকুমা বলেন নি।

মেজঠাকুমা চলে গেছেন। যাওয়ার সময় তার মনে হয়েছিল, যেন অবিচার অন্যায় হল। তাঁর সঙ্গে কীর্তিহাটের সেই পরম আপনার জনটির মত ব্যবহার করা হল না। কীর্তিহাটের জ্ঞাতিদের সম্পর্কে সে শঙ্কিত ছিল, হয়তো এসে যেতে চাইবে না। কিন্তু ব্রজেশ্বরই তাদের ঠেলা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজে তাদের স্টেশনে নিয়ে গিয়ে টিকিট করে চাপিয়ে দিয়ে এসেছে। সুরেশ্বর মেজঠাকুমাকে যাবার সময় বলেছিল—ঠাকুমা, কাজকর্মের ভিড়ে একবার কাছে বসতে পেলাম না, সুবিধে অসুবিধে অনেক হয়েছে, কিছু যেন মনে করবেন না।

মেজঠাকুমা তার চিবুকে হাত দিয়ে বলেছিলেন—না ভাই, পরম সমাদরে থেকেছি। এখানকার ঐশ্বর্য এ আরাম এ তো কখনও জীবনে পাই নি। তোমাদের এতবড় কীর্তিহাটের বাড়ীতেও তো বোধ হয় কোনকালে ছিল না। আমি কাঙালের মেয়ে, দুদিন বুড়ো স্বামীর দৌলতে রাণী হয়েছিলাম। মান্য খাতির পেতাম। তাও শেষ হয়ে এখন আবার কাঙাল হয়েছি। আমাকে এমন ক'রে বলে না। তোমার মা পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাঠাতো, তাতেই আজও স্বামী-শ্বশুর বংশের বউ সেজে বেঁচে আছি!

—টাকা আপনার ঠিক সময়ে যাবে যেমন যেত।

—যাবে বইকি। না গেলে চাইব। লিখব নাতিহুজুর, অধীনার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করতে হুকুম হোক। টাকা পাঠাও।

হেসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, দুটি জলের ধারাও নেমে এসেছিল চোখ থেকে। তার চোখও সজল হয়ে উঠেছিল। তিনি চলে গেলে মনে হয়েছিল ঠাকুমাকে থাকতে বললে হ'ত। এখানে থাকলে মায়ের অভাব পূর্ণ করতে না পারুন যত্ন করতে পারতেন। কিন্তু পরক্ষণেই শ্রাদ্ধের মধ্যে সদ্য খ্যাতি ও গৌরবের স্বাদ-পাওয়া, তরুণ আধুনিক মন বলে উঠেছিল—তুমি আর্টিস্ট, ছবি আর ফ্রেম এ দুটোর নিকটসম্পর্ক ভুলো না। এ ফ্রেমে ও ছবি কি মানায় না খাপ খায়। ডোণ্ট বি সিলি!—

তবু মন খারাপ করেই বসে ছিল। ব্রজেশ্বর স্টেশন থেকে ফিরে এসে বসে বলেছিল—বাপস! রাজা, তোমার ধৈর্য বটে! ওঃ! ঠাকুমার সঙ্গে যে ভাবে কথা কইলে তুমি! এবং এদের যে অত্যাচার এ ক'দিন ধরে সহ্য করলে! আমার তো নিজের গুষ্টি! আমি যে

এই ক'দিনে কতবার ওদের খ্যাঁক ঝ্যাঁক করেছি। আজ তুমি আমায় লজ্জা দিচ্ছ। ওঃ! তোমাকে সেলাম। এখন প্রজার জন্যে একটু চা হুকুম কর। আর কিছুদিন ওরা থাকলে তোমাকে পাগল করে দিত।

চা খেয়ে সে আর থাকে নি। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল, সে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল। বলেছিল—আজ শনিবার ভাই, মিনার্ভা থিয়েটারে নেমন্তন্ন আছে—ওদের সঙ্গে খুব খাতির আছে। যাই। দু হপ্তা থিয়েটার দেখি নি।—হ্যাঁ—জগদীশ্বরকাকার ছেলেমেয়েদের গরম কাপড়-জামার জন্যে যে একশো টাকা দিয়েছিলে তুমি—তার ফেরত আছে পাঁচ টাকা ক' আনা। সেটা ভাই রাজা, রাখলাম আমি। আমার হ্যাণ্ড বড্ড টাইট। মাইনের টাকা পাই নি।

হেসেছিল সে।

সুরেশ্বর বলেছিল—টাকার দরকার আছে তোমার?

খুব হেসেছিল ব্রজেশ্বর, বলেছিল—এই না হলে রাজা? প্রজার চব্বিশ ঘণ্টাই টাকা চাই টাকা চাই টাকা চাই। আর রাজার তাতে বিস্ময়! কেন? না, টাকা সে কি করবে ভেবে পায় না।

পরিশ্রমের ঋণ শোধ করবার জন্যই সে তাকে কিছু দিতে চেয়েছিল, বলেছিল—কত চাই তোমার?

—যত দেবে রাজা। প্রজা ইজ অলওয়েজ পুয়োর। তার হাঁড়িটা শতছিদ্র। সে কলঙ্কিনী রাধা। তাকে ওই শতছিদ্র কুম্ভে জল এনে জালা ভরতে হয়! তা দাও না ভাই রাজা, একশোটা টাকা। বেশী দিলেও আপত্তি করব না। জামা কাপড় সব ছিঁড়ে গেছে। তা ছাড়া কীর্তিহাটের রায়দের মেজ তরফের বড় ছেলের বড় ছেলে। সুদিন দেখেছি, সমাদর বলতে গেলে তোমার মতই ছিল। খুব ভাল জামা কাপড় একসময় পরেছি হে! প্রথম ষোল বছর পর্যন্ত ফরাসডাঙ্গার ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি ছাড়া পরি নি। কিছু করিয়ে নিই।

নায়েবের কাছে টাকা চাইতে সুরেশ্বরের সঙ্কোচ হয়েছিল। নায়েব জানতে চাইবেনই এবং একটু আপত্তিও করবেন। তা ছাড়া রায়বাড়ীর তারই জ্ঞাতির অপমান হবে সেটাও তার মনে লেগেছিল। তার নিজের কাছে দেড়শো টাকা ছিল, তাই বের ক'রে সে তাকে দিয়েছিল।

এরপর কয়েকদিনই ব্রজেশ্বর আসেনি। তারপর এসেছিল সে চমৎকার সাজসজ্জা করে। ফরাসডাঙ্গার ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, চকচকে সেলিমী সু প'রে এসেছিল। গায়ে সেন্টের গন্ধ। হেসে বলেছিল—জয় হোক রাজা! প্রজা তব হইয়াছে সুখী! এই তো রাজার ধর্ম! প্রজানুরঞ্জন! সেদিন গানবাজনা ক'রে, অনেকক্ষণ থেকে, রাত্রি আটটায় সে গিয়েছিল।

তার এগজিবিশনে সাজানোর কাজেও সে যথেষ্ট খেটে গেছে। পরশু পর্যন্ত এসেছিল। তারপর কাল আজ সে আসে নি। তার অভাব সে অনুভব করেছে। সেই ব্রজেশ্বর, এই করেছে। করেছে, মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছে—যায় আসে, তার বিরুদ্ধে বলার তার কিছু নেই। কিন্তু তার নামে নিজের পরিচয় দিয়েছে। একসঙ্গে সুরেশ্বরের মুখে অতি সূক্ষ্ম

একটি বক্র তিক্ত হাস্য দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কপাল কুঁচকে উঠল !

মেয়ে দুটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সে বললে—ওর নাম সুরেশ্বর নয়, ওর নাম ব্রজেশ্বর। আমার জ্ঞাতি বটে। চিনি তাকে।

—কোথায় থাকে সে বাবু ?

—তা আমি জানি না। কোন দিন জিজ্ঞাসা করি নি।

—বাবু !

—বল !

—সে তো আপনার নিজের লোক—। আমাদের যে বড় বিপদ বাবু! ধারে মদ খেয়ে গেছে। আমরা আনিয়ে দিয়েছি। ভাড়া বাকী। আজ না দিলে কাল সকালে জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে বাড়া থেকে বের করে দেবে। তা আপনি দিয়ে—যদি তার কাছে—

—না। অত্যন্ত রূঢ়স্বরে সুরেশ্বর বললে।

সে কণ্ঠস্বরে তারা চমকে উঠল ভয়ে।

—চল মা চল !

—দাঁড়াও। তোমাদের ঠিকানা দিয়ে যাও। সে যদি এখানে আসে তবে লোক দিয়ে তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

—মেয়ের নাম শেফালি বাবু। ঠিকানা—নতুন রাস্তা, সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু আর বিডন স্ট্রীটের ধারে। ৫-নম্বর রাম ঘোষের গলি। ওই মনোমোহন থিয়েটারের পেছনে। তখনও সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু শ্যামবাজার পর্যন্ত আসে নি—ওই বিডন স্ট্রীটে মনোমোহন থিয়েটারের সামনে পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছিল। বুঝতে দেরী হল না তার। ব্রজেশ্বরও কাছাকাছি কোথাও থাকে। বিডন স্ট্রীটেই কোথায় যেন মারোয়াড়ীটির বাড়া তৈরী হচ্ছে। সে এবার ডাকলে—রঘু!

রঘু দরজার পাশেই ছিল। সে ভিতরে এল, সুরেশ্বর বললে—এদের নিচে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দে।

তারা চলে গেলেও সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল সীমা অসীমা সুলতা ঘরে বসে আছে।

ফিরে আসতেই সীমা বললে—বাবাঃ! ওরা কে ?

—প্রশ্ন করো না। উত্তর দিতে আবার কষ্ট হবে। সম্ভবতঃ দিতে পারব না !

—ওরা ভদ্রঘরের মেয়ে ?

—উঁকি মেরে দেখেছ ?

—দেখেছি।

—কথা শোন নি ?

—শুনে বুঝতে পারি নি।

—তা হ'লে থাক।

—বাঃ—অভদ্র মেয়েরা তোমার বাড়ী আসবে। জিজ্ঞাসা করব না?

—না করাই উচিত। জিজ্ঞাসা করলে বলব, আমিও ওদের চিনি না—ওরাও আমাকে চেনে না।

—তবে এল কেন?

—এল, আমার না হলেও আমার বংশের কারুর দায় আছে।

এতক্ষণে সুলতা বললে—ওদের কিছু সাহায্য করলে পারতেন আপনি। মুখ দেখে বড় বিব্রত মনে হল!

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে সুরেশ্বর তাকিয়ে রইল। মুগ্ধ হয়ে গেল সে। মুখের দিকে অসঙ্কোচে বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে থেকেই বললে—ঠিক বলেছেন। কিন্তু—!

—কিন্তু কি?

—আপনি অদ্ভুত!

লাল হয়ে উঠল সুলতা।

সুরেশ্বর বললে—আমি শাল্মলী বৃক্ষের চারা কিন্তু আপনি বেত নন। অত্যন্ত নরম লতা। মালতী বললে রাগ করবেন।

—এখন আপনার বাজনা শোনান!

বাজনা সে শুনিয়েছিল। এবং সারাটা দিন সুলতার কথাই ভেবেছিল। ওর কথার টানে ওই মেয়ে দুটির কথাও এসে পড়েছিল বারবার ঘুরে ঘুরে।

ওদের কিছু দেওয়া উচিত ছিল। সুলতা বললে—ওদের মুখ দেখে মনে হল ওরা খুব বিব্রত।

মুখের দিকে বার দুই তাকিয়েছিল সে। মেয়েটির রূপ আছে। কিন্তু বেশভূষাতে সে রূপে বেশী চড়া রঙের শেড দিয়ে ফেলেছে। ভালগার হয়েছে তাতে। তাই জন্যে তাকাতে পারেনি। সুলতার মুখেও রঙ ছিল। ঠোঁটে লিপস্টিক ছিল। চুল রুখু ছিল। দুটোতে আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছে।

ব্রজেশ্বরের উপর রাগ হয়েছিল। রাস্কেলের কি শয়তানি বুদ্ধি! তার নাম ব্যবহার করেছে। কেন? মনে হয়েছিল, তাকে বিপন্ন করবার জন্যে? কিন্তু তাই বা কি ক'রে করবে? তবে? তা হলে একটু বড়লোকী আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার জন্য? তা হয়তো হবে। ব্রজেশ্বরের কথাবার্তা মনে পড়েছিল। মিষ্টিমুখ, চতুর। ধনেশ্বর রায়ের ছেলে। ওর পক্ষে এ আর বিচিত্র কি? একটু হাসিও পেয়েছিল।

সারাটা দিন কথাগুলো ঘুরছিল মনের মধ্যে।। তারই মধ্যে সন্ধ্যার পর মনে হয়েছিল, কাল সকালেই ওদের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে মেয়ে দুটিকে পথে বের ক'রে দেবে। ভাড়া বাকী আছে, ধার পড়ে আছে। অস্বস্তি অনুভব করতে করতে হঠাৎ সে একসময় উঠে পড়েছিল ইজিচেয়ার থেকে। কিন্তু—।

টাকা? নায়েব ম্যানেজারকে সুরেশ্বর শুধু সঙ্কোচই করে না—অভিভাবকের মত ভয়ও করে। হঠাৎ মনে পড়েছিল আজ চারখানা ছবি দেড়শো টাকায় বিক্রী হয়েছে—সেটা তার আলমারিতে আছে এবং তার হাতখরচের টাকাও আছে। সে দুশো টাকা বের ক'রে নিয়ে

একটা জামা টেনে মাথায় গলিয়ে প'রে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ডাকলে—রঘু!

—বাবু!

—আমি একটু বেরুচ্ছি। হঠাৎ কৈফিয়তের প্রয়োজন অনুভব করলে, বললে—একজনের সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার, ভুলে গিছলাম। বুঝলি!

—গাড়ী বলব?

বাড়ীতে একখানা ব্রুহাম গাড়ী আছে। সে সেই তার বাবার আমল থেকে। সেটা হেমলতা ঘোচান নি। আবার মোটরের যুগ উঠেছে, মোটরও কেনে নি। সুরেশ্বর বললে—গাড়ী? তারপর বললে—না। বলে বেরিয়ে চলে গেল। জানবাজার থেকে হেঁটে চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত এসে দাঁড়াল। একটা ভুল হয়ে গেছে। মনে ছিল না এটা জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ। শীতটা ক'দিন গাঢ় হয়ে পড়েছে। শুধু আলখাল্লার মত একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গায়ের আলোয়ানটার প্রয়োজন অনুভব করলে। হ'লে অন্তত ভাল হত। থাক। সে চৌরিঙ্গী পার হয়ে এসে আবার একটু দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি নিলে একখানা। ট্রামে সে বড় একটা চড়ে না। হয় হেঁটে, নয় বাড়ীর ব্রুহামে, নয় ট্যাক্সিতে চড়ে। দিনের ভাগে প্রায়ই চরণবাবুর জুড়ি। মানে হেঁটে।

ট্যাক্সিতে চড়ে বললে—চলিয়ে বিডন স্ট্রীট আর সেন্ট্রাল এ্যাভেনু জংশন।

১৯৩৪।৩৫ সালের কলকাতা; কলকাতায় লোকসংখ্যা হয়তো দশ পনের লক্ষ। গাড়ীই বেশী, মোটর কম—বাস হয়নি। ট্রামে ভিড় নেই। বেলা বারোটা থেকে ট্রাম ফাঁকা ছোটে। রাত্রি আটটার পরও তাই। ট্যাক্সিখানা প্রচণ্ডবেগে ছুটে চলেছিল। বাইরে কনকনে হাওয়া গাড়ীর ভিতর ঢুকে তাকে শীত ধরিয়ে দিল। সে কাচ বন্ধ করে দিয়ে বসল। হঠাৎ বললে—রোখিয়ে তো সর্দারজী! বাঁয়া তরফ।

গাড়ী রুখলে সে। গাড়ী থেকে নেমে এক বাক্স গোল্ডফ্লেক সিগারেট দেশলাই কিনে নিলো, যেন একটা উত্তেজক কিছুর দরকার ছিল। ঠাণ্ডায় যে শীত তার থেকে আলাদা একটা কিছুর তাড়না তার বুকের স্পন্দনকে দ্রুততর করে যেন একটু কাঁপুনির সৃষ্টি করেছিল। গাড়ীর ভিতর বসে সিগারেট ধরিয়ে সে একটু আরাম পেলে।

বিডন স্ট্রীটে এসে নেমে তার ভাবনা হল—এই বাড়ী কোথায় পাবে? কি ভাবে বের করবে, কি বলে ঢুকবে? ব্যাপারটা এবার তার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। অভিজ্ঞতা নেই। বলতে গেলে এ অঞ্চলে কয়েকবার থিয়েটার দেখতে আসা ছাড়া এমনি কখনও আসে নি! কিন্তু পড়ে-শুনে একটা ধারণা আছে—তবে সেটা বেশ সহজ সরল নয়।

সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলে ফিরে যাই। পিছনে একটা পানের দোকান। সেখানে হিন্দুস্থানী পানওয়ালা পান বেচছে। সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন বেশ পাঞ্জাবি পরা, পাকানো গোঁফ, তেল-চকচকে চুলে বাহারে টেরী হিন্দুস্থানী হাসছে গল্প করছে। মধ্যে মধ্যে রিক্সা করে বাবু চলছে মালা গলায়। রজনীগন্ধার মালা। গোড়ের মালা এখন নেই। একজন একটা খড়-জড়ানো কাঠে-গোঁজা গোলাপ ফুলের কুঁড়ি এবং ফুল বিক্রী করছে। হাঁকছে—চাই ফুল!

হঠাৎ একজন হিন্দুস্থানী এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললে—বহুৎ আচ্ছা বিবি, বাবু সাহেব!

দেখিয়ে গা ?

সুরেশ্বর নার্ভাস হল। এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে নার্ভাসনেসের সঙ্গেই যুদ্ধ করছিল। এ-প্রশ্নে সে বেশ একটু দমে গেল। উত্তর দিল না।

—বাবুসাহেব !

—না !

—তব ইখেনে দাঁড়িয়ে কেনো ?

এবার সে সাহস সঞ্চয় করে বললে—একটা বাড়ী খুঁজছি, বাতলে দিতে পার ?

—হ্যাঁ। বাতাইয়ে।

ঠিকানাটা বললে সে। এবং বললে—ওখানে শেফালি বলে একটি মেয়ে থাকে, তার বাড়ী।

—হাঁ-হাঁ। জরুর জানি। উ তো মিনার্বার সখী ছিলো। আব এক বাবু উসকে রাখিয়েসে। আসেন। লেকিন বকশিস লিবো হামি !

—চল !

সে একটা সংকীর্ণ গলিপথ। দুধারের বাড়ীর দরজায় আলো জেলে বসে দাঁড়িয়ে নানান সাজে সাজা মেয়ের দল। নানান বাড়ী থেকে গান ভেসে আসছে। শিউরে উঠল সে। শীত তার বেশী ধরে গেল। প্রায় প্রতি ঘরের দরজা থেকেই ইঙ্গিতে আহ্বান করছিল তারা। সরব আহ্বানেও ডাকছিল—আসুন না ! অ বাবু !

হিন্দুস্থানীটা বললে—বাবু শেফালির কামরামে যাবেন। মিনার্বার শেফালি।

—আমি শেফালির চেয়ে ভাল। তাকিয়ে দেখুন। বলে হেসে উঠল মেয়েটা।

সে মাটির দিকে চেয়েই পথ চলছিল। আর সিগারেট টানছিল।

মনে হচ্ছিল পা থেকে মাথার দিকে সন্-সন্ করে একটা কিছুর স্রোত বইছে। কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে। হাত ঘামছে। মনে অনুতাপ হচ্ছিল। নিজের উপর রাগ, তার চেয়েও বেশী রাগ হচ্ছিল ব্রজেশ্বরের উপর। তাকে পেলে সে তার পায়ের জুতো খুলে মারতে পারত।

—এহি বাড়ী বাবুজী !

বাড়ীর দরজায় দু-তিনটে মেয়ে দাঁড়িয়ে। এখানটায় এত ভিড় নেই। যে-মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিল, তার মধ্যে শেফালি নেই। সুরেশ্বর বললে—জিজ্ঞেস কর তো শেফালি আছে কিনা ! হয়তো লাঞ্ছনার ভয়ে আগেই বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে থাকতে পারে।

একটি মেয়ে বললে—কাকে খুঁজছেন ? শেফালিকে ?

—হ্যাঁ।

—তার ঘরে হুজ্জুত চলছে। ভাড়া বাকি, বাড়ীওলী পা লাগিয়ে বসেছে। টাকা দেওয়ার কথা ছিল, দিতে পারে নি। তার বাবু ভেগেছে। সেখানে সুবিধে হবে না। হেসে উঠল সে—তা আমার ঘরে আসতে পারেন।

—আমাকে ভিতরে যেতে পথ দিন।

—হামার বকশিশ বাবু !

—কত ?

—সেলাম, খুসীসে দো-চার রূপেয়া দেদিজিয়ে !

চারটে টাকাই তার হাতে দিয়ে দিলে সে। বললে—চল ভিতরে গিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দেবে।

—জরুর ! বলেই সে সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াল। মেয়ে দুটি তাকে পথ দিল সরে গিয়ে। তাকে ডাকলে—আইয়ে হুজুর !

ঘুপচি কুয়োর মত একটা উঠোন। তার চারিপাশে ঘর। সব ঘরেই দরজা প্রায় ভেজানো। ভিতরে আলো জ্বলছে। কোন ঘরে হাসি-উল্লাস, কোন ঘরে গান, কোন ঘর প্রায় স্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে দু-চারটে কথা ভেসে আসছে। তারই মধ্যে একটা সংকীর্ণ সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে লোকটা ডাকলে—শেফাইলি বিবি !

সামনেই ওপাশে একখানা ঘরের দরজা খোলা। দরজায় বসে আছে একটি স্থূলাঙ্গী মেয়ে। নীচ হাত খালি—উপর হাতে তাগা আলোর ছটায় ঝক-ঝক করছে। তার ওদিকে ঘরের মধ্যে শেফালিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মাথা হেঁট করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। বেশ নেই, ভূষা নেই, হেট-করা মাথা থেকে খোলা চুল কিছু সামনে এসে পড়েছে। ডাক শুনে সে মাথা তুললে। আলোর ছটা মুখে পড়ল। সুরেশ্বর দেখতে পেলে, মেয়েট কাঁদছিল। এবার সুরেশ্বর সহজ হয়ে উঠল মুহূর্তে। সে হিন্দুস্থানীটিকে পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

অবাক হয়ে গেল শেফালি।

সুরেশ্বর বললে—তোমার মা কই ?

—সেই বাবু মা। বিহ্বলকণ্ঠে বললে শেফালি। ঘরের কোণ থেকে এবার উঠে এল তার মা। শেফালিও উঠে দাঁড়াল। তার মায়ের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সে সুরেশ্বরের ঐশ্বর্য দেখে এসেছে। এবং আরও দেখে এসেছে আজ তার বাড়ীতে বড় বড় লোকের ভিড়। তারা যখন গিয়েছিল, তখন ওই ভিড় দেখে বাড়ীতে ঢুকতে সাহস করেনি। অন্য লোককেও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করছিল একটু দূরের এক ভুজাওলাকে—ও-বাড়ীতে কি হচ্ছে ? তারা বলেছিল—এগজিবিশন ! তসবীরের এগজিবিশন ! ছবির গো ছবির। ওহি বাড়ীর মালিক বহুত লায়েক আদমী। বহুত নাম। উনি তসবীর আঁকিয়েছেন, ওহি দেখনে লিয়ে বড়াবড়া আমীর, বড়াবড়া ভারী-ভারী আদমী আসিয়েছেন !

ওরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছিল। শেফালির গৌরব-গর্বের অন্ত ছিল না, তার বাবুর এত ঐশ্বর্য, এত গৌরব। তারপর সকলে চলে গেলে ভিতরে ঢুকে ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়েছিল। তারপর যখন সুরেশ্বর এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সুরেশ্বরের ব্যক্তিত্ব, তার আকার অবয়ব দেখে নিতান্ত ছোট হয়ে পড়েছিল। কথাবার্তায় ভয় পেয়েছিল। সুরেশ্বর একবার রূঢ়কণ্ঠে 'না' বলেছিল, তাতে চমকে উঠেছিল দুজনেই। সেই মানুষ তাদের এই কদর্য পঙ্কপল্বলে নিজের পা-দুখানাকে হাঁটু পর্যন্ত কর্দমাক্ত করে এখানে এসেছেন। বুঝতে পারছিল না তারা। কিন্তু ওরা দেহব্যবসায়িনী, ওরা

দুনিয়ায় দেহের চাহিদার বিচিত্র তত্ত্ব নিপুণভাবে বোঝে। মা মেয়ে দুজনের মুখ-চোখই পরমুহূর্তে দীপ্ত হয়ে উঠল। মা বললে—আসুন, বাবা আসুন।

তারপরই দরজায় বসে-থাকা স্থূলাঙ্গীকে বললে—এখন যাও দিদি। পাবে বইকি। দেব বইকি। উনি দাঁড়িয়ে আছেন। মস্ত-বড়লোক, রাজার ছেলে, তার চেয়েও বড়। এখন যাও—

সুরেশ্বর বললে—উনি ভাড়া পাবেন?

স্থূলাঙ্গী বললে—হ্যাঁ বাবু, আমি দু'মাসের ভাড়া পাব। এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে ঘর ভাড়া করে তারপর—

—কত পাবেন?

—দু'মাসের ভাড়া ষাট টাকা। বাড়ীর সব থেকে ভাল ঘর বাবু। আলাদা কল, আলাদা সব।

একখানি একশো টাকার নোট তার হাতে দিয়ে বললে সুরেশ্বর—তিন মাসের ভাড়া মানে আগামী মাসের ভাড়াও নিয়ে রাখুন। বাকি টাকাটা—। কি যেন মদের ধার আছে বলেছিলে তুমি? কার কাছে?

—সেও আমার কাছে। সেও কুড়ি টাকা।

আর একখানা একশো টাকার নোট সে শেফালির মায়ের হাতে দিয়ে বললে—ওকে দশ টাকা দিয়ে বাকি টাকাটা তোমরা রাখো। এক মাসের মধ্যে তোমরা যা হয় কাজ দেখে নিয়ো। বুঝলে! আমি চললাম।

—চললেন?

—হ্যাঁ। সে ফিরল।

—বাবু! বাবু! আপনার পায়ে ধরছি! বাবু!

এক্ষেত্রে বোধহয় নাটক করার লোভ সম্বরণ কেউ করতে পারে না। সুরেশ্বরও সম্বরণ করতে পারলে না। সে ফিরল না—সে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। যে-নাটকটি হয়ে গেল উপরে, সে নাটকটির বেগ এবং গতি এত প্রবল এবং তীক্ষ্ণ যে, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সে নামতে নামতেই নিচে এসে গিয়েছিল। ফলে দরজা ফাঁক করে তাকে সকলে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে দেখলে। দরজায় যে-দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা দরজা থেকে সরে এসে তখন উঠোনে দাঁড়িয়েছে। সে আবার থমকে দাঁড়াল। তার এখন সাহস হয়েছে। অন্তর শুধু তৃপ্তি নয়, তার সঙ্গে অহঙ্কারেও পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সে বললে—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

তারা প্রগল্ভতা করলে না। একজন বললে—কি?

—কত উপার্জন কর তোমরা?

অবাক হয়ে গেল তারা। উত্তর কি দেবে বুঝতে পারলে না।

সুরেশ্বর হেসে বললে—এই শীতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। এই তো ফিনফিনে পোশাক। শীত করে না? কষ্ট হয় না?

করুণভাবে একটি মেয়ে বললে—খাব কি বাবু?

পকেট থেকে দুখানা দশ টাকার নোট বের করে তাদের দুজনের হাতে দিয়ে বললে—আজকের দিনটে আর কষ্ট করো না। রাত্রি বোধহয় দশটা বাজে!

বলে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে এল। তার পিছন পিছন আসছিল সেই হিন্দুস্থানীটি। সে-ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেছে। এইসন শরীফ-আমীর সে তার জিন্দগীতে দেখেনি। কানেও শোনে নি। হঁ্যা শুনেছে বটে—বাদশাহী জমানাতে। এ-জমানাতে নয়!

সে তাকে কিছু বলতেও সাহস করলে না। সুরেশ্বর এসে আবার দাঁড়াল। সেন্ট্রাল এ্যাভেন্যুর মোড়ে। একটা ট্যাক্সি চাই।

লোকটা এসে শুধু বললে—হুজুর!

—একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পার?

—ট্যাক্সি মিলবে না হুজুর, ঘোড়ারগাড়ী ডেকে দিই।

—আচ্ছা। ওই তো আড্ডা। আমি নিয়ে নিচ্ছি। দীর্ঘ পদক্ষেপে এসে সে একখানা গাড়ীতে চেপে বসে বললে—জানবাজার।

মনে মনে একটা নেশা লেগেছিল। আশ্চর্য একটা নেশার ঘোরের মত। ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে এই সদ্য সমাপ্ত দৃশ্যটার টুকরো টুকরো ছবি মনে ভেসে উঠছিল এবং গভীর তৃপ্তি অনুভব করছিল। গাড়ীর পিছনের সিটটায় বসে সামনের সিটের কোণের দিকে চেয়ে যেন ছবিগুলো দেখছিল। ঘুরে ঘুরে শেফালির একটা ছবি মনের সামনে আসছিল। প্রথম তাকে যেমন দেখেছিল—সেই ছবি। সেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল মেয়েটি, মুখ আধখানা দেখা যাচ্ছিল উপরের দিকটা। ভুরুর নিচে চোখ পর্যন্ত। কতকগুলো রুখু চুল কপালে এসে পড়েছিল। অত্যন্ত সকরুণ। গাড়ীর ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে সেই স্মৃতির ছবিটা যেন সে স্পষ্ট দেখছিল। সিগারেট টানাও সে ভুলে গিয়েছিল এবং সিগারেটটা পুড়েই যাচ্ছিল ধোঁয়ার একটি আঁকাবাঁকা রেখা তুলে। অনুভব করছিল নিঃশ্বাস দিয়ে। তার শিল্পী-মন আপসোস করছিল। একখানি সুন্দর ছবি হত। অতি সুন্দর ছবি হতে পারত। হঠাৎ হাতের আঙুলে গরম লাগায় আঙুল সরিয়ে নিয়ে আগুনের ছেঁকা খেলে। সচেতন হয়ে সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিয়ে সে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। ফিরে গেলে হয় না?

খানিকটা নড়েচড়ে বসে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললে। আঁকবার কোন সরঞ্জাম নেই, গিয়ে কি হবে? তাছাড়া সে-মুহূর্ত তো আর ফিরবে না!

গাড়ীটা ততক্ষণে ধর্মতলায় পৌঁচেছে। বাইরে ব্রিস্টল হোটেল—একটু দূরে মেট্রোতে এবং অন্য দোকানগুলোতে আলো ঝলমল করছিল। সায়েব-মেমের ভিড় চলেছে। ফিরিঙ্গী এবং দেশী ক্রীশ্চান মেম-সায়েবগুলো এদিকে-ওদিকে ঘুরঘুর করছে।

সব ভেসে যাওয়া ছবি যেন। গাড়ীটা কর্পোরেশন স্ট্রীটে ঘুরল। কর্পোরেশন স্ট্রীটের নতুন নাম হয়েছে—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড।

গাড়ী এসে বাড়ীর দরজায় লাগল। নামল সে। ভাড়া দিয়ে সে উপরে উঠে গেল। বসল কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে গিয়ে ক্যানভাসের উপর কয়লার স্টিক দিয়ে ওই ছবিটা আঁকতে

চেষ্টা করলে। কিন্তু হল না।

শুধু একটা উত্তেজিত অস্থিরতায় পায়চারি করলে ঘরের ভিতর। হঠাৎ একবার মনে হল ছবির সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে যাবে সে ?

নাঃ। তবে কি করবে সে ? একটা কিছু করার যেন প্রয়োজন। ওই মেয়েটার সেই মুখচ্ছবি ভাসছে। রাস্তার ধারে দরজায় দাঁড়ানো মেয়েগুলোর সেই শীতে কষ্ট পাওয়ার ছবি মনে পড়ছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে চিঠির কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে বসল সুলতাকে। হঠাৎ সুলতাকে মনে পড়েছে। সেই তাকে বলেছিল—মুখ দেখে মনে হল বড় বিব্রত। কিছু দিলে পারতেন।

## ১১

ধন্যবাদ দিয়ে পত্র লিখলে সুলতাকে। লিখলে—আপনাকে ধন্যবাদ, শত-সহস্র ধন্যবাদ না জানিয়ে মন তৃপ্তি পাচ্ছে না। আমার দৃষ্টিতে আপনি অস্ত্রোপচার করেছেন আজ। আমি দেখতে পাই নি—আপনি দেখতে পেয়েছিলেন, সকালের ওই মেয়ে দুটির মুখের মধ্যে বিব্রত বিপন্ন হওয়ার লক্ষণ। গাছের মাথায় ঝড়ের আগে ছায়া নামা আমি দেখেছি। ঝড় ওঠবার লক্ষণ দেখা দিলে আমি ছাদে উঠে দেখেছি পশ্চিমদিকে ময়দানের গাছগুলোর মাথায় ছায়া পড়ে। ছায়াই শুধু পড়ে না। গাছগুলোও নিঝুম হয়ে নেতিয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের মুখে ওটা দেখতে পাই নি। আপনি পেয়েছিলেন, আমাকে বলেছিলেন, কিছু দিলে পারতেন। সারাটা দিন কথাটা আমার মনে ঘুরেছিল। সন্ধ্যার পর মনে হয়েছিল—ওরা বলেছিল, কাল সকালেই ওদের বিপদ ঘটবে। সব কেড়ে নিয়ে বের করে দেবে পথে। তাই শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছিলাম। এবং সব সংকোচ জয় করে যখন ওদের আস্তানায় উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম, ঝড়ের ঝাপটা নেমেছে। সেই ঝাপটায় মেয়েটিকে দেখলাম, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মাথা নিচু করে কাঁদছে, মাথার চুল কপালে নেমে ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক ঝড়ে বিধ্বস্ত লতার পল্লবের মত। আমি টাকা দিয়ে ওদের বাঁচিয়ে এসেছি। এবং যে কৃতজ্ঞ-দৃষ্টির অভিষেক নিয়ে এসেছি, তা আমার জীবনের সব অপবাদের পঙ্কলেপনের মাঝখানে একটি চন্দনতিলক পরিয়ে দিয়েছে। আমি এই মুহূর্তেও অনুভব করছি—আমি দেবকুমার হয়ে গেছি।

মানুষের পাপপুণ্য, নিন্দা-প্রশংসার সব খোলস খসে পড়েছে। আপনার মন আশ্চর্য মন। পরশ-পাথরের মত। সে-মনের স্পর্শ পেয়ে আমার মন সোনা হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। ফিরে এসেই পত্র লিখছি আপনাকে। ইতি—সুরেশ্বর রায়।

এই খুশী-মনের জের তার আর ঘোচে নি বা মোছে নি। পরদিন সকালে উঠেও সে অনুভব করেছিল যে গ্লানি তার জীবনটাকে ভার করে রেখেছিল—তা যেন সব ঘুচে গেছে। সকালে

উঠেই সে ছাদের উপর উঠেছিল অকারণেই। তখন জানুয়ারী মাসের শীত। তারই মধ্যেই সে ছাদে উঠে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নিচে নেমে এসে বাজনা নিয়ে বসে ছিল।

রঘু চা-টোস্ট-ডিম নামিয়ে দিয়ে বলেছিল—আজও আবার সব লোকজন আসবে তো?

—নিশ্চয়ই! রঘুপতি রাঘব রাজারাম—তুমি ভাব কি? একজিবিশন এখন সাতদিন খোলা থাকবে। দশটা থেকে বারোটা। আবার চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা।

—খাবার-দাবারও আনতে হবে তো?

—তাও আনতে হবে। তবে কালকের মত নয়। অল্প পরিমাণে। সিগারেট আনবে। আর একখানা চিঠি ফেলতে হবে। না—থাক। আমি নিজে ডাকে দিয়ে আসব। এক্ষুনি বেরুব।

চিঠিখানা আজই পৌঁছুনো চাই সুলতার কাছে। সকালে জি-পি-ও-তে ফেললে বিকেলে পাবেই। চিঠি পেয়ে সুলতা বিস্মিত হয়ে আসতেও পারে! বেরিয়ে গেল সে চা খেয়েই। হেঁটেই গেল। জানবাজার থেকে জি-পি-ও কাছেই।

বিকেলে কিন্তু সুলতা আসেনি। তবে সে-কথা নিয়ে ব্যস্ত হবার বা ভাববার সময় পায় নি। কারণ, একদল তরুণ শিল্পী এসেছিলেন · কেউ কিউবিস্ট্, কেউ ফিউচারিস্ট।—কেউ বা অন্য কিছু। তাঁরা খুশী হলেন। এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেশ হৃদ্যপরিচয়ে পরিচিত হয়ে গেলেন। তাঁদের দল আছে। বললেন—আমাদের দলে আসুন।

সে চৌবাচ্চায় বন্দী মাছের ওপরে জলস্রোতের শব্দ এবং ইসারায় আহ্বান পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরিচয় এমনই গাঢ় হল যে, সেইদিনই সে তাদের বাজনাও শুনিয়ে দিলে—এস্রাজ-বেহালা।

এর মধ্যে সময় যে কেমন করে উড়ে গেল তা দলের কারুরই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একজন বললে—ওরে সর্বনাশ! আটটা যে বাজে বাজে! আমি উঠলাম। তখন নতুন করে কফি এবং খাবারের কথা বলেছে সুরেশ্বর। সে বললে—সে কি?

ভদ্রলোক বললেন—না! আটটার পর কফি—না স্যার! আবার আসব। নিয়ে যাব আপনাকে। আজ ছুটি!

অন্য একজন বললেন—উনি ড্রিংক করেন।

সুরেশ্বর বলে উঠল—বেশ তো। তাই আনাচ্ছি। বসুন।

—খুব ভাল হবে। আপনার স্বাস্থ্যপান ক'রে উন্নতি কামনা করে ফাংশন হবে আমাদের।

তারপর উৎসাহ এবং উল্লাসের মধ্যে সে তাদের গেলাসের সঙ্গে গেলাস ঠেকিয়ে মদও খেলে।

আসর যখন ভাঙল, তখন ন'টা বেজে গেছে!

সকলে চলে গেলে সে আবার গিয়ে ছাদে উঠল। চৌরিঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাথার মধ্যে মদের প্রভাব চঞ্চল উত্তেজনা জাগিয়েছে—মনের মধ্যে প্রশংসা প্রতিষ্ঠার এবং শিল্পীদের প্রীতির স্মৃতি চৌরিঙ্গীর আলোর মতই ঝলমল করছে। পৃথিবী যেন তাকে ডাকছে

মনে হচ্ছে।

হঠাৎ মনে হল কালকের রাত্রের কথা। বের হবে আজকে আবার? এই শীতের রাত্রে যারা স্বতি জামা আর রঙীন কাপড়ে ও রঙে-পাউডারে সেজে সামান্য টাকার জন্যে হাসির মুখোশ পরে বসে আছে পথের দিকে তাকিয়ে, তাদের সকলের হাতে পাঁচটা করে টাকা দিয়ে বলে আসবে—যাও ঘরে যাও। এই তো কিছু পেলে—এ থেকেই চালিয়ে নিয়ো। দাঁড়িয়ে শীতে কষ্ট ক'রো না, যাও।

আবার আজ একবার সে দেবতা হয়ে পুজো প্রণাম কুড়িয়ে ফিরে আসবে। ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল তার। কিন্তু—। একটা নয় অনেক, কিন্তু! সব থেকে বড় হয়ে উঠল একটা কিন্তু। সে মদ খেয়েছে। কি ভাববে সেই রামদীন—তাকে তো সঙ্গে নিতেই হবে। কি ভাববে যাদের হাতে টাকা দেবে তারা? ভাববে না এটা মাতালের খেয়াল?

নিজেকে সম্বরণ করলে সে। বাবার কথা মনে হল।

না! সে যাবে না! চন্দ্রিকাতে বাবা সহজ অবস্থায় মুগ্ধ হন নি। তার প্রথম দিনের কথা বেশ মনে আছে। বাবা বেহালা বাজিয়েছিলেন—সে তবলা বাজিয়েছিল। সে গন্ধ পেয়েছিল বাবার কাছ থেকে।

না—সে যাবে না।

পরদিন সকালটা এর তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে ছিল। সে তৃপ্তি উপচে পড়েছিল একখানা চিঠি পেয়ে। স্বলতার চিঠি; ছোট্ট চিঠি।

ভারী ভাল লাগল চিঠিখানি। তবে একটা কথার প্রতিবাদ করছি। মনে হয় অতি বিনয়ে লিখেছেন বা আবেগের আতিশয্যে লিখেছেন। সংসারে পরশপাথর অলীক বস্তু। কিন্তু সোনা বাস্তব। আপনার মনই সোনা দিয়ে গড়া। কিছুর ছোঁয়াতে সোনা সে হয় নি। আমার কাছ থেকে হয়তো খানিকটা উত্তাপ পেয়েছিলেন যাতে সোনার কাঠিন্য কিছু নরম হয়েছিল।

আপনি খাঁটি শিল্পী, বিচিত্র মানুষ—যাদের বিধাতা ছাঁচে তৈরী করেন না। নিজের হাতে তৈরী করেন পরমানন্দের মধ্যে।

ইতি—স্বলতা ঘোষ।

সেদিন সন্ধ্যায় সে মদ খায় নি। সময় থাকতে ম্যানেজারের কাছে টাকা চেয়ে নিয়ে রেখেছিল। এবং সন্ধ্যার পর বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বিডন স্ট্রীট এবং সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু জংশনে নেমে রামদীনকে ডেকেছিল। রামদীন দাঁড়িয়েই ছিল। সে সসম্ভ্রমে সেলাম করে বলেছিল—হুজুর!

—আসবে একবার আমার সঙ্গে?

—শেফালি বিবিকে হুঁয়া?

—নেহি! এদের মধ্যে সব থেকে গরীব যারা, তাদের কিছু করে দিতে চাই।

রামদীন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ তার মন আর একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছিল। বলেছিল—না। আমি ঘুরে আসছি। এগারটা নাগাদ আসব। বুঝেছ। তুমি থেকো।

ট্যাক্সিটা তখনও যায় নি। মোড় নেবার উপক্রম করছিল মাত্র। সে ট্যাক্সিতে চড়ে বলেছিল—চল। এখন নটা বাজে। দু ঘণ্টা ঘোরাও। তারপর ফের আসবে এখানে। এগারটায় এসে রামদীনকে সঙ্গে নিয়ে সেই গলিটা থেকেই শুরু করেছিল। যারা তখনও সেই শীতের মধ্যে ক্লিষ্ট মুখে, উৎকণ্ঠিত চোখে পথের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে ছিল তাদের হাতে সে এক একখানা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বলেছিল—ঘরে যাও। রাত্রি অনেক হয়েছে। সে দাঁড়ায়নি কোথাও এক মুহূর্ত। এ-মোড়ে ঢুকে ও মোড়ে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে চেপে বলেছিল—চল।

ট্যাক্সিটা সে দাঁড় করিয়েই রেখেছিল।

রাত্রে গিয়ে সুলতাকে পত্র লিখেছিল। পরদিন সকালে জি-পি-ও-তে ফেলে এসেছিল নিজেই। সেদিন সন্ধ্যার সময় সুলতা নিজেই এসেছিল।

বলেছিল—আপনি কি পাগল নাকি?

—কেন?

—এসব কি আরম্ভ করেছেন?

—এদের দুঃখ জানেন?

—জানা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করতে পারি। কিন্তু দুঃখ যতই থাক তার প্রতিকার কেউ কি এইভাবে করতে পারে?

—যতটুকু পারি!

—আপনি পৃথিবীর বুর্জোয়াদের একজন খাঁটি বুর্জোয়া।

হেসে উঠেছিল সে, বলেছিল—না—আমি আর্টিস্ট!

—না বুর্জোয়া। ন্যাশনাল মুভমেণ্ট নিয়ে সে চিঠি এই কারণেই আপনার পক্ষে লেখা সম্ভবপর হয়েছিল।

চুপ করে গিয়েছিল সুরেশ্বর। মনে আঘাত পেয়েছিল।

সুলতা বলেছিল—এ সব ছাড়ুন। মানি আর্টিস্টদের খেয়াল থাকে। তারা কিছুটা অদ্ভুত হয়ে থাকে। যে কাজ করেছেন তাতে তাদের এককণা উপকারও হয়েছে—একটা দিনের খোরাক হয়েও কিছু বেঁচেছে হয়তো! সব মেনেও বলব এটা পথ নয়! শুধু যারা বড়লোক তাদেরই এমন দয়ার অহঙ্কার থাকে। এটা ভাল নয়, ছাড়ুন!

বলে সে চলে গিয়েছিল।

* * * *

বিচিত্র মানুষের মন। সেই বৈচিত্র্য বশেই বোধ করি এই মতের পার্থক্য সত্ত্বেও কিছু দিনের মধ্যেই সুলতা এবং সুরেশ্বর খুবই কাছাকাছি এসে পড়েছিল। দেখার চেয়ে বেশী চিঠি লেখার মধ্যেই হয়েছিল এটা। মাস কয়েকের মধ্যেই তারা চিঠি লিখতে শুরু করত "সু" বলে এবং

শেষে সই করত "সু" ব'লে। সুলতাও তাই লিখত। আরম্ভে "সু"—শেষেও "সু"। ওরই মধ্যে বোধহয় জ্যামিতিক নিয়মে দুটি ত্রিভুজের মিলে যাওয়ার মত দুজনের চিঠিতেই সু শব্দের মিলের মধ্যে মনের মিল হওয়া বা মিলে যাওয়ার ইঙ্গিত ছিল। দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য—তা সামান্য ছিল না—ছিল অনেক। সেটা মতের এবং পথের। মতে ও পথে সুলতা ছিল ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুরেশ্বর সেদিক থেকে দাগী। কিন্তু ইদানীং তার ওই বিচিত্র ছবির অঙ্কনপদ্ধতির জন্য বিপ্লবী দলের প্রশংসা পেয়েছিল। তাঁরা হয়তো তাকে এই জন্যেই মার্জনা করেছেন যে, যারা সংসারে শিল্পী হয় তারা এ ধরনের ভ্রম এবং ভুল ক'রে ফেলে আবেগ বশে। তাহলেও মতের কথায় তাদের মিলত না। তবুও কিছু-দিনের মধ্যেই সুরেশ্বর লিখলে—দেখ পুরুষে নারীতে মিলন হয় বাহুবন্ধনের মধ্যে। এবং মনে মনে। যে মন মতের তোয়াক্কা করে না, তার রাজত্বের বাইরে তার বাস। সেখানে তোমার আমার মন—"সু" শব্দের মতই মিলে গেছে। এরপর রেশ্বর এবং লতায় যদি নাই হয় মিল—সেক্ষেত্রে কি যায় আসে' আমার মত হল—মিলনটা বিবাহের চেয়েও বড়। সেটা আমি জানি তোমারও। কিন্তু বিবাহের চেয়ে বড় যে মিলন—তার দিন আসে নি। এবং অন্যদিকে মিলনটাই যখন হয়ে গেছে মনে মনে তখন ছোট ব্যাপার বিবাহটাই বা হবে না কেন?

সুলতা লিখেছিল—তুমি পাগল। এক কথার বিয়ে।

সুরেশ্বর লিখেছিল—একশো বার। সুস্থ মানুষকে ঠেকানো যায়। পাগলকে ঠেকানো যায় না।

সুলতা লিখেছিল—যায়। রাঁচী পাঠালে।

সুরেশ্বর লিখলে—তার থেকে তুমি শেকল দিয়ে বাঁধো না!

সুলতা লিখলে—অবুঝের সঙ্গে সংকেতে আলাপ চলে না। আগেরকালে যাঁরা বলেছেন—অরসিকের কাছে রসের নিবেদন করতে নেই তাঁদের কথাটা পাল্টে বলতে চাই বোকা বা পাগলকে বুদ্ধিমানের মত কথা বলো না এবং একেবারে রূঢ় যুক্তি ছাড়া বোঝাতে চেয়ো না। তোমার সঙ্গে এ মিলন হয় না। বাবা ব্যারিস্টার। তাঁর মেয়ে আমি কিন্তু আমি পাগল নই, আর্টিস্টও নই। তুমি জমিদারের ছেলে হয়ে খেয়াল নেই যে আমাকে বিয়ে করলে তোমার সমূহ ক্ষতি হবে। দেবোত্তরের সেবায়েৎ স্বত্ব চলে যাবে। ওসব ভুলে যাও। আমি তোমার সু হয়েই থাকব, কুয়ের কারণ হতে পারব না।

সুরেশ্বর এবার টেলিফোন ধরলে। কারণ চিঠি যাবে আসবে এ বিলম্ব তার সহ্য হল না। সে বললে—সু। আমি সু বলছি। তুমি যদি আমার কুয়ের কারণই হও, দেবোত্তরের সেবায়েত পদ যদি যায়ই তবে আমি তোমাকে পেয়ে ধন্য হব—মুক্তি পেয়ে যাব। আমি এ যুগের মানুষ। রায়বংশের গৌরবে কোন শ্রদ্ধা নেই আমার। যেটুকু শ্রদ্ধা আজ আমার জুটেছে সে আমার তুলির জোরে, আমার মনের জোরে। দেবতাতেও আমার বিশ্বাস নেই। তবে এইটুকু বলছি—রায়বংশের সেবায়েতরা দেবতাকে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি পত্তনী দরপত্তনী দিয়েছেন, তার মোটা অংশ আমার ঠাকুরদা—তারপর আমার মা কিনে গেছেন। সুতরাং আর্থিক কষ্টে

পড়ারও আশঙ্কা নেই। যদি তাও থাকত তবে আমি তাতেও পিছপাও হতাম না। এখন কি বলছ বল?

সুলতা চুপ করে ছিল।

সুরেশ্বর প্রশ্ন করেছিল—উত্তর দাও।

—উত্তর?

—হ্যাঁ।

এবারও নীরব থেকেছিল সুলতা।

সুরেশ্বর বলেছিল—মৌন থাকলে সম্মতি আছে ধরে নিতে হয়। তা হলে কাল আমি তোমার বাবার কাছে যাব।

এবার সুলতা বলেছিল—এখনও ভাবছি।

—এর মধ্যে ভাবনার কি আছে?

—আছে।

—না—নেই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, মত নিয়ে কখনও কোনও ঝগড়া আমি করব না। তারপর হেসে বলেছিল—আমি ছবির একজিবিশন করব, তুমি বলো কিছু হয় নি, আমি রাগব না। তুমি ইলেকশনে দাঁড়িয়ো। আমি কথা দিচ্ছি তোমার পোস্টার তৈরী করে দেব। আমার জমিদারীতে বলে দেব।

—কিন্তু তবুও যদি না বনে?

—তখন ডাইভোর্স করে নেব।

—হুঁ।

—তার মানে?

—তার মানে তা হলে আমাকে পরীক্ষাটা আগে পাস করতে হবে। তারপর বিয়ে। তখন তুমি বাবাকে এসে বলবে।

—তা হ'লে আবার তখন কেন?

—তখন এই জন্যে যে, রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করে যদি ডাইভোর্স করতে হয় তখন আমি কি করব? জীবিকা উপার্জনের ক্ষমতা না-থাকলে নতুন স্বামী খুঁজে বেড়াতে হবে। নয়তো কোন সাবান গন্ধতেল স্নোওয়ালাদের মাল নিয়ে বাড়ী-বাড়ী বেচে বেড়াতে হবে কমিশনের জন্য। নেহাত ভাগ্য হলে টেলিফোনে চাকরী পেতে পারি। তা হবে না।

—তুমি ঠাট্টা করছ?

—বুঝলে এতক্ষণে? ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু তোমায় হাতজোড় করে মিনতি করছি, আমাকে পাসটা করতে দাও। বিয়ে হলে আর হবে না পাস করা। তুমি যা মানুষ!

ওই পরীক্ষার জন্যেই বিয়েটা ঠেকে ছিল। এবং সেটা দুজনের প্রতিশ্রুতিক্রমে খুব গোপনেও ছিল। তার কারণ সুরেশ্বরেরই দেবোত্তর। এদিকে তার মামা এবং ম্যানেজার ওদিকে সুলতার বাবা দুপক্ষেই হয়তো আপত্তি তুলবেন।

সুলতার পরীক্ষা ছিল মাস দেড়েক পর। ছাত্রী হিসাবে ভালই ছিল। এবং রেজাল্ট ভাল করবার নেশাও ছিল। তবু মধ্যে মধ্যে আসত সে সুরেশ্বরের দাবী মত। দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে যেত—ইডেন গার্ডেন বা গঙ্গার ধার দিয়ে। সপ্তাহে একদিন হয়তো।

এরই মধ্যে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

হঠাৎ কীর্তিহাটের দেবোত্তরের নায়েব সেটেলমেণ্ট ক্যাম্প-আদালতের এক সমন হাতে এসে হাজির হন। তার সঙ্গে মেজঠাকুমাও এসে হাজির হলেন কীর্তিহাট থেকে। সমনখানা তাঁরাই হাতে ক'রে এনেছেন। দেশে গভর্ণমেণ্ট সেটেলমেণ্ট হচ্ছে। তার ব্যাপার অর্থাৎ আইন কানুন প্রায় সামরিক আইনের ধাঁচে তৈরী। মাঠের মধ্যে তাবু খাটিয়ে তাঁরা তেতে পুড়ে থাকেন—তাঁদের তাঁবুর দরজায় বিত্তবান মালিকদের হাতজোড় ক'রে না দাঁড়ালে অঙ্গ শীতল হয় না—মেজাজ ঠাণ্ডা হয় না। কীর্তিহাটের কর্মচারীরা যা কাগজপত্র দেখিয়েছে তাতে তাদের সমস্যা মেটে নি। উল্টে মেজতরফ অর্থাৎ শিবেশ্বরের ছেলেরা নানান রকমে গোল বাধিয়েছে। যা কাগজ দেখিয়েছে তাতেই তারা আপত্তি দিয়েছে, বলেছে দেবোত্তর। আবার বহু দেবোত্তর সম্পত্তিও তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে রেকর্ড করিয়েছে। জাল-জালিয়াতি করতে তাদের দ্বিধা হয় নি। বরং তারা গৌরববোধ করেছে তাদের নিজেদের বিষয়বোধের জন্য। এতে মুখপাত্র হয়েছে সুখেশ্বরের ছেলে দুজন। দুজনেই চতুর এবং কিছু লেখাপড়াও শিখেছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ধনেশ্বর এবং জগদীশ্বর। জগদীশ্বর গাঁজা খায়, মদ খায়, ধনেশ্বর থেকেও উগ্র। সে বাঘ মেরে একটা বন্দুক পেয়েছে। সেই বন্দুক ঘাড়ে বেড়ায়। এবং কথায় কথায় মারপিট করে। সাধারণ গরীব প্রজারাও ভয় করে তার প্রহারকে এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা ভয় করে তাকে কুকথার জন্য। সরকারী কর্মচারী বিশেষ ক'রে হাকিমের কাছে তারা অত্যন্ত বিনীত এবং অনুগত। সুতরাং দেবোত্তরের কর্মচারীরা হয়ে পড়েছে অসহায়। হাকিম তাদের ঠিক বিশ্বাস করেন না। এবং তাদের ভরসায় সাধারণ প্রজা গরীব ও মধ্যবিত্ত কেউই সাক্ষী দিতে অগ্রসর হয় না। সুতরাং দেবোত্তরের নায়েবরাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে মিথ্যাবাদী জালিয়াত কুচক্রী। তাছাড়াও সেটেলমেণ্ট হাকিম হয়েছেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। কারণ আজও পর্যন্ত এই সম্পত্তির মোটা অংশের মালিক শ্রীসুরেশ্বর রায় তাঁদের ক্যাম্পে হাজিরা দেয়নি। সুতরাং তাঁরা হুকুম জারী করেছেন সুরেশ্বর রায়কে সশরীরে ক্যাম্প-আদালতে হাজির হতে হবে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ। অন্যথায় বডি ওয়ারেণ্ট জারী করে তাকে গ্রেপ্তার করে হাজির করা হবে।

সমন নিয়ে ছুটে এসেছে দেবোত্তরের নায়েব। সঙ্গে এসেছেন মেজঠাকুমা। মেজঠাকুমা বললেন—ভাই, বলতে গেলে ওরা আমারই বংশ। কিন্তু কি ক'রে দেখব যে তারাই ভগবানের সব সম্পত্তি আত্মসাৎ করছে। আর তোমাকে ঠকাচ্ছে। মেজকর্তা গিয়ে অবধি ওরা তো আমার দিকে ফিরে তাকায় না। ভগবানের প্রসাদের বরাদ্দ করে গেছেন শ্বশুর। আজকাল প্রসাদ বলতে করকরে আতপের ভাত আর সামান্য ব্যঞ্জন, তা মুখে দেওয়া যায় না। তাই খেয়ে পেটটা ভরে। আর তোমার মা বরাদ্দ ক'রে গেছেন পঞ্চাশ টাকা

মাসিক। তাতেই বস্ত্র তাতেই তেল তাতেই ধর্ম ব্রত-পার্বণ সব। ভাই, ভগবানের বাল্যভোগ শুধু মণ্ডায় ঠেকিয়েছে। আমি একটু করে ছানা কিনে দি ওই টাকা থেকে। তোমাদের বলব কোন্ মুখে? কিন্তু আজ যখন তারা ঠাকুরকে তোমাকে সবাইকে ঠকাবে তখন আমিও ঠকব। লজ্জার দায়ে ছুটে এসেছি—পেটের দায়ে ছুটে এসেছি। শ্বশুর বংশের মান সম্ভ্রম কীর্তি সব ডুববে বলে ভয়ে ছুটে এসেছি। তুমি চল ভাই। একবার গিয়ে দাঁড়াও!

এখানকার নায়েব ম্যানেজার হরচন্দ্র তখন কদিন থেকে অসুস্থ। তিনি ঘরে বিছানায় শুয়ে আছেন। না-হলে তাঁর নামে আম-মোক্তারনামা পাওয়ার অব এ্যাটর্নী দেওয়া আছে, তাঁকে পাঠালে চলত। দিন পরশু।

পরের দিন সুলতার সঙ্গে সে একটা এনগেজমেণ্ট করেছিল। ওই টেলিফোনে কথাবার্তার পর তারা দু-তিন দিন দেখা করেছে, বেড়িয়েছে একসঙ্গে। কথা ছিল ইডেন গার্ডেনে দুপুরবেলা গিয়ে সে তার ছবি আঁকবে।

সে ফোন করলে সুলতাকে।—বিপদ ঘটেছে সু।

—কি বিপদ?

সে বললে বিপদের কথা। বললে—এ রাজত্ব ইংরেজের রাজত্ব, অভিসম্পাত করছি, এই পাপেই ধ্বংস হোক। এবং হবেও তুমি দেখো। আমি নায়েবকে বললাম—আমি যদি সম্পত্তি না চাই। হেসে ম্যানেজার বললেন—তাও গিয়ে হাজির হয়ে বলে আসতে হবে। এবং হাজির না-হলে এরা কোমরে বেঁধে নিয়ে যাবে। এর আর জামীন নেই। আপীল নেই। কি করি বল তো!

হেসে সুলতা বলেছিল, আমার সামনে পরীক্ষা না থাকলে তুমি অ্যাব্‌স্কণ্ড করতে, আমি তোমাকে শেল্টার দিতাম। তাতে আমার যা হবার হ'ত। কিন্তু যাও না ঘুরেই এস না।

—যেতে বলছ?

—বলছি।

ছেড়ে দিয়েছিল ফোন সুরেশ্বর। কিছুক্ষণ পরে আবার সুলতা ফোন ক'রে বলেছিল—দেখ, বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম। বাবা বললেন—যেতেই হবে সুরেশ্বরকে। হি মাস্ট গো।

—মাস্ট গো!

—হ্যাঁ। বলছেন না-গেলে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যাবে তিনি বুঝতে পারছেন।

বৃদ্ধ হরচন্দ্র বিকেলে সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই এসেছিলেন—যাওয়ার কি ব্যবস্থা হ'ল দেখতে। সঙ্গে এখানকার পুরনো আমলাকে দিলেন, যে দীর্ঘকাল—প্রায় তিরিশ বছর—যোগেশ্বরের জমিদারী সেরেস্তায় আছে।

রওনা হতে হ'ল সেই রাত্রেই। না হলে সকালে পৌছুনো যাবে না। সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে সময় দেওয়া আছে—বেলা দশটা!

সেই গেল সুরেশ্বর। ১৯৩৪ সাল শেষ হয়েছে, ১৯৩৫ সালের মার্চের ৩১শে রাত্রে। দিন ছিল ১লা এপ্রিল!

সেই গেল। তারপর বিচিত্রচরিত্র এই খেয়ালী বা অর্ধপাগল সুরেশ্বর কীর্তিহাটেই থেকে গিয়েছিল। কলকাতায় মধ্যে মাঝে দুচার দিনের জন্য বা এক দুদিনের জন্য এসেছে, আবার ফিরে গিয়েছে কিন্তু সুলতার সঙ্গে আর দেখা করে নি। চিঠির মধ্য দিয়ে যে ঘনিষ্ঠতার শুরু হয়েছিল, চিঠির মধ্য দিয়েই তাতে ছেদ টেনে শেষ ক'রে দিয়েছে। শুধু সুলতার সঙ্গেই নয়, কলকাতার জীবনের সঙ্গে, শিল্পী-জীবন না-হলেও শিল্পী-সমাজের সঙ্গে, সভ্য সমাজের সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে। একবার নাকি বিলেত ঘুরে এসেছে—সেটা প্রথম দিকেই। তারপর সব শেষ। লোকে নানান কথা বলেছে। ক্রমে সে কথা চাপা পড়েছে। সুরেশ্বর সকলের মন থেকে মুছে গেছে।

সুলতা নীরবেই সব সহ্য করেছে। তার অন্তরের কথা সেই জানে। তবে সে বিয়ে করে নি। বি-এ পাশ করে সে দ্বিগুণ উৎসাহে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল। এম-এ পাস করে কলেজে অধ্যাপিকার কাজ নিয়ে সেই রাজনীতি নিয়েই একরকম মেতে আছে। বামপন্থী রাজনীতি। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি নয়! সোস্যালিস্ট সে। আজ ১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর। এই আঠারো বছর পরে সেই সুরেশ্বর এবং সেই সুলতা জানবাজারের বাড়ীতে আকস্মিক ভাবে মিলিত হয়ে সামনাসামনি বসেছে। সামনের দেওয়ালে সুরেশ্বরের আঁকা সারি সারি ছবি। বিভিন্ন ভঙ্গী বিচিত্র বর্ণবিন্যাস। উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল্ করছে। তার প্রথম ছবিখানার উপর ছড়ি ঠেকিয়ে সুরেশ্বর বললে—এই আমার প্রথম ছবি। পুণ্যবারিবিধৌত তট-বটচ্ছায়া-শীতল কীর্তিহাট গ্রাম।

১৮০১ সাল।

সুলতা ছবিখানার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ভারী ভাল হয়েছে ছবিখানা। রেখায় বর্ণে সুন্দর লাগছে।

না। শিল্পে সুরেশ্বর বেঁচে আছে!

সুরেশ্বর বললে—লেডীজ এ্যাণ্ড জেন্টেলমেন।

চকিত হয়ে উঠল সুলতা—লেডীজ এ্যাণ্ড জেন্টেলমেন!

সুরেশ্বর সংশোধন করে নিলে—না। এখানে তো তুমি একা সুলতা। হাসলে। তারপর বললে—দেখ, কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম, তুমি নিজেও জান—একটা পাগলামি আমাদের বংশে আছে। খেয়াল ততক্ষণই খেয়াল, যতক্ষণ মাত্রা না ছাড়ায়। আমার মাত্রা অনেকদিন ছাড়িয়েছে। তারপর কীর্তিহাটে গিয়ে সেটা আমার মন আমার বুদ্ধি আমার বাসনা কামনাকে এমনভাবে অভিভূত করেছে সুলতা যে আমার ঠিক থাকে না। অবশ্য মদ্যপান আমি প্রচুর করতাম। ওটা তাকে বাড়িয়ে তুলতে। আমি কল্পনায় নানান ছবি দেখি অন্ধকার রাত্রে। দেওয়ালের গায়ে, ছাদে চটে যাওয়া পলেস্তারার মধ্যে দেখতে পাই নানান ছবি। কখনও কখনও জীবন্ত হয়ে ওঠে তারা, কথা বলে। আজও আমার মনে হচ্ছিল, এই যে ছবিগুলোর মানুষ, হয় তারাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে, নয়তো অনেক অশরীরী আত্মা এখানে বসেছে। তারা দেখতে এসেছে ছবিতে কীর্তিহাটের কড়চা। শুনতে এসেছে সুরেশ্বরের জবানবন্দী।

চোখ দেখে সুলতার মনে হল, সুরেশ্বর কত দূরে—অনেক দূরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

## দ্বিতীয় পর্ব

সুরেশ্বর বললে সুলতাকে—আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে সুলতা, তোমাকে এই আজকের দিনটিতে পেয়ে সে কি বলব! আজ ১৯৪৩ সালের ২৫শে নভেম্বর হয়তো বা বিধাতাই ধার্য করে রেখেছিলেন যে দীর্ঘ পনের বছর পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতেই হবে!

সুলতা হাসলে। বললে—কেন, বিধাতার কি দায় পড়েছিল। দেখা তো তুমি এর আগে করলেই পারতে। তোমার কোন লজ্জার বালাই আছে বলে তো বিশ্বাস করি নে। তুমি কলকাতায় এসেছ। আমি জানি মাসে একবার তো এসেছই—কোন মাসে দুবারও এসেছ। আমি খোঁজ পেয়ে ফোন করেছি—তুমি ফোন ধরতে না, চাকরে ধরত, তুমি বলতে—বল বাড়ী নেই বাবু। কথাটা ক্ষীণভাবে হলেও ফোনের মারফত শুনেছি। চাকর তোমার রিসিভারের সাউণ্ডপিসে হাত চাপা দিতে জানত না, তুমিও শেখাও নি। তাছাড়া দুবার তুমি আমাকে দেখেও সরে গেছ—মানে গা ঢাকা দিয়েছ। একবার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে, একবার ধর্মতলায়—জি সি লাহার রঙের দোকানের সামনে। বোধহয় রঙ তুলি কিনে বেরুচ্ছিলে। আমি ওপারে মসজিদটার কাছে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে। তুমি হনহন করে চলে গেলে। কি—মিথ্যে বলছি আমি?

সুরেশ্বর বললে—না। মিথ্যে বল নি। সত্য কথা। অস্বীকারই বা আমি করব কেন? আমি আর যাই হই মিথ্যেবাদী নই। মানে যাকে কাপুরুষ মিথ্যেবাদী বলে। নইলে কৌতুক করে অনেক মিথ্যে বলি। রায়বংশের ছেলেরা বেশীর ভাগই সাহসী মিথ্যেবাদী। যেমন ধর, চাকরকে বললাম—বল বাড়ী নেই বাবু অথচ রিসিভারের মুখটা চাপা দিতে বললাম না। ও তথ্যটা আমি জানি না তা তো নয়। জানি। ওটা যাতে তুমি শুনতে পাও—তাই জন্যেই বলেছি এবং বেশ উঁচুগলায় বলেছি, যাতে কথাটা তুমি শুনতে পাও।

—সামনাসামনি বলতে পারতে তো!

—পারতাম না, চক্ষুলজ্জা হত!

—সেটা আজ ঘুচল কেন? আর চোখের লজ্জা তোমার আছে বলেও তো জানতাম না।

হেসে সুরেশ্বর বললে—আমিও জানতাম না। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে ওটা যে কেমন করে গজাতো তা আমি নিজেও জানি না।

—সেই তো। আজ সেটা গেল কি করে তাই তো জিজ্ঞেস করছি।

একটু ভেবে সুরেশ্বর সিগারেট ধরালে। তারপর বললে—দেখ—আজকের দিনটা এমন একটা দিন, যে দিনটা পঞ্জিকার অর্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান বা মেয়েদের অনন্ত ব্রত, সাবিত্রী ব্রত প্রতিষ্ঠা এবং উদ্‌যাপন করবার দিনের মত। ধর, আমি সংকল্প করেই ব্রত করেছিলাম যে, আজকের দিনটি যতদিন না আসবে, ততদিন আমি জগতে সমাজে নিতান্তভাবে নগণ্য এবং জঘন্যের মত থাকব। আজ সেই দিনটি এল। পঞ্জিকার নয়—ইতিহাসের। ১৯৫৩ সাল ২৫শে নভেম্বর; লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে ব্রতকথা শুনে এলাম। বেরিয়ে আসছি, তোমার

সঙ্গে দেখা হল। বুঝলাম, আমার ব্রত ঠিক পালন করা হয়েছে। তোমাকে এবার বললেই আমার ব্রতের সমাপ্তি।

—হুঁ। সুলতা বুঝলে এবার ; জমিদারী প্রথা রদ করে বিল পাশ হয়েছে এবং সুরেশ্বর তাতে আজ ক্ষুব্ধ এবং মর্মাহত হয়ে নির্লজ্জ উদ্ভ্রান্তের মত কথা বলতে শুরু করেছে। ক্ষোভে হৃদয়াবেগের বাঁধ ভেঙেছে।

ছবিগুলোর দিকে তাকালে সে। সারি-সারি বর্ণাঢ্য ছবি। বিচিত্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে আঁকা। প্রথম ছবিখানা যেন সেই কোম্পানীর আমলে কোন ইংরেজ চিত্রকরের আঁকা স্কেচের ঢঙে আঁকা ছবি। তবে কালো সাদা রেখাতে নয়—রঙ—তেলরঙে আঁকা। তার-পরের ছবিখানা একটি মন্দিরের মধ্যে কালীমূর্তি। মনে হচ্ছে পুরনো আমলের দেশী চিত্রকরের আঁকা ছবি।

লম্বা একটা বারান্দা-ঘেরা ঘর—দৈর্ঘ্যে বোধ হয় একশো পঁচিশ ফুটের কম নয়। ছবিও কম নয়। দু' সারিতে একটু উঁচু-নিচু করে অনেক ছবির সঙ্কুলান হয়েছে। অন্তত একশোর কম নয়। তা ছাড়াও বারান্দার দুটো প্রান্তের দুটো দেওয়াল আছে। তাতেও কুড়ি পঁচিশখানা ক'রে চল্লিশ পঞ্চাশখানা।

সুরেশ্বর বলেছে—এটা সে ছবি দিয়ে 'কীর্তিহাটের কড়চা' তৈরী করেছে। অর্থাৎ তাদের কীর্তিহাটের রায়বংশের ইতিহাস!

খুব গৌরবোজ্জল ঘটনাগুলিকে এঁকেছে।

একটু হাসি ফুটে উঠল সুলতার মুখে।

১৯৪৩ সালের ২৫শে নভেম্বর, আজ বাংলার বিধানসভায় জমিদারী প্রথা রহিত করে বিল পাশ হল। সুলতা অ্যাসেম্বলীর নিচের তলায় দেওয়ালের ধারে যে সরু একটা ফালিতে কিছু দর্শকদের বসবার জায়গা আছে—সেখানেই বসে ছিল। উপর-নিচে সমস্ত গ্যালারী দর্শকে পূর্ণ ছিল। উপরে গভর্ণরের গ্যালারীতে ক'জন রাজা-জমিদার বসে ছিলেন, যাঁদের সুলতা চিনত। বর্ধমানের মহারাজার টুপিটা সে খুঁজেছিল কিন্তু নজরে পড়েনি। ওই টুপিটা চেনার কথা তার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। এই অ্যাসেম্বলী হাউসের বাগানেই একটা বড় টি-পার্টি হয়েছিল। তাতে এসেছিলেন ইয়োরোপের এক বড় রাজনীতিবিদ্। তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল। সম্বর্ধনা শেষে যখন সে বেরিয়ে আসছিল তখন ঘটনাচক্রে সামনেই আসছিলেন প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মী এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার মশায়। তিনি তাকে দেখে বলেছিলেন—আরে সুলতা!

সে বলেছিল—ভাল আছেন? প্রণাম করতে গিয়েছিল। কিন্তু ভূপতিদা বলেছিলেন—না-না-না। অ্যাসেম্বলী হাউসের সীমানা গণতন্ত্রের কাশীক্ষেত্র, এখানে প্রণাম নিষিদ্ধ। সে বাবাকেও প্রণাম করতে নেই ছেলের। অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজের বিধানে ভোটাধিকার এখানে আঠারো বছর হলেই আপনি পায়। ইনহেরিটেন্স নেই এবং বাপের বিরুদ্ধে ছেলের ইলেকশনে দাঁড়াতে নিষেধ নেই। প্রণাম এখানে অচল। অধম এখানে কেউ নেই।

বলতে বলতেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। পার্টির আসরের একেবারে একপ্রান্তে একান্তে একখানি লম্বা আসনে একটি দম্পতি বসে ছিলেন। স্বামীর মাথায় ছিল একটি টুপি, গড়নটা বিচিত্রও বটে চেনাও বটে। যেন ছবিতে সে দেখেছে। অনেকবার দেখেছে। পরনে শেরওয়ানী চুস্ত পাজামা। কিন্তু কে ঠিক ঠাওর করতে পারেনি। ভূপতিদা থমকে দাঁড়িয়ে হেসে বলেছিলেন—হ্যালো বার্ডওয়ান!

তখন তার মনে হয়েছিল, হ্যাঁ, বর্ধমানের মহারাজার টুপিই তো বটে!

এ মহারাজাকে সে দেখেনি কিন্তু মহারাজ বিজয়চাঁদকে সে দেখেছে। ইউনিভারসিটির কনভোকেশনে দেখেছে। এবং সে কালে তাঁর এই টুপি মাথায় ছবি অনেকবার কাগজে ছাপা হয়েছে মনে পড়ছে তার।

ভূপতিদা বলেছিলেন—আপনি এখানে একপাশে?

মহারাজ বর্ধমান হেসেছিলেন। সে হাসির অর্থ স্পষ্ট।

থাক সে কথা। আজও সেই টুপি সে খুঁজেছিল ওইখানে জমিদারদের মধ্যে। পায়নি। পেয়েছিল পাইকপাড়ার বা কান্দীর কুমার বিমলচন্দ্র সিংহকে। তিনি সেবার ইলেকশনে হেরেছিলেন। আগের বারে তিনিও মন্ত্রী ছিলেন ভূপতিবাবুর সঙ্গে। তিনি বসে ছিলেন স্পীকার'স গ্যালারীতে, একেবারে প্রথমেই। তিনি অতি সুপরিচিত ব্যক্তি—কি রাজনৈতিক মহলে কি পণ্ডিত সাহিত্যিক রসিক মহলে। চেহারাতেও এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে একবার দেখলেই চেনা হয়ে যায়।

আরও একজনকে সে খুঁজেছিল। খুঁজেছিল কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উত্তরাধিকারীকে। হ্যাঁ, ওই একজন সন্ন্যাসী জমিদার। প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁকে যেন দেখেছিল। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী। তিনি ছিলেন উপরে। জমিদার কজনের মধ্যে।

সুরেশ্বরকে ঠিক তার মনেই পড়েনি। তাকে খোঁজেওনি। সে এখানে উপস্থিত থাকবার সম্ভাবনার কথা তার মনের মধ্যে উঁকিই মারেনি। সুরেশ্বরকে সে মনের দিক থেকেও মুছেই ফেলেছে। হ্যাঁ, মুছেই ফেলেছে। যখন সুরেশ্বর ওখানে গেল, তখন প্রথম প্রথম বেশ সকৌতুকে ওখানকার সব কিছুকে ব্যঙ্গ করে চিঠি লিখত। লিখেছিল, মনে আছে, এখানকার সেটেলমেণ্ট হাকিম হরেন্দ্রনাথ ঘোষ আমারই বয়সী। একেবারে নতুন হাকিম। সুপুরুষ চেহারা। চোখে চশমা আছে, চশমার পাওয়ার শুধু দুর্বল দৃষ্টিকে সবল করেনি, দিব্য-দৃষ্টি দিয়েছে। সাপের পাঁচটা করে পা আছে তা তিনি দেখতে পান। সারাদিন দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন ক্যাম্পের আদালতের মাঠে। সেটা ইচ্ছাপূর্বক তা গোপন করেননি ভদ্রলোক। আমার কেস নম্বরটা উঠলেও সেটাকে ঠেলে সরিয়ে রেখেছিলেন। তখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছিল তিনি সাপের তিনটে পা দেখেছেন। বেলা বারোটার সময় (আমি গিয়েছিলাম বেলা দশটায়) দেখলাম এক প্রবীণ প্রৌঢ় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সত্যিই কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এল থানার কনেস্টবলসহ ওঁর লোকেরা। তখন বুঝলাম পাঁচ পা-ই দেখতে পাচ্ছেন। তাঁকেও বসিয়ে রাখলেন। সব শেষে আমাদের কেস হল। কাগজপত্র দেখালে কর্মচারীরা, আমি শুধু দাড়িয়ে রইলাম। তাতেই হয়ে গেল। আমাদের বক্তব্য লিখে নিলেন। ফাইনাল

* * *

বিচার হবে এখন নয় ; এরপরে ; সে হবে মাস দুয়েক পর। তখন দোসরা হাকিম আসবেন। এঁর উপরের লোক। আমাকে বললেন—নোটিশ করলে আপনি আসেন না কেন ? বললাম—আমি তো এখানে থাকি নে, কলকাতায় থাকি। সংক্ষেপে বললেন—তা হলে কিছুদিন থাকুন এখানে। জমিদারী ভোগ করবেন কলকাতায় বসে বার মাস, তা অন্তত: সেটেলমেণ্ট যতদিন চলছে হবে না। পেশকারকে বললেন—ওঁর সমনগুলো দাও। পেশকার বললে—দাঁড়ান। তারপরই সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ডাক হল। হরিদাস মুখার্জি হাজির হো! কনেস্টবল দড়ি ধরে এনে হাজির করলে। হাকিম বললেন—কি ? উনি ( অর্থাৎ আমি ) কলকাতায় থাকেন, আপনি তো থাকেন না। এখানেই থাকেন শুনেছি, কাজের মধ্যে নেশা-ভাঙ। তা নোটিশ সমন পেয়েও আসেন না কেন ? সাপের পাঁচটা পা গজায়, আপনার কটা গজিয়েছে—দশটা না বিশটা ? এবার আমার প্রচণ্ড ক্রোধ হয়েছিল। আমি সমনগুলো হাতে-হাতে না নিয়ে চলে এসেছি। পেশকার হাঁকলে, সমন নিয়ে যান। বললাম—যথারীতি বাড়ীতে দিয়ে আসবার নিয়ম অনুযায়ী পাঠিয়ে দেবেন। দেখছি কিছুদিন থাকতে হবে। দেখি ! কলকাতায় রঙ-তুলি আনবার জন্য লোক পাঠাচ্ছি। ইতি—

তার কদিন পরেই চিঠি পেয়েছিল—সু, তুমি চিঠির উত্তর দাওনি। খুব পড়ছ বোধহয়। তা পড়। আমি ছবি আঁকছি। এখানে ল্যাণ্ডস্কেপ খুব ভাল। এবং ছবির দৌলতে অকস্মাৎ সেটেলমেণ্ট ক্যাম্প কোর্ট পর্যন্ত রঙ ধরে গেছে। মজা হয়ে গেছে। সেদিন কাঁসাইয়ের ধারে বসে ছবি আঁকছি একমনে। হঠাৎ পিছন থেকে কে বললে—বাঃ! আপনি তো চমৎকার ছবি আঁকেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম সেই হাকিম হরেন ঘোষ। তখন সাহেব নয়। শৌখীন বাঙালীর ছেলে—পাঞ্জাবি, ফিনফিনে মিলের ধুতি, পায়ে সবুজ রঙের জরিদার নাগরা! মনের রাগ দমন করার অভ্যেস আছে। উঠে হেসে নমস্কার করে বললাম—আপনি! বললেন—হ্যাঁ, বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। দূর থেকে দেখলাম আপনি বসে কি করছেন। কৌতুহল হল। এলাম। আপনি তো চমৎকার আঁকেন! বিনয় করলাম না। বললাম—খুশী হলাম। উনি সিগারেট দিলেন, নিজে ধরালেন। তারপর বললেন—শুনেছিলাম আপনাদের ধনেশ্বরবাবুর কাছে, কল্যাণেশ্বর বলে ইয়ংম্যানটির কাছে যে আপনি কলকাতায় থাকেন, টাকা আছে বাপের তাই ওড়ান আর থিয়েটার দেখেন, ফুর্তি করেন। আপনি আর্টিস্ট তা তো বলেননি। হঠাৎ খুব হৃদ্য হয়ে বললেন—তাই শুনেই তো রাগ হয়ে গেল মশাই! বললাম—বটে! তাই সমন জারী করেছিলাম! বললাম—তাতে কি হয়েছে ? আপনার সমনের টানে এসে কতকগুলো ভালো ল্যাণ্ডস্কেপ হয়ে যাবে আমার। বললেন—না মশাই, মনটা খচখচ করছে। আপনি গুণীলোক! তবে মনে এটাও হচ্ছে যে ভালোই করেছি। আপনাকে তো পেলাম। এখানে মাঠের মধ্যে যা কষ্ট, সারাটা দিন শুধু প্লট নম্বর, বাটা দাগ, রায়তী স্থিতিবান, মোকররী আর এমন এখানকার লোক যে সব তাতেই সকলের আপত্তি। কর রেকর্ড। দেখ কাগজ। এতে আর মাথার ঠিক থাকে! আপনার সমস্ত খতিয়ানে আপত্তি দিয়েছে আপনার জ্ঞাতিরা। সে হিসেবে আপনার উপকার করেছি আমি। আমার উপকার করার লাভও হয়েছে

দেখছি। এখানে মিশবার লোক পাইনে। আপনাদের ইস্কুল-লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে পড়ি। যত পুরনো বই। দিন কাটে না।

মানুষের মন সু, ভারী আশ্চর্য। বুঝলে এখুনি যে লোকটা মন্দ বললে মনে হয় এত বড় পাষণ্ড এবং এত বড় শত্রু আর নেই জগতে, সেই লোকটাই যদি কিছুক্ষণ পর বা তক্ষুনি কথাটা ঘুরিয়ে মিষ্টি কথা বলে প্রশংসা করে তা হলে সব ভুলে মনে হবে লোকটা ভারী ভাল। জান, সত্যটা উপলব্ধি করে খুব আশ্বাস পেলাম। কারণ তোমার আমার মধ্যে তো এরপর মধ্যে মধ্যে ঝগড়া হবেই। আমার তখন নিশ্চয় মনে হবে আজই পালাব, ফকিরী নেব; আর তুমি ভাববে—কি ভাববে? ডাইভোর্স করবে ভাবতে ভাল লাগে না, ভাল লাগে তুমি ভাবছ বিষটিষ খাবে। তখন আমি হয়তো তোমার মুখের দিকে তাকাব, তুমি জলভরা চোখ ফিরিয়ে নেবে। অমনি আমি গিয়ে বলব—আমারই অন্যায়, আমাকে মাফ কর সু! তুমি ফিক করে হেসে ফেলবে। ইতি—

এরপরও খান তিনেক চিঠি লিখেছিল। শেষখানা মনে আছে, তাতে খুব সরস রসিকতা বা বাক্যের ছটা বিস্তার করেনি। লিখেছিল—একেবারে সময় নেই সু। বড় জালের মধ্যে জড়িয়েছি। ধনেশ্বর কাকা আর সুখেশ্বর কাকার ছেলে কল্যাণেশ্বর যে ব্যাপারটা করেছিল তা খুব কঠিন ছিল না, কিন্তু হঠাৎ আমার বড় জ্যাঠামশায়ের দুই ছেলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং এমনই কুটিল ব্যাপার করে তুলেছেন যে আমাকে বিপদগ্রস্ত করেছেন। আমাকে পত্তনী বিলি করা সব সম্পত্তিই কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি প্রাচীন কাগজপত্র হাতড়াচ্ছি। কাগজের ধুলো পেটে গিয়ে গিয়ে পাকা জমিদারী সেরেস্তানবীশ হয়ে উঠছি। রঙ খুব কালো হয়েছে বলছিল গোয়ানপাড়ার হলদী বুড়ী। ইতি—

পুঃ দিয়ে লিখেছিল—সেটেলমেণ্ট হাকিমের সঙ্গে প্রেম আবার বিগড়েছে। তার কারণ আমার চেয়ে আমার জ্যাঠতুতো ভাইদের সঙ্গে ওর জমেছে বেশী। —ইতি সু।

তারপর নীরব হয়ে গিয়েছিল সুরেশ্বর। একেবারে নীরব। পুরো একমাস কোন চিঠি পায়নি।

অসীমার কাছে খবর নিয়ে জেনেছিল, সুরেশ্বরের এখানকার নায়েব ম্যানেজার হরচন্দ্রের পক্ষাঘাত হয়েছে। ওখানে যে কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে সুরেশ্বর গিয়েছিল তাকে এখানে পাঠিয়ে সুরেশ্বর ওখানকার কর্মচারীদের নিয়ে মামলা-মকদ্দমায় প্রায় ডুবে গেছে।

আরও মাসখানেক পর হঠাৎ চিঠি পেয়েছিল সুরেশ্বরের—সেই সাংঘাতিক চিঠি।

সুলতা, বিদায়। বিদায় নিচ্ছি চিরজীবনের মত। সব ভুলে যাও—ভগবানকে ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ যে বিয়েটা ঘটেনি, তুমিই পরীক্ষার আপত্তি তুলে বিয়েতে রাজী হওনি। হলে আজ আর আক্ষেপের শেষ থাকত না। তুমি আত্মহত্যা করতে। আমার—আমি যা হয়েছি তাই হতাম। অর্ধ পাগল ছিলাম। পুরো পাগল হতে চলেছি। প্রচুর মদ খাচ্ছি। খাঁটি দেশীমতে গোয়ানীজদের তৈরী মদ! আমাকে ভুলে যাও। আমাকে ফেরাবার চেষ্টা করো না, তা হলে আমাকে হয়তো আত্মহত্যা করতে হবে। ইতি—

সুরেশ্বর।

কষ্ট সুলতার নিশ্চয় হয়েছিল। তার মা-বাপ কেউই তার এবং সুরেশ্বরের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতার কথা জানতেন না। সে রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে সারারাত্রি কেঁদেছিল। একবার ভেবেছিল সে নিজে কীর্তিহাট যাবে, দেখা করে মুখোমুখি প্রশ্ন করবে—বল কি ব্যাপার! কেন এ চিঠি লিখেছ? কেন? কিন্তু ভাবলেও তা কাজে করতে পারেনি। মনে হয়েছিল, তার থেকে বোধহয় মেয়ের পক্ষে মৃত্যু ভাল। নিজে যাবে সে উপযাচিকা হয়ে তাকে সাধতে! ছি-ছি-ছি! ওদিকে ভাগ্যক্রমে ওদের স্টুডেন্টস মহলে ছাত্র-আন্দোলন উঠেছিল জমে। তারই মধ্যে পড়েছিল সে ঝাঁপ দিয়ে। তারপর বের হল পরীক্ষার খবর। এই খবরটাই তাকে শুধু বাঁচিয়ে দিলে না, উৎসাহে তার মাথাটা উঁচু করে দিয়ে বললে—বেঁচে গেছ। চল, সামনে চল। বি-এ পরীক্ষায় ইকনমিক্সের অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে। প্রবল উৎসাহে সে এম-এ পড়তে শুরু করলে। যেদিন এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয় সেইদিনই সে দাঁড়িয়ে ছিল ধর্মতলার মসজিদটার কাছে, ধর্মতলা স্ট্রীটের ফুটপাথের উপর, অপেক্ষা করছিল ট্রামের জন্য। হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল সুরেশ্বরের সঙ্গে।

সুরেশ্বরের গৌরবর্ণ রঙের উপর একটা পোড়া দাগের মত ছোপ ধরেছে। পরনে তার সেই বিচিত্র অদ্ভুত সাজ আরও অদ্ভুত হয়েছে। গেরুয়া রঙের সিল্কের একটা আলখাল্লা গোছের জামা। পরনে কোঁচানো ধুতি। মুখে একমুখ দাড়ি-গোঁফ, বাবরী চুল, চোখে—স্বপ্নাতুরই হোক আর উদ্ভ্রান্তই হোক—একটা বিচিত্র দৃষ্টি, সে বেরুচ্ছে লাহাদের দোকান থেকে। তার পিছনে একটা লোকের মাথায় একগাদা জিনিস—সম্ভবত ছবির জন্য তৈরী ক্যানভাস। লোকটার হাতেও একটা কাঠের বাক্স, তাতে বোধহয় তার্পিন—বার্নিশ রঙের টিন ছিল। সুরেশ্বরের নিজের হাতে একটা প্যাকেট। সম্ভবতঃ রঙ-তুলি। ভাগ্যক্রমে বেরুবামাত্র দুজনেই দুজনকে দেখতে পেয়েছিল, চোখোচোখি হয়েছিল। সুলতার চোখ বিস্ফারিত দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। সেও মুহূর্ত দুয়ের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল, সুলতার চোখের সঙ্গে মিলিত হওয়া তার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু ওই দুই মুহূর্ত পরেই সে মুখ ফিরিয়ে হনহন করে চলতে শুরু করেছিল পশ্চিম মুখে এগিয়ে। ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল একখানা ট্রাম। দাঁড়িয়েছিল দু ফুটপাথের মাঝখানে আড়াল করে। সে ট্রামে সুলতা চড়েনি। ট্রামখানা চলে গেলে সে তাকিয়ে তাকে খুঁজেছিল। তখন সুরেশ্বর আর নেই। পরের ট্রামে সে ইউনিভার্সিটি এসেছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় তাকে ফোন করেছিল। ধরেছিল চাকর। সে নাম বলেছিল, বলেছিল—বল বাবুকে সুলতা ঘোষ ডাকছেন। সে শুনতে পেয়েছিল সুরেশ্বর বলছে—বল বাবু বাড়ী নেই। উত্তরটা সে আর চাকরের মুখে শোনার জন্য প্রতীক্ষা করেনি। রিসিভারটা রেখে দিয়েছিল। ঘৃণা হয়েছিল তার।

কারণটা জানতে তার দেরী হয়নি।

অসীমা তাকে বলেছিল—সুরোদার খবর শুনেছিস?

—কি?

—সেখানে প্রবল প্রতাপে জমিদার হয়ে বসেছে। মদ খাচ্ছে। দেশী মদ। বাবা বলছিলেন—ভাল উপমা দিয়ে বললেন—বুনো মোষ যেমন পাঁকজলে গলা ডুবিয়ে বসে, তেমনি

ভাবে ডুবেছে শুনছি।

সুলতা বলেছিল—ওর চেয়েও ভাল উপমা আছে অসীমা। বন্য শূকরের উপমা। তারা শুধু গা ডোবায় না। দাঁতশুদ্ধ মুখ ডুবিয়ে পাঁক আর গেঁড়ো তুলে খায়।

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল অসীমা। কিন্তু সুলতা চলে গিয়েছিল। বলেছিল—কি করব শুনে অসীমা। আজ আমার ক্লাসের পর ক্লাস। তারপর ইউনিয়নের মিটিং।

এম-এ পরীক্ষার সময় সে শুনেছিল সেবার ফাইন আর্ট এগজিবিশনে সুরেশ্বর রায় একখানা ছবির জন্য ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। ছবিখানার নাম মা-যশোদা। একটি শ্যামাঙ্গী তরুণী মায়ের কোলে ছেলে আর আকাশের চাঁদ। ছবিতে এক সময় আগ্রহ ছিল। কিন্তু সে আগ্রহ তার বোধ করি বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিল সেবার।

অসীমা গিয়েছিল সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে। অসীমার সেবার ফিফ্‌থ ইয়ার। ফিরে এসে সুলতাকে ফোন করেছিল—সুরোদা বিলেত যাচ্ছে সুলতা।

—বিলেত? তা ভাল। ওই কীর্তিহাটের জমিদারী থেকে ভাল। কিন্তু খবরটা আমাকে কেন?

—এমনি। তোকে একটা জিনিস দিয়েছে দিতে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ। একখানা ছবি। খুব সুন্দর একটা ল্যাণ্ডস্কেপ!

—ধন্যবাদ জানাস। কিন্তু আমার ঘরে ছবি টাঙাবার জায়গা নেই। ফিরিয়ে দিস।

—ফিরিয়ে দেব?

—হ্যাঁ। বলে সে রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল। তারপর পড়ায় মন দিয়েছিল। যেন এই ছোট্ট ঘটনাটা তার পড়ার ঝোঁকে বেশ খানিকটা জোর জুগিয়েছিল দু-চার দিনের জন্য।

সেবার এম-এ পরীক্ষায় সুলতা হয়েছিল ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বাবা-মা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, মেয়েকে সংসারী দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা, কোন বাবা-মা তা না চায়, কিন্তু তার ছাত্রী-জীবনের এই সাফল্য এখানেও তাকে তার স্বাধীন মতে চলবার পাশপোর্ট দিয়েছিল। সে চাকরী পেয়েছিল, ভাল চাকরী, গভর্নমেণ্ট ডেকে তাকে শিক্ষা বিভাগে বেথুন কলেজে ইকনমিক্সের লেকচারার করে নিয়েছিল। এবং কিছুদিনের মধ্যেই পদোন্নতি হবে এ আশ্বাসও ছিল। নিজেকে কাজে ডুবিয়ে দিয়েছিল পরমোৎসাহে। নিজেকে বিচার করে সুলতা দেখেছে। তাতে বুঝেছে সুরেশ্বরের প্রতি অনুরাগ এর হেতু নয়। আজকালকার নারী-স্বাধীনতার যুগেও মনের অ্যাডোলেসেন্সের একটা কাল আছে; সে কালের মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবে কিছু তরুণ বন্ধু কিছু কিছু স্বপ্নসঞ্চার করে, কিন্তু সে স্বপ্নই। স্বপ্ন দুভাবে মিলোয়—এক, কিছুক্ষণ বেশ গল্পের মত বাস্তবের ধারাবাহিকতা রেখে চলে কেমন এলোমেলো হয়ে যায়, তুলির হিজিবিজি দাগ টেনে আঁকা ছবি মিটিয়ে দুর্বোধ্য করে দেওয়ার মত। অথবা কোন রচনার অংশবিশেষের উপর কলমের দাগ টেনে কেটে দেওয়ার মত। আর একভাবে শেষ হয়, ঘুম ভেঙে গিয়ে স্বপ্ন-স্বপ্ন অর্থাৎ মিথ্যে বলে ব্যঙ্গ করে মিলিয়ে যায়। সে স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত

হিজিবিজি হয়ে বা অবান্তর অবাস্তব হয়ে স্বপ্নের মধ্যেই অর্থহীন হয়, তাতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকে না, শুধু হাসি পায়। কিন্তু যে স্বপ্ন ধারাবাহিকতায় বাস্তবের পথে চলতে চলতে ঘুম ভেঙে থেমে যায় ভেঙে যায় সেই স্বপ্নই স্বপ্নকে মুখ ভেঙচায়, এবং স্বপ্ন যে দেখে তাকেও ভেঙচায় এই বলে যে কেমন ঠকেছ! তাতেই হয় খেদ, তাতেই স্বপ্নকে ব্যঙ্গের বিষয় করে তোলে। সুরেশ্বরের সঙ্গে তার জীবনের এই ঘটনাটুকু পরিসরে ক্ষুদ্র হলেও ধারাবাহিকতায় এবং ঘটনা-বিন্যাসে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বাস্তব ছিল, সেটা এইভাবে হঠাৎ ভেঙে গেল, ঘুম ভেঙে স্বপ্ন অসমাপ্ত হয়ে শেষ হওয়ার মত। যার ফলে যে কোন অন্য পুরুষের প্রতি এবং প্রেমের প্রতিও তাকে বিমুখ করে তুললে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বদলে সে চাকরী এবং ঘরকন্নার বদলে চাকরীর সঙ্গে রাজনীতির বৃহত্তর জীবন ও জগতের রঙ্গমঞ্চে বেশ বড় পার্ট পেয়ে গেল। তাতেই মেতে উঠল। তখন ১৯৩৯ সাল। পৃথিবী এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বলতে গেলে পুরনো অঙ্ক শেষ হয়ে নতুন অঙ্ক শুরু হচ্ছে। যার গতি যার আবেগ—নাটকের ভাষায় টেম্পো—একেবারে গোমুখীতে গঙ্গাবতরণের মত। স্বর্গের মন্দাকিনী পৃথিবীর মাটিতে ঝরে পড়ে তার জলে ধুলো, মাটি, খড়-কুটো সবকিছু স্বীকার করে কলস্বরে ঘোষণা করছেন—গঙ্গা হলেও আমি জল, গতি আমার নিম্নগামিনী, বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা হয়েও আমি মাটিকে ভালবাসি, আবিলতাকে স্বীকার করি! এই সত্য এই বাস্তব।

ইয়োরোপে তখন যুদ্ধ বাধে-বাধে অবস্থা। চীন জাপান যুদ্ধে নেমে গেছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বামপন্থা প্রবল হয়ে উঠেছে। সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা সোস্যালিজম কম্যুনিজম নিয়ে প্ল্যান করছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখন শুদ্ধ সুভাষচন্দ্র—ভারতের বিদ্রোহী আত্মার নব-যৌবনের প্রতীক; তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের দৃষ্টি এবং পদক্ষেপের মন্থরতার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি এবং পদক্ষেপ মিলছে না। সেই কালে পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রেরণায় সুলতা কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় নেত্রীস্থানীয় হয়ে উঠল। বাংলার নবীনা নেত্রী যাঁরা—কমলা দাশগুপ্তা, বীণা দাশ, মায়া ঘোষ প্রভৃতি মন্দিরা কাগজকে কেন্দ্র ক'রে সমবেত হন—সে দলে সে ঠাঁই ক'রে নিলো। এরই মধ্যে একদিন দেখা হয়ে গেল সুরেশ্বরের সঙ্গে। দেখা হল না—সেও তাকে দেখলে—সুলতাও তাকে দেখলে। হাওড়া স্টেশনে বম্বে মেল ছাড়ছিল—সন্ধ্যেবেলা—সুলতা গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে, তার বান্ধবীকে তুলে দিতে অন্য একটা গাড়ীতে। হঠাৎ সে দেখলে কুলীর মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে নিঁখুত সাহেবী পোশাক-পরা সুরেশ্বর চলেছে। মুখোমুখি প্রায়; দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দুটি কথা হয়েছিল। সুরেশ্বর বলেছিল—বিলেতে যাচ্ছি। সুলতা বলেছিল—গুড লাক! বলে সে-ই আগে পাশ কাটিয়ে অন্য প্ল্যাটফর্ম-মুখে চলে গিয়েছিল। সুরেশ্বর কি করেছিল ফিরে তাকিয়েও দেখেনি, তবে সে যে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি এটা সে অনুমান করেছিল। সে হয়তো মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে মেলের রিজার্ভকরা ফার্স্ট ক্লাস বার্থে গিয়ে চেপে বসেছিল।

কাগজে দেখেছিল—হঠাৎ নজরে পড়েছিল—বিলেতে তার একখানা ছবির খুব প্রশংসা হয়েছে। 'ইণ্ডিয়ান ম্যাডোনা'। কাগজে লিখেছিল—এই ছবিখানাই কলকাতার প্রদর্শনীতে বিশেষ সম্মান এবং প্রশংসা পেয়েছিল।

তাতেও তার অর্থাৎ সুলতার জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দগতি কোন বেদনাদায়ক স্বপ্নের দ্বারা বিঘ্নিত হয় নি। সহজভাবে স্বচ্ছন্দ গতিতে সেও কাগজখানা পুরনো খবরের কাগজের সঙ্গে বিক্রী ক'রে দিয়ে এগিয়ে চলেছিল আপন পথে—কলেজে, কাগজের আপিসে। পার্টি আপিসে অবশ্য সে যেত না; সেটা সরকারী চাকরির বাধা-নিষেধের জন্য।

* * *

তারপর, গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে—এ কথাটাও 'যৎকিঞ্চিৎ' হয়ে গেছে ব্যঞ্জনা হিসেবে। ভাগীরথীর মুখেই চড়া পড়েছে, এতদিনে সত্য ক'রে গঙ্গার ধারা দুটো হয়ে গেছে দুটো দেশে। ভাগ করে দিয়ে ইংরেজ যখন দেশ ত্যাগ করল, তখন ভাগীরথীর বুকে জাহাজ ভাসিয়ে ডায়মণ্ড-হারবার হয়ে যেভাবে বাংলা দেশে এসে কলকাতার পত্তন করেছিল—কুঠী গেড়েছিল, সেভাবে এদেশ ত্যাগ করেনি। ভাগীরথীর মুখেও চড়া পড়েছে। তারা দলে দলে ১৯৪৭-৪৮ সালে দমদম এরোড্রোম থেকে প্লেনে উড়ে চলে গেছে; ইংরেজ পল্টনেরা গেছে বম্বেতে ইণ্ডিয়া গেটের ভিতর দিয়ে বম্বে ডকে জাহাজে চেপে।

বাংলাদেশে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তখন রাজনৈতিক ক্যারমবোর্ডে দলাদলির স্ট্রাইকারের ধাক্কায় কর্মীরা বিভিন্ন দলের পকেটে ঘাঁটি গাড়ছে।

কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সুলতার মিল ১৯৪২ সাল থেকেই নেই। অর্থাৎ জনযুদ্ধের আমল এবং অ্যান্টিফ্যাসিস্ট লেখক-শিল্পীদের আন্দোলনের আমল থেকে। সে অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি-বিজ্ঞানের দৃষ্টি পেয়েছে। সে এসবের তত্ত্ব এবং মর্ম বুঝত। গোড়া থেকে সে সোস্যালিস্ট। তখনও পর্যন্ত, সোস্যালিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যেই ছিল—সেও ছিল—তবে একই বোর্ডের চারটে পকেট হওয়ায় একটা পকেটেই স্থান করে নিয়েছিল। তারপর প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন। ডাঃ বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন। প্রদেশ কংগ্রেসেও ওলোটপালোট হল। অতুল্য ঘোষ প্রেসিডেণ্ট হলেন। মহাত্মাকে হত্যা করলে গডসে দিল্লীর বিড়লা ভবনে। তারপর ঐক্যের বন্ধন দেখতে দেখতে ছিন্ন হয়ে গেল। সোস্যালিস্টরা পৃথক হল। তার সঙ্গে সঙ্গে সুলতাও তারপর একান্ন সালে ইলেকশনের আগে কৃষক-প্রজা-পার্টি হল। প্রফুল্ল ঘোষ তার বাংলাদেশের নেতা—সর্বভারতীয় প্রধান হলেন আচার্য কৃপালনী। ইলেকশন হয়ে গেল। সোস্যালিস্ট-কৃষক-প্রজা এক হয়ে পি-এস-পি হল।

দেশকে দেশের মানুষকে তীব্র আক্রমণ না করে পারলে না সুলতা। মানুষগুলো অদ্ভুত বোকা। এরা ধরতেও পারলে না কংগ্রেসের পরিবর্তন। তার ধাপ্পাবাজি! তারা ভোট দিলে কংগ্রেসকেই। কংগ্রেসকে এই সাবাস সুলতা দেয় যে, কংগ্রেস এই বোকা মানুষগুলোকে ঠিক চিনেছে। তারা যেখানে যেমন সেখানে তেমন খেলা খেললে। যেখানে জমিদারকে দাঁড় করালে ভোট পাবে, সেখানে জমিদারকে দাঁড় করালে। যেখানে শেঠকে দাঁড় করালে টাকার জোরে জিতে যাবে, সেখানে তাই করল। যেখানে কর্মী দিতে হবে, সেখানে কর্মীই দিল। এবং এই কৌশলে অধিকাংশ পল্লী অঞ্চলেই জিতে গেল। দু-চার জায়গায় হার হল না তা নয়—তবুও তারা সংখ্যায় এমন মেজরিটি হল যে, সব দলগুলি তাদের মতবাদ এবং নিজেদের সততা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে যথেষ্ট গৌরব এবং বিশ্বাস পোষণ করেও মানুষের কাছে গৃহীত হ'ল

না। তবে এটা ঠিক কথা যে—অন্ততঃ সুলতাদের তাই বিশ্বাস—এই যাত্রাদলের রাজার সাজ—যা প'রে কংগ্রেসওয়ালারা আসর জমাচ্ছে—সে আসর ভাঙবেই। জীবনের আসর চিরদিনের, সত্যের কদর চিরদিনের, কিন্তু জীবনের নামে অভিনয়ের আসর যতই অভিনয়গুণে জীবন্ত হোক, অভিনয় শেষ করতেই হয়। তখন পালাটা আর সত্য থাকে না এবং পালার বীরগুলো তখন একান্তভাবে নট বলে ধরা পড়ে। তখন সত্য এবং সত্যকারের মানুষের কাল আসে; তাদের তখন চেনে মানুষ—তাদের ডেকে এনে বসায় জীবনের আসরে। কথাটা আরও জোর দিয়ে বললে সে—পঞ্চাশ সালটা গোটা বিলেত এবং ইউরোপ ঘুরে এসে। স্টেট থেকেই স্কলারশিপ পেয়েছিল সে।

১৯৫৩ সালের নভেম্বর সেসনে কংগ্রেস দল নাটুকে ভাঁওতা দিলে দেশের মানুষকে জমিদারী উচ্ছেদ বিল এনে। জমিদারী উচ্ছেদ বিল নয়, এস্টেট্‌স্ এ্যাকুইজিশন বিল। শুধু দেশের মন্ত্রিত্ব নিয়ে তৃপ্তি হচ্ছে না এদের—জমিদারদের জমিদারী কিনে প্রকারান্তরে তারা জমিদারই সেজে বসবে। প্রজার খাজনায় এক পয়সা মকুব হবে না, ষোল আনা লাভ সমেত আয়বৃদ্ধি হবে। পতিত জমি—যা জমিদারদের খাস—তা আসবে তাদের হাতে—তারা বিলি করবে ইচ্ছামত। বিনিময়ে ভোগের সুবিধে হবে বটে।

বিল যেদিন থেকে বিধানসভায় এসেছে সেদিন থেকেই সে প্রায় নিয়মিত আসছে—শুনছে বক্তৃতা। অভিনয় দেখছে। কিন্তু একদিনও সে সুরেশ্বরকে দেখে নি। এবং এমনই ভাবে সে তার মন থেকে স'রে বা মুছে গেছে যে, তার দেখা এখানে পেতে পারে এমন কথা তার মনে হয় নি। এর অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। সেটা এই যে, সুরেশ্বর দেশে ফিরে—সে সেই ৪১ সালে—আবার সেই কীর্তিহাটেই ফিরে গেছে। সে তার খোঁজও করে নি কোনদিন এবং কোন সংবাদও সে পায় নি—যাতে তাকে মনে করবার হেতু হতে পারে। না শিল্পী হিসাবে না মানুষ হিসাবে। অসীমা-সীমার বিয়ে হয়ে গেছে। তারা ঘরণী গৃহিণী—অবশ্য ভাল ঘরেরই। তারাও তাকে ভুলেছে—সেও তাদের ভুলেছে। দেখাও হয় না। চিঠি লেখালিখিও নেই। তা ছাড়া আর একটা পার্থক্য হয়েছে সেটা সীমা-অসীমার ভাইকে নিয়ে। প্রদীপ যৌবনে পা দিয়েই বিয়াল্লিশ সাল নাগাদ গিয়ে পড়েছিল অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স্-আর্টিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশনে। সেখান থেকে একেবারে কম্যুনিস্ট পার্টিতে। দীর্ঘদিন স্টুডেন্টস ফ্রন্টে স্টুডেন্ট লীডার হয়ে ছাত্রজীবনের জের টেনে অবশেষে এ্যাডভোকেট হয়েছে হাইকোর্টে। পার্টির মেম্বারও সে বটে। কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯৪৯।৫০ সালে বে-আইনী ঘোষিত হলে অনেকদিন জেলেও ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে সে হাইকোর্ট যাচ্ছে আসছে। এর মধ্যে রাশিয়া-চীন দুটো দেশেই ঘুরে এসেছে। তার সঙ্গে চীনে গিয়েছিল অসীমা আর তার স্বামী—রাশিয়া গিয়েছিল সীমা এবং তার বর। তারা দুই বোনেই বিলাসিনী ধনী গৃহিণী হয়েও এবং পার্টি মেম্বার না হয়েও খুব কড়া রকমের কম্যুনিস্ট মতবাদ পোষণ করে। সুতরাং তাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হওয়া দূরের কথা—পথে দেখা হলেও এদিকে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গগলসটা অকারণে দুহাত দিয়ে নাকের উপর টিপে বসায়। অর্থাৎ সুরেশ্বরের সংবাদ কোন একটি সূচীছিদ্র সরু পথেও কোন সূত্রে আসে নি, আসতে পায় নি। সুতরাং

এস্টেট্‌স্‌ এ্যাকুইজিশন বিলের শেষদিনে সে যখন পরম কৌতূহলভরে উপর নিচে জমিদারদের মধ্যে কুমার বিমলচন্দ্র সিংহকে দেখে, তারপর বর্ধমানের মহারাজার টুপি খুঁজে দেখতে গিয়ে পেল না, তখন আর কাউকে খোঁজে নি—স্বরেশ্বরকে মনেও পড়ে নি। শুধু একটা কৌতুককর কথা মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, আজ যদি ভূমিরাজস্বমন্ত্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জায়গায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ থাকতেন তো বড় ভাল হত। তাহলে অপোজিশনের কেউ না কেউ তাঁর কৌতুক-কথাটা নিশ্চয় বলত। অন্ততঃ সে শ্রীসুধীর রায়-চৌধুরীকে, দাশরথি তা'কে বলে দিয়ে আসত বলতে। বলত—দেড় শো বছর পরে আবার হেস্টিংস আর তাঁর দেওয়ান বার রাঁইয়া নতুন খেলা খেলতে এসেছেন।

গালাগাল, তীব্র সমালোচনা, কঠিন উক্তি, গোলমাল করে বিপক্ষ দলের বক্তৃতায় বাধা দেওয়া, বক্তৃতা ঢেকে দেওয়া হয়ে গেছে। আজ শেষদিনে এই হলে ঢুকে ওই কথাটা মনে করেও সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেল। মনের মধ্যে একটা গম্ভীর ভারী থমথমে কিছু জুড়ে বসল। এ দেশের ইতিহাস স্মরণ ক'রে মনে হ'ল—যাই গলদ থাক নতুন আইনে, আজ এর গুরুত্ব এর মহত্ত্ব এর বিপ্লবাত্মক সম্ভাবনাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। মনের মধ্যে তার হঠাৎ মনে হল—একটা দেড়শো বছরের পাকা ইমারতের তলায় ডিনামাইট চার্জ করা হয়েছে—যে মুহূর্তে স্পীকার বলবেন—**It is now agreed to and passed**—; সেই মুহূর্তে বিপুল বিস্ফোরণ শব্দের সঙ্গে বিরাট ইমারত টলতে টলতে চারিপাশে ফেটে চৌচির হয়ে বিপুলতর শব্দ করে মাটিতে আছড়ে পড়বে। বিরাট একটা ধূলির পুঞ্জ উঠবে আকাশে, ঢেকে দেবে চারিদিক। হয়তো চাপা পড়ে মানুষ কাতরাবে ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে। শুনতে হবে দাঁড়িয়ে। চোখে জল এলেও মুছে ফেলতে হবে। যারা ওই ঘর আঁকড়ে পড়ে ছিল মৃত্যুই তাদের নিয়তি। মরতে দাও তাদের। তারা মরুক। খেদ কিসের? তাকাও, দৃষ্টি আরও প্রসারিত করে তাকাও; স্মরণ কর; এই তো কিছুদিন আগেই গোটা করদ রাজ্যগুলি অসহায়ভাবে এমন করেই ভেঙে পড়েছে! মনে পড়ছে না হায়দ্রাবাদে নিজামের নিজামত্বের সব থেকে উঁচু মিনারটা ভেঙে পড়ে যাওয়ার ছবি? কেঁদো না।

ভাবছিল সে। এরই মধ্যে কারুর মোটা ভারী গলার শব্দে সে চমকে উঠল। ডাঃ রায়ের গলা। তিনি তাঁর শেষ বক্তৃতা দিতে উঠেছেন। সম্ভ্রম ভরেই সে তাঁর দিকে তাকালে। অস্পষ্ট গোটা হাউসে কোথাও অসম্ভ্রম ছিল না। সকলে ডাঃ রায়ের গুরুত্ব পূর্ণ স্বীকার করে গম্ভীর-ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ডাঃ রায় আরম্ভ করলেন—

**"Sir, the curtain is about to be rung down on the scene with which —we in Bengal have been familiar for the last 150 years."**

হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। বেশ বলেছেন। যবনিকা নেমে আসছে। জমিদারদের নাটমন্দিরে, জলসাঘরে, উৎসব-সমারোহের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যের শেষে যবনিকাপাত হচ্ছে! জমিদারেরা এবার মুখের রঙ তুলে জরির পোশাক ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াবেন। এতক্ষণে হঠাৎ মনে পড়েছিল সুরেশ্বরকে। কীর্তিহাটের বাড়ী চাপা পড়বে সে? না—বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়াবে?—

সে চিন্তা বেশিক্ষণ থাকেনি। ডাঃ রায়ের গম্ভীর কণ্ঠের বক্তব্য স্তব্ধ বিধানসভার গম্বুজের

গোল ছাদে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, একটানা তিনি বলে চলেছিলেন—একটিবারের জন্য কোন কথা কেউ বলেনি—অন্য কোন শব্দও হয় নি।

"I am glad to say that my Party has been able to put before the country to-day a scheme which, I hope, will lead to better understanding between the raiyats and the landlords, between different clasess of society in this country and I hope that this will lead to the establishment of what we earnestly desire namely a welfare state in Bengal."

শেষ করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস তরফ থেকে শুরু হয়ে সারা সভায় সঞ্চারিত হয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠল টেবিল চাপড়ানোর শব্দ—যা করতালি ধ্বনি বলে গণ্য। বেশ লাগল। হাসি মুখেই উঠে দাঁড়াল সুলতা। শুধু দুটি শব্দে তার আপত্তি আছে। My Party. —কেন? শুধু My Party. কেন? জমিদারী প্রথা উঠবে এতে কার আপত্তি ছিল—কে না চেয়েছিল? এ যে বাংলাদেশের মাটির ভেতর থেকে বাংলাদেশ চেয়েছিল।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে সে লবীতে দাঁড়াল। দলে দলে এম-এল-এরা এখনও বিতর্ক করছেন। কিছু কিছু প্রবীন সভ্যেরা বেরিয়ে যাচ্ছেন। নিচে গাড়ী এসে দাঁড়াচ্ছে। নিজের নিজের গাড়ীতে উঠে চলে যাচ্ছেন। ওদিকে ওপর থেকে সিঁড়ি ভেঙে দর্শকেরা নামছেন। চিনি-চিনি করেও যেন কয়েকজনকে চেনা গেল না। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী নামলেন। বামপন্থীরা তাঁর দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর একটু মৃদু করলেন। কয়েকজন নমস্কার করলেন—শ্রীশ নন্দীও মৃদু হেসে নমস্কার করলেন।

একজন খবরের কাগজের রিপোর্টার তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম স্যার।

—বলুন।

—এই বিল সম্বন্ধে আপনার মত!

—নিশ্চয়ই খুব ভাল! ডিটেলস নিয়ে হয়তো একটু-আধটু পার্থক্য থাকতে পারে।

—একটু বেশী করে—

—ওই খুব বেশী যথেষ্ট। খুব ভাল। দেশের লোক যখন চেয়েছে। এবং জমিদারেরাও বাঁচল। ওদিকে পিছন থেকে সরস কণ্ঠে কেউ বললে—অন্ততঃ গালাগালের হাত থেকে। তিনি আর কেউ নন—তিনি কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ। তাঁর কণ্ঠস্বর সুপরিচিত।

শ্রীশচন্দ্র নন্দী নেমে গেলেন—তাঁর গাড়ী এসে লেগেছে। বাইরে কম্পাউণ্ডে গাড়ীর হর্নে রাত্রি চকিত হয়ে উঠেছে—হেডলাইটের আলোগুলো বাগানের গাছের মাথায় মাথায় ঘুরছে বাঁক নেবার সময়।

কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ একজন বামপন্থী নেতাকে বললেন—আপনার স্পীচ যাকে বলে টাইগারি স্পীচ হয়েছে। ওয়াণ্ডারফুল। সন্দেহ হচ্ছিল নিজের চরিত্রে। খুব বলেছেন লাম্পট্য টাম্পট্য লাগিয়ে—! হেসে উঠলেন। বেড়ে বলেছেন। তা চলুন না, চা খেয়ে গল্প ক'রে যাবেন বাড়ী।

—আজ না!

—বেশ, তা হলে কবিয়াল গোমানী আর লম্বোদরকে ডেকে আসর পাতাই একদিন। একজন জমিদার একজন লেফটিস্ট লীডার—আপনার স্পীচের জবাব সেখানে পেয়ে যাবেন। কি বলেন।

—মোস্ট গ্ল্যাডলি! তবে কান্দীর মিষ্টি খাব। মনোহরা।

—তার সঙ্গে লবণাক্ত কিছু? আপত্তি হবে না তো?

ভদ্রলোক বললেন—নিশ্চয় না। জমিদারদের গাল দিয়েও আপনার গুণ গাইব।

ঠিক এই সময়টিতেই এসে সামনে দাঁড়াল দীর্ঘকায় একটি লোক। প্রথমে চিনতে পারেনি সুলতা। চোখে নীল চশমাটার জন্যে আর ওকে এখানে দেখতে পাবার সম্পর্কে সচেতনতা না-থাকার জন্যই চিনতে পারেনি। তবে রোগাও হয়ে গেছে সে। শীর্ণ দেখাচ্ছে। দাড়ি গোঁফ না থাকাটাও একটা কারণ বটে। গায়ে ঢিলেঢালা আলখাল্লা গেরুয়া সিল্কের। পরনে পাজামা। সুরেশ্বর তার সামনে থমকে দাঁড়াল। সুলতা তখনও তাকিয়ে ছিল তার নীল চশমাটার দিকে কারণ চশমাটা যেন তার মুখেই নিবদ্ধ। কে? ভাবছিল সুলতা।

চোখের চশমাটা খুলে সুরেশ্বর বললে—চিনতে পারছ না?

সুলতা সবিস্ময়ে বলে উঠল—তুমি? তার বিস্ময় তাকে উষ্ণ হয়ে উঠবারও অবকাশ দিলে না।

হেসে সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ।

সকৌতুকে এবার সুলতা বললে—জমিদারীর উপর যবনিকাপাত দেখতে এসেছিলে?

সুরেশ্বর হাসলে, বললে—হ্যাঁ।

সুলতা বললে—তা যবনিকাপাতের সঙ্গে পাল চাপা পড়নি। কংগ্রেস সুবিধে দিয়েছে, গ্রীনরুমে গিয়ে কম্পেনসেশনের টাকায় মেক-আপ বদলে এবার নতুন সাজে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতে পারবে। এবার কি হবে? কংগ্রেসী, না বিজনেস ম্যাগনেট? তা ছাড়া তোমাদের তো আরও সুবিধে, দেবোত্তর। এবার আর নায়েব গোমস্তা পাইক রেখে প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করতে হবে না। খোদ সরকার এবার অ্যান্যুয়িটি পৌঁছে দেবেন!

সুরেশ্বরের হাসি এতেও মিলিয়ে গেল না। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওদিক থেকে কুমার বিমলচন্দ্র সিং সুরেশ্বরকে দেখে বললেন—কি মশাই, আপনি কীর্তিহাটের সুরেশ্বর রায় নয়? শিল্পী সুরেশ্বর রায়?

সুরেশ্বর নমস্কার ক'রে বললে—হ্যাঁ। আপনি ভাল আছেন?

—হ্যাঁ, তা আছি। উপায় কি ভালো না থেকে? তারপর আপনার খবর কি? বিলেতে গিয়ে নাম কিনে দেশে এলেন। তারপর সব নীরব। তবে শুনি না কি দেশে বসে দেদার ছবি আঁকেন। তা আমাদের দেখান!

—দেখাব!

—হ্যাঁ। এগজিবিশন করুন।

—এগজিবিশন নয়। কয়েকজন রসিক এবং আপনজনকে দেখাব।

—বেশ। আমাকে বাদ দেবেন না।

—নিশ্চয়ই না!

—আচ্ছা চলি।

তাঁর গাড়ী এসে লেগেছে। তিনি চলে গেলেন।

সুলতা যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। বললে—আমাকে দেখাবে না?

—ছবি?

—হ্যাঁ!

—যদি বলি আজই চল। তোমাকেই সর্বাগ্রে দেখাবার বাসনা আমার ছিল। এখানে না-পেলে আমি তোমার বাড়ী যেতাম! কারণ ছবি ঠিক এগজিবিশন নয়। ছবির মধ্যে দিয়ে আমার জবানবন্দী।

বিস্মিত হয়ে সুলতা তার মুখের দিকে তাকালে। এদিকে লবী জনবিরল হয়ে এসেছে। যাঁরাও আছেন তাঁরা নেমে গিয়ে বাগানে গিয়ে কে কার গাড়ীতে যেতে পারেন দেখছেন। কিছু কিছু দল বেঁধে হেঁটে বেরিয়ে পড়ছেন। এসপ্ল্যানেডে বা হাইকোর্টের ওদিকে গিয়ে ট্রাম ধরবেন। সুলতা এবং সুরেশ্বর ছাড়া মাত্র জন পাঁচ ছয় লোক ছিল। তার মধ্যে তিনজন হাউসের কর্মচারী।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুলতার মনে হচ্ছিল—এ যেন আর একজন—সে নয়। সে ছিল উল্লসিত উদ্ভাসিত বেপরোয়া একজন। এ যেন ক্লান্ত প্রশান্ত মানুষ একজন। সুরেশ্বর বললে—চল!

—আজ? তুমি পাগল?

—সে তো চিরকালের। পাগলামি আমার আছে সেটা জানি বলেই উন্মাদ নই। তবে যে-কোন মুহূর্তে পাগল হতে পারি। উঠতে পারে পাগলামি। বলেই সে খপ করে তার হাত ধ'রে বললে—চল!

চমকে উঠল সুলতা। কিন্তু রুষ্ট হতে পারলে না। কারণ এ হাতধরা জোর করে হাতধরা নয়, এ হাতধরার মধ্যে মিনতি অত্যন্ত স্পষ্ট।

সে বললে—ছাড়।

ছেড়ে দিলে হাত সুরেশ্বর। বললে—জোর নেই তোমার ওপর। কিন্তু গেলে আমি খুশী হতাম। ছবি দেখে কে কি বুঝবে জানিনে। বোঝাবার গরজও নেই আমার। ছবির ভেতর জবানবন্দী—ছবির রঙে হারিয়ে যাবার ভয় আছে। তাতে শিল্পী সুরেশ্বর জিতবে। কিন্তু মানুষ সুরেশ্বর বোবা আসামীই থেকে যাবে। তোমাকে পেলে তোমার কাছে সে বাঙ্ময় হতে পারত। বাচালও হয়তো হতো। এখানে যে নাটকের যবনিকাপাতের জন্য উল্লাস করছ সেখানে গেলে নাটকটার ম্যানাস্ক্রিপ্টটা দেখতে পেতে। আচ্ছা—

বলে সে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ফটকের দিকে।

সুলতার ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল। মনের মধ্যে যেন দ্বিধা জেগেছে একটা। ওই

লোকটার সম্পর্কে ধারণা তার যত খারাপ হোক তবু কি জানি কেন যেন একটা করুণা জাগছে। হাতের ঘড়িটার দিকে একবার সে চেয়ে দেখলে। নটা বেজে চার মিনিট। জানবাজার কাছেই। একবার ওর ওখান হয়ে গেলে কি হয়? বড়জোর দশটা, সওয়া দশটাই বাজবে। তাতে খুব দেরী হবে না। সে ডাকলে—দাঁড়াও। শুনছ!

সুরেশ্বর তখন ফটকে। সে ফিরে দাঁড়াল। —কিছু বলছ?

—হ্যাঁ। কাছে এসে বললে—চল, কিন্তু আধঘণ্টার বেশী না।

—তা হলে একটা ট্যাক্সি নিই।

—সেই ভাল।

একটু এগিয়ে এসে রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটায় কয়েক মিনিট দাঁড়াতেই ট্যাক্সি একটা মিলল, তাতে চড়ে বসে এসে সেই জানবাজারের বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। বাড়ীটা চেনা যায় না। দীর্ঘদিন এ পথে সুলতা হাঁটেনি। সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার একটা আধুনিক বহির্সজ্জা। রেলিংদেওয়া জোড়া জোড়া গোল থামওয়ালা সেই এক-শো সওয়াশো ফুট লম্বা বারান্দাটা বন্ধ করে আধুনিক প্যাটার্নের একটা চেহারা দেওয়া হয়েছে।

সুলতা দাঁড়িয়ে দেখলে বাড়ীটাকে। তারপর বললে—এটা কি করেছ বল তো?

—বারান্দাটাকে ঘেরার কথা বলছ?

—হ্যাঁ। হঠাৎ হেসে বললে—তবে তোমার মনটা ফুটে উঠেছে। বা তুমি ফুটে উঠেছ এর মধ্যে।

হাসলে সুরেশ্বর, বললে—বলতে পার। তবে কি জান, এসব কথা আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। প্রথম যখন দাড়ি গোঁফ চুল রেখে আলখাল্লা পরতাম তখনও শুনেছি। এখনও শুনি। আর অল্পবিস্তর সকলের চেহারাই তো এই। সে রাজার ছেলে গৌতম সিদ্ধার্থের চাঁচর চুল কেটে চীরবস্ত্র পরে বনে যখন তপস্যায় গেলেন তখন দেবদত্তরা এই ধরণের কথা বললে তো মিথ্যে বলে নি। অন্ততঃ প্রথম প্রথম যে দেখেছে সেই বলেছে—মানায় নি। ব্যারিস্টার গান্ধী যখন প্রথম গান্ধীর সাজ পরেছিলেন তখনও কি এমন ভাবে নি লোকে? তারপর ধর তোমার কথা। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিন ঠোঁটে তোমার লিপস্টিক ছিল, মনে পড়েছে আমি একটু বাঁকা কথা বলেছিলাম। আজ তুমি এমনই সেজেছ বা হয়েছ যে সেই লিপস্টিকের কথা তুললে এই ধরণেরই কথা হবে।

সুলতা তার মুখের দিকে তাকালে। ভুরু তার কুঁচকে উঠেছিল। কিন্তু সুরেশ্বরের মুখ সেই তেমনি বিষণ্ণ প্রশান্ত হয়ে আছে। যুদ্ধ করার বা ঝগড়া করার মনের কোন প্রকাশ ফুটে ওঠেনি সেখানে। কণ্ঠস্বরেও উত্তাপ নেই।

সুরেশ্বর বুঝেছিল, সে হেসে বললে—না, ঝগড়া আমি করিনি। বলছি কি জান, বলছি পরিবর্তন কালের নিয়ম। সেটা যেমন মানুষের হয় তেমনি মানুষের বিচরণক্ষেত্রে সর্বত্রই হয়। পুরনো বাড়ীতে নোনা ধরে। ফাট ধরে। তখন ভেঙে-চুরে মেরামত করতে হয়। আবার বংশও বাড়ে। তখন পাঁচিল ওঠে। জানালা ফুটিয়ে দরজা করতে হয়। বারান্দা

খিয়ে ঘর বাড়াতে হয়।

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে সুলতা বললে—বিয়ে করেছ? ছেলেপিলে বুঝি অনেকগুলো হয়েছে এর মধ্যে। মুখে হাসি এবং দৃষ্টিতে কৌতুক ফুটিয়ে সুলতা তার দিকে তাকালে।

সুরেশ্বর বললে—দেখ, প্রথমটা স্থির করেছিলাম বাড়ীটায় দুর্ভাগিনী মেয়েদের জন্যে একটা হোম-টোম বা আশ্রম-টাশ্রম করব। তখনই এই বারান্দা ঘেরার ব্যবস্থা হয়।

—সেই শেফালি কেমন আছে? যাকে করুণা করতে আমিই বলেছিলাম। তারপর তা থেকেই বুঝি তোমার করুণার স্রোত একেবারে ঝরঝর করে ঝরল—যার তোড়ে ঐরাবত ভেসে গেল!

—জানিনে ঠিক। তার খবর আর রাখিনি। ছেড়ে দাও ওকথা। তারপর মত বদলে ভেবেছিলাম অনাথ আশ্রম করব। বারান্দাটায় ক্লাস বসবে। কিন্তু তাও হয়নি। বারান্দা ঘেরার ইতিহাসটা এই, তবে ওর মধ্যে যেটা আধুনিক মেট্রো প্যাটার্ন চাপানো হয়েছে সেটা নেহাতই ইঞ্জিনীয়ার আর রাজমিস্ত্রীর কেরামতি। এখন ভিতরে এস। বাইরে ঝলমলে আলো পড়েছে, তার মধ্যে আমরা দুজনে পথে দাঁড়িয়ে বাগবিস্তার করছি, এতে জনসাধারণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

কথাটা ঠিক। রাস্তার সামনের দোকানে বেশ জটলা জমেছে। রাণী রাসমণির বাড়ীর নিচে বাইরের দিকটায় অসংখ্য দোকান। মশলাপাতি বিশেষ করে সুপুরীর পাইকারী দোকান অজস্র। তারই মধ্যে ছোট্ট তেলেভাজার দোকান থেকে নানান দোকান রয়েছে। দোকান-আইন মেনেও তারা ঝাঁপ আধখানা বন্ধ করে হিসেব-নিকেশ মেলাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে কৌতূহলী হয়ে তাদের দিকেই তাকাচ্ছে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে মোড় ফিরে ফিরিঙ্গী মেয়েরা যাচ্ছে, কেউ হেঁটে কেউ রিক্সায়, পিছনে তাকাচ্ছে শিকার অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা মাছের মত পিছনে আসছে কিনা? অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং হাওয়াই শার্ট প্যাণ্ট পরা দেশী বাবুসাহেবরাও যাচ্ছে। সকলেই ওই আলোঝলমল স্থানটায় এসে সবিস্ময়ে তাকাচ্ছে। বাড়ীটা প্রায় বারো মাস অন্ধকার থাকে—হঠাৎ সেটার হল কি যে এমন আলোর জৌলুস ফুটিয়ে রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে প্রধানা অভিনেত্রীর মত কোন এক বিশেষ রজনী উপলক্ষে রাজরাণীর পোশাকে মুখে পেণ্ট মেখে দাঁড়াল? তারপরই চোখে পড়েছে ওদের দুজনের দিকে।

সুলতা বললে—চল।

* * * *

ভিতরে এসে ওই বারান্দাঘেরা হলটায় নিয়ে এল তাকে সুরেশ্বর। এবং যে আলোগুলো নিভোনো ছিল তাও জ্বেলে দিলে। ঘরখানা ঝলমল করে উঠল শুধু আলোয় নয় ছবির রঙের উপর পড়া আলোর প্রতিচ্ছটাতেও বটে। রঙের আভাও ফুটে উঠল আলোর সঙ্গে।

সবিস্ময় দৃষ্টিতে সে তাকালে ছবিগুলোর দিকে। মুগ্ধবিস্ময়ে দেখছিল। এতো ছবি!

এতো ছবি এঁকেছে সে এই এতদিন অজ্ঞাতবাসে আত্মগোপন করে? ফিরে সে তাকালে সুরেশ্বরের দিকে। তারপর বললে—এতো ছবি এঁকেছ?

—এর তিন-চার গুণ ছবি এঁকেছি! কিন্তু এখানে সব ধরবার কথা নয়। আর সেগুলো যা আমি বলতে চেয়েছি ছবির মধ্যে তার সঙ্গে হয়তো সম্পর্ক ক্ষীণ বা মাত্রা ছাড়িয়ে বলা হয় বলে টাঙাই নি।

ছবিগুলোর দিকে আবার তাকালে সুলতা। দেখতে দেখতেই বললে—ছবির মধ্যে কিছু বলতে চেয়েছ নাকি?

—তাই জন্যেই তোমায় আমার আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল দেখাবার। এবং সর্বাগ্রে দেখবার এ তো ছবির প্রদর্শনী নয়, কীর্তিহাটের কড়চা—সুরেশ্বরের জবানবন্দী। ছবি থেকে যাঁরা বুঝতে পারবেন তাঁদের নমস্কার। তাঁরা রসিক এবং রসিকের চেয়েও বেশী কিছু। কিন্তু কি বলতে চেয়েছি তা যাদের কাছে বলতে পারি তার মধ্যে তুমি প্রথম এবং প্রধান।

হাসলে সুলতা। মনে মনে বলতে গিয়ে মুখে বেরিয়ে এল কথাটা। বললে—বড্ড দেরী হয়ে গেছে সুরেশ্বর। আমি অনেক দূরে বাস করি। নিউ আলিপুরে।

—তা জানি। তবে একটা কথা বলি। আজ নানান জমিদারের বাড়ীতে আসর পড়েছে। আমার মনে হচ্ছে বর্ধমানের মহারাজা সম্ভবতঃ গোলাপবাগের প্রাসাদ থেকে প্যালেস পর্যন্ত ঘুরছেন ছবি দেখে দেখে। মন চলে গেছে ১৭৯৯ পার হয়ে ১৭৫৭-তে। তা পার হয়ে আরও পিছনে, শোভা সিং যখন কৃষ্ণকুমারীর ছুরিতে মরেছিলেন সে আমলে। ওঁকে দেখছি, ইমোশনাল লোক। হয়তো ভাবছেন ডিনামাইট দিয়ে এই রাত্রেই সব চুরমার করে দেবেন। তারপর হয়তো ভাবছেন, না সব তিনি গভর্ণমেণ্টকে দান করে দেবেন। কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ হয়তো দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ছবির তলায় দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছেন। বলছেন—তোমার প্রবর্তন-করা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যারা আজ নাকচ করলে তাদের মধ্যে আমিও একজন। কোন জমিদার হয়তো একা বসে কাগজের উপর হিসেব করে দেখছেন কম্পেনসেশন কত পাবেন। কেউ কেউ গাল দিচ্ছেন যারা এটা করলে তাদের। এমন লোকও হয়তো এক-আধজন আছেন যাঁরা প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করছেন। কেউ যদি বাঈজী-বাড়ী গিয়ে শেষ উৎসব করেন তবে তাঁকে আমার সেলাম রইল। আমি এই ছবির আসর পেতেছি। ভেবেছিলাম সারা রাত একলাই এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরব! ভাগ্যক্রমে এমন জনকে পেলাম যাকে আমি চেয়েছি মনে মনে ছবিগুলো আঁকবার সময় থেকে টাঙাবার সময় পর্যন্ত।

হঠাৎ একটা লম্বা ছবি, যেটা টেবিলের উপর রাখা ছিল সেটা তুলে নিয়ে প্রথম ছবিটার ফ্রেমে ঠেকিয়ে বললে—এই আমার প্রথম ছবি সুলতা। কংসাবতীবারি-বিধৌত তট—বনচ্ছায়া-শীতল কীর্তিহাট নামক গ্রাম। ১৮০১ সাল।

প্রকাণ্ড বড় বড় ছবি। অয়েলে আঁকা। চার ফুট তিন ফুট বা তার চেয়েও বড়। সুন্দর ছবি। যেমন বর্ণাঢ্য তেমনি বিচিত্র টেকনিকে আঁকা। যেমন আমাদের দেশের

মন্দিরের ভিতর দিকে পোড়ামাটির কাজের মধ্যে কৃষ্ণলীলা রামলীলা ফোটানো হয় তেমনি ঢঙে আঁকা। গ্রাম নদী বন সব আছে পটভূমিতে। গ্রামের খড়ের চাল ঘরের চালগুলিতে সোনালী হলুদ রঙ চমৎকার লাগছিল, তারই মধ্যে সাদা একখানা পাকা বাড়ী। এও পটভূমির কোলে দ্বিতীয় পটভূমি। ছবিটার কেন্দ্র-বিন্দু পথ—পথের উপর পাল্কি চলছে। তার মধ্যে টোপর মাথায় মুকুট মাথায় বালক-বালিকা বর-কনে। বরের হাতে একখানা কাগজ।

তার পিছনে নরনারী। বাদ্যভাণ্ড। আসাসোঁটা হাতে বরকন্দাজ পাইক।

দেখছিল সুলতা।

সুরেশ্বর বললে—রায়বংশের প্রথম জমিদার সোমেশ্বর রায় ১৮০১ সালে দশ বৎসর বয়সে জমিদার হয়েছিলেন। বিয়ে করে তিনি গ্রামে প্রবেশ করছেন।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, বললে—ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

চকিত হয়ে উঠল সুলতা। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ?

সুরেশ্বর সেই মুহূর্তেই বললে—না, আমার ভুল হয়েছে। এখানে তো তুমি একা রয়েছ সুলতা! আর তো কেউ নেই!

তারপর হেসে বললে—আমার হঠাৎ মনে হয় ঘরখানা নরনারীতে ভরে গেছে! এমন ভুল আমার হয় মধ্যে মধ্যে। একটু আগে বলছিলাম, তুমিও জান, একটা পাগলামি আমাদের বংশে আছে। প্রথমে খেয়াল বলে চলে যায়, কিন্তু খেয়াল ততক্ষণই খেয়াল যতক্ষণ মাত্রা না ছাড়ায়। মাত্রা ছাড়ালেই হয় পাগলামি। আমার মাত্রা অনেক দিন ছাড়িয়েছে। তারপর কীর্তিহাটে গিয়ে সেটা আমার মন বুদ্ধি আমার বাসনা কামনাকে এমনভাবে অভিভূত করলে যে আমার সব বেঠিক হয়ে গেল। তার উপর প্রচুর মদ্যপান করতাম। সেটা তাকে বাড়িয়ে তুলত। আমি কল্পনায় নানান ছবি, নানা মানুষ দেখি অন্ধকার রাত্রে। দিনে দেওয়ালের গায়ে ছাদে চটে-যাওয়া পলেস্তারার মধ্যে দেখতে পাই নানান ছবি, নানান মানুষ। কখনও কখনও জীবন্ত হয়ে তারা কথা বলে। আজও আমার হঠাৎ মনে হল ছবির মানুষগুলো ছবি থেকে নেমে এসে ঘর ভরে বসেছে! এরা যে ঐতিহাসিক সুলতা, কাল্পনিক তো নয়। এদের অশরীরী আত্মা এসে বসেছে মনে হল। তারাও দেখতে এসেছে ছবিতে 'কীর্তিহাটের কড়চা'। শুনতে এসেছে সুরেশ্বরের জবানবন্দী!

সুলতার মনে হল সুরেশ্বর যেন কত দূরে—অনেক দূরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

## ২

একজন চাকর এসে ঢুকল হাতে ট্রে নিয়ে। নামিয়ে দিল সামনের টেবিলে। বুড়ো চাকর। সে সুলতাকে দেখে নমস্কার করে বললে—ভালো আসেন দিদিমণি?

সুলতা তাকে এবার চিনলে। এ তো সেই রঘু। রঘু বুড়ো হয়ে গেছে, চুল গোঁফ একেবারে সাদা হয়ে গেছে। সে বললে—তুমি তো রঘু!

—হ্যাঁ। তুমি রঘু। রঘুর বাংলায় এখনও হিন্দী টান যায়নি!

—এখনও আছো বাবুর কাছে? ভাল আছ?

—হ্যাঁ। ই বাবুকে ছোটা উমরসে মানুষ করলাম। কাঁহা যাই আর কেমন করে যাই ছোড়কে?

সুরেশ্বর কোন সাড়াই দিলে না। সে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। রঘু ট্রেতে চা এবং কিছু কেক মিষ্টি এনে নামিয়ে দিয়েছে। সে চায়ের কাপটা তুলে নিলে। চায়ের তৃষ্ণা এবং ক্ষিদেও তার পেয়েছিল। সুরেশ্বরকে জানে, সে হয়তো নাও বলবেই না। সেই বরং সুরেশ্বরকে বললে—চা নাও।

তেমনি ভাবে অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে—না। তারপর বলেই গেল—সুলতা, ভেবেছিলাম—১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করব। সে ছবিও আমার আঁকা আছে। কিন্তু দেখলাম তাহলে ১৯৪৭ সালে কড়চা শেষ করতে হয়। এবং তাতে রায়বংশের ভূমিকা ছোট হয়ে যায়। যাকে বলে সাইড ক্যারেক্টার তাই দাঁড়ায়। তারপর ভেবেছিলাম—ইম্পীচমেণ্ট অব হেস্টিংস ছবি দিয়ে শুরু করব। সে ছবিও আঁকা আছে। হাউস অব লর্ডসে ইম্পীচমেণ্টের পালা শেষে হেস্টিংস বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু মনে হল, তা হলে শেষ করতে হবে অন্ততঃ আরও একখানা বা দুখানা ছবি এঁকে। হেস্টিংস জবানবন্দী করেনি নিজে। সুরেশ্বর জবানবন্দী করছে, যাদের সামনে করছে, তাদের মধ্যে তুমি আছ, সে ছবি না-হলে শেষ হয় না। সে ছবি মনে কল্পনায় ছিল কিন্তু আঁকা হয়নি। তাই শুরু করেছি একেবারে বর-বেশী দশ বছরের সোমেশ্বর রায় জমিদার হয়ে কীর্তিহাটে ঢুকছেন সেখান থেকে। ১৮০১ সাল সেটা।

সতরো শো সাতান্নতে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলা হেরে গিয়ে নিমকহারামের দেউড়িতে মীরনের হুকুমে মহম্মদী বেগের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। তারপর মীরজাফর, তারপর মীরকাশেম নবাব কাশেম আলি খাঁ। উধুয়ানালা-ঘিরিয়া থেকে বকসারে শেষ। আবার মীরজাফর। এবার কোম্পানী দেওয়ানী পেলে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ। বাংলা ১১৭১-৭২ সাল। কোম্পানীর হাতে সব এল। মায় দেশরক্ষা পর্যন্ত।

পটভূমিটা তোমায় বোঝাচ্ছি সুলতা। ইতিহাসে তুমি পড়েছ। কিন্তু ইতিহাস ঘটনা বলে যায়, অবস্থার ভিতরটা বোঝায় না। এ বোঝানো বড় শক্ত!

আমি একখানা পুরনো পাচালীর পুঁথি পেয়েছি। সেখানা সোমেশ্বর রায়ের বাবা কুড়ারাম ভট্টাচার্যের লেখা।

ওগো মা শিবজায়া গো,
অধম সন্তানে কর দয়া গো
অন্তিমেতে অভয়া গো—
কুড়ারামে দিয়ো পদছায়া গো
হরজায়া গো!

মস্ত পাচালী। তার মধ্যে আছে সুলতা, সেদিন লোকে ইংরেজকে পরিত্রাতা ভেবেছিল।

* * *

মুসলমান আমলে বর্গী হাঙ্গামায় যে অত্যাচার করেছিল বর্গীরা তা তো জান। তবু সেকালে এক কবি মহারাস্ট্র পুরাণ লিখেছিল, তাতে আছে, পাপে সব পূর্ণ হয়ে গেছে দেখে স্বর্গ থেকে দেবতারা এসে বর্গী পেশোয়া থেকে নানান সেনাপতির মধ্যে তাঁদের শক্তি সঞ্চারিত করেছিল, দেশময় পাপীদের শাস্তি দিতে। এতেও তাই আছে—নবাবের সঙ্গে নবাবী আমল শেষ হতে অন্তত হিন্দু সমাজের সাধারণ লোক ইংরেজের উপর কৃতজ্ঞ হয়েছিল।

অত্যাচার তো কম হয় নি।

ওই পাঁচালীর গোড়াটা আমার মুখস্থ আছে। বলে সুরেশ্বর আবৃত্তি করে গেল—

কালে কালে পাপের ভারা পূর্ণ হইলে কাঁপে ধরা
ব্রহ্মা বিষ্ণু দিশেহারা যাচে তোমার দয়া গো।
হরজায়া গো।
তখন তোমার তা থৈ নাচে পাপী মরে পুণ্যাত্মা বাঁচে
পতি তোমার পদ যাচে শবরূপী হয়্যা গো
হরজায়া গো!
পলাশী ঘিরিয়া উধুয়ানালা হইল এমেতে নৃত্যশালা
ফুরালো নবাবী পালা সাহেবানে কৈলে দয়া গো।
হরজায়া গো!
রাঙা চুল লাল মুখ দেখিলে মা কাঁপে বুক
তবু মনে ভাবি সুখ সুবিচার প্যায়া গো।
হরজায়া গো!
সে পাঁচালী রচিতে সাধ হয়েছে দীনের চিতে
শিবরাম মম পিতে কুড়ারাম বাছা
কীর্তিহাটে আদি বাস বর্গী আইল মহাত্রাস
নবাবের সৈন্য নাশ, পালায় খুলে কাছা।
তারা পালাবার কালে গ্রামে গ্রামে অগ্নি জ্বালে
লুঠ করে মেরে ফ্যালে দরিদ্র প্রজারে
পিতা শিবরাম মরে অগ্নি জ্বলে বাস্তুঘরে
জননীর হাত ধরে বনে ও বাদাড়ে
পলাইয়া প্রাণ রক্ষা দ্বারে দ্বারে, অন্ন ভিক্ষা
তুমি কালী সর্বরক্ষা দিলে স্নেহছায়া গো
হরজায়া গো!
সে দয়াতে কুড়ারাম ফিরিল আপন গ্রাম
ভট্ট নয় রায় নাম কোম্পানীর কাছে পায়া গো
হরজায়া গো!
বর্ণিব সে সব কথা কোথায় জল মরে কোথা

ভিক্ষুকের রুখু মাথায় দিলে পাগ পরায়া গো।
হরজায়া গো!
তোমার মন্দির ক'রে তোমারে বসাই ঘরে
মাগি মাগো জোড় করে থাক অচলা হয়া গো।
হরজায়া গো!

অবাক হয়ে সুলতা শুনছিল। সুরেশ্বর চুপ করলে সে বললে—ওয়াণ্ডারফুল! সেটা আছে তোমার কাছে?

—আছে। জাল নয়। কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর সেরেস্তাখানা খুঁজতে খুঁজতে পেলাম এটা। সেটেলমেণ্টের জন্য কাগজ দেখতে গিয়ে রায়বংশের স্বরূপের কিছু ছবি' তখন পেয়েছি। তার মধ্যে এমন কিছু পেয়েছি যাতে আমি আমার বংশকে আমার রক্তকে চিনে যেমন শিউরে উঠেছি, তেমনি নেশাগ্রস্ত হয়েছি। তখনই পেলাম এটা।

এতে অনেক কিছু আছে সুলতা। সেদিনের বাংলাকে চেনা যায় জানা যায়। বোঝা যায়। সে বাংলা দেশ এ দেশ নয়! প্রথম ছবিখানিকে ভাল করে দেখ। বুঝতে পারবে। নতুন খড়েছাওয়া ছোট-ছোট ঘর, কোঠাবাড়ীও তখন সারা গ্রামে দুখানা বা একখানা। কীর্তিহাটে ১৮০১ সালের দশ বছর আগে প্রথম কুড়ারাম যে বাড়ী করেন সেখানাই গ্রামের প্রথম কোঠাঘর। পাচালীতেই আছে। তখন কুড়ারাম ভটচাজ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের দেওয়ান। ১৭৯১ সাল। ১৬৬০ পরগণার রাজস্ব স্থির করছেন, দশশালা বন্দোবস্ত হব। মেদিনীপুরের ময়নার পুরনো রাজবংশের তখন সম্পত্তি গেছে, সে সম্পত্তি গোয়ালপাড়া সরকারের ভুক্তান হয়ে কাশিজোড়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাশিজোড়াও তখন যাই-যাই করছে। ইতিমধ্যে কিছু লাট বের করে নিয়ে কোম্পানী বিলি করেছে, ছোট ছোট তালুকদারেরা নিয়েছে। কুড়ারাম তখন কলকাতার বাসিন্দে দেওয়ানজীর সঙ্গে। ঘর ছেড়েছিলেন বাপের মৃত্যুর পর আর ফেরেন নি! পাচালীতে আছে—

পরগণা ষোলশো ষাট কত মৌজা কত লাট
কত জল কত মাঠ কষি দিন রাত
তারই মাঝে চোখে পড়ে ময়না মেদনীপুরে
কাঁসাই নদীর পাড়ে তারই সাথে সাথ
কীর্তিহাট বাস্তুভিটা কি মাটি আঠালো চিটা
লাল চাল কত মিঠা—কাঁসাইয়ের পাড়ে ঘন বন
বামুন কায়েথ বদ্যি সদ্গোপ মাহিষ্য ছত্রি
চুয়াড় চামার মধ্যি আপনার জন।
রাত্রিকালে স্বপ্ন পাই, কীর্তিহাটে ফিরে যাই
খুঁজে ফিরি ভিটি তাই পাই বহু দুঃখে
হয়েছে জঙ্গল ঘোর শিয়াল চেঁচায় রাত্রিভোর
বহু হল কষ্ট মোর স্বপ্ন মাঝে বুকে।

সে হেতু বানালাম কোঠা মাটির দেওয়াল মোটা
শাল কাঠ দিয়ে গোটা মজবুদ চাল
শত তঙ্কা পুরাপুরি খোলা হাতে খরচ করি
হইলাম খুশী ভারী বাদে এতকাল !

সুলতা বললে—তুমি নিজে তৈরী কর নি তো ?

সুরেশ্বর বললে—অবিশ্বাস কর—কি বলব ? বাদপ্রতিবাদ করব না। প্রমাণ-প্রয়োগ হাজির করে ইতিহাস নিয়ে লড়াই করব না। শুধু বিশ্বাস করতেই বলব। পাণ্ডুলিপিতে বানান অনেক ভুল আছে। শব্দ দু-চারটে দুর্বোধ্য আছে। সে আমি পূরণ করেছি, হয়তো ভাষা কিছু আমার একালের জিহ্বায় একালের হয়ে গেছে। তবে তার কাহিনীটা শুনে যাও। ওই ছবিতে যে-পাকাঘরটা দেখা যাচ্ছে সেখানা সতেরো শো নিরানব্বইয়ে আরম্ভ হয়ে আঠারো শো সালে শেষ হয়েছে। মানুষেরা তখন আটহাতি ধুতি, কাঁধে গামছা ফেলে বেড়াত। খালি পা। ওই দেখ কজন ভট্টাচার্য রয়েছেন। তাঁদের পরনে দশ হাত ধুতি, তাও চল্লিশ ইঞ্চি, কাঁধে উড়ুনি। পায়ে তালতলার চটি। তাও শোভাযাত্রায় বেরিয়েছেন বলে। শুধু কুড়োরাম যাচ্ছেন ওই দেখ—পরনে লম্বা ধুতি গায়ে চাপকান তার উপর চাদর। মাথায় একজন ছাতা ধরে রয়েছে। তিনি জমিদার রায়বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের ডান হাত। পাল্কিতে সোমেশ্বরের হাতে যে কাগজখানা সেখানা জমিদারী নীলামে কিনেছেন তারই কাগজ !

কিছু কৌশল—বলতে গেলে চুরি, তাই বা কেন, ডাকাতি করে কিনেছেন লাট কীর্তিহাট। টাকা তিনি অনেক উপার্জন করেছিলেন। ঘুষ বল ঘুষ, উপরি বল উপরি। যা বলবে তাই মানব আমি।

তাইতো বলছিলাম—নিজের বংশের স্বরূপ দেখে আমার আমাকে যেন আমারই ভয় হয়েছিল সেদিন। শিউরে উঠেছিলাম। কিন্তু কুড়ারামকে দোষ দিই নি। কৃতী পুরুষ হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। হয়তো তোমার মতের সঙ্গে মিলবে না। তা না মিলুক। তা নিয়ে এ কৈফিয়তও দেব না যে, যারাই সংসারে বড় হয়, অন্তত বিষয়ের সংসারে, তারা কর আবওয়াব আদায় করে থাকেন। জোর করে যারা বাহুবলে রাজ্যজয় করে, অন্য দেশ লুঠ করে, তাদের কথা বাদ দিলাম সুলতা। কারণ তারা কারুর মতামতের ধার ধারে না। গ্রাহ্য করে না। কিন্তু যাঁরা তা না করেন, মানুষের প্রচলিত পথে বড় হন, তাঁরাও কিছুটা কর আদায় করেন। প্রভুত্ব অর্জন করলেই মানুষের আনুগত্যটা জমিদারী সেরেস্তার খাজনার উপর চাঁদার মত লোককে দিতেই হয়। না দিলে যাঁর যেমন প্রভুত্ব তেমনি পেনালটি আদায় না করে ছাড়েন না। মন্ত্রীদের কথা ভাবো না। মানে—স্বাধীনতার পরের মন্ত্রীদের কথা। এই তো স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত গুলি তো কয়েকবার চলল। লাঠিচার্জ তো বাদই দিচ্ছি। এবং এই পদ অর্জনের জন্য ভোট-ভোট করে পরস্পরের সমালোচনার নামে যে তত্ত্ব—সত্য মিথ্যা প্রকাশ পেলে তাই থেকে বিচার কর না। দেখ না, কত স্থানে কত প্রতিশ্রুতি। কতরকম প্রতিশ্রুতি। কোন দল বললে—সব জমিগুলো ওদের কাছ থেকে

কেড়ে নিয়ে তাদের দেব। কেউ বললে—তোমাদের জীবন সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে দেব। তার উপর তোমরা সত্যিকারের স্বাধীন থাকবে। তারপর এগাঁয়ে কুয়ো, ওগাঁয়ে ইস্কুল, ওগাঁয়ের রাস্তা—এসব খুচরো প্রতিশ্রুতি বা ঘুষ যাই বল না কেন—দেওয়ার তো হিসেব নেই। এর ছেলের চাকরী, ওর এটা, তার সেটা এ-সবের ফিরিস্তি নাই তুললাম। সুতরাং এ-ধরণের ব্যাপার চিরকাল আছে। ব্যাপারের ঢং পাল্টেছে। কিন্তু যাঁরা লোকনায়ক হলেন, তাঁদের অস্বীকার করব কি করে? কুড়ারাম ভট্টাচার্যকে তাই আমি অভিনন্দন জানিয়েছিলাম সেদিন।

কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পাচালী আমাকে খুব বেশী আকর্ষণ করত না বা এত মূল্য তাকে দিতাম না সুলতা যদি আমি আর একটা বিচিত্র এবং নিষ্ঠুর তথ্য আবিষ্কার না করতাম। তাতে তুমি জড়ানো সুলতা। অন্ততঃ তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরঙ্গ বন্ধন হবার কথা—প্রতিশ্রুতি দিয়েছি একরকম—তার মাঝখানে এই তথ্যটা এসে দাঁড়িয়ে আমাকে শিউরে দিয়েছিল। আমি সেই তথ্যটার অন্তরালে সত্য কি তাই আবিষ্কার করতে পুরনো কাগজ ঘাঁটকে দেখেছি সারাদিন—সেই ধুলা সর্বাঙ্গে মেখে ভূত হয়ে সন্ধ্যায় স্নান করে বিবি-মহলের ছত্রি-দেওয়া রেলিংঘেরা বারান্দায় বসে ভেবেছি।

সুলতা ভুরু কুঁচকে বিরক্তিভরেই বললে—কি বলছ পাগলের মত? আমার সঙ্গে কোথায় সম্পর্ক আবিষ্কার করলে?

—তোমার চারপুরুষের নাম জান সুলতা?

—কেন?

—বল! চারপুরুষ আগে তোমার পূর্ব-পুরুষের কারুর নাম ছিল ঠাকুরদাস পাল।

—ঠাকুরদাস! হ্যাঁ, ঠাকুরদাস ঘোষ।

—হ্যাঁ। তখন তিনি পাল ছিলেন। তাঁর ছেলে ছিল জগন্নাথ পাল! তিনি ঘোষ হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে নরেশ ঘোষ কলকাতায় অ্যাডভোকেট হয়েছিলেন। তিনিই ব্রাহ্ম হন। তাঁর ছেলে তোমার বাবা আর সি ঘোষ, রমেশচন্দ্র ঘোষ ব্যারিস্টার।

অবাক হয়ে সুলতা তাকিয়ে রইল সুরেশ্বরের মুখের দিকে।

সুরেশ্বর বললে—ঠাকুরদাস ছিলেন' আমার প্রপিতামহের বড়ভাইয়ের মত, ভক্তের মত। তাঁর বাড়ী ছিল কীর্তিহাট থেকে পনের-বিশ ক্রোশ দূরে, হুগলী জেলায়, গঙ্গার ধারে শ্যামনগরে। আমার প্রপিতামহের বিবাদ হয়েছিল তাঁর মামা বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে। বীরেশ্বর রায় দুর্দান্ত পুরুষ। সেই বিবাদে, আমার প্রপিতামহকে ঠাকুরদাস পাল জীবন বিপন্ন করে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তার জন্যে তাঁর প্রথম পক্ষের সংসার স্ত্রী-পুত্র সব পুড়ে মারা গিয়েছিল। আমার প্রপিতামহই আবার তাঁর বিবাহ দেন। সেই ঠাকুরদাস পাল, সুলতা, খুন হয়েছিলেন। কাগজ দেখতে দেখতে সন্দেহ হল—সে খুন করিয়ে ছিলেন আমার প্রপিতামহ। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। শরীরের রক্ত যেন বিষ হয়ে গেল সুলতা। মাথার খেয়াল যাদের থাকে, মস্তিষ্কের উগ্রতা তাদের স্বাভাবিক। সেই উগ্রতা চিন্তায় চিন্তায় এমন উত্তপ্ত হল যে, আমি পাগলই হয়ে গেলাম। আমার এই উদ্ভট মন যাকে লোকে খেয়ালী

বলে পাগল বলে, তার পাগলামি জাগল—আমি সুলতার পাশে দাঁড়াব কি বলে ?

সুলতা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

ক্লক-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দশটা বেজে গেল। সুলতা বললে—বল। থামলে কেন ?

* * * *

সুরেশ্বর বললে—খুন তিনিই করিয়েছিলেন। আমার প্রপিতামহ, তোমার পূর্ব-পুরুষকে।

—কেন ? জমিদারীর ব্যাপারে ?

—সে সুদীর্ঘ কথা সুলতা। সেই তো কীর্তিহাটের কড়চা। সেই তো আমার জবানবন্দী। গোটা রায়বংশ তার সঙ্গে জড়ানো। জমিদারীর দায়ে তিনি খুন করাননি। জমিদার ছিলেন বলেই খুন করিয়েছিলেন। করাতে পেরেছিলেন। সংসারে বংশ-গৌরব, জন্ম-গৌরবের মূল্য সব মানুষেরই আছে। অনেক বিদগ্ধ মানুষের কাছে শুনবে—পাঁচপুরুষ সাতপুরুষ আগে হয় পূর্বপুরুষ রাজা ছিল—নয় সিদ্ধপুরুষ ছিল, নয় কোন অবিস্মরণীয় মানুষ ছিল। কিন্তু এই বংশগৌরব যখন সম্পদের আর বিষয়ের সঙ্গে একসঙ্গে হয়, তখন সে হয় যত দীপ্ত তত উত্তপ্ত! দীপ্তি যখন কেউ ম্লান করে দিতে চায়, তখন তাকে উত্তাপ দিয়ে পুড়িয়ে মারে। সম্পদ যার না থাকে, তাদেরও এতে উন্মত্ত হবারই কথা। কিন্তু এখানে সম্পদবিষয়ও ছিল জড়ানো। বিষয়—মাতৃকুল-পিতৃকুল, মাতামহ-পিতামহ, পিতা-মাতা রত্নেশ্বর নিজে সকলে এতে জড়িয়েছিলেন। কিন্তু কলঙ্কই বল আর অগৌরবই বল, সবটাই ভ্রান্তিবশে একটি অকিঞ্চিৎকর সত্যকে গোপন করতে গিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন নিজেরাই! তাঁরা সত্যকে প্রকাশ করতে পারেন নি, সেই সত্যকে প্রকাশ করে জবানবন্দী দিয়ে আমি মুক্ত হতে চাই।

হাসলে সুরেশ্বর। তারপর সে ঠাণ্ডা চায়ের কাপটা তুলে নিলে।

সুলতা বললে—ওটা জল হয়ে গেছে।

রেখে দিলে সুরেশ্বর।

সুলতা ডাকলে—রঘু!

রঘু ঘরের দরজার ওপাশেই বোধহয় বসে বসে ঢুলছিল। এ অভ্যাস তার আছে। সুরেশ্বরের প্রতি তার মমতা আসক্তি—উদরান্নের দায়ে নয়—এর মধ্যে একটা নেশা আছে। খেয়ালী সুরেশ্বরকে মানুষ করে তার রূপ-গুণ-দোষ-ত্রুটি সবের নেশায় পড়েছে; সব থেকে বেশী সুরেশ্বরের খেয়ালীপনার অত্যাচারের নেশা। সে তাকে ছাড়তে পারে না। সুরেশ্বর ছবি আঁকে, সে দাঁড়িয়ে তুলি-রঙ এগিয়ে দেয়—ধরে। সুরেশ্বর বাজনা বাজায়, সে দরজার পাশে বসে শোনে। সুরেশ্বর মদ্য পান করে, সে উপকরণ তৈরী করে সন্ধ্যা থেকে। সুরেশ্বর রাত্রি জেগে বসে ভাবে, নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে বসে বসে ঘুমোয়, কিন্তু সামান্য শব্দে জেগে ওঠে!

রঘু এসে সামনে দাঁড়াল।

সুলতা বললে—একবার চা কর রঘু। তোমার লালবাবু চা খান নি, জুড়িয়ে গেছে।

রঘু বললে—চা খাবে এতো রাতে ? উটা খাবে না ?

—না।

স্থলতা বললে—কি ? ব্র্যাণ্ডি-হুইস্কি ? আমি তো জানি তুমি খাও। তা খাও না !

—না স্থলতা। আজ আমি এমন একটা কথাও বলতে চাইনে, যার উপর কোন মাদকের একবিন্দু প্রভাব পড়ে। চা নিয়ে আয় রঘু।

—তাই আন তাহলে। এক কাজ কর। বেশী করে তৈরী করে ফ্লাস্কে পুরে দাও। দরকার মত আমরা ঢেলে নেব। আর চল. আমি একটা ফোন করব।

স্থলতা, রঘু চলে গেল। স্থরেশ্বর এসে কাচের জানালায় দাঁড়াল রাস্তার দিকে চেয়ে। সামনে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট।

রাস্তাটা নির্জন হয়ে এসেছে। মধ্যে মধ্যে রিক্সা যাচ্ছে—আর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে দু-চার জন ফিরিঙ্গী এবং লুঙ্গীপরা মুসলমান। এ রাস্তাটায় এদের বাসই বেশী। রাণী রাসমণির শ্বশুর প্রীতিরাম মাড়ের কাছে জমি সংগ্রহ করেছিলেন কুড়ারাম ভট্টাচার্য। এক বিঘা জমি ব্রাহ্মণকে দিয়েছিলেন তাঁরা।

কুড়ারাম অর্থ উপার্জন করে জমিদারী কিনেও তাঁর বাল্যকালের অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি। প্রথম জীবনটা গেছে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে। বাপের মৃত্যুর পর মায়ের হাত ধরে পথে পথে বেড়িয়েছেন ভিক্ষা করে। মা বেশী দিন বাঁচেননি। ঘর থেকে বেরিয়ে ছ'মাসের মধ্যেই আত্ম-হত্যা করেছিলেন। কাল হয়েছিল তাঁর রূপ। ভট্টাচার্য-বংশে রূপ আছে অনেকদিন থেকে। গৌরবর্ণ রঙ, ব্রাহ্মণপণ্ডিতি চেহারা। এটার অবশেষ কীর্তিহাটের বিশ-ত্রিশ ঘর ভট্টাচার্যের বাড়ীতে আজও আছে। কুড়ারামের মা রূপের সে প্রদীপশিখাকে আরও উস্কেই শুধু দেন নি, সে প্রদীপে কিছু ঘৃতসিঞ্চনও করেছিলেন। তাঁর রূপ ছিল প্রতিমার মত।

হেরে পালালো—হিজলীর নবাবের সৈন্যরা ঘর জ্বালিয়ে লুঠে শিবরামকে হত্যা করে যেদিন রাত্রে, সে রাত্রে প্রথমেই ছেলের হাত ধরিয়ে স্ত্রীকে শিবরাম জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নিজে ছিলেন কিছু ঘুষ দিয়ে ঘরটাকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু তারা সব লুঠে ঘর জ্বালিয়ে তাঁকে হত্যা করে চলে গিয়েছিল। কুড়ারামের মা গ্রামে পরদিন ফিরে স্বামীর সৎকার করে আশ্রয়ের জন্য গ্রামের লোকের সঙ্গেই পথে বেরিয়েছিলেন—গোধা গ্রাম পুড়ে গেছে। সবাই নিরাশ্রয়। তার উপর বর্গীর ভয়। কিন্তু বর্গীরা এদিকে আসে নি, তারা চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর দিগনগর খিরপাই হয়ে চলে গিয়েছিল বর্ধমানের দিকে। পাঁচালীতে আছে—

"তবে কোন কোন গ্রাম বর্গী
দিল পুড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম শুন
মন দিয়া।
চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর আর দিগনগর খিরপাই পোড়ায়ে যায় বর্ধমান শহর।

লোকে ভাগীরথী পার হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল নানান স্থানে। হুগলী জেলায় গিয়ে

উঠেছিলেন কুড়ারামের মা ছেলের হাত ধরে। কটা ছেলে মরে হয়েছিল কুড়ারাম—কয়েকটি সন্তানের জননী কুড়ারামের মা, কিন্তু রূপ তাঁর যথেষ্ট ছিল। ছেলেও রূপবান। তাঁদের দেখে মমতা করে আশ্রয় দিয়েছিলেন একটি বর্ধিষ্ণু ঘরের প্রবীণা মহিলা। রান্নার কাজ দিয়েছিলেন। কুড়ারামকে দিয়েছিলেন পূজার ফুল তোলার কাজ।

মাস ছয়েক পর মা তার একদিন রাত্রে গলায় দড়ি দিয়েছিলেন।

কুড়ারাম জানত—তার মাকে উত্যক্ত করে তুলেছিল ওই বংশের একটি ছেলে। সে বুঝতে পারত। প্রথমটা নিরাপদেই ছিল—ওই বৃদ্ধা গৃহিণীর কৃপায়। তিনি তার মাকে আপনার ঘরে নিয়ে শুতেন। তিনি মারা গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধ শান্তি চুকতেই একদিন রাতে মা চীৎকার করে উঠলেন। সে ঘুমিয়ে ছিল। ঘরের একটা দরজা খোলাই শুধু দেখেছিল—আর কিছু সে দেখে নি—মা উদ্‌ভ্রান্তের মত হাঁপাতে হাঁপাতে দরজাটায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দরজাটার খিল ছিল না। তারপর সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে দেখেছিল তার মা ঘরে নেই। বাইরে অনেক গোলমাল। ওই বাড়ীরই খিড়কীর পাড়ের একটা গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মা ঝুলছেন। কুড়ারাম মায়ের সৎকারও করে নি। ভয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল।

তারপর ভিক্ষা করত। রাত্রে কোন গ্রামে কারুর দাওয়ায় কিম্বা গাছতলায় খুঁজে নিত আশ্রয়। একান্ত অনাহূতের মত। এরই মধ্যে আবার একটা আশ্রয় তার মিলল। সেও তার রূপের জন্য। সে এসে পড়েছিল হুগলী শহরে।

তখন মস্ত শহর হুগলী। হুগলীতে নবাবের ফৌজদার থাকেন। রাজা তখনও হন নি—বাবু নন্দকুমার তখন হুগলীর ফৌজদার। হুগলীতে তখন ইংরেজদের কুঠী। তখন সুতানটিতে তারা নতুন শহর পত্তন করে কুঠী তৈরী করে কলকাতা নাম দিয়েছে বটে, কিন্তু হুগলীর তখনও খুব জম-জমাট। পাশেই চুঁচড়োতে ওলন্দাজদের কুঠী ও আড্ডা। চন্দননগরে ফরাসীরা রয়েছে। দিনেমাররা শ্রীরামপুরে। এর সঙ্গে আরমানী মুসলমান ব্যবসাদাররা আছে। এ এক নতুন রাজ্যে এসে পড়েছিলেন কুড়ারাম। ব্রাহ্মণের ছেলে, ছেলেমানুষ, একটা ভয় তাঁর ছিল। এই ম্লেচ্ছের শহরে এসে কোথায় জাত চলে যাবে। সেই ভয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন দেবস্থলে। চুঁচড়োর ষাঁড়েশ্বরতলায়। এই রূপবান খুদে বামুনের ছেলেটিকে যাত্রীরা সমাদর করত। মেয়েরা বামুন করে খাওয়াতো, কিছু দক্ষিণে দিত। ওখানেই কিছু মন্ত্রতন্ত্র শিখেছিলেন। সেই শেখার দায়ে লেখাপড়াও, কিছুটা বাংলা, কিছু মুখস্থ করে সংস্কৃত পড়ে এই জীবনের গোড়া-পত্তন করে নিয়েছিলেন।

সময়টা তখন কিন্তু মানুষের সুখে-শান্তিতে বাঁচার পক্ষে নিরাপদ ছিল না। বর্গী গিয়েছে। কিন্তু তারপর থেকেই এই সব সাহেবান লোক, এই শান্ত নিরীহ দেশের বুকে নিদারুণ দাপাদাপি শুরু করলে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। নবাবের সঙ্গে ঝগড়া এসব লাগিয়েই রাখলে। আজ ফরাসীর সঙ্গে ইংরেজের ঝগড়া হয়, ইংরেজরা চন্দননগরে গিয়ে কামান দাগে, কাল ফরাসীরা হামলা করে।

এরই মধ্যে খবর রটল—নবাব আলীবর্দী খাঁর ইন্তেকাল হয়েছে, তাঁর নাতি সিরাজুদ্দৌলা

নবাব হয়েছেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজদের ওপর চটা। ফরাসীদের সঙ্গে আঁতাত বেশী। সুতরাং হুগলী অঞ্চলের অনেক লোক মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। তখন কুড়ারাম ভট্টাচার্যের বয়স পনের-ষোল। তিনি ঠাকুরের স্থান ছাড়েননি বটে কিন্তু এ এলাকা ছাড়িয়ে অন্য এলাকাতে আসা-যাওয়া শুরু করেছেন। এদেশে তখন অনেক ছোটখাটো বিদেশী ব্যবসাদার ব্যবসা করে যারা লিখতে পড়তে জানে না। এদের মধ্যে মুসলমান বেশী। আফগানিস্থান, পারস্য, আরব দেশ থেকে এদেশে এসে কাঁধে করে মাল বয়ে ব্যবসা শুরু করে; খাতা একটা রাখে, তাতে ধারে মাল যাদের দেয়, তাদের নাম লিখিয়ে নেয় অন্যকে দিয়ে। এবং এ থেকেই তারা কেউ কেউ হয়েছে ইতিহাস-বিখ্যাত মীরহাবিবের মত রাজনীতি ক্ষেত্রের ধুরন্ধর। ব্যবসার ক্ষেত্রে বড গদী ফেঁদে বসে ধনী হয়েছে এমন লোকও অনেক আছে। বাংলাদেশে কাবুলীরা এখনও আছে। সুরেশ্বর যখন কীর্তিহাটে প্রথম যায় পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে, তখন কাবুলীওয়ালাদের টাকা আদায়ের সময়। সে তাদের লাঠি এবং খাতা হাতে ঘুরতে দেখেছে। সে-খাতা বাংলায় লেখা!

সে আমলে এ ধরণের ব্যবসাদার ছিল প্রচুর। এই কুড়ারাম ভট্টাচার্য তাদের খাতা লিখে দিতেন। এই কর্মযোগেই তিনি চেষ্টা করে পারসী লিখতে-পড়তে শিখেছিলেন।

কুড়ারামের রূপ শুধু দেহেই ছিল না তাঁর হাতের লেখাতেও রূপ ছিল। লেখা ছিল গোটা গোটা ছাপার হরপের মত। ফলে দেবমন্দিরের যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের দান ও দক্ষিণার এলাকা ছেড়ে সামনে এই শহরগঞ্জের মুনাফার প্রশস্ত ক্ষেত্র তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকে অনায়াস প্রবেশাধিকার দিয়েছিল। তিনি ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীর গদীতে মুন্সী নিযুক্ত হয়েছিলেন মাসিক পাঁচ সিকা তঙ্কা বেতনে। এখানে তিনি পাকা হিসাবনবীশ হয়ে ওঠেন। তখনও বয়স বিশ হয় নি। সেই সময়ে খবর রটল নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা দখল করে কেল্লা উড়িয়ে দিয়েছেন। ইংরেজরা পালিয়েছে ফলতার ওদিকে। হুগলীতেও কি-হয় কি-হয় অবস্থা। বহুজন কারবার বন্ধ করে পালাচ্ছে। হাঙ্গামা মিটলে আসবে, খুলবে।

কুড়ারামও সরে এসেছিলেন হুগলী থেকে। গঙ্গার স্রোত এবং বাদশাহী শড়ক এই দুটো পথ থেকে যে যতদূর যেতে পারে, সে তত নিরাপদ। লোকে তাই পালাচ্ছিল। কুড়ারামও হুগলী থেকে সরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারকেশ্বরে। আবার ধরেছিলেন দেবতাকে। এখানে থাকতেই খবর পেয়েছিলেন, পলাশীতে নবাবের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর লড়াই হয়ে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেছে। নবাব সিরাজুদ্দৌল্লা হেরেছেন। শুধু তাই নয়, হেরে তিনি পালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর বেগমকে নিয়ে কিন্তু ভগবানগোলা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনে, নতুন নবাব সিজাজুদ্দৌলার সিপাহসালার মীরজাফর আলী খাঁয়ের ছেলে মীরন তাঁকে খুন করিয়েছে। সুতরাং এখন মোটামুটি আর লড়াইটড়াই হবে না। এবং ইংরেজ কোম্পানীরই এখন পাশার দানের পোওয়া বারো। যে যেখানকার সে সেখানে ফিরল। হুগলীতে বরং বেশী লোক ফিরল। কিন্তু কুড়ারাম ফিরলেন না। তখন তাঁর জীবনে যৌবনের নেশা লেগেছে। তিনি তারকেশ্বর মন্দিরে পূজক-পুরোহিতদের আশ্রয়েই ছিলেন। পুজোয় সাহায্য করতেন। লোকরঞ্জনে ক্ষমতা ছিল। উপার্জন বলতে গেলে সামান্য। কিন্তু ওই তারকেশ্বরে আসত এক

সম্পন্ন ঘরের কিশোরী কন্যা। তার মানত ছিল। আসত সে সপ্তাহে দু'দিন করে। রূপবতী কিশোরী। কোষ্ঠীতে আছে চৌদ্দ বছরে বৈধব্যযোগ। এইজন্যই তারকেশ্বরে নিয়মিত অর্চনার সংকল্প ব্রতের মত পালন করে। প্রাচীন জমিদার বংশ। কিন্তু সম্পদ এখন যাবার পালা। তাতেও অবশ্য কম কিছু নেই। বাড়ীতে হাতী আছে। পাল্কি আছে। চাকরানভোগী বেহারা আছে। ঘোড়া তো আছেই। ও অঞ্চলে নামডাক যথেষ্ট। লোকে রাজাই বলত। তাঁর ওই একটি কন্যা। কুড়ারাম এই কন্যার রূপে মুগ্ধ হলেন এবং নিজের রূপ এবং ব্রাহ্মণবংশের বৈশিষ্ট্য-গৌরবে মনেও করলেন না যে, ব্রাহ্মণ-পুত্র হলেও তিনি রাখাল এবং সে রাজকন্যা।

মেয়েটিও মুগ্ধ হয়েছিল।

পাঁচালীতে তাই বলেছেন কুড়ারাম।

দুরু দুরু কম্পে বুক হস্ত কম্পে শুষ্ক মুখ
বাক্যবদ্ধ হইনু মুক আশীর্বাদী দিতে
মিটি মিটি কন্যা হাসে কপট রোষের ভাসে
বোবা ঠাকুরের পাশে পুষ্প নারি নিতে।
চোখের পলক ঠারি জানাইয়া দেয় কুমারী
মন সমর্পণ করি দিয়াছি তোমাকে।
আমি পাগল হইলাম তারকেশ্বরে ধেয়াইলাম
পূর্ণ কর মনস্কাম পাওয়াও কন্যাকে।

কিন্তু তারকেশ্বর সে মনস্কামনা পূর্ণ করেন নি। বরং কপালে লিখেছিলেন লাঞ্ছনা। দাস-চারেক মধ্যে কথাটা প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে আসতেন বৃদ্ধা ঠাকুমা, দাসী, পাইক, গোমস্তা। ঠাকুমাই নাতনীকে নিয়ে পূজার্চনা করাতেন, দাসীও থাকত অবশ্য একটু দূরে। ক্রমে ক্রমে ইসারা-ইঙ্গিত থেকে কথাবার্তাও হয়েছিল। বুড়ী ঠাকুমা এই রূপবান যুবককে দেখে ভুলেওছিলেন। তাঁর ক্রমে ক্রমে ধারণা হচ্ছিল—বাবা তারকনাথই এই কুড়ারামের ছদ্মবেশে বা কুড়ারাম হয়ে জন্মে তাঁর নাতনীর বর হতে এসেছেন। পাঁচালীতে তার বর্ণনা আছে।

ইসারা-ইঙ্গিত হইতে হাতে হাতে ছুঁতে ছুঁতে
দোঁহে যায় মজি দুঁহুতে ঠাকুমাও বোঝে।

এই ঠাকুমাই বলেছিলেন ছেলেকে—দেখ, এই ছেলেই বুঝি বর। এরই সঙ্গে বিয়ে দে। একেবারে সাক্ষাৎ শিব রে, সাক্ষাৎ শিব!

কিন্তু ছেলে তাতে তুষ্ট তো হন-ই নি—রুষ্ট হয়েছিলেন প্রচণ্ডভাবে। একটা পুজুরী বামুন—ওই পাণ্ডাশ্রেণীরও চাকর, সে হবে তাঁর জামাতা! তিনি মুখে কিছু বলেন নি মাকে। কিন্তু কন্যা ও মায়ের পরের আসবার নির্দিষ্ট দিনের আগেই হাতী চড়ে এসেছিলেন এবং মোহন্তের সঙ্গে কথা বলে গিয়েছিলেন। মহান্ত তারকেশ্বরের মহান্ত, তিনি কুড়ারামকে ডেকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে অপমান ও লাঞ্ছনার শেষ রাখেন নি। দেবতার পূজা সেবা করতে গিয়ে যাত্রী কুমারী কন্যার উপর পাপদৃষ্টি দাও তুমি পাষণ্ড! তুম বদমাস শয়তান, পাপী হো। তারপর

হুকুম দিয়েছিলেন—সেইদিনই সূর্যাস্তের পূর্বে সে যেন তারকেশ্বর ছেড়ে চলে যায়। না গেলে দুনিয়াতে সে আর থাকবে না। তাতেই ক্ষান্ত হন নি ; পাইক সঙ্গে দিয়ে হুগলী পর্যন্ত তাকে তাড়িয়ে রেখে আসবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

হুগলী এসে তিনি কয়েকদিন মুহ্যমান হয়ে পড়ে আবার মহোদ্যম নিয়ে অর্থোপার্জনের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়ে ওই কন্যাকে তিনি বিবাহ করবেন। ব্যবসা তিনি পারবেন না তা জানতেন। তিনি চেয়েছিলেন চাকরী। এমন চাকরী যাতে মাইনেটা কিছু নয়, তার থেকে অনেক বেশী পাওয়া যায় ঘুষ। ঘুষকে তখন ঘুষ বলত না। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম ছিল। পাইকের উপরি—তলবানা। গোমস্তার উপরি—তহুরী। নায়েবের—নায়েব সেলামী। আমলাদের—পার্বণী। দালালের-দালালীর উপরেও দস্তুরী। সাহেবের—ভেট। ডালি। কুড়ারাম বেছে বেছে জমিদারী সেরেস্তা পছন্দ করেছিলেন এবার এবং এসে উঠেছিলেন প্রাচীন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ জমিদারী বাড়ী বাঁশবেড়ের কাছে। দাতার বংশ —নিত্য প্রভাতে উঠে ব্রাহ্মণকে নিষ্কর দিতেন কিছু। বাঁশবেড়ে জমিদারদের রাজা খেতাব আজও লোকসমাজে বহাল আছে। সকলে রাজার কাছে দর্শনপ্রার্থী হলে রাজা বলেছিলেন—তাই তো ঠাকুর, সাক্ষাৎ দেবতার মত তোমার রূপ, তা বিলম্বে এলে! এক্ষুনি যে নিয়মমত দান একজন নিয়ে গেল বাবা। তুমি কাল এস।

কুড়ারাম বলেছিলেন—হুজুরের কাছে নিষ্কর দানপ্রার্থী হয়ে আসি নি আমি। আমি একটি কর্মপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

—কর্ম ? তা দেবকর্ম লোকজন তো যথাযথ রয়েছে এখন। তা—

হাতজোড় করে কুড়ারাম বলেছিল—দেবকর্ম আমি জানি হুজুর। কিন্তু তার প্রার্থনায় আসি নি ঠিক। এসেছি হুজুরের সেরেস্তাখানায় কোন কর্মের জন্য। আমি পার্সী জানি, বাংলা জানি, হিসাবনিকাশ রাখতে পারি।

—বল কি! কই তোমার হস্তাক্ষর দেখি!

হাতের লেখা দেখে খুব খুশী হয়ে কাজ দিয়েছিলেন তিনি। এখানে বছরখানেক কাজ করে পাকা জমিদারী সেরেস্তার পাটোয়ার হয়ে উঠেছিলেন। আমীনের কাজ তাও শিখেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে খবর তিনি পেয়েছিলেন যে, সেই কন্যার বিবাহ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। শুনে প্রথম ভেবেছিলেন, কাজকর্ম ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। কিন্তু কয়েকদিন পর মদ্যপানে দীক্ষা নিয়ে এই বিরহ ভুলেছিলেন। পাঁচালীতে লিখেছেন—

ভুলিতে বিরহ জ্বালা লইনু জপের মালা
ভরিয়া নারিকেল মালা খাইনু কারণ
পাইনু সান্ত্বনা তাতে জননী চরণ প্রসাদে
কর্ম করি সাথে সাথে হয় উপার্জন।

সুরেশ্বর হাসলে। এই ধরণের শক্ত বস্তুনিষ্ঠ মানুষ না হলে কুড়ারাম ভটচায বাংলার জমিদারী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অজ্ঞাতনামা কীর্তিমান ব্যক্তি হতে পারতেন না। রায়বংশ

প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। তবে তাঁর এই পথে কঠিন পরিশ্রমে দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়ার কারণটা বোধ হয় ছিল এই কন্যাটির পিতৃবংশের সর্বনাশ। সেটা তিনি সচেতন মনে জানতেন না বোধ হয় তবে অচেতন মনের গভীরে ছিল এই বাসনা। না হলে তিন বছর পর যখন খবর রটল নবাব জাফর আলিকে নবাবী গদী থেকে নামিয়ে কোম্পানী তাঁর জামাই মীর্ মহম্মদ কাসেম খাঁকে তক্তে বসাচ্ছেন এবং কাসেম খাঁ খুব কাজের লোক তখন বাঁশবেড়ের চাকরী ছেড়ে তিনি মুরশিদাবাদ রওনা দিতেন না। বাঁশবেড়ের কর্তাই তাঁকে সুপারিশপত্র লিখে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন কান্দীর উত্তররাঢ়ী কায়স্থবংশের সন্তান নবাব সরকারের কানুনগো ( তখন নাম ছিল বঙ্গাধিপ ) প্রাণগোবিন্দ সিংহের কাছে। কুড়ারামের হাতে তখন পাঁচ হাজার টাকা জমেছে। তখনকার দিন, পথ নিরাপদ ছিল না। তারপর নবাব বদলের কাল। কুড়ারাম হুগলীতে গিয়ে কোম্পানীর কুঠীতে টাকাটা জমা দিয়ে বরাত নিয়েছিলেন কাসিমবাজারের কুঠীর উপর।

মুরশিদাবাদে এসে পড়েছিলেন মরসুমের সময়। নবাব কাসেম আলি খাঁ তখন শ্বশুর মীরজাফরের আমলের যত বিশ্বস্ত কর্মচারী তাদের প্রত্যেককে হিসাবনিকাশের দায়ে ফেলে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছেন। জাফর আলীর রাজস্ব বিভাগের কর্তা ছিলেন কিনুরাম এবং মণিলাল। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষান্ত হলেন না, তাদের প্রাণদণ্ড দিলেন। ছ বহন হরকরা জাফর আলীর পেয়ারের হরকরা ছিল। তারও দশা হল তাই। এমন কি হারেমের দাসীবাদীরাও দায়ে পড়ল। রাত্রে কান্না শোনা যেত। তামাম অবস্থাপন্ন কর্মচারীর তখন হিসাব হচ্ছে, সুমার হচ্ছে পরগনাওয়ারি। নতুন বিচক্ষণ পাটোয়ারের প্রয়োজন হয়েছে নবাব সরকারে। প্রাণগোবিন্দ সিংহের নির্দেশমত নবাবের প্রিয়পাত্র মুৎসুদ্দিদের প্রধান আলি ইব্রাহিম খাঁর বিশ্বাসভাজন মুন্সীর হাতে এক হাজার টাকা নজরানা দিয়ে কানুনগোদের অধীনে কর্ম পেলেন কুড়ারাম। পেলেন প্রাণগোবিন্দ সিংহের অধীনে নয় তাঁর ভাই কানুনগো গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অধীনে।

শুধু কর্মই পান নি। জীবনে প্রথম সঙ্গিনীও জুটে গিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যার পর কানুনগো গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যাচ্ছিলেন কান্দী মোকাম। খাগড়া ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠবেন পাল্কিতে। পাল্কিবেহারা সিপাহী পাইক সেখানে হাজির থাকবে। গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত তিনি সিংহজীকে নৌকায় তুলে দিতে গিয়েছিলেন। ফিরবার পথে তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর। লালবাগ মুরশিদাবাদের পর বাকী সবই তখন পল্লীগ্রাম্। অন্ধকার পথ। গঙ্গার ধারে সিদ্ধির জঙ্গল। বড় বড় আমবাগান। পথের দুধারেও জঙ্গল। তিনি সন্তর্পণে আসছিলেন একলাই। জীবনের প্রথম থেকে পথে পথে ঘুরে গাছতলায় রাত্রি কাটিয়েছেন তিনি, দুঃসাহস তাঁকে যেন আশ্রয় করেছিল ভাগ্যফল হিসাবে। হাতে ছিল এক গাছি গুপ্তি লাঠি। লাঠি হিসাবেও মজবুদ। একেবারে ডগায় পরানো ছিল লোহার বোলো। হঠাৎ এক সময় কে যেন ছায়ামূর্তির মত উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে একেবারে তাঁর উপরেই আছড়ে পড়েছিল। ধাক্কাটা আচম্বিতে অতর্কিতে। পাশের একটা বাগান থেকে বেরিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে ওপরের জঙ্গলে ঢুকবার মতলব ছিল তার। কিন্তু কুড়ারামের উপর আছড়ে পড়ল। কুড়ারাম পড়ে

গেলেন, সেও পড়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য হলেন কুড়ারাম, যার ধাক্কা খেয়েছেন সে অত্যন্ত হাল্কা মানুষ, হাল্কাও বটে কোমলও বটে, হয় বালক না হয় স্ত্রীলোক। আঘাত তিনি পান নি, পড়েই গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে তিনি তাঁর গুপ্তিটা কুড়িয়ে নিয়ে ডান হাতের মুঠোয় ধরে বললেন—কৌন হো তুম ?

উত্তর পান নি। দেহটা প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। তখন হেঁট হয়ে তার গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে বুঝেছিলেন সে স্ত্রীলোক। গন্ধেও বুঝেছিলেন। চুলের গন্ধ পেয়েছিলেন। আবার নেড়ে দেখেছিলেন তার মুখ, নাকের কাছে হাত দিয়েছিলেন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কিনা দেখবার জন্য। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছিল। তার সঙ্গে হাতে ঠেকেছিল বেসর। নাকের বেসর। মুসলমানী ?

এবার পোশাক নেড়ে দেখছিলেন। হ্যাঁ, গায়ে কাঁচুলি ওড়না রয়েছে। কি করবেন ভেবে পান নি। ফেলে চলে যাবেন ? যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু দুঃসাহসী নব-যুবক কুড়ারাম এই রাত্রে নির্জনে এমন একটি বিচিত্র রোমান্স ত্যাগ করে যেতে পারেন নি। তাকে ধরে তুলতে গিয়েছিলেন। তৎক্ষণে সে কাতরে বলে উঠেছিল—ছোড় দো মুঝে ছোড় দো। খোদা কসম কুছ্ নেহি মেরি পাস।

কুড়ারাম বলেছিলেন—লেঃ বাবাঃ! যা ভেবেছি। প্যাঁজ রসুনের গন্ধ বাবা! উঃ!

সঙ্গে সঙ্গে সে বলেছিল খাঁটি বাংলায়—তোমার পায়ে পড়ি। তোমার পায়ে পড়ি।

কুড়ারামের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বলেছিলেন—কে তুমি ?

—তুমি কে ?

—একজন রাহী!

—নবাবের লোক নও ? সিপাহী নও ?

—চাকরী করি নবাব সেরেস্তায়, সিপাহী নই। তুমি কে ?

—নবাবমহলের বাঁদী। বুড়ো নবাবের ছেলে মীরন আলীর বাঁদী। হিন্দু বামুনের মেয়ে ছিলাম, আমাকে ধরে এনেছিল। নবাবজাদা মরে গেল, বাঁদীদের কতক দিয়ে দিয়েছিল একে-ওকে, আমি মণিবেগমের কাছে ছিলাম। নতুন নবাব সব বাঁদীদের খোজা দিয়ে মারপিট করাচ্ছে ছেঁকা দিচ্ছে, বলছে—নবাবী টাকা জহরত কার কাছে কি আছে নিকাল। যা ছিল দিয়েছি। তবু রেহাই নেই। একটা হীরের আংটি ছিল সেটা ঘুষ দিয়ে আমি পালিয়েছি। পালাব আমি। আমাকে ছেড়ে দাও। কিছু নেই আমার।

সুরেশ্বরের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। একটা মানুষের ব্যস্তত্রস্ত উচ্চ পদক্ষেপের শব্দে। জুতো পায়ে দেওয়া বিংশ শতাব্দীর মানুষ। ছুটে চলেছে।

কর্পোরেশন স্ট্রীট থেকে মোড় ফিরে একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে। তার পিছনে তিনজন যেন তাকে ধরবার জন্যই ছুটছে। হয়তো একটু পরই শোনা যাবে কোলাহল। কেউ কাউকে ছুরি মেরেছে অথবা দুজনেই দুজনকে মেরেছে। ফ্রী স্কুল স্ট্রীট এখান থেকে খানিকটা দক্ষিণে গিয়েই। এখনও সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ—যখন ইংরেজের জীবন উদ্দাম হয়ে উঠে ফিরিঙ্গী সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল—সেই সভ্যতার রাজ্য বা সাম্রাজ্য। তার সঙ্গে আছে

মুসলমান আমলের ওই কালের জের যে-কালে কুড়ারাম ভটচাজ ওই মেয়েটিকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

মেয়েটিকে কুড়ারাম ছেড়ে দেন নি। ঘরে এনেছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন। মীরজাফরের ছেলে মীরন বজ্রাঘাতে মারা গেছে তখন—বছর খানেক আগে। লোকে বলছে ঢাকার পথে নৌকোতে নির্বাসনে যাচ্ছিলেন সিরাজজননী আমিনা বেগম আর সিরাজের প্রধান শত্রু তাঁর মাসী ঘেসেটী বেগম। ঘেসেটী বেগম বলতে গেলে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জাফর আলি খাঁয়ের চেয়েও বড় ছিলেন। এঁর চরিত্র নিয়ে কুৎসিত কথা এবং গল্পের আর অন্ত নেই। তবুও তো নারী। আলিবর্দীর কন্যা। ঢাকায় পাঠানো হচ্ছিল যেন আর কোন গণ্ডগোল না হয়। মীরন ছিল প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু তার আসল মতলব ছিল অন্য। সিরাজের বেগম যারা ছিল তাদের এক লুৎফুন্নিসা বেগম আর উমদৎউন্নিসা বেগম ছাড়া বাকীদের সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছিল মীরন আমীর-ওমরাহদের মধ্যে। ক্লাইভ সাহেবের সাঙ্গোপাঙ্গরাও নাকি সব থেকে খুবসুরতি যারা তাদের বেছে নিয়েছে। কিন্তু এই কয় বেগমকে নিয়ে ছিল সমস্যা। লোকের ভয়ে লুৎফুন্নিসা আর উমদৎকে বিলি করতে পারে নি বা নিজেও নিতে পারে নি মীরন। লুৎফুন্নিসাকে নাকি বলা হয়েছিল কাকে পছন্দ কর তুমি বল!

লুৎফুন্নিসা বলেছিল—হায় মেরী নসীব। হায় সরম কি বাত্!—

—কেন?

—কেন? হাতীর উপর যার চড়া অভ্যেস বা হাতীতে যে চড়েছে তাকে কতকগুলো গিধ্ধড় দেখিয়ে বলছে—বল কোন গিধ্ধড় তোমার পসন্দ্!

উমদৎউন্নিসা ছিল সিরাজের বিয়ে-করা বেগম। তাকে কিছু বলতে সাহসই করে নি। কিন্তু যতদিন আমিনা ঘেসেটী বেঁচে আছে ততদিন বিপদ কাটবে না। নবাব আলিবর্দী খাঁর বেটী যদি কোন রকমে বেরিয়ে একটা আশ্রয় পায় এবং সিপাহীদের সামনে দাঁড়ায় তো কি হবে কেউ বলতে পারে না। মীরন তাঁদের ঢাকা পাঠাবার নাম করে নৌকোয় চড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পদ্মার বুকে নৌকোটা ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। কেউ জানবে না কেউ দেখবে না, পদ্মার বুকের উপর কোন সাক্ষী থাকবে না। তাই ডুবিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমিনা ঘেসেটী নৌকো যখন ডুবছে তখন তার উপর দাঁড়িয়ে উপরের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে বলেছিল—আরে বেইমান, বিজলী গিরে রে তেরা শিরপর, বিজলী গিরে রে মীরন, তেরা শিরপর বিজলী গিরে। তারপর ডেকেছিল আল্লাহতায়লাকে। ডাকতে ডাকতেই ডুবেছিল নৌকো। এবং এই চিৎকার-অভিশাপ গঙ্গার ধারের অনেক লোক শুনেছিল, তাই আর গোপন থাকে নি। মিথ্যে হয় নি বেগমদের অভিশাপ। সুরেশ্বর জানে এটা কাকতালীয়। অভিশাপ ফলে না। কিন্তু মীরন মরেছিল বজ্রাঘাতে। কুড়ারাম ভট্টাচার্য সে কালের লোক, তিনি অভিশাপ মানতেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এতে।

"বেগমদের অভিশাপে মীরন মরে বজ্রাঘাতে সাতটি ছিদ্র ছিল মাথে দেখেছে সকলে।"

পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দমন করতে যাচ্ছিলেন মীরন শাহজাদা। সঙ্গে কোম্পানীর পল্টন-কাপ্তেন। মীরনের সঙ্গে বাঈ ছিল, হাত-পা টেপার খানসামা, কাহিনী বলার লোক—এরাও

ছিল সেদিন তাঁবুতে। আকাশে মেঘ উঠতেই মীরন ভয় পেয়ে আসর মজলিস সব ফেলে বড় তাঁবু ছেড়ে ছোট্ট একটা তাঁবুর মধ্যে এসে ঢুকেছিল, যেমনভাবে লোকে চোরকুঠীতে লুকোয়। কিন্তু হঠাৎ আকাশ ঝলসে উঠল বিদ্যুতে—কড় কড় কড়াৎ শব্দে চারিদিকটা থরথর করে কাঁপিয়ে ডেকে উঠল মেঘ। বাজ পড়ল মীরনের সেই ছোট তাঁবুতেই। তার মাথায় সাতটা ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল, মুখখানা ঝলসে গিয়েছিল। সেই সঙ্গেই ছিল এই মেয়ে। অন্য তাঁবুতে। নাম ছিল ফয়জান। ফয়জান তখন মাসছয়েক এসেছে। গঙ্গার ঘাটে স্নানে এসেছিল, মীরন নৌকো থেকে হুকুম দিয়েছিল—লে আও উয়ো ছোকরী কে। সিপাহীরা তুলে এনেছিল। ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে। সত্যকার সুন্দরী মেয়ে। মীরনের সঙ্গে বাঈজী বেগম চাকর নফর এরা ফিরল মুরশিদাবাদ। মীরন শাহজাদা হেরে গিয়ে মরে নি, তাহলে তার তাঁবুর হীরা-জহরৎ টাকা লুটের সঙ্গে এরাও লুট হত। কিন্তু মীরন তখন শাহজাদা মীরন। বাপ জাফর আলি মুর্শিদাবাদের তক্তে বসে আছেন। সুতরাং খুব ইজ্জত সম্ভ্রমের সঙ্গেই মীরনের তাবুর সব এসে ঢুকেছিল মুরশিদাবাদ হারেমে।

মণিবেগম এককালে সিরাজের বিয়ের সময় বাঈজী হিসেবে নাচতে এসেছিল। সে আর বব্বু। দুই বাঈজীকেই নিকা করে ঘরে ঢুকিয়েছিলেন জাফর আলি খাঁ। মণিবেগম হয়ে উঠেছিল প্রধান বেগম। মণিবেগম রূপসী মেয়েটাকে দেখে নিজে নিয়েছিলেন বাঁদী করে। হয় জাফর আলি খাঁর হাত বাড়ানো বন্ধ করতে কিম্বা হয়তো জাফর আলির নজর তার দিক থেকে সরে অন্যদিকে ফিরতে চেষ্টা করলে এই মেয়েটাকে দিয়ে সেই নজর বন্ধ করতে। কোনটা ঠিক জানতেন এক মণিবেগম।

মেয়েটাকে ঘরে এনে তুলেছিলেন কুড়ারাম। রূপ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বেশ একটু বিশদ বর্ণনা। এ যুগেও রীতিমত অশ্লীল। কাজী নজরুলের বসন্ত কবিতাটি নিয়ে এ যুগের একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক নিষ্ঠুর কথা বলেছিলেন। সে কবিতা এর কাছে কিছুই নয় সেদিক দিয়ে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর জাতের। ভারতচন্দ্রের কাব্যগুণ এতে নেই। তারপর কুড়ারাম মেয়েটাকে বলেছিলেন—দেখ, মুসলমান থাকতে তোকে ঘরে ঠাঁই দিতে পারব না। বাজারে বাঈজী হলে সেখানে তুই আমার কথা ভুলবি। আর নবাবের নজর ফের পড়বে। তখন আবার পাকড়াও হবি। তা হলে কি করি বল তো।

মেয়েটা কি বলবে ? সে বলেছিল—তুমি যা বলবে।

সেও মুগ্ধ হয়েছিল কুড়ারামকে দেখে তাতে সন্দেহ নেই। কুড়ারাম একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল—পথ আছে। হয়েছে।

—কোন পথ ?

—তার আগে বল—পিয়াজ রসুন গোস্ত ছাড়া ভাত রুচবে তো তোর ?

মেয়েটা বলেছিল—আমি তো হিন্দু ঘরের বিধবা। তাই তো খেতাম।

কুড়ারাম বলেছিল—সেইজন্যেই তো বলছি। হিন্দু বিধবা একবার ও সব খেতে ধরলে

ছাড়তে পারে না। সলমানীর চেয়ে বেশী খায়।

মেয়েটা বলেছিল, পারব। তুমি দেখ।

কুড়ারাম বলেছিল—তাহলে তোকে বোষ্টমী হতে হবে। মহাপ্রভুর ধর্ম, ওতে বাধা নেই। চল তোকে জিয়াগঞ্জের হরিদাস বাবাজীর কাছে নিয়ে গিয়ে ভেক দিয়ে নিয়ে আসি। ভাল হবে। ফোঁটা তিলক কাটলে চুড়ো করে চুল বাঁধলে কার সাধ্যি ধরবে তুই নবাব হারেমে বেগম সাহেবের বাঁদী ছিলি। তোর নাম ছিল ফয়জান।

কথা হচ্ছিল কুড়ারামের বাড়ীতে বসে। কুড়ারাম হিসাবের দিক থেকে অত্যন্ত পাকা এবং সে দিকে বুদ্ধিবিচার তীক্ষ্ণ ছিল। নিজে লিখেছেন—

যাহা করি রোজগার তিন ভাগ করি তার
এক ভাগে ব্যয়ভার নিজের পেটের
এক ভাগ পুঁতে রাখি পিত্তলের ঘটি ঢাকি
অন্য ভাগ লগ্নী রাখি বিশ্বাসী শেঠের।

হিসাবী লোকটি মুরশিদাবাদে পাঁচ হাজার টাকার বরাত হুণ্ডী নিয়ে এসে টাকা ভাঙিয়ে হাজার টাকা নজরানা দিয়েছিলেন চাকরীর জন্য। বাকী চার হাজারের কিছু টাকা হাতে রেখে একটা সামান্য বাড়ী কিনেছিলেন খাগড়ার প্রান্তে। নবাবী শহরের ধার ঘেঁষে। সামান্য দু কুঠরী দালান। নবাবের কাছে যারা সাজা পেয়েছিল পূর্বতন নবাব-প্রীতির জন্য তাদেরই একজনের বাড়ী। বাকী টাকাটা ওই বাড়ীর মেঝেতেই পুঁতে রেখেছিলেন। কথা হচ্ছিল সে বাড়ীতে। বেশ খিল কপাট বন্ধ করে।

মেয়েটা আবারও বলেছিল—যা বলবে তুমি, তাই করব। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। প্রাণের ভয়ে যা ছিল সব দিয়ে কোন রকমে বেরিয়ে জঙ্গল ভেঙে বাগানের পাশ দিয়ে পড়ো বাগানের তলা দিয়ে কোথা পালাচ্ছিলাম জানি না। হয়তো সাপে খেতো নয়তো কোথাও খানাখন্দে পড়ে জান যেতো—

—উঁহু উঁহু। জান নয় জীবন বল! জানে পেঁয়াজের গন্ধ ছাড়ে।

মেয়েটা হেসেছিল, বলেছিল—অভ্যেস হয়ে গিয়েছে এমন—

—ছাড়তে হবে।

—ছাড়ব।

হঠাৎ কুড়ারাম বলেছিল—এক কাজ কর।

—কি?

—দাঁড়া। বলে একটা ধারালো দা দিয়ে বলেছিলেন—ওই লম্বা বেণীটা আগে কাট। ওই চুল বাধা। চুল একেবারে কামাতে হবে। নইলে ওই বাহারে চুল আর সিঁথির ঢং যাবে না। কাট!

মেয়েটা তাই কেটেছিল। অনেক কষ্টে অবশ্য। চোখ দিয়ে জল পড়েছিল একদিকে, অন্যদিকে হাসছিল; এ যেন এক কৌতুক। নিজে কাটতে পারে নি, বলেছিল—তুমি কেটে দাও।

—চেঁচাস নে।

—না।

জোরে খড় কাটার মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটেছিলেন কুড়ারাম। তারপর বলেছিলেন—আর এক কাজ কর।

—বল।

বাইরে বেরিয়ে খানিকটা গোবর এনে তাকে দিয়ে বলেছিলেন—খা। খেয়ে শুদ্ধ হ। বামুনের মেয়ে তো, বুঝিস না? নে।

বেশ খানিকটা গোবর নিয়ে সে কোঁত করে গিলেছিল অম্লান মুখে।

কুড়ারাম বলেছিলেন—হ্যাঁ, তুই বামুনের মেয়ে বটিস।

তারপর কলসীতে গঙ্গাজল ছিল, এনে খানিকটা খেতে দিয়েছিলেন, বাকীটা হুড় হুড় করে তার মাথায় ঢেলেছিলেন, তারপর বলেছিলেন—যা শুদ্ধ। বল দশবার—কি বলবি বল দেখি?

মেয়েটা বলেছিল, শ্রীহরি শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি।

—বাস শুদ্ধ। এবার ওই ঘাঘরা-মাগরা ছেড়ে আমার কাপড় পর একখানা। কাল শাড়ী কিনে এনে দেব!

কুড়ারাম জীবনে বহুবার শাস্ত্রকে নিজে নিজের মনোমত করে ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন। অন্যের ব্যাখ্যার ধার ধারেন নি, কিন্তু কখনও শাস্ত্র মানি না বলে ফেলে দেন নি। বলতেন—শাস্তর হলো বৈতরণী পারের নৌকো, বাইব আমি নিজে। ওপারে পৌছুলেই হল।

বৈতরণী পার হতে হইলে শাস্ত্র তরী ভূমণ্ডলে
আমি নিজ বাহুবলে বাহিব ওপার।

মোট কথা এই ভাবেই ব্রাহ্মণ বালবিধবা শ্যামা দাসীকে মীরন ধরে এনে ঘাঘরা কাচুলি ওড়না পরিয়ে নাম দিয়েছিল ফয়জান, কুড়ারাম তাকে ঘরে এনে মাথা নেড়িয়ে গোবর খাইয়ে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে তিলক ফোঁটা রসকলি কাটিয়ে নাম দিয়েছিল ললিতা বৈষ্ণবী। চুল যখন আবার নতুন করে গজিয়ে এক পিঠ হয়েছিল তখন তাকে বৈষ্ণবীর চেহারায় ফয়জান থেকেও ভাল লেগেছিল। প্রথম প্রথম ঘরে বন্ধ করে যেতেন সেরেস্তাখানায়। এসে ঘর খুলবার আগেই গলার সাড়া দিতেন, অমনি জানালাটা খুলে ললিতা মুখ বাড়িয়ে হাসত।

ললিতার পয় ছিল। এবং ললিতা নতুন জীবনে সত্যই কুড়ারামগতপ্রাণ ছিল। ঘর করেছিলেন পনের বছর। এর মধ্যে যত উন্নতি হয়েছিল কুড়ারামের তত তিনি সুখী হয়েছিলেন ললিতাকে পেয়ে। এবং বিশ্বাস এমনি গাঢ় হয়েছিল যে, তাঁর টাকা কোথায় মাটিতে পোতা আছে তাও কুড়ারাম ললিতাকে দেখিয়েছিলেন। সৌভাগ্য কুড়ারামের যে, তাঁদের সন্তান হয় নি।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ জানতেন কুড়ারাম বিবাহিত। ললিতাই তাঁর স্ত্রী। তিনিই তাঁকে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের বর্ষায় সময় সাবধান করে দিয়েছিলেন—ভটচাজ, তুমি একা নও, শুনেছি

পরিবার নিয়ে বাস কর, লোকে বলে স্ত্রী সুন্দরী। সেইজন্যে সাবধান করছি হে, সময় থেকে অন্তত পরিবারকে ঘরে রেখে এস। কোম্পানীর সঙ্গে কাশেম আলীর বনছে না!

কুড়ারাম সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান হয়েছিলেন। নবাব কাশেম আলী রাজধানী সরিয়েছেন মুঙ্গেরে; কোম্পানীর কেল্লা কলকাতা থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। সুতরাং কুড়ারাম ভুল করলেন না, তিনি কলকাতার দিকেই এগিয়ে এলেন। মারামারি রক্তারক্তি যা হবার মুরশিদাবাদ থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত হবে। বলতে গেলে মুরশিদাবাদকে একরকম খালিই করছেন নবাব। তিনি কৃষ্ণনগরে এসে এক আস্তানা গেড়ে রাখলেন। দরকার হলেই ওখানে এসে উঠবেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন মীরকাশেমের কোপ থেকে রেহাই পেয়ে কৃষ্ণনগরে ফিরেছেন। মহারাজ তাঁকে জানতেন। জানবার কারণ, নবাব তখন আয় বাড়াচ্ছেন; পরগণায় পরগণায় রাজস্ব বৃদ্ধি করছেন, আবওয়াব চাপাচ্ছেন। সে সব যাদের কলমে হচ্ছে তাদের মধ্যে কুড়ারাম ভট্টাচার্য অন্যতম। কুড়ারামের হিসাব অনুযায়ী দিনাজপুরের রাজার রাজস্ব আগের থেকে ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার বেড়েছে। নাটোরের বেড়েছে আট লক্ষ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সে অনুপাতে কমই বেড়েছে, ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। সুতরাং আশ্রয় পেয়েছিলেন। সহজেই। সেখানে ছোটখাটো আস্তানা তৈরী করে রেখেছিলেন। দরকার হলেই সরবেন। নগদ টাকাটা জিম্মা দিয়েছিলেন তাঁর মালিকের মত উপরওয়ালা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের হাতে। তার পরিমাণ তখন প্রায় দশ হাজার।

গঙ্গাগোবিন্দ প্রশ্নও করেন নি—এত টাকা কোথা পেলে?

টাকা আরও বেশী হলেও জিজ্ঞাসা করতেন না। করবেন কেন? ব্যাপারটা তো বলতে গেলে প্রকাশ্য। নবাব কোম্পানী জমিদার সকলেই আয় করছেন। নবাব কাশেম আলী নবাবী নেবার সময় পনেরো লক্ষ টাকা দিয়েছেন কোম্পানীর সাহেবদের। ভান্সিটার্ট সাহেবই নিয়েছে পাঁচ লাখ, হলওয়েল দু লাখ সতেরো হাজার। তা ছাড়া কোম্পানীর আলাদা। মীরজাফর আলি দিয়েছিলেন ষাট লাখ টাকা। একা ক্লাইভকেই দিতে হয়েছিল কুড়ি লাখ।

নবাবেরা দিয়ে সেটা প্রজার ঘাড়ে না তুললে পাবে কোথায়? সে দিক থেকে নবাব কাশেম আলী জবরদস্ত। রাজস্ব বাড়িয়ে পূর্বের আয় থেকে এক কোটি দশ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে পাকা আয় করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় জমিদারদের কাছে খেলাতই হোক আর জরিমানাই হোক আদায় করেছিলেন কোটি দরুণে। তার সঙ্গে সেরেস্তার কর্মচারীরা পাবে না এ কি কথা! অন্ততঃ সে আমলে কুড়ারামেরও মনে হয় নি, ঘুষের টাকা উপরওয়ালাকে দেখালে তিনি তাকে ধরবেন এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও তা ধরেন নি, বেশ সহজভাবেই নিয়ে রেখে স্মরণার্থ একটা রসিদ দিয়েছিলেন। মানুষের শরীর, তিনি যদি নাই থাকেন তবে পুত্র পৌত্র যে থাকুক তিনিই দেবেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই লড়াই বাধল। এক কাটোয়াতেই যা মুরশিদাবাদের আগে যুদ্ধ হল, নইলে কুড়ারামের কথাই হল সত্য। যুদ্ধ হল ঘিরিয়ার উধুয়ানালায়—মুরশিদাবাদের উত্তর-পশ্চিমে। কুড়ারাম আগেই সরে গেলেন গঙ্গা পার হয়ে পশ্চিম তীর ধরে নবদ্বীপ পর্যন্ত,

তারপর গঙ্গা থেকে জলঙ্গী ধরে কৃষ্ণনগর।

কাশেম আলী গেলেন, আবার বুড়ো নবাব এলেন। এবার আর কুড়ারাম ফিরলেন না। ওই কৃষ্ণনগরে রাজার সেরেস্তাতেই কাজ নিয়েছিলেন। ঠিক ভাল লাগে নি ঝঞ্ঝাট। সে সময় ললিতাকে নিয়ে সুখে থাকবার একটা মোহ তাঁকে পেয়েছিল। কিন্তু বছর খানেক পর বুড়ো নবাব মারা গেলেন। ছেলে নজুমউদ্দৌলা নবাব হল। মণিবেগম তার অভিভাবিকা। তখন ললিতা বললে—ফিরে চল মুরশিদাবাদ। বেগম আমাকে খুব ভালবাসতেন।

কুড়ারাম ভেবে-চিন্তে ফিরেছিলেন।

ললিতা মণিবেগমের কাছে কিছু বকশিসও পেয়েছিল। বেগম সব শুনে খুশী হয়ে কিছু অলঙ্কার দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন একখানা কুঠী। কুড়ারামের মিলেছিল চাকরী নবাব-দপ্তরে। নবাবদপ্তরের রস আর বিশেষ ছিল না। নতুন কুঠীতে একটু ভালভাবেই সংসার পেতেছিলেন তিনি।

দেওয়ানী তখন কোম্পানীর হাতে গিয়েছে। আদায় তহশীল সব। নবাববাড়ীতে নবাব থেকে বেগম এবং নবাবজাদা নবাবজাদীরা সব কোম্পানীর তনখাভোগী। শুধু আশে-পাশে কিছু কিছু সম্পত্তির আদায় আছে এই পর্যন্ত। পাওনা-গণ্ডা বিশেষ নেই। কোম্পানীর দেওয়ানী সেরেস্তায় ঢোকা সহজ নয়। তার মুরুব্বি সব কলকাতায়। কিন্তু কলকাতায় নোনা লাগে, বাঘ আসে, ডোরা বাঘ; তা ছাড়া মুরব্বিরা অচেনা, কলকাতা তার থেকেও বেশী অজানা। কিন্তু কুড়ারাম লিখেছেন—

ভাগ্যে যার থাকে বল শুষ্ক বৃক্ষে ধরায় ফল
মরুভূমি মিলায় জল—বর্ষে বিনা মেঘে।

ব্যাপারটা ঠিক তাই। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হঠাৎ পড়ে গেলেন হেস্টিংস সাহেবের সুনজরে। ঘটনাটা অদ্ভুত। নবাব সিরাজুদ্দৌলা যখন কাশিমবাজার কুঠীর উপর চড়াও হয়ে হামলা করেন, তখন হেস্টিংস সাহেব পালিয়ে গিয়ে এক মুদীর দোকানে আশ্রয় চেয়েছিল। মুদীও দিয়েছিল। তাকে রন্ধনঘরে একটা জালায় পুরে তার মুখটা ঢেকে রেখেছিল। তাতে প্রাণে বেঁচেছিলেন তিনি। তিনি গভর্নর হয়েছেন এখন। তিনি খুঁজছিলেন কান্ত মুদীকে। কিন্তু সঠিক কান্ত মুদী কিনা নিঃসংশয় হতে পারছিলেন না। জনকতক লোকই কান্ত মুদী বলে এলেও তিনি ঠিক চিনতে পারছিলেন না, কিন্তু ঠকবার লোক তিনি নন। ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাদের। এদেশের লোকের কাছে সাদা মানুসেরা যেমন সব একরকম দেখতে, সাদা মানুষের কাছে কালো মানুষেরাও প্রায় সেই রকম। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বুদ্ধিমান লোক, হেস্টিংস সাহেব কি জন্যে কান্ত মুদীকে চান তা খানিকটা বুঝে খোঁজ করে ঠিক কান্ত মুদীকে নিয়ে গিয়েছিলেন হেস্টিংস সাহেবের কাছে। এবং বলেছিলেন—মি লাড, আপ উসকে এইসা কোই বাত পুছিয়ে যো বাত আপ জানতে হৈ আউর ই জানতে হে। আউর কোই নো নট।

সাহেব বলেছিলেন—ঠিক বাত। দ্যাটস রাইট! আচ্ছা উসকো পুছো—কোই সাহেব কো উসকে সাথ কাশিমবাজার কুঠী লুট হোনেকা বক্তমে মোলাকাৎ হুয়া?

কান্ত মুদী বলেছিল—এক সাহেব প্রাণের ভয়ে আমার কাছে এসেছিল, আমি আমার

মুদিখানায় লুকিয়ে রেখেছিলাম।

—হ্যাঁ। কিস্ কায়দসে উসকো ছিপাকে রাখা?

—জালার ভেতর পুরে মুখে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম।

সাহেব বলেছিলেন—ক্যা বোলতা? জালাকে অন্দর রাখ্যা—মু বন্ধ্ করকে। উ তো মর যাগা!

—না হুজুর, আমি জালাতে বাতাসের জন্যে ফুটো করে দিয়েছিলাম।

—হাঁ। হোনে সেক্তা হ্যায়। লেকিন খানে ক্যা দিয়া? রোটী—গোস?

—না হুজুর—পান্তা ভাত আর আমানি দিয়েছিলাম।

—আচ্ছা! আচ্ছা। বহুত আচ্ছা। লেকিন তুমি উ সাবকে পহ্‌ছানতে পারে?

—না হুজুর।

—হ্ম হ্যায়। উ হ্ম হ্যায় কান্তবাবু। আজসে তুম বাবু বন গেয়া। তুম হামারা জান বাঁচায়া, হম তুমকো বাবু বানায়েগা, রাজা বানায়েগা।—

আর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে বলেছিলেন—আচ্ছা কামদার হুঁসিয়ার আদমী হো তুম সিংবাবু। তুম হামারা কোম্পানীকে দেওয়ানী সিরাস্তামে কাম করো। আই এ্যাম ভেরী প্লিজড উইথ ইউ। বহুত খুস হুয়া হম।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কাজ পেয়েই লোক পাঠালেন মুরশিদাবাদ। আপনার অনুগত লোকদের ডেকে আনলেন। তার মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন কুড়ারাম।

৩

পাঁচালীতে আছে—

দেবী সিংহ রেজা খান হইলেন হতমান
বন্দী হয়্যা শেষে যান কোম্পানীর ফাটকে।

মহম্মদ রেজা খাঁ—রাজা দেবী সিং তখন কোম্পানীর রেভেন্যু বোর্ডের সর্বেসর্বা। তারা নিদারুণ অত্যাচারে খাজনা আদায় করে দেশ উৎসন্ন দিলে। তবু কোম্পানীর খাঁই মিটল না। বিলেতে কোম্পানীর অংশীদাররা শতকরা সাড়ে বারো টাকা লাভ পেলে। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট বছরে চল্লিশ লক্ষ টাকা ট্যাক্স আদায় করলে কোম্পানীর কাছে। জগৎশেঠের দেনা শোধ হল না। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর হল। রেজা খাঁ, দেবী সিং গেল। রেজা খাঁ ফাটকে গেল। নন্দকুমারের ফাঁসি হল। রায়রাঁইয়া অর্থাৎ কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান হলেন রাজা দুর্লভরামের পুত্র রাজবল্লভ। ডেপুটি দেওয়ান হলেন গঙ্গাগোবিন্দ সিং। তারপর দেওয়ান! ফ্রান্সিস সাহেবের সঙ্গে হেস্টিংসের পিস্তল লড়াই হল। জখম হলেন ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস সাহেবের দলের একজন সায়েব মারা গেলেন। হেস্টিংসের হল জয়জয়কার, তার সঙ্গে দেওয়ানজীর। তার সঙ্গে কুড়ারামের।

দেওয়ানজীকে কতজনে কত বললে। দেওয়ানজী ছিলেন পাহাড়ী। তিনি নড়েননি।

তাঁর আড়ালে কুড়ারাম ঢিপি হলেও উইঢিপি ছিলেন না—একটা পাথরের ভাঁই ছিলেন। দেওয়ানজীকে দেওয়ানী থেকে একবার নামালে। কিন্তু দেওয়ানজী আবার উঠলেন। বললেন—নিজের কাম করে যাও কুড়ারাম। যার জন্তে আছ, সে কাজ তুমি করো। কেউ তোমাকে নামাতে পারবে না। আজ নামালে কাল উঠবে। বুঝেছ? আমাকে কোম্পানী রেখেছে কোম্পানীর আয় দেখতে বাড়াতে; আদায় করতে। আমাকে করতেই হবে। না করলে নিশ্চয় স্বধর্ম হবে আমার। রাজা সেপাই রাখে সান্ত্রী রাখে বদমাসকে দুষমনকে মারতে। সে তার কাম। দয়া সেখানে তুমি করবার কৌন-হো? কৌই নেহি হো। সে কাম না করলেই হবে বেইমান। নিমকহারাম। কি করব? দেখো ভটচায, দুনিয়া যে বানিয়েছে সেই বানিয়েছে বাঘ—সেই বানিয়েছে হরিণ। সেই বানিয়েছে ঘাস লতাপাতা। হরিণ ঘাস খায়, বাঘ হরিণ খায়। মানুষ বাঘ মারে। মানুষও মরে। ওসব বিচার আমার নয়। তোমার নয়। আপনা কাম। যে সাধু সে জপ করুক। যে ভিখিরী সে ভিখ মাঙুক। তুমি তোমার কাম কর।

হেস্টিংস চলে গেলেন দেশে। সেখানে পার্লামেণ্টে ঝড় উঠল। হেস্টিংস সাহেবের পর ভান্সিটার্ট সাহেব এল—তারপর এল বুড়ো লর্ড কর্নওয়ালিস। দেওয়ানজীর চাকরী থাকবে এ কেউ ভাবে নি। কিন্তু দেওয়ানজী তবু রইলেন। দেওয়ান থেকে খারিজ হয়ে জমা বাকী সেরেস্তার ভার পেলেন। কুড়ারাম তাঁর দপ্তরেই এলেন। এই সময়ে মারা গেল ললিতা। তখন থাকতেন দেওয়ানজীর সঙ্গে বেলুড়ে। দেওয়ানজীদের পাইকপাড়ার বাড়ী তখনও হয় নি। বেলুড়েই মারা গেল ললিতা। দেওয়ানজী বললেন—এবার বিয়ে করে সংসার কর ভটচায। যা হয়ে গেছে গেছে, শেয়াল চাঁদে খেয়েছে। এবার ফের নতুন করে আরম্ভ কর।

কুড়ারাম চমকে উঠেছিলেন। দেওয়ানজী বলেছিলেন, হেসেই বলেছিলেন—আমি সব জেনেছি ভটচায, লজ্জা পেয়ো না।

রায় ভটচাজের পাঁচালীতে আছে—

দেওয়ানজীর রাজবুদ্ধি ডেকে কন শোন যুক্তি
বংশ বিনে নাহি মুক্তি নরক রৌরবে।
অতএব বিভা কর মিছা কেন কাল হর
স্বাপ বংশ বংশধর মায়াময় ভবে।
ললিতার এন্তাকালে স্নান করি গঙ্গাজলে
দাড়ি গোঁপ চেঁছে ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করি।
দর্পণে দেখিনু মুখ হইল আশ্চর্য সুখ—
যৌবন রয়েছে অটুট হরি হরি হরি।
দেখিলাম বক্ষপাটা টিলা নয় আঁটাসাঁটা
এ যেন জীবন গোটা সব আছে পড়ি।

অতএব রায় ভটচাজ বিয়ে করবার অভিলাষী হলেন। কিন্তু বয়স্কা কন্যা চাই। সুন্দরী কন্যা চাই। এবং বংশও উচ্চ চাই। পেতেও বিলম্ব হ'ল না। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের

প্রিয়পাত্র, কোম্পানীর দেওয়ানী দপ্তরে বিচক্ষণ কর্মচারী, শক্ত সমর্থ রূপবান মানুষ, লোকে বলে অর্থ তাঁর অনেক, তাঁর কি আর কন্যার অভাব হয়? বিবাহ করলেন পছন্দ করে; কালীঘাট গ্রামে, তখন কালীঘাটকে তার বাসিন্দারাই বলত গ্রাম। সুন্দরী বয়স্থা কন্যা; কিন্তু বংশের খুঁত ছিল। লোকে বলত ফিরিঙ্গী সংস্পর্শে দোষ। সেই কারণেই এমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হয় নি, কিন্তু কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য, যিনি মুসলমান হয়ে যাওয়া বামুনের মেয়েকে গোবর খাইয়ে গঙ্গাস্নান করিয়ে ললিতা করতে পেরেছিলেন তাঁর পক্ষে এ বাধা বাধাই হয় নি। বিয়ে ক'রে নবদ্বীপে গিয়ে পোড়া-মা-তলায় আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্যের বংশধরদের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে পাকা ভিত গেড়ে সংসার শুরু করেছিলেন। কলকাতায় তখন জানবাজারে রাণী রাসমণির কাছে জমি পেয়েছেন। বাড়ী করলেন ছোটখাটো. এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন নিজের গ্রাম নিজের ভিটেকে। দৃষ্টি স্বপ্নের মধ্যেই হোক আর গভীর চিন্তার মধ্যেই হোক, কীর্তিহাট ছাড়িয়ে কাঁসাই নদীতে তরী ভাসিয়ে হলদীতে পড়ে চলে গেছে মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'নিমক-মহল' পর্যন্ত। অর্থাৎ যেখানে নুন তৈরী হ'ত সে সব অঞ্চল—হিজলী তমলুক কাঁথি পর্যন্ত।

কোম্পানী হেস্টিংস সাহেবের আমল থেকে নুনের কারবার একচেটে করেছে। খালারি বা নুন তৈরীর খালগুলি কোম্পানীর খাস, সেখানে জমিদারের দাপট চলে না। কোম্পানী দাদন দেয়, ঠিকাদারদের নুন কেনে। ওদিকে দক্ষিণে মারাঠা এলাকার নুন আমদানি বন্ধ হয়েছে। দেশে নুনের দর চড়েছে, নিমক মহলের ইজারার এলাকায় এখন পূর্ণিমা অমাবস্যার জোয়ারের মধ্যে মা লক্ষ্মীর মল বা নূপুরের ঝম ঝম শব্দ শোনা যায়। মা লক্ষ্মী এখানে লক্ষ্মী মেয়ের মত আস্তে হাঁটেন না, চঞ্চলা চপলা দুরন্ত মেয়ের মত দৌড়ে আসেন।

নুনের দেওয়ানীর পদ তখন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তার থেকেও ইজারাদারির উপর নজর ছিল বেশী। কীর্তিহাটে পোক্ত আরামদায়ক মাটির কোঠাবাড়ী করিয়ে ওখানেই কারবার শুরু করবার বাসনা করেছিলেন। হঠাৎ বাধল বিপর্যয়। মেদিনীপুরে হল চুয়াড় হাঙ্গামা। প্রথম কোম্পানীর সঙ্গে রাজস্ব নিয়ে লেগেছিল ওখানকার জমিদারদের। লড়াইও দু'চারজন জমিদার করেছিল। সে লড়াই কলকাতার ময়দানে মনুমেন্টের তলায় সন্ধ্যার পর হিন্দুস্থানীদের কপাটী খেলার মত লড়াই। লড়াইয়ে হেরে জমিদারেরা বাগ মানলে, কিন্তু চুয়াড় পাইকেরা পাইকান জমি বাজেয়াপ্তির জন্যে হাঙ্গামা বাধালে। চুরি ডাকাতি খুনখারাপি দিয়ে শুরু, ক্রমে পাঁচশো সাতশো হাজার দেড়হাজার চুয়াড় পাইক জবরদস্তি ক'রে কোম্পানীর নতুন জমিদারদের কাছারী লুঠ করতে আরম্ভ করেছে, রায়তদের ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, বাজার হাট গঞ্জ লুঠ করে খুনখারাপি করতে শুরু করেছে। তখন ১৭৯৮-৯৯ সাল।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং তখনও কাজে রয়েছেন। লর্ড কর্নওয়ালিস দেশে চলে গেছেন। দেওয়ানজীও কাজ ছাড়বার কথা ভাবছেন। কুড়ারামও তাই ভাবছেন—আর কেন? এই-বার কাজ ছেড়ে স্বাধীন হবেন। অনেক ব্রহ্মত্র করেছেন দেশে। কলকাতায় নানান কাজ এখন। টাকা তাঁর আছে, সেই টাকা সায়েবদের ধার দিয়ে বা তাদের কারবারে দিয়ে মুচ্ছুদ্দীর কাজ করলে প্রচুর উপার্জন হতে পারবে। স্ত্রী তার আগেই পাঁচ বছরের সোমেশ্বরকে

রেখে মারা গেছেন। বিবাহের কথা তাঁর মনে হয় নি—তবে অন্য লোকে বলেছিল। কিন্তু তাতে তাঁর মন সায় দেয় নি। মনে কেমন একটা বৈরাগ্য এসেছে। মন গেছে ইষ্টের দিকে। এখন সাধ মায়ের মন্দির ক'রে তাঁর আশ্রয়ে সোমেশ্বরকে নিয়ে একটি সুখের সংসার করেন। আর তার সঙ্গে নুনের খালাবির ইজারাদারি। নইলে থাকবেন কি নিয়ে? শুধু জপে কি কাল কাটে? আর আট-নয় বছর পার হলেই সোমেশ্বর ষোল বছরের হবে। সোমেশ্বরকে মানুষ করবার জন্য একটি ব্রাহ্মণ বিধবা এবং একটি শূদ্র ঝি রেখে দিয়েছেন। লোকে হাসতো। বলত —ভটচাজ রাম কিপ্পন! এত টাকা, তাই রাখবি রাখবি একটা ভাল বাঈজী রাখ। ছুটো কসবী আনকী রাঁড় রাখ। তা না—ছুটো ঝি। কিন্তু কুড়ারাম পাঁচালীতে এই বামুনের মেয়েকে মা বলেছেন—আর শূদ্র ঝিটিকে বলেছেন কন্যা।

হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল দেওয়ানজীর কাছে। দেওয়ানজী বললেন, মেদিনীপুর কালেক্টরীতে যেতে হবে তোমাকে। তোমার নিজের এলাকা। ওখানে হাঙ্গামা বেধেছে জান তো? এখন কোম্পানীর ফৌজ গিয়েছে। রাজারা ওই দু চারদিন কেল্লা বন্ধ ক'রে থেকে এবার কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করছে। ওখানকার হস্তবুদ ঠিক করে কালেক্টরী ধার্য করবে। আর মারাঠী আমলে ওদের যে.পাইকান জমি ছিল, যে জমি পাইকরা ভোগ করত মাইনের বদলে তা বাজেয়াপ্ত ক'রে বিলি ক'রে দেবে। এই সব নিয়ে রেভেন্যু হবে। বুঝলে? রাজাদের তো আর পাইক পুষবার দরকার নেই। আর বর্গী আসছে না। এলে খোদ কোম্পানীর সরকার তার সমঝোতা করবে লড়াই দেবে। আর নিজের জেলায় যাচ্ছ—ব্রহ্মত্র মাল জমি—

—সে আপনাকে জানাব, হুজুর, তারপর।

—এইজন্যেই তোমাকে ভালবাসি, ভটচাজ।

কুড়ারাম মেদিনীপুরে যেদিন পৌঁছুলেন, সেইদিনই পাইকদের সর্দার নষ্টগুড়ের খাজা গোবর্ধন দলপতির ফাঁসি হয়ে গেল। লোকটা বিপর্যস্ত করে তুলেছিল অঞ্চলটাকে। মেদিনীপুরের রাণী শিরোমণি তখন কোম্পানীর একরকম নজরবন্দী।

রেভেন্যু ধার্য করলেন কুড়ারাম। ধর্ম তাকিয়ে কোম্পানীর স্বার্থ ষোল আনার জায়গায় দু আনা বেশী ক'রেছিলেন—

ধর্মকে মাথায় রাখি কোম্পানীর স্বার্থ দেখি
কুড়ারামে দিতে ফাঁকি কেহ নাহি পারে—
যেখানে দু পয়সা পাই নুন খেয়ে গুণ গাই
দিই কিছু সুবিধাই মনিবে না মেরে।

সে সময়ের কালটা সকলে জানে। মেদিনীপুর বাঁকুড়ায় জমিদার-বিদ্রোহ সে সামান্য হলেও পাইক চুয়াড় বিদ্রোহ বাংলার শেষ বিদ্রোহ। কোম্পানীর শক্তিকে ঝড়ের মত বইতে হয়েছিল—শালবন তালবন সমৃদ্ধ মেদিনীপুরের বনস্পতিগুলির মাথা নোয়াতে। পাঠান মোগল আমল থেকে যে সব রাজা উপাধিধারী সামন্তেরা বংশের কুর্শীনামা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রাচীন বৃক্ষের মত মাটির গভীরতম প্রদেশে শিকড় চালিয়ে বসে ছিল—তারা এই ঝড়ের মুখে ভগ্নশাখা

হয়েছিল সবগুলিই। কিছু কিছু মধ্যকাণ্ডে দুমড়ে দু'টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছিল—কিছু কিছু একেবারে মূল ছিঁড়ে উল্টে পড়েছিল মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে। পাইকানের গোড়ানির কেন্দ্রে বসে কুড়ারাম এই লীলা দেখেছিলেন আর মনে মনে ভেবেছিলেন—ওই ভাঙাগাছের খালি জমির উপর বংশের চারা গাছটি পুত্‌লে হয় না? হঠাৎ চোখে পড়ল বাকী জায়ের তালিকায় দেনদার ময়নার রাজার নাম। উপরি উপরি খাজনা বাকী পড়েছে রাজার। এবার রাজার রক্ষা থাকবে না—রাজা যাবে। ময়নার মধ্যেই কীর্তিহাট!

যদি—।

ময়নার রাজা—সেই ধর্মরাজের আশ্রিত হাজার দু হাজার বছরের পুরনো লাউসেনের বংশধরদের কাছ থেকে মারাঠাদের আশ্রয় নিয়ে রাজ্য কেড়ে নিয়ে রাজা হয়ে থাকলে যদি তাদের দোষ না হয়ে থাকে, তা হ'লে এদের এই বাকী খাজনার দায়ের সময় একটু উন্মে-আন্মে দিয়ে ওদের ঠেলে ফেলেই যদি কেউ দেয়, তবে তাতে আর অপরাধ কোথায়?

ময়নার রাজার জমিদারী থাকবে না, এ নিশ্চিত।

ওই তো ময়না পরগণার ওপাশে কাঁসাইয়ের উত্তরে মহিষাদল। মহিষাদল ছিল মহাপাত্রদের, কল্যাণ রায় মহাপাত্রদের শেষ পুরুষ; জনার্দন উপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেছিলেন, সে তাকে পথে বসিয়ে নিয়ে নিয়েছিল মহিষাদল। উপাধ্যায়দের শেষ রাণী জানকী। রাণী পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন। সে অন্ধ হল। মহিষাদল এল গর্গ বাহাদুরের হাতে। লক্ষ্মী ভূমি কখন যে কার বাড়ী ঢোকেন কেউ বলতে পারে না।

ভাবনাটা মনের মধ্যেই ঘুরছিল। মনে মনে কুড়ারাম মাকে ডাকছিল—বল মা, তুমি বল!

এরই মধ্যে এল কোম্পানীর পরওয়ানা।

আসছে কলকাতা থেকে। রেভেন্যু বোর্ডের হুকুমে যেতে হবে তাকে বাঁকুড়া।

বৈশাখ মাস, ঝড়বৃষ্টির সময়। কিন্তু উপায় ছিল না। কাজ জরুরী।

* * * *

হঠাৎ সুলতার কণ্ঠস্বরে সুরেশ্বর ১১৭৮ সালের কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পাঁচালী থেকে এসে পড়ল ১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বরে। সামনে দেওয়ালে ছবিগুলি ঝুলছে। এতক্ষণ এরাই যেন সজীব হয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিল। সুলতার গলার সাড়ায় ছবির মধ্যে ছবি হয়ে মিশে গেল।

* * * *

—কি, তুমি ধ্যানস্থ হয়ে গেছ মনে হচ্ছে!

ছবিগুলো বাস্তব হয়ে উঠেছিল। সুলতার গলার সাড়ায় তারা যেন ছবি হয়ে ছবির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সুরেশ্বর বর্তমানে ফিরে এসে সুলতার দিকে তাকালে।

সুলতা বললে—আমি দু'বার এসে ফিরে গেছি। ধ্যানভঙ্গ করিনি—হাতে কাজ ছিল বলে! কি এত ভাবছিলে? সেকাল?

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ সেকাল। তবে ঠিক এই মুহূর্তটিতে টাকার অঙ্কে এসে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম রায়বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুড়ারাম ভট্টাচার্য—রায় ভট্টাচার্য নামক ব্যক্তিটি যেদিন দশ এগার বছরের ছেলের বিয়ে দিয়ে জমিদারী কিনে বরকনে নিয়ে কীর্তিহাট গ্রামে প্রবেশ করলেন—যেটা আমার প্রথম ছবির বিষয়বস্তু—সেদিন তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। তখন জমিদারী কেনার টাকা দেওয়া হয়ে গেছে—কালী প্রতিষ্ঠা, তাঁর মন্দির, পাকা বাড়ী এসব খরচ শেষ হয়েছে। অর্থাৎ ওসব বাদ দিয়েও পাঁচ লক্ষ টাকা। অথচ মাইনে ছিল যৎসামান্য। শতের কোঠায় পৌঁছে আর বেশী দিন চাকরী করেন নি।

সুলতা বললে—তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? সে রাজত্বটাই তো লুঠের রাজত্ব। ঘুষ আর কোম্পানীর সাহেবদের লাথি এ দুটো এত সস্তা ছিল যে ছিয়াত্তুরের মন্বন্তরে মানুষের প্রাণ এত সস্তা হয়নি এবং কুলীনের ছেলেদের বিয়ে এত সস্তা হয়নি। তবে একটা কথা বলতে পার যে কুড়ারামেরা ঘুষ নিয়ে দশ বিশ লাখ আটকে বা পুঁতে রেখেছিলেন বলেই দেশে থেকেছিল, নইলে সবই চলে যেত বিলেতে।

হাসলে সুরেশ্বর। ঘুষ তুমি বল আমি আপত্তি করব না। তবে কুড়ারাম রায় ভট্টচাজ সামনে থাকলে তিনি প্রতিবাদ করতেন। ঘুষ? আমার ন্যায্য পাওনা। সাক্ষী মানতেন ধর্মকে, সেকালের ধর্মরাজকে। তিনি এসে তাঁর স্বপক্ষে সাক্ষী দিতেন হলফ করে বলতে পারি। মিনিস্টার হলে আজকাল নমস্কার পায়, মিনিস্টারী গেলে পায় না। সুতরাং মিনিস্টার থাকা-কালীন পাওয়া নমস্কারটা ন্যায্য পাওনা নয় বললে তো চলবে না। কিন্তু ও-কথা থাক। এতক্ষণ করছিলে কি?

সুলতা বললে—বাড়ীতে টেলিফোন ক'রে ফিরে আসবার সময় দেখলাম—রঘু ময়দা মাখছে। আমি ভাবলাম আমার জন্যে করছে। বললাম—এসব কেন করছ? দরকার নেই। রঘু বললে—তা বলো না দিদিমণি। তুমি খাও, তা হলে সঙ্গে লালবাবুরও খাওয়া হবে। আজ সারাটা দিন বলতে গেলে কিছু খায়নি। কেন, খাওনি কেন? জমিদারী যাওয়ার শোকে?

—যেটা থাকে সেটার বিয়োগেই শোক। বলতে পার। কিন্তু ঠিক তা নয়। কীর্তিহাটে গিয়ে খাওয়ার পর পিতৃপুরুষের দিবানিদ্রাটা অভ্যেস করেছি। এবং ওর আমেজ এমন যে খাওয়ার পর ঘুমুবার ব্যবস্থার অভাব হলে খাওয়াটাই তাকে তুলে দিতে হয়। কিংবা বমি হয়ে উঠে যায়। আজ সকাল থেকে ছবি টাঙিয়েছি। তিনটের পর অ্যাসেম্বলীতে গিয়েছি। সুতরাং ঘুমুবার সময় কোথায়? তাই খাই নি।

—এসেও তো কিছু খাওনি!

—ঠিক খেয়াল হয় নি। তোমাকে ছবি দেখাবার ব্যগ্রতাটাই সব থেকে বড় হয়ে উঠেছিল। তুমি সময় দিয়েছিলে একঘণ্টা। তার মধ্যে ছবিই বা কখন দেখাই, খাইই বা কখন। ছবি দেখাবার তাড়ায় মনে ছিল না। কিন্তু তুমি রঘুর সঙ্গে হাত লাগালে নাকি? কেন?

—তা একটু লাগালাম। লুচি বেলে দিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইণ্টারেস্টিং কিছু পেলাম,

পড়ছিলাম—পড়া হয়ে গেল।

—কেন যে এসব করতে গেল ? ছি-ছি-ছি !

—তাতে কি হয়েছে ? উদর নামক যন্ত্রটি তো আমারও আছে। সেখানে খাদ্যরসের মোবিল না পড়লে যে যন্ত্রটি জলে যাবার সম্ভাবনা আছে। হলামই বা অনার্ড গেস্ট, একটু হাত লাগালাম। তুমি ক্ষিদে ভোল—তুমি শিল্পী। কিন্তু আমি মাটির জীব।

হেসে সুরেশ্বর বললে—তার ওপর তুমি সোসালিস্ট। গান্ধীজী যে গান্ধীজী তিনি ছিলেন স্পিরিচুয়াল সোসালিস্ট। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—দেশ এখন একটিমাত্র কবিতা চায় —সেটির নাম অন্ন। তুমি তার থেকে বড়ো নিশ্চয়, যদি প্রশ্ন করি খাওয়ার জন্যে বাঁচা—না বাঁচার জন্যে বাঁচা তা হলে কি উত্তর দেবে হলপ ক'রে বলতে পারি না।

—এ তকরার খেতে খেতে হবে। তাও না। তকরার একেবারে বাদই থাক। তুমি তোমার কড়চার কাহিনী বল। তার আগে তোমাকে বলে নিই। তোমার আদিপুরুষের নামাঙ্কিত একটা পাঁচালী, অবশ্য সেটা তোমার হাতে নকল করা, সেটা তোমার টেবিলের উপর পড়ে আছে। বলছিলাম না, ময়দা মাখতে মাখতে ইণ্টারেস্টিং কিছু পড়ছিলাম—সেটা ওইটেই। খুব ভাল ক'রে পড়েছি বলব না। তবে মোটামুটি পড়েছি। সমাজে সেকালে যারা বংশপ্রতিষ্ঠা করেছে, তারা এমনি না-হলে হয় না।

রঘু এসে দাঁড়াল।

সুলতাই বললে—কি ? খাবার দিয়েছ ?

রঘু বললে—হাঁ দিলম।

সুলতা বললে—এস। খেয়ে নাও আগে। এবং খেতে খেতেই বল। তোমার কথা তো অনেক। আমাদের আসরের পরমায়ু এই রাত্রিটুকু। দশটা বেজে গেছে। বসো।

তারা রঘুর পিছনে পিছনে খাবার ঘরে ঢুকল। বসল সামনা-সামনি। রঘু খাবার সাজিয়ে রেখেছিল। আয়োজন দেখে সুরেশ্বর বললে—এত করতে গেলি কেন ? লুচি বেগুন-ভাজা আলু-ছেঁচকি—মাংসটা তো না হয় খাবোই। এ যে অনেক।

সুলতা হেসে বললে—আমি বলেছি।

—কেন এত ঝঞ্ঝাট করলে ?

সুলতা বললে—আজ না-হয় আমি অতিথি, আমি আমার অনারেই করেছি। অবশ্য তোমার মান রাখতে। কারণ, বলতে তো পারি সুরেশ্বর গল্প শোনাবার ছবি দেখাবার জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে সারারাত্রি উপোস করিয়েছিল।

সুরেশ্বর অপ্রতিভ হয়ে গেল এবার। বললে—দেখ, আমার কমন সেন্স যেন কমে যাচ্ছে ! সত্যিই তো !

সুলতা বললে—সারাদিন তুমি খাওনি। ক্ষিদের খুব বোধ রয়েছে বলেও মনে হল না। রঘু বলছিল—দিদিমণি, আমার সেই লালবাবু যে কি রকম হয়ে গেলো ! খায় না। খেতে দিলে পড়ে থাকে। কীর্তিহাটে মেঝলা ঠাকুর-মাই ছিলেন, উনহি উনকে খাওইতেন। লালবাবু বিলায়েৎ চলে গেলেন, ঠাকুর-মাই গেলেন বৃন্দাবন। আর আইলেন না। উসকে

বাদসে এহি হাল। আজ সাত আট বরিষ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, এমন হল কেন? বললে—হামি নোকর, হামি কি করিয়ে বলি। উনকে পুছিয়ে—উ বলবে। উ ঝুট তো বোলে না!

সুরেশ্বর সুলতার আগেই খেতে শুরু করেছিল। সুলতা বললে—কত খিদে পেয়েছিল বল তো?

—কেন?

—না-হলে আমি খেতে শুরু করলাম কি না তা লক্ষ্য না করেই খেতে শুরু করেছ তুমি!

—ওই দেখ। ছত্রিশ সাল থেকে তেপ্পান্ন সাল—সতের বছর কীর্তিহাটে একলা থেকেছি,, ভেবেছি, নানান দেশ ঘুরেছি, তার মধ্যে এইরকম হয়ে গেছি। প্রথম মেজঠাকুমাকে পেয়েছিলাম সেখানে।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—মেজঠাকুমা আমার মেজদি, আমার জীবনের পরম সম্পদ। একাধারে মা ছিলেন আবার ঠিক বড়দিদি ছিলেন। হয়তো বা রায়বংশের প্রতিষ্ঠা করা যে যুগলবিগ্রহ আছে তারই মূর্তিমতী রাধা ছিলেন। আমার জন্যে কলঙ্কের ভারও মাথায় নিয়েছেন তিনি।

—কলঙ্ক? কি কলঙ্ক?

—কলঙ্ক সংসারে নারীর একটিই সুলতা। ভালবাসার কলঙ্ক! রায়বংশ এমন পচে গেছে যে নিজের বংশের শ্রেষ্ঠ পুণ্যের আশ্রয় মেয়েটিকে কলঙ্কিনী বললে তারাই!

—থাক সুরেশ্বর, ওসব তোমার ঘরের কথা। তার থেকে তুমি বল—তোমার কড়চার কথা বল! আমার পূর্বপুরুষ ঠাকুরদাস পাল খুন হয়েছিলেন। বাবাকে আমি টেলিফোন করলাম, বললাম—আজ ফিরব না বাবা। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম—আমাদের পূর্বপুরুষ ঠাকুরদাসের কি পাল উপাধি ছিল? বললেন—হ্যাঁ, তখন তাই ছিল। কিন্তু আসল উপাধি আমাদের ঘোষ! জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি কি খুন হয়েছিলেন? বললেন—শুনেছি তাই। একজন দেশী ক্রীশ্চান গুণ্ডা তাঁকে খুন করেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—ঘটনাটা কি জান? বললেন—সে তো আমারও তিন পুরুষ আগে। তাছাড়া ওই উনি খুন হলে আমার পিতামহ কলকাতায় এসে ব্রাহ্ম হন, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যায়। তারপর তিনিও আমার বাবাকে ছেলেমানুষ রেখে মারা যান। আমি মামার বাড়ীতে থেকে পড়েছি, বিলেত গেছি। ওসব পিছনের খবর আমাদের ঠিক জানা নেই। জানিনে। বাবা কারণ জানতে চাইলেন, বললাম—কাল বলব। তোমার পূর্বপুরুষ কি ওই ক্রীশ্চান গুণ্ডাটাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন বলছ? কি করে জানলে তুমি? কে বললে তোমাকে?

—বলেনি কেউ, আমি খাতা থেকে পেয়েছি।

—খাতা থেকে?

—হ্যাঁ, প্রথম পেলাম জমাখরচের খাতা থেকে।

অবাক হয়ে গেল সুলতা। জমাখরচের খাতা থেকে? তার হাতে ধরা লুচি আলু-

ছেঁচকি সে ধরেই রইল।

* * * *

সুরেশ্বর বললে—রায়-বংশের সাত পুরুষের পাপপুণ্য ভালোমন্দ সব-কিছুর ফিরিস্তি বুঝি বিধাতার ইচ্ছায় গচ্ছিত ছিল আমার ওই মেজঠাকুমা—মেজদির কাছে। মেজদিকে কলঙ্কিনী অপবাদ না দিলে হয়তো এ ফিরিস্তি তিনি আমাকে দিতেন না! তাই সেই কথাই বলছিলাম তোমাকে। এবং তার সঙ্গে আমার জবানবন্দী যেটা তোমার কাছে প্রথম দেবার আছে সেটাও দেওয়া হয়ে যাবে।

সুলতা বললে—বল।

সুরেশ্বর বললে—মেজঠাকুমাকে ওরা কলঙ্ক দিলে। সেই বৃত্তান্ত থেকেই বলি। মেজঠাকুরদার মৃত্যুর পর থেকে মা ওঁর পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা বরাদ্দ করেছিলেন। মা মারা গেলেও সেটা আমি বন্ধ করি নি। আমার সঙ্গে একটি স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বাবার শ্রাদ্ধের সময়। সেটেলমেণ্টের সময় মেজতরফ আমাকে ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে বুঝতে পেরে উনিই ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়, আমার ওখানকার নিজস্ব নায়েবকে নিয়ে। আমি তোমাকে জানালাম। তুমি তাড়া দিয়ে বললে—যেতে হবে বইকি। যাও। ঠাকুমা-নায়েবের সঙ্গে রঘু চাকরকে পাঠিয়ে দিলাম আগে, পরের দিন আমি কীর্তিহাটে পৌঁছুলাম এগারটার সময়; শেষ চৈত্র তখন। ওখানে গ্রীষ্ম, কীর্তিহাটে বলে 'খরা', তখন প্রখর হয়ে উঠেছে। মেদিনীপুরে নেমে জীপ ট্যাক্সিতে গিয়েছিলাম—ফলে সর্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল।

মেজঠাকুমা বিবিমহলের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। নায়েব ছিল, ডিকু, রোজা, ওরা চাকরী করত, সেই বাবার শ্রাদ্ধের সময় থেকে তারা ছিল; কিন্তু অভ্যর্থনা করলেন মেজঠাকুমা। রায়বংশের যেটুকু স্নেহ আমার প্রাপ্য সেটা যেন ওঁর কাছে জমা ছিল সুলতা। অপরাধ বোধহয় তাঁর এইখানেই।

সব মনে পড়ছে আমার। ছবিতেও এঁকে রেখেছি। সে ছবি অবশ্য অনেক পরে আসবে, কিন্তু তখন আর আমাকে বলে দিতে হবে না সুলতা যে এইটে মেজঠাকুমার ছবি, তিনি সুরেশ্বরকে হাত ধরে বলছেন—

—এস ভাই আমার সোনার নাতি এস।

আমি প্রণাম ক'রে বলেছিলাম—তাইতো ঠাকুমা, নিজের সম্বন্ধে তো তাহলে এবার সাবধান হ'তে হবে। চোরে ডাকাতে না লুঠে নিয়ে যায়!

মেজঠাকুমা হেসে বলেছিলেন—ভয় কি ভাই! আমি তোমাকে ভক্তি করে বুকে ঝুলিয়ে রাখব। নাত-বউ এলে তাকে পরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।

* * * *

কথার জবাব খুঁজে পায়নি সুরেশ্বর। মেজঠাকুমা বলেছিলেন—নাও, মুখ হাত ধোও। চায়ের জল চড়ানো আছে। রঘু চা দিক। চা খেয়ে স্নান করে ফেল। আমি তরকারী রেঁধে ফেলেছি। ভাতটা বাকী। চড়িয়ে দি। স্নান ক'রে ঠাকুরবাড়ী প্রণাম করে এসে

খেয়ে নাও। তারপর জিরিয়ে নাও।

—এসব—মানে এত কষ্ট আপনি কেন করলেন ঠাকুমা? রঘু যা হয় করতো।

—কেন? আমি থাকতে রঘু কেন? তুমি আমার নাতি। ছেলে টাকা, নাতি সুদ। টাকার মুখ দেখিনি, ভাগ্যি আমার ভগবান আমাকে সুদ পাবার হকদার করেছেন। ভাতের উপর মিষ্টান্ন। তোমার মেজঠাকুরদা-র ধুলোয় ফেলে-দেওয়া পোটলাটা তুমি মাথায় তুলে নিয়েছ। আমি থাকতে রঘু কেন?

দুফোঁটা চোখের জলও পড়েছিল তাঁর।

খাওয়ার সময় কাছে বসে খাইয়েছিলেন। সুন্দর রান্না মেজঠাকুমায়ের। মেজঠাকুমা বলেছিলেন—আমি জানি তুমি মাংস খাও। কিন্তু তোমার মেজঠাকুরদার বৈষ্ণব মন্ত্র, আমারও তাই। ওটা আমি ছোঁব না। ওই গোয়ানদের বললে ওরা গুলতিতে পাখী মেরে দেবে। ওইটে বরং রঘু রেঁধে দেবে তোমাকে।

অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সুরেশ্বর। তিনি তাঁর কাছে মাসোহারা পান বলে তোষামোদ করছেন এ ধারণা তার একেবারে মুছে গিয়েছিল।

এই সময়ে বাইরে কাঁসাইয়ের ধারের জঙ্গলে সেই বউ-কথা-কও পাখী ডেকে উঠেছিল। চৈত্র মাস। এটা ওদের পাগল হয়ে ডাকারই মাস।

কথার ধারাটাকে ঘোরাবার জন্যেই সুরেশ্বর বলেছিল—সেই পাখী ডাকছে, না ঠাকুমা?

সঙ্গে সঙ্গে গালে হাত দিয়ে মেজঠাকুমা বলেছিলেন—ও-মা! তাই তো!

অবাক হয়ে সুরেশ্বর তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

মেজঠাকুমা বলেছিলেন—এতদিন ছিল না ভাই পোড়ারমুখো পাখী। অন্ততঃ আমার কানে আসেনি। তাই তো ও-মা বলে গালে হাত দিচ্ছি! মনে হচ্ছে তোমার মেজঠাকুরদা পাখীটা তুমি হয়ে ফিরে এলে তাহলে!

সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠেছিলেন।

সেই স্নেহশীলা মায়ের মত মেয়েটি যে এমন যত্ন করে খাওয়াচ্ছিল, সে যেন মুহূর্তে পরিহাস-মুখরা সখী হয়ে উঠেছে।

সুরেশ্বরের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সেই দিন রাত্রেই মেজঠাকুমা তাকে বলেছিল—আজ থেকে আমি তোমার মেজবউদি। ঠাকুমা বললে, কেমন বুড়ী হয়েছি বলে লজ্জা করে! কেমন?

সুরেশ্বর বলেছিল—না।

—কেন?

—একটু খাটিয়ে নেব।

—কি মেজ বউ? হেসে উঠেছিলেন তিনি।

—না মেজদিদি!

—বাঃ, সে খুব ভাল। আর একালে কি বলে—মডার্ন না কি তাও হবে। তাহলে কিন্তু তুমি বলো, আপনি নয়!

—বলব।

মেজঠাকুমা বলেছিলেন—এইবার চলি, তুমি ঘুমোও একটু। আমার অনেক কাজ। গোপালকৃষ্ণের ভোগ হল, এইবার মন্দিরে যাই, সেখানে আমার নাগরকৃষ্ণের ভোগ আছে। তারপর পোড়া পেটের পিণ্ডি আছে। সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরের চরণোদক-তুলসীমায়ের বেলপাতা নিয়ে আসব।

এই ভূমিকা সুলতা।

ওই সর্ববঞ্চিতা বিধবা যুবতী ঠাকুমাটি তাঁর সব স্নেহরসভরা জীবনকুম্ভটি আমার মাথার উপর ঢেলে দিলেন।

সন্ধ্যেতেও তিনি এলেন কিন্তু কথাবার্তার সুযোগ হল না। সেরেস্তার আসর পড়েছিল। আমার নায়েব দেবোত্তরের নায়েব সকলে এসেছিলেন; কথাবার্তা হচ্ছিল। সেটেলমেণ্টে স্বত্বের সমস্যা তাঁরা বোঝাচ্ছিলেন আমাকে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

দেবোত্তরের নায়েব বললেন—মেজতরফ বলছেন—বাড়ী—সবই দেবোত্তর। অন্দর, বিবিমহল সব।

—কিন্তু পার্টিশন দলিলে তো সই করেছেন!

—করেছেন। সে করেছেন শিবেশ্বর রায়। তিনি মৃত। ছেলেরা দেবোত্তরের সেবায়েত হিসেবে আপত্তি করছে এরকম পার্টিশন অসিদ্ধ। বাড়ী সব দেবোত্তর।

—তারই বা প্রমাণ কি?

—প্রমাণ? হেসে দেবোত্তরের নায়েব বললে—আমি ওঁদের নায়েব, আপনারও নায়েব। আমি ওঁদের বলেছি—কাগজ যা বলবে, আমার কাছে যা আছে বের করে দেব। কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই। প্রমাণ ওঁরা জানেন। আমাদের ঘোষালও জানেন। বল না ঘোষাল।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, আমার নায়েব এবার বললে, ব্যাপারটা গোলমেলে বটে। ওঁরা সোমেশ্বরের ট্রাস্ট ডিড, রত্নেশ্বর রায়ের ট্রাস্ট ডিড বের করছেন, তার নকল আমাদেরও আছে। তাতে আছে কীর্তিহাটের যাবতীয় জমিদারীপত্তনী সম্পত্তি দেবত্রীকৃত হইল। এবং এই আয় হইতে যে সকল সম্পত্তি অর্জিত হইবে, তাহাও দেবত্র বলিয়া গণ্য হইবে। ওঁরা বলছেন—বাড়ীগুলি দেবত্রের আয় থেকে তৈরী, সুতরাং এও দেবত্র। বিভাজ্য নয়। তবে যে যেমন দখল করছেন, দখল করবেন। দান-বিক্রয় চলে না।

দেবোত্তরের নায়েব বলেছিলেন এবার—ব্যাপারটা আরও একটু জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, বড়তরফ এতে যোগ দিয়েছেন; আপনার জ্যেষ্ঠতাতের বড় ছেলে প্রণবেশ্বরবাবু আসছেন, তিনি এতে যোগ দিয়েছেন। তিনিই বোধহয় বুদ্ধি যোগাচ্ছেন কলকাতা থেকে। এবং সে বুদ্ধি হাইকোর্টের উকিল-ব্যারিস্টারের। তাঁদের জন্যে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়েছে, আপত্তির দাবী আরও মজবুত হয়েছে। ধরুন, তিনি আপনাদের

বড়তরফের অর্ধেকের শরিক। বড়তরফই বিবিমহল পেয়েছে। বড়তরফই ছোটতরফ অর্থাৎ রামেশ্বর রায়ের বাড়ীর অংশ কিনেছে। ওঁদেরই বাপ তাঁর অংশ আপনাদের বিক্রী করেছেন। তাঁরা আপত্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার দোষ হয়ে যাচ্ছে যে, দেবেশ্বর রায় যে পার্টিশনের সময় বিবিমহল নিয়েছিলেন টাকা দিয়ে, সে অসিদ্ধ, আবার রামেশ্বরের অংশ খরিদ অসিদ্ধ, আবার যজ্ঞেশ্বর রায়ের বিক্রী অসিদ্ধ।

বিরক্তিভরে আমি বলেছিলাম সুলতা, বেশ তো, বাড়ীর একটা ভাগ তো আমার যাবে না। সেটা তো থাকবে। নিন, ওঁরা বাড়ীর ভাগ নিয়েই যদি তুষ্ট হন তো হোন।

এবার বেরিয়ে এসেছিলেন মেজঠাকুমা। তিনি যে এখনও পর্যন্ত ঘরের মধ্যে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন, তা জানতাম না। এসে বলেছিলেন—কেন নায়েববাবু, সে আমলের কর্তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের এস্টেটের খাতাপত্র আছে। তা থেকে বের হবে।

তারপর আমাকে বললেন—তুমি ওসব কথা কখনও মুখে আনবে না নাতি। নিয়ে সুখী হয় হোক—এ কথা বলা মানে হার মানা।

দেবোত্তরের নায়েব বললে—খাতা যে সব নেই মা। কোথায় গেল তা কেউ জানে না। সে কি ছোটবাবুর নায়েবকে আমি খুঁজে দেখতে বলিনি? খাতা তো মেজকর্তার আমল থেকে কোথায় কি গেল কেউ বলতেও পারে না। কি ঘোষাল, বলুন না!

ঘোষাল বললে—খাতা নেই।

আমি হেসে মেজঠাকুমার মুখের দিকে তাকালাম।

মেজঠাকুমা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আমি গিয়ে সাক্ষী দিলে হয় না?

—সে স্বত্বের মকর্দমার সময় দেওয়ানী আদালতে দিতে পারেন, বলতে পারেন—এই শুনেছেন, শুনে আসছেন। তার দাম কতখানি হবে, কাগজপত্রের ওপরে, তা হাকিমের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সেটেলমেণ্ট কোর্টে ও শুনবেই না তারা।

মেজঠাকুমা আমার দুঃখে দুঃখ পেয়েই চলে গিয়েছিলেন।

* * * *

পরের দিন সকালে সেটেলমেণ্ট আদালতের দুর্ভোগ যা হয়েছিল, তা তোমাকে পত্রে আমি লিখেছিলাম। চারটে পর্যন্ত বসে থাকা, হাকিম হরেন ঘোষের সঙ্গে আলাপ। এসব তুমি জান। একটা কথা লিখিনি। দুপুরবেলা গাছতলায় বসে জমিদার হওয়ার দুর্ভাগ্যের জন্য আপশোস করছি, ক্ষিদে পেয়েছে, ঠিক সেই সময়টিতে রঘু তোয়ালে ঢেকে খাবার নিয়ে গিয়েছিল, মেজঠাকুমা পাঠিয়েছেন।

এরপর আমায় ছবি আঁকতে দেখে হরেন ঘোষ হাকিমের মুগ্ধ বিস্ময়ের কথাও লিখেছি। ঘোষ আমার বন্ধুত্বের জন্য কিছু কিছু মূল্য দিয়েছিলেন। কয়েকটা ব্যাপারে আপত্তির ক্ষেত্রে তিনি ওদের ধমক দিয়েছেন। কাগজ দেখাতে বলেছেন। সে-সব ছোটখাটো ব্যাপার।

মূল বাড়ী নিয়ে ব্যাপারটার তখনও দেরী আছে। আমিও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য কিছু করেছি। কলকাতা থেকে বই আনিয়েছি, শরৎবাবুর সব বই। কিছু আধুনিক লেখকদের

বই, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, শৈলজানন্দ, প্রবোধকুমার—এই সব, আর খানকয়েক মাসিকপত্রও নিয়েছি। সবই হাকিমের জন্য বলতে গেলে। তবে দোহাই ধর্ম, এটাকে তুমি ঘুষ দেওয়া বলো না। ওঁর জন্যে একখানা বাড়ীও দেখে দিয়েছি, ওঁর স্ত্রী আসবেন। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। কথা দিয়েছি—মেয়েদের জন্যে যে ইস্কুলটা করছি আমি মায়ের নামে, সে বাড়ীটা তাড়াতাড়ি করিয়ে ওঁকে দেব, যতদিন উনি থাকবেন। সুখেশ্বরকাকার ছেলে কল্যাণেশ্বর তার ঠিকেদার, তাকেও বলে দিয়েছি। হাকিমের জন্যে সেও প্রাণপণে খাটছে।

এদিকে খাতাপত্র সন্ধান করে পাওয়া যায়নি। আমি ছেড়েই দিয়েছি সব আশা!

মেজঠাকুমা কেমন হয়ে গেছেন। মধ্যে মধ্যে বলেন—তোকে আমি মিছেই নিয়ে এলাম ভাই। লজ্জায়, দুঃখে যে মরে যাচ্ছি রে।

—কেন ঠাক্‌মা? এতে তোমার লজ্জা কি?

—ওরে তোর মেজঠাকুরদা যে এর হেতু!

—তা আর তুমি কি করবে?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতেন—বুঝতে পারছি না রে! মনকে বোঝাতে পারছি না।

আমার করুণা হত।

এই সময় হঠাৎ মেজঠাকুমাকে ওরা কলঙ্কিনী বললে!

কিছুদিন পর। দিন বিশেক পর। সেদিন রবিবার, বিকেলে গিয়েছিলাম হরেন ঘোষের ওখানে। ওঁর স্ত্রী এসেছেন। দেখা করতে গিয়েছিলাম। রবিবারের সকালটা জমে উঠেছিল। ১৯৩৬ সালের আধামডার্ণ অর্থাৎ ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে। যে মেয়ে অন্ততঃ হাকিম-গৃহিণীর মর্যাদা রাখতে পারে। অর্থাৎ আবদার করতে পারে। বেশ লাগল, চা খাওয়ালেন। প্রথমেই বললেন স্বামীকে—ওই ওঁকে বল। তোমায় দিয়ে হবে না।

আমি বললাম—কি?

—একটা ছুতোর মিস্টার রায়। এই ফার্নিচারগুলো একটু ঠুকেঠেকে দেবে।

হরেন ঘোষ বললেন—দেবেন মশায়। নইলে মান আমার আর থাকে না।

—মান তোমার উনি পাঠিয়ে দিলেও থাকবে না। কারণ, উনি তো আমারও বন্ধু। তোমার এতগুলো পিওন, এতগুলো ক্লার্ক, এত ক্ষমতা, তার দামটা তাহলে কি?

আমি বললাম—দেব। নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব। এর জন্য নতুন পাতা ঘরে অশান্তি করবেন না।

হাকিম-গৃহিণী বললেন—আর সেই কথাটা বললে না? বললেন স্বামীকে।

হরেন ঘোষ বললেন—তুমি বল না, তোমারও তো বন্ধু।

—বলতাম নিশ্চয়। কিন্তু এ-কথাটা তোমার বলা উচিত।

বললাম—কি? বলুন?

—ছবি মশাই। একখানা ছবি ওঁর এঁকে দিতে হবে।

—দেব। খুশী হয়েই বললাম—দেব।

—আমার কলকাতা যাবার আগে দেবেন কিন্তু। সেখানে দেখাব আমি।

—কখন কলকাতা যাবেন? এই তো এলেন।

—মাস তিনেক পর।

—তাহলে কথা দিলাম।

বলে চলে আসছিলাম। বোশেখ মাস পড়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তবু এখনও প্রচণ্ড উত্তাপ। বাড়ী ফিরতে কষ্ট হল। মেজাজও খারাপ হল। এর উপর ঠাকুরবাড়ীর কাছে এসে ধনেশ্বরকাকার গর্জন শুনে ভুরু কুঁচকে উঠল আমার। এরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমার নীরবতা এবং ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে। আজ যেন গর্জনটা বেশী, তবু চলে এলাম। বিবিমহলের সামনে রোজারিওকে পেলাম, বললাম—ওরে, একটা ছুতোর ডেকে হাকিমের বাসায় কাল নিয়ে যাবি তো! মজুরী আমরা দেব। আর—। বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। বলতে যাচ্ছিলাম, ধনেশ্বরকাকাকে বলে আসুক বাবু জিজ্ঞেস করছেন, এত চেঁচাচ্ছেন কেন? কিন্তু না থাক। শুধু ছুতোরের বরাত করেই ক্ষান্ত হলাম।

রোজা বললে—যাব হুজুর!

হন হন করে উঠে গেলাম। ভাবছিলাম, একবার তোমাকে আসতে লিখলে কি হয়! হরেন ঘোষের বউয়ের সঙ্গে আলাপ করে যাবে। মন্দ লাগছিল না আইডিয়াটা। উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, মেজঠাকুমা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন শোকাতুরার মত, অতি ক্লান্তের মত। দু চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে। তিনি কাঁদছেন।

সেদিন মেজদিকে ঘরে বসে এমন করে কাঁদতে দেখে সে আঘাত পেয়েছিল। একটু চিন্তিত হয়েই প্রশ্ন করেছিল—কি হল মেজদি? কাঁদছ কেন?

মেজঠাকুমা মেজদি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি থেকে তুমি হয়েছিলেন।

মেজঠাকুমা চোখ মুছে চোখের জল গোপন করতে পারেনি, আরও বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। যেন ভেঙে পড়ে গিয়ে বলেছিলেন—সুরেশ্বর, আমাকে তুই বৃন্দাবন পাঠিয়ে দে ভাই! নয়তো নবদ্বীপ। যা দিস তুই তার বেশী আমার লাগবে না। আমাকে শুধু পাঠিয়ে দে।

মেজঠাকুরদার বড় ছেলে, মেজদির বড় সতীনপো এবং তার মেজ ছেলে তাঁকে কুৎসিত কথা বলেছে। চরমতম কুৎসিত কথা। এর থেকে বড় অপমান আর কিছু হতে পারত না মেজদির। শুধু মেজদিরই নয়, তারও।

সুরেশ্বর বললে—আমি লজ্জায় মরে গেলাম সুলতা। তার সঙ্গে কি যে দুরন্ত ক্রোধ আমার হল, তা বলতে পারব না। মনে হল, ওই ভাঙাভগ্ন দেহ, ফাটলধরা মানুষটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষাক্ত কীট সরীসৃপে ভরা। রায়বংশের ধ্বংসবীজ বিষাক্ত বাষ্প ওর মধ্যে জমাট বেঁধে আছে। ওটাকে আমার ধ্বংস করা উচিত। এখুনি ছুটে গিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে আসি! তিরিশ সালে জেলে যখন গিছলাম, তখন পুলিশ আমাদের বন্দুক-রিভলবার বাজেয়াপ্ত করে

নিয়েছিল। আমি স্টেটসম্যানে অনুতাপ করে চিঠি লিখে স্পাই নাম কিনেছিলাম। কিন্তু বন্দুকটন্দুক নিইনি আর। কলকাতায় নায়েব হরচন্দ্র ঘোষাল বলেছিলেন। তাতে মা-আমি দুজনেই না করেছিলাম। বন্দুক থাকলে সেটা নিশ্চয় আমি কীর্তিহাট নিয়ে যেতাম এবং সেই-দিনই আমি খুন করে বসতাম এবং নিজেও হতাম।

উপলক্ষ্য একখানা সাবান। দামী ল্যাভেণ্ডার সোপ ব্যবহার করত সুরেশ্বর। মেজদি একদিন বলেছিলেন— বাহারের খুসবু ভাই নাতি। একে কি সাবান বলে?

—ল্যাভেণ্ডার সোপ বলে মেজদি!

—খুব দামী বুঝি?

—তা দামী বই কি। খাস বিলিতী জিনিস। এক-একখানা আড়াই টাকা।

—ওরে বাপরে! তাই। তারপর হঠাৎ হেসে বলেছিলেন—জানিস ভাই, আমার দাদাশ্বশুর, তোর ঠাকুরদারও বাবার মামা—বুঝতে পারলি?

—হ্যাঁ, বীরেশ্বর রায়।

—হ্যাঁ তিনি। খুব জাঁদরেল লোক ছিলেন। নীলকুঠীর সাহেবদের তখন কুঠী ছিল। তাদের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেন। তাদের কাছে ইংরিজী শিখেছিলেন। একজন পাদরী-সাহেব ছিল, সে পড়াতো। সে নাকি ডাল-ভাত আর কড়াইবাটা খেতে খুব ভালবাসত। তা আমার দাদাশ্বশুর হয়ে উঠলেন সায়েবী মেজাজের লোক। বন্দুক দিয়ে বাঘ মারতেন, কুমীর মারতেন। ঘরে নাকি, এই বিবিমহলে, খাঁচায় করে বাঘ পুষেছিলেন। তাঁর কুকুর ছিল। এই বড় বড় কুকুর—ডালকুত্তা। কুকুর মণ্ডা খেত। ঘিয়ের মিষ্টি খেলে রোঁয়া উঠবে—তাই খাস মণ্ডার বরাদ্দ ছিল। তিনি মহলে যেতেন, কুকুর সঙ্গে যেত, যেত পাল্কিতে। এ-গাঁয়ে তখন সরকারদের বাড়িতে স্বর্ণপিসী ছিল গাঁয়ের পিসী। তা স্বর্ণপিসী বলত—মরে এবার ফিরেশ্বরের কুকুর হব। তাই ভাই আমারও বলতে ইচ্ছে করছে—এবার মরে তোর বেটী হয়ে জন্মাব, নইলে নাতনী হয়ে।

হেসে সুরেশ্বর এক বাক্স সাবান তাঁকে দিয়ে বলেছিল—তার জন্যে মরতে হবে জন্মাতে হবে এত ঝঞ্ঝাট করতে হবে কেন? যার নাতি এমন সাবান মাখে, সে কি নিজে এ-সাবান মাখতে পারে না?

লজ্জিত হয়ে মেজঠাকুমা বলেছিলেন—না-না-না সুরেশ্বর। আমাকে কি সাবান মাখতে আছে? তা আবার ওই সাবান!

—আছে ঠাকুমা। কে বললে নেই?

—তুই পাগল!

—না। পাগল নই। এ তোমাকে নিতেই হবে। মাখতেও হবে। না মাখলে আমার দিব্যি রইল।

—এই দেখ্! কি করলি বল তো?

বলে তিনি নিয়েছিলেন সাবানের বাক্সটি।

সুরেশ্বর বললে—আমার মায়ের থেকে মেজদি বয়সে ছোট ছিল। আমার থেকে আট-দশ বছরের বড়। তখন তাঁর বয়স ছত্রিশের বেশী নয়। সন্তান-সন্ততি হয়নি। রূপ ছিল, যৌবনও ছিল। দেখতে যুবতী মেয়ে মনে হত। মনে মনেও তাই ছিলেন, একটি সরস কৌতুক, দুর্লভ নির্মল জলের জোয়ার তাঁর জীবনকে ভরে রেখেছিল। তার সঙ্গে ছিল সাধ-আহ্লাদ: এ-সাধ বোধহয় বুড়ো-বুড়ীরও থাকে। তাঁর অপরাধ তিনি যুবতী, সুন্দরী। তার উপরেও অপরাধ ছিল—আমার প্রতি তাঁর স্নেহ এবং বিষয়ের ঝগড়ায় আমার দিকে তাঁর পক্ষপাত। ফলে—

দুর্নাম রটল কয়েক দিনের মধ্যেই।

ওই সাবান মাখতেন মেজদি। প্রথম ক'দিন ঘরে সকলের অগোচরে মুখে মাখতেন। তারপর একদিন ঘাটে গিয়ে স্নানের সময় গায়ে মেখেছিলেন। ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে ঘাট ভরে গিয়েছিল। তাঁর গায়েও সে-গন্ধ লেগে ছিল।

সে-খবরটা রটিয়েছিল প্রথম ধনেশ্বরের মেজছেলে, ব্রজেশ্বরের ভাই। তারপর ধনেশ্বর রুদ্র-মূর্তিতে সৎমায়ের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

—সাবান মাখছ? খুসবু সাবান? সুরেশ্বর দিয়েছে? লম্পটের পুত্র ওই সুরেশ্বর দিয়েছে তোমাকে খুসবু সাবান?

হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন মেজগিন্নী!

ধনেশ্বর এবার অ্যাক্‌টিংয়ের ভঙ্গিতে চীৎকার করে উঠেছিল, তুই ভ্রষ্টা, তুই পাপিষ্ঠা। তুই কলঙ্কিনী!—কলঙ্কিনী, ও যে তোর পৌত্র! ছি-ছি-ছি!

বলতে বলতে চলে এসে ঠাকুরবাড়ীতে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে শুরু করেছিল, তিরস্কার করতে শুরু করেছিল মরা বাপ শিবেশ্বর রায়কে—

—নরকস্থ হও। অনন্তকালের জন্য নরকস্থ হও তুমি। তুমি শিবেশ্বর রায়—তুমি কামার্ত পশু ছিলে, ফলভোগ কর তার। কর ফলভোগ। রত্নেশ্বর রায়, তোমার স্বর্গসিংহাসন নড়েছে। পড়ছে—পড়ছে নরক মুখে। কাঁদছ, তুমি কাঁদছ? তারপর অট্টহাস্য করে উঠেছিল—হা-হা-হা-হা! ধনেশ্বরের পিতৃদত্ত শিক্ষার মধ্যে নাটুকেপনা একটি বড় সম্পদ।

লোক জমেছিল চারিদিকে। পঙ্ক-পল্বলে ঝাঁকবন্দী খেয়ো মাছির মত।

মেজদি ভয়ার্ত হয়ে ঘরে খিল দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। মরবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু ভয় হয়েছিল। নিদারুণ ভয়। তবে কি করবেন? তবে কি করবেন? ওদিকে গোটা মেজতরফের কুৎসিত কথাগুলি গোটা বাড়ীটার খিলানে খিলানে যেন বেজে বেড়াচ্ছিল। মেজদি থাকতেন সুরেশ্বরের অংশের বাড়ীতে। যে-ঘরে মেজকর্তা থাকতেন, সেখানেই থাকেন। বাকী ঘরগুলিও ওদের দখলে। সেখান থেকেও ভেসে আসছে কুৎসিত বিস্ময় প্রকাশের শব্দ ও ধ্বনি। শিউরে-ওঠা, একটি লম্বা টানা ও শব্দ।—ও মাঃ! কোথায় যাব গো! কি লজ্জা, কি ঘেন্না! ঘাটে সুগন্ধি সাবান মাখা! এমন গন্ধ যে, গায়ের পাশে

মৌমাছি উড়ছে! ছি-ছি-ছি! তা-ও আবার কে দিয়েছে? না—নাতি! আপন ভাগুরপোর ছেলে! ছি-ছি-মা! ও যে ছেলের বয়সী গো! সেকালে বারো বছরের মেয়ের ছেলে হয়েছে। কি রুচি, কি প্রবৃত্তি! আর ওই ছেলে, ওই কুলাঙ্গার!

মেজদির হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড যেন মাথা কুটে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল। হঠাৎ এক সময় তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে প্রায় উন্মাদিনীর মত ছুটে এসে উঠেছিলেন বিবিমহলে।

—সুরেশ্বর! সুরেশ্বর! দাদু-ভাই! ওরে!

সুরেশ্বর তখন বাইরে বেরিয়েছিল। তখন থেকে তিনি এখানেই ভয়ার্ত হরিণীর মত লুকিয়ে বসে আছেন।° কাঁদছেন।

সুরেশ্বর ফিরে এসে তাঁকে কাঁদতে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—কি হল মেজদি? কাঁদছ কেন?

মেজদি হু-হু করে কেঁদে উঠেছিলেন, বলেছিলেন—সুরেশ্বর, আমাকে দয়া করে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দে ভাই। নয়তো নবদ্বীপ। ওরে, যা দিস তুই তার বেশী লাগবে না। আমাকে শুধু পাঠিয়ে দে। ওরে, জগদীশ্বর সেই খুনে পাষণ্ড নেই, সে এলে আমার লাঞ্ছনার বাকি থাকবে না।

* * * *

বহু কষ্টেই কি হয়েছে তা মেজদি বলেছিলেন। সুরেশ্বরের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল। হাতের কাছে বন্দুক থাকলে বা রিভলবার থাকলে সে আজ নির্বংশ করে আসত রায়বংশকে। শেষ গুলিতে নিজে মরত।

কিছু করবার জন্য সে অধীর হয়ে উঠেছিল। ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করেছিল শুধু হাতেই। ইচ্ছে হচ্ছিল ধনেশ্বরের তৃতীয় পুত্র, সেই অতিকায় দানব যেমন সুখেশ্বরের বুকে চেপে বসে গলা টিপে তাকে হত্যা করেছিল, তেমনিভাবেই সেও গিয়ে ওই ধনেশ্বরের বুকের উপর চেপে বসে গলা টিপে হত্যা করে তাকে, তার কলুষিত কণ্ঠটাকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেয়।

মেজঠাকুমা বললেন—আমাকে ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকতে দেবে না বলেছে। আমি তিনবেলা গোবিন্দের কাছে যাই, সন্ধ্যায় গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি, মালা গেঁথে দিয়ে আসি, ভয়ে যেতে পারিনি সুরেশ্বর। মরবার আমি সাহস পাচ্ছিনে, নইলে মরতাম রে। কিন্তু আমি গ্রামে মুখ দেখাব কি করে?

একটা অজুহাত পেয়ে সুরেশ্বর চমকে সজাগ হয়ে উঠল মুহূর্তে। সে মেজঠাকুমাকে বললে—ওঠ। এস আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—ঠাকুরবাড়ী। এস। দেখি। যা হবার হয়ে যাক। এস।

—না সুরেশ্বর। তুই ওদের জানিসনে। ওরে—

—ওদের আমি জানি মেজদি—তুমি আমাকে জান না। এস। দেখি কার সাহস বড়,

তোমাকে কি বলে ?

—না-রে। ওরে আমার কলঙ্ক মাথায় করে আমি মরব, তুই ওদের—

বাধা দিয়ে স্বরেশ্বর বলেছিল—তোমার কলঙ্ক তুমি সইবে, কিন্তু আমি সইব না। এস। যদি না এস, তবে—

—বেশ, তোর কাছে আর আসব না।

—না। চীৎকার করে উঠেছিল স্বরেশ্বর।

এবং মেজদির হাতখানা চেপে ধরে আকর্ষণ করেছিল।—এস। ওঠ। তারপর ডেকেছিল—রঘু!

রঘু পাশের ঘরেই উৎকর্ণ হয়ে সব শুনছিল। সে এসে দাঁড়াতেই বলেছিল—রোজা, ডিকু এরা আছে ?

—রোজা আছে। ডিকু আজ সনঝা বেলাসে ছুটি নিয়েছে।

—বেশ, তুই স্বদ্ধ আয়।

৪

মদে মাতাল হয় মানুষ। বিষয় নিয়ে তেমনি বিবাদ করে মানুষ। না ক'রে উপায় নেই। সুলতা, রায়বংশের সেরেস্তাখানায় তুটো ঘর আছে, মামলার নথিতে বোঝাই। রায়-বংশের একটা বিখ্যাত মামলা—রত্নেশ্বর রায় আর তাঁর বোন সর্বাণী দেবীতে। রত্নেশ্বর নাকি পোষ্যপুত্র। কিন্তু তাঁকে পোষ্য নেবার পর ওই কন্যা হয়েছিল। কন্যাকে টাকা—দু'লক্ষ টাকা—দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়, সম্পত্তি দেননি। বাপের মৃত্যুর পর সর্বাণী দেবী মামলা করেন। রত্নেশ্বর হাতজোড় করে আরও টাকা—অনেক টাকা দিয়ে সে মামলা মিটিয়ে-ছিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলেরা মামলা অনেক করেছে। আমি দূরে থেকে এর সংস্পর্শ বাঁচিয়ে ছিলাম; মেজঠাকুরদার মামলা করার কথা শুনে প্রশ্ন করতাম নিজেকে; কেন? কেন করেন? দু'-চারটে মামলা তিনি করতেন জেদের বশে, কুটিল উদ্ধত জোতদারদের সঙ্গে, তাতে তারিফ করতাম। দু'-একটা মামলা হত অন্য জমিদারের সঙ্গে, তাতেও মন সায় দিত। বাকীর জন্য আমি নিন্দাই করতাম। যাই হোক, মোট কথা বিবাদ-কলহে রুচি আমার ছিল একথা বলে অপবাদ আমাকে কেউ দেবে না। আমি গেলাম মেজঠাকুমাকে নিয়ে। রোজা আর রঘু আমার সঙ্গে গেল, রঘু চাকরখানসামার কাজ করলেও হিন্দুস্থানী। তখন—মানে সতেরো বছর আগে ওর বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশী ছিল না। সেও লাঠি নিয়ে লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে এল।

হঠাৎ একটু থেমে স্বরেশ্বর বললে—সুলতা, অসাধারণ শক্তিশালী বলে অহঙ্কার আমার কোনকালে নেই। তবে রায়বংশের বংশানুক্রমে আমরা লম্বা-চওড়া কাঠামোর অধিকারী, হাড় আমাদের মোটা শক্ত। বাবা-মা যেভাবে মানুষ করেছিলেন তাতে পুষ্টির অভাবও ছিল না। সেটা ছত্রিশ সাল, আমার বয়স ছাব্বিশ। তবে সাহস আমার ছিল। জেদ আমার ছিল। ভয় কিছুকে করি নি। সেটা তুমি জান। স্টেটসম্যানে যে চিঠিটা আমি ছেপেছিলাম,

সেটা ন্যায় হোক অন্যায় হোক, অর্ধসত্য অর্ধমিথ্যা যাই হোক, আমার যেটা বিশ্বাস সেটা ছাপতে ভয় আমি পাই নি। এবং তারপর সহজ পদক্ষেপে সমাজে এসেছি। এসেই তোমাকে চিঠি লিখেছি। সুতরাং সবচেয়ে বড় বল ছিল আমার দুঃসাহস। বল ত বটে এবং সেইটেই বোধহয় ছিল ইলেকট্রিক পাওয়ারের মত একটা শক্তি, যাতে দুর্দান্ত রাগের সুইচ অন করে আমাকে একটা ক্রাশিং মেশিনের মত চালু করে দিলে। তার ফলে আমার থামবার উপায় ছিল না। দুর্দান্ত ক্রোধে সাহসে আমি চলেছিলাম। হয় ওদের পিষে দেব, নয় আমিই অক্ষম হয়ে ফিউজ হয়ে থেমে যাব। কিংবা গোটা যন্ত্রটা ভেঙে যাওয়ার মতই ভেঙে যাব।

ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকে ডাকলাম—ঠাকুরমশায়!

ঠাকুরবাড়ীতে হেজাক বাতি জ্বলছিল মন্দিরের বারান্দায়। কালীমন্দিরে একটা, গোবিন্দ-মন্দিরে একটা। আমিই দিয়েছিলাম কিনে। মেজঠাকুমাই আদায় করেছিলেন।

গমগম করে উঠল গোটা ঠাকুরবাড়ীটা। আমি আমার কণ্ঠস্বর শুনে একটু চমকে উঠলাম। এমন করে তো কখনও কাউকে ডাকি নি! সন্দেহ হল—এ আমার কণ্ঠস্বর?

মেজঠাকুমা সভয়ে বললেন—সুরেশ্বর!

তখন আমি খুশী হয়ে উঠেছি। হ্যাঁ, এই তো রায়বংশের কণ্ঠস্বর!

বাধা কেউ দেয় নি। ধনেশ্বর ব'সে আহ্নিক করছিলেন। তাঁর দুই ছেলে দ্বিতীয় আর চতুর্থ, ভূপেশ্বর এবং রাজেশ্বর, তারা বসে ছিল ঠাকুরবাড়ীর ওপাশে কাছারীবাড়ীর বারান্দায়। কথা বলছিল সুরেশ্বরের আপন জ্যাঠতুতভাই প্রণবেশ্বরের সঙ্গে। প্রণবেশ্বর সেইদিন সকালেই এসেছে। এসেছে এই সেটেলমেণ্টে নিজের স্বত্ব লেখাতে। নিজেদের স্বত্ব সবই বিক্রী করেছে; করেছেন তার বাপ যজ্ঞেশ্বর, কিনেছিলেন সুরেশ্বরের মা। থাকবার মধ্যে আছে মুনাফা বা লাভশূন্য দেবোত্তরের সেবায়েত স্বত্ব। তার জন্যে আসে নি, এসেছে ধনেশ্বদের সঙ্গে যোগ দিতে। যা পারা যায়, যেমন ক'রে পারা যায় কিছুটা খামচে নিতে। খবরটা সুরেশ্বরকে নায়েবরাই দিয়েছিল। প্রণবেশ্বর এসে সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা করে নি। এবং নিজের যে বাড়ী সুরেশ্বরদের বিক্রী করেছে, যে বাড়ীতে এখন ধনেশ্বর ও সুখেশ্বরের ছেলেরা বাস করছে সেখানেও যায় নি। দেবোত্তরের সামিল কাছারীবাড়ীর একখানা ঘরে এসে উঠেছে। আগে এমন ক'খানাই ঘর ছিল যেখানে বিশিষ্ট প্রজা, পত্তনীদার, উকীল, মোক্তার এলে বাসা দেওয়া হত।

সুরেশ্বরের হাঁকে ঠাকুর বেরিয়ে এসে দাঁড়াল—আজ্ঞে!

সুরেশ্বর বললে—মেজঠাকুমা এসেছেন।

কোন দিক থেকে কোন কথা উঠল না। শুধু একটু চাঞ্চল্য ছাড়া। ধনেশ্বর একবার ফিরে দেখে ডেকে উঠলেন—কালী করুণাময়ী! আর কত সহ্য করবি মা?

ওদিকে তাঁর ছেলেরা খানিকটা ফিসফাস ক'রে চুপ হয়ে গেল। শুধু একবার উঁকি মেরে দেখেই প্রণবেশ্বর ঘরে ঢুকে গেলেন।

নির্বিবাদে কালীমন্দিরে প্রণাম ক'রে, রাজরাজেশ্বর এবং গোবিন্দমন্দিরে প্রণাম ক'রে

চরণোদক নিয়ে বেরিয়ে এলেন মেজঠাকুমা। সুরেশ্বর সেদিন বোধহয় একটা ঝোঁকের মাথায় ঠাকুমার সঙ্গে মন্দিরের ভিতরে ঢুকেছিল। সে ঘরে ঢুকে প্রণাম করে উঠে চারিদিক তাকিয়ে দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। ঘরের কোণে একটা বড় আয়রন-চেস্ট। আলমারী নয়—সিন্দুক। আকারে প্রকাণ্ড। সে জিজ্ঞাসা করেছিল—এখানে ওটা? আয়রন-চেস্ট?

পূজুরী জবাব দিয়েছিল—হ্যাঁ!

—কি থাকে ওতে?

—তা তো জানি না বাবু! আমি তো খোলা দেখি নি!

মেজঠাকুমা বললেন—ওতে গোবিন্দের গহনা থাকত। এখন কতকগুলো পুরনো কাগজ আছে।

—চাবি কার কাছে?

মেজঠাকুমা উত্তর দিলেন না। ঠাকুর বললে—তা তো বলতে পারব না। সিন্দুক তো খোলা হয় না কখনও। আমি দেখি নাই বাবু।

—হুঁ! গহনা আছে, না—নেই? ঠাকুরকে পরানো হয় না?

—না।

মেজঠাকুমা হেসে বললেন—গহনা নেই সুরেশ্বর।

—নেই?

মেজঠাকুমা বললেন—এখন ওসব কথা থাক সুরেশ্বর। পরে যা হয় করবে। রাত্রি হয়েছে, গোবিন্দের শয়নের সময় হয়েছে, চল।

সুরেশ্বর বললে—চল।

তার মনটা খুশী হয়ে উঠেছে। সে আঁচ একটা পেয়েছে। একটা নিষ্ঠুর কলহের সূত্র পেয়েছে সে!

বেরিয়ে এসে সে ডাকলে—নায়েববাবু!

বৃদ্ধ নায়েব বেরিয়ে এল—আজ্ঞে!

—খুব জরুরী দরকার আছে আমার। একবার আসুন আমার ওখানে।

—কাল। কাল আসতে বল্ ভাই। আজ নয়। আজ মেজাজ তোর ভাল নেই। আমার কথা শোন।

সুরেশ্বর একটু চুপ করে ভাবলে। ইতিমধ্যে মেজঠাকুমা মৃদুস্বরে বললেন—আমার কথাগুলো শুনে নে ভাই আগে।

সুরেশ্বর বললে—থাক। কাল সকালেই আসবেন।

তার নিজের নায়েবকেও ডেকে বললে—কাল সকালে আপনি ওঁকে তাগিদ দিয়ে নিয়ে আসবেন।

আজ সুরেশ্বরের কণ্ঠস্বরে ভঙ্গিমায় অলঙ্ঘনীয় একটি প্রভুত্বের ভার এবং ধার দুইই ছিল।

এতক্ষণে প্রণবেশ্বর বেরিয়ে এসে বললে—কেমন আছ?

—ভাল। আপনি কখন এলেন?

হেসে প্রণবেশ্বর বললে—এই সকালে।

—এখানে উঠেছেন ?

—হ্যাঁ। নইলে আর উঠব কোথায় ! বাবা তো সবই বেচে—।

—বেচলেও তো সেটা বাইরে যায় নি ! ঘর তো ঘরেই আছে।

—তা আছে। কিন্তু বিষয়-ব্যাপার নিয়ে ঘরে-ঘরেই তো বিবাদ আগে লাগে।

হেসে স্বরেশ্বর বললে—তা লাগে !

—সুতরাং—

—বুঝেছি বড়দা। থাক।

—কাল একবার যাব তোমার কাছে।

—আসবেন।

বেরিয়ে এসে পথে প্রথমেই মেজঠাকুমা বললেন—তুই ভাই ঘোষাল ম্যানেজারকে আনা। এরা কুরুক্ষেত্র বাধাতে জোট বেঁধেছে !

স্বরেশ্বর বলেছিল—তাঁর যে স্ট্রোক হয়ে প্যারালিসিস হয়েছে ঠাকুমা ! সেরেছেন তবে আসা যে অসম্ভব। তা ছাড়া স্মৃতিও ভ্রংশ হয়েছে।

—তা হলে !

—ভেবো না তুমি ঠাকুমা। এ যদি সব চলেও যায় তবু আমি ফকীর হব না। আর তাই বা হব কেন ? মিথ্যের জাল, ও টিকবে না। লড়ব, দরকার হলে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ব।

তারপর নীরবে পথ হেঁটেছিলেন দুজনে। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে মেজঠাকুমা বলেছিলেন—ঠাকুরের গহনা তোর মেজঠাকুরদা সব বিক্রী করেছেন স্বরেশ্বর।

চুপ ক'রে রইল স্বরেশ্বর।

—সিন্দুকের চাবি তাঁর কাছেই ছিল। তিনি তো বিষয়বুদ্ধিতে পাকা ছিলেন। তিনি গহনা গালিয়ে, সোনার পরিমাণ কম ক'রে লিখে জমা করে, নিজের বিষয় কিছু—তাও বাজে বিষয়—দেবোত্তরে কেনা হল বলে খরচ লিখেছিলেন। ধরবার তো কেউ ছিল না !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে স্বরেশ্বর। কি বলবে ? এঁরই মেজঠাকুমার স্বামী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতি এঁর ভালবাসার কথা সে জানে। আশ্চর্য লাগে। সমস্ত দোষত্রুটি সব অকপটেই বলেন—তবু তাঁর প্রতি এই মেয়েটির ভালবাসা তো কম নয় ! কি দিয়ে গেছেন তিনি ? কিছু না। বলতে গেলে—পথেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তবুও—। আশ্চর্য লাগে স্বরেশ্বরের।

মেজঠাকুমা আবার বললেন—কি যে সে বুদ্ধি কি বলব তোকে ! তাঁর বাপ—আমার শ্বশুর—রায় বাহাদুরের আমলে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। রাজরাজেশ্বর প্রথম থেকেই আছেন। সে আমার বড় শ্বশুরের, সোমেশ্বর রায়, তোদের যিনি জমিদার প্রথম পুরুষ তাঁর আমলের। মা-কালী প্রতিষ্ঠার অনেক ক' বছর পরের কথা। এক সন্ন্যাসীর কাছে পেয়েছিলেন। তোর মেজ-ঠাকুরদা যখন গহনা বিক্রী করেন, তখন এই দুই আমলের যেসব জমাখরচের খাতায় এই গহনা তৈরীর খরচ আছে তা বেছে বের ক'রে এনে নিজের কাছে রেখেছিলেন। ছেলেদেরও বলেন

নি। তারা গহনা বিক্রীর কথা জানে--খাতার কথা জানে না। গহনা কম ছিল না ভাই। শুধু গহনা নয় অনেক আসবাব—সোনার ফুরসী পর্যন্ত।

সুরেশ্বর ব্যগ্র উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—সে সব খাতা তো নষ্ট করে দিয়ে গেছেন তিনি?

হেসে মেজঠাকুমা বললেন—না। তা করেন নি। বলতে আজ লজ্জা পাচ্ছি ভাই, আমি বলেছিলাম—দেখ, করলেই যদি চুরির পাপ, তবে আর ওগুলো রাখছ কেন? কিন্তু তিনি বলেছিলেন—উঁহুঁ। কোন মকদ্দমায় কখন লাগে! তুই আমলের খাতাতেই অনেক সম্পত্তি কেনার জমাখরচ আছে। অনেক নমুদ আছে। ও থাক। যখন আমার সব যাবে তখন পুড়িয়ে দেব। সেগুলোকে একটা ভাঙা সিন্দুকে কতকগুলো বাজে কাগজের গাদায় লুকিয়ে রেখেছিলেন।

—সেগুলো আছে ঠাকুমা?

—আছে। সেগুলো তুই নিয়ে যা ভাই। আজ তো আর আমার কোন লজ্জাই রইল না। এই যে তোর সঙ্গে ওরা বিষয়ে নানান প্যাঁচ ক'সে তোকে সম্পত্তি বিক্রী করেও বঞ্চিত করতে চাচ্ছে, এর জন্যে আগেই বের করে দেওয়া উচিত ছিল। ওতে অনেক নজীর পাবি। পূজুরী বামুনের মেয়ে---বুড়ো জমিদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল--শিখেছি অনেক, জানি অনেক। দেওয়া উচিত ছিল, তুই আমার ছেলের অধিক, সহোদরের অধিক। তুই খেতে দিস তাই খেতে পাই। তোকে আমিই আনতে গিয়েছিলাম সেটেলমেন্টের জন্যে। তবু পারি নি দিতে বা বলতে। আজ লজ্জা ঘুচে গিয়েছে—

বলে হেসে উঠলেন, বোধ করি সেদিন সেই প্রথম হাসলেন, বললেন—নাতি, তুই শেষে ল্যাভেণ্ডার সাবান দিয়ে আমার লজ্জাটজ্জা সব ধুয়েমুছে শেষ ক'রে দিলি! সিন্দুকের চাবিও আমার কাছে আছে, সেও তুই নিয়ে যা। ওরে, সব আজ রাত্রেই নিয়ে যা।

সে অনেক কাগজ অনেক খাতা। মোটা মোটা রোকড় খাতা খেরোতে বাঁধানো—শক্ত সুতো পাকানো দড়িতে বাঁধা, প্রায় এক একটার ওজন আড়াই সের, সংখ্যায় পঁচিশ খানা। ওজনে দেড় মণের উপর। আর কাগজ, সে স্তূপীকৃত। তার মধ্যে তারের ফাইলে গাঁথা চিঠি। সে ফাইলও অনেক। আরও কতকগুলো ছোট ছোট দপ্তর। তার সঙ্গে বের করে দিয়েছিলেন একটা সুন্দর বাক্স। এক বারে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়নি রোজা এবং রঘুর পক্ষে। দুবারে নিয়ে যেতে হল। বিবিমহল মূল বাড়ী থেকে কম রাস্তা নয়। বেশ খানিকটা। সবশেষে মেজঠাকুমা দুটো চাবি দিয়েছিলেন। ওই লোহার সিন্দুকটার দুটো চাবি। মেজকর্তার মৃত্যুর পর ও দুটোরও কেউ খোঁজ করেনি। কারণ ওটার গজভুক্ত কপিত্থের মত অবস্থার কথা মেজ-তরফের কারুর কাছেই অজ্ঞাত ছিল না। মেজকর্তা যতই তৈরী করা হিসেবের আড়াল দিয়ে থাকুন, আসল সত্যটা চাপা থাকবার কথা নয় কোন লোকের কাছেই। ধনেশ্বর প্রভৃতির মনে মনে সেই বোধটা ছিল। চাবি যার কাছে থাকবে সেই দায়ে পড়তে পারে এই কারণেই কেউ চাবির খোঁজ করে নি। চাবি দুটোর একটা বলতে গেলে অতিকায় ইঞ্চি পাঁচ ছয় লম্বা, তেমনি মোটা; ওজনে হয়তো পোয়া খানেক। আর একটা সেকালের কামারের তৈরী গা-তালার চাবি, সেটাও বেশ বড়।

মেজঠাকুমা দিয়ে বললেন—আমার পুরনো কর্তা সিন্দুকটা ফাঁক করে গেছেন, নতুন কর্তাকে দিচ্ছি, তুই ওটাকে ভ'রে দিস ভাই।

চাবি দুটো এবং ওই বাক্সটা সুরেশ্বর নিজে নিয়ে এসেছিল। বাক্সটা থেকে চন্দনের গন্ধ উঠেছিল।

প্রথমেই সুরেশ্বর খুলেছিল ওই বাক্সটা। হাতীর দাঁতের কাজকরা চন্দন কাঠের বাক্স। তারই মধ্যে ছিল প্রাচীনকালের পুঁথির আকারের একখানি খাতা। প্রাচীনকালের কাগজ। চন্দনের গন্ধ উঠছিল। পাতাগুলোর কোণ দুমড়ে গেছে। সন্তর্পণে সেখানা বের করেছিল সুরেশ্বর, ভেবেছিল কোন পুরনো দলিল জাতীয় কিছু হবে। কিন্তু উপরের মোড়ক কাগজখানা খুলে তার আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। খাতা বা পুঁথিখানার উপরে সেকালের শর বা লটের কলমে কষের কালিতে লেখা—

ওঁ কালী চরণ ভরসা।

কালিকা মঙ্গল—তথা, পাঁচালী রায়বংশস্য, রচিতং কুড়ারামেণ রায়বংশস্য
স্থাপয়িতা। বসতি কীর্তিহাট গ্রাম—পরগণা ময়না অন্তর্গত। সরকার—
গোয়ানপাড়াভুক্ত; জেলায়াৎ মেদিনীপুরে। রাজত্ব কোম্পানী বাহাদুরস্য,
বর্গী নবাব নিসূদন। শকাব্দ ১৭২৮। বঙ্গ-সাল ১২১৩। আংরেজী ১৮০৭।

কবি কালিদাস যদি বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহে রাজ্যখণ্ড পেয়ে রাজা কালিদাস হতেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকত না, বর্ধমানের রাজার সেরেস্তায় রামপ্রসাদ সেন রোকড়ের খাতায় হিসেবের বদলে শ্যামা-সঙ্গীত লিখে ধরা পড়ে রাজার কৃপায় ব্রহ্মত্র পেয়ে সাধক হয়েছিলেন এমন নজীর অনেক আছে, কিন্তু বিক্রমাদিত্য কালিদাসের মত হতে কোনদিন চাননি—চাইলে হতে পারতেন না। বর্ধমানের রাজাও রামপ্রসাদ হতে পারতেন না। সেই নজীরে সুরেশ্বরের কাছে কুড়ারামের এই পাঁচালী রচনার নিদর্শন এক মহাবিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। তাঁর একসঙ্গে জমিদার আর পাঁচালীকার হওয়া তার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছিল। সারারাত জেগে সে সেদিন এই পাঁচালী পড়েছিল।

* * * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, আমার ভাল লেগেছিল। আশ্চর্য লেগেছিল। শুধু রচনা নয়, কাহিনী এবং এই লোকটিকে আমার আশ্চর্য ভাল লেগেছিল। যদি বল নিজের বংশের আদি-পুরুষ বলে ভাল লেগেছে, তাও অস্বীকার করব না। যদি বল আমার মধ্যে সেদিন জমিদার জেগেছিল বলে ভাল লেগেছে, আমি রি-অ্যাকশনারী, তাতেও তকরার করব না। কোন ভান নেই, কোন ধর্মের বা ইজমের দোহাই নেই—আশ্চর্য অকপট মানুষ।

শেষের লাইনগুলো পড়েছ? মন দিয়ে পড়েছ কিনা জানিনে, আমি বলছি, তুমি আবার শোন—

পাপপুণ্য নাহি জানি, যাহা করিয়াছি আমি
সবার মালিক তুমি, জয় কালী-করালী।

ছিলাম দরিদ্র সুত ন ভবিষ্য নাহি ভূত
বর্তমানে দুঃখ কত তুই মা দেওয়ালি।
সেই দুঃখ পার করিলি, তুই সেই শক্তি দিলি
শেষে জমিদারী দিলি, মোর ঘরে এলি।
ছত্রি জমিদারের টাকা চুয়াড়েরা ডাকাবুকা
লুঠে দিল গাত্র ঢাকা, সে তুই লুঠালি।
থাক মা অচলা হয়ে, বিপদ আপদ জয়ে
সোমেশ্বরে ভাগ্য দিয়ে, দিয়ে বংশাবলী।
দিয়ো মাগো অতঃপর লক্ষ্মী-সরস্বতী বর
রায়কুল বংশধর ভরিয়া অঞ্জলি।
কোম্পানীকে দিয়ো জয় তাদের অনুগ্রহ যেন রয়
রায়বংশ হয়ে অক্ষয় মা তোর কৃপায়।
তোমাতে দেবত্র করি, বিষয় আদি জমিদারী
আমি মা ভাসাই তরী, রাখো রাঙা পায়।

আবৃত্তি শেষ ক'রে সুরেশ্বর বললে—সুলতা, মায়ের যদি চরণ থাকে আর যদি রাঙা টুকটুকেই হয় তবে তা কুড়ারাম পেয়েছিলেন। আর মা না থাকলে কথাই নেই, চরণ নেই, কুড়ারাম চোখ বুজে ফুরিয়ে গেছেন, তিনি মা-হারানো ছেলের মত খুঁজেও বেড়াচ্ছেন না। তবে আজ যদি কুড়ারাম জন্মাতেন, তবে একজন দুর্ধর্ষ রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতা হতেন তাতে সন্দেহ নেই।

সুলতা হাসলে। হেসে বললে—অ্যাসেমব্লীতে সুবোধ বাঁড়ুজ্জের এবং আর সবদের গালাগালি তোমাকে আঘাত দিয়েছে, তুমি ভুলতে পারছ না।

—না। সে গালাগালির জন্যে দুঃখ নেই—মনে কোন ক্ষতও নেই। আমি বলছি সুলতা, এত ক'রে এমন ক'রে বলছি এই জন্যে যে, আমি যেন তাঁকে অবিচার না করি।

—না। সে অবিচার তুমি করনি। আমিও করছি না। আমি অ্যাসেমব্লীর মেম্বর হলে হয়তো এমনি গালাগালিই করতাম। আর তার জন্যে দোষও তুমি দিতে পারতে না। কারণ আজ এইটেই মানুষের বিশ্বাস। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় লোকে কর্নওয়ালিশকে আশীর্বাদ করেছিল। আমি কালই চণ্ডীচরণের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং পড়ছিলাম। সে কথা থাক। ও নিয়ে মীমাংসার জন্যে আমি বসে নেই সুরেশ্বর। আজ আমি যার জন্যে এই রাত্রেও তোমার এখানে রয়ে গেলাম, বসে রয়েছি, সেই কথা বল। তোমার পূর্বপুরুষ আমার পূর্বপুরুষকে খুন করেছিলেন বা করিয়েছিলেন, যার জন্যে তুমি আর ফিরে এলে না কীর্তিহাট থেকে। আমার সঙ্গে জীবনে পাক বাঁধবার জন্যে আঁচলের যে খুঁটটা ধরে ছিলে সেটা ছেড়ে দিয়ে লিখলে—এ গ্রন্থি বাঁধা চলে না। ওখানে বিধাতা ছুরি উদ্যত করে রেখেছেন, বাঁধতে গেলে কেটে খানখান হয়ে যাবে। আমি সেই কথাটা শুনতে চাই। তুমি তাই বল। কীর্তিহাটের কড়চা তুমি দশজনকে ডেকে দেখিয়ো। তার থেকে তোমার জবানবন্দীতে

আমার গরজ বেশী।

সুরেশ্বর বললে—একটার সঙ্গে আর একটা এমন ভাবে বাঁধা সুলতা, যে বিধাতার ছুরিও তাকে কেটে আলাদা করতে পারবে না।

—কুড়ারামের পাঁচালীতে রায়বংশের খামখেয়ালী প্রকৃতি, ক্ষেত্রবিশেষে উন্মত্ত আচরণের একটা বীজ আছে। হেরিডিটি সায়েন্সে আছে, লুন্যাসি আর প্রতিভা, যদি তাকে পাপপ্রবৃত্তি পুণ্যপ্রবৃত্তি বলি, তবে তর্ক করো না। মেনে নাও, ও দুটো বংশে নানা মিশ্রণের মধ্যে একসময় ঢুকে বসলে সে থেকেই যায় এবং তার খেলা আর থামে না, চলে। এই খেয়ালীপনা পাগলামির বীজ রায়বংশে ঢুকিয়েছিলেন কুড়ারাম রায়। তুমি তাঁর পাঁচালীটা পড়ে এলে। কিন্তু সন্ধানটা ধরতে পারনি।

সুলতা সবিস্ময়ে বললে—কোনটা বল তো? কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পাগলামী বীজ? তিনি ভাল না মন্দ সে বিচার না করে একটা কথায় নিশ্চয় তুমি বিস্মিত হবে না যে, তিনি দুই আর দুইয়ে চারের ছিলেন। মনুষ্য বলব না, ও শব্দটি ব্যঙ্গ করে ব্যবহার করি আমরা। পাগলামির একবিন্দু অপবাদ তাঁকে দিয়ে রেহাইয়ের কোন অজুহাত কেউ তৈরী করতে পারবে না। তা তাঁর ছিল না।

—কিন্তু আমার মধ্যে আছে। আমার বাবার মধ্যে ছিল। বাবার দুর্দান্ত খেয়ালীপনা বা যা তিনি করেছিলেন—যথেষ্ট শিক্ষা সত্ত্বেও—সেটা যে পাগলামির সামিল তা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুলতা বললে—না, তা করব না। কারণ, যারা তোমার আমার কথা জানত, তারা তুমি ডুব মারলে এই কথাই বলেছে। বলেছে ওই বাপেরই ছেলে তো! তবে আমি বলি, তা ঠিক নয়। ওটা তাঁরও এসেছিল, তোমারও এসেছে—অনেক টাকা থেকে। অনেক টাকা থাকলেই মানুষ মদ খেয়ে ব্যভিচার করে। সেটা অভ্যাসে দাঁড়ায়। ও থেকে দেহে মনে দুদিক থেকেই বিষ ঢোকে।

সুরেশ্বর বললে—অস্বীকার অবশ্যই করব না। সে বললে—সবার মধ্যেই ও বীজ আছে। কারণ আদিম কালে ওইটেই ছিল জীবন-ধর্ম, জীব-ধর্ম তো বটেই। কিন্তু তার থেকেও প্রত্যক্ষ কারণ রয়েছে, সেই কথা বলছি। কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পাঁচালীতে আছে তিনি সোমেশ্বরের বিয়ে দিয়েছিলেন—

সুলতা বললে—হ্যাঁ, বিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁর তারকেশ্বরে যে মেয়েটির সঙ্গে ভালবাসা হয়েছিল তার মেয়ের সঙ্গে। ওটা একটা অতৃপ্ত ভালবাসার তৃপ্তিসাধনের একটা সস্তা পথ বটে।

সুরেশ্বর বললে—সস্তা বা সুগম পথ ছেড়ে বাঁকা পথ বা সূক্ষ্ম পথ ধরবার লোক তো ছিলেন না কুড়ারাম। ভালোবেসে ভালোবাসার জনকে, তুমি চন্দ্রলোকে থাকবে আমি পৃথিবীতে বা শুক্রগ্রহে থেকে ভালোবেসে যাব অনন্তকাল, এ ধাঁচের মানুষই তিনি ছিলেন না। যাক গে। মানুষ কথাটা এখানে আমিই ব্যবহার করলাম। সে কথা থাক। মোটকথা শোন। এই মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল এক মুসলমান আমলের জমিদারের ছেলের

সঙ্গে। কুড়ারাম সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু সে ছিল বামুনে সুপুরুষ। এ একেবারে রাজোয়াড়ী সুপুরুষ। বর্ণনায় রাত্রি কাটাব না, ওটা কল্পনা করে নাও। তাঁর ছবি এখন মনে হচ্ছে আমার আঁকা উচিত ছিল : কিন্তু আঁকিনি। বাড়ী বাঁকুড়া এবং হুগলীর বর্ডারে। সেই বাড়ীতে কুড়ারাম রায় হঠাৎ গিয়ে পড়লেন বা উঠলেন একান্ত আকস্মিকভাবে। ইচ্ছে করে নয়। তিনি যাচ্ছিলেন কোম্পানীর কাজে বাঁকড়ো জেলা। পথে হঠাৎ এল জল ঝড় দুর্যোগ। পাইক সওয়ার বেহারারা প্রথম একখানা গাঁয়ের ধারে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। কুড়ারাম ছিলেন পাল্কিতে। জল ঝড়ে গাছতলা মন্দের ভাল, কিন্তু তার সঙ্গে দু-একটা বজ্রপাত হলে গাছতলা সাপের গর্ত কি বাঘের দেখার সমান বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

পাঁচালীতে আছে—

শিয়রেতে সর্পরন্ধ্র অরণ্যে ব্যাঘ্রের গন্ধ
এ থেকেও আরও মন্দ বজ্রপাতে বৃক্ষ।
সুতরাং উঠায়ে পাল্কী
হাঁকায়ে চলিনু জলদি
সওয়ার বেহারা লন্দী গ্রাম গৃহ লক্ষ্য।

গ্রাম সামনেই ছিল, এবং বড় একখানা শ্যাওলা-ধরা পাকাবাড়ীর মাথাও দেখা যাচ্ছিল। সেই গ্রামে ঢুকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সওয়ার-বরকন্দাজদের তগ্‌মা দেখে গৃহস্বামী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কোম্পানীর কানুনগো, খোদ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ডানহাত কুড়ারাম ভটচাজের নাম শুনে গৃহস্বামী ত্রটস্থ হয়ে উঠেছিলেন। কুড়ারামও গৃহস্বামীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ওই রাজোয়াড়ী চেহারা। সবাঙ্গে দুঃখ দৈন্যের ক্লেশের ছাপ, কিন্তু মাথাটা উঁচু সোজা। মিষ্ট কথা। কিন্তু লোকটি বোকা-বোকা।

বলেছিলেন—তাই তো ভাঙা ঘর। ছাদ ভেঙেছে। খড়ের চাল করেছি, তাতেও জল পড়ে, এখানে আপনাকে কি করে কোথায় বসাই! কি খাওয়াই! আমি তো বলতে গেলে সর্বস্বান্ত!

বাড়ীর ভিতর থেকে হুকুম এসেছিল, উনি বাড়ীর ভেতর দোতলায় থাকবেন। হুকুম এনেছিল একটি আশ্চর্য রূপসী সাত বছরের মেয়ে। পরনে ফিরানী। যা নাকি চাষা-ভুষাদের মেয়েরা পরে। কুড়ারাম বলেছিল—বাঃ বাঃ বাঃ, এ তো অপরূপ মেয়ে!

বাপ বোকার মত হে-হে করে হেসেছিলেন। বাপকে মেয়ে বলেছিল—মা তুমাকে ডাকছে বাবা। বললে ধরে নিয়ে আসবি! এস!

তখনও কুড়ারামের মনে হয়নি এই মেয়ের সঙ্গে সোমেশ্বরের বিবাহ দেবার। তিনি চারিদিক তাকিয়ে দেখছিলেন। বৈঠকখানার ছাদ নেই। ধসে পড়েছে। খড়ের চাল তুলেছে। সামনে পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। এদিকে বড় পুকুরটার বাঁধা ঘাট, তারও দু পাশের রানা দুটো কাত হয়ে পড়েছে। এসবের ইতিবৃত্ত কুড়ারামের অজানা নয়। বাংলাদেশের জমিদারদের বাড়ীর নাড়ীর খবর তাঁর নখ-দর্পণে। এ সব বাড়াকে তিনি ভয়

করেন। ভাঙা বড় বাড়ী আর পূর্ববঙ্গের কীর্তিনাশা রাক্ষসী নদী, ও দুইয়ে কোন তফাৎ নেই। বরং কীর্তিনাশার চেয়েও ভাঙা বাড়ী ভয়ঙ্কর। কীর্তিনাশা একূল ভাঙলে ওকূল গড়ে। বড় বাড়ী যখন ভেঙে পড়ে তখন সব চেপে পিষে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। ধুলো হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

রাজহাটের রায়বাড়ী, মুসলমান আমলের রাজা উপাধিধারী। নিজেরাই রাজা উপাধি নিত। বড়রাজা মেজরাজা সেজরাজা। রাজা অনেক। অনেকেই দেশ ত্যাগ করেছে। অনেক মরেছে। যেমন পলুপোকার মধ্যে রোগ হলে ঝাঁকে ঝাঁকে মরে। তাদের সম্পত্তি দু-চার বিঘে বা দশ বিঘে জমি দৌহিত্র বংশে গেছে। এখন এই পুরনো বাড়ীতে আছে এই একা মানুষটি আর তার স্ত্রী এবং এই একটি মাত্র কন্যা। লোকে বলে পাগল। পাগলামি রাজাগিরি। পাগলামি নিশ্চয়, নইলে সামান্য হাজার কয়েক টাকা আয় নিয়ে কোম্পানীর প্রথম আমলে মেদিনীপুর বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম বিষ্টুপুর প্রভৃতির রাজারা যখন কোম্পানীর সঙ্গে রাজস্বের নতুন চুক্তি করতে অস্বীকার করলে, তখন তাদের দেখাদেখি শিবনারায়ণ দেবরায় সেও বললে—খাজনা দেব না। কোম্পানী কে খাজনা বাড়াবার? ফলে মেদিনীপুর থেকে ফার্গুসন সাহেব একজন সার্জেন্টের অধীনে ষোলজন বন্দুকধারী সিপাহী পাঠিয়ে দিলেন। রাজার চাকরানভোগী পাইক ছিল জন চল্লিশেক। তারা বন্দুকের শব্দ শুনে পালাল। রাজা ঘরে গিয়ে খিল বন্ধ করলেন। কোম্পানীর সিপাহীরা বন্দুকের গুলিতে দরজা ঝাঁঝরা করে দিলে। তখন জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল সাদা কাপড়ের ফালি আর একখানা গয়না-পরা আশ্চর্য সুন্দর হাত। রাজাকে নিয়ে রাণী বেরিয়ে এসে সার্জেন্টের কাছে হার মেনে চুক্তি সই করলে। লোকে বলে সেটা রাজার জন্যে নয়, সেটা সেই আশ্চর্য সুন্দর হাতের অধিকারিণী রাণীর জন্য। কোম্পানীকে খেশারত দেবার জন্য রাণীই দিলেন তাঁর অলঙ্কার খুলে। তখন সব রক্ষা হল বটে, কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যেই সূর্যাস্ত নীলাম আইনে সব জমিদারীই চলে গেল। রয়েছে এখন এই গ্রামখানি। তাও আজ যায় কাল যায়। রাজাকে বার-দুই ধরেও নিয়ে গিয়েছিল হুগলীর কালেক্টরীর পেয়াদা এসে। এসব বিবরণ সব জানতেন কুড়ারাম ভটচাজ। কিন্তু এই বাড়ীতে সেই তারকেশ্বরের হৃদয়হারিণীর বিয়ে হয়েছে এ কথাটা তিনি ঠিক স্মরণ করতে পারেন নি। তাই বাড়ীর ভিতর যখন তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন রাজা, তখন অন্দরের প্রবেশপথে তাকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে গেলেন।

রাণী নমস্কার করে বললেন—আসুন। আজ আমাদের বাড়ী ধন্য হল। রাজকর্মচারী অনেক আসে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কর্মচারী তো আসে না। তা ছাড়া আপনার হাত তো শুধু কলমে ধন্য নয়। বাবা তারকেশ্বরের পূজায় ধন্য, মা হংসেশ্বরীর পূজায় ধন্য। আসুন। আসুন।

রাজা হে-হে করে হেসেছিলেন।

রাত্রিতে তাঁর খাওয়ার সামনে পাখা হাতে বসে রাণী খাওয়াচ্ছিলেন তাঁকে। রাজা

তখন আফিঙের মৌজে নিজের ঘরে বসে তামাক খাচ্ছেন।

রাণী বলেছিলেন—অদৃষ্টই সব থেকে বলবান, নয় কানুনগো সাহেব ?

কুড়ারাম বলেছিলেন—দৃষ্ট হলে সেদিন তার সঙ্গে লড়তাম। আজও যদি পাই সেই মরে নয় আমি মরি !

রাণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—তারপর বিয়ে-টিয়ে হয়েছে ? ছেলে-পিলে কি ? নাতিপুতি ?

কুড়ারাম বলেছিলেন—বিয়ে অনেক কালই করিনি। তবে ললিতা বলে একটি মেয়ে সেবাটেবা করত।

ফিক করে হেসে ফেললেন রাণী। বললেন—ও তো পুরুষের ভূষণ। তারপর ?

—সে মারা যাবার পর বিয়ে করেছিলাম কালীঘাটে। সে একটি সন্তান হবার পরই মারা গেল। বিবাহ করিনি। করবও না।

—কটি সেবাদাসী ? হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—থাক গে। নিজের গরজ গজিয়ে উঠেছে কথা শুনে। ছেলেটি কত বড় হল ?

—দশ বছরের।

পাখাখানি নামিয়ে রেখে রাণী বলেছিলেন—তাহলে অদৃষ্টের মুখে একটু চুনকালি দিয়ে দাও না। তুমি তো পুরুষসিংহ।

একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কুড়ারাম।

হেসে রাণী বলেছিলেন—আমাদের যা হবার তা তো হয়েছে। আমার ওই একটি মেয়ে। সাতটা ছেলে-মেয়ে আঁতুড়ে মরেছে তা ছাড়া। তা আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে আমাদের বিয়ে না হতে দেওয়ার ঠাট্টার শোধটা নাও না অদৃষ্টের উপর। তোমার তো আজ টাকার অভাব নেই। আমার মেয়েকে দেখেছো। আমার থেকেও সুন্দরী হবে !

পাচালীতে আছে—

রাণী মোরে কয় হেসে বেহান হইব শেষে
মধু সাথে অম্ল মিশে মিষ্ট হবে আরও
সাথে তার চোখে পানি কাতরে কহিল রাণী
কন্যাদায়ে দিবাযামী নিদ্রা নাহি মোরও ॥

কুড়ারাম বলেছিলেন—কেঁদো না তুমি। নিলাম, তোমার কন্যা আমি নিলাম। তোমার কন্যা আমার পুত্রবধূ হল। তোমার মেয়ে রাজবংশের মেয়ে, ওই রক্তে আমার বংশও ধন্য হবে !

মানুষ ভাবে না সুলতা—মানুষের শুদ্ধ রক্ত আর রাজবংশের রক্ত এক নয় ! ওইখানে মিশল !

তারপর ভট্টাচার্য উপাধি রায় উপাধির তলায় চাপা দিয়ে জমিদারী কিনে কুড়ারাম ছেলের

বিবাহ দিয়ে ঘরে আনলেন সর্বস্বান্ত রাজার রাজকন্যা। তার সঙ্গে রাজরক্ত। ভট্টাচার্য রায় হল।

তার কারণ আছে সুলতা। রাণী তাঁর কন্যাকে কুড়ারামের পুত্রের হাতে দিতে চাইলেও মেয়ের বাপ মুঘল আমলের রাজা খেতাবধারী নিঃস্বপ্রায় ব্যক্তিটি কানুনগো চাকুরীজীবী এবং ভট্টাচার্য উপাধিধারী বাপের ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে.চান নি। তিনি কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরেছেন। তার গোলামি করেন নি।

লোকটির মস্তিষ্ক ছিল না কিন্তু আশ্চর্য একটি সহনশীল জেদ ছিল। তাঁর কাছে কুড়ারাম যখন প্রস্তাব করলেন এই বিবাহের, তখন তিনি ঘাড় নেড়ে একটু হেসেই বললেন—তা কি করে হবে? আমাদের রাজবংশ! আমাদের মেয়ে ভট্টাচার্যবাড়ীতেও যায় না। ও জোতদার কি কানুনগোর ঘরেও যায় না।

হেসে সবিনয়ে বলেছিলেন—আমরা ধরুন নদীর মাছ, পুকুরের জল আমাদের সইবে ক্যানো গো মশায়! ও হয় না!

স্ত্রী অন্তরালে ছিলেন। বেরিয়ে এসে এবার বলেছিলেন—পাগলামি করো না।

—পাগলামি কি হল?

—হল না? রাজা। রাজার ঐশ্বর্য তো ষোল আনা। বাড়ী ভেঙে হাঁ করে আছে, ভেঙে পড়ে কোন দিন চাপা দেবে। রাজার থাকবার মধ্যে তো বাড়ী পুকুর ব্রহ্মত্র, রাণী কাঁখে কলসী করে জল আনে। ঘাটে চান করে। রাজা নিজে হাতে সেজে তামাক খায়। বাকী খাজনার দায়ে কোম্পানী মধ্যে মধ্যে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরে রাখে—

চোখ লাল হয়ে উঠেছিল কন্যার পিতার। এবার তিনি ভাঙা পাঁচিল দিয়ে গাছপালা শূন্য বাগানটায় ঢোকা একটা গরুকে তাড়া দিয়ে প্রায় একটা ব্যাঘ্রগর্জন করে উঠেছিলেন।

কুড়ারামেরও মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল।

রাজার গৃহিণী রাণী সারদা দেবী থমথমে মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিও প্রাচীন জমিদার ঘরের মেয়ে। তাঁর বিয়েও ঠিক এই কারণেই তাঁর বাবা কুড়ারামের সঙ্গে দেন নি। সে ক্ষোভ তাঁর অন্তরেও ছিল, প্রবলভাবেই ছিল। এবং তিনি এই অক্ষম অপদার্থ শিমুল ফুলের মত মানুষটার হাতে পড়ে যে দুঃখ জীবনে পেয়েছেন তা তাঁর জীবনে তুষানলের মতই জ্বলছে অহরহ। তাঁর বাপ বিবাহে তাঁকে অলঙ্কারে অর্থে কম কিছু দেন নি। কিন্তু সেসব গিয়েছে। গিয়েছে এই মূর্খ জেদসর্বস্ব ব্যক্তিটির জন্য।

তিনি কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন, মেয়েকে ভাসিয়ে দিতে আমি দেব না।

রাজা গ্রাহ্য করেন নি, পাগলের মতই নেমে গিয়েছিলেন এবং গরুটাকে একটা লাঠি দিয়ে পিটতে আরম্ভ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার।

কুড়ারাম রাণীর দিকে ফিরে বলেছিলেন—ঠিক আছে সারদা, হবে। সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি নিশ্চিত থাক। শুধু দুটো বছর সময়। দুটো বছর!

দু বছরও লাগে নি, দেড় বছরের মধ্যেই সব হয়ে গিয়েছিল। জমিদারী কেনা, সরকারী

আদালতে—একেবারে সুপ্রীম কোর্টে—দরখাস্ত করে ভট্টাচার্যকে রায়ভট্টাচার্য করে নিয়ে, ঘটক এবং একজন কর্মচারী পাঠিয়েছিলেন কুড়ারাম রায়।

ঘটক পরিচয় দিলে বোকা মনুষ্য রাজা দেবরায় বলেছিলেন—এ তো সেই ভটচাজ!

সারদা দেবী বলেছিলেন—না রায়ভটচাজ। ভটচাজ বাদ যাবে।

—তা কি করে যাবে?

—কেন, তোমরা কি ছিলে? গুরুগিরি করতে না ছত্রি রাজাদের? চক্রবর্তী নও তোমরা?

—হুঁ, বটে। তা সে অনেকদিনের কথা!

—তাই জন্যে তো সব গিয়েছে। ঘরে আজ পাঁচটা টাকা নেই যে ঘটককে দেব।

রাজা চুপ ক'রে ছিলেন।

পরদিন সকালে ঘটকের সঙ্গে কথাবার্তা হবার কথা। কিন্তু বাধা পড়েছিল। এসেছিল কোম্পানী কালেকটারীর চাপরাশী। সঙ্গে পরোয়ানা। নীলেম-হয়ে-যাওয়া জমিদারীর বাকী অনাদায়ী টাকার জন্যে ক্রোক। না দিলে রাজাকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

সেকালের আইনের প্যাঁচ। মবলকে এগার হাজার সিক্কা টাকা দশ আনা সাড়ে বারো গণ্ডা রাজস্ব পাওয়ার জন্য লাট নম্বর বারোশত তিয়াত্তর নিলাম হয় দশ হাজার টাকায়। সে টাকা কোম্পানীর কালেকটারী ভুক্তান হওয়ার পর এক হাজার সিক্কা দশ আনা সাড়ে বারো গণ্ডা কোম্পানীর প্রাপ্য দরুণ এই পরোয়ানা জারী হইতেছে।

রাজা শিবনারায়ণ কোম্পানীর চাপরাশী দেখে অত্যন্ত ভয় পেতেন। তিনি যে সেই রাজস্ব দেব না ঘোষণা ক'রে লড়তে গিয়ে কোম্পানীর ষোল ষোলটা বন্দুকের পাঁচবার আওয়াজে আশিটা বিস্ফোরণ শব্দ শুনেছিলেন এবং এমন পুরনো মোটা কাঠের দরজা জোড়াকে ফেটে যেতে দেখেছিলেন সে স্মৃতি তিনি কিছুতেই মুছতে পারেন না। তাঁর আফিঙের নেশা, সোজা নেশা নয়, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় প্রায় ছ মটর কলাই ভোর আফিঙের নেশা। চোখ দুটো শিবের মতই বড় এবং ওই নেশায় শিবের চোখের মতই বারো আনা বুজে থাকত। সে চোখও পুরো খুলে বিস্ফারিত হয়ে উঠত কোম্পানীর চাপরাশী দেখলে। সুতরাং তিনি বাইরে বেরিয়ে চাপরাশী দেখেই দ্রুত ফিরে অন্দরে গিয়ে ঢুকে ঘরে খিল দিয়েছিলেন।

রাণী সারদা দেবী ডেকে বলেছিলেন—দরজা খোল ভয় নেই। ফিরে গিয়েছে।

রাজা শিবনারায়ণ ঘরের মধ্যে একটা শালগ্রাম হাতে ক'রে বসেছিলেন। শালগ্রাম নয়, তাঁর সঞ্চয়ের আফিঙ। সেটা গিলবেন কি ক'রে সেইটে সমস্যা হয়েছিল তাঁর। তিনি রাণীকে বলেছিলেন—মিছে কথা বলছ। আমাকে তুমি ধরিয়ে দেবে।

—না। না। না।

রাণীর কথা শেষ হতেই মেয়ে কাত্যায়নী বলেছিল—না বাবা, সত্যিই হারামজাদ কুত্তারা চলে গেল। সেলাম করে চলে গেল বাবা।

তখন দরজা খুলেছিলেন শিবনারায়ণ। মেয়ে কাত্যায়নী বলেছিল—ওই ঘটকবুড়োর সঙ্গে যে নায়েব বেটা না গোমস্তা বেটা এসেছে সে জামিন হয়ে সই করে দিলে। জমিদারবাবু

সোমেশ্বর রায়বাহাদুরের বকলমে সই দিলে। কুত্তারা লেজ গুটিয়ে সেলাম ক'রে চলে গেল!

কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য সদর হুগলীতে বসে নিজে কালেকটারীর আমলাদের নিয়ে ব্যাপারটা করেছিলেন।

শিবনারায়ণ রায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। এবং কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন বাবু জমিদার সোমেশ্বর রায়ের উপর। সুতরাং তারপর আর বিবাহের পথে একটি কণ্টকও মাথা তুলে ওঠেনি।

আট বছরের কনে কাত্যায়নী কীর্তিহাটে এসেছিলেন, সঙ্গে এসেছিল ওঁদের বাড়ীর একমাত্র ঝি বুড়ী কুন্তী। কুন্তী ওদেশের মেয়ে—বাপ ছিল দেবরায়দের ছত্রি চাপরাশী, মা ছিল কাহার বা কূর্মী। আজীবনই এদের বাড়ী আছে। প্রথম জীবনে শিবনারায়ণের ঝি ছিল, বিয়ে কখনও হয়নি। কাত্যায়নীকে মানুষ করেছিল সেই। সে আগলে আগলে রেখেছিল কাত্যায়নীকে। কিন্তু তবু কাত্যায়নী প্রথম দিন থেকেই শ্বশুরবাড়ীতে চাকরদের ঝিদের দু-চার-বার শাসন ক'রে ডেকেছিল—এই হারামজাদা! শুনতে পাস না? এই হারামজাদী—কানে তোর ক'ভরি সোনা আছে?

কুন্তী তাদের বলেছিল—কিছু মনে করো না। লেড়কী মেয়ে—বাচ্চা। তবে ও তো রাজার বেটী! বেতরিবৎ ওর সয় না!

শুনে কিন্তু কুড়ারাম রায় ভটচাজ খুশী হয়েছিলেন। খুব খুশী!

হাঁ। এইবার বাড়ীতে সত্যিই জমিদারী মহিমা এসেছে।

রাজকুমারী কাত্যায়নী কীর্তিহাটের কড়চায় রায়দের বংশধারায় বইয়ে দিলেন এদেশের পাঁচশো বছরের আমীরশাহী চাল-চলন, ধারা-ধরণ, হাঁটা, কথা বলা, রীতিনীতি সব। ঝি-চাকরেরা তাঁকে ভয় করতো বাঘের মত। রাগ হলে হাতের কাছে যা থাকত তাই ছুঁড়ে মারতেন। আবার বকশিশ দিতেন। দেবতায় ছিল অচলা ভক্তি। ব্রতে উপবাসে তাঁর মত নিষ্ঠা বিরল। দেবসেবায় যে কত নতুন নতুন ধারা তিনি প্রচলন করেছিলেন তার হিসেব কাগজে পাওয়া যায়। হাঁটতেন তিনি আস্তে কিন্তু পা ফেলতেন তাতে শব্দ হ'ত। ছিপছিপে পাতলা অসাধারণ রূপসী ছিলেন, ওজন বেশী ছিল না কিন্তু তিনি নড়লেই কীর্তিহাটের বাড়ীর মেঝে সাড়া দিয়ে জানাতো যে রাজকুমারী বধূ কাত্যায়নী সচলা হয়েছেন। আবার অতিথি অভ্যাগত কুটুম্ব সজ্জনের কাছে তাঁর মত অনুগ্রহপরায়ণা কেউ ছিল না। মধ্যে মধ্যে পাগল হতেন। বাপের রোগটা পেয়েছিলেন। শুধু বাপের নয় দেবরায়দের বংশে এখানে ওখানে যারা ছড়িয়ে ছিল, যাদের কথা জানত লোকে. তাদের মধ্যে দশ পনের জন আধপাগলের নাম আমি পেয়েছি সুলতা। রাজকুমারী কাত্যায়নীর এসব বিবরণ কুড়ারাম রায় ভটচাজের পাঁচালীতে নেই। পাঁচালী তো তুমি সদ্য পড়েছ। তবে তাড়াতাড়ি পড়েছ। আমি বিশদ করে বলে গেলাম। এ বিবরণ আমি শুনেছি।

কিছু শুনেছি রায়বাড়ীতে মেজঠাকুমার কাছে। তিনি এসব শুনেছিলেন মেজঠাকুরদার কাছে। কিছু কিছু এখনও গ্রামে চলিত আছে। বাড়ীতে বাড়ীতে পুরুষ পরম্পরায়—

অবশ্য মেয়েদের মধ্যে—চলে আসছে।

রায়বাড়ীর পিছন দিকে দুধসায়র পুকুর আছে। বাঁধানো ঘাট। আগে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। কুড়ারাম রায় কাটিয়েছিলেন পুকুর রাজকুমারী বউমার স্নানের জন্য। পুকুরে জল ভ'রে একশো ঘড়া দুধ ঢেলেছিলেন, প্রথম যেদিন বউমা পুকুরে স্নান করেন সেই দিন। পুকুরটা এখনও আছে, মজে এসেছে, পাঁচিল পড়ে গেছে। এখন বাড়ীতে কুয়ো হয়েছে। ওটায় এখন বাসন মাজা হয়। কিন্তু সেদিন ও পুকুরে রায়বাড়ীর ছেলে বউ ছাড়া কেউ স্নান করত না। দুধপুকুরে স্নান করলে রঙ ফরসা হত। রাজকুমারী বউ কাত্যায়নী নিজেই ছিলেন রূপের ঝর্ণা।

রায়বংশে আমীরশাহী চাল—পাগলামি ব্যাধির সঙ্গে আর একটি জিনিস তিনি এনেছিলেন সেটি রূপ। কুড়ারাম রায় রূপবান ছিলেন কিন্তু বলেছি তো সেটা বামুনে রূপ। যে রূপ কপালে চন্দনে তিলকে খোলে। এ রূপের জাত আলাদা। এ রূপ প্রসাধন ভূষণ ভূষা ছাড়া খোলে না।

নূরজাহান, পদ্মিনী এ তো সহজ পথে আসে নি স্থলতা। অনেক ঐশ্বর্য অনেক শক্তির উপর সাধনপীঠ বানিয়ে তার উপর আলপনা পেতে বাছাইকরা দশ বিশটা রূপের বাটি থেকে রক্ত মিশিয়ে মিশিয়ে তবে এসেছে। গালে গোলাপ কোন দেশের কোন মৌলিক রূপেই ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস। ওটা হয়েছে অনেক সাধনায়। রাজকুমারী কাত্যায়নী তাই এনে দিয়ে গেছেন রায়বংশে। কুড়ারাম ভট্টাচার্য তাতে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করতেন। বলতেন—সম্পদ সৌভাগ্য এ আমার ছিল। কিন্তু বউমা আমার যে শ্রী নিয়ে এসেছে তাতে সম্পদ সৌভাগ্য উজ্জ্বল হল।

এইখানেই কুড়ারাম রায়ের পাঁচালী ইতি। দুটো কথা আছে। তিনি কিন্তু ছেলে-বউ নিয়ে কীর্তিহাটে থাকেন নি। থেকেছিলেন কলকাতায়। থেকেছিলেন ছেলেকে গড়ে তোলবার জন্য। তখন দেশে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কর্ণওয়ালিশ সাহেবের পর লর্ড ওয়েলেসলী এসেছেন। নতুন লাটপ্রাসাদ তৈরী হয়েছে। বিশাল সিঁড়ির দুধারে তকমা আচকান জড়িজড়ানো পাগড়ী পরা খানসামা বেয়ারা আর্দালী চোপদার দাঁড়িয়ে থাকে। নতুন গাড়ী ঘোড়া আসছে, বিলেত থেকে সাহেব ব্যবসাদার আসছে, রাইটার আসছে, বড়াটাঁকি লালদীঘির উত্তর পাড়ে লম্বা রাইটার্স বিল্ডিং সেরেস্তাখানা পড়েছে। ব্যবসাদার আসছে, নতুন উকীল অ্যাটর্নী আসছে, ডাক্তার আসছে। জেনারেল কাপ্তেন আসছে। মেমসাহেব আসছে এখানে বেশ্যাবৃত্তি করতে। সায়েবী সরাইখানা কাফিখানা হচ্ছে। পাদ্রীরা আসছে। তারা এখানে গির্জে করছে। ইস্কুল করছে। কিরিশ্চান করছে। লেখাপড়া শেখাচ্ছে। ক'জন সাহেব এখানে ইস্কুল করেছে—শেরবোর্ন সাহেব ড্রামণ্ড সাহেব আরও কত সাহেব।

ওদিকে হিন্দুস্থানে—ভারতবর্ষে গোলমাল। সেই গোলমাল তামাম মুলুক ভরই কোম্পানীর সঙ্গে। সাহেবানরা পাকাপোক্ত ভাবে বসেছে। এখন সরকারী সেরেস্তায় চাকরী বড় ব্যবসা বড় জমিদারী যা কর—ইংরিজী না শিখলে হবে না। ইংরিজী ভবিষৎ না হলে

বড় সমাজে ঠাঁই পাবে না। রামমোহন রায় পথ খুলেছেন। কলকাতার কায়স্থরা সুবর্ণবণিকেরা ঠেঙেভেঙ্গে ইংরিজী শিখে মুৎসুদ্দি দালালী কাজ করছিল, তাদেরও ইংরিজী শেখার তাড়া পড়েছে। কুড়ারাম নিজে কোনরকমে কাজ চালান। মুখে মুখে শিখে নিয়েছেন। কিন্তু ছেলেকে ভালরকম ইংরিজী, তাঁর সঙ্গে সহবৎ তম্বিবৎ না শেখালে তার জীবনের সাধ অঙ্কুরেই মরে যাবে এ তিনি জানতেন বলেই সোমেশ্বর এবং পুত্রবধূ রাজকুমারী কাত্যায়নীকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। সোমেশ্বর ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্মতলার ইস্কুলে ভর্তি হল।

বেয়ান সারদা দেবী এবং বেয়াইকে কালীঘাটে মাতৃদর্শন করতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। আলাদা বাড়ী ভাড়া ক'রে দিয়েছিলেন। নইলে পৌত্র না হলে মেয়ের মা-বাপকে জামাইঘরের ভাত খেতে নেই। কিছুদিন তাঁদের এখানে রেখে কাত্যায়নীসহ পাঠিয়ে দিলেন স্বগ্রামে। ইতিমধ্যে ওখানকার বাড়ী মেরামত করিয়ে দিয়েছিলেন; কারণ সবই তাঁর সোমেশ্বর পাবে। এই সময়ের মধ্যে বেয়ানের সঙ্গে অনেক গল্প অনেক রহস্যরসিকতায় পরম আনন্দে কেটেছে তাঁর। বেয়াই আফিঙ খেতেন। বিলিতী মদও খাওয়াতেন কুড়ারাম। তিনিও খুব খুশী ছিলেন। কুড়ারাম মাসে মাসে যেতেন কীর্তিহাট। চাঁদপাল ঘাটে বড় বজরা বাঁধা থাকত তাঁর। নাম ছিল—ললিতা। সেই বজরায় যেতেন। হলদী নদীতে ঢুকে জোয়ার এলাকা পর্যন্ত গিয়ে নামতেন। সেখানে থাকত তাঁর হাতী। হাতীর নাম ছিল জংবাহাদুর।

লোকে অনেক কথা বলত,—বেয়ান সম্পর্ক নিয়ে।

কিন্তু তিনি কড়চায় লিখেছেন—

ছেলে বউ সাথে আনি বেয়ান সারদা রাণী
সর্বসুখী মনে মানি কাটে দিন কয়।
কত হাসি কত কথা আগামী জন্মের তথা
কল্পনা পুরাবে মাতা জানিনু নিশ্চয় ॥

তারপর সেই কটা লাইন—আগে বলেছি—

পাপপুণ্য নাহি মানি যাহা করিয়াছি আমি
সবার মালিক তুমি জয় কালী করালী।

তার শেষ লাইন—

তোমাতে দেবত্র করি বিষয় আদি জমিদারী
আমি মা ভাসাই তরী রাখো বাঙালায়।

মায়ের চরণেই তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। একবার কীর্তিহাট গিয়ে অসুখে পড়লেন। ছেলে সোমেশ্বরকে লোক পাঠিয়ে আনালেন। লিখলেন, "অবিলম্বে আসিবা।" সোমেশ্বরের বয়স তখন কুড়ি। বধূ কাত্যায়নীর বয়স সতের। তখন তার তিনটি সন্তান হয়ে মারা গেছে। এই এক খেদ নিয়ে তিনি গেলেন। ওই দেখ তাঁর দেহত্যাগের ছবি। এর মধ্যে তারা খেয়ে উঠে এসে সেই ছবি টাঙানো বারান্দায় ঢুকল। সুরেশ্বর

ছবিখানা দেখালে। একটা প্রকাণ্ড গাছ উপড়ে পড়েছে। গাছাটার কাণ্ডটায় একটা মানুষের দেহের আভাস।

প্রচুর ধুমধাম ক'রে শ্রাদ্ধ করেছিলেন সোমেশ্বর। টাকা খরচ হয়েছিল চল্লিশ হাজার। চাল খরচ হয়েছিল চল্লিশ মণ। ময়দা খরচ হয়েছিল দশ মণ।

শ্রাদ্ধের পর ও-অঞ্চলে কলেরা হয়েছিল। সোমেশ্বর সস্ত্রীক কলকাতায় চলে এসেছিলেন।

* * *

সুরেশ্বর পরের ছবিখানা দেখালে। আশ্চর্য একটি রূপসী মেয়ে। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার। চোখে প্রদীপ্ত দৃষ্টি। সুরেশ্বর বললে—পরের ছবি দেখ সুলতা। এরও চার বছর পরের। সোমেশ্বরের বয়স তখন চব্বিশ। ইংরাজী ১৮১৫ সাল। রাজকুমারী বধূ কাত্যায়নীর বয়স একুশ।

তাঁর কোল শূন্য। রাজরক্তের সঙ্গে উন্মত্ততা উগ্রতার সঙ্গে আর একটি ব্যাধি তিনি নিয়ে এসেছিলেন, সেটি তাঁর মৃতবৎসা দোষ।

হয়তো এ যুগ হলে রক্ত পরীক্ষা ক'রে কোন ব্যাধির বীজ বের হত এবং তার প্রতিষেধকও পাওয়া যেত। কিন্তু সে যুগে ইংরেজ ডাক্তারও তার প্রতিকার করতে পারে নি। কুড়ারামের মৃত্যুর পূর্বে তিনটি মৃত সন্তান প্রসব করেছিলেন। তারপর আরও দুটি মৃত সন্তান প্রসব করেছেন। মধ্যে মধ্যে উন্মাদ হয়েছেন।

অন্তর্বত্নী হলেই তাঁর মস্তিষ্ক অসুস্থ হ'ত। প্রথম হত মেজাজ খারাপ। উগ্র মেজাজ উগ্রতর হত। পাঁচ ছ মাসে তিনি বোবা হয়ে যেতেন। অনবরত ঘুরতেন ঘরের মধ্যে। তারপর প্রায় উন্মাদ। প্রলাপ অসংলগ্ন কথা বলতেন। চাকর-বাকরের লাঞ্ছনার আর সীমা থাকত না। সব থেকে বিপদ হ'ত সোমেশ্বরের। স্বামীকে দেখলে ক্রোধ আক্রোশের আর সীমা থাকত না।

বলতেন—ইচ্ছে করে তোমার বুকে বসে গলাটা টিপে ধরে শেষ ক'রে দি।

দু তিনবার ধারালো দা নিয়ে তাঁকে কাটতে গিয়েছিলেন। তাকে আটকেছিলেন তাঁর মা বা সারদা দেবী। সোমেশ্বর পালিয়ে বেঁচেছিলেন। অনেকে বিবাহ করতে পরামর্শ দিয়েছিল তাঁকে কিন্তু তা তিনি করেন নি। কারণ ছিল—কুড়ারাম মৃত্যুর সময় ছেলেকে প্রতিশ্রুত করিয়ে নিয়েছিলেন—কাত্যায়নী বদ্ধ উন্মাদ হলেও সে যেন বিবাহ না করে। তাঁর শিয়রে তখন ও-দিকে বসেছিলেন কাত্যায়নীর মা তাঁর বেয়ান রাণী সারদা দেবী।

সারদা দেবী তখন বিধবা। তিনি কন্যার এই সময় আসতেন, কাছে থাকতেন। তিনিই কন্যাকে বলে রাজী করিয়ে তাকে অর্থাৎ কাত্যায়নীকে দিয়েই সোমেশ্বরকে বলিয়েছিলেন, তখন অবশ্য কাত্যায়নীর সুস্থ অবস্থা; বলিয়েছিলেন—দেখ আমার তো এই অবস্থা। তুমি বাড়ীতে তোমার সেবার জন্যে দুটো ভালো ঝি রাখো। মন ভাল রাখতে গানটান শুনবার জন্যে একজন বাঈজী রাখো। নইলে তুমিও যে পাগল হয়ে যাবে!

সোমেশ্বর ঠিক জমিদার বাচ্চা জমিদার ছিলেন না। হতে পারেন নি। তিনি কৌশলী মানুষ ছিলেন, তার সঙ্গে সাহসীও ছিলেন। কিন্তু বেপরোয়া মানুষ ছিলেন না। নইলে

নিজেই এসব ব্যবস্থা করতেন। অবশ্য বাঈজী তাঁর ছিল। তবে বাঁধা ছিল না। এখানে ওখানে বাগানে বজরায় আমোদ-আহ্লাদ করতেন।

দু চারটে খরচ পেয়েছি খাতায়—এসব খাতা সোমেশ্বরের খাস খাতা। তিনি কলকাতায় যে ব্যবসা করতেন অর্থাৎ সাহেবদের মুৎসুদ্দির কাজ করতেন, টাকা লগ্নী করতেন তার জমাখরচের খাতা। সোমেশ্বর একজন সাহেব অ্যাটর্নীর টণ্ডি ছিলেন, তাঁকে টাকা ধার দিয়ে তাঁর কেসগুলির থেকে কমিশন পেতেন। তাছাড়া টাকা লগ্নী করেছিলেন নুনের ব্যবসায়ে। মেদিনীপুর কাঁথী অঞ্চলে 'খালারি' ইজারা নিয়ে নুন তৈরী করাতেন। নুনের ব্যবসা একচেটে কোম্পানীর, কোম্পানী নুন কিনত। এ ছাড়া রবিনসন সাহেব বলে একজন সাহেব তাঁদের অঞ্চলে নীলের কুঠী করেছিল, সেই কুঠীতেও তাঁর অনেক টাকা খাটত। জীবনে স্ত্রীকে নিয়ে সুখশান্তির যতই অভাব হোক না কেন, তিনি বাইরের ব্যবসায়ে কাজে মেতে থাকতেন দিনে, সন্ধ্যায় যেতেন বাঈজীবাড়ী। রাত্রে বাড়ী ফিরে ওই ঝিদের সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে যেতেন। উঠতেন বেলা এক প্রহরের সময়। মধ্যে মধ্যে দু'চারদিন দরজায় আঘাত পড়ত। করাঘাত করতেন কাত্যায়নী দেবী। তাঁকে ধরে নিয়ে যেতেন তাঁর মা রাণী সারদা দেবী। কাত্যায়নীর একটা সুস্থ অবস্থাও ছিল। সেটা প্রসবের পর আসত। মৃত সন্তান প্রসব করার পর তিনি কাঁদতে শুরু করতেন এবং পনের বিশ দিনের মধ্যে অনেক কান্না কেঁদে বিষণ্ণ প্রতিমার মত থাকতেন কয়েকদিন, তারপরই হতেন আর এক মানুষ। স্বামীর ঘরে তাঁর বিছানা হ'ত। ঝি দুটিকে হয় তাড়াতেন, নয় তারা সরে যেত এই বাড়ীর দূরতম প্রান্তের একতলার ঘরে। তখন গোটা সংসারটা চলত তাঁর অঙ্গুলিহেলনে। তিনি বাসনের ঘরের বাসনগুলি গুনতেন, কতগুলি হারিয়েছে হিসেব করতেন। আসবাবপত্রও এইভাবে হিসেব করতেন। যা হারাত সেগুলি তৎক্ষণাৎ পূরণ করেও সোমেশ্বরের নিষ্কৃতি ছিল না, কাত্যায়নী তাঁকে দিয়েই চাকর-বাকর, সরকার, নায়েব সকলকে তিরস্কার করিয়ে ছাড়তেন। এবং ডাক্তার-বদ্যি ইত্যাদি ডাকিয়ে সমারোহ জুড়ে দিতেন। মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখতেন—কোন দেবস্থলের স্বপ্ন। সেখানে যাওয়ার সাড়া পড়ত।

•

তারপর একখানা শুধু কালো ছবি। তার মধ্যে সোমেশ্বরের আভাস মাত্র রেখায় ফুটে আছে। কিন্তু ওই দেখ সুলতা—কতকগুলো বাইরের ঘটনা আঁকা আছে ওই যে ছবিটার প্যানেলে। সোমেশ্বর নিজের জীবনের কোন ঘটনায় মনের কোন ছায়া রেখে যান নি। চিঠি যা পেয়েছি তা ব্যবসায় সংক্রান্ত। যেমন নুনের দেওয়ান দ্বারকনাথ ঠাকুরের চিঠি; পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের ছেলে—তিনি তখন কোম্পানীর কানুনগো রয়েছেন, তাঁর চিঠি। রবিনসন সাহেবের চিঠি। কীর্তিহাটের প্রধান নায়েবের চিঠি, কালীমাতার পূজকের চিঠি,—তা ছাড়া দু'চারজন প্রজা সজ্জনের চিঠি—

মহামহিম মহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সোমেশ্বর রায় জমিদার মহাশয় অশেষ প্রতাপান্বিতেষু।

হুজুর বরাবর অধীন প্রজার দরখাস্ত এই যে, ইত্যাদি ইত্যাদি। দরখাস্ত তার ঘরের জন্য জোতের মধ্যে একটি তাল গাছ কি শাল গাছ কি তার পুত্রকন্যার বিবাহে পোড়া কাঠের জন্য একটি বটবৃক্ষের ডাল বা মাতৃশ্রাদ্ধে একটি তিন্তিরী বৃক্ষ কাটবার অনুমতি প্রার্থনা। অথবা একটি ছোট পুষ্করিণী খননের অনুমতি প্রার্থনা। তখন কোম্পানীর সঙ্গে জমিদারের চুক্তি অনুযায়ী জমিদার জমিদারীর জলকর ফলকর বনকর, লাহা-মহল, পাতা-মহল, কাষ্ঠকয়লা-মহল এমন কি উর্ধ্ব-অধঃ—সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি। কন্যার বিবাহে জমিদার প্রণামী পান—তার নাম মারোচা। পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে জলদানের পাত্র, ঘড়ি বা ঘটি কাছারীতে পৌঁছে দিতে হয়।

এর মধ্যে কাত্যায়নী সম্পর্কে কোন কথা নেই। কাউকে সোমেশ্বর রায় লেখেন-নি। একবার পোষ্যপুত্র নেওয়ার কথা তুলে—কাত্যায়নীর হাতের কঙ্কণের আঘাতে কপাল কেটে ছিলেন—সে কথা শুনেছি, মেজঠাকুমার কাছে। আর তাঁর ছবিতে দেখছি একটা লম্বা কাটা দাগ। অন্য যারা প্রবীণ তাঁদের কাছেও শুনেছি। কিন্তু কোন নমুদ পাইনি।

জমাখরচের খাতায় মধ্যে মধ্যে পেয়েছি—বিদায়-বকশিশ খাতে খরচ ২৫০৲ টাকা। শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সাহেব হুজুর বাহাদুরের খাস ঝিকে বিদায় উপলক্ষ্যে—নগদ বকশিশ—। ২৫০৲ টাকাই উচ্চতম বকশিশ নয়। নিম্নতর। উচ্চতম বকশিশ ১০০০ টাকাও আছে। কাত্যায়নী দেবী সুস্থ হলে যে সব খাস ঝিদের বিদায় করা হত—এ বকশিশ তারা পেয়েছে।

দেখ প্যানেলটা দেখ, দেখতে পাবে, পুঁটলি বগলে ক'টি মেয়ে চলে যাচ্ছে।

তারপরই দেখ এই ছবিটা। সে আমলের চৌরঙ্গীর পথে সোমেশ্বর চলেছেন স্ত্রীকে নিয়ে কালীঘাটে! এ ঘটনার গল্প রায় বংশে সুপ্রচলিত এবং সুপ্রসিদ্ধ। রায়-বংশের গল্প উঠলেই স্মৃতিপথে এসে যায়। রায়-বংশের ছেলেমেয়ে—সে আধুনিকই হোক আর প্রতিক্রিয়াশীলই হোক—শুনেছে, জানে এবং মানেও। ঘটনার যে শেকল একটার সঙ্গে একটাকে গেঁথে কার্য এবং কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা টেনে নিয়ে যায় তার মাঝখানে এক একটা ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে থাকে। যেন হঠাৎ একটা বাইরের আংটা কোন এক অদৃশ্য চুম্বকের টানে ছুটে এসে শেকলটার প্রান্তে জুড়ে যায়। এও তাই।

বহুশ্রুত ঘটনাটি এই। কালীঘাট সোমেশ্বরের মামার বাড়ী। কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য তাঁর আমলে এই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারটিকে সাহায্য করে নানান সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিয়ে তাদের বর্ধিষ্ণু করে তুলেছিলেন। তাঁরা অনুগত ছিলেন এবং সত্যকার হিতৈষী ছিলেন। সোমেশ্বরও বাল্যকালে কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকতেন যখন কুড়ারাম বিদেশে বা মফস্বলে যেতেন তখন। সোমেশ্বরও ভালবাসতেন তাঁদের।

একদিন তাঁর মামাতো-ভাই এসে খবর দিয়ে গেল, কালীঘাটে এক তান্ত্রিক এসেছে। ক'দিন আগে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। তান্ত্রিক আধ পাগলা—।

মামাতো-ভাই হরিপ্রসাদ চাটুজ্জে বলেছিল—তান্ত্রিকরা আধ পাগলা হয়। মুখ খারাপ হয়। অনেকে গাইয়েও হয়। লোকটা আশ্চর্য গাইয়ে। গাইয়ে-বাজিয়ে—সব যন্ত্র বাজাতে পারে; প্রথম যখন কালীঘাটের শ্মশানে আসে তখন একটু সুস্থ ছিল—মধ্যে মধ্যে গান-

বাজনার আসর বসলে জয় কালী বলে এসে ঢুকে বসত। বলত—আমাকে একটু বাজাতে দেবে? কখনও বলত—গাইতে দেবে? দিত, সবাই—সে অদ্ভুত ব্যাপার। লোকে একটু ভালটাল বাসত। মধ্যে মধ্যে মার খেতো। লোকে মারত। বলত—মেয়েদের দিকে নাকি ড্যাব-ড্যাব্ করে তাকায়। পলক পড়ে না। এক একজনের কাছে এসে তার মুখের কাছে মুখ এনে বলে—তুমি সেই বট?—বেশ কয়েকদিন মার খেয়েছে। কিন্তু এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু ভাই এই দশদিন আগে জোয়ারে একটা যুবতী মেয়ের দেহ ভেসে এসেছিল। একাদশীর জোয়ার। সেদিন জোয়ারটা বেশী। মাঝখানে দেহটা ভেসে চলছিল—একবার ডুবছিল একবার উঠছিল। চোখে পড়েছিল সবারই কিন্তু তান্ত্রিক জয় কালী বলে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তুফান-জোয়ার—তারই মধ্যে থেকে সে দেহটা টেনে এনে তুললে। টাটকা মড়া। রূপসী একেবারে বোধ হয় যোড়শী মেয়ে। সকলে জিজ্ঞেস করলে—কি করবে! বললে—আসন করে সাধন করব। সামনে পরশু চতুর্দশী, পরের দিন অমাবস্যে। তারপর তাই চলে গেল নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। লোকে ভেবেছিল বাঘে খাবে। নয়ত মড়ার লোভে শেয়াল এসে ওকে সুদ্ধ ছিঁড়বে! তিনদিন কেউ দেখেনি। চারদিনের দিন নৌকোর মাঝিরা দেখতে পেয়েছিল। পাড় থেকে গড়িয়ে ভাঁটার কাদার ওপর পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে। তুলে এনে মন্দিরের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছিল। জ্ঞান হয়ে লোকটা ক'দিন হয়ে গিয়েছিল ঘোর উন্মাদ। কেবল চেঁচাতো—ফেলে দিলি! ফেলে দিলি! দে—! আর খিস্তি গালাগালি। এখন শান্ত হয়েছে। লোকে বলছে সিদ্ধ হয়ে গেছে লোকটা। তা ছাড়া এখন শুনছি লোকটা অনেকজনকে অনেক ওষুধ—মানে জঙ্গল থেকে লতাপাতা ছিঁড়ে এনে হাতে দলে দেয়, ভাল হয়ে যায়। কটি বাঁজা মেয়েরও সন্তান হবে শুনেছি ওর ওষুধে। যাবে একবার বউমাকে নিয়ে?

সেই চলেছেন সোমেশ্বর ওই দেখ।

৫

পশ্চিম দিকে সেকালের কলকাতার ময়দানে উলুখাগড়ার জঙ্গল, দু-চারটে জলা, গঙ্গার ধারে বড় বড় অশথের গাছ। জাহাজ বজরার মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। চৌরঙ্গীর পূব পাশে সেকেলে বাড়ী। তখন হোয়াইটওয়ে লেডল তৈরী হয়নি, গ্র্যাণ্ড ফিরপোর বাড়ী তৈরী হয়নি। বাতা-ওয়ালা ছোট বাড়ী, গোল থাম, কাঠের রেলিং।

ব্রুহাম গাড়ী চলছে, সহিসেরা সামনে ছুটছে, পাল্কী চলছে। তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে রাহী চলছে। ঘোড়ায় চলছে সওয়ার। গরুর গাড়ী চলছে।

ওই দেখ, পাল্কীতে কাত্যায়নী।

ব্রুহামে সোমেশ্বর। চোগা চাপকান পরেন নি, পরেছেন পাটের কাপড়-চাদর। কাত্যায়নীর পরনে বালুচরের বুটীদার রেশমী শাড়ী।

* * * *

সোমেশ্বর রায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন তান্ত্রিককে দেখে। আরে!

—কি? জিজ্ঞাসা করলেন মামাতো-ভাই হরিহর।

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সোমেশ্বর তান্ত্রিককে বললেন, কি বাবা চিনতে পারছেন আমাকে?

তান্ত্রিক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, হাহা-হা! রায়বাবু? হাহা-হা! পারি বৈকি চিনতে। কেন পারব নি! হাহা-হা!

—এ পথে কত দিন বাবা?

—তা তিন জন্ম হল গো। এ জন্মে বছর পাঁচেক হয়ে গেল গো। হাহা-হা! আমি ভাবছিলাম গো তোমার কথা। হাহা-হা!

অবাক হয়ে গেলেন সোমেশ্বর। তাঁর কথাই ভাবছিলেন? তবু জিজ্ঞাসা করলেন, কে বললে আমি আসব?

—হাহা-হা। আমার মন বললে গো! তোমাকে আমার দরকার আছে যে! হাহা-হা!

আশ্চর্য! এ লোককে তিনি চেনেন। শ্যামনগরের ভটচাজবাড়ীর জামাই, পেশাদার কুলীনের ছেলে। ওর শ্বশুর খুব নামজাদা গৃহীতান্ত্রিক ছিলেন। শ্মশানে কালীপূজা করতেন। শ্মশানে জপতপ করতেন। তন্ত্রমতে স্বস্ত্যয়ন করতেন। কুলীনের ছেলে শ্যামকান্ত চাটুজ্জে—ভটচাজের কন্যাকে বিয়ে করে ঘরজামাই ছিলেন। প্রথম প্রথম বেড়াতেন গান-বাজনা করে। গান-বাজনার শিষ্য ছিল। নিজেও বড় বড় বাড়ীতে খেরুয়ার খোলে পোরা তানপুরা কাঁধে নিয়ে গান শোনাতে আসতেন। অসাধারণ গাইয়ে বলেছে মামাতো-ভাই, তা এক বিন্দু বাড়িয়ে বলে নি। যেমন সঙ্গীতে জ্ঞান তেমনি কণ্ঠস্বর। তন্ত্রের ঝোঁকও ছিল। পাঁচ টাকা পার্বণী করে দিয়েছিলেন, কালীপুজোর পর এসে গান শুনিয়ে নিয়ে যেতেন। আজ বছর পাঁচেকই হবে আর আসেন নি। পাঁচ বছরে শ্যামাচরণ একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছেন। ক্ষ্যাপা-ক্ষ্যাপা কথা, হাহা-হা, হাহা-হা, যেন একটা উল্লাস উথলে উঠছে ওই শব্দের গমক মেরে। চাউনিও বদলেছে, চোখ দুটো বড়, সে চোখ লাল হয়ে আছে। চোখের তারা কখনও স্থির, কখনও অস্থির। কিন্তু যেন জ্বলছে জ্বলন্ত আঙরার মত।

তিনি বললেন—তা আমার বাঞ্ছা যে পূর্ণ করতে হবে।

—হাহা-হা। তোমার আবার বাঞ্ছা কিগো বাবু, জমিদারি, বাড়ী-টাকাকড়ি, হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর,—আবার বাঞ্ছা? বলে হা-হা করে হেসে উঠল।

—আমার সন্তান নাই বাবা! সন্তান হয়, সব মরা সন্তান। অনেক প্রার্থনা করেছি—মায়ের কাছে—

—কার কাছে? ওই ন্যাংটা মাগীর কাছে! শ্মশানে ওটা ন্যাংটা হাহা-হা! সংসারে ওটা ভিখিরী! হাহা-হা। ওই দেখ না কালীমন্দিরের আশে-পাশে ওই টেনা-পরা দুখো দুখো কুমারী মেয়ে একটা পয়সা দাও, একটা পয়সা দাও বলে বেড়াচ্ছে, ওর মধ্যে সেটাও আছে। চোখ থাকলেই দেখবে। সেদিন আবার চং করে ভেসে এসেছিল মড়া হয়ে।

হাহা-হা। ফেলে দিলে। তা ওই করবে তোমার বাঞ্ছাপূরণ? ধুর-ধুর-ধুর! মন্দিরে যেটা আছে সেটার মুখ চোখ জিভ সব তো তৈরী করা! হাহা-হা!

লোক জমে গিয়েছিল অনেক। জনকতক লোক কালীর নিন্দে করার জন্তে রেগে উঠেছিল। তান্ত্রিক হাহা-হা করে হেসেছিলেন। সে হাসি আর থামে না। সোমেশ্বরের রোমাঞ্চ হয়েছিল সে হাসিতে। তিনি তাঁর হাত চেপে ধরেছিলেন।—বাবা!

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তান্ত্রিক। তিনিও হাত চেপে ধরেছিলেন সোমেশ্বরের। সোমেশ্বর শিউরে উঠেছিলেন। তান্ত্রিকের হাতে যেন আগুনের মত উত্তাপ। চোখ দুটো ঝকমক করে উঠেছিল।

তান্ত্রিক বলেছিলেন, হবে। হবে। বাঁচবে ছেলে হেহে-হে! নিশ্চয় বাঁচবে। কিন্তু যজ্ঞ করতে হবে। করব আমি। আর ওষুধ দোব। খেতে হবে। হ্যাঁ।

—তাই করুন।

—হেহে-হে। সে এখানে নয়। বুঝেছ। এখান থেকে আমার ঘাড়ধাক্কা হয়ে গিয়েছে হেহে-হে। আমি তাতেই মনে মনে তোমাকে ডাকছিলাম, হেহে-হে! কীর্তিহাটে যেতে হবে। বুঝেছ! ওখানে সিদ্ধেশরীর আসন আছে। ওখানে বসে সাধন করব। হেহে-হে। হবে।

—তার সঙ্গে আমার স্ত্রীর মাথার দোষ হয় মধ্যে মধ্যে, তা-ও ভাল করে দিতে হবে।

—সব হবে, সব হবে, হেহে-হে! কি মজা, হেহে-হে। দেখ দেখ, যোগটা দেখ—হেহে-হে!

তারপর হঠাৎ একেবারে যেন উন্মাদ হয়ে গেলেন—জলন্ত দৃষ্টিতে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে গালাগাল শুরু করলেন—হারামজাদী বেহায়া ন্যাংটা মাগী! এবার তোর একদিন কি আমার একদিন!

সোমেশ্বর তাঁর দৃষ্টি দেখে শিউরে উঠেছিলেন। কাত্যায়নীর মাথার ঘোমটা খুলে গিয়েছিল।

সুলতা, অলৌকিক শক্তিটক্তির কথা আমি তোমার মনে বা কারুর মনেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিনে—চাইও না। কিন্তু পাগলের মত মানুষ যখন কিছু খোঁজে, ক্ষ্যাপা যখন পরশপাথর খুঁজে খুঁজে ফেরে, তখন এমনি দৃষ্টি চোখে ফোটে। আয়নায় আমিও মধ্যে মধ্যে আমার চোখে এমনি দৃষ্টি দেখেছি।

সুলতা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এবং সে কিছু যে ব্যঙ্গ-শ্লেষাত্মক, তার আভাসও ফুটে উঠেছিল তার দৃষ্টিতে এবং ঠোঁট দুটির ভঙ্গিমার মধ্যে চাপা হাসিতে।

বাধা দিয়ে সুরেশ্বর বললে, থাম সুলতা, ব্যঙ্গ-শ্লেষ আমাকে আজ বিঁধতে পারবে না। আমার মনে একটি বিশ্বাসের দুর্ভেদ্য বর্ম আমাকে ঢেকে রেখেছে। বহু সন্ধানে যা আমি পেয়েছি, তাই আমি বলছি। এই মুহূর্তে আমার চোখের দিকে—ঠিক ওইরকম না হলেও, অনেকটা ওইরকম দৃষ্টি দেখতে পাবে। ওতে আমি বিশ্বাস করেছি। কারণ, সোমেশ্বরের

স্ত্রীর এর পরের সন্তানটিই জীবন্ত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এবং বেঁচেও ছিল। সেটি কন্যা। তার তিন বছর পর হয়েছিল পুত্র। এবং কাত্যায়নী দেবীর মাথার গোলমাল ভাল হয়ে গিয়েছিল। তান্ত্রিক যজ্ঞ করেছিলেন, ওষুধও খাইয়েছিলেন। এবং এখনও আমাদের ওখানে বায়েনরা আছে, যারা ওই তান্ত্রিককে যথাসর্বস্ব দিয়ে সেবা করেছিল, তাদের তিনি বন্ধ্যাত্বের ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলেন। আরও দুটি ওষুধ দিয়েছিলেন—একটি দু'দিন অন্তর পালাজ্বরের ওষুধ। একটি পয়সা একটি সুপুরী নিয়ে তারা ওষুধ আজও দেয়, শিকড় এবং কোন উদ্ভিদের পাতা, তারা দলে পিষে দেয়, লোকে চিনতে পারে না, তাতে লোকে সারে। আমি দেখেছি। তোমরা বিশ্বাস কর বা না-কর, রাসপুটিনের ইতিহাস রাশিয়ার কম্যুনিস্ট ইতিহাস থেকেও মোছে নি!

স্থলতা তাকিয়েছিল ছবিটার দিকে।

সোমেশ্বরের হাত ধরে তান্ত্রিক দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘকায় সোমেশ্বরের হাত ধরে একটি সোজা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় তাকে সুরেশ্বর সোমেশ্বরের থেকেও উঁচু করে এঁকেছে। বুকের মোটা মোটা হাড়গুলি প্রকট হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য রকমে সজীব হয়ে উঠেছে এই তান্ত্রিকটি। তার চোখ দুটো ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে। বড় বড় চোখের সাদা ক্ষেতে লালের আভা ফুটিয়েছে; প্রকট পঞ্জরাস্থিগুলির অন্তরালে রুক্ষ কঠোর বা ক্ষুধার্ত হৃদয়ের স্পন্দনের পর্যাপ্ত আভাস মিলছে। একটা রহস্যময় হাসি তার মুখে, ধূসর কালো গোঁফ-দাঁড়ির মধ্যে সাদা সুগঠিত দাঁতের সারি। বিদ্রূপ ব্যঙ্গের বাঁকা রেখায় সে-হাসি ধারালো তীক্ষ্ণ। হয়তো খানিকটা হিংস্র কিম্বা সেটার অর্থ ক্রুদ্ধ প্রভুত্ব! গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে গেরুয়া কাপড়, পায়ে খড়ম।

সুলতাকে ছবিটা আকর্ষণ করলে। সে উঠে কাছে গিয়ে দেখতে লাগল। সুরেশ্বর বললে —ব্যাকরণ নির্দেশ লঙ্ঘন করলে রূপ হয়তো থাকবে কিন্তু রূপের অন্তরালের রূপসী বা মোহিনী যিনি, তিনি মুখ ফেরাবেন নতুন বউয়ের মত। লজ্জা না বলি, সরম যাকে বলি, তা যার মধ্যে বেশী আছে, তিনি হয়তো এই মর্ডান যুগেও চোখ বুজে ফেলবেন। ছবি একটু দূর থেকেই দেখো, তাতে রূপসী অসঙ্কোচে রূপের রঙ-রেখার বাতায়নে মুখ রেখে চেয়ে থাকবেন। ছবিটার বৈশিষ্ট্য আছে। আশেপাশে যে বনচ্ছায়ার আভাস তার মাঝখানে তান্ত্রিক—কাছ থেকে একরকম, দূর থেকে দেখলে মনে হবে আঁধার ভেদ করে বেরুচ্ছে।

সুলতা হেসে পিছিয়ে এসে ছবিখানাকে দেখতে দেখতে বললে—সত্যিই ছবিটা বড় ভাল হয়েছে, সুরেশ্বর। তান্ত্রিক যেন কাছে টেনে নিয়ে যায়।

সুরেশ্বর জানলা দিয়ে বাইরে রাত্রির আকাশের সন্ধানে চোখ ফিরিয়ে বললে—ছবিটাকে বারকয়েক আমি এঁকেছি। বাস্তবের সত্যকে ফোটাতে চেয়েছি। রায়বাড়ীর কুলজী আর কীর্তিহাটের কড়চার উপকরণ খুঁজতে খুঁজতে একটা সত্য আমি আবিষ্কার করেছি, সেটা হল এই যে, একটা দুর্নিবার আকর্ষণে কিছু যেন টানে। আমি ওখানে গিয়ে তারই টানে যেন পড়ে গিয়েছিলাম। যত হাতড়াই, যত ভাবি এই পেয়েছি, ততই দেখি আরও গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়েছি। আর যত অন্ধকার গাঢ় হল, ততই মনে হল, এর চেয়ে সত্য

আর কিছু নেই।

বিচিত্র হেসে সুরেশ্বর বললে—গল্প শুনে ভেবেছিলাম, এর পর নিশ্চয় তান্ত্রিক ধরা পড়বে বুজরুক বলে। ক্রনোলজি ভেঙে একটা গল্প বলি—সেটা ঘটেছিল আমার পিতামহের অর্থাৎ রায়বংশের বিদগ্ধ শিরোমণি দেবেশ্বর রায়ের আমলে। এক তান্ত্রিক এসেছিলেন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মানুষ, দাড়ি-গোঁফে-চুলে বেশ ঘোরালো চেহারার মানুষ। এসে রায়বাড়ীতে ওঠেন নি, বসেছিলেন রায়বাড়ীর বিমলদিঘির বাঁধা ঘাটে। তারপর পথচারীদের অতি পরিচিতের মত নাম ধরে ডেকে কাছে এনে কিছু কিছু গোপন কথা বলে বিমূঢ় করে দিয়েছিলেন। কিছু-ক্ষণের মধ্যে রটে গেল—ত্রিকালদর্শী পুরুষ এসেছেন। সব থেকে বিস্ময়কর কথা কিছু কানে কানে বলেছিলেন দেবেশ্বরকে। চমকে উঠেছিলেন তিনি। মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর তখন প্রচুর খেয়ে খেয়ে ডিসপেপসিয়া ধরিয়েছিলেন, তাঁকে বলেছিলেন—বাবা, আপনার পাকস্থলীতে তিনটি অপাচ্য অন্ন রয়েছে। একটির বর্ণ লাল, একটির কালো, আর একটি নীলাভ। কোন বন্ধুরূপী শত্রুর বাড়ীতে সমাদরের নিমন্ত্রণের মধ্যে আপনাকে খাইয়েছে তারা। তার থেকেই এর সৃষ্টি। এবং এই অন্নই হয়তো—। অন্তত আপনার জীবনে সকল অন্নকেই বিষাক্ত করে দেবে। আর তার ছেলে ধনেশ্বরকে দেখে বলেছিলেন—এর সাংঘাতিক ফাঁড়া আছে। রায়-বাহাদুর তখন বেঁচে কিন্তু তিনি তখন তীর্থে। অবশ্য তিনি থাকলেও প্রভাবমুক্ত রাখতে পারতেন না নিজেকে। সে-কথা যাক। এর পর প্রতিকারের জন্য শ্মশানে কালীপূজার ব্যবস্থা হল। কৃষ্ণবর্ণ ছাগ থেকে শুরু করে আয়োজন উপকরণ অনেক।

লোকটা বুজরুক। খেলাটা শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে তুলতে পারেন নি। মহানিশায় শ্মশানে কালীকে একাকিনী অবস্থায় ফেলে দিয়ে মূল্যবান দ্রব্যগুলি পোঁটলা বেঁধে নিয়ে পালিয়ে ছিলেন। মূল্যবান দ্রব্যের মধ্যে সব থেকে মূল্যবান ছিল একটি নীলা আর একটি পান্না। শনি এবং রাহুর দশা বলে নীলা ধারণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কলকাতা থেকে নীলা এসেছিল, সে আমলে দুটি রত্নের দাম নিয়েছিল সাতশো টাকা। দেবোত্তরের খাতায় খরচ পড়ে আছে।

এদের আপসোস হয়নি। এঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন এই কারণে যে, লোকটা যেহেতু বুজরুক ভণ্ড, সেইহেতু তার সব কথাই মিথ্যা হতে বাধ্য।

এসব গল্প মুখরোচক। ওই গুণে শুধু বেঁচেই নেই, হাত পা ছড়িয়ে বেঁচে আছে। আমারও শোনা ছিল। সুতরাং সোমেশ্বর তান্ত্রিককে নিয়ে এসে কীর্তিহাটে যজ্ঞ করিয়েছিলেন শুনে ভেবেছিলাম এমনি কিছু একটা সত্য প্রকাশ পাবে। যেটা কীর্তিহাটের বক্তাদের কাছে দুর্বোধ্য এবং দুর্ভেদ্য হলেও আমার মত বিদগ্ধ শ্রোতার কাছে ধরা পড়বে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা তা পড়ে নি। শুধু তাই নয়—আজও সেই তান্ত্রিকের ওষুধ ওখানে অনেক জনের মধ্যে সফল হচ্ছে। আমার দু'দিন অন্তর জ্বর হয়েছিল, ডাক্তারি ওষুধে, কুইনিন-ইনজেকশনে বন্ধ হয় নি। আমি ভাল হয়েছি ওই ওষুধে। খেতেও হয় নি। একটা পয়সা আর একটা সুপুরী নিয়ে ওখানকার বায়েনরা একটা জলজ উদ্ভিদ দলে পিষে হলুদমাখা ন্যাকড়ায় বেঁধে শুঁকতে দিয়েছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুঁক জলে ফেলে দিতে হয়। এও সেই তান্ত্রিকের ওষুধ।

সেই তান্ত্রিকের ওষুধে আর যজ্ঞের ফলে রায়বাড়ীর বধূ রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবী বৎসর খানেক পরেই জীবন্ত-কন্যা প্রসব করলেন। এ প্রত্যাশা সকলেই করেছিলেন, কারণ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি আগে ছ'মাস থেকেই বিষণ্ণ হতেন, তিন-চার মাসে ঘরে ঢুকতেন, বোবার মত হয়ে যেতেন। পাঁচ-ছ' মাস থেকে আগুনের মত উগ্র হয়ে উঠে সমস্ত সংসারটাকে দাহন করতেন। এবার তার কিছুই হয়নি।

তান্ত্রিক বলেছিলেন—পুত্র হোক, কন্যা হোক—ব অক্ষর আদিতে রেখে নামকরণ করো।

তান্ত্রিক তখন গত হয়েছেন। কংসাবতীর জলে নৌকাডুবিতে ভেসে গেছেন। সোমেশ্বরের আর আপসোসের সীমা ছিল না। তিনি তান্ত্রিককে কীর্তিহাটে এনে এখানেই বাস করিয়েছিলেন। তান্ত্রিকের প্রায় ক্রীতদাস হয়ে পড়েছিলেন। উগ্র তান্ত্রিক উপদ্রবের শেষ রাখতেন না। কালী-মায়ের পূজক তাঁর ভয়ে পালিয়েছিল। পূজা করতেন তান্ত্রিক নিজেই। বিচিত্র লোক। তাঁর নিজের কাছে ছিল এক শালগ্রাম শিলা—তাঁর পূজা আর কালীর পূজা করতেন একসঙ্গে। শিউরে উঠত সকলে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস করত না। কারণ, কাত্যায়নী তখন অন্তঃসত্ত্বা হয়েও সুস্থ স্বাভাবিক আছেন। ওদিকে কলকাতায় একটা প্রকাণ্ড মামলায় জয়ী হয়েছেন সোমেশ্বর।

তান্ত্রিক খবর শুনে হেসে বলেছিলেন, হাহা—হাঃ। হাহা—হাঃ। হবে না। হাহা—হাঃ—সৌভাগ্য-শিলা রাজরাজেশ্বর—হাহা—হাঃ!

এরই কিছুদিন পর।

তান্ত্রিক তখন যেন অতি অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। কাঁসাইয়ের ওপারে যে জঙ্গলটার কথা এবং যে শিমুলগাছটার কথা আমি বার বার বলেছি, যেখানটাকে তান্ত্রিক চিনেছিলেন এক সিদ্ধাসন বলে, লোকে যেটাকে বলত সিদ্ধেশ্বরীতলা, সেখানে তিনি পঞ্চপর্বের রাত্রে যেতেন সাধনা করতে। রাত্রে যেতেন নৌকা করে, সঙ্গে যেতেন সোমেশ্বর, তাঁকে উত্তর সাধক হবার প্রতিশ্রুতি তিনি করিয়ে নিয়েছিলেন। আর বায়েনদের একজন খুঁজে খুঁজে তাঁকে শব এনে দিত। সেদিন ছিল চতুর্দশীর রাত্রি।

ভাদ্র মাস। কাঁসাই তখন দুকূলপ্লাবিনী। সোমেশ্বর, তান্ত্রিক আর সোমেশ্বরের অতি অনুগত দু'জন—তারা হাড়ি এবং শিবে বাগ্দী, এরা যেত নৌকা নিয়ে। তারা হাড়ি আর শিবে বাগ্দীকে বলা চলে তাল আর বেতাল, যদি সোমেশ্বরকে বলা যায় বিক্রমাদিত্য। উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ছাড়াও এরা বন্যায়, অগ্নিদাহে, শত্রুহননে সর্ববিধ কর্মেই সোমেশ্বরের সঙ্গী। এদের হাতে নৌকাখানা কংসাবতীর প্রলয়ঙ্করী উন্মাদনাকে মথিত করে ঠিক ওই জঙ্গলে গাছের গোড়ায় গিয়ে লাগত। এঁরা দুজনে সব উপকরণ নিয়ে গিয়ে উঠতেন শিমুলতলায়। উপকরণ সব সাজিয়ে নিয়ে তান্ত্রিক বলতেন সোমেশ্বরকে—যাঃ।

চলে আসতেন সোমেশ্বর। ফিরে এসে নৌকায় বসতেন। যতক্ষণ না সাড়া দিতেন তান্ত্রিক ততক্ষণ যাবার হুকুম ছিল না। ওদিকে জঙ্গলে থাকত ভরু বায়েন। তার কর্ম ছিল ওই শবটিকে বেশ ভাল ক'রে তালপাতার চ্যাটাইয়ে জড়িয়ে গাছের উপরে বেঁধে রাখা। ভোর-

বেলা উঠে আসতেন তান্ত্রিক। ধরে নিয়ে আসত ভরু, তারপর ধরতেন সোমেশ্বর। এনে নৌকায় চাপাতেন। এপারে এসে সেই শেষ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে তারা এবং শিবে তাঁকে ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দিত তাঁর ঘরে। সোমেশ্বর স্নান করে চলে যেতেন অন্দরে।

এরই মধ্যে সেদিন ওপার থেকে ফিরবার সময় হঠাৎ নৌকোখানা গেল উল্টে। ভরা কাঁসাই। তার উপর আকাশে ছিল মেঘ-ঝড়। সমুদ্র খুব দূরে নয়। তুফান এখানে বেশী হয়। নৌকা উল্টে সকলে ডুবল জলে। সোমেশ্বর, শিবে, তারা তিনজনে কোনক্রমে সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠলেন কিন্তু সারারাত্রির সাধনার পর মদ্যপান এবং সাধন-ক্লান্তিতে বিবশচৈতন্য এবং অবশ-দেহ তান্ত্রিক গেল ভেসে। এঁরা কাদা মেখে ঘরে ফিরলেন। তান্ত্রিকের আর সন্ধান মিলল না। হয়তো এখানে তাঁর সাধনা সিদ্ধ হবার নয়, সিদ্ধি অপেক্ষা করছিল গঙ্গাসাগর সঙ্গমে। কাঁসাই হয়ে হলদী। হলদী হয়ে ভাগীরথী। তারপর হিজলীর পাশ দিয়ে ওপাশে কাকদ্বীপকে রেখে রসুলপুরের মোহনা পার হয়ে সাগরদ্বীপে সাগরসঙ্গমের আবর্তের মধ্যে সিদ্ধি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল।

সোমেশ্বর লজ্জায় ভয়ে মুহ্যমান হয়ে গেলেন। খোঁজ তিনি করালেন অনেক। কিন্তু পেলেন না। লজ্জা এই জন্যে যে, নিজে বাঁচলেন অথচ তান্ত্রিক শ্যামাকান্তকে বাঁচাতে পারলেন না। ভয়, এরপর যদি বিঘ্ন ঘটে, যদি কাত্যায়নীর উন্মত্ততা দেখা দেয়। কিন্তু তা দেয় নি। তবু তিনি আতঙ্কিত হয়ে বজরায় অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কাত্যায়নীকে নিয়ে চলে গেলেন কলকাতায়। কীর্তিহাটে যেন আতঙ্ক দেখছিলেন। কলকাতায় জন্ম হল তাঁর প্রথম জীবিত সন্তান—কন্যার। নাম হল বিমলা।

বিমলার অন্নপ্রাশন হল কীর্তিহাটে। শুধু অন্নপ্রাশন নয়—সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিকের শালগ্রাম, সৌভাগ্য-শিলা রাজরাজেশ্বরের প্রতিষ্ঠা হল।

খরচ হয়েছিল কুড়ি হাজার টাকা।

রাজরাজেশ্বরের স্বতন্ত্র চত্বর এবং মন্দির—দশ হাজার টাকা। রাজরাজেশ্বরের এক মুকুট তৈরী হয়েছিল সায়েব জুয়েলারদের বাড়ীতে। হীরে বসানো ছিল পাঁচখানা। মিহি মুক্তোর ঝালর ছিল। দাম এক হাজার টাকা।

বাকীটা উৎসব, ভোজন, দান।

যে মামলাটায় জিতেছিলেন, তাতে সোমেশ্বর পেয়েছিলেন এক লক্ষ টাকার ডিক্রী। বাকী আশী হাজার টাকায় কিনেছিলেন নতুন জমিদারী। সেরেস্তা বড় হল। ম্যানেজার বহাল হল নায়েবের বদলে। বরকন্দাজ বহাল হল পশ্চিমদেশী; ভোজপুরী জোয়ান। শিবে-তারার মধ্যে তারা থাকত কলকাতায় সোমেশ্বরের কাছে। শিবে মরেছে বাঘের হাতে। হলদীর মোহনার কাছে গিয়ে আর ফেরেনি।

নতুন ম্যানেজার পাকা লোক ছিলেন, মহিষাদলের রাজা গর্গবাহাদুরদের স্টেটের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার। দেওয়ানদের নতুন নাম হয়েছে ম্যানেজার। গিরীন্দ্র আচার্য। গর্গবাহাদুরদের কুনজরে পড়েছিলেন। তাঁকে আশ্রয় দিলেন সোমেশ্বর, বসবাস করালেন।

আর আনলেন নবদ্বীপ থেকে রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থকে। কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য দীক্ষা

নিয়েছিলেন নবদ্বীপে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের এক বংশধরের কাছে। তিনি গত হয়েছেন, আছেন গুরু-মা। সোমেশ্বর দীক্ষা নিয়েছেন গুরু-মার কাছে। সেই গুরু-মাই দিলেন এই তরুণ ছেলেটিকে, বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স, নিষ্ঠাবান ধার্মিক এবং পণ্ডিত ছেলে, ওঁদেরই জ্ঞাতি। মায়ের পূজায় বা প্রভু রাজরাজেশ্বরের সেবার কোন ত্রুটি হবে না, হতে পারে না।

এ ব্যবস্থা সোমেশ্বরের নয়, এ-ব্যবস্থা কাত্যায়নী দেবীর। তাঁর মস্তিষ্ক এখন সুস্থ। কন্যাকে কোলে নিয়ে বর্ষার পৃথিবীর মত শান্ত শীতলা। তবে মধ্যে মধ্যে ঝড় উঠলে সেটা ছোটখাটো সাইক্লোন হয়ে দাঁড়ায়। দেবসেবায় ত্রুটি হলে তাঁর কন্যার অমঙ্গল হবে। সুতরাং সে-ব্যবস্থা তিনি করলেন। শুধু এখানের নয়, তাঁর পিত্রালয়েরও। এরপর থেকে রায়বংশে কাত্যায়নী দেবী এক দীপ্তিময়ী দেবী।

সমস্ত রায়বংশ, কীর্তিহাট কাত্যায়নী দেবীর ভয়ে কাঁপত।

তিন বছর পর ভূমিষ্ঠ হল পুত্র।

ব দিয়ে নাম। নাম হল বীরেশ্বর রায়। বীরেশ্বরের জন্ম কলকাতায়। সোমেশ্বর রায় তখন কলকাতায় খুব কর্মব্যস্ত। তাঁর অভ্যুদয় হচ্ছে, অপ্রত্যাশিত অভ্যুদয়। ইংরেজ এ্যাটর্নীর কাছে টণ্ডির কাজ করে আইনে তাঁর খ্যাতি হয়েছে। অনেক বড়ঘরের ল-এজেণ্ট হয়েছেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তখন এদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তার কাছে যান। তিনি পছন্দ করেন। দ্বারকানাথ তখন নুনের দেওয়ানের চাকরী ছেড়ে স্বাধীনভাবে নানান ব্যবসা করছেন। তাঁর মধ্যে আইনের পরামর্শদাতা হিসেবে নাম তাঁর খুব। তিনি ল্যাণ্ড হোল্ডারস সোসাইটি স্থাপন করেছেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর সহকারী ; সোমেশ্বর প্রসন্নকুমারের সহকারী বা সহযোগী। এই সময়টা তখন জমিদারদের একটা দুঃসময়। কোম্পানী নতুন আইন করে লাখেরাজ ব্রহ্মত্র নানকার প্রভৃতির উপর কর ধার্য করতে চেষ্টা করছেন। ওদিকে লিমিটেশন এ্যাক্ট ক'রে লর্ড ওয়েলেসলী জমিদারদের একটা বড় ঘা দিয়ে গেছেন। প্রজার চার বছর খাজনা বাকী হলেই বৎসরান্তে শেষ বছরের খাজনা তামাদি বলে গণ্য হবে। অবশ্য চার বছর খাজনা বাকী হলে শতকরা ২৫ টাকা সুদ জমিদার পাবে। এদেশে সুদ ছিল মহাজনীতে খাজনায় জমিদার সুদও নিতেন না এবং প্রজার খাজনা যত কালেরই বাকী থাক, দিতে সে অস্বীকার করত না। ছ আইন সাত আইন উঠে গেছে। প্রজাকে বেঁধে রেখে খাজনা আদায় করা যায় না। জমিতে গাছ ধান ক্রোক করে টাকা আদায় নিষিদ্ধ হয়েছে। এর উপর এই লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত বা তার উপর খাজনা ধার্য হলে জমিদার এবং তার সঙ্গে বাংলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছেন রাণী কাত্যায়নী, পাইকপাড়ার রাণী, কান্দীর রাণী। দ্বারকানাথ তাঁর এস্টেটে আইনের পরামর্শদাতা। সোমেশ্বর তাঁর সহকারী। এ-বাড়ী রায়-বংশের স্থাপয়িতা কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের মনিব-বংশ বলতে গেলে। তারপর লালাবাবু এ-বংশের সব অপরাধ মুছে দিয়ে পুণ্যবংশে পরিণত করেছেন। এ-সব লাখেরাজ রাজস্বমুক্ত সম্পত্তি, কোম্পানী সরকারের প্রকাশ্য নীলামে লাখেরাজ বলে সরকারই নীলেম করিয়েছেন, কিনেছিলেন লালাবাবু দেবত্র হিসাবে। বিহারে এবং অযোধ্যা অঞ্চলে বৃন্দাবনের কাছে সে

সম্পত্তি অনেক সম্পত্তি।

এখন কোম্পানীই দাবী করছেন, খাজনা দিতে হবে। নতুন কালে খবরের কাগজ হয়েছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ক্যালকাটা কুরিয়ার, ইংলিশম্যান। বাংলা কাগজও হয়েছে।

এসবের মধ্যে সোমেশ্বর জড়িয়ে পড়েছেন। তাতে তাঁর প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। তবে তিনি হিসেবী লোক, সব কাজেই হিসেব করে নামেন। রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বন্ধ করবার মত আন্দোলনের বাইরে থেকেছেন। সে-সব ক্ষেত্রে তিনি রাধাকান্ত দেবের দলের লোক। দ্বারকানাথের একখানা মজার পত্র আছে তাতে। তিনি সোমেশ্বরকে লিখেছেন, "আমি জানিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, স্ত্রীর কথায় তুমি সতীদাহ ও বিধবাবিবাহ সমর্থন হইতে পশ্চাদপদ হইতেছ। ইহা লজ্জার কথা। অতীব লজ্জার কথা।" কাত্যায়নী দেবীর ভয়ে সোমেশ্বর রাধাকান্ত দেবের দলে যোগ দিয়েছিলেন।

এ-সবের নজীর থাকে-থাকে সাজানো ছিল এই জানবাজারের বাড়ীতে। এ-সব আমি অনেক পরে-পরে আবিষ্কার করেছি। আগেরটা পেয়েছি পরে, পরেরটা পেয়েছি আগে। তোমাকে বলবার সময় গুছিয়ে বলছি। আর কিছু শুনেছি গল্প, তার বেশীর ভাগ মেজঠাকুমার কাছে।

*    *    *    *

সুলতা, মেজঠাকুমা আমার মধ্যে-মধ্যে দুঃখ করে বলতেন, সুরেশ্বর, ওরে আমার ভয় হয় কি জানিস? ভয় হয় আমার না রাবণের মা নিকষার দশা হয়! রায়বংশের পুরী আগ্‌লে আমাকে না বসে থাকতে হয়, সেই পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত।

সুরেশ্বর বললে—আমি সেদিন সকালে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছি সুলতা। আমি সেই মডার্ন আর্টিস্ট, বিদ্রোহী আধ-পাগলা সুরেশ্বর নই; একটা ভাবের ঘোরের মধ্যে চলে গেছি ১৮৩৭-৩৮ সালে। মধ্যে-মধ্যে সোমেশ্বর রায় হতে চেষ্টা করছিলাম। ওই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে কল্পনা করেছি, মনে হয়েছে চোখে তাকে দেখছি। তোমাকে কাত্যায়নী ভাবতে চেষ্টা করেছি, এমন কি ব্রজদার সেই শেফালি মেয়েটিকে ভাবতে চেষ্টা করেছি, সোমেশ্বরের প্রেয়সী-বাঈজী। ওই যাদের হাতে টাকা দিয়ে সেদিন ঘরে যেতে বলে এসেছিলাম, তাদের ভাবতে চেষ্টা করেছি, সোমেশ্বর রায়ের সেবাদাসী ঝি।

সুলতা হেসে ফেললে। বললে—মনে-মনে পরম তৃপ্তি নিশ্চয় পেয়েছিলে। কিন্তু আমার নামটা টানছ কেন? যদি-বা সেদিন তোমার তা মনে হয়ে থাকেই তবে ওটা বাদ দিয়েই বল। ওর জন্যে তোমাকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলার জন্য নরক-দর্শন করতে হবে না, বা তোমার রথখানি মাটির উপরে বাতাসলোকে চলে না যে ধপ করে মাটিতে আছড়ে পড়বে।

হেসে সুরেশ্বর বললে—এত আছাড় খেয়েছি সুলতা যে, তা খেয়ে আছাড়-প্রুফ হয়ে গেছি। পাহাড়ের শিখর থেকে সমতলে পড়েছি, স্বর্গ থেকে নরকে পড়েছি; তা নইলে আজ তোমার এই কথাটিতেই আছড়ে প'ড়ে হাত-পা ভাঙতাম। ঝগড়া করব না, ধরে নাও কাত্যায়নী তোমাকে ভাবি নি। তবে কথাটা এই যে আমি সেদিন সকালে যেন মৃত্যুপুরী

বা অতীত কালের যবনিকা ঠেলে বর্তমানের দিকে পিছন ফিরে অভিভূতের মত হাতড়ে-হাতড়ে চলেছিলাম, হঠাৎ পথ হারিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। এই সময়ে বেলা তখন দশটা, মেজঠাকুমা এলেন, আমাকে চরণোদক দিয়ে নির্মাল্য মাথায় ঠেকিয়ে ওই কথাগুলি বললেন।

অভিভূত সুরেশ্বর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসু হয়ে মেজঠাকুমার দিকে তাকালে।

মেজঠাকুমা অত্যন্ত ম্লান হেসে বললেন—ধনেশ্বর গাল দিচ্ছে রে! ওই কথা বলে গাল দিচ্ছে। বলছে, আজ ওই বিশ্বাসঘাতিনীই সুরেশ্বরকে সব লাগাচ্ছে। ধ্বংস করছে মেজ-তরফকে। নিকষার মত হবে তুমি!

সুরেশ্বর বললে—না ঠাকুমা, পুরাণের কোন দুঃখিনীর সঙ্গে যদি তোমাকে তুলনাই করতে হয়, তবে তুমি গান্ধারী। গান্ধারীর স্বামী অন্ধ ছিলেন বলে সারাজীবন চোখে কাপড় বেঁধে ছিলেন, আলো দেখেন নি। তুমি বিয়ে করেছিলে ষোল বছর বয়সে ষাট বছরের শিবেশ্বর রায়কে। কুশণ্ডিকার হোমের আগুনে তুমি তোমার ষোল থেকে পঞ্চাশ, এই যৌবন কালটিকে আহুতি দিয়ে একেবারে একান্ন বছরের প্রৌঢ়া হয়েছিলে। তুমিই তো দুর্যোধন, দুঃশাসনকে উপেক্ষা করে সত্য কথা বলবে। নইলে কে বলবে বল!

মেজঠাকুমা বললেন—মনটা জুড়িয়ে দিলি ভাই। আমি এখন যাই রে। একবার বাপের বাড়ী যাব, ওপাড়ায়, আমার বিধবা ভাজ খালাস পাচ্ছে। ভুগছে অনেক দিন থেকে। ডাক্তার বলেছে, আজ আর পার হবে না, একবার দেখে আসি।

সুরেশ্বর চমকে উঠে বললে—আর কোন বড় ডাক্তার দেখালে না?

—ডাক্তার? কি হবে?

—মানে?

—মানে বিয়ের এক বছরের মধ্যে বিধবা হয়েছে। ছেলে নেই, পুলে নেই। লোকের বাড়ী বলতে গেলে খেটে খায়। প্রথম যৌবনে লোকে এত মিথ্যে কলঙ্ক দিয়েছে যে, বেঁচে ছিল শরশয্যেতে ভীষ্মের মত! আমার থেকেও বছর চারেকের ছোট। কি করবে বেঁচে?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল সুরেশ্বর।

মেজঠাকুমা একটু হাসলেন, যে হাসিতে অন্যের চোখে জল আসে। পা বাড়িয়ে আবার ফিরলেন, বললেন—হ্যাঁরে, চায়ের আগে দুখানা বাতাসা দিয়েছিল রঘু? খেয়েছিস?

—বাতাসা?

—হ্যাঁ, রাজরাজেশ্বরের শয্যাভোগ?

—শয্যাভোগ?

—হ্যাঁ। এখানে শয্যাভোগ হয় ঠাকুরের। আমি বাড়ীতে বলে রেখেছিলাম, তারা ভোর বেলাতেই দিয়ে গেছে। আমাকে বললে তারা?

রঘু বললে—হ্যাঁ, উতো দিয়ে গিয়েসে।

—তা দিস নি কেন ?

—উ।

—ওরে বড়লোকের চাকর বড়লোক! উ! মানে উ কি খাবে আমার বাবু! দে এনে দে। খা ভাই। আমি দেখে যাই। খা।

দুখানি ছোট বাতাসা। মেজঠাকুমাই মুখে ফেলে দিলেন। খেতে হল সুরেশ্বরকে। তবে গুড়ের বাতাসা, খারাপ লাগল না।

মেজঠাকুমা বললেন, আগে বরাদ্দ ছিল কাঁচা মিষ্টির। দুটি করে কাঁচা মিষ্টি, ঠাকুরের শয়নের সময় পাশে রেকাবীতে করে রাখা থাকত। আর জল। বরাদ্দ করেছিলেন রাজকুমারী বউ•কাত্যায়নী। সোমেশ্বর রায়ের স্ত্রী। লোকে বলত, বাঘিনী ঠাকরুণ। সুরেশ্বর হেসে বললে, সোমেশ্বর রায়কে মেজঠাকুমা বলেন, ফোমেশ্বর রায়। শ্বশুর-স্বামীর নাম তো করতে ছিল না সেকালে। তারপর সুরেশ্বর জের টেনে বললে—মেজঠাকুমা বললেন—তাঁর মেয়ে বিমলা যখন দু বছরের তখন শেষরাত্রে উঠে সে ক্ষিদে পেয়ে কাঁদত। উপরি উপরি দিন কয়ের পর একদিন ঝিকে বললেন—মাথার গোড়ায় দুটো করে মিষ্টি রেখে দিস, আর এক গ্লাস জল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কীর্তিহাটেও তো খুকী-খোকা আছে, মা মুক্তকেশী খুকী আর রাজ-রাজেশ্বর গোপাল! তাহলে তো তাঁদের ক্ষিদে পায়! এই পরদিন উঠেই হুকুম হল, বজরা সাজাও, আমি কীর্তিহাট যাব। এসেই সেই দিন থেকেই এই ব্যবস্থা হল। সেকালে মিষ্টান্ন তৈরী হ'ত বাড়ীতে। বড় বড় গাই ছিল, ঘোষ ছিল। ঠাকুরবাড়ীতে হালুইকর বামুন ছিল। তারা ক্ষীর করে, ক্ষীরের নাড়ু তৈরী করে দিত। তারপর তোমার ঠাকুরদাদের আমলে চাকরান জমি দেওয়া হয়েছিল ময়রাদের। তারা কাঁচা মিষ্টি দিয়ে যেত। তারপর তোমাদের সেরেস্তা থেকে ময়রার নিজের খাজনার জোতের উপর যখন বাকী খাজনার নালিশ হল, তখন ওই মিষ্টির জমিটা সমেত ভুক্তান করে নালিশ হল। নালিশের ডিক্রীর দায়ে জোত নীলেম হয়ে গেল। কিনলে ধনেশ্বর। তারপর ময়রা মিষ্টি বন্ধ করলে। তখন থেকে দুখানা বাতাসা ব্যবস্থা হল।

হাসলেন মেজঠাকুমা। বললেন—ওবেলা আসব ভাই, এবেলা যাই। ছুঁড়িটাকে বড় ভাল বাসতাম। শেষ দেখাটা করে আসি।

—চল আমি যাই।

—তুই যাবি ?

—যাব না ? তুমি যাচ্ছ, আমি যাব না কেন ?

—আয়। তার ভাগ্য! যাচ্ছিস যদি তবে তার অস্থিটা অন্ততঃ যাতে গঙ্গা পায় তার ব্যবস্থা ক'রে দে ভাই। দেহ নিয়ে আর কেউ যায় না; আর তাতে বাসমড়াও হয়ে যায়। অস্থিটা পাঠিয়ে দে।

—সে তুমি দেবে। তুমি হুকুম করবে, আমি তামিল করব।

বিহ্বল হয়ে গেল মেজঠাকুমা। নীরবেই পথ চলতে লাগল। সদর রাস্তায় না গিয়ে রান্নাবাড়ীর পাশ দিয়ে স্নানের পুকুর, দুধপুকুরের বাগানের মধ্য দিয়ে চলছিল মেজঠাকুমা।

হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে বললে—এই খানটায় গোপেশ্বর সুখেশ্বরকে মেরে ফেলেছিল।

সুরেশ্বর বললে—চল। দুঃখ আর কত করবে?

মেজঠাকুমা বললেন—তা ঠিক বলেছিস ভাই। দুঃখ আর কত করব। তাই তো এত বড় ঘেন্নার কথার কলঙ্ক দিয়ে সেদিন ওরা যখন গুজব রটালে তখন প্রথমটা বুকে যেন শেল বিঁধেছিল। কি দুঃখ যে হয়েছিল কি বলব! কিন্তু ওই বলেই বুঝিয়েছি, দুঃখ আর কত করব!

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন—আঃ হায় হায় হায়! এ্যাঁ! এ গাছটাও কেটে ফেলেছে! সামনে একটা প্রকাণ্ড থালের মত গর্ত। কোন বড় গাছ সমূলে কাটার চিহ্ন!

—হ্যাঁ, কোন বড় গাছ ছিল এখানে।

বাগানের সব থেকে বড় আমগাছ ছিল এখানে। গাছটা দুধপুকুরে বাগান করবার সময় কুড়ারাম মশায় রাজকুমারী পুত্রবধূকে দিয়ে পুঁতিয়েছিলেন। মালদা'র আমের গাছ। আঁটির গাছ, গুঁড়িটা ছিল এত মোটা যে, দুটো মানুষে হাত বাড়িয়েও জড়িয়ে ধরতে পারত না। হুঁঃ! বলে একটি আক্ষেপসূচক ধ্বনি তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বললেন—এ সুখেশ্বরের ছেলেদের কাজ! ওই যে কল্যাণেশ্বর, ওর মত কুটিল আমি দেখি নি। ওর বাপ বাইরে যত ভদ্র ছিল, ভেতরে তেমনি ছিল কুটিল। ওই তো তোর মেজ-ঠাকুরদাকে ঠাকুরদের গয়না বিক্রী করে বিঘে-কতক ডাঙ্গা কেনা হল এই জমাখরচ দেখিয়ে টাকাটা মারবার ফন্দী দিয়েছিল। ঠিকেদারী করে কল্যাণেশ্বর গাছ থেকে তক্তা তৈরী করিয়েছে।

—চল ঠাকুমা বড় বাজে বকছ।

—বাজে বকছি?

—বকছ না?

—তুই ছোঁড়া বুঝবি নে রে। এর বেদনা তুই বুঝবি নে। কলকাতার মানুষ তুই, এখানকার তো নস! জানিস, এ গাছের একটা গল্প আছে। গাছটা তখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। কাত্যায়নী ঠাকরুন পুকুরে চান করছেন, তখন বয়স পঁয়তাল্লিশের পার। এই গাছে এক ছোঁড়া ডোম উঠেছিল আম পাড়তে। ঠাকরুণ এসে ঘাটে বসেছেন, গায়ের কাপড় খুলে দাসীতে তেল মাখাচ্ছে। ছোঁড়ার কপালে দৈবঘাত, সে ওই রঙ দেখে হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছিল। আর পড়বি-তো-পড় ঠাকরুণের নজরেই পড়। ঠাকরুণ হেঁকেছিলেন, কে রে শূয়ারের বাচ্চা! ছোঁড়াটা ভয়ে হুড়মুড় করে ডালে-ডালে পাঁচিলে নেমে লাফিয়ে পড়ে পালিয়েছিল। পাঁচিলের বাইরে এই যে ঢিবিটার উপর দিয়ে যাচ্ছি, এইটেই ছিল তখন ডোমপাড়া। কর্তারাই বসিয়েছিলেন। বাড়ীতে তারা জমাদারের কাজ করত। ঠাকরুণ তৎক্ষণাৎ উঠে দাসীকে বলেছিলেন, মাহুতকে বল জংবাহাদুরকে পাঁচিলের ওপাশে নিয়ে আসবে। পিঠে সাজটাজের দরকার নেই। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। হারামজাদী ছেলে-দুলে আস্তে-আস্তে যাবি নি, দৌড়ে যাবি। বুঝলি—আমি একশো গুনব। তার মধ্যে না

এলে ঝাঁটা-পেটা করব। যা। একশোর মধ্যেই সে এনেছিল। তারপর বোধ হয় দুশো-তিনশো গুনতে গুনতে হাতী এল। হুকুম হল, ডোমরা সব জিনিসপত্র বের করে নাও ঘর থেকে! পাঁচশো গুনব আমি। তারপর হাতী ঘর ভেঙে দেবে। কাত্যায়নী ঠাকরুণ বাঘিনী ঠাকরুণ। ডোমরা বাদ-প্রতিবাদ করেনি, বেরিয়ে এসে সরে দাঁড়িয়েছিল। ঠাকরুণ মাহুতকে বলেছিলেন, সমশের জংবাহাদুরকে বল—পাড়াটা ভেঙে মাঠ করে দেবে। তারপর অবিশ্যি ডোমদের জায়গা দেওয়া হয়েছিল, ঘর করবার জন্যে, টাকা, খড়, বাঁশ, তালগাছ দেওয়া হয়েছিল, তা হয়েছিল। কিন্তু ওই ছোঁড়াটাকে গাছে বেঁধে দশকোড়া লাগিয়েছিল চাপরাশীরা। এ গাছটা সেই গাছ রে!

## ৬

সুরেশ্বর এসে ভালই করেছিল, নইলে হতভাগিনী বিধবার শেষকৃত্যটাও হত জীবনকালের বেঁচে থাকার লাঞ্ছনার চেয়েও কঠিনতর লাঞ্ছনার মধ্যে।

একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঘোঁট পাকিয়েছে—এর প্রায়শ্চিত্ত হয় নি। একজন ম্যাট্রিক ফেল হাফ-মাতব্বর ছেলে বলেছে—ডাক্তারের কাছে শুনেছে রোগটা টিবি ইন্টেস্টাইন।

প্রবীণদের মধ্যে কয়েকজন ধনেশ্বরের নেতৃত্বে আলোচনা করেছেন, ওর যৌবনে যে অপবাদ হয়েছিল তা অপবাদ নয় সত্য। তার জন্য ওকে কোন যজ্ঞিতে রাঁধতে পর্যন্ত কাঠি দিতে দেওয়া হ'ত না। এ ক্ষেত্রে অন্তত প্রায়শ্চিত্ত একটা হয়ে থাকলে কথা ছিল না। কিন্তু যখন হয় নি তখন এতে কে কাঁধ দেবে!

ধনেশ্বর বলছেন—আমাদের স্টেট থেকে পাঁচ টাকা দেবার কথা ছিল এইসব অনাথা দরিদ্রের সৎকারের জন্যে। তাই বা কি করে দেব? এ তো একরকম ধর্মচ্যুত! রায়বাড়ীর দলিলে এ নিয়ে দুটি নির্দেশ আছে। এক, ওই পাঁচ টাকা বরাদ্দ। দুই রায়বাড়ীর দেবোত্তরের ট্রাস্টি, যাঁর পালা পড়বে দেবোত্তরে, তাঁর তরফ থেকে কারুকে উপস্থিত থাকতে হবে।

পালাটা এখন ধনেশ্বরদের। ধনেশ্বর এসেছেন। তা ছাড়াও যার বাড়ী কেউ মারা যায় সেখানে ধনেশ্বর পালা থাক বা না-থাক যান। এখানে তাঁর উদারতা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু অধর্মের কাজ তিনি করবেন না।

প্রতিবাদ করছে অতুলেশ্বর। শিবেশ্বরের ছোট ছেলে। যে ম্যাট্রিক ফেল করে কংগ্রেস করে বেড়ায়। ১৯৩০ সাল থেকে অগ্নিগর্ভ মেদিনীপুর কংগ্রেস। তবে ভাগ্য ওর ভাল আর ধরা পড়ে নি। গ্রামে প্রায়ই থাকে না। কংগ্রেস করে কীর্তিহাটের বাইরে। সে হঠাৎ গ্রামে এসে গেছে আজকের দিনটিতেই।

অতুলেশ্বর দাদাকে প্রশ্ন করছে—তাহলে হবেটা কি? পচবে ঘরে? গ্রামের মধ্যে?

প্রশ্নটা মারাত্মক, এর জবাবে আমি কি জানি বলা চলে না। যাদের মড়া তারা যা হয় করবে এও বলা চলে না, কারণ মেয়েটি সামান্যমাত্র একখানা ঘর সম্বল করেই কোনক্রমে দিনপাত করে এসেছে। তার শ্বশুরবংশের অন্যদের সঙ্গে পৃথক অনেকদিন।

সুরেশ্বর এবং মেজঠাকুমা এসে উপস্থিত হলেন এই মুহূর্তটিতেই। ধনেশ্বর বলে উঠল—দুর্গা দুর্গা।

দুর্গা শব্দটির ব্যঞ্জনা এখানে অনেক গভীর ছিল, স্থূলতা। ধনেশ্বরকাকার দুর্গা স্মরণে আমার শরীরে পর্যন্ত জ্বালা ধরেছিল। কিন্তু মেজঠাকুমা দেখলাম অবিচল। বললেন—হতভাগী সত্যিই মরেছে না এখন বেঁচে থাকতেই হচ্ছে কথাগুলো?

অতুলেশ্বর বললে—কি রে? তুই তো ভিতরেই ছিলি! বললে সে রায়দের জ্ঞাতি ভটচায-দের একটি ছেলেকে।

সে বললে—না মারা গেছে তা আধঘণ্টা হবে! ওই মেজমাকে খবর যখন পাঠালাম তখনও উ—আঁ করছিল, তারপর যখন চুপ করেছে তখনই বোধহয় হয়ে গেছে। গ্রহণীর রুগী তো! একটু দেখে—আমি ভিতরে গিয়ে দেখলাম—চোখ স্থির হয়ে গেছে, নিশ্বেসও পড়ছে না।

মেজঠাকুমা ভিতরে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন—না, গেছে। খালাস পেয়েছে। তা ওর গতির কি হবে বাবা ধনেশ্বর?

—কি হবে? অনেকে বলছে এটা ওর পেটের যক্ষ্মা। ভয়ঙ্কর সর্বনেশে রোগ। তাছাড়া তোমার তো অজানা নয়, ঠাকুর-দেবতা ব্রাহ্মণভোজনে ভটচাজবাড়ীর বউ হয়েও ছুঁতে নাড়তে পেত না। এখন কাকে বলব—যাও হে গতি ক'রে দিয়ে এস।

—কিন্তু লোকে তো ওর হাতে খেতো। তোমার বাবাও খেয়েছেন। আমার কাছে যখন যেতো ও তখনই বলতেন, নেড়ী, একটা কিছু রান্না করে দিয়ে যা। তোর হাত নয়তো, অমৃত।

ধনেশ্বর বলে উঠল—সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ওটা মানুষের একটা ব্যাধি। তা নইলে তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তোমার সঙ্গেই বা গিঠ বাঁধবেন কেন? আর তুমিই বা ঘাটে বসে ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখবে কেন?

মুহূর্তে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু কুৎসিত কিছুই নয় ভয়ঙ্কর কিছুও যেন তার সঙ্গে সেই জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়ল। আমিও কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু মেজঠাকুমা সেই মুহূর্তটি বোধকরি একমুহূর্তের জন্য রায়গিন্নী হয়ে উঠলেন। বললেন—তোমার মুখ দেখলে পাপ হয় ধনেশ্বর! তুমি এখান থেকে যাও! গোপেশ্বরের বাপ তো তুমি!

আশ্চর্য শক্তি ছিল ওই কণ্ঠের মধ্যে, কথার মধ্যে। ধনেশ্বর যে ধনেশ্বর সেও একেবারে বোবা হয়ে গেল। মুখখানা হয়ে গেল ফ্যাকাসে! সমস্ত জনতাও স্তব্ধ হয়ে রইল। ফিস্-ফাস্ করেও কেউ একটি কথা বললে না।

মেজঠাকুমা বললেন—একখানা গরুর গাড়ী কেউ এনে দেবে, গাড়ীর দাম দেব আমি। আমিই ওকে গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে কাঁসাইয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসব।

ধনেশ্বর মাথা হেঁট করে একটি কথা না বলে ওখান থেকে চলে গেল।

আমি তখন কথা ফিরে পেলাম, বললাম—তুমি চুপ কর মেজঠাকুমা, আমি ব্যবস্থা করছি। না হয় ইস্কুলে যাচ্ছি, সেখান থেকে ছেলেদের ডেকে আনছি, তাদের নিয়ে আমি যাব।

অতুলেশ্বর এগিয়ে এল, বললে—রাজী তো আমরাই রয়েছি।

এর পর আর কোন বেগই পেতে হয় নি। মেজঠাকুমার বিধবা ভাজের সৎকার হয়ে গেল নির্বিবাদে। লোক অনেকগুলিই হল। তবু আমি গেলাম সঙ্গে। মেজঠাকুমা একবার বললেন —তুই যাবি? শরীরে—

হেসে বললাম—শরীরটা কি আমার ননীর পুতুলের মত মেজঠাকুমা? আমি ইচ্ছে করলে তো ওই হাড় ক'খানাকে একলাই ঘাড়ে করে দিয়ে আসতে পারি! পারি না?

—রায়বাবুরা সব পারে। তা—যা। বারণ করব না। হতভাগী চিরকাল ভাগ্যের লাথি ঝাঁটাই খেয়েছে। মরবার পর যদি এইটে ওর ভাগ্যে ছিল যে তুই ওর শ্মশানবন্ধু হবি, ঘাটের খেয়ায় তুইও থেকে ওকে তুলে দিয়ে আসবি, তাহলে সেটাতে আর আমি বাগড়া দি কেন? যা!

অতুলেশ্বর এসে বললে—একটু এদিকে শোন। বয়সে ছোট অতুলেশ্বর আমার সম্বন্ধে খুড়ো। তুমি বলে ডাকলে। কথা বললে এই প্রথম। বললে—শ্মশানে যারা যায় তারা কিছু নেশা ভাঙ করে। কেউ মদ কেউ গাঁজা। তা—

বললাম—বেশ তো। সে এদেশে সর্বত্রই করে। শিবঠাকুরের এলাকা। বলে পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে দশ টাকার নোট একখানা বের করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল খাট চাই, জিনিসপত্র চাই। বললাম—খাট-টাটের ব্যবস্থাও তো করতে হবে।

হেসে অতুলেশ্বর বললে—এখানে খাট-খাটিয়া নেই, বাঁশের মাচান বেঁধে নিয়ে যায়। আগে রায়বাড়ীতে খাটের রেওয়াজ ছিল, এখন সেখানেও বাঁশের মাচান। সুখেশ্বরদা বাবা একদিনে গেলেন—সে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এমন ব্যাপারটা না হলে অন্তত বাবার জন্যে ঘরের খাটই একখানা দেওয়া হত। কিন্তু সে হয় নি ওই ব্যাপারটার জন্যে। সুখেশ্বরদার লাশ, পুলিস পোস্ট মর্টেমের জন্যে নিয়ে গেল গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে মেদিনীপুর। বাবার দেহটা এইখানেই ছেড়ে দিলে বোনাফাইডি সুইসাইড বলে। বাবা গেছেন বাঁশের মাচায়। খাট বের করবার কথা কেউ মুখেও আনে নি।

চমৎকার কথা বলে অতুলেশ্বর। মেদিনীপুরী টান অবশ্যই আছে। কিন্তু বাঁধুনীতে গাঁথুনীতে শহরের বাগ্‌বিন্যাস থেকে মলিন নয়।

অতুলেশ্বরই বললে—বাঁশের ব্যবস্থা আছে। ওই কাঁসাইয়ের জঙ্গলে বাঁশ আছে, ওটা দেবোত্তরের সম্পত্তি, কিন্তু গ্রামের কারুর মৃত্যু হলে ওখান থেকে বাঁশ পায়। শুকনো গাছ দু-চারটে থাকেই। কাঠও কেটে নেয় ওখান থেকে। তবে নতুন কাপড় চাই একখানা, খানিকটা ঘি, একটুকরো সোনা, একটুকরো রুপো, বালি, কুঁচকাঠি, তা আরও পাঁচটা টাকা দাও। ওতেই হয়ে যাবে।

নোট আর একখানা দশ টাকারই দিলাম। বললাম—বাকিটা এখন রাখ।

মেয়েটার দেহ বের করতে আমিও গিয়েছিলাম। বোধ হয় মেজঠাকুমাকে খুশী করতেই। দুর্গন্ধে আমার বমি আসছিল। বহু কষ্টেই দমন করে বের করে আনলাম। মেজঠাকুমা বোধ হয় দেখলেন না, কারণ তিনি উপু হয়ে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে

কাঁদছিলেন।

বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে উতরে গিয়েছিল। মেয়েটির বাড়ী হয়ে ফিরতে হয়, সেখানে তখনও মেজঠাকুমা বসে ছিলেন, বাইরে পোড়া মালসায় আগুন রেখে এবং দরজার পাশে নিম রেখে। কিছু মিষ্টিও আনিয়ে রেখেছিলেন। এ টাকাটা উনি দিয়েছিলেন। আমি বললাম—মিষ্টি আমি খাব না ঠাকুমা।

অতুল বললে—ও বমি করেছে ওখানে গিয়ে। ওকে বারবার বললাম—তুমি কাঁধ দিয়ো না। ভীষণ দুর্গন্ধ। ও শুনলে না। শ্মশানে গিয়েই হড় হড় করে বমি করে ফেললে। কি করব ফিরে পাঠাতেও পারলাম না। ও—ও এল না। আমি ভাবলাম—ফিরে পাঠালে দুর্নাম করবে, বলবে কলকাতার বাবু!

মেজঠাকুমা বললেন—একটা কণা ভেঙে মুখে দে। তার তৃপ্তি হবে। ওর ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা গোটা আষ্টেক টাকা পেলাম—পয়সায় সিকিতে আধুলীতে টাকায়। বোধহয় শেষ কাজের জন্যেই রেখেছিল। তুই ওর ছেলের কাজ করলি, বাপের কাজ করলি, সধবা হলে বলতাম স্বামীর কাজ করলি। নে, একটু ভেঙে নে। কই তোর গা দেখি!

বুকে হাতের উল্টো পিঠটা ঠেকিয়ে বললে—গা গরম হয়েছে সুরেশ্বর! দাঁড়া আমি সঙ্গে যাই। বলেই ডাকলে—রাধারমণ!

রাধারমণ মেজঠাকুমার আর এক ভাই। সেও আমাদের সঙ্গে শ্মশানে গিয়েছিল। তাকে বললেন—বউ আর তুই সব ব্যবস্থা কর এবার। বুঝলি, আমি চললাম।

আলো নিয়ে ভিকু শ্মশান পর্যন্ত গিয়েছিল। পাঠিয়েছিলেন মেজঠাকুমাই। বললেন—চল্ ভিকু!

নীরবে পথ হাঁটছিলেন, হঠাৎ বললেন—চল্ ঠাকুরবাড়ী হয়ে চল্। প্রণাম করে চরণোদক নিয়ে যাবি।

ধনেশ্বর কারণ নিয়ে সন্ধ্যা করছিল, বার দুই কালী কালী বলে গম্ভীরস্বরে ডেকে উঠলেন। প্রণবেশ্বর, কল্যাণেশ্বর এবং কয়েকজনই বসে ছিল কাছারীর দাওয়ায়।

প্রণবেশ্বর বললে—শ্মশানে গেছলে?

বললাম—হ্যাঁ।

—বড় বাড়াবাড়ি করছ। এত কেন?

কল্যাণেশ্বর বললে—তুমি এবার এম-এল-এ হবার জন্য দাঁড়াও সুরোদা। আমরা প্রাণপণে খাটব। টাকা আছে। তার উপর যা নাম হয়ে গেল না ঠিক বেরিয়ে যাবে!

আমি কিছু বলবার আগেই মেজঠাকুমা বললেন—কল্যাণ, দুধপুকুরের সব থেকে বড় আম গাছটা—যেটার নাম ছিল গিন্নীর গাছ—সেটা কে কাটলে রে? তুই?

—কি?

—দুধপুকুরের গিন্নীর গাছটা! তুই কেটেছিস আমাকে বললে—

—কে বললে?

—বললে তোর যারা মজুর খাটে তারা।

—হ্যাঁ, সেটা বাবার আর দাদুর শ্রাদ্ধের সময় কাটিয়েছি।

—সে সব শ্রাদ্ধ তিন দিনে হয়েছে। বারোটি ক'রে বামুন খেয়েছে, তুই এতবড় গাছটা কাটালি—

—কি—? হঠাৎ সন্ধ্যারত ধনেশ্বর চীৎকার করে উঠলেন—দুধপুকুরের পাড়ের গিন্নীর গাছ? তাতে যে একশোখানা তক্তা হবে! আমি পিতৃশোকে ভ্রাতৃশোকে পুত্রের লজ্জায় কাতর সেই ফাঁকে—

নাটমন্দিরটা কুৎসিত কোলাহলে ভরে উঠল।

সুরেশ্বর বললে—ঠাকুমা, আমার শরীরটা বড় ক্লান্ত—

—চল্ ভাই চল্! না, একটু দাঁড়া। ঘোষালমশাই!

ঘোষাল সুরেশ্বরের নিজস্ব কর্মচারী। ঘোষাল এসে বাইরে দাঁড়াল। মেজঠাকুমা বললেন সুরেশ্বরের একটু জ্বর হয়েছে, ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠান।

জ্বর নেহাৎ একটু নয়, টেম্পারেচার উঠল একশো চার। তার উপর সর্বাঙ্গে বেদনা, কাঁধের ব্যথাটা অসহ্য।

ডাক্তার অ্যাসপিরিনের পুরিয়া তাঁর ব্যাগ থেকেই বের করে দিয়ে গেলেন। সুলতা, আমার ভিতরটা তৃষিত হয়েছিল স্কচ হুইস্কির জন্যে। শ্মশানে আমি ভাল ছেলে সাজবার অভিপ্রায়ে ঠিক নয়, ওই ওদের সঙ্গে দেশী কারণ পান করি নি। করতে পারি নি।

এখানে মেজঠাকুমা বসে। রঘুকে বরাত করতে পারছিলাম না। বললাম—ঠাকুমা, তুমিও তো সারাদিন বসে। বোধহয় খাও নি কিছু। যাও বাড়ী গিয়ে খাও। তুমি ভেবো না, ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বলে আমি এক্ষুনি ঘুমিয়ে যাব!

মেজঠাকুমা বললেন—না। রঘু—যে ঘরে বউমা, তোর বাবুর মা এসে থাকতেন ওইটে পরিষ্কার ক'রে দে। আমি ওখানেই কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যে করে নেব। শোবও ওই ঘরে। এক বার চল্ আমার সঙ্গে ও বাড়ী, কখানা কাপড় আর পুজোর ঝোলাটা নিয়ে আসব।

—কি দরকার ঠাকমা। কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ?

—ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখা নিয়ে যে কেলেঙ্কারী করছে ধনেশ্বর তারপর প্রকাশ্যে কপালে কৃষ্ণনামের ছাপ না আঁকলে তো রাধার পুজো লোকে করত না রে! আমার ষোল বছরে ছেলে হলে তার বয়স আজ একুশ বাইশ হ'ত। তুই না হয় আমার নাতি—পৌত্র। ভাসুর-পোর ছেলে। আমি ঠাকুমা। সেই ঠাকুমা হয়ে এই বাড়ীতে বাসা গাড়ব, দেখি কার সাধ্যি আমাকে কি বলে এরপর। চল্ রঘু! ডিকু বাবুর কাছে বস্। রাত্রে আজ দুজনেই থাকবি। বাবুর জ্বর।

ঠাকুমা নিচে নেমে দরজা খুলতেই আমি উঠে গিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে ফিরে এসে শুলাম। এবং শরীরের ক্লান্তি তাঁর সঙ্গে হুইস্কী ও অ্যাসপিরিনের যৌগিক ক্রিয়ায় ঠাকুমা ফিরবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভেঙে ছিল অনেকটা রাত্রে, তখন অ্যাসপিরিনের ক্রিয়া শেষ হয়েছে। গায়ের মাথার

বেদনা ধীরে ধীরে অ্যাসপিরিনের বাঁধ ভেঙে বাঁধা জলের আস্তে আস্তে ঝ'রে ঝ'রে একসময় সশব্দে ভেঙে নামার পড়ার মত জেগে উঠল। আমি কাতরে উঠলাম—আঃ! পাশ ফিরে শুলাম।

ও-ঘর থেকে সাড়া উঠল। কেউ যেন উঠে দরজার কাছে এল। রঘুর নাক ডাকার শব্দ পাচ্ছি। সে আমার খাটের পাশেই মেঝেতে শুয়ে আছে। আর একটা পুরিয়া খেতে হবে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা পেয়েছে। হুইস্কীর রিঅ্যাকশনও বটে, তার সঙ্গে জ্বরের উত্তাপেও জলের তৃষ্ণা আছে।

দরজাটা খুলে গেল। বললাম—কে? ঠিক মনে ছিল না মেজঠাকুমা এখানে আছেন সে কথা। মেজঠাকুমা উত্তর দিলেন—আমি।

—মেজঠাকুমা!

—হ্যাঁ। তিনি ঘরে এসে ঘরের কোণে টিপয়ের আড়াল থেকে নীল কাচ দেওয়া হ্যারিকেনটা বের করে উস্কে দিয়ে টিপয়ের উপরে রাখলেন। এবং এসে খাটের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন—কাতরাচ্ছিস কেন?

বললাম—দেখ তো জল কোথায়!

জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিলেন। আমি একটু উঠে এক নিঃশ্বাসে জলের গ্লাসটা শেষ ক'রে বললাম—ওষুধের পুরিয়া দাও, আরও জল আন। গায়ের উত্তাপটা বেড়েছে কিনা দেখ দেখি:

গায়ে হাত দিয়ে দেখে বললেন—বেড়েছে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আবার অ্যাসপিরিন খাবি? আর এই জ্বরে ও ছাই গিল্‌লি কেন?—

—কি?

—কি আর? রায়বংশের যাতে নাড়ী কাটা!

—তুমি টের পেয়েছ?

—পাব না? ও-বাড়ী থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকেই দেখি সৌরভে সুবাসে ঘর মো-মো করছে। আমি জানি তুই খাস।

বললাম—বকবে না?

—বকব? অন্নপ্রাশনের সময় সেকালে সোনার ছোট্ট গ্লাসে কালীমার প্রসাদী কারণ দিত, তাই ঠেকিয়ে দিত ছেলের মুখে।

বললাম—তাই নাকি?

বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু এখন ঘুমো। মাথায় হাত বুলিয়ে দি।

তিনি মাথায় হাত বুলতে লাগলেন। কিন্তু ঘুম আমার এল না। বললাম—ওই জানালাটা খুলে দাও। কাঁসাইয়ের ধার থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে।

—ওটা আমিই বন্ধ করে দিয়েছি। জলো বাতাস তো।

—তা হোক। ওতে ক্ষতি হবে না।

—তার থেকে আমি বাতাস করি।

—বেশ।

পাখা ঘুরতে লাগল। বললেন—টানাপাখাটা মেরামত করিয়ে নে না। টানবার লোক অনেক মিলবে।

—পাখা কোথায় ?

—পাখা কোথায় ? বাবা, পঞ্চাশখানা পাখা চলত সেকালে। ছোট ঘরে একটা বড় ঘরে জোড়া। যে পাখা টানত তার হাত-পা কোনখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত আর দড়ির অপর দিকটা থাকত বিছানায়। পাখা টানতে টানতে বন্ধ হলে সেই দড়িতে হ্যাঁচকা টান পড়ত আর হাঁক উঠত, এ্যাও হারামজাদা! কাত্যায়নী ঠাকরুণের আমলে বিধি ছিল রাত্রে যে পাখাওলা য'বার থামবে, সকালে তাকে জওলাপ্রসাদের কাছে তত দু কিল ক'রে খেতে হবে। জওলা না কি একবারে দেড় সের আটা খেতো, পাওভর ঘিউ খেতো। বরাদ্দ ছিল ভাণ্ডার থেকে। খোরাক আর তার ওপর মাইনে পেতো তিন টাকা। সারারাত ছাদে জেগে পাহারা দিত আর হেঁকে হেঁকে ফিরত—অঃ—হ—হ! অ—হ—হ! হৈ! সারারাত। জওলা থামলেই কাত্যায়নী হাঁকতেন—জওলাপরসাদ, থামলে কেন ? জওলা বলত—তনি তিয়াস পাইল। পানি খাইছিলাম মাঈজী!

থেমে কাত্যায়নীর কথায় ছেদ টেনে বললেন—পাখা ওই নিচের তলার একটা ঘরে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। সবই ভাঙা। তবু দু-চারটে কি ভাল থাকবে না! থাকবে। একটু মেরামত করিয়ে কাপড় লাগিয়ে টাঙালেই নতুন। ছাদে কড়িতে কড়া-টড়া সব লাগানো আছে।

—সে হবে। তুমি কাত্যায়নীর গল্প বল তো!

—ওরে বাবা! সে তো মহাভারতের একটা পর্ব রে! তার ভয়ে শুধু রায়বাড়ী নয় খোদ কর্তা সোমেশ্বর রায় পর্যন্ত টটরস্ত।

* * * *

অসুখে ভুগেছিলাম সুলতা সাতদিন। সাতদিন ধরে গল্প করেছিলেন মেজঠাকুমা কাত্যায়নী দেবীর।

সন্তান হয়ে বাঁচাবার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠে কাত্যায়নী স্বামী থেকে আরম্ভ করে জমাদারনী পর্যন্ত এবং কলকাতা থেকে কীর্তিহাট পর্যন্ত কঠিন শাসনে নিয়ন্ত্রিত করে আশ্চর্য শৃঙ্খলায় বদ্ধ করেছিলেন।

স্বামীর কলকাতা ছেড়ে আসবার সময় ছিল না। কাত্যায়নী নিয়মিত আসতেন কীর্তিহাটে। যে দেবতার দয়ায় তাঁর সন্তান বেঁচেছে, তিনি সুস্থ হয়েছেন, তাঁর প্রতি ভক্তির অন্ত ছিল না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুজো করাতেন, ভোগ শেষ হলে বাড়ী ফিরতেন। তারপর তাঁর রান্না চড়ত। সেই রান্না হ'লে খেতেন। সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুমোতেন। সন্ধ্যের পর উঠে গা ধোওয়া চুল বাঁধা শেষ ক'রে আসতেন ঠাকুরবাড়ী, সেখানে আরতি, শীতলভোগ, শয়নের ব্যবস্থা ক'রে এসে বসতেন কাছারীর ঘরে। ফটক বন্ধ হ'ত। আমলা মুহুরী ছাড়া কেউ থাকত না। তিনি বিষয়ের কথা বলতেন ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্যের সঙ্গে। কোথায় কোন

মামলা হচ্ছে, কোথায় কোন্ সম্পত্তি বিক্রী হচ্ছে, খবর নিয়ে বাড়ী ফিরে জল খেতেন। তখন খাবার করা শুরু হত। লুচি তরকারি মাছ ক্ষীর সব তৈরী হ'ত সেই সময়। মেয়ে বিমলা ছেলে বীরেশ্বর মানুষ হত দুজন সুন্দরী সুশ্রী ভদ্রঘরের মেয়ের হাতে। তিনি শুধু খোঁজ নিতেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়, আর কয়েকবার স্তন দিতেন কোলের সন্তান ছেলেকে। রাত্রে খেতে বসতেন ঘরে, বাইরে বারান্দায় এসে বসত ভাণ্ডারী সরকার চাকর ঝিদের প্রধানরা, আর ছিল একজন তার ভার ছিল গ্রামখবরদারির। ঝি চাকরের সর্দারেরা কোন্ চাকর কোন্ ঝি কি দোষ করেছে তা পেশ করত, তিনি বিচার করে দণ্ড দিতেন। ভাণ্ডারী বলত কি আছে কি নাই। সরকার লিখে নিত, কাত্যায়নী বলতেন, কত কি আসবে। গ্রামখবরদারির লোক গ্রামের খবর বলত। কোথায় কে রায়বাড়ীর নিন্দে করেছে, কে ভাল বলেছে, কার বাড়ীতে অসুখ, কার অভাব—নিবেদন করত। সরকারকে হুকুম দিতেন খোঁজ করতে, অভাবীর ঘরে চাল-ডাল পৌঁছে দিতে; অসুখের জন্যে বাড়ীর বাঁধা বদ্যিকে বলতে। আর নিন্দে-বান্দার কৈফিয়ৎ নিতে তাদের ডাক পড়ত খোদ তাঁর কাছে। যারা প্রশংসা করত, তাদেরও তিনি সম্মান করতেন। নোট করা থাকত; কোন উপলক্ষে—বিয়ে, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন—কিছু তাদের বাড়ী হলেই হয় দামী কাপড়, নয় সোনার কিছু, নয়তো নৌকুতো বলে এক টাকা দু'টাকার জায়গায় দশ টাকা দিতে হুকুম দিত।

এই সময় ভাই, দেশ থেকে 'সতী যাওয়া' উঠিয়ে দেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল দেশের সব মাতব্বরেরা। কেউ রাজা, কেউ জমিদার—সব সায়েবী মতের বড়লোকরা। তার মধ্যে দ্বারকা ঠাকুর ছিলেন মাথার লোক। এই রবি ঠাকুরের ঠাকুরদাদা। তাঁর সঙ্গে সোমেশ্বর রায়ের জানাশোনা দহরম-মহরম ছিল। ওঁরা একবয়সী ছিলেন। তাছাড়া উনি ছিলেন নুনের দেওয়ান। আর সোমেশ্বর রায় কাঁথি তমলুকে হলদীর ধারে তখন নুন তৈরীর 'খালারী' বন্দোবস্ত নিয়ে নুনের কারবার করতেন। সেজন্য ঠাকুরবাবুর কাছে যাওয়া-আসা করতে হত। ঠাকুরবাবু কড়া লোক ছিলেন। আর ইনি খুব হুঁসিয়ার ব্যবসাদার ছিলেন। ওঁর সায়ে সায় দিতেই হত তাঁকে।

কাত্যায়নী ঠাকরুণ তখন কীর্তিহাটে এসে রয়েছেন।

হাসলেন মেজঠাকুমা। বললেন, তখন তো তাঁর স্বামীর শখ মিটেছে। মানে—মেয়ে হয়েছে একটি, ছেলে হয়েছে একটি, আর কি দরকার স্বামীতে? কিন্তু—কথা শেষ না করে বেশ একটু সশব্দে হেসে উঠলেন।

অস্পষ্ট আবছায়ার মত নীল লণ্ঠনের আলোয় সুরেশ্বর খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে শুনছিল। বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছে, একফালি জ্যোৎস্না তেরচা হয়ে একপাল্লা জানালার গায়ে লেগে যেন মেঝের উপর পিছলে পড়েছে। হাসির শব্দে সে মেজঠাকুমার মুখের দিকে তাকালে। বললে, হাসলে কেন?

—হাসলাম তোমাদের গুষ্টির ধারা মনে করে।

—কি সেটা?

—সেটা? সেটা হল—যেটা এখনও তোমার মধ্যে দেখছি নে সেইটে। রায়বাড়ীর

বেটাছেলেরা একলা বিছানায় শুতে পারে না। কাত্যায়নীদেবীর সবশুদ্ধ সাতটা ছেলে। তার মধ্যে শেষের দুটো বেঁচেছে। কাত্যায়নীর শরীর ছিল দুর্বল। তিনি ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে সরে আসতেন তার ওটাও একটা কারণ। স্বামীর জন্যে দুটো সেবাদাসী নিজে দেখে পছন্দ করে বহাল করে দিয়ে এসেছেন। তার ওপর বাঈজী আছে। এখন আর সেবাদাসীদের চাকরী যেত না। মাথা গরম তো সেরে গিয়েছিল।

সুরেশ্বর অতি বিষণ্ণ হাসি হাসলে। বললে, মিথ্যে দোষ তুমি দাও নি ঠাকুমা! বাবার কথা মনে পড়ছে। বাবার মত মানুষ তো আমি কমই দেখেছি। এত পণ্ডিত, এমন ভদ্রলোক! আর মাকে আমাকে কি ভালোই বাসতেন! তিনি—।

—তুই এবার ঘুমুতে চেষ্টা কর, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি। কথা থাক। চোখই বুজে ছিল সুরেশ্বর। মাথায় লঘু চালনায় মেজঠাকুমার হাতখানি ঘুরছিল। সুরেশ্বর বললে, চুলগুলো বরং টানো ঠাকুমা, ওরকম করে দিলে সুড়সুড়ি লাগছে। না, আরও জোরে টানো। টানো না যত জোর আছে তোমার। মা দুর্গার অসুরের চুল টানার মত টানো না!

মেজঠাকুমা বললেন—বোঁটায় কেন খাড়া, না বংশাবলীর ধারা। তোর মেজঠাকুরদার এই রোগ ছিল। একবার চুল টানতে টানতে আমার ঢুল এসেছে, টানতে টানতে হাতেও ব্যথা ধরেছে। উনিও যেন ঘুমিয়েছেন। আমি টানা ছেড়ে এমনি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়েছি। আর চমকে জেগে উঠে দিলেন হাত ছুঁড়ে। লাগল আমার নাকে। রক্ত পড়তে লাগল। তখন বলে, এমনি সুড়সুড়ি দেয়, আমার মনে হল বিছেটিছে কিছু বেড়াচ্ছে চুলের মধ্যে।

হেসে সুরেশ্বর বললে, মেজঠাকুরদাকে তুমি খুবই ভালবাসতে, না মেজদি?

অত্যন্ত প্রসন্ন ধীরকণ্ঠে বললেন মেজঠাকুমা, আমি খুব সুখী হয়েছিলাম সুরেশ্বর। মিথ্যে বলব না ভাই তোর কাছে, প্রথম যখন বিয়ে হয়, তখন বুড়ো বলে দুঃখু হয়েছিল, কেঁদেছিলাম। কিন্তু ক্রেমে ক্রেমে দুঃখ কোথায় গেল জানি নে, মনে হত আমি খুব সুখী। তবে যদি বলিস, সুখ কাকে বলে তুমি জানোই না, তবে তার জবাব আমার নেই। যা পেয়েছি, তাই অঢেল। ওঁর জন্যে লজ্জা অনেক পেতাম। উনি যেসব কাজকর্ম করেছেন, সেসব তো চোখেই দেখছিস। আমি বারণ করলেও শুনতেন না। কাত্যায়নী ঠাকরুণের মত দাপটও আমার ছিল না, তিনি ছিলেন রাজকন্যে। রাজবংশ। আমি পুজুরী বামুনের মেয়ে। সে ক্ষমতাও ছিল না। তবে বেশী লজ্জা পেতাম ওঁর মেজবউ মেজবউ রব তোলা বাতিক দেখে। চোখের আড় হয়েছি তো সঙ্গে সঙ্গে মেজবউ! মেজবউ! তারপর বাড়ীর ছাদ কাঁপিয়ে মে-জ-বউ! এলেই জুড়িয়ে যেতেন, বলতেন, যাও কোথা? চটকদুলালী আমার! এই আছে এই নেই। ফুরুত আর ফুরুত। আমাকে আদর করে একলা পেলে বলতেন, চটকদুলালী। বলতাম, একটা কথাই বলতাম—বলতাম, মরতে। বলতেন, সে আমি মরার পর যেয়ো। না হয় যদি পার সেইদিনই যেয়ো, চিতায় পুড়ে মরো আমার। বলে আক্ষেপ করে বলতেন, কলিতে ধর্ম একপদ! তাও এরা ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে আধখানা থেকে সিকিখানায় এনেছে। নইলে সতী অধর্ম অন্যায় হয়! কাত্যায়নীদেবী যা লিখেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে ফলছে।

অক্ষরে-অক্ষরে !

বললাম না, কাত্যায়নীদেবী ছেলেমেয়ে নিয়ে তখন এখানে, তাঁর কানে এল, সতী ওঠাবার জন্যে দরখাস্ত করছে কলকাতার বড় বড় লোকেরা। তার মধ্যে দ্বারকা ঠাকুর একজন প্রধান। উনি জানতেন নুনের কারবার করেন স্বামী, তিনি দ্বারকানাথের কত অনুগত। তিনিও তা হলে সই দেবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চিঠি লেখালেন স্বামীকে। ভাল লিখতে জানতেন না নিজে, কোনমতে সই দিতে জানতেন মোটা মোটা করে, তিনি প্রেমপত্র লেখাতেন মুহুরীকে দিয়ে। তিনি বলতেন মুহুরী লিখত। তারপর পড়ে শোনাতো। তাতে তিনি সই দিতেন মোটা আঁকাবাঁকা হরফে—কাত্যায়নী।

ওদিকে তখন ভোর হয়ে এসেছে। আমার জ্বরটা যেন ছেড়ে আসছে মনে হল। ঘাম হচ্ছিল। দেশে তখন ম্যালেরিয়া ছিল প্রচুর। ১৯৩৬ সাল। শীত করে জ্বর আসে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

ঠাকুমা বললেন, দেশের সম্পত্তি পেলে তো! এখন ভোগ। সকালে উঠেই ডাক্তারকে বল কুইনিন ইন্‌জেকশন দিয়ে দিক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

* * * *

ভোরে জ্বর ছাড়ল, আবার বিকেলে শীত করে জ্বর এল। কুইনিন মানলে না। সেদিন জ্বর প্রবলতর হল, একশ তিন উঠল টেম্পারেচার।

মেজঠাকুমা ডেকে পাঠালেন বুড়ো ভটচাজ মশাইকে। তিনি নাড়ী দেখে ঠিক বলে দেবেন, ক'দিন হবে জ্বরের ভোগ। নাড়ীতে সর্দি না পিত্তি না বায়ু, না সর্দি পিত্তি, না বাতপিত্তি, কি কি ঠিক বলে দেবেন। ডাক্তারেরা ওসব জানে না, ওরা নাড়ী গোনে ঘড়ি ধরে।

মেজঠাকুমাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না। উনি মেজঠাকুরদার কাছে যা হতে পারেন নি, আমার কাছে তাই হয়েছিলেন, হয়েছিলেন কাত্যায়নী দেবী।

দয়াল ভটচাজের বয়স আশী। সম্পর্কে মেজঠাকুমার শ্বশুর। লাঠি ধরে এলেন। পাকা আমের মত চেহারা, তেমনি টকটকে রঙ। মাথার চুল-ভুরু সব পাকা। দেখে বললেন, সাদা জ্বর মেজ-মা। চিন্তা নেই। দিন-পাঁচেক লাগবে। তবে বাবুর মালোয়ারী ধরলে মনে হচ্ছে গো! দুটো ঠায় উপোস দাও।

বসে রইলেন ভটচাজ কিছুক্ষণ। মেজঠাকুমা বললেন, রায়বাড়ীর গল্প শুনতে ওঁর খুব ঝোঁক। ওঁকে বলুন।

দন্তহীন মুখে হেসে দয়াল ভটচাজ বলেছিলেন, আজ নয় মা, কাল বলব। কাল এসে আবার দেখে যাব। বলব তখন।

আমি কি করব। উপোস দিয়েই পড়ে রইলাম আর ডাক্তারের মিকশ্চার খেলাম। কিন্তু কাল কাটে কি করে? পুরনো খাতা আর কাগজ নিয়ে পড়লাম। পুরনো খাতায় পেলাম কল্যাণীয়া শ্রীমতী বিমলাকুমারী দেবীর শুভপরিণয় উপলক্ষে খরচ। জামাতা আশীর্বাদী! হীরার আংটি একটি, মারফৎ হ্যামিল্টন এণ্ডো কোং, মোকাম কলিকাতা, মূল্য এক হাজার

টাকা! বিস্ময় লাগল। জমা-খরচের খাতাটার সাল ১২৩১ সাল, ইংরিজী ১৮২৪। বিমলা-কুমারীর বয়স সাত, ১৮১৭ সালে তার জন্ম।

কাত্যায়নীরও বিয়ে হয়েছিল সাত বছর বয়সে।

খরচের পাতাতেই চোখ বুলাচ্ছিলাম। সে এলাহি কাণ্ড। পরিশেষে একটা খরচের ফর্দ পেলাম। একসঙ্গে সব হিসেব। খরচ যোগ করে দাঁড়িয়েছে পনের হাজার টাকায়!

তারপরের দিন মেজঠাকুমা ঠাকুরবাড়ী গিছলেন; সেখান থেকে ফিরবার পথে পুরনো বাড়ী হয়ে ফিরলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন রেশমী কাপড়ে বাঁধা একটা কাগজের পুলিন্দা। রেশমী কাপড়-খানা এককালে সুদৃশ্য এবং বেশ মূল্যবান ছিল। বললেন, এটা তাঁর বাক্সের মধ্যে রাখা ছিল রে। দেখ এতে কি আছে।

দেখছিলাম পাল্টে পাল্টে। দেখলাম সবই প্রায় চিঠি। চিঠিগুলি রত্নেশ্বর রায়ের লেখা, লিখেছিলেন অধিকাংশই শিবেশ্বরকে। কয়েকখানা দেবেশ্বর রায়কে লেখাও আছে। তিরস্কারপূর্ণ চিঠি। তার একটাতে লেখা আছে "প্রয়োজন হইলে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিতেও পশ্চাৎপদ হইব না। তুমি লিখিয়াছ দেবত্র টিকিবে না আইনে। দেখা যাইবে কি হয়। মোট কথা তোমার অহিন্দু আচরণ আমি সহ্য করিব না ইহা জ্ঞাত হইবে।" শেষে কতকগুলি কথা আছে, যেগুলিকে বেদবাক্যের মত বলা যায়।

আমি ভাবছিলাম। এমন সময় জাঠতুতো ভাই প্রণবেশ্বর, খুড়তুতো ভাই সুখেশ্বর কাকার ছেলে কল্যাণেশ্বর এল আমাকে দেখতে। বসলে, বললে—অসুখ ধরালে তো!

বললাম, অসুখ নয়। মানে ওই মেয়েটির অসুখ আমাকে ধরে নি।

কল্যাণেশ্বর ছড়ানো কাগজগুলো দেখে বললে, ওগুলো কি?

—চিঠি। পুরনো চিঠি সব। রায়বাহাদুরের লেখা তাঁর ছেলেদেরকে।

—ও কোথায় পেলে?

—বাড়ীতেই। আবার কোথায়!

চুপ করে রইল কল্যাণেশ্বর। প্রাণবেশ্বরদা বললে, দেখ, কল্যাণেশ্বর গার্লস স্কুলের ঠিকে নিয়েছে। ঘর তৈরী হয়ে গেছে, জানালা-দরজা লাগাতে বাকি আছে। এখন ওটা থাকবার জন্য দিতে হবে সেটেলমেন্ট অফিসারকে তুমি বলেছ। কল্যাণ কাজ শেষ করতে গিয়ে থমকাচ্ছে। কারণ, কাল মেজঠাকুমা সন্ধ্যের সময় বললেন, কল্যাণেশ্বর দুধপুকুরে আমগাছ—কি গিন্নীগাছ না কি নাম—সেটা কাটিয়েছে। ও সেটা কাটিয়েছে ঠিক। কিন্তু সে পোড়া কাঠের জন্যে। ওদিকে ধনেশ্বর কাকা কাল রাত্রে যাচ্ছেতাই করেছেন। যত গাল তোমাকে মেজঠাকুমাকে দিয়েছেন, তত কল্যাণেশ্বরকে। সে যা হয় হবে। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—আমতক্কার দরজা-জানালা লাগালে বিলের সময় তার টাকা দেব না—এ বলবে না তো?

কল্যাণেশ্বর বললে, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি সুরেশ্বরদা, উনি যাই করুন তোমার বিপক্ষে, তাতে আমি আর থাকব না।

একটু বিষণ্নহাসি আমার মুখে দেখা দিয়েছিল। লজ্জা হয়েছিল। নিঃস্ব রায়সন্তানদের চেহারাটা যেন সাসপেকটেড টি বি পেশেন্টদের মত সকরুণ হয়ে উঠেছে অবিকল।

স্তাবকতায় বাধে না। সামান্য স্বার্থের জন্যও স্তাবকতা করতে পারে। এরা আজ চুরি করে গাছ কাটে। আজ ঝগড়া করে কাল এসে গড়িয়ে পড়ে সামান্য স্বার্থের জন্য। নারীর কাছে এদের দাম হয়েছে বিষাক্ত পোকার মত। তারা ঘেন্নাই করে, ভয় পর্যন্ত করে না সাপ কি বাঘ বলে। বললাম, না, ও-বিষয়ে আমি কোন আপত্তি তুলব না। তুমি ঘরখানার দরজা-জানালা লাগিয়ে দাও। মিস্টার ঘোষ প্রায় নির্বাসিত বিরহী যক্ষ হয়ে উঠেছেন—ভয় হচ্ছে সেটেলমেণ্টের পরচা থেকে সেগুলো পরচা-দূত হয়ে না দাঁড়ায়। ক্রোধবশে এর নাম কেটে ওর নাম না বসিয়ে দেন।

খুব হেসে উঠল কল্যাণেশ্বর, অযথা উচ্চহাসি। তারপর বললে, ওই চিঠিগুলো থেকে কি খুঁজছ বল দেখি?

—খুঁজছি কিছু, ঠিক বিষয় নয়।

—তবে?

—রায়বাড়ীর ইতিহাস জানতে চাচ্ছি।

—তা কি চিঠিপত্রে পাবে?

—তাই পাব।

কল্যাণেশ্বর বললে, তাহলে তোমাকে সন্ধান দি সুরেশ্বরদা। দেখগে ঠাকুরের গহনা থাকত যে আয়রনচেস্টে, সেটার মধ্যে অনেক চিঠি আছে। সেসব রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় রেখে দিয়েছিলেন। মিথ্যে বলব না, দুখানা ডায়রীর মত ছিল, একখানা রায়বাহাদুরের, একখানা বীরেশ্বর রায়ের, আমার বাবা তো দাম বুঝতেন, তিনি রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন খুন হলেন, তখন যে সে কে নিলে? কে নিলে কেন, নিলে বেজোদা নিয়েছে। না হলে হারিয়েছে।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, খুঁজে দেখ কল্যাণ, আমাকে দিলে আমি এক হাজার টাকা পর্যন্ত দেব।

অবাক হয়ে গেল কল্যাণেশ্বর।

প্রণবেশ্বর বললে, তুমি ঠিক কি খুঁজছ বলবে?

বললাম, বিশ্বাস করবে?

—বল।

—প্রথম নিজের বংশের কথা কে না জানতে চায় বল! দ্বিতীয়, রক্তের মধ্যে একটা কি আছে। সেটা কি জানতে চাই। বিষয় চিরকালের নয় বড়দা, সে সবাই জানে। আমি খুঁজছি আমার বাবার কেন এমন হল? আরও অনেকের ওই পাপ দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের কথাও আমার অজানা নয়। হয়তো বলবে এটা মানুষের পাপ। হয়তো তাই। কিন্তু এ-বংশের পুণ্য তো কম নয়! তবু কি করে পাপ কোথা থেকে এল? একে আমি বড় ভয় পাই বড়দা।—কেন পাই? এই আর কি—পাগলামি বলতে পার।

হাতটা উল্টে দিলে প্রণবেশ্বর। অর্থাৎ কিছুই বুঝলাম না।

কল্যাণেশ্বর বললে, ঠাকুরের সিন্দুক খুলে দেখ, অনেক কাগজ-চিঠিপত্রের গাদা পাবে।

মেজঠাকুমা এসে দাঁড়ালেন। চাবি তো তোকে দিয়েছি সুরেশ্বর। তুই সিন্দুকটা খুলে আজ দেখ। কল্যাণকে হাজার টাকার কথা যখন বলেছিস, তখন এখুনি নিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে বের করে আন, নইলে আজ রাতেই কেউ সিন্দুকটাকে ভেঙে ফেলবে।

*           *           *

সেই কাগজের মধ্যে উপকরণ পেলাম। খানকতক মূল্যবান চিঠি। কাত্যায়নী দেবী লিখছেন স্বামীকে—শতকোটি প্রণামান্তর স্বামীচরণে নিবেদনমিদং, স্বামীন, তদীয় পত্র প্রাপ্ত হইয়া অধিনী দুশ্চিন্তায় আশঙ্কায় জীবনমৃতা হইয়া কালযাপন করিতেছে। আপনি কি এমন দুঃস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছেন যে, নিশাকালে ভয় প্রাপ্ত হইয়া বু-বু করিয়া উঠিয়াছেন? কিন্তু আপনার কাছে কি রাত্রিকালে কেহ শয়ন করে না? অধিনী তো ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিল, সে ব্যবস্থা কি বলবৎ নাই? যদি বলবৎ না থাকে, তবে আপনি আপনার পছন্দমত লোক নিযুক্ত করিয়া কাছে লোক রাখিবেন। কদাচ একাকী রাত্রে শয়ন করিবেন না। তাহাতে অধিনী কোন আপত্য করিবে না। এখানে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন বলিয়া দেবতার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করিলাম। ৺মা চরণে স্বর্ণ-বিল্বপত্র, শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর জিউর নিকট স্বর্ণতুলসী অর্পণের ব্যবস্থা হইল। অত্রস্থ কুশল। শ্রীমতী বিমলা এবং শ্রীমান বীরেশ্বরের সর্বাঙ্গীণ কুশল। বীরেশ্বর এমন দুর্দান্ত ও বলশালী হইয়াছে যে, তাহাকে আমি ক্রোড়ে লইতে ভয় পাই। আমার প্রেমচন্দনসিক্ত প্রণাম গ্রহণ করিয়া অধিনীকে কৃতার্থ করিবেন। কারণ কম করিবেন।—ইতি তদীয় শ্রীচরণাশ্রিতা কাত্যায়নী দেবী।

মোটা হরফে লেখা কাত্যায়নী। চিঠি লিখেছে কোন পাকা-হাত মুহুরী। তারপর পেলাম সোমেশ্বরের পত্র।

প্রাণাধিকা প্রিয়তমাসু—

শ্রীমতী কাত্যায়নী আমার প্রেম-আশীর্বাদ জানিবা। তোমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় অবগত হইলাম, কিন্তু কোন আশ্বাস বা কোন ভরসা আজও পাই নাই। প্রায় নিশাযোগে দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি। কাছে লোক থাকে। কিন্তু সে কি করিতে পারে? সামান্য মানবকুলের কোন্ ক্ষমতা যে দেবরোষের প্রশমন করিবে? প্রায়শঃই অর্থাৎ দুই-এক দিবস অন্তর স্বপ্ন দেখিতেছি—যেন রাজরাজেশ্বর প্রভু জীউ বালকের মূর্তি ধরিয়া আমাকে শাসন করিতেছেন, আর তান্ত্রিক শ্যামাকান্ত দূরে রক্ত চক্ষুতে তাকাইয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছে।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের একখানা চিঠি আমি পেয়েছি সুলতা। সুন্দর চিঠি। যেমন হাতের লেখা, তেমনি সেকালের কথার গাঁথুনির নমুনা। লিখেছেন সোমেশ্বর রায়ের পত্রের উত্তরে। কারণ তার উল্লেখ রয়েছে।

লিখেছেন—অশেষ কল্যাণ ও তৎসহ সম্মানপূর্বক নিবেদনমেতৎ আপনার লিপিখানি পাইয়া তত্র বাটীর সমাচার অবগত হইয়া চিন্তান্বিত হইয়াছি। আমি তো অত্র ধামে থাকিয়া মহামহিমময়ী শ্রীশ্রীকালিকা দেব্যা মাতাঠাকুরাণীর এবং মহামহিম পরম দয়াল শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর জিউ প্রভুঠাকুরের পূজা-অর্চনা এবং সেবাদি যথাসাধ্য করিতেছি। কোন ত্রুটি বা সেবা-

অপরাধ হইতে দিই নাই। নিয়মিত মাতার চরণে ১০৮ বিল্বপত্র এবং প্রভুজিউয়ের মস্তকে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদত্ত হইতেছে। তত্রাচ এরূপ দুঃস্বপ্ন আপনি দেখিতেছেন কি কারণ তাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। এবং সমস্ত আনুপূর্বিক বিচার করিয়া আপনার ন্যায় ধর্মপরায়ণ ভক্তিভাজনের অপরাধ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আপনার দুঃস্বপ্ন দর্শনকেও উড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। উপর্যুপরি দুঃস্বপ্ন দর্শন কিমতে উপেক্ষা করিতে পারা যায়। তবে এখানকার সেবা ইত্যাদিতে ত্রুটি হয় নাই এবং হইবেক না জানিবেন। তবে হিতৈষী হিসেবে যদি মদীয় চিন্তায় যাহা মনে হইতেছে তাহা নিবেদন করি, তবে আপনি দুঃস্থ মনে করিবেন না। আপনার অপরাধ ওই শ্যামাকান্তের অপঘাতমৃত্যুতে কিছু অর্শিয়া থাকিবেক বলিয়া মনে লইতেছে। সম্ভবতঃ জলে ডুবিয়া আপনি নিজে বাঁচিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে পারেন নাই। হইয়া থাকিলে এইখানে অপরাধ হইয়া থাকিবেক। অন্যথায় তাঁহাকেই বা স্বপ্নে দেখিবেন কেন? আমার বিবেচনায় আপনি যদি ৺শ্যামাকান্তের বংশাবলীকে তুষ্ট করেন, তবে অবশ্যই তিনি তুষ্ট হবেন। শ্যামাকান্তের এক শ্বশুরালয় শ্যামনগর। আমার কন্যারও বিবাহ শ্যামনগরে ভট্টাচার্য বংশে দিবার স্থির করিতেছি। তাহার সপ্তমবর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিতেছে। সেই সূত্রে সেখানে গিয়া জানিলাম, শ্যামাকান্তের এক পুত্র আছে। পুত্রটি পিতৃমাতৃহীন। মাতামহী লালনপালন করিতেছেন। অবস্থা ভাল নহে। তাহাকে কিছু অর্থ, কিছু সম্পত্তি দান করিলে মনে হয় ইহার প্রতিকার হইতে পারিবেক। অধিক কি আর, নিবেদনমিতি, পুঃ—শ্রীযুক্তা গিন্নীঠাকুরাণীর সহিত পরামর্শ করিয়াই ইহা লিখিলাম। তিনি সাতিশয় বিব্রত এবং ভীত হইয়াছেন।

সোমেশ্বর রায় এই পত্র পেয়ে পত্র উপেক্ষা করলেন না, নিজে স্বয়ং এসে হাজির হলেন কীর্তিহাট। এবং পুরোহিত রামব্রহ্মকে এবং নায়েব গিরীন্দ্র আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন শ্যামনগর। যাতায়াতের জন্য বজরা ছিল নিজস্ব। দুখানা বজরার সঙ্গে পাহারাদারি ছিপে লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। সঙ্গে অর্থ নিয়েছিলেন। দিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে আসবেন। কাঁসাই ধ'রে হলদী হয়ে গঙ্গার উজান বেয়ে এসে উঠলেন শ্যামনগরের ঘাটে। কোথায় কার বাড়ীতে আতিথ্য নেবেন? শ্যামনগর ব্রাহ্মণ সদগোপ-প্রধান গ্রাম। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মত্র ভোগ করেন, যাজন-যাজন গুরুগিরি করেন। সদগোপেরা চাষবাস ক'রে খায়। এদের কারুর খড়ের চালের বাড়ীতে সোমেশ্বর রায় স্বচ্ছন্দবোধ করতে পারবেন না। খড়ের চাল মাটির দেওয়ালের ঘরে শুলে মনে হত ঘরে আগুন লাগবে, রাত্রে কোন না-দেখা গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে কামড়াবে, এমন কি ভূমিকম্প হয়ে ঘর ভেঙে পড়বার আতঙ্কও তাঁর ছিল। স্থির করলেন বজরাতেই তিনি থাকবেন। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন তাঁর ভাবী বৈবাহিককে খবর দিতেই গ্রাম ভেঙে এসে দাঁড়াল। কীর্তিহাটের রায়বাবু এসেছেন। তাঁর সাজানো বজরা, সেই বজরা দেখতেই তাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না।

ভট্টাচার্যেরা এসে সসম্মানে তাঁকে আহ্বান করলেন, বললেন—মহাভাগ্য আমাদের! আপনি পদার্পণ করেছেন।

সোমেশ্বর তাঁদের কাছেই খোঁজ নিলেন—শ্যামাকান্ত তান্ত্রিকের বিগত বিবরণ এবং তাঁর

ছেলের বর্তমান অবস্থার সংবাদ।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের ভাবী বৈবাহিক বললেন—শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কাশ্যপ গোত্রীয় কুলীন সন্তান বাবু, মূলবাড়ী ওদের যশোহর জেলায়। শ্যামাকান্তের বাপ কাশীনাথ অনেক বিবাহ করেছিলেন। এই হুগলী জেলাতেই সাত আটটি বিবাহ ছিল। শুদ্ধাচারীর বংশ। সাধনা-টাধনার ঝোঁক তাঁরও ছিল। শ্যামাকান্তকে নিয়ে তিনি ঘুরতেন। ওইটিই তাঁর ঘরণী স্ত্রীর সন্তান। গান তিনিও গাইতেন। শ্যামাকান্তকে বলতে গেলে তিনি মূলধন দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পর শ্যামাকান্তও বাপের বৃত্তি নিয়েছিলেন। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। গানবাজনায় যাকে বলে ওস্তাদ। ওস্তাদও বটে সাধকও বটে।

আমাদের এখানে, আমার জ্ঞাতিভাই অবশ্য, বয়সে আমার থেকে অনেক বড়, বলতে গেলে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ছিলেন—পদ্মনাভ ভট্টাচার্য। পণ্ডিত লোক। টোল ছিল বড়। নাম ছিল। নিজে পণ্ডিতই শুধু ছিলেন না, ক্রিয়াকর্ম, বিশেষ করে তান্ত্রিক পূজা, খুব ভাল জানতেন। তন্ত্রমতে স্বস্ত্যয়নে খুব খ্যাতি ছিল। পঞ্চপর্বে জপতপ-ক্রিয়াও করতেন। শ্যামাকান্ত কোত্থেকে তাঁর খোঁজ পেয়ে তার তানপুরা ঘাড়ে এসে হাজির হল। তখন নবীন যৌবন বলতে গেলে। আমরাও তখন নবীন। কিছু কম বয়স। পদ্মনাভ ভটচাজকে জড়িয়ে ধরলেন —আমাকে পুরশ্চরণ করাতে হবে। দীক্ষা আমার বাবার কাছে নিয়েছি। পুরশ্চরণ করা হয় নি। সেটি করিয়ে পূর্ণাভিষেকে দীক্ষিত করতে হবে। রূপবান চেহারা বাবু, তার উপর সুন্দর কণ্ঠ, তারা তারা বলে গান গাইতে গাইতে বিভোর হয়ে যেতো; পদ্মনাভ-দাদা ফেরাতে পারলেন না। বললেন—বেশ থাকো। কিন্তু তন্ত্র-শাস্ত্র পড়েছ? সেটা কিছু প'ড়ে নাও। থাকবে আমার এখানে পুত্রের মত। এই থাকতে থাকতে মায়া জন্মাল। নিজের একটি কন্যা ছিল। বললেন—আমার মেয়েকে বিয়ে কর। তুমি শিবের মত পাত্র, আমার কন্যাও সুলক্ষণা। গৃহস্থ হয়ে ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে সাধনা করবে। আমি বলছি, যা চাও তাই পাবে। আমার টোল আমার যজমান—ব্রহ্মত্র রয়েছে, নিশ্চিন্ত সাধনা করতে পারবে। তাই হয়ে গেল। তিনি মানে শ্যামাকান্ত একটা পুরুষ ছিলেন। গানে বাজনায় হাসিতে একেবারে আমাদিগে মাতিয়ে রাখতেন। মধ্যে মধ্যে খ্যাপার মত হাসতেন।

সোমেশ্বর বললেন—সে তো আমি জানি—দেখেছি।

—হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু প্রথম বয়সে দেখেন নি। মানে কুড়ি বাইশ বছরে। তখন বলতেন—জান হে শিবানন্দ, কালী এলে কি বলব জান? আমি বলতাম—কি? বলতেন—বলব—রাজা কর্ আমাকে, রাজা করে দে। হা হা করে খানিকটা হেসে আবার বলতেন —তোমাকে মন্ত্রী করব হে। আর বিয়ে করব একশো আটটা। তোমার ভাইঝির সব দাসী ক'রে দোব।

মধ্যে মধ্যে চলেও যেতেন তানপুরো ঘাড়ে ক'রে। কোথাও ওস্তাদ এসেছে শুনলে কি কোথাও কোন সাধুটাধু এসেছে শুনলে আর তাকে রাখে কে?

পদ্মনাভ শেষটায় আপশোষ করতেন, ওকে বাঁধতে গিয়ে ভুল করেছি। কন্যেটার কপালে কষ্ট আছে। ইতিমধ্যে তিনি হঠাৎ জরবিকারে মারা গেলেন। শ্যামাকান্তকে বলে গেলেন

—দেখ, ঘরে বসে সাধনা কর। এমন ক'রে ছুটো না। তখন আমার ভাইঝি মানে পদ্মনাভ-দাদার কন্যা বড় হয়েছে। কিছুদিন এই সময় সুস্থ হয়ে ছিলেন তিনি। তারপর এই সন্তান হল। সন্তানটি বছরখানেকের যখন তখন একদিন উধাও হলেন। শুনেছেন এক সাধু এসেছে, খুব বড় সাধু। দেখতে গিয়ে বাস মানুষ সেই গেল আর ফিরল না। এর মধ্যে কাণ্ড হল, ওঁর স্ত্রী আমার ভাইঝি মারা গেল। তারপর থেকে আমার বউদিদি, পদ্মনাভ-দাদার স্ত্রী, ওই নাতিকে নিয়ে মানুষ করছেন আর কাঁদছেন। দেখবার শুনবার মানুষ নাই। জমি জেরাত, মালের জোত নিলেম করালে জমিদার, মানে সরকার বাবুরা। এখন ব্রহ্মত্রটুকু আছে। বাড়ীতে নারায়ণশিলা আছে। ওই পালেরা খুব অনুগত ওদের। ও বাড়ীর মহাভক্ত। ভাগে চাষ করে ষোলআনার উপরেও কিছু এনে দেয়। তাতেই চলে। বালকটিও অত্যন্ত সুশীল মেধাবী, নবম বৎসরে উপনয়ন হয়েছে। ভক্তিমান, সুন্দর কান্তি। আমি তাকে শালগ্রাম সেবাপূজা শিখিয়ে দিয়েছি। এখন পূজাও সেই করে। এই কোনরকমে চলছে আর কি! তা আপনি যখন এসেছেন তখন তার আর চিন্তা কি? এবার তার বৃহস্পতির দশা হল। শুধু একটা আপশোস হচ্ছে তিনি জলে ডুবলেন, সে সময় যদি একটা সংবাদ পেতাম তবে শ্রাদ্ধটা করাতাম।

সোমেশ্বর ঘাড় হেঁট ক'রে রইলেন, তারপর বললেন—ওটা আমার অপরাধ হয়েছে। নিশ্চয় অপরাধ হয়েছে। তবে কি জানেন। আমার মনে হয়েছিল সংসারাশ্রম ত্যাগী সন্ন্যাসী তো। তাঁর আবার শ্রাদ্ধ কি? তবে আমি সন্ন্যাসীর পারলৌকিক যা তা করেছিলাম।

শিবানন্দ বলেছিলেন—তা করবেন বইকি। নিশ্চয়, তাতে ত্রুটি হবে কেন? রাজাতুল্য ব্যক্তি। গৃহে দেবতা অবস্থান করছেন। না, তা আমরা বলি নি। তবে ছেলেকে দিয়ে কিছু করানো যেত এই আর কি!

—এইবার করুন। শাস্ত্রে নিশ্চয় বিধি আছে। পতিত শ্রাদ্ধ উদ্ধার তো হয়! চলুন আমি একবার ছেলেটিকে দেখে আসি।

—আপনি কেন যাবেন। সে আসবে।

—না—না। তার মাতামহীকে প্রণাম ক'রে আসব। দেখে আসব ঘরদোর। পদব্রজে শ্যামনগরের ধুলো পায়ে মেখে সোমেশ্বর রায় এসে উঠেছিলেন পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের ভাঙা ঘরে। ঘর তখন ভাঙাই বটে। নিদারুণ অর্থকষ্টের লক্ষণ গৃহস্থের গৃহস্থালীর সর্বাঙ্গে ভগ্নদেহ রোগীর দেহের মত ফুটে উঠেছে।

সেই ভাঙা দাওয়ায় খুঁটি ধরে একটি সুকুমার কিশোর দাঁড়িয়েছিল বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে। পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মাতামহী, মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন।

সোমেশ্বর প্রথম দৃষ্টিতেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বাঁশীর মত নাক, আয়তটানা চোখ, গৌরবর্ণ রঙ। দেখতে শ্যামাকান্তের মতই। তাঁর দাড়ি গোঁফ চুল ছিল বলে সাদৃশ্যটা অবিকল তা বোঝা যায় না তবে বললে সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে হ্যাঁ, এই তো তার ছেলেই বটে।

মূলতা, এই টিকলো নাক আর টানা আয়ত চোখ এটা রায়বংশের নয়। এটা শ্যামাকান্ত

চট্টোপাধ্যায়ের বংশের। রায়বংশও সুপুরুষ বংশ। কিন্তু ওই ছবির দিকে চেয়ে দেখ—কুড়ারাম ভট্টাচার্যের, সোমেশ্বর রায়ের, বীরেশ্বর রায়ের রঙ গৌরবর্ণ কিন্তু নাকের ডগাটা মোটা, চোখ বড় হলেও টানা নয়, তার মধ্যে উগ্রতা আছে। কিন্তু রত্নেশ্বর রায়ের চোখ, তারপর থেকে আমাদের চোখ টানা, তাতে একটা মাদকতা আছে।

আঃ, যদি তুমি আমাদের বাড়ীর কোন মেয়েকে দেখতে সুলতা তবে বুঝতে। অর্চনা, জগদীশ্বর-কাকার মেয়ে তার দৃষ্টি যেন মদির!

ঘড়িতে ঢং শব্দে আধঘণ্টা বাজল।

সুরেশ্বর বললে—ঘড়ির দিকে তাকিয়ো না। আমাদের ঘড়ির কাঁটা একশো পনের কুড়ি বছর পিছিয়ে গেছে।

যা বলছিলাম।

সোমেশ্বর যা করলেন তা যে করবেন তা নিজেও বোধ হয় ভাবেন নি। ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলেন। কষ্ট তাঁর হয়নি। বত্রিশ তেত্রিশ বছর বয়স, সবল রায়বংশের পুরুষ, অনায়াসে এগার বছরের বিমলাকান্তকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—তোমার নাম কি বাবা।

—আমার নাম শ্রীবিমলাকান্ত দেবশর্মা চট্টোপাধ্যায়।

—কি নাম? বিমলাকান্ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

ছেলেটিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললেন—হে ভগবান। একেই বলে প্রাক্তন ভগবদ্ নির্দেশ। ন্যায়রত্নমশাই—

—আজ্ঞে!

—শ্যামাকান্ত যখন যাগযজ্ঞ করেন আমার সন্তানের জন্য তখন যজ্ঞশেষে বলেছিলেন—কন্যা পুত্র যাই হোক নাম রেখো ব দিয়ে। আমার মেয়ের নাম বিমলা। ছেলের নাম বীরেশ্বর। তিনি ব দিয়ে নাম রাখতে বলেছিলেন। বিমলা রাখতে তো বলেন নি। সেটা তো আমি রেখেছি। তা—হলে?

রামব্রহ্ম বলেছিলেন—হ্যাঁ, যোগাযোগটা অদ্ভুত বটে।

—অদ্ভুত নয়, বিধিনির্দিষ্ট। বলেই হাতজোড় করে পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের স্ত্রীকে বলেছিলেন—মা, ভিক্ষা চাইছি। আমার কন্যা বিমলার জন্য আপনার বিমলাকান্তকে যে ভিক্ষা চাইছি মা। আমার মা এক কন্যা এক পুত্র সন্তান, আর হবে না। বিমলাকান্তের সঙ্গে বিমলার বিবাহ দিয়ে আমি সম্পত্তি দু অংশে ভাগ করে দোব। ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখাব। শ্যামাকান্ত আমার জন্য যজ্ঞ করে পুত্র কন্যা বাঁচিয়েছেন, আমার বাড়ীতে গুরুর মত পুরোহিতের কাজ করেছেন। মা, তাঁর আমলে আমার বৃদ্ধির সীমা নাই। একসঙ্গে নৌকোডুবিতে ডুবলাম, আমি বাঁচাতে চেষ্টাও করি নি মা, নিজে সাঁতার কেটে কূলে এসেছি। ভাবি নি তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে মরলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ হত। এ আমার

মহাপাপ হয়েছে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব মা, আমি বিমলাকান্তকে জামাই করে।

প্রৌঢ়া মাতামহী বলেছিলেন—ঘোমটার ভিতর থেকে ফিসফিস করে—সে ঘোমটার মুখে কান না-পাতলে শোনা যায় না। সোমেশ্বর বলেছিলেন—বিমলাকান্তের দিদিমা আপনি, আমি তার শ্বশুর হব সুতরাং আমি তো আপনার ছেলে মা। আমার সামনে কথা বলতে দোষ কি।

ঘোমটা-ঢাকা মাথাখানি ঘন ঘন নড়ে উঠেছিল—না। অর্থাৎ তা পারবেন না।

শিবানন্দ হেঁট হয়ে ঘোমটার গায়ে কান পেতে বলেছিল—তবে আমাকে বল আমি বলছি। তখন শিবানন্দকে বলেছিলেন—ওরে বাপরে, এর উপর আমি কি বলব? কি আছে বলবার। আমি তো বাঁচলাম। উনি আমাকে বাঁচালেন। কত্তা স্বপনে বলেন—গিন্নী এস। তা আমি বলি এখন আমি পারব না। এইবার আমি নিশ্চিন্ত। ওকে দিলাম। তবে দুটি কথা। আমি যতদিন আছি ওকে নিয়ে যাবেন না।

সোমেশ্বর বলেছিলেন—নারায়ণ, নারায়ণ। কালী, কালী। তাই পারি? তবে আপনি চলুন—

—ছি—ছি—ছি!

—কেন তীর্থস্থানে কালীঘাটে! আলাদা থাকবেন।

—তা আমার ঠাকুরসেবার কি হবে?

—হবে। যেমন চলছে তেমনি চলবে। পূজো ভোগ সবের ব্যবস্থা বিমলাকান্তের বউ যে হবে তার কাজ, তার ব্যবস্থা করবে সে!

—ভিটেটি থাকবে তো?

—নিশ্চয়, বিমলাকান্ত আমার জামাই হবে, আমার মেয়ে এই ভিটের বউ হবে—এ ভিটে না-থাকলে যে তাদের অকল্যাণ হবে।

—বেশ বেশ বাবা বেশ! যা করবে তুমি তাই হবে।

প্রণাম করে চলে এসেছিলেন সোমেশ্বর বজরায়। বাড়ী থেকে বের হতেই বৃদ্ধার কান্না শুনতে পেয়েছিলেন, ওরে মা রে—ওরে বাবা শ্যামাকান্ত রে, কোথায় তোরা গেলি রে মানিক, ওরে তোদের বিমলাকান্ত রাজা হল রে, একবার এসে দেখে যা রে।

চোখের জল মুছেছিলেন সোমেশ্বর। এবং তিনদিনে শ্যামাকান্তের শ্রাদ্ধ করিয়ে শ্রাদ্ধান্তে বিমলাকান্তকে আশীর্বাদ করেছিলেন। একজন চাকর একজন কর্মচারী রেখে বাড়ী মেরামত করবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। চাকর মানে সর্বক্ষণ-স্থায়ী চাকর নয়, ভগবান পালই ওদের তিন পুরুষের জোতদার, ভাগে জমি করে," তাকে ডেকে আনিয়ে মাসে দেড় টাকা মাইনের ব্যবস্থা করেছিলেন। একজন বিধবা ব্রাহ্মণকন্যাকে বাড়ীর রান্নার জন্য দেড় টাকা বেতনে নিযুক্ত করেছিলেন।

বিষয়-সম্পত্তি কি আছে কি গেছে তাও খোঁজ নিলেন। খাজনার জোত সবই গেছে। ব্রহ্মত্র আছে সামান্য। সোমেশ্বর গিরীন্দ্র আচার্যকে পাঠালেন জমিদারবাড়ী। পত্তনীদার সরকারবাবুদের বাড়ী সন্নিকটেই, শ্যামনগরের একটা মাঠ পার হয়ে রাধানগর। শ্যামনগর

রাধানগর দুটি মৌজা মিলিয়ে লাট যুগলপুর। এর জমিদারেরা প্রাচীন, পরগনা গোকুলশাহী, নবাবী আমলের দানেশমন্দ খেতাবধারী রাজার এলাকা! কিন্তু দশশালা বন্দোবস্তের পর 'সানসেট ল'য়ের আমলে পরগনা রাখতে পারেন নি। কিছু কিছু মৌজা লট অষ্টম আইন হতেই পত্তনী বন্দোবস্ত করেছেন। যুগলপুর লাট বন্দোবস্ত নিয়েছে এখানকার সরকাররা। জাতিতে কায়স্থ। পেশা পূর্বে ছিল ওই পরগনাতেই তহশীলদারী। এখন পত্তনী স্বত্বে জমিদার। পাকা হিসেব, গোমস্তা থেকে জমিদার। এবং মহাজনীও করেন।

বলতে গেলে সুলতা, আমার পূর্বপুরুষ কুড়ারামেরই জাতের লোক তবু তফাৎ একটু আছে। ভারত অধীশ্বর যদি সিংহ হয় তবে ভূস্বামী বৃদ্ধ বাঘের জাত। কুড়ারাম ছিলেন চিতা। আর এরা নেকড়ে বলা যায়। যারা কোল থেকে ঘুমন্ত ছেলে তুলে নিয়ে গেলে জানতে পারা যায় না। আমি জমিদারবংশের ছেলে—আমার কাঁধের উপর ভারীদের মত দুদিকে মস্ত ভারী দুটো ভার। তার একটাতে ভাল কাজের বোঝা আছে, অন্যটায় হয়তো তার থেকেও ভারী মন্দ কাজের বোঝা আছে। সেই আমিই বলছি এদের মাথায় একটা মোট ছিল, সেটা মন্দ কাজের মোট। বগলে ভিক্ষের ঝুলির মত একটা ঝোলা আছে তাতে ভাল কিছু নিশ্চয়ই থাকবে। না থাকা হতেই পারে না।

ঝুলিটার মধ্যে যা ছিল সেটা হল দেব-দ্বিজে মৌখিক ভক্তি। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করার পুণ্য, কপালে তিলক কাটতেন—তার পুণ্য। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণভোজন করাতেন এবং উচ্ছিষ্ট পাতা-গুলি বিতরণ করতেন ব্রাত্যদের। কীর্তন গান শুনে কাঁদতেন। এগুলি কৃত্রিম ছিল তা বলছি না। অকৃত্রিমই ছিল।

অন্যদিকে অর্থাৎ মোটটায় ছিল অনেক কিছু। সেগুলো মোটা ভারী কিছু ছিল না। খুন-খারাবী দাঙ্গা ঘর জ্বালানো এসব ছিল না। কিন্তু হিসেব যোগটি ছিল জোঁকের মত। তাই-ব কেন ওই নেকড়ের মত।

কোন ব্রাহ্মণ প্রজা এলে তাঁর পদধূলি নিয়ে প্রণাম করত, যত্ন করে খাওয়াতো। তারপর সুদ মাপের সময় হাতজোড় করে বলত—ওইটি পারব না। টাকা ধার করতে এলে সম্পত্তির খোঁজ-খবর নিয়ে 'কটে' টাকা দিত। কট মানে ব্যারিস্টারের বাড়ীর মেয়ে তোমার বোঝা উচিত। তবে কট আর নেই। কট ছিল মেয়াদী বন্ধকী। দশ বছর, পাঁচ বছর সময় নির্দিষ্ট থাকত, তার মধ্যে টাকা শোধ দিতে হবে। না দিলে মেয়াদ-অন্তে ওই ধারের দলিলই বিক্রী দলিল হয়ে যাবে।

এই সরকারেরাই বিচিত্র কৌশলে বিমলাকান্তের মাতামহের জোতগুলি খাস করে নিয়েছে! সরকারদের আয় বিশেষ ছিল না। হাজার চারেক টাকা জোত। তবে প্রজার বাড়ীর চালের লাউ-কুমড়ো, শাক-আড়ার শাক, গরুর দুধ, পুকুরের মাছ প্রভৃতির একটা রাজভাগ বলে ভাগ নিয়ে মন্দ চলত না। ছেলেরা শুধু দুধে-ভাতেই মানুষ নয়, মাছে-ভাতেও বেশ প্রোটিন পুষ্ট দেহ। মাংসটা খেতো না কারণ বৈষ্ণব।

সোমেশ্বরের আগমনবার্তা শুনে তাঁরা নিজেরাই এলেন। সে কি কথা ব্রাহ্মণ। রাজতুল্য ব্যক্তি! তিনি এসেছেন, পদার্পণ করেছেন আমার ভূমিতে, দেখা করতে যাব না!

যাবার সময় চাদরের খুঁটে হিসাব করে পুরাতন জমির জন্য সুদসহ পাওনা এবং নতুন এতশত বিঘা জমির মূল্য বা সেলামী হিসাব করে—প্রায় চার হাজার টাকা—বেঁধে নিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন—হরি বোল হরি বোল। গোবিন্দের মহিমা কাকে যে কখন কি করেন এক তিনি ছাড়া কেউ বলতে পারে না। জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ।

বৃদ্ধ সরকারের একটি চোখ ট্যারা ছিল। কোন্‌টি তা খবর পাইনি। পরবর্তী কালে বীরেশ্বরের একখানি চিঠি পেয়েছিলাম। লিখেছিলেন গোমস্তাকে, ওই লোকটা যেন আমার কাছে না আইসে। তাহাকে দেখিলেই আমার ক্রোধ হয়, চোখটা গালিয়া দিতে ইচ্ছা হয়।

এই লাট যুগলপুর বিক্রী করেছিল সরকারেরা বীরেশ্বর রায়কে।

এই ঘটনার প্রায় একত্রিশ বছর পর। ১৮৬২ সাল। মিউটিনীর পর। তখন ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী হয়েছেন।

যাক সুলতা, সে কথায় পরে আসব। সে একত্রিশ বছর পরের কথা। ১৮৩১ সালে বিমলা-কান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিমলার বিবাহ হয়ে গেল। সে বিবাহ মহাসমারোহের বিবাহ। তার খরচের অঙ্কটাই আছে জমা-খরচের খাতায়, বিশদ বিবরণ কোন কাগজপত্রে নেই। বেঁচে আছে লোকের মুখে মুখে, আর কয়েকটি নিদর্শনে।

রায়বাড়ীর খিড়কীতে দুধপুকুর হয়েছিল। সোমেশ্বরের বিয়ের সময় বধূ কাত্যায়নী তাতে স্নান করবেন। এবার কাটানো হয়েছিল বিমল সায়র—কন্যা বিমলার বিবাহে। বিমলা কন্যা। তার গ্রামে বের হতে লজ্জা নেই। তাই কাটানো হয়েছিল ঠাকুরবাড়ীর পিছন দিকে। ঠাকুরবাড়ীর সামনে 'মায়ের পুকুর' কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার সময় কাটানো হয়েছিল। সে পুকুরে স্নান করত পুরুষে মেয়েতে সকলে। জলও খেতো। এবার কাটানো হল বিমল সায়র। এ সায়রে স্নান করবে গ্রামের মেয়েরা। তবে হাড়ি বাউড়ী ব্রাত্যদের মেয়েরা নয়। দু দিকে দুটো ঘাট বাঁধানো হয়েছিল। সে বাঁধাঘাট এখনও আছে। রানাগুলো ভেঙেছে, সিঁড়ি পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গেছে, তবুও আছে। এখনও বিমল সায়রই গ্রামের সব থেকে ভাল পুকুর।

আর সে খাওয়া-দাওয়ার গল্প কাহিনীর মত এখনও লোকের মুখে মুখে আছে। মেয়ের বিয়েতে একটা পর্ব ছিল ক্ষীর চিঁড়ে। ক্ষীর চিঁড়ে কলা গুড় দিয়ে সধবাদের খাওয়ানো হত। সোমেশ্বর ক্ষীর চিঁড়ে করেছিলেন; তার গল্প করে লোকে বলে—ক্ষীর ছিল খুসবু ক্ষীর, গন্ধে মৌ-মৌ করেছিল নাটমন্দির। যারা খেয়েছিল তারা সারাটা দিন খুসবু ভরা ঢেকুর তুলেছিল। চিঁড়ে ছিল গোবিন্দভোগ ধানের, যে ধানে যখন শীষ বের হয় তখন গোটা মাঠটা সুগন্ধে ভরে ওঠে। তাছাড়া কলকাতার সন্দেশ মিষ্টি; তখন কলকাতায় নতুন রসগোল্লা হয়েছে, পান্তুয়া হয়েছে। গ্রামের লোক খায়নি। তার সঙ্গে মর্তমান কলা। দেশের মিষ্টি ছিল মণ্ডা আর বোঁদে। মণ্ডা বলতে চিনির ঢেলা।

বল্লভ পাল গ্রামের প্রবীণতম চাষী সদ্‌গোপ। সে আমার কড়চায় অনেক উপকরণ

যুগিয়ে দিয়েছে। সে শুনেছিল তার বাপ-মায়ের কাছে, ঠাকুমার কাছে। পাল এখন ঘোষ উপাধি নিয়েছে। সে বলেছিল, বাবু, মণ্ডা মানে চিনির ঢেলা, বাড়ীতে ভাঁড়ে থাকত। কখন আসে কুটুম-সজ্জন অতিথি-ফকীর, মাসাবধি থাকলেও গন্ধ হত না। কিন্তু যার দাঁত ভেঙেছে তাকে চুষতে হত। যার নড়া দাঁত তারও জলে গুলে খেতে হত। একবার ওই ঘোষলবাড়ীতে, যিনি আপনাদের নায়েব গো, তার বাড়ীতে এক রাগী বামুন এসেছিল দুপুরবেলায়। তাকে দিয়েছিল মণ্ডা। ব্রাহ্মণ কামড় মেরে বেকুব, নড়া দাঁত ছিল, মট করে গেল ভেঙে, তেষ্টা-ক্ষিধের সময় দাঁত ভেঙে ব্রাহ্মণ আগুন। সেই মণ্ডা নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল গেরস্ত কর্তার কপালে। কপাল কেটে রক্ত পড়ল, মণ্ডা ভাঙল না।

আর গল্প আছে অন্দরমহলের সঙ্গে জোড় লাগিয়ে আর এক মহল অন্দরের পত্তন। কন্যা-জামাতার জন্যে আর এক মহলের বনেদ গোড়া হয়েছিল ওই বিয়ের অষ্টমঙ্গলের মধ্যে। এ কথাটা চলিত আছে কীর্তিহাটে।

অষ্টাহব্যাপী উৎসব। বাঈ নাচ, খেমটা নাচ, তার সঙ্গে বহুবল্লভ পাল বলে—এসেছিল বাবু তর্জা গান! মহাদেব মোদক আর কেষ্ট ঘোষ। বাবার কাছে শুনেছি, তিনি ত্যাখন বালক। বুয়েচেন, মহাদেব মোদক এই কালো রঙ আর শিবের মত ডাগর রাঙা রাঙা চোখ। আর ধবধবে সাদা মাথার চুল। তেমুনি এক জোড়া সাদা মোচ। নেপুর পায়ে দিয়ে কি নাচন ধুয়ো ধরেছিল।

নেচে নেচে আয় রে আমার কেষ্ট নীলমণি
যতনে তোমার পিঠে পটপটাপট লাগাই পাঁচনী।
রাজাবাবুর মেয়ের সাদী পাত্র ব্রাহ্মণ কুলের নিধি
নিখুঁত আচার বেদ বিধি তার সাথে নাচে যবনী
বেটা তোর তার পিছে কিসের ঘুরঘুরানি
পিঠে তোর লাগাই পাঁচনী!

তর্জা গানে সাধারণ লোকে মেতে গিয়েছিল। এখনও লোকে ওই কয়েক ছত্র মনে করেই রাখে নি শুধু, গান করেও গেয়ে থাকে। চাষের সময় মাঠে গেলে চাষীর মুখে শোনা যায়, আমি শুনেছি।

একটা হাসির কথা এর সঙ্গে আছে। পাঁচ বছরের বীরেশ্বর খুব কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন দিদির বিয়েতে সব হয়ে গেল তো আমার বিয়েতে কি হবে?

* * *

এর পর জামাই ছেলেকে নিয়ে—ছেলে জামাইয়ের শিক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে—কাত্যায়নীকে যেতে হয়েছিল কলকাতা।

গ্রামের গল্প এখানেই ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু চার বছর পর সোমেশ্বর আবার সপরিবারে এসেছিলেন কীর্তিহাটে। শুধু জামাইকে রেখে এসেছিলেন কলকাতায়, সে তখন কলকাতার

হিন্দু কলেজে পড়ছে। বয়স পনের বছর। মেয়ে বিমলার বয়স বার। সে তখন অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে। শিউরে উঠেছেন সোমেশ্বর এবং কাত্যায়নী। মা ছাড়া এ বিপদে উপায় কি? এ ছাড়াও সোমেশ্বরের আর একটা টান ছিল। নীলকর রবিনসন তখন নীলের কুঠীতে লাভ করে ব্যবসা বাড়াচ্ছে। একটা কুঠী থেকে তিনটে কুঠী করছে। নতুন কুঠীর একটা এখানেই মাইল দুয়েক দূরে। আর একটা শ্যামনগরে। শ্যামনগরের সরকারেরা তখন অবস্থায় ঘায়েল হয়েছে। তাদের সঙ্গে রবিনসনের যোগাযোগ সোমেশ্বরই করে দিয়েছিলেন। এবং অন্য দিকে তাঁর ঝোঁক পড়েছে নতুন নতুন ভূসম্পত্তি কেনার উপর। দ্বারকানাথ ঠাকুর মশায়ের মত পরগনা কেনার ঝোঁক তাঁর ছিল না। ছিল বাছাই করে লাট মৌজা খরিদের। নতুন ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্য বিচক্ষণ লোক, তাঁর পরামর্শে তিনি কিনেছিলেন সেই সব মৌজা যে সব মৌজায় পতিত আছে বেশী। পতিত আবাদ করিয়ে বিলি করে তা থেকে মোটা লাভ হবে।

৮

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, তুমি নিশ্চয় জান, অন্ততঃ এম-এল-এ সুবোধবাবুর বক্তৃতায় শুনেছ, পশ্চিম বাংলায় জমিদারেরা পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টের সময় প্রজার কাছে খাজনা আদায় করে কোম্পানী সরকারকে দিত তার ৯০ ভাগ, নিজেরা পেত ১০ ভাগ। সেই স্থলে তারা ক্রমে খাজনা বাড়িয়ে যে আয় করেছিল বা করেছে তাতে এখন সরকারের ভাগ হয়েছে ২১, জমিদার লাভ করে ৭৯। বাংলার সরকারের রাজস্ব আয় এখন এক কোটি বারো লক্ষ—আর জমিদারের আয় সাত কোটি উনআশী লক্ষ। তার পথ আবিষ্কার করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে সোমেশ্বর একজন।

সোমেশ্বর এতেই মেতেছিলেন।

জামাই কলকাতায় পড়ছিল। জামাই বিমলাকান্ত সুপুরুষ, শান্ত বুদ্ধিমান। তার সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ছিল না। কাত্যায়নী কিন্তু বলতেন—বিমলের সম্পর্কেই ভাবনা আমার। ও চালকলা-বাঁধা বামুনের ছেলে, ছেলেবেলায় যজমান চরিয়েছে তো। বিমলাকে যদি আমার রোগেই পায় তবে কুলীনের বেটা সংস্কৃতজানা যজমান-চরানো ছেলে ও কি—?

অর্থাৎ ও কি আবার তাহলে বিয়ে না করে সেবাদাসী বাঈজী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? আমি যে মাথায় মাথায় ভাবছি গো।

তারপর ছেলে বীরেশ্বরকে দেখিয়ে বলতেন, আর দেখ না, এই ভটচায্যি থেকে রায় হওয়া হারামজাদাকে দেখ না! সেই যে না, হিঁদুর ছেলে মুসলমান হলে কালাপাহাড় হয়, ঠিক তাই। একেবারে মেলেচ্ছ হল।

নয় বছরের বীরেশ্বরের সঙ্গে রবিনসন সাহেবের ছেলে জনি, জন রবিনসনের খুব ভাব হয়েছে। তার বোন মেরীর সঙ্গেও ভাব। সে সকালবেলা উঠেই টাটু ঘোড়ায় চড়ে চলে যায় কুঠী-বাড়ীতে। বেলা বারোটায় এসে খায়। তাতেও তার আপত্তি। ওখানে খাবে না কেন?

ওখানে সে জনির সঙ্গে হুটোপুটি করে, গুলতিতে শিকার করে। বন্দুক নিয়ে বড় রবিনসন শিকার করে, সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। বীরা, বীরেশ্বরকে পাদরী হিল সাহেব বলে, বীরা ; বীরা ছেলে সাপের লেজ ধরে ঘুরপাক খাইয়ে ওদের বিস্ময় অর্জন করে বীর হয়ে ওঠে।

মায়ের কথা শুনতে পেলে সে ক্ষেপে যায়, বলে, খবরদার, হারামজাদা তুমি বলবে না।

মা বলত—বললে কি করবি রে হারামজাদা!

প্রথম প্রথম আপন মনে গজগজ করত সে, তারপর বলত, তাহলে তোমাকেও বলব হারামজাদী।

প্রথম দিন শুনে রাগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সেবারেই বিমলার প্রথম সন্তান হল—হল সেই কাত্যায়নীর মত মরা ছেলে। শিউরে উঠলেন কাত্যায়নী।

মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় এসে ডাক্তার দেখিয়ে কাত্যায়নী ফিরে গেলেন। রেখে গেলেন জামাইয়ের সেবার জন্য একটি—

হেসে সুরেশ্বর বললে—কি বলব সুলতা। খারাপ কথা একটু ভাল কথায় ঢেকে বা গিল্টি দিয়েই বলি। রেখে গেলেন একটি 'তাম্বুলকরঙ্ক বাহিনী'। কলকাতার বাড়ীর নায়েব বা ম্যানেজারকে ডেকে শলাপরামর্শ করে যোল বছরের জামাইয়ের জন্য একটি ষোড়শী মেয়েকে রেখে গেলেন। তার মাসোহারার বন্দোবস্ত করে, টাকা মাস কয়েকের অগ্রিম দিয়ে গেলেন। এবং তার কর্ম কি তাও বুঝিয়ে দিলেন।

অনেক ভেবে-চিন্তে করেছিলেন।

তাঁর লেখা একখানি চিঠি আছে, তাতে লিখছেন—কুলীনের ছেলে তদুপরি ভট্টাচার্য বংশের পুত্র পাগল বিমলাকে লইয়া ঘর না করিয়া পলায়ন করিয়া বিবাহ করিলে কি করিব? এই সমুদয় চিন্তা করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সেবাদাসী রাখাই স্থির করিলাম। আপনার জন্য বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা রাখিয়াছিলাম, কিন্তু কলিকাল পূর্ণ হইয়াছে, ওদিকে ব্রাহ্মধর্ম অনাচার শুরু করিয়াছে। আবার বিধবা-বিবাহের হুজুগ উঠিয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণকন্যা ভয়ে রাখিলাম না। মুসলমান বাঈজী রাখিলেও বিষম বিপদ ঘটিতে পারে। যদি মুসলমান হইয়া যায়। অগত্যা নানাবিধ শলাপরামর্শ করিয়া ও খোঁজ করিয়া একটি বেশ্যা-কন্যাকেই পছন্দ করিলাম। মেয়েটির মা অত্র কলিকাতার বিখ্যাত ঘোষালবাবুদের বাড়ীর বড়কর্তার বাঁধা খেমটাওয়ালী।

চিঠিখানা সোমেশ্বর রায়ের চিঠির দপ্তর থেকে পেয়েছি। যা ছিল ওই সিন্দুকের মধ্যে।

বাড়ী এসে কাত্যায়নী চারিদিকে খোঁজ করতে লাগলেন সাধু-সন্ন্যাসীর—বিশেষ করে তান্ত্রিক সাধুর। তান্ত্রিক শ্যামাকান্তের ওষুধ এবং যাগ-যজ্ঞের ফলে তাঁর অসুখ ভাল হয়েছে। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে ওছাড়া পথ দেখতে পান নি। তান্ত্রিক শ্যামাকান্ত তাঁর কিছু ওষুধ গ্রামের বায়েনদের দিয়ে গেছেন কিন্তু সে-সব জর-জড়ির ওষুধ আধ-কপালে মাথাধরার ওষুধ ; বন্ধ্যা মেয়ের সন্তান হয় এমন জড়ি বুটি ওষুধও তারা জানে। কিন্তু মৃতবৎসাদোষ সারে, মাথার পাগলামির ওষুধ—এ তারা পায় নি।

ওদিকে ঘটেছিল বিপর্যয় !

জামাই বিমলাকান্ত পলাতক হয়েছিলেন কলকাতা থেকে। একেবারে এসে উঠেছিলেন মাতামহের ভিটেতে। মাতামহী তখন গত হয়েছিলেন বৎসর দুয়েক পূর্বে। ঘর-দোর অবশ্য সোমেশ্বর রায়ের বন্দোবস্তেই সুরক্ষিত ছিল। সোমেশ্বর রায় ঘর-দোর মেরামত করিয়েছিলেন, নতুন কোঠাঘর করিয়েছিলেন, যে ঘর পাকাঘরের মতই অথচ তার থেকেও আরামদায়ক। পাকা বারান্দা, পাকা মেঝে, চুনকাম করা দেওয়াল, শুধু চালই খড়ের। ইচ্ছে ছিল পাকা ঘরই করিয়ে দেবেন। কিন্তু আপত্তি হয়েছিল দু দিক থেকে। প্রথম স্ত্রী রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবীর দিক থেকে, বলেছিলেন, না। তারপর মুখ নেড়ে বলেছিলেন—ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তবে এসব কি খুলে বলতে হয় ? জন জামাই ভাগনা তিন নয় আপনা। মেয়ের বিয়ে হলেই মেয়ের আবার মান বাড়ে। এখানে একটা কিছু হবে আর পাকাবাড়ী থাকলে হনহন করে গিয়ে ঘরে উঠে খিল দেবে। পাকা ঘরে বাস করে খড়ের চালে মানুষ থাকতে পারে না। মনে হয় সাপে কামড়াবে, আগুন লাগবে, ঝড়ে উড়বে। ও থাক।

আর আপত্তি করেছিলেন বিমলাকান্তের মাতামহী, ও থাক বাবা। পাকা ছাদ ঘর করতে নেই। ও গরমে মানুষকে পচিয়ে দেয়। তোমার বাড়ীতে মহল করে দিয়েছ সেই ঢের। এই ভটচাজের ভিটেতে ওটা কর না।

বিমলাকান্ত পাকাবাড়ীতে বেশ ক বছর থেকেও ওখানে গিয়ে থাকতে অসুবিধা বোধ করেন নি। আসবার সময় শ্বশুরকে চিঠি লিখে এসেছিলেন, সে চিঠি আমি পেয়েছি। লিখেছিলেন, ভক্তিপূর্বক অসংখ্য প্রণামান্তর নিবেদনমিদং পরে লিখি যে, আমি অদ্যই শ্যামনগর রওনা হইতেছি। অতঃপর স্থির করিয়াছি যে, সেখানেই জীবন নির্বাহ করিব। এ ধনৈশ্বর্য, এ সম্ভোগ আমার কোনমতেই সহ্য হইতেছে না। সারমেয়ের ঘৃত যদ্রূপ সহ্য হয় না, তদ্রূপই বলিতে হইবে। কিন্তু আমি ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। আমার পিতা সাধক ছিলেন। মাতামহ ক্রিয়াবান শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আমি বাল্যকালে ভক্তিমতী ভট্টাচার্য-গৃহিণী মাতামহীর নিকট যে সকল শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহা বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। উপনয়নের পর আমিও স্বহস্তে 'নারায়ণশিলা'র সেবা করিয়াছি। ইহার পর এবম্বিধ রাজৈশ্বর্য বাদশাহী, ম্লেচ্ছসুলভ ভোগ আমার জন্য নহে। বাল্যকালে কোন কদাচার হইলে মাতামহী বলিতেন, কদাচার করিলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, কুষ্ঠরোগ হয়। তাহা আমার পক্ষে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। যাহাই হউক অতঃপর গৃহে থাকিয়া শাস্ত্রচর্চা ও কুল-কর্ম করিয়াই কাল কাটাইব। পূজ্যপাদ মহাশয়, আমার কোন অভাবও রাখেন নাই। শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী আমার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া মদীয় মনোরঞ্জন এবং পরিচর্যার জন্য গীতবাদ্যনৃত্যকুশলা পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ওদিকে হিন্দু কলেজেও আমার জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। মহাশয়ের ইহা অগোচর নহে যে, তত্রস্থ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে পরলোকগত ডিরোজিও সাহেবের মতাবলম্বী ধর্মবিশ্বাসহীন অনেক ছাত্র আছে। তাহারা মদ্যপান করে, গো-মাংস ভক্ষণ করে। তাহারা আমার মতামতের জন্য ব্যঙ্গ করে, অনেক সময় আমার পিরানের পকেটে উচ্ছিষ্ট হাড় ভরিয়া দেয়। জোরপূর্বক

মগুপান করাইবার জন্য টানাটানি করে। আমি তাহাদের সহিত কলহে অপারগ। তাহার উপর এই পরিচারিকা নিয়োগকরণের জন্য আমি সব অন্ধকার নিরীক্ষণ করিতেছি। ধর্ম চরিত্র গেলে আর কি থাকে মনুষ্যের ? সুতরাং আমি শ্যামনগর রওনা হইতেছি। শ্বশ্রূমাতাকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিবেন। চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি শপথপূর্বক কহিতেছি যে বিমলার অবস্থা যে মতই হউক না কেন, আমি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ কদাপি করিব না। ইহা ত্রিসত্য বলিয়া কহিতেছি। করিলে আমার চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবেক। আমাকে যখন স্মরণ করিবেন তখনই শ্রীচরণে গিয়া হাজির হইব। কেবলমাত্র ধর্মাচরণ ও ধর্মরক্ষা হইলেই হইল। মহাশয়ের শ্রীচরণে আমার অসংখ্য কোটি প্রণাম নিবেদন করিতেছি। পরমারাধ্যা পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতার চরণে—ইত্যাদি ইত্যাদি—।

পত্রখানি আশ্চর্যই শুধু মনে হয় নি আমার সুলতা, একটি সত্যও আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কোন দেশের সকল মানুষই পতিত হয় না। কোন ধর্মের এমন বিকৃতি কোন কালে ঘটে না, যাতে সব মানুষ বিকৃত হয়ে যায়। কোন কালেই এমন প্রমাণ নেই যা একটা জাতির সাধনার সবটুকুকে গ্রাস করে অবশেষে যা ফেলে রাখে তার সবই আবর্জনা। সেই কারণেই আজ মানুষ মাটি খুঁড়ে চলেছেই এবং তাদের মিলছেও অতীতের ধনরত্ন। সেকালে বিমলাকান্তের মত কিছু লোক ছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনদের দলকে যে গুড়ুম সভা মারধোর করেছিল, তাদের যত অপরাধই থাক, এদের ছিল না। আর গুড়ুম সভার বলেই সেদিন জাতটা বাঁচে নি। বেঁচেছিল এদের জোরেই।

সুলতা হেসে বললে—মতপার্থক্য থাকতে পারে।

—অর্থাৎ একে তুমি বাঁচা বল না। বল ভূতের উপদ্রবে জীবনের মৃত্যু।

সুলতা বললে—বললে ঝগড়া বাধবে, তর্ক উঠবে। তা করতে আমি আসি নি। আমি শুনতে রয়ে গেলাম, তাই বল।

—বলছি। তবে সেদিন পথের মোড় না-ফিরলে গোটা জাতটাও ক্রীশ্চান হয়ে যেতে পারত। এবং তাতে সম্ভবত তোমার মতে ভালই হত। আমরা তখন থেকেই কোটপেণ্টালুন পরতে শিখতাম। মন্দিরগুলো গির্জে হয়ে যেত। তার সঙ্গে মসজিদগুলো যেতো কিনা আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। তাহলে তোমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন করতে না, করত এই মসজিদ-ওয়ালারা। তোমরা ক্রীশ্চান হয়ে সাদা গুরুদের অনুগমন করতে।

—না। কিন্তু ও রাখ সুরেশ্বর। বল, কড়চার কথা বল। আমি অবশ্যই বিমলাকান্তের এ আশ্চর্য দৃঢ়তা ও চরিত্রবলের প্রশংসা করছি, নমস্কার জানাচ্ছি। চরিত্র যেখানে বড় হয়ে ওঠে সেখানে যা ধরেই সে উঠুক না কেন তাই সত্য, তাই শ্রদ্ধার, তাই প্রগ্রেসিভ।

—আর ঝগড়া রইল না। মিটিয়ে ফেললে তুমি। হাসলে সুরেশ্বর। তারপর শুরু করলে—এর পর তুমি যা বললে, তাই হল অর্থাৎ জিতলেন বিমলাকান্তই। জমিদার সোমেশ্বরের বজরাটা সেদিন আবার রওনা হল শ্যামনগর। এবার তিনি একা নন, সঙ্গে শ্রীরাজকুমারী কাত্যায়নী দেবী এবং জমিদার-কন্যা বিমলা। গেলেন না কেবল বীরেশ্বর। তিনি বাড়ীতে হিল সাহেবের কাছে রইলেন। রবিনসন সাহেবের কুঠীতে গিয়ে জানি

রবিনসনকে নিয়ে পাখী শিকার করে বেড়ালেন। তখন বন্দুক ছুঁড়তে শিখেছেন তিনি।

সোমেশ্বর এবং কাত্যায়নী গিয়ে জামাইকে বলেছিলেন—বাবা, তুমি দেবতা। আমরা বুঝতে পারি নি। ইষ্টদেবতার নামে শপথ করে বলছি বাবা, তোমার রান্না আর রাজরাজেশ্বর প্রভুর রান্না একরকম পবিত্রতার সঙ্গে হবে।

বিমলাকান্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। এবং এসেও ছিলেন। বিমলা নাকি হাত ধরে বলেছিল, যাবে না তুমি? আমি কি করে থাকব?

এর পর সোমেশ্বর বাড়ীতে জামাতা ও পুত্রের সংস্কৃত পড়ার জন্য পণ্ডিত এবং পার্সী পড়ার জন্য মৌলবী রেখেছিলেন, ইংরিজী শেখাতেন ওই পাদরী হিল সাহেব। কড়াই বাটা আর ভাত পরিতোষ সহকারে খেয়ে ভিক্টোরিয়া যুগের খাঁটি ইংরিজী শেখাতেন। পণ্ডিত লোক ছিলেন।

তিনি বলতেন, বীরা দি ইণ্টেলিজেণ্ট, বিমলা দি ডিলিজেণ্ট। বিমলা খুব বড়া পণ্ডিটা হইবে। কিন্তু জিমিডার হইটে পারিবে না। বীরা জিমিডার হইবে। বিমলা টুমি যডি—শেষটা বলতেন না। কি সেটা তুমি অনুমান করতে পার। অর্থাৎ ক্রীশ্চান!

* * *

সুলতা, একটা সিগারেট খেয়ে নিই। একটু জলও খাব। বকেছি অনেক না? দাও, জলের গ্লাসটা অনুগ্রহ করে এগিয়ে দাও।

সিগারেট ধরিয়ে এক রাশ ধোঁয়া গিলে মুখে-নাকে উদ্গীরণ করে সুরেশ্বর বললে, এইসব উপকরণের মধ্য থেকে সেই অসুখের মধ্যে ফুরসীতে তামাক খেতে ইচ্ছে হত। পাঁচ-ছ দিন জ্বরে ভুগেছিলাম। তার মধ্যে মেজঠাকুমা আমাকে তাঁর ঠাকুরমার ঝুলি প্রায় উজার করে ঢেলে দিয়েছিলেন। এবং একদিন ডেকে এনেছিলেন জ্ঞাতি ভটচাজদের প্রবীণতম ব্যক্তিটিকে। তিনি সম্পর্কে তাঁর শ্বশুর হতেন। মেজঠাকুরদার থেকে বয়সে বড়। প্রায় আশির কাছাকাছি বয়স। ডেকেছিলেন আমার নাড়ী দেখতে। তিনি নাড়ী দেখে বলে দিতে পারেন, জ্বর কদিন থাকবে, কবে ছাড়বে। তিনি নাড়ী দেখে বলেছিলেন, সাদা জ্বর বউমা। ভয় নেই। পাঁচ দিন ভোগ। তবে কুইনিন যদি ফোঁড়ো তবে এক-আধ দিন কম হবে।

হয়েছিল তাই। কুইনিন ইঞ্জেকশনে তিন দিনে জ্বরটা বেমক্কা ছোট ঘোড়ার রাশের টানে বাগ মানার মত বাগ মেনেছিল কিন্তু পা ঠুকতে মাথা নিয়ে এপাশ-ওপাশ করতে ছাড়ে নি, মানে একটু করে টেম্পারেচার আরও দুদিন হয়ে ছাড়ল।

সে যাক। পরে বলব।

ঠাকুমা বলেছিলেন, সেকালের কথা শুনবে তো ওঁকে ধর ভাই। উনি আমার খুড়শ্বশুর। তোমার ঠাকুরদার বয়সী। উনি অনেক জানেন।

—কি ব্যাপার?

—ও, রায়বংশের কথা শুনবে। জানে না তো। বাপ গেছেন অল্পবয়সে। মা এ বাড়ী আসেন না। আমি কাত্যায়নী দেবীর গল্প বলছিলাম।

—ওঃ, তিনি ছিলেন রাজার মেয়ে, এখানে বলত রাজকুমারী বউঠাকরুণ। আড়ালে বলত বাঘিনীঠাকরুন। শুনেছি, আমরা দেখি নি। তাঁর দাপে এ গাঁয়ে কোন অন্যায় কেউ করতে পারত না। স্বয়ং সোমেশ্বর রায় তটস্থ। পাদরী ছিল সাহেব পর্যন্ত তটস্থ। একদিন কি হিন্দু-ধর্মের নিন্দে করেছিল। তিনি শুনে বলেছিলেন—ওই পাদরী মিনসেরে বলিস তো ওই সব যদি বলবে তো ওর দাড়ি চাঁচিয়ে দেব। আবার ভক্তিমতীও ছিলেন। শুনলেন কাঁদীর বাড়ীতে সিংহরাজাদের রাধাবল্লভ ঠাকুর সোনার ফুরসীতে তামাক খান তিনবার। একবার বাল্যভোগের পর, একবার ভোগের পর, একবার রাত্রে। অমনি হুকুম হল, রাজরাজেশ্বরেরও সোনার ফুরসীর ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঁচ দিনই তিনি এসে নাড়ী দেখে যেতেন, ঠাকুমা তাঁকে মিষ্টি খাওয়াতেন, চা খাওয়াতেন, তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন সোমেশ্বর রায়ের গল্প। বলতে তাঁর দ্বিধা ছিল বোধহয়। সোমেশ্বর রায়ের কোন ভাল দিক তাঁর মনে স্মৃতির ঘরে বোধহয় স্থানই পায়নি। যেটুকু পেয়েছিল সেটুকু সবই তাঁর আমিরীর কথা। বিশেষ করে দেহবিলাসের।

সেদিন ঠাকুমা ছিলেন না। হঠাৎ বললেন—তাই তো হে, বলব কি করে? একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তা তোমার বয়স অনেক হয়েছে, ষোল অনেক দিন পার হয়েছে। আমি তো তোমার ঠাকুরদাদার খুড়ো। বাহাত্তুরে পেরিয়েছি। তা শোন। সরস করে বলেছিলেন, সোমেশ্বরের এখানকার নৈশজীবনের কথা। কাত্যায়নী দেবী এক কন্যা এক পুত্রের পর স্বামী থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন, তাঁর ভয় ছিল, তান্ত্রিক গত হয়েছেন, আবার যদি সন্তান গর্ভে এলে তিনি পাগল হন অথবা মৃতবৎসা রোগ আবার ধরে! এইজন্যে কলকাতা থেকে তাঁর পরিচর্যার জন্য দাসী তিনি এনেছিলেন। কিন্তু সোমেশ্বর তাতেও তৃপ্ত হতেন না। রাত্রিকালে বজরায় তাঁর আসর বসত ব্রাত্য মেয়েদের নিয়ে। কিন্তু জামাই বিমলাকান্ত আসতেই তাতে ছেদ টানতে হল। বৃদ্ধ হেসে বলেছিলেন, ভাই, সে আসর যেমন-তেমন আসর নয়। স্বর্গের দেবালয়ের আসরের মত আসর। সোমরসে বিভোর হয়ে সোমেশ্বর বসতেন চন্দ্রের মত আর ব্রাত্য মেয়েরা তাঁকে ঘিরে বসত নক্ষত্রের মত।

শুনেছি। কানে-কানে বলেছিলেন, সে নাকি উলঙ্গের আসর। বাইরে বন্দুকধারী সিপাহী পাহারা দিত। বজরার কামরায় দরজা আগলে থাকত তারাচরণ হাড়ি। সে ছিল একটি ব্যাঘ্র বিশেষ।

সুলতা, হয়তো বুড়োর নিজের মনেও এ নেশার ঘোর কাটে নি। সেই নেশার ঘোরেই দন্তহীন মুখে গল্প করেছিলেন। বলা শেষ করেও হাসি মিলায় নি তাঁর। বৃদ্ধের জিভখানা ফোকলা মুখের মধ্যে থরথর করে কাঁপছিল। বলব কি তোমাকে, তার ছোঁয়াতে আমার জরজর্জর দেহে-মনেও একটা নেশা লেগেছিল। সেই সময় তোমাকে একখানা পত্র লিখেছিলাম তাতে জ্বরের কথা লিখি নি, লিখেছিলাম এখানকার গোয়ানপাড়ার মেয়েদের কথা। তাতে খুব রসিকতা এবং উল্লাস ছিল। সেটা আমার নেশালাগার সত্যকে গোপন করবার জন্যেই বোধহয় লিখেছিলাম।

গোয়ানদের মেয়েগুলো কাঁসাইয়ের ধারে এসে দাঁড়িয়ে ডাকত—ঐ বাবু সাহেবের নোকর! এ রঘু মহারাজ!

রঘু যেত না—যেতেন মেজঠাকুমা—বলতেন, কি লা বজ্জাত ছুঁড়ীরা?

—বাবু কেমন আছে গো মাঝলা বিবি রাণী।

—মরণ! ফের যদি বিবি বলবি তো ডিকুকে বলব, চুলের ঝুঁটি ধরে কিল মারবে পিঠে। বিবি কি লা? মা বলতে পারিস না?

ওরা হাসত। খিলখিল করে হাসত।

মেজঠাকুমা বলতেন, বল না পোড়ামুখীরা কি বলছিস?

—বললাম তো। বাবু হুজুর কেমুন আছে গো!

—জ্বরে আছে! যা পালা।

কোন কোন দিন আমি নিজেই যেতাম! ওরা যে কত আহা উঁহু করত সে কি বলব। হায় হামারা নসীব! বাবুর কাহে বোখার হল গো! হামার কেনো হলো না! আঃ বাবু! তোমার চাঁদের পারা মুখ শুখায়ে গেল গো। রোজী বেচারীর নিদ নাই গো!

সঙ্গে সঙ্গে দলটাকে দলটা হেসে উঠত। আমার অসুস্থ দেহের উত্তপ্ত রক্ত আরও উত্তপ্ত হত। মনে হত রায়বংশের ধারাটা যেন এই রক্তসমুদ্রের ঈশান কোণে ঝড়ের মত উঁকি দিচ্ছে।

সাত দিনের দিন, ছদিন উপবাস করে যেদিন পথ্য করলাম সেদিন, মেজঠাকুমা কাত্যায়নীর মৃত্যু পর্যন্ত এসে পৌঁচেছিলেন।

তবে মৃত্যুর কথাটা বলি। সেটা আমার ভাল লেগেছিল।

মেজঠাকুমা বলেছিলেন, ভাই, স্বামী পুত্র এবং জামাই রেখে কাত্যায়নী দেবী ডঙ্কা বাজিয়ে চলে গেলেন। সজ্ঞানে দেহত্যাগ যাকে বলে, তাই। সামান্য তিন দিনের জ্বর। তিন দিনের দিন সকালে স্বামীকে ডেকে বললেন, ও গো, আজ আমি যাব।

—সে কি? কি যা তা বলছ?

—ঠিক বলছি। কবরেজ ভাল আছে বলে গেল, ও ধরতে পারলে না। আজ যেন কোথাও যেয়ো না। তাই হল ভাই। সেই রাত্রেই গেলেন। স্বামীকে ডেকে বললেন, তোমার পা দুটো আমার মাথায় ঠেকিয়ে দাও। আবার আসছে জন্মে যেন তোমাকে পাই। এই আশীর্বাদ কর।

হাউহাউ করে কেঁদেছিলেন সোমেশ্বর।

কাত্যায়নী দেবী ধমক দিয়েছিলেন, দেখ দেখ, বুড়োবয়সে ছেলে জামাই মেয়ের সামনে ঢঙ দেখ! চুপ কর! চুপ কর বলছি! হ্যাঁ!

জামাইকে বলেছিলেন—বাবা, তুমি আমার দেবতা। বিমলাকে তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি।

ছেলেকে বলেছিলেন, আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিস। আমি হারামজাদা বললে, তুই আমাকে হারামজাদী বলেছিস। যা বারণ করেছি তাই করেছিস। বুড়ো বাপকে যেন কষ্ট

দিস না! বুঝলি!

বীরেশ্বর ভুরু কুঁচকে বসেছিলেন।

—আর বিমলাকান্ত দেবতা। তার অসম্মান করিস না। তোর দিদি—

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তুমি দিদিকে যত ভালবাস তার থেকে আমি দিদিকে বেশী ভালবাসি। তুমি বরং চুপ কর। এত বকলে অসুখ বাড়বে। অসুখ হয়েছে ক'দিন, অমনি মরব বলে একটা হৈ-হৈ লাগিয়ে দিলে!

—তুই একটা হারামজাদা রে! একেবারে নাস্তিক। আমি বুঝতে পারছি, আজ আমি যাব! তাই তিনি গিয়েছিলেন। বীরেশ্বরেরও ওকথা বলার দোষ ছিল না, কারণ জর মাত্র তিন দিনের। তিন দিনের সকালবেলা থেকে ওই শুরু করলেন, সন্ধ্যে নাগাদ চলে গেলেন।

মেজঠাকুমা হেসে বলেছিলেন, কাত্যায়নী বলতেন, চিঠিতেও স্বামীকে নাকি লিখেছিলেন। সতী-যাওয়াকে যারা অত্যাচার বলে উঠিয়ে দিচ্ছে, দিতে চাচ্ছে তারা মেলেচ্ছ, তারা যবন। স্বামীকে বলেছিলেন, তুমি যদি দরখাস্তে সই কর তবে তোমার মুখ আমি দেখব না। সতীপ্রথা উঠে গেল, কোন লাট জানি উঠিয়ে দিলে, তোর মেজঠাকুরদা নামটা তার বলতেন।

আমি নামটা বলে দিয়েছিলাম সুলতা। লর্ড বেন্টিঙ্ক!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। লাটসাহেব বেন্টিক। কাত্যায়নী গাল দিতেন বেন্টিঙ্ককে। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলতেন, আইন করলি করলি; কলার পাতে লেখা রইল। কাত্যায়নী যদি বিধবা হয় তাহলে সে তোর ওই আইন মানবে না, মানবে না, মানবে না। সতী সে যাবেই।

সেইটেই তাঁর পূর্ণ হল না। তার বদলে সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে দলমল করে চলে গেলেন।

তাঁর চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ হয়েছিল। সে উপলক্ষ্যে কীর্তিহাটের ব্রাহ্মণদিগে সবৎসা গাভী দান করেছিলেন। সে সব বড় গাই। মেজঠাকুমা বলেছিলেন, ভাগলপুরের গাই। গ্রামে বড় পাঞ্জাবী গাইকে ভাগলপুরের গাই বলত। সধবা যে, ব্রাহ্মণ শূদ্র সব, শাড়ী সিঁদুর শাঁখা দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অতিথিশালা।

* * *

সুলতা, এসব জেনে যখন শুলাম রাত্রে তখন কাত্যায়নীর মৃত্যু শ্রাদ্ধ সব কোথায় গেল—মনে জেগে রইল সোমেশ্বর রায়ের ওই নৈশআসরের কথা। যারা সেদিন অ্যাসেম্বলীতে জমিদারের ব্যভিচারের কথা বললেন, তাঁদের দোষ দেব না। আমার পূর্বপুরুষের সব কথা বাদ দিয়ে ওইটে যখন আমার মনেই সাড়া তুললে, তখন আর তাঁদের দোষ দেব কি করে?

শেষ পর্যন্ত নিজের উপর রাগ করে বললাম, যাক ও খাতাপত্র ঘেঁটে আর কাজ নেই। যে বিষ চাপা আছে, সে চাপাই থাক। তাকে খুঁড়ে বের করে কাজ নেই। ছেদ টেনে দেওয়াই ভাল কীর্তিহাটের কড়চার। মন থেকে মুছে ফেলাই ভাল।

মুছে দিয়ে ছেদ টেনে দিতে চাইলেও তা হয় না। ইতিহাসের একটা চক্রযন্ত্র আছে, তাতে অতীতকাল দাঁতওলা চাকার মত বর্তমানের চাকার গর্তে গর্তে ঢুকে নিজের সঙ্গে যুক্ত রেখে মানুষের জীবনকে চালায়। অতীতের কর্ম কর্মফল হয়ে তার আস্বাদ বর্তমানকে আস্বাদন না করিয়ে ছাড়ে না। সে তিক্ত হোক—বিষ হোক—আর অমৃত হোক বা মধুরই হোক। কাল যা খেয়েছি, তার পুষ্টিতেই আজ বাঁচি। এক যারা আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে তপস্যা করে, সব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়—বুদ্ধ চৈতন্য যাঁরা তাঁরা আলাদা।

সুরেশ্বর তা নয়। সে কি ক'রে রেহাই পাবে সুলতা, এ থেকে? জরের সময় উপবাস করা অবস্থায় যা ভেবেছিল, সংকল্প করেছিল, তা পথ্য পাবার দিনটিতেও উল্টে গেল। অবিচার সুরেশ্বরের উপর করো না, সে ইচ্ছে ক'রে তা করে নি।

ব্যাপারটা ঘটল এইভাবে। সে-দিন সে পথ্য করে উঠেছে। মেজঠাকুমা কইমাছ আনিয়ে ঝোল রেঁধে বসে পথ্য করিয়েছেন, এমন সময় তার নায়েব এল—আজই একবার ক্যাম্পে যেতে হবে—ওঁরা হাজির হয়েছেন—আপত্তি দিচ্ছেন। পরিশেষে বললে—ব্যাপার খুব জটিল ছোটবাবু!

—সেই বাড়ীরই ব্যাপার তো! বাড়ী দেবোত্তরের টাকায় হয়েছে এই তো? ও আর আমি পারছি না, ঘোষালমশাই। নিন, তাই নিন ওঁরা।

—ব্যাপারটাকে এমন ছোট ক'রে দেখবেন না বাবু! জাল ওঁদের প্রকাণ্ড। মতলব সাংঘাতিক। আমি তো হতভম্ব হয়ে গিয়েছি।

—কি হ'ল?

—কাল ওঁরা গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে। প্রণবেশ্বরবাবু, কল্যাণেশ্বরবাবু আর ধনেশ্বরবাবুর মেজছেলে ভূপেশ্বর তিন জন মিলে গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে সব থেকে বড় দেওয়ানী উকীল সুধাবাবুর কাছে। প্রণবেশ্বরবাবু কলকাতার ব্যারিস্টারের কাছ থেকে যে মত এনেছিলেন তা যাচাই করতে। সুধাবাবু বলেছেন—হ্যাঁ, এ একটা খুব জোরালো পথ বটে। পয়েন্ট খুব স্ট্রং পয়েন্ট।

—বুঝলাম—। কিসের? এরই তো?

—শুনুন আগে। এখানে যদি এই হয় যে সব দেবোত্তর। বাড়ী দেবোত্তর। দেবোত্তরের বাইরে সম্পত্তি নাই—তা হলে—সেই নজীরে এঁরা—ওঁদের পূর্বপুরুষ কলকাতায় যে-সব বাড়ী পেয়েছিলেন, তাও দেবোত্তর হবে। জানবাজারের আপনার অংশের বাড়ী, তাও তাই হবে। হবে না? বুঝে দেখুন! সেটেলমেণ্টের পরচার বলে, এখানকার সম্পত্তি নিয়ে মামলা ক'রে, তারই নজীরে তখন কলকাতার বাড়ী নিয়ে মামলা করবে। শিবেশ্বরবাবু কলকাতার বাড়ী বেচেছেন—তা ক্যান্সেল হবে, যজ্ঞেশ্বরবাবু বেচেছেন—সে ক্যানসেল হবে, আপনার জানবাজারের বাড়ীর পার্টিশনে পাওয়া তাও ক্যানসেল হবে। বুঝে দেখুন!

চমকে উঠল সুরেশ্বর। অর্থাৎ তাকে একরকম সর্বস্বান্ত হ'তে হবে। জানবাজারের বাড়ীই তার একমাত্র সম্পত্তি—যা সমস্ত দেবোত্তরের মূল্যের চেয়েও মূল্যবান। এর তিন আনা অংশ মাত্র থাকবে তার।

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল তার। পরক্ষণেই হল দারুণ ক্ষোভ—তারপর সেটা রূপান্তরিত হ'ল দুরন্ত ক্রোধে। ওঃ!

দুর্যোধন কপট পাশায় যে রাজ্য চৌদ্দ বছরের জন্য জিতেছিলেন, চৌদ্দ বছর পর সেই রাজ্য ফিরে দেবার সময় বলেছিলেন—বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী। রায়বাড়ীর পার্টিশন কপট পাশার দান নয়। কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে যে আপোস বিভাগে রাজ্যভাগ হয়ে কৌরবেরা হস্তিনাপুরে—আর পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য করেছিলেন; তাই নাকচ করে সবটা গ্রাস করবার জন্য এটা ওদের পাশা খেলার চ্যালেঞ্জ—কপট পাশার দান ফেলার মত ব্যাপার। সুরেশ্বর যুধিষ্ঠির নয়—সে তাকে খুব পছন্দও করে না। সে অর্জুন ভীম এই দু'জনের ভক্ত। ও পাশার দান ও মেনে নেবে না। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে সে চুপ করে ভাবলে, বললে—দলিল আবার ভাল ক'রে দেখুন।

—দেখেছি বাবু। দলিলে বাড়ীর কথার কোন উল্লেখ নেই। ঠাকুরবাড়ীর কথাই আছে। কিন্তু ওদের যুক্তিটা তো বুঝছেন! দেবোত্তরের টাকা থেকে তৈরী সব। দেবোত্তরের বাইরে কিছু নেই। সুতরাং বাড়ীও দেবোত্তর!

—কলকাতায় যে-ব্যবসা ছিল সোমেশ্বরের, তার থেকেই বলতে গেলে সম্পত্তি কিনেছিলেন তিনি। পত্তনী নিয়েছিলেন। বাড়ী তা থেকে হয়েছে।

—কিন্তু তার নমুদ কোথায়? নমুদ চাই।

—কেন? জানবাজারে খাতাপত্র নিশ্চয় থাকবে।

—আজ্ঞে না। সেসব আছে দেবেশ্বর রায়ের আমল থেকে। তাও কলিয়ারীর খাতাপত্র, সেসব বড়বাবু যজ্ঞেশ্বরবাবুর কাছে। তার আগেকার যা কিছু খাতাপত্র, সে রায়বাহাদুরের আমল থেকে এখানে এসেছিল।

হঠাৎ সুরেশ্বরের মনে পড়ে গেল, মেজঠাকুমা বলছিলেন, সোমেশ্বরের কন্যা বিমলার বিবাহের আটদিনের মধ্যে অন্দরের নতুন মহলের ভিত কাটা হয়েছিল। সাল-সন-মাস এ পাওয়া গেছে একরকম কিন্তু খাতা চাই। দেবোত্তরের খাতা আছে। দেবোত্তর থেকে এ-খরচ হয়ে থাকলে নিশ্চয় খরচ থাকবে।

দেবোত্তরের খাতার গাদা সে পেয়েছে। সেদিন খাতা ওল্টাতে ওল্টাতে রাজরাজেশ্বরের মুকুট এবং গয়না খরিদের খরচ দেখেছে। সে খাতার গাদা ওল্টাতে ওল্টাতে বিমলার বিয়ের বছরের খাতাটা পেলে। বিয়ের খরচের একজায়গায় ফর্দ তার পড়া ছিল। সে খাতাখানা ওল্টাতে লাগল। বিয়ে হয়েছে আষাঢ় মাসে। বৈশাখ থেকে সে বিমল সায়র কাটানোর খরচের আরম্ভ আবিষ্কার করলে। কল্যাণীয়া শ্রীমতী বিমলা দেবী মাতার শুভবিবাহ উপলক্ষে নূতন পুষ্করিণী বিমল সায়র কাটানোর শুভারম্ভ; মুনিষ (অর্থাৎ মজুর) দুইশত ষোলজন

দৈনিক খাটুনীর দাম—এক আনা হিসাবে মোট সাড়ে তের টাকা।

পাতার পর পাতা ওল্টালে সে। নজরে পড়ল বিচিত্র, অবিশ্বাস্য অনেক কিছু। গব্য ঘৃত খরিদ পাঁচ টাকা মণ দরে ষোল সের ঘৃতের দাম—দুই টাকা। কিন্তু সেসব দিকে মন দেবার সময় ছিল না। বিয়ের দিন থেকে আটদিনের খরচ সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজে পেল কিন্তু অন্দরমহলের বা কোন বাড়ীঘরের পত্তনের জন্য ভিত খোঁড়ার খরচ সে পেলে না। ভিত খোঁড়া শুধু হয় না। ভিত পূজা হয়। সোনা-রূপো-তামা দিয়ে বাস্তুদেবতার অর্চনা হয়। তার কোন নিদর্শন মিলল না।

এই সময় এলেন মেজঠাকুমা। সুরেশ্বর বললে—তুমি ঠিক জান ঠাকুমা, ওই মাঝের মহলটা বিমলা দেবীর বিয়ের আটদিনের মধ্যেই পত্তন হয়েছিল ?

—তাই তো গল্প শুনেছি। যার তার কাছে তো শুনিনি, তাঁর কাছে শুনেছি। তাছাড়া মাটির পোড়ানো টালিতে সাল-সন তো লেখা আছে রে। একবারে দ্বিতীয় মহলে ঢুকবার যে বড় দরজাটা আছে, তার মাথায় লাগানো আছে। পুমুণীর অনন্তরাজ, মেদিনীপুরের ফারাতুল্লা রাজ এরাই গেঁথেছে। নক্সা কাটবার মিস্ত্রী এসেছিল কলকাতা থেকে।

সুরেশ্বর নায়েবকে বললে, দেবোত্তরের খাতায় কোন খরচ নেই। এই খাতা দেখালেই হবে।

—ঠিক তা মানবে না। বলতে পারে—আরও খাতা ছিল।

—তা বলুক। সেও ওদের বের করে দেখাতে হবে। শুধু আপত্তি দিলেই হবে না। ওদেরও দেখাতে হবে !

—তাহলে আপনি একবার যদি আসেন—

—চলুন।

মেজঠাকুমা বললেন, আজই পথ্যি করে উঠেই রোদে রোদে যাবি কি ? ম্যালেরিয়া জ্বর, অম্বল হবে আর হুঁ-হুঁ করে কাঁপন দিয়ে আসবে। তুই বরং চিঠি লিখে হাকিমের কাছে সময় চেয়ে পাঠা।

কথাটা সমীচীন বলে মনে হল। বেশ যেন ঘুমের আমেজও ধরে আসছিল। তাছাড়া চড়া রোদ্দুর মাথায় করে খারাপ মেজাজ নিয়ে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি ওই মেজতরফের ধনেশ্বর প্রমুখদের ছোঁয়াচে বিশ্রী কিছু করে বসে সে, এই ভয়টাও হল। মাথাটা সত্যিই যেন উত্তপ্ত প্রখর হয়ে রয়েছে। কলকাতায় ফ্যানের তলায় যে-মেজাজ গড়ে উঠেছে, মেদিনীপুরের কড়া রোদের আঁচে ঝলসে সে-মেজাজ ঠিক থাকার কথা নয়। একখানা কাগজ টেনে নিয়ে সে দরখাস্তের ফর্মে একখানা পত্র লিখে দিলে নায়েবের হাতে—এটা দেবেন, তিন-চার দিন পর যেদিন দিন দেবেন, আমি যাব। লিখেও দিয়েছি, মুখেও বলবেন।

নায়েব চলে গেল। সুরেশ্বর একটা সিগারেট ধরিয়ে গিয়ে কাঁসাইয়ের দিকের জানালাটার ধারে দাঁড়াল। বেলা বারোটা বাজছে। সূর্য প্রখর হয়ে উঠেছে। ওপারে বনটা স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রায়। ক্বচিৎ দুটো চারটে পাখী এ-গাছ থেকে উড়ে ও-গাছে বসছে। গোটা দুয়েক ঘুঘুর সেই একটানা করুণ ঘু-ঘু, ঘু, ঘু-ঘু ঘু শব্দ, একটা এদিক একটা ওদিক

থেকে ভেসে আসছে। আর কয়েকটা বনকাক ডাকছে কক্‌-কক্‌ শব্দে। প্রখর উত্তপ্ত বাতাসের স্পর্শ তার মুখে-বুকে লাগছে। কংসাবতীতে জল এখন কম, ওপারে বালির চড়া পড়েছে। জলস্রোতটা প্রায় বিবিমহলের বনেদের হাতবিশেক দূরে বাঁধানো পোস্তার গা ঘেঁষে চলছে। কাঁসাইয়ের জল কাঁচা স্বচ্ছ, তাতে স্রোত ক্ষীণ, ক্ষীণ স্রোতের ধারায় দুপুরের সূর্যের ছটা গলানো রূপোর মত ঝলছে, মনে হচ্ছে তার উত্তাপও যেন অনুভব করা যায়। দুটো কুকুর উত্তাপক্লিষ্ট হয়ে জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে।

হঠাৎ পিছনদিক থেকে মেজঠাকুমা এসে বললেন—সর।

পিছনের দিকে সুরেশ্বর তাকাতেই বললেন—জানালা বন্ধ করে দি। বিছানা করে দিয়েছে রঘু, শুগে যা। ভালো লাগবে। ছুঁড়িদের আসতে এখনও দেরী আছে। ওঃ কি দরদ বাবুসাহেবের জন্যে ওদের! অর্থাৎ গোয়ান মেয়ে।

সুরেশ্বরের জ্বরের ক'দিন তারা রোজ খোঁজ নিয়েছে। বাবুসাহেব কেমন আছে? উত্তর মেজঠাকুমা দিয়েছেন—মরণ মুখপুড়ীদের, বাবুসাহেবের জন্যে চোখে ঘুম নেই। যা—পালা। বাবুর জ্বর হয়ে আছে।

সুরেশ্বর এসে বিছানায় গড়িয়ে প'ড়ে বললে—যার মেজঠাকুমা নেই তার কেউ নেই।

ঠাকুমা বললেন—তুই বড় ডেঁপো!

—তুমিই ক'রে তুললে!

—তোর সঙ্গে ফক্কুড়ি করবার সময় নেই আমার। আমি চললাম ঠাকুরবাড়ী, ভোগের সময় হয়েছে। তোর জ্বরের আগে বলেছিলাম—ভোগের মাছের মুড়ো যেন তোর জন্যে আসে। পাঠায় নি। তার পরদিন আমার ভাজ মরল, সেখানে গেলাম, তুইও গেলি, তার পরদিন থেকে তো জ্বরে পড়লি। আজ দাঁড়িয়ে থেকে মুড়ো এখানে পাঠাব তবে আমার কাজ!

—কি হবে? আমি তো খেয়েছি।

—ওবেলা পর্যন্ত দিব্যি থাকবে, ওবেলা খাবি। তুই যেন উঠে পড়বি নে বুঝলি! একটু ছবি-টবি আঁক না। খেয়ে ঘুমুলেও অম্বল হয়। বুঝলি। আমার ফিরতে দেরী হবে। সেই সন্ধ্যেবেলা। আমি ওই খাতা খুঁজব! অনেক খাতা সুখেশ্বর হাতিয়ে রেখেছিল। কল্যাণকে পেটে পুরে বের করবার চেষ্টা করব। আমি ওকে টাকা কবলাব। খাতা দিলে সেটা দিবি। অ্যা!

—তুমি মেজদি অদ্ভুত!

—কেন রে?

—তুমি না পারো কি বল তো? মেজঠাকুরদার মত মানুষকে বশ মানাতে পার—ঝগড়া করতে পার। গোয়েন্দাগিরি করতে পার।

—আরও পারি রে। ল্যাভেণ্ডার সাবান মেখে কলঙ্ক কিনতে পারি। তুই যে তুই কলকাতার আমীর তোকেও বশ মানাতে পারি।

বলে হেসে তিনি চলে গেলেন। সুরেশ্বর প্রসন্ন বিস্ময়েই মুগ্ধ হয়ে ঠাকুমার কথা ভাবছিল

ছাদের কড়িকাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ টানাপাখাটা সচল হয়ে উঠল। ব্যাপারটা বুঝলে সুরেশ্বর ; —মেজঠাকুমাই পাখাটানা ছোঁড়াটাকে, কিল না মারুন, ধমক মেরে সচেতন ক'রে দিয়েছেন।

চোখ জড়িয়ে আসছিল আরামে। ঘুমিয়েই পড়তো, হঠাৎ ওই বন্ধ জানালাটার ওপার থেকে বোধহয় কাঁসাই নদীটাই খলখল ক'রে যেন হেসে উঠল।

গোয়ান মেয়েগুলো এসেছে নদীর ধারে তার জানালার সামনে।

তোমাকে বলব কি সুলতা, সে স্মৃতি আমার মনের মধ্যে আমি আজও অনুভব করি। এবং শিউরে উঠি।

আমার বুকের ভিতরে যেন ওই হাসির প্রতিধ্বনি উঠল, আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মধ্যে। কান দুটো মুহূর্তে গরম হয়ে উঠল। হাতের তেলোয় ঘাম দেখা দিল। আমি শুয়ে থাকতে পারলাম না। রায়বংশের রক্ত উদ্বেল হয়ে উঠল, আমি বিছানা থেকে উঠে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। হাঁপাচ্ছিলাম এবং অন্ধকারের মধ্যেও নিষ্পলক হয়ে চেয়ে ছিলাম কিন্তু কিছু দেখি নি। ভয় এবং আকর্ষণের নিদারুণ দ্বন্দ্ব হচ্ছিল। তারই মধ্যে আকর্ষণই জিতেছিল। জানালার খড়খড়ি সন্তর্পণে তুলে চোখ রেখেছিলাম। খড়খড়িতে চোখ রেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যা দেখলাম, তা দেখব এ কল্পনা ছিল না। কল্পনায় ছিল ওরা দল বেঁধে কাঁসাইয়ের পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে আমার বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সাড়া দিচ্ছে আমাকে। আমি যে কেমন আছি সে খবর ওরা রাখে, দু তিন বেলা রাখে। ভিকু পিদ্রু য' বার পাড়ায় যায় ত' বার আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে মুখে মুখে এক একটি বুলেটিন ছড়িয়ে দেয়। ওরা তার উপরে এই ভরাডুপুরে কাঁসাইয়ের ওপারে ডাল ভাঙতে পাত কুড়াতে এসে একবার খবর নিয়ে যায়। আজ নিশ্চয় খবর পেয়েছে যে, বাবুসাহেব আজ ভাত সুরুয়া খেয়েছে, সুতরাং বন্ধ জানালার ধারে এসে ওরা হেসে সাড়া দিয়ে ডাকছে। কিন্তু তা নয়। যা দেখলাম সুলতা, সে কল্পনার বাইরে। মেয়েগুলো কাঁসাইয়ের জলে নেমেছে, সামান্য স্বল্পবাস অর্থাৎ ডুরে গামছা পরে এবং উদ্দাম হয়ে সাঁতার কাটছে আর হাসছে।

রবীন্দ্রনাথের কাশীর মহিষী করুণার যৌবনোচ্ছলা শত সখীর মত ব্যাপার। তফাত সেটা ছিল শীতকাল, কাশীর শীত, সুতরাং তারা কিনারার উপরে উঠে ছুটোছুটি করেছিল আর এরা এই প্রখর গ্রীষ্মে কাঁসাইয়ের এক বুক জলে উবছে উঠছে, সাঁতার কাটছে আর জল ছুঁড়ছে আমার জানালার দিকে এবং খিলখিল ক'রে হাসছে।

কাচস্বচ্ছ জলের ভিতর অর্ধনগ্ন নারীদেহ, সে যে কি মোহের সঞ্চার করে পুরুষের মনে— সে তুমি নারী তোমাকে বোঝাতে পারব না। পুরুষে অনুমান করে বুঝতে পারে। আদিম উষার কাল থেকে প্রকৃতি এমনি করেই পুরুষকে হাতছানি দেয়। পুরুষ যেখানে সভয়ে মা ব'লে কন্যা ব'লে সরে এসেছে সেখানে সে বেঁচেছে, আশীর্বাদ পেয়েছে। আর যেখানে তাকে প্রিয়া বলে দু হাত মেলে এগিয়ে গেছে সেখানে তাকে সে পায়ের তলায় ফেলে বুকের উপর চড়ে নেচেছে। জীবজীবনে প্রকৃতি প্রথমদিকে পুরুষকে কাছে ডেকে তার সঙ্গে নর্মলীলা শেষ ক'রে খেয়ে পেটে পুরেছে! তবু সেই কাল থেকেও তো পুরুষের এই সর্বনাশীর মোহে

তার পিছনে ছোটার শেষ নেই। বুকের রক্ত তোলপাড় ক'রে উঠল আমার। তোমাকে দেখে কখনও এ মোহ জাগে নি। এমন কি ওই সেই শেফালির ঘরে টাকা দিতে গিয়েছিলাম, ওদের পাড়ায় পথের মেয়েকে টাকা দিয়ে তাদের বিস্মিত করে দিতে চেয়েছিলাম, তাদের দেখেও এ মোহ জাগে নি!

দেহ বোধহয় অবশ হয়ে যাচ্ছিল—মন মোহমগ্ন হচ্ছিল। হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে জানালাটা সজোরে খুলে গিয়ে কপালে আমার আঘাত করলে, কপালটা কেটে গেল। আমার মোহ ভেঙে গেল। আমি চোরের মত ফিরে এলাম। কপালে রক্ত পড়ছিল, রঘুকে ডেকে বললাম—তুলো টিঞ্চার আইডিনে ভিজিয়ে লাগিয়ে দিয়ে ন্যাকড়া বেঁধে দিতে।

বসে ভাবতে ভাবতে গোপেশ্বরের কথা মনে পড়ল।

শিউরে উঠলাম। নিজেকে তিরস্কারই করছিলাম, কঠিন তিরস্কার।

অনেকক্ষণ পর মন শান্ত স্থির হল। আমি কাজের অভাবে ওই পুরনো খাতাগুলোই দেখতে লাগলাম। ওল্টাতে ওল্টাতে এসে পড়ল রাজরাজেশ্বরের মুকুট খরিদের পাতাটা। মাঃ হ্যামিল্টন এণ্ড কোং, মোকাম কলিকাতা, মূল্য এক হাজার টাকা!

কালীমায়েরও সোনার মুকুট ছিল। সে শুধু সোনার। তাতে হীরে ছিল না। দাম কম ছিল। সোনার ভরি তখন চৌদ্দ-পনের-ষোল। দশ ভরি সোনার মুকুটের দাম একশো ষাট আর বানি। মানে মজুরী—সে কত? বেশী হলে পঞ্চাশ টাকা। কুড়ারাম জহরত কেনেন নি। তিনি সোনা কিনতেন। সোমেশ্বর কিনেছিলেন জহরৎ। তাঁর হাতে হীরের আংটি ছিল, দাম আড়াই হাজার টাকা। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাবার হাতের আংটি হারিয়েছিল, তার দাম ছিল পঁচিশ হাজার টাকা। সে আংটি শ্যামবাজারের এক মিস্ত্রী কুড়িয়ে পেয়ে ফেরত দিয়ে বকশিস পেয়েছিল এক হাজার টাকা। সোমেশ্বর কালীর ভক্ত তা হ'লে ঠিক ছিলেন না।

খাতা ওল্টাতে লাগলাম।

কত বিচিত্র আইটেম; কত দুর্বোধ্য খরচ। বারবরদারী খাতে খরচ। মানে বুঝতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। বুঝেও বুঝতে পারিনি। ইনাম বকশিস সহজ কথা। বারবরদারী হল ট্রাভেলিং খরচ। টি-এ। রোশনাই জলুস থেকে শুরু করে সংসার খাতে খরচে খুঁটে দেওয়ার খরচ—প্রত্যেকটি লিখে গেছে। জলসা নৃত্যগীত খাতে মোটা মোটা খরচ। বকশিস খাতে বাঈজী বিদায়ে দরাজ হাতের পরিচয়। দানখয়রাত খাতে খরচ তার থেকে কম নয়। ভিক্ষুককে এক পয়সা থেকে ব্রাহ্মণকে এক টাকা থেকে একশো টাকা। আবার হাজার টাকাও আছে। কীর্তিকলাপে মন্দিরনির্মাণ, পুষ্করিণী-কাটা টোল-প্রতিষ্ঠা ইস্কুল-প্রতিষ্ঠা মেদিনীপুর সরকারী স্কুলে দান চার অঙ্কের হিসাব। জমিদারী তদ্বির উন্নতি খাতে খরচ দেখে চমকে উঠেছিলাম। কাঁসাইয়ের ধার বরাবর সাত আট মাইল লম্বা বাঁধ মেরামত খাতে কয়েক হাজার টাকা। হঠাৎ একখানা খাতায় চোখে পড়ল শুভবিবাহ খাতে খরচ। শ্রীমান দেবেশ্বরের বিবাহের খরচ।

আমার মন কৌতূহলে উতলা হয়ে উঠল।

পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগলাম। আরম্ভ হয়েছে সিদ্ধি থেকে। সিদ্ধি এক পয়সা।

*    *    *

সে বিরাট খরচ।

কয়েকটা পৃষ্ঠা জুড়ে এক পয়সা থেকে হাজার দু হাজার পর্যন্ত দফায় দফায় খরচ জুড়ে সে এক পাঁচ অঙ্কের হিসাব। বারো হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ টাকা কয়েক আনা কয়েক গণ্ডা। দফায় দফায় পড়ে গেলাম। প্রতিটি আইটেম। কলকাতায় বউভাত হয়েছিল একটা। আর একটা বউভাত হয়েছিল কীর্তিহাটে। ব্রাহ্মণভোজন, শূদ্রভোজন, অপরাপর ভোজন, গোয়ানদের সিধা, মুসলমানদের সিধা। বারুদের কারখানা। রোশনাই খরচ। কলকাতায় বাঈনাচ। কীর্তিহাটে যাত্রাগান। লাঠিয়াল বিদায়। কত খরচ, খরচের অন্ত নাই। এর মধ্যে পেলাম একজনের নাম। ঠাকুরদাস পাল। ঠাকুরদাসের ও তস্য পুত্র-কন্যার পোশাক বাবদ। গাত্রহরিদ্রা লইয়া যাইবার খরচ মাঃ শ্রীঠাকুরদাস পাল। শ্রীঠাকুরদাসদের পাথেয়। আবার দেখলাম অষ্ট-মঙ্গলার খরচ বরকন্যাসহ ঠাকুরদাস তত্ত্ব লইয়া যায়, তদ্বাবদ খরচ একশত টাকা। কন্যা বাড়ীতে চাকর-বাকরদের বকশিস বাবদ একশত টাকা, জিম্মা ঠাকুরদাস পাল।

আশ্চর্য এই ঠাকুরদাস পাল।

পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের বিবাহের সর্বত্র যেন সে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছিল। আমার আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

চাকর? চাকরের আগে তো শ্রী লেখার রেওয়াজ ছিল না।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম স্তব্ধতা। আমার প্রপিতামহ রত্নেশ্বর রায় ছিলেন সে-আমলেরই শুধু নয় সকল আমলের দুর্লভ মানুষ। শুনেছি প্রথম জীবনে মামা বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে বিরোধ করেছিলেন তাঁর দুর্দান্ত জমিদারপনার প্রতিবাদে। অথচ এ বংশের দৌহিত্র হিসেবে তিনিই ছিলেন রায়েদের উত্তরাধিকারী ; পরে মামার সঙ্গে মিটেছিল, মামা তাকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন। তিনি মামার সঙ্গে বিবাদ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তা হলে সকলেই বলত, তিনি ঝগড়া করেছিলেন সম্পত্তির জন্য। তিনি নীল বিদ্রোহের সময় নীলকরদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে তিনি ইস্কুল করেছিলেন দুটো। চ্যারিটেবল হসপিটাল দিয়েছিলেন। ল্যাণ্ডহোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বর ছিলেন। সেকালের বড় বড় ধনী জমিদারমহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁর কজন পরম প্রিয়পাত্র ছিল, তাঁরা গ্রামজীবনের সাধারণ লোক। তাঁদের ভাইয়ের মত সমাদর করতেন। ঠাকুরদাস তাহলে তাঁদের কেউ? হঠাৎ মনে পড়ে গেল শ্যামনগরের ইস্কুলের একটা বৃত্তি আছে, মেডেল আছে, যার নাম ঠাকুরদাস স্কলারশিপ, মেডেলটার নাম ঠাকুরদাস মেডেল। গোল্ড সেণ্টার্ড মেডেল। তাহলে? কে ঠাকুরদাস পাল? খাতা ওল্টাতে লাগলাম যদি আর তার কোন পরিচয় মেলে। কিছুদিন পরেই খরচ দেখলাম ঠাকুরদাস পালের পুত্রের বিবাহে বধূ সমাদরের যৌতুকের জন্য গহনা খরিদ একদফা এক হাজার টাকা!

সে আমলে এক হাজার টাকা তো কম নয়। তখন চৌদ্দ টাকা সোনার ভরি! তাছাড়া

সাধারণ গৃহস্থঘরে সোনার গহনার প্রচলন হয়নি। গহনা ছিল রূপোর। উল্টেই যাচ্ছিলাম খাতার পাতা। নানান বিচিত্র খরচ। সেকাল যেন খরচের আইটেমগুলোর মধ্য দিয়ে নিজের একটা বিচিত্র রূপ উদ্‌ঘাটিত করছিল। কথকতার খরচ, রামায়ণ গানের খরচ, গায়ক বিদায়, আবার পাল্কি বহনের বেহারা খরচ, মদের জন্য ইনাম বকশিস, ভট্টাচার্যপাড়ায় শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যের কন্যার বিবাহে সাহায্য ; সে দু চার টাকা নয়, একশো টাকা। সন্ন্যাসীদের জন্য গাঁজা খরচ। সাপুড়েকে বকশিস। গোয়ানপাড়ার সাহায্য। ঘরতৈরীর জন্য দশ ঘর গোয়ানকে একশ• টাকা হিসাবে এক হাজার টাকা! ওই গোয়ানরা! মনে আবার গোয়ানপাড়া জায়গা জুড়ে বসল।

গোয়ানদের এনে কংসাবতীর ওপারে ওই শক্তিসাধনার সিদ্ধপিঠ থেকে কিছুটা দূরেই বসত করিয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়। এই হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়—সোমেশ্বরের পুত্র, রত্নেশ্বরের দুর্দান্ত মামা এবং রত্নেশ্বর তাঁর পুত্রও বটেন পোষ্যপুত্র হিসেবে।

অতীত কালের স্বপ্নের মধ্যে একটা বেলা কোথায় কোন্ দিকে কেটে গিয়েছিল ঠিক ছিল না তার। অনেকক্ষণ ওই গোয়ান পাড়ার দিকেই আমি তাকিয়েছিলাম। ওদের পাড়ায় যাই নি কোনদিন। ওদের সঙ্গে ভাল করে কথাও বলিনি, ওদের দিকে তাকাইওনি। তবে দেখছি বইকি। শুধু দেখা নয়, একটা আকর্ষণী বন্ধন যেন বেঁধে ফেলেছে। ডিকু—ডি ক্রুজ, রোজা রোজারিও আমার পেয়াদা হিসেবে কাজ করছে। কথাবার্তায় হিন্দী টান, হিন্দী-উর্দু মেশানো বিচিত্র বাংলা। ওরা নাকি পর্টুগীজদের বংশ। গোয়া থেকে ওদের নিয়ে এসেছিলেন গোলন্দাজী করবার জন্য। এনেছিলেন হিজলীর নবাব। মহিষাদলের গর্গ বাহাদুররাও কিছু এনেছিলেন। বাস করিয়েছিলেন। সে ইংরেজ আমলের আগে। তখন একদিকে বর্গীরা আসছে অন্যদিকে ফিরিঙ্গী জলদস্যু ওই হারমাদরাই আসছে ; ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে হিজলী নিয়ে নবাবের ঝগড়া লাগছে। এরা তখন এখানে কামান দাগত। গোলন্দাজের কাজ করত। এরা তাদেরই বংশধর। কি জন্যে যে বীরেশ্বর রায় তাদের এখানে এনেছিলেন তা জানতেন তিনি আর জানতেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু এরা এ অঞ্চলে মানুষদের বিচিত্র মেলার মধ্যে একটি অতি বিচিত্র রং এবং প্রকৃতি নিয়ে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এ দেশে এতকাল বাস ক'রে তার সবই একে একে এখানকার জলে বাতাসে রোদে মুছে মুছে প্রায় এক হয়েই এসেছে তবু কিছু বৈচিত্র্য এখনও আছে। সে মুখে আছে চোখে আছে চুলে আছে, কারু কারু রঙেও আছে। একটা পিঙ্গলাভা ফুটে বেরোয়। চোখে বারুদী উগ্রতা এবং চোখের তারায় পিঙ্গলাভা আছে। প্রচুর মদ খায়। নিজেরাই চোলাই করে। মেয়েরা উগ্র অপকর্ষ প্রসাধন করে। নির্লজ্জার মত হাসে। জামা একটা ক'রে পরে। বুড়ী মেয়েরা এখনও সেমিজ ধরণের ফ্রক বা গাউন পরে। আবার তরুণীরা আঁটোসাঁটো করে কাপড় সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দেহভঙ্গিমাকে যথাসাধ্য প্রকট ক'রে এদেশের মেয়ের মত ঝুড়ি কাঁখে কাঠকুটো ভেঙে বেড়ায়। এবং নদীর ধারে কয়েকজন একসঙ্গে জুটলেই গলা মিলিয়ে গান গায়—নির্জন প্রান্তরে বা জঙ্গলের ভিতরে—"তিলেক দাঁড়াও হে নাগর, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" সে নাগর। ব্রজের কানাই তাও তারা জানে। বাইবেলের কথা সামান্যই জানে। ওই

সামান্যেই তাদের গভীর শ্রদ্ধা। মেইরী বলে কপালে বুকে আঙুল ছোঁয়ায়!

বিবিমহলের নিচেই কাঁসাই। তার ওপারের জঙ্গলের মধ্য থেকে কাঁসাইয়ের কিনারায় এসে কতদিন ওরা দাঁড়িয়ে সমস্বরে গেয়ে যায়—তিলেক দাঁড়াও হে নাগর! কোনক্রমে যদি আমার দেখা পায় সুলতা, তবে খিলখিল ক'রে হেসে ওরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। আমি কখনও বিরক্ত হই কখনও খুশী হয়ে হাসি। তার উপর আজ যেন দারুণ মোহে পড়ে গেছি। আজই দুপুরে তাদের অর্ধনগ্ন দেহে সাঁতার দিতে দেখে কিছুক্ষণের জন্য যেন জগতের আদিম যে ঊষায় পুরুষ এবং প্রকৃতি নর এবং নারীরূপে এসে দাঁড়িয়েছিল সে ঊষাকে প্রত্যক্ষ করেছি।

সেদিন চোখে ওদের সেই আগেকার কালের আসল চেহারাটা কল্পনা করে মনে আবার একটা রঙ ধরিয়েছিলাম। সেকালের ওদের একটা পোশাকও মনে মনে ছবি আঁকিয়ে আমার মনে ভেসে উঠেছিল। আজকাল যারা ব্যাণ্ড বাজায় তাদের যে ধরনের বিচিত্র পোশাক সেই পোশাক পরিয়েছিলাম ওদের পুরুষদের। এবং মেয়েদেরও এমনি একটা ঢংয়ের পোশাক ও চুল বাঁধার ঢং মনে মনে ছকতে ছকতে এসে আবার দাঁড়িয়েছিলাম কাঁসাইয়ের ধারে বিবিমহলের দক্ষিণের খোলা বারান্দাটায়। তাকিয়েছিলাম ওপারে জঙ্গলের পশ্চিম ধার ঘেঁষে একটা টিলার উপর ওদেরই গ্রামটার দিকে। মধ্যে মধ্যে জঙ্গলের কোলে নদীর কিনারাটার দিকেও তাকাচ্ছিলাম। ওই মেয়েগুলোর প্রত্যাশায়। ওদের দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ইচ্ছেটা ঠিক কথা নয়, ঠিক কথাটা হল 'বাসনা'। ওদের ভাল করে দেখতে পেলে মনে মনে পুরনো ছাঁদের পোশাক পরিয়ে একটা ছবি দাঁড় করানো যায়। কিন্তু ওদের সাড়াশব্দে অন্ততঃ গানের সাড়া ছিল না। দূরে গ্রামটা থেকে গরুর ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল ওদের ঘরের চালের ওপর কটা মোরগ গলা ফুলিয়ে লড়াইয়ের হাঁক হাঁকছে। মধ্যে মধ্যে কুকুরের ঝগড়ার শব্দ উঠেছে। আর একটা মানুষের আভাস! কখনও একটা তীক্ষ্ণ উচ্চ নারীকণ্ঠ। ঠিক কি বলছে বোঝা যায় না। স্বরটা চিলের ডাকের মত ছড়িয়ে পড়ছে।

মনে আছে সুলতা, নদীর জলে তখন বিকেলের হলদে রোদের ছটা পড়ে রঙীন ঝকমকানি উঠছে। কাঁসাইয়ে জোয়ার আসে নীচের দিকে, এতদূর আসে না। ওপারের বন উজ্জ্বল রোদে ঝলসাচ্ছে। পাখীর ডাক উঠছে প্রচুর। কল-কল, কল-কল। কিচি-মিচি। কিন্তু সব আমার কাছে নিঝুম মনে হচ্ছে ওই মেয়েগুলোর সমবেত কণ্ঠের গানের অভাবে আর হাসির খিলখিল শব্দের অভাবে! এবং মনে হচ্ছে সামনের এই ছবিটা শুধু ব্যাকগ্রাউণ্ড, কটা মেয়ের ছবির অভাবে অসম্পূর্ণ।

এমন সময় পিছন থেকে শুনলাম সরস মধুর কণ্ঠ আমার মেজদির। মেজদির পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলছেন—কি রে, এই দুপুরে এই বারান্দায় রোদ মাথায় ক'রে দাঁড়িয়েছিস? তোর মেজদাদু পাখীটার ডাক উঠছে নাকি?

ফিরে তাকিয়ে বললাম—না!

—তবে?

মেজদিকে দেখে রসিকতা করতে ইচ্ছে হল—গোয়ানপাড়ার মেয়েগুলোর গান শুনব বলে

দাঁড়িয়ে আছি।

—সে আমি বুঝেছি। কিন্তু ও শখ কেন বল তো? গোয়ানপাড়ার মেয়ে পাখীগুলোই বেশী রে। ও স্বরে ভুলিস না। ওখানকার পুরুষগুলো মোর্গা ভাই, গলা ফুলিয়ে লড়ুয়ে হাঁক ছাড়া ডাক জানে না, আর সবই লড়ুয়ে মোর্গা! খুনখারাপিতে সিদ্ধহস্ত! মাসে দু-চারটে কাটাকাটি ওরা করেই। ওদের পিদ্রূ গোয়ানের গল্প শুনেছি, গায়ে কাঁটা দেয়। কি বাড়! আমার শ্বশুরের দাপে বাঘে বলদে জল খেত। সেই তাঁর ছেলেবেলার সাকরেদ-ভক্ত প্রিয়পাত্র ঠাকুরদাস পালকে দিনেদুপুরে ওই কাঁসাইয়ের পাড়ের উপর এই এতবড় ছোরা বুকে বসিয়ে দিয়েছিল। মরে গেল ঠাকুরদাস পাল। বলতে গেলে আমার শ্বশুরের চোখের সামনে। শুনি নাকি তাঁর ঘরেই দুজনের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে কাছারীর বাইরে গিয়ে ওই খানিকটা নদীর ধার পর্যন্ত গিয়েই ঠাকুরদাস হাত চেপে ধরলে, অমনি—! শুনেছি নাকি ঘড়া দরুণে রক্ত পড়েছিল।

—গোয়ানটার কি হল?

—তার অবিশ্যি ফাঁসি না দ্বীপান্তর কি হয়েছিল। সে আর ফেরেনি। লোকটা ডাকাত ছিল। তার মেয়েটা ওই যে হলদি বুড়ী—ওকে তো দেখেছ। সেই যে! সেই ভাসুরপোর শ্রাদ্ধের সময় এসে তোকে বউমাকে সেলাম দিলে। সালাম পহুঁছে হুজুরাইন, হামার ছোটা হুজুর! যে বললে—হমি লোক তো হিয়া পাতা পেড়ে নেই খাবো মালেক। হামরা তো হিন্দু নেহি। হমি লোক কিরিস্তান। আর হারমাদ হামরা—

মনে পড়ল সুরেশ্বরের। বুড়ীকে দেখেছিল বাবার শ্রাদ্ধের সময়।

অনেকটা বয়স বুড়ীর। রঙটা সত্যিই ফরসা। মাথার চুলগুলো শনের মতই সাদা হয়ে গেছে প্রায়। চৌকো গৌরবর্ণ মুখখানায় দাগে দাগে একটা মাকড়সার জাল আঁকা হয়ে গেছে। চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মত কটা বা পিঙ্গল। পরনে ছিল একটা সেমিজের মত ছিটের গাউন। অর্থাৎ তার গাউনত্ব ছিল না। কিন্তু সেটা তার তোলা পোশাকী গাউন; সেদিনের বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের বাড়ী আসবার জন্যই প'রে এসেছিল, তা বোঝা গিয়েছিল। তাতে ন্যাপথলিনের গন্ধ ছিল।

মেজঠাকুমা বলেছিলেন—পিদ্রূর সাজা হলে গোয়ানপাড়ার সকলে, গাঁয়ের সকলে ওকে ওর মাকে তাড়াবার জন্য বলেছিল আমার শ্বশুরকে। কিন্তু তাঁর বিচার ছিল অতি ন্যায্য। তিনি তো তাড়ানই নি বরং রক্ষে করেছিলেন। বলেছিলেন—যা ক'রেছে পিদ্রূ করেছে তার জন্য ওদের সাজা হবে কেন? সেজন্যে হলদি রায়বাড়ীর অবস্থা এত হীন হলেও খাতির না ক'রে পারে না। তবে তোমাদের মানে ভাসুরের বংশের উপর খাতির বেশী। তার মানে জান?

—কি?

হেসে ঠাকুমা বললেন—আমার ভাই তোর মেজঠাকুরদার কাছে শোনা। তিনি বলতেন দাদার চেহারা ছিল কন্দর্পের মত। তাই বা কেন? কন্দর্পের চেয়ে বেশী। কন্দর্প তো কোমল কিশোর বা যুবক। দাদার ছিল বীরের মত চেহারা। এই লম্বা। তেমনি মুখ

তেমনি চোখ তেমনি রঙ। তেমনি বুকের ছাতি। তাঁকে দেখে ওই হারামজাদীদের লালসার অন্ত ছিল না। দাদারও ক'জন গোয়ান শিকারী ছিল, তারা সঙ্গে যেত, বাঘ মারবার সময়।...

হঠাৎ ঠাকুমা মুখে কাপড় চাপা দিলেন, বললেন—আমি বলেছিলাম, আর তুমি কালো একটু মোটাসোটা বলে তোমার দিকে তাকাতো না বুঝি? ওঃ জ্বলে উঠতেন। দশবার রাধা রাধা বলে বলতেন—শুনলে পাপ হয় এ কথা।

সুরেশ্বর চিন্তার রাজ্য থেকে ফিরে এসে মেজঠাকুমার সঙ্গেই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, উপভোগ করেছিল এই আশ্চয সেকেলে অথচ সর্বকালের মাধুর্যময়ী এই রূপসী ঠাকুমাটির কথাগুলি। উত্তরে নিজেও রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারেনি, বলেছিল—তুমি বুঝি তাঁকে পাহারা দিতে হলদিদের দল যখন আসত? ছাদে উঠেও গোনপাড়ার দিকে তাকাতে দিতে না!

হেসে উঠলেন মেজঠাকুমা, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—যেন ঠোঁটের ডগায় উত্তরটি উদ্যত হয়েছিল, সেটা তোকে সাবধান করা দেখে বুঝতে পারছিস না। সেইজন্যে তো বলছি ভেতরে চল্। মনসার কথায় আছে মনসা যেন বেটীকে বলেছিলেন—সব দিক পানে তাকিয়ো মা, দক্ষিণ দিক পানে তাকিয়ো না। তোর দাদু ছিলেন কালো এবং আমি যেকালে ভার পেয়েছিলাম সেকালে তিনি বুড়ো হয়েছিলেন। তোর দাদু তোকে দেখে বলেছিলেন—নাতি, তোমাকে দেখে দাদাকে মনে পড়ছে। তিনি রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন। তুমি তার তুল্য কি তার থেকেও সুন্দর হে। তুমি সুন্দর তুমি নবীন। পাঁচজনে কলঙ্ক দিয়ে তোকে আমার নটবর করে তুলেছে। আমাকে ভাবনায় ফেলেছিস তুই। আয়, ওদিকে সেই মুখপুড়ী ছুঁড়ীদের গানের জন্য কান পেতে দর্শনের জন্য চোখ পেতে থাকতে হবে না।

ঘরে এসে ডেকচেয়ারে বসলাম। টানাপাখা আবার চলতে লাগল।

দিনের বেলা খেয়ে না ঘুমিয়ে বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সুলতা, তার মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিলাম; কি দেখেছিলাম মনে নেই, তবে তার মধ্যে ঠাকুরদাস ছিলেন, আমার ঠাকুরদাও উঁকি মেরেছিলেন আর পিদ্রু ছিল, গোয়ানপাড়ার মেয়েগুলোও ছিল। এলোমেলো জড়ানো স্বপ্ন। মানে মাথার মধ্যে সেকালের ওই ইতিবৃত্তগুলো মাতালের মদের নেশার মত ঘুরপাক খাচ্ছিল।

স্বপ্নের শেষের দিকটায় ঠাকুরদাসের রক্তাক্ত দেহ ছিল মনে আছে। একটু আতঙ্কের সঙ্গেই জেগে উঠলাম। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে—

রঘু চা এনে দিলে।

চা খেয়ে কি মনে হল, ভাবলাম, ঠাকুমা বললেন—ঠাকুরবাড়ী-কাছারী থেকে বেরিয়ে কাঁসাইয়ের ধারটায় গিয়ে পিদ্রু খুন করেছিল ঠাকুরদাসকে। জায়গাটা দেখে আসি!

বেরিয়ে পড়লাম।

কীর্তিহাট গ্রামখানা নদীর ধারে ধারে লম্বা—কলকাতার মত গড়ন। রায়বাড়ী তার এক পাশে। মানে যে দিকটা জুড়ে আছে তার পরে আর অন্যলোকের বসত নেই। নদীর ঘাটে

গিয়ে একটা রাস্তা পড়েছে। তার ওপারেই গোয়ানপাড়া।

গিয়েছি অনেকবার। কিছুই ছিল না। থাকবার মধ্যে জঙ্গল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলাম।

গোয়ানপাড়ায় তখন হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি চলছে। গরুকে ডাকছে ছাগলকে ডাকছে। হাঁসকে ডাকছে—আ-তি-তি-তি। আ কোর কোর তি-তি-তি। আ—ছেলেগুলো কোলাহল করছে। বকাবকিও শোনা যাচ্ছে। কলহ নয়। গুরুজনেরা বকছে ছেলেমেয়েদের। আমার পাশ দিয়ে ক'টা গোয়ান মেয়ে কীর্তিহাটে বাজার করে ফিরে এসে নদীর ঘাটে নামল। হাতে মুখে দড়ি বাঁধা কেরোসিনের বোতল, মাথায় একটা ক'রে ডালা। আর একটা করে সরষের তেলের ভাঁড়।

আমাকে দেখে ফিক ফিক করে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে। আমি প্রাণপণে গম্ভীর হয়ে বিচরণ করছিলাম, বলতে পার শিশিরবাবুর চিন্তামগ্ন আলমগীরের মত। ওদের দেখে ভয়ার্ত যেমন মেকী সাহস দেখায়, তেমনি পোজ নিয়েছিলাম আমার মনে আছে। কিন্তু ওরা ছাড়বার পাত্রী নয়, ওদের উপমা আমাদের পুরাণে, কাব্যে খুঁজে পাই নে। প্রমীলার রাজ্যের কথা শুনেছি। বিস্তৃত বিবরণ নেই। থাকলে বোধহয় উপমা মিলত। ওরা বললে, সেলাম মালিকসাহেব।

আমি বললাম, সেলাম।

—হুজুরের বোখার হয়েছিল। কতদিন জানালাতে দেখি নি। আব্‌ তবিয়ৎ ভাল হল?

—হ্যাঁ। হয়েছে।

তবুও ছাড়ান দিলে না। বললে, গোয়ানপাড়ার ঘাটে হুজুর?

বললাম, বেড়াতে এসেছি।

—তবে চলেন মালিক হমলোকের গাঁওয়ে।

বললাম, না, তোমরা যাও।

—কোইকে ডেকে দিব হুজুরবাহাদুর?

—না।

—আর তসবীর আঁক না মালিক?

—না।

—এই রোজা মেয়েটা বলে, হুজুরকে বলব, হুজুর হামার তসবীর আঁকো। তা ওর আঁক না হুজুর। উর খুব শখ। আর উ দেখতে ভি খুব সুরত আছে।

এবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

আমি নিশ্চয় রাঙা হয়ে উঠেছিলাম। এরা তো সুলতা, অসীমা, সীমা নয়, এদের সঙ্গে আমার পেরে ওঠবার কথা নয়। আর এরা চীৎপুরের বাড়ীর দরজায় যারা পেটের অন্নের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তারাও নয় যে, পকেট থেকে টাকা দিয়ে ঘরে যেতে বললে কৃতজ্ঞতায় মাথা হেঁট করে মনে-মনে পায়ে মাথা ঠেকাবে। এদের গায়ে হারমাদের রক্ত। এরা কাঁসাইয়ের ধারের জঙ্গলে বাস করা আদিম নারী। আমি ভঙ্গ দিলাম। যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সঙ্গে ওদের

দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাঁয়ের মুখে ফিরলাম। ফিরতে গিয়েই দেখলাম, পিছনে জঙ্গলের মধ্যে কে একজন লুকুচ্ছে। আমি গ্রাহ্য করলাম না, চলে এলাম। কিছুটা এসেছি অমনি মেয়েগুলোর তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি পেয়ে আবার থমকে দাঁড়ালাম। অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে কাকে। একটা কথা কানে এল—এঁঃ, রায়বাবুর বাড়ীর লড়কা। কুত্তার পাকিটে একঠো দামাড় নেহি বাবু খিতাব। যা-যা, ভাগ। নেহি তো নাক কেটে লিবো রে শালা!

বুঝলাম, কোন রায়বংশের গুণধর ওদের পিছু নিয়েছিল। তাকেই এ-কথা বলছে।

দুপুরে নিজে যা করেছি তার জন্য লজ্জায় মরে গেলাম।

এবং তখনই বোধহয় জিতে গেলাম।

যৌবনের ধর্মকে আমি মানি। ব্যভিচারী বলে যারা সংসারে ঘৃণিত, তাদের বিচারও আমি সহানুভূতির সঙ্গে করেছি। কিন্তু হ্যাঙলামি-কাঙালপনা; নারীর সঙ্গে প্রেমের ক্ষেত্রে ছিঁচকে চোরের বা গাঁটকাটার কাজ যারা করে, তাদের ঘেন্না করে এসেছি। আমার এই জ্ঞাতি-পুত্রটিকে দেখে যে ঘেন্না হল তার ওপর, তার থেকেও বেশী ঘেন্না অনুভব করছিলাম নিজের ওপর। বিল্বমঙ্গলের মত চোখ দুটোর ওপর ক্রোধের আর সীমা ছিল না।

খারাপ, অত্যন্ত খারাপ মন নিয়েই ফিরে এলাম।

একটা কথা এক সময় বিদ্যুচ্চমকের মত মনে হল, মানুষের এই পাপ রায়বংশে এমন করে বাসা বাঁধলে কেন?

বাবার কথা মনে পড়ল। মাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, সুরেশ্বরকে নারীদের থেকে দূরে থাকতে বলো। যদি নাই থাকতে পারে, তবে যেন বিবাহ করে।

আর একটা কথা মনে পড়ল, প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক মানুষ আর মানুষীর মধ্যে দুটিতেই আবদ্ধ রাখতে হয়। বাকি ক্ষেত্রে সম্পর্ক পিতা-কন্যা; মাতা-পুত্রের। কথাটা রায়-বাহাদুর রত্নেশ্বরের। তিনি বলে গেছেন।

গোয়ান মেয়েগুলোকে মনে মনে মা বলতে গিয়েও পারি নি। তোমাকে মনে করতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তোমার মুখ ঢেকে ওদের মুখ ভেসে উঠছিল। এরই মধ্যে কখন এসে পৌঁছে গিয়েছিলাম বিবিমহলের দরজায়। মাথা হেঁট করেই আসছিলাম। হঠাৎ শুনলাম, কে বললে—এই যে!

মাথা তুলে দেখলাম, সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের পেশকার।

লোকটা কালো, রোগা, যারা খুব ধূর্ত হয়। বললে, এই তো বেড়িয়ে এলেন। তাহলে তো ভাল আছেন!

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, লোকটা কি দেখতে এসেছে আমার অসুখ কতটা সত্যি, তাই?

লোকটা বলে চলেছিল—ওঃ, কতক্ষণ এসেছি, আধ ঘণ্টার উপর। চলুন, সাহেব বসে আছেন। মিসেস ঘোষ কাল কলকাতা যাবেন। হঠাৎ ঠিক হয়েছে। তাঁর ছবি এঁকে দেবার কথা আছে। সেটা নিয়ে যাবেন তিনি।

—মানে? এই রাত্রে?

—হ্যাঁ। কাল যে কলকাতা যাবেন, সেখানে দেখাবেন তিনি।

কি হয়ে গেল মেজাজ, বললাম, বলবেন, রাত্রে ছবি আঁকা হয় না।

—হেজাক-বাতি ঠিক করে রেখেছি।

—বলবেন, হবে না। পারব না। আমার শরীর ভাল নেই।

—উনি চটে যাবেন। মেমসাহেব ঝোঁক ধরেছেন।

—তাহলে চটতে বলবেন। বিরক্ত করবেন না। বলে আমি ঘরে ঢুকে গেলাম।

সুরেশ্বরের নিজস্ব কর্মচারী ঘোষাল। হরচন্দ্রেরই ভাইপো। সে বললে, কথাগুলো কড়া হয়ে গেল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে, তা হোক!

নায়েব বললে, পরশু থেকে কীর্তিহাটে বুঝারত হবে আজ ঢোল পড়ল। সাহেব নিজে করবেন।

—তা করুন।

—আপনাকে হয়রান করবে এই আর কি!

—কি হয়রান করবে?

—সঙ্গে সঙ্গে রোদে রোদে ঘোরাবে হয়তো। হয়তো আমাদের কথা শুনবে না। স্বত্বের ঘরে ওরা যা বলবে তাই লিখবে। ওদের তো লম্বা হাত!

—ঠিক আছে। আপনি কাগজপত্র ঠিক করে রাখুন, থাকলে দেখাবেন। না থাকলে বলবেন, কাগজ নেই, অন্যে যা বলছে তাই লিখুন তিনি। তারপর তো মুন্সেফ কোর্ট, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, হাইকোর্ট আছে।

চুপ করে রইল নায়েব, কথাটা তার মনঃপূত হল না। সে একটু চুপ করে থেকে মাথা চুলকে বললে, একবার চলুন না সাহেবের কাছে। গিয়ে বলবেন, দেখুন লোকজনের সামনে পেশকার আপনার এইভাবে কথা বললে—

সুরেশ্বর একটু রুক্ষভাবেই বললে—না।

নায়েব চলে গেল। সে বিবিমহলের সেই চারিপাশ খোলা ছাদওয়ালা বারান্দায় ঘুরতে লাগল। মন তিক্ত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে এসব ওই ওদের দানপত্র করে চুকিয়ে দিয়ে চলে যায় সে, তাহলে এই হরেন ঘোষ নামক সেটেলমেণ্ট হাকিমের লম্বা হাতটিও আর তার নাগাল পাবে না। সে তখন ঠাকুরদাস পালকেও ভুলে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল হুইস্কির বোতল সে এখনি খোলে। এবং তারপর বাজনা বাজায়। রঙ-তুলির মত বেহালাও তার সঙ্গী। সঙ্গেই এনেছে। কিন্তু এই বাজনাটা তার লোকজন থাকলে যেন নিজের কাছেই জমে না। বিশেষ করে এখানকার লোকজন।

সেই বাপের শ্রাদ্ধ থেকে এ পর্যন্ত তার তিনবার আসা হল, এখনও পর্যন্ত বলতে গেলে গ্রামের লোকের কাছে সে অপরিচিতই। এদের যা স্বভাবচরিত্র, সে তার বাবার শ্রাদ্ধের সময় এসে দেখেছিল। সেটা একান্তভাবে লোভ আর খানিকটা সেও লোভ বা আর এক

ধরনের ক্ষুধা—রক্তমাংসের দেহের ক্ষুধা, এই সর্বস্ব। কিন্তু এবার এসে আরও গভীর এবং ভয়াবহ চেহারা দেখছে। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে যে ক্ষুদ্রতা এদের এবং যে কুটিলগতিতে সে-ক্ষুদ্রতা পাক খায়, তার তুলনা হয় একমাত্র সাপের সঙ্গে। প্রথমটার তুলনা শেয়ালের সঙ্গে। সত্য বলতে গেলে, এদের সে সহ্য করতে পারে না।

ডিকু বলে, বিলকুল সব হারামী আছে হুজুর।

রোজা অর্থাৎ রোজারিও বলে, বিনা মতলবে কোই বাত করে না মালেক। ঝুটা আদমী, ঝুটা বাত্!

সুরেশ্বরও তাই মনে করে, এদের মধ্যে অস্বস্তিও বোধ করে। এমনকি প্রশংসা কেউ করলেও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। বোধহয় ওরাও জানে সেটা অর্থাৎ সুরেশ্বর রায় তাদের চেনে এটাও ওরা বুঝেছে। তাই কেউ এদিকে ধার ঘেঁষে না। একমাত্র ওই মেজঠাকুমা! এই রায়বাড়ী, এই কীর্তিহাট গ্রামে ওই মহিলাটিই তার পরমাত্মীয়, প্রিয়জন। তিনি তাঁর সঙ্গে আদিরস-ঘেঁষা রসিকতা করলেও মিষ্টি লাগে, তার তোষামোদ করে তাকে তাঁর অন্নদাতা বললেও সে সঙ্কোচ বোধ করে না; মনে হয় না কোন মতলবে বলছেন। তিনি দুপুরে একবার খাবার সময় আসেন, আবার সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ী ফেরত পুষ্পচরণোদক নিয়ে তাকে দেন, রাত্রে কি কি খাবার আয়োজন করেছে ঠাকুর তার তদ্বির করে চলে যান। তিনি তো জানেন তার হুইস্কি খাওয়ার কথা, তাই খাওয়ার আগেই চলে যান। হুইস্কির সঙ্গে রাত্তিরের খাবার খেয়ে নিয়ে সুরেশ্বর এসে বসে ওই সামনের মনোরম খোলা বারান্দাটিতে, হাতে বেহালা থাকে। বাজায় আপনমনে। আমেজ লাগে।

আজ এই উত্তেজিত মুহূর্তটিতে সে হুইস্কির বোতলটা খুলে বসে গেল। মেজঠাকুমা এখনও আসেননি। সেজন্য সুরেশ্বর আজ বিরক্ত হয়েছিল মেজঠাকুমার উপর। মনে মনে প্রশ্ন করেছিল, কি দরকার ওঁর রাত্রে আসবার?

প্রায় সেই ক্ষণটিতেই মেজঠাকুমা এসে গিয়েছিলেন। মুখে সুরেশ্বর কিছু বলতে পারেনি। তাই বা কেন, মনটা প্রসন্নই হয়ে উঠেছিল।

মেজঠাকুমা কিন্তু সেদিন ঠিক সেই মানুষটি নন, যাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের হাসি এবং সরস বাক্যে কীর্তিহাটের এই নির্বাসনবাসটি মধুর হয়ে ওঠে।

পুষ্পচরণোদক দিয়ে বললেন, আজ নদীর ওই গোয়ানপাড়ার ঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। ঠাকুরদাস পালকে পিদ্রুগোয়ান ওইখানটায় খুন করেছিল, বললে না তুমি? মনে হল জায়গাটা একবার দেখে আসি।

—হুঁ। তা ডিকু কি রোজারি কি রঘুকে সঙ্গে নিলেই পারতে। একলা গেলে কেন?

—কি বিপদ, আমি কি ছেলেমানুষ, পথ হারাব?

—ওরা তো তাই রটাচ্ছে, তুমি ওদের ছুঁড়িগুলোর ইসারায় পথ হারাতেই গিয়েছিলে। চন্দ্রেশ্বর দেখেছে।

চন্দ্রেশ্বর সুখেশ্বরের ছোট ছেলে।

—ও। হ্যাঁ দেখলাম বটে। গ্রাম থেকে কেউ ওদের পিছু নিয়েছিল। আমি ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে জঙ্গলের মধ্যে গাছের আড়ালে লুকিয়েছিল। মেয়েগুলো যা কুৎসিত ভাষায় ওকে গালাগাল করছিল।

—সেটা এবার তোমার নামে রটল।

—রটুক।

—না ভাই। আমার গায়ে লাগে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল থেকে লোক সঙ্গে করে বেরুবি।

—কেন ? এখানে সাক্ষী রেখে বেড়াতে হবে নাকি ? না, তোমারও সন্দেহ হচ্ছে ?

—তুই আচ্ছা গোঁয়ার কিন্তু। রায়বংশ তো !

—বলতে দাও। ওদের বলতে দাও। ওটা আমার প্রাপ্য রায়বংশ বলেই। কিন্তু তোমার সন্দেহ হয় কিনা বললে না তো।

—হলেই বা তোর তাতে কি যাবে-আসবে বল ?

বুঝলাম অভিমান।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, সায়েবের পেশকারের সঙ্গে ঝগড়া করলি।

—হ্যাঁ, তাও করেছি। দরকার হলে আবার করব।

—ওরা মানে ধনেশ্বর লাফাচ্ছে। প্রণবেশ্বর খুশী। পরামর্শ হচ্ছে—কাল প্রথমেই ওরা বাড়ীর স্বত্বে আপত্তি দেবে। বলবে, বাড়ী দেবোত্তর। মানে প্রণবেশ্বরদের অংশ যা কিনেছ, এই বিবিমহল যা তোমার নিজস্ব, এর সব দেবোত্তর। মানে বিক্রী সিদ্ধ নয়। ভাগ সিদ্ধ নয়। সব তো শুনেছিস।

বিরক্তিতে, ক্ষোভে, ঘৃণায় সুরেশ্বরের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে বললে, নিক ঠাকুমা নিক ওরা। ওতে আমার দরকার নেই। নিক।

—না ! কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠল মেজঠাকুমার। বললেন, জমিদারের ছেলে হয়ে এই কথা বলছিস তুই ? ছি ! দিতে ইচ্ছে হয় দিতে পারিস। কিন্তু ঠকিয়ে নিতে দিবি ? পরকে ঠকিয়ে নেওয়া যেমন পাপ, জেনেশুনে নিজে ঠকাও তেমনি ঘেন্নার কথা। সে যদি আবার ক্ষমতার অভাবে হয়। শোন, তোকে বলি,—যে-খাতাগুলো তোকে দিয়েছি, তার সবগুলো খোঁজ। ওর মধ্যেই পাবি রায়বাহাদুরের দেবোত্তরের বাইরে কলকাতায় যে ব্যবসা ছিল, শেয়ার ছিল কোম্পানীতে, তার জমা-খরচের খাতা। আমি দেখেছি সে খাতা। তার মধ্যে ইমারত খরচ পাবি। তোর কলকাতার বাড়ী এখানকার বাড়ী সব সেই টাকাতে।

বলে চলে গেলেন মেজঠাকুমা।

তার দিকে সুরেশ্বর তাকিয়ে রইল সবিস্ময়ে শুধু নয়, সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে। আজ তাঁর এক নতুন চেহারা দেখেছে সে। একেবারে রাজমাতার মত চেহারা। আশ্চর্য, পুজুরী বামুনের মেয়ে, এমনটা হল কি করে ?

* * *

—সমস্ত রাত্রি আমি খাতা উল্টেছিলাম। পাতার পর পাতা। আজ আর ইতিহাস

ঘাঁটতে নয়, নজীর খুঁজতে। ঠাকুমা মনের মধ্যে একটা তেজ বা আগুন জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিলেন সুলতা। সে আগুনটা অ্যালকহলের ছিটে পেয়ে জ্বলে উঠেছিল জোরালো হয়ে। ওদের রায়ত কেনা মেরামত-করানো ভিতর-বাড়ীটা ওরা ঠকিয়ে নেবে ?

এদের অর্থগৃধ্নুতার জন্য নীচতার জন্যে ঘেন্না, ওদের জোট বেঁধে আমাকে ঠকাবার চেষ্টায় রাগ—ওদের মেজঠাকুমাকে পর্যন্ত কলঙ্কিনী অপবাদ দেওয়ার কুৎসিত প্রবৃত্তির জন্য ক্ষোভ—এগুলো মিলে আমাকে নিষ্ঠুর কঠোর করে তুলেছিল সেদিন। মদ খেয়েছিলাম মধ্যে মধ্যে, আর খাতাই উল্টেছিলাম পাতার পর পাতা, খাতার পর খাতা।

২

কিছুই পেলাম না। দেবোত্তরের খাতার মধ্যে কোথাও পেলাম না ইমারৎ খরচ। আবার ওল্টাতে লাগলাম। এবার হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা টাকা জমা হয়েছে সেইদিকে। সামান্য টাকা, দেড়শো টাকা জমা ! মাঃ সোমেশ্বর রায়। দেবোত্তরের ইটের পাঁজা বিক্রয় হয়, সোমেশ্বর রায় অন্দরমহল তৈরীর জন্য খরিদ করেন—তস্য মূল্য বাবদ দেড়শত টাকা ! চমকে উঠলাম। এই তো পেয়েছি। অর্থাৎ দেবোত্তর থেকে ইট নিয়েও তার দাম পর্যন্ত সোমেশ্বর রায় দিয়েছেন নিজের তহবিল থেকে। পুরো এক গ্লাস হুইস্কি খেয়ে বেহালাখানা তুলে নিয়ে ভাবলাম বেহালা বাজাব। গভীর রাত্রি। আকাশে পশ্চিম দিকে চাঁদ পাণ্ডুর হ'তে সবে আরম্ভ করেছে। ছোটজাতের এক রকম পাখী আকাশে ক্রমাগত উড়েই বেড়াচ্ছে। সে পাখী তুমি বোধহয় দেখনি সুলতা, কলকাতায় কাটিয়েছ তো সারা জীবন ! ওরা চকোর। কাঁসাইয়ের ওপারের জঙ্গল থেকে কোন ফুলের গন্ধ আসছে। বউকথাকও পাখীটাও ডাকছিল। গ্রাম নিস্তব্ধ। শুধু মধ্যে মাঝে গ্রামের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে চীৎকার করছিল। ছড়িটা তুলে নিয়ে টান দিয়েছি ; বাজাব—'শুন যা শুন যা পিয়া'। তোমাকেই ভেবেছিলাম মনে মনে ! হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল। জমাখরচের খাতাখানা খোলাই ছিল, ফরফর ক'রে ওল্টাতে লাগল। পুরোনো কাগজ ছিঁড়ে যাবে ভয়ে ছড়িটা দিয়েই চেপে ধরলাম এবং বেহালাটা রেখে বন্ধ করতে গেলাম।

হঠাৎ নজরে পড়ল পাতাটায় লেখা—সৎকার খরচ ; ঠাকুরদাস পাল খুন হওয়ায় তাহার লাশ সদরে যায় ; সদরে লোক পাঠাইয়া তাহার শবদেহ সৎকারের খরচ, পঁচাত্তর টাকা। তার জায় রয়েছে—বারবরদারি যাতায়াত খরচ, তাহাদের খাদ্য খরচ, চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃত, নূতন বস্ত্র ইত্যাদি খরচ ! ঠাকুরদাস পাল। সেই ঠাকুরদাস ! সে খুন হয়েছে। তার সৎকারে চন্দন কাষ্ঠ ঘৃত খরচ করেছেন রত্নেশ্বর রায়।

আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। ওল্টাতে লাগলাম। ঠাকুরদাসের শ্রাদ্ধের খরচ পেলাম। সেই পৃষ্ঠাতেই পেলাম পিদ্রু গোয়ানের পরিবারকে সাহায্য।

একটা আশ্চর্য চেহারা ফুটেছিল রত্নেশ্বর রায়ের। মাথাটা নত হয়ে এল। আক্রোশ ক্রোধ তাঁর চিত্তকে দৃষ্টিকে অভিভূত করতে পারে নি। ঠাকুরদাসকে যে খুন করেছে তার

অপরাধে তুমি তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে অপরাধী করনি।

উল্টেই গেলাম খাতা। হঠাৎ একটা চার অঙ্কের খরচ চোখে পড়ল। পনেরশো টাকা। খরচের বিবরণ প'ড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। হুজুর বাহাদুরের পত্রের আদেশ অনুযায়ী পিত্রু গোয়ানের দায়রা মামলায় তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য একজায়গায় খরচ—পনেরশো টাকা।

চমকে গেলাম।

প্রতিটি পাতায় রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের সই রয়েছে। বিশ্বাস করতে পারলাম না। পিত্রু গোয়ানের দায়রা মামলায় পনেরশো টাকা সাহায্য? তার পরিবার সন্তান-সন্ততিদের সাহায্য করেছেন বুঝতে পারলাম। দয়া করুণা! এও কি দয়া? করুণা? গোয়ান মেয়েটি কি এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল—বাঁচাও হুজুর! বাঁচাও আমার স্বামীকে! না—? সন্দেহ হচ্ছিল রত্নেশ্বর রায়ের মত ব্যক্তিকেও।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল শ্যামনগরে চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি আছে—ঠাকুরদাস দাতব্য চিকিৎসালয়! মনে মনে প্রণাম করলাম রত্নেশ্বর রায়কে, বললাম—ক্ষমা কর আমাকে।

সারাটা রাত মদের নেশাতেও ঘুম আসেনি।

সকালবেলা স্নান ক'রে নেশাটা কেটেছিল, কিন্তু রত্নেশ্বর রায়ের চরিত্র নিয়ে যে ঘোরটা লেগেছিল সেটা কাটেনি। মনের মধ্যে একটি কথাই ধ্বনিত হচ্ছিল—অদ্ভুত! অদ্ভুত! চা খাচ্ছিলাম এমন সময় আমার কর্মচারী এসে ডাকলে—বাবু, বুঝারত আরম্ভ হয়েছে। গ্রামের নৈঋর্ত কোণ থেকে। এসে পড়ল বাড়ীর সীমানায়। ওরা বাড়ী দেবোত্তর বলে আপত্তি দেবে।

—ঠিক আছে চলুন। ডিকুকে বা রোজারিওকে ডাকুন। খানকয়েক খাতা নিয়ে যেতে হবে।

বাড়ীতে আসতে দেরী ছিল। নায়েব শঙ্কিত হয়ে ছুটে এসেছিল। নৈঋর্ত কোণ থেকে উত্তর দিকে সেটেলমেণ্ট চলছিল। সাহেব টেবিলের উপর ম্যাপ গেঁথে তা থেকে প্লট বাই প্লট বুঝারত করে চলেছিলেন। লোক অনেক জমেছে। গ্রামের বর্ধিষ্ণু ব্যবসাদার সুরেন দে, রাধাগোবিন্দ ভটচাজ, শিবনাথ ওঝা, নটবর সিং, নন্দ ঘোষ, নটু বাউড়ী, মোটা কালো ইব্রাহিম শেখ, তা ছাড়া ধনেশ্বর, প্রণবেশ্বর এঁরা তো আছেনই।

সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—এতক্ষণে সময় হল আপনার?

—তাতে আপনার কাজে ব্যাঘাত হয়েছে?

—নিশ্চয় হয়েছে। আপনারা জমিদার। প্রজা যে স্বত্ব বলছে সে সম্বন্ধে আপনাদের সম্মতি কিম্বা আপত্তি দুটোর একটা চাই। না হলে আমার কাজ শেষ হয় না। ওগুলোতে আপনার মতামত কিছু নাই তাই আমি লিখেছি। মানে প্রজার পক্ষেই গেছে। এঁরা আপত্তি দিয়েছেন। লিখেছি। এটাতে কি বলুন?

তবুও বুঝতে পারলাম না। সবে তো পনের বিশ দিন গেছে। প্রজাইস্বত্বের ব্যাপার ঠিক রপ্ত হয়নি।

হঠাৎ পিছনে একটা দুর্বোধ্য হাউহাউ শব্দ শুনলাম। সকলেই ফিরে তাকালে। দেখলাম, একজন বৃদ্ধ, লোলমাংস থলথল করছে, তার মধ্যে হাড়গুলো প্রকট হয়েছে, মাথায় চুল উঠে গিয়ে যে ক' গাছা আছে তা সাদা ধপধপে এবং ব্যোমকেশের মত উর্ধ্বমুখী, একমুখ খোঁচাখোঁচা দাড়ি গোঁফ, ভুরু দুটোও পাকা এবং ঘন মোটা। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, একজন তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী ফিটফাট পোশাকপরা ভদ্রলোকের হাত ধ'রে আসছে। চোখে দৃষ্টি নেই, ঘোলাটে চোখের তারা দু'টো শূন্য-লোকের দিকে স্থির নিবদ্ধ, পা দুটো ঠিক পড়ছে না। লোকটা হাউহাউ করে কি বলছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

অফিসার বিরক্তিভরে তাকালেন। বললেন—চীৎকার করো না এমন ক'রে!

বৃদ্ধের সঙ্গের ভদ্রলোকটি খাসা ইংরেজীতে বললেন—তার নিজের কথা বলবার অবশ্যই স্বাধীনতা আছে।

হাকিম চটে উঠে বললেন—কে তুমি? ওইই বা কে?

ভদ্রলোক বললেন—ওঁর নাম বহুবল্লভ পাল। উনি এইখানকার বিশ দাগ প্লটের মালিক। আমি ওঁর ছেলে, উনি চোখে দেখতে পান না, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ইংরিজীতেই বললেন।

উরু ভটচাজ, সে প্রৌঢ় লোক, বিচিত্র-চরিত্র মানুষ বলে পরিচয়টা শুনেছিলাম সুলতা, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় বিশেষ ছিল না। শুনেছিলাম প্রথম যৌবন থেকে মেজঠাকুরদার থিয়েটারে পার্ট করতেন, তারপর প্রেম করে একটি শূদ্রকন্যাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। বাড়ীর জমি বিক্রী করে কিসের দোকান করেছিলেন, তারপর ফেল পড়ে গ্রামে ফিরে বিয়ে করে রায়বাড়ীতে চাকরীও করেছিলেন। এখন গ্রামে মাতব্বরী করেন। ক্রিয়াবাড়ীর যজ্ঞে উরু ভটচাজ অপরিহার্য। তিনি রান্নাশালে মোড়া নিয়ে বসেন। বাঁ হাতে সিগারেট পোড়ে ডান হাতে হুঁকো থাকে। কোন নেশা নেই এ ছাড়া। ওই খেয়েই ক্রিয়া শেষ ক'রে উঠে যান। তবে এখনও নাকি ব্রাত্যপাড়া থেকে গোয়ানপাড়া পর্যন্ত মেয়েদের কাছে প্রিয়জন। তার জন্য কিন্তু তিনি লজ্জিত নন। কথা-বার্তা খুব ভাল বলেন অবশ্য তার একটা বিশেষ ধরন আছে। উরুবাবু বলে উঠলেন—ব্রিলিয়াণ্ট স্টার অব আওয়ার ভিলেজ স্যার। উজ্জ্বল নক্ষত্র। এম. এ'-তে ভাল রেজাল্ট করেছে। আমাদের বহুবল্লভ পালের ছেলে। শ্রীরাধাবল্লভ পাল। উকীল হয়েছেন।

হাকিম বললেন—নরম সুরে বললেন—বেশ তো, কি বলতে চান সেইটে তো পরিষ্কার ক'রে বলতে হবে।

রাধাবল্লভ বললেন—উনি বলছেন এসব হল লাখরাজ।

এবার ধনেশ্বর এগিয়ে এসে বললেন—না। ওগুলি জোতের সামিল।

—এাঁ? জিজ্ঞাসা করলে বহুবল্লভ।

কানের কাছে মুখ এনে ছেলে বললে—ধনেশ্বরবাবু বলছেন—না। এ সব জোতের সামিল! রায়তি স্থিতিবান!

—না। চীৎকার করে উঠল বহুবল্লভ।

হাকিম বললেন—বেশ তো, কাগজ দেখান। লাখরাজ তার প্রমাণ তো দিতে হবে।

—এ্যাঁ ?

কানের কাছে মুখ রেখে ছেলে বুঝিয়ে দিলে। তাতে পাল বললে—কখনও খাজনা আমি দিই নাই! কখুনও না! আমার বাবার আমল থেকে! হ্যাঁ!

উকীল বললেন—ভোগদখল সূত্রে নিষ্কর।

হেসে হাকিম বললেন—নিশ্চয় লিখব। তার সঙ্গে ধনেশ্বরবাবুদের আপত্তিও রেকর্ড করতে হবে আমাকে।

—ধনেশ্বরবাবু! আহা—হা! চীৎকার ক'রে উঠল বহুবল্লভ—রায়বংশের মুখ উজ্জ্বল করছে। বাহবা বাহবা!

ধনেশ্বর বললেন—বহুবল্লভ, তোমার ধন হয়েছে, ছেলে এম-এ পাস করেছে, না ? তবুও কথাটা হিসেব ক'রে বলো। বুড়ো হাতী মরতে মরতেও সে হাতী! সেকাল হলে—।

বহুবল্লভের উকীল ছেলে বললে—ড্রোনস অব দি সোসাইটি। লজ্জাও নেই এদের!

প্রণবেশ্বরের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, সে বললে—এর মধ্যে ঝগড়ার তো কোন কারণ নেই। বহুবল্লভ যা বলেছে—

—প্লীজ সে বহুবল্লভবাবু! বললে উকীল ছেলে!

—বহুবল্লভবাবু ?

—হ্যাঁ, না বললে উনিও নাম ধরে বলবেন!

—বেশ! যে যা বলছে তাই রেকর্ড করুন আপনি স্যার।

বহুবল্লভ তবু থামল না। সে হাউহাউ করে বললে—কীর্তিহাটে বসতবাড়ী আর গোচরের খাজনা মাফ ছিল। কখুনও জমিদার লেয় নাই, পেজাতে দেয় নাই। মাফ করেছিলেন সোমেশ্বর হুজুরের পিতা কুড়ারাম হুজুর। আজ পাঁচপুরুষ আমাকে নিয়ে ভোগ করে আসছি। ই আমাদের স্বত্ব হয়েছে। আজ লোব বললেই দোব আর জমিদার পাবে ? এইটো হাকিমের বিচার ?

হাকিম এবার নিজেই চীৎকার করে বললেন—বিচার আমি করব না। সে পরে হবে। আমি রেকর্ড করে যাব, যা প্রমাণ পাব সব।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার, সুলতা, রায়বংশের পাঁচালী।

কীর্তিহাটে বাস্তু জমি গোধন চারণ ভূমি
মা কালী চরণে নমি দিলাম নিষ্কর
মাঠেতে পুকুর খুঁড়ি সিচ দিনু তিন গাড়ি
মৎস্য খাবে লোকে ধরি রুই কাৎলা পর।

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম—আমার কথাটা লিখে নিন।

—আপনার আবার ভিন্ন কথা আছে নাকি ?

—আছে। ধনেশ্বর কাকা বোধহয় জানেন না। না-হলে আপত্তি দিতেন না। বহুবল্লভ

পাল যা বলেছেন তা সত্য। কীর্তিহাটে বাস্তুজমি গোচর নিষ্করই বটে। কুড়ারাম রায়-ভটচাজমশায় দিয়ে গেছেন। তার সঙ্গে মাঠের পুকুরের সিচ এবং রুই কাৎলা ছাড়া মাছও সাধারণ লোককে ধ'রে খেতে দিয়ে গেছেন।

—তার নজীর চাই হে। তার নজীর চাই।—গম্ভীর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন ধনেশ্বরকাকা।

আমি বললাম—আছে নজীর। দেখাব। কুড়ারাম রায়-ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিজের জীবনের পাঁচালী আমি পেয়েছি, আমি পড়েছি, আমি দেখাব।

সকলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বৃদ্ধ বহুবল্লভ বার্ধক্যজড়িত কণ্ঠে প্রায় চীৎকার ক'রে বললে—পেনাম! পেনাম! তোমাকে পেনাম বাবু! কই তুমি কই! রাধা! বাবু কই? নিয়ে চল কাছে।

ছেলে হাত ধরে বৃদ্ধকে কাছে নিয়ে এল। সে আমার হাত ধরলে প্রথম। তারপর হেঁট হতে গেল, আমি বাধা দিলাম।

—না। বয়সে আপনি অনেক বড়।

—বয়সে বড়? তুলসীপাতা তুমি বাবু। নিখুঁত বেলপাতা। পোকালাগা চক্রলাগা পাতা ফেলে দিতে হয়। ওই ধনেশ্বরবাবুদের মত। তুমি নিখুঁত। মাথায় করতেই হবে গো। পেনাম না লাও, নমস্কার লাও। কই, মুখে একবার হাত বুলিয়ে দেখি!—হ্যাঁ। বটে। বেশ লম্বা গো। লাগাল পেতে বেঁকা কোমর সোজা করতে হয়। নাক টিকলো। চামড়া মাখনের মত। বা বা বা! গোটা গাঁয়ের লোক আশীর্বাদ করবে তোমাকে। তোমার ঠাকুরদাদার বাবা রায়-বাহাদুরকে দেখেছি আমি। ছেলে-মানুষে। ঠাকুরদাস পালের পেথম পক্ষ মারা গেলে আমার পিসীর সঙ্গে রায়বাহাদুর তার পেয়ারের ঠাকুরদাস পিসের বিয়ে দিয়েছিল গো। তিনি ছিলেন এক জবর লোক! তুমি তার বংশের ছেলে বট।

হয়তো কিছুটা নাটুকেপনা আমার মধ্যে আছে স্থূলতা। আমি ভেবে দেখছি। নইলে ওইভাবে রাত্রে চীৎপুরে দেহ-ব্যবসায়িনীদের দান করে রূপকথার রাজপুত্র সাজতে চাইব কেন? নাটুকেপনা বলতে পার আবার অভিজাতপনা বলতে পার। আবার রায়বংশের ধারাও বলতে পার। আমাকে সেদিন সেটেলমেণ্টের সাহেব ঠাট্টা করেছিল। আমি যে মাত্র ওই পাঁচালীর কথা বললাম এবং বললাম—ভোগদখলকারীদের লাখ্‌রাজ দাবীতে আমার আপত্তি নেই, অমনি তার ক্রিয়া একটা হয়েছিল। যেটার জন্যে বহুবল্লভ পাল প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে। যে কথার পিঠে বা জবাবে ধনেশ্বর-কাকার দল একেবারে চুপ ক'রে গেল—কোন কথা বলতে পারলে না। কিন্তু সায়েব কথা বললে—বেশ অ্যাক্টিং করার মত ভঙ্গি, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ মিশিয়ে বলে উঠল—দেখুন—দেখুন আপনাদের জমিদার সাড়ে আট আনার মালিক—কি মহান্ সত্যবাদী দেখুন।

অভিনয় যখন অভিনয় বলে ধরা পড়ে তখন তার মত বিশ্রী এবং পীড়াদায়ক আর কিছু হয় না।

কজন মুখ টিপে হেসেছিল। এমন কি বহুবল্লভ পালের উকীল ছেলেটি পর্যন্ত। কিন্তু তাতে আমার গায়ে একটুও ছেঁকা লাগে নি।

আমি চলে এসেছিলাম। আমার নায়েবকে বলে এসেছিলাম—আমাদের নিজেদের বাড়ীর পটে এলে যেন আমাকে খবর দেওয়া হয়।

বাড়ী এসে একটা আশ্চর্য তৃপ্তির মধ্যে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কলকাতার মাথায় আকাশ অবশ্যই আছে—কিন্তু সে আকাশ মানুষের চোখে বড় পড়ে না। আমি ঝড়ের আকাশ দেখতে ছাদে উঠতাম। রাত্রে নক্ষত্র দেখতে উঠতাম কিন্তু কখনও সাধারণ সময়ে খোলা আকাশের দিকে ভরপুর মন নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকি নি। সেটা এখানে এসে আমাকে পেয়ে বসেছিল। এখানে আকাশের একটা রঙ আছে। ঋতুতে ঋতুতে পাণ্টায়। সেদিন আকাশটা ছিল ঘষা কাঁচের মত। মানে ধুলো উঠেছিল বাতাসের স্তরে। তারই উপরে খাঁ-খাঁ-করা আকাশে একজোড়া বড় আকারের কালচে রঙের পাখী—দুটি ডানা স্থিরভাবে মেলে দিয়ে পাশাপাশি উড়ে আসছিল। পক্ষীমিথুন তাতে সন্দেহ নেই। কল্পনা করছিলাম—তোমাকে নিয়ে এই বিবিমহলে জীবনটা এইভাবে স্থির পাখা বিস্তার করে ভেসে থাকার মত কাটিয়ে দেব। জমিদারী, বিবিমহল, রায়বাড়ি এ-সবের উপর আমার আকর্ষণ তো ছিল না, সে তুমিই সাক্ষী দেবে, কিন্তু সেদিন ঘোর লেগেছিল। বঙ্কুবল্লভের প্রণামের অনেক দাম। ওর উকিল ছেলে আজ মুখ টিপে হাসলেও কাল আমার কাছে নত হবে। ওকেই না হয় এখানে ম্যানেজার রাখব। নতুন উকীলের আর কত উপার্জন, উকীল ম্যানেজারের একজন দরকার হবে।

পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আগে থেকে জমি নিয়ে আইন বদলাতে বদলাতে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে মহাভারত হয়ে উঠেছে। বেঙ্গল টেনেন্সী এ্যাক্টের আয়তন দেখলে চমকে উঠতে হয়। পঞ্চম আইন, ষষ্ঠ আইন, সপ্তম আইন, অষ্টম আইন এসব সেকালের। তখন প্রজাকে এনে আটক কয়েদ ক'রে খাজনা আদায় করতে পারত জমিদারেরা। তারপর মাঠে ধান ক্রোক করে আদায় করতে পারত খাজনা। সেই আমলে সোমেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায় জমিদারী করে গেছেন। তারপর ওসব আইনের অষ্টম আইন বাদে সব উঠে গেছে। জমিদার-প্রজার মধ্যে সরকারের চোখে ভেদ নেই। এখন সব মুনফেসী সাবজজ কোর্টের এলাকার বিচারের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। আদায়-তহশীল সেরেস্তা থেকে মামলা সেরেস্তা বড় হয়ে উঠেছে। এখন একজন উকীল রাখলে মন্দ হয় না। ভেবেছিলাম বিকেলে লোক পাঠাব।

হঠাৎ এরই মধ্যে কি ক'রে ঠাকুরদাস পাল উঁকি মেরে মুখ বাড়ালে বলতে পারব না। ঠাকুরদাস পাল—বঙ্কুবল্লভের পিসেমশাই হত।

বঙ্কুবল্লভ তো বলতে পারবে ওই কথাটা! ঠিক করলাম নিজেই যাব বিকেলে বঙ্কুবল্লভ পালের কাছে।

দুপুরে মেজঠাকুমা এসেছিলেন—তাঁকে বললাম কথাটা। মেজঠাকুমা আশীর্বাদের ছলে অনেক গুণগানই বল আর বাস্তব গানই বল করতে করতে ঘরে ঢুকেছিলেন। তিনি বললেন—সারা-গ্রামে ধন্যি ধন্যি উঠেছে।

কথাটা চাপা দিয়ে আমি বঙ্কুবল্লভের ওখানে যাবার কথা বললাম। তিনি খুঁতখুঁত করলেন প্রথমটা। তারপর বললেন—তা যাস। শুনেছি আমার শ্বশুরের হুকুম ছিল আমায়

শাশুড়ীর উপর। বিকেলে তিনি বের হতেন ঝি আর চাকর নিয়ে। বিশেষ করে বাউড়ী বাগদী চুয়াড় পাড়ায় তিনি গিয়ে দেখতেন কার বাড়ীর চাল থেকে ধোঁয়া উঠছে কার উঠছে না। মানে কার রান্না চেপেছে কার চাপেনি। বাড়ী থেকে চাল যেত তাদের বাড়ী। ভদ্র শূদ্র গরীব কারুর অসুখ বেশী শুনলে খোদ কর্তা যেতেন দেখতে—চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। তা যেতে পারিস। সঙ্গে লোক নিয়ে যাস।

মেজাজটা যাকে জমিদারী ভাষায় 'সরিফ্' বলে তাই হয়ে গেল। বিকেলে গেলাম বঙ্কুবল্লভের বাড়ী। সদ্‌গোপ পাড়া মাটির দেওয়াল—কোঠাবাড়ী খড়ের চাল ঘর। রাস্তা সঙ্কীর্ণ, একখানা গরুর গাড়ী যায়। বঙ্কুবল্লভের-ঘরের চালে টিন। পোতা বা ভিত বাঁধানো। বাড়ীর সামনেটার পাকা থামদেওয়া পাকা মেঝে। পাল চোখে অন্ধ হলেও শনের গোছা টানিয়ে টেঁড়ায় পাক দিয়ে দড়ি কাটছিল। তকলীতে সুতা কাটার মত। বসেছিল একখানা তক্তাপোশের উপর উপু হয়ে।

আমার সঙ্গে মানে পিছনে লোকও জুটেছিল—দুটো কুকুরও চেঁচাচ্ছিল। আমি সামনে দাঁড়িয়ে বললাম—পালমশাই, আমি আপনার কাছে একবার এলাম!

দৃষ্টিহীন চোখ সামনে তুলে পাল বললে—কে? তারপর আমার কাপড়জামা এবং ল্যাভেণ্ডার সাবানের গন্ধ শুঁকে বললে—হাকিম মশায়—

—না। আমি সুরেশ্বর রায়।

—আঁ! চমকে উঠল পাল। তারপর চীৎকার করে বললে—ওরে রাধা! ওরে অ রাধা! গেলি কোথা রে বাপু?

আর একজন প্রবীণ এসে দাঁড়াল এবং নমস্কার করে আমাকে আহ্বান ক'রে বললে—আসুন আসুন। বলে ঘর থেকে দেশী ছুতোরের হাতে শালকাঠের তৈরী ভারী চেয়ার এনে পেতে দিয়ে বললে—বসুন।

পাল বললে—কে? বেজো না কে?

—হ্যাঁ।

—রাধা কোথা? রাধা?

—সে হাকিমের কাছে গিয়েছে।

—হাকিমের কাছে? কচু-পোড়া খেয়েছে—নিকাপড়া শিখে উকীল হবে! হাকিম ছাড়া আর চিনলে না কিছু। বসুন বসুন বাবা, বসুন। আজ সমস্তদিন তোমার নাম করেছি গো!

—আমি একটা কথা জানতে এসেছি আপনার কাছে।

—ওই আমবাগানটার আর পুকুরটার কথা। ওটোতে বাবা কিছু গোল আমাদের আছে। ওটো রায়বাহাদুর আমাদিগে দানটান করেন নাই। যখন আমার পিসীর বিয়ে হয় উনিই খুব ধ'রে পড়ে বিয়ে দেয়ায়েছিলেন। পিসী আমার ডাগর হয়েছিল। বারো বছর বয়ক্রম হয়েছিল। তা তখন পিসের বয়স আমার, তা—পঁয়তিরিশ হবে বইকি! একটুকুন বেমানান হয়েছিল তো!—তা আমার ঠাকুরবাবা—রায়বাহাদুরদের কথা মেনে

বিয়ে দিয়েছিল। তাখন ওই বাগান আর মণ্ডল পুকুর ঠাকুরবাবাকে ভোগ করতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ভোগ কর্ তু। কিন্তু গাছ কাটতে পাবি না—, পুকুরের মাছ খাবি—কিন্তুক পুকুর বাগান বেচতে পাবি না। এই বিত্তান্ত বটে মশায়। দেখ বাবু, তুমি আজ এমুনি করে সত্যি কথা বললে—আমি মিছে কি ক'রে বলি?—

আমি বললাম—না, ওর জন্যে আমি আসিনি।

চোখ স্থির ক'রে পাল বললে—তবে?

—আমি কয়েকটা কথা জানতে এসেছি ঠাকুরদাস পাল সম্পর্কে।

—অঃ। তিনি মহাশয় লোক ছিলেন গো। যেমন স্বাহ তেমনি ক্ষ্যামতা আর তেমুনি সাহস। দুদ্দান্ত সাহস—দুদ্দান্ত লোক। আপনকার ঠাকুরবাবার বাবা রায়বাহাদুরের চেলা গো! আর আরও ছিল—কমলদাদা অন্তপান। তোমার ঠাকুরবাবার বাবার পেথম নাম তো কমলাকান্ত। মামা পুষ্যি নিয়ে নাম দিলে রত্নেশ্বর। অঃ শুনেছি, আমরা তো তখন জন্মাই নাই। মামা ভাগ্নেতে সে ভয়ানক ঝগড়া। বলে—মামা গুমী করতে গিয়েছিল ভাগ্নেকে। সেই তো ঘরে আগুন লাগল পিসেদের গাঁয়ে। তাতে তোমার ঠাকুরবাবার বাবাকে বাঁচাতে ছুটল পিসে, বাঁচালে, ইদিকে পিসের প্রথম সংসার জলন্ত চাল চাপা পড়ল। আবার শেষটায় যে কি হল—

—কি হল—তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি আপনাকে।

—সেটাতে পিসের দোষই বটে। বুয়েছেন—ঠিক কথাটি কেউ জানে না। সি কাক পক্ষীতেও না! তবে—দোষ পিসের বটে। ক্যানে বলছি—শোনেন। পিসের ছেলে আমাদেরই হামজুটি—এই বছর তিন চারের বড় হবে। সি থাকত কীর্তিহাটে। থাকত আপনকার ঠাকুরবাবা—দেবেশ্বর বাবুমহাশয়ের কাছে। হ্যাঁ, তিনি একটা বাবুমহাশয় বটে। চেহারায় যেমন কার্তিক। তেমুনি মেজাজ। ইংরিজী নেকাপড়াতে পণ্ডিত। বাঘ মারতে যেতেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে একটা হাসি ছিল তার। সি মশায় ছুরির মতন। বুয়েছেন। আমার দাদা ঠাকুরদাস পিসের বড় বেটা তাঁর কাছেই থাকত। কলকাতা গেলেন বড়বাবু, সেও কলকাতা গেল। তাকেও পড়াতে চেয়েছিলেন রায়বাহাদুর। তা তার হল না। লেখাপড়া ছেড়ে ওই বড়বাবুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। শিকারে যেত। তা পরেতে দুম্মতি—গোয়ানপাড়ার পিদ্রূ গোয়ানের বুন ছিল—তার নাম ছিল ভায়লা। মশায় সে এক মেয়ে বটে। যেমন রঙ তেমনি চেহারা। সি দেখেছি আমরা। তাকেই সে বার করে নিয়ে ভাগলো। এইতে পিদ্রূ খুব খাপ্পা। একে গোয়ান তার ওপর ছিল মারহাট্টা গুণ্ডা ডাকাত। সে রায়বাহাদুরের কাছে নালিশ করলে। রায়বাহাদুর ঠাকুরদাস পিসেকে বললে—তোর ছেলেকে সাজা নিতে হবে। কি হল ঠাকুরদাস পিসের—সে বললে—সাজা কিসের? সে বেটাছেলে। মেয়েটার বিচার কর। দেখ সেই হারামজাদী আসলে দোষী। রায়বাহাদুর খুব ধমকালে। মশায়—সেদিন সেখানে সে ঘরে মাছি ঢুকবার হুকুম ছিল না। ছিল পিসে, পিদ্রূ আর খোদ রায়বাহাদুর নিজে। পিসের দুম্মতি—সে বললে—তা হলে আমিও সব ফাঁস করে দোব হ্যাঁ। কি ফাঁস করে দেবে, কি বিত্তান্ত তা কেউ জানে না মশায়, জানত পিসে, জানতেন রায়বাহাদুর।

তা লোকে অনুমান করে মশায় যে রায়বাহাদুরের সঙ্গে তার খুন মামলা করেছিলেন জানেন তো। মানে রায়বাহাদুর পুষ্যিবেটা আর মেয়ে হল আসল। রায়বাহাদুর মামলা করেন নাই, টাকা দিয়ে মিটিয়েছিলেন। সেই তারই কোন গুহ্য কথা বোধহয় হবে। তাই ফাঁস করে দোব ব'লে পিসে বেরিয়ে এসে পিদ্রুকে বললে—আয় শালা গোয়ান ওর বিচার রায়বাহাদুর করবে কিরে, তোতে আমাতে হোক। আয়। এই তখুনি রায়বাহাদুর ইশারা দিয়ে থাকবেন। তাই পিদ্রু বেরিয়ে এল, দুজনে হাতাহাতি করতে করতে নদীর ঘাট পর্যন্ত গেল। ঘাটটার নাম গোঘাটা। মানে ওই গোচরের পাশে তো। যেটা নাথরাজ ছিল আপুনি স্বীকার করলেন। ওই ঘাটে গরুতে জল খেতো। এখন লোকে বলে গোঘাটা মানে গোয়ানঘাটা! পিসে যেছিল ওই গোয়ানপাড়াতেই। মেয়েগুলোর সঙ্গে ভজিয়ে দেবে ভায়লার দোষ। বলছিল সে তাই—আয় তোদের বিটী গোলার কাছে শোন কার দোষ। কিন্তু ওই ঘাটে গিয়েই পিদ্রু একবারে এই এক হাত লম্বা ছোরা বার করে আচমকা দিলে বসিয়ে পিসের বুকে। অঃ সে ঘড়া ঘড়া রক্ত পড়েছিল!

একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—পিদ্রুর মামলায় অনেক টাকা খরচ হয়েছিল—

—হ্যাঁ। বড় উকীল দিয়েছিল। ওই রায়বাহাদুর দিয়েছিলেন, তাই গুজব মাশায়।

—কেন?

—ক্যানে? একটু চুপ করে থেকে পাল বললে—সঠিক বলতে তো পারব না। এতবড় নোকটা—ধার্মিক নোক—কীর্তিমান নোক—সন্দেহ করলে পাপ হয়। নোকে বলে—দোষ তো পিসের বেটার। পিদ্রুর অপমান তো পিসের বেটাই করেছে। ঝোঁকের মাথায় করেছে। এই বলে দয়া হয়েছিল তার। আবার দুচারজন বলে মশায়, ওই যে পিসে বলেছিল, আমিও তাহ'লে ফাঁস করে দোব তাই জন্যে রায়বাহাদুর পিদ্রুকে হুকুমই দিয়েছিলেন—দে সাফ করে!

কথাটা মনে লেগেছিল আমার স্থলতা। এটাই সম্ভব। একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ঠাকুরদাস পালের কে আছে বংশে?

পাল বলেছিল—পিসের ছেলের ছেলের ছেলে, মানে ছেলের নাতি আছে। সে এখন মস্ত লোক, ব্যারেস্টার সাহেব। সে জাতকুল এখানকার সব ঘুচিয়ে মুছিয়ে সাহেবী কাণ্ড। পিসের ছেলে ভায়লাকে নিয়ে কলকাতা পালিয়েছিল। বাবা খুন হল, রায়বাহাদুরের ভয়ে এল না। পিসী ছাদ্দটাদ্দ করলে। উদিকে তোমার ঠাকুরবাবার কাছে টাকা কিছু নিয়ে সে কলকাতায় ব্যবসা করলে। ভায়লাকেও ছেড়ে দিলে। এখানে বিয়ে ক'রে গিয়েছিল, সে বউ লিলে না। বউটার ভাগ্যি ভাল মরেও গেল। ত্যাখন সে করলে কি, বেহ্ম হয়ে গেল মাশায়। তখন বেহ্ম হওয়ার খুব ধুম হল। বিয়ে করলে বেহ্ম বাড়ীতে। অবস্থা তখন ভাল করেছিল। তারপরেতে ভগবানের মার। ব্যবসা ফেল হ'ল। একবারে ফেল হল। ধাক্কাটা সইতে পারলে না। মরেও গেল। বউ ছেলে কোথায় যাবে, গেল বাপের বাড়ী। তারপরেতে ছেলে লেখাপড়া শিখে উকীল হল। লাতি বিলাত গেল। ব্যারেস্টার

হয়ে এল। মস্ত লোক এখন। তবে শুনেছি নাকি গুজব বটে মাশায়—ওই ছেলের সব খরচ মায় লাতির বেলাত যাবার খরচ সে সব রায়বাহাদুর দিয়েছিলেন। না হয় তোমার ঠাকুরবাবা মানে বড়বাবু দিয়েছিলেন। দেবেশ্বরবাবু মহাশয়। তারা আর এখন পাল লয়। ঘোষ হয়েছে। মিস্টার রমেশচন্দ্র ঘোষ ব্যারেস্টার!

আমি চমকে উঠলাম। সুলতা, মনে হল কংসাবতীতে প্রলয় বন্যা এসেছে, সেই বন্যায় আমরা দুজনে দুদিকে ভেসে যাচ্ছি। তবুও মনে আশা করেছিলাম, ঐ রমেশ ঘোষ তোমার বাবা নন। কিন্তু সন্দেহ রইল না. পালের ছেলে উকীল ফিরে এসে যে ঠিকানাটা দিলে সেটা তোমাদেরই।

আবার আমি রায়বংশের অতীতের অন্ধকারের মধ্যে অন্ধের মত ছুটলাম, কোথায় আলো কোথায় আলো বলে। আলোর বদলে আগুনের কুণ্ডতে প'ড়ে যদি ছাই হয়ে যাই তাও এ থেকে ভাল।

হঠাৎ দিন চারেক পর কৃষ্ণযবনিকা যেন তুলে দিলেন ভাগ্যবিধাতা। হঠাৎ এল ব্রজেশ্বর। মনে আছে ব্রজেশ্বরকে, যে আমার নামে পরিচয় দিয়ে যেতো আসতো শেফালির বাড়ীতে? যে আমাকে বলত রাজাভাই। সেই অতি মিষ্টমূর্খ, অকুলবিদ্ সুন্দর চেহারা ব্রজেশ্বর। ধনেশ্বর-কাকার বড় ছেলে। যে অতিচতুর রায়বংশধরটি আমাকে মূর্খ প্রতিপন্ন করেছিল, সেই ব্রজেশ্বর? মনে আছে? হাঁা, সেই হঠাৎ এল কীর্তিহাটে। তার আসার ভঙ্গিও বিচিত্র।

তখন আমি অন্ধকারে অন্ধের মত কাগজের স্তূপের মধ্যেই ডুবে আছি। কিন্তু সেটা বিষয় বা সম্পত্তির জন্য নয়! ওরা বাড়ীর স্বত্বে আপত্তি দিয়েছিল। বলেছিল, এ কারুর ব্যক্তিগত নয়। এ দেবোত্তর। এজমালী অবিভাজ্য।

আমি সেই খাতাখানা দেখিয়েছিলাম। দেবোত্তরের খাতায় ইটের পাঁজা অর্থাৎ ভাটা বিক্রয় দরুণ জমা। শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু সোমেশ্বর রায় মহাশয়ের অন্দর মহল তৈয়ারীর জন্য দেবোত্তরের যে ইটের ভাটা হইতে ইট লয়েন তাহার মূল্যবাবদ জমা মাঃ শ্রীল শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর রায় মহাশয়। টাকাটা সামান্য, সাড়ে তিনশো টাকা।

ওরা চমকে গেল। দেখলে। তারপর আর কথা বললে না, আপত্তিটাও তুললে না। বুঝলাম ব্যক্তিগত জমাখরচের খাতাখানা ওদের হাতেই আছে। কিন্তু এইভাবে ছোট একটা ইটের জমাখরচ দেবোত্তরের খাতায় লুকিয়ে বসে আছে তা অনুমান করতে পারেনি।

সম্পত্তির জন্য আমি খাতা ঘাঁটছিলাম না। ঘাঁটছিলাম ওই ঠাকুরদাস পালের খুনের অন্তরালে কোন্ অনুমানটি সত্য তাই আবিষ্কারের জন্য। ওই সামান্য কি বলেছিলেন ঠাকুরদাস পাল তার জন্য রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর তাঁকে খুন করালেন? রত্নেশ্বর রায়ের পাপপুণ্যে আমার কিছুই করবার নেই। ওর ভাগ বা উত্তরাধিকার নেই। উত্তরাধিকার থাকে বিষয়ের। তা আমি পেয়েছি। কিন্তু এ যে তাঁর পাপ, যদি এটা সত্য হয়, তাঁর পাপই হয়, তবে সেই পাপ যে প্রচ্ছন্ন কলির মত ছুরি বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে তোমার এবং আমার মধ্যের বন্ধনটা কাটবার জন্যে। এ নিয়ে মনে মনে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি যেন কেঁদেছ।

মুখ ফিরিয়ে বসেছ। তারপর বলেছ—এর পর আর হয় না তোমার সঙ্গে আমার বন্ধন। আমিও ভাবছি, ঠাকুরদাস পাল এমন কোন মর্মান্তিক কথা বলেছিল? সে কথা তিনি বলার পরই কি আমিই পারব তোমার সঙ্গে জীবন বাঁধতে? আমি পাগলের মত কাগজ ঘাঁটছিলাম। দেবতার ঘরের সিন্দুকের ভিতর থেকে কাপড়ের টুক্‌রোয় বাঁধা অনেক চিঠি পেয়েছিলাম সোমেশ্বর রায়ের আমলের। বহু বিচিত্র চিঠি। কাত্যায়নী দেবীর আরও ক'খানা সেই ধরনের প্রেমপত্র ছিল, ল্যাণ্ড-হোল্ডারস অ্যাসোসিয়েসনের চিঠি, রেগুলেশনের নকল পেলাম। নানান জমিদারের চিঠি পেলাম। আর পেলাম রবিনসন নীলকুঠীর কুঠিয়ালসাহেবের একটি চিঠি। তার মধ্যে দেখলাম তিনি তাকে টাকা ধার দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, রবিনসনের ব্যবসায়ে জমিদার হিসেবে সাহায্য করেছেন প্রজাদের নীল বুনতে বাধ্য ক'রে, এবং আরও অনেক কিছু ক'রে। একখানা চিঠি ছিল বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে। রবিনসন লিখেছে—'মিস্টার রায়বাবু, তোমার ছেলে বীরা এখানে বেশী থাকছে বলে তুমি মনে মনে ভয় পেয়েছ শুনলাম। রেভারেণ্ড হিল আমাকে বলেছেন। চিন্তা করো না। সে আমাদের ভালবাসে, আমার ছেলে জনি এবং মেয়ে মেরীর সঙ্গে তার খুব ভাব। আমরা তাকে ভালবাসি। দুর্দান্ত সাহসী ছেলে। তবে আমরা তাকে মুর্গী বীফ হ্যাম খাওয়াইয়া ক্রীশ্চান কখনই করিব না। মেরী ইংরেজ মেয়ে। সুতরাং চিন্তা করো না।"

বীরেশ্বর তখন ষোল বছরের।

আরও চিঠি পেয়েছিলাম—একখানা প্রিন্স দ্বারকানাথের। তিনি জানতে চেয়েছিলেন জমিদারী সম্পর্কে কতকগুলো তথ্য। সোমেশ্বর গ্রামে এসে শুধু জমিদারীর খাজনার সঙ্গেই নয় মাটির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে এসব তথ্য তাঁর নখদর্পণে ছিল।

আর একখানা চিঠিতে বর্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদের কথা ছিল। দ্বারকানাথ লিখেছিলেন —শ্মশান হইতে পলায়ন করিয়াছে, মরাটা ভান, ইহা প্রায় আরব্য উপন্যাসের সিন্দুক ওড়ার মতই অবিশ্বাস্য। যাহা হউক সঠিক সকল ঘটনা না জানিয়া ইহাকে আমি সমর্থন অসমর্থন কিছুই করিতেছি না। অগ্রে জানিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিব, তদনুসারে কর্ম করিব। পরে এ বিষয়ে আপনাকে সমুদয় জ্ঞাত করাইব।

আর একখানা পত্রে ছিল—"আপনি গ্রামে বসিয়া পৌত্তলিকতা এবং তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি বিকৃত আচার লইয়া আছেন ইহাতে আমার দুঃখ হয়। আপনি কলিকাতায় আসুন। মাননীয় শ্রীরামমোহন রায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করুন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি আপনার মতের পরিবর্তন হইবে। তাহা ছাড়া অর্থ লইয়া জমিদারী কেনায় আমাদিগকে ভুলাইয়া ইংরাজেরা ব্যবসা-বাণিজ্য সব হস্তগত করিয়া লইতেছে। বাণিজ্যই লক্ষ্মী। সুতরাং আমাদিগকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও অগ্রসর হইতে হইবে।"

এসব যখন পড়ছিলাম তখন মনের মধ্যে সেকালটা ভেসে উঠেছিল কিন্তু সে আমলের ইতিহাসকে জানার প্রলোভন আমার ছিল না।

আমি জানতে চাচ্ছিলাম ওই ঠাকুরদাস পাল আর রত্নেশ্বর রায়ের কথা। তাতেই আমি এমন মগ্ন হয়ে গেছি যে, শুধু অতীতই বা কেন, বর্তমান কালের আর কিছু মনে ছিল না

আমার। কলকাতা তুমি সব অনেক দূরে চলে যাচ্ছে যেন। আমি ১৯৩৬ সালের এপ্রিলের শেষে কীর্তিহাটে চোখ মেলে বহুবল্লভ পালের উকীল ছেলে, হাকিম হরেন ঘোষ, রায়বংশের ভাঙা কুঁজোদেহ ধনেশ্বর-কাকা, শিবু পণ্ডিতের আধুনিক সাহিত্যের আলোচনা, সুরেন দের কাছে সেকালের ছ আনা আট আনা মন ধানের দামের কথা, উরু ভটচাজের মুখে দানীবাবু গিরিশবাবুর বক্তৃতার কথা শুনতে শুনতেও রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের আমলে বাস করছি, আর তাঁকেই জেরা করছি। বলুন—কি হয়েছিল বলুন।

এদিকে ওইদিনের ওই ঘটনার পর গ্রামটা গোটা যেন ছুটে আমার কাছে এগিয়ে এল। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা মনে হ'ল আমার। তিন চার বার এসেছি, বাবার শ্রাদ্ধে ক্রিয়াকর্মের সময় সকলকে মিষ্ট ভাষায় সবিনয়ে সম্ভাষণ করেছি, তারাও মিষ্ট কথা বলেছে, তুষ্ট হয়েছে বলে হেসেছে, কিন্তু তবু কাছে আসে নি। যা হয়েছে দূরে দূরে দাঁড়িয়েই হয়েছে। কিন্তু চারদিন আগের ঘটনাটির ফলে এমন একটা কিছু হয়ে গেল যাতে তারা একেবারে দরজা ঠেলে এসে ঘরে ঢুকে চেপে বসল। হেসে বললে—এলাম আমরা।

শুধু ভদ্রজনেই নয়; গ্রামের যাদের আমরা ব্রাত্য বলি তাদের দল এল নালিশ নিয়ে, বললে—আমাদের এইটে বিচার করে দ্যান।

বেশ মদ্যপান ক'রে আবেগবিভোর হয়ে এসে হাজির হল, বললে—লইলে আমরা আর কার কাছে যাব আজ্ঞে? বলে দ্যান!

ওদের প্রথম মামলা নিয়ে মনে হ'ল খুনের মামলার রায় দিতে হবে। সে এক স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ। বুড়ো হাটু বাউড়ী একটি যুবতী মেয়েকে সাঙা করেছিল। যুবতীটি ঘর করতে করতে একটি নব যুবকের সঙ্গে প্রেম করে। তা নিয়ে পাড়ায় হাঙ্গামা অনেক হয়। মারধরও হয়। অবশ্য মেয়েটাকে। এবং ছোঁড়াটাকে কানও মলতে হয়, কিন্তু শেষে মেয়েটা এর সর্বস্ব হরণ করে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পাশের গাঁয়ে পালিয়ে গেছে। সেও কীর্তিহাটের সামিল আমাদেরই জমিদারী। মেয়েটা মরিয়া হয়ে আমার সামনেই ঘোমটা খুলে বললে—আমি যাব নি। খাব নি, উর ভাত খাব নি। বুড়ো মড়ার গায়ের গন্ধে আমার ঘুম হয় না!

আমি বিচার করে দিলাম—মেয়েটা যা টাকা গয়না বাসন নিয়ে এসেছে তা ফেরত দিতে হবে। আর ও ওই যাকে বরণ করেছে তার কাছেই থাকবে।

সাধুবাদ পড়ে গিয়েছিল। মেনে নিয়েছিল তারা।

এমনি আর একটা নালিশ সেদিন এসেছিল, গোয়ানপাড়ার নালিশ। মেয়েরা ছিল না। ছিল পুরুষরা। নালিশটা এই—হুজুর মালেক, তোমার জমিনে হামি লোক বাস করি। লেকিন সিটিলমেণ্টে গীর্জের মালিক কেনো হলদী বুড়া হোবে। যে মুখপাত্র হয়ে এসেছিল সে নতুন লোক, তাকে দেখি নি। তাকে দেখে মনে হয় না সে মানুষ অন্ততঃ গোয়ানপাড়ার মানুষ! সে যেন এক গল্পলোক বা স্বপ্নলোকের মানুষ! লোকটার দিকে চেয়ে ছিলাম। হঠাৎ রায়বাড়ীতে শাঁখ বাজল। উলু পড়ল। কিছু বুঝলাম না। লোকটার দিকেই দৃষ্টি ফেরালাম। এমন সময় কে যেন ছুটে এল, গোয়ানদেরই ছেলে। সাদা ক'রে বহু নিয়ে আইলো বড়কা বাবুর বড়কা ছেলিয়া। বিবুজাবাবু। এই মস্ত বহু। বহুত ফেশন খবসুরত

ভি। আর বিরজাবাবু বঁঢ়িয়া পোশাক পিহিনকে আইলো। বহুৎ বড়া আদমী হইয়াছে। বড়া নোকৃরী মিলল উনকে। বাপরে—বাপরে—ক্যা কায়দা!

ওদের আর নালিশ করা হল না। ছুটে সব একসঙ্গে চলে গেল। এ লোকটাও চলে গেল।

চুপ করে বসে ছিলাম কিন্তু মনটা চঞ্চল এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বুঝেছিলাম ব্রজেশ্বর ফিরেছেন এতদিন নিরুদ্দেশের পর কোন এক হতভাগিনীর মস্তক ভক্ষণ ক'রে। কিন্তু বড় চাকরী পেয়েছে বড়লোক হয়েছে সেটা খুব মাথায় এল না। কোন ধনবানকে ঠকিয়ে তার একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে অদৃষ্ট ফিরলে বিস্ময়ের কিছু থাকত না। এ চাকরী!

আজ মেজদি পর্যন্ত আসেন নি! মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। বোধহয় ওই বধূটির জন্য। রঘুকে বললাম—বেহালাটা দে।

বেহালাটা নিয়ে বাজাতে গিয়ে একখানা ফটোর দিকে চোখ পড়ল। পুরনো ফটোগ্রাফ, ফেড হয়ে গেছে। রায়বাহাদুর রায়বাহাদুর হয়েছিলেন ১৮৮২ সালে, সেই সময়ের চোগা চাপকান পাগড়ি পরা ফটো, হাতে সনদ। বলতে ভুলেছি, সেকালের কতকগুলো ফটো কাছারীতে পড়ে ছিল, কাঁচ ভেঙে, ফ্রেম ভেঙে, সেগুলো আমি নিয়ে এসেছিলাম। রায়-বাহাদুরকে বললাম—

—তোমার একেবারে মুছে যাওয়া উচিত ছিল।

রঘু এসে ডাকলে—মেজঠাকুরমা আসলেন!

—ডাক এইখানে! নিচে যে ঘরটায় এখন বাইরে লোকজন বসে সেইখানে বসেছিলাম। মেজদি এখানে না-আসা নন। কেউ না থাকলে আসেন।

রঘু বললে—আরও মাইয়াছেলিয়া আছে।

—আরও মেয়েছেলে?

—নতুন বহু লিয়ে আসছেন।

—অ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই উঠে গেলাম।

মেজদি আমাকে দেখেই বললেন—দেখ ভাই নাতি, ব্রজ কেমন বউ এনেছে। তুই এইবার বিয়ে কর ভাই। নাতবউ, এই হল সুরেশ্বর, তোমার দেওর। আর আমার চুলের কালো রঙ। মুখের হাসি। অন্নদাতা। রায়বাড়ীর পঞ্চপিদীমের ঘিয়ের পিদীম।

আমি অবাক হয়ে গেলাম সুলতা! চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ কি বউ! এ যে পরমাসুন্দরী মেয়ে।

বউটিও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। সঙ্গে রায়বাড়ীর গণ্ডা দেড়েক আইবুড়ো মেয়ে। দেখতে তারা সুন্দরী। বিয়ের বয়স চারটের বেয়ে যাচ্ছে। তারা নতুন বিয়ে এবং নতুন বউয়ের রসে মগ্ন। গা-টেপাটেপি ক'রে হেসে যাচ্ছে।

আমি বললাম—নমস্কার!

মেয়েটিও বললে—নমস্কার।

বললাম—বসুন! তোরা ব'সরে! মেজদি, এদের সব জলটল খেতে দাও!

আইবুড়ো মেয়েদের মধ্যে সব থেকে বড় জগদীশ্বর-কাকার মেয়ে অর্চনা, সে বললে—জল তো শুধু খাব না। তোমার বাজনা শুনব। ব্রজদা বললে, বউ গান জানে। তুমি বাজাও বউ গান করবে।

অবাক লাগল, প্রমত্ত নটরাজ জগদীশ্বর-কাকার মেয়েটি এমন!

মেজদি বললে—আর তুই নাচবি!

—সে আমি কেন? তুমি নাচবে!

—কেন না। আমি নাচব কেন? বিয়ে বিয়ে ক'রে ক্ষেপেছিস্, দাদার সামনে ধেই ধেই করে নাচ। দাদা তা হলে বিয়ে দিয়ে দেবে। গতি হবে একটা!

এরই মধ্যে ডাক শোনা গেল—ভাই রাজাবাহাদুর! কই, কোথায়? ওরে বাপরে! করেছে কি তুমি রাজা, এ যে সত্যি সত্যি মহারাজা হয়ে বসে গেছ ভাইয়া!

এসে হাজির হল ব্রজেশ্বর। সেই হাসিমুখ, এতটুকু অপ্রতিভতার চিহ্ন নেই। পরনে স্যুট। চমৎকার চেহারা হয়েছে। দেহের শীর্ণতা আর নেই। এসেই হাতখানা চেপে ধরলে। আমি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। একটু একটু করে সে বিবর্ণ হতে লাগল। হঠাৎ আমাকে টেনে বললে—একটু এখন তাড়াতাড়ি আছে ভাই। পরে আসব। একটা কথা বলে যাই।

ব্রজেশ্বরের হাত ধরে আমিই টানলাম। বললাম—মেজদি, তুমি এদের খাওয়াও। আমি ব্রজদার সঙ্গে কথা বলি।

ওকে টেনে একবারে নিরিবিলি ঘরে নিয়ে গিয়ে বললাম—কি ব্যাপার?

হেসে বললে—অনেক ব্যাপার রাজা। শেফালির ব্যাপারটার জন্যে তোমার কাছে আমার অনেক লজ্জা। মাফি মাংছি ভাই। মাফি কিয়া যায় রাজা! উ ভাই হামার কসুর হুয়া। স্রেফ নেশার ঝোঁকে বলে ফেললাম আমি সুরেশ্বর রায়। ট্যাক্সিতে চাপিয়ে জানবাজারের বাড়ীর কাছে গাড়ী দাঁড় করিয়ে, বাড়ীর দরজায় আজেবাজে কথা বলে ওদের কাছে খাতিরটা জমিয়েছিলাম ব্রাদার। ঝোঁকে পড়ে গেলাম। জ্ঞান ছিল না। হিহি করে হেসে বললে—জ্ঞান কোনকালে নেই। করি কি বল! রায়বাড়ীর নামটা আর ওই দালানটা ছেলেবেলা থেকে মাথা খেয়েছে। শেফালিকে বললাম বাঁধা রাখব। বাড়ী ভাড়া করলাম। টাকা তুমি একশো টাকা দিয়েছিলে, আর মাড়োয়ারীর বাড়ী হচ্ছিল, লোহার কড়ি ছিল, তাই দুখানা বেচে টাকা প্রথমটা জুগিয়েছিলাম। ইটও কিছু বেচেছিলাম। শেষে দেখলাম ধরা পড়ব। ভেগে গেলাম রাজা। তোমার কাছে আসতে সাহস হল না, লজ্জাও হল। শেষ বুদ্ধি মাথায় খেলল। ঘুরছি চৌরঙ্গী ধ'রে। তোমার বাড়ী যাব বলে যেতে না পেরে দক্ষিণ-মুখো হাঁটা দিয়েছি। কাবলী ছোলাভাজা পকেটে, চিবুচ্ছি। হঠাৎ দেখলাম মহারাজা অজিতেশ্বর প্রসাদের বন্ধ ফটকটা খোলা, দরজা দিয়ে তিনখানা মোটর বেরিয়ে গেল। ফটকের সেন্ট্রিটা খট ক'রে পা ঠুকে সেলাম করলে। বুঝলাম রাজাসাহেব এসেছেন—ওঃ, মনে হল, সা—লা, রাজা যদি একটা হ'তাম এমনি। গাছতলায় বসে থাকতে থাকতে ফন্দি এল মাথায়। মাথায় ধুলো মাখলাম, কাপড়টা খানিকটা ছিঁড়লাম। জামাটার পকেটটা ছিঁড়লাম। বসেই রইলাম, পথের দিকে তাকিয়ে। এক সময় দেখলাম রাজার গাড়ী ফিরছে। গিয়ে ফটকের

সামনে দাঁড়ালাম। গাড়ী ভেতরে ঢুকল। আমি হেঁট হয়ে নমস্কার করলাম। গাড়ী ঢুকে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সে বিকেল পর্যন্ত। আবার গাড়ী বের হল। ফের নমস্কার। গাড়ী চলে গেল। সন্ধ্যের সময় ফিরল। তখনও দাঁড়িয়ে, তখনও নমস্কার। দাও ভাই, তোমার ভাল সিগারেট দাও।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। সিগারেট ধরিয়ে ব্রজেশ্বর বললে, এ ফন্দি আমাকে সুখেশ্বর-কাকা শিখিয়েছিল। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখত বড় বড় রাজাকে। লিখত—আমি রাজবংশের ছেলে, আজ নিঃস্ব, চাকরী করতে পারি না, লেখাপড়া শিখি নি। বড় দুঃখে আছি। সাধারণের কাছে হাত পাততে পারি নে। একটা সংস্কৃত শ্লোক লিখত "যাচনা মোঘা বরম অধি গুনে নাধমে লব্ধকামাঃ।" টাকা আসত কিছু কিছু। সেই ফন্দি মাথায় গজিয়েছিল। যাক, সন্ধ্যের সময় বারবার তিনবার আমাকে দেখে রাজাসাহেব জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, কি চাই? বললাম—কাগজ দাও লিখে দি। লিখে দিলাম—"প্রিন্স অব কাটিহাট স্টেট, ওয়ান্টস টু টেল হিজ পেথেটিক স্টোরি।"

বাস, ডাক এল। গেলাম।—ওই বললাম—আমি কাণ্ডিহাটের প্রিন্স, আমরা সিন্স দি টাইম অব আকবর শাহ প্রিন্স। ইংরেজ টাইমে আমাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। আজ গরাব। কিন্তু ইওয়োর হাইনেস, শান্তিপুরের ধুতি ছাড়া পরতে পারি না, সিল্কের জামা ছাড়া গায়ে দিতে পারি না। স্কিন ছড়ে যায়। আজ আপনি যদি সাহায্য না করেন তবে মরে যাব।

রাজা বললেন,, তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছি তুমি ঝুটা বাত বল নি। কিন্তু কিছু টাকায় তোমার কি হবে? চাকরী কর। বললাম—ইওয়োর হাইনেস, লেখাপড়া জানি না। বাধা দিয়ে রাজা বললেন, কিছু দরকার নেই, তোমার সহবৎ আছে, ইউ নো ম্যানারস। তুমি আমার ছেলের একজন এডিকং হয়ে থাকবে। মাইনে পাবে। তুমি বিয়ে করেছ। বুঝলাম বিয়ে হওয়া-না-হওয়ার উপর মাইনে নির্ভর করছে। বললাম, করেছি। মাইনে হল দেড়শো টাকা। ফ্রি কোয়ার্টার। এবং পোশাক সুট তাছাড়া চুস্ত পাজামা শেরওয়ানী তাও পাব।

চলে গেলাম সেখানে। মাস কয়েক পর রাজা ধরলেন, ক্যা মতলব? তুমি বহু আন না, রূপেয়া ভেজো না। ক্যা মতলব? বললাম—হুজুর, বউ শ্বশুরবাড়ীতে আছে, যাব আর নিয়ে আসব।

ভেবেছিলাম রাজা, পালিয়ে এসে আর যাব না। মানে বউ কোথা পাব? কলকাতায় এসে কিন্তু বউ পেয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। এক নারী-কল্যাণ আশ্রমের পাণ্ডার সঙ্গে। চাঁদা তুলে আশ্রম চালায়, বড় বড় ধনী লোক চাঁদা দেয়। অনাথা বিধবা কলঙ্কিনা কুমারী এইসব মেয়েদের আশ্রয় দেয়। খেতে পরতে দেয়। বিয়ে দিয়ে দেয়। আবার পেট্রনদের মনোরঞ্জনের জন্যেও এদের কাজে লাগায়। মেয়েগুলো বলতে গেলে কয়েদীর মত থাকে। দু-চারটে ভাল আশ্রম আছে। সে বললে—তার জন্যে ভাবনা কি। বউ দিতে পারি। এস। তুমি বন্ধু লোক। একটি মেয়ে আছে বুঝেছ, খুব

সুন্দরী, বয়স একটু হয়েছে, বিধবা। দেওর অত্যাচার করেছিল। মেয়েটা চীৎকার করে লোক-জানাজানি করে। কেসে দেওরের কনভিকশন হয়ে গেছে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে স্থানও গেছে। কোর্ট থেকেই নিয়ে এসেছি। কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাট ওকে নিয়ে। বিদেয় করতে চাই। দেখ, বিয়ে দিতে পারি। দেখলাম, বয়স আমার সমান হবে হয়তো। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। বিয়ে ক'রে ফেলেছি। ওখানে নিয়ে যাবার সময় সব বলেছিলাম। সরমা ভাল মেয়ে। কিন্তু ওর সন্দেহ এখনও আছে আমি ফেলে পালাব। তাই এবার কুমার-বাহাদুরের কাজে কলকাতা এসেছি, কুকুর কিনতে হবে। একজোড়া ফার্স্টক্লাস অ্যালসেসিয়ান চাই। আমার উপর ভার পড়ল। ও আমার সঙ্গ ছাড়ল না। বললে—সঙ্গে যাব আমি। আর ছুটি নাও, তোমার দেশে গিয়ে তোমার বাবা-মাকে প্রণাম করে আসব। ভাল লাগল। মনে একটা বাসনাও ছিল একবার সেজেগুজে কীর্তিহাটে আসব। আমার এখানকার পজিশনটা দেখাব। বেশী দেখাবার ইচ্ছে ছিল সুখেশ্বর-কাকাকে। জান রাজা, এই লোকটিকে মেরে আমার ভাইটা পাগলা গারদে গেছে তাতে আমার একবিন্দু দুঃখ নেই। আমার বাবা মাতাল বজ্জাত গোঁয়ার সব। কিন্তু সুখেশ্বর-কাকা ছিল স্নেক—পাইথন অজগর! বাবারে বাপরে! তা সে নেই কিন্তু তার ছেলেরা আছে। তারা দেখুক। এখানে এসে শুনলাম তুমি আছ রাজা। আর যা করেছ না তা রাজার মতই করেছ। লোকে ধন্য ধন্য করছে।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে—দেখ, আমি লেখাপড়া শিখিনি, আমার অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছে, মিথ্যে বলি হরদম, তোমার অনেক আছে, তোমাকে হিংসেও করতাম। তা এখনও করি। মাঝে মাঝে করি। সব সময় করি না। বিলিভ মি। আবার ভালও বাসি। আমি শেফালির ওখানেও গিয়েছিলাম। এবার না। এর আগের বার কুমার সাহেবের সঙ্গে চারদিনের জন্যে এসেছিলাম। সেই সময়। শেফালি খ্যাংড়া নিয়ে তেড়ে এল। আমাকে তো জান। আমি মানাতে জানি। বললাম, তাই মার। পিঠ পেতে দিচ্ছি তারপর বসে একটু পান টান করে কিছু টাকা দিয়ে বললাম—দেখ আমি যাই হই বেইমান নই। না হলে আসতাম না। আর বড়বংশের ছেলেও বটে। তখন ও তোমার কথা বললে। বললে, হ্যাঁ ওই একটা মানুষ বটে! বললে সব কথা। আমি রাজাভাই, পাপী মানুষ, আমি ব্রজেশ্বর, কিছুদিনের মধ্যেই ওখানে ঘুন হয়েছিলাম। সন্দেহ হল কোনখানে নিশ্চয় ঢুকেছ। পথে ঘুরে বেড়িয়েই তো প্রথম সাহস সঞ্চয় হয়। প্রথম কলকাতায় গিয়ে চীৎপুরের ট্রামে ঘুরতাম। সন্ধ্যে থেকে দশটা পর্যন্ত। তারপর পায়ে হেঁটে। তারপর সুড়সুড় করে মুড়ি দিয়ে ঢুকলাম। তারপর হাঁক ডাক মেরে। কিন্তু দেখলাম রাজার ছেলে এসেছিল দুঃখীর দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, রাজার ছেলের মতই ফিরে গেছে। ঢোকে নি কোথাও। সেলাম দিলাম। কুর্নিশ!

আমি অবাক হয়ে শুনলাম। বিচিত্র চরিত্র এই মিষ্টমধুর পাষণ্ডটিকে কি বলব খুঁজে পেলাম না।

ব্রজেশ্বর বললে—কিছু বল রাজাভাই। আমি ভাই অকপটে সব বলেছি তোমাকে, দিব্যি গেলে বলতে পারি, একটি মিথ্যে বলিনি।

বললাম—কি বলব তাই ভাবছি। বলবার কিছু পাচ্ছিনে ব্রজদা।

—ব্রজদা না বলে প্রহ্লাদা বলো। তুমি রাজা। কিন্তু শুনলাম মদ খাচ্ছ!

—তা খাচ্ছি।

—অবাক বলতে হবে। মদ খেয়েও তুমি—। মুখের দিকে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি?

ব্রজেশ্বর বললে—আমি খবর সব নিয়েছি। মদ খেয়েও তোমার মন ওদিকে ছোটে না?

—কোন্ দিকে?

—কোন্ দিকে আবার? শিব ছুটেছিল মোহিনীর পেছনে। এখানে পটোরা গান গায়—শিব বাগ্দিনীর পিছনে বাগ্দীপাড়ায় ঘুরত। ব্রহ্মা মদ খেয়ে নিজের কন্যা সন্ধ্যার দিকে তাকিয়েছিল। মানুষের কথা বাদই দাও। মদ খাও, খেয়ে মন ছোটে না? এখানে এমন সোনার চাঁদ গোয়ানপাড়া—ছুঁড়িদের যেমন দেহ, তেমনি রঙ। ওরা একসঙ্গে মেমসাব, আবার দণ্ডকারণ্যের শবরী! তুমি এখানে মদ খেয়ে, ছবি এঁকে, বেয়ালা বাজিয়ে কাটিয়ে দিলে!

চুপ করে রইলাম। মনে মনে যাচাই করছিলাম সরলতা। ব্রজেশ্বর পাষণ্ড হোক, মূর্খ হোক, যা-হোক, কথায়বার্তায় রস রসিকতা যারই ফোয়ারা ছুটিয়ে থাক, তার মধ্যে দুপুরের রৌদ্রের মত একেবারে সাদা এবং প্রখর উত্তাপের মত সত্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। আবহাওয়া কথাটা বলব না, খাপ খাবে না এখানে। ব্রজেশ্বরকে মিথ্যে বলতে ইচ্ছে হয় নি।

—প্রিন্স ব্রাদার!

—ভাবছি ব্রজেশ্বরদা। না-ভেবে তো বলা ঠিক হবে না।

—জান? কেন জিজ্ঞেস করছি জান?

—কেন?

—দেখ, সুখেশ্বর-কাকা একেবারে 'ঔরংজেব' ছিল। সে যদি ভাই অমনি বাদশাহীর আসরে প্রিন্স হয়ে জন্মাত, তবে ঠিক ওই খেল খেলত। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিল—ঠিকেদারীও করত, আমাকে নিয়ে আমার বেনামে ঠিকেদারী চালাত। বলেছি তো—নেটিভ স্টেশনে পর্যন্ত চিঠি লিখত কায়দা করে—তাতে মধ্যে-মাঝে বিশ-পঞ্চাশ-একশোও এসেছে। রায়বাড়ির সম্পত্তি, দাদুর মত ধুরন্ধর, তার কাছ থেকেও বেনামে বন্দোবস্ত নিয়েছে। আমি জানতাম বলে কিছু কিছু টাকার ভাগ আমাকে দিত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কাণ্ড করেছিল—রায়বাড়ীর সব মোক্ষম দলিল-কাগজপত্র হাতিয়ে রেখেছিল। দাদু যে

দাদু, সেও জানতে পারে নি। তিনি সেরেস্তা থেকে অনেক কাগজ-খাতা সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি ঠাকুরের সিন্দুক থেকে গহনা বের করে গালিয়ে বিক্রি করলেন। জমা-খরচের জোচ্চুরিতে মারলেন। কিন্তু সুখেশ্বর-কাকা সেই সময় সরালেন রাজরাজেশ্বরের মুকুট থেকে পাথর আর সরালেন কখানা দলিল, কখানা বাঁধানো খাতা। একখানা খাতা ইংরিজীতে লেখা—বীরেশ্বর রায়ের ডায়েরীগোছের। আর একখানা রায়বাহাদুরের ডায়েরী। বুঝেছ।

—সে-খাতা কোথায়? সোজা হয়ে বসেছিলাম আমি।

—সুখেশ্বরকাকা একটা শক্ত ট্রাঙ্কে ভরে রেখেছিলেন নিজের শোবার ঘরে—মাথার শিয়রে। মধ্যে মধ্যে বলতেন, এই তোমাদের মানে তোমার বাবার সম্পর্কে; বলতেন, ভারী হিংসে ছিল তাঁর। যোগেশ্বরদার ও হতেই হবে। যজ্ঞেশ্বরদার হবে দেখ্‌বি। তোমার মা যখন যজ্ঞেশ্বরজেঠার দেবোত্তর পত্তনী নিলেন, বাড়ী কিনলেন, তখন বলেছিলেন, বাবা মরুক, তারপর পাশা উল্টে দেব আমি। মোক্ষম অস্ত্র আমার কাছে আছে।

অধীর হয়ে উঠেছিলাম আমি, বলেছিলাম,—আমি টাকা দেব ব্রজদা, তুমি দিতে পার সুখেশ্বর-কাকার ছেলেদের কাছ থেকে এনে ওই খাতা—

—সবুর রাজাভাই। সবুর কিজিয়ে। উ বিল্‌কুল দপ্তর হামারা পাশ হ্যায়। গোপেশ্বর যেদিন খুন করলে মেজকা'কে, তার দিনতিনেক পর ঠিকেদারীর বিল করবার জন্যে খাতা বার করতে গিয়ে সেই ট্রাঙ্ক আমি খুলেছিলাম। এবং সেই সময় কি মনে হল, ওই দপ্তরটি আমি বের করে নিয়েছিলাম। সে আমি কিছু পড়েছিলাম। ইংরেজী লেখা, সেই কতকালের লেখা পড়তে পারি নি আমি, কিন্তু রায়বাহাদুরের ডায়েরী আমি পড়েছি। ডায়েরী খুব সংক্ষেপ বটে। তবে তার মধ্যে মাঝে মাঝে বড় বড় লেখা আছে। মানে দিল খুলে লিখেছেন। অনেক বড় বড় কথা। ভাল ভাল কথা তাতে আছে।—মধ্যে মধ্যে এমন চিত্তচাঞ্চল্য হয়, কামার্ত হইয়া উঠি, তখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানগম্য সব তিরোহিত হইয়া যায়। মন বলে, তুমি ধনী জমিদার-পুত্র, তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছ ভোগ করিতে। না করিলে তুমি মূর্খ। তোমার অধিকারের মধ্যে সবই তো তোমার। ইচ্ছা করিলেই পাইতে পার। কেন মিথ্যা মূর্খের মত সংযম করিয়া নিজেকে পীড়া দিতেছ? মধ্যে মধ্যে এমন চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে যে, নিজেকে স্থির রাখিতে পারা সুকঠিন হইয়া ওঠে। দুরন্ত ক্রোধ হয় সবকিছুর উপর। ইষ্ট-নাম করিতেছি। তাহাতেই বা শান্তি কোথায়? আজ স্ত্রীকে, সকলকে তিরস্কার করি। কাছারীতে উগ্র হইয়া থাকি। দেহধারণের একি পাপ, একি শাস্তি!

ব্রাদার, সে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি যে আমি, আমার ভয় লেগেছিল পড়তে! কিন্তু কথাগুলো তো সত্যি। নিজেকে খতিয়ে দেখেছি। তফাৎ—তিনি ছুটতেন না, আমি ছুটি পিছনে পিছনে। গালও খেয়েছি কত মেয়ের কাছে—। তা তোমার—

—আমার ভয় লাগে ব্রজেশ্বরদা, আমার ভয় লাগে। বাবার সব কথা মনে পড়ে যায়। মায়ের মুখ মনে পড়ে। কেমন একটা দুরন্ত ভয় লাগে আমার। নিজেকে শান্ত করি কি করে জান? শান্ত করি, যাকে ভাল লাগে, তার ছবি আঁকি। ছবিতে তাকে অন্যে চিনতে পারে না, আমি পারি।

—রাজা ! মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ব্রজেশ্বর। তারপর বললে, বুঝতে ঠিক না পারলেও, ঝাপসা ঝাপসা বুঝছি। তোমাকে সেলাম।

—কিন্তু সেই খাতাগুলো আমাকে দেবে ব্রজেশ্বরদা ? বিশ্বাস কর, আমি কাউকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে সেগুলো ব্যবহার করব না।

—রাজাসাব, সে আমি জানি। খাতাগুলো আমি লুকিয়ে রেখে গেছি। জানি না উইয়ে খেয়েছে কিনা। যদি না খেয়ে থাকে, আমি দেব তোমাকে। দেব কেন ? দিয়ে রেখেছি সুরেশ্বর। কলকাতা যাবার সময় সঙ্গে নিতে পারিনি ভয়ে। কোথায় যাবে। ওবাড়িতে রাখিনি। কে হাতাবে। এই বিবিমহলে—ওই কোণে একটা কুঠরী আছে। তাতে আছে সব ভাঙা ছবি, কাঠকাটরা ; দেওয়ালে একটা খোলা আয়রণচেষ্ট গাঁথা ছিল—আমি তারই মধ্যে রেখে গেছি—ন্যাকড়াটার ওপর কালি দিয়ে লিখে দিয়েছিলাম—"রায়বাহাদুরের শ্রাদ্ধের ফর্দ" ইত্যাদি। সে কেউ নাড়ে নি বলেই আমার বিশ্বাস, যদি তুমি এবার এসে ফেলে না-দিয়ে থাক। ও-ঘরটায় বীরেশ্বর রায়ের বন্দুক-টোটা থাকত। দরজাটা খুব মজবুত। মদও থাকত। তারপর কাঠকাঠরা ঢুকেছিল বাড়ী যখন তোমার বাবা মেরামত করান তখন। তুমি ওটাকে সাফটাফ করাও নি তো ?

—ভেবেছিলাম করাব। রঙ-তুলির ছবির আড্ডা করব। কিন্তু ছোট আর আলো কম বলে করি নি। কই চল, দেখ কোথায় রেখেছ ?

—এখুনি ?

—এখুনি।

বাধা পড়েছিল। অর্চনা আর মেজঠাকুমা এসে ঘরে ঢুকলেন। অর্চনা বললে—বাবাঃ বাবাঃ, দু' ভাইয়ে কি এত কথাবার্তা চলেছে গো, যার আর শেষ নেই ? আমরা পিত্যেশ করে বসে থাকব কত ?

মেজঠাকুমা বললেন—আমি বলি নি ভাই। অচি আমাকে সামনে করে এল। বলে, বান বিঁধলে তোমাকেই বিঁধবে। ব্রজকে ছেড়ে দাও ভাই সুরেশ্বর। বাড়ী থেকে ডাকতে এসেছে। বউয়ের ঘুম পেয়েছে। এতটা পথ এসেছে। আমরা আজ ওদের ফুলশয্যা করব। বুঝেছ। এখানে তো কিছু হয় নি।

—আর একটু, পাঁচ মিনিট দাঁড়াও, ঠাকুমা। পাঁচ মিনিট। তারপর না-হয় ব্রজদার ফুলশয্যাতে আমি বাজাব, ব্রজদা গাইবে, সুন্দর গলা ওর। আর কে নাচবে তা ঠিক তোমরাই করে দেবে।

মনটা আমার সত্যই খুশি হয়ে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। ব্রজেশ্বর যা দিয়েছে, তাতে আমার মন একেবারে ভরে গিয়েছে। অতীতকালেরই একটা মোহ আছে। রায়বাড়ীর অতীত কাল, সে আমার অতীতকাল ; একান্তভাবে আপনার। যার মধ্যে সূত্র পাব, যা ধরে আমি কেন এমন হলাম, সেই সত্য জানতে পারব। আরও আকুতি ছিল, তোমার এবং আমার মধ্যে যে-ব্যবধান হঠাৎ আবিষ্কার করেছি, তা কি পূর্ণ করা যায় না। এর মূল্য তোমার কাছে কতটা মনে হচ্ছে জানি না—

*　　　　*　　　　*

দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুনেই চলেছিল সুলতা, কোন কথা বলে নি। এক বিচিত্র সত্য অতীতকালের মধ্য থেকে এসে সামনে দাঁড়িয়ে তাকেও অভিভূত করেছিল। তার অতীতপুরুষে ছিল এক ঠাকুরদাস পাল। রত্নেশ্বর রায়ের অনুগৃহীত জন। কেমন একটা অস্বস্তি তার মনে হচ্ছিল বইকি! সে রত্নেশ্বরকে রক্ষা করতে গিয়ে তার স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাতে পারে নি। তাকেই আবার রত্নেশ্বর খুব সম্ভবত পিদ্রু গোয়ানকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন। তাতে একটা ক্ষোভও হচ্ছিল তার। ওই অস্বস্তি এবং এই ক্ষোভ দুই মিলিয়ে একটা কি তৈরী হয়েছিল, তার মূল্য নিশ্চয় সে অনুভব করেছে।

এতক্ষণে সে সুরেশ্বরের কথার জবাবে বললে—মূল্য অনেক মনে হচ্ছে সুরেশ্বর। না-হলে এতকাল পরে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার পর তোমার এই ছবিগুলির সামনে নির্বাক হয়ে বসে তোমার কথা শুনছি কেন? বয়স অনেকটা হয়েছে। এইভাবে সারারাত্রি জেগে গল্প শোনার তো কথা নয়। বল তুমি। থেমো না। রাত্রি একটা পার হয়ে গেছে। বল।

ঢং করে ঘড়িতে একটা ঘণ্টা বাজল। সুলতা বললে, ক্লকটা ফাস্ট আছে, দেড়টা হয় নি এখনও। একটা বাইশ। বল।

* *

ব্রজেশ্বর খুঁজে পেয়েছিল দপ্তরটা। আমি খুলে দেখেছিলাম তৎক্ষণাৎ। আমার হাত কাঁপছিল। কেন তা জানি না। বেশ ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। ব্রজেশ্বর বলেছিল—রাজা, হল কি তোমার?

হেসে বলেছিলাম—জানি না।

সে বলেছিল—আমায় দাও। গিঁটটা অনেক দিনের। মজে গেছে।

সেও খুলেছিল অনেক কষ্টে। দু'খানা খাতাই ছিল তাতে। একখানা ডিমাই আট পেজী। চামড়ায় বাঁধানো ছিল। সেটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল—এইটেই ইংরেজীতে লেখা বীরেশ্বর রায়ের। আর এটা রত্নেশ্বর রায়ের। একেবারে পুরো ডিমাই সাইজের। সেটা বাংলায়।

এর মধ্যে এসেছিল অর্চনা।—হল তোমাদের?

ব্রজেশ্বর বলেছিল—হল।

—কটা বাজছে মনে আছে? এগারটা।

সুরেশ্বর সুলতাকে বললে, আজ দেড়টা বাজে। সেদিন এগারটা বাজছিল তখন। ও-ঘরে ক্লক-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজা তখনও শেষ হয় নি।

ব্রজেশ্বরদা আমাকে বলেছিল—চল রাজা, তুমি আমার বাসী ফুলশয্যাতে বাজনা বাজাবে, এ আমার খুব ভাল লাগছে। তুমি বাজাবে, আমি গাইব। নাও, তোমার বেহালাটা নাও।

চুপি চুপি বলেছিল—একটু খেয়ে নেবে নাকি? রাত্রি হয়ে গেছে—।

—না। চল।

ব্রজেশ্বরদা সেদিন ভাল গান গেয়েছিল। তবলা বাজিয়েছিল ব্রজেশ্বরের সৎ-কাকা। মেজ-ঠাকুরদার দ্বিতীয় পক্ষের এক ছেলে। ওই করেই সে একরকম ফেরে এ অঞ্চলে। নেশা করে। চমৎকার তার হাত।

শেষে গান গেয়েছিল মেজদি এবং অর্চনা। ব্রজেশ্বর কিছুতেই ছাড়ে নি। অনুরোধ ছিল তার অর্চনাকে। কিন্তু অর্চনা ধরেছিল—মেজদিকে গাইতে হবে।

মেজদি অগত্যা গেয়েছিলেন সাদামাটা একখানা কীর্তন। তাও মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে বলে-ছিলেন—দূর! সব মাটি করে দিলাম। আমার হয় না বলছি। সত্যিই হচ্ছিল না। সুতরাং শেষ করবার কথাও কেউ বলে নি।

তারপর ধরেছিল অর্চনা। সুলতা, মেয়েটার গলা যেন মধুঢালা। কি বলব তোমাকে। কাজী নজরুলের গানের খুব চল তখন। নজরুলের গজল গাইলে। আমি বেহালায় ছড় টান-ছিলাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। নেশা লাগছিল। গান শেষ করলে অর্চনা, তখনও আমি ছড়ি টানছি।

অর্চনা বললে—এখনও ছড়ি টানো যে!

ছড়িটা তুলে বললাম—তাইতো!

ঠাকুমা খিল খিল করে হেসে উঠলেন। বললাম—তা হাসতে পার মেজদি। অর্চনার কাছে ঠকে গেছি।

ঠাকুমা বললেন—দেখো যেন প্রেমে পড়ো না ভাই-বোনে। গান শুনে প্রেমে পড়ার নজীর আছে। আমার দাদাশ্বশুর সায়েবী-মেজাজের মানুষ ছিলেন। এ-দেশের মেয়ে তাঁর চোখে ধরত না।

—ঠাকুমা! শাসিয়ে উঠল অর্চনা।

ঠাকুমা দমলেন না, বললেন—এক বন্ধুর বাসরে গানে-বাজনায় আমার দিদিশাশুড়ীর কাছে ঠকে এমন প্রেমে পড়লেন যে, সেই কলকাতায় বসে থেকে বিয়ে করে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

—এমন অসভ্য তুমি! ঠাক্‌মাগুলো এমনিই হয়।

উঠে গেল অর্চনা। সকলে হেসে উঠল। ব্রজেশ্বরদা বললে—এ-বাড়িতে এমন মেয়ে একটাও নেই।

রাত্রি তখন প্রায় দুটো।

বাড়ী ফিরে এসে অনেকটুকু মদ্যপান করেছিলাম। খাতাগুলো সামনে ছিল। যে আনন্দটুকু নিয়ে ফিরে এসেছিলাম, তা তখন উত্তেজনায় পরিণত হয়েছে। ভয় হচ্ছে। আবার অদম্য কৌতূহল!

* * *

সে-কৌতূহল দমন করতে পারি নি। খুলে পড়েছিলাম।

মোটা কাগজের খাতা। পাতাগুলো হলদে হয়ে এসেছে। মধ্যে মাঝে লালচে ছাপ। কোণগুলো আপনাআপনি দুমড়েছে-কুঁকড়েছে। নেড়ে দেখলাম, ভেঙে যাচ্ছে। সন্তর্পণে

নাড়তে হবে। বেশ টানা লেখা। বোধহয় কুইন-পেনে লেখা। লেখা ভাল কিন্তু টান আছে, আর কালি ওই লাল-হলদে রঙের বিবর্ণতার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। একটুক্ষণ মন দিয়ে দু-চারটে লাইন পড়তে পড়তে টানের ছাঁদটা আর্টিস্টের লাইনের ঢংয়ের মত চোখে পড়ে, অক্ষর স্পষ্ট হয়ে উঠল।

This is not my diary. I don't keep my diary and don't like to keep diary like others. What is the use of writing what you do everyday ? You do the same thing--today—tomorrow—day after tomorrow, you eat you drink you do this and that—you sleep. It seems to me that it is ludicrous to write them every night--before you retire. But this is something else. Something has happened today, that very seldom happens. Wonderful something, memorable something ! That's why I am writing down –in details lest I should forget them. It is just like writing down a poetry—you hear from a poet, which will never be published.

অনেক উচ্ছ্বাস আছে। তারপর নিজের পরিচয় দিয়েছেন। পড়তে পড়তে মনে হল দাম্ভিক উগ্র শক্ত সাহসী বিলাসী এক রসিক মানুষ সামনে এসে দাঁড়ালেন।

I am Bireswar Roy, son of Someswar Roy of Kirtihata. I can easily say—Prince of Kirtihata—I am. My father is really the king of the place. But he is a coward, he is shrewd—and he is—devoted to idolatry. I am opposed to it. I don't believe in it. Neither do I believe in other —theory or thesis about God. No I do not, I don't believe in Rev. Hill's preachings also. I do not believe what Raja Rammohon Roy says. But my father—is an affectionate father. I love him. Still I have ignored his repeated request to marry—where is the girl—that will be my wife ?

স্ত্রী হবার মত নিজের যোগ্য কন্যা বাংলা দেশে তিনি খুঁজে পান নি। কলকাতায় সাহেবদের পাঠশালা থেকে হিন্দু কলেজে কিছুদিন পড়া-শোনার পর দেশে এসেছিলেন বাপের সঙ্গে।

এখানে এসে রেভারেণ্ড হিলকে বাড়ীতে রেখে বীরেশ্বরের পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন সোমেশ্বর। এখানে আরও আকর্ষণ পেলেন বীরেশ্বর। নীলকর রবিনসনের বাড়ী। তাঁর ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার আকর্ষণ তাঁকে এখানে বাঁধলে। তার সঙ্গে শিকার করে, ঘোড়ায় চড়ে, হিল সাহেবের কাছে পড়ে, এক অদ্ভুত মানুষ হয়ে উঠলেন। না পড়লেন শাস্ত্র,

না পড়লেন দর্শন, এমন কি হিল সাহেব বাইবেলখানা বার দুই পড়িয়ে আর পড়াতে পারেন নি। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় পারঙ্গম হলেন। জীবনী পড়লেন। আইন পড়লেন এবং ঘোষণা করলেন, তিনি ঈশ্বর-ফিশ্বরে বিশ্বাস করেন না। কালীকে মানেন না! রাজরাজেশ্বর নামক নুড়িকেও মানেন না। ব্রাহ্মদের ব্রহ্মাকেও মানেন না। ইংরেজদের গড, মুসলমানদের আল্লা, কিছুকেই না।

**I do not believe in anything, any form of God—not in Kali not in that round shaped stone—not in Brabma, not in God nor in Allha.**

এর সঙ্গে তিনি শিখলেন গান। কণ্ঠস্বর ভাল ছিল না কিন্তু কালোয়াত হবার খুব একটা ঝোঁক ছিল।

এই বীরেশ্বর রায় তাঁর যোগ্য কন্যা দুনিয়াতে অন্তত এই বঙ্গদেশে, যেখানে অষ্টমবর্ষে গৌরী হিসাবে বধূ-বরণ করতে হয়, সেখানে পাবেন কোথায়? রবিনসনের কন্যা ছিল কিন্তু সেদিকে মন টেনেছিল কি না কেউ বলতে পারে না। তিনি লেখেন নি। বরং লিখেছেন, আমার হাসি পায় যখন জন রবিনসন এবং তার বোন মেরী কথায় কথায় কপালে বুকে কাঁধে হাত দিয়ে ক্রশ আঁকে। এরা একেবারে মূর্খ কুঠিয়াল। বোধ করি ওদের দেশের লাঠিয়াল ছিল। শব্দ দুটো ইংরিজীর মধ্যে ব্যবহার করেছেন।

তিনি সেদিন স্মরণীয় ঘটনার খাতা হিসেবে এই খাতা আরম্ভ করে লিখছেন—

**Today—26th April 1842, 14th Baisakh 1250 B. S. is a memorable day for me. I have found her out. She is she—whom I have wanted all my life and have searched her even in my everyday dreams. Yes—she is the she.**

## ৪

বীরেশ্বর রায় গিয়েছিলেন, সুলতা, বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী। কলকাতা জীবনের বন্ধু। সম্পর্কে ভাই। সোমেশ্বরের মামাতো ভাইয়ের ছেলে। কুড়ারাম ভটচাজ বিয়ে করেছিলেন কালীঘাটে এক গরীব ব্রাহ্মণের মেয়েকে—তা বলেছি। বিনিময়ে তিনি তাঁর শ্যালকের ভাগ্যের পথ খুলে দিয়েছিলেন। তাকে নিজের অধীনে কোম্পানীর সেরেস্তায় ঢুকিয়েছিলেন। তিনিও নিজের ভাগ্য গড়ে নিয়েছিলেন যথাসাধ্য। রায় বংশের তুলনায় তা তেমন কিছু না-হলেও যথেষ্ট করেছিলেন। কালীঘাট তখন গ্রাম মাত্র। কালীঘাট ছেড়ে তিনি কলকাতার ভিতরে উত্তরাঞ্চলে বড় বাড়ী করেছেন। ছেলে ইংরিজী লেখা-পড়া শিখেছে। নাম হয়েছে। তারই বিয়ে,—বিয়ে চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ অঞ্চলে জয়নগর-মজিলপুরের কাছে। কন্যাপক্ষ গ্রামের জমিদার এবং মানী লোক। এ বিয়েতে বীরেশ্বর গিয়েছিলেন। সোমেশ্বরের মামাতো ভাইয়ের ছেলে বীরেশ্বরেরই সমবয়সী এবং সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই।

বিয়ের আসরে বাঈজী-নাচ হয়েছিল—সেই আসরে তিনি বসেছিলেন, মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। নাকি খুব ভাল গাইছিল বাঈজী। বাঈজীর একটি মেয়ে ছিল, সেও তার সঙ্গে সুর দিচ্ছিল। গাইছিল ভৈরবী।

ঠিক ঠিক জায়গায় বাহা-বাহা এবং মোহর বকশিস করেছিলেন। এমন সময় একটি কিশোরী মেয়ে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য সপ্রতিভ এবং আশ্চর্য রূপ। গৌরাঙ্গী নয় শ্যামাঙ্গী কিন্তু অপরূপ তার লাবণ্য। তখন মেয়েরা—সে দশ বছর বয়স থেকে—চিকের ভেতরে বসে। পথে-হাঁটে মুখ নিচু করে। ক্ষণে-ক্ষণে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে ষাট বছরের বৃদ্ধ থেকে বারো বছরের বালককে দেখে—; সেই আমলে সেই তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরী এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, নমস্কার! আপনাকে বাসরে বর ডাকছে।

মুখের দিকে তাকিয়ে বীরেশ্বর সবিস্ময়ে বলেছিলেন, আমাকে?

—হ্যাঁ! আপনি তো বরের ভাই! রায়বাবু!

—হ্যাঁ। কিন্তু—

—কিন্তু কিছু নেই, বর বাসরে বিপদে পড়েছেন।

—বিপদে পড়েছেন?

—হ্যাঁ। গান গাইতে গিয়ে মান গিয়েছে। মান বাঁচাতে আপনাকে ডাকছেন।

বীরেশ্বর কৌতুক অনুভব করেছিলেন। বরের হয়ে বাসরে তাঁকে গান গাইতে হবে? হিন্দু প্রথা সামাজিক আচার বহু কিছুকেই তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। কিন্তু বিয়ের বাসরে একটা রোমান্স আছে এটা তিনি মানতেন।

কণ্ঠস্বর যেমনই হোক, নবযুবক বীরেশ্বরের গায়ক-খ্যাতির জন্য লোলুপতা ছিল। থিয়েটারের দলে সিরিয়াস অ্যাক্টরের সিরিও কমিক কি কমিক পার্টে খ্যাতির জন্য এবং কমিক অ্যাক্টরের সিরিয়াস পার্টে নামের জন্য যেমন লোলুপতা থাকে—এও তাই আর কি। তবে গানে জ্ঞান এবং দখল তাঁর ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে বীরেশ্বরের ফাঁকি ছিল না। তিনি শিকারীও ছিলেন, তিনি লিখেছেন—

**"I have never missed my bullet shot at a target nor have I ever erred in 'tal' in any recital of any Raga."**

যে ঘটনাটা ঘটল তারই ওপর লিখেছেন ওটা।

বাসরে যেতেই বর বললে—ভাই বীরা, তুমি মান রাখ ভাই। এই ইনি আমার দিদি-শাশুড়ী। গান শুনে বললেন—ওরে, হরু ধোপা বাইরে এসেছে, ওর গাধা হারিয়েছে। বলে ঘরে ঢুকেছে। বল, এ তার গাধা নয়! তারপর এমন গান শোনালেন এঁরা যে, বাজাতে গিয়েও হেরে গেলাম।

হেসে বীরেশ্বর বললেন—আগে ওঁদের অনুমতি হোক!

ঠাকুমা বললেন—তোমার অনুমতি হোক ভাই রায়হুজুর, তুমি বসবে আমাদের ঘরে, এতে আমাদের অনুমতি লাগে! তুমি এসেছ শুনে অবধি আমাদের উঁকিঝুঁকির সীমা নেই। সবাই দেখেছি। আর বলব কি, যাকে বলে মজে যাওয়া তাই গেছি। এই বয়সে

আপসোস হচ্ছে, কেন সেকালে জন্মেছিলাম।

বীরেশ্বর ঘরে ঢুকে বরের আসনের পাশে বসেছিলেন। বাজনার সরঞ্জামের অভাব ছিল না। তবলা পাখোয়াজ থেকে তানপুরা সব।

বীরেশ্বর পাখোয়াজ টেনে নিয়ে ঘা দিয়ে দেখেছিলেন সুন্দর করে বাঁধা আছে। ময়দার লেপনেও হাত দিতে হয়নি। বলেছিলেন—নিন ঠাকুমা, আরম্ভ করুন।

—আগেই আমরা?

—আমি তো বাজাচ্ছি!

—বেশ। নে লা, ভাই ভবানী, নে। রায়হুজুরের বাজনার সঙ্গে আর কে গাইবে? তুই নে!

এই সেই মেয়ে যে তাঁকে আসরে ডাকতে গিয়েছিল। সে বললে—না, উনি গাইবেন আমরা শুনব। দায় তো বরের ঠাকুমা, কনের তো নয়। বর গাইতে পারে তো ওকে আমরা ছেড়ে দেব নইলে বেঁধে রাখব। তা ওঁর বদলে উনি এসেছেন, ছাড়িয়ে নিয়ে যান!

বর বললে— না-না। আপনি গান। সত্যি বলতে আপনার গান শোনবার জন্যেই বাবাকে ডেকেছি। নইলে রাখুন না আমাকে বেঁধে। ছাড়ানটা চাচ্ছে কে? তা ছাড়ান কি এ বাঁধনের পর মেলে কারুর?

ঠাকুমা বলেছিলেন, তোমরা বড় চতুর জন্তু নাতজামাই। বাঁধন ছিঁড়ে পালাও। আবার রাতচরা গরুর মত রাত্রে চরে এসে ভালমানুষ সেজে দাঁড়িয়ে থাক গোয়ালের সামনে।

মেয়েরা খিল-খিল করে হেসে উঠেছিল। বীরেশ্বরের মনে খট করে লেগেছিল কথাটা। তিনি গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বলেছিলেন, বেশ আমিই গাইছি। কে বাজাবে? বরকে বলেছিলেন, তুই ধর ঠেকা দিয়ে যাবি!

—না-না। ওই উনিই ধরবেন।

—কে?

সেই মেয়েটিকেই দেখিয়ে দিয়েছিল নারায়ণচন্দ্র।

বীরেশ্বর পাখোয়াজটা পাশে রেখে তবলা বাঁয়া এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন নিন। এবং তানপুরাটা নিয়ে সুর দেখে ধরেছিলেন সাধারণ গান।

"কালার লেগেছে রূপ নয়নে।
কালার—।
লেগেছে রূপ নয়নে—এ-এ-এ, লেগেছে!
কালার!"

তবলার কোমল হাতে হলেও চটাং শব্দে ঠিক ধরতার সময় চাঁটির শব্দ তুলে ক্ষিপ্রগতিতে মেয়েটির আঙুলগুলি যেন নেচে উঠল—নাচের জলদ তালে চলা হাল্কা প্রণয়ের মত। তবলা বোল বলে মুখর হয়ে উঠল, একেবারেই পরান দিয়ে বাজনা ধরেছে। বিস্ময়ের সীমা রইল না তাঁর। এ মেয়ে কে?

হঠাৎ মেয়েটি তালে চাঁটি দিয়ে বললে—হুঁ !

অর্থাৎ তাকে ধরিয়ে দিচ্ছে, যাচ্ছে যাচ্ছে ধর। হেসে সামলে নিলেন বীরেশ্বর। তারপরই বুঝতে পারলেন বাজিয়ে আড়ি মারছে। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে ধরে মুখ রাঙা করে যেন রোষ ভরে বাজিয়ে চলেছে। আবারও হেসে তিনিও ধরলেন বাঁকা পথ। খেলতে লাগলেন। জলদ থেকে জলদতর করলেন গতিকে।

কালার লেগেছে রূপ নয়নে। কালা-র
লেগেছে রূপ নয়নে রূপ নয়নে রূপ নয়নে
কালা-র। লে-গে-ছে রূপ নয়নে-এ
কা-লা-র। লেগেছে।

ঘরখানা সঙ্গীতের শব্দতরঙ্গে ভরে উঠেছে। কথা গৌণ হয়ে গেছে। খেলছে কণ্ঠে সুর আর তবলার বোল। ঝর ঝর ঝর ঝর শব্দে জলপ্রপাত ঝরছে অথবা ঝমো ঝমো ঝমো শব্দে একখানা বাসন মেঝেতে পড়ে গড়িয়েই চলেছে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে। শ্রোতাদের নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। শব্দের মধ্যেও তারা একটা লড়াই চলছে বুঝতে পারছে। অকস্মাৎ বীরেশ্বর অনুভব করলেন তিনি একটি অক্ষর উচ্চারণের মত সময় কখন হারিয়ে ফেলেছেন, এবারই তবলায় গানে সমাপ্তির ছেদ পড়বে, ও মারবে তবলায় চাটিঝাঁ—কিন্তু তাঁর তখনও একটি অক্ষর বাকী থেকে যাবে। কা-লা-র কা লা পর্যন্ত বলা হবে র অক্ষরটি অনুচ্চারিত রাখতে হবে, তিনি হেরে যাবেন। মুহূর্তে তিনি সামলে নিলেন, কা লা দুটি অক্ষরকে জুড়ে ক্লা ক'রে নিলেন এবং গাইলেন কালার লেগেছে রূপ নয়-নে-ক্লার! মেয়েটি ফিক করে হেসে তবলায় সমাপ্তির ধাঁ মেরে বললে, আপনার সঙ্গে আমি পারি! বাবা, এ দৌড়ে কলকেতা পৌঁছুনো যেতো।

বীরেশ্বর আশঙ্কা করেছিলেন, সে উচ্চহাস্যে ব্যঙ্গ করে এই অতিসূক্ষ্ম ভুলটুকু, যা এদের কারও কাছে ধরা পড়ে নি, তাকে ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে অপদস্থ করবে। কিন্তু তারও উপর বেশী হয়েছিল বিস্ময়। এ মেয়ে কে? তিনি জানেন, তিনি দেখেছেন, সঙ্গীতে জন্মগত প্রতিভা নিয়ে অনেকে জন্মায়। অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। এ যে তাই ত্যতে তার সন্দেহ রইল না! কিন্তু এ মেয়ে কে?

গোটা ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে ছিল। শ্রোতাদের বিস্ময় এবং অভিভূত ভাবটা এখনও কাটে নি! কয়েক মুহূর্ত পর ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, একটা হার-জিত যেন হল! তা' জিতল কে রে ভবানী?

—উনি ঠাকুমা। চমৎকার হেসে মেয়েটি বললে।

ঠাকুমা বললেন—তাতে লজ্জা নেই। বীরু রায় কত বড় বড় ওস্তাদ রেখে গান শিখেছে। তোর বিদ্যে তো ভগবৎদত্ত। তোর বাবার 'ঔরসের' ফল। তবে তোর ঐ বাবা তোকে সাধতে দেয় এই যা, নইলে এতদিন ভাতের হাঁড়ির কালি আর উনোনের ছাই চাপা পড়ত। তা এইবারে তুই একটা গান শুনিয়ে দে। দেখবি গানে রায়বাবু তোকে ঠকাতে পারবে না।

# কীর্তিহাটের কড়চা

দ্বিতীয় খণ্ড

# চতুর্থ পর্ব

রাত্রি গভীর হয়েছে। কলকাতা শহরের মত শহরও স্তব্ধ। জানবাজারের বুক চিরে চলে গেছে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, তার একটু আগে গিয়ে মিলেছে লিণ্ডসে স্ট্রীটের সঙ্গে, লিণ্ডসে স্ট্রীটের উত্তরে হগ সাহেবের মিউনিসিপ্যাল মার্কেট। ১৯৫৩ সালেও ফিটন ছিল অনেক। গোটা অঞ্চলটাতেই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। বোধ করি বাঙালী হিন্দু পরিবারের বড় বাড়ী হিসাবে রায়দের বাড়ীটাই শেষ বাড়ী। পশ্চিম গায়েই ফ্রি স্কুল স্ট্রীট। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে কিছুক্ষণ আগে কতক্ষণ তার হিসেব ঠিক নেই, এই অতীত কথায় বক্তা এবং শ্রোতার নিমগ্নতায় মধ্যে সে হিসেব হারিয়ে গেছে, তবে কিছুক্ষণ আগেও মধ্যে মধ্যে মধ্যযুগের সেই নির্জন প্রান্তরে ধ্বনিত কোন দুঃসাহসী কিম্বা কোন পলাতকের ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজের মত একটি ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ খপ-খপ খপ-খপ শব্দ তুলে দূর থেকে কাছে এসে আবার দূরে চলে গেছে। দু-চারটে কুকুরের আওয়াজ শোনা গেছে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ওদিক থেকে। মার্কেটের মাংসের দোকানে হাড় আর ফেলে দেওয়া চর্বি মাংস খেয়ে যে কুকুরগুলো সারাদিন পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করে আর দোকানের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারাই এখন ফুটপাথে পড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে কিছু দেখে চীৎকার করে উঠছে। আবার সব চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। এ অঞ্চলে অনেক বার, সেগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। এর আগে মাঝে মাঝে স্খলিত পায়ের প্রমত্ত জুতোর শব্দ, দুচারটে জড়ানো কথা, গান বা আস্ফালন শোনা গিয়েছিল—তাও আর শোনা যায় না।

নভেম্বর মাসের পঁচিশে তারিখের রাত্রি; শীত ঘন হয়ে এসেছে, বাহিরে হয়তো আবছা কুয়াশার একটা আভাস ভাসছে; সব স্তব্ধ; এরই মধ্যে সুরেশ্বর বলে চলেছিল কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর কড়চা, আর সামনে সাজানো ছবিগুলিকে দেখিয়ে বলছিল—এই দেখ!

১৯৪৮ সালে ভবানী দেবী জলস্রোতে ঝাঁপ দিয়ে কোথায় চলে গেলেন। বীরেশ্বর রায় কীর্তিহাট ছেড়ে এলেন। কলকাতায় এই বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। এই ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে তার জুড়ি ঠিক এমনি গভীর রাত্রে ক্ষুরের শব্দ তুলে, চাকার শব্দ তুলে ফিরে আসত। তখন রাস্তায় পিচ হয়নি, গাড়িতে রাবার টায়ার হয় নি, রীতিমত রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে এপাড়ার অনেক ঘুমন্ত জনের ঘুম ভাঙিয়ে ফিরত বউবাজার থেকে। বউবাজারে সোফিয়া বাঈয়ের ঘরে তিনি আসর পেতেছিলেন। এ সেই সোফিয়া, যে কিশোরী বয়সে বীরেশ্বর রায়ের মামাতো ভায়ের বিয়ের আসরে তার মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল মুজরো করতে। যার গান শুনতে বসে সবটা তার শোনা হয় নি। ভবানী দেবী এসে মুখ টিপে হেসে বলেছিলেন—আপনার ভাই—বর—বাঁধা পড়েছেন গানের দায়ে। বাসরে গানের আসরে ফেল করেছেন। তিনি আপনাকে ডেকেছেন তাকে খালাস করে নিয়ে যেতে।

এই সপ্রতিভ ও কিশোরীর সরস কৌতুকের আহ্বানে তিনি সোফিয়ার গান আধশোনা করে উঠে গিয়ে নিজে পড়েছিলেন ভবানী দেবীর আঁচলের বাঁধনে। সেই বাঁধন ভবানী দেবী খুলে দিতেই তাঁর মদের নেশার মধ্যে মনে পড়েছিল সোফিয়াকে। তিনি কলকাতায় এসে প্রথমেই কিনেছিলেন জুড়ি গাড়ী।

কলকাতা তখন জবচার্ণকের হাট এবং ঘাট কলকাতা অর্থাৎ বাজার কলকাতা এবং বন্দর কলকাতা থেকে রাজধানী কলকাতার চেহারা নিচ্ছে।

লর্ড ওয়েলেসলীকে তখন বলত নবাব ওয়েলেসলী। একাধারে গবর্নর জেনারেল আবার জঙ্গীলাট। কলকাতাকে বেড় দিয়ে ষাট ফুট চওড়া সার্কুলার রোড বা বাহার সড়ক গঙ্গার ধারে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে কলকাতার উত্তর সীমানা পর্যন্ত বাঁধিয়ে দিয়েছেন। গবর্নর জেনারেলের থাকবার জন্য বিরাট লাটপ্রাসাদ বানিয়ে ফেলেছেন। তখন লর্ড ডালহৌসি ভবিষ্যতের গর্ভে, জায়গাটির নাম ডালহৌসি স্কোয়ার হয় নি। শুধু কলকাতায় নয়, ব্যারাকপুরে বাগানবাড়ী হয়েছে। লাটসাহেবের বাড়ী চাকর-বাকরের বাহিনীতে ভরে গেছে।

কলকাতার লোক বসে নেই। তারাও এতে যোগ দিয়েছে। বড় বড় বাড়ী-বাগান-বাড়ীর ধুম পড়েছে। গাড়ী ঘোড়ার আমদানী হচ্ছে। ব্রুহাম-ল্যাণ্ডো-জুড়ি কম্পাস ফিটন। আবার টাউন হলও তৈরী হয়েছে সাধারণের চাঁদায়।

লাট প্রাসাদে ডিনার হয় পার্টি হয়, মদের জোয়ার বয়, বল নাচ হয়। নাচের শেষে রাত্রে চলে তাদের মদের ব্যভিচার। ফিলিপ ফ্রান্সিস মাদাম গ্র্যাণ্ডের বাড়ী ছুটত মই ঘাড়ে ক'রে এটা ইতিহাসে লেখা আছে। ওখানেই শেষ নয়, ছোটখাটো সাহেবদের বাড়ীতে পোষা থাকত এদেশী মেয়ে। সে বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা থেকে জমাদারনী পর্যন্ত। লোকে বলে ক্লাইব সাহেবের হারেম ছিল, হেস্টিংসেরও ছিল। জাহাজের সেলার এসে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট অঞ্চলে দাপাদাপি করত। তার দেখাদেখি এদেশের ধনীদের বাগানবাড়ী হয়েছিল এবং দাপাদাপি ছিল বউবাজারের বাঈজীপাড়া থেকে হাড়কাটা রামবাগান সোনাগাছি পর্যন্ত। এসব পাড়া তখন জমে উঠছে সবে। সায়েবদের জন্যে বিলেত থেকে মেয়েরা আসছে বেশ্যাবৃত্তি করতে।

তারই মধ্যে চলে সভাসমিতি। তারই মধ্যে রাত্রিশেষে সূর্যোদয়ের ছটা বাজে। সকালে উঠে রাত্রের নেশা চোখ থেকে মুছে রাতের মানুষ আর এক মানুষ হয়ে ওঠে।

রামমোহন রায় ব্রাহ্মদর্শন প্রচার করেন ; ইংরিজী শিক্ষার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। সতীদাহ নিবারণের আন্দোলন করেন। বিদ্যাসাগর আন্দোলন করেন বিধবা বিবাহ নিয়ে। জমিদারেরা করেন ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি, বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠেছে। খবরের কাগজ হয়েছে। এনকোয়ারার, ইস্ট ইণ্ডিয়ান, জ্ঞানান্বেষণ, ইণ্ডিয়া গেজেট, বেঙ্গল হরকরা, সমাচার দর্পণ, সংবাদপ্রভাকর, সমাচার চন্দ্রিকা।

সুলতা বললে—সে-কালকে আমি জানি সুরেশ্বর। তুমি বীরেশ্বর রায়ের কথা বল।

সুরেশ্বর বললে—তুমি জান সে আমিও জানি। তবে আমি আমার এর পরের ছবিখানাকে তোমাকে বোঝাচ্ছি। দেখ এই ছবিখানাই সব থেকে বড় ছবি। দেখ ছবিটাকে উপরে নিচে ডেকরেশনের প্যানেল দিয়ে আসলে তিন ভাগে ভাগ করেছি। উপর আর নিচের প্যানেলে আছে সেকাল। দেখ—উপরের প্যানেলে লাট সাহেবের নতুন বাড়ী, দুপাশে লিভারি আঁটা চাকরের সারি, মাঝখানে দাঁড়িয়ে লর্ড ওয়েলেসলী। তারপর দেখ টাউন হল। ওই দেখ ডেভিড হেয়ার ঘড়ির দোকান বন্ধ করেছে, বগলে বইয়ের গাদা। তার পাশে ডিরোজিও। তার পাশে চার্লস গ্র্যাণ্ট ; তারপর মেকলে। ওই দেখ চৌরঙ্গীতে সাহেবদের গাড়ী চলছে, সামনে সহিস ছুটছে। ওই দেখ পাল্কি চলছে। ওই দেখ উইলিয়ম বেণ্টিক। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ। বেণ্টিকের হাতে গুটনো কাগজ, সতীদাহ-প্রথা রহিত বিল, বিধবা বিবাহ বিল। নিচের প্যানেলে দেখ রামমোহন রায় উঁচু বেদীতে দাঁড়িয়ে একটি আঙুল দেখাচ্ছেন, লোকে দেখছে। এক ঈশ্বর। ব্রহ্ম। তারপর দেখ দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁর সামনে দুটো দরজা—ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি,

কার টেগোর এ্যাণ্ড কোং, য়ুনান ব্যাঙ্ক। ওর পরে একটা বাগান, ওটা প্রিন্স দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া ভিলা। তারপর দেখ প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রাধাকান্ত দেব—বগলে শব্দকল্পদ্রুম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—হাতে প্রথম ভাগ, ব্যাকরণ কৌমুদী, সীতার বনবাস, মাইকেল মধুসূদন দত্ত—হাতে মেঘনাদ বধ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ওই দেখ প্যারিচরণ সরকারের হাতে ফার্স্ট বুক। ওই দেখ কালীপ্রসন্ন সিংহ বগলে মহাভারত। আবার ওই দেখ রাত্রে সাহেবদের বল নাচ। বাবুদের বাইজী খেমটা নাচের আসর। এরই মাঝখানে ওই দেখ, এই বাড়ীর মাঝখানের হলে বসে রয়েছেন বীরেশ্বর রায়। সামনে টেবিলে হুইস্কির বোতল গ্লাস। ওই পড়ে রয়েছে সোফার উপর সোফিয়া বাঈ। মদে তার জ্ঞান নেই। অপরূপ সুন্দরী ছিল সোফিয়া বাঈ। কেউ বলত কাশ্মীরী মেয়ে, কেউ বলত পার্শী মেয়ে। নিতান্ত শৈশবে কিনে মানুষ করেছিল ওর বাঈজী-মা!

১৮৫৫ সালের ৩১শে মের রাত্রি সেদিন।

তার আগে সুলতা, ১৮৪৮ সালের ২৩শে জুলাই, শ্রাবণ মাসের ৬ তারিখ ছিল, সেই তারিখে বীরেশ্বর রায় লিখেছিলেন তাঁর স্মরণীয় ঘটনালিপির বাঁধানো খাতাটাতে—Am I going mad? Yes it is madness! Let it come. তারপর থেকে বলতে গেলে মেরুন রংয়ের চামড়ায় বাঁধানো খাতাখানাকে একরকম সাদাই বলতে হবে। ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত মাত্র কয়েকটা তারিখের কথা মাত্র দুচার বা আটদশ লাইনে লেখা। মাত্র ঘটনাটুকুর উল্লেখই আছে। বীরেশ্বর রায়ের চরিত্রবৈশিষ্ট্য-আবেগের কোন স্পর্শ নেই। একরাত্রির শিকারের কথা আছে। যা ঘটেছিল তা ঘটনার বৈচিত্র্যেই রোমাঞ্চকর। বিস্তৃতভাবে লিখলে ভাল একটা শিকার-কাহিনী হতে পারত, কিন্তু দশ লাইনে লিখেছেন বীরেশ্বর রায়। একেবারে গোড়াতেই লেখা killed a tigress today. বিবরণ সংক্ষিপ্ত। জন রবিনসনকে খবর দিয়েছিলাম, সে এসেছিল। নৌকো করে হলদির মোহনার কাছে জঙ্গলে যেতে হয়েছিল। মাচা বাঁধা ছিল। শুনলাম বাচ্চা আছে সঙ্গে। বুঝলাম বাঘিনী। বললাম—ফার্স্ট শট আমার। জন বললে—না—আমার। আমি গেস্ট তোমার।

আমি বললাম—জনি, তুমি মিস করবে আমি নিশ্চিত।

জনি রেগে উঠল, বললে—বাজি?

বললাম—হারবে!

সে বলল—মানে? তুমি আজকাল গুনতে শিখেছ না কি?

বললাম—না। নারীর প্রতি তুমি অন্ধভাবে আসক্ত। ওই সব এদেশের কালো মেয়েগুলোর যেটাকেই দেখ তার জন্যে পাগল হয়ে ওঠ। And it is a tigress—she is beautiful and clever. ওদের তুমি চেন না। The striped tigresses are Brahmin ladies among the tigers.

জনি হেসে উঠল। বললে—তুমি একটা ডেভিল। আমার হাতেই ওটা মরবে। দেখ!

জোর করলাম না। কারণ ও আমার গেস্ট। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তাই হল। The tigress came. বাঁধা ছাগলটা একবার চেঁচিয়েই চুপ করলে। বাঘিনীটা একটা গর্জন দিয়ে চুপ করলে। চাঁদের আলো ছিল। জনি নিশানা করে গুলি করলে। বাঘিনীটা লাফ দিয়ে উঠে ধপ করে পড়ল নিথর হয়ে। জনি হেসে উঠে—Bira, you have lost বলে ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ল মাচা থেকে। মূর্খ! মাতাল! আমি বারণ করবার সময় পেলাম না। কিন্তু যা করতে হবে করতে ভুললাম না। বন্দুক তুললাম। আমি জানি জনি মিস

করেছে গুলি। এবং ওই ব্যাঘ্র-নারীটি মরার ভান করে পড়ে আছে ; she will now jump up on the foot ! ঠিক তাই। মুহূর্তে বাঘিনী উঠে দাঁড়িয়ে দেহটাকে টান ক'রে একটা ভীষণ গর্জন করে উঠল। জনি মুহূর্তে হতভম্ব হয়ে গেছে, বন্দুক তুলতে হাত কাঁপছে। আমি বন্দুক ধরে স্থির। বাঘিনী লাফ দিল, আমি গুলি করলাম। এবং সে উঁচুতে উঠে আবার পড়ল ধপ করে। এবং আবার আমি গুলি করলাম। জনি নিচে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশেষিত শক্তি ভেঙেপড়া মানুষের মত। বন্দুকটা ফেলে দিয়েছে মাটিতে নিজেই। এবার আমি লাফিয়ে পড়লাম। বাঘিনী মরেছে। প্রথম গুলিতেই মরেছে। মাথার খুলি ভেঙেছে। দ্বিতীয় গুলিটা লেগেছে বুকে। জনিকে বললাম—বাক আপ জনি ! টেক এ সিপ অফ ব্রাণ্ডি। ইট ইজ নাথিং। পকেট থেকে ছোট বোতলটা বের করে দিলাম। বরং—বললাম—try a tiger and you will hit him. There you will never miss. খুব জোরে হেসে উঠলাম। জনি চমকে উঠে বললে—বীরা, স্টপ স্টপ। ফর হেভেন্‌স্ সেক ইউ স্টপ।

এটা সেপ্টেম্বরে। জুলাইয়ের ওই যে ভবানী দেবী জলে ভেসে গেলে লিখেছিলেন—Am I going mad ? তারপর এই প্রথম।

তারপর ডিসেম্বরের ১০ তারিখে ক'লাইন লেখা। কলকাতা যাচ্ছি আজ। সামনে বড়দিন। কলকাতায় নেমন্তন্ন আছে অনেক। লাটসাহেবের সঙ্গে ইণ্টারভিয়্যু আছে। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির মিটিং আছে। কিন্তু আর কি কীর্তিহাটে ফিরব ? No ! খুব বড় করে লেখা No !

ডিসেম্বরের ১৫ই লেখা—রাণী রাসমণির বাড়ীতে গিয়েছিলাম দেখা করতে। জানবাজারের বাড়ীর জায়গা ওঁরাই দান করেছিলেন। কৃতজ্ঞতা মানুষের থাকা উচিত। নইলে ওঁরা ধর্মবিশ্বাসী গোঁড়া হিন্দু, ওঁদের সঙ্গে আমার বনার কথা নয়। জামাই মথুরবাবু অতি ভদ্র এবং বেশ আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি। He received me with dignity and kindness, very gracefully. তারপর রাণীর সঙ্গেও দেখা হল। একটি মহিমময়ী মেয়ে। আমাকে মায়ের মত আদর করলেন। ব্রাহ্মণ বলে সমাদর ভক্তি করলেন। I was charmed—simply charmed. She is really a queen.

১৮৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী কিছু লেখা আছে। আজ খুব মদ খাচ্ছি। অনেক বিশিষ্ট অতিথি নিমন্ত্রণ করেছি। আজ সন্ধ্যার আসরে মনে হল আমি যেন কয়েক মাস ধ'রে একটা টানেলের অন্ধকারে অন্ধের মত পায়ের তলায় বন্ধুর মাটিতে হুঁচোট খেয়ে, পা দুখানাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে এবং উপর থেকে ঝরে পড়া জলে ভিজে অসুস্থ ক্লান্তদেহে জীবনের উপর বীতস্পৃহ মন নিয়ে কলকাতায় এসে অবারিত সূর্যালোকের মধ্যে নতুন স্বাস্থ্য, নতুন উৎসাহিত মন ফিরে পেয়েছি।

Today life is something wonderful to me. I wish to live. I want to live.

দু'দিন আগে লাটসাহেব লর্ড ডালহৌসির সঙ্গে দেখা করে এসেছি। A great personality and a great diplomat—an Empire builder. আমি তাঁকে কুর্নিশ করে অভিবাদন করেছি। তিনি হাসলেন। বেশ সদয় হাসি। আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতেও গিয়েছিলাম। বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হল।

They were all very friendly to me. And I also made them feel that I was also no small fry. They all felt my personality and appreciated what I spoke in the meeting.

আমি নীলের চাষে জমিদারদের যে সমস্যা হয়েছে তার ওপর বলেছি। জন রবিনসনের মুখ আমার মনে পড়ছিল। মধ্যে মধ্যে সাদা চামড়া বলে তার অনেক ঔদ্ধত্য সহ্য করতে হয়। নীল যেসব জমিতে চাষ হয় তার খাজনা আমরা পাই নাম্‌বললেই হয়। Permanent settlement-এর সময় নীলের চাষ কতটুকু হ'ত! এখন প্রায় ২৫ লক্ষ বিঘেতে নীলের চাষ হয়। তাতে ১৲ টাকা হারে খাজনা বাংলার জমিদারেরা পেলে তাদের পঁচিশ লক্ষ টাকা আয় বাড়ত। আমি গ্রেট দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথাই উদ্ধৃত করেছিলাম। নতুন কথা বলি নি। তবুও যে জোরের সঙ্গে আমি বলেছি তা সকলেই ভাল বলেছেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে বললেন—

Roy, you stay here in Calcutta, we shall miss you if you go back to that village home of yours.

সেদিন আলাপ হয়েছে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত সিংহ পরিবারের অল্পবয়সে খ্যাতিমান কালীপ্রসন্ন সিংহের সঙ্গে। আশ্চর্য উজ্জ্বল তরুণ। কত বয়স হবে? আমি ভেবেছিলাম ১৭।১৮ হবে। কিন্তু সিনহা হেসে বললে—আমি এখনো পনেরোতে চলছি। এবারেই আগস্টে বিয়ে করেছি। সুতরাং বয়স যাই হোক, আমি একজন পরিপূর্ণ মনুষ্য। হাফ প্লাস বেটার হাফ ইজ ফুল ওয়ান—মোর দ্যান ওয়ান। রসিক লোক। এরই মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা বলে একটি সভা করেছে। শুনে বিস্মিত হয়েছি দেখে তরুণটি বললে—ডিয়ার রায়সাহেব, "বাল্যাবধি ইচ্ছে কবি কালিদাস হব কিন্তু এখন সে ইচ্ছে ছেড়েছি, কারণ কালিদাস লম্পট ছিলেন। তারপর ভাবছিলাম, জনসন হব কিন্তু না তিনি ছিলেন গরীবের ছেলে। তবে রামমোহন রায় হওয়া যায়।" মোট কথা বিখ্যাত হতে চাই। তার জন্ত বিদ্যোৎসাহী হয়েছি। গ্রন্থ লিখে গ্রন্থকার হব। ব্রাহ্ম হতে চেষ্টা করছি। বিধবাবিবাহে উৎসাহী দেব।

বলে হাসতে লাগল। বললে—যখন লিখব তখন এসব কথা খুলে লিখব দেখবেন। আপনাকে এক কপি প্রেজেণ্ট করব।

আমি তাঁকে ১লা জানুয়ারীর এই সান্ধ্য আসরে নিমন্ত্রণ জানালাম। সাদরে তিনি গ্রহণ করলেন। বললাম—নাচ-গানের ব্যবস্থা থাকবে।

তরুণ কালীপ্রসন্ন হেসে বলেছিলেন—That's wonderful! আমার দুটো জিনিস জন্মলগ্নে বলতে গেলে বিধাতা-নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই নাচ-গান আর সাহিত্য। আমার জন্মের দিন বাবা নাচ-গান জলসা করিয়েছিলেন। আর পণ্ডিত বিদায় করেছিলেন শাল দিয়ে!

Certainly I will come, Thank you Mr. Roy.

নাচ-গানের আয়োজন করেছি। আমার হৃদয় আজ অন্ধকার কাটিয়ে সকালের ফুলের মত ফুটছে। তার কারণ যে তরুণী বাঈজীটি এসেছে, সে আমার চেনা। সেই মামাতো-ভাইয়ের বিয়েতে যে নিতান্ত কিশোরী বয়সে তার মায়ের সঙ্গে গান করতে গিয়েছিল। সেও আমাকে চিনেছে। সে হাসলে। আমার দৃষ্টি দেখে সে আমার অভিলাষ বুঝেছিল। সকলে বিদায় হলে সে যখন বিদায় চাইলে তখন তার হাত ধরে বললাম—না। আজ বছরের প্রথম দিন। আজ থেকেই তোমাকেই আমি জীবনের সঙ্গে বাঁধতে চাই। বাকি গোটা

জীবনটার জন্য।

সোফিয়া স্থিরভাবে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বাঁ-হাতে কান চাপা দিয়ে হেঁট হয়ে সেলাম বাজিয়ে বললে—বহুত মেহেরবাণী। লেকেন—। হাসলে সে।

বললাম—লেকেন—কি বল?

বললে—উয়ো আপকি বেগম—বিবি সাহেবা হুজুরাইন, সেদিন যেমন আমার গানের মাঝখানে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি করে এসে ঢুকবে আসরে এবং আজকের রাত্রিটিও শেষ হতে দেবে না, তখনও কি হবে?

বললাম—সে নেই।

—নেই?

—না, চলি গয়ি।

—চলি গয়ি? কাঁহা?

—খোদা মালুম।

একটু চুপ করে থেকে সে বললে—আজ রাত থেকেই তোমার কাছে বাঁদী হয়ে রইল সোফিয়া!

১৮৫৫ সালের ৩১মে-র রাত্রি সেদিন।

সেইদিনের এই ছবি স্থূলতা। মদের নেশায় প্রায় হতচেতন হয়ে সোফিয়া পড়ে আছে। তবলা-বাঁয়া পড়ে আছে, ফুরসী গড়গড়া পড়ে আছে, হুঁকোদানে বাঁধানো হুঁকো রয়েছে, পানের বাটা, পিকদান রয়েছে; তবলচী-সারেঙ্গীদাররা চলে গেছে। ছুটো গোলাপপাশ গড়াচ্ছে। বীরেশ্বর রায় মদের বোতল গ্লাস টেবিলে রেখে বসে আছেন, বড় বড় চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে। মদের নেশা যেন কিছুতেই ধরছে না।

একটা ঘটনা ঘটে গেছে। যার স্মৃতি কিছুতেই মন থেকে মুছছে না। আজ দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণি বিরাট কালী-মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। বিরাট মন্দির, চারিদিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে উঁচু কাছিম পিঠে বিস্তীর্ণ জমির উপর গঙ্গার পোস্তা বাঁধিয়ে যে-মন্দির তৈরী হয়েছে, তা সেণ্ট জনস্ চার্চ থেকে জাঁকজমকে হয়তো উঁচুতে কম হবে না। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ। নানান দেশ থেকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত এসেছে। কাঙালীতে ভরে গেছে। যজ্ঞ হচ্ছে। কলকাতার বড় বড় লোকেরা দেখতে গেছেন। জঙ্গলভরা দক্ষিণেশ্বর, পথে ছ'পাশে জলা। তারই মাঝখান দিয়ে নতুন রাস্তা করিয়েছেন রাণী। লাট-প্যালেস থেকে যে-রাস্তাটা উত্তরমুখে মারাঠা ডিচ পার হয়ে টালা-সিঁথি-বরানগরের ভিতর দিয়ে চলে গেছে ব্যারাকপুর লাটসাহেবের বাগানবাড়ী, যার ছ্ধারে শুধু জঙ্গল-জলা, আর মাঝে মাঝে গোলপাতার বস্তী আর ছ'চারটে বাগান-বাড়ী, বরানগরের উত্তরে সেই রাস্তাটা থেকে নতুন রাস্তাটা পশ্চিমমুখে চলে গেছে মন্দির পর্যন্ত। এদিকে আর একটা রাস্তা বাগবাজার খাল পেরিয়ে কাশীপুরের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। ওই রাস্তা ছটোর আজ হাতখানেক মাটি ধুলো হয়ে উঠে গেছে গাড়ীর চাকায় চাকায়। ল্যাণ্ডো বাগ ফিটন ব্রাউনবেরী আর ভাল ভাল ঘোড়া। সে একেবারে সারিবন্দী। ছ ধারে কাঙালী চলেছে, তার মাঝখান দিয়ে গাড়ী। সামনে সহিসেরা হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও। এর মধ্যে বীরেশ্বরও গিয়েছিলেন। কিন্তু যেতে যেতে আপসোস করেছেন, কেন গাড়িতে এসেছিলেন। ধুলোতে সর্বাঙ্গ ভরে গেছে। এর থেকে চাঁদপালঘাট কি জগন্নাথঘাট থেকে বজরা করে এলে পারতেন। কিন্তু কিছুদিন আগে কেনা নতুন ফিটন,

আর কালো ওয়েলার ঘোড়া ছুটো দেখবার কেমন একটা ঝোঁক হয়েছিল। বীরেশ্বর রায় নিজেই লিখেছেন,—It was a mistake.

রায় সোফিয়াকে নিয়ে বেড়াবার জন্তে নতুন ফিটন আর জোড়া বাছাই করে কালো ছুটো ঘোড়া কিনেছিলেন সম্প্রতি। গঙ্গার ধারে চাঁদপাল ঘাটে যেতে যে একটা পথ চলে গেছে দক্ষিণে, কাঁচাপথ, সেই পথে, কিছুদিন আগে তাঁর পুরানো গাড়ি আর ঘোড়াছুটো হেরে গিয়েছিল অন্ত গাড়ির কাছে। নতুন ঘোড়া, নতুন ফিটন সেইজন্তে। গঙ্গার ঘাটে তাঁর ছুখানা নৌকোও আছে। একখানা বড় বজরা, অন্তখানা পানসী। বড় বজরাখানা সোমেশ্বর রায় করিয়ে গিয়েছিলেন। ওখানায় গঙ্গা হয়ে কাকদ্বীপকে উল্টো দিকে রেখে হলদীর ভিতর হয়ে বর্ষার সময়ে সরাসরি কীর্তিহাটে যাওয়া যায়। শুকোর সময়ে জোয়ারো এলাকার পর, পাল্কি করে যান বাকি পথটা। কিম্বা হাতী। বীরেশ্বর রায় ঘোড়ায় যেতে ভালবাসেন।

থাক সে-কথা। কীর্তিহাট অনেক দূরে পড়ে গেছে। দিন দিন দূরত্ব বাড়ছে। সেখানে কোনদিন ফিরবার বাসনা তাঁর নেই।

ভর্তি ছুপুরে ফিরবার সময় ওই কথা ভাবতে ভাবতেই ফিরছিলেন। রাণী রাসমণির কাছে তাঁরা উপকৃত। পিতামহ দান গ্রহণ করেছিলেন—এই জানবাজারের জমি। অবশ্য সেদিনের কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য কোম্পানীর সেরেস্তায় থেকে অনেক কিছু সুগম করে দিয়েছিলেন। তার জন্য তিনি তাঁর প্রাপ্যও নিয়েছিলেন। জমিটা দান। তাছাড়া রাণীকে বীরেশ্বর সত্যিই শ্রদ্ধা করেন। রাণী যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি তেজস্বিনী আবার তেমনি দানশীলা। জেলেদের উপর কোম্পানীর জুলুম বন্ধ করতে গঙ্গার জলকর বন্দোবস্ত নিয়ে যে বুদ্ধি এবং সাহস দেখিয়েছেন, তা রাণীরই উপযুক্ত। আবার পূজার সময় কোম্পানীর গোরাদের সামনে যে সাহস দেখিয়েছেন, সেও তাই। আবার কলকাতায় এবং দেশে অন্নকষ্টের সময় তিনি কাশী যাওয়া বন্ধ করে সেই টাকা খয়রাত করে আর এক মহীয়সী রূপের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন—তার নিমন্ত্রণ বীরেশ্বর উপেক্ষা করতে পারেননি। তিনি এসেছিলেন। কিন্তু এসেও তাঁর ভাল লাগে নি। কিছুক্ষণ থেকেই তিনি শরীর খারাপ বলে চলে আসছিলেন। সকালবেলা থেকে মদ খাননি। তার উপর পথের ধুলো, মেজাজ অত্যন্ত খারাপ ছিল। গাড়ীতে চড়ে কোচম্যানকে বলেছিলেন—জলদি। তুরন্ত যানা। বহুত তুরন্ত। তবিয়ৎ ঠিক নেহি হ্যায়। সমঝা?

—হাঁ হুজুর।

সামনে ছুটো সহিস ছুটে চলেছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে, ঘোড়ার আগে দৌড়তে হবে তাদের। ছুটো সহিস পিছনে দাঁড়িয়েছিল। ওরা ক্লান্ত হলে এরা নেমে ছুটবে, ওরা গাড়ীর পিছনে দাঁড়াবে। বেলা একটা বেজে গেছে। পথে ভিড় তখন কমেছে। দক্ষিণেশ্বরের মুখে গাড়ী দু'একখানা আসছে। যাচ্ছে দু'চারখানা। কিন্তু মানুষের ভিড় তখনও নাগাড়ে চলেছে। শুধু দক্ষিণেশ্বরের ভিড় নয়, আজ ছিল স্নানযাত্রা—যত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বদ্ধ জীব—গামছা-কাপড় কাঁধে ফেলে দলবেঁধে চলেছে গঙ্গার ঘাটে। ছেলে-মেয়ে বুড়ো-জোয়ান। যারা ফিরেছে, তাদের কপালে কাদালেপা। গঙ্গামাটি। বুকেও তাই। চৌদ্দ জন্মের পাপ খণ্ডন হল। শুধু পাপই খণ্ডন হয় নি—পুণ্যের ফল বোঝা মাথায়, কাঁকালে, নতুন কেনা ধামায় ভরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পুণ্য দস্তুরমত ফল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আম-কাঁঠাল। গঙ্গার ঘাটে কিনে বাড়ী ফিরছে। বাড়ী ফিরে খাবে, কলেরা হবে, মরবে। শুধু আম-কাঁঠাল নয়, বঁটি-খুন্তি চাটু-কড়াই, খেলনা চাকি,

পুতুল অনেক কিছু।

হঠাৎ সামনের সহিসদুটো হৈ-হৈ করে উঠলো। সামাল সামাল।

কোচম্যান চীৎকার করে উঠল—এও উল্লু!

চমকে উঠে বীরেশ্বর সামনে তাকিয়ে দেখলেন—এক অর্ধ-উলঙ্গ বদ্ধ উন্মাদ, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ছুটে চলেছে সামনে—আর চীৎকার করছে—না-না-না। পারছি না। পারব না। ছেড়ে দে, গলা ছেড়ে দে। বলি—বলি!

উন্মাদ, দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই। গাড়ীর সামনে, সহিস-কোচম্যানের চীৎকারে হুঁশ নেই। চীৎকার করতে করতে ছুটেছে। কোচম্যান দু'হাতে জোড়া ঘোড়ার লাগামের রাশ টেনে ধরলে। কিন্তু ঘোড়াদুটো প্রমত্তশক্তির গতিতে ছুটছে সামনের দিকে, তারাও থামতে পারছে না। বীরেশ্বর মুহূর্তে ফিটনের সামনের ডগ-সিটে উঠে দুই হাতে কোচম্যানের ধরা লাগাম ধরে সজোরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে টেনে ধরলেন। ঘোড়াদুটো সামনের দুটো পা তুলে, ডাইনে বেঁকে বায় পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা ঘোড়ার মুখের ধাক্কায় আছাড় খেয়ে পড়েছে। বীরেশ্বর লাফ দিয়ে নামলেন। ঘোড়াদুটোরই কষ কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। বীরেশ্বর বললেন—চাবুক। ওসমান—চাবুক।

লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

দুরন্ত রাগে বীরেশ্বর হাঁকড়ালেন চাবুক—এ্যাও উল্লুক, শূয়ার কাঁহাকা! পিঠটা কেটে গেল, লোকটা শিউরে উঠে যেন চেতনা ফিরে পেল। উঠে বসল। বীরেশ্বরের হাতের চাবুক হাতেই থেকে গেল। পাগলটাকে তিনি চেনেন।

কলকাতার ময়দান এবং চৌরিঙ্গীর সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা সকলেই প্রায় এ পাগলকে চেনে। সে সাহেব-মেমেরাও চেনে। তারা শখ করেও দেখতে আসে বিকেলে। গঙ্গার ধারে নতুন পোস্তা বাঁধাই হয়ে পাকা রাস্তা তৈরী হয়েছে স্ট্র্যাণ্ড রোড। নতুন নতুন নৌকো ভিড়ানোর অসংখ্য ঘাট এবং ঘাটের উপর দু-চারটে দোকান গড়ে উঠেছে। চাঁদপাল ঘাট থেকে নতুন কেল্লা পর্যন্ত সোজা সুন্দর রাস্তার ধারে গাছের শ্রেণী। সুন্দর দেখায়, এখানে বিকেলে সাহেব-বিবিরা বেড়াতে আসে। দেশী বড়লোকেরাও আসে। নতুন আমদানী রকমারি গাড়ীঘোড়া পাল্কির ভিড় জমে। সাহেব-মেমেরা হাত ধরাধরি করে হাওয়া খায়। পথটার নাম 'রেসপণ্ডেন্সিয়া ওয়াক'। এখানে বেড়াতে এসে অনেক সাহেব-মেম, দেশী বড়লোক এসপ্লানেড রো ধ'রে এসে চৌরিঙ্গীর কাছাকাছি গাড়ী দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ে। তারপর দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলে। ওদিকে এখনও জলা নলখাগড়ার জঙ্গল আছে। তারই মধ্যে পাগল কোথাও থাকে। আজ এখানে কাল ওখানে। নিত্য সকালে উঠে চলে একবার কালীঘাট মুখে, মন্দিরের কাছ বরাবর গিয়ে নাকি এমনি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ফিরে পালিয়ে আসে। তারপর কোথাও পড়ে থাকে। চীৎকার করে। বিকেল নাগাদ সুস্থ হয়। তখন লোকে তাকে ঘিরে ধরে। পাগল বলে—গন্ধ নিবি? গন্ধ নিবি? নে।

শূন্যের দিকে হাতটা বাড়ায় তারপর ঘষে দেয় সকলের হাতে, সঙ্গে সঙ্গে অতি মধুর গন্ধে তাদের নিশ্বাস ভরে যায়।

পাগল খানিকটা মাটি তোলে মুঠো করে তারপর আকাশের দিকে তুলে বলে—নে খা।

লোকে দেখে মাটি নয় গুড় হয়ে গেছে।

পাগল বলে—সরবৎ খাবি ?

তারা বলে—খাব বাবা।

—তবে জল আন। জল আন।

তারা জানে, আগে থেকেই জল নিয়ে আসে, পাগল তার ময়লা হাতখানাই ঘটির মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। তার পর বলে—খা।

তারা খেয়ে বুঝতে পারে—জল সরবৎ হয়ে গেছে।

অসুখ-বিসুখে তারা পাগলের কাছে আসে, ধরে, ভাল করে দাও বাবা।

পাগল কখনও রাগ করে চীৎকার করে ওঠে। বলে—না-না-না। তারপর ছুটে পালায়। চীৎকার করে—জোচ্চুরি-ঠকামি-ছেনালি আর কত কত কত করবি ? বাবারে, বাবারে, আর পারি না, পারছি না! হাউ হাউ করে কাঁদে। নিজের গলা টিপে ধরে বলে—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি। ওরে ছেড়ে দে—। আমাকে বলতে দে—।

লোকে অবাক হয়ে যায়, আবার ভয়ও পায়। অনেকক্ষণ পর হয়তো সুস্থ হয়ে নলখাগড়ার পাতা কি ঘাস কি কিছু যা সামনে পায় ছিঁড়ে হাত বাড়িয়ে আকাশের দিকে তুলে ধরে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর সে প্রার্থীর হাতে দিয়ে বলে—খাইয়ে দিগে যা। যা। ভাল হয়ে যাবে।

লোকে বলে—ভাল সত্যি হয়ে যায়।

সাহেবরা ওষুধ নেয় না, কবচ নেয়। গন্ধ শোঁকে। মাটি গুড় হয়ে যাওয়া দেখে টাকা দিয়ে যায়, পাগল কখনও নেয় কখনও ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

বীরেশ্বর দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখেছেন। হেসেছেন সাহেব-মেমের বিস্ময় দেখে। তাঁর নিজের এসবের জন্য কোন আকর্ষণ নেই। তিনি জানেন, এর মধ্যে কোথায় এমন সূক্ষ্ম জালিয়াতি আছে তা ধরা যায় না। অথবা যদি এটা সত্যিও হয় তবে ওতে তার কি দরকার ? ওর দাম কতটুকু ? গল্প আছে—কে একজন সিদ্ধিলাভ করে ভরানদীর স্রোতের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পার হয়ে এসেছিল। তা দেখে লোকের যত বিস্ময়ই লাগুক, দাম কষলে তো তার দাম একটা পয়সা। খেয়াঘাটের পারানি তো এক পয়সা। আবার তাঁর মত লোকের কাছে কিছুই না, যত বড় তুফানই হোক বীরেশ্বর রায় সাঁতার দিয়ে পার হতে পারেন।

এসবের জন্য নয়, বীরেশ্বর রায় ওদিকে বেড়াতে যেতেন রাত্রিকালে। সহিসদের মশাল নিভিয়ে দিতে বলতেন। তারপর অন্ধকারে অপেক্ষা করতেন। একদিন শুনতে পেয়েছিলেন গান। কলকাতায় আসার ক'দিন পরেই। সোফিয়ার সঙ্গেও তখন নিজেকে জড়ান নি।

অপূর্ব গান গাইছিল কেউ। অপরূপ। অধিকাংশ গানই রামপ্রসাদী সুরে। তার মধ্যে বাক্য-বিন্যাস অদ্ভুত, কিন্তু একটি বেদনা আছে। সর্বোপরি কণ্ঠস্বর। এবং সুরের আরোহী-অবরোহীর মধ্যে অতি সূক্ষ্ম দ্যুতিময় খেলা। প্রথম দিনের শোনা গানের কলিটা মনে আছে—

"হেরেছি, তবু হার মানি-নি!
ধরেও বেঁধে রাখিনিকো,
পালাবি তুই তা জানি নি।"

ভারী ভাল লেগেছিল। কোনখানে যেন নিজের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল কথাগুলো। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত জঙ্গল ভেঙে খুঁজে বের করেছিলেন গায়ককে। একটা গাছতলায় বসেছিল এই পাগল। ওকে চিনতেও পেরেছিলেন। চৌরিঙ্গীর ধারে ওর বুজরুকি এর আগে দেখেছিলেন।

বীরেশ্বর রায়কে দেখে পাগল চমকে উঠেছিল।

বীরেশ্বর হেসে বলেছিলেন—ভয় পাচ্ছ? আমি পুলিশ নই।

পাগল উঠে দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে বলেছিল—তুমি কে? কি নাম তোমার?

—কেন?

—তুমি প্রেত?

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন বীরেশ্বর, ধমক দিয়ে বলেছিলেন—চোপ রও উল্লুক।

গ্রাহ্য করে নি পাগল, মুখের দিকে তাকিয়ে একদৃষ্টে তাকে দেখছিল। বলেছিল—আমি তোমাকে চিনেছি। ঠিক চিনেছি। কীর্তিহাটের ওপারে জঙ্গল—মাঝখানে কাঁসাই। হাঁ!

চমকে উঠেছিলেন বীরেশ্বর। দু পা পিছিয়ে এসে বলেছিলেন—কে তুমি? কি করে জানলে এসব?

হা-হা করে হেসে উঠেছিল পাগল। হা-হা-হা-হা-হা-হা! গাছের ভিতর থেকে সে হাসির আওয়াজে কটা বাদুড় উড়ে পালিয়েছিল। কিছুটা দূরে কারা যেন ভয়ে বু-বু শব্দ করে উঠেছিল। ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল, চাঁদের আলোয় দেখতে পেয়েছিলেন বীরেশ্বর। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলেন—থাম, থাম, এমন করে হেসো না তুমি! বীরেশ্বর রায় ওতে ভয় পায় না!

থমকে গিয়েছিল পাগল। আরও কাছে সরে এসে—পাগল বলেছিল—বীরেশ্বর? বীরেশ্বর! ব দিয়ে নাম।

চাঁদের আলোয় তার চোখ দুটো চক-চক করছিল। তারই মধ্যে বীরেশ্বর অনুভব করেছিলেন পাগলের ওই দৃষ্টির মধ্যে বিস্ময় আর বিমুগ্ধতা ফুটে উঠেছে।

পাগল বলেছিল—সেই বেইমান—সেই জোচ্চোর—সেই ছুড়িটা—সেটা আছে তো? সৌভাগ্য-শিলা? রাজ-রাজেশ্বরী? অনেক টাকা অনেক ভূমি দিয়েছে তো? রাজা করে দিয়েছে? খুব ননী খেতে দাও—মাখন-ছানা-মালপো-পায়েস দাও তো!—আর সেই নেংটি সব্বনাশী? ওঃ-ওঃ-ওঃ। বেশ কথা বলতে বলতে পাগল যেন হঠাৎ যন্ত্রণায় অধীর হয়ে বলে উঠেছিল—ধরলি, টিপে ধরলি গলা? ধরলি? ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! বলে নিজেই নিজের গলা দুই হাতে টিপে ধরলে। এবং মুখ গুঁজে পড়ে গিয়ে-গোঙাতে লাগল।

বীরেশ্বর রায় বাঘ শিকার করেছেন—রাত্রির অন্ধকারে সুন্দরবনের মধ্যে বসে কাটিয়েছেন। দুর্দান্ত সাহসী পুরুষ। তিনি সেদিন ঘামে ভিজে গিয়েছিলেন। গ্রীষ্মের কাল ছিল না, সেটা ছিল শীতকাল, তবু ঘাম দেখা দিয়েছিল ওই পাগলের কথায়, তার পাগলামিতে। পাগলামি তো নয়। এর কথা তো প্রলাপ নয়। এ তো সব সত্য! তাঁর পা দুটো যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল, চলেও আসতে পারেন নি। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

পাগল শান্ত হয়েছিল অনেকক্ষণ পর। শান্ত হয়েছিল কেঁদে। বীরেশ্বর আস্তে আস্তে চলে আসতে পেরেছিলেন এতক্ষণে। গাড়ীর কাছে যখন পৌচেছিলেন তখন কোচম্যান ওসমান এবং সহিস দুজন ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সহিসেরা নেভানো হাত-লণ্ঠন জেলে বসেছিল। তারা পাগলের ওই হাসি শুনেছে। কজন লোককে পালিয়ে যেতে দেখেছে। আর অনেক দূরে হলেও তার ডাক শুনেছে। রাত্রিকালে তার নাম করতে নেই। ওসমান ঠিক এদেশী মুসলমান নয়। তবু এদেশের প্রবাদ মানে, এদেশে বাস করছে অনেকদিন থেকে, এ ডাক যে ডেকেছে তাকে 'বড় মেয়া' বলে। বড় মেয়া দক্ষিণ থেকে কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করে। এক

প্রহরে পাড়ি মারে পাঁচ সাত কোশ !

* * *

এরপর বীরেশ্বর বহুবার মনে করেছেন পাগলের কাছে যাবেন। কিন্তু যেতে সাহস হয় নি। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না, ধর্মকে বিদ্রূপ করেন, তবু সেদিনের ঘটনার পর না-মেনে পারেন নি যে, এই পাগল অন্তর্যামীর মত মানুষের কথা জানতে পারে, বলতে পারে। তিনি ভয়ে যান নি। যদি পাগল বলে—সে মরে নি! বলে যদি তেমনি অট্টহাসি হাসে! বললে তো তাঁকে বন্দুক নয় পিস্তল পকেটে নিয়ে দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়াতে হবে, তাকে বের করে ওই বাঘিনীটার মত গুলী করে মারতে হবে। না হলে আত্মহত্যা করতে হবে। তবে দূরে দাঁড়িয়ে গান শুনে আসতেন। গানগুলির সুর রামপ্রসাদী হলেও গান রামপ্রসাদের নয়। রামপ্রসাদের গানের তখন খুব প্রচলন। রামপ্রসাদের গান সবাই চেনে এবং জানে। এ গান সম্ভবতঃ ওই পাগলেরই গান। ধর্ম ঈশ্বর মিথ্যা হোক, সিদ্ধপুরুষ বলে যারা খ্যাত তারা বুজরুক হোক ভণ্ড হোক, কিছু তৃষ্ণার্ত আকুল মানুষ আছে যারা মরীচিকার পিছনে ছুটে পাগল হয়ে যায়। বিচিত্রভাবে কিছু কিছু শক্তিও তারা পায় ওই পাগলের মত। যারা ওই পেয়ে খুশী হয় তারা করে খায় ওই ভাঙিয়ে, যারা খুশী হয় না তারাই পাগলটার মত কাঁদে। পাগল সুস্বর সুদক্ষ গায়ক, হয়তো নিজের দুঃখ গান বেঁধেই গেয়ে থাকে। গান শুনেছেন, ভুলেও গেছেন বীরেশ্বর। প্রথম দিনের দু কলি মনে আছে, আর আছে আর একদিনের গান—

"এবার রণে ক্ষান্ত দে মা
মা বলে ধরিলে পায়ে
তবুও কি তোর নাই ক্ষমা !
না হয় এবার খড়্গাঘাতে
শেষ করে দে মুণ্ডপাতে
মুণ্ডটা ঝুলায়ে হাতে
তা-থৈ-তা-থৈ নাচো শ্যামা !

এ পাগল তো সেই পাগল। সহিসরা বললে—দক্ষিণেশ্বরে তারা ওকে দেখেছিল। ওসমান বললে—দৌড়কে দৌড়কে আকে—বস্।

—হ্যাঁ হুজুর, সব্বাঙ্গে ধুলো মেখে এল। আমাদের গাড়ীর ছামনে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর মন্দিরের চুড়োর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর যা করে কালীঘাটে গিয়ে, ওই ফিরে পালিয়ে আসে—

বীরেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করলেন—পালিয়ে আসে কেন ?

ওসমান বললে—উ কৌন জানে হুজুর ? ই তো সিদ্ধাই ফকীর! উসকা বাত কোই নেহি জানতা !

বীরেশ্বর রায় সেদিন পথে ওই পাগলকে ফেলে চলে আসতে পারেন নি। আঘাত লোকটিকে কম লাগেনি। বেশ আঘাত পেয়েছে। ঘোড়া দুটো লাগামের টানে নিজেদের সামলাতে সামনের পা চারটে তুলে 'শিরপা' হয়ে ডাইনে ঘুরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, না হলে পাগলের উপর দিয়ে তারা দুর্দান্ত বেগে গাড়ীখানাকে টেনে নিয়ে চলে যেত, গাড়ীটা হয়তো খানিকটা লাফিয়ে উঠত, বীরেশ্বর রায় ঝাঁকানি খেতেন। কিন্তু লোকটা চাপা পড়ত। মরে যেত। এতে লোকটা চাপা পড়ে মরে নি, কিন্তু গাড়ীর বোমের এবং ঘোড়ার মুখের ধাক্কায়

ছিটকে পড়ে ঘায়েল হয়ে গেছে। রায় লোকটিকে চিনে পথে ফেলে দিয়ে আসতে পারেন নি, তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে ফিটনের পিছনের সিটে শুইয়ে দিয়ে, নিজে সামনের ডগসিটে বসে কলকাতা এসেছেন। গাড়ীটা যখন টালা পেরিয়ে কলকাতা ঢুকছে, লোকটির তখন হুঁশ হয়েছিল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল সে বীরেশ্বর রায়ের দিকে।

রায় বলেছিলেন—কি ? কেমন মনে হচ্ছে ?

সে বলেছিল—তুমি সাক্ষী রইলে তো !

—কিসের ?

—কি রকম মারলে আমাকে ? কিন্তু দেখ, মারলে না ! উঁহু, মারতে পারলে না !

—বাজে বকো না। পড়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলে। এখন কেমন মনে হচ্ছে ?

—ভাল। ভাল। এই পিঠে, হ্যাঁ, এইখানে কন্‌কন্‌ করছে। ও কিছু নয়। ভাল হয়ে যাবে। তা আমাকে নামিয়ে দাও না কেন ?

—না, চল, যাবে তো চৌরিঙ্গীর মাঠে। আমি যাব জানবাজার। নামিয়ে দোব চল।

—তুমি বীরেশ্বর ? বীরেশ্বর রায় ?

—হ্যাঁ। কি ক'রে চিনলে আমাকে ? সত্যি বলবে !

—সেদিন তুমি বললে !

—না। তুমি আমাকে চিনেছিলে আগেই। বল।

—বলব ?

—হ্যাঁ।

মুহূর্তে রূপান্তর ঘটে গেল পাগলের, সে নিজের গলা টিপে ধরে বললে—ছাড়। ছাড়। ছাড়। আঃ—আ ! নিজের হাতের মুঠি সে ক্রমশঃ কঠোর থেকে কঠোরতর করে তুলতে চাচ্ছে।

বীরেশ্বর শঙ্কিত হয়ে তার হাত দুখানাকে ছাড়াবার জন্যে টেনে ধরলেন। পাগল হাত ছেড়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর বললে—বলতে দেয় না। গলা টিপে ধরে।

—কে ?

—কে আবার ? ওই ওই, মন্দিরে এসেছে আজ ! ওই !

—পালিয়ে এলে কেন ?

—ভয়ে ! ভয়ে ! আমাকে দেখলেই আঃ—আঃ—ছাড় ছাড় ! আবার সে টিপে ধরলে নিজের গলা।

বীরেশ্বর আবার টেনে ছাড়িয়ে দিলেন, বললেন—থাক, বলতে হবে না।

সে গাড়ীর কোণে চুপ ক'রে বসে রইল। বীরেশ্বর ভাবছিলেন ওরই কথা। মনে ঘুরছিল শেকসপীয়রের হ্যামলেটের কথা—

There are more things in heaven and earth—than are dreamt of in your philosophy.

বীরেশ্বর ওই কোটেশনটা মনে করে সান্ত্বনা পেলেন। সান্ত্বনা ঠিক নয়—মনে মনে একটা কিনারা খুঁজে পেলেন। হঠাৎ মনে পড়ল—ক'দিন আগে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ী গিয়েছিলেন, তিনি এক ব্রাহ্ম নেতার বাড়ীর গল্প বললেন, তাঁর স্ত্রীকে ডাইনীতে নজর দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত ডাক্তার বৈদ্য হার মেনে গেলে ওঝা এনেছিলেন তিনি, তাইতেই রোগিণী

সুস্থ হয়েছে।

ভাবতে ভাবতেই তিনি পাগলকে ভাল ক'রে দেখছিলেন। এককালে পাগল নিঃসন্দেহে সুপুরুষ ছিল। মাথাভর্তি কাঁচাপাকা রুখু চুল, মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ, সর্বাঙ্গে একটা ধূলার আস্তরণ, তার নিচে ময়লার একটা ছোপ পড়েছে। কপালটা যেন ছেঁচা। চামড়া কুঁকড়ে গেছে। একটা লম্বা কাটা দাগ, লম্বালম্বি নেমে এসেছে কপাল থেকে গোঁফের উপর পর্যন্ত, বাকীটা গোঁফদাড়ির মধ্যে বিলুপ্ত, দেখা যায় না।

বললেন—তোমার কপালে মুখে ওই দাগগুলো কিসের ?

শান্তকণ্ঠে পাগল বললে—ছেঁচেছে। ছেঁচে ছেঁচে মেরেছে পাথর দিয়ে।

—কে ?

—কে আবার! সর্বনাশী! ওঃ, কি প্রহার কি প্রহার কি প্রহার! ও আর কতটুকু ? বুকের ভিতরে আগুনে পুড়িয়ে লোহার শিক দিয়ে বেঁধে।

চুপ ক'রে রইলেন বীরেশ্বর। বুঝলেন না ঠিক। তবে সে যে অধ্যাত্মসাধনার কথা বলছে তাতে আর তাঁর সন্দেহ রইল না। এবং তাঁর নাস্তিকতাবিশ্বাসী মনের যে ধারালো ব্যঙ্গবিদ্রূপের ছুরিখানি, সেখানি যেন কেমন ভোঁতা হয়ে গেল। লোকটার সর্বাঙ্গে তার জীবনের বার্তাগুলি ফুটে রয়েছে, তা যেন পাথরে খোদাই করা বার্তা। ওকে ছুরির ধারে মুছে বা চেঁচে ফেলা যায় না!

গাড়ী লর্ড ওয়েলেসলির তৈরী বাহার সড়ক বা সার্কুলার রোড ধরে ডিহি শেয়ালদহকে বাঁয়ে রেখে এণ্টালীতে ধর্মতলার মোড় নিয়ে উঠল জানবাজারে। স্নানযাত্রার দিন আজ, চীৎপুর রোডে ভিড়ের অন্ত নাই। কাতারে কাতারে লোক ছুটেছে গঙ্গায় চুবতে। এ ছাড়াও বাবু-ভাইয়েরা বজরা নৌকো পানসী করে চলেছে মাহেশ। তার উপর এবার রাণী রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা দক্ষিণেশ্বরে। বাহার সড়কের এ পাশে হিঁদুর অঞ্চল কম। মুসলমান দেশী ক্রীশ্চান বেশী, পথটাও ভাল। গাড়ী ধর্মতলার মোড়ে চৌরিঙ্গীতে মোড় নিল। রায় ভাবলেন, ওকে নামিয়ে দেবেন। কিন্তু লোকটা যেন ধুঁকছে। ক্লান্ত হয়ে চোখ বন্ধ ক'রে কোণে ঠেস দিয়ে বসে আছে। দেখে মমতা হল বীরেশ্বরের। ওকে ডাকলেন না। একেবারে বাড়ীর দরজায় এসে গাড়ী দাঁড়ালে ওকে ডাকলেন—শুনছ ?

—এঁ্যা!

—এসে পড়েছি, নামো।

চারিদিক চেয়ে দেখে পাগল বললে—এ কার বাড়ী ?

—আমার।

—তোমার ? কীর্তিহাটের রায়-হুজুরের ?

—হ্যাঁ।

—এখানে কেন নামব ?

—আমি বলছি বলে নামবে।

—আমার সব কেড়ে নেবে ?

হেসে ফেললেন বীরেশ্বর, বললেন—কি আছে তোমার ?

—হাঁা, কিছুই নাই। কিছুই নাই।

—চল। ভয় নাই। স্নান কর। কিছু খাও। তারপর সুস্থ হয়ে যাবে তোমার যেখানে ইচ্ছে।—চল।

—মারবে না তো ?

—না।

বাড়ীতে ঢুকে পাগল বাড়ীর আসবাব ঐশ্বর্য দেখে বোধ হয় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। দেওয়ালে কুড়ারাম রায়-ভটচাজের এবং সোমেশ্বর রায়ের অয়েল পেণ্টিং টাঙানো ছিল। তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। হঠাৎ সোমেশ্বরের ছবিকে বললে—নরক ভোগ্ করছ তুমি! হুঁ-হুঁ, করবে না? তারপর ঘাড় নেড়ে বললে—না—না। না—তুমি প্রায়শ্চিত্ত করেছ। তা করেছ।

কুড়ারামকে বললে—আচ্ছা লোক। তোমাকে কিছুতে ছুঁতে পারে না। আচ্ছা লোক!

বীরেশ্বর চাকরকে বললেন—একে যত্ন ক'রে স্নান করা। নতুন কাপড় দিবি। বুঝলি? কিছু খেতে দে। বলে উপরে চলে গেলেন।

সোফিয়া থাকত নিজের বাড়ীতে বউবাজারে। আসত সন্ধ্যেবেলা। গাড়ী গিয়ে নিয়ে আসত। দিনের বেলা বাড়ীটা চাকর-বাকরের হাতে। চাকর অনেক। বীরেশ্বর রায় উপরে গিয়েই প্রথম এক গ্লাস মদ্য পান ক'রে স্নান করলেন। তারপর খেতে বসবার আগে চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন—পাগলটাকে স্নান করিয়েছিস? খাইয়েছিস?

—হ্যাঁ।

—নতুন কাপড় দিয়েছিস?

—দিয়েছি। তা ছিঁড়ে আধখানা ক'রে পরেছে।

—কি করছে?

—মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছে।

—তা হ'লে ঘুমুক। ডাকিস না ওকে।

এরপর রায়ও ঘুমিয়েছিলেন। ঘুমের জন্য তাঁর শরীরও কাতর হয়েছিল। কলকাতার ফ্যাশানে সেকালে বিদগ্ধ এবং ধনীসমাজের কেউ রাত্রি বারোটা একটার আগে শুতেন না। উঠতেন বেলা দশটায়। রায় সোফিয়াকে নিয়ে জেগে থাকতেন, দুটো তিনটে পর্যন্ত মাইফেল হ'ত। বন্ধুবান্ধব জুটত। তারা বিদায় হত বারোটায়, তারপর সোফিয়া আর তিনি উল্লাস করতেন। উন্মত্ত উল্লাস! সোফিয়া ক্লান্ত হত, তিনি হতেন না। মধ্যে মধ্যে সোফিয়া বলত—মেরি মালিক!

—বাতাও।

—হুকুম দাও তো বাঁদী একটা কথা বলে।

—বল। বল। দো চার দশ বিশ যত তোমার দিল চায় বাতাও!

—এ যে তুমি তোমার শরীরকে বিলকুল বরবাদ করছ মালিক। এমন করলে শরীর তোমার ক'দিন টিঁকবে?

—য দিন টেঁকে।

—যদি বেমারি হয়! যদি ভেঙে পড়ে যাও!

—তো জহর পিকর মর যাউঙ্গা। বলে হা হা করে হেসে উঠেছিলেন। তারপর বলেছিলেন —কি তুমি মথকে গেছ?

ক্লান্তভাবে হেসেছিল সোফিয়া। রায় বলেছিলেন—তা হ'লে বল তোমার সঙ্গে আরও একজন দু'জনকে আনি!

সোফিয়া বলেছিল—না। কিন্তু রায় মানেন নি, সন্ধ্যার আসরে সোফিয়ার সঙ্গে নিত্যনূতন একজনকে আনবার ব্যবস্থা করেছিলেন। জীবনে প্রচুর সম্পদ পেয়েছেন তিনি এবং জেনেছেন নারী শুধু ভোগেরই সামগ্রী,—ভালবাসা একনিষ্ঠা ওসব মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা। সুতরাং ভোগের বিষয়ে তিনি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। রাত্রি তিনটের আগে তাঁর দেহমন ক্লান্ত হ'ত না। উঠতে দেরী হত, দশটার আগে নয়, বারোটাও হয়ে যেত এক-একদিন। আজ সকালে উঠতে হয়েছিল রাণীজীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠার নিমন্ত্রণরক্ষার জন্ম। ফিরে এসে খেয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙল গানের সুরে। ঘুমের ঘোরের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। তারপরই মনে হল পাগলের কথা। এ সেই পাগল গাইছে। সেই কণ্ঠস্বরই বটে। কিন্তু আজ আর সেই গান অর্থাৎ রামপ্রসাদী সুরে মনের কথার গান নয়। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ছিল, টানা পাখা চলছে, কিন্তু তাতেও যেন অসহ্য গুমোট। দেহে অবসাদ, চোখের পাতায় ঘুমের জড়িমার সঙ্গে মদের ঘোর রয়েছে। পাগলের সুরের খেলা মৃদুধ্বনিতে কানে আসছে; ধীরে ধীরে তিনি বুঝলেন—মিয়া-কি-মল্লারে আলাপ করছে পাগল। পাগলেরও বোধ হয় এই গুমোট গরম অসহ্য বোধ হয়েছে। ৩১শে মে—জ্যৈষ্ঠের অর্ধেক চলে গেছে। আজ কুড়িদিন বিন্দুবর্ষণ হয় নি, মেঘ বড় উঁকি মারে নি। পৃথিবী যেন পুড়ছে, ঝলসাচ্ছে। তবু বিকেলে একটা ঝড়ো হাওয়া বয়, ঠাণ্ডা জলো ভারী হাওয়া। তাও দু' দিন থেকে বন্ধ। পাগল মিয়া-কি-মল্লার সাধছে বোধ হয় মেঘ-জলের জন্ম। একটু হাসলেন বীরেশ্বর। কিন্তু সে হাসি শেষ হতে না-হতে তিনি চমকে উঠলেন একটা দীপ্তিতে। বদ্ধ-দরজা-জানালা ঘরেও একটা রূঢ় তীব্র আলোর আভাস চকিতে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট গর্জনে মেঘ ডেকে উঠল। তিনি উঠে পড়লেন বিছানা থেকে। উঠে গিয়ে পশ্চিমদিকে রাস্তার ধারের জানালাটা খুলে দিলেন।

## ৩

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, এ বাড়ীটা তখন আকারে ছোট ছিল। এই যে-দিকটায় এই বারান্দা এবং তার কোণের ঘরগুলো, যেখানে আমরা বসে রয়েছি এগুলো তখনও হয় নি। পূবদিকের আর উত্তর দিকের এল শেপের বাড়ী ছিল, এ দিকটা ছিল একতলা। বীরেশ্বর রায় শুতেন পূব দিকে উইংএর শেষ ঘরখানায়। অর্থাৎ তিনদিক খোলা পেতেন। পশ্চিম-পূর্ব-দক্ষিণ। উত্তর দিকের বড় হলটা ছিল তার মজলিসের ঘর। ওই শোবার-ঘরে এখনও তাঁর মেহগনি কাঠের খাটখানা আছে। ওখানাতেই বাবা শুতেন। মা কখনও ওঘরে শোন নি ওই খাটটার জন্যে। বাবাও খাটখানা পাল্টাতে দেন নি।

যাকগে সে সব কথা।

ওই ঘরখানারই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটা জানালা খুলে তিনি দাঁড়িয়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ওই মেঘ দেখে তিনি বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর খাতায় মেঘের বর্ণনা আছে। বলেছেন—King amongst clouds—বিশবার লিখেছেন—I have never seen such a wonderful black mass of cloud like this Wonderful. This cloud is King cloud amongst the clouds—Puskar-Sumbarta and so on. ঘন কালো, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তার করে দিয়েছে আপনাকে, ফুলছে ফাঁপছে,

চলছে। চলছে বায়ুকোণ থেকে অগ্নিকোণে। গম্ভীর থমথমে রূপ, নাদির শা চেঙ্গিজ খাঁয়ের মত ; গম্ভীর মন্থর গতিতে রাজকীয় মহিমায় চলছে।

হঠাৎ আবার একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল। দক্ষিণে তখন গ্রেভইয়ার্ড রোড, মানে এখনকার পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত সবই বস্তী। গ্রেভইয়ার্ড রোডের ওদিকে জঙ্গল। গোটা দক্ষিণটায় গাছের মাথা আর মেঘে মাখামাখি। বিদ্যুতের চমকটায় সবটা যেন ঝক্‌মক্ করে উঠল, তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তিনি জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। নিচে থেকে পাগল তখন মিয়া-কি-মল্লারের আলাপে ধরতার প্রাথমিক বিলম্বিত লয় সেরে দ্রুতলয়ের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। বীরেশ্বর রায় আপনার সঙ্গীতজ্ঞান অনুযায়ী তীক্ষ্ণ বিচারে পাগলের আলাপের বিশ্লেষণ এবং বিচার করছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে হল, পাগলের গানের শক্তিতেই এ মেঘ উঠল নাকি ? আজ সকাল থেকে যা ঘটেছে যা দেখেছেন এবং পূর্বে পাগল যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে তাতে এ অঘটন সেই ঘটিয়েছে বলেই তাঁর মনে হল। সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ ছিল অসাধারণ, শুধু শুনতেই তিনি ভালবাসতেন না, তিনি চর্চা করেছেন। বড় বড় ওস্তাদদের কাছে নানান গল্প শুনেছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে সব থেকে বেশী গল্প দীপক আর মেঘমল্লার নিয়ে প্রচলিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর নাস্তিক্যবাদী বীরেশ্বর তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি মত এ সবে অবিশ্বাস করেও শেষ পর্যন্ত কূল হারিয়ে বসলেন। তিনি আবার একবার শুনলেন আলাপ। নিখুঁত আলাপ করছে পাগল। শুধু ব্যাকরণেই নিখুঁত নয়, পাগলের রামপ্রসাদী গানে যে আশ্চর্য আকৃতিময় প্রাণধর্ম থাকে তাও এতে রয়েছে। পাগল সিদ্ধ গায়ক। বীরেশ্বর সম্ভ্রমভরে নিচে নেমে এলেন।

পাগল ঘরে ছিল না। বুঝতে পারলেন দক্ষিণ দিকে যে বাগানটা আছে সেই বাগানে বসে গাইছে। তিনি বেরিয়ে এলেন।

কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য যে বাড়ীটা করেছিলেন, সেটা আকারে বড় ছিল না। একটু আগেই বলেছি স্থূলতা যে পূর্ব এবং উত্তর দিকের উইং দুটো পুরনো। পশ্চিম এবং দক্ষিণ উইং পরে তৈরী হয়েছে। এই দক্ষিণ দিকে ছিল তখন বাগান। কলকাতার বনেদী বড়লোকদের বাড়ীতে এখনও কিছু কিছু সে কালের বাগানের অবশেষ আছে। ছোট পুকুর, বাঁধানো ঘাট, বসবার বেদী, ঝাউএর সারি অনেক অযত্ন সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাঙা কুঞ্জবনের মত বেঁচে আছে। সে কুঞ্জ সে কালে রায়বাড়ীতে প্রথম পত্তন করেছিলেন সোমেশ্বর রায়, তাকে সমৃদ্ধ করতে তখন শুরু করেছেন বীরেশ্বর রায়। এই কয়েক বছর অর্থাৎ ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে তখন রায়বাড়ীর ছোট বাগানটিকে সজ্জায় বেশ একটু ভারীই করে তুলেছিলেন।

বাঁধাঘাটের উপর চাতালটা আগাগোড়া মার্বেল দিয়ে বাঁধিয়েছিলেন। ঠিক মাঝখানে ছিল একটা আটকোণা প্রশস্ত বেদী। আর সেটিকে ঘিরে অনেকগুলি বসবার আসন।

সেই মাঝখানের বেদীর উপর বসে পাগল মেঘের দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে মিয়া-কি-মল্লার ভেঁজে চলছিল। তিনি তার গানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন নি। একটু শুনে হঠাৎ কি মনে ভেবে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন বাড়ীর ভিতর এবং একটা তানপুরা নিয়ে সেটাকে বেঁধে তৈরী করে নিয়ে ফিরে গিয়ে পাগলের পিছনে বসে তাতে সুর তুলেছিলেন। পাগল একবার ফিরে তাকিয়েছিল। ওই একবারই। তারপরই মেঘ ডেকে উঠল। বৃষ্টি এল ছিটেফোঁটা, তারপর একবার মোটা ধারায় প্রবল বেগে। হঠাৎ থেমে গেল। বীরেশ্বর রায় ভিজছিলেন।

একটা চাকর ছাতা এনে তাঁর মাথার উপর ধরেছিল। তিনি বলেছিলেন—না। লোকটা কিন্তু দাঁড়িয়েই ছিল। বৃষ্টি হঠাৎ থেমে যেতেই সে বললে—হুজুর!

কথার উত্তর দেননি বীরেশ্বর। সে বলেছিল—হুজুর শিল হবে। হুজুর।

বলতে বলতে সত্যই শিল পড়তে শুরু করেছিল, ছোট ছোট কাঁকর-পাথরের মত। পাগলের গান তখন শেষ হয়েছে। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বীরেশ্বর উঠলেন এবং পাগলকে বললেন, ওঠো। শিল হবে।

সে বললে—হ্যাঁ।

—চল, ঘরে চল।

—না।

—না নয়। চল। মরবে।

—না, না। মারবে না। মারতে চায় না। দগ্ধাতে চায়।

—পাগলামি করো না, এসো।

তখন শিলের দানা ক্রমশঃ মোটা হতে শুরু হয়েছে। পুকুরের জলে শিল পড়ার গর্তগুলো বড় বড় হচ্ছে। জল ছিটকে উঠছে। বাঁধানো চাতালে শব্দ উঠছে। বীরেশ্বর তাকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে ঘরে আনলেন। ঘরে এসে ঢুকেছেন মাত্র, এমন সময় মেঘাচ্ছন্নতার অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় সন্ধ্যায় মিলিত সে গাঢ় অন্ধকারকে চিরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল—সে চমকে চোখ ঝলসে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গেই কড় কড় শব্দে বাজপড়ার মেঘের ডাকে বাড়ীটা পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠল। বীরেশ্বর পর্যন্ত চমকে উঠলেন। পাগল চমকাল না। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। বীরেশ্বর বললেন—দেখেছ, হয়তো মরতে আজ।

একটু বিষণ্ণ হাসলে পাগল।

বীরেশ্বর বললেন—তোমার উপরেই পড়ত।

পাগল ঘাড় নাড়লে—না।

—তুমি মল্লার গাইছিলে। এমন গান তুমি শিখলে কার কাছে?

—শিখলাম? কার কাছে?

—হ্যাঁ?

অতিবিষণ্ণ করুণ-কণ্ঠে পাগল বললে—শিখলাম? গোড়াতে শিখেছিলাম বাবার কাছে। তারপর ওস্তাদের খোঁজ পেলেই ছুটতাম পিছনে, ঘুরতাম। তা আর কতটুকু? তারপরে—?

—তারপরে?

—তারপরে আপনি হল। ওই যেমন করে গন্ধ হল, এটা এল, ওটা এল, গানও এল। আমি খেপে উঠলাম। গান বেঁধেছিলাম—আর তুই পালাবি কোথা, আমি হয়েছি তালগাছের মাথা।

চুপ করে গেল পাগল।

বীরেশ্বর বললেন—তুমি এমন গান জান—এতবড় গাইয়ে—আজ তুমি মল্লার গেয়ে বৃষ্টি আনলে—

—না-না-না। মেঘ দেখে আমার ভাল লাগল। আচ্ছা মেঘ রাজামেঘ—বুঝেছ রাজা-মেঘ। এমন দেখা যায় না। তাই দেখে মন হল গাইলাম। বুঝেছ। আমি পারব কি করে? সে পারত তানসেন শুনেছি। এসব তো তারই কাণ্ড। তাকে যে ধরতেই পারলাম না। আছড়ে ফেলে দিলে। বুঝেছ!—আঃ—আঃ—আঃ—ছাড়, ছাড় ছাড়।

আবার পাগলামি উঠল তার—সে নিজের গলা নিজে টিপে ধরে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

বীরেশ্বর দুপুরের মতই তার হাত দুটো ধরে সজোরে টেনে ছাড়িয়ে দিলেন। পাগল মাথা ঠুকতে লাগল। বীরেশ্বর তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন এবার।

—ছাড়, ছাড় আমাকে ছাড়।

বীরেশ্বর অনুভব করলেন—পাগলের দেহে যেন হাতীর বল। কিন্তু তবুও সে বৃদ্ধ, জীর্ণদেহ। কয়েক মুহূর্ত পর মনে হল, লোকটা নিথর হয়ে গেছে। তিনি বিস্ময় অনুভব করে তাকে ছেড়ে দিলেন। সে জড়বস্তুর মত গড়িয়ে পড়ে গেল। পাগল অজ্ঞান হয়ে গেছে।

তিনি বললেন—জল। জল আন।

চাকরেরা দুজন দাঁড়িয়েই ছিল কাছে। তাদের একজন ছুটল।

চোখেমুখে জল দিয়ে পাগলের চেতনা ফিরল বটে কিন্তু সে নিঝুম হয়ে পড়ে রইল। যেন সব শক্তি তার নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

ওদিকে বাড়ীতে তখন সাড়া পড়ে গেছে। তেলবাতি আগেই হয়ে গেছে, তাতে আলো জ্বলছে, সুগন্ধি ধূপ পোড়ান হচ্ছে, ফরসী-হুঁকোতে এবেলা জল ফিরিয়ে ঠিক করা হচ্ছে। সারি সারি কল্কেতে কাঠগড়ার তামাক সেজে রাখছে ছিটমহলের চাকরেরা। সন্ধ্যে লেগে এল। কিছুক্ষণ পরই সোফিয়া বাঈ আসবে, আসর বসবে। নায়েবখানায় নায়েব আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এখনও শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষণও কম হয়নি। রাস্তাঘাটে জল জমেছে, কাদা হয়ে উঠেছে। সাহেবান লোকদের এলাকাগুলোর খোয়ার রাস্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাকি কলকেতার রাস্তাঘাট ধুলো আর গঙ্গাতীরে মাটি, দুপাশে জবজবে নালা। এতে কি আর ঘোড়ারগাড়ী যাবে? অথচ সোফিয়া বাঈকে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে। কি যে মতি হল বাবুর!

মতির আর দোষ কি? এ তো এখন আমিরীর অঙ্গ। যে আমীরের বাঈ নাই, সে আবার আমীর নাকি? তাছাড়া বীরেশ্বরবাবু তো বিয়ে করে প্রথম ক'বছর এখানেই ছিলেন, সে জীবন তো তিনি দেখেছেন। সেই নবীন বয়স—আঠারো-উনিশ; আর কলকাতার এই সমাজ, এই হালচাল, এর মধ্যে গঙ্গাজলের মত পবিত্র জীবনযাপন করেছেন। স্ত্রী-অন্ত প্রাণ। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে স্ত্রীকে নিয়ে গান-বাজনা করেছেন। চাকরবাকর কারুর ত্রিসীমানাতে যাবার হুকুম ছিল না। সেই মানুষ কি হল—এই হয়ে গেলেন।

তাঁর ধারণা ওই যে এখান থেকে কীর্তিহাটে গেলেন বউ নিয়ে, বিবিমহল তৈরী করে বাস করতে লাগলেন, বাপের সঙ্গে বনল না, বাপ ঠিক ছেলেকে বিশ্বাস করলেন না; বেশী বিশ্বাস করলেন জামাইকে; তাতেই ঘটল সর্বনাশ। আর ওই কুঠিয়াল জন রবিনসন। ওই সাদা-চামড়া ইংরেজ—সাতসমুদ্র-তেরনদী পেরিয়ে এদেশে এসে ভেল্কিবাজীতে দুনিয়া দখল করে বসল, ওদের অসাধ্য কিছু আছে নাকি? আকণ্ঠ মদ গিলে আর ওইসব যা-তা মাংস খেয়ে ওরা যেমন দৈত্যের মত খাটে, তেমনি বেলেল্লাপনা করে নিজেদের মেমদের নিয়ে। জোড়ায় জোড়ায় দিগেবন্দী হয়ে বুকে বুক ঠেকিয়ে কোমর ধরে নাচে। কুঠিয়ালগুলোর তো রোজ এদেশী নতুন মেয়েছেলে চাই। সে কালো না ফরসা, যুবতী না আধাবয়সী সে দেখবারও চোখ থাকে না মদের ঘোরে। সেই ছোঁয়াচে লোকটি এমন হয়ে গেল। ঘোড়ায় চেপে জন সাহেবের কাছে যাওয়া, জঙ্গলে বাঘ শিকার করা, নদীর মোহনায় কুমীর শিকার করেই বা মদ

মানবে কেন? আর সেই বউমাটি! তাকে নায়েব দেখেছেন—সে তো সাক্ষাৎ দেবী। চোখমুখের দিকে তাকালেই মন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ত। সে-মেয়ের এসব সহ্য হবে কেন। তাছাড়া সে বিয়েতে গিয়েছিল, শুনে এসেছে—সে-মেয়ে এক সাধুর কন্যা। সিদ্ধসাধক ছিলেন তার বাপ। সে কন্যার এইসব পাপসংসর্গ দুষ্ট স্বামীসঙ্গ সহ্য হবে কেন? সে জলে ডুবে পরিত্রাণ পেলে। তারপর আর কি, বাধাবন্ধহীন হয়ে বীরেশ্বর রায় তুফানে ঝাঁপ খেয়েছে। জীবনে একটা দিন শান্ত হয়ে শুদ্ধ হয়ে শুকনো মাটির বুকে বসে থাকা তাঁর সয় না; সন্ধ্যে হতে হতে ঝাঁপ দেবেন তুফানে। লোকে বাগানবাড়ী যায় স্ফূর্তি করতে; গঙ্গায় বজরায় আসর পেতে স্ফূর্তি জমায়; কেউ যায় খাস বাঈজী কসবীর বাড়ী; আর বীরেশ্বর রায়ের বসতবাড়ীতে আসে বাঈজী। বাপ সম্পত্তি দেবোত্তর করে গেছে। এসব তাতে নিষিদ্ধ। কিন্তু তাই বা বলে কে? দেখে কে?

ভগ্নীপতি—জামাইবাবু বিমলাকান্ত ছিলেন অন্য একজন সেবায়েৎ, কিন্তু তিনি তো স্বেচ্ছায় সব ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন কাশী। কীর্তিহাট থেকে এসে কিছুদিন পর্যন্ত ছিলেন কলকাতায়। ছেলে কমলাকান্তকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন, তা নায়েব জানে। প্রথম কলকাতায় চলে এসে উঠেছিলেন এই বাড়ীতেই, দিন পনের ছিলেন, তারপর নায়েবই তার জন্তে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরমশায়দের বাড়ীর ওদিকে একখানা বাড়ী দেখে দিয়েছিলেন—সেখানে উঠে গিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন যেতেন আসতেন, যোগ ছিল। কিন্তু তারপর চলে গেলেন এখান থেকে। হঠাৎ চলে গেলেন, বলেও গেলেন না। নায়েব সেদিন ওঁদের খোঁজ করতে গিয়ে শুনলে—তাঁরা কাশী চলে গেছেন।

কোচম্যান এসে সেলাম করে দাঁড়াল।—বন্দেগী হুজুর।

সেলাম আদবকায়দার বহরটা দেখ! নবাবের জাত কিনা। কথায় কথায় বলবে—অমুক জায়গার নবাব—তার চাচার শ্বশুরের ফুফুর দুধভাইয়ের নানার পোতা। সইয়ের বউয়ের বকুলফুলের বোনপো-বউয়ের বোনঝি-জামাই।

—সেলাম, নায়েবসাহাব। আবার বললে কোচম্যান ওসমান।

—সেলাম! এই সেলামটির জন্ম ওসমান আবার সেলাম করেছে। ঠাণ্ডিপোলাও আর বাইগনের কোর্মা খায়, চোখে সুরমা টানে, দাড়িতে আতর একটু লাগায় ওসমান, সেলাম আদায় না করে ছাড়ে না। হাসলেন নায়েব। বললেন—কি?

—এই পানি হইয়ে গেলো, বহুৎ গর্দা কাদা হো গয়া রাস্তামে। পানি ভি হোগা চার পান জাগহমে। ইসমে ঘোড়া লেকে ক্যায়সে যাউ?

—বউবাজার তো?

—হাঁ।

—অরে বাবা, ওহি তো শোচতা হায়।—গর্দামে কাদামে ঘোড়া নেহি চলেগা। কোই জাগা গাঢ়া উড়া হোগা তো পায়ের জখম হো যায়েগা। এতনা দামী জানবার। বিলকুল বরবাদ হো যায়েগা।

—তো কি হম যায়েগা?

—পাল্কী ভেজিয়ে না। কাহার লোগ তো বৈঠকে বৈঠকে খাতা হায়।

—তো বোলায় দেও মহাবীর সিংকো।

চলে গেল ওসমান।

নায়েব আবার আকাশের দিকে তাকালেন। শিল থেমে গেছে। আকাশে মেঘ ফিকে

হয়ে কাটতে শুরু করেছে। সূর্যাস্তের রঙ লেগেছে, রাঙা ছোপ ধরেছে, সে-ছোপ দ্রুত উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে ; নীচের রঙ গাঢ় থেকে গাঢ়তর লাল হয়ে পাটকিলে রঙে দাঁড়িয়েছে। মধ্য-আকাশে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে নীল আকাশের টুকরো।

মহাবীর এসে দাঁড়াল।

নায়েব বললেন, বেহারা-পাল্কী ভেজো বউবাজার, আর তুমলোক চার আদ্‌মী যাও। বিবিকে লে আও। সারেঙ্গীদার তবলচী পয়দল আয়েগা। হাঁ? সমঝা?

—জী হুজুর।

মহাবীর চলে যাচ্ছিল। এমন সময় হুম্ হুম্ করে একখানা ভাড়ার পাল্কী এসে ঢুকল বাড়ীর হাতার মধ্যে। বেহারার হাঁক শুনে নায়েব খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, একখানা ভাড়ার পাল্কী এসে ঢুকছে। পাল্কীখানা এসে সিঁড়ির নীচে নামল, তার ভিতর থেকে নামলেন—কীর্তিহাটের ম্যানেজার-নায়েব গিরীন্দ্র ঘোষাল। শশব্যস্তে এখানকার নায়েব বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

—আসুন আসুন। আপনি? হঠাৎ? কোন খবর নেই—এমন—

ঘোষাল বললেন—এলাম, জরুরী খবর আছে। মালিক কোথায়?

—এই তো বোধ হয় উপরে গেলেন। সারাদিন এক পাগল নিয়ে পড়ে আছেন।

—পাগল নিয়ে?

—পাগলও বটে, সিদ্ধপুরুষও বটে মশাই। বুঝেছেন?

—কি রকম?

—রকম আজ দেখে তো তাক্ লেগে গেল। রোদে পুড়ে যাচ্ছিল—জল-ঝড় এক-মাসের উপর ছিল না। আজ একেবারে দেখছেন তো চোখেই, জলে-ঝড়ে-শিলাবৃষ্টিতে পৃথ্বী শীতলা ভব হয়ে গেল। পাগল জল আনলে মশায়। বুয়েছেন—ওই বাগানে বেদীর উপর বসে এমন মল্লার হাঁকলে—সে শুনে তো আমাদের একেবারে ঘোর লেগে গেল, খোদ বাবু উপর থেকে নেমে এসে তানপুরো নিয়ে বসে গেলেন পিছনে। বাস, তারপরই বিদ্যুৎ, ডাক, ঝম-ঝম করে বৃষ্টি, তারপর শিলাবৃষ্টি। ভাগ্যে বাবু জোর করে পাগলাকে টেনে এনে ঘরে ঢুকিয়েছিলেন, যেমনি ঘরটিতে ঢুকেছেন অমনি বজ্রপাত।

—তাই নাকি? আমি তখন সবে গঙ্গার ঘাটে নেমেছি। ঝড়ে নৌকো সামাল সামাল হয়েছিল, ডুবেই প্রাণটা যেতো বোধ হয়, তা মাঝিবেটারা দারুণ মাঝি তো, ভিড়িয়ে ফেললে।

—কতদূর পর্যন্ত মেঘ পেয়েছেন?

—দক্ষিণে তো গেল। কলকাতা ঢোকা পর্যন্ত আকাশ ফটফটে। হেঁড়ে কোণে মেঘ উঠছে—উঁকি মারছে, তাই নজরে পড়ল খিদিরপুরের ও-মাথায়। বললাম—বেয়ে চল বেটারা। জলদি জলদি। নিমাই মাঝি বললে,—কূলে ভিড়াই নায়েবকর্তা, উ যে ম্যাঘ, ওরে বিশ্বাস নাই, যদি রথ হাঁকায় তো দেখতে দেখতে ঢেকে দিবে। বললাম—সি হবে না রে ব্যাটা। মরতে মরতে কলকাতার ঘাটে পৌঁছতে হবে, এই আজই। বাবু মজলিসে বাঈ নিয়ে বসলে দেখা হবে না কাল বারোটা পর্যন্ত। আমি কাল সকালেই ফিরব। মরি মরি, বাঁচি বাঁচি। চল। তা বেটা হাল ধরেছিল বটে। মুঠো বটে। সোনায় হাত বাঁধিয়ে দিতে হয়। ঘাটে নৌকো লেগেছে আর জল পড়তে লাগল। তারপরে শিল। থামতেই উঠে পাল্কী ভাড়া করেছি। দুনো দোব বলেছি।

কথাটা ঘুরে গেল। কলকাতায় নায়েব হেরম্ব ঘোষ পাগলের কথা পাশে রেখে দিলেন; ঘোষালমশায়ের কথার মধ্যে জরুরী কিছুর আঁচ পেয়েছে। সে বললে—কাল সকালে ফিরবেন? রাত্রেই দেখা করবেন বাবুর সঙ্গে!

—এই এখুনি হলে ভাল হয়। এত্তেলা পাঠাও একটু। বল খুব জরুরী—।

—এত জরুরী—

থেমে গেলেন হেরম্ব ঘোষ, কাজটা কি জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেলেন না। ঘোষালমশায় রায় এস্টেটের প্রধান কর্মচারী। হেরম্ব ঘোষের কাজ কম নয়, হয়তো বা টাকার দিক দিয়ে তার এখানেই মোটা মোটা টাকার জমা-খরচ হয়, লেন-দেন হয়; ব্যবসাতে টাকা লগ্নী করা, টাকা ধার দেওয়া—সে-সবের মোটা কারবার এখানেই। কিন্তু ঘোষালমশায় দুমাস অন্তর এসে সমস্ত হিসেবনিকেশ দেখে খাতায় সই মেরে যান। তাছাড়া সোমেশ্বর রায়ের দেবোত্তরের ট্রাস্ট-দলিলে তিনি একজন অ্যাডভাইসার। তিনি ছুটে এসেছেন, এখুনি দেখা করবেন, কাল সকালেই ফিরবেন। এ-কাজ খুব জরুরী। তার উপর তিনি নিজে যখন এসেছেন, তখন কাজটা গোপনীয় বলেই মনে হল। জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও পারলেন না হেরম্ব ঘোষ।

ঘোষাল বললেন, এ যদি হয়, মানে কাজটা, খেয়া যদি ঘরে ঢুকোতে পারি, তবে রায়বংশে লক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী হলেন, আর অচলা হলেন।

—বলেন কি?

—হ্যাঁ।

একজন চাকর এসে রূপো-বাঁধানো হুঁকোতে কল্কে চড়িয়ে ঘোষালের সামনে বাড়িয়ে ধরলে। হুঁকো নিয়ে তাতে টান দিয়ে ঘোষাল বললেন, তুমি যাও ঘোষ। বাবুকে বলে এস। এক্ষুনি। বলবে—মহিষাদলের কথা। খুব জরুরী।

ঘোষ বললে—মহিষাদল! উ কথা কাগজে বার করে দিয়েছে ঈশ্বর গুপ্ত। ওই দেখুন না সংবাদপ্রভাকর পড়ে রয়েছে।

ঘোষাল তুলে নিলেন কাগজখানা। একটা খবরের নীচে দাগ দেওয়াও রয়েছে। 'কলিকাতার শীল বনাম মহিষাদলের রাজা বাহাদুর।' "অহো, হে পাঠকগণ! মহারাজ মহিষাদলাধিপতি অবোধ অকৃতজ্ঞ কর্মচারীদিগের কুহকজালে জড়িত হইয়া এতদিনের পর দারুণ দুর্দাশাপ্রাপ্ত হইলেন।…বর্তমান অধিরাজ বাহাদুর কি অশুভক্ষণে কলুটোলানিবাসী ধনরাশি ৺মতি শীল মহাশয়ের স্ত্রী আনন্দময়ী দাসীর নিকটে এক লক্ষ টাকা কর্জ করিয়াছিলেন, সেই লক্ষ টাকার নিমিত্ত তাঁহার সর্বস্বান্ত হইল। মতিলাল শীলের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল শীল তাঁহার বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করণার্থে প্রতিজ্ঞাকরতঃ পরিশেষে সর্বস্ব গ্রাস করিয়া বসিলেন।"

ঘোষাল কাগজখানা ফেলে দিলেন। কাগজ জানে কচু লেখে ঘেঁচু। কি জানে তারা? কতটুকু জানে? ঘোষাল নিজে মহিষাদলের কর্মচারী ছিলেন। সেখান থেকে তারা তাঁকে অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে ক্ষান্ত হয়নি—তাঁকে সর্বস্বান্ত করতে চেয়েছিল। সোমেশ্বর রায় তাঁকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। এইসব ঋণ করতে ঘোষাল বারণ করেছিলেন বর্তমান মহারাজার বাবাকে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ বাহাদুরকে। দুহাতে খরচ করতে নিষেধ করেছেন। অপরাধ তাঁর এই।

কাগজখানা ফেলে দিয়ে ঘোষাল বললেন, উনি দেখেছেন কাগজ? খবর জানেন?

—উনিই তো দাগ দিয়েছেন।

—বহুত আচ্ছা। যাও, গিয়ে বল—মহিষাদলের আরও খবর আছে জরুরী। বলবে শীলেরা সম্পত্তি রাখবে না, বিক্রী করবে—। সেই খবর নিয়ে এসেছি।

—কিনবেন নাকি ?

—আমি কিনতে বলব ! এতবড় সম্পত্তি, আর বাড়ীর দোরের সম্পত্তি আর মিলবে না। ঠিক এই সময়েই উপরে বীরেশ্বরের গলাঝাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

বীরেশ্বর রায় বিকেলে গোসলখানায় স্নান সেরে তখন সদ্য বেরিয়েছেন, চাকরে স্নানঘরে-পরা ধুতি ছাড়িয়ে পাটে পাটে কোঁচানো কোঁচায় ফুলকেটে কাপড় হাতে দাঁড়িয়ে ছিল—কাপড় ছাড়িয়ে নেবে, একটা চাকর বিলেতের আমদানি টার্কিস তোয়ালে দিয়ে গা মুছে দিচ্ছে। টেবিলের উপর আতরদানে আতর-তুলো রাখা রয়েছে। আংটি রয়েছে বাক্সে; চেন-ঘড়ি রয়েছে। আলনায় পাটভাঙা নবাবী ঢঙের মসলিনের বুটিদার পাঞ্জাবি। টালিগঞ্জে মহীশূরের টিপু সুলতানের বংশধরেরা এসে অবধি কলকাতার সন্ধ্যের আসরে এই ঢঙের পাঞ্জাবির রেওয়াজ হয়েছে। বাইরে যেতে হলে চোগা-চাপকান, চাদর-শাল-টুপির দেওয়াজ শুধু দরবারী পোশাকই নয়, বড় বড় জলসায়, নাচের আসরেও চলে বটে, কিন্তু বাঈ-বাড়ী কি বাগানবাড়ী বা ছোট মজলিসে এইটের চল হয়েছে। বিশেষ করে যারা খুব উঁচুমেজাজী শৌখীন, তাদের মধ্যে।

গলার সাড়া দিয়ে হেরম্ব ঘোষ বাইরে দাঁড়ালেন।

রায় বললেন—ঘোষ ? গলার সাড়ার ইসারায় তিনি বুঝেছেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভেতরে এস।

ভেতরে এসে হেঁট হয়ে নমস্কার করে দাঁড়ালেন ঘোষ।

—কি ?

—আজ্ঞে, কীর্তিহাট থেকে ঘোষালমশায় এসেছেন। কাজ খুব জরুরী। কাল সকালেই ফিরে যাবেন তিনি।

—গিরীন্দ্র ঘোষালমশাই ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজই এখুনি দেখা করতে চান।

—পাঠিয়ে দাও।

—ওই মহিষাদলের রাজবাড়ীর ব্যাপার, আজ কাগজে—

—বুঝেছি। তিনি আসুন তাঁর কাছেই শুনব।

হেরম্ব ঘোষ চলে গেলেন।

রায় বললেন—কাপড় ছাড়িয়ে নে। বাইরে কে আছে, ঘোষালমশাই এলে দাঁড়াতে বলবি, কাপড় ছাড়া না হলে যেন না ঢোকেন।

চাকর তাঁকে কাপড় ছাড়িয়ে নিল। এ সেদিনের আমীরী আভিজাত্যের অঙ্গ।

গিরীন্দ্র ঘোষাল বীরেশ্বরকে তুমি বলেন। আজ তিনি রায় এস্টেটে এসেছেন পঁয়ত্রিশ বৎসর। বীরেশ্বরের জন্মও তখন হয়নি। সোমেশ্বর কীর্তিহাট থেকে যখন তান্ত্রিক শ্যামাকান্তের জলে ডুবে মৃত্যুর পর চলে আসেন তখন তিনি এসেছেন। মহিষাদলে গর্গ বাহাদুরদের এস্টেটে কাজ করতে করতে মহারাজা বাহাদুরের কোপদৃষ্টিতে প'ড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন সোমেশ্বর রায়ের। বয়স ছিল তখন তরুণ। কিছু কিছু ইংরিজী শিখেছিলেন, পাটোয়ারী বংশের ছেলে। বাপ পিতামহ সকলেই গোমস্তা নায়েব ছিলেন। রায়দের এস্টেটে এসে সোমেশ্বরের আমলে তিনি অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে জমিদারী চালিয়েছেন; পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের নির্দিষ্ট ডৌল জমা—অর্থাৎ মহালের মোট আদায়ের উপর বৃদ্ধি করেছেন দু-দুবার মাথট চলন করেছেন মামুলী চাঁদা নাম দিয়ে। সব থেকে বড় কাজ করেছেন মহালের যত আবাদযোগ্য পতিত ছিল, সে পতিতগুলি ওইসব জঙ্গলের দুর্দান্ত চুয়াড়দের দিয়ে ভাঙিয়ে জমিতে পরিণত করেছেন। সেসব জমির উপর সিচের জন্য বাঁধ কাটিয়েছেন। ফলে জমিদারীর আয় দ্বিগুণে পরিণত হয়েছে। আর করেছেন, বেছে বেছে যেসব মহালে দুর্ধর্ষ প্রজার বাস, যাদের শাসন করতে না পেরে জমিদারেরা বিব্রত হয়েছে, সেইসব মহাল রায় এস্টেট থেকে খুব সস্তায় পত্তনী নিয়ে তাদের শাসন করে আয় এবং এলাকা দুই-ই বৃদ্ধি করেছেন। বীরেশ্বরের বাল্যবয়সে স্নেহবশে তাকে কোলেও ক'রেছেন। এবং তিনি সেকালে দুঃসাহসী সবল বালক বীরেশ্বরকে বড় ভালও বাসতেন। বলতেন—হ্যাঁ, এই তো বাঘ-বাচ্চা। এই তো খাঁটি জমিদার হবে। সুতরাং তুমি বলার তাঁর অধিকার ছিল। তবে পরে বীরেশ্বর সম্পর্কে তাঁর মত বদলেছিল। সোমেশ্বরের অন্তে তিনি কাজ ছেড়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন; কিন্তু সোমেশ্বর তাঁকে মৃত্যুকালে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে বীরেশ্বর যতক্ষণ পর্যন্ত অমার্জনীয় অপরাধ না করবে ততক্ষণ তিনি কাজ ছাড়বেন না।

বিমলাকান্তকে সকলেই স্নেহ করত, তার সঙ্গে শ্রদ্ধাও করত, ঘোষালও করতেন। বিমলাকান্ত যখন বীরেশ্বরের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য স্বেচ্ছায় সব পরিত্যাগ করে চলে এলেন শুধু স্ত্রী বিমলার গহনা এবং তাঁকে দেওয়া টাকা নিয়ে, তখন ঘোষাল এবং স্মৃতিতীর্থ ভেবেছিলেন কাজ ছেড়ে দেবেন তাঁরা। কিন্তু বীরেশ্বর তাঁদের ডেকে বলেছিলেন—অন্যায় আমি করিনি ঘোষাল-কাকা, স্মৃতিতীর্থমশায়। আমাদের বংশের দেবোত্তরে জামাই সেবায়েত হবেন এ হয় না। বাবা বিবাহের সময় অর্ধেক সম্পত্তি তাকে দিতে চেয়েছিলেন, সে তার প্রাপ্য। বিমলাকান্ত চলে গেল, তার অংশ সে নিক। নেব না বলে সে মহত্ত্ব দেখাতে চেয়েছে। তার কারণ সে জানে ওই কমলাকান্তই সব পাবে। সে ভবিষ্যতের কথা, ভবিষ্যতে যা হয় হবে। আপনি আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি দুভাগ ক'রে তার আদায় যেমন দেখছেন দেখুন। খরচ বাদ দিয়ে লাভের টাকা বিমলাকান্তকে পাঠিয়ে দিন। তার সঙ্গে আমার বিবাদ কেন এ আপনাদের জানার ইচ্ছে থাকলেও জানতে চাইবেন না। আপনারা তাকে দেবতা মনে করেন, সাধু মনে করেন, করুন। আমার মতে সে মহাপাপী, সে শয়তান, আমার দিদির মাথাখারাপ তার জন্যে। একটা চালকলা-বাঁধা ভটচাজ বংশের ছেলে—নাতি—তাকে সহ্য করতে পারবে কেন রায়বংশের মেয়ে। কিন্তু সেসব কথা থাক। আমার অমার্জনীয় অপরাধ, এটা বিমলাকান্তের কাছে হ'তে পারে, কিন্তু আপনার কাছে নয়। বলুন বিবেচনা ক'রে বুকে হাত দিয়ে। যদি তা বলতে পারেন, আমি কিছু বলব না।

তা বলতে পারেন নি ঘোষাল।

ঘোষালের সঙ্গে আরও একজন ছিলেন, তিনি কালীমায়ের এবং রাজরাজেশ্বরের পূজক, রায়দের গুরুবংশের সন্তান রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থ।

প্রশ্ন দুজনকেই করেছিলেন বীরেশ্বর। তাঁরা এর উত্তর দিতে পারেন নি। বীরেশ্বর বলেছিলেন—বলুন, আপনাদের অসম্মান করেছি? কি অন্যায় হয়েছে আমার আপনাদের কাছে?

রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থ বলেছিলেন—কিন্তু বিমলাকান্তের প্রতি আক্রোশ তোমার অহেতুক। ধর্মবিচারে এ অন্যায়। আমরা মানুষ তো। এ অন্যায়ই বা আমরা দেখব কেমন করে? আমার পক্ষে এ সহ্য করা অত্যন্ত কষ্টকর। বিশেষ করে, আমি তোমাদের সংসারে বেতনভোগী পূজকই শুধু নই, তোমার পিতার গুরুবংশের জ্ঞাতি। তোমার স্ত্রী আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

রাগে বীরেশ্বরের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। আত্মসংবরণের জন্যই তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ছিলেন, তারপর বলেছিলেন—অকারণ ওইসব কথা তুলে কি লাভ বলুন? আমার স্ত্রী—। আবার চুপ ক'রে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর। তারপর আবার বলেছিলেন—তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন, আপনি তাঁর গুরু। আমি ধর্ম ঈশ্বর মানি না। দীক্ষা আমি নিই নি, সুতরাং ও-দাবী আমার কাছে নাই করলেন। সম্পত্তি দেবোত্তর, বাবার দলিল অনুসারে দেবতার সেবাপূজা চালালে তবেই তার সেবাইত হিসেবে আমি সম্পত্তির মালিক। সত্য বলতে তার জন্যেই সেবাপূজা চালিয়ে যাই। ওসবে বিশ্বাস আমার নেই। এবং আমি সরে এলে বিমলাকান্ত নিষ্কণ্টক হয়ে দেবোত্তরের মালিক হবে, সেই কারণে ওটা আঁকড়ে ধরে আছি আমি। আমি জানি, আপনি বিশেষ ক'রে বিমলাকান্তের পক্ষপাতী। আমাকে খুব ভালচক্ষে দেখেন না। কিন্তু আপনাকে আমি একটি কারণে শ্রদ্ধা করি। আপনি সত্যবাদী আর নির্লোভ। বাবার কাছে তাঁর মৃত্যুর সময় কথা দিয়েছি আপনাদের সম্ভ্রম আমি হানি করব না। সে সম্ভ্রম হানি আমি করি নি করব না। আমি কথা দিচ্ছি, আমি কলকাতা গিয়ে বাস করব। এখানকার পূজাসেবা আপনারা চালাবেন। আমি হস্তক্ষেপ করব না। বিমলাকান্তের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যাই হোক, আপনারাও তা নিয়ে কথা বলবেন না। বিবাহ আমি আর করব না। সম্পত্তি আপনাদের ওই বিমলাকান্তের পুত্রের হাতেই যাবে। আপনারা সেটা রক্ষা করে যান।

বীরেশ্বরের কীর্তিহাট ছেড়ে আসার এটাও একটা কারণ।

সেই অবধি গিরীন্দ্র ঘোষালই সম্পত্তি পরিচালনা করে আসছেন। তিন মাস অন্তর হিসাব আসে। মাসে মাসে রিপোর্ট আসে। বীরেশ্বর দেখেন সই ক'রে দেন এই পর্যন্ত। গিরীন্দ্র ঘোষালের পরিচালনায় এস্টেটের আয় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে।

* * *

গিরীন্দ্র ঘোষাল ঘরে ঢুকে বললেন—ভাল আছ তো বাবা?

বীরেশ্বর বললেন—বসুন। ভাল আছি বই কি। তবে বোধ হয় মোটা হয়ে যাচ্ছি একটু। হাসলেন।

গিরীন্দ্র বললেন—কিছু মেদ হওয়া ভাল।

বীরেশ্বর বললেন—এখানে তো ওখানকার মত ঘোড়ায় পাঁচ দশ মাইল ছুটবার সুবিধে নেই। ওখানে কুস্তি করতাম এখানে এসে তাও হয় না। সকালে উঠতে দেরী হয়, সন্ধ্যেতে

আজ মিটিং, কাল এঁর বাড়ী নেমন্তন্ন, পরশু ওঁর বাড়ী। বিকেল থেকে সাজগোছ। হয় না। সাঁতার কাটারও সুযোগ নেই। গঙ্গার জলে স্নানে নোনা ধরে বলে।

গিরীন্দ্র বললেন—তা মোটা একটু হলেই বা। দেখতে তো ভাল লাগছে।

বীরেশ্বর হাসলেন। তারপর বললেন—হঠাৎ এলেন এমনভাবে, ওখানে কোন গোলমাল ঘটেছে নাকি ?

—না—না। আমাদের গোলমাল কিছু নয়। তবে মহিষাদলের বড়ই বিভ্রাট। ঘোষ নায়েব বললে—ব্যাপারটা তুমি জান দেখলাম, সংবাদ প্রভাকরে ছাপা খবরটায় তুমি দাগ দিয়ে রেখেছ।

—শীলরা দখল করতে গিয়েছিল !

—হ্যাঁ। দখলও একরকম করেছে। মহারাজ লক্ষণপ্রসাদ রাজবাড়ীতে ছিলেন না। ওঁর মা মহারাণীসাহেবা ছিলেন। তিনি ফটক বন্ধ করে রেখেছিলেন। লোকজনও যথেষ্ট ছিল। শীলেদের লোক সেরিফের সারজেন্ট-টারজেন্ট নিয়ে গিয়েও ঠিক ভরসা পায়নি। শেষ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে মেদিনীপুর থেকে এনে দখল নিয়েছে। মহারাণীসাহেবা দেওয়ান রামনারান গিরির বাড়ীতে উঠেছেন। এখন শীলেরা এই সম্পত্তি বিক্রী করবে ; খবর পেয়েই আমি লোক পাঠিয়েছি, নিজে এসেছি তোমার কাছে। এ সম্পত্তি তো ছাড়া হবে না বাবা। চার-পাঁচ লাখ পেলেই শীলেরা ছেড়ে দেবে সম্পত্তি।

বীরেশ্বর চুপ ক'রে থাকলেন।

ঘোষাল বললেন—কাঁসাইয়ের ওপারে লাট কীর্তিহাটের তিনখানা মৌজা, তার ওপার থেকে একনাগাড় মহিষাদলের এস্টেট। ঘরের বাইরে খামারবাড়ীর মত লাগোয়া পরগনা। এ হাতছাড়া করলে, আর কখনও হবে না।

বীরেশ্বর রায় এবার বললেন—না ঘোষালমশায়, একমত হ'তে পারলাম না।

—কেন ?

—মহিষাদলের ওঁরা সর্বস্বান্ত হবেন, আমি কিনব, এ হয় না। না। জমিদাররা এ দেশে এতেই মরছে মরবে। একজন জমিদার ফকীর হবে আর আমি রাজা হব, এটা বড় খারাপ ব্যাপার। ল্যাণ্ডহোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশনে আমি ক'বারই বলেছি এ নিয়ে। বলেছি, এসব ক্ষেত্রে জমিদারদের উচিত বিপন্ন জমিদারকে রক্ষা করা। তা ছাড়া প্রাচীন বংশ। এটা উচিত হবে না। অন্তত আমি পারব না। আরও কথা আছে, এতবড় জমিদারি, অনেক টাকা রেভেন্যু। আদায় হোক-না-হোক জমিদারকে দাখিল করতে হবে। প্রজার কাছে খাজনা আদায় আগে হপ্তম পঞ্চম ছিল, তখন একরকম ক'রে হত। ধরে এনে, মেরে, পিটে বুকে বাঁশ দিয়ে, মাঠের ধান ক্রোক ক'রে আদায় হ'ত। এখন সব উঠে যাচ্ছে।

—উঠে গেলেও আছে এবং থাকবে। তা ছাড়া জমিদারী রাজত্ব দাপের, ও বাপের নয়। যার লাঠি তার মাটি। যার দাপ তার সাতখুন মাপ। প্রজাকে চিরকাল ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় হয়, না-হলে হয় না, রায়ত চাষীসে দাতা নেহি, লেকিন—বিনা জুতিসে দেতা নেহি। ওসবের জন্যে ভেবো না। আর প্রতিবেশী, পাশের জমিদার-রাজা, এইসব বলছ তুমি ; বেশ তুমি না হয় না নিলে, কিন্তু নেবে তো একজন।

বীরেশ্বর বললেন—এর জন্য শীলদের যা দুর্নাম হয়েছে তার নমুনা তো কাগজে দেখছেন। কলকাতাতেও সুদখোর কুচক্রী বলে খুব দুর্নাম রটেছে।

—কিন্তু জন রবিনসন নিলে কি আমাদের খুব সুবিধে হবে বাবা ?

চমকে উঠলেন বীরেশ্বর।—জন রবিনসন ? জনি ?

—হাঁ, রবিনসন সাহেব। যার শীল যার নোড়া তার ভাঙি দাঁতের গোড়া—এই জাতই হল ওই লালমুখোরা। বাবা, মীরজাফরই বলতে গেলে যুদ্ধ জেতালে। বিশ তিরিশ হাজার নবাবী ফৌজ। ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখে দিলে, তবে না ক্লাইব সাহেব জিতলে! আর দেখ তাকেই শেষে ঠেলে ফেলে গোটা দেশ দখল ক'রে নিলে। ব্যবসা নিয়ে ছিল রবিনসন, কত্তাবাবু এখান থেকে নিয়ে গেলেন, নীলকুঠীর জন্যে যত টাকা দরকার যুগিয়েছেন। একটা কুঠী থেকে দুটো হল। টাকা রায়বাড়ীর। সুদ অবিশ্যি দিয়েছে। কিন্তু লাভ ? লাভ তো মোটা করেছে। এখন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবে। শীলবাবুরা মহিষাদল মামলায় ডিক্রীতে দখল নিয়েছে শুনে জনি সাহেব কথা চালাচ্ছে। জমিদারী কিনবে। পাকা করবে ব্যবসা। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী নামে জমিদারী কোম্পানীও হচ্ছে।

বীরেশ্বর আবার আপন মনে যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলেন—জন রবিনসন জমিদার হবে ?

ঘোষাল বললেন—কথা চলছে আমি দেখে এসেছি। আমিও লোক পাঠিয়েছিলাম। বলেছি—আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন কথা পাকা করবেন না। তা অবিশ্যি করবেন না শীলেরা। ওঁরা মহাজন, টাকা বোঝেন ; চোটাচুটি হলে দাম বাড়বে, এ জানেন। তুমি না বলো না বাবা। মহিষাদলের মহারাজা দেশের মানুষ ; দেশের মানুষের সঙ্গে পারা যায়, পারা যাবে। আর এই লালমুখোরা যদি মহারাজার জায়গায় চেপে বসে তবে কীর্তিহাটে আমাদের ইজ্জত বাঁচিয়ে বাস করা দায় হবে।

বীরেশ্বর বললেন—হুঁ।

ঘোষাল বললেন—তোমার উপর জন সাহেব এখন খুব গরম। কি হয়েছিল বাঘ শিকারে গিয়ে সে জান তোমরা। তবে দেশে রটেছে, জন সাহেব বাঘ মারতে গিয়ে বাঘের হাঁকে ভিরমী খেয়ে পড়ে গিয়েছিল, তুমি বাঘ মেরে তাকে বাঁচিয়েছ। লোকে এই নিয়ে জন সাহেবের নামে ছড়া বেঁধেছে—"মামী মারলে হাঁক, জন বললে বাপ। পেণ্টুল গেল ভিজে ; রায় মারলে মামীকে বললে খোপা বামীকে, সায়েবের পেণ্টুলটা সোটার জলে সিজে।" হেসে ফেললেন ঘোষাল, বললেন—বাঘকে তো গাঁওগাঁওলার লোকজনে মামা বলে! তা সেটা নাকি বাঘিনী ছিল, তাই বলে মামী। সাহেব মেদিনীপুর গিয়েছিল, সেখানেও খবর রটেছে। কারা নাকি চেঁচিয়ে বলেছে, মামী, বেটা এসেছে গো। ও মামী! জন সাহেব তাকে মারতে গিয়েছিল। সে এক কাণ্ড। তা সব রাগ গিয়ে পড়েছে তোমার ওপর। জমিদারী কিনে ঝগড়াঝাঁটি করবারই যে মতলব সায়েবের তাতে কোন সন্দেহ নাই। সায়েব যদি ওই জমিদারী কেনে, তবে শেষ পর্যন্ত কীর্তিহাট রক্ষা করা দায় হবে। রাঘব বোয়াল নয়, ওরা কুমীর।

দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে ঘোষাল বললেন—শুনি রাণীভবানী বলেছিলেন পলাশীর আগে যে খাল কেটে কুমীর এনো না। তা তিনি তো সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশ ছিলেন, তাঁর বাক্যি কি মিথ্যে হয় ? এ বাবা কুমীরকে ঢুকতে দেওয়া হবে!

বীরেশ্বর বললেন—ভেবে দেখি।

ঠিক এই সময়ে হাত আড়াই লম্বা দেওয়াল-ঘড়িতে মিষ্টি আওয়াজে ঘণ্টা বাজতে লাগল। ঘড়ির দিকে তাকালেন বীরেশ্বর। সাতটা বাজছে। ঘরে ঘরে আলো জেলে দিচ্ছে চাকরেরা। বড় একটা আঁকশিতে জড়ানো তেলে ভিজানো ন্যাকড়ায় জ্বালা আগুন—দেওয়ালগিরি—ঝাড়লণ্ঠনের মোমবাতিতে ঠেকিয়ে জেলে দিচ্ছে।

মাথার উপর জোড়া টানাপাখা টেনেই চলেছে পাংখাবরদার। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। প্রবল জলঝড়ের পর চমৎকার আবহাওয়া। পাখার হাওয়া আজ না হলেও চলে। মশার উপদ্রবটা এই জ্যৈষ্ঠের দশ-পনের দিন প্রচণ্ড কাঠফাটা রৌদ্রে মরে গেছে। যে কটা ছিল, তা আজকের জলঝড়ে গেল। তবে আজ পোকার উপদ্রব এরই মধ্যে থেকে শুরু হয়েছে। পাখাগজানো উই আর ডেয়ো পিঁপড়ে এরই মধ্যে আলোর ছটা পেয়ে ঘরে ঢুকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বীরেশ্বর তাকিয়ে পোকা ওড়া দেখছিলেন। ঘোষাল বললেন—তা হলে আমি এখন নিচে গিয়ে জিরুই। কিন্তু কালই আমাকে ফিরতে হবে। শীলদের বলে এসেছি, তিন-চার দিনের মধ্যেই খবর দোব।

যেতে যেতে দরজার মুখে ফিরে দাঁড়ালেন ঘোষাল। বললেন—ভালো ক'রে ভেবে দেখো বাবা। তামাম হিন্দুস্থানটা এই বেটা বড়লাট ডালহৌসি কেমন ক'রে খেয়ে ফেললে তা ভেবে দেখো। এরপর এই চুনোপুঁটি সাহেবগুলানও এমনি করে তামাম জমিদারী গিলবে, এ আমি বলে দিলাম বাবা।

বীরেশ্বর রায় দাঁড়িয়েই রইলেন। অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। মন একবার বলছে—কিনে ফেল মহিষাদলের জমিদারী। বাবু বীরেশ্বর রায় থেকে রাজা বীরেশ্বর রায় হও। দুর্দান্ত গৌরবে বেঁচে থেকে ভোগ ক'রে নাও। যত পার! টাকা আছে, ভোগে বাধা নেই, ভোগ তোমার পায়ের তলায় গড়াচ্ছে; হীরা-জহরৎ, বড় বড় ঘোড়া, ভাল ভাল গাড়ী, মদ, মেয়ে-মানুষ সবই হতে পারে টাকায়। ইংরেজ বেশ্যা এসেছে, হোটেলে থাকে তারা। টাকা ফেললে তাদেরও পাওয়া যায়। কিন্তু হাজার হাজার লোকের সেলাম প্রণাম এ পাওয়া যায় না টাকায়। এই সেলাম প্রণামের সুখ ওসব সুখের চেয়েও বড় সুখ।

কিনে ফেল। ওতে আর দ্বিধা ক'র না। রাজা—না—মহারাজ বীরেশ্বর রায় বাহাদুর অব কীর্তিহাট! লাটসাহেবের দরবারে নিমন্ত্রণ পেতে ওকালতি তদ্বির করতে হবে না। লাটের খাতা আছে, যাদের নিমন্ত্রণ করতে হবে তার তালিকা আছে তাতে। তাতে মহারাজা অব কীর্তিহাটের নাম উঠে যাবে।

বীরেশ্বর রায় বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

সামনে পুবদিকের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে। আজ স্নানযাত্রা গেল। আজ পূর্ণিমা। বিকেলের সে রাশি রাশি জমাট কালো মেঘের অবশেষ আর কয়েক টুকরো মাত্র জলে-ধোয়া আকাশে ভেসে যাচ্ছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। পুবদিকে সোনালী রঙের পূর্ণ চাঁদ একখানা বড় সোনার থালার মত নতুন বড়াশড়কের ওপাশে—ডিহি শেয়ালদহ আর ডিহি এণ্টালীর সীমানার ওপাশে—ধীরে ধীরে আকাশে উপরে উঠছে। অকস্মাৎ তিনি অধীর অস্থির হয়ে উঠলেন। পূর্ণিমা তাঁর কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ভবানীকে বিবাহ করে তিনি কলকাতার এই বাড়ীতে এসে উঠেছিলেন এমনি পূর্ণিমার দিনে। সেদিন ফুলশয্যার কথা। কিন্তু হয় নি, হয়েছিল পরের দিন। কারণ উদ্যোগ হয়ে ওঠে নি। তবে বাড়ীর মেয়েরা একটা আনন্দের আসর বসিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেচে বিয়ে করেছে, সে নিয়ে মেয়েমহলে তো বিস্ময়ের শেষ ছিল না। শুধু মেয়েমহলেই বা কেন, পুরুষদের মধ্যে বন্ধুবান্ধব যারাই শুনেছিল, তারাই বিস্ময়প্রকাশ করেছিল। এ নিয়ে কথা হয়েছিল অনেক। মেয়েরা বীরেশ্বর রায়কে ধরেছিল আমরা বউয়ের গান শুনব। বন্ধুবান্ধবেরা বলেছিল—কি বীরেশ্বর,

তুমি নাকি কিন্নরী বিয়ে করে এনেছ? কিন্তু গান শোনাও!

বীরেশ্বর, তখন নবীন তরুণ বীরেশ্বর, পত্নীগৌরবে এবং আনন্দে পরিপূর্ণ; তিনিও মনে মনে চাচ্ছিলেন শোনাতে কিন্তু সে তো তিনি নিজে পারেন না। বাবা যে বর্তমান।

বলেছিলেন—তা আমাকে বললে কি হবে? বাবাকে বল!

সোমেশ্বর রায়কেই বা কে বলবে? বলেছিলেন তাঁর সম্পর্কীয়া এক ভগ্নী। রাজকুমারী কাত্যায়নীর আমল থেকেই এ বাড়ীর পোষ্য। কাত্যায়নীর মোসায়েবা করতেন। তাঁর পর বাড়ীর গৃহিণীর দায়দায়িত্ব তিনিই চালান। তিনি এসে সোমেশ্বরকে বলেছিলেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বিমলাকে, মুখপাত করে।

সোমেশ্বর ভাবিত হয়েছিলেন—রায়বংশ জমিদারবংশ, সেই বাড়ীর বউ গান শোনাবে, সেটা কি রকম হবে? জামাই বিমলাকান্তকে ডেকে পরামর্শ করেছিলেন, তাই তো গো বাবাজী, এ কি ক'রে হয়? মানে রায়বংশের বউ গান না হয় গাইতে পারে, কিন্তু সে গান দশজনকে শোনাবে, কি ক'রে হয়? সেটা কি উচিত হবে?

বিমলাকান্তের নিজেরও কৌতূহলের সীমা ছিল না। সঙ্গীতজ্ঞ বাপের ছেলে সে, উত্তরাধিকারসূত্রে সঙ্গীতে দখল তার জন্মগত কিন্তু এ চর্চা সে ইচ্ছে করেই করেনি। তার মাতামহ বারণ করে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ও যেন বিমলাকান্ত না শেখে।

মাতামহের মৃত্যুর সময় বিমলাকান্ত ছোট ছিলেন। মাতামহী কথাটা তাকে প্রায় দুবেলাই বলতেন। গানের জ্ঞান নিয়ে যে জন্মায়—অনুরাগও তার জ্ঞানের সঙ্গে সহজাত। ছোট বিমলাকান্ত পুজোর সময় ঢাক বাজলেই দুটো কাঠি নিয়ে টিন বা কাঠ বাজাতে শুরু করতেন। কখনও একলা থাকলেই যা কিছু হোক নিয়ে তার উপর আঙুল দিয়ে শব্দ তুলে বাজনা বাজাতেন। কখনও গান ভাঁজতেন। মাতামহীর চোখে পড়লেই বলতেন—ও করতে নেই ভাই। ও করো না। ওতেই তোমার মায়ের কপাল তোমার কপাল খেয়েছে। বাপ বাউণ্ডুলে হয়ে চলে গেল। ও আর তুমি করো না।

একটু বড় হলে—অর্থাৎ সাত আট বছর থেকেই তিনি প্রশ্ন করতেন—কেন দিদিমা?

দিদিমা তাঁর বাপের কথা বলতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, তোমার দাদামশাই আমাকে বলে গিয়েচেন—দেখো গিন্নি, বিমল যেন ও পথ না ধরে। ওই পথকেই আমার ভয়। ও ধরলে আর কিছু হবে না। ও হল মদ ওর কাছে। বুঝেছ!

কথাটা শুনে শুনে তাঁর মনের মধ্যে গান সম্বন্ধে একটা আতঙ্কের মত কিছু জন্মে গিয়েছিল। গান শুনলেই তাঁর মন যেন বাতাসের বেগে আগুনের মত ছুটতে চাইত। কিন্তু মনকে তিনি নির্বাপিত আগুনের মত ক'রে হিম হয়ে বসে থাকতেন। এ আগুন নেভে না—ক্রমে ক্রমে বাতাসে আঙরার আগুনের মত ঝিকমিক করে উঠত, কিন্তু ইন্ধন তিনি যোগাতেন না। শ্বশুর সোমেশ্বর রায় ওস্তাদ রেখেছিলেন—বীরেশ্বর গান শিখতেন, কিন্তু বিমলাকান্ত বলতেন, না। ও আমার দিদিমার নিষেধ আছে। মধ্যে মধ্যে বড় ওস্তাদ এলে সে আসরের একপাশে বসে গান শুনতেন। বেশী ভাল লাগলে কয়েক দিন খুব উন্মনা হয়ে যেতেন। কিন্তু বীরেশ্বর বিয়ে ক'রে এনেছে—মেয়ের গান শুনে—এই কথা শুনে তাঁরও কৌতূহলের অন্ত ছিল না। শুনবার জন্যে তাঁরও প্রবল আগ্রহ হয়েছিল। মনেও সেদিন আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছিল। বীরেশ্বর তাঁর শ্যালক, সে বিবাহ করেছে। শ্যালকের বিবাহ! তা ছাড়াও বীরেশ্বর তাঁকে চালকলা-বাঁধা ভটচাজ বামুনের ছেলে,—ভীরু-শান্ত বলে যতই অবজ্ঞা করুন—বিমলাকান্ত তা করতেন না। তিনি বয়সে সম্পর্কে বড় ছিলেন, স্নেহ করতেন। কিন্তু শান্ত অথচ গম্ভীর

চরিত্রের জন্য তাঁর সঙ্গে উল্লাসে হুল্লোড়ে মাততে পারতেন না। কিন্তু বিবাহের একটা রঙ আছে। যে রঙ শুধু বর-কনের মনেই লাগে না—পরিবারের পাড়ার আত্মীয়স্বজন সকল জনেরই মনকে রাঙিয়ে দেয় হোলির আবীরের মত।

বউটিকেও বড় ভাল লেগেছিল বিমলাকান্তের। গৌরী নয়, কিন্তু শ্যামবর্ণ রঙে মেয়েটি অপরূপ দেখতে। বার বার বলেছিলেন—ভারী ভাল বউ হয়েছে। ভারী ভাল। বীরা ভাই, তুমি জহুরী বটে। একেবারে খনি থেকে মণি—সমুদ্রে ডুবে মুক্তা খুঁজে বের করেছ। তারপর গানের কথা যা শুনলাম—মানে বীরাবাবু, তুমি মুগ্ধ হয়েছ যে গাইন—সে গান সে গলা যে কি তা অন্যে না বুঝুক আমি বুঝছি।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—জামাইবাবু, আপনাকে তা হ'লে গোপনে একটা কথা বলি!

তখনকার কালে ভগ্নীপতিকে উপাধি ধরে তাতে মশাই যোগ ক'রে সম্বোধনের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু ভট্চাজ মশাই কথাটা জমিদারপুত্র-ইংরিজীনবীশ বীরেশ্বর রায়ের কানে বড় কটু ঠেকত—মনে হ'ত বুঝি পুরুত বা পূজুরী বামুনকে ডাকছে। তাই বীরেশ্বর রায় ভগ্নীপতিকে জামাইবাবু বলতেন। জামাইবাবু বা ভগ্নীপতিকে দাদা বলার রেওয়াজ তখন ওঠেনি। তিনি সেদিন বিমলাকান্তকে বাসরঘরে গানের পালায় তাঁর নিজের গানে কালাকে 'ক্লা' করে মান বাঁচানোর কথাটা বলে বলেছিলেন—একটা মজার ব্যাপার জামাইবাবু, কখন যে ও বাজনার তুনের মধ্যে আমার ভুল করিয়ে দিলে, আমি বুঝতেই পারিনি, ঠিক তেহাইয়ের কাছ বরাবর এসে আমাকে সাবধান ক'রে দিলে হুঁ বলে একটা ইসারা দিয়ে, আমি ভাবলাম গেলাম। কিন্তু চট্ করে কালাকে 'ক্লা' ক'রে খাটিয়ে মেরে দিলাম। তা—কি সহবৎ ওর। বললে না যে ভুল আমার হল। বললে, ও নিজে হেরেছে।

বিমলাকান্ত অবাক হয়ে বলেছিলেন—বল কি?

—এক বিন্দু বাড়িয়ে বলিনি! একদিন ঘর বন্ধ করে গান শুনবেন। দেখবেন।

তখন বাড়ীতে গান শোনার আগ্রহ পূর্ণিমার কোটালের বানের মত ডাক শুরু করে জাগতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা বীরেশ্বরের এলাকা পার হয়ে সোমেশ্বরের দরবারে এসে আছড়ে পড়েছে।

শ্বশুরেরও ইচ্ছে ছিল শুনতে। ঘরের বাইরে বা পাশের ঘরে বসে বউমার গান শুনবেন। কি এমন গায় যাতে তাঁর মদমত্ত হাতীর মত ছেলে বীরা একেবারে মোহিত হয়ে পড়ল। পুরোহিত রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থ খবরটা শুনে হেসে বলেছিলেন—রায় মশায়, সংস্কৃত কাব্যে মদমত্ত অরণ্য কুঞ্জর বশীভূত করা এক বাঁশীর কথা শুনেছি। বধূটির কণ্ঠে তা হ'লে সেই বংশীধ্বনি বাজে। শ্রীমান বীরেশ্বর তো আমাদের মদস্রাবী-দিকহস্তী গো। সোমেশ্বর হেসেছিলেন।

বাড়ীর মেয়েদের আবদার শুনে তাঁর সে ইচ্ছে প্রবল হয়েছিল,—তবুও বিমলাকান্তকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তাই তো বাবাজী, এটা কি ঠিক হবে?

সব থেকে সমীহ ছিল তাঁর এই জামাইটিকে। যে ছেলে একালে—যেকালে তান্ত্রিকেরা লতাসাধন করেন—ভৈরবী নিয়ে ঘোরেন, গৃহস্থদের রক্ষিতা থাকে, জমিদার ধনীদের বাঈজী থাকে—নাচগান জানা সেবাদাসী রাখলে শ্বশুরবাড়ীর রাজ-ঐশ্বর্য ছেড়ে পালায়, তাকে সমীহ না করে উপায় কি?

বিমলাকান্তও এক নিশ্বাসে সম্মতি দিতে পারেন নি—চক্ষুলজ্জা হয়েছিল। বলেছিলেন—হ্যাঁ, তা—।

—ওই তো! মানে রায়বাড়ীর নতুন বউ গান শোনাবে—!

বিমলাকান্ত বলেছিলেন—অনুমতি করেন তো বলি।

—বল। জিজ্ঞাসাই তো করছি!

—দেখুন, রায়বাড়ীর বউয়ের মুখও তো আজকে ছাড়া কাল বা পরশু থেকে বাইরের লোক দেখতে পাবে না। কিন্তু আজ তারপর কাল ফুলশয্যা লোকজন আসবেন, বউয়ের মুখ আজ কাল তো সবাই দেখবেন। তা—বউ গান জানেন—গান শুনে বীরেশ্বরভায়া বিবাহ করেছেন—এ ক্ষেত্রে বউ যদি আজ বাছাবাছি আপনারজনের মধ্যে গান শোনান, তাতে দোষের কিছু হবে বলে তো মনে হয় না!

সোমেশ্বর জামাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—চমৎকার বলেছ। তুমি চমৎকার বলেছ। হাঁ, তা হ'লে গাইতে পারেন। নিশ্চয় গাইতে পারেন। তোমরা ব্যবস্থা কর। তবে বাছাবাছা আপনার লোক। অন্দরের দরজা বন্ধ থাকবে। বাইরের লোকজন চলে যাবার পর। বুঝেছ, দোতলায় হলঘরে—আসর করে গান শুনতে পার!

সেদিনও ছিল পূর্ণিমা তিথি।

ভবানী গান গেয়ে শুনিয়েছিল। বীরেশ্বর তানপুরা ধরিয়েছিলেন বিমলাকান্তকে। বলেছিলেন—উঁহু, আজ না বললে শুনব না।

নিজে তবলায় সঙ্গত করেছিলেন। বরাত করেছিলেন ভবানীকে, তুমি সেই গৌরী লউটি যায়ে, রোয়ে রোয়ে—, সেই গানটা গাও!

তাই গেয়েছিল ভবানী।

এই বারান্দায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পড়েছিল।

বীরেশ্বর রায় আজও পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে অধীর অস্থির হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি এসে ঘরে ঢুকে তিনি চাকরকে ডেকে বললেন—হুইস্কী নিয়ে আয়।

## ৫

কি হবে তাঁর রাজত্বে? কে ভোগ করবে তাঁর রাজত্ব? রাজত্ব কি মানুষ নিজের জন্যে অর্জন করে? বংশের জন্য করে। না খেয়ে তিল তিল করে সঞ্চয় ক'রে রেখে যায় তাঁর বংশধরেরা ভোগ করবে বলে।

তাঁর রাজত্ব ভোগ করবে কমলাকান্ত?

না। তা হবে না। তা দেবেন না তিনি।

লোকে তাঁকে বলে—বিবাহ কর্। কি হয়েছে, স্ত্রী জলে ডুবে মরেছে। মরেছে? ভবানী মরেছে? যা হয়েছে তাই হয়েছে। বিবাহ তিনি আর করবেন না। না। ও মেয়েজাত, ও জাতকে নিয়ে বেদের সাপ নিয়ে খেলার মত খেলতে হয়। গলায় পরতে নেই। সে বিষদাঁত ভেঙে বিষের থলি গেলেও না। ওরা পাক্ কষতে পারে। তোমাকে শ্বাসরোধ করে মেরে দেবে!

তার থেকে তিনি কুড়ারাম রায়ের বহুকষ্টে সঞ্চিত অর্থ, যা সোমেশ্বর বাড়িয়েছেন, তাঁর আমলেও বাড়ছে তা তিনি ভোগ ক'রে সব শেষ ক'রে দিয়ে যাবেন।

শুধু—শুধু ওই জনি। জন রবিনসন। প্রশ্ন ওই বেটা ইংরেজবাচ্চা। চার্লস রবিনসন

ইংল্যাণ্ডে মোট বইত মাথায় করে। এখানে এসেছিল কোম্পানীর পল্টনে চাকরি নিয়ে। তারপর পল্টনে চাকরির মেয়াদ ফুরুলে লাটসাহেব ওয়েলেসলীর চাকরিতে ঢুকেছিল একরকম চাকরের কাজ নিয়ে। সেখানে থাকতেই ইংল্যাণ্ড থেকে আসা একটা মেমসাহেবকে বিয়ে করেছিল। তার দৌলতেই হয়েছিল মেদিনীপুরে নুনের ট্যাক্স আদায়কারী। তাঁর বাবার সঙ্গে আলাপ সেই সময়ে। তাঁর বাবাই তাকে টাকা দিয়ে খালাড়ী ইজারা নিয়ে নুনের কারবারে নামিয়েছিলেন। তারপর নুন থেকে রবিনসনের মাথায় ঢুকল নীলকুঠী। সোমেশ্বর রায়কে বলেছিল—রায়, নুনের কারবার থেকে নীলের কারবারে অনেক বেশী লাভ। নুনের লাভ তো কোম্পানী চুষে নেয়। তার থেকে নীলে নামো। সোমেশ্বর হিসেব ক'রে বুঝে নীলের কারবারেই টাকা লগ্নী করেছিলেন। ইংরেজ জাত, মিথ্যে বলেন নি নায়েব ঘোষাল, ওরা যাই করে থাক এ দেশের, এ দেশের লোককে কিছু করতে দেয় না, দেবে না। নীলকুঠীর ব্যবসা সাহেবদের একচেটে। ও বেটারা খুন করছে, ডাকাতি করছে, লোককে বেঁধে মারছে, মেয়েদের ইজ্জত মারছে, কিন্তু ওদের সব মাফ। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কালেকটার, ওপরের কর্মচারীরা শিকার করতে আসে, নীলকুঠীতে ওঠে। গোগ্রাসে খায়, মদ গেলে, কুঠীওয়ালাদের মেয়ে বউ নিয়ে হুল্লোড় করে, ওদের ঘোড়া হাতী নিয়ে শিকার করে—বাস; আর কি চাই? চালাও পান্সী!

কিছুদিন আগে ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে লিখেছিলেন—'যে সকল সাহেব যখন এ দেশে আইসেন, তখন তাঁহাদিগের ঐশ্বর্যের কথা কি বলিব, এক ছেঁড়া টুপি পচা কাপড়ের প্যাকেট পাণ্টলন এবং এক কাচের টম্বল সম্বল মাত্র, কৌশলক্রমে কোন ব্যবসা ফাঁদিয়া বাবু কাড়িতে পারিলেই কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার আর আধিপত্যের সীমা থাকে না, তখন প্রকৃত এক কৃষ্ণ বিষ্ণুব মধ্যে হইয়া উঠেন।···আমরা কি মূর্খ আর সাহেবরা কি চতুর, আমারদিগের টাকায় ও আমারদিগের পরিশ্রমে সৌভাগ্য করিয়া, আবার কথায় কথায় আমাদিগ্যেই রাস্কেল বলে, ঘুষি মারে, চক্ষু রাঙ্গায়, যখন কিছু থাকে না, তখন কত তোষামদ করে, পরে হৃষ্টপুষ্ট হইলেই "ডেম, বগর লায়ার বেঙ্গলিস' ভিন্ন কোন কথা শোনা যায় না···!"

ঠিক লিখেছেন ঈশ্বর গুপ্ত। সোমেশ্বর রায়ের টাকায় চার্লস রবিনসন—লাটসাহেবের খানসামা রবিনসন কুঠীয়াল সাহেব হয়েছিল। আজও বীরেশ্বর রায়ের টাকা খাটে জন রবিনসনের কুঠীতে। সেই জন—জনির মেজাজ গরম হয়েছে। বাঘিনীর পেটে যাচ্ছিল, বাঁচিয়েছিল বীরেশ্বর রায়, সেই তার অপরাধ! তার জন্যে লোকে তাকে ব্যঙ্গ করে। করবেই। এবং তার জন্য তার রাগ হবে বীরেশ্বর রায়ের উপর। তাও হবে। হিতোপদেশের ইন্দুরছানাকে যে ঋষি বর দিয়ে বাঘ করে তাকে ইন্দুর-বাঘ খেতে যাবেই। এই নিয়ম!

মহিষাদলের সম্পত্তি কিনবে জন, জনি। লাটসাহেবের খানসামা চার্লস সাহেবের ব্যাটা।

আর এক গ্লাস হুইস্কি ঢেলে খেলেন বীরেশ্বর রায়।

না—তা হতে দেবেন না! জনিকে বাড়তে দেবেন না। না।

নিচে পাল্কীর বেহারার হাঁক উঠল। একটু নড়ে-চ'ড়ে বসলেন বীরেশ্বর রায়। কে এল? সম্ভবতঃ সোফিয়া! আজকের ঝড়বৃষ্টিতে কলকাতার রাস্তা কাদা জলে ভরে গেছে। গাড়ী যায় নি। পাল্কী গেছে।

কলকাতায় বাড়ীর ট্যাক্স গাড়ীর ট্যাক্স নিয়ে ইংরেজপাড়া পরিষ্কার হচ্ছে। ধোয়া

পড়ছে। আলো জ্বলছে। আর নেটিব পাড়া কাদা খানা খন্দকে ভর্তি, অন্ধকারে ঢেকে আছে।

সোফিয়া এসে ঘরে ঢুকে সেলাম করলে—বন্দেগী মেরি মালিক, রাজাসাহেব খোদাবন্দ!

—এস—এস।

—ক্যা, বাঁদীকে দেরী হুয়া? আপ খুদ নিজু হাঁত সে সিরাজী লিকে পিতে হেঁ? লেকেন আভি তো আট নেহি বাজা হ্যায় মালেক!

হেসে রায় বললেন—না—না। বেশ ঠাণ্ডা করেছে।

—হাঁ—হাঁ—হাঁ—আত তো বহুত মৌজকে রাত হ্যায়। কিন্তু আমি কি করে মালিক! এই জল ঝড় রাস্তায় গর্দা পানি, আপনার সওয়ারী গেল, তবে তো বের হতে পারলাম!

বসল সোফিয়া একটা স্বতন্ত্র আসনে। হাতের পাখা, জর্দার কৌটো রেখে এগিয়ে এল রায়ের কাছে এবং গেলাস বাঁ হাতে ধ'রে বোতল তুলে ঢেলে গেলাস এগিয়ে দিয়ে বললে—পিজিয়ে মেরি মালেক!

তারপর বললে—আজ কি জমকদার কালো মেঘের তুফান উঠেছিল মালেক, দেখেছ?

রায় বললেন—দেখেছি। কিন্তু তুমি জান আজকের এই জমকদার মেঘের তুফান এক ফকীর মিয়া-কি-মল্লার গেয়ে নিয়ে এসেছে।

সবিস্ময়ে সোফিয়া বললে—বল কি মালেক! সাচ বাত্?

—বিলকুল সাচ সোফিয়া। নিজ আঁখ সে ম্যয় দেখা···

—হাঁ! বিস্ময়ে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

রায় বললেন—এই বাড়ীতে সোফিয়া। এই বাগানে বসে সে মল্লার ভাঁজলে। মেঘ তখন ওই কোণে জেরা সে। তারপর ও গাইতে লাগল আর হু-হু ক'রে ছুটে এল মেঘ, ফুলে ফুলে, হাজারো কালো মর্দানা হাঁতিকে মাফিক! আমি তার সঙ্গে তানপুরা বাজিয়েছি। খুব ভাগ্যি যে আমি তার গান থামিয়ে জোর ক'রে তাকে ঘরে টেনে এনেছিলাম, না হলে বিজলী গিরতো ওই ফকীরের উপর।

—উ ফকীর? কাঁহা গয়া উ? চলা গয়া?

—নেহি। মওজুদ হ্যায়। তুমারই লিয়ে ময়নে উনকে মওজুদ রাখ্যা হুঁ!

—হাঁ?

—হাঁ! সেইজন্যে ব্যস্ত হয়েছিলাম তোমার জন্যে। তোমাকে দেখাব। ফকীরকে বলব কি—ফকীর মেরি সোফিয়াকে তুমি কিছু শিখিয়ে দাও। তোমার খানাপিনা গাঁজাভাঙ যা লাগবে সব বন্দোবস্ত করব আমি। আমি নিজেও শিখব।

—সে বহুত আচ্ছা হবে মালিক। বহুত আচ্ছা হবে। আমীর তোমার মেহেরবাণীর আর কিনারা নেই। আমি তোমার বাঁদী হয়ে থাকব।

রায় হেসে চাকরকে ডাকলেন—জলা!

জলা—জলধর, রায়ের খাস চাকর। সে এসে দাঁড়াল। রায় বললেন—সেই পাগল কি করছে দেখ। ডেকে আন—বল আমি ডাকছি। বুঝলি!

জলধর ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

রায় বললেন—দাও, আরও ঢাল।

—আরও খাবে মালিক? এত বড় ফকীর আসছে—মেজাজ তো তোমার ঠিক রাখতে হবে।

—মেজাজ ঠিক থাকবে সোফিয়া। ও ভাবনা তুমি ভেবো না! দাও!

সোফিয়া ঢালতে লাগল। রায় হেঁকে বললেন—তবলচী সারেঙ্গীদারকে পাঠিয়ে দে, কে আছিস!

তবলচী সারেঙ্গীদার বাইরে বসেছিল, বিনা হুকুমে তাদের ঢুকবার নিয়ম নেই। তারা এসে সেলাম বাজিয়ে ফরাসের উপর বসল। তবলা বাঁয়া পাখোয়াজ তানপুরা সারেঙ্গী সব নামিয়ে বাঁধতে বসল।

হঠাৎ একটা ভয়ার্ত চীৎকারে ঘরখানা চমকে উঠল। রায়ও চমকে উঠলেন—দেখলেন—পাগল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চীৎকার করছে এবং ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপছে।

রায় উঠে গিয়ে পাগলের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকি দিয়ে বললেন—এই! এই! এই পাগল—এই!—কি হ'ল? এই!

—না—না—না—ঃ আর ভয় দেখিয়ো না। না—। আমি পালাচ্ছি। আমি পালাচ্ছি।

ব'লে মুহূর্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একরকম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল। অবাক হয়ে গেলেন বীরেশ্বর। পাগলের চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। সে নিচের বারান্দা—সেখান থেকে নেমে বাগানের মধ্যে দিয়ে ফটক পার হয়ে বেরিয়ে চলে গেল!

* * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, বীরেশ্বর রায়ের ওই চামড়ায় বাঁধানো খাতার মধ্যে বিবরণটি আছে। এরপর তিনি কয়েকদিনই ওই ময়দানে ঘুরেছেন ওই পাগলের সন্ধানে। কিন্তু তাকে পান নি। কেউ বলতে পারে নি। রায় তাঁর খাতাতে লিখেছেন—হি ইজ এ মিস্টিরিয়াস ম্যান। আই ডু নট বিলিভ ইন দিজ থিংস স্টিল আই ক্যান নট ডিনাই হিম। নো—আই ক্যান নট! বাট্‌ হোয়াট ইজ ইট দ্যাট মেড হিম সো মাচ এ্যাফ্রেড? সোফিয়া ওয়াজ নার্ভাস, শকড। শী থট দ্যাট দি ক্রেজী ফকীর ক্রায়েড ইন কণ্টেম্পট লাইক দ্যাট টু সী হার। নো; হি ডিড নট লুক এ্যাট হার এ্যাট অল। হি ওয়াজ লুকিং স্ট্রেট এ্যাট দি ওয়াল। হোয়াট ইজ ইট হি স দেয়ার।

(He is a mysterious man. I do not believe in these things, still I cannot deny him. No, I cannot. But what is it that made him so much afraid? Sofia was nervous, shocked. She thought that the Crazy Fakir cried in contempt like that to see her. No, he did not look at her at all. He was looking straight at the wall. What is it he saw there.)

সোফিয়া সেদিন অভিশাপগ্রস্ত পুরাকালের কোন কন্যার মত প্রাণহীন হয়ে গিয়েছিল। কয়েকবারই সে বীরেশ্বর রায়কে বলেছিল—হামারা কেয়া হোগা মেরা মালেক? এ কেয়া হো গয়া?

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—কুছ নেহি হুয়া। ডরো মৎ।

সোফিয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। তার বিশ্বাস হয়েছিল, ফকীর তাকে অভিশাপ দিয়ে গেলেন। সে অভিশাপে না হতে পারে এমন কিছু নেই দুনিয়ায়। তার রূপ তার যৌবন তার জীবন সবই ঝরে যাবে গলে যাবে, অকালেই শুকিয়ে যাবে হয়তো।

বীরেশ্বর রায় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—কিছু ভয় করো না, ওসবে কিছু হয় না। তার প্রমাণ তো দেখেছ। ওই তো ভবানীকে বলত ওর ওপর দেবতার দয়া আছে। জন্ম থেকে গানে সিদ্ধি তারই ফল। সব ঝুট। ওই তো তার ছবি ওই দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি ইচ্ছে ক'রে। তার ছবিকে সামনে রেখে তোমার সঙ্গে মহব্বতি করি, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? কিছু হয়নি।

সোফিয়া দেওয়ালের দিকে তাকালে। দেওয়ালে ভবানীর একখানা অয়েল পেন্টিং ঝুলছে। সদ্য বিবাহের পরই শখ করে বীরেশ্বর রায় ওই অয়েল পেন্টিংখানা আঁকিয়েছিলেন সাহেব শিল্পীকে দিয়ে।

কঠোর নিষ্ঠুর বীরেশ্বর রায় ছবিখানা ইচ্ছে ক'রে এই ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন।

সোফিয়া এতে খুশী হয়েছিল। ভবানী যে বিয়ের আসর থেকে তার গানের মাঝখানে বীরেশ্বরকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার জন্য মনে তার ক্ষোভ এবং ক্ষত ছিল। মধ্যে মধ্যে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে সে মুখ টিপে হাসত। আজ ছবিখানার দিকে তাকিয়ে সে বললে—জনাব, হুজুর, মেরা মালেক, ওই তসবীরখানা তুমি সরাও। দোহাই তোমার। আমার মালুম হচ্ছে কি—ঠোঁট দুটো তার কাঁপতে লাগল। অনেক কষ্টে সে-কান্না সামলে সে বললে—ওই ওরই গোস্সায় আজ এই হয়ে গেল। দেখ তুমি, ওর চোখ যেন জ্বলছে।

—জ্বলছে? কোথায়?

বীরেশ্বর রায় ছবির দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন—কই, কোথায় চোখ জ্বলছে?

—তুমি দেখ মালিক, ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখ।

—দেখা হ্যায় সোফিয়া। নেহি! উ তো রোতি হ্যায়!

বীরেশ্বরের মনে হয়েছিল ভবানীর ছবির চোখ সজল, ছল-ছল করছে। টলটলে হয়ে চোখের কোলে কোলে জমে রয়েছে। এখুনি বুঝি ঝ'রে পড়বে।

কিন্তু সোফিয়ার তা মনে হয়নি।

দুজনেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। সারেঙ্গীদার তবলচী এরা ব্যাপার দেখে সন্তর্পণে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে থাকতে তাদের অস্বস্তিও হয়েছিল, ভয়ও পেয়েছিল তারা। তাদের দুটো ভয়—একটা ভয় ওই ফকীরের রোষ সোফিয়ার সঙ্গী হিসেবে তাদের উপরেও পড়েছে। আর একটা ভয় বীরেশ্বর রায়ের মেজাজের ভয়। কখন মেজাজ বিগড়ে রায় হুজুর খাপ্পা হয়ে উঠে বলবেন—বেতমিজ বেয়াদপ কাঁহাকা, সহবৎ জান না, তরিবৎ জান না? কেন, কেন এখানে বসে আছ? কেন? তারপরই হয়তো হাঁকবে—চাবুক—।

কিছুক্ষণ পর সোফিয়া বলেছিল—হুজুর মালিক!

ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেই রায় বলেছিলেন—কি?

—বাঁদীকে আজ ছুট্টি মিলবার হুকুম হোক মালিক! আজ আমার শরীর মন কেমন হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে হয়তো আমি ম'রে যাব!

তার চোখ থেকে জল গড়াচ্ছিল।

তার দিকে এবার তাকিয়ে দেখলেন রায়, তারপর বললেন—যাও। আজ তোমার ছুটি। কাল ছবিটা আমি খুলেই দেব।

সোফিয়া সেলাম ক'রে চলে গেল। রায় চাকরকে বললেন—ও বাড়ী যাবে, কাহারদের বল পাল্কী ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসবে। সঙ্গে যেন বরকন্দাজ যায়।

তিনি বসে রইলেন ভবানীর ছবির দিকে তাকিয়ে। বললেন—অন্তত নরকে স্থান তোমার। মুক্তি তোমার নেই। পাবে না কোন দিন।

তারপর বোতলটা টেনে নিলেন।

কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলেন বারান্দায়, ডাকলেন—জলধর! ওসমানকে ডাক।

ওসমান আসতেই বললেন—গাড়ী জোতো ওসমান। তুরন্ত!

ওসমান সভয়ে বললে—হুজুর!

—কি?

—এতনা রাত—

—কি হয়েছে তাতে? ওই ফকীরকে খুঁজে বের করতেই হবে।

—ও ফকীরকে তো মিলবে না হুজুর মালিক। ওকে তো হাজার ঢুঁড়েও মিলবে না।

—মিলবে না? কেন?

—ও তো হাওয়া হয়ে গেল হুজুর। এই ফটক থেকেই হাওয়া হয়ে গেল। আমি নিজু আঁখ সে দেখেছি।

—তুমি উল্লুক। গিধ্বড়। বেওকুফ কাঁহাকো, আদমী হাওয়া হয়? হতে পারে!

—হম নিজু আঁখসে দেখা হায় হুজুর।

ধমকে উঠলেন রায়—ইয়ে ঝুট হায়! ই কভি নেহি হো সক্তা হায়!

—হোতা হায় মালেক! হামেশা হামেশা হোতা হায়!

—ওসমান!

—মালিক, নোকরি আমি ছেড়ে দিচ্ছি হুজুর। আমি যেতে পারব না। বালবাচ্চা নিয়ে ঘর করি। আমাকে মাফ করুন হুজুর। আজ ও ফকীর গোস্সা হয়ে চলে গেল ফটকের ওপারে, গিয়ে হাওয়া হয়ে চলে গেল, ওর পিছনে গেলে ওকে কখনও মিলবে না। উপরন্তু ফকীরের বেশী গোস্সা হলে বিপদ ঘটে যাবে।

—ঘোড়াতে জিন দিয়ে নিয়ে এস আমি ঘোড়ায় চড়ে যাব।

—হুজুর!

এবার চীৎকার করে উঠলেন বীরেশ্বর। ওসমান সভয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বীরেশ্বর রায় বেরিয়ে গেলেন ময়দানের দিকে।

চৌরিঙ্গীর ওপাশে ময়দানে গোলপাতার জঙ্গলের মধ্যে তখন কোলাহল করে শেয়াল ডাকছে। অন্ধকার ময়দান। আজ বৃষ্টির পর একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। রাস্তায় কাদা। তারই মধ্যে রায় এগিয়ে গেলেন। ডানদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে পড়ে রইল রেসপওেস্তিয়া ওয়াক। ঘোড়াটা ওই দিকটা চেনে। ওই দিকেই যেতে চাচ্ছে। জঙ্গলের দিকে নরম মাটিতে ঘোড়াটা যেতে চাচ্ছে না। বার বার ঘাড় বেঁকাচ্ছে। রায় চাবুকটা দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন ঘোড়াটাকে।

চীৎকার ক'রে ডাকলেন—পাগল! এই পাগল!

ময়দানের গোলপাতার জঙ্গলের উপর দিয়ে কলকাতায় সন্ধ্যার পর যে ঝড়ো হাওয়া বয়, সেই হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। একটা একটানা শব্দ উঠছে সর-সর—সর-সর।

প্রহর ঘোষণা করে শেয়ালেরা স্তব্ধ হয়েছে। বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। ওই উত্তর-পশ্চিম দিকে খানিকটা দূরে লাটসাহেবের বাড়ীর আলো জ্বলছে। বীরেশ্বর রায় ফিরে এলেন। পাগলের কোন সাড়া কোন সন্ধান মিলল না।

সারারাত্রি বীরেশ্বর রায়ের ঘুম হয়নি।

ওইদিনের ঘটনা, যা তিনি স্মরণীয় বলে লিখে রেখেছেন, তার মধ্যে আছে—

For the rest of the night—I lay wide awake and thought over the matter.

৬

পরদিনের ঘটনাও লিখেছিলেন তিনি। ওই ঘটনার জের হিসেবে নয়। সেদিন সারা কলকাতায় একটা চাঞ্চল্য বয়ে গিয়েছিল। খবর রটেছিল—রুশদেশের রণতরী এসেছে বঙ্গোপসাগরে, ঘুরছে; কলকাতায় এসে উপস্থিত হবে যে কোন মুহূর্তে এবং গোলা দেগে ফোর্ট উইলিয়ম উড়িয়ে দিয়ে শহরটাকে লুটে তছনছ ক'রে দিয়ে চলে যাবে।

সকালবেলায়ই উঠেছিলেন বীরেশ্বর রায়। রাত্রে ঘুম হয়নি। চা খেয়ে ফুরসিতে তামাক খাচ্ছিলেন। মাথা ক'ষে আছে। চাকর জলধরকে ডেকে বলেছিলেন—স্নান করব, তেল আন। তেল মাখাবার লোককে ডাক।

তেল মাখাবার জন্যে স্বতন্ত্র লোক আছে। ঘণ্টাখানেক ধরে গা-হাত-পা টিপে তেল মাখাবে; চট-পট শব্দ উঠবে। এ তেল মাখার আরাম আছে—অসুস্থ শরীর সুস্থ হয়। যে তেল মাখায়, সে প্রায় আধা-পালোয়ান—তেল মাখানোর পরিশ্রমে তার শরীরে ঘাম ছুটে যায়। তেল মাখবার সময় সেখানে চাকরবাকর ছাড়া আর কারু যাবার হুকুম নেই। তেলধুতি প'রে তেল মাখা—সে অবস্থাটা প্রায় উলঙ্গ অবস্থা। বীরেশ্বর রায় জলচৌকির উপর ব'সে তামাক খান এবং তেল মাখেন। তেল মাখতে বসবার সময় খানিকটা হুইস্কি খান—তেল মাখা শেষ হলে, স্নানের ঠিক পূর্বে, একবার খান। তার আগে নাপিত ক্ষৌরী করে দেয়। পরামানিক ব্রজলাল—তাঁর বাঁধা মাইনে করা লোক। তেলমাখার সময় সে ব'সে গল্প বলে। একেবারে খাঁটি রূপকথার গল্প। তা ছাড়া বলে খবর। কাজ তার এক দুপুর। হুজুরের ক্ষৌরী—তারপর বাড়ীর লোকজন চাকর-বাকরের চুল কাটা ক্ষৌরী, সে বেলা তিনপ্রহর পর্যন্ত, তারপর তার ছুটি। সেই ছুটির সময় সে গিয়ে শহরের নাপিতমহলে জোটে। সেখান থেকে খবর সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসে।

ব্রজলাল মেদিনীপুরের লোক। বাড়ী তার ঘাটালের কাছে। ঘাটালের বহু লোক, বিশেষ ক'রে মৎস্যজীবীরা, কলকাতায় এসে বাস করছে। ধর্মতলার পুব পাশটায়, যেটা জেলেপাড়া, সেখানে ঘাটালের বহু জেলের বাস। ব্রজলালের এ খবরটা নাপিতমহলের এবং ওই জেলে মহলের—দুই মহলের খবর। নাপিতেরা শুনেছে বড় বড় বাড়ী থেকে। এবং জেলেরা গঙ্গায় মাছ ধরে—সেখান থেকে শুনে এসেছে তারা। কাল জেলেরা প্রহরখানেক বেলা থাকতে জাল গুটিয়ে নৌকো নিয়ে একেবারে গঙ্গা ছেড়ে খালের ভিতর দিয়ে খালে এসে নৌকো বেঁধেছে। তাদের মধ্যে কথা হচ্ছে—আলোচনা চলছে—তারা কলকাতা ছেড়ে পালাবে কি না! কিন্তু ভয় হচ্ছে, ঘাটাল ফিরতে হ'লে গঙ্গার ভাটি ধরে যেতে হবে, ইতিমধ্যে

রুশ জাহাজ গঙ্গায় ঢুকে পড়ে থাকলে মরতে হবে সবংশে। রুশদের কামান নাকি রুশদের বড় বড় চেহারার মতই বড় বড়। তেমনি নাকি তেজালো বারুদ। গোলাও তেমনি জবরদস্ত।

নাপিতেরা বলেছে—বাবুরা ভাবছে কি করবে? কেউ বলছে পালানো ভাল। গঙ্গার তীর ছেড়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে যেখানে হোক। খুব বড় বড় যারা তারা ভাবছে পাটনা কাশীর কথা। তবে যারা খুব নামজাদা লোক, কালীপ্রসন্ন সিংহের নাপিত বলেছে—আমার বাবু কাল খুব তকরার করলেন ওই দত্তবাবুদের সঙ্গে। বললেন—ইংরেজদের কামান বড়—বেশী জবরদস্ত। এদের ক্ষমতাও বেশী। •আর এ গুজব ছাড়া কিছু নয়। গত বছর থেকেই এ গুজব মধ্যে মধ্যে ওঠে। বাজে—ও সব বাজে।

ব্রজলাল বললে—তা দত্তবাবু বললে—তুমি হলে ইংরেজের ভক্ত হে। ইংরেজ ছাড়া দোসরা আর কেউ নেই দুনিয়ায়। কিন্তু রুশরা কত বলবান তা দেখেছ। এক একটার চেহারা কি? আর দেশটা কত বড়? কত লোক ওদের! আমি বলছি—আমি খুব খাঁটি খবর শুনেছি, এদিকে জাহাজ এসে কলকাতা উড়িয়ে দেবে—ওদিকে কাবুল হয়ে এসে দুম দুম ক'রে ঢুকে পড়বে। কাল বিকেল থেকে খবরটা চাউর হয়েছে—চারদিকে ফুস্‌ফুস্ গুজ-গুজ চলছে হুজুর।

বীরেশ্বর রায়ের ভুরু কুঁচকে উঠল। কথাটা বছরখানেক ধরে মধ্যে মাঝে উঠছে। গতবার খবরের কাগজে পর্যন্ত খবরটা উঠেছিল।

তা মন্দ হয় না। এ ব্যাটাদের বাড় বেড়ে গেছে। বড় বেড়েছে। গতকাল ঘোষাল নায়েব একটা কথা বলেছে—খাঁটি কথা। এদেশের সব ওই ইংরেজরা করতলগত করবে। ডালহৌসি এসে তার পোড়াপত্তন করলে। এসে অবধি রাজ্যের পর রাজ্য গ্রাস করে চলেছে। প্রথমে মুলতান—তারপর রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর গোটা পাঞ্জাব, ওদিকে মারাঠা পেশোয়ার মৃত্যুর পর, তার পোষ্যপুত্র নাকচ করে 'সাতারা', তারপর 'ঝাঁসি', 'নাগপুর' কেড়ে নিলে; হায়দ্রাবাদের নিজামের বেরার নিয়েছে, বলতে গেলে গোটা ভারতরাজ্যই তো গ্রাস করেছে। ওদিকে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করে জিতেছে। বাকী আর কতটুকু? অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শা'র এলাকা আর দিল্লীর বাদশার এলাকা খাস দিল্লী আর তার চারিদিকে খানিকটা। এ আর কতক্ষণ? এও থাকবে না। নিশ্চয় থাকবে না এ বীরেশ্বর রায় কেন একটা বালকেও তা বলতে পারে। অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে নাকি ঝগড়া লাগাবার চেষ্টাও হচ্ছে এদের তরফ থেকে। এর পরই কোনদিন শোনা যাবে—গেল ওয়াজিদ আলি শা'র রাজ্য। এদিকে ব্যবসা করতে এসে সব ব্যবসাই একচেটে করেছে। কোম্পানীর ব্যবসা তো আছেই। নিমকমহল আফিংমহল একচেটে। তারপর নতুন নতুন সাহেবেরা আসছে, কোম্পানী খুলে ব্যবসা করছে। নীলকুঠী, রেশমকুঠী, ব্যাঙ্ক, কয়লা—এ সবই ওদের হাতে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের য়ুনান ব্যাঙ্ক কার টেগোর উঠে গেল, ঠাকুরবাড়ীর দেনা অগাধ। এখন দেবেন ঠাকুর সব সম্পত্তি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হাতে দিয়েছেন—তিনি দেনা শোধ দিচ্ছেন। আর একদিকে পাদরীরা রাজত্বের দাপটে লোককে ক্রীশ্চান করছে। থাকবার মধ্যে আছে তো দেশের দুটি জিনিস—জমি জমিদারী আর জাতধর্ম। জাত মারতে শুরু করেছে—আবার জমিদারীতেও হাত দিচ্ছে। এ যেন একবারে খুব হিসেব-নিকেশ করে ছ'কে কাজ করছে।

মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী হচ্ছে। জন রবিনসন মহিষাদলের জমিদারি শীলেদের কাছে নিচ্ছে। ওরা সব নেবে। নায়েব ঘোষাল ঠিক বলেছে। এদেশের মানুষকে গোলাম

বানিয়ে ছেড়ে দেবে।

পুরনো বাদশাহী আমলের রাজা জমিদারদের অবস্থা আজ যেন বীরেশ্বর রায়ের কাছে নতুন চেহারায় দেখা দিল।

মহিষাদলের রাজার অনুপস্থিতিতে ম্যাজিস্ট্রেট এসে জবরদস্তি ফটক খুলিয়ে রাজবাড়ীতে ঢুকেছে। রানীর চোখের জল পড়েছে—তাতেও তার মন গলে নি। রানীকে পাল্কী চড়ে দেওয়ানের বাড়ী গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

কারুর ইজ্জত এরা রাখবে না। বর্ধমান—দিনাজপুর—নাটোর—পুটিয়া—বিষ্ণুপুর—সব—সব যাবে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন বীরেশ্বর রায়। চাকরের হাতখানা ঠেলে দিয়ে বললেন—ছাড়।

লাখরাজ—ব্রহ্মত্র—দেবোত্তর—পীরোত্তর—নানকার এদেশে লোকে ভোগ ক'রে আসছে চিরকাল। আজ কোম্পানী আইন করে তার ওপর খাজনা বসাচ্ছে। বর্ধমানের রাজা এর জন্য বিলেতে আপীল করেছেন। ভরসা সেই মামলা।

এরা কিছু রাখবে না। নায়েব ঘোষাল ঠিক বলেছে—জনি শীলদের কাছে জমিদারি নিচ্ছে—এ ওদের এদেশে জমিদারি একচেটে ক'রে বসবার সূত্রপাত!

নীলকর হিসেবে যে অত্যাচার করে—সে বীরেশ্বর জানেন। প্রকারান্তরে তাঁরা দু পুরুষ নীলকরদের টাকা যুগিয়ে সুদ খেয়ে আসছেন। চোখ বুজে থেকেছেন।

জমিদার হলে আর রক্ষে রাখবে না জনি।

উঠে দাঁড়ালেন বীরেশ্বর রায়—এগিয়ে চললেন গোসলখানার দিকে। তেলমাখানো চাকরটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। পিঠের তেলটা এখনও বসানো হয়নি। কিন্তু বলতে কিছু ভরসা হল না তার। রায় হুজুরের মুখ থমথম করছে।

স্নান সেরে এসে বীরেশ্বর রায় খাস কামরায় বসলেন। জলধরকে বললেন—কীর্তিহাটের নায়েব ম্যানেজার আর এখানকার নায়েবকে ডাক।

গিরীন্দ্র ঘোষাল এসে বসলেন সামনে, বললেন—কিছু ঠিক করলে বাবা?

—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। এ হল ইংরেজদের সব্বনেশে মতলব। কোম্পানীর হয়ে লর্ড ডালহৌসি যেমন গোটা দেশের রাজ্যটা গ্রাস করলে—তেমনি জনিদের মত ছুটো ইংরেজগুলো জমিদারি গ্রাস করতে লেগেছে। জন রবিনসন নিতে চাইলে—নিতে আমাদিগেই হবে। তবে এ বেলাটা থাকুন আপনি। আমি একবার বেরুব। একবার রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের কাছ থেকে ফিরে কথা বলব।

—দেব মশায় মহাশয় লোক—মস্ত লোক—কিন্তু তিনি—মানে তাঁর কাছে—

—সেটা ফিরে এসে বলব।

সকালের এ বীরেশ্বর রায় আর এক মানুষ। সন্ধ্যার মুখ থেকে যে বীরেশ্বর রায়—তার সঙ্গে এ বীরেশ্বরের অনেক তফাত স্থূলতা।

এ বীরেশ্বর বিষয়ী বীরেশ্বর—সে কালের আধুনিক বীরেশ্বর—গণ্যমান্য বীরেশ্বর। ল্যাণ্ডহোল্ডার অ্যাসোসিয়েসনের মেম্বার, বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রভৃতি অনেক সভার সভ্য—এমন কি সদ্য প্রতিষ্ঠিত কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি'রও সভ্য হয়েছেন। কিছুদিন আগে বহু-বিবাহ নিবারণপ্রথা রহিতের জন্য যে দরখাস্ত হয়েছে,তাতে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে সইও

করেছেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনেরও তিনি পক্ষপাতী।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুরেরই লোক—তাঁর মতকেও সমর্থন করেন বীরেশ্বর, কিন্তু প্রীতি শ্রদ্ধা বিশেষ নেই। পণ্ডিত বড় খটরোগা লোক। বীরেশ্বর রায়ের মদ খাওয়ার কথা—সোফিয়াকে রাখার কথা—কলকাতার সমাজে গোপন নেই; তা গোপন রাখতে বীরেশ্বর নিজেও চান না। যে যাই বলুক তা গ্রাহ্যও করেন না। কিন্তু যারা এ নিয়ে খটরোগামি করে তাদের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে এড়িয়েই চলেন। কাজ কি? তোমার মত নিয়ে তুমি থাক। আমার মত নিয়ে আমি আছি। আমি বীরেশ্বর রায় আমি সবই বুঝি—বুঝেই করি, তার জন্য তোমার মতামতের ধার ধারিনে। বিদ্যাসাগর তুমি পণ্ডিত, তুমি বিদ্যাসাগর থাক। আমি বীরেশ্বর রায় হয়েই থাকতে চাই। আমার দাম আমি জানি। সেদিন কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে যাওয়ার সংকল্পও তিনি করেছিলেন। কলকাতার সমাজের প্রতিষ্ঠাবান লোক। বড় বড় লোকে কথা শোনে। মহিষাদল মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরের একটি প্রাচীন রাজবংশ, হোক তা কয়েকবার হস্তান্তরিত—বংশান্তরিত—তবু মহিষাদল রাজপাট পুরানো বনেদী রাজপাট। বর্গী হাঙ্গামার সময় অনেক করেছিলেন তাঁরা। কামান এনে বসিয়েছিলেন, গোয়া থেকে গোয়ানীজ গোলন্দাজ এনে বসিয়েছিলেন বর্গীদের সঙ্গে লড়াই দেবার জন্যে। ছিয়াত্তুরের মন্বন্তরের সময় প্রচুর অন্নদান করেছেন। সেই রাজপাট চলে যাবে। ভুক্তান হবে নীলকর কুঠীয়ালের সম্পত্তির সঙ্গে! এই কথাটাই তিনি বলবেন পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে। তিনি চেষ্টা করলে অনেক কিছু হতে পারে। শীলেরা ধনী সুবর্ণবণিক। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর যদি সুবর্ণবণিক সমাজের মল্লিক রাজাদের এবং অন্য অন্য বড় বড় ধনীদের বলেন—তবে কাজ নিশ্চয়ই হবে।

* * *

বিদ্যাসাগরকে তাঁর ভাল লাগেনি। বিদ্যাসাগর তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিলেন না বলে মনে হল। বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র কিছু বড় তাঁর চেয়ে—তিনি তাঁকে কয়েকবার আপনির মধ্যে তুমি বললেন। বললেন—শুনেছি কীর্তিহাটের কথা। আপনাদের কথা। খুব নাকি কড়া জমিদার। কুমোরেরা হাঁড়ি তৈরীর জন্যে মাটি নিলে মাশুল আদায় হয়।

রায় বলেছিলেন—হ্যাঁ তা হয়। কাঁসাইয়ের ধারে ময়নার রাজাদের তৈরী বাঁধটা ভেঙে গিয়েছিল—সেটা মেরামতের জন্য পাঁচ রকমে টাকা তুলতে হয়েছিল। সেটা মেরামত হয়েছে। নিরাপদ হয়েছে ওরাই।

—হ্যাঁ তাও শুনেছি। কিন্তু তারপর তো সেটা ওঠেনি, কায়েম হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণের এক জমিদারের রেভেন্যুর জন্যে জেল হয়েছিল; তার নায়েব সেবার প্রজাদের কাছে গারদ সেলামী চেয়েছিল—জমিদারকে খালাস করবে বলে। জমিদার খালাস পেয়েছে—বাড়ীতে বসে গড়গড়া টেনে বাঈ-নাচ করিয়ে তামাক খাচ্ছে—কিন্তু গারদসেলামী ওঠেনি। তা আমার কাছে কি জন্যে আসা হয়েছে?

বীরেশ্বর রায়ের মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তিনি যে কথা বলতে এসেছিলেন তা আর বললেন না। যাঁর জমিদার ধনীদের সম্বন্ধে এমনই ধারণা তাঁকে বলে কি হবে? বললেন—আপনি দেশের লোক—বড় লোক মহৎ লোক—দেখতে এসেছিলাম।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন—জমিদারদের অনেকে ভাল কাজ করছে। ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করছে—আমাদের দেশের পুরাণ শাস্ত্র অনুবাদ করে ছাপছে। তোমাদের তো টাকা শুনেছি অনেক,

নীলকরকে টাকা ধার দাও—এখানে সাহেবদের সঙ্গে কারবার—তা কিছু করেন না কেন ?

বীরেশ্বর থমকে গেলেন—তাঁর স্বভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ; বড়মানুষ যেখানে কিছু চায় —সেখানে 'না' বললে বড়মানুষ ছোট হয় না—যে 'না' বলে সেই ছোট হয়। সেখানে 'হ্যাঁ' বললেই বড়মানুষটা ছোট হোক বা না হোক—অন্তত তার নাগাল পাওয়া যায়। বললেন—করতে পারি যদি আপনি চান। কত বড়মানুষ আপনি—আপনার কথা রাখতে করব।

হেসে বিদ্যাসাগর বললেন—কেন—আমার কথায় করবেন কেন। নিজের ইচ্ছেয় করবেন। দেশের—

—দেশ মানুষ তাদের মঙ্গল—ওসব আমি বুঝি না—। হ্যাঁ—আপনাদের মত লোককে বুঝি।

—কেন বুঝবেন না ! পুণ্য বোঝেন—দেবসেবা আছে—সমারোহের সঙ্গে করেন। তার থেকে কি এতে কম পুণ্য ?

—না বিদ্যাসাগর মশাই—ও পুণ্য বাপ পিতামহ করে গিয়েছেন—দেবোত্তর সম্পত্তি। তা থেকে চলে, চালাতে হয় আমাকে সেবায়েৎ হিসেবে। আমি ঈশ্বর ধর্ম পুণ্য—কিছুই মানি না ! কালাপাহাড় বলতে পারেন।

বিদ্যাসাগর বললেন—তা বেশ, আমিই বলছি।

—তা হ'লে করব।

—বেশ—বেশ—বেশ ! আমি রাজনারায়ণবাবুকে পত্র লিখব—তিনি মেদিনীপুরে হেডমাস্টার—তিনি আপনাকে অনেক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন। আলাপ আছে তাঁর সঙ্গে ?

—না। হবে আলাপ। তা'হলে আজ আসি। নমস্কার।

খোসমেজাজে ফিরেছিলেন বীরেশ্বর। খাতায় লিখেছিলেন—I feel proud. Yes I feel proud ; তবে তার সঙ্গে লিখেছিলেন—এই খাটো মাথায় দুর্বলশরীরে লোকটি খুব তেজস্বী—চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়। অসাধারণ মানুষ। অন্য লোক হলে আমি কড়া কথা বলতাম। কিন্তু এমন সম্ভ্রম হ'ল—যে পারিনি। মনে মনে আনন্দ হচ্ছে—যে আমি তা পারি নি।

শোভাবাজারে দেবেদের রাজবাড়ীতে এসে রায় খুশী হয়েছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেবকে দেখে। যেমন সৌজন্যসম্পন্ন তেমনি মিষ্টভাষী, তেমনি ধর্মপরায়ণ—খবর পেয়ে নিজে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন—আসুন—আসুন বাবা, আসুন।—

তিনি কায়স্থ—বীরেশ্বর ব্রাহ্মণ—তিনি প্রণাম করতে উদ্যত হয়েছিলেন। হাঁ—হাঁ করে উঠে পিছিয়ে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর। তবুও তিনি হেঁট হয়ে প্রণাম না জানিয়ে ছাড়েন নি। —সে কি বাবা। আপনি ব্রাহ্মণ। তুলসীপাতার কি ছোট বড় আছে ! তারপর কি প্রয়োজন বাবা ?—

বীরেশ্বর যেন বেঁচে গিয়েছিলেন মানুষটিকে পেয়ে ; বলেছিলেন—বিশেষ দরকারে এসেছি। আপনি জমিদার সমাজে মাথার লোক—আপনার কাছ ছাড়া আর কার কাছে যাব ? আমি মহিষাদলের রাজাবাহাদুরের ব্যাপার নিয়ে এসেছি। তাঁরা আমাকে কিছু বলেন নি। আমি নিজে এসেছি। শীলেদের ব্যাপার তো শুনেছেন ? কাগজে বেরিয়েছে।

—শুনেছি বাবা। শুনেছি বইকি। সংবাদ প্রভাকর পড়েছি। কি বলব বল ? আমরা ভূস্বামীরা আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় করি—বিষয়কর্মে শৈথিল্য আমাদের ; মহাজনকে

বিশ্বাস করি।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—মহাজনকেই বা দোষ কি দেব। সে তো দলিলের শর্ত মত কার্য করেছে। তবে—হ্যাঁ—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—এত বড় বাড়ী—একটা বুনিয়াদী রাজপাট।

বীরেশ্বর বললেন—আপনি শুনেছেন—শীলেরা জমিদারি ইংরেজদের বন্দোবস্ত করছে। জন রবিনসন বলে একজন কুঠীয়াল নিচ্ছে।

—শুনেছি। একটু হেসে বললেন—সেও তো তোমাদের টাকাতেই ব্যবসা করেছে। আমরাই তো আমাদের সর্বনাশ করছি। রাণী ভবানী পলাশীর আগে বলেছিলেন—খাল কেটে কুমীর আনা হবে। তাই হল। গোটা ভারতটাই গিলে ফেললে লর্ড ডালহাউসি।

—এখন জমিদারীগুলোও গিলবে? আপনারা তাই দেখবেন?

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেববাহাদুর বললেন—আপনি ক্রয় করতে চান?

—না। আমার তা অভিপ্রায় নয়। এই এতবড় বাড়ী রক্ষা যাতে হয়—তাই চাই। আর জন রবিনসন যাতে জমিদার হয়ে না বসে তাই চাই। আপনি কলকাতা সমাজের মাথার মানুষ, আপনি অনুরোধ করুন শীলেদের।

—কিন্তু ডিক্রীর টাকা তো চাই। অন্ততঃ কিয়দংশ তো দিতে হবে। এক কার্য করুন। রাজাবাহাদুরের কিছু সম্পত্তি আপনি পত্তনী বন্দোবস্ত নিয়ে টাকা দিন। সেই টাকা শীলদের দিয়ে—নতুন দলিল করে কিস্তিবন্দি হোক। কি বলেন!

বীরেশ্বর রায় বললেন—না—তাও ঠিক আমার ইচ্ছা নয়। রাজাবাহাদুরের যে সম্পত্তি তাতে পত্তনী না দিয়েও তিনি অনায়াসে শোধ দিতে পারেন। কিস্তিবন্দি করিয়ে দিন আপনি বলে ক'য়ে। তবে রাজাবাহাদুর যদি বন্দোবস্ত করেন ইচ্ছাপূর্বক তবে আমি নিতে পারি। সেটা পরের কথা।

দেববাহাদুর বললেন—সাধু, সাধু, বাবা, আপনি সাধু লোক। আপনার নির্লোভতা দেখে সুখী হলাম। কিছু মনে করবেন না বাবা—আমি একটু পরীক্ষা করছিলাম আপনাকে। নইলে—সে ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই হয়েছে। স্বর্গীয় মতি শীল মহাশয় সদাশয় লোক ছিলেন—মহৎ মানুষ ছিলেন। সামান্য শিশি-বোতলের দোকান ছিল ধর্মতলায়—ওই তো তোমাদের লালবাজারের ধারে গো। খালি শিশি কিনে বিক্রী করতেন। তারপর অদৃষ্ট খুলল। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন। দান করেছেন। ইস্কুল করেছেন কতগুলিই। তবে—ব্যবসা মহাজনী, কুসীদজীবী পেশা, ইংরেজ আমলে ব্যাঙ্কার······। হাসলেন দেববাহাদুর।—কি করবেন? তাঁর মৃত্যুর পর ছেলেরা একটু কড়া হ'তে চেয়েছে। তার উপর মামলা মোকদ্দমার জেদ! সেই জেদ অনেকটা বেশীদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে আর কি! তা বড় বাপের ছেলে তো—ক'রে-কর্মে ফেলে চৈতন্য হয়েছে। তারা কিস্তিবন্দিই করে নিচ্ছে। আমি খবর পেয়েছি।

বীরেশ্বর রায় খুশী হলেন। বললেন—যাক, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

—একটা প্রশ্ন করব বাবা?

—বলুন?

—আপনার চিন্তাটা কিসের ছিল? ওঁদের সঙ্গে কি খুব সুখ ছিল আপনাদের? শুনি নি তো?

একটু চুপ ক'রে থেকে বীরেশ্বর বললেন—ওই রবিনসন নেবে বলে আমার দুশ্চিন্তা ছিল।

—কিন্তু সুখ তো আপনাদের ওদের সঙ্গেই ছিল! শুনেছি ওখানেই নাকি আপনি থাকতেন! আপনাদের টাকাতেই বুড়ো রবিনসন ব্যবসা করেছিল।

—সবই সত্য শুনেছেন। কিন্তু ছোট রবিনসন দিন দিন এমন উদ্ধত হচ্ছে যে, তাকে বরদাস্ত করা সম্ভবপর নয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে দেব বললেন—এখন কি হয়েছে বাবা—এই তো কলির সন্ধ্যা। ভারত গ্রাস করলে—এরপর ইংরাজ মাথার উপর দিয়ে হাঁটবে। সারা দেশ থেকে হিন্দুত্ব বিলুপ্ত করবে। শুরু হয়েছে—তার সূত্রপাত হয়ে গেছে। সতীপ্রথা আইন করে বন্ধ করেও ক্ষান্ত হল না—বিধবা-বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন উঠেছে। আর কৌতুক দেখ—এ সব আমরাই করছি। আমাদের দিয়েই করাচ্ছে। আমাদের দেশের ধর্মই সব বাবা। তবে ধর্মের অনেক বিকৃতি হয়েছে—তার সংস্কার প্রয়োজন এও ঠিক কথা। সংস্কারের পরিবর্তে তাকে বিসর্জন দিলে ইষ্ট দূরের কথা—অনিষ্ট সামান্য ব্যাপার, সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিছুই আর থাকবে না। এইটে এঁরা বুঝছেন না। রামমোহন রায় মশায় মস্ত লোক ছিলেন—অধ্যয়ন অনেকেই করেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হয়েছেন—বিদ্যার সাগরও তিনি বটেন—বলতে গেলে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ, নইলে পিতা পাচকের কাজ করেন……তাঁর পুত্র মেধায়, প্রতিভায় এমন পণ্ডিত হয় শুধু চেষ্টাতে? কিন্তু তিনি এ কি করছেন? বিধবা-বিবাহ?

থামলেন রাজাবাহাদুর, তারপর একটু হেসে বললেন—আপনাদের জেলাতেই তো বাড়ী গো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আলাপ-পরিচয় আছে? করেছেন?

—দেখেছি মাত্র। আলাপ ঠিক হয়নি। একদিন কিছু বাক্য বিনিময়—তাকে আলাপ বলে না।

—সে কি গো? করবেন—করবেন—আলাপ-পরিচয় করবেন। এক জেলার লোক—তার উপর দুজনেই ব্রাহ্মণ। যাবেন।

একজন চাকর এসে হেঁট হয়ে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল। রাজাবাহাদুর বললেন—একবার যে গাত্রোত্থান করতে হবে বাবা। সামান্য একটু মিষ্ট-মুখ করতে হবে। তিনি নিজেই আগে উঠে দাঁড়ালেন।

বীরেশ্বর রায় না বলতে পারলেন না। এসে অবধি অনুভব করছিলেন—মানুষটি একটি বিরাট মানুষ—তাঁর বিনয়—তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে ভক্তি—তাঁর মিষ্ট এবং শুদ্ধ ভাষায় বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে যে পরিচয় তাঁর ইতিমধ্যেই ফুটে উঠেছিল—তা এই বিরাট ঐশ্বর্যের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেন আকাশস্পর্শী বলে মনে হচ্ছিল।

পাশে একখানি ঘরে মার্বেল টেবিলের উপর কিছু ফল, কিছু মিষ্টান্ন রাখা ছিল রূপার রেকাবীতে—রূপার গ্লাসে জল—সামনে চেয়ারের উপর কার্পেটের আসনপাতা। পাশে এক-খানি ছোট ঘরের দরজায় চাকর দাঁড়িয়ে আছে কাঁধে টার্কিশ তোয়ালে নিয়ে।

রাজাবাহাদুর বললেন—যান বাবা, হাত মুখ ধুয়ে আসুন।

হাত-মুখ ধুয়ে বীরেশ্বর ফিরতেই বললেন—শুনেছি বাবা আধুনিক কেতার মানুষ—তার জন্য টেবিলেই দেওয়া হয়েছে। অবশ্য গঙ্গাজল দিয়ে ধুঁয়ে দিয়েছে।

হাসলেন বীরেশ্বর রায়। বললেন—আপনার গৃহে তো অনাচারের স্থান নেই।

—শুদ্ধাচার মানেই তো পরিচ্ছন্ন জীবন গো। যা পরিচ্ছন্ন মালিন্যহীন তাই তো পবিত্র।

এবং ধর্ম তো সেইখানেই।

খেয়ে-দেয়ে হাতমুখ ধুয়ে তোয়ালেতে হাত মুছে এ ঘরে এসে বসতেই রাজাবাহাদুর বললেন—আপনি একটু বসুন—আমি আসছি।

বলে চলে গেলেন। খানসামা হাতজোড় ক'রে বললে—হুজুরের জন্য ওঘরে তামাক দেওয়া হয়েছে।

বীরেশ্বর বুঝলেন—রাজবাহাদুর এই জন্যই উঠে গেছেন। পাশের ঘরের কাছে যেতে যেতেই তিনি চন্দন-গুঁড়ো ও আতর-মেশানো তামাকের গন্ধ পেলেন। সোনার আলবোলার নল ধরে ছিলমচী খানসামা দাঁড়িয়ে ছিল—টেবিলের উপরে সোনার ডিবায় পান। একখানি রেকাবীতে মশলা—দারুচিনি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ।

আশ্চর্য সুশৃঙ্খলা। যেন ঘড়ির কাঁটার মত, ছোট কাঁটাটিকে ঘিরে বড় কাঁটাটির ঘোরার মত অতিথিকে ঘিরে এ-বাড়ীর সমারোহভরা আতিথ্য-ধর্ম ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আলবোলার নল হাতে নিয়ে টানতে টানতে তিনি ভাবছিলেন। কলকাতার বিশৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার আবর্তের মধ্যে এমন সুন্দর সুস্থ পবিত্র জীবনযাত্রার পরিচয় এর পূর্বে তিনি পান নি। অবশ্য জমিদারদের সভায় বড় বড় ব্যক্তিদের তিনি দেখেছেন—তাঁদের কথা-বার্তা শুনেছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে তিনি দেখেননি, তাঁর বাবার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল—তাঁর গল্প শুনেছেন। শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুরকে তিনি দেখেছেন—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছেন। আলাপ নেই। চেষ্টা করেন নি। তরুণ কালীপ্রসন্ন সিংহকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। বয়সে সিংহ তাঁর থেকে বেশ ছোট, তবু বিদ্যার প্রখরতায় তাঁর থেকে তিনি প্রদীপ্ত। কৌতুকপ্রিয়, রসিক, বিদ্যোৎসাহী, বিদ্বান। বউবাজারের রাজেন্দ্র দত্তকে দেখেছেন—মৌখিক আলাপ আছে। সাত-সাতটা হৌসের মুৎসুদ্দি—অগাধ অর্থ উপার্জন করেও দান ক'রে ফকীর। এই অবস্থাতেও সেদিন হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ স্থাপন করেছেন। রাজেন্দ্রনাথ মিত্রকে দেখেছেন, কথাবার্তা শুনেছেন। অগাধ পাণ্ডিত্য। আরও কত নাম করবেন। এ আমলটাই যেন দিগ্‌বিজয়ীদের আমল। তাঁদের সাড়ায় দেশ গম-গম করছে। কিন্তু রাজা রাধাকান্তকে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে যা দেখলেন—তাঁর কাছ থেকে একটি স্নিগ্ধ স্পর্শ পেলেন এমন বোধ হয় আর কারুর কাছে পাওয়া যায় না বলেই তাঁর মনে হল।

## ৭

এই সময় রাজাবাহাদুরের সাড়া পেলেন ওঘরে। রাজাবাহাদুর ফিরেছেন। আলবোলার নলটি টেবিলের উপর রেখে তিনি এঘরে ফিরে এলেন। রাজাবাহাদুর এসে বসেছেন তাঁর আসনে, তাঁর সামনে একটি মূল্যবান ট্রের উপর প্রকাণ্ড আকারের একখানা বই। রাজাবাহাদুর বললেন—বসুন। এবার দুটো ঘরের কথা বলি। বাবা তো সোমেশ্বর রায়মশায়ের একমাত্র পুত্র, শুনেছি অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের পর আপনার জন্ম। আপনার ভগ্নীপতির পিতা ছিলেন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, তিনিই নাকি ক্রিয়াকর্ম করেন, তারপর এক কন্যা এক পুত্র হয়ে বাঁচে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনেছি তাই।

—ভগ্নীটি নাই। গত হয়েছেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু—

—বলুন !

—এত কথা আপনি জানলেন কি ক'রে ?

—আমার বাবার ওটা বোধ হয় একটা স্বভাব। তা ছাড়া আপনার ভগ্নীপতি বিমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আমি জানি। তিনি পত্নীর মৃত্যুর পর কলকাতায় এসে কিছুকাল ছিলেন। পুত্রটিকেও দেখেছি। সুন্দর সুকুমার। তবে নরাণাং মাতুলক্রম তো, বাপের মত এত সহনশীল শান্ত নয়, তেজস্বী। উগ্ররকমের তেজস্বী।

মাথার মধ্যে রক্ত যেন চন চন করে উঠল বীরেশ্বরের। বিমলাকান্তকে কতটুকু জানেন রাজাবাহাদুর ? সাপ। তাও গোখুরা নয়, তেজের সঙ্গে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে গর্জন করে সাড়া দিয়ে আক্রমণ করে না। চিতি সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে নির্জীবের মত ; মনে হয় ছেঁড়া দড়ির একটা তাল কি ছেঁড়া লতার খানিকটা ; অসতর্ক পদক্ষেপে মুখটা ছুঁড়ে দিয়ে আক্রমণ করে দাঁত ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয়। গোখুরার বিষে ত্বরিত মৃত্যু, অল্পক্ষণেই যন্ত্রণার শেষ হয় আর এ—এই চিতি সাপের বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে। অনন্ত যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে মৃত্যু। রাজাবাহাদুরকে কি বলে গেছে তিনি জানেন না। হয় বলে গেছে—বীরেশ্বর নাস্তিক অধার্মিক মদ্যপ অত্যাচারী হিংস্র অমানুষ—

রাজাবাহাদুর বললেন—আপনাদের উপর বিমলাকান্তের কৃতজ্ঞতা-স্নেহের শেষ নেই। বলতেন—একটু তেজস্বী, আধুনিক ইংরাজীপন্থী কিন্তু হৃদয়টা বড় ভাল। তবে বড় ভুল করে বসে। এবং ভুলকে কখনও বিচার করে দেখে না। নইলে বীরেশ্বর আমার কনিষ্ঠ সহোদরের মত। আমার জীবনের যা কিছু সে তো ওঁদেরই জন্য। সামান্য যজমানসেবী ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, বাপ ছিলেন ঘরজামাই, আমার জন্মের পরই চলে গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী হয়ে ; তারপর ফিরেছিলেন ওই রায়মশায়দের বাড়ীতে। তারপর কংসাবতীর বন্যায় ডুবে মারা যান। তাঁর ক্রিয়ার ফলে সন্তান হয়েছিল বলে নিজের কন্যার সঙ্গে আমার মত ভিক্ষুকের বিবাহ দিয়ে ঘরে রেখেছিলেন, পড়িয়েছেন। কলকাতায় কলেজে দিয়েছিলেন, তারপর ঘরে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, মৌলবী, ইংরেজ পাদ্রী রেখে সংস্কৃত পার্সী ইংরিজী শিখিয়েছিলেন। ওঁদের কাছে আমার অনেক ঋণ। হেসে বলতেন—হয়তো জন্মজন্মান্তর শোধ করতে হবে।

বীরেশ্বর রায় বিস্ময়ে যেন অভিভূত হচ্ছিলেন এবার। মনের বিস্ময়ের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করছিলেন। বার বার ভাবতে চাচ্ছিলেন—এও তার ওই সাপের প্রকৃতির খলতা ছলনা চতুরতা। আসল সত্যটিকে চাপা দিয়ে নিজের সততাকেই জাহির করবার জন্য এই কথা সে বলে গিয়েছে। মনে পড়ছিল কমলাকান্তকে। মনে পড়েছিল ভবানীকে। ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন অন্তরে অন্তরে! আবার মন বলছিল—না-না! এ মহত্ত্ব তার স্বীকার করতে হবে যে, সে রায়বংশের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়ে যায় নি! রাজাবাহাদুরের কথা শেষ হলে এতক্ষণে প্রশ্ন করলেন—তিনি ওখান থেকে কেন চলে এলেন তার কারণ কিছু বলেন নি ?

—হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করেছিলাম বইকি। কারণ কীর্তিহাটের রায়বংশের জামাই। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ডান হাত আপনার পিতামহ রায়ভট্টাচার্যমশাই তো খ্যাতিমান লোক। আপনার পিতাও এখানে সর্বজনপরিচিত ছিলেন। সতীদাহ নিবারণের দরখাস্তের সময় স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় সত্ত্বেও তিনি তাতে সই করেন নি। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। আপনাদের অর্থের কথা বিষয়ের কথা বিষয়ীরা সকলেই জানেন। সেই বিষয়ের একাংশের মালিক, দেবোত্তরেরও সেবায়েৎ—তিনি এলেন আমার কাছে শব্দকল্পদ্রুমের কর্ম করতে। বললেন—জীবিকা এবার নিজেকেই অর্জন করতে হবে।

যা আছে তা তো আমার নয়, এই কমলাকান্তের। তখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এর কারণ কি ? আমার মনে হয়েছিল আপনার সঙ্গে বিবাদ হয়ে থাকবে। তা বার বার বললেন—না-না-না। বিবাদ কলহ এ আমার সঙ্গে হ'তে পারে না বীরেশ্বরের। সে সম্পর্কই নয়। তার একমাত্র দোষ সে নাস্তিকভাবাপন্ন। তা নইলে গুণী মানুষ। উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষা করেছে। গানে বাজনায় গুণীলোক। দুর্দান্ত সাহসী ; বাঘ কুমীর শিকার করে। উঁচু নজর। তাছাড়া ভেবে দেখুন, নিজে পছন্দ করে এক দরিদ্র শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করেছিল। কন্যাটি সাক্ষাৎ দেবী। খানিকটা দেব-অংশ তাতে আছে, এ বিষয়ে সন্দেহই নেই। বিবাহের সময় কন্যার পিতা বলেছিলেন—দেখুন বাবা, মদ্যপান যারা করে বা যারা উন্মার্গগামী এমন পাত্রের হাতে বিবাহ দিতে গুরুর নিষেধ আছে আমার। তা আপনি কি তা করেন ? বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা করি। মিথ্যা আমি বলি না। তবে যদি আমাকে ওই কন্যা দান করেন তবে মদ্যপান ত্যাগ করব আমি। এবং তাই করেছিলেন তিনি। তারপর দুর্ঘটনা ঘটেছে। কি যে হল ভগবান জানেন। বলতে পারব না কারণ আমি চলে আসার পর সংঘটিত হয়েছে, বধূটি কংসাবতীর ঘাটের দহে ভেসে গেছে। তারপর বীরেশ্বর এই আঘাতে মদ্যপান অবশ্য আরম্ভ করেছেন, কিন্তু বিবাহ আর করেন নি। এ যুগে, যেখানে দুটো তিনটে চারটে, কুলীন সন্তানেরা শতাধিক বিবাহ করেন সে যুগে এই স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিবাহ না করা একটা বিশেষ লক্ষণ তার চরিত্রের। সে ঝগড়াঝাঁটি করবে কেন ? আমি চলে এলাম অন্য কারণে, সেটা ধরুন, সম্পত্তি তো কমলাকান্তের। ওখানে থেকে জীবনযাপন করার অর্থ কমলাকান্তের অর্থে জীবনযাপন করা। সেটা আমার ভাল লাগল না। শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, বিষয়কর্মও বুঝি কিন্তু শাস্ত্রকর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কর্ম করেই জীবিকা অর্জনের অভিপ্রায়ে চলে এসেছি। সেইটাই সংকল্প। এবং সেইজন্যই রাজাবাহাদুরের কাছে আসা।......তা তিনি 'শব্দকল্পদ্রুমে'র যে অংশটি করেছেন তা অতি উত্তম হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল ওঁকে অন্য কর্ম দিয়ে এখানে রাখি কিন্তু কি অভিপ্রায় হল তাঁর হঠাৎ বললেন—আর এখানে থাকব না, বারাণসী যাব। এখানে কলকাতার ইংরিজীয়ানার মধ্য থেকে ছেলেকে তিনি রক্ষা করতে চান। কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা দেবেন, ইংরাজী শিক্ষারও ব্যবস্থা করবেন। তা ছাড়া তাঁর এক ভগ্নী এসে পড়ল ঘাড়ে। সন্ন্যাসিনীর মত। তারও কাশীধামে বসবাসের একান্ত ইচ্ছা। এইজন্যে চলে গেলেন।

চমকে উঠলেন বীরেশ্বর। ভগ্নী ? বিমলাকান্তের ভগ্নী ? তিনি তো শোনেন নি ! পূর্ববঙ্গে শ্যামাকান্তের ক'টি বিবাহ ছিল। তাদের মধ্যে কারুর কন্যা ?

মন বললে—না-না-না। এ সেই সেই। দহে দেহ মেলে নি। এ সেই !

চঞ্চল হয়ে অনেকটা আকস্মিকভাবেই বীরেশ্বর হাতজোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—এবার আমাকে অনুমতি করুন রাজাবাহাদুর, আমি উঠি।

—উঠবেন ? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি। ভাল লাগছিল, আপনার সঙ্গে বাক্যালাপে আনন্দ পাচ্ছিলাম। তা আমার বাড়ীতে ব্রাহ্মণ আপনি পদার্পণ করেছেন, তার কিঞ্চিৎ সম্মানী দক্ষিণা না দিলে তা সার্থক হয় না। এই আমার শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থ।

বীরেশ্বর সৌজন্যে অভিভূত হয়ে গ্রহণ করলেন। বললেন—এ তো মহামূল্য বস্তু। মাথায় রাখতে হয়। তাই রাখব।

—না-না, শুধু মাথায় রাখলে হবে না। একটু-আধটু পড়তে হবে। সবটা দেখলে খুব সন্তুষ্ট হব। খুশী হব।

—দেখব, পড়বার চেষ্টা করব।

—সাধু সংকল্প। সাধু-সাধু। তারপর হেসে বললেন—দেখুন পড়ে, পড়া শেষ হলে দেখবেন সংস্কৃত বেশ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে। এবং কি মনোরম ভাষা, দেবভাষা যে বলে তা মিথ্যা নয়—তা বুঝবেন।

চাকরকে বললেন—যা গাড়ীতে তুলে দিয়ে আয়। তারপর হঠাৎ বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনলাম বাবা নাকি একজোড়া খুব তেজস্বী আরবী ঘোড়া কিনেছেন? ক'জনই বলেছিলেন আমাকে।

হেসে বীরেশ্বর বললেন—হ্যাঁ, ঘোড়া জোড়াটা ভাল। কিন্তু রাজাবাহাদুরের আস্তাবলে যে সব ওয়েলার আরবী ঘোড়া আছে তার সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না।

রাজাবাহাদুর বললেন—না বাবা, পত্নীসম্পদের মত কতকগুলি বস্তুর জন্ম ভাগ্য প্রয়োজন। সবার হয় না। তার মধ্যে ঘোড়া একটি বস্তু। যার ও ভাগ্য নাই সে মূল্য অনেক দিয়ে কিনেও ঠকে যায়। যদি জুটল তো মরে গেল। আর ভাগ্য—ধরুন মহারাণা প্রতাপ—তাঁর তো আকবর শাহের হাতে অনেক নিগ্রহ, কিন্তু ঘোড়ার ভাগ্যে তিনি চৈতককে পেয়েছিলেন! তা সেই জুড়িতে এসেছেন নাকি?

—না, এ অন্ত জুড়ি।

—আচ্ছা অন্ত কোনদিন যদি আসেন সেই জুড়িতে আসবেন। দেখব। আমি ঘোড়া চিনি, লক্ষণ জানি। বলে দেব কেমন ঘোড়া।

এরই মধ্যে বীরেশ্বর রায়ের মনে অন্ত একটি প্রশ্ন ঘুরছিল। যেন তিনি হঠাৎ বললেন—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি কলকাতার সংবাদ দেখছি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাখেন।

—কি বলুন।

—চৌরিঙ্গীর মাঠে ওইসব জলাজঙ্গল যে-দিকে সেদিকে এক পাগল সন্ন্যাসী থাকেন! সায়েব-সুবোরাও যায় তাঁর কাছে—

—ও যিনি গন্ধ এনে দেন, ধুলোকে গুড় করে দেন? মধ্যে মধ্যে নিজেকে দংশন করেন। চীৎকার ক'রে কাঁদেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই। সেই।

একটু চুপ করে থেকে রাধাকান্ত দেব বললেন—হ্যাঁ, আশ্চর্য সন্ন্যাসী বটে। তবে বাবা, সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছেন উনি। শুনেছি কামাখ্যা পাহাড়ে তাঁর আসন থেকে তাঁকে তুলে একেবারে খাদে নিক্ষেপ করেছিল!

* * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, সেদিনের, এই সুদীর্ঘ বিবরণটি বীরেশ্বর রায় ফিরে এসেই লিখেছিলেন খাতায়। শেষকালে লিখেছেন—আজ আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছি। এই বিরাট ধনীটির মধ্যে এক বিরাট জ্ঞানীকে দেখে, এলাম। এ দেশে যাঁরা ধনী এবং জ্ঞানী ও গুণী তাঁরা প্রত্যেকেই নবযুগের মানুষ। হিন্দু সংসারে জন্মগ্রহণ করেও তাঁরা হিন্দু সমাজের সকলপ্রকার আচার ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত। ইংরাজের চরিত্র, ইংরাজী দর্শন, এ থেকেই তাঁরা প্রবুদ্ধ। কিন্তু এই মানুষটি সম্পূর্ণ অন্ত মানুষ। ইনি খাঁটি হিন্দু। আচারবিচারগুলিকে এমন সুন্দর সংস্কার ক'রে বজায় রেখেছেন যে কেউ তাঁর আচারআচরণকে অজ্ঞতার অন্ধকারপ্রসূত বলতে পারবে না। একটা ভুল হয়ে গেছে, তাঁর বিরাট গ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুমের জন্ম ডেনমার্ক দেশের অধীশ্বর যে সুবর্ণচক্র পাঠিয়ে সম্মানিত করেছেন, তা দেখা হয়নি। ইউরোপের পণ্ডিতেরা রাজাবাহাদুরের

এই কর্মের জন্ম ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমারও এসব সাধ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু—। আমি ঈশ্বর মানি না। ওই পাগল সাধুকে দেখেও মানি না—আজ রাজাবাহাদুরকে দেখে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে তার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। তবু এই যে ইচ্ছা আমার পূর্ণ হল না, এর কারণ কি বলব? অদৃষ্ট ছাড়া কোন সংজ্ঞা আছে? রাজাবাহাদুর বললেন—সে নাকি দেব-অংশজাতা ছিল। তা হোক বা না হোক, সে তো সত্যই দেবীচরিত্রের ছিল। তার সেই বাসরঘরের গান—গৌরী লউট যায়ে—রোয়ে রোয়ে—গান গাওয়া মূর্তি মনে পড়ছে।

সে তো সত্যসত্যই ধ্যান। তার সেই মূর্তি মনে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল সেই অল্প কয়েক বৎসর কি গভীর আনন্দের মধ্যে তাঁরা বাস করেছিলেন, কত কল্পনা করেছিলেন। ভবানী নিত্য পূজা করত, লালপেড়ে গরদের শাড়ী প'রে কালীমন্দিরে যেত—তিনি কাছারীতে বসে দেখতেন। সে রূপ দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে যেত। ঈশ্বরদেবতায় বিশ্বাস তিনি করতে পারতেন না। কিছুতেই না। কোন শাস্ত্র তাঁকে সে বিশ্বাস দিতে পারেনি, কোন পণ্ডিত কোন সন্ন্যাসী তাঁর সংশয় খণ্ডন করতে পারে নি। কিন্তু ভবানীর বিশ্বাস দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'ত।

ভবানী কখনও নিজের জন্য কিছু চায় নি—কখনও তাঁর অবিশ্বাস নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। একটি আশ্চর্য সরল সহজ মানুষ, আশ্চর্য হৃদয়, আবার তেমনি নির্ভীকতা, সাহস। ভয় তার ছিল না।

ক'টি ঘটনা বীরেশ্বর রায়ের মনে অক্ষয় হয়ে আছে। শেষ-আশ্বিন; ঠিক পুজোর আগে ঝড়বাদল হয়েছিল—সাইক্লোন। প্রচণ্ড প্রলয়ঙ্কর ঝড়। গোটা গ্রামখানার বাড়ীর খড়ের চাল উড়ে গিয়েছিল, মাটির বাড়ীর দেওয়াল ঝড়ের বেগে বৃষ্টির মুখে ছুরি দিয়ে যেন কেটে দুখানা করে দিচ্ছিল। বড় বড় মাটির ঘর ভেঙে পড়ছিল হুড়মুড় করে। নদীর ওপারে ও সিদ্ধপিঠের ঘন জঙ্গলটায় গাছগুলো ভাঙছিল কাঠির টুকরোর মত। রায়দের বাড়ীর বন্ধ জানালা ঝনঝন শব্দ করে কাঁপছিল। পূর্ব-উত্তর কোণের বারান্দাটার কাঠের ঝিলমিলিগুলো ঝড়ের টানে ছেড়ে কোথায় উড়ে গিয়েছিল কাটা ঘুড়ির মত। ঝড়ের গোঙানি ভীষণ ভয়ঙ্কর। বীরেশ্বরের দিদি পাগল বিমলা এক বছরের কমলাকান্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। চিন্তা সকলেরই হয়েছিল। চিন্তা কেন ভয়ই হয়েছিল। এ ঝড় আর বাড়লে এ পাকা বাড়ীটাও হয়তো ধ্বসে যাবে। অন্ততঃ দোতলার কিছুটা বা সবটাই হয়তো যাবে। উপর ছেড়ে সকলে এসে নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

মৃত্যুভয়ে বিমলার কান্না সব থেকে বেশী বিব্রত করে তুলেছিল সকলকে। ঠিক সন্ধ্যার সময় তখন। রায়বাড়ীর কালীমন্দিরে সেদিন আরতি হয় নি। নাটমন্দিরে টাঙানো ঝাড়-লণ্ঠনগুলো ছিঁড়ে গিয়ে থামে লেগে বা দেওয়ালে লেগে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে ভাবছিল ভবানী। হঠাৎ ঝড়ের একটা দমকা ঝটকায় ভেঙে পড়েছিল ওই বারান্দার আরও কতকগুলো ঝিলিমিলি এবং একটা থাম ভেঙে পড়েছিল প্রচণ্ড শব্দ করে। সে শব্দে চমকে উঠেছিল সকলেই কিন্তু বিমলা এবার শিশু কমলাকান্তকে কোল থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বুকে হাত রেখে আর্তচিৎকার করে উঠেছিল—মরে যাব, মরে যাব বলে। লাফ দিয়ে উঠে পড়ে পালাতে যাচ্ছিল বেরিয়ে। ভবানী ছুটে গিয়ে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ভয় কি? ভয় কি? কমলাকান্তকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন বীরেশ্বর।

বিমলা চিৎকার করে উঠেছিল—না-না-না। বাড়ী ভেঙে চাপা পড়বে সব, ছেড়ে দাও।

ভবানী বলেছিল—মাকে ডাক দিদি। ভয় কি? যে বাড়ীতে মা রয়েছেন, সেখানে ভয় কি?

—না না, পারব না।

—আমি ডাকছি, তুমি শোন। বলেই সে তার সেই আনন্দিত কণ্ঠের স্বরে স্তোত্র পাঠ করতে শুরু করেছিল।

বীরেশ্বর খাতায় লিখেছেন—সংস্কৃত আমি চর্চা করিনি। বলতে গেলে জানি না বলতে হয়। তবু এদেশের মানুষ হিন্দুর ঘরে জন্ম বলে বুঝতে সেদিন কষ্ট হয় নি। কিন্তু স্তোত্রটি স্মরণ করতে পারছি না। শুধু মনে পড়ছে, আজও কানে বাজছে ভবানীর মধুর কণ্ঠে অন্তরের বিশ্বাস এবং আবেগ-মেশানো কয়েকটি শব্দের একটি কলি। "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।" বার বার ফিরে-ফিরে প্রতি স্তবকের শেষে ওই কথা "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।"

সারা ঘরখানা ভরে উঠেছিল শুধু তার কণ্ঠমাধুর্যে নয় স্তোত্রের শব্দ-ঝঙ্কারেই নয়, ভরে উঠেছিল একটি আশ্চর্য আশ্বাসে। ভবানীর বিশ্বাসের প্রতিধ্বনিই যেন সেই আশ্বাস। সব ক'টি লোক হাতজোড় করে নিশ্চল হয়ে বসে ছিল। বিমলাও হাতজোড় করে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় সেই সময়টাই ছিল ঝড়ের চরমতম বেগের সময়। ঘণ্টাখানেক পর ধীরে ধীরে কম পড়তে শুরু করেছিল। শেষ রাত্রে অনেক শান্ত। প্রাতঃকালে তখনও বাতাস বইলেও আকাশে ঘন কালো মেঘের রাশি দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে ছুটলেও ঝড়ের বিপদ তখন কেটেছে। কিন্তু ওদিকে সারা কীর্তিহাটকে বেড় দিয়ে কাঁসাই হয়েছে দুকূল পাথার। সকালে ভবানীকে দেখেছিলাম ওই ভাঙা বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দুকূল পাথার কাঁসাইয়ের লালচে জলের বিপুল বিস্তারের দিকে। দূর-দূরান্তর পর্যন্ত রক্তাভ জল-রাশির মধ্যে জেগে আছে গাছের মাথা ঘরের চাল। চোখ দিয়ে তার জল গড়াচ্ছিল।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—কাঁদছ?

মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে ভবানী বলেছিল—কত প্রাণ নষ্ট হল? এখনও হচ্ছে। কত দুঃখ বল তো!

—এতে তো মানুষের হাত নেই।

—না। ঈশ্বর এক এক সময় এমন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন! একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—কাল থেকে ভাবছি। কাল—।

—চুপ করলে কেন? কাল কি—

—আচ্ছা, দিদি এত ভয় পাচ্ছিলেন কেন?

—ও তো পাগল। ছেলেমানুষের মত। ঘর চাপা পড়বে বলে ভয়।

—জান!

—কি?

—কাল যেন ভয়ঙ্কর কিছু দেখছিলাম।

—সে তো ভয়ঙ্করই ছিল কালকের রাত্রি।

—না। ওসব ছাড়াও।

—সেটা আবার কি?

—ঠিক তো বলতে পারব না। বোঝাতেও পারব না। কিন্তু ভয়ঙ্কর ছিল। আমার মনে হয় দিদিও দেখেছিলেন।

বীরেশ্বর হেসে বলেছিলেন, তুমি তো জান আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।

চুপ করে গিয়েছিল ভবানী।

তারপর সে এক সেবাপর্ব। কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের দেবোত্তরের দলিলে ছিল, গ্রামের বিপদে গ্রামবাসীকে সাহায্যের ব্যবস্থা। কতকগুলি শর্ত ছিল। বিপদ-আপদ ঘটলে যে বাড়ীতে ঘটত, সে বাড়ীর লোকে ঠাকুরবাড়ীতে খেতে পেত। এবার গোটা গ্রামের বিপদ। গ্রামে জল ঢুকে ঘরবাড়ীই শুধু ভাঙে নি। ধানের গোলা ডুবেছে বন্যায়। অনেক জায়গায় ধ্বসে গিয়ে ধান ভেসে গেছে। মানুষ মরেছে, ভেসে গেছে ; গরু ছাগল মরেছে। সে দারুণ দুর্দিন।

রায়বাড়ীর সাহায্য-ব্যবস্থা ভবানীর জন্যই সেবার দানছত্র হয়ে উঠেছিল। সে এসে তার সমস্ত গহনা খুলে দিয়ে বলেছিল, এগুলো বিক্রী করে খয়রাতের কাজে লাগিয়ে দাও।

বীরেশ্বর তখন বিমলাকান্তের সঙ্গে বসে এই সাহায্যের ব্যবস্থাই করছিলেন।

বিমলাকান্ত বলেছিলেন, গহনা তুমি রাখ, রায়বাড়ীর সিন্দুকে এখনও টাকার অভাব হয়নি।

লজ্জিত হয়ে ভবানী বলেছিল, আমি কি তাই বলেছি। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠ-বেড়ালীরা বালি মাটি মেখে এসে সেতুর উপর গা-ঝেড়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল।

বিমলাকান্ত বলেছিলেন, তা নিচ্ছি, একখানা কিছু। বাকী তুমি নিয়ে যাও। তবে আজ থেকে তোমার নাম হল কাঠবেড়ালী। কি বল ?

বীরেশ্বর হাসছিলেন, এবার বলেছিলেন—তা মন্দ হবে না জামাইদা, 'স্কুইরিল' বেশ মিষ্টি শোনাবে। 'প্রেটি স্কুইরিল।'

সেবার এই সাহায্য দানসত্র করে তুলেছিলেন বীরেশ্বর রায়, ভবানীর জন্যে।

*　　*　　*

আর একটা ঘটনা মনে পড়েছিল রায়ের। এটা পূর্বের ঘটনার আগের ঘটনা। বিমলা এবং ভবানীর একসঙ্গে সন্তান হয়েছিল, একদিন আগে, একদিন পরে। কালীপূজার পর দুজনকে নিয়েই আসছিলেন কলকাতায়।

তখনও পর্যন্ত বীরেশ্বর ভবানীকে নিয়ে কলকাতায় জানবাজারের বাড়ীতেই বাস করতেন। মধ্যে মধ্যে বজরায় করে আসতেন কীর্তিহাটে। বছরে দু-তিনবার। তার মধ্যে পূজার আগে এসে কালীপূজা পর্যন্ত থেকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় বিমলার হাতের ফোঁটা নিয়ে যমদ্বিতীয়া পার করে কলকাতায় ফিরতেন। সেবার বিমলা সন্তান-সম্ভবা শুনে তাকেও নিয়ে যাচ্ছিলেন কলকাতায়। মৃতবৎসা ব্যাধিগ্রস্তা বিমলাকে প্রতি প্রসবের সময়ই কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই নিয়ে যাচ্ছিলেন। কাঁসাই হয়ে রূপনারায়ণ ধরে ভাগীরথীতে পড়ে উজানে আসতে হত। তখনকার কাল। তখন নদীতে ডাকাতের ভয় ছিল। বিশেষ করে রূপনারায়ণ থেকে ভাগীরথী পর্যন্ত এবং ভাগীরথীর কতকটা পর্যন্ত একদল গোয়ান ডাকাতি করে বেড়াত। এ অঞ্চলে এককালে হিজলীর নবাব, মহিষাদলের রাজারা বর্গীদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য গোয়া থেকে হারমাদী রক্তওয়ালা গোয়ান গোলন্দাজ এনে এখানে বাস করিয়েছিলেন। ইংরেজ অধিকারের পর সে পর্যন্ত প্রায় আশী-নব্বুই বৎসরে দেশে মোটামুটি শান্তি রয়েছে। বর্গীরা আজ নিজেদের দেশেই বিপন্ন, নিজেদের মধ্যে মারামারি করে শক্তিহীন হতমান হয়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে বার বার হেরে সন্ধি করেছে। সন্ধি নামেই সন্ধি আসলে ইংরেজের প্রভুত্ব মানতে হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশে রাজা, জমিদারদের তোপ-

গুলোকে ইংরেজ কতক কেড়ে নিয়ে গেছে, দু-চারটে ছোট তোপ বাড়ীর ফটকে সাজিয়ে রাখতে দিয়েছে বটে, কিন্তু অকেজো করে তবে দিয়েছে। সুতরাং গোয়ান গোলন্দাজদের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। তারা আজ শান্ত কৃষিজীবীতে পরিণত। রাজা, নবাব তাদের জমি-জেরাত দিয়ে স্থায়ীভাবেই বাস করিয়েছিলেন এখানে।

আগে যখন গোলন্দাজী করত তারা, তখন মেজাজ ছিল আলাদা। মিলিটারী মেজাজ। সে মেজাজে তারা চাষ করত না। ভাগে চাষ করত এখানকার হরিজন চাষীরা। যা তারা দিত, তাই নিত। না কুলোলে চাষীর ভাগ কেড়ে নিত। কিন্তু গোলন্দাজী গিয়ে তারা কর্মহীন বেকার হয়ে পরিণত হয়েছে চাষী গৃহস্থে। বুলি হয়ে গেছে বাংলা। পোশাকও হয়ে গেছে বাঙালী পোশাক। মধ্যবিত্ত ভদ্রজনের মতই তারা থাকে। চার্চ আছে। নিজেদের পাদরী পুরুত আছে। এদেশের চাষী গৃহস্থদের মত সন্ধ্যেবেলা খোল বাজিয়ে যীশুর নাম কীর্তন করে। নিজেরাই গান বেঁধে নেয়। এমন কি—"বলরে ভাই মধুর স্বরে—যীশুর নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে? যীশুর নামে গহন বনে মৃত তরু মঞ্জরে।" গানও গায়। ওদের মধ্যে লেখাপড়া আছে, পাদরী পুরুতও বটে, পাঠশালার পণ্ডিতও বটে। সাজগোছের সময় পাতলুন, কোট পরে।

কিন্তু একটা দল, অল্প কিছু লোক, এরা রাজার এলাকার লোক নয়, এরা হিজলীর নবাবের আনা দলের একটা অংশ, এরা শান্ত হয়নি, চাষ ভাল লাগেনি, এরা সেই পূর্বপুরুষের হারমাদি রক্তের নেশায় আজও বুঁদ হয়ে আছে। এক সময় নবাবদের আমীরীর উল্লাস এবং ধারাধরনও এদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের দু-চারটে মেয়ে নবাবী হারেমে ঢুকেছে। মুসলমান আমল শেষ হওয়ার পর এরাও সাধারণ মুসলমানদের দু-দশটা মেয়েকে শাদী করে নিয়ে এসেছে। উর্দু-বাংলা মিশিয়ে কথা বলে। বাঁকা-বাঁকা কথা। এদেরই দু-তিনটে দল আজও নদীতে ডাকাতি করে—নিজেরা ডাকাতি বলে না। বলে হারমাদী। এবং গোঁফে তা দেয়। দুপাশের গালে গালপাট্টা, পাকানো গোঁফ, লম্বা ঝাঁকড়া চুল। সে চুলে মেহেদী মাখিয়ে লাল করে যথাসাধ্য হারমাদ্ হতে চেষ্টা করে। জলে এরা দুর্ধর্ষ। রঙ এদের কটাসেই বটে।

রায়বাড়ীর বজরার সঙ্গে ছিপ আর ডিঙ্গি নৌকোতে অবশ্য চারখানা ছিল। তাতে লাঠিয়াল সড়কীওলা ছিল বিশ-পঁচিশজন। তাদের সর্দার ছিল কীর্তিহাটের ফুলচাঁদ বাগ্দী, আর কাঁথির ফড়িং মালো। ফড়িং মালো এককালে নাকি সাগর দ্বীপের মুখে জঙ্গলে আড্ডা করে জাঁহাবাজী করেছে। বাঘ মেরেছে, হরিণ মেরেছে। মধ্যে মাঝে লুটতরাজও করেছে। এখন বীরেশ্বর রায়ের মত মনিব পেয়ে তার কাছে চাকরি নিয়েছে। আর ফুলচাঁদ বাগ্দী—এ বাড়ীর দু পুরুষের চাকর। বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে শিকারে যায়। বন্দুকে বারুদ গেদে যুগিয়ে দেয় হাতে।

পথে রূপনারাণে পড়ে কিছু আসতে আসতেই খানিকটা ঝড়ো হাওয়া উঠেছিল। বাতাসের উল্টো মুখে চলছিল নৌকো। পথে যেখানে নৌকো বাঁধবার কথা সেখানে পৌঁছুতে দেরী হয়ে গিয়েছিল, ওদিকে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। হঠাৎ উল্টো দিক থেকে বাতাসের মুখে একখানা ছিপ আসছিল তীর-বেগে। সাড়া পড়ে গিয়েছিল ডিঙ্গিতে ডিঙ্গিতে। ছিপখানা ছিল সবের সামনে। তার উপরে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সড়কিওলারা।

ওদিকের ছিপখানা কাছে আসতেই সকলে গুঞ্জন করেছিল, হিজলীর হারমাদি হারামীরা। হুঁসিয়ার।

বীরেশ্বর বন্দুক বের করে হাতে নিয়ে বজরার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। খানিকটা

ঠোকাঠুকি হয়েছিল, তারপরই ওরা পালিয়েছিল, দলবলের জোর দেখে, বন্দুক দেখে। বন্দুক তিনটে ছিল, বীরেশ্বর বারবারই আওয়াজ করেছিলেন। ফুলচাঁদ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বজরার সামনে সড়কি আর ঢাল নিয়ে, সেদিন বন্দুক গেদে তৈরী করে যুগিয়েছিল ভবানী। বিমলার বিচিত্র স্বভাব ছিল, নৌকার দোলায় সে গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ত। সে ঘুমুচ্ছিল।

রায়ের মনে পড়েছিল প্রতিটি ঘটনা। প্রথম তিনি তিনটে বন্দুক গেদে নিয়ে পাশাপাশি রেখে পরের-পর ফায়ার করেছিলেন। তারপর আবার বন্দুকে বারুদ ঠাসবার জন্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন, ভবানী বারুদ ঠাসছে বন্দুকে।

বলেছিলেন—দাও, দাও আমাকে দাও। তুমি পারবে না।

ভবানী বলেছিল—দেখ না পেরেছি কি না? দেখ।

বীরেশ্বর তবু নিজে ঠাসাই আরও শক্ত করবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝেছিলেন ঠাসাই ঠিক হয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্যাপ পরিয়ে ঠিক করে দিয়েছে সব। ছররার সঙ্গে এদেশী জালের কামার কাঠি তাও দিয়েছে। নিজেই বললে ভবানী—কাঠি দিয়েছি, ছররাও দিয়েছি। বন্দুকটা হাতে নিয়ে সাবধানে ফায়ার করেছিলেন রায়। ভেবেছিলেন হয়তো ধাক্কা বেশী দেবে। নয়তো গুলি ছররা বেশী দূর যাবে না। কিন্তু তা কিছুই হয় নি। ফায়ার করে বন্দুকটা নামাতে নামাতে সে আর একটা বন্দুক হাতে তুলে দিয়েছিল। এই সময়ে বিমলার ঘুম ভেঙে সে চিৎকার শুরু করেছিল ভয়ে।

ডাকাতেরা পালিয়েছিল, ওদের একজন বোধ হয় মরেছিল। জলে পড়ে ভেসে গিয়েছিল। একজন জখম হয়েছিল। এ পক্ষের ক্ষতি কিছু হয় নি। বন্দুকের গুলির ভয়েই তারা কাছে ঘেঁষে নি, দূরত্ব রেখে বাতাসের মুখে চলে গিয়েছিল উল্টো মুখে।

ভবানীর শুধু এইটুকুই সব নয়। সে মাস্টার বাপের কাছে ইংরিজী কিছুটা শিখেছিল, বাংলা ভাল জানত, সংস্কৃত যাকে জানা বলে তা জানত না, তবে শ্লোকস্তোত্র তার কণ্ঠস্থ ছিল। পুজা-পদ্ধতি জানত। সোমেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর বীরেশ্বর রায় যখন কীর্তিহাটে এসেছিলেন তখন কিছুদিন সে কালীমায়ের পুরোহিত রায়বংশের প্রথম পুরুষ কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের গুরু-বংশের জ্ঞাতিসন্তান রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের কাছে দীক্ষা নিয়ে কিছুদিন শাস্ত্র পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতও কিছু শিখেছিল। সেই সময় বর্ধমানের মহারাজা বাহাদুরের রামায়ণ, মহাভারত এসেছিল তাঁদের বাড়ী। মহারাজার মেদিনীপুরে অনেক জমিদারী। বাগড়ী পরগনা তাঁদের অধীনে অনেকটা পত্তনী নিয়েছিলেন সোমেশ্বর রায়। সেই সূত্রে মহারাজার প্রীতিভাজন ছিলেন রায়েরা। এই রামায়ণ, মহাভারত পড়ে ভবানী বলেছিল, তুমি এমনি কীর্তি কিছু কর না! তোমার তো অনেক আছে।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তুমি বলছ?

—হ্যাঁ বলছি। এইভাবে লেখা থাকবে তোমার নাম।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কি
মহর্ষি মহাকবি বাল্মীকি বিরচিত
মহাগ্রন্থ বীরেশ্বর দেবশর্মা কর্তৃক মূল
সংস্কৃত হইতে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত।

উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন বীরেশ্বর। তিনি বলেছিলেন—নিশ্চয় করব। জান ভবানী, আগে অন্ত রকম ছিলাম। এদেশের এইসব ধর্মকর্ম আচার-বিচার কিছু ভাল লাগত না আমার। রেভারেণ্ড ছিল আমাকে পড়াতেন, ইংরিজী শিখিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এ সবকিছুকে ঘেন্না করতে

শিখিয়েছিলেন। দেবতা পূজার্চনা কত মিথ্যে এ-সব বলতেন। তাতে শুধু হিন্দুর দেবতা পূজো আচার-বিচারই মিথ্যে হয়ে যায়নি, ঈশ্বরও মিথ্যে হয়ে গিয়েছে আমার কাছে। তোমাকে পেয়ে আজ একটু একটু করে বুঝতে পারছি, এসবের মধ্যেও মহিমা আছে, সত্য আছে। মত আজও আমার ঠিক পাল্টায় নি। তবে বুঝছি আছে, কিছু আছে। ওদের বাইবেলে যে সব সেণ্টের কথা আছে, আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যে তেমন সেণ্ট অনেক আছে। ওদের যীশু আছেন, আমাদের কৃষ্ণকে না মানি, রামকে না মানি, বুদ্ধ আছেন। পাপ ওদের অনেক, আমাদের থেকে অনেক বেশী। এদেশে রবিনসন যা করছে তা দেখছি। আমার ঠাকুরদাদা লোকে বলে ঘুষ নিতেন। ওরা বেশী বলে। কিন্তু ক্লাইভ হেস্টিংস যে টাকা ঘুষ নিয়েছে তার তুলনায় তা কি? আগে এগুলো জেনেও যেন জানতাম না। ভাবতাম না। তোমাকে পেয়ে ভাবছি। ঈশ্বর না মানতে পারি, ধর্ম না মানি, সদাচার মেনে মনে আনন্দ পাচ্ছি। ভাল লাগছে। কীর্তি করব। করব বইকি। এ সব সদ্‌গ্রন্থ। অনুবাদ করাব। ইস্কুল দেবার ইচ্ছে আছে। আরও অনেক কীর্তি।

বীরেশ্বর রায় লিখেছেন খাতায়—অনেক রাত্রির দীর্ঘক্ষণ এই কীর্তির একটা ফিরিস্তি করতাম দুজনে। বিবি মহলে দোতলার উপর গোল ছত্রির তলায় বসে কথা হত। নিচে কাঁসাইয়ের স্রোতের একটা একটানা শব্দ উঠত। ওপারে সিদ্ধপীঠের জঙ্গলে ঝিঁঝির ডাক উঠত। এক একদিন কেউ ডেকে উঠত। আমি বীরেশ্বর রায় ফেউয়ের ডাকে উৎকর্ণ হয়ে উঠে চঞ্চল হতাম। সে হেসে বলত, অমনি রক্ত গরম হয়ে উঠল তো? না।

সে বুঝত, আমার প্রিয় বন্দুক মনে পড়েছে। আমার চোখের দৃষ্টি কাঁসাইয়ের ওপারে জঙ্গলের অন্ধকারে চলে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুঁজছে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আগুনের আঙরার মত জ্বলন্ত দুটো গোল চোখ।

—পাখী নয়, হরিণ নয়। এ বাঘ। বাঘ মারব না?

সে বলত—বাঘ যখন মানুষ মারবে, গরু মারবে তখন মানুষ বাধ্য হয়ে মারবে বাঘকে। তখন দোষ হবে না। কেউ যতক্ষণ ক্ষতি না করে ততক্ষণ কেন মারবে বল? এ পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মানুষও তৈরী করেছেন, বাঘও তৈরী করেছেন। বাঘ বনে থাকে থাকুক। মানুষের ঘর চড়াও যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ তুমি চড়াও হয়ে মারবে কেন?

যুক্তিগুলো দুর্বল, অন্যে কেউ বললে ব্যঙ্গ করতাম, হয়তো বা ধমক দিতাম, মূর্খ বলতাম। কিন্তু তার মুখে এমন মানাত কথাগুলি এবং এমন সরল সহজভাবে সে বলত যে আমারও মনে হত, তাই তো। কথা তো ঠিক!

নারীপ্রণয়মুগ্ধ পুরুষেরা কামান্ধ হয়ে বোকা হয়ে যায়। কিন্তু এ তা নয়, আমি বোকা হতাম না।

জল-জল। কিন্তু আকাশ থেকে যে জল ঝরে সে জল নির্মল, তুমি খুঁটি পুতে চাদর টাঙিয়ে সে জল পাত্রে ধর, সে জল ফিল্টার করা জল থেকেও নির্মল। সেই জল মাটিতে পড়ে পঙ্কিল। একই কথা। ভবানীর মুখে সে ওই আকাশের ঝরা জল। ওই কথা পণ্ডিত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের মুখে ফিল্টার-করা জল। রেভারেণ্ড হিলের মুখেও তাই। সাধারণের মুখে ওই কথাই, বোকার কথা, নির্বুদ্ধিতার এবং অদৃষ্টবাদিতার পঙ্ক মেশানো কথা। তারা যখন বলে কপালে ছিল বলে বাঘে ধরেছে, তখন তাদের পিঠে চাবুক মেরে বলতে ইচ্ছে করে, এও তোর কপালে ছিল।

ভবানী, আশ্চর্য ভবানী! কিন্তু সেই ভবানী—। এ কি করে হল। কেমন করে হল? রায়ের খাতায় আছে, শব্দকল্পদ্রুম উল্টে দেখছি সারাদিন, আর ভাবছি।

৮

এরই মধ্যে কীর্তিহাটের ম্যানেজার নায়েব এসে এত্তেলা পাঠিয়েছিল। শব্দকল্পদ্রুমখানা সরিয়ে রেখে রায় বলেছিলেন, আসতে বল।

ঘোষাল-নায়েব এসে বসে বলেছিল—কি হল?

রায় বললেন—শীলেদের সঙ্গে মহিষাদলের একটা মিটমাট হচ্ছে।

—মিটমাট হচ্ছে? বিস্মিত হল ঘোষাল। মিটমাট হবার তো কথা নয়। মহিষাদলে ওরা ক্রোক পরোয়ানা নিয়ে গেলে শীলেদের লোকের তো প্রাণ যায়-যায় হয়েছিল। গড়ের দরজা বন্ধ করে ভিতরে লোকজন তৈরী রেখেছিল। জোর করে ঢুকলে একটি প্রাণীকে ফিরতে হত না। কালেক্টার-সাহেবকে মেদিনীপুর থেকে এনে তাঁকে নিয়ে ঢুকেছিল। শীলদের এক ছেলে বলছিলেন, ভগবান এসে বললেও মিটমাট করব না।

বীরেশ্বর বললেন, সে হয়তো জেদের মুখে সে সময় বলে থাকবেন ওঁরা। কিন্তু পরে ওঁরা বুঝেছিলেন। মহাজনী ওঁরা করেন, ব্যবসা ওঁদের। কিন্তু হাজার হলেও মতি শীল মশায়ের বংশ। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে বড় হয়েছিলেন। দান ধ্যানে সদাশয় লোক। তাঁর বংশ তো!

—তোমাকে, মানে—মনবুঝানো কথা বলে নি তো?

—না। আমি ওঁদের বাড়ী যাই নি। ওঁরা আমাকে বলেন নি। বললেন স্বয়ং রাজাবাহাদুর রাধাকান্ত দেব। তাঁর খবর মিথ্যে হতে পারে না। নিজে সঠিক না জেনে কথা বলবার লোক নন তিনি।

—হ্যাঁ, তা নন। ঘোষাল চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল। রায় বুঝলেন—মহিষাদলের প্রতি ঘোষালের এ বিরাগ আপোসের সংবাদে সন্তুষ্ট হয় নি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঘোষাল বললে, তা হলে আমি চলে যাই আজই। তা ভালই হল। রবিনসন পাচ্ছে না! সেই ভয়টাই আমার ভয়।

জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রায় বললেন, কাল সকালে যাবেন। এখন জল-ঝড় কালবৈশাখীর সময়। এই বিকেল মাথায় করে যাওয়া ঠিক হবে না। আর কথাও কিছু আছে।

ঘোষাল বললে, সেটা এই সময় হওয়াই ভাল নয়? মানে সন্ধ্যার সময় তো—।

সন্ধ্যার সময় সোফিয়াকে নিয়ে মজলিশের কথা ইঙ্গিতে বললেন ঘোষাল। বীরেশ্বর বললেন, তাই হোক। বসুন। মহিষাদলের কথাটাই আগে বলে নিই। রাজাবাহাদুর বললেন, মিটমাটের শর্ত অনুযায়ী এখন এক লাখ দিতে হবে, বাকী টাকার জন্যে কিস্তীবন্দী হবে। ওঁরা হয়তো আপাততঃ টাকার জন্যেও বটে, আর নিয়মিত খাজনা পাবার জন্যেও বটে—কিছু-কিছু লাট পত্তনী বিলি করতে পারেন।

একটু থেমে ভাবলেন রায়। সম্পত্তিতে তাঁর আকর্ষণ নেই। কিসের আকর্ষণ? ভবানী নেই। সন্তান নেই। কিসের জন্য, কার জন্যে সম্পত্তি? সব ভেঙে-চুরে বিলিয়ে দিয়ে যেতে

পারলে তাঁর তৃপ্তি। বিমলাকান্তের সন্তানের জন্তে, বংশের জন্তে—। ভাবলে পাথরে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয় তাঁর। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। সে দীর্ঘনিঃশ্বাসে মুখ তুলে তাকালে ঘোষাল। কিন্তু বলতে কিছু সাহস করলে না।

বীরেশ্বর নিজেই বললেন, সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে হয় না কিনতে। কি হবে সম্পত্তি বাড়িয়ে? তবু—

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তবু ভূমি বিশেষ করে এখন জমিদারী স্বত্বের ভূমি একরকম রাজত্ব। ও পরহস্তগত হলে সহজে পাওয়া যাবে না। আগের কাল নেই যে, জবরদস্তি করে, গায়ের জোরে দখল করা যায়। যতক্ষণ বেঁচে থাকতে হবে, ততক্ষণ মান-সম্মানের জন্তও করতে হবে। কিনতে বা পত্তনী নিতে হবে। নেওয়া উচিত।

ঘোষাল বললে—তা আর বলতে? তা ছাড়া মা-লক্ষ্মী একরকম যেচে আসতে চাচ্ছেন। 'যাচা কনে, কাচা কাপড় আর বাছাই ভূমি' এ পেয়ে ছাড়লে ঠকতে হয়।

—হ্যা। দেখুন, ওঁরা কোন্ কোন্ সম্পত্তি পত্তনী বিলি করবেন। যা দেবেন আমরাও নিতে প্রস্তুত জানিয়ে দেবেন। বরং একদিন নিজে যাবেন। আপনি ওঁদের সম্পত্তির বিবরণও সব জানেন। বোধ হয় বৃদ্ধির আয়ও আছে, ঠকতে হবে না।

—তা আছে। যথেষ্ট আছে। খাজনা ওদের কমই বটে। টাকায় টাকা বাড়লেও বেশী হবে না। হ্যাঁ, এবার আমি মহলে মহলে ইস্তাহার পাঠিয়েছি, এবার শতকরা সিকি বৃদ্ধি দিতে হবে। কোন আপত্তি শোনা হবে না। দক্ষিণের জমিদারেরা তামাম বছরে দুবার-তিনবার 'মাঙন' আদায় করছে। হয় মেয়ের বিয়ে, নয় ছেলের পৈতে, নয় শ্রাদ্ধ। সুলতান-পুরের বাবুরা তো বাড়ী করবার জন্তে 'মাঙন' নিয়েছে। গতবার নিয়েছে, এবারও নেবে। আমাদের মাঙন একবার কালীপুজোর সময় মায়ের নামে। বিয়েতে দুবার মাঙন আদায় হয়েছিল, সে বিমলা-মার বিয়ের সময় একবার, তোমার বিয়ের সময় একবার। সে ধর, অনেককাল আগের কথা। ওই জগন্নাথপুরে জমিদার খাজনা বাকীর দায়ে জেলে গেল। সেরেস্তা থেকে গারদ মাঙন আদায় হল। আমাদের সে সব নেই। মায়ের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন, রায়বাড়ীতে বংশবৃদ্ধি নাই। অন্নপ্রাশন, পৈতে, বিয়ে এ সব তো নেই। তা বলে আমরা প্রাপ্য পাব না কেন? এত বড় এস্টেট, চলবে কি করে? কোম্পানীর বন্দোবস্তে মৌজা-লাটের ডৌল আদায়ের দশ ভাগ কোম্পানীর ঘরে দিয়ে এক ভাগ জমিদার পায়। তা কতটুকু? আমি ভেবেছি, এবার সিকি বৃদ্ধি করব।

রায় বললেন, বাবার আমলে একবার বৃদ্ধি হয়েছে। অবশ্য তা অনেক দিন হল।

ঘোষাল বাধা দিয়ে বললে—সেটাকে বৃদ্ধি আমি বলব কেন? সেটা তো লিমিটেশান এ্যাক্ট বাবদ খাজনা বাকী থাকলে সিকি ধরাটা আমাদের প্রাপ্য। সুদ। আগের কালে তামাদি ছিল না। কোম্পানী তামাদি আইন করে ওটা চালালে। বৃদ্ধি আলাদা ব্যাপার। আমরা বিনা কারণে বৃদ্ধি চাচ্ছি না। দেশের জিনিস-পত্তরের দাম বাড়ছে। ধানের দর বাড়ছে। তা ছাড়া আমরা নদীর ধারে বাঁধ দিয়েছি, মাঠে পুকুর কাটিয়েছি, আমরা বৃদ্ধির হকদার।

—বেশ তা করুন। কিন্তু তার আগে কালেক্টারকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। মেদিনীপুরে উকীলকে বলুন, একটু খোঁজ-খবর ভাল করে রাখতে; মানে চাঁদা-টাঁদার কথা উঠলে চাঁদাটা যেন সকলের আগে আমাদের দেওয়া হয়। বড়দিনে ভেট-টেটগুলো বেশ ভাল করে দেওয়া হয়। নইলে ও বেটারা পিছনে লাগবে। এতবড় মানুষ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর,

তাঁর সঙ্গে প্রজার লাগল ঝগড়া, কালেক্টর বেটা লাগলে প্রজার হয়ে ঠাকুরমশায়ের পিছনে। জানেন তো ?

—হ্যাঁ, তা জানি বৈকি। তবে তোমার একটু যাওয়া দরকার, মধ্যে মধ্যে সেলাম-টেলাম দেওয়া কথাবার্তা বলা, এ হলে আর কোন গোলমাল থাকে না।

—আচ্ছা এবার গিয়ে মেদিনীপুর যাব। আপনাকে বলেই রাখি, একটা ইস্কুল ওখানে করবার ইচ্ছে আছে। বিদ্যেসাগর মশায় একদিন বলছিলেন, আজ আবার দেবমশায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হল। সব জমিদারই কিছু কিছু এসব কাজ করছে। আমাদের কিছু না করাটা খুব ভাল দেখাচ্ছে না। ইতিমধ্যে আপনি মেদিনীপুরে হেডমাস্টার রাজমোহন বসুর সঙ্গে দেখা করবেন। বলবেন, আমরা একটি এম-ই স্কুল দিতে চাই। উনি যদি কি ভাবে কি করা উচিত পরামর্শ দেন তো উপকৃত হব, কৃতজ্ঞ থাকব।

নায়েব গিরীন্দ্র ঘোষাল বললে, তাহলে একটা মাঙনও ধরব এবার।

—বেশী হবে না ?

—না না। প্রজার কাছে না নিলে রাজা পাবে কোথা ? সে আমি সব ঠিক করব, কোন চিন্তা তুমি করো না। তাহলে কাল প্রত্যুষেই চলে যাব আমি। আমি একবার কালীঘাট ঘুরে আসব। এতদূর এসেছি মাকে প্রণাম করে আসি। এতবড় তীর্থ।

নায়েব চলে গেল।

চাকর এসে ঘরে ঢুকল, তার হাতে ট্রের উপর বোতল গ্লাস। এসে সে টেবিলের ওপর রাখলে। হুজুর আজ সকাল থেকে এ দ্রব্য ছোঁন নি। সেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফিরেছেন বারোটার সময় তারপর ফিরে এসে থেকে একটা মোটা বই নিয়ে পড়ছেন, দেখছেন। এর জন্ম হুকুম করেন নি। তারপর এল কীর্তিহাটের নায়েব ম্যানেজার। তাকে কাকা বলে হুজুর খাতির করেন। সে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েই আছে সেই থেকে। এবার সে নায়েব চলে যেতেই ঢুকল ঘরে। তার সঙ্গে আরও খবর আছে। বউবাজার থেকে সোফিয়া বাঈয়ের বাড়ী থেকে লোক এসেছে। বলছে জরুরী খবর।

রায় বোতল গ্লাস দেখে তৃষ্ণার্ত অনুভব করলেন নিজেকে। বোতলটা খুলে পানীয় ঢাললেন গ্লাসে।

চাকর বললে, বউবাজার থেকে বাঈ-সাহেবের বাড়ী থেকে লোক এসেছে।

এ সময় সোফিয়ার লোক ? মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল তাঁর।

টাকা ? অথবা। অথবা আর কি হতে পারে ? টাকা। অথচ মনটা তাঁর এখন যেন অন্যরকম হয়ে আছে। যে রকমটা সাধারণতঃ হয় না। রাজাবাহাদুরের বাড়ী থেকেই মন যেন জলের ঘূর্ণির মত ঘুরছে। নিচে থেকে ঘুলিয়ে ভেসে উঠছে অতীতকালের কথা। সে কথা তিনি শুধু মদ খেয়ে ভুলে থাকেন। ভবানী !

সামনের ছবিটার দিকে তাকালেন তিনি। অয়েল-পেন্টিংটা যেন জীবন্ত। শখ করে বিয়ের বছর-দেড়েক পর তিনি সাহেব চিত্রকরকে দিয়ে এ ছবি আঁকিয়েছিলেন। নিজে বসে থাকতেন, ভবানীর পাশে, সাহেব ছবি আঁকত ভবানীকে দেখে। তাঁর নিজের ছবিও আঁকিয়েছিলেন। সেটা আছে নিচের মজলিশের ঘরে। এ ছবিটা এখানেই আছে গোড়া থেকে। এই ঘরেই তিনি সে সময় ভবানীকে নিয়ে বসতেন। সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিতেন। ভবানী গান গাইত, তিনি বাজাতেন। তারপর এইখানেই সোফিয়াকে নিয়ে তিনি মজলিশ করেন। ছবিটা রেখেছেন, সরান নি আক্রোশবশে। মনে মনে বলেন, দেখ, তুমি দেখ !

মনে মনে যেদিন অতীত মনে পড়ে যায়, এবং ছবির দিকে তাকান, সেদিনও বলেন, আবার হঠাৎ যেদিন ছবির দিকে চোখ পড়ে, সেদিনও অতীত কথা মনে হয়, সেদিনও বলেন, এবং সোফিয়াকে টেনে নেন কাছে।

কত দিন উন্মত্তের মত সোফিয়াকে দুই হাতের উপর ছোট্ট মেয়েটির মত তুলে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিয়ে খেলা করেন, আর বলেন, দেখ-দেখ। ছবির মুখ যেমনকার তেমনি থাকে, তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বীরেশ্বর। মদের ঘোরে পরিপূর্ণ অবয়বের ছবিখানা তাঁর কাছে জীবিত ভবানী বলেই মনে হয়।

সোফিয়াও গুণবতী, সোফিয়া ভবানী থেকে অনেক সুন্দরী। সেকালের নেকী বাঈজী, বিখ্যাত বাঈজী ছিল। সোফিয়া হয়তো তেমনি বিখ্যাত হতে পারত। কিন্তু সেও বীরেশ্বর রায়ের প্রেমে পড়েছে। সে তাঁকে সত্যই ভালবাসে। নিজেকে বলে আমি হুজুরের বাঁদী। হুজুরের পায়ের আওয়াজ আমার কলিজায় পাখোয়াজের বোল বলে।

সে কথা বিশ্বাস করেন রায়। কিন্তু তবু আজ এই সময়টিতে তাঁর ভাল লাগল না সোফিয়ার লোকের সঙ্গে কথা বলতে। এ মাসের টাকা এখনও পায় নি সোফিয়া, দেওয়া হয় নি। কালই ভেবেছিলেন দেবেন। টাকাটা কাল সকালেই হেরম্ব ঘোষ জমা করে দিয়ে গেছে। কিন্তু কাল ওই পাগলা তান্ত্রিক সব ভণ্ডুল করে দিয়ে চলে গেল। এমন ভয় পেলে সোফিয়া যে থরথর করে কাঁপছিল সে। চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টি মনে পড়ছে রায়ের। তাড়াতাড়ি পাল্কী ডেকে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, টাকাটা দেবার কথা তাঁর মনেই হয় নি।

হাজার হলেও তওয়াইফ, কসবী। নিজেকে বেচেই সে খায়, সঞ্চয় করে; দুনিয়াতে ওই তার সান্ত্বনা, ওতেই তার সুখ; টাকা ভুলতে সে পারে না!

বীরেশ্বর বললেন—ডাক তাকে।

লোকটা এসে তাঁকে নিচু হয়ে কুর্নিশের ভঙ্গিতে সেলাম করে দাঁড়াল।

রায় বললেন—কি খবর? রূপাইয়া?

লোকটা আবার সেলাম ঠুকে বললে—জনাবালীর মেহেরবাণীতে বাঈয়ের খানাপিনা-আরাম সব কিছু চলে। বহুৎ জরুরৎ হয়ে গেছে—রূপাইয়ার, কেও কি কাল রাত থেকে বাঈয়ের খুব বুখার। একদম বেহোঁস! বাঈয়ের বুড়ী আম্মাজান হেকিম ডেকেছিল, দেখে গেছে সে। বলে গেল কি—বুখারে ভুগবে মনে হচ্ছে। আম্মাজানের হাতে রূপাইয়া নাই। তা আম্মা বললে, তুই যা বসীর, রাজাসাহেবের কাছে, রূপাইয়া নিয়ে আয় আর খবর ভি দিয়ে আয়, কি সোফিয়ার ভারী বুখার! যা করতে হয় করতে বল।

সবিস্ময়ে রায় বললেন—একদম বেহোঁস? এমন বুখার?

—জী হুজুর!

—হুঁ! কেমন হেকিম ডেকেছিলে? বড় কেউ, না, যেমন-তেমন একটা কেউ?

—ভাল হেকিম সে বটে। কিন্তু বড় কেউ নয়। তবে—

—কি তবে?

—বাঈ বুখারের ঘোরে বিড়-বিড় করে বকছে। বলছে, হুজুর কাল সেই হিন্দুসাধুর কথা। আমি শুনেছি। মাফি কিয়া যায় হুজুরৎ। মাফি কিয়া যায় বলছে। মধ্যে মধ্যে চিল্লাচ্ছে, মর যাউঙ্গী মর মর যাউঙ্গী! আম্মাজানকে কাল বাঈ বলেছিল, এখানকার সব বাত। আম্মা ভাবছে, হেকিম দেখে গিয়েছে গিয়েছে। এখন সেই সাধুর দরবারে গিয়ে পড়বে। তা তার পাত্তা-উত্তা তো কুছ মালুম নেহি, মালুম জরুর হুজুর-বাহাদুরের আছে। আম্মাজান সে আর্জিও

জানিয়েছে রাজাসাহেবের কাছে, কি সেই হুজরতকে বলে-কয়ে যদি নিয়ে আসেন!

বীরেশ্বর বললেন, ও সাধুর পাত্তা মেলে চৌরিঙ্গীর ময়দানে। তা দেখব আমি। বুঝেছ। আর রূপাইয়া নিয়ে যাও, এখন একশ নিয়ে যায়ও। আমি একবার না হয় যাব বাঈসাহেবার বাড়ী। সমঝা?

সেলাম করে বসীর বলল, হাঁ হুজুর। বিলকুল সব সমঝা গিয়া। বসীর চলে গেলে বীরেশ্বর রায় নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন, সোফিয়াকে অভিসম্পাত দিয়ে গেল পাগল?

না? না, কিছু দেখে যেন ভয়ে-পালিয়ে গেল?

* * *

সুরেশ্বর বললে, পড়তে পড়তে আমার ক্লান্তি আসছিল সুলতা। হয়তো তোমারও ক্লান্তি আসছে শুনতে শুনতে। আমি বুঝতে পারছিলাম না, বীরেশ্বর রায় যিনি স্মরণীয় ঘটনাই শুধু লেখেন তিনি ওই সোফিয়ার অসুখের খবরের মত খবরও লিখেছেন কেন? ওই পাগল নিয়েই বা এতখানি লিখেছেন কেন? নাস্তিক বীরেশ্বর রায়। অবশ্য নাস্তিক হওয়া সেকালে সোজা কথা ছিল না। কারণ কালটার উদয়াস্ত আস্তিকতার মধ্যে। সেকালের বাতাসে শুধু অক্সিজেনই ছিল না, তার সঙ্গে আস্তিক্যবাদও ছিল। তবু বীরেশ্বর রায় নাস্তিক হতে চেষ্টা করেছিলেন। পৃথিবীর ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি জীবনে সবকিছুর উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তাঁর স্মরণীয় ঘটনার বিবরণের মধ্যে প্রশ্ন থাকত না। একটা সিদ্ধান্ত করে তাতে তিনি পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছেন। আজ তাঁর স্মরণীয় বৃত্তান্তের মধ্যে এত প্রশ্নচিহ্ন কেন?

এবার তার যেন একটা উত্তর পেলাম!

স্মরণীয় বৃত্তান্তে একটা ছত্র পেলাম এবার। আজকার দিনটি আমার এ পর্যন্ত জীবনের মধ্যে বোধ হয় সর্বোত্তম বিস্ময়ের দিন! Greatest surprise—শব্দ ব্যবহার করে তৃপ্ত হন নি, লিখেছেন—It is something more than surprise—যার কোন উত্তর আমি খুঁজে পাই নি! আমি ভেবে পাই নি, রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের মত বিস্ময়কর মানুষ কেমন করে হয়? বিপুল সম্পদ, কলকাতার সমাজে এত সম্মান, এত পাণ্ডিত্য, সে মানুষ এমন বিনয়ী মিষ্টভাষী মধুরপ্রকৃতির কেমন করে হয়? বিমলাকান্ত—সে কেমন করে আমার সম্পর্কে এত প্রশংসা করে যায়! বিমলাকান্ত সম্পর্কে বুঝতে পারি, হয়তো সে অতিকুলীন, অতিজটিল। কিন্তু সত্যই কি তাই? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে এটা একটা প্রশ্নই। আমি যে উত্তরটা বের করেছি, সেটা ঠিক নয়।

এই প্রশ্নের একটা ছোঁয়াচ যেন সংক্রামক ব্যধির মত আমাকে আক্রমণ করেছে। প্রশ্ন জাগছে, এত দিন যা ভেবে এসেছি, তাও কি তবে সত্য নয়?

মিথ্যাও তো বলতে পারব না! আমার চোখের ভ্রান্তি হতে পারে। ভ্রান্তি কি সকলের চোখেই হয়েছে?

মনে পড়ছে, কাঁসাইয়ের ওপারে মহিষাদলের রাজাবাহাদুরের এলাকায় 'সতীঘাট'। আমার জন্মের কিছুকাল পরে সতীদাহ প্রথা উঠিয়ে দেবার পরও গর্গ-বংশের এক রাণী সতী হয়েছিলেন। সে বিবরণ শুনেছি।

কীর্তিহাটে ভবানীর চিতায় যদি তেমনি সতীঘাট হত? কাঁসাইয়ের ঘাটের কাছের দহটায় যদি ভবানীর দেহটা ভেসে উঠত, তবে আমি একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করে নাম দিতাম দেবীঘাট। কিন্তু কোথায় গেল দেহটা? বিচিত্র ব্যাপার, জয়নগরে লোক পাঠিয়ে তার বাপকেও পাই নি। তার বাপ চলে গেছেন কলকাতায়। আজও পর্যন্ত ফেরেন নি। তারপর খবর পেয়েছি,

চলে গেছেন কাশী। দেশে কয়েকদিনের জন্য ফিরে বিষয়ের ব্যবস্থা করে কাশী চলে গেছেন।

আজ রাজাবাহাদুর বললেন, বিমলাকান্তের এক ভগ্নীর কথা। কে সে ভগ্নী? তার কোন ভগ্নী ছিল বলে তো শুনি নি! কে সে?

এত প্রশ্নের উত্তর একটি উত্তরে মেটে।

ভবানীর মৃতদেহটা কোথায়?

জানতে পারলে নতুন জীবনে বাঁচতে পারি আমি। আমার সমস্ত সম্পদ দিয়ে অনেক কাজ করি। সর্বাগ্রে একটা ইস্কুল করি। দীঘি কাটাই। পুরাণের অনুবাদ প্রকাশ করে বিলি করি।

সারাটা দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ভাবনা ভাবলাম। দিনে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। না ভবানীকে নয়। সোফিয়াকেও নয়। স্বপ্ন দেখেছি একটি অবগুণ্ঠিতা নারীকে, তার মুখ কিছুতেই খুলতে পারলাম না। সন্ধ্যায় ছাদের উপর পায়চারি করছিলাম, আর ওই স্বপ্নের কথাই ভাবছিলাম। কে?

এর আগে পর্যন্ত স্বপ্ন দেখে কখনও এত চঞ্চল হই নি। হঠাৎ মনে পড়ল সোফিয়ার কথা। গাড়ী জুততে বললাম। কথা দিয়েছি, যেতে হবে। আজ যেন সোফিয়ার আকর্ষণটাও কত দুর্বল হয়ে গেছে। মনকে প্রশ্ন করলাম, সোফিয়া পুরনো হয়েছে?

না। কোন নতুন নারীর মুখও তো মনে পড়ছে না। মনে হচ্ছে, এই ধরনের দিন-যাপন ধারার উপরেই একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করছি।

নারীর মুখ মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে। কি প্রতিষ্ঠাময় জীবন। কত সম্মান। কত আনন্দ রাজাবাহাদুরের। কত সম্ভ্রম ওই মানুষটির। এইরকম জীবনের আকর্ষণেই যেন সোফিয়ার উপর আকর্ষণ চলে গেছে।

ওঃ, এমন জীবনই তো আমি চেয়েছিলাম একদিন। ঘর-সংসার, সন্তান-সন্ততি। বিশাল জমিদারী। দেশময় ছড়িয়ে-পড়া নাম। দান-ধ্যান। উৎসব। কীর্তি। এইসব নিয়ে কতই না কল্পনা করেছিলাম।

আজ তার বদলে আমি কোথায় চলে এসেছি। ওঃ—অনেকদূর। অনেকদূর। তার কারণ, ওই একটি নারী।

বীরেশ্বর রায় সোফিয়াকে দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন। সোফিয়ার গায়ের উত্তাপ বেশী না হলেও সম্পূর্ণরূপে বিকারগ্রস্ত। চোখদুটো ঘোর লাল। আর বিড়-বিড় করে প্রলাপ বকে যাচ্ছে।

বসীর যা বলেছিল ঠিক তাই। মৃদু কণ্ঠস্বর, আধখানা-আধখানা কথা, কান পেতে শুনলেন বীরেশ্বর। তার মধ্যে বার বার শুনলেন, মাফি মাংতি হুঁ—জেরৎ মাফি মাংতি। মধ্যে মধ্যে ভয়ার্তের মত চীৎকার করছে।

সোফিয়ার আম্মা বললে—হেকিম আজ দু-দুবার এসেছিল। সে বলছে—মগজমে খুন চড় গিয়া হোগা।

মাথায় রক্ত চড়েছে। কথাটা মনে লাগল বীরেশ্বরের।

সোফিয়ার আম্মা বললে—জোঁক ধরাতে বলছে। মাথায় জোঁক ধরালে রক্তটা টেনে বের করে নেবে। কিন্তু এ বিশ্বাস হচ্ছে না আমার বাবুসাহেব। আমি তাকে কালকের সেই সাধুর কথা বলেছি। তা শুনে সে ভড়কে গেছে। বলে গেছে—মালুম হোতা কি তুমি যা বলছ, তাই ঠিক। বিড় বিড় করে বলছেও তাই। তুমি দেখ সন্ধান কর—সে হিন্দু

ফকিরকে খুঁজে তাকে গিয়ে পহেলে ধর। যদি তাতেও কিছু না হয়, তখন জোঁক ধরাব। আগে তাই দেখ। নয়তো বড় মসজিদে গিয়ে কোন মুসলমান ফকিরকে ধর, সে যদি এর কোন কাটান দিতে পারে। বাবুসাহেব, সোফিয়া তোমারই বাঁদী হয়ে আছে, মেহেরবাণী করে সেই হিন্দু সাধুর পাত্তা লাগাও। তাকে তুমি ধর। নইলে সোফিয়া হয়তো বাঁচবে না। আমি একজন ওঝা ডেকেছিলাম বাবুজী, সে বলে গেছে—উ হিন্দু ফকিরের দুটো জিন আছে, একটা মর্দানা একটা ঔরৎ, সেই ঔরৎটাকে সোফিয়ার কন্ধাপর চড়িয়ে দিয়েছে।

চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে কথা শেষ করলে সে, ওঝা বললে, ঔরৎ জিন বহুৎ জোরদারণী। সে ওই হিন্দু ফকিরের হুকুম ছাড়া নড়বে না।

বীরেশ্বর রায়ের মনে পড়ল কালীপ্রসন্ন সিংহকে। এই মানুষটিকে তাঁর ভারী ভাল লাগে, তাঁকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁর থেকে বয়সে ছোট। এখনও বয়স অল্প, কুড়ি পার হয়নি। এরই মধ্যে সত্যকারের বিচক্ষণ বিদ্বান হয়ে উঠেছেন। রসিক কৌতুকপরায়ণ, কুসংস্কার থেকে মুক্ত। ইংরিজী-জানা হালের মানুষ। তিনি সেদিন গল্প করেছিলেন—এক খুব আধুনিককালের পরিবার, যাঁরা ব্রাহ্ম হয়েছেন, তাঁদের বাড়ীতে একটি মহিলা অসুস্থ হয়েছিলেন। ডাক্তার-বৈদ্যরা কি অসুখ বুঝতে পারেনি। শেষে ওঝা এনেছিলেন তাঁরা, ঝাড়ফুঁক করে সে ভাল করে দিয়েছে মহিলাটিকে।

গল্পটি বলে সিংহ বলেছিলেন—দেখুন, রায়মশায়, কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে, এ বুঝে ওঠা খুব কঠিন। শেক্সপীয়র বলে গেছেন—there are more things in heaven and earth—কথাটা কি এতবড় কবি মিথ্যেই লিখে গেছেন?

সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে থেকেই ভাবছিলেন। সোফিয়ার মুখে একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে। নিষ্ঠুর যন্ত্রণা হচ্ছে তার।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রায় ঠিক করলেন, পাগলকে খুঁজে তিনি যেমন করে হোক বের করবেন। এবং নিয়ে আসবেন।

পাগলের নিজের যন্ত্রণার কথাও মনে পড়ল। নিজের হাতে গলা টিপে ধরে বলে—ছাড়, ছাড়, ছাড়। আঃ-আঃ-আঃ! কখনও কখনও নিজের হাত কামড়ে ধরে রক্ত বের করে ফেলে তবে শান্ত হয়।

সোফিয়ার আম্মা বললে—বাবুসাহেব!

বীরেশ্বর বললেন—আমি তাকে যেখান থেকে পারি নিয়ে আসছি বাঈসাহেবা, তুমি ভেবো না। আমি এখান থেকেই তার খোঁজে বের হবো।

রাত্রিদুপুর পর্যন্ত রায় ঘুরেছিলেন চৌরিঙ্গীর ময়দানে। সন্ধ্যেবেলা তিনি একলা নন, আরও অনেক লোক রানী রাসমণির গঙ্গার ঘাটে যাবার রাস্তাটার উপর দাঁড়িয়েছিল, তারাও খুঁজছিল সাধুকে। একজন বলেছিল—তাহলে সাধুবাবা আজ কালীঘাট তরফে গিয়ে পড়েছে। শুনে বীরেশ্বর গাড়ীতে এসে উঠে বলেছিলেন—চলো কালীঘাট।

কালীঘাট গিয়েও কোন সন্ধান মেলেনি। তারাও সাধুকে জানে, সাধু এদিকে এসে কখনও দাঁড়ায় না; ছুটতে ছুটতে আসে, এসে থমকে দাঁড়ায়, তারপর হঠাৎ ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে উত্তরমুখে ছুটে পালায়। মধ্যে মধ্যে নিজের গলা টিপে ধরে, বলে—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। আঃ-আঃ—। কিন্তু সে তো আজ দু-তিনদিন আসেনি!

রায় আবার ফিরেছিলেন। গঙ্গার ধারের নতুন রাস্তা ধরে গোটা ময়দানটাকে বেড়ে

ঘুরে বেরিয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে গাড়ী থেকে নেমে কান পেতে শুনেছিলেন কোন কথার সাড়া উঠছে কিনা।

আগের দিনে ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টি যথেষ্ট হয়েছিল। চৌরিঙ্গীর পাশের ময়দানটা তখনও পর্যন্ত কাদা-কাদা হয়ে আছে, মধ্যে মধ্যে ঘাসের তলায় খালে জল জমে রয়েছে; বারকয়েক এইরকম জলের তলায় পড়লেন রায়। পোশাক-পরিচ্ছদের তলার দিকটা কাদায় ভরে গেল। জুতোজোড়াটা কাদায়-জলে ভিজে ভারী হয়ে উঠল—তবুও তিনি খুঁজলেন। ওসব দিকে তাঁর খেয়ালই ছিল না।

রাস্তাঘাট সব নির্জন হয়ে গেছে। একেবারে জনশূন্য বললেই চলে। যানবাহন, পাল্কি-ডুলি, গাড়ী-ঘোড়া একখানাও চলছে না। চৌরিঙ্গীর ধারের বাগানওয়ালা সায়েবসুবার বাড়ীর ফটকে আলো জ্বলছে কোম্পানীর নিয়মানুসারে। এদিকে এখন রাস্তার ধারে আলোও হয়েছে। তাও তেল ফুরিয়ে কতকগুলো নিভে গেছে। কতকগুলো মিটমিট্ করছে, আর কিছুক্ষণ পরেই নিভবে। গোটা ময়দানে শুধু ঝিঁঝির ডাক বেজে চলেছে, মধ্যে মধ্যে প্যাঁচা ডাকছে। বাদুর উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে। ঘাসের মধ্যে সাপের মুখে-ধরা ব্যাঙ কাতরাচ্ছে। দুবার শেয়ালেরা সমবেত চীৎকার করে ক্ষান্ত হয়েছে। আর মশা ভনভন করছে কানের পাশে।

সম্ভবত একটা বেজে গেছে। রায় কোচম্যানকে বললেন—আবদুল!

আবদুল চুপচাপ কোচবক্সে বসে ছিল। মধ্যে মধ্যে হাত নেড়ে, চাপড় মেরে মশা তাড়াচ্ছিল। সহিস চারজন রাস্তার ধারে বসেছিল একটা মশাল নিভিয়ে; তারাও মশা তাড়াচ্ছিল আর ভাবছিল—কতক্ষণে রায়হুজুর ক্লান্ত হয়ে বলবেন—চলো, ঘুমাও গাড়ী। হয়তো বা মনে মনে কটুকাটব্যও করছিল। এরই মধ্যে বীরেশ্বর ডাকলেন—আবদুল, আব চলো ঘর।

শুনামাত্র সহিসরা নিভন্ত মশালগুলো জ্বলন্ত মশাল থেকে জ্বালিয়ে নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিল।

বীরেশ্বর রায় কেমন একটা শূন্য মন নিয়েই বাড়ী ফিরছিলেন। মধ্যে মধ্যে চকিতের মত বিস্মিত প্রশ্ন মনে জাগছিল—পাগল গেল কোথায়?

গাড়ী চৌরিঙ্গী ধরে এসে রানী রাসমণির বাড়ীর রাস্তায় ডানদিকে মোড় ফিরে পূবদিকে খানিকটা এসে দক্ষিণমুখে মোড় নিল।

মানুষ সব ঘুমিয়ে গেছে। কয়েকটা পথের কুকুর শুধু তারস্বরে চীৎকার করছে। মনে হচ্ছে যেন কিছু দেখেছে।

রায় জিজ্ঞাসা করলেন—আবদুল, কুত্তারা এমন চিল্লাচ্ছে কেন?

কুকুরের ঝগড়ার স্বর এ নয়। সমবেতভাবে কিছুকে আক্রমণের স্বর। কিছু দেখেছে ওরা। বলেই রায় গাড়ীর দরজা থেকে মুখ বাড়ালেন। দেখলেন, একটা অর্ধ-উলঙ্গ লোক ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে গাড়ীর সামনে খানিকটা আগে চলেছে, তার পিছনে কুকুরগুলো চীৎকার করে তাকে অনুসরণ করছে। রায়ের চিনতে ভুল হল না।—এই তো সেই পাগল! এই তো!

পাগল তাঁর বাড়ীর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। চীৎকার করে উঠল—রায়বাবু! রায়বাবু।

বাড়ীর ফটকের দারোয়ান ভিতর থেকে কি বলছে। কিন্তু পাগল চীৎকার করেই চলেছে—রায়বাবু—রায়বাবু!

সেই মুহূর্তেই গাড়ীখানা গিয়ে ফটকের সামনে দাঁড়াল। মশালধারী সহিস হাঁকলে—দরোয়ানজী।

দারোয়ান গাড়ীর শব্দ পেয়ে দরজা খুলছিল কিন্তু তার আগেই রায় গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন। এবং পাগল সাধুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন—কোথায় ছিলে তুমি? কোথা থেকে এলে?

—কে? রায়বাবু? তুমি রায়বাবু?

—হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি? আমি তোমাকে সারা ময়দান খুঁজে এলাম কালীঘাট পর্যন্ত।

পাগল অস্থিরভাবে বললে—দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বর। সেখানেও ঢুকতে পারলাম না। সেই—সেই—সেই পথ আগলালে। সেই—।

—কে? কে পথ আগলালে? কি বল তুমি?

—যে পথ আগলায়। কালীঘাট আগলায়, কামাখ্যায় আগলেছিল—সেই। সেই—। যার ছবি তোমার ঘরে আছে। তোমার ঘরে!

রায় চমকে উঠলেন। বললেন—কোন্ ছবি? কি বলছ তুমি?

—ওই যে, যে-ছবি দেখে কাল পালিয়ে গেলাম। সেই ছবিটা, সেই ছবিটা একবার দেখাবে? একবার দেখাবে?

রায় স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পাগল বললে, একবার। একবার দেখাও, একবার—

—ও-ছবি যার, তুমি তাকে চেন?

—চিনি না? সর্বনাশী, ছলনাময়ী, মোহিনীরূপে ভয়ানক মেয়ে—ওঃ—ওঃ! বলেই সে আপনার গলা টিপে ধরলে। নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করতে লাগল এবং চীৎকার করতে লাগল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। ওরে বলতে দে। দিবিনে?

বিচিত্র পাগলামী পাগলের। নিজেই টিপছিল নিজের গলা, এবার গলা টিপে ধরা হাতের একটা হাত নিজেই কামড়ে ধরলে।

রায় টেনে তার হাতদুখানাকে ছাড়িয়ে দিলেন। ওদিকে ফটক তখন খুলে গেছে। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তাঁকে অতিক্রম করে ঢুকতে পারছে না। রায় পাগলের হাত ধরে টেনে হাতার ভিতরে ঢুকলেন। বললেন—এস।

পাগল বললে—কোথায়?

—ছবি দেখবে বলেছিলে। এস, ছবি দেখবে এস।

—ছবি? দেখাবে? দেখাবে?

—এস।

কৌতূহলের আর অন্ত ছিল না বীরেশ্বর রায়ের।

ঘরে ছবির সামনে পাগলকে দাঁড় করিয়ে দিলেন রায়। দেখ। চাকরকে বললেন—একটা মশাল জ্বেলে আন। ধর সামনে। সহিসদের মশাল নিয়ে আয় বরং। জলদি যাবি।

চাকরটা ছুটে গিয়ে মশালটা নিয়ে এল। রায় মশালটা তার হাত থেকে নিয়ে নিজে তুলে ধরলেন ছবির সামনে। চাকরটাকে বললেন—তুই যা ঘর থেকে।

একদৃষ্টে পাগল ছবিটা দেখতে লাগল।

পাগল একদৃষ্টে ছবির দিকে তাকিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন পাগলের কথার জন্য।

কি বলবে পাগল ? পাগলের কথাগুলো তাঁর মনের মধ্যে যেন চারিপাশ থেকে প্রতিধ্বনি তুলছে ; সর্বনাশী, ছলনাময়ী—মোহিনীরূপে ভয়ঙ্করীও।

কি অর্থ তার, তাই তিনি শুনতে চান।

ছবিখানা প্রকাণ্ড বড়। ভবানীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি। একখানা চেয়ার ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে রাজরানীর মত। বীরেশ্বর রায় তাকে রানীর মত সাজিয়ে নিয়ে আসতেন ওই সামনের বারান্দায় ; চেয়ারের হাতল ধরে ভবানী দাঁড়াত, তিনি দূরে বসে থাকতেন ; আর সাহেব-পেণ্টার ছবি আঁকত। এক পোশাক, এক গহনা, একরকম চুলের বিন্যাস। ভবানীর চুল ছিল, আশ্চর্য চুল। প্রায় তার হাঁটু ছুঁইছুঁই করত। আর পরিমাণেও ছিল প্রচুর। সাহেব যেদিন ছবি আঁকত, সেদিন সাহেবের নির্দেশমত তাকে মাথা ঘষতে হত। চুলের রাশি ফুলে ফেঁপে উঠত, কালো মেঘের পুঞ্জের মত। ভবানীর রঙ ছিল শ্যামবর্ণ। নাকে ছিল একটা বেশ বড় দামী হীরের নাকচাবি। জলজল করত সেটা। চিত্রকরসাহেব অবিকল তাকে ফুটিয়ে তুলেছে ছবিতে। অবিকল। বীরেশ্বর রায়ের মধ্যে মধ্যে রাত্রে নেশার ঝোঁকে তাকে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়। তাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু তাকে পাগল চিনলে কি করে ? তাঁর ধারণা হয়েছে ভবানীকে পাগল দেখেছে, ভবানী ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর। না হলে চেনা

ভ্রূ কুঞ্চিত করে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন রায়।

পাগল একটু এগিয়ে গেল। চেয়ারের হাতলে-রাখা হাতখানার উপর ঝুঁকে কি দেখছে। ছ'টা আঙুল ছিল ভবানীর। ডান হাতে, কড়ে আঙুলের পাশে ছোট্ট একটা আঙুল ছিল। সেটি পর্যন্ত স্পষ্ট করে আঁকতে চিত্রকর ভোলেনি।

পাগল আঙুলটির উপর হাত দিলে এবং প্রশ্ন করলে—ছ'টা আঙুল ? এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। ছ'টা !

রায় বললেন—হ্যাঁ, ওর ছ'টা আঙুল ছিল।

পাগল আবার ছবির মুখের দিকে তাকালে। তারপর বললে—ওটা ? আঙুল দিলে সে ছবির সিঁথির কাছে। একটা ঘূর্ণি—বাহার নয় ?

—হ্যাঁ। ওর কপালের মাঝখানে চুলের সিঁথির মুখে চুলের একটা ঘূর্ণি ছিল !

—হুঁ। চোখের চাউনি ? সে-চাউনি তো নয় ! উঁহু। পাগল শুধু ঘাড় নাড়তে লাগল। না-না-না ! না !

—কি ?

—সে তো নয় ! এ সে তো নয় ! তবে—

—কি তবে ?

—তবে তো এ-এ-এ—

—কি ? এ কে ?

পাগল অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ওঃ-ওঃ-ওঃ।

রায় বললেন—বল, এ কে ? তুমি চেন ?

পাগল ঘাড় নাড়তে লাগল—না-না-না।

অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বীরেশ্বর রায়। মশালটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুই হাতের সবল থাবায় দুই কাঁধ ধরে নিষ্ঠুর ঝাঁকি দিয়ে বললেন—বল। বল। কোথায় দেখেছ ওকে? কোথায় থাকে ও?

পাগল তাতে বিচলিত হল না, সে বারেকের জন্যও ফিরে তাকালে না বীরেশ্বরের দিকে অর্থাৎ প্রশ্নও জাগল না তার মনে, কেন এমন রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করছে সে। ছবির দিকে তাকিয়েই রইল। এবং সেই ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল—না-না-না। এ নয়, এ নয়। তার ছ'টা আঙুল ছিল না। তবে ট্যারা ছিল। এ কম, সে বেশী। এ তো সে নয়।

বীরেশ্বর বুঝতে পারলেন না কথার অর্থ। ভ্রূ কুঞ্চিত করে একটু বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন—সে কে?

—সে? ওই ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেই সে উত্তর দিলে।

—হ্যাঁ, সে কে?

—সে মায়াবিনী, সে—সে ডাকিনী।

—ডাকিনী?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। কামাখ্যা মন্দিরে সে ডাকিনী। এ সে নয়। না। ছ'টা আঙুল তার ছিল না। এ একটু ট্যারা, সে অনেক ট্যারা ছিল। নইলে অবিকল সেই।

এবার রায়ের দিকে ফিরে বললে—ও কে? তুমি এ-ছবি কি করে পেলে? ওর—ওর নাম কি? মহালক্ষ্মী?

—না। ভবানী!

—ভবানী? ভবানী? হ্যাঁ। ঠিক, ঠিক! ও কোথা? হ্যাগো! ও কোথা?

—জানি না। তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি—তুমি তো লোকে বলে সিদ্ধপুরুষ—বলতে পার, ও কোথায়?

—না-না-না। আমি কিছুই নই। ওই—ওই গন্ধ আনতে পারি। ওই ধুলো গুড় করতে পারি। ওই দিয়েই সে-মায়াবিনী সব কেড়ে নিয়ে গেল। তার ভয়ে আমি পালিয়ে বেড়াই।—

বলতে বলতে সে আবার নিজের গলা টিপে ধরলে। এমন জোরে সে টিপে ধরলে যে, চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে বলে মনে হল। একটা বিকৃত গোঙানি তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করলে।

রায় আবার তার হাত চেপে ধরে টেনে ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আশ্চর্য! তার হাতের মুঠো লোহার সাঁড়াশির মত শক্ত হয়ে উঠেছে। তবুও রায় তার থেকে অনেক বলশালী। ছাড়িয়ে দিলেন। লোকটা অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর। মেঝের উপর পড়ে সে কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর বীরেশ্বর তাকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বললেন—এই ঘরে তুমি থাকবে। আমি বাইরে থেকে তালা দেব। কাল সকালে খুলে দেব। তোমাকে কাল সকালে যেতে হবে সোফিয়া বাঈজীর বাড়ী। তাকে তুমি কি করেছ? সে প্রলাপ বকছে। তোমার কাছে মাফ চাচ্ছে। তাকে ভাল করে দিতে হবে তোমাকে।

পাগল কথা বললে না, মেঝের উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ল। রায় বললেন—ওই তো খাটে বিছানা করা রয়েছে, উঠে শোও।

সে উত্তর দিল না। পড়েই রইল।

—শুনছ।

পাগল তবু সাড়া দিল না। রায় বিরক্তিভরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চাকরকে বললেন—তালা নিয়ে আয়।

চাকর তালা নিয়ে এল, তিনি নিজে হাতে তালা দিয়ে চাবিটা নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন।

সকালবেলা, তখন প্রায় সাড়ে-ন'টা, তখন ঘুম ভাঙল বীরেশ্বর রায়ের। উঠে চাকরকে ডাকলেন। চাকর বাইরে দাঁড়িয়েই ছিল এই ডাকের প্রতীক্ষায়। সে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। বললে—ও-ঘরে—

—কি ও-ঘরে—

—ওই সেই পাগলাবাবাকে তালা দিয়ে রেখেছেন—

—হ্যাঁ। কি? সে নেই?

—আজ্ঞে না। খুব গোঙাচ্ছে। আর খুব দুর্গন্ধ উঠছে।

—গোঙাচ্ছে? দুর্গন্ধ উঠছে?

—খুব!

—দরজা ফাঁক করে দেখেছিস? কি ব্যাপার? দেখিসনি?

—আজ্ঞে না। ভয়ে কেউ ওদিকে যাইনি আমরা।

রায় চাবিটা তার হাতে দিয়ে বললেন—যা, খুলে দেখ।

সে চাবি-হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অর্থাৎ তার ভয় করছে।

—আচ্ছা আমি মুখ-হাত ধুয়ে যাচ্ছি।

তিনি উঠে গোসলখানায় ঢুকলেন। গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বারান্দার ওপাশে বন্ধ ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে চাকরের কথার সত্যতা বুঝতে পারলেন। একটা জন্তুর মত গোঙানি উঠছে আর দুর্গন্ধে যেন বমি আসছে। তিনি নাকে রুমাল বাঁধলেন। তারপর তালা খুলে দরজা দু'পাট ঠেলে খুলে দিলেন।

দেখলেন সে এক বীভৎস দৃশ্য।

লোকটা ঘরময় মলমূত্র ত্যাগ করে তারই উপর পড়ে আছে; সর্বাঙ্গে যেন মেখেছে, মুখে পর্যন্ত লেগেছে। মনে হল মুখ রগড়েছে ময়লার উপর। তার উপর লোকটা জ্ঞানশূন্য, দেখেই বোঝা যাচ্ছে অসুস্থ। গলা দিয়ে নিষ্ঠুর যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ গোঙানির মত বের হচ্ছে।

থমকে দাঁড়ালেন বীরেশ্বর। এ কি বিপদ! এ কে পরিষ্কার করবে? একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বললেন—কি করবে ওকে নিয়ে? এঁ্যা?

—আজ্ঞে! বলে চাকর চুপ করে রইল। পিছনে বারান্দায় তখন চাকরবাকরেরা অনেক এসে জুটেছে। এমন কি নায়েব কর্মচারীরাও।

—নায়েববাবু? তাহলে মেথর ডাকুন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চাকরেরা শিউরে উঠল।

নায়েব এসে বললে—আজ্ঞে হুজুর উনি সিদ্ধপুরুষ, মেথর দিয়ে—

—তাহলে, লোকটিকে পরিষ্কার করতে তো হবে। অন্তত তুলে নীচে কোথাও নামিয়ে দিতেও হবে। সিদ্ধপুরুষকে ওই ভাবে রাখাও তো ঠিক হবে না!

—আপনি যান হুজুর, যা হয় আমরা করছি। চাকরবাকরেরা শূদ্র বলে ওকে ছুঁতে ভয় করছে। ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন, তাঁরা করবেন। আপনি যান।—

রায় চলে এলেন। গত রাত্রিতে তিনি একরকম মগুপান করেনই নি। পাগলকে ঘরে বন্ধ করে গিয়ে কাপড়চোপড় ছেড়ে খাবার আগে ও পরে অতি অল্প পরিমাণে খেয়ে শুয়ে পড়েই ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। লোকটা সম্পর্কে ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। গতকাল দিনে তিনি ঘুমোন নি—সারা দুপুর ভেবেছিলেন রাধাকান্ত দেববাহাদুরের কথা। তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রথম জীবনে বিবাহের পর যে কয়েক বৎসর শান্ত-সংযত জীবনযাপন করেছিলেন তখনকার কল্পনার কথা মনে পড়েছিল। আর মাঝে মাঝে ভেবেছিলেন, সোফিয়ার কথা এবং এই পাগলের কথা। সন্ধ্যার মুখে সোফিয়ার বাড়ী গিয়ে তার অবস্থা দেখে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ওই পাগলকে খুঁজেছেন। বাড়ী এসে বাড়ীর দরজায় পাগলকে পেয়ে তাকে নিয়ে ঘণ্টাদেড়েক তার সঙ্গে কাটিয়ে তার অবংবদ্ধ প্রলাপ থেকে এইটুকু বুঝেছিলেন যে, পাগল ভবানীকে দেখেনি। অর্থাৎ তার মুখে সে জীবিত আছে এ-সংবাদ পাননি। তাতে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, খানিকটা ক্লান্তি এবং নিশ্চিন্ততার মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এবং মদ বেশী পরিমাণে খেয়ে জ্ঞান হারাতেও ঠিক ভাল লাগেনি!

ঘরে এসে বসতে চাকর এসে দাঁড়াল। বললে—বেরেকফাস্টো দেয়া হয়েছে হুজুর।

রায় তখন বিলিতীকেতায় সকালে খেতেন ব্রেকফাস্ট। টেবিল ছিল, চেয়ার ছিল দস্তুরমত। কফি, রুটি-মাখন, ডিম, কেক দিয়ে ব্রেকফাস্ট। দুপুরে দেশীমতে ভোজন, রাত্রে বিলিতী নয়, একেবারে নবাবী আমলের পোলাও-কালিয়া-কোর্মা। ভবানীর অন্তর্ধানের পর এই ব্যবস্থা। তবে মদটা সব সময়েই থাকত।

রায় চেয়ারে বসে বললেন—মদটা নিয়ে যা।

চাকর বিস্মিত হল।

রায় রুটি-মাখনের পাত্রটা টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—পাগলকে কে পরিষ্কার করছে?

—আজ্ঞে, খাজাঞ্চীবাবু।

—হরি চক্রবর্তী?

—হ্যাঁ। বলছেন—গায়ে খুব তাপ। পেবল জ্বর।

—হুঁ, তা নইলে বেহুঁশ হবে কেন? পরিষ্কার করে খানিকটা আতর গায়ে মাখিয়ে দিতে বলবি। আর কাউকে বল—বউবাজারে সোফি বাঈয়ের বাড়ী গিয়ে সে কেমন আছে খবর নিয়ে আসবে। দেখ, হয়তো বশীর এসেও থাকতে পারে।

—নায়েববাবু বলে দিলেন, আজ শ্যামবাজারে হুজুরের জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ীতে ছেরাদ্দের নেমন্তন্ন আছে। আপনি যাব বলেছিলেন!

বীরেশ্বর রায়ের মনে পড়ল—হ্যাঁ, আজ জ্যাঠাইমার সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হবে, তার সঙ্গে সমারোহের সঙ্গে দান-উৎসর্গ হবে, আগুশ্রাদ্ধের সময় এসব হয়ে ওঠেনি।

কুড়ারাম রায় ভটচাজের শ্যালক-পুত্র, বাবা সোমেশ্বর রায়ের মামাতো ভাই, হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর জ্যাঠা। এ পর্যন্ত রায়বাড়ীর জ্ঞাতিকুটুম্বের মধ্যে বলতে গেলে ওই একমাত্র কুটুম্ববাড়ী। তবুও সে-সম্পর্ক তিনি রাখতে পারেননি। একটা ক্ষত আছে। ওই জীবনের সব থেকে বড় এবং একমাত্র ক্ষত ভবানী। হরিপ্রসাদকাকার ছেলে রমাপ্রসাদের বিয়েতে গিয়েই তিনি ভবানীকে দেখেছিলেন। ভবানীকে নিয়ে যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন ও বাড়ীতে যাওয়া-আসা ছিল নিয়মিত। জগদ্ধাত্রী বউদির সঙ্গে ভবানীর সখিত্বও ছিল। ভবানী—। তার চলে যাওয়ার পর তিনিও যাননি ও-বাড়ীতে, ওরাও আসেননি এ-বাড়ীতে। ওই একমাত্র সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যান। তাঁর বাড়ীতে ক্রিয়াও নেই, কর্মও নেই; না অন্ন-

প্রাশন, না উপনয়ন, না বিবাহ! একটা কর্ম বাকি আছে। না দুটো। একটা ভবানীর মৃত্যু-সংবাদ পেলে নষ্টশ্রাদ্ধ উদ্ধার করবেন, আর একটা বাকি তাঁর শ্রাদ্ধ, সে কে করবে ভগবান জানেন, কিন্তু তখন তিনি থাকবেন না। তবে তাঁকে আজ যেতে হবে। যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, উচিত। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রায় বললেন—হ্যাঁ, যেতে হবে বইকি। কাপড়চোপড় ঠিক কর। হ্যাঁ, যেতে হবে।

সুরেশ্বর বললে—তোমার মনে আছে সুলতা, কালীঘাটের দরিদ্র পরিবারে বিয়ে করেছিলেন কুড়ারাম রায় ভটচাজ। কালীঘাটের হালদাররা সেখানকার সমাজপতি। তাঁদের কাছে এই চাটুজ্জে পরিবার অনেকটা একঘরে ছিল। অভিযোগ ছিল—প্রৌঢ় চাটুজ্জে জাহাজী সাহেবদের খানাপিনার জিনিস-কারবারীদের চাকরি করতেন। পদে ছিলেন সরকার। খানার গোস্ত্ আসত বড় বড় ঝুড়িতে, মাথায় করে আনত যারা, তারা কোন্ জাত কে জানে, তবে আসত গোমাংস, শূকর-মাংস—বীফ, হ্যাম; জাহাজে সেসব তাঁকে ছুঁতে নাড়তে হত। কিন্তু মাইনে ছিল যৎসামান্য, আর কিছু পাওনা পেতেন কাপ্তেন সাহেবদের কাছে বকশিশ। কিন্তু এতে তাঁর অভাব মেটেনি। তবে চলে যেত কায়ক্লেশে। জাত গিয়েও পেট ভরেনি।

কুড়ারাম রায় ভটচাজমশায় বিয়ের পর শ্বশুরকে চাকরি ছাড়িয়েছিলেন, কাজে লাগিয়েছিলেন নিজের কাছে। আর শ্যালক ছিল একটি—গুরুপ্রসাদ, তাঁকে লাগিয়েছিলেন কোম্পানীর সেরেস্তায় নিজের অধীনে; দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর করেছিলেন। গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অর্থোপার্জন করে কালীঘাট ছেড়ে শহর কলকাতায় জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বাড়ী করেছিলেন। গুরুপ্রসাদ বেশী দিন বাঁচেন নি। তবে ছেলে হরিপ্রসাদকে ইংরিজী লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তাঁর গায়ে সেকালে ব্রাহ্মধর্মের বাতাস লেগেছিল। তবে ওদের সঙ্গে সরাসরি জাতে উঠতে তাঁর সাহস ছিল না। হরিপ্রসাদ বীরেশ্বর রায়ের জ্যাঠামশায়। সোমেশ্বর রায় থেকে বয়সে বড়। হরিপ্রসাদের বড় ছেলে দেবপ্রসাদের ডাকনাম নারায়ণচন্দ্র। বয়সে বীরেশ্বর রায় থেকে বড় কিন্তু বন্ধুই। তাঁরই বিয়েতে গিয়ে তিনি ভবানীদেবীকে দেখেছিলেন। তাঁরই মাতৃশ্রাদ্ধ! ব্রাহ্মধর্মের বাতাস গায়ে লাগলেও, মাতৃশ্রাদ্ধে গোঁড়া হিন্দুত্ব বজায় রেখে শ্রাদ্ধ করেছিলেন। অনেক সমারোহও করেছিলেন। আদ্যশ্রাদ্ধ তিলকাঞ্চন করে সেরে রেখে ছ'মাসের মাথায় সমারোহ। একালে হিন্দু যারা, তারাই জানে না তো তোমরা তো ব্রাহ্ম, তোমাদের না-জানারই কথা, তাই বলছি। আমিই কি জানতুম সুলতা? জানতুম না। বাবার মৃত্যুর পর—সম্পত্তির জন্যে গোঁড়া হিন্দুমতের একেবারে খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত পালন করিয়েছিলেন ঘোষাল ম্যানেজার। মায়ের মৃত্যুর পর পালন করিয়েছিলেন মেজঠাকুমা। আদ্যশ্রাদ্ধের সময় কলকাতা এসেছিলেন। তারপর প্রতি মাসে তাঁর পোস্টকার্ড আসত—আঁকাবাঁকা মোটা হরফে লিখতেন, ভাই, বউমায়ের মাসিক শ্রাদ্ধটি করিতে যেন ভুলিবে না। অনেকে এক মাস, দু' মাস বাদ দিয়া তিন মাস বাদ দিয়া এক মাসে দুটো-তিনটা সারে, সেটা 'অশাস্তরীয়' হয় না হয়তো। কিন্তু ভাই, তিন মাস খাইতে না দিয়া এক মাসে তিন মাসের খাওয়া কি মানুষ খাইতে পারে? ওটা যারা করে, তারা নিশ্চয় মাকে ভুলিয়া যায়। তোমার মাকে তুমি ভুলিতে পার না।

শ্রাদ্ধ সম্পর্কে মত জিজ্ঞেস করতে হলে পরলোক সম্বন্ধে মত বলতে হয়। সে-মতামতের কথা থাক। আর মতামতেরই বা মূল্য কি আমাদের, যারা রামের দলে থাকলে রামের

কথা বেদবাক্য ভাবি, আবার দল ভেঙে হরির দলে গিয়ে হরির কথা শুধু বেদবাক্যই ভাবিনে —রামকে গালিগালাজ করি। আমি কোন দলেরই নই। তবু মেজঠাকুমার কথাটা পালন করেছিলাম অক্ষরে অক্ষরে।

দোহাই তোমার সুলতা, তুমি মুখ খুলবে মনে হচ্ছে, কিন্তু দোহাই খুলো না। তোমাকে আমি ইঙ্গিত করে কিছু বলিনি। আমি শাক্ত নই, শৈব নই, বৈষ্ণব নই, সৌর নই—কংগ্রেস নই, কম্যুনিস্ট নই, আর্টিস্ট হিসেবে প্রগ্রেসিভ নই ; রি-অ্যাকশানারী বলতে চাও বলতে পার, তবে আমি তাও নই। কলকাতায় থাকতে বিদগ্ধ কাগজসমূহে 'সহজিয়া' কাল্টের কথা পড়েছিলাম—পণ্ডিতব্যক্তিদের কাছে এ সম্পর্কে দুর্বোধ্য আলোচনা শুনেছিলাম, কিন্তু বস্তুটা কি, তার মাথামুণ্ডু কেন—সাকার না নিরাকার, পিণ্ডাকার না তরল পদার্থ—কিছুই ধারণা হয়নি। কীর্তিহাটে গিয়ে বাউলদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সে পরে বলব, তবে তাদের দেখে বুঝেছিলাম ব্যাপারটা কি! খ্যাপা গোপাল দাসকে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সহজিয়াটা কি ? সে হেসে বলেছিল—হরি, হরি, হরি—নিজে ওই পথ ধরে বলছ ওই পথটা কি ? নেশা করেছ, চোখ ঢুলঢুল করছে, তবু শুধাও নেশাটা কিরকম ? বাবাধন, এই যে সহজ পথে, সবার 'সাঁথে' পেরেম করে হাটন ধরেছ—এই তো সেই পথ। আমি সেদিন বসেছিলাম ওই কাঁসাইয়ের ওপারে, যেখানটাকে সিদ্ধপীঠ বলে সেইখানে। জমেছিল সেখানে ওই গোয়ানপাড়ার গোয়ানরা থেকে ওপারের কীর্তিহাটের ব্রাত্যরা পর্যন্ত। সকলে চাঁদা করে ভোগ দিয়েছিল মায়ের। খাওয়া-দাওয়া চলছিল। তার মধ্যখানের মধ্যমণি বলব না—মাঝের মানুষ ছিলাম আমি। সভায় যাকে প্রধান অতিথি বলে।

একটু থেমে সুরেশ্বর বললে—তার আগে বীরেশ্বরের কাহিনী থেকে কি করে উনিশশো ছত্রিশ সালে কীর্তিহাটে পরবর্তী পঞ্চমপুরুষ সুরেশ্বর রায়ের জীবনে এলাম, সেটা বলে নিই। বীরেশ্বর রায়েই ফিরে যাই।

* * *

বীরেশ্বর রায় তাঁর স্মরণীয় ঘটনার সেই খাতাটিতে তিনদিন পর লিখেছেন। তার প্রথম ছত্রই হল—আজ তিনদিন ধরে ঘটনার আবর্তে পড়ে আমি কি পাল্টে যাচ্ছি ? আজ তিনদিন আমি রাত্রে শোবার আগে মদ্যপান করিনি। একটা নতুন নেশায় যেন মেতে উঠেছি।

সেদিন হরিপ্রসাদজ্যাঠার বাড়ীতে জ্যাঠাইমার শ্রাদ্ধে গিয়ে কলকাতার বহু বিশিষ্টজনের সঙ্গে দেখা হল। পুরনো পরিচয় অনেকের সঙ্গে ছিল, তাদের সঙ্গে দেখাশুনো হয়নি আজ কয়েক বৎসর। পুরনো পরিচয় নতুন হয়ে উঠল। নতুন পরিচয়ও হল অনেকের সঙ্গে। কলকাতার দুই দলেরই বড় বড় মাতব্বররা এসেছিলেন। হরিপ্রসাদজ্যাঠা খুব হুঁশিয়ার লোক। ব্রাহ্মদলের কাছ-ঘেঁষা হয়েও দুই দলকেই সমান আদরে নিমন্ত্রণ করেছেন। ওদিকে পণ্ডিত-সভা বসেছে। পণ্ডিত-সভায় ভিড় খুব। রাজা রাধাকান্ত দেব ওখানে বসেছেন দেখলাম। তাঁর সঙ্গে তাঁর দলের হোমরা-চোমরারা। সংস্কৃত-জানা পণ্ডিত ব্রাহ্ম-ঘেঁষা কয়েকজনকেও দেখলাম। শুনলাম, ওখানে তর্ক চলছে, বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় বিচারের। বিদ্যাসাগর আসেননি। এলে আসরটা নিশ্চয় খুব জমত। ওদিকে যেতে সাহস হল না। পণ্ডিতদের টিকি নাড়া, নস্য নেওয়া আর সংস্কৃত বচন—ও আমার সহ্য হয় না। আমি বিধবা-বিবাহের দিকে।

ফটকেই দেবপ্রসাদদার শ্যালকের একটি ছেলে নিমন্ত্রিতদের গলায় বেলকুঁড়ির মালা পরিয়ে দিচ্ছিল। মালা পরে ভিতরে এসে দেখলাম, দেবপ্রসাদদার মেজ ছেলে শিবপ্রসাদ দাঁড়িয়ে

অভ্যর্থনা করছে। সে আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি এল প্রণাম করতে। বললাম—নিয়ে চল একবার শ্রাদ্ধের আসরে।

হরিপ্রসাদজ্যাঠা বসেছিলেন, প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে আদর করে বসালেন কাছে। বললেন—এসেছ! আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবে না।

ওই কথার মধ্যে অনেক কথা লুকানো আছে। আমি জানি। চুপ করে রইলাম।

দেবপ্রসাদদা শ্রাদ্ধে বসে দান উৎসর্গ করছেন। দানগুলি ভাল হয়েছে। চারটে ষোড়শ করেছেন। তাছাড়া একটা রূপোর ষোড়শ। জিনিসপত্রগুলো ভাল।

বললাম—দানগুলি চমৎকার হয়েছে।

হরিপ্রসাদজ্যাঠা বললেন—ইচ্ছা আছে স্ত্রী-শিক্ষার জন্ম বিদ্যাসাগরমশায়ের হাতে এক হাজার টাকা দান করব।

—বিদ্যাসাগরমশায়কে দেখছিনে?

—তিনি কলকাতায় উপস্থিত নেই। থাকলে নিশ্চয় আসতেন।

এমন সময় কলকাতার সব থেকে উজ্জ্বল আলো ( অবশ্য আমার কাছে ) কালীপ্রসন্ন সিংহ-মশায় এসে দাঁড়ালেন। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, দেখা হয়ে খুব খুশী হলাম। তিনিও খুশী হলেন বলে মনে হল। আমাকে নমস্কার করে বললেন—রায়মশায়কে অনেকদিন পরে দেখলাম! ভাল আছেন জানি। খুব গানবাজনা নিয়ে মশগুল। তা বেশ। তা বেশ।

হরিপ্রসাদজ্যাঠা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কালীপ্রসন্নবাবু এর পর সোফিয়াকে নিয়ে তাঁর সামনে রসিকতা করে বসবেন ভাবলেন—ওদিকে যে প্রসন্নকুমার ঠাকুরমশায় সিংহমশায়কে খুঁজছিলেন।

কালীপ্রসন্নবাবু বললেন—কেন মশায়, আমার সঙ্গে আবার প্রয়োজনটা কি হল তাঁর? আর তাঁকে তো দেখলাম না পণ্ডিত-সভার বিচারের আসরে!

হেসে হরিপ্রসাদকাকা বললেন—তাঁরা অন্যত্র বসেছেন। বৈঠকখানার একটা ঘরে। ওখানে খুব জোর আলোচনা হচ্ছে। বর্ধমানের মহারাজা লাখরাজের ব্যাপার নিয়ে যে মামলা করে-ছিলেন বিলেতে কোম্পানীর বিরুদ্ধে, তার রায় বেরিয়েছে। মহারাজা ডিগ্রী পেয়েছেন। সেই নিয়ে খুব আলোচনা চলছে।

হেসে কালীপ্রসন্ন বললেন—তাহলে বলুন, ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং বসে গেছে।

—তা বলতে পারেন। তবে যান একবার। বীরেশ্বরকেও নিয়ে যান। ওঁকেও খুঁজছিলেন। বলছিলেন, আপনার ভাইপো বীরেশ্বর রায় জমিদারী ভাল বোঝেন। তিনি আসেননি?

কালীপ্রসন্ন বললেন—চলুন রায়, দেখি। লাখরাজে স্বার্থ আমাদের সবারই, কম আর বেশী। আপনাদের আদি কর্তা তো শুনেছি প্রথম লাখরাজেই বিষয় পত্তন করেছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ একশো বিঘে লাখরাজ নিলেমে ডাকিয়ে বলেছিলেন, এইবার শুরু কর।

আমি বললাম—হ্যাঁ।

* * *

ঘরটায় মোটা কার্পেটের উপর মজলিশ চলছিল। অধিকাংশই জমিদার এবং বেশ প্রতিষ্ঠাবান

লোক। তার মাঝখানে প্রসন্নকুমার বসেছেন। তিনি ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের বলতে গেলে জীবনীশক্তি। দ্বারকানাথের পর তাঁর এবং রাজাবাহাদুর রাধাকান্ত দেবের শক্তিতেই ওটা চলে। এই লাখরাজ বাজেয়াপ্তি নিয়ে আন্দোলন শুরু তাঁরাই করেছিলেন। আন্দোলনে কিছু হয়নি। বর্ধমানের রাজা মামলা করেছিলেন। এখানে হেরে বিলাত পর্যন্ত আপীল করেছিলেন।

একজন সংবাদ-প্রভাকরের মন্তব্য পড়ে শোনাচ্ছিলেন, প্রথমটা পড়া হয়ে গিয়েছিল, শেষ-ভাগটা পড়া হচ্ছিল তখন।

"ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা এবং অন্যান্য নিষ্করভোগী মহাশয়েরা এইক্ষণে বর্ধমানেশ্বর বাহাদুরের জয়-জয় শব্দে আনন্দচিত্তে মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করুন। ওই ডিগ্রী সর্ব-সাধারণের পক্ষেই সমান কল্যাণকর হইয়াছে। যেহেতু তাহার তাৎপর্য এই যে, যে সকল ভূমির ৬০ বৎসর সমান ভোগ ও বিক্রয়-স্বত্বাধিকার প্রমাণ হইবে, তাহার দলিল দস্তাবেজ থাকুক না থাকুক, গভর্নমেণ্ট কোনমতেই তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।"

খিদিরপুরের ঘোষাল বললেন—ওটা তো গায়ের জোর ওদের। এ-দেশ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর পীরোত্তর লাখরাজের দেশ। এ থেকেই দেবসেবা চলেছে। ব্রাহ্মণদের টোল চলেছে। মক্তব চলেছে। ওরা এসে দেশ দখল করে সবের উপরেই খাজনা চাপাবে। তা আইনে টিকবে কেন? ঠিক হয়েছে!

প্রসন্নকুমার আমাকে দেখে বললেন—আরে রায় যে। কিছুক্ষণ আগে তোমার খোঁজ করছিলাম তোমার কাকার কাছে! তুমি যে অদৃশ্য হয়ে গেলে হে। ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ অ্যাসোসিয়েশনে প্রথম প্রথম যে কটি বক্তৃতা দিয়েছিলে তা বড় ভালো হয়েছিল। অনেক আশা করেছিলাম তোমার কাছে!

কালীপ্রসন্ন বললেন—উনি এখন সভ্য অ্যারিস্টোক্রাট মশায়। গ্রাম্য যখন ছিলেন তখন জমিদারী নিজের হাতে চালাতেন। প্রজাদের পিঠে ঠ্যাঙা চালাতেন, বুকে কাঠ চাপাতেন, বেঁধে রাখতেন, খাজনা আদায় করতেন, আবার নদীর বাঁধ বাঁধতেন, পুকুর কাটাতেন, গোচর ভাঙলে প্রজার জরিমানা করতেন, এখন শহরে বসে সভ্য হয়েছেন। জুড়ি হাঁকাচ্ছেন। একজোড়া কালো ঘোড়ার জুড়ি যা কিনেছেন চ-ম-ৎ-কা-র! তারপর সন্ধ্যায় বাইজীর কণ্ঠে ঠুংরী টপ্পা শুনছেন। এখন আর খোঁজই বা কি রাখেন, বলবেনই বা কি?

আমি ছাড়লাম না, বললাম—কালীপ্রসন্নবাবু, এ ছাড়া আছে।

—কি বলুন। শুনি!

—মহাশয়ের লেখায় পড়েছিলাম—বাল্যাবধি ইচ্ছে কবি কালিদাস হব। কিন্তু সে ইচ্ছে ছেড়েছি কারণ কালিদাসের লাম্পট্য অনুসরণ করেও শক্তি না থাকলে কালিদাস হওয়া যায় না। তারপর ভেবেছিলাম, ঠিক মনে নাই সিংহমহাশয়, আপনি কি হতে চেয়েছিলেন, তবে তিনি নাকি দরিদ্রের পুত্র ছিলেন বলে সেটা হতে চান নি আপনি। আমি ভেবেচিন্তে লক্ষ্ণৌর ওয়াজিদ আলী শা হতে চেয়েছিলাম, দেখেছিলাম ওটা হওয়া যায়—ছোট আর বড়। ধরুন যেমন আপনি রামমোহন রায় হতে পারেন ধারণা ক'রে বিদ্যোৎসাহী হয়েছেন, গ্রন্থকার হতে চেষ্টা করছেন, বিধবা-বিবাহে উৎসাহ দিচ্ছেন। তেমনি আমিও ছোটখাটো ওয়াজিদ আলী শা হতে চাচ্ছি। তা সে তো গ্রামে বসে হওয়া যায় না। লক্ষ্ণৌ শহর অনেকদূর—কলকাতায় অন্তত না চেপে বসলে চলে কি করে?

কালীপ্রসন্ন উদার রসিক বলেই তাকে এত ভাল লাগে, এই কারণেই তিনি আমার কাছে

কলকাতায় নবীন সমাজের মধ্যে উজ্জ্বলতম মানুষ মনে হয়। তিনি আমার উত্তরে উচ্চহাস্য করে বললেন—ব্র্যাভো ব্র্যাভো, ব্র্যাভো রায়মশায়। চ-ম-ৎ-কা-র উত্তর দিয়েছেন। কথাটা প্রথম আলাপের দিনই আপনাকে বলেছিলাম আমি—নয় ?

বললাম—দেখুন ঠিক মনে করে রেখেছি। তবে আমার মত ক'রে ভেঙেচুরে নিয়েছি!

সকলেই মৃদু মৃদু হাস্য করতে লাগলেন।

প্রসন্নকুমার বললেন—না না রায়, আপনি অ্যাসোসিয়েশনে আসুন। সত্যিই জমিদারদের একটা বেশ সঙ্কট চলছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন নিজে খাজনা আদায় করত তখন রেজা খাঁর দুর্নাম হয়েছিল। কিন্তু তার উৎসাহদাতা তো কোম্পানীর কর্তারা। হেস্টিংস সাহেব তো ঢালাও হুকুম দিয়েছিল। তারপর গুঁতো খেয়ে দায় চাপালে রেজা খাঁর উপর। রেজা খাঁ গেল —সঙ্গে সঙ্গে দেবী সিং, গঙ্গাগোবিন্দ সিং এলেন—তার সঙ্গে আপনার পিতামহও ছিলেন। তাঁরা যা করেছেন তাতে হেস্টিংসের হুকুম ছিল। আইনের পর আইন—পঞ্চম হপ্তম। প্রজাকে বেঁধে রেখে মারধর করে খাজনা আদায় করে দাও, আমাদের পেট ভরাও, কোম্পানীর ক্যাশে চালান যাক। তারপর পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট। দশ ভাগের ন ভাগ—শতকরা নব্বুই টাকা কোম্পানীর প্রাপ্য। বাস যেই পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট হয়ে গেল, একটু সুরাহা হল, অমনি বাতিল হল পঞ্চম হপ্তম। কোম্পানীর সমদৃষ্টি। প্রজাকে মারধর করতে দেবেন না। তারপর পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সুবিধের জন্যে অষ্টম আইন। ভাল কথা। বেশ কথা। তারপর লিমিটেশন অ্যাক্ট। এদেশে সুদ ছিল না তামাদি ছিল না। এখন তামাদি—চার বছরে কর নালিশ। পাঁচ বছরের খাজনা পাবে। কোম্পানীর লাভ হবে স্ট্যাম্প। আবার সব নতুন আইন হচ্ছে। প্রতীক্ষায় থাকুন। ওদিকে ভারতগ্রাস চলছে। একে একে সব পেটে ভরছে। লর্ড অকল্যাণ্ড, লর্ড এলেনবারা, তারপর লর্ড ডালহৌসি। মারাঠা ঝাঁসি খেয়ে ফেলেছে। এবার, এই এক্ষুনি বলছিলেন লক্ষ্ণৌর ওয়াজিদ আলী শার কথা। তার কি হচ্ছে দেখুন। তাকে হটিয়ে বোধ হয় অযোধ্যা নিলে বলে!

মজলিশটা অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। সকলে চুপ ক'রে বসে রইলেন। হঠাৎ ওঘরের কথাগুলো কানে এল। ভূত! ভূত! ভূত!

কালীপ্রসন্ন বললেন—ঠাকুরমশায়, ওঘরে দেখছি ভূত নেমেছে। আমি আর রায় একটু ভৌতিক কৌতুক উপভোগ করে আসি। বলে আমাকে টানলেন।

ওঘরে মজলিশ সত্যই জমজমাট। তামাকের আসরে তামাকবিলাসীরা বসেছেন, গড়গড়া ফুরসী হরদম তাজা, রূপো বাঁধানো হুঁকোর মাথায় বিশটা কল্কেতে কাষ্টগড়া বিষ্টুপুরী-গয়ার তামাক পুড়ছে। আতরের খুসবাই ভুরভুর করছে। রূপোর পরাতে বিস্তর পানের খিলি। পান মুখে তামাক টানতে টানতে মল্লিকদের রাম মল্লিক গল্প বলছেন।

কালীপ্রসন্ন বললেন—বেড়ে জমিয়েছ মল্লিক।

মল্লিক তুখোড় লোক, বললে—মিছরির দানার ছুরির মুখটা জমতে বাকি ছিল, সিং, তুমি এয়েচ বাবা, এবার দানা পুরো জমাট হয়ে গেল। এস।

—এলাম। কিন্তু আচ্ছা ভূত নামিয়েছ তো। ওঘর থেকে ঘাড়ে ধরে নিয়ে এল হে। বল গল্পটা শোনা যাক।

—গল্প নয় বাবা। সত্য। তাঁবা-তুলসী-গঙ্গাজল-জর্ডনের জল-গীতা-বাইবেল হাতে বলতে পারি। আমার জ্ঞাতিভাই সুরেন্দ্র মল্লিক, যাকে লোকে বলে ভাণ্ডার মালিক, যে পাদরীদের

কাছে যাওয়া-আসা করে। ক্রীশ্চান হই-হই করছে, লোভ মেমের উপর নিদেন দেশী পাদরী-কন্যা। তার বাবা মারা গেছে মাস তিনেক। শ্রাদ্ধ করেনি। এখন বাপ ভূত হয়েছেন। ঠ্যালা নাও। ইংরিজী বিদ্যে বাকি্য বেরিয়ে গেছে। বাছাধন কাঁপছেন। বুঝলে না, রাত্রি-কালে একদিন নয়, দুদিন নয় চারদিন এই রাত ঠিক বারোটা একটা বাজে আর ঘরের বাইরে কেউ যেন ঘুরে বেড়ায়—দরজা হুট্‌হাট্ করে মনে হয়। বাস্ ঘুম ভেঙে যায়। প্রথম মনে করেছিল চোর। নয় ঘরে তো দাসী-টাসী আছে আর ছোঁড়া চাকরও আছে। ঠাকুর আছে, আমলা আছে। তা ঘর খুলে বেরিয়েও ছিল। সাহস আছে আমাদের সুরেন্দরের। তা বলতে হবে। একটা গুপ্তি হাতে বেরিয়েছিল। কোথায় কি? কাক পড়ে বেদানা খাচ্ছে মানে কাকস্য পরিবেদনা। তারপর ভাবলে ইঁদুর-টিঁদুর। ঘরের দরজা বন্ধ করেছে আর বাইরে থেকে—।

নিজেই নাকিসুর করে মল্লিক বললে—সুঁরন্দর! সুঁরো!

এবার সহজ সুরে মল্লিকই সুরেন্দ্র হয়ে বললে—কে?

—আঁমি তোঁর বাঁবা। বঁড় কঁষ্ট। ছেঁরাদ্ধ কঁরিস নিঁ। পেঁরেত হঁয়ে বঁড় কঁষ্ট পাঁচ্ছি। আঁমি মরবার ক্ষণে তিনঁ পো দোঁষ পেঁয়েছি। ছেঁরাদ্দ কর। দোঁষ কাঁটা। নঁইলে পেঁরেত হঁয়েছি। রঁাগ হচ্ছে। ইঁচ্ছে ইঁচ্ছে তোঁর বুঁকে চেঁপে বঁসি—গঁলাটাঁ টিপে দিঁ।

প্রায় সমস্বরে শব্দ উঠল—ওরে বাবা! তারপর?

মল্লিক বললে—তারপর আর কি। চক্ষু চড়ক গা-ছ! হস্তপদ গুটিয়ে পেটের ভিতর। বু-বু-বু-বু শব্দ ক'রে ধপাস ক'রে পতন! শব্দ শুনে বউ জেগে ওঠে—সেও ক'রে বু-বু। শেষে বাড়ীর লোক—তার পরেতে পাড়ার লোকের জাগরণ। কি ব্যাপার? কি ব্যাপার মশায়? না—ও কিছু না। কি রকম একটা বাইরে শব্দ হতে ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝুন, ছোকরার ধড়িবাজিটা একবার বুঝুন। এর পরেও বলে—ও কিছু না। কিন্তু যাবেন-টা কোথায়? বাছাধন যাবেন-টা কোথায়? পরের দিন ঠিক আবার খুটখাট হুট-হাট! আর নাকিসুরে—সুঁরন্দর শেঁষ গঁলাই টেঁপাবি? বাস্ এই একটি কথা! এমনি তিন-চারদিন। এখন বাছাধন যাচ্ছেন দেশ বেড়াতে। মানে গজং গচ্ছ গয়াং গচ্ছ। গয়া যাচ্ছেন। সেখানে শেরাদ্ধ পিণ্ডি সব শেষ করবেন। মাথা কামাতে হবে তো। তা মাথায় চুল না গজানো পর্যন্ত এদিকে ওদিকে ঘুরে দেশে ফিরবেন। বুঝলে না? শেরাদ্ধও হবে পাদরীদের কাছেও মুখ থাকবে! তা আমিও বাবা রাম মল্লিক, তাকে তাকে আছি, ও যেদিন রওনা হবে, আমিও রওনা হব পিছু পিছু। চল না, কোথায় যাবি চল না। ঠিক পিছন পিছন যাব আমি।

কালীপ্রসন্ন বললেন—মল্লিকমশায়ের শেষ খবরটা ভুল। মানে ও গয়াটয়া কোথাও যাচ্ছে না।

—এখানেই শ্রাদ্ধ করবে নাকি তা হ'লে?

—না। পাদরী সাহেবদের কানে কথাটা উঠেছে৭ তারা ওকে বলেছে, don't be afraid মালিক, don't worry, আমি আজই মাদার মেরীকে বলিটেছি, মাদার আপনি আদেশ করেন, দো গোরা পল্টন ভুট পাঠাইয়া ডিন। ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডি হইটে যারা মারা গেল, টারা ভুট হইয়া আছে। টারা সঙ্গীন লইয়া রাত্রে পাহারা ডিবে, উ বাবা ভুটটা আসিলেই গ্রেপ্টার করিয়া হোলি গোস্টের কাছে লইয়া যাইবে। হোলি গোস্ট বাবা ভুটটাকে কিরিশটান করিয়া ডিবে।

মল্লিক তেলেবেগুনে জলে উঠল।—তামাশা! কিন্তু তামাশা বেরিয়ে যাবে সিংহমশায়।

—তামাশা নয়। আমি যা শুনেছি তাই বলে গেলাম। কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কথা ক'টি বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মল্লিক বললে—পা-ষ-ণ্ড!

ঠিক এইসময় বাড়ীর চাকর এসে রায়কে বললে—রানীমা একবার ডাকছেন আপনাকে অন্দরে।

রানীমা অর্থাৎ দেবপ্রসাদদার স্ত্রী। জগদ্ধাত্রী বউদি। ভবানীর সখী। বয়সে ভবানীর থেকে দু'তিন বছরের ছোট। অনেকদিন দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। ভবানীর নিরুদ্দেশ বা মৃত্যুর পর থেকে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। দেবপ্রসাদ যায়নি তাঁর বাড়ী। তিনিও এ-বাড়ী আসেননি।

* * *

জগদ্ধাত্রী বউঠাকরুণ নিজের ঘরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকবামাত্র বললেন—এস ঠাকুরপো! বস।

—ভাল আছ বউদি? ব'লে হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গেলেন রায়।

জগদ্ধাত্রী পিছিয়ে গিয়ে বললেন—ওকি? আজ কি নতুন হলাম নাকি! কবে তোমার প্রণাম নিয়েছি।

—নাওনি, তখন আর একটা ব্যাপার ছিল। সে তো চুকে গেছে। এখন নেবে না কেন?

—না। তা হ'লেও না। মানুষ ম'রে গেলেও সম্পর্ক একবার হ'লে চোকে না ঠাকুরপো। আমি যদি মরে যাই তবে ওঁর কি আমার বাপ-মা ভাইদের সঙ্গে সম্পর্কটা মুছে যাবে? বস।

চেয়ার পাতা ছিল। সামনে মার্বেলটপ টেবিলে রূপোর রেকাবীতে কিছু খাবার এবং রূপোর গ্লাসে জল রাখা ছিল। জগদ্ধাত্রী বউদি বললেন—খাও। একটু জল খাও। এ বাড়ীতে তো তুমি আসই না। আজ সাত আট বছর কলকাতায় এসেছ, কখনও আস না, কোনও একটা খবরও দাও না। আমি যেতে পারিনে—

লজ্জায় কথাটা বলতে পারলেন না জগদ্ধাত্রী বউদি।

রায় বললেন—যাওনি ভালই করেছ বউদি। যে বীরেশ্বর রায়কে গিয়ে দেখতে সে এক—কি বলব? প্রেত বলতে পার—নরক-বিলাসী বলতে পার!

চুপ করে রইলেন জগদ্ধাত্রী। একটু পর বললেন—তুমি খাও ভাই। আমি জানি তুমি এই এসে চলে যাবে, আর আসবে না। এসেছ এই মহাভাগ্যি বলতে হবে। খবর পেয়ে সেই-জন্যেই আমি শত কাজ ফেলে—আজ তো ভাই হাজার কাজ বুঝতেই পারছ,—সব ফেলে তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। একবার দেখা করব। একটু মিষ্টিমুখ করাব। আর দুটো কথা বলব। নাও হাতে আমিই জল দিচ্ছি। ইচ্ছে করেই দাসীচাকর কাউকে রাখিনি। যে কথা বলব—তা কারুর সামনে হয় না। নাও, তোয়ালে ধর, মুখ মোছ। খাও। আমি বলে নিই কথাটা। না বলে প্রাণটা আনচান করছে আমার।

মুখে দু টুকরো ফল ফেলে দিয়ে তাঁর মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন বীরেশ্বর।—এমন কি কথা বউদি? তার কথা?

—একরকম তাই। সে নেই—

—সে মরেছে?

—মরেছে বইকি? নইলে কি খবর পেতে না?

—খবর টুকরো টুকরো পাই বউদি। কাল রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ী গিছলাম। শুনলাম তাঁর ওখানে বিমলাকান্ত কিছুদিন কাজ করেছিলেন। তার ওখানে একজন কেউ ছিল তাঁর ভগ্নী! বিমলাকান্তের ভগ্নী তো কেউ ছিল না বউদি। সে তো সবাই জানে। সে ছাড়া আর কে হবে বল? সে তাকে দাদা বলত—

—না ঠাকুরপো, তুমি তাকে ভুলেই যাও। সে মরেছেই ধর। তুমি বিয়ে কর।

—সে মরলে বিয়ে করতে পারি বউদি। বেঁচে থাকলে তাকে আমি খুন করব, তারপর ফাঁসি যাব। একটা নিরপরাধ মেয়েকে বিধবা ক'রে কি লাভ হবে বল?

—তোমার মনের কথা যা তা আমি জানি।

—কি জান?

—তোমার সন্দেহের কথা আমি জানি।

চমকে উঠলেন বীরেশ্বর। এ কথা জানেন তিনি আর সে—পৃথিবীর আর কাউকে জানতে তিনি দেননি। তবু স্বাভাবিক ভাবে জেনেছিল বিমলাকান্ত। তার জানারই কথা। সেই তাকে বলেছে। কিন্তু জগদ্ধাত্রী বউদিকে কে বললে? কে বলতে পারে! তেমন চমকে উঠে ঘাড় তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—কে বললে তোমাকে?

দরজার মুখে একজন ঝি এসে দাঁড়াল, জগদ্ধাত্রীকে ডাকলে—বউরানীমা!

—কি?

—নিচে বড় গোলমাল। আপনি আসুন। পিসীঠাকরুণ চেঁচামেচি করছে—যত সব মেলেচ্ছোর কাণ্ড—তিনি চলে যাবেন। এখুনি চলে যাবেন!

জগদ্ধাত্রী বললেন—আমি যাচ্ছি তুই যা।

বলে ওপাশে গিয়ে দেওয়ালের ধারে রাখা একটা বড় চেস্টড্রয়ার খুলে তার ভিতর থেকে একখানা চিঠি এনে বললেন—চিঠিখানা পড়ে দেখো। মাসখানেক আগে চিঠিখানা পেয়েছি!

চিঠিখানার খামের উপরের হস্তাক্ষর দেখে তাঁর মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। এ লেখা—ভবানীর হাতের লেখা!

* * *

সুরেশ্বর বললে—ঠিক এই সময়ে মেজঠাকুমা ঘরে ঢুকলেন সুলতা। বললেন—এখনও আলো জ্বেলে কি পড়ছিস সুরো? রঘু বললে—কাল ও বাড়ী থেকে গানটান ক'রে এসে সেই আলো জ্বেলে পড়তে বসেছিস, সকাল হয়ে গেছে তবুও পড়ে যাচ্ছিস। খাস নি দাস নি। রঘু ভয়ে তোকে ডাকতে পারে নি!

সুরেশ্বরের মোহ ভেঙেছিল। সে এতক্ষণ ঠাওর করেছিল যে সে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ১৯৩৬ সালে কীর্তিহাটের পুরনো বাড়ী বিবিমহলে বসে দুর্দান্ত বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনা লেখা খাতাখানা পড়ছিল। অতীতকালের মধ্যে সে চলে যায়নি!

খাতাখানা বন্ধ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ভবানী দেবী তাঁর পত্রে জগদ্ধাত্রী দেবীকে কি লিখেছেন তা জানবার জন্যে চিত্ত আমার অধীর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মেজঠাকুমার পিছন পিছন—ভাই রাজা! বলে ডাক দিলে ব্রজেশ্বরদা!

যত মিষ্ট ব্রজেশ্বরদাদা—তত পচা; না—সুলতা ঠিক হল না। ব্রজেশ্বরদা উৎকৃষ্ট মদের মত। যখন খাই তখন মনেই সুধা, তারপর তার যখন ক্রিয়া হয় তখন মনে হয় সে বিষ। এবার তাকে মনে হচ্ছিল পুরনো অনেক পুরনো মদের মত। তার স্বাদ বেড়েছে। নেশাতে বিষের

ঝাঁঝ কমেছে। ভবিষ্যতে পোর্ট-টোর্টের মত সব বিষটুকু উপিয়ে দিয়ে ওষুধ হয়ে উঠতে পারে—তাহলে বিস্মিত হব না!

## ১০

মেজঠাকুমাকে সুরেশ্বর প্রথমটা কথার উত্তর দিতেই পারে নি। অকস্মাৎ তার যেন স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়েছিল। কালকের আধখানা রাত্রি যেন বর্তমান থেকে হারিয়ে গেছে। একটু পর স্মরণ হল, ও-বাড়ীতে ব্রজেশ্বরদার নতুন বউ নিয়ে যে আসর পড়েছিল তার কথা। সেখানে সে বাজিয়েছে, ব্রজেশ্বরদা গান গেয়েছে, অর্চনা গান গেয়েছে, মেজঠাকুমাও কীর্তন গেয়েছেন। রায়বাড়ীর দেউলে দশায়—ভাঙা আসরে—ব্রজেশ্বরদা'র দু'নম্বর বাসর হয়ে গেছে। তারপর সে এ বাড়ীতে এসে কীর্তিহাটের ভট্টাচার্যদের—ভাগ্যপরিবর্তনে রায় খেতাবধারীদের—তৃতীয় পুরুষ বীরেশ্বর রায়ের ডায়েরী পড়ছিল। ডায়েরী নয়—স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জী। এমনই তন্ময় হয়ে ছিল, যে তন্ময়তার মধ্যে সে উনিশ শতকের কীর্তিহাটে এবং কলকাতায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সকালে মেজঠাকুমা জানালা খুলে দিতেই দিনের আলোয় তার খেয়াল হ'ল এটা উনিশ শো ছত্রিশ সাল,—এপ্রিল মাসের শেষ। সেটেলমেণ্ট হচ্ছে। আজ একটা দিনও আছে। মাঠে যাওয়ার জরুরী দরকারও আছে। সামনের দেওয়ালে যে ক্যালেণ্ডারটা ঝুলছে তাতে—সেটেলমেণ্ট আপিসের তলবের দিনগুলি লাল পেন্সিলে একটা করে ঢেকাটার চিহ্ন সে নিজে হাতে এঁকে দিয়েছে। জরীপের তিন ঠ্যাঙওয়ালা টেবিলটার প্রতীক।

মেজঠাকুমা বললেন—কি পড়ছিলি সারারাত ধ'রে? এটা তো দেখছি খাতা? কি আছে এতে? সম্পত্তির দলিলের নকল? না—বিবরণ? কি? না। সেগুলো তো বেশ বড় হয়। এর থেকে অনেক লম্বা! চওড়াও বেশী!

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—এতে রায়বাড়ীর কুলজী আছে মেজদি। বীরেশ্বর রায় নিজে হাতে লিখে গেছেন। আরও খানতিনেক খাতা আছে—তাতে কুলজী লিখে গেছেন—রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। রায়বাড়ীর ভাল মন্দ গৌরব কলঙ্ক সব আছে।—

—ডায়েরী?

—হ্যাঁ।

—কোথায় পেলি? এর খোঁজ যে তোর মেজঠাকুরদা কত করেছে রে! ছিল তাঁর কাছেই।—তিনি লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। ওই ঠাকুরদের গহনার সিন্দুকে শ্বশুরমশাই রেখেছিলেন। খুব দামী রেশমী কাপড়ে বেঁধে। তার উপর কাগজ সেঁটে লিখেছিলেন—"এ কেহ পড়িবে না! পড়িলে মহাপাতকের ভাগী হইবে।" উনি পড়েন নি। রেখে দিয়েছিলেন। তারপর কিছুদিন পর আর পাওয়া যায় নি। উনি সেই মণি-হারা সাপের মত দিনকতক গর্জে গর্জে মাথা কাছড়ে কাছড়ে বেরিয়েছিলেন। তারপর তো—ওই সর্বনাশ ঘটে গেল। তুই কি করে পেলি সুরেশ্বর?

সুরেশ্বর কপালের রুক্ষ চুলগুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে চোখ বুজে মাথাটি চেয়ারের মাথায় রেখে বললে—ব্রজদা কাল রাত্রে আমাকে বের করে দিয়েছে মেজদি। এই বাড়ীতেই চোরাকুঠরীতে সে লুকিয়ে রেখেছিল। মেজঠাকুরদার কাছ থেকে ও দুখানা সরিয়েছিলেন সুরেশ্বরকাকা। সেটা ব্রজদা জানত। কাকা মারা যাবার পর হিসেবের খাতার ট্রাঙ্ক খুলে

সে বের করে নিয়েছিল।

—কিন্তু তুই পড়লি কেন সুরেশ্বর ? পড়তে যে মানা ছিল! এ তুই কি করলি ভাই ?

সুরেশ্বর বললে—কিন্তু এমন কোন লেখা কাগজ তো এতে সাঁটা ছিল না ঠাকুমা। ব্রজদাও আমাকে এমন কোন কথা বলে নি!

—কিন্তু ছিল আমি জানি। তিনি আমাকে বলেছিলেন। তা—হলে—।

হঠাৎ সুরেশ্বরের চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মনে পড়ল—সে সেখানে পড়া শেষ করেছে সেখানে বীরেশ্বর লিখেছেন—বউঠান চিঠিখানা হাতে দিলেন। হাতের লেখা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। এ যে ভবানীর হাতের লেখা!

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর লিখেছিলেন, বলছেন মেজঠাকুমা—কেহ পড়িয়ো না। মহাপাতকের ভাগী হইবে। তবে—? তবে কি—?

ভবানী দেবীকে খুন করেছিলেন তিনি ? ভবানী দেবী কি ?

বুকের ভিতরটা ধড়ধড় করে উঠল।

মেজঠাকুমা বললেন—তা হলে সুরেশ্বর ছিঁড়েছে। এ কেবল সেই পারতো।

রঘু চা দিয়ে গেল। চায়ের দিকে তাকিয়ে দুধটা দেখে সারারাত্রি-জাগা দেহটা কেমন যেন বিদ্রোহ করে উঠল—সে সেটাকে ঠেলে দিয়ে বললে—র-চা নেবু দিয়ে ক'রে আন রঘু, দুধ-চা খেতে ইচ্ছে করছে না।

—র-চা খাবি ? সে যে ভয়ানক কষা রে। শরীর ক'ষে যাবে।

—না ঠাকুমা। খুব ভাল জিনিস, খেয়ে দেখ না!

—না, তোর ভাল জিনিস তুই খা। বাবাঃ—ওই আবার খায়!

এই সময়েই ব্রজেশ্বরের গলার সাড়া মিলল—ভাই রাজা!

—এস ব্রজদা!

—তোমার ভাই সুরেশ্বর নাম না হয়ে রাজেশ্বর কি রাজরাজেশ্বর হওয়া উচিত ছিল।

বলতে বলতেই ব্রজেশ্বর ঘরে ঢুকল। ঠাকুমা বললেন—দেখ্ না এসে শুনি রঘু বললে—বাবু কাল খায়নি—ঘুমোয় নি—সারারাত খাতা নিয়ে পড়েছে। সকাল হয়ে গেছে—তবু খেয়াল নেই।

—তাই তো রাজা, চোখ দুটো যে রাঙা হয়ে উঠেছে! মুখখানা থমথম করছে। কাল রাত্রে—। না। সে ঘরের কোণের ব্র্যাকেটের উপর রাখা বোতলটার দিকে তাকিয়ে দেখে বললে,—না। তবে ?

রঘু র-চায়ের কাপ নিয়ে এসে ঢুকল। নামিয়ে দিলে টেবিলে।

ব্রজেশ্বর বললে—র-চা আর আছে রে ? আমাকে দে এক কাপ।

মেজঠাকুমা বললে—তবে আমাকেও একটু দে রে রঘু। চেখে দেখতে হল তো! কি মধু আছে ওতে!

ব্রজেশ্বর বললে—কি পড়ছিলে বলছিল মেজঠাকুমা ? বলেই সে সামনের খাতার দিকে তাকিয়ে বললে—ও! সঙ্গে সঙ্গেই পড়তে শুরু করেছিলে ?

এই সময় বাইরে পথের উপর ঢেঁড়া বাজল ডুগ-ডুগ শব্দে। যেন বিবিমহলের সামনেই বাজিয়ে দিলে কেউ।

মেজঠাকুমা বললেন—ঢেঁড়া কিসের ? কোরোক (ক্রোক) নাকি ? এই সকালে ? দেখরে ব্রজ, তুই না হয় উঠে দেখ!—

উঠে দেখতে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই ঢেঁড়াদার বা তার সঙ্গের লোক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলে—আজ বিকেলে মিটিং হবে। মেদিনীপুর থেকে জাতীয় নেতারা আসবেন। সকলে দলে দলে যোগদান করবেন।

চঞ্চল হয়ে উঠল সুরেশ্বর। ব্রজেশ্বর কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

. মেজঠাকুমা বললেন—অতুলেশ্বর! এ সেই তার কাজ। এই চারদিন আগে গ্রামে ফিরেছে। সেই আমার ভাজের সৎকারের দিন শ্মশান থেকে এসে একদিন কি দুদিন পর কোথায় গিয়েছিল। ফিরল কাল। তার কাজ। এবার একটা হাঙ্গামা বাধাবে। সারা দিন গ্রামের ছোঁড়াদের মধ্যে ঘুরেছে।

ওদিকে আবার ঘোষণা উঠল—দলে দলে আসবেন। নূতন শাসনতন্ত্র ও আগামী নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা হবে। মেদিনীপুরের শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হবে।

* * *

সুরেশ্বরের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠে গেল—এরই মধ্যে। কলকাতা হলে হয়তো উঠত না। এখানে না উঠে পারলে না। এ—মেদিনীপুর!

বিচিত্র মেদিনীপুর! পরগনায় পরগনায় রাজার অঞ্চল মেদিনীপুর, বড় বড় জমিদারের অঞ্চল মেদিনীপুর। ক্ষুদিরামের দেশ মেদিনীপুর। সত্যেন বোসের বাড়ী, হেম কানুনগোর বাড়ী; এখানে অম্বিকানগর প্রথম লক্ষ্যভেদের স্থান। দুর্দান্ত মেদিনীপুর। পাইক বিদ্রোহের দেশ। নাড়াজোলের রাজা দেবেন্দ্রলাল খাঁ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সাতকড়িপতি রায়, কিশোরীপতি রায়, তরুণ নেতা সতীশ সামন্ত, রামসুন্দর সিং! নামগুলি একনিঃশ্বাসে মনে পড়ে গেল।

সামনে এসে দাঁড়াল ক'জন তরুণ কিশোর। বেঙ্গল ভলেণ্টিয়ার্সের ভলেণ্টিয়ার্স। বাংলার ইতিহাসে গিরিয়ার যুদ্ধে বাঁকুড়ার বারো বছরের ছেলে জালিম সিংহের উত্তরাধিকারী। অগ্নিশিখা! পেডি, ডগলাস, বার্জকে এই ক্রুদ্ধ বহ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হয়েছে। প্রদ্যোত, অনাথ, মৃগেন, ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ, নির্মলজীবনের দেশ মেদিনীপুর! তাদের আত্মার উত্তাপে উত্তপ্ত মেদিনীপুর!

ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এ জেলায় আসতে চায় না। এখন বৃদ্ধ গ্রিফিথ এসেছে। গারোয়ার রাইফেলসের থার্ড ব্যাটেলিয়ন এসে ঘিরে রেখেছে শহর মেদিনীপুর। রাত্রে সেখানে কার্ফু। লাল নীল সাদা কার্ড দিয়ে মেদিনীপুরের তরুণদের চিহ্নিত করেছে। নিষ্ঠুর অত্যাচারে অত্যাচারিত মেদিনীপুর। সন্তোষ বেরাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। নারীদের লাঞ্ছনা করেছে। অর্থদণ্ড করেছে—পিউনিটিভ ট্যাক্স।

শুধু খাস মেদিনীপুর শহর বা সাবডিভিশন নয়, তমলুক সাবডিভিশনেও অত্যাচার চলেছে। অর্থদণ্ড দিয়েছে।

কিছুকালের জন্য হৃতচৈতন্যের মত মেদিনীপুর শুব্ধ ছিল। সেই কারণে দুমাস আগে এখানে সেটেলমেণ্টের নোটিশ পেয়ে এখানে আসবার সময় সুরেশ্বর নিশ্চিন্ত মনে এসেছিল। কথাগুলো মনে পড়েনি।

সে ১৯৩০ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে যে চিঠি ছেপেছিল তা তার মনে পড়ে গেল। "বিদায় সত্যাগ্রহ!"

তার বাবার লেখা ইংলিশম্যানের এডিটোরিয়ালগুলির কথা মনে পড়ল।

আজ যেন তার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ১৯৩০ সালে জেলের মধ্যে সত্যাগ্রহী বন্দী-

আচরণে যে সত্যাগ্রহবিরোধী একটা উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ দেখে একটা রেখা নেছিল সত্য ও অসত্যের মধ্যে, সত্যাগ্রহের মহাননীতির মধ্যে যে দুর্নীতির মুখের একটি উঁকি খছিল, তাতেই সে ভেবেছিল সব বিষাক্ত হয়ে গেছে। সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে এসেছিল ।!

আজ মেদিনীপুরের বিবিমহলে বসে কংগ্রেসের 'ঢেঁড়া' শুনে এবং ঘোষণা শুনে তার শরীর ন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

মনে পড়ছে কাল রাত্রে বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনালিপির মধ্যে পড়া কয়েকটি ঘটনার কথা।

গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধাই বা কেন—একান্ত আনুগত্যের আতিশয্যে নতজানু হয়ে বসে তাঁর হাতে মাথা ঠেকিয়েছিলেন। সে আমলের কলকাতায় নতুন অভিজাতমহলকে মনে পড়ছে। তার থেকে শুধু একটি সর্ববাদী-সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মহান ইংরাজ ভারতের ত্রাণকর্তা—অধঃপাত এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে সেই মশালধারী পথ-প্রদর্শক। ইংরেজ বিশ্ববিজয়ী ইংরেজ অজেয়!

১৯২১ সালেও তার বাবা তাই ভেবেছেন। ১৯৩০ সালে সেও বিচিত্রভাবে এমন কিছু একটা ভেবেছিল। আশ্চর্য! তার সংস্পর্শে এসে শিবেশ্বর ঠাকুরদার পচধরা বংশ থেকে অতুলেশ্বর বেঁচে গেল?—বিচিত্র!

এখানে এসে অবধি সে কংগ্রেস দেশ স্বাধীনতা এ নিয়ে কোন জটলা কোন আলোচনা শোনে নি। আজ অতুলেশ্বর ঘোষণা করে ঢেঁড়া বাজিয়ে জানাচ্ছে?

সুরেশ্বর বললে—ব্রজদা, একবার অতুলেশ্বরকে আমার কাছে আনতে পারো? তার মনে পড়ল অতুলেশ্বরকে সে দেখেছে তার বাবার শ্রাদ্ধের সময়। রায়বংশের রূপ তার মধ্যেও আছে। আর দেখেছিল মেজঠাকুমার ভাজের মৃত্যুর দিন। কিন্তু বিবিমহলে সে কোনদিন এসে দেখা করেনি। কেন করেনি আজ তার কারণটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে!

ব্রজেশ্বর বললে—দেখি, ছোট আংকলটি তো আমার যত ঠাণ্ডা তত গরম। ওর বিচার তো অদ্ভুত। ওর ন্যায়শাস্ত্রটাই আলাদা। বুঝেছ। তবে তোমার এই মেজদিকে বল না। উনি তো তাঁর জননী। শিবেশ্বর রায়ের তৃতীয়পক্ষটি ওই একটি ছেলের কাছেই জননী। বাকী সকলের কাছে ঘুঁটেকুড়ুনী।

—এই দেখ, ব্রজ, আবোলতাবোল তুই বকিসনে।

—আবোলতাবোল? বল তো ঠাকরুণ যে টাকাটা তুমি আজ দাদুর মৃত্যুর পর থেকে রাজাভাইয়ের কাছ থেকে মাস মাস পাও, তার থেকে কত টাকা তুমি তোমার ওই দুলালটিকে গোপনে দিয়ে থাক?

—কে বললে?

—আমি বলছি। অহং। আই।

—তুই বললেই হবে? তুই তো আজ দেশ ছেড়েছিস সেই মেজকর্তার, সুখেশ্বরের মৃত্যুর পর। ফিরছিস এতকাল পরে নতুন ধিঙ্গী বউ নিয়ে। কি ক'রে জানলি তুই?

—এই দেখ! ওগো ঠাকরুণ, লগ্নে যাদের চাঁদ থাকে তাদের লোকে বলে লগনচাঁদা। তারা আর কিছু না হোক, লোকের মন গলাতে পারে। কাল এসেই আমি সব শুনে নিয়েছি অর্চনার কাছে! অর্চনা আমাকে সব বলেছে। সেও ছিঁটে-ফোঁটাটা পায়, তা ছাড়া তোমার অতুলেশ্বর আংকলের ও তো সহকারিণী। সে তো তুমিও জান গো! জান না?

*সম্মুখে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত শ্রীমান রাজা নাতি, তোমাকে ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখায়,* তুমি সাবানের খুসবয়ের সঙ্গে নাতি-সোহাগী ঠাকুমার গরব ছড়িয়ে বেড়াও, বল তো তার দিব্যি করে!

মেজঠাকুমা পুতুল হয়ে গেলেন।

এতক্ষণে সুরেশ্বর বললে—এতে তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন ঠাকুমা? এতে তো লজ্জার কিছু নেই। অতুলেশ্বর তোমার ছেলে, তাকে কিছুটা মানুষ করেছ; মমতা স্বাভাবিকও বটে, আর ধর্ম ন্যায় সব সম্মতই বটে। এ ছাড়া অতুলেশ্বর যা করে দেশের কাজ, সে তো পুণ্যের কাজ গৌরবের কাজ। তাকে টাকা দাও স্নেহ কর, এতে লজ্জা কেন পাচ্ছ। যে টাকা তোমাকে মা দিয়ে গেছেন, আমি যা আজও দিচ্ছি, তা তো দান নয় ভিক্ষে নয়—প্রণামী—তোমার পাওনা। ও নিয়ে যাকে দেবে যা করবে তাতে আমি কিছু ভাববই বা কেন, ভাববার অধিকারই বা কি?

অকস্মাৎ মেজঠাকুমার চোখ থেকে জল গড়াতে লাগল। তিনি আঁচল টেনে মুছতে মুছতে নীরবে উঠে চলে গেলেন। ও ঘর থেকে ডেকে বললেন—তুই ভাই খাওয়া-দাওয়া কর, স্নান কর—। ব্রজ, তুই ভাই একটু তাগিদ দিয়ে এসব করা।

চোখ বুজে বসেছিল সুরেশ্বর। ব্রজেশ্বর বললে—কাল রাত্রে দেখি তুমি প্রায় যোগাসনে বসেছিলে রাজা। ওই দ্রব্যপূর্ণ বোতলটা খুলে যা আমি খেয়েছিলাম খানিকটা তারপর আর একটি বিন্দুও দেখছি কমে নি!

সুরেশ্বর চোখ বুজেই বললে—তুমি একবার অতুলেশ্বরকে নিয়ে এস। সে বোধ হয় আমাকে ঘৃণা করে। তুমি তো জান—আমি তিরিশ সালে জেল থেকে ফিরে একখানা চিঠি লিখেছিলাম।

ব্রজেশ্বর বললে—জানি রাজা। সে সময়ে মন্দ কথা আমিও বলেছি। তখন তো আলাপ ঠিক হয় নি। দেখাই হয়েছিল জ্যাঠামশায়ের শ্রাদ্ধের সময়। তারপর তার কারণও শুনেছি আলাপ হয়ে। তবে অতুল তোমাকে ঘেন্না ঠিক করবে না। সে রকম সে নয়। বুঝেছ! জাত ওর আলাদা!

—তুমি একবার এনো ওকে।

—আলাপ করবে? টাকাকড়ি দেবে? তা দাও তো দেখ অতুলের সঙ্গে আমিও কোমর বেঁধে নেমে যাই দেশোদ্ধারে।

—তুমি ব্রজদা, ইনকরিজিব্‌ল্। আমি ওর একটা ছবি আঁকব।

—ছবি আঁকবে? মহাপুরুষ বলে? সকৌতুকে হাসলে ব্রজেশ্বর।

সুরেশ্বর বললেন—তাতে আশ্চর্য কি ব্রজদা। হতেও পারে। কাল রাত্রে বীরেশ্বর রায়ের স্মৃতিকথায় পড়ছিলাম, তিনি কলকাতায় গিয়ে দরখাস্ত করে লর্ড ডালহৌসির সঙ্গে ইণ্টারভিউ পেয়েছিলেন। ইণ্টারভিউ মানে সেলাম জানানো। লাটসাহেবের সামনে গিয়ে অভিভূত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর হাতখানা মাথায় ঠেকিয়েছিলেন। একলা তিনিই এ কাজ করেন নি, সেকালে অনেকে ক'রেছেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে তোমাদের মেজতরফে যা ঘটেছে তা তুমি জান, কে বলবে বল যে, যে ভালটুকু আছে তা ওই অতুলেশ্বরের মধ্যে জমা নেই? তবে এতখানি নাই বা বললাম, খেয়াল হয়েছে, ছবি একটা ওর এঁকে রাখব আমি।

ব্রজেশ্বর চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—তা আনব ওকে। বললেই আসবে। কত ভাল তা আমি জানি না, তবে ভাল ও বটে। সে ছেলেবেলা থেকে। বাবা-কাকারা সকলেই সেই যাকে বলে 'বেগুনে কেন খাড়া—না বংশাবলীর ধারা'। এক ক্ষুরে ন্যাড়া মাথা। ওই কেমন করে বেগুন নয় সগুন বা সেগুন বলতে পার, ওতে কাঁটা নেই এবং সার আছে।

তারপর হাসতে হাসতে বললে—ওর পাশে আমার ছবি একটা এঁকো, খুব ভাল পোজ দিয়ে দেব।

রঘু এসে দাঁড়াল।

ব্রজ বললে—নাও ওঠো। চানটান ক'রে ফেল রাজাভাই, দূত এসে দাঁড়িয়েছে! মেজদি বলে গেছে আমাকে। মেজদি আমার পোড়াকপালী রাজরানী, ওকে আমরা অকথা-কুকথা বললে ও চুপ ক'রে সহ্য করে কিন্তু ও যখন বলে—তা আমার কথা শুনবি কেন রে, আমি তো তোদের ঠাকুরদার এঁটো ভাতের কেনা দাসী! তখন ভাই সহ্য হয় না। নাও ওঠো।

রঘু এতক্ষণে বললে—নায়েববাবু আসিয়েছেন।

—নায়েববাবু! ডাক। বলে উঠে দাঁড়াল সুরেশ্বর। বললে—এবার ওঠালে ব্রজদা। সেটেলমেণ্টের সাহেবের বঁড়শির টান পড়ল বোধ হয়। আজ যেন কি কি ব্যাপার আছে। সাহেবটির বদমেজাজের কারণটা আজ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ চার বছর মেদিনীপুরে যে জঙ্গীরাজত্ব চলছে, সাহেবের মেজাজের ভিতটা তার ওপর। ঠিক খেয়াল হয়নি!

নায়েব এসে ঘরে ঢুকল—এখানকার এজমালি দেবোত্তরের নায়েব। সুরেশ্বর বললে—এই উঠেছি আমি। স্নান করে নিই। কোর্ট তো দশটায়। দেরি আছে এখনও।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সময় এখনও আছে। তবে আমি তার জন্তে আসিনি। একটা বিষয়ে আপনার মত জানতে এসেছি। কাল অনেক রাত্রে ধনেশ্বরবাবু প্রণবেশ্বরবাবু পরামর্শ করে ওঁদের মত বললেন, তখন আমি এসেছিলাম এখানে আপনাকে বলতে। কিন্তু আপনি ও-বাড়ীতে ছিলেন কাল। মাথা চুলকাতে লাগল নায়েব। বলতে পারলে না ও-বাড়ীতে আপনি তখন ব্রজবাবুর বিয়ের উৎসবে গানবাজনা করছিলেন।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ, কাল ব্রজদার বিয়ের বাসী ফুলশয্যে ছিল—

ব্রজেশ্বর সংশোধন করে দিয়ে বললে—বকেয়া ফুলশয্যে ব্রাদার। রাজাভাই, তুমি কীর্তিহাটে এসেছ জমিদারী রক্ষে করতে, বাসী নয় বকেয়া বলতে হয়। বকেয়া থাকলেই আদায়, বাসী হলে এ-যুগে ফেলে দিতে হয়। পান্তাভাতের রেওয়াজ অনেককাল উঠে গেছে। কি গো নায়েববাবু!

নায়েব একটু হাসলে কিন্তু চুপ করে রইল।

সুরেশ্বর বললে—কথাটা কি? বলুন।

—আজ ওই কাঁসাইয়ের ওপারের গোয়ানপাড়ার বুঝারত আছে। তা গোয়ানরা বলেছে বাস্তু ওদের সমস্ত নিষ্কর। কিন্তু ওঁরা দুজন বলছেন—নিষ্কর নয়, সমস্ত বাস্তু চাকরান। এরা ডাক-হাঁক করবে প্রয়োজনমত, বাড়ীর ক্রিয়াকর্মে খাটবে, এ শর্তে ওদের বাস করিয়েছিলেন রাজাবাবু মানে বীরেশ্বর রায় মশায়। তা ওঁরা বললেন আপনাকে বলতে। বলেছেন—এ ব্যাপারে একমত হয়ে এই কথা না বললে খুব অনিষ্ট হবে এস্টেটের।

কথাটা খুব বোধগম্য হ'ল না সুরেশ্বরের। মোটামুটি বুঝলেও ঠিক ব্যাপারটা যেন ধরতে

পারছে না।

নায়েব বললে—ওটা আসলে যাদব রায়ী নিষ্কর। খোদ আদি কর্তা রায়ভটচাজমশায়ের আমলে ওটা তিনি কিনেছিলেন। ওই সিদ্ধপীঠটাটি নিয়ে একশো আট বিঘা জঙ্গল-জমি যাদব রায় নিষ্কর দিয়েছিলেন, এই গ্রামের সেকালে শ্যামাদাস চক্রবর্তীকে, তিনি তান্ত্রিক ছিলেন, ওই সিদ্ধপীঠ তাঁরই সাধনপীঠ। রায়ভটচাজমশায় তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছে কিনেছিলেন। ঘন জঙ্গল ছিল নাম ছিল ছিটমহল চিত্‌রং। তা পরেতে রাজাবাবু বীরেশ্বর রায় ওই গোয়ানদের এসে বসালেন সিদ্ধপীঠের এলাকার বাইরে ওই ডাঙাটায়। অবিশ্যি জমিদারী শাসনে তখন ওদিকে লাগত। খাজনাও কখনও ওরা দেয় নি। কাজ করেছে, খাতায় মাইনে বলে খরচও লেখা আছে। তা নিষ্কক না চাকরান তা জানতেন তাঁরা। লাখরাজ সেরেস্তায় কিন্তু চাকরান বলে ওদের নামে কোন পত্তন নাই। তা কর্তারা বলছেন পুরনো আমলের চেকে পত্তন দেখাবেন। তখন কথাটা আপনাকে বলা আমার কর্তব্য। মানে যা দেখছি আপনার মত তো আলাদা!

—তার মানে পুরনো আমলের চেকবইয়ে যে সব খরচ না হওয়া সাদা গোটা চেক আছে তাই লিখে প্রজার অংশ কেটে ফেলে দেবেন? কিন্তু ধরা পড়বেন না তাতে? লেখা কালি? এসব মিলবে?

ব্রজেশ্বর বললে—রাজাভাই শিখেছ অনেক কিন্তু শিখতে বাকীও অনেক। ব্রাদার, কার্স্ট ক্লাসে পঞ্চতন্ত্র পড়েছিলাম তার একটা শ্লোকে ছিল শাস্ত্র অপার বিঘ্ন অনেক। কিন্তু তাতেও রাজার ছেলেরা মুখ্য থাকেনি। ব্রাদার, জমিদারেরা ও রাজারা পক্ষযুক্ত পক্ষীর মত, কেউ গড়ুর কেউ চামচিকে। গড়ুর ঘরের কোণে ওড়ে না। ওড়ে চামচিকে। তখন তাদের ধর্মকর্ম আলাদা। এও তাই ব্রাদার। কষের কালি আছে, শরের কলম আছে, পুরনো হাতে লেখায় এক্সপার্ট আছে, চালের গাদা আছে। ও আমার পিতাঠাকুর ঠিক মেরে দেবেন। ইংরিজী লেখাপড়া হয় নি সে আলাদা কথা কিন্তু এ শাস্ত্রে তিনি পণ্ডিত, সুখেশ্বরকাকা থাকলে থোকা সুদ্ধ তৈরী হয়ে যেত। তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী ছিলেন।

ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হ'ল না সুরেশ্বরের। সে বললে—আমি তাহ'লে বলব, আমার কোনদিকেই কোন আপত্তি নেই। সে গোয়ানদের দাবীতেও নেই ধনেশ্বরকাকাদের দাবীতেও নেই। কারণ আমি জানিনে কিছু।

* * *

গোটা গোয়ানপাড়া সেদিন সেটেলমেণ্ট আপিসের সামনে। দলবেঁধে বসে আছে গাছের তলায়, গোলমাল করছে। সকলের মাঝখানে ব'সে হলদীবুড়ী, সেই বকছে বেশী। তার পাশে বসে আছে একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে। মেয়েটির মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে বিশেষ করে চোখে পড়ে।

সুরেশ্বরেরও চোখে পড়ল। চমৎকার মুখের শ্রী। বড় টানা চোখ, নাকটি একটু ছোট, কপালখানিও ছোট। নাকে একটি খাঁজ। ঠোঁটের গড়নটা একটু বাঁকা। ওর সব শ্রীই যেন ওইখানে জমা হয়ে আছে। মাধবী ফুলের ঠিক মাঝখানে যেমন হলদে আভাটুকুই মাধবীর রূপের উৎস, এও ঠিক তেমনি।

কিন্তু এ রূপের চেয়েও ও বেশী চোখে পড়ে ওর শান্ত স্বভাব এবং পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার জন্য। পরিচ্ছদ আর কি? মাত্র একটা হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক। পায়ে একজোড়া সস্তা চটি।

নিয়াজে হাফপ্যাণ্ট। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে পরিচ্ছন্ন শ্রী ওকে অন্য সকল গোয়ান মেয়েপুরুষ থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে।

এদিকে ক্যাম্পের সামনে ভদ্রজনদের ভিড়। এ গ্রাম, আশপাশ গ্রাম থেকে বিষয়ী লোকেরা এসেছেন, অবিষয়ীরাও এসেছেন, কারণ একটুকরো জমির উপর একখানা ঘর যার আছে তাকে এ দরবারে না এসে উপায় নেই। ধনেশ্বরকাকা, প্রণবেশ্বরদা, সুখেশ্বরকাকার ছেলে কল্যাণেশ্বর একখানা কম্বল পেতে কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন। সুরেশ্বরের জন্যেও রঘু একখানা সতরঞ্জি এনে পেতে রেখেছে।

সুরেশ্বরকে দেখে একজন হলদীবুড়ীর পিঠে হাত দিয়ে ডাকলে। হলদীবুড়ী এদিকে পিছন ফিরেই হাত-পা নেড়ে আপনমনে বকছিল। পিঠে হাত দিয়ে ডাকার জন্যে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে ঘাড় ফিরিয়ে বললে—কে রে বেত্তমিজ? হাঁ? পিঠে হাত দিয়ে ডাকিস? মারব থাপ্পড়—

—ওই দেখ—কলকাতার রায়বাবু এসে গেলেন!

—কলকাতার রায়বাবু? ফিরে বসল বুড়ী। তারপর সে উঠল। ওই মেয়েটির হাত ধরে সে এসে সুরেশ্বরের সামনে দাঁড়াল—সেলাম হুজুর! রাজাবাবু, আমাকে চিনছেন? সেই সিবার হুজুরের বাবার ছেরাদের সময় সেলাম দিলাম—

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি বইকি। তুমি গোয়ানদের সর্দারের মেয়ে—

—হাঁ হুজুর। আমি পিক্রুর বেটী। লোকে আমাকে হলদী বলে—আমার নাম হল হিলডা। হাঁ। কুইনি, সেলাম দে বাবুকে, সেলাম দে।

মেয়েটি বেশ সবিনয়ে মাথা নামিয়ে বললে—গুড মর্নিং সার।

হেসে সুরেশ্বরও বললে—গুড মর্নিং। কি নাম বললে হিলডা?

—কুইনি। ই নাম দিয়েছে ওর মা। বাও ওর গোয়ানীজ নাম দিল না, দিলে বাঙালী নাম। দুটো নাম ওর। কি নাম বল্ কুইনি!

—আমার নাম অরুন্ধতী গুপ্তা।

বিস্ময়ের আর অবধি রইল না সুরেশ্বরের। সে বললে—তুমি তাহ'লে—এদের মধ্যে—

—ওর মা, সে কলকাতায় থাকত, কিছু লিখাপড়া করল তো ওকে সাদী করলে ওর বাপ। বাঙালী ক্রীশ্চান ছিল সে। তারপরে সে মরে গেল। ওর মায়ের খুব কষ্ট হল। তখুন কি করবে বাবু, আবার ফিরে এল কলকাতায় আমাদের মত গোয়ানীজ পাড়ায়। তারপর মা-টার তো বেমার হল। খবর পেয়ে আমি আনলাম ইখানে। ইখানে এসে সে মরল—বেটীটা থাকল আমার কাছে। কার কাছে দিব? আমার আপনার ছিল ওর মা। এই দু বছর হয়ে গেছে। ভাল মেয়ে বাবু।

—আচ্ছা। তোমাদের তো আজ সব গোয়ানপাড়ার বুঝারত?

—হাঁ হুজুর। তা এঁ কি বিচার রায়বাবু লোকের? আমরাদিগে সে রাজা রায়বাবু ইখানে ডেকে আনলে, বাবা বলছিল আমাকে কি গোয়ানরা রাজা রায় হুজুরকে জান বাঁচালে, উনার রানীকে গোয়ান লোক মা বলত—উ তো দেওতা ছিল হুজুর। রাজা রায় ওই বনের পাশে জমিন দিয়ে বললে—ই জমিনের উপর ঘর বানাও, গাঁও বানাও, খাজনা মাপ—নাখরাজ দিলাম। আজ ই লোক বলে—চাকরান? বলে চেক আছে রসিদ আছে! ঝুটাবাত বিলকুল ঝুটাবাত। আপছি খুব আচ্ছা লোক, আমীর ভদ্দর লোক, আপনার লেগে ব'সে আছি বাবু, আপনি কি বলবে? বলেন বাবু—আপনার রায় শুনবে আমি!

ততক্ষণে গোয়ানরা সব এসে হলদী বা হিলডার পিছনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

—আমি তো এসবের কিছুই জানি না হিলডা। আমি কোন কিছুতেই আপত্তি করব না।

হিলডা হাত দুখানা নেড়ে দিয়ে বললে—হা—হা—হা। আপনে জমিদার, আপনে বলে আমি জানে না! হা—হা—হা। জমিদার কলকাতায় বসে থাকবে, জমিদারির কিছু জানবে না তো রায়ত বাঁচবে কি ক'রে? হা—হা—হা। উ রোজ ই গাঁয়ের লোকের ঘরবাড়ী গরু চরবার জমিন সব আপনি বললে নাখরাজ। গোয়ান লোক কি করলে হুজুর? উ বাত কেনো বলছে না আপনে?

সুরেশ্বর ভেবে পেলে না কি ক'রে ওকে বুঝিয়ে দিতে পারে ব্যাপারটা। যা জানি না, তা জানি বলাও তো মিথ্যা বলা। গোয়ানদের জমির খাজনা সে চায় না, সে মাপ করে দিতে পারে; কিন্তু অন্য শরিকদের ক্ষতি করবার তো অধিকার তার নেই। লাখরাজ যা কিছু তা এখনও মেজতরফের আছে। ওটা তারা বিক্রী ক'রে নি।

গোয়ানপাড়া চাকরান প্রতিপন্ন হলে সম্ভবতঃ একশো টাকা পরিমাণ খাজনা হতে পারবে। তার অংশ তারা পাবে। সে লাখরাজ স্বীকার করলে সেটা তাদের লোকসান হবে। সে দেখলে সকলে তার মুখ চেয়েই রয়েছে। তার কথার মর্ম কেউ বোঝে নি। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল ওই কুইনী মেয়েটির উপর। মনে হল চেষ্টা করলে ওকে বোঝাতে পারা যায়। সে বললে—তুমি একটু বুঝিয়ে বলতে পার। সম্পত্তি তো আমার একলার নয়। আমি জমিদার হয়ে সব জানি না এটা কথা ঠিক বটে। কিন্তু শরিক যখন আছে তখন কেমন ক'রে বলতে পারি যে এ লাখরাজই বটে!

হঠাৎ পিছন থেকে ধনেশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বললে—না জান, সহজ বুদ্ধিতে এটা তো বুঝতে পার হে রাজাবাবু, যে লাখরাজ সম্পত্তি কাউকে লাখরাজ দিতে গেলে বিক্রী করতে হয়। একই জমিতে আমরাও লাখরাজ স্বত্বের মালিক ওরাও লাখরাজ স্বত্বের মালিক—এ কি করে হয়!

কথাটা অত্যন্ত স্পষ্ট করে দিলে ধনেশ্বর। সুরেশ্বরের মনে পড়ল ব্রজেশ্বর বলেছিল—আমার বাবা লেখাপড়াতে পাস করতে পারেনি। কিন্তু জমিদারী বিদ্যেতে বি-এ এম-এ। কথাটা সত্য। এক কথায় পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে আইনসম্মত স্বত্বের কথা।

—কখুনও খাজনা আমরা দিলাম? এতবড় বাড়ীর বাবু আপনে—ই বাত ঝুটাবাত—

—ঝুটাবাত? এ্যাঁ? ঝুটাবাত? খাজনা শুধু রূপেয়াতে হয়? আর টাকা খাজনার কথা তো বলিনি আমরা। বলেছি বেগারের কথা, চাকরান!

—চাকর আমরা কারুর না! মনিব আমাদের কেউ না। রাজাবাবু রায় হুজুর এখানে এনেছিল। জমি দিয়েছিল পিয়ার ক'রে। আমরা কাম দিয়েছি তলব দিয়েছে। ডিকুরুজ কাম করছে ই বাবুর কাছে, তলব দেয় না? সচ বলো তুমি মঝলা তরফ কা বড়াবাবু, কখুনও আমরা লোক বেগার দিলাম? বলো! আমার বাবা রায়বাহাদুরের কাজ করতো রূপেয়া মিলত না? বাবা—রায় বাবুলোকের বেইজ্জতি করেছিল এক বদমাস—বাবা আমার নিমক খেতো রায়বাহাদুর রায়বাবুর, উসকে জান নিয়ে লিল। ফাঁসি গেল। রায়বাহাদুর এতো টাকা খরচ করলে। তুমি বাবুরা ও বাবুর পোতা, বেটার বেটা, আজ তুমি লোক এই বাত বলবে? হা—হা—হা!

—আমি বলব হিলডা। আমি বলব—আমরা খাজনা কখনও নিইনি—বেগারও নিইনি। আমারও অংশ আছে।

কথাটা যে বললে তার কণ্ঠস্বর সুরেশ্বরের পরিচিত নয়। সে ফিরে দেখলে সে অতুলেশ্বর!

—আ, ছোটকাবাবু! স্বদেশীবাবু! রাজা হয়ে যাবে তুমি! হাঁ!

ধনেশ্বর একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল। তুই রাজদ্রোহী। এইভাবে তুই প্রজা বিদ্রোহ করতে চাস।

ব্যাপারটা কতদূর গড়াতো তা কেউ বলতে পারে না। কল্যাণেশ্বর এসে তার পথটা বন্ধ ক'রে দিলে এক কথায়। ওদের কথা পরে মীমাংসা হবে জ্যাঠামশায়। এখন গভর্নমেণ্ট থেকে আপত্তি পড়েছে সমস্ত লাখরাজে!

—মানে?

—আসুন না ক্যাম্পে!

* * *

সুরেশ্বর বললে—ব্যাপারটা একটু জটিল। জমিদারীর কথা না বুঝলে ঠিক ধরা যাবে না, বুঝতে পারবে না। এবং না বুঝলে রায়বাড়ীর ইতিহাস—আমার জবানবন্দী সম্পূর্ণ হবে না।

আমিও সেদিন এই তথ্যগুলিকে তিক্তকষায় বস্তুর মতই অতি কষ্টে আস্বাদন করেছিলাম।

ক্যাম্পে তখন মেদিনীপুর কালেক্টরেটের খাস তালুক বিভাগের একজন কর্মচারী এসে আপত্তি দাখিল করেছিলেন এই গোটা লাখরাজটার উপর। যার নাম ছিটজঙ্গল-মহল চিত্রং।

পুরনো কাগজ ম্যাপ দাখিল ক'রে তিনি বলছিলেন—স্যার, এই ছিটজঙ্গল-মহল চিত্রং, পরগনা মাজনামুঠার অন্তর্গত। এর রেভেন্যু মৌজা মাজনার মধ্যে ভুক্তান হয়ে থাকলেও এই ছিটমহলের খাজনা পুরনো রেকর্ডে ধার্য করা আছে একশো পাঁচ টাকা বারো আনা ছয় পাই। এখন এঁরা এই ষোলআনা ছিটমহল লাখরাজ বলে দখল করলে এর রেভেন্যু আসবে কোথা থেকে।

পরগনা মাজনামুঠার মালিক ছিলেন রাজা যদুরাম রায়, সে পলাশীর যুদ্ধের সময়। তারপর দুপুরুষ পরে তাঁর বংশ লোপ হলে, সম্পত্তির মালিক হন তাঁর অবীরা পুত্রবধূ সুগন্ধা দেবী। তাঁর আমলে পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট হয়। সুগন্ধা দেবী পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টে খাজনার হার মানতে রাজী হন নি। ফলে তখন সরকারী খাস আদায়ে আদায় হয়েছে খাজনা। কিন্তু সদাশয় কোম্পানী রাজবংশের স্বত্বলোপ করেন নি। আদায়-খরচা এবং রেভেন্যু কেটে নিয়ে রাজবংশের বিধবাকে লাভ যা তা দিতেন। তাঁর অবর্তমানে সম্পত্তি নিয়ে দত্তক পুত্র আর দৌহিত্র বংশে মামলা হয়। দৌহিত্র বংশ জয়ী হয়। এই পারমানেণ্টের সময় এখানকার কালেক্টরেটে রেভেন্যু নির্ধারণের ভার নিয়ে আসেন কানুনগো কুড়ারাম ভট্টাচার্য বা রায়-ভটচার্য। তিনিই এই ছিট জঙ্গলমহল চিত্রং লাখরাজ হিসেবে খরিদ ক'রে এর রেভেন্যু মাজনা তৌজির ঘাড়ে চাপিয়ে যান। কিন্তু রেভেন্যু ডিফল্টে বার বার এই সম্পত্তি হস্তান্তর হয়ে হয়ে শেষ সরকারী খাসমহল হিসেবে গণ্য হয়। মধ্যে মধ্যে পাঁচ বছর দশ বছরের জন্য টেম্পোরারী বন্দোবস্ত হয়েছে। গত বৎসর থেকে সে ব্যবস্থা রহিত করে সরকার ১৯৩৬-এর ১লা জানুয়ারী থেকে খাসে রাখাই স্থির করেছেন। এখন মাজনামুঠা সরকারী খাসমহল, খাসমহলের জমিদারি স্বত্বের মালিক। সেই হিসেবে আমরা আপত্তি দিচ্ছি যে এই ছিটজঙ্গল-মহল লাখরাজ হতে পারে না। কেননা এই রেভেন্যু চুয়ান্ন টাকা সরকারকে পেতেই হবে। এই তার কাগজ—এই তার ম্যাপ। এই দেখুন!

হাকিম হরেন ঘোষ একটু হেসে বললেন—কি ? আপনাদের কি বলবার আছে এতে ? এই যে কলকাতার রায়বাবু ! আপনার কাছে তো কুড়ারাম রায়ের পাঁচালী-টাঁচালী হরেক রকম আছে, শুনছি আজকাল ছবি আঁকা ছেড়ে কাগজপত্র নিয়ে কি সব গবেষণা-টবেষণা করছেন অনেক কিছু। কিছু বলুন !

সুরেশ্বর খোঁচাটা একটু নিষ্ঠুর ভাবেই অনুভব করলে। মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। বলতে গেল—না—আমার বলবার কিছু নেই। যা পাচ্ছেন তা লিখুন। আমরা কিছু নবুদ পেলে পরের স্টেজে এ নিয়ে আবার লড়ব।

ওদিকে বাইরে তখন গুঞ্জন উঠেছে চারিদিকে, রাজা যদুরামের লাখরাজ বাতিল হবে ? তবে কোন লাখরাজ থাকবে ? লোকে বলে রাজা যদুরামের নিষ্কর খাঁটি সোনার মোহর এবং তাতে নাকি মা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আছে।

সরকারী খাসমহলের কর্মচারীটি বললেন—এই ছিটজঙ্গল-মহলে একশো আট বিঘার যে প্লট রয়েছে এ ছাড়াও আঠাশ বিঘা আবাদী জমির একটি প্লট রয়েছে, সে জমি রেকর্ড হয়েছে দয়াল ভট্টাচার্যের নামে।

দয়াল ভট্টাচার্য—সেই দলু ভটচাজ যিনি শিবেশ্বর রায়েরও খুড়ো, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের জ্ঞাতিভাই। যিনি নাড়ী দেখে রোগ নির্ণয় করতে পারেন, যিনি সুরেশ্বরকে সোমেশ্বর রায় আর তাঁর স্ত্রী বাঘিনী ঠাকরুণ রাজকুমারী কাত্যায়নীর গল্প বলেছিলেন। তিনি এবার এগিয়ে এসে বললেন—নজীর আমার কাছে আছে হুজুর। আমার দলিল রয়েছে, এই দেখুন। ১২৯৯ সালের খরিদা দলিল। স্বর্গীয় কুড়ারাম রায়-ভট্টাচার্য যখন গ্রামে ফিরে প্রথম বসবাসের ইচ্ছা করেন, তখন আমার প্রপিতামহ তার কাজকর্ম দেখতেন। জ্ঞাতি আমরা। তখন খুব নিকট জ্ঞাতি। এই দু-পুরুষ ছাড়াছাড়ি। তা রায়-ভটচাজমশায় এই লাখরাজ সম্পত্তি কেনেন, তিনি ওই জঙ্গল আর নেন না। আমার প্রপিতামহকে এই আবাদী জমি দেন। টাকা বোধ হয় তিনিই দিয়েছিলেন। এতেই সব আছে দেখুন। রাজা যদুরামের দেওয়া লাখরাজ—ও লাখরাজ অক্ষয়। দেখুন এতেই বিবরণ পাবেন। খোদ নবাব মীরজাফর আলি খাঁয়ের ছাড়া দেওয়া আছে। রায় যদুরামের নিষ্কর কোনক্রমেই বাতিল হবে না।

## ১১

সেটেলমেণ্ট অফিসার হরেন ঘোষ দলিল এবং ছাড়পত্র পড়ে বললেন—এ তো অদ্ভুত! দেখুন মশায়, আপনি দেখুন ! দেখে বলুন, কি লিখব।

সরকারী খাসমহলের কর্মচারী পড়ে দেখে বললেন—অদ্ভুতই বটে। বলে পুরনো বিবর্ণ কাগজখানা কপালে ঠেকিয়ে বললেন—সরকারী ইণ্টারেস্টের কি হবে-না-হবে তা জানি না, তবে চোখে দেখে চোখ সার্থক হল। রাজা যদুরামের হাতের লেখা। এই ছাড়পত্রের কোন নজীর, কোন নবুদ নেই গভর্ণমেণ্টের ফাইলে। আগে একবার প্রাইস সাহেব জরীপ করেছিলেন, তাতেও এর উল্লেখ নেই।

পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আগে সামন্ততন্ত্রের সামন্তরাজা রাজা যদুরাম। মাজনামুঠা পরগণা নিয়ে এগার পরগণার মালিক। এগার পরনার রাজস্ব ছিল নামমাত্র। কয়েকশো

টাকা। গোটা মেদিনীপুরের রাজাদের রাজস্ব ছিল নামমাত্র। কোম্পানীর প্রথম বন্দোবস্তে ঝাড়গ্রামের রেভেন্যু হয়েছিল মাত্র ৪০০৲ চারশো টাকা। তখন মীরজাফর আলি খাঁ মুর্শিদাবাদে নবাব।

রাজা যদুরাম সকালে উঠে ব্রহ্মত্র দান না করে জল খেতেন না। ব্রাহ্মণকে দান, বৈষ্ণবকে দান, পীরকে দান। নিত্য দান করতে করতে নিষ্করে ভরে গেল তাঁর পরগণার পর পরগণা জমিদারী।

পলাশীর যুদ্ধের জন্য কোম্পানীকে যে টাকা দেবার কথা, সে-টাকার জন্য মেদিনীপুরের খাজনা নবাব কোম্পানীকে জাঁত দিয়েছিলেন। কোম্পানী নবাবকে জানালে, রাজা এইভাবে লাখরাজ দিলে মেদিনীপুরের এগার পরগণা লাখরাজ হয়ে যাবে। নবাব খবর পেয়ে তলব পাঠালেন রাজা যদুরামকে মুর্শিদাবাদের দরবারে হাজির হতে। রাজা অমান্য করলেন না নবাবের হুকুম, মুর্শিদাবাদে হাজির হলেন এবং পরদিন দরবারে নবাবকে নজরানা পেশকশ দিয়ে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন।

নবাব তাঁকে বললেন—আমার কাছে খবর এসেছে, খোদ ইংরেজ কোম্পানী জানিয়েছে আমাকে। শুধু কোম্পানী কেন? তোমার পুত্র কুমার জয়নারায়ণও দরখাস্ত দিয়েছে। খবর এই যে, নিত্য তুমি লাখরাজ দান কর। এই দানের ফলে তোমার জমিদারী এগার পরগণায় খাজনা ঘাটতি হয়ে গিয়েছে। এখন আমার হুকুম, এইসব লাখরাজ তোমাকেই নাকচ করে জমা-বন্দোবস্তি করতে হবে। আর—তুমি আর কোন লাখরাজ দিতে পারবে না।

রাজা যদুরাম একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন—মহামান্য নবাববাহাদুর, আমি তা করতে অক্ষম। আমি হিন্দু, দান করে সেই দান ফিরিয়ে নিলে শাস্ত্রমতে শুধু আমি নরকস্থ হব না, আমার পূর্বপুরুষরা নরকস্থ হবে। লাখরাজ যা দিয়েছি, তা ফিরিয়ে নেওয়া অসম্ভব। আর ভবিষ্যতে দান বন্ধ করতে বলছেন, তা-ও আমি পারব না। কারণ এই সংকল্প আমি ভগবানের নাম নিয়েই ইষ্টদেবতাকে সাক্ষী রেখে গ্রহণ করছি।

নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—পারতেই হবে। আমার হুকুম।

—আমাকে মার্জনা করবেন জনাব আলি খোদাবন্দ, আমি অক্ষম।

—তুমি অক্ষম?

—আমি অক্ষম।

নবাবের ক্রোধের সীমা রইল না। হয়তো গর্দান নেবারই আদেশ দিতেন। কিন্তু নিষ্ঠুরতর শাস্তির কল্পনা তাঁর মগজে এল। তিনি বললেন—ভাল। দেখি তুমি কি করে তোমার সংকল্পে অটুট থাক?

বলে আদেশ দিলেন—গর্ত খুঁড়ে রাজাকে কোমর পর্যন্ত পুঁতে রাখ। যেন নড়তে না পারে। কোন লেখার সরঞ্জাম কাছে না থাকে। দেখি কেমন করে দান করে? জল খেতে চাইলে দেবে। আহার চাইলে দেবে। শুধু দান বন্ধ কর।

তাই নাকি হল। তাঁকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হল। সকালে সংবাদ শুনে অনেকজনে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। সামনে ছিলেন এক ফকির। তিনি ফকিরকে ডেকে বললেন—ফকিরসাহেব, আমার এই দান আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন। বলে হাতে ছিল একটি আংটি, সেইটি খুলে দান করলেন। ওই আংটিটা খুলে নিতে ভুল হয়েছিল নবাবের নোকরদের।

তারপর তিনি বললেন—দাও, আমাকে খাদ্য দাও। জল দাও।

নবাব সংবাদ পেয়ে কর্মচারীদের তিরস্কার করলেন এবং বললেন—দেখ, আর দান করবার মত ওর কাছে কি আছে, তা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ।

তাই দেখা হল। আর কোনকিছু ছিল না। নবাব সংবাদ শুনে বললেন—ভাল। কাল! কাল তুমি কি কর, তা আমি দেখব।

পরদিন রাজা যা করলেন, তা পৃথিবীতে কেউ কোনদিন ভাবেনি।

সামনের জনতা থেকে একজন ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন—আপনাকে আজ আমি আমার জীবনের বোধ হয় শেষ দান করব। বলে—সামনের মাটির বুক থেকে ছিঁড়ে নিলেন দূর্বার একটি টুকরো। আর ব্রাহ্মণকে বললেন—ওই অশ্বত্থগাথের একটি পাতা আমাকে দয়া করে এনে দিন। ব্রাহ্মণ বুঝতে পারলেন না এই পাতায় কি হবে। তবু এনে দিলেন। রাজা পাতাটি হাতে নিয়ে কঠোর দংশনে নিজের জিভের ডগায় ক্ষতের সৃষ্টি করলেন, রক্ত বেরিয়ে এল, গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তিনি তখন সেই দূর্বার ডাঁটাটি রক্তে চুবিয়ে পাতার উপর লিখলেন—আমার নিষ্কর বাস্তুভিটা আড়াইশত বিঘা আপনাকে দান করে ধন্য হলাম। ইতি লিখিতং শ্রীযদুরাম রায়, সাকিম মাজনামুঠা কিশোরপুর। অতি সংক্ষিপ্ত দানপত্র। যত সংক্ষেপ লেখা যায়। যতটুকু কুলোয় ওই অশ্বত্থগাছের পাতায়। বললেন—এর তলায় আঠা দিয়ে কাপড়ের টুকরোর উপর এঁটে নেবেন।

লোকে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সওয়ার ছুটে গেল নবাবের কাছে খবর নিয়ে। জনাব আলি, তাজ্জব কি বাত্—। ওই কাফের হিন্দু রাজা—।

নবাব শুনে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ সওয়ারের দিকেই তাকিয়ে রইলেন। তারপর খোদার নাম নিয়ে উঠে নিজে এলেন সেখানে। এবং দাঁড়িয়ে থেকে রাজাকে মাটি থেকে তুলে সমাদর করে নিয়ে এসে, হিন্দু নোকর ডেকে স্নান করাতে হুকুম দিলেন। ব্রাহ্মণ পাচক দিয়ে রান্না করিয়ে খাওয়ালেন। তাঁর নিজে হাতে হুকুমনামা লিখে দিলেন রাজা যদুরাম রায়ের দেওয়া নিষ্কর কোনকালে কারও হুকুমে খারিজ বা বাতিল হবে না। এবং রাজাকে বললেন—রাজাসাহেব, গোটা দুনিয়া যদি খোদা তোমাকে দিতেন, তবে তাঁকেও বলতে হত, রাজা, দান করবে তুমি নিশ্চয়, কিন্তু দুনিয়ার জরীপ—মাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দান করবে। আমার অনুরোধ হল, তুমি এরপর দিন পাঁচ বিঘার বেশী লাখরাজ দান করো না।

যে ব্রাহ্মণকে এই বাস্তু দান করেছিলেন, নবাব স্বয়ং তাকে ডেকে, অর্থ দিয়ে এক টাকা খাজনায় ওই রাজবাড়ী প্রত্যার্পণ করিয়েছিলেন যদুরামকে।

এ লাখরাজ সেই যদুরাম রায়ের। এ ঘটনার পূর্বের দান। এখানকার তারাদাস চক্রবর্তী ছিলেন সিদ্ধ তান্ত্রিক। ওই জঙ্গলের মধ্যে শিমুলতলায় তিনি সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছিলেন। তখন এই জঙ্গলে চিতাবাঘের খুব উপদ্রব ছিল, তাই নামই হয়ে গিয়েছিল চিতার আড়ং, তা থেকেই নাম চিতারং—সাধারণ লোকে বলে চিতরং।

চক্রবর্তী এই সিদ্ধপীঠে সাধনা করে যখন সিদ্ধ হলেন, তখন সংবাদ শুনে লোক পাঠিয়েছিলেন তারাদাস চক্রবর্তীর কাছে। তাঁকে ভূমি দান করে ধন্য হবেন।

চক্রবর্তী চেয়েছিলেন ওই সিদ্ধপীঠের জঙ্গল—ওই শিমুলতলাটুকু। রাজা তাঁকে সমস্ত ছিটমহলটাই দান করে, এই ছিটমহলের অংশমত যে রাজস্ব, তা 'মাজনামুঠা' মৌজায় নিজের নিষ্কর খাস জমির উপর জমাপত্তন করে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

ওই লাখরাজের অর্পণনামায় স্পষ্ট করে সে-কথা লেখা আছে।

"আপনাকে অত্র "ছিটমহল 'চিতারং' ব্রহ্মত্র দান করিলাম এবং নবাবী সেরেস্তায় লিখিত যে একশত পাঁচ সিক্কা তঙ্কা রাজস্ব ধার্য আছে, তাহা নবাব বাদশাহ দরবারে পূর্ণ করিবার জন্ম পরগণে মাজনামুঠা অন্তর্গত মৌজা মাজনামুঠার এলাকায় আমার স্বকীয় নামীয় নবাবী ফারমানযুক্ত লাখরাজ হইতে একশত বিঘা জমি একশত পাঁচ টাকা বারো আনা দশ গণ্ডা খাজনায় জমাপত্তন করিয়া দিলাম। সুতরাং ইহাতে রাজদরবার হইতে এবং মদীয় স্থলাভিষিক্ত ভবিষ্যৎ জমিদার কাহারও কোন আপত্তির কারণ থাকিবেক না। ইতি—দেবব্রাহ্মণসেবক শ্রীযদুরাম রায়, রাজা, পরগণা মাজনামুঠা, সাকিম কিশোরপুর, ফৌজদারী মেদিনীপুর, সুবা বাংলা।"

সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের ভিতরে-বাইরে সমস্ত জনতা একটি আশ্চর্য পবিত্র আচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্ম সেই বিচিত্র স্তব্ধতার মধ্যে কয়েকটা পাখীর ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায়নি। একটা বেনে-বউ পাখী খুব কাছেই ডেকেছিল ঘনপল্লব একটা অশ্বত্থগাছের মধ্যে। বেনে-বউ পাখীর ডাকের মধ্যে যেন কথার আভাস আছে। স্থানীয় লোকেরা কেউ বলে—পাখীটা বলে, গেরস্তের খোকা হোক। কেউ বলে, না। বলে "কৃষ্ণের পোকা হোক।" কেউ কেউ বলে—না-না-না, তাই বলতে পারে? বলে—"কৃষ্ণ কোথা হে।"

কোন কৃষ্ণানুরাগিণী বৈষ্ণবী পক্ষী-জন্ম নিয়ে এই বলে কেঁদে বেড়াচ্ছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সুরেশ্বরের মনে হয়েছিল—পাখীটা আজ বলছে—"যদুরাম কোথা হে।"

বাকি সব স্তব্ধ। বিষয়ী মানুষের মনও একটা ভাবের নিস্তব্ধতায় মগ্ন হয়ে গেছে।

এ স্তব্ধতা ভঙ্গ করেছিল পিছন থেকে হলদী বা হিলডার কণ্ঠস্বর।

—হুঁজুরবাহাদুর! ডিপ্‌টিসাব!

এতক্ষণে সচেতনতা ফিরে এসেছিল মানুষদের মধ্যে। তারা নড়তে-চড়তে শুরু করেছিল, মৃদু গুঞ্জনে কথাবার্তা কইতে আরম্ভ করেছিল। খাসমহলের তরফের সরকারী কর্মচারী বলেছিলেন—ওটার একটা কপি করিয়ে নথির সঙ্গে অ্যাটাচ করে দিন স্যার। মূল ছাড়পত্রে একটা সই দিন, ক্যাম্পের শীল দিয়ে দিন। আমি ওর একটা কপি নেব। কপির সঙ্গে সমস্ত লিখে রিপোর্ট করে দেব। মনে হয় এরপর আর কিছু হবে না। এইখানেই শেষ হয়ে গেল।

—অপ্‌সারসাব! আমার লোকের কি হবে? বাবুলোকের লাখরাজ তো কায়েম হোয় গেল। আমরাদের?

হরেনবাবু বললেন তাঁর চাপরাসীকে—বুড়ীকে বল্‌, কিছুক্ষণ সবুর করতে হবে।

* * *

এরপর স্তব্ধ জনতা গুঞ্জন করতে শুরু করলে।

কিছুক্ষণ ধরে বাইরে যদুরাম রায়ের কথাই উঠল, ক্যাম্পের সামনের সমস্ত বাগানটা জুড়ে। গাছের তলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটলার মধ্যে যদুরাম, যদুরাম, যদুরাম। পাখীর ডাকের মধ্যেও যেন যদুরাম, যদুরাম।

সব থেকে মুখর বক্তা—দয়াল ভটচাজ।

—রায়ভটচাজ ছাড়পত্তরখানা আমার প্রপিতামহকেই দিয়েছিলেন। এই নিষ্কর ছিটমহল যখন চক্রবর্তীদের দৌহিত্রদের কাছে কিনলেন, তখন ওখানা চেয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—নবাব নামে নবাব, মালিক ইংরেজ। কোম্পানীই এখন সুবার দেওয়ান। নবাবী আমল শেষ।

বলতে গেলে এরাই রাজা। মুসলমানেরা এদেশে থেকে এদেশের সব কিছু কিছু মানত। মন্দির ভেঙেছে, ধর্মের ওপর অত্যাচার করেছে, তবু মেনেছে। এদেশে থেকে থেকে বুঝত। এরা কিন্তু মেলেচ্ছ। এরা ওসব মানে না। এসেছে টাকা লুটতে, টাকা টাকা আর টাকা, টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। আমি দেওয়ানী সেরেস্তায় কাজ করি। আমি জানি, ওরা এখন লাখরাজ ব্রহ্মোত্তর-দেবোত্তর বাজেয়াপ্ত করবার ফিকির-ফন্দী খুঁজছে। আয় বাড়বে। এখন, ওখানা না থাকলে তো চলবে না। ওখানা দিতে হবে। দিয়েছিল তারা। সম্পত্তিই যখন বেচলে, তখন ছাড়পত্তর নিয়ে কি আর ধুয়ে খাবে? রায়ভটচাজমশায় কাকা হতেন, আমার প্রপিতামহ নকুল ভটচাজের ভাইপো। নিজে ওই জঙ্গল ১০০ বিঘে নিয়ে জমি পঁচিশ বিঘে কিনিয়ে দিলে ভাইপোকে। তখন ছাড়পত্তরখানা ভাইপোকে দিয়ে বলেছিলেন—এটা তুই রাখ নকুল। আমি বা আমার ছেলে, তারা লাখরাজ প্রমাণ করতে পারবে। তুই হয়তো কষ্টে পড়বি, বেগ পাবি। ওটা তুই রাখ। তোদের ঘরের লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রেখে দিস। তাতে কল্যেণও হবে। বছর-কতক আগে লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা পুরনো হয়ে বাঁধন-টাধন খুলে খসে গেল। হাজার হলেও বেত তো। তখন বেরুল—কড়ি, সে-আমলের সিঁদুরমাখা টাকার সঙ্গে এই কাগজ। আমি বলি—কিছু মন্তরটন্তর লেখাটেকা আছে বুঝি। তা দেখতে গিয়ে দেখি, এই দলিল আর তার সঙ্গে এই ছাড়পত্তর। বুঝেছ।

ধনেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আমাদের সব বড় বড় ঘর ভর্তি কাগজ, সিন্দুক ভর্তি দলিল, সব যে কোথায় গেল!

হাত দুটো উল্টে দিল এবং বার দু-তিন হতাশভাবে ঘাড় নাড়লে। তারপর বললে—লক্ষ্মী যখন ছাড়ে দয়াল-ঠাকুরদা, তখন শুধু তিনিই যান না, তাঁর আসার নজীরপত্তরও সব নিয়ে চলে যান। তখন দলিলদস্তাবেজে উই ধরে; কাগজ উড়ে বেড়ায় বাতাসে। সারের গোবর মাটির মধ্যে পড়ে পচে যায়।

সকলে চুপ হয়ে গেল। চুপ হয়ে যাবারই কথা। এত বড় রায়বাড়ী। দু-পুরুষ আগে রত্নেশ্বর রায়ের আমলের ঐশ্বর্যের কথা, খ্যাতির কথা সকলের কাছে গল্প-কথা হয়ে আছে। তাই বা কেন, এই শিবেশ্বর রায় মেজকর্তা যখন প্রথম এখানে কর্তা হয়ে বসলেন—তখনকার কথাও অনেকে দেখেছে। ধনেশ্বর রায়ের প্রথম যৌবনে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো; টমটম হাঁকানো, তাঁর বিলাসের কথা সকলের মনে আছে। রায়বাড়ীর শখের থিয়েটারের কথা এখনও ভোলে নি লোকে। বাড়ীতে ডান্সিং মাস্টার, এখানকার গরীব ঘরের সুকণ্ঠ ছেলেদের সখীর ব্যাচ নিত, সন্ধ্যায় রিহারস্থাল দিল; ঘুঙুরের ঝমঝম ঝমঝম শব্দ উঠত। গান গাইত। এ তো কথায় কথায় লোকে বলে থাকে। চাপরাসওয়ালা চাপরাসী। হিন্দুস্থানী দারোয়ান। লাঠিয়াল পাইক গমগম করত কাছারিতে। সেই বাড়ী দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল। তলা ফুটো নৌকোর মত ভুস করে ডুবে গেল। কাগজপত্র শুধু উইয়ে খায় নি, অযত্নে অবহেলায় ছড়িয়ে পড়ে উড়ে গেছে। দলিলপত্র কে কোথায় নিয়েছে, গেছে, নষ্ট করেছে কেউ তার খবর জানে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়বে বইকি!

দয়াল ভটচাজ বললেন—ভাই, আমাদের পুঁথি-পত্তরের অবস্থাও ওই হয়েছে। তোমাদের জমিদারীর কাগজ, আমাদের পুঁথি। পুঁথি কি কম ছিল রে ভাই। বেতের কাঠের প্যাটরা-বন্দী একঘর পুঁথি। সে সব ওইভাবে গিয়েছে। আমার নাতির ছেলেরা ইংরিজী ইস্কুলে পড়ে। তারা লাইবারি করবার জন্তে পুঁথিগুলোকে ফেলে দিয়েছে। কতকগুলো পুঁথিতে রঙচঙে কাঠের পাটার মলাট ছিল, সেগুলো নিয়ে রুল টানবার রুল করেছে। দলিলগুলো

বাক্সতে আছে। আর ও দুখানা ছিল লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে, আমার চোখে পড়েছিল বলে রেখেছিলাম।

সুরেশ্বর বসে ভাবছিল—ওখানা পেলে সে রূপো কি সোনার ফ্রেম করে বাঁধিয়ে রেখে দেয়। ভাবছিল, অন্তত ওটার ফটো সে তুলে নেবে। ভাবছিল, কিশোরপুরে গিয়ে যদুরামের ভাঙা বাড়ী দেখে আসবে। সেখানকার ইঁট-খিলেনের পলেস্তারায় যদি কোন লতাপাতা দেবমূর্তি আঁকা কারুকার্য পায় সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে। ভাবছিল, যদুরাম রায়ের বংশধরেরা যদি কেউ থাকে। ভাবনার মধ্যপথে মনে পড়ল—সম্পত্তি গিয়েছিল তাঁর দৌহিত্র বংশে। তাঁর একমাত্র ছেলের একমাত্র নাবালক সন্তান মারা গেলে সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন যদুরামের নিঃসন্তান পুত্রবধূ সুগন্ধা দেবী। হঠাৎ মনে হল—চমৎকার নামটি তো! সুগন্ধা দেবী। একালে সুলতা, সুপ্রিয়া, মঞ্জু, মঞ্জুলিকা, এণাক্ষী, মীনাক্ষীর যুগে সুগন্ধা নামটি আশ্চর্য মিষ্টি এবং আশ্চর্য আধুনিক। ভাবছিল, সুলতাকে নামটা উপহার দেবে। সুলতা আছে থাক সে তাকে সুগন্ধা বলে ডাকবে, চিঠিতে সম্বোধন করবে।

না। হঠাৎ মনে পড়েছিল, পিক্রু গোয়ান খুন করেছিল ঠাকুরদাস পালকে। ঠাকুরদাস পাল সুলতার পূর্বপুরুষ। পিক্রু গোয়ানের মামলায় রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় পিক্রুকে বাঁচাবার জন্ম কয়েক হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। পিক্রুর কন্যা ওই হলদী বুড়ী হিলডাকে তিনি জমি দিয়েছিলেন। হিলডাকেই দিয়েছিলেন গোয়ানপাড়ার মণ্ডল অর্থাৎ প্রধানের পদ!

তাহলে? চকিতে একটা কথা মনে হল সুরেশ্বরের। সে এই ক' মাসের মধ্যে জমিদারীর অনেক কিছু শিখেছে, বুঝেছে। তাহলে তো ধনেশ্বর-কাকা যা বলছেন তাই তো সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ভূস্বামীত্ব না থাকলে, গোয়ানপাড়ার ভূমির উপর জমিদারীত্ব না থাকলে কি করে তিনি হিলডাকে মণ্ডলের পদ দিতে পারেন? লাখরাজ স্বত্বের মালিক যখন লাখরাজ দেবেন, তখন মূল স্বত্ব চলে যাবে। বিক্রীর সামিল হবে। সুতরাং একটা কিছু দেনা-পাওনা ছিল। দেনা-পাওনার মধ্যেই জমিদার-প্রজা সম্বন্ধ! ছিল, একটা কিছু ছিল। চাকরান হওয়াই সম্ভব! তা হলে?

হিলডা একটু দূরে বসে অনর্গল বকে যাচ্ছে। কানে আসছে সুরেশ্বরের।

—হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। দুনিয়ার হাল, কাজের সময়মে কাজী, কাজ হয়ে গেলো তো পাজী। আজ দরকার নেই। গোয়ানদিগে লিয়ে দরকার নেই। বাবুদের অভাব হল। এখন খাজানা বসাও! গোয়ান লোকের উপর খাজনা বৈঠাও। বাস। উ আমরা লোক দিব না বাবা। হ্যাঁ দিব না। 'আতুল'বাবু ঠিক বাতায়েছে। এহি তো সরকারী টেক্সো আজ দিচ্ছে না লোক, কি করছে সরকার? ই তো জিমিন্দার। আমরা লোক-ভি দিব না। কংগ্রিস বানাইব গোয়ানপাড়ায়। ই-ই-কুইনীকে সিকিটারী বানাইব। উ তো বুঝে। সমঝে সব। লিখাপড়ি জানে।

কে যেন কি বলতে গেল। হিলডা হাত তুলে তাকে শাসিয়ে ধমক দিলে,—চুপ। বেতমিজ কাঁহাকা! বাতের উপর বাত বলে!

হঠাৎ একটা কথা সুরেশ্বরের মনে হল। হ্যাঁ, হয়তো হতে পারে তা! সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। হন-হন করে এগিয়ে গিয়ে ধনেশ্বর-কাকাদের জটলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকলে, কল্যাণেশ্বর!

সুখেশ্বর রায়ের ছেলে কল্যাণেশ্বর। ব্রজেশ্বরদা বলেছিল—সুখেশ্বর-কাকা ছিলেন বিষয়-বুদ্ধিতে ডক্টরেট উপাধিধারী। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়ে বেনামীতে ইউনিয়ন

বোর্ডের ইঁদারা, কালভার্ট ঠিকে নিতেন। ভারতবর্ষের নানান রাজ-রাজড়াদের চিঠি লিখতেন, কুমার সুখেশ্বর রায় নাম সই করে। লিখতেন, সর্বস্বান্ত রাজবংশের সন্তান আমি, অভাবগ্রস্ত, সাধারণের কাছে সাহায্য চাইতে মর্যাদায় বাধে। দেব-সেবা চালাতে হয়। কখনো লিখতেন, আমি কন্যাদায়গ্রস্ত। কখনও লিখতেন, আমার পিতৃশ্রাদ্ধ। কখনও লিখতেন, আমি আজ কঠিন রোগে শয্যাশায়ী, চিকিৎসার খরচ নেই। আপনি রাজা। ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হোক, এই নিঃস্ব সর্বস্বান্ত, মাত্র বংশ-গৌরব সম্বল এই হতভাগ্যকে রাজোচিত সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা করি। সই করতেন—Kumar Sukheswar Roy, Prince of Kirtihat। কল্যাণেশ্বর তাঁর উপযুক্ত পুত্র। সে এখন কণ্ট্রাক্টারি করে; বাড়ী-ঘর কণ্ট্রাক্ট নিয়ে এজমালী গাছ কেটে তার তক্তা থেকে দরজা জানলা সরবরাহ করে। সে ধনেশ্বর-প্রণবেশ্বর প্রভৃতির চক্রান্তের মস্তিষ্ক। কথায় ভদ্র, শুধু ভদ্র নয়, পারঙ্গম। ব্রজেশ্বরের পারঙ্গমতা অন্য ধরনের, তার মধ্যে মিষ্টতা, আমিরী আছে, কিন্তু উদ্ধত আভিজাত্যের উষ্ণ সম্ভ্রম নেই। এর সেইটে আছে। সে বিশিষ্ট কেউ একজন এবং ন্যায় ও সত্যপরায়ণ উন্নতশির কেউ বলে প্রমাণ করতে পারে।

কল্যাণেশ্বর তাকালে, বললে—কি? আমাকে ডাকছ?

—হ্যাঁ। একটা কথা আছে।

সে উঠে এল। বললে—বল।

—একটু ওদিকে চল, নিরিবিলিতে।

একটু সরে এসে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে সুরেশ্বর বললে—আমার একটা প্রস্তাব আছে।

—প্রস্তাব? মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললে—গোয়ানদের লাখরাজ স্বীকার করতে বলছ তো? কিন্তু আমরা স্বীকার করলেও তা দাঁড়াবে না। তা হলে বলতে হবে, ও লাখরাজ আমরা ওদের দান বা বিক্রী করেছি। কোন রকম বাধ্য-বাধকতা ওদের সঙ্গে আমাদের ছিল না, বা নেই। সে তুমি অতুল কোর্টের কাছে বললেও তা হবে না।

—সে আমি জানি বা বুঝি!

—না। তুমি ঠিক বোঝ না সুরেশ্বরদা। বিষয় খুব জটিল জিনিস। তাছাড়া প্রজাটজা নিয়ে চরাও নি, নাড়ো-চাড়ো নি; কোথায় কোন ফাঁক তা তোমার জানা নেই। আমাদের কিছু প্রমাণ করতে হবে না। ওরা নিজেরাই প্রমাণ করে দেবে। ওদের গ্রামের চার্চের প্লট এলেই ঝগড়া বাধবে। গোয়ানেরা বলবে, সর্বসাধারণের। হিলডা চেঁচাবে—না, এটা আমার নামে রেকর্ড হবে। ঐ জমিন গ্রামের মণ্ডল হিসেবে রায়বাবুরা আমরার বাবা-দাদাকে মণ্ডল করে দিয়ে দিলে। আমরা জমিদার, মণ্ডল আমরা নিযুক্ত করেছি। প্রমাণ হয়ে যাবে। তোমার অনেক আছে। তুমি ছেড়ে দিতে পার। কিন্তু আমরা কোথায় ছাড়তে পাব, বল? অন্ততঃ একশো টাকা খাজনা ধার্য হয়ে যাবে। তোমার দুয়ের-তিন; আমরা একের-তিনে বছরে তেত্রিশ টাকা পাঁচ আনা ছ গণ্ডা দু কড়া দু ক্রান্তি পাব। সেটা আমাদের কাছে অনেক। ওর দাম বিশগুণ। পণে ছশো সাতষট্টি-আটষট্টি টাকা দাঁড়াবে। মাফ কর, ও হয় না।

সুরেশ্বর জুতোর ডগা দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে ছবি আঁকছিল। পৃথিবীতে হাত পঙ্গু বা হাতকাটা কিছু চিত্রকরেরা পায়ে তুলি ধরে ছবি আঁকে। কেউ কেউ বা দাঁতে তুলি ধরে আঁকে। সে মধ্যে মধ্যে পায়ের ডগায় ধুলোর ওপর ছবি আঁকে; সে শুনছিল আর ছবি আঁকছিল।

আঁকছিল গোয়ানপাড়ার ছবিব, যেমনটা সে নদীর এপার থেকে গোয়ানপাড়াকে দেখেছে—বিবিমহলের ছাদের গোল ছত্রিঘর থেকে দেখেছে। কল্যাণেশ্বরের কথা সে বিশেষ মন দিয়ে শুনছিল না। কল্যাণেশ্বরের মুখে-মুখে হিসেবের অঙ্কের নির্ভুলত্ব তার মনকে আকর্ষণ করতেই পারে নি। সে ছবি আঁকছিল জুতোর ডগা দিয়ে আর ভাবছিল, কিভাবে প্রস্তাবটা উত্থাপন করবে! কেমন করে বলবে,—ঠিক এই সময়টিতেই কল্যাণেশ্বর বললে, বিশগুণো পণে ওদের অংশের ওই পাড়াটার মূল্য হবে ছশো সাতষট্টি-আটষট্টি।

সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ্বর বললে—ওই টাকাটা ওরা দিলে স্বীকার করে নিতে আপত্তি হবে তোমাদের ?

—আপত্তি ? না, তা হবে কেন ? সত্য কথা বলতে বেগার আজকাল আর পাওয়া যাবে না, দেবে না। কংগ্রেসওলারা যা করলে না, তাতে আর কোন জমিদারই জমিদারী চালাতে পারবেন না। গভর্ণমেণ্টের চৌকীদারী ট্যাক্স, তাই দিচ্ছে না। এর পর বলবে, কোন খাজনাই দেব না। সুতরাং টাকা পেলে আপত্তি করব কেন ? দেখ না, ওদের বল না। রাজী হয় তো ভালই ! টাকা কিন্তু আগে চাই !

—টাকা তোমাদের আমি দিচ্ছি, এক্ষুনি দিচ্ছি। তবে চেক দেব। বিয়ারার চেক, মেদিনীপুর ব্যাঙ্কেও আমার এ্যাকাউণ্ট আছে। সেখানকার চাও, কলকাতার চাও দিয়ে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কল্যাণেশ্বর, তারপর একটু মুখ মটকে হেসে বললে—আচ্ছা, বলে দেখি জ্যাঠামশাইকে।

চলে গেল সে। সুরেশ্বর ফিরে নিজের সতরঞ্চিতে বসে নায়েব ঘোষালকে ডেকে সমস্ত বলে বললে—আপনি বিবেচনা করে কিভাবে কি করতে হবে ব্যবস্থা করে ফেলুন। যেন কোন দিকে ফাঁক না থাকে।

নায়েব একটু চুপ করে থেকে বললে—গোয়ানরা কিন্তু তাহলে আর কাউকে মানবে না!

সুরেশ্বরের মনে তখন যদুরাম রায়ের ছোঁয়াচ লেগেছে। সে বললে—না মানুক।

নায়েব ঘোষাল ফিরে এসে বললে—ওঁরা তো নতুন সুর তুলেছেন।

—নতুন সুর ? কি ? টাকা বেশী চাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ, টাকাই আসল কথা। বলছেন—ওই গোয়ানরাই ওখানকার বাস্তুর প্রজা। তা ছাড়া বাকীটা জঙ্গল। সিদ্ধপীঠ। ওর আয় এক পয়সা নেই। অথচ গভর্ণমেণ্টের সেস আছে, দিতে হবে। সে তো ঘর থেকে গোনা। তাহলে তোমার বাবুকে বল ওই জঙ্গল-টঙ্গল নিয়ে গোটা লাখরাজের অংশটাই নিয়ে নেন। আবার দামের বেলা বলছেন—মূল্যবান গাছ আছে। তার মূল্যও আছে।

মাথার ভিতরটা চন-চন করে উঠল সুরেশ্বরের। কিন্তু তার মনের মধ্যে তখনও রাজা যদুরাম রায়ের একটি কাল্পনিক মূর্তি ভাসছে। ক্রোধ তার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করে দিলে। সে বললে—ডাকুন কল্যাণকে, ডাকুন।

নায়েব ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে বিলম্ব তার সইল না। সে নিজেই এগিয়ে গেল। ওদের ওখানে গিয়ে বলল—নায়েববাবু সব বলেছেন আমাকে। বেশ তো তাই রাজী আছি, সমস্ত একশো আট বিঘের আপনাদের একের-তিন আমি কিনতে রাজী আছি। বলুন, কত চাচ্ছেন আপনারা।

ধনেশ্বর থিয়েটার করে উঠল—ও-হো, ও-হো, অ-হো কি মহৎ, কি মহিমা! ধন্য-ধন্য-ধন্য।

এ যুগে তুমি ধন্য! হয়তো যদুরাম রায় জন্মান্তরে তুমি হয়ে ফিরে এসেছ। এই দান এও ভূমিদান। দেখুন, সকলে দেখুন!

লজ্জায় ক্রোধে লাল হয়ে উঠল সুরেশ্বর। তবুও সে নিজেকে সম্বরণ করে বললে—মহৎ আপনারাও কম নন। আপনাদের মহত্ত্ব থেকেই আমার মহত্ত্ব। কিন্তু ও কথাগুলো এক্ষেত্রে অবান্তর ধনেশ্বর-কাকা। চেঁচামেচি না করে কাজটা শেষ করে নিন।

কল্যাণেশ্বর ধমক দিলে ধনেশ্বরকে—জ্যাঠামশাই! আপনার মস্ত দোষ, আপনি যখন-তখন স্থান-কাল বিচার না করে অ্যাক্টিং শুরু করে দেন। বসুন আপনি চুপ করে। যা করবার আমি করছি!

কল্যাণেশ্বর বললে—দাম সুরেশ্বরদা উনি একটু অবুঝের মত চাচ্ছেন। আমি বুঝিয়ে বললাম, কিন্তু উনি—মানে গরজটা তোমার বুঝেছেন। বলছেন, দুটো মানে জঙ্গল আর গোয়ানপাড়া মিলিয়ে প্লটার—দাম একের-তিন অংশে দু হাজার টাকা চাচ্ছেন।

সুরেশ্বর একটি রোমাঞ্চকর স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিল। অর্থাৎ তার অভাব নেই। কোটি নেই, পঞ্চাশ লক্ষও নেই, দশ লক্ষও নেই, তবু কয়েক লক্ষ আছে ব্যাঙ্কে। যা ফুরোতে তার জীবন কেটে যাব। তার উপর বছরে নির্দিষ্ট আয় আছে, যার পরিমাণ বিশ হাজারের কম নয়। এখনও সে সংসারে একা মানুষ। বিচিত্র খেয়ালে খেয়ালী। আজ তাকে যদুরামের খেয়ালে পেয়ে বসেছে। হলদীবুড়ী হিলডা রায়বংশের যে দুর্নাম করছে, সে দুর্নাম সুরেশ্বরকে স্পর্শ করেছে। সে বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনা পড়ে শেষ করতে পারে নি, তবে এটা বুঝেছে, বীরেশ্বর রায় যখন এদের এখানে বসিয়েছেন, তখন নিশ্চয় তিনি এদের কাছে ঋণী। রায়-বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ঋণের সে আভাস পেয়েছে। পিক্ৰু ফাঁসি গিয়েছে খুন করে। আজ সে ঋণ শোধ করবে। দু হাজার টাকা দাম শুনে সে ভ্রূকুঞ্চিত করলে না, বিরক্ত হল না, বললে—বেশ তাই নাও। চেক লিখে দিচ্ছি আমি।

নায়েব ঘোষাল বললে—একখানা দলিল তো করতে হবে! বিনা দলিলে—

—দলিল এক্ষুনি হতে পারে না?

—এক্ষুনি? তা কি করে, মানে—

কল্যাণেশ্বর বললে—স্ট্যাম্প, কাগজ আমার কাছে আছে। আমি রাখি। দলিল হবে না কেন বলছ ঘোষাল। হয়ে যাক না। ও তো সব এক প্লটে রেকর্ড হয়েছে। একশো আট বিঘে প্লট। গোয়ানদের অধীনস্থ চাকরানভোগী হিসেবে খতিয়ান হয়েছে। বিক্রী দলিলে এক কলমে হয়ে যাবে। আর বয়ান কতটুকু। সংক্ষেপ করে লিখলেই হবে।

—কিন্তু জগদীশ্বরবাবু নেই। তিনি তীর্থে গিয়েছেন।

—তিনি আমমোক্তারনামা দিয়ে গেছেন তাঁর বড় ছেলেকে। তিনি সই করবেন।

সুরেশ্বর বললে—করে নিন। তাই করে নিন। ও কাজ আজই শেষ করব আমি। বলে সে ডাকলে, রঘু! পোর্টফোলিওটা দে।

রঘু বসেছিল একটু দূরে, তার কাছে ছিল জলের কুঁজো গ্লাস, টিফিন-কেরিয়ারে খাবার, পোর্টফোলিও।

রঘু পোর্টফোলিওটা এনে দিল। সুরেশ্বর চেক বই বের করে বললে—মেদিনীপুরের ব্রাঞ্চের চেক দি।

কল্যাণেশ্বর বললে—হাঁ, তাই দাও। আর বেয়ারার চেক দাও। ভাঙাতে সুবিধে হবে।

ইতিমধ্যেই বিমলেশ্বর, কমলেশ্বর এবং অতুলেশ্বর এসে দাঁড়িয়েছিল কাছে। অতুলেশ্বর বললে—চেক কিন্তু নামে নামে দাও সুরেশ্বর। এক জায়গায় হলে আমাদের পক্ষে অসুবিধে হবে।

কল্যাণেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—এখানে এই দশজনের সামনে ভাগাভাগি করো না ছোটকা। লোক হাসিও না।

শিবেশ্বর রায়ের দুই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হয়েছিল ষোলটি তার মধ্যে আটটি পুত্র চারটি কন্যা জীবিত। প্রথম স্ত্রীর পুত্র ধনেশ্বর, সুখেশ্বর, জগদীশ্বর, সমরেশ্বর আর দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভের বিমলেশ্বর, কমলেশ্বর, অতুলেশ্বর। শিবেশ্বর থাকতেই প্রথম পক্ষের পুত্র তিনজন আপনাপন পরিবার নিয়ে পৃথক। দ্বিতীয় পক্ষের বিমলেশ্বর খানিকটা উদাসী মানুষ, সে ঘুরে বেড়ায় স্থানীয় তীর্থে-তীর্থে, কমলেশ্বর গাঁজা খায় মদও খায়। লোকের ছাগল গরু পেলে বেচে দেয় পাইকারদের। কখনও কখনও গাছও বেচে দেয় সকলের অজ্ঞাতে। বিমলেশ্বরের সংসার আছে কিন্তু ছোট দুজন বিবাহ করেনি। তারা দুজনেই সুরেশ্বর থেকে বয়সে ছোট। ধনেশ্বর সুখেশ্বর, জগদীশ্বর এদের জন্মকাল থেকেই অবজ্ঞা করে এসেছে। এরাও তাদের বিরোধী। তাদের আশঙ্কা, চেক ধনেশ্বরদের হাতে পড়লে টাকা তারা পাবে না। বাড়ী মেরামত, এজমালী মামলা খরচ, পিতৃশ্রাদ্ধ অর্থাৎ শিবেশ্বরের শ্রাদ্ধ এই নিয়ে তারা টাকা কেটে নেবে।

অতুলেশ্বর বললে—কল্যাণ, লোকে হেসে হেসে ক্লান্ত হয়ে গেছে। আর তারা হাসবে না। চেক তুমি ছখানাই লেখো সুরেশ্বর। তা নইলে আমরা অন্তত সই করব না।

কল্যাণ বললে—তাহলে তাই করো। কি বলব?

সুরেশ্বর কোন কথা বললে না, সে চেক লিখতে বসল। নাম লিখে দু হাজার টাকা ছ ভাগ করতে গিয়ে থমকে গেল। তিন ছয়ে আঠারো। বাকী দুশোকে ছ ভাগ। মনে মনে বার কয়েক ভাগ করে মেলাতে না পেরে বললে—কত হবে কল্যাণ?

কল্যাণ বললে—লেখো না সাড়ে তিনশো করে। একশো টাকাই বেশী যাবে তোমার।

অতুলেশ্বর বললে—তিনশো তেত্রিশ টাকা পাঁচ আনা চার পাই হবে সুরেশ্বর। লেখো। ছখানা চেক লেখা শেষ হলে সে বললে—এই নাও, অতুলকাকা। তুমিই নাও, সব দিয়ে দাও।

এতক্ষণে নায়েব ঘোষাল বললে, তাহলে রেজেস্ট্রির কথাটা কয়ে নিন। এর পর—

কল্যাণ ভ্রূকুঞ্চিত করে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠল—এতখানি অবিশ্বাসের কথা কেন উঠছে সুরেশ্বরদা? না-না-না। এ—। এ কি? সই হয়ে গেছে দলিল, সাক্ষী-সাবুদ সই করেছে। সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে দাখিল হচ্ছে, হাকিম দেখে এ্যাটেস্ট করে দিচ্ছেন—রেকর্ড সংশোধন হয়ে যাচ্ছে। এর চেয়েও কি রেজেস্ট্রি বেশী? আর আমরাও রায়বংশের ছেলে। সুরেশ্বরবাবুও যা আমরাও তাই। তফাত উনি ধনী, আমরা গরীব হয়ে পড়েছি। তা ছাড়া কথা যেখানে খোদ রায়বংশের ছেলেতে ছেলেতে হচ্ছে, তার মধ্যে কর্মচারী, সে নায়েব হোন আর ম্যানেজার হোন, কেন কথা বলবেন? এ কি কথা?

অতুলেশ্বর বললে—বেশ তো, থাক না। চেক ফেরত দাও। দলিল ছিঁড়ে ফেল। দরকার কি? রাখ।

সুরেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—না-না-না। ওঁর হয়তো ভুল হয়ে গেছে, হয়তো উনি কথাটা আমাকে বলতে পারতেন। তবে উনিও গ্রামের লোক, প্রবীণ মানুষ। নাও কাজটা সেরে ফেল।

ওরা চলে গেল। সুরেশ্বর চোখ বুজে গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে বসে রইল। আজ দিনটা যেন বড ভাল লাগছে। জীবনে এমন দিন একটা-আধটা আসে। যদুরাম রায়। রাজা যদুরাম রায়। রাজার গল্প শুনে সে যা করলে, তার মূল্য হয়তো অনেক হবে। কাল সারারাত বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জী পড়ে শেষ করতে পারে নি। তিনিই এনেছিলেন এই গোয়ানদের। কেন এনেছিলেন সে কথা আজ জানতে পারবে। হয়তো তাঁর প্রজামেধ যজ্ঞে সমিধ সংগ্রহের জন্য এদের এনে বসবাস করিয়েছিলেন। হয়তো ওঁদেরও দু চাব দশজন যজ্ঞে বলি হয়েগেছে। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের প্রিয়পাত্র ঠাকুরদাস পাল—সুলতার পূর্বপুরুষকে—

—সালাম রাজাবাবু! বহুৎ-বহুৎ সালাম!

চোখ মেললে সুরেশ্বর। হিলডা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। তার পিছনে গোয়ানেরা। হিলডাব মুখখানাব উপর বেলা তৃতীয় প্রহরেব বোদ এসে পড়েছে। সে রৌদ্রে তার মুখে আঁকা মাকডসার জালের মত রেখাচিহ্ন আশ্চর্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে সেই কিশোরী মেয়েটি, সেই কুইনী। তাব মুখেও রোদ পড়েছে। রৌদ্রক্লিষ্টতার মধ্যেও তার কিশোব লাবণ্য যেন ঝলমল করছে। একটি পেলব লাবণ্য রয়েছে মেয়েটির মুখে। চমৎকার ছবি হয। নাম দেওয়া যায় সকাল-সন্ধ্যা, এপাব-ওপার। অনেক নাম হয়।

হিলডা তখন আপন মনেই বলছিল—আপনে সব কিনে নিলে রাজাবাবু! ই আচ্ছা হল। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ ভালা হল। আপনে রাজা আদমী, আমীর লোক। আমাদের বাডী ঘর বিলকুল লাখরাজ করে দিবে! অতুলবাবু বলেছে সব। আমরা লোক আপনেব নাম করব। কাম করব। যখুন বোলাবেন কাম করব। ই তো ভোট আসছে বাবু। ভোট হবে। ইবার আপনে খাডা হয়ে যাও বাবুসাহেব। আমরা লোক বিলকুল ভোট দিব।

—হ্যাঁ হুজুর, আপনে খাডা হয়ে যান।

সুরেশ্বব শেষ কথাগুলো শুনে চকিত হয়ে উঠল। ভোট? ইলেকশন? সঙ্গে সঙ্গে হাসিও পেল তার। চমৎকার পন্থা পেয়েছে এরা প্রতিদানের। ভোট! সে হেসেই বললে—না হিলডা, ভোটে আমি কোনদিন দাঁডাব না। ভোট আমাকে দিতে হবে না।

অবাক হয়ে গেল হিলডা। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গোয়ানরা। বিচিত্র এই রায়বাবুব এমন সুন্দর ছেলেটি ভোটও চায় না!

কুইনী এতক্ষণে কথা বললে—আপনি বুঝি কংগ্রেসের হয়ে দাঁডাতে চান না স্যার?

সুরেশ্বর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে। বললে—গান্ধীজীকে রোজ সকালে উঠে প্রণাম করি কুইনী। যারা ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছে, তাঁদেরও প্রণাম করি। তবুও ভোটে আমি দাঁডাব না। আমার ভাল লাগল তোমাদের বাস্তবাড়ী লাখরাজ করে দিতে, করে দিলাম। ভালবেসে দিলাম। তোমরা ভালবেসো তাহলেই হবে।

—সালাম হুজুর, হাজারো সালাম। হায়-হায়-হায়। বহুত রোজ আপনে বাঁচেন। গোয়ানরা ভি রোজ সকালে আপকে সেলাম দেবে।

সে সেলাম করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সব গোয়ানেরা। সেলাম করেনি শুধু কুইনী। হিলডা ধমক দিয়ে বলেছিল—আরে, এ তো বহুত বেতমিজ লডকী। সেলাম দে!

কুইনী হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল।—নমস্কার স্যার।

বেশ্বরসু সেদিন লজ্জিত হয় নি, সঙ্কুচিত হয় নি, সেলামের উত্তরে সেলামও দেয় নি তাদের।

বড় ভাল লেগেছিল তার।

১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর শেষরাত্রে জানবাজারের বাড়ীতে সুলতা ঘোষ শুনতে শুনতে এতক্ষণে কথা বলেছিল। বলেছিল—লাগবারই কথা সুরেশ্বর। দান তো ধর্মের দোহাইয়ে পুণ্যের দাবীতে পরলোকে অক্ষয়-স্বর্গ-ই দেয় না, ইহলোকে দাতা-খ্যাতিও দেয়। কিন্তু ওর মধ্যে বীজের বীজকাটা দুটি পাতার মাঝখানে অঙ্কুরের একটা ডাঁটি থাকে। সেটা মাটির নিচের দিকে হয় শিকড়, উপর দিকে হয় শাখা-প্রশাখা। মাটির নিচের রস, আকাশের আলো, বাতাসের অক্সিজেন-কার্বন ডায়ক্সাইড, এসবে হয় তার অক্ষয় অধিকার। বনস্পতি তো না কাটলে সঙ্কুচিত বা লজ্জিত কিছু হয় না।

সুরেশ্বর হেসে বলেছিল—ধন্যবাদ তোমাকে। মাঝখানে ছেদ টেনে একটা সিগারেট খাবার কথা মনে করিয়ে দিয়েছ।

সিগারেট ধরিয়ে সে বলেছিল—যা বললে তার কোন প্রতিবাদ করব না। সংসারে কায়েমী স্বত্ব দু রকমের সুলতা। একটা মাটি, আর ধন-সম্পদের কায়েমী স্বত্ব, আর একটা হল মানুষের ভালবাসায় অধিকার। তা আমি পেয়েছি সুলতা। কিন্তু এক্সপ্রয়েট যাকে বল, তা করি নি। এখনও ইচ্ছে করলে করতে পারা যায়। তুমি যদি কোনদিন দাঁড়াতে চাও ইলেকশনে, তবে সেটা নিয়ে তোমাকে দিতে পারি।

মুখ লাল হয়ে উঠল সুলতার। সুরেশ্বর বললে—দোহাই তোমার সুলতা। আমি তোমাকে আঘাত করি নি, করতে চাইনে। সব অধিকার গেলেও বন্ধুত্বের অধিকারে রহস্যই করেছি। এখন ও তর্ক ছেড়ে দাও। আমার জবানবন্দী—ছবির মধ্যে কীর্তিহাটের কড়চা দেখাচ্ছি। সব শুনে, সব দেখে বিচার করো। তার আগে তর্ক না, বাদ না, প্রতিবাদ না! রাত্রি অনেক হয়েছে। শেষ প্রহরের দিকে চলেছে। স্বাধীনতার পরের কলকাতা। যে কলকাতায় সন্ধ্যের পর যুদ্ধের আমলের ময়দান-চারিণীরা স্বাধীন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যাদের বিচরণ এবং মাতামাতির কেন্দ্রস্থল এই ফ্রী স্কুল স্ট্রীট। শুধু যুদ্ধের পরের কলকাতা নয়, দাঙ্গার পরের কলকাতা, যেখানে গুণ্ডারা আজ বীরের পর্যায়ে উঠে মহাবীরের মত দাপাদাপি করে সারা রাত্রি। সেই কলকাতার সেই ফ্রী স্কুল স্ট্রীট নিস্তব্ধ। একখানা ফিটন চলছে না। একটা মোটর চলছে না। এখন একটা লগ্ন এসেছে, যে লগ্নটিতে আমার এই জবানবন্দী অতীতকালের প্রেতলোকে পৌছবে, হয়তো রায়েরা শুনবে। বর্তমানে তুমি শুনবে, আগামীকালের সূর্যোদয়েও তার রেশ চলবে। সুতরাং শুনে যাও। মনে কর এককালের বন্ধুর জীবনের শেষ দিনের শেষ রাত্রে শেষ কথা শুনছ।

* * *

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—বিচিত্র কথা শোন সুলতা। সেদিন এত করেও গোয়ানদের মুক্তি দিতে পারলাম না।

—কেন?

—কাল আসে নি সুলতা। এই আজকের দিন, মানে ১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর আসে নি বলে হল না। আইনে আটকাল।

দলিল শেষ হয়ে দাখিল হল। ধনেশ্বর রায়েরা সুরেশ্বরের নামে লাখরাজ ছিল জঙ্গলমহল-চিত্রং রেকর্ড করিয়ে দিলে। স্বত্ব লাখরাজ—লাখরাজদার সুরেশ্বর রায়। সুরেশ্বর রায় বললে—গোয়ানরাও এতে লাখরাজ স্বত্বভোগী। ওদের সমস্ত বাস্তু লাখরাজ। ওরা কারুর প্রজা নয়। তাও রেকর্ড হল। স্বত্ব হল ভোগদখলসূত্রে নিষ্কর। কিন্তু প্রশ্ন উঠল—তাহলে

এই দাগগুলো ? পথ, পুকুর, গলিপথ, এবাড়ী-ওবাড়ীর মধ্যে কয়েকটা পতিত প্লট—যেগুলোতে ওদের গরু চরে, ছাগল চরে, যেগুলো ওদের গোরস্তান, সেগুলো কার মালিকানায় ওদের অধিকার দখল হবে, তার মীমাংসা করতে হবে। বল, তোমরাই বল, কার খতিয়ানভুক্ত হবে ? এসব জমির মালিক কে ? কার জমি ?

হিলডা বললে—কার ? না—না, উ তো আমরাদের নায় সাব। উ তো বাবুদের।—হাঁ, আমরা ভোগ করি, দখল করি। লেকিন মালিক তো নায়।

সুরেশ্বর বললে—লিখুন, সর্বসাধারণের। মালিকানি কারুর নয়। হলে সরকারের।

হরেনবাবু বললেন—তা হয় না রায়মশায়। লাখরাজের মধ্যে সরকারের কোন মালিকানা খতিয়ান কি করে থাকবে ? সেটেলমেণ্টের আইনে জমি থাকলেই সরকারের অধীনে মালিক একজন চাই। সাধারণতঃ জমিদারের অধীনস্থ জমিদারীতে খাসখতিয়ানে ওগুলো ঠাঁই পায়, কিন্তু সাধারণের ব্যবহার্য হিসেবে ব্যবহারের অধিকার থাকে সাধারণের। মালিক না থাকলে চলবে না। মালিক থাকতেই হবে। কারণ এদেশেরই নিজের কোন স্বত্ব নেই—এদেশ এক সম্রাটের সম্পত্তি। সম্রাট দেশকে জমিদারীতে ভাগ করে, জমিদারকে ঊর্ধ্ব এবং অধঃলোকের পর্যন্ত মালিকানি দিয়েছেন। মালিক না থাকলে কি করে বসবে ? কিন্তু ছিট জঙ্গলমহল, চিতরং, লাখরাজ। লাখরাজের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাঘাট রয়েছে, যে পুকুর রয়েছে, তা-ও লাখরাজ, সে জমিদারীর খাস পতিতেও যেতে পারে না। এখন সেগুলো হবে কার ?

সুরেশ্বর ভেবে এর মীমাংসা পেলে না।

হরেনবাবু সার্কেল অফিসার হাসলেন। ধনেশ্বর বললে—ওরে হয় না। এ হয় না। ভগবান তো স্বর্গের দ্বার খুলেই রেখেছেন, কিন্তু যাওয়া চাই তো দোর পর্যন্ত। যে যাবার, সে যায় রে, বাকিদের যাওয়া হয় না ; খোলা দরজাটা হাঁ-হাঁ-ই করে।'

হিলডা এবার এসে বললে—তবে উসব পথ, পতিতপুকুর আমরাদের রাজাবাবুর নামে রাখেন ডিপ্‌টিসাব। আর ওহি তো সত্যিও বটে। ঘরবাড়ী আমরাদের লাখরাজ, খাজনা আমরা দিই না, চাকরান ভি নায়, লেকেন বাবুর ইলাকাতে আমরা থাকি। জমিদার আমরাদের বটে। ওই করে দিন হুঁজুর।

হরেন ঘোষ অনেক ভেবে তাই করলেন। মূল লাখরাজদার শ্রীসুরেশ্বর রায়, তাঁর অধীনে গোয়ানরা ভোগদখলসূত্রে নিষ্কর স্বত্বের অধিকারী।

গোয়ানরা সুরেশ্বরকে সানন্দচিত্তে মালিক জমিদার বলে জয়ধ্বনি দিয়েই চলে গেল বাড়ী। ক'জনে বলে গেল—ই আচ্ছা হল। এহি ঠিক। ঝগড়া হোবে, গোলমাল হোবে তো বিচার কোন্ করবে ? ই ভালা হল, আচ্ছা হল। জমিদার বিচার করবে।—

* * *

'স্বর্গের সিংহদ্বার খোলাই আছে, দু-চারজন ভাগ্যবান সেখানে যায়, বাকি মানুষ ভাগ্যদোষে যেতে পারে না। দরজাটা খোলা হাঁ-হাঁ-ই করে।'

কথাটা ঘুরছিল সুরেশ্বরের মনের মধ্যে। কথাটা ধনেশ্বর-কাকা অবস্থা মিলিয়ে বলেছেন ভাল। হয় ভাগ্যবান হতে হবে, নয় ভাগ্যবিধাতাই বদল করতো হবে, যে-বদলের সঙ্গে ভাগ্যের বিধানটাই বদলে যায়।

উত্তরটা তার মনের মধ্যেই ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত যেন বেজে উঠল।

ফিরছিল সে। ক্যাম্প-কোর্ট শেষ হয়ে এসেছে। সে একটু আগেই বেরিয়ে

পড়েছে। নইলে হরেন ঘোষ হয়তো নতুন করে আলাপ জমাবার চেষ্টা করবে। আজকের আচার-ব্যবহারে কথায়বার্তায় তাই মনে হয়েছে তার। তাছাড়া তার মনকে আকর্ষণ করছে বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জীর খাতাখানা।

একখানা চিঠি বীরেশ্বর রায়ের বউদি জগদ্ধাত্রী দেবী তাঁর হাতে দিলেন। বীরেশ্বর রায় হাতের লেখা দেখে চমকে উঠলেন। হাতের লেখা যে ভবানীর।

ভবানী দেবী দহের ঘাটে গায়ের গহনা খুলে গামছায় বেঁধে রেখে দিয়ে ভরা কংসাবতীর দহে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁর দেহ পাওয়া যায়নি, না পাবারই কথা। ভেসেই চলে যাওয়ার কথা, গঙ্গার বুকে পড়ে সাগরতীর্থের মুখে। অবশ্য পথে ভাঁটার সময় চড়ায় লাগতেও পারে, হয়তো সুন্দরবনের জন্তু-জানোয়ারে ছিঁড়ে খেতে পারে, গঙ্গার স্রোতের টান থেকে কুমীরে টেনে নিয়ে গিয়েও খেতে পারে। অসংখ্য পচা-মাংসভুক মাছ ঠুকরে খেতেও পারে। বাঁচার কথা তাঁর নয়।

তবু কেন জানি না, বীরেশ্বর রায় ভবানী মরেছে এ-কথা বিশ্বাস করেননি। কেন তা লেখেননি, তাঁর অনুমান সত্য। ভবানী দেবীর নিজের হাতের লেখা চিঠি তাঁর হাতে এসে পৌঁচেছে। কি লেখা আছে তা পড়বার মুহূর্তটিতেই মেজদি এসে পড়েছিলেন, বলেছিলেন—ওঠ।

তারপর ব্রজদা।

আবার তার মন দুর্নিবার আকর্ষণের টানে ঘরের মুখে চলেছে, সেই খাতা খুলে সে বসবে।

হঠাৎ পিছন দিকে অনেক পায়ের শব্দ সুরেশ্বরের কানে এসে পৌঁছুল যেন। শব্দটা উচ্চ হয়ে উঠছে। এবং এ-শব্দটা যেন চেনা। কলকাতায় পিচের রাস্তার উপর এ-ছন্দের পদশব্দের ধ্বনির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মার্চের শব্দ। পায়ের বুট না থাকলে এ-শব্দ শুধু পায়ে ওঠে না।

সাইকেলের ঘণ্টা বাজছে। অসহিষ্ণু আরোহী ঘণ্টা দিচ্ছে। সে সরে দাঁড়াল, পাশ দিয়ে সাইকেল বেরিয়ে গেল খানচারেক। খাকী পোশাকপরা, কোমরের বেল্টে রিভলবার বাঁধা পুলিশ অফিসার। এবার সে ঘুরে দেখলে। খুব বেশী দূরে নয়, সেটেলমেণ্টের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে, এই রাস্তাটা ধরেই চলে আসছে পুলিশবাহিনী। কুড়ি-পঁচিশজনের একটি আর্মড পুলিশবাহিনী। পথের ধুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ছে। সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে যেসব লোকেরা এসেছিল, তারা দল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

সুরেশ্বরের মন চকিতে বীরেশ্বর রায়ের কাল থেকে মুখ ফিরিয়ে আজকের অপরাহ্নের কীর্তিহাটে ফিরে এল।

মেদিনীপুরের কীর্তিহাটে। সেখানে রায়বংশের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে অতুলেশ্বর।

আজ মিটিং হবে ঘোষণা করেছে ঢেঁড়া দিয়ে। কংগ্রেসের মিটিং। রিজার্ভ ফোর্স আসছে।

সুরেশ্বরের মনে ছবির কল্পনা জেগেছিল। তিনখানা ছবি। বা একখানাতেই তিনজনের ছবি—লর্ড ডালহৌসির সামনে নতজানু বীরেশ্বর রায়।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ছবি।

কংগ্রেসের ঝাণ্ডা হাতে অতুলেশ্বর।

না। তার সঙ্গে তারও ছবি না আঁকলে সম্পূর্ণ হবে না। 'বিদায় বিপ্লব' পত্র হাতে সুরেশ্বর রায়।

পুলিশবাহিনী তার পাশ দিয়ে চলে গেল।

## ১২

সুরেশ্বরের ইচ্ছে হয়েছিল সে যায় সভার নির্দিষ্ট স্থানে। কিন্তু সে যায়নি। সম্বরণ করেছিল নিজেকে। সে জানে, যে-মন, যে চরিত্র, যে-বাস্তবতাবোধ নিয়ে এ বিপ্লবের কর্মী হওয়া যায়, সে তার নেই। না—নেই।

হয়তো এ মন তাকে দিয়েছে তার অর্থনৈতিক অবস্থা, বাল্যকালে তার বাবা তাকে যা শিখিয়েছিলেন; যে-দৃষ্টি দিতে চেয়েছিলেন, সেই শিক্ষা, সেই দৃষ্টি। এবং তিরিশ সালে জেলের মধ্যে বিপ্লবীদের যে এক উন্মত্ত মনের বিচিত্র বাস্তববোধের পরিচয় পেয়ে সে শিউরে উঠেছিল, যা সহ্য করতে পারেনি, সেই অভিজ্ঞতা তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

বীরেশ্বর রায়, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়, তা থেকে দেবেশ্বর রায়, তার পিতামহ তিনি গোপনে বিপ্লবীদের অর্থসাহায্য করতেন বলে সে শুনেছে, তাঁর পর তার বাবা যোগেশ্বর রায় —তিনি ইংলিশম্যান স্টেটসম্যানের চাকরি করেও, ইংরেজ সরকার সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা করেছেন, স্টেটসম্যানের চাকরি ছেড়ে তিনি দেশবন্ধু দাশের কাগজেও লিখেছেন। তারপর সে। সে জেলে গিয়েছিল। ফিরে এসে সে অনুতপ্ত হয়েছিল। তারপর অতুলেশ্বর।

অতুলেশ্বর আজ গুলি খেয়ে মরতে হয়তো পারবে।

বিবিমহলে সেই ছত্রি ঘরে বসে সুরেশ্বর বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জীর খাতাখানা সামনে খুলে রেখে খানিকটা পড়েও আর পড়তে পারেনি। মন তার ওই মিটিং-এ কি হচ্ছে, তার ভাবনাতেই বার বার ঝাঁপ খেয়ে পড়তে চাচ্ছিল এবং পড়ছিল। গোটা বিবিমহলে এক রঘু ছাড়া কেউ নেই। মেজদি আসেননি, ব্রজেশ্বরও না। তারাও কি মিটিংয়ে কি হচ্ছে দেখতে গেছে? অথবা ঘরের মধ্যে তারই মত সংশয়াকুল হয়ে রয়েছে?

মিটিংটা হচ্ছে পুরনো তিনমহলা রায়-বাড়ীর উত্তরে যে-খিড়কির দুধপুকুর আছে, তার ওপাশে যে ডোমপাড়ার পতিত প্রান্তরটা সেখানে। প্রৌঢ়া রাজকুমারী কাত্যায়নী একটা তেরো-চৌদ্দ বছরের ডোমের ছেলে গাছে চড়ে তাঁর গায়ের আশ্চর্য সুন্দর রং দেখেছিল বলে যে-ডোমপাড়ার গোটাটাই হাতী দিয়ে ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন, এটা সেই প্রান্তর।

একটা কোলাহল ভেসে আসছে। ঠিক বুঝতে পারছে না সুরেশ্বর কি হচ্ছে। সে ছত্রিটায় বসেছিল, ছত্রিটার চারিদিকে আটটা থাম, নিচে রেলিং, বাকি উপরের দিকটা ছাদ পর্যন্ত সবই ফাঁকা, চারিদিকেই দেখা যায়। তবে অনেকটা দূরে রায়বাড়ী ওদিকটা আড়াল করে রেখেছে। সে দেখছিল, পথেঘাটে কোন লোক নেই। গ্রামের অন্য সকল দিক থেকেই প্রাণস্পন্দন, জীবন-গুঞ্জন সরে গিয়ে ওই—ওইখানটাতেই জমায়েত হয়েছে। প্রথম বারকয়েক 'বন্দেমাতরম', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠেছিল কিন্তু তারপর আর কোন ধ্বনি উঠছে না। উঠছে একটা বহু কণ্ঠস্বরের মিলিত বহুবাক্যের একসঙ্গে উচ্চারণের কোলাহল। তবু এখনও কোন বন্দুকের শব্দ ওঠেনি—এইটেই একমাত্র আশ্বাস।

এদিকে দেখা যাচ্ছে, কংসাবতীর স্রোতোধারা চলে গেছে একটু পূর্বদিকের ছোঁয়াচ-লাগানো দক্ষিণমুখে। সন্ধ্যার লালচে আলোর ছোপ ধরেছে কাঁসাইয়ের জলে।

বিবিমহলের এই ছত্রিঘরের ঠিক নিচে দহটার বুকে কিছুতে অর্থাৎ কোন জলচর জীব হঠাৎ নড়ে উঠল; জলের বুকে গোলাকার বৃত্ত একটার পিছনে একটা ছুটছে। এই দহে ভবানী দেবী ঝাঁপ দিয়েছিলেন মরবার জন্য। কিন্তু মরেননি। ভেসে গিয়েছিলেন কাঁসাইয়ের স্রোতে। ওই পূর্ব-দক্ষিণ মুখে। ভবানী দেবীর চিঠিখানা কিছুক্ষণ আগে সে পড়েছে। জগদ্ধাত্রী দেবীকে লিখেছিলেন নিরুদ্দেশ হওয়ার সাত বছর পর। সাত বছর পর বীরেশ্বর রায়ের অহেতুক অনুমান সত্য হয়ে দাঁড়াল। ভবানী দেবী মরেননি! তিনি বেঁচে আছেন।

"মরিব মানস করিলেই মরণ আইসে না। পৃথিবীতে যাহার লিখনে যত দুর্ভাগ্য, যত দুর্ভোগ প্রহারের ব্যবস্থা বিধাতা লেখে, তাহা এড়ানো যায় না। ভোগ করিবার জন্য বাঁচিতে হয়। অদৃষ্টই বাঁচায়। আমি বর্ষার কাঁসাইয়ে মরিব বলিয়া ঝাঁপ দিয়াছিলাম, কিন্তু মরণ হয় নাই। বাঁচিয়াছি। কোথায় আছি, কেমন আছি তাহা লিখিব না। আর আমার ঘরে ফিরিতে সাহস নাই—ইচ্ছা নাই। ঠিকানাও দিব না। তিনি ঠিকানা পাইলে আমাকে নিশ্চয় খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং হয় গলা টিপিয়া নয় গুলি করিয়া মারিবেন। মরিতে আমার ভয় নাই কিন্তু তিনি স্ত্রী-হত্যার পাতকে পাপী হইবেন। হয়তো থানা-পুলিশ হইয়া একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবে। আবার তিনি হয়তো সব শুনিয়াও ক্ষমা করিয়া ঘরে লইতেও পারেন। তিনি সব পারেন। সমাজের আপত্তি হইলে ক্রীশ্চান হইয়া যাইবেন। কিন্তু আমাকে ঘরে লইলে সর্বনাশ হইবে। আমি দুর্ভাগ্য, আমি পাপ। তুমি জ্ঞাত আছ, আমি এক সাধক-তান্ত্রিকের কন্যা। আমার পালক বাবা বলিতেন, তাঁহাকে কামাখ্যা পাহাড় হইতে যোগিনী-ডাকিনীতে ঠেলিয়া নিচে ফেলিয়া দেয়। তিনি অনেক নিচে পড়িয়া মারা গিয়াছেন, নয় জন্তুতে খাইয়াছে। কিন্তু সে-ও আমার জন্মের জন্য। আমার জন্মের পাপেই তাঁহার এই পরিণাম হইয়াছে। আমার পাপেই আমার এমন স্বামী মদ ছাড়িয়া আবার মদ ধরিলেন, প্রায় পাগল হইলেন। আবার ঘরে ফিরিলে হয়তো সর্বনাশ হইবে। আমাকে মারিয়া ফেলিয়া নিজে মরিবেন। এত কথা তোমাকে লিখিতেছি এই জন্য যে, তুমি আমার বাল্য-সঙ্গিনী ছিলে, বিয়ের সম্বন্ধে বড়-জা হইয়াছিলে, তুমি সব কিছু কিছু জান এবং আমার স্বামী তোমার দেওর। এখন বলিবার কথা এই যে, তুমি ভাই তাঁহাকে ডাকিয়া বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নতুন বিবাহ দিয়া সংসারী করিয়া দিবা। তুমি আমা অপেক্ষা বয়সে ছোট, বাল্যকালের সঙ্গিনী, তথাপি তুমি সম্পর্কে বড়-জা, তুমি আমার প্রণাম জানিবা। ইতি—ভবানীকুমারী দেবী।"

এর নিচেই বীরেশ্বর রায় লিখেছেন—"পাপ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাকে পাইলে খুন করিব, তাহাতেও সন্দেহ নাই। মহাপাপিনী, নইলে তাহার গর্ভস্থ সন্তান অবিকল বিমলাকান্তের মত হইল কেমন করিয়া? কামার্ত পশু বিমলাকান্ত। সে-ও বুঝিয়া এই কারণেই পলাইয়াছে। আমার আক্ষেপ হইতেছে, ওই সন্তানটাকে গলা টিপিয়া আমি তাহার চক্ষের সম্মুখে মারিয়া ফেলি নাই কেন?"

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিল সুরেশ্বরের। সে আর নড়েনি, খাতাখানাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পড়তে সাহস হয়নি।

আবার ধন্যবাদও দিয়েছে যে, বীরেশ্বর রায়ের বংশের সন্তান নয় তারা। বিমলাকান্তের পুত্র কমলাকান্ত বীরেশ্বরের ভাগিনেয়, বীরেশ্বর রায়ের পোষ্যপুত্র হয়ে নাম হয়েছিল রত্নেশ্বর রায়। তার বংশধর তারা।

বিমলাকান্তের উপর নিষ্ঠুর ক্রোধের কারণ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। হায় ধর্মপরায়ণ

বিমলাকান্ত! হায় তোমার তান্ত্রিক সাধক পিতা শ্যামাকান্ত! হায় তোমার মাতামহ শুদ্ধাচারী ধার্মিক পদ্মনাভ ভট্টাচার্য!

অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে আকস্মিক একটা বিদ্যুতের চমকের মত একটা সত্য সুরেশ্বরের মনের মধ্যে ঝলসে উঠল।

রায়বংশে তীব্র নারী-দেহ-পিপাসা কোথা থেকে এল, তার উৎস যেন এই বিদ্যুৎ-চমকে স্পষ্ট পরিষ্কার ভাবে সে দেখতে পেয়েছে। বিমলাকান্ত এর উৎস। সে নিজেকেও তো জানে। তার রক্তের মধ্যে এর জোয়ার বা বন্যার আবেগ তো সে অনুভব করেছে। মনে পড়ে গেল গোপেশ্বরকে।

ওঃ! শিউরে উঠল সে। বিমলাকান্ত থেকে সে, ব্রজেশ্বর, গোপেশ্বর—এরা পঞ্চমপুরুষ। ওই বীজ এই সম্পদের ইনকিউবেটারে সযত্নপালিত হয়ে সমস্ত রক্তধারাকে বিষাক্ত করে দিয়েছে। তার আগে—। থাক, পিতৃপুরুষদের কথা থাক।

হঠাৎ সেই মুহূর্তটিতেই উঠেছিল কয়েকবার মানুষের সমবেত কণ্ঠধ্বনি—বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম। জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। ইনকিলাব শব্দটা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। সে-শব্দটি একজন বা দুজনে ধ্বনি দিয়ে থাকে। কিন্তু য'জনেই সে-শব্দটি ধ্বনি দিয়ে থাক, তার মধ্যে যে একটি কণ্ঠস্বর অতুলেশ্বরের, তাতে তার সন্দেহ ছিল না।

মন ফিরে এসেছিল আর একদিকে। ঘন কালো মেঘাচ্ছন্নতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সূর্যের আভাসের একটি রজতশুভ্র রেখার মত অতুলেশ্বর। ও কোথা থেকে এল? হয়তো শ্যামাকান্ত যে শক্তিসাধনা অর্ধসমাপ্ত রেখে কাঁসাইয়ের বন্যায় মরেছিলেন, তারই পুণ্যফল!

হঠাৎ একটা উচ্চকণ্ঠের ডাক ভেসে এল যেন আকাশপথ ধরে। অনেকটা উঁচু থেকে ডাকছে—রাজাভাই!

বুঝতে বাকি রইল না কে ডাকছে। কিন্তু কোথা থেকে ডাকছে খুঁজতে গিয়ে তার নজরে পড়ল দূরে রায়বাড়ীর ছাদের আলসের গায়ে দাঁড়িয়ে ব্রজেশ্বর। চোখোচোখি হতেই সে চীৎকার করে বললে—অতুলকে অ্যারেস্ট করেছে।

বিস্মিত হল না সুরেশ্বর। সে তাকিয়েই রইল তার দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে কোন মেয়ে এসে ব্রজেশ্বরকে কি বললে।

—পুলিশ আসছে। বলেই ব্রজেশ্বর চলে গেল। বোধ হয় ছাদ থেকে নেমে গেল এবার। দেখতে পেলে, দূরে ঠাকুরবাড়ীর ওপাশে, মা-কালীর নামে প্রতিষ্ঠা করা কালীসাগরের ওদিকের পাড় ধরে অনেক লোক ছুটছে। পালাচ্ছে। সম্ভবত পুলিশ তাড়া করেছে। মেদিনীপুরে কংগ্রেস আজও বে-আইনী প্রতিষ্ঠান। পুলিশ বোধ হয় লাঠিচার্জ করেছে। এদিকে 'বিবিমহল' একখানি একক বাড়ী। এর পাশ দিয়ে এক গোয়ানপাড়ার লোক ছাড়া কেউ হাঁটে না। পূর্ব এবং দক্ষিণদিকটা ফাঁকা। শুধু বনই আছে। বসতির মধ্যে নদীর ওপারে গোয়ানপাড়া।

না—। আসছে। গোয়ানপাড়ার লোকই আসছে। ক'টি তরুণী মেয়ে আর জনকয়েক জোয়ান ছেলে। রোজী বলে প্রগল্‌ভা মেয়েটিও তার মধ্যে রয়েছে। আরও রয়েছে—কুইনী। ওদের জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও কিছু জিজ্ঞাসা করলে না সুরেশ্বর।

কি জিজ্ঞাসা করবে?

সত্যি কথা বলতে, তার একটু যেন সঙ্কোচও হচ্ছিল। নিজেকে ছোট মনে হচ্ছিল। এরা

যে-ডাকে সাড়া দিয়েছে, সে-ডাকে সে সাড়া দেয়নি।

ওরা চলে গেল রাস্তা ধরে—গোয়ানপাড়ার ঘাটের দিকে।

চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল সুরেশ্বর। ভাবছিল—স্টেটসম্যানে 'বিদায় সত্যাগ্রহ' বলে যে পত্রখানা সে লিখেছিল, সে তো ন্যায়বিচারে মিথ্যা নয়। তবে—তবে সে কেন সঙ্কোচ বোধ করছে? কেন?

হঠাৎ চোখে পড়ল—বিবিমহল আর রায়বাড়ীর মাঝখানে যে বিশ বিঘের উপর আমবাগান, সেই বাগানের বৃহদায়তন গাছগুলোর গুঁড়ির আড়ালে আড়ালে একটি সচল নারীমূর্তি। কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও যাচ্ছে না। হঠাৎ একবার সে গাছের আড়াল থেকে বের হতেই সে তাকে চিনলে। সে অর্চনা। জগদীশ্বর-কাকার সেই সুষমাময়ী মেয়েটি।

অর্চনা, বাগানের গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে, এ-পাশ ও-পাশ তাকিয়ে দেখে নিয়ে খুব দ্রুত হেঁটে এসে ঢুকল বিবিমহলেই।

সুরেশ্বরের মনে পড়ল, সকালবেলা ব্রজদা বলেছিল, মেজদি অতুলকে স্বদেশী করতে টাকা দেন। তিনি তার অভয়দাত্রী, তার অর্থসাহায্যদায়িনী। এবং অর্চনা তার সহকারিণী।

অর্চনা তবে পালিয়ে এসেছে। ব্রজদা বললে—ও-বাড়ীতে পুলিশ এসেছে। অর্চনা কি ভয়ে পালিয়ে এসেছে? সে দ্রুত নিচে নেমে গিয়ে দাঁড়াল হলটায়। কিন্তু কই অর্চনা?

অকস্মাৎ নদীর ঘাটের উপর ছত্রিঘরের দরজাটা খোলার শব্দ হল। পুরনো দরজা সন্তর্পণে খুললেও শব্দ হয়। তারপরই একটা ভারী কিছু জলে পড়ার শব্দ। চমকে উঠল সুরেশ্বর। সে আবার হল থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল ছত্রিঘরের দিকে। তখন দরজাটা বন্ধ হচ্ছে। পায়ের শব্দ শুনে অর্চনা চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল।—কে?

—ভয় নেই। আমি সুরেশ্বরদা।

—সুরেশ্বরদা! ওঃ, চমকে উঠেছিলাম আমি। বলে আবার সে পিছন ফিরে দরজাটা দিতে গিয়ে বললে—ভালই হয়েছে। আমি এই দরজা দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছি। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে যাও। দেখো যেন ছত্রিঘরের ওদিকের দরজাটা দিতে ভুলো না। আমি বিবিমহলের পিছনে পিছনে চলে যাব।

—কোথায় যাবে?

—ঠাকুরবাড়ী ঢুকব গিয়ে।

—ঠাকুরবাড়ী?

—হ্যাঁ। বলে সে বেরিয়ে গেল। সুরেশ্বর আর কোন প্রশ্ন করতে পারলে না। প্রশ্নের সময় এ নয়। দরজা বন্ধ করে সে এসে আবার উপরের ছত্রিঘরে উঠল।

রায়বাড়ীতে গোলমাল উঠছে।

পুলিশ এসেছে তাহলে। হঠাৎ মনে হল, মেজদি? মেজদি অতুলেশ্বরকে ভালবাসেন। একমাত্র ওই ছোট ছেলেটিরই মা তিনি হতে পেরেছিলেন। তাঁকে?—তাঁকে যদি লাঞ্ছনা করে?

১৯৩০ সাল থেকে চট্টগ্রামে, মেদিনীপুরে ইংরেজের পুলিশ, এদেশী পুলিশ যে কুৎসিত বীভৎস অত্যাচার করেছে, তা যদি পাপ হয়, যদি অপরাধ হয়, তবে এই ইংরেজ রাজত্ব থাকবে না। কিন্তু তা মনে করলে আতঙ্ক হয়। এ যে মেদিনীপুর।

সে বেরিয়ে গেল রায়বাড়ীর দিকে।

হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি-বাঁধা অতুল দাঁড়িয়ে আছে। তার জামাকাপড় ধুলায়

ধূলিধূসর হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে। রায়বাড়ীর সুন্দরবর্ণের অধিকারী ছেলেটির কপালে কালসিটে পড়েছে। হাত ফেটে গেছে, লম্বা রুক্ষ চুলগুলি ধূলায় পিঙ্গল হয়ে উঠেছে। তার পাশে কোমরে দড়ি-বাঁধা, হাতে হাতকড়া পরানো বৃদ্ধ রঙলাল মণ্ডল। তার দেহে নির্যাতনের চিহ্ন। আরও তিনটি অতুলের সমবয়সী যুবক, তাদের একজনকে সে মেজদির ভাজের শব-সৎকারের সময় দেখেছে। পরিচয় সেইদিন সামান্যই হয়েছিল। একজন ও-পাড়ার গাঙ্গুলী-বাড়ীর ছেলে।

অতুল তাকে দেখে একটু হাসলে। সুরেশ্বরের বিস্ময়ের সীমা ছিল না ওই বৃদ্ধ রঙলালের হাতে হাতকড়া দেখে।

এ বৃদ্ধ ? এ বৃদ্ধ কি করলে ?

পুলিশ সার্চ করছিল অতুলেশ্বরের ঘর। শিবেশ্বর রায়ের ছয় ছেলের মধ্যে বাড়ী ভাগ হয়ে গেছে। অতুলেশ্বরের ভাগে তিনখানা ঘর পড়েছে। আসবাব সামান্যই, ভাঙা খাট একখানা। একটা পুরনো আলমারি। একটা চেস্ট-ড্রয়ার। তার উপর একটা পুরনো আমলের ড্রেসিং-আয়না। ক'টা ব্র্যাকেট। একটা শেল্‌ফে কতকগুলো বই। খানদুই চেয়ার। একখানা টেবিল, একখানা হাল-আমলে কেনা সস্তা ক্যাম্বিসের ফোল্ডিং ইজিচেয়ার। একখানা ঘর ফাঁকা। একখানা ঘরে কিছু বাসন। তোলা বাসন। কখানা পুরনো সতরঞ্চি। একখানা গালিচা। কতকগুলো ভাঙা কাঠ-কাঠরা। একটা কুলুঙ্গীতে খানকয়েক রূপোর বাসন। মাথায় ছাদের গায়ে ঝুলানো একটা ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন।

ধনেশ্বর আপনমনেই বকে যাচ্ছেন—এই পরিণাম। অদৃষ্টের পরিহাস। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। তাঁর পিতা বীরেশ্বর রায়। ইংরেজ রাজত্বের সম্ভ্রান্ত, স্বনামধন্য রাজভক্ত জমিদার। রাজা উপাধি পাবার কথা কিন্তু মৃত্যু হওয়ায় পাননি রত্নেশ্বর রায়। কত খাতির রাজদরবারে। আজ তাঁর বংশধর রাজদ্রোহী। বাঃ! বাঃ! বাঃ!

পুলিশ অফিসার দুজন কনেস্টবল নিয়ে সার্চ করে চলেছিল ভ্রূক্ষেপহীনভাবে। একজন সামনে বসেছিল একটা চেয়ারে, সিগারেট টানছিল।

ব্রজেশ্বর ওদিকে বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে এসে রয়েছে সুরেশ্বরের কেনা অংশে। যে-অংশে মেজদি থাকেন।

সুরেশ্বরকে সহজে ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। তার পকেট এবং কোমর সার্চ করে দেখে পরিচয় নিয়ে তবে ঢুকতে দিয়েছে। সে বলেছে—এইদিকটা তার নিজস্ব—সে তার নিজস্ব অংশে ঢুকবে।

সার্চ শেষ করে অফিসারটি উঠে বললে—আচ্ছা, চল।

তারা ভারী বুটের শব্দ তুলে নেমে চলে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল গ্রেপ্তার-করা লোক ক'জনকে।

চলে যেতেই ধনেশ্বর প্রখরভাবে মুখর হয়ে উঠল।

বিমলেশ্বর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর অংশের বারান্দায়। সে উদাসী প্রকৃতির মানুষ। তাদের তিন সহোদরের মধ্যে সেই সব থেকে বড়। তার চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে। তার ওদিকে কমলেশ্বর বসে আছে এবং কাঠি দিয়ে বরান্দায় পলেস্তার চটাখসা মেঝের উপর কিছু লিখেই চলেছে আপনমনে।

সুরেশ্বর ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলে—মেজদি কোথায় ?

ব্রজেশ্বর আজ পাল্টে গেছে। সে সরস-কৌতুকপরায়ণতা নেই। বিষণ্ণ হয়ে গেছে।

একটু বিষণ্ণ হেসে বললে—ধ্যানে বসেছেন। জপ করছেন।

সুরেশ্বর বারান্দা থেকে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ব্রজেশ্বর বললে—ওখানে কোথায় যাবে? ঠাকুরবাড়ীতে? অতুল মিটিং করবে—সকাল থেকেই অস্বস্তি, কারণে অকারণে যমকে ডাকছিলেন। এস, নাও আমাকে, আর পারছিনে। মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধ স্বামীদেবতাকে স্মরণ করে তাঁকে তিরস্কার করছিলেন—বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে এই হতভাগী ছাড়া কি আর কাউকে খুঁজে পাওনি! কি গ্রহের জঞ্জালে আমাকে ফেলে গেলে! ওই তোমার ওখানে ঢেঁড়া যখন পড়ল তখন থেকে। দেখলে না, ছুটেই প্রায় পালিয়ে এলেন। অতুলকে বারণ করবেন। কিন্তু কোথায় অতুল। অতুল আর সারাদিন বাড়ী আসেনি। সে সকাল থেকে এদিক-ওদিক ঘুরে মিটিংয়ের ব্যবস্থা করে গিয়েছিল সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে। গোয়ানদের তরফি ওকালতি করবে কে? সে তো তোমার দৌলতে মিটে গেছে শুনেছি। দু হাজার টাকার চেক কর্তন করেছ। সে ওখান থেকে ওই চেক নিয়ে মুহূর্তের জন্য বাড়ী এসেছিল। চেকখানা অর্চনার হাতে দিয়ে বলে গেছে মাকে দিস। বলিস, আজ হয়তো আমাকে ধরবে। পুলিশ আসছে খবর পেয়েছি। বলেই বেরিয়েছিল। মেজদি সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছেন রায়বাড়ীর সংকটত্রাণের মা-বাবার কাছে। অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ীতে। কি একটা আপদ উদ্ধার বিপত্তারণ মন্ত্রতন্ত্র আছে ভাই, যার মধ্যে শ্লোকে শ্লোকে ত্রাহি মাম, ত্রাহি মাম প্রার্থনা আছে সেটা পূজুরী বামুনের বেটীর মুখস্থ। তাই পাঠ করছে। অন্তত অর্চনা তাই বললে। কারণ সেও তার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী গিয়েছে, বোধ হয় সুরে সুর মেলাচ্ছে।

অর্চনার ছবিটা মনে পড়ে গেল সুরেশ্বরের। কিন্তু তা বললে না ব্রজেশ্বরকে। ব্রজেশ্বরকে সে অবিশ্বাস করে না। এ বাড়ীতে সেই তার সব থেকে অন্তরঙ্গ। উপকারী বন্ধু, আপনার জন। কিন্তু ব্রজদা বেশী কথা বলে। মদও খায়। কোথায় কাকে বলে বসবে কখন, তার স্থিরতা নেই। অর্চনা যে কিছু রাজনৈতিক অপরাধের প্রমাণ বা বস্তু আজ কাঁসাইয়ের দহে ফেলে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

আশ্চর্য লাগছে তার। আজকের দিনটা আশ্চর্য। যেন একটা যবনিকা উঠে গিয়ে একটা পরম বিস্ময়ের অকল্পিত দিগন্ত উদ্ভাসিত হল তার কাছে!

যদুরাম রায়। অতুলেশ্বর। অর্চনা মেজঠাকুমা!

মেজঠাকুমার উপর খানিকটা রাগ হল। মহিলা অসাধারণ অভিনয় করে অতুলেশ্বরের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠ স্নেহের কথা জানতে দেননি।

তাকে কত কথাই না বলে এসেছেন তিনি। তাকে খাইয়ে ঠাকুরবাড়ী যাবার সময় বলেছিলেন—"আমার বংশীধারী গোবিন্দের সেবা হল, এইবার চললাম ভাই আমার প্রাণগোবিন্দ রাধামাধবের সেবা করতে।" কথাগুলোর গড়ন এমন এবং মেজঠাকুমার বলার ঢং এমন যে, শুনবামাত্র মোহ জাগে। কথাগুলো মেকি কি খাঁটি, কষে বা যাচাই করে দেখবার কথা মনেই হয় না। ঠাকুমা তাঁর যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় একটি জীবনাধিক বালগোপাল আছে, সেকথা কোনদিন জানতে পর্যন্ত দেননি।

মনের কথাটা তার ভুরুতে কটা রেখার খাঁজে বোধ হয় ফুটে উঠেছিল। ব্রজেশ্বর বললে—কি ভাবছ রাজাব্রাদার?

—ভাবছি। ভাবছি ব্রজদা, অতুল নিজে যা করেছে, তাতে বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে কিন্তু ওই বৃদ্ধ মণ্ডলটিকে জড়ালে কেন? বেশ মারধর করেছে দেখলাম।

—তা বেশ। শুনলাম পুলিশ আনলফুল এসেম্বলী ডিক্লেয়ার করেই লাঠি চার্জ করেছিল।

রঙলালকে বাঁচাতে অতুল ঝাঁপিয়ে পড়ে বুড়োকে বুক দিয়ে ঢেকেছিল। লাঠি পড়েছিল অতুলের ঘাড়ে। তারপর তাকে টেনে মাটিতে ফেলে বুটের লাথি মেরেছে। অতুল অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিল। তখন বৃদ্ধও বাদ যায়নি। তবে বৃদ্ধের যে পক্ষোদ্গম হয়েছে। এককালের চাষীভূষি। জমিদাররা বলত হুকুমের গোলাম। একটা কথা দাদু বলতেন, মনে আছে—“চাষী সে বিনা দাতা নেহি, বিনা লাঠিসে দেতা নেহি।” পথে ভদ্রজন ব্রাহ্মণদের দেখলে হেঁট হয়ে প্রণাম করত। সে আজ উকিল-ছেলের বাবা, তার উপর এই আমল, অবস্থাও ভাল হয়েছে; বয়স হলে কি হবে, লীড হবার বড়ই বাসনা। অতুলের ঢেঁড়াদার ওবেলা বলেছিল—মেদিনীপুর থেকে নেতারা আসবেন। কথাটা মিথ্যে। তলে তলে ওই রঙলালকেই বলেছিল—আপনাকেই সভাপতি হতে হবে। রঙলাল তৎক্ষণাৎ রাজী। সভাপতি হবার বাতিকে পেয়েছে ওকে। এর আগে তিরিশ সালেও দু'-চারবার সভাপতি হয়েছে। এবার মাশুল দিতে হল।

—হুঁ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সুরেশ্বর। তারপর বললে—চললাম।

ব্রজেশ্বর বললে—আমি যাব সন্ধ্যের পর। এখন ভাই একখানা গাড়ীটাড়ীর যোগাড় দেখি। ভোরবেলা উঠে পালাব। আর এখানে না। বউ ভয় পেয়েছে। বলতে কি, আমিও নার্ভাস হয়েছি। কে জানে কোন্ ফ্যাসাদ বাধবে আবার। অতুল যে তলে তলে কি করে রেখেছে, কে জানে। বোমা-কোমা যদি বানিয়ে-টানিয়ে থাকে, তবে তা গুষ্টীসুদ্ধ নিয়ে টানাটানি করবে।

সুরেশ্বর শিউরে উঠল। কথাটা তার মনে হয়নি।

অর্চনা দহের জলে কি ফেলে দিল? কিন্তু সেকথা মনে চেপে রেখেই বেরিয়ে এল বড়বাড়ী থেকে।

* * *

বিবিমহলে এসেই দেখা হল মেজঠাকুরদার সঙ্গে। অর্চনাও রয়েছে। সুরেশ্বর বললে—আপদ্উদ্ধার পাঠ শেষ হল? মা কি বললেন?

ঠাকুমার মুখখানা কেমন হয়ে গেল। বোধ হয় এই ধরনের কথা, গলার ওই সুর তিনি প্রত্যাশা করেননি।

অর্চনা বললে—তুমি খুব রেগেছ, না সুরেশ্বরদা?

অপ্রস্তুত হল সুরেশ্বর। এতে রাগ করা অন্যায়, এটা অলঙ্ঘনীয় বিধান। এ সত্য যে মানে, তার না মেনে উপায় নেই। রাগের হেতুটা এতে রাগ করার চেয়ে আরও লজ্জার কথা। সুতরাং অপ্রস্তুত হয়ে বললে—অতুল যা করেছে করেছে, তোমরা এতে জড়ালে কেন?

মেজঠাকুমা বললেন—ওরে, আমি যখন ষোল বছরের মেয়ে এ বাড়ীতে বউ হয়ে এলাম তখন সব ছেলেরা আমার ওপর রাগ করেছিল। অতুল তখন আট বছরের। ওই শুধু কাছে এসেছিল—মা বলেছিল। ধনেশ্বর-জগদীশ্বর-সুখেশ্বরের তখন বিয়ে হয়েছে, ব্রজ হয়েছে কল্যাণ হয়েছে। ওরা সৎভাইদের নিয়ে তোর মেজঠাকুরদাকে আমাকে আলাদা ক'রে দিলে। উনিও বললেন—বাঁচলাম। কিছুদিন কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেনি। ওই অতুল আসত রে। মা বলে কাছে দাঁড়াত। কোলে বসত। ছেলেরা খবর পেলে এসে টেনে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। ও কাঁদত। ও এই বাউণ্ডুলেমি করে বেড়ায়, কত বারণ করেছি, কিন্তু রায়বংশের গোঁ, মানে নি। কিন্তু মা বলে যখন কাছে এসে বলত—এইগুলো খুব গোপনে লুকিয়ে রেখো

তো মা। দেখো, অতুলের তা হলে হাতে দড়ি পড়বে। হ্যাঁ, তখন কি করব, রেখেছি। না-রেখে পারি, তুই বল!

—কিন্তু অর্চনাকে জড়ালে কেন?

—সে তুই ওকে জিজ্ঞেস কর ভাই। আমি বার বার বারণ করেছি রে, বার বার বারণ করেছি। অতুলেরও দোষ দিতে পারব না। এই ওর মুখের সামনে বলছি আমি। অতুলের পিছন পিছন কুকুরের মত ফিরেছে। অতুল একদিন লাল কালিতে ছাপা কতকগুলো কাগজ দিয়ে বললে—রেখে দাও তো মা। খুব সাবধানে রেখো। অর্চনা বারান্দার দিকের বন্ধ জানালাটার খড়খড়ি তুলে শুনছিল, সে ফিসফিস করে বললে—আমাকে দেখাও না ছোটকা? পায়ে পড়ি তোমার! সে এই গেল বছর! মেদিনীপুরে তখন দারুণ অত্যাচার! কি করবে অতুল, একটু ভেবে বললে—আয় ঝাঁটাখাগী, ঝাঁটা যার কপালে থাকে তাকে বাঁচায় কে? আয়। একখানা কাগজ পড়ে অর্চনা বললে—এগুলো সেঁটে দেবে দেওয়ালে তো? আমি আঠা ক'রে এনে দেব! তারপর এই এক বছর কাকার ভাইঝি হয়েছেন।

সুরেশ্বর বললে—আজ জলে কি ফেললি অর্চনা?

অর্চনা হাসলে, কথার উত্তর দিলে না। মেজদি বললেন—ও বলবে না। অতুলের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে। সে তোকেও বলবে না। ওরা যা করে তা আমিও সব জানি না সুরেশ্বর।

—ব্রজেশ্বরদা জানলে কি করে? সকালে সে তোমার সামনেই বললে!

অর্চনার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে এবার বললে—আমি ওকে বলি নি সুরেশ্বরদা। ও ধরে ফেললে। রাত্রে আমরা যখন গানবাজনা করছিলাম, তখন ছোটকা এসে একবার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কিছু বলবে। মেজঠাকুমা যখন কেত্তন গাইছিল, তুমি বাজাচ্ছিলে, আমি সেই ফাঁকে উঠে গিয়েছিলাম, ছোটকা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, আমার হাতে পেন্সিলের মত পাকানো একটা চিঠি দিয়ে বলেছিল—পড়ে ছিঁড়ে ফেলিস। যা। বলে ও চলে গেল। আমি চিঠিখানা নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ ব্রজদা ঘরে ঢুকল। ও দেখেছিল। আমি কি করব, পিছন দিকে হাত নিয়ে চিঠিখানা কচলে ছুঁড়ে খাটের তলায় ফেলে দিলাম। ও সটান এসে খাটের তলায় ঢুকে চিঠিখানা তুলে নিলে। ধরা পড়ে গেলাম। চিঠিখানায় লেখা ছিল—কাল মিটিং করবই। পুলিশ নিশ্চয় আসছে, একটা মারধর ধরপাকড় হবে। সকাল থেকে আমার সময় নেই। পুলিশ গাঁয়ে ঢুকলে আমার ঘরের কোণের সেই কাগজগুলো সরিয়ে ফেলিস। আর মাকে সাবধান করিস। এইটে পড়ে ও বললে—তুইও ওর সঙ্গে এইসব করিস নাকি? বললাম—করি আর কি বড়দা, ও এইসব করে বেড়ায়, এ তো ভাল কাজ কিন্তু এ বাড়ীর তো কেউ তা মনে করে না। ওকে গালমন্দ করে। আমরা—আমি আর ঠাক্‌মা—শুধু ওকে ভালবাসি। ও পোস্টার লেখে আমি আঠা করে দি। কখনও আমিও কালি বুলিয়ে দি। আর ঠাকুমা ওকে দরকার হলে টাকা দেয়। এখানে ওখানে যায় ঘোরে। টাকা তো পায় না। ঠাকুমা দেয়। আর কিছু বলি নি সুরেশ্বরদা। ভগবানের দিব্যি ক'রে বলতে পারি।

মেজদি বললে—আর তুই সে কথাটা গোপন করিসনে অর্চনা। সুরেশ্বরকে বল। সে সর্বনেশে জিনিসগুলো ফেলে দেবার ব্যবস্থা কর। ধরা পড়লে সর্বনাশ হবে। তার ফাঁসি দ্বীপান্তর যা হয় হবে হোক। কিন্তু গোটা বাড়ীটা ধ্বংস ক'রে দেবে রে। আর ও ঘরখানা

সুরেশ্বরের।

চমকে উঠল সুরেশ্বর।

—কোন্ ঘর?

—যে ঘরে তোর ঠাকুরদা—আমার বড় ভাসুর মারা গিয়েছিলেন। শ্বশুরঠাকুরের খাস-কামরা। যোগেশ্বর-ভাসুরপো যে ঘরখানা সাজিয়ে বসবার ঘর করেছিলেন। ঘরখানা কাছারীর লাগোয়া, নিচের তলায়। ও ঘর ভাসুরপো খুড়োকে মানে তোর মেজঠাকুরদাকেও খুলে দেয়নি। ঘরটারও নাকি দোষ আছে। ঘরখানা তৈরী করেছিলেন শ্বশুর; তৈরী করতে লাগিয়ে তীর্থে গেলেন, ফিরে এলেন অসুখ নিয়ে; ওই ঘরেই শুলেন, তারপর মারা গেলেন। বড় ছেলেকে বলে গেলেন এখানে থাকতে, ওই ঘরেই শুলেন, তারপর ভাসুর, ওই ঘর তাঁকে দিয়ে গেলেন। ভাসুর একদিন সকালে, কি হল, কার সঙ্গে কলকাতা থেকে কে একটা ফিরিঙ্গী এল, তার সঙ্গে চেঁচামেচি করলেন, তারপর মাথা ধরে শুলেন। ওই ঘরেই। বেহুঁশ অবস্থা। তারই মধ্যেই রাত্রে ধড়মড় করে উঠে বললেন—ঠাকুরবাড়ী—ঠাকুরবাড়ী। নিয়ে চল। ওই নিয়ে গেল—শুইয়ে দিলে, প্রাণ বেরিয়ে গেল। ভাসুরপো যোগেশ্বর ঘরখানা ভাগে পেয়ে মেরামত করালে, সাজালে, কিন্তু বসে নি। ক'দিনের জন্য তোর মাকে নিয়ে এখানে এসে থেকেছিল; তোর মা সব কথা শুনে তাকে বসতে দেয় নি। তখন আমার বিয়ে হয় নি। অতুলের মা তখনও বেঁচে। আমি এসে অবধি ও ঘরে দুটো তালা লাগানো। তোর মেজঠাকুরদাও ও ঘরের তালায় হাত দেন নি। ভয় করতেন। সবাই ভয় করে রে এ বাড়ীর। ওই ঘরটায়। ওই ঘরটার একটা জানালার শিক কোথায় খোলা আছে অতুল বের করেছিল, নয়তো সে-ই শিকটা খুলেছিল। ওই ঘরে সে কিসব রেখে গেছে!

—কি অর্চনা? জানিস তুই?

—বোধ হয়—

—কি বোধ হয়?

অত্যন্ত মৃদুস্বরে অর্চনা বললে—রিভলভারের গুলী আর বোমা তৈরী করবে বলে জিনিস এনেছিল, সেইসব রেখে গেছে।

—ওই ঘরের চাবি কোথায়?

—সে তো তোর ওই চাবির সঙ্গেই থাকবে। সে তো ভাসুরপো কাউকে দেন নি। খুব বড় বড় দুটো তালা।

সুরেশ্বরের মনে পড়ল দুটো বড় চাবি তার সুটকেসের পকেটের মধ্যে আছে।

* * *

তালা খুলে কিন্তু ঢুকতে বারণ করলে অর্চনা। বললে—তালা-চাবি খুলো না সুরেশ্বরদা, লোক-জানাজানি হবে। বাড়ীর লোক শুনলেই উঁকি মেরেও দেখতে আসবে। ওদিকে ছোটকা বা ওদের কেউ মার খেয়ে যদি বলে ফেলে তবে মুশকিল হবে। তার থেকে আমি রাত্রে ওই শিক খুলে ঢুকে খুঁজে নিয়ে আসি। আমি কখনও ঢুকি নি ঘরে। তবে ছোটকা বলেছিল যে ঘরের একদিকে কতকগুলো বড় তাকিয়া আছে। ইঁদুরে কেটেছে। সেই কাটা তাকিয়ার ভিতরে প্যাকেট মুড়ে রেখে দিয়েছে। তাকিয়াটার গায়ে একটা সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া আছে।

সুরেশ্বর বললে—তাই হবে। তালা খুলব না। কিন্তু তুই ঘরে ঢুকবিনে। আমি ঢুকব। আমাকে শুধু দেখিয়ে দে, কোন জানালার কোন শিক খোলা আছে।

রায়বাড়ীর ঠাকুরবাড়ী, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। মাঝখানে নাটমন্দির ঘিরে উত্তরদিকে দক্ষিণদ্বারী কালীমন্দির। পশ্চিমদিকে লম্বা সেরেস্তাখানা। পূর্বদিকে স্বতন্ত্র একটা চত্বর গোবিন্দমন্দির। তার পাশে আলাদা ভোগরান্নার ঘর। দক্ষিণদিকে নাটমন্দিরের পর এক সারি ঘর। এই নাটমন্দির এবং দক্ষিণদিকের ঘরগুলির মাঝখানে সোজা প্রশস্ত বাঁধানো পথ চলে গিয়েছে ওই শখের বড় ঘরখানা পর্যন্ত। ঘরখানা দক্ষিণদ্বারী; ঠাকুরবাড়ীকে বাঁয়ে পূবদিকে রেখে, বলতে গেলে আলাদা চত্বর। সামনে সেকালে সুন্দর বাগান ছিল। দক্ষিণ-দিকে বাগানের অল্প উঁচু আলসের মত পাঁচিলের গায়ে আরও একটা ফটক। এই ফটক দিয়েই সেকালে সাহেবসুবা মুসলমান-ক্রীশ্চান অর্থাৎ এই গোয়ানরা আসবে বলে এই ব্যবস্থা করে-ছিলেন রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। ঘরখানার সামনে প্রশস্ত বারান্দা। গোল থামের সারির মাথায় ছাদ। থামগুলোর উপর দিকে সেকালে শৌখীন কাঠের ঝিলমিলি ছিল। বারান্দার কোণে সারি সারি তিনটে পাকা সেগুনের সুন্দরগড়ন মোটা তক্তার দরজা। মাঝখানের দরজায় মোটা পিতলের কড়ায় দুটো ভারী তালা ঝুলছে। তালাগুলোও পিতলের। বিলিতী কোম্পানীর সেকেলে দামী তালা। পশ্চিমদিকে উঁচু পাঁচিলঘেরা ফলের বাগান। কলমের আমের কয়েকটা গাছ এখনও আছে। একটা বুড়ো লিচু, দু'তিনটে জামরুলের গাছ আছে। এদিকে ঘরখানার দুটো বড় জানালা। পিছনদিকে রায়দের অন্দরমহল। মাঝখানে একটা গলি। এ দেওয়ালে একটা দরজা দুটো জানালা। এই দরজা দিয়েই অন্দরমহলে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এ দরজাটা গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দিয়েছিলেন যোগেশ্বর রায় সুরেশ্বরের বাবা।

মেজখুড়ো তাঁকে লিখেছিলেন—"তুমি তোমার অংশ সবই মেরামত করাইয়াছ। আমার অংশও মেরামত করাইব। এবং আমার অনেকগুলি সন্তান, তাহাদের জন্য নতুন ঘরেরও প্রয়োজন। সেইজন্য তোমার বাড়ীর কিছু কিছু ঘর আমি ব্যবহার করিতে চাই। ওখানে থাকিয়া মেরামত নির্মাণের কাজ শেষ করিয়া লইতে চাই।"

যোগেশ্বর সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরেও যখন শিবেশ্বর দখলকরা-ঘরগুলি থেকে সরবার বা নিজের বাড়ীতে আলাদা ঘর তৈরীর কোন লক্ষণই দেখালেন না, তখন এই ঘরখানার পিছনের দরজা তিনি গেঁথে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় রায়বাড়ার যে দরজাটা ছিল এই দরজার কুজুরুজু, সেটাও গাঁথিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে এই মধ্যবর্তী গালটা হয়ে গিয়েছিল অব্যবহার্য। এইদিকেরই দুটো জানালার মধ্যে একটা জানালার একটা নয় দুটো শিক সুকৌশলে খুলত অতুলেশ্বর। জানালার কপাটগুলো খোলাই ছিল, লোক-দেখানো বন্ধ করা ছিল, ঠেললেই খুলে যায়। একটু জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলতে হয়। বন্ধ করারও নিজস্ব কৌশল ছিল অতুলের। সেটা করত তারের আংটার সাহায্যে।

অতুলেশ্বর যখন এ ঘরে ঢুকেছে তখন রায়বাড়ীর ছাদের আলসের উপর ঝুঁকে অর্চনা পাহারা দিয়েছে। সে সব বেশ ভাল করেই জানে। সে ছাদ থেকে শুধু পাহারাই দিত না। নিচের মুখে গলিতে টর্চ ফেলে তাকে আলো দেখাত।

সুরেশ্বর বিস্ময়বোধ করছিল—এই আশ্চর্য সুন্দর এবং সুকণ্ঠের অধিকারিণী এই মেয়েটির দুঃসাহস দেখে।

ঘরে ঢুকে সুরেশ্বর টর্চ জ্বাললে। অর্চনা ছাদের আলসেতে ঝুঁকে পাহারা দিচ্ছে। আজ সে একা নয়, তার পিছনে মেজদি দাঁড়িয়ে আছেন। গলির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল রঘু।

সুরেশ্বর তিন ব্যাটারীর টর্চটা জ্বাললে, মেঝের উপর ধুলো জমে আছে, আলোর ছটা

মেঝের উপরে পড়লেও সচকিত চামচিকেগুলো ফরফর ক'রে উড়তে লাগল। কতকগুলো ইঁদুর ছোটাছুটি ক'রে কোথায় কোন ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল বা কিছুর মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে গেল। টর্চটাকে নিচের দিকে ঘুরিয়ে সুরেশ্বর দেখে নিলে তাকিয়ার গাদা কোথায়। সামনে কয়েক পা দূরে ঘরখানার মাঝখানে একখানা শতরঞ্চি পাতা রয়েছে। চাদরও পাতা ছিল, সেখানাকে গুটিয়ে জড়ো করে দিয়েছে একদিকে। দেওয়ালের গায়ে শতরঞ্চির উপর পাতা ফরাসের চারিপাশে খানকতক ভেলভেটের গদীমোড়া চেয়ার সোফা। ধুলোয় বিবর্ণ হয়ে গেছে সব। ভেলভেটের রংটা কি ছিল ঠিক বোঝা যায় না। চারিপাশে তুলো ছড়ানো। টর্চটার আলো গিয়ে পড়ল পাশে একটা কোণে একটা টেবিলের উপর। তার উপর গোটাকতক তাকিয়া রাখা। অনেকগুলো। প্রকাণ্ড বড় বড় তাকিয়া। সেগুলো ধুলোয় ঢাকা পড়েছে। তার মধ্যে কোনটায় সিঁদুরের চিহ্ন আছে বের করা সোজা নয়। পকেট থেকে রুমাল বের করে সে ঝাড়তে শুরু করলে। রাশি রাশি ধুলো উড়ে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে তাকে। কিন্তু বের করতেই হবে। নিশ্চিহ্ন করতে হবে সব। অতুলেশ্বর এই রায়বংশের বোধ করি শেষ ঘৃতদীপ। সেটিকে নিভতে দেওয়া হবে না। তার সঙ্গে অর্চনা। রায়বংশে রূপ আছে। বেছে বেছে শ্রেষ্ঠ রূপের গোলাপে গোলাপে মিলন ঘটিয়ে এ রূপ তৈরী হয়েছে। রায়বংশের সব মেয়েই শ্রীমতীর চেয়েও কিছু বেশী। সুন্দরী বললে বেশী বলা হবে না। অহঙ্কারের অসৌজন্য ঘটবে না। কিন্তু অর্চনা তাদের মধ্যেও সুন্দরী। সুরূপার মধ্যে অপরূপা। তার মুখের ছাঁচটা ঠিক রায়বাড়ীর ছাঁচ নয়। ছাঁচটা আলাদা। কিন্তু তা রায়বাড়ীর মুখের ছাঁচ থেকেও বোধ হয় নিখুঁত। রঙ তার সব থেকে গৌরী। কণ্ঠস্বর তার—।

ভাবনায় ছেদ পড়ল। মন থেমে গেল। তার চোখে পড়েছে একটা তাকিয়ার গায়ে একটা সিঁদুরের ফোঁটা। একটা কাটা জায়গায় তুলো বেরিয়ে আছে। সে তার মধ্যে হাত ভরালে। খুঁজতে শক্ত কিছু হাতে ঠেকল। ভাল করে ঠাওর ক'রে দেখলে—হ্যাঁ, একটা প্যাকেট। বেশ বড় প্যাকেট। গোল একটা কি। একটা নয় দুটো একসঙ্গে বাঁধা। সে টেনে বের ক'রে আনলে সেটাকে। ব্যাডমিণ্টন শাটলকক রাখবার গোল কাগজের খোল, দুটো খোল একসঙ্গে দড়ি দিয়ে একটা করে বেঁধে রেখেছে। সেটাকে রেখে সে আবার খুঁজলে। কটা গোল লম্বা কিছু পেলে। একটা দুটো তিনটে চারটে। বের করে টর্চের আলোয় দেখেই সে বুঝতে পারলে বোমার খোল। দিশী হাতে তৈরী খোল। বাকী তাকিয়াগুলো সে প্রত্যেকটি টিপে হাতে তুলে ওজন দেখে নিশ্চিন্ত হল। তখন সর্বাঙ্গ তার ঘামে ভিজে গেছে। তার সঙ্গে ধুলো তুলো লেগেছে চুল থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে।

এতক্ষণে সে নিশ্চিন্ত হল।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাতে গিয়ে থমকে গেল। না। হয়তো কাল সকাল পর্যন্ত এ গন্ধ এ ঘরে ঘুরবে, অল্প অল্প করে বের হবে জানালা দরজার ফাঁক দিয়ে।

এবার সে ফিরবে। কিন্তু তার পূর্বে টর্চটাকে ছাদের দিকে ফেলে দেখলে। সারি সারি তিনখানা টানা পাখার ফ্রেম ঝুলছে। ছাদের পলেস্তারা দু-এক জায়গায় খসে পড়ছে মেঝের উপর। কড়িতে বর্গায় রং বিবর্ণ হয়েছে। এবং সমুদ্রের উপর মেদিনীপুরের নোনা জলো হাওয়ায় মরচে ধরেছে। টর্চের শিখার আলোকবৃত্তকে সে নিচে নামালে দেওয়ালের উপর। অবাক হয়ে গেল সে। বড় বড় অয়েল পেন্টিং। ও কে? পূর্ণাবয়ব অয়েল পেন্টিং দামী সোনালী গিল্টীর ফ্রেমে বাঁধানো। সামনের অর্থাৎ দক্ষিণদিকের তিনটে দরজার মাথায় তিনখানা ছবি। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। রায়বাহাদুরের মেডেল বুকের উপর চাপকানে এঁটে মাথায় পাগড়ি

পরে দাঁড়িয়ে আছেন থে ান জাতীয় চেয়ারের হাতল ধরে। মাঝখানে একটু উঁচুতে প্রকাণ্ড কালীমূর্তি। তেলরঙে আঁকা। ধুলো অনেক পড়েছে। তবু টর্চের জোরালো আলোর এবং তেলরঙের গুণে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চমৎকার কালীমূর্তি। ভাল এঁকেছে শিল্পী। তার ওদিকে কে? ও, রায়বাহাদুর-গৃহিণী সরস্বতী দেবী! জানবাজারের বাড়ীতে বুক পর্যন্ত ছবি আছে। সে সবও অয়েল পেন্টিং। পশ্চিমের দেওয়ালে দুখানা। বীরেশ্বর রায়। সিংহের মত পুরুষ। কি দৃপ্ত দৃষ্টি! নাক একটু মোটা। তার পাশে—ভবানী দেবী! পূর্ণাবয়ব। চেয়ারের হাত ধরে দাঁড়িয়ে। সর্বালঙ্কারভূষিতা। এ সেই ছবি। ওই যে ডান হাতে ছ'টা আঙুল। কাল রাত্রে সে পড়েছে। ছটা আঙুল। বিড়বিড় করে সেই তান্ত্রিক পাগল বলেছিল—না, সে তো নয়। ছটা আঙুল, সে তো নয়। শ্যামবর্ণা অপরূপা শ্রীময়ী—। বিস্মিত হয়ে গেল সুরেশ্বর। আশ্চর্য তো। হ্যাঁ। হ্যাঁ। অর্চনার মুখের আভাস যেন ফুটে উঠছে। হ্যাঁ! হ্যাঁ! রায়বংশের মুখের ছাঁচের সঙ্গে অর্চনার ছাঁচ আলাদা। সে তো এই ছাঁচ। সে শিল্পী। সে তো দেখছে, মুখের অবয়বের রেখাগুলি এমন কি নাকে এবং চোখের ঈষৎ বঙ্কিম টান আছে, তাও মিলে যাচ্ছে। অর্চনার ছটা আঙুল নেই। আর এই ভবানী দেবী শ্যামবর্ণা আর অর্চনা গৌরী। নীল অপরাজিতা আর শ্বেত অপরাজিতা।

হঠাৎ কিছুর শব্দে তার একাগ্রতা ভাঙল। জানালায় ঠক্‌ঠক্ শব্দ হচ্ছে। ছাদের টর্চের আলো এসে পড়েছে খোলা জানালা দিয়ে। একটা ঢেলা এসে পড়ল জানালায়।

সুরেশ্বর জানালার মুখে এসে দাঁড়াল।

উৎকণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠের ডাক আসছে—সুরেশ্বর। ওরে।

—আঃ, ঠাকুমা!

সুরেশ্বর বুঝলে দেরি হয়েছে তার। সে তার টর্চের আলো বাইরে ফেলে ইশারা দিলে। তারপর মৃদুস্বরে বললে—যাচ্ছি আমি।

বেরিয়ে এল সে। জানালার ও-পাশেই জিনিসগুলো রেখেছিল। সেগুলো বের করে নিয়ে অর্চনার ফেলা আলোয় জানালার কপাট টেনে দিয়ে শিক দুটো টেনে বসাতে চেষ্টা করলে। অর্চনা বললে—ঠুকে দাও সুরেশ্বরদা। দেখ না, পায়ের কাছেই একটা পাথর পাবে। ঠুকে বসাতে হবে।

সুরেশ্বর ঠুকে শিক দুটো বসিয়ে তার হাতের টর্চটা অর্চনার মুখের উপর ফেললে।

অর্চনা বললে—কি হচ্ছে?

অবিকল সেই মুখ।

## ১৩

সেই রাত্রেই সেগুলির শেষকৃত্য করে এসে স্নান করে রঘুকে বললে—একটু কড়া ক'রে চা কর্ রঘু।

রঘু বোতল গ্লাস নিয়ে আসছিল। সে বললে—এ খাবে না?

—না। খেতে তার ইচ্ছে করছিল না। রঘু সেগুলো ব্র্যাকেটের উপর রেখে দিয়ে ও ঘরে যাচ্ছিল চা করতে। সুরেশ্বর আবার জিজ্ঞাসা করলে—শোন। আর একবার ভাল ক'রে দেখে আয় কুয়োর ধারে কিছু পড়ে আছে কি না? ভাল ক'রে দেখবি। না—চল আমি

সুদ্ধ যাই।

ওই জিনিসগুলি বিবিমহলের পিছনে যে উঠোনটা আছে সেই উঠোনের মাঝখানে একটা মজা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কুয়োটায় গ্রীষ্মকালে জল থাকে না, বর্ষায় জলে ভ'রে ওঠে। পুরনো কুয়ো, মেরামতের অভাবে গাঁথনীর গায়ের ছিদ্র দিয়ে গ্রীষ্মে শুকনো কাঁসাইয়ের টানে জল স'রে যায়, আবার বর্ষায় কাঁসাই ভরলে অর্ধেকের উপর জল ঢুকে ভরে যায়। এখন কুয়োটা শুকনো। তলায় রাজ্যের আবর্জনা জমে আছে, তার মধ্যে কাঁসাইয়ের ওপারের বনের ঝরাপাতা বেশী। ঝড়ে উড়ে এসে পড়ে। কাদাও অনেক। তারই মধ্যে শক্ত জিনিস অর্থাৎ বুলেট, স্প্লিন্টার এবং লোহার খোলগুলো ফেলেছে। অ্যাসিড জাতীয় বস্তু এবং গুঁড়ো বস্তু যা ছিল তা ঢেলে দিয়েছে কাঁসাইয়ের জলে। শিশিগুলোও ভেঙে কাঁসাইয়ে ফেলে দিয়েছে। কাল থেকে কিছু মজুর লাগিয়ে মাটি কেটে কুয়োটাকে বন্ধ করে দেবে। বেশ সতর্কতার সঙ্গেই সব করেছে, আসবার সময় একবার দেখেও এসেছে, তবু আর একবার দেখা প্রয়োজন মনে হল। কয়েকদিন পর সর্বসমক্ষে জানাজানি করে ওই খাস কামরা খুলে ঝাড়ামোছা পরিষ্কার করবে ঠিক করেছে।

বেশ ভাল ক'রে দেখে এসে আবার একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

জীবনে এক একটা দিন আশ্চর্য দিন আসে সুলতা। এমন আশ্চর্য দিন হয়তো সারাজীবনে দুটো বা চারটে আসে। তার বেশী নয়।

কাল রাত্রে বীরেশ্বর রায়ের জীবনের যে স্মরণীয় ঘটনার দিনটির কথা পড়তে পড়তে রাত্রি প্রভাত হয়ে গিয়েছিল, সেই দিনটি এইরকম; যতখানি সে পড়েছিল তারপরও প্রায় দু পাতা আছে। খাতা বন্ধ করবার সময় সেটা উল্টে দেখে নিয়েছিল মনে হয়। মেজাদ ব্রজেশ্বর দুজনে এসে পড়েছিলও বটে! আবার তার দারুণ একটা ভয়ও হয়েছিল তাও বটে। ভবানী দেবীর চিঠি! না জানি তার মধ্যে কি লেখা আছে!

তবে ভবানী দেবীর ছবি যখন রায়বাড়ীর দেওয়ালে টাঙানো আছে আজও, তখন সেটা ভয়ঙ্কর কিছু নয়—সেটা বীরেশ্বর রায়েরই ভ্রান্তি—তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বেঁচে ছিলেন, তাঁর শেষ জীবনে কন্যা হয়েছিল, তাদের সঙ্গে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের সম্পত্তি নিয়ে মামলা হয়েছিল, রায়বাহাদুর তা মিটিয়ে নিয়েছিলেন। কন্যার জন্মের পূর্বে বীরেশ্বর রায় সস্ত্রাক-ভাগ্যে কমলাকান্তকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন। কমলাকান্ত রায়বংশের বংশধারায় নামে ঈশ্বরত্ব যোগ ক'রে রত্নেশ্বর হয়েছিলেন। ভবানী দেবীর শ্রাদ্ধ করেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। সুতরাং কলঙ্কের দুশ্চিন্তা সেখানে নেই। তবু একটা ভয় হচ্ছিল সুরেশ্বরের।

ভবানী দেবীর চিঠিখানাও সে পড়েছে তারপর। তাতে তার অন্ধকার গাঢ়তরই হয়েছে। যেন একটা হাঁপ ধরাছিল। ভাবছিল এই অন্ধকারের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে সেই গাঢ়তম আদিম অন্ধকারের উৎস, যা রায়বাড়ীর বংশধরদের মধ্যে রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। রায়বাড়ীর সম্পদ তার উপর নীলাভ আবরণ দিয়ে চাঁদের কলঙ্ক শোভার মত করে নিয়েছে। ভবানী দেবীর প্রতি বীরেশ্বর রায়ের সন্দেহ বিমলাকান্তকে নিয়ে—সে কি চাপা পড়েছিল? বাধ্য হয়ে চাপা দিয়েছিলেন বীরেশ্বর? কলঙ্কের ভয়ে?

শিউরে উঠেছিল সে। সেই মুহূর্তে অতুলেশ্বরকে নিয়ে কোলাহল প্রবল হয়ে উঠেছিল কীর্তিহাটে। তারপর থেকে এই মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আশ্চর্য আর একদিক! রায়বাড়ীর বংশধারায় যে ঘনতম অন্ধকারের উৎসকে সে সন্ধান করতে গিয়ে সামনে পা ফেলতে ভয় করছিল, সেই

অন্ধকার ভেদ করে একটা আশ্চর্য দীপ্ত রশ্মিরেখা বেরিয়ে এসেছিল, সেটার সামনে ছিল অতুলেশ্বর আর অর্চনা! আশ্চর্য মনে হয়েছিল। অন্তের কাছে এ যুগে সেটা হয়তো আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু সুরেশ্বরের কাছে সেটা আশ্চর্য। তারপর এই আশ্চর্য পরমাশ্চর্য হয়ে উঠল অর্চনার সঙ্গে ওই ভবানী দেবীর সাদৃশ্য দেখে।

তফাত রঙের, আর তফাত একটা আঙুলের। চিত্রকর ভবানী দেবীর ডান হাতে ছটা আঙুল বেশ একটু স্পষ্ট করে এঁকেছিলেন শিল্পনৈপুণ্যে।

রঘু এসে চা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—কিছু খাবে না?

চায়ে চুমুক দিয়ে আরাম বোধ করে সুরেশ্বর একটি আঃ শব্দ উচ্চারণ করে তারপর বলেছিল—এই রাত্রে আবার কি খাব? খেয়েছি তো!

রঘুর স্বভাব একটা ধাঁজেই যেন পেরেক পোঁতা হয়ে আটকে আছে। সে উত্তাপে গলেও না, ঠাণ্ডাতে জমেও যায় না। ওর প্রকৃতির তাপমান সেই এক জায়গাতেই অচল ঘড়ির মত স্থির হয়ে থাকে। কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, চলাফেরা সব তাই। সে সেই ঠাণ্ডা গলায় থেমে থেমে বললে—সে কি খেয়েছ? সেই তো ন'টার সময় চারখানা লুচি খেয়েছ। সব তো ফেলে রেখেছ।

খেতে পারে নি সুরেশ্বর। মেজদি এবং অর্চনার কাছে সব শুনে উৎকণ্ঠিত হয়ে সে অপেক্ষা করছিল নিস্তব্ধ নিষুতি মধ্যরাত্রির। কথা ছিল রায়বাড়ীর অন্দরে সব নিষুতি হলে অর্চনা মেজদিকে নিয়ে ছাদে উঠে টর্চ জ্বালবে। সুরেশ্বর এদিকটা দেখেশুনে নিরাপদ বুঝলে টর্চ জ্বালবে। তারপর রঘুকে নিয়ে সে ওই খাস কাছারীর পিছনের গলিতে যাবে। সেই উৎকণ্ঠায় খেতে সে পারে নি। রঘুর তা ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না। লালবাবু কাল রাত্রে খায় নি, আজ রাত্রে খাবে না, সে তার ভাল লাগছে না।

সুরেশ্বর বললে—এখন খেলে অসুখ হবে রঘু। যা। খিদে নেই।

—ওটা খাও। খিদে হবে—। আমি টাটকা লুচি ভাজি, মাছ আছে—

—না। কিছুই খাব না।

রঘু এবার চলে গেল। দুঃখিত হয়েই গেল, কিন্তু সে বোঝবার উপায় নেই। সেই শান্ত ধীর পদক্ষেপেই চলে গেল।

সুরেশ্বর স্তিমিত টেবিল ল্যাম্পটাকে বাড়িয়ে দিল। আজ সন্ধ্যে থেকে ইচ্ছে করেই হেজাক জ্বালে নি। টানাপাখা টানবার লোকটাকে এবং গোমেশ রোজাকেও সন্ধ্যে থেকে বিদায় ক'রে দিয়েছে। সন্ধ্যেবেলা ব্রজেশ্বর এসেছিল, তাকেও অল্পক্ষণ পরে বিদায় করে দিয়েছে। বলেছে—শীত-শীত করছে, আবার বোধ হয় ম্যালেরিয়াটা সাড়া দিচ্ছে। তুমি যাও ব্রজেশ্বরদা, আমি ঘুমোব।

ব্রজেশ্বরকে বিদায় করে টেবিল ল্যাম্পটা বাড়িয়ে দিয়ে সে আবার খাতাটা খুলে বসল।

—তারপর? রায়বাড়ীর অন্দরমহলের দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিলে।

* * *

১৮৩৬ সাল থেকে ১৮৫৬ সাল। এ আশী বছর। আশী বছর একটা শতাব্দী থেকেও অনেক বেশী। অনেক। আশী বছর আগের একটি দিনে জানবাজারের বাড়ীতে সে দেখতে পেলে বীরেশ্বর রায়কে।

বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীর চিঠিখানা খুলে স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবছিলেন। ভাবছিলেন এবং ডায়রীতে লিখেছিলেন তিনি—"তাহাকে আমি মারিয়া ফেলি নাই কেন?"

সুরেশ্বর আজ ভবানী দেবীর ছবিটা দেখে এসে অবধি তাঁর সম্পর্কেই ভাবছে। আর অর্চনার সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখে তার ভাবতে ইচ্ছে করছে ভবানী দেবী কি পুনর্জন্ম নিয়ে ফিরে এসেছেন? কোন ঋণ শোধ করতে এসেছেন? না তাঁর পাওনা পেতে এসেছেন?

হেরিডিটি-বিজ্ঞান সে মোটামুটি জানে। রত্নেশ্বর রায়ের বংশে সে বিজ্ঞানের নিয়মে তো ভবানী দেবীর রূপ বা সাদৃশ্য এ বংশে কাউকে আশ্রয় করে আসার কথা নয়।

সুরেশ্বর আবার ডায়রীখানা পড়তে শুরু করলে। মন চলে গেল ১৮৫৬ সালে।

বীরেশ্বর রায় ভাবছিলেন। ভাবছিলেন ভবানীর কথা।

এই চিন্তার মধ্যেই খানসামা এসে দাঁড়িয়েছিল বীরেশ্বর রায়ের সামনে।

বীরেশ্বর বললেন—কি?

—আজ্ঞে হুজুর, সেই পাগ্‌লাবাবা—

এতক্ষণে বীরেশ্বর রায়ের মনে পড়ল, লোকটি সকালবেলা ক্লেদাক্ত অবস্থায় জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তিনি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে তার? কেমন আছে?

—উঠে বসে শুধু কাঁদছে।

—কাঁদছে?

—হ্যাঁ, চুপচাপ বসে আছে, কাঁদছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। পাঁচবার ডাকলে এক-একবার মুখের পানে তাকায়, কিন্তু আবার মুখ ফিরিয়ে বসে সেই কাঁদছে।

—জ্বরটা কমেছে তাহ'লে?

—তা হুজুর ওঁর অঙ্গে কে হাত দেবেন?

—কেন? যে বামুন সরকারমশাই ওকে ধোয়া-মোছা করেছিলেন?

—তিনি সেই ওকে ধোয়ামোছা ক'রে গঙ্গাচানে গিয়েছেন।

—হুঁ। চল দেখি।

ব'লে রায় উঠলেন। কাল রাত্রের কথা মনে পড়ছে। এ তো সে নয়। এ তো নয়। এর ছটা আঙুল! রায় এসে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন, পরিচ্ছন্ন কাপড় পরানোতে ক্লেদ ধুয়ে দেওয়ার সঙ্গে শরীরের ময়লা উঠে মানুষটাকে অন্যরকম লাগছে। তা ছাড়া মানুষটার মধ্যে সেই অধীর অস্থিরতা আজ যেন অনেক শান্ত। তা ছাড়া কাল রাত্রে অসুখটাও হয়েছিল বেশী। পরিশ্রান্ত, দুর্বল হয়ে গেছে।

রায় ডাকলেন—শুনছেন?

শুনছ বলতে যেন বাধছে। পাগল বলতেও কেমন লাগছে। লোকে পাগ্‌লাবাবা বলে, তাও বলতে পারছেন না।

পাগল হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। তা ছাড়াও তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসে রয়েছে সে।

—শুনছেন! বলে পাগলের পিঠে তাঁর হাত রাখলেন বীরেশ্বর রায়। জ্বর সামান্য আছে বলেই মনে হল।

পাগল এবার মুখ তুলে ফিরে তাকালে। রায় দেখলেন, সত্যি, পাগলের চোখ থেকে জলের ধারা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে—তার দাগ চকচক করছে। তাঁকে দেখে পাগল বললে—রায়বাবু!

—হ্যাঁ। কি হল? কাঁদছেন কেন?

একটু হাসলে পাগল। নিঃশব্দ একটুকরো হাসি।

রায় বললেন—কাল ছবি দেখে আপনি কি বলছিলেন? ওকে চেনেন?

—ওকে? পাগলের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দুর্বল শোনাচ্ছে। কাল রাত্রে জ্বরটা খুব বেশী হয়েছিল।

বীরেশ্বর বললেন—হ্যাঁ—ও কে?

—ও? ও হ'ল—। ও হ'ল—দয়া। যেন অনেক ভেবে বললেন।

—দয়া? কি বলছ যা তা? এবার আবার তুমি বলে ফেললেন রায়!

—আমার মন তাই বলছে। বুঝেছ! আমি তো ওকে দেখি নি। তবে—তবে—বুঝতে পারছি। সেই সেই ভয়ঙ্করী—

আতঙ্কে থর থর ক'রে কেঁপে উঠল পাগল, বললে—না—না—বলব না। বলব না। না।

বলতে বলতে আবার তার সেই অভ্যস্ত পাগলামি উঠল। নিজের গলা নিজে চেপে ধরলো এমন নিষ্ঠুরভাবে যে মানুষ নিজে নিজের গলা টিপে ধরতে পারে এ কথা বীরেশ্বর রায় এই পাগলের এই আত্মনির্যাতন না দেখলে বিশ্বাস করতেন না।

রায় আগে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস হয়েছে যে অদৃশ্য কেউ তাকে এইভাবে তার হাত দিয়েই তার গলা টিপে ধরে।

ধ'রে, কোন কথা পাগল বলতে চায় কিন্তু সে বলতে দিতে চায় না! এ দেশের প্রচলিত সংস্কার বিশ্বাসই তো শুধু নয়—মহাকবি শেক্সপীয়র হ্যামলেটের মুখ থেকে বলিয়েছেন—

"There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy."

তিনি পাগলের দুই হাত নিজের দুই হাত দিয়ে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরলেন। আরও ক'বার তিনি জোর ক'রে ছাড়িয়েছেন, তিনি জানেন ওই বৃদ্ধ লোকটার শীর্ণ হাত লোহার সাঁড়াশীর মত শক্ত হয়ে ওঠে এবং একটা অবিশ্বাস্য শক্তি সঞ্চারিত হয় ওই হাতে।

আজ অবশ্য সহজেই ছাড়াতে পারলেন ওর হাত। কালকের জ্বরে বড় দুর্বল হয়ে গেছে পাগল। সে নেতিয়ে পড়ে গেল। এবং আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রায় অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন—তাঁর মনে হচ্ছে পাগল বলতে পারে ভবানী কোথায়? বলতে পারে ভবানী কে? লোকটা সম্পর্কে রাজাবাহাদুর রাধাকান্ত দেব বলেছেন—লোকটা সাধনা করতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছে। হয়তো এই পাগলামির মধ্যেই তার সিদ্ধি একদিন আসবে। এই যে পাগলামী করে বেড়ায় এরই মধ্যে চলছে ওর সেই সাধনা। এ দেশে তান্ত্রিক সাধক অনেক এমনই করে পাগল হয়, অনেকে পাগলই থেকে যায়। এদের অনেক শক্তি অনেক ক্ষমতা। যদি কিছু সে নাই জানতে পেরে থাকে তবে সে কাঁদছে কেন?

কিছুক্ষণ পর রায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তো—আপনি তো অনেক কিছু পারেন, অনেক কিছু জানেন—লোকে বলে আপনি নাকি সিদ্ধপুরুষ—

ঘাড় নাড়তে লাগল পাগল—না—না—না।

—লুকোচ্ছ আমাকে?

—না। ঘাড়ই নাড়তে লাগল।

—তবে গন্ধ আনেন কি ক'রে?

শান্তভাবে জানালার বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে এবার বললে—ওই—ওই—ওই পাখি। আর ওই দু' একটা—। দূর্—দূর্। ও—আর কি? ওতে কি হয়? ছলনাময়ী সর্বনাশী সে ভুলিয়ে দিলে। ভুলিয়ে দিলে। এখন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

কাতরতার ক্লান্তিতে কণ্ঠস্বর যেন ভেঙে পড়ল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে।

রায় এবার জিজ্ঞাসা করলেন—ওই ছবি কার? আপনি ওকে চেনেন? না চিনলে পরশু রাত্রি থেকে এমন করছেন কেন?

—অবিকল সেই সর্বনাশীর মত। কিন্তু সে নয়, সে নয়। এর ছটা আঙুল। সে নয়। সে মোহিনী, এ দয়াময়ী। ‥মুখ দেখে চিনতে পারবে এ দয়াময়ী। তার যে নানা রূপ! কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী—! ভয়ঙ্করী ক্ষেমঙ্করী মোহিনী করুণাময়ী। ওকে চেনা ভার, ওকে জানা ভার। ওকে জোর ক'রে জানা যায় না, পায়ের তলায় পড়তে হয়। ও কোথায় আমাকে বলতে পার? ও কি—ও কি—

থেমে গেল পাগল।

—কি?

—ও কি—

—ও আমার স্ত্রী!

—তোমার স্ত্রী? চমকে উঠল পাগল। তোমার স্ত্রী? রায়বাবু! রায়বাবু! দয়া কর—বাবা আমাকে দয়া কর—

বিস্ময়ের আর সীমা রইল না বীরেশ্বর রায়ের। তিনি প্রশ্ন করলেন—কি বলছেন আপনি—?

—ওই ওর কাছে ওর কাছে একবার নিয়ে চল আমাকে। একবার—বাবা একবার। বাবা একবার—।

—ও তো নেই, পাগ্‌লাবাবা।

—নেই?

—না। জলে ডুবে মরেছে বলেই—

—মরেছে? চীৎকার ক'রে উঠল পাগল।

—কীর্তিহাটে কাঁসাইয়ের দহের ধারে ওর গহনাপত্র পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু দেহ পাওয়া যায় নি। কিন্তু আজ জানলাম সে বেঁচে আছে। কোথায় আছে জানি না। আপনাকে তাই জিজ্ঞাসা করছি, বলুন, আপনি অনেক জানেন জানতে পারেন, বলুন সে কোথায় আছে?

মুহূর্তে পাগল সেই দুর্বল দেহেই উঠে দাঁড়াল—আমি চললাম, আমি চললাম রায়বাবু, আমি চললাম। তাকে খুঁজে আনব। রায়বাবু তাকে খুঁজে আনব—আমি চললাম।

রায় তাকে বাধা দিলেন—না।

পাগল বলে উঠল—না-না-না। ছাড়। আমাকে ছাড়। রায়বাবু আমি যাব। খুঁজব—

—না। আপনাকে তার আগে সোফিয়া বাঈকে ভাল ক'রে দিতে হবে। আপনি সেদিন তাকে কিছু করেছেন।

—না—না—না। আমি কারুর কিছু করি নি, ছেড়ে দাও আমাকে। ছেড়ে দাও।

—সে হবে না পাগ্‌লাবাবা। সে সেদিন সন্ধ্যেতে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই জ্বরে পড়েছে। বিকারের ঘোরে শুধু আপনার নাম করছে। আপনাকেই তাকে ভাল ক'রে দিতে হবে। যে হাকিম তাকে দেখেছে সেও বলেছে এ ঠিক বেমারীর বুখার নয়। আপনাকে যেতে হবে। আগে সেখানে চলুন, তারপর যেখানে ইচ্ছে যাবেন।

*　　*　　*

সোফিয়া নিঝুম হয়ে বিছানায় পড়েছিল। যেন সব শক্তি তার শেষ হয়ে গেছে। সোফিয়ার মা উদ্বিগ্ন মুখে বসেছিল মাথার শিয়রে। একটি ঝি মাথায় বাতাস করছিল। আজ দুপুরবেলা তাদের যে হেকিমসাহেব দেখে, তার পরামর্শমত বড় হেকিম এনেছিল, সে হেকিম দুই রগে জোঁক বসিয়ে অনেকটা রক্ত বের করে ফেলেছে, তারপর থেকে এমনি নিঝুম হয়ে গেছে। গায়ের জ্বর কমেছে। সোফিয়ার মুখের গোলাপী রঙ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

পাগ্‌লাবাবাকে একরকম ধরেই এনেছেন বীরেশ্বর রায়। সে বার বার বলেছে—ছেড়ে দাও। রায়বাবু, আমাকে ছেড়ে দাও।

দু-একবার গাড়ীর মধ্যে থেকে লাফিয়ে পড়তে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বীরেশ্বর রায় সতর্ক হয়েই ছিলেন। তিনি ধরে আটকেছেন। পাগ্‌লাবাবা অসহায়ের মত চীৎকার করেছে—গোলকধাঁধা। গোলকধাঁধা, ওরে ওরে নরকে পতন—নরকে পতন। ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও!

বাড়ীর দরজাতেও সে বসে পড়েছিল একেবারে ছোট ছেলের মত। ছোট ছেলের মত কেঁদে মিনতি ক'রে বলেছিল—তোমার হাতে ধরছি রায়বাবু, ছেড়ে দাও।

বীরেশ্বর রায় কঠিন হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে সোফিয়ার অসুখ এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর হয় রুষ্ট দৃষ্টির ফলে, অথবা কোন তুকতাকের জন্ম হয়েছে। এই তান্ত্রিক সেই কারণেই যেতে চাচ্ছে না। এদের সম্পর্কে অনেক কথা অনেক গল্প শুনেছেন। এদের মধ্যে রামপ্রসাদের মত, কমলাকান্তের মত দেবতুল্য সিদ্ধ তান্ত্রিক, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত সিদ্ধ মহাপুরুষ যোগী যেমন আছে, তেমনি আছে পিশাচতুল্য ভ্রষ্ট মানুষ, যারা ডাইন ডাকিনের মত লোভী কামাচারী দুষ্ট লোক; রাক্ষসের মত হিংস্ররক্তপিপাসু। এরা না পারে কি? সব পারে। বান মারার কথা তিনি শুনেছেন। কালি কাঁটা মড়ার হাড় নিয়ে মন্ত্র পড়ে মানুষের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয়, সেইগুলো মানুষের অগোচরে এসে তাদের বেঁধে। তারপর মানুষ যন্ত্রণায় অস্থির হয় অধীর হয়। পঙ্গু হয়ে যায়। কোন চিকিৎসায় কিছু হয় না। এক অনিষ্টকারীর চেয়ে শক্তিমান ওঝা হলে সে তাকে মন্ত্রবলে ঝাড়ফুঁক ক'রে সারাতে পারে নইলে মরতে হয় হতভাগ্যকে। কলকাতা শহরে সাহেবরা পর্যন্ত ঘরে চুরি হলে ওঝা ডেকে চাকর-বাকরদের চালপড়া খাওয়ায়, যে চোর তার মুখের চাল রক্তে লাল হয়ে ওঠে। চোর ধরার জন্য পুলিশ কোতোয়ালরা নল চালাবার ওঝা ডাকে। এ লোকটা ঠিক সেইরকম কিছু করেছে। তিনি তাকে কিছুতেই ছাড়বেন না। তিনি হাতের মুঠো শক্ত করে তার হাত ধ'রে টেনে তুলে বলেছিলেন—সে হবে না পাগ্‌লাবাবা। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। যেতে তোমাকে হবে, আর ওকে সারিয়েও তোমাকে দিতে হবে।

"আমি নিজের জন্ম ভয় করি না।" বীরেশ্বর রায়ের ডায়রীতে আছে। তিনি লিখেছেন—"আমার কিছু অনিষ্ট করিলে আমি তাহাকে গুলি করিয়া মারিব। যদি হাত দুইখানাই লোকটা পঙ্গু করিয়া দেয় তবে আমার লোক তাহাকে খুন করিবে, আমি তাহা দেখিব।"

টেনেই একরকম তুলে এনেছিলেন তাকে। সবল শক্তিমান পুরুষ বীরেশ্বর রায়। তার উপর মানুষ হিসাবেও দুর্দান্ত জেদী মানুষ। ওই বৃদ্ধ শীর্ণকায় লোকটাকে তুলে আনতে বেগ পান নি। সে আমলের সিঁড়ি সোজা উঠে গেছে, তেমনি চড়াই। পাগলকে ঘরে এনে ফেলে দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলেন।

পাগল ঘরে ঢুকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—যাঃ! যার মানে বোধ হয় এই যে,

আর তার কোন উপায় নেই, যা হবার তা হয়ে গেল।

সোফিয়া চোখ বুজে নির্জীবের মত নিঝুম হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল।

সোফিয়ার মা বসেছিল মাথার শিয়রে বোবার মত, সে সাধুকে দেখে ব্যস্ত হয়ে হাতজোড় করে উঠে এসে বলেছিল—হজরত, তুমি সাধু ফকীর, তোমার পায়ের ধুলোতে আমার গরীবখানা ধন্য হয়ে গেল; তুমি মেহেরবান, তুমি জিন্দাপীর, তুমি সব পার, খোদাতয়লা ভগোয়ানের মেহেরবাণীতে, জানি না আমার বেটী কি কসুর করেছে তোমার কাছে, তবে কসুর করেছে জরুর নইলে তুমি গোস্সা হবে কেন? যা হয়েছে তুমি মাফ কর। তুমি মাজানিন, ফকীর, পীর্-উ-মুরশিদিমা, তুমি এখনি আগুন হয়ে যাও, এখনি ঠাণ্ডি পানি হয়ে যাও, খোদাবন্দ, এ বেওকুফ ছোটি লড়কী, এর কসুর তুমি মাফ কর!

পাগল একদৃষ্টে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখছিল সোফিয়াকে। দেখে সে যেন বিহ্বল হয়ে গেছে।

ঘরখানা নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাঁদীটা হাতের পাখা নাড়া বন্ধ করে তাকিয়ে ছিল পাগলের মুখের দিকে, সোফিয়ার মা সেও যেন অকস্মাৎ বোবা হয়ে গিয়ে পাগলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, পিছনে বীরেশ্বর রায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি পাগলের মুখের ছবিখানা দেখছিলেন ওদিকের দেওয়ালের ধারে পায়ার উপরে দাঁড়ানো বড় আয়নাটার মধ্যে। পাগলের মুখখানাকে এমন কোমল হতে তিনি এ ক'দিনের মধ্যে একদিন একমুহূর্তের জন্য দেখেন নি। লোকটার মুখের চামড়া কিসের বা কিছুর আঁচড়ের দাগে ক্ষতবিক্ষত, চামড়া গুটিয়ে গেছে, কুঁকড়ে গেছে, তবু তারই মধ্যে আশ্চর্য কোমলতা ফুটে উঠেছে। চোখ দুটি আয়ত এবং অক্ষত, সুন্দরও বটে, তবে সে চোখের দৃষ্টি অধীর অস্বাভাবিক, সে দৃষ্টিও এই মুহূর্তে স্থির, এই মুহূর্তে মমতার মাধুর্য যেন স্থির হয়ে ভেসে রয়েছে।

পাগল আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বললে—আহা—আহা—হারে! আ—হা—হা!

সোফিয়ার মা আশ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠে দু পা পিছিয়ে গিয়ে মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলে—সোফি, সোফি, বেটী! মেরি জান! দেখ্ বেটী দেখ, উ মাজানন পীর ফকীর এসে তোর সামনে বসেছেন, তোকে মেহেরবাণী করছেন। বেটী, মেরি সোফি! সো—ফি—।

এবার ক্লান্তভাবে চোখ মেললে সোফিয়া। তাকালে মায়ের দিকে। মা বললে—দেখ বেটী, ওই ফকীর, পীর-উ-মুরশিদিমা খুদ এসে বসে রয়েছেন। দেখ, ওই—ওই তোর সামনে।

সোফিয়া এবার তাকালে তার দিকে। রাজ্যের ভয় সে দৃষ্টিতে, তার সঙ্গে ভিক্ষুকের আর্তি। তারপর সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল প্রসন্ন একান্ত উজ্জ্বলতা, যেন একটা নিবুনিবু প্রদীপের শিখাটিকে কেউ উস্কে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার শুকনো ঠোঁটদুটিতে কেউ যেন টেনে দিলে একটি আশ্বাসের হাসির রেখা।

পাগল এবার নিজেই এগিয়ে গেল তার শিয়রের দিকে—মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—ভয় নেই। ভাল হয়ে যাবে। ভয় নাই।

তারপর সে তার মুখে হাত বুলিয়ে দিলে। গভীর স্নেহের স্পর্শের স্বাদ বা গন্ধ যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরাও অনুভব করলেন।

—যাঃ, ভাল হয়ে গেছে। স—ব ভাল হয়ে গেছে। যা—কিছু খা! দুধ খা। দুধ। গরম দুধ।

নিজে হাতে গরম দুধের বাটী ধরে চামচে ক'রে তাকে খাইয়ে দিলে পাগল। সোফিয়ার মা

বললে—সন্তজী হম্‌লোক মুসলমানী, আপনে হাঁত সে উসকে পিলাবেন—

পাগল গ্রাহ্যই করলে না। ভাল লাগল বীরেশ্বরের, তিনি সোফিয়ার মাকে বারণ করে বলেছিলেন—ওঁদের জাত নেই বাঈ সাহেবা। আল্লা খুদা আর ভগবান হরি রাম রহিম কৃষ্ণ করিম বিলকুল ওদের কাছে এক হয়ে গেছে।

পাগল সোফিয়াকে খাইয়েই চলেছিল, আর বলেই চলেছিল—খা-খা! সব ভাল হয়ে গেছে। খা! আমি তোকে কিছু বলি নি, সে তাকে দেখে, তাকে দেখে! খা-খা।

পাগল ফেরে নি। বীরেশ্বর রায় তাকে রেখেই চলে এসেছিলেন। কি করবেন? ফেরবার কথায় পাগল বলেছিল, না-না, তুমি যাও, তুমি যাও ,আমি যাব না। আমি যাব না! তুমি যাও।

সোফিয়ার মা বলেছিল—আপনি যাইয়ে রায়বাবু সাব। বেটীর বহুৎ ভাগ্‌ হ্যায়, আর উ আপকে কৃপাসে মিল গিয়া, সাধুজীর সব সেওয়া ময় করুঙ্গি। ব্রাহমন বুলাওঙ্গি, উ উনকে সব সেওয়া করেঙ্গে। ঠিক হ্যায়।

রায় চলে এসেছিলেন।

* * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, সেদিনের স্মরণীয় ঘটনা বীরেশ্বর রায় প্রায় দশ পৃষ্ঠা ধরে বর্ণনা করেছেন। শেষ করেছিলেন বোধ হয় বাড়ী ফিরে এসেই, সন্ধ্যা থেকে কয়েক ঘণ্টা ধরে লিখে। শেষ দিকে আট-দশটা লাইন আছে—ফিরে এসে বসেছি আজকের ঘটনাগুলো লিখতে। পরপর কটা দিন—আশ্চর্য দিন এসেছে আমার জীবনে। এমন ঘটনাবহুল দিন এমন বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনা এমন পরপর সমাবেশ, এর আগে কখনও আসে নি। লিখে রাখলাম। লেখা শেষ করে ভাবছি। কি ভাবছি? একটার পর একটি ছবি ভিড় করে যেন গোলমাল করে দিচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে কলম ধরে আছি, যা মনে হচ্ছে লিখেছি। মনে হচ্ছে, পাগল কি? সত্যকারের মহাপুরুষ? পিশাচসিদ্ধের কথা শুনেছি, ও কি তাই? লোকটা থেকে গেল মুসলমান বাঈজীর বাড়ীতে সোফিয়ার সেবা করবার জন্য? ওখানেই থাকবে? ওখানেই খাবে? মহাপুরুষদের জাত নেই জানি। ও কি তাই? তবে এমন যন্ত্রণা ভোগ করে কেন? নিজের গলা নিজে টিপে ধরে 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে' বলে চিৎকার করে কেন? ভাবছি। আবার মনে হচ্ছে, ভবানীর ছবির সামনে পাগল যা করলে। বললে—না-না, সে নয়। এর ছটা আঙুল! ভবানী—।

হঠাৎ মনে ভেসে উঠেছে—শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী বউদি চিঠিখানা দিলেন। ভবানী বেঁচে আছে! ভবানীর চিঠি!

ভবানী কোথায়? ভবানীর ছবি মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, দাদার বিয়ের দিন নাচের আসরে এসে আমাকে ডাকলে গান গেয়ে বরকে গানের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। আসরে ওর বাজনার মধ্যে আমার খেই হারানোয় ওর সেই ছোট কৌতুকটি।

মনে পড়ছে বিয়ের রাত্রি।

মনে পড়ছে, প্রথম সন্তান হয়েছে ভবানীর। আমি গভীর রাত্রে ওকে গিয়ে ডাকলাম। ওকে বললাম—।

না। সে কথা স্মরণেই থাক। স্মরণীয় খাতাতেও লিখে যাব না। লিখতে পারব না। না তা পারব না।

মনে করে রেখেছি, বলে যাব, মৃত্যুর পর এই খাতাখানা যেন আমার চিতায় আমার বুকের

উপর দেওয়া হয়। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আমার দেহের সঙ্গে।

তবু পারব না লিখতে। না-না-না।

No—No—No—তিনটে No বেশ মোটা অক্ষরে লিখেছেন বীরেশ্বর রায়।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, ওইখানেই ওই তিনটে No শব্দের তলায় একটা দাগও টেনেছিলেন। অর্থাৎ শেষ করেছিলেন। কিন্তু দাগটা কেটে আবার তার তলায় আবার দুটো-তিনটে ছত্র লিখেছিলেন।

"হঠাৎ মনে হচ্ছে এত সব যে বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনা ঘটছে, জীবনে যা এই কদিন আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটল, এরপর কাল, হ্যাঁ, কাল সকালেই যদি ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, সে এসেছে ? আসবে ? সে ?"

মোটা করে লেখা—'She' !

১৪

"তা কিন্তু হয় নি। সংসারে মানুষের আশার শেষ নেই, সে আকাশে ফুলফোটা দেখতে চায়, ফোটাতে চায়। কিন্তু ফুল আকাশে ফোটে না। বীরেশ্বর রায় সেদিন প্রত্যাশা করেছিলেন, হয়তো সকালে উঠে দেখবেন—"

সুরেশ্বর বললে—শুধু বীরেশ্বর রায় কেন, তোমাকে কি বলব সুলতা, সেদিন উনিশশো ছত্রিশ সালের মে মাসের রাত্রিতে সেই ডায়রী পড়ে, আমারও তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। বীরেশ্বর রায় উনবিংশ শতাব্দীর আধা রোমান্টিসিজিম, তাই বা কেন, বারো আনা রোমান্টি-সিজিম আর চার আনা রিয়ালিজম মেশানো কালের মানুষ। ১৮৫৬ সালের অনেক পরে রামকৃষ্ণদেব সিদ্ধিলাভ করেছেন। দত্তবাড়ীর নরেন দত্ত তখনকার দিনের চার আনা রিয়ালিজমকে ষোল আনা করে রামকৃষ্ণকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, ঈশ্বর দেখাতে পার ? সে চ্যালেঞ্জে চার আনা রিয়ালিজমও রোমান্টিসিজমের মধ্যে অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ-দেব নাকি তাঁকে কালীদর্শন করিয়েছিলেন। নরেন দত্ত বিবেকানন্দ হয়ে শুধু ভারতবর্ষ নয়, আমেরিকায় গিয়েও তার ঘোর ধরিয়েছিলেন। বীরেশ্বর রায় ডায়রীতে যে প্রত্যাশার কথা লিখেছেন, তা কিছুমাত্র আন্‌রিয়াল বা অবাস্তব ছিল না। কিন্তু আমি ? আমি বিংশ শতাব্দীতে সেই গ্রীষ্মের রাত্রে দরজা বন্ধ করে, পাখা বন্ধ করে ডায়রীর পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, ঠিক ওই প্রত্যাশা করে।

অবশ্য তার কারণ ছিল। কারণ আমি জানতাম যে, ভবানী দেবী ফিরেছিলেন। তাঁর একটি কন্যা হয়েছিল। সে কন্যার বংশ বিদ্যমান। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়কে বীরেশ্বর রায় পোষ্যপুত্র নিয়ে বিষয় দিয়েছিলেন। তার জন্য তাঁর কন্যার তরফ থেকে পোষ্যপুত্র নাকচের মামলা দায়ের পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু মামলাটা চলেনি, মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। কি কারণে কিভাবে মিটমাট হয়েছিল, যথাসময়ে বলব। সে নিয়েও একটা ছবি আমি এঁকেছি। এবং এই মামলার মিটমাটের সময় তোমার পূর্বপুরুষ রায়বংশের এমন একটা কথা জেনেছিল, যে কথাটা প্রকাশ করবার ভয় দেখানোতেই সে খুন হয়েছিল পিদ্রু গোয়ানের হাতে। তার ছবি ওই কোণে আছে।

এখন দেখ, ওই দিনমানে, সোফিয়া বাঈজীর বাড়ীতে ওই তান্ত্রিক পাগল অপরিসীম মমতায় ওই রুগ্ন সোফি বাঈজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখ মেলেছে। শুকনো ঠোঁটে তার

শীর্ণ আশ্বাসের হাসি ফুটে উঠেছে। আর পাগলের ক্ষত-বিক্ষত কদর্য মুখখানিতেও কি করুণা বা মমতা! ছবিখানা এঁকে আমি খুশী হয়েছিলাম। পাগলের দৃষ্টিতে একটা মিস্টিক কিছু ফুটিয়েছি বলেই আমার বিশ্বাস!

ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম, সেখানে একজিবিশনে ওখানা ছিল। একটি মেয়ে দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'Melting' নাম দিয়েছ কেন? Beauty and the Best নাম দিলেই তো পারতে। আমি বলেছিলাম, না, পাথর গলছে। দেখছ না, এই যে লোকটার গায়ের রঙে আমি পাথরের রঙ ফুটিয়েছি! পাথরের মত মানুষটা গলছে। ছবিটার প্রশংসা করেছিল অনেকে। একেবারে কাছে মনে হবে পাথর। একটু দূরত্বে ভ্রম হবে, পাথর না মানুষ? দূর থেকে মনে হবে মানুষ কিন্তু বর্বর অথবা উন্মাদ।

ছবিটার দিকে তাকালে সুলতা। পাগল সম্পর্কে তারও কৌতূহল জেগে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, এই লোকটা যেন এদের সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধসূত্রে জড়িয়ে রয়েছে।

সত্যই ছবিখানা ভাল। সুরেশ্বরের তুলির চাতুর্য বাস্তবকে লঙ্ঘন করে ছবিখানাকে ফুটিয়েছে অবাস্তব মাধুর্যে। তারই মধ্যে তার বক্তব্যকে প্রকাশ করেছে। লোকটা ঝুঁকে পড়েছে তার মুখের কাছে। তাতে পাগলের মুখে অন্ধকার বা ছায়া পড়বার কথা। কিন্তু সোফিয়ার মুখের রঙের আভাটিকে সে পাগলের ঝুঁকে-পড়া মুখের ওপর প্রদীপের আলোর মত ফেলে প্রদীপ্ত করে তুলেছে। অথচ বাকী অঙ্গগুলিতে শেওলা-ধরা পাথরের রঙে তাকে অমানুষ অথবা অন্ধকারের মানুষ করে ফুটিয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সীমারেখায় একটু ঈষৎ সাদা আভাস। পাথর যেন সত্যই গলতে শুরু করেছে।

সুরেশ্বর তাকে ডাকলে—সুলতা!

—বল!

—ওটাতেই দৃষ্টিকে বেঁধে রেখো না। তারপর দেখ। রাত্রির পরমায়ু ফুরিয়ে আসছে। তারপরের ছবিটা দেখ। ওই দেখ, বীরেশ্বর রায় কলম ধরে লিখছেন, কটি কথা লিখেই তিনি থেমে গেছেন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। একটু এগিয়ে গেলে নজরেও পড়বে—No.

অর্থাৎ সে আসে নি। ভবানী দেবীকে তিনি ফিরে পান নি সকালে। অথবা কোন একটি দীর্ঘ অবগুণ্ঠিতা নারী সন্তর্পিত পদক্ষেপে এসে দাঁড়ায় নি, জানবাজারের রায়বাড়ীর ফটকে।

* * *

পরের দিনের ডায়রীর পাতা আমিও ওই প্রত্যাশা করে উল্টেছিলাম। আমিও হতাশ হয়েছিলাম। লেখা ছিল, না। সে আসে নি। কল্পনা চিরকাল মিথ্যাই হয়। তারপর লিখেছেন, সারাদিন ভেবে ঠিক করেছি, কাশীতে লোক পাঠাব। পাঠাবার মত বিশ্বাসী লোক একমাত্র ছেদী সিং। কিন্তু সে বুড়ো হয়েছে। বয়স সত্তরের কাছে। কিন্তু ও ছাড়া এ কাজের ভার তো বিশ্বাস করে কারুর হাতে দিতে পারব না। ছেদী বারো বছর বয়সে ঢুকেছিল, বাবার বাচ্চা খানসামা বয় হিসেবে। তারপর আমার ভার পড়েছিল তার উপর। তখন সে ভর্তি জোয়ান। আমার মত সবল দুরন্ত ছেলেকে এদেশী চাকর সামলাতে পারত না। তাই ছেদীর উপর পড়েছিল আমার ভার। আমার পৈতের পর আমার খানসামা হয়ে এসেছিল মহেন্দর। আর ছেদী হয়েছিল আমার দারোয়ান, আমার সঙ্গে লাঠি নিয়ে মুরেঠা বেঁধে ফিরত। রবিনসনের কুঠী গিয়েছি, ছেদী সঙ্গে গিয়েছে, কোমরে তলোয়ার বেঁধে। যেখানে গিয়েছি, সে ছায়ার মত ফিরেছে আমার সঙ্গে। আমার জন্তে প্রাণ সে দিতে পারত। আজ সে সত্তর

বছরের বুড়ো, তবু সে আমাকে ছাড়ে নি। তার বাড়ী কাশীর ওপারে রামনগরের কাছে। আমি তাকে দিয়েছি অনেক। দেশে তার ক্ষতি হয়েছে। বাড়ীতে তার বেটা বেটী বউ। তাদের ছেলেপুলে হয়েছে। তবু সে আমাকে ছাড়তে পারে নি। জানবাজারের বাড়ীতেই থাকে। পেনশন দিয়েছি। ওকে পাঠাব। বছরে একবার সে বাড়ী যায়, দু মাস তিন মাসের জন্যে। সেই বাড়ী যাওয়ার নাম করেই যাক। কাশীতে এসে সে বিমলাকান্তের বাড়ী যাবে। দেখে আসবে সেখানে সে আছে কিনা! রাজা রাধাকান্ত দেবকে বিমলাকান্ত বলেছিল, এক ভগ্নীর কথা। ভগ্নী? তা ছাড়া বলবেই বা কি? হয়তো এক বাড়ীতে নাও থাকতে পারে। কারণ তার বাবাও নিরুদ্দেশ বা উদ্দেশহীন তার সঙ্গে সঙ্গেই। ছেদী পাকা খবর নিয়ে আসবে। তাকেই পাঠাব। অন্যকে এ খবর বলবার আমার সাহস নেই।

তাকে পেলে তার সঙ্গে বোঝাপড়া আমি করব। কিন্তু লোকে তার নামে দুর্নাম দেবে, সে আমার সহ্য হবে না। রায়বংশের মাথা হেঁট হয়ে যাবে, চিরদিনের জন্যে।

ছেদীকে ডেকে সব বললাম আজ সন্ধ্যায়। সে বললে—আপনে নিশ্চিন্ত থাকেন বীরাবাবু ভাইয়া; হামি বিলকুল খবর নিয়ে আসবে। তুরন্ত আসবে। এক রোজ বেকয়দা দেরী হামি করবে না।

রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল হয়েছে। রাণীগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেনে যাবে। তারপর গঙ্গার কোন ঘাটে গিয়ে নৌকো। উজান হলেও হেঁটে যাওয়ার চেয়ে শীঘ্র যাবে। আসবার সময় নিচের দিকে স্রোতের মুখে অনেক শীঘ্র হবে। মোটমাট মাস চারেক লাগবে। কিন্তু আমার ধৈর্য যেন থাকছে না। চার মাস দীর্ঘ সময়।

আজ সন্ধ্যেটাই কাটছে না। একা বসে আছি। ছেদীকে টাকা-কড়ি দিয়ে বিদায় করে লিখছি, আর ভাবছি। চার মাস!

সোফিয়ার অসুখ। সকালবেলা ওর লোক এসেছিল, বললে—সোফিয়া ভাল আছে। বিপদ কেটেছে। কিন্তু খুব দুর্বল। উঠে বসতেও পারে না। জোঁক বসিয়ে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয় হয়েছে। কালো মুখখানা কাগজের মত সাদা দেখাচ্ছিল। তার উপর এত বড় বিকারটা গেল। আশ্চর্য! তাহলে তো ওই সন্ন্যাসীর কোপেই এমনটা হয়েছিল। সন্ন্যাসীর কৃপাতেই তো সারল। সন্ন্যাসীর আশ্বাসে চোখ মেললে। নিষ্প্রভ চোখে যেন প্রদীপ জ্বলল। আমার চোখের উপর ভাসছে। আর ওই বিচিত্র পাগলের মুখে কি আশ্চর্য করুণা দেখলাম! আমার কাছে একটা বিস্ময়ের মত মনে হচ্ছে। ভাবছি, এদের ক্রোধ হয় যত সামান্য অপরাধে, আবার কি অফুরন্ত আশ্চর্য দয়া এরা ঢেলে দেয় মানুষের দুঃখ দেখে।

সোফিয়ার লোকটা বললে—সারারাত্রি পাগল সোফিয়ার মুখের কাছে ঠিক তেমনি করে তাকিয়ে বসে ছিল। মধ্যে মধ্যে শুধু বলেছে, ভাল হয়ে যা। যা। ভাল হয়ে যা। আ-হা-হা-রে! বলেছে, নাকি ভাল হয়ে যাবে আজ!

অবিশ্বাস্য কথা। সোফিয়ার সুস্থ সহজ হতে বেশ কিছুদিন লাগবে। তবে এরা হয়তো সব পারে। বেচারী সুস্থ হোক। সম্পূর্ণ সুস্থ হোক। তবে আজ সোফিয়া থাকলেই কি ভাল লাগত? বোধ হয় লাগত না। মনে হচ্ছিল, এখন মনে মনে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করছি, আর কাউকে ডাক দেব? আমার নাম শুনলে নিশ্চয় আসবে। কিন্তু তাও ভাল লাগছে না। না, ভাল লাগছে না।

জীবনে যেন একটা ক্লান্তি এসেছে ওতে। হ্যাঁ, ক্লান্তি এসেছে। আজ দীর্ঘদিন এতেই ডুবে ছিলাম। নদীর মধ্যে কুমীর যেমন ডুবে থাকে, তেমনি করে ডুবে ছিলাম। কীর্তিহাটে মদ্যপান

করে উন্মত্ত হয়ে থাকতাম। নিষ্ঠুরতম মানুষ হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যভিচার করিনি। শিকার করেছি। মানুষকে নির্যাতন করেছি। কি করেছি সব মনেও পড়ে না। খাতাখানা উল্টে দেখছি। সাত বছর আগে সে যেদিন নিরুদ্দেশ হল, তার পরদিন লিখেছিলাম—Am I going mad ? Yes, it is madness. It is coming.

তারপর আর লিখিনি ; কলকাতা আসবার আগে রবিনসনের লক্ষ্যভ্রষ্ট এক বাঘিনীকে মেরে তাকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছিলাম, সেই ঘটনাটা লিখেছি। তারপর কলকাতায় এসেছিলাম নতুন মানুষ হতে। তখন থেকে লিখছি। কিন্তু নতুন জীবন আরম্ভ করেও পারি নি। সোফিয়াকে পেয়ে আশ্চর্য ভাল লেগেছিল। মনে পড়েছিল, দাদার বিয়ের আসরে ওর গান আধ-শোনা করে উঠে গিয়েছিলাম, তারই ডাকে। তাই মনে হয়েছিল, ওর গানই শুনব এবার যতদিন বাঁচি। কিন্তু তাতেও যেন অরুচি এসেছে। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনে নতুন স্বাদের সাধ জেগেছে। তারপর এই খবর। জগদ্ধাত্রী-বউদি দিলেন এই চিঠি। চিঠিতে বেনারসের ছাপ আছে। আর সোফিয়াকে নিয়ে মেতে থাকবার কল্পনাও ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে, সোফিয়ার অসুখ হয়ে একটা মুক্তি পেয়েছি। মদ ভাল লাগছে না। থাক, সোফিয়া কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হোক। আমি তার কথা ভাবব। আর নতুন মানুষ হবার চেষ্টা করেও দেখি! রাজাবাহাদুরকে ভাল লেগেছে।

* * *

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায়ের জীবনে সত্যই তখন একটা নতুন স্বাদের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। সোফিয়ার কথা আর ভাবেন নি। সে সেরে উঠছে। নতুন কাউকেই ডাকেন নি। ভাবছিলেন—কিভাবে শুরু করবেন নতুন জীবন।

সঙ্গে সঙ্গে কাজও যেন কেউ যুগিয়ে দিয়েছিল। যুগিয়ে দিয়েছিল জমিদারী। দিন-তিনেক পরেই কীর্তিহাটের নায়েব ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্য মহিষাদল স্টেটের কাছ থেকে ষোল আনা তৌজি পত্তনী নেওয়ার ব্যবস্থা করে তার কাগজপত্র নিয়ে এসে পৌঁছেছিলেন। পত্তনী বন্দোবস্তীর পাট্টা কবুলতি, লাট ও তৌজি দিগরের একজায় কাগজপত্র নিয়ে বোঝাই দুটো বড় প্যাঁটরা।

প্রথমটা বীরেশ্বরের ভাল লাগে নি। বলেছিলেন—ওসব আর আমি কি দেখব বলুন। আমার ওতে তো আগ্রহ রুচি বিশেষ নেই। আপনি দেখেছেন তো।

গিরীন্দ্র বলেছিলেন—না, তোমাকে একবার দেখতে হবে বইকি। দেখার প্রয়োজন আছে। পাট্টা কবুলতির বয়ানে দুটো জায়গায় আমার সঙ্গে মতের ফারাক হয়েছে। সে দুটো দেখ। আর—

অসহিষ্ণু হয়ে বীরেশ্বর প্রশ্ন করেছিলেন—কি সে দুটো?

প্রথম ওঁরা দলিলে 'দোরবস্ত হক-হুকুক' লিখেই সেরে দিতে চান, আমি বলেছি—তা হবে না, ওসব মহলওয়ারী স্বত্বের নাম যথারীতি লিখে দিতে হবে, পাতামহল, কাষ্ঠমহল, কয়লা-মহল, মৌজামহল, হাট-ঘাট-গঞ্জ, নিমকমহল আদি সহ দোরবস্ত হুকুক কথাগুলি লিখতে হবে। তা ওঁরা বলছেন—নিমকমহল তো লেখাই চলবে না, কারণ ও তো সরকারী খাস ; খালারি বন্দোবস্তি যা করেন, সে তো কোম্পানী করেন, ও কোম্পানীর একচেটে। আমি বলেছি আমরা তা স্বীকার করব কেন দলিলে। এই তো লাখরাজ নিয়ে মামলায় বর্ধমানের মহা-রাজাধিরাজ বাহাদুর প্রিভি কাউন্সিলে জিতে লাখরাজ টিকিয়ে দিলেন। কে জানে নিমকমহল নিয়ে মামলা-মোকর্দমা করলে প্রিভি কাউন্সিলের কি রায় হবে? আবার তৌল ধার্য করবার

সময় পাতামহল, কাষ্ঠমহল, কয়লামহলের আয় তার সঙ্গে যোগ করতে চাচ্ছেন। বলছেন, জঙ্গলমহলগুলোতে পাতা বন্দোবস্তিতে একশো-দেড়শো পাই ও কয়লামহলে কাঠকয়লায় আয়—তাও দেড়শো-দুশো, কাঠ থেকে আয় তো মোটা—মানে দু হাজার আদায়ী ডৌল হলে পাঁচশো টাকা। এই সবের আয় চাপাতে চাচ্ছেন। করছেন সবই ওঁদের ম্যানেজার। মানে তো বুঝতে পার। আমি বলেছি, সে অবশ্যই হবে। যেমন প্রচলন আছে—নায়েবের প্রাপ্য, গোমস্তাদির প্রাপ্য, সে তো দিতেই হবে। দেব। তা—মানে—রাঘব বোয়ালের খাঁই। আগে-ভাগেই দাও আর কি! এ তোমাকে দেখতে হবে। যেতে হবে, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে হবে। রাজাবাহাদুরের অভিমান রয়েছে, দেখলাম। মানে ওঁর ইচ্ছে, তুমি পত্তনী নিচ্ছ, তুমি ওঁদের কাছে যাবে, বলবে। এই আর কি—

বীরেশ্বর রায় এসব বোঝেন। ভাল করেই বোঝেন। জমিদারীর আয়—তিল কুড়িয়ে তাল; বাদশা-নবাবদের আমলে সে এক কাল গেছে। এই তো বলরামপুর-জানপুর থানায় খয়রারাজারা সতেরোটা পরগণায় নবাব দপ্তরে খাজনা দিত বছরে বারোশো টাকা, তাও কোন বছর দিত, কোন বছর দিত না; ইংরেজরা প্রথম এসেই গ্রাহাম সাহেবের আমলে সেই খাজনা করেছে বাইশ হাজার টাকা। তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সে খাজনা সতেরো পরগণার পাই-পয়সা আদায় জুড়ে মোট আদায়ের একশো ভাগের নব্বুই ভাগ ধার্য করেছে।

হিসেব করেছেন তাঁরই ঠাকুরদা। কি করবেন, হুকুম কোম্পানীর, আর তদারক দেওয়ান রায়রাঁইয়া সিংজীর।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নাকি লিখেছিলেন—পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, ভরসা কেবল দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ।

বর্ধমানের মহারাজা দেওয়ানবাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধে আসেন নি বলে তাঁর জমিদারীর উপর শতকরা নিরেনব্বুই টাকা কালেক্টারী খাজনা ধার্য হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত অষ্টম আইনে বর্ধমান এস্টেট বেঁচেছে। লোকে বলে বর্ধমানের মহারাজার বাঁচবার জন্যে অষ্টম আইন সৃষ্টি করেছিল কোম্পানী সরকার। শুধু বর্ধমান কেন, গোটা বাংলাদেশের রাজা জমিদারেরা বেঁচেছে পত্তনী আইনে। ইংরেজদের আমলে পাই-পয়সার কড়া হিসেব; বেনে হয়েছে রাজা। বাদশাহী আমলে যে আমীরী চলেছে, মাইফেল চলেছে, দানপত্র চলেছে, সে আজ অচল, চলতে পারে না। আজ বনে যে শালপাতা-ওয়ালারা পাতা নিয়ে শালপাতা তৈরি করে, তার উপর জমা ধার্য করতে হয়েছে জমিদারকে। বনে আগুন লেগে কাঠকয়লা হয়, স্বর্ণকারে কর্মকারে কেনে, নূনের খালারীতে লাগে, তারও জমা ধার্য হয়েছে। নদীর ঘাটের জমা, হাটের জমা, নানান জমা করে তাই থেকে আয় বাড়াতে হয়েছে এবং হবেও।

আবওয়াবও আদায় করতে হয়। আবওয়াব অবশ্য চিরকাল আছে। সে বাদশাহী নবাবী আমল থেকে। ছেলের বিয়ে, মেয়ের বিয়ে, ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা, পিতৃশ্রাদ্ধ এতে আদায় হয়, এ তাঁর মতে অন্যায় নয়। তবে মাথট, বছর বছর একটা না একটা চাঁদা, এটা অন্যায়। দক্ষিণের জমিদারদের নাম করবেন না, অন্ন জুটবে না, মুখের অন্ন বরবাদ হবে, গারদ মাথট আদায় করে নাম কিনেছেন বটে। কুমোররা হাঁড়ির জন্যে মাটি নেয়, তার জন্যে জমা আদায়টা তাঁর ভাল লাগে না। মাটি, জল। এ দুটোর উপর—না-না, ওটা ঠিক নয়।

দলিলের খসড়া দেখতে দেখতেই ভাবছিলেন তিনি। ওদিকে গিরীন্দ্র আচার্য বোল মৌজার ডৌল-জমার হিসেব, পতিতের পরিমাণ, তার মধ্যে 'রগবা' মানে আবাদযোগ্য পতিতের হিসেবের

কাগজ সাজিয়ে রাখছিলেন থাকে থাকে।

রায় দলিলের খসড়া দেখে বললে—আপনি যা বলেছেন, তাই ঠিক, ওসবের স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার। এ তো সব দলিলের বাঁধা বয়ান। এ মহল, ও মহল, হাট-ঘাট, গোলাগঞ্জ, খানা-খন্দক, খাল-বিল, দোরবস্ত হক-হকুক, ঊর্ধ্ব-অধঃ—যে যে স্বত্বে আমি স্বত্ববান, এ লিখতেই হবে। না হলে এর জন্যে পরে হাঙ্গামা হতে পারে। যে কেউ বলতে পারে, জমিদার এ রাইট দেয়নি পত্তনীদারকে। দোরবস্ত হক-হকুকের মানে তো ঠিক হয় না। পুকুর কাটাতে, কুয়ো কাটাতে না হয় লোকে জমিদারের হুকুমনামা নেয়। কিন্তু ঘুড়ি কুওড়াতে তো হুকুমনামার দরকার হয় না, কোন জমিদার তা দাবীও করে না। ওসব প্রত্যেক আইটেম লেখা থাকা উচিত। ঊর্ধ্ব শব্দ লেখা থাকলেও এসব ক্ষেত্রে তার মানে নেই। তবে নিমক-মহল সম্বন্ধে লিখতে পারেন, "সরকারী আইনগত পরিবর্তন মত জমিদারের যা প্রাপ্য সেই স্বত্ব আদি"। বুঝেছেন—তাহলে ওঁদের আপত্তির আর কিছু থাকবে না।

—সেও আমি বলেছি। যা বলবার তা বলতে ফাঁক আমি রাখিনি। তবে আসল কথা টাকা। তাও মনিবের স্বার্থে নয়। আপন আপন পেট ভরণের জন্যে। তা নইলে এতবড় রাজ-এস্টেটের এই অবস্থা হয়। খাজনা আদায়ই করে না গোমস্তারা। ওই ঘরে বসে মাইনে নেয়, যা পায় নিয়ে আসে; কিছু দেয়, কিছু ট্যাঁকবন্দী করে। বকেয়ার কাগজ দেখে না। পঞ্চাশ বছরের খাজনা বাকি চলে আসছে। অবশ্যি খাজনা কম, মুসলমান প্রজা। এছাড়া বিশ-পঁচিশ-তিরিশ বছর প্রচুর। আট বছর, দশ বছর তো হামেশা বাকি। ষোল মৌজাতে বাকির অঙ্ক দু-লাখের কাছাকাছি। সব নগদ খাজনার মহাল। উটবন্দী ফসলমুখী কাটা খামার চলনের মহাল আমি নিইনি। বলেছি ওসব চলবে না। বরং সাজা খাজনার তৌজি বেছে নিয়েছি। আদায় একটু কষ্ট বটে। তা লাঠি থাকলে আদায় বাপ্-বাপ্ বলে হবে।

বীরেশ্বর রায় বাকি জায়ের কাগজের থাক টেনে নিলেন।

আচার্য বলেই চললেন—বাবা, এই নিয়ে আমার সঙ্গে বনল না। আমাকে ছোট দেওয়ান করে নিয়ে এল, বুড়ো দেওয়ান বললেন, দেখ, অক্ষম হয়েছি, তুমি বাপু ইংরিজী-টিংরিজী জান, আর হাল-আমলের লোক, দেখেশুনে চালাও। চালাচ্ছিলাম। কাগজপত্র দেখে চক্ষু চড়কগাছ। এ কি ব্যাপার? এত বাকি? এ তো হাল আইনে সব তামাদি। চার বছর খাজনা, এক বছরের খাজনা সুদ, এই পাঁচ বছরের খাজনা ছাড়া তো সব জলে গিয়েছে। তা বুড়ো দেওয়ান বললেন, না না। তামাদি নেই। আমাদের এস্টেটে সুদও নিই না আমরা, প্রজারা তামাদিও বলে না। বলবে না। বুড়ো দেওয়ান বলেছিলেন, সে প্রাণ গেলেও বলবে না। আমি সেই দিনই বলেছিলাম, দেওয়ানজী, মুখে না হয় বলবে না, বললে না। কিন্তু বললেও না, আদায়ও দিলে না, দেনদারও মরে গেল, পাওনাদার গেল। তাহলে হলটা কি? বললেন, এর ছেলে দেবে, ওর ছেলে নেবে। বর্গী-হাঙ্গামার সময় একশো বছর আগে গোয়া থেকে কতকগুলো হারমাদ গোলন্দাজ আনা হয়েছিল, গড়ে কামান বসানো হয়েছিল, তারা বসে আছে; কি করবে, কাজকাম তো এখন নাই। তাদের জায়গা-জমি দিয়ে, গেঁয়োখালির কাছে বাস করিয়েছিলেন রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়। তারা এক গলগ্রহ, গোটা দুটো মৌজা জুড়ে বাস করছে। খাজনা না, পাত্তি না; কাজও নাই, কামও নাই। কটা-কটা চোখ, কটা-কটা রঙ। বেঁকা-বেঁকা কথা। মধ্যে মধ্যে আসে, হামলা করে, খানে দিজিয়ে। ভুখে মরছে। ধর উপাধ্যায়দের বংশই নেই। আবীরা রানী জানকীবাঈ গুরুবংশ, গর্গদের জগন্নাথ গর্গকে দিয়ে গেলেন গদী। তিনি মারা গেলেন, নাবালক ছেলে

রামনাথ গর্গকে রেখে সৎ-মা ইন্দ্রাণী তার গার্জেন ছিলেন। তারপর রামনাথ গর্গ মারা গেলেন; তিনিও নিঃসন্তান—রানী বিমলা দেবী সতী হলেন আগরপাড়ার চরে; রানী ওই সতী হবার সময়ে একটা কাগজে লিখে এই লক্ষ্মণপ্রসাদকে গদী দিয়ে গেলেন। দোষই বা কাকে দোষ। এক-এক মন্দির আছে—যার চুড়ো যতবার কর ভেঙে পড়বেই, এ এস্টেটেরও তাই। অল্পবয়সে যায়। রানী-মায়েরা পোষ্য নেন। নাবালক ছেলের গার্জেনী করেন। কাজেই বংশে মহাভয় ঢুকে আছে, এতে পাপ অর্শাবে, ওতে পাপ অর্শাবে। এ করতে নাই, ও করতে নাই। এই সুযোগে এরা এসে খেতে চাইত। হাঙ্গামার ভয় দেখাত। আর্জি নিয়ে যেত খাবার। অবিশ্যি সবাই তা নয়। জন-বিশ-পঁচিশেকের একটা দল ছিল। নদীতে ডাকাতি করত। একবার—যেবার তোমার বজরার ওপর হামলা করবার চেষ্টা করেছিল। তা পারেনি—

বীরেশ্বরের মনে পড়ে গেল। তিনি বন্দুক চালিয়েছিলেন। ভবানী বন্দুকে বারুদ ঠেসে ঠিক করে দিয়েছিল। কাগজ থেকে একবার মুখ তুললেন তিনি। তাকালেন সামনের বারান্দার দিকে।

আচার্য বলেই চলছিলেন—তোমার বন্দুকের গুলীতে একটা গোয়ান মরেছিল বোধ হয়। তাদের আমিই ও এলাকা থেকে তাড়িয়েছিলাম। হুজ্জোত কম হয়নি। তবে দুটো দল হয়ে গিয়েছিল। যারা ভাল লোক, তাদের জমিজমা দিয়ে, হাল-গরুর খরচ দিয়ে চাষীবাষী করিয়ে ওদের দিয়েই এ-বেটাদের খেদিয়েছিলাম। কোম্পানী সরকার খুব সাহায্য করেছিল। বেটারা ও-গ্রাম থেকে পালিয়ে একেবারে গাং পার হয়ে চব্বিশ পরগণার জঙ্গলে আড্ডা গেড়েছিল। এখন শুনি হিজলীর সেকালের নবাবদের বংশের এক পীরসাহেব আছেন, তিনি নাকি তাদের আশ্রয়-টাশ্রয় দিয়েছেন। বাকিরা এখন বেশ গেরস্ত হয়ে গিয়েছে। তারা বেশ ভদ্র আর এদেশী হয়ে গিয়েছে। তা আমি ওসব তৌজি নিইনি। ও—ওঁদেরই থাক।

বীরেশ্বর রায় তৌজির পর তৌজির বিবরণের কাগজ উল্টে দেখছিলেন। গিরীন্দ্র আচার্যের বাক্যস্রোতের ঝরঝর শব্দে তাঁর মন আকৃষ্ট হয়নি; মনঃসংযোগে বাধার সৃষ্টিও করতে পারেনি। কিন্তু ওই হলদীর মোহনায় তাঁর বজরার উপর গোয়ানদের হামলার কথা বলতেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। বারান্দায় বসে টানা-পাখাওয়ালাটা পাখা টানছে। চাকর মহেন্দ্র দরজার গোড়ায় বসে আছে। কথাবার্তায় মৃদু গুঞ্জন উঠছে বারান্দার কোনখানে। হুকাবরদার হাত-পা টেপার হিন্দুস্থানী খানসামাটা বোধ হয় গল্প করছে।

এদিকে বলেই চলেছেন আচার্যি ম্যানেজার, আমি থাকলে আমার পরামর্শমত চললে এ অবস্থা হত না। আমি সোজা করেও সব এনেছিলাম। তা ওই তো বললাম, একদিকে এস্টেটের কর্মচারীদের আঁতে টান পড়ল। তারা নাবালক আর পোষ্যপুত্রের আমলে চোখে ধুলো দিয়ে খাচ্ছিল, তা বন্ধ হল, পাঁচখানা করে লাগাতে লাগল। ওদিকে প্রজারাও এসে কাঁদতে লাগল। আর মালিকরা ভয় পেলেন এই তো এ বংশে পোষ্যপুত্রের পর পোষ্যপুত্র চলছে; মালিক মারা যাচ্ছে অকালে। এইসব চোখের জলে অকল্যাণ হবে; ভয়ে আমাকে বললেন—এসব চলবে না আচার্যি—না, না। প্রজার ওপর এমন কড়াকড়ি লোকে শাপশাপান্ত করছে। আমি সেই দিন জেনেছিলাম এর আর প্রশ্ন নাই—একদিন-না-একদিন—

আবার বাধা দিলেন বীরেশ্বর রায়। তিনি আবার কাগজে মন দিয়েছিলেন। এসবের একটা নেশা আছে। এ যে বোঝে তার মন মিষ্টান্নের ওপর মক্ষিকার মত বসলে নড়ে না।

তাড়িয়ে দিলেও উড়ে আবার একটা পাক দিয়ে এসে বসে যায়। বীরেশ্বরের মনও ওই মক্ষিকার মত জমিদারী বিবরণের মিষ্টান্নের উপর আবার এসে জমে গিয়েছিল। একখানা মৌজার বিবরণের পাতা উল্টে পরের পাতায়—মাথায় মৌজার নামটা দেখেই বললেন মৌজা বীরপুর! মণ্ডলান তৌজি!

আচার্য সোজা হয়ে বসলেন। নিজের পায়ের উপর নিজে হাত বুলিয়ে একটু দুলতে দুলতে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ বাবা, মণ্ডলান তৌজি। মণ্ডল গোপাল সিং। ও আমি যেচে নিয়েছি বাবা। কত্তার সামনে চেয়ারে বসে সেই "আমরা ছত্তিরি রায়বাবু" বলে মোচপাকানো আমার মনে আছে। ওর সঙ্গে সে আমলে মামলা করে জিতে আমার মনের সুখটা হয়নি। এবার ওর সঙ্গে একবার পাঞ্জা লড়ব।

কথাটা মনে পড়ল বীরেশ্বর রায়ের। তিনি শুনেছিলেন, ব্যাপারটা তাঁর সামনে ঘটেনি। বীরপুর মৌজার পাশেই রায়দের গগনপুর লাটের এলাকা। দুই এলাকার মাঝে একটা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের যে অংশটা রায়বাবুদের, সেই অংশ থেকে গোপাল সিংয়ের লোকেরা কখনও জবরদস্তি, কখনও চুরি করে কাঠ কেটে নিয়ে যেত। মহিষাদল এস্টেটের মণ্ডলান তৌজি বীরপুর। মণ্ডল গোপাল সিং, জাতিতে সে ছত্রি, এককালে পাইকদের সর্দার ছিল, মণ্ডলান আদায় যেখানে, সেখানে জমিদারের সঙ্গে জমিদারীর সম্পর্কে বলতে গেলে না-সম্পর্ক। জমিদার তৌজির খাজনা পায় মণ্ডলের কাছে। বছর বছর বন্দোবস্ত কোথাও। কোথাও দু'-চার বছর অন্তর। মণ্ডল ব্যক্তিটিই সর্বেসর্বা। সে তৌজির খাজনা জমিদারকে দিয়ে জমিজমা ইচ্ছেমত প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে। যাকে ইচ্ছে হয় তাকে জমি দেয়। ইচ্ছে হলে উৎখাত করে। মোট কথা, আইন অনুসারে স্বত্বের জোরে জমিদার না হয়েও সেই জমিদার তৌজি একবার মণ্ডলান আদায় বন্দোবস্ত করলে, আর সে মণ্ডলকে উচ্ছেদ করা খুব কঠিন। মহিষাদল এস্টেটে কথাটা জানানো হয়েছিল। সোমেশ্বর রায় লোক পাঠিয়েছিলেন। দুই এস্টেটে কোন মনোমালিন্য ছিল না। মহিষাদল চিঠির উত্তরে গোপাল সিংকে পাঠিয়েছিলেন সোমেশ্বর রায়ের কাছে।

সোমেশ্বর রায় কাছারী-ঘরে বসেছিলেন। তিনি বসতেন ছোট একটা চৌকিতে কার্পেট-বিছানো গদীতে। পিছনে থাকত মোটা মখমলের তাকিয়া। সামনে একপাশে থাকত খানকয়েক চেয়ার-কুর্সী। অন্যদিকে থাকত একটু নিচু তক্তায় সতরঞ্চির উপর চাদর। ওর উপর বসতেন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি সদগৃহস্থ প্রজারা। সাধারণ প্রজাদের জন্য মেঝের উপর মাদুর-কম্বল বিছানো থাকত। কুর্সীর ব্যবস্থা ছিল বিশেষ লোকের জন্য। যেমন মিয়া মোকাদেম কিম্বা দারোগা বা আদালতের নাজির-টাজির। নানান কাজে এঁদের আসতে হত। মধ্যে মধ্যে বুড়ো রবিনসন এবং পাদরী হিলসাহেব এলে বসত। আর একদিকে একটা চৌকিতে বসত নায়েব-ম্যানেজার।

গোপাল সিং দেখা করতে এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্তে রায়বাবু বলে সটান গিয়ে ওই একখানা কুর্সীতে চেপে বসেছিল।

সোমেশ্বর রায় অবশ্যই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু নিজে মুখে কিছু বলেননি। বলেছিল আচার্য ম্যানেজার, ওসব কুর্সী সাহেব-সুবা দারোগা-নাজীরের জন্যে গোপাল সিং। মণ্ডল প্রজার জন্যে নয়। ওই—ওই—

তিনি দেখাতে গিয়েছিলেন, মেঝের উপর বিছানো সতরঞ্জি-কম্বলের বিছানা, কিন্তু সোমেশ্বর রায় ভদ্রতা করে বলেছিলেন, এই যে তক্তাপোশের উপর ফরাস রয়েছে সিং এইখানে বস।

গোপাল সিং বলেছিল, আমি ছত্রি রায়বাবু। বাংগালী নই। এককালে আমার দাদো ছিল মনসবদার। দারোগা-নাজীর লোকের চেয়ে ছোট আছি না। বেশ বসেছি আমি। বলেন—কিসের লেগে তলব!

সোমেশ্বর রায় বলেছিলেন, আগে জল খাও গোপাল, তারপর হবে কথা। তাড়াতাড়ি কিসের? আচার্য, সিংকে জল খাওয়াও।

জল খেয়ে গোপাল এসে বলেছিল, এখন বলেন কি কথা?

সোমেশ্বর বলেছিলেন, আমি তো তোমাকে তলব পাঠাইনি গোপাল। তুমিই বলবে কথা কি।

—আমার রাজাসাহেব বললেন, কীর্তিহাটের রায়বাবুর কিসব কথাবার্তা আছে, তুমি যাও গোপাল সিং শুনে এস। ফয়সালা করে এস।

—কথাবার্তা বীরপুর সীমানার জঙ্গল নিয়ে। তা তুমি তো মণ্ডল—তা নিয়ে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কি? সে রাজাবাহাদুরের এস্টেটের সঙ্গে। হবে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা।

—তবে সেই করবেন। সেই ভালো। তারপর হেসে বলেছিল, এক কাজ করেন রায়বাবু, বীরপুরের সীমানা নিয়ে গোল লাগছে আপনার গগনপুরের সীমানার। গগনপুরে আমাকে একটা আপনার খাস জোত দিয়ে দেন। হাঁ, সেলামী কিছু দিব। আর গগনপুর ওই বীরপুরের মতুন আমাকে মণ্ডলান বন্দোবস্ত করুন। সব মিটে যাবে বাবা। কুনো গোল থাকবে না।

আচার্য রুখে উঠেছিলেন। কিন্তু সোমেশ্বর রায় ইঙ্গিতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর আরম্ভ হয়েছিল মামলাপর্ব। মহিষাদলের সঙ্গে নয়। চুরি, রাহাজানি, চার্জ দিয়ে বীরপুরের যারা গোপাল সিংয়ের চ্যালাচামুণ্ডা, তাদের উপর নালিশ। মামলার পর মামলা, পাঁচ বছর মামলা চলার পর গোপাল একটা মিটমাট করেছিল। তাও মহিষাদলের রাজাবাহাদুরের অনুরোধে মিটমাট করেছিলেন সোমেশ্বর রায়।

বীরেশ্বর রায়ও সোজা হয়ে বসলেন। সমস্ত বিষয়-ব্যাপারটা মিষ্টান্নের উপর গোলাপজলের ছড়া দেওয়াতে সৌরভযুক্ত বা লবণাক্ত ব্যঞ্জনে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটা দেওয়ার মত ঈষৎ ঝাল হয়ে অধিক মুখরোচক হয়ে উঠল। বললেন, ভাল করেছেন। প্রয়োজন ছিল। এটা অবহেলা করে এসেছি আমরা। বাবা তো এরপর বেশী দিন বেঁচে ছিলেন না। যে কিছুদিন ছিলেন, তখন তাঁর জামাতা দেখাশুনা করেছে। আমি তখন কলকাতায়। তারপর আমি হাতে নিয়েছি সম্পত্তি, অবহেলা আমারই বলতে হলে। ভাল করেছেন।

—নিশ্চয়। তোমরা ভুললে আমি ভুলব কেন? যে চেয়ারখানায় বসেছিল, সেখানা আমার চিহ্নিত করা আছে বাবা। আমি ওকে হাঁটু ভাঙিয়ে ঘোড়ার মত বসাব, বসিয়ে পিঠের ওপর চেয়ারখানা লাগাব, আর চেয়ারের ওপর একমুণে একটা পাথর চাপিয়ে দেব। তার ওপর একটা বাঁদর। হাঁ, যখন বীরপুর বাছাই করি, তখন থেকে ভেবে ভেবে আমি কি করব তা ঠিক করে রেখেছি।

তারপর বললেন, শুধু বীরপুর নয়, পাতা উল্টাও, দেখ, শালমুঠা-আঁচলপাড়াও বেচেছি। ভুবন মাইতি আমাদের এলাকা থেকে উঠে গিয়েছে, সব বিক্রি করে বলে গিয়েছে—রায়বাবুদিগে খাজনা আমি দোব না। আর সর্বানন্দ ঘোষ উঠে গিয়ে বাস করছে আঁচল-পাড়ায়। তোমার আমলেই একটা ফৌজদারী মামলায় আমাদের চাপরাসীর জরিমানা করিয়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। এ দুজনের সঙ্গেও মোকাবেলা হবে, দেখা যাবে এরপর কোথা বাস

বাছাধনেরা!

একটু হাসলেন বীরেশ্বর রায়। ও দুজনের ব্যাপার সামান্য। বলতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু আচার্য তা ভোলেননি। রায় কাগজ উল্টে গেলেন।

এরই মধ্যে অত্যন্ত করুণ বিনীত ভঙ্গীতে এসে দাঁড়িয়েছিল মহেন্দ্র চাকর। কিছু নিবেদন আছে তার।

রায় মুখ তুলে প্রশ্ন করেছিলেন—কি?

—আজ্ঞে ম্যানেজারবাবুর খাবার—।

—এর মধ্যে খাব কি রে?—বলেছিলেন আচার্য। তারপরই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আরে বাবা, এ যে বারোটা বাজে। ওঃ! একেবারে বুঝতেই পারি নাই, রাত হয়েছে। তাহলে আজ উঠি বাবা। কাল আবার হবে। ওঃ, তোমার সব ব্যাঘাত করে দিলাম।—বলে তিনি উঠে পড়লেন।

ব্যাঘাত করে দিলাম অর্থে মদ্যপানের কথা বলেছেন আচার্য। কিন্তু মদ্যপান আজ ক'দিনই তিনি করেননি।

তারপর একনাগাড়ে এই দেড় মাসের উপর সময়টা তিনি বিষয় নিয়েই আছেন। বিষয়ী ঘরের ছেলের বিষয়ে যে স্বাভাবিক প্রীতি ও আসক্তি, তা সুযোগ পেয়ে জিহ্বা বিস্তার করে জেগে উঠেছে। তৌল কষেছেন, পতিতের হিসেব করেছেন, কোথায় নদীতে বাঁধ দিতে হবে, কোথায় কয়েকটা বাঁধ কাটাতে হবে, তাতে কত পতিত আবাদ হবে এবং এই ডৌল জমার উপর কত বৃদ্ধি কোথায় সম্ভবপর হবে—এই নিয়ে মস্ত একখানা খাতা তৈরী করে ফেলেছেন। দলিল নিয়ে রাজাসাহেবের কলকাতায় অ্যাটর্নীর বাড়ী গিয়েছেন। নিজের অ্যাটর্নীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন—পত্তনী মৌজাগুলি নিয়ে আয়বৃদ্ধির পথ আবিষ্কার করেছেন।

ষোলখানা পত্তনী মৌজার ডৌল কুড়ি হাজার পাঁচশো বাইশ টাকা এগার আনা দশ গণ্ডা। সরকারী রেভেন্যু আঠারো হাজার টাকা পাঁচ আনা দশ গণ্ডা। সরঞ্জামী অর্থাৎ আদায় খরচা শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে পাঁচশো দশ টাকা। লাভ ছেড়ে দিতে চেয়েছেন নিট মুনাফার শতকরা পঁচিশ টাকা। এই লাভের টাকার উপর দশগুণ টাকা সেলামী ধার্য হয়েছে অর্থাৎ ষোলআনা মৌজায় রেভেন্যু এবং জমিদারের মুনাকা বাদ দিয়ে লাভ থাকবে পাঁচশো টাকা। তা হোক। আচার্যের সঙ্গে পরামর্শ করে যে মতলব করেছেন বীরেশ্বর রায়, তাতে এই পাঁচশো টাকা লাভ আগামী বছরের মধ্যে পাঁচ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। কুড়ি হাজার পাঁচশো টাকা আদায়ের উপর টাকায় সিকি বৃদ্ধি করলেই পাঁচ হাজার টাকা বাড়বে। এর সঙ্গে পাতা, কাঠকয়লা কাঠমহলের জমা আছে। ষোলখানা গ্রামের চারখানাতে হাট আছে এবং ছয়টা খেয়াঘাট আছে। তাতেও সমস্ত জুড়ে পাঁচশো থেকে হাজার টাকা আয় বাড়বে। এসব জমা মহিষাদল এস্টেট আদায় করতেন না। গোমস্তারাই কিছু কিছু নিয়ে বিলি-ব্যবস্থা করত এবং তারাই আত্মসাৎ করত। এরপর আছে পতিত আবাদ। সেদিক দিয়ে কয়েকখানা তৌজিতে অনেক সম্ভাবনা আছে। এ-কাজ রায়দের এস্টেটে অনেক হয়েছে এর আগে। গিরীন্দ্র আচার্য এতে খুব করিত-কর্মা লোক। নদীর ধারের পতিত হলে, নদীর ধার-বরাবর বাঁধ টেনে দিয়ে এদেশী মজুর, খেটেখাওয়া লোকদের ডেকে বসাবে চার বছর, পাঁচ বছর পর খাজনা ধার্য হবে, তখন প্রথম দু বছর আধা খাজনা লাগবে, তারপর পুরো খাজনা দেবে। এদিক দিয়েও দশ বছরের মধ্যে আরও সাত-আট হাজার টাকা আয় বাড়বে ষোল মৌজায়। সুতরাং রায়বাড়ীর আয় তখন ষোল মৌজায়

দশ হাজারে দাঁড়াবে।

এর মধ্যে সবই কিছু বিনা বাধায় হবে না। বাধা পড়বে। গোপাল সিংহ আছে ; এবং প্রায় প্রত্যেক মৌজাতেই দু-একজন করে ছোটখাটো গোপাল আছে ; সে সিংহ না হোক, নেকড়ে বা দুষ্ট শেয়ালও হতে পারে। তাছাড়া, আচার্য বললেন—গাঁয়ে নতুন মানুষ দেখলেই দু-চারটে কুকুর লাগে ও তাদের দুমুঠো মুড়ি, দুটো পাঁঠা কাটলে আটটা টেংরী হয়, ছুঁড়ে দিলে তারা পোষ মেনে যাবে। তখন আমরা যার ওপর লেলিয়ে দোব, তাদের ওপরেই লাগবে। তবে গোপালের সঙ্গে হবে। তা হোক। লাঠির পথ গোপালের, আমাদের পথ মামলার চরকীপাকের। ছ' মাসের মধ্যে বারদশেক সদর হাঁটতে হলেই জিব বেরিয়ে যাবে। সরকারী দপ্তরে ওর নামে দাগও আছে। পাইক হাঙ্গামার সময় উনি ছিলেন, চুয়াড়দের পিছনেও ছিলেন, সেসব থানাতে আছে।

রায় একমনে ভাবছিলেন—ভেবে বলেছিলেন, আমি আর একটা পথের কথা ভাবছি। কিছু টাকা খরচ হবে। মৌজায় মৌজায় এক-একটা দেবস্থল আছে। সেগুলো জমিদারী স্বত্বের অন্তর্গত। সেখানে ঘরটা মেরামত করানো, কিছু সংস্কার ; আর কি গ্রামে সরকারী পুকুর যা আছে, তার মধ্যে ভাল যেটি, সেটিকে ভাল করে কাটিয়ে দেওয়া। এতে লোকে খুশী হবে। আর কীর্তিহাটে একটা বাংলা ইস্কুল। ওটার কথা বলতে গেলে এই সব কাজের মধ্যে মনেই পড়েনি। ওটাকে আমি করে ফেলতে চাই।

—দাঁড়াও বাবা। এই কাজটি হয়ে যাক। মা-লক্ষ্মী আসবার কথা, তিনি আগে আসুন, ঘরে ঢুকুন। তারপর মা-সরস্বতীর পাটন হবে। মনে যখন করেছ, তখন হবে বৈকি। তুমি কীর্তিহাটের রায় এস্টেটের মালিক, তুমি মনে করেছ যখন তখন হতেই হবে। একটা কেন, ইচ্ছে করলে পাঁচটা হতে পারে। সেই তো আমাদের মনের খেদ বাবা বীরেশ্বর। তোমার এমন বিষয়বুদ্ধি। তুমি এমন ইংরিজী বল। এই তোমার রাজপুত্রের মত চেহারা, তুমি একটা ধাক্কাতে সবকিছু ছেড়ে—।

চুপ করে গেলেন। তারপর কথা খুঁজে নিয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, জমিদার, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, গান-বাজনা, বাঈ—এসব তোমরা না করলে করবে কে ? বলতে গেলে তো ওরা তোমাদের দয়াতেই বাঁচে। আর ওসব হল শোভা। নাহলে মানায়ও না। তারপর দুটো-তিনটে বিয়ে এ তো সাধারণ লোকে করে গো। তা ওই যে বউমা গেলেন, আর তুমি সব ছেড়ে বিবাগী হয়ে কলকাতায় এসে সব ছেড়েছুড়ে—। না, না। এ চলবে না বাবা। সোফিয়াবিবি আছে থাকুক। বাগানবাড়ী কর। সেখানে রাখ। আর তুমি বিয়ে কর। এতবড় বংশ, বংশধর চাই। ভায়েতে সব পাবে, এটা—। মানে আমাদেরও ভাল লাগে না।

রায় সজাগ হয়ে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ। এবার ভেবেছি এমনভাবে আর না। হ্যাঁ, কাজকর্ম নিয়েই থাকব। আপনি কাগজপত্র নিয়ে রাজাবাহাদুরের কাছে চলে যান। সব পাকা করে দলিলপত্র শেষ করে ফেলুন।

বলে বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন।

ইচ্ছে হয়েছিল এক মাসের উপর হয়ে গেল গান-বাজনা করেননি, আজ সোফিকে ডেকে শেষ গান-বাজনা করে ওকে বিদায় দেবেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডেকেছিলেন—মহেন্দ্র।

—আজ্ঞে। মহেন্দ্র চব্বিশ ঘণ্টাই হাজির থাকে কয়েক হাতের মধ্যে।

লোক পাঠিয়ে দে সোফির ওখানে। বলবে—আজ একবার আসতেই হবে। মনটা বড় চঞ্চল করে দিয়ে গেল আচার্য। অন্তরে পশুর ক্ষোভ জেগে উঠছে!

লোক গিয়ে ফিরে এসেছিল, সোফির সারেঙ্গীদারকে নিয়ে। সে সেলাম বাজিয়ে বলেছিল, বাঈয়ের তবিয়ৎ এখনও পুরা ঠিক হয়নি হুজুর। মাফি মেঙেছে সে।

—কি হচ্ছে তার?

—বহুৎ দুব্‌লা আছে হুজুর।

—চিকিৎসা করাচ্ছে?

—হাঁ। ওই ফকিরসাব দাওয়াই দিচ্ছেন, আওর ঝাড়ফুঁক করেন। তাবিজ ভি দিলেন।

—ফকির? ওই পাগ্‌লাবাবা?

—হাঁ হুজুর।

—সে ওখানে আসে নাকি?

—হাঁ, আসে।

কথাটা শুনে মনে বড় ভাল লেগেছিল বীরেশ্বরের। তারপর এই পাঁচ-ছ দিন পর পর লোক পাঠালেন। সকলে বললে বাঈয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি। বারান্দায় ঝুঁকে তার মা বলেছে—তার তবিয়ৎ ঠিক নেই। শেষ দিন মহাবীর সিংও এসে তাই বললে, সঙ্গে সঙ্গে বললে, বাঈসাহেবা গানা-বাজনা করছেন।

কেমন একটা খটকা লেগে গেল। মহাবীর সিংকে জেরা করে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলে ফেলেছিল, হুঁয়াকা বাজারমে তো লোক বোল রহা হ্যায়—

—কি? কেয়া বোল রহা হ্যায়? অঁা?

—বোল রহা কি—ওই সাধুবাবা বাঈকে গানা শিখাচ্ছেন। বাঈ তো ভাল আছে। আওর—

—আওর কি? বলো! চুপ কাহে? বলো!

—হুজুর, উ লোক বোল রহা হ্যায় কি উ সাধু তো মুসলমান বন গিয়া।

—মুসলমান বন গিয়া?

—হাঁ, হুঁয়াই খাতা হ্যায়, পিতা হ্যায়—

—আরে না। উ লোক খানেপিনে মে কুছ হরজা নেহি হোতা বাবা।

মহাবীর এবার নিজেই বললে—নেহি হুজুর, উ লোক বোলতা কি—সাধু ফকির ভি নেহি হ্যায়। ছোড় দিয়া। উস্তাদকে মাফিক পুষাক পিহিন তা। আওর বাঈকি নিকা করেগা।—

—বাঈকি নিকা করেগা?

—হ্যাঁ, কোই বোল্‌তা সোফি বাঈকি সাথ, কোঁই কোই বোলতা, নেহি উনকি মাইকি সাথ।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বীরেশ্বর রায়।—এও সম্ভব?

তিনি মহাবীরকে বলেছিলেন, যাও। ম্যানেজারবাবুকে ভেজো।

ঘোষ আসতেই বলেছিলেন, সোফিয়ার বাড়ী একবার যেতে হবে তোমাকে। মহাবীর কি বলছে শুনে নাও। তদন্ত করে এস আসল ব্যাপারটা কি! সঙ্গে লোক নিয়ে যাও।

"ধর্মের মধ্যে অধর্ম লুকিয়ে থাকে, ন্যায়ের মধ্যে অন্যায় আছে, পুণ্যের মধ্যে পাপের বাসা আছে, লক্ষ্মীর ছায়ার আড়ালে আড়ালে অলক্ষ্মী! মানুষের মধ্যে অমানুষ—যার আসল রূপ

পশুর। হবে না কেন! মানুষ যে জন্তু।"

সুলতা হেসে বললে—বেশ তো বীরেশ্বর রায়ের কথা বলছিলে সুরেশ্বর, হঠাৎ দার্শনিকতা শুরু করলে কেন?

সুরেশ্বর বললে—কথাগুলো বীরেশ্বর রায়েরই সুলতা। আমার নয়। তবে ওঁর কথা সত্য। খাঁটি সত্য। তাই তোমার মনে হচ্ছে আমি দার্শনিকতা শুরু করেছি আমার জবানবন্দীর সমর্থনে। তবে আর্টিস্ট আমার কাছে তো বাস্তব জগতে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। কারণ লাইট আর শেড এ দুটো পাশাপাশি না থাকলে কোন ছবিই প্রাণ পায় না। ছবি ছবিই থেকে যায়। তাই কথাগুলো মুখস্থ হয়ে আছে। বীরেশ্বর রায় বোধ হয় কথাগুলি সেদিন সেই মুহূর্তেই লিখেছিলেন। নায়েব ম্যানেজার ঘোষকে নিজে দেখে তদন্ত করতে পাঠিয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন রাগে এবং আক্রোশে।

"সাধুরা পাথরের দেবতা খাড়া ক'রে মহান্ত হয়ে বসে, তাদের ভোগ রাজভোগ, বিলাস রাজার চেয়েও বেশী। তান্ত্রিকের ভৈরবী থাকে। কুলবধূকে স্বর্গের লোভ দেখিয়ে বের ক'রে নিয়ে যায়। বৈষ্ণবদের সেবাদাসী থাকে। আমার জমিদারী থেকে এদের আমি চাবুক মেরে বের করব। আর, ম্যানেজার ফিরে আসুক, তার কাছে জানি সে কি বলে, তারপর আমি নিজে যাব এবং এ যদি সত্য হয় তবে ওই পাগল পিশাচকে আমি খুন করব। কিছু অবিশ্বাস নেই। এরা তান্ত্রিক, অনেকে বলে মড়ার মাংস খায়। সাধনার জন্যে নরবলি দেয়, বামা-চারীরা মেয়ে নিয়ে সাধনা করে। সাধনা না ছাই। কুৎসিত ব্যভিচার। সত্য হলে আমি খুন করব।"

"সে পরিত্রাণ পেয়েছে আমার হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু এ পাবে না। না। না।

নায়েব ঘোষ ফিরে এল। তার গলা পাচ্ছি।"

* * *

এরপর সুলেখা, বীরেশ্বর রায়ের লেখা এলোমেলো। বোধ হয় রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। লিখেছেন—"লোকটা একটা কাউয়ার্ড। কথা বলতে পারছে না, মাথা চুলকোচ্ছে, ভয়ে যেন কেমন হয়ে গেছে। কেবল বলছে তান্ত্রিকদের কাণ্ড। তান্ত্রিকদের কাণ্ড। আমি কিল মারলাম, ধমক দিলাম, আমার হাতের কিলের ঘায়ে তেপয়ার মাথাটা ভেঙে গেল। পিশাচ পশু। অ্যাণ্ড ছাট বিচ। বিশ হাজার টাকা। তারও বেশী। হিসেব নেই। দু বছরে—। তার ছবির সামনে বসে তাকে আমি দেখিয়ে ভালবেসেছি।"

সুরেশ্বর বললে—আমি তার থেকে অনেক কষ্টে সবটা বুঝেছি।

নায়েব এসে বলতে পারে নি; তার সঙ্কোচ হয়েছিল, হয়তো ভয় হয়েছিল, যা দেখেছে তা বলতে।

মাথা চুলকে বলেছিল—আজ্ঞে হুজুর, ওঁরা তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ ওঁদের কাণ্ড তো। মানে বোঝা—কি ক'রে বলব—

বীরেশ্বর রায় সামনের তেপয়টার উপর দুরন্ত ক্রোধে একটা কিল মেরেছিলেন, তেপয়ার টপটা ফেটে গিয়েছিল।

ধমক দিয়ে বলেছিলেন—কি ক'রে বলবে? যেমন ক'রে মানুষে কথা বলে তেমনি ক'রে

বলবে। যা দেখেছ তাই বলবে। তোমার কাছে কোন ব্যাখ্যা শুনতে আমি চাইনি!

নায়েব ম্যানেজার ঘোষ কোনরকমে বলেছিল—আজ্ঞে মহাবীর যা শুনে এসেছে—

—হ্যাঁ। কি? তাই সত্যি?

—আজ্ঞে দেখে তো তাই লাগে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে সামনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, বোধ হয় কি করবেন ভেবে নিলেন বীরেশ্বর রায়। তারপর বললেন—হুঁ। যাও তুমি।

আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—মহাবীর! আব্দুলকে গাড়ী তৈয়ার করতে বলো। তুমি তৈয়ার থাকো। বলেই ঘরের দিকে ফিরলেন কিন্তু আবার ফিরে এসে বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে বললেন—সুখদেও পাহলওয়ানকে সাথমে লেনা। হাতিয়ারবন্ধ হোকে যানা। বলেই ভিতরে ঢুকে মহেন্দ্র চাকরকে বললেন—বোতল গ্লাস আন। আর জুতো দে।

তাঁর সেই শখ করে কেনা কালো ঘোড়া দুটোর জুড়িতে উঠতে উঠতে হুকুম করেছিলেন—বহুবাজার। সোফিয়া বাঈয়ের মোকাম। জলদি!

সুরেশ্বর বললে—সেকালে চাকরকে মনিবের মেজাজটা আগে বুঝতে হ'ত। যে বুঝত সেই থেকে যেত হয়তো গোটা জীবন। না-হলে দুদিন পর জবাব হয়ে যেত। কোনরকমে চাকরি টেঁকলেও একপাশে পড়ে থাকত। আবদুল মহাবীর সুখদেও এরা ছিল বীরেশ্বর রায়ের পেয়ারের লোক। মেজাজ বুঝত এবং সেই মেজাজ যা চাইত তা করতে তারা দ্বিধা করত না। আবদুল সেই তেজী কালো ঘোড়া দুটোর লাগাম একবার টেনে ধরেই ঢিল দিয়ে ইশারা দিয়েছিল—'জোর সে বেটা লোক।' এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাবুকের দড়িটা শূন্যে শিস্ দিয়ে উঠেছিল হাওয়া কেটে।

তখন কলকাতা এ কলকাতা নয়। চৌরিঙ্গীর ওদিকটায় এবং সাহেবদের এলাকায় রাস্তা পাকা এবং সমতল হলেও দেশী লোকের বসবাসের অঞ্চলে রাস্তা অসমান, খানাখন্দে ভরা—ধুলো ওড়ে। সঙ্কীর্ণ রাস্তা, দুপাশে গলি আর ঘুঁচি। খোলার চালের বস্তি। মাঝে মাঝে পাকা বাড়ী। তাও পুরনো।

সন্ধ্যার মুখ, সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলোতে অন্ধকার জমেছে, পাশের দোকানের বড় কুপীগুলোতে দুটো নলের মুখে দুটো ক'রে ধোঁয়াটে লালচে আলোর শিখা জ্বলছে। ধুলোয় ধোঁয়ায় যেন কুয়াশার মত জমেছে। কিন্তু মনিবের হুকুমে আবদুলের হাতে কালো জুড়িগাড়ীর চাকা লোহার হালে ঘর্ঘর শব্দ তুলে প্রচণ্ড জোরে ছুটে চলেছিল। ধর্মতলার পর উত্তরমুখে, পুরানো কসাইটোলা—হালের বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট—ধরে লালবাজারে মোড় ফিরে বউবাজার পৌঁছতে ওই কালো জুড়ির দেরী হয় নি। রাস্তার লোকেরা সভয়ে দুপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। সহিস দুটো তফাৎ—তফাৎ—হুঁশিয়ার—শব্দ ক'রে ঘোড়ারও আগে আগে ছুটেছিল। আবদুল কোচবক্সে বসে অসতর্ক পথচারীদের দু'চার ঘা চাবুকও মেরেছিল! বউবাজার পৌঁছতে দেরী হয় নি। তবুও বারদুয়েক বীরেশ্বর তাগিদ দিয়েছিলেন—আ-বদুল।

সোফিয়া বাঈয়ের বাড়ীখানা কাঠের রেলিং, কাঠের খুঁটি দেওয়া বারান্দাওয়ালা- বাড়ী। একটু আগেই ফিরিঙ্গী কালীর স্থান। তখন সেখানে ত হচ্ছে। দেশী ক্রীশ্চান ফিরিঙ্গীরা দাঁড়িয়ে আছে। বেশ একটা ভিড় জমেছে

গাড়ীখানা থামতেই রায় গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন

পুরনো আমলের ধাঁচের বাড়ী। মল্লিকবাবুদের ভাড়াখাটানোর বাড়ী। বাড়ীটার উপরে উঠবার সিঁড়ি ঠিক মাঝখানে। রাস্তার উপরে দরজার মুখ থেকে সোজা খাড়া উঠে গেছে উপরে। একেবারে মাথায় খানিকটা প্রশস্ত জায়গা।

রায় মহাবীর সিং এবং সুখদেও পাহলওয়ান'কে দরজায় রেখে বললেন—কোইকো ঘুসনে নেহি দেনা!

উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি উপরে উঠে চলে গেলেন। দু-তিনটে সিঁড়ি উঠেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মৃদুকণ্ঠের গান ভেসে আসছে। কালোয়াতি উচ্চাঙ্গের গান নয়, সাদা সরল সুরের বাংলা গান। কণ্ঠস্বর চেনা; গাইছে ওই পাগল। সেই মাঠে যেমন শুনেছেন তেমনি। না, বোধহয় তার থেকেও প্রাণের রসে মাখামাখি।

চেনা তোকে হল নাক—
জানা তোকে হ'ল না।
বারে বারে দিলি দেখা
ক'রে গেলি ছলনা।
মোহিনী অধরে হাসি—
দেখে কাছে ছুটে আসি
দেখি ভীমা এলোকেশী—
উন্মাদিনী ললনা
চেনা—তোকে হল না—
জা—না—তোকে হল না।

অস্থির পদক্ষেপ তাঁর ধীর হয়ে গেল। ধীর পদক্ষেপে উঠে গেলেন তিনি। উপরে সিঁড়ির মাথায় প্রশস্ত জায়গাটায় ঘরের দরজার মুখে দাঁড়ালেন। যা দেখলেন তাতে তাঁর মুহূর্ত-পূর্বের ধীরতা কোথায় চলে গেল। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

মহাবীরের শোনা কথা, ম্যানেজার ঘোষের কথা শুনেও এ তিনি কল্পনা করতে পারেন নি।

একটা পুরু গদীর উপর মখমল বিছিয়ে, পিছন দিকে একটা সাটিনে মোড়া তাকিয়া রেখে, পাগল সামনে একটা নিচু চৌকীর উপর পা রেখে বসে আছে আমীর ওমরাহের মত। তার গায়ে গেরুয়া রঙের দামী মলমলের আলখাল্লা, মাথার চুলে তেল পড়েছে, খুসবু তেলের গন্ধ উঠছে। দাড়ি গোঁফ তাও পরিচ্ছন্ন। পাগলের পায়ের উপর হাত রেখে বসে আছে সোফিয়া। সোফিয়ার চিবুকটি বাঁ হাতে তুলে ধরে পাগল একটু ঝুঁকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে, চোখের দৃষ্টিতে যেন প্রদীপের শিখার মত কিছু জ্বলছে। ওই দেখতে দেখতেই গান গাইছে।

পাগলের পিছনে দাঁড়িয়ে একটা বাঁদী। তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করছে। সোফিয়ার মা পাশে ব'সে তানপুরায় সুর দিচ্ছিল, পাশে একটা তেপয়ের উপর ধূপদানিতে গুগ্‌গুল লাবান পুড়ছে।

সোফিয়ার বেশভূষা আরও বিস্মিত করেছিল রায়কে। সোফিয়ার পরনে হিন্দুস্থানী হিন্দু মেয়ের পোশাক। গায়ের কাঁচুলীর উপর শাড়ী, তাও বাংলাদেশের সাদা জমি লালপেড়ে শাড়ী। চুল তার এলো হয়ে পিঠের উপর পড়ে আছে।

*　　　*　　　*

বীরেশ্বর রায়কে দেখেই সোফিয়ার মায়ের মুখ পাংশু বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। হাতের তানপুরায় সুর দেওয়া আঙুলটা আপনিই থেমে গিয়েছিল। সে-ই শুধু তাকে দেখেছিল। সে-ই বসে ছিল দরজার দিকে মুখ ক'রে। সোফিয়া বসেছিল প্রায় পিছন ফিরে পাগলের দিকে তাকিয়ে। বাঁদীরা সম্পূর্ণ পিছন ফিরে ছিল। দেখতে পাওয়া আর একজনের উচিত ছিল, সে পাগলের কিন্তু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সোফিয়ার মুখের দিকে। কোন শব্দ কোন গন্ধ হয়তো বা কোন অনুভব বশেই তার দৃষ্টি সোফিয়ার মুখ থেকে সরিয়ে নেওয়া বা ফেরানো অসম্ভব ছিল। মগ্ন হয়ে গেছে লোকটা। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে একটা আশ্চর্য মোহে। এমন ক'রে রূপ দেখা বীরেশ্বর কল্পনা করতে পারেন না। শুধু পাগলই বা কেন, সোফিয়াও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। পিছন দিক থেকে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে নিস্পন্দ স্থির। চোখ তার নিস্পলক হয়ে গেছে।

সোফির মা তানপুরাটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজার সামনে প্রায় পথ আটকে দাঁড়াল এবং হাতজোড় করেই বললে—রায়বাবু সাব! এর মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। আপনি ফিরে যান। মাফ করুন।

এতক্ষণে চমক ভাঙল বীরেশ্বরের। তিনি এবার তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং বললেন—বহুৎ আচ্ছা!

এবার সোফিয়ার মোহগ্রস্ততা ভাঙল। সে চমকে উঠে মুখ ফেরাল এবং বীরেশ্বর রায়কে সামনে দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। পাগলও এবার চঞ্চল হয়ে দৃষ্টি ফেরালে। তার হাত থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে সোফিয়া। চোখের সম্মুখ থেকে সোফির মুখ সরে যাওয়াতে সে অধীর চঞ্চল হয়ে সোফি যেদিকে তাকিয়েছে সেদিকে তাকিয়ে রায়বাবুকে দেখে তারই দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু এতটুকু ভয় ছিল না তার দৃষ্টিতে বা মুখে। তার বদলে ছিল বিস্ময়। যেন বীরেশ্বরকে চেনেই না, চিনতে চেষ্টা করছে!

—কিরে, চিনতে পারছিস নে?

তুমি বলতেও ইচ্ছে হয় নি বীরেশ্বরের।

—রায়বাবু? প্রশ্ন করেই কথাটা বললে পাগল!—বীরেশ্বর রায়?

—হ্যাঁ। কি হচ্ছে এসব? সাধনা?

নীরবে ঘাড় নেড়ে সে জানালে—হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ।

—কসবীর বাড়ীতে কসবী নিয়ে সাধনা হচ্ছে তোর? পিশাচ ভণ্ড—

বাধা দিয়ে সোফির মা বলে উঠল—হজরৎ—উনে হজরৎ হ্যায় হুজুর—

—চোপ! ধমক দিয়ে উঠলেন বীরেশ্বর।

পাগল বললে—সে একবার জলে ভেসে এসেছিল, একবার আমাকে জলে ডুবিয়েছিল, একবার পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছিল। আবার এখানে এনেছে। হেসে বললে—এবার যত্ন কত! দেখ, কেমন আমীর নবাব করে দিয়েছে! দেখ না, মেটেবুরুজে নবাব ওয়াজিদ আলিশা বন্দী হয়ে রয়েছে। আর পথ থেকে ডেকে এনে আমাকে আমীরের মসনদে বসিয়ে ভোলাতে চাচ্ছে। দেখ না।

—জাতটাও দিয়েছিস, মুসলমান হয়েছিস এই কসবীটার জন্যে?

পাগল বার-বার ঘাড় নেড়ে বললে—না—না—না, ওর জাত নেই, ওর জাত নেই।

—ও তোর কে?

পাগল এবার দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বললে—জানি না। ও বলছে না!

—তুই বল!

—আমি? ঘাড় নেড়ে পাগল বললে—না—!

—বলতেই হবে তোকে, তোকে আমি বলাব।

বীরেশ্বর রায় অধীর অস্থির। প্রকৃতি যেন পাল্টে গেছে। তিনি তিলে তিলে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলেন। এবার এই মুহূর্তটিতেই বোমবাজির পলতে পুড়ে পুড়ে বিস্ফোরণ হয়ে গেল। তিনি পাগলের ঝাঁকড়া চুল ডান হাতের মুঠোয় ধরে সেখানেই টেনে আছড়ে ফেলে দিলেন।

সোফিয়া চীৎকার ক'রে উঠল।—রায়বাবু! রায়বাবু!

সোফির মা কেঁদে উঠল। বাঁদীটা ছুটে গেল বারান্দায়। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গেল—জান বাঁচাও! জান বাঁচাও!

বীরেশ্বর রায় কিছুই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি পাগলের বুকে চেপে বসে গলায় হাত দিয়ে বললেন, বল্—বল্ ও তোর কে?

পাগল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বীরেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল শুধু। একটি কথাও বললে না। যেন অকস্মাৎ বোবা হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে যেন কিছু কথা ছিল।

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় লিখেছেন সুলতা—তাতে যেন জিজ্ঞাসা ছিল। একদিন পর যখন লিখছি তখন আমি শান্ত; মাথার মধ্যে নেশার স্পর্শ নেই। কাল আমার ওই দৃষ্টি দেখে মনে হয়েছিল সে বুঝতেই পারছে না তার এতে অপরাধটা কি হয়েছিল! কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল, চোখে সে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছিল।

থাক সে কথা। বলব সেটা, বলবার সময় এলে। তবে বীরেশ্বর রায়ের ক্রোধ তাতে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছিল। তিনি এবার—

. এবার গলার নলিটা টিপে ধরে নিষ্ঠুর চাপ দিয়ে বলেছিলেন—বল্। বল্—। বল্।

পাগলের মুখখানা অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিকৃত এবং নীল হয়ে আসছিল, একটা গোঙানি বেরিয়ে আসছিল—জন্তুর গোঙানির মত।

রায় নিষ্ঠুরভাবে বলেছিলেন—নিজের গলা নিজে টিপে ধরে বলতিস—ছাড়! ছাড়! বলতে দে! বলতে দে! এমনি ক'রে টিপতিস্? বল্—ছেড়ে দেব! বল্!

সোফিয়ার মাও ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল বারান্দায়। সেও চেঁচাচ্ছিল—জান বাঁচাও! জান বাঁচাও! রাস্তায় গোলমালও কিছু উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু বীরেশ্বর রায় ভ্রূক্ষেপ-হীন। সোফিয়া পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল। তাদের ঘরে গোলমাল হয়। সে জানে, সে হয়তো তার জীবনে দেখেও থাকবে। কি করবে খুঁজে পাচ্ছিল না। হঠাৎ সে এবার বীরেশ্বরের ডান পায়ের উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে পাখানা জড়িয়ে ধরে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—হুজুর, রায় হুজুর, উনি হজরৎ, আমি ওর বাঁদী। হুজুর—

রায় নিষ্ঠুর ক্রোধে তাঁর পা-খানাকে ছুঁড়ে দিলেন, সোফিয়া সেই পা ছোঁড়ার বেগে একটি যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে গেল। রায় নিষ্ঠুর হেসে বললেন—হাঁ। কসবী যারা তারা সবারই—।

বলতে গিয়েছিলেন—'তারা সবারই বাঁদী'। কিন্তু বলা হল না। তাঁর জুতোর ডগার ঠোক্করে সোফিয়ার উপরের ঠোঁটখানা কেটে দু ফাঁক হয়ে গেছে। রক্ত বেরিয়ে আসতে শুরু

করেছে!

বীরেশ্বর রায়ের হাতের মুঠো আলগা হয়ে গিয়েছিল। চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল দীর্ঘকাল আগের কথা। ছবিটাও ভেসে উঠেছিল তাঁর স্মৃতিতে।

বীরেশ্বর রায় লিখেছেন—মুহূর্তে ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। ছবিটা মনে পড়ে গেল। সে ঠিক এমনি ক'রে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বলেছিল—বিশ্বাস কর তুমি। আমাকে এমন ক'রে অপমান ক'র না। তার থেকে তুমি আমাকে মেরে ফেল। ও গো—

আমি এমনি ক'রেই পা ছুঁড়েছিলাম। সে উল্টে এমনি ভাবেই চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারও সেদিন চুল এলো ছিল। পরনে লালপেড়ে শাড়ী ছিল। উল্টে যখন পড়ল তখন তার উপরের ঠোঁটখানা কেটে গেছে। রক্ত বেরিয়ে আসছে।

আমি সেদিন বিচলিত হই নি। তার রক্ত বেরিয়ে আসা দেখেছিলাম বসে-বসে। সে হাত দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছে একবার হাতখানা চোখের সামনে ধ'রে দেখেছিল। তারপর নীরবে উঠে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। আমি মহিন্দিরকে ডেকে বলেছিলাম—বোতল গ্লাস আন।

মদ খেতে খেতেই সোফার উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকালে মহিন্দিরই আমাকে ডেকে তুলেছিল। ক্রুদ্ধ হয়েই উঠে ব'সে তাকে বলেছিলাম—কি?—

মহিন্দির কেঁদে উঠে বলেছিল—রাণীমা—

—কি? রাণীমা কি?

—রাণীমা নাই হুজুর! কাঁসাইয়ের ঘাটে অঙ্গের গয়না খুলে রেখে—

বীরেশ্বর রায়ের সেই স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাগলের কণ্ঠনালী-ধরা হাতের মুঠো শিথিল হয়ে গিয়েছিল আপনা থেকেই। তিনি পাগলকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

এ কি করলেন তিনি। ছিঃ! সোফিয়া কিন্তু তার ঠোঁটের আঘাত ঠিক গ্রাহ্য করেনি। সে তার মত ঠোঁটে হাত দিয়ে দেখেনি কি হয়েছে। কি গড়িয়ে আসছে। সে সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আঘাত সামলে নিয়ে উঠে বসে তাকিয়েছিল পাগল সন্ন্যাসীর দিকে। এবং কাতর কণ্ঠে ডেকেছিল—হজরত! হজরত! তারপর বীরেশ্বর রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিরস্কার করে বলেছিল—আপনে উন্‌কে খতম কর দিয়া রায়বাবু?

রায় এবার পাগলের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। পাগল নিস্পন্দের মত পড়ে আছে। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সোফিয়া পাগলের উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁর মুখের কাছে মুখ এনে আর্তকণ্ঠে ডাকতে লাগল—হজরত। হজরত।

পাগল যেন খাবি খাচ্ছে। সোফিয়া চীৎকার ক'রে ডাকলে—পানি-পানি। আম্মা পানি।

সোফিয়ার মা তখনও বাইরে চেঁচাচ্ছিল। মেয়ের ডাকে ঘরে এসে চীৎকার করে উঠল—খতম কর দিয়া?

—পানি। পানি আম্মা। পানি দো!

জলের বদ্‌নাটা এগিয়ে দিল সোফিয়ার মা। সোফিয়া পাগলের মুখে চোখে জলের ঝাপটা

দিতে দিতে ডাকতে লাগল—হুজরত! হুজরত! ফকীর সাহেব!

পাগল চোখ মেলেছে। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সোফিয়ার মুখের দিকে। সোফিয়া আবার ডাকলে—বাবা! বাবা সাহেব! বাবা!

পাগল এবার সাড়া দিতে চেষ্টা করলে—কিছু বলবার চেষ্টায় ঠোঁট দুটো ফাঁক হল কিন্তু স্বর বের হল না।

সোফিয়া ডাকছেই আর্তস্বরে—বাবা!

আবার ঠোঁট হাঁ হল। আবার! বীরেশ্বর রায় স্থির হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মনে অনুশোচনা ছিল না। উৎকণ্ঠা ছিল। লোকটা কি ম'রে যাবে? গলার নলীটা কি ভেঙে গেছে?

না। মরবে না। তবে গলার নলীটা জখম হয়েছে। আওয়াজ বের হচ্ছে না।

ওদিকে দরজার মুখ থেকে মহাবীর ডাকছে—হুজুর! হুজুর!

নিশ্চয় লোক জমে গেছে বাঁদীটা এবং সোফিয়ার মায়ের চীৎকারে। সুখদেও পাহলওয়ানের আওয়াজ আসছে। হট্ যাও! নেহি। নেহি! ঘুসনেকা হুকুম নেহি হ্যায়! রায় আর থাকতে চাইলেন না। পাগলটা মরবে না। কষ্ট পাবে। তা ওর প্রাপ্য। ঠিক হয়েছে। তাঁর শাস্তি দেওয়া হয়ে গেছে।

সোফিয়া ওকে 'বাবা' বলে ডাকছে! সোফিয়ার ঠোঁট কেটেছে তাঁর জুতোয়। ঠিক হয়েছে। এও সোফিয়ার প্রাপ্য!

তিনি ফিরলেন। দরজার বাইরে সিঁড়ির মাথায় প্রশস্ত জায়গাটায় দাঁড়ালেন। নিচে অনেক লোক দরজার সামনে। তা হোক তিনি ভয় করেন না। ভুল হয়ে গেছে তিনি নিজে হাতিয়ার আনেন নি।

ঠিক সেই মুহূর্তে কর্কশ ভাঙা একটা অস্বাভাবিক আওয়াজে কে চীৎকার করে উঠল—আঁ—! আঁ—! আঁ!

তিনি ফিরে আর একবার তাকালেন। দেখলেন—পাগল চীৎকার করছে—আঁ! আঁ। আঁ! ঠিক যেন একটা জন্তু চীৎকার করছে। ওটা জন্তুই। মানুষ হয়ে জন্মালেও ওটা জন্তু ছাড়া কিছু নয়।

তিনি নেমে এলেন নিচে।

সামনে একটা জনতা জমেছে। তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুখদেও আর মহাবীরের দিকে তাকিয়ে আছে। মহাবীরের হাতে তলোয়ার, সুখদেওয়ের হাতে একটা লাঠি! সুখদেও পাহলওয়ানের বিপুল শরীর এবং মহাবীরের হাতের তলোয়ার দেখে তারা এগিয়ে আসতে সাহস করছে না।

বীরেশ্বর নিচে রাস্তায় নেমেই বললেন—যাও, সব চলে যাও। কুছ নেহি হুয়া। যাও—যাও! হিন্দু সন্ন্যাসীটা আওরতের লোভে মুসলমান হতে যাচ্ছে বলে আমি ওকে থোড়া কুছ সাজাই দিয়েছি। ব্যাস। যাও—যাও।

বলতে বলতেই তিনি গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। আবদুল লাগামের টানে জিভের শব্দে ঘোড়া দুটোকে ইসারা দিলে—চল্।

ঘোড়া ছুটল লালবাজার স্ট্রীট মুখে।

সুখদেও মহাবীর ছুটল আগে এবং পিছনে তাদের সঙ্গে সহিস দুটো। হট্ যাও—হট্ যাও।

প্রচণ্ড জোরে ছুটেছিল বগিগাড়ীখানা। লোকে তফাৎ হয়ে পথ দিলে। কিছু দূর এসে সুখদেও ও মহাবীর উঠল গাড়ীর পিছনে আর কোচবক্সে। সহিস ছুটো ছুটল সামনে।

পিছনে তখন একটা বচসা লেগে গেছে। হিন্দু এবং মুসলমানেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু ক'রে দিয়েছে।

* * *

গাড়ীর মধ্যেই তার একটা অনুশোচনাও হয়েছিল। পাগলের জন্য নয়, হয়েছিল সোফিয়ার জন্য। মন বলছিল অন্যায় হয়ে গেল। ওটা অন্যায় হয়ে গেল।

সোফিয়া কসবী বাঈজী। এই তার পেশা। এই তার ধর্ম। এককালে সে মুজরো ক'রে খেতো। শৌখীন ধনীর সঙ্গে অর্থবিনিময়ে রাত্রিযাপন করত। তিনি তাকে অর্থ দিয়ে নিজের সম্পত্তি ক'রে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে তাঁর দেওয়া অর্থের চেয়ে বেশী অর্থ পেলে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে ফারখত করে চলে যেতে পারে।

এই পাগলটাকে অর্থের জন্য না হোক তার ওই ভেল্কির জন্য যদি তার আনুগত্য স্বীকার করে, তবে তাতেই বা তাঁর বলবার কি আছে ?

হ্যাঁ, কিছু কিছু নারীপাগল আছে যারা এর জন্য খুন-খারাপী করে। তিনি তাঁদের দলের নন। না—না। এটা অন্যায় হয়ে গেছে।

দোষ সোফিয়ার নয়। দোষ ওই ভণ্ড পিশাচের। ওদের এমনতর অনেক ভেল্কি আছে যাদু আছে যার বলে মানুষকে—বিশেষ ক'রে দুর্বলচিত্ত মানুষকে, যাদের মধ্যে মেয়েরাই বেশী, পোষা জন্তুর মত বশীভূত ক'রে ফেলে।

—বাড়ী এসে পৌঁছেই তিনি ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। মহিন্দরকে ডেকে হুকুম করেছিলেন—বোতল গ্লাস আন !

মহিন্দর বোতল গ্লাস সাজিয়েই রেখেছিল। ঢেলে দিয়েছিল গ্লাসে। জল মিশিয়ে দিয়েছিল। বীরেশ্বর মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঘরময় একপাক ঘুরে গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—ঘোষবাবু ম্যানেজারকে ডাক।

ঘোষ এসে দাঁড়াতেই বীরেশ্বর বললেন—কাল সকালে মহাবীর সুখদেওকে বাদ দিয়ে অন্য দারোয়ান সঙ্গে ক'রে একবার সোফিয়া বাঈজীর বাড়ী যাবেন। সঙ্গে এক হাজার টাকা নিয়ে যাবেন, ওকে দিয়ে আসবেন। বলবেন—ওকে আর আমার দরকার হবে না। বুঝলেন !

ঘোষ হুকুম শুনেও গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—কি ?

ঘোষ বললে—একটা 'এলিবি' রাখলে হ'ত না ? মহাবীর যা বললে—

—কি ? ওরা থানাপুলিশ করবে ?

—তা—।

—করুক। আপনি যান।

—আমি অবিশ্যি ঘনশ্যাম পরামানিককে পাঠিয়েছি। বউবাজার অঞ্চলেই ও ইঁট পেতে বসে কামানের কাজ করে। বলে দিয়েছি খবরটা জেনে আসতে।

হেসে বীরেশ্বর বলেছিলেন—আচ্ছা।

* * *

বীরেশ্বর রায় এরপর লিখতে বসেছিলেন। ওই খাতায় লিখেছেন—সোফিয়ার ওখান থেকে ফিরে এসে লিখে রাখছি যা হয়েছে। ঘটনাটা সমস্ত লিখেছেন—

ঘোষ 'এলিবি' রাখতে বললে। আমার হাসি এল। সামান্য একটা তান্ত্রিক সাধু আর

একটা কসবী বাঈজীকে যদি খুন করেই আসতাম, তাতেই বা কি হ'ত ? লোকটা অত্যন্ত দুর্বল লোক। ভীতু!

জমিদারী করতে গেলে এ হয়। একটা দুটো কেন দু-দশটা খুন হয়ে যায়!

বলরামপুর কাশীজোড়ার জমিদার চৌধুরী বীরপ্রসাদ মেদিনীপুর শহরের সম্রান্ত ব্রাহ্মণ চাটুজ্জে-বাড়ীর মেয়ে জবরদস্তি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। মেদিনীপুরের লোকেরা একজোট হয়ে মামলা করিয়ে চৌধুরীকে সাজা দিইয়েছিল। তিরিশ ঘা বেত। বেত খেয়েছিল চৌধুরী কিন্তু আঘাত তার লাগেনি। বেত মারবার লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিল, এমনভাবে বেত মারবি যাতে শব্দ হবে খুব, কিন্তু চৌধুরীর পিঠে পড়বে ফুলের ঘায়ের মত। এক এক বেতে দশ বিঘে লাখরাজ মিলবে। হয়েও ছিল তাই। চৌধুরী বেত খেয়ে অক্ষত দেহে গায়ের পিরহান চড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনশো বিঘে লাখরাজের সনদ দিয়ে গিয়েছিলেন লোকটাকে!

এ তো একটা কসবী আর একটা পাগলা বাউণ্ডুলে গাঁজাখোর লম্পট! যাদু আর ভেল্কি দেখিয়ে বেড়ায়! লোকটা না মরলে আমি খুশী হব। আমার সাজা হবে এই ভয়ে নয়। আমি দেখতে চাই এই লোকটার পরিণতি কি হয়।

মরে এবং মরবে সবাই, সে পরিণতি নয়। এই জন্তুটা শেষ পর্যন্ত কি জন্তুতে দাঁড়ায় তাই আমি দেখতে চাই।

জন্তু অবশ্য সবাই। হ্যাঁ—সবাই। রাজা বাদশা, নবাব থেকে ভিখিরী পর্যন্ত। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফৈজী বাঈজীকে দেওয়াল গেঁথে অন্ধকূপে পুরে মেরেছিল। আরও অনেক কথা শোনা যায়। বড় রাজা বাদশার ইতিহাস সব তাই। সব তাই। তারা প্রকাশ্যে হত্যা করে। বিচারের নাম ক'রে করে। ঔরংজেব বিচার করে ভাইকে কেটেছিল। গুণ্ডাতে চোরাগোপ্তা খুন ক'রে মারে। একটা মহান্ত একটি তের বছরের মেয়েকে রেপ করে মেরে ফেলেছিল বাবার আমলে। রাজা বাদশা নবাব জমিদার চোর গুণ্ডা সন্ন্যাসী মহান্ত সব জন্তু, এ ছাড়াও খোঁজ করলে দেখা যাবে সবাই জন্তু। ধার্মিক বিমলাকান্ত কুটিল জন্তু। আমিও জন্তু। হ্যাঁ, আমিও জন্তু। আমার এই খাতাখানা উল্টে উল্টে দেখলাম। দেখলাম যা করেছি তার সবই তো জন্তুর আচরণ। তবে আমি ওদের থেকে কম জন্তু। তা না-হলে আজ ওই সাধুটাকে আর সোফিয়াকে খুন করতে পারতাম আমি। কি হত? টাকার জোর থাকলে হয় না কিছুই। এবং অন্যায় করতাম না। অন্যায়ের সাজাই দিতাম। এরই মধ্যে একটা-আধটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আসে। রাধাকান্ত দেব আসে। ওরা দুনিয়ার সৃষ্টিতে অর্থহীন ব্যতিক্রম! কারণ ওরা কিছুই করতে পারে না।

খাতা উল্টে দেখছি আর নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছি—এগুলো কেন লিখে রাখি? কেন? এসব স্মরণ ক'রে কি ফল? বিচার ক'রে দেখছি কিছু না। আজ থেকে ঠিক করলাম আর লিখব না।

এইটেই আমার শেষ স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রইল। তলায় লিখে দিচ্ছি—দি এণ্ড!

* * *

এর পর সুলতা, সুরেশ্বর বললে—সত্যই বীরেশ্বর রায়ের খাতাটা সাদাই থেকে গেছে। অন্তত আরও শতখানেক পৃষ্ঠা তাতে ছিল। সব সাদা। সব সাদা!

ওদিকে ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ ঢঙ শব্দে তিনটে বাজল।

হেসে সুরেশ্বর বললে—সেদিনও, মানে বীরেশ্বর রায়ের ডায়রীটা এই পর্যন্ত প'ড়ে বাকী

সাদা পাতাগুলো ওলটাচ্ছি আর ভাবছি—তারপর ? তারপর কি হল ? মনের মধ্যে অসংখ্য প্রশ্ন আমার। বীরেশ্বর রায়ের জীবনে ভবানী দেবী ফিরে এসেছিলেন। কি ক'রে এলেন ? এলেন যদি তবে বীরেশ্বর রায় তাকে নিলেন কি করে ?

তাঁর ডায়রীর মধ্যে দেখছি তিনি তার মুখে লাথি মেরেছিলেন। মেরেছিলেন সন্দেহবশে। বিমলাকান্তকে জড়িয়ে সে সন্দেহটা।

ঠিক এমনি সময়ে সুলতা, কীর্তিহাটের বিবিমহলের বন্ধঘরের শুধু অন্ধকার আবহাওয়াটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ঘড়িতে পাঁচটা বাজার শব্দে !

ঢঙ ঢঙ করে পাঁচটা বেজেছিল।

ততক্ষণ পর্যন্ত ওই লেখাটায় একেবারে পরিপূর্ণভাবে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম, বোধহয় বারেকের জন্যও চোখ তুলিনি। এবার চোখ তুলে দেখলাম, জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো আসছে। এতক্ষণে শব্দও কানে এসে পৌঁছুল। কাঁসাইয়ের ওপারে বনটায় কাকেরা ডাকছে। ওরাই সংখ্যায় বেশী। মধ্যে মধ্যে কোকিল ডেকে উঠছে খুব ঘন বা ক্ষিপ্র কুহু-কুহু-কুহু-কুহু শব্দে।

আমি আলোটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে উঠে এসে জানালা খুলতে যাচ্ছি এমন সময় নীচে থেকে ডাক শুনলাম—রাজাভাই। ভাই রাজা!

ঘুরে এসে রাস্তার ধারের জানালাটা খুললাম। ঘরের কেরোসিনের গ্যাস মেশানো বাতাসে ভারী বুকটা বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়িয়ে গেল। একেবারে যেন সেকালের ভারী আমল থেকে একালে এলাম।

দেখলাম একখানা টাপর দেওয়া গরুর গাড়ী নামাচ্ছে গাড়োয়ান। গাড়ীর টাপরের ভিতর থেকে মুখ বের করে ব্রজেশ্বরদা ডাকছে—রাজাভাই।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি ? গাড়ী কেন ?

গাড়োয়ান গাড়ী থামালে। ব্রজদা গাড়ী থেকে নেমে বললে—পালাচ্ছি ভাই। সূর্য না উঠতেই পালাচ্ছি।

—পালাচ্ছ ?

—হ্যাঁ। বাবার বক্তৃতা, বিষয় নিয়ে কূটকচালী ঝগড়া—এসব ভাই সইত। কিন্তু অতুলেশ্বরের দায়ে যে হাঙ্গামা লাগল রায়বাড়ীতে এ ভাই সইবে না। পালাচ্ছি। আবার যদি বেটারা আজকে আসে আর বাড়ীসুদ্ধ লোককে নিয়ে টানাটানি ক'রে তবে রাজাভাই মরেই যাব।

দেখলাম ওদিক থেকে অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ীর দিক থেকে আসছেন মেজঠাকুমা, অর্চনা এবং ব্রজদার বউ।

ব্রজেশ্বর বললে—একটু চা খাওয়াও ভাই। রঘু উঠেছে ?

সুরেশ্বর বললে—ব্রজেশ্বরদা সেই দিনই চলে গিয়েছিল্ সুলতা। চা-টা খেয়ে যাবার সময় বলেছিল—রাজাভাই, খুব সাবধানে থেকো। মেদিনীপুর যা হয়ে উঠেছে, তাতে জান-মান কিছু থাকবে না। আমি খবর সবই রাখি। পলিটিক্সে আমি এখন দস্তুরমত ওয়াকিবহাল আদমী। রাজা, মহারাজকুমারকে খবরের কাগজ পড়ে আমাকে শোনাতে হয়। তাতে এখন প্রজাভাইটি অনায়াসে অ্যাসেম্বলী কাউনসিলে গিয়ে বক্তৃতা করতে পারে। তবে কংগ্রেস-টংগ্রেস নয়। বশম্বদ রাজা-জমিদার পার্টির একজন জোরালো সভ্য হতে পারে। কিন্তু টাকা চাই, নয় তো, কংগ্রেসী হতে হবে। বাপ্‌স্, ও আমি হতে পারব না। জেলকে

তবু সইতে পারি, ঠ্যাঙানীকে আমার বড় ভয়। কাল অতুল-খুড়োর যা হাল দেখলাম, দেখেই আমার দেহপিঞ্জর ভেঙে প্রাণবিহঙ্গ পালাবার জন্যে মাথা ঠুকছে। এরপর যে কি হবে তাই ভাবছি। রায়বাড়ীর ছেলে বলে যদি ধরে নিয়ে গিয়ে একটা ঝাঁকি দেয়, তবে গলগল করে সব বলে ফেলব। কাল সারা রাত্রি ঘুমুই নি রাজাভাই। ঘুমটি সবে এসেছিল; বউ অঘোরে ঘুমিয়ে গেছে, একটু একটু নাকও ডাকছে, আমার সবে তন্দ্রা নেমেছে, এমন সময় পাশের ঘরের দরজা খুলল। পদধ্বনি উঠল, সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের একটু খসখস আর ফিসফিস কথা। চমকে উঠে পড়লাম। পুলিশ-টুলিশ এল নাকি? মেজদি অর্চনা উঠল কেন? বুঝেছ? তারপরই আর কি, জানালার আড়ালে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, তোমার বাড়ীতে আলো জ্বলছে, জানালা খোলা। এঁরা দেখলাম চলে গেলেন। ছাদের উপর পায়ের শব্দ পেলাম। তারপর টর্চ সঙ্কেত। মোট কথা ভাই, সমস্ত একেবারে রায়বাহাদুরের খাস কাছারী—দেওয়ানী খাস পর্যন্ত যা ঘটেছে সবই দেখেছি। তবে হলটা কি তা ঠিক জানি নে। কিন্তু কিছু যে হয়েছে এবং সেটা যে আমার খুড়োবাহাদুরের সঙ্গে জড়ানো, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বুঝলাম তুমিও জড়িয়ে পড়ছ। গাড়ী আমার বলা ছিল। আজই আমি যেতাম। কিন্তু খেয়ে-দেয়ে। সে মতলব বর্জন করে ভোররাত্রে উঠে গাড়ীটাকে ডেকে এনে রওনা দিচ্ছি। অতুলখুড়োর জন্যে আমার আশঙ্কা নেই। ওর বুকে বাঁশ দিয়ে ডললেও ও কথা বলবে না। ফাঁসি ও হাসি মুখেই যেতে পারবে। ভয় আমার ওই অর্চনার জন্যে, তোমার জন্যে, আর অতুল-খুড়োর মা-যশোদা ওই মেজদির জন্যে। তুমি অনিচ্ছে সত্ত্বেও জড়াচ্ছো তা আমি বুঝতে পারছি। ভাল হচ্ছে না। তুমি এক কাজ করো ভাই রাজা, যথাসম্ভব শিগ্‌গির ওই অর্চনা আর মেজদিকে নিয়ে এখান থেকে কলকাতায় চলে যাও। এখানে থেকো না।

কথাগুলো ব্রজদা আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল সুলতা।

আমি স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম—এই মিষ্টমুখ মনোহর রায়-বংশধরটি শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুর বা কলকাতায় পুলিশ হেড কোয়ার্টারে যেতে পারে কিনা! তাকে বিশ্বাস তো অসম্ভব! কলকাতায় বিডন স্ট্রীটের ধারের গলিতে শেফালী বলে বেশ্যা মেয়েটির কাছে যে ব্রজেশ্বর সুরেশ্বর নাম বলে আমাকে বিপদগ্রস্ত করতে দ্বিধা করেনি, একটা দেহ-ব্যবসায়িনীর সঙ্গে প্রতারণা করতে ইতস্তত করে নি, সে কি আর এটা পারবে না?

ব্রজেশ্বরদা চতুর, কিন্তু এত চতুরতা আমি ভাবিনি। সে আমার চাউনি দেখেই আমার মন বুঝেছিল। বলেছিল—তুমি যা ভাবছ রাজাভাই, আমি তা সমঝা হুঁ। নাঃ—সে ভয় করো না। বিভীষণ হবার মত সাধ্যি আমার নেই, তরণীসেনের মৃত্যুবাণ রামকে বলতে পারা সোজা কথা নয়, ব্রাদার! বিশ্বাসটা রেখো। তবে ভয় আমার প্রহারকে। ওইটে সহ্য করতে পারব না বলে পালাচ্ছি। বউকেও বলব না। নিশ্চিন্ত থাক!

কথাটা মেজদি, অর্চনা এবং ব্রজেশ্বরের বউ এদের থেকে সরে গিয়ে নির্জনে হচ্ছিল। চায়ের কাপটা ছিল হাতে। সেটা নামিয়ে দিয়ে বললে—কাল রাত্রে শুধু নিজের ভয়ে অস্থির হই নি; সাবাসও দিয়েছি। অতুলখুড়োকে কখনও প্রণাম করিনি আজ পর্যন্ত। সে বিজয়ার দিনও নয়। কাল তাকে প্রণাম করেছি। তোমাদেরও সাবাস দিয়েছি। অর্চনা মেজদির চেয়ে তোমাকেই বেশী দিয়েছি। কারণ তোমার সঙ্গে অতুলের স্নেহ বল, ভালবাসা বল, এসব কিছু নেই; ওদের আছে। ওরা টানে করেছে। তোমার টানটা যদিই থাকে তবে মেজদির টান। আর বংশের জন্য টান। কাল বলছিলে, অতুলের ছবি আঁকবে। তখনই সেটা মালুম

হয়েছে আমার।

ব্রজদা কথা কইতে ধরলে আর ছাড়ে না। বলেই যাবে। বলেই যাবে। সম্ভবত ওইটেই তার মূলধন। ওদিকে সূর্য তখন উঠে পড়েছে; কাঁসাইয়ের বনের গাছগুলোর মাথায় রোদ চিক-চিক করছে। রায়বাড়ীর শ্যাওলা-ধরা চিলে-কোঠার আলসেতেও রোদ এসে পড়েছে। গাড়োয়ানটা নিচে থেকে হাঁকলে, বাবুমশায়। আর দেরী করলি পর বাস ধরা যাবেক নাই।

রাস্তা কম নয়; পাঁশকুড়ো গিয়ে ট্রেন, রাস্তা প্রায় বারো ক্রোশ, চব্বিশ মাইল। এখান থেকে মাইল পাঁচেক গিয়ে বাস। সেই বাস ধরতে হবে।

ব্রজদা ঘড়িটা দেখে বললে—তাই তো রে বাপধন! মনে করিয়েছিস ভাল। এই এলাম রে বাপ্। তাহলে চলি রাজাভাই। বলে সে হাঁকতে হাঁকতেই চলতে শুরু করলে, কই মেজদি? তোমাদের হয়েছে তো? কি সব খাওয়াবে, তা হল? না হয়েছে তো থাক। চোখের জল ফেলাটা সেরে ফেল।

আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলাম নিচে পর্যন্ত। হঠাৎ কি মনে হল বললাম, টাকা-কড়ি আছে তো? মানে দরকার নেই তো?

ব্রজেশ্বর বলেছিল—ও কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেন রাজা। খোদ ইংলণ্ডেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—সেও বলবে আছে। তবে তোমার কাছে টাকা আজ কিছুতেই নেব না, রাজা-ভাই। তুমি ভাববে মুখ বন্ধ করে থাকব, তার দাম চাচ্ছি। অতুল যা দেখিয়ে গেল, রাজাভাই, তারপর সবে একটা রাত কেটেছে। আজ আর টাকা নেব না। দিলেও না।

ব্রজদার বউ গাড়ীতে উঠল। ব্রজদা উঠতে যাচ্ছিল অর্চনা বললে—দাঁড়াও, বউয়ের পা মুছে নিই, নিতে হয়।

মেজদি চোখের জল মুছছিলেন, বলেছিলেন—আর দু-চারটে দিন থেকে গেলেই তো পারতিস ব্রজ। এসে বললি, সাত দিন থাকবি। তা তিনটে দিন পার না হতেই চলছিস।

—তোমার মনে নেই ঠাকুমা, দাদু বলতেন, ভাগ্যে মিউটিনি হয়েছিল তাই কীর্তিহাটে রায়েরা পাকাপোক্তভাবে এখানে এসে শেকড় গেড়েছিল। নাহলে বীরেশ্বর রায় কলকাতা শহর, সোফি বাঈজী-টাইজী ছেড়ে এখানে এসে আর বাস করতেন না। তিনি তো প্রতিজ্ঞা করেই ছেড়েছিলেন কীর্তিহাট। আমি বীরেশ্বর রায়কে সবসে বড়া রায় বলে মানি। কিন্তু অধম বংশধর। টাকা নেই। ঠাকুমা সত্যি বলছি;—আজ মেদিনীপুরে তিন-তিনটে ম্যাজিস্ট্রেট মরল, পল্টন এনে ইংলণ্ডেশ্বর জেলাটা চষছে, আর অতুল-খুড়ো কিনা রায়বাড়ীতে তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়ালে। এই অবস্থায় টাকা থাকলে আমি আজই ইংলণ্ডের টিকিট কিনে জাহাজে চড়তাম। দুটো টিকিটের টাকা থাকলে বউ নিয়েই যেতাম। না থাকলে, একটা টিকিটের টাকা থাকলেও বউকে রায়বাড়ীতে সাবিত্রী ব্রত করতে বলে রেখে পালাতাম।

বলে সে গাড়ীতে চড়ে বসল।

* * *

কথাটা গল্প নয়, কথাটা সত্য স্থূলতা। বীরেশ্বর রায় মিউটিনির ধাক্কায় কীর্তিহাটে এসে বাস করেছিলেন। প্রথমে ইচ্ছে ছিল মিউটিনির হাঙ্গামা মিটলেই চলে যাবেন। যাই হোক, এসপার-ওসপার একটা হয়ে যাক। ইংরেজ থাকলে যেমন ছিলেন, তেমনি থাকবেন। ইংরেজ যদি হারেই তবে কলকাতা তো থাকবে, উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তবে গোলা মেরে ভেঙে-চুরে দিয়ে যাবে। তা যাক, সারিয়ে-টারিয়ে নিয়ে বাস করবেন। বাংলাদেশের নবাব

যিনিই হোন, সে মুরশিদাবাদের নবাবই হোন, আর মেটেবুরুজে বন্দী অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শা-ই হোন, তাঁকে নজরানা আর কুর্নিশ দিয়ে বাস করবেন।

সুলতা প্রশ্ন করলে—পেলে কোত্থেকে? বীরেশ্বর রায় তো আর কিছু লেখেন নি বললে!

সুরেশ্বর বললে, পেয়েছি চিঠি থেকে। জমিদারী সেরেস্তা একটি আশ্চর্য যাদু-ঘর সুলতা। কাগজপত্রের যাদুঘর। এখানে এক টুকরো কাগজ নষ্ট করতে মানা। সে কালে জমিদারেরা বলতেন—লক্ষ্মী চঞ্চলা। এই চঞ্চলাটিকে সোনার শেকল পরিয়ে বাঁধা যায় না, ওঁকে বাঁধতে হয় গণেশ আর সরস্বতীর পাকানো হিসেবের দড়ির তৈরী জালে। কাগজের উপর হিসেব-নিকেশ আর প্রমাণপত্রের ফাঁদ ছিঁড়তে উনি পারেন না। জমিদারী সেরেস্তার পাটোয়ারীরা বলে, দু বিঘে চার বিঘে জমি তারা কলমের খোঁচায় গেঁথে রামের হাত থেকে বিনা ফৌজদারীতে শ্যামকে দিতে পারে। পুকুর চুরি কথাটা চলিত, শোনাও যায়, শুনে হাসিও পায়, কিন্তু সত্যি সত্যিই পুকুর চুরি হয় জমিদারী সেরেস্তায়। আগে বলেছি তোমাকে, ঠাকুরের গহনা চুরি ঢাকবার জন্যে মেজঠাকুরদা এক গাদা জমাখরচের খাতা গায়েব করেছিলেন। সোমেশ্বর রায়ের জীবনের ঘটনাগুলো চিঠিপত্র থেকে পেয়েছিলাম। এক এক আমলের চিঠিপত্র বড় বড় পুলিন্দায় বেঁধে শক্ত কাপড়ের গায়ে কালী দিয়ে লিখে তাড়াবন্দী সাজানো ছিল। কোনটায় লেখা—মামলা সেরেস্তার চিঠি কোনটায় লেখা গোমস্তা দিগরের চিঠি, কোনটায় লেখা সরকার বাহাদুরের চিঠি। কোনটায় লেখা নোটিশ-পত্রাদি।

এ আমলের ফাইল আর কি! কোন-কোনটায় লেখা খাস চিঠিপত্র।

হেসে সুরেশ্বর বললে—কাগজের ফাঁস সত্যিই মালক্ষ্মী কাটতে পারেন না। কিন্তু মালক্ষ্মীর সহায় ওখানে মাষষ্ঠী। লক্ষ্মীপেঁচার ঠোঁটের ধারে যে জাল কাটে না, তা ষষ্ঠীমায়ের অনায়াসে দাঁতে নখে কেটে ফাঁক করে দেয়। ফাঁক দিয়ে মালক্ষ্মী বাহনের পাখায় ভর দিয়ে পাল দরুনে বংশধরদের আড়াল রেখে পালান। জালটা পড়ে থাকে ধুলোর জঞ্জালে। ষষ্ঠীমায়ের দেওয়া গণ্ডা গণ্ডা বাছাধনদের তখন দুধ গরম হয় ওই কাগজের জালের আগুনে।

সেদিন আর আমার অস্বস্তির শেষ ছিল না। যার জন্যে এত ব্যগ্রতার সঙ্গে রায়বংশের কথা জানতে চেয়েছিলাম, তার প্রথমটা হল সেটেলমেণ্টের তাগিদ; আমার জ্ঞাতিদের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার প্রমাণ ছিল কাগজে এবং বংশের ইতিহাসের মধ্যে। তারপর যে তাগিদটা এল, সেটা তোমার এবং আমার মধ্যে যে সম্পর্ক তার ভিতটা নড়ে গেল ওই কাগজ থেকেই। ঠাকুরদাস পাল! তাকে পিত্রু গোয়ান খুন করেছিল।

ঠাকুরদাসের প্রথম পক্ষের স্ত্রী-পুত্র ঘরে আগুন লেগে পুড়ে মরেছিল। ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায় জমিদারী শাসন করবার জন্য।

তারপর রায়বাহাদুরের আমলে রায়বাহাদুরের সঙ্গে ঠাকুরদাস কি বচসা করে কোন্ একটা গুপ্ত কথা বলে দেবে বলে শাসিয়েছিল। ঘটনাটার অব্যবহিত পরেই পিত্রুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, পিত্রুর এক বোনের ব্যাপার নিয়ে। ঝগড়া করতে করতে বাইরে গিয়েছিল দুজনে। এবং নদীর ঘাটে পিত্রু ঠাকুরদাস পালের বুকে ছোরা মেরেছিল।

রায়বাহাদুর, ঠাকুরদাস পালের নামে পাশের গ্রামে ইস্কুল করে দিয়েছেন, আবার পিত্রুকে মামলায় বাঁচাবার জন্যেও চার অঙ্কের টাকা খরচ করেছেন। পিত্রুর মেয়ে ছিলতাকে জমি দিয়েছেন, গোয়ানপাড়ার 'মণ্ডলানী' করে দিয়েছেন।

সমস্ত ঘটনাগুলো লোকেরা জানে, কিন্তু কেন তা জানে না। আমি ব্রজদার কাছে

বীরেশ্বর রায়ের এবং রায়বাহাদুরের ডায়রী পেয়ে সাগ্রহে প্রথম থেকে পড়তে শুরু করে হঠাৎ মাঝখানে ডায়রীটা শেষ হয়ে যাওয়ায় নিদারুণ অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। মনের মধ্যে তখন অহরহ দাঁড়িয়ে আছেন ভবানী দেবী। ওই অয়েল পেন্টিংএর ভবানী দেবী। রাজরাণীর মত সর্বাঙ্গে অলঙ্কার-মণি-মাণিক্যের ছটা। সিংহাসনের মত আসনখানার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। বোধ হয় ষোড়শী। মুখে তাঁর আশ্চর্য লাবণ্য। চোখে তেমনি একটি দীপ্তি! আগের দিন রাত্রে ওই খাস কাছারী ঘরে টর্চের আলোয় কয়েক মিনিট দেখেছি মাত্র। বীরেশ্বর রায়ের ডায়রী পড়ে মনে মনে ভবানী দেবীর যে ছবি এঁকেছিলাম, তার থেকে এ ছবি অনেক উজ্জ্বল।

বীরেশ্বর রায় বিয়ের সময়ের স্মরণীয় কথার মধ্যে ভবানী দেবীর রূপের কথা লেখেন নি তেমনি করে যেমন করে গুণের কথা লিখেছেন। এমন কি ছটা আঙুলের কথাও লেখেন নি। লিখেছিলেন, শ্যামবর্ণা মেয়ে। কাজেই মনের তুলিতে উজ্জ্বল রূপের রঙ আপনা থেকেই বাদ পড়েছিল।

রায়বংশের ইতিহাস আমি ছবিতে এঁকেছি। ভবানী দেবীর ছবি রয়েছে, ওই দেখ, ওই দেখ। ওই গান গাইছেন তানপুরা হাতে। বীরেশ্বর রায়ের মামাতো ভাইয়ের আসরে, তাঁর পূর্বরাগের ছবি। আর ওই বর ও বধূর ছবি। ওতে তাঁর সে অসামান্যতা নেই। সায়েব পেন্টারের আঁকা সেই আশ্চর্য ছবিখানা নকল করবার চেষ্টা করেও আমি পারি নি। লজ্জিত হয়েছি। কিন্তু ওই ছবিখানি ছাড়া অন্য ছবিও এর মধ্যে দিতে মন সরে নি। কিন্তু আমার হাতের রায়বাড়ীর ইতিহাসের ছবির মধ্যে সে ছবিও দিতে পারি নি। ওই এক পাশে ছবিখানি আলাদা করে টাঙিয়ে রেখেছি। সব শেষে একটু দূরে; কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে।

সুরেশ্বর উঠে গেল এবং লম্বা বারান্দা ঘেরা ঘরখানার একপ্রান্তে, প্রস্থের দিকে দেওয়ালে টাঙানো একখানা মাত্র ছবির ঢাকাটা টেনে খুলে দিলে। মাথায় একটা আড়াইশো পাওয়ারের বাল্ব জলছিল; সেই আলোয় ছবিখানা ঝলমল করে উঠল।

সত্যিই সে শ্যামবর্ণা ষোড়শী মেয়েটি অপরূপা এবং মহিমাময়ী।

সুলতাও দেখতে দেখতে আপনার অজ্ঞাতেই বোধ হয় পায়ে পায়ে উঠে কাছে গেল। অয়েল পেন্টিং কিছুটা দূর থেকে দেখতে হয়, একথা তার অজানা নয়, ওই রূপের মহিমা সুষমা তাকে টেনে নিয়ে গেল।

সুরেশ্বর বললে—সেদিন, আগের দিন রাত্রে দেখেছি। পরের দিন সকালে ডায়রীটা যখন মাঝখানে থেমে গেল, তখন থেকে ওই ছবির ভবানী দেবী আমার মন জুড়ে এমন করে দাঁড়ালেন, যে আর আমার মনে কিছুই রইল না। অর্চনার মুখে এই মুখের আশ্চর্য আদল রয়েছে, কিন্তু এ মহিমা কোথায় পাবে সে? তবুও অর্চনা গায়ের রঙে গৌরী।

সুলতা বললে—হ্যাঁ, রূপের মধ্যে এ মহিমা যদি শিল্পীর তুলির জাদুতে হয়ে থাকে, তবে বলব সে আশ্চর্য শিল্পী। আর এ মহিমা যদি সত্যিই ওঁর রূপের মধ্যে থাকে, তবে তিনি মহিমাময়ী!

ছবিখানার উপর ঢাকাটা আবার টেনে দিলে সুরেশ্বর। বললে—ওটা ঢাকা থাক। নাহলে আমার জবানবন্দী শেষ হবে না, আমি বলতে বলতে থেমে যাব, তুমি ছবি দেখতে গিয়ে অন্যমনস্ক হবে। চল, বসি গিয়ে।

আসনে এসে বসে সুরেশ্বর বললে—সেদিন তোমাকেও ভুলে গেলাম সুলতা। মনে মনে

প্রায় অধীর অস্থির হয়ে উঠেছি। এই ভবানী দেবী সম্পর্কে বীরেশ্বর রায় তাঁর স্মরণীয় ঘটনার খাতার মধ্যে বার বার অবিশ্বাসের ইঙ্গিত করেছেন। বার বার ইঙ্গিতে বিমলাকান্তকে জড়িয়ে নির্মম আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। বিমলাকান্ত সন্তান কমলাকান্তকে নিয়ে এত বড় বিষয়ের ছ আনা অংশ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। চলে গেছেনই বা বলব কেন, সত্য বলতে পালিয়েছেন! বীরেশ্বর রায়ের লেখার মধ্যে এই নারী সম্পর্কে অগাধ আসক্তির পরিচয় পেয়েছি; তিনি এ সম্পার্ক সত্য কথা লিখতে গিয়েও লিখতে পারেন নি। যে আমলে সম্পত্তিবান কুলের অধিকারীরা দুটো-চারটে বিয়ে করে, সেই আমলে বীরেশ্বর ভবানী দেবী জলে ঝাঁপ দেবার পরও বিয়ে করেন নি।

বংশের কলঙ্কের ভয়ের কথার উল্লেখ আছে। লিখছেন—সে লিখতে পারলাম না। এক জায়গায় আছে—

I shall die—with this truth buried in my breast.

ডায়রীর শেষ ঘটনা তান্ত্রিককে গলা টিপে ধরার সময় সোফিয়া বাঈজী তাঁর পা চেপে ধরেছিল, তিনি পা ছুঁড়ে তাকে ফেলে দিতে গিয়েছিলেন, তাঁর জুতোর ঠোক্করে সোফিয়ার ঠোঁট কেটেছিল। তিনি এইখানে লিখেছেন, তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল যে, ভবানী দেবীও ঠিক এইভাবে কাতর মিনতিতে তাঁর পা চেপে ধরেছিল বিবিমহলে, তিনি সেদিনও এমনি করে পা ছুঁড়েছিলেন, যার ফলে এমনিভাবেই ভবানী দেবীর উপরের ঠোঁটটা কেটে গিয়েছিল। ঘটনাটা মনে পড়ার জন্যই তাঁর হাতের মুঠো আলগা হয়ে গিয়ে ছাড়া পেয়েছিল তান্ত্রিক।

ডায়রী এখানেই শেষ করেছেন দারুণ আক্ষেপে।

মানুষ জন্তু। জন্তুর আবার স্মরণীয় ঘটনা কি? The end লিখে দাগ টেনেছেন, বাকী পাতাগুলো সাদা!

মন অধীর হয়ে বলছিল, এ যদি সত্য হয়, তবে আজই ভূমিকম্প হয়ে গোটা রায়বাড়ী ভেঙে-চুরে যাক, আর রায়বাড়ীর সকলেই তার মধ্যে চাপা পড়ে যাক।

বাইরে যারা যেখানে আছে রায়বংশের, শেষ হয়ে যাক শেষ হয়ে যাক। এই মহিমাতেও যদি কলুষের কালি পড়ে থাকে—

সুলতা বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু তুমি তো জানতে সুরেশ্বর যে ভবানী দেবী আবার ফিরে এসেছিলেন। তাঁর একটি কন্যা হয়েছিল। তাই কি প্রমাণ করে না যে, বীরেশ্বর রায় এক্সেসিভ ড্রিঙ্কিং-এর ফলে ক্রেজি হয়ে গিয়েছিলেন। ডিজিজ্‌ড মাইণ্ড হয়ে গিয়েছিলেন।

সুরেশ্বর বললে—বিবাহের পর থেকে মদ তিনি ছেড়েছিলেন।

—কিন্তু শেষের দিকে আবার ধরেছিলেন।

—ধরেছিলেন এটা সত্য। সেটা ওই সন্দেহ জাগবার পর।

—কিন্তু তাতে কি? নিলেন কেন আবার? তুমিও ক্রেজি। এক্সকিউজ মি!

সুরেশ্বর বললে—আমি ক্রেজি তা আমি জানি। যখন প্রথম দাড়ি-গোঁফ রাখি আমার মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও তখন আয়নার মধ্যে নিজের ছবি দেখে বার বার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি, কেন? দাড়ি রাখলাম কেন? তবু কামাই নি। এবং সম্ভবতঃ পুরনো সম্পত্তিশালী বংশের ওটা একটা পরিণতি। এক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়, সুলতা। আমার কথা শেষ করতে দাও। বলতে দাও, তাহলে বুঝবে।

ব্রজদা যাবার সময় বলে গেলেন—বীরেশ্বর রায় মিউটিনির সময় পালিয়ে এসেছিলেন কীর্তিহাটে। সে কীর্তিহাট থেকে বউ নিয়ে পালাচ্ছে অতুলেশ্বর তে-রঙা ঝাণ্ডা তুলে পুলিশ

হাঙ্গামা রায়বাড়ীতে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল বলে। সেই কথাটা সত্যি বলে, কাগজের মূল্যের কথা উঠল। তা থেকে তুমি প্রশ্ন তুলে গোল বাধাচ্ছ।

বীরেশ্বর রায়ের সন্দেহ কি করে নিরসন হয়েছিল, সেইটে জানবার আগ্রহে তখন আমি অধীর।

সীতাকে রামের চেয়ে কেউ বেশী চিনত না, বেশী জানত না। সেই রাম রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করেও অগ্নিপরীক্ষা চেয়েছিলেন। এবং সবার থেকে তাঁর উদ্বেগই ছিল বেশী। তোমাকে অতিরঞ্জন করছি না, আমার উদ্বেগ সেদিন সেই উদ্বেগ! সীতার পাতাল প্রবেশের মত ভবানী দেবীর এমনই ধরনের মৃত্যু হলে আমি তখন লব-কুশের মত বুক চাপড়ে কেঁদে ধন্য হতে চাই। তোমার ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি ফুটেছে সুলতা। বুঝতে পারছি সীতার উপমা দেওয়াতে তুমি আমাকে সেণ্টিমেণ্টাল ভাবছ। হ্যাঁ, সেণ্টিমেণ্টাল মুডে বাস্তব জীবনকে বিচার করতে গেলে ভুল হয়। দড়ি দেখে সাপ ভেবে অকারণ হৈ-চৈ করে লোক জড়ো করে। না, আমি তা করি নি।

ভবানী দেবী তখন আমার কাছে সত্যই রায়বংশের সীতার মত হয়ে উঠেছেন। বীরেশ্বর রায় নিজেও তাই ভেবেছেন। আমি জানি, অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি সেই কাহিনীর জন্য অস্থির, অধীর!

ব্রজদা চলে গেল। মেজঠাকুমা এবং অর্চনা দাঁড়িয়ে রইল। গেল না। আমি তখন রায়বাহাদুরের ডায়রীটা খুলবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি। যদি ওর মধ্যে থাকে। থাকা সম্ভব। সম্ভব কেন, নিশ্চয় আছে! কিন্তু ওদের জন্য খুলতে পারছি না। চলে যেতে বলতেও পারছি না। বার বার তাকাচ্ছি অর্চনার মুখের দিকে। ঠিক ভবানী দেবী!

মনে আছে, অর্চনার সঙ্গে প্রায় প্রতিবার চোখাচোখি হয়েছিল। তাতে অর্চনা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বলেছিল—আমার উপর খুব রেগেছ, না?

আমি বলেছিলাম—না।

—তবে? তবে এমন করে তাকাচ্ছ কেন?

—বীরেশ্বর রায়ের স্ত্রী ভবানী দেবীর অয়েল পেণ্টিং ওই খাস কাছারীতে টাঙানো আছে। দেখেছিস কখনও?

হ্যাঁ, জানিয়ে ঘাড় নাড়লে সে। এবং আরও লজ্জা পেলে।

মেজঠাকুমা বললেন—হ্যাঁ, ও তারই মত দেখতে! তবে তিনি ছিলেন শ্যামবর্ণ, আর ও ফরসা।

আমি সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি জান ঠাকুমা, তিনি স্বামীর উপর অভিমান করে কাঁসাইয়ে ডুবে মরব বলে ঝাঁপ খেয়েছিলেন। তারপর কি করে বাঁচলেন, ফিরলেন?

—ওরে বাপরে! সে কথা সবাই জানে। ওঁর জন্ম হল দেবী অংশে। যখন বিয়ে হয়, তখন আমার দাদাশ্বশুরকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যে মদ তিনি ছোঁবেন না। প্রথম ক বছর মদ ছোঁন নি, স্ত্রী নিয়ে একেবারে পাগল। একবার নাকি কত্তার বাঁ হাতটার বাই ফুলে খুব বেদনা হয়েছিল। রাজার ছেলে, রাজামানুষ, সঙ্গে সঙ্গে বদ্যি, ডাক্তার। তাঁরা আর কিছুতেই কমাতে পারে না। কেন কমে না? তখন প্রকাশ হল, প্রকাশ করে দিলে ভবানী দেবী যে তাঁর মাথার চাপে হয়েছে। সারা রাত ওঁর হাতের ওপর মাথা রেখে শুতে হয় ওঁকে। বালিশে মাথা দিতে দেন না। তারপর ছেলে হয়ে মারা

গেল। ওই তাতেই আবার বেগড়ালেন উনি। মদ শুরু করলেন। তা সে তো দেবী অংশে জন্ম ওঁর, ওঁর সহ্য হল না। উনি কাঁসাইয়ে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু মরেন নি, ভেসে গেলেন। সাগর দ্বীপের কাছে। সেখানে এক কালীস্থান আছে, সেইখানে সন্ন্যাসিনী হয়ে সত্যিকার তপস্যা করেছিলেন। তারপর কত বছর পর যখন স্বামী মরো-মরো তখন শিয়রে এসে বসেন। কোন আশা ছিল না বাঁচবার। তা ওই সতীর পুণ্যের জোরে বেঁচে উঠলেন। ভাল হলে তায়ে মানে আমার শ্বশুর রায়বাহাদুরকে পুষ্যি নিয়ে সম্পত্তি দিয়ে স্বামী-স্ত্রী চলে গেলেন কাশী!

মনটা আমার শান্ত খানিকটা হয়েছিল, কিন্তু পূর্ণতৃপ্তির স্বস্তি পায়নি। আমার মন চাইছিল পূর্ণ বিবরণ! আমি চুপ করেই থেকেছিলাম।

মেজঠাকুমার মন ভবানী দেবীকে নিয়ে উতলা ছিল না, তাঁর মন অতুলেশ্বরের জন্য ব্যাকুল ছিল, তিনি আমার নীরবতার সুযোগে নিজের কথা পেড়েছিলেন।

—সুরেশ্বর! তাহ'লে—

—কি ঠাকুমা?

—অতুলের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করবি নে ভাই? আর তো কেউ কিচ্ছু করলে না।

কথাটা মনে হল। হ্যাঁ, কিছু করা প্রয়োজন! বললাম—হ্যাঁ ঠাকুমা, করব বইকি! আমাদের বংশে ও একটি আশ্চর্য ছেলে! একটু হেসে বলেছিলাম—আমি এগিয়ে গিয়েও পারি নি ঠাকুমা।

—না-রে! তুই পিছিয়ে ভালই করেছিস। তাহলে বংশটার আর কিছু থাকত না। তোকে আশ্রয় করেই বিষয়, দেবসেবা, রায়বংশের নাম আজ বেঁচে আছে। তা ছাড়া ছবি এঁকে নাম করেছিস তুই!

আমি কথা না বাড়িয়ে বললাম—তুমি যাও ঠাকুমা, এখনও তো তোমার ঠাকুরবাড়ীর ডিউটি হয় নি। যাও তুমি, আমি আজই নায়েবকে পাঠাচ্ছি, এই সকালেই পাঠাচ্ছি। থানায় যাক। কি বলে দেখুক। তারপর মেদিনীপুর সদরে পাঠাব। উকীলদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁরা যা বলবেন—তাই করা যাবে!

—আর একটা কথা বলব।

—বল।

—এই মেয়েটার একটা গতি করে দে।

অর্চনাকে দেখালেন ঠাকুমা। অর্চনা একটু চমকে উঠল। ভুরু উঁচু করে বললে—আমার পিছনে কেন লাগলে ঠাকুমা? না। ও সব ভাবনা ভাবতে হবে না, সুরোদা। ও সব করলে আমি একদিন বাড়ী থেকে চলেই যাব। আমাকে খুঁজে পাবে না!

এবার আমি ঠাকুমা দুজনে চমকালাম। ঠাকুমা কেন চমকালেন, তা তিনি জানেন, আমি চমকালাম এই জন্যে যে, অর্চনা তা হলে অতুলেশ্বরের সঙ্গে, এই দলের সঙ্গে এমন করে জড়িয়েছে যে ছাড়াবার উপায় নেই?

সে হন-হন করে চলে গেল। মেজঠাকুমাকে বললাম—ওকে রাজী কর ঠাকুমা, আমি ওর বিয়ে দিয়ে দেব। কথা দিলাম। তবে ভাল করে দেখ, এর সঙ্গে ও কতটা জড়িয়েছে।

ঠাকুমা বিবর্ণ মুখে বললেন—ওরে কলঙ্ক যে আমার হবে। অতুল আমার একটু হ্যাওটা, এ মেয়েটাও খানিকটা বটে। দুজনে যা শলা-পরামর্শ, গুজ-গুজ, ফিস-ফাস করে তা আমার ঘরে বসেই করে। লোকে দোষ দিলে তো অন্যায় হবে না সুরো! আমি কি করি বল তো?

কথা কটি বলে, অর্চনাকে ডাকতে ডাকতেই তিনি নেমে গেলেন।—অৰ্চি, ওরে!

আমি রঘুকে ডাকলাম—রঘু, চা আর কিছু খাবার দে। গত রাত্রি থেকে ভাল করে খাওয়া হয়নি। শরীরটা রাত্রিজাগরণে ঝিম-ঝিম করছিল। নির্জনে এবার আমি রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের খাতাখানা খুললাম। চমৎকার খাতা। কালো চামড়ায় বাঁধানো পুট, কাপড় সাঁটা শক্ত মলাটের খাতা; ফুলস্ক্যাপ সাইজ।

উল্টে দেখলাম—গোটা গোটা অক্ষরে প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা। জীবনী ওঁ দিনলিপি!

শ্রীরত্নেশ্বর রায়। নিবাস কীর্তিহাট। বঙ্গদেশস্থ জিলা মেদিনীপুর।

"মদীয় মৃত্যুর সময় সজ্ঞান থাকিলে আমি এই দিনলিপি মদীয় চিতায় নিক্ষেপ করিয়া ভস্ম করিতে নির্দেশ দিব। জ্ঞান না থাকিলে ইহা লিখিতেছি যে, একান্তভাবে বিষয়-সম্পত্তির গণ্ডগোল হইলে দিনলিপি পড়িতে, দেখিতে পারেন। তাহাতে অনেক সংশয় মিটিবেক। কিন্তু বংশের ইতিহাস যাহা দিনলিপির অপর পৃষ্ঠায় লেখা থাকিল, তাহা পাঠ করিবেক না। করিলে তাহার উপর আমার অভিশাপ বর্ষিত হইবেক। এবং পরলোকে আমার আত্মা অশান্তির অনলে দগ্ধ হইয়া যাইবেক। সম্ভবতঃ রায়বংশের পূর্বপুরুষেরা নরকস্থ হইবেন।"

আমিও মুহূর্তের জন্য চমকে উঠেছিলাম সুলতা। বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহী বাংলাদেশের ছেলে আমি, আমিও চমকে উঠেছিলাম। এরপরও খুলব? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভবানী দেবী মনের মধ্যে ভেসে উঠে বলেছিলেন—খোল! তারপর মনে এসেছিলে তুমি। একটা নাম মনে পড়েছিল, ঠাকুরদাস পাল।

মনে মনে বলেছিলাম—'ক্ষমা কর আমাকে। আমাকে জানতেই হবে। মানতে পারলাম না তোমার মানা।' তারপর উল্টেছিলাম সে পাতাটা। পরের পাতা থেকে শুরু।

ওঁ কালী।

"অদ্য ১২৬৬ সাল, ইংরাজী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ, শকাব্দ ১৭৮১, শুভ দোল পূর্ণিমা তিথি, তারিখ ২০শে ফাল্গুন; সন্ধ্যার পর ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া দৈনন্দিন বৃত্তান্ত অর্থাৎ ঘটনাদি কার্যাদি যাহা মদীয় জীবনে এবং পরিবারস্থ মনুষ্যগণের জীবনে ঘটিতেছে এবং গ্রামে, সমাজে যাহা যাহা বিশেষ ঘটনাবলী সজ্ঘটিত হইতেছে, তাহা সমুদয় প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। রায়বংশের কুলদেবতা জগজ্জননী শ্রীশ্রী৺রীকালী কীর্তিশ্বরী ও পিতামহ সোমেশ্বর রায় মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কল্যাণময় সৌভাগ্যশিলারূপী শ্রীশ্রী৺জনার্দন দেব এবং কীর্তিহাটের ওপারস্থ সিদ্ধপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার সহায় হোন। নারায়ণী বাগ্‌বাদিনী দেবী সরস্বতী আমার লেখনীকে সংশয়-মুক্ত করুন।

প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহা লিখিব, তাহা সত্য লিখিব। কোনপ্রকার মিথ্যা লিখিয়া সত্য যাহা তাহাকে আচ্ছাদিত করিব না।

তৎসঙ্গে ইহাও লিখিতেছি, ভগবান এবং সকল দেব-দেবীর নিকট মনে মনে ঐকান্তিক ব্যগ্রতা ও লক্ষ লক্ষ প্রণতি নিবেদন-পূর্বক অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি যে, রায়বংশে যদি প্রকাশের অযোগ্য কোন কলঙ্ক ঘটে বা পূর্বকালে ঘটিয়া থাকে, তাহা অপ্রকাশ রাখিয়া যাইব। যথা পিতৃপিতামহ কলঙ্ক, মাতৃ-মাতামহী, পিতামহী সম্পর্কিত কুৎসা কলঙ্ক কন্যা-কলঙ্ক। এই ত্রিবিধ কলঙ্ক বা পাপ ইত্যাদি উচ্চারণে যেমন মহাপাপ অর্শায়, লেখাতে তেমনি অর্শিয়া থাকে। সে পাপ যিনি সঙ্ঘটন করিয়াছেন, তাঁহার বিচার করিবেন সর্বনিয়ন্তা যিনি, তিনি।

আজ দোল পূর্ণিমার শুভ পুণ্য দিনে আমি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য নাম উপাধির পরিবর্তে

রত্নেশ্বর রায় নাম ধারণপূর্বক কীর্তিহাটস্থ রায়বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলাম। মহামান্ত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায় মহাশয় আমাকে যথাবিধি যজ্ঞ করণাদি করিয়া পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অহো! অদৃষ্টের কি চক্রান্ত! অথচ আমি সত্য-সত্যই পিতা-মাতার কাছে ফিরিলাম! পোষ্যপুত্র হিসাবে ফিরিলাম।

এতদিন যাঁহাকে পিতা বলিয়াছি, তাঁহাকে আজ পিসামহাশয় বলিয়া জানিলাম। ক্রিয়াদির সময় তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন। আমিও ক্রন্দন করিলাম। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায় এ অঞ্চলে প্রস্তর-হৃদয় মনুষ্য বলিয়া কথিত; এ অঞ্চলের মনুষ্যেরা তাহার ভয়ে ভীত! তিনিও ক্রন্দন করিলেন।

আমি প্রজ্বলিত হোম-অগ্নির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ ভাবিতেছিলাম, আমার অদৃষ্টে এ কি ঘটিল! ইহার উপমা বা তুলনা তো খুঁজিয়া পাইতেছি না।

পুরাণে কথিত আছে, দেব বলরাম মাতা দেবকীর অষ্টম গর্ভে আগমন করিলে দেবগণ, ভগবান কৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভে আসিবেন বলিয়া সৃষ্টিকর্তা পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বার্তা নিবেদন করিলে, ব্রহ্মা দেবকী গর্ভস্থ ভ্রূণবীজকে বৃন্দাবনস্থ বসুদেব-পত্নী রোহিণী দেবীর গর্ভে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। দেব বলরাম দেবকীর পুত্র হইয়াও রোহিণীর পুত্র বলিয়া জগতে খ্যাত হইয়াছিলেন।

মদীয় ভাগ্য, অদৃষ্ট আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জটিল। আমি রায়বংশের পুত্র হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াও দৌহিত্র বলিয়া পরিচিত। আমার জন্মদাতা এবং জন্মদাত্রী যিনি তাঁহারাই এত কাল পর আমাকে যজ্ঞ করিয়া পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করিলেন।

এতকাল পর জ্ঞাত হইলাম, আমি ভবানী দেবীর গর্ভজাত সন্তান। আমার জন্মদাতা পিতা শ্রীবীরেশ্বর রায়।

অথচ এতকাল আমি শ্রীবিমলাকান্তের ও বিমলা দেবীর পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছি।

অথচ এই সত্য আজ লোকসমক্ষে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। তাহাতে আমার এক ঊর্ধ্বতন পুরুষ লোক-নিন্দায় এবং সমাজ-নির্দেশে পরলোকেও অনন্ত নরকগামী হইবেন। সংসারে মনুষ্যগণ পাপ করিয়া থাকে এবং পরলোকে তাহার ফলভোগ অবশ্যই করে। কিন্তু লোকসমাজে তাহা যখন প্রচারিত হইয়া মুখে মুখে ঘোষিত হয়, সমাজকর্তাগণ যখন তাহাকে এই গুপ্ত কর্মের জন্য অভিশাপ দেন, তখন তাঁহার যে পুণ্যটুকুও থাকে, তাহাও অগ্নিমুখে তৃণসম ভস্মীভূত হইয়া থাকে। যাঁহার কথা গোপন করিতে হইল, তিনি সাধারণ মনুষ্যগণ বা চলিত সমাজ-বিধানে বিচারিত হইবার মনুষ্য নন। তিনি মহাসাধক। সারাজীবন কঠিন এবং কঠোর সাধনা করিয়া বজ্রাঘাতে তালবৃক্ষের মত আহত হইয়াও বিনাশপ্রাপ্ত হন নাই। বার বার মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছেন। এবং শেষ পর্যন্ত শান্তিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন বটে, তবে পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। নিজে বলিয়াছেন, তাঁহাকে জন্মান্তর ধারণ করিতে হইবে, সিদ্ধির জন্য।

এই মহাসাধক ছাড়াও আরও এক পূর্বপুরুষ তাঁহার সঙ্গেই মহাপাপ করিয়াছেন। সে পাপ তাঁহাকে দেবতাই ছলনা করিয়া করাইয়াছেন বলিয়া মদীয় দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে।

অতএব এই সত্য প্রকাশ করিতে বিরত থাকিলাম। তবে এই সত্য প্রকাশ করিলাম যে, আমি বীরেশ্বর রায় এবং শ্রীমতী ভবানী দেবীর সন্তান হইয়াও শ্রীবিমলাকান্ত এবং ৺বিমলা দেবীর সন্তান বলিয়া পরিচিত ছিলাম, আবার আজ অদৃষ্ট চক্রান্তে আশ্চর্য বিধানে পোষ্যপুত্র

হইয়া পিতা-মাতার ক্রোড়ে এবং রায়বংশের সম্পত্তিতে আবার ফিরিয়া আসিলাম। অদৃষ্টের চক্রান্ত। সাধনায় ভ্রষ্ট হওয়ার কর্মফল বহন না করিয়া মানবের উপায় নাই।

ওই মুখবন্ধের পাতাখানা পড়ে আমার মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করে উঠল। রত্নেশ্বর রায় পোষ্যপুত্র হয়েও পোষ্যপুত্র নন। তিনি বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবীর সন্তান হয়েও শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত সে-পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন না। বিমলা দেবী এবং বিমলাকান্তের সন্তান বলে পরিচিত ছিলেন। আবার পোষ্যপুত্র হয়ে ফিরে এসেছেন। কারণ প্রকাশের উপায় নেই। রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন, তাতে ঊর্ধ্বতন পুরুষের মহাপাপ প্রকাশ হয়ে পড়বে। প্রকাশ হলে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হবেন।

কি সে পাপ?

রায়বাহাদুরের পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার দিনলিপি চৌদ্দখানা বাঁধানো খাতায় লেখা আছে। সেগুলো আমার সামনে থাকবন্দী সাজানো ছিল। তখনকার দিনে একালের মত তৈরী ডায়রীর চল হয়নি। ভাল কাগজ কিনে দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে ছাপাখানায় পুটের চামড়ায় রত্নেশ্বর রায়, সাকিম কীর্তিহাট, লিখিয়ে নেওয়া হত।

সেগুলো আর পড়তে সাহস হয়নি। যেন পঙ্গু হয়ে গেছি মনে হয়েছিল। অথচ আমার ধারণা ছিল স্বর্গ-নরক, পাপপুণ্য ঈশ্বর এসব আমি কিছুই মানিনে। এসব কুসংস্কার, অতীতকালের বিজ্ঞানবোধহীন মানুষের মনের তৈরী।

অন্যদিকে আমার এতকাল ধরে শোনা কথার রঙে আর কাগজপত্রের তথ্যের রঙে আঁকা কালো-সাদা রঙে আঁকা পুরুষানুক্রমিক রায়দের মিছিলের ছবিটার উপর কে যেন জলে-চোবানো তুলি চালিয়ে ঘষে সব ঝাপসা করে একাকার করে দিলে। শুধু কয়েকটা কালো রেখাই রইল, কিন্তু কালচে হয়ে দুর্বোধ্য হয়ে গেল।

বাঘে যখন সজারুকে আক্রমণ করে তখন সজারু তার কাঁটাগুলো ফুলিয়ে খাড়া করে বসে থাকে, নড়ে না। বাঘ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে, কখনও থাবা মারতে যায় কিন্তু গুটিয়ে নেয়। সেও জানে—ওই কাঁটাগুলো বিঁধে যাবে, গিলতে গেলে মরতে হবে, তবুও সে নড়ে না। আমি ঠিক তেমনি করেই তাকিয়েছিলাম ওই খাতাগুলোর দিকে।

মনে প্রশ্ন হচ্ছিল হাজার রকম। পাপ? কি পাপ? মানুষ খুন? নরহত্যা? ঘরে আগুন জ্বালানো? ব্যভিচার? চুরি?

এগুলোর সবই রায়েরা করেছে। তা ডায়রীতে গোপন করলেও, জমা-খরচের খাতায় কোন-না-কোন রকমে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। জমিদারবংশে জমা-খরচের অঙ্কগুলো শুধু অঙ্ক নয়, ওগুলো লক্ষ্মীকে বাঁধার শেকল। ওখানে তারা জমা বা খরচের অঙ্কপাতে কড়াতেও ফাঁক রাখেনি।

হঠাৎ মনে হল, দরকার নেই আমার এত বিবরণে। আমি ভবানী দেবীর সম্পর্কে যে কথা শুনেছি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। রায়বংশের মায়ের ধারায় কোন বিষ নেই, এই যথেষ্ট। রায়বংশের পুরুষদের ইতিহাসে কুড়ারাম রায় থেকে উনিশশো বিশ-পঁচিশ সালের একজন শ্রেষ্ঠ ইন্টেলেকচুয়াল আমার বাবা পর্যন্ত, এখানে ধনেশ্বরকাকার সেই দৈত্যাকার পুত্রটি পর্যন্ত চরমতম অপরাধ করেছেন, তার মাশুলও দিয়েছেন। এদিকে রত্নেশ্বর রায়, অতুলেশ্বরের পুণ্যের পরিচয়ও রয়েছে। এ-সবই জানি, সহ্য হয়েছে। এর উপরে ঊর্ধ্বতন পুরুষে আরও যদি কোন মহানরকের পাপ করে থাকেন, থেকেছেন। সে জেনে আমার দরকারই বা কি?

আমি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর বুদ্ধিবাদী, আমি নিজে আজও এমন কিছু করিনি, যার জন্তে লজ্জাবোধ হতে পারে, মাথা হেঁট হতে পারে, সুতরাং আমি পবিত্র।

মনে আছে সুলতা, পবিত্র কথাটা মনে আসায় আমি হেসেছিলাম। 'পবিত্র' কথাটার মানে কি? বড়জোর clean—পরিচ্ছন্নই হতে পারে মানুষ। হ্যাঁ, আমি পরিচ্ছন্ন মানুষ। এক স্টেটসম্যানের চিঠিখানা। না—তাতেই বা আমার লজ্জার কি আছে। ওতেও কোন অপরিচ্ছন্নতা নেই। ওখানে আমি সোজা—স্ট্রেট। যা দেখেছি, দেখে যা মনে হয়েছে, তাই লিখেছি। গান্ধীজী বার বার সত্যাগ্রহ থেকে পিছিয়ে আন্দোলন বন্ধ করেছেন। Himalayan blunder স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব এবং মনের পরিচ্ছন্নতা সেখানেই।

আর আমি মদ্যপান করি। হ্যাঁ করি। কিন্তু আমি জানি—এদেশের মত দেশেও আজ কেউ বলবে না যে, মদ্যপান করা অপরাধ। এ-অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারেন গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের মত জনকতক ব্যক্তি। সেখানেই মাথা হেঁট করব। আর কোথাও নয়।

সুতরাং আমি টেনে নিয়েছিলাম ১৮৮০ সালের ডায়রীখানা। ১৮৮০ সালের জমা-খরচের খাতায় ঠাকুরদাস পালের হত্যাকারী পিক্রু গোয়ানের মামলায় তাকে বাঁচাতে চার অঙ্কের একটা খরচ দেখেছিলাম। ঘটনাটা ওই সালেই ঘটেছে।

পাতার পর পাতা উল্টে গেলাম। একশো কুড়ি পাতায় তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের ডায়রী। এক-এক পৃষ্ঠায় তিনদিন-চারদিনের ঘটনা। আট লাইন দশ লাইনে শেষ। শুধু এক-একটা দিনের ঘটনা পৃষ্ঠাব্যাপী। দু'পৃষ্ঠা খুব কম।

প্রথম পৃষ্ঠাব্যাপী ঘটনা যেটা পেয়েছিলাম, সেটা পড়ে কৌতুক বোধ করেছিলাম। সেদিন তমলুকের এস-ডি-ও, আর সদর থেকে ডি-এম, এস-পি এসেছিলেন স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে। স্কুল তার দশ বছর আগে হয়েছে। স্কুলের বাড়ীর মাথায় খোদাই করে লেখা আছে—বীরেশ্বর হাই ইংলিশ স্কুল, কীর্তিহাট। ১৮৭০ সাল। তার নীচে লেখা—রত্নেশ্বর রায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

একপৃষ্ঠা জুড়ে সেদিনের বিবরণ দিয়েছেন। শেষে লিখেছিলেন, আজকের দিনটি একটি সত্যকারের শুভ দিবস। বিশিষ্ট রাজপ্রতিনিধিবর্গের সহিত বাক্যালাপে ও দেশসংক্রান্ত নানাবিধ আলাপ-আলোচনায় অতিবাহিত হইল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর আমাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া উৎসাহিত করিলেন। বলিলেন, সদাশয় গভর্নমেণ্ট গুণী-দানশীল জমিদারগণের সর্বদাই সংবাদ রাখিয়া থাকেন। তাঁহার পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব আমার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনিও আজ স্বচক্ষে তাহা পরিদর্শন করিয়া উপলব্ধি করিলেন। এবং অবশ্যই তিনি এ সম্পর্কে লাটসাহেবের দপ্তরে জানাইবেন। আমি ভাবিতেছি, এখানকার ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয়টি বড় করিব। এবং মাতা ভবানী দেবীর নামে একটি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিব।

কিন্তু সে থাক। সেদিন আমি সবটা পড়তেও পারিনি। মন ছুটছিল। ছুটছিল ওই দিনের ডায়রীর সন্ধানে।

পেলাম। জানুয়ারীর ১লা—১৬ই পৌষ, ১২৮৬ সাল থেকে অক্টোবর পার হয়ে নভেম্বরের ৪ তারিখ, ২০শে কার্তিকের ডায়রীতে পেলাম যা খুঁজছিলাম। প্রথম ছত্রেই লেখা।

"কি একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। বুঝিতে পারিতেছি না কি ঘটিল। এমন যে কখনও ঘটিবে, ইহা তো জীবনে কোনদিন ভাবি নাই। ঠাকুরদাস—আমি বাল্যকালে

তাহাকে দাদা বলিয়াছি। তাহার কাঁধে চড়িয়াছি। মনে পড়ে, পিসেমশায় বিমলাকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে কীর্তিহাট হইতে চলিয়া গিয়া প্রথম উঠিয়াছিলাম শ্যামনগর। পিসেমশায়কে তখন বাবা বলিতাম। কীর্তিহাটের উত্তরাধিকারী আমি জন্মাবধি সেই বিশাল প্রাসাদে কাটাইয়া ওই ক্ষুদ্র বাটীখানিতে আসিয়া কাঁদিতে লাগিয়াছিলাম। আমার ছোট পনি ঘোড়াটির জন্য যখন ক্রন্দন করিতেছিলাম, তখন ঠাকুরদাস, তখন সে চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়স্ক সরল চাষীর পুত্র, সে আমাকে তাহার কাঁধে চড়াইয়া বলিয়াছিল, দেখ, আমি তোমার টাট্টু-ঘোড়া অপেক্ষা অধিক জোরে দৌড়িতে পারি। আমার কান্না থামিয়া মুখে হাসি ফুটিয়াছিল। ঘটনাটা একটুকরো ছবির মত বেশ মনে আছে আমার। তাহার পর কলিকাতায় যখন কিছুদিন ছিলাম, তখন যে মধ্যে মধ্যে আসিত। যখনই আসিত, আমার জন্য কিছু না কিছু লইয়া আসিত। খেজুর-গুড়, মর্তমান কদলী আনিয়া সে আমার হাতেই দিত। একবার একটা হরিণের বাচ্চা আনিয়া আমাকে দিয়া বলিয়াছিল, দাদা, তোমার জন্যে আনিয়াছি। সে আমাকে দাদা বলিত। আমি তাহাকে দাদা বলিতাম। হরিণটা বাঁচে নাই। যেদিন মরে, সেদিন খুব কাঁদিয়াছিলাম। তাহার পর কাশী যখন গেলাম, তখন আর দীর্ঘদিন দেখা হয় নাই। আমরাও আসি নাই। তাহারও যাইবার শক্তি ছিল না। একাদশ বৎসর পর আমি সতের বৎসরের হইয়া দেশে আসিলাম। তখন আমাকে দেখিয়া তাহার সে কি বিস্ময়! আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছিল, এ যে রাজপুত্র হইয়া উঠিয়াছ দাদাঠাকুর। ছেলেবেলায় মনে হইত, তুমি তোমার বাবার মত দেখিতে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ঘরের গুরুপুত্র গুরুপুত্র চেহারা হইবে তোমার বাবার মত। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি দাদাঠাকুর, অনেকটা মামার মত, রায়-হুজুরের মত গো। চোখের চাউনি অবিকল। নাকের ডগাটাও নাকি তেমনি ফুলিয়া উঠে। কপালে তেমনি তিন-চারিটা রেখা দেখা দেয়। সব মনে পড়িতেছে। তাহার পর নীলকর রবিনসন সাহেবদের সঙ্গে কলহে-বিবাদে, সরকার জমিদারের সঙ্গে বিবাদে সেই ছিল আমার দক্ষিণহস্ত। শেষ আমার পিতা যখন শ্যামনগর পুড়াইয়া দেন, তখন তাহার স্ত্রী-পুত্র পুড়িয়া মরিল। আমি আবার রায়বাড়ীর মালিক হইয়া তাহার বিবাহ দিয়াছি। সে ইদানীং আমাকে তেমন করিয়া ঘনিষ্ঠভাবে পাইত না বলিয়া অভিমান করিলেও, তাহা অপেক্ষা আপনার লোক আর কে আছে?

সেই ঠাকুরদাসদাদা, আজ খুন হইয়া গেল!

হইল বলিতে গেলে তাহার পুত্রের অপরাধে। আমার পুত্র দেবেশ্বরের অপরাধে। পিক্রুর ভগ্নী ভায়োলেটকে লইয়া। লিখিতে আমার লেখনী অবশ অক্ষম হইয়া আসিতেছে। এবং ভীত হইতেছি। মনে হইতেছে বংশাশ্রিত সেই অপরাধের অভিশাপ পারদের মত অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবেশ্বর আমার পুত্র। সে আমার ভয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুরদাস আমাকে গ্রাহ্য করিল না। ঠাকুরদাস তাহার অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়া আমার মুখের উপর বলিল—। আমি আতঙ্কিত হইলাম, একথা সে জানিল কি করিয়া? একথা জানিতেন পাঁচজন—পিতৃদেব, মাতাঠাকুরাণী, মাতুল ও পিসেমহাশয়, আর জানিতেন পূজ্যপাদ রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন। গিরীন্দ্র আচার্য জানিলেও জানতে পারেন। কিন্তু ঠাকুরদাস জানিল কোন্ সূত্রে? সে আমাকে ভয় দেখাইল—সে প্রকাশ করিয়া দিবে। আমি গর্জন করিয়া উঠিলাম, তবু সে ভীত হইল না। পিক্রু তাহাকে ধমক দিল। ভায়োলেটের ভাই হিসাবে সে নালিশ করিয়াছিল আমার কাছে। তাহার উপর সে আমার প্রিয়পাত্র, দেহরক্ষী। সেও ধমক দিল। ঠাকুরদাস তাহাকে বলিল, তুইও ধমক দিস যে। বেটা নিজের বোনের

দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইতেছিল ? পিক্রু ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ঠাকুরদাসও রুখিয়া উঠিল। আমি বাধা দিলাম। না—। ঠাকুরদাস উদ্ধতভাবে বলিল, আয় তবে বাহিরে আয়। দেখি তুই কেমন গোয়ান আর আমি কেমন সদ্‌গোপের পুত্। আয় বাহিরে আয়। বলিয়া সেই আগে বাহিরে গিয়া তাহাকে আহ্বান করিল। যাইবার সময় পিক্রু আমার দিকে তাকাইয়াছিল। আমি কিছু ইসারা করিয়াছিলাম ? না, মনে পড়িতেছে না। তবে মনে মনে চাহিয়াছিলাম। পিক্রু তাহা বুঝিয়াছিল। সে ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া বাহিরে পড়িল, তাহার পর আয়—আয় বলিয়া আগাইয়া গেল। চক্ষের অন্তরালে চলিয়া গেল, আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, ক্রোধে অধীর হইয়া ভাবিতেছিলাম, পিক্রু যদি হারিয়া যায়, তবে ঠাকুরদাস হয়তো উচ্চকণ্ঠে রায়বংশের সেই কথা চীৎকার করিয়া বলিয়া দিবে। কি করিব ? এমন সময় পিক্রু ছোরা হাতে লইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল, উস্কো জান হাম লে লিয়া হুজুর।

আমি বজ্রাহত হইয়া গেলাম।

লোকজনে এতক্ষণে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পিক্রু বলিল—ঠিক হ্যায়, পাকড়াও হামে। হামার বহিনের বেইজ্জতির হামি বদ্‌লা লে লিয়া। মেঁইরী হামাকে জরুর মাপ করবেন। হাঁ, জরুর মাপ মিলেগা আমার।

আমি বোধ হয় টলিতেছিলাম। কে যেন আমাকে ধরিয়া ফেলিল। মাথায় মুখে জল দিয়া শোয়াইয়া দিল। বাকি দিনটা শুধু শুইয়াই ছিলাম। ঠাকুরদাসের জন্ম কাঁদিয়াছি। ঠাকুরদাসদাদা নাই। কিন্তু দোষ আমার নহে, তাহার।

সে আমাকে ওই কথা প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়া ভয় দেখাইল। সম্ভবতঃ আমার পুত্র এ কথা বলিলে—ঠিক এমনি পরিণতি ঘটিয়া যাইত। ঠাকুরদাস তাহার বাল্যের দাবীতে আজিকার সম্পর্কটা ভুলিয়া গিয়াছিল।

* * *

খাতাখানা বন্ধ করে রেখে দিলাম সুলতা। মাথার ভিতরটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। এরপর ? এরপর কি করে কি বলে তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াব ?

গোপন ক'রে রাখব তোমার কাছে ? না, সে ইচ্ছে আমার হয়নি। অনেক ভেবে ঠিক ক'রেছিলাম তোমার কাছে ফিরব—তোমাকে ডেকে ডায়রীর পাতা পড়াব। সমস্ত বলব। ব'লে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব—এরপর কি তুমি এই ঘটনা সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে ফেলে আমার জীবনের সঙ্গে জীবন জড়াতে পারবে ?

সারাটা দিন উদ্‌ভ্রান্তের মত ওই ঘরটার মধ্যেই বসে ছিলাম। স্থির কিছু করতে পারিনি। যেটা স্থির করি সেটা আবার অস্থির হয়ে যায়।

যে প্রশ্ন নিজে নিজেই করেছিলাম—সুলতা কি সব শুনে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে ? উত্তর নিজেই দিয়েছিলাম—পারুক না-পারুক গিয়ে তাকে বলা উচিত। বলব। আর কেনই বা মুছে ফেলতে পারবে না ? কিন্তু তবু যেন বাধোবাধো ঠেকছিল। কি ক'রে বলব তোমার ঠাকুরদা'র ঠাকুরদা আমার প্রপিতামহের প্রজা ছিলেন, অনুগত জন ছিলেন, তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্ম আমার প্রপিতামহ তাকে একরকম খুন করিয়েছিলেন। এবং ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন যদি তোলো তো বলতে হয় ন্যায়-অন্যায় বিচার থাক, তবু বলতে হবে অন্যায় জেদ আবদার এবং অশোভন ঔদ্ধত্য প্রথম থেকে ঠাকুরদাস পালই দেখিয়েছেন। ওই পিক্রু গোয়ানের বোন —তার নাম ছিল ভায়োলেট, সে নাকি বিচিত্রভাবে পেয়েছিল তার পোর্টুগীজ পিতৃপুরুষের রূপ;

তার ছিল অনেকটা ফিরিঙ্গী মেয়ের চেহারা, পোড়া সাদা রঙ, নীল চোখ, পিঙ্গল চুল ; আর প্রকৃতিতে ছিল চঞ্চল দুর্দান্ত। পনের-ষোল বছরের কিশোরী। রত্নেশ্বর রায়ের বড় ছেলে দেবেশ্বরের কথা শুনেছ ; আমাকে দেখে আমার মেজঠাকুরদা বলেছিলেন—তিনি ছিলেন রায়-বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ। ওই দেখ তাঁর ছবি।

সুরেশ্বর উঠে গিয়ে একখানা ছবির সামনে দাঁড়াল, সুলতা তাকালে ছবিখানার দিকে। সত্য কথা বলেছে সুরেশ্বর। সত্যই দুর্লভ সুপুরুষ।

মনে পড়ল সুলতার—সুরেশ্বর বলেছে একটু আগে যে ওর মেজঠাকুরদা বলেছিলেন ওকে—তাঁর থেকেও তুমি যেন সুপুরুষ হে!

না—তা নয়। সে কথা সুলতা মানতে পারবে না। তবে সুরেশ্বরের মধ্যে তাঁর আদল আছে। উজ্জ্বল দীপ্ত মুখ, রায় বংশের চোখ বড় বড় কিন্তু দৃষ্টি তাদের উগ্র। এঁর চোখে উগ্রতা নেই, মাধুর্য এবং কৌতুকের একটি সংমিশ্রণ রয়েছে চোখে। তাও খানিকটা সুরেশ্বরের আছে, কিন্তু সেও এঁর মত নয়।

—দেখেছ!

—হ্যাঁ। হাসলে সুলতা। জমিদার ধনীর ছেলের প্রতীক বলা যায়।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ, তা বলতে পার, সেকালের খুব প্রগ্রেসিভ মানুষ। পৃথিবীর সমস্তকে শুধু ব্যঙ্গই করতেন না, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের বঙ্গ সংস্কৃতির যে ভাগটা খাঁটি বিলেতি সভ্যতার উপাসনা করতেন, তাঁদের মধ্যে এক খণ্ড হীরকের মত উজ্জ্বল মানুষ ছিলেন। কিন্তু সে কথা পরে বলব। এখন এই ছবিটা দেখ সুলতা, এই 'ভায়লা পিক্রস'—ভায়োলেট! অবশ্য আমার কল্পনা করে আঁকা। ঠিক সে কেমন ছিল জানি না, তবে একটু আগে বলেছি 'কুইনি' নামে একটি তের-চৌদ্দ বছরের মেয়েকে দেখেছিলাম গোয়ানদের সমাজনেত্রী হিলডার সঙ্গে। কলকাতায় মা-বাপ মরে যাওয়ায় এখানে এসেছে। বাপ ছিলেন একজন বাঙালী ক্রীশ্চান। মুখার্জি। সে হল ভায়োলেটের মেয়ের ছেলের মেয়ে। তার চেহারাটা নিয়েছি। কিন্তু রঙে উগ্রতা দিয়েছি। কুইনীর চোখে হারমাদী পূর্ব-পুরুষের চোখের আভাস আছে, তাকে আরও নীল করে দিয়েছি। পরনে দিয়েছি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীর ফিরিঙ্গী মেয়েদের পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঝোলা ফ্রক।

সুলতা বললে—কিন্তু কোমর থেকে পিঠ থেকে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত ওড়না দিয়েছ কেন?

—তার কারণ সেকালে গোয়ানপাড়ায় ওরা ওইভাবে ওড়না ব্যবহার করত। সে কথা পরে বলব সুলতা। এখন আসল কথায় আসতে দাও। রাত্রির পরমায়ু ফুরিয়ে আসছে। সকালে তোমাকে চলে যেতে হবে। এর মধ্যে আমার সব কথা—রায় জমিদারদের জবানবন্দী—শেষ হবে না জানি। তুমি মাইনে করা আদালতের বিচারক নও, তুমি বিনা মাইনেতে দেশের কাজ কর, মাইনে নিয়ে কলেজে পড়াও। কাল তুমি আসবে না। তবু যতটুকু পারি ততটুকু বলে নি।

এই ভায়োলেট মেয়েটি তখন নিরুদ্দেশ হয়েছে কিছুদিন। গোয়ানরা—যে গোয়ানরা ক' বছর আগে পর্যন্ত নদীতে ডাকাতি করেছে, যাদের পূর্বপুরুষরা ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল দেশে, শুধু লোকের সম্পদই লুটত না, ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী লুঠে নিয়ে গিয়েও বেচে দিয়ে আসত ; তাদের মেয়েরা নিরুদ্দেশের সঙ্গে তাদের কোন ছেলে নিরুদ্দেশ হলে তারা রাগ করত, কিন্তু তা না হ'লে তাদের মর্যাদাহানি হ'ত এবং তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। খুঁজত কার সঙ্গে পালাল।

সংসারে জাতই বোধহয় ইজ্জতের সিংহাসন বল সিংহাসন, বেদী বল বেদী।

ঠাকুরদাস পালের মৃত্যুদিনের বৃত্তান্ত ডায়রী থেকে আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রতিটি পাতা আমাকে পড়তে হয়েছিল। এর মধ্যে পেয়েছিলাম—রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় হঠাৎ কলকাতায় গিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন এই ভায়োলেটকে। এই জানবাজারের বাড়ীর বন্ধ দরজায় সে মাথা কুটছিল আর চীৎকার করে ডাকছিল রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেশ্বর রায়বাবুকে।

ঘটনাটা তিনি জেনেছিলেন তার কাছ থেকে। মেয়েটা প্রেমে পড়েছিল নবীন এই রায়-বাবুর। নবীন রায়বাবুও তাকে চেয়েছিলেন বিলাসের জন্য। নবীন রায়বাবুর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিল গোপালচন্দ্র পাল। ঠাকুরদাস পালের দ্বিতীয় পক্ষের জ্যেষ্ঠপুত্র। ঠাকুরদাস পাল যেমন ভালবাসত রত্নেশ্বর রায়কে, গোপালও তেমনি ভালবাসত দেবেশ্বর রায়কে। দেবেশ্বরের ছিল সে গোপালদাদা।

রায়বাহাদুর এদিনের ডায়রীতেও লিখেছিলেন—এ বংশের উপর পরমাপ্রকৃতি পরমেশ্বরীর কাছে অপরাধের এ মহাঅভিশাপ আমার আজন্মের কৃচ্ছ্রসাধন তপস্যাতেও শান্ত হয় নাই। সে অভিশাপ আসিয়া ফলিয়াছে আমার পুত্রের মধ্যে। ইহা হইতে কি নিষ্কৃতি নাই? আমি বন্ধ দরজায় সজোরে করাঘাত—অবশেষে পদাঘাত করিতে লাগিলাম। ভিতর হইতে সাড়া কেহ দিল না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই গৃহমধ্য হইতে বন্দুকের শব্দ উঠিল।

সুলতা, বাপের ভয়ে দেবেশ্বর রায় বন্দুকে টোটা পুরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। চেয়ারে বসে কার্টিজ পোরা বন্দুকের নল বুকে লাগিয়ে পা দিয়ে ট্রিগার টেনেছিলেন। নড়া-চড়ার মধ্যে নলটা বুক থেকে সরে এসেছিল একপাশে। ফলে গুলিটা বগলের দিকে মাংস ভেদ ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তারপর দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে রায়বাহাদুর দেখেছিলেন, পাশে বন্দুক নিয়ে ছেলে পড়ে আছে রক্তাক্ত দেহে।

ভায়লাও এসেছিল—সে বুক চাপড়ে কেঁদে আছড়ে পড়েছিল।

পাওয়া যায়নি গোপালকে, সে ভয়ে রান্নাঘরের একতলা ছাদের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পাশের গলিটাতে পড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

* * *

সুরেশ্বর কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যেন তার জবানবন্দীতে একটা ছেদ টেনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

সুলতা এতক্ষণ প্রায় নির্বাক হয়ে ধৈর্য ধরে শুনে আসছিল। এবার সে একটু চকিত হয়ে বললে—দেবেশ্বর রায়—? কথা শেষ করতে পারলে না।

সুরেশ্বর বললে—বেঁচেছিলেন। পায়ে ট্রিগার টিপবার সময় বন্দুকটার নল খানিকটা ঝাঁকিতে খানিকটা নড়েচড়ে স'রে গিয়েছিল। বলেছি সে কথা। তিনি না বাঁচলে আজ সুরেশ্বর রায় পৃথিবীতে এসে এই ১৯৫৩ সালের নভেম্বরের রাত্রে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাস উপলক্ষ করে তোমার সামনে জবানবন্দী দিত না। এই সব ছবি এঁকে এক্জিবিশন করত না। দেবেশ্বর রায়ের তখন বিবাহ হয়ে গেছে। বধূটি তৎকাল অনুযায়ী বালিকা। দেবেশ্বর ছিলেন আধুনিক। তিনি এ বিবাহে রাজী ছিলেন না। বীরেশ্বর রায়ের কালের তুলনায় সেকালে ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়লেও রত্নেশ্বর রায় ছিলেন গোঁড়া মানুষ। তিনি ছেলের উনিশ বছর বয়েসে একটি দশ বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। দেবেশ্বর রায়ের বিয়েতে সকল কাজেই সকলের আগে ছিলেন ঠাকুরদাস পাল। বিয়ের গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে

গেছেন তিনি, বর কনে যখন কীর্তিহাটে আসে বজরায় তখন তার ভার ছিল তাঁর হাতে। আর দেবেশ্বর রায়ের বরাভরণ, গার্ডচেন, ঘড়ি, হীরের বোতাম, দু হাতের চারটে দু হাজার টাকা দামের আংটি, তাঁর এসেন্স—পমেটম থেকে সমস্ত বিলাসদ্রব্যের ভার ছিল ঠাকুরদাসের বৃদ্ধ বয়সের পুত্র আদরের গোপালের উপর।

সুলতা একটু হাসলে।

সুরেশ্বর প্রশ্ন করলে—তুমি হাসলে সুলতা?

—তুমি আমার কাছে আস নি সেদিন ফিরে, সে ভালই করেছিলে।

—কেন?

—আমার ঠাকুরদার কাকা তোমার ঠাকুরদার খানসামা ছিলেন। ঠাকুরদাস পালকে খুন করার ঘটনা—তিনি তোমার পূর্বপুরুষের প্রজা ছিলেন এ ঘটনাটা বিচার করে যদি বা ভুলে গিয়ে পথ পাওয়া যায়, এই কথাটা ভুলতে পারার আর পথ নেই!

সুরেশ্বর চুপ ক'রে রইল। একটু পরে বললে—আমি ভুলতে পারতাম। ভুলতে পারতাম এ কথাই বা বলছি কেন—কথাটা আমার মনেই হয় নি।

—না হতে পারে। আমার মনে হ'ত। কারণ যারা বড় ছিল, তারা ভুলতে পারে কিন্তু যারা ছোট ছিল তারা ভুলতে পারে না। যাক, কথা তোমার শেষ কর। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি কি কথা তিনি প্রকাশ করে দিতে ভয় দেখিয়েছিলেন, তিনি মানে ঠাকুরদাস পাল, যাতে রায়বাহাদুর এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। যা তিনি ডায়রীতে লেখেন নি। তবে একটা কথা বলেছ, রায়বাহাদুর লিখেছেন ডায়রীতে, অদৃষ্টের চক্রান্তে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে লিখেছেন—অদৃষ্টের চক্রান্তে আমি আজ পোষ্যপুত্র হয়ে ফিরে এলাম আমার জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীর সন্তান-রূপে। বিমলাকান্ত কি চুরি করেছিলেন এঁদের সন্তানকে? না—।

কথায় প্রশ্ন না করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

সুরেশ্বর হেসে বললে—না—তিনি করেন নি।

—তবে?

—করেছিলেন বিমলা দেবী। বীরেশ্বরের সহোদরা। যাঁর সন্তান হয়ে হয়েই মারা যেত। একদিন পুরো নয়—ঘণ্টা দশেক আগে-পিছু রায়বাড়ীতে দুটি সন্তান এসেছিল। আগে বিমলার সন্তান এল, তারপর ভবানী দেবীর। দ্বিতীয় দিনে বিমলার সন্তানের অসুখ হল। যেমন অসুখ হয়ে তার সব সন্তানগুলো গেছে, যেমন যেত বিমলা দেবীর মা সোমেশ্বর রায়ের স্ত্রী রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবীর। যিনি রূপের ভাণ্ডার নিয়ে এসে রায়বাড়ীতে রায়বংশের প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিমলা ছিলেন পাগল। অন্তর্বত্নী হলেই তাঁর পাগলামি ভাল হ'ত। সন্তান হয়ে মারা গেলে আবার পাগল হতেন। তিনি তাঁর ছ-আনা অংশের সম্পত্তি কে ভোগ করবে এ ভাবনাতেই পাগল হতেন হয়তো। তিনি গভীর রাত্রে তাঁর নিজের রুগ্ন সন্তান নিয়ে ভ্রাতৃবধূর ঘরে ঢুকে সন্তান বদল করে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর খেয়াল ছিল না যে সেই গভীর রাত্রে বীরেশ্বর রায় লুকিয়ে সূতিকাঘরে ঢুকেছিলেন—সন্তানের মুখ দেখতে।

বীরেশ্বর রায়—বীরেশ্বর রায় হলেও কালটা সেকাল। লজ্জায় বীরেশ্বর রায় হয়েছিলেন অন্তরালবর্তী। ভবানী দেবীও চোখ বুজেছিলেন লজ্জায়। তাঁরা ভেবেছিলেন পাগল বিমলা-দেবী নিজের সূতিকাঘর ভেবেই ঢুকেছেন—এই বাড়ীতেই সেটা সুলতা। তুমি তো দেখেছ মাঝখানকার যে হলটা যে হলটায় বীরেশ্বর রায় বসতেন—তার এপাশ থেকে যে করিডোরটা অন্দরে গেছে, তার প্রথমেই দু পাশের দুখানা ঘরে ঘটেছিল এই ঘটনা। সামনাসামনি ঘর।

এ দু' ঘরেই দুজনের সূতিকাগার। বিমলা দেবী চোরের মত ঘরে ঢুকে নিজের রুগ্ন ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে বীরেশ্বরের পুত্রকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ভবানী দেবী—বীরেশ্বর রায় দুজনের কণ্ঠ থেকে একটি শব্দ বের হয়নি, হ'তে পারেনি। ভবানী দেবী রুগ্ন ছেলের পাশে পাথরের মূর্তির মত বসে ছিলেন। বীরেশ্বর অধীর হয়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ বিমলাকান্ত এসে তাকে বলেছিলেন—শান্ত হও বীরেশ্বর, আমি সব শুনেছি। শুনেছি কেন, আমিও দেখেছি। সূতিকাঘর দুটির পাশেই ছিল বীরেশ্বর রায় এবং বিমলাকান্তের শোবার ঘর। রায়বাড়ীতে এ ব্যবস্থা রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবীর আমল থেকে। তিনি যখন দশ বছর বয়সে রায়বাড়ী আসেন, তখন থেকেই তিনি সংসারের গৃহিণী। তাঁর নিজের সন্তান হয়ে বাঁচত না। বেঁচেছিল তান্ত্রিক শ্যামাকান্তের তন্ত্রমন্ত্রে কি ক্রিয়াকর্মের ফলে। কাত্যায়নী দেবী স্বামীকে পাশের ঘরে শুইয়ে রাখতেন। সোমেশ্বর রায়ও শুতেন। কারণ শোকের মুহূর্তে কাত্যায়নীর পাশে না থেকে তিনি পারতেন না।

নিজের কন্যার প্রথম সন্তান যখন মরল, তখন তিনিই এ ব্যবস্থা করেছিলেন। অথচ যখন কন্যা প্রথম পাগল হয়, তখন তাকে কীর্তিহাটে আনবার সময়, তিনি জামাতার জন্য দাসীর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।

হাসলে সুরেশ্বর।

তারপর বললে—যা বলছিলাম, যা প্রশ্ন করেছ তার কথাই বলি সুলতা। রাত্রি বুঝি শেষ হয়ে আসছে। বিমলাকান্ত বীরেশ্বরকে বলেছিলেন—তুমি শান্ত হও বীরেশ্বর, আমি সব দেখেছি। কাল যখন রাত্রে ভবানীবউমার ঘর থেকে ছেলে তুলে নিয়ে এল, তখনই আমি গিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। মেঝেতে এগুনিটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিমলা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমার মনে হল, হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। তবু আমি যাই নি। দাঁড়িয়েই ছিলাম। যাক, অজ্ঞান হলে আমি অন্তত তোমার সন্তান তোমাকে ডেকে জাগিয়ে দিয়ে আসতে পারব। কিন্তু কিছুক্ষণের পর নিজেকে সামলে নিয়ে বিমলা বললে—যাও, তুমি-শোও গে। নইলে চেঁচিয়ে আমি গোল করব। বলব—আমার আঁতুড়ে ঢুকছে। আমি বললাম—কি করলে? বিমলা বললে—বেশ করেছি। আমার ভাগের সম্পত্তি খাবে কে? বললাম—ওই ছেলেই খাবে। বললে—হ্যাঁ খাবে, আমার ছেলে হয়ে খাবে।

বীরেশ্বর আশ্বস্ত হয়েছিলেন। বিমলা দেবীর সন্তান ভবানী দেবীর সূতিকাঘরে মারা গিয়েছিল। লোকে বলেছিল, এবার কাত্যায়নী দেবীর মৃতবৎসা রোগ মেয়েকে ছেড়ে ছেলের বউকে ধরল। সোমেশ্বর রায় জেনেছিলেন। তাঁকে বলেছিলেন বীরেশ্বর এবং বিমলাকান্ত। সোমেশ্বর বলেছিলেন—তোমার আরও সন্তান হবে বীরেশ্বর। ওর আর হবে না। হলেও বাঁচবে না। ওই ছেলেকে আমি অর্ধেক সম্পত্তি দেব। বাকী তোমার সন্তানদের মধ্যে ভাগ হবে। আর ওকে তুমি পোষ্যপুত্র নেবে। তার স্বীকারপত্র বিমলাকান্ত তোমাকে লিখে দেবে।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা হ'লে ওর নাম থাকবে রত্নেশ্বর।

সুলতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—এ তুমি কি বলছ সুরেশ্বর?

সুরেশ্বর বললে—সে পত্র আমি পেয়েছি সুলতা!

—কিন্তু—? ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল সুলতার। বিমলাকান্ত আর দিতে চান নি? তাই এত রাগ—

—না সুলতা। তারপর এমন বিচিত্র ঘটনা ঘটল, যাতে বীরেশ্বর রায় আর বলতে সাহস

করলেন না যে ওটি তাঁর পুত্র। ছেলেটি যখন এক বছরের তখন সোমেশ্বর রায় মারা গেলেন। উইলে লিখে গেলেন—বিমলা দেবীর পুত্র সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবেক। কিন্তু তাহাকে রায়বংশের গোত্র ধারণ করিতে হইবেক। সেই কারণে মদীয় পুত্র তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তার পর ছেলেটি যত বড় হতে লাগল, তত মনে হ'ল এ ছেলে অবিকল বিমলাকান্ত!

চীৎকার করে উঠল সুলতা—সুরেশ্বর!

তার মনে পড়ল—বীরেশ্বর রায় বার বার তাঁর স্মরণীয় ঘটনার খাতায় ভবানী দেবীকে পাপিনী বলেছেন।

ঠিক সেই সময়ে পাখী ডেকে উঠল।

কলকাতাতে পাখীরা ডাকে, গ্রামের মত কলরব করে! ভোর হয়ে আসছে। সুরেশ্বর বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলে কাচের জানালাগুলো বন্ধ।

সে দৃষ্টি ফিরিয়ে সুলতার দিকে তাকিয়ে বললে—না সুলতা, ওই মহিমময়ী জননীটি আমাদের বংশের মহাপুণ্য। এই রাত্রি শেষ হচ্ছে। ভোরের আলো ফুটছে। উনি ঠিক এই মুহূর্তটির মত। উনি ওর পিতৃবংশে পিতা এবং স্বামী বংশে স্বামীকে বলতে গেলে উদ্ধার করেছেন।

তোমার মত আমারও উদ্বেগের উৎকণ্ঠার আর সীমা ছিল না।

সেদিন—কীর্তিহাটে, যেদিন রাত্রে রায়বাহাদুরের ডায়রীতে, ঠাকুরদাস পালের খুন হওয়ার দিনের ডায়রী পড়ে আমি ভাবছিলাম তোমার কথা, আর বংশের যে পাপের কথা কিছুতেই লিখতে পারেন নি রত্নেশ্বর রায়—সেই কথাটির কথা। প্রায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। স্নান করি নি খাই নি। বার বার ডায়রী পাল্টেছি। পড়তে শুরু করেছি সেই গোড়া থেকে। মেজঠাকুমা এসে ফিরে গেছেন। তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, আমি রূঢ় কথা বলেছি। রঘুয়া আমার ভয়ে সামনে আসতে পারে নি। সন্ধ্যার সময় একবার সাহস করে অর্চনা এসেছিল—তার পিছনে মেজঠাকুমা ছিলেন।

অর্চনা বলেছিল—সুরেশ্বরদা!

রাগ হয়েছিল, সে রাগ চেপে অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলাম—নায়েব এখনও মেদ্‌নীপুর থেকে ফেরে নি অর্চনা।

অর্চনা মুখরা মেয়ে এবং সাহসী—তা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে—সেও দমে গিয়েছিল।

একটু পরে বলেছিল—ওই অতুলদা'র কথা ছাড়া আর কি কোন কথা নেই আমাদের সুরোদা?

আমি বলেছিলাম—থাকলেও এখন কোন কথা বলবার মত সময়ও নেই, মনের অবস্থাও নেই, অর্চনা।

অর্চনা বলেছিল—চল ঠাকুমা!

ব'লে সে মেজদিকে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

রাত্রে ঘুম আসে নি। আমি সকালবেলা থেকে অতুলের দৃষ্টান্ত মনে করে সংকল্প করেছিলাম—যে মদ্যপান আর করব না। কিন্তু রাত্রে মদ্যপান করেছিলাম—ঘুমের জন্য। রঘু সভয়ে খাবার এনে নামিয়ে দিয়েছিল। খিদেও ছিল, খেয়েছিলামও। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সুরার প্রভাবে।

এমনি ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছিল রঘুর ডাকে।

রঘুয়া এসে ডেকে বলেছিল—পুলিশ!

—পুলিশ?

—হ্যাঁ, গাদা গাদা। চারিদিক ঘেরাও করেছে।

চমকে উঠেছিলাম। জানালায় গিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম—পুলিশ গিজগিজ করছে। ঘেরাও করেছে চারিদিক। রায়বাড়ীর চারিদিক। আর্মড পুলিশ।

তারাই এ সত্যগুলি আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়ে গেল খানাতল্লাসীর সময়।

সুরেশ্বর বললে—গোটা রায়বাড়ী সার্চ করেছিল পুলিশ। গতবার কেবল অতুলেশ্বরের অংশের ঘর সার্চ করে চলে গিয়েছিল। এবার গোটা বাড়ীটা।

সর্বাগ্রে সার্চ করেছিল রত্নেশ্বর রায়ের খাস কাছারী। যে ঘরটায় অতুল ওই নিষিদ্ধ ভয়ানক বস্তুগুলি লুকিয়ে রেখেছিল, সেই ঘরখানা।

আমি বিবিমহলেই বসেছিলাম। গত রাত্রি পর্যন্ত যে চঞ্চলতা, অধীরতা আমাকে অধীর করে রেখেছিল, তা ওই পুলিশবাহিনী দেখেই যেন স্থির হয়ে গেল। চিন্তা শুধু একটি। অর্চনা এবং মেজদি। মেজদির জন্যে খুব চিন্তা ছিল না। কারণ মেজদির সঙ্গে অতুলেশ্বরের ঘনিষ্ঠতা মা ও সন্তান হিসেবে। তাছাড়া তিনি ইংরেজ তাড়াবার জন্যে কোমরে কাপড় জড়িয়ে লাগবার মত প্রচণ্ডা একথা চট্‌ করে কেউ মনে করবে না। ভয় অর্চনার জন্যে।

মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করছিলাম—অতুল মারধর খেয়ে সব বলে ফেলে নি তো? বাংলাদেশে বিপ্লবের ইতিহাসে জমিদার ও ধনীর ছেলে নরেন গোসাঁই মানিকতলা বোমার মামলায় অ্যাপ্রুভার হয়ে জমিদার-সন্তানদের অবিশ্বাসী প্রমাণ করে গেছে। তার উপর এই রায়বংশ। হঠাৎ মনে হয়েছিল, ব্রজেশ্বরদার কথা। ব্রজেশ্বরদা যাবার সময় সব বলে দিয়ে যায় নি তো? অসম্ভব নয়! সে সব পারে!

ঠিক এই সময় একজন পুলিশ-অফিসারকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছিলেন দেবোত্তরের এজমালী নায়েব। আমি একটু চকিত হয়েছিলাম নিশ্চয়। নায়েব বলেছিলেন—এ কাছারী হল এই সুরেশ্বরবাবুর।

জিজ্ঞাসা করতে হল না, অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—ওই কাছারীঘরখানা আপনার?

নায়েব বুঝিয়ে দিলে—ওই খাস কাছারী রায়বাহাদুরের—ওই ঘরের চাবি চাচ্ছেন।

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। বুঝলাম, পুলিশের এই সার্চটির পিছনে নিশ্চিত সংবাদ আছে। নিছক সন্দেহবশে এ সার্চ নয়।

অফিসারটি বললেন—আপনি সঙ্গে আসুন, আর চাবিটা চাই।

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম—চাবি তো আমার কাছে নেই। চাবি আমার এখানকার কর্মচারীর কাছে আছে, তিনি কাল মেদিনীপুর গেছেন, ফেরেন নি।

—অতুলেশ্বরের জামিনের জন্যে গেছে?

—হ্যাঁ।

—উনি আপনার কে?

—কাকা। আমার বাবার আপন খুড়তুতো ভাই।

—আপনারা তো পৃথক।

—হ্যাঁ। অনেক দিন থেকে।

—তবে?

—পাঠিয়েছি, আমার কর্তব্য বলেও বটে, আর এমন কোন মারাত্মক অপরাধ সে করে নি,

এটা আমার বিশ্বাস বলেও বটে।

—ও আচ্ছা। আসুন। তালা তাহলে ভেঙেই ফেলতে হবে। সার্চের সময় আপনি উপস্থিত থাকবেন।

আমার আজ বয়স চুয়াল্লিশ, ১৯১০ সালে আমার জন্ম। ১৯৩৬ সালে আমার বয়স ছিল সাতাশ। বাবা বিবাহ করেছিলেন ১৯০৮ সালে। তারপরই তিনি এসব মেরামত করিয়েছিলেন। সে মেরামতের সময়েই এ ঘর মেরামত হয়েছিল। এবং সেই সময় থেকেই আর খোলা হয় নি। কড়া হুকুমে বন্ধ ছিল। কারণ এই মেরামতের বছর কয়েক আগে মেজঠাকুরদার এক কন্যার বিবাহে এ ঘর খুলে দেওয়া হয়েছিল বরযাত্রীদের ব্যবহারের জন্যে। বরযাত্রীরা এ ঘরে উপদ্রবের বাকী রাখে নি। পুরনো আমলের ঝাড়লণ্ঠনগুলো লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। একখানা মূল্যবান পুরনো গালিচা ক্ষুর দিয়ে কেটে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে এ ঘর ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর যে কড়া নির্দেশ তা কখনও শিথিল হয়নি। এবং মেজতরফ যতই অভাবে পড়ে ছোট কাজ করে থাক, এদিকে তাদের আভিজাত্যের উঁচু মাথা কখনও হেঁট করেন নি। এ খাস-কাছারীর সীমানা তাঁরা মাড়াতেন না। নিষেধ ছিল। শুধু অতুলেশ্বর জানলার শিক সরিয়ে ওই জিনিসগুলো রাখতে এ ঘরে ঢুকেছিল গোপনে। সেই পথেই আমি ঢুকেছিলাম সেদিন রাত্রে চোরের মত।

পুলিশ অফিসারদের হুকুমে হাতুড়ি পিটে পুরনো মরচে-ধরা তালাটা ভেঙে ফেলে, কনেস্টবলেরা বুটের লাথিতে খুলে দিল দরজাটা। মোটা ভারী সেগুন কাঠের দরজা দুটোও দীর্ঘকাল বন্ধ থেকে যেন জমে গিয়েছিল। প্রবল ধাক্কায় খুলবার সময় এক পাল্লা দরজার একটা কব্জা ভেঙে গেল। সাতাশ বছরের বদ্ধ হাওয়া একটা গন্ধ নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

দরজা-জানলা খুলে সার্চ আরম্ভ হল। আমি সার্চের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারিনি। আমি ও-বিষয়ে একরকম ভবিতব্যের উপর নির্ভর করে একরকম নিশ্চিন্ত; হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি বলব বল? তাই ছিলাম। আমার দৃষ্টি পড়েছিল রায়বাহাদুরের ছবির দিকে। তাঁর মাথার উপর কুইন ভিক্টোরিয়া এবং প্রিন্স অ্যালবার্টের ছবি। রায়বাহাদুরকে আমি ব্যঙ্গ করিনি। আমি তাঁর ছবি দেখে বীরেশ্বর রায়ের ছবি দেখে মেলাচ্ছিলাম, দুজনের মধ্যে মিল কতখানি, অমিল কতখানি। অমিল বেশী কিন্তু তার মধ্যেও আশ্চর্য মিল চোখের চাউনিতে এবং নাকের গড়নে। নাক আর চোখ এ দুটোর সঙ্গে সম্বন্ধ বড় নিকট।

ওদিকে সতরঞ্চি উঠিয়ে বালিশের গাদা তছনছ করে তার তুলো ছড়িয়ে ঘরটা কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ধুলোর ঘূর্ণি তুলে দিলে। গোটা বিশ-পঁচিশ ইঁদুর ঘরময় ছুটোছুটি করে বেরিয়ে গেল। কিন্তু পাওয়া কিছু গেল না। এমন কি সেই ছেঁড়া বালিশটা, সেটাও নেই। সেটা বিছানার গাদার উপরেই ছিল। একটু বিস্মিত হলাম।

মনের মধ্যে অর্চনার মুখটা ভেসে উঠল। তাছাড়া আর কে হতে পারে?

পুলিশের সার্চ অদ্ভুত স্থূলতা। তারা দেওয়াল থেকে বড় বড় অয়েল পেন্টিংগুলো পর্যন্ত নামিয়ে দেখলে। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে এক সারি কুশন দেওয়া চেয়ার ছিল, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখলে। ঘরের পিছনদিকে যে জানলাটার শিক খোলা যেত, সেটা তারা গোড়াতেই আবিষ্কার করেছিল।

একজন অফিসার বললেন—কেউ নিশ্চয় সরিয়েছে এর মধ্যে। ধুলোর উপর যেন আসা-যাওয়ার চিহ্ন রয়েছে।

—পরশুই সার্চ করা উচিত ছিল।

খোলো, ওই ঘর দুটো খোলো।

হলঘরটার দুপাশে দুটো ছোট কামরা। বন্ধ দরজা দুটোর একটায় তালা ঝুলছিল; কিন্তু তালাটা খুলে গেছে। সেদিন রাত্রে ওটা লক্ষ্য করিনি।

তালাটা টেনে ছাড়িয়ে ফেলে ঘরে ঢুকল পুলিশ।

ঘরখানা ছিল রায়বাহাদুরের খাস কামরা, তিনি এই ঘরে বসে কাজ করতেন। সেক্রেটারীয়েট টেবিল, চামড়ার গদী-আঁটা পুরনো আমলের চেয়ার দিয়ে সাজানো, পাশে একটা প্রকাণ্ড সে-আমলের মেহগনী কাঠের ইজিচেয়ার, দুই কোণে দু প্রকাণ্ড দামী কাঠের সিন্দুক। সিন্দুক দুটোর আলতারাপ দুটো মরচে ধরে নষ্ট হয়ে গেছে।

সেক্রেটারীয়েট টেবিলটার ড্রয়ারগুলো খোলাই ছিল। এবং তার মধ্যে ছিল কয়েকটা পুরনো জিনিস, তার মধ্যে ছিল একটা ভাঙা পেপার-ওয়েট, দুটো কলম, আলপিন কুশন, আর একটা আতরের শিশি। কিছু শুকনো ফুল বিল্বপত্র, সম্ভবতঃ সেগুলো নির্মাল্য। আর একটা ধুলো-মাখানো ছোট পাথর, নীল কাঁচের মত এক কোণে পড়েছিল। সেটা আমি হাতে পরেছিলাম সুলতা, সেটা ছিল মূল্যবান নীলা। তার কথা থাক। পরে যদি কোন দিন সময় করে এস, তবে তোমাকে বলব। এসবগুলো পুলিশ দেখেও দেখেনি, এতে তাদের প্রয়োজন ছিল না। আমি ওগুলো পরে সংগ্রহ করেছিলাম।

পুলিশ ড্রয়ার বন্ধ করতে গিয়ে আধখোলা রেখেই ছেড়ে দিয়ে খুলেছিল ওই ভাঙা দুটো সিন্দুকের একটা। একটা কৌতুক ঘটেছিল। কৌতুক ছাড়া কি বলব। ছোট-বড় গোটা দশেক কাঁকড়া বিছে সিন্দুকটার খোলা ডালার গায়ে লেগেছিল; তারা আলোর ছটায় আর মানুষের সাড়ায় কিলবিল করে নড়াচড়া শুরু করে, ও-ঘরের ইঁদুরগুলোর মতই চারিদিকে পড়ল ছড়িয়ে। যে সিপাহীটা ডালা খুলেছিল, সে আয় বাপ! বলে ডালাটা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এসে পড়েছিল একজনের ঘাড়ে। সে আর একজনের। সঙ্গে সঙ্গে সে এক তাণ্ডব। কে পালাবে আগে তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি। কিন্তু সে মিনিটখানেকের জন্য। তারপরই পুলিশ-অফিসার দুজন একসঙ্গে ধমক দিয়ে উঠতেই তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বুট দিয়ে চেপে মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়া কয়েকটা বিছেকে পা দিয়ে চেপে মেরে দিলে এবং কয়েকটা সিন্দুকের তলায় গিয়ে লুকোলো।

পুলিশ-অফিসার এবার এগিয়ে এসে নিজেই ডালাটা তুলে ধরলেন। তখন ডালা থেকে নেমে তারা বোধহয় সিন্দুকের ভিতরে থাকবন্দী সাজানো কাপড়ে বাঁধা কাগজের দপ্তরের ভিতর লুকিয়েছে। দুটো-তিনটে তখনও দপ্তরের ফাঁকে উপরের দিকেই ছিল, তারা লেজের দিকটা বেঁকিয়ে তুলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

ভিতরের দপ্তরগুলোর দিকে তাকিয়ে অফিসারটি বললেন—এর মধ্যে কিছু থাকবে কি? এত কাঁকড়া বিছে?

অন্য অফিসারটি বললেন—দাঁড়াও জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

এবার ইউরোপীয়ান অফিসার এসে সব দেখে বললেন—দেখতে নিশ্চয় হবে। You must; information is definite. You must.

একটু ভেবে নিয়ে বললেন—ইস্কো বাহার নিকালো। দোনোকো।

অর্থাৎ গোটা সিন্দুক দুটো।

তাই হল। সাহেব আমাকে প্রশ্ন করলেন—কি আছে এতে? কি এগুলো? ছড়ি দিয়ে দপ্তরগুলোকে দেখিয়ে দিলেন।

বললাম—আমি জানি না।

—জানি না? এ ঘর তোমার নয়?

—হ্যাঁ আমার। কিন্তু আজ আমি প্রথম ঢুকছি এই ঘরে। শুনেছি এ ঘর তালাবন্ধ আছে আমার জন্মের আগে থেকে!

—মানে?

মানে সংক্ষেপে যতটা বলা যায় বললাম। সাহেব বললেন—আই সী!

বাইরে সিন্দুক দুটো টেনে এনে, ডালা খুলে উল্টে ফেলে দিলে। ভিতরের দপ্তরগুলো বেরিয়ে পড়ল মাটির উপর। তারপর লাঠি দিয়ে ঠেলে দপ্তরগুলো নাড়া দিয়ে কাঁকড়াবিছের সঙ্কট-মুক্ত করে একটি একটি ক'রে সরিয়ে দেখলে।

এবার বাইরের পূর্ণ রৌদ্রালোকে দপ্তরগুলোকে দেখা গেল ভাল ক'রে। তিনজন অফিসার তিনটে দপ্তর তুলে নিয়ে সন্তর্পণে খুলে দেখলেন।

সুলতা, তারই মধ্য থেকে বের হ'ল—আমি যা খুঁজছিলাম তাই। যা বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনার খাতায় নেই, যা রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লেখেন নি, তাই সব পেলাম ওই দপ্তরের মধ্যে। রায়বংশের গোপন কলঙ্ককথা বল তাই, অথবা বৈদগ্ধ্যের চকমিলান মহলে আঁধার সুড়ঙ্গ বল তাই।

সুলতা বললে—পাখী ডাকছে—সুরেশ্বর। সকাল হতে দেরি নেই—।

সুরেশ্বর বললে—ভুলিনি সে কথা। তবু কথাগুলো এসে পড়ল। এই কথাটাই ভেবে এসেছি এতকাল। কিন্তু সে থাক। এখন সেদিনের কথাই শেষ করে নি। হ্যাঁ, সেদিন যে দপ্তরটা সাহেব দেখছিলেন, সে দপ্তরে বাঁধা কাগজগুলির কোনটি কোন হিসেবের কাগজ নয়—বিষয়ের কাগজ ছিল না, সবগুলি চিঠি। সায়েবটি যে দপ্তরটা খুলেছিলেন তার একখানা চিঠি দেখে বললেন—

My God! Letters—very old letters—1857, September, it is from the District Magistrate of Midnapur to Bireswar Roy. I see.

কিছুটা পড়ে রেখে দিয়ে বললেন—in 1857 these people thought that the Britishers were godsent to this country to save them from the tyrants—Rajas, Maharajas and Nawabs of Bengal and also the Burgee Plunderers from the south, and in 1936 their children are trying to overthrow the same British Government. Ungrateful creatures.

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—Hallo young chap, take this letter. Just read it.

বলে দপ্তরটাসুদ্ধ আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে।

* * *

চিঠিখানার কথাই আগে বলি সুলতা। চিঠিখানা মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়কে। বীরেশ্বর রায়ই প্রথম চিঠি লিখে তাঁকে জানিয়েছিলেন—তিনি কীর্তিহাটে এই সিপাহী বিদ্রোহের দুর্দিনে এসেছেন—এখানে যাতে কোন হাঙ্গামা না হয়, উত্তর ভারতের অপরিণামদর্শী অকল্যাণকর উত্তেজনার প্রচার এবং প্রসার না ঘটে তাই দেখবার জন্য। কলকাতার ১৪ই জুনের অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। নিদারুণ উৎকণ্ঠা ভোগ করেছেন। নবাব ওয়াজিদ আলি শা ও তাঁর দুজন মন্ত্রীকে ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী করা হয়েছে।

কলকাতার ধনী শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই এই অবস্থায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। তাঁদের সকলেই একবাক্যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন যে, এই বর্বর সিপাহীগণের এবং অন্ত প্রদেশের কতিপয় অবিবেচক স্বার্থান্ধ অত্যাচারী রাজা ও জমিদার এর সুযোগ নিয়ে উত্তরভারতে যে সর্বনাশা নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করেছেন, সেই অগ্নির বিস্তার যাতে এই শান্ত ইংরাজানুরাগী বঙ্গদেশে না হয় তার জন্ম প্রাণপণ সমবেত চেষ্টা করতে হবে। আমি মেদ্নীপুরে আমার স্বগ্রামে ও আমার জমিদারী এলাকায় থেকে বেশী কাজ করতে পারব ব'লেই এসেছি এবং অবিলম্বে আমার আসার সংবাদ এবং উদ্দেশ্য আপনাকে জ্ঞাত করা কর্তব্য বোধ করছি। এবং নিবেদন করছি যে, অত্র অঞ্চলে সুসভ্য সুশৃঙ্খল এই ইংরাজ শাসন উচ্ছেদ করবার চেষ্টা যারা করবে তাদের উপর দৃষ্টি রাখাই আমার সংকল্প, এবং সর্ববিধ সংবাদ মাননীয় মহোদয়কে জ্ঞাত করব। অত্র জেলায় পাইক ও চুয়াড় বিদ্রোহ এবং এই কিছুদিন পূর্বে জঙ্গল অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা স্মরণ ক'রেই একথা মাননীয় মহোদয়ের নিকট নিবেদন করলাম।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক এই কথাগুলিই লিখে বীরেশ্বর রায়কে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছিলেন—এসব তথ্য সত্য হলেও ইংরাজ শাসনশক্তি অত্যন্ত সুদৃঢ়। এসব উচ্ছৃঙ্খল শয়তানদের দমন করতে আমরা বদ্ধপরিকর। তোমার এই পত্রে অবশ্যই আমি আনন্দিত হয়েছি, উৎসাহিত বোধ করেছি। কীর্তিহাট জমিদারদের রাজভক্তির কথা সুবিদিত। আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি যে, তুমি এই সঙ্কটের সময় আপনার শক্তির স্বক্ষেত্রে চলে এসেছ। এবং সক্রিয়ভাবে সরকারকে সাহায্য করতে কাজ করছ। বিশ্বস্তভাবে কাজ করছ জেনে খুশী হয়েছি। ভবিষ্যতে শান্তি ও ও শৃঙ্খলা ফিরে এলে সরকার অবশ্যই এ কথা মনে রাখবেন।

দপ্তরটায় বেশীর ভাগ সরকারী চিঠিপত্র। বীরেশ্বর রায়ের আমলের। রায়েরা সে আমল থেকেই শুধু বিষয়-সংক্রান্ত চিঠিপত্র নিয়মিতভাবে ফাইল করার মত থাকে-থাকে সাজিয়ে রাখেন নি, বন্ধুবান্ধবদের চিঠিপত্র তাও রেখে গেছেন। বিখ্যাত রাজনারায়ণ বোসের খানকয়েক চিঠিও পেয়েছিলাম।

ওদিকে তখন দু নম্বর সিন্দুকটা বের করে এনে খোলা হল। সে সিন্দুকে বের হল সব বিচিত্র জিনিস। জড়িবুটি নির্মাল্য থেকে নানান জিনিস; শিলাজতু, মৃগনাভি, রাশীকৃত খালি আতরের শিশি, সে আমলের দামী বিলিতী এসেন্সের শিশি, সমস্ত কিছুতে পুরনো আমলের ডগডগে কালিতে নামলেখা কাগজ আঁটা। জড়ি বুটীর মোড়কেও নাম লেখা আছে। একটা বিচিত্র নাম আমার মনে আছে—'রেসা খাদ্মে'—তার তলায় লেখা আমাশয়ের অব্যর্থ ঔষধ। এ ছাড়া বেরিয়েছিল কতকগুলো ছোরা।

পুলিশ অফিসারেরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ছোরাগুলির বাঁটে কাগজ আঁটা—তাতে লেখা ছিল—'চিতোরের রাজপুত ছোরা', 'মোগল বাদশাহ বংশের ছোরা'; 'মুরশিদাবাদের নবাব বংশের ছোরা'; এই তিনটেই পড়া গিয়েছিল, বাকীগুলোর লেখা বিবর্ণ হয় নি কিন্তু কাগজ ছিঁড়ে দু'একটা অক্ষর ছাড়া বাকীটা ছিল না।

আর পাওয়া গিয়েছিল—ছোট বড় মাঝারি সাইজের দক্ষিণের পিতলের এবং পাথরের পুতুল। শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। কিছু পাওয়া গিয়েছিল নানা আমলের তামা ও রূপোর টাকা।

একটি স্ফটিকের নারীমূর্তি হাতে নিয়ে সাহেব একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখন কাগজের দপ্তর নিয়ে ব্যস্ত। কতকগুলো কাগজ ছড়িয়ে পড়েছে। দপ্তরের কাপড়গুলি সাধারণ কাপড় নয়, রেশমের ঝাড়া থেকে 'কেটে' তৈরি হয়—সেই কাপড়ে বাঁধা। মূল্য

তার ফাইন সিল্ক থেকে কম হলেও মজবুদ বেশী। তাতে লেখা রয়েছে সাল সন এবং বিষয়। আমি ওই ছড়িয়ে পড়া কাগজগুলো কুড়োতে গিয়েও একবার ক'রে চোখ না বুলিয়ে পারি নি। যদি সূত্র পাই!

সাহেব আমাকে ডাকলেন—হ্যালো বয়!

একজন অফিসার বললেন—সাহেব ডাকছেন।

এসে দাঁড়ালাম। বলতে হ'ল—Yes sir.

সাহেব মূর্তিটা দেখতে দেখতেই বললেন—আমি শুনেছি তুমি একজন আর্টিস্ট। এবং একজন এলিট ব্যক্তি।

বললাম—আর্টিস্ট আমি বটে—ছবি আমি আঁকি কিন্তু এলিট কি না কি করে বলব?

তিনি বললেন—আমি জানি, তুমি ঠিক এই ডিস্ট্রিক্টের লোক নও। তুমি কলকাতার লোক। তোমার বাবা একজন ফেমাস জার্নালিস্ট ছিলেন, In the editorial staff of the Englishman and a regular contributor to the Statesman. তোমার একখানা চিঠি স্টেটসম্যানে বেরিয়েছিল সেও আমি জানি। I am sorry, Mr. Roy, যে তোমার ঘর আমাকে সার্চ করতে হচ্ছে! That badmash—young cousin of yours—

আমি সংশোধন ক'রে দিলাম—No Sir, he is my uncle.

—Uncle?

—Yes sir, uncle.

—তাই। তার জন্যে তোমার ঘর সার্চ করতে হচ্ছে।

আমি নীরবে একটু হাসলাম।

এবার সাহেব বললেন—তুমি বলতে পার এ মূর্তিটি কি? অত্যন্ত সুন্দর নয়?

দেখালেন তিনি আমাকে। আমি দেখলাম। সত্যই সে মূর্তিটি অপূর্ব। সে মূর্তি আমি ছবিতে দেখেছি। প্রাচীনকালের ভাস্কর্যের নিদর্শন। খাজুরাহো মন্দিরে কোনারকের মন্দিরে এসব মূর্তি খোদাই করা আছে—মিথুন মূর্তি!

এবার আমি বাকী মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম কয়েকটাই এ মূর্তি আছে। কয়েকটা কেন—অনেকগুলো। তা ছাড়া উড়িষ্যার পত্রলেখা, প্রসাধনরতা নারীমূর্তি তাও রয়েছে।

রায়বাহাদুর এগুলি সংগ্রহ করে এনেছিলেন তীর্থভ্রমণে গিয়ে। দক্ষিণের নটরাজমূর্তি, ছোট ছোট দেবমূর্তি এও রয়েছে।

আমি বললাম—আমি খুব খুশী হব ওই মূর্তিটা আপনি যদি নেন।

সাহেব বললে—না। সার্চ করতে এসে এ আমি নিতে পারি না।

অফিসারটি কাছে এসে বললেন—পরে পাঠিয়ে দেবেন। বুঝলেন!

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললাম—তা হ'লে ওই দপ্তরগুলি কি আমি এবার গুছিয়ে নিতে পারি?

সাহেব বললেন—Oh yes, নিশ্চয় তুমি ওগুলি কুড়িয়ে গুছিয়ে তুলে নিতে পার। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগও কিছু নেই। কিন্তু বাধ্য হয়ে এ ঘর আমাদের সার্চ করতে হল। We got information—that Atul used to keep dangerous things in the room. ওই ভাঙা জানালা দিয়ে সে এ ঘরে ঢুকত!

আমি চট ক'রে বলে ফেললাম সুলতা—তাহলে অতুলকে সঙ্গে আনলেই তো পারতেন, সে দেখিয়ে দিত কোথায় রেখেছে।

সাহেব বললেন—Oh Mr. Roy, সে পাথরের চেয়েও শক্ত। সে ভাঙে তবু কথা বলে না। বলেছে আর একজন। এবং সে সত্যি বলেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে পরে অতুল সরিয়ে থাকতে পারে অথবা আরও কেউ আছে যে ধরা পড়েনি, সে সরিয়ে থাকতে পারে।

একজন অফিসার এই সময় এসে স্যালুট করে দাঁড়ালেন। তাঁরা রায়বাড়ীর অন্দরমহল সার্চ করছিলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—Have you finished ?

অফিসারটি বললেন—Yes sir, we have got the pistol.

—Pistol ? You have got it ?

—কোথায় পেলে ?

—অতুলের সৎমা আমাদের হাতে একটা কাঠের বাক্স বের ক'রে দিয়ে বললেন—অতুল এটা তাঁকে রাখতে বলেছিল যত্ন করে, ওই মিটিংয়ের দিন দিয়েছিল, বলেছিল—পুলিশ এসে যদি ধরে তাকে, তবে তিনি যেন এটা যত্ন করে রেখে দেন, সে ফিরে এসে নেবে। কিংবা কেউ তার হাতের চিঠি নিয়ে এলে দেবে। আর পুলিশ যদি না ধরে, তবে এসেই সে নেবে। প্রথম তাঁর কোন সন্দেহ হয় নি। আজ এখন সব শুনে সন্দেহ হচ্ছে বলে তিনি বের ক'রে দিচ্ছেন। এতে কি আছে তা তিনি ঠিক জানেন না। আমরা লোহার শিক দিয়ে চাড় দিয়ে বাক্সটা খুলে দেখলাম—পিস্তল।

সাহেব হনহন ক'রে এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন —Mr. Roy !

আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম।

—তোমার বাড়ীতে থাকবে তুমি। তোমার বাড়ীও আমরা সার্চ করব।

আর পায় নি কিছু ওরা সার্চ ক'রে ; ওই পিস্তলটা বের করে দিয়েছিলেন মেজঠাকুমা। ওরা সার্চ শেষ করে যাবার সময় মেজঠাকুমাকে অ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে গেল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—মহা বিব্রত হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম না এটা কেমন ক'রে হল ! মেজদি রেখেছিল অথচ আমাকে বলেনি ? কার্টিজগুলোর খবর অন্যান্য জিনিসের খবর আমাকে দিলে, অথচ পিস্তলটা দিলে না, এর রহস্য আমি বুঝতে পারছিলাম না।

বুঝিয়ে দিল অর্চনা এসে। তার চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে উঠেছে। আমি তখন অপরাহ্ণবেলায় চুপ ক'রে কাঁসাইয়ের ধারের জানালাটা খুলে সেইদিকে তাকিয়ে এই কথাই ভাবছিলাম। ডিক্রুজ রোজা ওই দপ্তরগুলো খাস কাছারীর উঠোন থেকে বয়ে এনে একটা ঘরে থাক্ থাক্ ক'রে রাখছিল। দু নম্বর সিন্দুকটার যাবতীয় জিনিস তাও আনছিল। রঘু খাবার করছিল। সারাদিন খাওয়া হয়নি, সে রান্নাও চড়াতে পারে নি। বিবিমহলও সার্চ ক'রে গেছে পুলিশ। সাহেব আমার ঘরে মদের খালি বোতল এবং ভর্তি বোতলগুলি দেখে খুশীই হন নি শুধু, খানিকটা খেয়েও গেছেন, আমার আঁকা যে ছবিগুলো ছিল তারও তারিফ করেছেন। সম্ভবতঃ প্রত্যাশা করেছেন আমি ওই মূর্তি এবং একখানা ছবি ওঁকে পাঠিয়ে দেব। এমন সময় অর্চনা এসে দাঁড়াল।

আমি শান্তভাবেই বললাম—আয়।

সে সামনেই জানালাটার একটা পাল্লা ধ'রে দাঁড়াল। চুপ ক'রে দাঁড়াল। হঠাৎ একসময়

বললে—আমার জন্যে—। আর বলতে পারলে না, কেঁদে ফেললে সে।

আমি চমকে উঠলাম শব্দ দুটো শুনে। বললাম—তার মানে?

সে কাঁদতেই লাগল।

—অর্চনা!···অর্চনা!

এবার সে কাঁদতে কাঁদতেই মৃদুস্বরে বললে—ওটা ছোটকা ক'দিন আগে কোথেকে এনে আমাকে দিয়ে বলেছিল—এটা রেখে দে। বুঝলি! হয়তো মিটিংয়ের দিন হাঙ্গামা করবে পুলিশ। যদি এস পি আসে তবে আমি ছুটে এসে নিয়ে যাব। যদি আমাকে ধরে তবে এক-জন কেউ এসে ঠাকুরবাড়ীতে অতিথি হয়ে থাকবে—রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় বলে হাঁকটাক দেবে সন্ন্যাসীরা যেমন দেয়। তুই তাকে প্রণাম করবি, সে তোকে একটা শাঁখের আংটি দিয়ে বলবে, আঙুলে পরো মা সিদ্ধ হবে! তারপর তুই কোন ফাঁকে এটা দিয়ে দিবি। আমি—।

কান্নার থামতে থামতে বলছিল সে। ছোটকা বলেছিল—খবরদার অর্চি, এটা যেন না যায়। খবরদার। তাই সব ফেলে দিয়েও ওটা আমি সেদিন ফেলি নি, তোমাদের বলি নি। আজ যখন ওরা এসে ঘিরলে আর খাস কাছারীর তালা ভেঙে ঢুকল, তখন বুঝলাম সব কেউ বলে দিয়েছে। তখন আমি মেজদিকে বললাম। ওটা আমার বাক্সের মধ্যে কাপড়ের ভিতরে ছিল। মেজদি বললে—সর্বনাশী, করেছিস কি? দে আমাকে দে, আমি যা হয় করছি। আমার হাত থেকে বাক্সটা নিয়েই মেজদি বারান্দা থেকে একজন সাবইনস্পেক্টারকে ডেকে ওই কথা বললে।

আমি বুঝলাম এবার।

মনে মনে ওই পুজুরী বামুনের যে মেয়েটি এ বাড়ীতে একান্তভাবে অন্নবস্ত্র আর মাথা গুঁজবার আশ্রয়ের জন্য পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধকে বিবাহ করে দাসীপনা করেছে এককালে স্বামীর—স্বামীর মৃত্যুর পর নানা গঞ্জনা মিথ্যা কলঙ্ক সহ্য করে রায়বংশধরের কাছে মাসোহারা নিয়ে এক কোণে পড়েছিল, তাকে প্রণাম ক'রে বললাম—এ বংশে লোকে বলে ভবানী দেবী নাকি এ বাড়ীর মহীয়সী বধূ, তাঁর পুণ্য তাঁর তপস্যার তুলনা মেলে না। তাঁর কথা আমি জানি না। পাই নি এখনও সব। কিন্তু তোমার তুলনা নেই তুলনা নেই তুলনা নেই!

যুবতী কুমারী অর্চনাকে বাঁচাতে আজ তুমি সব দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে হাতকড়া প'রে জেলখানায় গেলে।

সেদিন আমি সান্ত্বনা দিয়ে অর্চনাকে ও-বাড়ী পাঠিয়ে বলেছিলাম—আমি যা হয় করব অর্চনা—তুই ভাবিস নে!

* * *

সেদিন রাত্রিটি ঠিক আজকের এই রাত্রিটির মতই সুলগ্ন, আমি স্থান কাল সমস্ত কিছু থেকে বিস্মৃত হয়ে ওই চিঠির দপ্তর খুলে বসেছিলাম।

বাধ্য হয়ে বসেছিলাম। কারণ এই জানবাজারের প্রকাণ্ড বাড়ীতে নিঃসঙ্গ একক হয়ে থাকতে থাকতে তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে জীবন বেঁধে, পরিপূর্ণ করবার আয়োজন করতে করতে হঠাৎ সরকারী তলবে কীর্তিহাটে এসে মেজদির মধ্যে পেয়েছিলাম মাকে, পেয়েছিলাম সহোদরার মত বড়দিদিকে; বাঙলা দেশের বাঙালীঘরের ঠানদিকে। জীবনটা আমার ভ'রে রেখেছিলেন, আমাকে ক'রে রেখেছিলেন একটি নাবালক কিশোর বালক। আমি সমাদরের লোভে তাই হয়ে উঠেছিলাম। কীর্তিহাটের সবই আমার কাছে ছিল অরুচির বস্তু। কিন্তু তিনিই ছিলেন আমার রুচি—কীর্তিহাটের স্বাদ।

১৯৩৬ সাল, মেদিনীপুর জেলা, পর পর তিন তিন জন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট খুন হয়েছে, ১৯২১ সাল থেকে এ পর্যন্ত গোটা জেলাটায় কীর্তিহাটে রায়দের প্রভাবে গড়া ইউনিয়ন বোর্ড ছাড়া অধিকাংশ জায়গাতে ইউনিয়ন বোর্ড হয় নি, হলেও ট্যাক্স আদায় হয় নি। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমলের সে যুদ্ধের আগুন এখনও জ্বলছে, মেদিনীপুর ক্ষুদিরামের জন্মভূমি ; সারা জেলাটায় ইংরেজ পুলিশ দিয়ে কিছু করতে না পেরে গাড়োয়ালী পল্টন এনে জেলা শাসন করছে। ১৯৩৪ সালে ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ, নির্মলজীবনের ফাঁসি হয়ে গেছে।

অর্চনা বলে গেল—অতুল বলেছিল—কেউ আসবে রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় ব'লে। তার হাতে পিস্তলের বাক্স যেন সে দেয়।

রামকৃষ্ণদের সঙ্গে অতুলের সংযোগ রয়েছে। সুতরাং কত বড় এবং জটিল মামলা পুলিশ গড়তে পারবে, সে পুলিশ জানে, কিন্তু পিস্তলটা যখন মেজদিদি নিজে বের ক'রে দিয়েছে তখন অন্ততঃ তাঁকে আর্মস অ্যাক্টে সাজা না দিয়ে ছাড়বে না!

এর প্রতিকার মামলা। কিন্তু মামলা করেও তো ফল হবে না। উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার আমার শেষ ছিল না। কোন দিকে এক বিন্দু আলো আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই অন্যমনস্ক হবার জন্যই ওই পুরনো চিঠির দপ্তর নিয়ে বসেছিলাম।

চিঠির পর চিঠি ; সে দপ্তরটার সবই ম্যাজিস্ট্রেট, এস পি, এস ডি ও সাহেবদের চিঠি। বীরেশ্বর রায়ের লেখা চিঠির নকলও কিছু কিছু ছিল। সব চিঠিই ইংরেজের জয়গানে মুখরিত। সেটা ভাল লাগে নি।

অন্য একটা খুলে ছিলাম। কাপড়ে সাল সন দেখেই খুলেছিলাম। সে ১৮৫৭ সাল। তার মধ্যে প্রথমেই পেয়েছিলাম মেদিনীপুর জেলা ইস্কুলের হেডমাস্টার বাংলাদেশের বিখ্যাত রাজ-নারায়ণ বসুর পত্র।

সত্যেন বোস, কানাইলালের সঙ্গে শত্রুতায় নরেন গোসাঁইকে মেরে ফাঁসি গিয়েছিলেন—রাজনারায়ণ বোস সত্যেন বোসের পিতামহ। অরবিন্দ ঘোষ বারীন ঘোষের মাতামহ। তাঁকে পত্র লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়, কি লিখেছিলেন তার নকল নেই, তবে তিনি যে কলকাতার অবস্থা লিখেছিলেন তার উল্লেখ ছিল চিঠিতে—।

"আপনার পত্রে কলিকাতার বর্তমান অবস্থার কথা সম্যক অবগত হইলাম এবং যুগপৎ ভীত হইলাম ও দুঃখ অনুভব করিলাম। আপনি কলিকাতায় ইংরাজদিগের উদ্বেগ এবং গবর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং মহোদয়কে এদেশের সমুদয় লোকের উপর উত্তেজিত করিবার প্রয়াসের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইল। আবার অযোধ্যার নবাব সাহেব ওয়াজিদ আলি শাকে কেল্লার মধ্যে বন্দী করিবার সময় তিনি যে গলদশ্রু হইয়া বিলাপ করিয়াছেন, তাহাতে কে দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারে। এবং গবর্নর জেনারেল বাহাদুর লর্ড ক্যানিংকে নমস্কার জানাই। ক্লেমেন্সি ক্যানিং তাঁহার সার্থক নাম। কোনরূপেই বুঝিতে পারিতেছি না মঙ্গল কিসে ?.. ইংরাজের সভ্যতায় আমাদের এই নবজাগরণের সময় —ইহার বিপর্যয় ঘটিলে আবার আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইব। ইহা নিশ্চিত।

তবে অত্র জেলায় অবস্থাও আদৌ শান্তিপূর্ণ নহে। বড়ই ভীতির মধ্যে বসবাস করিতেছি। এখানেও সিপাহী বিদ্রোহের ভারতব্যাপী তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছিয়াছে! যে মাসে একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ সিপাহী আসিয়া অত্রস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। কর্নেল ফস্টর উক্ত পল্টনের অধিনায়ক, তিনি তেওয়ারীকে ফাঁসি দিয়াছেন। এবং পল্টনের সিপাহীদিগকে ধানদূর্বা লইয়া বিশ্বস্ত থাকিবার শপথ লওয়াইয়াছেন। ফস্টর সাহেবের

একজন রাজপুত রমণী রক্ষিতা আছে। উক্ত রমণী অশ্বপৃষ্ঠে ফস্টর সাহেবের সঙ্গে ঘুরিতেছে এবং পল্টনের সিপাহীদিগকে বুঝাইতেছে।

তথাপি আশঙ্কার শেষ নাই। সাহেবগণ কাঁসাই নদীতে নৌকা প্রস্তুত রাখিয়াছে। প্রয়োজন হইলে স্ত্রীপুত্রদের চাপাইয়া ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা করিয়া দিবে। হিজলীর মুখে জাহাজে চড়িবে। আমরাও খুব ভীত ভাবে দিনাতিপাত করিতেছি। ইস্কুলে পেণ্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া থাকি। যখনই সিপাহী আসিবে তখনই পেণ্টালুন চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া ফেলিব। সিপাহীদিগের পেণ্টালুনের উপর খুব রাগ।

এখানকার অবস্থা সমুদয় জ্ঞাত করিলাম। কলিকাতার অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় না হইলেও ভয় রহিয়াছে। তবে কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়া ভালই করিয়াছেন। এবং এখন হইতে এখানে থাকিবার সংকল্প করিলে আরও সুখী হইব। মহাশয়ের সহিত পরিচয় না থাকিলেও আপনার নাম শুনিয়াছি। একটি মধ্য ইংরাজী ইস্কুল স্থাপনের কথা পূর্বে শুনিয়াছিলাম কিন্তু মহাশয়ের পত্নী বন্যার জলে ভাসিয়া যাওয়ায় নিরতিশয় দুঃখে এখান হইতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন বলিয়া তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। এখন যখন ফিরিয়া আসিয়াছেন তখন এই সকল জাতীয় কল্যাণমূলক কার্যগুলি সম্পাদনকরতঃ মনুষ্যজীবন সফল সার্থক করুন।"*

চিঠিপত্র নিয়েই সেদিন ও সারারাত্রি আমার কেটে গিয়েছিল সুলতা। মধ্যে মধ্যে ঢুলেছি। কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছি। আবার জেগেছি আবার পড়েছি। এমনিভাবেই তখন ভোর হচ্ছে, এমন সময় ঘোষ নায়েব, যাকে মেদিনীপুর পাঠিয়েছিলাম অতুলেশ্বরের জামীনের জন্যে, সে ফিরে এল উকীলের চিঠি নিয়ে।

ভাল উকীল তিনি। নতুন উঠছেন। তিনি পত্র লিখেছেন, চেষ্টা তিনি করছেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থা খুবই প্রতিকূল। তবে শোনা যাচ্ছে বৃদ্ধ রিটায়ার্ড আই-সি-এস গ্রিফিথ সাহেব চলে যাচ্ছেন। আসছেন বাঙালী আই-সি-এস—বি আর সেন। সেন সাহেবের সুশাসক বলে সুনাম আছে। এবং জোর গুজব এবার গভর্ণমেণ্ট এত কড়াকড়ির পর একটা আপোস করবার চেষ্টা করবেন লোকদের সঙ্গে। তার আর বিলম্ব নাই। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সেন-সাহেব চার্জ নেবেন। এবং কড়াকড়ি অনেক শিথিল হবে। বর্তমান কেসের অবস্থা এমন গুরুতর নয়। মাত্র ১৪৪ ধারা ভঙ্গ। তবে গোপনে জানলাম রামকৃষ্ণ, যার ফাঁসি হয়েছে, তার দলের সঙ্গে যুক্ত করবার চেষ্টা করছে। তা হ'লেও সেনসাহেব এলে সাধারণ ভাবেই বিচার হবে। তাতে ছ' মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে। তার বেশী নয়।

তখনও মেজদি হাতকড়া প'রে মেদিনীপুরে উপস্থিত হন নি।

আমি ভাবছিলাম—আমি গিয়ে সেন-সাহেবের কাছে হাতজোড় ক'রে বলব, এ মহিলাটি একান্তভাবে নির্দোষ। এঁকে দয়া ক'রে ছেড়ে দিন। সন্তানবাৎসল্যের পুণ্যের উপর এমন নিষ্ঠুর আঘাত হানবেন না।

এক সপ্তাহের মধ্যে সেনসাহেবও এলেন, আমিও গেলাম, পুলিশসাহেবকে সেই মূর্তিটা শুধু নয় আরও দু তিনটে ওই ধরণের মূর্তি এবং আমার আঁকা ছবিও দিয়ে দেখা করে এলাম। নিবেদন জানিয়েও এলাম।

* পত্রখানির মর্ম রাজনারায়ণ বসুর জীবনী হ'তে গৃহীত। কিছু কিছু মেদিনীপুরের ইতিহাসের ঘটনার কথা—এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। যেমন—কর্নেল কর্টরের রাজপুত প্রণয়িনীর কথা।

সেটেলমেণ্ট তখন বন্ধ হয়েছে কয়েক মাসের জন্য। কিন্তু মেজদির জন্যে কলকাতায় ফিরে আসা আমার হল না। আমার অবলম্বন হল ওই দপ্তর।

প্রায় আশী বছর সুলতা, ১৯৩৬ সাল থেকে ১৮৫৭, আশী বছরের এক বছর কম হবে, উনআশী বছর, সাতান্ন সাল আর ৩৬ সালের মাস কয়েকটা যোগ দিলে পূর্ণ আশী বছর। এই আশী বছর পূর্বের বাংলাদেশের মধ্যে বিচরণ করে এ কালকে ভুলে রইলাম। মনে রইল শুধু দুটি একালের মুখ। একটি মেজদির, অন্যটি তোমার। তবে মেজদির চেয়ে তুমি ম্লান হয়ে গিয়েছিলে এ সত্য আমি স্বীকার করব। একটা রক্তমাখা মসলিনের যবনিকা তোমাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

এরই মধ্যে একে একে আবিষ্কার করলাম সব। পেলাম সব।

সুরেশ্বর বললে—চার মাস ধরে এই চিঠিপত্রগুলি সব পড়েছিলাম সুলতা। প্রথম প্রথম বেছে বেছে পড়েছিলাম, তারপর নির্বিচারে সব।

প্রথম বেছে বেছে পড়েছিলাম মানে, চিঠির কিছুটা পড়ে আমি খুঁজছিলাম, রায়বাড়ীর যে সত্যকে রত্নেশ্বর রায় ভয় পেয়ে নিজের ডায়রীতে লেখেন নি। বীরেশ্বর রায় লিখতেন, তিনি সব দোষ সত্ত্বেও নির্ভীক পুরুষ ছিলেন, সত্যকে তিনি না-লেখা হতেন না। এ সত্য তাঁর সময়ে তাঁর সম্মুখেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু স্মরণীয় ঘটনার খাতা লেখা তিনি বন্ধ করেছিলেন। সে সত্য তাঁরা যেভাবে দেখেছিলেন, তা বড় ভয়ঙ্কর সুলতা। পড়ে আমিও ভয় পেয়েছিলাম। মনে মনে বার বার কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েও পারি নি। কিন্তু এই সত্যটুকু আবিষ্কার করতে গিয়ে নূতন সত্য আবিষ্কার করলাম। সেই ঘটনাটাই আগে বলি, তখনও পর্যন্ত যে কথা গোপন করে গেছেন রত্নেশ্বর রায়, যা লিখে যান নি বীরেশ্বর রায়, তা আমি পাই নি। কিন্তু নতুন যেটা পেলাম, তা বিস্ময়কর।

মেজদি আর অতুলের মামলাটা হঠাৎ মাঝখানে ঘোরালো হয়ে উঠল। আমাদের কীর্তিহাটের পাশের গ্রামের হরি সিং দফাদার মাঝখানে তার নিজের ষোল বছরের ছেলেকে পুলিশের কাছে হাজির করলে। ছেলেটার নাম শিবু। কীর্তিহাটের স্কুলে পড়ত। অতুল কীর্তিহাটের স্কুল থেকে ছেলে সংগ্রহ করত। ছেলেটার কাছ থেকে হরি সিং নিজেই বের করেছিল একখানা ছোরা, কতকগুলো ইস্তাহার, আর খানকয়েক চিঠি। অতুলের লেখা চিঠি। অতুল—মেজদি অ্যারেস্ট হবার মাসখানেক পর, তখন আমি মেদিনীপুর শহরে একটা বাসা নিয়েছি, মধ্যে মধ্যে যাই, থাকি। মামলার তদ্বির করি। আশা হচ্ছিল, অন্তত উকিল বলছিলেন সম্ভবতঃ মেজদির জামিন হবে, এবং তিনি খালাস পেয়ে যাবেন। কারণ তিনি তো ঠিক জানতেন না যে, ওই বাক্সটার মধ্যে পিস্তল আছে।

হঠাৎ সেদিন গিয়ে শুনলাম, হরি সিংয়ের ছেলে অ্যারেস্ট হয়ে, জট পাকিয়ে, মামলা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। ছেলেটা স্টেটমেণ্ট দিয়েছে যে, অতুলবাবুর দলের ছেলে সে। পুলিশ, ইংরেজ এদের মারবার জন্যে খুব বড় দল' আছে, তার নাম সে জানে না। সে অতুলবাবুকে লীডার জানে, আর কয়েকজনকে জানে। এ ছোরা, ইস্তাহার সে অতুলবাবুর কাছে পেয়েছে। তিনি রাখতে দিয়েছিলেন। অতুলবাবুর কাছে পিস্তল, গুলী আছে। সে দেখেছে। ক' বছর আগে মেদিনীপুর সদরঘাটে কাঁথীর এস-ডি-ও আর পুলিশসাহেব সামসুদ দোহাকে গুলী করে মারবার কথা যখন হয়েছিল, তখন সে অতুলবাবুর সঙ্গে মেদিনীপুরের সদরঘাট পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু এমন পুলিশ ছিল চারিদিকে যে, কেউ কাছে যেতে পারে নি। মেদিনীপুরের দুজন বড় নেতা ছিল। তাঁদের নাম সে জানে না। তারা ফিরে

এসেছিল। অতুলবাবু শঙ্কর সেন আর দোহাসাহেবকে মারতে পারেন নি বলে রাস্তায় কেঁদেছিলেন। কীর্তিহাটে ফিরে অতুলবাবুর বাড়ীতে জল খেয়ে সে বাড়ী গিয়েছিল। অতুলবাবুর মা জল খেতে দিয়েছিলেন। অতুলবাবুকে বলেছিলেন—আমার ভাগ্যি যে ফিরেছিস। তুই ফিরবি, এ আশা আমি রাখি নি। এর পর পুলিশ ভাবছে, শুধু আর্মস অ্যাক্টে কেস করবে, না কন্সপিরেসি কেস করবে।

পুলিশের আপত্তিতে মেজদির সঙ্গে ইণ্টারভ্যু পর্যন্ত পাই নি সেদিন। কীর্তিহাটে ফিরে এলে—তখন এই মামলায় সময় ধনেশ্বর কাকা আসতেন, কল্যাণেশ্বর আসত, বিমলেশ্বর কাকা আসতেন, খোঁজ নিতেন মামলায় কি হল? প্রণবেশ্বরদা পালিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়, পাছে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন বলে।

হরি সিংয়ের ছেলে শিবু সিং ধরা পড়ে কেস জটিল হয়েছে শুনে ধনেশ্বর কাকা বলেছিলেন—নারায়ণ, নারায়ণ! হরি সিংয়ের ছেলে? সর্বনাশ, সর্বনাশ!

তারপর তাঁর অভ্যস্ত অ্যাক্টিংয়ের ভঙ্গিতে বলে উঠেছিলেন—এ মিথ্যা, এ মিথ্যা, এ মিথ্যা! কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলে উঠেছিলেন—বা-রে অদৃষ্ট বা! বা-রে তোর রচনা করা জাল! যখন বিপক্ষে তুই যাস, তখন লোহার বাসরঘরে সূচীছিদ্রে ঢোকে কালনাগিনী। বেহুলার পায় কালঘুম। মতিভ্রম ঘটাস তুই!

কথাটা বুঝতে পারি নি। তারপর পরিষ্কার হয়েছিল। কল্যাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিল—হরি সিংহের পূর্বপুরুষের সঙ্গে কি একটা ঘটেছিল না জ্যাঠামশায়?

ধনেশ্বর কাকা বলে উঠেছিলেন—গোপাল সিং, দুর্ধর্ষ গোপাল সিং। মহিষাদলের মণ্ডলান মৌজা বীরপুর বীরেশ্বর রায় বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন, গোপাল সিংকে শাস্তি দিতে। দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়। মামলায় মামলায় সর্বস্বান্ত করেই ক্ষান্ত হন নি, মৌজা বীরপুরের মণ্ডলী কেড়ে নিয়ে সকলের সমক্ষে কাছারীর মেঝের উপর খড় ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, দাঁত দিয়ে ওঠাও। তারপর নিজের চোখের সামনে রাখবার জন্য তাকে এনে বাস করিয়েছিলেন পাশের গ্রামে। জমি-জেরাত দিয়েছিলেন। ঘর করবার টাকা দিয়েছিলেন। সবই দিয়েছিলেন। হুকুম ছিল, রোজ সকালে এসে সেলাম দিয়ে যাবে। তার জন্য একটা বার্ষিক বৃত্তি ছিল তার। সর্দারী বৃত্তি—গোপাল সিং। বন্ধ করেছিলেন আমার বাবা।

কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হল তাঁর, অথবা করুণ হল, বললেন—তখন বাবার অবস্থা হীন হয়েছে। যোগেশ্বরদা যজ্ঞেশ্বরদা কলকাতায় সেখানকার ঐশ্বর্যে মত্ত। কীর্তিহাটের মায়া-মমতা নেই। সেবার থিয়েটার হচ্ছে আমাদের, ওই হরি সিং-এর বাপ তখন বুড়ো, হরি সিংয়ের বয়স আঠারো-উনিশ। হরি সিংয়ের বাপ রাম সিংয়ের কথা ছিল, ঘুরে ঘুরে গোলমাল থামাবার। বুড়ো তা না করে ইস্কুলের বেঞ্চে বসে তামাক খাচ্ছিল। প্রফুল্ল প্লে। বাবা নিজে যোগেশ। আমি নব-যুবক। আমি সেবার প্রথম নামব। আমি শিবনাথ। বাবা গ্রীনরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকলেন, রাম সিংকে ডাক তো রে, বেঞ্চিতে বসে আছে। তিনি যে কি করে তার ভদ্রলোকদের সঙ্গে বেঞ্চে বসে হুঁকোর তামাক খাওয়া দেখেছিলেন, তিনিই জানেন। আমাদের চাপরাসী যোগীন্দর পাঁড়ে ডাকতে গিয়ে ফিরে এসে বললে—সে বললে—এখন উঠলে তার জায়গা যাবে। পরে দেখা করবে। তা সে রাত্রে তো এলই না। পরে একদিন এলে বাবা বললেন—রাম সিং, তোমরা একটা বৃত্তি পাও আমাদের কাছে, খাতাতে লেখা আছে, সর্দারী বৃত্তি মাসিক এক টাকা হিসাবে বারো টাকা। নিচে দাগ দিয়ে লেখা আছে, নিত্য কাছারীতে হাজিরা দিবার জন্ত এবং ক্রিয়াকর্মে-পার্বণে সর্দারী কাম নির্বাহের জন্ত! ও বৃত্তি

আমি বন্ধ করলাম। বুঝেছ! বেঞ্চিতে বসে হুঁকো টেনে সর্দারী করা হয় না!

রাম সিং চুপ করে ছিল, এই হরি সিং সঙ্গে ছিল, সে বলেছিল—সে সব দিন চলে গিয়েছে বাবু। মাসে এক টাকায় এখন গরুর রাখাল মেলে না। আর বৃত্তি? সে না পাই তো দেখা যাবে আদালতে। আদালতও করেছিল, কিন্তু তাতে হেরেছিল। খাতার লেখার নমুদ আদালত ফেলতে পারে নি। আমার মনে পড়ল। সেদিন পর্যন্ত ফাইলে চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে যে পর্যন্ত এসেছি, তাতে মিউটিনির সময় বীরেশ্বর রায় কীর্তিহাটে এসে পাকা হয়ে বসেছেন। নতুন পত্তনী নেওয়া জমিদারীর খাজনা বৃদ্ধি করছেন। বীরপুরে মামলা শুরু হয়েছে, গোপাল সিংয়ের সঙ্গে, মণ্ডলান মহলের মণ্ডলান প্রথা তুলে দেবার জন্ম!

কথাটা আমি ঠিক বিশ্বাস করি নি, সুলতা। মেদিনীপুর থেকে বাড়ী আসার পথশ্রম সত্ত্বেও অর্ধেক রাত জেগে ওই কথাটা ভেবেছিলাম, আর মধ্যে মধ্যে এক-একখানা চিঠি তুলে নিয়ে পড়ছিলাম।

পরের দিন সকালে বৃদ্ধ রঙলাল মণ্ডল মশায় এসেছিলেন। ওই কথাটা শুনেই এসেছিলেন। আর এসেছিলেন দয়াল ঠাকুরদা। দুজনেই ধনেশ্বর কাকার কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন—এ হে-হে, অতুলবাবু সিংদের বাড়ীর ছেলেকে বিশ্বাস করলেন কেন গো। ছি-ছি-ছি। এ অন্যায় হয়েছে।

দয়াল ঠাকুরদা বলেছিলেন—অতুল এ সব জানত না নাকি? দূর-দূর-দূর! এ কি করলে সে?

স্কুলের হেডমাস্টারও সেদিন এসেছিলেন। তিনিই কেবল বলেছিলেন—হরি সিং অবশ্য করে থাকতে পারে, আক্রোশবশে। গল্পটা প্রবীণেরা জানে। রাম সিংয়ের ব্যাপার আমার আমলেই। কিন্তু শিবু এমন তো করতে পারে না। ছেলেটা ক্লাসে থার্ড-ফোর্থ হয়। ভাল ছেলে! অনেস্ট ছেলে!

সবই সত্যি সুলতা। গল্প, রচনা করা গল্প নয়, বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা। শিবুও সত্যিই ভাল ছেলে। পরে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছে। দুই-ই সত্যি এবং তার সঙ্গে এটাও সত্যি যে, শিবু এই সব ঘটনার কথা সারারাত্রি ধরে বাপের কাছে শুনে তারপর পুলিশের কাছে স্টেটমেণ্ট দিয়েছিল।

বাপ তার একদিন হঠাৎ ওই ছোরা আর চিঠি আবিষ্কার করার পর ছেলেকে ওইভাবে সারারাত বলে বলে তাকে উত্তেজিত করে স্বীকার করিয়েছিল।

আদালতের জেরাতে সে তা স্বীকার করেছিল।

কন্সপিরেসি কেস পুলিশ করতে পারে নি। মেদিনীপুর মেদিনীপুর। এর জোড়া বাংলাতে নেই, বোধ করি ভারতবর্ষেও নেই। সেখানে কন্সপিরেসি কেস করে সাক্ষী পাওয়া যায় না।

ম্যাজিস্ট্রেট 'পেডি' মার্ডার কেসে বিমল দাসগুপ্তকে ফাঁসি দেবার জন্যে হাইকোর্টে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল বসেছিল। কিন্তু কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার হীরালালবাবু আর নারাণবাবুকে পুলিশ সেই দারুণ নির্যাতনের সময় ভয় দেখিয়েও সাক্ষী দেওয়াতে পারে নি। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল উঠিয়ে নিয়েছিলেন। সাক্ষী অতুল মেজদির কেসেও মেলে নি। শুধু শিবু অ্যাপ্রুভার হয়েছিল। আমাদের উকিল ওই জেরাই করেছিলেন।

—গোপাল সিংয়ের নাম শুনেছ? তোমাদের পূর্বপুরুষ?

শিবু বলেছিল—হ্যাঁ জানি।

—তুমি শুনেছ, তাঁকে বীরেশ্বর রায় জমিদার সর্বস্বান্ত করেছিলেন মামলা করে, দাঁতে কুটো করিয়েছিলেন—

সরকারী উকিল আপত্তি করতে ছেলেটি বলে উঠেছিল—হ্যাঁ জানি।

—কি করে জানলে? কে বললে?

—বাবা।

—কবে বললে, যেদিন পুলিশের কাছে স্টেটমেণ্ট দাও, তার আগের দিন? না অনেক আগে?

—না, সেই দিন রাত্রে। কিছুটা কিছুটা জানতাম আগে থেকে।

আদালতে আমি ছিলাম, আমি সব ভুলে গিয়ে শুধু ভেবেছিলাম্ কি জান? ভেবেছিলাম —নাঃ, সুলতার কাছে ফিরে গিয়ে কাজ নেই। যদি যাই তবে রত্নেশ্বর রায় আর ঠাকুরদাস পালের ঘটনাটা চিরদিন বিষাক্ত লোহার শলার মত আমাদের দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। না, কাজ নেই, কাজ নেই।

শুধু অতুল চুপ করে ছিল।

আর মেজদি বলেছিলেন—তা বেশ হল। দেনা শোধ হল! হেসেছিলেন।

অতুল এবং মেজদির জেল হয়ে গেল। অতুলের দু বছর, মেজদির ন মাস। মেজদিকে খালাস করবার জন্যে চেষ্টার আর বাকী রাখি নি, কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি ওইটের উপরেই জোর দিয়েছিলেন; মেজদি নিতান্ত সরল, সেকেলে ধরনের বড়ঘরের বউ; এক বৃদ্ধ ধনী তাঁকে তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিলেন; অতুল তাঁর স্বামীর ছোট ছেলে, সতীন-পুত্র। তিনি এসে এই ছেলেটিকে মানুষ করে মায়ের চেয়েও মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এদেশের অল্পবয়সে বিধবারা যেমন ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন, বাইরের জগতের সঙ্গে সংস্রব চুকিয়ে দিয়ে, ইনিও ঠিক তাই। এবং তার উপর নিতান্ত সরল মানুষ। দেশ স্বাধীন বা পরাধীন, এতে তাঁর কিছু যায়-আসে না। অতুল ওই মিটিংয়ের দিন যাবার সময় পিস্তল-ভরা বাক্সটা তাঁর কাছে রাখতে দিয়েছিল। বলেছিল, এটা রেখে দিও। উনি রেখে দিয়েছিলেন, জানতেনও না কি রেখেছে এর মধ্যে। পুলিশ সার্চ করতে আসবামাত্র বের করে দিয়েছেন। পিস্তল যে বাক্সে ছিল, সেটা এই বিখ্যাত জমিদারবাড়ীর আগের কালের একটা আইভরির কাজ-করা চন্দন কাঠের বাক্স, সেটা চাবিবন্ধ ছিল। চাবি তাঁর কাছে ছিল না। কাজেই এ যে তিনি জানতেন না, এটা নিশ্চিত। সুতরাং এতে যদি তাঁর শাস্তি হয়, তবে একান্তভাবে নির্দোষ একটি নারীকে, নারীজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়সম্পদ মাতৃস্নেহের জন্য শাস্তি পেতে হবে। সম্ভবতঃ ঈশ্বর লজ্জিত হবেন। হয়তো বা ক্রাইস্ট দ্বিতীয়বার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করবেন এবং ঈশ্বরকে ক্ষমা করবার জন্য প্রার্থনা জানাতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

সকলেই অভিভূত হয়েছিল। কিন্তু বিচারক হন নি, হতে পারেন নি। ট্রাইব্যুনাল নয়, সেসন নয়, ম্যাজিস্ট্রেট বিচারকের আদালতে বিচার; তিনি তাঁকে ন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে লিখেছিলেন—লার্নেড ব্যারিস্টার যে বলেছেন, তিনি এসব বুঝতেনই না, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এই জেলাটি মেদিনীপুর, এখানকার সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এই ধরণের অন্যায় অপরাধকে সর্বাপেক্ষা মহৎ কর্ম মনে করে। শুনেছি, ছেলের ফাঁসি হলে সে ছেলের মা ছেলের জন্য গৌরব অনুভব করে। তার উপর দিস ফ্যামিলী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শিক্ষিত জমিদার বংশ। পাবলিক প্রসিকিউটার তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। এই বংশে

একজন বীরেশ্বর রায় ছিলেন, তিনি বাড়ীতে ইংরেজ ধর্মপ্রচারক মিঃ হিলের কাছে ইংরাজী শিখেছিলেন। মিউটিনির সময় এই জেলার বিদগ্ধ হেডমাস্টার রাজনারায়ণ বোস এবং অন্যদের সঙ্গে দুর্ধর্ষ দুষ্ট প্রকৃতির সিপাহীদের চেয়ে ইংরেজ শাসন মঙ্গলজনক তা বুঝতেন, এবং বুঝে সহযোগিতা করেছিলেন। বীরেশ্বর রায়ের ছেলে রত্নেশ্বর রায়বাহাদুর এবং শিক্ষিত লোক ছিলেন। সেই বংশের কোন বধূ যে এতখানি নির্বোধ হতে পারে তা মনে করি না। এবং অ্যাপ্রুভার শিবচন্দ্র সিং বলেছে, কণ্টাইয়ের এস-ডি-ও এবং এস-ডি-পি-ও শঙ্কর সেন এবং সামসুদ দোহাকে, যারা সরকারী কাজ দৃঢ়তার সঙ্গে করত, তাদের মারবার জন্য এসে ব্যর্থ হয়ে যেদিন ফিরে যায়, সেদিন মিস লেডী তাদের যত্ন করে খাইয়েছিলেন, উৎসাহজনক বাক্য বলেছিলেন। এ কথা আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং তাঁকে নির্দোষ আমি মনে করতে পারি না। সুতরাং—।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—জেল হয়ে গেল।

দু দিন পর অনেক চেষ্টা করে ইণ্টারভ্যু পেলাম। এ পর্যন্ত আণ্ডার ট্রায়াল অবস্থায় কোন রকমেই ইণ্টারভ্যু পাই নি। বিচারের পর পেলাম।

অতুলকে বললাম—তুমি কি শিবুদের ব্যাপার জানতে না?

সে হাসলে। চুপ করে রইল। বললে—অন্য কথা বল। ওর জন্যে আপসোস করে কি হবে?

তারপর বললে—দেখ, একটা অনুরোধ করব, তোমার অনেক টাকা আছে, একটি ভাল পাত্র দেখে অর্চির বিয়েটা দিয়ে দিও।

বললাম—বিয়ে করবে সে? আমি জানি না।

অতুল বললে—বলো আমার নাম করে। মেজদাকে তো জান—।

বললাম—আমি তা করব।

মেজদির সঙ্গে ইণ্টারভ্যু পেয়েছিলাম ওই দিন। বললাম—মেজদিকে কি বলব?

অতুল বললে—প্রণাম দিও। বলো, আমি বুঝেছি সব।

জেলের অফিসার বললে—সময় হয়ে গেছে।

হেসে অতুল চলে গেল।

অতুল বুঝেছিল, মেজদি অর্চনাকে বাঁচাবার জন্যই দায়টা নিজে নিয়ে পিস্তলটা বের করে দিয়েছেন। সেটাই সে ইঙ্গিতে বলে গেল।

আধ ঘণ্টা পর মেজদির সঙ্গে ইণ্টারভ্যু।

মেজদি আমাকে দেখে একমুখ হেসে বলেছিলেন—এসেছিস!

—হ্যাঁ।

—আমাকে রক্ষে করবার জন্যে এত টাকা খরচ করলি ভাই? অবিশ্যি তোর আছে, খরচ করেছিস, আমি বলবার কে? তা বেশই করেছিস। এখন একটা কাজ করিস ভাই, তোর সাত পুরুষ তোকে আশীর্বাদ করবেন। অর্চির একটা গতি করে দিস। ওরে, তুই হয়তো বিশ্বাস করবি নে। তোরা হালআমলের ইংরেজী জানা আধা-সাহেব, ওরে ও হল সেই আমার বড় শাশুড়ী। তোর ঠাকুরদা আমাকে স্বপ্নে বলে গেছেন। বংশকে রক্ষে করতে এসেছেন!

আমি কথা বলতে পারি নি। গলাটা যেন কান্নায় বুজে আসছিল।

মেজদি তাঁর বড় বড় চোখ দুটি আরও বড় করে বললেন—জানিস, জেলখানায় এসে

নানান জাতের মেয়ের মধ্যে জাত-ধর্ম কি করে বাঁচাব, কি করব, এই ভেবে প্রথম দু-তিন দিন খুব কাঁদতাম, আর আপসোস করতাম, গোবিন্দকে ডেকে বলতাম—শেষে এই করলে ঠাকুর? ভাই, তিন দিনের দিন শেষরাত্রে ঘুমটি এসেছে, আর তোর মেজঠাকুরদা এসে শিয়রে দাঁড়ালেন। আমি শিউরে উঠলাম। তিনি হেসে বললেন—'ভয় লাগছে নাকি ছুটকী?' আমি বললাম—'না'। তিনি বললেন—'তবে শিউরে উঠলে কেন গো?' বললাম—'এ পাপপুরীতে কেন এলে তুমি, কেন এলে? বের হবে কি করে?' তা বললেন—'আমরা তো এখন শূন্যে শূন্যে যাই, আমাদের কি জেলখানায় আটকাতে পারে? এই বুদ্ধি হল শেষে! আর এসেছি তোমাকে আশীর্বাদ করতে গো। তুমি অর্চিকে রক্ষা করেছ। অর্চি কে জান? উনি হলেন সেই ঠাকুমা। তপস্বিনী বউ রায়বাড়ীর। আর অতুল হল আমার বাবা। রায়বাহাদুর। আর সুরেশ্বর আমার দাদা! ওরা সব ঋণ শোধ করতে এসেছে। দেখনি, অর্চনার সঙ্গে ঠাকুমার মিল। আর সুরেশ্বরের সঙ্গে আমার দাদার চেহারার মিল! তুমি অর্চিকে শুধু বাঁচাও নি, ওই গোপাল সিংদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেশী হয়েছিল, সেটাও শোধ হল। বুঝেছ?'

আমি চুপ করে শুনেই যাচ্ছিলাম। প্রতিবাদ করিনি। এতটুকু অবিশ্বাসের ছায়া কি ছাপ আমার মুখে পড়েনি। আমার বুকের ভিতরটা একটা আবেগে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। ভাববারও ক্ষমতা ছিল না যে, এই সরল প্রাচীন আমলের বিশ্বাসী-মন মেয়েটি আপনমনেই একটি স্বপ্ন কল্পনা রচনা করে নিয়েছে। তাও আমি ভাবিনি। আজও ভাবিনে। তবে সেই বিশ্বাসেই যে আজ ছত্রিশ সাল থেকে তেপ্পান্ন সাল পর্যন্ত কাজ করছি তাও নয়। মনে মনে বিচার করে, এই কর্তব্য বলে করে যাচ্ছি। এই সতের বছর সেখানেই পড়ে আছি এই

কিন্তু সে থাক। যা বলছিলুম বলি।

মেজদি শেষকালে বলেছিলেন, বেশী মদ খেতে বারণ করেছিলেন। একবারে খাওয়া বন্ধ করতে বলেননি। বলেছিলেন, ওগুলো বেশী খাসনে ভাই। একেবারে না-খেতে বলব না। মাছের জল আর তোদের মদ। রায়বাহাদুর আমার শ্বশুর—তাঁর ঘরে সৌভাগ্যশিলা ছিল সন্ন্যাসীর দেওয়া, তার উপর যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নেবেন ঠিক করলেন। তা গুরু ছিলেন রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন। তিনি বললেন—তা হয় না। তবে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। যিনি শ্যাম, তিনি শ্যামা। শক্তিমন্ত্রে যুগলের দীক্ষা দিলাম। তুমি বৈষ্ণববীজে জপ করো। আর পিতলের বাটীতে নারকেল জল ঢেলে তর্পণ করে তাই প্রসাদ নিয়ো। লোকে বলে, তাতেই নাকি রায়বাহাদুরের নেশা হত। তা অল্প করে খাস। আর বিয়ে করে ফেল। সেই সুলতাকেই না-হয় বিয়ে কর। ধনেশ্বরেরা আপত্তি-টাপত্তি করবে। মামলা-মকদ্দমা করবে। তা তুই না হয় সেবাইতী ছেড়ে দিবি। দেবোত্তরে তো আছে ছাই। সম্পত্তি তো পত্তনী দিয়ে সব তোর হাতে। কলকাতায় গিয়ে থাকবি।

আমার মনে সুলতা, ওই গোপাল সিং-এর বংশধর শিবু আর বীরেশ্বর রায়ের প্রপৌত্র শিবেশ্বর রায়ের ছেলে অতুলের কথা নতুন করে জেগে উঠল।

বললাম—সে হবে ঠাকুমা। তুমি আগে খালাস হয়ে বেরিয়ে এস, তখন হবে।

তিনি বলেছিলেন—না রে, দেরি তুই করিসনে। আমি খালাস হয়ে এসে তোর বউয়ের কাছে উঠব, বুঝলি? ওরে বউ নইলে সংসার আলোনা হয়ে যায়। বউ চিনির মত মিষ্টি নয় রে, নুনের মত মিষ্টি। বিয়ে করলে বুঝবি—জীবনের অন্নের ওপর ব্যান্নন পড়ল।

মানে-অভিমানে চাটনীর স্বাদ পাবি। ছেলে-মেয়ে হলে তার ওপর পায়েস মিষ্টি পড়ে ভোগ ষোল আনা হবে। নইলে তুই আবার যে কি করবি, তা ভগবানও বলতে পারবেন না।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে কিছু মনে করেই যেন সুরেশ্বর হেসে আপনমনে ঘাড় নাড়তে লাগল, যে ঢঙের হাসির মধ্যে অর্থ একটাই, সেটা হল—হায়-হায়-হায়! এ হায়-হায় আপসোসেরও বটে, আবার তারিফেরও বটে। কোন মৃত প্রিয়জনের সুখস্মৃতি মনে হলে যেমন হাসি হাসে মানুষ।

সুলতা প্রশ্ন করলে—কি?

—হাসছি কেন জিজ্ঞাসা করছ?

সুলতা বললে, শুধু তো হাসছ না, তার সঙ্গে আরও কিছু রয়েছে।

সুরেশ্বর বললে—ধরেছ ঠিক। ভাবছি টাকার দেনা যথাসর্বস্ব দিয়েও শোধ হয়। তাতে খালাস পেয়ে মানুষ খেটে-খুটে নতুন করে শুরু করতে পারে, যাতে আর পাওনাদারের দাবী চলে না। কিন্তু কাজের দেনা, কর্মফলের জের, ওর আর শেষ নাই। শেষ হয় না। এমন টাকার দেনায় মহাজন মাফ দেয়, না দিলে দেউলে হয়ে রেহাই মেলে, কিন্তু এতে মাফ নেই, আর দেউলে আইনের মত আইনও নেই।

সুলতা হেসে বললে—অর্থটা কি? রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের বংশের ছেলে আর ঠাকুরদাস পালের বংশের মেয়ে ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একত্রিশ-বত্রিশ সালে প্রেম করেছিল, তারপর ছত্রিশ সালে সরে গিয়েছিল এবং আবার তিপ্পান্ন সালে সারারাত্রি জেগে বোঝাপড়া করছে?

—বলতে পার—

বাধা দিয়ে সুলতা বললে—সেজন্যে কিন্তু আমি আসিনি। আমি শুনতে এসেছিলাম, কীর্তিহাটের রায়বংশের ইতিহাস, দেখতে এসেছিলাম তোমার ছবি। কত উজ্জ্বল করে তুমি তাকে তুলে ধরে আর্কিওলজিক্যাল মনুমেণ্ট তৈরী করছ। ফৈজী বলে এক নাচওয়ালীকে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ঘরের ভেতর পুরে জানালা-দরজা গেঁথে মেরেছিল। বন্ধ ঘরটা আজ হয়তো খোলা। লোকে দেখে ঘরখানার গড়ন, নক্সা, বাহার আর তারিফ করে। দেখতে গেলে দরজায় টিকিট কিনতে হয়।

সুরেশ্বর বললে, না। ও-পথ ধরে আমার মন হাঁটেনি সুলতা। তুমি পলিটিক্যাল মানুষ, তুমি নিজে যখন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' হাঁক, তখন ঠিক অর্থ ভাব—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। কিন্তু পথেঘাটে বা কোথাও ওই হাঁক শুনলে চমকে ওঠো, ভাব—কম্যুনিস্টরা হাঁক দিচ্ছে। ওর আসল অর্থ, তারা ছাড়া বাকিরা সকলেই বিপ্লবের মধ্যে রক্তের স্রোতে ভেসে যাক।

সুলতার মুখ লাল হয়ে উঠল, সে কিছু বলতে যাচ্ছিল। সুরেশ্বর হাতজোড় করে বললে—মাফ চাচ্ছি। আমাকে ভুল বুঝো না সুলতা, আমি তোমাকে বাঁকা বঁড়শিতে বিঁধতে চাইনি। বিচারকের আসনে বসিয়েছি তোমাকে। তুমি বিচার করো। দেখ—স্যার গুরুদাস তখন উকিল হাইকোর্টে, এক জজ বলেছিলেন, হাফ এডুকেটেড বার। গুরুদাসবাবু পাদপূরণ করে বলেছিলেন, এ্যাণ্ড কোয়ার্টার এডুকেটেড বেঞ্চ। এটা অনেকটা তেমনি হয়ে গেছে। যে হাসি দেখে তুমি তোমার আমার কথা তুললে, তা আমি ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম, ওই গোপাল সিং-এর আর রায়বংশের বিবাদের কথা। সেটা অতুল আর মেজদির আর্মস অ্যাক্টের কেসে কনভিকশনেও শেষ হয়নি, তারপরও তার জের চলেছে। এই সেদিন পর্যন্ত। তারপর মেজদি বলেছিলেন, বিয়ের কথা। আমি মামলা করেছি, সে আমার উপর হামলা করেছে। তাতেও—

হাসলে সুরেশ্বর।

হেসে বললে—তাতেও ঠিক এই তত্ত্বটা সত্য হয়ে গেছে যে, কর্মফল না বল, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জের মেটে না দুনিয়ায়। আরও মজার কথা শোন, সেইদিনই বিশ্রীভাবে ঠিক এমনি আর একটা মামলার নোটিশ জারী হয়েছিল। ঠিক এই কারণেই ওই হাসিটা আপনি এসেছে এবং আমি মনে মনে তারিফ করেছি কর্মফলের খেলার।

মেদিনীপুর থেকে বাড়ী এসে মুখ-হাত ধুয়ে গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে জল মিশিয়ে খাচ্ছি, হাতে সিগারেট পুড়ছে। আর ভাবছি, যতদূর মনে পড়ছে এলোমেলো ভাবনা। গোপাল সিং, বীরেশ্বর রায়, রাম সিং, শিবেশ্বর রায়, হরি সিং, শিবু, অতুলেশ্বর, মেজদি ; মনের মধ্যে ক্ষোভ ধোঁয়াচ্ছে। কখন যে অজ্ঞাতসারে রায়বংশের জমিদারত্ব বেরিয়ে এসে তাতে ফুঁ দিতে লেগেছে বুঝতে পারিনি। মনে সংকল্প করছি—আজও হরি সিংরা আমাদের প্রজা। আমলটা উনিশশো ছত্রিশ হোক, এখনও পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট রাইট অনুযায়ী ওদের গাঁয়ের ঊর্ধ্ব-অধঃ হক হুকুবকায় মালিক আমি। এদিকে সেটেলমেণ্ট এসেছে। আমার জমিদারী স্বত্বের অধিকারে আমি হরি সিংয়ের সমস্ত রায়তীস্বত্বে লাখরাজ থাকলে, লাখরাজ স্বত্বে আমি আপত্তি দিতে পারি। এর আগে যদি আমার কর্মচারীরা তাতে সায়ও দিয়ে থাকে, তবে তাতে আমি গররাজী হয়ে আপত্তি জানাতে পারি যে, কর্মচারীর সঙ্গে যোগসাজস করে এ-সম্মতি দেওয়া হয়েছে, এটা আমি অস্বীকার করছি। সেটেলমেণ্ট কোর্ট না মানে, আমি দেওয়ানীতে মামলা করতে পারি। মুন্সেফ কোর্ট, জজকোর্ট, হাইকোর্ট পর্যন্ত এ-মামলা চলতে পারে। অনেক কিছু চলতে পারে। এমন কি কীর্তিহাট স্কুলের ছেলেদের উত্তেজিত করে ওই শিবুর জীবন দুর্বহ করা যেতে পারে।

পায়ের শব্দ শুনে গ্লাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নামিয়ে দিয়ে রঘুকে বললাম, নিয়ে যা এখান থেকে। লোকজন আসছে।

প্রথমেই এল অর্চনা। খবরটা প্রকাশ হতে বাকি ছিল না। খবর সবাই জেনেছিল। অর্চনাও জেনেছিল, সে এসে ঘরে ঢুকেই মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে—এ কি হল সুরোদা! ঠাকুমা—

বুঝলাম, মেজদির জেলটা তার জন্যে এই ভেবে মেয়েটা মনে মনে নিজেকে নিজে প্রহার করছে। আমি বললাম—মেজদি তোকে কাঁদতে বারণ করেছে অর্চি। তুই কাঁদিসনে। তিনিও বলেছেন, আমিও বলছি, তুই যা করেছিস, তা রায়বাড়ীর আর একটা ছেলে যদি করত ধর আমি করতাম তবে রায়বংশের মুখ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হত। তুই মেয়ে, কুমারী, তাই। মেজদি বললেন কি জানিস, তাঁকে স্বপ্নে মেজঠাকুরদা দেখা দিয়ে বলেছেন যে, তুই হলি এ-বাড়ীর সতী বউ ভবানী দেবী। কিন্তু এখন থেকে সাবধানে থাকিস ভাই। দেখ হিন্দুর ঘরে কন্যা হল লক্ষ্মী, তার মর্যাদাতে বংশের মর্যাদা।

অর্চনা হঠাৎ বললে—আমি যাচ্ছি সুরোদা। সব দলবেঁধে আসবার কথা। বড় জেঠামশাই সন্ধ্যে করছেন, তাঁর হলেই সব আসবে। আমার বাবা আজ এসেছেন। তিনিও আসবেন। পালাই।

ওর যাবার একটা পথ ও আবিষ্কার করেছিল। ওই কাঁসাইয়ের ঘাটের দরজা দিয়ে। যেতে গিয়ে অর্চনা ফিরে এল। এসে চাপাগলায় বললে, সুরোদা, নদীর ওপারে একটা লোক।

—লোক ?

—হ্যাঁ, অদ্ভুত পোশাক। কোট-প্যাণ্ট বটে। কিন্তু কি রকম !

—তুই সদর দরজা দিয়েই যা না। অপরাধ তো করিসনি। খোঁজ নিতে এসেছিলি, তাতে হয়েছে কি? যা। রঘু বরং তোকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

তাই সে গেল। আমি দেখতে গেলাম লোকটা কে? গিয়ে দাঁড়ালাম ছত্রির গোল ঘরটার। সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে, শীতকালের শেষ; মেজদিদের মামলা গড়িয়ে গড়িয়ে ছত্রিশ সাল পার করে সাঁইত্রিশ সালের মার্চের কাছে এসে পৌঁচেছে। বাংলা ফাল্গুন মাস, শুক্লপক্ষের গোড়ার দিক, জ্যোৎস্নায় দেখতে পেলাম, হ্যাঁ, দস্তুরমত একটা কোট-প্যাণ্ট-পরা লোক ওপারে জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে ওখানে? ওখানে দাঁড়িয়ে কে?

বেশ মোটা গলায় উত্তর এল—From that Goan Para.

—গোয়ানপাড়া? কে তুমি? গোয়ানদের কে?

—Oh—I am none of them.—তারপর ফিরিঙ্গীসুলভ ভাষায় বললে—উ লোকের—হিলডার—মেহমান আছি। Come from Calcutta.

—কি করছ ওখানে? এমন করে দাঁড়িয়ে?

—Who you please? হামি রয়বাবুকে সাথ মুলাকাত মাংতা হ্যায়। Are you Roy Babu—Mr. Sureswar Roy?

বললাম—Yes—that's my name.

—Thank God—May I see you sir?

রঘু এসে বললে—ও বাড়ীর সব আসিয়েসেন।

—ও! চল। বলে ওকে বললাম—Come tomorrow sometime.

—Why not today?

—No. I am very tired today. Come tomorrow. Come with Roser or Gomesh. They belong to Goanpara.

বলে আমি চলে এলাম।

নীচে তখন ধনেশ্বর কাকা, জগদীশ্বর কাকা, বিমলেশ্বর কাকা, এমন কি গাঁজাখোর ঘোরতর বাউণ্ডুলে কমলেশ্বর সেও এসেছে। সুখেশ্বর কাকার দুই ছেলে, কল্যাণেশ্বর, ধনেশ্বর কাকার মেজছেলে রাজেশ্বর, ছোট-বড় সকলেই এসেছে। এবং সেদিন একটা নতুন চেহারা দেখলাম, রায়বংশের সবারই মধ্যে। আগুনে ক্রমশ ছাই পড়ে, পড়তে পড়তে এমন হয় যে, উপরে শুধু ছাই আর নীচে কাঠকয়লা কি পোড়া কয়লা ছাড়া কিছু থাকে না। কিন্তু সেদিন দেখলাম এই মামলাটার ঝড়ো হাওয়ায় ছাই উড়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে এবং কাঠকয়লাগুলো দামী কাঠের কয়লা বলে গভীর নীচে যে এক টুকরো আঙরায় আগুন ছিল, তার আগুন কাঠকয়লাগুলোতেও হাওয়ার জোরে কোণে কোণে ধরে উঠে ঝিকমিক করছে। অতুলের আগুনের ছোঁয়াচে ওরাও যেন ধরে উঠেছে।

ধনেশ্বর কাকা আজ আর আক্ষেপ করলেন না। রায়বাহাদুরের বংশধর জেল খাটছে, তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হন নি।

সকলেই দুঃখ পেয়েছেন। চোখে-মুখে তারই ছাপ ছিল। টুকরো-টুকরো ছাড়া-ছাড়া কথা হল।

—আপীল?

আমি বললাম—আপীল করব বইকি।

—আপীল মিথ্যে! এত বড় সাদা শয়তানের জাত, এ তো হয় না!

জগদীশ কাকার কথা তোমাকে বলেছি। গাঁজা, মদ দুই তিনি খেতেন। ক্রোধ তাঁর প্রচণ্ড। প্রথম যৌবনে অহরহ বন্দুক ঘাড়ে করে বেড়াতেন। পথে কোন লোকের, বিশেষ শূদ্র প্রজাদের, প্রণাম করতে আধ মিনিট দেরি হলে মাথার চুলের মুঠো ধরে মাটিতে ঠেকিয়ে দিয়ে বলতেন—প্রণাম করতে হয়! বুঝেছিস? হ্যাঁ!

তীর্থ থেকে সেই দিনই ফিরেছেন; শালা রেলের চাকরি করে, ছোট চাকরে নয়, তার কাছ থেকে সেকেণ্ড ক্লাসের পাস নিয়ে ভারত ভ্রমণ করে ফিরেছেন। বিদেশের হাওয়ায় তাঁর চেহারা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তিনি এখন অনেকটা সুস্থ। হয়তো তীর্থের প্রভাব ছিল। তিনি বললেন—অন্তত মাকে দণ্ডটা বিনা দোষে দিয়েছে। ওরা যাবে। যেতে হবে। এ আমি বুঝে নিয়েছি। দেখে তো এলাম, গোটা ভারতবর্ষ! আপীল তুমি কর বাবা সুরেশ্বর। করলে হয়তো অন্য রকম দাঁড়াবে। শুধু মায়ের জন্যে। ওই। উনি সন্তানের মত মানুষ করেছেন অতুলকে; বলতে গেলে ওঁরই ছেলে। সে রাখতে দিয়েছে, সরল বিশ্বাসে রেখেছেন।

কল্যাণেশ্বর বললে—এটা মেজকা ভাল বলেছেন। অতুলকার জেলেই বরং থাকা ভাল। বেরিয়ে এসে ও তো চুপচাপ থাকবে না! হয়তো জেল থেকে বেরিয়ে এমন কিছু করবে যে, ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে।

ধনেশ্বর কাকা বলেছিলেন—কল্যাণ এটা ভাল কথা বলেছে। এতক্ষণে হঠাৎ তাঁর কথায় অ্যাক্টিংয়ের সুর লেগেছিল, খু—ব ভাল কথা। দূ-রদৃষ্টির কথা! আর আজকের কালে রাজদ্রোহিতার জন্য জেল সে তো সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের কথা! মানুষে ধন্য ধন্য করবে, পরলোকে পিতৃপিতামহের মুখ উজ্জ্বল হবে। ওঃ! কে জান ও, ওই শৈশবে মাতৃহীন ছেলে, মাতৃস্তন্যের জন্য কাঁদত, ছোটমা বুকে তুলে নিয়েও ওটা দিতে পারেন নি। তিনিও কাঁদতেন তার সঙ্গে। সেই শিশু। ওঃ! রায়বংশ, জমিদার বংশ। সাহেব কুলের অনুগৃহীত বশম্বদ, I remain your most obedient servant, এটা A B C শিখবার আগেই মুখস্থ হত আমাদের। সাহেবরা এসে এই বিবিমহলে থাকত, খানা খেত, আমরা দেখেছি, কর্তারা তটস্থ। সেই বংশের ছেলে। উড়ায়েছে বিদ্রোহের ধ্বজা। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়!

সুলতা, তোমাকে শপথ করে বলতে পারি, আমার মনে রয়েছে স্পষ্ট, এই ধরনের থিয়েটারী ঢঙে ধনেশ্বর কাকার কথাগুলো সেদিন এতটুকু অশোভন বেমানান মনে হয় নি! বরং মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলেছিল। তাতে আন্তরিকতার ঝঙ্কার ছিল।

হঠাৎ কমলেশ্বর একটু বেসুরো বলেছিল, ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠেছিল—ওই হরি সিংকে আমি দেখব। এর শোধ নেব!

ধনেশ্বর কাকা ধমক দিয়ে বলেছিলেন—দেখ, নেশা রায়বংশে প্রায় সবাই করেছে। কিন্তু তোর মত মাথা খারাপ কারুর হয় নি। ওই নিয়ে আস্ফালন করে বেড়াস নে। তাছাড়া সেটা তো কীট রে! কুকুর! মাসিক সাত টাকায় তার খোরাক-পোশাক!

কমলেশ্বর প্রতিবাদ করে বলে উঠেছিল—আমি আজ তিন দিন প্রতিজ্ঞা করে নেশা পরিত্যাগ করেছি।

জগদীশ কাকা বলেছিলেন, মঙ্গল হবে তোর। কিন্তু যা বললি তাতে মঙ্গল হবে না। বুঝতে চেষ্টা করিস, অতুল কি করেছে। আমাদের পূর্বপুরুষ ইংরেজের দাসত্ব স্বীকার করে-

ছিলেন। অতুল সেটা ছিঁড়ছে। সে ছিঁড়ছে, শেয়াল কুকুর মেরে নয়। সিংহ, বৃটিশ সিংহের সঙ্গে তার যুদ্ধ!

সেই দিন সুলতা, সেই মুহূর্তে নতুন করে সেই একখানি ছবি আঁকবার কথা মনে হয়েছিল। সেই একদিকে বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায় ইউনিয়ন জ্যাক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, অন্য দিকে অতুল তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ধরে দাঁড়িয়েছে।

সেই আমার ছবি এঁকে এই জবানবন্দী রচনার শুরু।

ওঁরা চলে গেলে, আমি ওই ছবির কথাই ভাবছিলাম। শরীর ক্লান্ত, তবু মন ক্লান্ত হয় নি। আবার খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খেয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে ছবির খসড়াই করছিলাম। হঠাৎ ডাক শুনলাম—

—সাব। রয় সাব! বাবু সাব!

সেই কণ্ঠস্বর। মোটা কর্কশ। খানিকটা উদ্ধত!

—মিস্টার রয় সাব!

সদর দরজায় ডাকছে এবার। বিরক্ত হয়ে রঘুকে বললাম—ডাক তো লোকটাকে!

ভাবছিলাম ওকে কঠিন তিরস্কার করব!

কিছুক্ষণ পর ভারী জুতোর শব্দ তুলে এসে দাঁড়াল একটি মূর্তি। হ্যাঁ, লোক বললে ঠিক বলা হয় না। হিন্দীতে বলে, 'এক মূরত'। এও তাই। বিচিত্র বিস্ময়কর। যত বিরক্তি হয় দেখে, তত কৌতূহল আকর্ষণের একটা শক্তি আছে লোকটির মধ্যে।

সে মানুষটা যেন মানুষ নয়, বিচিত্র গড়নে গড়া মানুষের একটা নিদর্শন। মডার্ন স্কাল্প্‌চারে যে সব মূর্তি গড়ার রেওয়াজ উঠেছে এ যেন তাই। বিধাতার শিল্পশালায় নানা ছাঁচ আছে। অষ্টাবক্র মুনির কথা শোনা যায়, তাও দু'চারটে দেখা যায়। কিন্তু এ ছাঁচও কি বিধাতার শিল্পে আছে? অত্যন্ত ভারী গড়ন, লম্বাও কম নয়, কিন্তু তবু কেন যেন অস্বাভাবিক অসদাচার, চোখ দুটো উগ্র এবং গোল নাকটা স্থূল; ঠোঁট পুরু। উজ্জ্বল হেজাক লণ্ঠনের আলো তার মুখে পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল, রঙটা দেখলাম লালচে কিন্তু রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে! একজোড়া বেশ পাকানো গোঁফ লোকটাকে আরও উদ্ধত চেহারা দিয়েছে। পোশাকটা পুরনো, এবং দেখেই বোঝা যায় পোশাক ওর মাপে তৈরী পোশাক নয়, কলকাতার চোরাবাজার যাকে বলে, সেখানে যে সব পুরনো পোশাক ফুটপাথে গাদা ক'রে বিক্রী করে, তা থেকে কেনা। অথবা অনেকদিনের পুরনো। কারণ সবই খাটো হয়ে গেছে। অথচ লোকটা খুব হৃষ্টপুষ্ট নয়, খাদ্যাভাব আছে এটা খুব স্পষ্ট। বয়স বেশী নয়—বড়জোর চল্লিশ হবে।

লোকটা এসেই অভিবাদন করলে—গুড ইভনিং স্যা—।

বললাম—গুড ইভনিং! কিন্তু তোমাকে তো আমি বললাম—কাল আসবার জন্যে। কিন্তু তুমি তবু এ সময়ে কেন এলে?

লোকটি বললে—I am sorry sir—believe me—I am so sorry for this.

লোকটার কথার উচ্চারণও ওর চেহারার মত ভারী। জিভটা মোটা, সরি 'অড়ি' গোছের উচ্চারণ করে স্যরকে শুধু স বলে শেষ করে। খুব বিনয় করে বললে কিন্তু তা আমাকে খুব খুশী করতে পারেনি সেদিন সেই মুহূর্তে। আমার মাথার তখন মদের প্রভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ু-শিরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং অন্তর্মুখী হয়েছিল। যে কল্পনাটা মাথায় কিছুক্ষণ আগে এসে-ছিল সেটা তখন বাইরের এই ব্যাঘাত সত্ত্বেও যাদুকরের বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে পাতা, তা থেকে গাছ হয়ে বেড়ে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার গজিয়ে আর একটা চেহারা

নিচ্ছে, এমনি অবস্থা। বীরেশ্বর রায় রত্নেশ্বর রায় আর দেবেশ্বর রায় ইউনিয়ন জ্যাক ইংরিজী ভাষা, ইংরিজী পোশাক আর এদিকে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, খদ্দরের কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে অতুল তার পিছনে মেজদি, হাতে গীতা, পরনে থান কাপড়—তার পাশে অর্চনা লালপেড়ে শাড়ী পরনে তার হাতে আনন্দমঠ আর শাঁখ। আবার পরক্ষণেই ভাবছি—না দুটো স্বতন্ত্র ছবি—শতবর্ষ আগে, শতবর্ষ পরে।

পরক্ষণেই মনে হল—না! আরও একখানা ছবি। মিউটিনির কলকাতার ছবি না থাকলে এটা সম্পূর্ণ হয় না। কলকাতার মিউটিনির ছবি মনে ভেসে উঠল একখানা চিঠির বর্ণনা থেকে। নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে যেদিন মেটেবুরুজ থেকে বন্দী করে ফোর্ট উইলিয়মে আটক করে ইংরেজরা, সেদিন ময়দানে বেরিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়। দৃশ্যটা তিনি দেখেছিলেন। তারপরই চলে আসেন কীর্তিহাটে।

ওইসব ফাইলের মধ্যে খানকয়েক চিঠি পেয়েছিলাম। একখানা কালীপ্রসন্ন সিংহ মশায়ের। একখানা বীরেশ্বর রায়ের মামাতোভায়ের।

১৮৫৭ সালের ১৩ই-১৪ই জুন কলকাতায় সে এক বিভীষিকার রাজত্ব। সিপাহীরা ব্যারাক-পুর-বহরমপুরে বিদ্রোহী হয়েছে, কলকাতায় আসছে ভেবে লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ীর সামনে ইংরেজ ফিরিঙ্গী ক্রীশ্চানদের ভিড় জমেছিল। গঙ্গার বুকে জাহাজ সাজানো ছিল। সিপাহীরা এলে তারা জাহাজে গিয়ে উঠবে। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের উপর বিশ্বাস তো বিশ্বাস এতটুকু আস্থা ছিল না। তাদের উপর আক্রোশে তারা ফেটে পড়তে চাচ্ছিল। বীরেশ্বর রায় তাই দেখেই কলকাতা ছেড়ে এসেছিলেন কীর্তিহাট। সাহসী বাঘ শিকারী প্রজাশাসক বীরেশ্বর রায় আমার পূর্বপুরুষ, তিনি ভীত হয়েছিলেন নাই বললাম—শঙ্কিত হয়েছিলেন এই কথাটার উল্লেখ রয়েছে কালীপ্রসন্ন সিংহের চিঠিতে। বীরেশ্বর রায় জানিয়েছিলেন তাঁকে তাঁর সংকল্পের কথা। উত্তরে সিংহ লিখেছিলেন,

"ভিয়ার বেরাদর, বেরাদরই লিখছি আপনাকে। বেরাদারি সহজ নয়, বেরাদারিতে একসঙ্গে শুধু আহার বিহার নয় পরস্পরের বিপদে আপদে বুক দিতে হয়। মরলে কাঁধ দিতে হয়। সুখের ভাগ দিতে হয় দুঃখের ভাগ নিতে হয়। আপনি এ দুর্যোগে, এ দুর্যোগ আমাদের আশ্বিনে ঝড়ের মত (সাহেব বাহাদুরেরা যাকে সাইক্লোন বলে), এই সিপাই মিউটিনির সাইক্লোনে কীর্তিহাটের ছাতার মধ্যে মাথা গুঁজবার ভাগ দিতে চেয়েছেন, এরপর বেরাদার না বলে উপায় কি!

আপনি এই ডামাডোলের বাজারে দেশে যাবার মতলব করেছেন—উত্তম করেছেন। তবে শুনেছি মেদিনীপুরে গোলমাল তাল আকারে না হলেও পাত্তিলেবু আন্দাজের আছে। তা সহ্য হবে। খবর পেয়েছি মেদিনীপুরের হেডমাস্টার রাজনারায়ণ বসু কাপড় চাদর ভিতরে পরে তার উপরে কোট পেণ্টালুন চড়ান। সিপাইরা এলেই পেণ্টুলান কোট খুলে ফেলে দেশী চেহারায় সেপাইদের জয় হাঁকবেন। আপনার বাড়ী অনেক ভিতর অঞ্চলে। আপনি অনেক সময় পাবেন। হয় মুসলমানী আমীর সেজে বসবেন নয় আপনার ঠাকুরদাদার কালীমার সামনে পৈতে বের করে মা কালী মা কালী বলে স্তব করবেন। বেরাদারের উপদেশ মনে রাখবেন। আমার বা আমাদের কলকেতার বাবুদের যাবার উপায় কি? এইখানেই যে আমাদের সব! মাগ ছেলে, ভিটে মাটি, টাকা পয়সা গিনি, দু'চারখানা হীরে মুক্তোভরা ভারী ভারী সিন্দুক, ঘরসংসার মায় গড়গড়া, রূপোবাঁধা হুঁকো পর্যন্ত। কলকাতায় জানবাজারে আপনার বাড়ীতে ইঁট কাঠ আছে, কীর্তিহাটে তার থেকে বড় বাড়ী। টাকা পয়সা কোম্পানীর

কাগজ হীরে জহরত পুঁটলি বেঁধে নিয়ে কালী কালী বলে চলে যান সেখানে।

"বাঙালী বিদ্রোহ কালে ভেতো বাঙালী। ইংরেজ এবং ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ বড় হয়ে উঠছে। ওদিকে চুনোগলি কসাইটোলার মেটে ইদরিস, পিদ্রুস, গমিস, ফিরিঙ্গীরা ডিস্ খাবার লোভে ভলেনটিয়ার হয়েছে। সাহেবেরা শক্ত জায়গায় কিল মারতে ভয় খেয়ে নরম জায়গায় আঁচড়াচ্ছে। সেপাইদের উপর রাগ বাঙালীর উপর ঝাড়বার তালে আছে। লর্ড ক্যানিংকে বাঙালীর অস্ত্রশস্ত্র বঁটি কাটারি পর্যন্ত কেড়ে নিতে ওসকাচ্ছে। শুনেছেন বোধহয় গোপাল মল্লিকের বাড়ী সভা ডেকে বাঙালীরা বুঝিয়েছে যে, যদিও একশো বছর হয়ে গেল তবু তাঁরা সেই যেড়া বাঙালীই আছেন। ওদিকে ইংরেজরা মাগছেলে ও স্বজাতির শোকে মরীয়া।"* মরীয়া তেরিয়া হয়! সুতরাং কলকাতায় থেকে কি করবেন? বাঈজীর গান জমবে না। চোখে ব্রাণ্ডি হুইস্কির নেশা লালচে আভা ফোটাবে না। সুতরাং চলে যান—চলে যান।

হ্যাঁ, শুনলাম, কাপ্তেন সুরো মল্লিক বললে—সোফি বাঈজী নাকি আপনাকে ছেড়ে একটা পাগলা সাধুকে ভজেছে? আপনি তাকে নাকি গলা টিপে ধরে প্রায় বোবা ক'রে দিয়েছেন। সে নাকি এখন খোনা সুরে আঁ—আঁ ক'রে কি বলে কেউ বুঝতে পারে না। সুরো মল্লিক বললে—এবার বাওয়া বীরেশ্বর রায় ফীরেশ্বর হয়ে যাবে। বলে, বাওয়া সাধু নাকি বেহ্মদত্যি নামায়। কাজটা মন্দ করেন নাই। আমার মতে তো সাতশো সাবাস আপনার পাওনা! সেদিন একটা ন্যাংটা নাগা এসেছিল ভিক্ষে চাইতে। একমুঠো চাল সে নেবে না। দুটো চাল হাতে নিয়ে দুই আঙুলে টিপে ঝরঝর করে জল বের করলে, চাকর বেটারা তাকে শিব সাক্ষাৎ ভেবে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হল। আপনি যেমন পাগলটাকে উত্তমমধ্যম দিয়েছেন তেমনি দিতে পারলে আমি খুশী হতেম। তবে তাকে দুটোর বেশী পয়সা আমি দিই নি। হিসেব করে দেখলে দু পয়সার ম্যাজিক সে দেখিয়েছে তা মানতে হবে। শেষ হল কি জানেন, কোথা থেকে ঘোড়ায় চেপে সাহেব পুলিশ এসে তাকে ধরলে। তার কাছ থেকে বের করলে রুটি। এ রুটি নাকি সেপাইদের নিশানা! কি সব্বনাশ মশাই! আপনি চলে যান! গাঁয়ে দেশে ঘরবাড়ী থাকলে আমিও পালাতাম।

ইতি
ভবদীয় বেরাদার
কালীপ্রসন্ন সিংহ

* * *

সেদিন রাত্রে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পত্রখানাকে স্মরণ হয়েছিল। তার মধ্যে নতুন করে অঙ্কুর মেলে ছবির আইডিয়া আর একরকম চেহারা নিচ্ছিল।

আমি ছবি আঁকি। আমি সেকালের ছবির কথা ভাবছিলাম। বাংলাদেশের পটের মাকালী, রাধাকৃষ্ণ, নরকের ছবি বাতিল হয়ে তখন ইংরেজী ছবির ঢঙ এসেছে। কলকেতার এবং বড় বড় রাজরাজড়ার বাড়ীতে কুইনের অয়েল পেন্টিংয়ের আমল। আমি ঢঙের কথা ভাবছিলাম। মনে পড়ছিল দিল্লীর দরবার।

সাহিত্যে তখন বিদ্যাসাগর মশায়ের কাল চলছে। বঙ্কিমের আনন্দমঠ আসতে তখনও অনেক দেরি। অবনীন্দ্রনাথ নন্দবাবু যামিনী রায় অনেক পরে। আমি ভাবছিলাম দিল্লীর দরবারের ঢঙে আঁকলে কি হয়? হঠাৎ আমার চিন্তায় ব্যাঘাত দিয়ে লোকটা জোরে বারকয়েক কাশ্‌লে গলা ঝাড়া দিলে। আমি ফিরে তাকালাম। দেখলাম সে আমার দিকেই

* কালীপ্রসন্ন সিংহের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কিত রচনার অংশবিশেষ

তাকিয়ে আছে। এবার মনে পড়ল ও কয়েকটা কথা বলতে চায়। জানালা থেকে সরে এসে আবার চেয়ারে ব'সে বললাম—বল তোমার কি বলবার আছে।

সে বললে—you see Roy Babu I am a poor man very poor.—

—হ্যা সেটা দেখছি। কিন্তু কি চাও তুমি? সাহায্য? ওরে রঘু, একে দুটো টাকা দে তো।

লোকটা বললে—Oh God—আপনে হামাকে বেগার ভাবছে রায়বাবু। সো হামি নেই। বহুত দো রূপেয়া two rupees—আমি বকশিশ দিয়েসি খুঁজি লোককে।

—খুঁজি? বিস্ময়ের সঙ্গে আমি প্রশ্ন করেছিলাম—

—ও স্যার, I was a professional Shikari—big বাবুজি জমিন্দার ব্যারিস্টার রইস আদমী—Some times European sahibs were my clients. উলোককে শিকার মিলায় দিতম। মাচান কে পর উ লোকের side-এ থাকতম। Sometimes Roy Babu —I killed tiger for them, they used to pay me handsomely and carried the trophy as their own. তো ট্রাইব্যাল People বুনো আদমী যো লোক টাইগার ভাল্লু বাইসনকে খবর লিয়ে আসে খোঁজ দেয়—উলোক we call them—"খুঁজি"। Informer. I earned a lot and spent every thing, sometimes I paid ten rupees to them. Two rupees নিয়ে কি হোবে আমার। No I dont want money from you. I have not come to yon fo-' that (নো—আই দোন্ত ওয়ান্ত মনি ক্রম য়ু। আই হ্যাভ নত কম তু য়ু ফ হ্যাত।)

—Then (দেন)? একটু তিক্ত বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম আমি।

সুলতা বাধা দিয়ে বললে—এসব কথায় তোমার জবানবন্দী বড় বেশী জটিল ক'রে তুলছ সুরেশ্বর। রাত্রি শেষ হয়েছে। ভোর হয়েছে, পাখী ডাকছে। আমার তো যাবার সময় হয়ে গেল। সে হাসলে একটু।

সুরেশ্বর বললে—শিবের মাথায় জটা আছে সুলতা, গঙ্গার ধারা যে গঙ্গার ধারা তাও হারিয়ে গিয়েছিল, সেই জটার মধ্যে। জটা বাদ দিয়ে শিব অথবা গঙ্গা কারুর কথাই বলা যায় না। যা বলছি তা ওই সেকালের একশো জটার একট জটা, যার মধ্যে দিয়ে রায়বংশের কাহিনীর স্রোত চলে এসেছে। এবং তোমার বংশের স্রোতেরও তার সঙ্গে সংস্পর্শ আছে। সেদিন রায়বংশের শরিকদের সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল তা শুধু উল্লেখ করেই ছেড়েছি, বলেছি সেই কথাগুলো যা আমার ছবি আঁকার কল্পনাকে নতুন ক'রে জাগিয়ে তুলেছিল। এর কথা না বললেই নয়। শোন—যতটা সকাল হতে হতে শোনা যায় তাই শুনে যাও। বাকীটা না হয় বাকীই থাকবে।

সুলতা হেসে বললে—বল!

সুরেশ্বর বললে—লোকটি বললে—রায়বাবু, আপনে হিলডা পিড্‌রুজ গোয়ান বুড়ী কে জানেন! হ্যাট ওল্ড ওয়্যান হামার নিস, সিস্টার'স ডটারকে নিয়ে আসছে কলকাতাসে! হা—নেম ইজ কুইনী মুকুরজী! এ বিউটিফুল নাইস গার্ল। (Her name is Quinee Mookherjee—a beautiful nice girl.)

—হ্যা আমি তাকে দেখেছি।

—ইজ শী নত এ বিউতিফুল নাইস গাল—(Is she not a beautiful nice girl)?

—হ্যা। কিন্তু হিলডা বলছিল—সে তার আত্মীয়। বাপ মা মরার পর সে তাকে

এখানে এনেছে।

—ইয়েস রয়বাবু, থ্যাঙ্ক হা ফ ছাত। দেয়া ওয়াজ নান তু লুক আফতা হা এ্যাত ছাত তাইম। আই ওয়াজ দেন ইন জেল—Yes Roy Babu. I thank her for that. There was none to look after her at that time—I was then in jail—

—জেল? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

—ইয়েস ইন জেল। আই ওয়াজ কনভিক্‌টেড তু জেল ফ সেভেন ইয়ারস ফ কজিং দি দেথ অব এ ভীল গুন্দা—বাই স্ট্রাইকিং হিম উইথ দি বাত্‌ অব মাই গাম। হি এ্যাতক্‌ড্‌ মি ফারস্ত। (Yes, in jail. I was convicted to jail for seven years for causing the death of a Bhil goonda by striking him with the butt of my gun. He attacked me first.)

বিবরণটা সে বলে গেল।

সি-পির জঙ্গলে তখন একরকম তার বাস ছিল। বিচিত্র জীবন। ষোল-সতের বছর বয়স থেকেই তার শিকারে নেশা। বারো বছর বয়সে কলকাতায় এক ইয়োরোপীয়ান টেনিস ক্লাবে ম্যানেজারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে ঢুকেছিল। বল কুড়িয়ে কাজ শুরু, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তার পনের-ষোল বছর বয়সে সে সব শিখেছিল। লনের কাজ থেকে টেনিস খেলা পর্যন্ত। লেখাপড়া সে করেনি—ভাল লাগত না। এই সময় উড়িষ্যার এক করদ রাজ্যের রাজা এসেছিলেন কলকাতা, টেনিস কোচ, গ্রাউণ্ড সুপারভাইজার প্রভৃতির সন্ধানে—তাঁর রাজধানীতে টেনিস খেলার ব্যবস্থা করবেন; প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থা। রাজা তাকেও পছন্দ করেছিলেন। সেও গিয়েছিল কোচ এবং সুপারভাইজারের সঙ্গে। সেখানে গিয়ে টেনিস থেকে সে গিয়ে পড়েছিল মহারাজার শিকারের ব্যবস্থার মধ্যে। এটা তারও ভাল লেগেছিল বেশী। রাজা ছিলেন পাকা শিকারী। রাজা তার উপর ছিলেন সদয়। ছেলেমানুষ বলেও বটে এবং তার উৎসাহ ও আনুগত্যের জন্যও বটে। তিনি টেনিসের চেয়ে তাঁর প্রিয়তর ব্যসন—শিকারের বিভাগে তাকে নিয়েছিলেন। সেও সেখানে তার কাজ দেখিয়েছিল। বন্দুক সাফ করা থেকে বন্দুক চেনা বন্দুক চালানো সবেই সে পাকা হয়ে শেষে পাকা শিকারী হয়ে উঠেছিল। রাজা হঠাৎ মারা গেলেন—প্রিন্স শিশু, পাঁচ বছরের। সুতরাং শিকার পার্টিতে ছাঁটাই হল। বন্দুক তাকে উঠল। ওর চাকরি গেল। চাকরি গেল কিন্তু শিকারের নেশা গেল না। সে নিজেই ব্যবসা খুললে। প্রফেশনাল শিকারী হল সে।

সুরেশ্বর বললে—তার কথাগুলো মনে পড়ছে সুলতা। সে বলেছিল—এ নেশা মদের নেশার চেয়েও নাকি তীব্র। এমন কি—।

একটু বিনীত হেসে বলেছিল—If you allow me to say—তাহলে নারীর নেশার চেয়েও তীব্র। Stronger than woman hunting.

আমি হেসে বলেছিলাম—প্রথমটা জানি। দ্বিতীয়টা জানি না। কিন্তু থাক না ওসব কথা। যা ঘটেছিল তাই বল না।

সুলতা লক্ষ্য করলে সুরেশ্বর যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সে তাকাচ্ছে তার ছবিগুলোর দিকে।

সময় চলে যাচ্ছিল। ভোর হয়ে এসেছে। সুলতা শুনতে পাচ্ছে রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দ উঠছে। পাখী ডাকছে। কাক ডাকছে। শালিক পাখীদের কলকল শব্দে ডাক উঠছে। চড়ুইগুলো কিচ্‌কিচ করছে। ক'টা চড়ুই ঘরটার মধ্যেই উড়ে বেড়াচ্ছে। এরা যে ঘরের

কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে ঘরের মধ্যে বাসা বাঁধে কেউ বলতে পারে না।

সুলতা ডাকলে—সুরেশ্বর!

সুরেশ্বর তার দিকে তাকিয়ে বললে—ওই কথাটা ব'লে সেদিন আমি চমকে উঠেছিলাম সুলতা। রায়বংশের ইতিহাস মনে পড়েছিল। এ নাকি প্রকৃতির অভিশাপ! যাক। আমার সে চমক লোকটির চোখে পড়েনি। সে বলে যাচ্ছিল। প্রফেশনাল শিকারী হয়ে উড়িষ্যা এবং সি-পির বর্ডারের জঙ্গলে একটা জংলীদের গ্রাম থেকে কিছু দূরে একটা কাঠের বাংলো তৈরী করে সে শুরু করেছিল তার বিজনেস।

হ্যাঁ, বিজনেসই বটে। সে শিকারের সিজনের শুরুতেই কলকাতার বড় বড় জমিদার ব্যারিস্টারদের কাছে যেত এবং বলত তার সঙ্গে গেলে শিকার গ্যারান্টিড। শিকার সে করিয়ে দেবেই!

—My arrangements were very good, Roy Babu and were liked by all big roycee people. Tigers, bears—leopards—they got. They also got girls—there. Anglo-Indian girls. I took them from Calcutta—for this purpose. They were sports. And—they had good time there. Forest was beautiful and full of thrill. Also they could earn a lot from these big people. They were my friends—also.

আমি বলেছিলাম—ও কথা আবার আনছ কেন? যা বলবার তোমার তাই বল।

সে বলেছিল—

I don't want to hide any thing from you sir, this is the reason why I am telling you every thing. I was a daredevil at that time. My mother did not like me. I did not care for her. She lived in Calcutta—in a house on the Eliot Road. The house belonged to her first husband—father of my elder sister. She was then in a convent. She loved me. I also loved her. This Quinee is her daughter Roybabu.

লোকটি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার আগ্রহ খুব ছিল না তার কথা শুনবার জন্তে। তবু এই বিষণ্ণতার মধ্যে তাকে কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় নি। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম লোকটির কিছু মনে পড়ে গেছে।

তাই বটে—সে কয়েক মুহূর্ত পরেই বললে—কুইনী ছেলেবেলা থেকেই খুব শান্ত। আমি তাকে প্রথম যখন দেখি সে তখন বছরখানেকের বাচ্চা। ভারী সুন্দর শান্ত বেবী। একটু shy, একটি রঙীন কাঠবেড়ালী ছিল আমার। সর্বদা পকেটে থাকত। সেইটেকে দিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। আমার মা হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল। কামড়ে দেবে আঁচড়ে দেবে। আমি কাঠবেড়ালীটির মুখে আমার কড়ে আঙুল পুরে দেখিয়ে দিয়েছিলাম—সেটা কামড়ায় না। নিজের খোলা হাতের উপর চাপিয়ে দেখিয়েছিলাম একটি নখের আঁচড় দেয় না। তাতেও মা থামে না।

My mother never liked me you see. I also did not like her. Whenever we met—we quarrelled. But my sister—oh she was an angel.

ওই কারণেই আমি আরও ঘর ছেড়েছিলাম। বাড়ীখানা তো আমার বাবার ছিল না, ছিল মার্গির বাবার। মার্গির বাবা ওই বাড়ী আর টাকা রেখে গিয়েছিল, সেই টাকার

ছেলেবয়সে মানি Convent-এ পড়ত। আর আমি ঘর ছেড়ে বনে বনে ঘুরতাম। To be frank—Mr. Roy—এটা আমার প্রকৃতিও বটে। আমার বাবার প্রকৃতি এমনি ছিল। মানি—

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মানি? তোমার বোনের নাম নাকি? মানি?

—Yes Roy Babu, মানি is not an English word—it is a Bengali word —meaning—Jem—diamond. Mani's father—so far I have heard—he had some Bengali connection. My mother though an Anglo Indian could speak Bengali like in any Bengalee.

—জান মানির যখন বিয়ে হ'ল সে বিয়ে করেছিল একজন বেঙ্গলী ক্রীশ্চানকে মিঃ মুকুর্জীকে—তখন মা আমাকে জানায় নি। জানিয়েছিল আমাকে মানি। আমি আসতে পারি নি। আসি নি। পরে এসে আলাপ করেছিলাম। কিন্তু মুকুর্জীকেও আমি খুব পছন্দ করিনি। সে ঠিক আমাদের মত ছিল না। আমি কলকাতায় এসেও বাড়ীতে উঠতাম না। হোটেলে উঠতাম। ছোট হোটেলে। দু'চারদিন দু'চারবার বাড়ীতে আসতাম, দেখা ক'রে চলে যেতাম। কুইনীকে দেখার পর আমার আকর্ষণ বেড়েছিল, আমি তারপর থেকে বাড়ীতে আসতাম বেশী বেশী। দু'একবার থাকতেও ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু থাকি নি মুকুর্জী আর মায়ের জন্যে। কুইনী যখন পাঁচ বছরের তখন সেবার এসে তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল। সেবারই আমার মা মারা যায়। ডেথ বেডে মা আমার জন্যে একটু চিন্তিত হয়েছিল। মানিকে মুকুর্জীকে বলেছিল—হ্যারিসকে বাড়ীতে একখানা ঘরে থাকতে দিস আমি যেটায় থাকি। মানি মুকুর্জী রাজী হয়েছিল। আমি সেবার যাবার সময় ঠিক করে গিয়েছিলাম যে, এবার থেকে এসে হোটেলে আর উঠব না—এখানেই এসে উঠব। সব আকর্ষণ আমার পাঁচ বছরের কুইনীর জন্যে। কিন্তু সেইবার গিয়েই ঘটে গেল আমার জীবনের সর্বনাশ।

এখন যে ঘটনায় তার জীবনটা এমন হয়ে গেল সেটা ঘটল সি-পিতে। একজন জংলী জোয়ান ছিল তার খুব অনুগত। তার সঙ্গে খুব দোস্তি ছিল তার। একসঙ্গে মদ খেত। যারা শিকার করতে যেত তাদের মধ্যে কারও ঝোঁক ছিল ট্রাইবাল গার্লসের উপর। এই বীরাই—বীরাই নাম ছিল জোয়ানটার, সে এনে দিত। বীরাইয়ের একটা কুকুর ছিল—ওদেশী কুকুর, কুকুরটা ছিল ভীষণ তেজী আর অত্যন্ত হিংস্র। হ্যারিসেরও একটা কুকুর ছিল, সে সেটাকে নিয়ে এসেছিল রাজাসাহেবের বাড়ী থেকে। একদিন দুটো কুকুরে ঝগড়া হয়ে মারামারি লেগে গেল। দুটো কুকুর একসঙ্গে বেশ থাকত। কিন্তু সেটা ছিল ওদের মেটিং সিজন।

চিরন্তন বিরোধের বীজের দুটি দল। একটি থাস্ত অস্পৃটি নারী। ঝগড়া লাগল তাই নিয়ে। জংলী কুকুরটা হঠাৎ হ্যারিসের কুকুর প্যাম্বারের গলায় কামড়ে ধরলে। সে কামড়ে ধরা আশ্চর্য হিংস্র ধরা। গলায় চারটে দাঁত ফুটিয়ে চেপে ধরে ক্রমাগত ঝাঁকি দিতে লাগল। হ্যারিস আর বীরা প্রথমটা দুজনেই দেখছিল ওদের লড়াই। প্রথমটা হ্যারিস বুঝতে পারেনি এই যুদ্ধের গুরুত্বটা কিন্তু যখন এমন ভাবে ঝাঁকি দিতে লাগল তখন সে ছুটে গেল ছাড়াবার জন্যে। কিন্তু নিষ্ঠুর হিংস্র বুনো কুকুরটা মার খেয়েও তা সহ্য ক'রেও আঁকড়ে ধরে থাকল।

হ্যারিস বীরাকে চিৎকার করে বললে—ছাড়িয়ে দে বীরা ছাড়িয়ে দে!

বীরা হি হি ক'রে হাসছিল। সে বুঝতে পারেনি। কিংবা বুঝতে পেরেও ছাড়ায় নি।

হ্যারিসের প্যান্থার তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বীরা হাততালি দিচ্ছে। হ্যারিস আর সহ্য করতে পারে নি, সে ছুটে ঘরের ভিতর থেকে বন্দুক এনে তার অব্যর্থ নিশানায় ওই জংলী কুকুরটাকে গুলি করেছিল। মুহূর্তে বীরা চীৎকার করে ছুটে এসেছিল—আঁা, লড়াই করে মারলে আমার কুকুর—তু আমার কুকুরকে মারলি কেন? হ্যারিস বলেছিল—তোকে গুলি করব আমি। কিন্তু বীরা বন্দুকটা হঠাৎ আচমকা টেনে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে হ্যারিসকে আক্রমণ করেছিল। বলেছিল—তোকে এমনি করে মারব আমি। কিন্তু সেটা সম্ভবপর হয় নি। বীরার চেয়ে হ্যারিস শক্তিমান হোক বা না হোক সে প্যাঁচ জানত, বক্সিং জানত। সে তাকে ঘায়েল করেছিল। অবশ্য মার সেও খেয়েছিল যথেষ্ট। বীরা ঘায়েল হয়ে পড়েছিল, হ্যারিস উঠে দাঁড়িয়ে টলছিল। কিন্তু আক্রোশ তার তাতেও মেটেনি। হঠাৎ বন্দুকটা পড়েছিল নজরে। পড়েছিল সেটা। জ্ঞান তার ছিল না, সে বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে বীরার মাথায় বাট দিয়ে মেরেছিল একটা ঘা! কতটা জোরে মারছে তা তার খেয়াল হয়নি। বীরা তখন হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছিল এবং তাকে গাল দিচ্ছিল কুৎসিত ভাষায়। হ্যারিস বাঁটটা দিয়ে মারতেই মাথাটা ফেটে গেল। রক্ত বেরিয়ে এল গলগল ক'রে। বীরা লটকে পড়ে গেল। তখন তার খেয়াল হল এ সে করলে কি? মরে গেল লোকটা!

দুরন্ত আতঙ্কে সে সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে সামনে যা পেলে নিয়ে পালাল। কোথায় যাবে ঠিক ছিল না। মনে পড়েছিল কলকাতা। হেঁটেই সে রওনা দিয়েছিল। রেলস্টেশন—বনে বনে বিশ মাইল পথ। সেই পথটা সে সেই ক্ষতবিক্ষত দেহে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছিল। শুধু তো পুলিশের ভয় নয়। বীরাজংলীর গ্রামে খবর গেলে তারা এসে তাকে তীর মেরে বিঁধে ফেলেই ছাড়বে না, টাঙি দিয়ে কুপিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেবে। তার বন্দুক দুটো ছিল। একটা রাইফেল, একটা দোনলা। কার্টিজও ছিল বাংলোতে কিন্তু তা দিয়ে কতক্ষণ রুখবে। স্টেশনে এসে ট্রেনে চেপে এসেছিল কলকাতা। কিন্তু মানির বাড়ীতে ওঠেনি। একখানা ঘর, মায়ের ঘরটা তার, মা দিয়ে গেছে, মানি রাজী হয়েছে দিতে তবুও ওঠেনি। ভয়ে ওঠেনি। মুকুজ্জীর ভয়ে। এবং মানিও বোধহয় বিরক্ত হবে এসব শুনে—সেই ভয়ে।

উঠেছিল সে, যেসব বান্ধবীদের সে তার অরণ্য-স্বর্গে নিয়ে যেত, যারা সেখানে গিয়ে দ্বিগুণ উল্লাসে স্বচ্ছন্দচারিণী বনদেবী সেজে উল্লাস করত এবং কয়েক মাসে নোটের গোছা উপার্জন করে ও স্বাস্থ্য ফিরিয়ে কলকাতা ফিরত, তাদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতমা, তার বাড়ীতে। সেও তাকে আশ্রয় দিতে বিমুখ হয়নি। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি পায়নি। পনের দিনের মধ্যে পুলিশ ঠিক এসে তাকে অ্যারেস্ট করেছিল।

তার দুর্ভাগ্য। বীরাজংলী সঙ্গে সঙ্গে মরেনি। দুদিন পর হাসপাতালে পুলিশের কাছে ডায়িং ডিক্লারেশন দিয়ে তবে মরেছিল। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের লোক। তারা গ্রামে খবর দিয়ে গ্রামের লোকেদের এনে তাকে পাঠিয়েছিল দশ মাইল দূরের সাব-ডিভিশনাল টাউনে। সেখানেই বীরা ডায়িং ডিক্লারেশন দিয়েছিল; হ্যারিসসাহেব তাকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরে মাথাটা ভেঙে দিয়েছে। কুকুরদুটোর বৃত্তান্তের সাক্ষী ছিল—কুকুরদুটোর ফটোগ্রাফ। বিচারে তার সাত বছর জেল হয়ে গেল।

এরই মধ্যে মুকুজ্জী এবং মানি দুজনেই মারা গেছে। সে বিন্দুবিসর্গ জানত না। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতায় ফিরেছিল হ্যারিস। আর কোথায় যাবে? মনে পড়েছিল—

মানি তার মায়ের মৃত্যুশয্যায় মায়ের ঘরখানা তাকে দেবে বলেছে। সে গেলে, তার এইসব বৃত্তান্তের পর তারা খুশী হবে না সে জানত। মানির স্নেহ আছে। কিন্তু তবুও হয়তো খুশী হবে না। সে তো জানে, মানি মুকুর্জীকে কি রকম ভালবাসত!

মায়ের মৃত্যুর সময় সে দেড়মাস ছিল ওই বাড়ীতে, ওই সময়েই কুইনীর সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল, সে-সময় দু-চার দিন সে তার বন্ধু এবং বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করেছিল তার নিজের খরচে। কিন্তু—

তার কথাগুলো মনে পড়ছে সুলতা। হ্যারিস বলেছিল, মিস্তার মুকুর্জি ওয়াজ এ বেংগলী ক্রীশ্চান, এ সেলসম্যান ইন দি হোয়াইটওয়ে লেডল কোম্পানী। হি অলয়েজ সাফারড ফ্রম এন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ফ অ্যাংলো বয়েজ এ্যাণ্ড গার্লস। হি দিদ নত লাইক আওয়ার হুল্লাজ এ্যাণ্ড মেরিমেকিং। মাই সিস্‌তা মানি দো এ্যান এ্যাংলো গার্ল কুদ নত জয়েন আস ফ হিম। শী লাভদ হিম ভেরি ডীপলি। অলসো মাই মাদা গ্রু এ্যাংরি উইথ মি। শী কার্সড মাই ফাদা।

Mr. Mookerjee was a Bengali Christian, a salesman in the Whiteaway Laidlaw Company. He always suffered from an inferiority complex for the Anglo boys and girls. He did not like our hullas and merry making. My sister Mani though an Anglo girl could not join us for him. She loved him very deeply. Also my mother grew angry with me. She cursed my father.

অকুণ্ঠ স্বরে তার বাপের পরিচয়ও দিয়েছিল সে। বলেছিল, হ্যাঁ, বাবা তার লাইফ-এ সাকসেসফুল লোক ছিল না। চরিত্রেও সে অস্থির ছিল, তারই মত।

বলেছিল সে—My father was a pure Englishman. Came to India as a soldier. But was discharged for misconduct. Then he became a football trainer in an Anglo Indian football club. Then he became a sports goods dealer. There he lost everything. After that he got a job in the port police. There he met this Mr. Pedros, father of Mani. Pedros was a young man and my father was an old man of fifty-five or so. Mr. Pedros was an officer in an Indian firm—doing export import business. Pedros was their supervisor in the docks. Here they met and secretly organised a smuggling business together. You see, my father used to come to Pedros' house everyday and met my mother. Mr. Pedros died suddenly, leaving my mother and Mani. This house was Pedros' own house. My father took advantage of this situation and induced my mother to marry him. When I was born—he again lost his job for misconduct, and lived on my mother, became a great drunkard. Then he died.

তার বাবা লোক ভাল ছিল না। সেও খুব ভালোমানুষ হতে পারেনি এটা সে মানে। তবু মানির উপর ভরসা করে কলকাতায় এসেছিল। এবং আশা করে এসেছিল এবার সে ভাল লোক হতে চেষ্টা করবে। কুইনীকে স্নেহ করবে। কুইনীকে সে ইংরেজ এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান

সোসাইটিতে ইনট্রোডিউস করবে। শরীরটা সেরে উঠলেই নতুন মানুষ হবে সে। তা যদি সম্ভবপর নাই হয়, শরীরটা সারলেই আবার সে যা-হয়-কিছু করবে। শিকারের নেশা তার এখনও আছে। বন্দুক তার গেছে, চেষ্টা করলে বন্দুক সে আবার পাবে। ইচ্ছে ছিল এবার জানোয়ার ধরার ব্যবসা সে করবে। না-হয় সার্কাস পার্টিতে চলে যাবে। যা-হোক-কিছু করবে। কিন্তু এলিয়ট রোডের বাড়ীতে এসে সে-বাড়ীতে অন্য লোকদের দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে মানি নেই, মুকুর্জি নেই, তাদের ছোট্ট মেয়ে কুইনী নেই, তার জায়গায় একজন মিস্টার রাইট বাস করছে। তারা ভাড়া নিয়েছে গোটা বাড়ী। আশপাশের চেনা লোকেরা বলেছে তাকে যে, মুকুর্জি-মানি দুজনেই মরে গেছে। আগে মুকুর্জি, তারপর মানি। দুজনেরই থাইসিস হয়েছিল। মানির অসুখে সেবা করতে এসেছিল এই গোয়ানপাড়ার হিলডা পেড্রোস। মানির বাপ পেড্রোসের সে বোন হত। পেড্রোসের মা ছিল এই গোয়ানীদের মেয়ে। মানি চিঠি লিখেছিল তাকে। মানির মৃত্যুর পর এই হিলডা নিয়ে এসেছে কুইনীকে এখানে। এবং বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে এসেছে এই রাইটকে।

কি করবে সে? তার আজ অর্থ নেই, আশ্রয় নেই। তাছাড়া 'কুইনী' মানির মেয়ে, তার ভাগ্নী, শেষে সে এই গোয়ানদের গ্রামে এসে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, অসভ্য হয়ে যাবে! তাই সে এসেছে এখানে। সে চায় কুইনীকে নিয়ে সে এলিয়ট রোডের বাড়ীতে সংসার পাতবে। তার আর কে আছে? কুইনীই তার সব হবে। তাকে মানুষ করবে।

—ভেরী সুইট গাল। য়ু সী! Very sweet girl, you see.

কিন্তু হিলডা তাকে আমল তো দেয়ই নি, তাকে নানান কটু কথা বলেছে। বলে, মানি তাকেই কুইনীর গার্জেন করে গেছে। যা করবার সেই করবে। সে মিদনাপুরে কুইনীকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে, নতুন সেসন আরম্ভ হলে। কিন্তু সেসব মিথ্যে কথা। কিচ্ছু করবে না। আর সে গার্জেন কি করে হবে সে থাকতে? সে কুইনীর মায়ের ভাই, এক মায়ের পেটের ভাই-বোন, না হল এক বাপের! হিলডার এটা নিজের জায়গা। সে এখানে অসহায়। কাল সারাদিন ধরে খারাপ কথা শুনে শেষে রায়বাবুর নাম শুনে সে এখানে এসেছে। শুনেছে সে যে গোয়ানপাড়ার প্রত্যেকে রায়বাবুকে মানে। হিলডাও মানে, খাতির করে।

—আপনি রায়বাবু গোয়ানপাড়া রেণ্ট ফ্রি করে দিয়েছে। এখানকার লোকের ভি বহুৎ রাইট দিলে। য়ু হ্যাভ এ ফাইন সেন্স অব জাস্টিস—You have a fine sense of justice, রায়বাবু, য়ু প্লিজ হেল্প মি, তেল স্যাত হিলদা তু গিভ কুইনী তু মি। You please help me, tell that Hilda to give Quinee to me.

সে তাকে পড়াবে। সত্যকারের ফাইন লেডী হবে সে।

আমি তার কাহিনী শুনে বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, ওই লোকটির কথা। কুইনীকেও মনে পড়ছিল। কথাবার্তাগুলিও মনে পড়ছিল। নমস্কার তার! কিছুক্ষণের জন্য রায়বাড়ীর কাহিনী—বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায়, অতুলেশ্বর, মেজদিকে নিয়ে যে-বিচিত্র চিন্তা জেগেছিল, তাও ভুলে গিয়েছিলাম। বিস্ময়কর বিচিত্র জীবন!

লোকটাই আমাকে সচেতন করে তুলেছিল—রায়বাবু!

ঘোরটা ভেঙে গিয়েছিল।

আমি তাকে বলেছিলাম—ইয়েস মিস্টার হ্যারিস, কাল আমি সকালবেলা হিলডাকে ডাকব। কুইনীকেও সঙ্গে আনতে বলব। তাদের কাছে এ বিষয়ে তাদের কি বলবার আছে জিজ্ঞাসা

করব। তারপর তোমাকে উত্তর দেব। তার আগে কিছু তো বলতে পারব না।

হ্যারিস এইটুকুতে খুশী হয়েছিল। বলেছিল, রয়বাবু, আই নিড ইট। তুমি এই বলবে আমি জানতাম। নিশ্চয় তুমি শুনবে। তবে তুমি বিচার করে দেখো, সে সঙ্গত কথা বলছে কিনা! হয়তো বলবে, আমি মার্ডারার। হয়তো বলবে, আমি বদমাস। আমি ওই শিকারের সময় গার্লস নিয়ে যেতাম, আমি পাজী লোক, কিন্তু দেখ, সে করতাম বাধ্য হয়ে আমার প্রফেশনের সুবিধের জন্তে, আর সে মেয়েরাও ছিল প্রফেশনাল। কিন্তু আমি তো ভদ্রলোক।

কথাগুলো আমাকে আর একটা দিক সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিল সুলতা, আমি তাকে কথায় বাধা দিয়ে বলেছিলাম, সেসব কাল শুনব। আজ আর নয়। এগারটা বাজছে। তুমি এস। কিন্তু তুমি রয়েছ কোথায়? হিলডার বাড়ীতে?

—না। সে থাকতে অবশ্য বলেছিল। কিন্তু তা আমি থাকিনি। হিলডা বড় রাফ রুড। তাছাড়া ওদের ঘরদোর ভাল নয়। হিলডাই আমাকে বলেছিল, চার্চের পাশে একখানা ঘর আছে সেখানে থাকতে। মিদনাপুর থেকে পাদ্রী এসে থাকে। আমি তাও থাকিনি। আমি অন্ত একজনের বাড়ীতে রয়েছি। তাকে টাকা দিয়েছি—ক্যাশ ফাইভ রূপিজ। সেখানে থাকছি।

লোকটা চলে গেলে কিছুক্ষণ আমি ওর কথাই ভেবেছিলাম। বিচিত্র জীবন; পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ ওর বাপ, আর্মি থেকে ডিসচার্জড হয়ে ফুটবল-ট্রেনার, তারপর দোকান। তারপর পোর্ট-পুলিশে ঢুকে স্মাগলিং। ছেলে টেনিস ক্লাবে বয়, সেখান থেকে উড়িষ্যায়, নেটিভ স্টেটে গিয়ে শিকারী। খুন। জেল। জাতটাই বিচিত্র।

খেয়েদেয়ে শুয়ে ঘুম আসেনি, ফিরে এসেছিলাম রায়বংশের কথায়। সেদিনের আজকের কথায়। ছবি আঁকার কল্পনা নিয়েই শুয়ে জেগে ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ কল্পনা একটা এল, খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

আঁকব, ১৮৫৭ সালে কুইনস ডিক্লারেশনের সময়, ডিক্লারেশন পড়ছেন কলকাতায় লর্ড ক্যানিং। মেদিনীপুরে পড়ছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একটা প্যাণ্ডেলের তলায়। প্যাণ্ডেল নয় সেটা, ছাদই হবে। ছাদের তলায় মোটা মোটা সারিবন্দী থাম। থামের পায়াগুলো মোটা পাথরের, সেগুলো এক-একটা জমিদারী এস্টেট। আর থামগুলো শক্ত পাথরে খোদাই মানুষের মূর্তি। তাঁরা জমিদার, কারও টাইটেল রাজা, কারও মহারাজা, কারও রায়বাহাদুর, কারও রায়সাহেব, কারও বা খেতাব নেই। আর অগণিত ভীতিবিহ্বল মানুষ। তারা চাষী, তারা গৃহস্থ, তারা সাধারণ মানুষ। চারিদিক ঘিরে থাকবে পুলিশ, মিলিটারী। ছাদটার মাথায় উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক।

আর একটা আঁকব—১৯৩০ সাল। সেটাতে সেই ছাদ, সেই পুলিশের বেষ্টনী, মিলিটারীর পাহারা। এবং চাষীগৃহস্থেরা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, চোখে বিদ্রোহী দৃষ্টি। আর ওই থামগুলোর পাথরের মানুষ জেগে উঠেছে। তার মধ্যে কীর্তিহাটে যে-স্তম্ভটা বীরেশ্বর রায়ের মূর্তি ছিল, সেটা ফেটে গেছে, তা থেকে বের হচ্ছে অতুলেশ্বর, তার হাতে তেরঙা ঝাণ্ডা। আর পাশে দাঁড়িয়ে মেজদি দিচ্ছেন আশীর্বাদ, অর্চনা বাজাচ্ছে শাঁখ।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোইনি। মনে হয়েছিল চীৎকার করি আনন্দে। হ্যাঁ, পেয়েছি। পেয়েছি। এই আইডিয়া নিয়েই দুখানা ছবি আঁকব আমি। এই আমার এই ছবির একজিবিশনের সূচনা। বীজ।

অনেক রাত্রে সেদিন শুয়েছিলাম।

রাত্রি শেষ হয়েছে। বাইরে মহানগরীর বর্তমান জেগেছে। বিরাট কর্মকাণ্ডের চাকাটা সশব্দে চলতে শুরু করেছে। গঙ্গার বুকে জাহাজে স্টীমারে ভোঁ বাজছে। মিলের পর মিলে সাড়ে পাঁচটার সিটি সাইরেন-ভোঁ বাজছে। গাড়ীর চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাখীর শব্দ হারিয়ে গেছে। তাকে ছাপিয়ে উঠছে মানুষের সাড়া।

তাকে উপেক্ষা ক'রেই সুরেশ্বর বলে চলল—সুলতা, পরের দিন সকাল—সে দিনটি ছিল ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসের ২৬শে। ১৯৩০ সাল থেকে ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে। আজ সে পূর্ণ মূল্য পেয়ে সগৌরবে পৃথিবীর ইতিহাসে চিহ্নিত। কিন্তু সেদিন ১৯৩১ সাল ভারতবর্ষের মানুষের বুকে ওর স্থান ছিল ভাবী জননীর প্রত্যাশিত দিনটির মত।

আমি ওই দিন—ওই দেখ ওই ছবিখানা আরম্ভ করেছিলাম সকালে উঠেই। আমার মনেই ছিল না হ্যারিসের কথা। সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। প্রথমে উঠে ক্যানভাস বের করে ইজেলের উপর চাপাচ্ছি, মনে পড়ল আজ ২৬শে জানুয়ারী। একখানা পতাকা টাঙাবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু পতাকা কোথায় পাব? হঠাৎ মনে হয়েছিল এ তো আর বীরেশ্বর রায়, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের সম্পদ-গৌরব-ঝলমল রায়বাড়ী নয়। এ অতুলেশ্বরের রায়বাড়ী। জীর্ণ ফাটল-ধরা শ্যাওলা-পড়া পলেস্তরা-খসা রায়বাড়ী।

আজ নতুন কালের পতাকা থাকবে না? নিশ্চয় থাকবে। অতুল পিস্তলগুলি যোগাড় করেছিল আর পতাকা যোগাড় করেনি? পিস্তলটা মেজদি বের ক'রে দিয়েছেন, আমি গোপনে কার্টিজগুলো ফেলে দিয়েছি। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের যে ঘরটায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বড় অয়েল পেন্টিং টাঙানো ছিল সেই ঘরটাই অতুলেশ্বর ইংরেজরাজত্ব উচ্ছেদের লড়াইয়ে অস্ত্রাগার করেছিল। এ বাড়ীতে জাতীয় পতাকার অভাব হবে?

অর্চনাকে ডেকে পাঠালাম আমি। অর্চনা এসে বললে—ডেকেছ সুরোদা?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। অর্চনার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। অস্বাভাবিক রকমের লাল। গৌরবর্ণ মুখখানাও যেন রাঙা দেখাচ্ছে। মনে হল জ্বরটর হয়েছে। বললাম—তোর মুখ-চোখ এমন কেন রে?

সে বললে—ও কিছু না।

—কিছু না মানে? জ্বরটর হয়েছে নাকি?

—না। এখন বল কি বলছ?

—দেখি—তোর কপালের তাপ দেখি।

—না—দেখতে হবে না। কাল রাত্রে ঘুম হয়নি।

এবার ওর চোখে জল দেখতে পেলাম। এবার বুঝলাম সারারাত কেঁদেছে মেয়েটা। আমি বললাম—তুই মিথ্যে এমন ক'রে কাঁদিস নে। মেজদি বা অতুলের জন্যে কাঁদতে নেই।

এবার দরদর করে জল গড়িয়ে এল চোখ থেকে। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা ক'রে বললে—না, তাদের জন্যেও কাঁদিনি সুরোদা। তুমি বল—কি বলছ।

আমি বললাম—না। বল তুই আগে কি হয়েছে।

এবার সে বললে—আমাকে বলির ব্যবস্থা হয়েছে সুরোদা। তাই কেঁদে নিচ্ছি।

—তার মানে?

—বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে এসেছে—একজন পুলিশ সাবইন্সপেক্টারের সঙ্গে।

আমার মামার শালার ছেলে। তার স্ত্রী মারা গেছে। মামা সম্বন্ধ ক'রে দিয়েছে। আমি শেষে—

কথা শেষ করতে পারলে না অর্চনা—আবার ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে। আমি কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলাম সুলতা ; তারপর বললাম—তুই ভাবিস নে—এ বিয়ে হ'তে আমি দেব না। আমি জগদীশকাকার হাতে পায়ে ধরব—বলব—অর্চির বিয়ের ভার আমার। আমি পাত্র দেখে যা খরচ করতে হয় ক'রে ওর বিয়ে দেব। ভাবিস নে।

অর্চনা চোখ মুছে হাসল। সে হাসির মানে আলাদা—জাত আলাদা। তার মানে একটা নয় অনেকগুলো। তাতে যত ব্যঙ্গ তত ক্ষোভ। সে হাসি যত ধারালো তত বাঁকা। বললে—যেয়ো, বাবা অপমান করবে। সম্বন্ধ পাকা ক'রে এসেছে। দিন পর্যন্ত একরকম স্থির। ফাল্গুনের শেষে। টাকা নেবে না। সরকারী চাকরে। মাকে কাল আমি বলেছিলাম—বিয়ে আমি করব না। জোর করে বিষ খাব। বাবা ঠাস ক'রে এক চড় মেরেছে আমার গালে। ও থাক। সে যা করবার আমি করব। এখন কি বলছ বল!

—অর্চনা? আমি তার মুখে-চোখে একটা নিষ্ঠুর সঙ্কল্পের আভাস দেখতে পেয়েছিলাম।

—আঃ! বল না কি বলছ!

তার হাত চেপে ধ'রে বললাম—বল্ তুই বিষ খাবি নে! তুই বিষ খাবি! আমি বুঝেছি।

হেসে ফেলে সে বললে—খাব না। হল তো!

—তবে? তবে তুই কি করবি?

—সে আমি বলব না।

—অর্চনা!

একটু চুপ ক'রে থেকে অর্চনা বললে—আবারও আমি বলব সুবোদা। তাতেও যদি না মানে আমি পুলিশকে চিঠি লিখব যে রায়বাড়ীর অর্চনা ব'লে মেয়েটা অতুলকা'র সঙ্গে এইসব কাজ করেছে। তাহ'লে আমাকে ধ'রে নিয়ে যাবে। পুলিশ দারোগাসাহেবও আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে না!

আমি চমকে উঠেছিলাম। তাকে অবিশ্বাস করতে পারি নি। আমি তার হাতখানা চেপে ধ'রে বলেছিলাম—না। তা করবি নে।

—তা হ'লে কি করব বলতে পার?

আমি উত্তর দিতে পারি নি। সে হেসে বলেছিল—বল? বল কি করব?

আমি ভেবেই বলেছিলাম—আমি জগদীশকাকাকে ডেকে বা তার কাছে গিয়ে সব কথা গোপনে বলব। এবং বিয়ের ভার আমি নেব। নিশ্চিত থাক্। সব শুনে জগদীশকাকা কখনও জেদ করবে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে সে বলেছিল—বেশ তাই হ'ল। এখন কি বলছ বল। আমি এখন ঠাকুরবাড়ী যাব। মেজদি নেই। একবার গিয়ে দাঁড়াতে হবে। না-হলে পুরুতরা পূজুরীরা যা মন তাই নমো নমো ক'রে পুজো সেরে পালাবে।

—সে করিস। কিন্তু এখুনি যে আমার একটা ফ্ল্যাগ চাই।

—ফ্ল্যাগ?

—হ্যাঁ, কংগ্রেস ফ্ল্যাগ। আজ ২৬শে জানুয়ারী।

—ফ্ল্যাগ তুলবে?

—হ্যাঁ।

—না, তুলো না। বাড়ীতে স্পাই রয়েছে। ঝোঁকের মাথায় কিছু করতে গিয়ে আর মিছিমিছি জট পাকিয়ো না।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি—বাড়ীতে স্পাই রয়েছে? কি বলছিস রে? কে?

—অবাক হচ্ছ কেন? কল্যাণদাকে চেনো না? এই মামলাটা যতদিন চলছে—ততদিন ওর সঙ্গে থানার বাবুদের চিঠি চালাচালি হচ্ছে। ওর রাগ তোমার ওপর। তোমাকে জড়াবার চেষ্টার অন্ত নেই। মেজজ্যাঠাকে তো জানতে। তার নিজের হাতের তৈরী সিপায়ের ঘোড়ার মত বাপের বেটা। সুষি আমাকে বলেছে। সুষমা ওর নিজের বোন, সে মিথ্যে কথা বলবে না। আবার বলতেও পারি না সেও দাদার সাগরেদ কিনা। আমাকে বার বার বলেছে—মেজদির ঘরে কি অতুলকা'র ঘরে আর কিছু আছে তো ফেলে দে অর্চি। আমি বললাম—আমি কি করে জানব সুষি? তা বললে—তুই তো মেজদির সঙ্গে ফিরন্তিস—বাঘের সঙ্গে ফেউয়ের মত। তাই বলছি। আর সুরোদার কাছে এমন ক'রে যাসনে। দাদা বলছিল—সুষি, বিবিমহলের দিক খবরদার যাবি নে, সুরেশ্বরদার কাছে। ওর ওপর পুলিশ নজর রাখছে। মেজজ্যাঠা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিল জান তো? বোর্ড এ জেলায় চলে নি। তবু ও আঁকড়ে ধরেছিল—ছাড়েনি। কত বলেছে লোকে—কিন্তু তবু ছাড়েনি। মেজজ্যাঠার মৃত্যুর পর থেকে কল্যাণ সেটা ধরেছে। আজ সকালবেলা থেকে ছাদের ওপর ঘুরছে। কি? না, কার বাড়ীতে কোথায় ফ্ল্যাগ উঠেছে দেখছে। ওসব যাক। আমার কথা শোন। তোমার কথা আমি শুনব—যদি তুমি আমার কথা শোন। আমি চললাম সুরোদা, বাবা খুঁজবে আমাকে।

বলে আর দাঁড়াল না সে। চলে গেল। আমার মনের ক্ষোভ বল ক্ষোভ—ক্রোধ বল ক্রোধ—অসহায় হিংসা বল হিংসা—বেড়ে গিয়েছিল সুলতা। আমি কোনমতে সান্ত্বনা পাই নি। ফ্ল্যাগ ওঠাব না? ফ্ল্যাগ নেই কিন্তু আমি ছবি আঁকি, রঙ দিয়ে কাপড়ের কালির উপর ছবি আঁকতে কতক্ষণ লাগবে আমার?

এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম সব। কিছুক্ষণ পর ছবি আঁকতে শুরু করেছিলাম। কাপড়ে রঙ করে ফ্ল্যাগ তৈরী করে বিবিমহলের ছাদের উপর তোলা হয় নি—সম্ভবতঃ অর্চনার কথায় আমি ভয়ই পেয়েছিলাম। কারণ অর্চনার কথাটাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। অর্চনা বলেছে—"আমার কথা মানলে তোমার কথা মানব"। আজ মনে মনে খতিয়ে দেখে বার বার নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেছি—তাই কি সত্যিই করত? করতে পারত? আজ আমার মন বলে পারত না। কখনোই পারত না। বিপ্লবীরাও তা পারে না। চট্টগ্রামের অনন্ত সিং নিজে এসে কলকাতার আই বি আপিসে ধরা দিয়েছিলেন—তার কারণ অন্ত। তখন দল ধরা পড়েছে। আর তার সংসারের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন হচ্ছে। এবং তখন তিনি ভেবেছিলেন তাঁর 'মিশন' শেষ হয়েছে। তিনদিনের জন্যে চট্টগ্রামে ইউনিয়ন জ্যাকের জায়গায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িয়ে, ভারতবর্ষের একখানা শহরকেও স্বাধীন করে স্বাধীনতার যে পত্তন করে গেলেন তাতেই বীজ পোঁতা হল।

কিছুদিন আগে পড়েছি সুলতা, কোথায় কোন বৌদ্ধমঠে নাকি একটি পাত্রের মধ্যে হাজার বছরের পুরনো পদ্মবীজ ছিল। সেই বীজটা মঠের ধারে জলাশয়ে পড়ে তা থেকে গাছ হয়েছে এবং ফুলও ধরেছে সে গাছে।

সুতরাং বিচার ক'রে দেখেই বলছি—সেদিন আমার মনের মধ্যে ভয়ই ছিল। আবার

লজ্জাও ছিল। মনে হয়েছিল, আমি ইংলিশম্যান স্টেটসম্যানের যোগেশ্বর রায়ের ছেলে, আমি নিজে তিরিশ সালে জেল থেকে ফিরে বিদায় সত্যাগ্রহ বলে চিঠি লিখে স্টেটসম্যানে ছাপিয়ে পিছিয়ে এসেছি, আজ আর মুক্ত রণক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার অধিকারই নেই। হয়তো নিজেই এমন দুর্বল যে ঝোঁকের মাথায় ক'রে ফেলে ধরা পড়ে নির্যাতন সইতে না পেরে সর্বনাশ ক'রে ফেলব।

ছবিই আঁকছিলাম ফ্ল্যাগ তোলার বদলে। তারই মধ্যেই থাকবে ফ্ল্যাগ। বীরেশ্বর রায়রূপী ১৮৫৭ সালের স্তম্ভটা ফেটে গিয়ে ভেঙে পড়ছে, তারই মধ্যে থেকে অতুল বের হচ্ছে ফ্ল্যাগ হাতে। পাথরের থামটার পাষাণ কীর্তিহাটের জমিদারী ফেটে চৌচির হয়ে টুকরো টুকরো পাথরের একটা স্তূপে পরিণত হয়েছে।

এরই মধ্যে বেলা তখন নটা বেজে গেছে। আমি ইজেল পেতেছি কাঁসাইয়ের ধারের বারান্দাটায়। ওপারে সিদ্ধপীঠের জঙ্গল। জঙ্গলটার পশ্চিম প্রান্তে আমার সামনের দিকে অনেকটা পশ্চিমে গোয়ানপাড়া, ডাক শুনলাম—Sir, Roy Babu.

আমি তুলিটা চালাতে চালাতেই ডাকটা শুনলাম। তুলি তুলে তার দিকে তাকালাম। দেখলাম ওপারে দাঁড়িয়ে কালকের সেই হ্যারিস।

কি জানি কেন, মুহূর্তে একটা কঠিন ক্রোধে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনে হয়েছিল লোকটা আমাকে একটি শুভ কাজে বাধা দিলে। আরও বেশী রাগ হয়েছিল লোকটা অ্যাংলোইণ্ডিয়ান বলে। এরা এদেশের মানুষ হয়েও এদেশের শত্রু। অন্ধবিশ্বাসী মানুষের মতই বিশ্বাস হয়েছিল সেই মুহূর্তে সুলতা যে, যে মুহূর্তে কীর্তিহাটের জমিদারস্তম্ভ ফাটিয়ে অতুলেশ্বর বের হচ্ছে—এই ছবিটি আঁকতে যাচ্ছি—সেই মুহূর্তে ওই লোকটার এই পিছন ডাকা যেন ইঙ্গিতময়।

তুলিটা ফেলে আমি রূঢ়কণ্ঠে বলেছিলাম—আমার এখন সময় হবে না মিঃ হ্যারিস! সন্ধ্যেবেলা দেখব। এখন যাও।

সে কিন্তু ছাড়েনি। বলেছিল—কিন্তু তুমি আমাকে কাল কথা দিলে রয়-বাবু! তুমি নিশ্চয় সাধারণ লোক নও। আশা করি কথা তুমি রাখবে। তা না হ'লে আমি নিশ্চয় চলে যেতাম। দেয়ার ইজ কোর্ট।

আমি প্রাণপণে আমার রাগ চাপবার চেষ্টা করছিলাম। তবু ঠিক তা চাপতে পারছিলাম না। তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম।

সে বলেই চলেছিল—ইউ আ এ বিগ জমিণ্ডার—গত এ বিগ হাউস, সন অব অ্যান অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ফ্যামিলি—ইউ শুড অ্যাণ্ড মাস্ট কীপ ইয়ো ওয়ার্ডস—।

You are a big Zaminder. got a big house, son of an aristocratic family—you should and must keep your words.

কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল লোকটা সকালেই বোধহয় মদ্যপান করেছে। পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে একটু একটু দুলছে।

কঠিন ক্ষোভ হয়েছিল। কিন্তু ওকে চীৎকার ক'রে খেদিয়ে দিয়ে নিজেকে ছোট করতে পারি নি। লোকটা এখান থেকে চলে গিয়ে পথে পথে গাল দিতে দিতে যাবে। আমি বলেছিলাম—দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি। গোয়ানপাড়া গিয়ে এখুনি হিলডা কি বলে শুনে আসব।

হ্যারিস বলেছিল—তুমি যাবে রয়বাবু? হোয়াই? হিলডাকে ডাক তুমি!

—না। তাতে অনেকক্ষণ সময় নেবে।

আমার ইচ্ছেও হয় নি ওকে ঘরে ঢুকতে দিতে। জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে গিয়েছিল ডিক্রুজ। ছুটে আগে চলে গিয়েছিল গোমেশ পাড়ায় খবর দিতে।

* * *

আমি জানতাম না সুলতা যে আমি ওই হ্যারিসের ডাকে যাচ্ছি না। যাচ্ছি নিয়তির আকর্ষণে। তা ছাড়া আর কি বলব আমি বুঝতে পারি না। সেদিন থেকে আজও পর্যন্ত না।

সুলতা বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকালে। কিন্তু প্রশ্ন কিছু করলে না।

সুরেশ্বর বললে—আমি গোয়ানপাড়ায় যেতেই পাড়ায় একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। হিলডা আমাকে সম্বর্ধনা করবার জন্য বিব্রত হয়ে উঠে হাঁকডাক শুরু ক'রে এমন একটা কাণ্ড করেছিল যে আমি লজ্জিত হয়েছিলাম। বারণ করলেও সে শোনে নি। চেয়ার বের ক'রে আনতে গিয়ে বেচারী পড়ে গিয়ে আঘাত লাগিয়েছিল পায়ে। ত্রাণ করেছিল কুইনী এসে।

কুইনী ওদের চার্চের পাশের ঘরে পাঠশালায় ছেলেদের পড়াচ্ছিল। এখানে আসবার আগে পর্যন্ত সে কলকাতায় ইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ত। এখানে এসে ছেলেদের নিয়ে একটা পাঠশালা খুলেছে। সে পড়ায় তাদের। কুইনীকে দেখে চিনতেও সেদিন কষ্ট হয়েছিল। সেদিন সে ফ্রক পড়ে নি। পরেছিল শাড়ী। তাতে অনেকটা বড় দেখাচ্ছিল। সুন্দর একটি বাঙালীর মেয়ে। মাজা রঙ, চোখে যেন ইউরোপের নীলের আভাস। চুলে ঈষৎ পিঙ্গলাভা। রুখু চুলের বেণী পিঠে ঝুলিয়ে সে এসে হিলডাকে বলেছিল—বস তুমি। ব্যস্ত হয়ো না। রায়বাবু এসেছেন—উনি দাঁড়াবেন একটু। তাতে কি হয়েছে? আমরা তো খবর জানি না! তারপর চেয়ারখানা ভাল করে পেতে দিয়ে বলেছিল—বসুন স্যার।

হিলডা বলেছিল—আপনে আসবেন বাবু খবর না মিললে কি করবে হামরা। আপনে গোটা গোয়ানপাড়া লখরাজ করে দিলে—আপনে জমিদার—আপনে আসবেন—

বাধা দিয়ে আমি বলেছিলাম—আমি খুব জরুরী কাজে এসেছি হিলডা। মিঃ হ্যারিস—! হ্যালো মিস্টার হ্যারিস!

হ্যারিসকে দেখতে পাইনি। সে পিছন পিছন আসছিল, কোথায় গেল বুঝতে পারলাম না। কিন্তু হিলডা হ্যারিসের নাম শুনে যেন ক্ষেপে গেল। চীৎকার ক'রে উঠল—হ্যারিস—উ বদমাস—বজ্জাত—খুনী আদমীঠো আপকে পাশ গিয়েছে? হারামী কি বাচ্চা হারামী, খুনীকে লেড়কা খুনী! হারামীর বাবা—হামার ভাই পিড্রোস—ওই হ্যারিসের বাপকে লিয়ে জান হারালে বাবুসাব। উ হারামী কলকাত্তা সে ফিরিঙ্গী ছোক্‌রী লোককে লিয়ে গিয়ে বড়ালোক বদমাস লোকের কাছে বেচত—উ কুইনীকে নিতে আসছে। হারামী বেচে দিবে কুইনীকে—

হঠাৎ ওপাশ থেকে উচ্চতর কণ্ঠে কুৎসিত ভাষায় হ্যারিসের সাড়া পেয়ে তাকালাম ফিরে। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে সেও গাল দিচ্ছে—ইয়ু বিচ্‌—

সে অশ্রাব্য ভাষা। তেমনি কর্কশ উচ্চকণ্ঠ। বুঝতে পারলাম, যা মদ সে খেয়েছিল, তাতে ঠিক এইভাবে ঝগড়া করবার মত মনের বল পায় নি হ্যারিস, সে আমার পিছনে আসতে আসতে সম্ভবতঃ তার পাঁচ টাকায় ভাড়াকরা আস্তানাতে গিয়ে আরও মদ গিলে ফিরছে, এই মুহূর্তে।

আমি ধমক দিয়ে হ্যারিসকে বলেছিলাম—হ্যারিস! চুপ কর তুমি!

হ্যারিস থামে নি—চীৎকার করে উঠেছিল—হোয়াট বিচ ইজ লাইং—

কুইনী চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, এবার সে ইংরিজীতে হ্যারিসকে বললে—শী ইজ নট

লাইং। ইট ইজ ফ্যাক্ট!

হ্যারিস কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ আবার চীৎকার ক'রে বলে উঠল—ইউ ডটার অব এ ব্ল্যাক নিগার—হাউ ডেয়ার ইউ সে সো—

—মিস্টার হ্যারিস!

কুইনীর কণ্ঠস্বরকে চাপা দিয়ে হ্যারিস চীৎকার করেই চলেছিল। আমার আর সহ্য হয় নি—আমি ভিক্রুজ আর গোমেশকে বলেছিলাম—তোমরা দাঁড়িয়ে আছ আর ও লোকটা এইভাবে গালাগাল দিচ্ছে? বলে আমি নিজেই উঠে গিয়ে তার কলারটা চেপে ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলেছিলাম—উইল ইউ স্টপ? অর—।

লোকটার দৃষ্টি আমার দিকে ছিল না—ছিল আমার পিছনে এবং তার চারিপাশে গোয়ান পুরুষেরা এগিয়ে আসছিল তার দিকে!

সে এবার চুপ করে গিয়েছিল। নেশার মধ্যেও তার বোধহয় জ্ঞান উঁকি মেরেছিল। সে বলেছিল—অল রাইট বাবু; অলরাইট। লীভ মী প্লিজ। আই প্রমিস টু কীপ কোয়ায়েট!

তাকে ছেড়ে দিয়ে আমি ব্যাপারটা সংক্ষেপ করবার জন্য কুইনীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কুইনী, এ বলে এ তোমার মামা। সে তোমাকে নিয়ে যেতে চায় কলকাতা।

কুইনী বলেছিল—না। আমি ওর সঙ্গে যাব না।

আমি বলেছিলাম—বেশ। কিন্তু ও বলছে—তোমাদের যে বাড়ী আছে এলিয়ট রোডে, সে বাড়ীর একখানা ঘর তোমার মায়ের মা ওকে দিয়ে গিয়েছিল। সেই ঘরখানা সে চাচ্ছে। হিলডা গোটা বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে এসেছে।

হিলডা এবার আবার রাগে ফেটে পড়ল।

বলতে বলতে সুরেশ্বর যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। চুপ করে গেল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর মাথা হেঁট করে তার সামনের লম্বা রুক্ষ চুল ডান হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলে উঠল—ওঃ!

সুলতা বুঝতে পারলে এই স্মৃতি তার কাছে নিষ্ঠুর পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।

পূর্ণ সত্যের উপর দাঁড়িয়ে জীবনের জবানবন্দী দেওয়া তো সহজ নয়। ভিতর থেকে গলা চেপে ধরে এমনি করে। সে চুপ করে রইল। বাইরে দিনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তার ইচ্ছে হল বলে, থাক সুরেশ্বর, আজ এইখানেই থাক। বরং আজ সন্ধ্যেয় এসে শুনে যাব। কিন্তু তার পূর্বেই সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, সেদিনের ঘটনাগুলো আমার কাছে শুধু স্মৃতি নয়, আমার কাছে ছবির মত প্রত্যক্ষ হয়ে ভেসে ওঠে।

সে-ছবি আমি এঁকেছি। ওই দেখ ছবিটা। সে উঠে গিয়ে একখানা ছবির সামনে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে দেখালে—এইখানা। সেখানাও সুরেশ্বরের আঁকা বড় ছবির মধ্যে একখানা।

সুলতা দেখলে, একটা টালি দিয়ে ছাওয়ানো ঘর। ঘরটার মাথায় একটা ক্রুশ। দেখলেই বুঝতে পারা যায়—একটি চার্চ। তার সামনে একটি জনতা। পিছনে মাটির ঘরের খড়ের চালের আভাস, তার পিছনে দিগন্তের গাছপালা।

জনতার মধ্যে চেয়ারে বসে সুরেশ্বর, তার চোখ বিস্ফারিত। বিস্ময়-আতঙ্ক-লজ্জা তার মধ্যে ফুটে রয়েছে। তার পাশে একটি বৃদ্ধা মেয়ে, পরনে ঢিলেঢালা ফ্রক অথবা সেমিজ। মুখখানা শতরেখায় রেখাঙ্কিত, চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, একটা হাত বাড়িয়ে আছে সে। তার পাশে আধুনিক কালের বাঙালী মেয়ের মত কেরতা দিয়ে কাপড়-পরা একটি সুশ্রী তরুণী মেয়ে বিবর্ণ-

মুখে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে সামনে জীর্ণ স্যুট-পরা একটি নিষ্ঠুরদর্শন লোক। সুলতা বুঝতে পারলে, সেই হ্যারিস। আশেপাশে অনেক লোক। নারী-পুরুষ। তাদের চোখেও বিস্মিত দৃষ্টি।

বিস্ময় যার জন্য, সেটা সুলতার কাছে বোধ্য নয়। সে বুঝতে পারলে না তার অর্থ। কিন্তু তার রূপটা বিস্ময়কর বলেই তার মনে হল।

একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী, সেই কুণ্ডলীর মধ্যে উপরের দিকে একটা মুখ। একটা মুখ নয়। পর পর তিনটে মুখ। একটার উপর আর একটা, তার উপর আর একটা। সব থেকে তলার মুখখানার ঘের সব থেকে বড়। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল। তার উপরে যেখানা, তার চুল বেশবিন্যাস করা। এ-দুখানা মুখের চুল এবং কপাল ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার উপর যে মুখখানি, সে মুখটির সবটাই দেখা যাচ্ছে, সুন্দর সুপুরুষ, যেন অনেকটা সুরেশ্বরের মত দেখতে। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী, পাকানো গোঁফ। কিন্তু সে-মুখ জীবন্ত মানুষের নয়, মরা মানুষের মুখ। মনে হয় নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে মারা গেছে। তার ছাপ রয়েছে মুখের মধ্যে।

ছবিখানার দিকে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

সুরেশ্বর বললে, সুলতা, সেদিন গোয়ানপাড়ার জনতার সামনে যেন সেই আরব্য উপন্যাসের গল্পের বোতলে বন্দী দৈত্যটার বোতল থেকে বেরিয়ে পড়ার মত বেরিয়ে পড়ল রায়বংশের কবর-চাপা দেওয়া ইতিহাসের এমনি একটা মূর্তি। ওই গোয়ান-বুড়ী ছিলডা পুরনো কালের যাদুকরের মত উচ্চারণ করলে যাদুমন্ত্র। আর সঙ্গে সঙ্গে রায়বংশের সযত্নে তৈরী করা সমাধি ফাটিয়ে বের হল রায়বংশের পাপ অপরাধ, হয়তো বা ব্যাধি। ধর্ম সংসারে মানুষকে ঈশ্বর এবং স্বর্গ বৈকুণ্ঠ না দিক, তাকে পুণ্য দেয়, পবিত্রতা দেয়, জীবনে পরমানন্দ দেয়, শান্তি দেয়। সেই ধর্মের মধ্যে পাপ প্রবেশ করলে তখন আর রক্ষা থাকে না। মানুষের জীবনে বংশে এর নিগ্রহ থেকে মানুষের নিষ্কৃতি মেলে না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাঁরও সাধ্য নাই এ থেকে নিষ্কৃতি দিতে।

রায়বংশে সেই পাপ সঞ্চিত আছে।

সম্পদ-সঞ্চয়ের ইতিহাস বা তত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক কাল যাই ব্যাখ্যা করুক সুলতা, যে-কালে এই ব্যাখ্যার উদ্ভব হয়নি, সে-কালে সম্পদ সে-কালের ন্যায়-নীতির পথে অর্জন করে, মানুষের অনেক কল্যাণ করে গেছে। তাদের নাম আজও করে মানুষ। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম বেঁচে থাকবে। কিন্তু সম্পদ-সৌভাগ্য যারা অর্জন করতে পাপকে ইচ্ছে করে আশ্রয় করেছে, পাপ তাদের রক্তের মধ্যে আশ্রয় করেছে, পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে। লোকের নিন্দার কথা ইতিহাসে বা লোকশ্রুতিতে বীভৎস কালো অক্ষরে তাদের নামের পাশে লেখা তো থাকেই, তার চেয়েও বেশী, বংশাবলীও সেই ধারাকে বয়ে নিয়ে চলে।

ওই প্রথম যে মুখখানা, সে রায়বংশের ধর্মসাধনার মধ্যে প্রবেশ করা পাপ। দ্বিতীয় মুখখানা সম্পদ-সৌভাগ্যের মধ্যে প্রবেশ করা পাপ। আর তার মধ্যে যে মুখখানা পুরো দেখতে পাচ্ছ, যার মধ্যে আমার চেহারার আদল রয়েছে, সে মুখ হল রায়বংশের শ্রেষ্ঠ রূপবান, লৌকিক বিচারে শ্রেষ্ঠ গুণবান, শ্রেষ্ঠ অভিজাত, শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল বংশধর যিনি তাঁর। মুখে তাঁর অসহায় ভাব দেখ, যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি দেখ। তিনিও পরিত্রাণ পাননি। আত্মা তাঁর আর্তনাদ করে।

সুরেশ্বরের কণ্ঠস্বর আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। বোধহয় সেটা সে নিজেই বুঝতে

পারলে। কারণ হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—

হিলডা হ্যারিসের কথায় রাগে যেন একমুহূর্তে পাগল হয়ে গেল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—বাড়ী? ওই বাড়ীর ঘরের দাবী তুই করিস, খুনে শয়তানের বাচ্চা, খুনে শয়তান! তোর মা ওই ঘর তোকে দিয়ে গিয়েছে? কি তার এক্তিয়ার ছিল দেবার? তোর বাপ তোর মায়ের সঙ্গে—

কুৎসিত কথা সে স্থূলতা। যার অর্থ হল, হ্যারিসের মা তার বাপ ওই খাঁটি ইংরেজ প্রৌঢ় সার্জেন্টটির প্রেমে পড়ে ষড়যন্ত্র করে গোপনে মদের সঙ্গে কিছু খাইয়ে তার প্রথম স্বামীকে একরকম মেরে ফেলেছিল। বাড়ীটা ছিল কুইনীর মায়ের বাপ রোজারিও পিক্রুসের। হ্যারিসের মায়ের প্রথম স্বামীর। ও-বাড়ী রোজারিও পেয়েছিল—

হিলডা চীৎকার করে বলেছিল, রায় জিমিদারবাবু, রায়বাহাদুর উ বাড়ী দিয়েছিল তাকে। জরিমানা। হাঁ, জরিমানা। দলিলে লিখা আছে, উ বাড়ী রোজারিওর লেড়কা-লেড়কী পাবে, আর কোই পাবে না। ভায়লা—ভায়লেট পিক্রুস। মেমলোকের মতুন সুরত ছিল তার। গোপাল পাল—

ঘড়িটা বাজতে শুরু করলে এই মুহূর্তে।

ঢং, ঢং, ঢং—

ছটা বেজে গেল। সুরেশ্বর বলে চলল। সে-কাহিনী সুদীর্ঘ, তবু তার যতটা বলা যায়। সুলতা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। গোপাল পাল তার ঠাকুরদাদার কাকা। ঠাকুরদাস পালের ছেলে।

গোপাল পাল!

হিলডা বলেছিল সুলতা, 'গোপাল পাল'। তুমি বুঝতে পারছ তিনি কে? গোপাল পাল রায়বাহাদুরের বড়া বেটার ইয়ার ছিল। সেই নাকি ভায়লেটকে রায়বাবুর বড় ছেলের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে এই গোয়ানপাড়া থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতা। তার ছেলে রোজা পিক্রুস। গোপাল উকে ফেলে চল গেল। রায়বাহাদুরবাবু দেখলে, কলকাতার বাড়ীর দরওয়াজা পর বোসে ভায়লা কাঁদছে। রায়বাহাদুর সব জানলে। দরওয়াজায় ধাক্কা মারলে। ডর লাগলো রায়বাবুর বড়া বেটার। ডরসে বন্দুক নিয়ে খুন হতে গেল। আর গোপাল পাল ভাগলো। রায়বাহাদুর তখুন জরিমানা দিলে। জরিমানা দিলে গোপাল উনার বড়া বেটার ইয়ার বলে। ভায়লার দাদা, আমার বাবা সে রায়সরকারে নালিশ করলে, বিচার করো হুজুর। গোপালের বাপ বললে, আমার লেড়কার দোষ কাঁহা? দোষ উ ছুকরীর। সো গেল কাহে? গাল দিলে। আজ ই ছোকরাকে সাদী করলে, কাল তাকে ছাড়লে, ফের সাদী করলে দুসরা ছোকরাকে। বাবা হামার খুন করলে গোপালের বাবাকে। রায়বাহাদুর জিমিদার, ধরমকে মানে, ধরমকে হিসাবসে বিচার। হামারা বাবার মামলামে বহুৎ খরচা করলে। তব ভি ফাঁসি হোয়ে গেল। রায়বাহাদুর ইসকে লিয়ে গুণাগারী দিলে। পিক্রুসের বেটী এই হিলডাকে জমীন দিলে। এ সারা পাড়ার মণ্ডলান দিলে। রায়বাবুর দলিলে লিখা আছে কি,—এই বাড়ী ভায়লার লেড়কা রোজারিওকে দিলাম। ভায়লা সাদী করবে, উর লেড়কা না পাবে। রোজারিওর বেটা পাবে, বেটী পাবে—দুসরা কোই না পাবে। ওহি বাড়ীর কামরা তোকে দিবে? তোর মা—উ দিবার কে?

হিলডার চীৎকারে অত্যন্ত কদর্য হয়ে উঠেছিল জায়গাটা। হ্যারিস তার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে

তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার নেশা বোধহয় ছুটে গিয়েছিল, কারণ এসব ইতিহাসের সে কিছুই জানত না। এবং না জানার জন্যে যত দুর্বোধ্য ঠেকছিল, ততই মনে হচ্ছিল, এর জবাব নেই, এ অকাট্য। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর কথা। তার কিছুটা আমি বলেছি। গোয়ানপাড়ার মেয়ে ভায়োলেটকে দেবেশ্বর রায়ের ভাল লেগেছিল। কিন্তু কীর্তিহাটের সিংহ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ভয়ে তিনি এখানে কিছু করতে পারেননি। তিনি কলকাতায় গেলে তাঁর সহচর গোপাল পাল তাকে এখান থেকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল কলকাতায়।

গ্রামে গোয়ানদের মধ্যে তখন খুব হৈ-চৈ। তারা খুঁজছিল ভায়োলেটকে। ভায়োলেট গোয়ানদের প্রধান পিক্রুসের সৎ-বোন। তাদের বাপ এক, মা পৃথক। তারা কেউ সন্দেহ করতে পারেনি যে, দেবেশ্বর রায়ের সহচর তাকে নিয়ে গেছে কলকাতায়। তারা ভেবেছিল, সে নিরুদ্দেশ হয়েছে তাদেরই মতন যারা—তাদের কারুর সঙ্গে। যারা খানিকটা বন্য, খানিকটা উদ্দাম, তাদের মত, তাদের কোন দুঃসাহসীর সঙ্গে। তখন ছিল। কাঁসাইয়ে নৌকা যেত-আসত। যেত সেই হিজলীর পাশ দিয়ে সাগরতীর্থ পর্যন্ত। ওপারের মুসলমানদের সঙ্গে যোগ ছিল তাদের। তীতুমীরের কথা পড়েছ। তীতুমীরের মত দুঃসাহসী শক্তিমান মুসলমানরাও নৌকায় ডাকাতি করত। তারা আসত-যেত। কিন্তু কয়েকমাস পরে সত্য আবিষ্কার করে-ছিলেন নিজে রত্নেশ্বর রায়। তার ফল যা হয়েছিল বলেছি।

আমি ভাবছিলাম, তবে কি গোপাল পালই দোষী? আমি ভুল বুঝেছি তবে? মনে পড়েছিল বৃদ্ধ রঙলাল পালের কথা। তিনিও আমাকে তাই বলেছিলেন। ঠাকুরদাস পাল তাঁর পিসেমশাই হয়েছিলেন। বলেছিলেন—গোপালদাদা বড়বাবুর সঙ্গে ঘুরত। সেও মনে করত, সেও মস্ত বাবু। ভায়লাকে ভালবেসে নিয়ে পালিয়েছিল কলকাতা। রায়বাহাদুর কলকাতা গিয়ে হঠাৎ ভায়লাকে দেখতে পেয়েছিলেন। গোপালদাদা ভয়ে পালিয়েছিল। রায়বাহাদুরের কাছে খবর শুনে পিক্রুস খুন করেছিল ঠাকুরদাস পালকে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল রায়বাহাদুরের ডায়রী। ঠাকুরদাস আমাকে অকস্মাৎ শাসিয়ে বললে—তুমিও জেনো, ছেলেকে শাসন করলে আমি সব ফাঁস করে দোব। আমি জানি, তোমার গুষ্ঠীর সব খবর আমি জানি। হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি, আমি জানি। পুষ্যিপুত্তুর নেয়ার খবর আমি জানি।

রায়বাহাদুর চমকে উঠেছিলেন। তারপর ইসারা করেছিলেন পিক্রুসকে। মনে মনে আমার, সেই সযত্নে ঢাকা-দেওয়া রায়বংশের অর্জিত মহাপাপের কথা ঠিক এমনিভাবেই যেন মাটি ফাটিয়ে এই ছবিটার মত আমার সামনে ভেসে উঠেছিল।

বুঝতে আমার বিলম্ব হয়নি, এখানেও রায়বাহাদুর সুকৌশলে সব অপরাধ চাপিয়ে দিয়ে-ছিলেন গোপালের উপর।

সুলতা! সম্পদ হল লক্ষ্মী। ভূমিতে আর মায়ে প্রভেদ নেই। দুইকেই আমরা ভাবি দেবতা। মানুষ সেই লক্ষ্মীকে ঘরে এনে লক্ষ্মীশ্বর নাম নেয়। ভূমি—জমিদারীর নামে কিনে ভূস্বামী হয়। সন্তান থেকে স্বামীত্ব দাবী করে। সে যে কতবড় অপরাধ, সে বোধহয় কেউ ভেবে দেখেনি কোনকালে। প্রজার রাজা সেজেই থাকেনি এদেশে জমিদারেরা। বোধহয় জান, রাজার এবং প্রজার এদেশে সম্বন্ধে বাপ-বেটা—এটা জমিদারদের কথা। এ অপরাধের অবশ্যম্ভাবী ফল ভূস্বামীর বংশে-বংশে ঘটে এসেছে। এদেশে-ওদেশে সব দেশেই ঘটেছে। এই অপরাধের সঙ্গে রায়বংশে অমার্জনীয় অপরাধ, ভীষণতম অভিশাপ অর্শেছিল, তাদের পূর্বপুরুষের

ধর্মসাধনার মধ্যে।

ধর্মসাধনা করতে গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী হয়ে। শক্তিসাধনা। বিমলাকান্তের বাপ শ্যামাকান্ত। সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী—যাঁকে সোমেশ্বর পেয়েছিলেন কালীঘাটে। যিনি কীর্তিহাটে এসে যজ্ঞ করেছিলেন। কবচ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—পুত্রই হোক আর কন্যাই হোক, নাম দেবে ব অক্ষর দিয়ে।

তন্ত্র সত্য হোক বা না হোক, বিশ্বাস কর বা না কর, সোমেশ্বরের এক কন্যা, এক পুত্র এরপর বেঁচেছিল, এটা বাস্তব সত্য।

এই ছবির এই যে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে পর পর চাপানো তিনটে মুখ, এর প্রথমটা সেই শ্যামাকান্তের। দ্বিতীয়টা সোমেশ্বরের। তৃতীয়টা দেবেশ্বরের।

বংশানুক্রমের ধারা বিচিত্র গতিপথে বেয়ে এসেছে। বংশধারার স্রোতের সঙ্গে মহাপ্রকৃতির, মহাশক্তির অভিশাপ।

সুলতা অসহিষ্ণু প্রশ্ন করলে—তুমি এসব কি বলছ সুরেশ্বর? সুলতার সন্দেহ হল, সুরেশ্বরের মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। রাত্রে যখন সে প্রথম তাকে বলতে আরম্ভ করে তাদের বংশের কাহিনী, তখন জনশূন্য ঘরটায় শুধুমাত্র তাকে সামনে রেখে সে সম্বোধন করেছিল, লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন!

তারপরই ভ্রম বুঝতে পেরে বলেছিল—আমার মনে হচ্ছে সুলতা, এই ঘরে আজ অনেক লোক এসে বসেছেন। ওই ছবির মানুষগুলির আত্মাদের উপস্থিতি আমি বুঝতে পারছি।

সুরেশ্বর বললে—তুমি বুঝতে পারছ না, না?

—না। অর্থ থাকলে তো বুঝব। এ কথার কি কোন অর্থ হয়?

—অর্থ আছে, কিন্তু তোমাদের না বোঝারই কথা। কিন্তু বল তো, রাশিয়ার বিচিত্র মানুষ রাসপুটিনের কথার অর্থ আছে? বিশ্বাস কর?

সুলতা বললে—তার আসল সত্য কতটা জানি না, তবে মানুষটা ইতিহাসের মানুষ। সে এক ধরনের কিছু একটা জানত। যাতে জারের ছেলেকে সে বাঁচিয়েছিল। তার কলঙ্কও অনেক।

—ভাল সুলতা। এদেশে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অন্তত সেই হিসেবে অবশ্যই মানো। আমি জানি, এ-যুগে অনেকে তাঁকে মনে মনে অস্বীকার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জন্যে তা পারে না। তুমি তাঁকে মানো বা না মানো, তাঁর কথা জানো নিশ্চয়।

সুলতা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

সুরেশ্বর বললে—বল!

সুলতা বললে—আমি ব্রাহ্ম বলে বলছ এ কথা?

—না। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন রামকৃষ্ণকে অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। ব্রাহ্ম বলে নিশ্চয় বলিনি। বলছি, তুমি রাজনীতিতে, শিক্ষায় খাঁটি একালের মানুষ। তার উপর নিজে রাজনৈতিক পার্টির সভ্য।

সুলতা হাসলে, বললে—একালের উপর তোমার রাগটা সেকালের লোকের মত। যাক, যা বলছিলে তাই বল। সকাল হয়ে এসেছে। পালা শেষ কর।

সুরেশ্বর বললে, পালার এখনও অনেক বাকি সুলতা। তোমার সময় নেই বলে আমার তো শেষ হবে না। আজ সন্ধ্যায় আসতে বলব। যদি না আস, তবে নাইবা থাকলে তুমি,

আমি পথের লোক ডেকে এনে শোনাব। তোমাকে লিখেছিলাম, তোমার কাছে আমার ফিরে যাওয়া অসম্ভব। কেন অসম্ভব সে কথাটা তোমাকে বলেছি। তোমার আমার মাঝখানে আমার পূর্বপুরুষের খাঁড়াঘাতে তোমার পূর্বপুরুষের রক্তস্রোত বইছে। সেইটে যখন জানলাম, তখন ও-লেখা ছাড়া আমার উপায় কি ছিল। তবে তোমার প্রপিতামহ গোপাল ঘোষ রায়বাহাদুরের কাছে খেসারতের দাম নিয়েছিলেন হাত পেতে, সে দলিল আছে। আর ভায়োলেটকে নিয়ে পরবর্তীকালে তাঁর অপবাদকে সত্য করে তুলেছিলেন। যাক, সেসব না শুনলে বুঝতে পারবে না। এখন যে অপরাধের কথাটা বলেছিলাম, তাই বলি।

সেদিন গোয়ানপাড়ার কোলাহলের মধ্যে এই ছবিটা যখন আমার মনের চোখে ভেসে উঠেছিল, সেদিন সেই মুহূর্তটা আমার কাছে জীবনের সব থেকে ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। যতবার হিলডা বলেছে গোপাল ঘোষের নাম, ততবার মনে হয়েছে, রায়বংশের এঁরা মাথা হেঁট করে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ থেকে তাঁদের জল পড়ছে। তাঁরা সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

হিলডাকে চুপ করতে বলতেও আমার শক্তি ছিল না। হঠাৎ কুইনী চীৎকার করে উঠেছিল —তুমি চুপ কর। তুমি চুপ কর দিদা।

হিলডা তবুও থামেনি।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে কুইনী চীৎকার করে উঠেছিল এবার—দি—দা!

আশ্চর্য সে চীৎকার। সেরকম চীৎকার করে বারণ করলে বোধহয় দুনিয়ার কেউ তা লঙ্ঘন করতে পারে না। এবং হিলডাও পারেনি। চুপ করে গিয়েছিল। গোয়ানদের গুঞ্জন থেমে গিয়েছিল। সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল একমুহূর্তে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কুইনীর মন। তার পক্ষে এ কথাগুলি শোনা আমারই মত অসহ্য হয়ে উঠেছে। হয়তো বা আমার চেয়েও অসহ্য তার পক্ষে। পিতৃপুরুষের মধ্যে সব সমাজেই বোধহয় পুরুষের কলঙ্ক থেকে নারীর কলঙ্কের জ্বালা বেশী, তার ওজন বেশী। ভায়োলেট তার মাতামহের মা। সে তার সহ্য-সীমার শেষপ্রান্তে এসে এই চীৎকার করে উঠেছিল। সে গোয়ানদের মধ্যে বাস করলেও এদের থেকে পৃথক। বলতে গেলে অনেক দূরে বাস করে মানসিক জগতে। সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সেই স্তব্ধতার মধ্যে সে বলেছিল—uncle Harris—I refuse to go with you. I refuse to give you the room you claim as yours. You please go back and do whatever you like. Roy babu has got no right to interfere in my affairs.

বলেই সে চলে গিয়েছিল।

আমিও চলে এসেছিলাম ফিরে। সারা পথটা মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে এসেছিলাম। বার বার মনে ঘুরছিল রায়বংশের এই অপরাধের কথা। ছবিটা মনের মধ্যে যেন রঙে রঙে ফুটে উঠছিল। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে এই তিনটি মুখ একের পর এক থাকে থাকে ফুটে উঠেছে।

শ্যামাকান্ত শক্তিসাধনার জন্য গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তিনি পরমাশক্তিকে মাতৃভাবে পেতে চাননি, চেয়েছিলেন পুরুষে যেমন করে নারীকে পেতে চায় তেমনিভাবে। তার ফল হল ভীষণ। অভিশপ্ত হলেন নিজের জীবনে। জান্তবজীবনের প্রকৃতি পেলেন।

সোমেশ্বর রায়—সৌভাগ্যশিলার লোভে এবং তাঁর এই পথে সাধনসঙ্গিনী এক ব্রাত্য-নারীর লোভে—তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। লোকে জানত তিনি মরেছেন। কিন্তু শ্যামা-

কান্ত মরেননি তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে। বেঁচেছিলেন। তারপর সন্ন্যাসী হয়েও আবার বিবাহ করেছিলেন সস্ত্রীক সাধনা করবার উদ্দেশ্যে।

রামকৃষ্ণদেব সারদাদেবীকে দেবতা হিসেবে অর্চনা করেছিলেন, শুনেছ কিনা জানি না। তিনি তাঁর মধ্যেও মাতৃরূপকে দেখেছিলেন। শ্যামাকান্তের উল্টো হল। তাঁর পত্নীর গর্ভে সন্তান জন্মাল।—কন্যা।

উন্মাদ পাগল হলেন শ্যামাকান্ত। ছুটে পালালেন। কিন্তু তাঁর সাধনা তাঁকে ছাড়বে কেন? তিনি এক বিধর্মী নারীর মোহে বাঁধা পড়লেন। জাত হারালেন।

রায়বংশের তপস্বিনী বউ ভবানী দেবীর বাপের নাম তাই তাঁর পালক পিতা গোপন রেখেছিলেন।

ভবানী দেবী বিমলাকান্তের বৈমাত্রেয় ভগ্নী। শ্যামাকান্তের সাধনার মধ্যে যেটুকু পুণ্য ছিল, তাই নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন।

কমলাকান্ত-রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে বিমলাকান্তের চেহারায় সে সাদৃশ্য ছিল, তা এসেছিল তাঁর মাতামহ থেকে।

রায়বংশে ওই লালসা—সম্পদের সাহায্যে—এমনভাবে আগুন হয়ে জ্বলছে যে সমস্ত পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছে। যত লালসা, যত পতন, তত জ্বালা, তত উন্মত্ততা।

অন্তত এইটেই বিশ্বাস হয়েছে আমার। তাঁদের কাগজপত্রে, কারুর ডায়রীতে, কারুর চিঠিপত্রে, কারুর খরচের খাতায় এর পরিচয় তাঁরা রেখে গেছেন। আমার মধ্যেও সে তাড়না আমি অনুভব করেছি।

তাঁদের জীবনের ঘটনায় রচনায় তার পরিচয় পদে পদে অক্ষরে অক্ষরে। তবে বিচিত্রভাবে বংশ-পুণ্য তার প্রায়শ্চিত্তও করে যাচ্ছে। সে কাহিনী না শুনলে—। ঘাড় নাড়লে সে। যার অর্থ তা না শুনলে বুঝতে পারবে না। কিছুক্ষণ পর বললে—আর তাই বোধহয় ইতিহাসের ধারা।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল দুজনে। ঘড়িতে আধঘণ্টা বাজল। ঢং শব্দে।

তারপর সুরেশ্বর ডাকলে—রঘু।

—যাই।

রঘু এসে দাঁড়াল।

—একটু চা কর। রঘু চলে গেল।

সুলতা বললে, না। আমি যাব এবার সুরেশ্বর।

—যাবে? চা খেয়ে যাবে না?

—না। তবে এ নিয়ে তুমি এমন করে নিজেকে আধ-পাগল করে তুলেছ কেন, তা আমি বুঝতে পারি না। ইতিহাসের ধারায় এক-একটা ধারা এসেছে, আবার ইতিহাসই তাকে মুছে দিয়েছে।

সুরেশ্বর তার মাথার রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে অবিন্যস্ত লম্বা চুলগুলোকে বিন্যস্ত করে নিয়ে বললে—দেখ, ইতিহাস পুরনো ধারাকে বদলে নূতন ধারা আনে কিনা জানি না; তবে নতুন একটা চেহারা নেয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে আর একটা ধারা আছে। সেটা তার মনের ধারা চিন্তার ধারা থেকেও আরও গভীরে বইছে। সে এই চেহারা বদলেই তুষ্ট হয় না, সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। পরিণাম আর পরিণতিতেই তার বিশ্রাম নেই; পূর্ণতার জন্যে সে জন্মজন্মান্তর ঘুরছে—এইটেই তার বিশ্বাস। অন্য দেশ দেখেছি। সামান্যই দেখেছি। কিন্তু

এদেশে সেই বিশ্বাস আজও সমান দৃঢ়, তা আমি অনুভব করছি বলেই এমন না হয়ে আমার উপায় ছিল না। উঃ কি সংগ্রাম সুলতা। গোটা রায়বংশের সাতপুরুষের সংগ্রাম আমার এই তেতাল্লিশ বছরের জীবনে ঘটে গেল। আমি—

কথায় বাধা দিয়ে রঘু এসে ঢুকল। রঘু অবশ্য বাধা নয়। বাধা ছিল তার পিছনে। তার পিছনে একটি মেয়ে।

আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে। পূর্ণ যুবতী। বলতে হয় অপরূপা। বিধবা মেয়ে। সুরেশ্বর চমকে উঠল তাকে দেখে। সুলতাও উঠল। মনে হল মুখখানা যেন চেনা। পর মুহূর্তেই তার এই 'চেনা' মনে হওয়ার কারণটা মনে পড়ল এবং আপনাআপনি তার দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হল সামনের দেওয়ালের দিকে, যেখানে ভবানী দেবীর পূর্ণাবয়ব অয়েলপেন্টিংখানা ঝুলছিল সেইখানে। আশ্চর্য সাদৃশ্য তো। শুধু ভবানী দেবী অলঙ্কারে, বেনারসী শাড়িতে, সিঁথির সিঁদুরে স্বামীসৌভাগ্যবতী, রাজরানী, আর এ মেয়ে নরুণপেড়ে সাদাজমি কাপড়-পরা, নিরাভরণা, খালিহাত, যেন সর্বরিক্তা। তাছাড়া ভবানী দেবী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী। এ মেয়ে গৌরাঙ্গী। রূপের মধ্যে একটি মহিমা আছে।

সুরেশ্বর বিষণ্ণতার মধ্যেই বিস্ময়ে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে—অর্চনা?

হেসে অর্চনা বললে—হ্যাঁ গো আমি। ভূতটুত নই। জ্যান্ত অর্চনা।

—হঠাৎ তুই কোত্থেকে এলি? তীর্থ থেকে সরাসরি?

—না। কীর্তিহাট হয়ে আসছি।

—কীর্তিহাট হয়ে? সেখানে কবে এসেছিস? এক সপ্তাহ আগেও তো আমি গেছি সেখানে।

—এখানে এসেছি পরশু সকালে।

বলে এবার সে প্রণাম করলে সুরেশ্বরকে। হেসে সুরেশ্বর বললে—প্রণাম! তাও একটা?

—তাহলে গোটাকতক মাথা ঠুকব নাকি পায়ে?

—উঁহু।

—তবে?

—তাহলে দে, মাথায় হাত বুলিয়ে দে, পুণ্যি হোক, পাপটাপ খণ্ডে যাক। মাথাটা নোয়ালে সুরেশ্বর।

অর্চনা বললে—তা হবে না মনে কর নাকি? নিশ্চয় হবে। বলে সে সত্যিই তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে।

সুরেশ্বর এবার হাত পেতে বললে—এবার প্রসাদ!

—সে আছে। সব আছে। কাশীর পেঁড়া আছে, পেয়ারা আছে। বৃন্দাবনের চিনির মুড়কি আছে, এলাচদানা আছে। মায় সাবিত্রীর সিঁদুর আছে। আর জয়পুর থেকে অনেক জিনিস কিনে এনেছি। কিন্তু তার আগে, তুমি কি মানুষ বল তো, এঁর সঙ্গে মানে সুলতাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়াটা তো উচিত।

—ওই তো, আলাপের বাকি রইল কি? আলাপ তো হয়ে গেছে। নাম তো দেখছি শুনেই ফেলেছিস।

—হ্যাঁ, রঘু বললে, সারারাত্রি ছবি দেখিয়ে রায়বংশের কাহিনী বলেছ। আমার কথাও তাহলে বলেছ তো।

—বলেছি বৈকি। রায়বাড়ীতে আমার কথা তুই আর মেজদি আর অতুলেশ্বরকে বাদ

দিয়ে কি বলা চলে? কিন্তু শেষ হয়নি। নে, মুখ-হাত ধুয়ে নে—

—তার আগে তুমি এক্ষুনি নীচে যাও।

—কেন?

কুটুম্ব-জ্ঞাতির দল, বিষয়ের শরিকের দল নীচে বসে আছে।

—মানে?

—মানে কল্যাণদা হেড পাণ্ডা, তার সঙ্গে বিমলেশ্বরকাকা, আমার দাদা অমরেশ্বর, ব্রজেশ্বরদার ভাই রাজেশ্বর মায় প্রণবেশ্বরদা—সব দল বেঁধে এসেছে। ব্রজেশ্বরদা-ও এসেছে। আমি পরশু এসেছি। এসেই দেখি, বিকেলবেলা কাগজ নিয়ে নাটমন্দিরে বসে জমিদারী উচ্ছেদের বিবরণ পড়া হচ্ছে। কাল সব পরামর্শ করে আমার কাছে এসে বললে, তোকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আমরা সুরেশ্বরের কাছে যাব। জমিদারী উচ্ছেদ হচ্ছে, গোটা বংশটাকে পথে দাঁড়াতে হবে, দেবসেবা বন্ধ হবে। এর প্রতিকার এখন থেকে না করলে চলবে না। তাই আগমন। এসে সব নীচের হলঘরে বসেছে, আমাকে দূত করে পাঠিয়ে দিলে, খবর দে।

সুরেশ্বর হাসলে। সুলতার দিকে তাকিয়ে বললে—সুলতা, রাত্রি শেষ হয়েছে, সূর্য বোধহয় উঠছে; জমিদারী উচ্ছেদ বিল পাস হয়েছে, জমিদারী এখনও যায়নি, তাতে সময় লাগবে। ইতিমধ্যে মিছিল এসে পৌঁচেছে। আমাদের দাবী মানতে হবে। তোমার পলিটিক্সে এবং ইতিহাস-অর্থনীতির পণ্ডিত হিসেবে এটা কাজে লাগবে। এখনকার মত অ্যাডজোনর্ড। আজ সন্ধ্যেতে তোমাকে আসতে বলব।

সুলতা বললে—তুমি যাও। আমিও বরং যাই।

—একটু বস। আমি লছমনকে বলে দিই একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসুক। একটুক্ষণ অর্চনার সঙ্গে গল্প কর।

সে নীচে নেমে গেল।

সুলতা অর্চনাকে বললে—আপনি নীচে রঘুর কাছে আমার নাম শুনে কি করে চিনলেন আমাকে?

অর্চনা বললে—সুরোদা যখন সেটেলমেণ্ট নিয়ে কীর্তিহাটে গেল, তখন সুলতার নামে চিঠি যেত, আবার সুলতার চিঠি আসত। ওই তো বাউণ্ডুলে মানুষ, চিঠি পড়ে থাকত। আমরা তো তখন আইবুড়ো, তখন কৌতূহল কত, পড়েছি চিঠি। মেজদিও আবার চিঠি শুনত। তারপর হঠাৎ কি হল, আপনার চিঠি বন্ধ হল ও-ও বন্ধ করলে।

চুপ করে রইল সুলতা।

অর্চনা বললে—তখন সুরোদা আধ-পাগল। সত্যি বলব আপনাকে, ভয় লাগত মধ্যে মধ্যে। যা খেয়াল হত তাই করত। একদিন শুনলাম, শরিকদের তিন হাজার টাকা দিয়ে গোয়ানপাড়ার গোয়ানদের বাড়ী-ঘর, গোটা পাড়াটা লাখরাজ করে দিয়েছে। সেইদিনই ছোটকা মানে অতুলেশ্বরকাকা অ্যারেস্ট হলেন, বাড়ী সার্চ হল, মেজদি আমাকে বাঁচাতে গিয়ে অ্যারেস্ট হলেন, জেল হয়ে গেল। এর পরই আমার বিয়ে হয়ে গেল। বাবা বিয়ের ঠিক করেছিলেন একজন পুলিশ দারোগার সঙ্গে। আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। ভাবলাম বিষ খাব। জানেন, আমি অতুলকার সঙ্গে ওই সব কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম। বাঁচালে আমাকে সুরোদা। বাবার পায়ে-হাতে ধরে অনেক কষ্টে রাজী করে নিজে আট হাজার টাকা খরচ করে আমার বিয়ে দিলে ডাক্তার পাত্র দেখে। তখন ও দুর্দান্ত মদ খাচ্ছে। আমি আপনাকে চিঠি লিখব

ভেবেছিলাম কিন্তু সুরোদা জানতে পেরে বলেছিল—খবরদার অর্চি, ও-কাজ করিসনে।

সুলতা অস্বস্তি বোধ করলে এবার, তার নিজের কথা এর মধ্যে নতুন করে জড়িয়ে ফেলাটা ভাল লাগল না তার। আবার কেন? সুরেশ্বর সম্পর্কে তার আর কোন আকর্ষণ নেই। তার এই নতুন জীবনে সে যে আনন্দ পেয়েছে, তাতে ঘর-সংসারের কামনা অত্যন্ত তুচ্ছ, ছোট হয়ে গেছে। তাছাড়া এই বয়সে, বয়স তো তার প্রায় চল্লিশের কাছে। আটত্রিশ পার হতে চলেছে, এখন বিয়ের কনে সাজবার কথা মনে হলে হাসি পায়। অর্চনা কথাটা ওই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেছে; সম্ভবতঃ এমন কোন কথা তার মনে পড়েছে, যা ওকে নিজের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করে দিয়েছে, স্মৃতির মধ্যে বেদনার স্বাদ নতুন করে জেগে উঠেছে, হয়তো এখুনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। হয়তো ওর নিজের বিয়ের কথা—যার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ছে বৈধব্যের কথা। অতি অল্পদিনের মধ্যেই যে অর্চনা বিধবা হয়েছে, তা ওকে দেখেই বোঝা যায়। যার ধাক্কায় সেদিন কুমারী বয়সে যে অর্চনা ওর ছোটকাকার সঙ্গে আগুন নিয়ে খেলতে নেমেছিল, সে নিজের চোখের জলে ভিজে অঙ্গার হয়ে গেছে। সে আজ তার এই জীবন, এই মন বুঝতেই পারছে না। তাকে প্রীতিআদরের স্নেহসিঞ্চনে ভিজিয়ে নরম করে টানতে চাচ্ছে, তার সমাদরের সুরোদার দিকে। একটু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

অর্চনা ঠিক এই মুহূর্তে তার দিকে তাকাল এবং জিজ্ঞাসা করলে—হাসছেন কেন সুলতাদি?

সুলতা চট করে উত্তরে বলবার কথা খুঁজে পেলে, কথাটা অনেকক্ষণ থেকেই তার মনে উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপেক্ষা করে। যখন নিজেই সে প্রশ্ন করেছিল—রঘুর কাছে আমার নাম শুনে কি করে চিনলেন আমাকে? সেই তখন থেকে। সে বললে—হাসছি ভাই, আপনাকে কিন্তু আমি আপনার নাম শুনবার আগেই দেখে চিনেছি, আপনি অর্চনা। রায়বাড়ীর মত বাড়ীর মধ্যে স্বদেশী-করা মেয়ে! ওই ওঁর ছবির সঙ্গে আপনার মিল দেখে।

অর্চনা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে ভবানী দেবীর অয়েলপেন্টিংটার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে প্রণাম করে বললে—হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে। কিন্তু উনি জন্মেছিলেন দেবতার অংশে। নিজের সাধনভ্রষ্ট বাপকে উদ্ধার করেছিলেন। ওঁরই পুণ্যে রায়বংশে অতুলকা জন্মেছে, সুরোদা এসেছে। ওঁর সঙ্গে আমার চেহারার মিল, এক বংশ বলে। আমার স্বামী ডাক্তার ছিলেন, বলেছিলেন আমাকে। এমন হয়। ওঁর পুণ্য আমি কোথায় পাব? ওঁরা বলে—আমি হাসি। কি বলব? অতুলকা জেল থেকে খালাস হয়ে বিয়াল্লিশের সাইক্লোনের পর নিউমোনিয়া হয়ে যখন শয্যাগত তখন আমাকে ওই কথা বলেছিল—অর্চি, এ বংশের পুণ্যটুকু তোকে ধরতে হবে বলেই তো এই দুঃখ, তুই বিধবা হয়েছিস। মা চলে গেছে বৃন্দাবন, রায়বাড়ীর দেবসেবার ভার তোর ওপর। সুরো—

কথা সে শেষ করতে পারলে না; নিচেরতলা থেকে একটা উচ্চ উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—তুমি কি আমাদের ভিখিরী মনে কর নাকি? কি ভাব তুমি?

চমকে উঠল অর্চনা। কান পেতে রইল। চোখ তার সুলতার দিকে নয়, চোখ তার ঘরের ছাদের দিকে।

আবার সেই গলার আওয়াজ উঠল—নিশ্চয় তাই ভাবছ তুমি! হাজারবার বলব—তাই ভাবছ তুমি!

অর্চনা এবার উঠে পড়ল। বললে—একটু বসুন ভাই, আমি নিচে গিয়ে দেখি। কি বলব —পচে গেছে, বুঝলেন, সব পচে গেছে। ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। আমি দেখি। সুরোদা

যদি এর উপর রেগে যায় তো অনর্থ হবে। সুরোদা ওইটে আর ছাড়তে পারলে না। মাঝে মাঝে এমন ক্ষেপে যায়—

অর্চনা পা বাড়ালে, সুলতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—চলুন আমিও যাই। ট্যাক্সি এসে থাকবে এতক্ষণ। না এলে একটু দাঁড়াব।

—না। বসুন। ট্যাক্সি এলেই রঘু বা লছমন এসে ডাকবে। ওখানে নিচে দাঁড়িয়ে রায়বংশের এদের যে চেহারা দেখে যাবেন, তাতে সুরোদা লজ্জা পাবে, আমিও পাব। একটু বসুন।

সুলতা অগত্যাই বসল। কথাটা সত্যি বলেছে অর্চনা। রায়বংশের জ্ঞাতিকলহের মধ্যে গিয়ে পড়ে সেও বিব্রত হবে, সুরেশ্বরও হবে, হয়তো বা আর দু-একজন হবে, কিন্তু দু-একজন বিব্রত হওয়ার সীমানা পার-হওয়া মানুষ, তারা গ্রাহ্য করবে না। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়, কারণ ওরা দল বেঁধে এসেছে। অর্চনাকে নিয়ে এসেছে, ওদের স্বার্থের ব্যাপার।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আপনি ঝরে পড়ল তার বুক থেকে। যতক্ষণ প্রাচুর্যের মধ্যে আছে মানুষ, ততক্ষণই সে মানুষ। প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ অন্যায়-অবিচার মনুষ্যত্বের ব্যভিচার অনেক করে, কিন্তু তার মধ্যেও প্রতিষ্ঠা, গৌরব, আত্মতৃপ্তির জন্য মনুষ্যত্বের দীপ্তিকে প্রশ্রয় দেয়, লক্ষ্মীর ঘরের ঘিয়ের প্রদীপের মত জ্বালিয়ে রাখে, কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে যখন নিচে নামে, তখন আর মনুষ্যত্বের একবিন্দু অবশিষ্ট থাকে না। লক্ষ্মীর ঘরের ঘিয়ের প্রদীপ নিভলেই মশাল জ্বালো, তাতেও অন্ধকার ঘুচবে না, মশালের কলিতে ধোঁয়ায় দম বন্ধ করে অন্ধকারকে ভয়ঙ্কর করে তুলবে।

আজও সুরেশ্বরের মহত্ত্ব, সুরেশ্বরের এই খেয়ালীপনার ঝকমকানি সব ভাল লাগছে এবং বাস্তবে সম্ভব হয়েছে, ওই লক্ষ্মীর ঘরের ঘিয়ের পঞ্চপ্রদীপে পাঁচ-পাঁচটা পলতের মুখে শিখা উজ্জ্বল হয়ে জলছে বলে। সেকাল হলে সুরেশ্বর বীরেশ্বর রায় হত, না হয় রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুর হত। যে তার ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে—

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে। সুলতা উঠে গিয়ে দাঁড়াল, বীরেশ্বর রায় যে ছবিটার মধ্যে ওই তান্ত্রিক পাগলের গলা টিপে ধরেছেন। পাশে পায়ে ধরেছে সোফিয়া বাঈজী। তান্ত্রিক যন্ত্রণাকাতর মুখে হাঁ করে আছে।

সুরেশ্বর বললে—আঁ-আঁ। একটা আনুমানিক জান্তব চিৎকার করছে।

কিছুক্ষণ ছবিটা দেখে, পাশের ছবির দিকে তাকালে। প্রকাণ্ড বড় ছবি একখানা। ঠিক মাঝখানে টাঙানো। একটা দরবারের ছবি।

ইংরেজ আমলের দরবার। পুরনো ইংরেজ আমল। সাহেবদের পোশাকে বোঝা যাচ্ছে। খুব জাঁকজমক করে সাজানো, ক'জন সাহেব উঁচু ডায়াসে বসে আছে, একজন একখানা কাগজ খুলে তা থেকে কিছু পড়ছে। সামনে দেশী লোকেরা বসে আছে। সামনের এঁরা রাজা জমিদার। চোগাচাপকান, পাগড়ি, শামলা, সোনার মোটা গার্ডচেন পরে বসে আছেন। পিছনে অনেক লোক। এদেশের কালো চামড়া বিস্ফারিত ভীত-দৃষ্টি ঘোলাটে চোখ। সুরেশ্বর শিল্পী হিসেবে প্রশংসার পাত্র, এ স্বীকার সে করবেই। এক্সপ্রেসন তার ভাল।

ফ্রেমের উপর ছবির নাম-লেখা কাগজটার উপর ঝুঁকে সে লেখাটা পড়তে চেষ্টা করলে।

শতাব্দী শেষ। ১৮৫৮ সাল 'কুইনস প্রক্লামেশন'—মেদিনীপুর দরবার। আবার সে ছবিটার দিকে তাকালে। এই যে বীরেশ্বর রায়ও বসে আছেন। প্রথম সারিতে বাঁদিকে,

সেভেন্থ চেয়ারে বসে আছেন।

সে উঠে দাঁড়াল। নিচের গোলমাল যেন বেড়ে উঠছে। অস্বস্তিবোধ করতে লাগল সে। এর মধ্যে বন্দীর মত দাঁড়িয়ে আছে সে। ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এখনও ট্যাক্সি এল না। তাহলে সুরেশ্বর ভুলেই গেছে ট্যাক্সির কথা বলতে। হ্যাঁ, তাই হবে। নিশ্চয় তাই। কিন্তু সে আর এখানে এইভাবে মুখ লুকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। না, সে আর থাকবে না।

এবার সে হনহন করে চলতে লাগল।

হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকারে কেউ ফেটে পড়ল—একদিন এর জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে। কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেব, বুঝলে!

—কমলেশ্বর! কমলেশ্বর! থাম থাম!

—কেন থামব। চিৎকার করে বলব।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুলতা। ঠিক এই মুহূর্তে নিচে নামতে তার পা উঠছে না। সিঁড়িটা যেখানে নেমেছে, নিচের বারান্দায়, তার কোলেই বড় ড্রয়িংরুমটা; একেবারে সামনে গিয়ে পড়তে হবে।

—কমলেশ্বর, কমলেশ্বর, তোমার পায়ে ধরছি আমি।

—তাতে আমার বয়েই গেল! দেবোত্তর! দুটো পাথরের পুতুল, সে খায় না, পরে না, তার সেবা! ও আমি মানি না! মানব না!

এবার বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল সুলতার মুখে। ওই কথাটায় মুহ্যমানতা তার কেটে গেল। সামনের দেওয়ালের একটা ছবি তার চোখে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যে একটা আলো জ্বলছে। তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে চারজন মানুষকে।

পরিপূর্ণ আলো পড়েছে একজন শয্যাশায়ী লোকের মুখে। কে? মুখে দাঁড়ি-গোঁফ, মাথায় চুল। এ কি পাগল নয়? হ্যাঁ, পাগলই। কিন্তু এ পাগলের মুখের চামড়া কোঁকড়ানো নয়, মুখখানা কালো নয়। মসৃণ কপাল, রঙটা গৌরবর্ণ, সুপুরুষ মানুষ, চোখ থেকে জল পড়ছে, মুখ প্রসন্ন। পাশে আবছা হলেও চেনা যাচ্ছে বীরেশ্বর রায়কে, এপাশে ইনি ভবানী দেবী। আরও একজন। পায়ের তলায় বসে আছে। পিছনটা দেখা যাচ্ছে। ফ্রেমে লেখা, শাপমুক্তি। সংগ্রাম শেষ।

হঠাৎ সুলতার কানে এল—

—বেশ করি, আমি খুব করি। আমি যা করি তাতে আমার জাত যায়, না? আর ও, ওই সুরেশ্বর, ও যে ক্রীশ্চান, গোয়ান মেয়ে বিয়ে করেছিল, একটা লম্পট। খুব বেঁচেছে, মেয়েটা ওকে রেহাই দিয়েছে। ও দেবোত্তরের কে? দেবোত্তর ফলাচ্ছে!

চমকে উঠল সুলতা। সুরেশ্বর—ক্রীশ্চান গোয়ানী মেয়ে—

—আজ আবার ওই তো একটা মেয়েকে নিয়ে সারা রাত—সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল উঠল!

—সুরেশ্বর সুরেশ্বর—মরে যাবে, সুরেশ্বর। রাজাভাই! রাজা!

এবার অর্চনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সুরোদা, সুরেশ্বরদা—

সুলতা আর থাকতে পারলে না, আর সহ্য হল না তার। সে দ্রুতপদেই দক্ষিণের বারান্দাটা অতিক্রম করে নিচে নেমে এল। চলেই সে যেত। কিন্তু ঘরের ঝগড়াটা তখন বাইরে এসে পড়েছে। একটি লোক—ময়লা কাপড়-জামা সত্ত্বেও বোঝা যায়, রায়বংশের

ছেলে, মাটিতে পড়ে আছে।

সুরেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে—পিছন ফিরে সে দাঁড়িয়েছিল—তবু বোঝা যাচ্ছিল সে ক্রুদ্ধ, এখনও তার ক্রোধ যায়নি। তাকে হাতে ধরে রেখেছে অর্চনা। দরজার মুখে একজন কালো চশমা পরা, একজন সুপুরুষ বয়স্ক লোক। কাঁপছেন তিনি। সুরেশ্বর বলছে—শোন কমলেশ্বর, দেবোত্তর সম্পত্তি দেবোত্তরই থাকবে, ও ভাঙতে আমি দেব না। হ্যাঁ, কুইনীকে আমি বিয়ে করেছিলাম, তাতে জাত আমার যায়নি। তাতে রায়বংশের—অন্ততঃ দেবেশ্বর রায়ের বংশের—কেউ নরকস্থ হবে না। রায়বংশ তাতে ধন্য হয়েছে। জীবনে যদি কোন পুণ্য করে থাকি, তবে ওই আমার শ্রেষ্ঠ পুণ্য। আমার বাড়ীতে তোমার গলা টিপে ধরে তোমার চিৎকার বন্ধ করতে হল, তাতে আমি দুঃখিত, কিন্তু একবিন্দু লজ্জা আমার হচ্ছে না, অনুশোচনাও আমার হচ্ছে না, কারণ তিনি আমার অতিথি, আমার এককালের বান্ধবী, তিনি সম্ভ্রান্ত মহিলা, তিনি দেশের সেবা করেন, তিনি উচ্চশিক্ষিতা, মর্যাদাময়ী, তাঁর তুমি অপমান করেছ।

সুলতা এবার পিছন থেকে ডাকলে—সুরেশ্বর!

চমকে উঠে সুরেশ্বর এবং অর্চনা তার দিকে ফিরল। সুরেশ্বর বললে—তুমি নেমে এসেছ সুলতা!

—হ্যাঁ। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি যাব। কিন্তু তুমি এ কি করছ?

—আমাকে মাফ কর সুলতা, কি বলে যে আমি মাফ চাইব তোমার কাছে, আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

—না না। আমি বুঝতে পারছি, উনি বোধহয়—

—ও অতি ইতর! আগে গাঁজা খেত। মাথা খারাপ।

—থাক থাক। চল, আমাকে পৌঁছে দাও, ফটক পর্যন্ত।

সুরেশ্বর বললে—চল, সেই ভাল। রায়বংশ অভিশপ্ত সুলতা। কাল তোমাকে অর্ধেকটা বলেছি, তাতে সব বলা হয় নি, সব শুনলে বুঝতে পারতে।

চলতে চলতেই সুলতা বললে—ভাল-মন্দ নিয়ে সংসার সুরেশ্বর। টেনে টেনে কথাটা বললে সুলতা। অব্যক্ত কথাটার মধ্যে অনেক কিছু রইল।

সুরেশ্বর বললে—নিশ্চয় সুলতা, নিশ্চয়। কিন্তু দুনিয়াতে উঁচু বেদীর উপর যারা দাঁড়ায়, তাদের ভালোত্ব যত উজ্জ্বল, মন্দত্ব তত কালো, ভয়ঙ্কর। ধর্ম আর সম্পদের চেয়ে উঁচু বেদী আর নেই। দুটো নিয়ে রায়বংশের রক্ত।

—থাক ও কথা এখন। একটু পর প্রায় গেটের কাছাকাছি এসে বললে—ওই কালো চশমা-পরা উনি কে? তোমাকে রাজাভাই বলছিলেন!

এতক্ষণে হেসে সুরেশ্বর বললে—তোমার কানে তো ঠিক মানে নিয়ে পৌঁচেছে! উনিই ব্রজেশ্বরদা। অন্ধ হয়ে গেছেন।

—অন্ধ?

—হ্যাঁ, অন্ধ। সম্ভবতঃ রক্তদুষ্টি থেকে। যার উৎপত্তি—চুপ করে গেল সে।

নীরবেই লনটা অতিক্রম করে ফটকে এসে দাঁড়াল দুজনে। সুরেশ্বর বললে—ওই ট্যাক্সি নিয়ে আসছে লছমন! বোধহয় এত সকালে ট্যাক্সি পাচ্ছিল না।

ট্যাক্সিখানা এসে ফটকের সামনে দাঁড়াল। লছমনা নেমে বললে—এতনা সবেরে ট্যাক্সি একঠো নেহি থা। উধার সে লে আয়া—

—ঠিক হ্যায়।

ট্যাক্সির দরজা খুলে দিলে সুরেশ্বর, সুলতা ভিতরে উঠে বসল। সুরেশ্বর বললে—অর্ধেক জবানবন্দী আমার শুনেছ সুলতা, বাকী অর্ধেকটা শোনাবার জন্মে সন্ধ্যেবেলা তোমাকে আসতে অনুরোধ জানাচ্ছি। কমলেশ্বরের কথায় তুমি রাগ করনি, সে আমি জানি!

সুলতা বললে—আসব। নিশ্চয় আসব। একটা নতুন কৌতুহল জেগেছে আমার। তুমি বলছিলে, তোমার শ্রেষ্ঠ পুণ্যের কথা। কুইনীকে তুমি—

—হ্যাঁ, তাকে আমি বিয়ে করেছিলাম। সে আমার শ্রেষ্ঠ পুণ্য! রায়বংশের সব থেকে বড় দেনাটা শোধ করব বলে। থেমে গেল সে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার সে বললে—সন্ধ্যেবেলা সব বলব সুলতা। চোখ অকস্মাৎ তার জলে ভরে উঠল, পিছন ফিরে সে বাড়ীর দিকে হন-হন করে চলে গেল।

## ১৫

পরের দিনের সন্ধ্যা—সুলতাকে সামনে রেখে সুরেশ্বর বললে।

—আজ আমার মুলতুবী জবানবন্দী আরম্ভ করতে গিয়ে আমাকে পিছিয়ে যেতে হচ্ছে সুলতা। ১৮৫৭ সালে বীরেশ্বর রায় এসেছিলেন কীর্তিহাটে। তখন মিউটিনির সময়। পিছিয়ে যাচ্ছি ১৮১৫-১৬ সালে বীরেশ্বর রায়ের জন্মের আগে।

না গেলে, যে গোপন পাপ রায়বংশের রক্তের ধারায় বয়ে চলছে, পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে তার কথা বলা হবে না। সেইটে বলব।

যে কথা সযত্নে গোপন ক'রে গেছেন রত্নেশ্বর রায়, যার আভাস মাত্র দিয়ে ডায়রীতে স্পষ্ট লিখেছেন—"সে কথা লিখিতে পারিব না! সজ্ঞানে মৃত্যু হইলে এই ১৮৬০ সালের ডায়রীখানি আমার চিতায় দগ্ধ করিতে বলিব।" সেই গোপন কথা আমি পেলাম পুলিশের খানাতল্লাসীর সময়—যখন তারা খাস কাছারীর কাঠের সিন্দুকভর্তি চিঠিপত্রের দপ্তর বা ফাইলগুলো কাঁকড়াবিছের ভয়ে তছনছ করে দিয়ে গেল।

এক কথায় তত্ত্বের খোলে মুড়ে বলতে পারি—সে পাপ—ধর্মজীবনের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা পাপ, আর সম্পদ এবং সংসারজীবনের মধ্যে বাসা বাঁধা পাপ! কিন্তু তাতে গুরুত্বটা ঠাওর করা যাবে না। কি ঘটেছিল তাই বলতে হবে।

সোমেশ্বর রায়ের কন্যা বিমলার বিয়ে দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তের পুত্রের সঙ্গে। বিমলাকান্তের সঙ্গে। তার কারণ, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তরই কি সব তান্ত্রিক ক্রিয়া-কর্মের ফলেই সোমেশ্বর রায়ের স্ত্রী রাজকুমারী কাত্যায়নীর সন্তান হয়ে বেঁচেছিল এবং শ্যামাকান্ত একদিন দুর্যোগের রাত্রে নৌকো করে কীর্তিহাটের ওপারে জঙ্গলের মধ্যে সিদ্ধপিঠে সাধনভজন ক'রে ফিরবার পথে নৌকোডুবি হয়ে ভেসে যান। সোমেশ্বর রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তিনি ভক্তি এবং আগ্রহবশে শ্যামাকান্তের শিষ্য হিসেবে সঙ্গে থাকিতেন; নৌকোডুবির পর অনুতাপ হয়েছিল তাঁর যে, তিনি বাঁচলেন আর গুরুর মত শ্যামাকান্ত বাঁচলেন না, তাঁকে তিনি বাঁচাতে পারলেন না।

পাপ এঁদের দুজনের। ধর্মের পাপ এই শ্যামাকান্তের। আর সংসার সম্পদের পাপ সোমেশ্বরের। মাতৃবংশ আর পিতৃবংশ। রত্নেশ্বর রায় থেকে দুই পাপ যুক্তধারায় চলে আসছে রক্তের স্রোত ধরে পুরুষানুক্রমে ধারা রেখে। ওইখানেই ব্যাধির মূল।

সুলতা বাধা দিলে। বললে—পাপ-পুণ্য এসব বাদ দিয়ে বল। তাঁদের পাপ-পুণ্যের বিচার নাই করলে। তাঁদের পরের পুরুষরা যা করেছে সে দায়িত্ব তাদের। পূর্বপুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ কি বল! হেরিডিটি যদি বল, তবু মেনেও বলব—হ্যাঁ, দায়িত্ব পরবর্তী পুরুষদের।

সুরেশ্বর একটু চুপ করে থেকে বললে, হেরিডিটি অমোঘ, ও এড়ানো সহজে যায় না। সে চেহারা থেকে মুদ্রাদোষ থেকে চরিত্র পর্যন্ত সব। কিন্তু তাই শুধু আমি বলছি না। ওই পাপ-পুণ্যই আমি বলব। আমি বিশ্বাস করেছি। তার কারণ, যে চিঠিগুলি পেয়েছি তার বিবরণ থেকে আমি বিশ্বাস করেছি, এমন পাপ আছে যাতে সৃষ্টির, মহাপ্রকৃতির অভিসম্পাত পড়ে। মানুষের উপর পড়ে, বংশের উপর পড়ে। তাছাড়া বাস্তব সংসারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এক পুরুষের কর্মের ফল অন্য পুরুষকে ভোগ করতে হয়। তাও তো হারায় না সংসারে! রায়বংশের পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের ফল সেদিন গোয়ানপাড়ায় দেখে এসেছিলাম। তার কিছুদিন আগে অতুলেশ্বরের কেসে শিবু সিং বলে ছেলেটির অ্যাপ্রুভার হয়ে সাক্ষী দেওয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। ধর্ম ভগবান পাপ সেকালের মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য। কালকের জবানবন্দীর মুলতুবীর সময় এসেছিল, আজ তাই স্বাভাবিক ভাবে উঠেছে। ও নিয়ে তর্ক করতে বসি নি। তুমিও করো না। তাহলে তর্কেই রাত্রি শেষ হবে। ধর্ম আর ভগবতীর সন্ধানে ১৮১৫ সালে শ্যামাকান্ত গৃহত্যাগ করেছিলেন।

সুরেশ্বর সেই বারান্দা-ঘেরা ছবির ঘরেই কালকের মত আলো জেলে বসে তার প্রতীক্ষা করছিল। ছবিগুলোর দিকে তাকিয়েই সে বসেছিল। হাতে সিগারেট পুড়ছিল। সামনে টিপয়ে একটা শূন্য গ্লাস। সুলতা ঘরে ঢুকতেই সে বললে—এস।

সুলতা বললে—এলাম। কিন্তু অর্চনা কই? তোমার ব্রজেশ্বরদা আছেন শুনলাম, তিনি?

সুরেশ্বর বললে—তারা কালীঘাট গেল, দর্শন করতে।

—ব্রজেশ্বরবাবু তো—

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ অন্ধ। তবু মায়ের সামনে যাবে প্রণাম করবে। কাঁদবে। একটু চুপ করে থেকে বললে—মানুষটাই পাল্টে গেছে সুলতা। একমাত্র নিষ্ঠুর আঘাতই মানুষকে পাল্টায়। পাথর মানুষ ফেটে গিয়ে ঝর্ণা বের হয়, আবার জলভরা দিঘি বন্যার পর রাশীকৃত বালিতে মজে গিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়। রাজকুমারী বউ কাত্যায়নী দেবীর জন্যে যে পুকুর কাটিয়ে ঘড়া বিশেক দুধ ঢেলে দুধপুকুর নাম দেওয়া হয়েছিল, সেটা ১৯৪২ সালের সাইক্লোনে কাঁসাইয়ের বানে এমনিভাবে মজে বালির মরুভূমি হয়ে গেছে। ব্রজেশ্বরদা অন্ধ হয়ে, লাঠি ধরে ছেলে নিয়ে এল কীর্তিহাটে, সেটা আটচল্লিশ সাল। আমি খবর পেয়ে দেখতে গেলাম, তখন ও নাটমন্দিরে প্রণাম করছে, আর ঝরঝর চোখের জলের ধারায় ভাসছে। শান্ত করতে বললাম—ভয় কি ব্রজদা, আমি চিকিৎসা করাব তোমার, ভাল হয়ে যাবে চোখ। ও বললে কি জান? বললে—না-না, রাজাভাই না। চোখ আর আমার দরকার নেই রাজাভাই। চোখ গিয়ে আমি কাঁদতে শিখেছি। কান্না ভুলে যাব। অনেক হেসেছি রাজাভাই, অনেক। জীবনটাকেই হাসিকৌতুক করে নিয়েছিলাম। কান্নার সুখ জানতাম না। এ বড় সুখ। চোখ আর আমি চাই না! আমার ধনেশ্বরকাকা ব্রজদার বাপ, তিনি অ্যাক্টিং করে কথা বলতেন। ব্রজেশ্বরদা সেদিন বিল্বমঙ্গল থেকে আবৃত্তি করেছিল—"ভেবে দেখ্ মন, তোরে নাচায় নয়ন।" শুনে আমারও চোখে জল এসেছিল সুলতা। মনে হয়েছিল—গোটা রায়বংশের অন্তরাত্মা যেন আবৃত্তি করছে।

সুলতা এসেছিল একরকম মন নিয়ে। মনটা তার আর একরকম হয়ে গেল। ব্রজেশ্বর

কেমনভাবে আবৃত্তি করেছিল তা সে শোনে নি। কিন্তু ওর কথা যদি সত্য হয়, তবে তার ছোঁয়াচ যেন আজ সুরেশ্বরের কণ্ঠেও রয়েছে বলে মনে হল তার।

রঘু এসে চায়ের ট্রে নামিয়ে দিলে।

সুরেশ্বর বললে—গ্লাসটা নিয়ে যা। আর বলে দে, সুলতাও খাবে। অর্চনাদের ফিরতে দেরি হবে একটু। ওরা হয়তো খেয়েও আসতে পারে। কালীঘাট থেকে ওরা অতুলের বাসায় যাবে দেখা করতে।

সুলতা বললে—অতুল? ও, সেই অতুলেশ্বরকাকা তোমার?

—হ্যাঁ। সে তো এখন একজন লীডার। কতকগুলো সরকারী কমিটির মেম্বার। তার বাসা আছে। সে রায় লেখে না আর, লেখে ভট্টাচার্য।

—ও। জিন্নার গ্রুপের অতুল ভটচাজ? কিষাণ লীডার?

—হ্যাঁ। রায়বংশের রায় এবং ঈশ্বরত্ব সে বাদ দিয়েছে। কীর্তিহাটের সংস্রব সে রাখে না। এখন তিন-চারটে সরকারী কমিটির মেম্বার। পলিটিক্যাল সাফারার হিসাবে দুখানা ট্যাক্সি পেয়েছে। সে তার জীবন নতুন ক'রে আরম্ভ করেছে। আসছে ইলেকশনে সে অ্যাসেম্বলীতে দাঁড়াবে।

সুলতা হেসে বললে—লোকে বলে, পুণ্যের ফল নাকি দেরিতে মেলে। কিন্তু আমি তো দেখছি, পুণ্য যদি চেঁচিয়ে করে তবে তার ফল হাতে হাতে।

সুরেশ্বর বললে—সেটা পলিটিক্সের পুণ্য সুলতা। সে কি ট্রেজারী বেঞ্চের দলে, কি অপোজিশনে। ট্রেজারীর দলে নগদ বিদায় আছে, কিন্তু অপোজিশনে পজিশন আছে। ভগবানের রাজত্বে পাপ বল পুণ্য বল দুয়ের ফলই না পাকলে পড়ে না। কিম্বা ডিম থেকে বাচ্চা হওয়ার মত। যাক শোন, কালকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এসেছি। আজ কিন্তু পিছিয়ে আরম্ভ করতে হবে। ১৮১৫-১৬ সালে। রায়বংশের পাপের কথাটা বলব।

* * *

১৮১৫।১৬ সালে শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য নামক এক কুলীন সন্তান। তার প্রথম বয়সের ছবি নেই। প্রথম ছবি ওই দেখ কালীঘাটে, সোমেশ্বর রায়ের সঙ্গে। চোখে পাগল-পাগল দৃষ্টি, দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। ঝাঁকড়া চুল। তখনই আধ-পাগল। পেশাদার কুলীনের ছেলে; অর্থাৎ বাপ কৌলীন্য মূলধনের জোরে যশোর অঞ্চল থেকে পশ্চিমবঙ্গে কুলীনের কন্যাদায় উদ্ধার করে বেড়াতেন। বছরে এক মাস পনের দিন এক এক শ্বশুরবাড়ীতে থেকে—গুরুর বাৎসরিক পার্বণী, পুজোর বাৎসরিক পার্বণ; পিতৃ-পিতামহের একোদ্দিষ্ট—বড়দিনে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট লাটসাহেবের ডালির মত তাঁদের পাওনা নির্দিষ্ট ছিল—কাপড় চাদর পাণের এবং নগদ দক্ষিণা নিয়ে চলে যেতেন। একটা স্বস্থান ছিল এবং একজন পত্নী জীবনসঙ্গিনী থাকতেন। কাশীকান্ত,—কাশীকান্ত ছিল শ্যামাকান্তের বাপের নাম। কাশীকান্তের যিনি ঘরণীগৃহিণী, তাঁরই গর্ভের সন্তান শ্যামাকান্ত। কাশীকান্তের পেশা বিবাহ হলেও তিনি তন্ত্রমতে সাধনভজন করতেন। আর গানও তিনি গাইতে পারতেন।

কাল একথা বলেছি। তবু মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। শ্যামাকান্ত ছেলেবেলা থেকে একটু যেন কেমন অস্বাভাবিক ছিলেন। কেমন একটা বাইরের নেশা ছিল। গ্রাম থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে কিম্বা বনে জঙ্গলে ঘুরতেন। আর ছিল তাঁর গানের নেশা। ওই বিদ্যায় দখল নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। তেমনি ছিল কণ্ঠস্বর।

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—একাল হলে এ মানুষটি মিথ্যে তন্ত্রসাধনা করতে ছুটত না।

পাগলও হ'ত না। সিনেমায় মিউজিক ডিরেক্টার হ'ত। জীবনের কাম্য তাঁর এর মধ্যেই মিলে যেত।

হাসিটা মিলিয়ে গেল সুরেশ্বরের। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—এই মানুষটির মত হতভাগ্য মানুষের জীবনকথা আমি পড়ি নি—কারুর কাছে শুনি নি, কল্পনাও করতে পারি নে।

প্রথম যৌবনেই যখন বাপ মারা গেলেন, তখন তিনি পাখা মেললেন। গান গেয়ে বেড়ানো পেশা ধরলেন—আর তার সঙ্গে সাধন-ভজন। দীক্ষা বাপের কাছে নিয়েছিলেন। হঠাৎ মনে তন্ত্রসাধনার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। এসে হাজির হলেন শ্যামনগরে, পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের কাছে। বললেন—দীক্ষা আমার বাবার কাছে নিয়েছি। কিন্তু পুরশ্চারণ হয়নি; আমাকে পুরশ্চারণ করিয়ে দিতে হবে। পূর্ণাভিষেক দীক্ষা দিতে হবে।

পুরশ্চারণ, পূর্ণাভিষেক না হলে শক্তিসাধনায় অধিকার হয় না।

পদ্মনাভ ভট্টাচার্য বললেন—এক সপ্তাহ থাক এখানে; আমি দেখি তোমার ওই অধিকার আছে কিনা। তারপর বলব।

সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, নবীন বয়স। কথায়-বার্তায় উল্লাস। দুঃসাহসী। তার উপর তাঁর গান। মার্গসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত দুইই গান অপূর্ব। হা হা ক'রে হাসেন। সারা রাত গান ক'রে ক্লান্তি নেই। শ্যামাসঙ্গীত—তখন রামপ্রসাদ সন্থ বিগত, বাংলাদেশ রামপ্রসাদের গানের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। কীর্তন গানে একসময় বাংলাদেশ ভেসেছিল। তেমনি করেই ভেসেছিল সে কালটা শ্যামাসঙ্গীতে।

সাত দিনের মধ্যে গোটা শ্যামনগর জয় ক'রে নিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। তাঁর বয়সী নবীন দলের পাণ্ডা হয়ে উঠেছিলেন। মানুষটা বিচিত্র, যেখানে থাকে সেইখানটিকেই নিজের ঘর ক'রে নিতে পারে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। তাঁর নিজের সংকোচ নেই—অসংকোচ নবীন শ্যামাকান্ত গৃহস্থেরও সকল সংকোচ ভেঙে দেন। পদ্মনাভ ভটচাজকে একদিনেই ঠাকুরমশাই থেকে বাবাঠাকুর, দ্বিতীয় দিনে 'বাবা' বলতে লাগলেন, তাঁর গৃহিণীকে মাঠাকরুণ থেকে মা বলে আপনার হয়ে গেলেন। পদ্মনাভ ভটচাজের এগার বছরের কুমারী কন্যা মহালক্ষ্মী তাঁর পরম ভক্ত হয়ে উঠল।

সাতদিনের দিন পদ্মনাভ বললেন—দেখ, তোমার লক্ষণ জন্মলগ্ন সব বিচার করে আমি দেখেছি বাবা কান্ত। তোমার ভাগ্য খুব জটিল। আবার সাধকের লগ্ন, লক্ষণ সব আছে। তোমাকে সস্ত্রীক সাধনা করতে হবে। ঘরে থেকে সাধনা করলে তুমি রামপ্রসাদের মত মাকে পাবে। স্বয়ং মা তোমার কন্যা হয়ে এলেও আসতে পারেন। আর সন্ন্যাসী হলে এ সাধনায় তোমার বিপদ আছে বাবা।

শ্যামাকান্ত নিজের হাতের রেখা দেখতে দেখতে বলেছিলেন—কি হবে?

—তা আমি দেখতেও পাচ্ছি না, বলতেও পারছি না। তবে হ'তে পারে অনেক রকম—উন্মাদ হতে পার; মহাশক্তি তো ছলনাময়ীও বটেন, তাঁর ছলনায় যে কত রকম হয়—

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—তা হোক, তার সঙ্গে খেল্ খেল্তে গিয়ে পাগল হ'লে না হয় হব! তবে তাকে তো আমার পিছু পিছু ফিরতে হবে?

পদ্মনাভ বললেন—একটা কথা বলি বাবা, শোন। তুমি আমার মহালক্ষ্মীকে বিয়ে কর। ওর ভাগ্য খুব ভাল। তবে ওর পরমায়ু স্বল্প। তা হোক, ওকে বিয়ে করে তোমরা সস্ত্রীক পুরশ্চারণ কর, পূর্ণাভিষিক্ত হও; তোমার মন্ত্র আমি জেনেছি। এই তো?

ব'লে কানে কানে তাঁর দীক্ষার বীজমন্ত্রটি উচ্চারণ করেছিলেন, শ্যামাকান্ত চমকে

উঠেছিলেন। পদ্মনাভ ভট্টাচার্য বলেছিলেন—ওকেও আমি ওই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে রেখেছি। কুমারী হলেও দিয়েছি। ওর ভক্তিযোগ প্রবল। তোমার বাবা ভক্তিযোগ খামতি। জ্ঞানযোগ, মানে ক্রিয়া-কাণ্ডে আসক্তি প্রবল। তুমি এমন শ্যামাসঙ্গীত গাও শুনে অন্যজনে কাঁদে, তুমি কাঁদ না। ও তোমার সঙ্গে থাকলে দুটোর মিল হবে। কল্যাণ হবে তাতে। সিদ্ধি পাবে। আমারও এই এক মেয়ে, আমার যজমান পাবে, লাখরাজ পাবে, শিষ্যসেবক পাবে। বাবা, তোমাকে সোজা ক'রে বলি—কাঁদতে শিখতে হবে তোমাকে আগে। তা দেখ, ভক্তিতে কাঁদা সোজা কথা নয়। মায়ায় মমতায় শোকে দুঃখে নরম হতে হবে বাবা কান্ত। সন্ন্যাসী হলে যত শুকনো আছ, তার থেকেও শুকিয়ে যাবে। তখন আছাড় মেরে ভাঙলে তবে যদি জল বেরোয়। বুঝেছ!

শ্যামাকান্তের ভুরু কপাল সব কুঁচকে উঠেছিল। তিনি যেন ভাবতে শুরু করেছিলেন কথাটা।

পদ্মনাভ বলেছিলেন—একটা সত্য কথা বলবে বাবা?

শ্যামাকান্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু ভুরু ললাটের কুঞ্চন মিলোয় নি।

পদ্মনাভ বলেছিলেন—আমার কথায় রাগ হচ্ছে? নয়?

শ্যামাকান্ত এবার হেসে বলেছিলেন—তা হচ্ছিল।

—হ্যাঁ হবে, আমি জানি যে। এখন যে কথাটা জিজ্ঞাসা করব তার জবাব দাও তো বাবা!

—বলুন।

—রাগ না করে, বেশ ভেবে আমাকে সত্য কথা বলতে হবে।—হ্যাঁ?

—বলুন!

—ধর, এই যে তুমি ঘুরে বেড়াও, হাস, গান কর, তোমার এমন রূপ, তোমাকে সবাই ভালবাসে। মেয়ে-পুরুষ বলতে গেলেই সবাই। তা বাবা—। থেমে গিয়ে হেসে বলেছিলেন—রাগ করতে নেই আমার কথায়, আমাকে গুরু করতে এসেছ! বল তো মেয়েছেলেদের, বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কি ভাব তোমার জাগে? মনে মনে মা বলে—তার মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে মাটির দিকে তাকাও—না—।

শ্যামাকান্ত বেশ ভেবেই ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলেন—না।

—হুঁ। আমি জানি। তোমার লক্ষণে রয়েছে একথা। তা জান তো, চণ্ডীতে আছে—"স্ত্রীয়া সকলাঃ সমস্তা জগৎসু।" মহাপ্রকৃতি এই জগতের নারীপ্রকৃতির মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ ক'রে রেখেছেন। এদের মা বলতে পারলে তিনি মায়ের মত দয়া ঢেলে দেবেন—বুকে করবেন। না পারলে বাবা শিব হতে হবে—তাও শবরূপী শিব! না হলে তিনি আঘাত করবেন। তোমার বুকে চড়ে ধেই ধেই করে নাচবেন। শেষ পর্যন্ত গ্রাস করবেন। এখন ভেবে দেখ তুমি।

সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ভেবে শ্যামাকান্ত পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের কথায় রাজী হয়েছিলেন। তাঁর কন্যা মহালক্ষ্মীকে বিবাহ করে শ্বশুরের কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং তাঁকে 'পটল গুরু' করে পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে পুরশ্চারণ করে ক্রিয়া-কর্ম শুরু করেছিলেন। খানিকটা শান্তও হয়ে এসেছিলেন। তবে ছিল গানের ঝোঁক! সেটা কমে নি, সেটা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। কোথাও কোন বড় ওস্তাদের খবর পেলে আর ঘরে থাকতেন না। ছুটতেন।

শ্বশুর পদ্মনাভ ভটচাজ বারণ করতেন। বলতেন—বাবা, সিদ্ধি যদি চাও বাবা, তবে গান গেয়ে মাকে ডাক। বুঝেছ না? তুমি গাইবে, মা শুনবেন। বুঝলে! এই যে তুমি বড় বড় ওস্তাদের পেছনে ছোট, তাদের আসরে কেলোয়াতির মার-পেঁচ শোন, এর মধ্যে কেরামতি অনেক। লাঠির দুই মাথায় আগুন জ্বেলে খেলোয়াড়েরা খেল দেখায়, লোহার গোল বালায় ন্যাকড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে চারটে-পাঁচটা নিয়ে লোফালুফি করে। সে কেরামতি বটে, কিন্তু তাতে রান্নাও হয় না, হোম-যজ্ঞিও হয় না, এমন কি বাবা তার আলোতে কাজকর্ম, রাত্রের আঁধারে পথ চলা তাও হয় না।

কিন্তু শ্যামাকান্ত ও কথা মানতে পারতেন না। আবার পঞ্চপর্বে-অমাবস্যায়-পূর্ণিমায়-চতুর্দশীতে-অষ্টমীতে-সংক্রান্তিতে মাঝরাত্রে উঠে চলে যেতেন। শ্মশানে জপ করতে।

এর মধ্যেই বছর তিনেক পর মহালক্ষ্মীর সন্তান হল। বিমলাকান্ত।

শ্যামাকান্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কই, কন্যা হল কই?

শ্বশুর বলেছিলেন—সময় হলে হবে বাবা! সাধনাতে অধীর হলে চলে? মা তোমাকে তো কৃপা করেছেন মনে হচ্ছে। আগে বংশধর দিলেন। এবার হবে।

এই সময়ে হঠাৎ জ্বরবিকারে মারা গেলেন পদ্মনাভ ভটচাজ। শ্যামাকান্ত এবার গুরুহীন হয়ে বাধাবন্ধহীন হয়ে উঠলেন। তাঁর খেয়ালীপনা বাড়ল। মধ্যে মধ্যে শ্মশানচারী হতেন, মধ্যে মধ্যে গানের খেয়ালে মাততেন। গানের খেয়ালে মাতলে তখন বড় বড় জমিদার ধনীর বাড়ী গিয়ে উঠতেন, গান শোনাতেন। গান শুনিয়ে শিরোপা নিয়ে ফিরতেন দু মাস তিন মাস পর।

শাশুড়ী পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের গৃহিণী তখন নিজের কপালে ঘা মেরে বলতেন—এ কি কপালে ছিল মহালক্ষ্মীর! একটা লক্ষ্মীছাড়া বাউণ্ডুলের হাতে পড়েছে। ঘরের দেবসেবা অচল; যজমানের ক্রিয়া-কর্ম চলে না। শিষ্যরা মন্ত্র নিতে এসে ফিরে যায়—শেষ পর্যন্ত কি বড়-ভটচাজের পাট্ বন্ধ হবে! কপাল, আমার কপাল!

কন্যা মহালক্ষ্মীর তা গায়ে লাগত; এবং স্বামীর আচরণও তাকে আঘাত দিত। একটা নিদারুণ অবহেলা তিনি অনুভব করতেন স্বামীর আচরণের মধ্যে। কিন্তু শান্ত মানুষ ছিলেন তিনি—তিনি নীরবে সব সহ্য করতেন।

তবুও ঝগড়া হত মধ্যে মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। মহালক্ষ্মী মৃদুস্বরে বলতেন—শ্যামাকান্ত চীৎকার করতেন। এবং সে চীৎকারের মধ্যে একটা কথাই ফিরিয়ে-ঘুরিয়ে বলতেন। শ্বশুর তাকে প্রতারণা করেছেন। কিন্তু এমন সাধু মোলায়েম বাক্যে নয়, একেবারে সে আমলের খাস চলতি কথায় বলতেন—বেটা আমাকে গরু ভেবে দড়িতে বেঁধে আটকে গেছে। বেটা জানত না, আমি গরু নই, আমি ষাঁড় নই; আমি মোষ—মহিষাসুর। খোলছানি মাড় খেয়ে বাঁধা আমি থাকবার নই। দড়ি যেদিন ছিঁড়ব, সেদিন তছনছ করে দেব সব। হ্যাঁ!

তাঁর সে মূর্তি দেখে শিউরে উঠতেন স্ত্রী মহালক্ষ্মী এবং তাঁর মা! শুধু তাই নয়, গৃহীর তান্ত্রিক আচরণ ত্যাগ করে তিনি বামাচারীর পথ ধরতে গেলেন। তান্ত্রিকের কন্যা মহালক্ষ্মীর কাছে এ অগোচর রইল না। তিনি কিছুদিন লক্ষ্য ক'রে বললেন—

—এ কি হচ্ছে?

—কি? ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন শ্যামাকান্ত।

—কি? আমাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছ? আমি কিছু বুঝি না, না?

—বুঝেছিস তো বুঝেছিস।

—গুরুর দেখানো পথ ছাড়লে কি হয় জানো না ?

—জানি, কচু হয়।

—সে কচু গুরুর ভাগ্যে নয়, নিজের ভাগ্যে জোটে। গুরু তোমাকে যাকে মা বলে ভজনা করতে বলেছেন—তাকে তুমি শালী বলে গাল দাও !

—হ্যাঁ দিই। মা বললে সে মা—শালী বললে সে শালী। মা বলে ডেকে তো দেখলাম। করুণা ? ধুর ! করুণা চাইলে দেমাক বাড়ে। আর করুণা চেয়ে পাবটা কি ? শালা মুষ্টি-ভিক্ষে। যা না দশ বাড়ী ঘুরে কেঁদে আয় দেখ, মুষ্টিভিক্ষের বেশী কি মেলে ? শালা মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার ! বুঝেছি—জবরদস্তি চুলের মুঠো ধরে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ওকে বশ না মানালে ও মানে না। শালা ওই পথ।

শাশুড়ীকে বললেন—ও সব তোমাদের শুদ্ধচারে পুজোটুজো আমার দ্বারা হবে না—তুমি পুরুত দেখ। দিগে বন্দী পুজো। শক্তি পাট বোষ্টুম পাট—তাও আবার শক্তি পাটে কালী দুর্গা জগদ্ধাত্রী পুজোতে সকাল থেকে তিন পহর পর্যন্ত বন্দী। লোক রাখ। ও আমার দ্বারা হবে না।

লোকের অভাব ছিল না সেকালে। ব্রাহ্মণেরা—বিশেষ করে গৃহস্থ ঘর যাদের তারা—ত্রিসন্ধ্যা করত, পূজাপাঠ করত নিত্যনিয়মিত। পদ্মনাভ ভটচাজের বংশের পেশা গুরুগিরি। তাদের প্রত্যেকের ঘরে ছিল শালগ্রামশিলা; আর ছিল শরিকানী শক্তিপূজা। দুর্গাপূজা-কালীপূজা-জগদ্ধাত্রীপূজা হত। দশঘর জ্ঞাতির মধ্যে পুজো ছিল ছখানি দুর্গা, আটখানি কালী, চারখানি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গ'ড়ে পূজো হত, মাঝখানে একটি খড়ো আটচালা ঘিরে চারটি চণ্ডীমণ্ডপে। বিচিত্র ব্যবস্থা, কোন প্রতিমার সামনে বলি হত, কোন প্রতিমার পুজো হত বৈষ্ণব মতে। শালগ্রামশিলা বিষ্ণুর প্রতীক, হিংসা রক্তপাত তাঁর সামনে নিষিদ্ধ, কিন্তু শ্যাম-নগরে ভটচাজবাড়ীতে শিলারূপী বিষ্ণুর সামনে তার নিষেধ ছিল না। কেবল সে কয়েক দিন তাঁর অন্নভোগ হ'ত না। কারণ বলির খর্পরে রক্তপূর্ণ হলেই তখন সব অন্নব্যঞ্জন আমিষ হয়ে যায়। এছাড়া শিবমন্দিরে ছিল শিবলিঙ্গ।

শিষ্য-সেবক ছিল দেশ জুড়ে; কেউ চাইত বৈষ্ণব মন্ত্র, কেউ শাক্ত, কেউ শৈব। শ্যামনগরের ভটচাজদের বাড়ীতে এসে যে যে-মন্ত্র চাইত তাই পেত। তাঁরা ছিলেন দেবতত্ত্বের ভাঁড়ারী। ভাঁড়ারে সব থাকত। যার যা প্রার্থনা, তার তাই মিলত। জমিদারেরা অধিকাংশ ছিলেন জগদ্ধাত্রীর উপাসক। বিশেষ ক'রে শাক্ত জমিদারেরা। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী পূজা করেছিলেন প্রথম। গোটা বাংলার হিন্দু সমাজের সমাজপতি, রাজ-ঐশ্বর্যে বাংলার বিক্রমাদিত্য, নবরত্নের সভার মত সভা—তেমনি প্রতিষ্ঠা; লোকে বিশ্বাস করত জগদ্ধাত্রী পূজার ফল। তাই জমিদারদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী মন্ত্র উপাসক ছিলেন বেশী।

রাণীভবানী ছিলেন, লোকে বলত, সাক্ষাৎ ভবানীর অংশোদ্ভূত। মহিমায় রাজরাজেশ্বরী, বুদ্ধিতে একটা সাম্রাজ্য চালাতে পারতেন। মীরজাফরেরা যখন ষড়যন্ত্র ক'রে ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উচ্ছেদের মতলব করে তখন তাঁর কাছেও লোক পাঠিয়েছিল তারা। লোকে তাঁকে বলত অর্ধবঙ্গেশ্বরী। তাঁর বিধবা মেয়ে পরমাসুন্দরী তারাকে বড়নগরে গঙ্গার ঘাটে দেখেছিলেন সিরাজউদ্দৌলা, গঙ্গার উপর নৌকা থেকে। দেখে পাগল হয়েছিলেন পাবার জন্যে। রাণীভবানী মেয়েকে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে রক্ষা করেছিলেন তাকে। মীরজাফরেরা বিশ্বাস করেছিল, রাণী নিশ্চয় ষড়যন্ত্রে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়ে সাহায্য করবেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি। তিনি যে কথাটা বলেছিলেন বাংলাদেশে সেটা প্রবাদবাক্য হয়ে গেছে।

আজও লোকে বলে—খাল খেটে কুমীর এনো না। রাণীভবানীর পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণ রায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে কালীসাধনা করতেন। আজও বড়নগরে সে পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। রাণী বাংলাদেশে নাকি এক লক্ষ কালী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—গ্রামে নগরে, তার জন্য নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন। সে পূজা সে নিষ্করের উপর আজও চলে। রামকৃষ্ণ রায়, মহারাজা রামকৃষ্ণ রায়, সুলতা, যেখানে শবাসনে বসতেন তার সামনেই আজও আছে গোপাল মন্দির। রাণীভবানীর কন্যা তারা দেবীর প্রতিষ্ঠিত গোপাল। সেকালের বাংলাদেশে শক্তিমন্দিরের পাশে সব বাড়ীতেই নারায়ণ সেবা যুগলবিগ্রহ সেবা আছে। সুতরাং গুরুগিরি যাদের পেশা তাদের ঘরে পূজার এ বিচিত্র প্রথা থাকবে, তাতে আশ্চর্য কি সুলতা!

সুলতা হাতের চায়ের কাপটা ট্রের উপর নামিয়ে দিয়ে বললে—পড়েছি কিছু কিছু। শুনেছিও। কিন্তু এমন অর্থহীন ব্যাপার—যার মাথামুণ্ড নেই, এটা জানতাম না।

সুরেশ্বর হেসে বললে—মাথা থেকে হাত, পা, আঙুল—সবই তাঁরা হয়তো বেঁচে থাকলে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সে আমি পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, এর ভিতর থেকেও শুদ্ধাচারী পরিচ্ছন্ন মানুষের অভাব ছিল না। আজও তাকিয়ে দেখ সুলতা, দুনিয়ার দিকে, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র পাশাপাশি বাস করছে, এ বলছে ওর মধ্যে নোংরামি বেশী, এ বলছি ওর ভিতরের কদর্যতার মত কদর্যতা আর হয় না—নেই। ও ঝগড়া থাক। আমি বলছে সেকালের মানে ১৮১৫ সালের কথা। সেই কথাই বলি।

১৮১৫।১৬ সালে এরপর শ্যামাকান্ত একদিন নিরুদ্দেশ হলেন—স্ত্রী শিশুপুত্র সব ফেলে।

এঁরা ভেবেছিলেন—গেছে, আবার ফিরবে দু'তিন মাস পর। শ্যামাকান্ত যেতেন তো মধ্যে মধ্যে গান শোনাতে। কিন্তু না। ফিরলেন না!

শ্যামাকান্ত বেরিয়েছিলেন পূর্ণ সন্ন্যাস নিয়ে। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়েছিলেন—সিদ্ধি তাঁকে পেতেই হবে।

সন্ন্যাসের নিয়ম হল—সব ত্যাগ করতে হয়—নাম পরিচয় জাতি বর্ণ—ব্রাহ্মণ হলে উপবীত এবং বলতে হয়, ইহলোক এমন কি পরলোক পর্যন্ত ত্যাগ ক'রে তবে সন্ন্যাস নিতে হয়। কিন্তু শ্যামাকান্ত তার তানপুরার মমতাটি ছাড়তে পারেন নি, সেটিকে ঘাড়ে ক'রে বেরিয়েছিলেন।

* * *

এসে উঠেছিলেন কালীঘাটে। মহাপীঠ—কালীতীর্থ কালীঘাট। পাশে কেওড়াতলার মহাশ্মশান; সেখানে সাধনা করবেন, শব-সাধনা। কালীঘাটে এসে দিনকয়েকের মধ্যে তাঁর খাতির জমে উঠেছিল—সন্ন্যাসী হিসেবে নয়, গায়ক হিসেবে। কেওড়াতলার শ্মশান তখন সত্যই মশাশ্মশান। ১৮১৬ সাল। তখন সুন্দরবনের আভাস কলকাতার ময়দান থেকেই শুরু। মধ্যে মধ্যে বাঘের উপদ্রব হয় আশেপাশে। মধ্যে মধ্যে ডাক শোনা যায় রাত্রে। তারই মধ্যে নিশাচরের মত ঘুরে বেড়াতেন। রাত্রে জপ করতেন। শবের সন্ধান করতেন। একদিন পেলেন এক শব। জোয়ারে গঙ্গার জলে ভেসে যাচ্ছিল। শ্যামাকান্ত স্নান করছিলেন। দেখতে পেলেন জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে একরাশি কালো চুল আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে উঠছে একটি যুবতী নারীদেহ। তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়ে ধরলেন সেই দেহ। এবং তুলে নিয়ে এলেন। তখন শীতকাল। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানের জন্য সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড় জমেছে। তিনি সেই দেহ টেনে এনে লুকিয়ে রাখলেন সযত্নে। তিথিও নাকি অভীষ্ট তিথি ছিল। সেই রাত্রে তিনি, শ্মশানের নিবিড়তম অভ্যন্তরে তাঁর যে আসন ছিল, সেইখানে শবাসনে বসেছিলেন। কিন্তু সিদ্ধি তাঁর হয়নি। হয়েছিল উল্টো।

সঠিক কি ঘটেছিল তিনি জানেন। তবে লোকে বলত—তাঁকে আসন—ওই শবের বুক থেকে মহাশক্তি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন গঙ্গার কিনারায়। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন সমস্ত রাত্রি। তন্ত্রসাধনায় এই ধরনের ঘটনার কথা অজস্র শোনা যায়; তুমি শুনেছ কিনা জানি না। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ রায় সম্পর্কে এমনি গল্প আছে। তিনি শবাসনে বসে যখন ধ্যান করছেন, তখন নাকি মা রাণীভবানীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে দেখেছিলেন—তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাস্তি দিতে আসছেন। অথচ রাণীভবানী তখন ঘরে নিদ্রামগ্ন। রাজা রামকৃষ্ণ এই মায়াময়ী রাণীভবানীর ভয়ে আসন ছেড়ে উঠে পালাতে গিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এমনি কিছু ঘটেছিল শ্যামাকান্তের। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। পরদিন সকালে তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন আর এক সন্ন্যাসী। উত্তর প্রদেশের বৈষ্ণব সাধু। শুনেছি নাকি শবাসনের শবটি তখন ছিল না। ছিল একটা কঙ্কাল আর একরাশ চুল।

ওই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর যত্নেই শ্যামাকান্ত বেঁচেছিলেন। সুস্থ হতে কিছুদিন লেগেছিল।

শ্যামাকান্ত মৃত্যুকালে বলেছিলেন—ওঃ—তার সঙ্গে যদি দেখা না হত! ওই তার ছবি সুলতা। ওই দেখ মৃত্যুশয্যায় শ্যামাকান্ত! মুখের রেখায় রেখায় আলোর ছটা পড়েছে। এ পাশে বীরেশ্বর রায়, ওপাশে ভবানী দেবী, পায়ের তলায় বিমলাকান্ত।

—তিনি মারা গিয়েছিলেন যে বছর বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীকে ফিরে পান সেই বছর—১৮৬০ সালে। এখানকার লোকে জানত তিনি মারা গিয়েছিলেন চল্লিশ বছর আগে এই কীর্তিহাটেই কাঁসাইয়ের জলে ডুবে। কিন্তু না। তিনি জলে ভেসে গিয়ে কাঁসাইয়ের একটা বাঁকে গিয়ে চড়ায় উঠেছিলেন। চল্লিশ বছর পরে হতভাগ্য শ্যামাকান্ত মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন পূর্বে সুস্থ হয়েছিলেন। তাঁর সেই উন্মাদরোগ বল উন্মাদরোগ, অথবা মহাশক্তির নিষ্ঠুর প্রহার বল নিষ্ঠুর প্রহার থেকে মুক্তি পেয়ে বীরেশ্বর রায়কে পত্র লিখেছিলেন সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। সে পত্রে তিনি তাঁর জীবনের বিচিত্র ঘটনাগুলি অকপটে খুলে লিখে অনুরোধ করেছিলেন—"একবার তোমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি। তুমি আমার জামাতা—আমার যে পরম পুণ্যফলকে, মহামায়ার প্রসাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা তুমি উদ্ধার করিয়াছ। আমি যাহা বলিতে চাহিয়াও বলিতে পারি নাই, মহাকোপে কুপিতা শক্তি যাহার জন্য আমার কণ্ঠরোধ করিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, সেই কথা তুমিই আমাকে বলাইয়াছ। তাহা অবশ্য স্পষ্ট হয় নাই। পরে মহাসিদ্ধ সাধকের কৃপায় তাহা আমি বলিয়া আজ সুস্থ হইয়াছি। আজ আমি জাতিভ্রষ্ট, সাধনাভ্রষ্ট, আমি ঘৃণিত—হয়তো মৃত্যুতে অনন্ত নরক। এ সময়ে তোমার একবার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি।"

বীরেশ্বর রায় গিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে শান্তিতে মরেছিলেন শ্যামাকান্ত।

তাঁর সে পত্র আমি পেয়েছি। আমার কাছে আছে। এইখানেই আছে। আরও একখানি পত্র; সে পত্র লিখেছিলেন—কীর্তিহাটের কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের কুলগুরুর বংশধর, সোমেশ্বর রায়ের কুলপুরোহিত কালীমায়ের সেবক, সোমেশ্বর রায়ের দেবোত্তরের অন্যতম ট্রাস্টি রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন। তিনি পদত্যাগ করবার জন্য বীরেশ্বর রায়কে পত্র লিখেছিলেন। সব কথা তিনি মুখে মুখে বলতে পারেন নি—বীরেশ্বর রায়কে পত্র লিখে জানিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর রায় তখন কীর্তিহাটে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। এসেছেন ওই মিউটিনির সময়। ১৮৫৭ সালের জুন মাসে কলকাতার অবস্থা দেখে চলে এসেছেন। মেটিয়াবুরুজে বন্দী অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে যেদিন ফোর্ট উইলিয়মে নিয়ে গিয়ে আটক করে ইংরেজ কর্নেল, সেদিন ওয়াজিদ আলি শা কেঁদেছিলেন। সেই দৃশ্য দেখার পর বেদনায়

হোক, ভয়ে হোক, হয়তো বা দুয়ের জন্যই কীর্তিহাটে ফিরে এসে বিষয় নিয়ে প্রমত্ত হয়েছিলেন।

ডিসেম্বর মাসে একবার কলকাতায় গিয়েছিলেন, একটা সই দেবার জন্যে। রাইট অনারেবল চার্লস জন ভাইকাউণ্ট ক্যানিং-এর কাছে বাঙালী মহারাজা রাজা এবং জমিদারের পক্ষ থেকে, বিদ্রোহী সিপাহীদের হাত থেকে দিল্লী উদ্ধার করার পর, অভিনন্দন এবং আনুগত্য জানিয়ে যে Address দেওয়া হয়েছিল, তাতে সই করতে গিয়েছিলেন।

My Lord—We the Rajas, Zeminders, Talookdars, Merchants and other Natives of the Province of Bengal, take the earliest opportunity, on retaking Delhi, to offer your Lordship in Council our warmest congratulations on the signal success which has attended the British arms, under the circumstances unparalled in the annals of British India—

এ দরখাস্তে প্রথম সই ছিল—মহারাজাধিরাজ মহাতাব চান্দ বাহাদুর বর্ধমানাধিপতির। দ্বিতীয় সই ছিল রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের। বীরেশ্বর রায়ের সই তার বেশী নিচে ছিল না। আড়াই হাজার সই ছিল এ দরখাস্তে।

সই যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রাচীন আমলের জমিদার রাজা যাঁরা তাঁরা অনেকে মনের ভাব চেপে দরখাস্ত করেছিলেন হয়তো, কিন্তু বীরেশ্বর রায় মনোভাব চাপেন নি; কুড়ারাম রায় কোম্পানীর কর্মচারী থেকে জমিদার। তাঁর সই অকপট। তাঁর পরিচয় চিঠিপত্রে আছে। এরপর নিশ্চিন্ত হয়ে ইংরেজের ছায়াপত্রতলে থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি আপন পরিকল্পনা মত দেশের উন্নতি, তাঁর জমিদারীর উন্নতি করতে আরম্ভ করেছিলেন। দুষ্টকে দমন—শিষ্টকে পালন ক'রে আদর্শ জমিদার হতে চেয়েছিলেন।

স্কুলের পত্তন হয়েছিল। কাঁসাইয়ের ধার বরাবর বন্যারোধী বাঁধের ভাঙনগুলিকে সংস্কার করিয়েছিলেন। গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত করিয়েছিলেন।

ওদিকে শুরু হয়েছিল নূতন পত্তনী নেওয়া মহলগুলিতে নূতন বন্দোবস্ত। খাজনাবৃদ্ধি, পতিত আবাদ, সেচের জন্য বাঁধ তৈরী, পুকুর কাটাই। ভাদ্র-আশ্বিনে গরীব প্রজাদের ধান চাল সাহায্য। এবং তার সঙ্গে বিচার।

তার সঙ্গে গিরীন্দ্র আচার্যের অধীনে একটি বড়রকমের মামলা সেরেস্তা খুলেছিলেন। প্রথম মামলা দায়ের হয়েছিল গোপাল সিংহের নামে। একসঙ্গে আঠারটি মকদ্দমা। গোটা জমিদারীতে প্রথম বছরেই দেওয়ানী ফৌজদারীতে চারশো মামলা দায়ের হয়েছিল মেদিনীপুর আদালতে।

দ্বিতীয় বছরে মামলার সংখ্যা বাড়ল। এবার মামলা বাধল শ্যামনগরে। শ্যামনগর বীরেশ্বর রায় পত্তনী নিলেন—ওই দে সরকারদের কাছ থেকে। শ্যামনগরের প্রজাদের মুখপাত্র দাঁড়ালেন—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।

কমলাকান্ত তখনও রত্নেশ্বর রায় নন, তখনও তাঁর পরিচয়—তিনি বীরেশ্বর রায়ের ভাগ্নে। কমলাকান্তের পিছনের প্রজার দলের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন—ঠাকুরদাস পাল।

সুরেশ্বর উঠে গিয়ে ওদিকের টেবিল থেকে একটা কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে এসে বসল। বললে—লাট যুগলপুরের পত্তনী পাট্টার দলিলখানা আর ওই বিষয়ের চিঠিপত্রে বিচিত্র কথা আছে। শোনাব তোমাকে। ১৮৫৯ সাল। বাংলাদেশে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন

নিভেছে। কোম্পানীর হাত থেকে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর এম্পায়ার অথবা খাস্‌মহল হয়েছে। 'বৃটিশ এম্পায়ার এস্টাবলিশড বাই ল' এই তার বয়ান। জমিদারেরা পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আইনবলে জমিদারির ঊর্ধ্ব-অর্ধের মালিক। কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরীর ইংলণ্ডজাত প্রজাদের রাইট কালাআদমীর চেয়ে অনেক বেশী। তারা তখন এদেশে ব্যবসা খুলে বসেছে একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত। সে সময় নীলের কুঠীর সাহেবদের দাপট উঠল চরমে। নীলবিদ্রোহ বাঙলার ইতিহাসের একটা অধ্যায়। এখান থেকেই নতুন যুগের আন্দোলনের শুরু।

জন রবিনসন বীরেশ্বর রায়ের বন্ধু ছিল। ছেলেবেলায় সে এই সময় শ্যামনগরে কুঠীর পত্তন করেছিল। শ্যামনগরের জমিদার দে-সরকারেরা জন সাহেবের কুঠীতে টাকা লগ্নী করে রবিনসন সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। দে-সরকাররা যুগলপুরের ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, কায়স্থ প্রজাদের বিদ্রোহের জন্য করেছিলেন এটা। ব্রাহ্মণ প্রজা বড় খারাপ সুলতা, তার মানে ইণ্টেলেকচুয়েল বলতে পার।

দে-সরকারদের কর্তা ছিলেন প্রথমে মহাজন, চড়া সুদে টাকা ধার দিতেন। লাট যুগল-পুর—খানচারেক মৌজা, তার অন্তর্গত শ্যামনগর-রাধানগর; এই দুখানি গ্রামই বড়। রাধা ও শ্যাম নামাঙ্কিত দুখানি তৌজির জন্যই নাম যুগলপুর। এ ছাড়া দুটি চক—দুখানি। একখানিতে ষোল আনা মুসলমানের বসতি, নাম চক ঠাকুরপাড়া। অন্যখানির নাম চক পাকপাড়া বা পাইকপাড়া, এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে মুসলমান, বাগ্দী, বীরবংশী ও বাউড়ীদের মিলিয়ে বাস। লাট যুগলপুরের ইতিহাস একটু বিচিত্র। সে ইতিহাস না বললে সবটা পরিষ্কার হবে না। একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের গ্রাম ঠাকুরপাড়ার মিঞারাই এখানকার তালুকদার ছিলেন। ঠাকুরপাড়ার মিঞারা মুসলমান হলেও উপাধি ছিল ঠাকুর। তার কারণ, বীরেশ্বর রায়ের আমলের একশো বছর পূর্বেও এই ঠাকুরেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। প্রসিদ্ধ যোগীর বংশ ছিল ঠাকুর বংশ। যোগযাগ অনেক কিছু ছিল এই বংশে। মাননীয় ব্রাহ্মণ বংশ।

সতেরশো একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ সালে বর্গীরা যখন বাংলাদেশে প্রথম পঙ্গপালের মত এল, যখন কুড়ারাম ভটচাজ দশ-এগার বছরের ছেলে, মায়ের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে পথে পালিয়েছিলেন, সেই সময় এই ঠাকুর বংশের প্রধানজন ত্রিভুবন ঠাকুর নসীব গুণে ঠিক ঠিক বলে দিয়েছিলেন; বলে দিয়েছিলেন, পথে এই বিপদ হবে, বিপদ থেকে নবাব রক্ষা পাবেন এবং শেষ পর্যন্ত জিতবেন। ভাস্কর পণ্ডিত আর ফিরবে না, এ কথাটি পর্যন্ত ছিল তার ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে। সমস্ত অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলে নবাব সন্তুষ্ট হয়ে এই লাট যুগলপুর তাঁকে দিয়েছিলেন সামান্য একশো তঙ্কা রাজস্বের বিনিময়ে। এবং নিজের গায়ের বহুমূল্য শাল খুলে তাঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই শাল গায়ে দিয়ে গ্রামে ফিরলে বংশের নবীনেরা কথাটা গৌরব করে বলে বেড়িয়েছিলেন। তখন ত্রিভুবন ঠাকুর শুধু ঠাকুর, লাট যুগলপুরের জমিদার। কিন্তু যুগলপুরের যশমানধারী ব্রাহ্মণেরা এ অনাচার সইতে* পারেন নি। তাঁরা বলেছিলেন—নবাবের গায়ের শাল, ও শাল গায়ে তিনি মুসলমানী খাদ্য খেয়েছেন, হাত না ধুয়ে রুমালে হাত মুছে সেই হাত ওই শালে ঠেকিয়েছেন। ত্রিভুবন ঠাকুর যখন সেই শাল গায়ে দিয়েছেন, তখন তাঁর হাত শালে ঠেকেছে, সেই হাত মুখে ঠেকেছে, সুতরাং তাঁর জাত গেছে। কলমা না পড়েও তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন।

ত্রিভুবন ঠাকুরদের যোগসিদ্ধির জন্য খাতির ছিল অসাধারণ। শ্যামনগরের ব্রাহ্মণদের রাগ ছিল তাঁদের উপর, রাধানগরের কায়স্থদেরও রাগ ছিল—তার কারণ ঠাকুরেরা কায়স্থদের শূদ্র

বলে তাঁদের কোন দান নিতেন না তাঁদের মন্ত্র দিতেন না। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণদেরও পূজনীয়। তাঁদের প্রতি এঁদের অবজ্ঞাও ছিল। সুতরাং এই নবাবী শাল দান নেওয়ার ত্রুটির সুযোগ তাঁরা ছাড়লেন না। তাঁরা ব্রাহ্মণ সমাজের পঞ্চজন এবং রাধানগরের কায়স্থ সমাজ তাঁকে পতিত করে প্রতিশোধ নিলেন। ত্রিভুবন ঠাকুর কিন্তু টললেন না। বললেন—যিনি দেশের অধিপতি, তিনি জাতির উর্ধ্বে। শাস্ত্রে বলে, 'সর্বদেবোময়ো রাজা, তিনি তাঁর গলা থেকে মুক্তার মালা কি স্বর্ণহার খুলে দিলে তা গ্রহণ করতে আছে, আর শাল গ্রহণেই দোষ ?

এ পক্ষ বলেছিল—স্বর্ণ রৌপ্য মণিমুক্তা কখনও অশুদ্ধ হয় না। উচ্ছিষ্ট স্পর্শেও না। শাস্ত্রে আছে, বিষ্ঠাতে স্বর্ণ খণ্ড পড়ে থাকলে তাকে লক্ষ্মীর প্রসাদ বলে তুলে নিতে হয়। ধুলে শুদ্ধ। শাল বস্ত্র সে পশম রেশম—কার্পাস যাই হোক।

ত্রিভুবন ঠাকুর প্রশ্ন করেছিলেন—পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের পিতামহ জনার্দন ভট্টাচার্যকে। জনার্দন ভট্টাচার্য বন্ধু ছিলেন তাঁর। গোপনে সাধন-ভজনের তত্ত্ব আলোচনা করতেন তাঁরা।

জনার্দন ভট্টাচার্য চুপ করেই ছিলেন। তাঁর অন্তরের কথা তিনিই জানেন, তবে স্বপক্ষে-বিপক্ষে কোন কথাই বলেন নি।

ত্রিভুবন ঠাকুর প্রশ্ন করেছিলেন—জনার্দন, তুমি কি বল ? তোমার মত ?

জনার্দন বলেছিলেন—আমি তো দেশের বাইরে নয় ত্রিভুবন। কি বলব ?

ত্রিভুবন আর কোন কথা বলেন নি। চলে এসেছিলেন নিজের ঠাকুরপাড়ায়। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই মেদিনীপুরের ফৌজদারকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন; মেদিনীপুর থেকে মোল্লা মৌলভী এবং কিছু সিপাহী আনিয়ে বাড়ীতেই কলমা পড়েছিলেন।

তার আগে বাড়ীর বিগ্রহ এবং শিলা যা ছিল সব বিসর্জন দিয়েছিলেন গঙ্গার গর্ভে। ভেঙে অঙ্গহীন করতে বোধহয় পেরে ওঠেন নি। এবং ঠাকুরপাড়ার জ্ঞাতিবর্গ যারা তাদের বলেছিলেন—যারা কলমা পড়তে রাজী আছে তারা থাক এ পাড়ায়। যারা রাজী নও, তারা অন্ততঃ এ পাড়া ছেড়ে অন্যত্র যাও। শ্যামনগর-রাধানগর যদি যাও তবে ভূমি আমি নিষ্কর দেব। কিন্তু এ পাড়ায় বাস, সে তোমাদেরও সুবিধে হবে না। আমারও না। যারা কলমা পড়বে, আমার সঙ্গে থাকবে, তাদের আমি প্রত্যেককে কুড়ি বিঘা নানকার দেব। তাদের ছেলে-পুলেদের নবাব সরকারে চাকরির ব্যবস্থা করে দেব। তোমরা বুঝে দেখ। তবে এটা মনে রেখো, পতিত তোমরাও আমার সঙ্গে হয়েছ। নবাব দরবার থেকে ফিরে এসেই তোমাদের সকলের বাড়ীতে আমি মুরশিদাবাদের মিষ্টান্ন পাঠিয়েছি। তোমরা খেয়েছ।

কেবল দু' ঘর ছাড়া সকলে ত্রিভুবন ঠাকুরের সঙ্গেই থেকেছিল, তাঁকে ছাড়তে তারা চায়নি। দু' ঘর চলে গিয়েছিল স্থানান্তরে। শ্যামনগর-রাধানগরেও তারা থাকে নি।

ত্রিভুবন ঠাকুর কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে নাম নিয়েছিলেন মহম্মদ আবুসবের খাঁ। কিন্তু খাঁ উপাধি তাঁর কায়েম হয় নি, লোকে তাঁকে ঠাকুরই বলত। আবু ঠাকুর।

আবু ঠাকুর মসজিদ করেছিলেন মন্দির ভেঙে। মুরশিদাবাদ থেকে কারিগর রাজমিস্ত্রী এসেছিল। স্বয়ং নবাব পাঠিয়েছিলেন। মসজিদের পর হয়েছিল তাঁর পাকা দালানবাড়ী। ঠাকুর সাহেবের হাবেলী। হাতী কিনেছিলেন, ঘোড়া কিনেছিলেন। আর ওই ছিটমহল ঠাকুরপাড়ার একটু দূরে ওরই ভিতরে মুসলমান এবং ডোম বাগদী পাইকদের এনে বাস করিয়েছিলেন। নাম দিয়েছিলেন চক পাইকপাড়া।

ঠাকুর মিয়া কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন, দেব-বিগ্রহ গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজীবী থেকে জমিদার হয়েছিলেন। কিন্তু যে বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, যোগবিদ্যা আর অদৃষ্ট গণনাবিদ্যা সে তাঁর কোথায় যাবে। তা যায়ও নি এবং তিনি তাঁর চর্চাও ছাড়েন নি। আরও একটি নিয়ম তিনি করেছিলেন—কোরবানীতে তিনি দুম্বা খাসী ছাড়া গরু কোরবানী করেন নি।

তিন পুরুষ পর্যন্ত ঠাকুরবংশ অপ্রতিহত প্রতাপে জমিদারী করেছিলেন, মীরকাশেম আলি খাঁর সময় পর্যন্ত।

শ্যামনগর-রাধানগরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদগোপদের সঙ্গে ঠাকুরবংশের লড়াই চলেছে বিচিত্র পথে। ঠাকুর মিয়া বা আবু ঠাকুর তাদের উপর জমিদারী করে গেছেন সেলাম নিয়ে, খাজনা নিয়ে। বাস আর কিছু না। শুধু সেলাম আর টাকা। কারুর ধর্মে তিনি হাত দেন নি। কারুর কন্যাকে বংশের কারুর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে জেদ করেন নি। বিয়ে-সাদী ঠাকুর-পাড়ার জ্ঞাতিদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। আর বিয়ে-সাদী যা দিয়েছেন তা বেছে বেছে হাজী, যাঁরা হজ্জ করে এসেছেন, তাঁদের বাড়ীতে। একটি পরিবার। ত্রিভুবন ঠাকুরের দুই বিবাহ, তাতে পুত্র তিনটি, কন্যা তিনটি, জ্ঞাতি দশ-বারো ঘর, সুতরাং বিয়ে-সাদীর জন্যে বাইরে যেতে হয় নি।

আবু ঠাকুর সকালে দলিজায় বসতেন, জমিদারী করতেন, নালিশ শুনতেন, বিচার করতেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ যারা আসত, তাদের জন্যে আলাদা ফরাস থাকত এবং তা থাকত তাঁর বা ঠাকুর মিয়াদের আসন থেকে নিচে। এসে সেলাম দিতে হত, যাবার সময় সেলাম দিয়ে যেতে হত। জরিমানা করতেন, সে জরিমানার মাফ ছিল না। শ্যামনগর-রাধানগরে খাজনা বাড়িয়েছিলেন, বিঘাপ্রতি দেড় টাকা হতে দু টাকা আড়াই টাকায়। লাট যুগলপুরের দুই তৌজি শ্যামনগর-রাধানগরের বাৎসরিক ডৌল জমা ছিল পাঁচ হাজার টাকা, তিনি তাকে বাড়িয়ে করেছিলেন, সাড়ে সাত হাজার। খাজনা এক পয়সা বাকী থাকত না। তিনি নায়েব-গোমস্তা রেখে-ছিলেন ওই রাধানগরের কায়স্থদের। ওদেরই মধ্যে কয়েকজনকে মহাজনীতে সাহায্য করে প্রজার কাছে খাজনা আদায় করতেন। টাকাও তিনি তাদের দিতেন বিনা সুদে। তারা প্রজার খাজনা আদায়ের সময় কাছারীতে প্রজার হয়ে খাজনার টাকা সেরেস্তায় দিত এবং সুদসুদ্ধ আদায় করত। তিনি মুসলমান, তিনি সুদ নিতেন না। মোট কথা তিনি বিচিত্র উপায়ে দুই তৌজির হিন্দু প্রজাদের জব্দ করেছিলেন নিঃস্ব করে। ব্রাহ্মণেরা কেউ সংস্কৃতে তাঁর স্তব করে সংস্কৃতে শ্লোক তৈরী করলে, শ্লোকপিছু পাঁচ টাকা ইনাম দিতেন। এবং দরকার মত সংশোধন করে দিতেন।

কিন্তু শ্যামনগরের কোন ব্রাহ্মণ তাঁর স্তব রচনা করে নি।

তাঁর অন্তে তাঁর ছেলে গুলমহম্মদ ঠাকুর নাকি সিদ্ধযোগী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। হজ্জ করে এসেছিলেন তিনি। তিনিও যোগ করতেন। এমন বাকসিদ্ধ ছিলেন যে যা বলতেন তাই ঘটত।

তৃতীয় পুরুষে এই যুগলপুর নিয়ে গোলমাল লাগল কোম্পানীর সঙ্গে। তৃতীয় পুরুষে তখন তিন ছেলে, দুই মেয়ে, এক ছেলে ভোগী, এক ছেলে পূর্বপুরুষের মত যোগী, ছোট ছেলে নবাবী পল্টনে ঢুকেছিল; পলাশীর যুদ্ধে নবাবের হয়ে লড়তে গিয়ে মরেছিল। বড়জন ভোগ-বিলাসের জন্য প্রথম গিয়ে বাস করেছিলেন মুরশিদাবাদে। তারপর গিয়েছিলেন নবাব কাসেম আলী খাঁর সঙ্গে মুঙ্গের। সেখানেই থেকে গেছেন। ফেরেন নি। সম্পত্তি নিয়ে

আছেন যিনি, যোগী এবং জমিদার, তিনি মেঝ্‌লা ঠাকুর মিয়া। এদিকে সরকার তখন কোম্পানীর হাতে গিয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যুগলপুর লাটের তালুকদারের উপর নোটিশ জারী করলেন—কোম্পানীর নতুন আইন অনুযায়ী তোমার জমিদারী তুমি নতুন করে বন্দোবস্ত নাও। শুধু নতুন করেই নয়, নতুন নিয়মে বৎসর বৎসর ডাক অনুযায়ী বন্দোবস্ত নিতে হবে তোমাকে।

মেঝ্‌লা ঠাকুর মিয়া নোটিশ ফেলে দিয়ে বললেন—ফিরিঙ্গী লোক বলে কি? আরে ঠাকুরবংশের জমিদারী ফরমান খুদ আলীবর্দী খাঁ বাহাদুরের। তাকে নাকচ করবে কে? বলে দিলেন—এ কভি না হো সকতা হ্যায়। দিল্লগী হ্যায় ইয়ে!

মেঝ্‌লা ঠাকুর মিয়া একদিকে আমীর, অন্যদিকে ফকীর, লোকে জানত তাঁদের বংশের গুপ্তবিদ্যা হঠযোগ, যার চর্চা করে বাপ গুলমহম্মদ নানান বিচিত্র কাজ করতেন, বাকসিদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তিনি বাপের কাছ থেকে নিয়ে তার চর্চা করেন। কোন নেশা করেন না, অথচ সর্বদাই ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে থাকেন। শখ ছিল শুধু পান খাওয়ার। মুক্তার চুন দিয়ে পান খেতেন, তার সঙ্গে এমন মশলা থাকত যা খেয়ে শীতের দিনেও মলমলের পাঞ্জাবি পরে ঘামতেন। নোকরকে পাখার হাওয়া দিতে হত। ভাষা ছিল মিষ্ট। কিন্তু এতটুকু অমর্যাদা বোধ করলে সাপের মত মুহূর্তে ফোঁস করে ফণা তুলতেন। যুগলপুরের ব্রাহ্মণদের উপর রাগ তাঁরও ছিল।

সেই ত্রিভুবন ঠাকুর বা আবু ঠাকুরের প্রাপ্য সেলামী—সেলাম আদায় করতে নিত্য একবার হাতী চড়ে গ্রামে ঘুরতেন।

শখ ছিল গান-বাজনায়। কিন্তু মেয়েদের গলায় ঠুংরী-টপ্পায় রুচি ছিল না, রুচি ছিল ধ্রুপদে। খেয়ালও ভালবাসতেন। নিজে ছিলেন বড় পাখোয়াজী।

কোম্পানীর সঙ্গে এই নিয়ে তিনি লড়াই করেছিলেন সাত-আট বছর। ঠিক এমনি মামলা তখন কাশীজোড়ার রাজার সঙ্গে হয়ে গেছে কোম্পানীর। কোম্পানী সুপ্রীম কোর্টে হেরেছিল। কিন্তু হেস্টিংস সাহেব ছিল ধুরন্ধর লোক। সে ইম্পে সাহেবকে ঘুষ দিয়ে ইজ্জত রক্ষা করেছিল। এরপর আইনও পাস করেছিল, জমিদারী কেড়ে নিয়ে বন্দোবস্তের জন্যে।

কুড়ারাম রায় ভটচাজ তখন গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে বাংলার জমিদারী নাটকের প্রথম অঙ্কে একটি পার্শ্বচরিত্র। কিন্তু তাঁর হাত অনেক। কুড়ারাম রায়ের ব্যবস্থায় জমিদারী বেঁচে গিয়েছিল ঠাকুরদের। কিন্তু আদায় কোম্পানীর খাসে চলে গিয়েছিল। আদায় করে রেভেন্যু কেটে নিয়ে বাকী টাকা আসত মেঝ্‌লা ঠাকুরের হাতে। কোম্পানী পাঠাতেন।

একশো টাকা রেভেন্যু তখন সাড়ে সাতশো টাকা, আর সরঞ্জামী আদায় খরচ শতকরা পাঁচ টাকা বাদ যেত। ঠাকুর মিয়ার নায়েব ছিল রাধানগরের মাধব দে-সরকার। মাধব দে-সরকার ঠাকুর মিয়াদেরই অনুগৃহীত মহাজন হিসেবে কাজ করত। ঠাকুর তালুকদারীর সব তার নখদর্পণে। এবং তার টাকাও ছিল। কোম্পানীর টাকা যুগিয়ে সে ঠাকুরের টাকা যুগিয়ে যেত।

গোল বাধল ১৭৯৩ সালে। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময়। কোম্পানী যখন দশশালা বন্দোবস্তের জন্য জরীপ করে আদায়ের উপর শতকরা নব্বুই টাকা জমা ধার্য করবেন বলে জমিদারদের উপর ফতোয়া ফরমান জারী করলেন, তখন ঠাকুর বললেন—তোবা তোবা। এ কি বাত! এ হয় না হতে পারে? নবাবী পাঞ্জা শীলমোহর দস্তখত দেওয়া বন্দোবস্তী বাতিল? নয়া বন্দোবস্ত নিতে হবে ফিরিঙ্গী বানিয়ার কাছে? হায় আল্লা রসুল! হায় পয়গম্বর! নেহি, এ কভি না হো সকতা হ্যায়। এ কাম যদি আমি করি তবে সে হবে গুনাহগারি! জমিদারী

যানে দেও। ঠাকুরবংশ একসঙ্গে জমিদার বটে, আবার ফকীরও বটে। যোগীর বংশ।

কেউ রাজী করাতে পারে নি। বাড়ীতে মেয়েরা কেঁদেছিল। ঠাকুরপাড়ার জ্ঞাতিরা দরবার করেছিল, কিন্তু মেঝ্‌লা ঠাকুর নড়েন নি।

তাঁর এক-কথা—এ কভি না হো সকৃতা হ্যায়।

বাদশা দেওয়ানী দিলে ফিরিঙ্গী কোম্পানীকে। আমি সরকারী খাজনা তাদের দিয়েছি—সেখানে পাঠাবে বলে। তা ব'লে নবাব আলিবর্দীর পাঞ্জা মোহর দস্তখতী ফরমান নাকচ করে নয়া বন্দোবস্তী? তা হলে তো তাকেই মালেক-ই-মুল্ক বলে মেনে নেওয়া হল। কভি না। নবাবের নিমক খেয়ে, হিন্দু ছিলাম মুসলমান হয়েছি, এখন আবার তা না মেনে নিমক-হারাম হব? তা' হলে তো মুসলমান থেকে ফের কেরেস্তান হ'তে হয়। না—এ কভি না হো সকৃতা হ্যায়।

শুধু তাই বলেই ক্ষান্ত হন নি তিনি। তিনদিন পর ঠাকুরপাড়ায় ঘোষণা করেছিলেন—আর এখানে এই ঠাকুরপাড়ায় তিনি থাকবেনই না। যেখানে জমীনের মালেক হিসেবে সেলাম আদায় ক'রে আজ তিনপুরুষ কাটিয়ে এলেন, সেখানে খাজনা গেল গেল; সেলাম যেখানে যেতে বসেছে সেখানে আর তিনি থাকবেন না ঠাকুরপাড়ায়। কভি না। এ কভি না হো সকৃতা হ্যায়। চলো, ঠাকুরশরীফে গিয়ে বাস করব।

ঠাকুরশরীফ—কাকদ্বীপের কাছে একটা দ্বীপের মত জায়গা। বাকসিদ্ধ গুলমহম্মদ ঠাকুর নবাব মীরকাসেমের প্রথম আমলে নগদ টাকা সেলামী দিয়ে এই দ্বীপটি নানকার হিসেবে একরকম খরিদই করেছিলেন। তখনও মীরকাসেমের সঙ্গে কোম্পানীর ঝগড়া বাধে নি। সে ফরমানে নবাবী মোহরের সঙ্গে কোম্পানীর এক সাহেবের দস্তখৎ ছিল। কারণ নবাব মীরজাফর কোম্পানীর দেনা শুধতে মেদিনীপুর অঞ্চল কোম্পানীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে বন্দোবস্ত মত কোম্পানীর সইয়ের দরকার ছিল। তাতে আপত্তি দিতে কোম্পানীর এক্তিয়ার ছিল না। তিনি ফিরিঙ্গীকে খাজনা দিতে হবে যে মুলুকে সে মুলুকে বাস করবেন না। দ্বীপটায় কিছু প্রজা ছিল। হজরৎ গুলমহম্মদ ঠাকুরের সমাধি ছিল, আবাদী জমি ছিল। সে প্রায় পাঁচশো বিঘার উপর; সেখানে গিয়ে বাস করবেন তিনি।

তাই করেছিলেন তিনি। এখানকার পাকা ইমারৎ, পুকুর, বাগ-বাগিচা সব ফেলে চলে গিয়েছিলেন 'ঠাকুরশরীফে'।

সে চলে যাওয়ার কথা শ্যামনগরের লোকের মুখে আজও শুনতে পাওয়া যায় সুলতা!

সেদিন নাকি ঠাকুরপাড়ার বাকী লোকেরা পাকপাড়ার পাইকেরা এমন কি লাট যুগলপুরের ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সকলে পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে সেলাম দিয়েছিল আর কেঁদেছিল।

মাঝ্‌লা ঠাকুর হাতীর উপর চেপে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত এসেছিলেন। ছেলেরা এসেছিল ঘোড়ায়, বয়েল গাড়ীতে—মেয়েরা পালকিতে। জ্ঞাতিরাও কয়েক ঘর তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। তাদের পুরুষেরা হেঁটে আর মেয়েরা বয়েল গাড়ীতে। মাঝ্‌লা ঠাকুর হাতীর উপর বসে দু ধারে মুখ ফিরিয়ে সেলাম ফিরিয়ে দিতে দিতে গিয়েছিলেন—"সেলাম আলায়কুম, সেলাম আলায়কুম, সেলাম আলায়কুম!"

গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়েছিল মাধব দে-সরকারের সঙ্গে। দে-সরকার মেদিনীপুর থেকে ফিরছে—লাট যুগলপুরের তালুকদারী সে কোম্পানীর মেদিনীপুর কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের কাছ থেকে বন্দোবস্তের কাগজ নিয়ে ফিরছে। সেটা ১৭৯৪ সাল।

খবরটা সে নিজেই দিয়েছিল মাঝ্‌লা ঠাকুরকে। সেলাম করেই দিয়েছিল। মাঝ্‌লা ঠাকুর

একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—তা হ'লে এই বুড়ো হাতীটা তোকে দিয়ে গেলাম মাধব। নতুন জমিদার হলি—হাতীতে না চড়লে মানাবে না। তবে এটাকে যেন খেতে দিস। মরা হাতীর লাখ টাকা দামের লোভে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলিস না। তা হলে তোকে অভিসম্পাত লাগবে। বুঝলি! আমাদের বংশের সিদ্ধাই তো জানিস!

মাধব দে-সরকার বৈষ্ণব—ফোঁটা তিলক কাটত; গলায় কণ্ঠী পরত। সে খুশী হয়ে সেলাম করে বলেছিল—গোবিন্দর নামে দিব্যি করে বলছি ঠাকুরসাহেব। গলার কণ্ঠী ছুঁয়ে বলছি। দোব—দোব—দোব।

ওদিকে তখন গ্রামে সর্বরক্ষাপাড়ায় ঢাক বাজতে শুরু করেছে। বাজনা শুনে তাড়াতাড়ি নৌকোয় চড়ে ঠাকুরসাহেব বলেছিলেন—জলদি নাও খুলরে মাঝি—জলদি জলদি।

সেদিন ঠাকুর মিয়ারা ঠাকুরপাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলে শ্যামনগরের ব্রাহ্মণসজ্জনে ঢাক বাজিয়ে গ্রামদেবতা সর্বরক্ষের কাছে পূজো দিয়েছিল। তারা খুশী হয়েছিল—এবার মাধব সরকার ভক্ত বৈষ্ণবমানুষ জমিদার হল, এবার তাদের সুখের দিন এল। তারা এবার গুরুর মত থাকবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভুল ভাঙল।

দে-সরকারের গোমস্তা এল আদায় করতে, বসল চণ্ডীমণ্ডপে। থোকা কড়চা খুলে সকলকে খাজনার ফর্দ শোনালে। তিন বছরের খাজনা বাকী। রহমৎ ঠাকুরের সঙ্গে কোম্পানীর যে সময়টা ঝগড়া চলেছে সে সময় কোম্পানীর ঢোল দিয়ে গিয়েছে যে কোম্পানী খাস করলে লাট যুগলপুর। সেই সময় থেকে খাজনা প্রজাও দেয় নি, রহমত ঠাকুরও আদায় করেন নি। তিনিই বলেছিলেন, ঠিক বাত, ফয়সালা হোক। তারপর নেওয়া যাবে।

সেই খাজনার সঙ্গে সিকি সুদ চড়িয়ে খাজনা দাবী করলে দে-সরকারের গোমস্তা। ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদগোপ প্রজারা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—সুদ! সুদ কিসের?

—বাকী খাজনার।

—বাকী খাজনার সুদ? যা ঠাকুরেরা কখনও নেয় নি!

—ঠাকুরসাহেবরা মুসলমান—সুদ তাঁদের কাছে হারাম। শাস্ত্রে নিতে বারণ আছে। কিন্তু তাঁরা যে নানান আবওয়াব নিতেন গো। দে-সরকার কর্তা মহাজনী ক'রে সুদ নিয়ে সামান্য অবস্থা থেকে জমিদার। সুদ তিনি নেবেন। তাঁকে তো কোম্পানীকে তিন বছরের টাকা গুনতে হয়েছে। ঠাকুরসাহেবরা দিতেন বছরে একশো টাকা সরকারী খাজনা, দে-সরকার কর্তা দিয়েছেন বছরে সাতশো। সুদ না নিলে জমিদারী রাখবেন কি ক'রে? তাছাড়া বন্দোবস্ত তো এখন বছর বছর। তার মানে কোম্পানী তো বাড়িয়েই যাবে।

ব্রাহ্মণেরা চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—হুঁ। সুদ না দিলে?

হেসে গোমস্তা—ওলায়েত্ সিরজা—বলেছিল—তা আমি কি করি বলব? দে-সরকার বলবেন। কোম্পানীর হুকুম তো ঢালোয়া হুকুম। খাজনা আদায় জন্তি কি কাণ্ড ঘটতেছে বাংলাস্থানে ওকিব (ওয়াকিবহাল) আছেন তো! ধরি আন—বাঁধি রাখ, বুকে কাঠ চাপাও, ব্যাত চালাও, পিঠে ব্যাল কাঁটার ডাল দিয়া পিটো। খাজনা আদায় কর। রেজা খাঁর মতন জবরদস্ত আদমী গেল। এখনও স্তাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং মজুত। নতুন আইন করি দিছে। এখন জমিদার দে-সরকারের মরজি। শুনতেছি ইবার কোম্পানী আইন করতেছে, পাকা ধান মাঠে আটক দিয়া খাজনা আদায় করাবার আইন করবেন। বললাম তো, এ্যাখন প্রজার মতি আর জমিদারের তাগদ। তবে মরজি বলে একটা বাত্ আছে। এ্যাই তো আমাদের ঠাকুর-

সাহেবের দিল সায় দিলে না, মরজি উঠল না, ছেড়ে দিলে ঝুটা চীজের মতুন।

গোমস্তাটি পাকা গোমস্তা। দে-সরকার তাকে হিজলীর নবাববংশের যে ছিটেফোঁটা তখনও ছিল, তাদের সেরেস্তা থেকে এনে বহাল করেছিলেন। তাঁর সেরেস্তায় তিনি গ্রামের দু-চারজন জাতি-জ্ঞাতির মধ্য থেকে নিয়েছিলেন, তারা নিতান্তই ছিল নিরীহ আমলা, যে সেরেস্তা হাতের মুঠোর কাবেজে থাকে সেই সেরেস্তায় রেখেছিলেন। যেমন খাজাঞ্চি, হিসেবনবীশ, খাস জোত তদারকদার, গরুবাছুর তদারকদার—এইসব কাজ করত তারা। বাকী কাজ, যেখানে প্রজার সঙ্গে কারবার, নায়েব গোমস্তা এসব ছিল মুসলমান এবং অন্য জায়গার লোক—যাদের পক্ষে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা গ্রামের লোক বলে চক্ষুলজ্জার কোন কারণ নেই।

গোমস্তা ওয়ালেত্ মিরজার কথার জবাব ব্রাহ্মণেরা ঠিক খুঁজে পান নি। বাংলাদেশে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং, রেজা খাঁর খাজনা আদায়ের অত্যাচারের কথা তাঁদের অজানা ছিল না। তাঁরা সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন, ঠাকুর মিয়াদের তালুকদারীর মধ্যে তাঁরা কতটা সুখে এবং নিরাপদে ছিলেন। তবু তাঁরা হাল ছাড়েন নি। তাঁরা দল বেঁধে গিয়েছিলেন রাধানগর—দে-সরকারের বাড়ী। দে-সরকারের বাড়ী তখনও কাঁচা দেওয়ালের উপর খড়ের চালের বাড়ী। কেবল একতলা একটি দালানে রাধাগোবিন্দ, নিত্যানন্দ এবং জগন্নাথের সেবা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সামনে খড়ের আটচালা। আটচালার সামনে খড়েরই একখানা ওই আটচালার মতই সেরেস্তাখানা, তাও হালে তৈরী হয়েছে। সেইখানে তক্তাপোশে ফরাস করে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে কাছারী করেন। নিচে আটচালার মেঝের উপর তালপাতার চাটাই খেজুর চাটাই বিছানো। একদিকে আর দুখানা তক্তাপোশের উপর সতরঞ্চ বিছানো।

ব্রাহ্মণেরা যখন পৌঁছুলেন, তখন ওই সেরেস্তাখানা কাছারীর সামনে মাধব দে-সরকার বাঁ হাতে রূপো বাঁধানো হুঁকো ধরে তামাক খাচ্ছিলেন আর সামনে বাগিচার পত্তন করছিলেন—নারকেলের বাগান লাগাবেন। পরনে থান ধুতি; তখন বিলিতী রেলির কলের কাপড় আমদানি হয়েছে; পায়ে চটি; গায়ে একটা মেরজাই। কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি, তার সঙ্গে একটি সোনার সরু হার চিকচিক করছে।

ব্রাহ্মণদের দেখেই সমাদর ক'রে দে-সরকার আহ্বান করে বললেন—আসুন আসুন আসুন। পবিত্র হল আমার নতুন কাছারী। বলেই হুঁকো বাঁ হাতে ধরেই হেঁট হ'তে চেষ্টা ক'রে বললেন—ওঃ! কাতর আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। তারপর সেই স্বল্প একটু হেঁট অবস্থাতেই ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন—ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। কোমরে এমন দাল্‌কো দরদ লেগেছে—ওঃ! বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

হেসে সুরেশ্বর বললে—ব্রাহ্মণেরা সেকালের ইন্টেলেকচুয়েল। একালের ইন্টেলেকচুয়েলের মতই চতুর। দে-সরকারের মুখে একসঙ্গে হাসি এবং যন্ত্রণার অভিনয় তাঁদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। মুহূর্তেই তাঁদের চিত্ত বিরূপ হয়ে উঠেছিল। তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন—বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ফোঁটাতিলক কাটা দে-সরকার পূর্বের মতই তাঁদের পায়ের ধুলো নিয়ে মুখে বুকে ঠেকাবেন। কিন্তু বুঝলেন, জমিদার দে-সরকার তাঁদের আর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবেন না। দে-সরকার এই ক'দিনের মধ্যেই জমিদার হয়ে দ্বিতীয় জন্ম নিয়েছে। সে দে-সরকার মরে বেঁচেছে। ব্রাহ্মণ দলের অগ্রণী ছিলেন তখন জনার্দন ভট্টাচার্য, বিমলাকান্তের মাতামহ পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের পিতামহ, তিনি বৃদ্ধ তখন, কিন্তু খাঁটি বামুনে তেজ তাঁর ছিল। তিনি বলেছিলেন—হয়েছে বাবা মাধব! ওই ঢের। ওতেই আশীর্বাদ করছি। তা বড়ই দুঃখের কথা। কোমরে দাল্‌কো বাত ধরলো। তা ধরে। তা ধরে। বিষয়ের বোঝা যখন ঘাঁচ

করে মাথায় চাপে, তখন দুর্বল মানুষ হ'লে খ্যাচ ক'রে কোমরে দাল্‌কো বাত ধ'রে যায়। ও আর সারে না বাবা! তা বেশ! ঘোড়ার কুমড়ে, বিষয়ীর দাল্‌কো আর বামুনের পায়ে ফাট, এ নাহলে মানায় না বাবা। কিন্তু এক কাজ করতে পারো বাবা, কোম্পানীর চরণ ঠেকিয়ে নিতে পার ওখানে, শুনেছি কোম্পানী নাকি 'পাচুকো'। মানে ভূমিষ্ঠ হবার সময় মাথায় আগে ভূমিতে ঠেকেনি, পা আগে ঠেকেছিল, নইলে পৃথিবী দলন করবার শক্তি পাবেন কোথা থেকে। নিশ্চয় 'পাচুকো' ওরা, তুমি খবর নিয়ো।

ব্রাহ্মণেরা বাকপটু—সেখানে তাঁরা যত চতুর, তার থেকে বিষয়কর্মে এবং বাস্তবতা বোধে অনেকগুণে চতুর দে-সরকার। তিনি শ্লেষকেও শ্লেষ বলেই ধরেন নি। সুবুদ্ধির মত হেসে বলেছিলেন—বড় ভাল বলেছেন, বড় ভাল বলেছেন। কোম্পানীর জন্মকালে যদি পা দুটোই সর্বাগ্রে সদম্ভে মাটিতে পড়ে না থাকে, তবে দুনিয়া পদদলিত ক'রে বেড়াচ্ছে কি ক'রে? ঠিক কথা। ভাববার কথা!

আটচালায় এনে সমাদর করে সতরঞ্চ পাতা তক্তাপোশের উপর বসিয়ে কড়িবাঁধা ডাবাহুঁকোয় তামাক খাইয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তারপর, সকলে মিলে আপনারা এই সময় মানে—।

সমস্ত কথা শুনবার আগেই দে-সরকার সব জানতেন, তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন এবং লোহা উত্তপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় সে সুতীক্ষ্ণ বোধ তাঁর ছিল, তিনি সেই মুহূর্তের অপেক্ষা করে শুনেই যাচ্ছিলেন বিবরণ এবং ঠিক মুহূর্তটিতে এতখানি জিভ কেটে বলেছিলেন—রাধামাধব, রাধামাধব, রাধামাধব হে, আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনাদের কাছে সুদ গোমস্তা 'ওয়ালেত্ মির্জা' হাজার হলেও তো হিন্দু নয়! ও ঠিক বুঝতে পারে নি। তাই কি হয়? আপনাদের সুদ নাই, আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনারাও তামাদি বলবেন না। ও যেমন ঠাকুরদের সময় ছিল, তেমনি চলবে। তবে—।

ব্রাহ্মণরা, এমন কি একালের ইণ্টেলেকচুয়েলরাও বিষয়বুদ্ধিতে ভোঁতা বললে রাগ করো না সুলতা। ১৯৩৭ সালেই সেটেলমেণ্টে পলিটিক্যাল ইণ্টেলেকচুয়ালদের কেমন ক'রে ঠকিয়েছিল কল্যাণেশ্বর, সে বলব তোমাকে যথাসময়ে।

এখন আবার সেকালে ফিরে চল। ব্রাহ্মণেরা ওই ক'টি কথাতেই উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিলেন।

পদ্মনাভ ভট্টাচার্য বলেছিলেন—আবার তবে রাখছ কেন বাবা? তবে-টা কি ব্যক্ত কর!

—বলছি—মানে—, দেখুন, আমাকে সম্পত্তি বজায় রাখতে হবে। তাতে সুদ ব্রাহ্মণের কাছে না নিয়ে চালাব, তাতে আমার ধর্ম আছে। কিন্তু সকলকে মানে দোরবস্ত প্রজার—! তবে-টা আমার তৎসম্পর্কে!

ব্রাহ্মণেরা হেরে গেলেন। একমুহূর্তে ধর্মপ্রাণ দে-সরকারের দুঃখ অনুমান ক'রে বললেন—নিশ্চয়—নিশ্চয়। এতে কথা কি আছে! নিশ্চয়!

দে-সরকার নিবেদন করলেন—তা হলে নিবেদন নাই। আমি বলি কি—আপনারা খাজনা বাবদ তঙ্কা আমানত রাখুন। আমানতি রোকা নিন। তারপর হিসাব-নিকাশ ক'রে চেক রসিদ দেওয়া হবে।

খুশী হয়ে ব্রাহ্মণেরা উঠে এলেন। দে-সরকার কোমরে দাল্‌কো ব্যথা নিয়ে কোনক্রমে ঈষৎ হেঁট হয়ে ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলে প্রণাম সারলেন। এবার ব্রাহ্মণেরা অখুশী হলেন না।

ঠাকুর মিয়াদের সেলাম দিতে হ'ত, সেটা দিতে হল না আর, সঙ্গে সঙ্গে দে-সরকারের কাছে প্রাপ্য প্রণামটা গেল। আর আমানতের প্যাঁচে পড়লেন। সুদ রেহাইয়ের বদলে, হিসাবের বদলে, ঠাকুর মিয়াদের আমলের যার যত বাকী ছিল, তাও দেয় দাঁড়াল।

তখন তাঁরা জ্ঞানচক্ষু বিস্ফারিত করে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে ঝগড়াটা আরও পাকল সর্বরক্ষেতলার বলি নিয়ে।

সর্বরক্ষাদেবী গ্রামদেবতা। শক্তি মূর্তি, একখণ্ড পাথর। তাতে মুখ হাত পরিয়ে কাপড় দিয়ে সাজিয়ে বিজয়াদশমীতে, মাঘী পূর্ণিমাতে পূজা হয় বলি হয়। সেবায়েৎ চিরকাল জমিদার। কিন্তু ঠাকুরেরা মুসলমান বলে তাঁদের নামে সংকল্প ছিল না। আগের কাল থেকে জমিদারের দেওয়া জমি বাবদ একজন প্রজা একটি পাঁঠা এনে দিত। বলি হ'ত। সংকল্প হ'ত গ্রামবাসী প্রধানতম ব্রাহ্মণের নামে, তিনিই পেতেন ওই বলির প্রসাদ। দে-সরকারের সঙ্গে ঝগড়া লাগল এই নিয়ে। দে-সরকার বললেন—আমি হিন্দু জমিদার। এখন সংকল্প আমার নামে হবে। বলি আমি পাব।

আর ঝগড়া হ'ল ষষ্ঠীতলায়। ষষ্ঠীতলায় পূজোর সময় দে-সরকার-গিন্নী অষ্টাঙ্গে গয়না প'রে বউ বেটী নিয়ে এসে ভটচাজবাড়ীর গিন্নীদের সামনে দাঁড়ালেন। সঙ্গের কর্মচারী বললে—ঠাকুরুণরা একটু স'রে বসবেন গো! রাণী-মা এয়েছেন। ওনার পূজো হয়ে যাক আগে, তারপর আপনারা সব পূজো করবেন। বাড়ীতে জামাইবাবুরা এসেছেন। বসে আছেন। কত্তা হুকুমও দিয়েছেন—তাঁর বাড়ীর পূজো আগে হবেন।

সেকালের ব্রাহ্মণগৃহিণী তাঁরা—লাল সুতো হাতে বেঁধে কৃষ্ণনগরের মহারাণীর গায়ে জল ছিটিয়ে দেমাক করে বলে এসেছিলেন—আমার হাতের লালসুতো আছে তাই বাংলাদেশের মান আছে। গ্রাহ্যও করেন নি মহারাণীকে। তা এ তো দে-সরকার। কে একজন প্রখরা ব্রাহ্মণকন্যা বলে উঠেছিল—দাঁড়াতে বলরে মুখপোড়া—দাঁড়াতে বল তোর চামচিকে রাজার চামচিকে রাণীকে। দে-সরকার যদি রাজা হয় তবে চামচিকেও পক্ষীদের রাজা। রাণী-মা! মরণ, তোদের জিভে আর কিছু আটকায় না।

তাঁরা সরে তো বসেনই নি বরং ইচ্ছে ক'রে দেরি করেছিলেন—ঠায় রোদে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন দে-সরকার-রাণীকে।

ঝগড়া এরপর থেকেই বাধল। দে-সরকার সুযোগ পেলেন সুদ সমেত বকেয়া আদায়ের। কোম্পানীর পারমানেন্ট সেটেলমেণ্টের আমল। জমিদার যারা খাজনা নিয়মিত যোগায়, তাদের খাতির করে কোম্পানী। দে-সরকারের মোটা খাস জোত ছিল। গোটা ঠাকুরপাড়ার ঠাকুরদের নানকার তিনি আত্মসাৎ করেছেন। তার সঙ্গে মহাজনী। তিনি মামলা মকদ্দমা ক'রেও বছর বছর কিস্তিমাফিক খাজনা যুগিয়ে যান। জানেন সবুরে মেওয়া ফলে। আর জানেন হাতে মারার চেয়ে ভাতে মারাই মোক্ষম মার। তারপর লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে মুনসেফী আদালতের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পেয়ে মামলায় মামলায় ব্রাহ্মণদের পাকে পাকে প্যাঁচ কষতে শুরু করেছিলেন।

ব্রাহ্মণেরা কিন্তু আশ্চর্য জাত। তাঁরা প্যাঁচে পড়েও প্যাঁচ ছাড়ালেন উল্টো প্যাঁচ ক'ষে। গোটা যুগলপুর লাটের মুসলমান সদ্‌গোপ-ব্রাত্যদের এক ক'রে আশ্চর্য একটি জোট বেঁধে তুললেন। শেষ পর্যন্ত দে-সরকার একটা মিটমাট করতে বাধ্য হল।

ব্রাহ্মণদের সুদ উঠিয়ে দিয়েছিল। বকেয়া খাজনা যা দাবী করেছিল দে-সরকার ঠাকুর মিয়াদের আমলের বাকী জড়িয়ে, তাও ছেড়ে দিয়েছিল। এবং বৃত্তির দাবী আর তুলতেই

সাহস করে নি। শেষ বয়সে হঠাৎ পঙ্গু হয়েছিল মাধব দে-সরকার, তাতে তার ধারণা হয়েছিল যে, ব্রাহ্মণদের শাপে এই ব্যাধি ধরেছে তাঁর।

তারপর তাঁর ছেলে নিতাই দে-সরকার, সেই ট্যারা মানুষটি, যে ব্যক্তিটি সোমেশ্বর রায়ের কাছে পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের বাকী খাজনার টাকা পাইপয়সা গুনে নিয়ে খুঁটে বেঁধে প্রণাম করে চলে গিয়েছিল। নিতাই দে-সরকার মাধব দে-সরকার থেকে গুণী মানুষ ছিল জমিদার হিসেবে। যে প্রণাম উঠিয়ে দিয়েছিল মাধব দে-সরকার কোমরে দাল্‌কো বাতের জন্য, সে বাতকে সে প্রশ্রয় দেয় নি। অজস্র প্রণাম দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত নামমাত্র একটা বৃদ্ধি, টাকায় দু আনা, তা সকলের সম্মতি নিয়ে আদায়ও করলে। কিন্তু তাতে খুশী হল না। টাকায় দু আনা বৃদ্ধি! এ যে ভিক্ষে নেওয়া হল। তবু অধীর সে হল না। সুযোগ মিলল।

১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর দে-সরকার সে সুযোগ পেলে। জন রবিনসন এসে তাকে মহাজন ধরলে। কুঠী চালাবার জন্যে টাকা চাই। টাকার উপর মোটা সুদ। বছরখানেক চড়া সুদে টাকা নিলে কুঠী চালাবার জন্যে। সময়মত শোধও দিলে। দে-সরকার লোকটাকে এক বছরে বাজিয়ে চিনে নিলে।

মিউটিনির পর ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর খাসমহল হতেই দাপট বাড়ল ইংরেজদের। তার সঙ্গে জন রবিনসনের হাত লম্বা হয়ে উঠল। দুটো কুঠী তার ছিল। কিন্তু চলত না খুব ভাল। মদ আর ব্রাত্য নারীর নেশায় ব্যবসা সে ঠিক চালাতে পারত না। দে-সরকার টাকার কারবার করতে করতে বললে—সাহেব, তুমি যুগলপুরে কুঠী কর। আমার জমিদারী, আমি তোমাকে সাহায্য করব। টাকা দোব। ওখানকার জমিতে এখান থেকে অনেক ভাল নীল জন্মাবে।

জন রবিনসন ওখানে ঠাকুরপাড়ায় কুঠীর পত্তন করলে।

দে-সরকারের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, সেটা ওই সাহেবের খুঁটির জোরে ওই যুগলপুরের ব্রাহ্মণদের সে শায়েস্তা করবে।

তখন লালমুখ সাহেব কলির দেবতা হয়ে উঠেছে এদেশের মানুষের কাছে। জন রবিনসনের আর একটা উৎসাহের কারণ ছিল। এখানে পাকপাড়ার নারী।

কিছুদিনের মধ্যেই রবিনসনের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে এবং ধুলোয় যুগলপুরের মানুষ ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলে চকিত হয়ে উঠল। জমিতে জবরদস্তি নীল বোনা আরম্ভ হল। পাইকে ভরে উঠল নীল কুঠী। ব্রাহ্মণেরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। দে-সরকার পালকি চড়তে শুরু করলে। দু পাশে পাইক না নিয়ে হাঁটে না। দ্বিতীয় বৎসরে বিমলাকান্তের জমিতে জবরদস্তি নীল পড়ল।

ঠাকুরদাস পাল তখন পঁয়ত্রিশ বছরের জোয়ান। তার অহঙ্কার ছিল কীর্তিহাটের জামাই এবং শরীক বিমলাকান্তের জোতদার সে! তার জমিতে বাঘেরও ধান খাবার ক্ষমতা নেই। হঠাৎ তার জমিতে নীল বুনতেই সে চিঠি লিখলে কাশীতে বিমলাকান্তকে। —"এ অপমানের অত্যাচারের প্রতিকার না হইলে সে জমি করিতে পারিবে না। যাহা হয় প্রতিকার করিতে আজ্ঞা হয়। একবার না আসিলে প্রতিকার হইবে না। ইতি সেবক—শ্রীঠাকুরদাস পাল।"

কিছুদিন পর শ্যামনগরের ঘাটে এসে একখানা নৌকা লাগল। নৌকা থেকে নামলেন বিমলাকান্ত নয়, আঠারো-উনিশ বছরের "কমলাকান্ত"। সুন্দর সুপুরুষ—গৌরকান্তি—কাশীর জলহাওয়ায় আর ব্যায়ামে গড়া শক্ত দেহ। উজ্জ্বল দীপ্ত উগ্র চোখ। নাকের ডগাটি ঈষৎ স্থূল।

অনেকটা বিমলাকান্তের মত। আবার যারা বীরেশ্বর রায়কে দেখেছে, তারা বলবে চোখের দৃষ্টি আর নাকের ডগার ঈষৎ স্থূলতার মধ্যে তাঁর স্পষ্ট আদল। বাবা আর মামার মত একই সঙ্গে!

তোমাকে যেমনভাবে বলে যাচ্ছি সুলতা, ঠিক এমনিভাবেই সেদিন কীর্তিহাটের রায়বংশের সত্যটি আমার মনের সামনে একটির পর একটি করে ভেসে উঠেছিল। সেদিন গোয়ানপাড়ায় যে ঘটনা ঘটল, তার প্রতিক্রিয়ায় মনের মধ্যে এই অতীত কাহিনী ভিড় করে মুখ বাড়িয়ে কখনও ভয় দেখাচ্ছিল, কখনও যেন সজল চোখে আমাকে বলছিল—এর প্রায়শ্চিত্ত তুমি করো। তুমি করো। আবার এক-এক সময় বলছিল—মিথ্যের কবরে চাপা পড়ে আমরা মুক্তি পাচ্ছি না। কবর খুঁড়ে তুলে আমাদের মুক্তি দাও।

কাঁসাই তখন বিস্তীর্ণ বালির রাশি। এক পাড় থেকে আর এক পাড় পর্যন্ত পথ অনেকটা, গোয়ানপাড়ার পাড়ে ভাঙন, লাল কাঁকর আর কাঁকর-জমা পাথরের চাঁইয়ে-চাঁইয়ে বাঁধা পড়েছে। ওদিকে একটা স্রোত। তারপর খানিকটা চড়া, সেখানে কিছু চাষ হয়। তারপর এদিকে কীর্তিহাটের দিকে আর একটা স্রোত, তারপর এদিকেও লাল কাঁকর আর পাথরের চাঁইয়ে গড়া শক্ত পাড়। ওদিকে সিদ্ধপীঠের জঙ্গল। সেখানে শালবন, বনকদম, শিমুলের গাছ, বেউড় বাঁশের ঝাড়, এদিকে কীর্তিহাটে বিবিমহলের বাঁধানো পোস্তার নীচে বড় বড় সেগুন গাছের জঙ্গল। তার অনেক বড় গাছ কেটে মেজোতরফ বিক্রী করেছেন; তার শেকড় এবং বীজ পড়ে অসংখ্য চারা হয়েছে, সেও একটা ছোটখাটো জঙ্গল। এইখানে এসেই গোয়ান মেয়েগুলো মেজদির সঙ্গে কথা বলত। একটা দহ আছে বিবিমহলের বাঁধা ঘাটে, সেখানে সাঁতার দিতে আসত গ্রীষ্মের দুপুরবেলা; এখান থেকেই কাল রাত্রে আমাকে ডেকেছিল ওই হ্যারিস।

এই এতটা পথ বালি ভেঙে এসেছিলাম আমি অতীতের ভূতে-পাওয়া মানুষের মত। কেবল ওই মুখগুলো দেখেছিলাম। ওই ঘাটে এসে ঠিক তুমি যে প্রশ্ন করলে একটু আগে, ঠিক সেই প্রশ্ন আমারও মনে জেগেছিল। রায়-ভটচাজ বংশের এই ধারা, সত্যই কি ওই মহাশক্তির অভিশাপ, না হেরিডিটির প্রভাব, না উপচে-পড়া সম্পদের বিষক্রিয়া? কিছুতেই ওই অভিশাপের কথাটাকে উপেক্ষা করতে পারি নি। ওইটেকেই আমার সবচেয়ে বড় মনে হয়েছিল।

তাই বাড়ী এসেই চিঠির দপ্তর খুলে বসে সমস্তটা আগাগোড়া পড়তে শুরু করেছিলাম। তোমাকে বলেছি—পুলিশ এসে ঘর খানাতল্লাস করতে গিয়ে অতুলেশ্বরের বিরুদ্ধে কিছু পায় নি, কিন্তু ওই কাঁকড়াবিছে-ভরা দামী সেগুন কাঠের সিন্দুক ভর্তি চিঠির দপ্তর বের করে দিয়ে গিয়েছিল। আমি একটি একটি করে পড়ে, রায়বংশের এই ইতিহাসটুকু বের করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে দিয়েছিলাম।

১৮৫৯ সালের জানুয়ারী মাসের একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, মস্ত মোটা চিঠি, চিঠিখানা কাশী থেকে বিমলাকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন রায়বাড়ীর কুলপুরোহিত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে।

আজ কথা আরম্ভ করবার সময় যে রেশমী কাপড়ে বাঁধা কাগজের বাণ্ডিলটা টেবিলের উপর রেখে বসেছিল, সেটার বাঁধন খুলতে খুলতে সুরেশ্বর বললে—পূর্বেই বলেছি, ১৮৫৭ সালে এখানে এসে সিপাহী বিদ্রোহের বিভীষিকা মিটলে বীরেশ্বর রায় জমিদারী নিয়ে প্রমত্ত হয়ে পড়েছিলেন। না পড়েই বা কি করবেন। জীবনে তখন তাঁর নারীর নেশা কেটেছে। কাটিয়ে দিয়েছে সোফিয়া বাঈ। জীবন নেশা নইলে কাটে না। নেশা তখনই দরকার হয় না যখন পেটের ভাত জোটে না।

পেটে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জুটলে তখন আর নেশা নইলে জীবন কাটে না। হয় ভগবান, নয় নারী, নয় বিষয়।

বীরেশ্বর রায়ের ভগবান নেশা ছেলেবেলা থেকে ছিল না। নারীর নেশাও কেটেছে। সুতরাং বিষয়, তাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। যেটাকে সংসারে নেশার জিনিস বলে অর্থাৎ সুরা, সেটা হল নেশার ক্ষুধা বাড়াবার ওষুধ। ভগবান ভজতে গিয়েও মদ খায়, নারী নেশাতেও মদ নইলে চলে না, বিষয়ের নেশাতেও ওটা চাই। অন্তত ভূ-সম্পত্তি নিয়ে যারা মাতে সেকালে তাদের শতকরা নব্বুইজন মগুপানে ক্ষুধা বাড়াত।

বীরেশ্বর রায় ওই দুটিকে সম্বল করে কীর্তিহাটের কাছারীর জাঁকজমক বাড়িয়ে জেঁকে বসেছেন। কলকাতা থেকে খানসামা ছিলমবরদার, খিদমতগার, আর্দালী হরকরা, চাপরাসী, দারোয়ান এনেছেন। দেউড়ীতে পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা পড়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। মামলা সেরেস্তা প্রকাণ্ড করে ফেঁদেছেন ; জমিদারী সেরেস্তার আর একটা ফ্যাকড়া বেরিয়েছে, দাদন সেরেস্তা। নায়েব গিরীন্দ্র আচার্যির নাম হয়েছে ম্যানেজার, তাছাড়া খাজাঞ্চী সেরেস্তা, হিসাব-নিকাশ সেরেস্তা চিরকাল ছিল, তারও কায়দা-কানুন বেড়েছে। নতুন ঘরবাড়ীর পত্তন হয়েছে। পুরনো ঘরবাড়ী মেরামত হয়ে ঝকঝক করছে। আস্তাবলে ঘোড়া এসেছে, গাড়ী এসেছে। হাতী ছিল গোড়া থেকে, আরও একটা হাতী কিনেছেন। আশাসোঁটা, তাও কিনেছেন নতুন করে।

কাছারী কালীমন্দিরের নাটমন্দিরের দক্ষিণে এবং পূর্বে সারি-সারি ঘরে বসত। তার ঘরদোর বেড়েছে। নতুন আসবাবে নতুন ঢঙে সাজানো হয়েছে, আসবাব খাস সাহেবী দোকানের, ঢঙও সাহেবী। ঘরে ঘরে ক্লক ঘড়ি। সেগুলি একসঙ্গে বাজা চাই। মিনিটে মিনিটে মিল চাই। তার জন্য আলাদা লোক। এ বিবিমহল, সায়েব-সুবার জন্য নির্দিষ্ট। ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টার, এস-পি, ডেপুটি সাহেবরা আসবেন, এখানে থাকবেন।

বীরেশ্বর রায় কালীবাড়ী সংলগ্ন কাছারীতে বড় একটা আসতেন না। প্রণাম করতে হবে বলে আসতেন না। তিনি কালীবাড়ী এবং কাছারীর লাগোয়া যে প্রথম অন্দরমহল সেখানেই থাকতেন, সেখানেই ছিল তাঁর কাছারী। রায়বাড়ী, রায়বংশের আর কেউ নেই। থাকবার মধ্যে তাঁর মা রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবীর দূরসম্পর্কের দশ-বারোটি পোষ্য-পোষ্যা। তার মধ্যে বৃদ্ধ বিধবার সংখ্যা বেশী। তারা বিমলাকান্তের জন্য তৈরী পিছনের মহলটায় থাকত।

সেদিন সকালবেলায় বীরেশ্বর রায় বসে মামলা সেরেস্তার কাগজ দেখছিলেন। পাশে বসেছিল ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্য আর মামলা সেরেস্তার নায়েব। পরামর্শ চলছিল গোপাল সিংয়ের মকদ্দমা নিয়ে।

গোপাল সিং—মণ্ডলান আদায়ী মহাল-বীরপুরের মণ্ডল। তাকে উচ্ছেদ করে মৌজা বীরপুর খাস আদায়ে আনতে হবে। তার জন্য এক বীরপুর মহলে চারশো নম্বর বাকী খাজনার মামলা দায়ের হয়েছে। এ ছাড়া খোদ গোপাল সিংয়ের সঙ্গে দেওয়ানী, ফৌজদারী জড়িয়ে পঁচিশ নম্বর মামলা।

অবস্থাটা একটু জটিল হয়ে উঠেছে। প্রজারা সকলেই গোপাল সিংয়ের বশীভূত। তারা বলছে, মণ্ডল গোপাল সিংয়ের হাতে খাজনা দেয় বরাবর, তারা তাকেই জানে, তার সঙ্গেই তাদের বন্দোবস্ত, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে খাজনা দেবে না। জমিদারকে খাজনা দেবে গোপাল সিং।

বীরেশ্বর রায় বসে ভাবছেন। গিরীন্দ্র আচার্য নিজের মাথার তালু নখ দিয়ে ক্রমাগত চুলকে যাচ্ছেন। মামলা সেরেস্তার নায়েব আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ভাবছেন।

প্রজারা একথা সকলে বললে—মণ্ডলান উচ্ছেদ হওয়া শক্ত হবে।

বীরপুর মৌজার মণ্ডল জমিদারকে আদায় দেয় দেড় হাজার টাকা। নিজের থাকে প্রায় পাঁচশো। উচ্ছেদ হলে এই আদায় হাসতে হাসতে তিন হাজারে দাঁড়াবে। কিন্তু সে কথাটাও বড় নয়। বড় কথা, গোপালের মণ্ডলগিরি ঘোচাতে হবে। না হলে অপমানের শোধ হবে না। গোপালকে এনে কাছারীতে বসাতে হবে মেঝের উপর মাদুরের আসনে।

বীরেশ্বরের সোজা হিসেব। হেরে হারানো। মুন্সেফ কোর্টে হারলে জর্জ কোর্ট, সেখানে হারলে হাইকোর্ট। তমলুক থেকে মেদিনীপুর, সেখান থেকে কলকাতা। চলুক না প্রজা কত চলতে পারে!

আচার্য হঠাৎ মাথা চুলকানো বন্ধ করে বললে—এক কাজ করা হোক!

বীরেশ্বর রায় তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। নায়েব সোজা হয়ে বসল। আচার্য নায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—মামলার শমন সমস্ত গায়েব করে পেয়াদাকে দিয়ে জারী হইল, রিটার্ন লিখিয়ে দাও। বুঝেছ?

—আজ্ঞে।

—তারপর ডিগ্রী হোক একতরফা। বুঝেছ?

—কতক ডিগ্রী হোক। কতক মামলার মাঝখানেই টাকা দাখিল হোক।

—আজ্ঞে?

—বুঝলে না? আমারই প্রজার নামে টাকা দাখিল করলাম! বুঝেছ?

—বুঝেছি। আজ্ঞে হ্যাঁ। এবার বুঝেছি!

—যা ডিগ্রী হল, তার কতকগুলোতে আমরাই টাকা দাখিল করলাম। ঘরের টাকা ঘরে এল। দু-চার কি দশ নম্বর রেখে দাও; তামাদীর মুখে-মুখে জারী করে জিইয়ে রাখ! বুঝেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জলের মত। এ মোক্ষম পথ। হ্যাঁ আজ্ঞে, এর আর মার নেই। প্রজাদের জমিদারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার হয়ে গেল। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদেরও হারও হল না।

—বাবা বীরেশ্বর, তুমি কি বল?

বীরেশ্বর বললেন—তা তো হল সব। কিন্তু প্রজার খরচ হল না, অবস্থায় তারা দুর্বল হল না।

—'ধৈর্য ধরতে হবে বাবা।' তিনি আঙুল তুলে বললে তিন বছর। তিন বছর পর নীলেম উচ্ছেদ দুই মামলাতে জড়িয়ে দোব। এদিকে খোদ গোপালের সঙ্গে চলুক ফৌজদারী দেওয়ানী!

সুলতার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল বিস্ময়ে। তার দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে—বিস্মিত হচ্ছ তুমি?

সুলতা বললে—তা হচ্ছি। না হলেই বিস্ময়ের কারণ হত আমার পক্ষে।

সুরেশ্বর বললে—তখন ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব established by Law: সামন্ত ভূস্বামীরা জমিদারে পরিণত হয়েছেন, might is right—সেটা একমাত্র ইংরেজের। ভূস্বামীদের বিদ্রোহ দমনে লাঠি চার্জের right নেই। যা কর আদালত মারফত। তাঁদের যুদ্ধপিপাসা মেটাবার রণক্ষেত্র তখন একটিই। আদালত। মকদ্দমাই তখন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে রক্তক্ষয় হয় না, রক্তশোষণ হয়। ফর্মটা পাল্টেছে। গিরিয়ার যুদ্ধে আলীবর্দী খাঁ রুমালে পাতলা ইট বেঁধে সরফরাজ খাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, কোরাণ বলে, পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়েছিল, ক্লাইভ সাদা ফ্ল্যাগ দেখিয়েছে বলে। যুধিষ্ঠির যে যুধিষ্ঠির দ্রোণ গুরুকে বধ

করবার সময় অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ বলেছিলেন। প্রেমের কথা এক্ষেত্রে তুলব না। কিন্তু যুদ্ধে এ আছেই। তোমাদের নতুনকালে এ মামলাযুদ্ধ গৌণ হয়ে ভোটযুদ্ধ বড় হয়েছে। বল তো সুলতা, হলফ করে, সে যুদ্ধে ফল্‌স ভোটিং হয় কিনা! রাগ করো না। আমি জমিদারীর স্বপক্ষে আদৌ নই। আমি খুশী হয়েছি। আজই আমার জ্ঞাতিরা এসেছিল, জমিদারী উচ্ছেদ হচ্ছে, আইনটা বলবৎ হবার আগে তারা জমিদারীর অন্তর্গত খাস জোত, খাস পতিত,ভুয়ো চেক কেটে রায়বংশের নানাজনের নামে প্রজাপত্তন করতে চায়। তাতে জমিদারী গেলেও আসল বস্তু জমির একটা বড় অংশ রায়বংশের দখলেই থেকে যাবে। কিন্তু তাদের সে প্রস্তাবে আমি রাজী হইনি। কমলেশ তারই জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমাকে গাল দিচ্ছিল, তাও দেখে গেছ। তার হয়ে তোমার কাছে মাফ চেয়েছি, বলেছি—ও ইতর, নেশাখোর। তার সঙ্গে এটা বলিনি যে, কমলেশ একজন উৎসাহী চরম বামপন্থীদের মতবাদের সমর্থক, পার্টি মেম্বার না হলেও তাদের দলের একজন বড় ভরসা!

সুলতা বললে—কংগ্রেসের কথা বললে না?

সুরেশ্বর বললে—তাও বলেছি, অতুলেশ্বরের কথা! তাছাড়া রাজা, জমিদার এরা তো সবাই এখন কংগ্রেসের দলে। কয়েকজন জোতদার অন্তত একজন মহারাজকুমার কম্যুনিস্ট পার্টিতে আছে। তোমাদের দল খুঁজলে গোপনে আমিষভোজী দু-চারজন মিলবে। কিন্তু ও কথা থাক। আমার জবানবন্দী দিয়ে যাই। তুমি শুনে যাও। সন্দেহ হলে প্রশ্ন করে ঘটনাকে পরিষ্কার করে নিও। তার বেশী অধিকার নিলে তোমার পক্ষেও সেটা ট্রেসপাস করা হবে।

সুলতা হেসে বললে—বল।

সুরেশ্বর বললে—ঠিক সেই সময়েই আর্দালী এসে সেলাম করে দাঁড়িয়েছিল। বীরেশ্বর রায় তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই সে আবার সেলাম করে বলেছিল—ছেদী সিং আসিয়েসে বানারসসে!

—ছেদী সিং! চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন বীরেশ্বর রায়। ছেদী সিংকে তিনি দু বছর আগে কাশী পাঠিয়েছিলেন, ভবানী কাশীতে বিমলাকান্তের বাড়ীতে আছে কিনা জানতে পাঠিয়েছিলেন। কাশীতে যদি বিমলাকান্তের বাড়ীতে সে থাকে তবে তার সঙ্গে বিমলাকান্তের সম্পর্ক কি তাই জানতে চেয়েছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বলেছিলেন, বিমলাকান্ত তাঁকে তার এক ভগ্নীর কথা বলেছিল। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল—তার এ ভগ্নী ভবানী ছাড়া আর কেউ নয়। ছেদী সিং ছাড়া আর কাউকে এ কাজের ভার দিতে পারেন নি। বিশ্বাসী ছেদী তাঁর বাপের কাছে বাচ্চা চাকর ছিল, তারপর পনেরো-ষোল বছর বয়সে সে তাঁর চাকর হয়েছিল। তাঁর যৌবনে সে তার দেহরক্ষীর মত ছিল। তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত ফিরত। ছেদী এখন বৃদ্ধ। তাকে পেন্সন দিয়ে কলকাতার বাড়ীতে রেখেছিলেন। ছেদী যখন কাশী যায়, তখন বিদ্রোহ সবে শুরু হয়েছে। সে যাবার পর বিদ্রোহের আগুন জ্বলল। জ্বলল গোটা উত্তর ভারত জুড়ে। কাশীতেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল। বিদ্রোহে ইংরেজের ক্ষতি সামান্যই হয়েছে। কিন্তু তার প্রতিশোধে ইংরেজ করেছে সেখানে বীভৎস নরমেধ যজ্ঞ। দশ-বারো বছরের ছেলেদের গুলী করে মেরেছে, মানুষকে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে গাছের ডালে। আগুন জ্বালিয়ে হিন্দুস্থানীদের পাড়ার পর পাড়া পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

বিহারে আরার কুমার সিংহের অধীনে বিদ্রোহ হয়েছিল। আরা থেকে সাসারাম পর্যন্ত তিনি কোম্পানীর গোরাদের জীবন দুর্বহ করে শেষ পর্যন্ত ইংরেজের গুলীতে মারা গেছেন।

সেখানেও ইংরেজ তার প্রতিহিংসার আগুনে ছারখার করে দিয়েছে সমস্ত কিছু।

এর মধ্যে ছেদী বেঁচে আবার ফিরে আসবে এ প্রত্যাশা বীরেশ্বর রায় করেন নি। বিমলাকান্ত কমলাকান্ত বেঁচে আছে, এ খবর অবশ্য পেয়েছেন। ৫৮ সালের প্রথমেই মিউটিনির ঝড় শান্ত হয়ে আসছে তখন; তখন চারিদিকে শুধু বিচারের নামে ফাঁসি চলছে। সেই সময় বিমলাকান্ত চিঠি লিখেছিলেন—রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে লিখেছিলেন।

"শ্রীচরণাম্বুজেষু, অশেষ ভক্তিপূর্বক নিবেদনমেতৎ, পরে লিপি যে, এই নিদারুণ সঙ্কটপূর্ণকালে সকল মানবই বিদেশস্থ আপনাপন স্নেহাস্পদ ও আত্মীয়বর্গ সম্পর্কে উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন। সংবাদ না প্রাপ্ত হইলে সকলেই চিন্তিত হইয়া ধারণা করিতেছেন যে, তাঁহারা হয়তো আর জীবিত নাই। এমন এক মন্বন্তরায়—ইহা স্বাভাবিক। সেই কারণে আপনাদিগের জ্ঞাতার্থে নিবেদন যে, আমাদিগের জন্য চিন্তা করিবেন না। কমলাকান্তসহ আমি শ্রীশ্রী৺কালীমাতা ও শ্রীশ্রী৺নারায়ণের অনুগ্রহে নিরাপদ কুশলে রহিয়াছি। বড়ই দুর্যোগ এবং দুঃসময় অতীত হইল। বর্তমানে অত্রস্থ স্থানে ক্রমশঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতেছে। কীর্তিহাট ত্যাগ করিয়া আসিবার পর হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত কোন পত্রাদিই আমি লিখি নাই। তাহার কারণ, মনে মনে ইহাই ভাবিয়াছি যে, পত্র আদানপ্রদানে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বরভায়া আপনাদের উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। বড়ই কষ্ট অনুভব করি কিন্তু ইহা যখন আমার উপর দৈবরোষের ফল, তখন ইহা লইয়া পরিতাপ করিয়া কি ফল?

যাহা হউক, আমি বুঝিয়াছি, আমি দূরে থাকিলেই মঙ্গল হইবে। তাহাতে আমি শান্তিতেও আছি। এখানে আসিয়া আমি একটি কর্ম গ্রহণ করিয়াছি। আদালতে দেশীয় ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়া ভালই আছি। শ্রীমান কমলাকান্তও যথারীতি অধ্যয়নাদি করিতেছে।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ভ্রাতৃজীবনকেও কর্তব্যবোধে একখানি পত্র লিখিলাম, তদীয় কলিকাতাস্থ বাসভবনের ঠিকানায়। তিনি প্রত্যুত্তর দিবেন কিনা জানি না। সম্ভবতঃ দিবেন না।

পরিশেষে আপনাদের নিকট নিবেদন—আপনারা তাহাকে অনুরোধ করিয়া সংসারী করুন। এত বড় রায়বংশ, তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী কমলাকান্ত। কমলাকান্তের উপর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায়বাবু প্রসন্ন নহেন। এক্ষেত্রে মদীয় বিবেচনায় তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হইলে পুত্র-কন্যাদি জন্মিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে। তাঁহাকে বলিবেন, আমি পত্রেও তাঁহাকে লিখিয়াছি যে, কীর্তিহাট হইতে আসিবার কালীন যে অর্থ ও অলঙ্কারাদি পাইয়াছিলাম কপর্দকও ব্যয় করি নাই। তাহা সবই মজুদ আছে এবং তাহাকে সামান্য সামান্য লগ্নী ব্যবসায়ে বৃদ্ধিও করিয়াছি। তদুপরি বর্তমানে কর্ম করিয়া যাহা উপার্জন করিতেছি, তাহাই লইয়া কমলাকান্ত সন্তুষ্ট থাকিবে। এবং কমলাকান্ত অধ্যয়নে কৃতী হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি নব-প্রবর্তিত বি-এ পরীক্ষা দিবে। পাসও করিবে। ইচ্ছা করিলে সে কোন উত্তম সরকারী চাকুরিও পাইতে পারে। আইন অধ্যয়ন করিয়া উকিলও হইতে পারিবে। তাহাকে আমি এখন হইতেই বুঝিয়াছি। সে ভবিষ্যতে কীর্তিহাট সম্পত্তির কোন অংশই দাবী করিবে না।

আপনকাদের কুশল প্রাপ্ত হইলে সুখী হইব। আপনি এবং পূজনীয় শ্রীগিরীন্দ্র আচার্য খুড়ামহাশয়কে মদীয় সভক্তি প্রণাম জানাইতেছি।

অধিক আর কি। ইতি—

প্রণত

শ্রীবিমলাকান্ত দেবশর্মা (ভট্টাচার্য)

করবার সময় অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ বলেছিলেন। প্রেমের কথা এক্ষেত্রে তুলব না। কিন্তু যুদ্ধে এ আছেই। তোমাদের নতুনকালে এ মামলাযুদ্ধ গৌণ হয়ে ভোটযুদ্ধ বড় হয়েছে। বল তো সুলতা, হলফ করে, সে যুদ্ধে ফল্‌স ভোটিং হয় কিনা! রাগ করো না। আমি জমিদারীর স্বপক্ষে আদৌ নই। আমি খুশী হয়েছি। আজই আমার জ্ঞাতিরা এসেছিল, জমিদারী উচ্ছেদ হচ্ছে, আইনটা বলবৎ হবার আগে তারা জমিদারীর অন্তর্গত খাস জোত, খাস পতিত-ভুয়ো চেক কেটে রায়বংশের নানাজনের নামে প্রজাপত্তন করতে চায়। তাতে জমিদারী গেলেও আসল বস্তু জমির একটা বড় অংশ রায়বংশের দখলেই থেকে যাবে। কিন্তু তাদের সে প্রস্তাবে আমি রাজী হইনি। কমলেশ তারই জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমাকে গাল দিচ্ছিল, তাও দেখে গেছ। তার হয়ে তোমার কাছে মাফ চেয়েছি, বলেছি—ও ইতর, নেশাখোর। তার সঙ্গে এটা বলিনি যে, কমলেশ একজন উৎসাহী চরম বামপন্থীদের মতবাদের সমর্থক, পার্টি মেম্বার না হলেও তাদের দলের একজন বড় ভরসা!

সুলতা বললে—কংগ্রেসের কথা বললে না?

সুরেশ্বর বললে—তাও বলেছি, অতুলেশ্বরের কথা! তাছাড়া রাজা, জমিদার এরা তো সবাই এখন কংগ্রেসের দলে। কয়েকজন জোতদার অন্তত একজন মহারাজকুমার কম্যুনিস্ট পার্টিতে আছে। তোমাদের দল খুঁজলে গোপনে আমিষভোজী দু-চারজন মিলবে। কিন্তু ও কথা থাক। আমার জবানবন্দী দিয়ে যাই। তুমি শুনে যাও। সন্দেহ হলে প্রশ্ন করে ঘটনাকে পরিষ্কার করে নিও। তার বেশী অধিকার নিলে তোমার পক্ষেও সেটা ট্রেসপাস করা হবে।

সুলতা হেসে বললে—বল।

সুরেশ্বর বললে—ঠিক সেই সময়েই আর্দালী এসে সেলাম করে দাঁড়িয়েছিল। বীরেশ্বর রায় তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই সে আবার সেলাম করে বলেছিল—ছেদী সিং আসিয়েসে বানারসসে!

—ছেদী সিং! চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন বীরেশ্বর রায়। ছেদী সিংকে তিনি দু বছর আগে কাশী পাঠিয়েছিলেন, ভবানী কাশীতে বিমলাকান্তের বাড়ীতে আছে কিনা জানতে পাঠিয়েছিলেন। কাশীতে যদি বিমলাকান্তের বাড়ীতে সে থাকে তবে তার সঙ্গে বিমলাকান্তের সম্পর্ক কি তাই জানতে চেয়েছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বলেছিলেন, বিমলাকান্ত তাঁকে তার এক ভগ্নীর কথা বলেছিল। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল—তার এ ভগ্নী ভবানী ছাড়া আর কেউ নয়। ছেদী সিং ছাড়া আর কাউকে এ কাজের ভার দিতে পারেন নি। বিশ্বাসী ছেদী তাঁর বাপের কাছে বাচ্চা চাকর ছিল, তারপর পনেরো-ষোল বছর বয়সে সে তাঁর চাকর হয়েছিল। তাঁর যৌবনে সে তার দেহরক্ষীর মত ছিল। তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত ফিরত। ছেদী এখন বৃদ্ধ। তাকে পেন্সন দিয়ে কলকাতার বাড়ীতে রেখেছিলেন। ছেদী যখন কাশী যায়, তখন বিদ্রোহ সবে শুরু হয়েছে। সে যাবার পর বিদ্রোহের আগুন জ্বলল। জ্বলল গোটা উত্তর ভারত জুড়ে। কাশীতেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল। বিদ্রোহে ইংরেজের ক্ষতি সামান্যই হয়েছে। কিন্তু তার প্রতিশোধে ইংরেজ করেছে সেখানে বীভৎস নরমেধ যজ্ঞ। দশ-বারো বছরের ছেলেদের গুলী করে মেরেছে, মানুষকে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে গাছের ডালে। আগুন জ্বালিয়ে হিন্দুস্থানীদের পাড়ার পর পাড়া পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

বিহারে আরার কুমার সিংহের অধীনে বিদ্রোহ হয়েছিল। আরা থেকে সাসারাম পর্যন্ত তিনি কোম্পানীর গোরাদের জীবন দুর্বহ করে শেষ পর্যন্ত ইংরেজের গুলীতে মারা গেছেন।

সেখানেও ইংরেজ তার প্রতিহিংসার আগুনে ছারখার করে দিয়েছে সমস্ত কিছু।

এর মধ্যে ছেদী বেঁচে আবার ফিরে আসবে এ প্রত্যাশা বীরেশ্বর রায় করেন নি। বিমলাকান্ত কমলাকান্ত বেঁচে আছে, এ খবর অবশ্য পেয়েছেন। ৫৮ সালের প্রথমেই মিউটিনির ঝড় শান্ত হয়ে আসছে তখন ; তখন চারিদিকে শুধু বিচারের নামে ফাঁসি চলছে। সেই সময় বিমলাকান্ত চিঠি লিখেছিলেন—রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে লিখেছিলেন।

"শ্রীচরণাম্বুজেষু, অশেষ ভক্তিপূর্বক নিবেদনমেতৎ, পরে লিপি যে, এই নিদারুণ সঙ্কটপূর্ণকালে সকল মানবই বিদেশস্থ আপনাপন স্নেহাস্পদ ও আত্মীয়বর্গ সম্পর্কে উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন। সংবাদ না প্রাপ্ত হইলে সকলেই চিন্তিত হইয়া ধারণা করিতেছেন যে, তাঁহারা হয়তো আর জীবিত নাই। এমন এক মন্বন্তরায়—ইহা স্বাভাবিক। সেই কারণে আপনাদিগের জ্ঞাতার্থে নিবেদন যে, আমাদিগের জন্য চিন্তা করিবেন না। কমলাকান্তসহ আমি শ্রীশ্রী৺কালীমাতা ও শ্রীশ্রী৺নারায়ণের অনুগ্রহে নিরাপদ কুশলে রহিয়াছি। বড়ই দুর্যোগ এবং দুঃসময় অতীত হইল। বর্তমানে অত্রস্থ স্থানে ক্রমশঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতেছে। কীর্তিহাট ত্যাগ করিয়া আসিবার পর হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত কোন পত্রাদিই আমি লিখি নাই। তাহার কারণ, মনে মনে ইহাই ভাবিয়াছি যে, পত্র আদানপ্রদানে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বরভায়া আপনাদের উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। বড়ই কষ্ট অনুভব করি কিন্তু ইহা যখন আমার উপর দৈবরোষের ফল, তখন ইহা লইয়া পরিতাপ করিয়া কি ফল ?

যাহা হউক, আমি বুঝিয়াছি, আমি দূরে থাকিলেই মঙ্গল হইবে। তাহাতে আমি শান্তিতেও আছি। এখানে আসিয়া আমি একটি কর্ম গ্রহণ করিয়াছি। আদালতে দেশীয় ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়া ভালই আছি। শ্রীমান কমলাকান্তও যথারীতি অধ্যয়নাদি করিতেছে।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ভ্রাতৃজীবনকেও কর্তব্যবোধে একখানি পত্র লিখিলাম, তদীয় কলিকাতাস্থ বাসভবনের ঠিকানায়। তিনি প্রত্যুত্তর দিবেন কিনা জানি না। সম্ভবতঃ দিবেন না।

পরিশেষে আপনাদের নিকট নিবেদন—আপনারা তাহাকে অনুরোধ করিয়া সংসারী করুন। এত বড় রায়বংশ, তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী কমলাকান্ত। কমলাকান্তের উপর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায়বাবু প্রসন্ন নহেন। এক্ষেত্রে মদীয় বিবেচনায় তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হইলে পুত্র-কন্যাদি জন্মিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে। তাঁহাকে বলিবেন, আমি পত্রেও তাঁহাকে লিখিয়াছি যে, কীর্তিহাট হইতে আসিবার কালীন যে অর্থ ও অলঙ্কারাদি পাইয়াছিলাম কপর্দকও ব্যয় করি নাই। তাহা সবই মজুদ আছে এবং তাহাকে সামান্য সামান্য লগ্নী ব্যবসায়ে বৃদ্ধিও করিয়াছি। তদুপরি বর্তমানে কর্ম করিয়া যাহা উপার্জন করিতেছি, তাহাই লইয়া কমলাকান্ত সন্তুষ্ট থাকিবে। এবং কমলাকান্ত অধ্যয়নে কৃতী হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি নব-প্রবর্তিত বি-এ পরীক্ষা দিবে। পাসও করিবে। ইচ্ছা করিলে সে কোন উত্তম সরকারী চাকুরিও পাইতে পারে। আইন অধ্যয়ন করিয়া উকিলও হইতে পারিবে। তাহাকে আমি এখন হইতেই বুঝিয়াছি। সে ভবিষ্যতে কীর্তিহাট সম্পত্তির কোন অংশই দাবী করিবে না।

আপনকাদের কুশল প্রাপ্ত হইলে সুখী হইব। আপনি এবং পূজনীয় শ্রীগিরীন্দ্র আচার্য খুড়ামহাশয়কে মদীয় সভক্তি প্রণাম জানাইতেছি।

অধিক আর কি। ইতি—

প্রণত

শ্রীবিমলাকান্ত দেবশর্মা ( ভট্টাচার্য )

পত্রখানা রামব্রহ্ম ঠাকুর তাঁকে দেখিয়েছিলেন। তিনি পড়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

সুরেশ্বর বললে—জান সুলতা, এই চিঠিখানা পড়ে সেদিন বার বার আমার ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল। মনে মনে কল্পনা করতে চেয়েছিলাম—বীরেশ্বর রায় চিঠিখানা পড়ে সেদিন কি করেছিলেন!

সবুজরঙের ডিম্বাকৃতি স্ট্যাম্পের মাঝখানে সাদা রঙের কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবিওয়ালা ছোট আকারের পুরনো খামটা তুলে ধরলে সুরেশ্বর। খামখানার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতেই বললে—অনুমান করেছিলাম, বীরেশ্বর রায়ের মনের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ বোধহয় আরও কুটিল হয়ে উঠেছিল। প্রকারান্তরে বিমলাকান্ত লিখেছে যে, রায়বংশের একবিন্দু রক্তের বা শুক্রের সম্পর্ক যখন কমলাকান্তের সঙ্গে নেই, তখন রায়বংশের সম্পত্তিই বা দাবী করবে কেন?

তিনি অর্থাৎ বীরেশ্বর রায় নিশ্চয়ই রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের চিঠিখানা রেখে বলেছিলেন, চিঠিখানা থাক আমার কাছে। আপনি এখন আসুন।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে বিদায় করে ঘরে গিয়ে মদ্যপান করে তুচ্ছ কোন কারণে রাগে অন্ধ হয়ে সারাটা দিন চীৎকার করেছিলেন। অথবা কাঁসাইয়ের দহে কুমীর বা ওপারের জঙ্গলে ভালুক শিকার করতে যেতেন। তখন কাঁসাইয়ের দহটায় কুমীর থাকত। জঙ্গলেও ভালুক ছিল। মধ্যে মধ্যে বাঘও আসত।

* * *

আজ এতদিন পর ছেদী সিং ফিরে এসেছে শুনে বীরেশ্বর রায় চমকে উঠলেন। ছেদী সিং! ছেদী এতদিন পর ফিরেছে? সে বেঁচে আছে? তিনি ভেবেছিলেন, ছেদী বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে ছেদী ফিরবেই—এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল চলে গেল এবং তার মধ্যে মিউটিনির মত এমন একটা কাল গেল বলে ভেবেছিলেন, ছেদী নেই। ছেদী ফিরে এসেছে এবং যখন এসেছে, তখন ভবানীর খবর তার কাছে পাবেন—এই ধারণাটা বিদ্যুৎ-চমকের মত চমকে উঠল।

তিনি আর্দালীকে বললেন—নিয়ে এস তাকে। আর্দালী চলে গেল। কিন্তু তার তর সইল না, নিজেই উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আসবার সময় গিরীন্দ্র আচার্য ম্যানেজার-কাকাকে এবং নায়েবকে বললেন, ওবেলা, বাকি কথা ওবেলা হবে। ছেদী এসেছে। ওবেলা।

গিরীন্দ্র আচার্য বোধহয় বিস্মিত হননি। তিনি ছেদীকে চেনেন। পুরনো লোকটির প্রতি বীরেশ্বর রায়ের মমতার কথাও জানেন।

বারান্দার একধারে ছেদী একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক পায়ে। আর একখানা পা তার খাটো হয়ে শূন্যে উঠে আছে, শুধু তাই নয়, একটা শুকনো বাঁকা গাছের ডালের মত বেঁকে গেছে।

লাঠি ধরেই ছেদী ঝুঁকে সেলাম করে বললে; হুজুর, গরীবপরবর, আমার ফিরতে বহুৎ দেরি হয়ে গেছে। কসুর মাফ্ কিয়া যায় মালিক। আমি ইচ্ছে করে দেরি করিনি। এহি পয়ের কো লিয়ে দেরি হয়ে গেল।

বীরেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছিল পায়ে?—গুলী?

অনুমান করতে কষ্ট ছিল না। বেনারস। মিউটিনি কর্নেল নীলের নিষ্ঠুর প্রতিশোধ ব্যবস্থা। সবই রায় জানতেন।

—হ্যাঁ হুজুর, গোলী! কলেজায় কি মাথায় বিঁধল না। বিঁধল পায়ে। নসীব!

পিছন থেকে শিউরে গিরীন্দ্র আচার্য বলে উঠেছিলেন—অসুর। বেটারা অসুর। ওদের সঙ্গে মানুষ পারে!

বীরেশ্বর রায় ছেদীকে বলেছিলেন—তার জন্য আপসোস করো না ছেদী। বেঁচেছ, জীউ পরমাত্মা বেঁচেছেন, সে বিশ্বনাথের কৃপা। ভাবনা কি? আমি তোমার সারা জিন্দগীর ভার নিলাম। কিছু ভেবো না। তোমার বাড়ীর সব বেটা-বহু-পোতা-নাতি এরা—

ছেদী হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরলে। যেন বারদুই টাল খেলে। কিছু বলতে গিয়েও পারলে না। থর থর করে কাঁপতে লাগল দুটি ঠোঁট। চোখ থেকে বেরিয়ে এল জলের ধারা।

গিরীন্দ্র আচার্য শঙ্কিত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ছেদী?

বীরেশ্বর বললেন—বুঝতে পারছেন না, মিউটিনির আগুনে সর্বনাশ হয়ে গেছে ছেদীর। কাশীতে নির্বিচারে গুলী করে মেরেছে গোরারা। দশ-বারো বছরের ছেলেরা তারা কি বোঝে, তারা মিউটিনি খেলা খেলছিল। একদল সিপাহী সেজে চেঁচাচ্ছিল। তাদের ধরে এনে কোর্ট মার্শাল করে সবগুলোকে।

ছেদী সিং এতক্ষণে বললে,—হামার তিনো বেটাকে হুজুর গাছের ডালমে ফাঁসী লট্‌কা দিলে। তামাম গাঁওমে আগুন লাগায় দিলো। ব্যস সব—।

টপ টপ করে তার চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল।

—তা তোরা ওই ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতে গেলি কেন বাবা? গিরীন্দ্র আচার্য বললে—ওরে কলিশেষে ওদের রাজত্ব রে; একছত্র। বিধির বিধানের বিরুদ্ধে। আঃ!

বীরেশ্বর বললেন—কি করবে বল? এসেছ, বেশ করেছ। ভাল করেছ। তোমার সব ভার আমি নেব ছেদী। তুমি বাঁচলে কি করে তাই ভাবছি আমি। তোমার পায়ে গুলী লাগল, ওরা তবু তোমাকে ছেড়ে দিলে, ফাঁসী লটকালে না, এই আশ্চর্য।

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছেদী বললে—হামাদের জামাইবাবু বিমলাকান্তবাবু হামাকে বাঁচাইলেন হুজুর, উনার বাড়ীমে সে রোজ আসিয়েছিলাম। উনকে হিঁয়া শুনলাম কি গোরালোক—

বীরেশ্বর রায় বাধা দিলেন তাকে।—শুনব ছেদী সিং, ভিতরে এস। বলে ভিতরে চলে গেলেন তিনি।

লাঠিতে ভর দিয়ে একপায়েই সে অনেকটা যেন লাফিয়ে চলার মত ভঙ্গিতে এসে ঘরে ঢুকল। রায় আর্দালীকে বললেন—কাউকে আসতে দিয়ো না। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

•

—তুমি বিমলাবাবুর মোকাম গিয়েছিলে ছেদী?

—হ্যাঁ হুজুর। আপনে ভেজলেন হামাকে, ওহি কাম লিয়ে গেলম, জরুর গিয়েছিলাম হুজুর।

—সে? তাকে দেখতে পাওনি?

ঘাড় নাড়লে ছেদী—না।

—মিথ্যে কথা ছেদী। বিমলাকান্তবাবু তোমার জান বাঁচিয়েছেন বলছ?

উপরের দিকে হাত বাড়িয়ে একটু মুখ তুলে ছেদী ছাদের দিকে তাকিয়ে বললে—বিশ্বনাথজীর নাম সে বলছি হুজুর—ঝুট বাত হম্ কভি বলবে না—আপনা সামনে। কভি না!

ছেদীর মুখে সে কথা খোদাই করা ছিল। বীরেশ্বর তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। চেয়ারের উপর বসেছিলেন, মাথাটা ঠেসানের উপর হেলিয়ে দিয়েছিলেন হতাশায়।

ছেদী বলেছিল—হুজুর।

—যাও তুমি এখন—। বলেই আবার বলেছিলেন—না। দাঁড়াও। তার কোন খবরও পাওনি বিমলাবাবুর কাছে?

—হাঁ হুজুর, সো খবর মিলিয়েসে হুজুর। সো খবর হমি আনিয়েছি।

সোজা হয়ে বসে বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—কোথায়—ছেদী সিং?

—বানারসমে হি হুজুর।

—বানারসমে? তবে যে তুমি বললে—

—হুজুর, মাঈজীকে বিমলাবাবুর কোঠীমে হমি নেহি দেখা হুজুর। মাঈজী হুঁয়া থাকতেন না। থাকেন না। হমি কমসে কম বিশ রোজ বিমলাকান্ত হুজুরকে কোঠীমে গিয়েসি হুজুর—কভি নেহি দেখা। কভি নেহি। বহুরাণীজী দেওকন্যা হ্যায় হুজুর, সতীমাঈকী-মাফিক তপস্যা করতি হ্যায়। বিশ্বনাথজীকে মন্দির যানেওয়ালী গলিমে উনকি সাথ হামরা পহেলা রোজ মুলাকাত হুয়া। বিমলাকান্ত হুজুর উনহি কহলেন—ছেদী, তোমার বহুরাণী যোগিনী বন গিয়েছেন। কাশীমে হি উনি আছেন। উনকি বাপকে সাথ রহতি। লেকিন হামারা পাশসে উনহি কসম কি বাত লিয়েছেন, কি উনকি ঠিকানা কোঈকো হম নেহি দেগা।

ছেদী সিং বলে গেল, বীরেশ্বর রায় স্তব্ধ হয়ে শুনে গেলেন।

প্রথম দিন দুপুরবেলা গিয়ে বাড়ীতে সে বিমলাকান্তকে দেখতে পায়নি। কিন্তু বাড়ীর ছাদে শাড়ী শুকুতে দেখে সে ভেবেছিল, বহুমায়ী এখানেই আছেন। ছেদী সিং জানত বীরেশ্বর রায়ের সন্দেহের কথা। মন তার ঘৃণায়, রাগে ভরে গিয়েছিল। নোকর এসে যখন বলেছিল—বাবুজী ঘরমে নেহি হ্যায়, কছ্‌হরী গিয়া।

ছেদী বলেছিল—মাঈজীকি কহো কি কীরতিহাট সে ছেদী সিং ভেট মাংতা।

নোকরের কথা শুনে তিনি বলেছিলেন—কে ছেদী সিং আমি তো জানি না।

কথাটা ছেদী চাকরের পিছন পিছন গিয়ে অন্দরের দরজার এধারে দাঁড়িয়ে শুনে আর অপেক্ষা করেনি, জোর করে ঘরে ঢুকে বলেছিল—কি মাঈজী, ছেদী সিংকে আপনি চিনছে না? আঃ! কিন্তু কথা সে শেষ করতে পারেনি। সত্যই তিনি অপরিচিতা। একটি সুন্দরী যুবতী, তিনি বহু বটেন কিন্তু বহুমায়ীজী নন।

সে অপ্রতিভ হয়ে মাফ চেয়ে বলেছিল—কসুর হয়েছে মা, কসুর হয়েছে। বহুত কসুর হয়েছে আমার। আমাকে মাফ কর।

তিনি হেসে বলেছিলেন—বুঝেছি বাবা, তুমি কীর্তিহাটের বহুমায়ী, এখানকার সতীমায়ীকে খুঁজতে এসেছ। কিন্তু তিনি তো এখানে থাকেন না বাবা। তিনি—। একটু থেমে ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—সে তো আমি বলতে পারব না। কাশীতে তাঁকে লোকে সতীমাঈ বলে। তাঁর খোঁজ করে দেখো। আর বাবুর সঙ্গে যদি দেখা করবে তো বিকেলে আসতে হবে। বাবুজী কাছারীতে কাম করেন। এখন সিপাহী লোক নিয়ে বহুৎ গোলমাল, তার জন্তেও তিনি খুব ব্যস্ত।

ছেদী জিজ্ঞাসা করেছিল—আপনি? আপনি কে মাঈজী?

মাঈজী হেসেছিলেন এবং একটু ঘোমটা টেনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নোকরটা বলেছিল—

তুমি তো আচ্ছা বেতরিবৎ আদমী। মাঈজী কে? মাঈজী এ-মোকামের মাঈজী! বাবুজীর স্ত্রী।

অবাক হয়ে ছেদী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। মাঈজী হেসে বলেছিলেন—হ্যাঁ বাবা। তুমি অবাক হচ্ছ, তা হবার কথা। তোমরা জানবে কি করে? কাশীতে এসে বাবুজীর সঙ্গে আমার সাদী হয়েছে। ওই সতীমায়ী, তোমাদের বহুরাণীই বাবুকে সাদী করিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছি তোমার মন। তা বসো না তুমি। বিকেলে বাবু আসবেন। তাঁর কাছে সব শুনবে। থাক। রামলাল, বাইরে ওই তোমার কামরায় ওকে বসতে দাও।

বিকেলবেলা চোগাচাপকান পরে বিমলাকান্ত আপিস থেকে ফিরে ছেদী সিংকে দেখে সমাদর করে বলেছিলেন—ছেদী! তুমি! দেশ এসেছ? না, তোমাদের বহুরাণীজীর খোঁজে এসেছ? বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়েছিলে শুনলাম?

লজ্জিত হয়ে ছেদী বলেছিল—হ্যাঁ জামাইবাবু, আমার বহুৎ কসুর হোয়ে গইল হুজুর। আমি ভাবিয়েছিলম—

—হ্যাঁ। তোমাদের বহুরাণীজী এখানে থাকেন।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, না, ছেদী সিং। তিনি, তোমাদের বহুরাণী সাক্ষাৎ দেবী। এখানে তাঁকে লোকে সতীমায়ী বলে। তিনি এখানে কেন থাকবেন বল? তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে থাকেন। আমি তাঁর পতা জানি। কিন্তু আমাকে তিনি কসম খাইয়েছেন, তাঁর পতা আমি কাউকে বলতে পাব না। বিশ্বনাথজীর সামনে আমাকে বলিয়ে নিয়েছেন।

ছেদী সিং কি বলবে ভেবে পায়নি। বিমলাকান্তই বলেছিলেন—আমি বুঝতে পারছি ছেদী সিং, তোমাকে বীরাবাবু তার খোঁজেই পাঠিয়েছে। তার ধারণা তোমাদের বহুরাণী এখানেই থাকেন। কিন্তু না, তা নয়। বীরাবাবুকেও আমি দোষ দেব না ছেদী সিং। দোষ তার নয়। তোমাদের বহুরাণীর এই বোধহয় নসীব! রাজরাণী আজ যোগিনী হয়ে গেল। পার্বতীমাঈ যেমন শিবের জন্য যোগিনী হয়েছিলেন, তোমাদের বহুরাণী ঠিক তাই হয়েছেন। তুমি যদি তাঁর খোঁজে এসে থাক, তবে খোঁজ কর। কাশীধামে দিনের ভাগে কেউ তাঁকে দেখে না। রাত্রে কোন কোন দিন বিশ্বনাথজীর আরতির পর যখন সব লোক চলে যায় মন্দির থেকে, তখন অন্নপূর্ণা মাতাজীর মন্দিরের পাশে কালীমায়ের আস্তানা থেকে তাঁকে বের হতে দেখতে পাবে। সঙ্গে থাকেন তার বাপ, নয় কমলাকান্ত বাবুয়া। কমলাকান্ত তাঁর কাছে থাকে। কিন্তু সাবধান ছেদী, তিনি কথা না বললে তুমি তাঁকে দিক করো না, তাহলে পাণ্ডারা তোমাকে মেরে জখম করে দেবে। তবে কবে যে তিনি আসেন, তাঁর কোন ঠিকানা নেই। সে তাঁর আপনা মরজি আর খেয়াল।

ছেদী অবাক হয়ে শুনছিল। এবার বলেছিল—আমাকে যে একবার তাঁর দরশন পেতেই হবে জামাইবাবু। বীরাবাবু যে আমার বাউরা হয়ে যাবে হুজুর।

—কিন্তু সে তো ফিরবে না ছেদী সিং। তার জন্তে সে জোড়াসাঁকোর জগদ্ধাত্রী বহুজীকে পত্র লিখেছেন, আমি জানি। বীরাবাবুর সাদী দিতে লিখেছেন। আমাকেও এই বয়সে আবার বিয়ে করিয়েছেন। তুমি ফিরে যাও। ফেরা তো এখন কঠিন হবে। চারিদিকে সিপাহীরা হাঙ্গামা করছে। আরাতে জগদীশপুরে কুমারসিং দানাপুরের সাহেবান লোককে কেটেছে। তার থেকে চিঠি লেখ—

—না হুজুর। তাঁর দেখা যে আমাকে পেতেই হবে।

—তবে চেষ্টা কর। দেখ।

তিনদিন পর দেখা পেলে ছেদী সিং। তখন মিউটিনির আগুন জ্বলে উঠবে-উঠবে এমন

সময়। আজিমগড়ে তখন গোলমাল শুরু হয়েছে। আজিমগড় থেকে কোম্পানী সাতের লাখ টাকা বেনারস পাঠাচ্ছিল; আজিমগড়ের দেশী সিপাহীরা টাকাটা আটক করেছিল। কিন্তু সাহেবান লোক জবরদস্তি সে-টাকা শেষ পর্যন্ত পাঠালেন। সেখানে সিপাহীরা ক্ষেপে উঠল। সাহেবরা বিবিলোকের সঙ্গে পল্টনের লাইন ব্যারাকে খেতে বসেছিলেন। গুলী গোলার আওয়াজ উঠতে লাগল। বাইরে বিগল বাজল। আরম্ভ হয়ে গেল মিউটিনি। আগুন জ্বলল আজিমগড়ে। সিপাহীরা কোয়ার্টার মাস্টারকে গুলী করে মারলে। একদল ঘোড়সওয়ার সিপাহী ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পথ থেকে সাত লাখ টাকা লুঠে নিয়ে গেল। টাকা লুঠে নিয়ে সিপাহীরা ছুটেছে ফয়জাবাদের দিকে। খবরটা বেনারসে এসে পৌছেছে দুদিন আগে। ছেদী যেদিন বিমলাকান্তের সঙ্গে প্রথম দেখা করে তার পরদিন। সেদিন শহরে গুজব থাকলেও শহর ঠাণ্ডা ছিল। ছেদী সিং সেদিন সন্ধ্যা থেকে বিশ্বনাথের গলিতে অপেক্ষা করেও মাঈজীকে দেখতে পায়নি। গরমের সময় সে এসে দশাশ্বমেধ ঘাটে শুয়েছিল। দ্বিতীয় দিনও পায়নি। সেদিন খবরটা এসেছে। যা এতদিন চাপা কানাকানি ছিল, তা এবার লোকে মুখ ফুটে বলছে। এইবার যাবে ফিরিঙ্গীলোক। যাবার ওয়ক্ত হয়েছে।

তৃতীয় দিন শোনা গেল—দেশী সিপাহীদের বন্দুক-তলোয়ার সব কেড়ে নেবে। সিপাহীর এর চেয়ে অপমান হয় না।

ওদিকে আদালতের নাজির পণ্ডিত গোকুলচাঁদ আর সুরত সিং কাছারীর মধ্যে সাহেবানদের বিবি আর বালবাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে তুলছেন। তাঁদের সঙ্গে কাজ করছেন বিমলাকান্ত। তাঁর সময় নাই, অবসর নাই। ছেদী বিমলাকান্তের বাড়ীতেই ছিল। সারাদিন গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ফিরত। সন্ধ্যার সময় আসত বিশ্বনাথের মন্দিরে। দাঁড়িয়ে থাকত মন্দিরের দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। খানা গিয়ে পাকিয়ে খেয়ে নিত জামাইবাবুর বাড়ী।

সুরেশ্বর বললে—তুমি জান কিনা জানিনে সুলতা, সেকালে বিহার, ইউ পি-র ব্রাহ্মণ-ছত্রীরা যারা এদেশে আসত, তারা যে-কাজই করুক মাইনে নিয়ে, বাঙালীর রান্না তারা খেত না। বাঙালী মাছ খায় বলে তাদের অভিযোগ বহু পুরাতন, তখন আবার নতুন করে অভিযোগ উঠেছে, বাঙালী আধা-কিরিস্তান হয়ে গিয়েছে, তারা বাবুর্চির হাতে খায়, মুরগী খায়, পিঁয়াজ খায়। ছেদী সিং কাশীধামেও বিমলাকান্তের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও খেতো না। সে জাতে ছিল ছত্রী। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়।

যাক সেকথা। তৃতীয় দিন, যে-কাশীতে ভূমিকম্প হয় না বলে প্রবাদ আছে, সেই কাশী ওই উত্তাপে ভূমিকম্পের মতই যেন মাথা নাড়া দিলে, সঙ্গে সঙ্গে বড় ভূমিকম্পের সময় মাটির ভিতরে যে একটা চাপা গোঙানি শোনা যায়, তেমনি একটা মানুষের চাপা গর্জন উঠল। সেদিন সন্ধ্যে থেকেই লোকের এখান-ওখানে জটলা জমে উঠেছে। ভাঙের দোকানে বিক্রী বেড়েছে। সেদিনও ছেদী ওই অন্নপূর্ণা মন্দিরের দরজার পাশে ঘোরাফেরা করছিল। আরতির কাঁসর-ঘণ্টা থামল। প্রথম প্রহর শেষের নহবৎ থামল; গলিতে লোকজন কমে গেছে, গরু-ষাঁড়গুলি বিশ্রামের জন্ত শুয়ে পড়তে শুরু করেছে, বাজারের দোকানদানীতে ঝাঁপ পড়ছে, ছেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হতাশ হয়ে ফিরেই আসবে বলে উঠি-উঠি করছে, হঠাৎ তার কানে এল, ভিতর থেকে কেউ বললে—জয় সতী মায়ীজী কি!

মিষ্ট নারীকণ্ঠে উত্তর কেউ দিলে—জয় শিউ সীমন্তিনী কি!

চমকে উঠল ছেদী। সে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। একটু ভেবে নিয়ে সিংদরজাকে সামনে করে গলির উল্টোপাশ ঘেঁষে হাতজোড় করে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মশাল হাতে একটা লোক বেরিয়ে এল, তারপর সে যাকে দেখলে, তাকে দেখে তার আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। সতেরো-আঠারো বছরের এক নওজোয়ান। রূপ তার ছিল, রূপবান নওজোয়ান, বুকের ছাতিও এতখানি, মাথায় সে এরই মধ্যে অনেকের চেয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা দেখে ছেদী অভিভূত হয়নি, সে অভিভূত হয়েছে এইজন্যে যে, সে তার চোখ এবং চাউনির মধ্যে, তার নাকের ডগার মধ্যে সে যে নওজোয়ানী কালের বীরাবাবুর চোখ-চাউনি দেখছে। নাকের ডগাটা অবিকল সেইরকম।

মশালচীর মশালের আলোয় গলির ভিতর-ঠাঁইটা আলোময় হয়ে উঠেছে। অবাক হয়ে দেখছে সে। তার সেই দৃষ্টি দেখে সেই নওজোয়ান ধমক দিয়ে বলে উঠল—কৌন হায় তুম? এই!

এবার চমকে উঠল সে। গলার আওয়াজের মধ্যে বীরাবাবুর আওয়াজ, কথা বলার ঢঙের মধ্যে অবিকল সেই ঢঙ। ছেদী জবাব দিতে ভুলে গেল। চেয়ে রইল নওজোয়ানের মুখের দিকে, বাবুয়া—সেই কমলাকান্ত বাবুয়া? কি তাজ্জব!

নওজোয়ান দরজার সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে একেবারে তার সামনে দাঁড়িয়ে আরও গম্ভীর আওয়াজে বললে—কেয়া মাংতা হ্যায়!

ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়ির উপর দাঁড়ালেন যিনি, তাকে চিনতে একমুহূর্তও দেরি হল না ছেদী সিংয়ের। সাত-আট বছর হয়ে গেল, বহুরানীজী একদিন রাত্রে কাঁসাইয়ের ঘাটে গায়ের গহনা খুলে রেখে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন; সেও এই বর্ষার সময়। ভরা কাঁসাই। ভেসে গিয়েছিলেন। তারপর আজ। এই এত দিন পরেও দেখে চিনতে তার এক লহমা দেরি হল না। তার চোখ নওজোয়ান কমলাকান্তের মুখ ছেড়ে তাঁর দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। সে বলতে চাচ্ছে, বহুরানীজী, মাঈজী। কিন্তু তার আওয়াজ বের হচ্ছে না।

—কমলাকান্ত! কি হল? কে যেন বহুরানীজীর পিছন থেকে কথা বললেন।

—এই একটা লোক—

—যেতে দাও। চল।

—কে ও? কে? এবার কণ্ঠস্বর সতী-মাঈজীর।

—বহুরানীমাঈ—! ছেদীর গলা কেঁপে উঠেছিল থরথর করে।

—তুমি ছেদী! ছেদী সিং?

—মাঈজী!

ততক্ষণে লোক জমে গেছে সেখানে। সতীমাঈজী কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। তিনি আসেন, জপ করেন, চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে ধারায় ধারায়। তারপর উঠে চলে যান, কিন্তু আবিষ্টের ভাবটা কাটে না। কখনও কখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। অনেকক্ষণ পর জ্ঞান হয়, তখন তিনি ধীরে ধীরে ওঠেন এবং চলেন কমলাকান্তের পিছনে পিছনে। পিছনে থাকেন তাঁর বৃদ্ধ বাপ। কমলাকান্তের সামনে থাকে মশালচী। শশব্যস্ত হয়ে পথ করে দিয়ে সরে দাঁড়ায় পথের লোক। তিনি কারও সঙ্গে কথা বললে লোক জমবে বইকি! লোকটা কে?

কমলাকান্ত ছেদীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতেই প্রশ্ন করলে—এই সেই ছেদী সিং, ভালো-মা?

সতীমাঈ বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু তুই সর। তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন, ছেদীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ছেদী?

ছেদী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললে—মাঈজী! বহুরানীজী!

—তোমার বাবু কেমন আছেন ছেদী?

—বাবু? হামারা বীরাবাবু?—তার চোখদুটো যেন এক মুহূর্তে ফেটে গেল। জল বেরিয়ে এল দরদরধারে।

পিছন থেকে মাঈজীর বাপ, তাকেও চিনতে পেরেছিল ছেদী, তিনি বললেন—বাসায় চল মা। বাসায় চল। পথের মধ্যে কেন এসব কথা?

মাঈজী বলেছিলেন—এস ছেদী।

—ভালো-মা!

—কি রে?

—আমি ও-বাড়ী চললাম বাবার কাছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাঈজী বললেন—তাই যা।

বীরেশ্বর রায়ের সামনে বসে সেদিনের বৃত্তান্ত বলতে বলতে ছেদী চোখের জল সামলাতে পারেনি। বার বার সে চোখ মুছছিল।

বীরেশ্বর রায় চুপ করে বসে শুনছিলেন। অকস্মাৎ যেন অধীর হয়ে উঠলেন, বললেন—ছেদী, সে কি বললে বল? কি বললে তোমাকে?

—হুজুর! শ্রিফ আপকে বাত। ছেদী, তুমার বাবু কেমন আছেন? বাবুজীর তবিয়ৎ আচ্ছা আছে? বাবুজী তুমার দারু কি বহুৎ বহুৎ পিচ্ছেন? বাবুজীর মেজাজ কি বহুৎ খারাপ আছে? হমি কি বলব হুজুর! বহুরানীজীর পাশ কুছ ছাপি নেহি। তপস্যাসে সবকুছ উনকি মালুম আছে হুজুর। দেওকন্যা, সাক্ষাৎ দেবী হইয়ে গিয়েসেন তপস্যা করকে। হুজুর, সোফি বিবিকি বাত ভি উনকি মালুম হায়। হামার মু দেখলেন আর বলিয়ে দিলেন—আমার খোঁজে আসিয়েসো ছেদী? তুমার বাবু ভেজিয়েসেন? আঁ! হামি কুছ বললাম না হুজুর। ডর লাগলো আমার। দেখলম হুজুর, কেশমে তেল নেহি। সারা বদনমে এক আভরণ নেহি। হাতমে শঙ্খ, বাস্, আর কুছ নেহি। এক বাস হুজুর। লালপাড় এক শাড়ী। বাস্। হামি কুছু বললম না—মাঈজী থোড়া হাসলেন। কহলেন—হমি জানে ছেদী! তুমি বাবুজীকে হুকুম সে আসিয়েসো। উসকে বাদ পুছলেন আপকে বাত। হমি বোলা—মাঈজী, আপকে লিয়ে হামার বীরাবাবুজীর এমুন হালত্। আপনি ফিরিয়ে চলেন মা! চুপসে বৈঠ রহলেন। থোড়া বাদ কহলেন—নেহি ছেদী, সো হোয় না ছেদী। হামার হুকুম নেহি হ্যায়। একতিয়ার নেহি হ্যায়। কালীমায়ী কি হুকুম নেহি। হুজুর, উনকি আঁখোমে পানি আসিয়ে গেল। থোড়া বাদ কহলেন—শুনো, কাল হম এক খত্ লিখ দেগা, উয়ো খত্ লেকে যাও। বাবুজীকে সবকুছ লিখ দেঙ্গে। তুম যাও, বাবুজীকে দেও। আওর উনকে কহো—ফিন সাদী করনেকো লিয়ে।

—এত্তো মোটো চিঠ্ঠি হুজুর। তিন রোজ লিখিয়েছিলেন। হামি ওহি মোকামমে ছিলাম। আঁখসে দেখা হুজুর, মাঈজী লিখলেন আর কাঁদলেন। একদফে চিঠি লিখলেন, উ ছিঁড়িয়ে দিলেন। ফিন লিখলেন। ঘরসে নিক্‌লালেন না। রাতমে কালীবাড়ীমে যাইলেন না। চিঠ্ঠি লিখা শেষ করকে উনকি বুড্ঢা বাপজীকে দিলেন। উনি পড়লেন। বললেন—বেকয়দা তুমি লিখলে মায়ী, রায়বাবু এ-চিঠ্ঠি ফেক্ দিবেন, ছিঁড়িয়ে দিবেন। মাঈজী কহলেন—নেহি বাপুজী, জরুর পড়বেন। কহলেন—আপনে এখুন সব কথা লিখিয়ে দিন। উতো হমি লিখবে না। উনকি বাপুজী তব আর চিঠ্ঠি লিখলেন; দোনো চিঠ্ঠি এক করকে

লিফাফা বন্দী করকে হামকে দিলেন, কহলেন—তুম জলদি চলে যাও ছেদী। সিপাহীলোককে সাথ গোরা-সাহেবলোককে লড়াই শুরু হো যায়েগা, তুম চলে যাও।

ওহি চিঠ্ঠি লিয়ে হমি গেলম জামাইবাবুকে হুঁয়া। জামাইবাবু ভি এক খত্ লিখ দিয়া হিঁয়াকে ঠাকুরমহারাজকে দেনে কো লিয়ে। উ দুনো খত্ লিয়ে হমি হামার ঘর যানেকে লিয়ে—

চিঠি নিয়ে নিজের বাড়ী যাবার জন্তে বেরিয়েছিল ছেদী। হঠাৎ পথে গোলমাল শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল। লোকজন ছুটছিল। গোরাদের সঙ্গে সিপাহীদের হাঙ্গামা বেধেছে। ইংরেজ কাপ্তেন কর্ণেল নীলের কড়া হুকুমে সিপাহীদের ক্যাণ্টনমেণ্টের মাঠে ডেকে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। সামনে কামান বারুদে ঠেসে তৈরী করে রাখা হয়েছিল সাজিয়ে। বন্দুক বা হাতিয়ার কেড়ে নেওয়ার মত অপমান আর নেই সৈনিক-জীবনে। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। এক্ষেত্রে কামানগুলোর মুখের মধ্যে সিপাহীরা দেখতে পেয়েছিল আরও কিছু। সেটা এই গোরাদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। পলাশীর মাঠ থেকে যত লড়াই লড়ছে তারা হিন্দুস্থানের বুকে, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে, তারা ঠিক এই পথে লড়াই ফতে করেছে। তবু তারা প্রথমে মাথা হেঁট করে তাদের হাতিয়ার নামিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কাপ্তেনের হুকুমে যখন গোরার দল সিপাহীদের নামিয়ে-রাখা হাতিয়ার দখল করতে এগিয়েছিল, তখন আর তারা স্থির থাকতে পারেনি। তারা লাফ দিয়ে পড়ে পরিত্যক্ত বন্দুক কুড়িয়ে নিয়ে শুরু করেছিল ফায়ারিং। মরতে যখন হবে, তখন লড়াই করেই মরবে। বিদ্রোহই ভাল। কানে তাদের বেজে উঠেছিল নানাসাহেব তাঁতিয়া তোপীর আওয়াজ।

সাধারণ মানুষ ছুটে পালাচ্ছিল। ছেদী তার বাড়ীর পথে পড়েছিল এরই সামনে। এবং কিছু করবার আগেই একটা গুলী এসে লেগেছিল তার পায়ে। পড়ে গিয়েছিল উপুড় হয়ে। রাত্রির অন্ধকার নামছে তখন।

ছেদী বীরেশ্বরবাবুকে বলেছিল—হুজুর, সেই আঁধিয়ারার মধ্যে পা টেনে টেনে এসে পৌঁচেছিলম গলির মুখে। সেটা জামাইবাবু বিমলাকান্তজীর বাড়ীর গলি। সেখানেই পড়েছিল সে।

—রাত কেতনা ঘড়ি মালুম নহি থা।

কাশীতে সেদিন সন্ধ্যা থেকে নহবৎ বাজেনি। কাঁসরঘণ্টা যেমন বাজে তেমন করে বাজেনি। বিলকুল সবকুছ যেন বদলে গিয়েছিল সেদিন। এরই মধ্যে দুজন দেশোয়ালী তাকে তার অনুরোধে পৌঁছে দিয়েছিল বিমলাকান্ত জামাইবাবুর মোকাম।

তারপর দু মাহিনা যে কিভাবে তার কেটেছে সে জানে না। বিমলাকান্তজী আর তার নতুন বহুজীর তদারকীতে, কবিরাজজীর দাওয়াই-এ কোনরকমে ভাল হয়ে সে উঠল বটে, কিন্তু তখন তার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। তিন বেটার ফাঁসি হয়েছে। ঘর-দোর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সে নিজে হয়ে গিয়েছে ল্যাঙড়া। লাঠি ধরে সেই বানারস মুলুক থেকে কলকাতা আসতে তার ক্ষমতা ছিল না।

—হুজুর, আমার মগজ গিয়েছিল খারাপ হয়ে। দিনরাত কেঁদেছি। শেষে মাতাজী আমার খবর পেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাসায়। সেখানেই ছিলাম এতদিন। এতদিন পর—। হঠাৎ শুনলাম, কমলাকান্তবাবুরা আসছেন বাঙলামুলুক। সঙ্গে আসছেন মাতাজী।

ছেদী শুনে মাতাজীকে হাতজোড় করে বলেছিল—মাতাজী! এ গরীবকে তুমি নিয়ে চল মাতাজী। আমি আমার হুজুরের কাছে বাত্ দিয়েছিলাম, জান থাকলে আমি ফিরব। জান

আমার আছে। কিন্তু কথার খেলাবীর কসুর দিন দিন পথল হয়ে উঠছে। সে দোনা খণ্ড আমার বটুয়ার মধ্যে আজও আছে। আমি তাকে দেব। কথার খেলাবীর কসুর থেকে আমি খালাস হয়ে যাব।

* * *

চমকে উঠলেন বীরেশ্বর রায়।

—কমলাকান্ত? কমলাকান্ত ভবানী এসেছে? কোথায়?

—কমলাকান্ত বাবুজী আসিয়েসেন বিমলাকান্ত জামাইবাবুর আপনা বাড়ী শ্যামনগর। আর মাঈজী চলিয়ে গেলেন উনার পিতাজীর সাথ মে।

—কোথায়? জয়নগরের বাড়ীতে?

—না হুজুর। কোই দুসুরা জাগা—হুঁয়া এক ভারী কালীমন্দিল আছে।

বীরেশ্বর রায় চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—চিঠি কই। যে চিঠির কথা বলছিলে।

ছেদী চিঠি বের করে দিলে। মোটা চিঠিই বটে। কাগজ পুরোনো আর ময়লা হয়ে গেছে।

* * *

এই সেই চিঠি সুলতা।

সুরেশ্বর কাগজের বাণ্ডিলটার রেশমী কাপড়ের আবরণ খুলে বের করলে পত্রখানি। সে আমলের তুলোট কাগজের মত কাগজ। পিছনের দিকটা ময়লা হয়ে গেছে। চিঠিখানা কপালে ঠেকিয়ে সে সযত্নে চিঠিখানা খুললে। বললে—চিঠিখানা স্বামীকে স্ত্রীর লেখা চিঠি হলেও, গোপন করবার মত প্রেমপত্র নয়। তিনি নিজেই পত্রে লিখেছেন—শোন, প্রথমটা পড়ে শোনাই।

শ্রীচরণাম্বুজেষু,

সহস্রকোটি প্রণামপূর্বক নিবেদনমিদং। স্বামীন! আপনি আমার পরম দেবতা। লক্ষ্মীর নিকট নারায়ণ যদ্রূপ, সতীর নিকট মহেশ্বর যদ্রূপ, আমার নিকট আপনিও তদ্রূপ। সীতা যেমন রামের নিকট অগ্নিপরীক্ষা দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, তিনি রামচন্দ্র ব্যতিরেকে চিন্তায়, কর্মে, দেহে অপর কাহাকেও ভজনা করেন নাই, কামনা করেন নাই, তদ্রূপ পরীক্ষায় প্রাণ বিসর্জন দিতে পারিলে আমি পরম ভাগ্যবতী মনে করিতাম। সেদিন আপনার পদাঘাতে যখন আমার ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছিল, তখন আর আমার নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কারের অবধি ছিল না। হায়, আমি কি করিলাম, কোন্ অপরাধে আমার অদৃষ্টে এমন ঘটিল, তাহার আর কোন-প্রকার কূলকিনারা করিতে পারি নাই। তথাপি আপনাকে বিশ্বাস করিতে কহিতেছি, আমাদের ইষ্টদেবী জগদম্বা কালীমাতার দিব্য করিয়া কহিতেছি যে, আপনাকে আমি দোষারোপ করিতে পারি নাই। আমি নিজেও ভাবিয়া পাই নাই—কমলাকান্ত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া জামাইবাবুর মত দেখিতে হইল! আপনি পুনরায় মদ্যপান করিতে লাগিলেন, আমি নিজেকে এমত অপরাধিনী ধার্য করিলাম যে, আপনার চরণতলে পতিত হইয়া মিনতিপূর্বক নিষেধ করিতেও সাহসিনী হইলাম না। নিরন্তর তাপিত হইয়াই তুষানলেই দগ্ধ হইতে লাগিলাম। কারণ তখনও পর্যন্ত আমি আমার পূর্ণ পরিচয় জ্ঞাত হই নাই। আমার পালক-পিতা—বলিতে গেলে তাঁহাকেই আমার পিতা বলিয়া জানি, তাঁহার স্ত্রীকেই আমার মাতা বলিয়া জানিয়াছিলাম, শুধু শুনিয়াছিলাম, আমার পিতা সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন।

আমার পালক-পিতা আপনাকে যতটুকু বলিয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা একটি কথাও অধিক তিনি কোনদিন বলেন নাই। আর বলিতেন—আমার জন্মদাতা তান্ত্রিকসাধক পিতার নাম প্রকাশ করিতে তাঁহার এবং আমার গর্ভধারিণী মাতার নিষেধ আছে। এবং ইহা লইয়া আমি কোনদিন কোন কথা চিন্তাও করি নাই। একটা কথা আরও বলিতেন—পিতৃকুলকে উদ্ধার করিবার জন্যই আমার জন্ম। দেবতার ইচ্ছায় আমার জন্ম। তিনি প্রথম স্থির করিয়াছিলেন আমাকে আজন্ম কুমারী রাখিবেন। যে-কোন অশুদ্ধ পাপমতি আমাকে বিবাহ করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে। সেই কারণেই আপনার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তিনি আপনাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন—আপনি মদ খাইবেন না। আপনার সহিতও বিবাহ দিতে তাঁহার মত ছিল না। কিন্তু বাসরঘরে আপনার বাজনার সঙ্গে গান গাহিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এবং এই প্রস্তাব আপনি করিয়াছেন শুনিয়া আমি আনন্দসাগরে ভাসিয়াছিলাম, আমার জগদ্ধাত্রী সইকে বলিয়াছিলাম—সই, তোর ঠাকুমাকে বল, উনি বাবাকে বলিয়া দিউন—আমি বিবাহ করিব। আমার বাবা বরাবর আমার বাল্যকাল হইতে বলিতেন—ভবানীর বিবাহ দিব না। বারণ আছে। আমার গর্ভধারিণী জননীর কথা মনে নাই, তবে আমি যাঁহাকে মা বলিয়া চিনিয়াছিলাম, তিনিও তাহাই বলিতেন। বলিতেন—ভবানী কুমারী থাকিবে—দেবতার আদেশ। কিন্তু ওই বাসরঘরের ঠাকুমা যখন বাবাকে আমার নাম করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কন্যা বিবাহ করিতে চাহিতেছে, তখন তুমি বিবাহ দিবে না কেন, তখন বাবা মত করিয়াছিলেন। এবং আপনাকে আমার যেসব কথা বলিয়াছিলেন ও আপনাকে যে শর্ত করাইয়াছিলেন, সেসব কথা আমাকে বলিয়াছিলেন—আমি প্রথম শুনিয়াছিলাম যে, আমার জন্মদাতা দেবতার অভিশাপে রোষে পড়িয়াছেন, তিনি জীবিত বা মৃত তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি জীবিত থাকিলে অনন্ত দুঃখ এবং মৃত হইলে নরক ভোগ করিতেছেন—আমাকে তপস্যা করিয়া তাঁহাকে শাপমুক্ত করিতে হইবে। ইঁহার অধিক তিনি আমাকে কোন কথা বলেন নাই। বলিয়াছিলেন—তাহা জানিতে চাহিয়ো না। মঙ্গল হইবে না।

তাহার পর কমলাকান্তের জন্ম হইল; দিদি তাহাকে আমার কোল হইতে কাড়িয়া লইলেন। সেসময় বাবা আসিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়া বলিয়াছিলেন—হয়তো মা, তোমার উপরেও মাতা রুষ্ট হইলেন। নতুবা এমন হইবে কেন। আমি চুপ করিয়াই ছিলাম, কোন কথা কহিতেও পারি নাই। তাহার পর দিনে দিনে আমার অদৃষ্ট মন্দ হইল, আপনি কমলাকান্তকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, আমার চতুর্দিক আমি অন্ধকার দেখিলাম। তাহার পর এই কাণ্ড ঘটিল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কি মনে হইল—এই খিড়কীর ঘাটের সিঁড়িতে আসিয়া বসিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে সিদ্ধপীঠের দিকে হাতজোড় করিয়া বলিলাম—আমাকে বলিয়া দাও আমি কি করিব? অবশেষে আমার মনই বলিল—তুমি মর। ওই লাথিখাওয়া মুখ আর কাহাকেও দেখাইয়ো না। তখন গহনাগুলি খুলিয়া পুঁটলি বাঁধিয়া ঘাটে রাখিয়া জয় মা বলিয়া ঝাঁপ দিলাম। ভাসিয়া গেলাম। কিন্তু আমার এমনই অদৃষ্ট আমি মরিলাম না। কংসাবতীর প্রবল বন্যাও আমাকে গ্রাস করিল না।

বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া একখানা ঘরের চালে আসিয়া ঠেকিয়া প্রাণের তাড়নায় হয়তো আমিই সেটাকে চাপিয়া ধরিয়াছিলাম। সেই চালটার সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া লাগিলাম হলদীর একটা বাঁকের চড়ায়। সেই চালের উপর একটা বিষধর গোখুরা সর্পও ছিল। হতভাগিনীর ভাগ্য, সেও আমাকে দংশন করিল না। আমি নিজে তখন অজ্ঞান, জ্ঞান ছিল না, মৃতবৎ সেই চড়ায় আটকানো চালের সঙ্গে পড়িয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে ঝড় থামিয়াছে, প্রভাত হইয়াছে,

রোদ দেখা দিয়াছে। হলদীতে তখন ভাটির টান পড়িয়াছে। অনতিদূরের গ্রামের লোকেরা বাহির হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া আমাকে তদ্রূপ অবস্থায় দেখিয়া প্রথমে মৃত ভাবিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, ওই সর্পদংশনে আমার মৃত্যু ঘটিয়াছে। গ্রামের একজন ওঝা আসিয়া ওই সর্পটিকে ধরিয়া পরে আমাকে ধরাধরি করিয়া ডাঙায় তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে আমার মৃত্যু হইয়াছে কিনা। কিন্তু সর্পবিষের কোন লক্ষণ প্রাপ্ত হয় না এবং আমার মধ্যে তখনও জীবনের লক্ষণ দেখিতে পায়। তখন তাহারা আমাকে দৈবরক্ষিত বলিয়া অনুমান করে ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বাঁচাইতে চেষ্টা করে, লবণ দিয়া আমার সর্বাঙ্গ চাপা দেয়। অনেকক্ষণ পর আমার জ্ঞান ফেরে। কিন্তু সেইদিনই জ্বরাক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ি। আমি জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, দয়া করিয়া তোমরা যেন কোন অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়াইয়ো না। কারণ তাহাদিগের মধ্যে আমি কাহারও গলায় উপবীত দেখি নাই। এবং কয়েকজন মুসলমানকেও দেখিয়াছিলাম। একজন অতি সম্ভ্রান্ত মানী মুসলমান মিয়া মোকদ্দের টুপি মাথায় একটি ঘোড়ার উপর বসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি অতিকষ্টে বলিয়াছিলাম,—আপনি আমার পিতার মত, আমি আপনার অভাগিনী কন্যা। আর পরিচয় কি দিব?

সেই মহানুভব মিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—মা, তোমার কোন আশঙ্কার কারণ নাই। তুমি আমাকে পিতা বলিলে, আমিও তোমাকে কন্যাই বলিতেছি। নিশ্চিন্ত থাক। আমরা ধর্মে মুসলমান, কিন্তু আমাদের বংশে যোগসাধন আছে। লোকে আমাদিগকে ঠাকুর বলিয়া থাকে। আমরা মুসলমান হইলেও, কাহাকেও জোর করিয়া কখনও মুসলমান করি নাই।

আমার চক্ষুদ্বয় হইতে জল নির্গত হইল। তাহা দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন—বুঝিয়াছি মা, এই দুর্যোগে তোমার ঘর ভাঙিয়াছে—বন্যার জল ঢুকিয়া ঘর ভাসাইয়া ভাঙিয়া গিয়াছে। চালের উপর উঠিয়াছিলে। চালটা বন্যার তুফানে ভাসিয়াছে।

তখন আমার একটা কম্প আসিয়াছে, দুরন্ত শীত করিতেছিল, কোন উত্তর দিবার ক্ষমতাও ছিল না এবং কিবা উত্তর দিব—খুঁজিয়াও প্রাপ্ত হই নাই।

তখন সেই সম্ভ্রান্ত মিয়াসাহেব ওই গ্রামেরই এক ব্রাহ্মণের ঘরে আমাকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দেন। এইখানেই দীর্ঘ একমাস আমি রোগভোগ করি। সে প্রায় অচেতন অবস্থায় কাল কাটিয়াছে। একজন সন্ন্যাসী আমার চিকিৎসা করেন।

রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পর ঠাকুরসাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মাঠাকুরানী, সন্ন্যাসীঠাকুর বলিয়াছেন—তুমি অতি পুণ্যবতী ও ভাগ্যবতী ধর্মপ্রাণা। এক্ষণে তুমি অনেকটা আরোগ্যলাভ করিয়াছ, এতকাল অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলে, তোমার বুকে শ্লেষ্মা জমিয়াছিল, বহুকষ্টেই সন্ন্যাসীর চিকিৎসায় সারিয়াছ, এক্ষণে বল, তোমার কে কোথায় আছেন, তাঁহাদের সংবাদ প্রেরণ করি। তাঁহারা আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।

আমি আপনার পরিচয় তাঁহাকে দিতে পারি নাই, আমার বাবার পরিচয় দিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম—যদি কৃপাপূর্বক কোন বিশ্বাসী লোক দ্বারা আমার লিখিত পত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন, তবে তিনি আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। এবং আমার পিতাঠাকুরকে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

এই ঠাকুর মিয়াসাহেবদের অধীনে এই গ্রামে অনেক দুর্ধর্ষ লোক বসবাস করে। ঠাকুর মিয়ামহাশয়েরা তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গোয়ান আছে, যে গোয়ানরা নদীতে ডাকাতি করিত তাহারা ইহারাই। আরও অনেক বাগ্দী আছে। তাহারা খুব সাহসী

লোক। তাহাদের মধ্যে পিক্রু গোয়ান এই পত্র লইয়া গিয়াছিল এবং পনের দিনের মধ্যে বাবাকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। বাবা আসিলে আমি তাঁহার পদে কান্দিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিলাম। বাবাও আমার মস্তক বক্ষে ধরিয়া অনেক ক্রন্দন করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি ইহা জানিতাম মা, আমি ইহা জানিতাম বলিয়াই তোমার বিবাহ দিতে চাহি নাই। তোমার গর্ভধারিণী তিনি সাক্ষাৎ সতীদেবী ছিলেন, তিনি ইহা আমাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—পিতৃকুলের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এই কন্যাকে করিতেই হইবে। জগজ্জননীর পূজা-অর্চনা করিয়া কুমারী ভাবেই কাল কাটাইবে, ইহার বিবাহ দিবেন না। এবং সেইদিন আমাকে আমার জন্মকথা, সত্য পরিচয় বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া বলেন। সমস্ত শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম, অনেক কাঁদিলাম এবং বলিলাম—সেদিন বিবাহের পূর্বে আমাকে এসব কথা বলেন নাই কেন। হায়, তাহা হইলে তো এমত ঘটনা ঘটিত না। আমার যাহা হইত হইত, যাহা হইল হইল, আমি যাঁহাকে বিবাহ করিলাম, যিনি আমার দেবতাতুল্য, তিনি তো এমত যাতনা পাইতেন না।

বাবা কি বলিবেন? দীর্ঘক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—তোমার প্রাক্তন। আর আমার ভ্রম। আমি ভাবিয়াছিলাম এসব কিছু আদৌ ঘটিবে না। অনেকেই আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু সেসব কি কখনও ঘটে?

অতঃপর অনেক চিন্তা করিয়া আমার পিতা আমাকে লইয়া আমার দাদা বিমলাকান্ত জামাইবাবুর নিকট আমাকে লইয়া আসেন। এবং তাঁহাকে আমার জন্মবৃত্তান্তের কথা, আমাদের পিতার কথা খুলিয়া বলেন। এবং আমার পিতার বাহুতে যে তাঁহার নামাঙ্কিত রূপার চৌকা তাবিজ ছিল, তাহা ও তাঁহার পরিত্যক্ত তন্ত্রশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা লেখা কাগজ-পত্রাদি, এমন কি বিমলাকান্তদাদার মাতামহের হস্তলিখিত সাধনপদ্ধতির খাতা প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শন করেন। দাদা কান্দিয়া আকুল হইলেন। আমার পিতাকে বলিলেন—হায়, এসব কথা আগে বলেন নাই কেন? আপনি জানেন না কি অন্তর্যাতনায় আমি দগ্ধ হইয়া আসিতেছি। আমি বুঝিতে পারিতাম না, কেমন করিয়া আমার সহিত কমলাকান্তের এমন সাদৃশ্য আসিল! একথা যখন আপনি জানিতেন যে, আমি এবং ভবানী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং ভগ্নী, তখন একথা শ্রীযুক্ত রায়কেই (অর্থাৎ আপনাকে) বা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই কেন? তাহা হইলে তো এমত দুর্ঘটনা ঘটিত না। এক্ষণে চলুন তাঁহার নিকট যাই, সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলি। কিন্তু আমার পিতা বলিয়াছিলেন—না। ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। ভবানীর মাতা, তিনি আমার ভগ্নীতুল্যা, তাঁহার নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এবং ইহা প্রকাশ করিলে তোমাদের পিতৃবংশ নরকস্থ হইবেন। এবং তোমার পিতা, তিনি জীবিত কি মৃত আমি জানি না, তাঁহার আর এই অভিশাপ কখনও মোচন হইবে না।

অতঃপর কাশীধামে আমাকে লইয়া আসা স্থির হয়। স্থির হয়—সেখানে আমি সংযম নিয়ম পালনপূর্বক ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া ৺রী মাতার নিকট দ্বাদশ বর্ষ ব্রত পালন করিব।

তদবধি কাশীতেই রহিয়াছি, সেই ব্রত পালনই করিতেছি। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইতে আর অল্পদিন বাকী আছে। আমার জন্মদাতা পিতা বোধহয় মৃতই হইবেন। কারণ আমার পিতা কামাখ্যা অঞ্চলে কামাখ্যাদেবীর পাণ্ডাগণের দ্বারা অনেক খোঁজখবর করিয়াছেন, কিন্তু কোন সন্ধানই কেহ প্রাপ্ত হন নাই। দ্বাদশ বর্ষ অন্ত হইলে ভাবিয়াছি দেহত্যাগ করিব। মা-গঙ্গা রহিয়াছেন—পতিতপাবনী তিনি, কাহাকেও বিমুখ করেন না। এবার আর ভ্রম করিব না। এবার হরপদ বন্দন করিয়া আশ্রয় লইব। এবং ব্রত শেষ হইলে ভরসা আছে মহামায়াও

আমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্য বাঁচাইবেন না। অত্রসহ আমার বাবাকে বহু অনুরোধ করিয়া আমার পিতার সকল বৃত্তান্ত লিখাইয়া অত্র পত্রের সহিত পাঠাইলাম। দেখিবেন—এ হত-ভাগিনীর ভাগ্যের কিরূপ দয়ামায়াহীন খেলা। দ্বাদশ বর্ষ গত হয় নাই বলিয়া বাবা লিখিতে চাহিতেছিলেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম—তবে কি আমি আমার পতিদেবতার নিকট অপরাধিনী হইয়া থাকিব? ইহার পূর্বেও এরূপ মনে হইয়াছে, কিন্তু আপনি সোফিয়াকে লইয়া সুখে আছেন ভাবিয়া বাবাকে এমন অনুরোধ করি নাই। আজ ছেদীকে আমার সন্ধানে পাঠাইয়াছেন—দেখিতে পাঠাইয়াছেন আমি কাহার সহিত বাস করি, কিরূপ আমার মতিগতি, আপনি সোফিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ বুঝিতেছি কি মনঃপীড়া আপনি হতভাগিনীর জন্য ভোগ করিতেছেন। ছেদী স্বচক্ষে সমুদয় দেখিল। আমি কাশীতে আসিয়া অবধি আমার আপন দাদা হইলেও বিমলাকান্ত জামাইবাবুর সহিত পৃথক বাস করিতেছি। আমার ব্রহ্মচারিণী ব্রতে আমি পিতা ও পুত্র ব্যতীত কাহাকেও স্পর্শ করি না। লোকে এখানে আমাকে সতীমাতা বলিয়া থাকে। এবং আমি জোর করিয়া দাদার আবার বিবাহ দিয়াছি।

কমলাকান্ত আপনার মতই জেদী হইয়াছে। যত বড় হইতেছে, তত আপনার সহিত সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইতেছে। কণ্ঠস্বর অবিকল আপনার মত ভারী। জোরে কথা কহিলে আপনার গম্ভীর কণ্ঠস্বর মনে করিয়া অনেক সময় চমকিয়া উঠি।

আমার পিতার আকৃতিই সে পাইয়াছে। আমার দাদা, তাহার মাতুল, তিনিও অবিকল তদীয় পিতার মত—তদনুযায়ীই তাঁহার সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেন। কমলাকান্ত আজও তাঁহার আত্মবৃত্তান্ত জানে না। দ্বাদশ বর্ষের ব্রতের পূর্বে জানাইব না। জানাইতে অত্যন্ত ভয় হয়।

পরিশেষে এই হতভাগিনীর অসংখ্য কোটি প্রণাম জানিবেন। এবং এ দাসীর এই মিনতি-পূর্বক নিবেদন যে, এ মন্দভাগিনীকে ভুলিয়া যাইবেন। আমার পিতার অপরাধ—সে-অপরাধ বাবার পত্রে জ্ঞাত হইবেন। আমার সংসারে স্থান নাই, আমার ইহা প্রাক্তন। আপনি এ দাসীকে বিস্মৃত হইয়া পুনরায় বিবাহাদি করিয়া সংসারধর্ম পালন করিবেন। জীবনে সুখী হইবেন। পত্র শেষ করিতে মন চাহিতেছে না। মনে হইতেছে—আরও অনেক লিখি।

জন্মজন্মান্তরে আবার যেন ভাল ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া আমার স্বামীন্, আমার আরাধ্য দেবতাকেই প্রাপ্ত হই—এই আশীর্বাদ করিবেন। অধিক আর কি। ইতি—

আপনার চরণাশ্রিত দাসী
একান্ত মন্দভাগিনী
ভবানী দেবী

* * *

চিঠিখানা পড়া শেষ করে সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর রুমালে চোখ মুছে বললে—যখনই চিঠিখানি পড়ি সুলতা, তখনই জল আসে আমার চোখে।

সুলতা চিঠিখানা তার হাত থেকে নিয়ে চিঠিখানি দেখলে। তাকিয়েই রইল চিঠিখানার দিকে।

সুরেশ্বর উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার একখানা ছবির কাছে। এখানা সেই ছবি, যে ছবিতে শ্যামাকান্তের মৃত্যু হচ্ছে। এক পাশে বীরেশ্বর রায়, এক পাশে ভবানী দেবী, পায়ের তলায় পিছন ফিরে বিমলাকান্ত, কিন্তু তাঁর মুখের একপাশ দেখা যাচ্ছে। তাতে আলো পড়েছে

এবং বোঝা যাচ্ছে দাড়ি-গোঁফ, ঝাঁকড়া চুল, শীর্ণ মুখ, মুখের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত, শ্যামাকান্তের সঙ্গে কি আশ্চর্য মিল রয়েছে নাকের এবং কপালের। কাল সুলতা এই ছবিখানার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছিল ওই সন্ন্যাসীর মুখে ধুনির আলোর দীপ্তি কি আশ্চর্য কৌশলে টেনেছে সুরেশ্বর! যেন খানিকটা অলৌকিকত্বের আভাস এনে দিয়েছে।

সুলতা ভবানী দেবীর লেখা চিঠিখানা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। বললে—চমৎকার হাতের লেখা। আর চিঠির মধ্যে অন্তরের আশ্চর্য আকৃতি! ভারী দুঃখ হচ্ছে। জান সুরেশ্বর, ভারী দুঃখ হচ্ছে!

সুরেশ্বর ফিরে এসে নিজের আসনে বসে বললে—কিন্তু দুঃখকে তিনি জয় করেছিলেন। হার মানেন নি।

—সব কালেই তাই। কিছু মানুষ জন্মায় আশ্চর্য শক্তি নিয়ে, তারা হার মানে না, জেতে। তাদের জন্যেই মানুষ জেতার পথে এগিয়ে চলে। সে আমি বলছি না। আমি বলছি—অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে এই কষ্ট যারা করেছে, তারা ঠিক পথ ফেলে কত এগিয়ে যেত বল তো!

সুরেশ্বর বললে—ও তর্ক আমি করব না সুলতা। কারণ ভবানী দেবী ছাড়া এর জবাব তোমাকে কেউ দিতে পারেন না। তাঁর বিশ্বাস মিথ্যে, একথা তুমি যেমন নির্ভুল বিশ্বাসে বলছ, তেমনি বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে তিনিই পারেন বা পারতেন জবাব দিতে। আমি মাঝখানের মানুষ। তাছাড়া আমি কোন বিচার করিনি এঁদের। আমি দেখেই বা এঁদের সম্পর্কে জেনেই শেষ করেছি। যে অপরাধ তাঁরা নিজে স্বীকার করে গেছেন, তাঁদের উত্তরাধিকারী হিসেবে তার দায় আমি মাথা হেঁট করে বোঝার মত তুলে নিয়েছি।

দপ্তরটা খুলে সে চিঠিখানা রেখে, আরও একখানা চিঠি খুঁজে বের করলে। এবং টেবিলের উপর রাখলে। আগে বের-করা মহেশচন্দ্র মুখুজ্জে অর্থাৎ ভবানী দেবীর পালকপিতা বা ধর্ম-বাপের চিঠিখানা নিয়ে খুললে। বললে—ভবানী দেবী তাঁর বাবাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন যে চিঠি, এখানা সেই চিঠি। মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্যামাকান্তের জীবনের প্রথম দিকটা শ্যামাকান্তের কাছেই শুনেছিলেন। মহেশচন্দ্র ইংরেজী শিখেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে প্রথম বন্দোবস্তই বল, আর জবরদস্তি দখলই বল, পেয়েছিল চব্বিশ পরগণা। এবং তারা ব্যবসা এবং জমিন দখলই শুধু করে নি, তার সঙ্গে তারা তাদের সুসভ্য ক্রীশ্চান ধর্মের প্রচারও শুরু করেছিল এই অঞ্চলেই। এখনি তুমি বলছিলে—ভবানী দেবী যদি ধর্মের অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি পেতেন, তাহলে কত সুখেরই না হ'ত। কত কল্যাণই না হ'ত। কিন্তু মানুষ ঈশ্বর, ধর্ম বা কোন ইজম মাথায় না করে বিপ্লব, দেশজয়, রাজ্যস্থাপন, এমন কি ব্যবসাতে জিনিসে ভেজাল দিতে পারে না। কালোবাজারেও খেলা খেলতে পারে না। দেশের বহু ধর্মশালা, গোরক্ষিণী সমিতি তার সাক্ষী। অশোক ধর্মবিজয় করেছিলেন বৌদ্ধমতে। মুসলমানেরা এসে শুধু বাদশাহী করেনি, তাদের আল্লাকে এনে হিন্দুদের পুতুল ভেঙে এদেশে বসাতে চেয়েছিলেন। মুসলমানকে হঠাতে যখন ইংরেজ এল, তখন তাদের সঙ্গেও মিশনারীরা এসেছিল, আমাদের খৃষ্ট ভজাতে, বাইবেল পড়াতে, কোট-পেন্টালুন পরাতে, ইংরিজী শেখাতে। চব্বিশ পরগণায় অনেক প্রচারক এসে মিশন খুলেছিল। মহেশচন্দ্র এদের কাছে ইংরিজী শিখেছিলেন, তারপর চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু ক্রীশ্চান হন নি। এও মানেন না, ও-ও মানেন না, এমনিতর মানুষ। সেই চাকরি নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন গৌহাটি। ইচ্ছে ছিল, দেশে আর ফিরবেনই না। কারণ দেশের সমাজের তরফ থেকে তাঁকে মিশনারীদের সংস্রবে প্রায় পতিতই করেছিল। নিতান্ত কাঁচাবয়স তখন, বাইশ বা তেইশ। গৌহাটিতে খাসিয়াদের ইংরেজী শেখাবার চাকরি; তার

সঙ্গে অসমীয়া এবং বাঙালীদের মধ্যে খৃষ্টমহিমা প্রচার ছিল আর একটা দায়িত্ব।

সেইখানে দেখা হয় শ্যামাকান্তের সঙ্গে। কামাখ্যা পাহাড়ে ওই মন্দিরের এলাকার মধ্যে পাগলের মত ঘোরে, কখনও কাঁদে, কখনও হাসে। লোকে বলে—মহাসাধক!

মহেশচন্দ্র হাজার হলেও হিন্দুর ছেলে; বেলপাতা তুলসীপাতার মাহাত্ম্যে বিশ্বাস না করুন, বেলপাতা তুলসীপাতার রসকে উপেক্ষা করতেন না। অসুখে-বিসুখে খেতেন। আসাম তখন কালাজ্বরের এলাকা। তুলসীপাতা বেলপাতা জ্বরের প্রতিষেধক। সেটা ওখানকার লোকের কাছেই তিনি পেয়েছিলেন। লোকে বলত—এ হল পাগলাবাবার ওষুধ। পাগলাবাবা নিজের হাতে তুলে বেলপাতা বা তুলসীপাতা দেয়, ছেঁচে রস করে খেলে জ্বর সারে। পাগলাবাবার নামডাক খুব। কিন্তু লোকজনকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে।

এইসব শুনে মহেশচন্দ্র তাকে তিরস্কার করতে এবং তার সঙ্গে তর্ক করতেই গিয়েছিলেন প্রথমদিন। সেসময় এই পাগল একটা একতারা বাজিয়ে গান করছিল। যেমন তার কণ্ঠস্বর, তেমনি তার তাল আর মানের উপর অধিকার। সব থেকে বড় কথা গানের আকর্ষণী এবং মানুষকে অভিভূত করার শক্তি! জনকয়েক পাণ্ডা আর যাত্রী পাগলাবাবার গান শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মত; মহেশচন্দ্রও গিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তাদের সঙ্গে গান শুনতে বসে গিয়েছিলেন।

গান শেষ করে যন্ত্রটা রেখে পাগল সাধু কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে থাকতে কাউকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেছিল।

লোকজনেরা কেউ কিছু বলে নি, কিন্তু মহেশচন্দ্র বলেছিল—এই সন্ন্যাসী ওহে! শুনছ! কি বলে তোমাকে, পাগলবাবা? এই পাগলা! এই!

হঠাৎ চোখ মেলে সন্ন্যাসী তাকে দেখে বলেছিল—কি?

—এমন কুবাক্য, অশ্লীল বাক্য বলে গালাগাল করছ কেন?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সাধু হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠেছিল—হা-হা-হা, হা-হা-হা, হা-হা-হা!

মহেশচন্দ্র বলেছিলেন—তুমি সাধু, তুমি সন্ন্যাসী, তোমার কাছে মানুষ ভাল কথা শুনতে চায়। তুমি খারাপ কথা বলছ, এ কি রকম সাধু তুমি?

পাগল খানিকটা ধুনির ছাই মুঠো করে তুলে বলেছিল—খাবি?

—ছাই কেন খাব? তুমি খেতে পার?

—দূর বেটা, ছাই কেন হবে, চিনি। এই দেখ না খাচ্ছি আমি। বলে মুখে খানিকটা পুরে দিয়ে স্বচ্ছন্দে খেয়ে নিয়ে বাকীটা অন্য লোকেদের দিয়ে বলেছিল—খা তো রে, তোরা খেয়ে দেখ তো! দেখিয়ে দে তো ওকে!

সকলেই খেয়ে বলেছিল—চিনি!

সাধু সামান্য অবশিষ্টটুকু এবার তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিল—দেখ না রে বেটা, দেখ না! চেখেই দেখ না!

বিস্মিত হয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। ছাইয়ের স্বাদ তো নয়! স্বাদ তো চিনির স্বাদই বটে! এতেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। এর পর প্রায় নিত্যই যেতেন সাধুর কাছে। এবং ক্রমে ক্রমে সাধুর অন্তরঙ্গও হয়ে উঠেছিলেন। সাধুও যেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

মধ্যে মধ্যে সাধুর পাগলামি বাড়ত। অহরহ অশ্লীল বাক্যে গালাগাল দিয়ে বেড়াত। যাকেই দিক, সে যে কোন নারী, তাতে সন্দেহের অবকাশই রাখত না পাগল। শালী

হারামজাদী শব্দেই তার পরিচয় থাকত। শুধু তাই নয়, তখন আবর্জনা ক্লেদ মেখে দাপাদাপি করত। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার থাকত না।

প্রথমবার যেবার মহেশচন্দ্র সাধুর এই অবস্থা দেখেন, সেবার তাঁর গভীর মমতা হয়েছিল। মমতাবশতঃই তিনি সাধুকে জোর করে ধরে স্নান করিয়ে দিতেন, জোর করেই খাওয়াতেন। সাধু কাঁদতেন হাউ-হাউ করে। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। বেশী উগ্র হয়ে উঠলে জোর করে বশ মানাতেন। মহেশচন্দ্র বলশালী মানুষ ছিলেন।

এই এতেই সাধু সেবার কয়েকদিনের মধ্যেই শান্ত হয়েছিলেন। এবং মহেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—আমার আর একটি কাজ করবি তুই ?

মহেশচন্দ্র—কি বল ?

গোড়া থেকেই মহেশচন্দ্র তাকে তুমি বলেছিলেন, আপনি আর বলেননি। সাধুও তাকে বলেছিলেন—আমাকে তুই তুমিই বলিস। গালাগালি সম্বোধন করে বলেছিলেন—তুই বেটা ভাল লোক রে! ভাল লোক।

সেদিন সাধু বলেছিল—আমার উত্তরসাধক হবি তুই। দেখ, আমি তাকে টেনে এনেছি। কাছে কাছে ঘুরতে হয় তাকে। ঘোরে, কিন্তু ধরতে আর পারছি না। কিছুতে না! তাতেই তো রাগ করে তেড়ে ধরতে যাই—গালাগালি করি, কিন্তু এমন যে ধরা যায় না। আসল আসন হচ্ছে না, বুঝলি না!

মহেশচন্দ্র বলেছিলেন, সে আমি পারব না।

—পারলে ভাল হত রে! তোকে আমি সিদ্ধির বিভূতি দিতাম। বুঝলি না!

—উঁ-হু। দেখ—ওতে আমার—

—কি ? বিশ্বাস তোর এখনও হয় নি ?

—বিশ্বাস নয়, বিশ্বাস আর কি করে না করি! তুমি পার অনেক রকম। কিন্তু ওতে রুচি নেই আমার!

—দূর বেটা! রুচি ? রুচি কি রে ? রুচি ? খুব তো রুচি করে ঘি-ময়দার লুচি করে খাস। মিষ্টান্ন খাস। পোলাও খাস। খেয়ে হবার মধ্যে হয় তো রক্ত আর বিষ্ঠা। ওরে বেটা, যা খাবি তাতেই ও দুটো হয় রে। রুচি! বলে হা-হা করে হেসেছিলেন।

—দেখ, যা পারব না, তা ব'ল না।

—তা'হলে আর একটি কাজ করবি ?

—ভাল লাগলে পারব। বল!

—দেখ, আমার একটি নারায়ণশিলা ছিল। বুঝলি! সৌভাগ্যশিলা। সেটি একজন আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। বুঝলি! ওই শিলা আমিও একজন বৈষ্ণব সাধুকে মেরে কেড়ে নেবার মতলব করেছিলাম, তা সে বোষ্টুম সন্ন্যাসী দিয়ে দিয়েছিল। তারপর আমার কাছ থেকে একজন,—আমাকে তুফানের মত বানে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়েছে। ভেবেছিল আমি মরে যাব। তা মরি নাই আমি। বেঁচে চলে এসেছি কামাখ্যাতে। বেটা জমিদার। ও মুলুকে আমাকে দেখতে পেলে মেরে ফেলত। তাই এখানে এসেছি, সাধন করব বলে। কিন্তু সেই শিলার পূজো আমি এখান থেকে উদ্দেশ্যে রোজ করি। বুঝলি! কিন্তু হচ্ছে কি জানিস ? পূজোতে গোলমাল বাধছে। সেই ছুড়িটার পূজো করতে গিয়ে মায়ীর পূজো করে বসি। আবার মধ্যে মধ্যে মায়ীর পূজোতে সেই ছুড়িটার পূজোর মন্তর বলে ফেলি। বেলপাতা দিতে তুলসীপাতা দি। আবার তুলসী দিতে বেলপাতা দি। ওই নারায়ণ পূজোটি

তুই আমার হয়ে করে দিবি। হ্যাঁ, দিবি!

—কি সব পাগলের মত বল, আমার মাথায় ঢোকে না!

—ঢোকে না? তবে সব বলি শোন, তাহলে বুঝবি!

* * *

শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—মাগী আমাকে আচ্ছা ধাপ্পা দিলে সেদিন। বুঝলি! একবারে ষোড়শী যুবতী। মড়া হয়ে ভেসে এল জোয়ারে। টকটকে লালপাড় শাড়ী পরনে, এই চুল একরাশ জলে ভাসছে মাথায় সিঁদুর টকটক করছে। পাড়ের ওপর লোকেরা দাঁড়িয়ে হায়-হায় করছে, আঃ, কার ঘর ভেঙে দিয়ে সতীলক্ষ্মী জলে ভাসলো গো! হায়-হায় হায়-হায়। আমি তখন চিনেছি। ঠোঁটে হাসি দেখতে পেলাম। স্পষ্ট দেখলাম। বুঝলাম এসেছে, আসতে হয়েছে! হ্যাঁ, পড়লাম জলে ঝাঁপিয়ে। হাত্তির মত জোয়ার ঠেলে গিয়ে ধরলাম চুলের মুঠোয়। ধরলাম যদি তো ঢেউয়ে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল আমার বুকে। ডুবিয়ে মারবার ইচ্ছে, বুঝলি না! মেরে ফেলবে আমাকে। তা আমিও শ্যামাকান্ত, ঠেলে ফেলে দিয়ে চুল ছেড়ে কাপড়ের আঁচল দাঁতে ধরে নিয়ে এলাম টেনে। কিনারায় এসে জলে ভাসিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এলাম ক্যাওড়াতলায়। কাঁধে করে তুলে গাছের ডালে বেঁধে রাখলাম। রাত্রিটা ছিল চতুর্দশী, কৃষ্ণপক্ষ। বসব ওই মড়ার উপর আসন করে। হ্যাঁ। তারপর কারণ করতে বসলাম। কারণ আর জপ। সিদ্ধি আর মারে কে?

রাত্রে বসলামও। তারপর—।

ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিলেন শ্যামাকান্ত সেদিনের স্মৃতি স্মরণ করে। কিছুক্ষণ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে কামাখ্যা পাহাড়ের ওপাশে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের দিকে তাকিয়েছিলেন।

হঠাৎ বললেন—দেখ, মরা মেয়েটার মুখখানা ছিল অবিকল বিমলার মায়ের মত দেখতে। বিমলা আমার ছেলে। বুঝলি! রাত্রে মড়াটা নামিয়ে এনে গণ্ডীটণ্ডী কেটে তার মধ্যে তাকে রেখে মুখের ঢাকাটা খুলে দিয়ে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করে আসন করে বসতে যাব, এমন সময় দেখি কি জানিস? এ তো সে মড়া নয়! এ তো বিমলার মায়ের মুখ নয়! এ যে এ যে—ওরে, দেখি ঠিক যেন আমার মায়ের মুখ। অবিকল রে অবিকল! আর মরা তো নয়, এ যে চোখ খুলে তাকাচ্ছে!

ভয়ে আমি পিছিয়ে গেলাম। পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম, আবার তাকালাম, দেখলাম—না তো! এ তো সেই মুখ! হ্যাঁ! সেই যেমন বানে ভাসবার সময় হাসি দেখেছিলাম, তেমনি হাসছে যেন! যেন ডাকছে, বলছে—এস এস। আসন করে বস, ভয় ক? বুঝলি, কানের কাছে যেন ফিসফিস করে বললে।

ধুনি জেলেছিলাম। ধুনিতে আগুন জ্বলছে। আমি দেখছি। হ্যাঁ, ঠিক সেই। ঠিক। আবার ইষ্ট স্মরণ করে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু যত যাই এক পা এক পা এগিয়ে ততই যেন পাল্টে যায়। স্পষ্ট দেখলাম, কই, সিঁথিতে তো সিঁদুর নাই। বয়স যেন কমে গিয়েছে। ছোট হয়ে গেছে মড়াটা। থমকে দাঁড়ালাম। এ কি? এ কি? এইসময় হঠাৎ হল কি জানিস, দুটো জন্তু—শেয়াল না কি জন্তু—কালো মত দেখতে, খ্যা-খ্যা করে ঝাপটাঝাপটি করতে করতে এসে পড়ল সেই ধুনির ওপরে। বুঝলি! জ্বলন্ত ধুনি নিভে গেল। আর সে কি চিৎকার! খ্যা-খ্যা করতে করতে আওয়াজ যে কি বিকট হয়ে উঠল, কি বলব! চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে তখন, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় হাজার খানেক শেয়াল ডেকে উঠল। হুয়া-হুয়া-হুয়া-হুয়া!

আমার মনে হল, হা-হা-হা-হা করে হাসছে। আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি। বুকের মধ্যে যেন ঢাক পিটছে। নিঃশ্বাস নিচ্ছি, মনে হচ্ছে পচা মড়ার গন্ধে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমন সময় মনে হল কে যেন আমার একখানা হাত চেপে ধরলে। কনকনে ঠাণ্ডা একখানা হাত। সমস্ত শরীর চমকে উঠল। আমি চিৎকার করে উঠে হাতখানা ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাতে গেলাম। কোথায় পালাব? তখন অমাবস্যার কোটাল ডেকেছে গঙ্গায়, আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জোয়ার বাচ্ছে কালীমন্দিরের দিকে। সেই দিকে ভেসে এসে ধাক্কা খেলাম একটা গাছের শিকড়ে। মনে হল মরে যাব। কিন্তু কোনরকমে আঁকড়ে ধরলাম তার শেকড়টা। আস্তে আস্তে সামলে নিয়ে ওই শেকড়টা ধরে ধরে পাড়ে উঠে আর খাড়া হতে পারলাম না। সেই শিকড়ে মাথা দিয়ে পড়ে রইলাম।

—আমার আর কিছু মনে ছিল না। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। একে শীতকাল, তার উপর সমস্ত রাত্রি ওই জোয়ারে ভেসে এসে গাছের শেকড় ধরে কাদার উপর পড়ে থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলাম, এক বৈষ্ণব সাধু একটা গোলপাতার ছাউনি ছোট ঘরের মধ্যে কড়াইয়ে আংরা করে আমাকে তাপ দিচ্ছেন। সাধুর মাথাতে জটা, কপালে বৈষ্ণবদের হরিচন্দনের তিলক। গলাতে মোটা তুলসীকাঠের মালা। আমাকে চোখ মেলতে দেখে বললেন, কেয়া বাবা, আব আচ্ছা মালুম হোতা?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—আঃ, মহেশ, এই সাধুর সঙ্গে যদি দেখা না হত। বুঝলি। আঃ।

আবার অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন শ্যামাকান্ত। সেই সেইকালের কথা মনে পড়েছিল।

*　　　*　　　*

সুরেশ্বর মহেশচন্দ্রের চিঠিখানা খুলে ধরে বললে—এইখানটা পড়ে শোনাই তোমাকে সুলতা। বীরেশ্বর রায়কে শ্যামাকান্তের বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে এইখানটায় লিখেছেন—তুমি মদীয় জামাতা, পুত্রস্থানীয়, তোমাকে অকপটে কহিব যে, হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও প্রথম বয়সে পাদ্রীদের কাছে ইংরাজী শিখিয়া এইসব সাধনভজনের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ফলাফলের সত্যতা সম্পর্কে আজও সম্যক পূর্ণ বিশ্বাসী নহি। শ্যামাকান্ত তদীয় এই সময়কার বৃত্তান্ত কহিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—সাধু আমাকে আমার চার জন্মের কথা বলিয়াছিলেন। জন্ম-জন্মান্তরের কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে শক্ত হইয়াছিল সেদিন। আজও সংশয় আছে, কিন্তু শ্যামাকান্তের সংশয় ছিল না।

শ্যামাকান্ত সেদিন চোখে মেলেছিলেন বটে কিন্তু পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে লেগেছিল এক মাস। শ্লেষ্মাদোষে জ্বর হয়েছিল তাঁর। বৈষ্ণব তাঁকে ফেলে দেন নি। তিনিই তাঁর সেবা করে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন। বরং সেইসময় তাঁকে তিনি বলেছিলেন তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের কথা। এক জন্ম নয়, চার জন্মের বৃত্তান্ত। প্রথম জন্মে শ্যামাকান্ত নাকি পিশাচ-সিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই জন্মে নাকি এক মেয়েকে তিনি ভালবেসেছিলেন, কিন্তু সে মেয়ে ছিল বড়ঘরের, তার ধনদৌলত ছিল, আর চার জন্মের আগের শ্যামাকান্তের কিছু ছিল না, গরীব ঘরের ছেলে ছিল সে। এক জমিদার রাজা ঘরের ছেলে সে মেয়েকে বিয়ে করেছিল। চার জন্ম আগের শ্যামাকান্ত সেই দুঃখে ক্ষোভে পিশাচসিদ্ধ হবার সাধনা করেছিল। হয়েছিল সে পিশাচসিদ্ধ। পিশাচকে দিয়ে সে সেই মেয়ের স্বামীকে মেরে ফেলেছিল। কিন্তু সে মেয়েকে সে পায় নি। সে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরেছিল। তখন শ্যামাকান্ত সেই পিশাচকে দিয়ে শুরু করেছিল ব্যভিচার-অত্যাচার। শেষে পিশাচই তাকে একদিন বধ করেছিল।

দুসরা জনমে নাকি তিনি হয়েছিলেন বড়া ভারী জমিদার। সে ওই পিছলা জনমের ফল। বহুৎ ভোগ করেছিল। তবু লালসা তার মেটেনি। দেওতার সেবাও করেছিল। তার ফলে তিসরা জনমে হয়েছিল যোগী। বহুৎ খেয়ালী আদমী। রাজা-মহারাজা-বাদশা তাকে খাতির করত, কিন্তু তাতেও তার লালসা মেটেনি। কি হ'ল তার যোগে, যদি সে তামাম দুনিয়ার মালিক না হল! ব্রহ্মচারী ছিল, না হলে যোগ হয় না, কিন্তু তাতেও তার ক্ষোভ ছিল। তাই শেষজীবনে সে শক্তি-সাধনা শুরু করেছিল—সে শক্তির মালিক হবে। এই তার চৌথা জনম। সে তারই জের টানছে। লেকেন—।

শ্যামাকান্ত হেসেছিলেন, লেকেন কি বাবাজী? লেকেন!

—লেকেন, বাবা, ওহি পিশাচটো! উ তুমকো নেহি ছোড়তা!

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—সেই শালাই তাহলে সেদিন রাত্রে আমার সাধন পণ্ড করেছে! ঠিক বলেছ তুমি!

—হাঁ বাবা, পহেলে উসকো ভাগানেকা জরুরৎ হ্যায়।

সন্ন্যাসীকে বড় ভাল লেগেছিল শ্যামাকান্তের। সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছিলেন—বাবা, কিছু-দিন তুমি শুদ্ধাচারে ক্রিয়া-করম কর। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণের আচারে নিজেকে শুদ্ধ কর। পিশাচ অশুদ্ধ আত্মা, তোমার আত্মা শুদ্ধ হলে সে ভাগবে।

তাই করতে শুরু করেছিলেন শ্যামাকান্ত। ইতিমধ্যে এসেছিল গঙ্গাসাগর স্নানের তিথি। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগর যাবেন বলেই এসেছিলেন কালীঘাট। এখান থেকেই নৌকা-টৌকায় কোনমতে জায়গা করে নেবেন। আরও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসবে, সঙ্গী জুটে যাবে। আরও কয়েকবার তিনি সাগরতীর্থ গিয়েছেন। শ্যামাকান্তও বলেছিলেন—তিনিও যাবেন তাঁর সঙ্গে।

মহেশচন্দ্রের চিঠিখানা আবার তুলে নিয়ে সুরেশ্বর বললে—সুলতা, মহেশচন্দ্র লিখেছেন—"কিন্তু শ্যামাকান্ত পুণ্যার্জনের জন্য সাগরতীর্থে যাইতে চাহেন নাই। তিনি আমাকে বলিয়া-ছিলেন—ওই বৈষ্ণব সাধুর নিকট এক দুর্লভ নারায়ণশিলা ছিল। ওই শিলাটির অর্চনা তিনি যখন করিতেন, তখন আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লক্ষণ হইতে বুঝিয়াছিলাম, এই শিলাকেই বলে সৌভাগ্যশিলা! এ শিলা যাহার নিকটে থাকে, তাহার সৌভাগ্যের অন্ত থাকে না। দরিদ্র রাজা হয়। গৃহী অশোক হয়। এ শিলাকে সহায় করিয়া মানুষ যে সাধনাই করুক, তাহাতে সে নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করে।

শ্যামাকান্ত একদিন সাধুকে প্রশ্ন করেছিলেন—এ শিলাটি কোথায় পেলেন গোসাঁইজী?

সাধু বলেছিলেন— এ শিলা আমি বদ্রীনাথের পথে এক সাধুনীর কাছে পেয়েছিলাম।

—এ কি শিলা বাবা! সৌভাগ্যশিলা নয়?

হেসে গোসাঁই বলেছিলেন—সৌভাগ্য কামনা করে অর্চনা করলে এ সৌভাগ্যশিলা। যা চাও, তাই মেলে। ধন-দৌলত, মনস্কামনা পূরণ—সবই দেবেন উনি। আর কিছু না চাইলে উনি দেন পরমধন বাবা, চৈতন্য। উনি আসলে হলেন চৈতন্যশিলা।

—হুঁ।

গোসাঁই বলেছিলেন—ঝুটা বাত আমি আর বলি না বাবা। আমি যখন প্রথম সন্ন্যাসী হই, তখন আমি ভালো আদমী ছিলাম না। চোর ছিলাম।

—চুরি করেছিলেন এই শিলা?

—তা বলতে পার। সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘুরছিলাম কিছুদিন। তাঁর কাছে রোটির ভাবনা হত

না। রোটি তিনি দিতেন। মতিও ফিরেছিল। তিনি মরবার সময় আমাকে এই শিলা দিয়ে বলেছিলেন—দেখ বেটা, এই শিলা সাগরসঙ্গম মে বিসর্জন দেনা। হাঁ, তিন দফে হম সাগর-তীরথ গিয়া, ওহি কো লিয়ে, লেকেন দিল নেহি উঠা।

বাবা, গিয়েছি বিসর্জন দিতে, কিন্তু পারি নি, ফিরে নিয়ে এসেছি। তারই জন্ম এবারও চলেছি বাবা। এবার ঠিক করেছি নিশ্চয় বিসর্জন দিয়ে আসব।

শ্যামাকান্ত যেতে চেয়েছিলেন ওই শিলাটির লোভে। ওই শিলা পেলে তাঁর মনস্কামনা নিশ্চয় পূর্ণ হবেই হবে।

গঙ্গাসাগরে গিয়ে শ্যামাকান্ত মুহূর্তের জন্ম গোস্বামীর সঙ্গ ছাড়েন নি। তিনি ফেলে দিলেই শ্যামাকান্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নেবেন। কিন্তু বিচিত্র কথা, গোস্বামী রোজ ওই শিলাকে ঝুলিতে পুরে বুকে ঝুলিয়ে নিয়ে স্নান করে এলেন, কিন্তু বিসর্জন দিতে পারলেন না।

শ্যামাকান্ত রোজ জিজ্ঞাসা করেছেন—কই, বিসর্জন দিলেন না গোসাঁই?

গোসাঁই বলতেন—নেহি বাবা। নেই সকা! কিছুতেই পারলাম না। পারছি না, পারব না!

শ্যামাকান্ত মনে মনে হিংস্র হয়ে উঠছিলেন। মনের মধ্যে নানান কুটিল অভিপ্রায় জেগে উঠছিল। কিন্তু এই গোসাঁই তাঁকে সেদিন মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন। এতটা নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ তিনি হতে পারেন নি। কিন্তু মনের মধ্যে দ্বন্দ্বেরও শেষ ছিল না। শেষ ওই গঙ্গা-সাগর থেকে ফিরবার আগের দিন রাত্রে শ্যামাকান্ত অস্থির হয়ে উঠেছিলেন—ও শিলাটি তাঁর চাই। সৌভাগ্যশিলা! ওই শিলাই তাঁর জন্মজন্মান্তরের পিশাচকে তাড়াবে, তাঁকে সিদ্ধি দেবে। ওটি তাঁর চাই!

তখন গভীর রাত্রি। মাঘ মাসের প্রথম, সাগরদ্বীপের শীত। বাতাস বইছিল। শ্যামাকান্ত ঘুমুতে পারেন নি, গোস্বামী সাধুর পাশেই শুয়েছিলেন। তিনি এই দ্বন্দ্বের মধ্যে ঘুমুতে না পেরে উঠে বসলেন।

মনের মধ্যে তাঁর কুটিল খেলা চলছে।

উপকার করেছে! ধুত্তোর, কিসের উপকার? আমার মৃত্যু হবার হ'লে ও বাঁচাতে পারত? যে সিদ্ধিতে মরাকে বাঁচানো যায়, তা ওর নেই, ও বেটা পায় নি। তা ছাড়া ওর গুরু ওকে বলেছিল—এ শিলাকে সাগরতীর্থে বিসর্জন দিতে। বেটা চারবার এসে পারলে না। এ তো ওর নয়। ওকে যদি—!

পাশে একটা ধুনি জলছিল। শীতের জন্মও বটে, জানোয়ারের জন্মও বটে। সেটাতে কাঠ চাপিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে সেটাকে উজ্জ্বল করে তুলছিলেন শ্যামাকান্ত। তারই দীপ্তিতে ঘুমন্ত সাধুকে দেখছিলেন।

কম্বলের বালিশ করে শুয়েছে গোসাঁই। ঝুলিসমেত সৌভাগ্যশিলাটিকে বেটা কম্বলের ভাঁজের মধ্যে পুরে রেখেছে। মাথার গোড়ায় ছোট্ট সিংহাসনে ছোট্ট আধ হাত পরিমাণ উঁচু রাধাকৃষ্ণমূর্তিটি রয়েছে। বেটার ভয় হয়েছে, না হয় কঠিন লোভ ওই শিলার ওপর। রাধাকৃষ্ণমূর্তি চুরি যাক, তা সহ্য হবে। এ শিলা চুরি সইবে না।

ক্রমাগত ধুনিতে ফুঁ দিচ্ছিলেন শ্যামাকান্ত। এবং একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন ওই আগুনের দিকে। মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছিলেন সাধুর দিকে। ইচ্ছে হচ্ছিল—

হঠাৎ গোসাঁইয়ের সাড়ায় শ্যামাকান্ত দৃষ্টি ফেরালেন সন্ন্যাসীর দিকে। দেখলেন, গোস্বামী সাধুও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

গোস্বামী সন্ন্যাসী উঠে বসলেন। বললেন—ঘুম আসছে না তোমার?

শ্যামাকান্ত উত্তর দেন নি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই ছিলেন তাঁর দিকে।

গোস্বামী বললেন—ওই শিলাটির জন্যে, না?

শ্যামাকান্ত এবার বলেছিলেন—হ্যাঁ, গোসাঁই। ওটি তোমাকে বিসর্জন দিতেই হবে। তুমি বিসর্জন দেবে—আমি তুলে নোব। ওটিকে আমাকে পেতেই হবে। ওটি আমার চাই গোসাঁই!

—না দিলে?

—না দিলে? প্রশ্নের পুনরুক্তি করে সাধুর চোখে চোখ রেখেই তাকিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত, তাঁর পলক পড়েনি। কিন্তু মনে যা হচ্ছিল—তা বলতেও পারেননি।

—জবরদস্তি কেড়ে নেবে?

—তা নেব গোসাঁই! ও আমার চাই!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোসাঁই বলেছিলেন—তাতে যদি আমার জান নিতে হয় তাও নেবে! নয়?

—তা—।—

—একবার গাঁজা সাজ বাবা। গাঁজা খাই। তারপর তাই হবে। তাই নাও। ও তোমারই হয়েছে। ওর যা দেবার তা আমাকে ও দিয়েছে। চৈতন্য হয়েছে আমার।

হেসেছিলেন সাধু।

গাঁজা খেয়ে ঝুলিসুদ্ধ থলিটি নিয়ে ভোরবেলা সঙ্গমস্থলে এসে জলে ডুবিয়ে থলির দড়ি শ্যামাকান্তের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, নাও, ধর। কিন্তু এরপর তুমি আর আমার সঙ্গে এস না। হ্যাঁ!

—আমার একতারা আর লোটা কম্বল নিতে হবে।

—সে আমি ঝোপড়ীর বাইরে রেখে দিচ্ছি গিয়ে। তুম উঠা লেকে চলে যাও ভাই। ঝোপড়ীর বাইরে লোটা কম্বল আর একতারাটি তুলে নিয়ে পা বাড়াবেন শ্যামাকান্ত, ভিতর থেকে সন্ন্যাসী বললেন—আর এক বাত ভাই!

—কি?

—এই সাগরতীরথে বাত দাও কি—তুমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধি হলে—ওই শিলাকে এই সঙ্গম তীরথে বিসর্জন দেবে!

—দেব!

সন্ন্যাসী কাঁদছিলেন—তাঁর কথার ভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরের মধ্যে তা প্রকাশ পাচ্ছিল। কথার স্বর কাঁপছিল।

কিন্তু শ্যামাকান্ত তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। তিনি পেয়েছেন। এবার তিনি পেয়েছেন। এই যে শিলা—সৌভাগ্যশিলা—একে দিতেই হবে—তিনি যা চান। সিদ্ধি তাঁকে দিতেই হবে।

শবাসন হোক বা যে আসন হোক করে বসবার আগে—যন্ত্র আঁকতে হবে। সেই যন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুর স্থান আছে। পূজা আছে। চতুর্দ্বারে বিষ্ণু-শিব-সূর্য-গণেশ।

—ওঁ বিষ্ণবে নমঃ শিবায় নমঃ ওঁ সূর্যায় নম গণেশায় নমঃ।

তারপর—মহামেঘ প্রভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্র পিধায়িনীং—।

এবার তিনি পেয়েছেন।

একতারা বাজিয়ে নৌকোর আসর জমিয়ে রেখে ফিরেছিলেন শ্যামাকান্ত।

তাদের কথার মধ্যে এসে ঘরে ঢুকল অর্চনা।

অর্চনার হাতে শালপাতে মোড়া কিছু। সুরেশ্বর কথা বন্ধ করে বললে—আয়। কখন ফিরলি?

—এই তো। গাড়ী থেকে নেমেই উপরে আসছি। রঘু বললে—সুলতাদি এসেছেন—কাজ আবার লালবাবু সেই কালকের কথা ফের আরম্ভ করেছে। নাও—মাথাটা নামাও।

—কি? ও কালীঘাট গিয়েছিলি বুঝি!

—হ্যাঁ মায়ের নির্মাল্য।

মাথা হেঁট করলে সুরেশ্বর। মাথায় নির্মাল্য ঠেকিয়ে দিয়ে অর্চনা বললে—তোমার হয়ে আমি মাথায় ঠেকালাম সুলতাদি। তোমায় দিতে গেলে তুমি পড়বে অস্বস্তিতে। তোমায় না দিয়েও আমার তাই হচ্ছে।

সুলতা হেসে বললে—আমার কল্যাণটাও তোমার হোক।

—তাই হোক। আচ্ছা আমি চলি—সুরোদা। এখনও চা খাই নি।

—কেন? অতুলের ওখানে যাস নি?

—গিছলাম। কিন্তু সন্ধ্যে করবার সুযোগ পেলাম না, বললামও না। ভাল লাগল না আমার। যে অতুলকা—মিটিং করতে যাবার সময় কি কোন কাজে যাবার সময় মেজদির হাতে মায়ের পুষ্প মাথায় না ঠেকিয়ে যেত না, সমিতি গড়বার সময় কালীমাকে ধ্যান করত; পুজো করত; সে বলে—পুষ্প-টুষ্পে বিশ্বাস নেই অর্চি, ও আমায় দিসনে। দেবোত্তরের কথায় বললে—শরীকরা ঠিক বলছে, জমিদারী সরকার নিচ্ছে, নেওয়া উচিত—ও পাপ থাকা উচিত নয়, কিন্তু যা খাস জমি আছে তা দেবতার নামে থাকার কোন মানে হয় না। ও হল জমিদারীর হাতী ঘোড়া লোক লস্কর না হোক কুলীন ঘরজামাইয়ের সামিল। আলাদা মহল তার পূজক পুরোহিত, বাল্যভোগশীতল-অন্নভোগ! কেন? আমি বললাম—সে কি ছোটকা, তুমি এই কথা বলছ? বললে—বলছি! কারণ ওসব এযুগে অচল। তুই বলিস সুরেশ্বরকে। বলিস আমি বলেছি। দেবোত্তর ক্যানসেল করে দিক। কমপেনসেসনের টাকা শরীকেরা ভাগ করে নিয়ে নতুন করে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বাঁচুক। আচ্ছা বলব, বলে আমি উঠে চলে এলাম। জান, ব্রজদা পথে কাঁদলে। বললে—অতুল কথাটা এমন করে বললে!

সুরেশ্বর বললে—ব্রজদারো চা জলখাওয়ানোর ভার তোর উপর রইল অর্চি!—

তোমাদের দুজনকেও খাওয়াব। সন্ধ্যে করে উঠে চা খেয়ে রান্না চড়াব। ঠাকুরকে বলে এসেছি—আমি আসছি। রান্না আমি করব। আরও আছে। তাও বলব।—তোমার কথা তুমি শেষ কর। কথা নয়—জবানবন্দী। কতদূর হ'ল?

সুরেশ্বর বললে—শ্যামাকান্ত সৌভাগ্যশিলা নিয়ে কালীঘাট ফিরছেন!

অর্চনা চলে গেলে সুলতা বললে—বড় ভাল মেয়ে।

—হ্যাঁ। রায়বাড়ীর সব শুভ, সব কল্যাণের ভাণ্ডার হল মেয়েটি।

—কিন্তু লেখাপড়া শেখাও নি কেন? এইসব মেয়ে কি হ'ত বল তো?

হেসে সুরেশ্বর বললে—অর্চনা এম-এ পাস করেছে সুলতা।

—এম-এ পাস করেছে?

—হ্যাঁ। বিধবা হবার পর কি করব, ওকে পড়িয়েছিলাম। টপটপ করে পাস করে গেল। হিন্দু ফিলজফি খুব ভাল করে পড়েছে। তার জন্যে সংস্কৃত পড়েছে বাড়ীতে।

চুপ করে রইল সুলতা।

সুরেশ্বর বললে—ওর কথা এখন থাক সুলতা। ওর লেখাপড়া শেখার সময় ও যখন বি-এ পড়ে, তখন আর একজন ওর সঙ্গে পড়ত। সেসব কথা সবই শুনবে। সবই রায়বাড়ীর জবানবন্দীর অন্তর্ভুক্ত। এখন একশো তেত্রিশ বছর আগে ফিরে চল। কীর্তিহাট রঙ্গমঞ্চে রায়বাড়ী নাটকের তখন প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্য প্রায়। কুড়োরাম রায়-ভটচাজ নাটক শুরু করে দিয়ে গত। সোমেশ্বর নায়ক, তাঁর সন্তান নেই। তাঁর সঙ্গে শ্যামাকান্তের দেখা হয়েছিল কালীঘাটে। সৌভাগ্যশিলা পেয়ে শ্যামাকান্ত পাগলবাবা সিদ্ধির প্রত্যাশায় প্রমত্ত হয়ে উঠেছেন। সিদ্ধি তাঁকে পেতেই হবে। সৌভাগ্যশিলা তাঁর সহায়। তাঁর কথা নাকি তখন ফলতে শুরু করেছে। যাকে বলে বাকসিদ্ধি। তখন তাঁর ভক্ত জুটেছে। কেউ আসে রোগের জন্যে, কেউ আসে বিপদের জন্যে। শুনেছি, বশীকরণের জন্যেও ধনী গৃহিণীরা আসতেন, আবার ধনীজনেও আসতেন জুড়ি হাঁকিয়ে।

তখন সতীনের যুগ। বড়লোকদের তিন-চার স্ত্রী, কি তারও বেশী স্ত্রী থাকতেন। তাঁদের গৃহিণীদের মধ্যে স্বামী সমাদরের প্রতিযোগিতা চলত। সে যত্নসেবা থেকে বশীকরণ পর্যন্ত নানান পথে চলত সতীনে সতীনে লড়াই। ধনীরা আসতেন কোন মোহিনী বাঈকে বশ করবার জন্য। সন্তানহীন সোমেশ্বর কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি। বারো-তেরো বছর বয়সে পৈতে হওয়ার পরই ন্যাড়ামাথায় পিতার বান্ধবীর কন্যা রাজকুমারী কাত্যায়নীকে বিয়ে করেছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে বাল্যখেলার মধ্য দিয়ে যে প্রেমে তিনি পড়েছিলেন, তার অপমান তিনি করেন নি। কাত্যায়নীর মা নিঃস্ব রাজার গৃহিণী হলেও সত্যকারের রাণী-বুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন। তিনি মেয়ের সতীনের পথে কাঁটা দিতে বাছাই করে বাইরে সুন্দরী বাঈজী এবং ঘরে রূপসী দাসী রেখে দিয়েছিলেন, সোমেশ্বর রায়কে আর বিবাহের ভাবনা ভাবতেই দেন নি। আরও একটা কূট চাল চেলেছিলেন তিনি। বড় বড় গণৎকার ডেকে তাঁদের দিয়ে বলিয়েছিলেন, সন্তান হয়ে নষ্ট হওয়া হেতু সোমেশ্বরেরই গ্রহসংস্থানের দোষ। তিনি শত বিবাহ করলেও সন্তান বাঁচবে না, যতক্ষণ না এই গ্রহরোষের উপযুক্ত শান্তি না হয়। গণৎকারেরা রাজকুমারী কাত্যায়নীর মায়ের কাছ থেকে বিদায় পেতেন, আবার গ্রহশান্তি যজ্ঞেরও সুযোগ পেতেন।

এর মধ্যে সোমেশ্বর রায় তাঁর মামাতো ভাইয়ের কাছে সন্ধান পেয়েছিলেন কালীঘাটের এই পাগলাবাবার। তখন তিনি গ্রহযোগ করে প্রায় হতাশ হয়েছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরামর্শে স্ত্রীকে সাহেবডাক্তার দেখাচ্ছেন। রাজকুমারী কাত্যায়নী তখন অন্তঃসত্ত্বা। মেয়ে বিমলা তখন তাঁর গর্ভে এসেছেন। তবুও মামাতো ভাইয়ের মুখে এই সাধুর কথা শুনে কালীঘাট এসে পাগলাবাবার শরণ নিলেন।

পাগলাবাবা সোমেশ্বরকে চিনতেন। পদ্মনাভ ভটচাজের গানপাগল জামাই শ্যামাকান্ত বছরে একবার কালীপুজোর বিপুল উৎসবে শ্যামনগর থেকে কীর্তিহাটে যেতেন। তখন উৎসবের মধ্যে ওস্তাদী গানের একটা আসর হত। বাঈজী নাচ আসত কলকাতা থেকে। শ্যামাকান্তের এই ছিল প্রধান আকর্ষণ। ওস্তাদী আসরে তিনি গানও গেয়েছেন, তবলা-পাখোয়াজে সঙ্গতও করেছেন। কাপড়, চাদর এবং তার সঙ্গে পাথেয় দক্ষিণা নিয়ে আসতেন।

তিনি তাঁকে দেখেই তাঁকেও চিনেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল কীর্তিহাটের কোলে কাঁসাইয়ের ওপারে জঙ্গলের মধ্যে সিদ্ধাসনের কথা। সিদ্ধাসনের কথা মধ্যে মধ্যে মনে পড়ত তাঁর। ওখানকার সিদ্ধসাধক তারাদাস চক্রবর্তীর কথা তিনি শুনেছিলেন, জানতেন।

চক্রবর্তী ওখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন করেছিলেন। সে আসনও আছে। কিন্তু ওখানকার কাছেও কেউ যায় না। কারণ ওই শিমুলতলায় তারাদাস চক্রবর্তীর নায়িকার আত্মা আজও ঘুরে বেড়ায়। চক্রবর্তী তাঁকে ওখানে আসন পাহারা দিতে রেখে গেছেন। বিচিত্র কাহিনী তার। চক্রবর্তী প্রথম যোগিনী-সাধন করে সিদ্ধ হন। তারপর তারই কৃপায় এবং সাহায্যে পেয়েছিলেন শক্তিসাধনায় সিদ্ধি। রাজা যতুরাম রায় তাঁকে নিষ্কর দিয়েছিলেন এই জঙ্গল। পরে এ জঙ্গল মহল চিতরং কিনেছিলেন কুড়ারাম রায়-ভটচাজ। সিদ্ধাসন একসময় প্রলুব্ধ করেছিল শ্যামাকান্তকে। কিন্তু তখনও তিনি গৃহী। তাঁর সাহস হয়নি।

এ সিদ্ধাসন এবং এই বন তখন নাকি যোগিনী-রক্ষিত ছিল।

সোমেশ্বর রায়ও শ্যামাকান্তকে চিনেছিলেন এবং বিস্মিতও হয়েছিলেন। এ তো সেই শ্যামনগরের ভটচাজবাড়ীর পদ্মনাভ ভটচাজের জামাই। কিন্তু তবুও শ্যামাকান্তের কথাবার্তা শুনে বুঝেছিলেন, এ মানুষ সে মানুষ নয়। মানুষটা আলাদা হয়ে গেছে। চোখের চাউনিতে কথায়বার্তায়, হাসিতে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, এ সিদ্ধ হয়েছে।

শ্যামাকান্তও ভরসা দিয়ে বলেছিলেন—হবে। হবে। বাঁচবে ছেলে। হে-হে-হে। কিন্তু যজ্ঞ করতে হবে। করব আমি, আর ওষুধ দোব। খেতে হবে। হ্যাঁ।

সোমেশ্বর বলেছিলেন—তাই করুন।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—হে-হে, সে এখানে নয়। বুঝেছ! কীর্তিহাটে যেতে হবে। ওখানে সিদ্ধেশ্বরীর আসন আছে, সেখানে, সেখানে করব যাগ।

—সেখানে!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি যাগ করব, ভার আমার, তোমার ভয় কি?

সোমেশ্বর রায় তাই করেছিলেন। শ্যামাকান্তকে নিয়ে সস্ত্রীক এসেছিলেন কীর্তিহাটে।

সুরেশ্বর বললে—এসব কথা কাল তোমাকে বলেছি সুলতা। বলিনি শুধু শ্যামাকান্ত এবং সোমেশ্বরের গোপন কথা। সে কথা লোকেরা কেউ জানত না। পরে একথা জেনেছিল দুজন। একজন গৌহাটিতে মহেশচন্দ্র। অন্যজন রামব্রহ্ম ভটচাজ, সোমেশ্বরের কুলপুরোহিত। মৃত্যুর পূর্বে সোমেশ্বর তাঁকে ডেকে সব কথা বলে গিয়েছিলেন। দুজনের দুখানা চিঠিই এই রয়েছে। দুজনেই লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়কে। দুজনের চিঠিতেই এক কথা। ঘটনায় এতটুকু অমিল নেই। তফাৎ শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে যা বলেছিলেন, তাতে শ্যামাকান্তের দোষ নেই। আর সোমেশ্বর রায় রামব্রহ্ম ভটচাজকে যা বলেছিলেন—তাতে তাঁর নিজের দোষ থাকলেও তা শ্যামাকান্তের থেকে কম!

মহেশচন্দ্রের চিঠিতে রয়েছে, শ্যামাকান্ত তাঁকে বলেছিলেন—জানিস, সোমেশ্বর রায়ের সন্তান বাঁচাবার জন্তে কীর্তিহাটে যজ্ঞ করলাম। প্রথম যাগ করেছিলাম রায়দের কালীমন্দিরের সামনে। সামনে রাখলাম আমার সৌভাগ্যশিলাকে। কিন্তু মনে হল, হল না ঠিক। পূর্ণাহুতি দিলাম, শিখাটা জলে উঠে দপ্‌ করে নিভে গেল। কেউ যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে। মনটা খারাপ হল। ভাবলাম, এ কি হল? তারপর কারণটা পেলাম। সেই দিনই গেলাম ওপারে সিদ্ধাসনের জঙ্গলে। সোমেশ্বর বললে—আপনি যাবেন ওখানে, কিন্তু ওখানে—। মানে লোকে বলে, যোগিনী আছে। লোকে গেলে ভয় পায়।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—ভয়! ধুর! বলে হেসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—যোগিনীর ব্যাপারটা কিছু জান? শুনেছ?

সোমেশ্বর নাকি বলেছিলেন—লোকে বলে যে, চক্রবর্তী প্রথম যোগিনীসিদ্ধ হয়েছিলেন।

সেই যোগিনী ছিলেন তাঁর নায়িকা। তাঁর সাহায্যেই তিনি কালীসিদ্ধ হন। চক্রবর্তী সেই নায়িকাকে এখানকার আসন আর এই বন পাহারা দিতে রেখে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে যেন এই স্থান ছেড়ে না যায়। নাহলে জন্তু-জানোয়ারে, চোর-ডাকাতে, ভ্রষ্টমানুষে এসে এ আসন অশুদ্ধ করে দেবে। যোগিনীকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন। আর বাড়ীতে বলে গিয়েছিলেন ভাইপোদের, যেন ওই বনের ধারে পাতায় যোগিনীকে ভোগ দিয়ে আসে। আজও সে ভোগ আমার এস্টেট থেকে যায়। কারণ ওই জঙ্গল আমরা কিনেছি, আমার এলাকা। তা চক্রবর্তী সেই তীর্থে গিয়ে আর ফেরেন নি। কোথায় মারা গিয়েছেন, কেউ জানে না। কেউ কেউ বলে—হিমালয়ে তপস্যা করছেন, ওঁরা তো যতদিন ইচ্ছে বাঁচতে পারেন। কোনদিন আসবেন। তিনি এলে যোগিনীর মুক্তি হবে। এখন ওই একবেলা ব্রাহ্মণে পাতায় করে একটা ভোগ নামিয়ে দিয়ে আসে। তাছাড়া ওর ত্রিসীমানায় কেউ যায় না। গেলে মুখে রক্ত উঠে মরে যায়।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—ওই বনেই আমাকে আসন করতে হবে। ওখানে একটা যাগ করব। বুঝেছ রায়বাবু, ওই যোগিনীর দৃষ্টিতেই তোমার সন্তান বাঁচে না। এবার আমি বুঝেছি। তোমাকে আমার উত্তরসাধক হতে হবে। সাহস আছে? দীক্ষা নিয়েছিস?

—হ্যাঁ।

—তবে ঠিক আছে। তোমাকে পুরশ্চরণ করিয়ে শুদ্ধ করে নোব। আমি জপ করব, তুমি পাহারা দেবে, বুঝলে?

তাই করেছিলেন শ্যামাকান্ত। দিনের ভাগে সেই দিনই তিনি বনের ভিতর ঢুকেছিলেন। শিমুলতলার আসন দেখে ফিরে এসে বলেছিলেন, ঠিক আছে।

তারপর তিথি দেখে তিনি বনে গিয়ে আসনের আশপাশের জঙ্গল নিজে হাতে পরিষ্কার করে ফিরে সোমেশ্বরকে বলেছিলেন—আজ যাব। তৈরী থাকবে। ভয় করবে না। বুঝলে। এর নাম বীরাচার। বীর ছাড়া এ আচার অন্যের নয়।

মহেশচন্দ্র লিখেছিলেন—দুইটি শ্লোক তিনি বলিয়াছিলেন, সে শ্লোক অদ্যাপি আমার মনে রহিয়াছে। "মহাবনো মহাবুদ্ধির্মহাসাসিক শুচিঃ। মহাস্বচ্ছো দয়াবাংশ্চ সর্বভূতহিতেরতঃ।" এই হইল বীরাচারীর লক্ষণ। আর উত্তরসাধক যিনি হইবেন, তাঁহাকেও হইতে হইবে সমান গুণসম্পন্ন। "সমান গুণসম্পন্নেঃ সাধয়ে-দ্বীভভী স্বয়ম।" এবং উত্তরসাধককে শাস্ত্র-পাণি হইতে হইবে। আমি সঠিক বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি নাই, তবে এইটি বুঝিয়াছিলাম যে, যাহারা দুঃসাহসী এবং কৌশলী তাহারা সবই পারে।

শ্যামাকান্তকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম, তুমি যোগিনীকে দেখিয়েছিলে?

শ্যামাকান্ত আমাকে বলিয়াছিলেন—ওরে মূর্খ, তোর এখনও বিশ্বাস হইল না? ওরে, রাত্রে আমি আসনে জপে বসিলাম, সে খসখস শব্দ করিয়া আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফোঁসফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল। ওরে, আমার সম্মুখে ধুনি ছিল, সম্মুখে আসিতে পারিল না, পৃষ্ঠদেশের অতীব নিকটে দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস ফেলিল, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। কারণ রক্ষামন্ত্রে আমার অঙ্গবন্ধন করা ছিল। আমি স্বহস্তে ভোগ রন্ধন করিয়া ভোগ দিয়া কিছুটা দূরে রাখিয়া দিলাম এবং অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, সে শিবামূর্তিতে আসিয়া ভোগ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। তবুও বলিবি—যোগিনী দেখিয়াছ? তুই এসব বুঝিবি না। দীক্ষা না হইলে ইহা বুঝিতে পারা যায় না রে মূর্খ!

আমি বলিয়াছিলাম, বুঝাইয়া বলিলে বুঝিব না কেন?

শ্যামাকান্ত বিচিত্র উত্তর দিয়াছিলেন—ওরে বেটা, জলে চিনি ফেললেই গলিয়া যায়, তাহা তুই দেখিয়াছিস বলিয়াই বুঝিতে পারিস। যে দেখে নাই তাহাকে কিরূপে বুঝাইবি? ওরে মূর্খ, প্রস্তরের মধ্যে হীরক থাকে, তাহা যে হীরক চেনে সেই ব্যক্তিই চিনিতে পারে। অপরকে তাহা হীরক বলিয়া বিশ্বাসই করিতে হয়।

উত্তর শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

*　　　　*　　　　*

এরপর শ্যামাকান্ত যা বলেছিলেন, তা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। কিছুদিনের মধ্যেই নাকি দেহধারিণী হয়ে যোগিনী এসেছিলেন তাঁর সম্মুখে।

সে এক শ্যামাঙ্গী যুবতী, পাগলিনী। কীর্তিহাটের কেউ তাকে চিনত না, দেখে নি। হঠাৎ সে একদিন এল কোথা থেকে, রূপ ছিল পাগলিনীর। কিন্তু অতি উগ্র সে, অর্ধউলঙ্গ মেয়েটা দাঁত কড়মড় করতে করতে বিড়বিড় করে বকত। মানুষজনকে অভিসম্পাত আর গালিগালাজ দেওয়াই ছিল তার কাজ। হাঁ-হা করে বাড়ীতে ঢুকে যা সামনে পেত তাই কেড়ে খেয়ে নিত। গৃহস্থেরা তাড়া করলে সে যা হাতের কাছে পেত, তাই নিয়ে আক্রমণ করত গৃহস্থকে। হাতে একটা লাঠি কিম্বা গাছের ডাল, কিছু না পেলে ঢেলা, তাই ছিল অস্ত্র। এ ছাড়াও নখ আর দাঁত, আদিম অস্ত্র মানুষের। কিন্তু গ্রামের লোকে দলবদ্ধ হয়ে তাকে তাড়া করেছিল, সে ছুটে এসে ঢুকেছিল রায়দের ঠাকুরবাড়ীতে। শ্যামাকান্ত তখন মাকালীকে ভোগ দিয়ে যোগিনীর ভোগ নিয়ে চলেছেন সিদ্ধাসনের জঙ্গলে ভোগ দিতে। মেয়েটা ছুটে এসে সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তকে বলেছিল, আমাকে মারছে, আমাকে বাঁচাও, ও সন্ন্যেসীঠাকুর, আমাকে বাঁচাও। তখন সে মার যথেষ্ট খেয়েছে। কপাল কেটে গেছে। হাতে বুকে প্রহারের দাগ। শ্যামাকান্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে লোকজনদের বলেছিলেন—চলে যাও। ওকে মেরো না। এ মানুষ নয়। একে ভর করেছে কোন ডাকিনী যোগিনী।

পাগলিনী এবার হাত বাড়িয়ে কেড়ে নিতে গিয়েছিল শ্যামাকান্তের হাতের যোগিনীর ভোগ।

শ্যামাকান্ত তৎক্ষণাৎ চিনেছিলেন তাকে ওই যোগিনী বলে। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওই ওপারের জঙ্গলে এবং তাকে পরিতৃপ্ত করে যোগিনীর ভোগ খাইয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—চলে যাবি? না থাকবি?

—সে বলেছিল—খেতে দেবে?

—রোজ তো শেয়াল হয়ে খেয়ে যাস। আজ পাগলী সেজে এসেছিস। চালাকি করছিস?

মেয়েটা খিল-খিল করে হেসেছিল।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—শান্ত হয়ে থাকিস তো থাক। রোজ খাবি। কাপড় দোব, খেতে দোব। তেল দেব, মাথায় মাখবি। অনেক জিনিস দেবো। শুধু শান্ত হয়ে থাকতে হবে। কাউকে মারতে পাবি নে। কাউকে শাপ-শাপান্ত করবি নে। আমি যা বলব শুনবি। নে, এবার পান খা।

যোগিনীর ভোগের জন্ম পান ছিল, সেই পানও তাকে খাইয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন—আর অনিষ্ট করবিনে তো?

—না। না।

—বেশ। ওইখানে শুয়ে ঘুমো। আমি ওবেলা আসব।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন, ওই যোগিনী কোন পাগলিনী নারীদেহকে আশ্রয় করে তাঁর মন্ত্র আকর্ষণে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সেই দিনই শ্যামাকান্ত তন্ত্রসার শাস্ত্রের বীরাচারমতে কনকাবতী যোগিনী-পূজাসম্মত পূজা করেছিলেন তার। তাকে স্নান করিয়ে, মাথায় তেল দিয়ে, চুল আঁচড়ে, কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে, পায়ে আলতা দিয়ে, নূতন লালপেড়ে শাড়ী পরিয়ে তার অর্চনা করেছিলেন।

সোমেশ্বরও সেদিন হাতে একখানা তলোয়ার নিয়ে সিদ্ধাসন থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে উত্তরসাধকের কাজ করেছিলেন, পাহারা দিয়েছিলেন।

* * *

এর পর থেকে শ্যামাকান্ত ওই সিদ্ধাসনের জঙ্গলেই আস্তানা গেড়েছিলেন। কাজ হয়েছিল ওই যোগিনী পাগলীর সেবা, তাকে পূজার্চনা করে তুষ্ট করা। শুধু একবার আসতেন সকালে। এসে স্নান করে সৌভাগ্যশিলার অর্চনা সেরে মায়ের প্রসাদী ভোগ নিয়ে চলে যেতেন ওই সিদ্ধাসনের জঙ্গলে। মাসখানেক পর যোগিনীকে নিয়ে এলেন শ্যামাকান্ত। পোষা জন্তুর মত সে শ্যামাকান্তের পিছন পিছন গ্রামে এসে ঢুকল।

সেদিন সমস্ত কীর্তিহাটের লোকেরা তাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। লালপাড় শাড়ী পরনে একটি শ্যামাঙ্গী লাবণ্যময়ী মেয়ে। দাঁত কড়মড় করছে না। কাউকে মারতে যাচ্ছে না। নিজের বেশভূষা নিয়েই সে প্রমত্ত। কাপড় ঝাড়ছে। হাতের শাঁখা দেখছে। আর ফিকফিক করে হাসছে। মন্দিরের নাটমন্দিরে এনে তাকে বসিয়ে শ্যামাকান্ত সোমেশ্বরকে বলেছিলেন—ডাক, তোমার গৃহিণীকে ডাক। যোগিনী আশীর্বাদ করবে। তাকিয়ে দেখছ কি?

সোমেশ্বরও তাকিয়ে দেখছিলেন মেয়েটাকেই। এক মাসের মধ্যে সেই অর্ধউলঙ্গ উন্মাদ পাগল ভিক্ষুক-মেয়েটার পরিবর্তন দেখে বিস্ময়ের সীমা ছিল না তাঁর। মেয়েটা পাগলের মত হাসে বটে, মধ্যে মধ্যে রেগেও উঠতে চাচ্ছে, কিন্তু তবু তার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। সবচেয়ে তফাৎ মেয়েটার চেহেরায়।

মেয়েটার দেহে কোথাও কোন মালিন্য নেই। কাদা নেই, ধুলো নেই। চুলে জটা নেই। মুখখানায় সেই একটা উগ্র ভয়ঙ্কর ভাব নেই। শ্যামবর্ণা মেয়েটা কোমলাঙ্গী হয়ে উঠেছে, একটি লাবণ্য যেন ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

রাজকুমারী কাত্যায়নী গরদের শাড়ী পরে এসে তার সামনে আসনে বসেছিলেন।

শ্যামাকান্ত যোগিনীকে বলেছিলেন—নে, আশীর্বাদ কর। বল ছেলে হয়ে বাঁচুক তোমার। বল। খুব ভাল ভাল মিষ্টি খেতে দেবে রাণীমা। বল!

যোগিনী খুব খুশী হয়ে বলেছিল—বাঁচবে, বাঁচবে, বাঁচবে।

এই সব ব্যাপারে কেউ কোন কথা বলে নি, বলতে সাহস করে নি। একমাত্র পুরোহিত রামব্রহ্ম স্মায়রত্ন বলেছিলেন—দেখুন রায়মশায়, আমি আপনার পুরোহিত বলেই বলাটা কর্তব্য মনে করি, যদি অনুমতি দেন তো বলি।

—বলুন।

—আমি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের জ্ঞাতিবংশীয়। তন্ত্র আমি জানি। জানি বলেই আমাকে আপনার পিতা এখানে এনে বসবাস করিয়ে মায়ের পুজোর ভার দিয়েছেন। আপনি যজমান। গৃহী। রাজাতুল্য ব্যক্তি। কুলাচারে আপনারা দক্ষিণাচারী। শুদ্ধমতে আমরা মা বলে তাঁকে আহ্বান করি, পূজা করি। সেই মতে মায়ের প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। এখন বামাচার বা বীরাচার করতে গেলে অনিষ্ট হবে রায়বাবু। লোকটা বামাচারী। তার

উপর—।

সোমেশ্বর এ সব বুঝতেন না তা নয়। বুঝতেন। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন আগমবাগীশের দূরের জ্ঞাতি, তিনি আগমবাগীশের ভিটেতে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন। তন্ত্রমতে নিত্য আহ্নিকসন্ধ্যা করেন। বোঝেন সব। তিনি ভাবছিলেন। ন্যায়রত্নকে থামতে দেখে বললেন—আর কি বলুন দেখি?

—মানে লোকটি মায়ের ঘরে বসে বামাচারে পূজো করে, কারণ করে, সেই হাতেই বেলপাতা নিয়ে মাকে দেয়, সে তো হল। না হয় বুঝলাম যিনি দক্ষিণাকালী তিনিই বামাকালী, যেমন ভাবে যে তাঁকে চাইবে তেমনি ভাবেই তাঁর সাক্ষাৎ বলুন প্রসাদ বলুন পাবে। কিন্তু ওই যে নারায়ণশিলাটি, যেটি ও সঙ্গে করে এনেছে, সেটির পূজোও সে ওই কারণের হাতেই করে। ও শিলাটি বড় দুর্লভ শিলা। রাজার ঘরে উনি রাজরাজেশ্বর, সন্ন্যাসীর কাছে, সাধুর কাছে উনি সাক্ষাৎ চৈতন্যময় ব্রহ্মানন্দ। অনাচার করছে ও, অপরাধ ওর বটে কিন্তু আপনার গৃহে তো হচ্ছে সেই অনাচার। দেখুন, স্থান, মৃত্তিকা এতেও তো পাপপুণ্য অর্শায়। ওই অপরাধ আপনার গৃহকে অর্শাচ্ছে তো! গৃহের কল্যাণ-অকল্যাণ আছে। দোষযুক্ত জমি, দোষযুক্ত ভিটে এ তো লোকে কেনে না, দান করলেও নেয় না! সুতরাং—। তা ছাড়া ওই পাগলীটাকে ও যোগিনী বলছে, তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই!

সোমেশ্বর একটু ভেবে বলেছিলেন—দেখুন, মাস দুয়েকের মধ্যেই সন্তান হবে রাজকুমারী রাণীবউয়ের। এ একটা মাস আমার সহ্য না করে উপায় নাই। যজ্ঞটজ্ঞ করলে। ফলটা দেখতে হবে তো!

ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—অন্ততঃ আপনি বলুন, ওই শিলাটির পূজা আমি করি। আর স্বতন্ত্র স্থানে করি। শক্তি আর বিষ্ণু দুয়ের পূজার মত আলাদা। ভজনসাধনের পথ আলাদা। কেউ বলে মা আর ছেলে। কেউ বলে যিনি শ্যাম, তিনিই শ্যামা। তবু সব বিপরীত। বিল্বপত্রে মায়ের পূজো তুলসীপত্রে প্রভুর পূজো। এঁর রক্তচন্দন ওঁর শ্বেত অগুরু চন্দন। এঁর জবা, ওঁর শ্বেতকরবী, মালতী। বলুন, আপনার ঝঞ্ঝাট, রোজ সকালে ছুটে আসেন। মানে সন্তুষ্ট ক'রে, কোনরকমে বুঝিয়ে আর কি!

—বলব। এই তিনদিন পর শনিবার চতুর্দশীতে উনি শেষ যাগ করবেন, ওই সিদ্ধপীঠে সেটা হয়ে যাক, তারপর বলব।

—বেশ। এতদিন, আজ তিনমাস চলছে, আর তিনদিন চলুক!

তিনদিনের সকালে সোমেশ্বরকে কথাটা বলতে হয় নি। সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তই এসে বলেছিলেন, রায়বাবু! আজ তোমার ন্যায়রত্নঠাকুরকে বলো, নারায়ণের পূজোটা করতে। বুঝেছ? আর সব উদ্যুগ যেন ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছয়। আমার উপোস। কিন্তু মনোহরা তো উপোস করবে না। তার ভোগ পাঠিয়ে দিয়ো।

সোমেশ্বর বুঝেছিলেন সেই মেয়েটির কথা বলছেন শ্যামাকান্ত। তবু বিস্ময় প্রকাশ ক'রেই বলেছিলেন—মনোহরা?

হে-হে করে হেসে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন, পাগলী সেজে চোখে ধুলো দেবে ভেবেছিল যোগিনী! বুঝেছ, পাগলী সেজে ধুলোকাদা মেখে রূপ ঢাকা দিয়েছিল। আমি দেখেই চিনেছিলাম। যোগিনী মনোহরা যোগিনী—শ্যামবর্ণা আয়তনয়ন, কোমলাঙ্গী পরিপূর্ণা যুবতী, সেদিন দেখেছ, আজ দেখবে! আজ তোমার উপবাস, তোমার গৃহিণীর উপবাস, রাত্রে তুমি সারারাত্রি উপস্থিত থাকবে। পূর্ণাহুতির পর তিলক নেবে। মনোহরার আশীর্বাদ নেবে।

দেখবে তাকে।

সোমেশ্বর গ্রায়রত্নকে ডেকে খুশী হয়ে বলেছিলেন—হয়ে গেছে গ্রায়রত্নমশাই। নিজেই এসে বলে গেলেন, ওহে, আজ গ্রায়রত্নকে বলো, নারায়ণের পুজো করতে। বুঝেছ!

—ওইটে ওঁর কাছে কায়েম করে নেবেন।

—নেব, বলব। যাগটা হয়ে যাক। আচ্ছা, আর একটা কথা। কনকাবতী নামে যোগিনী আছে?

—হ্যাঁ আছে, সুরসুন্দরী, কনকাবতী, মনোহরা, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, মধুমতী, পদ্মিনী যোগিনী অনেক, চৌষট্টি যোগিনী, তার মধ্যে মানুষে ওই আট-দশটি যোগিনীসাধনই করে।

—মনোহরা যোগিনী কি শ্যামবর্ণা?

—হ্যাঁ, কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দু বক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাং চীনাংশুকাং পীনকুচাং শ্যামাং কামদুঘাং বিচিত্রাং। এই হল ওঁর ধ্যান!

সেদিন রাত্রের অভিজ্ঞতায় সোমেশ্বর রায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। সে রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলেছিলেন রামব্রহ্ম গ্রায়রত্নকে। বলেছিলেন—সে আমি বর্ণনা করতে পারব না গ্রায়রত্নমশাই! সে কি যাগ! কি পূর্ণাহুতি! আমি তো সারাক্ষণ দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার কাছ থেকে আরও স'রে কাঁসাইয়ের গর্ভে বসেছিল, শিবে আর তারা। আর হরি চাঁড়াল। বুঝলেন, থমথম করছে রাত্রি, চতুর্দশীর অন্ধকার। বনের মধ্যে ঝিঁঝি ডাকছে, প্রহরে প্রহরে শিবারব। তারই মধ্যে শ্যামাকান্ত হাঁকছেন, কালী কালী কালী। আর ডাকছেন, মনোহরা, মনোহরা। খলখল করে যোগিনী হাসছে। পূর্ণাহুতির সময় গেলাম, ডাক পড়ল। তখন দেখি ওঁর চোখদুটো রক্তবর্ণ, হোমের ধুনি গনগন করছে। আর যোগিনী সামনে থমথমে হয়ে বসে আছে, পরনে লাল চেলী, গলায় ফুলের মালা, হাতে শঙ্খ, তার সঙ্গে চুড়ি, রুক্ষ এলোচুল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, এই বড় চোখ দুটো লাল হয়ে ঢলঢল করছে। শ্যামবর্ণ রঙ—ধুনির আলোয় সে যে কি লাগছিল কি বলব! চোখদুটি ঠিক হরিণের চোখ। তার উপর কারণের ঘোরে রাঙা লাগছে। যেন ভর লেগেছে। তারপর আমাকে কারণ দেবার জন্যে পাত্রতে কারণ ঢেলে যোগিনীকে দিয়ে বললেন—মনোহরা, দে, রায়বাবুকে প্রসাদ করে দে। নিয়ে কি করলে জানেন? বললে—তু খা, খেয়ে ওকে দে। তারপরে আমাকে দিবি। এই বাবু, আমার এঁটো খাবি?—খাস না। ওই ওর এঁটো খা। আমার মনের কথা কি করে বুঝলে বলুন?

চুপ করে ছিলেন রামব্রহ্ম। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পূর্ণাহুতি কেমন হল বলুন।

—ভাল। ভাল। একবারে দু'হাত উঁচু হয়ে জ্বলল। তারপর আ-স্তে আ-স্তে নিভে এল।

এরপর থেকে শ্যামাকান্ত ওইখানেই আস্তানা গেড়েছিলেন। প্রথম খড়ে-বাঁশে চালা আর রায়বাড়ীর পাঁজা থেকে ইট নিয়ে গিয়ে ইট পেড়ে মেঝে করে নিয়েছিলেন। তারপর বাঁশের বেড়া দিয়ে তার গায়ে মাটি ধরিয়ে দেওয়াল। দুখানা কামরা। একখানায় শ্যামাকান্ত, একখানায় যোগিনী।

ঠিক পনের দিন পর কলকাতা থেকে একটা আশ্চর্য সুখবর এসেছিল। সোমেশ্বর রায় একটা হারপাল্লার মামলায় আশ্চর্যভাবে জিতেছেন। জিতেছে খোদ কোম্পানীর বিরুদ্ধে। নুনের খালারির মামলা। কোম্পানী খালারি খাস করেছিল। তিনি ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলেন।

খালারির জমি কোম্পানী নিয়েছিল কিন্তু খাজনা-কমি দেয়নি। সে খাজনা-কমির মামলায় ডিগ্রী পেয়েছেন। দশ হাজার টাকার ডিগ্রী!

প্রিন্স দ্বারকানাথ শুনের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পর্যন্ত বলেছিলেন—মামলা করে দেখ একটা কিন্তু কিছু হবে বলে মনে হয় না। তবু দেখ।

উৎসব পড়ে গিয়েছিল কীর্তিহাটের কাছারীতে। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—এ আপনার গৃহে সৌভাগ্যশিলার আশীর্বাদ বাবু!

শ্যামাকান্তের কাছে গিয়েছিলেন, শ্যামাকান্ত হা-হা করে হেসে বলেছিলেন—এখন হয়েছে কি রায়বাবু, তোমাকে আমি রাজা করে দোব।

যোগিনীকে ডেকেছিলেন, মনোহরা!

মনোহরা যোগিনী তখন মানুষের মত। তবে ছোট মেয়ের মত আবদেরে। সে এসে সরাসরি শ্যামাকান্তের কোলে এসে বসেছিল। ডাকছিস ক্যানে?

—রায়বাবুর মামলা জিৎ হয়েছে। কি চাই তোর বল!

—লাল টক্‌টকে কাপড়। আর সন্দেশ। খুব ভাল মণ্ডা।

—বাবুকে রাজা করে দিতে হবে।

—হবি রাজা হবি!

—ছেলে বাঁচাতে হবে।

—হ্যাঁ, রাঙা ছেলে হবে।

—কি ছেলে হবে? বেটী, না, বেটা?

—বিটী হবে, বেটা হবে, সব হবে।

এর সপ্তাহখানেক পরেই হয়েছিল রাজকুমারী কাত্যায়নীর এক কন্যাসন্তান। এবং আশ্চর্য, কন্যাটি পূর্বের সন্তানদের মত মৃতসন্তান হয়নি। জীবিত কন্যা—সরবে কান্না কেঁদে তার আসার সংবাদ ভূমিষ্ঠ হতে হতেই ঘোষণা করে জানিয়েছিল।

* * *

সোমেশ্বর রায় মামলায় জেতা দশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করলেন সৌভাগ্যশিলার মন্দির। আর ওই সিদ্ধাসন বাঁধিয়ে পাকা করে দিলেন। কিন্তু শ্যামাকান্ত যেন উগ্র হয়ে উঠলেন। সবকিছুতে অধীর উগ্র। উদ্‌ভ্রান্ত। শুধু তাই নয়, নির্যাতন শুরু করলেন ওই যোগিনী পাগলীর উপর। তাকে গালাগাল করতেন, তারপর শুরু করলেন প্রহার।

মহেশচন্দ্র তাঁর চিঠিতে লিখেছেন—শ্যামাকান্তের কথা। শ্যামাকান্ত তাঁকে বলেছিলেন—যোগিনী সোমেশ্বর রায়ের অভীষ্ট পূরণ করিল। কিন্তু আমাকে ছলনায় ভুলাইয়া প্রতারণা করিতে লাগিল।

আমি সাধনা করি, সে পূজা গ্রহণ করে কিন্তু সিদ্ধিতে সাহায্য করে না। মধ্যে মধ্যে পূজার আসনে বসিয়া আমি ধ্যান শুরু করিলেই উঠিয়া পলাইয়া যাইতে শুরু করিল। কখনও সমাদর করিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আসন হইতে টানিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি তাহাকে বলিতাম—তোকে মারিয়া ফেলিব। সে ক্রন্দন করিত। তাহাকে গালাগালি করিতাম, সেও গালাগালি করিত। অবশেষে তাহাকে প্রহার করিয়া কহিলাম—কবে আমাকে সিদ্ধি দিবি বল?

সে বলিল—আমি জানি না।

আবার তাহাকে প্রহার করিলাম। বলিলাম—বল্! বল্!

সে বলিল—সিদ্ধির গাছ এখানে নাই। কোথায় পাইব?

তাহাকে প্রহার করিয়া এবার ঘরে বন্ধ করিলাম। আমি ক্রোধে ক্ষোভে উগ্র হইয়া উঠিলাম।

কয়েকদিন পর, তখন জ্যৈষ্ঠ মাস—মনোহরা একদিন পলাইয়া গেল। গিয়া উঠিল সোমেশ্বর রায়ের বাড়ীতে। তাহাকে গিয়া কাঁদিয়া সামান্য নারীর মত ছলনা করিয়া কহিল—বাবু, আমাকে বাঁচাও! আমি তখন নিদ্রিত ছিলাম। নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া মনোহরাকে না দেখিয়া সমস্ত জঙ্গল খুঁজিলাম। তাহার পর গেলাম রায়বাড়ী। সেখানে দেখিলাম, সে সোমেশ্বর রায়ের কন্যাকে কোলে করিয়া আদর করিতেছে।

সেখান হইতে আমি তাহাকে ধরিয়া আনিলাম। সোমেশ্বর কহিল—আপনি এমন করিয়া ইহাকে প্রহার করিতেছেন, ইহাতে আপনার কিরূপে সিদ্ধি হইবে? প্রসন্ন না হইলে কে কবে কাহাকে অভীষ্ট সিদ্ধিতে সাহায্য করিয়া থাকে!

আমি তাহাকেও গালাগাল দিয়াছিলাম।

সুরেশ্বর বললে—এর কিছুদিন পরই নেমেছিল বর্ষা। কাঁসাই ভরতে শুরু করেছিল। একদিন প্রবল বর্ষা নেমে বন্যা এসেছিল। বন্যার জল কীর্তিহাটের উঁচু বন্যারোধী বাঁধের গায়ে বাধা পেয়ে সিদ্ধপীঠের জঙ্গলে ঢুকে ডুবিয়ে দিয়েছিল সিদ্ধপীঠ।

শ্যামাকান্তের ছোট ঘরের মেঝেতে জল ঢুকেছিল। পঞ্চমুণ্ডীর আসন এবং সামনের চত্বরের উপরেও দাঁড়িয়েছিল প্রায় আধ হাত জল। অবশিষ্ট ছিল শিমূলতলার বাঁধানো গোল বেদীটা। সেটা জমি থেকে হাত তিনেক উঁচু। তারই উপর যোগিনীকে নিয়ে শুকনো কাঠে হোমকুণ্ডের আগুন দিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত।

মহেশচন্দ্র লিখেছেন—শ্যামাকান্ত অদ্ভুত মানুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় চার বৎসর ধরিয়া তাঁহার সঙ্গ করিয়া তাঁহাকে যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে তিনি সত্যবাদী তাহাতে আমি নিঃসন্দেহ। দুরন্ত, দুঃসাহসী, ভয়লেশশূন্য। কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই। ইহা জ্ঞানের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা হয়তো যায় না। তিনি বলিয়াছিলেন—সেই দুর্যোগ এবং অন্ধকার দেখিয়া তিনি উল্লসিত হইয়া জপে বসিয়াছিলেন। রিমিঝিমি বর্ষণ হইতেছিল, বিদ্যুৎ চমকিতেছিল; মেঘগর্জন হইতেছিল; তাঁহার মনে হইতেছিল এই দুর্যোগ-ভয়াল রাত্রে মহাশক্তির তপস্যার উপযুক্ত কাল।

মনোহরাকে পাশে বসাইয়া তিনি জপ শুরু করিয়াছিলেন। সেই দুর্যোগের মধ্যে সেদিন মনোহরা পলাইয়া যায় নাই। তাঁহার গায়ে গা দিয়া বসিয়াছিল। শিমুলগাছটা খুব ঘন নিবিড় হইলেও, পাতা হইতে ঝরিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতেছিল। তথাপি ইহারই মধ্যে শ্যামাকান্ত জপে একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। যেন তাঁহার চেতনা ছিল না।

হঠাৎ একসময় মনোহরা তাঁহাকে ডাকিয়াছিল।—এই, এই ঠাকুর। ও ঠাকুর, শুনিতেছিস? কত জপ করিবি। ও ঠাকুর!

ধ্যান ভাঙিয়া শ্যামাকান্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—কি? কি বলিতেছিস?

সেই পাগলিনী অথবা যোগিনী বলিয়াছিল—আমার যে ক্ষুধা পাইয়াছে। আমাকে খাইতে দে। ও ঠাকুর!

শ্যামাকান্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখের ধুনিটা হইতে খানিকটা জলসিক্ত ছাই মুঠা করিয়া তুলিয়া তাহাকে দিয়া বলিয়াছিলেন—নে খা! খা!

মনোহরা ভয় পাইয়াছিল। শ্যামাকান্ত আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—খা, খা, তোকে খেতে হবে। খা! খা!—বলিয়া তাঁহার ত্রিশূলটা লইয়া প্রহারের ভয় দেখাইয়াছিলেন।

ভয়ে মনোহরা ছাই মুখে দিয়া পরম হর্ষভরে বলিয়াছিল—ও ঠাকুর, এ যে গুড়! বলিয়া সে গব গব করিয়া সেই সিক্ত ছাইপিণ্ডটা খাইয়া ফেলিয়াছিল।

শ্যামাকান্ত সবিস্ময়ে নিজের হাতে লাগিয়া থাকা ছাইটুকু আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং নিজেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। সত্যই হাতে লাগিয়া থাকা জলসিক্ত ছাইয়ের আস্বাদ সুমিষ্ট গুড়ের মত!

তিনি উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। আসিতেছে, সিদ্ধি আসিতেছে।

এই সময়েই প্রভাত হইতেছিল। সেই প্রভাতেই তিনি বনের বাহির হইতে তারা হাড়ি এবং শিবে বাগ্দীর ডাক শুনিতে পাইয়াছিলেন। সোমেশ্বর রায় নৌকা পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের ওপারে লইয়া যাইবার জন্য।

সুলতা এবার আর বাধা না দিয়ে থাকতে পারলে না। বললে—এই আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?

সুরেশ্বর বললে—আমি কিছুই বলছি না সুলতা। মহেশচন্দ্রের চিঠিতে যা লেখা আছে, তাই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। এর প্রমাণ তো আমি দিতে পারব না। সেকালে যা ঘটত, তা একালে হয়তো ঘটে না। কিম্বা কেউ ঘটাতে চায় না বলে ঘটে না। মহেশচন্দ্রও সেই কথা লিখেছেন। শোন।

"এই বৃত্তান্ত শ্যামাকান্ত যখন বলিয়াছিলেন, তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু অবিশ্বাসই বা কি করিয়া করিব, তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনই তিনি আমাকে তাঁহার ধুনির ছাই খাইতে দিয়াছিলেন। আমি প্রথমটা খাই নাই। কিন্তু অপর সকলে খাইয়াছিল; তাহা দেখিয়া মুখে কিছুটা আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছিলাম, সত্যই তাহার স্বাদ গুড়ের মত। শুধু তাহাই নয়, ইহার পরে কয়েকদিনই জলে নিজের হাত ডুবাইয়া আমাকে খাইতে দিয়াছেন, তাহাও সরবৎ বলিয়া মনে হইয়াছে। অবিশ্বাস করিব কি করিয়া?

এরপর বর্ষার সময় শ্যামাকান্তকে বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছিল কাঁসাইয়ের এপারে কীর্তিহাটে। বর্ষাবাদলের জন্য আচ্ছাদন ছিল, কিন্তু বন্যা প্রতিরোধের উপায় ছিল না।

সোমেশ্বর বলেছিলেন—দেখুন, ঝড়-বাদল-বান-এর উপর তো হাত নেই। তার উপর জঙ্গলে বান ঢুকলে সাপখোপ, পোকা-মাকড়ের উপদ্রব সে তো নিবারণ করা যাবে না। আসছে বছর আমি জঙ্গলটার চারিপাশে উঁচু পগার দিয়ে দেব। ঘরগুলোকে ভেঙে খুব উঁচু করে দাওয়া তৈরী করিয়ে দেব। ততদিন এ-পারেই থাকুন, একেবারে নদীর কিনারায়—কিনারাটা যেখানে খুব উঁচু। পাথরে কাঁকড়ের শক্ত পাড়, ওখানে আমাদের একখানা ঘরও আছে। বাগানবাড়ী করব বলে করেছি। পিছনে নদীতে একটা দহ আছে। ও-বাড়ীতে আমরা কেউ বাসও করিনি। ওখানেই থাকুন নির্জনে। তারপর বর্ষা যাক, তখন আবার—।

শ্যামাকান্তের কিন্তু বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না। তিনি পেয়েছেন, তিনি মনে মনে জপ আর যোগিনীকে স্মরণ করে ধুলো-মাটি যাই তুলুন তা মিষ্টি হয়ে যায়। জলে হাত দিয়ে ইচ্ছে করলে জল সরবৎ হচ্ছে, সিদ্ধি এসেছে। তিনি বুঝতে পারছেন, এই সাধনায় ছেদ না ফেলে পঞ্চ পর্বে পর্বে ওই সিদ্ধাসনে আসন করে বসে জপ-ধ্যান-হোমক্রিয়ার আকর্ষণে টানলে পূর্ণ সিদ্ধিকে আসতেই হবে। সর্বশক্তির মূল শক্তি আসবেন, এসে সামনে দাঁড়াবেন, বলবেন—বর নে। জ্যোতির্ময়ী নিবিড় কৃষ্ণ জ্যোতির্লেখা।

কি বর চাইবেন ? তিনি জানেন, দেবী বলবেন—রাজ্য সম্পদ, দেবত্ব, দেবকন্যা—বল কি চাই ?

শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—ভুলবার পাত্র শ্যামাকান্ত নয়। সে-সবে ভুলবেন না। তিনি বললেন—না-না-না-না।

—তবে অমরত্ব ?

—উঁহু-উঁহু—

—তবে ?

—শুধু তোমাকে, শুধু তোমাকে চাই। আর কিছু চাই না।

পাগল হয়ে উঠতেন যখনই বলতেন এ-কথা। তাঁর ঝাঁকড়া চুল দিয়ে মাথা নেড়ে গান গেয়ে উঠতেন।

আর কিছু বাসনা নাই ( আমার )—

চাই না মোক্ষ চাই না মুক্তি
শুধুই তোকে পেতে চাই।
চাই না আমি অমরত্ব
সোনাদানা কি রাজত্ব—
তোর ওপর কায়েমী স্বত্ব
জবরদখল যেন পাই।

* * *

একাকার হতে চাইরে বেটা, তার সঙ্গে একাকার। বুঝলি ! মাগ-ভাতারের মত। হা-হা। হা-হা। হা-হা।

সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকতেন।

মহেশচন্দ্র লিখছেন স্থূলতা—তিনি শিউরে উঠেছিলেন শুনে। শ্যামাকান্তকে তিরস্কার করে বলেছিলেন—তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় ? কি বলছ তুমি ?

হা-হা শব্দে অট্ট হেসে শ্যামাকান্ত যেন ভেঙে পড়তেন।

মহেশচন্দ্র লিখেছেন—তিনি একদিন বলেছিলেন—তুমি কি ?

—কি ?

—পিশাচ ?

—ধুর বেটা ! আমি শিব রে, আমি শিব !

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। নির্বাক হয়ে এই লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সুন্দর সুপুরুষ মানুষ, এমন কণ্ঠস্বর, যে-লোক গান গেয়ে কাঁদে, তাঁর সঙ্গে এমন প্রেমের সঙ্গে ব্যবহার, সে এমন পৈশাচিক কামনা কেমন করে পোষণ করে ! কি জঘন্য কামনা !

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—ওরে বেটা, তন্ত্র না জানলে জানবি নারে। তন্ত্র না জানলে বুঝবি না। যে সাধক, সে শিব। শোন, শোন—

অনিত্য কর্মসংত্যাগী নিত্যানুষ্ঠান তৎপরঃ। মন্ত্রারাধনমাত্রেণ শিবভাবেন তৎপরঃ।

স্ত্রী ময়ঞ্চ জগৎ সর্বং তথাত্মানঞ্চ ভাবয়েৎ। হাঁ, ওরে বেটা, সাধকই একা শিবপুরুষ। বাকি ব্রহ্মাবিষ্ণু-ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য-বায়ু-বরুণ-জগৎ-সংসার সব স্ত্রী। সব স্ত্রী। হাঁ।

সেইভাবে ভাবিত তখন শ্যামাকান্ত। ভাব তখন শুধু আর ভাবনায় নেই, তখন চেহারা নিচ্ছে। অন্ততঃ তিনি তাই ভেবেছিলেন। ওই ধুলো-ছাই যখন গুড় হয়েছে, তখন মধুর স্বাদ

পেয়েছেন। সেই মধুর ভাণ্ডার পেতে বিলম্ব আর সইছিল না। ভরা কংসাবতীকে তিনি অভিশাপ দিতেন—তুই শুকিয়ে যাবি, তুই শুকিয়ে যাবি। সূর্যের তেজে তোর বুক পুড়ে যাবে, ঝলসে যাবে। চড়া পড়বে। মজে যাবি। ওই চাষীরা তোর বুকে লাঙলের ফাল চালাবে।

আকাশ মেঘকে অভিসম্পাত দিতেন। দিনের মধ্যে কয়েকবার আসতেন কালীমন্দিরে। এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবীমূর্তিকে গালাগাল করতেন। মধ্যে মধ্যে আক্রোশ পড়ত তাঁর নিজের সৌভাগ্যশিলার উপর। তাকে গালাগাল করে বলতেন—রাজবাড়ীতে রাজভোগ খেয়ে তুই মজায় আছিস, নয়? রাজার মন যোগাচ্ছিস। কই দে আমায় যা চাই, দে। তোকে আমি ভাঙব। ঠুকে ঠুকে ভাঙব। কমা—কাঁসাইয়ের জল কমা।

লোকজনেরা শঙ্কিতবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। মধ্যে মধ্যে রামব্রহ্ম তাঁর সঙ্গে তর্ক করতেন। বলতেন—এ হয় না, এ হয় না। বীরাচার তুমি ছাড়। নইলে মঙ্গল হবে না তোমার। প্রহার খাবে। বজ্রের প্রহার হবে। তন্ত্র আমিও জানি, আমি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বংশধর। এ-পথ তুমি ছাড়।

শ্যামাকান্ত অট্টহাস্য করতেন।

ওদিকে সেই পাগলিনীরও একটা পরিবর্তন হয়েছিল। সেই কীর্তিহাট গ্রামের মধ্যে এসে মানুষজনের সঙ্গে মিশতে চাইত কিন্তু মানুষজনে তাকে ভয় করত। মেয়েটা তখন আর একরকম। শ্যামাকান্তের নিষ্ঠুর পীড়ন সে সইতে পারত না, সুযোগ পেলেই ছুটে পালিয়ে আসত রায়বাড়ীতে। রাজকুমারী রাণী কাত্যায়নীর কাছে গিয়ে শান্ত মেয়েটির মত বসে বলত—একবার খুকীকে দাও না গো! একটু কোলে নিই!

দিতে ইচ্ছা না থাকলেও দিতে হত, ভয় করে দিতেন শিশু বিমলাকে তার কোলে। সে তাকে আদর করত। কিছুক্ষণ পর বিমলাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেত সোমেশ্বরের কাছে। ঘুরে বেড়াত ঘরময়। দেখে বেড়াত ঐশ্বর্য। অবাক হয়ে দেখত।

এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। সেপ্টেম্বর মাস—আশ্বিনের প্রথম। ১২ই আশ্বিন, ২৮শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে কালেক্টারী রেভেন্যু দাখিল করতে গিয়ে নায়েব একটা লাট নীলামে ডেকে এলেন। পরগণা মাজনামুঠার সবথেকে বড় লাট—লাট মহাতাপপুর। মুনাফা সাত হাজার টাকা।

তখন মাস মাস রেভেন্যু দেবার আইন। মাসে মাসে নির্দিষ্ট দিনে টাকা না দিতে পারলে sunset law অনুযায়ী নীলাম হয়ে যেত। সোমেশ্বর রায় মেদিনীপুরে একটা সেরেস্তা খুলেছিলেন। মামলা চালাবার জন্যে আর নীলামে সম্পত্তি ডাকবার জন্যে। ভাল মহল—সচরাচর জমিদারেরা ছাড়তেন না, লোকসানি মহল নীলাম হত। ছোট মহল ছেড়ে দিতেন ছাড়া নীলাম হতে দিতেন না। এবার ভাল মহল উৎকৃষ্ট সম্পত্তি পাওয়া গেছে। খাঁটি সোনা।

রায়বাড়ীর কালীমন্দিরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠেছিল। তার সঙ্গে শিঙা-শানাই। ষোড়শোপচারে আনন্দময়ীর পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল। তার সঙ্গে সৌভাগ্যশিলা রাজরাজেশ্বর পূজা। সোনার বেলপাতা, সোনার তুলসী গড়বার হুকুম হয়েছিল সেকরাকে। গ্রামে তখন স্বর্ণকার এনে বসানো হয়েছে। তার সব থেকে বড় কাজই ছিল এই।

একদিন পর মহালয়া—পিতৃপক্ষের একাদশী। সেদিন বলি দিয়ে পূজা হবে, ব্রাহ্মণভোজন হবে ব্যবস্থা হচ্ছে, এরই মধ্যে এসে দাঁড়ালেন শ্যামাকান্ত। চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে। ক্রোধে ফেটে পড়ছেন।

বললেন—রায়বাবু, আমার শিলা দাও।

—কি হল ? সোমেশ্বর চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিলেন।

সেই যে যোগিনী অভিষেকের দিন শ্যামাকান্ত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে বলেছিলেন—ওই পূজাটা তুমি সেরে দিয়ো হে ন্যায়রত্ন। তারপর থেকে ন্যায়রত্নই পূজা করে আসছেন। শ্যামাকান্ত বলতে গেলে কীর্তিহাটেই আর বড় আসতেন না। ওখানেই থাকতেন। সোমেশ্বর ভেবেছিলেন —তান্ত্রিক ভুলেই গেছে নারায়ণশিলার কথা। মধ্যে মধ্যে এসে গালাগাল দিয়ে যেতেন শিলাকে, ব্যস ওই পর্যন্ত।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—আমি চলে যাব হে। এখানে হ'ল না। ভাল আমার হ'ল না। ভাল হল তোমার। আমার সাধনার ফল তুমি পাচ্ছ। আমাকে চলে যেতে হবে।

—কেন ? আপনি তো পেয়েছেন। আজ ধুলো-মাটি আপনি হাতে করতে গুড় হয়, ভুরো হয়—

—দূর শালা, গুড় তৈরী করতে পারলেই যদি সিদ্ধি হয়, তবে তো আখের চাষ করলেই তা হ'ত রায়বাবু। তোমার মত টাকা থাকলে, জমিদারী থাকলে তো লাখ মণ গুড় কিনে রাখলেই সিদ্ধি ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারা যায় হে। শালা গুড়ের ব্যবসাদাররা তো তাহ'লে সিদ্ধপুরুষ !

তারপর মাথার চুল টানতে টানতে বলেছিলেন—মাসে মাসে পঞ্চপর্ব চলে যাচ্ছে, ঘরে বসে ভেরেণ্ডা ভাজছি, যোগিনীছুঁড়ির মন উড়ি-উড়ি করছে। সাধন নইলে পালায়।

—কোথা পালাবে ? আমার এলাকায়—

হা-হা করে হেসে বলেছিলেন—ওরে শালা, শালুক চিনেছ গোপালঠাকুর, ওরে, দেহে তো ও একটা পাগলী রে, পাগলীটা এল সেদিন—যোগিনী ঘুরছিল, আমার টানে ওর মধ্যে ঢুকল। সাধনের টানে বাঁধা ছিল। না-না, আমি চলে যাব, আমি চলে যাব। তোমার ঘরে লক্ষ্মী ওথলাচ্ছে, তুমি শালা মজা মারছ। ওই মুড়িটা ঢালছে তোমাকে। চলে যাব আমি। পরশু মহালয়া, কাল চতুর্দশী, তিথি চলে যাচ্ছে, পর্ব পালাচ্ছে, এপারে বসে বান দেখছি আমি। জান, ওপারে রাত্রে লগ্নযোগ আমাকে মুখ ভ্যাঙচায়। শেয়ালগুলো হি-হি করে হাসে। ঘরে বসে জপ করি, আমার জপ কেটে যায়।

হঠাৎ সোমেশ্বর বললেন—বেশ তো। বসে থাকতে হবে না আপনাকে। আগে এ-কথা বললে নিশ্চয় আমি ব্যবস্থা করতাম। চলুন, নৌকো করে নিয়ে যাব আমি। আমি শিবে, তারা যেমন যাই, তেমনি যাব। করুন সাধন আপনি।

শ্যামাকান্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে সোমেশ্বরের হাত চেপে ধরেছিলেন।—যাবে ? না তখন বলবে—এই বানে যাওয়া যায়, আপনি বলুন। না-হয় বলবে—আপনি যান, আমি যেতে পারব না। তোমরা বড়লোক। সিংদরজায় খিল দেবে। পাহারাদারে পাহারা দেবে। বলবে—ভাগো !

—না, তা বলব না।

—তিন সত্যি কর। বল যাব—

—যাব, যাব, যাব।

* * *

সুরেশ্বর বললে - সুলতা, এরপর যা ঘটেছিল, তা জানত সবাই। নৌকোডুবি হয়েছিল। ভেসে গিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। সোমেশ্বরও ভেসে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাঁচিয়েছে তারা হাড়ি। শিবু বাগ্দী নাগাল পেয়েছিল মনোহরার, শ্যামাকান্তকে কেউ ধরতে পারেনি। কেউ যেন তার বুকে চেপে কি জলের নীচে থেকে পায়ে ধরে টেনে তাকে ডুবিয়ে নিয়ে কোথায় জলস্রোতের

টানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তার হদিস কেউ পায়নি।

তাঁরা প্রাণে বেঁচে কোন রকমে ওপারে উঠে রাত্রি কাটিয়ে পরদিন এপার থেকে নৌকো আনিয়ে ফিরেছিলেন। সোমেশ্বর রায়ের যে দেহে আতর মাখতেন—সাবান মাখতেন তাঁর সেই সারা অঙ্গে কাদা কাদা আর কাদা। শিবু তারা কাদায় মাখামাখি। যোগিনী মেয়েটার একরাশ রুক্ষ চুল কাদায় বীভৎস দেখাচ্ছিল। সারা গায়ে কাপড়ে কাদা। বিবরণ শুনে লোকে স্তম্ভিত হয়েছিল। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—মহাশক্তি! এ মহাশক্তির রোষ! বামাচারীরা এইভাবে অপঘাতে মরে—নয় উন্মাদ হয়ে যায়।

লোকটিকে তো মা সাধনের উপকরণ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এমন কণ্ঠ, এমন সংগীতবোধ, কোনদিন মা বলে ডেকে গান গাইলে না। হায়রে—

তোর উপর কায়েমী স্বত্বের দেখব দখল পাই কি না পাই! দেখিয়ে দিয়ে গেল বাবা।

শিবু বাগ্দীকে সোমেশ্বর পাঠিয়েছিলেন কিনারা ধরে খুঁজতে, যদি শ্যামাকান্তের দেহ পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি নয়, শিবু আর ফেরেইনি। পাওয়ার কথা নয়, কাঁসাই নদী উপরে এমনি পাহাড়ে নদী। বারো মাসের ছ'মাস হেঁটে পার হওয়া যায় কিন্তু নীচে কাঁসাই হয়েছে হলদী। কংসাবতী হয়েছে হরিদ্রাঙ্গী। ভাগীরথীর সঙ্গে যেখানে মিশেছে, তার একটু উপরে তার সঙ্গে মিশেছে এসে কেলেঘাই। সে এক বন্যাবর্বরা আদিবাসিনীর মত দুর্মদা। ওই মনোহরার মতই সে পাগলী। হলদীর পরই ক্রোশকয়েক দক্ষিণে রসুলপুরের মোহনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার রসুলপুরের মোহনা, সুলতা। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কাপালিককে দেখেছিলেন। তার কাল, শ্যামাকান্তের কাল থেকে অনেক পরে। ১৮২২।২৩ সাল আর ১৮৭২ সাল বোধ হয়। পঞ্চাশ বছর পর।

যাক, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় এলাম। বলছিলাম হলদীর কথা। সমুদ্র থেকে জোয়ার উঠে ভাগীরথীর বুক বেয়ে চলে যায় চুঁচড়োর ধার পর্যন্ত। আশেপাশে যেসব নদী-খাল এসে পড়েছে এর মধ্যে, তার মধ্যে দিয়েও জোয়ার ঢোকে। হলদীতে জোয়ার ঢোকে। বর্ষার সময় তাই কাঁসাই যখন ভরে, তখন সে তরঙ্গময়ী হয়ে ওঠে। যেদিন শ্যামাকান্ত ডোবেন, সেদিন ছিল আশ্বিনের কৃষ্ণা-চতুর্দশী। আজও আশ্বিনের চতুর্দশী অমাবস্যা-পূর্ণিমার জোয়ারকে বলে ষাঁড়া-ষাঁড়ির বান। অমাবস্যার জোয়ারই প্রবল, সেইটেই ষাঁড়ার বান। জোয়ারের পর যখন ভাটার টান পড়ে, তখন তার টানও ভয়ঙ্কর। সেই টানে ভেসে গিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। তাঁকে পাওয়ার কথা নয়। তাছাড়া যত বীভৎসই মনে হোক তাঁর আচরণ, সাধন-ভজন, তবু তাঁকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। তাঁর দেহ গঙ্গায় পড়ে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পড়েছে। মহামায়া তাঁর দুর্নিবার ভয়ঙ্কর বাসনাকে ওই সঙ্গমতীর্থে সমাধিস্থ করে তাকে মুক্তি দিয়েছেন—এই ধারণাই নিঃসন্দেহে করেছিল লোকে।

এ ব্যাখ্যা করেছিলেন রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন।

সোমেশ্বর অনেক হায়-হায় করেছিলেন। শ্যামাকান্তের শ্বশুরবাড়ীতে একটা খবরও পাঠিয়েছিলেন। তখন শ্যামাকান্তের স্ত্রীও বিগত। থাকবার মধ্যে ছিলেন শাশুড়ী। আর বছর-দুয়েকের ছেলে বিমলাকান্ত। তাঁদের সাহায্যও কিছু করতে চেয়েছিলেন সোমেশ্বর, কিন্তু তাঁরা তা নেননি; ভট্টচাজের ঘর হলেও, লাখরাজ মানে জমি তাঁদের যথেষ্ট ছিল। একশো বিঘার জোত, সে সামান্য নয়, তাছাড়া শিষ্য ছিল অনেক। পদ্মনাভ ভটচাজ-গৃহিণী তখন গুরু-মা হিসেবে দীক্ষা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যেতেন। মানে-সম্মানে তাঁরা বৃহৎ ছিলেন

না কিন্তু মহৎ ছিলেন। হেসেই বলেছিলেন—না। মায়ের কৃপায়, নারায়ণের দয়ায় চলে যাবে। তবে যদি খবরটা আগে দিতেন, তাহলে ভাল হত, একবার বিমলাকান্তকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে দেখতাম। তা দোষ রায়বাবুকেই বা কি দেব, দোষ অদৃষ্টের, আর কর্মফেরের। যা হয়েছে তা মায়েরই ইচ্ছে আর তাঁর কর্মফল। তার সঙ্গে আমাদের অদৃষ্টের।

সোমেশ্বর রায় নিজে একটি প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। ওই সাধককে তিনি বাঁচাতে পারেননি তার জন্যও বটে, আর তিনি একরকম তাঁর শিষ্য—উত্তরসাধক হিসেবে সেজন্যেও বটে। এ না করে তাঁর মন তৃপ্তি পায়নি। এর বিধান দিয়েছিলেন রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন। ব্রাহ্মণভোজন করিয়েছিলেন। এখান-ওখান থেকে তান্ত্রিক কৌল প্রভৃতিদের এনে সমাদর করে ভোজন-বিদায়—তাও করেছিলেন। তার সঙ্গে কাঙালীভোজন। আর ওই কাঁসাইয়ের পাড়ে যে বাগান, সেই বাগানে, অনেক যত্ন করে রেখেছিলেন শ্যামাকান্তের ওই মনোহরা যোগিনীকে। দাসী পর্যন্ত রেখে দিয়েছিলেন। আরও কিছু করেছিলেন সোমেশ্বর, তিনি নিজে এবার তন্ত্রমতে পূজা-অর্চনায় গভীরভাবে মন দিয়েছিলেন।

আশ্চর্যের কথা, যোগিনী মেয়েটা শ্যামাকান্তের নিখোঁজের পর শান্ত হয়ে গিয়েছিল—বিশেষ ক'রে রায়বাবুর মেয়ে বিমলাকে নিয়ে তার আর মমতার শেষ ছিল না। এবং শিশু বিমলাও তার কোল এত ভালবাসত যে তাকে না পেলেই সে কাঁদতে আরম্ভ করত।

কিছুকাল পর সোমেশ্বর তাকে নিয়ে সাধনার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন সাবধান করে দিয়েছিলেন তাঁকে। না—এ ঠিক হবে না বাবু। এ করবেন না।

শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—নৌকো ওল্টায় নি মহেশ! সোমেশ্বর রায় আমাকে নৌকো থেকে—মাঝ কাঁসাইয়ের সেই ষাঁড়া কোটালের ভাটির টানের সময় তখন—তখন তুলে ফেলে দিলে। দিলে তারা হাড়ি।

আমি ভাবনায় ডুবে ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম কি জানিস—ভাবছিলাম আজ কি হবে? আজ গিয়ে বসব আসনে। যোগিনীর কাপড়ের খুঁটে আমার গেরুয়ার খুঁট বেঁধে বসব। ডুবব। বুঝলি—রামপ্রসাদের গানে আছে—'ডুব দে রে মন কালী বলে।' তাই ডুবব। জগৎ সংসার সব মুছে যাবে। শব্দ না গন্ধ না স্পর্শ না—কিছু থাকবে না। বাইরে হোক প্রলয়, আমার কাছে কিছু থাকবে না। হাঁ। আমি আর আমার সামনে অন্ধকার। যোগিনী অজ্ঞানের মত বসে থাকবে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে আলো—হাঁ আলো—নীল আলো—মহামেঘ-প্রভার মত আলো। চমকে চমকে উঠবে। কলরব করবে শিবারা—হোমের আগুনে আহুতি দেব এক এক কুশী। এই সব ভাবছি। আর ভাবছি—আজ যাবে কোথা? হুঁহুঁ! জানিস, মনের মধ্যে গানের কলি এসেছিল, সে এক কলি আজও মনে রয়েছে রে—'আর তুই পালাবি কোথা?' হঠাৎ তাড়া হাড়ি উঠে এসে আমাকে জাপটে ধ'রে চ্যাঙদোলা করে তুলে ঝপ করে জলে ফেলে দিলে। রায়বাবুর মুখ দেখি নি। শুধু শুনেছিলাম তার কথা। যাও—সিদ্ধি তোমার জলের তলায় আছে। সৌভাগ্যশিলা নেবে তুমি! যাও!

আমি ডুবে গেলাম। সাঁতার জানতাম—তা ভালই জানতাম। কালীঘাটে জোয়ারের টান থেকে দাঁতে কাপড় কামড়ে ধ'রে সেই মাগীর শব টেনে এনেছিলাম। কিন্তু কাঁসাই সেদিন ভীষণ। টেনে নিয়ে চলল। ভেসে উঠলাম তবু। উঠে সাঁতার কেটে নৌকোটা ধরতে গেলাম। তো রায়বাবু একটা দাঁড় কেড়ে নিয়ে মাথায় মারলে। এই দেখ কপালের দাগ। এই খানিকটা লেগেছিল, তাতেই কপাল ফেটে গেল। গোটাটা মাথায় পড়লে মরেই

যেতাম।

তা মরে গেলাম না সব কালো হয়ে গেল। ভারী আনন্দ হ'ল রে। ভারী আনন্দ মনে হ'ল, সেই কালো রে। যে কালোর মধ্যে ডুবব ভাবছিলাম! কালী কালী বল মন—মনে হ'ল কালীর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। আসছে—সে আসছে। বাস—রায় শালাকে শাপশাপান্ত করলাম না, করতে ভুলে গেলাম। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে জল ঢুকছিল—আপনা-আপনি কুম্ভক করে চিৎ হয়ে মড়ার মত ভাসলাম। মনে হল কে যেন কোলে করলে।

তাঃ। না—। সেটা আমার ভুল। বুঝলি, কোলে কেউ করেনি, একটা শালগাছের গদি ভেসে যাচ্ছিল—সেই গদিতে গিয়ে ঠেক খেয়েছিলাম। কি ক'রে যে গদিটার ওপরে উঠে শুয়েছিলাম তা জানি না। করাতীরা গদিটা চৌকো করে চিরে রেখেছিল। উপরের পিঠটাতে শুয়েছিলাম শালা অনন্তশয্যেতে বিষ্টু ঠাকুরের মত। দিব্যি ভাসতে ভাসতে এসে লেগেছিলাম একটা বাঁকের মাথায় চড়াতে।

গাঁয়ের লোকেরা নদীর ধারে এসে কাঠ সমেত আমাকে তুলেছিল।

কপাল। আর সেই মাগীর ছলা। মাগীর ওই কাজ; প্রহার খেয়েও ছাড়বে না—তাকেই ধরা দেয়!

চেতনা হয়েছিল দুপুরবেলা। দেখি সব বাগদী আর মুসলমান। আর কেরেস্তান। সে এক তিনদিকে জল—একটা দ্বীপের মতন আশ্চর্য জায়গা—বামুন-কায়েতের বংশ নেই। জায়গাটার মালিক মুসলমান হাজী সাহেব। হাজীও বটে ঠাকুরও বটে। তাকে চিনলাম—তারা আমার শ্বশুরবাড়ী শ্যামনগরের মালিক ছিল। তার আগে ব্রাহ্মণ ছিল। মস্ত যোগীর বংশ। ঠাকুর উপাধি ছিল। এরা তারাই।

তারাই বাঁচালে।

* * *

ঠাকুর মিয়া শ্যামাকান্তকে খুব খাতির করেছিলেন। তিনি তাঁকে চিনলেও নিজের পরিচয় তাঁকে দেন নি। ঠাকুর মিয়া পিতৃপুরুষের যোগবিদ্যা আর গণনাবিদ্যা ছাড়েন নি। তিনি নিজে হাজী ধার্মিক লোকও বটেন তার সঙ্গে আমীরও বটেন। নানকার গ্রামখানায় তাঁর শাসন অদ্ভুত। কেউ কারুর জাত মারে না। মারবার হুকুম নেই। মুসলমানদের প্রতাপ বেশী বটে কিন্তু অন্য জাতের মেয়েকে কেউ সহজে মুসলমান ক'রে কেড়ে আনতে পারে না। বলে—উটি চলবে নাই। উঁহু! তিনি শ্যামাকান্তকে তান্ত্রিক বলে চিনতে ভুল করেন নি। বলেছিলেন—তা তুমি থাক গোসাঁই, ঢাক ঢোল বাজায়ো নাই, চুপচাপ ওই গাঁয়ের ধারে বাগ্দীদের কালীর থান আছে, সেখানে থাক।

গ্রামের কালীর স্থান একেবারে শ্মশানের ধারে। স্থানটি পছন্দ হয়েছিল তাঁর। বসেও ছিলেন কিছুদিন। মাস কয়েক। মাটির কালীমূর্তি তৈরী করে নতুন করে আসন করবার চেষ্টায় ছিলেন।

ঠাকুর মিয়া একদিন তাকে ডেকে বলেছিলেন—তুমি নাকি, ইয়ারা বলছে, খুব ভাল গান কর গোসাঁই!

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—তা কিছু জানি।

গানবাজনার মধ্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমেছিল। তিনি গাইতেন ঠাকুরসাহেব নিজে বাজাতেন; তবে সে সব গান তাল মান লয়ের রাগরাগিণীর আলাপ। কিন্তু তবু মাসকয়েক পর ওখান থেকে চলে এসেছিলেন শ্যামাকান্ত। এসেছিলেন কামরূপ কামাখ্যা। সেও তাঁকে

মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ওই ঠাকুরসাহেব।

শ্যামাকান্ত খুঁজেছিলেন নায়িকা। সাধন-সঙ্গিনী ভৈরবী। একদিন ঠাকুরসাহেবকে বলেছিলেন মনের কথা। ওখানে ঠাকুরসাহেবের কড়া নজর ছিল ওই বিষয়টিতে। মেয়ের ইজ্জত—ধর্ম—এ কেউ কারুর নাশ করতে পারবে না। দুষ্টনষ্ট মেয়ে ছিল। কিন্তু সে গোপন রেখে চলত। প্রকাশ পেলে তিনি কঠিন সাজা দিতেন। সেই জেনেই শ্যামাকান্ত তাঁর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। একটি ভৈরবী তিনি সংগ্রহ করে নেবেন বা বাইরে থেকে সংগ্রহ ক'রে আনবেন। বলেছিলেন—ঠাকুরসাহেব, এই পথেই সাধন করে এসেছি। সাধন আমার এ পথ ছাড়া হবে না। আমাকে হুকুমটা দেন। আমার সিদ্ধি হ'লে আপনাকে আমি রাজা ক'রে দোব!

ঠাকুরসাহেব নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—সিদ্ধাই আমি জানি হে গোসাঁই। তা হাজার পথ থাকতি ই পথ নিলা ক্যানে হে? রসুল আল্লা, ই কি ফ্যারে পড়িছ হে! দেখ, তোমার ধরম তোমার। কিছু বলব না আমি। কিন্তু উটি ইখানে হবে নাই সো হুকুম নাই আমার বাপের হজরত গুলমহম্মদ ঠাকুরের। না।

একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—আমার একটা বাত শোনবা? তুমি কাঁউর কামাখ্যায় যাও হে! ই সাধন তোমার সিখান ছাড়া হবে নাই! আমি ইসবের কিছু জানি। ই শ্মশে যারে তুমি সাধন কর হে সে মা সেজে বসে আছে। বুঝলা না! কাঁউর হ'ল ডাকিনীর শ্মশ, কুহক-বিস্তার চল সিখানে। তুমি সিখানে যাও। ইখানে উ হুকুম আমি দিব না বাপু! টাকা-কড়ি আমার কাছে কিছু লিবা আমি দিব। গাঙ দিয়া বড় বড় মালের ভাউলে যায়—গৌহাটি। আমার এই গোয়ানরা আছে। তারা এককালে হারমাদ ছিল। এখুনও ফাঁক পেলে মারতে পারে ভাউলে বারো। তা আমার শাসনে পারে না। দু-চারজনা ভাউলেতে কাম করে। তারা তোমাকে নিয়া গৌহাটি কামাখ্যা পৌছায় দিবে। বুঝলা? ইখানে উ সব হবে নাই। তুমাকে চলি যাতি হবে। ই হুকুমের নড়চড় নাই।

আসবার দিন ঠাকুরসাহেব শ্যামাকান্তকে নগদ একশো টাকা দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন—একটা বাত শোনবা? তুমার থেক্যা আমার উমর অনেক বেশী গোসাঁই। কত আর উমর হবে তুমার। পঁচিশ! আমার উমর ষাট পার হে! আর আমি বুঝি! আমরা তো হিঁদু ব্রাহ্মণ ছিলাম। সিদ্ধাই ছিল আমাদের। ঠাকুর নাম ঘুচে নাই। শুন, যা বলি শুন! নায়িকা ভৈরবী এ নিয়া সাধন করো না বাপ। বড় খারাপ। ই হ'ল কি জান—বুকে সাপ নিয়া দিল ঠাণ্ডা করা। ডংশন সে করবেই! তার থিকা এক কাম করিয়ো। পোলার মতুন মাকে ডাক। আর ওই পথে যদি হাঁটবা—তবে স্বজাত স্বঘর দেখে কন্তের লক্ষণ দেখে সাদী ক'রে পরিবার নিয়া সাধন কর। পথ সোজা হবে। বুঝলা! জান তো সব। আমি ইসলামের বান্দা, ইসব আমাদের কাছে কাফেরী। বেধরম অধরম। তবে আমার বাবা গোস্তা নই। আমি জানি, আমি আমার ইসলামকে মানলেই হল। তবু খানিক আধেক বুঝি, বললাম—তুমি ভেব্যা দেখো! হাঁ?

শ্যামাকান্ত সেলাম ক'রে বলেছিল—ঠাকুরসাহেবের কথা মনে থাকবে আমার। সঙ্গে সঙ্গে হেসেছিলেন।

ঠাকুরসাহেব এবার শক্ত হয়ে উঠে বলেছিলেন—হাসিয়ো না পোলা, হাসিয়ো না। তোমার বুকে ডংশন আমি তোমার ললাটে দেখছি হে!

মহেশচন্দ্র লিখেছেন—আমি তোমাকে সব বিশদ করিয়াই বিবৃত করিলাম। যে দিবস তিনি আমাকে তদীয় জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছিলেন সে দিবস একটা গোটা বেলা কাটিয়া গিয়াছিল। আমি সমস্ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। হিন্দুর সন্তান, এমত কাহিনী অনেক শুনিয়াছি। আমাদের অঞ্চলে এক কাপালিক আসিয়া কিছুদিন ছিল, তাহাকে দেখিয়া ভয় করিত। শুনিতাম সে নরমাংস খায়, নরবলি প্রদান করে। শ্যামাকান্ত সেই ধরনের মানুষ—ওই এমনি এক পথের পথিক। অথচ লোকটির কাহিনী শুনিয়া তাহার উপর ক্রোধ করিতে পারি নাই। তাহার একটা আকর্ষণী ছিল এবং কোথায় যেন একটা দুঃখী ভাব ছিল। আমি তাহার কথাগুলি সেই রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতঃ সব লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

ইহার দুই-চারিদিন পর তাঁহার নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি খুবই চঞ্চল—যেন তাঁহার পাগলামি আবার বৃদ্ধি পাইবে মনে হইল। গালাগালি দেওয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাণ্ডারা বলিলেন—সারাদিন আহার করেন নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আবার এসব কি হইতেছে?

সুরেশ্বর বললে—মহেশচন্দ্র মনে করেছিলেন গালাগাল দেবেন শ্যামাকান্ত। কিন্তু না। তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন, বলেছিলেন—ওরে, কাল যে এক মহাপর্ব রে। পঞ্চপর্বের তিন পর্ব একসঙ্গে। সংক্রান্তি, কৃষ্ণ-চতুর্দশী তার উপর মঙ্গলবার। ওরে, এ পর্ব দুর্লভ। বড় দুর্লভ! পর্ব চলে যাবে, আমার সাধন হবে না রে আমার সাধন হবে না।

—বেশ তো, তুমি তোমার সাধন কর না। কে বারণ করছে?

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—শির নাই তার শিরঃপীড়া! পাত্র নাই তার রন্ধন! ওরে বেটা, কাঠ নাই আগুন ধরবে কিসে রে?

মহেশচন্দ্র লিখেছিলেন—আচ্ছা বলতে পার, এই যে এমন করে কাদাধুলো মেখে বনে জঙ্গলে শ্মশানে এমনি ক'রে ঘুরছ, এই তো একবার—একবার কেন দু-দুবার জলে ডুবতে ডুবতে বাঁচলে, তারপরও এমনি ক'রে ঘুরছ কেন, এতে হবে কি?

হবে কি? হবে কি? অবাক হয়ে গিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। তারপর বলেছিলেন—রাজা হয়ে কি হয় রে বেটা? টাকা জমিয়ে কি হয় রে? কি হয়? সোমেশ্বর রায় শালা জমিদার হয়েছে। জমিদারী কত, তবু কিনছে। কেন রে? সুখ রে বেটা সুখ। ওরে জন্ম জন্ম ধরে মানুষ সুখ খুঁজছেই খুঁজছেই। আমি পরজন্ম খুঁজছি। ওই পেলে সব সুখ আমার হবে। সুখে ডুবে যাব রে। দুঃখ, বুঝলি, এই পাঁজরায় পাঁজরায় দুঃখু, সব সুখের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। ওরে, এক একটা পর্বের লগ্ন যায়, সুখ মাথার ওপরে মেঘের মত গুরগুর ক'রে ডেকে চলে যায়। খানিকটা ছোঁয়া দিয়ে ডাকে। ওরে বর্ষায় না। একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—সোমেশ্বর রায় আমার সৌভাগ্যশিলা কেড়ে নিলে—জলে ফেলে দিলে, দিক; শাপ সাধককে দিতে নাই দোব না। শালা আমাকে বাঁচিয়েছে রে। জানিস—শালা মহান ডাকাত, আমার মনে হ'ত শালা সিদ্ধি হ'লে জমিদারই হব। হাতীতে চড়ব পাল্কীতে চড়ব ঘোড়াতে চড়ব—এই হুকুম দোব বাঁধ শালাকে মার শালাকে! লোভ হচ্ছিল। তা বেশ করেছে। ও লোভটা গিয়েছে রে। কিন্তু দুঃখ তো যাওয়া চাই রে। সুখ তো চাই। ওই আ-কা-শ ভরা মেঘের মত সুখ! জানিস—আমার সব ঠিক। সব ঠিক। লক্ষণে বুঝতে পারছি। শুধু আমার নায়িকা চাই। পাচ্ছি না। জায়গা, আসন আমার মিলেছে! শুধু নায়িকা!

* * *

মধ্যে মধ্যে ক্ষেপে উঠতেন সৌভাগ্যশিলার উপর।

বলতেন—ওই, ওই নুড়ি ভগবানই আমার সর্বনাশ করেছে রে। বুঝলি, বৈষ্ণব সাধু আমাকে বলেছিল—সন্ন্যাসীর কাছে ও হল চৈতন্যশিলা। গৃহস্থের কাছে সৌভাগ্যশিলা—ধনসম্পদ ভূমি সৌভাগ্য দেয় আর সাধুকে দেয় চৈতন্য। চৈতন্য না কচু। ভেদ ভেদবুদ্ধি রে, ভেদবুদ্ধি। বুঝলি ওই মনোহরা যোগিনীকে আমি পেলাম, কিন্তু ওকে প্রকৃতি হিসেবে নিতে গিয়ে মনে হল কি জানিস? মনে হ'ল—পাপ হবে। কামার্থে গ্রহণ করা হবে। কাম! কাম কি রে? কাম তো মহাশক্তির বিধান। ওইখানে তো সৃষ্টি রে। পরমানন্দ। মেয়েটাকে দেবতা ক'রে পুজোই করলাম। বললাম—তুই আমার দূতী। দূতী! বুঝলি, এ ওই নুড়িটার খল! ব্রহ্মাণ্ডের রাজা দেবতাদের দেবতা, বেটা পালক! বৈকুণ্ঠে দরবার করে, জয় বিজয় পাহারা দেয়, রাজভোগ খায়। আর বলে এটা পাপ—ওটা পুণ্য। পাপ পুণ্য। থাক বেটা জমিদারবাড়ীতে পুষ্যিপুত্তুর ঘরজামাইয়ের মত। খাক দাক আর মামলা বাধাক—পরের হয়ে নিয়ে দিক সব চুটিয়ে দিক—ওই রায়কে।

ওঃ, ওটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আসতে পারতাম! শালা সোমেশ্বর থাক—ওই ওকে নিয়ে থাক। মামলা করুক, মকদ্দমা করুক, টাকা করুক। চাই না। আমার নায়িকা চাই। এই কামাখ্যা পীঠ!

নায়িকা পান নি। পান নি—না—তাঁর নিজের চোখে কাউকে নায়িকা বলে মনে হয় নি—এ শুধু তিনিই জানেন।

তার কারণ মহেশচন্দ্র লিখেছেন—নায়িকা নায়িকা ক'রে আক্ষেপ করতেন, ওখানকার পাণ্ডাদের মধ্যে তান্ত্রিক বলতে গেলে সবাই। তাঁদের মধ্যে দু-চারজন বামাচারী বীরাচারীও ছিলেন, তাঁরা তাঁকে নায়িকা সংগ্রহে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। কামাখ্যা অঞ্চল নাকি ডাকিনীতন্ত্রের দেশ, ডাকিনীবিদ্যা জানা নায়িকা তাঁরা এনে দিয়েছেন তাঁকে, কিন্তু তিনি বলেছেন—ও না। না—না—না। এতে হবে না। আমার মন চাচ্ছে না। লক্ষণ ওর যতই থাক।

হঠাৎ একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

শ্যামাকান্ত মন্দিরের চত্বরে ধ্যানে বসেছিলেন রাত্রে। গৌহাটি অঞ্চলে শহরের মধ্যেই বাঘ ঢুকত তখন। কামাখ্যা পাহাড়ে নিত্য রাত্রে বাঘের ডাক শোনা যেত। পাণ্ডারা সন্ধ্যার আগেই মন্দির বন্ধ করে চলে আসতেন। সে দিন ছিল শুক্লা-চতুর্দশী। শ্যামাকান্ত সন্ধ্যার সময় গিয়ে মন্দির-চত্বরে ঢুকেছিলেন—রাত্রে ক্রিয়া করবেন। কারুর বারণ তিনি শোনেন নি। নায়িকা না নিয়েই বসেছিলেন।

সকালে মন্দির-চত্বরে পাণ্ডারা ঢুকে দেখলে তাঁর আসনে তিনি তখনও ধ্যানস্থ হয়ে বসে। হাতে তাঁর যন্ত্রপুষ্পের অঞ্জলি। জবা অপরাজিতা বিল্বপত্র।

পাণ্ডারা প্রথমটা ভেবেছিল সমাধিস্থ হয়েছেন বুঝি। কিন্তু না। পাণ্ডাদের সাড়াতেই চোখ মেলে দিনের আলো দেখে অঞ্জলি তাঁর যন্ত্র আঁকা পীঠে ঢেলে দিয়ে নিজের হাত শুঁকেছিলেন। মুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই অঞ্জলি দেওয়া ফুলের কয়েকটা ফুল তুলে পাণ্ডার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—দেখ তো শুঁকে! দেখ তো!

বিস্মিত পাণ্ডা প্রশ্ন করেছিল—শুঁকে?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। সুগন্ধ পাচ্ছ কি না দেখ তো!

—তা তো এখান থেকেই পাচ্ছি।

ব্যঙ্গ ক'রে হেসে বলেছিলেন শ্যামাকান্ত—তা তো পাচ্ছ। কিন্তু জবায় অপরাজিতায় বেলপাতায় গন্ধ থাকে নাকি? এঁ্যা!

—তা তো বটে! পাণ্ডার এতক্ষণে হুঁস হয়েছিল। গন্ধ তো থাকে না। এলো কোত্থেকে?

—কোত্থেকে? দেখবে? দেখ! নিজের হাতখানা উপরে তুলে ধরে সেদিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়েছিলেন, তারপর বলেছিলেন—দেখি তোমার হাত।

তার হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের আঙুল ঘষে দিয়ে বলেছিলেন—দেখ! শোঁকো।

পাণ্ডা শুঁকে দেখে বলেছিল—তাই তো।

সেদিন সাধনায় ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। হঠাৎ মধ্যরাত্রে মনে হল একটি অপূর্ব মধুর গন্ধের বায়ুস্তর তাঁকে আশেপাশে উপরে থেকে মেঘের মতই ঢেকে ফেলেছে। তিনি যেন মোহগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিলেন—মনে হল ওই গন্ধের উৎস তাঁর সামনেই রয়েছে, তাঁকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। মনে হল অতি নিকটে। চোখ খুলতে তাঁর সাহস হয়নি। তবে হাত বাড়ালেন তিনি ওই উৎসকে ধরবার জন্য। না, ধরবার কিছু পান নি। কায়াময়ী কেউ ছিল না। তিনি হাতখানা দিয়ে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ব্যগ্র আগ্রহে খুঁজলেন। কেউ না। শুধু একটি হিমশীতল স্পর্শ তাঁর আঙুলের ডগাগুলিকে ছুঁয়ে গেল।

চমকে উঠে চোখ খুলেছিলেন তিনি।

শুক্ল চতুর্দশীর জ্যোৎস্নায় অঙ্গন ঝলমল করছিল। নিস্তব্ধতা থমথম করছে। জ্যোৎস্নার মধ্যে কামাখ্যামন্দির ছবির মত মনে হচ্ছিল। কোথাও কেউ নেই। উপরের দিকে চত্বরের ওপাশে তাকালেন। সেখানেও কোন ফুলেভরা গাছ দেখতে পেলেন না। তিনি আবার চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন। আবার মনে হল চারিপাশের বায়ুস্তর সেই গন্ধে ভরে উঠেছে।

তুলে নিলেন তিনি জবা এবং অপরাজিতা ফুল অঞ্জলি ভ'রে। জবা এবং অপরাজিতার বর্ণ আছে গন্ধ নেই। বদ্ধাঞ্জলি বুকের কাছে ধরলেন—গন্ধে ভরে গেল নাসারন্ধ্র। তিনি সেই অঞ্জলি ধরেই ধ্যানমগ্ন হলেন। গন্ধের মধ্যেই অবস্থান করেছেন এতক্ষণ পর্যন্ত। তিনি বুঝেছেন, এইবার সামনের দিকে এগিয়ে আসতে আর এক পা ফেলেছে সে। প্রথমে স্বাদে তারপর গন্ধে। সে আসছে। এরপর? শব্দে হয়তো। নূপুর বাজবে? বাজবে কিছু। তারপর বর্ণে—রূপে দেখবেন। তারপর স্পর্শে।

আসবে। সে আসবে। না এসে সে যাবে কোথায়!

* * *

মহেশচন্দ্র লিখেছেন—এরপর কামাখ্যায় শ্যামাকান্তের খ্যাতি হ'ল প্রচুর। ভক্ত জুটতে আরম্ভ হ'ল। কিন্তু শ্যামাকান্ত তাতে ভোলেন নি। তিনি হয়ে উঠছিলেন বৈশাখের পিপাসার মত উগ্র শুষ্ক।

ভক্তেরা আশ্রম করে দিলে। কিন্তু সেদিকে তিনি তাকালেন না। দু-চারজন সেবকও জুটল। তারা প্রণামী কুড়োতো। কামাখ্যা মন্দিরে যারা কাজকর্ম করত, তারাই এরা।

শ্যামাকান্ত সে দিকেও তাকাতেন না। তিনি ভাবতেন।

মহেশচন্দ্রই তাঁকে বলেছিলেন—তোমায় লোকে প্রণামী দেয়, সেগুলো ওইসব পাঁচভূতে নিয়ে নেয়। ওগুলো নিয়ে তো তুমি গরীব-দুঃখীদের দিতে পার!

—তুই নে না।

—আমি তো বিকেলবেলা আসি। লোক তো সারাদিনই আসে তোমার কাছে।

—তা আমি কি করব রে। আমি তো চাইনে। তুই ব্যবস্থা কর। তার চেয়ে এক কাজ কর না!

—কি?

—তুই আমার নায়িকা দেখে দে।

—ও কথা তুমি বলো না আমাকে।

—ওরে বেটা, নায়িকা বললে রাগ করিস। আচ্ছা বিয়ে দিয়ে দে!

—বিয়ে! অবাক হয়ে গেলেন মহেশচন্দ্র। তুমি সন্ন্যাস ছেড়ে বিয়ে করবে?

—কেন রে বেটা, সন্ন্যাস ছাড়ব কেন? সে-ই সন্ন্যাসিনী হবে!

—কিন্তু লোকে তা দেবে কেন?

—দেবে রে দেবে! দেবে না! দেখ আজ দুপুরে সে মেয়ে এসেছিল।

—এসেছিল?

—হ্যাঁ বেটা। যে পাঠাবার সেই পাঠিয়েছিল। সেই মাগী। পাঠিয়েছিল। কুলীন বামুনের ষোল বছরের আইবুড়ো মেয়ে; বাপ নেই; কামাখ্যা দর্শন করে আমার কাছে এসেছিল। আমি তাকে দেখেই বুঝেছি। এ মেয়েকে সে-ই পাঠিয়েছে। মেয়ের মা বললে—বাবা আশীর্বাদ কর যেন বর মেলে। আমরা কুলীন বামুন তার উপর বাপ নাই, এই বিদেশে পড়ে আছি, মেয়ের বিয়ে দিতে পারি নি—তুমি আশীর্বাদ কর। এ সেই মেয়ে রে। কাল তাদের আসতে বলেছি। আসবে। তুই আসিস।

পরের দিন মহেশচন্দ্র এসে বসেছিলেন। তখন ওই আশ্রমে বসছেন শ্যামাকান্ত। সকাল থেকে যারাই এসেছে তাঁকে দর্শন করতে শ্যামাকান্ত তাদের বলেছেন—আজ না। আজ না। যাও, আজ যাও। কণ্ঠস্বরে অধীরতা; ঘাড় নাড়া, হাত নাড়া সবের মধ্যেই একটা অধীরতা। মহেশচন্দ্রের চিত্ত কিছুটা বিরূপ হয়ে ছিল। তিনি শ্যামাকান্তকে শ্রদ্ধা করলেও ভয় করতেন না। তিনি বলেছিলেন—এত অধীর হয়ে পড়েছ তুমি একটা মেয়ের জন্যে। এই তোমার সাধনা?

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—তুই মূর্খ রে, তুই মূর্খ!

—আমি মূর্খ? আর তুমি এই সাধক?

—হ্যাঁরে, আমি সাধক। এ সাধনার কি বুঝিস রে বেটা?

—বুঝে আমার কাজ নেই। নারী নিয়ে সাধনা—

বাধা দিয়ে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—বেটা, সংসারে সৃষ্টির সাধনাটা কি বল তো? ওরে বেটা, পুরুষ আর প্রকৃতি, শিব আর শক্তি এদের খেলাতেই সৃষ্টি। ওরে বেটা, সে শক্তির জন্যে শিব তপস্যা করে নি?

—করেছিল। কিন্তু মদনভস্ম জান না?

—সেই তো রে। ভস্ম করে আবার বাঁচাতে হয়। ও মরে না। থাম, থাম। আসছে।

চারিদিক তাকিয়ে দেখেছিলেন মহেশচন্দ্র। দেখতে পেয়েছিলেন অনেকটা নীচে একদল যাত্রী আসছে। কিন্তু মানুষ ঠিক চেনা যায় না। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—চিনতে পারছ তুমি এখান থেকে?

—মন বলছে। মন বলছে! দেখ, পরখ কর! স্থির ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তিনি পথের দিকে। কামাখ্যা পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথ। দুধারে তখন ঘন গাছের জঙ্গল। সেকালে এখানে-ওখানে হিংস্র জন্তু থাকত। বাঘও থাকত ওৎ পেতে। লোকজন মিলে

কোলাহল করতে করতে আসত। মধ্যে মধ্যে বাঁকে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত যাত্রী আসছে। মুখ দেখা যেত না, চেনা যেত না, শুধু দেখা যেত মানুষদের কারও একটা পাশ কারও বা কাপড়, এই মাত্র। তারই দিকে তাকিয়ে ছিলেন শ্যামাকান্ত। আশ্রমের সামনে যেখানে রাস্তাটা এসে সামনে পড়েছে, সেখানে যাত্রীর দল উপস্থিত হতেই শ্যামাকান্ত বললেন —ওই!

মহেশচন্দ্র দেখলেন, সত্য। শ্যামাকান্তের ষোড়শী কুমারী ইপ্সিতাকে দেখে চিনতে দেরি হল না তাঁর।

সেকালে ষোল বছরের মেয়ে সচরাচব কুমারী থাকত না। তখন গৌরীদানের কাল চলছে গৌরীদানে অক্ষয়পুণ্য। অবিবাহিতা থাকে কিছু মেয়ে, তাবা ব্রাহ্মণের ঘরের কুমারী মেয়ে পাল্টি কুলীনের ঘরের পাত্র তখন দুর্লভ। এক-একটি কুলীনের ছেলে দশ-বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ পর্যন্ত বিয়ে করে। বিষ্টুঠাকুরের সন্তান তারাচরণের নাম জানতেন মহেশচন্দ্র, লোকে বলত যেঠেরা তারাচরণ। বিশ-পঁচিশ বছরের কুলীনের মেয়েব বিয়ে হত ষাট বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রার পথে বিয়ে কবে কুলীনের ঘবের ত্রিশ বছবের মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে অক্ষয়পুণ্য করে যান তাঁবা—একথা মহেশচন্দ্র জানেন।

মেয়েটি কুমারী তা দেখেই বুঝেছিলেন। মাথায় কোন অবগুণ্ঠন নেই। পিঠে একপিঠ চুল এলিয়ে পড়ে আছে। আঁচলের খুঁটটি গলায় চুলকে বেড়ে এপাশে ঝুলছে। হাতে কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে, শাঁখা নয়, অন্য কিছু কাঁচের চুড়ি বোধ হয়।

কাছে আসতেই মহেশচন্দ্র মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শ্যামাঙ্গী মেয়ে, বোধ হয় কালো বললেই ঠিক হয়, কিন্তু এমন সুষমা এমন লাবণ্য! আয়ত দুটি চোখে আশ্চর্য কিছু আছে। আয়ত চোখদুটির নীলাভ শুভ্রতাব মধ্যে আকাশের উদাস প্রসন্নতা এবং তেমনি মৃদুদীপ্তি তারার স্থিরতা তাব কালো তারাদুটিতে। আশ্চর্য শান্ত! মন স্নেহে কারুণ্যে ভরে উঠেছিল মহেশচন্দ্রের।

সঙ্গে একটি প্রৌঢ়া বিধবা ছিলেন।

যাত্রীর দল উঠে চলে গেল একটু উপরে মন্দিরের দিকে, প্রৌঢ়া বিধবা কুমারীটিকে নিয়ে শ্যামাকান্তের আশ্রমে ঢুকলেন। শ্যামাকান্তকে প্রণাম করে তাঁব সামনে বসে বললেন—আজ আমাকে আসতে বলেছিলেন।

শ্যামাকান্ত ওই কন্যাটির দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। মেয়েটি লজ্জায় মুখ নত করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। শ্যামাকান্ত বললেন—মুখ তোল, তোমার কপাল দেখি!

মেয়েটি মুখ তুললে কোন রকমে।

—হুঁ।

প্রৌঢ়া বললে—বিয়ের যোগ আছে কিনা দেখুন বাবা। আমার বোনঝিও বটে সতীন-ঝিও বটে। বাপ-মা দুই গিয়েছে। পাঁচ বছর যেতে না যেতে খেয়ে বসে আছে। উঁচু কুলীনবংশ। তার ওপর মেয়ের অষ্টমে মঙ্গল। গণকে বলে—মেয়ের হাতে সন্ন্যাসযোগ আছে। মেয়ের সন্ন্যাস-যোগ মানে বিয়ে হবে না। আমি তো চিরঞ্জীবী নই। মরব তো একদিন। তখন কি হবে? বিধবা হয়ে ঘরে থাকে, সে এক কথা, গতর আছে খেটে খাবে। তাই বা পাল্টা ঘর নইলে যার-তার হাতে ওর সাতপুরুষকে নরকস্থ করে দিই কি করে। পয়সা নেই, টাকা নেই যে, যশোর-খুলনাতে ওদের পাল্টা ঘর আছে, সেখান থেকে লোক পাঠিয়ে একটা বুড়ো ধাড়া ধরে আনব। তারপর যা আছে কপালে তাই হবে। সে সন্ন্যেসিনী হোক, আর

যা হবে হোক, আমি দেখতে আসব না।

—দেখি, তোমার হাত দেখি।

মেয়েটির হাত দেখে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—হুঁ। সব লক্ষণ আছে! সব।

—সে কি বাবা?

—ঘর ওর নেই। সন্ন্যেসিনী হতে হবে ওকে।

—তাহলে? তুমি একটা কবচ-টবচ দাও না বাবা!

—দেখ, আমি ফুলে মেল, ভরদ্বাজ গোত্র। বিষ্টুঠাকুরের সন্তান নৈকুষ্যি। তোমাদের কি? তবে আমি তো সন্ন্যেসী, আমার ওসব এখন নাই। তোমাদের কি?

—কি বলছ বাবা?

—কোন মেল, কার সন্তান, কি রকম ঘর তোমাদের পাল্টা?

—আমরা বাবা, তোমাদের পাল্টাই বটে। ফুলে মেল কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, নৈকুষ্যিও বটে। যশোরে বাড়ী ছিল; পেটের দায়ে ধুবড়ীতে এসেছিল ওর বুড়ো বাপ। বুড়ো বয়সে আমাদের দু বোনকে বিয়ে করে ঘাড়ে ক'রে এসেছিল। আমাদের রূপ দেখে ছাড়তে পারে নি। নিজে ছিল কালো কুচ্ছিত।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। বুঝলাম। তা আমার হাতে ওকে দেবে?

—ভৈরবী করবে?

—আগে সাতপাক দিয়ে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করব, তারপর আমি যখন ভৈরব তখন ও ভৈরবী হবে। শিব বিয়ে করে নি?

—তুমি যে সন্ন্যেসী হয়েছ বাবা, তা আবার বিয়ে কি করে করবে?

—বললাম তো। শিব বেটা তো যোগী সন্ন্যাসী। তপস্যা করছিল। সে কি করে বিয়ে করলে রে? এঁ্যা? শাস্ত্র? শাস্ত্রে যা চাইবি তাই পাবি!

অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল প্রৌঢ়া তার দিকে। মেয়েটিও পলকহীন দৃষ্টিতে শ্যামাকান্তকে দেখছিল।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—এই দেখ, আমার আশ্রম। সিদ্ধি আমার হয়েছে। তবে পূর্ণ সিদ্ধি হয় নি। বুঝলি? তা সস্ত্রীক তপস্যাতে বসলেই সিদ্ধি হবে। তোর মেয়ের কপালে সন্ন্যেসিনী যোগ আছে, সিদ্ধি ওরও হবে। বুঝলি? সাক্ষাৎ শক্তি। হ্যাঁ। তখন ঘর চাইলে রাজবাড়ী হবে। কুবের এসে ভাণ্ডারী হবে। তা ও গয়নাগাঁটি পরবে না। না—তা পরতে চাইবে না। কি কচ্চে? তোর কি মন? এঁ্যা? আমি শিব হব। শিবের মতন বর চায় মেয়েতে। এঁ্যা?

একটু, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তবে আমি শিবের মত বুড়ো নই। বয়স তিরিশ পার হয় নি! বলে হা-হা করে হেসেছিলেন।

প্রৌঢ়া বলেছিল—তা বিয়ে করে ফেলে দিয়ে বোম-বোম করে চলে যাবে না তো বাবা?

হা-হা শব্দে হেসে কামাখ্যা পাহাড়টাকেই চকিত করে তুলে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—না-না-না। তোর মেয়ে মরলে তাকে কাঁধে ফেলে সতী-সতী করে ঘুরে বেড়াব তিন ভুবন। কি নাম তোর মেয়ের?

—শিবানী।

—আচ্ছা, আচ্ছা। শিবানী-শিবানী করে বুক বাজিয়ে ঘুরব। ক্ষেপে যাব। ফেলে আমি যাব না। বুঝলি! ও আমার জন্মজন্মের শক্তি রে। ওকে দেখেই চিনেছি। আর আমি

মরব না, আমি মরব না, বিধবা ও হবে না। জন্ম-জন্ম ও সধবাতেই মরেছে। বুঝলি ?

মহেশচন্দ্রও শুনে বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিলেন তার দিকে।

*　　　*　　　*

প্রৌঢ়া পরের দিন মহেশচন্দ্রের বাড়ী এসেছিলেন অনেক খুঁজে খুঁজে। বলেছিলেন—বাবা, তোমার কাছে এলাম। শুনেছি, তোমার সঙ্গে পাগলাবাবার খুব খাতির! আমার শিবানী রাজী হয়েছে বাবা। বলেছে—মা-মাসী, শিবানী আমাকে মা-মাসী বলে, বললে—আমাকে ওঁরই হাতে দাও মা-মাসী ; আর বেশী কি বলবে বল ? তা আমার মনে খুঁতখুঁত একটু আছে, সেটি ওঁকে আমি বলতে পারছি না। তোমাকে বলতে এসেছি।

—বল কি বলছ ?

—বলছি বাবা, শিবানীকে আমি ওঁর হাতে দোব, বিয়েতে কিন্তু কিরে-করণে খুঁত থাকলে হবে না। আর আমাকে বাবা থাকতে দিতে হবে আশ্রমে। আমি শিবিকে ছেড়ে থাকতেও পারব না। আর, আর বাবা, ওইসব পাঁচজনাতে পেনামী-টেনামী কুড়িয়ে মেরে দেয়, সে সবের ভার আমি নোব। আমার জন্যে তো নয়, ওই ওদের জন্যে। ভেবে দেখ বাবা। আর আগন বাঁধও তো করতে পারব!

কথাটা মহেশচন্দ্রের মন্দ লাগে নি। এই প্রৌঢ়া যদি মায়ের মত পাগলের সংসার পেতে দিয়ে সংসারী করে তুলতে পারে, তবে সে খুব ভাল হবে। অন্ততঃ ওই মেয়েটি একটা জোর পাবে। তিনি বলেছিলেন—বেশ তো, আমি বলব। তুমি ভেবো না মা, আমি পাগলের মত করাতে পারব।

মত তিনিই করিয়েছিলেন। তবে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—তা পেনামী ও-বেটী কুড়োক। জমা করুক, বুকে চাপিয়ে মরুক। কিন্তু আমার সাধনভজন নিয়ে কিছু বলতে পারবে না। সে সব কথা হবে আমার ওই মেয়ের সঙ্গে।

মহেশচন্দ্র বলেছিলেন—তুমি ওই মেয়েকে মদ খাওয়াবে নাকি ?

—মদ কি রে বেটা, মদ কি ? সুধা! কারণ! পূর্ণাভিষেক হবে, দীক্ষা হবে, ভৈরবী হবে, কারণ না করলে হবে কেন ?

—নাঃ, এ তুমি করো না। একটি এমন মেয়েকে বিয়ে করছ, তাকে নিয়ে ঘর-সংসার কর, সুখী হও। তুমি তো সাধন করে পেয়েছ কিছু। আবার কেন ?

হা-হা করে হেসে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—দূর শালা, কিছুতে কি হবে রে ? কিছুতে ? কিছুও যা, কক্কাও তাই। আমি কে কানাকুকুর, গাড় চেটে পেট ভরাব ? শোন শোন শোন। গান শোন! গান এসেছে—

মন করিস নে, ছিঁচকে চুরি
পারিস যদি কর ডাকাতি
　　আন লুঠে রাজার পুরী।
নয় গেরস্ত, নয় জমিদার,
　　লুঠে আন রে রাজার ভাঁড়ার—
টেক্কা নিয়ে কর রে কাবার
　　সাহেব বিবি নওলা ছুরি।
টেক্কা দিয়ে তুরুপ মেরে
　　শিব পেয়েছে শক্তিকে রে

শিবের টেক্কা নেরে কেড়ে
তবেই বুঝি বাহাদুরি—
মন করিস নে ছিঁচকে চুরি।
এখানে নাই পাপপুণ্য ( হেথা )
শূন্য পূর্ণ পূর্ণ শূন্য
শূন্য পূর্ণ ধন্য করে
নাচা রে এক কালো নারী।

* * *

সুরেশ্বর বললে—মহেশচন্দ্রের চিঠিতে তিনি গানটিও উদ্ধৃত করেছেন সুলতা। লিখেছেন—গানখানি আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাও পত্রে লিখিলাম। এবং সেদিন মনে মনে বুঝিয়াছিলাম, এতাদৃশ ব্যক্তিকে সাংসারিক বুদ্ধি লইয়া বিচার করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি। সেদিন শ্যামাকান্ত যে চারজন্মের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস হইয়াছিল। এবং সেই দিন দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল এই কুমারীকেই স্বয়ং ভগবতী তাঁহার সাধনার জন্যই পাঠাইয়াছেন। নারী লইয়া তান্ত্রিকেরা সাধনা করেন, তাঁহারা সে সব শক্তি নানানভাবে জাতি-বিচার আচার-বিচার না করিয়াই করেন। শ্যামাকান্তের ভাগ্য প্রসন্ন, ভগবতী তাঁহার ধর্মপত্নীসহ সাধনা তপস্যার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়েই এমত ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং আমি উদ্যোগী হইয়াই এ বিবাহের ব্যবস্থা করিলাম। আমারই গৃহে কন্যা সম্পাদন করিলেন শিবানী দেবীর বিমাতা ও মাসীমাতা। রাত্রে বিবাহ শেষ হইল, পরদিনই শ্যামাকান্ত শিবানী দেবীকে দীক্ষা দেওয়াইলেন, তাঁহার বিমাতাকে দিয়া। যাগযজ্ঞ যাহা করিবার নিজে শ্যামাকান্ত করিলেন, বীজমন্ত্র বলিয়া দিলেন, তাহা লইয়া শিবানী দেবীর বিমাতা প্রদান করিলেন শিবানী দেবীর কর্ণকুহরে।

যজ্ঞ শেষ করিয়া শ্যামাকান্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, শিবানী দেবীকে বলিলেন—তোমাকে আমি এইবার পুরশ্চরণ ও পূর্ণাভিষিক্ত করিয়া সন্ন্যাস দিব। তুমি মনে করিবে, তুমি সাক্ষাৎ শক্তি। এবং আমি স্বামী সাধক সন্ন্যাসী, আমি শিব। হ্যাঁ। কিছুদিনেই তুমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে যে, শক্তি তোমার মধ্যে আসিয়াছেন।

বধূবেশিনী শিবানী সেদিনও বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া বসিয়াছিল। আমার আজও স্মরণ রহিয়াছে—শ্যামাকান্ত হঠাৎ কালী কালী বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার জপের আসনে বসিবার সময় হইয়াছিল ; আমরা তিনজন বসিয়া ছিলাম ; শিবানী দেবী তাঁহার বিমাতা এবং আমি। শিবানী দেবীর বিমাতা শিবানীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—শিবি, তোর কি ভয় করিতেছে ? শিবানী দেবী বলিয়াছিলেন—কিছু বুঝিতে পারিতেছি না মা-মাসী ! সে অত্যন্ত অসহায় ভাব ! শিবানী দেবীর বিমাতাই তাঁহাকে সাহস প্রদান করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—ভয় কি ? তুই এমন বাপের কন্যা। তোর বাপও তান্ত্রিক ছিলেন, তবে গৃহী। আমরা দুই ভগ্নী তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলাম, পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছি। পুরশ্চরণ করিয়াছি। কোন প্রকার ভয় নাই। সাহস অবলম্বন কর। এত বড় সিদ্ধ সাধকের সহধর্মিণী হইলে, তোমার মত ভাগ্য আর কাহার হয় ; এই জন্মেই তোর মুক্তি হইবে। দেখিস মা, সিদ্ধি হইলে আমার তোর পিতামাতার যাহাতে মুক্তি হয়, জন্মান্তর চক্রপাক ছিন্ন হয়, তাহাই যেন করিস ! আর আমি তো রহিলাম, ভয় কি ?

মহেশচন্দ্র লিখেছেন—"আমি নিজেও সেদিন এই মেয়েটিকে সাহস দিয়াছিলাম ; বলিয়া-

ছিলাম—আমিও রহিয়াছি। উনি আমাকে ভালবাসিয়া থাকেন। এবং আমি অনেক কথাই উঁহাকে সাহস করিয়া বলিয়া থাকি, উনিও তাহাতে কর্ণপাত করেন, বিবেচনা করেন। আমি সর্বদাই লক্ষ্য রাখিব। তোমার কর্ম হইবে মানুষটিকে শান্ত করা, তুষ্ট করা। তাহাতে উনিও শান্ত সুখী হইবেন, তুমি শান্তি সুখ পাইবে। এ তো অপর কিছু নহে, ধর্মপথে জীবনযাপন। সেই সংসারে উত্তম পথ, শ্রেষ্ঠ পথ, সুতরাং ভয়ের কি রহিয়াছে?"

শিবানী দেবীর বিমাতা বলিয়াছিলেন—বাবা, মা কামাখ্যার সম্মুখে এই কথা তুমি বলিলে, আজ হইতে তুমি শিবানীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলে। ও তোমার ভগিনী হইল। কেমন?

আমি বলিলাম—তাহাই হইল।

শিবানী ইহাতে যেন আশ্বস্ত হইয়াছিল।

শ্যামাকান্তকেও এই কথা বলিয়াছিলাম। তিনি উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন—ভালই হইল রে। তুই আমার শ্যালক হইলি। তোকে শালা বলিয়া গাল দিব। তোর ইংরিজীয়ানাকে ভয় করিতে হইবে না। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়াছিলেন।

* * *

এর পর নাকি কিছুদিন শ্যামাকান্ত আশ্চর্যভাবে সুন্দর স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। সেই অশান্ত, অধীর, চঞ্চলতা তাঁর ছিল না। জীবনের ওপর মায়া-মমতা হলে মানুষ নিজের চারিদিকটা যেমন সুন্দর করে গড়ে তোলে, তেমনি করে গড়ে তুলেছিলেন, আশ্রমে একখানি ঘর ছিল, তার সঙ্গে আর দুখানি ঘর করিয়েছিলেন। সামনে কিছু ফুলগাছ লাগিয়ে একটি বাগান তাও করেছিলেন। দেহে শ্রী এসেছিল। পূজাঅর্চনায় কিন্তু অবহেলা, শৈথিল্য আসে নি। সে নিয়মমত করে যেতেন। ভক্ত যারা আসত, সেকালে কামাখ্যা দুর্গম তীর্থ ছিল, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এবং কিছু কিছু দুঃসাহসী যাত্রী আসত। তাদেরও অধিকাংশ ময়মনসিং, ধুবড়ী, কুচবিহার অঞ্চলের যাত্রী। এরা এলে এদের কথা শুনতেন, তাদের কাছে প্রণামী নিতেন। শিবানীকে বাঁ পাশে নিয়ে বসে থাকতেন, দেখে সত্যই যেন শিব ও সতীর মত দেখাত। শ্যামাকান্তের দেহ নধর হয়ে উঠেছিল, তাঁর গৌরবর্ণ উজ্জ্বলতর মনে হত। বড় বড় চোখ, নেশায় রক্তাভ এবং ঢুলঢুল করত। কপালে গোল সিঁদুরের টিপ, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষ। শিবানীর যখন বিবাহ হয়, তখন ষোড়শী হলেও রোগা ছিলেন, গায়ের রঙ ছিল কালো। কিন্তু তার দেহেও এসেছিল লাবণ্যের জোয়ার। দেহ ভরে উঠেছিল, গায়ের রঙে ফুটেছিল একটি পেলব সুষমা। চুল ছিল প্রচুর। সে চুলে সন্ন্যাসিনী ভৈরবী বলে তেল দিতেন না; রুখু চুল ফুলে ফেঁপে মুখখানিকে ঘিরে এলিয়ে পড়ে থাকত, সামান্য বাতাসে উড়ত। মুখে প্রসন্ন হাসি। পূজা-অর্চনার আয়োজন এবং শ্যামাকান্তের সেবাতেই থাকতেন অহরহ মগ্ন। সন্ধ্যায় শ্যামাকান্ত নিত্য গান রচনা করে গান করতেন।

সময়টা সে-কাল স্থূলতা। তার উপর কামাখ্যাতীর্থের গণ্ডীর মধ্যে ছিল তাঁদের আশ্রম। লোকে যে মন নিয়ে আসত, তাতে তাঁকে দেখে লোকে বলত—সাক্ষাৎ মা!

দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। মহেশচন্দ্রের পত্রে রয়েছে—শিবানী দেবীর বিমাতা দেহত্যাগ করিলেন। নবম মাসে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক দিবসের মধ্যেই তদীয় প্রাণবায়ু নির্গত হইল। ইহার পরও কিছুদিন শ্যামাকান্ত শান্তই ছিলেন। হঠাৎ কি ঘটিল তিনি জানিতেন, প্রথমেই কেমন যেন স্তম্ভিত স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু বলেন না। চিন্তান্বিত বলিয়া মনে হইত।

আমি জিজ্ঞাসা করিতাম—কি হইয়াছে? এত চিন্তা কর কিসের?

তিনি নিরুত্তর থাকিতেন। তাহার সে দৃষ্টি দেখিয়া আমারও ভয় লাগিত।

একদিন বলিলেন—সব ভুল হইয়া গেল। স—ব।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ?

বলিলেন—তুই বুঝিতে পারিবি না।

ইতিমধ্যে কয়েকজন যাত্রী আসিয়াছিল তাহাদিগকে কুৎসিত গালিগালাজ দিয়া বলিলেন—যাও—যাও—যাও। এখানে কিছু নাই। এখানে কিছু নাই। ফাঁকি। ফাঁকি।

সে চীৎকার বীভৎস চীৎকার। হঠাৎ আবার থামিয়া গালিগালাজ শুরু করিলেন কোন নারীকেই। যেমন পূর্বে করিতেন।

আমি বাধা দিতে চেষ্টা করিলাম পূর্বের মত, কিন্তু সেদিন ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া আমাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি অপমানিত বোধ করিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। উঠিয়া চলিয়া আসিতেছি এমন সময় শিবানী দেবী আমাকে মিনতি করিয়া ডাকিলেন—দাদা! আমি তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করি নাই, দাঁড়াইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম বলিব—তুমি দুঃখ করিয়ো না ভগ্নী ; তোমার উপর কোন রাগ অভিমান করিয়া যাইতেছি না। কিন্তু তাহা বলা হইল না, তাহার পূর্বেই শ্যামাকান্ত গর্জন করিয়া পত্নীর চুলের মুঠায় ধরিয়া তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—যা—যা—তুই সুদ্ধ চলিয়া যা। বাহির হইয়া যা!

ইহার পর আমি আর দণ্ডায়মান থাকি নাই, চলিয়া আসিয়াছিলাম। আর কিছুদিন ওদিকে যাই নাই। হঠাৎ একদিন সংবাদ পাইলাম, পাণ্ডারাই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, যে শ্যামাকান্তের আশ্রমে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। শিবানী দেবী প্রায় অর্ধমৃত এবং শ্যামাকান্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন!

তাড়াতাড়ি গিয়া যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম এবং শ্যামাকান্তকে নরপিশাচ না ভাবিয়া পারিলাম না!

পাণ্ডারা বলিলেন—শ্যামাকান্ত সেই হইতেই আবার উন্মত্ত দুর্দান্তপনা শুরু করিয়াছিলেন। কয়েকদিন কখনও বুক চাপড়াইতেন, চীৎকার করিতেন। এবং চারিদিকে পাগলবৎ ঘুরিতেন। আর নিষ্ঠুর নির্যাতন করিতেন স্ত্রীকে। অকথ্য গালিগালাজ এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রহারও করিতেন।

কয়েকদিন পর একটা পরিবর্তন হইল। শ্যামাকান্ত আরও ভয়ঙ্কর হইলেন। বুক চাপড়াইয়া হায় হায় করিতেন না। গর্জন করিতেন। সবই কামাখ্যাদেবীর প্রতি। ঘটনার দিন সকাল হইতেই ওঁয়া ওঁয়া শব্দ করিতে শুরু করিয়াছিলেন। মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া ওইপ্রকার শব্দ করিতে করিতে নিজের গলা টিপিয়া ধরিতেছিলেন। আশ্রমে যান নাই। কিছু আহার করেন নাই। হঠাৎ সন্ধ্যার মুখে আশ্রমে ফিরিয়া উন্মত্তবৎ ভৈরবীদেবীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন পাণ্ডা আশ্রমের পাশ দিয়া ফিরিতেছিল, তাহারা তাঁহাকে চাপিয়া ধরে, নহিলে শিবানী দেবীকে হয়তো মারিয়াই ফেলিতেন। কিন্তু উন্মত্ত শ্যামাকান্ত তাহাদিগকেও প্রহার করিতে উদ্যত হইতেই তাহারাও তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। এবং ধরিয়া হস্ত বন্ধন করিয়া আশ্রমের ঘরেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। শিবানী দেবী তখন আহত, তাঁহার মাথায় আঘাত লাগিয়া কাটিয়া রক্তপাত হইতেছিল। সর্বাঙ্গ প্রহারে জর্জরিত। চেতনা ছিল না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কোনমতে বহন করিয়া পাণ্ডাদের গৃহে আনিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়া চেতনা সঞ্চার করিয়াছে। তিনি এখনও খুবই কাতর। এদিকে শ্যামাকান্তের আশ্রম শূন্য। যে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল সে ঘরের

দ্বার ভগ্ন ; শ্যামাকান্ত রাত্রেই হাতের বন্ধন কোনক্রমে খুলিয়া বদ্ধ দ্বার ভাঙিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

আমি কি করিব, আমি শিবানী দেবীকে গৃহে লইয়া আসিলাম। পাণ্ডাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ প্রবীণ তান্ত্রিক বলিয়াছিলেন—মনুষ্যটি ভ্রষ্ট হইয়া উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। এইরূপই হইয়া থাকে।

শিবানী দেবী সুস্থ হইলে তাঁহার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে ভয়ে বিস্ময়ে ঘৃণায় অভিভূত হইয়া যাইলাম।

* * *

সুরেশ্বর চিঠিখানা মুড়ে রেখে বললে—এরপর চিঠিখানায় যে সব ঘটনার বর্ণনা আছে তা সেকালের ভাষায় হয়তো তোমার মনে হবে অশ্লীল। অশ্রাব্য। মহেশচন্দ্র লিখেছেন—এবার তোমার কাছে যাহা বর্ণনা করিতেছি, তাহা তোমার সম্মুখে আমি বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিতাম না। পত্রে লিখিতেও ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু মা ভবানী আমাকে বলিল—"সমুদয় সত্য বৃত্তান্ত অকপট ভাবে আপনি বিস্তারিত ভাবে তাঁহাকে জ্ঞাত করুন—নতুবা আমার অপরাধ লাঘব হইবে না।"

তিনি যা লিখেছেন তা তোমাকে আমি এ কালের ভাষায় বলছি। বুঝতে তোমার কষ্ট হবে না।

শ্যামাকান্ত বামাচারী তান্ত্রিক—তিনি গোড়া থেকে পুরুষ হিসেবে মহাশক্তিকে চেয়েছিলেন প্রকৃতিরূপে। তিনি তাঁর স্বামী অর্থাৎ প্রভু হবেন। যোগিনী সাধনের মধ্যে তিনি তাঁকে পেতে চেয়েছিলেন কীর্তিহাটের সিদ্ধাসনে বসে। সেখান থেকে জলে ভেসে যেতে যেতে চরে এসে ঠেকে বেঁচেছিলেন। তারপর এসেছিলেন কামাখ্যায়, সেখানে ওই ষোড়শী শিবানীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করে সস্ত্রীক সাধনায় পেতে চেয়েছিলেন মহাশক্তিকে।

তিনি শিবানী দেবীকে বলতেন—দেবী আসবেন, সাক্ষাৎকার হলে তাঁকে অধিষ্ঠাতা হতে হবে শিবানীর মধ্যে। আর তিনি নিজে পাবেন শিবত্ব। ফলে তাঁদের হবে অনন্ত জীবন অনন্ত যৌবন, আর তাঁরা হবেন অনন্ত শক্তির অধীশ্বর।

বলতেন আর হাসতেন। মধ্যে মধ্যে একটি গান করতেন—যে গানটি তিনি অন্য কারুর সামনে গাইতেন না।

আর তুই পালাবি কোথা ?
উঁকি মেরে মুচকি হেসে
ফাঁকি দিয়ে হেথা হোথা।
মেঘের ফাঁকে বিদ্যুতের মত
উঁকি মেরে মুচকি হেসে—
এবার তোকে ধরেছি নাগাল
হয়েছি তালগাছের মাথা।
আর তুই পালাবি কোথা ?

শিবানী দেবী ভীত হতেন। তাঁর অন্তরাত্মা ত্রাসিত হয়ে উঠত। তিনি মিনতি ক'রে বলতেন—না—না। এ গান তুমি গেয়ো না।

হা-হা ক'রে হেসে শ্যামাকান্ত বলতেন—ভয় লাগছে তোর! লাগবে। প্রথম প্রথম ভয় হবে যে। সহজ কথা তো নয়! সূর্যি এসে ঢুকবে পিদিমের মধ্যে। বুঝলি না! তখন তো

মাটির পিদিম তার সলতে তার তেল সব ফুস হয়ে যাবে। হাঁ। ওই শিখা তখন জ্যোতি হবে। পিদিমের মত তোর ভয় হবে বইকি! কিন্তু সাহস কর। সাহস কর।

শিবানী দেবী প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে সাহস অর্জন করতে পারেন নি। তিনি চোখ বুজে ধ্যান করতে গিয়ে ভয় পেতেন। তিনি মনে মনে বলতেন—না—মা—না। তুই এমন রূপে আসিস নে, মা—এমন রূপে আসিস নে। আমাকে লোপ করে দিসনে। শান্ত মূর্তিতে আয়, ছোট হয়ে আয়—মা বলে আয়। আমি তোকে মা ব'লে ডাকি। তুই ওকে বাবা বলে ডাক। ওর মনকে ভুলিয়ে দে—গলিয়ে দে!

এমনি ভাবেই চলছিল সাধনা। বিলম্বে অধীর হয়ে উঠছিলেন শ্যামাকান্ত। বলতেন—এ কি হ'ল। নাগালের মধ্যে এসেছে অথচ কি হচ্ছে? যেন ছুঁয়ে-ছুঁতে পারি না। আচ্ছা দেখি কতদিন এই চার আঙুল বাইরে থাকিস? তুই না এগিয়ে আসিস আমি এগুব। ধরব তোকে।

সেই এক পা সামনে ফেলেই তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। কি যেন ঢুকল পায়ের তলায়। সে এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক বিষকণ্টক। ওই বিষকণ্টক পেতে রেখেই শ্যামাকান্তের নাগালের চার আঙুল বাইরে থেকে একহাত সামনে এক যবনিকা ধ'রে নিজেকে অদৃশ্য রেখে অনন্ত রহস্যময়ী তাঁকে গন্ধে সুরে স্বাদের আভাসে ইঙ্গিতে আহ্বান ক'রে বলছিলেন—এস—এস—এস। শ্যামাকান্ত এগিয়ে যেতে পা ফেলতেই সেই কাঁটাতে আহত হয়ে আর্তনাদ ক'রে বসে পড়লেন।

হঠাৎ সেদিন প্রকাশ পেল—শিবানী দেবী সন্তানসম্ভবা।

শিবানী দেবীই বলেছিলেন। সাধনায় আমি বসব না। আমি—।

শ্যামাকান্ত যেন বজ্রাহত হয়ে গেলেন। সুরেশ্বর বললে—এখুনি বললাম মহাশক্তি বিষকণ্টক পেতে রেখে সামনে ডেকে শ্যামাকান্তকে আহত পঙ্গু করে দিলেন। না। তিনি তালগাছ হ'তে গিয়েছিলেন—তিনি বজ্রাগ্নি হয়ে এসে তাঁর মাথায় পড়ে বললেন—আমাকে ধর। আমি এসেছি!

সত্যসত্যই বজ্রাহতের মত শ্যামাকান্ত ঝলসে গেলেন। এ কি হ'ল? তিনি ঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন।

সব গেল! এ সাধনায় সঙ্গিনী আছে। সেখানে জাতিবিচার নেই। প্রকৃতি-পুরুষের সহজ আচরণে বাধা নেই। কিন্তু সন্তান তো নেই! এ সাধনায় বর্তমানকেই অনন্তে প্রসারিত করে, ফুল ফোটে, ফল তো নেই, ভবিষ্যতের বীজ তো বহন করে না! ফল হলেই সব গেল। হয়ে গেল। বর্তমান তো নেই, ফুরিয়ে গেল বর্তমান।

মহেশচন্দ্রের চিঠিতে এ সম্পর্কে সেকালের ব্যাখ্যা আছে।

সেই তান্ত্রিক পাণ্ডা তাঁকে বলেছিলেন—এমনিই হয়। মহাপ্রকৃতি সামনে ওই আবরণটি রেখে এগিয়ে এসে ইশারা দেন ওই সব অলৌকিক শক্তির। গন্ধের ইশারা, স্বাদের ইশারা, সুরের ইশারা। সাধক ঠিক থাকলে তিনি নিজেই আবরণ ফেলে দেখা দেন। মা বলে লুটিয়ে পড়লে করুণাময়ী হয়ে তুলে নেন। আর এ পথে এমনি হয়, এ ভুল হবেই, ভুল হলেই আবরণটি পড়ে যায়। ওপারে কোথায় কি? কিছু নেই, শূন্য অন্ধকার, সেখানে দন্তশূন্য জড়তার শূন্য মুখগহ্বরের মত বীভৎস ভয়ঙ্কর এক হাঁ তাকে গ্রাস করতে আসে।

অমৃতের বদলে মৃত্যু আসে।

শ্যামাকান্তেরও মৃত্যু হল। মৃত্যু হয়েও এখানে নিষ্কৃতি নেই। প্রেত হয়। সাধক

শ্যামাকান্ত সেই প্রেত হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি চেয়েছিলেন শিবানীর গর্ভের সন্তানের মৃত্যু। কিন্তু শিবানী তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। সেই সংঘর্ষের সময়েই দৈবক্রমে পাণ্ডারা এসে তাঁকে রক্ষা করেছিল।

প্রেত কোথায় কোন নরকের মুখে ছুটেছিল কেউ খোঁজ করে নি। শিবানী দেবী কিন্তু খোঁজ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে মহেশচন্দ্র তাঁর সন্ধান করেছিলেন। মাস দুয়েক পর সন্ধানও পেয়েছিলেন। তখন শ্যামাকান্তের অবস্থা নরকের প্রেতের মত।

ধুবড়ী থেকেও কয়েক ক্রোশ দূরে ব্রহ্মপুত্রের ধারে একখানা মুসলমান গ্রাম, উন্মাদ শ্যামাকান্ত তাদের মধ্যেই বাস করছেন। তারা তাঁকে ব্রহ্মপুত্রের তটের এক নির্জন শ্মশানে একদিন সকালে একটা অর্ধজ্বলন্ত চিতার ছাই এবং অঙ্গারের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছেন। দূরে ছিল একটা শব আর একটা অজ্ঞান ব্রাত্যনারী। তারা নৌকার মাঝি। ওই শ্মশানে তখন কিছুদিন শ্যামাকান্ত বাস করছিলেন। তারা তাঁর গন্ধ আনার শক্তির কথা জানত। মাটিকে ছাইকে গুড় করতে পারার ক্ষমতারও পরিচয় পেয়েছিল। সেদিন সকালে সেই গন্ধবাবাকে চিতায় এমন ক'রে পড়ে থাকতে দেখে তারা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল নিজেদের গ্রামে। সমস্ত মুখটা পুড়ে গেছে। চেহারা হয়েছে প্রেতের মত। দেহের ক্ষত ভাল হয়েছে কিন্তু ঘোরতর উন্মাদ। ওদের মধ্যেই বাস করছেন। ওদের সঙ্গেই খাচ্ছেন। কোন বিচার নেই।

এ কথা শিবানী দেবীকে মহেশচন্দ্র জানাতে পারেন নি। গোপন রেখেছিলেন কথাটা।

সাত মাস পর শিবানী দেবীর সন্তান হল—কন্যা-সন্তান!

*　　*　　*

মহেশচন্দ্রর চিঠিটা খুলে সুরেশ্বর আবার পড়ল—এই কন্যাই ভবানী! আমার গৃহেই ভবানী ভূমিষ্ঠা হইয়াছিল।

মদীয় পত্নী সন্তানসন্ততিহীনা। অতি মমতাময়ী ছিলেন এবং ধর্মপ্রাণাও ছিলেন। তদীয় ধর্মপ্রাণতার জন্যই আমি যৌবনে ক্রীশ্চান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও সে ধর্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। তিনি শিবানী দেবীকে সাতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। ভবানী ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনিই একরূপ তাহার মাতা হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন। কারণ শিবানী দেবী সন্তান-প্রসবের পর আবার কঠোরভাবে সন্ন্যাসিনীর মতই জীবনযাপন করিতেন। আচার আচরণ, এমন কি তন্ত্রমতে পঞ্চপর্বে উপবাস করিয়া থাকিতেন, সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিতেন জপের আসনে।

কন্যাকে দেখিতেন মদীয় পত্নী।

তিন বৎসর পর তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।, সামান্য জ্বর হইয়াছিল। সম্মুখে তিনদিন পর ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। দ্বিতীয় দিন হইতেই আমাকে এবং মদীয় পত্নীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—আমি আগামীকল্য সম্ভবতঃ দেহরক্ষা করিব। এই কন্যা আপনাদিগকে দিলাম। আপনারা ইহাকে পালন করিবেন। এই কন্যাকে বিবাহ দিবেন না। বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে উহার পিতা-মাতার বৃত্তান্ত সমস্ত বলিয়া বলিবেন যে, তাহার পিতাকে পাপমুক্ত করিবার জন্যই তাহার জন্ম। সে যেন সমস্ত জীবন শুদ্ধাচারে থাকিয়া মহামায়ার পূজা করে। কোন শুদ্ধ সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বিধি বলিয়া দিবেন। হাসিয়া বলিয়াছিলেন—বিবাহই বা কে করিবে! প্রথমতঃ এই সন্ন্যাসের মধ্যে যাহার জন্ম তাহার জাতি নাই। তাহার উপর তিনি জাতি হারাইয়া মুসলমানদের মধ্যে বাস করিতেছেন! কে তাহাকে বিবাহ করিবে?

আর বিবাহ দিতে গেলেই তাঁহার পরিচয় জানাজানি হইবে। সে যেন না হয়। আর কোনরূপ অনাচার—যে মদ্যপায়ী, যে পরদারাসক্ত, তাহার সংস্রব—এ কন্যার সহ্য হইবে না। এরূপ হইলে ইহার মৃত্যু হইবে।

তুমি যখন উপযাচক হইয়া বিবাহ করিতে চাহিলে, তখন তোমার মত পাত্র পাইয়া ভবানীর ভাগ্য ভাবিয়াই প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম সব কথাই তোমাকে বলিব, তুমি জানিয়া যদি বিবাহ কর তবে আপত্তির কি আছে। কিন্তু সব বলিতে পারি নাই। শিবানী দেবীকে স্মরণ হইয়াছিল। শুধু বলিয়াছিলাম—কন্যাটি এক সিদ্ধ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কন্যা। তাঁহারা সস্ত্রীক সন্ন্যাসী হইয়া তন্ত্র-সাধনা করিতেন। কন্যাটিকে আমাকে দান করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম জানিতে চাহিও না। এবং মদ্যপান বা কোনপ্রকার পরনারী সংস্রব করিতে পারিবে না, যদি এরূপ শপথ কর তবে বিবাহ দিতে পারি।

তুমি তাহাতে রাজী হইয়াছিলে!

* * *

বীরেশ্বর রায় চিঠিখানা পড়ে চোখ বুজে চুপ করে বসেছিলেন।

সামনে ছেদী সিং এক পায়ের উপরেই ভর দিয়ে উপুড় হয়ে বসেছিল। এতক্ষণ ধরেই সে বসে আছে। একটি বাক্য উচ্চারণ করে নি। শব্দ করে নি। ১৮৫৮ সালের কীর্তিহাটের কাছারী চলছে নিচে।

পাইকদের হাঁকডাক চলছে। নায়েব-গোমস্তার শাসনবাক্য শোনা যাচ্ছে। আস্তাবলে ঘোড়ার ডাক উঠছে।

হাতীটা কোথাও থেকে এল, গজেন্দ্র-গমনের তালে তালে শেকলে বাঁধা ঘণ্টা বাজছে ঢঙ—ঢঙ। ঢঙ—ঢঙ!—ঢঙ—ঢঙ!

অনেক লোকের আওয়াজ শোনা গেল। বোধ হয় কোন মহলের প্রজারা এসেছে।

বীরেশ্বর রায়ের কাছে এসবের অস্তিত্বও যেন ছিল না। তাঁর মনে এই বিচিত্র কথাগুলিই ঘুরছিল। কালটা সেকাল। অবিশ্বাস তিনি করেন নি। তিনিও তো দেখেছেন এমন মানুষ। কলকাতার ময়দানের ঘাসের বন আর জঙ্গলের মধ্যে এক পাগল হাতে ঘষে গন্ধ দেয়, মাটি তুলে দিলে গুড় মনে হয়। অপরূপ কণ্ঠস্বর তার। স্তব্ধ রাত্রে গান শুনে চোখে জল আসে। মধ্যে মধ্যে গলা টিপে ধ'রে বলে—ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। বলতে দে!

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

# কীর্তিহাটের কড়চা

তৃতীয় খণ্ড

সুরেশ্বর বললে—এই শ্যামাকান্তের অভিশাপ নাকি রায়বংশ বহন করছে—শুধু শ্যামাকান্তের নয়—এ পাপের অংশ—সোমেশ্বর রায়—ডাকাতি করে তাঁর কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করেছিলেন। এই ছিল রায়বংশের বিশ্বাস।

সেকালের বিশ্বাস।

সুলতা বললে—তার মানে তো বুঝলাম না। সোমেশ্বর রায় তাঁকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন বলে ?

সুরেশ্বর বললে—এ প্রশ্ন সেইদিনই বীরেশ্বর রায় তাঁদের কুলপুরোহিত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে করেছিলেন। যখন বীরেশ্বর রায় মহেশচন্দ্রের পত্র হাতে নিয়ে বসে ভাবছেন, তখনই রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। প্রয়োজন তাঁর জরুরী। কিন্তু দারোয়ান বলেছিল—হুজুরের বারণ আছে। এখন তো—

কুলপুরোহিত রামব্রহ্ম রায়বাড়ীর শুধু পুরোহিতই ছিলেন না, তিনি সোমেশ্বর রায়ের দেবোত্তর স্টেটের একজন ট্রাস্টিও ছিলেন। তাঁর একটা অধিকার ছিল। তিনি গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নেওয়ার ছলে সাড়া দিয়ে ডেকেছিলেন—বীরেশ্বর !

বীরেশ্বর রায় ঘাড়টি ফিরিয়ে সাড়া দিয়েছিলেন—কে ? খানিকটা চিনতে পেরেছিলেন আওয়াজ থেকে ; অন্ত কেউ হলে হয় সাড়া দিতেন না, নয় দারোয়ানকে বলতেন—পরে আসতে বল !

রামব্রহ্ম বলেছিলেন—আমি রামব্রহ্ম।

সজাগ হয়ে উঠে বীরেশ্বর বলেছিলেন—আসুন !

ছেদী তাড়াতাড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে উঠেই গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছিল।

রামব্রহ্ম এসেই বলেছিলেন—একটি কথা যে বলতে এসেছি বাবা !

—বলুন।

—তোমার ভাগিনেয়, বলতে গেলে রায়বাড়ীর বংশধর সে-ই। তুমি তো আর বিবাহ করলে না। কমলাকান্ত শ্যামনগরে এসেছে। শুনেছ ?

—শুনলাম ছেদীর কাছে।

—কি জন্য এসেছে, শুনেছ ?

—হ্যাঁ, রবিনসন নীলকুঠী করছে শ্যামনগর ঠাকুরপাড়ায় ; সে তাদের জমিতে জোর করে নীল বুনিয়েছে। কমলাকান্ত এসেছে সেখানে ; বিমলাকান্তের পত্র নিয়ে।

—হ্যাঁ। ছেদী তার সঙ্গে এসেছে। ছেদীর হাতে বিমলাকান্ত বাবাজী আমাকে পত্র দিয়েছে। লিখেছে "কমলাকান্ত জেদী। তাহার প্রকৃতি বীরেশ্বরের মত। সে ঝগড়াঝাঁটি বাধাইয়া বসিতে পারে। কালটা বড়ই বিরুদ্ধ কাল। আমাদের গ্রহের ফেরও বটে এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরাজদের আক্রোশ বাড়িয়াছেও বটে। সুতরাং বীরেশ্বরবাবুকে অনুরোধ করিবেন যেন এই বিবাদটা তিনি মিটাইয়া দেন।" তা বিমলাকান্ত কি তোমাকে কোন পত্র দেয় নি ?

—না। বীরেশ্বর রায় হেসে বলেছিলেন—তাতে তার সম্মানের হানি হত !

—না-না বাবা। বিমলাকান্ত দেবতুল্য ব্যক্তি। কিছু মনে করে না। অবিচার বরং তার ওপরই হয়েছে। কথাটা তোমাকে এতদিন আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু বলতে পারি নি। তোমার পিতা আমাকে তাঁর শেষ অসুখের সময় বলেছিলেন। বলেছিলেন—বিমলাকান্তের পিতার কাছে যে অপরাধ করেছি, তার আর মার্জনা নেই আমার। তার ফল আমি পেয়েছি। বুঝতে পারছি পরকালে অনন্ত নরক হবে আমার। তাছাড়া যে পাপ আমি ঘাড়ে করেছি, সে পাপ আমার বংশকে আশ্রয় করে বংশকেও নরকস্থ করবে।

—আপনি বিমলাকান্তের বাপকে, তান্ত্রিক শ্যামাকান্তকে, কাঁসাইয়ের বন্যায় ফেলে দেওয়ার কথা বলছেন ?

সবিস্ময়ে রামব্রহ্ম বললেন—তুমি কি করে জানলে ?

—জেনেছি।

—তবে ?

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বাবা আপনাকে মৃত্যুর পূর্বে অসুখের সময় কি বলেছিলেন ?

—তুমি তো জান বলছ, বাবা !

—তবু আমি আপনার কাছে শুনতে চাই। যা শুনেছি তা কতটা সত্য, তা একটু মিলিয়ে দেখতে চাই।

একটু চুপ করে থেকে রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—সে আমি তোমাকে মুখে ব্যক্ত করতে পারব না। কারণ—একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তুমি তাঁর পুত্র, আমি তোমার পুরোহিত, তোমার পিতার পাপের কথা তোমাকে মুখে-মুখে বলতে জিহ্বা আড়ষ্ট হবে। আর তোমার মানও হয়তো—। হেসেছিলেন ন্যায়রত্ন। আমি ভাল করে স্মরণ করে লিখে জানাব। একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—কিন্তু বিমলাকান্তের কথা থাক ; কমলাকান্ত তোমার ভাগিনেয়, অদ্যাপি তক বলতে গেলে তোমারও বংশধর, তাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। ছেদী চিঠি এনেছে, তার সঙ্গে একই নৌকাতে এসেছে আমার কন্যা এবং দৌহিত্রী। তাদের কাছে শুনলাম, বিপদ আসন্ন হয়ে উঠেছে বাবা। কমলাকান্তের সঙ্গে রবিন সাহেবের বচসা হয়ে গেছে। কমলাকান্ত শুধু বিমলাকান্তের রক্তধারা বহন করে না, সে বিমলার পুত্র, তোমাদের রক্ত রয়েছে, মহাজেদী। ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষা করেছে, সে ইতিমধ্যে গ্রামের লোকেদের নিয়ে বিবাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। সেই কারণেই আমার বৈবাহিক আমার কন্যা-দৌহিত্রীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। বিলম্ব করলে হয়তো এমন কিছু ঘটে যাবে, যার আর প্রতিকার করবার কোন পথ থাকবে না।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—আমি আজই পত্র লিখে লোক পাঠাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে বজরাও পাঠাচ্ছি, কমলাকান্তকে এখানে নিয়ে আসবে। যা করবার আমি এখান থেকে করব। তার সেখানে থাকবার প্রয়োজন কি ?

রামব্রহ্ম বিস্মিত হয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়ের কথা শুনে। বালক কমলাকান্তের উপর বীরেশ্বর রায়ের ক্রুদ্ধ আক্রোশ এবং ঘৃণার কথা তিনি জানতেন, চোখে দেখেছেন তিনি। পাঁচ বছরের কমলাকান্তকে চাকর কোলে নিয়ে বেড়াত ; ঠেলাগাড়ীতে চড়িয়ে বাগানে ঘোরাতো ;

বীরেশ্বর রায় সেখানে থাকলে বলতেন, নিয়ে যা এই উল্লুক, ওটাকে নিয়ে যা এখান থেকে। নিয়ে যা বলছি।

শেষ পর্যন্ত এমন হয়েছিল ; তখন তিনি মদ্যপান করতে শুধু করেছেন ; তিনি হুকুম দিয়েছিলেন—ওটাকে যেন তাঁর সামনে কেউ নিয়ে না আসে। যে আনবে চাবুক মেরে তার পিঠের চামড়া তুলে দেব আমি!

বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীকে নিয়ে থাকতেন বিবিমহলে। বিমলাকান্ত থাকতেন বাড়ীর দ্বিতীয় মহলটায়। কমলাকান্তকে মানুষ করবার জন্য দাসী ছিল—তাদের হাতে সে মানুষ হত। সে বড় ভালবাসত ভবানী দেবীকে ; বিবিমহলে যাবার জন্য ঝোঁক ধরত। কিন্তু সেখানে যেতে পেত না সে। ভবানী দেবীরও হুকুম ছিল না এ মহলে আসবার।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন থেকে সকলেই যা বুঝেছিল তা সহজ অনুমানের কথা। একসঙ্গে বিমলার এবং ভবানীর সন্তান হল, মৃতবৎসা দোষগ্রস্তা বিমলার ছেলে বাঁচল, আর ভবানীর প্রথম সন্তান মরল। এই দুঃখ এবং ক্ষোভ থেকেই হিংসায় এমন হয়ে উঠেছেন বীরেশ্বর রায়। শেষ পর্যন্ত বিমলাকান্ত পুত্র কমলাকান্তকে নিয়ে এখান থেকে চলে গেলেন, আর ফিরলেন না। সে আজ বারো বৎসর। এই বারো বৎসরের মধ্যে বীরেশ্বর রায় ভগ্নিপতি-ভাগিনেয়ের নাম মুখে আনেন নি। কোন সংবাদ নেন নি। এমন কি নিজের বাপের উইলকে একরকম গায়ের জোরে নাকচ করে দিয়েছেন। কমলাকান্ত দৌহিত্র হিসাবে সোমেশ্বর রায়ের আট আনা অংশের উত্তরাধিকারী, তাকে আজ এই বারো বছরের মধ্যে জমিদারীর লভ্যাংশ দেন নি। তত্ত্বতল্লাস বলেও কোন টাকা কি সামগ্রী তাকে পাঠান নি।

বিমলাকান্ত নির্লোভ মানুষ, সদাচারী পণ্ডিত মানুষ, সকলে বলে—মানুষটি দেব-চরিত্র। তিনি এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। কিন্তু কমলাকান্ত ছাড়বে না। সাবালক হলেই সে মামলা করবে। সকলের ধারণাই তাই।

গিরীন্দ্র আচার্য বলেন—মামলা হবেই ন্যায়রত্নমশাই। তার আগে কর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। না হলে ধর্ম থাকবে না। বীরেশ্বর মিটমাট করবে না। সহজে বিষয় দেবে না। বিষয় বিষ। শেষে এতে কুরুক্ষেত্র হবেই। দেখুন, রাজা নবকৃষ্ণ দেব, ক্লাইবের দেওয়ান, লক্ষ লক্ষ টাকা, বিষয় তো একটা রাজ্য বিশেষ। তাঁর উইল নিয়ে মামলা হল পোষ্যপুত্র গোপীমোহন আর ছেলের সঙ্গে। ছেলে জানে হারবে, তবু মামলা করলে। দুই পক্ষে ছ লাখ টাকা খরচ করে শেষে মিটমাট। মামলা চলে বিলেত পর্যন্ত। এও তেমনি হবে।

আচার্য দু-চারবার সাহস করে একথা বীরেশ্বরকে বলেছিলেন। বীরেশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—ও কথা বলবেন না আমাকে। আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না। হতে দেব না। আমার মৃত্যুর পর যা হয় হবে। মামলায় যদি হারি, তবে তৎক্ষণাৎ বীরেশ্বর রায় দেহত্যাগ করবে।

তাই আজ এমন অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনে ব্রাহ্মণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি এগিয়ে এসে রায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—মঙ্গল হোক তোমার, মঙ্গল হোক বাবা। এই তো, এই তো মানুষের মত কথা, তোমার মত কথা! আজ তোমার পিতা পরলোকে তুষ্টি পাবেন।

বীরেশ্বর রায় নীরবেই সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। সে দৃষ্টি কিছুটা উদাস, কিছুটা বেদনাভারাক্রান্ত, কিন্তু সে দৃষ্টি প্রসন্ন।

রামব্রহ্ম বলেছিলেন—আমার কন্যা লক্ষ্মী এসেছে। ওখানে যে সব কাণ্ড চলছে, তাতেই ওরা তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে বলছিল—কমলাকান্তের নাকি চেহারা হয়েছে কার্তিকের মত। বাপেদের বংশের মত মাথায় খাটো নয়। এই লম্বা-চওড়া প্রশস্ত বুক, নাক আর চোখ এ দুটি—নাকি অবিকল তোমার মত। আমি বললাম—তা হবে না, 'নরাণাং মাতুলক্রম' যে খ্যা।

বীরেশ্বরের মুখে এবার একটি বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর বড় বড় উগ্র চোখ দুটিও নাকি জলে ভরে উঠেছিল। ন্যায়রত্নের আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

সেইদিনই সন্ধ্যায় ন্যায়রত্ন চিঠি লিখে বীরেশ্বরের হাতে দিয়ে এসেছিলেন। সোমেশ্বর রায় মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে ডেকে অকপটে নিজের পাপের কথা বলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—সেকালের মানুষের বিশ্বাসমত পারলৌকিক শান্তির ব্যবস্থা করতে। নিজে বিছানায় বসে শাস্ত্রবিধানমত চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

বীরেশ্বর রায় চিঠিখানা খুলে সাগ্রহে পড়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে ছিলেন। হয় বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন, নয় বিশ্বাস করতে মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেন।

মহেশচন্দ্রের লেখা চিঠিখানায় শ্যামাকান্তের বিবরণের ঘটনার সঙ্গে কোন অমিল নেই।

অমিল ছিল দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীতে। দুজনেই আপন দোষ দেখতে পান নি। এখানে কিছুটা তফাৎ—শ্যামাকান্ত নিজের দোষ দেখেন নি। সোমেশ্বর কিছুটা দেখেছিলেন। ন্যায়রত্ন লিখছেন চিঠিতে—তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—আপনি জানেন, স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এই তান্ত্রিকের কি অত্যাচার আমি সহ্য করিয়াছি! আপনিই আমাকে এসব অনাচার বীরাচারের সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিলেন, আমি তাহাও শুনি নাই। বংশের জন্য আমি সব সহ্য করিয়াছিলাম। তবে পাপ আমার লোভ! আমার সন্তান বাঁচিল, অবশ্য কলিকাতায় সাহেব ডাক্তার চিকিৎসা করিবার সময় বলিয়াছিলেন—এবার রক্তদোষের চিকিৎসা হইল, এবার সন্তান রক্ষা পাইবে। কিন্তু তাহা আমি বিশ্বাস করি না। সন্তান ওই তান্ত্রিকই বাঁচাইয়াছেন। কারণ ওই সময়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে দশ হাজার ডিগ্রী পাইলাম, তাহা তো পাইবার কথাই নয়! দুইটা একসঙ্গেই ঘটিল। আগে ডিগ্রী পরে সন্তান। তান্ত্রিক হাসিয়া বলিলেন—এখন হইয়াছে কি, তোমাকে রাজা করিয়া দিব।

এতেই লোভ হয়েছিল সোমেশ্বর রায়ের। তাঁর বিচারের দৃষ্টিতে তিনি তান্ত্রিকের শক্তির দুটি মূলধন দেখতে পেয়েছিলেন। এক ওই সৌভাগ্যশীলা রাজরাজেশ্বর, আর তাঁর তান্ত্রিক সাধনা তপস্যার শক্তি, ওই মনোহরা যোগিনী!

তাঁর মনে মনে অভিপ্রায় ছিল মনোহরাকে পেলে তিনিও এই সাধনা করতে পারবেন। এবং সিদ্ধিও পাবেন।

ইতিমধ্যে মনোহরাকে তিনি আকৃষ্ট করবারও চেষ্টা করেছিলেন। মনোহরা—যোগিনী,

না দেবী, যাই হোক সে বাইরে ছিল একটা মাথাখারাপ দরিদ্রকন্যার মত। সামান্ত রঙচঙে জিনিস পেলে সে খুশী হত। ভাল খেতে পেলে খুশী হত। আর তার স্নেহ পড়েছিল বিমলার উপর। ছেলে কোলে নিয়ে সে বসে থাকত পরমানন্দে। এই সুযোগ নিয়েছিলেন সোমেশ্বর। ক্রমে তার বিশ্বাসও হয়েছিল যে, মনোহরার মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি তাঁকে বলেছিলেন—ওই সাধুটাকে ছেড়ে দে না। আমার কাছে থাক। আমি কত জিনিস দেব; কত ভাল খেতে দেব! রাণীর মত রাখব! কি?

পাগলী বলেছিল—আমাকে মারবে না ওর মত?

—না, না, না। মারব কেন?

—ও আমাকে মারে। বড় মারে।

—তাই তো বলছি, ওকে ছেড়ে দে।

—ও যে আমাকে খুন করে দেবে। ও খুনে। বাবারে।

—ওকে তাড়িয়ে দেব এখান থেকে।

—ও মন্তর জানে, মেরে ফেলবে আমাকে। তোমাকেও ফেলবে। ও তোমাকে ভয় করে না।

হঠাৎ সোমেশ্বরের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—তুমি ওকে খুন করে দিতে পার না। দাও না গো! তোমার কাছে আমি খুব ভাল হয়ে থাকব। তোমার মেয়েকে মানুষ করব। দাও না গো!

এই বীজ! বীজ অঙ্কুর মিলল। পাতা বের হল। ক্রমে-ক্রমে সোমেশ্বর মনে মনে সাপের মত চক্রান্তের পাকে-পাকে বিষধারের মত হিংস্র হয়ে উঠলেন। সেদিন রাত্রে ওই বন্যায় নৌকো ভাসিয়ে ওপারে যাবার পথে তাঁর মনে সঙ্কল্প জাগল। এই সুযোগ। বন্যার এই দুর্দান্ত তুফানে ফেলে দেবেন। রক্তপাত করতে হবে না, আঘাত করতে হবে না, শুধু জলে ফেলে দেওয়া। মারবে ওঁকে কাঁসাই। প্রত্যক্ষ অপরাধ হবে না।

তাই দিলেন। কিন্তু—।

সুরেশ্বর বললে—কথাটা বিচিত্র সুলতা, সোমেশ্বর রায় এই পাগল মনোহরাকে নিয়ে সাধন করতে সাহস করেন নি, তাকে আহারে-বিহারে নানা সামগ্রীতে সন্তুষ্ট করে নিজের বিলাস-সঙ্গিনীতে পরিণত করে তাকে আটকে রেখেছিলেন। ধারণা ছিল যোগিনী তুষ্ট হয়েই তাকে ধরা দিয়েছে। তার দয়াতে সব হবে।

তা হয়েছিল। সোমেশ্বর রায় তখন মহলের পর মহল কিনেছিলেন। রবিনসন সাহেবকে টাকা ধার দিয়ে তার কুঠীর লাভ থেকে লাভ পেয়েছিলেন। কলকাতার একজন সায়েব অ্যাটর্নীকে টাকা ধার দিয়ে তার টওী হয়েছিলেন। কিন্তু কোন বিভূতি তিনি পান নি।

মেয়েটা বেঁচে ছিল বছর তিনেক। তিন বছর সোমেশ্বর উন্মত্ত ছিলেন তাকে নিয়ে। বীরেশ্বরের জন্মের পর সে মারা যায়। অনেক দেওয়ার সঙ্গে সে তাঁকে আরও একটি সামগ্রী দিয়ে গিয়েছিল, সে হল সোমেশ্বরের ভ্রান্তনারীর উপর একটা দুর্দমনীয় আকর্ষণ! এদিকে তাঁর রুচি আগে ছিল না। আগে বাঈজী রেখেছেন, বাড়ীতে সেবাদাসী রেখেছেন কিন্তু

আত্মনারীতে রুচি ছিল না। এবার হল এই রুচি। রাজকুমারী কাত্যায়নী এক কন্যা, এক পুত্রের পর স্বামীকে দিয়েছিলেন অবাধ স্বাধীনতা। যা ইচ্ছা করুন, তিনি তাঁর পুত্র-কন্যা এবং গৃহের গৃহিণীত্ব নিয়েই পরিতুষ্ট।

রামব্রহ্ম লিখেছিলেন—শুধু ব্যভিচারের জন্ত যোগিনীকে লইয়া থাকার জন্ত তিনি ভ্রষ্ট হইলেন, পাপগ্রস্ত হইলেন। তিনি স্বমুখে এই কথা আমাকে বলিলেন, এই পাপেই আমি ডুবিলাম। এই পাপ হইতে উৎপন্ন ব্যাধি হইতেই আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চলিয়াছি। অনন্ত নরকেও আমার বোধ হয় স্থান হইবে না। আপনি যথোচিত যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া ইহার প্রতিকার করিবেন। তান্ত্রিকের নিকট ঋণ আমি শোধ করিয়াছি। বিমলাকান্তকে অর্ধেক সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছি। কিন্তু মনোহরা যোগিনীকে লইয়া যে পাপ করিয়াছি ইহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে জানি না।

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় চিঠিখানা পড়ে কি ভেবেছিলেন, মনে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কিনা জানি না। তাঁর নিজের জীবনে সোফিয়া পর্বের মধ্যে এর কোন প্রভাব পেয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে আমি যেন দেখেছিলাম। বিমলা থেকে বীরেশ্বর তিন বছরের ছোট; এই তিন বছরের মধ্যেই সোফিয়া এসেছিল তাঁর জীবনে। তবে সব ক'খানি চিঠি পড়ে তাঁর মনে পড়েছিল পাগলাবাবাকে, তার নিদর্শন আছে। এবং এ চিঠিগুলির প্রতিটি অক্ষর তাঁর সত্য মনে হয়েছিল। তিনি আকুল হয়ে পত্র লিখেছিলেন কমলাকান্তকে। কমলাকান্ত তাঁর কাছে রত্নেশ্বর; তিনি তাঁকে রত্নেশ্বর বলেই পত্র লিখেছিলেন। সে পত্রও আছে, এই দেখ। পড়ি শোন।

প্রাণাধিকেষু,

অসংখ্য কোটি আশীর্বাদ এবং স্নেহচুম্বনপূর্বক শ্রীমান রত্নেশ্বর বাবাজীবন অত্র পত্রে তোমাকে লিখি যে, ছেদী সিং এবং অত্র রায়রাজবাটীর পুরোহিত পূজ্যপাদ ন্যায়রত্নমহাশয় প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, তুমি সম্প্রতি শ্রীশ্রীকাশীধাম হইতে দীর্ঘকাল পর কার্যব্যপদেশে শ্যামনগর বাটী আগমন করিয়া তত্র অবস্থান করিতেছ। নীলকর জন রবিনসন সম্প্রতি শ্যামনগর ঠাকুরপাড়ায় কুঠী পত্তন করিয়া তত্রস্থ জমিদার সরকারবাবুদিগের সহিত সহযোগ করতঃ ওখানকার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অপরাপর প্রজাদিগের উপর অযথা উৎপীড়ন করিতেছে, বলপূর্বক প্রজা সকলের ধান্য জমির ধান্যাদি ফসলসমূহ ভাঙিয়া দিয়া নীল বপন করাইতেছে। এমন কি রায়বাটীর জামাতা দৌহিত্রের জমিতেও জবরদস্তিপূর্বক নীল বপন করিয়া তোমাদিগের ভাগদার জোতদের নির্যাতন, অপমান করিয়াছে, তৎসংবাদসমূহ অবগত হইয়া প্রতিকারার্থ তুমি কাশীধাম হইতে আসিয়াছ। উত্তম করিয়াছ। এতাদৃশ উৎপীড়ন, জবরদস্তি শুধুমাত্র অর্থক্ষতিকারকই নয়, ইহা মর্যাদা-হানিকর ও অপমানজনক। অবশ্যই ইহার প্রতিবিধান প্রয়োজন। কিন্তু বাবাজীবন, অত্র বাটী—যাহা তোমার বাটী—তথায় না আসিয়া শ্যামনগরে আসিয়া ওঠা তোমার কি উচিত হইয়াছে? এবং নিরাপদ হইয়াছে? ইহাতে আমি মর্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিলাম, মর্মস্থলে আঘাত পাইলাম। দীর্ঘকাল তোমাকে নিরীক্ষণ করি নাই। তজ্জন্য বক্ষে তাপ অনুভব করি। আমার তো তুমি ব্যতীত কেহ নাই। যক্ষের মত সমস্ত আগলাইয়া বসিয়া আছি মাত্র।

ছেদীর নিকট অবগত হইলাম এবং শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্নকে তদীয় কন্যা বলিয়াছেন শুনিলাম যে, তুমি কুমার কার্তিকের মত সুন্দর হইয়াছ; রায়বংশের অনুরূপ বীরোচিত আকৃতি হইয়াছে এবং তোমার চোখ এবং নাসিকা অনেকটা আমার মত হইয়াছে। শুনিয়া অবধি চিত্ত, হৃদয় তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমাকে বক্ষে লইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।

আমি বজরা পাঠাইলাম, তুমি পত্রপাঠ এই বজরায় স্বীয় বাটীতে চলিয়া আসিবে। আমি ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। বাড়ীঘর চুনকাম করিয়া পরিষ্কার করাইবার ব্যবস্থা করিলাম। আসিবার পূর্বে দ্রুতগামী নৌকায় কাহাকেও অগ্রে পাঠাইবে। এখানে ৺শ্রী মাতার স্থানে এবং ৺রাজরাজেশ্বরের স্থানে বিশেষ পূজা দেওয়া হইবে। নহবৎ বাদ্যের ব্যবস্থা করিব।

সর্বশেষে যাহা লিখিতেছি তাহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ছেদী বলিল—তোমার সঙ্গেই তোমার ভালো-মা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ভবানী দেবী তদীয়া পিতৃদেবসহ কাশীধাম হইতে আগমন করিয়াছেন এবং শ্যামনগরে তোমাকে নামাইয়া তিনি অন্যত্র কোথাও গমন করিয়াছেন। ছেদী তাহার কোন ঠিকানা, নিশানা অবগত নহে। অবগত হইলে আমি নিজেই গমন করিতাম। তুমি তাঁহাকে মদীয় এই নির্দেশ জানাইবে যে, তিনি যেন অত্র বাটী আগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া আমার অপেক্ষা করিয়া থাকেন। তুমি আসিলে তোমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিব এবং অত্র বাটীতে তাঁহাকে লইয়া আসিব। তাঁহাকে বলিবে, তিনি আগমন করিলেই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমি কলিকাতায় যাইব। তথায় আমি এক পাগলাবাবাকে জানি—সম্ভবতঃ তাহাকে দেখিলে তাঁহার এতদিনের ব্রত উদযাপিত হইবেক। তুমি পত্রপাঠ এই বজরাতে বাটী চলিয়া আসিবে।

ইতি

আশীর্বাদক

শ্রীবীরেশ্বর রায় দেবশর্মণঃ

* * *

বীরেশ্বর রায় বাড়ী সংস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। জমিদারী সেরেস্তার খাতায় খরচ লেখা আছে, ইমারত খাতে খরচ; শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর ওরফে কমলাকান্ত রায় ভট্টাচার্য আসিবেন বিধায় সমুদয় ইমারৎ সংস্কার চুনকাম ইত্যাদি করা হয়, তাহার জন্য ঝিনুকের চুন পোড়াই খরচ একদফা চার টাকা পাঁচ আনা পাঁচ গণ্ডা।

চাপরাসী, দারোয়ান, পাইকদের পাগড়ির জন্য লাল শালু খরিদ। এমনি অনেক খরচ সে সময় রায় এস্টেটে হয়েছিল। যাতে যে কেউ হোক বলবে, বীরেশ্বর রায় সেদিন মনের সকল সংশয় উত্তীর্ণ হয়ে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হয়তো বা তিনি মনে মনে অভিযোগ করছিলেন ভবানী এবং বিমলাকান্তের উপর। কেন তারা তাঁকে বলে নি এতদিন? তারা তো এসব পরিচয় অনেক দিন আগে জেনেছে! সে সময় জানালে তো সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যেত। সেদিন কলকাতায়—মহেশচন্দ্র ভবানীকে কলকাতায় বিমলাকান্তের কাছে নিয়ে সব কথা প্রকাশ করেছিলেন—সেই দিন!

রত্নেশ্বর তাঁর সন্তান, প্রথম সন্তান।

দিদি বিমলার জন্ত সেদিন এ-সত্য গোপন করেছিলেন তাঁরা। তাঁরা তিনজনে। তিনি, বিমলাকান্ত এবং ভবানী। আর জানত বিমলা, সে নিজে চোর! সে গত। আর জানতেন তাঁর বাবা। সোমেশ্বর রায়। তিনিই এ সংবাদ গোপন করে রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেন—বিমলা গত হোক, ও বেশীদিন বাঁচবে না। তারপর তুমি পোষ্যপুত্র নিয়ে ফিরে নিও।

বিমলাকান্তও প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

তাঁর এইসব চিন্তার কথার আভাস আছে তাঁর চিঠিতে। কাশীতে বিমলাকান্তকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। রত্নেশ্বর রায় সমস্ত চিঠি সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। কাশীতে বিমলাকান্তকে এই অনুযোগ করেই চিঠি লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়। এবং তাঁকে লিখেছিলেন—"আপনি আমার কাছে পুত্র ঋণে আবদ্ধ। তাহা পরিশোধ করিতে আপনি আসিবেন। অবিলম্বে আসিবেন। তাহাতে সরকারী কর্ম না থাকে, কর্ম পরিত্যাগ করুন। আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন, তিনি আমার কনিষ্ঠা সহোদরা। তাহাকে লইয়া আসুন, ৺পিতাঠাকুর তাঁহার ঋণ পরিশোধার্থে অর্ধেক সম্পত্তি নামে রত্নেশ্বরকে দিলেও তাহা আপনার, আপনাকেই তাহা দিয়া গিয়াছেন। তাহা অবশ্যই আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমার হৃদয় অধৈর্য পীড়িত হইয়া নিরত অশান্ত অধীর। আপনি অবিলম্বে আসুন। এবং আপনার পক্ষে আরও গুরুতর প্রয়োজন এই যে, সম্ভবতঃ আমি মহাসাধক ভবদীয় পিতৃদেব ও মদীয় শ্বশুরমহাশয়কে জানি। তিনি অদ্যাপি জীবিত। পত্রপাঠ চলিয়া আসুন।"

চিঠিখানা রেখে সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় কলকাতায় লোক পাঠিয়েছিলেন, জরুরী পত্র লিখেছিলেন সেখানকার নায়েব দেওয়ানকে।

"আপনি পত্রপাঠ 'বহুবাজার' গিয়া সোফিয়া বাঈজীর সন্ধান করুন। তাহার ওখানে পূজনীয় পাগলাবাবা আছেন কিনা সন্ধান লউন। যদি থাকেন, তবে তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া জানবাজার বাটীতে আনিয়া পরম যত্নে রাখিয়া সেবা করিবেন। যদি না আসেন তবে সদাসর্বদা বহুবাজারের বাটীর উপর নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। যেন কোথাও চলিয়া না যান।

যদি সোফিয়ারা ঐ বাটীতে না থাকে, তবে তাহারা এখন কোথায় বাস করিতেছে, পাগলা-বাবাই বা কোথায় বাস করিতেছেন, বিচক্ষণ লোক নিযুক্ত করিয়া তাহার সন্ধান করুন। দেশান্তরে লোক প্রেরণ করিতে হইলে তাহাও করিবেন। অত্র কর্মে অর্থব্যয়ের জন্ত চিন্তা করিবেন না। যত টাকা খরচ হয় করিবেন। সহস্র, পাঁচ সহস্র কোনমতে মালিকের মতের জন্ত চিন্তিত হইবেন না।"

বীরেশ্বর রায়ের আকৃতি, উল্লাস সম্ভবতঃ বর্ষার কাঁসাইয়ের বন্তার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। পরিচয় তার সব কিছুতে রয়েছে। জমা-খরচের খাতায় একটা খরচ রয়েছে। তার মধ্যেও রয়েছে পরিচয়। বিবিমহলের জন্ত আসবাব খরিদ। প্রত্যাশা তিনি অনেক করেছিলেন, এ আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কিন্তু কমলাকান্ত আসেন নি। ফাইলে চিঠি রয়েছে কমলাকান্তের। বজরা ফিরে এসেছিল। বজরা থেকে নেমে এসেছিল খানসামা কর্মচারী কৃষ্ণ সরকার, রাঁধুনী বামুন, আর চারজন চাপরাসী। এসে নীরবেই বোধ করি চিঠিখানা বীরেশ্বর রায়ের হাতে দিয়েছিল। এই সেই চিঠিখানা সুলতা।

বজ্রের মত চিঠি !

অশেষ সম্মানাস্পদেষু, মাননীয় মহাশয়,

ভবদীয় পত্রপ্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বিভ্রম ও বিভ্রান্তিতে পড়িলাম। আপনি প্রাণাধিক ইত্যাদি বহু সুমিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া আমাকে অবিলম্বে কীর্তিহাট যাত্রা করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি বহু চিন্তা করিয়া এবম্বিধ আচরণের হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না। ভাবিতেছি, এই কলিকালে কি দ্বাপরযুগের ধনুর্বক্ত পর্বের ভূমিকা হইতেছে ? মহাশয়ের সহিত প্রবল প্রতাপ মহারাজ বংশের তুলনা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমি গরীব ব্রাহ্মণসন্তান। আমি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিতে পারি না।

মহাশয়, কোন্ মুখে কি করিয়া এমত সুন্দর বাক্যগুলি লিখিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। আপনি আমার মাতুল, ইহা আমার ভাগ্যের দোষ। আমি রায়বংশের দৌহিত্র, আমার রক্তে আপনাদের রায়বংশের রক্তের সংস্রব আছে ইহাতে আমি জ্বালা অনুভব করি। রায়বংশ ধনীর বংশ, কিন্তু তাহাদের পাপের সীমা নাই। এসব কথা আমি জানিতাম না। বীরপুরের ছত্রী গোপাল সিংহ প্রাচীন লোক, সে এখানে আসিয়া আপনার পিতা-পিতামহের কুৎসা করিয়া গেল। এবং স্বয়ং আপনি তাহারি প্রমাণ। আপনি অত্যাচারী, আপনি মগুপ, আপনি লম্পট ; মুসলমান বাঈজী রাখিয়া তাহাকে লইয়া কলিকাতার বসতবাটীতে উল্লাস করেন ; আপনি নিজের সতীসাধ্বী দেবীতুল্যা পত্নীকে বিতাড়িত করিয়াছেন। মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণসন্তান, সামান্ত ব্যক্তি। তবে আমার পিতা দেবচরিত্র ব্যক্তি। পিতামহ শুনিয়াছি মহাসাধক ছিলেন। আপনার সহিত আমাদের সকল প্রকার সম্পর্ক অনেক দিন পূর্বেই ছিন্ন হইয়াছে। আমার পিতাকে আপনি একরূপ বিতাড়িত করিয়াছেন। আমাকেও করিয়াছেন। আপনার সহিত কোন সম্পর্কই আমার নাই। উক্ত কীর্তিহাটের পুরী আপনার নানাবিধ পাপপুরীতে পরিণত হইয়াছে। ওই পুরীতে আপন স্বত্বের বলে যেদিন প্রবেশ করিতে পারিব সেইদিন যাগযজ্ঞ দ্বারা সমস্ত শুদ্ধ পবিত্র করিয়া প্রবেশ করিব। তৎপূর্বে নহে। আপনার বজরা ফিরাইয়া দিলাম।

আপনি আমার ভালো-মা কোথায় আছেন জানিতে চাহিয়াছেন। তাহা আপনি পাইবেন না। তিনি আজ জীবনে তপস্যা সার করিয়াছেন। সমগ্র কাশীর লোকে তাঁহাকে সতী-মা বলিয়া ডাকে। তাঁহার মুখের দিকে কেহ চোখ তুলিয়া তাকায় না। আপনার মত পাপীর স্পর্শমাত্রে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনি দয়া করিয়া তাঁহার কোন খোঁজ করিবেন না।

নীলকর জন রবিনসন সাহেবের সঙ্গে যাহা করিবার তাহা আমিই করিব। তবে যাহাতে রায়বংশের ভাগিনেয়ের মর্যাদাহানি হয় এমন কিছু করিব না, তাহাতে নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আমি মূর্খ নহি। সুতরাং অতঃপর এ লইয়া ভবদীয় শিরঃপীড়ার কারণ না ঘটিলে কৃতার্থ হইব। পরিশেষে নিবেদন ইতি।

—নিবেদক

—শ্রীকমলাকান্ত দেবশর্মা ( আমার নাম রত্নেশ্বর নহে )।

সুরেশ্বর বললে—

চিঠিখানার মধ্যে ছিল বজ্রের আঘাত।

নির্মম আঘাত তিনি পেয়েছিলেন এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কি করেছিলেন তা বলতে পারব না। তবে ঘটনার স্রোত তখন দ্রুত বইতে শুরু করেছে।

ঠিক চারদিন পরের লেখা একখানা চিঠি দপ্তরের মধ্যে রয়েছে। বীরেশ্বর লেখেন নি। বীরেশ্বর রায়কে লিখেছেন তাঁর দেওয়ান ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্য। তিনি দিন-পনের আগে মহল সফরে বেরিয়েছেন। ওই নতুন পত্তনী নেওয়া মহলদিগরে। সেসব মহলে অনেক কাজ। লাট কুতুবপুরের জমিদারী কাছারীতে নিজের কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মহলে মহলে।

সে আমলে জমিদারদেরও নিজেদের আকার-আয়তন মত চতুরঙ্গবাহিনী ছিল। ষোল কাহারের পাল্কি, বর্ক-অন্দাজ—যারা দস্তুরমত বড় পাগড়ি-কুর্তা এবং নাগরা জুতো পরে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে চলত; এরা অধিকাংশই ছিল হিন্দুস্থানী ডন-বৈঠক করা, ঘিউ-রুটি খাওয়া শরীর। নিত্যনিয়মিত কুস্তি করত এরা। তার সঙ্গে এদেশী লাঠিয়াল পাইক। কালো রঙ, পাকা বাঁশের মত শরীর, আঁটসাঁট করে হাঁটু পর্যন্ত খাটো কাপড, গায়ে জমিদারবাড়ীর দেওয়া ইউনিফর্ম ফতুয়া, মাথায় লাল শালুর পাগড়ি, কাঁধে একখানা গামছা। হাতে চার হাত লম্বা এদেশী লাঠি। আর থাকত দুজন ঘোড়সওয়ার হরকরা; এরাও বর্ক-অন্দাজদের সামিল, তবে এদের বিশেষ কাজ ছিল চিঠি নিয়ে যাওয়া-আসা। জরুরী চিঠি নিয়ে জমিদারী কাছারীতে আসা এবং তার উত্তর নিয়ে যাওয়া। এছাড়া গরুর গাড়ীতে আমীন এবং জরীপের সরঞ্জাম, তার সঙ্গে হিসাবনিকাশনবীস মুহুরী দুজন-তিনজন। আরও যেত রসুইয়ে বামুন, চাকর। সরঞ্জামেরও সমারোহ ছিল; রান্নার বাসন, বড় কড়াই, হাতা, বড় হাণ্ডা, সতরঞ্জি, তাকিয়া, চাদর, রূপা-বাঁধানো হুঁকো। তার সঙ্গে ডাবা-হুঁকো। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, মাহিষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। কল্কে তামাক ঝুড়িভর্তি। আর সঙ্গে চলে গজেন্দ্রগমনের সঙ্গে তালে তালে ঘণ্টা বাজিয়ে রাজহস্তীর মত জমিদার-হস্তী। কাছারী পৌঁছে দেওয়ান সরজমিনে তদারকের প্রয়োজন হলে হাতীর পিঠে থাকেন। এই হাতী ঘোড়া গরুরগাড়ীর রথ এবং পদাতিক দিয়ে চতুরঙ্গবাহিনী।

উদ্দেশ্য ছিল, সমারোহ দেখিয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই ত্রাস এবং সম্ভ্রম সঞ্চার করা।

নূতন মহলদিগরে প্রজাদের বাকী খাজনা আদায়, খাজনা বৃদ্ধি, পতিত জরীপ এবং পতিত জমি ভেঙে জমি তৈরীর ব্যবস্থা। তার সঙ্গে আছে মাঠের মধ্যে খাস পতিত সামিল সিচের পুকুর পঙ্কোদ্ধারের ব্যবস্থা; জমিদার কিছু টাকা দেবেন, বাকিটা বেগার ধরে কাটানো। নদীর ধারের মহলে নদীর বন্যা রোধের জন্য বাঁধ তৈরী। দেবস্থান মেরামত, দরকারমত দু-চার বিঘা জমি গ্রাম্য-দেবতার সেবার জন্য দান ইত্যাদি মহৎ কর্মও ছিল এর সঙ্গে। গ্রাম্য কলহ-বিবাদের বিচার করা হত।

চতুরঙ্গবাহিনী কাছারীতে এলে গ্রাম কলরবে মুখর হয়ে উঠত। নিত্য দেড় মণ দু মণ চাল রান্না হত। গ্রামের দরিদ্রজনেরা আসত, পাত পেতে বসে খেত, কুমড়োর ছক্কা, বেগুনের

অম্বলসহযোগে ডাল-ভাত খেয়ে হরিবোল দিয়ে উঠে যেত। এ-হরিবোল জমিদারের জয়ধ্বনি। তাছাড়া গ্রামের সদ্‌গৃহস্থ মণ্ডলদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হত। স্বয়ং দেওয়ান দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াতেন।

এবারের আয়োজনে ঘটা ছিল অনেক বেশী। এবার মণ্ডলান তৌজী বীরপুরের কাছা-কাছি গ্রামের কাছারীতে দেওয়ানের কাছারী পড়েছে।

বীরপুর মণ্ডল প্রজা গোপাল সিং ছত্রীর এলাকা। সে-গ্রামে আজও খাজনা আদায়ের দপ্তর পড়ে নি। কথাবার্তাও না। যা হচ্ছে আদালত মারফত। এবার কাছাকাছি কাছারীতে স্বয়ং দেওয়ান এসে বসে কুরুক্ষেত্রের উদ্যোগপর্ব রচনা করছেন।

স্বয়ং বীরেশ্বর রায়ের আসবার কথা ছিল, কিন্তু সেদিন ছেদী সিং আসার পর সে-মত পরিবর্তন করে তিনি দেওয়ান আচার্যকেই পাঠিয়েছেন। তিনি কমলাকান্তকে পত্র লিখে বজরা পাঠিয়ে রায়বাড়ীর রঙ কিরিয়ে মেরামত করে তার জন্তেই অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় এল ওই বজ্রের মত পত্রোত্তর।

ঠিক তার চার দিন পর এল দেওয়ান আচার্যের এক পত্র। পত্র নিয়ে এসেছে ঘোড়সওয়ার হরকরা। সে-পত্র কমলাকান্তের ওই পত্রের পর যেন বজ্রাঘাতের বিদ্যুৎ এবং গর্জনের পর তার আগুন-জ্বলে-ওঠার চেহারা নিয়ে দেখা দিল।

দেওয়ান আচার্য লিখেছেন—হঠাৎ একটা জরুরী সংবাদ পেয়ে না জানিয়ে তিনি থাকতে পারলেন না। তাই সওয়ার হরকরা মারফত পাঠাচ্ছেন। আজই সন্ধ্যার সময় তিনি সংবাদ পেয়েছেন—বীরপুরের গোপাল সিং ছত্রী শ্যামনগর গিয়েছিল কমলাকান্তের কাছে। কমলাকান্ত শ্যামনগরে এসেছেন এ-সংবাদটা এ-অঞ্চলে রটে গেছে। সেখানে নীলকুঠীর সাহেবের সঙ্গে মামলা লড়বেন বলে গুজব খুব জোর হয়ে উঠেছে। গোপাল সিং ছত্রি খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছিল, আজ ফিরে এসে নাকি গ্রামে প্রচার করেছে যে, কমলাকান্ত তাঁর তরফ থেকে তার মণ্ডলান স্বীকার করে নেবেন। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি নালিশ দায়ের করছেন মেদিনীপুর আদালতে মামা বীরেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে। এবং প্রত্যেক মহলে ঢোলসহরত করে প্রজাদের জানিয়ে দেবেন যে, যারা বীরেশ্বর রায়কে ষোল আনা খাজনা দেবে, তারা নিজের দায়িত্বে দেবে। কমলাকান্ত সমুদয় সম্পত্তির আট আনা অংশের মালিক, তিনি তাঁর অংশের খাজনা নিজে আদায় নেবেন। বীরপুরের গোপাল সিং কাল বীরপুরে গ্রাম-দেবতার কাছে বলি দিয়ে পূজো দিয়েছে, সেই উপলক্ষ্যে দশখানা ঢাক নিয়ে সারা গ্রাম তোলপাড় করে বলেছে—এবার বীরেশ্বর রায়কে দেখ্ লেঙ্গে। নাকে ঝামা ঘষব। গোটা সম্পত্তি যাতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস যায় তার চেষ্টা করছে কমলাকান্ত।

দেওয়ান আচার্য দেখে গিয়েছিলেন—বীরেশ্বর শ্যামনগর থেকে কমলাকান্তকে সাদরে আহ্বান জানিয়ে কীর্তিহাটে আনবার জন্ত বজরা পাঠাচ্ছেন। পত্রের খসড়া তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বীরেশ্বর রায় খসড়া পড়তে দেননি, পড়ে শুনিয়েছিলেন।

সুরেশ্বর বললে—সম্ভবতঃ ভবানী দেবীর কথা এবং পাগলাবাবার কথা তাঁকে জানতে দিতে চান নি। যেটুকু তিনি কমলাকান্তকে লিখেছিলেন, সেইটুকুই পড়ে শুনিয়েছিলেন। তারপর

এই খবরে দেওয়ান আচার্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, তিনি লিখেছেন—তার খানিকটা তোমাকে পড়ে শোনাই সুলতা, বোধ হয় মুখে বলার চেয়ে ভাল হবে।—

বীরপুরের গোপাল সিং শ্যামনগর গিয়া কমলাকান্তের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছে। এবং তাঁহার কাছ হইতে আশ্বাস লইয়া ফিরিয়াছে। গোপাল সিং নাকি কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীযুক্ত কমলাকান্তবাবু মহোদয়ের তরফ হইতে ঢোল সহরত করিয়া পরোয়ানা জারী করিতেছেন যে, প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায়কে খাজনা প্রদান করিবে, তাহারা নিজের দায়িত্বে প্রদান করিবে। তাঁহার তরফ হইতে তাহা ওয়াশীল দিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন না। এবং বৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায়ের সহিত বন্দোবস্তমত কোন বৃদ্ধিই মঞ্জুর করিবেন না।

মিশ্র বলিলেন—তিনি লাট কুতবপুরের সকল গ্রামেই সকল প্রজার কাছেই এবম্প্রকার কথাবার্তা শ্রবণ করিয়াছেন। সম্ভবত কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে দিবার চেষ্টা করিবেন।

সুতরাং অবিলম্বে মেদিনীপুরের আদালতে খোঁজ লওয়া আবশ্যক এইরূপ কোন মামলা দায়ের হইয়াছে কিনা। এবং শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ভায়াজীবনের সঙ্গে একটা রফা প্রয়োজন। বিবাদের ক্ষেত্রে গোপাল সিংহের সহিত তাহার যোগাযোগ অতীব ক্ষতিকর হইবেক। আরও শুনিলাম—শ্রীযুক্ত কমলাকান্তবাবু কীর্তিহাট মোকাম আসিতেছেন না। শ্যামনগর এখান হইতে সন্নিকট। মাত্র ক্রোশ-পনের দূর। শুনিতেছি সেখানে শ্রীকমলাকান্ত ধর্মঘট করিয়া সরকারবাবু ও রবিনসন সাহেবের সহিত ঘোরতর বিবাদের সৃষ্টি করিতেছে।

অদ্য ভোর-ভোর সওয়ার যাত্রা করিতেছে। দ্বিপ্রহর বা তৃতীয়প্রহর নাগাদ পৌঁছিবে। আমাকে অবিলম্বে আপনার আদেশ জানাইবেন, আমি অতঃপর কি করিব।

শ্রীশ্রী৺গৌরীমাতার চরণাম্বুজে এবং শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বরের নিকট মালিকের সর্ববিধ কল্যাণ কামনান্তে ইতি—

নিবেদক ভবদীয় আশ্রিত

শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র আচার্য

শেষে তোমাকে সম্বোধনটা শোনাই, না'হলে অসম্পূর্ণ থাকবে জমিদারের পরিচয়।

মহামহিম মহিমার্ণব, প্রবলপ্রতাপ, বহুজন প্রতিপালক, অশেষ গুণান্বিত, শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর রায় ভূস্বামী কীর্তিহাটস্থ বরাবরেষু।

* * *

অজাতশত্রু বাপবিম্বিসারকে বন্দী করে রাজা হয়েছিলেন। ঔরংজীব পিতা শাজাহানকে বন্দী করে রেখেছিলেন আগ্রা ফোর্টে। সেসব রাজা-রাজড়ার ব্যাপার। কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন বাপ বা ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ মদ্যপ, অপব্যয়ী, ব্যভিচারী হলে ছেলে বা উত্তরাধিকারী সরকারে দরখাস্ত দিয়ে প্রার্থনা করত যে, উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজ ন্যায্য স্বার্থরক্ষার জন্য অপব্যয়ী মালিকের হাত থেকে সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে 'কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে' নেওয়া হোক। তার নজীর তখন হয়েছে। কিছুদিন আগে বর্ধমান জেলার বনওয়ারিবাদ রাজবাড়ীর রাজাবাহাদুর এক মুসলমান বাঈজী নিয়ে কলকাতায় প্রমত্ত জীবনযাপন করতেন বলে তাঁর

ছেলে নালিশ করে সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে দিয়েছিল। পুরনো রাজা মাসোহারা নিয়ে কলকাতায় থাকেন। এইসব নজীর সংগ্রহ করেছিলেন কমলাকান্ত।

বীরেশ্বর রায় তাতে ভয় পান নি। ভয় পাবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তবু তখনও তিনি মত্ততায় অধীর। ক্রুদ্ধ হয়েও ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারেন নি। তিনি রত্নেশ্বর রায়কে লিখেছিলেন—

কল্যাণবরেষু,

তোমার উদ্ধত স্পর্ধিত পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। এবং মনে মনে শঙ্কিত হইলাম যে, তোমার এবম্বিধ উক্তির জন্য নরকেও তোমার স্থান হইবে না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলে এই প্রকারই হইয়া থাকে। ইহার জন্য তোমার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। তুমি কাহাকে কি বলিয়াছ তাহা জান না।

গোপাল সিং রায়বংশের অবমাননাকারী ; তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমার পক্ষে ইহা যে কত বড় পাপ তাহা তুমি অবগত নহ।

তোমার সহিত পত্রালাপেও আমার মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা হইতেছে। তথাপি স্নেহনিম্নগামী ; এসব উন্মার্গগামিতা পরিত্যাগকরতঃ তুমি এখনও আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। বরং তোমার ভালো-মাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ইহাতে তোমার পাপ হইয়াছে কিনা। আমার বিশ্বাস তাহা তুমি কর নাই। তিনি কখনই এবম্প্রকার কার্য ও উক্তি অনুমোদন করিতে পারেন না। ইহা ব্যতীত শুনিতেছি, তুমি আমার নামে মামলা করিতে মনস্থ করিয়াছ। মহলদিগরের দোরবস্ত প্রজা সকলকে রায়সরকারে খাজনা দিতে নিষেধ করিয়া ঢোলসহরত করিবার কথা কর্ণে আসিতেছে। এ-কার্য করিলে তোমার আত্মঘাত করা হইবে। আমি আদালতে প্রমাণ করিয়া দিব যে, তুমি ৺সোমেশ্বর রায়ের কন্যা—বিমলাবালা দেবীর গর্ভজাত সন্তান নহ, শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত ভট্টাচার্যও তোমার জন্মদাতা পিতা নহেন। জালিয়াতি বা জাল করিয়া নয়, শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত এবং তদীয়া ভগ্নী শ্রীমতী ভবানী দেবীকেই সাক্ষী মান্য করিব। তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন।

তুমি সাবধান হইবে। নিজেকে সম্বরণ করিবে। তোমাকে এসব কথা লিখিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অথবা তোমার অপরাধ কি ? ইহা তোমার পিতৃ-মাতৃ উভয় বংশের উপর নিদারুণ অভিশাপের ফল। আমি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। তুমি অন্তত তোমার ভালো-মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ কর। তুমি তোমার ভালো-মাকে বল—আমি তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।

ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীবীরেশ্বর রায় দেবশর্মণঃ

চিঠি নিয়ে গিয়েছিল একজন সওয়ার বর্ক-অন্দাজ। নদীর পথ অনেক ঘুরপথ। তাতে অনেক দেরি লাগবে। এ যাবে সোজা পথে, নদী পার হতে হবে, রূপনারায়ণ। তা হোক, খেয়া আছে। বড়জোর তিন দিন লাগবে। কিন্তু ততদিনে কর্মফলেরই হোক আর অদৃষ্টচক্রেই

হোক, সে একটা নিষ্ঠুর পাক খেয়েছে। গোটা শ্যামনগর তখন আগুন লেগে পুড়ে গেছে।

সওয়ার যখন গ্রামে পৌছুল, তখনও অনেক ঘরের খড়শূন্য কাঠ ধোঁয়াচ্ছে। কমলাকান্তের ঘরখানায় শিকল দিয়ে বন্ধ করে একেবারে চারকোণে আগুন দিয়েছিল। ঘরের মধ্যে বন্ধ ছিল সে। আর এমনি করে আগুন দিয়েছিল ঠাকুরদাস পালের ঘরে। বাকি গ্রামটায় একসঙ্গে অনেক ঘরে আগুন দিয়েছিল। ফলে কেউ কারু সাহায্য করতে পারে নি। কমলাকান্তের গোটা পিঠটা পুড়ে গেছে। ঠাকুরদাস পালের সর্বাঙ্গ এখানে-ওখানে পুড়েছে। সে কমলাকান্তকে আগলে তার কাছেই শুতো। সে-ই কোনরকমে জানালা ভেঙে কমলাকান্তকে নিয়ে বেরিয়ে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওদিকে ঠাকুরদাস পালের বাড়ীতে তার স্ত্রী-পুত্র পোড়া-চালের তলায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে গেছে।

কমলাকান্তকে আশ্রয় দিয়েছেন বিমলাকান্তের জ্ঞাতিরা। ঠাকুরপাড়ায় ঠাকুরদের ভিটের উপর নতুন তৈরী বাংলোটায় রবিনসন সাহেব মদ খেয়ে বন্দুক কাঁধে নিয়ে পায়চারি করছে এবং মধ্যে মধ্যে উড়ন্ত কাক-চিল মেরে আনন্দ করছে।

গোটা শ্যামনগর পুড়ে গেছে। যুগলপুরে দুখানা মৌজা—শ্যামনগর, রাধানগর; মিয়াঠাকুরদের ঠাকুরপাড়া ছিল শ্যামনগরেরই অন্তর্গত কিন্তু শ্যামনগর থেকে একটু দূরের শ্যামনগরেরই একটা আলাদা চক ছিল ওটা। তার পাশে পাকপাড়া আর একটা চক।

শ্যামনগরই সব থেকে বড় বসতি। অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কয়েকঘর বৈদ্য, তাছাড়া নবশাকদের পাড়া, গোপপাড়া, তেলিপাড়া, তামুলিপাড়া, মাহিষ্যপাড়া—অধিকাংশই সেকালের সদ্‌জাতি। এই শ্যামনগর বলতে গেলে একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত পুড়ে গেছে। অকস্মাৎ আগুন লেগে পোড়ে নি, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে কুঠিয়াল জন রবিনসন। আগুন লাগিয়েছে নাকি বীরপুরের ছত্রী বদমাস গোপাল সিং। এবং কমলাকান্ত এই আগুনে পুড়ে জখম হয়েছে, আর ঠাকুরদাস পালের স্ত্রী-পুত্র ঘরের পোড়াচাল চাপা পড়ে মারা গেছে। তাছাড়া গোয়ালে গরু পুড়েছে, ছাগল পুড়েছে, গৃহস্থের উঠোন-চাটা কুকুর-বেড়ালও পুড়েছে। দশ-পনের জন কিছু কিছু পুড়েছে, আর হাত-পা পুড়িয়েছে অনেক লোক।

পৃথিবীতে ঘটনার গতিপথ বিচিত্র। মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আবহাওয়ার খবরে বলতে পারে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার আবহাওয়ার খবরে বলছি—কাল শুকনো যাবে আবহাওয়া অথবা মেঘলা যাবে। কিন্তু মানুষের মনের গতি অতি বিচিত্র, কোন যন্ত্রেই তাকে মাপা বা ধরা যায় না।

ছত্রী গোপাল সিং এসেছিল বীরেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কমলাকান্তের পিছনে আশ্রয় নেবার জন্য।

কমলাকান্ত কাশী থেকে শ্যামনগর এসেছিলেন শুধু নিজের জমি উদ্ধার করবার জন্যেই নয়, তিনি নিজেও এসেছিলেন বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে। কথাটা তাঁর নিজের মনে মনেই ছিল, ঘুণাক্ষরে বিমলাকান্তকে বা ভালো-মাকে জানতে দেন নি।

কমলাকান্ত রত্নেশ্বর রায় হয়ে ডায়রী রাখতে শুরু করেছিলেন। তাঁর ডায়রীর প্রথম খণ্ডটা একটু বিচিত্র। পৃষ্ঠার দুটো দিক—প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি ডায়রী শুরু করেছিলেন, যেদিন তিনি

বীরেশ্বর রায়ের পোষ্যপুত্র হয়ে রত্নেশ্বর রায় হলেন সেদিন থেকে ; দুয়ের পৃষ্ঠায় তিনি তাঁর জীবনের পূর্বকথা লিখেছিলেন। তারই মধ্যে আছে তাঁর অকপট মনের প্রকাশ।

নিজের বংশ-পরিচয়—যে বংশ-পরিচয় তাঁর কাছে তাঁর বাল্যকাল থেকে সত্য বলে জানা ছিল তাই দিয়েছেন। যতটুকু কথা মনে পড়ে তা লিখেছেন। তার মধ্যে রয়েছে—'আমার বাল্যকাল, তখন আমার চার বছর বয়স—আমার মামা বীরেশ্বর রায়কে দেখে বড় ভয় হত। আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকতেন যে আমি পালাতাম, পালাবার জন্ত কান্না শুরু করতাম। এমন ছবি দুটো-চারটে আমার মনে যেন গেঁথে রয়েছে।' তারপর কলকাতার কথা লিখেছেন। বছর-দুয়েক কলকাতায় ছিলেন। এরই মধ্যে ভবানী তাঁর বাবাকে নিয়ে কলকাতা এসেছেন—তিনি তাঁকে 'ভালো-মা' বলে ডাকতেন। তাঁর কোলেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। 'ভালো-মা'র প্রতি ভালবাসা ছিল বাপ বিমলাকান্তের চেয়েও বেশী। ভালো-মাকে পেয়ে যেমন খুশী হয়েছিলেন, তেমনি ক্রোধ তাঁর বেড়েছিল মামার উপর। সেই বয়সেই এটুকু বুঝেছিলেন যে, 'ভালো-মা' ওই মামা বীরেশ্বর রায়ের ভয়েই চলে এসেছেন। তারপর কাশী। কাশীর জীবনের অনেক ঘটনা আছে। সেখানে দুর্দান্তপনা করেছেন, ওখানকার বাঙালী ছেলেদের নেতৃত্ব করেছেন, কুস্তি লড়েছেন, গঙ্গায় সাঁতার কেটেছেন, হৈ-হৈ করেছেন, ভালো-মায়ের সঙ্গে মন্দিরে গিয়েছেন, বাপের সঙ্গে সন্ন্যাসী দেখতে গিয়েছেন ; আবার আদালতে গিয়েছেন। কোম্পানীর সাহেবদের বাড়ীতে ও ক্যান্টনমেন্টে গিয়েছেন বাবার সঙ্গে। তাদের সঙ্গে নিভয়ে কথা বলেছেন। পড়াশুনা করেছেন, সংস্কৃত-ইংরাজী পড়তেন। বাংলা পড়াটা তখন খুব জরুরী ছিল না। বাবা পড়াতেন সংস্কৃত, ভালো-মায়ের বাবা দাদামশাই মহেশচন্দ্র পড়াতেন ইংরাজী।

তার সঙ্গে দিন দিন তাঁর আক্রোশ বৃদ্ধি পেয়েছে এই মামার উপর। তখন জেনেছেন সোমেশ্বর রায়ের দৌহিত্র হিসেবে তিনি মাতামহের উইলসূত্রে রায়বাড়ীর সম্পত্তির অর্ধেক অংশের উত্তরাধিকারী, দেবোত্তরের সেবাইত। তাঁর বাবা বিমলাকান্ত সমস্ত ত্যাগ করে এসেছেন কিন্তু সে ত্যাগ করবার অধিকার তাঁর নেই। আইন জেনেছেন। সে আইন-বলে তিনি তাঁর মগুপ বাঈজীবিলাসী মামাকে সমস্ত বিষয় এবং দেবত্র থেকে অপসারিত করতে পারেন। কিন্তু বিমলাকান্ত এবং তাঁর ভালো-মাকে তিনি এ-মনের কথা ঘুণাক্ষরে জানতে দেননি। তিনি জানতেন, তাঁরা তাকে তিরস্কার করবেন, বাধা দেবেন।

ডায়রীর এই বিবরণের মধ্যে এক জায়গায় লেখা আছে : "একদা আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলাম—সে একটি পাষণ্ড ; মহাপাপী। ঈশ্বরকে বলিহারি যে তিনি এমন জঘন্য কদর্য মানুষের মাথায় বজ্রাঘাত করেন না!

ভালো-মা ঘরের ভিতরে ছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—তুই কাহাকে এ কথা বলিতেছিস রে ?

আমি বলিলাম—বলিতেছি আমার মাতুল মহাশয়কে। তোমার স্বামী কথাটা জিভে আটকাইয়া গেল।

ভালো-মা স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। তাহাতে নিজেকে বড়ই ক্ষুদ্র

মনে হইল। তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—তোর জিহ্বা খসিয়া যাইবে। অনন্ত নরকে তোর স্থান হইবে না। তোর চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইলেন। তারপর ক্ষিপ্তের মত স্বীয় ললাটে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন—ফাটিয়া যাউক, কাটিয়া যাউক, আমার এই মন্দ ললাট ফাটিয়া যাউক।

অতঃপর সে এক তুমুল কাণ্ড। তিনি জলগ্রহণ করিলেন না। মদীয় পিতৃদেব তাঁহার বাসাবাটী হইতে আসিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। আমি অধোবদন হইয়া রহিলাম বটে, কিন্তু আমার মনের সঞ্চিত ক্রোধ আরও যেন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া ভালো-মা এবং পিতৃদেবের আদেশে আমাকে সারাদিন উপবাস করিতে হইল। এই নিন্দার আমার জিহ্বা কলুষিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের নির্দেশক্রমে অহোরাত্র আমাকে ওই উপবাসী অবস্থায় শ্রীহরি শ্রীহরি - হরি শ্রীরাম শ্রীরাম শ্রীরাম জপ করিতে হইল।

তাহা করিলাম। ভালো-মায়ের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। তিনি আমার গর্ভধারিণীর অধিক। দেবী অপেক্ষাও পবিত্রা এবং পূজনীয়া। তাহার সঙ্গে পিতৃনির্দেশ অবশ্যই পালন করিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিলাম সুযোগ পাইলেই কলিকাতা যাইব। এবং মামলা দায়ের করিয়া এই বীরেশ্বর রায়ের দম্ভ চূর্ণ করিব। প্রতিশোধ লইব। শুধু বীরেশ্বর রায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করিলাম। যেন আমার পিতৃদেব এবং ভালো-মাতা হইতে দীর্ঘায়ু হন তিনি। তখন আমি আমার এই আক্রোশ ক্ষোভ মিটাইব।"

হঠাৎ সুযোগ এল। বিমলাকান্ত এবং ভালো-মা বর্তমানেই কমলাকান্ত বাংলাদেশে ফিরিবার সুযোগ পেলেন। চিঠি পেলেন ঠাকুরদাস পালের। "জমিতে সায়েব জবরদস্তি নীল চাষ করাইতেছে। আমি আর চাষ করিতে পারিব না। আতপের অভাবে ঠাকুরের ভোগ হইবে না। প্রতিকার যাহা হয় করিতে আজ্ঞা হয়।" বিমলাকান্ত বাধ্য হয়ে চিঠি দিয়ে কমলাকান্তকে শ্যামনগর পাঠালেন। শ্যামনগরের জমি জন রবিনসনের নীল চাষের গ্রাস থেকে উদ্ধার করবার জন্য। নিজে ছুটি পেলেন না। আদালতের কাছ থেকে তিনি তখন কমিশনরিয়েটের কাজ পেয়েছেন।

জন রবিনসনকে পত্র দিলেন বিমলাকান্ত। ওদিকে রায় এস্টেটে গিরীন্দ্র আচার্যকে পত্র দিলেন। রায়ব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থকে পত্র দিলেন। ডাকযোগে কলকাতায় বীরেশ্বর রায়কেও পত্র দিতে তিনি ভোলেন নি। কমলাকান্তকে প্রতিজ্ঞা করালেন, বল তুমি সেখানে গিয়ে তোমার মামার সঙ্গে ঝগড়া করবে না?

কমলাকান্ত বললেন—ঝগড়া আমি করব না কিন্তু তিনি যদি করেন!

—করলেও তুমি সহ্য করবে।

কমলাকান্ত এর উত্তর দিতে চান নি।

রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করিতে চাহি নাই। এ প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশে আসিবার আমার কোনরূপই আগ্রহ ছিল না। কারণ আমার শ্যামনগর আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য পৈতৃক জমি নীলকরের হাত হইতে উদ্ধার করা নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কীর্তিহাটের সম্পত্তি। আমাকে পরিত্রাণ করিলেন ভালো-মা। আমি উত্তর দিবার পূর্বেই

তিনি মধ্যস্থলে আসিয়া কহিলেন—না, তিনি তাহা করিবেন না!

আমি বলিলাম—যদি করেন ?

তিনি বলিলেন—তাহার জন্য চিন্তা নাই। আমি দেশে যাইতেছি, তোর সঙ্গেই যাইব। তিনি কলহ করিলে তুই আমাকে বলিবি, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।

—কি ব্যবস্থা করিবে ?

—আমি তোকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিব—এই আমরা আসিয়াছি, কি করিবেন করুন।

আমি বলিলাম—না—না—না। তাহা আমি পারিব না।

ভালো-মা বলিলেন—উত্তম, তাহাও তোকে করিতে হইবে না! শুধু আমাকে জানাইবি —তিনি ঝগড়া করিতেছেন।

আমি সুযোগ গ্রহণ করিলাম। বলিলাম—তাহাই হইবে। ভালো-মা শ্যামনগরের ঘাটে আমাকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন তাঁহার পিতার সঙ্গে। তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন আছে, বারো বৎসরের ব্রত। বারো বৎসর পূর্বে গঙ্গাসাগর তীর্থের নিকট এক জাগ্রত কালীমন্দিরে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বারো বৎসর অন্তে সেই মন্দিরেই ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন। যাইবার সময়ও বলিয়া গেলেন—আমার চরণ স্পর্শ করিয়া বল তিনি ঝগড়া করিলে কিছু করিবার পূর্বে আমাকে না জানাইয়া কিছু করিবে না।

সঙ্কল্প ছিল এই প্রতিজ্ঞার সুযোগই আমি লইব। পিতা প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন—বল তুমি মাতুল বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে কলহ করিবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করি নাই, তৎপূর্বেই ভালো-মা মাঝখানে পড়িয়া বলিয়াছিলেন—না, তিনি তাহা করিবেন না। সুতরাং আমার কলহ করিতে বাধা নাই ইহা আমি জানিতাম। সেই সুযোগই গ্রহণ করিলাম। কীর্তিহাটের পত্র লইয়া বজরা আসিতেই আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম, সাদর পত্রের উত্তরে বজ্রসমতুল্য পত্রোত্তরে আঘাত হানিলাম। তিনি কলহ করেন নাই, ভালো-মাকে তো তাহা জানাইবার প্রয়োজন নাই!"

সুরেশ্বর বললে—সেদিন শ্যামনগরে এসে কমলাকান্তের অবস্থা আমি কিছুটা অনুমান করতে পারি। আমার সঙ্গে মেলে। সেটেলমেণ্টের বুঝারতের প্রথম দিন : যেই আমি কুড়ারাম রায়ের পাঁচালীর কথা উল্লেখ করে গোচর আর বসতবাড়ী লাখরাজ বলে স্বীকার করে নিলাম, অমনি গোটা গ্রামের মানুষ আমাকে ধন্য ধন্য করে আমাকে তাদের পরম আশ্রয় করে তুললে। আমি তাই বিশ্বাস করলাম। স্ফীত হলাম।

কমলাকান্তকেও তাই বলে মেনে নিয়েছিল শ্যামনগরের লোক। প্রথম দিনই সে জন রবিনসনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। বিমলাকান্তের চিঠিখানা বাংলোর ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল, জন রবিনসন চিঠিখানা পড়ে খুশী হয়েই বেরিয়ে এসে তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছিল—আশ্চর্য্য তো! তুমি বীরার মত দেখতে, তুমি বিমলাবাবুর ছেলে? I am so glad to see you young man!

বিমলাকান্তের চিঠিতে বেশী কিছু ছিল না, তিনি লিখেছিলেন—আমার ছেলেকে তোমার

কাছে পাঠাচ্ছি। তার পরিচয়পত্র এটা। আশা করি আমাকে তোমার মনে আছে। সামান্ত কাজের জন্ত তাকে পাঠালাম, তার কাছে সব শুনবে।

কমলাকান্তও ভদ্রতা করে কয়েকটা কথা বলেছিল। জন রবিনসন বলেছিল—বল, কি করতে পারি? নিশ্চয়ই তোমাদের জমির কথা। ওয়েল, আজ নয়, কাম টু-মরো। আমি নিশ্চয় ব্যবস্থা করব। কিন্তু কিছু খাবে না? এ কাপ অফ টী?

ধন্তবাদ দিয়ে কমলাকান্ত বলেছিল—নিশ্চয়; খুব আনন্দের সঙ্গে খাব।

হেসে রবিনসন বলেছিল—বস, বস। এত খুশী হলাম আমি যে, হিন্দু গোঁড়ামি তোমার মধ্যে নেই। তোমার বাবা বিমলাবাবু আমাদের ওখানে আসত, তখন সে ছেলেমানুষ, কখনও এক গ্লাস জল খেতো না।

এইটুকুতেই প্রথম দিনেই গোটা শ্যামনগর মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ওঃ, কি খাতির করেছে কুঠিয়ালসায়েব! হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে আদর কত! চা খাইয়েছে। যেটা ওই দে-সরকারদেরও বলে না। গ্রামের ভট্টাচার্যেরা অবশ্য সায়েবের ওখানে চা খাওয়ায় দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু মুখে কিছু বলেন নি। সাহসের কথায়, ইংরিজীতে কথা বলার পারঙ্গমতায় মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা ক'রে বলেছিলেন—ও-ও তো নিজে মস্ত জমিদার। কাশীতে শিক্ষা। তার উপর রায়েদের রক্ত আছে। বীরেশ্বর রায়কে ডেকে লাটসাহেব দেখা করে। চেহারা দেখছ না! নরাণাং মাতুলক্রম।

ঠাকুরদাস খুশী হয়েছিল সব থেকে বেশী। সে বলেছিল—বাপ জিন্দে ছেলে হয়, দাদাঠাকুর আমার মামা জিন্দে ভাগে।

সন্ধ্যেবেলা গ্রামের সকল লোক এসে তার বাড়ীতে বসে তাকে বলেছিল—দেখ ভায়া, তোমার কাছে আমরা একবার এলাম।

খুশী হয়ে কমলাকান্ত বলেছিলেন—আসুন। ঠাকুরদাসদা, যে-সতরঞ্চি এনেছি কাশী থেকে, সেইটেই পাতো। বসুন।

গ্রামের প্রবীণ তিনি, কমলাকান্তের সম্পর্কে ঠাকুরদাদা, তিনি বলেছিলেন—ভায়া, সাহেব তো তোমার জমি ছেড়ে দেবে। কিন্তু গ্রামের লোকের কি হবে? দেখ গ্রামের মধ্যে কেউ ধনী হলে, শিক্ষিত হলে সকলে তার মুখের দিকে ভরসা করে চেয়ে থাকে। ধনী শিক্ষিত যিনি, তিনিও লোকের মুখের দিকে তাকান। তোমাদের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলতে পারলে তো সাহেব এবার হাতে মাথা কাটবে।

তারপর বলেছিলেন—সাহেবের অত্যাচারের কথা। জান ভাই, বেটা মহিষাসুরের মত লম্পট। মেয়েদের ইজ্জত পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠেছে। তুমি আমাদের ছেড়ে মিটমাট করো না। আমাদের নিয়ে যা করবার হয় কর। না-হয় এক কাজ কর না। তুমি কীর্তিহাটের অর্ধেক অংশের শরিক, তুমি আমাদের সব জমিজেরাত কিনে নাও। আমাদের বরং তোমার মহলে জায়গা দাও। এখানে তুমি সাহেবের সঙ্গে ফয়সালা কর।

তরুণ কমলাকান্ত স্ফীত নিশ্চয় হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া তিনি শহরের শিক্ষায়-দীক্ষায় অন্ত ধরনের মানুষ। তার উপর তিনি জেদী, দুর্দান্ত—তাঁর দেহে বীরেশ্বর রায়ের রক্ত. তাঁর

প্রকৃতি জন্মগত ধাতুর জন্ত উগ্র অনমনীয়। তিনি বললেন—এ-কথা বলতে হবে কেন ঠাকুরদা, এর জন্তেই আমি কাশী থেকে আসি নি! এ তো তাকে চিঠি লিখলেই হত! আপনাদের জন্যায় আমি এখানে এসেছি। আপনাদের ছেড়ে আমি মিটমাট করব! তা কখনও করব না।

তাঁরা সকলে একবাক্যে সাধুবাদ দিয়ে উঠে গিয়েছিল।

পরদিন কমলাকান্ত সাহেবের সঙ্গে কথামত দেখা করতে গিয়ে তাই বলে এল এবং ঝগড়া করেই চলে এল।

জন রবিনসন তাঁকে বললেন—ওয়েল ইয়ং ম্যান, আমি তোমায় অর্ধেক জমি নীলচাষ থেকে রেহাই দেব। নট অল। দে-সরকার জমিদার বললে—তোমাদের ল্যাণ্ডই হল বেস্ট ল্যাণ্ড। ওল্ড রায়বাবু—ইয়োর ম্যাটারন্তাল গ্র্যাণ্ডফাদার, ভেরী শ্রুড ম্যান, সে সান-ইন-ল'র জন্মে বেছে বেছে বেস্ট ল্যাণ্ড কিনেছিল। হাফ ছেড়ে দেব আমি।

মনে মনে তেতে উঠেছিলেন কমলকান্ত। কিন্তু নিজের কথা বাদ দিয়ে বলেছিলেন—বাট হোয়াট এ্যাবাউট আদার পিপ্‌ল্? অন্ত সব লোকদের কি হবে? আমি আমার জন্তে কিছু বলব না, অন্তদেরও অর্ধেক জমি ছেড়ে দাও। সকলের ভাল জমিতে তুমি জবরদস্তি নীল লাগাতে বাধ্য করছ। তা করলে তো হবে না।

চমকে উঠেছিল জন রবিনসন।

দেশে তখন নীলকরের অত্যাচার নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে। হরিশ মুখার্জি বলে একজন নেটিভ খুব কড়া কড়া কথা লিখছে। এখানে লেফ্‌টেন্যাণ্ট-গভর্নর গভর্নর-জেনারেলের কাছে দরখাস্ত করছে। ছেলেটা সেই সুরে কথা বলছে। শহর থেকে এসেছে ইংরিজী-জানা ইয়ং ম্যান। জন রবিনসন চমকে উঠল। তার উপর ছেলেটা বীরেশ্বর রায়ের ভাগ্নে। কীর্তিহাটের অর্ধেক অংশের মালিক। এর আওয়াজ তো ব্ল্যাক কাটিজের আওয়াজ নয়।

জন রবিনসন চমকে উঠে বলেছিল—হোয়াট?

—অন্ত লোকেদের কি হবে?

জন রবিনসন বলেছিল—আই সী, ভয় দেখাচ্ছ আমাকে?

—নো। বলছি—এ মহা অন্তায় করছ তুমি। অত্যাচার করছ। এটা না করে অর্ধেক জমি ওদেরও ছেড়ে দাও। ওদের ফেলে আমি তোমার এই অনুগ্রহের অর্ধেক ছেড়ে দেওয়া —এ আমি নেব না।

জন রবিনসন হাসি থামিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—হুঁ! I see. You are a chela of Haris Mukherjee.

কমলাকান্তের প্রকৃতিও উগ্র ছিল, তিনি ভয় পান নি, বলেছিলেন—No. I am not anybody's chela.

—Then What are you? Who taught you all these things?

—আমি কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর অর্ধেকের মালিক। যে সোমেশ্বর রায়ের টাকাতেই তোমার বাপ ব্যবসা করেছিল, মাসে মাসে সুদ গুনতে তোমরা, তিনি আমার মাতামহ। I

know all these things.

রবিনসন রেগে উঠে দাঁড়িয়েছিল।—you say so?

—Yes, I say so. কীর্তিহাটের এলাকায় তোমার কুঠী আছে। এস্টেটের টাকা সব শোধ হয়েছে কিনা জানি না। হরিশ মুখার্জির চেলা নই আমি।

জন রবিনসন চীৎকার করে বলেছিল—বোয়, হামারা চাবুক লে আও।

মুহূর্তে কমলাকান্তও উঠে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে নেমেছিলেন জমিতে এবং দ্রুতপদে চলে এসেছিলেন। রবিনসন হা-হা শব্দে হাসতে লেগেছিল।

গ্রামে ফিরে সে-গ্রামের সকলকে ডেকেছিলেন এবং রবিনসনের সঙ্গে লড়াইয়ের বীজ পত্তন করেছিলেন সেইদিনই।

সুরেশ্বর বললে—এখানে একটা কথা বলি সুলতা। সেটা হল—বামুন, বদ্যি আর কায়স্থ—এই তিনটে জাত সেকালে জমিদারী সেরেস্তার বড় খারাপ জাত ছিল। তার সঙ্গে মুসলমান। সহজে এরা বশ মানত না। রাজা-জমিদার এদের হজম করতে পারে নি। তার সঙ্গে ছত্রী। তবে বাংলাদেশে তারা খুব কম। জমিদারীর বাজারে যেসব মৌজায় এই তিন জাতের বেশী বাস, সে-সব গ্রামের দর কিছু সস্তা। শ্যামনগর সেই ধরনের গ্রাম। ঠাকুর-মিয়াদের জমিদারী যেদিন দে-সরকাররা কেনে, সেদিন এঁরা ঢাক বাজিয়ে পুজো দিয়েছিলেন সর্বরক্ষেতলায়। দে-সরকার যেদিন সুদের দাবী করেছিল, সেদিন গ্রামসুদ্ধ চড়াও হয়েছিল দে-সরকারের নতুন জমিদারী-কাছারীর আটচালায়।

কমলাকান্তকে পেয়ে এরা কোমরে বল পেয়েছিল। বিশেষ করে কমলাকান্ত যে দম্ভ করে বলে এসেছে—আমি কীর্তিহাটের এস্টেটের আট আনার মালিক, তাতে ভরসা পেয়ে তাদের মনের আগুনের উপর পড়া ছাই উড়ে গিয়ে নতুন করে গনগনিয়ে উঠেছিল। সুতরাং বিবাদটা পাকতে দেরি হয় নি।

পথ একটা স্থির হয়েছিল, তাতে জমিদারের সঙ্গে লড়াই শুরু হল আগে। দে-সরকার রবিনসনকে ডেকে এনে বসিয়েছে; সে-ই এখন টাকা দিচ্ছে, সুতরাং মূলে আঘাত দেওয়া হল আগে। ওদিকে রবিনসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কমলাকান্ত তাঁর নতুন শেখা ইংরিজীবিদ্যায় ফলাও করে দরখাস্ত করলেন হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট থেকে কমিশনার, লাটসাহেব পর্যন্ত। ওদিকে দে-সরকারদের সঙ্গে ধর্মঘট করে খাজনা দেওয়া বন্ধ করা হল।

দে-সরকারের বাড়ী রাধানগর—সেখানে অধিকাংশই কায়স্থ, কায়স্থেরাও চুলবুল করতে লাগল, কিন্তু দে-সরকার সুকৌশলে ব্যাপারটাকে কায়স্থদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং অপর জাতের জোট বেঁধে, জাত নিয়ে ঝগড়ায় পরিণত করেছিলেন। ফলে কায়স্থেরা যোগ দিতে ইচ্ছে থাকতেও সরে রইল।

সুরেশ্বর বললে—জাত নিয়ে ঝগড়া যে কি, তা তো তোমাকে বোঝাতে হবে না। এ দেশটাই হিন্দু-মুসলমানের লড়াইয়ে ভাগ হয়ে গেল।

সুলতা বললে—ইয়োরোপে জু-কৃশ্চানের ঝগড়া, শার্ব-ক্রোটের ঝগড়া অনেক উদাহরণ আছে, তুমি বল—কথাটা অবিশ্বাস করছি না। ব্রাহ্মদের সঙ্গে হিন্দুদের ঝগড়া নেই-নেই

করেও থেকে গেছে। বাবা বলেছিলেন—সুরেশ্বর পিছিয়েছে বোধ হয়, তোকে বিয়ে করলে দেবোত্তরের সেবায়েৎ-স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে বলে।

সুরেশ্বর বললে—চতুর দে-সরকার এই জাতিতত্ত্বের চাল চালতে ভোলেন নি। রবিনসনের কুঠীতে অনেক কায়স্থের চাকরি করে দিয়েছিলেন। চতুর লোক ট্যারা দে-সরকার। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও তুলেছিলেন—পথে-ঘাটে দেখা হলে বামুনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মুখে-বুকে ধুলো বুলোতে হবে এটা কি রকম? সেইটে আমি করিনে, সেই ওদের রাগ।

তবুও একটা দল বিরূপ ছিল, কিন্তু ধর্মঘটে যোগ দেয় নি।

শ্যামনগরে ব্রাহ্মণেরা সদ্গোপ এবং অন্যদের বারণ করেছিলেন—কোন কায়স্থকে দেখে মাথা হেঁট করবিনে। খবরদার!

ঠাকুরদাস পাল তাদের নেতা, কমলাকান্তের চেয়ে বয়সে বড় হয়েও অনুগত লক্ষ্মণ, সে হরিধ্বনি দিয়ে বলেছিল—হরি-হরি ভাই!

সোৎসাহে হরিধ্বনিও উঠেছিল। ঠিক এই সময়ে এসেছিল বীরপুরের গোপাল সিং। গোপাল জানত বিমলাকান্তকে এবং কমলাকান্তকে তাড়িয়েছেন বীরেশ্বর রায়। চতুর বিষয়ী গোপাল সিং কমলাকান্তের আগমনবার্তা শুনেই এখানে এসেছিল, বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে লড়াইয়ে কমলাকান্তের মত দুর্ভেদ্য ঢালের পশ্চাতে আশ্রয় নেবার জন্যে।

বিষয় হল মজার বস্তু, কমলাকান্তকে উত্তেজিত করে কোনরকমে খাড়া করতে পারলে বীরেশ্বরের ডান হাতখানাই ভেঙে দিতে পারবে।

কার্যকারণে ঘটনাও এই মুখে চলছিল। বীরেশ্বর রায়ের পাঠানো বজরা এল, লোক এল চিঠি নিয়ে, কমলাকান্ত চিঠির উত্তরে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে চিঠি লিখে বজরা ফিরিয়ে দিলেন। গোপাল উৎসাহিত হয়ে উঠল। তার কাজ কতে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অতি উৎসাহে হঠাৎ একটা কথায় ঘটনার স্রোত ফিরে গেল। অতি চাতুর্যের সঙ্গে সে একই নিশ্বাসে কখনও জন রবিনসন এবং দে-সরকারদের সঙ্গে ঝগড়ায় কমলাকান্তকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে বসেছিল।—

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—

"গোপাল সিং লোকটি দুর্দান্ত সাহসী লোক। তাহার অসাধ্য কর্ম নাই। সে আমাকে ধর্মঘটে এবং রবিনসন সাহেবের সঙ্গে বিরোধে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিল এবং বলিল—আপনি বলেন বাবা-সাহেব—ব্রিফ বলেন, মামলা হ'লে টাকা খরচ করবেন—আমি উদের দেখে লিই। গোপাল সিংয়ের দল আছে বাবা, উ দল নিয়ে সে সব পারে। বিশুবাবু ডাকাইতি কর্‌ত, নীলকুঠী সে অনেক লুটেছে, সো বাবা হামিও পারে। ব্রিফ বলেন—মামলাতে খরচ যোগাইবেন, বাস্, দিব শালা লুচ্চা আংরেজবাচ্চাকে—।

"দন্তের উপর দন্ত স্থাপন করিয়া সে ডান হাতখানা তলোয়ারের মত চালাইয়া দিল। অতঃপর বলিল—টাকা বাবাসাহেবের ছালা ছালা গো! ওই মামা—আপনের মামা কংস মামা আছে গো! হাঁ! উস্‌কে হঠিয়ে দিন, আপনার সম্পত্তির ভাগ আউর টাকা লিয়ে লিন। আপনি তো রাজা গো। দেখবেন তখুন ই সাহেবটো আপনার পাশ টাকা লিয়ে

যাবে আউর বলবে—ঘুট মর্ণিং বাবুসাব, সেলাম বাজাইবে। হাঁ! ইখানে উ সাহেবের জবরদস্তি হামি রুখবে। ই বাত হামি দিলাম। আপনি মামলা করেন আপনার সম্পত্তির ভাগের লিয়ে। ঢেঁরা পিটাইয়ে দিন তামাম তৌজিতে কি বীরেশ্বর রায়কে খাজনা দিবে তো হামি উ উশুল দিবে না। তাহার কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিতেছি। সে সত্য কথাই বলিয়াছে। আমার এই অত্যাচারী নৃশংস মাতুলের হাত হইতে অন্ততঃ আমার প্রাপ্য অংশ উদ্ধার করিতে হইবে। ইহা আমার কর্তব্য। ইহা ধর্ম। না করিলে আমি মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারি না। এবং রবিনসন ও দে-সরকারদের অত্যাচার হইতে শ্যামনগরের অধিবাসীদের যদি বাঁচাইতে না পারি, তবেই বা আমি মনুষ্যপদবাচ্য কিসে?"

সুরেশ্বর বললে—এর পরই ঘটনার স্রোত বিচিত্রভাবে ঘুরে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় কমলাকান্তের বাড়ীতে গ্রামের লোকেদের জমায়েৎ হবার কথা। আগের দিন ষষ্ঠীপুজো ছিল। সেই পূর্বকাল থেকে ষষ্ঠীপুজো সর্বাগ্রে হয় ব্রাহ্মণদের। জমিদার ব্রাহ্মণ হলে এবং গ্রামের লোক হ'লে তাঁর পুজো ব্রাহ্মণদের মধ্যে আগে হয়। কিন্তু জমিদার ব্রাহ্মণ না হ'লে তাদের বাড়ীর মেয়েদের অপেক্ষা করতে হয়, ব্রাহ্মণ-গৃহিণীদের পূজা হ'লে তবে হয় তাঁদের পূজা। দে-সরকার জমিদারী কেনার পর প্রথম বৎসর এ নিয়ে একটা কাণ্ড হয়েছিল; ব্রাহ্মণ-গৃহিণী ও কন্যারা তাঁদের নাকঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা দে-সরকারকে মেনে নিতে হয়েছিল, উপায় ছিল না। এবার সকালবেলাতেই দে-সরকারের গোমস্তা শেখজী রবিনসন সাহেবের পাইক নিয়ে এসে ষষ্ঠীতলা ঘেরাও করে বসেছিল। এবং বেলা বারোটা পর্যন্ত ঘিরে রেখে দে-সরকার এবং তাঁর আত্মীয়বন্ধু বাড়ীর মেয়েদের পুজো শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অন্য কাউকে পূজা করতে দেয় নি।

কমলাকান্ত পর্যন্ত সেখানে গিয়েছিলেন প্রতিবাদ করতে। সঙ্গে ছিল ঠাকুরদাস এবং ছত্রী গোপাল সিং, আর ছিলেন কয়েকজন মাতব্বর ব্রাহ্মণ।

গোমস্তার সঙ্গে বাদানুবাদ কিছু হয় নি। কুঠীর ল্যাঠিয়ালরা, সাহেবের চাকরেরাই মহড়া নিয়েছিল। তারাই বলেছিল—জমিদারের বাড়ীর পূজা হবে, তবে অন্যের পূজা হবে, তার আগে নয়। সাহেবের হুকুম আছে।

বিনা ল্যাঠির জোরে তাদের হঠবার হুকুম ছিল না। হঠলেও বিপদ ছিল রবিনসন কুঠিয়ালের চাবুকের। কমলাকান্ত ভাবছিলেন, কিন্তু প্রবীণ ব্রাহ্মণেরা সব দিক বিবেচনা করে সরেই এসেছিলেন। সেইদিনই গোপাল সিং যে-বন্ধনে বেঁধেছিল কমলাকান্তকে, অতি উৎসাহে বেমক্কা টান দিয়ে কমলাকান্তকে চমকে দিলে; কমলাকান্তও ক্রুদ্ধ হয়ে টান মেরে বাঁধনটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

কমলাকান্ত বসে প্রতিকারের কথা ভাবছিল। গোটা গ্রামটাই আহত হয়েছে এ-অপমানে। যারাই আসছিল, বসছিল, তাদের সকলেরই ছিল এক কথা। জমিদার মাথার উপর পা দিচ্ছে, ধর্ম-সমাজ পর্যন্ত মানছে না।

তারই ভিতর থেকে কখন যে দে-সরকারদের কুৎসা আরম্ভ হয়েছিল কেউ বুঝতে পারে নি। গোপাল তার মধ্যে ফোড়ন দিয়ে যাচ্ছিল, তার ফোড়নের উপকরণের সবটুকুই জমিদারের

অত্যাচারের নামে বীরেশ্বর রায়ের কুৎসা।

দে-সরকারদের নিন্দা, তাদের অধর্ম-আচরণ, কৃপণতা, ছোট নজর থেকে দে-সরকারের ট্যারা-চোখে এসে উপস্থিত হল। তারপর তার পুত্রের গণ্ডমূর্খত্বের কথা। তার থেকে এল দে-সরকার-গৃহিণীর নাকের নথে; এরই মধ্যে কে বললে—সরকারের কন্তেটার ঢঙ দেখেছ! স্বামী ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তার জন্তে কোন দুঃখ আছে, খেদ আছে!

একজন বললে—ওরা তো বলে, মেয়ের ছেলে হ'ল না বলে জামাই বিয়ে করেছে, তাই দে-সরকার কন্তেকে বাড়ী এনে রেখেছে; বলেছে—মেয়ে আমার সতীন নিয়ে ঘর করবে না। কিন্তু আসল ব্যাপার তাড়িয়ে দিয়েছে। সে নাকি সাতখানা কাণ্ড।

কমলাকান্ত বলেছিলেন—থাক না ওসব কথা। ও নিয়ে আমাদের দরকার কি?

গোপাল বলে উঠেছিল—দরকার আছে বাবাসাহেব। আদালতে সরকারকে হাজির করতে পারলে ওই তো বরম্ বাণ। হামাদের উকিল জেরা করবে কি—তুমার বেটী ঘরে আছে কেনো সরকারবাবু? আঁ? সরকার জরুর বলবে কি—বেটী হামার সতীন লিয়ে ঘর করবে না, তাই হিঁয়া থাকে। উকিল দিবে এক ধমক—ঝুট বাত্! ফলানা আদমীর সাথ আপনের বেটীর লটঘট হোয় নাই? সব গোলমাল হইয়ে যাবে সরকারবাবুর। হাঁ। উ সব বিলকুল খবর যোগাড় করো বাবা।

সকলে হেসে উঠেছিল। কমলাকান্ত তিক্ত হয়েও কথাটা ভেবে দেখছিলেন।

গোপাল নিজের কথার জের টেনে বলে চলেছিল—হামি বাবা একদকে বীরেশ্বর রায়কে হাজির করাইয়ে ই জেরা তো জরুর করাই কি, রায়বাবু আদমী লোক বোলে কি আপনে রাণীসাহেবা ভাগ গিয়েছে, কিসকে সাথ গিয়েছে আউর কাঁহা গিয়েছে? আঁয়া?

মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয়ে গিয়েছিল। কমলাকান্ত চমকে উঠেছিলেন, অসহ্য মর্মযন্ত্রণায়; কথা কটা যেন তাঁর বুকের ভিতরে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত। মনে হ'ল গোপাল চিমটে দিয়ে জ্বলন্ত আংরা ধরে তাঁর বুকের ভিতরে টিপে ধরেছে।

—এ্যা-ও! বলে একটা বুকফাটানো হুঙ্কার আপনি তাঁর গলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এবং লাফ দিয়ে উঠে তিনি গোপালের গালে মেরেছিলেন প্রচণ্ড একটা চড়।

গোপাল চমকে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে গোটা মজলিস। প্রথমটা কেউ বুঝতেও পারে নি এর মধ্যে হল কি? গোপাল হতভম্ব হয়ে কমলাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কমলাকান্ত বলেছিলেন—মুখ ভেঙে দেব তোমার। জিভটা ছিঁড়ে নেব!

এরপর যা হবার তাই ঘটল। কথা দু-চারটে আরও হয়েছিল, কিন্তু সে থাক। গোপাল নিজের পাগড়িটা—যেটা কমলাকান্তের চড় মারার ঝটকায় পড়ে গিয়েছিল, কুড়িয়ে নিয়ে নীরবে হনহন করে চলে গিয়েছিল।

সেইদিনই আর একটা ঘটনা ঘটে গেল। সেটা সন্ধ্যের সময়। কমলাকান্তের বাড়ীর দাওয়ায় গ্রামের মজলিশ বসেছিল। আলোচনা ওই আলোচনা। কমলাকান্ত হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ মুখার্জিকে পত্র লিখেছে—রবিনসনের অত্যাচারের কথা জানিয়েছে, তাই পড়ে শোনাচ্ছিল, এমন সময় জন তিন-চার চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে ছুটে এসে বললে—দে-সরকারের পালকি

যাচ্ছে। তার ছেলে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ী। ষষ্ঠীতে যায় নি, আজ যাচ্ছে।

সমস্ত আসরটা মুহূর্তে একাগ্র এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পালকি হাঁকিয়ে সদন্তে চলে যাবে ?

কমলাকান্ত বলেছিলেন—ক'জন চাপরাসী আছে রে ?

—পাঁচজন-ছ'জন হবে।

—আর বেহারা আটজন নিয়ে তের-চৌদ্দজন।

চট করে ঠাকুরদাস উঠে এসে বলেছিল—তা থাক। তুমি হুকুম দাও, আমি ওর ছেলেকে পায়ে হাঁটিয়ে এখানে এনে দি!

—মারামারি করবি না ?

—না-না-না। তিনসত্যি করছি। তুমি শুধু হুকুম দাও। দেখ না কি করি আমি!

—কোন অভদ্রতা করবি নে, শুধু পালকি থেকে নামিয়ে আনবি! দাঙ্গা করবি নে, সে হবে কি করে ?

—দেখ না! গাঙের ঘাটের পাশের জঙ্গল থেকে বড়মেয়ার ছুটি হাঁক ছাড়ব শুধু। বলেই সে ক'জন সাকরেদকে ইসারা দিয়ে ছুটে চলে গেল। পিছনে পিছনে জন-পনেরো সাকরেদ। ছুটে বেরিয়ে গেল। গোটা মজলিসটা মুহূর্তে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। এমন কি কমলাকান্তের সম্পর্কে দাদামশাই—বয়সে ষাট পার হয়েছেন—তিনি পর্যন্ত খি-খি শব্দে হেসে বলেছিলেন—তাহলে জলদি যা, জলদি! দেখ তো কেউ পালকি কত দূরে ?

কমলাকান্ত ঠিক বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করেছিল—কি বলুন তো ?

—দেখ না নাতি, দেখ না! ঠাকুরদাস অনেক রকম পারে হে। দেখ না!

ইতিমধ্যেই দূরে পালকির বেহারাদের ডাক শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে আলোর ছটা বাড়ল, মশাল হাতে মশালচীর পিছনে দে-সরকারের ছেলের পালকি। সামনে পিছনে তিনজন-চারজন লাঠিধারী বরকন্দাজ। মাথায় লাল শালুর পাগড়ি। মজলিসটা স্তব্ধ হয়ে গেল। কমলাকান্তের মনে লেগেছিল। তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখেছেন—"আমি কীর্তিহাটের রায় এস্টেটের মালিক, আমার তুলনায় এই ব্যক্তিটা একটা ক্ষুদ্র ব্যক্তি। সে এইভাবে লোকলস্করসহ পালকি চাপিয়া চলিয়া গেল, আমি আমার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম। এবং মনে হইল, ইহার জন্য দায়ী বীরেশ্বর রায়, আমার মাতুল। এমন হিংসা, এমন জটিল চরিত্রবিশিষ্ট মনুষ্য আমি দেখি নাই। আমাকে আমার অধিকার উদ্ধার করিতেই হইবে। এবং এই শ্যামনগর-রাধানগর-যুগলপুর লাট খরিদ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম।"

তখন আসরে চলেছে দে-সরকারদের ভবিষ্যৎ ভবিতব্যের কথা। প্রবীণতম ভট্টাচার্য বলছেন—অতি দানে বলি বদ্ধঃ, অতি মানে চ কৌরবাঃ। অতি দর্পে হত লঙ্কা, সর্বমত্যন্তম-গর্হিতম। এই কায়স্থ কুলকজ্জলের তাই হয়েছে। একসঙ্গে অতিমান এবং অতিদর্প। এ সহ্য হবে না!

আঘাত তাঁদেরও লেগেছিল।

—সম্মুখে দেবস্থান, ব্রাহ্মণদের মজলিস চলছে, একেবারে একটা সম্ভাষণ না করে চলে

গেল। পালকি থেকে না নামিস, মুখ বাড়িয়ে দেবতাকে প্রণামটা তো করলে পারতিস!

হঠাৎ একটা প্রবল কোন জান্তব গর্জনে সব কথা বন্ধ হয়ে গেল, দু-চারজন চমকেও উঠেছিল। পরক্ষণেই হেসেছিল সকলে। কমলাকান্তও চমকে উঠেছিলেন।

—কি? বাঘ?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা হুঙ্কার। ওদিকে কতকগুলো লোকের চিৎকার শোনা গেল।—বাঘ-বাঘ-বাঘ! সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রান্তেই বাঘ-তাড়ানো টিন বেজে উঠল।

বাঘ? এখানে বাঘ আছে। চিতাবাঘ। মধ্যে মধ্যে দু-একটা গেলেদা বাঘও এসে পড়ে, একথা রত্নেশ্বর শুনেছেন।

বুড়ো ভটচাজ হেসে উঠে বলেছিলেন—সাবাস, সাবাস, সাবাস! কমলাকান্তের এবার মনে হল ঠাকুরদাস উঠে যাবার সময় বলে গেছে, 'বড়মেয়ার' দুটি ডাক! তবে কি! তিনি বললেন—ঠাকুরদাস?

—হ্যাঁ। ফুটো হাঁড়ি-মালসায় মুখ ভরে অবিকল ডাকতে পারে। তবে আজকের ডাক মোক্ষম!

ঠিক সেই মুহূর্তে পালকিবেহারা চাপরাসী মশালচী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে মজলিসের মানুষগুলি দেখে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

বৃদ্ধ ভটচাজ জিজ্ঞাসা করলেন—কি হল?

একজন সভয়ে বললে—বাঘ! ডোরা বাঘ, একবারে ঘাটের মুখে জঙ্গল থেকে হাঁকড়ে উঠল মাথায়, জঙ্গল একেবারে ঝড়ে নড়ার মত নড়ে উঠল!

—বস বস বাবাসকল বস। একটু করে জল খাও। লাঠিগুলি রাখ। বাবু কোথায়?

একজন চাপরাসী বললে—বাবু ওই পালকির মধ্যে। কি হবে?

—হবে, বস। হচ্ছে।

ঠিক ঐই সময়েই দূরে ঠাকুরদাসের গলা পাওয়া গেল। সে হেঁকে বলছিল—দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর!

বলতে বলতেই দে-সরকারের ছেলেকে একরকম জড়িয়ে ধরে নিয়ে এসে হাজির হল। বললে—ওঃ, এ্যাই বড় বাঘ, একটু হলেই ঝাঁপ দিত। বাপ, হাঁকাড় কি? আমরা ওখানে ছিলাম। তা বেয়ারা-বরকন্দাজরা পালকি ফেলে চলে এল, বাবুমাশায় দেখি পালকির মধ্যে প্রায় বেহুঁস। বড়া খারাপি হয়ে গিয়েছে। কোন রকমে ওনাকে এই নিয়ে আসছি। ছোঁড়াগুলান হৈ-হৈ করে বাঘের পেছোনে টিন বাজাচ্ছে। এই লেন। বসেন বাবুমাশায়, বসেন। এক ঘটি জল দেন।

দে-সরকারের ছেলের পোশাক-পরিচ্ছদ ধুলোয় নষ্ট হয়েছে। ঠাকুরদাস তাকে পালকি থেকে বের করবার সময় সুকৌশলে মাটিতে একটা আছাড়ও খাইয়েছিল।

প্রবীণতম ভট্টাচার্য বলেছিলেন—বস বাবা, না তার আগে ঘরে দেবতা রয়েছেন প্রণাম কর; ব্রাহ্মণেরা রয়েছেন, পায়ের ধুলো নাও। এ হল বাবা দেবতা ব্রাহ্মণকে অবহেলা উপেক্ষার ফল। কলিকাল হলেও এক পাদ ধর্ম তো এখনও আছে! এমন করে দেবতা

ব্রাহ্মণকে তুম কোন হ্যায় বলে চলে গেলে এমনি করেই হুঙ্কার দেয়। বাঘে দেয়, ভালুকে দেয়! কখনও কখনও বিনা মেঘে বাজও হাঁকড়ে ওঠে বাবা!

সুলতা হেসেছিল এবার। বলেছিল—সেকালের রসজ্ঞান তো বিচিত্র!

—সেকালটাই বিচিত্র ছিল সুলতা। সুরেশ্বর হাসলে। তবে একালেই কি আমরা কম যাই! কলকাতায় একটা ইলেকশনে দেখেছিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের বাড়ীর সামনে একদল সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম করে বলছিল—অমুকচন্দ্র অমুক। আর দল সঙ্গে সঙ্গে একটা হাঁড়ি হাতে নিয়ে দুম করে ভেঙে দিচ্ছিল। অর্থাৎ নাম করলে হাঁড়ি ফাটে।

সুলতা হেসে বললে—জানি।

সুরেশ্বর বললে—ও কথা থাক। এখন শুনে যাও যা ঘটল। এই রসিকতার মাশুল কি দিতে হল, তাই বলি।

—দে-সরকারের ছেলে একটু স্থূলকায় কিন্তু জমিদার কায়স্থের ছেলে, তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি দেবতাকে এবং ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে বলেছিলেন—আমি যাই এবার। এ উপকার মনে থাকবে আমার।

বেয়ারারা পালকিখানা আনতে গিয়ে সেটাকে পায় নি। সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে পথের উপর পড়েছিল। ঠাকুরদাস বলেছিল, তাহলে বাঘটা বোধ হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেঙে দিয়েছে।

এর পর বিনা বাক্যব্যয়ে পায়ে হেঁটে দে-সরকারের ছেলে বাড়ী ফিরে গিয়েছিল।

কমলাকান্ত সারাক্ষণ চুপ করেই বসেছিলেন। বিদায়ের সময় শুধু বলেছিলেন—আপনার বাবাকে বলবেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার পিতা শ্রীবিমলাকান্ত তাঁর মহলে একটা জোত রাখেন বটে, কিন্তু আমি এখনও প্রজা নই আপনাদের। আমি কীর্তিহাটের আট আনা অংশের মালিক। আমিও জমিদার। বলবেন।

দে-সরকারের ছেলে চলে গিয়েছিলেন।

তার দশ দিন পর, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শ্যামনগরে আগুন লাগল। শ্যামনগরে তখন জোট বেশ জমাট বেঁধেছে। সকলে সাবধানে চলাফেরা করে। গ্রামের মোড়ে মোড়ে পাহারা দেয়। দেখে জমিদারের বা রবিনসনের লোক আসছে কিনা। দু দিন পর অবশ্য দে-সরকারের ছেলে অনেক বরকন্দাজ সঙ্গে করে পালকি হাঁকিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেছে। সেদিন রাস্তার ধারে কেউ ছিল না। কিন্তু কোথায় কোন অন্তরাল থেকে ক্যানেস্তারা বাদ্য হয়েছিল। এই পর্যন্ত।

হঠাৎ দশ দিন পর তৃতীয় প্রহর রাত্রে যখন সব মানুষ একটা শেষরাত্রের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন গ্রামে আগুন লাগল। সে আগুন একটা পরিকল্পনা করে লাগানো আগুন। যাকে আগুনের বেড়াজাল বলে তাই।

প্রায় সব কটি ঘরে একসঙ্গে আগুন লাগল। যেন কেউ কারু সাহায্যে যেতে না পারে। এবং কমলাকান্তের কোঠাঘরে চার কোণে আগুন লাগল। এবং ঘরের দরজায় শিকল তুলে তালা দিয়েছিল একটা। কমলাকান্তের কাছে ঠাকুরদাস শুয়ে থাকত। ঠাকুরদাস কোঠাঘরের জানলা ভেঙে বের হবার পথ করেছিল। তখন মাথার উপরের চাল পুড়ে খসে পড়েছে ভিতরে। কমলাকান্ত উপুড় হয়ে পড়ে গেছেন। পিঠ তাঁর ঝলসে গেছে। ঠাকুরদাসই তাঁকে কোন

রকমে টেনে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল নিচে। ওদিকে তখন ঠাকুরদাস পালের বাড়ীতে তার স্ত্রী-পুত্র সকলে পোড়া চালের তলায় চাপা পড়েছে। তার বাড়ীতেও ঠিক তালা শিকল লাগিয়ে চার কোণে আগুন লাগানো হয়েছিল।

আগুন লাগিয়েছিল গোপাল সিং। হুকুম ছিল রবিনসনের।

গোপাল সিং কমলাকান্তের কাছে চড় খেয়ে তা হজম করে নি। সে গোপাল সিং, তা সে করে না। সে শ্যামনগর থেকে চলে আসতে আসতে ফিরে গিয়েছিল কমলাকান্তের শত্রু রবিনসন এবং দে-সরকারের কাছে। রবিনসন নিতান্ত ইতর ইংরেজ হলেও ইংরেজ, সে যা করবার নিজে সোজাসুজি করতে চেয়েছিল। কিন্তু চতুর দে-সরকার গোপাল সিংকে দেখিয়ে বলেছিল—গোপালকে ভার দাও সাহেব। তার থেকে জবরদস্ত লোক তোমার নেই। আর গোপালও তো তোমার কুঠীর কাজে ভর্তি হচ্ছে। দাও, ওকেই ভারটা দাও।

গোপালের দম্ভ স্ফীত হয়ে উঠেছিল এবং ধূমায়িত আক্রোশটাও বাতাস পেয়ে উঠেছিল জ্বলে। সে নিজে হাতে শোধ নেবে। সে বলেছিল—চুপ করে থাকেন সাহেব, ক'টা দিন চুপ করে থাকেন। আমি আমার সাকরেদদের নিয়ে আসি। দোহাই আপনের, কুচ্ছু করবেন না। আমি লাল ঘোড়ার চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে দিব। আপনা কুটীকে বারেন্দেমে কুর্সী পর বইঠিয়ে আরামসে, দেখবেন লাল ঘোড়াকে ঘৌড়দৌড়।

গোপাল হেঁকে বলেও গেছে। হামার নাম গোপাল সিং!

* * *

সওয়ার খবর নিয়ে ফিরে এল।

বীরেশ্বর সংবাদটা শুনে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বেঁচে আছে? তুম আপনা আঁখ সে দেখা?

—নেঁহি হুজুর। মুলাকাত আমার সঙ্গে হয় নি। চিঠিও ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বীরেশ্বর রায় অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পরে চেতনা হয়েছিল। কিন্তু চোখ লাল, দৃষ্টি বিহ্বল। তার সঙ্গে বিকারের মত প্রলাপ।

মেদিনীপুর থেকে ইংরেজ ডাক্তারসাহেব এসেছিল। ডাক্তারসাহেব বলেছিল—ব্রেন কন্‌জেশন হয়েছে। যারা মদ খায়, তাদের হয়। আবার কোন মানসিক আঘাত থেকেও হয়। মনে হচ্ছে অবস্থা খারাপ। গিরীন্দ্র আচার্য মহল থেকে ফিরে এসেছেন খবর পেয়ে। তিনি এসেই সাহেব ডাক্তার আনিয়েছেন।

সাহেব ডাক্তারের কথা শুনে পরামর্শ করে রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন, গিরীন্দ্র আচার্য লোক পাঠালেন কমলাকান্তের কাছে। মাতুলের অবস্থা তাঁকে জানানো আবশ্যক। সেও অসুস্থ। তবু যেমন করে হোক তাঁর আসা আবশ্যক। বজরা তাঁরা পাঠান নি সাহস করে।

পাঁচ দিনের দিন একখানা ছিপ এসে লেগেছিল কাঁসাই-এর ঘাটে। নৌকা থেকে নেমে এসেছিলেন মহেশচন্দ্র এবং ভবানী।

লোকে প্রথমটা চিনতে পারে নি।

পারবে কেন ? সাধারণ লোকে রায়বাড়ীর বধূ ভবানী দেবীকে দেখে নি। সেটা পর্দার যুগ।

সুলতা, প্রৌঢ়া রাণী কাত্যায়নীকে একটা চৌদ্দ বছরের ডোমেদের ছেলে অবাক-বিস্ময়ে গাছের উপর থেকে দেখছিল বলে তার কি শাস্তি হয়েছিল বলেছি। সেই যুগ। তার উপর বধূ ভবানী দেবীকে তারা জানত রাজরাণী, এবং তাঁকে না দেখলেও তাঁর রাজরাণীর উপযুক্ত বসন-ভূষণের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল। এ মেয়ে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের। ভূষণের মধ্যে হাতে দু গাছি শঙ্খ ছাড়া কোন ভূষণ ছিল না; আর পরনে একখানি লালপেড়ে শাড়ী। তবে রুখু চুলের রাশি এবং চোখের দৃষ্টিতে তারা বিস্মিত হয়েছিল। চিনতে পারে নি।

ভবানী দেবী এসে ঢুকেছিলেন কালীবাড়ীতে।

লোকজন তখন ব্যস্ত। বাবুর অসুখ। একটা চাপা আশঙ্কা সকলের বুকে এবং চোখেমুখে ফুটে উঠেছে। লোকজন অনেক তবু গুঞ্জনের কলরবও ছিল না।

ভবানী দেবী নাটমন্দিরে প্রথম প্রণাম সেরে, নাটমন্দির থেকে মায়ের মন্দিরের বারান্দায় উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গড়িয়ে পড়েছিলেন। একেবারে নিস্তব্ধ নিথর হয়ে পড়েছিলেন কিছুক্ষণ।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন ছিলেন তখন রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে। মায়ের মন্দির খোলাই ছিল; দর্শনার্থীর জন্য খোলা রাখার নিয়ম ছিল। পরিচারক ঘুরছিল এদিক-ওদিক, সে ভোগের যোগাড়-যন্ত্র করছিল। সে হাতে একটা বড় গাড়ু নিয়ে গঙ্গাজল ছড়া দিয়ে চলেছিল ভোগশালা থেকে মন্দির পর্যন্ত। এই পথে মায়ের ভোগ আসবে। নাটমন্দির থেকে লোকজনেরা সরে যাচ্ছিল, ভোগে দৃষ্টি পড়বে তাদের। সে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল ওই বারান্দায় লুটিয়ে পড়া মেয়েটিকে দেখে।

—কে গো ? ও গো, কে গো, তুমি বাছা ? ওঠো ওঠো। মায়ের ভোগ হবে, ভোগ আসবে ওঠো।

উত্তর দেন নি ভবানী দেবী, নিস্পন্দ হয়ে পড়েই ছিলেন। পরিচারক আবার ডেকেছিল, ও গো মেয়ে! আরে এ যে নড়ে না! কি বিপদ ?

নাটমন্দিরে একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। তিনি বোধ করি নিদারুণ সংশয়ের মধ্যে মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, কি হবে, কি ঘটবে এর পর! এবার তিনি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পরিচারককে বলেছিলেন—ওঁকে ডেকো না বাবা, ওঁর হ'লে উনি আপনি উঠবেন।

মহেশচন্দ্র সে আমলের শহরবাসী ইংরিজী-জানা মানুষ। লম্বা-চওড়া মানুষ ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল। তাঁর কথায় পরিচারক একটু দমে গিয়ে বলেছিল—মায়ের যে ভোগের সময় হল।

—তা হোক। মা তো! একটু না-হয় দেরিই হবে সন্তানের জন্য!

কথাটা শুনে পরিচারক হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সে কি করবে বুঝতে না পেরে গাড়ুটা হাতে ধরে দাঁড়িয়েই ছিল। ঠিক এই সময় রাজরাজেশ্বরের মন্দির থেকে ন্যায়রত্নমশাই মায়ের

মন্দিরে এসে পড়েছিলেন। রাজরাজেশ্বরের চত্বরের দরজা পার হয়েই তিনি মহেশচন্দ্রের কথাগুলি শুনতে পেয়েছিলেন। পরিচারকের কথাও—শেষ কথা—শুনেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন সে একটু বিব্রত।

—মায়ের যে ভোগের সময় হল।

উত্তরে শুনলেন—তা হোক। মা তো! একটু না হয় দেরিই হবে সন্তানের জন্য!

ভাল লাগল। কিন্তু হল কি? তিনি পরিচারককে ডেকে বললেন, কি হল হরিচরণ?

—আজ্ঞে, একটি মেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মায়ের দরজার সামনে। ডাকলে সাড়া নেই। উঠতে বলছি, তা উনি বলছেন—

ন্যায়রত্ন ততক্ষণে এসে পড়েছেন সামনে। দেখলেন সাষ্টাঙ্গে প্রণতা ভবানী উপুড় হয়ে পড়ে আছে, পিঠের উপর রাশীকৃত রুক্ষ চুল ছড়িয়ে পড়েছে; নিথর নিস্তব্ধ। একটি প্রগাঢ় আত্মনিবেদন যেন ধ্যানে সমাহিত হয়ে গেছে। তিনি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন।

—কোন মানসিকের জন্য এসেছেন বুঝি? তিনি এবার ফিরে তাকালেন মহেশচন্দ্রের দিকে। তিনি চমকে উঠলেন, যেন চেনা মুখ। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। তাঁর বিস্ময় অপরিসীম হয়ে উঠেছিল। দু-পা এগিয়ে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—মহাশয়ের নাম?

—নাম? মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বলে আঙুল দেখিয়ে ভবানীকে দেখিয়ে বললেন—খবরটা পেয়ে আর থাকতে পারলে না, ছুটে এসেছে।

ফিরে ভবানীর দিকে তাকালেন ন্যায়রত্ন।

মহেশচন্দ্র বললেন—বারো বছর ব্রহ্মচারিণীর ব্রত নিয়েছে, এই আর এক পক্ষ বাকী। তবু এল। পারলে না থাকতে!

ন্যায়রত্ন বোধ হয় সোরগোল তুলতেন। মহেশচন্দ্র বারণ করে বললেন—না। সোরগোল তুলবেন না। সে খুব খারাপ হবে!

ন্যায়রত্ন এবার এগিয়ে গিয়ে ভবানী দেবীর মাথায় হাত দিয়ে ডাকলেন—মা!

ভবানী দেবীর সাড়া ছিল না। তিনি ওখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেই জ্ঞান হারিয়েছিলেন। তিনি পরিচারকের হাতের গাড়ুটা নিয়ে গঙ্গাজল ঢেলে মাথায় ছপছপ করে ঝাপটা দিয়েছিলেন। আর ডেকেছিলেন—মা-মা-মা!

সোরগোল উঠেই গেল আপনা থেকে। গিরীন্দ্র আচার্য ছিলেন বাড়ীর মধ্যে, বীরেশ্বর রায়ের শোবার ঘরের বারান্দায়। মেদিনীপুরের একজন দেশী ডাক্তার রয়েছেন। ঘরের মধ্যে। বীরেশ্বরের খাস চাকর জলধর বসে আছে মাথার শিয়রে। মাথা কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। জলপটি চলছে অহরহ। একজন চাকর বাতাস দিচ্ছে। রায়বাড়ীর কবিরাজমশাই বসে আছেন, আচার্যের পাশে। নাড়ী দেখছেন তিনি। সারা অন্দরে এক পায়রার ডাক ছাড়া কোন ডাক শোনা যায় না। নিষেধ আছে জোরে কথা বলতে। কথাবার্তা ফিসফিস করে; অথবা অতি মৃদুস্বরে চলছে, তাও দুটো-চারটে। পুকুরের ধারে জলের উপর ঝুঁকে-পড়া কুলগাছ থেকে পাকা কুল মধ্যে মধ্যে ঝরে পড়ার সঙ্গেই তার তুলনা হয়। মধ্যে মধ্যে একটি দুটি টুপ-

টুপ শব্দ।

এরই মধ্যে গিরীন্দ্র আচার্য কালীবাড়ীর গোরগোলের সাড়া পেলেন। উঠে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন—কি হ'ল ?

ঠিক এই সময়েই উঠল শাঁখের শব্দ। তিনি দ্রুতপদে নেমে এলেন। ভেবেছিলেন কমলাকান্ত এসেছেন।

তিনি নিচে নাটমন্দিরে এসে দেখলেন, সমস্ত সেরেস্তাখানা, চাকর-বাকর, লোক-লস্কর সব ভিড় করে চারিপাশে দাঁড়িয়ে গেছে। সব স্তব্ধ, শুধু একটা ঠেলাঠেলি চলছে। মধ্যে মধ্যে দারোয়ানেরা হেঁকে সাড়া তুলছে। খবরদার! খবরদার! খবরদার!

ভিড় ঠেলে তিনি জিজ্ঞাসা করতে করতেই এলেন—কি ? কি ? ব্যাপার কি ?

একটি কথা—রাণীমা!

—রাণীমা ? রাণীমা কে ?

—আজ্ঞে রাণীমা! সতীরাণী বউ!

—সতীরাণী বউ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বুকের ভিতরটা ধক-ধক করতে শুরু করেছিল আচার্যের। আশঙ্কা না আনন্দ তিনি বুঝতে পারেন নি। বারো বছরেরও বেশী—তের বছর পূর্ণ হবে এই বর্ষায়। এতকাল পর ? তবে এটা তিনি জানতেন, বীরেশ্বর রায় আজও তাঁর সন্ধান করেন। এত বড় এস্টেটের দেওয়ান, এস্টেটের খুঁটিনাটি, জমিদারীর জোত-জমাই শুধু তাঁর নখদর্পণে নয়, খোদ মালিকের প্রতিটি কর্মের সংবাদ তিনি রাখেন। পা ফেললে আওয়াজ শুনে বলতে পারেন, মালিক কোন্ মেজাজে কি বলতে আসছেন।

সেদিন ছেদী ফিরে আসবামাত্র বীরেশ্বর রায় চঞ্চল হয়ে উঠে বিষয়কর্ম সমস্ত ঠেলে ফেলে তাঁদের একটি কথায় বিদায় দিয়ে, ছেদীকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে পাহারা রেখে ঘরে ঢুকেছিলেন। একটি প্রহর দরজা খোলেন নি। তারপর যখন বের হলেন, তখন যেন অন্য মানুষ। সেইদিনই তিনি কমলাকান্তকে পরম সমাদরে যেন আর্ত হয়ে আসতে বলে চিঠি লিখেছিলেন। এর মধ্যে একটা রহস্যের আভাস তিনি পেয়েছিলেন।

একটা কৈফিয়ৎ অবশ্য মিলেছিল ন্যায়রত্নের কাছে। তিনি সোমেশ্বর রায়ের পাপের কথা, শ্যামাকান্তের কাছে তাঁর অপরাধের কথা চিঠি লিখে বীরেশ্বরকে জানিয়েছেন, একথা ন্যায়রত্ন তাঁকে বলেছিলেন; এবং বলেছিলেন, বীরেশ্বরের মন সম্ভবতঃ এই কারণেই পাল্টেছে। কমলাকান্ত শ্যামাকান্তের পৌত্র। প্রায়শ্চিত্ত করবার সুমতি সেই কারণেই।

তবু এই বিষয়ী মানুষটির মন এতে সন্তুষ্ট হয় নি। তিনি ছেদীকে ডেকে কথাবার্তার মধ্যে প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করেছেন। ছেদী বুদ্ধি তাঁর থেকে বেশী ধরে না। তবু বিশেষ কিছু জানতে পারেন নি। তবে আভাস একটা পেয়েছেন।

কাশীতে বিমলাকান্ত আবার বিবাহ করেছে তা জেনেছেন। আর পেয়েছেন এক সতীমায়ের খবর। ছেদী বলেছে—তিনি সাক্ষাৎ দেবী। তপস্যা করেন। এই সতীমাঈজীই

বিবাহ দিয়েছেন বিমলাকান্তের। কমলাকান্তকেও তিনি খুব কৃপা করেন। বাবুজী, বেটার মাফিক। এমন কি সতীমাঈ তীরথ করতে এসেছেন, যাবেন গঙ্গাসাগর পর্যন্ত, এসেছেন বিমলাকান্তের সঙ্গে। কিন্তু সতীমাঈ যে কে তা তিনি প্রশ্ন করেন নি। কাশীধাম তপস্যার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। এই কলিতে ঈশ্বরসন্ধানী তপস্বী-তপস্বিনীদের আশ্রয় ভূমি। সুতরাং কাশীতে সতীমাঈর আবির্ভাব তাঁর বিষয়ী মনের উপরেও এতটুকু সন্দেহের ছায়া ফেলে নি। এমন কি রায়বাড়ীর ভেসে-যাওয়া সতীরাণী বউয়ের সঙ্গে কাশীর সতীমাঈজীর নামের মিল সত্ত্বেও এদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে, তাও তাঁর মনে হয় নি। এই মুহূর্তেও তা তাঁর মনে হচ্ছিল না। তিনি নানা প্রশ্নের মধ্য দিয়েই এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়ালেন। ভিড় থেকে বেরিয়েই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, একটি মেয়ে মন্দিরের দরজার সামনে নতজানু হয়ে বসে আছেন, দরজায় দাঁড়িয়ে রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন তাঁর হাতে মায়ের নির্মাল্য দিচ্ছেন। পরিচারক তখনও হাতে শাঁখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে ধরে তার পাশে বসে আছেন একজন পককেশ বৃদ্ধ। তার মুখের এক দিকটা দেখা যাচ্ছিল। দেখে মনে হল—দেখা মুখ, এবং মুহূর্তেই বুঝলেন ভবানী দেবীর পালক-পিতা, মহেশচন্দ্র। গিরীন্দ্র আচার্য এসে মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়ালেন।

ন্যায়রত্ন নির্মাল্য মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন—চিরায়ুষ্মতী ভব।

প্রণাম করলেন ভবানী দেবী। ন্যায়রত্ন গিরীন্দ্র আচার্যকে দেখতে পেলেন এবার, এবং বেশ দীপ্তমুখে বললেন—আর ভয় নেই আচার্যমশায়। বারো বৎসর তপস্যা করে রায়বাড়ীর গৃহলক্ষ্মী ফিরেছেন। মা প্রসন্ন। বীরেশ্বর অচিরে সুস্থ হবেন।

ভবানী দেবী প্রণাম করে উঠে ফিরে তাকালেন; গিরীন্দ্র আচার্যের নাম শুনেই তাকালেন। এবং উঠবার চেষ্টা করলেন।

আচার্য তাঁর মুখের দিকে স্তম্ভিত বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়েছিলেন; শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, রুক্ষ চুলের রাশি সে মুখখানিকে ঘিরে আশ্চর্য রূপ এবং মহিমা দিয়েছে। ঠোঁট দুটি শুষ্ক। কিন্তু চোখ দুটি আশ্চর্য উজ্জ্বল। ভবানী দেবী একটু ট্যারা। চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্নাচ্ছন্নতা রয়েছে যেন। অথবা কোন ভাবনায় সে দৃষ্টি সমাহিতের মত মগ্ন। মধ্যে মধ্যে সচেতনতা দেখা দিচ্ছে, মেঘাচ্ছন্ন দিনে কাটা মেঘের ফাঁক দিয়ে বিচ্ছুরিত সূর্যালোকের মত। আচার্যকে দেখে দেখে সেই মুহূর্তে তেমনি এক ঝলক সচেতনতার আলো ফুটে উঠেছে। তিনি এতক্ষণে অনবগুণ্ঠিত মাথার উপর কাপড়ের আঁচল টেনে দিলেন।

সামাজিক এবং বিষয়ী মানুষ আচার্যের মনে মুহূর্ত পূর্বেও শত প্রশ্ন একটা ভয়ার্ত জনতার মত একসঙ্গে যেন কোলাহল শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু ভবানী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে শান্ত শুধু হল না, লজ্জিত হয়ে তারা লুকিয়ে পড়ল মনের কোণে কোণে। আচার্যের ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল; একটা আবেগ তাঁর বুকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তিনি বললেন —আসুন মা!

শুধু বৃদ্ধা মাসীমা, রাজকুমারী রাণী-কাত্যায়নীর এক জ্ঞাতি ভগ্নী যিনি এখন রায়বাড়ীর অন্দরে পোষ্যমহলে কর্তৃত্ব করেন এবং দেবমন্দিরে মেয়েদের কৃত্যগুলি সম্পন্ন করেন এবং করান, তিনি এগিয়ে এসে বললেন—এত দিন পর কি দেখতে এলে মা? একদিন-আধদিন নয়, সাড়ে

বারো বছর পার হয়ে গেল, লোকে জানে, আমরা জানি, তুমি জলে ডুবে মরেছ, সেই তুমি ফিরে এলে আজ কি মনে করে বল দিকি ? সম্পত্তি ? বলি ও আচার্য।

আচার্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন কথা শুনে, নিজের নাম শুনে সচেতন হয়ে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—চুপ করুন আপনি ! জিভ আপনার খসে যাবে। কাকে কি বলছেন ? জানেন সারা কাশীধাম ওঁকে বলে সতীমাঈ ! পথে চলে যান, লোকে পথের ধুলো কুড়িয়ে নেয় ! ছেদী —ছেদী কই ? ছেদী !

ছেদী অনেকক্ষণ এসে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল লাঠিতে ভর দিয়ে, সে বললে—হুজুর ! হমি আপনা আঁখ সে দেখিয়েছি হুজুর, দেওতা, মাঈজী হামার দেওতা আছেন ! হুজুর, হামার বাবুজী মাঈজীর পতা করতে কাশী পাঠাইয়েছিলেন। উনকে চিট্টি হামি হামারা হুজুরকে উ রোজ হাতে দিলম, বিলকুল সব বললম। বাবুজীর আঁখ সে আঁশু নিকাল গৈলি হল !

ভবানী দেবী মৃদুস্বরে বললেন—ছেদী ! চুপ কর তুমি। খুড়োমশায় আপনি বলুন, আমাকে পথ দিতে। আমি ভিতরে যাব।

তারপর তিনি মাসীমাকে বললেন—অপরাধ আমার হয়েছে মাসী। কিন্তু উনি আমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন। তিনি আমাকে আসতে লিখেছেন। তাঁর হুকুমেই আমি এসেছি।

আচার্যের দিকে একখানা চিঠি তুলে ধরে বললেন—এই পড়ে শোনান, ওঁরা যদি শুনতে চান। উনি কমলাকান্তকে লিখেছিলেন। তার মধ্যেই আছে! শেষখানার শেষছত্রটা পড়ুন।

আচার্য পড়লেন—"তুমি তোমার ভালো-মাকে বল, আমি তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।"

পড়া শেষ হওয়ামাত্র ভবানী দেবী চলে গেলেন রাজরাজেশ্বর মন্দিরে, সেখানে প্রণাম করে এসে অন্দরের মুখে দাঁড়ালেন, বললেন—আমাকে পথ দিন। বললেন মাসীমাকে, কিন্তু সকলে দু পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিলেন।

পরিচারক আবার শাঁখ বাজালে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে কেউ একজন হুলুধ্বনি দিয়ে উঠেছিল, একজন শুরু করতেই সব মেয়েরাই দিয়েছিল। উলু-উলু শব্দে নাটমন্দির হেসে উঠল যেন।

একজন কেউ বলেছিল—করছ কি ? সবাই কি থ হয়ে গেল নাকি। জলধারা দিয়ে নিয়ে যাও, জলধারা দাও।

আচার্য বলেছিলেন—ওহে পরিচারক, করছ কি ? এস আমার সঙ্গে এস। তিনি ভবানীকে থামতে বলেন নি, তাতে পিছু-ডাকা হবে ; একটু ত্বরিতপদে তাঁকে পাশ কাটিয়ে আগে এসে বলেছিল—আমি আগে যাই মা। মহেশবাবু, আপনি আসুন।

সিঁড়ি পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়ে আচার্য বলেছিলেন—তাঁর দেওয়ানী ভঙ্গীতে—আর নয়। এখান থেকে সব ফিরতে হবে। কেউ না। বরকন্দাজ কোথায় ? মহাবীর ! সিঁড়ির মুখে খাড়া থাক। কেউ না উপরে যায়। একটি শব্দ না হয়। হাঁ ?

—হাঁ হুজুর

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, এ সমস্ত বিবরণ আছে রত্নেশ্বর রায়ের প্রথম ডায়রীখানায়, যে খানার এক পিঠে আছে দৈনন্দিন দিনলিপি, ওই পোষ্যপুত্র হিসেবে বাপ-মায়ের কোলে ফিরে আসার দিন থেকে, আর আর এক পিঠে আছে তাঁর বিগত জীবনের বিবরণ। তারই মধ্যে এই দিনটির সমস্ত ঘটনা তিনি বিশদভাবে লিখেছেন। শুনে লিখেছেন অবশ্য। কারণ তিনি তখনও শ্যামনগরে পিঠের পোড়া ঘা নিয়ে শুয়ে। এবং তখনও তিনি তাঁর আত্মপরিচয় জানেন না।

তাঁর পুড়ে জখম হওয়ার কথা কীর্তিহাটের বরকন্দাজ ফিরে এসে বলেছিল বীরেশ্বর রায়কে, ওদিকে স্ত্রী-পুত্রহারা আহত ঠাকুরদাস কমলাকান্তের ভালো-মাকে খবর দিতে ভুলে যায় নি। শ্যামনগর তখন পুড়ে গেছে। প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, কিন্তু তারই মধ্যে তাদের ধর্মঘটের ঘট মাটির ঘট থেকে পাথরের ঘট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, রাধানগরের কায়স্থদের মধ্যে এই ঘটনায় দে-সরকারদের জ্ঞাতিদের নেতৃত্বে দু ভাগ হয়ে গেছে। যারা এতকাল জ্ঞাতি, স্বজাতি এবং স্বগ্রামবাসী বলে মুখে চুপ করেছিল, তারাও সদলে এসে শ্যামনগরে এসে ব্রাহ্মণ মাতব্বরদের কাছে বলে গেছে যে, তাঁদের সঙ্গেই তারা রইল, আজ থেকে দে-সরকার জ্ঞাতি, স্বজাতি হয়েও আমাদের শত্রু! ঘরে শিকল দিয়ে আগুন লাগিয়ে ব্রহ্মহত্যা! হে ভগবান! ওই ম্লেচ্ছ কুঠিয়ালের সংসর্গে এসে পিশাচ হয়ে গেছে লোকটা!

শুধু রাধানগর নয়, এই খবরটা এমন একটা চেহারা নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়েছিল যে, আট-দশখানা গ্রামের মানুষ এসে বলে গিয়েছিল, আমরাও আছি। এসব গ্রামের দু-তিনখানায় জন রবিনসনের নীল অভিযান চলেছিল। বাকী গ্রাম এসেছিল প্রাণের দরদ, দুঃখে।

শ্যামনগর পুড়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্য একটা বাহুবলের সৃষ্টি হয়েছিল। ঠাকুরদাস পাল, বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা ভটচাজমশায়কে ডেকে বলেছিল, একটি কাজ করতে হবে বাবাঠাকুর; কমলা-কান্তদাদার ভালো-মায়ের কাছে আমি যে তিন সত্যি করেছি, ওর অসুক-বিসুক, বিপদ কিছু হলেই আমি তাকে খবর দোব। তা তেনাকে যে একটা খবর দিতে হয়। উনি কাশীর সতীমা, কাশীতে লোকে বলে দেবতা। আমার মহা অপরাধ হবে!

—কোথায় খবর দেব? উনি কোথায় আছেন?

—সে আমাকে বলে গিয়েছেন বাবাঠাকুর। আমাদের জানা থানেই আছেন। আমাদের ঠাকুর মিয়াদের হজরতপুর-গুলমহম্মদ শরীফের ঈশেন কোণে পাগলী কালীমায়ের থান আছে, তিনি সেখানে আছেন। কাশী থেকে স্বপনাদেশ পেয়ে এসেছেন, স্বপন হয়েছে নাকি ওইখেনেই তেনার কি বেরতো আছে, শেষ হবে। বলে গেছেন, বাবাঠাকুর, মিয়াসাহেবের কাছে গেলেই তিনি লোক দিয়ে আমার কাছে পৌঁছে দেবেন। রাজরোষের উপর দেবরোষ হলে সব্বনাশ হবে বাবাঠাকুর। আমার নরক হবে।

বৃদ্ধ ভটচাজ বলেছিলেন—আজ লোক পাঠাচ্ছি, ভাবিস নে তুই। ওরে আমরাও যে ভাবছি। এ করলাম কি? বিমলাকান্তের একমাত্র পুত্র রে; রূপে কার্তিক, গুণে বৃহস্পতি। তার এ দশা তো আমাদের জন্যে। নইলে সে কীর্তিহাটের জমিদার, বিমলাকান্তের সঙ্গে সাহেবের আলাপ, সে তো তার জমি ছেড়েই দিতে চেয়েছিল। আমাদের জন্যেই মিটমাট করে

নি। ঝগড়া করেছে সাহেবের সঙ্গে। আমরাও যে মাথায় মাথায় ভাবছি—বিমলাকান্তকে এ সংবাদ দেব কি করে ?

তারপর হঠাৎ বলেছিলেন—ওরে তুই যা বলছিস তাতে ওই সতীমাটি দেবতাই বটেন রে। নইলে এই যোগাযোগ হয় ? যোগাযোগটা তো তিনিই করে দিলেন। শুনেছি, বুড়ো ঠাকুর মিয়া আজও বেঁচে আছেন। বয়ঃক্রম পঁচাশী, হয়তো বেঁচে আছেন এই আজকের জন্যে। তিনি কিরিঙ্গী কোম্পানীকে খাজনা দিতে হবে বলে যুগলপুরের মত লাট ইস্তবা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। যাবার দিন আমরা বামুনরা সর্বরক্ষেতলায় পুজো দিয়েছিলাম ঢাক বাজিয়ে। ঠাকুর মিয়া কানে আঙুল দিয়ে নৌকায় চেপে চলে গিয়েছেন। তাঁর কাছেও একখানা পত্র দেব রে, বলব হজরতের বংশ আপনারা ঠাকুরসাহেব, আপনারা এককালে সিদ্ধযোগী ছিলেন। তা আপনাদের কাছে অপরাধের ফল ফলেছে। আমরা আপনাদের নজরানা, সেলাম আপনাকে জানালাম। আমাদের ক্ষমা করবেন !

সুলতা, এইখানটা পড়ে আমার ভারী ভাল লেগেছিল। হয়ত এটা সেকালের কুসংস্কার, অজ্ঞতা, যা বলবে সবই। তবু ভাল লেগেছিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটু হাসলে সুরেশ্বর।

সুলতার মুখেও একটি করুণ হাসি ফুটে উঠল।

সুরেশ্বর বললে—যাক। সেইদিনই লোক চলে গিয়েছিল ছোট একখানা ছিপ নিয়ে। ভাটির মুখে যাওয়া। বোধহয় এক দিনেই পৌঁছেছিল। ভালো-মা ফিরেছিলেন, তিনদিনের দিন। একখানা লম্বা বোল দাঁড়ের ছিপে এসে পৌঁছেছিলেন ; দাঁড়িদের সবাই ছিল গোয়ান। ছিপখানা ঠাকুর মিয়ার নিজের ছিপ।

সুলতা প্রশ্ন করলে—ঠাকুরসাহেব কিছু লেখেন নি ?

—না ! তবে নাকি ভালো-মাকে বলে দিয়েছিলেন, মা, তুমি ভটচাজদের বলিয়ো, কবরের মুখে পা বাড়াইছি। দিল্লীর বাদশাহের শাজাদাদের ফিরিঙ্গীরা শুনেছি নাকি শড়কের উপর ফটকে ফাঁসি লটকাইয়া রেখে দিছে ; কবর দিতে দেয় নাই তিনদিন। এই রসুলপুরের মোহনা দিয়া বাদশাহকে জাহাজে করে রেঙ্গুন পাঠাইয়া আটক রাখছে। শুনে কেঁদেছি। আল্লাতলা আর রসুলে আল্লা পয়গম্বরের কাছে কইছি—খতম কর জিন্দিগী, পার কর ; কবরে ফরমান পাঠাও। তা আজ ভটচাজের চিঠিখানা পেয়ে মনে হচ্ছে—এই, এই চিঠ্যি দরখাস্ত পাবার তরেই আল্লা আমারে জীবিত রাখছিলেন। বলিয়ো, দিল সাফা করে ছিয়ে খোসলে আমি সব মাফ করে গেলাম।

আর একশো টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন নতুন ঘর করবার জন্যে।

ভবানী দেবী যখন দুদিন পর এসে পৌঁছেছিলেন, তখন কমলাকান্তের ফাঁড়া কেটেছে, ফোস্কাগুলো কিছু বসেছে, কিছু ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; পোড়া ঘায়ের চিকিৎসা করছে বিষ্ণুপুরের ভাণ্ডারীরা। তখন এদেশে নানান চিকিৎসা ছিল; এ্যালোপাথি তখনও কলকাতা এবং বড় বড় শহর ছাড়া বড়-একটা হয় নি। বৈদ্য ছিলেন বড় বড়। বিচক্ষণ বৈদ্য। তা ছাড়া ছিল নানান স্বপ্নাদ্য ওষুধ। যার পরমায়ু আজও ফুরোয় নি। পেনিসিলিন উঠেছে। ১৯৫৩ সালে

অনেকটা সুলভও হয়েছে, তবু চাঁদসীর, মা মনসার স্বপ্নাদ্য চিকিৎসা বেঁচে আছে। পাঁজির পাতা ওল্টালে আরও অনেক এমন চিকিৎসার বিজ্ঞাপন পাবে। বিষয়পুরের ভাণ্ডারীরা জাতে নাপিত, তাদের কুলধর্ম ক্ষৌরি তারা করত না। ঘা ফোড়ের চিকিৎসা করত। তাদের ওষুধ নাকি অব্যর্থ ওষুধ ছিল। সেই চিকিৎসা চলছে। কমলাকান্ত তিনদিনেই ফাঁড়া কাটিয়েছেন, ঠাকুরদাসের পোড়া তাঁর থেকে বেশী। সে তখনও খুব কাতর!

বীরেশ্বর রায়ের প্রথম চিঠিখানা পুড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় চিঠিখানা ভালো-মা পেয়েছিলেন। সেখানা এসেছিল শ্যামনগর যে রাত্রিতে পোড়ে তার পরদিন। চিঠিখানা পড়ে চমকে উঠেছিলেন তিনি। চিঠিখানা পড়েছি, তোমার মনে আছে, কমলাকান্তের সেই বজ্রের মত পত্রখানা পেয়ে এবং আচার্যের চিঠিতে গোপাল সিংয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগের সংবাদ জেনে তিনি লিখেছিলেন, "তোমার স্পর্ধিত পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম এবং শঙ্কিত হইলাম যে, এবম্বিধ পত্রের জন্য তোমার নরকেও স্থান হইবে না!

চমকে উঠে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ওরে, তুই তাঁকে কি লিখেছিলি রে? কমলাকান্ত? কি লিখেছিলি তাঁকে?

রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন, "প্রথমে নির্বাক রহিলাম। ভালো-মা সব পত্রখানি পাঠ করিলেন। মধ্যে মধ্যে অংশ বিশেষ পড়িয়া উচ্চ কণ্ঠেই তাহা বলিতেছিলেন, 'তোমার সহিত পত্রালাপ করিয়া আমার মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা হইতেছে।' এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছিলেন—'ওরে, তুই কি এমন কথা লিখিয়াছিস রে?' আমি নিরুত্তরই ছিলাম। আবার পড়িলেন "তোমার ভালো-মাকে বলিবে আমি ব্যাকুল হইয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

তিনি পরিশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কমলাকান্ত! কি লিখিয়াছিস বল?"

সে কণ্ঠস্বর শুনে কমলাকান্ত—রত্নেশ্বর রায় চমকে উঠেছিলেন। লিখেছেন—"বজ্রের মত কঠোর। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, আমি ভস্ম হইয়া যাইব।"

রত্নেশ্বর বলেছিলেন সব। ভয় পেয়েই বলেছিলেন। ভালো-মা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসেছিলেন। এরই ঘণ্টা দুয়েক পর কীর্তিহাটের সওয়ার এসেছিল গিরীন্দ্র আচার্যের পত্র নিয়ে। বীরেশ্বরের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা! কমলাকান্তের পুড়ে যাওয়ার সংবাদ শুনে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন!

তখনও গোয়ানদের ছিপ ঘাটে বাঁধা ছিল।

সেই ছিপেই তিনি রওনা হয়ে চলে এসেছেন কীর্তিহাট।

রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতেই আছে—ভালো-মা, আমার গর্ভধারিণী, সতীশিরোমণি শ্রীমতী ভবানী দেবী ইষ্টদেবীকে এবং সৌভাগ্যশিলা রাজরাজেশ্বরকে প্রণাম করে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পদতলে উপবেশ করিলেন পুরানের সাবিত্রীর মত!

সেইদিনই শেষরাত্রে পিতা বীরেশ্বর রায়ের জ্ঞান হইল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের শেষ। স্বামীর শিয়রে বসিয়াছিলেন মাতৃদেবী। ভৃত্যেরা তালবৃন্ত দিয়া ব্যজন করিতেছিল। গৃহের মধ্যে চিকিৎসক বসিয়া ঢুলিতেছিল। বাহিরে দেওয়ান, কবিরাজ প্রভৃতি নিদ্রিত হইয়াছে। আমার মাতারও কখন চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি

কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন—তুমি কে? তুমি—!

দেখিলেন নির্নিমেষ নেত্রে স্বামী তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন।

তিনি করুণ হাস্যসহকারে বলিলেন—আমি আসিয়াছি। আমি তোমার ভবানী!

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় এরপরই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রত্নেশ্বর?

—ভালো আছে। কিন্তু এখনও ঘা শুকোয় নি! ভাল হলেই আসবে!

—না। কালই আমাকে কলকাতা নিয়ে চল। পথে তাকে তুলে নেব। কলকাতায় চল। পাগলাবাবাকে বের করতে হবে। তিনিই তিনি। আমি চিনতে পারিনি। আমি কলকাতায় যেতে চাই। তাছাড়া আমাকে ভাল হতে হবে।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে সমস্ত বিশদভাবে লিখেছেন এবং তারপর শপথ করে লিখেছেন—আমার সতীসাবিত্রীর মত জননীকে যাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা লিখিয়া রাখিলাম। যাহারা কটু বলিয়াছে তাহাদিগকে আমি ক্ষমা করিব না। কখনও না। তাহা হইলে অনন্ত নরক হইবে আমার। পিতার ওই মাসীটিকে কয়েক দিনের মধ্যেই মাসোহারা দিয়া কাশী পাঠাইব। এখানে রায়বাড়ীর অন্দরে 'কর্তামা' সাজিয়া বিচরণের শেষ করিব।

তার জমিদারী গ্রহণ করিলাম, এখন আমার প্রধান কর্ম গোপাল সিংহের দমন! সে আমার এই জননীকে কুৎসিত বাক্য বলিয়াছে। এক চপেটাঘাতে সে দমিত হয় নাই। সে আমাকে পুড়াইয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছে, গোপাল সিংহ ধ্বংস যজ্ঞের সকল সমিধ প্রস্তুত। এবার অগ্নি প্রজ্বলিত করিব।

"প্রথমেই পিতৃদেব আমার পৃষ্ঠদেশের ক্ষত দেখিতে চাহিলেন।" রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে আছে। ব্রাকেটে লেখা আছে—তখনও তাঁহাকে মাতুল বলিয়াই জানিতাম।

রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে আছে—আর তিনদিন পর কীর্তিহাট থেকে বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীকে নিয়ে বজরায় কলকাতা রওনা হয়েছিলেন। সঙ্গে লোকজন, ডাক্তার-বৈদ্য, সেবক-কর্মচারীর কথা অনুমান করতে পার। বর্ণনা করব না। কিন্তু রত্নেশ্বর রায় তার বর্ণনা করেছেন। তিনি অজ্ঞাতবাস থেকে জয়ী হয়ে যৌবরাজ্যে আপন অধিকারে প্রথম পদার্পণ করলেন, রায়বাড়ীর খাস বজরায়, যার নাম ছিল 'কীর্তিহাট।' এ বজরা তৈরী করিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়, তখন কুড়ারাম রায়ের 'ললিতা' পুরনো হয়েছে। সে বজরা কমলাকান্ত জ্ঞান হয়ে প্রথম দেখলেন। তার বিশদ বর্ণনাই করেছেন।

কীর্তিহাট থেকে আসবার পথে হলদীর মোহনার কাছাকাছি গুলমহম্মদ শরীফ, হুজরতপুরে বজরা লাগিয়ে ভবানী দেবী নায়েব আচার্যকে পাঠিয়েছিলেন ঠাকুরসাহেবের কাছে, সঙ্গে গিয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। উপঢৌকনও পাঠিয়েছিলেন। কমলাকান্তের জন্য কলকাতা থেকে আসবাব আনিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়, তার মধ্য থেকে একখানা উৎকৃষ্ট গালিচা পাঠিয়েছিলেন। গালিচাখানা বড় নয়, একজনের আমীরী চালে বসবার মত। তার সঙ্গে তার উপযুক্ত মসলন্দ অর্থাৎ তাকিয়াও ছিল। আরও কিছু ছিল,—একটা হাতীর দাঁতের কাজকরা মেহগনি কাঠের বই রেখে পড়বার কাঠা, একটি রূপার সামাদান, কিছু আতর এবং একটি ছোট সোনার রেকাবিতে কিছু মেওয়া ফল।

আচার্য গিয়ে ঠাকুরসাহেবকে সেলাম করে সব সামনে নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—আমার মালিকের খুব অসুখ, মা তাঁর শিয়রে বসে আছেন, কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মা তাঁর ঠাকুরসাহেব বাপজীকে এইগুলি পাঠিয়েছেন।

ঠাকুরসাহেব অভিভূত হয়ে বলেছিলেন—বা রে নসীব বাঃ! খেল বটে তোর। কদিন আগে শ্যামনগরের বামুনরা চিঠির মারফত পাওনা বকেয়া সেলাম নজরানা মিটিয়ে দিয়েছে। আজকে কীর্তিহাটের রায়বাবু পাঠালে আমারে খেলাত। কিন্তু নিয়া করব কি?

মহেশচন্দ্র বলেছিলেন—ওই গালিচায় বসে নামাজ করবেন, ওতেই বসে এই তেকাঠার উপর কোরান শরীফ রেখে এই সামাদানে আলো জেলে পড়বেন। এই মেওয়া ফলক'টি আপনি খাবেন!

ঠাকুরসাহেব ভবানী দেবীর পরিচয় পেয়েছিলেন এই সেদিন, যেদিন ওই গোয়ানদের ছিপে শ্যামনগর থেকে কীর্তিহাট যান!

কয়েকটা লোক কয়েকটা নতুন কাপড়ের গাঁট এনে নামিয়ে দিয়েছিল, এখানকার লোকেদের জন্য পাঠিয়েছেন ভবানী দেবী।

ঠাকুরসাহেব তখন আশী পার হয়েছেন, তবু সমর্থ মানুষ ছিলেন। খুব সমর্থ লাঠি হাতে গ্রাম ঘুরতেন রোজ। তখনও পাখোয়াজ বাজাতেন, সূচে সুতো পরাতে পারতেন এবং তাঁর মত মিহি সেলাইয়ের কাজ নাকি ঠাকুরবাড়ীর বিবিসাহেবরাও করতে পারতেন না।

ঠাকুরসাহেব বলেছিলেন—চল, আমি যাই, বাপজানকে আমাদের সিদ্ধাই আছে, তার দোয়া দিয়া আসি!

হেঁটেই গিয়েছিলেন তিনি নদীর ঘাট পর্যন্ত। একটা ডুলি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল। বজরার কামরায় ঢুকেই তিনি বলেছিলেন—কুছ ডর নাই বাপজান! আমার ফকীরির ইমান আর পিতিপুরুষের সিদ্ধাইয়ের যদি কিম্মত থাকে তবে তুমি এই নদীর বাতাসেই ভাল হয়ে উঠবা। আর এই আমার মা জননী, ইনি সতী, ইনি দেবতা বাবা। ইন্নার তপস্যা সি কখুনও বরবাদ হয় না। সাবিত্রির কথা জানি বাবাজান, আমি পড়েছি, জানি। বাবা জান, যিবার খরা খুব কড়া হয়, সূয্যির তেজে যিবার দুনিয়া ফাটে, সিবার বর্ষা নামে তুফানে। তুমাদের বারো বছরের ছাড়াছাড়ি, মার এমুন তপস্যা, মিল হবার সময় এমন তুফান না হলে হয় বাবা!

আশীর্বাদ করে চলে এসেছিলেন। বীরেশ্বর রায়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু মন্ত্রতন্ত্রও পড়ে দিয়েছিলেন। ভবানী দেবী তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। বৃদ্ধ চোখের জল ফেলে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে আবার ঘুরে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—একটা বাত বলবঁ বাবা?

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বলুন। হুকুম করুন।

—হুকুম রাখবে বাবা?

—সাধ্য ভোর কসুর করব না!

ভিতরে ঢুকে বলেছিলেন—নফরেরা বাইরে যা তো বাবা। আর কামরার দরজাটা বন্ধ

করি দিল।

তারপর বলেছিলেন—তামাম শ্যামনগর পুড়ায়ে দিলে ওই বেটা ফিরিঙ্গী। তোমার ভায়াকে ঘরে শিকল দিয়া পুড়ায়ে মারবার চেষ্টা করলে! তুমি তার শোধ লিবে না? পারবে না।

আশ্চর্য ঠাকুরসাহেব, শান্ত ফকীরের মত মানুষ, চোখ দুটো তাঁর ধক-ধক করে জ্বলে উঠেছিল। বলেছিলেন—কলিজায় আমার বড়া লেগেছে বাবা। লাট যুগলপুর আমাদের সিদ্ধাইয়ের বকশিস, জাতের দাম। বাবা, ফিরিঙ্গীকে এনে ঠাকুরদের চোট্টা নফর আজ পুড়ায়ে দিলে। আমি কিছু করতে পারলাম না। তুমি পারবে না শোধ লিতে?

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—তাঁর চোখ দুটোও জ্বলে উঠেছিল—মনে এ আমার ছিল, তার উপর আপনি ফরমায়েস করলেন, তামিল জরুর হবে!

—সাবাস সাবাস! দিল আমার খুস করে দিলে!

তিনি চলে গিয়েছিলেন।

শ্যামনগরের ঘাটে বজরা এসে লেগেছিল। তার আগেই ছিপ এসেছিল খবর নিয়ে। স্বয়ং ভবানী দেবী পত্র লিখে কমলাকান্তকে আদেশ করেছিলেন প্রস্তুত থাকতে। কঠোর নির্দেশ ছিল তাঁর। লিখেছিলেন—"আদেশ অমান্য করিলে তুমি মাতৃহত্যার পাতকী হইবে। পিতৃহত্যার পাতক অর্শিলেও আশ্চর্যের হইবে না। দাদা বিমলাকান্ত তোমার মুখদর্শন করিবেন না!"

কমলাকান্ত বীরেশ্বর রায়ের অসুখের সংবাদে এবং শ্যামনগরের এই দুর্ঘটনায় নিজেও অনুতপ্ত এবং হয়তো নিঃসহায় বোধ করছিলেন। তিনি আদেশ অমান্য করেন নি। শ্যামনগরের ঘাটে আসেন নি; লোক রেখেছিলেন। এবং নিজে বাড়ীতে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ঘাটে এসে জুটেছিল গোটা শ্যামনগর। বীরেশ্বর রায় এ সারা অঞ্চলে তখন গল্পের মানুষ। বজরা, ভাউলে নৌকো, ছিপ নিয়ে সে একটি ছোটখাট নৌবহর ঘাটে যখন লেগেছিল, তখন এ অঞ্চলের মানুষের বিস্ময়ের সীমা ছিল না!

গিরীন্দ্র আচার্য ঘাটে নেমে গ্রামের প্রধানদের নিয়ে কমলাকান্তকে আনতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে লোক-লস্কর নিয়েই গিয়েছিলেন। কমলাকান্ত জ্ঞাতি ভট্টাচার্যদের বাড়ীতে ছিলেন, সেদিন তখন প্রস্তুত হয়ে তাঁদের পাকা দেবমন্দিরের বারান্দায় বসে ছিলেন।

ডুলি আনানো ছিল। দুখানা ডুলি।

কমলাকান্ত ঠাকুরদাস পালকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ঠাকুরদাস দাদা কিন্তু আমার সঙ্গে যাবে!

আচার্য হেসে বলেছিলেন—বেশ তো বাবুজী; শুধু ঠাকুরদাস কেন গো, শ্যামনগরের দশ-বিশজন-পঞ্চাশজন যত জন খুশি নিয়ে চল না! তোমার হুকুম! অমান্যি করে কার সাধ্যি।

সমবেত লোকজনেরা দুঃখের মধ্যেও হেসে উঠেছিলেন! কমলাকান্ত একটু লজ্জা পেয়েছিলেন। ডায়রীতে লিখেছেন—"দেওয়ানজীর এবম্প্রকার উক্তিতে আমি গৌরব এবং

লজ্জা উভয়ই অনুভব করিলাম।

দেওয়ান আচার্য কমলাকান্তকে নিয়ে রওনা হবার সময় কীর্তিহাটের বিচক্ষণ কর্মচারী বলু ঘোষ এবং দুজন পাইককে রেখে এসেছিলেন ; বিমলাকান্তের পোড়া বাড়ীর চাল বর্ষা চালানোর মত মেরামতের জন্য। এবং ঠাকুরদাস পালের বাড়ীর মাথা ভেঙে নতুন দেওয়াল চড়িয়ে মজবুত করে তৈরীর জন্য। বর্ষার পর ইট পাড়িয়ে বিমলাকান্তের বাড়ী পাকা হবে। সুতরাং কোন রকমে বর্ষা কাটানোর মত করে রাখা হবে। ক্রোশ দুয়েক দূরে কুতুবপুরের কাছারী, কীর্তিহাটের এলাকা, সেখানকার কাছারীর সমস্ত সাহায্য এখানে আসবে। আর প্রধানদের ডেকে শ্যামনগরের লোকেদের বাড়ীঘর মেরামতের জন্য দু হাজার টাকা দিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন—এ হ'ল কমলাকান্তবাবুর প্রণামী। বলতে গেলে এক রকম আগুনটা তাঁর ফুঁয়েই জলে উঠেছে! টাকা কর্মচারীর কাছে রইল। তাঁরা যাকে যা দিতে বলবেন, বলু অর্থাৎ বলরাম ঘোষ তাকে তাই দেবে। এছাড়া কাঠ তাঁরা কুতুবপুর জঙ্গল থেকে পাবেন।

রত্নেশ্বর লিখেছেন—ইহাতে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। অনুভব করিলাম—হ্যাঁ। আমি জমিদার।

আচার্য আর একটি কথা বলেছিলেন, কমলাকান্তকে—বাবুজী, সকলের কাছে বলুন, আপনার বাড়ীর বিগ্রহকে সাক্ষী করে বলুন—এই নিগ্রহের প্রতিকার না করে শ্যামনগরে আর ঢুকবেন না। লাট যুগলপুর আপনার এই গৃহদেবতার নামে কিনে, সেবায়েৎ হয়ে এ গ্রামে ঢুকবেন। আপনি ব্যাঘ্রশাবক, শৃগালের অত্যাচার নিবারণ করা আপনার ধর্ম। ইজ্জৎ।

একাল হলে রত্নেশ্বর রায় তা পারতেন না। কিন্তু সেকালে তিনি তা পেরেছিলেন। ডায়রীর পাতায় মোটা মোটা করে লিখেছেন কথাগুলি।

তারপর লিখেছেন—ওই কথা।

ডুলিতে চড়িয়া ঘাটে আসিলাম। শ্যামনগরের সমস্ত লোক আসিয়া আমাকে বিদায় দিল। আমি বিজয়ীর মত আসিয়া বজরায় আরোহণ করিলাম। ওই প্রতিজ্ঞা করিয়া মনের সকল গ্লানি আমার মুছিয়া গিয়াছিল। বজরায় উঠিতেছি এমন সময় পিছন হইতে ঠাকুরদাস দাদা বলিল—দাদাঠাকুর, শালা সাহেব! ঘোড়ায় চড়িয়া ওই দেখ, অনেকটা দূর হইতে দেখিতেছে। দেখিলাম—তাহার কথা সত্য, অনেকটা দূরে জন রবিনসন ঘোড়ায় চড়িয়া দেখিতেছে! পিঠে কাঁধের উপর বন্দুকের নলটা উঁচু হইয়া আছে। আমি গ্রাহ্য করিলাম না। বজরায় আরোহণ করিলাম। মাতাঠাকুরাণী বজরার কামরার দরজার মুখে পর্দা সরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই তিনি আমাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—না। আগে আমাকে নহে, আগে তাঁহাকে। আর! সুসজ্জিত কামরার অভ্যন্তরে বিছানার উপর মোটা তাকিয়া হেলান দিয়া তিনি দরজার দিকেই তাকাইয়া ছিলেন। বুঝিলাম, আমারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন! তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই আমার দৃষ্টি আনত হইল। গভীর লজ্জা এবং অনুশোচনা অনুভূত হইল! শালপ্রাংশু মহাভুজ রাজসদৃশ আকৃতি, তাহার আয়ত চক্ষুর্দ্বয়ের দীপ্ত দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমি অগ্রসর হইয়া চরণে প্রণত: হইতে উদ্যত হইতেই তিনি আদেশ করিলেন—অগ্রে তোমার পৃষ্ঠের ক্ষতস্থান

দেখাও! দেখি!

—না, আগে প্রণাম করুক।

—প্রণাম! তাই হোক। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী! তাই কর, তোমার ভালো-মায়ের আদেশই শিরোধার্য কর!

প্রণাম করে উঠে এবার অপরাধীর মত হেসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর রায়, প্রস্তর মনুষ্য, লোকে বলত পাথরে গড়া মানুষ। সে কি দেহে, কি মনে! সেই মানুষের চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসেছিল!

রত্নেশ্বর রায় কিন্তু সেদিনও স্পর্শ করতে পারেন নি অন্তর্নিহিত এই পাথর ফাটানো ভোগবতী উৎসটিকে।

সুরেশ্বর বললে—তিনি মানে রত্নেশ্বর রায় খুব বিস্ময় বোধ করেছিলেন, কলকাতার ঘাটে পালকিতে চড়েই বীরেশ্বর রায় ওখানকার প্রধান কর্মচারী ঘোষকে ডেকে প্রথম যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সেই কথা শুনে।

ভবানী দেবীর সামনেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সোফিয়ার ওখানে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ হুজুর!

—খোঁজ পেয়েছ?

—না, হুজুর। তিনি ওখানে নেই। চলে গিয়েছেন!

—কোথায় গিয়েছেন?

—তা ওরা জানে না বললে।

—কে বললে? সোফিয়া নিজে?

—না হুজুর, বাঈ এখন কারু সঙ্গে দেখা বড় করে না। অনেক কষ্টে ওর মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই বললে। বললে—তিনি চলে গিয়েছেন, তারা কোন পত্তা জানে না!

ভবানী দেবী শুনছিলেন। পাশে রত্নেশ্বর রায়ও দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠছিলেন এবং ভাবছিলেন—তিনি ভুল করেছেন এসে!

"আমি তখন ভাবিয়াছিলাম—আমি মহাভ্রম করিয়াছি; পবিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষ ভাবিয়া কণ্টকময় শিংশপা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াছি। আর ধিক্কার দিয়াছিলাম ভালো-মাকে। মনে পড়িয়াছিল পুরানের গল্প, এক সতী তদীয়া মহালম্পট কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীর আদেশে তিনি ওই পাপাচারী স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া বেশ্যালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন। দারুণ অন্ধকারের মধ্যে পথিপার্শ্বে ধ্যানমগ্ন এক ঋষির অঙ্গে উক্ত পাপাচারীর পা ঠেকিবামাত্র পাপস্পর্শে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয়। তিনি তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে, সূর্যোদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে, রে মহাপাপী, তোর মৃত্যু ঘটিবে। সতীশিরোমণি নাকি সদর্পে বলিয়াছিলেন—অন্ধকারে অজ্ঞানতাবশতঃ সঙ্ঘটিত এই অপরাধের জন্য তুমি আমার স্বামীকে অভিশাপ প্রদান করিলে। আমি তোমাকে প্রত্যাভিশাপ দিব না। তবে ইহাও বলিব যে, যদি আমি সতী হই, তবে এই রজনীরও আর কখনও অবসান হইবে না। সূর্য উদিত হইবে না। শেষে অবশ্য দেবগণের মধ্যস্থতায় সর্পও মরে নাই, যষ্টিও

ভগ্ন হয় নাই, সতী এবং ব্রাহ্মণ উভয়ের মহিমাই রক্ষিত হইয়াছিল; দিব্যদেহ ধারণ করিয়া দিব্যরথে আরোহণপূর্বক সতী তাঁহার স্বামীকে লইয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণের বাক্য রক্ষিত হইয়া রজনীশেষে সূর্য উদিত হইয়াছিল, সৃষ্টিও রক্ষা পাইয়াছিল। এই প্রকারের সতীত্ব-মহিমা-কীর্তন যাহারা করিয়াছেন, তাঁহারাই এদেশের সর্বনাশ করিয়াছেন! ভালো-মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমিয়া গেল। এবং যখন তিনি নিজে প্রশ্ন করিলেন, তখন আমার অশ্রদ্ধা জন্মিল।

ভবানী দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন বীরেশ্বর রায়কে—আমি চিঠি লিখে সোফি বাঈকে ডেকে পাঠাব? হয় তো আমি ডেকে পাঠালে আসবে, আর বলবেও!

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তুমি চিঠি লিখবে?

—হ্যাঁ। তুমি লিখলে ভয়ে না আসতে পারে। আমি লিখলে আসবে। অন্ততঃ আমার ভরসা পাবে সে। লিখব তোমার অসুখ খুব।

একটু ভেবে বীরেশ্বর বলেছিলেন—দেখ!

বাড়ী এসে ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থার মধ্যেও এ কথাটা ওঁদের দুজনের একজনও ভোলেন নি। চিকিৎসক এসেছিলেন দুজন, একজন বড়-সাহেব ডাক্তার এবং একজন বড় কবিরাজ। অসুখের উপশম বারো আনাই হয়ে গিয়েছিল; চার আনা অবশিষ্ট ছিল। মাথার যন্ত্রণা ছিল না কিন্তু বাঁ হাত এবং বাঁ পা অবশ হয়ে গিয়েছিল, সেটা তেমনিই আছে। ডাক্তার বলেছিলেন—প্যারালিসিস। কবিরাজও তাই বলেছিলেন।

ডাক্তারী মতেই ওষুধের ব্যবস্থা হল। পূর্ণ বিশ্রামের কথা দুজনেই বলে গেলেন। সুরা, মাংস ইত্যাদি বন্ধ! আর ব্যবস্থা হ'ল মালিশের। সে মালিশের তেল দিয়েছিলেন কবিরাজমশাই।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা বসে ভবানী দেবী পত্র লিখেছিলেন সোফিয়া বাঈকে। লিখেছিলেন—"রায়বাবুর খুব অসুখ। বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে আমি নিজে পত্র লিখছি, তুমি আমার সঙ্গে একবার দেখা কর।"

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—দাঁড়াও আগে খোঁজ করি।

—খোঁজ?

—হাঁ। খোঁজ। জানি, সোফি এখন অন্য কার কাছে রয়েছে। এরা তো—। হেসেছিলেন। হাসিতেই বাকী অংশটা বলা হয়ে গিয়েছিল। ঘোষকে ডাকতে বল। জলধর, ঘোষকে ডাক।

ঘোষ এসে মাথা চুলকে বলেছিল—বাঈ এখন কোন বড়লোক বা আমীরের বাঁধা নেই। মানে—। অন্তরকম হয়ে গেছেন। ওই কাজ করে না। তবে গান-বাজনার বায়না হলে যায়। তাও নাচে-টাচে না। বৈঠকী গায়! সেও খুব বড় আসরে। নাহ'লে বাড়ীতে থাকে, কি সব জপতপ করে। ওই পাগলাবাবার পর থেকে আর এক রকম হয়ে গেছে।

—হুঁ! একটু চুপ করে থেকে বীরেশ্বর বলেছিলেন—আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দিয়ে আসতে বলেছিলাম। সেটা দেওয়া হয়েছিল? আমার এই একটা হয়েছে দেখছি—

কথাবার্তা সব ঠিক মনে পড়ছে না।

ঘোষ বলেছিল—হ্যাঁ নিয়েছিল। তবে বাঈ নিজে নয়—বাঈসাহেবার মা নিয়েছিল।

রত্নেশ্বরে ঘৃণা জন্মাছিল। শুধু বীরেশ্বর রায়ের উপরেই নয়, ভালো-মার উপরেও চিত্ত তার বিমুখ হয়েছিল। বাঙালীর ছেলে, ইংরিজী শিখেছেন, সে কালের আধুনিক; রামমোহন রায়ের বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের হাওয়ায় নিশ্বাস নেন, তাঁর সহ্য হয় নি এই ধরনের লজ্জাহীন ব্যবহার। বাড়ীতে মহেশচন্দ্র রয়েছেন, মহেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্য ছিল; তার সঙ্গে মতে তাঁর মিলত, তাঁর কাছে গিয়ে বলেও তিনি খুশী হন নি। তিনি বলছিলেন—এ নিয়ে কোন ঔৎসুক্যপ্রকাশ তোমার উচিত হবে না ভাই।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—আপনি ভালো-মাকে বারণ করুন:

—না। সে অধিকার আমার নাই।

রত্নেশ্বর ডায়রীতে লিখেছেন—"অতঃপর আমি এই বাড়ীতে থাকিয়াও তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করাই স্থির করিলাম। তাঁহারা যে দিকটায় ছিলেন সে দিকটা ত্যাগ করিয়া একেবারে পশ্চিমের অংশটায় বাসস্থান স্থির করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এও স্থির করিলাম মাতুল মহাশয় একটু সুস্থ হইলেই সমস্ত সম্পত্তি ইত্যাদি আমার অংশমত পৃথক করিয়া লইব। তিনি এক্ষণে একরূপ অক্ষম হইলেন, তাহাকে বলিব—তিনি তাঁহার অংশের মালিকানার পাওয়ার অব এ্যাটর্নী আমাকে প্রদান করুন। তাঁহার খরচপত্রাদি সমুদয় যথাবিধি আমি সরবরাহ করিব। এবং তাঁহার সন্তানাদি যদি অতঃপর হয় তবে তাহাদিগকে যথাসময়ে বুঝাইয়া দিব। এবং শর্ত করাইয়া লইব যে, উৎসব আনন্দ ব্যতিরেকে ভদ্রাসন বাটী মধ্যে কোনপ্রকার অনাচার করিতে কেহই পারিবেন না। প্রয়োজন হইলে এমতে একটি বাগানবাটী ক্রয় করা যাইতে পারে।

সেইরূপ ব্যবস্থাদি করিয়া লইয়া আমি একদা জানবাজার বাটীর সেরেস্তাখানায় আসিয়া বসিলাম। বলিলাম—আগামীকল্য হইতে আমি আসিয়া কাছারীতে বসিব। আমার বসিবার ঘর ও আসবাবাদির ব্যবস্থা করুন!

পিতা কাশী হইতে আসিবেন। তাহার পূর্বেই আমি শক্ত হইয়া বসিতে চাই। অন্যথায় পিতাকে আমার আশঙ্কা আছে। তিনি বলিবেন—বীরেশ্বর বর্তমানে কদাপি তাহা হইতে পারে না।

তিনি পিতা। কিন্তু তিনি ভুলিয়া যান যে সম্পত্তির মালিক তিনি নহেন, মালিক আমি। তিনি আমার বাল্যকালে আমার ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করিলে আমি বালককালে অনেক সুখে থাকিতে পারিতাম।

সুখছাড়াও আমার কর্তব্য আছে। ভগবান সে কর্তব্য অর্পণ করিয়াই এই রায়বংশের অর্ধেকের মালিক করিয়া আমাকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন! রায়বংশের মর্যাদা, ধর্ম, দেবতার তুষ্টিসাধন আমার অবশ্য কর্তব্য।"

পরদিন থেকে তাই হয়েছিল সুলতা।

কাছারীতে রত্নেশ্বরের বসবার ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল—বীরেশ্বর রায়ের ঘরে—তাঁরই আসন

তাঁর বসবার জন্ম নির্দিষ্ট হয়েছিল। পাশে তক্তাপোশের উপর বসেছিলেন গিরীন্দ্র আচার্য। বীরেশ্বর রায় তাঁকে যেতে দেন নি।

গিরীন্দ্র আচার্য তাঁকে সম্ভাষণ করে বলেছিলে—এস, ভায়া এস। বাবুজীর হুকুম হয়েছে এই ঘরে এই আসনে তুমি বসবে। কাগজপত্রে সই করবে। যা বুঝতে না পারবে তা আমাকে বলবে। আমি বুঝিয়ে দেব তোমাকে।

প্রথমদিনই আচার্য তাঁকে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের আনন্দময়ী দেবোত্তরের অর্পণনামা এবং সোমেশ্বর রায়ের ট্রাস্ট দলিল পড়তে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—এই দুখানা থেকেই কাঠা-মোটা বুঝতে পারবে। আর সম্পত্তির আয়ব্যয় বিলিব্যবস্থা সবই পাবে। পড়। কাল দেখাব, ওঁদের নিজের নগদ টাকা কারবারে হিসেবপত্র। মজুত টাকা, কত লগ্নী, তার সুদ। এবং তাই থেকে হাল পর্যন্ত কত সম্পত্তি আবার কেনা হয়েছে, তার বিবরণ তৈরীই আছে, তা দেখাব।

সম্পত্তি অনেক। তোমরা রাজাতুল্য ব্যক্তি! সরকারের কাছে একটু ধরাপাড়া করলেই খেতাব পাবে। কতবার বলেছি তোমার মাতুলকে, তা তিনি তো এতকাল একরকম পাগলই ছিলেন! এবার মামাকে বল তুমি। তুমি বললে না করিবে না। একটা খেতাব না-হলে মানাচ্ছে না!

বলতে বলতেই উঠে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন আচার্য। ঘরখানা থেকে কাছারীর বারান্দা দেখা যাচ্ছে, সেখানে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। একজনকে চিনতে পেরেছিলেন রত্নেশ্বর। সে পিক্রুস গোয়ান। জোসেফ পিক্রুস। ভালো-মাকে পৌঁছে দিতে এসেছিল শ্যামনগর।

আচার্য তাদের সঙ্গে একান্তে কথা বলে, তাদের বসিয়ে, উপরতলায় চলে গিয়েছিলেন। বুঝতে বাকী ছিল না যে, তিনি বীরেশ্বর রায়ের কাছে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত তার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এ কি কথা? তাকে এই কর্তার আসনে বসিয়ে রেখে আচার্য চলে গেলেন উপরে। তাকে কোন কথা বলা প্রয়োজন মনে করলেন না। তা হ'লে তো এ সঙ সাজা!

তিনি হরকরাকে বলেছিলেন—ডাক্ ওই লোকটাকে।

পিক্রুস এসে তাঁকে সেলাম ক'রে হেসে বলেছিল—আরাম হয়ে গেলেন হুজুর? আচ্ছা আচ্ছা, মাদার মেইরীর কৃপা, মেহেরবানী!

—কি খবর তোমাদের? কি জন্তে এসেছ?

আবারও হেসে পিক্রুস বলেছিল—এত্তালা ভেজলাম বড়া হুজুরের কাছে! একটা কাম আছে।

—কি কাম? বল!

—উ তো বড়া হুজুরকে কাম। উন্‌কে পাশ শুনবেন!

—হুঁ!

তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বাইরে এসে উপরে উঠে গিয়েছিলেন। একেবারে বীরেশ্বর রায়ের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দরজাটা বন্ধ ছিল। বাইরে দাঁড়িয়েছিল চাকর জলধর, আর একজন হরকরা। তিনি তাদের গ্রাহ্য না-করে দরজা টেনেছিলেন। জলধর সভয়ে

বলেছিল—হুজুর—

নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কি ?

—নায়েববাবু কি পরামর্শ করছেন, বলেছেন—

তার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় মেড়ে তিনি ডেকেছিলেন—ভালো-মা !

চড় হজম করেই জলধর বলেছিল—মা ও ঘরের মধ্যে নাই হুজুর।

—নাই ? একমুহূর্ত চিন্তা ক'রে সে এবার একটু জোরেই দরজা ঠেলে ওই ভালো-মাকেই ডেকেছিলেন। ভালো-মা !

ভিতর থেকে আচার্য বলেছিলেন—আসছি। কয়েক মুহূর্ত পরেই আচার্য দরজা খুলে দিয়ে তাকে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন—এক্ষুনি তোমাকে ডাকবার কথা হচ্ছিল !

বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন রত্নেশ্বর, তাঁর আর রাগ বা অভিযোগ করবার কারণ ঘটে নি !

বীরেশ্বর রায় তাকে বলেছিলেন—বস ! পাখাখানা নিয়ে মাথায় হাওয়া কর।

রত্নেশ্বর তাই করেছিলেন।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—যে কথা হচ্ছে তা তোমার মা—মানে ভালো-মাও জানবেন না। জানব আমরা তিনজন—আমি তুমি আর দেওয়ান খুড়োমশাই।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন রত্নেশ্বর। একটু ভয়ও হয়েছিল।

—শোন ! জন রবিনসনকে আমি শাস্তি দিতে চাই ! দেওয়ানী মামলা তার নামে দায়ের হয়েছে, কিন্তু তাতে এর শোধ হবে না ! আমি ওকে—।

চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর। কি করতে চান বুঝতে তাঁর বাকী থাকে নি। মুহূর্তে একটা দুরন্ত ভয় যেন তাঁকে চেপে ধরেছিল।

বীরেশ্বর রায় তা বুঝেছিলেন। বলেছিলেন—ভয় পেয়ো না। জমিদারিধর্ম বড় কঠিন। এটা একরকম রাজধর্ম। দুষ্টকে শত্রুকে দমন করতেই হবে। না-পারলে জমিদারী চলবে না। দেওয়ানী মামলা করেছি, ওর কাছে আমরা আজও হাজার বিশেক টাকা পাব। কিন্তু তাতে অনেক দেরী লাগবে। একটা দাঙ্গা বা—। দাঙ্গার চেয়ে গোপনে ওকে—। লোক পেয়েছি।

রত্নেশ্বরের শরীর হিম হয়ে আসছিল ! গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

এবার আচার্য বলেছিলেন—আমি বলছি, তাতে অনেক হাঙ্গামা হবে। কোনরকমে প্রকাশ পেলে গভর্নমেণ্ট হুজোতের বাকী রাখবে না। এই সবে মিউটিনী গেল। তেতে আছে। আমি বলি—বেটার তো নানান বাতিক আছে। মেয়েমানুষ, শীকার, টোপ ফেলে কাবেজে নিয়ে এসে বেটাকে এমন করে দিক যাতে কাজের বাইরে যায় ! সব থেকে ভাল হত, বিশুবাবুর দলের মত দল থাকলে। কুবী মেরে দিয়ে জখম করে দিয়ে চলে যেত। এরা তা পারবে না। দলটল এদের ঠাকুরসাহেব ভেঙে দিয়েছেন।

এই সময় ঘরে ঢুকেছিলেন ভবানী দেবী। তিনি এতক্ষণ পূজায় ছিলেন পাশের ঘরে। ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—আমি পুজোয় বসে সব শুনছিলাম। কিন্তু দুদিনও কি তর সইছে না তোমার ? ভাল হয়েই ওঠো !

—না। তুমি জান না—

—জানি!

—রত্নেশ্বর যদি জীবন্ত পুড়ে মরত—

—তা যখন হয় নি, তখন যদি হ'ত বলে রোগ বাড়িয়ে ফল কি?

—না। সে আমি ভুলতে পারছি না।

—ওসবের ভার খুড়োমশায়ের হাতে দাও, রত্নেশ্বরকে নিয়ে উনি যা-হয় করবেন। এসবে আমি দুঃখ পাই। সহ্য করতে পারিনে। তবু জেদ যখন তোমার যাবে না, তখন সর্বনাশা পাপ না করে খুড়োমশাই যা বলেন তাই কর! বিপদ ডেকে আনা হবে। পাপ হবে।

—টাকা বিপদ কাটিয়ে দেবে। আর পাপ? না—তাও হয় না। রাজ্য করতে গেলে বিদ্রোহী দমন করতে হয়। শত্রুকে ধ্বংস করতে হয়। রাজধর্ম জমিদারিধর্মে তাতে পাপ অর্শায় না। আইন বাঁচাতে পারলেই হ'ল।

কথাটা কতক্ষণ চলত' তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সমস্তকিছুর মোড় ফিরে গেল পালকির বেহারাদের হাঁকে।

ভবানী দেবী বললেন—থাক এখন ওসব কথা। পালকি এল। সোফিয়া বোধ হয় এল! জলধর, দেখ তো বাবা কে এল পালকিতে?

জলধর বারান্দায় ঝুঁকে বললে—বাঈ সাহেবা।

ভবানী দেবী বললেন—তুই নিচে যা রত্ন।

আচার্য সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন। রত্নেশ্বরকে বললেন—এস বাবুজী ভায়া। এস—। আমরাই যা হয় করব।

তিনি বেরিয়ে গেলেন। রত্নেশ্বর বেরিয়ে এসে বারান্দায় বেরিয়ে ডাকলে—ভালো-মা!

ভবানী দেবী সাড়া দিয়েছিলেন—কি?

—আমার কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে। তোমাকে একলা বলতে চাই।

বীরেশ্বর রায় বললেন—ভিতরে এস। বাইরে একলা বলা হয় না। যাও পুজোর ঘরে যাও!

পুজোর ঘরে গিয়ে ইচ্ছে করে বীরেশ্বর রায়কে শুনিয়েই একটু উচ্চকণ্ঠে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—এ আমার আর সহ্য হচ্ছে না ভালো-মা।

—কি?

—এই সোফি বাঈকে ডেকে আনছ—

—তুই অন্তত এ কথাটার মধ্যে থাকিস নে। তুই নিচে যা।

—তুমি একে পাপ মনে করছ না? আশ্চর্য!

এঘর থেকে বীরেশ্বর থেকেছিলেন—সতীবউ!

ভবানী ব্যগ্রভাবে বলেছিলেন—ওরে, আমি তোকে মিনতি করছি। রত্ন। তোকে মিনতি করছি।

—সতীবউ!

—যাই।

—যাই নয় শোন ; রত্নেশ্বর, তুমিও শোন। নইলে আমাকেই কোনরকমে বিছানা ছেড়ে উঠবে হবে।

ভবানী এ ঘরে এসে বলেছিলেন—ও যাচ্ছে। এখুনি যাচ্ছে। রত্ন।

বীরেশ্বর বললেন—না। তুমি যে চিঠিখানা লিখেছিলে, আর শ্বশুরমশাই যেখানা লিখেছিলেন, চিঠি দুখানা ওকে পড়তে দাও।

—পড়তে দেব ?

—হ্যাঁ পড়তে দেবে। দাও। দাও।

ভবানী দেবী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে চিঠি দুখানা বের ক'রে রত্নেশ্বরের হাতে দিলেন।

বীরেশ্বর বললেন—চিঠি দুখানা তুমি নির্জন ঘরে পড়ে শেষ করে আমাদের কাছে এস। যাও। তারপর তোমার সঙ্গে কথা হবে। তোমার জানার সময় হয়েছে। যাও। এখন সোফি এসেছে, তার সঙ্গে আমাদের কথা আছে কিছু, সেরে নিই !

রত্নেশ্বর পাশের ঘরে গিয়েই পড়তে বসলেন চিঠি দুখানা।

সোফিয়া এল। কিন্তু সে সোফিয়া নয়। এ যেন আলাদা মানুষ। পেশোয়াজ পায়জামা নয়—ঘাঘরা কাঁচলী ওড়না নয়, নাকে হীরার নাকচাবী নাই—কপালে টিকলী নাই। কানে দুল মাকড়ী নাই, গলায় চিক নাই। হার নাই। হাতে বাজুবন্ধ, কঙ্কন নাই, সাদা-মাটা হিন্দুস্থানী ঢঙে লালপাড় শাড়ী পরে এসেছে, গায়ে মুসলমানী কাঁচুলী আছে ; চুলে বেণী নাই, চুল এলানো এবং বেশ ভালো করে আঁচড়ানোও নয়। চোখে সুরমা আছে, মুখে পান জর্দাও আছে। অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে সোফিয়ার তা এক নজরেই বোঝা যায়।

ঘরে ঢুকেই সে শয্যায় আধশোয়া অবস্থায় বীরেশ্বর রায়কে দেখে কয়েক মুহূর্ত যেন স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়েছিল। সে বিশ্বাস করতে পারেনি নিজের চোখকে। তসলিম জানাতেও ভুলে গিয়েছিল।

ভবানী দেবী তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন—এস।

সোফিয়া বলেছিল—রুস্তমের মত বাবুজীর এমন হাল হয়ে গেছে!

ঘরখানা ছিল নিস্তব্ধ। সোফিয়া মৃদুস্বরে বললেও—বীরেশ্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি একটু হেসে বলেছিলেন—দুনিয়া ভর একটিই হাল সোফি। সব কুছ বদল যাতা হ্যায়।—সোফি বিবি ভি বদল গয়ি-হ্যায়।

এতক্ষণে সে তসলিম জানিয়ে বলেছিল—হাঁ হুজুর—ই বাত ঠিক হ্যায়।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—এঁকে চিনতে পারছ ?

—হাঁ হুজুর। হুজুরাইনকে আমি দেখবামাত্র পহছান লিয়া। উঁর পরওয়ানা পেয়েই আমি এসেছি। পরওয়ানা না-পেলেও দেখলেই আমি চিনতে পারতাম। উ তসবীর— ? ওই তো।

সে ভবানী দেবীকে বারবার তসলিম জানিয়েছিল।

ভবানী দেবী একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—বস।

—আপ খড়ি হায়। আগে আপনার তশরিফ রাখতে হুকুম হোক।

—আমাকে বসতে হবে?

—জরুর। না-হ'লে আমি বসতে পারি? আমি তওয়ায়েফ—নবাব বাদশা আমীর লোকের পরসন্তার থাকত—আমি তাও নই। আপনি হুজুরাইন। আগে আপনি বসুন।

রত্নেশ্বর রায় তখন পাশের পূজোর ঘরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে পত্র দুখানা পড়ে যাচ্ছেন। ভবানী দেবী লিখেছেন—মৃতবৎসা রোগাক্রান্তা বিমলা নিজের মৃত্যুরোগাতুর ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে, নিস্তব্ধ ঘুমন্ত পুরীর মধ্যে নিজের ঘরের দরজা খুলে, বেরিয়ে এসে ভবানী দেবীর ঘরে ঢুকেছেন। ঘরে তখন বীরেশ্বর রায় বোনের সাড়া পেয়ে কোণে আলমারির আড়ালে লুকিয়েছেন। ভবানী দেবী ঘুমের ভান করে পড়ে আছেন। বিমলা নিজের ছেলেকে শুইয়ে রেখে রত্নেশ্বরকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

রত্নেশ্বর কমলাকান্ত হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে কমলাকান্ত বড় হয়ে দেখতে হ'ল বিমলাকান্তের মত। মাথা তাঁর ঝিম্‌ঝিম্ করছে।

হ্যাঁ, মুখের চিবুকের গড়ন, কপালের গড়ন, লম্বা ঢঙ—এ বিমলাকান্তের মতই বটে। শুধু নাকের ডগা এবং চোখের দৃষ্টি তাঁর বীরেশ্বর রায়ের মত। সারা দেহের কাঠামো তাঁর রায় বংশের মোটামোটা হাড় এবং শক্ত গাঁথুনিতে গাঁথা। রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন, মূলতা—"আমার মনে হইতে লাগিল—যেন সমস্ত ভূমণ্ডল থর-থর করিয়া কম্পিত হইতেছে। আকাশমণ্ডল হইতে নক্ষত্রসমূহ কক্ষচ্যুত হইয়া দিগ-দিগন্তরে ছুটাছুটি করিয়া কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। আমি দিবা না রাত্রি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য সম্যক উপলব্ধি হইতেছে না। কখনও ক্রোধ হইতেছে এতকাল যাহাকে মাতা বলিয়া জানিতাম সেই বিমলা দেবীর উপর। আমার মাতৃবক্ষ হইতে তিনি আমাকে কাড়িয়া লইয়াছেন। কখনও ক্রোধ হইতেছে আমার প্রকৃত পিতামাতার উপর। আমাকে তাঁহারা কাড়িয়া লইতে দিলেন। চক্ষে দেখিয়াও নীরব রহিলেন!

"এতদিনে বুঝিতে পারিতেছি, আমাকে—এতদিন আমার পিতা বলিয়া যাঁহাকে জানিতাম তিনি—কেন বিমলা দেবীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে দিতেন না। আমাকে বলিতেন ইহা তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই হইতেছে। তাঁহার মৃত্যুর সময় তিনি বলিয়াছিলেন—আমার শ্রাদ্ধ তুমি করিবে। কমলাকান্তকে করিতে দিবে না। তাহাতে তাহার অমঙ্গল হইবে। আমার উপনয়নের সময় নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়া পিতামহ মাতামহ প্রভৃতির নাম তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন।

"কারণ এতদিনে বুঝিলাম। এতদিনে সব বুঝিলাম।"

সে তিনি পূর্ণ তিন পৃষ্ঠা লিখেছেন।

সুরেশ্বর বললে—হবারই কথা। এ তো সাধারণ ঘটনা নয়। এ তো একটা এত বড় গাছ—তাকে শেকড়সুদ্ধ তুলে নদীর এক তীর থেকে আর এক তীরে এনে নতুন করে

লাগানোর মত ব্যাপার। গাছ হলে বাঁচত না। মানুষ বলেই সম্ভবপর হয়েছে।

সুলতা বললে—রাগ করো না, একটা কথা বলব। আমি সোস্যালিস্ট বলে বলছি না। বলছি একেবারে সাধারণ মানুষ হিসেবে। ব্যাপারটা যদি একটু ইতর-বিশেষ হ'ত—ধর—যদি তাঁর আসল বাপ-মা রায়বাড়ীর আশ্রিত দরিদ্র দম্পতি হতেন—এবং তারপর এতটা বয়সে—এই সত্য জানিয়ে তাঁর বাপ-মা তাঁকে নিজের ছেলে বলে দাবী করতেন—তা হ'লে এটা তাঁর সহ্য হত কিনা সন্দেহ।

সুরেশ্বর বললে—রাগ সত্যি করব না সুলতা। খুব খাঁটি কথা বলেছ। সংসারে বিমলাকান্তের মত মানুষ দু-চার জনের বেশী হয় না—যাঁরা সব স্বার্থ অনায়াসে ত্যাগ করে দুঃখকে মাথায় তুলে নিতে পারেন। রত্নেশ্বর রায় তা ছিলেন না। বিমলাকান্তের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর রক্ত তাঁর মধ্যে ছিল না। সামলে নিতে তাঁকে বেশীক্ষণ লাগে নি। তিনি এরই মধ্যে এঘরে সোফিয়া বাঈয়ের সঙ্গে বীরেশ্বর রায়ের যে কথা হচ্ছিল তা শুনে মনে রেখেছিলেন। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। এ সত্য আমি অস্বীকার করব না। তবে চরিত্রেও তিনি খুব শক্ত মানুষ ছিলেন—অত্যন্ত শক্ত। আমার মনে হয়েছে, তন্ত্র সাধনা যদি সত্য হয় তা হলে শ্যামাকান্ত যা পারেন নি, তা তিনি পারতেন। প্রখর বুদ্ধিজীবী। তন্ত্র সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তা বলব পরে। বলব কেন, ডায়রী থেকে পড়ে শোনাব।

সোফি বাঈ পাগলাবাবার কোন খবর দিতে পারে নি।—তিনি অকস্মাৎ একদিন বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি।

সোফি বলেছিল—বাবুজী হুজুর, আপনি যেদিন বাবাসাহেবকে জখম করে দিয়ে চলে এলেন, উসকে বাদ—পুরা ছ মাহিনা—উনি মুর্দার মত পড়ে থাকতেন। না খানা, না পিনা, একদম মুংগা—বোবার মত। কভি কভি—আঁ-আঁ—এমনি করে পুকারতেন।

কারুকে দেখে শান্ত হতেন না। সোফি এলে তবে শান্ত হতেন। ওদিকে বাজারময় খবরটা রটেছিল—হিন্দু সিদ্ধযোগীকে মুসলমান করে নিচ্ছে মুসলমান বাঈ। একদিকে মোল্লারা লেগেছিল উঠেপড়ে। তার সঙ্গে সোফি বাঈয়ের মায়েরও উৎসাহের সীমা ছিল না। অন্তদিকে হিন্দুরা ক্ষেপে উঠেছিল।

—বাবুজী, এই সময়ে মিউটিনির হাঙ্গামা না হলে হয়তো একটা 'খারাপ' কিছু ঘটে যেত। আমরা, বাবুজী, বহুবাজার থেকে চলে গিয়েছিলাম ; বড়া মসজেদের কাছাকাছি। পাগলাবাবার তবিয়ৎ এমন বেহাল হয়ে গেল যে, আমরা ভাবলাম—মরে যাবে। আমার মা চাইলে—উনকে বাহার রাস্তার পর ছেড়ে দিত। কিন্তু আমি দিই নি। এক রোজ রাতে বাবুজী, সকলে ভাবলাম আজ রাতে ফকীর জরুর ম'রে যাবে। মাকে উ রোজ কিছুতেই রুখতে পারলাম না—ঘরসে বাহার বারেন্দেমে নিকাল দিলে।—আমিও বাবুজী ওই বারান্দায় এসে তার শিয়রে বসে রইলাম। থোড়া পানি যদি মরবার সময় খেতে চেয়ে না পায় তবে তার চেয়ে গুনা আর হয় না। জাড়ার রাত বাবুজী। তার গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে, নিজে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সাধুর ঠোঁট নড়ছিল হরদম, যেন কিছু বলছিল। কিন্তু আওয়াজ ছিল না। আমার কাছে কিছু কস্তুরী ছিল—আর কিছু দাওয়াই ছিল—মকরধ্বজ আমি

থোড়া থোড়া মুখে দিয়েছিলাম।

এমনি সমস্ত রাত বাবুজী। শেষ রাতে আমার থোড়া নিদ এসেছিল। ওদিকে বড়া মসজেদে আজান উঠল। আর তার পরই সাধুজী যেন পুকারে উঠল—মা!—ধরা গলায় খুব ঠাণ্ডা আওয়াজে বললে—মা!

আমি চমকে উঠে ঝুঁকে পড়ে ডাকলাম—বাবাসাহেব!

বাবাসাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগল বাবুজী। সে কি কান্না কি বলব! সে যেন দরিয়াতে তুফান উঠে গেল!

সেই দিন থেকে সাধুজীর ওই হাল কাটল—আবার একটু একটু ক'রে ভাল হয়ে উঠল। আমি হকিম ডেকে দেখালাম। হকিম তাজ্জব বনে গেল। বললে—এ বেঁচে উঠল কি ক'রে? তাজ্জব কি বাত!

বেঁচে সাধুজী উঠল বাবুজী, লেকিন, দুসরা আদমী হয়ে গেল। বহুৎ চুপ-চাপ। যেন পাগল আর নয়।

আমাকে বললেন—বেটী, আমার যা কুছ সঙ্গীতকে মূলধন আছে—তোকে দিয়ে দি, নিয়ে লে। তবে এক বাত আমাকে দে। এই বাত দে কি কসবীগিরি আর করবি না। এই গানা গেয়ে খাবি। আর রোজ সুবাতে উঠে ভজন করবি।

বাবুজী, গলার আওয়াজ উনকে খারাব হয়ে গিয়ে ছিল। ভাঙা তানপুরার মত। তবু আমাকে ভাঙা গলায় গান উনি শেখালেন।

ওদিকে বাবুজী, আমার মা মোল্লাদের নিয়ে মতলব করলে কি উনকে কলমা পড়াবে। আমাদের বদনামী হচ্ছিল—কি আমরা সাধুজীর সঙ্গে থেকে হিন্দু বনে গিয়েছি।

বাবাসাহেব সমঝালেন। এ রোজ আমাকে বললেন—আমি চল যায়েগা বেটী। ধরম সব কুছ এক হ্যায়। লেকিন যো সাধন আমার উ তো আবি তক পুরা হুয়া নেহি। আব হামকো যানে হোগা। তু হামাকে নিকাল দে হিঁয়াসে। হম চলা যাই।

একটু চুপ করে সোফিয়া বলেছিল—লেকিন বাবুজী, উনকে বচানে নেহি সেকা হম। বাঁচাতে পারি নি বাবুজী—আমার আম্মাজান আর মোল্লারা মিলে তাঁকে জোর করে কলমা পড়িয়েছিল।

আমি তার পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম—কিন্তু তিনি বলেছিলেন—কেঁদো না সোফি। আমার জাত নেই। ধুবড়ীর কাছে আমি মুসলমানবাড়ীতে ছিলাম—তারা খুব ভক্তি করত। তাদের ঘরেই খেয়েছি। থেকেছি। জাত আমার নেই। জাত কারুর যায় না। তবে এ আমার নসীব। জলদি জলদি তু আমার যা দেবার তু নিয়ে নে। আমি চলে যাব।

ছু মাহিনা পরে বাবাসাহেব চলে গেলেন। কোথায় গেলেন বলে যান নি।

পাশের ঘরে ব'সে সব শুনেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। তাঁর ঘৃণার আর অন্ত ছিল না। শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে যেখানে কথা উল্লেখ করেছেন—সেখানেই তাঁর ঘৃণা ক্রোধ যেন

উপচে পড়েছে।

তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, স্বলতা—"আমার ইচ্ছা হয় আমার দেহ চিরিয়া শ্যামাকান্তের যে রক্ত আমার মধ্যে আছে—তাহা নির্গত করিয়া দিই। কিন্তু তাহা মানুষের পক্ষে তো সম্ভবপর নয়। কিন্তু এ পাপ-রক্তের প্রভাব হইতে আমারই পরিত্রাণ কোথায়? কি করিয়া জগতে আত্মরক্ষা করিব তাহার কূল-কিনারা দেখিতেছি না।"

সোফিয়া আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার জন্ত উঠেছিল। যাবার আগে কয়েকটি কথা হয়েছিল—সেই কথা ক'টি শুনে রত্নেশ্বর বেশী বিচলিত হয়েছিলেন। ভবানী দেবী বলেছিলেন—ডেকে পাঠালে আবার আসবে তো?

তসলিম জানিয়ে সোফি বলেছিল—আমি হুজুরের বাঁদী। যখন ডাকবেন আসব।

—তাঁর খবর পেলে জানাবে?

—খবর? জরুর জানাব। তবে—গোস্তাকি মাফ হলে বলি—

—বল।

—খবর আপনার কাছে আসবে।

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভবানী দেবী।

—আপনার জন্তে বাবাসাহেব কাঁদতেন।

—আমার জন্তে?

—হ্যাঁ। বোধ হয় তিনি আপনাকেই খুঁজছেন।

এতক্ষণে বীরেশ্বর বললেন—তোমাকে তিনি কি বলেছিলেন, বল।

—বলেছিলেন—হু জু রা ই ন—তাঁর বেটী! পহলে দিন—উনার তসবীর দেখে—ওহি লিয়ে তিনি এমন চীৎকার করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন···হুজুরাইনের মায়ের তসবীর। কিন্তু হুজুরাইনের ছ'টা আঙুল—তাঁর ছ'টা আঙুল ছিল না। আর বলতেন—ওঁর সঙ্গে দেখা না হলে তাঁর গুনার শেষ হবে না। বলতেন—হুজুর তিনি ঝুটা বাত কখনও বলতেন না। বলতেন—সোফি তুমি আমাকে বল বাবাসাহেব আমি তোমাকে বলি বেটী! তবু কভি কভি দিলের মধ্যে তুফান উঠে যায়। আমার অন্দরে এক শয়তান আছে—সে বলে —কেন? তুনিয়াতে ও হল ঔরৎ আর তুমি হলে মর্দানা। কেঁও বাপ বেটী কেঁও। তার টুঁটি টিপে ধরি। বলি—মর যা—তু মর যা! কিন্তু সে মরে না। ডরকে মারে লুকিয়ে যায়। আবার সুবিস্তা পেলেই বেরিয়ে আসে। ইস সে রেহাই আমার সেই বেটী দিতে পারে। রায়বাবু বলেছে—সে মরে নি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—বলতে পার ও কোথায় আছে? সে বেঁচে আছে। আমাকে তাকে খুঁজতে হবে। তার দেখা পেলেই আমার আন্দরের শয়তান মরবে। আমাকে বেটীর মত পিয়ার করতেন। আমার আম্মা এর জন্তে নারাজ ছিলেন। আমাকে একলা পেলে বলতেন এসব কথা। এসব বাত তোকে বেটী বলে বলছি সোফি। আর কাকে বলব? তুই যদি পারিস তো রায়বাবুকে বলিস। দোসরা কাউকে বলিসনে। বলিস—আমি তার কাছে মাফ চাচ্ছি। তবে আমার বেটী—সে সাক্ষাত দেবী।

কথাগুলি শুনে চমকে উঠেছিলেন—রত্নেশ্বর। সন্দেহ তাঁর গোড়া থেকেই হচ্ছিল যে, যে

তান্ত্রিক পাগলাবাবার কথা হচ্ছে, এর সঙ্গে শ্যামাকান্তের সংস্রব আছে। সোফিয়া যখন প্রথম আসে তখন সে সন্দেহ করেছিল বীরেশ্বর রায়ের লালসাকে। তারপর চিঠি দুখানা পড়ে তাঁর এই পরিচিত চেনা পৃথিবী চুরমার হয়ে গেল, তিনি ভাবছিলেন এই বিচিত্র কথা আর শুনছিলেন সোফিয়া বাঈয়ের কথা। প্রায় নিঃসন্দেহই হয়েছিলেন যে, সোফিয়া বিবি যে পাগলাবাবার কথা বলছে, সে-ই হয় তো শ্যামাকান্ত। এবং বীরেশ্বর রায় ও ভবানী দেবী এই প্রয়োজনেই সোফিয়াকে ডেকেছেন। শেষ কথা কটিতে তিনি নিঃসন্দেহ হয়ে গেলেন। এই হতভাগ্য ধর্মত্যাগী নারীলোলুপ তান্ত্রিকই শ্যামাকান্ত। তার মাতামহ।

কয়েক মুহূর্তে ভেবে নিয়েছিলেন তিনি। অনেক ভেবেছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে ভবানী দেবীকে ডেকে বলেছিলেন—ভালো-মা। মা!

ভবানী তখন দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সোফিয়াকে বিদায় দিচ্ছেন। তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—রত্ন?

—ওঁকে একটু দাঁড়াতে বল মা।

—দাঁড়াতে বলব?

—হাঁ। বলেই নিজে এগিয়ে গিয়ে সোফিয়াকে সেলাম করে বলেছিলেন—মাতাজী, মেহেরবাণী ক'রে যদি একটু অপেক্ষা করেন। একটু!

সোফিয়া তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল সেই বিয়ের আসরের বীরেশ্বর রায় হুজুরকে।

—আমার কয়েকটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

সোফিয়া এবার বলেছিল—সাহেবজাদা, তুমি মাতাজী বলে আমাকে সালাম জানালে। বেটা, তোমার উপর আল্লাহতলার মেহেরবানী বর্ষাক। বল বেটা কি বলছ?

—একটু বসতে হবে।

ফিরে এসে বসেছিল সোফিয়া। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—আমার বাবুজীর এই বেমার। তা ছাড়া আমার বাবুজীকে তো আপনি যানেন—আমীর মানুষ। গানা বাজানা ওঁর দিলের পিয়ারা চীজ। আপনি ওঁকে দিনের পর দিন গান শুনিয়েছেন। খুশী রেখেছেন। এখন উনি একলা পড়ে থাকেন। ওঁর মেজাজ দিল ঠিক থাকে না। তা আপনার কাছে আমার আর্জি, আপনি যদি—যেমন ওঁকে গান শোনাতেন দিল খুস রাখতেন—তেমনি ভাবে দিন আসেন—থোড়া কুছ গান শোনান—তা হলে বড় ভাল হয়। আমি মাতাজীর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব। আর আপনি আমার মাতাজীর সমান—আপনি আজ বেকার হয়ে কে কবে মজলিসে গানা বাজানার জন্যে ডাকবে তার জন্যে তাকিয়ে থাকবেন—এতে আমাদের ইজ্জতও যায়। যা তন্‌খা আপনার মিলত—তাই মিলবে! পালকি যাবে। নিয়ে আসবে আপনাকে। আমি আপনার জন্যে মোকাম ঠিক করে দেব। সেই মোকামে থাকবেন। দারোয়ান ভি থাকবে—ক'উকে দিক্ করতে দেবে না!

তাঁর কথা শুনে সোফিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল তাঁর মুখের দিকে। ভবানী দেবী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বলতেও কিছু পারেন নি সোফিয়ার সামনে। নিজের কানকে

তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সোফিয়ার কথা কাশী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছিল। সে সময় মধ্যে মধ্যে রত্নেশ্বর যে সব কথা বলত, তা মনে করে আজকের এই কথার অর্থবোধ তাঁর হয় নি। আজই সোফিয়া এই ঘরে আসবার ঠিক আগেই সে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছে—"ভালো-মা, এইসব অনাচার, এ আমার সহ্য হচ্ছে না। তুমি একে পাপ মনে করছ না?" সেই রত্নেশ্বর এ-কি বলছে?

বীরেশ্বর রায় শুনেই যাচ্ছিলেন, একটি কথাও বলেন নি।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—"পিতৃদেব নীরবে সমস্ত শ্রবণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান। তিনি আমার মনের কথা যথার্থ অনুমান করিলেন এবং কহিলেন—তুমি উত্তম কহিয়াছ। সোফির নিকট আমি ঋণী রহিয়াছি। সম্ভবতঃ তাহার গান আমাকে পাগল হওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছে। আজ প্রয়োজন ফুরাইয়াছে বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলে অন্যায় হইবে। এবং জীবনে গীত-বাদ্যের আনন্দের প্রয়োজন আছে। আজ সোফিকে দশজনের মজলিসে গান করিয়া বাঁচিতে হইলে তাহাও এ বাটীর পক্ষে অপমানজনক। সোফি, তুমি বাবুজীর কথা রাখিলে আমি খুবই খুশী হইব। কোন অনুশোচনা থাকিবে না। তোমারও জীবনে সাধু সংস্পর্শে পরিবর্তন হইয়াছে। নিত্য বা 'মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভজন শুনাইবে—উচ্চাঙ্গের গীত শুনাইবে। ইহা আমারই বাসনা।"

ভবানী দেবীকে বোধ করি কোন ইঙ্গিতও করে থাকবেন। তিনিও বলেছিলেন—আমিও খুব খুশী হব সোফিয়া।

সোফিয়া একটু অভিভূত হয়েছিল। সত্যই, শুধু গানবাজনার উপর নির্ভর করার জন্য তার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। চোখে জল এসেছিল তার, সে কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে বলেছিল—হুজুরাইন যখন বলেছেন তখন তাই হবে। হুজুরাইন বলেছেন—বাবাসাহেব ছোটা হুজুর বলেছেন—আমি কি তা অমান্য করতে পারি? যেমন বলবেন, তেমনিই হবে।

ভবানী দেবী অন্যরকম বুঝেছিলেন। তিনি সোজা অর্থেই ধরেছিলেন—বীরেশ্বর রায় যা বলেছেন তাই। আজ সোফিয়াকে অর্থের জন্য কষ্ট পেতে হচ্ছে, সুতরাং রায়বাড়ী থেকে মাসোহারার ব্যবস্থা করলে রত্নেশ্বর। বাপের জমিদারী আমীরী ইজ্জত বজায় রাখলে। কিন্তু তাঁর ভুল ভাঙল। সোফিয়া চলে যেতেই বীরেশ্বর রায় রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিলেন—তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে আমি খুব খুশী হ'লাম রত্নেশ্বর। ভালোই করেছ। কথাটা আমার মনেও হচ্ছিল। কিন্তু তোমার মাকে না জানিয়ে, না বুঝিয়ে কথাটা বলি নি।

রত্নেশ্বর স্থিরদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—কথাটা প্রকাশ পেলে রায় বংশের কলঙ্কের আর বাকী থাকবে না।

এবার চমকে উঠেছিলেন ভবানী দেবী। বুঝতে পেরেছিলেন ছেলের মন। তিনি বলেছিলেন—আবার চাপা দিবি রত্নেশ্বর? একবার চাপা দিয়ে—

বাধা দিয়ে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হ্যাঁ মা, চাপা দিতে হবে। এমন কি এরপর রায় বংশেরও আর কেউ যেন জানতে না পারে—তার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি তো আজ বারো বছর চাপা

দিয়ে এসেছ মা। তুমি তো ওঁকে জানাতে পারো নি। সাধারণ ঘর হ'লে হ'তো মা। রায়-বাড়ী তো তা নয়! কথাটা প্রকাশ পেলে ওই গোপাল সিংয়ের মত লোক দেশময় মুখে মুখে বে-ইজ্জত ক'রে বেড়াবে। মহাভারতের যুগ এটা নয়। তাই বা বলছি কেন? কর্ণের কথাটা ভেবে দেখো।—সারাটা জীবন সূতপুত্র পরিচয়েই থেকে গেলেন—কোন দিন মাকে মা বলতে পেলেন না। মা কুন্তী—তিনিও ছেলেকে ছেলে বলতে পারেন নি। কর্ণের মৃত্যুর পর ছেলেদের বলেছিলেন—কর্ণের তর্পণ করো, উনি তোমাদের বড় ভাই। আজ তাও চলবে না। চাপা দিতেই হবে। উনি মুসলমান হয়েছিলেন—এ প্রকাশ পেলে রায়বাড়ীর ছেলেমেয়ের বড় ঘরে বিয়ে হবে না।

এছাড়া এর নজীর রায় বংশে তখন সোমেশ্বর রায় স্থাপিত করে গেছেন। যে লোকটা জলমগ্ন পাগলাবাবার সন্ধান করতে গিয়ে ফেরে নি—সে বাঘের পেটে যায় নি—তাকে সরিয়ে ফেলেছিলেন সোমেশ্বর। কারণ, লোকটা কেঁদেছিল।

* * *

থাক পাগলাবাবার কথা বলি।

এর ছ মাস পরে একখানা চিঠি এসেছিল নবদ্বীপ থেকে। শ্যামাকান্ত রায়ের শেষ পত্র। নবদ্বীপের 'পোড়া মা' তলায় শ্যামাকান্ত আশ্রয় নিয়েছিলেন। সোফিয়ার বাড়ী থেকে চলে গিয়ে ওই পোড়া মা তলায় পথের ধারে একটা গাছতলায় বাসা বেঁধে জীবনের শেষ ক'দিনে তিনি কি সাধনা করেছিলেন, তা তিনি বলতে পারেন। সাধনার ক্রিয়াকর্ম কেউ কিছু দেখে নি। তবে ওই আধপাগলের মত মানুষটি বসে থাকতেন। কেউ দিলে খেতেন, না দিলে খেতেন না। মাত্র ভোরে একবার তাকে গঙ্গার ঘাটে দেখতে পেতো। ঘাট থেকে স্নান করে ফিরতেন। গঙ্গার ঘাটে যাওয়া কেউ বড় একটা দেখে নি।

যে লোক চিঠি নিয়ে এসেছি—সে সাধারণ সামান্ত লোক। চিঠি দিয়ে বলেছিল—আজ্ঞে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। না গেলে হয়তো দেখা হবে না।

সুরেশ্বর বললে—চিঠিখানার কথা বলে'ছ তোমাকে, সুলতা। সাধারণ সুস্থ মানুষের লেখা বলেই মনে হয়।

তিনি তখন সুস্থও হয়েছিলেন। চিঠিখানা পড়ে মনে হয় তিনি যেন ভবানী দেবীর ফেরার কথাও জানতেন।

তখন বিমলাকান্ত কলকাতায় এসেছেন। কাশ্মীর চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেছেন। সম্পত্তি তিনি গ্রহণ করেন নি; তবে টাকা তিনি কয়েক হাজার নিয়েছেন। টাকাটা বিমলা দেবীর নামে বিষয়ে খাটছিল। কলকাতায় স্বতন্ত্র বাসা করেছেন। তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে যান নি।

গিয়েছিলেন ওঁরা পাঁচজন। বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, বিমলাকান্ত, মহেশচন্দ্র আর সোফিয়া। রত্নেশ্বর রায় যান নি। যাবার তাঁর উপায় ছিল না। তিনি তখন মামলায় আসামী। রাধানগরে দে-সরকারের বাড়ীতে ডাকাতি পড়েছিল। ডাকাতেরা টাকা-কড়ি বিশেষ নিতে পারে নি, তবে দে-সরকারকে নির্মমভাবে মারধর করে ডান হাতখানা ভেঙে দিয়েছে, আর

বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। কুঠীয়াল জন রবিনসন তখন নেই। সে খুন হয়েছে—তার নিজের লোকের হাতে।—একজন ফিরিঙ্গী এসে তার কাছে চাকরি নিয়েছিল। দুর্দ্ধর্ষ দুর্দান্ত লোক, রবিনসন সাহেবের নামডাক শুনে এসেছিল। ইংরেজ ফিরিঙ্গী নয়। পোর্টুগীজ ফিরিঙ্গী।

তখন শ্যামনগরের প্রজাদের জোট জমাট বেঁধেছে। তারা ধর্মঘট পেতে দে-সরকারদের খাজনা বন্ধ করেছে। রবিনসন সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করছে। একেবারে সোজা আইন-আদালতের পথ। তার জন্য তদ্বির-তদারক মামলা পরিচালনা করছে কীর্তিহাটের এস্টেটের কর্মচারীরা। বিমলাকান্তের বাড়ীতে বিমলাকান্তের নামের আড়ালে তাদের সেরেস্তা বসেছে। পাইক-লাঠিয়াল আছে। বিচক্ষণ মামলাবাজ গোমস্তা আছে। ওদিকে হুগলীতে একটা বাড়ী কিনে সেখানে আর একদফা সেরেস্তা। সেখানে একজন নীল-কুঠীর পুরনো কর্মচারীকে মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনেতে বহাল করা হয়েছে। হুগলীর সব থেকে বড় উকিলকে নিযুক্ত করা আছে। সাব-ডিভিশন আরামবাগে আর একদফা সেরেস্তা।

এসব হয়েছে দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যের পাতা ছক অনুযায়ী। তবে খেলে যাচ্ছেন রত্নেশ্বর রায়।

পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে আচার্য বলেন—মার খেয়ে যাও ভাই। কিস্তী দিক, তুমি ঢেকে দিয়ে চল। সময় হলে উঠকিস্তী, পরকিস্তী একসঙ্গে হবে।

দে-সরকারদের বাকি খাজনার মামলা চলছে; মামলার সমন আসছে কিন্তু জারী হচ্ছে না। প্রজাকে পায় না। বাড়ীতে লটকে জারী করবে তার সাক্ষী মেলে না। তারপর সমন জারী হলে নানান বিচিত্র আপত্তি পড়ছে। সিধে সরল বাকি খাজনার মামলা—চলছে তো চলছেই। অবশেষে ডিগ্রী হচ্ছে। ওদিকে মুন্সেফকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সদরে আপীল হচ্ছে। সমস্ত যুগলপুর লাটে শ-পাঁচেক জমা।

সুরেশ্বর বললে—জমা বুঝতে পারছ সুলতা ?

হেসে সুলতা বললে—টেনেন্সী বলছ তো! তা জানি।

—হ্যাঁ টেনেন্সী জান, তা জানি, কিন্তু ওর এদেশী নাম জমা। তাই বলছি। এই ধরো না সন-তারিখের মত। আজ কোন্ তারিখ কোন্ সাল জিজ্ঞাসা করলে আমিও বলব, তুমিও বলবে—আজ পঁচিশে নভেম্বর নাইন্টিন ফিফ্‌টি-থ্রি, বাংলা সনটি যদি বা সাত বছর যোগ করে, ছ'শো বছর বাদ দিয়ে তেরশো ষাট সালের হদিস করতে পারি, তবু তারিখটা কোনমতেই বলতে পারব না। জমা বলতে ক্রেডিট কথাটাই মনে পড়বে।

—মেনে নিলাম। এখন বল—রত্নেশ্বর রায়ের কথাটা বল। রত্নেশ্বর রায় জমিদারীতে বসেই ফৌজদারী মামলার আসামী কেন হলেন, সেইটেই আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। তুমি বলছিলে রত্নেশ্বর রায় রায়বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে খুন করিয়েছিলেন। আবার বলছ—জমিদারী গদিতে ছ'মাস বসতে না বসতে ফৌজদারী মামলার আসামী হলেন, সুতরাং শ্রেষ্ঠ পুরুষের সংজ্ঞাটির জন্যে কৌতূহলের আমার শেষ নেই।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ সুলতা, আমার বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ রায়বংশে। বীরেশ্বর রায়

পথনির্দেশ করছেন, আচার্য দেওয়ান তাঁর পাশে পাশে চলছেন, শেখাচ্ছেন লড়তে হবে, লড়াই ছাড়া রাজত্ব চলে না। এবং লড়তে হলে লড়বে শক্তের সঙ্গে, সবলের সঙ্গে। তাতে যেমন চাই শক্তি এবং সাহস, তেমনি চাই বুদ্ধি এবং কৌশল। একটা কথা এই সঙ্গে বলে নিই—বীরেশ্বর রায় যে পালোয়ান রেখেছিলেন, তার সঙ্গে তাঁর হুকুমে রত্নেশ্বর রায়কে কুস্তী করতে হয়, প্যাঁচ শিখতে হয়। ঘোড়ায় চড়তে হয়।

ওই প্রথম দিনই যে হজরৎপুরের পিক্রুজ একজন পর্টুগীজ ফিরিঙ্গীকে নিয়ে এসেছিল, সেই লোকটা পিক্রুজের কাজিন। কস্টেলো পিক্রুজ। গোয়ার লোক। মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসত। থাকত। এই লোকই রবিনসনের কাছে গিয়ে কাজ নিয়েছিল। কিছুদিন সাহেবের হুকুম তালিম করে সাহেবের সঙ্গে শীকার খেলে প্রিয়পাত্র হয়ে হয়ে উঠেছিল তার। হঠাৎ তার কাছে এল হজরতপুরের পিক্রুজ, একটি মেয়েকে নিয়ে। ফিরিঙ্গী মেয়ে—কটা চোখ, কটা চুল, কটা রঙ এবং খানিকটা বর্বরা। হজরতপুরের পিক্রুজের সৎবোন ; গোয়ার ফিরিঙ্গী পিক্রুজের বাক্‌দত্তা বধূ। নাম তার মার্থা।

এ সবটাই সুকৌশলে সাজানো বাঘশীকারের 'বেইটে'র মত। বাঘ ঠিক এল, শিকারীর লক্ষ্য অব্যর্থ, বাঘ ম'ল।

রবিনসন একদিন ফিরিঙ্গী পিক্রুজের অনুপস্থিতিতে মার্থার ঘরে ঢুকল। মার্থা চীৎকার করলে। তার সঙ্গে লড়াই করলে। অথচ সেই তাকে ইসারায় ডেকেছিল। পিক্রুজ ছুটে এল। লাফ দিয়ে পড়ল রবিনসনের ঘাড়ে, এবং তাকে শেষ করে দিয়ে চলে গেল মার্থাকে নিয়ে ; গঙ্গার নৌকো ভাসিয়ে।

পুলিশের হুলিয়া হ'ল—মার্থাকে তারা পেলে, কিন্তু ফিরিঙ্গী পিক্রুজকে পাওয়া গেল না।

পোর্টুগালে যাওয়ার জাহাজের টিকিট কেনার দাম খরচ পড়ে আছে রায়বাড়ীর খাতায়। একটা মোটা টাকাও খরচ পাওয়া যায় দাতব্য খাতে। কাকে কি বৃত্তান্ত তা লেখা নেই।

এটা ঘটল তিন মাসের মাথায়। মার্থা জবানবন্দী দিলে। সাহেব পিক্রুজের অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে তার উপর পাশবিক অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছিল, সে চীৎকার করে উঠেছিল। কস্টেলো পিক্রুজ কোথায় ছিল—সে ছুটে এসে সাহেবকে আক্রমণ করে। সাহেবও তাকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু পিক্রুজ গোড়াতেই পড়েছিল তার ঘাড়ে। সে তাকে ছুরি মেরে তাকে অর্থাৎ মার্থাকে নিয়ে পালায়। শ্যামনগর থেকে কলকাতা। কলকাতায় মার্থাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েই সে যে কোথায় চলে গেছে মার্থা তা জানে না।

মার্থার পক্ষে বড় কাউন্সেল নিযুক্ত করেছিল হজরতপুরের পিক্রুজ। ব্যাপারটা সাদা চামড়া আর কটা চামড়ায় বলে খুব বেশীদূর এগোয় নি। মার্থার কাউন্সেলও ছিল একজন খাস বিলিতী সাহেব। রবিনসনের ইতিহাসটাও নারী সম্পর্কিত ব্যাপারে খুব পরিচ্ছন্ন ছিল না। এর আগে একটি ব্রাত্য নারীহত্যার অভিযোগ হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। মামলাতে তার কিছু হয় নি। কিন্তু প্রথম কুঠী তার ফেল পড়েছিল এইজন্যে। সুতরাং কোনক্রমেই রায়বাড়ীর জমা-খরচের খাতা পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে পুলিশের মনে হয় নি।

তাছাড়া রায়বাড়ীর হাতে আর একটা জোরালো প্রমাণ ছিল রবিনসনের বিরুদ্ধে খার বাবদ

বিশ হাজার টাকার একটা ডিগ্রী। যেটা উত্তরাধিকারী অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রহীন রবিনসনের মৃত্যুতে প্রায় দিকভ্রান্ত হয়েছিল জারীর পথে। রবিনসনের উত্তরাধিকারী স্থির না হওয়া পর্যন্ত ডিগ্রী জারী স্থগিত রাখতে হয়েছিল। মৃতের উপর জারী হবে ডিগ্রী, নয় তার উত্তরাধিকারীর উপর। সুতরাং রবিনসনের মৃত্যুতে রায়বাড়ীর সমূহ ক্ষতি। তবে তা দেখাতে হয় নি। বলেছি তো এ-পথেই হাঁটে নি পুলিশ।

তারপরই মাসখানেক পর দে-সরকারদের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে, মারধর ক'রে তার ঘর জ্বালিয়ে দিলে। দে-সরকারের ডান হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিলে। জ্বলন্ত মশালের বাড়ি মেরে সারা মুখখানা ছিঁচকে পোড়া করে দিয়ে গেল।

দে-সরকার এজাহারে পুলিশের কাছে বললেন—তিনি দেখেছেন, কমলাকান্ত ভট্‌চাজকে একটু দূরে বাড়ীর ফটকের সামনে তাকে ঘোড়ার উপর দেখেছেন।

সুরেশ্বর বললে—সব দেশের জমিদারীতেই বোধ হয় আছে। তবে বাংলাদেশের জমিদারীর ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা অনেকগুলিই আছে। দু-একটা ঘটনা গল্প হয়ে আজও চলিত আছে মুখে-মুখে। জমিদারী চালনায় এগুলি সে-আমলের সিংহকীর্তি। অন্তত, তাই লোকে বলত, সমাজে মানত।

মুসলমান আমলে কাজী ছিল, বিচারও ছিল, কিন্তু ইংরেজের ক্রিমিন্তাল প্রসিডিওর কোড ছিল না। প্রজার কাছে খাজনা আদায়ের জন্য হপতম পঞ্চম আইন করেছিল কোম্পানী কিন্তু ক্রমে ক্রমে জমিদারদের মুখে পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের আট-ঘোড়ার গাড়ীতে ক্রিমিন্তাল আইনের কাঁটা-লাগানো লাগাম পরিয়ে দস্তুরমত পোষা আরবী ঘোড়ায় পরিণত করেছিল। হপতম পঞ্চম তুলে দিয়ে সিভিল স্যুটের মুন্সেফী আদালত দেখিয়ে দিয়েছিল। এবং ক্রিমিন্তাল প্রসিডিওর কোড চালু করে জমিদার-প্রজাকে এক গোয়ালে পুরেছিল। তবু তারা এই কাঁটা-লাগাম ছিঁড়ে দুর্দান্তপনা করছে ইচ্ছামত।

একটা ঘটনার কথা বলি—হেস্টিংস সাহেবের প্রিয়পাত্র কান্ত প্রথম হলেন বাবু তারপর রাজা। বহু লক্ষ টাকা আয়। কান্তবাবুর চতুর্থ পুরুষ কৃষ্ণনাথ। নাবালক অবস্থায় মালিক হয়েছিলেন বিষয়ের। স্টেট গিয়েছিল কোর্ট অব ওয়ার্ডসে। কৃষ্ণনাথকে খাসা ইংরিজী শিখিয়ে কোর্ট অব ওয়ার্ডস তাঁকে রাজার মেজাজ তৈরী করে দিয়েছিলেন। প্রচুর মদ্য, হৈ-হল্লা, ইয়ার-বন্ধু, কুকুর-বন্দুক-পিস্তল এসব দিয়ে রাজত্বের খেলাঘর সাজিয়ে দিতে কসুর করেন নি। তার সঙ্গে রাজোচিত পোশাক এবং ডেকরেশন। তরুণ কৃষ্ণনাথ দিলদরিয়া লোক, তেমনি মেজাজ। একবার বাড়ীতে যাত্রাগান হচ্ছে। উনি অবশ্য দেখছিলেন না। উনি বাইরে প্রমোদভবনে ছিলেন। সেখান থেকে রিটায়ারিং টাইমে অন্দরে যাচ্ছেন। সঙ্গে চোপদার চলেছে, মশালচি চলেছে। যাবার পথ ওই আসরের পাশ দিয়ে। আসরে তখন নারদমুনি হরিগুণগান করছেন। রাজার রঙদার চোখে সাদা চুল-দাড়ি পরা মুনিকে খুব ভাল লাগল। চোপদারকে জিজ্ঞাসা করলেন—কৌন হ্যায় উয়ো ?

চোপদার বললে—নারদমুনি হুজুর !

—নারদমুনি ? আচ্ছা। উ তো আচ্ছা আদমী হ্যায়। বলে ঘুরলেন। কুর্শী আনিয়ে

সব লোকের সামনে বসলেন এবং হুকুম করলেন—আউর এক নারদমুনি লাও!

অধিকারী সন্ত্রস্ত, ছুটে সাজঘরে গিয়ে আর একজনকে পাকা চুল-দাড়ি পরিয়ে নিয়ে আসরে নামালেন।

হুকুম—আউর লাও। আউর লাও।

শেষ পর্যন্তও দশ-বারোজন লোক—মেয়েদের চুলে সফেদা মাখিয়ে সাদা করে পরিয়ে আসরে এনে নামিয়ে দিলে। রাজা খুব খুশী হয়ে একশো টাকা ইনাম দিয়ে চলে গেলেন।

এই কৃষ্ণনাথের হাতের হাজার-পাঁচেক টাকা দামের আংটি চুরি গেল, সন্দেহ হল চাকরের উপর। সুতরাং তাকে শাস্তি দিলেন। কিন্তু ভুলে গেলেন ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড অনুযায়ী ও-অধিকার তাঁর নেই। এমন প্রহার করলেন যে, চাকরটা মরে গেল।

বহরমপুরের এস ডি ও খুশী ছিলেন না মহারাজ কৃষ্ণনাথের উপর। লোকটিও ছিলেন গণ্যমান্য বংশের। কিন্তু সে-খাতির কৃষ্ণনাথ করতেন না। তিনি ওয়ারেন্ট বের করলেন; কৃষ্ণনাথ তার আগে কলকাতা পালালেন। কিন্তু কোম্পানীর রাজত্বে কলকাতা তার কেল্লা নয়। মুসলমান আমলে রাজাদের মাটির কেল্লাগুলোর পাঁচিল আর কটক সব ভেঙে দিয়েছে কোম্পানী। কলকাতাতে কোম্পানীর খাস ডেরা। কোথায় যাবেন? কৃষ্ণনাথ যে-খেলনাটা পেয়েছিলেন কোম্পানীর কাছে—পিস্তল—গ্রেপ্তারের ভয়ে সেই পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

তবু বাংলা দেশের জমিদারেরা হটেন নি। সুচতুর ভাবে আইনের সূঁচের সুতোর ছিদ্র দিয়ে উটে চড়ে পার হয়ে যেতেন।

রবিনসনের পর দে-সরকার। গোপাল সিংহের পর্ব শুরু হয়ে গেছে তখন। মামলা-মোকদ্দমা চলছে তখন। বাঘ-নেকড়ে মারার পথ আর ইঁদুর ধরা কি মারার পথ এক নয়। দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যের একখানা পত্র আছে। তিনি রবিনসনের মৃত্যুর পর কীর্তিহাট থেকে লিখেছিলেন কলকাতায়। লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়কে। আচার্য বীরেশ্বর রায় এবং রত্নেশ্বরকে কলকাতায় রেখে চলে এসেছিলেন কীর্তিহাট। হজরতপুরের পিক্রুস মারফৎ ওই কস্টেলো পিক্রুসকে তিনিই নৌকো করে হজরতপুর পর্যন্ত এনে নামিয়ে দিয়েছিলেন। কস্টেলো ওখান থেকেই ফিরে গিয়ে উঠেছিল শ্যামনগরে। চাকরি নিয়েছিল রবিনসনের। কস্টেলো পিক্রুস উধাও হয়ে গেল তার কাজ সেরে, খবর পেয়ে দেওয়ান জানালেন—"যে পাপ-বৃক্ষটির কাণ্ড কায়স্থ এবং তস্য শাখা কিরিঙ্গী, তাহার শাখাটি ছেদিত হইয়াছে। অতঃপর কাণ্ডটির ব্যবস্থা হইতেছে। এই বৃক্ষে ছত্রি মূষিকটি আশ্রয় লইয়াছে, এক্ষণে তাহাকে গর্তে আশ্রয় লইতে হইবে। চিন্তা করিবেন না, সকল ব্যবস্থাই হইতেছে। তবে এক্ষণে বাবু রত্নেশ্বর জামাজীবনকে লইয়া এখানে আসা প্রয়োজন। ইস্কুল পত্তনের যে আয়োজন হইতেছে, ওই আয়োজনের খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে এখানে আনয়ন করিয়া ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হউক। তাহাতে বিশেষ সুফল ফলিবে বলিয়া মনে করি। আমি উক্ত রাত্রেই কাণ্ড ছেদন করাইব।"

* * *

সুরেশ্বর বললে—হয়তো কুটিলতম রাজনীতির খেলা খেলেছিলেন দেওয়ান। নবাব-বাদশার

দরবার হলে ইতিহাসে এ-ঘটনা পড়ে বিস্মিত হ'ত লোকে।

ব্যবস্থা হয়েছিল—ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মেদিনীপুরের কালেক্টরসাহেব বাহাদুর ; সন্ধ্যায় উৎসব হবে। নৃত্য-গীত এবং উচ্চাঙ্গসঙ্গীত।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পাশে বীরেশ্বর-রত্নেশ্বর হাজির থাকবেন। ওদিকে সেই রাত্রে শ্যামনগরে দে-সরকারের বাড়ীতে পড়বে ডাকাত। শুধু আগুন দিলে কাজটা সোজা হত, কিন্তু তাতে শ্যামনগরের লোকের উপর সন্দেহ পড়তে পারে। সেইজন্যে হবে ডাকাতি, যার উদ্দেশ্যটা হবে লুঠতরাজ। প্রতিহিংসা প্রতিশোধ বলে চালানো যাবে না।

ঘটনার কয়েকদিন আগে একটা ফৌজদারী হয়েছিল গোপাল সিংহের সঙ্গে। সামান্য ঘটনা নিয়ে ফৌজদারী। ইঁদুর গোপাল সিং তখন মামলায়-মামলায় উত্ত্যক্ত। শ্যামনগরে বিমলাকান্তের একজন পাইক রাধানগর গিয়ে সামান্য কথায় খপ করে চেপে ধরেছিল গোপাল সিংয়ের হাত ; গোপাল তাকে ঘায়েল করে বসল। এবং ঘায়েল করে তার হুঁশ হল—সে পুলিশ কেসে পড়েছে। সে হ'ল ফেরার।

রাধানগরে দে-সরকারের তখন সেই ছিল ভরসা। গোপাল পালাল পুলিশের ভয়ে। নির্বান্ধব দে-সরকার সারারাত্রি মালা জপ করে গোবিন্দ ভরসা করে দিনযাপন করছিলেন।

আচার্য এ-কার্য সমাধা করবার জন্য লোক এনেছিলেন দক্ষিণ কাঁথি অঞ্চল থেকে। বাংলাদেশে এমন দল তখন অনেক ছিল। যারা চিঠি দিয়ে ডাকাতি করত। বিশু ডাকাতের নাম জান। বিশ্বনাথ ঘোষ ডাকাতি করতেন বড বড় বাড়ীতে, অনেক নীলকুঠিও লুঠেছেন। লোকে বলত বিশুবাবু। কোম্পানী সোজা পথে তাকে ধরতে পারে নি। দলের লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়েছিলেন। হাণ্টারসাহেব লিখে গেছেন—

Biswanath Babu exercised his vocation in broad daylight, sending previous notices of his designs to those he intended to plunder."

বিশুবাবুর মত মহৎ ডাকাত চিরকাল দুর্লভ কিন্তু এই ধরনের দুঃসাহস অনেক দলের তখন ছিল। এত বড় একটা জমিদারপক্ষ সহায় পেয়ে তারা দে-সরকারের মত কৃপণ জমিদার-মহাজনের বাড়ী লুঠতে, জ্বালাতে, বলতে গেলে এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল। ছকা ব্যবস্থা। তারা হানা দেবে, হৈ-হৈ করে ঘাঁটি পাতবে। শ্যামনগরের লোকে উঠবে, সভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে নিজেদের এলাকায়।

গ্রামের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে ডাকাতি-চুরি হয় না। এক্ষেত্রে তার অভাব হয় নি, দে-সরকার বাড়ীর পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ তারা পেয়েছিল। রাত্রি দুপুরের পর ডাকাতের দল—সে প্রচণ্ড চীৎকার করে মশাল জ্বালিয়ে হানা দিয়ে পড়ল, তখন কান্না উঠল দে-সরকারের অন্দরে, কিন্তু সে চীৎকার মানুষ সাড়া তো দেয়ই নি, দে-সরকারের ভগবানও সাড়া দেন নি। ডাকাতদের তিনজন এসেছিল ঘোড়ায় চেপে।

মেয়েদের উপর ডাকাতেরা নির্যাতন করে নি। তারা গায়ের গহনা খুলে দিয়েছিল হুকুমমত। কিন্তু দে-সরকারের ছেলে এবং দে-সরকারকে বাইরে টেনে এনে জলন্ত মশাল দিয়ে পিটে ছিঁচকা পোড়া করে দিয়েছিল। এবং ভেঙে দিয়েছিল একখানা হাত। তবু দে-সরকারকে

বাহাদুরি দিতে হবে। টাকা কোথায় আছে তিনি বলেন নি। ছেলে একটা জায়গা জানত, সেটা দেখিয়ে দিয়েছিল।

এই সময়েই ফটকের বাইরে ঘোড়ার উপর দেখা গিয়েছিল তরুণ রত্নেশ্বর রায়কে। মাথায় পাগড়ি, মুখে একটা ফেটা বাঁধা, পরনে ব্রিচেস কোট—

তিনি ডেকে বলেছিলেন—প্রাণে মেরো না। পোড়ামুখ নিয়ে বাঁচতে দাও।

তারপর আর তাঁকে কেউ দেখে নি।

এ-কাজটি রত্নেশ্বর নিজের মতে ও বুদ্ধিতে করেছিলেন। বীরেশ্বর রায়কে বলেন নি। এমন কি দেওয়ান আচার্যও সময়ে জানতে পারেন নি। তবে রত্নেশ্বর শক্ত করে ঘাঁটি বেঁধে কাজ করেছিলেন।

বীরেশ্বর রায় এবং আচার্য দেওয়ান ডাকাতির দিন ইস্কুলের ভিত্তিস্থাপনের ব্যবস্থা এবং রাত্রে নৃত্য-গীত এবং বৈঠকী গানের ব্যবস্থা করেছিলেন 'এ্যালিবি' রাখবার জন্যে। ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীরা উপস্থিন থাকবেন। তাঁরা নিশ্চয় বলবেন—সে কি? আমরা সেখানে সে-রাত্রে উপস্থিত—কীর্তিহাটে। সারাদিন সেখানে ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান, রাত্রে উৎসব। তাঁরা ডাকাতি করাচ্ছেন সেই রাত্রে—এ কি করে সম্ভবপর হতে পারে?

রত্নেশ্বর এই সুযোগ নিলেন।

তিনি মজলিসে সাহেবদের আপ্যায়ন করছিলেন। ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তখন সোফিয়া বাঈয়ের বৈঠকী গান সবে শেষ হয়েছে। সোফিয়া বাঈ সন্ধ্যায় বসে প্রায় ঘণ্টাদেড়েক তার অপরূপ গানে মজলিশকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁর গানের পর আসরে উঠে দাঁড়িয়েছিল দুজন তরুণী খেমটাওয়ালী। বাছাই করে কলকাতার সেরা খেমটাওয়ালী আনা হয়েছিল। রূপে, কণ্ঠস্বরে, নৃত্যদক্ষতায় তারা অপরূপা। ঠিক এই সময় বাপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তিনি অবসন্নের মত বসে পড়েছিলেন।

ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন বীরেশ্বর রায়, তাঁর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবং অন্যান্য অতিথিরাও উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারেন নি। গোটা আসরটাই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। রায়বংশের উত্তরাধিকারী —এমন সুন্দর সুপুরুষ মার্জিতরুচি তরুণটির প্রতি দৃষ্টি সকলেরই আকৃষ্ট হয়েছিল। বীরেশ্বর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে রত্নেশ্বরের হাত ধরে বলেছিলেন—কি হল, রত্নেশ্বর?

—মাথা ধরেছে, তার উপর হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরে গেল।

বীরেশ্বর তাকে হাতে ধরে তুলে একখানা আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। একজন পাংখা-বরদার একখানা ছোট হাতপাখা নিয়ে তাঁর মাথায় হাওয়া করতে শুরু করেছিল। একজন এনেছিল গোলাপজলের বোতল। রত্নেশ্বর হাতে মাথা ধরে কিছুক্ষণ বসে থেকে হেসে বলেছিলেন সাহেবকে—I am very sorry sir that I have disturbed the whole show.

—Are you alright now?

কাঁচুমাচু করে রত্নেশ্বর রায় বলেছিলেন—সুস্থ হয়েছি অনেকটা, তবে ঠিক সম্পূর্ণ সুস্থ হই নি। যদি অনুমতি করেন, তবে আমি একটু বিশ্রাম করি গিয়ে। আমার একটা শিরঃপীড়া

আছে, তাতে অনেক সময় প্রায় অজ্ঞানের মত পড়ে থাকি। তবে ভয়ের কিছু নেই।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়েছিলেন। রত্নেশ্বর বাপকে বলেছিলেন—একটুও চিন্তা করবেন না আপনি। আপনি বসুন। আমি একটু শোব।

বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে বলেছিলেন—কেউ যেন আমাকে না ডাকে। ভবানী দেবী পূজায় ছিলেন। পূজা সেরে উঠে এসে ছেলেকে আর পান নি। পেয়েছিলেন একটা চিরকুট। তাতে লেখা ছিল—আজ আতসবাজী পুড়বে আমি দেখতে যাচ্ছি। বাবা আর দেওয়ানজী ছাড়া কাউকে বলো না। কোন ভয় নেই। ভোর হবার আগেই ফিরব।

গোপনে তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। ছ'জন সওয়ার বরকন্দাজ এবং সঙ্গে একটা বাড়তি ঘোড়াও তিনি নিয়েছিলেন।

শ্যামনগরের পথ ছুটো, একটা নদীর পথ। সেটা অনেক ঘুরপথ। একটা ত্রিভুজের ছুটো বাহুর মত কাঁসাই আর ভাগীরথী ধরে এক নদীপথ, অন্যটা ত্রিভুজের কর্ণের মত একটা স্থলপথ। কিন্তু দুর্গম। এই পথটাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। নদীপার ছিল পথে, সেখানেও বন্দোবস্ত তিনি করে রেখেছিলেন—পারের নৌকা অপেক্ষা করছিল। মাইল-তিরিশেক পথ, মাঝে কুতুবপুরের কাছারী। সেখানে ঘোড়া বদল করে নিয়ে উঠেছিলেন শ্যামনগর, ডাকাতি তখন চলছে, মশাল দিয়ে পিটছে কর্তা দে-সরকারকে।

তিনি গিয়ে ডেকে বলেছিলেন—প্রাণে মেরো না। ছিঁচকেপোড়া মুখে নিয়ে বেঁচে থাকতে দাও।

তিনি আসবেন এ-খবরটা কাজের কাজী যারা তারা জানত, বলা ছিল। তারা তাঁকে ঘাঁটিতে ঢুকতে আটকায় নি।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরেছিলেন। ছ'দিকে ষাট মাইল পথ। যেতে-আসতে ঘণ্টা-আষ্টেক লেগেছিল। কীর্তিহাটে যখন ফিরেছিলেন, তখন বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, দেওয়ান আচার্য জেগে পথের দিকে চেয়ে বসেছিলেন।

ভবানী দেবী তিরস্কারের আর বাকি রাখেন নি। বীরেশ্বর রায় গম্ভীরমুখে স্তব্ধ হয়ে বসে-ছিলেন। আচার্য হাঁক ছেড়ে কয়েকবার মৃদু তিরস্কার করে বলেছিলেন—বড্ড ছেলেমানুষী করেছ দাদুসাহেব। বড্ড ছেলেমানুষী। না-না-না, আমাদের না জানিয়ে এরকম ভাবে—না-না-না।

তবে পরে একান্তে তাকে বলেছিলেন—সাবাস দাদুসাহেব। তুমি যা করলে—এ একটা দেখালে বটে। হ্যাঁ, বুকের পাটা আছে তোমার। বুদ্ধিও খেলিয়েছ বটে। সাবাস, সাবাস! তবে এরকম আর করো না।

একটু ভেবে বলেছিলেন—তবে ভাই কাল সকালেই তোমাকে কলকাতা চালান করব সাহেবদের সামনে। রাত্রে অসুখ বেড়েছে, কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চিকিৎসার জন্যে। বুঝেছ?

হেসে রত্নেশ্বর বলেছিল—ঠিক আছে, আমি তৈরী।

—কষ্ট হবে না তো! সারারাত্রি তিরিশ কোশ ঘোড়া হাঁকিয়েছ।

—না। বলেন তো কালই নমুনা দেখিয়ে দিতে পারি।

—থাক। তাতে আর কাজ নেই।

পরের দিনই সাহেবদের বিদায় দিয়ে বীরেশ্বর রায় ছেলেকে নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খুশী হয়ে বলেছিলেন—স্কুলটা তাড়াতাড়ি শেষ কর মিস্টার রায়। স্কুলের ফাউণ্ডেশন আমি পত্তন করলাম। ওপনিং দেখে যেতে চাই। এবং আমার ইচ্ছে আমিই সেটা করি।

বিদায়ের সময় রুপোর রেকাবীর উপর পঁচিশখানা মোহর সবিনয়ে তুলে ধরেছিলেন বীরেশ্বর, সাহেব সকলের সামনেই রেকাবখানাসমেত, সেটা নিয়ে দিয়েছিলেন আর্দালীর হাতে। তাছাড়া রুপোর কর্ণি এবং আরও অনেক উপহার ছিল, অন্য সাহেবরাও বাদ যান নি। সকলেই সেলামী নিয়ে রায়বাবুর সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সকলেই রত্নেশ্বরের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। রত্নেশ্বর অসুস্থ এবং রাত্রে অসুখ বেড়েছে এ-কথাটা আচার্য এসে প্রথমেই জানিয়েছিলেন সাহেবদের। বিবিমহলে এসে সকালবেলাতেই সাহেবের সঙ্গের কেরানীকে বলেছিলেন—হুজুরকে একটু বলে দেবেন, কর্তার আসতে একটু হয়তো দেরি হবে। রত্নেশ্বরবাবুর অসুখটা বেড়েছে। ডক্তার-কবিরাজে বলছে—সাধারণ শিরঃপীড়া নয়, একটু জটিল মনে হচ্ছে। বলছে—কলকাতায় নিয়ে যাওয়া ভাল।

কথাটা কেরানী যথাসময়ে পেশ করেছিল হুজুরের সামনে, এবং তার মিনিট-কয়েকের মধ্যেই বীরেশ্বর রায় এসে হাজির হয়ে দেরীর জন্য বিরক্তি জন্মাবার পূর্বেই দেরীর জন্য মার্জনাভিক্ষা করেছিলেন।

সন্ধ্যার মুখে বজরা রওনা হয়েছিল কলকাতা।

কলকাতায় এসেও রত্নেশ্বর বড় সাহেব ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে বিছানায় শুয়ে থাকতেন। রত্নেশ্বরের শিরঃপীড়া—অহরহ যন্ত্রণা। ডাক্তার রোজ আসছেন, দেখছেন, মোটা ফি নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রে কোন দিক থেকে কোন হদিস পাচ্ছেন না। ওষুধ আসে, ফেলে দেওয়া হয়।

এই অবস্থায় হুগলী থেকে এল পুলিশের পরোয়ানা। দে-সরকারের বাড়ীর ডাকাতির সময় রত্নেশ্বর রায়কে নিজে দেখেছেন—মাথায় পাগড়ি এবং মুখে ফেটা বাঁধা থাকা সত্ত্বেও চিনেছেন বলে এজাহার করেছেন দে-সরকার এবং তাঁর ছেলে।

সুরেশ্বর বললে—একটা গল্প বোধ হয় তুমিও শুনেছ সুলতা; এক ব্রাহ্মণ বিধবার বাড়ীতে কি একটা পুজো ছিল। ষষ্ঠী পুজো কি সত্যনারায়ণ ধরনের কিছু। কিন্তু বুড়ী পুজুরী না-পেয়ে গঙ্গারঘাট গেছল পুরুতের সন্ধানে। হাইকোর্টের জজ সার গুরুদাস গঙ্গাস্নান সেরে ঘাটে উঠেছেন, বুড়ী তাঁকে গিয়ে ধরেছিল—ও বাবাঠাকুর, আমার এই পুজো দয়া ক'রে করে দাও। তা সার গুরুদাস বামুন হিসেবে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন নি। বুড়ীর বাড়ী গিয়ে পুজো করে দিয়েছিলেন। বুড়ী তাকে বলেছিল—বাবা তুমি দারোগা হয়ো।

তার অর্থ টা অত্যন্ত স্পষ্ট।

এখানে মেদিনীপুরের সাহেবরা সেলামীর চেয়েও বেশী পেয়েছিলেন। রূপোর থালাসুদ্ধ মোহরগুলো পকেটে পুরেছিলেন।

সুতরাং ক্রিমিন্তাল প্রসিডিওর কোডের 'এলিবি'র সূচীছিদ্র দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে গেলেন রত্নেশ্বর। তার উপর সার্টিফিকেট ছিল কলকাতার সাহেব-ডাক্তারের। একটি কঠিন কোন রোগে আক্রান্ত বাবু রত্নেশ্বর রায় তাঁর চিকিৎসাধীনে রয়েছে। তাকে স্থানান্তরিত করা এখন অতীব বিপজ্জনক। আচার্য দেওয়ান মোটা জামীন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওদিকে মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লোক ছুটেছিল চিঠির জন্য। রত্নেশ্বর রায় ঘটনার তারিখে সমস্ত দিন তাঁর চোখের সামনে ছিলেন এবং অত্যধিক পরিশ্রম করেছিলেন, যার ফলে সন্ধ্যার পর সম্ভবতঃ নটা নাগাদ মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তিনি শয্যাশায়ী হয়েছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রত্নেশ্বর রায়ের অসুখ বৃদ্ধি পায় এবং ঐদিনই চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতা স্থানান্তরিত করা হয়। এ সমস্তই তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে।

বাবু রত্নেশ্বর রায়কে ওই তারিখের কোন ঘটনার জন্য দায়ী করা অসম্ভব। এবং তাঁর মত একজন উচ্চশিক্ষিত মার্জিতরুচি তরুণ যুবকের পক্ষে এমন কাজ কখনও সম্ভবপর নয়।

যে ব্যক্তি এমন কথা বলেছে সে আক্রোশবশতঃ মনের ভুলেই চোখে ছায়াবাজীর মত কিছু দেখেছে। অথবা ইচ্ছাকৃত আক্রোশবশতঃই এমন কথা বলেছে।

এই চিঠিতেই রত্নেশ্বর রায় সব দায় থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

পাগলাবাবার চিঠি নিয়ে লোক এসেছিল এরই মধ্যে। তখনও রত্নেশ্বর আদালত থেকে দস্তুরমত নথিপত্রে লিখিতভাবে খালাস পান নি। তিনি কলকাতাতেই শয্যাশায়ী হিসেবে ঘরের মধ্যে সেরেস্তাখানা পেতে জমিদারী সেরেস্তার কাগজ বুঝছেন। সুতরাং তাঁর যাওয়া হ'ল না।

আইনের এই দায়ের বন্ধনে বাঁধা না থাকলে এই যাওয়া নিয়ে হয়তো সমস্যা দাঁড়াত। রত্নেশ্বর রায় যেতে চাইতেন না। এ নিয়ে একটা সংঘর্ষ বাধাও বিচিত্র ছিল না।

তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখেছেন—"আমি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছি। ইংরাজী শিক্ষাও লাভ করিয়াছি। আমি এদেশের প্রাচীনকালের মানুষের মত অন্ধবিশ্বাসী নহি। তন্ত্রও আমি পড়িয়াছি। কিন্তু বীরাচার বা কামাচার বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহার ফল যে যাহাই পাইয়া থাকুক তাহা পশু বা জন্তুধর্ম। তাহা কখনও মানবধর্ম হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে-কোন কর্মসিদ্ধি দুই উপায়েই সম্ভবপর, সৎপথে ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া সেই মত কর্ম করিয়াও সিদ্ধ করা যায়; আবার অসৎ উপায়েও করা যায়। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যুদ্ধ জয়, মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে মামলায় ডিগ্রি ইহা হামেশাই হইতেছে। যে-উপায়ে রবিনসনের উপর শোধ তোলা হইল, যে কৌশলের পথে আইনকে ফাঁকি দিয়া দে-সরকারের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলাম তাহা আইনসম্মত পথ নহে। কিন্তু ইহা বিষয়ব্যাপার এবং বাস্তবজীবনের ব্যাপার। কিন্তু যাহা ধর্ম যাহা ভগবৎতত্ত্ব ও সাধনা তাহা মানবের বিবেকবিরুদ্ধ অশুদ্ধ ক্লেদাক্ত পথে কখনওই সমর্থনীয় নহে। ইহাকে ধর্ম-অনুসারেই পাপ বলিতে হইবে। মহাপাপ—ঘৃণ্য কর্ম—বিবেকবিরোধী চিন্তা! শক্তিকে আমরা মাতৃরূপে অর্চনা করি। চণ্ডীতেই আছে—জগতের নারীজাতিই তাঁহার প্রতিভূ। নারী লইয়া ব্যভিচার করিয়া বিশ্বজগতের মাতৃরূপিণী

শক্তিকে যে ব্যক্তি বন্দিনী রক্ষিতার মত আয়ত্তাধীনে পাইতে চায়, সে ব্যক্তি নরকের কৃমিকীটের তুল্যই ঘৃণ্য। নরকের কৃমিকীট বিষ্ঠার মত কদর্য অভক্ষ্য বস্তু আহার করে ; মানুষ তাহা করিতে গেলে তাহাতে তাহার অপঘাত অপমৃত্যু ঘটে। সে প্রেত!"

দীর্ঘ দু পৃষ্ঠা ধরে লিখেছেন তাঁর মনের চিন্তা। এবং বাপ মা এবং বিমলাকান্তের প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছেন—তাঁরা কেন গেলেন, কোন মুখে গেলেন তা বুঝলাম না। রায় বংশ—ভট্টাচার্য বংশের স্মৃতি থেকে এই মহাপাতকীর নাম সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া উচিত।

* * *

পাগলাবাবা নবদ্বীপে পোড়া-মা তলার কিছুটা দূরে এক পাশে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, বিমলাকান্ত, মহেশচন্দ্র এবং সোফিয়া কলকাতা থেকে বজরা করে গিয়েছিলেন নবদ্বীপ। তবে যথাসাধ্য আত্মগোপন করে ছিলেন। মনে তাঁদেরও কিন্তু ছিল। পাগলাবাবার সবকিছুই তাঁরা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ওই কলমা পড়ে মুসলমান হওয়াটা তাঁরা স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি। সেই কারণে পথে বজরা থেকে নেমে নৌকো নিয়েছিলেন। বজরা বাঁধা ছিল শান্তিপুরের ঘাটে। নৌকো কলকাতা থেকেই সঙ্গে গিয়েছিল। নবদ্বীপে সাধারণ মনস্কামনা পরিপূর্ণার্থীর মত যেন ওই সিদ্ধ পাগলাবাবার কাছে এসেছেন, এই পরিচয় দিয়েছিলেন। গঙ্গার ঘাট থেকে গিয়েছিলেন পদব্রজে। বীরেশ্বর রায়ের জন্য একখানা গরুরগাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কারণ তাঁর পক্ষাঘাতের পঙ্গুত্ব সম্পূর্ণরূপে তখনও সারে নি।

পাগলাবাবার নবদ্বীপেও খ্যাতি হয়েছিল। অনেক লোক তাঁর কাছে আসত, এখানে তাঁর নাম পাগলাবাবা ছিল না। লোকে তাঁকে 'মা-বোলা বাবা' বা মা-বোলা ফকীর বলত। ফকীর মানে তিনি কলমা পরে মুসলমান হয়েছেন এ কথাটা গোপন ছিল না। প্রকাশ তিনি নিজেই করেছিলেন।

কারুর সঙ্গে কোন কথাই বলতেন না। মৌনী। শুধু মধ্যে মধ্যে বুকফাটানো করুণ আর্তনাদে ডাকতেন—মা, মা, মা! চোখ দিয়ে ধারা গড়াতো! বহুলোক আসত, ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকত, প্রশ্ন করত, কিন্তু তিনি থাকতেন নীরব নিস্পন্দ। গভীর রাত্রে ভাঙা গলার গান শুনেছে লোকে। তাও তাতে ভাষা নেই। একাক্ষরা গান। মা-মা-মা। মা-মা-মা-মা-মা। মা!

লোকে পয়সা দিয়ে যেত। পড়ে থাকত, তিনি কুড়োতেন না। খেতেন শুধু জল! কিন্তু এ সত্বেও দু-তিনজন ভক্ত তাঁর জুটেছিল। এদের কাছেই সামান্য কথাবার্তা বলতেন। তাও একান্তে। এদেরই তিনি বলেছিলেন—তিনি মুসলমান, তাঁর উচ্ছিষ্ট যেন হিন্দু কেউ না খায় ; কেউ যেন তাঁকে প্রণাম না করে! তিনি হিন্দুই ছিলেন—কিন্তু মায়ের কোপে বিপাকে পড়ে তাঁর হিন্দু জাত গিয়েছে।

রত্নেশ্বর রায়ের কাছে বর্ণনা করেছিলেন বীরেশ্বর রায়। রত্নেশ্বর লিখে রেখেছেন নিজের ডায়রীতে।

তাঁর ওই ভক্তরাই ব্যবস্থা করেছিল সাক্ষাৎকারের। তারাও জানত না 'মা-বোলা' ফকীরের

সঙ্গে এঁদের সম্পর্কের কথা। এবং সোফিয়া বাঈই ওঁদের মুখ রক্ষা করেছিল। ভক্তরাও বুঝেছিল এবং তারাও যাদের যাদের বলেছিল তারা জেনেছিল সোফিয়াই তাঁর আপনজন। সোফিয়ার সে সময়ের বেশভূষা সাদাজমি লালপেড়ে শাড়ী, এলো চুল, এবং প্রসাধনবর্জিত সাজ-সজ্জা কারুর মনে কোন সংশয়ই জাগতে দেয় নি। তারা ভেবেছিল সোফিয়াই ফকীরের বেটী আর এঁরা তাঁর প্রসাদধন্য ভক্ত!

দিনের আলোতে নয়, রাত্রে তাঁরা গিয়েছিলেন।

"যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে।" বীরেশ্বর রায় এই কথাটাই বলেছিলেন। উঠবার শক্তি তখন তাঁর ছিল না। তিনি সোফিয়াকে দেখে খুশী হয়েছিলেন, বলেছিলেন—এসেছিস মা! বস্।

দীর্ঘকাল পরে হ'লেও মহেশচন্দ্রকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই চিনেছিলেন, বলেছিলেন—মহেশ! আঃ বাঁচলাম!

জামাই বীরেশ্বর রায়, পুত্র বিমলাকান্ত, কন্যা ভবানীকে দেখে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—লজ্জায় আমি ম'রে যাচ্ছি। দুঃখের আর আমার পার নেই। সামনে কত জন্ম ধ'রে যে অন্ধকার, কতকাল যে অমাবস্যা তা জানি না। কিন্তু আজ লজ্জা আমার তার থেকে অনেক বেশী অনেক বড়। তোমাদের লজ্জা দিলাম। তোমাকে বিমলাকান্তকে।—তবে—।

তবে আমি তো সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছি। সম্বন্ধ তো নেই তোমাদের সঙ্গে। তবু ক্ষমা—ক্ষমা চাচ্ছি।

ভবানী এবার এসে তাঁর মাথার শিয়রে ব'সে তাঁর মাথাটা কোলে নিয়ে বসেছিলেন, এবং ডেকেছিলেন—বাবা!

তাঁর মুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছিলেন শ্যামাকান্ত। থরথর করে চিবুক ঠোঁট কেঁপেছিল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার স্থির হয়ে ঘাড় নেড়েছিলেন—না।

তারপর বলেছিলেন—সেও মরে গেছে। আমি প্রেত।

ভবানী বলেছিলেন—না। বারো বছর আমি সংসার স্বামী ত্যাগ ক'রে আপনার জন্যে তপস্যা করেছি। আপনি ভালো হয়েছেন, জ্ঞান ফিরেছে। এবার আপনি আপনার তপস্যার ফল পাবেন, সিদ্ধি পাবেন।

শ্যামাকান্ত আবার ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—না। নরক হবে আমার। আমি দেখতে পাচ্ছি। কত জন্ম যে ঘুরতে হবে তা জানি না। হ্যাঁ, তবে সেই দারুণ প্রহার আর করে না। গলাটা টিপে ধরে না। তবে সিদ্ধি-মুক্তি ও অনেকদূর। দক্ষিণেশ্বরে এক জন্ম-সিদ্ধ সাধক আমাকে বলেছে। লোকে তাকে এখনও চেনে নি। অল্পবয়সী পাগল পাগল মানুষ। ওখানে থাকে। পূজুরীর ভাই। সে আমাকে বলেছে। পাগলামীটা সেই সারালে। * সেই প্রহার থেকে মুক্তি দিলে। সে বললে—করেছিস কি পাগলাবাবা, মাকে মা চিনলি না—মেয়েছেলে বলে চিনলি রে! মা বলে ডাক। মা বলে ডাক। মা-মা বলে কাঁদ। কিন্তু—

ঘাড় নাড়লেন শ্যামাকান্ত, অর্থাৎ হ'ল না। বললেন—পারলাম কই? আবার ঘাড় নেড়ে বললেন—পারলাম না তো।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—এই সোফিকে প্রথম 'মা' বললাম। বাবা, মনে হল—সব বিশ্বসংসার মধু হল—পূর্ণিমার আলোয় ঝলমল করে উঠল। মনে হল সব তাপ জুড়িয়ে গেল। বাবা, কিছুক্ষণ পর আবার সোফির মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা ধ্বক ক'রে উঠল। কই মা? মা কেন হবে। যুবতী রূপসী নারী। সেই মোহিনী গো। মজার কথা কি জান—সোফি লজ্জা পেলে। চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকালে। মনকে আমি শাসন করলাম। বললাম—মা—মা। ওরে মা!

চুপ করে গিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। কিছুক্ষণ পর বললেন—তাই চলছে সারাজীবন। আজও। আজও বাসনা। সে মোহিনী হয়ে ওই মেয়ের মধ্যে থেকে অহরহ ভোলাচ্ছে। কত জন্ম যে লাগবে তা জানি না। এই মরব। আজই মরব। রাত্রে অমাবস্যা লাগবে—ওই লাগবে আর মরব। ভয় করছে। মা মা বলে ডাকছি। কিন্তু মধ্যে মনে হচ্ছে আসছে জন্মে—আসছে জন্মে—বাসনা যেন পূরণ হয়। সিদ্ধি যেন পাই!

ভবানীকে দেখতে বাসনা ছিল। রায়বাবুর ঘরে ভবানীর ছবিকে তার ছবি বলে ভুল করেছিলাম। দেখি নি ওকে—তাই জানিয়েছি। কিন্তু মহেশ ওর বিয়ে কেন দিলে! না দিলেই ভাল করতে। আমার তো শুধু ওই বাসনাই ছিল না। রাজা হবারও বাসনা ছিল। আমারই বংশ হ'ল তো! যদি আমার পাপ আশ্রয় করে?

ওই প্রশ্ন করেই চুপ করেছিলেন শ্যামাকান্ত, আর কথা বলেন নি!

এই কথাই রায় বংশের গুপ্ত কথা! আর এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছে রায় বংশের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে।

ভবানী দেবীর পিতা, বিমলাকান্তের পিতা—শ্যামাকান্ত মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। রত্নেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায়ের আপন পুত্র হয়েও পোষ্যপুত্র। সেও গুপ্ত কথা। সোমেশ্বর রায় অভিশপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর সেই ব্রাত্যানী মনোহরা বিলাসও গুপ্ত কথা।

হঠাৎ চুপ করে গেল সুরেশ্বর। তারপর বললে—শ্যামাকান্তের শেষকৃত্য হিন্দুমতে হয় নি। ভবানী দেবী বা বিমলাকান্ত অশৌচ পালন করেন নি। তাঁর শেষকৃত্য করেছিল সোফিয়া!

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—এই অন্ধ ধর্মবিশ্বাস মনুষ্যগণকে মানুষ হইতে দেবতা করে না। পিশাচ করিয়া তোলে। ধর্মবুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া পাপবুদ্ধি গোটা মানবসমাজকে, বিশেষ করিয়া হিন্দুসমাজকে, অন্ধকারের প্রেত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাকে আমি প্রশ্রয় দিব না। আমি জ্ঞানের আলোক হাতে লইয়া বিচরণ করিব।

যে পাপ আমাদের বংশকে আশ্রয় করিয়াছে, বলিয়াছেন ভ্রান্ত তান্ত্রিক, তাহাকে মুছিয়া দিব। ইহাই প্রতিজ্ঞা করিলাম।

একটু চুপ করলে সুরেশ্বর। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে ক্লান্ত হয়েছে বোধহয়। ডাকলে—রঘু!

রঘু এসে দাঁড়াল। সুরেশ্বর বললে—একটু চা খাওয়া।

সুলতা বললে—বাবু তোমার আজ খেয়েছেন রঘু? না, না-খেয়ে শুধু চা খেয়েই যাচ্ছেন? না খেয়ে থাকলে খাবার দিয়ো। আমি রয়েছি, খাওয়াব। রাত্রের জন্যে কি করছ?

রঘু বললে—উ তো অর্চি দিদি করছেন। সে বহুত্ কিছু করছেন।

সুরেশ্বর বললে—সে কি? কি করছে?

—পহেলে তো লুচি মান্‌সো আর মাছ বানাইবেন বললেন। তারপর বললেন—না লুচি না, ঘি-ভাত বানাইবেন। বিরিজ দাদাসাহেব ভি বললেন কি হাঁ—ঘি-ভাত বানাও অর্চি। জিমিদারী গেইলো তো আজ ভোজ লাগানা!

—কি কাণ্ড! যেমন অর্চি তেমনি ব্রজদা! অর্চি তো কাউকে নাড়তে ছুঁতে দেবে না। সে তো একাই সব করবে!

রঘু বললে—হাঁ, জলখাবার ভি উনহি বানাইয়ে ফেললেন। হামাকে বললেন দিবার জন্তে। থোড়া কুছ বাকী আছে। ঘিউ মে' চুড়া ভাজছেন। হামি চা বানাই? চা না কফি বানাইব?

অর্চনা নিজেই ঘরে ঢুকল, তার ত্ব-হাতে ত্বখানা প্লেট। নামিয়ে দিয়ে বললে—খাও!

সুরেশ্বর বললে—তুই এসব শুরু করেছিস কি? আমাকে বললি সন্ধ্যের মন্ত্র স্মরণ সেরেই এখানে এসে বসবি; তারপর এইসব শুরু করেছিস? ঘি-ভাত কে করতে বললে?

বাধা দিয়ে অর্চনা বললে—ব্রজদার সাধ হ'ল যে! বললে—অর্চি, তুই যখন কোমরে আঁচল বেঁধে তরকারী রাঁধবার জন্তে হাতা-খুন্তিই ধরবি তখন ভাল ক'রেই ধর। বেশ জুত্ করে রান্নাবান্না কর। বললাম—বেশ তো কি খাবে বল? বললে—দেখ জমিদারী উঠল, তার অনারে একটা ফিস্ট হয়ে যাক। গুষ্টীর সকলে থাকলেই ভাল হ'ত তা ওই কমলেশ্বর খুড়ো দিলে সব তেতো ক'রে! তা ছোট করেই হোক—ঘি-ভাত, মাংস-মাছ-দই-মিষ্টি—ভাজা। এই বেশ হয়ে যাবে। খাইনিও অনেকদিন! দেখ ব্রজদা তোর ভাঙা দেউলে রায়বাড়ীতে জন্মেও খেয়েছে প'রেছে ভাল। ওতে খেদ নেই আমার। এখন তো অন্ধ ফকীর। দিনরাত মালা জপি, বলি পার কর—পার কর। আজ কেমন ঘোর লেগেছে। মনে হচ্ছে শেষ জমিদারীটা করে নি। গানের আসর পাতলে ভাল হত—তা সে হবে না থাক। খাওয়া-দাওয়াটা কর!

একটু হেসে অর্চনা বললে—কি করব? বললাম—তাই করছি। ব্রজদা বসে আছে, মাংস চড়িয়ে এসেছি, সে ব'সে ব'সে ডিরেকশন দিচ্ছে। এতে সর্বনাশ সর্বনাশ করছ কেন? তোমরা কাহিনী বলছ শুনছ—বল, শোন—আমি এর মধ্যে সব করে ফেলছি!

সুলতা অর্চনাকে দেখছিল, নিবিষ্টচিত্তে এই মেয়েটিকে দেখছিল। সুরেশ্বর একটু আগে বলেছে তাকে যে, অর্চনা বিধবা হবার পর বি-এ পাশ করেছে। সংস্কৃত নিয়ে এম-এর কোর্স শেষ করে রেখেছে। কিন্তু অর্চনার কোথাও তার পরিচয় সে খুঁজে পাচ্ছে না। বেশভূষায় রকমেসকমে সেই সনাতন বাঙালী মেয়ে; একটু আগে দেখেছে একখানা মটকার কাপড় সাদামাটা ঢঙে প'ড়ে তার উপর সেই পর্দার চাদর গায়ে জড়িয়ে কালীমায়ের পুষ্প এনে মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে সন্ধ্যে করতে গেল। এখন একখানা নরুনপাড় কাপড় পরেছে, সায়া ব্লাউস আছে কিন্তু সে নেহাতই লজ্জা-নিবারণ মাত্র, তার মধ্যে কোন সৌন্দর্য নেই। কাপড়খানায় সেকেলে বাঙালীমেয়ের মত হাতের হলুদ তেলের দাগ লেগেছে। শরীর থেকে মসলার একটা

গন্ধও উঠছে।

সুলতার দৃষ্টির সঙ্গে হঠাৎ তার দৃষ্টি মিলতেই অর্চনা বললে—কি দেখছেন এমন ক'রে বলুন তো!

হেসে সুলতা বললে—আপনাকেই দেখছি।

—আমাকে? আমার মধ্যে কি খুঁজছেন? পুরুষেরা বেহায়া। কিন্তু আপনি তো তা নন।

—এমন অসাধারণ আপনি, কিন্তু কিছুতেই ধরা যায় না, আশ্চর্য সাধারণ সেজে রয়েছেন।

অর্চনা বললে—ও নিয়ে তর্ক পরে করব। তর্ক করতে গেলে রান্না নষ্ট হবে। ব্রজদা মাংস রান্নার ডিরেক্টার, গন্ধ শুঁকে ডিরেকশন দিচ্ছে, এক্ষুনি হাতা দেবার গন্ধের ইসারা পেলে হয়তো নিজেই হাতা ধরতে উঠবে, চোখে একরকম দেখতেই পায় না। হয়তো হাত-পা পোড়াবে। কিন্তু ডাকবে না।

সুরেশ্বর বললে—তা হলে তুই যা—। ব্রজদা এমন অদ্ভুত হয়ে গেল!

অর্চনা যাবার জন্যে ঘুরেছিল, কথাটা শুনে সে ফিরে দাঁড়াল। বললে—ব্রজদা কি বলছিল জান? অদ্ভুতই বটে ও।

—কি বলছিল?

—বলছিল—অর্চনা, আমার মধ্যে মধ্যে মনে হয় কি জানিস? আমি বললাম—কি? তো বললে—দেখ আমিই সেই শ্যামাকান্ত, বুঝলি ওই যে পতন হল—মরল। নরক ভোগ করে সে ঘুরছে। দু-তিন জন্ম পরে আবার রায়বংশে এসেছি। তেমনি চেহারা। গান গাইতেও পারি। তেমনি ব্যভিচারী ছিলাম। তেমনি রাজ্যসম্পদ ভোগের বাসনা। এই দেখ, মারটাও কেমন গেলাম দেখ, অন্ধ হয়ে গেলাম। এখন জপ করছি দিনরাত, কিন্তু করলে হবে কি, মেয়ের গলার সাড়া শুনলে জপ ভুল হয়ে যায়! অনুশোচনারও শেষ নেই, কামনারও অন্ত নেই!

সুলতা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—আপনারা এইসব বিশ্বাস করেন না কি?

অর্চনা হেসে বললে—বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি বলুন? এ আবার পৃথিবী নয় জন্মান্তর। না হয় নাই মানলুম জন্মান্তর। কিন্তু ফ্যামিলী ক্যারেকটার? হেরিডিটি? ব্রজদা যা বলেছে, তাতে এ বংশের সবাই শ্যামাকান্ত। ওই যে বসে সুরোদা—। ও সমস্ত জীবনটা একরকম তপস্যা করে মেয়েদের থেকে দূরে থেকেছে। আপনাকে ভালবেসেছিল, সে যে কি ভালবাসা আমি জানি। আপনি হয়তো নাও জানতে পারেন। সেই সুরোদা হঠাৎ একদিন কুইনীকে দেখে পাগল হয়ে গেল। যখন সুরোদা রায়বংশের সব কথাই বলছে তখন এ কথাও বলবে। আমি খানিকটা আগে বলে দিয়ে যতিভঙ্গ, ছন্দোভঙ্গ করে গেলাম!

রঘু কফির কাপ হাতে ঘরে ঢুকল এবং বললে—বিরিজবাবু ডাকছেন আপনাকে।

—ওই! আমি চললাম! আমাকে ব্রজদাকে কফি দিয়ে আসিস রঘু। ঠাণ্ডা হলে গায়ে ঢেলে দেব কিন্তু।

অর্চনা চলে গেল।

সুরেশ্বর খাবারের ডিসটা এগিয়ে দিল। সুলতা কফিটা তুলে নিয়ে বললে—তুমি খাও। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে আমি বুঝতে পারছি।

—উহুঁ, তুমি ঠিক করেছ। কফিটা জুড়িয়ে যাবে।

—ভাল হবে, কোল্ড কফি হবে।

সুরেশ্বর কফিটা নামিয়ে রাখলে কিন্তু খাবারটা টেনে নিলে না, অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সুলতা বললে—ভাবতে বসলে যে।

—হ্যাঁ ভাবছি। ভাবছি অর্চনা একটা কথা বলে গেল। বলে গেল কুইনির কথা। হ্যাঁ সুলতা, কুইনীর উপর একটা আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সে আর্টিস্টের আকর্ষণ একটি সুন্দর রূপের উপর। কুইনী রক্তমাংসের মানবী, সুতরাং বলব না ফুলের উপর আকর্ষণের মত। তবে তা ছাড়াও একটা কথা আছে। কুইনীর কাছে আমার দেনা ছিল।

সুলতা তার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে অতুলকাকার এবং মেজদিদির কনভিকশন হয়ে গেল, আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে বাড়ী ফিরলাম। রাত্রে হ্যারিস এল। বলেছিলাম তোমাকে সে যেন একটা সমন নিয়ে এল।

পরদিন ছবি আঁকব ভাবছিলাম, এমন সময় সে আবার এল হিলডার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে, এলিয়ট রোডের বাড়ীর একখানা ঘরের উপর আর কুইনীর উপর তার অধিকারের দাবী নিয়ে; আমি কথা দিয়েছিলাম, বিরক্ত হয়ে নিজেই গেলাম গোয়ানপাড়া। সেখানে হিলডা হ্যারিসের মুখের উপর যে জবাব দিলে, তাতে কুইনীর মায়ের পিতামহীর কলঙ্ককথা প্রকাশ ক'রে দিলে—বললে ঠাকুরদাস পালের ছেলে গোপাল পাল ভায়লেটকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারই জরিমানাস্বরূপ ওই বাড়ীখানা রায়বাহাদুর তাকে দিয়েছিলেন। দলিলে লেখা আছে—ওই বাড়ী ভোগ করবে ভায়লার গর্ভের প্রথম সন্তান। এবং তারই ছেলেমেয়েরা। ভায়লার বিয়েও দিয়েছিলেন, তাকে টাকা দিয়েছিলেন। হ্যারিস অন্যবংশের ছেলে। মনে আছে তোমার। কিন্তু আমি লজ্জা পেয়েছিলাম। মাথা হেঁট করেছিলাম। কারণ আমি জানতাম, কুইনীর মাতামহ গোপাল পালের সন্তান নয়, গোপাল পাল নিজের জন্যে ভায়লাকে নিয়ে পালান নি। তিনি তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ মডার্ন ব্যক্তি দেবেশ্বর রায়ের জন্য। রায়বংশের কলঙ্ক ঢাকা দিয়েছিলেন রায়বাহাদুর সেটাকে গোপালের উপর চাপিয়ে। আমি জানতাম বলেই লজ্জা পেয়েছিলাম। কুইনীও এসব কথার উল্লেখে স্বাভাবিকভাবেই লজ্জিত ক্ষুব্ধ দুই হয়েছিল। সে এককথায় হ্যারিসকে দৃঢ়স্বরে 'না' জবাব দিয়েছিল। যার অর্থ আমি যাব না তোমার সঙ্গে এবং ঘরের অধিকারও দেব না, দুইই। বলেই চলে গিয়েছিল সেখান থেকে। আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করে ফিরবার পথে ওই ছবিখানা কল্পনা করতে করতে ফিরেছিলাম। ওই পরপর উপরে উপরে তিনখানা মুখ।

প্রথমটা শ্যামাকান্তের, তার উপরেরটা সোমেশ্বরের, তার উপরেরটা দেবেশ্বরের। তারও উপরে অনেক মুখ চাপানো যায় সুলতা, আমার বাবার জ্যেঠার জাঠতুতো ভায়েদের, ব্রজদার,

কার নয়, সর্বশেষ, ধনেশ্বর কাকার সেই দৈত্যাকার অর্ধোন্মাদ ছেলেটির।

পুরুষ এবং নারীর এই দেহবাদের খেলা মানুষের জীবনে পাপ স্বীকৃত হয়েছে কতকাল তা জানিনে। এবং মানুষের জীবনে যখন থেকে ভালবাসা এসেছে বিবাহ এসেছে, তখন থেকে ব্যভিচার সত্যিই পাপ—এতবড় লজ্জাও নেই আর এতবড় ধ্বংসের বীজও আর নেই। কিন্তু পাপ বলে যত সে বর্জন করতে চেয়েছে, তত সে-পাপ তাকে আশ্রয় করেছে বিচিত্রপথে। ধর্মের ছিদ্রপথে, শক্তি ও সম্পদের সিংহদ্বার দিয়ে। রাজা-বাদশাদের ঘরে হাজার দরুণে ক্রীতদাসী থাকত, লুঠে-আনা বাঁদী থাকত। ধনশালীদের ঘরেও কম থাকত না। আবার নিছক ডাকাত বোম্বেটেরাও কম যেত না। রায়বংশে এই দুটো পথ দিয়ে প্রবেশ করেছে এই পাপপ্রবৃত্তি। একে আমি সমর্থন করব কি ক'রে? এবং হয়তো ওই গোয়ানপাড়াতে শাড়ীপরা রুইনী আমার মনের মধ্যে এ প্রবৃত্তির স্পন্দন তুলেছিল। তাই যেন রায়বংশধর বলে আমি ভয় পেয়েছিলাম। বাড়ী এসে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী খুলে পড়তে বসেছিলাম। আগাগোড়া পড়ে জানতে চেয়েছিলাম সব।

সারাটা দিন কিছু খাই নি। ১৯৩৭-এর জানুয়ারী মাস। শীতটা একটু বেশীই ছিল। রঘুয়া স্নান করবার তাগিদ দিলে বলেছিলাম—না স্নান করব না। বড় শীত পড়েছে। আর শরীরটাও খারাপ-খারাপ করছে। ভাত-টাতও খাব না। চা আর পাঁউরুটি দিয়ে যা এখানে; এখানেই খাব।

রঘুয়া চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল। ওটা ওর স্বভাব। যে কথা মনোমত হয় না তার প্রতিবাদ করে না, কিন্তু কথাটা মেনে চলেও যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি বলেছিলাম—কি?

—ডাকডারবাবুর কাছে লোক ভেজি?

—না। সে ওবেলা হবে'খন।

—কুইনিন খেয়ে নেন—ইটার সাথ—। সে হুইস্কির বোতলটার দিকে ইঙ্গিত করেছিল। আমি সেদিন শিউরে উঠেছিলাম সুলতা। না।

ধর্ম সম্পদ শক্তি তিন যখন ব্যভিচারে প্রমত্ত করে মানুষকে তখন ওই বস্তুটাই তার প্রথম উপকরণ। না—। খাব না।

পড়তে শুরু করেছিলাম রায়বাহাদুরের ডায়রী। এই সময় আর একজন এলেন—কালীবাড়ীর পূজক। চরণোদক এবং নির্মাল্য দিয়ে এসেছেন রায়বাড়ীর সবচেয়ে মোটা শরীক এবং সম্পদশালী বংশধরটিকে দেবার জন্য।

এটার ব্যবস্থা করেছিলেন মেজদি। তিনি ধমকে বলে এসেছিলেন—রায়বাড়ীর অন্য শরিকেরা ঠাকুরবাড়ী গিয়ে পাতা পেড়ে খেয়ে আসে। ও যায় না। সকলের সঙ্গে ওর তুলনা চলে না। ওকে নিত্যি এসে দিয়ে যাবেন—চরণোদক পুষ্প!

কথাটা মানতেন পূজকেরা। শুধু ভয়েই নয় খানিকটা শ্রদ্ধাও ছিল। আমি কীর্তিহাটে আসবার পর থেকে; দেবসেবার জন্যে মেজদিদি অনেক ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠাকুরদের অভাব মিটেছিল।

আমি পূজককেও বলেছিলাম—না।

তারপরই বলেছিলাম—মানে, ওই তাকে রেখে যান, পরে আমি খাব। পুষ্প মাথায় ঠেকাব। এখনও স্নান করি নি, বাসি কাপড় ছাড়া হয় নি।

ধর্মের উপরে আমার সেদিন হুইস্কীর চেয়েও বেশী ভয় হয়েছিল। শুধু ভয় নয়, বিরাগ—তীব্র বিরাগ আমার মনে জেগে উঠেছিল। সম্পত্তি পূর্বপুরুষের, দেবতা তাঁরা স্থাপন করে গেছেন। তাছাড়া মনে পড়েছিল ভবানী দেবীকে। তাই ঘৃণা করতে পারি নি। মানুষের জীবনের বিষ বলতে পারি নি। নইলে—তাই সেদিন বলতাম উচ্চ কণ্ঠে এবং সম্পত্তি দেবোত্তর নইলে বলতাম—আর এক পয়সাও দেব না আমি পুজোর জন্যে।

একটানা পড়ে গিয়েছিলাম রত্নেশ্বর রায়ের দিনলিপির মধ্যে তার বংশকথা। রায়বাহাদুর বংশকথা শেষ করেছেন শ্যামাকান্তের মৃত্যুতে। তারপর রায়বাড়ীর বিবরণ রায়বাহাদুরের দৈনন্দিন ডায়রীতে তারিখে তারিখে লিখে গেছেন।

যখন শেষ করলাম বংশকথা তখন বেলা অপরাহ্নও পার হচ্ছে। অভিভূত চিত্ত নিয়ে উঠেছিলাম। চোখের উপর ভাসছিল শ্যামাকান্তের মৃত্যুদৃশ্য। কানে যেন শুনতে পাচ্ছিলাম শ্যামাকান্তের শেষ কথাগুলি।

বিশ্বের মহাশক্তিকে আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি সনাতনী নারীরূপে। যিনি হবেন তাঁর ভোগ্যা তাঁর দাসী। কি ভয়ঙ্কর বাসনা, কি নিঃসীম স্পর্ধা।

প্রচণ্ড আঘাতে বারবার আহত হয়েছেন—শক্তি বাঘিনীর শিকার নিয়ে খেলার মত নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে, বারবার তিনি মা বলতে চেয়েছেন, গড়িয়ে পড়তে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর কামার্ত শক্তি পিপাসার্ত চিত্ত বারবার 'না' বলেছে। মৃত্যুকালেও তিনি অকপটকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন! বলে গেছেন আবার তাঁকে আসতে হবে বাসনা পূর্ণ করতে। মহেশচন্দ্রকে বলে গেছেন—ভবানীর বিবাহ দিয়ে অন্যায় করেছ। তার গর্ভের সন্তানসূত্রে বংশেও এই বাসনা অর্শাবে!

রায়বাহাদুর দৃঢ়সংকল্প করেছিলেন, তাঁর বংশপরিচয়ের শেষে রয়েছে—আমি এ পাপকে মুছে দিয়ে যাব!

কিন্তু তা হয় নি!

বেদনা ভারাক্রান্তচিত্ত যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। রঘুকে ডেকে বলেছিলাম—ওই ছত্রিঘরে ইজিচেয়ার পেতে দে। নিজে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম ছত্রিঘরে। শীতের অপরাহ্নে সন্ধ্যার সেদিন আকাশটা গাঢ় লাল হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যা হতে তখনও আধঘণ্টা দেরী, কিন্তু সূর্য তখনই যেন আবীরের থালার মত হয়ে উঠেছে। ছত্রিঘরের মাথা থেকে পশ্চিমদিক্ অবারিত। একটা শালবন আছে। তার ওপারে দিগন্ত একেবারে কাঁসাইয়ের বাঁকের ওপার পর্যন্ত দেখা যায়।

ছত্রিঘরে চেয়ার পেতে ওইদিকে তাকিয়ে মনটা খানিকটা প্রীত হল। নিজে ছবি আঁকি—রঙের নেশা ধরল। আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের মত রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল বললে অর্থহীন কাব্য করা হবে। এবং তা ভাবিও নি। তবে চোখজুড়োনো লালচে আকাশের দিকে তাকিয়ে মন

খানিকটা সুস্থ হল।

কেমন জান—খুব একটা তীব্র শোকার্ত ক্ষোভ শান্ত হয়ে এলে যেমন হয় তেমনি। রঘুকে বললাম—কল্কি করে নিয়ে আয়।

মনে পড়ল মেজদিকে—তিনি থাকলে একটা সহজ সান্ত্বনা দিতে পারতেন। হয়তো বলতেন—ওরে তুই ভুল বুঝেছিস—শ্যামাকান্ত মুক্তি পেয়ে গেছেন, সিদ্ধি পেয়েছেন—ছেলের মতই মা তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

না-হয় বলতেন—ওরে ভাই, জগৎশুদ্ধই ওই চলছে রে। কম আর বেশী। বেশ তো, তুই না-হয় এর প্রায়শ্চিত্ত কর। মুক্তি দে রায়বংশকে! দীক্ষা নে—মা ভাব জগৎ-সংসারকে।

রামকৃষ্ণদেবের কথা বলে বলতেন—স্বয়ং পরমহংসদেব ঠাকুর শ্যামাকান্তের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। ও কি মিথ্যে হয়!

না-হয় একটা রাগ-সই রসিকতা করতেন।

হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। পায়ের শব্দটা নরম। তার সঙ্গে কাপড়ের খসখস শব্দ। দেখলাম অর্চনা এবং তার পিছনে কেউ!

অর্চনা সেই কাল রাত্রে মেজদিদির জন্যে কেঁদে চলে গেছে। তার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধের সংবাদটাও দিয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম—তুই ভাবিসনে, জগদীশ কাকার কাছে গিয়ে আমি তাঁকে বলে এর ব্যবস্থা করব। ওই বউ-মরা দারোগা পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে দেব না। আমি সম্বন্ধ করব—টাকাকড়ি যা লাগে ভার আমার। কিন্তু আজ সারাটা দিন তা মনে পড়ে নি। রায়বংশের পুরুষদের পাপের কথা ঘেঁটেই দিন শেষ করেছি। হয়তো তাই বলতে এসেছে। জগদীশকাকার অন্দরে কথাটা নিয়ে অনেকদূর এগিয়েছে।

একনজর দেখেই আমি মুখ ফেরালাম। সামনের দিকে তাকিয়ে বললাম—আয়!

অর্চনা বললে—তোমার শরীর না কি ভাল নেই? স্নান কর নি—সারাদিন খাও নি?

বুঝলাম রঘু বলেছে। কথাটা স্বীকার করে নিয়েই বললাম—হ্যাঁ।

—গোয়ানপাড়ার কুইনী এসেছে। আমার কাছে গিয়েছিল। তোমাকে কি বলবে।

—কুইনী?

—হ্যাঁ। এই তো আমার সঙ্গে।

এবার উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালাম—পূর্বমুখে, ওরা পশ্চিমদিকে মুখ করে ছত্রিঘরে ঢুকেছে। অর্চি আগে, কুইনী পিছনে একটু দূরে। সম্ভ্রম করে অর্চির সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে নি। আমার সম্মতির অপেক্ষা করছে। তাতে ছত্রির ছাদের ছায়াটা ওর মুখে বা গায়ে পড়ে নি, আকাশের লাল রঙের প্রতিফলন পড়েছে। শ্যামবর্ণা মেয়েটিকে বড় চমৎকার লাগল। ওবেলার মত নয়, এবেলা সে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। কৃশ্চান ঘরের মেয়ে, ওরা আমাদের বাঙালী হিন্দুদের থেকে আগেই ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে। ১৯৩৭ সালে তখনও আমাদের মেয়েরা কাপড় পরার এ ভঙ্গি আটপৌরে ক'রে তোলে নি। এমন রুখু চুল তখনও রেওয়াজ হয় নি। কিন্তু ওদের সমাজে এটা তখন আটপৌরে ব্যাপার।

তাছাড়া রূপ শুধু চোখই দেখে না, মনও দেখে। আমার মনটাই সেদিন কুইনীর উপর মমতাচ্ছন্ন হয়ে ছিল। ওর সঙ্গে যেন রক্তের আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। পরিপুর্ণ গোধুলি আলোর একটা বিশেষ রূপ আছে, যাকে বলে 'ক'নে-দেখা আলো'। কালো মেয়েও নাকি এ আলোয় সুন্দরী হয়ে ওঠে। তাই হয়েছিল কুইনী।

অর্চনা বললে—এস কুইনী!

কুইনী বললে—নমস্কার স্যার।

—কি খবর কুইনী? হ্যারিস কি আবার গোলমাল জুড়েছে?

—না স্যার। সে চলে গেছে।

—এস ভেতরে এস।

বসতে দেবার আসন ছিল না, আমি হেঁকে বললাম—রঘু দুখানা বেতের চেয়ার আন।

অর্চি বললে—আমি যাচ্ছি। পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর খাবার কি আছে দেখি। রঘু বলেছে তুমি সারাদিন দু-টুকরো পাউরুটি খেয়ে আছ। শরীর খারাপ তবু ডাক্তার ডাকতে দাও নি। আমি বুঝতে পারছি—মেজদিরা দুঃখ নিয়ে মাথা ভার করে মন খারাপ করে বসে আছ। পুরনো কাগজ ঘাঁটছ, কি খুঁজছ তুমিই জান।

সে চলে যেতে যেতে বললে—কুইনী যা বলবে তা তোমাকে গোপনে বলবে। তার জন্তেই আমার কাছে গিয়েছিল। তুমি বল কুইনী, আমি ভিতরে যাচ্ছি। কথাটা তুমি সেরে নাও।

বুকটা ধ্বক ক'রে উঠল। গোপনে কুইনী কি বলবে? সে কি জানে তার সঙ্গে রায়-বংশের সম্পর্কের কথা? তার মুখের দিকে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। সে দৃষ্টি তার রূপ দেখবার দৃষ্টি নয়, তার মন দেখবার দৃষ্টি!

কুইনী কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা পুরনো বড় খাম বের করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি ওগুলো কুইনী?

কুইনী মৃদুস্বরে বললে—এলিয়ট রোডের বাড়ীর দলিল আর তিনখানা চিঠি আছে এর মধ্যে। মা আমাকে মরবার সময় দিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি প'ড়ে দেখবেন।

হাতে ক'রে নিয়েও আমি বললাম—হ্যারিস যদি চলে গিয়ে থাকে তবে দলিল দেখার কি দরকার আছে? যদি মামলা-মকদ্দমা করে তখন দেখব বরং!

কুইনী মৃদুস্বরে কথা বলছিল, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়েছিল পুর্ণ দৃষ্টিতে। কোন সঙ্কোচ—যে সঙ্কোচ দরিদ্রের থাকে ধনীর কাছে, নারীর থাকে পুরুষের কাছে, তার একবিন্দু ছিল না তার দৃষ্টিতে। সে বললে—কিন্তু পড়ে দেখলে আমি খুশী হব!

—বেশ তাহ'লে পড়ব।

—তাহ'লে আমি যাই।

—সে কি? অর্চি আসুক।

—না। আমি যাই। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, ওপারে যেতে হবে। দেরী হয়ে যাবে। আমি অর্চিদিদিকে ব'লে যাব।

সে চলে গেল—আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। শীতের সন্ধ্যের মুখটায় সূর্য অত্যন্ত দ্রুত অস্ত যায়। ওই অস্তমান সূর্যকে সামনে রেখেই সে চলে গেল কাঁসাইয়ের গর্ভে নেমে। পিছন দিক থেকে একটা শিলুটের ছবির মত মনে হচ্ছিল। অর্চনা এসে বললে—আর বাইরে না। এর মধ্যেই কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। ভেতরে এস, ঠাণ্ডা লাগবে। কি দেখছ?

আঙুল দেখিয়ে বললাম—কুইনী যাচ্ছে। শিলুট ছবির মত।

অর্চনা বললে—মেয়েটা ওদের পাড়ায় খাপ খায় না।

—কি ক'রে খাবে। ও শিক্ষিত। তা ছাড়া ও তো বাঙালীই। তারপর যে কথাটা জিভের ডগায় এসে পড়ল তা বলতে গিয়ে থমকে গেলাম। বলতে গেলাম ও বাঙালীই শুধু নয়, ওর মধ্যে রায়বাড়ীর রক্তের সংশ্রব আছে।

আমার থমকে যাওয়াটা এত সুস্পষ্ট যে তা অর্চনার নজর এড়ায় নি। সে বললে—আর কি বল তো?

উত্তর খুঁজে যা পেলাম সে আর্টিস্টের উত্তর, বললাম—মেয়েটি বড় ভাল মডেল।

—মডেল? মানে ছবির?

—হ্যাঁ। ফিগারটি বড় ভাল। গোধূলির আলোয় ও দাঁড়িয়েছিল দেখেছিলি?

—দেখেছিলাম। কিন্তু ওসব মতলব ছাড়। কেলেঙ্কারির বাকী রাখবে না লোকে।

—বলেছিলাম—না। সে মতলব নেই। চল।

অর্চনা যে বলে গেল সুলতা, আমি কুইনীকে একদিন দেখে পাগল হয়ে গেলাম, সে ধারণার বীজ এইদিনটির এই ঘটনা। তবে—।

একটু চুপ করে থেকে সুরেশ্বর বললে—তবে একেবারে সত্য নয় এও আমি বলব না! সত্য কিছুটা আছে বৈকি। নইলে ওর ঋণশোধের জন্যে এতখানি হয়তো আমি করতাম না!

—ঋণ? সুলতা প্রশ্ন করলে।

সুরেশ্বর বললে—রায়বংশের বা আমার পিতামহের ঋণ!

—সেদিন যে পুরনো খামটা আমার হাতে সে দিয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যের পর সেখানা থেকে বের করেছিলাম তার মধ্যে যা আছে সব। একখানা দলিল। দলিলদাতা রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। গ্রহীতা ভায়োলেট পিক্র- যা দান করেছেন সে হল এলিয়ট রোডের বাড়ী।

দলিলখানায় বিশেষ কিছু নেই। বাড়ীটি ভায়োলেট পিক্রসের প্রথম গর্ভজাত সন্তান রোজারিও পিক্রসের সন্তান সন্ততিরা পাবে। ঈশ্বর-না-করুন যদি রোজারিও বা তার সন্তানের বংশ না থাকে তবে ওই বাড়ী কৃশ্চান আইনমতে তার অন্য উত্তরাধিকারী পাবে। দানের কারণ হিসেবে লিখেছেন—ভায়োলেট পিক্রসের পিতা পিক্রস এবং তার ভাই পিক্রস একসময় বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায়কে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে।

সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ছত্র। এর মধ্যে ফাঁক আছে। সে ফাঁক মারবার বা গোপন করবার

জন্য কোন চেষ্টা করেন নি। ফাঁকটা এই স্থূলতা যে, ভায়োলেটের বাপ-ভাইয়ের উপকারের মূল্য হিসেবে যে বাড়ী দান করছেন, সে বাড়ী ভায়োলেটকে দান করছেন না কেন বা তার গর্ভে রোজারিওর পরে যারা আসবে তারাই বা পাবে না কেন ? গোপাল পাল বা ঘোষের নাম দলিলে নেই।

এরপর ছিল দুখানা চিঠি।

একখানা রায়বাড়ীর এটর্নীর চিঠি। তিনি ভায়োলেটকে লিখছেন—রোজারিও পিক্রসের মা হিসেবে। লিখছেন—"ম্যাডাম, তোমার ছেলে রোজারিও পিক্রসের লেখাপড়া এবং শিক্ষাকাল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণের জন্য আমার মক্কেল মিঃ ডি রায় (জানবাজার-বাসী) সর্তসাপেক্ষে মাসিক একশত টাকার ব্যবস্থা করেছেন। এবং আপনার নিজের জন্য আজীবন মাসিক পঞ্চাশ টাকারও ব্যবস্থা ক'রে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। রোজারিও পিক্রস সম্পর্কে শর্ত এই যে, রোজারিওকে কোন উপযুক্ত মিশন স্কুলে পড়তে হবে, থাকতেও হবে স্কুলসংলগ্ন বোর্ডিংএ বা অপর কোন উপযুক্ত মিশন বোর্ডিংএ। এই খরচ সে তার আঠার বছর বয়স পর্য্যন্ত পাবে। কোন কারণেই লেখাপড়া ছেড়ে দিলে এ খরচ সে পাবে না। আপনার সম্পর্কে কোন শর্ত নেই। আপনি এই ৫০ টাকা বৃত্তি আজীবন পাবেন। আপনি রোজারিও পিক্রসকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আপিসে এলে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হবে।"

দ্বিতীয় পত্রখানা—আমার ঠাকুরদা দেবেশ্বর রায়ের নিজের হাতে লেখা এবং লিখেছিলেন ভায়োলেট পিক্রসকে।

সোজা ভায়োলেট সম্বোধন। ম্যাডাম নয়, প্রিয় নয়—My dear madam তো নয়ই। শুধু—ভায়োলেট!

তোমার পত্র পেয়েছি। রোজারিও লেখাপড়া ছেড়েছে সেই কারণে তার মাসিক খরচ বন্ধ হয়েছে। এই শর্তেই তাকে খরচ দেওয়া হ'ত। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ভায়লেট যে, রোজারিও সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও সে এই বয়সেই এমন দুর্দান্ত হয়ে গেল। তাকে শিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি করে তুলতে আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি, এ মনে করেও সান্ত্বনা পাচ্ছি না। তোমার সম্পর্কেও তাই ভায়োলেট। আমি তোমার সম্পর্কেও সকল খবর রাখি। আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না যে একদিন তুমি সত্যই আমাকে ভালবেসেছিলে। এবং আমিও সে-সময়ে তোমাকে ভালবাসতাম। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভুলতে পারি না যে, তুমি এবং আমি পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়ে ভালই করেছি। না-হলে দুজনেই নিষ্ঠুরতর যন্ত্রণা ভোগ করতাম। ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না। তবুও এক্ষেত্রে এই কথাটা ছাড়া আর কথা খুঁজে পাচ্ছি না যে, ঈশ্বর যা করেন তা' মঙ্গলের জন্যেই করেন। তোমার আজকের দুঃখদুর্দশা এ সবই তোমার কর্মফল। এর দায় বিন্দুমাত্র আমার নেই। তবু পুরনো দিনের কথা স্মরণ ক'রে এ মাস থেকে তোমার ৫০ টাকা বরাদ্দ বাড়িয়ে ১০০ টাকা করে দিলাম।

রোজারিওর প্রতি কর্তব্য আমি অবশ্য অস্বীকার করব না। সে লেখাপড়া করলে না। আমি খবর নিয়েছি শিক্ষকেরা তার সম্পর্কে কোন আশা করেন না। এবং তারা তাকে ইস্কুলে রাখতেও রাজী নন। এক্ষেত্রে আমি মনে করি তাকে এই সময় থেকেই কাজের মধ্যে টেনে

আনা উচিত। কাজ করতে করতে সে কাজের মানুষ হয়ে উঠতে পারে। তুমি তাকে আমাদের রে এ্যাণ্ড কোম্পানী—সোয়ালো লেন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ো, আমি তাকে চাকরী দেব। সে এখন মাসে ৮০৲ টাকা পাবে। এবং তাকে বলে দিয়ো, কাজে গাফিলতি হলে কাজ থেকে কোম্পানী যে কোন মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

পুরনো কটিদিনের স্মৃতিকে মনে করে তোমাকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।"

আরও একখানা চিঠি ছিল। সেখানা রে এ্যাণ্ড কোম্পানীর অফিসের চিঠি। চিঠিখানা মিসেস পিক্রুসের নামে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি।

"মিস্টার রোজারিও পিক্রুসের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। সে আমাদের একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল। কোম্পানী তার এই অকালমৃত্যুর কথা বিবেচনা করে তার একমাত্র কন্যার ভরণপোষণ এবং পড়াশোনার জন্য ব্যবস্থা করতে চায়। তুমি এর জন্য অনুগ্রহ ক'রে আমাদের এ্যাটর্নীর সঙ্গে দেখা কর।"

* * *

চিঠি ক'খানা পড়ে আমি বিস্মিত হলাম সুলতা।

রায়বংশের সঙ্গে সম্পর্কের কথা কুইনী জানে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল কি জান? মনে হয়েছিল এই চমৎকার মেয়েটি কুইনী আমার আপনার লোক। বারবার তাকে মনে পড়েছিল।

সুলতা, কুইনীকে প্রথম দেখেছিলাম মাস কয়েক আগে সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে হিলডার সঙ্গে। তখন সে ফ্রক পরত। নিতান্ত কিশোরী মেয়ে। তার কোন আকর্ষণই ছিল না। তারপর এতদিন পরে আগের দিন এবং আজ তাকে দেখলাম, সে শাড়ী পরেছে। একটা নারীত্বের আকর্ষণ এসেছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে যে মোহে পুরুষ মুগ্ধ হয়ে ছুটতে চায়, সে মোহ তখনও তার ছিল না।

অর্চনা বলে গেল, তাকে একদিন দেখেই আমি পাগল হয়েছিলাম, সেটা ঠিক নয়। ওটা ওর ভুল ধারণা।

সেদিন রাত্রে আমি ঘুমুতে পারিনি সুলতা! শুধু এই কথাটাই মনের মধ্যে ঘুরেছিল। কথার সঙ্গে কুইনী। বারবার তাকে মনে পড়েছিল। যতবার মনে করেছি ততবার অপরাধীর মত লজ্জাবোধ করেছি। মেয়েটি ওই দলিল এবং পত্র দুখানা দিয়ে কিছু না বলে চলে গেল। কিন্তু তার মধ্যে কিছু বলে গেল নিশ্চয়। সেটা কি—তা বুঝতে পারছিলাম না। একবার মনে হ'ল আমি যেমন একটি মমতা অনুভব করলাম, তেমনি কিছু বোধ থেকেই সে দিয়ে গেল! পরক্ষণেই মনই প্রতিবাদ করলে—না,—প্রচ্ছন্নভাবে তিরস্কার করে গেল। ঘৃণা জানিয়ে গেল। হয়তো কোন দাবী জানিয়ে গেল।

শেষপর্যন্ত শেষেরটাই মনে হল। তাই তো স্বাভাবিক। আমার থেকে ধনী যারা তাদের আচার-আচরণ বংশের ইতিহাসের আলোচনা তো ঘৃণার সঙ্গেই আমিও করে থাকি। তবে কুইনীই বা করবে না কেন? এটা সর্বকালের মনের কথা—কিন্তু একালে মন যেন উগ্র হয়েছে।

আগের কালে একথা মনেই থাকত। নালিশ জানালে ভগবানের কাছে জানাতো। একালে হয়তো সরাসরিই নালিশ জানিয়ে গেল মেয়েটি।

এরই মধ্যে একটা যেন পরিত্রাণের পথ পেলাম। পথটা সহজ, এই সংসারের প্রচলিত পথ। অর্থ দিয়ে ঋণ শোধ। এ ছাড়া আর পথই বা কি ?

একবার মন হ'ল কিছু টাকা কুইনীকে দেব। বলব—এটা তোমার পাওনা রায়বাড়ী থেকে, তুমি নাও।

আবার মনে হল—না। টাকা নয়, কুইনী যাতে সত্যি মানুষ হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করব। ম্যাট্রিক পাশ করুক। হিলডা বলছিল, ওকে মেদিনীপুর কৃশ্চান মিশন গার্লস স্কুলে ভর্তি করে দেবে, সেখানে খরচ লাগলে দেব। আর মায়ের নামে গার্লস স্কুলের বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে —সেটাকে তাড়াতাড়ি ওপেন করিয়ে দিই। কুইনী ম্যাট্রিক পাশ করলে ওই স্কুলে চাকরি দেব।

কলকাতায় কৃশ্চান সমাজে দুটো ভাগ আছে। একটা ভাগে বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন। তাঁদের সমাজ আলাদা। তাঁরা বাঙালীই। আর একটা সমাজ আছে—এলিয়ট রোডের এলাকাতেই এদের ভিড়—তারা কৃশ্চান, কিন্তু বাঙালী নয়, ভারতীয়ও নয় আবার ইংরেজও নয়। সেখানে গিয়ে যেন কুইনী হারিয়ে না-যায়। ভেবে ঠিক করছিলাম পরের দিন সকালে উঠেই যাব গোয়ানপাড়ায়, কুইনীকে ডেকে বলব—কুইনী, তোমার কাছে আত্মীয়ের দাবী নিয়েই কয়েকটা কথা বলব। তুমি শোন !

সকালে উঠেই শুনলাম রাত্রে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। অতুলকাকার এবং মেজদিদির মামলায় সরকারী পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল ছত্রিদের ছেলে শিবু সিং, তাকে কেউ জখম করেছে। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে তাদের গ্রামের ধারে একটা জঙ্গলের মধ্যে। তার ডান হাতের কব্জির নিচে থেকে আঙুল সমেত হাতখানা প্রায় সম্পূর্ণ কেটে গেছে—সামান্য মাত্র চামড়ায় লেগে আছে।

শিবু সিং রাত্রে শৌচে উঠেছিল। ওদের বাড়ী গ্রামের প্রান্তে। বাড়ীর পরেই একটা পুকুর, সেই পুকুর পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে শৌচে বসেছিল। এ ধরনের আক্রমণের ভয় তখন যথেষ্ট ছিল মেদিনীপুরে। গোটা মেদিনীপুরে পেডি, ডগলাস বার্জ মার্ডার কেসে সরকার সাক্ষী পান নি।

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার, এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার পুলিশের কথামত সাক্ষী দেন নি বলে ট্রাইবুন্যাল ব্যর্থ হয়েছে। আর একটা কেসে নাড়াজোল খাঁ রাজাদের এক কর্মচারীর ছেলে সাক্ষী ছিল, কিন্তু রাজাসাহেবের নির্দেশে ছেলের বাপ তাকে উল্টো কথা বলিয়ে কেস নষ্ট ক'রে দিয়েছে। সেই মেদিনীপুরে, শিবু সিংয়ের বাপ সরকারী দফাদার হরি সিং পদোন্নতির লোভে আর রায়বাবুদের ওপর বংশগত আক্রোশের বশে ছেলেকে উত্তেজিত করে সাক্ষী দিইয়ে, এ সম্পর্কে চিন্তিত এবং সতর্ক ছিল না, তা নয়, খুব সতর্কই ছিল। ছেলের সঙ্গে হরি সিং পাহারা দিতেও এসেছিল। এবং দাঁড়িয়েছিল জঙ্গলের বাইরে একটু দূরে।

হঠাৎ ছেলের চিৎকার শুনে বাপ ছুটে যখন গেল তখন জঙ্গল ঠেলে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল

কেউ। পিছন থেকে দেখেছে, চিনতে পারে নি। শিবু তখন পড়ে কাতরাচ্ছে ; তার হাতখানা পড়ে আছে মাটির ওপর।

আর পড়ে আছে একখানা কুকরীর খাপ। আনকোরা নতুন। সেই খাপখানা নিয়ে পুলিশ এসেছে ওবাড়ী। খাপের চামড়ার ওপর কালী দিয়েই মালিক নাম লিখেছে শখ ক'রে ; নামটা জগদীশ্বর রায়।

সুলতা, জগদীশ্বর কাকার কথা বলেছি। অর্চনার বাবা ; সবে দুদিন ফিরেছেন তীর্থ থেকে। কোন তীর্থ থেকে শখ ক'রে তিনি কুকরী কিনে এনেছিলেন, এবং খাপটার উপর নিজেই শক্ত কলমে কালী বুলিয়ে বুলিয়ে নাম লিখেছিলেন। এ খাপ্ সেই খাপ্।

বুকটা আমার কেঁপে উঠল সুলতা।

দুটি নাম এবং অসংখ্য প্রশ্ন মনের মধ্যে একসঙ্গে জেগে উঠল। জগদীশ্বর কাকার কুকরীর খাপ! অর্চনা তাঁর মেয়ে। অতুলের সহকারিণী! তারপর অসংখ্য প্রশ্ন। কিন্তু সে-সব প্রশ্ন ঢাকা দিয়ে অর্চনাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠল বড় হয়ে। তাই বা কেন, ওই প্রশ্নটাই একমাত্র প্রশ্ন হয়ে উঠল। এবার ওকে বাঁচাব কি ক'রে? এ কাজ কে করেছে সে জানে ওই সর্বনাশী মেয়েটা এবং কুকরীটা যে সেই বের করে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহই ছিল না আমার।

অর্চনা পুরনো শ্যাওলাধরা রায়বাড়ীর মেয়ে হয়েও এ-কালের মেয়ে। অতুলের সহযোগিনী হিসেবে যা করেছে তা জানি আমি। সেদিন রাত্রে ছাদের আলসেতে দাঁড়িয়ে আমাকে খাস কাছারীর কোথায় কি লুকোনো আছে তা বলে দিয়েছিল, সে সব মনে পড়ল আমার। মন থেকে সব মুছে গেল, ছুটে গেলাম ভিতর বাড়ী।

সেখানে গিয়ে দেখলাম, একজন ইনস্পেকটার এসে বসে আছেন। সঙ্গে একদল দশ-পনেরজন কনেস্টবল। চতুরঙ্গ-বাহিনী নিয়ে আসবার সুযোগ হয় নি। ভোরবেলা খবর পেয়ে হরি সিংহের বাড়ী এসে সমস্ত দেখে, শিবুকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েই, ওই খাপটায় জগদীশ্বর রায়ের নাম পেয়েই সরাসরি চলে এসেছেন। জগদীশ্বর রায়কে এ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবেন। তার যে ছেলে কটার বারো বছরের বেশী বয়স তাদেরও ছাড়বেন না।

এ বাড়ীকে বিশ্বাস নেই। শুধু ছেলেরাই নয়, এ বাড়ীর গৃহিণীও এতে জড়িয়ে আছেন, এ প্রমাণিত হয়ে গেছে।

শিবু তার এজাহারে বলেছে যে, আমি শৌচে বসেছি সেই সময়ে ঝোপের ভিতর থেকে একজন মুখে ফেটা বাঁধা লম্বা রোগা লোক বেরিয়ে আসে, আমি তাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকি, তখন লোকটা হাত তুলেছে উপরে চমকে দেখলাম হাতে একটা দায়ের মত কিছু চক্‌চক্ করছে। মাথায় মারবে বলে লক্ষ্য করেছে দেখে আমি ডান হাতখানা তুলে ছিলাম রুখ্‌বার জন্য—আঘাতটা পড়ল হাতের উপর। আমার চিৎকারে বাবা 'কি হ'ল' বলে ছুটে আসতে আসতে লোকটা এদিক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। তাকে চিনতে আমি পারি নি। তবে লোকটি অল্পবয়সী ছেলেছোকরা নয়, বয়স হয়েছে, আর তার গায়ে মদের গন্ধ ছিল।

বিবরণ প্রায় বারো আনা জগদীশ্বর রায়ের সঙ্গে মিলে যায়। তবে জগদীশ্বর কাকা রোগা নন, তার শরীর এখন যে রকম, তাতে তাঁকে স্থূলকায়ই বলা যায়।

এ ছাড়া আরও একটা জায়গায় গরমিল হচ্ছে। সেটা হ'ল এই যে, গতকাল সকালবেলা থেকেই রায়বাড়ীর বড় মেজতরফ অর্থাৎ শিবেশ্বর রায়ের প্রথমপক্ষের সন্তানদের কেউই বাড়ীতে নেই। তাঁরা সকালে এখান থেকে বেরিয়ে গেছেন। বাড়ীতে নেই। তাঁরা গেছেন তাঁদের মামার বাড়ী। হাওড়া জেলায় 'বাগনান' স্টেশনে নেমে মাইল দেড়েক পথ ; প্রাচীন জমিদার বাড়ী ; তাদের বাড়ীতে 'রটন্তী কালী' পূজা হয় সমারোহ ক'রে।

হয়তো তুমি জানো না সুলতা, রটন্তী কালীপূজা হয় মাঘ মাসের প্রথম কৃষ্ণা চতুর্দশীতে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ছিল ঘটনার দিন।

ধনেশ্বর কাকা এবং জগদীশ্বর কাকার মামাতো দুই ভাই শুধু জমিদারসন্তান নন, তাঁরা সরকারী চাকরিতে দিকপাল ব্যক্তি। বড় ভাই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট থেকে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। তিনি রায়বাহাদুর, ছোটভাই আর্মিতে ডাক্তার হিসেবে মেজর হয়েছিলেন। দুজনেই বসবাস করেন কলকাতায়, কিন্তু রটন্তী কালীপূজায় তাঁরা সপরিবারে আসেনই আসেন। এই কালীপূজার উপর তাঁদের অচলা ভক্তি। রায়বাহাদুর—মেজর সে যাই হয়ে থাকুন—তা এই মায়ের কৃপায়, এ বিশ্বাস তাঁদের হিমালয়ের মত দৃঢ়। তাঁদের জীবনে নজীর আছে, যে যখনই তাঁরা বিপদে পড়েছেন, তখনই এই দেবতাটি তাঁদের কৃপা করেছেন। সেই কৃপায় তাঁরা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। এবং যেবারই কোনপ্রকারে কোন অঙ্গহানি বা অবহেলা হয়েছে সেইবারই তাঁরা বিপদে পড়েছেন।

ছোটভাই মেজর সাহেব একবার বলেন, পেশবারে তখন পোস্টেড তিনি, তাঁর পুজোর তারিখ ভুল হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন সববার আসতে পারতেন না, কিন্তু পূজার দিনে নিরম্বু উপবাস করতেন। তারিখ ভুলের জন্য তাঁর উপবাস করা হয়নি। তাঁর ডায়রীর নোট অনুযায়ী উপবাসের কথা পরের দিন। ওখানে একটু গোলমাল হয়। ত্রয়োদশী সংযুক্ত চতুর্দশী, আর পূর্ণিমা সংযুক্ত চতুর্দশী নিয়ে গোল বাধে। যাই হোক, মেজর সাহেব তখন মেজর নন, ক্যাপ্টেন। রাত্রে সেদিন তাঁর জীবনসঙ্কট হয়েছিল। তার বিস্তৃত বিবরণ থাক, আমি সঠিক জানিনে, কিন্তু তিনি সেই সঙ্কটে মায়ের নাম জপ করেই পরিত্রাণ পান। এবং পরে দাদার চিঠিতে জানতে পারেন, সেইদিনই গিয়েছিল মায়ের পূজা। এবং একটি বলি নাকি দ্বিচ্ছেদ হয়েছিল!

রায়বাহাদুরেরও এমন অভিজ্ঞতা অনেক।

শুধু তাঁরাই নন, কীর্তিহাটে শিবেশ্বর রায়ের প্রথমপক্ষের তিন সন্তান ধনেশ্বর জগদীশ্বর-সুখেশ্বর এঁদেরও পক্ষ থেকে সেখানে বলি হয়। এবং দৌহিত্র হিসেবে পূজাতে সঙ্কল্পও হয়ে থাকে। এঁদের তার জন্য অর্থনৈতিক চিন্তা করতে হয় না, বলি ও ভোগের খরচ আসে তাঁদের মাতামহের দেওয়া জমি ও জমিদারীর আয় থেকে। বৎসরে পাঁচশো টাকা মুনাফা আজও তাঁরা পেয়ে থাকেন। জমির উৎপন্ন ধান থেকেও টাকা পান। এই রটন্তী কালীপূজার সময় গিয়েই তাঁরা মুনাফার টাকা এবং ধানের ভাগ নিয়ে বিক্রী করে টাকা নিয়ে বাড়ী ফেরেন। আগে সপরিবারে যেতেন, এখন মেয়েদের এবং ছোট ছেলেদের নিয়ে যান না। যারা শক্ত সমর্থ হয়েছে, যারা অসুবিধা ভোগ করতে পারবে তাদের নিয়েই যান। তাই বারো বছরের বেশী

বয়সের ছেলেদের নিয়ে তাঁরা কাল সকালে চলে গেছেন। বাড়ীতে থাকবার মধ্যে বড় মেজ তরফের মেয়েরা ছাড়া কেউ নেই।

থাকবার কথা, শিবেশ্বর ঠাকুরদার দ্বিতীয়পক্ষের দুই ছেলের, তাদেরও একজন কমলেশ্বর, গাঁজাখোর, চোর, সেও দাদাদের সঙ্গে গেছে। রটন্তী পুজোর ভোজ খেতে। আছে একা বিমলেশ্বর। মুখচোরা শান্ত কুনো লোক বিমলেশ্বর কাকা। বিশ্বসংসারের কাছে নিজেকে অপরাধী অক্ষম জ্ঞান ক'রে ঘরের কোণেই বাস ক'রে। আর মালা জপ করে, ত্রিসন্ধ্যা পূজা করে। বৈষ্ণবধর্মে তার দীক্ষা। মাছ খায় না, মাংস খায় না, গলায় কণ্ঠিও প'রে। চৈতন্য-চরিতামৃত পড়ে নিয়মিতভাবে। এক হাজার আটবার পড়বার সঙ্কল্প তার, তার মধ্যে দুশো বার পড়া হয়ে গেছে। সে ঘরের কোণেই বসে আছে পুজোর আসনে।

ইনস্‌পেকটর নায়েবকে ডেকে তার সামনে জগদীশ্বর কাকার ঘর সার্চ করেছেন। খুড়ীমাকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। অর্চনাকেও করেছেন। অর্চনা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। জগদীশ্বর কাকার বন্দুকটা পড়ে আছে তক্তাপোশের ওপর, লাইসেন্সটাও পড়ে আছে। তার সঙ্গে বহু পুরানো একখানা সরকারী চিঠি। লাইসেন্সটার সঙ্গে পিন দিয়ে গাঁথা রয়েছে। চিঠি-খানায় মেদিনীপুরের ডি-এম জগদীশ্বর রায়ের অসমসাহসের প্রশংসা ক'রেছেন একটা নরখাদক বাঘ মারার জন্য এবং লিখেছেন—সরকার এর জন্য খুশী হয়েছেন এবং তোমাকে একটা ডি-বি-বি-এল ব্রিজলোডিং গানের লাইসেন্স দিচ্ছেন।

আমি যেতেই ইনস্‌পেকটর বললেন—কি মশাই? আপনি কিছু জানেন নাকি?

কণ্ঠস্বর কঠিন দুর্বিনীত। কুটিল ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ এবং বাঁকা।

বললাম—কিসের?

—জানেন না কিছু, ন্যাকা সাজছেন না? শিবুকে কোপালে কে?

বললাম—না।

—কাল রাত্রে কি করেছেন? কোথায় ছিলেন?

—বাড়ীতে।

—বাড়ীতে? তাহলে এ বাড়ীর কুকরী নিয়ে ভূতে কুপিয়ে এল নাকি?

বললাম—বলতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু না-জানলে কি করে বলব?

—আপনারা জানেন। আপনাদিগে বলতে হবে। বলাব আমি।

ভিতরের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটছিল। কিন্তু কি করব? একলা আমি হলে হয়তো জবাব দিতাম। মার খেতাম। মারতে পারতাম না। কিন্তু জবাব দিয়ে মার খেয়েও অন্ততঃ তৃপ্ত হতাম যে সহ্য করি নি, নির্যাতন ভোগ করেছি। কিন্তু সামনে আমার ওই সর্বনাশী অর্চনা। তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে! মাটির উপর দৃষ্টি রেখে দরজার একটা বাজুতে ঠেস দিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

ইন্সপেকটর কুকরীর খাপটা সামনে ধ'রে বললেন—কি লেখা রয়েছে চামড়ার উপর কালী দিয়ে, পড়ুন। এই লেন্স দিয়ে দেখুন। কি এটা?

—জগদীশ্বর রায়, কীর্তিহাট!

—এটা ওখানে গেল কি করে ? বলুন কি করে গেল ? বলুন ? বলনা খুকী—অর্চনা, অর্চনা তোমার নাম, বল না কাকে দিয়েছ তোমরা ? কে চেয়ে নিয়ে গেছে ? বল ? সুরেশ্বরবাবু ? বাড়ীতে তো কাল থেকে লোক দুজন, ও বাড়ীতে ইনি। আর এ বাড়ীতে ওই বিমলেশ্বর—কুনো কাদার তাল লোকটা। ওর দ্বারা এটা হয় না। লোকটা মদ খায় না, বৈষ্ণব মানুষ। শিবু মদের গন্ধ পেয়েছে। আমার বিশ্বাস এটা এই এঁরই কাজ, নিজে করেন নি, টাকা-পয়সা আছে। মদ খান ছবি আঁকেন, নিজের এতখানি ক্ষমতা হবে না, তবে পারেন, টাকাপয়সা খরচ করে লোক দিয়ে করাতে পারেন। ওই অতুলেশ্বরের আর তার মায়ের কেসে টাকা জলের মত ঢেলেছেন। কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার আনিয়েছেন। এ কীর্তি ওঁর। কুকরীর খাপটা না-পেলে কথা ছিল, ভাবতাম দলের কারুর কীর্তি। কিন্তু এই খাপ বলছে এ এই বাড়ীর কারুর কীর্তি!

হঠাৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল অভদ্র সয়তানটা—এই অর্চনা!

চমকে উঠল অর্চনা।

—বল। বল। বল বলছি!

আমি থাকতে পারলাম না আর। আমি দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলাম—ওরই সমান চীৎকার করে বলে উঠলাম—ভদ্রভাবে কথা বলুন বলছি!

—হোয়াট ? বিকট চীৎকার করে উঠল ইনসপেকটরটা!

আমি অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বললাম—আপনি এই দেশেরই লোক, হয়তো ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা বৈদ্য হিন্দু। ভদ্রবংশের সন্তান আমরা—

—চোপ্‌ চোপ্‌ চোপ্‌—। ওসব বাক্যি বাসী হয়েছে, ওসব রাখ্‌—সত্যি কথা বল। নইলে বুটশুদ্ধ তোর বুকে চড়ে নাচব। আর এই রুল—তাকাল সে অর্চনার দিকে।

শিউরে উঠেছিলাম। অর্চনা থরথর করে কাঁপছিল। দুহাতে শক্ত ক'রে সে দরজার বাজু চেপে ধরলো। ঠিক এই সময় সুলতা, যা ঘটল, তার মত বিস্ময়কর ঘটনা আমার জীবনে বোধহয় ঘটে নি!

পিছন দিক থেকে একটি মৃদু কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হল—ওরা নয় ইনসপেকটর বাবু, আমি—আমি শিবুকে কুপিয়েছি।

চমকে ফিরে দেখলাম—দাঁড়িয়ে আছে বিমলেশ্বর। লম্বা রোগা মানুষটি, হাতে তার একটা কুকরী। কুকরীটা নামিয়ে দিয়ে বললে—এই নিন সেই কুকরীটা।

অবাক হয়ে গিয়েছিল সবাই। ইনস্‌পেকটর পর্যন্ত।

বিমলেশ্বর বললে—কাল সকালে যখন মেজদা'রা বাগনান গেল, যখন বউদি, অর্চনা ওঁদের সঙ্গে নীচে নেমে গেছিল, তখন ফাঁক পেয়ে ঘরে ঢুকে আমি কুকরীটা চুরি করে এনেছিলাম। এনেছিলাম এই জন্যে। মদ আমি খাই নি জীবনে। আমার বষ্টুম মন্ত্র। কিন্তু ওই গোপাল সিং-এর নাতি হরি সিংয়ের বেটা আমাদের বাড়ীর পাইকের বাচ্চা, আমাদের ইস্কুলে ফ্রিশিপে পড়ত, যে ভাবে আমার মায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে জেল খাটালে, সেটা—।

হঠাৎ চুপ করে গেল সে!

আমরাও সকলে চুপ করে রইলাম। কারুর কথা বলবার শক্তিও যেন ছিল না। একটা শব্দে আমাদের সে ভাবটা কাটল। দেখলাম—অর্চনা মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেছে। সম্ভবতঃ চেতনা হারিয়েছে; এই অবস্থা আর সহ্য করতে পারে নি।

মেজখুড়ীমা ঘোমটা টেনে ঘরের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অর্চনার পাশে বসে ডাকলেন—অর্চনা! অর্চনা।

অর্চনার সাড়া ছিল না। ইনস্পেকটর বললে—সেন্সলেস হয়ে গেছে। মুখে চোখে জল দিন।

বিমলেশ্বর অর্চনার এই অবস্থায় বিচলিত হন না। সে বললে—আমি দেশটেশ বুঝি না; স্বাধীনতা টাধিনতা নিয়েও আমি মাথা ঘামাই না। আমি ভগবানকে ডাকি, আর ঘরের মধ্যে থাকি। কারুর অনিষ্টে নেই ইষ্টেও নেই। কিন্তু হরি সিংয়ের বেটা শিবু সিং, যার ঠাকুরদার বাবা গোপাল সিংকে আমার ঠাকুরদা রায়বাহাদুর পথের ভিখিরী করে সাজা দিয়ে একটা ভাঁড় দিয়েছিলেন হাতে। দয়া করে জমিজেরাতও কিছু দিয়েছিলেন। তার এই শয়তানি, রায়বংশের গিন্নীর হাতে দড়ি পরানোর শয়তানিতে, আমার মনে বুকে আগুন জ্বলেছিল। ব'সে ব'সে ঘরে ভেবেছি আর কপালে ঘা মেরেছি। পরশুর আগের দিন খবর এসেছিল, মায়ের জেল হয়েছে। সুরেশ্বর তখনও ফেরেনি। পরশু সারাদিন যত ভেবেছি, তত পাগল হয়েছি। রাত্রে তুলসী-মালা ফেলে দিয়েছি। কালী মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলেছি, মা, তোমার শরণ নিলাম। তুমি বল দাও, সাহস দাও। কাউকে কিছু বলি নি। মনে মনে সঙ্কল্প করেছি শোধ নেব। আগের রায়বাড়ী হলে বরকন্দাজ পাঠাতাম, ধরে আনত বাপ-বেটাকে। কাছারীর থামে বেঁধে চাবকাতাম। ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতাম। ঘরে আগুন লাগাবার কথাও মনে হয়েছিল। কিন্তু তাতে ওদের মেয়েছেলেগুলো কষ্ট পেত। ঘর আবার নতুন হত। ভুলে যেত। [illegible] মনে মনে বিচার ক'রে ওই শিবুকেই সাজা দেব ঠিক করে-ছিলাম। খুন—খুনই করে ফেলব। নয় এমন জখম করব যে, যেন সারাজীবন মনে থাকে। রাত্রে বাবাকে স্বপ্ন দেখেছি! কাল সকালে উঠে ভেবেছিলাম জগদীশদার বন্দুকটা চুরি ক'রে গুলি করে মারব বেটাকে। সকালে যখন দাদারা বাগনান গেল, তখন মেয়েছেলেরা সব নিচে, ঘরখানা খোলা পড়ে ছিল, আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু বন্দুকটা নিতে গিয়ে নিলাম না। এতবড় জিনিসটা সামলাব কি করে? আর হয়তো সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ হবে। চোখে পড়ল নতুন কুকরীটা রয়েছে মেজদা'র বিছানার তলায়। ওইটেই বের ক'রে নিয়ে এলাম। লুকিয়ে রাখলাম। সারাদিন কালীমন্ত্র জপ করলাম। সন্ধ্যের সময় স্ত্রীকে বললাম—আমি যাচ্ছি বলরামপুর বাবাজীর আখড়ায়, ওখানে আজ কীর্তন হবে, ফিরতে রাত্রি হবে আমার। এখন যেতে হবে আটদিন। অষ্টাহ নামগান। স্ত্রী সন্দেহ করে নি। মধ্যে মধ্যে যাবার মধ্যে বলরামপুর যাই আমি। কালীমায়ের প্রসাদী কারণ সন্ধ্যেবেলা বড়দা খায়। আজ বড়দা নেই। আমি সেই প্রসাদটা খাব ভেবেছিলাম। কিন্তু সাহস হয় নি চাইতে। গোয়ানপাড়ায় চোলাই মদ মেলে। দু একজন গোপনে চোলাই ক'রে বিক্রী করে। আমি তাদের কাছে গিয়ে বড়দা'র নাম ক'রে মদ এনে মাকে নিবেদন করে খেয়ে গিয়েছিলাম। লুকিয়েছিলাম হরি

সিংয়ের বাড়ীর পাশের পুকুরপাড়ের জঙ্গলে। মতলব করেছিলাম, এমনি ক'রে লুকিয়ে থাকব, একদিন, দুদিন, তিনদিন, চারদিন—একদিনও কি খিড়কীতে হাত-পা ধুতেও বের হবে না! আমার ভাগ্য ভাল যে, সেইদিনই বের হল। হাতে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে হরি সিং আর আগে আগে শিবু। শিবু এসে শৌচে বসল পাশের জঙ্গলটাতেই। আমি সট্ করে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকলাম। তারপর—!

চুপ করলে বিমলেশ্বর।

নীরবে স্তম্ভিত হয়ে শুনে গেলাম সবাই। সে সেই অতি কুৎসিত অতি অশ্লীল ইনস্পেকটর পর্যন্ত। ওদিকে ততক্ষণে অর্চনার জ্ঞান ফিরেছে। সে স্থির অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছে বিমলেশ্বরের কথা!

বিমলেশ্বর বললে—আমার রক্তমাখা জামাটা আছে। সেটা নষ্ট করতে পারি নি। সেটাও আমি এনে দিচ্ছি।

এতক্ষণে ইন্সপেক্টর বললে—না। দাঁড়ান। আপনার সঙ্গে আমি যাব। ঘরটা সার্চ করব। একলা আপনাকে যেতে দেব না। আপনাকে আমি অবিশ্বাস করি নি। আপনাদের বাড়ীর নাড়ী নক্ষত্র আমরা সংগ্রহ করেছি। আপনি এ কাজ পারেন এ কথা কেউ ভাবতে পারে না। কিন্তু। একটু হেসে বললে—মানুষ সব পারে। কিছু অসাধ্য নাই।

সুরেশ্বর চুপ করলে। তারপর বললে—বিমলেশ্বরকে হাতকড়ি দিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল। যাবার সময় আমাকে বললে বিমলেশ্বর—সুরেশ্বর, দাদারা কেউ নেই, কমলেশ্বরও নেই, তোমাকেই বলে যাচ্ছি, ওরা রইল। দেখো একটু। ওরাও তোমার সঙ্গে একই বংশ। আর আমার জন্যে মিথ্যে উকীল-টুকীল দিয়ে টাকা খরচ ক'র না। আমার কোন আপশোস নেই। আমি রায়বাড়ীর বেইজ্জতির শোধ নিয়েছি।

* * *

বিমলেশ্বরকে নিয়ে গেল, আমি অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন অভিভূত আমি জীবনে হই নি। বিমলেশ্বরের স্ত্রী এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বিমলেশ্বরের স্ত্রীকে আজকেই যাকে ভাল করে দেখা বলে, তা প্রথম দেখলাম। বিমলেশ্বর ব্রজদার বয়সী। হয়তো দু-তিন বছরের বড়। কাকীমা আমার থেকে বয়সে ছোট। বর্ধমান শহরের উকীলের মেয়ে। শুনেছিলাম শক্ত কঠিন মেয়ে। বিমলেশ্বরের অংশমাফিক টাকা-কড়ি, ধান-পান, তিনি বুঝে নিতেন। বাইরে বের হতেন না, অন্তরালবর্তিনী থেকেই এ কাজ করে যেতেন। বিমলেশ্বরকে যে কথার যন্ত্রণা-গঞ্জনা দিতেন, সে নাকি বিমলেশ্বর ছাড়া কারুর সহ্য করার শক্তি ছিল না। তাঁর বড় মেয়ে তার বয়স বছর বারো, সেই ছিল তাঁর সেক্রেটারী থেকে পাইক বরকন্দাজ পর্যন্ত সবকিছু। নিজে পর্দা একটু বেশী মানতেন। জগদীশ্বর কাকা যে জগদীশ্বর কাকা, তার স্ত্রী থেকেও বেশী মানতেন তিনি।

তিনি আজ বাইরে এসে দাঁড়ালেন, মাথার ঘোমটা মাথার মাঝখানে তুলে দিয়ে। তিনি কাঁদেন নি। প্রথমেই এসে কঠিন ভাষায় অর্চনাকে বললেন—হল-হল? তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হল মা?

অর্চনা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কি বলছেন উনি? উনি কি অর্চনার সঙ্গে যোগাযোগের কথা জানেন?

তাড়াতাড়ি আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম—খুড়ীমা। সর্বনাশ হয়ে যাবে! খুড়ীমা! রায়বংশের। বুঝতে পারছেন না এ কথা ছড়ালে। বাকীটা বলতে পারলাম না।

আমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। তারপর ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে বললেন—আমি উকীলের মেয়ে, আমি বুঝি! থাক। বলে তিনি গিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করব? ফিরে চলে আসব? না, আর একটু বুঝিয়ে বলে আসব! কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে কয়েকটা কথা বলাই স্থির করে ডাকলাম—খুড়ীমা!

বিমলেশ্বরের মেয়ে শোভনা কাঁদছিল। খুড়ীমা বললেন ভিতর থেকে, আসতে বল্ ভেতরে।

ভিতরে গিয়ে দেখলাম, এসে তিনি বিছানায় উপুড় হয়ে পড়েছেন, কাঁদছিলেন বোধহয়। তখনও চোখ মুছছিলেন। উঠে বললেন—কিছু বলছ বাবা?

—বলছি খুড়ীমা!

—বল?

—যে কথাটা আপনি বলছিলেন খুড়ীমা—অর্চনার নাম ক'রে—

—সে তো সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধ করেছি বাবা। আমি বুঝি। তিনিও আমাকে একথা বুঝিয়ে গেছেন। কাল শেষরাত্রে যখন ফিরে এলেন ওইসব করে, তখন চিৎকার করে উঠতে গিয়েছিলাম। উনি মুখ চেপে ধরে বলেছিলেন—চেঁচালে এখুনি আমি নিজে মরব। সমস্ত কথা শুনে আমি কুকরীটা, রক্তমাখা জামাটা, কাপড়খানা সব নষ্ট করতে বলেছিলাম। উনি বলেছিলেন—পাপটা হাত থেকে পড়ে গেছে বর্ধমানের বউ। ওটা যদি পায়, তাহলে বিপদ হবে। মেজদার ঘাড়ে দায় গিয়ে পড়বে। অর্চনা দশা পড়বেই। কিন্তু তা তো হতে দেব না আমি। তবে আর শিবুকে মেরে এলাম কেন? সেই, ছোটমায়ের জেলের কারণ বলেই তো! এ যে তার থেকেও সর্বনাশ। রায়বংশের কুমারী মেয়ে, পদ্মফুল; লোকে বলে—সতীবউরাণী ঘুরে এসেছেন। এগুলো থাকবে! দরকার হলে বের করে দিতে হবে প্রমাণ হিসেবে। কিন্তু—

একটু চুপ করে থেকে বললেন—কিন্তু ওকে ক্ষমা আমি করতে পারব না বাবা। চিরজীবনে পারব না। এ কাজ উনি নিজে করতেন কিনা জানি না। ইন্সপেক্টর ঠিক বললে—মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। উনি সেই গোড়া থেকেই; এই কথাটা নিয়ে মধ্যে মধ্যে—হায়রে কপাল, আর আমরা এমন অপদার্থ যে ব্যাঙে লাথি মেরে গেল, তাই সইতে হল? ছোটমায়ের অতুলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে হরি সিংয়ের বেটা শিবু সিং? নিজে থেকে থানায় গিয়ে বলে এল। আমরা তার কিছু করতে পারলাম না! বলতেন আর ডাকতেন, হে রাজরাজেশ্বর, তুমি তো এখনও রয়েছ রায়বাড়ীতে! মা-কালী, তুমিও তো রয়েছ মা। এর বিচার তোমরা করবে না? অতুল ছোটমা রাজদ্রোহ করেছে, তোমাদের বিচারে শাস্তি হয় তো প্রাপ্য, হয়েছে শাস্তি

হোক। কিন্তু এই নেমকহারাম, এই অকৃতজ্ঞ শিবু সিং-এর বিচার কর! রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় ওর প্রপিতামহকে শেষ করে দিতেন; তাকে রক্ষা করেছিলেন সতী বউরাণী। তার এই প্রতিদান? এর বিচার করবে না?

বাবা, একদিন অর্চনা বারান্দায় যেতে যেতে বোধহয় শুনেছিল, সে হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললে—ন'কাকা, চুপ কর, আর লোক হাসিও না। চুপ কর! কথাগুলো শুনলে লোকে হাসবে!

উনি অবাক হয়ে চুপ করে গেলেন, আমিও গেলাম বাবা! উনি বললেন—কেন অর্চনা?

হেসে অর্চনা বললে—সে কি হাসি বাবা, দেখলে মরা-মানুষের অঙ্গেও জ্বালা ধরে। বললে—রাজরাজেশ্বর কি তোমার দারোয়ান না বরকন্দাজ, যে শিবু সিংকে তোমার হুকুমে ঘাড় ধরে লাঠিপেটা করতে যাবে? না মা-কালী রায়বাড়ীতে নবাবী আমলের তাতারিণী প্রহরিণী যে, তলোয়ার হাতে শিবুকে কাটতে ছুটবে! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! দুঃখ হয়েছে, ভগবান দুঃখ দূর কর। ভগবান ঝাড়ু হাতে জমাদারের মত দুঃখের জঞ্জাল সাফ করতে আসবেন, সুখ রয়েছে আরও সুখ দাও, তো ভগবান ঝুড়ি ভর্তি আরও সুখ মাথায় করে সঙ্গে সঙ্গে হাজির হবেন। চারটি খেতে দাও, পরতে দাও কি এই জন্যে? যারা নিজের দুঃখ নিজেরা দূর করতে পারে না, তার দুঃখ ভগবানের বাবা এসেও ঘোচাতে পারে না। বলি হ্যাঁ ন'কা, খাবার সময় তো নিজে যোগাড় করে এনে রেঁধে-বেড়ে হাতে তুলে খাও। তা দুঃখ নিজের হাতে ঘোচাতে পার না কেন? অপমানের শোধ তাই বা নিজে নিতে পার না কেন?

অবাক বাবা—, অবাক হয়ে গেলাম! উনি বললেন—তুই তো মিথ্যে বলিস নি অর্চনা! কথা তো ঠিক! কিন্তু শিখলি কার কাছে?

বললে কি জান? বললে—তুমি যে গোবিন্দের পূজো কর—সেই ঠাকুরের কাছ থেকে। মহাভারত পড়, পুণ্যের জন্যে পড়। ভাব তো কুরুক্ষেত্রের কথা; ঠাকুর তো দেহধারী, তখন—তিনি তো ইচ্ছে করলেই পাণ্ডবদের অপমানের প্রতিকার করতে—তাঁর চক্রকে ডেকে বললেই পারতেন—যাও চক্র, কৌরবদের সবংশে ধ্বংস করে দাও। কে আটকাতো বল? কিন্তু তিনিও তা করেন নি, পাণ্ডবরাও তা বলে নি। পাণ্ডবরা যুদ্ধ করে রাজ্য উদ্ধার করেছে—অপমানের শোধ নিয়েছে।

বলে আর দাঁড়ায় নি তখন—চলে গিয়েছিল। আমি বাবা তখনও ভাবতে পারিনি—এর ফল এই হবে। বরং ভালই মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল এই যে ওর উঠতে-বসতে ঠাকুর আর ঠাকুর, যা করেন তিনি, এটা যদি এতে ঘোচে তো ঘুচুক। জ্ঞান তো কোন কাজ করতেন না, যা করতাম আমি। উনি বছরে গোটা কুড়ি টাকা খরচ করে লটারীর টিকিট কিনতেন। যতবার বলেছি—কিছু কর, তা করেন নি! ভেবেছিলাম—'অর্চনার কথায় যদি এই ঘোরটা কাটে তো কাটুক!

এরপর বাবা অর্চনার কাছে উনি যেতেন। ডেকে কথা বলতেন। আমি কান দিই নি। অর্চনা বলছে বলুক!

কাল দুপুরে, রান্নাঘর থেকে দেখলাম—অর্চনা একটা কালো কিছু হাতে ক'রে ঘরে ঢুকল

—কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেল। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি—অর্চনা নিজে কুকরীটা ওঁকে দিয়ে গিয়েছিল। হয়তো উনি চেয়েছিলেন তা' হতে পারে। তবে দিয়ে গিয়েছে ও। ওই সর্বনাশী।

আমি খুব বিস্মিত হই নি! কুকরী অর্চনা বের করে দিয়েছে—এ সন্দেহ আমার গোড়া থেকে। কিন্তু অর্চনা যে—তার বুকে আগুনও জালিয়েছে, এ সন্দেহ হয়নি। অর্চনার এই নতুন চেহারায় আমি ভয় পেলাম!

খুড়ীমা বললেন—আমি ওকে অভিশম্পাত দেব বাবা সুরেশ্বর। দেখো তুমি, ও যেমন একটা নিরীহ মানুষের এমন সর্বনাশ করলে—আমার কপালে এমন করে আগুন জালিয়ে দিলে, এর ফল ওকে পেতে হবে। ও জীবনে সুখী হবে না। বিয়ের বাসরে বিধবা হবে। হয়তো নিজের স্বামীর মৃত্যুর হেতু হবে ওই। এই আমার মত—আমার মত—দুঃখ ওকে পেতে হবে।

আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বলুন। মনের ক্ষোভটা বেরিয়ে যাক! পরে যা হয় হবে—এখন পুলিশের হাত থেকে অর্চনা বাঁচুক।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন—তোমার অনেক টাকা আছে সুরেশ্বর। আর সম্পত্তি সমস্ত পত্তনী দরপত্তনী হয়ে তোমার হাতে। তুমি ওই সিংদের উচ্ছেদ করবে—বল! এর শোধ নেবে!

কি করব? বললাম—করব।

বিবিমহলে ফিরে এসে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম, মনে হচ্ছিল এই অভিভূত অবস্থা থেকে বুঝি কোনদিন মুক্তি পাব না। এই রায়বাড়ীর মধ্যে থেকে কিছু একটা; কিছু একটাই বলি কেন, তার ভালো-মন্দ সব কর্মের ফল একটা অজগরের মত কোন গর্ত থেকে বেরিয়ে আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে। এ থেকে বোধহয় আমার আর মুক্তি নেই। শ্যামাকান্তের, সোমেশ্বরের, বীরেশ্বরের, রত্নেশ্বরের, দেবেশ্বরের, আমার জ্যেঠামশাইয়ের, বাবার সব কর্মফলের স্বাদ কেউ যেন আমার বুকে বসে আস্বাদন করাচ্ছে। শুধু তাই বা কেন, ব্রজদার কর্মফলের স্বাদ গ্রহণ করে তার দামও আমাকে মাথায় ব'য়ে দিয়ে আসতে হয়েছে।

ভাগ্য নিয়তি এ মানতাম না। আজও মানি না। তবে কর্মফলের ফলভোগ করতে হয় এবং বংশানুক্রমে সে বহুদূর প্রসারিত, এ-কথা আর না মেনে পারি না। সবিস্ময়ে সেদিন ভাবছিলাম গোপাল সিংয়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা হচ্ছিল, ওই অর্চনা মেয়েটার জন্যে। এ-মেয়েটাও এই পাকচক্রে জড়িয়ে পড়েছে। পুড়ে ছাই না-হয়ে যায়। ন কাকীমা ওকে অভিশম্পাত দিলেন। অভিশম্পাতে কিছু হয় না, কিন্তু কর্মচক্রের ঘুরপাকের পাকই শুধু নেই, ওর একটা নেশাও আছে। সে-নেশা কি ছাড়বে ও?

ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার নায়েব এসে ঢুকল। বললে—বিমলেশ্বরবাবুকে হাতকড়ি দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে গোটা গ্রামটা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সামনে দশজন কনেস্টবল, পিছনে দশজন।

কি বলব! চুপ ক'রে রইলাম। নায়েব বললে—উদ্দেশ্য ভয় দেখানো। সরকারের জরুকে

সাক্ষী দিয়েছিল শিবু, তাকে জখম করার ফল দেখ। শিবুর বড ভাই তাদের সঙ্গে যাচ্ছে আর বলছে—দেখ বাবা, গোপাল সিং ছত্রির অপমানের শোধ দেখ!

কথাটা যেন খচ ক'রে বুকে এসে বিঁধল সুলতার। গোপাল সিংয়ের অপমানের শোধ! কিন্তু গোপাল সিংয়ের অপরাধ!

হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ যেন ডাকলে—সুরেশ্বর রয়েছ?

নায়েব বললে—দয়াল ভট্টচাজমশায়। শুনলাম উনি দেখে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদেছেন। বোধহয় এই কথাই বলতে এসেছেন।

বললাম—যান, নিয়ে আসুন।

প্রায় আশী বছরের বৃদ্ধ। এখনও বেশ সবল আছেন। নিজে এখনও সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে যান। তিনি এসেছেন।

একা তিনি নন, আমাদের জ্ঞাতি উরু ভটচাজ, তিনিও এসেছেন।

দয়াল ভটচাজ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের জ্ঞাতিভাই। বয়সে অনেক ছোট। রায়-বাহাদুরের মেজ ছেলে শিবেশ্বর রায়ের বন্ধু। বয়সে বড় ছেলে দেবেশ্বর রায়ের থেকে দু'-চার বছরের বড়। কিন্তু দেবেশ্বর রায় ছিলেন সে আমলের এলিট, ইংরিজীতে অতিপারঙ্গম, সাহেবী মেজাজের মানুষ। আর আভিজাত্য-গৌরবে অতি উচ্চশীর্ষ। সম্পদের এবং বংশ-গৌরবের উচ্চপীঠ থেকে কখনও মাটিতে নামতেন না। বাল্যবয়সে গোপাল পালের সঙ্গে যে প্রীতি হয়েছিল, সেটা ঠিক প্রীতি নয়, ভক্তের প্রতি দেবতার বাৎসল্যের মত প্রেম। কীর্তিহাটের লোকেরা তাঁর নাগাল পেত না। তাই তাঁদের বয়সীরা সকলে আশ্রয় করেছিল শিবেশ্বর রায়কে। দয়াল ভটচাজেরা বংশানুক্রমে রায়বংশের গুণমুগ্ধ, প্রেমমুগ্ধ। সে কুড়ারাম রায় ভটচাজের আমল থেকে। দয়াল ভটচাজের প্রপিতামহ কুড়ারাম রায় ভটচাজের অনুগত জ্ঞাতিভাই হিসেবে তাঁর সম্পত্তির তদ্বির-তদারক করতেন। কুড়ারাম রায় ভটচাজ তাঁকে বেতন দিতেন। তাছাড়াও তাঁকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। ওই সিদ্ধাসনের জঙ্গল, রায় বন্থুরামের দেওয়া লাখরাজ ছিটমহল, চিতারং-এর আবাদী জমির সবটুকুই তাঁকে দিয়ে যজমান-সেবী ব্রাহ্মণ থেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সৎ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে। একে জ্ঞাতি, তার উপর উপকৃত এই পরিবারটি দয়াল ভটচাজ পর্যন্ত চারপুরুষ ধরে রায়বাড়ীকে সম্ভ্রম ও মমতা দুই নিয়ে আঁকড়ে ধরে আছেন। কখনও রায়বংশের নিন্দা শুনতে পারেন না। তাঁদের দুঃখের দিনে তার ভাগ নিতে এগিয়ে আসেন সর্বাগ্রে। আজ দয়াল ভটচাজ এসেছেন। সঙ্গে উরু ভটচাজ এসেছে। উরু ভটচাজ ধনেশ্বর রায়ের বন্ধু, থিয়েটার-পাগল, নিঃসন্তান, উল্লাসময় মানুষ। শিবেশ্বর রায়ের আমলে ধনেশ্বরের সঙ্গে থিয়েটার করেছেন। আমোদে-প্রমোদে-উল্লাসে শিবেশ্বর রায়ের সঙ্গী। সেই প্রীতির সম্পর্কটুকু তিনি ভুলতে পারেন না, তিনিও এসেছেন।

সুরেশ্বর বললে—বড় মিষ্ট লেগেছিল তাঁদের সেদিন। আত্মীয়তা যে এত মধুর, এর আগে ঠিক অনুভব করিনি। মেজদি, অর্চনা আমার জ্ঞাতি আত্মীয় নয়, ওরা আমার আপনজন।

সম্ভ্রম করেই সেদিন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম—আসুন। বসুন! চেয়ার এগিয়ে দিতে পা বাড়িয়েছিলাম। নিজেই চেয়ার নিয়ে বসে দয়ালদাদু বিনা ভূমিকায় কিছু বলতে উদ্যত হয়েও বলতে পারলেন না। তাঁর ঠোঁট-দুটো কাঁপতে লাগল।

উরুকাকা কথা বললেন—বললেন—ঠাকুরদা সেই তখন থেকে কাঁদছেন। বিমলেশ্বরের কোমরে দড়ি বেঁধে হাতকড়া পরিয়ে—। ওঃ, সে বড় মর্মান্তিক দৃশ্য, ওঃ।

দয়ালদাদু বলে উঠলেন—কাঁদতে কাঁদতেই বললেন—এই কি দেখতে পারা যায়!

—ওঃ! ঠিক বলেছেন। আবালবৃদ্ধবনিতা কাঁদছে। কাঁদবে না। রায়বংশের ছেলে। কীর্তিহাট—কীর্তিহাট রায়বংশের কীর্তিতে। তার বংশধর, তাও বিমলেশ্বরের মত ধর্মপ্রাণ ছেলে। ওঃ! কালের কি কুটিল গতি। অতুলকে ধরে নিয়ে গেল, মেজখুড়িমাকে নিয়ে গেল। লোকে গৌরব করেছে। সাবাস রায়বংশ। দেশের স্বাধীনতার জন্তে—ওঃ! আর এ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম আমি। ভাল লেগেছিল, লোকে বিমলেশ্বরের জন্তে কাঁদছে।

দয়ালদাদু বললেন—জামিনের চেষ্টা করবে না ভায়া? তুমিই তো বলতে গেলে রায়-বংশের পঞ্চপ্রদীপের একটি জলন্ত প্রদীপ। আর তো সব প্রদীপে তেল ফুরিয়েছে।

বললাম—হ্যাঁ, করব।

—বিমলেশ্বর নাকি বারণ করেছে?

—তা করুন। ম্লান হেসে আমি বললাম—তিনি আমার টাকা খরচের কথা ভেবেছেন, কিন্তু আমার সে শুনলে চলবে কেন?

উরুকাকা বললেন—শুধু তাই নয় ভায়া, এর শোধ তোমাকে নিতে হবে। হ্যাঁ।

দয়ালদাদু বললেন—যেমন ক'রে রায়বাহাদুর নিয়েছিলেন শোধ। ওঃ, ঋণের শেষ আর রণের শেষ এ রাখতে নেই। নিষেধ আছে। রায়বাহাদুর তা রাখতেন না। ক্ষুরধার বুদ্ধি। তেমনি বিচার! রণের শেষ তিনি রাখতেন না। কিন্তু তাঁর ভালো-মায়ের হুকুম। কি করবেন তিনি। গোপাল সিংয়ের স্ত্রী এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে নাটমন্দিরে। দয়াময়ী সতী-বউরানী—তিনি প্রার্থী ফেরাতেন না। কি করবেন? থেকে গেল রণের শেষ। বীরেশ্বর রায় হুকুম করলেন—থাক। সতীবউরানী অভয় দিয়েছে। থাক। তবে চোখের সামনে এনে রাখ। নজর রাখবে। থাক—বা... 'লুক খাঁচায় পুরে রাখা জমিদারীর একটা অঙ্গ। থাক।

উরুকাকা বললেন—হ্যাঁ। গোপাল সিং একটা বাঘ ছিল। এটা ঠিক। হরি সিংয়ের মত সাপ নয়।

* * *

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের জমিদারি জীবনের প্রথম কাজ শ্যামনগরের প্রতিশোধে দে-সরকারদের ঘরপোড়ানো। ট্যারা দে-সরকারের হাত ভেঙে দেওয়া। তখনও তিনি পোষ্যপুত্র হয়ে নিজের বাপমায়ের সন্তান হয়ে খাঁটি মালিক হন নি।

জন রবিনসনের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিল পিক্রস। করিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়। রত্নেশ্বর রায় জমিদারী পেয়ে জমিদার হিসেবে প্রথম বোঝাপড়া করেছিলেন গোপাল সিংহের সঙ্গে।

তাঁর ডায়রীর যে অংশে পূর্বকথা লেখা ছিল তার শেষ কথা গোপাল সিংয়ের কথা। লিখেছিলেন—"এবার গোপাল সিং ধ্বংসযজ্ঞ। সমিধ প্রস্তুত। আমি জমিদার হইয়া তাহাতে আহুতি দিব।"

এই কথাতেই পূর্বকথা শেষ। তারপরই আরম্ভ হয়েছে তাঁর দিনলিপি ডেলী ডায়রী। সেদিন ছিল দোলপূর্ণিমা। ১২৬৪ সাল। সেদিনের ডায়রী লিখতে গিয়েও তিনি গোপাল সিংয়ের কথা ভুলতে পারেন নি।

সেদিন বীরেশ্বর রায় যজ্ঞ করে রত্নেশ্বরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিলেন।

বীরেশ্বর রায় এই অনুষ্ঠানে বিরাট উদ্যোগ করেছিলেন। জীবনের এতদিনের সমস্ত দুর্ভোগ দুশ্চিন্তা অশান্তির স্তূপকে বোধহয় এই যজ্ঞে জ্বালিয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিলেন।

উৎসব তখনকার দিনে যতরকম হতে পারে, করেছিলেন; কবিগান, খেমটা নাচ, বাঈনাচ, যাত্রাগান, পাঁচালী, আতসবাজী, রায়বেঁশের নাচ, তারের খেলা—কোন কিছু বাদ দেন নি।

সোফিয়া বাঈ এসেছিল। সোফিয়া বাঈ কিন্তু বাঈ হিসেবে আসেনি। সে এসেছিল সত্যকারের আত্মীয়ের মর্যাদা নিয়ে। সে কালটা ছিল বিচিত্র; গোপন পর্যন্ত ছিল না যে এই সোফিয়া বাঈই বীরেশ্বর রায়ের অনুগৃহীতা। এ মর্যাদা তাকে দিয়েছিলেন ভবানী দেবী স্বয়ং।

রত্নেশ্বর রায় কিন্তু এর মধ্যেও গোপাল সিংকে ভোলেন নি। লিখেছেন—"এই অনুষ্ঠানে গোপাল সিং আইসে নাই। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।"

দেওয়ানজী গিরীন্দ্র আচার্য অনেক চিন্তা ক'রে এই অনুষ্ঠানেই একটি বিশেষ পর্ব যোগ করেছিলেন। রত্নেশ্বর বীরেশ্বর রায়ের আমমোক্তারনামার বলে এই অনুষ্ঠানেই সমুদয় খাস-মহালের মণ্ডলদের আহ্বান করেছিলেন। আগামী বৎসরের সদর পুণ্যাহের দিন ধার্য করে-ছিলেন এই দিনেই। মহলের হাটের ডাক, ঘাটের ডাক, জলকর ফলকর বনকর বাৎসরিক বন্দোবস্তির ব্যবস্থা ক'রে মৌজা বীরপুরেও ঢোলশহরৎ করে জানিয়েছিলেন বীরপুরের মণ্ডলান বন্দোবস্ত এই সময়েই হবে।

বীরপুর বন্দোবস্ত নেওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত গোপাল সিংকে নাকচ করবার জন্ম অনেক খরচ করে যে বিস্তৃত জাল ফেলেছিলেন, তা প্রায় বাতিল বা নাকচ হবার সম্ভাবনা ছিল এতে। তবু তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ এপর্যন্ত হাজার দরুনে যে সব বাকী খাজনার মামলা দায়ের হয়েছিল, তাতে বীরপুরকে মণ্ডলান তৌজি হিসেবে স্বীকার করা হয় নি। এই ঢোল-শহরতে 'মণ্ডলান' প্রথা স্বীকার করেছিলেন রায়েরা। তবে এতে গোপাল সিংকে আসতে হবে কীর্তিহাটে।

রত্নেশ্বর রায় তখন নতুন—তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হবে এতে?

—মণ্ডলান স্বত্ব ডাক হবে। অন্য লোকেও ডাকবে।

—যদি নিজে না আসে? অন্য লোক পাঠায়?

—বেনাম ডাক—নেব না। লিখে দিয়েছি। তা ছাড়া আমাদের সে রাইট আছে বাবুজী!

বলে বই খুলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—এই পড়ে দেখ—

"Their power to summon and if necessary to compel the attendance of their tanents was maintained."

আচার্য বলেছিলেন—হাত আমাদের লম্বা বাবুজী—খেলতে পারলেই হল। তোমার মাতুলের দোষ কি জান, বড় জেদী আর একগুঁয়ে। ওই যে ধরেছেন মণ্ডলান স্বত্ব স্বীকার করব না, তো করবই না! দেখ না আমি কি করি।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—শুনেছি বীরপুর মৌজার চার পাঁচখানা গ্রামের লোক, তার খুব বাধ্যও বটে, আবার বাঘের মত ভয়ও করে; কে ডাকতে আসবে তার সঙ্গে টোক্কর দিয়ে?

* * *

কথাটা মিথ্যে শোনেন নি রত্নেশ্বর। গোপাল সিং শ্যামনগরে গিয়ে তাঁর কাছে চড় খেয়ে শোধ নেবার জন্ম দে-সরকার এবং রবিনসনের কাছে যে আস্ফালন করেছিল তা কতখানি সত্য তা যাচাই করে নিয়েছিলেন রত্নেশ্বর!

বীরপুরের গোপাল সিং সত্যই বিচিত্র চরিত্রের মানুষ!

হয়তো সে আমলটাই বিচিত্র সুলতা! সে আমলে দুচারখানা গ্রামের মধ্যে এমনি ধরনের এক-একজন লোক ছিল। যারা ছিল গ্রামের সর্বেসর্বা প্রধান। তারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নয়, তারা সম্পত্তিশালী দুর্ধর্ষ লোক। চোর-ডাকাতকে শাসন করত, আবার আশ্রয় দিত, ধরে এনে বেঁধে মারত, আবার দারোগা ধরতে এলে তাকে লুকিয়ে রাখত। মামলায় টাকা দিয়ে সাহায্য করত, সাজা হয়ে গেলে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে জেলে যেত এই মানুষদের ভরসায়! দুর্বৎসরে খেতে দিত, সুবৎসরে কষে আদায় ক'রে নিত। দারোগাকে সেলাম করত। কনেস্টবলকে 'তুম্' বলত। রাইটার আর জমাদারকে বলত—ইয়ার। মাসে মাসে খাসী, বড় মাছ, ঘি, চাল, দুধ, তরকারী সাজিয়ে একটা ক'রে ভেট পাঠাতো। নিজে দিত না, পরের কাছ থেকে নিয়ে দিত। সাধুসন্ন্যাসীর সেবা করত, তুকতাকের কবচ মাদুলী নিত, শঙ্খনির্মাল্য নিত। কাপড় কম্বল দিয়ে বিদায় করত। কিন্তু ধর্মালোচনা করত না—শুনত না! মামলায় মিথ্যা বলত। দিনকে রাত করত, দরকার হলে খুন করাত; আবার বাত দিলে বলত জাত দিলাম। বাত রাখতে পারলে জাত থাকবে, নইলে বাতের সঙ্গে জাতও যাবে। কাউকে রক্ষা করব বললে প্রাণ দিয়ে যথাসর্বস্ব পণ করে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করত।

অধিকাংশেরই বিচার ছিল খেয়াল মত; বুদ্ধি তাদের ছিল না তা নয়, কিন্তু বুদ্ধির সবটাই ছিল কুটিল। ওই খেয়ালের বিচারকে সমর্থন করতে প্রয়োগ করত। মদ খেত, গাঁজা খেত; রক্ষিতা রাখত; রক্ষিতা থাকত ঘরেই। আবার উন্মত্ত হলে ও পাপে সীমা থাকত না।

আইন এরা মানত' না। নিজের এলাকায় নিজের আইন তৈরী করত। জমিদারদের ক্ষুদে সংস্করণ। জমিদাররা এদের জন্মেই এমন হয়েছিল, না, জমিদারদের অনুকরণে বা তাদের থেকে বাঁচবার জন্ম এমন হয়েছিল, তা বলতে পারব না সুলতা। সেটা অনুসন্ধান ক'রে

দেখতে পার। হয়তো বা সে কালের এইটেই ছিল রাষ্ট্রের চরিত্র, সমাজের চরিত্র, মানুষের চরিত্র।

গোপাল সিংয়ের কথা বলি।

গোপাল সিং বীরপুর মৌজার বাঘ ছিল। বাংলাদেশের মাটির মানুষ ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদগোপ মাহিষ্য এদের থেকে কিছু স্বতন্ত্র—ভুলতে পারত না সে ছত্রি। গ্রামের শ্রেষ্ঠ জমিটুকু ছিল তার। স্বচ্ছল সংসার। সম্পদ টাকাকড়ি কত ছিল বলা কঠিন কিন্তু ধান ছিল তার প্রচুর। একটা পুকুরের চারি পাড়ে খড়ের 'বড়' অর্থাৎ মোটা দড়ি পাকিয়ে তারই বেড় দিয়ে তৈরী গোলায় বাঁধা থাকত। কেউ বলে একশো কেউ বলে দেড়শো গোলা পুকুরটাকে ঘিরে, সে এক আশ্চর্য শোভার সৃষ্টি করত।

উঠত ভোরে, তারপর ডন বৈঠক দিয়ে ছোলা গুড় আর সদ্যদোওয়া ফেনাশুদ্ধ দুধ খেয়ে, লম্বা ছিলমে গাঁজা খেয়ে, মাথায় মুরেঠা বেঁধে গায়ে আংরাখা পরে, বেরিয়ে এসে একটা পাক দিয়ে আসত মাঠে। হেঁটে যেত না, যেত ঘোড়ায়। ভাল দেশী ঘোড়া ছিল তার। পাঞ্জাবী-দের কাছে কিনত। তারপর এসে বসত দলিজার তখতপোশে। মণ্ডলান তৌজি বীরপুরের মণ্ডল সে, তার সেরেস্তা ছিল, সেরেস্তা অবশ্য জমিদারের নামাঙ্কিত। খোকা থেকে সকল কাগজপত্রেই লেখা থাকত জমিদারের নাম। রসিদ 'চেক'-এতেও থাকত জমিদারের নাম জমিদারের শীলমোহর। তবে হুকুম ছিল তার। তার হুকুমে গোমস্তা কাজ করে যেত। 'রোকা' যা দিত তাতে তার দস্তখত থাকত জমিদারের মণ্ডল গোপাল সিং ছত্রি।

তখতপোশে বসে আবার খেত গাঁজা তারপর মদ। শুধু মদ গোপাল সিং কখনও খেত না। গাঁজা খেয়ে মদ খেতো। বলতো—বাবা, কালী মায়ের বেটা আমি। নেশা করি মাকে মনে দেখবার লেগে। তা নিচে পাতি বাবাকে, তারপর তার উপর খাড়া করি মাকে। মা তখুন জিভ বার ক'রে হাসে।

সবই ছিল তার প্রকাশ্য ব্যাপার। জীবনে যা অপ্রকাশ্য তা তার স্বার্থের ব্যাপার বিষয় ব্যাপার।

গ্রামের প্রজারা এসে বসে থাকত। তাদের নালিশ শুনত। জরিমানা আদায় করত। ভেট নিত। কেউ আনত খাসী কেউ আনত তরকারি, সে শাক পর্যন্ত; কেউ আনত ঘি কেউ দুধ। খাজনা আদায় হ'ত। দরখাস্ত জানাতো।

দলিজার কাজ সেরে গোপাল সিং স্নান করতে যেত পুকুরে; ঝাঁপিয়ে পড়ত কুমীরের মত। প্রচুর সাঁতার কেটে উঠত। তারপর কালীমা গোবিন্দজী থেকে ষষ্ঠীমাকে প্রণাম ক'রে এসে খেতে বসত। সে খাওয়াও নাকি একটা পর্ব ছিল। মাছের মাথা ভিন্ন খাওয়া হ'ত না। এবং পাঁচ পোয়া চালের ভাত সে খেতো। তার সঙ্গে ছোলার দাল। তারপর ঘুম। টানা সন্ধ্যে পর্যন্ত। সন্ধ্যের সময় উঠেই নেশা-যোগ। আগে বাবার ভোগ তারপর মায়ের ভোগের প্রসাদ পেয়ে সন্ধ্যার মজলিশ। সে গ্রামশুদ্ধ লোক। সে দুপুররাত্রি পর্যন্ত। তারপর অন্দরে। তিনটি বিবাহ ছিল—তার উপর ছিল রক্ষিতা দাসী!

কিন্তু এই সব নয় গোপাল সিংয়ের। বর্ষার সময় গোপাল সিংয়ের আর এক রূপ ছিল।

পাঁচখানা গ্রামের লোক আসত তার দলিজায়। বর্ষার ধান ফুরিয়েছে, চাষের সময় ধান চাই।

'গাঁজার নেশার পাটার উপর মদের নেশার বিগ্রহ চড়িয়ে' গোঁফে তা দিতে দিতে গোপাল সিং প্রশ্ন করত—কোন গ্রামের রে তোরা বেটারা ?

—পাঁচপাড়ার আমরা সিংমশায়!

—কতজনে নিবি কত ধান চাইরে শা—রা! হিসেব ক'রে বল।

—হিসেব ক'রে এনেছি সিংমশায়। চার পৌটী ধান আমাদের চাই।

মানে একশো ষাঠ মন!

গোপাল বলত—দেখ তো দাশজী, কোন কোন গোলায় পুরো এক এক পেটি ধান আছে ?

দাশজী গোমস্তা বলে দিত নম্বর।

গোপাল বলত—যা এই এই নম্বরের গোলা চারটে ভেঙে ধান নিয়ে যা। খড়ের বড় তুলে রেখে যা।

তারা চলে যেত খুশী হয়ে। আর একদল এসে দাঁড়াত—আমরা সাওতা থেকে এসেছি। প্রণাম।

—তোদের কত চাই ?

—আমাদের লোক কম, দু পৌটী চাই।

—শা-লোক কম কেনে রে ? বেশী হয়ে যা না। আমি বারণ করেছি। দুটো তিনটে বিয়ে কর। বলে দাও দাশ দুটো গোলার নম্বর।

আবার অন্য গ্রাম আসত। তারা নম্বর জেনে নিয়ে চলে যেতো। 'বাখরের' খড়ের দড়ি খুলে ধান তুলে গাড়ী বোঝাই করত; খড়ের দড়ি সযত্নে জড়ো করে রেখে যেত গোপাল সিংয়ের চাষবাড়ীতে। মেপে দেখার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু কম হ'ত না কখনও। আবার ধান উঠলে মাঘ মাসের শেষ থেকে শুরু করে গোটা ফাল্গুন ধানবোঝাই গাড়ী আসত। গ্রামের লোকেরা প্রণাম ক'রে বলত—আমরা পাঁচপাড়ার লোক ধান এনেছি।

—এনেছিস শা—রা। বেশ করেছিস। যা, যে বাখার ভেঙেছিলি সেই বাখারে ধান তুলে বড় বেঁধে দিয়ে যা। পুরো এনেছিস ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আসল সব আছে। তবে বাড়ি পুরো দিতে পারছি না সিংমশায়, এবার ফলন খারাপ।

—কত বাকী থাকল লিখে দিয়ে যা।

সিংয়ের তরফেও কেউ ধান মেপে নিত না।

শুধু এই নয়, গোপাল সিংয়ের আর এক চেহারা ছিল। বিবাদী সম্পত্তি দখল নিতে সাহায্যের জন্য লোক আসত। বিবাদী জমি দখল দিয়ে দিতে হবে সিংজী।

—কোথাকার গো ?

—নসীমপুরের।

—কার সঙ্গে, ফৌজদারি ?

—নসীমপুরের সাহাদের সঙ্গে।

—ওরা কাকে আনবে ?

—শুনছি—গোপ গাঁয়ের গোপদের।

—তারা গোপ ? শা—মরদ বটে !

—আপনাকে যেতে হবে।

—যাব। দুশো টাকা লিব।

—আজ্ঞে—

—ভাগ্‌রে শা—ভাগ। আজ্ঞেতে নেই গোপাল সিং। হাঁ বললে আছে! আধা টাকা রেখে যা। আধা টাকা গিয়ে আগে লিব—তারপরে নামব। মামলা খরচা শা—তোদের।

তাই ঠিক দিনে যেত গোপাল। কাটাকাটি ক'রে মিনিট পনেরোর মধ্যে দু চারটেকে ঘায়েল ক'রে তাদের ভাগিয়ে দিয়ে চলে আসত। দুচার লাঠি খেয়েও আসত। কিন্তু জখম হয়ে মাটি সে নেয় নি কখনও। ফৌজদারি মামলায় আসামী হত। কিন্তু বিচিত্র এ্যালিবি রেখে যেতো, যার জোরে অধিকাংশ সময় বেরিয়ে আসত।

কেউ আসত শত্রুর উপর শোধ নিতে হবে।

—কি করতে হবে ?

—শিক্ষা দিতে হবে।

—বাবা লিখাপড়ি জানি না আমি। মারধর জানি। জান লিতেও জানি। বাকী কি করতে হবে বল ?

—ঘা কতক উত্তম মধ্যম।

—শা—, হাত লিব না পা লিব না কান কেটে লিব তাই বল্। হাত পা ভাঙতে লিব একশো টাকা, কান কেটে লিতে দেড়শো !

জান নিতে হবে বললে বলত—কি করেছে তুমার ? বেটী বহু বহেন কারুকে বাহার করেছে ? তুমার কারুর জান লিছে ? সি হলে পর লিতে পারি। রাখো পানশো। নাম বলো। হদিশ বলো। সাতদিনের অন্দরে লাশ মিলবে মাঠে, না তো ঘাটে, না তো রাস্তার উপর ! না-হলি ভাগো !

ঘরে আগুন দিতে হলে পাঁচ দশ টাকা।

পথের মধ্যে লোকের সামনে কান মলে দিতে হলে পঁচিশ টাকা। তার সঙ্গে দুটো থাপ্পড় দিতে হলে আরও দশ টাকা। তার সঙ্গে গাঁজা মদ !

এও সব নয়। এমন যে গোপাল, থানায় তার খাতির খুব। খাসী মাছ ঘি তরকারি দুধ, মধ্যে মধ্যে টাকা, এ গোপাল দিত। কিন্তু তাই সব নয়। তার এলাকার কোন আসামীকে তার সাহায্য ভিন্ন পুলিশ ধরতে পারত না।

কিছুদিন আগে, শ্যামনগর পুড়িয়ে আসার পরই একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেকথা লোকের মুখে গল্প হয়ে উঠেছিল। সকালে দলিজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল থানার নতুন রাইটার, সঙ্গে দুজন কনেস্টবল। গোপাল সিং তাকে দেখেই 'আরে—আরে—আরে—'বলে পরম আগ্রহভরে এসে বলেছিল—চামারী সিং, কাহা জায়েগা ভাইয়া ? ই বাবু ?—

—আপনার ইলাকায় এলম সিংজী। ইনি নৌতুন জমাদার! বলে সে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল রাইটারবাবুর সঙ্গে।

গোপাল তাকে সাগ্রহে আহ্বান করেছিল তার বাড়ীতে। আসেন—আসেন। বসেন। তামাকুল পিয়েন। সরবত আন, পান আন, মদ আন। খাসী এনে কাট!

রাইটারবাবুটি পুরানো বন্ধু। সিংজীর সঙ্গে অনেক মন্থ পান করেছেন। তাঁর মারফতে অনেক ঘুষ নিয়েছেন। কিন্তু আজ তিনি কান দেন নি। তিনি আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—না। একজন ফেরারী আসামীর সন্ধানে এসেছি। খবর পেয়েছি সে এসেছে। আমাকে যেতেই হবে।

—আরে বসেন মশাই। উ শালাকে হামি হাজির করে দিব। কেনে ভাবছেন আপনি। বসেন, মৌজ করেন। মদ খান। রাত মে যা চান তাই দিব। কাল সকলে শা—কে লিয়ে মজেসে চলিয়ে যাবেন।

কিন্তু মুন্সীসাহেব শোনেননি। চলে গিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন সন্ধ্যে নাগাদ—অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়ে—শূন্য হাতে।

গোপাল আবার তাকে পাকড়েছিল। বসেন-বসেন। ই কি বাত! এই রাতে ফিরবেন, না খানা, না পিনা। তা হয় না মশা।

মুন্সীবাবু অগত্যা ছিলেন। সম্মুখে রাত্রি, পথও অনেকটা এবং ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত দুই-ই ছিলেন সকলে।

গোপাল তাদের সমাদর করে মন্থ, মাংস, খিচুড়ি, মাছের মুড়ো খাইয়ে বিছানা করে শুতে দিয়েছিল। একটি যুবতীও দিয়েছিল। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন মুন্সীবাবু। কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘরের মেঝেটা জলে ভিজে উঠেছে, বিছানা ভিজেছে এবং বাইরে থেকে কারা হুড় হুড় করে জল ঢালছে জানলা দিয়ে।

মেয়েটা একপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালটা ছিল শীতকাল। মুন্সীবাবু ভিজে বিছানায় শুয়েছিলেন, তাঁর কাপড়-জামাও ভিজে গেছে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে উঠে ঘরে পা দিতে গিয়ে কাদায় পা দিয়েছিলেন, মাটির মেঝে জলে ভিজে কাদা হয়ে উঠেছে।

এ কি?

মেয়েটা জবাব দিয়েছিল—সিংজী।

—সিংজী?

—হাঁ, সিংজীর লোকেরা জানালা দিয়ে জল ঢালছে।

—কেন?

—তা জানি না।

মুন্সীসাহেব দরজায় এসে খিল খুলে দরজা টেনে দেখেছিলেন, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। তিনি তারস্বরে চীৎকার করেছিলেন—সিংজী। সিংজী। গোপাল সিং বাবু। ও মশায়।

বাইরে অট্টহাস্য বেজে উঠেছিল। হা-হাঁ-হা! কেমন মজা!

এটা গোপালের কৌতুক। তার রসরসিকতা এইরকম। কিন্তু শেষ রক্ষা করেছিল

গোপাল। দরজা খুলে ভিজে মুন্সীকে বের করে শুকনো কাপড় পরিয়ে শুকনো ঘরে শুকনো শয্যায় শুতে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সকালে উঠেই মুন্সীসাহেব তাঁর ফেরারী আসামীকেও হাজির পেয়েছিলেন। গোপাল সিংয়ের লোকেরাই তাকে লুকিয়ে ফেলেছিল মুন্সী যেতে যেতে, আবার তারাই তাকে হাজির করে দিয়েছে মুন্সীজী উঠতে উঠতে।

গোপাল মুন্সীকে বলেছিল—এই লেও বাবা, তোমার আসামী। লিয়ে যাও। কিন্তু বাবা, গোপাল সিংকে ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাইও না। গোপাল ঘোড়া আছে না—হাঁতী আছে, উঁট আছে। ডিঙানো যায় না। বললাম—বস বাবা, মৌজ করো। শুনলে না। তাই হাতের খেল দেখিয়ে দিলম।

আসামীটাকে বলেছিল—যা রে শালা যা। বুরা কাম করিয়েছিস, সাজা লিতে হবে। আজ না লিস, কাল লিতে হবে। তা বা চলে যা। তোর 'বালবাচ্চা জরু অরু' রইল। আমি রইলম। খানে মিলবে, পরনের কাপড়া মিলবে। সো সব কুছ আমি দিব। যা।

* * *

এই গোপাল সিং।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের প্রথম দিনের ডায়রী দশ পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা। অনুষ্ঠানের উৎসবের বিবরণ থেকে মায়ের কোলে ফিরে আসার আবেগময় মনোভাবের বর্ণনার সঙ্গে গোপাল সিংয়ের কথা অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।

—সে যদি নাই আসে। তবে কি করবেন ? কে ডাকবে ? এই গোপালকে কে শক্র করবে ? অথচ মণ্ডলান তৌজী স্বীকার দোষ হয়ে যাচ্ছে। রত্নেশ্বর দেওয়ানকে চিন্তিতভাবেই কথাগুলো বলেছিলেন।

হেসে গিরীন্দ্র আচার্য বলেছিলেন—বাবুজী, লোক আছে। ডাকবার লোক আমার হাজির আছে।

—হাজির আছে ?

—কে ?

আচার্য ডেকে বলেছিলেন—ভগবান মণ্ডলকে ডাক তো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক দীর্ঘকায় প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা অনুপাতে শীর্ণকায় এক প্রৌঢ় এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিল।

ভগবান মণ্ডল অবস্থায় গোপাল সিংয়ের সমকক্ষ লোক। কিন্তু নির্বিরোধী। এতকাল পর্যন্ত গোপালের অনুগতই ছিল। সে যা বলেছে, তাই মেনেছে। কিন্তু আর মানবে না। সে ডাকতে প্রস্তুত আছে। কীর্তিহাটের জামাই সে। আচার্য তার শ্বশুর-শ্যালকদের দিয়ে তাকে জাগিয়েছেন। মণ্ডলান তুমি নাও। মাথা হেঁট করে কতকাল থাকবে ?

ভগবান রাজী হয়েই এসেছে এখানে।

গিরীন্দ্র আচার্য বলেছিলেন—ফৌজদারি হবেই। গোপাল ছাড়বে না। ওতেই সে জালে পড়বে। ভগবানকে সামনে রেখে লড়বে আমাদের লোক। গোয়ানদের আমি ঠিক করে রেখেছি। এই সমারোহের মধ্যেই বীরেশ্বর রায় গোয়ানদের বসতের জায়গা দিয়েছিলেন ওই সিদ্ধপীঠের জঙ্গলের পাশে খানিকটা দূরে ওই লালমাটির ডাঙার উপর। একেবারে কাঁসাইয়ের

ধারে। ছিলডার বাবা পিক্রুস ওদের সর্দার। পিক্রুস তখন পঁচিশ-তিরিশ বছরের জোয়ান। রবিনসনের মৃত্যুর পর পুলিশ তার উপর নজর রেখেছে। সে রায়বাবুর আশ্রয়ে এসেছিল বাঁচবার প্রত্যাশায়।

গোপাল সিং কিন্তু আসে নি। একটা গুজব কেমন করে রটেছিল যে বীরেশ্বর রায় প্রতিজ্ঞা করেছেন গোপাল এলে তাকে ধরে কালীমায়ের স্থানে নরবলি দেবেন। বিচিত্রভাবে গুজব নিজের গড়ন নিজে নেয় সংসারে। গুজব রটেছিল বীরেশ্বর রায়ের নিরুদ্দিষ্টা সতী বউ বারো বছর কালী সাধনা করেছেন। তার উদ্‌যাপন হবে নরবলি দিয়ে। গোপাল সেই বলি।

কথাটা সেকালে অবিশ্বাস্য ছিল না। নরবলি তখনও ছিল। তান্ত্রিকেরা দিত গোপনে শ্মশানে, লোকালয় থেকে দূরে ; ডাকাতেরা বড় ডাকাতি করবার আগে অনেক সময় নরবলি দিত। জেদের ক্ষেত্রে জমিদারেরাও নরবলি দিয়েছে। নিজে গোপালও বলি হিসেবে নরবলি না-দিক, নরহত্যা কয়েকটা করেছে, তার মধ্যে একটাকে নরবলিই বলা চলে। ছিরুদাসকে সে কালীপুজার রাতে অন্ধকার মাঠে এক কোপে কেটেছে। কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যে শিবপুরের ছিরুদাস একসময় দুর্দান্ত দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল—মানত' না সে কাউকেই। সম্পত্তিবান লোক, লোকে বলত একদল ডাকাত তার অধীনে আছে। বর্তমানে গোপাল সিং যা করে তাই সে তখন করত। বলতে গেলে গোপালের গুরুও সে বটে এবং গোপাল তাকে খুন করেই তার গদীতে বসেছে তাও বটে। স্থানীয় সম্পত্তিবান ব্রাহ্মণ কায়স্থ গন্ধবণিক তালুকদার পত্তনীদার এবং সংগৃহস্থেরা ছিরুদাসের ঔদ্ধত্যে পীড়িত এবং লাঞ্ছিত দুইই হয়েছিলেন। শেষে তাঁরা একজোট হয়ে প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হয়ে কাণ্ডটা করেছিলেন। গোপাল তখন নবীন যুবক। গন্ধবণিক তালুকদার লোকাই চন্দ হয়েছিল জোটের মাথা। সেদিন কালী পুজো। লোকাই চন্দের বাড়ীতে সেদিন গোপাল হাজির ছিল। নেমন্তন্নে গিয়েছিল। রাত্রি দুপুরে পুজো। লোকাই চন্দ উপোস করে বসেছিল। গোপালও বসেছিল কাছে। ওই কথাই হচ্ছিল। গোপাল বলেছিল—হামি পারি চন্দবাবু!

—তুমি পার ? হেসে বলেছিল—এত সোজা নয় গোপাল!

—না পারলে দুয়ো দিবেন। ছত্রি থেকে গোপাল খারিজ হয়ে যাবে!

মাথায় কারণের ঝোঁক ছিল, সেই ঝোঁকের মাথাতেই হচ্ছিল কথাবার্তা। এমন সময় একজন পাইক এসে বলেছিল—ছিরুদাস এসেছে।

—ছিরু দাস।

—হ্যাঁ। কালপুজোর খবর করতে এসেছে। নেমন্তন্নপত্ত করেছিলেন।

—নিয়ে আয়। না—আমি যাচ্ছি।

উঠে যাচ্ছিল চন্দ, গোপাল বলেছিল—হামাকে একটা তলোয়ার দিবেন ? কি দাও ? ঘরেই ক'খানা রামদা আর তলোয়ার সাজানো ছিল।

—গোপাল।

—দিয়া দেখেন।

—কিন্তু আমার গ্রামের মধ্যে নয়।

—ঠিক আছে। তাই হোবে।

—দেখে নিয়ে যাও!

—হামি এই দরজা দিয়ে নিকলে যাচ্ছি। একটুকুন দেরী করবেন।

ছিরু দাস চাষীর ছেলে, দুর্দান্তপনার জোরে সম্পত্তিবান হয়ে সে প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাবানদের গায়ে-গা-দিয়ে বসবার শখে একজন অনুচর সঙ্গে ক'রে কালীপূজার দিন সন্ধ্যে থেকে তত্ত্বতল্লাস করতে বেরিয়েছে। সে দাঁড়িয়েছিল কালীমূর্তির সামনে। চন্দ্র তাকে অতিথি হিসেবেই আহ্বান করেছিল। আপ্যায়িতও করেছিল। কয়েক পাত্র কারণ পান করে উঠেছিল ছিরু দাস।—উঠলাম চন্দ্রমশায়!

চন্দ্রের মনে দ্বিধা হচ্ছিল। অতিথি এসেছে! তার উপর গোপাল একলা গেল যদি না-পারে, তবে সব প্রকাশ হয়ে পড়বে।

চন্দ্র বলেছিল—আজ থাক না দাস।

—আজ্ঞে না। ওইটি আজ্ঞে করবেন না। বাড়ী আমাকে ফিরতেই হবে। অনেক শালা তক্কে আছে। আমি বাড়ী নাই জানলে বাড়ী মেরে দেবে। তাছাড়া গুরুর বারণ আছে—বাইরে রাত আমি কাটাব না। মানুষ ঘুমোয়—না—মরে। পরের বাড়ীতে ঘুম আর যমের দুয়োরে মাথা দেওয়া দুই সমান।

চন্দ্র বলেছিল—তবে সঙ্গে লোক দি, অপেক্ষা কর।

নিজের হাতের লাঠির মধ্য থেকে একটা ধারালো চকচকে গুপ্তি বার করে বলেছিল——"যাঁহা ছিরু দাস তাঁহাই ভীমপুর"। এই আমার দোসর। আপনাদের আশীর্বাদে মানুষ তো মানুষ ভূত প্রেত পিশাচে ছিরুকে পথ ছেড়ে দেয়।

বলে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল। গ্রাম পার হয়েই বিস্তীর্ণ মাঠ একটা। ছিরু চলে যাওয়ার আধঘণ্টাও হয় নি—মাঠ থেকে একটা চীৎকার উঠেছিল। সে চীৎকার ভীষণ চীৎকার। চমকে উঠেছিল চন্দ্র। কি হল?

গোপাল ধরা পড়ল? মরল? সে ভাবছিল লোক পাঠাবে কি পাঠাবে না। হঠাৎ ছুটে এসে পড়েছিল ছিরু দাসের সঙ্গের লোকটা।—চন্দ্রমশায়!

চন্দ্র আবার চমকে উঠেছিল।—কি হল?

হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটা বলেছিল—সর্বনাশ হয়ে গেল হুজুর। মাঠের মধ্যে একটা গাছের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল একটা দানোর মত কি! তারপর—

—তারপর কি?

—একখানা দা দিয়ে—

—কি? কি?

—দাস মশায়কে এক কোপ। তারপর আমাকে। আমার হাতে মশাল ছিল। আমি লাঠী ধরতেই পারলাম না। দাসমশায়ও গুপ্তি খুলতে পারলে না। আমার হাতে কোপ লেগেছে। মশাল পড়ে গিয়েছে। সে দাসমশায়ের বুকে বসে কোপাচ্ছে।

লোকজন গিয়েছিল হৈ হৈ করে। স্বয়ং চন্দ্র গিয়েছিল। হৈ হৈ সেই করিয়েছিল। গোপাল জানে, সেটা চন্দ্রমশায়ের ইশারা। গোপাল তখন অমাবস্যার অন্ধকারের মধ্যে দূরে চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে হেসে উঠে সেই জনহীন মাঠে বলে উঠছিল—জয়কালী!

পরদিন পরিচ্ছন্ন পোশাক প'রে মুরেঠা বেঁধে এসে চন্দ্রকে নমস্কার করে বলেছিল—আপনার বাড়ীতে কালীপুজো হয়েছে কাল। পেসাদ লিতে এলম।

চন্দ্র খাতির ক'রে বসিয়ে বলেছিল—এস—এস—এস। প্রসাদ সর্বাগ্রে তোমার হে! তুমি সাধক! বস!

কথাটা গোপালের মনে পড়েছিল। গোপাল সেইজন্তে আসে নি। তবে উকীল সে পাঠিয়েছিল! উকীল মজবুদ উকীল—মহিষাদল স্টেটের নায়েব। মহিষাদলের কাছারীতেও সে গিয়েছিল। রাজাবাহাদুর তাকে তিরস্কার করেছিলেন। গোপালের বিবরণ তাঁর অজানা ছিল না। বীরেশ্বর রায় তাঁর সঙ্গে যে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন, তিনি শীলদের সঙ্গে মিট-মাটের জন্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কাছে গিয়েছিলেন, রাজাবাহাদুরকে যে-কথা বলেছিলেন, সবকিছুই তাঁর কানে এসেছিল। এবং শ্যামনগরে সে দে-সরকার এবং রবিনসনের সঙ্গে হাতমিলিয়ে গোটা গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে এবং রত্নেশ্বরকে পুড়িয়ে মারবার জন্ত ঘরে শিকল দিয়ে বন্ধ করেছিল, তাও জানতেন।

তিনি বলেছিলেন—আমার উচিত এখান থেকেই তোমাকে বেঁধে কীর্তিহাটে পাঠানো। যাও তুমি, আমার সম্মুখ থেকে চলে যাও! আমি একটি কথাও তোমার জন্তে বলব না বলতে পারব না!

গোপাল অসহায় বোধ করেছিল প্রথমটা। তারপর সে নিজেকেই নিজে বলেছিল, কুছ পরোয়া নেহি হ্যায়।

তারপর ধরেছিল নায়েবকে। রাজাসাহেব এ নিমন্ত্রণে নিজে যাবেন না, তবে তাঁর আশীর্বাদী লৌকিকতা নিয়ে যাবে তাঁর সদর নায়েব। সেই নায়েবকে ধরেছিল গোপাল এবং কবুল করেছিল—খেয়া কোনরকমে ঘর ঢুকাংয়ে দিন নায়েববাবু, আমি একশো টাকা কবুল করছি আপনের নজরানা!

* * *

সেদিন গোপাল নিজে এলে কি হ'ত বলা কঠিন! সেদিন রায়বাড়ীতে দেবতা-মন্দির থেকে, কাছারী থেকে অন্দর পর্যন্ত পরিপূর্ণ প্রশান্তির একটি অতিপ্রসন্ন বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল।

নাটমন্দিরে হয়েছিল পোষ্যপুত্র গ্রহণের যজ্ঞ। বিমলাকান্ত অশ্রুসজল চক্ষে দান করেছিলেন কমলাকান্তকে, দান গ্রহণ করেছিলেন বীরেশ্বর এবং ভবানী দেবী। জল সকলের চোখ থেকেই গড়িয়ে পড়েছিল। তাঁরাও কেঁদেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরাও কেঁদেছিলেন।

যজ্ঞশেষে অন্দরে লক্ষ্মীর ঘরের সামনের দরদালানে রায় পরিবারের সকলে রত্নেশ্বরকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

প্রথমেই আশীর্বাদ করেছিলেন একসঙ্গে যুগলে বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবী।

সেই কাত্যায়নী দেবীর বোন বীরেশ্বর রায়ের মাসীমা বসে বলে দিচ্ছিলেন ক্রমপর্যায়। এ আর এক মানুষ। বীরেশ্বর রায় পুত্রের হাতে দিয়েছিলেন নিজের হাতের হীরের আংটি। ভবানী দেবী দিয়েছিলেন একসেট সোনার বাসন।

ভদ্রমহিলা বলেছিলেন—ওমা! বাটি যে খালি গো। ওতে বাটি ভরে দুধ দাও। তুমি মা। দাও দাও। ওগো দুধ আন—দুধ আন। সন্তান নিচ্ছে—মা—ও কি সোনায়-দানায় মেলে? মেলে মায়ের দুধে। একবাটি দুধে তোমার মাই থেকে গেলে একফোঁটা মিশিয়ে দাও। না-থাকে, ওই ঘরে যাও, গিয়ে দুধে মাইয়ের বোঁটা ঠেকিয়ে দাও! তারপর মুখে অন্ন দাও দুটি। ওই অন্নপ্রাসন হল। হ্যাঁ। তারপর দুজনে বস। বীরেশ্বর আর তুমি। বউমা, তুমি ছেলেকে আগে কোলে নাও। উঠে বস ভাই রাজাবাবু নাতি আমার, রায়বংশের এ কুল ও কুল দুকুলের শিবরাত্রির শলতে—মায়ের কোলে উঠে বস। মায়ের কোলে এলে তুমি। বা-বা-বা—কি মানিয়েছে দেখ! মা দুর্গার কোলে কাতিক! যশোদার কোলে গোপাল বলব না মা, গোপাল বড় নিষ্ঠুর, মাকে কাঁদিয়েছিলেন। মা কৌশল্যার রামচন্দ্র। এই ঠিক। ফিরে এল হারানিধি, এসে রাজপাটে বসবে! দুঃখ হচ্ছে কি জান—সীতা নাই! আঃ, আজ সীতা থাকলে কি হ'ত? আঃ, যাত্রায় গান শুনেছিলাম—অযোধ্যার প্রজারা কাঁধে ভার নিয়ে গান গেয়েছিল—'আয় ভাই ভার নিয়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।' এ ঠিক তাই!

কে ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠেছিল—তুমি তো রয়েছ ঠাকুমা, সীতা হয়ে বাঁয়ে ব'স না! আনন্দের টলমল সরোবরে যেন দমকা বাতাসে একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাস উঠেছিল। মেয়েরা সব হেসে উঠেছিল খিল খিল করে। বীরেশ্বর রায়ের মত দুর্দান্ত পুরুষের সামনেও তাদের হাসতে ভয় হয় নি!

বীরেশ্বর রায় নিজেও মৃদু মৃদু হেসেছিলেন।

ঠাকুমাটি বলেছিলেন—কে লা?

কেউ সাড়া দেয় নি। ঠাকুমা বলেছিলেন—এ নিশ্চয় অঞ্জনা! ও নইলে কে বলবে এমন কথা। মর—মর—মর। আমায় মানাবে না ভাবিস বুঝি? ওলো, আমি রাজকুমারী রাণী কাত্যায়নীর মাসতুতো বোন্। আমাদের গায়ের রঙ সোনার মত, রূপ আমাদের লক্ষ্মীর মত! সাজলে এখনও নাতিকে ভোলাতে পারি! মরণ!

আবার হাসির রোল উঠেছিল। ঠাকুমা বলেছিলেন—থাম, হাসিস নে, শুভকর্ম হয়ে যাক। বউমা, এইবার ছেলেকে চুমু খাও, খেয়ে তুমি বীরেশ্বরের কোলে দাও। নাও বাবা বীরু, কোলে নাও ছেলে, তোমার বংশধর—তুমিও চুমু খাও।

—এইবার নাতি, তুমি বস ভাই মা-বাবার সামনে কোলের কাছে। আমরা পাঁচজনে আশীর্বাদ করি। প্রথমে আমি!

বলে ধানদূর্বার সঙ্গে একটি মোহর দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। একখানি রূপোর থালায় মোহর সাজানো ছিল, বীরেশ্বর সেখানা ছেলেকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—প্রণাম কর। প্রণামী দাও।

রত্নেশ্বর রায় ঠাকুমাকে পাঁচখানা মোহর দিয়ে প্রণাম করেছিলেন।

পিছন থেকে সেই কণ্ঠস্বর আবার শোনা গিয়েছিল—সুদশুদ্ধ নগদ বিদেয় ঠাকুমা! সকলে আবার হেসে উঠল। এবার বেশী। যেন হাওয়াতে বর্ষার এলোমেলো মাতন লেগেছে। এবং কালটাও যেন ভরা-ভর্তি বর্ষা বলে মানিয়ে গেছে বড় ভাল।

ঠাকুমা মুখঝামটা দিয়ে বলেছিলেন—মর মর মর। এমন মুখ যদি না-হবে তো এমন কপাল হবে কেন তোর?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল—কেন ঠাকুমা, কপালটা আমার মন্দ কিসে বল। ফক্কাপুরের রাজরাণী, খুদকুঁড়োতে পেট ভরাই, রাত্রে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, বাড়ীর পাঁদাড়ে ঝোপে-ঝাড়ে শেয়াল ফৌজ পাহারা দেয়। রাজা আমার হবুচন্দর, খায়দায় কাঁসী বাজায়; কপাল আমার মন্দ কিসে বল?

বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, রত্নেশ্বর সকলেই এই মেয়েটির খোঁজে কৌতুক এবং কৌতূহলভরে তাকিয়ে দেখেছিলেন। কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পায় নি। মেয়েটি পিছনে আত্মগোপন ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—মেয়েটি কে মাসীমা?

—আমারও বটে তোমার মায়েরও বটে ভাইয়ের নাতনী। আমার আপন ভাই। তোমার মায়ের তা হলে মাসতুতো ভাই। তাহলে দেখ তোমার মামাতো ভায়ের বেটী। তোমার ভাইঝি সম্পর্কে, নাম হল অঞ্জনা। ওদের গেরামে অঞ্জনাঠাকরুণ কালীমা আছে, তার দোর ধরেই হল ওই বেটী। তা আমাকে মধ্যে মধ্যে লেকে চিঠি, তোমাদের খবর নেয়; এবারে তুমি রাজসুয় অশ্বমেধ করছ বাবা, দেশদেশান্তরের লোক এল। প্রজাসজ্জন, তালুকদার, পত্তনীদার, বড় বড় লোক, হাকিম হুকিম, তা আমিও ওকে লিকেছিলাম—আসবি—অবশ্যি অবশ্যি আসবি। চোখের সাথক ক'রে যাবি।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—বেশ করেছেন মাসীমা। উচিত করেছেন। বলা তো আমাদেরই কর্তব্য ছিল। তা আমরা তো ঠিক জানতাম না! বেশ করেছেন।

বীরেশ্বর রায় ভবানীকে বলেছিলেন—তুমি খবর করো!

এদিকে আশীর্বাদ একের পর এক হয়েই চলেছিল। রত্নেশ্বর প্রণাম ক'রে অন্ত সকলকেই এক মোহর ক'রে প্রণামী দিয়ে চলেছিলেন।

আশীর্বাদের পালা শেষ হ'তেই এসেছিল প্রণামের পালা। রত্নেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে যারা ছোট তারা এবং দাসীরা ভিড় করে এসেছিল এগিয়ে। হঠাৎ ঠাকুমা বলেছিলেন—অঞ্জনা কই? ও অঞ্জনা? তুই তো বড় লো! আয় আয়। কাল তো হিসেবে হল তুই সাতদিনের বড়! আয় না লো!

এবার এগিয়ে এল অঞ্জনা। বললে—না ঠাকুমা, প্রণাম আমি নিতে পারব না। আমি সাতদিনের বড়, উনি আমা থেকে চৌদ্দ আঙুল মাথায় উঁচু। আমি মনে মনেই বলছি—ভগবান মঙ্গল করুন। মা কালী রক্ষে করুন আপদে বিপদে। জমিদার আছেন রাজা হোন। বলেই সে এগিয়ে এসে প্রথম প্রণাম করেছিল বীরেশ্বর রায়কে। একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, সুন্দর মুখশ্রী, মাথায় একরাশ ফোলা কোঁকড়া চুল, নাকটি একটু খাটো, চোখ দুটি অপরূপ

সুন্দর ; একটু রোগা দেখাচ্ছে। পরনের কাপড়খানা পোশাকী কিন্তু পুরনো। হাতে দুগাছি শাঁখা আর বাঁ হাতে নোয়া। একটু শীর্ণ। দেহে পরিচ্ছদে অভাব যেন প্রকট হয়ে রয়েছে।

বীরেশ্বর তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন—সুখী হও মা। কিন্তু প্রণাম নেবে না কেন রত্নেশ্বরের ? সম্বন্ধে বড়।

—না—না মামাবাবু। না। বলে সে ভবানীর পায়ে প্রণাম করেছিল। ভবানী দেবী তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখে ঠেকিয়ে বলেছিলেন—ছেলেপুলে কি মা ?

বলে উঠলেন ঠাকুমা।—তবে আর বলছি কি মা। ছেলেপুলে হয় নি।

বীরেশ্বর বললেন—প্রণাম কর রত্নেশ্বর।

রত্নেশ্বর সর্বাগ্রে কয়েকখানা মোহর তুলে নিয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হল। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে এসে হেঁট হয়ে অঞ্জলি পেতে বললে—দিন হাতে দিন। সোনা পায়ে রাখবার ভাগ্যি আমার নয়। আর প্রণাম ওই হল। রাজাবাবুর কোন দূরসম্পর্কের গরীব বোন, রাণী কাত্যায়নী দেবীর মাসতুতো বোনের খুড়তুতো ভাই তার নাতি। কথায় বলে 'সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো বউ-এর বোনঝি জামাই'। দিন।

বলে অঞ্জলি পেতে মোহর কটা নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিল—বাবু রত্নেশ্বরকে রাজা কর ঠাকুর। ধনে পুতে সংসার ভ'রে দাও।

কণ্ঠস্বরে তার এমন আন্তরিকতা যে সকলে তার কথায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এরপর সম্পর্কে ছোটদের প্রণামের পালা তারপর দাসীদের। কুটুম্ব সজ্জন—গ্রামের জ্ঞাতিদের মেয়েরা—দল বেঁধে এসেছিল। এবং তারা ভিড় করে ঠক্‌ঠাক্ প্রণাম শুরু করে দিয়েছিল। এতক্ষণে রত্নেশ্বর সহজ হয়ে উঠেছিলেন। হাসিমুখে প্রত্যেকের হাতে একটি করে গিনি দিয়ে তাদের বিদায় শেষ করেছিলেন।

তারপর বাড়ীর দাসদাসীরা।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—বেলা তিন পহর হয়ে গেছে। তোমরা একসঙ্গে প্রণাম কর। তোমাদের সকলে প্রত্যেকে পাঁচ টাকা করে পাবে।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—আমার সঙ্গে আয় রত্ন। একটা কাজ বাকী আছে। আয়। বলে বলেছিলেন—মহাবীর, এখন কেউ যেন না আসে!

বীরেশ্বর রায় তখন প্রায় সুস্থ, শুধু একটা পা একটু টেনে চলতে হয় ; লাঠি নিতে হয়েছে। তার সঙ্গে তিনি রত্নেশ্বরের কাঁধের উপর ভর দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেলেন। দোতলায় এই মহলে তিনি ভবানী এবং রত্নেশ্বর ছাড়া কেউ থাকে না। আর একজনকে ভবানী দেবী নিয়ে এসেছেন, সে হল সোফি বাঈ। বিবিমহল বিশিষ্ট অতিথিতে ভর্তি। বাইজীর দল, খেমটার দল, সেসব অন্য জায়গায় থাকে। সোফিকে ভবানী এখানে একখানা কোণের ঘরে থাকতে দিয়েছেন। বীরেশ্বর রায় কিছু বলেন নি। রত্নেশ্বর বলেছিল—লোকে কি বলবে ?

ভবানী বলেছিলেন—কি বলবে ? বলবার কি আছে। আমার বাপের শেষকৃত্য আমি করতে পারি নি, ও করেছে। তারপর ছ' বছর ও ওঁর সেবা করেছে। এতেও যদি ওর থাকলে নিন্দে হয়, তবে সে নিন্দে মাথায় ক'রে নিতে হবে। তাছাড়া ওর আচার-আচরণ

খাওয়া-দাওয়া কোনটেতে কোন নিন্দের কি আছে বল ? তুই কি ভেবেছিস রত্ন, মাসোহারার নাম করে ওর মুখ-বন্ধের জন্তে বেঁধে রেখেছিস ? ছি!

রত্নেশ্বর আর কথা বলেন নি। সোফি বাঈ সেইদিন থেকেই রায়বাড়ীর তনখা নিয়ে জানবাজারেই কাছাকাছি একটা বাড়ীতে থাকে। নিত্য সন্ধ্যার সময় আসে, বীরেশ্বরের সামনে মেঝেতে বসে থাকে, ভবানী দেবী বসে থাকেন বীরেশ্বর রায়ের বিছানায়; কথাবার্তা বলেন। গল্পগুজব করেন। তারপর একখানা গান গেয়ে চলে যায়। বেশভূষা করে না সোফিয়া। হিন্দুস্থানী মেয়েদের ঢঙে লালপেড়ে শাড়ী পরে। আভরণের মধ্যে হাতে দুগাছি বালা, চুল সাধারণত এলোই থাকে। কোন কোন দিন বেণী রচনা করে সাধারণ একটা খোঁপা বাঁধে।

স্কুলের বনিয়াদ পত্তনের সময় একবার সে এসেছিল। সেবার বীরেশ্বর তাকে নিয়ে এসেছিলেন, সাহেবদের এদেশী খাঁটী গান গেয়ে শোনাবার জন্তে। এবার ভবানী নিয়ে এসেছেন। তাঁদের স্বামীস্ত্রীর জীবনের শুভকর্মে সোফিকে তিনি বাদ দিতে পারবেন না। এবং প্রথমে বিবিমহলে জায়গা দিয়ে তাঁর মনটা খুঁতখুঁত করেছিল তাই তিনি এক কোণের একখানা ঘরে তাকে এনে রেখেছেন।

তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রান্না সোফিয়ার একজন হিন্দু দাসী করে নেয়। দেবতার প্রসাদও খায়। খায় না শুধু মাংস প্রসাদ। এমনিতেও সে মাছ মাংস পেঁয়াজ এসব খায় না।

রত্নেশ্বরকে নিয়ে গেলেন ভবানী নিজের ঘরে। বললেন—বস। তারপর নিজে গিয়ে ডাকলেন সোফিকে।

সোফি উপরতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দরদালানে এই অনুষ্ঠানপর্বটি দেখছিল। ভবানী এগিয়ে এসে তার হাত ধ'রে নিয়ে এসে বললেন—বেটাকে আশিস করো সোফি।

—আমি ? বুকে হাত দিয়ে অসীম বিস্ময় প্রকাশ করে বললে—আমি ?

—হ্যাঁ। তুমি! বাবুজীর তুমি সেবা করেছ। বহুৎ সেবা করেছ। আমার পিতাজীর তুমি শেষ কাজ করেছ। তুমি আমার বহেন সোফি। আমার বেটা সে কি তোমার বেটা নয় ? তোমার আশিস না নিলে তো ওর আশিস পুরা হবে না সোফি!

সোফি অকস্মাৎ চোখ বন্ধ করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে দুটি জলের ধারা নেমেছিল চোখ থেকে। তার চোখ খুলে কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে হেসে বীরেশ্বরকে বলেছিল—মালিক, আপনিও কি এই হুকুম করছেন ?

বীরেশ্বরও বোধহয় আবেগে বিচলিত হয়েছিলেন, তিনি মুখ ফিরিয়ে অন্তদিকে তাকিয়েছিলেন। মুখ না-ফিরিয়েই তিনি বললেন—আমার কলেজার কথা ভবানী জানে সোফি!

সোফি এবার জিজ্ঞাসা করেছিল—বহুরা! বেটা বলব ? বলেছিল রত্নেশ্বরকে। রত্নেশ্বর সারাজীবন চরিত্র সম্পর্কে সজ্ঞানে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে সকল রকমের ছুৎমার্গ পরিহার করে চলেছেন। কিন্তু সেদিন তিনিও আবেগে অভিভূত হয়েছিলেন, তাঁর মনকে তিনি কঠোর কঠিন ক'রে রাখতে পারেন নি। তিনি মুখে উত্তর দেন নি, হাঁটুগেড়ে বসে ওই মুসলমানী বাঈয়ের পা ছুঁয়ে কপালে ঠেকিয়ে মাথা হেঁট করেছিলেন আশীর্বাদের জন্তে। সোফিয়া তার

মাথায় ডান হাত ঠেকিয়ে অন্য হাতখানি উপরে তুলে চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তার চিবুক স্পর্শ ক'রে ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলেছিল—মেরি জিন্দিগী সফল হো গয়ি। আল্লা মেহেরবান, আমার এই বেটাকে তুমি দুনিয়ার বাদশা করে দিয়ো।

তারপরেই সে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে।

* * *

বিকেলে হয়েছিল বাইরের লোকেদের সঙ্গে সম্ভাষণ। নায়েব আচার্য এইদিনেই পুণ্যাহের দিন স্থির করেছিলেন। কালীবাড়ীর বারান্দায় বীরেশ্বর রায়ের পাশে বসে রত্নেশ্বর রায় পুণ্যাহের টাকা গ্রহণ করবেন স্থির ছিল।

পুণ্যাহ সাধারণতঃ বৎসর শুরু না হলে হয় না। চৈত্র মাসে আখেরী গেলে তবে পুণ্যাহের কথা। কিন্তু সে প্রথা লঙ্ঘন করে আচার্য দোলের দিন পুণ্যাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। বলেছিলেন—আমরা চৈত্র কিস্তির রাজস্ব দাখিল ক'রে দাখিলা নিয়েছি কালেক্টরীতে। সুতরাং সম্পত্তিতে তো আমাদের স্বত্ব আগামী বছরেও বজায় আছে। প্রজাদের সঙ্গে বছরের হিসেব-নিকেশ চৈত্রতেও শেষ হবে না। চলবে। সুতরাং পুণ্যাহ করব, তাতে কার কি বলবার আছে?

বিকেলে বীরেশ্বর ক্লান্ত ছিলেন বলে নিচে নামেন নি। তিনি সন্ধ্যার পর নামবেন। রত্নেশ্বর একলা বসেই পুণ্যাহের 'সেহা' ও টাকা নিচ্ছিলেন। পাশে গিরীন্দ্র আচার্য বসে 'সেহা' অর্থাৎ মহালদিগরের নামধাম ইত্যাদি মিলিয়ে নিয়ে টাকা গুনে রত্নেশ্বর রায়ের হাতে দিচ্ছিলেন এবং দুজন নায়েব বসে সেহাগুলিতে এস্টেটের মোহর ছাপ দিয়ে মণ্ডলদের ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। এবার পুণ্যাহের টাকার সঙ্গে আরও একদফা টাকার আমদানি ছিল। সেটা রায়বংশের নতুন উত্তরাধিকারী রত্নেশ্বর রায়ের নজরানা। মণ্ডলেরা নজর দিয়ে প্রণাম করছিল। একজন কর্মচারী লিখে যাচ্ছিল নজরনাদাতা প্রজার নাম ও পরিমাণের অঙ্ক। ওদিক থেকে আর একজন বিদায় করছিল মণ্ডলদের। প্রত্যেককে কাপড় চাদর এবং নগদ টাকা দিয়ে বিদায়। টাকা রাখা হচ্ছিল রূপোর ঘড়াতে।

পুণ্যাহ আরম্ভে ঢাক বেজে থাকে—আবার শেষেও বাজে। ঢাকের অগ্রাধিকার বজায় রেখেও রসুন চৌকি বাজবার ব্যবস্থা। পুণ্যাহের আমদানি শেষ হলেই টাকার ঘড়া নিয়ে গিয়ে কালীমায়ের বেদীর নিচে রাখা হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বাজবার কথা।

কিন্তু আচার্য হাত তুলে ঢাক বাজাতে নিষেধ করে হেঁকে ঘোষণা করে বললেন—কাল সকালে মহল দিগরের খেয়াঘাট বা সরকারী নয়, আর হাট, তার সঙ্গে বার্ষিক জলকর আর বনকরের পাতা মহল, কয়লা মহলের ডাক হবে। যারা ডাকবে তারা যেন উপস্থিত হয়। আর একটা কথা, এবার পুণ্যাহে সব মহলের পুণ্যাহের টাকা এসেছে। আসে নি একমাত্র মওলান তৌজি বীরপুরের টাকা। সুতরাং এই মওলান তৌজির মণ্ডল আর মণ্ডল থাকতে চায় না বা অক্ষম। কাজেই কাল ওইসব ডাকের সঙ্গে এই বীরপুরের মণ্ডল পদ ডাকের ওপর বিলি করা হবে। সর্বাগ্রে ওই মণ্ডলানের ডাক হয়ে তবে অন্য ডাক হবে। নে, এবার বাজা। না। দাঁড়া। সন্ধ্যের পর রাজরাজেশ্বর প্রভুর মা আনন্দময়ীর দোল খেলা হবে। তারপর রাত্রে

হবে কীর্তন গান। আর কৃষ্ণযাত্রা। বাজী পুড়বে। ব্যাস—হয়েছে, নে, বাজা।

ঢাক বাজতে শুরু করেছিল।

সমস্ত কিছুর মধ্যে আনন্দ এবং উল্লাসের একটা স্রোত বইছিল, তার মধ্যে একটি অন্তঃস্রোত বইছিল বা গভীর একটি ঘূর্ণি আবর্তিত হচ্ছিল, যেটির লক্ষ্য হল গোপাল সিং।

বহুজন অর্থাৎ বহুপ্রজার ছোটখাটো দরবারও আছে। বাকী খাজনা পড়ে গেছে, কিছু মাফ চাই। না-হলে পেরে উঠছে না। দু' একজন অতি নাতোয়ান প্রজা বাকীটা সবই মাফ চায়। কেউ এসেছে—তার একটি মাছের পুকুর আছে, সেটি সে সেলামী দিয়ে নির্দায় বা মোকররী মৌরসী করে নিতে চায়।

কেউ চায়—জমিদারের খাস পুকুর বন্দোবস্ত নিতে।

কেউ চায়—তার বাপ জমিদারের খাস পতিতে গাছ লাগিয়েছিল সেই গাছগুলির ছাড় নিতে। হুজুরের দয়া হলে যদি তলস্থ জমিটুকুও পায় তবে সে একটি বাগান করবে। ছেলেরা আম কাঁঠাল খাবে।

দু' চারজন এসেছে—দেবতা প্রতিষ্ঠা করবে তার জন্য পাকা ইমারতের অনুমতি চাই।

অনেক ব্রাহ্মণ এসেছেন, তাঁদের কারুর আছে টোল, কারুর আছে দেবসেবা, তাঁরা জমিদার দপ্তর থেকে বৃত্তিপ্রার্থী। কেউ-কেউ দু-চার বিঘা জমিপ্রার্থী। বাউল-বৈরাগীরাও এসেছে, তারা মহাপ্রভুর সেবা করে, আখড়া স্থাপন করেছে; সেবার জন্য দু-চার বিঘা জমি তারাও চায়। তবে তারা ব্রাহ্মণদের মত নিষ্কর চায় না, খাজনা দেবে, তবে সেলামী দিতে পারবে না।

গোমস্তাদের মধ্যেও প্রার্থী আছে, তারা তহবিল তছরূপ করেছে, মামলা হচ্ছে না হবে, তার থেকে তারা অব্যাহতি চায়।

কুম্ভকারেরা এসেছে—জমিদারের খাস জায়গায় মাটি নিতে, খাজনা দিতে হয় সেটা মাফের অনুমতি হোক।

মেদিনীপুরে মাদুরের অনেক কারিগর আছে। তারা মাদুরের কাঠির চাষ করে জলা জায়গায়, বিলে, পুকুরে, তার খাজনা লাগে, সেটা মাফ করা হোক।

কোন গ্রামের লোকের আর্জি—তাদের গ্রামে পানীয় জলের অভাব, পুকুর একটি কাটিয়ে দেওয়া হোক।

কোন গ্রাম চায় গ্রামের সরকারী দেবস্থানের উন্নতির জন্য অর্থ সাহায্য।

গুজব রটেছে, এবার বীরেশ্বর রায় কল্পতরু হয়েছেন, ফেরাবেন না কাউকে। ওই নতুন বংশধরের হাত দিয়ে যে যা চাইবে দেবেন।

এরই মধ্যে গোপাল সিংয়ের ব্যাপারটি শুধু ক্রূর-কুটিল। দেওয়ান আচার্য দীর্ঘাকৃতি ভগবান মণ্ডলকে চোখে চোখে রেখেছেন। সে এসে উঠেছে তার শ্বশুরবাড়ীতে, কিন্তু দুবেলা তার খাবার নিমন্ত্রণ রায়বাড়ীতে। জলখাবার বা দেবতার প্রসাদ উপলক্ষ্য করে মিষ্টান্ন ফল-মূল ভগবানের শ্বশুরবাড়ীতে ভগবানের জন্য পাঠান হচ্ছে মায় ভাল তামাক, টিকে পর্যন্ত পাঠাতে তোলেন নি তিনি। একজন অতি সাধারণ লোককে তিনি ভগবানের শ্বশুরবাড়ীর সামনে

মোতায়েন রেখেছেন ভগবানের উপর নজর রাখবার জন্ত। ভগবান যেন না পালায়। কয়েক-বার তাকে ডেকে কথা বলে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, সে সাহসে ঠিক আছে কিনা। এবং সাহসও তাকে দিয়েছেন।

এবেলা পুণ্যাহ শেষ হতেই বীরেশ্বর রায়ের ঘরে রত্নেশ্বরকে বসিয়ে ভগবানকে ডেকে পাঠালেন। এ ঘরের দারোয়ান এখন ছেদী সিং, সে কাটা পা নিয়ে একটা চওড়া টুলের উপর মস্ত মুরেটা বেঁধে বসে থাকে; হুকুমমত বাইরের লোককে দরজা ছেড়ে দেয়। আচার্য বললেন—ছেদী, খুব লম্বাসে এক আদমী, সমঝা—কালাসে—আয়েগা, পাইক লে আয়েগা, উস্কা খাতির দেখলাবে। আঁর বলবে, চলে যাইয়ে মণ্ডলজী, ছোটা হুজুর তো আপকা লিয়ে বৈঠা হ্যায়। অঁা? উসকা পাশ হামলোকের কাম হ্যায়। উ লেনে হোগা। সমঝা!

—হাঁ হুজুর। সমঝ লিয়া! খাড়া হো যাউ?

—না-না। খাড়া কেন হোগা? ওতনা নেই। তবু ওরই মধ্যে সমঝাচ্ছো না? থোড়া খাতির! হঁ!

বলে হেসে তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে রত্নেশ্বরকে বুঝিয়ে ছিলেন, কি বলতে হবে!

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—ভগবান নেবে। আপনি ভাববেন না। আমি তাকে বোঝাবার জন্মে ঠাকুরদাস দাদাকে লাগিয়ে রেখেছি! ঠাকুরদাসদের সঙ্গে কুটুম্বিতে আছে।

একটু হেসে আচার্য বলেছিলেন—বহুৎ আচ্ছা বাবুজী সাহেব। আপনার বুদ্ধি রাজবুদ্ধি। জানেন একটা কথা আছে, কাঁটার মুখে শান দিতে হয় না, কাঁটা আপনার ধার নিয়েই গজায়; তেমনি রাজা জমিদারের ছেলেকে রাজবুদ্ধি শেখাতে হয় না, ও নিয়েই জন্মায়।

রত্নেশ্বর ভগবানকে কথা দিয়েছিলেন—তুমি শুধু সামনে দাঁড়াও ভগবান। যা করবার আমি করব। টাকা লোক সব আমার। কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে।

উপু হয়ে বসে হাতজোড় করে ভগবান বলেছিল—আমি ঠিক আছি হুজুর। আজ পঁচিশ বছর এই মনে-মনে জপছি। এই দ্যাখেন।

বলে হাঁটুর উপরে কাপড়টা তুলে দেখিয়েছিল, উরুতের উপর একটা দাগ। কাটা দাগ।

—ওটা কি?

—গোপাল আমাকে কুপিয়েছিল হুজুর। তখন আমার জোয়ান বয়স। গোপালও তখন জোয়ান, আমরা হাম জুটী। প্রথম প্রথম আমি মশায় ওর ডান হাত ছিলাম। আমার বাবার অবস্থা ভাল ছিল খাতির করত। একবার বাবু, আমার জেঠার জমি কিনলে পাঁচ কাঠা, জেঠার কন্তেদায়ের সময়। তার সঙ্গে আমাদের এক কিত্তে জমি, হুজুর, দো ডাকলে রা কাড়ে, সে কিত্তেটার অর্ধেক আর পাঁচ কাঠা জমির সঙ্গে রাতারাতি আল কেটে এক করে দিলে। আমি সামলাতে পারি নাই, মশায় ছুটে গিয়ে ওকে বলেছিলাম—ডাকাত কোথাকার?

ও মশায় হেঁসো দিয়ে কেটে তাল খাচ্ছিল। সেই হেঁসোটা খপ করে বসিয়ে দিলে এইখানে। ছ মাস বিছানায় পড়েছিলাম। কিন্তু কি করব? রাজাদের প্রিয়পাত্র। দারোগা-মুন্সীর সঙ্গে খাতির। মুখ বুজে আজ এই পঁচিশ বছর পড়ে আছি। সয়ে যাচ্ছি। এবার

আপনকার মত বল পেয়েছি, আমি পিছুব কেন ?

—মেয়েছেলে সব নিয়ে এসেছ ?

—আজ্ঞে হাঁ। সবাই এসেছে।

—দেখ, আমার ধারণা, খবরটা পৌঁছুবামাত্র ও খেপবে। ঘরে আগুন লাগানো ওর একটা ঝোঁক। শেকল দিয়ে আগুন দেয়। সেই জন্যে বলছি। ঘর পুড়লে আমি ঘর করে দেব। বুঝেছ। আমি লোক বল দেব!

—গরু-বাছুর ? তার ব্যবস্থা ?

সে ম্যানেজারবাবুর কহত মত কাল ভোরে আমার লোকেরা চরাবার নাম করে নিয়ে যাবে মাঠে, আপনকার কুতুবপুরের কাছারীর চাপরাশীরা ধরে নিয়ে যাবে কাছারীতে।

ঠাকুরদাস বসেছিল তার পিঠের কাছে। পৃষ্ঠবলের মত। ঠাকুরদাস সেই কলকাতা থেকে এ পর্যন্ত বরাবর রত্নেশ্বরের সঙ্গে আছে। শুধু শ্যামনগরের শোধের সময় তাকে কলকাতায় এক রকম আটক রাখা হয়েছিল। আসতে দেওয়া হয়নি। সে সঙ্গে থাকলে এ্যালিবি সত্ত্বেও বিপদের সম্ভাবনা ছিল। শ্যামনগর ফিরতেও দেন নি আচার্য। বলতেন—কত্তার হুকুম নাই। তুমি যাও, গিয়ে হুকুম নিয়ে এস।

কিন্তু সে ভরসা ঠাকরদাসের হত না। এবার সে এসেছে এবং শ্যামনগরের অভ্যাগত ভট্টাচার্যদের জ্ঞাতিদের এবং অন্যান্য লোকেদের দেখা-শুনার ভার তার উপর! শ্যামনগরে ধর্মঘট আজও অব্যাহতভাবে চলছে। গত আট মাস ধরে একটি পয়সা আদায় পায় নি দে-সরকার। ওদিকে রবিনসনের দেনার ডিক্রিতে ঠাকুরপাড়ার কুঠী ক্রোক হয়ে আছে। ওয়ারিশান সাব্যস্ত হয় নি বলে আজও নীলামে ওঠে নি। ঠাকুরদাসের স্ত্রী-পুত্র গেছে। সংসারে কেউ নেই। ঘরের মমতা বলতে ঘর আর জমি ছাড়া কিছু নেই। সে বেশ আছে। এবং তারও প্রতিজ্ঞা—শ্যামনগর দে-সরকারদের হাত থেকে কীর্তিহাটে না-আসা পর্যন্ত সে শ্যামনগর ফিরবে না।

এ বাড়ীতে সমাদরের মধ্যে সে ভাল আছে। অনেক কিছু বুঝেছে। গোপাল সিংয়ের উপর ক্রোধ তার কম নয়। রবিনসন গেছে, দে-সরকার ঘায়েল হয়েছে, এবার গোপাল সিং। সে রত্নেশ্বরের কথা মত ভগবান মণ্ডলকে ভজিয়েই চলেছে।

সে এবার বললে—দাদাবাবু, আপনি একবার কর্তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন কাকা মশায়ের। ওঁর একটা কথা। বুঝলেন না—তা হলেই বাস!

গিরীন্দ্র আচার্য একটু হেসে বললেন—কেন হে ঠাকুরদাস, শালগ্রামের আর ছোট-বড় আছে নাকি ? তোমাদের বুড়ো শিব জলে থাকেন সম্বছর, চৈত্তির মাসে তুলবার সময় দেখা যায়, অনেক বাচ্চা শিব হয়েছে। বাচ্চা হলে কি হবে তারাও শিব। উনি বলছেন—

—আজ্ঞে না। তবে কত্তার চরণের ধুলো মাথায় নিলে বুকে বল হবে। কত বড় প্রতাপ! এই আর কি! একবার কাছ থেকে চোখে দর্শন। আর তুটো বাকা।

রত্নেশ্বর হেসে বললেন—বেশ তো। তুই যা তো ঠাকুরদাস দাদা, দেখে আয় তো কি

করছেন উনি। যাকে বলে আয়, একবার আমি যাব একজনকে নিয়ে। ওঁর সঙ্গে কটা কথা আছে।

উপরের দক্ষিণের বারান্দায় বীরেশ্বর তখন আলবোলায় তামাক খাচ্ছিলেন। ঘুমিয়েছেন এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে কাঁসাইয়ের ওপারের পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছেন। আজ জীবনের সব বিক্ষোভ যেন মিটে গেছে। সাম্রাজ্যে যেন সম্রাট হয়ে বসেছেন। কিন্তু বাঁ পাখানা দুর্বল হয়ে গেল।

সামনে কয়েকখানা চিঠি পড়ে ছিল। কলকাতা থেকে এসেছে। তার মধ্যে একখানা চিঠি লিখেছেন বন্ধু কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখে এসেছিলেন বীরেশ্বর রায়। কলকাতায় ফিরে অসুস্থ অবস্থার জন্ম দেখা করতে পারেন নি। কোন খবরও দেন নি। এসব কথা জানাতে কেমন সঙ্কোচবোধ করেছিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে তাঁকে চিঠি লিখে যতটা জানানো সম্ভবপর তা জানিয়েছেন।

সিংহ তাঁর চোথা কলমে অল্প কয়েক ছত্র লিখেছেন।

"রায়মহোদয়, পত্রযোগে ভবদীয় বিবরণে চমৎকৃত হলেম। কাশীধামের বিখ্যাত সতীমাতা আপনার হারানো সহধর্মিণী! এ আশ্চর্য কাণ্ড। তার কথা অনেক শুনেছি মশায়। এমন কি ত্যাঁদড় রাম মল্লিক—তাঁর নাম করতে গদগদ হয়ে ওঠে। বলে তাঁর চলে যাওয়ার পথ থেকে ধুলো কুড়িয়ে পুরিয়া করে নিয়ে এসেছে! পরিহাস করছি নে মশায়, মহিলাটির বিবরণ অন্যের কাছে শুনে শ্রদ্ধা হয়েছে। যাক আপনি ভাগ্যবান। একটা অঙ্গ কমজোরি হয়ে যাওয়ার কল্যাণে তিনি ফিরেছেন, এখন অঙ্গটাকে অক্ষম করে বসে থাকুন অন্তত তার ভান করুন। তিনি সচলা হয়ে পাশে বসে সেবা করুন। তারপর ভাগ্নেকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন, এও উত্তম কথা। কলকাতায় এলে দেখব তাকে। এই উপলক্ষ্যে তার জন্ম একটি সোনার ঘড়ি পাঠালেম। বলবেন—জমিদারবাড়ীর ছেলেরা দশটার আগে বিছানা ছাড়ে না; হুতোমপ্যাঁচা বলে—এতেই তাঁদের সর্বনাশ। বাবাজীকে ঘড়ি ধরে চলতে বলবেন, সাতটার আগেই যেন বিছানা থেকে ওঠেন। বলবেন—ভূগোলে যাই লেখা থাক, লোহিত সাগর পূর্ব দিকে, সেটা যেন তিনি কলম্বাসের মত ভোরে উঠে আবিষ্কার করেন।"

তিনি তাকিয়ে আছেন পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের দিকে। ভাবছেন কথাটা সিংহকে লিখতে হবে। লিখবেন—"আমি কিন্তু দিবানিদ্রান্তে পশ্চিম দিকে লোহিতসমুদ্র দেখিলাম।"

ভবানী দেবী বসেছিলেন ঘরের মধ্যে, তার সামনে বসে আছেন মাসিমা নিস্তারিণী দেবী।

ঠাকুরদাস ভিতরের দিকের বারান্দায় দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে ডাকলে—মা।

—কে?

—আমি ঠাকুরদাস মা।

—ঠাকুরদাস? রত্নের কাজ শেষ হল?

—হয় নি। পুণ্যের ঘড়া আনা বাকী আছে। মায়ের অর্চনা হচ্ছে।

—সে তো সন্ধ্যের পর হবে। তুমি একবার আসতে বল তো তাকে।

—তিনি পাঠালেন মা—

—তাকে পাঠিয়ে দাও বাবা, আমি শুনব তার কাছে আমারও জরুরী দরকার আছে।

ঠাকুরদাস তাড়াতাড়ি রত্নেশ্বরের ঘরে এসে বললে—মা তোমাকে খুঁজছেন, যাও!

রত্নেশ্বর এসে দাঁড়াল। ভবানী দেবী ঘরে একলা বসেছিলেন, তখন নিস্তারিণী দেবী চলে গেছেন।

—আমাকে ডেকেছ?

—হ্যাঁ এ সব কি হচ্ছে তোর?

—কি মা?

—মাসীমা কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলেন। বলছিলেন—তিনি শুনেছেন, তাঁকে নাকি তুই তাড়িয়ে দিবি প্রতিজ্ঞা করেছিস? কেন? আমাকে সেদিন ওই কথা বলেছিলেন বলে? আমার শাশুড়ী যদি থাকতেন তিনি যদি বলতেন? কি করতিস তুই?

রত্নেশ্বর অন্য দিন হলে প্রতিবাদ করতেন, মনে-মনে ক্ষুব্ধ হতেন। কিন্তু আজ তা হলেন না। মনটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। একটু হেসে বললেন—তাড়িয়ে দেব বলি নি। ঠিক করেছিলাম মাসোহারা দিয়ে কাশী পাঠিয়ে দেব। এ বাড়ীর গিন্নীগিরিটা ঘুচিয়ে দেব।

—না। উনি যেমন আছেন তেমনি থাকবেন।

রত্নেশ্বর অত্যন্ত সহজভাবে বললেন—তা থাকুন। তুমি বলছ নিশ্চয় থাকবেন। কিন্তু ওঁকে বললে কে?

—বলেছেন যেই হোক। বলেছেন ন্যায়রত্নমশায়। উনি শুনেছিলেন ম্যানেজারবাবুর কাছে। কিন্তু ওসব হবে না।

—হবে না। ঠিক আছে। আমার নিজের মনটাও আজ খুঁত-খুঁত করছে দুপুরবেলা থেকে। উনি সেই তখন আশ্চর্য সুন্দরভাবে সব করালেন। আর কি সুন্দর কথাগুলো বললেন। আমি মা আশ্চর্য হয়ে গেছি। ভাবছিলাম, হ্যাঁ রায়বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম চালাবার জন্যে ওঁর মত গিন্নী না হলে চলে না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিলামও প্রতিজ্ঞা করেছি, ভাঙব কি করে! তা ভালই হল তোমার হুকুম!

ভবানী দেবী বলছিলেন—উনি আরও বলছিলেন অঞ্জনার জন্যে। ওর স্বামীকে একটা চাকরি দিয়ে ওকে এখানে রাখার কথা। মেয়েটির বড় খারাপ অবস্থা। বড় দুঃখ। ওকে তোকে বলতে বলে গেলেন।

রত্নেশ্বর বললেন—বেশ তো, তুমি বললে তাই হবে। তোমার ওই মাসশাশুড়ীটির পর এমনি একটি অন্দর-সুপারইনটেনডেণ্ট তো একজন লাগবে। অঞ্জনা মেয়েটি তা পারবে। হয়তো ঠাকুমার থেকে ভাল পারবে! উনি কোথায়?

—উনি? মৃদু ধমকে উঠলেন ভবানী। একটু চুপ করে থেকে চুপিচুপি বললেন—জানিস, তুই ওঁর কথা হলেই উনি-তিনি বলে সারিস, তিনি মনে দুঃখ পান। চাপা মানুষ, বলেন না। মধ্যে মধ্যে আমাকে বলেন—রত্ন এখনও আমাকে তোমার মত নিতে পারলে

না। নিলে না।

—কেমন লজ্জা করে। বেধে যায়!

—না। বাধবে কেন? যা, উনি বারান্দায় বসে আছেন, তামাক খাচ্ছেন।

রত্নেশ্বর এগিয়ে গিয়ে দরজা থেকেই ডাকলে—বাবা!

—রত্নেশ্বর! এস!

* * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, তাই বলছিলাম, মনে মনে হিংসা, ক্রোধ যতই থাক, সেদিন যদি গোপাল আসত আর আবেদন জানাতে পারত, তবে কি হত ঠিক বলা যায় না। সমস্ত রায়-বাড়ীতে সেদিন সন্তোষের একটি পরিপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল; ক্ষোভ যা কিছু ওই গোপালকে নিয়ে। না আসাতে এ পক্ষের সে ক্ষোভ আরও বেড়েছিল।

রায়বাড়ীর এত বড় উৎসব সমারোহের মধ্যে গোপাল সিং সম্পর্কে বিদ্বেষ ও আক্রোশের অন্তঃশীলা স্রোতটি কোথাও একবার অযথা এঁকে-বেঁকে যায় নি, সোজা বেয়ে গিয়েছিল ক্যানেলের খালের মত।

রচনাটি দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যের। মহিষাদলের নায়েব ওকালতি করেছিল গোপালের জন্য। দেওয়ান আচার্য বলেছিলেন—ও কথাটা বল না হে। কত টাকা দিয়েছে গোপাল? টাকাটা তাকে ফিরে দিয়ো। আমি তোমাকে দেব ও টাকাটা।

সে আর কথা বলে নি।

পরদিন সকাল থেকে কার্যসূচী অনুযায়ী কাজ হয়ে চলেছিল। প্রথমেই ছিল একদিকে দানপর্ব, অন্যদিকে ডাকপর্ব।

কাছারীতে হচ্ছিল হাট-ঘাট, জলকর, বর্ণকরের ডাক। আর ঠাকুরবাড়ীতে চলছিল দান।

'ডাক'-এর কাজ চালাচ্ছিলেন দেওয়ান আচার্য। তবে প্রথমেই বীরসিং মৌজার 'মণ্ডলান' ডাকের সময় নিজে বীরেশ্বর রায় এসে বসেছিলেন একবার। সেটা এসেছিলেন আচার্যের কথায়। ভগবানের মনোভাব বুঝে তিনি বলেছিলেন—ওই সময়টায় খোদ মালিক মানে আপনি বসলে ভাল হয়। বল পাবে।

বীরেশ্বর রায় আগের দিন সন্ধ্যার সময় রত্নেশ্বরের কথায় ভগবানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সাহসও দিয়েছিলেন। আচার্য হুঁশিয়ার লোক, তিনি তবুও ওই অনুরোধ করেছিলেন, এবং বীরেশ্বরও এসে বসেছিলেন। বীরপুরের মণ্ডলান পদের ডাক ডাকতে একটি মাত্র লোক, ভগবান মণ্ডল। সে এসে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলেছিল—হুজুর যদি অনুমতি দেন তো; আমি ডাকতে পারি!

বীরেশ্বর হেসে বলেছিলেন—তুমি তো ভগবান মণ্ডল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। হুজুরের বীরপুরেরই প্রজা!

—বেশ তো। ডাক! গোপাল তো আসে নি! ডাক।

মানুষ মাত্রেই আপন সাধ্যভোর চতুর। ভগবানও সাধ্য চাতুর্যের সঙ্গে দশের সম্মুখে তাঁর অভয় এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল। বলেছিল—ডাকতে হুজুরের অভয়

চাই, আশ্রয় চাই। নইলে আমি সামান্য লোক, চাষী মানুষ, আমি পারব ক্যানে?

বীরেশ্বর বলেছিলেন—নিশ্চয়। সে তুমি পাবে বইকি! নিশ্চয় পাবে। আমার কর্মচারী যাবে, পাইক-বরকন্দাজ দরকার হলে তাও পাবে। সবই পাবে। ডাক।

ভগবান এক ডাকেই পেয়েছিল মৌজা বীরপুরের মণ্ডলান পদ। বীরেশ্বর রায় তার নজরানা না নিয়ে ডাক মঞ্জুর করে উঠে চলে গিয়েছিলেন অন্দরে। তারপর কাজ চালিয়েছিলেন আচার্য।

ওদিকে নাটমন্দিরে রত্নেশ্বর বসেছিলেন দুজন নায়েবকে নিয়ে, তিনি মহালের দেবস্থান মেরামতি বা নির্মাণ খরচা দান ও প্রার্থীদের কাউকে কিছু জমি, কাউকে বার্ষিক বৃত্তি, কাউকে পুকুরের ছাড়, কাউকে বাগান করবার অনুমতি মঞ্জুর করছিলেন। এ সবের ফর্দ কর্মচারীরা আগে থেকেই করে রেখেছিল, তাতেই তিনি সই করে দিচ্ছিলেন।

প্রহর খানেক, প্রহর দেড়েকের মধ্যেই এ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আরম্ভ হয়েছিল লোকজনের জন্য উৎসব। সে নানারকম।

অন্যদিকে চলছিল আর এক বড় সমারোহের আয়োজন। তৃতীয় দিনে সব বিশিষ্ট বড় বড় লোকের শুভাগমন হবে। সাধারণ লোকজন অনেকই চলে যাবে। তারপর হবে বিশিষ্ট অতিথি আপ্যায়ন। তমলুকের এস-ডি-ও আসবেন, কাঁথীর এস-ডি-ও আসবেন। মেদিনীপুরের ডি-এস-পি তিনটে মুন্সেফী কোর্টের মুন্সেফ, পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টর, উকীলমোক্তাররা আসবেন।

কাল সকাল থেকে বারোটার মধ্যে সকলে এসে পড়বেন। এর মধ্যে মেদিনীপুরের সদর এস-ডি-ও আসছেন সস্ত্রীক পুত্র-কন্যা নিয়ে, তাঁদের নিয়ে আসছেন বীরেশ্বরের খুড়তুতো দাদা দেবপ্রসাদ ঘোষাল এবং বউদি জগদ্ধাত্রী দেবী। ওঁরাই অনুরোধ করেছিলেন সদর এস-ডি-ও রাধারমণ চ্যাটার্জিকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করতে। রাধারমণবাবু দেবপ্রসাদবাবুর ভায়রা-ভাই; জগদ্ধাত্রী দেবীর পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছেন। তাঁরা কীর্তিহাটের কথাবার্তা শুনে কীর্তিহাট আসবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। জগদ্ধাত্রী দেবী এবং দেবপ্রসাদবাবু এই কারণেই প্রথম দিন আসতে পারেন নি, তাঁরা ওঁদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

সুরেশ্বর বললে—আচার্য পাকা শিকারীর মত ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই হ্যারিসের মত; সে যেমন শিকারীর জন্যে মাচা বেঁধে তাকে সেখানে বসাবার আগে জানোয়ারের ট্র্যাকটির ডাইনে-বাঁয়ে, এখানে-ওখানে ডালের টুকরো ফেলে রেখে জানোয়ারটিকে সোজা নিয়ে আসে মাচানের সামনে, ঠিক তেমনি ব্যবস্থা করেছিলেন।

গোপাল সিংকে জানোয়ার আমি বলছি নে, তবে গোপাল সিংকে বাঘ বলব। নর-ব্যাঘ্র। বিক্রম তার বড়, ক্রোধ তার অসংহত, বুদ্ধি-বিবেচনা কম এবং তাকে সে অবহেলাই করে। কতকগুলো চাতুরী তার জানা আছে, তাই সে অভ্যাস করে রেখেছে। তার অতিরিক্ত বুদ্ধির খেলা যেখানে, সেখানে সে হেরে যায়। প্রবীণ বাঘের মত চতুর, সাবধানী—চেনা পথ ছাড়া অচেনা পথে হাঁটে না। কিন্তু এবার আচার্য তার খাদ্য নিয়ে টান মেরে ছেড়ে দিতেই সে বেরিয়ে এল। ঠিক পথে পথে এল।

আচার্য জানতেন আসতে হবে।

বীরপুরের মণ্ডলান ডাকের কথা তার কাছে পৌঁছুবামাত্র সে ক্ষিপ্ত হবে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কিছু একটা করবেই। সম্ভাবনাটা ছিল ভগবানের উপর ঝাঁপ দেবে। ভগবান সপরিবারে কীর্তিহাটে। আজ সকালেই তার গরু-বাছুর মাঠে যাবার কথা, কুতুবপুরের সীমানা বরাবর। সেখানে কুতুবপুরের কাছারীর পাইক-বরকন্দাজরা গরুগুলোকে ঘেরাও করে কাছারীতে পুরবে। নিষ্ফল আক্রোশে গোপাল ভগবানের জনশূন্য বাড়ীতে আগুন দিয়ে দোল-পার্বনের মেড়াপোড়া বা বহ্ন্যুৎসব করবে। হয় তো কুতুবপুর পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে। কাছারীও পুড়তে পারে।

তিনি কীর্তিহাটেও সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন।

তারপরই গোপাল পড়বে শিকারীর মাচার সামনে।

পরদিন সকালে এখানে সাহেব-সুবার আগমন হবে। তাঁদের সামনেই আসবে খবরটা।

গোপাল সিংহের গতরাত্রির কীর্তির রিপোর্ট।

সরকারী সাহেবদের একটা ডিউটি হল অত্যাচারী জানোয়ার শিকার করা!

সুবিধা আর একটু প্রশস্ত হয়ে গেল। সেটা হল মেদিনীপুরের সদর এস-ডি-ও রাধারমণ-বাবুর জন্যে। তিনি আত্মীয়। দেবপ্রসাদবাবুর ভায়রা-ভাই। সদর এস-ডি-ও ফিরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই কালেক্টারকে জানাতে পারবেন।

এত বড় উৎসবের মধ্যে বিচিত্রভাবে গোপাল সিংকে নিয়ে তাঁরা যে জাল রচনা করেছিলেন, কেউ অনুমানও করতে পারে নি যে, সে জাল আশী বছর পরে পর্যন্তও বিস্তৃত হয়ে রইল এবং তাতে পড়বে এবার গোপাল সিংয়ের কেউ নয়, রায়বাড়ীর এক ছেলে এবং এক মহিমাময়ী বিধবা বধূ। রত্নেশ্বরেরই পুত্রবধূ!

* * *

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—"সে দিন গোপাল সিংয়ের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই আমার ছিল না। নানা চিন্তা হইতেছিল।"

কখনও ভাবছিলেন—যা আমরা ভাবছি, তা যদি গোপাল না করে। যদি সে ধীর হয়ে অপেক্ষা করে। তারপর? তারপর ভগবানের সঙ্গে মিটমাট করে নেয়! যদি! চমকে উঠে ভেবেছিলেন—যদি ভগবান গোপালের বেনামদারই হয় গোড়া থেকে? তাহলে তো হেরে গেলাম!

অন্ততঃ এক বছরের জন্য হেরে গেলাম। গোপাল তার বেনামদার ভগবানকে সামনে রেখে গোঁফে তা দিয়ে বেড়াবে, আর বলবে—আরে বাবা, হামি গোপাল সিং! হামি শিয়ালকে মানে না বাবা। রায়বাবু! উ লোকেরা শিয়াল আছে। তাহলে এক বৎসর অন্ততঃ কীর্তিহাট অঞ্চলে মুখ দেখানো চলবে না।

পথ আছে। গোয়ানরা আছে। ওরা সব পারে। কলকাতায় লোক মিলবে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রত্নেশ্বর।

ফাল্গুনের শেষ। কীর্তিহাট অঞ্চলের লালমাটি ফাল্গুনেই উত্তাপ আকর্ষণ করে। খেয়ে

বিছানায় শুয়েও ভাবছিলেন। টানা-পাখা চলছিল। তখন চিন্তার মোড়টা ফিরেছে। তখন ভাবছিলেন—খবরটা এতক্ষণে নিশ্চয় পৌঁচেছে বীরপুর। এতক্ষণে কেন? আগেই পৌঁচেছে। আচার্যের হুকুম আছে কুতুবপুর কাছারীর উপর যে, বেলা এক প্রহর বাদে, ভগবানের গরু-বাছুর আটক করার পরই, বীরপুর মৌজায় ডাকের কথা চাউর করে দেবে।

খবর গোপাল পেয়েছে। সে ভগবানের বাড়ী পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে নিস্ফল আক্রোশে। বাড়ীতে কিম্বা হয় তো পথে পথে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে! ভাবছে কি করবে? অনেক কিছু করতে পারে গোপাল। অসাধ্য কর্ম তার কিছু নেই। এই আজ রাত্রে, এখানে নানা উৎসব। কাল কীর্তন-কৃষ্ণযাত্রা গেছে। আজ খেমটা নাচের আসর পড়বে। বারোটার পর শুরু হবে যাত্রাগান। বাইরে সামিয়ানা খাটিয়ে বড় একটা আসরে কবিগান, চম্পাবতীর গান চলবে। লোক আজ অনেক জমবে। গোপাল হয়তো চলে আসবে এই সুযোগে। একটু ভোল পাল্টে এলে কে চিনবে। মুখে গামছার ফেটা বেঁধে—!

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম নয় তন্দ্রার মত!

সে তন্দ্রার মধ্যে গোপাল সিং রত্নেশ্বর রায়কে ছাড়ে নি, অথবা রত্নেশ্বর তাকে ছাড়েন নি। স্বপ্ন বা তন্দ্রার মধ্যে কল্পনায় তিনি ছদ্মবেশী গোপাল সিংকে দেখেছিলেন ভিড়ের মধ্যে। সে যেন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রায়বাড়ীর দোতলার দিকে তাকিয়ে আছে ক্রুদ্ধ কুটিল দৃষ্টিতে। তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন—পাকড়ো! পাকড়ো! ওই-ওই! তিনি বুঝতেও পারছিলেন এটা সত্য নয়, স্বপ্নের মত কিছু, তবু জেগে উঠতে পারছিলেন না। জাগিয়ে দিলেন ভবানী দেবী। দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকলেন—রত্ন! রত্ন!

এতক্ষণে উঠে বসেছিলেন রত্নেশ্বর এবং লজ্জিতও হয়েছিলেন। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন—এমনভাবে চেঁচাচ্ছিলি কেন? স্বপ্ন?

হেসে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হ্যা; দেখছিলাম, শয়তান গোপাল সিং এসে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীতে রাত্রে থাম বেয়ে উঠবার মতলব করছে।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—তোকে যে গোপাল সিংয়ের আক্রোশ পেয়ে বসল রত্ন!

ঠিক সেই সময়ে দরজায় দাঁড়িয়ে একটি তরুণী মেয়ে বলেছিল—খুড়ীমা!

—আন! ভিতরে এস!

মেয়েটি ঘরের ভিতরে ঢুকল, হাতে একটি রূপোর গেলাস। দরজার মুখে বাইরের আলো-কে পিছনে রেখে দাঁড়িয়েছিল বলে রত্নেশ্বর তাকে চিনতে পারেন নি। কিন্তু ঝি সে নয়, এটা বুঝতে পেরেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কে?

—অঞ্জনা!

—ও!

—বড় কাজের মেয়ে। বড় ভাল। ওকে আজ সকালে বললাম—তুমি এখানেই থাক। বুঝলে! আপন বাড়ীই ভাববে। তা বললে—খুড়ীমা, যে বাড়ীতে থাকি, সে বাড়ীর খড়ের চালে খড় নেই, শুয়ে চাঁদের আলো দেখি, রোদের তাপে পুড়ি। এত বড় বাড়ী, আপনার ভাববার মত ভাবনা কোথায় পাব? বরং ভাবনা হবে এমন বাড়ীতে থাকব কেমন করে।

বললাম—থাকবে ওই আপনার ভেবে। ভাবতে পারলে ও ভাবনা হবে না। বললে—কি করতে হবে আমাকে? বললাম—মাসীমার সঙ্গে থেকে শিখে নাও সব। মাসীমা আর ক'দিন। পরে সব তুমি করবে। বললে—বেশ। বিকেলবেলা সরবৎ তৈরী করে এনেছে নিজে থেকে। বললে—দেখুন তো খুড়ীমা, কেমন হয়েছে? করে আনলাম আপনাদের জন্যে। কি চমৎকার করেছে, কি বলব! বাবু খেয়ে তারিফ করলেন। চমৎকার হয়েছে! তোর জন্যে আনতে বললাম—নে, খেয়ে দেখ!

—দাঁড়াও, মুখে জল দি!

সত্যই সরবৎটুকু চমৎকার লাগল। স্বাদ তো বটেই, ঘোল এবং চিনির সঙ্গে আমআদার স্বাদ ও গন্ধ; এবং আরও কিছু আছে। সরবৎটুকুতে গাঢ় এবং মিষ্টি গন্ধ দিয়েছে। আম-আদার গন্ধকে ছাপিয়ে উঠছে গন্ধ!

মুখে দিয়ে খানিকটা খেয়ে রত্নেশ্বর বললে—তাই তো!

কাশী অঞ্চলে সরবতের চল খুব, তরিবৎও খুব। কাশীতে মানুষ রত্নেশ্বর আবার চুমুক দিয়ে আবার বললে—আতর? কিসের আতর?

ভবানী দেবী বললেন—আমিও বুঝতে পারিনি। কিন্তু উনি ঠিক ধরেছেন।

—কিসের গন্ধ বল তো? রত্নেশ্বর তাকিয়েছিলেন অঞ্জনার মুখের দিকে।

এতক্ষণে কালকের সেই বাক্‌পটু অঞ্জনা বেরিয়ে এল। চুপ করে মিষ্টি হাসিমুখেই সে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণে। বললে—তা শুনে আপনি কি করবেন? তারপর একটু হেসেই বললে —বউদি এলে বরং শিখিয়ে দেব। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তার তো দেরী আছে। এখন গরমকালটায় সরবৎটা তৈরি করিয়ে খাব।

—তার জন্যে তো আমি রইলাম। আমি করে দেব। শুধু এই সরবৎ কেন, আরও জানি। দেখবেন কাল খাওয়াব।

—কিন্তু গন্ধটা কিসের? খুব চেনা মনে হচ্ছে।

—মুচকুন্দ ফুলের। জ্যাঠামশাই ঠিক ধরেছেন। মুচকুন্দ ফুল সকালবেলা ঘোলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলাম, তাতে গন্ধটা মিশে গিয়েছে। তারপর সরবতের সময় পাঁপড়ী বেটে মিশিয়ে দিয়েছি।

ভবানী দেবী প্রসন্ন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ, এবার তিনি বললেন—রান্নার মশলা বড় কথা নয়, বড় কথা হাত। রান্না হয় হাতের গুণে। অঞ্জনার হাতই সুন্দর। জানিস, সকালবেলা পুজোর উদ্যুগ করেছিল। সে যে কি পরিপাটী করে ফুলগুলি থরে থরে রেখে বেলপাতাগুলি বেছে থালা সাজিয়ে দিয়েছিল, মনে হচ্ছিল থালাখানি সামনে নামিয়ে দিলেই পুজো হয়ে যাবে। মা হাত বাড়িয়ে ধরে নেবেন।

অঞ্জনা গ্লাসটি তুলে নিয়ে চলে গেল। ভবানী দেবী বললেন—বড় ভাল মেয়ে রে। অনেক গুণ ওর।

রত্নেশ্বর হেসে বললেন—একটু বেশী কথা বলে।

—তা বলে। কিন্তু কথা কইতে জানে। কথাতেও মধু আছে।

—না। শুধু মধু না, একটু টক স্বাদ আছে।

—ওর স্বামীকে একটা চাকরি করে দে। উনি তোকে বলতে বলেছেন।

হয়তো অঞ্জনার স্বামীর চাকরি হয়ে যেত কিন্তু বাইরে থেকে বীরেশ্বরের ডাক এল—রত্নেশ্বর!

সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন গিরীন্দ্র আচার্য।—বাবুজী!

চঞ্চল হয়ে উঠলেন রত্নেশ্বর। বুঝলেন কোন খবর এসেছে। গোপাল সিংয়ের খবর।

—যাই। বলে উত্তর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ভবানী দেবীও তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন। তাঁর উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। স্বামী-পুত্রকে ফিরে পেয়ে সংসার জীবনে সম্রাজ্ঞীর মত ফিরে এসেও তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। এসব তাঁকে বড় পীড়িত করে। কিন্তু 'না' বলতেও পারছেন না। এত বড় জমিদারী, রাজার মর্যাদা, এসব রাখতে গেলে এ না করেই বা উপায় কি?

খবর গোপাল সিংয়েরই খবর। কিন্তু কল্পনার বাইরে চলে গেছে। গোপাল সিং নিজের স্ত্রী এবং পুত্রকেই মারাত্মকভাবে জখম করেছে। এবং নিজের ঘরে আগুন দিয়েছে; সেই আগুন এই ফাল্গুনের দুপুরে তার ঘরকেই পোড়ায় নি—গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে; গোটা মৌজা বীরপুরেই লেগেছে। মৌজা বীরপুর এখনও পুড়ছে। গোপাল সিং ফেরার।

খবর এনেছে কুতুবপুর কাছারীর সওয়ার বরকন্দাজ। ঘটনাটা ঘটেছে এইভাবে। বেলা এক প্রহরের সময়, গোপাল সিং মাঠ থেকে ফিরে, শিবকে গাঁজা ভোগ দিয়ে তার প্রসাদ নিয়ে, মা-কালীকে কারণ নিবেদন ক'রে সবে প্রথম পাত্র প্রসাদটি পেয়েছে এমন সময় সদরের নির্দেশমত কুতুবপুর কাছারীর একজন বরকন্দাজ ঢেঁরাদার নিয়ে বীরপুর মৌজার মণ্ডলান পদের নতুন মণ্ডল ভগবানদাস মণ্ডলের নাম ঘোষণা করে জানিয়ে দিচ্ছিল—"আজ থেকে নতুন ডাক মোতাবেক বীরপুরের নতুন মণ্ডল হল ভগবানদাস মণ্ডল। পুরানো মণ্ডল গোপাল সিং-এর মণ্ডলান খারিজ।"

গোপাল ঢেঁড়ার শব্দ শুনেই চমকে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে হাতের লাঠিটা নিয়েই ছুটে বেরিয়েছিল পথে।

কৌন শালারে! কার এতনা বড়া ছাতি আর কলেজা বীরপুরে এসে গোপাল সিংহের বিনা হুকুমে ঢেঁড়া পেটে ডুগ ডুগ আওয়াজ তুলে। কার গর্দানায় ছুটো মুণ্ড, কৌন শুয়ারের বাচ্চার চারটে হাত—। হঠাৎ ডুগ ডুগ আওয়াজ থেমে গেল। একটা গোলমাল উঠল। গোপাল আরও জোরে ছুটল।

পথে দেখা হয়েছিল নিজের ছেলের সঙ্গে। ছেলে তখন শুনেছে। সেও গর্জাচ্ছে। ফুঁসছে। কিন্তু সে গোপাল সিংয়ের মত নয়; সে অনেকটা স্থিরমস্তিষ্ক। সে ভাবছিল—কি করবে। ঢেঁড়াদারকে আর বরকন্দাজকে ভাগিয়ে দিলেই কি জিতবে তারা? ভাগাতে হবে, ভাগাবার জন্তেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু শুধু ভাগাবে? না, মারপিট করবে? ভেবেচিন্তে সে রক্তারক্তি বা অন্ত হাঙ্গামা না ক'রে এগিয়ে গিয়ে ঢেঁড়াদারের ডুগডুগিটা ছিনিয়ে নিয়ে বরকন্দাজকে ধমক দিয়ে বা গায়ের জোরে ভাগিয়ে দেওয়াটাই ঠিক করে, এগিয়ে গিয়েছিল।

সঙ্গে ছিল নিজেদের ক'জন অনুগত লোক। ঢেঁড়াটা ছিনিয়েও নিয়েছিল, বরকন্দাজের সঙ্গে দু'-চার লাঠির ঠোকাঠুকি হয়েছিল এবং শেষে তার পাগড়িলাঠি কেড়ে নিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছিল।

আচার্যের নির্দেশ ছিল মার খেয়ে এস, মেরে আসামী হয়ে এসো না।

ঠিক এই সময়ে গিয়ে পড়েছিল পাগলা হাতীর মত গোপাল সিং।

কেয়া হুয়া ?

সমস্ত শুনে ঠাস করে ছেলের গালে মেরেছিল এক চড়। হারামীর বাচ্চা, কুত্তার কুত্তা, শুধু ঢেঁড়া কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিলি? শালা বরকন্দাজের জানটা নিলি না রে—বাঁদীর বাচ্চা!

ছেলের বয়স চল্লিশের কাছে। সে বলেছিল—গালাগালি করো না, ঘরে চল! মগজ গরম করলে কাম হয় না। মগজ গরম করে বুড়বুকেরা।

আবার চড় তুলেছিল গোপাল তার গালের উপর। ছেলে খপ করে হাত ধরে রুখে দিয়েছিল। তারপর বাপ-বেটায় শুরু হয়েছিল হাত-কাড়াকাড়ি। ওদিকে বিপদের আশঙ্কা করে বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল গোপালের বড়-স্ত্রী, বড় ছেলের মা। সে এসে পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল—নেহি, নেহি, নেহি। শুনো, শুনো বাবু শুনো—নেহি।

গোপালের পৈশাচিক ক্রোধ উঠেছিল জ্বলে, সে ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে, তার বুকে চেপে বসে টিপে ধরেছিল তার গলা। এমন ছেলে যার পেটে হয়, তার মরাই ভাল। মেরেই ফেলবে সে।

ছেলে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি, সে বাপকে ধরে টেনে ছাড়াতে চেষ্টা করেছিল—ছাড়ো, ছাড়ো, ছাড়ো।

গোপাল এবার স্ত্রীকে ছেড়ে মাটি থেকে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে মেরেছিল ছেলের মাথায়। লোহার বোলো লাগানো লাঠি। সে লাঠির ঘায়ে ছেলের মাথা ফেটে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল তার মুখ-বুক সমস্ত। ছেলে কয়েক মুহূর্ত পরেই ধড়াস করে পড়ে গিয়েছিল মাটির উপর।

ওদিকে তখন লোক জমায়েত হয়েছে প্রচুর, গ্রামের প্রায় সকল লোক ছুটে এসেছে চীৎকার শুনে। তারা আর থাকতে পারেনি। তারা সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গোপালের উপর এবং তাকে আটকে ফেলেছিল। গোপাল তাদের কুৎসিত গালাগালি করে হুকুম করছিল—ছোড়্ ছোড়্ হারামীরা—ছোড়্ রে—শালা লোক, ছোড়্! উসকো জান লেগা আমি। আমার মানইজ্জত বরবাদ করে দিয়েছে ওই লেড়কা। ওকে মেরেই ফেলব আমি।

সে তখন উন্মত্ত—বিকারগ্রস্ত। হাতে আটক পড়ে সে থু-থু করে থুথু ছুড়তে আরম্ভ করেছিল।

গোপালের অন্য ছেলেরা এবং মাতব্বরেরা পরামর্শ করে তাকে ধরে এনে একখানা ঘরের মধ্যে পুরে শিকল-তালা দিয়ে বন্ধ করেছিল। এবং বড় ছেলের ও গোপালের স্ত্রীর সেবার দিকে মন দিয়েছিল। গোপালের স্ত্রী অজ্ঞান হয়েছিল অনেকক্ষণ। বড় ছেলের মাথার ক্ষতটা গভীর এবং শঙ্কাজনক। সে-ও অজ্ঞান। রক্তস্রাব হচ্ছিল প্রচুর। জনকয়েক মাতব্বর বড় ছেলের

ক্ষতস্থানে বিশল্যকরণী গাঁদার পাতা লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করতে না পেরে কাপড় পুড়িয়ে চুন মিশিয়ে 'করালী' প্রলেপ তৈরী করে লাগাবার ব্যবস্থা করছিল।

আর বড় ছেলের ছেলে, সে আঠারো-উনিশ বছরের নতুন জোয়ান, সে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গোপাল সিংকে অভিশম্পাত করছিল।

ঘরের ভিতর গোপাল সিংও নিষ্ফল আক্রোশে গর্জাচ্ছিল। হঠাৎ উত্তপ্ত উন্মত্ত মস্তিষ্কে শয়তান জেগে উঠেছিল। ঘরের মধ্যে পেয়েছিল চকমকি—শোলা। আর পেয়েছিল চোলাই-করা মদের বোতল। তাই নিয়ে সে ষাট বছর বয়সেও কসরৎ করে উঠেছিল ঘরের ভিতরের সাভায়। সাভায় দাঁড়িয়ে ঘরের চালের বাখারীর কাঠামো ভেঙে খড় ছাড়িয়ে চালের উপর উঠে মদটা ঢেলে দিয়েছিল চালের খড়ের উপর, তারপর চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল চালের মাঝখানে।

এ-কাজ সে নিঃশব্দে করে গিয়েছিল। প্রথমটা কারুর নজরে পড়েনি। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেই গোপাল উল্লসিত চীৎকার করে বলেছিল—যা সব ছাই হয়ে। যা সব জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে। যা—।

কাউকে চালে উঠতে দেয়নি। যে উঠবে, তাকে সে দাও দিয়ে কোপাবে বলে ভয় দেখিয়েছিল।

স্তম্ভিত হয়ে উঠেছিল লোকেরা।

গোপাল জ্বলন্ত খড় টেনে বের করে ছুঁড়তে শুরু করেছিল চারিদিকে। জ্বলে যাক বীরপুর। ছাই হয়ে যাক। সব শালা বেইমান।

ফাল্গুনের দুপুরে রাঢ় অঞ্চলে এলোমেলো তপ্ত হাওয়া বয়। সেই হাওয়াটা তখন উঠেছে। আগুন বাতাসে ছুটতে লাগল।

গোপাল সিং এক সময় ধপ করে পথের উপর লাফিয়ে পড়ে ছুটল। সে বুঝতে পেরেছিল—গ্রামের লোকেরা এমনকি নিজের পাড়ার লোকেরাও আজ তার শত্রু। তাকে ধরতে পারলে তারা তার হাতে-পায়ে বেঁধে ওই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবে। একবিন্দু করুণাও আজ আর তার জন্যে কোথাও কারুর মনেই নেই। এই আগুনেই সব পুড়ে গেছে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে সে পালিয়েছে। পথ ধরে বেরিয়ে মাঠে পড়ে মাঠে-মাঠে ছুটে পালিয়েছে।

গোটা বীরপুর এখনও জ্বলছে। ফাল্গুনের দুপুর—রাঢ়ের এলোমেলো গরম হাওয়া আগুনের সঙ্গ পেয়ে দুরন্ততর বেগে মাতামাতি ক'রে নাচিয়েছে আগুনকে। জ্বলন্ত ঘরের খড় শিখার বেগে আকাশে খানিকটা উপরে উঠে হাউইয়ের আগুনের মত বেঁকে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে এর ঘরে, ওর ঘরে; কয়েক মুহূর্ত পরেই সে চালগুলোও জ্বলে উঠেছে। পথ-ঘাট পুকুরের জল পোড়া খড়ের টুকরোর ছেয়ে কালো হয়ে গেছে।

লোক অভিশম্পাত দিচ্ছে গোপাল সিংকে।

আর কাকে দেবে? গোপালের স্ত্রীর গলা থেকে এখনও কাশীর সঙ্গে রক্ত উঠছে। ছেলের এখনও জ্ঞান হয়নি। গোটা গ্রামে ঘরের আশ্রয় নেই। কামাখ্যা মায়ের মন্দির পাকা; একটা পাকা নাট-মন্দিরও আছে, সেইখানে আশ্রয় নিয়েছে গোপালের পরিবারবর্গ। বাকি

লোকেরা গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটা গোহত্যা হয়ে গেছে। গরু পুড়ে মরেছে; বেড়াল-কুকুর তা-ও পুড়েছে।

বেঁচে আছে গোপালের পুকুরপাড়ের ধানের বাখার। ওইগুলোই লোকে চেষ্টা করে বাঁচিয়েছে। তাও, সমস্ত বাখারের খড়ের চাল তুলে ফেলে বাঁচাতে হয়েছে। কতকগুলো বাখার খুলে ধানের রাশি ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে। না বাঁচিয়ে উপায় ছিল না। নইলে লোকে খাবে কি ? ?

দেওয়ান আচার্য কথা শেষ করে বললেন—এমনটা হবে ঠিক ভাবিনি। তবে কাজ শেষ। গোপালের চিতা গোপাল নিজে জ্বালিয়েছে। আমাদের আর কিছু করতে হবে না। শুধু থানাতে খবরটা পাঠাতে হবে। সে কুতুবপুর কাছারী থেকে গিয়েছিল—আমি পাঠিয়ে এসেছি।

শুনছিলেন তিনজন—বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, রত্নেশ্বর রায়। বীরেশ্বর আলবোলা টানছিলেন কিন্তু কখন যে নলটা রেখে দিয়েছিলেন বা হাত থেকে খসে পড়েছিল, তার খেয়াল ছিল না। কথা শেষ হতেই তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে ডানহাতখানা বাড়িয়ে নলটা হাতড়ালেন। চাকর মহেন্দ্র দূরে দাঁড়িয়েছিল, সে এসে নলখানা তুলে দিল তাঁর হাতে।

ভবানী দেবী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—মা গো !

বীরেশ্বর তার দিকে তাকিয়ে বললেন—হুঁ।

—কি করলে বল তো ?

—কি ? একটু হাসলেন বীরেশ্বর।

আচার্য বললেন—আমরা কি করলাম বলুন মা ? আমরা আইনের পথ ছাড়া চলি নি। যা করেছে সে নিজেই করেছে।

—করেছে, কিন্তু—।

—না মা, কোন কিন্তু নেই। আমরা কিছু করিনি। বলুন!

—বাঘের খাঁচায় মানুষকে ঢুকিয়ে দিলে বাঘ মানুষটাকে মারে, ছিঁড়ে ফেলে। বাঘই মানুষটাকে মারে খুড়োমশাই। কিন্তু তাতে বাঘের পাপ হয় না। পাপ মানুষেরই হয়।

বীরেশ্বর রায় হাতের নলটা ফেলে দিয়ে বললেন—মানুষ তো একরকম নয়, সতী বউ। মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে। রাজা আর প্রজা, জমিদার আর রাইয়ত এক নয়। রাজাকে মধ্যে মধ্যে বাঘের খাঁচায় মানুষকে ফেলে দিতে হুকুম দিতে হয়। কাশীতে তো কোম্পানী রাজ্য রাখতে মিউটিনীর সময় কি করলে চোখে দেখেছ। ছেদীর কটা নাতীকে গুলী করে মেরে দিয়েছে। ছেলেদুটোকে ফাঁসি দিয়েছে। ছেদীর ঠ্যাঙটাই কাটা গেছে। রাজধর্ম একটা আলাদা আছে। রাম রাবণকে সাজা দিতে গোটা বংশটাকে ধ্বংস করেছিলেন। ওখানে সাধারণের সঙ্গে বিচার চলে না। আপনি এক কাজ করুন।

আচার্য তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

বীরেশ্বর বললেন—কুতুবপুর কাছারীতে আজ রাত্রেই লোক পাঠান—কুতুবপুরের কাছারীর খামজোতের সমস্ত খড় বীরপুরের প্রজাদের দেওয়া হবে। যা কাপড় এসেছে এখানে বিতরণের

জন্তে তার কিছু কাপড় পাঠিয়ে দিন। কাপড়চোপড় পুড়ে গিয়ে থাকবে। ধান-চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। গরীবদের দশ-পাঁচ টাকা দাতব্য—আর গৃহস্থ প্রজা যারা ঋণ চাইবে, তাদের ঋণ দেওয়া হবে।

রত্নেশ্বর রায় মুখে একটি কথাও বলেননি। যা ভেবেছিলেন লেখা আছে তাঁর ডায়রীতে।

"এরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা আমি কল্পনা করি নাই। গোপাল সিংয়ের উপর কঠিন ক্রোধ ও আক্রোশ সত্ত্বেও এমন পরিণতিতে আমি বিমূঢ় এবং বেদনাহত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পিতৃদেব সুকৌশলে কস্টেলো পিক্রসকে দিয়া জন রবিনসনকে হত্যা করাইয়াছিলেন। আমি প্রথমটা ভীত হইয়াছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করিয়া সবিস্ময়ে দেখিয়াছিলাম।"

অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে তখন সারা বাংলায় একটা বিক্ষোভ জেগে উঠেছিল, তার সঙ্গে রবিনসনের নারী-লোলুপতার জন্ম একটা ঘৃণা জমে উঠেছিল মানুষের মনে। নারীহত্যাও সে করেছিল। তাছাড়া যার কান্নায়-দুঃখে এই ক্ষোভ আক্রোশ সত্ত্বেও মানুষ এতটুকু দুঃখ পায় এমন কেউ তার এ-পৃথিবীতে ছিল না।

রত্নেশ্বর লিখেছেন—"এমন পাষণ্ডের এই পরিণাম মানুষের কৌশলে সংঘটিত হইলেও, ভাবিয়াছিলাম ইহাই বিধাতা-নির্দিষ্ট দণ্ড। ঐ মানুষের মাথায় বজ্রাঘাত হইলে আরও খুশি হইতাম কিন্তু এই পরিণামেও কোন দুঃখ পাই নাই।

"দে সরকারকে দণ্ড আমি নিজে দিয়াছি। তাহাতেও আপশোস করি নাই। কখনও করিব না। কারণ, সে গোটা শ্যামনগর পুড়াইয়াছিল, আমাকে পুড়াইয়া মারিতে চাহিয়াছিল ; আমি তাহার ঘর পুড়াইয়া দিয়াছি। ডাকাতেরা তাহার অধর্মসঞ্চিত অর্থ লইয়াছে, কিন্তু তাহার বাড়ীর নারী-শিশুদের অঙ্গ স্পর্শ করি নাই। হাতটা ভাঙিয়া দিয়াছি। শুনিয়াছিলাম, লোকটা স্বহস্তে জাল করিত। কিন্তু গোপাল সিংয়ের ক্ষেত্রে এ কি হইল ? গোপাল সিং নিজে মরিলে কোন দুঃখ হইত না। কিন্তু এ কি হইল ? নিজের পুত্রকে সে হত্যা করিল ? শুনিতেছি সে বাঁচিবে না। লোকটা পাষণ্ড দুর্দান্ত, সে আমার মাতার অপমান করিয়াছে। রবিনসন ও দে সরকারের হুকুমে সে-ই শ্যামনগরে আগুন জ্বালাইয়াছে, আমার পৃষ্ঠদেশে পোড়ার দাগ এখনও সামান্য ঘর্ষণে জ্বালা করে। কিন্তু তবু মন হায় হায় করিতেছে।"

ভবানী দেবী বলেছিলেন—বাঘের খাঁচায় লোক ফেলে দিলে বাঘ তাকে হত্যা করে কিন্তু হত্যার পাপ বাঘের তাতে একবিন্দু নেই, পাপ সবটাই মানুষের।

এই কথাটাই অমোঘ মনে হয়েছিল রত্নেশ্বরের। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছিল—"একদিন জমিদার আমি হইব, ইহা জন্মমাত্রেই স্থির হইয়াছিল। কিন্তু তাহা মনে মনে জানিয়াও এমন কল্পনা কখনও করিতে পারি নাই। অত্যাচারী বলিয়া রায়বংশকে ঘৃণা করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, জমিদার হইয়া আমি আদর্শ জমিদার হইব।"

বীরেশ্বর রায় ভবানীকে বলেছিলেন—মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে সতীবউ। রাজা আর প্রজা, জমিদার আর রায়ত এক নয়। রাজার হাতে শাসনের ভার আছে। রাজাকে মধ্যে মধ্যে বাঘের খাঁচায় মানুষকে ফেলে দিতে হুকুম দিতে হয়। রাজধর্ম আলাদা। মিউটিনি

দমন করতে কোম্পানী কাশীতে বালকদেরও গুলী করে মেরে ফেলেছে। রাম রাবণকে সবংশে বধ করেছিলেন।

কথাটা শুনে রত্নেশ্বর যেন পড়তে পড়তে একটা আশ্রয় পেয়েছিলেন। ডায়রীতে লিখেছেন—"পিতার উত্তর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম, তাহার বাক্যই যেন আশ্রয়-দণ্ড হইয়া আমাকে আশ্রয় দিল। আমি বল পাইলাম। পিতৃদেব ঠিক কথা বলিয়াছেন। রাজধর্মের মতই জমিদারধর্মও স্বতন্ত্র। ইহা দুর্বলের জন্য নহে। দুষ্টকে দমন করিতে গিয়া যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য পাপ করিয়াছি মনে হইলে জমিদারী আসনে বসা চলিবে না। দৃঢ় হইতে হইবে।

"তবে আজ হইতে ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অতঃপর যাহাই করিব, তাহা আইনসঙ্গত প্রকাশ্যপথে করিব। জমিদারী ধর্মে আইনই ধর্ম। সেখানে যাহা ঘটিবে, তাহার জন্য আমার কোন আপশোসের কারণ থাকিবে না।"

সুরেশ্বর বিষণ্ণ হেসে বললে—তাও পারেননি তিনি। তিনি ঠাকুরদাসদাদাকে পিক্রুসকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন। এবং তার আগেও আরও একটা হত্যা তিনি করিয়েছিলেন। সে-ও অবশ্য তিনি দুষ্টকে দণ্ড দিয়েছেন।

সুলতা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—সে কে?

—সে? সে একজন গোয়ান চাপরাসী। রায়বাড়ীর অন্দরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সন্দেহে তাকে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন।

চমকে উঠল সুলতা। রায়বাড়ীর অন্দরের সঙ্গে?

—হ্যাঁ। ওই অঞ্জনা মেয়েটির সঙ্গে।

সুলতা বললে—ওঃ!

সুরেশ্বর বললে—তোমাকে বলব কি সুলতা, ওই কীর্তিহাটের বিবিমহলে বসে আমি জমিদার হলাম বাধ্য হয়ে। আমাকে তুমি জানতে। একালের মানুষ। আমি একালের সত্যকেই বড় করেই কাজ করছিলাম। আমার স্বার্থের চেয়ে মানুষের দাবীতে প্রজার দিকটাই বড় করে দেখেছি। কিন্তু আমারও মনে হয়েছিল শোধ নিতে শিবু সিংয়ের উপর। শোধ না নিলে আমার অন্যায় হবে। ধর্মচ্যুত হব আমি। আমার ইজ্জত আর থাকবে না। রত্নেশ্বর রায়ের কাল—১৮৫৯ সাল। আমার কাল ১৯৩৭ সাল। দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে। রায়বাড়ীর ছেলে অতুল জেলে। কুমারী মেয়ে অর্চনা, সে তাতে জড়িয়ে পড়েছে। মেজঠাকুমাও জেল খাটছেন। সে সময়ে প্রজাপীড়ন কতটুকু করতে পারা যায়? যতটুকু যায়, ততটুকু করেছি আমি। সুলতা, আমি শিবু সিংহের ফ্রি-শিপ বন্ধ করতে পারিনি—করিনি। কিন্তু বোর্ডিং ফ্রি-শিপ বন্ধ করেছিলাম। হরি সিংয়ের সঙ্গে কয়েকটা মামলাও শুরু হয়েছিল। কিন্তু সময়ে সুমতি হয়েছিল। চেতনা হয়েছিল এই ডায়রী পড়ে। নিবৃত্ত হয়েছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে সুরেশ্বর বললে—বাংলাদেশে, তাই বা কেন, পৃথিবীতে জমিদার এমন একজনও নেই বা হয়নি যে প্রজা দমনের নামে মানুষকে পীড়ন করেনি। ও হয় না।

গোপাল সিংয়ের ধ্বংস পর্ব, আচার্য দেওয়ান এটার নাম দিয়েছিলেন গোপালমেধ যজ্ঞ, শেষ হতে বেশী দিন লাগেনি। মাস-তিনেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। গোপাল সিংয়ের ফাঁসী হবার কথা। কারণ, গোপালের ছেলে ওই রাত্রেই মারা গিয়েছিল। থানায় তার খবর এবং এজাহার দিয়ে এসেছিল কুতুবপুর কাছারীর নায়েব। গোপাল তখন পালিয়েছে। কিন্তু বিচিত্র কথা কি জান, গোপালকে ফাঁসীর হাত থেকে বাঁচালেন ভবানী দেবীর অনুরোধে বীরেশ্বর রায়।

পরের দিন ভোর রাত্রে ভবানী দেবী উঠে স্নান সেরে মন্দিরে এসেছেন, মঙ্গলারতি হচ্ছে মায়ের; তাঁর সামনে হাতজোড় করে হাঁটু গেড়ে বসল আপাদমস্তক চাদর ঢাকা একটি মেয়ে।

গোপাল সিংয়ের কনিষ্ঠা পত্নী। তার দুটি শিশুপুত্রকে নিয়ে এসেছে রায়বাড়ীর সতী বউরানীর কাছে।

—রানীমাঈ ভিখ্‌ সা।

ভোরবেলা তখন আবছা অন্ধকার রয়েছে। নাটমন্দিরে একটা পঁচিশ-বাতি সে-আমলের ঝোলানো কেরোসিনের চিমনী জ্বলছে। গোটা নাটমন্দিরে অল্পকিছু লোক। সারারাত্রি প্রায় উৎসব চলেছে। রাত্রি তিনটে নাগাদ উৎসবের বাতি নিভেছে। গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকেদের কাছে-পিঠের লোকের বাড়ী, দূরান্তরের লোকেরা এখানে-ওখানে রায়বাড়ীর চারিপাশে এবং সামিয়ানা খাটানো আসরের উপর শুয়ে আছে। হুকুম ছিল—কোন মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েছেলে থাকলে তাদের যেন ঠাকুরবাড়ীতে জায়গা দেওয়া হয়। এ-মেয়েটি কখন এসেছে কেউ জানে না। এসে ঠাকুরবাড়ীর নাট মন্দিরেই আশ্রয় নিয়েছিল। উৎসবমত্ত রায়বাড়ীর কারুরই ঠিক খেয়াল নেই।

সতী বউরানী আরতির পর মন্দির থেকে নামছেন, এরপর যাবেন, গিয়ে পূজোতে বসবেন।

নাটমন্দির এবং মন্দিরের মাঝখানে, যেখানে হাড়িকাঠ পোতা আছে, সেইখানে তিনি নামবামাত্র এই অবগুণ্ঠনবতী এসে নতজানু হয়ে হাতজোড় করে বসল। ভবানী দেবীর পিছনে ছিল অঞ্জনা এবং তাঁর দাসী-দামিনী। বাকি রায়বাড়ীর অধিবাসিনী কুটুম্বিনীরা সব তখন ঘুমিয়ে আছে। দারোয়ান-চাপরাসীরা ঢুলছে। পুরুষদের মধ্যে ন্যায়রত্ন এবং পরিচারক ছাড়া আর কেউ নেই।

এই আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত অবগুণ্ঠনাবৃতা মেয়েটিকে এমনভাবে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখে প্রথমটা ভবানী দেবী ভেবেছিলেন, সে দেবীকে প্রণাম করছে। তিনি সরে দাঁড়ালেন সম্মুখ ছেড়ে। কিন্তু মেয়েটি বললে,—রানীমাঈ, ভিখ্‌ সা।

অস্ফুটপ্রায় স্বর, কিন্তু তার মধ্যেও কাতরতার অন্ত ছিল না। বুকফাটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন বেরিয়ে এল।

চমকে গিয়ে পিছিয়ে এলেন ভবানী দেবী। এই শেষরাত্রে এমন অকস্মাৎ সামনে নতজানু হয়ে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে কে তাঁকে ভিক্ষা চাচ্ছে?

একলা তিনি চমকে ওঠেন নি, অঞ্জনা এবং দাসীটিও চমকে উঠেছিল। স্মাররত্ন মন্দিরের ভিতর থেকে বাইরে এসে সগু পা দিয়েছেন, তিনিও চমকে উঠে বলেছিলেন—কে?

পরিচারক তাড়াতাড়ি নেমে এসে বলেছিল—কে গো? কে? কে তুমি!

ভবানী দেবী তখন নিজেকে সামলেছেন, তিনি পরিচারককে বলেছিলেন—তুমি সরে যাও। দেখছ না, মেয়েটি ঘোমটা দিয়ে রয়েছে, আমার সঙ্গে কথা বলছে। তুমি সর।

ভবানী দেবী মেয়েটির জোড়করা হাত-দু'খানির রঙ এবং তার হাতের রূপোর মোটা কাঁকনির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, সে ভাল ঘরের মেয়ে এবং ঠিক এ-দেশের নয়। ভিখ্‌সা কথাটা তাঁর কানে ঠিক স্বরটি তুলেছিল।

পরিচারক সরে গেলে তিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি কে বাছা?

—আমি ভিখ্‌সা মাংতে এসেছি রানীমাঈ।

—বল, কি ভিখ্‌সা চাও?

—আমার বাচ্চাদের বাপের জান। আমার সিঁথির সিঁদুর। দুনিয়ার কেউ রাখতে পারবে না বলছে লোকেরা, কিন্তু আমি জানে রানীমাঈ, আপনি পারেন। আমি শুনিয়েছি, আপনি আপনার স্বামীকে বাঁচাইয়েছেন। কালীমায়ী আপনার বাত শুনেন।

অঞ্জনা এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিল, সে বললে—তোমার স্বামীর কি হয়েছে বল। কোথায় বাড়ী বল। কি নাম?

ভবানী দেবী বলেছিলেন—থাক। তুমি আমার সঙ্গে ভিতরে এস।

তিনি তাঁকে অন্দরে নিচের তলায় নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসিয়ে বলেছিলেন—কোথা থেকে এসেছ মা? বীরপুর থেকে?

ঘোমটাশুদ্ধ মাথাটা নড়ে উঠেছিল—হ্যাঁ।

—বুঝেছি তা। তোমার ভিখ্‌সা ভিখ্‌সা শুনেই বুঝেছি। তার উপর তোমার হাতের রঙ, মোটা কাঁকনি। কতক্ষণ এসেছ?

—রাত পহেলা প্রহরে বয়েলগাড়ী জুড়ে সঙ্গে আদমী নিয়ে বেরিয়েছি মায়ী, শেষরাতে এসে পঁহুছুলাম।

—গোপাল সিংয়ের ছেলে কেমন আছে?

—মরে গেছে মায়ী।

—তার মা কি তুমি?

না-এর ভঙ্গিতে মাথাটা নড়ে উঠল।—না। তারপর বললে—উ বড়কী আছে।

—হুঁ। সে? সে কি করছে?

—উকেও জখম করেছে মায়ী। তার উপর—। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটি।

একটু স্তব্ধ থেকে ভবানী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন—গোপাল সিং?

—সে যে কোথায় ভেগেছে মাঈজী, সেই জানে।

—হুঁ।

-কাল পুলিশ এসেছিল মাঈজী। ইজাহার নিয়ে গেল, বড়ী বেটার লাস ভি আটকে

রেখেছে। আজ সুবায় নিয়ে যাবে। লোকে বলছে উনকা ফাঁসী হোয় যাবে মায়ী। আপনি বাঁচান। মায়ী আপনি বাঁচান।

ভবানী দেবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—আমি কি ক'রে বাঁচাব মা? রায়বাড়ী তো কিছু করে নি; যা ক'রেছে তার ফল ফলে গেছে। গোপাল সিং রায়বাড়ীর পাইক বরকন্দাজ খুন করলে ত আমি চাপা দিতে বলতাম। কিন্তু গোপাল রাগের বশে নিজের ছেলেকে—। ওঃ!

গোপালের স্ত্রী বলেছিল—মাঈজী, আজ সারা গাঁওয়ের লোক তার উপর খাপ্পা হয়ে গিয়েছে। তাকে পেলে হয় তো ছিঁড়ে ফেলবে, আরও খুন খারাবি হবে; তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে লোকে তাকে খুঁজছে। এক তুমি বাঁচাতে পার। বাঁচাও তুমি। মায়ী আমার বালবাচ্চারা ছোট।

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে।

—কিন্তু আমি কি করব বল?

—তা আমি জানি না মায়ী। তবে তুমি পার। তোমার পতিকে তুমি সাবিত্রীর মত বাঁচিয়েছ। মা কালীর সঙ্গে তোমার বাতচিত হয়। এ আমাকে সবাই বলছে।

—কি বলছে?

একটু চুপ করে থেকে সে বললে—মাঈজী, সবাই বলছে কালীমায়ীর রোষে সিংয়ের এই হাল হয়েছে। তোমার মত সতীকে সে কটু বলেছিল তারই সাজা দিয়েছে মা। তুমি খুশী হলেই—মাফ্ করলেই সে বাঁচবে!

ভবানী বলেছিলেন—মা, আমি কোনদিন তাকে শাপশাপান্ত করিনি। তবু তুমি বলছ, আমি অন্তর খোলসা করে বলছি—মা, গোপালকে বাঁচাও, মা, গোপালকে বাঁচাও। মা, গোপালকে বাঁচাও। আর—

একটু চুপ ক'রে থেকে ভেবে বলেছিলেন—আর আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের হুজুরকে, গোপালকে বাঁচাবার কোন পথ আছে কিনা! তাঁরা কিছু পারেন কিনা? যদি থাকে তবে নিশ্চিন্ত হও—তা আমি করব।

গোপালের স্ত্রী মেঝের উপরে হাত রেখে বসেছিল, সে হাতখানা মেঝের ধুলোতেই বুলিয়ে নিয়ে নিজের কপালে ঠেকিয়েছিল!

ভবানী দেবী বলেছিলেন—কিন্তু তুমি কাল থেকে কিছু খাওনি মা!

কপালে হাত দিয়ে ক্লান্ত স্বরে বউটি বলেছিল—থোড়া পানি পিয়েছি মায়ী। আর কিছু কি খাওয়া যায়?

—যায় না। কিন্তু তবু খেতে হয় মা। কিছু খাও তুমি। তারপর নিজের ঝি দামিনীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—দামিনী তোর উপর এর ভার রইল! কিছু খাওয়া ওকে। আর, এ বাড়ীর কারুকে পরিচয় দিসনে যে গোপাল সিংয়ের স্ত্রী। মানুষ শত্রু হলে বড় নিষ্ঠুর; তার ওপর—

একটু ম্লান হেসে বলেছিলেন—বড়লোক হলে তখন আর তার শেষ থাকে না! তারপর

অঞ্জনাকে নিয়ে ওপরে চলে এসেছিলেন।

* * *

পুজোর ঘরে ঢুকবার আগে চাকর মহিন্দরকে ডেকে বলেছিলেন—বাবু উঠলেই আমাকে ইশারায় জানিয়ো। দেওয়ানজী কাছারীতে এলেই তাঁকে খবর দিয়ো কোন কাজ যেন আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে না করেন। রত্ন হয়তো উঠে থাকবে, তাকে ব'লো আমার আশীর্বাদ না নিয়ে যেন বাইরে না বের হয়। কোন হুকুম না দেয়। সে যেন কলকাতার জ্যেঠামশাই আর তাঁর ভায়রাভাইয়ের দেখাশোনা করে। অঞ্জনা তোমার উপর ভার রইল জগদ্ধাত্রী দিদির আর ওঁর বোনের।

গতরাত্রে এরই মধ্যে বীরেশ্বরবাবুর খুড়তুতো দাদা দেবপ্রসাদ এসেছেন, জগদ্ধাত্রী বউ এসেছেন, সঙ্গে এসেছেন সস্ত্রীক স-পুত্রকন্যা তাঁর ভায়রাভাই, মেদিনীপুর সদরের এস-ডি-ও রাধারমণবাবু।

তাঁরা ওদিকের মহলের দোতলায় আছেন। লোকজন চাকর দাসী সবই সেখানে মোতায়েন আছে, তবুও নিজেরা দেখাশোনা না করলে আতিথ্যে ত্রুটি হবে।

বীরেশ্বর, রত্নেশ্বর, দেওয়ান আচার্য—কারুর সাহায্যই কিন্তু ভবানীর প্রয়োজন হয় নি। কার্যোদ্ধার তিনি নিজেই করেছিলেন। স্বামী পুত্র কাউকে একটি কথাও বলতে দেন নি।

তিনি পুজোর আসনে বসে অন্তরের সঙ্গে ডেকে দেবতাকে বলেছিলেন—গোপালকে তুমি রক্ষা কর মা। ওই মেয়েটির কাছে আমার মুখ রক্ষা কর।

তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল। স্তবের সঙ্গে প্রার্থনা শেষ ক'রে তিনি প্রণাম সেরে চোখ খুলেই দেখেছিলেন জগদ্ধাত্রী দেবীকে। জগদ্ধাত্রী তাঁর সম্পর্কে বড় হলেও তাঁর সখী, বয়সে তিনিই বছর দুয়ের বড়।

জগদ্ধাত্রী দেবী কখন এসে তার পুজোর আসনের খানিকটা দূরে বসেছিলেন। চোখাচোখী হতেই জগদ্ধাত্রী বলেছিলেন—তোর পুজো করা সার্থক! কতক্ষণ বসে আছি। খেয়াল নেই। চোখ থেকে জলের ধারা আর থামে না!

ভবানী হেসে চোখ মুছে বললেন—না ভাই, সাড়া ঠিক পাই নি।

—এমনি করে রোজ কাঁদিস?

—কাঁদি। কোন কোন দিন মনের দুঃখ জানাই আর কাঁদি!

—মনের আবার দুঃখ কি তোর এখন?

—সংসারটাই দুঃখে ভরা ভাই। আর নিজের দুঃখই কি সব?

—তা বটে।

—সুরবালা উঠেছে? রাত্রে কোন অসুবিধে হয় নি?

—অসুবিধে? বাপরে! মুখের কথা না-খসাতে পাঁচটা লোক ছুটে আসছে। তা ছাড়া ওই অঞ্জনা মেয়েটি। একেবারে হাজির হয়ে আছে। সুরো উঠেছে, সে মেয়েকে নিয়ে এসেছিল, তোর ধ্যান দেখে চলে গেল। আমাকে রেখে গেল!

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভবানী দেবী। বললেন—আমি যাচ্ছি। পুজোর কাপড় ছেড়ে,

পুজোর হাত রত্নেশ্বরের মাথায় দিয়ে, ওঁর গায়ে বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আমি।

—না। তোর সঙ্গে কথা এখানেই বলবে সুরবালা। তুই পুজোর আসনে বসে থাকবি ও বলবে।

—কেন? কি ব্যাপার? দোহাই তোর, আমি ভাই সিদ্ধটিদ্ধ নই। কি ফ্যাসাদ মা। তারপরই একটা কথা মনে ক'রে এক নিশ্বাসেই বললেন—তা ছাড়া ওঁর কর্তা তো শুনেছি সাহেবী মেজাজের মানুষ, বাড়ীতে সাহেবী কেতা; সুরোবালাও তো মেমসাহেব হয়ে উঠেছিল শুনেছি, ওঁদের এসব বাতিক কেন?

হেসে জগদ্ধাত্রী বললেন—সে-সব উল্টে গেছে। এখন মাদুলী-কবচ পরে। মাঝখানে রাধারমণের ঝগড়া লেগেছিল ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে, দারুণ ঝগড়া। চাকরি যায় যায়। হঠাৎ কার পরামর্শে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে দিয়ে যাগযজ্ঞি করিয়ে খুব ফল হয়েছে। সাহেবটা ঘোড়া থেকে পড়ে খোঁড়া হয়ে বিলেত চলে গেল; রাধারমণের চাকরি যাওয়া দূরের কথা উন্নতি হ'ল। বাঁকড়ো ছোট জেলা, সেখান থেকে মেদিনীপুরে এস-ডি-ও হয়ে এল। লালমুখের পোস্ট এটা, বাঙালীকে দেয় না; তা ওকেই দিলে। এখন ভক্তিটক্তি খুব। তার ওপর মেয়ে বড় হয়েছে; তেরো পার হতে চলেছে। সাহেবী মেজাজ নামের জন্যে ভাল বড় ঘরে বিয়ে হচ্ছে না। মুখটিপে হাসলেন জগদ্ধাত্রী দেবী। বললেন—তা না হ'লে নিজে যেচে চিঠি লিখে আমাদের সঙ্গে ক'রে তোর বাড়ী এসেছে!

ভবানী স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আভাস তিনি পেয়েছেন।—মেয়ের বিয়ে?

প্রশ্নটা করবার আগেই জগদ্ধাত্রী দেবী মৃদুস্বরে বললেন—ওই এসেছে ওরা! অঞ্জনার সঙ্গে বাড়ী ঘুরে, ছাদে উঠে গ্রামটা দেখে এল। জানবাজারের বাড়ী দেখেছে একদিন।

তারপরই উচ্চকণ্ঠে বললেন—আয় সুরো আয়। আমি বসিয়ে রেখেছি।

ভবানী দেবী ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। এবং দেখলেন বারান্দার দরজার ঠিক মুখেই অঞ্জনা এবং তার পিছনে সুরবালা ও তার বড় মেয়ে স্বর্ণলতা ঘরে ঢুকছে। হেসে ভবানী বললেন—আসুন!

অঞ্জনা তাড়াতাড়ি একখানা গালিচা এনে বললে—মামীমা, আপনি মেঝেতে বসেছেন! উঠুন উঠুন এখানা পেতে দি!

সুরবালা সরাসরি বললেন—আমার স্বর্ণকে এনেছি আপনার কাছে। ওকে এই আপনার পুজোর আসনের সামনে আপনার হাতে দিতে এসেছি। ওকে আপনাকে নিতে হবে। বলুন, পুজোর আসনে ব'সে বলুন নিলেন!

মেয়েটি সুন্দরী, কিন্তু রূপ যেন একটু উগ্র। রঙ উগ্র, চোখের দৃষ্টি একটু খটখটে, হয়তো মেজাজ একটু উগ্র হবে। মেয়েটি একটু ডাগরই হয়েছে। তাঁর মনে পড়ল রত্নেশ্বরকে।

রত্নেশ্বরও সেদিক থেকে বিয়ের বয়স পার হয় হয় বয়সে পৌঁচেছে। কুড়ি বছরে পা দেবে। রত্নেশ্বরের বিয়ের কথা এতদিন বিমলাকান্ত বলেন নি, বীরেশ্বর বলেন নি, বলেন নি ঠিক এই দিনটির জন্যে। এ দিনটি না পার হলে বিবাহের আসরে হয় অধর্ম ক'রে মিথ্যা বলতে হত না-হয়, রায়-বাড়ীর গুপ্তকথা প্রকাশ পেত।

বিবাহের সম্প্রদানের আসরে বলতে হবে—ভরদ্বাজ আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য প্রবরস্ত—কুড়ারাম দেবশর্মণঃ প্রপৌত্রং—সোমেশ্বর দেবশর্মনঃ পৌত্রং—বীরেশ্বর দেবশর্মণঃ পুত্রম। কিন্তু তা বলবার উপায় ছিল না। রত্নেশ্বর এতদিন বিমলাকান্তের পুত্র বলে পরিচিত ছিল! সত্য বললে রায়বংশের যে কথা—যে মর্মান্তিক সত্য—নবদ্বীপে শ্যামাকান্তের কবরের নিচে চাপা পড়েছে—তা প্রকাশ হয়ে পড়ত!

রত্নেশ্বরের সঙ্গে ভালই মানাবে!

সুরবালা বলেছিলেন—মেয়ে আমার অসুন্দর নয় ভাই। তাছাড়া আপনার রত্নেশ্বর শুনেছি ভাল লেখাপড়া করেছে। কাল রাত্রে উনি তো কথাবার্তা বলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লেখাপড়া খুব ভালবাসে। আমার মেয়েকেও লেখাপড়া শিখিয়েছি। বাংলা তো ভালই জানে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা মুখস্থ। ইংরিজীও বেশ ভাল জানে—উনি শিখিয়েছেন। ফার্স্ট বুক সেকেণ্ড বুক একেবারে মুখস্থ। ইস্কুলে দেবার জন্যে উঠ্‌বন্দী, তা আমি দিতে দিই নি। তা হ'লে আর ব্রাহ্ম না হয়ে উপায় থাকত না।

ভবানী ভাবছিলেন। মনের মধ্যে রত্নেশ্বর, তারপর বীরেশ্বর তারপর মনে হল রাধারমণবাবু এস-ডি-ও; তারপরই চকিতে মনে পড়ে গেল অবগুণ্ঠনাবৃতা একটি মেয়ে, তারপর মনে পড়ল গোপাল সিংয়ের নাম। আবার মনে পড়ল রাধারমণবাবু এস-ডি-ও!

সুরবালা বলেছিলেন—আমরা অবিশ্যি চাকরে। আপনারা মস্ত জমিদার। রাজা লোক। তবু এ বিয়েতে অগৌরব হবে না আপনাদের!

ভবানী বলেছিলেন—আমি ভাই পণ নেব!

—দেব। আমাদের সাধ্যমত দেব। বলুন কি নেবেন?

—মেয়ে-জামাইকে কি দেবেন সে আপনারা জানেন। যা দেবেন তাই অনেক। তবে আমি মা, আমাকে পণ দিতে হবে!

—বেশ তো! বলুন। হুকুম করুন!

—সে ভাই, মেয়ের বাপকে বলব। পণ নেব আমি তাঁর কাছে।

* * *

সুরেশ্বর বললে—ভবানী দেবী তাঁর ভাবী বৈবাহিকের কাছে পণ নিয়েছিলেন—গোপাল সিংয়ের মামলা থেকে মুক্তি! তিনি বলেছিলেন—ওর স্ত্রীকে আমি কথা দিয়েছি। গোপালকে বাঁচাতে যা করবার করব।

রাধারমণবাবু অভিভূত হয়েছিলেন ভবানী দেবীর করুণা দেখে। তিনি বলেছিলেন—লোকটা পাষণ্ড, অতি দুর্দান্ত, সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর লোক। এবার নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গেছে। এসব লোকের সাজা হওয়াই উচিত। তবু আপনি যখন বলছেন, তখন আমা থেকে যতটুকু হয় করব আমি। আসল হাত আপনাদের। আপনারা যদি, মানে বীরেশ্বরবাবু যদি, বীরপুরের লোকেদের সামবান, তারা যদি সাক্ষী না দেয়, তা হ'লে খালাস পেয়ে যাবে! আমি বলব যাকে যা বলবার, মানে তদন্তের সময় তারা যাতে চোখ বুঁজে তদন্ত ক'রে যায়, তা বলব।

ভবানী বলেছিলেন—ওঁকে আমি বলেছি।

সে এর আগেই হয়ে গেছে। বীরেশ্বর রায়ও ভবানীর কথায় গোপালকে ক্ষমা করেছিলেন। রাধারমণবাবুর সঙ্গে একথা হবার আগেই তিনি স্বামীর কাছে একথা বলে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—সতীবউ, তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই! তাই হবে, দিলাম!

ভবানী তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে প্রণাম করতে গিয়ে চোখের জল ফেলেছিলেন তাঁর পায়ের উপর।

বীরেশ্বর সমাদর ক'রে তাঁর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওঠ, কেঁদো না। তুমি করুণাময়ী। তবে একটা কথা আছে।

মাথা তুলে বসেছিলেন ভবানী দেবী।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তার স্ত্রীকে বল, সর্ত হ'ল গোপাল সিংকে আসতে হবে। হাটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইতে হবে! অন্যায় বলছি?

ভবানী বলেছিলেন—না। অন্যায় বলনি। তা করতে হবে বইকি! মামলা-মকদ্দমা এ সবই তাকে মেটাতে হবে। নিশ্চয় হবে। কিন্তু তুমি রত্নেশ্বরকে বল! সে হয়তো কথা শুনতে চাইবে না!

—তোমার কথা শুনতে চাইবে না?

—তুমি বুঝতে পার না?

একটু চুপ করে থেকে বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা পারি! রত্নেশ্বর আমার থেকেও জেদী। আমার চেয়ে সে শক্তিতেও বড়। আচ্ছা, তাকে বলব আমি।

ভবানী বলেছিলেন—আমি যাই, তোমার কাছে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।

—একটু বস। তুমি বড় দূরে দূরে থাক। এতকাল পর ফিরে এসেও কাছে এলে না। ব্রত করেছিলে, তা শেষ হয়েও শেষ হ'ল না। ব্রতধর্ম নিয়েই থেকে গেলে।

ভবানী তাঁর কাছে একটু সরে বসে বলেছিলেন—রত্নেশ্বরের বিয়ে হোক, তাকে সব ভার দিয়ে চল আমরা তীর্থ বেড়িয়ে আসি।

—খুব ভাল বলেছ। খুব ভাল বলেছ। এখন সুবিধাও হল, রেলগাড়ী হয়ে গেল। পথের কষ্ট নেই। তাই যাব! শুধু তীর্থ নয়, আগ্রা লক্ষ্ণৌ দিল্লী এসবও দেখে আসব। আগ্রায় তাজমহল দেখব। তুমি তাজমহল দেখো, আমি তোমাকে দেখব!

হঠাৎ একটা শব্দে তাঁদের বাক্যালাপে ছেদ পড়েছিল। দরজার ওপাশে রান্নাঘরের মেঝের উপর একটা কিছু যেন পড়ে গিয়ে শব্দ হয়েছিল।

বীরেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কে?

ভয়ার্ত ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এসেছিল—আমি।! অঞ্জনা!

ভবানী দেবী বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। অঞ্জনার শ্যামবর্ণ মুখও ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সে একখানি পরাতের উপর বীরেশ্বর রায়ের প্রাতঃরাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালে

ঠেস দিয়ে। পরাত থেকে জলের গ্লাসটা কি ক'রে মেঝের উপর পড়ে গেছে। সে পরাতখানা নামাতেও পারছে না, জলের গ্লাসটা নিয়ে কি করবে তাও বুঝতে পারছে না।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—পড়ে গেল গ্লাসটা ? কি ছিল ওতে ?

—জল। কোনরকমে উত্তর দিয়েছিল অঞ্জনা।

—তা যাক। ওটা তুমি আমাকে দাও, দিয়ে, যাও নতুন গ্লাসে জল নিয়ে এস। না, মহেন্দ্রকে দিয়ে জল পাঠিয়ে দিয়ো। তুমি বরং রত্নেশ্বরকে গিয়ে বল, সে যেন এখুনি এ ঘরে আসে। একটু পর ! ওর খাওয়াটা হয়ে যাক। বুঝেছ !

ঘাড় নেড়ে—হ্যাঁ—জানিয়ে অঞ্জনা চলে আসতে পেরে বেঁচে গিয়েছিল। সে খাবারের পরাত নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল, কর্তা-গিন্নীর কথার সাড়া পেয়ে। ভাবছিল সাড়া দিয়ে ঢুকবে কি না ; এই মুহূর্তেই কানে এসেছিল বীরেশ্বরের গাঢ়স্বর এবং সেই গাঢ়স্বরের ওই গাঢ় কথা ক'টি—একটু বস'। তুমি বড় দূরে দূরে থাক। কতকাল পর ফিরে এসেও কাছে এলে না।

রত্নেশ্বরের সমবয়সী অঞ্জনা, রত্নেশ্বর থেকে কয়েকদিনের বড়। সেদিন বলেছিল—সাত-দিনের বড়। কিন্তু না, ঠিক হিসেবে আটদিনের বড়। সে হিসেবটা হয়েছিল রত্নেশ্বরের জন্মদিন ধ'রে নয়, বিমলার মৃত সন্তানের জন্মদিন ধ'রে। বয়স তার উনিশ পার হচ্ছে। তার উপর সন্তান হয়নি। এবং বিচিত্র চরিত্র, দারিদ্র্য এবং বাউণ্ডুলে স্বামীর উপেক্ষার মধ্যেও কৌতুক আর পরের ঘরের আনন্দ উল্লাসের ভাগ নিয়ে সে শুধু বেঁচেই নেই, সংসারে বিচরণ করে বেড়ায় চঞ্চল পদক্ষেপে। দশের সম্মুখে কোনরকমে পদক্ষেপের সে চাঞ্চল্য সংযত হয়, কিন্তু একা হলে আর রক্ষা থাকে না। সেদিন সেই মুহূর্তে ওই ভেজানো দরজার এপাশে একলা ওই রান্না-ঘরটিতে দাঁড়িয়ে কর্তা এবং গৃহিণীর এই গাঢ় কথাবার্তা শুনে তার অন্তরের কৌতুক-সরসতা উছলে উঠেছিল। সে নীরবে দাঁড়িয়ে আড়িপাতার মত শুনতে আরম্ভ করেছিল তাদের কথাগুলি। তন্ময় হয়ে শুনছিল। যখন বীরেশ্বর বলেছিলেন—তাজমহল দেখতে যাব, সেখানে তুমি দেখবে তাজমহল আর আমি তাকিয়ে থাকব তোমার মুখের দিকে। তখন তার কৌতুক-সরসতা প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল দমকা বাতাসের মত। হাসি চাপতে গিয়ে মুখে কাপড় চাপা দেবার জন্ম হাত খোলা পায় নি ; ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের কাপড়ে মুখ গুঁজতে গিয়ে নড়ে উঠেছিল হাতে ধরা পরাতখানা এবং গ্লাসটা গিয়েছিল সশব্দে মেঝের উপর পড়ে। লজ্জার এবং ভয়ের আর অন্ত ছিল না।

বড়লোকের বাড়ীতে আগন্তুক দরিদ্র আত্মীয়দের অবস্থা বড় নিদারুণ। চাকরদের চেয়েও মর্মান্তিক। তার উপর সদ্য একদিন আগে তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ভবানী দেবী তাকে নিজের কাছে রেখেছেন, তার সব ভার নিয়েছেন, বাউণ্ডুলে স্বামীকেও চাকরি দেবেন বলেছেন। চোখের উপর এ বাড়ীর ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ খেলা দেখেছে। গোপাল সিং-এর খবরের মধ্যে এদের বিক্রম দেখেছে, বীরেশ্বর রায়ের গাম্ভীর্য দেখেছে, ফলে একটা নিদারুণ ভয়ও তার অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত ছায়ার মত জমে উঠেছে। সেটা তাকে হাঁ ক'রে গিলতে এসেছিল সেই মুহূর্তে। কেঁপে উঠে সে কোনরকমে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল; ঠেসটা

না পেলে হয়তো পড়ে যেত।

ভবানী দেবী এসে তাকে তিরস্কার করলেন না, তাকে অব্যাহতি দিয়ে বললেন—মহেন্দ্রকে দিয়ে জল পাঠিয়ে দাও। আর তুমি রত্নেশ্বরকে বল, সে যেন কর্তার সঙ্গে এখুনি দেখা করে।

সে বাঁচল। বেঁচে গেল। রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দাটা হাল্কা পায়ে পার হয়ে ডানদিকে আর একটা রান্না-ঘরে বেঁকে সে খানিকটা ছুটে নিল আনন্দে এবং কৌতুকে। কিন্তু আবার থমকে গিয়েছিল রত্নেশ্বরের ঘরের সামনে এসে। রত্নেশ্বরকেও তার ভয় হয়ে গেছে ওই বীরেশ্বর রায়ের মতই। তারই বয়সী, তার থেকে সাতদিনের ছোট এই আত্মীয়টি শুধু লম্বায় চওড়াতেই নয়, চোখের চাউনিতে, কথায়-বার্তায়, তার থেকে ওজনে অনেক ভারী। নিজেকে সংযত করেই সে ঘরে ঢুকেছিল।

কিন্তু রত্নেশ্বর তাকে আশ্চর্য হাল্কা এবং প্রসন্ন মেজাজে স্নেহসরস কণ্ঠে বলেছিলেন—কি সংবাদ?

রত্নেশ্বরও বিবাহের কথার সংবাদটা শুনেছেন। তাঁর মেজাজে তখন দোলা লেগেছে। তিনি প্রসন্নমনেই ছিলেন এবং অঞ্জনার মতই কাউকে খুঁজছিলেন যার কাছে তিনি অসঙ্কোচে সংবাদটা সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি বাইরে বের হবার জন্যে পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। এবং এই কথাই ভাবছিলেন।

চাকরদের কাছে এ সংবাদ অসঙ্কোচে সংগ্রহ করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে বোন বউদি অথবা ঠাকুমা দিদিমারাই গুপ্তচরের কাজ করবার যোগ্য পাত্রী। কিন্তু তেমন কেউ ছিল না। তাই অঞ্জনাকে দেখে তিনি তার মধ্যেই সেই প্রত্যাশিত জনটিকে পেয়ে উল্লসিত কণ্ঠে—।

সুরেশ্বর বললে—তাই বা কেন সুলতা, উচ্ছ্বসিত উল্লাসের সঙ্গেই আহ্বান এবং প্রশ্ন করেছিলেন—কি সংবাদ?!

পৃথিবীতে এমন কতকগুলো জায়গা আছে, যে জায়গাগুলোতে ধ্বনির প্রতিধ্বনি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে সাড়া দেয়। অনেক খিলেনওলা বাড়ীতে একটা কে শব্দ বললে প্রতিধ্বনিতে সাতটা আটটা কে পরপর স্পষ্ট হয়ে বেজে বেজে যায়। অঞ্জনার প্রকৃতি চরিত্র ঠিক এমনি ধরনের। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া বাজে। রত্নেশ্বর রায়ের এই হাল্কা মেজাজের সুপ্রসন্ন ওই কি সংবাদ প্রশ্নটির প্রতিধ্বনি মুহূর্তে উত্তর হয়ে বেরিয়ে এসেছিল তার মুখ থেকে। তার নেভানো কৌতুকসরস চিত্তদীপটি দপ করে জ্বলে উঠেছিল। সে বলেছিল—সংবাদ, সুসংবাদ! মিষ্টি খাওয়ান।

—মিষ্টি? তা খাওয়াব। কিন্তু সংবাদটা আগে বল!

—আপনার বিয়ে।

—বিয়ে!

—হ্যাঁ। কনে তো দেখা দিতে এয়েছে!

—শুনেছি।

—দেখেছেনও!

—দূর থেকে।

কৌতুকময়ী মেয়েটি মুহূর্তে রঙ্গময়ী হয়ে উঠে চুপিচুপি বলেছিল—কাছ থেকে দেখতে চান না কি ?

—উঁ ? কাছ থেকে দেখা ? না—। এতটা থাক। কিন্তু তোমাকে খুঁজছিলাম।

—কেন ?

—মেয়েটি মানুষ কেমন যাচাই ক'রে বলতে পার ?

—পারি ! কি যাচাই করতে হবে বলুন !

—এখন হবে না। বলব তোমাকে। বুঝেছ। আমি এখন একটু বেরুব। সরকারী হাকিমরা আসবেন। বিবি-মহলে যাব। পরে, দুপুরবেলা একটু অবসর ক'রে এস।

—আসব ! কিন্তু এখন বাইরে যাবেন না। কর্তাগিন্নী ডাকছেন আপনাকে। বসে আছেন।

—বাবা মা দুজনে ডাকছেন ? কেন ?

—তা জানিনে। আসুন এখন। এমনিতেই কথায় দেরী হয়ে গিয়েছে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আপনার বিয়ের আনন্দে !

—আমার বিয়ের কথায় তোমার এত আনন্দ ?

—হবে না। কত ধুমধাম হবে। কিন্তু আসুন !

পথে যেতে যেতে অঞ্জনা বলেছিল—বাবাঃ যে বিপদ হয়েছিল—।

—কি বিপদ ?

—সে সেই দুপুরবেলা বলব !

বাপ মায়ের ঘরের সামনে এসে সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকলেন রত্নেশ্বর। —মা !

উত্তর দিলেন বীরেশ্বর।—এস।

তার পোশাকপরিচ্ছদ দেখে বললেন—বেরুচ্ছ কোথাও ?

—হ্যাঁ, বিবিমহলে যাব।

—হ্যাঁ দেখে এস। সমস্ত বন্দোবস্ত নিজে দেখা উচিত। রাজকর্মচারী আসবেন। এঁরা হলেন সাপ, গোখরো সাপ, বাঁশী বাজিয়ে যতক্ষণ মনোরঞ্জন করে রাখতে পারবে ততক্ষণ বেশ তালে তালে দুলে দুলে নেচে যাবেন। যেমনি তাল কাটবে কি তার প্রতি একটু অন্যমনস্ক হবে, অমনি ছোবল দেবেন। চাণক্যের শ্লোকেই আছে—রাজকুলকে বিশ্বাস করো না। অবশ্য এবার রাধারমণবাবু রয়েছেন বাড়ীতে, তিনি আত্মীয় হয়ে এসেছেন, আত্মীয় হতেও চাচ্ছেন। তাঁর জন্যে অনেকটা ঘরোয়া ব্যাপার হবে। তবু দেখে এস। নিন্দারই বা কিছু থাকবে কেন। যাবার সময় বিবিমহল হয়ে যাও, ওঁদের সঙ্গে দেখা করে কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করে যাবে। দেবব্রত দাদা আছেন, জ্যেঠাইমা আছেন, ওঁদের প্রণাম যেমন করবে, তেমনি রাধারমণবাবু এবং তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম করবে।

—যে আজ্ঞে। ওঁদের কাছ হয়েই যাচ্ছি।

—বস, আর একটা কথা আছে। তোমার জননী একটি কঠিন ভিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন একজনকে। ভোরবেলা মঙ্গল আরতির সময় একজন স্ত্রীলোক প্রার্থী তাঁর পায়ে ধ'রে ভিক্ষে চেয়েছেন—উনি মায়ের সামনে দেব বলেছেন।

রত্নেশ্বর ভুল বুঝলেন। তিনি ভাবলেন, ভোরবেলা সম্ভবতঃ রাধারমণবাবুর স্ত্রী বিয়ের কথা তুলে ভবানী দেবীর কথা আদায় করছেন। সেই কথা বলছেন বাবা। তিনি হেসে বললেন —কথা দিয়েছেন মা, তখন কথা কি আছে। দিতে হবে!

ভবানী দেবী এবার কথা বললেন—গোপাল সিংয়ের স্ত্রী এসে হাত জোড় ক'রে আমাকে বললে—আমার স্বামীকে বাঁচাও মা! এ এক তুমি পার। আমি তাকে কথা দিয়েছি রত্ন। মেয়েটি বলছে—গোপালের ফাঁসী হয়ে যাবে। তার বড় ছেলে মারা গেছে, বাঁচেনি। বড় স্ত্রী মর-মর। গাঁয়ের লোক ক্ষেপে গিয়েছে গোপালের উপর। পুলিশ এসেছে, তাকে খুঁজছে। সে ফেরার।

বীরেশ্বর রায় বললেন—আমাকে উনি বলতেই আমিও তুমি যা বললে তাই-ই বলেছি, তবে সর্ত রেখেছি, গোপালকে এসে ক্ষমা চাইতে হবে প্রকাশ্য কাছারীতে। মণ্ডলান দাবী নিজে থেকে নাকচ করতে হবে। তা ছাড়া যেখানে যা জবরদখল ক'রে রেখেছে সব ছাড়তে হবে!

মুখ নিচু করে রত্নেশ্বর শুনে যাচ্ছিলেন কথাগুলি। ক্ষণেক্ষণে তাঁর কপাল কুঁচকে উঠছিল। গোপাল সিংকে ক্ষমা করার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। রাগ হচ্ছিল তাঁর মায়ের উপর! ক্ষমা করবেন তিনি গোপালকে? গোপাল তাঁর সম্পর্কে যা বলেছিল, তা তো তিনি না-জানা নন। গোপাল তাঁকে ঘর-বন্ধ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। তাকে বাঁচাতে হবে? একি সত্য যুগ না ত্রেতা যুগ না দ্বাপর যুগ? শিবি রাজা আশ্রিত পায়রাকে বাঁচাবার জন্যে নিজের গায়ের মাংস কেটে দিয়েছিলেন বাজপাখীকে। জীমূতবাহন নাগকে রক্ষা করতে গড়ুরের আহার হতে গিয়েছিলেন। বশিষ্ঠ ক্ষমা করেছিলেন পুত্রঘাতী বিশ্বামিত্রকে। এটা কলি যুগ!

ভবানী ছেলেকে নীরব দেখে বলেছিলেন—কি তুই চুপ ক'রে রইলি যে?

—কি বলব? তুমি কথা দিয়েছ, বাবা তাই মেনে নিয়েছেন, এর ওপর আমি আর কি বলব? তবে—

—কি?

—তবে এতে আমাদের করবার কি আছে? আমরা বাঁচাব বললেই তো বাঁচানো যাবে না। এ তো এখন কোর্টের হাতে। এ তো খুনের মামলা দাঁড়াবে! বাদী তো আমরা নই।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা নই। কিন্তু কেসের সাক্ষীর মালিক আমরা। বীরপুরের সাক্ষী বীরপুরের প্রজারা। আমরা যা বলাব, তাই তারা বলবে। তা ছাড়া সরকারী মহলকেও আমরা একটু আধটু ব'লে কয়েও দিতে পারব বই কি! ব্যাপারটা তোমাকে নিয়েই জটিল হয়েছে বেশী। তোমাকে, সে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল—

—যদি তাই হ'ত, তা হ'লে কি গোপালকে বাঁচাবার কথা বলতে পারতেন! মা এ কথা দিতে পারতেন?

—না। তা পারতাম না। কিন্তু তা যখন হয় নি রত্ন, তখন ক্রোধ তোমার সম্বরণ করাই

উচিত।

ভবানী বলে উঠলেন—ওরে তোর—তোর বাপের এতে কল্যাণই হবে। বুঝলি, দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে। বল তো কি কাণ্ড হল? লোকটা নিজের ছেলেকে খুন ক'রে বসল'। তোদের ওপর রাগে! তা ছাড়া রত্ন, তুই ফিরে এলি আপনার অধিকারে। তোর বিয়ে দেব। তুই সংসারী হয়ে জীবন আরম্ভ করবি। আজ দয়াধর্ম ক'রে আশীর্বাদ কুড়িয়ে নে বাবা। লোকে ধন্য ধন্য করুক।

বীরেশ্বর বললেন—আরও একটা কথা আছে রত্ন, আজ গোপালকে রক্ষা করলে লোকে বলবে—এরা শুধু মারতেই পারে না, ইচ্ছে করলে এরা বাঁচাতেও পারে!

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায়ের ডায়েরীতে তিনি লিখেছেন—"শেষ কথা দুইটাতে আমার ক্ষোভ অপসারিত হইল! নূতন সংসারজীবনে প্রবেশ করিব, এই সময় গোপাল সিং-এর ওই অল্পবয়সী স্ত্রীটির এবং তাহার বালকপুত্র দুইটির অশ্রুজলে অবশ্যই আমার কল্যাণ হইবে না। ইহা অপেক্ষাও মূল্যবান কথা বলিয়াছেন পিতৃদেব। তাঁহার বিবেচনা বুদ্ধি এবং বিচারবোধ যতই দেখিতেছি ততই বিস্মিত হইতেছি। সত্যই তো, লোকে বলিবে—রায়বাবুরা ইচ্ছা করিলে শুধু মারিতেই পারেন না; ইচ্ছা করিলেই বাঁচাইতেও পারেন। বুঝিতে পারিয়া বলিলাম—ঠিক বলিয়াছেন। আমার আর কোন ক্ষোভ রহিল না। গোপালকে রক্ষা করাই এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য।"

* * *

রত্নেশ্বর এবার উঠবার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন। ভবানী বলেছিলেন—আর একটু ব'স। গোপালের স্ত্রীকে ডাকি, তাকে তোরা বাপবেটায় একটু আশ্বাস দে। আর কথাগুলোও বল!

গোপালের স্ত্রী এসে প্রায় হাউ-মাউ করে কেঁদেছিল। সে কান্নায় রত্নেশ্বর স্থির থাকতে পারেন নি, কিন্তু বীরেশ্বর রায় অবিচলিত ছিলেন। রত্নেশ্বরের চোখে জল এসেছিল। তিনি তা গোপান করতেই জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বীরেশ্বর রায় স্থির হয়ে বসে গড়গড়ার নল টেনেই গিয়েছিলেন। গোপালের স্ত্রীকে তার কান্নার বেগ কমে এলে বলেছিলেন—শোন বাছা, কতকগুলো কথা আমি ব'লে নি। স্থির হয়ে শোনো!

একে একে সর্তগুলি বলে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।

মণ্ডলান তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

বীরপুরের সমস্ত জবর-দখল সম্পত্তি ছাড়তে হবে।

কীর্তিহাটের কাছারীতে এসে কসুর স্বীকার করে মাফ চাইতে হবে।

এবার বল, তুমি গোপাল সিংকে রাজী করাতে পারবে?

দীর্ঘ ঘোমটাটানা ছত্রির মেয়ে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—হ্যাঁ। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরে পেয়েছিল অঞ্জনাকে। তাকে বলেছিল—রাণী মাঈজীকে একবার ডেকে দাও।

ভবানী দেবী উঠে এসেছিলেন, সে ভবানী দেবীকে বলেছিল—সে রাজী না-হলে আমি আর আসব না। রাজী হলে আমি নিজে তাকে নিয়ে আসব!

এতে মত শুধু দেন নি দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্য !

তিনি সব শুনে বলেছিলেন—এ কি করছেন বাবা বীরেশ্বর ?

বীরেশ্বর রায় চুপ করে ছিলেন—উত্তর দিতে পারেন নি !

ভবানী দেবী বলেছিলেন—মায়ের সামনে আমি কথা দিয়েছি দেওয়ান কাকা।

আলোচনাটা হয় তো আরও কিছুক্ষণ চলত কিন্তু মহিন্দর চাকর খবর নিয়ে এসেছিল—দেবব্রতবাবু, রাধারমণবাবু হাকিমসাহেবকে নিয়ে বাবুর কাছে আসছেন !

দেওয়ান আচার্য একটি কথা বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন—তা'হলে আমি যাই। ওঁরা আসছেন। ওদিকে অনেক কাজ ! আপনারা হুকুম করছেন, আপনারা মালিক ; আপনারা যা বলছেন তাই হবে। তবে—। একটু চুপ করে থেকেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—সাপের মাজা ভেঙে ছেড়ে দিলে কিছুদিন পর আবার ভাঙা মাজা জোড় পায়। তখন সে সাপ হয় কালসাপ !

বলতে বলতেই—কই ভায়া কই ? বলে দেবব্রতবাবু সাড়া দিয়েছিলেন।

—এস, দাদা এস !

—হ্যাঁ, মহিন্দর বললে—তুমি একটু পর আসছ। তা রাধারমণ বললেন—সেটা ওঁকে কষ্ট দেওয়া হবে, ওঁর হাঁটতে কষ্ট হয়, বাঁ পা এখনও টেনে চলতে হয় ; চলুন আমরাই যাই। রাধারমণও এসেছেন। তোমার বউদি, সুরবালা, সুরবালার মেয়ে স্বর্ণ, ছেলে মণীন্দ্র সকলে এসেছি আমরা।

বীরেশ্বর বিছানা থেকে নেমে উঠে দাঁড়ালেন তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য। ভবানী তাঁর লাঠিটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন।

—আসুন—আসুন—আসুন !

দেওয়ান আচার্য বেরিয়ে চলে গেলেন।

* * *

রাধারমণবাবু বসেই বললেন—এ তো আপনারা রাজত্ব গড়ে তুলেছেন বীরেশ্বরবাবু !

বীরেশ্বর রায় হেসে বললেন—পূর্বপুরুষ করে গেছেন। আমাদের ভাগ্যে আমরা ভোগ করেছি।

—তা করুন। রাজারা—রাজাদের ছেলেরা তাই করে। কিন্তু অনেক কীর্তি করেছেন। ভারী ভাল লাগল ! আপনার রত্নেশ্বরও খুব উপযুক্ত, খুব যোগ্যতা। He is a brilliant boy—আপনার দেওয়ান আমাকে বলছিলেন।

রত্নেশ্বর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। প্রণামাদি আসবামাত্র হয়ে গেছে।

রাধারমণবাবু বললেন—কে একটা দুর্দান্ত দুষ্ট লোক নাকি ভারী উপদ্রব শুরু করেছে। বলছিলেন আপনার দেওয়ান। শুনলাম আপনাদের ওপর রাগে সে না কি নিজের ঘরে আগুন লাগিয়েছে, বাধা দেওয়ায় তার নিজের ছেলেকে মাথায় মেরেছে এমন ক'রে যে খুন হয়ে গেছে ! আমি সব বলব আপনাদের এস-ডি-ওকে ! পুলিশকে একটু কড়কে দেবেন। ওরা সব পারে ! এসব লোকের চরম সাজা হওয়া উচিত। আমি শুনে খুশী হলাম কেন জানেন ?

আপনারা বেআইনী জবরদস্তি কিছু করেন নি! আপনারা আইনের পথেই চলেছেন! গভর্নমেণ্টও এইটে চাচ্ছেন।

বীরেশ্বর বললেন—কিন্তু বড় মর্মান্তিক হয়ে গেল ব্যাপারটা। বিশেষতঃ আমার গৃহিণীর মনে বড় লেগেছে। তিনি বলছেন—মণ্ডলানটা এইভাবে—

বাধা দিয়ে রাধারমণবাবু বললেন—নো—নো—নো স্যার, নো। আপনারা ঠিক করেছেন। খুব ভাল কাজ করেছেন। জানেন না বোধহয়, গভর্নমেণ্ট ভূমিস্বত্ব আইন সংশোধন করছেন। তাতে প্রজাদের অনেক সুবিধে হবে। বড়লাটের কাউন্সিলে আইনের খসড়া নিয়ে আলোচনা চলছে।

রত্নেশ্বর বললেন—Mr. Currie মুভ করছেন!

To amend the law relating to the recovery of rent in the Presidency of Fort William in Bengal. ?

—তুমি খবর রাখ! বাঃ! হ্যাঁ ওটা অনেকদূর এগিয়েছে। মোটামুটি

it is meant for improving the position of the raiyats of Bengal.

দুটো জিনিস নির্ঘাৎ—একটা হল—

the abolition of the Zaminders. Power to compel the attendance of their raiyats.

আর হাজির করতে বাধ্য করতে পারবেন না জমিদাররা। Second হল বারো বছর এক-নাগাড় প্রজা জোত ভোগ করলেই অকুপেন্সী রাইট হয়ে যাবে। বারো বছরের উপর মণ্ডলান স্বত্বের মণ্ডলকে তালুকদারী যদি দেয় ওই বারো বছরের দাবীতে তাহ'লে আপনাদের মুস্কিল হবে। বীরপুরের case-এ ঠিক ক'রেছেন আপনারা। এরপর মণ্ডলান আয়মাদারী এসব আর থাকবে না। আপনাদের দেওয়ানের ফারসাইট আছে। খুব ভাল ব্যবস্থা করেছেন!

ওদিকে জগদ্ধাত্রী সুরবালা স্বর্ণলতা ভবানী দেবীকে ঘিরে পাশের ঘরে বসেছিলেন, কিন্তু ওঁদের কান ছিল এ-ঘরে। সুরবালাই বললেন—ধান ভানতে শিবের গীত। এখানে এসেও সেই গভর্নমেণ্ট গভর্নমেণ্ট আর আইন আর আইন। দেখ তো কাণ্ড! বল না—জগদি!

জগদ্ধাত্রী দেবী উঠে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন—ও মশাই সাহেবমানুষ। মেমসাহেব যে মেজাজ খারাপ করছেন! বলছেন কুটুম্ববাড়ীতে এসে সাহেবী মেজাজটা ভুলতে পার না। ধান ভানতে শিবের গীত গাও যে! এলে মেয়ের বিয়ের কথা নিয়ে, এসে এসব হচ্ছে কি?

রাধারমণবাবু অপ্রতিভ হলেন। বললেন—সে ধর না হয়েই গেছে দিদি। যখন এসেছি, তখন বীরেশ্বরবাবুর মত রাজা লোক প্রার্থীকে ফেরাবেন কি বলে?

রত্নেশ্বর আর দাঁড়ালেন না। বললেন—আমি তা হলে এখন আসি। ওঁরা সব আসবেন, আমি দেখে আসি ব্যবস্থা সব ঠিকমত হ'ল কিনা!

যাবার সময় ফিরে ওঘরে স্বর্ণলতার দিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করেও পারলেন না।

* * *

খুশী কথাটা ঠিক যেন লাগসই হচ্ছে না সুলতা। সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় তাঁর

ডায়েরীতে যে কথাটা ব্যবহার করেছেন সে কথাটা একালে পড়তে গিয়ে আমারও মনে হয়েছে বড্ড যেন বাড়াবাড়ি করেছেন, তরুণ রত্নেশ্বর। তবে ঊনবিংশ শতকের ঊনষাঠ সালে ভাষার ঢঙটাই ওইরকম ছিল। যুগটাই ঈশ্বর গুপ্তের যুগ। এদিকে কালীপ্রসন্ন সিং হুতোমপ্যাঁচার নক্সায় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা রত্নেশ্বর রায়ের মত চরিত্রের মানুষের পছন্দ না হবারই কথা। তিনি লিখেছেন—"অহো! এই জগত-সংসারে প্রেম কি দুর্লভ আনন্দদায়িনী সামগ্রী। ইহা অনন্ত অপার আনন্দসুধা রসের অফুরন্ত নির্ঝরধারা। অকস্মাৎ যেন শরবিদ্ধ হৃদয়—ভূতল বিদীর্ণ হওত প্রবল উৎসধারায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া আমার তাপিত নবযৌবনকে নিষিক্ত করিয়া দিতেছে। আমার জীবনযৌবন যেন প্রখর গ্রীষ্মসন্তাপিত পত্রহীন বৃক্ষের মত এই রস অভিসিঞ্চনে পত্রপল্লব সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। পল্লবাগ্রভাগে পুষ্প উদ্গমের জন্ম ব্যাকুল হইয়াছে।"

ইত্যাদি ইত্যাদি সে অনেক কথা তিনি লিখেছেন। তাই বলছি কালের সাদামাটা 'খুশী' শব্দটা বোধহয় রত্নেশ্বর রায়ের মনের অবস্থা বোঝাবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সেটা আর খুঁজে হায়রান হব না সুলতা, তুমি বুঝে নিয়ো। তিনি লিখেছেন—তাঁর গান মনে পড়েছিল।

গানে রত্নেশ্বরের অধিকার দুদিক থেকে। সংসারে হেরিডিটির সত্য অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। পিতৃকুলে বীরেশ্বর রায় গান-বাজনার চর্চা করেছিলেন। মাতৃকুলে শ্যামাকান্ত ছিলেন সিদ্ধ-গায়ক। ভবানী দেবীও গানে জন্মগত অধিকার নিয়ে জন্মেছিলেন। রত্নেশ্বরের স্নায়ুশিরায় অস্থিমজ্জায় মস্তিষ্কে বুদ্ধিতে বোধে সঙ্গীতবোধ ও তার ব্যাকরণের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার বংশসঞ্চিত গুপ্তধনের মতই রাখা ছিল। ওই মধ্যে মধ্যে কখনও এমনি উল্লাস আনন্দে কদাচিৎ গুঞ্জন করেছে। সেদিনটি তার মধ্যে একটি দিন। রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর বংশ বিবরণের মধ্যে যা পেয়েছি তাতে কখন গান গেয়েছেন এমন কথা লেখেন নি। তাঁর দিনলিপি আরম্ভ হয়েছে মাত্র দুদিন আগে থেকে। ওই দোলের দিন, পোষ্যপুত্র হিসেবে মা-বাপের কোলে ফিরে আসার দিন থেকে। তার তৃতীয় দিনে রত্নেশ্বর বিবাহ সম্ভাবনাতেই শুধু নয় ভাবী বধূটিকে বাড়ীতে চকিত চাহনিতে দেখে বিবিমহলে যাবার পথে গুনগুন ক'রে বসন্তরাগ ভেঁজেছিলেন। পিছনের বরকন্দাজ তাতে হাসে নি, সে বাবুজী সাহেবের গান শুনে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। বিবিমহলে রত্নেশ্বর রায় যখন দেখাশোনা করছিলেন, তখন বরকন্দাজটি আর একজন বরকন্দাজকে বলছিল—আরে ভাই, বাবুজী সাহেব এমন গানা জানেন কি বলব তোমাকে!

রত্নেশ্বর কথাটা শুনেছিলেন। এবং নিজেকে সতর্ক করেছিলেন—"অন্যায় করিয়াছি, নিজের অজ্ঞাতসারে গান গাহিয়া ফেলিয়াছি। গানের পথে বিপদ আছে রায়বংশের।"

বিবিমহলে তখন ঝাড়াই মোছাই হয়ে গেছে। ভবানী দেবীর প্রত্যাবর্তনের পর বীরেশ্বর রায় বিবিমহলে বাস করেন নি। বংশের অন্দরে বাস করছিলেন। বিবিমহলের ফার্নিচার তখন এখানে এবাড়ীতে এসেছে। তার জায়গায় রত্নেশ্বর আসবেন বলে যে সব নতুন ফার্নিচার এসেছিল কলকাতা থেকে, গদী আঁটা চেয়ার সোফা মার্বেল টপ টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, বড় বড় আয়না, নতুন গালিচা সেইসব দিয়ে বিবিমহল সাজানো হয়েছে। হয়েছে ক' মাস আগেই, সেই ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন স্টোন স্থাপনের সময়। সেগুলো ঝাড়ামোছা এবং একটু এদিক ক'রে

সাজানো এইসব কাজ হচ্ছিল সে দিন। কুইন ভিক্টোরিয়ার, প্রিন্স এ্যালবার্টের ছবি টাঙানো হয়েছে; তার সঙ্গে বিলিতী ল্যাণ্ডস্কেপ ক'খানা টাঙিয়ে সাজিয়েছে। এ-সব কাজের জন্ম কলকাতা থেকে সাহেববাড়ীতে কাজকরা একজন বেয়ারাকে আনা হয়েছে। সেই সব বরাতমত করাচ্ছে। রত্নেশ্বর নিজে প্রত্যেক ঘরের ব্যবস্থা দেখে খুশী হয়েই ওখান থেকে ফিরছিলেন; নিচে এসে দেখলেন দেওয়ান আচার্য তাঁর জন্তে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। বললেন —বাবুজী সাহেব, আমি তোমার জন্তেই দাঁড়িয়ে আছি ভাই!

রত্নেশ্বর বললেন—বলুন।

—বলব কি? তুমি তো সব জান। এ তুমি বলে ক'য়ে বন্ধ করো।

—কি?

—গোপাল সিংয়ের সম্বন্ধে যে হুকুম হল সে হুকুম তুমি ওন্টাতে পার। ওন্টাও ভাই। নইলে জমিদারী চলবে না। অন্ততঃ আমি তো চালাতে পারব না।

রত্নেশ্বর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তা কি ক'রে হয়! মন তাঁর অন্তরকম হয়েছিল, তিনি সায় দিতে পারলেন না। বললেন—তা কি ক'রে হয় বলুন? মা কথা দিয়েছেন, খোদ কর্তা পর্যন্ত গোপাল সিংয়ের স্ত্রীকে ডেকে কথা দিলেন। সে কথা এখন না বলবেন কি ক'রে?

আচার্য বললেন—আমি তা হ'লে বাবুজী সাহেব, এই কাজকর্মগুলি চুকে গেলেই কাজ থেকে ছুটি নেব।

—ছুটি নেবেন!

—হাঁ। এরপর আমি আর কাজ করতে পারব না। আমার মুখ থাকবে না। কথায় বলেও আচার্য তৃপ্তি পান নি, কথা শেষ ক'রে ঘাড় নেড়েছিলেন—না।

রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—"মুহূর্তে আমার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আচার্য দেওয়ান আমাদের কথাও শুনিতে চাহিতেছেন না। এবং ভাবিতেছেন, রায়বাড়ীর তিনিই হর্তাকর্তা বিধাতা। তিনি না হইলে রায় এস্টেট চলিবে না, অচল হইয়া পড়িবে। আমি বলিলাম—বেশ আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা পিতৃদেবকে বলিব।" কথাটা আর সেই মুহূর্তে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি; পালকির বেহারার হাঁক শোনা গিয়েছিল। ব্যস্ত হয়ে একজন নায়েব ছুটে এসে খবর দিয়েছিল—হাকিমরা এসে পড়েছেন!

রায়বাড়ীতে হাকিমদের সম্বর্ধনা সেদিন রায়বাড়ীর সৌভাগ্যে কুটম্বিতার আসরে পরিণত হয়েছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সদর এস-ডি-ও রাধারমণবাবুর কন্তার বিবাহের সম্বন্ধের আসরে পরিণত হয়েছিল। ধুতিচাদর পরা রাধারমণবাবু তমলুকের এস-ডি-ও গুপ্ত সাহবকে বলেছিলেন—আজ কিন্তু আমরা রায়বাড়ীতে গভর্নমেণ্ট অফিসিয়েল নই মিস্টার গুপ্তা। আমরা আজ কন্তাপক্ষ। আপনারা শুনে নিশ্চয় খুশী হবেন যে আমার মেয়ে স্বর্ণলতার সঙ্গে বীরেশ্বরবাবুর পুত্র রত্নেশ্বরের বিয়ের সম্বন্ধ আজ পাকা হয়ে গেল!

অল্পবয়সী ইংরেজ ডি-এস-পি জোনস এসেছিল শীকারের লোভে। কথাটা শুনে সে উল্লসিত হয়ে বলেছিল—তা হলে তো এ শুভকর্মে আমাদের বরকনের কল্যাণ কামনা ক'রে কিছু পান

করা উচিত।

এ কথায় রাধারমণবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—সম্ভবতঃ তিনি আমার সম্মুখে মদ্যপান করতে সঙ্কোচবোধ করেছিলেন।

বীরেশ্বর রায় রত্নেশ্বরকে বলেছিলেন—তুমি তা'হলে ওদিকে গিয়ে কাজকর্মগুলি দেখ রত্নেশ্বর!

অবশ্য তার আগেই পরিচয়পর্ব শেষ হয়েছে। কীর্তিহাটের রায়বংশের উত্তরাধিকারীকে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন বীরেশ্বর রায় এবং তাঁর সঙ্গে রাধারমণবাবু তাঁর গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। সরকারী হাকিম তিনি—তিনি রত্নেশ্বরের গুণের কথা তাঁদের সামনে তুলে ধরেছিলেন সুন্দর কৌশলের সঙ্গে।

প্রথমেই বলেছিলেন—রত্নেশ্বর রায় কাশীতে ছিলেন মিউটিনির সময়। নিজের চোখে সব দেখেছেন। আমাকে বলছিলেন কাল; এমন সুন্দরভাবে বললেন এবং এমন বিচার ক'রেছেন যে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এবং আমি বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁর সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দেখে। সমস্ত ব্যাপারটা এ্যানালিসিস ক'রে অল্প কথায় সমস্ত কথাটা বলে দিলেন। বললেন—এটা হল ইণ্ডিয়ার ধর্মান্ধতার সঙ্গে ইউরোপীয়ান সিভিলিজেশনের লাস্ট ফাইট। এটাকে আলোর সঙ্গে অন্ধকারের লড়াই বলা যেতে পারে। ইণ্ডিয়ার ভাগ্য ভাল যে আলোর জয় হয়েছে। এ্যাণ্ড—ঃ এইটেই আমার সব থেকে ভাল লেগেছে; উনি বললেন—আলোই জেতে চিরকাল অন্ধকার হারে।

রত্নেশ্বর নিজের ডায়রীতে লিখেছেন—"এরূপ কথা আমি বলিয়াছিলাম ইহা সত্য কিন্তু এমন চমৎকার করিয়া বলি নাই। এবং ইহার সঙ্গে নির্বিচারে বালকবৃদ্ধকে হত্যা করার নিন্দাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার ভাবী শ্বশুরমহাশয় এই কথাগুলি বলিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে কোম্পানীর তরফের অত্যাচার বৃত্তান্ত বলা উচিত হইবে না।"

ওখান থেকে ফেরার পথে রত্নেশ্বর দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর ভাবী বধূকে। রায়বাড়ীর আলসের উপর বুক রেখে দুটি মেয়ে বোধহয় কীর্তিহাট গ্রাম দেখছিল। তার একজন অঞ্জনা অন্যজন স্বর্ণলতা; স্বর্ণলতাকে তিনি খুব ভাল ক'রে না দেখলেও তিনি তাঁকে চিনতে ভুল করেন নি। কারণ এমন মেয়ে রায়বাড়ীর জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে কেউ ছিল না।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রত্নেশ্বর ... লিখেছেন—"বিবিমহল ও রায়বাড়ীর খাসমহলের মধ্যবর্তী যে কলমের বাগান, সেই বাগানে প্রবেশ মুখে উক্ত নারীমূর্তিদ্বয়কে দেখিয়া চিনিলাম এবং পুলকিত হইলাম। অঞ্জনার পার্শ্ববর্তিনী ওই স্বর্ণাভ-বর্ণা কিশোরীটি যে স্বর্ণলতা ব্যতিরেকে অন্য কেহ হইতে পারে না ইহাতে আমার সংশয় ছিল না। আমি একটি বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। হৃদয় অভূতপূর্ব ভাবাবেশে আবিষ্ট হইল। সম্ভবতঃ তাহারা আমাকেও দেখিয়াছিল। কারণ তাহারা সরিয়া গেল। আমিও সরিয়া আসিলাম এবং লজ্জিত হইলাম। ছি—ছি—ছি, যদ্যপি কেহ দেখিয়া ফেলে! লোকে হাস্য করিবে। আমি তাড়াতাড়ি তত্রস্থান হইতে দ্রুতপদে কাছারীর মুখে চলিলাম। আমার সঙ্গে বরকন্দাজ

আমাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর একটু বিলম্ব হইলে সম্ভবতঃ গোলমাল হইত। যাহা হোক কাছারীতে আসিয়া বসিয়া মহাবীর সিংকে আজ্ঞা করিলাম যে, কেহ যেন এখন না আইসে। আমি বসিয়া স্বর্ণলতার সঙ্গে আমার ভাবী মিলিত জীবনের একটি সুখ-কল্পনার চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিতে বসিলাম।

"অকস্মাৎ মনে হইল অঞ্জনাকে বলিয়াছি দ্বিপ্রহরে আমার নিকট আসিবার জন্য। স্বর্ণলতার অন্তরের পরিচয় সম্যক জ্ঞাত হওনের জন্য কিছু প্রশ্ন করিব। কিন্তু কি প্রশ্ন করিব? প্রশ্ন একটি। আমাকে তাহার পছন্দ হইয়াছে তো? কিন্তু তাহা কি অঞ্জনাকে সরাসরি বলিতে পারিব? অঞ্জনা একটু প্রগলভা। লজ্জাবোধ হইতেছে।"

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর একটি ছোট কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটি তার ডায়রীর মধ্যে আছে।

কন্যার হইবে বিয়া ঘটকেরে আনাইয়া
পিতা কয় বাখানিয়া
পাত্র চাই ইন্দ্রের মতন
মাতা কহে বুদ্ধি নাই ইন্দ্র সাথে চন্দ্র চাই
খানিক কুবেরও চাই
রাজরূপ তার সাথে ধন।
ঘটক নাড়িয়া মাথা কন্যারে শুধায় কথা
এবে তুমি বল মাতা
এর সাথে আর কারে চাই?
কন্যা ভাবে মনে মনে হায় বলিব কেমনে
ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরের সঙ্গে যেন—পাই।

অঞ্জনার হাতে এই ধাঁধাটি দেবেন। স্বর্ণলতাকে সে বলবে—এই শেষ ছত্রে ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরের সঙ্গে কাকে চাই এই ফাঁকটি তুমি পূরণ করে দাও না ভাই! উত্তরটা আমি ভাই বুঝতে পারছি না!

অঞ্জনা লেখাপড়া জানে না, কিন্তু তা' বলে মূর্খ বলতে যা বোঝায় তা নয়। সেকালে লেখাপড়া না জেনেও পুরাণে কাব্যে রঙ্গরসিকতায় সে পারঙ্গমা ছিল। ছড়া, পাঁচালী, কৃত্তিবাসী-কাশীদাসী রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ মুখস্থ ছিল। আওড়াতে পারত। রীত তরিবৎ তাও সে ভালই জানত। লেখাপড়া না জানলেও অশিক্ষিতা ছিল না। সে একবার শুনে বলেছিল—কি—কি—কি আর একবার পড়ুন তো!

রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন—স্বলতা—"অঞ্জনার প্রশ্নে আমি কৌতুকবোধ করিলাম। বুঝিলাম সে বুঝিতে পারে নাই। আমি তাহাকে আবার একবার পড়িয়া শোনাইলাম। সে এবার খুক খুক শব্দে হাসিয়া ফেলিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসি রোধ করিতে চাহিল।"

রত্নেশ্বর প্রশ্ন করেছিলেন—হাসলে যে?

অঞ্জনা বলেছিল—এ তো খুব সোজা।

—সোজা? কই বল তো শুনি—।

—আর একবার পড়ুন।

রত্নেশ্বর পড়েছিলেন—

"ঘটক নাড়িয়া মাথা
কন্যারে শুধায় কথা
এবে তুমি বল মাতা এর সাথে
আর কারে চাই?
কন্যা ভাবে মনে মনে
হায় বলিব কেমনে—
ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরের সঙ্গে যেন—

অঞ্জনা বলে উঠেছিল—"রত্নেশ্বরে পাই।"

বলে খিলখিল শব্দে হেসে উঠেছিল।

রত্নেশ্বর শঙ্কিত হয়ে উঠে বলেছিলেন—চুপ—চুপ। বাইরে কে কোথায় শুনতে পাবে!

সাক্ষাৎকারটি পূর্বের বন্দোবস্ত মত দুপুরবেলা নির্জনে রত্নেশ্বরের ঘরে হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর গ্রামাঞ্চলে একটা বিশ্রামের সময় আসে। তখন সকলেই একটু আধটু গড়ায়।

সুরেশ্বর বললে—কি শীত কি গ্রীষ্ম—দুপুরের পর একটু গড়ানো এদেশের পক্ষে প্রয়োজন কি না সে কথা বৈজ্ঞানিকেরা বলতে পারেন। শুনেছি গান্ধীজীও নাকি গড়িয়ে থাকেন। ওঁর কোমরে যে পকেট ঘড়িটা আছে তাতে এলার্ম বাজে; ওই আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার পর সেটা বাজুক না বাজুক ঠিক উঠে পড়েন। তবে গ্রামের লোকে—নিতান্ত গরীবের ঘর ছাড়া সবাই ঘুমোয়। ১৯৩৭ সালেও ঘুমুতে দেখেছি আমি। ওর মধ্যে প্রয়োজন ছাড়া বোধহয় আভিজাত্যও আছে। আমারও ওটা অভ্যেস হয়ে গেছে।

সুলতা হেসে বললে—জানি আমি, আজ দুপুরেই টেলিফোন করেছিলাম। রঘু আমাকে বললে—লালবাবু নিদ যাচ্ছে দিদিমণি। কাল রাতভর আপনা সাথ গল্প করিয়েছেন আজ তো বহুৎক্ষণ নিদ যাবেন। দুপহর বেলা নিদ না-গেলে তবিয়ৎ খারাব হোয় উনকা। আমি বললাম—থাক তাহলে, ডেকো না।

সুরেশ্বর হাসলে। বললে—রঘুও ঘুমোয়। তবে টেলিফোনের রিঙ শুনে বোধ হয় জেগে উঠেছিল। ওরও এ রোগ ধরেছে কীর্তিহাটে। দুপুরবেলা সারা গ্রামে অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে ঘুমপাড়ানি মাসী এসে আঁচল বিছিয়ে বসেন।

—সেদিন, মানে, ১৮৫৮ সালের ফাল্গুন মাসের দুপুর বেলাটায় সবাই গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আগের দুদিন সারারাত্রিব্যাপী উৎসব গেছে। সারা রায়বাড়ীটা নিস্তব্ধ নিঝুম। রায়বাড়ীর কার্নিশে কার্নিশে অনেক পায়রা থাকত; আজও আছে; সেগুলো পর্যন্ত বাসায় বুক পেতে ব'সে থাকে; মধ্যে মধ্যে এক-একটা শব্দ ক'রে, তাও ক্ষীণ।

রত্নেশ্বর তাও লিখেছেন ডায়রীতে। তাঁর সেদিন ঘুম আসে নি। মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা

আসছিল কিন্তু পায়রাদের ওই ডাকেই চট্ চট্ করে সে তন্দ্রা ভেঙে যাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে ভাবনা হচ্ছিল—অঞ্জনা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি। দু চারবার খাট থেকে নেমে পায়চারী করেছেন; বার দুই বাড়ীর ভিতরের দিকের বারান্দার দরজা ফাঁক ক'রে তাকিয়ে দেখেছেন অঞ্জনা আসছে কি না। আবার দরজা বন্ধ ক'রে এসে বিছানায় উঠে হেলান দিয়ে বসছিলেন।

লিখেছেন—"প্রেমজনিত উদ্বেগ সম্বরণ করা অতীব কঠিন। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি এখনও তিনটা বাজে নাই। খাওয়া-দাওয়া আড়াইটা পর্যন্ত শেষ হয়। সুতরাং মাত্র অর্ধঘণ্টা পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে মাত্র, অথচ আমার মনে হইতেছে অন্তত দুই তিনঘণ্টা কাল আমি অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি।"

তারপর একসময় অঞ্জনা ঠিক এল। সন্তর্পণে দরজাটি খুলে গেল—এক ঝলক আলো ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকল অঞ্জনা এবং দরজাটি বন্ধ ক'রে এগিয়ে কাছে এসে বললে—বাবা! সবার চোখে ঘুম আছে, ঠাকমার চোখে ঘুম নেই। দিব্যি দেখি নাক ডাকছে, দেখে যেই উঠি অমনি দেখি বুড়ী ওঁ—আঁ শুরু করে দেয়। চোখ খুলে তাকিয়ে বলে—কিলা উঠলি যে? বিকেল হয়ে গেল না কি? একবার বললাম—ঘাটে যাব। তা বলে—না। আর একটু পরে যাস। এখন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। আর এই রাজসূয় যজ্ঞি। তিভুবনের লোক চারিদিকে। সোমত্ত মেয়ে—কোথা কে থাকে! যাসনে—শো! কি করব? এই এতক্ষণে ঘুমুলো। আস্তে আস্তে উঠে এসেছি। নেন—কি হুকুম বলুন!

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—খুব সাবধানে করতে হবে! বুঝেছ?

—বুঝেছি বলুন।

—একটি ধাঁধা দেব। যেন তোমাকে ধাঁধাটি দিয়েছি আমি। বুঝেছ?

—হ্যাঁ।

—তুমি মনে কর ধাঁধাটি বুঝতে পার নি এই ভান দেখিয়ে স্বর্ণলতাকে ডেকে বলবে—ভাই, তুমি তো লেখাপড়া জানা শহুরে মেয়ে, এই ধাঁধাটি পূরণ করে দেবে?

—ধাঁধা? কি ধাঁধা? বলুন।

—কাগজে লিখে দিয়েছি। না-হলে তোমার ভুল হয়ে যাবে।

—আমাকে শোনাবেন না? আমি তো পড়তে জানি না।

পড়ে শুনিয়েছিলেন রত্নেশ্বর। অঞ্জনা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল—কি—কি কি? আর একবার পড়ুন তো! বলে মুখে কাপড় চাপা দিয়েছিল। সে ধাঁধাই হোক আর ছড়াই হোক তার মর্মটা অনায়াসে বুঝেছিল। হাসিও পেয়েছিল কৌতুকে।

ধাঁধাটা শুনে অঞ্জনা বলেছিল—ও তো সোজা। উত্তর—"রত্নেশ্বরে পাই"। বলে খিল-খিল ক'রে হেসে উঠেছিল।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—চুপ—চুপ—কে শুনতে পাবে।

অঞ্জনাও সতর্ক হয়ে চুপ করে গিয়েছিল। ফিস্ ফিস্ ক'রে বলেছিল—ওই আমার দোষ। হেসে ফেলি। মা বলত—তুষমনের হাড়ে তৈরী দাঁত—না-হ'লে এমন ক'রে সবতাতেই কেউ হাসতে পারে না! ওতেই মরবি—তুই ওতেই মরবি!

রত্নেশ্বর ডায়েরীতে লিখেছেন—"অঞ্জনার বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া আমার অন্তর মুহূর্তে গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই দরিদ্র অথচ উল্লাস এবং সদাহাস্যময়ী মেয়েটির হাস্য কেহ সহ্য করে না। স্থির করিলাম ইহাকে পরবর্তীকালে স্বর্ণলতার সঙ্গিনী করিয়া দিব। এবং আমি ইহাকে সত্যকারের আপন জনের মতই সমাদর সম্ভ্রম করিব।"

অঞ্জনা চিঠিখানা হাতে ক'রে বলেছিল—তা হ'লে আমি যাই। আপনার কনেকে দেখিয়ে জবাব এনে দেব। তার যা বুদ্ধি সে ঠিক জবাব লিখে দেবে!

—কিন্তু বলে দি একটা কথা। উত্তরে কোন মানুষের নাম হবে না।

—মানুষের নাম হবে না?

—না। তোমার জবাব হয় নি। রত্নেশ্বরে পাই লিখলে হবে না। লিখতে হবে দেবতার নাম।

—দেবতার নাম?

—হ্যাঁ। ইন্দ্র চন্দ্র কুবের এঁদের সঙ্গে মানুষের নাম কি চলে? ওখানে দেবতার নাম দিতে হবে। যেমন রামচন্দ্রে পাই নয়তো মহেশ্বরে পাই নয়তো নারায়ণে পাই।

আবার মুখে কাপড় চাপা দিলে অঞ্জনা। আবার তার হাসি পেয়েছে।

রত্নেশ্বরও হেসে বললেন—আবার হাসি পেলে কিসে?

—যদি স্বর্ণলতা লেখে—মহেশ্বরে পাই!

—বেশ তো, আমি শিবের মতই হব তাহলে?

—পারবেন?

—কেন? পারব না কেন?

—শিব শ্মশানে মশানে ফেরে; গাঁজা ভাঙ খায়। ভূত নিয়ে ফেরে। আপনি এই রাজ অট্টালিকা ছেড়ে এমন হ'তে পারবেন? আরও অনেক চাই—বুড়ো হ'তে হবে, মাথায় জটা মুখে দাড়ি; মা গো! সে হতে পারবেন না আপনি।

রত্নেশ্বর হেসে ফেললেন। মেয়েটা এমন যে, সব কিছুকেই হাস্যকর করে তুলতে পারে। শিবের শিবত্ব বোঝে না, বুঝলেও সে-সব বাদ দিয়ে তার সকৌতুক দৃষ্টিতে শিবের পাকা চুল দাড়ি জটা এবং ভাঙ খাওয়াটাই সব হয়ে ওঠে। তিনি বললেন—তা হোক। তুমি ওকে দিয়ো তো। দেখি না কোন দেবতা ওর পছন্দ!

অঞ্জনা চলে গিয়েছিল এবং ফিরে এসেছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই। তখন রত্নেশ্বর উঠে মুখ হাত ধুচ্ছেন, সন্ধ্যের উৎসব আজ বিশিষ্ট উৎসব। আজ হবে বাঈজীর নাচ। এখুনি নিচে নেমে কাছারীতে গিয়ে বসবেন। খবরাখবর নেবেন।

চাকর রুপোর গ্লাসে ডাবের জল এনে ত্রিপয়ের উপর রেখেছে। রেকাবীতে মসলা-পান। মুখ ধুয়ে খেয়ে নিয়ে কাপড়চোপড় ছাড়বেন।

অঞ্জনা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

রত্নেশ্বর লিখেছেন—"তাহার মুখ সহাস্য; এবং কৌতুকে চোখ দুটি উজ্জ্বল। দেখিয়াই বুঝিলাম সে এই অল্পসময়ের মধ্যেই ধাঁধার উত্তর লইয়া আসিয়াছে। আমার অন্তর মন উদ্গ্রীব

হইয়া উঠিল উত্তরের জন্ত। কিন্তু ভৃত্যের সম্মুখে এসব কথা বলিতে নাই। কি করিয়া জিজ্ঞাসা করিব বুঝিতে পারিলাম না। শুধু কহিলাম—আইস। কোন সংবাদ আছে কি?

অঞ্জনা চতুরা, সে বলিল—"এই যাঃ আমার যে ভুল হইয়া গেল।"

অঞ্জনা চাকর গোবিন্দকে বলেছিল—গোবিন্দ, যাও তো নিচে ঠাকুমার কাছে যাও। বলো ছোটবাবুর জন্তে পান সাজা আছে, বড়বাবুর রেকাবিতে পান আছে, তার পাশেই ছোট রেকাবি আছে, তাতে যে পান সে পান ছোটবাবুর। সে রেকাবিটা নিয়ে এস তো।

গোবিন্দ চলে গেলে অঞ্জনা বলেছিল—পান সেজেছে স্বর্ণলতা। আমি আলাদা করে আপনার জন্তে রেখে দিয়েছি।

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি গোপন করে অঞ্জনা বলেছিল—খুব চালাক, খুব চালাক মেয়ে। আমি পান সাজছিলাম। আপনার হুকুম তামিল করতে গিয়ে আজ এবেলায় পান সাজা হয় নি। পান সাজছি আর ভাবছি, কি ক'রে যাই, কি ক'রে বলি। হঠাৎ আমার ভাগ্যি; ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল চুপ ক'রে। আমি পান সাজছি দেখে কাছে এসে বললে—পান সাজছ? বললাম—হ্যাঁ। এ পান কর্তাবাবুর, সতী বউরাণীর আর ছোটবাবুর। এ পান আমি সাজি। তারপর বললাম—এসেছ ভালই হয়েছে। একটা ধাঁধার উত্তর করে দিতে পার? বললে—ধাঁধা? কি ধাঁধা? পাড়াগাঁয়ের ধাঁধা ভাই আমি জানি না। বললাম—না; এ ভাই ছোটবাবুর তৈরী করা ধাঁধা। বললে—ছোটবাবু কে? বললাম—রত্নেশ্বরবাবু! মুখটা লাল হয়ে উঠল, বললে—উনি বুঝি তোমাকে ধাঁধা দেন উত্তর করতে? বুঝেছেন? মনে—মনে—।

মুখে আবার একবার কাপড় চাপা দিয়ে সামলে নিয়ে বললে অঞ্জনা—আমি বললাম—না, আমি ভাই সম্পর্কে ওঁর সাতদিনের বড় দিদি। কিন্তু ওঁরা ভাই বড়লোক, রাজা লোক, আর ভালমানুষ, তাই আমি পোষ্য হলেও চাকর মনে করেন না, সম্বন্ধটার মান রাখেন। আজ ওঁকে ডেকেছিলেন সতী বউরাণী জ্যেঠাইমা, আমি ডাকতে গেলাম। দেখলাম একমনে কাগজে লিখছেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন—কই অঞ্জনাদি, একটা ধাঁধার উত্তর দাও তো! আমি ভাই পারলাম না। লেখাপড়াজানা পণ্ডিত লোক। বললাম—লিখে দিন ভেবে বলব। এই দেখ! বলে কাগজখানা দেখালাম। তা পড়ে হেসে বললে—বল না, তোমার যে দেবতা পছন্দ তার নাম। আমি বললাম—আমার তো হয়ে গিয়েছে। এ জন্মের ঢাক বেজে গিয়েছে। কোন দেবতা ধারে কাছে ঘেঁষে না। তুমি বল। তো বললে—কাকে ছেড়ে ভাই কাকে চাইব বল! তেত্রিশ কোটি দেবতা। একে ছেড়ে ওকে চাইলে অন্তজনে রাগ করে। তার থেকে ভাই একজনের মধ্যে সব দেবতাকেই চাই। বুঝেছ! ওখানে উত্তর হবে 'সব দেবে' চাই! হেসে বললে—আমাকে বলো, কি বললেন তোমার ছোটবাবু। তারপর বললে—তোমায় তো দেখছি অনেক পান সাজতে হবে। আমি কয়েকটা সেজে দেব? বলে পান সাজতে বসল। খিলি আষ্টেক পান সেজে দিয়ে উঠে গেল।

রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন ডায়েরীতে—"উত্তর পাইয়া সত্য-সত্যই আমি পরাজিত হইলাম। সুকৌশলে 'সব দেবে' লিখিয়া আমাকে ঠকাইয়া দিয়াছে। নারী চরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়;

বুঝিতে পারিলাম না তাহার পছন্দ কি! কিন্তু পান যখন সাজিয়া দিয়াছে, তখন বিবাহে তাহার আগ্রহ আছে ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।"

অঞ্জনা রত্নেশ্বর রায়ের সম্মুখে হাত পেতে বলেছিল—আমার বকশিশ।

—বকশিশ! বকশিশ কি আপনারজনকে দেয়? তুমি কি দাস-দাসী? তুমি সম্পর্কে আমার সাত দিনের বড় দিদি।

—দিদি না ছাই! সাত দিনের বড় আবার বড়। আর রাজাবাবুর দিদি কি গরীব হয়? আমি আপনাদের দাসী না হই পোষ্য। চাকরে মাইনে পায়। আত্মীয় পোষ্যরা পেটভাতায় পোষ্য।

রত্নেশ্বর রায় আবেগে বিচলিত হয়েছিলেন—সেই বিচলিত মনে দুই হাতে অঞ্জনার পাতা অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুখানি চেপে ধরে বলেছিলেন—না-না-না! তোমার সম্মান এ সংসারে আমার মত, আমার যে বউ আসবে তার মতই হবে।

অঞ্জন বলেছিল—হাত ছাড়ুন। আমার পাতা হাত ভরে গিয়েছে।

রত্নেশ্বরের ডায়রিতে আছে—"অঞ্জনাও আনন্দে পুলকের-থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, আমি তাহার হস্ত দুইখানি ছাড়িয়া দিতেই সে সেই হাত মাথায় বুলাইয়া বুকে ধরিয়া চঞ্চল পদে প্রস্থান করিল।"

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, বিবাহস্বপ্নে বিভোর তরুণ রত্নেশ্বর রায় সেদিন ঠিক বুঝতে পারেন নি যে কি ঘটল। বুঝতে পেরেছিলেন অনেক পরে। সে কথা পরে বলবার সময় হলে বলব তবে তার ছবি আমি এঁকেছি। এই দেখ সে ছবি।

তরুণ রত্নেশ্বর রায় একটি দীর্ঘ শ্যামাঙ্গী মেয়ের হাত ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটিও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের কোণে যেন জল-বিন্দুর আভাস! দুজনেরই প্রফিলের ছবি। মেয়েটির চোখটি বড় সুন্দর, আর মাথায় একরাশি কোঁকড়ান চুল, ফুলে ফেঁপে পিঠের দিকে পড়ে রয়েছে, তাতে একটি ঢং এসেছে, যেটা ঠিক এদেশী নয়, অনেকটা সেকালের ইজিপশিয়ান মেয়েদেব চুলের মত।

সুলতা ছবিখানা দেখে বিস্মিত হল। মনে হল এই মেয়েটির ছবি যেন আর কোথাও আছে, এই সব ছবিগুলোর মধ্যে। সে উঠে এসে ছবিখানার কাছে দাঁড়াল। তারপর চোখ ফিরিয়ে বাকী ছবিগুলো দেখতে গিয়ে আটকে গেল, পাশের ছবিখানার দিকে।

কোন একজন ভয়ঙ্কর-দর্শন লোকের ছবি। দাঁতে-দাঁত টিপে লোকটা একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপকে ধরে আছে! লোকটা যেন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, পাথর কেটে গড়া একটা মূর্তি। সুলতা সবিস্ময়ে বললে—এ ছবিটা?

সুরেশ্বর বললে—ও ছবিটা গোপাল সিংয়ের। ওই গোপাল সিং।

—এই গোপাল সিং! কিন্তু এমন করে একটা সাপকে ধরে রয়েছে কেন?

—বলছি সুলতা। এই খবরটা সেদিন ঠিক এমনিভাবেই অর্থাৎ এই মুহূর্তটিতেই এসেছিল রায়বাড়ীতে। রত্নেশ্বর ডায়রীতে লিখেছেন—"আমি অঞ্জনার গমনপথের দিকেই দৃষ্টিপাত করতঃ তাহার কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। এমত সময় বাহিরের বারান্দার দিক হইতে বন্ধ

দরজার ওদিক হইতে কে ডাকিল—হুজুর !

—কে ?

—হামি, মহাবীর সিং।

এদিকের দরজা দিয়ে তখনই পানের রেকাবি হাতে ঘরে ঢুকেছিল তাঁর খাস চাকর গোবিন্দ। গোবিন্দ রেকাবখানা তাঁর সামনে নামিয়ে দিতেই সাগ্রহে দুটি পান তুলে মুখে পুরে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—দরজা খুলে দে !

দরজা খুলতেই মহাবীর সেলাম করে জানিয়েছিল—বড়া হুজুর আপনে কহলেন কি উনকে সাথ ভেট করনে কো লিয়ে !

—আচ্ছা। যাচ্ছি। বল গিয়ে আসছি আমি।

কথার মধ্যেই এসে ঘরে ঢুকলেন ভবানী দেবী। রত্নেশ্বর—

—মা !

—আমার কথার কোন দাম রইল না রে ? আমি মা আনন্দময়ীর সামনে যে কথা বললাম সে-কথা থাকবে না ! ঠোঁট দুটি তাঁর কাঁপতে লাগল।

সবিস্ময়ে রত্নেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—কেন মা ?

—কুতুবপুরের কাছারীর লোকেরা গোপাল সিংকে ধরে পুলিশের হাতে দিয়েছে।

—কে বললে ?

—কুতুবপুরের কাছারীর লোক খবর এনেছে।

—সে কি ? আমি তো সকালেই লোক পাঠিয়েছি কুতুবপুর !

* * *

ব্যাপারটা লোক পৌঁছুবার আগেই ঘটে গেছে। আগে থেকেই কুতুবপুর কাছারীতে যে হুকুম ছিল সেই অনুযায়ী ঘটেছে।

সুরেশ্বর বললে—আগে তোমাকে বলেছি সুলতা, কীর্তিহাটের বিচক্ষণ দেওয়ান ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে, বীরপুর মৌজার মণ্ডলান স্বত্ব ভগবান মণ্ডল ডাক নিয়েছে, এ সংবাদ যে মুহূর্তে গোপাল পাবে, সেই মুহূর্তে গোপাল খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত দুর্দান্ত ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ঝাঁপ দেবে। তাঁর হুকুম ছিল যে, বেলা এক প্রহরের পরই কুতুবপুর কাছারীর বরকন্দাজ ঢেঁড়াদার নিয়ে বীরপুরের পথে-পথে এই ঘোষণা জারী করবে। এবং গোপাল সিংয়ের কানে কোন রকমে পৌঁছে দিয়ে পালাবে। যদি পালাতে না-পারে, যদি গোপালের হাতে জখম হতে হয় তবে রায় এস্টেট থেকে খেসারত পাবে, মোটা টাকা। সে আমলে একশো টাকার দাম অনেক, এ আমলের হাজার টাকা থেকেও বেশী। আরও আন্দাজ ছিল এই যে, গোপাল তালাবদ্ধ ভগবানের বাড়ীতে আগুন দেবে। কিম্বা দল জুটিয়ে এসে লুট করবে। হুকুম ছিল, সঙ্গে সঙ্গে থানায় এত্তেলা দেবে। থানায় বন্দোবস্ত করা ছিল। থানার দারোগা, জমাদার, মুন্সীবাবুদের সঙ্গে গোপালের মহরম-মহরমের কথা অজানা ছিল না কারুর ; দেওয়ান তারও ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। একদিকে এস-ডি-ও, ডি-এস-পিকে নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন কীর্তিহাটে, তার সঙ্গে ইন্সপেক্টারবাবুও বাদ যান নি। ওদিকে দারোগা,

জমাদার, মুহুরীবাবুদের খুনী করবার ভার দিয়েছিলেন কুতুবপুরের নায়েবকে। সে তা করেছিল। ঘটল সবই, কিন্তু গোপাল সিং যা করলে, তা সকলের অনুমানকে অতিক্রম করে গেল। দেওয়ান আচার্য যে-মুহূর্তে খবর পেলেন যে, গোপাল বড় ছেলে এবং বড় স্ত্রীকে জখম করে নিজের ঘরে আগুন দিয়ে ছুটে পালিয়েছে, ফেরার হয়েছে, সেই মুহূর্তেই সওয়ার পাঠিয়েছিলেন কুতুবপুরের নায়েবের কাছে যে, কাছারীর সমস্ত লোকজন নিয়ে খোঁজ করে গোপাল সিংকে ধর, পুলিশের হাতে দাও। যারা ধরবে, তারা একশো টাকা বকশিশ পাবে। অবশ্য সকলে মিলে।

খবরটা কুতুবপুর গিয়ে পৌঁছেছিল সন্ধ্যার পর। ওদিকে কুতুবপুর, বীরপুর, এবং আশপাশের চার-পাঁচখানা গ্রামে এই ঘটনাটা নিয়ে আলোচনার শেষ ছিল না। আজকের এই ঘটনাটিতে সকল লোকের মনই বিরূপ হয়ে উঠেছিল এই দুর্দান্ত লোকটির উপর। তার সঙ্গে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মজলিসে খবর আসছিল, গোপাল সিংকে দেখা গেছে কোন জঙ্গলে অথবা কেউ যেতে দেখেছে জনহীন মাঠের মধ্য দিয়ে। অথবা গোপাল সিংয়ের কোন অনুচরের বাড়ীতে। কেউ বলে ওই গ্রামে, কেউ বলে সে গ্রামে। থানার দারোগা তখন গোপালের বাড়ীতে পৌঁছে এজাহার নিচ্ছেন। তার ছোট বউ গরুর গাড়ী চড়ে রওনা হয়েছে কীর্তিহাট সতীরাণী মায়ের উদ্দেশে। ওদিকে কুতুবপুরের কাছারী থেকে বরকন্দাজ পাইকের দল একশো টাকা বকশিশের উত্তেজনায় সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়েছিল গোপাল সিংয়ের সন্ধানে। হাতে মশাল, লাঠি, সড়কি। তবে হুকুম ছিল, জীবিত গোপাল সিংকে ধরতে হবে। গোপাল ফাঁসিকাঠে ঝুলে তার জীবনের মাশুল দিয়ে যাবে এই ছিল সর্ববাদীসম্মত রায়।

শুধু জমিদারের রায় নয়, মানুষের রায়ও ছিল তাই। সরকারের রায়ও তাই।

হিটলার নিজে আত্মহত্যা করেছে, তাতে বিজয়ী পক্ষ তৃপ্ত হয় নি। বিচার করে তাকে তারা মৃত্যুদণ্ডই দিত। কিন্তু বিচার হয় নি বলে ক্ষোভ থেকে গেছে। তোজো আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয় নি। তাকে বাঁচাবার জন্য বোধহয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সার্জনরা ছুটে এসেছিল এবং তাকে বাঁচিয়েছিল। বাঁচিয়েছিল তাকে বিচার করে ফাঁসি দেবার জন্যে।

* * *

হতভাগ্য গোপাল সিং নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল একবার। কিন্তু তার ভাগ্যে তা সফল হয় নি। তার মস্ত বড় ভুল হয়েছিল! নেশায় কালীসাধক গোপাল সিং ছুটে পালাবার সময় মায়ের নেশা বাবার নেশার একটাও সঙ্গে নেয় নি। যে নেশাটা করেছিল এই দুর্ঘটনার আগে, সেটা ছেড়ে গিয়েছিল বিকেল হতে-না-হতে। নেশা যখন ছুটল তখন দুরন্ত ফাঁসির ভয় তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে-ভয়কে সে চিরদিন ব্যঙ্গ করে ফাঁকি দিয়ে এসেছে, সেই ভয় সেদিন যেন তাকে পিছন থেকে আচমকা জাপটে ধরে হা-হা করে হেসে উঠে বলেছিল এইবার!

সুরেশ্বর বললে—দুর্দান্ত গোপাল সিং শুনেছি, ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠ ভেঙে ছুটেছিল। বেলা দুপুর; চৈত্র মাস তখন। দু-চারজন লোক তাকে দেখেছিল। এবং বিস্ময়ের তাদের সীমা ছিল না।

সিংজী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে! কেন? কি হল?

গোপালের গ্রাম তখন অনেকটা পিছনে। প্রায় ক্রোশ-দুয়েক। যেসব লোক দেখেছিল, তার ঘটনার কথা তখনও জানতে পারেনি। এমনকি দু ক্রোশ দূর থেকে বীরপুরের খড়ের চালের আগুনের ধোঁয়া বা গ্রামের লোকের চীৎকারও শুনতে পায়নি।

তারা সভয়ে সরেই গিয়েছিল। গোপাল সিং উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। তার সামনে পড়া মানে ছুটন্ত পাগল মহিষের সামনে পড়া। সামনে পড়লে সে বারকয়েক ক্ষুরের আঘাতে মাটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মাথা নিচু করে শিং সোজা করে তাকে বিঁধে গেঁথে নেবে—তারপর ফেলে দেবে ছুঁড়ে। এবং বারবার গুঁতিয়ে তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে চলে যাবে।

একজন তার সামনে পড়েছিল। সে তাকে দেখে আঁতকে উঠেছিল। কিন্তু গোপাল তাকে আঘাত করেনি, তাকে হুঙ্কার ছেড়ে শাসন করেনি, সেও থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর পাশ কাটিয়ে আবার সামনে ছুটেছিল।

সে পালাচ্ছিল।

রায়বাহাদুরের ডায়রীতে আছে, গোপাল তাঁর কাছে বলেছিল—ধরা পড়বার ভয়ে সে পালাচ্ছিল।

কিন্তু না। আমি ডায়রী পড়ে তার ছবিটা মনে মনে কল্পনা করেছি। ধূলায় ধূসর তার সর্বাঙ্গ। চোখদুটো বিস্ফারিত। আতঙ্কিত দৃষ্টি তাতে। হাতে আত্মরক্ষার উপযুক্ত একটা লাঠিও নেই। সব ফেলে দিয়েই সে পালিয়েছিল গ্রাম থেকে। সে পালাচ্ছিল নিজের কাছ থেকে।

সংসারে মানুষের মধ্যে যে চরমতম দুর্ধর্ষ, হার্ডেনড ক্রিমিন্যাল, সে পশুই হয়ে যায়। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকে শুধু একটি জায়গায়। সে হল তার মমতার মধ্যে।

সেই মমতার ঘর রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে ধ্বসিয়ে উপরের ছাউনি আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিয়ে সে যখন পালাচ্ছিল, তখন তার পশুত্বের হিংসা ওই ঘরভাঙা মানুষটার কাছেই ভয় পেয়ে পালাচ্ছিল।

গোপাল রায়বাহাদুরকে বলেছিল —হুজুর, পানির জন্যে ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, ভুখে পেটে যেন আগুন জ্বলছিল, কিন্তু ডরকে মারে—কোন গাঁওয়ে ঢুকি নাই—ঢুকতে পারি নাই।

লোকালয়ে সে ঢুকতে পারেনি। কার কাছে যাবে? কি করে বলবে—আমার ছেলেকে আমি খুন করে ফেলেছি, আমাকে বাঁচাও, একটু লুকিয়ে থাকবার জায়গা দাও! খুন সে নতুন করেনি। কিন্তু এমন দুর্বল, এমন অসহায় সে কোনদিন হয়নি। সে লোকালয়কে দূরে রেখে এসে ঢুকেছিল তিন ক্রোশ দূরের একটা জঙ্গলে। তখন রাত্রি নেমেছে। রাত্রির অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে সে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করে একটা বড় বটগাছে উঠে মোটা ডালের খাঁজে লুকিয়ে বসেছিল। ঘুম তার হয়নি, কাঁদতেও সে পারেনি, সন্ধ্যেবেলা থেকে একপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত আশপাশের গ্রামগুলো থেকে কুকুরের ডাক শুনে চমকে উঠেছে, গ্রামের হরিনাম-সংকীর্তন শুনে চমকে উঠেছে। গভীর রাত্রে চৌকিদারের হাঁক শুনে শুধু চমকেই ওঠেনি, তার যে-বুক কখনও কাঁপেনি, সে-বুকখানাও ধড়ফড় করে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা

এসেছে, সে বসে বসে ঢুলেছে এবং দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়ফড় করে জেগে উঠেছে। রাত্রিশেষে ভোরের পাখীর ডাক শুনে জেগে উঠে সব অবসাদ কাটিয়ে গাছ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমেছিল। কিন্তু যাবে কোথায় ?

গোপাল নিজেই পরে বর্ণনা করেছিল সেদিনের কথা। রত্নেশ্বর রায়ের কাছেই করেছিল। বলেছিল—বাবুজী, ভোরবেলা পাখিগুলো ঘন ঘন একসঙ্গে কলকল করে ডাকে। সে-ডাক যেন মুসাফিরখানায় ভোরবেলা—উঠো উঠো উঠো চলো চলো ডাকের মত। আমার মনে হয়েছিল বাবুজী, যেন তামাম দুনিয়ায় 'ধরো ধরো পাকড়ো পাকড়ো' আওয়াজ উঠে গিয়েছে। আধা-ঘড়ি একঘড়ির মধ্যে দুনিয়া আলো হয়ে যাবে, লোকজন জেগে উঠবে। গরুর রাখালেরা গরু নিয়ে মাঠে আসবে, এই জঙ্গলের ধারে ধারে গরু চরাবে ; কাঠুরেরা কাঠ কাটতে আসবে, মেয়েলোক শুকনো ডাল ভাঙতে পাতা কুড়োতে আসবে। আমি যাব কোথায় ? হাতে আমার কিছু ছিল না বাবুজী। হাতের লোহার বোলোওয়ালা ডাণ্ডাটা ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়েছি ; খ্রিফ দু হাত ছাড়া আমার কিছু নেই কাছে ; আমাকে ধরতে এলে আমি করব কি ? লড়ব কি দিয়ে ?

মনে হল—মরে যাই। নিজে থেকে মরে যাই। মাথার মুরেঠা খুলে পড়ে গিয়েছে, আছে এক পরনের কাপড়, সেই কাপড় গাছের ডালে বেঁধে ফাঁস বানিয়ে ঝুলে পড়ি। কিন্তু তাও পারিনি হুজুর ! নিজেই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমার নিজের ভয় দেখে। হয়তো সঙ্গে সঙ্গে হ'লে পারতাম। তখন মনে মনে হচ্ছিল—এই জঙ্গল ধরে কোনরকমে পালিয়ে যাব, যাব একেবারে গঙ্গার ওপারে ; সুন্দরবনের কোন গাঁওয়ে গিয়ে একদম ভোল পাল্টে কুঁড়ে বেঁধে থাকব। খাটব খাব। কিন্তু এ দিনের বেলা এ জঙ্গল থেকে বেরুনো হবে না।

গোপাল সিংকে এ-অঞ্চলে না চেনে এমন আদমী নেই। দেখলেই চিনবে আর চিনলেই লোকে হৈ-হৈ করবে। এত রোজ ধরে গোপাল যে জুলুম-জবরদস্তি করেছে, তার আক্রোশ আজ গর্ত খুঁড়ে বেরকরা সাপের মত বেরিয়ে পড়েছে। ফণা তুলে দুলছে।

মনে পড়ে গিয়েছিল—জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা মন্দির আছে। বটগাছ উঠে মন্দির-টাকে ফাটিয়ে দিয়েছে, তবুও গাছের শিকড়েই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

* * *

ওদিকে জঙ্গলের বাইরে তখন শোরগোল উঠেছে। সন্ধ্যের মুখে সে যখন এই জঙ্গলে ঢোকে তখন দূর থেকে কেউ দেখেছিল। তখনও এতবড় খবরটা তার কাছে পৌছায় নি। খবরটা এসেছিল রাত্রে। তারপর প্রহরখানেক রাত্রে কুতুবপুর কাছারীর পাইকবরকন্দাজ এবং তাদের সঙ্গে গোপালের উপর যাদের আক্রোশ তাদের একটা দল গ্রামে এসে পৌছেছিল।

লোকটি বলেছিল—গোপাল সিং সন্ধ্যের মুখে ওই জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে আমি দেখেছি। কিন্তু খবরটা তো শুনি নাই। ভাবলাম গোপাল সিং তো, তার তো হাজার কাজ, সেই কোন কাজে এই ভরসন্ধ্যেতে জঙ্গলে ঢুকছে। ব্যস্ত-সমস্ত দেখে হেঁকে বলতেও সাহস হয়নি—"সিং মশায়, এই সন্ধ্যেবেলা জঙ্গলে কোথা যাবেন ?"

তার কথা শুনে গোটা দলটি গাঁয়ের ভিতর অপেক্ষা ক'রে শেষরাত্রে রওনা হয়ে এসে এই সকালেই জঙ্গলের মুখে হাজির হয়েছে। শোরগোল উঠছিল তাদেরই।

গোপালের ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবার উপায় ছিল না। গাছে উঠে ব'সে থাকতেও ভরসা পায় নি। গাছে উঠলে অসহায়। তীর মারবে বাঁটুল মারবে। সে যথাসম্ভব দ্রুতপদে এসে হাজির হয়েছিল ভাঙা মন্দিরটার সামনে। বটগাছের ডালপালায় ঢাকা মন্দিরটা পেয়ে সে যেন বেঁচে গিয়েছিল, এক কোণে সে লুকোবে। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। প্রকাণ্ড একটা সাপের খোলস দরজার মাথার একটা ফাটল থেকে লম্বা হয়ে ঝুলে রয়েছে। কিন্তু সে লহমার জন্যে। গোপাল সাপকে ভয় করে না; গোপাল শুধু লাঠীবাজ দাঙ্গাবাজ খুনখারাবিবাজ নয়, সে আরও অনেক কিছু পারে—সাপ ধরতে পারে, সাপের ওঝা, ভূত প্রেত পিশাচ তাড়াতে পারে; তার হাতে তাবিজ আছে, জড়িবুটি আছে, ওসবের ভয় তার নেই। ভয় তার মানুষকে।

সে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজার পাশের একটা কোনায় উপু হয়ে চুপ করে বসেছিল। লোকজন এলেও দরজার মুখ থেকে সামনের কোণ দুটো খালি দেখে ফিরে যাবে।

কিন্তু—; গোপাল বলেছিল রত্নেশ্বর রায়কে (পরবর্তীকালে), কিন্তু মানুষের পাপ যব পুরা হয়ে যায় বাবুজী তখন ভগবান নারাজ হন, তিনি নারাজ হলে পার কারুর নেই। গোপালের পাপ সে-রোজ পুরা হয়েছিল, ভগবান নারাজ। কোণে বসে থাকতে থাকতে গোপাল চমকে উঠেছিল একটা গোঙানি শুনে। সাপের গোঙানি। বাপ, সে কি গোঙানি!

যেন কাল গর্জাচ্ছে। সতর্কদৃষ্টিতে আওয়াজের জায়গাটা আন্দাজ করে তাকিয়েছিল দরজার মাথার দিকে। হাঁ। ঠিক দরজার খিলানের মাথায় বটের শিকড়ে ফাটানো একটা ফাটল থেকে একটা বড় ব্যাঙের মুখের মত মুখ আর তার দুটো পলকহীন কালো চকচকে চোখ দেখতে পেয়েছিল সে। তার মুখ থেকে চেরা জিভের দুটো কাঁটা লক্লক্ ক'রে খেলছিল আগুনের শিখার মত।

সাপকে ভয় করে না গোপাল, কিন্তু বে-কায়দায় পড়েছে সে। সাপটাই আছে কায়দার জায়গায়। মাথার উপর! মাটির উপর সামনা-সামনি লড়া যায়। কিন্তু মাথার উপর দুষমন থাকলে তাকে লড়াই কি ক'রে দেবে।

গোপালের মনে পড়েছিল সে ঠিক এই কায়দায় ছিরুদাসের ঘাড়ের উপর গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে এককোপে ঘায়েল করেছিল!

এক উপায়, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পালানো। সাপটা অনেক উঁচুতে। ছোবল দিতে পারবে না। তাই করবার জন্য সে তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে সাপটা নামতে শুরু ক'রেছে। গোপাল পিছিয়ে এসে বসে তৈরী হয়েছিল সাপটাকে ধরবার জন্য। মাটিতে পড়ে ছোবল দেবার জন্য ঘাড় তুললেই তার ডানহাতও পাশ থেকে ছোঁ দেবে। চেপে ধরবে তার গলা। চোয়ালের নিচে। লক্ষ্যভ্রষ্ট সে হবে না। সে বিশ্বাস তার ছিল। লক্ষ্য করছিল সে সাপটাকে, সরসর করে পলেস্তারা ওঠা দেওয়াল বেয়ে নেমে আসছে। বিরাট

গোখরো! আয় বাপ! দুহাত এক করলেও এতবড় ফণা হয় না!

ওদিকে তখন মন্দিরের সামনে লোক। তারা গোপালকে দেখে হৈহৈ করে এগিয়ে এসেও থমকে গিয়েছিল—আয় বাপ!

সাপটা ফণা তুলেছে, তুলেছে গোপালের দিকে নয়, পিছনে দরজার কাছে মানুষের সাড়া পেয়ে ওদিকে ফণা তুলে গর্জন করে দাঁড়িয়েছে।

গোপাল এ সুযোগ ছাড়েনি। খপ করে সে ডান হাত দিয়ে ছোঁ মেরে সাপটার চোয়ালের নিচে সজোর মুঠিতে চেপে ধ'রে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল লেজটা, যেন সেটা তার হাত জড়িয়ে ধরতে না পারে। এতটুকু ভুল তার হয় নি। নিখুঁত পরিকল্পনায় সাপটাকে ধ'রেছিল। তারপর পা দিয়ে চাপা লেজটা বাঁ হাতে ধ'রে সে বেরিয়ে এসেছিল মন্দির থেকে।

তার তখনকার সে মূর্তি দেখে এতগুলো বরকন্দাজ-পাইক গ্রামের লোক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারা ভয় পেয়ে স'রে এসেছিল। দাঁতে দাঁতে সজোরে চেপে নিষ্ঠুর মুঠিতে সে সাপটাকে ধরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল মন্দিরটার ভাঙা দাওয়ার উপর। তার হাতের পেশী-গুলো ফুলে উঠে দেখাচ্ছিল পাথরের টুকরোর মত।

সাপ বড় পিছল জীব। গোপাল সিংয়ের মুঠো থেকে মুখটা সঙ্কুচিত করে যত সে পিছলে বেরুবার চেষ্টা করছিল তত শক্ত হচ্ছিল গোপালের মুঠো এবং সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল।

চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরুতে চাচ্ছিল যেন। লোকে অবাক হয়ে দেখছিল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ গোপালই বলেছিল—কেউ হাতিয়ার দিয়ে কেটে দাও দুষমনের মাঝবরাবর। তারপর হামি ছুঁড়ে ফেলব। এমনি ফেলব তো সয়তান ফের শির উঠাকে তাড়া লাগাবে।

বরকন্দাজ রামপূজন চৌবে এগিয়ে গিয়ে তার হাতের তলোয়ার দিয়ে সাপটাকে দু টুকরো করে দিতেই গোপাল বাঁ হাতের লেজের অংশটা পায়ের কাছে সেখানে ফেলে দিয়ে ডান হাতে ধরা মুখের অংশটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল দূরে।

তারপর বলেছিল—লে পাকড়ো। বলে সে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছিল সেই দাওয়ার উপর।

এ অংশটা রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—রামপূজন চৌবে। তারপর তারা গোপালকে ধরে এনেছে কুতুবপুরের কাছারীতে। ঘোড়া হাঁকিয়ে রামপূজনই এসেছে কীর্তিহাট।

গোপাল সিং ধরা পড়েছে। পাকড়েছে বাঁচতে গেলে সেই।

ভবানী দেবী স্বামীর কাছে বসে ছিলেন। তিনি ছুটে এসেছেন ছেলের কাছে, ওরে, মায়ের সামনে আমি কথা দিয়েছি। সে কথা আমার থাকবে না?

রত্নেশ্বর বললেন—সে কি? তাই হয়? তোমার কথা থাকবে না? এখনি লোক পাঠাব। বাবা কি বললেন।

—তিনি তোকেই ডাকছেন।

বীরেশ্বর রায় হুকুম দিয়েছিলেন—গোপালকে যেন পুলিশে দেওয়া না হয়। বা তার কোন অনিষ্ট না করা হয়। কাছারীতেই তাকে আটক রাখ। ঘোড়সওয়ার গিয়েছিল হুকুম নিয়ে।

কিন্তু তার আগে একজন পাইক চলে গিয়েছিল রণপায় চড়ে। পাঠিয়েছিলেন আচার্য দেওয়ান।

তিনি বুঝেছিলেন মামলায় আর গোপালের কিছু হবে না। তিনি হুকুম পাঠিয়েছিলেন সেখানকার নায়েবকে—"যে কোন অজুহাতে পার গোপালকে যেন শেষ করিয়া দেওয়া হয়। সদর হইতে যে হুকুমই যাউক না কেন, তুমি এ কার্য অবশ্য অবশ্য সমাধা করিবে। আমি শপথ করিয়াছি গোপালকে শেষ করিতে না পারিলে আমি ব্রাহ্মণ হইতে খারিজ। তুমি আমার জাতি রক্ষা করিবে।"

সুরেশ্বর বললে—বৃটিশ আমলাতন্ত্রের কথা অনেক শুনেছ সুলতা কিন্তু জমিদারী সেরেস্তার আমলাতন্ত্রের কথা জান না। বাংলাদেশে জমিদারদের অপকর্মের বারো আনার দায় এই আমলাদের।

একটা কথা প্রচলিত আছে—'মাটি বাপের নয় মাটি দাপের। মাটি কেনা যায় টাকাতে কিন্তু মাটি দখল হয় লাঠিতে।'

এ কথার স্রষ্টিকর্তা কে তা কেউ জানে না। তবে এই কথাটা জমিদারদের শিখিয়েছে এই আমলারা।

দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যের মুখে এ কথা দিনে অন্তত দশবার উচ্চারিত হ'ত। সুকৌশলে তাঁরা জমিদার আর প্রজাকে দুপাশে সরিয়ে রেখে এই লাঠিখেলার আসর পেতে রাখতেন। তবে একটা কথা বলব—তাঁরা কাজ ক'রে গেছেন নিজের ভেবে। দেওয়ান আচার্য রায় এস্টেটকে ছোট থেকে বড় ক'রে তুলেছিলেন—

কথায় বাধা পড়ল—

—অতীত কথায় ছেদ টেনে দিলে রঘু।

রঘু চাকর এসে দাঁড়াল।—খাবার তৈয়ার হল। দিদিমণি পুছলেন কি খাবার দিবেন? ও ঘরে ঘড়িতে ঢং ক'রে একটা শব্দ হল। সুলতা নিজের হাতঘড়িটা দেখে বললে—সাড়ে দশটা!

সুরেশ্বর বললে—আরও আধঘণ্টা পর। গোপাল সিংয়ের কথাটা শেষ করে নি, কি বল সুলতা?

সুলতা গোপাল সিংয়ের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ, তাই শেষ কর!

সুরেশ্বর বললে—ছবিটা তোমার ভাল লাগছে!

—ছবি তোমার সবই ভাল সুরেশ্বর। আর ছবির টেকনিক কি স্ট্যাণ্ডার্ড বিচার তো আমি করছি না। আমি তোমার গল্প শুনে গল্পের মানুষটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি। তার সঙ্গে ভাবছি রায়বাড়ীর কথা, সেকালের কথা।

হেসে সুরেশ্বর বললে—সে-কাল এ-কালের কাছে বিচিত্রই বটে। সব কালই তাই।

—আমি ভাবছি কি জান? গোপাল সিং আত্মহত্যা করতে পারলে না?

—সে আমিও ভেবেছি। কিন্তু পারে নি। আত্মহত্যার একটা ক্ষণ থাকে, সে ক্ষণটা পেরিয়ে গেলে আর পারে না। এটা সব কালের কথা। সে ক্ষণটা কখন পার হয়ে গিয়েছিল

তা বলতে পারব না। তবে গোপাল একটা কথা বলেছিল, বলেছিল রত্নেশ্বর রায়কে কিছুদিন পর। তখন সে রায়বাড়ীর পোষমানা মানুষ। বলেছিল—ছেলেকে মাথায় লোহার বোলো বসানো লাঠিটা মেরে স্ত্রীর বুকে চেপে ব'সে গলা টিপে ধ'রেছিল—লোকজনে তাকে ছাড়াতে এসে আক্রমণ করেছিল। সে কি হল তা বুঝতে পারে নি। মাথায় তখন আক্রোশের আগুন। সেই আগুনেই সে নিজের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়েছিল লোকেদের ভয়ে। লোকেরা যারা তার ভয়ে কাঁপত তারাই তাকে ধ'রে ওই আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। এমনটা কখনও ভাবতে পারে নি। তাই তাদের এই চেহারা দেখে হঠাৎ কেমন ভয় লেগে গেল। ওদিকে বড় পুত্রবধূ কেঁদে উঠল—মরে গেছে, মরে গেছে। 'একি হ'ল একি করলে' ব'লে। আমি সেই ভয়ে ছুটে পালালাম। তারপর সাপটা যখন ফণা তুলে দাঁড়াল মন্দিরের মধ্যে তখন যে কি ভয় হল বলতে পারব না; আমি তার কামড় খেয়ে মরতে পারতাম। কিন্তু ভয়ে পারলাম না। সেটাকে ধরে ফেললাম। মরতে পারলাম না! নিজে মরতে পারব না, ফাঁসি দিয়ে মারবে সরকার তাই মারুক। কিন্তু গোপাল মরল না। ভবানী দেবী তাকে বাঁচালেন। আচার্য দেওয়ান তাকে খুন করবার গোপন হুকুম পাঠিয়েছিলেন তাও ব্যর্থ হয়ে গেল।

* * *

বীরেশ্বর রায় সন্ধ্যাবেলা খোদ রত্নেশ্বরকে পাঠালেন গোপালকে বাঁচাতে। রণপা চেপে একজন পাইক কুতুবপুর কাছারী গেছে, দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্য তাকে পাঠিয়েছেন। খবরটা বীরেশ্বর রায়ের কানে চুপিচুপি তুলে দিয়ে গেল দেওয়ানের সহকারী সদর নায়েব বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী। বীরেশ্বর রায় তাকে বিদায় ক'রে দিয়েই ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন—তুমি নিজে যাও রত্নেশ্বর। না-হলে তোমার মায়ের বাক্য রক্ষা হবে না। আচার্য যা ব্যবস্থা করেছেন তাতে কাল সকালেই তাঁর দেবতার সামনে দেওয়া বাক্য ব্যর্থ হবে। অপরাধ হবে, মাথা হেঁট হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে এই দেওয়ানের হাতে গিয়ে আমাদের বাঁধা পড়তে হবে। আমাদের কাছারীতে গোপালকে বেঁধে এনে রেখেছে। খুনের দায় আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমাদেরই দায়ে ফেলতে পারে। যে চাকর, মনিবের হুকুমের বিপক্ষে যায় তাকে বিশ্বাস নেই। তুমি নিজে চলে যাও। গোপালকে বাঁচাতেই হবে।

তারপর নিজের মনেই যেন বলে উঠেছিলেন—"আমার জাত রক্ষা কর।" মনিবের জাত যাক তাতে ক্ষতি নেই, চাকরের জাত বাঁচুক. জাত! চাকরের জাত!"

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—"পিতৃদেবের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। প্রচণ্ড ক্রোধ তাঁহার হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। এবং চিন্তান্বিত হইলাম। কারণ কবিরাজ ডাক্তার সকলেই তাঁহাকে ক্রোধ করিতে নিষেধ করিয়াছে। এমন ক্রোধ তাঁহার এই কয়মাসে আমি কখনও দেখি নাই। বাল্যকাল মনে পড়িতেছে। যখন তাঁহার সম্মুখে গেলেই তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন। বলিতেন—লইয়া যা, উহাকে এখান হইতে লইয়া যা। আজিকার ক্রোধ অন্যরূপ। প্রাণপণে ক্রোধকে চাপিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম—আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি অবিলম্বে প্রতিকারার্থ কুতুবপুর গমন করিব।"

—কুতুবপুরের নায়েব যদি গোপালকে দেওয়ানের পত্র পেয়ে শেষ করেই থাকে তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে তুমি পুলিশের হাতে—। না পুলিশের হাতে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ ভবিষ্যতে প্রজাশাসনের জন্ত বে-আইনী কিছু করতে হয় তা করতে ভয় পাবে কর্মচারীরা। তুমি তাকে বেঁধে এখানে পাঠাবে। কাল সকালে তুমি ফিরে আসবে। আমার উৎকণ্ঠার সীমা রইল না।

*　　　*　　　*

কুতুবপুরের নায়েব বিচক্ষণ লোক। দেওয়ান আচার্যের পত্র পড়ে তার খটকা লেগেছিল। "সদর হইতে যে হুকুমই আসুক না কেন, তুমি এ-কার্য অবশ্য অবশ্য করিবে।" কথাটায় সে থমকে গিয়েছিল; "সদর হইতে যে হুকুমই আসুক না কেন—?" তা' হ'লে সদর থেকে অন্তরকম হুকুম আসবে বা আসছে। আচার্যের হুকুমই আগে পৌঁছেছিল। দেশী বাগ্দী পাইক রণপা চড়ে গেছে। রণপা, তুমি নিশ্চয় বোঝ সুলতা; সে কালের 'রণপা' ভাল ঘোড়ার সমান যেত, এমন কি পাকা রণপা-দার হলে তার থেকেও জোরে যেতে পারতো। তা ছাড়া ঘোড়ার পথ সড়ক ধ'রে আর রণপা'র পথ মাঠে মাঠে নাকের সোজা। রণপার একমাত্র বিপদ কাদায় জলে। কিন্তু মাসটা তখন চৈত্রের শেষ, সুতরাং কাদা জলের বাধাবিঘ্ন তখন পাবার কথা নয়।

বীরেশ্বর রায়ের হুকুমবাহী সওয়ারও খুব দেরীতে পৌঁছয় নি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছেছিল। হুকুমনামা পড়ে তিনি তখন ভাবছিলেন কি করবেন!

তখন গোটা বীরপুরের লোক ভেঙে এসেছে কাছারীতে। একদিনে একটি ঘটনায় বীরপুর বিজয় সম্পূর্ণ। গোপাল সিং বাঁধা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা কুতুবপুরের কাছারীতে এসে হাজির হয়েছে। আনুগত্য জানাতেই এসেছে। এমন কি যে সব দুর্ধর্ষ লোক গোপালের ডান হাত বাঁ হাত বা হাতের আঙুল ছিল তারাও এসেছে। শুধু কীর্তিহাটের জমিদারের ভয়েই নয়, গোপালের এই নিষ্ঠুরতম কৃতকর্মের আঘাত কেউ সহ্য করতে পারে নি, এই ঘটনার পর বিমুখ হয়েছে সবাই।

এরই মধ্যে রাত্রি একপ্রহরের সময় রত্নেশ্বর রায় সদলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন কাছারীর সামনে।

*　　　*　　　*

প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন রত্নেশ্বর রায়—গোপাল সিং কোথায়?

নায়েব বুঝতে পেরেছিল প্রশ্নের অর্থ। সে বলেছিল—আছে হুজুর। বেঁধে রেখে দিয়েছি। না-হলে তো তাকে আটকানো যায় না! হয়তো দরজা ভেঙে আবার হাঙ্গামা করে—

—ঠিক করেছেন! কি বলছে সে?

—কিছু না, মড়ার মত পড়ে আছে। বোবা হয়ে গিয়েছে। প্রথম কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করেছিল। কিন্তু তারপর চুপ হয়ে গিয়েছে।

—ওর বাড়ীর লোকেরা? তারা আসেনি?

—কে আসবে ? বড়ছেলে মরেছে ; বড় স্ত্রী এখনও পড়ে আছে। এমন ক'রে গলা টিপে ধরেছিল যে এখনও জল খেতে পারছে না। ছোটবউ আছে, তার বয়স অল্প, সে কাছারীতে আসে নি। বড়ছেলের দুই ছেলে, তাদের উঠতি বয়স, তারা বলে—পেলে ওর জান নেবে। কে আসবে !

—চলুন, আমি তার সঙ্গে দেখা করব। আর একখানা গরুর গাড়ী ঠিক করুন। এক্ষুনি। আমি রাত্রেই ফিরব। গোপালকে নিয়ে যাব কীর্তিহাট। কোথায় গোপাল ?

গোপাল কাছারীবাড়ীর কয়েদঘরে হাতে পায়ে বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল। ঘরখানার তালাবন্ধ দরজায় দুজন সমর্থ-শক্ত জোয়ান মোতায়েন ছিল। রত্নেশ্বর ঘরের দরজায় আসতেই তারা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

তালা খুলে রত্নেশ্বর ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই তাকে ডেকেছিলেন—গোপাল সিং !

নায়েব বলেছিলেন—গোপাল সিং, ছোট হুজুর নিজে এসেছেন। গোপাল !

বিশালকায় গোপাল সিং হাতে পায়ে বাঁধা অবস্থায় মাটির উপর পড়েছিল, ধুলা মাখা সর্বাঙ্গ, পরনের কাপড়, গায়ের আংরাখা এখানে ওখানে ছেঁড়া ; মাথার বাবরী চুল, গালপাট্টা গোঁপ ধুলোয় জট বেঁধে গেছে। অসাড় নিস্পন্দ। মুখখানা আলোর দিকে ঘোরালে গোপাল সিং ; রত্নেশ্বর রায় দেখলেন, গোপালের মুখ আঘাতের চিহ্নে ক্ষতবিক্ষত। কপালে কয়েকটা ক্ষতচিহ্নের উপর কালোরঙের কিছু জমাট বেঁধে আছে। বুঝলেন, গোপাল নিষ্ঠুর নির্যাতনে নির্যাতিত হয়েছে।

তিনি এগিয়ে গেলেন।

সুরেশ্বর বলতে বলতে থেমে গেল।

সুলতা তার মুখের দিকে তাকালে। দেখলে সুরেশ্বরের চোখ চক্‌চক্ করছে। কোন একটা উত্তেজনায় সে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

সুরেশ্বর তার দিকে থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে একটু বেঁকে মাটির দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন কিছু ভাবছে।

হঠাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর মুখ ফিরিয়ে বললে—মাফ করো সুলতা, গোপাল সিংয়ের কথা বলছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ১৯৩১ সালের সেই দিনের কথা। বিমলেশ্বর রায়কে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ গ্রাম ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালে। তারা দেখালে, ইংরেজের রাজসাক্ষীর উপর জুলুম করার ফল দেখো। এ যারা করবে, তাদের দশাও এই হবে।

কিন্তু তার সঙ্গে শিবুর বাবা গোপালের পৌত্র হরি সিং দফাদার যে কুৎসিৎ আস্ফালন ক'রে বেড়ালে, সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। সে রায়বাড়ীর ঊর্ধ্বতন প্রত্যেক জনকে গাল দিয়ে বেড়িয়েছিল পুলিশ দলের সঙ্গে সঙ্গে।

কথাগুলো বলছিল সে বিমলেশ্বরকে।*

—ডাকো—তোমার বাবা শিবেশ্বর রায়কে ডাকো। তার বাবা সেই সব-সে বড়া বদমাস, সেই তুমাদের বাঘে গরুতে একঘাটে জলখাওয়ানো—সেই রায়বাহাদুর রায়বাবুকে ডাকো। তার

বাবাকে ডাকো। রাখুক তোমাকে আজ। আঃ, আজ আমার বুকটা ঠাণ্ডা হল। হাঁ—আগুন মে জল পড়লো। আমার দাদো গোপাল সিংকে হাতে পায়ে বেঁধে কুতুবপুর কাছারীর করেদখানায় ধুলো আর গর্দার উপর ফেলে রেখেছিল। জমিদার! হাতে মাথা কাটে। যাও, আজ তুমি যাও, রায়বাহাদুরের বাহাদুর পোতা, বেটার বেটা তুমি যাও—হাজত ঘরে হাত-পা বাঁধা হয়ে পড়ে থাকো গোপাল সিংয়ের মতন! হা—হা করে হেসে বলেছিল—আজ শোধ হইল। হাঁ কলেজা ঠাণ্ডা হইল। হাঁ—হাঁ বাবা, এখুন কি হয়েছে। তুমিদের ঘর পড়বে ইট খসবে নীলাম হবে। আমি কিনব। হাঁ আমি কিনব। আমার শিবুকে সরকার বিলাত পাঠাবে। ব্যালিস্টার হবে। বহুৎ টাকা রোজগার করবে—সে কিনবে। আর তুমাদের বহু বেটী আসবে, আর আমার দাদি যেমন করে রায়গিন্নীর পা ধ'রে কেঁদেছিল তেমনি করে কাঁদবে। ঘর থেকে তাড়াও না সিং সাহেব। ঘর থেকে তাড়াও না।

লোকে পুলিশের ভয়ে স্তব্ধ হয়ে শুনেছিল। সেদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর শোধ নেব। কিন্তু পারি নি। কথাটা মনে হলে আজও শরীরে জ্বালা ধরে আমার। চুপ করলে সুরেশ্বর। কিছুক্ষণ পর বললে—থাক—। জবানবন্দীতে এসব কথার ঠাঁই নেই। গোপাল সিংয়ের ওই অবস্থা দেখে কিন্তু তরুণ রত্নেশ্বর রায় বিচলিত হয়েছিলেন।

তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখেছেন—"প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যায় উৎপাটিত বটবৃক্ষের মত ধুলিধুসর হইয়া পড়িয়াছিল। নায়েবের কথা শ্রবণ করিয়া সে সেই বন্ধন অবস্থার মধ্যেই মুখ ফিরাইয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল।"

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—গোপাল সিং!

হেসে গোপাল বলেছিল—আমাকে বেঁধে পুড়াইয়ে মারবেন, না, কালীমায়ের ঠাঁই কাটিবেন?

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—না গোপাল। আমার যে-ভালোমায়ের অপমান করায় আমি তোমাকে চড় মেরেছিলাম সেই ভালোমা আমার তোমাকে ক্ষমা করেছেন, বলেছেন তোমাকে বাঁচাতে হবে। আমি তোমাকে বাঁচাতে এসেছি।

রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—"আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপাল স্তম্ভিত হইয়া গেল! কোন বাক্য তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল না। আমি আবার বলিলাম—গোপাল! আমি মিথ্যা বলি নাই। আমি তোমাকে কীর্তিহাট লইয়া যাইব। অদ্য রাত্রেই অল্পক্ষণের মধ্যেই রওনা হইব। তোমার কনিষ্ঠা স্ত্রীও তোমার সঙ্গে যাইবে। ভালোমা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। সে পরশু রাত্রেই কীর্তিহাট গিয়া ভালোমায়ের শরণাপন্ন হইয়াছিল।"

এতক্ষণে গোপাল চীৎকার করে উঠেছিল—বাবুজী!

রত্নেশ্বর চমকে উঠেছিলেন। ক্রুদ্ধও হয়েছিলেন। কিন্তু আত্মসম্বরণ ক'রে গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—গোপাল!

গোপাল আর কথা বলে নি, ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না—না—না।

—তুমি যাবে না?

—না রাবুজী, যাব। জরুর যাব। আমি বলছি—না, কুছু না!

—তুমি সারাদিন কিছু খাও নি। কিছু খাও।

—পানি পিয়েছি বাবুজী।

—পানিতে তেষ্টা যায়, খিদে যায় না গোপাল, কিছু খাও।

—কুছু খাব ? বহুৎ খাইয়েছি ছোটা হুজুর, বহুৎ খাইয়েছি। জোয়ান বেটার মাথা ভেঙে কাঁচা কাঁচা খাইয়েছি।

একটু চুপ ক'রে ছিলেন রত্নেশ্বর রায়। তারপর বলেছিলেন—যা হ'য়ে গেছে তার উপায় নেই গোপাল সিং! তবু বাঁচতে হলে খেতে হয়—খাও কিছু। আমি তোমার ছোট স্ত্রীকে খবর পাঠাচ্ছি। সে আসবে। সেই তোমাকে খাওয়াবে।

গোপাল সিংয়ের কনিষ্ঠা পত্নী খবর পেয়ে এসে গোপালকে সত্যিই খাইয়েছিল। গোপাল কি খেয়েছিল জান সুলতা ? সের খানেক দুধ। কিন্তু তার আগে সে রত্নেশ্বর রায়ের কাছে হুকুম নিয়েছিল, এক ছিলম গাঁজা খাওয়ার।

বলেছিল—নেশা না করলে কিছু মুখে রুচবে না ছোটা হুজুর! মদ খাব না। মদ খেলে খুন চাপে। গাঁজা! গাঁজা পিবার হুকুম না-দিলে খেতে পারব না!

* * *

কীতিহাটে পৌছে গ্রামে ঢুকবার আগে গোপাল সিং একবার চঞ্চল হয়েছিল। হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠেছিল—না—না—না। ছোটা রায় হুজুর!

ঘোড়ার উপর রত্নেশ্বর রায় তখন অনেকটা এগিয়ে কীর্তিহাটে ঢুকছেন। তখন ভোররাত্রি ; মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উৎসব হয়েছে। সেরাত্রে রাজকীয় অতিথিদের উপস্থিতিতে বাঈ নাচ, খেমটা নাচ হয়েছে। উৎসব শেষ হবার পর লোকজন ঘুমিয়েছে। পরপর তিনরাত্রি জাগরণের ঘুম। গ্রাম স্তব্ধ।

রত্নেশ্বরের ডায়রীতে আছে—"আমি কাঁসাইয়ের বাঁধের উপর ঘোড়ার রাশ টানিয়া দাড়াইলাম। গোপাল সিং-এর গাড়ী অনেক পিছনে পড়িয়াছে। তাহাকে ফেলিয়া আমি গ্রামে ঢুকিলাম না। কারণ আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি করুণাময়ী মদীয় মাতাঠাকুরাণী গোপাল সিংয়ের নিরাপত্তার জন্ত জাগিয়া আছেন। আমি একাকী গেলেও তিনি মানিবেন না। তদপেক্ষা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াই ভাল।"

কাঁসাইয়ের ওপারে এসেই গোপাল চীৎকার শুরু করেছিল। সওয়ার এপার থেকে এসে খবর দিয়েছিল রত্নেশ্বর রায়কে। রত্নেশ্বর রায় অত্যন্ত তিক্তমনেই ফিরে ওপারে গিয়ে রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি ? চীৎকার করছ কেন ?

গোপাল বলেছিল—আমাকে কেটে এই নদীতে গেড়ে দিন রায়বাবু, আমাকে হাত-পা বেঁধে লিয়ে যাবেন না। মারিয়ে ফেলেন আমাকে। আমি গোপাল সিং—আমি—

এবার সে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল ছোটছেলের মত।

দীর্ঘঅবগুণ্ঠনবতী গোপালের স্ত্রীও হাত জোড় করেছিল রত্নেশ্বরের সামনে।

রত্নেশ্বর কয়েক মুহূর্ত ভেবে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতেই হুকুম দিয়েছিলেন।

ভোররাত্রিতে তাঁরা এসে পৌছেছিলেন কীর্তিহাটের কাছারীবাড়ীর সামনে। সেদিনও

তখন মঙ্গলারতি হচ্ছে। ভবানী দেবী মন্দিরের দাওয়ায় মায়ের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। আরতি শেষ হতেই রত্নেশ্বর তাঁর সামনে এসে বলেছিলেন—গোপালকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি মা!

—এনেছিস! বলেই হাত জোড় করে দেবীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—আমার মুখ রেখেছিস মা। রায় সংসারের মুখ যেন এমনি করে চিরদিন রাখিস, মা!

* * *

সুরেশ্বর থামল এইখানে। একটা সিগারেট ধরিয়ে কটা টান দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর বললে—১৯৩৭ সালে সেদিন রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর ঠিক এইখানে এইভাবেই থেমেছিলাম সুলতা। মনে হয়েছিল পরলোক যদি থাকে তবে সেখানে ভবানী দেবীর আত্মা আজ কি বলছেন, কি করছেন?

একটা ছবি মনে রূপ নিয়েছিল এক-মুহূর্তে।

মনে মনে অনেক সময় এমন হয়। মনের প্রশ্নের উত্তর ঝট করে একটা ছবি হয়ে জেগে ওঠে।

ঠাকুরদাস পালের মৃত্যু বিবরণ পড়ে তোমার এমনি একটা ছবি ভেসে উঠেছিল মনে। প্রশ্ন জেগেছিল—একথা যখন জানবে সুলতা তখন সে কি করবে? কি বলবে?

যে ছবিটা জেগে উঠেছিল সেটা আজ মনে করতে পারি। তুমি যেন স্থির বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছ আর দুটি জলের ধারা চোখের কোণে টলটল করছে। নেমে ঝ'রে পড়বে ব'লে।

তেমনি সেদিন ভবানী দেবীর যে ছবিটা মনে জেগেছিল, সেটা কতবার ভেবেছি আঁকি কিন্তু আঁকা হয় নি। ভবানী দেবী যেন দু'হাতে মুখ ঢেকেছেন লজ্জায় অনুশোচনায়।

আমার কানের কাছে গুঞ্জন করে উঠেছিল অর্চনার কথাগুলি। বিমলেশ্বর কাকার স্ত্রীর কাছে যে কথাগুলি ওবেলা শুনেছিলাম, সেই কথাগুলি। "রাজরাজেশ্বর কি রায়বাড়ীর পেয়াদা না মাকালী তাতারিণী প্রহরিণী যে দিনরাত তোমাদের হুকুম তামিল করবে?"

সেইদিন আমি কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর খাঁটি মালিক, জমিদারবংশের সন্তান, খাঁটি জমিদার হয়ে উঠলাম। স্থির করলাম, এর শোধ আমি নেবই নেব। গোপাল সিংয়ের পৌত্র দফাদার হরি সিং, তার ছেলে শিবু সিং। তাকে শাস্তি দিতে গিয়ে বিমলেশ্বর কাকা পারলেন না। উল্টে অপমানের বোঝা ভারী হল। এর শোধ আমি নেব।

বীরেশ্বর রায় তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে যে-ভুল করেছিলেন, সে ভুলের সংশোধন করব।

গোপাল সিং সেদিন ভোরবেলা কালী মন্দিরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় ক'রে বলেছিল—মাইজী, আপনেকে আমি খারাব বাত বলেছি, আমার পুরা সাজা হইয়েছে। ছোটা হুজুরকে আমি পোড়ায়ে মারবার জোগাড় করেছিলম, তার ভি সাজা হামার মিলিয়েছে। দুনিয়া তিতা হয়ে গেলো মাইজী। পাপী, হমি বহুৎ পাপ করিয়েছি মা! হামার সাজা হইয়েছে। আমাকে মাফ্ করেন মা, আমাকে মাফ্ করেন আপনে!

ভবানী দেবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—কিন্তু তোমাকে তো শাপশাপান্ত আমি

করি নি বাবা!

—না মাইজী, আপনে দেবী, সাক্ষাত দেবী। সে আমি জানে। তব্ ভি বলেন—মাফ্ করলেন! বুক আমার পুড়িয়ে গেলো মাঈ। খাক হইয়ে গেলো!

ভবানী দেবী বলেছিলেন—মাফ তোমায় করেছি, তোমার স্ত্রীকে মায়ের সামনে কথা দিয়েছি। তবু তুমি যখন বলছ; তখন আবারও বলছি, এই মায়ের সামনে বলছি—মাফ তোমাকে করলাম।

—মাঈজী, আমার ইজ্জৎ—

—বেশ। সে কথাও দিচ্ছি গোপাল। বেইজ্জৎ তোমার হবে না। তবে কর্তাবাবু যা বলেছেন তা শুনেছ তুমি?

—হাঁ মা।

—বেশ; বেইজ্জৎ তুমি হবে না। পুলিশের হাত থেকেও তুমি বাঁচবে। সে সব ব্যবস্থা আমি করেছি বাবা। তোমার স্ত্রীকে কথা দিয়েছি বলেই নয়, তোমার কৃতকর্মের এই ভয়ঙ্কর ফল দেখে আমি কেঁদেছি। তোমাদের ছোট হুজুরের বিয়ে হচ্ছে। বিয়ে হচ্ছে এ জেলার সদরের ডেপুটি সাহেবের মেয়ের সঙ্গে। আমি তাঁকে বলেছি—তিনিও আমাকে কথা দিয়েছেন। তুমি বেঁচেছ। তিনি বাঁচিয়েছেন।

গোপালকে তিনিই বাঁচিয়েছিলেন। বেইজ্জতি হয় নি, কটু কথাও বলেন নি বীরেশ্বর রায়। এতটার কারণ বোধহয় দেওয়ান আচার্যের ওই চিঠি। আচার্যকে অপদস্থ করবার জন্যই তিনি এতটা করেছিলেন। প্রথম ক'দিন বীরেশ্বর রায় গোপালের সঙ্গে দেখাও করেন নি। তাকে থাকতে দিয়েছিলেন, দু-মহলা প্রকাণ্ড অন্দরের এক প্রান্তে চাকরদের ঘরে।

রায়বাড়ীতে তখন রায়বংশের লোক মাত্র তিনজন। কর্তা-গৃহিণী এবং পুত্র। আত্মীয়-স্বজন যারা বারো মাস থাকত, তাদের সংখ্যা তখন দশজন। উৎসব উপলক্ষ্যে আর অনেক আত্মীয় এলেও মোটমাট চল্লিশের বেশী হয়নি। বাইরের লোকজনের সামনে যাতে গোপালের অপমান না-হয়, যাতে দেওয়ান আচার্যের হাত সহজে না পৌঁছায় তারই জন্যে স্থান দিয়েছিলেন বাড়ীর ভিতর।

রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে আছে—"পিতৃদেবের দূরদর্শিতায়, আশ্চর্য বুদ্ধিতে আমি নিত্য চমৎকৃত হইতেছি। অন্দর মহলে গোপাল সিংহ ও তদীয় পত্নী পুত্রকে স্থান দেওয়া আমার মনোমত হয় নাই। তাঁহাকে একথা নিবেদন করিতেই তিনি বলিলেন—তুমি এখনও বালক রহিয়াছ। তুমি দেওয়ান আচার্যকে সম্যক চিনিতে পার নাই। দেওয়ান আচার্য না-পারেন এমন কর্ম নাই। অন্যত্র রাখিলে তিনি সহজেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিবেন। আমি চমৎকৃত হইলাম। এ কথা আমার মনে হয় নাই। তিনি বলিলেন—রবিনসন সাহেবকে যে সুন্দর সুকৌশলে পর্তুগীজ স্ত্রীলোকের দ্বারা বশীভূত করিয়া এক পর্তুগীজ দ্বারাই শেষ করিল, তাহা স্মরণ কর। এখানে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করাইয়া দশ-বিশজন লোক দ্বারা তেমন কিছু করিলে কি করিবে!"

রাজকর্মচারীরা বিদায় নিয়েছিলেন পরের দিন। সদর এস-ডি-ও রত্নেশ্বর রায়ের ভাবী

শ্বশুর আরও একদিন ছিলেন। বিবাহ পাকাপাকি স্থির হয়ে গেলে তিনি গেলেন।

রাধারমণবাবুর সামনেই গোপালকে ডেকে তিনি তাকে বলেছিলেন—রায়বাড়ীর গিন্নীমা তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তোমার সে সব অপরাধের কথা আমি তুলব না। তোমার নিজের শাস্তি তুমি নিজে নিয়েছ, কিম্বা ভগবান দিয়েছেন, তার ওপর আমার হাত নেই। এখন শোন, যা বলছি। একথা তোমার স্ত্রীকে বলেছি। সে রাজী হয়েই মেনে নিয়েছে। বীরপুরের তোমার জোতজমার বেশীর ভাগ জবরদখল। সে সমস্ত তোমাকে ইস্তফা দিতে হবে। যা তোমার নিজস্ব, তা পাবে তোমার বড় ছেলের ছেলেরা আর তোমার বড় স্ত্রী। বীরপুরে তুমি বাস করতে পাবে না। তোমাকে বাস করতে হবে নতুনহাটে, কীর্তিহাটের পাশেই, নতুন গ্রাম পত্তন করেছি সেখানে।. সেখানে তোমাকে দশ বিঘে জমি, একটা বাড়ী, একটা খিড়কীর ডোবা—এই.তোমাকে দেব, পাইকান বন্দোবস্ত করে। রায়বাড়ীর কাছারীতে তোমাকে রোজ সকালে আসতে হবে। সেলাম দিয়ে যাবে। দূরে চোখের বাইরে তোমাকে যেতে দিতে পারব না। রায়বাড়ীর ক্রিয়াকর্মে এ বাড়ীতে আসবে, মোতায়েন থাকবে. রাজী আছ?

গোপাল চুপ করেই থেকেছিল, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে নি।

রাধারমণবাবু বলেছিলেন—নীচে আমার দারোগা হাজির আছে। রাজী থাকিস তো বল। না-থাকলে দারোগা নিজের কাজ করবে।

গোপাল রাধারমণবাবুর দিকে তাকিয়েছিল, সে তাঁকে চিনত না; তার কপালে ভ্রূকুটি জেগেছিল।

বীরেশ্বরবাবু বলেছিলেন—উনি মেদিনপুরের এস-ডি-ও।

গোপাল এবার মাথা হেঁট করে বলেছিল—জান যখন ভিপ মেঙেছি হুজুর, তখন বিলকুল মেনে লিয়েছি।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিল—হ্যাঁ। আপনি আমাকে বাঁচাইলেন। বীরপুর ঢুকবার মুখ আমার নাই। আর আপনের তাঁবেদারী ছাড়া দুসরা কোন কাম—সেও ভি আমি পারবে না। বিলকুল মেনে নিলম!

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—হ্যাঁ। আমার তাঁবেদারী ছাড়া তুমি কোথাও গিয়ে বাঁচবে না। দেওয়ানজীর হাত থেকে—।

বলেই তিনি থেমে গিয়েছিলেন। চাকরকে ডেকে বলেছিলেন—দেখ ছোট নায়েব কাগজ-পত্র নিয়ে ওপাশে বসে আছে। ডাক তাকে।

নায়েব এলে বলেছিলেন—কাগজপত্রে টিপ ছাপ নিয়ে নিন।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, গোপাল সিংকে রক্ষা করতে গিয়ে, হারাতে হল দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যকে।

আচার্য দেওয়ান পরের দিনই এসে বলেছিলেন—আমার বয়স হল বাবা; এদিকে তোমাদের সংসারেও আর ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নাই। ছোটবাবু ভায়া এরই মধ্যে বেশ বুঝে নিয়েছেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। এবার আমি ছুটি চাচ্ছিলাম।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—রত্নেশ্বরের বিয়ে বৈশাখে। এই সময় কি আপনার যাওয়া চলে ?

গিরীন্দ্র আচার্য বলেছিলেন—বেশ ; তারপর যেন আমাকে আর বেঁধে রেখো না বাবা। শরীর বড় ভেঙেছে আমার।

বীরেশ্বর অবলীলাক্রমে বলেছিলেন—না। ১লা জ্যৈষ্ঠ অষ্টম। ২রা জ্যৈষ্ঠ আপনি খালাস। আপনাকে আটকানো উচিতও হবে না। কারণ রত্নেশ্বর আপনাকে নিয়ে ঠিক চলতে পারবে না। আমার সঙ্গেই ওর সব মত মেলে না। কাল রাধারমণবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এই গোপালের কেস নিয়ে কথা। উনি বলেছিলেন—বীরেশ্বরবাবু এ পথে জমিদারী চালান আর চলবে না। ইংরেজ জাত বড় কঠিন জাত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাওয়ার। কিন্তু ওরা আইনকে বড় মানে। বিচারের সময় জজেরা ইংরেজ গভর্নমেন্টেরও খাতির করে না। জমিদারীর ধারা পাল্টান মশাই। রত্নেশ্বর বললে—আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছি, বেআইনি প্রজাশাসন—এ আমি কীর্তিহাট এস্টেট থেকে তুলে দোব। আপনার সঙ্গে ওর বনবে না! আমি ভাবছিলাম! আমিও আর হস্তক্ষেপ করব না, আপনাকেও বলব, দেওয়ান কাকা, এবার আমাদের সব ছেড়ে দিয়ে বসে-বসে দেখাই ভাল। তা আপনি নিজেই বলছেন।

সুরেশ্বর বললে—গোপাল সিংয়ের কথা এখানেই শেষ। গোপাল সিং এরপর বেঁচে ছিল কম দিন না, দশ বছর। ১৮৬৯ সালে রত্নেশ্বরের ডায়রীতে আছে—"আজ গোপাল সিং মারা গেল। এস্টেটের একজন হিতৈষী লোককে হারাইলাম। লোকটি অতীত কালে যাহাই করিয়া থাক, শেষ জীবনে সে সত্য-সত্যই সজ্জন ব্যক্তি হইয়াছিল ; মদ্যপান ছাড়িয়াছিল, বৈষ্ণব হইয়াছিল। কীর্তন শুনিতে-শুনিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিত। অনুতাপ করিত। নেশার মধ্যে গঞ্জিকা সেবন করিত, কিন্তু তাহাতে তাহার ক্ষতি হয় নাই। অবগত হইলাম যে, সে মৃত্যুকালে হরি-হরি জপ করিতে-করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। আরও অবগত হইলাম যে, তাহার পুত্রকে রায়বাড়ীর আশ্রয়ে সদ্‌ভাবে অনুগত থাকিয়া জীবন নির্বাহ করিতে বলিয়াছে। বলিয়াছে—এ কাল বড় কঠিন কাল, সে কাল গিয়াছে। ছোট রায়হুজুর ধার্মিক লোক। বিদ্বান পণ্ডিত লোক। আইন বোঝেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে উন্নতি হইবে। সুখে থাকিবে। তাঁহাদের সহিত সর্ত মানিয়া চলিবে। উনি না থাকিলে আমি বাঁচিতাম না। ফাঁসিকাঠে ঝুলিতাম। গোবিন্দ আক্রোশে তোদেরও রাখিত না, শেষ করিয়া দিত। বাঁচিলে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইত। গোবিন্দ শেষ পর্যন্ত কালাপানিতে মরিয়াছে। ওপথে হাঁটিস না।"

গোবিন্দ সিং গোপালের বড় ছেলের বড় ছেলে। বড় নাতি। বাপের মৃত্যুর জন্যে তার সব আক্রোশ পড়েছিল গোপালের উপর। বীরেশ্বর রায় বিচার করে গোপালের ন্যায্য সম্পত্তিটুকু রেখে বাকী সবই—যা মণ্ডলান স্বত্বের মালিক হিসেবে দখল করেছিল,—সে-সব কেড়ে নিয়েছিলেন, এবং বীরপুরের সম্পত্তি গোপালকেও দেন নি, দিয়েছিলেন ওই গোবিন্দ সিংকে। বলতে গেলে, খেসারত হিসেবে তাকে দিয়েছিলেন। এতেই গোবিন্দ সিং রায়হুজুরের বিচারের সুনাম করে সব আক্রোশ ফেলেছিল তার পিতৃহন্তা পিতামহের উপর। সে নাকি শপথ করেছিল, ঠাকুরদার জান সে নেবেই। এবং এতে তাকে উৎসাহিত করেছিল তার

পিতামহী ; গোপালের বড় স্ত্রী। আরও একজন এতে তাকে ইন্ধন জুগিয়েছিল। সে লোকটি হচ্ছে রায়বাড়ীর পুরনো দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্য।

গিরীন্দ্র আচার্যকে দেওয়ান পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায় ; ওই ২রা জ্যৈষ্ঠই সরিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে নিজের মুঠি থেকে ছাড়েন নি। রায়বাড়ীতে দীর্ঘ তিরিশ বৎসর দেওয়ানী কালের হিসেব-নিকেশ দাবী করে দায়ী করেছিলেন বিশ হাজার টাকার জন্ম। টাকাটার হিসেব মেলে নি। শেষে তার কাছে দশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়ে বলেছিলেন—এটা আমি লিখিয়ে নিলাম, কিন্তু এ আমি আদায় কখনও করব না। আপনি এস্টেটের অনেক খবর জানেন, আপনার কাছে তার নমুদও আছে। এটা আমি তার জন্ম হাতে রাখলাম। আর আপনার চিঠি আছে, সেটাও দেখিয়ে রাখি, সেটা আপনি এই সেদিন কুতুবপুরের নায়েবকে লিখেছিলেন—"সদর হইতে যে হুকুমই থাউক না কেন, যে কোন অজুহাতে গোপালকে শেষ করিয়া দিবে। আমার জাতি রক্ষা করিবে।"

গিরীন্দ্র আচার্য হেসেছিলেন। বলেছিলেন—ও আমি জানি, বাবুজীভাই চিঠিখানা গোড়াতেই নায়েবের হাত থেকে নিয়েছেন, সে খবর আমি জানি। বেশ তাই হল।

আরও বলেছিলেন—দেখ বাবা, নোকরী, গোলামী লোকে করে পেটের জন্যে। তবে পেটের জন্যে কখনও মুনিবের ক্ষতি করি নি। মুনিব মেরে খেলে আজ কীর্তিহাটের অন্তত: অর্ধেকটাই পেটে পুরতে পারতাম। তা আমি করি নি। তোমাদের কি আয় ছিল, কি আয় হয়েছে, তা তুমি জান। সে আমিই করেছি। পাপপুণ্য বাছি নি। তার অনেক নজীর আছে। পাবে সেরেস্তা খুললে। তিরিশ বছরে তিরিশটা জান খতম করিয়েছি, হয়তো বেশীও হবে। যারা বিরোধিতা করেছে তাদেরই, হয় হাতে, নয় ভাতে, মেরে রাজ্য নিষ্কণ্টক করে দিয়েছি। বীরপুর নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছিলাম তোমাদেরই জন্যেই। ভুল হয়েছিল, মাকালীর সামনে বলেছিলাম, গোপালকে খতম না করি তো আমি বামুন থেকে খারিজ। তবে, ভেবো না, তোমাদের দৌলতে অনেক করেছি আমি, আমি তোমাদের অনিষ্ট করব না। এই উপবীত ছুঁয়ে ইষ্ট দেবতার নামে হলপ নিয়ে বলছি।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—এ হ্যাণ্ডনোট আমি আপনার বউমা সতী বউয়ের কাছে রেখে দিচ্ছি, তাহলে হবে তো?

—বাস-বাস-বাস। এ আর কথা কি আছে।

—আর একটা কথা বলি।

—বল।

—একখানি মহল আপনাকে পত্তনী বা দরপত্তনী প্রণামী দিতে চাই। আর আপনি শেষ জীবনটা মেদিনীপুরে ল' দপ্তরের ভার নিয়ে বসুন। দেওয়ানীতে যা পেতেন তাই পাবেন। অপরের কাজকর্মও করতে পারবেন। আপনার প্রতিজ্ঞার আর একটা বাকী আছে, শ্যামনগর এখনও রায় এস্টেটে আসে নি।

হেসে আচার্য বলেছিলেন—সে এই আষাঢ় বা আশ্বিন কিস্তিতেই হয়ে যাবে বাবা, ভেবো না। তাছাড়া, দে-সরকাররা মহাল রাখতে পৌষ মাসে একটা হ্যাণ্ডনোট কেটেছে, চৈত্র মাসে

একটা হ্যাণ্ডনোট কেটেছে হুগলীর মহাজনের কাছে। সে হ্যাণ্ডনোট দুখানা আমি চোটা দিয়ে কিনবার কথাবার্তা পাকা করেছি। ওরা দুখানা হ্যাণ্ডনোটে আট হাজার নিয়েছে, সুদ মাসিক শতকরা একটাকা, আমি বলেছি, সুদসমেত আট হাজার আর ধরাট দু হাজার দিয়ে হ্যাণ্ডনোট আমি কিনব। তারা রাজী। কিনেই আষাঢ়ের আগে নালিশ ঠুকে দিলে আর সামলাতে পারবে না, টাকাও পাবে না। শ্যামনগর ঘরে ঢুকে যাবে। আমাকে খালাসই দাও। আমার আর খুব ইচ্ছে নেই!

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা হয় না দেওয়ানকাকা। কারণ আমাকে অবসর নিতেই হবে। রত্নেশ্বরকে ভার দিয়েছি, তাকেই সব ছেড়ে দিতে চাই। ওর সঙ্গে আপনারই মতে শুধু বনবে না নয়, হয়তো আমার সঙ্গেও বনবে না। আমি হস্তক্ষেপ করতে গেলে ও অসন্তুষ্ট হবে। আমি কলকাতায় না-হয়, সতী বউ বলছে—কাশী চলে যাব। ওর মাথার উপর লোক চাই। ওর শ্বশুর অবশ্য এস-ডি-ও, সরকারের ঘরে মুরুব্বির জোর ভালই হয়েছে। কিন্তু কি জানেন, বিষয়বুদ্ধি এঁদের নাই। এঁরা শুধু সরকার চেনেন, খেতাব চেনেন, কিন্তু সম্পত্তি বাড়ানো, সম্পত্তি রক্ষা কি করে করতে হয়, তা জানেন না। রত্নেশ্বর এরই মধ্যে বলছে—নতুন কাল, নতুন কাল। সব ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

* * *

সুলতা তখনও গোপাল সিংয়ের সেই দুই হাতে সাপ ধরা ছবিখানা দেখছিল। ছবিখানা তার আশ্চর্য ভাল লেগেছে।

সুলতা দেখতে দেখতে বললে—দাঁড়াও সুরেশ্বর, গোপাল সিংয়ের ছবিখানা একটু দেখি। আশ্চর্য বোল্ডনেস রয়েছে ছবিখানার মধ্যে।

সুরেশ্বর বললে—ও ছবিখানা শুধু গোপাল সিংয়ের ছবি নয় সুলতা; ওখানার গোপাল বাংলার সেকালের দুর্ধর্ষ প্রাণশক্তির প্রতীক। সে শক্তি স্বার্থপর, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু ওরই চাপে সাধারণ মানুষগুলো চাপ বেঁধে, জমাট বেঁধে একটা শক্তি ছিল। তারা গোপালকে বেঁধে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

সুলতা সপ্রশংস দৃষ্টিতে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যাঁ, সেটুকু চমৎকার ফুটেছে!

সুরেশ্বর বললে—১৭৯৩ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত গুনতিতে পঁয়ষট্টি বৎসর কাল সুলতা; পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট থেকে ১৮৫৯ সালে নতুন ভূমিস্বত্ব সংস্কার আইন। এর মধ্যে জমিদারদের প্রশ্রয় দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, এই দুর্ধর্ষ প্রাণশক্তিকে ইংরেজ শেষ করলে। তারপর হল নতুন আইন। তার আগে সুলতা, ১৭৫৭ সাল থেকে ৮ বছর পর ১৭৬৫ সাল, পলাশীর যুদ্ধ থেকে মীরকাসেম নবাবের পালা শেষ করে, বাদশাহের কাছে দেওয়ানী নিলে। ৬৫ সাল থেকে ১৭৯৩ সাল গুনতিতে ২৮ বছর, ধরতে পার তিরিশ-বত্রিশ-এর মধ্যে বাংলা দেশে নবাবী পালার পর জায়গীরদারী শেষ করে জমিদারী পালায় ফেলেছিল। রাজারা-মহারাজারা খেতাবটা রেখে জমিদারীই স্বীকার করে ইংরেজ রাজত্বের বনিয়াদ পোক্ত করেছিল। একদিকে করেছিল কোম্পানী সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টকে শক্ত, অন্যদিকে এদেশের দুর্ধর্ষ মানুষ,

যারা বর্গীর হাঙ্গামা পুইয়ে বেঁচেছে, গিরিয়া, পলাশী তারপর কাটোয়া-গিরিয়া-উধুয়ানালার বিপর্যয় মাথায় করে বেঁচেছে, বিশু ডাকাতের মত ডাকাত যারা নীলকুঠী লুঠ করে, নীল বাঁদরের অত্যাচার নিবারণ করতে চেয়েছে, যারা কুটিল মহাজনদের মেরেছে, যারা জমিদারদের সঙ্গে লড়েছে, তাদের শক্তি এমনিভাবে নাগপাশে বেঁধে জব্দ করতে বসল নতুন আইন।

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ববী রাজদণ্ড রূপে।"

কোম্পানীর হাত থেকে রাজ্য এল ইংলণ্ডেশ্বরীর হাতে। সাম্রাজ্যবাদের ভোল বদল হল দুনিয়া জুড়ে; ক্ষাত্র সাম্রাজ্যবাদের বদলে বৈশ্য সাম্রাজ্যবাদ। ইয়োরোপের সব জাতের ধাতই তাই। ইংরেজ তখন বিশ্ববিজয়ী হয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত চিরস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য বদ্ধ-পরিকর।

'বৃটিশ এম্পায়ার এস্টাব্লিশড বাই ল'।

সে রাজত্বে মানুষের একশক্তি তার সহ্য হবে কেন। তাকে শেষ করে দিতেই হবে। ওই সব কথাই বলতে চেয়েছি ওর মধ্যে। ছবিখানা সত্যই বোল্ড হয়েছে।

ছবিখানার দিকে নিজে কিছুক্ষণ দেখে. বললে—১৮৫৯ সালে নতুন আইন পাশ হল, গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিল তাই দিয়ে জমিদারকেও বাঁধলে। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের কনট্রাক্ট সই করে জমিদার ভেবেছিল, রাজার সঙ্গে কনট্রাক্ট বলে আমরাও রাজা। প্রজার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। কিন্তু ইংরেজ তা ঘুচিয়ে দিলে। এবার স্পষ্টাক্ষরে বলে দিলে—না, প্রজারা শুধু সরকারের প্রজা, তোমাদের সঙ্গে কনট্রাক্ট, তোমরা খাজনা আদায় করবে। তা থেকে সরকারের দেয় দিয়ে বাকীটা পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে ভোগ করবে!

১৮৫৯ সাল থেকে বাংলার প্রজাশক্তির সঙ্গে গণশক্তি শ্রান্ত ঘুমন্ত; উঠল প্রথম ১৯২১ সালে। বিচিত্র কথা কি জান, গুনতে গিয়ে উত্তর পেয়েছি ৬২ বছর। আবার ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫৩ সালে জমিদারী উচ্ছেদ ৩২ বছর।

সুলতা হেসে বললে—হঠাৎ ছবির মারফৎ জবানবন্দী দিতে গিয়ে যে রিসার্চ তত্ত্ব এনে বসলে? ওটা গবেষকদের হাতে ছেড়ে দাও। ওরকম গবেষণা একবার ১৮৫৭ সালে হয়েছিল, সেটা ফলে নি। আবার প্রত্যাশা ছিল—১৯৫৭-তে। কিন্তু তার দশ বছর আগে ১৯৪৭-এ ইংরেজ দেশ ছেড়েছে, স্বাধীনতা এসেছে। এসব চেতাবুনীওলাদের পক্ষে ভাল। তোমার কোন কাজে লাগবে না।

সুরেশ্বর হেসে বললে—দেখ, পথের ধারে খড়ি দিয়ে ছক এঁকে অদৃষ্ট গণনা কিম্বা রবিবারে সাপ্তাহিক রাশিফল লেখার বাসনা আমার নেই। সেজন্যে বলি নি। তবে কীর্তিহাটে বসে বসে ভাবতে ভাবতে এটা আমার চোখে পড়েছিল। তাই বললাম! এখন ফিরে যাচ্ছি ১৮৫৯ সালে।

গোপাল সিং এবং গোপাল সিংয়ের দৃষ্টান্তে মিউটিনির পর ইংরেজের শক্তির আতঙ্কে অন্য গোপালেরা দুরন্ত গোপাল থেকে সুবোধ গোপাল হয়ে গেল।

শুধু প্রজারাই নয়, ১৮৫৯ সালের আইনে, যে হাতে মিউটিনি দমন করেছিল ইংরেজ, নিঃশেষিত-শক্তি প্রজার মাথায় সেই হাতে অভয়মুদ্রা ফুটিয়ে, সেই হাতেরই তর্জনী উল্টে

জমিদারকেও শাসন করলে। জমিদারেরা পাল্টাল; পাল্টাতে বাধ্য হল।

তাদের কাছে ইংরেজ শুধু মিউটিনি দমনকারী শক্তিই নয়। ইংরেজ তার আগেই ক্রিমিয়ান ওয়ার জিতেছে। এদেশের লোকে মধ্যে মধ্যে কল্পনা করত, খাইবার পাস হয়ে রুশ পল্টন আসছে; কখনও কখনও ইণ্ডিয়ান ওসেনে রুশ রণতরীর গুজব উঠত। এ সবকিছুর স্বপ্নকে তাসের ঘরের মত সে ভেঙে দিয়েছে। সুতরাং তাদেরও শঙ্কিত এবং সাবধান না হয়ে উপায় ছিল না।

তার সঙ্গে আর একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল। কিসের থেকে বা কোন ঐতিহাসিক কারণে না কোন বিচিত্র অভিপ্রায়ে দেশের মধ্যে একটা নতুন স্রোত বইতে শুরু করল।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর এসেছেন, মাইকেল এসেছেন, বঙ্কিমের পদধ্বনি নিকটতর হয়েছে। ওদিকে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন এক ব্রাহ্মণ সন্তান। রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে পঞ্চবটীর তলায় রাত্রে বসে থাকেন, ঘুরে বেড়ান।

সুলতা, রত্নেশ্বর রায়ের মাতামহ শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় যে ধর্মসাধনার বিকৃতিতে শুধু নিজের জন্তে নরকের দ্বার উন্মুক্ত করেই যান নি, গোটা দৌহিত্র বংশের মধ্যে তাঁর বাসনার পাপ বীজ পুঁতে দিয়ে গিয়েছিলেন, সে ধর্মসাধনার পথেই গদাধর চাটুজ্জে স্বর্গের দ্বারমুক্তির পথ খুলতে চলেছেন।

১৮৬০ দশকের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

নবজাতকের কান্নার মধ্যে দেবেন ঠাকুরের বাড়ীতে এক নবজাতকের স্বর শোনা যাচ্ছে। ওদিকে মধ্য কলকাতার দত্তবাড়ীতে বাজছে আর এক নবজাতকের কণ্ঠস্বর।

রবীন্দ্রনাথ এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁদের সঙ্গে ও পিছনে আরও অনেক সুলতা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সুলতা বললে—সে নাম অনেক সুরেশ্বর! সেসব আমি জানি!

—জান না, একথা আমি কখনই বলিনে। আমি বলছি, এই যে স্রোত, এই যে ধারা, সেটা আর যাই হোক, সেটা ইংরেজের ভয়ে আসে নি। তবে যদি বল—ইংরেজ শাসন সেকালে দুষ্ট ছেলে শাসন করা কটন ইস্কুল, সেই ইস্কুলে পড়ে শাসনের ভয়ে দেশে ভাল স্রোত এসেছিল, তবে তাই না হয় হল। কিন্তু সেটা সেকালের উচ্চবিত্ত এবং উচ্চবর্ণের মধ্যে এসেছিল। সেটা রত্নেশ্বর রায়ের মধ্য দিয়ে রায়বংশে তিনি আনতে চেয়েছিলেন। শুধু কীর্তিহাটের রায়বংশেই নয়, অনেক জমিদারবংশেই এসেছিল।

তাই, বীরেশ্বর রায় যে দেওয়ান আচার্যকে বলেছিলেন—রত্নেশ্বর বলছে, সেরেস্তাকে সে ঢেলে সাজাবে। পুরনো আমল আর চলবে না, সেটা তিনি মিথ্যে বলে আচার্যকে সরাতে চান নি। সে সত্যকে তিনি রত্নেশ্বরের সঙ্গে অল্প কথাবার্তা বলেই বুঝছিলেন।

সেটা রত্নেশ্বর রায় করেছিলেন। অন্ততঃ করতে চেষ্টা করেছিলেন। মোটামুটি পেরেছিলেন, একথাও আমি বলব।

একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে আবার বলেছিল—পরবর্তীকালে দুটি হত্যা তিনি করিয়েছিলেন, তবুও তিনি আইন এবং ধর্মকে বড় করেই চলেছিলেন, একথা কেউ

অস্বীকার করতে পারবে না। অন্যে কেউ জানত না। অন্ততঃ সাধারণ লোকে কেউ এ ধরতে পারে নি, বুঝতে পারে নি। তাঁর ডায়রী পড়ে আমি বুঝেছি, জেনেছি—আমিও তা বলতে পারব না। তার আগে—।

তার আগে আমি গোপাল সিংয়ের জীবনটা শেষ করে নি। এমন একটি ঘরেলাগা আগুন বা বনে-লাগা আগুনের মত জীবন শেষ দশ বৎসর কেরোসিনের ডিবের নিরীহ আলোর মত জ্বলেছে। সেটা আর চোখে পড়বার মত নয়। আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি।

১৯৩১ সালের সেদিন, যেদিন বিমলেশ্বরকাকাকে ধরে নিয়ে গেল, সেই রাত্রে আমার মনে হয়েছিল, গোপাল নিশ্চয় এই ক্ষোভ তার ছেলেদের বুকের মধ্যে জেলে দিয়ে গিয়ে থাকবে।

নিশ্চয় সে বলে গেছে তার ছেলেকে, ছত্রির ছেলে আমি। আমার শিবটা মাটিতে ঠেকল তো মরণ আমার হইয়ে গেল। বাপের এই মরণের শোধ লিবি।

অবশ্য সে কথার উল্লেখ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে থাকবার কথা নয়। তবে একথা তার মনের মধ্যে থাকলে, নিশ্চয় কখনও না কখনও কোন ঘটনায়, কোন কথায়, কোন আচরণে প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

এরই জন্যে সুলতা, সেদিন অর্থাৎ ১৯৩১ সালে সেদিন রাত্রে আমি রত্নেশ্বর রায়ের দিনলিপিগুলো পাতার পর পাতা উল্টে গিয়েছিলাম, শুধু খুঁজে গিয়েছিলাম একটি নাম। গোপাল সিং। ১৮০৯ সাল থেকে ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত। প্রথম প্রথম প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গোপালের নাম পেয়েছি।

"গোপাল ঠিক কথা মত আসিয়াছিল এবং হেঁট হইয়া সর্বসমক্ষে নমস্কার করিল। আমি হাসিয়া বলিলাম—ভাল আছ? সে বলিল—হ্যাঁ হুজুরের মেহেরবাণীতে ঠিক আছি।

আমি তাহাকে একটি সিকি বকশিসের হুকুম দিয়া হাতে দিয়া বলিলাম—খাজাঞ্চীবাবুকে দাও।

সে আবার নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।"

বছরখানেক ধরেই এটা পেয়ে গেলাম। তারপর আর নিত্য নাম পাই নি। মধ্যে মধ্যে পেয়েছি।

১৮৬৯ সালে পেলাম গোপালের মৃত্যু সংবাদ।

রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন—"আজ গোপাল সিং মারা গেল। মনটা খারাপ হইল। তাহার মৃত্যুতে একজন সত্যকার অনুগত হিতৈষী হারাইলাম।"

শেষ দিকে দেখলাম "গোপাল তাহার পুত্রকে মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছে, যেন রায়বাড়ীর আশ্রয় ছাড়িস না। তাঁহার কৃপাতেই ফাঁসির হাত হইতে বাঁচিয়াছি। এবং তোরাও বাঁচিয়াছিস। নহিলে হয় ভিক্ষুক হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত। অথবা যে সব দুর্ভিক্ষ গেল, তাহাতেই সকলে পথের ধারে মরিয়া পড়িয়া থাকিতে হইত।"

সেদিন এর উত্তর পাই নি।

তবে নিজেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। মানুষ আগ্নেয়গিরি। তার বুকের আগুন কখনও নেভে না। শুধু তাই নয়, মানুষ মরে গেলেও তার বুকের আগুন তার বংশের বুকে

জেলে দিয়ে যায়। সিদ্ধান্ত আমার ভ্রান্ত নয়। ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে। ১৯৩৭ সালে পৃথিবীতে এমনি একটা ভয়ঙ্করতম আগ্নেয়গিরি ধোঁয়াচ্ছিল। তখন সারা পৃথিবীতে হিটলারের কথায় বক্তৃতায় সে আগুন লকলক করে শিখা বের করে জ্বলছে।

একটু চুপ করলে সুরেশ্বর।

তারপর বললে—পরে আমি খবর নিয়েছিলাম। জেনেছিলাম, কিভাবে গোপাল সিংয়ের ক্ষোভটা বংশাবলীতে সঞ্চারিত হয়েছিল।

বিচিত্র পথ সুলতা। বিচিত্র পথ।

গোপালের সঙ্গে গোপালের স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে ঝগড়া হত। সেই ঝগড়ার মুখে তার স্ত্রী বলত—তোমার মত বেইমান আমি দেখি নি। আমাকে তুমি আজ লাথি-ঝাঁটা মারছ। বেইমান তুমি 'পাসর' গিয়েছ যে সেদিন আমি ছত্রির মেয়ে রায়গিন্নীর পা ধরে 'ভিখ মাগোয়ার' ভিখ মেঙে তোমার জানটা বাঁচিয়েছিলাম।"

গোপাল ক্ষেপে গিয়ে মাথা চাপড়ে বলত—বেইমান হামি না। বেইমান তু। তু 'পাসর' গেলে কি তুর লেগে হামি গোপাল সিং এ মুলুকের শের, আজ হামি 'শিয়ার' হয়ে বেঁচে আছি। তুর আর তুর বেটা-বেটীর পেট ভরাবার জন্যে রায়কাছারীতে সেলাম দিয়ে চার আনা, আঠ আনা পয়সা লিয়ে আসি। আজ রায়বাড়ীর চাকরান জমি চষি। চাকর বনে গেলাম, সিরিফ তুর আর তুর বাচ্চাদের লেগে।

এর পর সে সবিস্তারে কখনও কখনও বলত—তার দুর্দশার কথা, লাঞ্ছনার কথা। কথাটা ছেলের বুকে প্রবেশ করেছিল এইভাবে।

ছেলের থেকে তার ছেলের বুকে। হরি সিং দফাদার।

হরি সিংয়ের ছেলে শিবু সিং।

তুমি শুনেছ সুলতা, শিবু সিংয়ের কাছে দফাদার হরি সিং ছোরা আর প্যাম্ফলেট দেখে তাকে যে মুহূর্তে অতুলেশ্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেনেছিল, সেই মুহূর্তে তার বুকের পুরনো কথা নতুন হয়ে জেগে উঠেছিল। আগুন লেগেছিল। সারা রাত হরি সিং শিবুকে গোপাল সিংয়ের অপমানের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে উত্তপ্ত করে তুলে তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে দারোগার হাতে দিয়েছিল এবং শিবু সেই আগুনের দহনে গলে হয়েছিল এ্যাপ্রুভার।

গোপাল সিংয়ের কাহিনী শেষ ১৮৬৯ সালে। কিন্তু তার শিকড় থেকে গিয়েছিল। ১৮৬৯ সাল থেকে ১৯৩৭ সালে তা থেকে ন'তুন গাছ বের হল। এবং ওখানেও শেষ হয় নি। তারপরও তার জের আছে, জের চলছে।

বিচিত্রতরভাবে পরে আর একটা এমনি মরা গাছের শিকড় থেকে গজানো গাছের সঙ্গে জড়িয়ে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত আমাকেই জড়িয়ে ধরেছিল পাকে-পাকে।

১৯৩৭ সালে সেদিন রাত্রে ঘুমুতে পারি নি। সেইদিনই করেছিলাম এই ছবিতে জবানবন্দীর পত্তন।

১৯৩৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী; তারিখটা আমার মনে রয়েছে সুলতা, রায়বাড়ীর জবানবন্দী—কীর্তিহাটের কড়চা আমি আরম্ভ করেছিলাম।

সুরেশ্বর বললে—তার আগেই আমি ঠাকুরদাস পালের অপঘাত মৃত্যুর কথা জেনেছি, তোমার সঙ্গে সম্পর্কের সকল প্রত্যাশায় ছেদ টেনে দিয়েছি। কিন্তু কীর্তিহাটের রায়বংশের হিসেব-নিকেশের বোঝা বয়ে সারাজীবন বেড়াব—এ সংকল্প আমার ছিল না। ভেবেছিলাম —সেটেলমেণ্টের হাঙ্গামাটা মিটিয়ে দিয়ে কোনরকমে এখান থেকে বেরিয়ে পালাব। চিরদিন আমার বদনাম আছে—আমি একজন উদ্ভট খেয়ালী মানুষ ; অনেক টাকা আছে আমার, সুতরাং আমি কাল ঘোড়া, ব্ল্যাকহর্স, অবশ্যম্ভাবীরূপে সয়তান হবে আমার সওয়ার। এবং আমি তার চালনায় আমার ক্ষুরে অনেক কিছু—অনেক কোমল বক্ষ—ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে একদা এক অন্ধকার গর্তে পা ভেঙে পড়ে সকল দৌড়ের অবসান করব। রায়বাড়ীর যে-কলঙ্ক ঢাকতে রত্নেশ্বর রায় ঠাকুরদাস পালকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন সুকৌশলে, তা জানায় আমার পক্ষে কাল ঘোড়া হওয়ার বাধা ছিল না। কিন্তু—

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে অতুলেশ্বর আর অর্চনা রায়বাড়ীর একটা বিচিত্র, বিস্ময়কর রূপ প্রকাশিত করে দিয়ে বিপদ বাধালে। শিবু সিং তারই মধ্যে এসে গোপাল সিংয়ের ঘটনার জের টেনে সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে কেমন করে দিলে। মনে হল কি জান? মনে হল— রায়বংশের কর্মফলের মধ্যে একটা আশ্চর্য দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। মন্দ কর্মের ফল ভাল কাজের পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। গিলে ফেলতে চাচ্ছে সকল পুণ্যকে। পুণ্য-বল, ন্যায়-বল করতে হলে অন্যায়ের দেনা শোধ করে তবে করতে হবে।

একটু ভুল হল ; তার আগে—মানে শিবু সিংকে নিয়ে বিমলেশ্বরকাকা যে-নতুন দৃশ্যের পটোত্তলন করলে, ২৪শে জানুয়ারী-এর ক'দিন আগে থেকেই ছবি আঁকার কল্পনা আমার হয়েছিল। মনে আছে—আমি বলেছি—কুইনীকে নিয়ে হাঙ্গামা বাঁধিয়েছিল সেই ফিরিঙ্গী হ্যারিস। হ্যারিসের দাবী কুইনীর ওপর। গোয়ান বুড়ী হিলডা তাকে তার হাতে দেবে না।

মীমাংসা করতে গিয়েছিলাম ছবি আঁকা ফেলে। ছবি আঁকব বলে ইজেলের উপর ক্যানভাস বসিয়ে সবে তুলি ধরেছি, ঠিক এই সময়ে সে পিছু ডাকার মত ডাকলে। বললে— আমি মীমাংসা করে দেবার ভার নিয়েছি, কথা দিয়েছি, আশা করি আমার মত একজন লর্ড-বংশের ছেলে সে-কথা কখনই খেলাপ করবেন না তিনি।

বিরক্ত হয়ে তখনই তুলি ফেলে উঠে গিয়েছিলাম। লোকজন কাউকে সঙ্গে না নিয়েই গিয়েছিলাম গোয়ানপাড়া। সেখানে গিয়ে ঝগড়ার মধ্যে রায়বংশের নাম উঠল। এবং অন্যের কাছে ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক, আমার কাছে ধরা পড়ল আসল সত্য। সে-সত্য ইঙ্গিতে আভাসে বলেছি যে, কুইনীর উপর দাবী হিলডাই করুক আর হ্যারিসই করুক, কুইনীর দায় রায়বংশের। আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায় তার জন্তে দায়ী। আমি মাথা হেঁট করে চলে এসেছিলাম। মীমাংসা আমাকে করতে হয়নি। কুইনী হ্যারিসের দাবী প্রত্যাখ্যান করে নীরবে চলে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, হিলডার দাবী সে মেনে নিলে। কিন্তু পরের দিন এসে সে আমাকে দেবেশ্বর রায়ের চিঠি আর রত্নেশ্বর রায়ের দলিল পড়তে দিয়ে চলে গেল।

আমি দেখতে পেলাম—শ্যামাকান্তের সোমেশ্বরের পাপ রত্নেশ্বরকে ডিঙিয়ে এসে আবার

দেবেশ্বর রায়ের মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে। শ্যামাকান্তের পাপ ধর্মের মধ্য দিয়ে সোমেশ্বরের পাপ সম্পদের মধ্য দিয়ে।

মনে মনে ছবির কল্পনা জাগল—তিনখানা মুখ আঁকব। একের উপরে আর একটা। শ্যামাকান্তের মুখের আউট-লাইনের মধ্যে সোমেশ্বরের মুখের লাইন তার উপর দেবেশ্বরের মুখ। তার চারপাশে একটা কালো ধোঁয়াচ্ছন্নতার পরিবেষ্টনী।

১৯৩৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী রাত্রে বিমলেশ্বরকাকা শোধ নিতে গেল শিবু সিংয়ের উপর। ২৪শে দারোগা এসে অ্যারেস্ট করলে। তাকে কোমরে দড়ি বেধে নিয়ে ঘোরালে সারা গ্রাম। দেখলাম ঘাতে-প্রতিঘাতে রায়বংশের কর্মফল আজও স্তব্ধ হয়নি। সে বয়েই চলেছে।

আমার নিজের মনের মধ্যেও অনুভব করলাম সে-স্রোত বইছে। বিমলেশ্বরকাকার স্ত্রী বর্ধমানের কাকী আমাকে শপথ করালেন—এর শোধ আমি নেব।

গোপাল সিংয়ের কাহিনীটা গোটা পড়লাম। রায়বংশের দায়-অপরাধ পেলাম না তা নয়, পেলাম; কিন্তু তার সঙ্গে পেলাম রায়বংশের ক্ষমাগুণেরও পরিচয়। এর পর ছ'মাস ধরে রায়বংশের ইতিহাস তন্নতন্ন করে রায়বংশের জবানবন্দী এবং কীর্তিহাটের কড়চা আঁকলাম ছবিতে। তার মধ্যে শুধু মানুষের অপরাধটাই পেলাম না, আরও কিছু পেলাম। ইতিহাস আমাকে বুঝিয়ে দিলে, একটা কালের গৌরব আর একটা কালের অগৌরব। এক কালের ন্যায়, অন্য কালের অন্যায়। আমি তাকে এড়াতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি, আমি জানি এ-কালে জন্মে তার দৃষ্টিভঙ্গী তার নির্দেশ অস্বীকার করব কি করে?

ঠিক সেই কারণেই সুলতা, গোপাল সিংহের ওই সাপ ধরা ছবিখানা—প্রতীক-ধর্মী হয়ে উঠেছে আপনাআপনি। ওটাতে গোপালের জীবন যেমন আছে, তেমনি আছে বাংলাদেশের একটা কালের ইঙ্গিত। প্রজাশক্তি বাঁধা পড়ল নাগপাশে।

কাল বদল হচ্ছে।

সেটা স্পষ্ট হয়েছে দেখ পরের ছবিতে। সেখানে প্রজার সঙ্গে জমিদার পাল্টাচ্ছে।

সুলতা বললে—ওটা তো রত্নেশ্বর রায়ের টোপর-পরা ছবি—পাশে কনে-মুকুট-পরা কনে। তারপর—ওটা আবার কার বিয়ে?

সুরেশ্বর বললে—ওটা তোমার পূর্বপুরুষ ঠাকুরদাস পালের বিবাহ। বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবী—দুজনের বিবাহ একসঙ্গে দিয়েছিলেন। বীরপুরের ভগবান মণ্ডলের শ্যালকের মেয়ের সঙ্গে। কীর্তিহাটের যে রংলাল মণ্ডল অতুলের ডাকা কংগ্রেসের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, যাঁর ছেলে উকিল হয়েছে, কনে তাঁর পিসীমা। শ্যামনগর পুড়ে যাওয়ার সময় তার স্ত্রীপুত্র সব গিয়েছিল। রত্নেশ্বরকে সেই বাঁচিয়েছিল। সে-কথা ভোলেননি বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবী। রত্নেশ্বরও তাই চেয়েছিলেন।

সুলতা কিছুক্ষণ ছবিখানার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে। তারপর পরের ছবিখানার দিকে তাকিয়ে বললে—এখানা? এ-তো রত্নেশ্বর রায়—সর্বালঙ্কার-ভূষিতা স্বর্ণলতা—

—ওটা নয়, ওর পরের খানা। যেখানায় দেখ রত্নেশ্বর রায় কীর্তিহাটের কাছারীতে

বসেছেন।

—কিন্তু এখানা? এখানায় রত্নেশ্বর রায় আর স্বর্ণলতা দেবী, তার সঙ্গে আর একটি মেয়ে—।

—ওই অঞ্জনা।

—অঞ্জনা! এই অঞ্জনা?

—হ্যাঁ, এই অঞ্জনা।

—অঞ্জনার ছবি এর আগে তো এঁকেছ?

—হ্যাঁ এঁকেছি। কিন্তু তার কোনটাতেই অঞ্জনা খুব স্পষ্ট নয়। প্রথম আছে ভিড়ের মধ্যে—পুরবাসিনীদের সঙ্গে মিশে। তারপর যেটাতেই আছে, অঞ্জনা হয় পিছন ফিরে আছে, নয় মুখের অতিঅল্প অংশই আছে।

সুলতা একদৃষ্টে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে রইল।

সুরেশ্বর বললে—কি দেখছ বল তো?

—কিন্তু মনে হচ্ছে এই ছাঁচের মুখ যেন দেখেছি। আরও আছে। বলছ অঞ্জনার মুখ কোথাও পুরো দেখাওনি। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে কার সঙ্গে মিল রয়েছে। কার ঠিক মনে হচ্ছে না।

সুরেশ্বর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—তার আর আশ্চর্য কি সুলতা। মানুষ শিল্পীর হাতে আর ক'রকমের ছবি আসবে বল। বড়জোর দুটো-তিনটে-চারটে। পোর্ট্রেট যারা আঁকে, তারা আসল মানুষ দেখে কিম্বা ফটোগ্রাফ দেখে আঁকে। আমাকে তো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কল্পনা সম্বল করতে হয়েছে। রায়বংশের রায়দের অয়েল-পেন্টিং ছিল, ফটোগ্রাফ যখন থেকে হয়েছে, ফটোগ্রাফও পেয়েছি। বাকিদের তো সবই কল্পনায় এঁকেছি। মানুষের কথা ছেড়ে দাও, বিধাতাপুরুষ যে বিধাতাপুরুষ তিনি যখন সৃষ্টি করেন, তখন একটা বংশের মানুষ-গুলোকে প্রায় একরকমই করে থাকেন। মধ্যে মধ্যে অন্য বংশের মেয়ে এসে তাদের বংশের ছাপ মিশিয়ে একটু-আধটু পাল্টে দেন মাত্র।

সুলতা ছবিটা তখনও দেখছিল। সে বললে—কিন্তু ছবিটাতে তুমি একটা ঘটনার কথা বলেছ। সেটা কি? ঠিক তো রত্নেশ্বরের বিবাহিত জীবনের মধুচন্দ্রিকা নয়।

—না, তা নয়। ছবিটাতে দেখ নতুন বউ স্বর্ণলতা দেবী ইংরিজী বই হাতে বসে রয়েছেন। এম-ভি-ও রাধারমণবাবু ইংরিজী-নবীশ, তিনি মেয়েকে ইংরিজী পড়িয়েছেন। রায়বাড়ীর যে অন্দর রাজকুমারী বউ-রাণী কাত্যায়নী দেবী পত্তন করে গিয়েছিলেন, সেই অন্দরের হাল বদলাচ্ছে স্বর্ণলতা দেবী থেকে। বীরেশ্বর রায়ের গৃহিণী সতীবউ, ভবানী দেবী মিশনারী ইস্কুলের মাস্টার মহেশ্বরবাবুর পালিতা কন্যা, তিনিও লেখাপড়া জানতেন, শুধু বাংলাই নয়, কিছু ইংরিজীও শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তা তাঁর ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাঁর রক্তে এমন কিছু ছিল, যাতে শিক্ষার থেকে সংস্কার বড় হয়ে উঠেছিল। সেটা আবার জন্মগত সংস্কার। বাপের সঙ্গীতবিদ্যার অধিকার জন্ম থেকে নিয়ে জন্মেছিলেন। তার সঙ্গে ধর্ম-পিপাসা। যার জন্যে রাজ্যপাট তাঁকে বাঁধতে পারেনি। রাজরাণী হয়েও তিনি সন্ন্যাসিনীই

থেকে গেছেন আজীবন। রায়বাড়ীর কীর্তিহাটের অন্দরে রাজত্ব চলছিল রাণী কাত্যায়নীর মাসতুতো বোন নিস্তারিণী দেবীর। আর কলকাতায় সোফি বাঈয়ের। রায়বাড়ীর অন্দরের হাল এই প্রথম পাল্টালো রত্নেশ্বর-বধূ স্বর্ণলতা দেবীর পদার্পণে। এস-ডি-ও'র মেয়ে ইংরিজী বিদ্যে ইংরিজী ফ্যাশনের হাওয়া বইয়ে দিলেন সেখানে। অবশ্য যৎসামান্য। ছবিটাতে অঞ্জনা স্বর্ণলতা দেবীর নাম দিচ্ছে। রায়বাড়ীর বউদের আসল নাম ঢাকা দিয়ে পোশাকী নাম বা জমিদারশাহী নামকরণ হত। জাহাঙ্গীর বাদশার হারেমে ঢুকে মেহেরউন্নিসা হয়েছিলেন নুরজাহান বেগম। সাজাহান বাদশাকে বিয়ে করে নুরজাহানের ভাইঝি আরজমনবানু হয়েছিলেন মমতাজ মহল। সেকালে জমিদার-রাজাদের বাড়ীতেও এই রেওয়াজ ছিল। ভবানী দেবীর দেওয়া রত্নবউ নামটা কিছুদিনের মধ্যেই পাল্টে হয়ে গিয়েছিল বিদ্যেবতী বউ। রায়বাড়ীর অন্দরের জ্ঞাতি-পোষ্যমেয়েরা ঠাট্টা করে নামটা দিয়েছিল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত। স্বর্ণলতা দেবী চটেছিলেন। অঞ্জনা মেয়েটির কথা বলেছি সুলতা। তার একটা ছন্দ ছিল নদীর মত। সেটা যেমন সহজ তেমনি সুরেলা। সে এই বিদ্যেবতী নামটা পাল্টে দিয়ে নাম দিয়েছিল—সরস্বতী বউ। সতী-বউয়ের বেটার বউ—সরস্বতী বউ।

সুলতা বললে—এসবগুলি কিন্তু চমৎকার ফুটেছে। গোপাল সিংয়ের ছবিটা বোধহয় সব থেকে বোল্ড। গোপাল সিং নাগপাশের সঙ্গে লড়াই করছে।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সুরেশ্বর বললে—ঠিক ধরেছ। রায় এস্টেটের দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত প্রজার রিপ্রেসেন্টেটিভ গোপাল সিং। ওর সঙ্গেই দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত প্রজাকে জবরদস্তি জঙ্গীশাসন শেষ হয়েছিল রায় এস্টেটে। এই দেখ—এই সরস্বতী বউ নামকরণের ছবিখানার পরের ছবিখানায় রত্নেশ্বর রায় সেই নির্দেশই জারী করছেন কাছারীতে।

ওই দেখ, কাছারীর ঘরে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল পড়েছে। গদী-আঁটা চেয়ারে বসেছেন রত্নেশ্বর রায়। তাঁর ডানদিকে নতুন দেওয়ান দাঁড়িয়ে। দুপাশে সারিবন্দী কর্মচারী নায়েব-গোমস্তারা। পিতলের তকমা-আঁটা পোশাক-পরা বরকন্দাজরা দরজায় দাঁড়িয়ে।

একটু থেমে বললে—ছবিখানাতে একটু এ্যানাক্রনিজিমের মত দোষ আছে। দেখ, টানা পাখাগুলো একটু বেঁকে রয়েছে অর্থাৎ চলছে। পিছনে বড় তালপাখা হাতে একজন খানসামা। অথচ রত্নেশ্বরের গায়ে হাঁসিয়াদার শাল দিয়েছি। প্রলোভনটা সম্বরণ করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু রত্নেশ্বর রায় জাঁকজমক ভালবাসতেন। আর সভা-সমিতি, দরবার, কালেক্টরসাহেবের খাস কামরায় দেখা করবার সময় ছাড়া কখনও চোগা-চাপকান শামলা এসব পরতেন না। পরতেন কোঁচানো ধুতি, সে-আমলের পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির নীচে ফতুয়া কি গেঞ্জি পরতেন না। ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবির ভিতর দিয়ে তাঁর দেহের গৌরবর্ণ ফুটে উঠত। বীরেশ্বর রায় প্রথম যৌবনে বাবরী চুল রেখেছিলেন। পরে কলকাতায় এসে কেটে ফেলেছিলেন। রত্নেশ্বর রায় গোড়া থেকেই খাটো করে চুল কাটতেন। দাড়ি-গোঁফ দুই কামাতেন। শুধু শাদা পাঞ্জাবিতে কাছারীর দরবারে তাঁর জাঁকজমক-প্রিয় চরিত্র ঠিক প্রকাশ হত না বলেই হাঁসিয়াদার কাশ্মীরী শাল তাঁর গায়ে দিয়েছি।

সুলতা ছবিখানা দেখছিল।

সুরেশ্বর পাশাপাশি তিনখানা ছবিতে রত্নেশ্বরের দৃষ্টি তিন রকম করেছে। শিল্পী সুরেশ্বরকে প্রশংসা না করে পারলে না সে। প্রথম বিবাহমণ্ডপে বর-বধূর ছবিতে রত্নেশ্বরের দৃষ্টি আনন্দোজ্জ্বল, প্রসন্ন হাসি ফুটেছে সে-দৃষ্টিতে। দ্বিতীয় ছবিতে, যেখানে স্বর্ণলতার নামকরণ করছে অঞ্জনা, সেখানে সে-দৃষ্টি অন্যমনস্ক। অঞ্জনা এবং স্বর্ণলতার মাঝখান দিয়ে খোলা দরজায় নিবদ্ধ। দরজার চৌকাঠের মাথা থেকে সরু শাদা একটি দাগ, তাতে যেন একটা কি! তারই দিকে চেয়ে আছেন রত্নেশ্বর রায়। তৃতীয় ছবিখানায় তাঁর দৃষ্টিতে মালিকের দৃষ্টি। তীক্ষ্ণ, গম্ভীর।

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় সেদিন নির্দেশ প্রচার করেছিলেন—কীর্তিহাট এস্টেট এখন থেকে পুরনো আমল বদলে নতুন আমলে এল। এ আমলে এস্টেট চলবে আইনের পথে। বে-আইনের পথে চলবে না। আইনে যতটুকু আছে, ততটুকু ছাড়া জোরজবরদস্তি বন্ধ।

প্রজার খাজনা বাকি—তার কাছে তাগাদা কর, তারপর নালিশ কর। নালিশী ডিগ্রীর টাকার এক পয়সা মকুব নাই।

আবওয়াবের মধ্যে তহুরী, তলবানা, নজরানা বহাল রইল। এছাড়া কোন মাঙন, কোন আবওয়াব রইল না।

স্বত্বস্বামীত্বের ক্ষেত্রে ফৌজদারী আমরা করব না। তারা করতে এলে আমরা অবশ্যই ঠেকাব। কিন্তু এগিয়ে যাব না।

প্রজাকে মারধর বন্ধ।

কোন প্রজার কোন অন্যায়, কোন পাপ আমি বরদাস্ত করব না। কোন মামলায় হাই-কোর্ট পর্যন্ত না লড়ে আমরা হার স্বীকার করব না। যে-প্রজা এস্টেটের অবাধ্য হবে, তার সঙ্গে সবক্ষেত্রে মামলা হবে। সে খাজনা দিতে এলে নেবে না। তার পথ খোলা। সে আদালতে দাখিল করুক। আমরা অপোসে নেব না। প্রয়োজন হলে প্রতি কিস্তীতে নালিশ হবে। সে চার আনা দাবী হলেও নালিশ হবে।

সে-সব ক্ষেত্রে সরকারী খাস পতিতে সে গরু চরাতে পাবে না। বন্ধ করবে না পথ, আর বন্ধ করবে না ঘাট। তাছাড়া জমিদারের খাস যাকিছু তার একগাছি ঘাস সে পাবে না।

রায় এস্টেটের গোমস্তা, নায়েব, বরকন্দাজ, পাইক প্রত্যেকের বেতন বৃদ্ধি হল। তাঁরা প্রজার কাছ থেকে বে-আইনী কিছু আদায় করতে পাবেন না।

আরও একটা নির্দেশ ছিল—রায় এস্টেটের জমিদারীর মধ্যে যেসব দেবস্থলের মালিক জমিদার, যেখানে দেবস্থলের খরচ জমিদারের দেওয়া দেবোত্তর থেকে চলে, সেখানে পুরোহিত-পূজক অনাচারী হলে তা বরদাস্ত করা হবে না। তাছাড়াও অনাচারী তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম বাউল-বষ্টুমদের আখড়া এসবও তুলে দেওয়া হবে। এ তিনি বরদাস্ত করবেন না।

সবশেষে তিনি বলেছিলেন—তোমরা কেউ মনে করো না যে, এটা আমার উদ্ভট খেয়াল কিম্বা খুব একটা সাধু-সন্ন্যাসী-গিরি করছি আমি। এটা হল এই আমলের পথ। আগেকার আমল চলে গিয়েছে। এ-আমল নতুন। আগের আমল ছিল কোম্পানীর আমল; তারা ব্যবসা করতে এসেছিল। তারা লাভ করতে এসেছিল—লাভ হলেই সন্তুষ্ট থাকত; খাজনার

টাকা আদায় তুমি যে করে হয় কর, আমি দেখব না, তুমি আদায় করে আমাকে দাও। বাস্। তাদের টাকা জুগিয়ে তুমি যা কর—কর, দেখব না। এখন ইংলণ্ডেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া আমাদের কুইন; মহারাণীর রাজত্ব। তাঁর চোখে সব প্রজা সমান। জমিদার প্রজা, বড়লোক-গরীবলোক সবাই প্রজা, সবাই সমান। তার জন্যে আইন করেছেন, নতুন আইন হচ্ছে—হবে। সেই আইন মেনে চলতে সকলে বাধ্য। আগে ঘুষ চলত, এখনও হয়তো চলছে কিন্তু তা বেশীদিন বোধহয় চলবে না। ইংরেজদের বিচারের মত সূক্ষ্ম বিচার এদেশে ছিল না—এমন সূক্ষ্ম বিচার হয় না। কাজীর বিচার নয়। এ-বিচার অতি সূক্ষ্ম বিচার। প্রজার উপর অন্যায় হলে জমিদার তো জমিদার, প্রজা আদালতে গিয়ে গভর্নমেন্টের নামে নালিশ করতে পারে। তারপর নতুন লেখাপড়া এনেছে ইংরেজ। লোকের চোখ খুলছে। ইংরেজ এদেশে একরকম ঈশ্বরপ্রেরিত। মস্ত বড় জাত। এতটুকু একটা দেশ—সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে। তার পরাজয় কোথাও নেই। সুতরাং এসব আর চলবে না। আমার শ্বশুরমশাই এস-ডি-ও। তিনি আমাকে বলছিলেন—বাবাজী, তোমাদের এস্টেটের ধারাধরন পাল্টাও। ইংরেজ-জাত বড় কঠিন জাত। সাতসমুদ্র-তের-নদী পার হয়ে এসেছে, জাহাজ করেছে, স্টীমে চলছে। রেল-লাইন পেতে রেলগাড়ীতে তিন মাসের পথ তিন দিনে পৌঁছে দিচ্ছে। বিদ্যুৎশক্তিতে টেলিগ্রাফ করেছে, এখান থেকে দিল্লী খবর যাচ্ছে মুহূর্তে। দেশের হালের বদলের এই শুরু। এই বদলের সঙ্গে যারা বদলাবে, তারাই থাকবে, শুধু থাকবে নয়—উঠবে, দিন-দিন উঠবে, যে না বদলাবে, সে মরবে।

সুরেশ্বর বললে—এই দীর্ঘ বক্তৃতাটির সবটাই তাঁর ডায়রীতে আছে। হয়তো আরও অনেক বলেছিলেন, কি বলেছিলেন জানি না, তবে এটুকু লিখে গেছেন। তার সঙ্গে আরও লিখেছেন—

"ইংরাজ ঈশ্বর-প্রসাদে আজ বিশ্ববিজয়ী। শুধু ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে বলিয়াই নয়—ক্রিমিয়ায় সে বিজয়ী হইয়াছে। যে রুশ-ভীতির কথা লইয়া দেশে অনেক প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিত, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইল। মধ্যে মধ্যে আফগানিস্তানের আমীরের কথা বলিত। বিশালকায় দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ আফগান সৈন্যের ভয় দেখিত, কিন্তু আফগানিস্তানের আমীর আজ ইংরাজেরই অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মদেশে পর্যন্ত ইংরাজ পদার্পণ করিয়াছে। ব্রহ্মের অধীশ্বর আজ রেঙ্গুন হইতে মান্দালয়ে পলায়ন করিয়াছে। ইংরাজ বিশ্ববিজয়ী। তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনা নাই। আজ আইনমত না চলিয়া উপায় নাই। তাহা ছাড়াও পিতামহ সোমেশ্বর রায়ের এবং পিতৃদেবের দৃষ্টান্ত এবং মাতামহ শ্যামাকান্তের দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া নূতনভাবে নূতন পথে যাত্রা শুরু করিতে আমি বদ্ধপরিকর। শ্যামাকান্তের এবং সোমেশ্বর রায় মহাশয়ের কুৎসিত কুসংস্কার আমি আমার জীবন এবং বংশ হইতে মুছিয়া দিতে বদ্ধপরিকর। পিতৃদেবের দুর্দান্ত দুঃসাহসের পথ, তাহাও পরিত্যজ্য। আমি ঈশ্বর এবং ধর্মকে মানি না তাহা নয়, কিন্তু ওই শবসাধনা, নারী লইয়া সাধনাকে কুসংস্কার এবং বিকৃত ধর্মাচার বলিয়াই মনে করি। এবং পিতৃদেবের জীবনকেও আদর্শ বলিতে পারি না। ব্রাহ্ম আমি হইব না, ধর্ম পরিত্যাগ করিব না, কারণ উপায়ও নাই। প্রপিতামহ কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য এই বংশ এবং

এস্টেটের পত্তনই দেবসেবার উপর করিয়া গিয়াছেন। আমি শুদ্ধাচারে বৈদিক ধর্মমতে থাকিব এবং সম্পূর্ণ আইনের পথে চলিব। জমিদারীর ক্ষেত্রে রাজার আইনই একমাত্র ধর্ম।"

*           *           *

সুরেশ্বর বললে—গোপাল সিংয়ের পৌত্র হরি সিংয়ের উপর শোধ নিতে পথ খুঁজতে আমাকে চিন্তা করতে হয় নি। বিমলকাকা এমন শান্ত লোক হয়েও ভুল করে বীরেশ্বর রায়ের পথ নিয়েছিলেন। আমি রত্নেশ্বর রায়ের নির্দিষ্ট পথ নিয়েছিলাম নির্ভয়ে। ইংরেজ সরকার তাকে রক্ষা করতে চাচ্ছে কিন্তু পারবে না, আমি তার উপর কিস্তী কিস্তী নালিশ করব। ইংরেজকেই আমাকে ডিগ্রী দিতে হবে। তার আদালতের পেয়াদারা এসে তার যথাসর্বস্ব ক্রোক করবে। সে যাবে কোথায়?

সুলতা, আমার মনে আছে, সেদিন মনে জমিদারীর নেশা লেগেছিল, আমি রঘুকে বলেছিলাম—দে রঘু, বোতলটা দে।

সুলতা বললে—তোমার জমিদারগৌরব পরে শুনব, কিন্তু রত্নেশ্বর রায় দুটো লোককে খুন করিয়েছিলেন বলছিলে। সে জমিদারীর জন্যে নয় বলছ তুমি?

সুরেশ্বর বললে—না সুলতা, জমিদারীর জন্ম নয়, যে দুটো খুনই তিনি করিয়েছিলেন তার কোনটাই জমিদারীর প্রয়োজনে করান নি। সংসারে রাম রাজত্বের কথাও আছে, রাবণ রাজত্বের কথাও আছে।

বাঁকা হেসে সুলতা বললে—কি বলছ তুমি? রত্নেশ্বর রায় দুটো খুন করিয়েছিলেন রামচন্দ্রের সীতা নির্বাসন এবং শূদ্রতপস্বী বধের মত পুণ্যকর্ম ভেবে করেছিলেন?

—কথাটা তুমি অনেকটা ঠিকই বলেছ সুলতা। রামচন্দ্র রাজা না-হলে এ দুটো করতেন না। আমার কথাটা আমি শেষ করি নি; তুমি তার আগেই মন্তব্য করেছ। রামচন্দ্র রাজা না-হ'লে—সীতাকে সতী জেনেও পরের মিথ্যা সন্দেহে নির্বাসন নাও দিতে পারতেন। আর শূদ্রক তপস্যা করার দরুণ অনাবৃষ্টি হয়েছে এর জন্য তাকে শাস্তি তিনি দিতেও পারতেন আবার নাও দিতে পারতেন। অনেক মানুষ আছে যারা রাজা নয় জমিদার নয় তাদের মধ্যে অনেকে স্ত্রীকে হরণের জন্যে—যে হরণ করে তাকে খুন করে, অনেকে আর এক বিয়ে করে দিব্যি সুখেস্বচ্ছন্দে থাকে, আর পাড়ার বা গ্রামের বদমাসকে কেউ কেউ শাস্তি দেওয়ার ভারটা কর্তব্যবোধে ঘাড়ে তুলে নিয়ে দাঙ্গা-মারপিট করে হাঙ্গামা বাধায় জেলেও যায়। কিন্তু রাজা হলে ওই রামের মতই কাজ না করে উপায় থাকে না।

—তার মানে?

—ধর, ঠাকুরদাস পাল রায়বংশের গোপন পাপের কথা প্রকাশ করব বলে ভয় দেখিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে রত্নেশ্বর রায় সাধারণ লোক হলে তার সঙ্গে হাতাহাতি করতে পারত আবার মুখ বুজে সয়েও যেতে পারত। কিন্তু জমিদার রত্নেশ্বরের ঠাকুরদাস পালের মুখ বন্ধ না ক'রে উপায় ছিল না। ওটা জমিদারী রক্ষার জন্ম বা জমিদারীর আয় বাড়াবার জন্ম নয়। ওটা জমিদার হওয়ার জন্ম। দ্বিতীয় খুনটাও তাই। একজন গোয়ানকে তিনি কোথায় হারিয়ে দিয়েছিলেন, সে কেউ জানে না।

—রায় বাড়ীর মর্যাদা ?

—রত্নেশ্বর লিখেছেন তাই তাঁর ডায়রীতে। কিন্তু ঠিক তা নয়। অঞ্জনা যদি ভ্রষ্টাই হয়ে থেকেছিল, তাতে রায়বাড়ীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার কথা নয়। অথচ এটাকে তিনি তাইই ভেবেছিলেন! ওই ছবিখানা আর একবার দেখ সুলতা। ওই যে বিবাহের ছবির পর, যেখানে রত্নেশ্বর রায়, স্বর্ণলতা দেবী বিদ্যাবতী বউ, এবং অঞ্জনা তিনজন রয়েছে, সেখানার দিকে। অঞ্জনা বলছে—বিদ্যেবতী না—নাম থাকুক সরস্বতী বউ। জ্যাঠাইমা সতী বউ, তার বেটার বউ সরস্বতী বউ। বিদ্যেবতী যেন ঠাট্টা ঠাট্টা। বিদ্যেসুন্দরের বিদ্যে-বিদ্যে।

—মেয়েটি তো লেখাপড়া জানত না বলছ।

—কিন্তু বলেছি ছড়া, পাঁচালী, এসব মুখস্থ ছিল, বিদ্যাসুন্দর সে আমলে খুব চল ছিল। কে তাকে পড়িয়ে শুনিয়েছিল জানি না। তবে বিদ্যেসুন্দর কারুর কাছে সে শুনেছিল। এখানেই স্বর্ণলতা বলেছিলেন—কর্তা গিন্নীকে ব'লে অঞ্জনাকে আমাকে দাও। ওঁরা তো শুনছি এইবার কলকাতা যাচ্ছেন। তারপর যাবেন পশ্চিম। কাশী গয়া বৃন্দাবন তীর্থ করতে। ওরই মধ্যে রত্নেশ্বর রায়ের ওই গোয়ানটার হারিয়ে যাওয়ার বীজ লুকিয়ে আছে।

সুরেশ্বর বললে—এই দুটো খুনের যা কারণ তা জমিদারীর প্রজাশাসন, প্রজাপোষণ এ সব-কিছুর জন্ম নয়, এর কারণ যা তা জীবনে অনেকের ঘটে থাকে হয়ে থাকে। মা-বাপের নামে কেলেঙ্কারী অপবাদ রটনা করলে এ কাজ ক্রোধবশে যে কোন লোক করতে পারে। তবে জমিদার বলে রত্নেশ্বর রায়ের পক্ষে সহজ হয়েছিল, যদি বল স্বাভাবিক হয়েছিল, তবে তাতেও আপত্তি করব না।

আর এই গোয়ানের ব্যাপারটা, ওটাও তাই বলা যায়—তবে ওর আসল কারণটা অন্য, দেখেছ, রত্নেশ্বর রায়ের দৃষ্টি অঞ্জনা এবং স্বর্ণলতার মাঝখানে একটা মাকড়সা ছাদ থেকে সুতো টেনে নামছে সেটার দিকে? দেখ সুতোটা দুলছে, ছাদ থেকে রাইট অ্যাংগেল করে নেমে আসেনি, একটুখানি বেঁকে আছে।

সুলতার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললে—তুমি ওটা বড় ভাল কল্পনা করেছ সুরেশ্বর। মাকড়সাটা অঞ্জনার দিক ঘেঁষে বেঁকে রয়েছে। তুমি—কি—।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ। তাই।

—রত্নেশ্বর সাধুতার আবরণে—

—না, আবরণে নয়। ওটার ইণ্টারপ্রেটেশন অন্যে যে যা করবে করুক আমি তা করি নি। তা করব না। কখনও না। রত্নেশ্বর রায় নিজের জীবনে কোন অসাধুতা কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি। মানুষ তিনি, তার মনও মানুষের মন, তাঁর মনে যখনই কোনও অন্যায় অসাধু প্রবৃত্তি উঁকি মেরেছে, তখনই তাকে তিনি চাবুক মেরে সার্কাসের ট্রেনার যেমন বাঘ সিংহকে খাঁচায় ঢোকায় তেমনি করেই তাদের পিঞ্জরেতে পুরেছেন। নির্মমভাবে নিজেকে আঘাত করেছেন তিরস্কার করেছেন।

এর ইণ্টারপ্রেটেশন আমার কাছে ওই রায়বাড়ীর রক্তে শ্যামাকান্ত এবং সোমেশ্বরের ধর্ম-সাধনায় ভ্রষ্টতার পাপ। শ্যামাকান্ত যেমন শেষ জীবনটা ক্রমাগত নিজেকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত

ক'রে শাসন করতেন, ঠিক তেমনি ক'রেই রত্নেশ্বর রায়ও নিজের অন্তরের মধ্যে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। এই পাপই বল আর তোমাদের আজকের ইণ্টারপ্রেটেশন অনুযায়ী হেরিডিটিই বল, অথবা এইটেই মানুষের স্বভাবের আসল চেহারাই বল, বলতে পার। কিন্তু আমি তা বলব না।

রত্নেশ্বরের জীবনে এই শাপ বা পাপকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেছে এই অঞ্জনা। একটু আগে বলছিলে—অঞ্জনার মুখের ঢঙের মধ্যে, আকৃতির মধ্যে আর কার ছবির যেন ছাপ পড়েছে।

পড়েছে সুলতা, একজনের নয় দুজনের। রায়বাড়ীর কড়চা বা জবানবন্দীতে প্রথম এ মুখের ছাপ পাবে সেই পাগল মেয়েটির মধ্যে, যাকে শ্যামাকান্ত চিনেছিলেন যোগিনী ব'লে। যাকে নিয়ে তিনি কাঁসাইয়ের ওপারের সিদ্ধপিঠের জঙ্গলে সাধনার নামে ব্যাভিচার করেছিলেন। এবং শ্যামাকান্তকে সেই বর্ষার সময় অমাবস্যার রাত্রে দারুণ দুর্যোগে তুফানপ্রমত্তা কাঁসাইয়ের জলে ফেলে দিয়ে সোমেশ্বর তাকে কেড়ে নিয়েছিলেন যোগিনী সাধনা করবেন ব'লে। চল, ওইদিকে চল, তার ছবি দেখবে। মিলিয়ে পাবে। তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে, কিন্তু তখন কথাটা এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

—এই দেখ পর পর দুখানা ছবিতে যে পাগলী এসে রায়বাড়ীর দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ধূলিধূসর দেহ, অর্ধউলঙ্গ, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। এর সঙ্গে হয়তো পুরো মিল পাবে না। কিন্তু এইটেতে পাবে। এই দেখ, পাগলাদাবা শ্যামাকান্ত তাকে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করেছে। স্নান করিয়েছে। নতুন কাপড় পরিয়েছে। মেয়েটি শান্ত এবং তৃপ্ত হয়ে শ্যামাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আরও দুটো ছবি আছে, এই একটা দেখ সোমেশ্বর রায়ের অন্দরে, সোমেশ্বরের কন্যা বিমলাকে কোলে ক'রে দোলাচ্ছে। কি প্রসন্ন শান্ত মুখ দেখ! আর একটা ছবি, যোগিনী তখন সোমেশ্বরের সাধনসঙ্গিনীর ছদ্মবেশে তাঁর বিলাসসঙ্গিনী হয়েছে, দেখ, এইটেতে যে ছবি আছে তারই সঙ্গে অঞ্জনার মিল রয়েছে পুরো।

সুলতা দেখলে। তাই বটে। দেখলে ভ্রম হয়; মনে হয় বুঝি যোগিনীই দাঁড়িয়ে আছে রত্নেশ্বরের সামনে। একটু ভেবে নিলে সুলতা। কপালে ক'টা রেখা জেগে উঠল। একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—এটা তুমি কেন করলে সুরেশ্বর? অঞ্জনা রায়বাহাদুরের পোষ্য ছিল—হয়তো বা—

—না সুলতা, তা ছিলেন না অঞ্জনা দেবী।

—তা হ'লে দুটো ছবি একরকমের ক'রে তুমি ওই মেয়েটির কি অপমান কর নি?

—না। তুমি রাগ করো না। একটু ভেবে দেখ। এখানে ওই মেয়েটি রায়বংশের কড়চার একটা সিম্বল। আমি যোগিনীর কোন ছবি পাই নি। দেখি নি। অঞ্জনার একটা ফটো ছিল শুনেছি কিন্তু সেটা নাকি রায়বাহাদুর আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে এক জায়গায় তার ছবির আদল পেয়েছি। তাই দেখে অঞ্জনার ছবি এঁকেছি এবং তা থেকেই যোগিনীর ছবিও এঁকেছি। আগে আমার জবানবন্দী শেষ হোক তারপর তুমি রায় দিয়ো। তবুও যদি তর্ক করো তবে কৈফিয়ৎ হিসেবে বলব—বিজ্ঞানস্বীকৃত একটা নিয়মকে আমরা সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করি, সেটা হল একজনের সঙ্গে আর একজনের আশ্চর্য চেহারার মিল। ওটা হয়ে

যায়। এও তাই।

একটু বক্র হাসি সুলতার মুখে ফুটে উঠল।

সুরেশ্বর বললে—তুমি এখনও বিচারক হিসেবে নিরপেক্ষ হতে পারলে না। কিন্তু পরে তোমাকে মত বদলাতে হবে।

—ভাল। বল শুনি!

একটু চুপ ক'রে বোধহয় কিছু ভাবলে সুরেশ্বর তারপর বললে—তাহ'লে তোমাকে রায়-বংশের জবানবন্দীর ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ করে পাঁচ বছর পরে যা ঘটেছিল সেইটেই আগে—এখনই শুনিয়ে দিই। আমি আমার কথায় বলব না। বলব রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর কথা।

সামনের টেবিলের উপর রাখা ডায়রীগুলির গাদা থেকে ১৮৬৪ সালের ডায়রী বেছে নিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি পোরা চিহ্নিত জায়গাগুলি খুলে দেখতে দেখতে একজায়গায় থামল সুরেশ্বর। বললে—এই পেয়েছি। শোন।

"আমি নিভৃতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে অঞ্জনাকে ডাকিয়া কঠিন ভাবেই করিয়া কহিলাম—এ তুমি কি করিতেছ? এসব কি শুনিতেছি?

অঞ্জনা ভয় পাইল না, সে বলিল—কি শুনিতেছ?

—তাহা তুমি জান না? গোটা অন্দরে কথাটা লইয়া কানাকানি চলিতেছে। লোকে হাস্য করিতেছে!

—কানাকানি চলুক। হাস্য করুক—তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না।

আমি এবার রোষদৃপ্ত কণ্ঠে কহিলাম—অঞ্জনা, তুমি সাবধান হইয়া কথা বলিবে।

অঞ্জনা আশ্চর্য এক হাস্য করিল, যেন জগৎসংসার সমস্ত কিছুকে অবজ্ঞা করিয়া কহিল—কেন? কি করিবে তুমি? মারিয়া ফেলিবে? তোমরা বড়লোক জমিদার, তোমরা সব পার। কিন্তু আমি তাহাতে ভয় করি না। আমি তাহাতে জুড়াইব। তবে একটি দয়া প্রার্থনা করিব। যেন ভাড়াটিয়া লোক দিয়া আমাকে হত্যা করাইয়ো না। তুমি স্বহস্তে আমাকে হত্যা করিয়ো। তুমি বিষ গুলিয়া আমাকে দিয়ো, আমি সহাস্যে তাহা পান করিয়া মরিব। তুমিই আমাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছ, আমি স্বহস্তে লিখিয়া যাইব, আমি স্বেচ্ছায় বিষ পান করিয়া মরিতেছি। ইহার জন্য কেহ দায়ী নয়।

অঞ্জনা প্রগলভা বটে। কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক প্রগলভতায় আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—অঞ্জনা, তুমি পাপিনী। কালসর্পিণীর সহিতই একমাত্র তোমার তুলনা হয়। দুগ্ধ পান করাইয়াও ফল হইল না।

অঞ্জনা এবার যেন আরও উদ্ধত এবং প্রগলভ হইয়া বলিল—হাঁ—হাঁ—আমি কালসর্পিণীই বটে। আমি পাপিনীই বটে। পাপ উদ্দেশ্যেই তোমাদের গৃহে সেবার আসিয়াছিলাম। দরিদ্রের কন্যা, এক দরিদ্রের স্ত্রী, সে দরিদ্র হইলেও ক্ষতি ছিল না, সে পাষণ্ড, সে দুশ্চরিত্র, সে বাউণ্ডুলে। তোমাদের গৃহে আসিলাম উৎসব দেখিতে। ঐশ্বর্য দেখিয়া লোভ হয় নাই তাহা বলিব না। অত্যন্ত লোভ হইয়াছিল। কিন্তু ততোধিক লোভ হইল তোমাকে দেখিয়া। আবার ভয়ও হইল। তোমার মত গম্ভীর, তোমার মত কঠোরচরিত্র যুবক আমি দেখি নাই।

পিত্রালয়ে, আমার দিকে আমাদের গ্রামের দুশ্চরিত্র যুবকেরা লোলুপদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। আমি কৌতুক বোধ করিতাম এবং অহঙ্কারও অনুভব করিতাম। তাহাদিগকে লইয়া কথায় খেলা করিতাম। আমি কালো হইলেও আমার মত মোহময়ী যুবতী দুর্লভ ইহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। রাজার ঘরে আমি পড়িলে তোমার স্বর্ণলতা অপেক্ষা বহুগুণে মহিয়সী হইতে পারিতাম। তুমি প্রথম আমার দিকে একবার চাহিয়া আর ফিরিয়া চাহ নাই। তারপর তোমার মাতা অনুগ্রহ করিয়া গৃহে স্থান দিলেন। আমি হস্তে চাঁদ পাইবার সুযোগ পাইয়া থাকিয়া গেলাম।

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিলাম নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের উপর আমার ছায়া পড়িয়াছে। ছায়া আমি ফেলিয়াছি। তুমি আমাকে, স্বর্ণলতার কাছে সেই ধাঁধা প্রেরণ করিবার জন্য দ্বিপ্রহরে তোমার ঘরে আহ্বান করিলে। আমি মনে মনে হাস্য করিলাম; উৎসাহিত হইলাম। তাহার পর তোমার বিবাহ হইল। তোমার মাতাপিতার সঙ্গে আমার চলিয়া যাইবার কথা। আমি সরস্বতী বউকে ধরিলাম; বলিলাম—ভাই, বউ, জ্যাঠাইমা জ্যেঠামশায়ের নিকট কোন প্রবীণাকে পাঠাইয়া দাও। আমি ভাই তোমাদের যুগলের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন সার্থক করিব। তোমরা শয়ন করিবে, আমি শয্যা রচনা করিব, আমি তোমাকে কেমন করিয়া পুরুষের নাসিকা ফুড়িয়া দড়ি পরাইতে হয় শিখাইব। পান সাজিব। এবম্বিধ নানাপ্রকার তোষামোদ করিয়া তাহাকে দিয়াই তোমাকে বলাইলাম। জ্যাঠাইমাকে বলাইলাম। সঙ্কল্প করিলাম, তোমাকে জয় করিব।

আমি বলিলাম—অঞ্জনা, তুমি থাম। তুমি থাম। এসব কথা বলিলে পাপ হয়, শুনিলে পাপ হয়—তুমি থাম।

অঞ্জনা বলিল—সে তোমার হয়, আমার হয় না। আমাদের মত যাহারা তাহাদের হয় না। যে ভগবান এবম্বিধ অদৃষ্ট দিয়া আমাদের জগতে পাঠান তিনি আমাদের এবম্বিধ চরিত্র দেন। আর তুমি এবং তোমার মত যাহারা শুদ্ধাচারী, তাহারা ভণ্ড, তাহারা কালী কালী হরি হরি জপ করিয়া দন্তে দন্ত টিপিয়া পড়িয়া থাকে, তুষানলে দগ্ধ হয়।

সভয়ে আমি বলিলাম—অঞ্জনা!

অঞ্জনা বলিল—আমি তোমাকে জানি না মনে করিতেছ? তোমার প্রতি পদক্ষেপ আমি চিনি, তোমার মুখ দেখিয়া বলিতে পারি কি তুমি ভাবিতেছ। মুখ খুলিলে বলিতে পারি কি বলিবে। তোমাকে দেখিলে তোমার দৃষ্টি উৎফুল্ল হয় না? আমি থাকিলে সরস্বতী বউয়ের সঙ্গে আলাপনের মধ্যে তোমার উচ্ছ্বাস বাড়ে না? কোনক্রমে আমার হাতে হাত ঠেকিলে তুমি চঞ্চল হও না? সত্য বলিবে!

আমি এবার কঠোর হইয়া বলিলাম—না—না—না!

অঞ্জনা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বিষণ্ণ থাকিয়া বলিল—তুমি মিথ্যা বলিলে।

আমি বলিলাম—না।

অঞ্জনা বলিল—তবে সত্য গোপন করিলে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মত অশ্বত্থামা হতঃ ইতি

গজের মতই কথাটা বলিলে। জমিদার হিসাবে তোমাকে লোকে ভয় করে। মানুষ হিসাবে তুমি আরও ভয়ঙ্কর। হাঁ, অস্বীকার করিব না তুমি অত্যন্ত সতর্ক। তুমি হাসিতে হাসিতে হঠাৎ গম্ভীর হইয়াছ। তোমাকে একাকী দেখিয়া তোমার ঘরে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তুমি কোন-প্রকার ছুতা করিয়া স্বর্ণলতাকে আহ্বান করিতে। বা চাকরকে আহ্বান করিতে! স্বর্ণলতার সম্মুখে তোমার উল্লাসে আমি পুলকিত হইতাম কিন্তু তোমাকে একাকী পাইয়া কাছে ছুটিয়া গিয়াও সভয়ে সরিয়া আসিতাম।

অতঃপর সহসা সে যাহা করিল তাহাতে আমি ভীত হইলাম, চঞ্চল হইলাম। সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—কেন, আমাকে কি এতটুকু ভালবাসা তুমি দিতে পারিতে না? এতটুকু? এক কণা। স্বর্ণলতার উচ্ছিষ্ট এতটুকু? তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইতাম। এই তো সারা দেশময় জমিদারদের ছুইটা তিনটা করিয়া স্ত্রী থাকে। রক্ষিতা থাকে। বাড়ীতে আশ্রিতাদের মধ্যে কত সুন্দরী যুবতীকে তাঁহারা অনুগ্রহ করেন। তাহাতে কি ক্ষতি হয়?

—তাহা ছাড়া রত্নেশ্বর, স্বর্ণলতা তোমার যোগ্যই নয়। নামেই লেখাপড়া জানা সরস্বতী বউ। রঙটাই কটা। আমার সঙ্গে তাহার তুলনা! তুমি ভয়ঙ্কর বলিলাম, ভুল বলিলাম। তুমি কাপুরুষ। তুমি পুরুষই নও। তুমি সিংহ নও, তুমি শশক।

আমি কঠোর কণ্ঠে তাহাকে বলিলাম—তুমি দুশ্চরিত্রা! চুপ কর তুমি।

অঞ্জনা তাহাতেও দমিল না। সে বলিল—হাঁ, আমি দুশ্চরিত্রা। অন্ততঃ মনে মনে আমি দুশ্চরিত্রা। তুমি সাধু। তুমি ভয়ঙ্কর। সেই প্রেতিনীর গল্প আছে—যাহারা সুযোগ পাইয়া সুন্দর পুরুষকে আশ্রয় করে তাহাকে চুষিয়া খায়, আমি তাই। সেইরূপভাবেই তোমাকে চুষিয়া খাইবার জন্ম তোমাকে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রহার খাইয়া আমাকে পলাইতে হইতেছে। কিন্তু তুমিও জ্বলিবে। নিশ্চয় জ্বলিবে। এই তেজ তোমার থাকিবে না।

আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম—অঞ্জনা অঞ্জনা—শোন।

সে চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে বলিলাম—কদাচ এ কার্য করিও না। কদাচ না। তাহা হইলে আমি তোমাকে সত্যই হত্যা করিব।

সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে ফিরিয়া চলিয়া গেল! আমি বুঝিলাম এবার ঔষধ ধরিয়াছে। সে ভীত হইয়াছে এবং বুঝিয়াছে!"

সুরেশ্বর খাতাখানা বন্ধ করলে।

সুলতা বললে—অদ্ভুত মেয়ে।

সুরেশ্বর বললে—বল, কি বলবে এর সম্বন্ধে?

—ওর সম্বন্ধে বলব; হাসলে সুলতা, বললে—তুমি কি বলবে জানি না, আমি বলব—সে চেয়েছিল তার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু পায় নি।

—রত্নেশ্বরকে সে চেয়েছিল, কিন্তু রত্নেশ্বরের কি তার দাবী মেনে আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল?

—রত্নেশ্বর ছাড়াও আর অনেক মানুষ ছিল, যারা রত্নেশ্বর থেকে কম উজ্জ্বল, কম গুণবান

নয়। হয় তো ধনী না হতে পারেন। সে স্বচ্ছন্দো ডাইভোর্স ক'রে তাদের একজনকে বিয়ে করে সুখী হতে পারত।

হেসে সুরেশ্বর বললে—তা সে করেছিল সুলতা। সে রত্নেশ্বর রায়ের সমস্ত শাসন, সমস্ত বন্ধন অস্বীকার ক'রে কলকাতায় জানবাজারের এই বাড়ী থেকে একদিন রাত্রে চলে গিয়েছিল। তখন কলকাতার বাড়ীতে রত্নেশ্বর রায় শীকারের জন্য একজন পোর্টুগীজ ফিরিঙ্গীকে রেখেছিলেন। ওই হ্যারিসের মত চরিত্র। এবং আশ্রয় নিয়েছিল ক্রশ্চান চার্চের। যেখানে রত্নেশ্বর রায়ের হাত পৌঁছয় না। যাবার সময় একখানা চিরকুট লিখে গিয়েছিল। 'পাপ তোমার কাছে হারিয়া পলাইতেছে।'

সুরেশ্বর একটু থেমে কথার জের টেনে বললে—এইজন্তেই আমি রায়বাড়ীর পূর্ব-পুরুষের ব্যাভিচার-সঙ্গিনী সেই যোগিনী মেয়েটার চেহারা অঞ্জনার চেহারার আভাস নিয়ে এঁকেছি। অঞ্জনাকে আমি অপমান করতে চাই নি। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না।

আরও আছে সুলতা। অঞ্জনার কথাটা তুমি ক্ষুব্ধ হয়ে তুললে বলে ক্রমভঙ্গ ক'রে বলতে হ'ল। এখন আমার জবানবন্দীর ক্রমে ফিরে চল। ১৮৫৯ সালে। রত্নেশ্বর রায়ের বিবাহ হল। অঞ্জনাকে স্বর্ণলতাই চেয়ে নিলে শাশুড়ী ভবানী দেবীর কাছে।

শুধু বীরেশ্বর রায় একটু খুঁত-খুঁত করেছিলেন। বলেছিলেন—তাই তো!

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় প্রস্তাবটা শুনে বলেছিলেন—তাই তো!

ভবানী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কেন, তাই তো কেন বলছ!

—তোমার মনে হচ্ছে না? অঞ্জনা এখানে বউমার কাছে থাকবে বলছ?

—আমার কাছে থাকলে আমার সুবিধে হ'ত। তোমার খাবার, সেবার ভারটা ওর উপর দিলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম। অঞ্জনারও আমাদের সঙ্গে তীর্থ দর্শন হ'ত। কিন্তু বউমার কথাও তো ভাবতে হবে। বউমা বলছেন—ও থাকলে আমি কথা কইবার লোক পাব। ও ভারী মজার মজার কথা বলে। এত বড় বাড়ীতে—চুপ করলেন বউমা। তবে বুঝলাম। কথাটা তুমিও ভাব, এত বড় বাড়ীতে ওই অল্পবয়সী মেয়ে, হাঁপিয়ে উঠবে যে।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—একবার রত্নেশ্বরকে ডেকে দিয়ো। তোমার সঙ্গে তার এ বিষয়ে কোন কথা হয়েছে?

ভবানী দেবী বলেছিলেন—তার সামনেই তো কথা হল। মায়ের মন্দির থেকে এলাম, বউমা, অঞ্জনাও আমার সঙ্গে ছিল। পুজার পর, ভোগের আগে বউমা বললে—আমার শরীরটা কেমন করছে মা। দেখলাম খুব ঘেমে গেছে। বললাম—তুমি চলে যাও, আমি রয়েছি; অঞ্জনা রয়েছে, তোমার চলে গেলে কোন দোষ হবে না। বউমা চলে এল নিজের ঝিকে নিয়ে। ফিরে এসে তোমার মার চরণামৃত পুষ্প দিয়ে রত্নকে দিতে গেলাম, দেখলাম, বউমা একটু সুস্থ হয়েছেন। ছেলেমানুষ, সায়েবী চালে মানুষ, এসব অভ্যেস নেই। বললাম—এখন সুস্থ লাগছে তো?

রত্ন বললে—ওঃ সে ঘেমে নেয়ে উঠেছিল যেন। এসে ধপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তারপর বললে—বাবাঃ, পেটের ভেতর আমার হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। ভয় করছে। এ

আমি সব সামলাব কি করে? মা চলে যাবেন! বললাম—কিন্তু পারতে হবে। না পারলে তো চলবে না। তুমি নিজে চোখে বিয়ের আগে এসে সব দেখে গিয়েছ! তা সাহস আছে, বললে—পারব বই কি। এসব ভাল লাগছে খুব। কিন্তু কখনও তো করি নি। দেখে ভাল লেগেছিল। এখন সেইসব করতে গিয়ে খেই হারিয়ে যাচ্ছে। ভয় হচ্ছে। কোথায় খুঁত হচ্ছে, কোথায় খুঁত হচ্ছে!

হেসে ভবানী দেবী বলেছিলেন—এর পর যখন অভ্যেস হবে, তখন দেখবে, মা তোমাকে অনবরত হেসে বলছেন, ভয় কি? ভয় কি বেটী। ওরে আমি যে মা। আমার কাছে খুঁত হয় সন্তানের! তাছাড়া মাসীমা রইলেন, উনিই এতদিন করে আসছেন, তোমার হাতে-হাতে সব জুগিয়ে দেবেন; বলে দেবেন। ওই দেখ না, অঞ্জনা সব কেমন অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে।

ভবানী বীরেশ্বর রায়কে বললেন—এই কথাতে রত্নেশ্বরই বললে—তোমার বউমা আমাকে একটা কথা বলছিল।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—কি?

রত্নেশ্বর বলেছিলেন স্বর্ণলতাকে—বল না, তুমি নিজেই বল না। আমাকে বললে কি হবে? খোদ মাকে বল। আমি বলতে পারব না।

—কি বউমা?

স্বর্ণলতা শাশুড়ীর সামনে ঘোমটা টেনে বসেছিলেন। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি শোন, ও কি বলছে।

তখনকার কালে বউ শাশুড়ীর সামনেও ঘোমটা দিত, এবং চাপা গলায় কথা বলত। অবশ্য ঘোমটা সারা-মুখ-ঢাকা ঘোমটা নয়, কপাল ঢেকে অন্তত ইঞ্চি দুই সামনের দিকে ঝুলে থাকত।

মৃদু কণ্ঠে স্বর্ণলতা বলেছিলেন—বলছিলাম, অঞ্জনা ঠাকুরঝির কথা!

—কি কথা? অঞ্জনা কিছু বলেছে বুঝি?

—না, ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে কথাটা সেরেছিলেন নবীনা রায়বধূ।

এবার রত্নেশ্বর ভিতরে ঢুকে এগিয়ে এসেছিল এবং বলেছিল—মা তো আমার বাঘিনী বউ-কাঁটকী শাশুড়ী নয়। বলতে গলা শুকুচ্ছে! ও বলছিল, তুমি চলে যাবে, একলা হবে ও; এইসব দেবতার কাজ; ঠাকুমা বলতে গেলে বুড়ী হয়েছেন। এই তো বিয়েতে খেটে মেচে খেয়ে আজ প্রায় মাসের উপর পড়ে আছেন। সেরে গেছেন, তবু উঠতে পারেন না। তার ওপর বাতের ব্যথা। আর ওঁর কথাবার্তা বড় সেকেলে। শুধু সেকেলে নয়, একটু চ্যাটাং-চ্যাটাং। তোমাকেই কি বলেছিলেন, তোমার মনে আছে। তাই বলছিল, অঞ্জনা যদি ওর কাছে থাকত, তো ভাল হ'ত। বলছিল—ঠাকুরঝি যদি এখানে থাকতো তাহলে খুব ভাল হ'ত। সব কাজ দিব্যি করে যেতো দুজনে মিলে, হাসি গল্পের মধ্যে। এই আর কি। কি বল না। ঘোমটাশুদ্ধ ঘাড়টা নেড়েও তো জানাতে পার!

তাই জানিয়েছিলেন নতুন বউ।

ভবানী দেবী হেসে বলেছিলেন— তোমার আমার কথা ছিল আলাদা। শাশুড়ী ছিলেন

না। শ্বশুর ছিলেন, তিনি থাকতেন কীর্তিহাটে, তো তুমি আমায় নিয়ে ছুটতে কলকাতায়। আবার তিনি কলকাতা গেলে তুমি আমায় টেনে আনতে এখানে। ঘোমটা দিতে হত না। সমীহ করবার কেউ ছিলেন না। তার ওপর সে আমলে ঘোরতর সাহেব তুমি।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—হুঁ। শুধু একটি হুঁ।

ভবানী দেবীর খেয়াল হয়েছিল, এতক্ষণে, তিনি বলেছিলেন—তুমি কি ভাবছ বল তো!

—ভাবছি, তাহ'লে অঞ্জনার স্বামীকেও এখানে রাখতে হবে।

—তা তো কথাই হয়েছে।

—না, এই বাড়ীতেই তার জন্তে নিচেরতলায় সংসার পাতিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। লোকটা মদ খায়, যাত্রা করে বেড়ায়, বাউণ্ডুলে। তাহলেও অন্দরেই তাকে থাকতে দিতে হবে।

—কেন ? তা করতে হবে কেন ? সে তো অঞ্জনাকে নেয় না। গণ্ডা দরুণে বিয়ে। চাকরি অঞ্জনার খাতিরে দিতে আমরা চাচ্ছি, কিন্তু অঞ্জনা বলছিল, কেন মিথ্যে তাকে চাকরি দেবেন জ্যাঠাইমা, সে চাকরি করবার মানুষ! দুদিন পর পালিয়ে যাবে। না হয় কারুর সঙ্গে মারপিট করবে। না হয় মাতলামি করে, আমার লজ্জার আর শেষ রাখবে না। আমাকে দয়া করে কাছে রাখবেন, এতেই আমি বাঁচলাম। এই ঢের। সংসার আমার অদৃষ্ট নয়। আর ও আমি চাইনে। ও কাজ করবেন না। আমি বললাম—দেখি না! তখন বললে—দেখুন! আপনাদের কাছে আমার অপমান নেই; আর সবই বলে রাখছি যখন, তখন আমাকে এর জন্তে দায়ীও করবেন না, আপনারা। এর পর চাকরি দেব বলেছি দেব, কিন্তু বাড়ীতে তাকে ঢুকতে দেব কেন ?

—তাহলে অঞ্জনার জন্তে আলাদা বাড়ী করে দিতে হবে।

আলাদা বাড়ীতেই যদি থাকবে, তাহলে এবাড়ীর ওইসব কাজ চব্বিশ ঘণ্টার কাজ, তা হবে কি করে ? ধর ভোররাত্রে মঙ্গল আরতি। শয়ন হয় রাত্রি এক প্রহরের পর। তখন শয্যা-ভোগ দেওয়া, তারপর বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া, কারুর অসুখ থাকলে তাকে একবার দেখা।

বাধা দিয়ে বীরেশ্বর বলেছিলেন—তোমাকে কি বলব, বুঝতে পারছি না আমি। আমাকে দেখেও তুমি পুরুষ চরিত্র বুঝলে না ভবানী! পুরুষের মন বহুগামী। তোমার দাদা বিমলাকান্ত দু-চারটেই হয়। তার বেশী হয় না। তার উপর ভূস্বামী, বলতে গেলে রাজা।

—ছিঃ! বলে উঠেছিলেন ভবানী! তুমি নিজে নিজের মুখে কালী মাখাচ্ছ, মাখাও। জোর করে মাখাচ্ছ। কিন্তু আমি তো জানি। সোফিয়াকে নিয়ে—। থাক ওসব কথা। নিজের ছেলেকে এত ছোট ভেবো না।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—ছোট আমি নিজেকে ভাবিনে কোনদিন। তবে ভয় আমার ওই অভিসম্পাতের, তোমার বাবা—

শিউরে উঠে ভবানী দেবী বলেছিলেন—না। আমি তার জন্ত সাধনা করেছি, না তা হবে না।

বীরেশ্বর হেসেছিলেন, বলেছিলেন—ভাল।

কথাগুলো আড়াল থেকে শুনেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। এবং নিঃশব্দে ফিরে এসেছিলেন।

বাপের উপর ক্রোধ হয়েছিল তাঁর !

তিনি ডায়রীতে লিখেছেন—"পিতার বাক্যগুলি অন্তরাল হইতে শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হই নাই। সারাটা জীবনই তিনি অকারণে সকলকে সন্দেহ করিয়া গেলেন। আমার মাতৃদেবী যিনি সাক্ষাৎ দেবী, সারাটা জীবন যিনি তপস্বিনী, তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। আমার সাধু-প্রকৃতি চরিত্রবান মাতুলকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। তিনি আমার উপর সন্দেহের আশঙ্কা পোষণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে ? তথাপি ইহা শ্রবণ করিয়া আমার কর্ণকুহর যেন দগ্ধ হইয়া গেল। যিনি সারাটা জীবন একজন বাঈজীকে লইয়া প্রমত্ত থাকিলেন, কি বলিব, অন্তরে অন্তরে সময়ে সময়ে দাবানল সদৃশ অনল-জ্বালা অনুভব করিয়া থাকি, যখন মনে পড়ে সোফিয়া বাঈয়ের মোহ আজও তাহার অন্তরে ঘৃতলোভী অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে। সোফি বাঈয়ের পরিবর্তন হইয়াছে অনেক। তাহার চরিত্রের বরং প্রশংসা করি, মদীয় পিতাকে সে প্রায় স্বামী জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে সঙ্গীতলহরী শুনাইয়া তৃপ্তিদান করে, উত্তম পান সাজিয়া দেয়। তাহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু পিতাকে কি বলিব ? এমত চরিত্র ব্যক্তি, এমত সন্দেহ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য কি ? তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি আমার চরিত্রবল তাঁহাকে এবং সকল জগৎসমক্ষে প্রমাণিত করিব। ওই অভিসম্পাতকে আমি ব্যর্থ করিব। পাপ মাত্রেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

"অঞ্জনা সরস্বতী বধূর নিকটই থাকিবে। এই বাড়ীতেই থাকিবে। এবং চব্বিশ ঘণ্টাই থাকিবে। রাখিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।"

তাই রেখেছিলেন রত্নেশ্বর। অঞ্জনা স্বর্ণলতার কাছেই রইল। আরও মাস তিনেক পর কালীপুজোর পর বীরেশ্বর রায় গিয়েছিলেন কলকাতা। সকলেই তাঁর সঙ্গে এসেছিল। রত্নেশ্বর, স্বর্ণলতা এমন কি অঞ্জনা পর্যন্ত।

রত্নেশ্বর বীরেশ্বরের জন্য খুব এলাহি ব্যবস্থা করেছিলেন। মহিন্দর চাকর যেমন ছিল, তেমনি ছিল তামাক সাজা, কাপড় কোঁচানো, তেল মাখানো, গা-হাত-পা টেপা, সামনে হাজির থাকা ও তাঁর ওষুধ-পত্র ঠিক ঠিক সময়ে দেবার জন্য সে কালের কম্পাউণ্ডারী-জানা একজন লোক নিযুক্ত করেছিলেন ; বীরেশ্বরের খাবার ভার ভবানী দেবীর উপর ; সোফিয়া তাকে গান শোনাবে। পান সেজে দেবে। আর ভবানী দেবীর পরিচারিকা ছিলেন দুজন। একজন ব্রাহ্মণ-কন্যা, প্রৌঢ়া বিধবা। আর একজন কলকাতার বড় লোকের বাড়ীর উপযুক্ত একটি ঝি। এ ঝি খুঁজে দিয়েছিলেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীর জ্যাঠাইমা জগদ্ধাত্রী দেবী।

রত্নেশ্বর রায় কলকাতায় এসে প্রায় মাস দুয়েক থেকে ফিরে ছিলেন কীর্তিহাটে। কার্তিকের মাঝামাঝি এসে ফিরেছিলেন পৌষের দশ তারিখে।

পৌষ মাসে কিস্তী আসছে, বাংলা দেশের জমিদারদের পৌষ থেকে চৈত্র চারটে মাস সমারোহের মাস। জমিদারী সেরেস্তায় যত কাজ হয়, তার বারো আনা কাজ এই চারটে মাসে। গ্রামে গ্রামে প্রজাদের খামারে ধান উঠছে। ধান ঝাড়াই হচ্ছে। পৌষ থেকেই আলু। আখ মাড়াইয়ের মরসুম মাঘ থেকে। তার সঙ্গে ছোলা-মসুর-গম, নানান রবি ফসল। চৈত্রে তিল। এই কটা মাসেই জমিদারীর খাতায় জমার অঙ্ক হাজারে হাজারে।

মহালে মহালে গোমস্তা সেরেস্তা পেতে বসেই থাকবে। পাইকেরা নিত্য প্রজার দরজায় দরজায় তাগিদ দিয়ে ফিরবে।

জমিদারবাড়ীর লক্ষীর ঘরে বড় চৌকো ত্রিশ-চল্লিশ মণ ভারী আয়রণ চেস্টগুলো প্রায় নিত্যই খোলা হবে একবার করে। তাতে টাকা পড়বে ঝঙ্কার তুলে। জমিদারের কাছারী চলবে, সকাল থেকে বেলা একটা পর্যন্ত, আবার সন্ধ্যের পর থেকে। দশটা-বারোটা যেদিন যেমন। আটটার পর থেকে অবশ্য সেরেস্তায় কর্মচারীরা কলম পেষে, জমিদার বসেন তাঁর আসর ঘরে।

শতরঞ্চের উপর সাদা ধবধবে চাদর ; তার উপর পুরু দামী গালিচা, চারিপাশে বড় বড় তাকিয়া। রূপোর আলবোলা, তাওয়া দেওয়া কল্কে ; রূপো বাঁধানো হুঁকো, হুঁকোদানের উপর বসানো থাকে।

গ্রামের যাঁরা ওরই মধ্যে সম্ভ্রান্ত, তাঁরা আসেন। নানান আলোচনা হয়। বেশীর ভাগ গ্রামের সমাজ নিয়ে। কোনদিন খোস-গল্প হয়। উচ্চ হাসিতে সব গমগম করে ওঠে।

কোন কোন দিন গানের মজলিস বসে। মধ্যে মধ্যে ওস্তাদ এসে হাজির হন। মাঘ মাসের সারা মাসটা মায়ের সামনে নাট-মন্দিরে ভাগবত পাঠ হয়। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা এসে গোটা নাটমন্দিরটা ভরিয়ে দিয়ে বসে।

সুরেশ্বর বললে—কীর্তিহাট যদি কখনও অচির ভবিষ্যতের মধ্যে যাও সুলতা, তাহলে তোমাকে নাটমন্দিরটা দেখিয়ে খুশী হই, তুমিও খুশী হও, তা বলতে পারি। মনে পড়ে গেল বলে, না বলে পারলাম না। প্রকাণ্ড নাটমন্দিরটার চারদিক ভাগ করা ছিল আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে। কালীমন্দিরে বিরাট বারান্দাটায় বসত ভদ্রঘরের মেয়েরা, তারা বর্ণেও উঁচু। এক পাশটা ব্রাহ্মণ, অন্য পাশটায় বৈদ্য-কায়স্থ থেকে অন্যেরা। চার-পাঁচটা বারান্দাবরাবর লম্বা সিঁড়ি আছে পর পর, গ্যালারীর মত, সেখান পর্যন্ত। তারপর একটা রেলিং, তার এধারে পুরুষ-মহল, সেও ভদ্র উচ্চবর্ণ। আর তিন দিকটায় যাদের এখন নাম হয়েছে হরিজন, তারা এবং মুসলমান, কৃশ্চান।

সুলতা বললে—খৃশ্চান ?

সুরেশ্বর বললে—গোয়ানদের ভুলে যাচ্ছ। ওই হিলডা বুড়ীর পাড়ার লোক।

—এরা ভাগবত শুনতে আসত ?

—না, ভাগবত শুনতে আসত না ; যাত্রা হলে শুনতে আসত, বাঈ নাচ, খেমটা নাচ হলে আসত। আর আসত গল্প শুনতে।

বিস্মিত হয়ে সুলতা বললে—গল্প শুনতে ?

—হ্যাঁ সুলতা, গল্প শুনতে। ভাগবত কথকের মত সেকালে গল্প কথক ছিলেন, যিনি গল্প বলতে, আসর পাতলে পনেরো দিন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতেন একটি গল্প।

—বল কি ?

—হ্যাঁ। এঁদের বোধহয় শেষ জনকে আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি পাঁচ দিন গল্প বলেছিলেন। এই কীর্তিহাটের ছবির কড়চায় একটা বিশেষ ছবি। গল্পগুলো বেতাল

পঞ্চবিংশতি বা কথা-সরিৎসারের মত। একটা গল্প শুরু করে, তার থেকে ফ্যাকড়া বের করতেন, পাঁচ-ছয়-সাত থেকে পনেরো পর্যন্ত, তারপর শেষ দিনে প্রথম গল্প শেষ হত। কিন্তু সে থাক, এখন ১৮৬০ সালে ফিরে চল। ১৮৫৯ সালের নভেম্বরের প্রথমেই বীরশ্বর রায় কীর্তিহাট থেকে গেলেন কলকাতা ; ব্যবস্থা হল, সদলে যাবেন তীর্থ দর্শনে, চাকর, ঠাকুর, ঝি, সরকার নিয়ে ভবানী দেবী এবং তিনি ঘুরতে যাবেন তীর্থ ; তখন রেললাইন বসে গেছে মোটামুটি। যেখানে হয় নি, সেসব জায়গায় নৌকো কিম্বা পালকি, রয়েল গাড়ী নিয়ে ঘুরবেন। সোফিয়া বাঈ সুদ্ধ সঙ্গে গিছলেন, তিনি দিল্লীতে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায় তসলীম রাখবেন, আজমীঢ় শরীফ যাবেন।

মনে তাঁর ইচ্ছে আজমীঢ় শরীফ থেকে আর ফিরবেন না।

রত্নেশ্বর রায় ফিরেছিলেন পৌষের দশ তারিখে, ইংরেজী ১৮৫৯ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর।

তিনি অগ্রহায়ণের শেষে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর সস্ত্রীক প্রথম কলকাতায় গিয়ে কলকাতার বড় বড় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন। কারণ বীরেশ্বর রায় কলকাতায় এসে ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বড় বড় বাড়ী যাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, নিমন্ত্রণপত্র চলত, তাঁদের নিমন্ত্রণ করে একটা বউভাত করেছিলেন ; যার খরচ আট হাজার টাকা হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে নৃত্য-গীতও ছিল, একথা সহজেই, অনুমান করতে পার। এর পর বড় বড় বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ আসতে শুরু করেছিল এ-বাড়ীতে, বর-বধূর। অনেক বাড়ীতে সপরিবার নিমন্ত্রণ। শুরু হয়েছিল জোড়াসাঁকোর জগদ্ধাত্রী দেবীর বাড়ী থেকে। রাণী রাসমণির বাড়ী থেকে উপঢৌকন এসেছিল। ও বাড়ীতে বীরেশ্বর রায় সস্ত্রীক পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে রাণীকে দেখাতে গিয়েছিলেন। জানবাজারের বাড়ীর জমি দানের জন্যও বটে, আর রাণীর মহিমময়ী চরিত্রের জন্যও বটে, তাঁর উপর বীরেশ্বর রায়ের শ্রদ্ধা ছিল অগাধ।

এর মধ্যে আবার নতুন জুড়ি কেনা হয়েছিল। এবার কালো ঘোড়া নয়, সাদা এক জোড়া ওয়েলার, দাম দেড় হাজার টাকা এবং গাড়ীটা ল্যাণ্ডো। সেই গাড়ীতে চড়ে রত্নেশ্বর কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে বেড়িয়েছিলেন। কলকাতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় তখনও পর্যন্ত অল্প। ছেলেবেলা বালক বয়সে বিমলাকান্তের সঙ্গে এসে বছর খানেক কি তার কম কলকাতায় ছিলেন। তারপর চলে গিয়েছিলেন কাশী। ফিরেছিলেন দীর্ঘকাল পর ; তখন তিনি যুবা। অনেক কাণ্ডের পর বাপের সঙ্গে পরিচয় এবং পুনর্মিলনের পর রুগ্ন বীরেশ্বরকে নিয়ে কলকাতায় এসে মাস চারেক ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে পুরো এক মাস তাঁকে জামীনে খালাস থাকতে হয়েছিল। সে সময় তিনি বের হন নি। এবার স্ত্রীকে নিয়ে নতুন ল্যাণ্ডো গাড়ীতে, নতুন সাদা জোড়া ঘোড়ায় জৌলুষ ছড়িয়ে বের হতেন। কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং স্ট্র্যাণ্ড রোডের গঙ্গার ধার থেকে লাটসাহেবের বাড়ীর চারিদিক থেকে সিঁথিতে এখন যেটাকে চিড়িয়ার মোড় বলে সেখানে কোন সাহেবের চিড়িয়াখানা পর্যন্ত ঘুরে দেখেছিলেন সেবার। তাঁদের সঙ্গে থাকত অঞ্জনা। তার কাছে থাকত খাবারের কৌটো, জলের কুঁজো, পানের বাটা, কোচ বক্সে কোচম্যানের পাশে মহাবীর সিং দারোয়ান, তার কোমরে সরকারী লাইসেন্সে বলীয়ান তলোয়ার। পিছনে জোড়া-পোশাক পরা সহিস।

তখন কলকাতায় নতুন যুগ। ১৮৫৭ সালের মিউটিনির পর থেকে ইংরেজের প্রতাপে কলকাতা, যে বনে বাঘ থাকে সেই বনের মত হয়ে অন্য জন্তুর উপদ্রব থেকে শান্ত হয়েছে।

তুমি হয় তো জান, তবুও পুরনো কলকাতার কথা আমার কড়চায় আছে বলেই বলছি, পুরনো কলকাতা ১৮৫৭ সালের আগে খুব শান্ত ছিল না। হুতোমের নক্সায় এর পরিচয় আছে। মোয়, খেলায়, পথে-ঘাটে ১৮৫৭ সালের আগে নানান উপদ্রব ছিল।

সমাচার দর্পণে ১৮৪০ সালের একটা খবরের কথা রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন এই প্রসঙ্গে। বারোয়ারীর পাণ্ডারা নানান অত্যাচার করত। বিশেষ করে সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকলে লাঞ্ছনার সীমা থাকত না।

দর্পণের খবরটা বেহালা সম্পর্কে। সেটা এই—"মান্য সাবর্ণ মহাশয়দিগের যুবা সন্তানেরা বারোয়ারী পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকের ডুলী পালকী দৃষ্টিমাত্রেই বারোয়ারীর দল একত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাঁহাদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাতে অবাক্য উচ্চবাচ্য যাহা মুখে আসিত, তাহাই কহিতেন, তাহাতে লজ্জাশীলা কুলবালা সকল টাকা-পয়সা সঙ্গে না থাকিলে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন।"

সুলতা বললে—মনে পড়েছে, পেটন সাহেব নামে একজন দুঁদে ম্যাজিস্ট্রেট মেয়ে সেজে পালকি চড়ে বেহালায় এসেছিলেন। এরা জবরদস্তি করে পালকির দরজা খুলতেই সাদা গোখরোর মত বেরিয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট পেটন।

—হ্যাঁ। পেটন সাহেব সেবার সায়েস্তা করলেও পুরো সায়েস্তা হয় নি। হুতোমের কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম ১৮৪১ সালে, তাঁর নক্সায় আছে, তাঁর আমলে একবার এক বারোয়ারী-তলার প্রতিমার সিংহ ভেঙেছিল আনবার সময়। সেই সিংহ মেরামতির জন্যে টাকা চাই। তারা পরামর্শ করে আটকে ছিল এক বিশিষ্ট সিঙ্গি মশায়কে। চাকুরে মানুষ। আপিস যাবেন। তাকে পথে আটকে ধরেছিল মায়ের সিঙ্গির পা ভেঙেছে, এখন সিঙ্গি কোথায় পাই, আমাদের উপর স্বপ্ন হয়েছে, আপনাকে এনে বসাতে হবে, মা দুর্গার পায়ের তলায়। সিঙ্গি মশায় মেরামতি খরচ দশ টাকা জরিমানা দিয়ে রেহাই নিয়েছিলেন।

কিন্তু ১৮৫৭ সালে মিউটিনী দমনের পর ইংলণ্ডেশ্বরী যখন ভারতেশ্বরী হলেন, তখন কলকাতার ওই হাল পাল্টাল। ইংরেজের ভয়ে তখন ফণা গুটিয়ে গর্তে ঢুকেছে সব।

তবু রত্নেশ্বর রায় দারোয়ান ছাড়া যেতেন না কোথাও। প্রয়োজন হলে একজনের জায়গায় দুজন নিতেন।

ডায়রীতে লিখেছেন—"দারোয়ান ইত্যাদি লইয়া অদ্য চিড়িয়াখানা দেখিয়া আসিলাম। দুইজন দারোয়ান লইয়াছিলাম। কলিকাতার এক শ্রেণীর ইতর গুণ্ডা ও উচ্ছৃঙ্খল ভদ্র যুবকের কথা শুনিয়াছি। আমি নিজেও সবল শক্তিমান। কাশীতে থাকিয়া কুস্তী করিয়া দেহ পাকাইয়াছি। কিন্তু কোন প্রকার উপদ্রব হয় নাই। সকল জীবজন্তু দেখিয়া নিরাপদে ফিরিলাম। অদ্যকার এই ভ্রমণ বড়ই আনন্দসহকারে উপভোগ করিয়াছি। একটি দৃশ্য দর্শন করিয়া চিত্তে রোমাঞ্চকর ভাবের উদয় হইল। এক জোড়া সবল ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রীর প্রেমলীলা

দেখিলাম, ব্যাঘ্রটি ব্যাঘ্রীকে কামড়াইতেছে, ব্যাঘ্রী তাহাকে থাবা মারিয়া প্রতিহত করিয়া গর্জন করিয়া যেন শাসন করিয়া কহিতেছে, নির্লজ্জ পুরুষ কোথাকার, তোমার কি কোন প্রকার লজ্জাসরম নাই। এই এত লোকজনের সম্মুখে এসব কি হইতেছে।

আমার পার্শ্বেই স্বর্ণলতা অবাক হইয়া দেখিতেছিল। তাহার দিকে তাকাইয়া আমি সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সে লজ্জায় মুখ নত করিল। আমি অগ্রসর হইয়া তদীয় হস্ত ধারণ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলাম, দেখিতেছ। সে বলিল—আঃ।

পিছন হইতে খুক খুক শব্দে কেহ হাস্য করিল। আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম অঞ্জনা হাস্য করিতেছে। সে সব লক্ষ্য করিয়াছে।"

গাড়ীতেও সামনের সিটে বসে অঞ্জনা বারবার মুচকে-মুচকে হাসছিল। স্বর্ণলতা দেবী রাঙা হয়ে উঠেছিলেন।

অঞ্জনা বলেছিল—এই আমি মুখ ফিরিয়ে উল্টো মুখে বসছি ভাই বউ। তাছাড়া ননদদের আড়ি পেতে শোনা চিরকালের। ওরা দেখলেও দোষ নেই, শুনলেও দোষ নেই। ছোটদাদা আমার চকোরের মত চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি ভাই চাঁদ, মেঘের আড়ালের মত ঘোমটাটা সরাও।

সে সত্যিই মুখ ফিরিয়ে বসেছিল।

স্বর্ণলতা সুযোগ পেয়ে রোষকটাক্ষে শাসন করেছিলেন রত্নেশ্বরকে। রত্নেশ্বর সেই গাড়ীর মধ্যেই হা-হা শব্দে হেসে উঠেছিলেন।

অঞ্জনা মুখ ফিরিয়ে বলেছিল—লজ্জা ভাঙল ?

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—অঞ্জনা, ঠিক বাঘিনীর মত তাকালে রে, হাতে আমার আবার চিমটী কাটলে।

অঞ্জনাও খিলখিল করে হেসেছিল। এবার স্বর্ণলতাও খুক-খুক করে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে আরম্ভ করেছিলেন।

বাড়ীতে এসেই দেখেছিলেন, কীর্তিহাটের খবর এসেছে। সেখানে ফিরতে হবে। সামনে বড়দিন। ভেটের ব্যবস্থা যাবে কলকাতা থেকে। তার কেনাকাটা আছে। এবং ছোট হুজুরকে যেতে হবে, মেদিনীপুরে সাহেবদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। হুজুরের শ্বশুর বলে দিয়েছেন, রত্নেশ্বর যেন আসে। বেয়াই মশাইয়ের কাল গেছে। এখন জেলার কর্তাদের সঙ্গে দহরম-মহরমটাই সব থেকে বড় কথা। আগে যা হয়েছে হয়েছে, এখন নতুন কালে নতুন চাল।

তা ছাড়াও বড় খবর ছিল, এবার শ্যামনগরের দে-সরকার শ্যামনগর বিক্রী করতে রাজী হয়েছে। তারা একবার ছোট হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিছু কথাবার্তা বলতে চায়।

খবর নিয়ে যিনি এসেছিলেন, তিনি ঠাকুরদাস পাল। বিয়ে করে তিনি চলে গিয়েছিলেন শ্যামনগর। শ্যামনগর বিক্রীর চিঠি তিনি এনেছেন। তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে।

সুলতা বললে—রত্নেশ্বর নিজের পতনের ব্যবস্থা নিজেই করেছিলেন। মানুষ তাই করে। তবে দোষ তিনি ষোল আনা অঞ্জনার ঘাড়েই চাপিয়ে গেছেন নিশ্চয়।

সুরেশ্বর বললে—বারো আনা তো বটেই। তবে নিজের ঘাড়ে চার আনা নিয়েছিলেন—সে তাঁর ডায়রীতে আছে। সে তোমাকে প'ড়ে খানিকটা শোনালাম। পরে আরও আছে। কিন্তু আমার ক্রম ভেঙো না। ক্রমানুসারে বলে যাই বলতে দাও।

এই যে দীর্ঘ ইতিহাসটি বললাম—এটি কিন্তু সব জেনেছিলাম একদিনে।

১৯৩৭ সালের শেষ জানুয়ারী শীতের দিন, সকালবেলাতেই পুলিশ এসে বিমলেশ্বরকাকাকে ধরে নিয়ে গেল; অর্চনাকে তিনি বাঁচিয়ে কোমরে দড়ি প'রে হাতে হাতকড়ি পরে পুলিশের সঙ্গে গ্রাম ঘুরে দেখিয়ে গেলেন, রায়বংশের ঋণ তিনি শোধ করলেন। ঋণ শোধ করতে তাঁর বৈষ্ণব ধর্মকে তিনি বিক্রী করেছেন, যে সম্মানটুকু ছিল তা বিক্রী করেছেন—অনুতাপ করেন নি।

কাকীমা আমাকে ডেকে বলেছেন—এর শোধ নেবে, তুমি আমাকে কথা দাও ভাসুরপো!

আমি কথা দিয়েছি। অর্চনা ঘরের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে। তার কথা বিমলেশ্বরকাকার স্ত্রী, তাঁর জা অর্থাৎ অর্চনার মায়ের কাছেও প্রকাশ করেন নি। তিনি বর্ধমানের উকীলের মেয়ে, তিনি আইন বোঝেন। এবং দেশের অবস্থাটাও বোঝেন।

বাড়ীতে ফিরে এসে আমি গোপাল সিংয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করেছি রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী থেকে। মাঝখানে গ্রামের লোকেরা এসেছেন। প্রত্যেকে সেদিন সহানুভূতি জানিয়ে গেছেন। দয়ালঠাকুরদা—উরুকাকা এসে চোখের জল ফেলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে গেছেন—শোধ নিয়ো।

বৃদ্ধ রঙ্গলাল মণ্ডল নিজে আসতে পারেন নি, শরীর তাঁর ভেঙে গেছে। তিনি বাড়ী থেকে বের হতে পারেন না, ওই কংগ্রেসের মিটিং যা অতুলকাকার কাণ্ড তার পর থেকে। রঙ্গলাল মণ্ডলমশায় সভাপতি হয়েছিলেন। পুলিশ যখন লাঠি চালায়, তখন অতুলকাকা নিজের দেহ দিয়ে তাঁকে ঢেকে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন, তবু আঘাত নিবারণ করতে পারেন নি। একটা লাঠির গুঁতো তাঁর কোমরে লেগে হাড় ভেঙে দিয়েছিল। তাঁকে এ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে দিয়েছিল, সেরে ওঠার পর প্রায় অক্ষম দেখে এবং বয়স দেখে ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশ। লোকে বলে—তাঁর হয়ে তাঁর উকীল ছেলে একটা বণ্ড গোছের কিছু লিখে দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছিল বাপকে। অক্ষম রঙ্গলাল বিছানায় শুয়ে থাকতেন আর ওই উকীল ছেলেকে গালাগাল দিতেন। তাঁর বড় ছেলে আমার কাছে এসেছিল। বলেছিল—আমাদের বাড়ীর সামনে বিমলবাবুকে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ নিয়ে গিয়ে ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। লেফট রাইট লেফট রাইট বলে চেঁচিয়ে কনেস্টবলগুলোকে দিয়ে পা ঠুকিয়েছে। বাবাকে অনেক কষ্টে সামলে রেখেছিলাম। তাঁকে তো দেখেছেন—খুব চেঁচান তিনি! এখনও হাউমাউ ক'রে কাঁদছেন। আপনার কাছে পাঠালেন, বললেন—সুরেশ্বরবাবুকে বল গা গিয়ে এর শোধ যেন তিনি নেন।

আমার মনেও ক্ষোভের অন্ত ছিল না। সেই ক্ষোভের বশেই ডায়রী পড়ছিলাম। বিচার করবার জন্ম নয়; দেখছিলাম পূর্বকালের ঘটনার মধ্য থেকে কোথায় কোন ছিদ্রপথ পাওয়া যায় যার মধ্য দিয়ে আইনের দড়ি পরিয়ে শিবু সিং এবং তার বাপ হরি সিংকে বাঁধতে পারি। কিন্তু পড়তে পড়তে কাহিনীর মধ্যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। যে তন্ময়তায় রত্নেশ্বর রায়ের

পূর্বকথা শেষ করে তার দিনলিপিতে এসে পড়ে পৌঁছুলাম রত্নেশ্বরের বিয়েতে, রায়বাড়ীর জীবননাটকে, অঞ্জনার প্রবেশে এবং বীরেশ্বর রায়ের প্রস্থানে।

সুলতা প্রশ্ন করলে—প্রস্থানে ? মানে ?

—তার অর্থ বীরেশ্বর রায় আর কীর্তিহাট ফেরেন নি। ওই গেলেন তিনি কীর্তিহাট থেকে কলকাতা। এবং তারপর কলকাতা থেকে তীর্থে।

—তীর্থে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর ?

—না। বৈরাগী তিনি ছিলেন না। স্ত্রী ভবানী দেবীর জন্য দেবতার পুষ্প চরণোদক এও তিনি নিত্য খেতেন তাঁর হাতে, তাঁর জন্যেই তীর্থে ঘুরেছেন, দেবমন্দিরে গেছেন, দেখতে গেছেন নিজের আগ্রহে কিন্তু প্রণাম করেছেন স্ত্রীর ইচ্ছায়, নিজের ইচ্ছায় নয়। শুধু গয়াতে গিয়ে পিণ্ড দিয়েছিলেন নিজের আগ্রহে। থাক ; এমনভাবে বলায় থেকে গুছিয়ে বলি।

* * *

১৮৫৯ সালের ডিসেম্বরে বড়দিনের আগেই ফিরলেন তিনি। সরস্বতীবউয়ের বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ সুতরাং অঞ্জনার মত একটি চিত্তরঞ্জিনী চতুরা অতি সুকৌশলে তার মধ্যে নিজের ইচ্ছেগুলো সঞ্চারিত করে দিত।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—বিপদে পড়িলাম। কীর্তিহাট হইতে নায়েব এবং মেদিনীপুর হইতে পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় ওখানে যাইবার জন্য লিখিয়াছেন। গিরীন্দ্র আচার্য লিখিতেছেন—দে-সরকার শ্যামনগর বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। এমত সময় স্বর্ণলতা সরস্বতীবউ একরূপ আবদার ধরিয়াছে কলিকাতায় বড়দিন না দেখিয়া যাইবে না। এখানে অবশ্য কলিকাতা দেখিয়া বেড়াইতেছি আনন্দ করিতেছি, আমারও যৎপরোনাস্তি সুখ এবং আহ্লাদ হইতেছে। বিশেষ করিয়া পরিভ্রমণের সময় অঞ্জনা যেরূপ ননদোচিত হাস্যপরিহাসে আমাদের উভয়ের জীবনের আনন্দে চঞ্চল বায়ুপ্রবাহ হিল্লোলিত করিয়া তুলিতেছে তাহাতে সুখ ও আহ্লাদ যেন তরঙ্গিনীর তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিয়া ছুটিতেছে। কিন্তু যে সব পত্রাদি পাইলাম তাহার পর আর কি করিয়া থাকা চলে ? আমি সামান্য যুবক নহি ; আমি কীর্তিহাটের রায়বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারীই বা কেন, আমি অধীশ্বর। অদ্যই পিতা সকল পত্রাদি পাঠ করিয়া আমাকে ডাকিয়া কহিলেন—।

বড়কর্তা বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বস ; যা পত্র এসেছে তাতে তোমাকে দু-তিন দিনের মধ্যে কীর্তিহাট ফিরতে হবে। জরুরী কাজ। বিশেষ ক'রে শ্যামনগর। শ্যামনগর ক্রয় সম্পর্কে যা পত্র দেখছি তাতে মনে হচ্ছে দে-সরকাররা হয়তো বা কিছু কিছু সুবিধে চাইবেন। প্রতিশ্রুতি চাইবেন। হয়তো বা রাধানগর বাদ দিয়ে বাকী বিক্রী করতে চাইবেন। কিম্বা ওঁদের সম্পত্তি জোতজমা নিষ্কর বলে স্বীকৃতি চাইবেন দলিলে। মৌখিক প্রতিশ্রুতিও কিছু চাইবেন বলে মনে হচ্ছে আমার। আচার্য হয়তো দিতে চাইছেন না—চাইবেন না। আমি বলব দেবে। দেওয়া উচিত। তাঁরা নত হয়েই যখন চাচ্ছেন তখন দেবে। এগুলি হল রাজধর্ম। আমাদের দেশেও আছে, অন্যদেশেও আছে। আলেকজেণ্ডার পুরু রাজার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিলেন সে তো জান। আমাদের দেশে অজস্র আছে। শাস্ত্রেরও এই নির্দেশ। সুতরাং তাঁরা

শ্যামনগর বিক্রী করছেন এইটেই আমাদের কাছে তাদের হার মানা। আমি হলে ওটা জলের দরে বিক্রী ক'রে দিতাম, কিন্তু যার সঙ্গে ঝগড়া তাকে দিতাম না। অবশ্য—

একটু থেমে হেসে বলেছিলেন—অবশ্য টাঁরা দে-সরকার অর্থগৃধ্নু, অল্পপ্রাণী লোক ; টাকাই তার কাছে সব। টাকা পেলে সে সব সইতে পারে। টাকার জন্তে সে সব করতে পারে। কিন্তু সে বিচার আমরা করব না।

রত্নেশ্বরের মন এতে সায় দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। এতে সম্পূর্ণ একমত আমি। যা আদেশ করলেন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

—হ্যাঁ। তবে সর্তগুলি যত্নসহকারে খুঁটিয়ে বুঝে দেখো। ওঁদের সম্পত্তি নিষ্কর এ আমরা দেব না। না। তা হতে পারে না। তা হ'লে প্রজা ঠিক হলেন না তাঁরা। মৌরসী ক'রে দিতে পার। খাজনা অন্তত: বছরে একটা টাকাও দিতে হবে। বুঝেছ!

—আজ্ঞে বেশ। তাই হবে।

—আর একটা কথা।

—আজ্ঞা করুন।

—দেখ—। শুরু করেও চুপ ক'রে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—বাবা।

—হ্যাঁ বলছি। আর একবার ভেবে নিলাম। ভেবে দেখলাম। দেখ—আমি মনে মনে অভিপ্রায় করেছি যে তুমি সম্পত্তির ছ আনার মালিক হয়েই আছো বাকী দশ আনার মালিক এখনও আমি। তোমাকে আমার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছি। তুমিই সব করছ। কিন্তু—।

চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর। কিন্তু পরমুহূর্তেই বীরেশ্বর রায় যে-কথা বলেছিলেন সে কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—দেখ আমি স্থির করেছি—অনেক চিন্তা করেই স্থির করেছি, যে আমার অংশ আমি দানপত্র করে তোমাকে দিয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হ'তে চাই।

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কেন বাবা? আমার কি কোন ত্রুটি—

—না—না। তুমি আমার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র। তার জন্য নয়। কথা হল কি জান, এই যে কালটা এল, এটা সম্পূর্ণ নতুন কাল। এ কালের জমিদারী চালনা সে কালের প্রথায় চলবে না। জমিদারীকে যে অর্থে রাজত্ব বলতাম তা আর রইল না। ১৮৫৯ সালে যে নতুন প্রজাস্বত্ব আইন হ'ল সে আইনে জমিদারের আসল অধিকারই চলে গেল। কীর্তিহাটে যে আদেশ তুমি কাছারীতে জারী করেছ তা খুব কালোচিত হয়েছে। প্রথমটা শুনে আমার ক্ষোভ হয়েছিল। পুত্র সকলেরই সমান রত্নেশ্বর, কিন্তু তুমি আমার কি তা অবশ্যই অনুমান করতে পার। সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যাওয়া নিধি। বিচিত্র কৃপায় ফিরে পেয়েছি তোমাকে।

রত্নেশ্বর ডায়রীতে লিখেছেন—"আমার মনে হইতেছিল আমি যেন স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া যাইতেছি, ইচ্ছা হইতেছিল আমার এই হিমালয়তুল্য পিতৃদেবের চরণতলে লুটাইয়া পড়ি।"

বীরেশ্বর বলেছিলেন—মিথ্যা গোপন তোমাকে করব না। তোমার শ্বশুরমশাই কথাটা

বলে গিয়েছিলেন—বেইমশাই কালটা বড় কঠিন পড়ল, আগের কাল গেল। কোম্পানী মানে বেনের দল আর দেশের মালিক রইল না, বৃটিশ ক্রাউন হল মালিক। এবার আর ঘুষের রাজত্ব রইল না। লাভের জন্তে যা খুশী তাই করার কাল রইল না। এবার মহারাণীর রাজত্ব, এ রাজত্বে বামুন চণ্ডাল জমিদার প্রজা ধনী দরিদ্র সব এক আইনের ফাঁসে বাঁধা পড়ল। নতুন এ্যাক্টটা পড়ে দেখুন। তখনও ঠিক আমলে আনি নি। তুমি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে নতুন হুকুম জারী করলে; শুনে একটু লাগল। আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে না একবার? তারপর এখানে এসে এ্যাক্ট সম্বন্ধে আলোচনা হল কালীপ্রসন্ন সিংহীমশায়ের সঙ্গে, তিনিও বললেন—আরে মশাই আগের কালে তলবমাত্রে প্রজার হাজিরানা ছিল কম্পালসারি। না এলে আপনি সিপাই পাঠিয়ে প্রজার ঘাড়ে ধ'রে আনতে পারতেন। আর তা পারবেন? অবিশ্বি রামাশ্যামাকে পারবেন। কিন্তু আমাকে পারবেন? আবার রামার পিছনে আমি দাঁড়ালে পারবেন? এ তো মশাই জুতো জামা পরা ঘোড়া হাতী চড়া গোমস্তাগিরি! জমিদারীর আর রইল কি? কথাটা ঠিক। আর ওতে আমার দরকার নেই রত্নেশ্বর। জমিদারী তোমাকে আমি দান করব। কলকাতার বাড়ী, আর নগদ টাকা আমার অংশের চার লক্ষের মধ্যে ছ লক্ষ টাকা—এই আমার থাকবে। ওতেই আমি বেড়াব তীর্থ—নানা স্থান। বাস। পরমায়ু আমার বেশী দিন নেই। আমি বুঝতে পারছি। বাকী ক'টা দিন আনন্দ করে কাটিয়ে দেব। আমার অন্তে আমার উইল অনুযায়ী চাকরবাকরকে কাউকে পাঁচশো কাউকে হাজার কাউকে একশো দিয়ে যা থাকবে তার থেকে সোফিয়াকে পাঁচ বা দশ হাজার টাকা এবং জীবন স্বত্বে ওই এলিয়ট রোডের বাড়ী দেব। এবং অবশিষ্ট সবের মালিক হবেন তোমার গর্ভধারিণী।

স্তব্ধ হয়ে সব শুনেছিলেন রত্নেশ্বর।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তুমি আপত্তি করো না। এ তোমার জন্তেই করছিনে আমি। আমার জন্তেই করছি—রায়বংশের জন্য করছি। বুঝেছ। রায়বংশের জন্ত। অবশ্য সোমেশ্বর রায়ের দেবোত্তরের বাইরের যা সম্পত্তি তাও আমি দেবোত্তর করে তোমাকেই তার সেবাইত করে দানপত্র করব। তুমি মালিক হবে সেবাইত সূত্রে। কোন সর্ত আমি আরোপ করব না। শুধু দেবত্র সম্পত্তি রইল দেবতার নামে। তাঁর সেবা চালিয়ে বক্রী আয় তুমি তোমার পছন্দমত খরচ করবে। আমি অপব্যয়ী। আমি বাল্যকাল থেকে ক্রোধীও বটে। এই গোমস্তাগিরির বড়লোকপনা এ আমার সইবে না।

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে একটি বিস্ময়কর কথা আছে, সুলতা, সেটি বলি। সেটি না বললে রায়বংশের জবানবন্দী কীর্তিহাটের কড়চা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে কথা ভবানী দেবীর কথা।

এই জানবাজারের বাড়ীর বড় হলঘরে কথাবার্তা হচ্ছিল পিতাপুত্রে। পাশের ঘরটা ছিল ভবানী দেবীর পূজার ঘর—নিজের ঘর। পাশেই ছিল ওদের শোবার ঘর। ওদিকের দক্ষিণ-পুব খোলা ওই ঘরখানা। ভবানী দেবী পূজায় বসে সব শুনেছিলেন। তিনি ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ওঘর থেকে পূজার একটি জবাফুল এবং বিল্বপত্র হাতে ক'রে এ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

পিতাপুত্র তাঁর দিকে তাকিয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন। ঠিক গোপন করবার জন্ত নয়। তার উপস্থিতিতে ঠিক এইসব কথা যেন স্বচ্ছন্দে অসঙ্কোচে কওয়া যেত না।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—মাতৃদেবী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন আর তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাতকরতঃ পিতৃদেব স্তব্ধ হইয়া গেলেন। আমিও তাঁহার দিকেই তাকাইয়া রহিলাম। এই পূজার পর তাঁহার যে মূর্তি হইত তাহা এক আশ্চর্য বিস্ময়জনক মূর্তি। মনে হইত তিনি যেন মানবী নহেন কোন অপার্থিব দেবীমূর্তি। তিনি আসিয়া পিতার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেব হস্ত প্রসারণ করিতেই তিনি পূজার জবাপুষ্প ও বিল্বদল তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন। পিতৃদেব তাহা মস্তকে স্বহস্তে ধারণ করিয়া স্বকীয় উপাধানের তলদেশে রাখিলেন। অতঃপর মাতৃদেবী বামহস্তের রৌপ্য ঘট হইতে কুশী করিয়া ইষ্টদেবীর চরণোদক তাঁহাকে পান করাইয়া কহিলেন—তুমি যাহা ধারণা করিয়াছ তাহা কদাপি ফলবতী হইবে না। বলিয়া ঈষৎ হাস্ত করিলেন।

পিতা কহিলেন—কি মনস্থ করিয়াছি কোন কথা বলিতেছ?

—তোমার উইলের কথা!

—হাঁ। বলিতেছিলাম বটে। তুমি তাহা শুনিতে পাইয়াছ?

—পাইয়াছি। শুনিয়া মন চঞ্চল হইল। কিন্তু মা বলিলেন—চঞ্চল হইস না ইহা কদাপি সত্য হইবে না।

পিতা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—উইল করা হইয়া উঠিবে না?

—না। উইল তুমি করিবে। কিন্তু যাহা মনে করিতেছ তাহা হইবে না। তোমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি এবং অর্থ ভোগ করিবার জন্ত ভবানী কদাপি জীবিত রহিবে না। আমি অগ্রে যাইব। তুমি আমার বিরহে উন্মত্তবৎ হইবে। সতীহারা শিবের মত তোমাকে হাহাকার করিতে হইবে।

পিতৃদেব হাস্ত করতঃ বলিলেন—অতঃপর কি হইবে। তুমি উমা রূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং আমার তপস্যা ভঙ্গ করিয়া আবার আমার গৃহে আসিয়া আমাকে সংসারী করিবে!

মাতৃদেবীর অধরে শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্রমার মত ক্ষীণ হাস্তরেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন —না। এতটা হইবে না। তবে তোমাকে—। তিনি নীরব হইয়া গেলেন। তৎপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ কহিলেন—তাহা তোমাকে আমি বলিব না। অন্ততঃ আজ বলিব না। আমি যেদিন যাইব সেইদিন বলিব। আমি শুধু বলিতেছি যে, তোমার উইলের মধ্যে আমার নাম উল্লেখ করিয়া ওই সকল কথা লিখিয়ো না। তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে। এ সংসারে ভাবনা আমার তোমার জন্ত।

অকস্মাৎ তাঁহার আয়ত নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল এবং আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম দরদর ধারায় তাহা নির্গলিত হইয়া দরদর ধারে তাঁহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসিল।

পিতৃদেব অত্যন্ত অভিভূত হইয়া গেলেন, বলিলেন—তুমি ক্রন্দন করিতেছ—সতীবউ?

মাতা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে-মূর্তি অপরূপ। এমন কদাচ নিরীক্ষণ করিয়াছি। মুখমণ্ডল যেন ঈষৎ উর্ধ্বে তুলিয়া তিনি কোন অদৃশ্যলোকের দিকে

তাকাইয়া আছেন। এবং সেখানে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, তাহা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

আমি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া ডাকিলাম—মা।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—রত্ন বাবা, তাঁহার ভাগ্যে আমার জন্যই দুঃখ-ভোগ রহিয়াছে। তুমি আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমার অবর্তমানে উনি যাহাই করুন, তুমি কদাচ তাঁহাকে অভক্তি করিবে না। অবহেলা করিবে না।

আমি কহিলাম—সে কি মা? এমন বাক্য তুমি কেন কহিতেছ? আমি কি নরাধম? আমি কি মনুষ্যত্ববর্জিত?

মাতৃদেবী কহিলেন—না বৎস, তুমি অতি কঠোরচেতা ন্যায়বান বলিয়াই এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়াও আরও একটি কথা রহিয়াছে। তোমরা ধনবান, তোমরা ভূসম্পত্তিশালী রাজতুল্য ব্যক্তি। তাহাদের মধ্যে এমতপ্রকারের মতিভ্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে। পূর্বে রাজাদের বাদশাহদের মধ্যে এরূপ ঘটনা নিরন্তর ঘটিয়াছে। আজও ধনসম্পত্তি লইয়া পিতাপুত্রে মনোমালিন্যের অবধি নাই।

বলিয়া তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

পিতা সকরুণ হাস্যসহকারে বলিলেন—উঁহার কথা তুমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিয়ো না রত্নেশ্বর। দেবতা-দেবতা, ধর্ম-ধর্ম করিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক সকল সময় সুস্থ থাকে না। বিশেষ করিয়া পূজা করিয়া উঠিবার অব্যবহিত পরই। অনেক সময় তিনি এইরূপ আবোল-তাবোল বকিয়া থাকেন।

অতঃপর—।

তারপর রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে এদেশের তৎকালীন ধর্মবিশ্বাসের অজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। বলেছেন—এইসব 'ভর' দেবাবিষ্ট বা ভূতাবিষ্ট হওয়ার মতই মানসিক বিকার। মা যে বারো বৎসর ব্রত করেছিলেন, তাতে কি তার বাপের পাপের খণ্ডন হয়েছে? —হয়নি। এইসব অলীক বিশ্বাস আমাদের সর্বনাশ করেছে। আমি এসব থেকে দূরে থাকব।

যাক, এইবার যা ঘটল, তাই বলি। রত্নেশ্বর রায় ফিরে এলেন কীর্তিহাট। কলকাতা থেকে হুইস্কী-ব্র্যাণ্ডির কেস এল, টার্কী ফাউল, তার সঙ্গে ডজন দরুণে দেশী মুর্গী, ভাল দেখে ভেড়া, দেশী কলকাতার মিষ্টান্ন। বিভিন্ন সাহেব-অফিসারদের এবং তাঁদের স্ত্রীর জন্যে সোনার ঘড়ি, সিল্কের থান, গরম কাপড়ের থান, মূল্যবান লেডীজ শাল এল। বিশেষ ব্যবস্থা করে কলকাতা থেকে সাহেবদের প্রিয় ফুল, তা-ও আনানো হয়েছিল। তবে সেগুলো মেদিনীপুর শহর পর্যন্ত পৌঁছুতে তাজা থাকেনি।

রত্নেশ্বর রায় চোগা-চাপকান পেন্টালুন পরে মাথায় শামলা লাগিয়ে বুকের উপর কাটাকাটি চিহ্নের মত ধাঁজে কাশ্মিরী শাল ফেলে সাহেবদের বাংলোয় বাংলোয় বড়দিনের ভেট দিয়ে সাহেবদের অজস্র ধন্যবাদ নিয়ে কীর্তিহাটে ফিরে এসেছিলেন।

ওদিকে শ্যামনগর কেনা হয়ে গিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় যা বলেছিলেন, তাই সত্য হয়েছিল।

ট্যারা দে-সরকার নিজে এসেছিলেন হুগলী শহর। শ্যামনগর হুগলী জেলা। সেখানে কীর্তিহাটের রায়েদের এস্টেটের সেরেস্তা ছিল, নিজের বাড়ী কিনেছিলেন। একটা সে-আমলের পুরনো ওলন্দাজদের কুঠী। সেই বাড়ীতে ট্যারা দে-সরকার ভাঙা হাত নিয়ে পুত্রের হাত ধরে এসে রত্নেশ্বর রায়ের সামনে প্রথম হেঁট হয়ে নমস্কার করে বলেছিলেন—বৈষ্ণব হয়ে তুলসীপত্র একটিকে ছোট দেখে ঠিক ঠাওর করতে পারিনি বাবা। মনে হয়েছিল, তুলসীপাতা নয়, পুদিনার পাতা। পায়ে মাড়িয়ে গেলাম, একটু ঠাওর করেও দেখলাম না। তা ডান হাতখানাই ভেঙে গেল!

আচার্য ছিলেন, তিনি বলেছিলেন—হবে। আবার ডান হাত হবে দে-সরকার। পায়ে-মাড়ানো তুলসীপাতা মাথায় তুলে ধরলে যখন তখন আবার হবে। তবে ওই কিঞ্চিৎ বেঁকে থাকবে।

—হবে? আচার্যমশায়—বলছেন—আবার হবে?

—হবে বৈকি? সত্যনারায়ণের পাঁচালী তো শুনেছ? সেই যে বণিকের মেয়ে সত্যনারাণের প্রসাদ নিয়ে খেতে যাবে এমন সময় খবর এল—নদীর ঘাটে বাপ-স্বামী সাতখানা বোঝাই নৌকো নিয়ে ফিরেছে, অমনি—

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে থাকা কি মুখস্ত আছে। 'পাক দিয়া ফেলে রামা হস্তের প্রসাদ।'

—হ্যাঁ, অমনি নৌকোসমেত স্বামী ঘাটের মুখে বারকয়েক বোঁ বোঁ করে ঘুরে ভুস করে জলের তলায় চলে গেল। ঘাটের জলের উপর শুধু বুক বুক করে বুক-বুকি উঠল। তার দৈববাণী—'আমার প্রসাদ ফেলে কোন্ অহঙ্কারে?' যা—এখন মাটি শুধু চেঁচে তুলে খা। তাহলে স্বামী নৌকো উঠবে। তা সে মেয়েটা খেয়েছিল, আর স্বামীসমেত নৌকো যেমন ভুস করে ডুবেছিল, তেমনি আবার হুস করে উঠেছিল। হবে আবার তেমনি হবে।

রত্নেশ্বর এঁদের এই বিচিত্র কথোপকথন কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন। কথাগুলো তিনি ডায়রীতে লিখে রেখেছেন।

আচার্য দে-সরকারদের কাছে হাজারদুয়েক টাকা গোপন দালালী পেয়েছিলেন, সে-খবর রত্নেশ্বর রায়ের কাছে গোপন ছিল না। তিনি মুখে কিছু বলেননি। দে-সরকার যখন তার সম্পত্তি নাখরাজ করে নেবার প্রস্তাব জানিয়েছিলেন, আচার্য তা সমর্থন করেছিলেন প্রকারান্তরে। কিন্তু সে নামে। তিনি রত্নেশ্বরকে চিনেছিলেন। রত্নেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায়ের উপদেশ মনে করে সম্পত্তি মোকররী-মৌরসী করে দিয়েছিলেন—বিঘায় দু' আনা খাজনা। মোট খাজনা ধার্য হয়েছিল বত্রিশ টাকা কয়েক আনা। আচার্য বলেছিলেন—ওঁদের ভিটে দেবতার ঘর—এগুলি সম্বন্ধে আমি বলি—নাখরাজ করে দেওয়া হোক।

দলিল হয়েছিল বিমলাকান্তের নামে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আর দুটো দলিল হয়েছিল—পাট্টা আর কবুলতি। জমিদার বিমলাকান্ত শ্যামনগর-রাধানগর পত্তনী বিলি করেছিলেন কীর্তিহাটের মা আনন্দময়ীর সেবায়েত বীরেশ্বর রায় এবং রত্নেশ্বর রায়কে।

শ্যামনগরের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য, সদ্গোপ-মাহিষ্য বাসিন্দারা চব্বিশপ্রহর হরিনাম উৎসব করেছিল—বোল হরি বোল, বোল হরি বোল, বোল হরি বোল! দে-সরকারদের বাড়ীতে বিগ্রহের

সামনে হরিবোল দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ধ্বনি দিয়ে গিয়েছিল—বল হরি—হরি বো—ল!

একমাস পরে আবার কলকাতা থেকে পত্র এসেছিল।

"তুমি অবিলম্বে বধূমাতাকে লইয়া এখানে আসিবে। মাঘ মাস শেষ হইতে চলিল। আশা করি ইতিমধ্যে আদায়পত্রের কার্যাদি সুচারুরূপে নির্বাহ হইয়াছে। আমরা ফাল্গুনের প্রথমেই পশ্চিম যাত্রা করিতেছি। তোমাকে যে-সকল দলিলের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা এ্যাটর্ণী প্রস্তুত করিয়াছেন। তুমি আসিলেই রেজেস্ট্রি হইবে। মাসীমাতাকে বলিবে—তিনি যদি তীর্থে যাইতে চান, তবে আসিতে পারেন। অঞ্জনার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু মাসীমাতা থাকিবেন না, সুতরাং তাহার যাওয়া হইবে না। মাসীমাতাকে বলিবে—সোফিয়াবাঈ আমাদের সঙ্গে আজমীঢ় যাইবে। তিনি যেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন।"

প্রায় ছ' মাস পর বীরেশ্বর রায় কলকাতা ফিরেছিলেন। তিনি তখন একা। ভবানী দেবী নেই। তিনি যা বলেছিলেন, তাই হয়েছিল। বীরেশ্বর রায় আবার তখন মদ্যপান শুরু করেছেন।

সুরেশ্বর বললে—কীর্তিহাটের কড়চায়, রায়বাড়ীর জবানবন্দীতে, বীরেশ্বর রায় শেষজীবন—বছর তিনেক বলতে পার—হারিয়ে-যাওয়া মানুষ।

তাঁর কথাটা সেরে নি সুলতা। ভবানী দেবীর মৃত্যু আমি এঁকেছি। কিন্তু বীরেশ্বর রায়কে তারপর আর আঁকি নি। তিনি।—

যাক, বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবীর জীবনের কথাটা গুছিয়েই বলি। রায়বাড়ীর জবানবন্দীর ওই ছবিগুলির দিক থেকে দৃষ্টি একটু সরিয়ে নাও।

বীরেশ্বর রায় ভ্রমণকাহিনীর কথা লেখেন নি, কিছু পাই নি, তবে লোকজন যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তাদের বলা কথা রায়বাড়ীতে কিছু কিছু আজও বেঁচে আছে। এবং একটা জমা-খরচের ছোট খাতা আছে।

যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তারা সবই চাকর-বাকর, দারোয়ান, ঠাকুর এইসব। একটু বিস্ময়কর ঠেকবে সুলতা যে, এদের মধ্যে গোপাল সিংও ছিল। বড়াবাবুহুজুর তীর্থ যাবেন শুনে রত্নেশ্বরের অনুমতি নিয়ে সে কলকাতায় এসে বড়াহুজুরের কাছে হাত জোড় করে বলেছিল—হুজুরের কিরপা হলে সে মহাপাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। তাকে হুজুরবাহাদুর এত লোকজনের সঙ্গে তাঁবেদার হিসেবে গরীবকে ভি সঙ্গে নিয়ে চলেন। সে গয়াতে গিয়ে বেটাকে পিণ্ড দেবে, বাপ দাদাকে দেবে। কাশী আর প্রয়াগমে গিয়ে স্নান অর্চনা করে সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে!

বীরেশ্বরের আগেই ভবানী দেবী বলেছিলেন—তুমি যাবে গোপাল সিং, তুমি যাবে।

বীরেশ্বরের মাসীমা রত্নেশ্বরের ঠাকুমাও গিয়েছিলেন। আর বলেছি, সোফিয়া বাঈও সঙ্গে গিয়েছিল। তার ব্যবস্থা সব আলাদা ছিল, কিন্তু খাওয়া-শোওয়ার সময় ছাড়া অন্য সময়ের বেশীর ভাগটা থাকত বীরেশ্বর রায়ের কাছে। বাঈজীর ঢঙ বা বেশভূষায় মুসলমানী ভাব তার ছিল না। সেই দীর্ঘকাল পর প্রথম সে যে লালপেড়ে শাড়ী হিন্দুস্থানী ঢঙে পরে এসেছিল, তাই ছিল তার পোশাক। এক সন্ধ্যার পর সে যখন এসে গানের আসর পাতত, তখনই কিছুটা

প্রসাধন এবং সামান্য বেশভূষা করে আসত।

রেললাইন তখন হাওড়া থেকে উত্তর মুখে উত্তরাপথ চলছে দ্রুতবেগে। কাজ মিউটিনীর কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৮৫৫ সালে লুপ লাইনের কাজ চলছিল, তিনপাহাড়ী, সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে, এদিকে মেন লাইন গিয়ে পৌছেছিল রাণীগঞ্জ। ১৮৫৫ সালে রেললাইনের তিনজন সাহেব সাঁওতালদের মেয়ে কেড়ে নিয়ে খুন হয়েছিল ইতিহাসে আছে। সে সময় কীর্তিহাটের জেলা মেদিনীপুরেও সাঁওতালরা ক্ষেপেছিল। মিউটিনীর পর রেললাইন দ্রুততর বেগে তৈরী হয়ে এগিয়ে চলেছিল। স্টীম ইঞ্জিনে টানা ট্রেনের বগিতে চড়ে পনেরো দিনের পথ তিনদিনে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বীরেশ্বর রায় ট্রেনে চড়েন নি, তিনি গিয়েছিলেন বজরায়।

চিকিৎসকের উপদেশের জন্যও বটে, এবং তাঁর মেজাজের জন্যও বটে। রেলগাড়ী—সে ছুটবে আপন গতিতে, আপন নিয়মে এবং আরাম তাতে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ভবানীর এবং তাঁর সঙ্গে মাসীমা প্রভৃতি ক'জন বিধবার রেল গাড়ীতে দারুণ অসুবিধা। সে আমল—রেলগাড়ীর বিভিন্ন কামরায় কত জাতের কত লোক, গাড়ীগুলো পৃথক হলেও একসঙ্গে জোড়া ; এর মধ্যে জাত বাঁচিয়ে কি খাওয়া যায় ?

বীরেশ্বর রায়ের অসুবিধা, রেলগাড়ী তাঁর হুকুম মানবে না। তাঁর জীবনের কার্যসূচীগুলোর সব ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। তার উপর ট্রেনে ঝাঁকি আছে। আর আছে উল্টে-পড়া কি সামনাসামনি দুটো ট্রেনে ধাক্কা লাগবার ভয়। চিকিৎসকেরাও বলেছেন, এই ধাক্কা-ধকলে বীরেশ্বর রায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে। তার থেকে, তাঁরাই বলেছেন—বজরায় যাওয়াই উচিত। ধাক্কা-ধকল থাকবে না, এখন ফাল্গুন মাস, ঝড় বা হাওয়ার সময় নয়। বজরা নৌকো যাবে মসৃণ গতিতে। মানসিক স্বস্তিতে থাকবেন রায়। এ ছাড়াও এই গঙ্গার বাতাসের গুণে রায়ের স্বাস্থ্য আরও ভাল হয়ে উঠবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস। তাই হয়েছিল।

তিনখানা বজরা, দুখানা বড়, একখানা ছোট। সব থেকে বড় বজরাখানা বীরেশ্বর রায়ের আমলের নতুন বজরা, যাতে দুখানা কামরা। একখানা বসবার, একখানা শোবার। এই বজরাতেই কীর্তিহাট যাওয়া-আসা করতেন। আর একখানা বজরা ছিল, সোমেশ্বর রায়ের আমলের, ছোট বজরা, সেটায় ছিল সোফিয়া বাঈ। অন্য বড় বজরাখানায় ছিল ভবানী দেবীর পূজার ব্যবস্থা, রান্নার ব্যবস্থা, এইটেরই একটা কামরায় থাকতেন মাসীমা এবং আরও দুটি বিধবা আত্মীয়া।

আর বাদবাকী লোকজন সব ছিল কয়েকখানা নৌকোয়। ভবানী দেবীর নিয়ম ছিল, ভোরবেলা উঠে ঘাটে নেমে স্নান করে পূজোর নৌকোয় উঠতেন। এদিকে লোকজনেরা মুখ-হাত ধুয়ে মুড়ি-মুড়কি-চিড়ে-গুড় কাছে বাজার থেকে দই কিনে ভিজিয়ে এক পেট খেয়ে নিত। মাল্লা-মাঝিদের অনেকে ভোর রাত্রে উঠে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খেয়ে তৈরী হত। ওদিকে মাসীমারাও স্নান সারতেন। তখন নৌকো ছাড়ত।

সোফিয়া বাঈয়ের কথা বলতে ভুলছি। সেও উঠত খুব ভোরে। উঠে স্নান করে বজরায় গিয়ে ঢুকত। কাপড়-চোপড় ছেড়ে ছাড়াতে বসত মেওয়া ফল। বাদাম, পেস্তা, কিসমিস

ভেজানো থাকত রাত্রে। তার সঙ্গে কাটত ফল। বাজার থেকে টাটকা ভাল যা পাওয়া যেত তাই।

রায় উঠতেন একটু বেলায়। নৌকো চলতে থাকত, তখনই তিনি উঠতেন। কোন দিন দেড় ঘণ্টা, কোন দিন ছু ঘণ্টা পর উঠতেন তিনি। তখন আবার একবার বজরা থামত। তিনি একবার তীরে নামতেন। কিছুখানি হাঁটতেন। শরীরটাকে একটু চঞ্চল করে নিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার নৌকোয় উঠতেন। মুখ হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে বসতেন বসবার ঘরে। এদিকে সোফিয়ার বজরা থেকে রূপোর রেকাবীতে কাটা ফল, মেওয়া ফল এসে পৌছুত, ভবানী দেবীর বজরা থেকে আসত মিষ্টান্ন এবং দুধ। তারপর চাকর বানাতো চা। নটা, কোনদিন দশটাও বাজত। খাওয়া শেষ হলেই বজরাখানা মাঝগঙ্গায় থামত। ওদিকে পাশে এসে লাগত সোফিয়া বাঈয়ের বজরা। মাঝখানে ছুপাশে রেলিং দেওয়া তক্তা পেতে দিত মাঝিরা। বাঈ তাঁর বীণাখানি হাতে করে এসে উঠতেন হুজুরের বজরায়।

এসে সেলাম করে বসত ; তার জন্তে পাতা থাকত স্বতন্ত্র গালচে, সঙ্গে কেউ না, সারেঙ্গীদার বা তবলচী কেউ না। বসে বীণ বাজাতো। কখনও উৎসাহবোধ করলে নিজেই বীরেশ্বর রায় তবলচী সারেঙ্গীদারদের ডাকতেন। সে কচিৎ। কাঙ্গণ এর ঘণ্টাখানেক পরই বজরা আবার একবার দাঁড়াত। এবার সোফিয়া চলে যেত নিজের বজরায়। তারপর তার বজরা সরে গেলে এপাশে এসে লাগত ভবানী দেবীর বজরা। ভবানী দেবীর বজরা এবং সোফিয়ার বজরা এক সঙ্গে ঠেকলে বীরেশ্বর রায়ের মাসীমা আপত্তি করতেন।

—ঠাকুর-দেবতা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার সঙ্গে স্পর্শ-দোষ ঘটবে।

যাক। আবার বিকেল হতে হতে আসত সোফিয়া। এবার সাজসজ্জা কিছু করতে হত তাকে, সারেঙ্গীদার, তবলচী. সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসর পড়ত। ভবানী দেবীও বজরায় থাকতেন। কিছু রাত্রি হলে তবে ভবানী দেবী আসতেন। স্বামীর খাবার-দাবার নিয়ে। সন্ধ্যের মুখে বজরা নৌকো কোন একটা বাজার বা গঞ্জের ঘাটের আশে-পাশে বাঁধা হত। রাত্রিকালে চলার নিয়ম ছিল না। আর একবার ছুপুরে নৌকো বাঁধা হত, লোকজনেরা রান্না করে খাবে।

প্রথম এসে নৌকো বজরার বহর তাঁরা বেঁধেছিলেন পাটনায়। ওখান থেকে পথে পথে যাবেন গয়া। পালকী, রয়েল গাড়ী নিয়ে গয়া যাবেন। সেখান থেকে ফিরে পাটনার ঘাট থেকে আবার রওনা হবেন কাশী। গোটা বৈশাখটা থাকবেন কাশীতে, তারপর রওনা হবেন প্রয়াগ। প্রয়াগ থেকে যমুনায় ঢুকে মথুরা-বৃন্দাবন ; আগ্রা-ফতেপুরশিক্রি ; আকবর শাহের সমাধি। তারপর এখনও ঠিক হয় নি, দিল্লী যাবেন কি গোয়ালিয়র যাবেন। গোয়ালিয়রে মিঞা তানসেনের সমাধি আছে। দিল্লী থেকে হরিদ্বার যাবার ইচ্ছা, ওদিকে কুরুক্ষেত্র, সাবিত্রীতীর্থ, জয়পুর এবং আজমীঢ়। আজমীঢ়ে সোফিয়া বাঈ বিদায় নেবে বলেছে।

বীরেশ্বর রায় সঙ্গে অর্থ নিয়েছিলেন যথেষ্ট। কত নিয়েছিলেন, তার জমা-খরচ নেই। গয়াতীর্থে পিতৃপুরুষকে পিণ্ড তিনিও দিয়েছিলেন, ভবানী দেবীও দিয়েছিলেন। এই প্রথম শ্যামাকান্তকে তাঁর পুহী নামে পিণ্ড দিয়েছিলেন। স্বামীকেও অনুরোধ করেছিলেন—সমাজের

ভয়ে সেখানে তাঁর শেষ কাজ করতে পারিনি। এখানে করলাম। তুমিও তোমার কাজ কর। আমার বাবাকে এখানে তুমি পিণ্ড দাও। সেও দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।

*　　　*　　　*

স্থলতা, যেটুকু শুনতে পাই ; তাতে শুনি এই গয়া থেকেই ভবানী দেবী কেমন পাল্টে গিয়েছিলেন। পিণ্ড দিয়ে এসে স্বামীকে বলেছিলেন—আমার কাজ শেষ হল গো! এইবার তুমি খালাস দিলেই আমি খালাস!

বীরেশ্বর বলেছিলেন—সে আমি যাবার সময় দিয়ে যাব, তার আগে নয়! অপেক্ষা করে থাক।

ভবানী বলেছিলেন—ওকথা বলতে নেই, বল' না।

—তুমিও খালাস চেয়ো না!

কথাটা ওইখানেই শেষ হল, কথার মধ্যে। কিন্তু সঙ্গের লোকেরা এখানে ফিরে এসে বলেছিল—কথা শেষ হলে কি হবে ; কাজে, ওই দিন থেকেই শুরু হল।

ভবানী দেবী কেমন যেন বদলে যেতে লাগলেন ; আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন একটা কোন ধ্যানে। ধ্যান কথাটা তাদের স্থলতা ; একাল হলে অন্য কথা বলতো নিশ্চয়। কোন একটা চিন্তায়, কিম্বা নিজের জীবনের সংস্কারের আচ্ছন্নতায়।

গয়া থেকে পাটনা ফিরবার পথে এটা ঠিক ধরা যায় নি। কারণ পালকীতে এসেছেন। পথে চটীতে আশ্রয় নিয়েছেন রাত্রে। বীরেশ্বর রায়ের কাছে এটা ধরা পড়ল পাটনায় ফিরে, বজরায় কাশীর পথে। প্রথম দিনই ভোরে গঙ্গাস্নান করে তাঁর পুজোর ঘর যে বজরায়, সেই বজরায় উঠে পুজোয় বসলেন। সকালবেলা সেদিন বীরেশ্বর রায় একলা পড়ে গেলেন। সোফিয়া বাঈ পাটনা সিটিতে গিয়েছিল, এক বান্ধবী বাঈজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। বীরেশ্বর রায়ের অনুমতি নিয়েই সে গিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় একখানা ইংরিজী বই পড়ছিলেন। ভেবেছিলেন বই পড়েই সময়টা কেটে যাবে। কিন্তু সময় দীর্ঘ হলে তিনি কি করবেন? বেলা প্রায় এগারটা অতিক্রান্ত হতে চলল, তবু ভবানী এলেন না তাঁর পূজার নির্মাল্য নিয়ে। সোফিয়া নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে সরাসরি উঠল তার বজরায়। কারণ এই সময়টায় সে থাকত না। ভবানী দেবী জল খান, এই কর্তব্যটির পর। এ সময় সোফিয়া থাকলে তাঁর মন খুঁত-খুঁত করত।

জানবাজারের বাড়ীতে সোফিয়া বসে থাকত মেঝের উপর পাতা গালিচায়, বীরেশ্বর রায় বসে থাকতেন একটা বড় ডিভানে ঠেস দিয়ে। অথবা দামী সেগুন কাঠের পালিশ-করা খাট জাতীয় তক্তপোশের উপর বড় তাকিয়া ঠেস দিয়ে। সেখানে দোতলার মেঝে হলেও সেটা পড়ত মা ধরিত্রীর অংশের পর্যায়ে। সেখানে ছোঁয়ার গণ্য হত না। কিন্তু বজরার কাঠের মেঝে তা নয়।

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই, একথাটা ভবানী দেবী বা তাঁরা মাসীশাশুড়ীরা মানতেন না।

সেই কারণে সোফিয়া ফিরে এসে এ বজরায় ওঠে নি। সে নিজের বজরায় গিয়ে উঠেছিল। তার রান্নাবান্না আছে। খাওয়া-দাওয়া আছে। তারও নিজের কিছু ভজন আছে। তার

ভজনও নানান যোগের জটিলতায় জটিল। ইসলামী উপাসনার সঙ্গে তার আর একটা জপ ছিল, সেটা পাগলাবাবার দেয়া মন্ত্র জপ।

বীরেশ্বর রায় অধীর হয়ে মহিন্দরকে বলেছিলেন—কি হল দেখতো মহিন্দর? এখনও পুজো শেষ হল না? এত দেরী তো হয় না!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভবানী দেবী এসে উঠেছিলেন তাঁর বজরায়।

বীরেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এত দেরী আজ?

একটু বিস্মিত হয়েই ভবানী বলেছিলেন—দেরী? না তো!

না তো? দেখ তো ঘড়িতে কটা বাজল?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভবানী বলেছিলেন—তাই তো! এগারটা! আমি তো বুঝতে পারি নি!

সেদিন আর এ নিয়ে উচ্যবাচ্য হয় নি। ভবানী দেবী চরণোদক নির্মাল্য দিয়ে, কাপড় ছেড়ে এসে স্বামীর পাশে বসেছিলেন।

বীরেশ্বর তখন যুবক। জন্ম তাঁর বিশ সালে, তখন চলছে ঊনিশশো ষাট। চল্লিশ বছর বয়স। তবুও জীবনে যে যুদ্ধ তিনি করেছেন নিজের সঙ্গে, যে যুদ্ধের নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁর বাঁ হাত, বাঁ পা খানিকটা দুর্বল হয়ে গেছে, তারই ফলে তখন তাঁর চুলের মধ্যে দু-চারটে পাকা চুল দেখা যেতো; ভবানী পাশে বসে তাই খুঁজে খুঁজে বের করে তুলে ফেলতেন।

সেদিন তিনি বলেছিলেন—আজ সকাল থেকে গান শোনা হয় নি, না?

—হ্যাঁ, সোফিয়া তার এক সহেলীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

—এখনও ফেরে নি?

—সে ঠিক সময় ফিরেছে। সে বলেছিল—দশ, সাড়ে দশ বাজে লৌটেঙ্গী, ঠিক তাই এসেছে। কিন্তু তোমার আসবার সময় হয়েছে বলে বজরায় ওঠে নি।

—ও, তাই আমার রাজাবাহাদুরের মেজাজ খারাপ হয়েছে।

—তোমার তাই ধারণা, না?

—তাতে অন্যায়টা কি হল?

ভবানী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে উঠেছিল বীরেশ্বর। বলেছিলেন—তুমি বুঝতে পার না ভবানী, আমি তোমাকে কেমনভাবে পেতে চাই? কিন্তু তুমি নিজেকে এমন আড়াল করে রেখেছ, পুজো পুজো আর পুজো নিয়ে—!

ভবানী দেবী সেদিন অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিলেন—দেখ তো পাগলামী! হ্যাঁ গা, আমি পুজো-অর্চনা করি কি আমার মঙ্গলের জন্যে?

বীরেশ্বর বলেছিলেন—থাক!

ভবানী ডেকেছিলেন মহিন্দরকে—মহেন্দ্র, বাবুকে তামাক দাও নি কেন? তামাক দাও। না। এক কাজ কর তো! বজরা থেকে আমার তানপুরাটা নিয়ে এস তো! পাখোয়াজটাও আনো। ময়দা করো।

স্বামীকে বলেছিলেন—নাও, আজ অধীনী তোমাকে গান শোনাবে। মহিন্দর তানপুরা

এনে দিতেই, বলেছিলেন—বজরা খুলে মাঝগঙ্গায় নিয়ে যেতে বল। ঘাটের কাছে ভিড় জমে যাবে। আর ও বজরার মাসীমারা আছেন। সোফি বাঈকেও ডাক।

—না। বীরেশ্বর মানা করেছিলেন। তুই তানপুরো পাখোয়াজ দে। সোফি থাক।

ঘাট থেকে বজরা খুলে মাঝগঙ্গার দিকে চলতে আরম্ভ করেছিল। সকলে বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু মহিন্দর চাকর বজরার ছাদে উঠে বলেছিল, একটু ঘুরে আসতে চলল বজরা।

* * *

এ বিবরণ মহিন্দরের সে তীর্থযাত্রা থেকে ফিরে এসে রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল। রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে লিখে রেখেছেন।

সেদিন না কি বড়হুজুরের যে আনন্দ, হুজুরের তেমন আনন্দ মহিন্দর আর কখনও দেখেনি। গান গাইতে গাইতে তানপুরার হাত মায়ের বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুচোখ থেকে ধারা নেমেছিল।

গান সে আশ্চর্য গান, আর হুজুরের সে বাজনাও আশ্চর্য! গান থামল, পাখোয়াজে ঘা মেরে হুজুর চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—আমি ভাল হয়ে গিয়েছি। সতীবউ, আমি ভাল হয়ে গিয়েছি।

ভবানী দেবী প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন সবিস্ময়ে। বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বাঁ হাতে আমার একটু কষ্ট হল না! আমি ভাল হয়ে গিয়েছি!

বিকেলে গঙ্গার কিনারায় উঠে দারোয়ানের সঙ্গে ঘুরেও এসেছিলেন। লাঠির দরকার হয় নি, তবু হাতে ছড়ি না নিলে যেন কেমন হাতখানা স্বস্তি পাচ্ছিল না।

* * *

পরের দিন ভোরে নৌকো বজরা পাটনা ছেড়ে রওনা হয়েছিল কাশীর মুখে। সে দিনও দুপুরে গান গেয়েছিলেন সতীবউরাণী। সেদিন কিন্তু পাখোয়াজ ধরতে দেন নি স্বামীকে। বলেছিলেন—বাঁয়া তবলা নাও। কাল যা পাখোয়াজে ঝড় তুলেছ, ও চলবে না। ভাল হয়েছ, বেশ ভাল কথা। কিন্তু ও হাত নিয়ে যুদ্ধ করা চলবে না।

সেদিন ভবানী দেবী ধ্রুপদী গান নি। হাল্কা গান ধরেছিলেন। সেদিন গানের আসর ভাঙতে আরও বেলা হয়েছিল। খেতে অনেক দেরী হয়ে গেল। ভবানী দেবী বললেন—না। এ হবে না। কাল থেকে রাত্রে, সোফির আসরের পর আমি গান শোনাব। না হয় এ বেলা সোফি বেশীক্ষণ গান শোনাবে, রাত্রে ওর আসর সকাল সকাল ভেঙে দিয়ো, তারপর আমাদের পালা।

তাই চলেছিল ক'দিন। বড় আনন্দ চাকর-বাকরদের। গান-বাজনা নিয়ে হুজুরের ঝোঁক বাড়ল। নতুন নিয়ম হ'ল, বেলা থাকতে নৌকো বাঁধতে হবে। হুজুর কিনারায় উঠে খানিকটা করে হাঁটবেন।

স্নানের আগে তেল মেখে হুজুর নিজে হাত-পা ভেঁজে নিতেন। ডন-বৈঠক দেবার মতলবও করেছিলেন, কিন্তু তাতে সতী-রাণী-মা বাধা দিয়ে বলেছিলেন—না। যা রয়সয়, তাই কর। ও করতে আমি দেব না।

দিন দশেক পর, কাশী পৌঁছুবার দুদিন আগে, হুজুর সেদিন যেন একটু বেশী মেতে উঠলেন। মদ খেয়ে নয়, নিজের ঝোঁকে। সেদিন বললেন—অনেক দিন নাচ হয় নি, আজ নাচ হবে।

সতীরাণী-মা বারণ করলেন—না।

হুজুর বললেন—না কেন? অনেক দিন নাচের আসর বসে নি, আজ এক বছরের ওপর।

সোফি বাঈ মাফি চাইলে। হাত জোড় করে। তবু শুনলেন না। নাচ হল শেষ পর্যন্ত। সে এক প্রহর রাত পর্যন্ত।

সেও আসর জোর করে ভেঙে দিলেন বউরাণী। সোফি বাঈ চলে গেল। এই পর্যন্ত মহিন্দর জানে।

এর পর রাত্রে কি হল স্বামীস্ত্রীর মধ্যে, কেউ জানে না। কিন্তু ভোরবেলা উঠে বউরাণী গঙ্গাস্নান করে সেই যে পুজোরঘরে ঢুকলেন, সারা দিনেও আর বের হলেন না। মাসীমা এসে চরণোদক পুষ্প দিয়ে বলে গেলেন, আজ আর বউমা পুজোরঘর থেকে বেরুবে না বাবা। কাল কাশী পৌঁছুবে, সে আজ সংকল্প করছে, হবিষ্যান্ন করবে। কম্বলে শোবে। শোবেও ওই পুজোরঘরে। বললে—ওঁকে কাল বলা হয় নি। ভুলে গেছি বলতে। ওঁকে আপনি বলে দেবেন। আজ আমি ও বজরায় যাব না। সোফিকে একটু বেশীক্ষণ থাকতে বলেছে। এবেলা-ওবেলা দুবেলাই।

বীরেশ্বর রায় একটি কথাও বলেন নি। চুপ করে শুনে শুধু একটি হুঁ বলেছিলেন। তারপর চুপ হয়ে গেলেন।

সেদিন স্নানের সময় তেল মেখে ডনবৈঠক দিলেন। বিকেলবেলা অন্যদিনের চেয়ে বেশীক্ষণ বেড়িয়ে ফিরলেন।

সন্ধ্যেবেলা সোফি বাঈয়ের গানের আসর বসে ভাঙল প্রথম প্রহরের বদলে রাত দু প্রহরে। গঙ্গার পাড়ে চারিদিকে তখন কোলাহল করে শেয়াল ডাকছে।

পরের দিন বেলা দশটার সময় নৌকো কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর লাগল। ও বজরার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বেণীমাধবের ধ্বজাকে এক পাশে দাঁড়িয়ে মা প্রণাম করছিলেন। তাঁর সে চেহারা দেখে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

এ তো পরশুর রাণীমা নন।

এ যেন সেই হুজুরের অসুখের সময় যে রাণীমা এসে শুধু শাঁখাশাড়ী পরে যোগিনীর মত রায়বাড়ীতে ঢুকেছিলেন, সেই রাণীমা!

একদিনের উপবাসও নয়, হবিষ্যান্ন করেছিলেন ভবানী দেবী, অর্ধ-উপবাসও বলা যায় না, সন্ধ্যার পূর্বে দুধ খেয়েছিলেন, তবু মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কয়েকটা উপবাস করে আছেন; তার উপর চুল রুক্ষ; সংকল্পের জন্য উপবাসের পূর্বদিন তেল নিষিদ্ধ। কম্বলে শুতে হয়। অশৌচ পালনের মতই ব্যবস্থা। অলঙ্কার সব খুলে রেখে শুধু শাঁখা পরেই তিনি নেমেছিলেন। বিমলাকান্ত এসেছিলেন সস্ত্রীক, পাণ্ডার লোকজন উপস্থিত ছিলেন। পূর্বে থেকে ব্যবস্থা করা

ছিল। একটা বড় বাগিচাওয়ালা মোকাম ভাড়া করে রাখা হয়েছিল। পালকি-ডুলি এবং এক্কা হাজির ছিল। শহর থেকে একটু বাইরে। ভবানী দেবীর পরামর্শ মতই করা হয়েছিল সব। আর একটা বাড়ীও ভাড়া করে রাখা হয়েছিল শহরের মধ্যে বিমলাকান্তের বাড়ীর কাছে। কাশীতে এক মাসেরও উপর থাকবেন, বিশ্রাম নেবেন বীরেশ্বর রায়। গঙ্গার একেবারে ধারে। হরিশ্চন্দ্রের ঘাটের দিকে। বীরেশ্বর রায় ওই বাগানে থাকবেন, সঙ্গের দারোয়ান লোকজন সবই থাকবে সেখানে; শহরের বাড়ীতে থাকবেন মাসীমারা। ভবানী দেবী ভোরবেলা শহরের বাইরের বাড়ী থেকে পালকিতে চলে আসবেন শহরের বাড়ীতে। এখানে এসে সারাদিন থাকবেন, স্নান, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি করবেন। বিকেলবেলা বীরেশ্বর রায় আসবেন, সন্ধ্যায় দেবদর্শন সেরে বিমলাকান্তের সঙ্গে গল্পগুজব করে সস্ত্রীক ফিরবেন বাগিচাবাড়ীতে। সোফিয়ার থাকবার ব্যবস্থা ওই বাগিচাবাড়ীতেই একটা আলাদা ছোট বাড়ীতে করা ছিল। সেটা ছিল বাগিচাবাড়ীর দপ্তরখানা বা বাইরের বাড়ী। মূল বড় বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও স্বতন্ত্র বাড়ী।

সুরেশ্বর বললে—এ-বাড়ী পরে কেনা হয়েছিল। এবং বাড়ীখানা পেয়েছিলেন মেজতরফ। মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর রায়। শিবেশ্বর রায়ের ধর্মবিশ্বাস ছিল বলে রত্নেশ্বর রায় বাড়ীখানা তাঁকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে এ-বাড়ী কিনেছিলেন আমার জ্যেঠামশাই—যজ্ঞেশ্বর রায়। এ-বাড়ী একবার আমি দেখেছি। আমার যখন পাঁচ-ছ বছর বয়স, তখন বাবা আমাকে এবং মাকে নিয়ে গোটা পশ্চিম ঘুরে এসেছিলেন। বড় মনোরম জায়গা ছিল। বাড়ীখানাও তেমনি মুঘল আমলের আমীরী ছাপমারা। কিন্তু সে-কথা থাক। যা বলছিলাম তাই বলি। এই বাইরের বাড়ী বা দপ্তর সেরেস্তাখানায় একখানা প্রশস্ত হল ছিল—সেইখানে বসত রাত্রের আসর।

মহিন্দর চাকর রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—এই কাশী এসেই সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। সতীরাণীমা ব্রত করলেন; ভোরবেলা যখন পালকিতে উঠতেন তখন আবছা অন্ধকারের মত দেখতাম, মায়ের যেন কেমন ঘোর লেগেছে। আবার ফিরতেন রাত্রে, তখন তাঁর দিকে তাকানো যেত না। সে যেন কেমন মানুষ। "পিথিমীর নন।" খাওয়াদাওয়া তো ফল-জল; তা ওই বাড়ীতে খেয়ে আসতেন। পালকি থেকে নামতেন যেন কাঁপছেন; দু'জন ঝি তাঁকে দু'পাশে ধরে উপরে নিয়ে যেত। এক মাস ব্রত, পয়লা বোশেখ থেকে বোশেখের সংক্রান্তি পর্যন্ত—তার মধ্যে প্রথম পনের দিন উপরে উঠেছিলেন,—বাকি ক'দিন উপরে ওঠেননি, তিনি আলাদা ঘরে শুতেন, তাঁর বিছানা একখানা কম্বল, তার উপর খুব ভালো রেশমী চাদর পাট করে চাদরের মত পাতা হত; আর একখানা কম্বল গুটিয়ে রেশমী চাদর জড়িয়ে বালিশের কাজ করত। আর চারখানা লালপাড় গরদের শাড়ী। শ্বেতপাথরের দু'-তিনটে গেলাস, খান-দুই রেকাবি; আর জপের মালাটালা এই সব। বাক্সপেঁটরা যা সব আসল সামগ্রী, সে-সব থাকত রায় হুজুরের কামরায়। একেবারে জানালা খুললেই গঙ্গা।

মহাবীর সিং কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘরের দরজায় পাহারা থাকত।

মহেন্দ্র রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—মা ব্রত করতে লাগলেন, হুজুর যেন নতুন করে সেরে

উঠলেন, মুখের উপর দাগ পড়েছিল, সেগুলো উঠে গেল, মনে হল দশ বছর বয়স কমে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আগের সেই মেজাজ। সেই চোখের তাকানি। সেই কড়া গলার ডাক। সব ফিরে এল।

রাত্রে সোফি বাঈয়ের আসর বসত অল্পক্ষণের জন্তে। ওই মায়ের সঙ্গে ফিরে এসে; মাকে উপরে তুলে শুইয়ে দিয়ে সটান এসে উঠতেন বাইরের বাড়ীতে পাতা আসরে, একখানা গান শুনেই ফিরে এসে শুতেন। সোফি বাঈয়ের সঙ্গে আসর যা হবার তা হ'ত দিনের বেলা। সকালে হুজুর উঠতেন আটটার সময়, তখন মা চলে গেছেন কাশীর ভিতরে শহরের বাড়ীতে। হুজুর মুখ ধুয়েই উঠতে উঠতে বাঈ মেওয়াফল আর অন্ত ফল কেটে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকত; আমি গরম দুধ, মাখন, মিছরী, প্যাঁড়া এনে নামিয়ে দিতাম। হুজুর খেতেন; সোফিয়া বাঈ বসে খাওয়াতো। সতীরাণী মা বাঈকে ভারটা ডেকে দিয়ে গিয়েছিলেন। খেতে খেতে গল্প করতেন। হাসতেন, মসকরা করতেন। আমি তামাক সেজে নলটি রেখে বাইরে গিয়ে বসে থাকতাম। খাওয়ার পর ডাক পড়ত তবলচীর আর সারেঙ্গীদারের। গানের আসর বসত। একটা বাজলে সে-আসর ভাঙত। হুজুর স্নান করে খেয়ে উঠে শোবার আগেই বাঈ আবার এসে হাজির হত পানের রেকাবি হাতে। পান-তামাক খেয়ে হুজুর শুতেন। বাঈ প্রথম প্রথম চলে যেত, দিনকয়েক পর থেকেই হুজুর বলেছিলেন—মাথায় হাত বুলিয়ে দাও; ভবানী দিত, পাকাচুল তুলত। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। না দিলে ঘুম আসবে না।

বাঈ মাথার শিয়রে কুর্সি টেনে নিয়ে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। পাকাচুল তুলতে বললে বলত—হুজুর, এখন তুমি ফের নওজোয়ান হয়ে গেছ, এখন কি আর পাকাচুল থাকে?—

হুজুর খুব হাসতেন। এই সময় হুজুর আর একরকম মানুষ হয়ে যেতেন।

* * *

কাশী থেকে রওনা হয়েছিলেন, বিন্ধ্যাচল হয়ে প্রয়াগ। জষ্টি মাসের পনের-ষোল তারিখে। পনের তারিখের শেষ রাত্রে ষোল তারিখের ভোরে। সতীবউরাণী একমাস ব্রত করে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন; তিনি একটু বল পাবেন—এই বলে অপেক্ষা করা হয়েছিল।

কিন্তু কাশী থেকেই আগের হালচাল সব বদলে গেল। সতীবউরাণী বাসা নিলেন নিজের ঠাকুর ছিল যে বজরায় সেই বজরায়। সেইখানেই তাঁর খাওয়া সেইখানেই শোওয়া। মাত্র তিনবার আসতেন এ বজরায়। একবার চরণোদক দিতে, একবার হুজুরের দিনে খাবার সময়, একবার রাত্রে খাবার সময়। ব'সে থেকে খাইয়ে হুজুরকে শুইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে হুজুর ঘুমিয়ে পড়লে তবে চলে যেতেন।

বলেছিলেন—তীর্থ শেষ করে ফিরে আবার আগের মতন হবে সব। তীর্থ যাচ্ছেন, ভগবান দর্শন করতে চলেছেন, এ সময় একমন হয়ে যেতে হবে। ওই চিন্তা ছাড়া অন্ত চিন্তা করলে কি ভগবানের দর্শন মেলে?

বলতেন—যে যে চিন্তা নিয়ে যায়, তীর্থের মন্দিরে দেবতার মূর্তির বদলে সে তাই দেখে। দেবতা দেখতে পায় না।

হুজুর মুখে কিছু বলেন নি, কিন্তু মেজাজ তাঁর আরও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন

—বেশ, তাই হবে। তোমার যখন তাই ইচ্ছে, তখন তাই হবে।

মহেন্দ্র বলেছিল—হুজুরের বজরার কামরায় আমি শোব এই ব্যবস্থা করেছিলেন রাণীমা। আমি শুতাম।

প্রয়াগ থেকে বজরা ঢুকল যমুনায়। বরাবর এসে উঠল মথুরায়, তারপর বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে দশদিন থেকে ফিরে এসে উঠলেন আগ্রায়। তবে মাসীমারা থেকে গেলেন বৃন্দাবনে। আগ্রায় দেবদেবতা নেই, সেখানে থেকে কি করবেন ? আগ্রায় বাড়ী ভাড়া করে দশদিন পর হুজুর রাণীমা, সোফিবাঈ আর লোকজনকে নিয়ে গিয়ে আগ্রায় উঠলেন।

রাণীমায়ের শরীর তখন আরও খারাপ হয়েছে। রোগা হয়ে গেছেন। আর মনে মনে কি ভাবেন, যেন মাটির মানুষই নন। খেতে কিছু পারেন না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অরুচি।

মহেন্দ্র মাথা চুলকে রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—মাসীমারা ফিসফাস্ গুজগুজ করছিলেন। মানে—।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হুঁ।

মহেন্দ্র এসব কথা রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর। সে প্রায় এক বছর পর। তীর্থপর্যটনে লেগেছিল ছ' সাত মাস, ছ' সাত মাস পর তাঁরা ফিরে এসেছিলেন কাশীতে। কাশীতেই একটি কন্যাসন্তান প্রসব ক'রে ভবানী দেবী মারা যান।

রত্নেশ্বর মোটামুটি ঘটনাগুলি জানতেন, তাই বলেছিলেন—হুঁ। বীরেশ্বর রায়ের মাসীমা এবং অন্যান্য প্রবীণারা কি কানাঘুঁষো করেছিলেন, তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বলেছিলেন —হুঁ।

কথাটা কিন্তু কেউ প্রকাশ্যে বলতে ভরসা পায় নি। তার কারণ ভবানী দেবী। ভবানী দেবী বারো বছর পর স্বামীর ঘরে ফিরে এসেও ঠিক সংসারী হন নি। এবং কালটা সে-কাল! কুড়ি-বাইশ বছর পর এমন ধর্মপরায়ণা পূজারিণীর মত মেয়ে সন্তানবতী হয়েছে, এটা যেন প্রবীণাদের কাছে একটু কেমন ভোগলিপ্সা অপবাদের মত মনে হয়েছিল। ভবানী দেবীর নিজের কাছেও সেটা অপরাধ বলে মনে হয়েছিল।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, প্রমাণ সঠিক মানে লিখিত প্রমাণ আমি পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস—তাই। কীর্তিহাটে সেদিন রাত্রে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী পড়তে পড়তে আমি যেন চোখে দেখতে পেয়েছিলাম বিশীর্ণা ভবানী দেবীকে। মুখে চোখে তাঁর অপরাধ-বোধের ছাপ। তিনি যেন মনে মনে বলছিলেন—'একি করলি মা! এ কি লজ্জায় ফেললি! সংসারে ফিরে আসার জন্যে কি এই শাস্তি দিলি!'

আর রাজকুমারী রাণীবউ কাত্যায়নী দেবীর মাসতুতো বোন বৃদ্ধা নিস্তারিণী দেবীর ফিস্-ফাস্ কথাগুলিও যেন কানে শুনেছিলাম—ছি—ছি মা, এ কি লজ্জা—! এতকাল পর! পুষ্যি-বেটা একুশ পার হয়ে পড়েছে বাইশে; বউ এসেছে ঘরে, কোনদিন তাকে চিঠি আসবে ম্যানেজার লিখবে—রত্নেশ্বরের সাহেব শ্বশুর লিখবে নাতবউয়ের সন্তান হবে! তা—না—। এখান থেকে খবর যাবে চিঠিতে—। লিকবে কি ক'রে গো!

আর একজন বলেছিলেন—তা বীরেশ্বর আমাদের পারবে। দিব্যি পারবে। আগেকার

কথা তো ঢাকা নেই। এখন এই দেখ না, তীর্থে এসেছে, সঙ্গে বাঈ নিয়ে এসেছে।

নিস্তারিণী বলেছিলেন—এইবারে আগুন লাগবে দিদি। বাপবেটায় মানে পুষ্যিবেটায় আর বাপে বিষয় নিয়ে লাঠালাঠি হবে। ছেলে আর হবে না এই বলে সব পুষ্যিবেটাকে দানপত্র ক'রে দিয়ে এল। এখন? এখন তো মায়ের নিজের ছেলে আসবে কোলে! সে কোথা দাঁড়াবে? কি মতিচ্ছন্ন মা! দানপত্তর ক'রে দিলি কেন?

সুরেশ্বর বললে—এ কথাগুলির আভাস আছে রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে। তাঁর ডায়রীতে শ্রাবণ মাসের আট তারিখে তিনি লিখেছেন—"আজ আগ্রা হইতে পিতৃদেবের পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। মাতৃদেবী এত দীর্ঘকাল—একুশ বৎসর পর আবার সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন! বুঝিতে পারিলাম, মনুষ্য যতই এবং যেমনি সংকল্প করুক, যত নিষ্ঠার সঙ্গেই ধর্মাচারণ করুক, তাহার প্রবৃত্তির কদাপি পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। পিতা কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও মৃদু হইলেও পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ছিলেন। তিনি সুস্থ হইবামাত্র আবার ভোগলালসার কাছে পরাজিত হইয়াছেন! কিন্তু আমার নানা চিন্তা হইতেছে। পিতা তাঁহার সম্পত্তি আমাকে দানপত্র করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। লোকচক্ষে আমি স্বর্গীয় সোমেশ্বর রায়ের দৌহিত্র হিসাবে তাঁহার সম্পত্তির অর্ধেক অংশের মালিক হইলেও প্রকৃতপক্ষে ষোল আনা সম্পত্তিরই মালিক তিনি। আমি অবশ্য ইচ্ছা করিলে এই অর্ধেক অংশ নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারি। এবং আমার বিশ্বাস পিতৃদেবও এ বিষয়ে কোন দাবী করিবেন না। করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমার পক্ষে ন্যায় কি হইবে? চিঠিখানা ম্যানেজারকে দেখাইলাম। তিনিও এই কথাগুলিই বলিলেন। অবশ্য দৌহিত্র হিসাবে আমার অংশের কোন কথাই তুলিলেন না। এবং বাড়ীতে এই পত্র সরস্বতীবউও দেখিল। পত্র পাঠ করিয়া সে আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপকরতঃ বলিল—"এখন কি হইবে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিসের কি হইবে?"

সে বলিল—সম্পত্তির?

পুত্রসন্তান অর্থাৎ ভ্রাতা হইলে তাহার সহিত সমভাগে ভাগ করিয়া লইব। ভগ্নী হইলে প্রচুর খরচপত্র করিয়া উচ্চবংশে তাহার বিবাহ দিব।

সরস্বতীবউ চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল আমার কথা তাঁহার মনঃপূত হইল না। আমি বলিলাম—ইহাই কর্তব্য এবং ধর্ম নহে কি?

সে বলিল—না, আমি তাহা মনে করি না। শ্বশুরমহাশয় তোমাকে যে সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাহা ইচ্ছা করিলে তুমি অবশ্যই দিতে পার। কিন্তু জমিদারী সম্পত্তি, বসতবাটী ভাগ হইলেই মাটি হইয়া যায়। তাহার আবার দাম কি? তা ছাড়া শ্বশুরমহাশয়ের কলিকাতার সম্পত্তি তো কম নয়। শুনিয়াছি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে খাটিতেছে এবং গোকুলের কৃষ্ণের মত দিনে দিনে বর্ধিত হইতেছে। কলিকাতার বাড়ীতে তোমার ভাগ নাই। ও বাড়ী দাদা-শ্বশুর সোমেশ্বর রায় দৌহিত্র হিসাবে তোমাকে দেন নাই। কলিকাতার তেজারতি ইত্যাদিও নয়। সে-সব তো সোনা। এই জমিদারী তাহার কাছে মাটি।

কথায় বাধা পড়িল। অঞ্জনা আসিয়া প্রবেশ করিল। আমি কহিলাম—থাক এখন এসব কথা। সে-সব অনেক দূরের ব্যাপার। এক্ষণে চুপ কর। অঞ্জনা আসিতেছে।"

সুরেশ্বর বললে—কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম সুলতা, বলছিলাম বীরেশ্বর রায় আর ভবানী দেবীর রায়বাড়ীর রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থানের কথা ; এসে পড়লাম রত্নেশ্বর রায়ের কথায় কীর্তিহাটের বাড়ীতে। ফিরে আবার সেই কথাই বলি।

আগ্রাতেই প্রথম কবিরাজ এবং ডাক্তার দেখিয়ে বীরেশ্বর রায় জানতে পারলেন যে ভবানী-দেবী আবার সন্তানসম্ভবা।

মহেন্দ্র খানসামা রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—সেদিন রাত্রে রাণীমায়ের সঙ্গে হুজুরের কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

রত্নেশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি কথা কাটাকাটি ?

মহেন্দ্র চুপ করে থেকেছিল—জবাব দেয় নি।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—মহেন্দ্রকে দুই-তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইয়া ধমক দিয়া প্রশ্ন করিলাম—কি কথা হইয়াছিল বল্। বলিতেই হইবে।

মহেন্দ্র মুখ নিচু করিয়া বলিল—সতীবউরাণী সংবাদ শুনিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছিলেন। হুজুর গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কাঁদিতেছ কেন ?

ভবানী দেবী বলিয়াছিলেন—এ তুমি কি করিলে ?

হুজুর বলিয়াছিলেন—কেন কি হইয়াছে ?

—কি হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আমার ব্রত, ধর্মাচরণ সব পণ্ড হইল, আমার লজ্জার সীমা রহিল না। রত্নেশ্বরের সম্মুখে আমি মুখ তুলিয়া কথা বলিব কি প্রকারে ? ইহকালের জন্য আমার পরকাল নষ্ট হইল। জীবনে মাকে ডাকিবার সময় পাইব না। মমতার পাঁকে আবদ্ধ হইয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, মায়ের মুখ ভুলিয়া যাইব, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কি হইয়াছে। তুমি জান, আমার জীবন ভোগের জীবন নয়। একবার বালিকা বয়সে যখন সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলাম না তখন তোমাকে দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলাম। তাহার ফল কি হইয়াছিল তুমি তো জান! নিজে তুমি কত দুঃখভোগ করিয়াছ ভাবিয়া দেখ! বারো বৎসর পর তোমার জীবনসংশয় অসুখের সময় আবার আমি ফিরিয়াছিলাম। সম্ভবত ভুল করিয়াছিলাম। তোমাকে তো বারবার বলিয়াছিলাম ঐসকল কথা!

হুজুর বলিয়াছেন—ভুল আমারও হইয়াছিল সতীবউ। তোমাকে বিবাহ করা আমার ভুল হইয়াছিল। তাহার পর আমার জীবনসংশয়ের সময় তুমি ফিরিয়া আসিলে আমার সকল দুঃখ সকল যন্ত্রণার উপশম হইল বলিয়া তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরা আমার ভুল হইয়াছিল। আমার বাঁচিতে চাওয়া—বাঁচা ভুল হইয়াছে। তোমাকে লইয়া সুখে কালাতিপাত করিব' কল্পনা করা ভুল হইয়াছে। চিকিৎসায় এবং এই পশ্চিম ভ্রমণে জলবাতাসের গুণে নূতন করিয়া জীবন যৌবন ফিরিয়া পাওয়া ভুল হইয়াছে। আমার ভাবা ভুল হইয়াছে—তুমি একান্ত করিয়া আমার। আমার ভাবা ভুল হইয়াছে—আমিই তোমার একমাত্র কাম্য! সবই ভুল হইয়াছে ভবানী, সবই ভুল হইয়াছে!

সতীরাণী মা কেমন হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি শুধু বিহ্বলের মত হুজুরের দিকে তাকাইয়াই

ছিলেন, একটি বাক্য তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হয় নাই।

হুজুর বলিয়া গিয়াছিলেন—বলিতে পার সতীবউ, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ছাড় স্বয়ং মহেশ্বরের সন্তান হইয়াছে বলিয়া তাহারা কি অধার্মিক? ব্রহ্মার-ঔরসজাত পুত্র নাই, তাঁহার মানসপুত্র আছে। পূর্ণব্রহ্মের অবতার রামচন্দ্রের পুত্র হইয়াছে, ভগবান কৃষ্ণের সন্তান হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা কি ধর্মভ্রষ্ট? বল—বল। তুমি বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়াছে, তুমি বল—তোমার উত্তর আমি শুনিতে চাই! বল—বশিষ্ঠের শতপুত্র ছিল বলিয়া কি তাঁহার পত্নীর পরকাল নষ্ট হইয়াছে? সীতার পুত্র লবকুশ, সাবিত্রী শতপুত্রের বর লইয়া স্বামীকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহারা নরকস্থ হইয়াছেন। বল—শুনি!

মহেন্দ্র বলেছিল রত্নেশ্বর রায়কে—হুজুর, আমি হুজুরের পিছন পিছন আসছিলাম, হুজুর রাণীমার ঘরে ঢুকলেন আমিও সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকেছিলাম, কিন্তু রাণীমাকে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে দেখে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপরই কথা আরম্ভ হল। রাণীমায়ের কথা শুনতে শুনতে মনে হ'ল আমি স'রে যাই। কিন্তু হুজুরের গলা তো জানেন, আর তিনি ঠাণ্ডা গলাতেও কথা বলছিলেন না। ঘরখানা গম্‌গম্ করছিল। তার আওয়াজ পেয়ে অন্য চাকরবাকরেরা ঝিয়েরা এসে বারান্দায় উঁকি মারছিল। আমি কি করব? রাণীমায়ের ঘরের দরজাটা টেনে দিয়ে আমি দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাতের ইসারায় সকলকে চলে যেতে বললাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনতে হল। শুনলাম।

তারপরই হুজুর ডাকলেন—মহিন্দর, মহিন্দর!

আমি ঘরে ঢুকে দাঁড়ালাম। দেখলাম—হুজুর রাণীমায়ের বিছানার পাশে ব'সে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমাকে দেখে বললেন—জল জল আন মহিন্দর জল। আর পাখা!

মা মূর্চ্ছা গিয়েছেন।

মাথায় মুখে জলের ছিটে দিয়ে হুজুর ডাকছিলেন—রাণীমার নাম ধ'রে। তাঁর হাত কাঁপছে। হুজুর, আমি চেঁচিয়ে দামিনী ঝিকে ডাকলাম—সে ছুটে এল।

জ্ঞান অল্পক্ষণ পরেই হল। জ্ঞান হয়ে আমাদের সকলকে দেখে একটু হেসে মা বললেন—থাক্—থাক্। কেমন মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। এখন বেশ সুস্থ হয়েছি। থাক্ আর বাতাস করতে হবে না।

হুজুরকে বললেন—যাও, যাও, তুমি এখানে থেকো না। আমার কিছু হয়নি। মাথার শিয়রে বসে থাকতে হবে না। যাও।

তারপর সুলতা, সুরেশ্বর বললে—আর কোনদিন কোনও এমন কথা হয় নি। এর-পর থেকে নাকি ভবানী দেবী ধীরে ধীরে সেরে উঠেছিলেন। নানান রকম খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল। সকালবেলা থেকে বেদানার রস, আঙুরের রস, বাদামের সরবৎ, পেস্তা, কিসমিস, তার সঙ্গে ঘি দুধ প্রচুর পরিমাণে খেতেন তিনি।

আগ্রায় আষাঢ় মাস থেকে প্রচণ্ড গরম আরম্ভ হয়েছিল। তাই আগ্রা থেকে বজরায় দিল্লী পৌঁছে, সেখান থেকে পালকি ঘোড়া, বয়েল গাড়ীতে হরিদ্বারে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর

রায়।

দিল্লীতে এসেই সোফিয়া বাঈজীর বিদায় নেওয়ার কথা। চলে যাবেন আজমীঢ়। চিরজীবনের জন্যই যাবার কথা। কিন্তু আজমীঢ় যাওয়া তার হয় নি। যেতে দেন নি ভবানী দেবী।

হুজুরের যত্ন ভাল হবে না। তা ছাড়া তিনি বলেছিলেন—এবার এসময় আমার দরকার আছে সোফি বাঈ।

সোফি বাঈ আগ্রা থেকেই নীরব হয়ে গিয়েছিল। চুপচাপই থাকত। সে সেলাম ক'রে বলেছিল—আমাকে আপনার দরকার আছে হুজুরাইন?

—হাঁ, দরকার আছে সোফি। এতদিন তুমি তোমার হুজুরকে গান শুনিয়েছ, এবার আমাকে শোনাবে। ভজন শ্রিফ ভজন!

সোফি হেসে বলেছিল—বেশ। তাই হবে! আমি তো একলা হুজুরের বাঁদী নই। আমি আপনারও বাঁদী।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—আরও আছে সোফি বাঈ। তুমি আমার পিতাজীর ধরম বেটী। তাঁর শেষ কাজ আমি করতে পারি নি। সে করেছ তুমি। তুমি আমার বহেন। তাঁর কাছে তুমি শেষ শিক্ষা নিয়েছ, দীক্ষা নিয়েছ। ভজন শিখেছ। সেই ভজন আমাকে শোনাবে। তা ছাড়া হুজুরের তোমার দিল খুস রাখবে কে? আমি তো আর পারব না! তুমি ছুটি নিলে তার ব্যবস্থা তো করতে হবে আমাকে। কিন্তু আমাকেই যে ছুটি নিতে হবে।

মহেন্দ্র সেদিনও কাছে ছিল ওঁদের। কাজ করছিল। রত্নেশ্বরকে সে যা বলেছিল তা তাঁর ডায়রীতে আছে।

"মহেন্দ্রের কথাগুলি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। মহেন্দ্র বলিল—আমার মাতৃদেবীর কথা শুনিয়া সোফি বাঈ নাকি চকিত হইয়া বলিয়াছিল—

—ছুটি? এ কি বাত্ বলছেন দিদিজী?

—হাঁ। ছুটি তো নিতে হবে ভাই। এই অবস্থায় কি আমি তাঁর সেবা করতে পারি! আমার কি সে বল আছে? না হুজুর তোমার আমাকে কাজ করতে দেবেন?

সোফি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তুমি আমাকে ভুলাচ্ছ দিদিজী?

হেসে উঠেছিলেন ভবানী দেবী।

সোফি জিজ্ঞাসা করেছিল—বেশ, কত দিনে ছুটি মিলবে আমার?

—খুদা মালুম সোফি!

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—"আমার ভগবতীর কৃপাধন্যা জননী তাহা হইলে সব অবগত হইয়াছিলেন!"

কার্তিকের প্রথমে হরিদ্বার থেকে দিল্লী ফিরে সেখানে দিন দশেক থেকে ওঁরা ফিরেছিলেন কাশী।

সেও ভবানী দেবীর ইচ্ছায় এবং আগ্রহে। সন্তান কাশীতে হবে।

ছেলে হ'লে নাম রাখবেন—বিশ্বেশ্বর। কন্যা হ'লে নাম রাখবেন—অন্নপূর্ণা।

পুত্র নয়—একটি কন্যা প্রসব করেছিলেন ভবানী দেবী।

বিমলাকান্ত কাশীতে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানীর সাহেব মেমসাহেবদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন বলে তার পদোন্নতিও হয়েছিল। তখন তিনি কালেক্টরেটের এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট হয়েছেন। ডাক্তার দাই এগুলি অর্থাৎ আঁতুড়ে থাকবার লোক ইত্যাদির সব ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। কেউই বিশেষ আশঙ্কা করেন নি। তবে মাসীমারা আশঙ্কা করেছিলেন। এতকাল পরে সন্তান হবে। তার উপর ভবানী দেবীর শরীর আবার যেন কিছু খারাপ হয়ে পড়েছিল—শেষের দু' মাস।

সুরেশ্বর বললে—কথাটা কাশীতে ফিরে আসার পর থেকেই গুছিয়ে বলি সুলতা। ভবানী দেবীর বৃত্তান্ত রায়বাড়ীর সর্বাঙ্গে সর্বকর্মে বোধহয় জড়িয়ে আছে।

ভবানী দেবীও কাশীতে এসে আবার যেন বদলে গেলেন। প্রথম তিন মাস আগ্রা পর্যন্ত তিনি মনে মুহ্যমানা এবং দেহে শীর্ণা হয়েছিলেন। কিন্তু আগ্রা থেকে স্বামীর সঙ্গে ওই কথাবার্তার পর হয়েছিলেন অন্য মানুষ। হাসি আনন্দ যেন তাঁর জীবনের পাত্র থেকে উপ্‌চে পড়ত। সোফির কাছে গান শুনতেন। স্বামীর খাওয়া-দাওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকু ত্রুটি হতে দিতেন না। কিন্তু কাশী ফিরে আট মাসের শেষ থেকে তিনি আবার বদলালেন।

স্বামীকে বললেন—এবার আমাকে ছুটি দাও। এই শরীর নিয়ে আমি যেমন দেখাশুনো করতাম তা আর করতে পারব না। হাঁটতে ফিরতেও আমার কষ্ট হয়।

মহেন্দ্র রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—হুজুর বলেছিলেন—না—না। বেশী হাঁটাহাঁটি তুমি করো না। বিশ্রাম নাও। আমার জন্যে ভেবো না। মহেন্দ্র আছে। তা ছাড়া সোফি রয়েছে। আর মন্দির-টন্দিরে যাওয়াও বন্ধ কর। হাঁটাহাঁটি তোমার ওখানেই বেশী হয়। আর ওই উপোসগুলি। ওগুলিও এখন বাদ দেওয়া দরকার। নেহাত কোন পর্ব হলে—কি একান্ত ইচ্ছে হলে এক একদিন—।

বাধা দিয়ে ভবানী দেবী নাকি মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে হেসে বলেছিলেন—না, তাও আর যাব না। স্নানজল নির্মাল্য আসবে তাতেই হবে।

সুরেশ্বর বললে—ভবানী দেবী এই বয়সে তাঁর এই অবস্থান্তরে লজ্জিত হয়েছিলেন। এবং মনে মনে ক্ষুণ্ণও হয়েছিলেন এর জন্যে। সম্ভবতঃ স্বামীর কাছে ফিরে এসেও তিনি দেহসম্পর্ক-রহিত একটি দাম্পত্যজীবনের কল্পনা করেছিলেন। প্রথম প্রায় এক বছর বীরেশ্বর রায় আংশিক পক্ষাঘাতে রোগীর মতই জীবনযাপন করেছিলেন। সুতরাং এ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব স্বামীস্ত্রীর মধ্যে হয় নি। কিন্তু একবৎসর নিয়ম পালন ক'রে সুচিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেও যেটুকু রোগ অবশিষ্ট ছিল তা থেকেও এই চেঞ্জে যাওয়ার ফলে পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠেই সহজ এবং স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন ফিরে পেতে চাইবেন এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ভোগী মানুষ। দুর্বল ভোগী নয়—সবল ভোগী তিনি। কিন্তু ভবানী দেবী তাঁর বিপরীত। তিনি বারো বৎসর ব্রতপালনের পর স্বামীর রোগশয্যায় ফিরে এসেছিলেন; এবং স্বামী তাঁর পুণ্যেই বেঁচেছেন এই বিশ্বাসবশে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁর তপস্যাকে। তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হল—বীরেশ্বর রায়েরও স্বপ্নভঙ্গ হল।

ভবানী দেবী সন্তান প্রসবের দিন গণনা করে ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ ক'রে রাখলেন। মন্দিরে তিনি যেতেন না তাঁর দৈহিক অবস্থান্তরের জন্ত, কিন্তু ঘরের মধ্যে পূজা পাঠ নিয়েই থাকতেন। স্বামীর কাছে আসতেন দুবার। সকাল এবং সন্ধ্যায়। দুবেলা দুটি প্রণাম ক'রে দু'চারটি কথাবার্তা বলে আপনার ঘরে চলে যেতেন।

একঘরে শোওয়া বন্ধ হয়েছিল। প্রথম কাশীতে আসবার পথে, কাশী পৌছুবার ঠিক আগের দিন থেকে। কাশীতে এসে থেকেই সেই যে একমাস সারাদিন উপোস ক'রে থাকতেন, ভোরে উঠে কাশীর ভিতরে বিমলাকান্তের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে এসে সারাদিন পূজা অর্চনা করতেন, তারপর সন্ধ্যায় আরতি দেখে বাড়ী ফিরতেন—তখন থেকে।

ব্রত উদ্‌যাপনের পরও পনেরদিন কাশীতে ছিলেন—তখনও সেই নিয়ম ভাঙেন নি। তারপর সারা তীর্থ ঘোরার চার পাঁচ মাস সেই নিয়মই বজায় রেখেছিলেন।

আগ্রাতে সন্তানসম্ভবা হয়েছেন এই কথাটা যখন ডাক্তার কবিরাজে বলে গেল, তখন স্বামীস্ত্রীতে যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল—যার কথা একটু আগেই তোমাকে বলেছি সুলতা—যার পর ভবানী দেবী স্বামীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেও এই নিয়মটুকু ভাঙেন নি।

তবে একটা নিয়ম নতুন করেছিলেন। হরিদ্বার থেকে ফিরে কাশী ফেরা পর্যন্ত সোফি বাঈ থাকত স্বতন্ত্রভাবে, জলপথে স্বতন্ত্র বজরায়, কাশীতে আগ্রায় হরিদ্বারে স্বতন্ত্র কুঠীতে; সেখান থেকে সে আসতো-যেতো নিয়মমাফিক, সকালে জলখাবার সময় ফল কেটে আনত, পান আনত, গান শোনাতো, দুপুরে খাওয়ার সময় এসে দূরে ব'সে থাকত; পান আনত; বড় রায়হুজুর শুলে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে কথা বলে মনোরঞ্জন ক'রে ঘুম পাড়াতো; আবার সন্ধ্যের সময় গানের মজলিসে আসত। হরিদ্বার থেকে সন্ধ্যের মজলিসও বসত বড় রায়হুজুরের শোবার ঘরে, সেখানে ভবানী দেবী থাকতেন। তারপর সোফি বাঈ চলে যেত। এবার কাশীতে ফিরে ভবানী দেবী বললেন—সোফি থাকবে এই বাড়ীতেই, দোতলায়। ভবানী দেবীর কামরা এবং বড় হুজুরের কামরা একেবারে পুব দিকে, সোফির জন্তে নির্দিষ্ট হল একেবারে পশ্চিম দিকের কামরা। আর বদল হল হুজুরের সঙ্গে ভবানী দেবীর কামরায়। একেবারে পূর্বদিকের কামরাখানা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট—কামরার পূর্বের জানালার নিচেই গঙ্গা এবং দক্ষিণদিকের জানালা খুললে অবারিত দক্ষিণই শুধু পাওয়া যায় না, গঙ্গাও খানিকটা পাওয়া যায়। রায়হুজুরকে দিলেন তার পাশের ঘরখানা, যেখানায় প্রথমবার তিনি থাকতেন।

সুরেশ্বর বললে—তোমার কি মনে হবে বা হচ্ছে তা আমি জানি না সুলতা, তবে আমার মনে হয়েছে বা এখনও আমার তাই বিশ্বাস যে ভবানী দেবীর ওই নতুন ব্যবস্থার মধ্যেই তাঁর নিজের ভবিষ্যত তিনি নিজে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে আমাদের রায়বাড়ীতে একটা প্রবাদ আজও রয়ে গেছে। মেজঠাকুমা বলতেন—পুণ্যবতীর কাজ ফুরলো, কিন্তু যাই যাই করেও স্বামীর মমতায় যেতে পারছিলেন না; তাঁর ইষ্ট তাঁকে সন্তানধারণের লজ্জা দিয়ে চৈতন্ত দিলেন—বললেন—বাঁচবি আর? বাঁচতে হলে, এই সংসারপঙ্কে ডুবতে হবে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস ভাগ্য তোর সধবার ভাগ্য, ভাগ্যের

ফলফুল ধরতে হবে। তা আমার দিদিশাশুড়ী প্রথম নাকি স্বপ্নে বলেছিলেন—মা, আমি স্বামীকে কাছে পেয়েও সে ব্রত পালনের ধর্মকে ধ'রে থাকব। কিছুদিন সংসার আমাকে ভোগ করতে দাও। ইষ্টদেবী বলেছিলেন—'বেশ তাই কর।' বলে হেসে মিলিয়ে গিয়েছিলেন। তা না-হলে না কি স্বামী বেঁচে উঠলেই তাঁর যাবার কথা ছিল। তা একবছর পার হয়ে দু বছরের বছরেই থাকার মাশুল দিতে হল। সধবা মেয়ে, ফল ধরতে হল। তখন সতীবউয়ের চোখ খুলল। মনে মনে মাকে ডেকে বললেন—আর নয় মা। ভোগের সাধ আমার মিটেছে। আমাকে এবার পায়ে টেনে নে। মা বললেন—তথাস্তু। সংসারে থাকার যে ফলটি জীবনে ফলেছে, ওই ফল বোঁটা খসে মাটিতে পড়ুক—তখন আসব। নিয়ে যাব।

এই স্বপ্নের কথা কে তৈরী করে চালু করে গিয়েছিল তা জানিনে। সুরেশ্বর বললে—তবে আমার মেজদি আমাকে কথাটা বলেছিলেন এবং আজও পর্যন্ত একথা রায়বাড়ীর মেয়েরা প্রায় সবাই জানে এবং বিশ্বাস করে। সে অর্চনাও করে।

সুলতা বললে—তোমার কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয়, সে নিজেই ভবানী দেবী, জন্মান্তরে রায়বাড়ীর ঋণ শোধ করতে এসেছে—একথাও বিশ্বাস করে অর্চনা।

—হ্যাঁ—তা বোধহয় করে। আগে ছেলেবেলায় তো করতই। তবে এখন এম-এ পাশ করেছে, এখন সেটা ততটা শক্ত আছে কিন জানিনে।

সুলতা বললে—ছেলেবেলার বিশ্বাস সহজে মরে না। আমি ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে, আমার ঠাকুরদা'র ঠাকুরদা ঠাকুরদাস পালকে কিছুতেই তোমার আঁকা ছবির মত চেহারায় কল্পনা করতে পারি নে, বিশ্বাস করতে পারিনে। মনে হচ্ছে তুমি জমিদারীর অহঙ্কারে চাষী ঠাকুর-দাসকে এমনি ক'রে এঁকেছ।

—ঠাকুরদাস পালের যে ছবি আমার আঁকা ছবির মধ্যে রয়েছে, তা কল্পনার ছবি নয় সুলতা। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের আমলে ফটোগ্রাফের রেওয়াজ হয়েছে। রত্নেশ্বর রায় অনেক ফটোগ্রাফ তুলিয়েছেন—তার মধ্যে চার পাঁচখানা গ্রুপ ফটো আজও আছে। বিবর্ণ নিশ্চয় হয়েছে, কিন্তু তবুও ঠাকুরদাসকে সবগুলোতেই চেনা যায়। আমি তাকে যেমনটি পেয়েছি তেমনটি এঁকেছি। দেখাতে পারি।

—আমাকে দেবে সেখানা?

সুরেশ্বর হেসে বললে—দেব। কিন্তু কি করবে নিয়ে?

সুলতা বললে—দেওয়ালে ছবি দিয়ে জিনিওলজি তৈরী করব। আমাদের বাড়ীর জীবনের অহঙ্কারকে একটু সংযত করব। যা ছিলাম—যা হইয়াছি। 'যা হইব'—তার ছবি পার তো একখানা এঁকে দিয়ো।

—কিন্তু কতদিন পরের ভবিষ্যৎ সেটা বল? চরম ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে পারি। সেটা আমি ভবানী দেবীর মত জানি। তার এদিকের যে ভবিষ্যৎটুকু সেটা আমার অজানা। ভবানী দেবী একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে। তিন মাস পর মাঘ মাসে তিনি একটি কন্যা প্রসব করে মারা যান। কাশীর সিবিল সার্জেন থেকে ভাল ডাক্তারদের ডেকে বীরেশ্বর রায় ডাক্তারের হাট বসিয়ে দিয়েছিলেন। সিবিল লাইনের একজন মেমসাহেব মিড-

ওয়াইফকে এনেছিলেন ডেলিভারির জন্তে। তিনদিন লেবার পেনের পর ডেলিভারী হল। হ'ল কন্যাসন্তান। তারপর হ'ল ভবানী দেবীর জ্বর। সেই জ্বরে আর তিনদিন পর তিনি মারা গেলেন।

সেদিন তিথি ছিল পূর্ণিমা। মাঘীপূর্ণিমা হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যতিথিগুলির মধ্যে একটি। মাঘী পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা।

মৃত্যুর পর ভবানী দেবীর হাতবাক্স থেকে চিঠিখানা পেয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রায়বাড়ীর পুরনো কাগজ ঘেঁটে অনেক মূল্যবান দলিল পেয়েছি; বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জী পেয়েছি; রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের তিরিশ বছরের ডায়রী পেয়েছি; দেবোত্তরের সিন্দুকের মধ্যে তাড়াবাধা চিঠির মধ্যে সোমেশ্বর রায়—রাণী কাত্যায়নীর প্রেমপত্র পেয়েছি; বীরেশ্বর রায়কে শ্যামাকান্তের গোপন সাধনার কথা লিখে যে পত্র ভবানী দেবী লিখেছিলেন তাও পেয়েছি। চন্দন কাঠের বাক্সে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের কীর্তিহাটের পাঁচালী পেয়েছি, কিন্তু ভবানী দেবীর এই চিঠির মত মূল্যবান আমি আর কিছু পাই নি। চিঠিখানা আমি অহরহ সঙ্গে রাখি। রাত্রে মাথার বালিশের তলায় রেখে শুই। ছবি আঁকবার আগে বা কোন কাজ করবার আগে কপালে ঠেকাই।

জামার ভিতরের পকেট থেকে একটি সুদৃশ্য মরকো লেদারের নোটকেস বের করে তার ভিতর থেকে একখানি বিবর্ণ কাগজ বের করে সযত্নে ভাঁজ খুলে সামনের টেবিলের উপর সে মেলে ধরলে।

—এই দেখ।

সুলতা দূর থেকেই চিঠিখানার হস্তাক্ষর দেখে বিস্মিত হল। গোটা গোটা সেকালের ছাঁদের হস্তাক্ষর, কিন্তু ভারী সুন্দর। আরও একটা কথা—লেখাগুলি এতটুকু অস্পষ্ট হয় নি, কালী যেন জগ্‌জগ্‌ করছে। কালী সম্পর্কে বিস্ময় তার ছিল না, কারণ সোসিওলজি সম্পর্কে রিসার্চ করতে গিয়ে অনেক পুরনো পুঁথি সে ঘেঁটেছে। তার মধ্যেও এই কালীর দীপ্তি সে লক্ষ্য করেছে। সেকালে এদেশে লোহার কড়াইয়ে নানারকম জিনিস ভিজিয়ে তার কষ থেকে কষের কালী তৈরীর কথা সে জানে। একটা উপাদান—হীরাকষের নামও তার মনে আছে।

চিঠিখানার উপর সাগ্রহে সে ঝুঁকে পড়ল। প্রথমেই সম্বোধনটা বড় ভাল লাগল।

* * *

জন্মজন্মান্তরের পরমারাধ্য প্রিয়তম

স্বামীন—

দাসীর শেষ প্রণাম নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ করুন। শেষমুহূর্তে আমার জ্ঞান থাকিবে না —সেই কারণে আমি প্রণাম এই পত্র নিবেদন করিয়া রাখিলাম।

সন্তান প্রসব করিয়াই আমার জীবনের পালা সম্বরণ করিতে হইবে, ইহাই দৈবাদেশ। সজ্ঞানে আপনাকে দেখিয়া দেহত্যাগে দুঃখ অনুভব করিব বলিয়াই মা'র নিকট ইহাই আমি চাহিয়াছিলাম। জানি তুমি ইহা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু বিশ্বাস করিও—দৈবাদেশ স্বপ্নযোগেই হইয়া থাকে। ইহা বিশ্বাস করিও। তোমাকে কতদিন তো বলিয়াছি, স্বপ্নযোগে

মায়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তার কথা। বারো বৎসরের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আসিয়া—তোমার অসুখের কথা শুনিয়া—ব্রত অসম্পূর্ণ রাখিয়া তোমার শিয়রে আসিয়া বসিয়াছিলাম। মা তোমাকে বাঁচাইলেন। আমাকে বলিলেন—তুই ফিরিয়া আয়। কিন্তু তোমাকে ফিরিয়া পাইয়া যাইতে দুঃখবোধ করিলাম। নয়নযুগল হইতে অশ্রু বিনির্গত হইল। জননী হাসিলেন। বলিলেন—থাকিলে এয়োতী নারীর ফল ভোগ করিতে হইবে! ফল ধারণ করিয়া সৃষ্টির নিয়ম মানিতে হইবে। পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াও শিবের প্রতি এমত আকর্ষণে ফিরিয়া উমা হইয়া গিরিরাজতনয়া হইয়াছিলেন। এবং শিবকে লাভ করিয়া, যিনি নিজেই মহাপ্রকৃতি, তাঁহাকেও ফল ধরিতে হইয়াছে। স্বকীয় অঙ্গের হরিদ্রা হইতে গঠন করা পুতুল জীবিত হইয়া গণেশ হইল অতঃপর কার্তিকের। কার্তিকেয়ের জন্ম শিব উমার সহিত রতিরঙ্গে মাতিয়াছিলেন।

এ স্বপ্নের কথা তোমার নিকট নিবেদন করিয়াছিলাম। এই দিবস তুমি আমাকে বলিলে—দেখ ভবানী, ইতিপূর্বে তুমি আমাকে অনেক স্বপ্নের কথা বলিয়াছ, আমি এ সম্পর্কে কোনপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করি নাই বা উত্তর প্রদান করি নাই। শুনিয়া তোমার তৃপ্তির জন্ম কখনও হাস্যসহকারে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছি, কখনও কৃত্রিম বিস্ময়-প্রকাশ করিয়াছি—কখনও শঙ্কা প্রকাশ করিয়া তুমি যে প্রকার দেবপূজা বা গ্রহস্বস্ত্যয়ন করিতে চাহিয়াছ, তাহাতেই মত দিয়াছি। কিন্তু আজ যে স্বপ্নের কথা বলিতেছ, ইহার উত্তর আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত না দিয়া উপায় নাই। কথাটা হইল কি জান, স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না, বা সত্য নহে; দিবাভাগে জাগ্রত অবস্থায় মনুষ্যসকল যে প্রকার চিন্তাভাবনা করিয়া থাকে বা যে সমস্ত ঘটনা সমুদয় সংঘটিত হইয়া থাকে, নিদ্রিত অবস্থার মধ্যেও সেই সকলই কিছুটা এলোমেলো হইয়া বা যেমত তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় বা বিশ্বাস তদনুসারে পরিবর্তিত হইয়া স্বপ্ন হইয়া দেখা দেয়।

যেমন ধর—তুমি ক্রমাগতই দেবতার কথা ভাবিয়া থাক। তাহাতে তোমার অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস; সুতরাং তিনিই তোমাকে দেখা দিয়া কথা বলিয়া থাকেন। তোমার মনে হইয়াছে যে—তুমি ব্রত উদ্‌যাপন স্থগিত রাখিয়া আমার অসুখের সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলে এবং আমি পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া বাঁচিলাম। তাহাতে তোমার ধারণা হইল যে, এমত কঠিন অসুখ হইতে যখন আমি বাঁচিলাম তখন তাহার মাশুলস্বরূপ তোমার জীবন দিতে হইবে। যা আমার জীবনলাভেই তোমার তপস্যা পূর্ণ হইল—এবার তোমাকে যাইতে হইবে। এবং এতদিন ব্রহ্মচর্য করিয়াছ, তপস্যা করিয়াছ, তাহার ফলে তোমার মনে ধারণা হইয়াছে যে, ইহার পর সন্তান ধারণ করা তোমার পক্ষে পাপ বা শাস্তিস্বরূপ হইবে। সুতরাং এমতপ্রকার স্বপ্ন তুমি দর্শন করিয়াছ।

আমি খুবই আঘাত পাইয়াছিলাম। তাহার কিছুটা তুমি অনুভব করিয়াছিলে। এবং কিছুক্ষণ পর আবার আমাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিয়াছিলে—ভবানী, আমি ভাবিয়া দেখিলাম আমার কথা ভুল; আমি এতকাল নাস্তিক ছিলাম, সেইমত আচরণ করিয়াছি; সেইহেতু এতবড় দৃষ্টান্তের এবং শিক্ষার পরও মূঢ়ের মত তোমার কথায় প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু তুমি চলিয়া গেলে অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে আমি সত্যই মূঢ় ভ্রান্ত। দেখ,

যতবার এমত চিন্তা মনে উদিত হইল ততবারই ঐ কোণে একটা টিকটিকি টকটক করিয়া উঠিল। এবং আরও আশ্চর্যের কথা ততবারই বাহিরে হাঁচির শব্দ শুনিয়াছি। এবং আরও আশ্চর্যের কথা আমার মনের মধ্যেও বারবার মায়ের মূর্তি ভাসিয়া উঠিল।

আমাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য তুমি মায়ের একটি বিশেষ পূজা দিতে বলিয়াছিলে। পূজার পর নির্মাল্য ও চরণোদক গ্রহণ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলে—এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলাম।

সেই রাত্রে তুমি আমাকে বলিয়াছিলে—দেখ ভবানী, একটি শ্যামাসঙ্গীত আছে। আয় মা সাধনসমরে। দেখি মা হারে কি পুত্র হারে। আমাকে গাহিতে বলিয়াছিলে, আমি গীতখানি গাহিলাম, শেষ হইবামাত্র বলিলে—ভবানী, অতঃপর আমরা যতদিন বাঁচিব, ততদিন এবম্প্রকার সাধনসমরই করিব মায়ের সঙ্গে। আমার দেহের তো এমতপ্রকার অবস্থা। এই অবস্থাই আমাকে এই সাধনজীবনে সাহায্য করিবে। আমরা সংসারে যতদিন বাঁচিব ততদিন ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণীর মতই জীবনযাপন করিব। দেখাই যাউক না-কেন—'মা হারে কি পুত্র হারে ?'

আমি আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। কিছুদিন বেশই ছিলাম—সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলাম তোমার বিশ্বাস এবং আমার বিশ্বাস এক হইয়াছে।

কিন্তু মায়ের বিচিত্র পাকচক্র দেখ, মদীয় পিতৃদেবের সন্ধানের নিমিত্ত সোফিকে আহ্বান করা হইল এবং মা সেটা করাইলেন আমাকে দিয়াই। আমার ডাকে নির্ভয়ে সে আসিল এবং কথাবার্তার পর যখন তাহাকে বিদায় দেওয়া হইল তখন রত্নেশ্বর কথাবার্তাগুলি শুনিয়া এবং সমস্ত বিবরণ জানিয়া সোফিকে সেই তোমাকে গান শুনাইবার জন্য নিযুক্ত করিল। ভয় করিল—সোফি স্বাধীন থাকিলে হয়তো বা কথাটা প্রকাশ করিয়া দিতে পারে। এবং আশ্চর্যের কথা—আমার মনে হইল—আমি বাঁচিলাম, তুমি পুরুষ এবং ভোগী, তোমাকে তুষ্ট করিবার একজন লোক পাইলাম—তাহাকে আড়াল দিয়া আমি বাঁচিব।

তুমি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলে। আমি সোফিকে আরও বেশী করিয়া সামনে আনিলাম। কিন্তু তুমি তাহাকে অবহেলা করিয়া আমাকেই আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে। রত্নেশ্বরকে যজ্ঞ করিয়া গ্রহণ উপলক্ষ্যে তুমি তাহাকে কীর্তিহাট লইয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলে না। কিন্তু আমিই জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম।

তোমার মনে পড়িবে—আমি বলিয়াছিলাম—একনিষ্ঠভাবে সে তোমার মনোরঞ্জন করিয়া তোমার একধরনের পত্নীত্ব লাভ করিয়াছে। মহাভারতে মহাত্মা বিদুরের গর্ভধারিণী দাসী ছিলেন। ইহা আমাদের শাস্ত্রে আছে। তুমি কোন উত্তর প্রদান কর নাই। তবু লইয়া যাইতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলে। এই কারণেই তাহাকে আমি সকালে তোমার ফল কাটিয়া আনিবার ভার দিয়াছিলাম। তুমি যত সুস্থ হইতেছিলে তত বেশী করিয়া আমাকে টানিতে-ছিলে। আমি তোমাকে ছাড়িয়া মরিতে চাহিতেছিলাম না অথচ ভয় হইতেছিল—সাধনসমরে হয় তো হারিয়া যাইব। মনে কর আমরা সন্তানাদির কামনা করি নাই বলিয়া রত্নেশ্বরের অনুকূলে দানপত্র সমাধা করিয়া দিবার পরামর্শ করিয়াছিলাম।

তাহার তীর্থযাত্রার পথে গয়া হইতে ফিরিয়া পাটনায় সেদিন সকালে সোফি ছিল না,

আমার পূজা শেষ করিতে বিলম্ব হইয়াছিল—তুমি রাগ করিয়াছিলে—তোমার সন্তোষ সাধন করিতে গান গাহিলাম, তুমি পাখোয়াজ সঙ্গত করিয়া উল্লাসে বলিয়া উঠিলে—আমি ভাল হইয়া গিয়াছি। ছড়ি ছাড়িয়া হাঁটিতে লাগিলে, খানিকটা ব্যায়াম আরম্ভ করিলে, আমি সুখী হইলাম, কিন্তু তুমি যখন আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতে, তখন ভয় পাইতাম। আরও ভয় পাইতাম দর্পনে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া। আমারও যেন যৌবন ফিরিয়াছে। মাসীমারা বলিলেন—গঙ্গার বাতাসে, পশ্চিমের জলে, আমার শরীর সারিতেছে। এবং জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে এই সময় মা আমাকে আর স্বপ্নে দেখা দেন নাই।

কিন্তু যেদিন তুমি সোফিকে নাচিতে হুকুম করিলে, সেদিন আমি চমকিয়া উঠিলাম। শঙ্কিত হইয়া চিন্তা করিলাম—নাচ দেখিতে শখ হইল কেন? সোফির কটাক্ষ, তাহার অঙ্গের হিল্লোল লীলা দেখিয়া তোমার পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম এবং আমার নিজের মধ্যেও কামনা জাগিয়াছিল—ইহা অস্বীকার করিব না।

তাহার পর যাহা হইল তাহা হইয়া গেল। কুশীর মুখে গলিত ঘৃতধারা যখন অগ্নিকে আকৃষ্ট করে তখন ঘৃতের ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই থাকে না, সে আত্মসমর্পণই করে। আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতে গিয়াও পারি নাই।

সেইদিন রাত্রে মনে হইল—এ কি হইল। এ কি করিলাম? সাধনসমরে পরাজিত হইলাম। অনেক কাঁদিলাম। শেষরাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন স্বপ্ন দেখিলাম। মা দেখা দিয়া মৃদু মৃদু হাসতেছিলেন। মাকে বলিলাম—মা, আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। এইবার চরণে স্থান দাও। টানিয়া লও।

মা বলিলেন—সংসারে থাকিতে চাহিয়াছিলে, তাহার ঋণ শোধ কর। তৎপর তোমাকে টানিয়া লইব। মৃত্তিকাবক্ষে বৃক্ষ জন্মে, রস শোষণ করে, তাহার ঋণ শোধ হয় ফলদানে। তোমাকেও ফল দিতে হইবে।

কিন্তু তাহাতেও আমি দমিত হই নাই। আমি যেন ফলবতী না হই এই জন্য কাশীতে বিশেষ সঙ্কল্প লইয়া কঠোর ব্রত করিলাম। তোমার নিকট হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিলাম। লোকসমাজে কি করিয়া মুখ দেখাইব ভাবিয়া পাইলাম না। আপ্রায় তোমার সহিত কলহ হইল। তুমি কঠিন কথা বলিলে। তখন সোফির শরণাপন্ন হইলাম। সোফি আমার ভগ্নী-তুল্যা। তোমার দিক দিয়াই নয়, আমার ধর্মের দিক দিয়াও বটে। তাহাকে ডাকিয়া সব খুলিয়া বলিয়া বলিলাম, সোফি তুমি আজমীঢ় যাইও না। তুমি এখানে থাক। আমাকে রক্ষা কর। ভগ্নীর কার্য কর। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম হইলেও তুমি তাঁহাকে ভজনা করিয়াছ, তাঁহাকেই চাহিয়াছ; আমার বাবার কাছে দীক্ষা লইয়া তুমি ধর্মেও আমাদের ধর্ম পালন করিতেছ। এ জন্মে তুমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শান্ত হও। তুমি নূতন করিয়া তাঁহার মনোহরণ কর। তাহাকে টানিয়া লও।

এ সব বৃত্তান্ত তুমি সোফিকে জিজ্ঞাসা করিলেই জ্ঞাত হইবে। সে কখনই মিথ্যা বলিবে না। সে আমার অনুরোধে, আদেশে নূতন করিয়া সাজিল, নূতন করিয়া অঙ্গ মার্জনা করিল, বেণীবন্ধন করিল। আমি সেই সুযোগ দিবার জন্য তাহাকে প্রায়ই নৃত্য দেখাইতে আদেশ

করিয়াছিলাম।

তুমি আকৃষ্ট হইলে। তাহার নিকট ধরা দিলে। তখন তোমার শরীর নীরোগ, দেহে পূর্বের বল পাইয়াছ, বলিতে কি তোমাকে দেখিয়া আমারই মনে হইত তুমি সেই যৌবনের বীর নবযুবক!

আমি সোফিকে অধিক করিয়া তোমার দিকে ঠেলিয়া দিলাম। কাশীতে আসিয়া সেই কারণেই সোফিকে দোতলায় স্থান দিলাম, তোমার সঙ্গে ঘর বদল করিয়া এক পাশের ঘর লইলাম এবং তোমার ঘরে সোফির আসা-যাওয়ার পথের সব সঙ্কোচ ঘুচাইয়া দিলাম।

স্বামীন, পরম দেবতা, আমি নিশ্চিত জানি, আমার সংসার ভোগের অনিবার্য ফল প্রসব করিয়াই আমাকে যাইতে হইবে। আগ্রাতে তুমি আক্ষেপ করিয়া প্রকারান্তরে আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলে যে, সংসারে মানুষ যাহারা, তাহারা যেন দেবী অংশোদ্ভূতা যাহারা তাহাদিগকে বিবাহ না করে। তাহারা বিবাহ করিয়া স্বামীকে সেবা করে, ভালবাসে, স্বামীকে পাইবার জন্য নয়, দেবতাকে পাইবার জন্য। সংসার করে, স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য। পরজন্মে বা লোকান্তরে তাহারা স্বামীকে কামনা করে না, তাহারা কামনা করে দেবতাকে। বন্ধনে তাহারা আবদ্ধ হয়, বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য।

স্বামীন্, কথাটি আমি মনে মনে অনেক আলোচনা করিয়াছি। কথাটি এক হিসাবে সত্য বটে। কি করিয়া অস্বীকার করিব? কিন্তু এই হিসাবটি তো মায়া-মোহের মিথ্যা হিসাব। ইহাই তো শাস্ত্রোক্ত পথ। তোমার কথাটি ভাল লাগিবে না। কারণ তোমার অনেক বাসনা আছে। আরও অনেক জন্ম তোমাকে পৃথিবীতে আসিতে হইবে। আমার এই জন্মেই মুক্তি নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং ইহাই অবশ্যম্ভাবী। তুমি যেন আর বিবাহ করিও না। আমার স্বার্থের জন্য বলিতেছি না। তোমার স্বার্থের জন্য বলিতেছি। কারণ নিজের শক্তি না বুঝিয়া তুমি সকল সম্পত্তি রত্নেশ্বরকে দান করিয়াছ। বিবাহ করিয়া নূতন সংসার করিলে নিদারুণ অশান্তি ও পুত্রের সঙ্গে কলহ আরম্ভ হইবে। সে কলহে অর্থাৎ মামলা-মোকদ্দমায় রায়বংশের এবং আমার পিতার সাধনভ্রষ্টতার সকল রহস্য প্রকাশ পাইবেই।

এ সম্পর্কে আমি দাদার সঙ্গে কৌশলে আলোচনা করিয়াছি।"

সুলতা এবং সুরেশ্বর এক সঙ্গেই চিঠিখানা পড়ে যাচ্ছিল। সুরেশ্বর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে ভবানী দেবীর দাদা বিমলাকান্ত; বুঝতে পারছ সুলতা?

সুলতা ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ, তা সে বুঝেছে।

তারপর পড়ে গেল—

"দাদাকে বলিলাম, দাদা সম্পত্তি তো রত্নেশ্বরকে দানপত্র করা হইয়াছে। এখন যে সন্তান হইবে তাহার কি হইবে?

দাদা বলিলেন—রত্নেশ্বর অবশ্যই তাহাকে তাহার অংশ দিবে। সে তোমার সন্তান। বীরেশ্বরেরই পুত্র। দানপত্র করিয়াছে বলিয়া কি সে অংশ দিব না এমন কথা বলিতে পারে?

আমি বলিলাম—দাদা, বিষয় বিষের তুল্য। ইহা দেবতাকেও স্বার্থপর করে। মানুষকে অমানুষ করে।

দাদা বলিলেন—তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। তবুও রত্নেশ্বর তাহা পারিবে না।

আমি বলিলাম—মা কালী তাহাই করুন। বাবা বিশ্বনাথ তাহাকে সেই সুমতিই যেন দেন। কিন্তু আইনটা কি? আইনের বলে পাইতে পারিবে কি?

দাদা বলিলেন—না। দানপত্রের অর্থই হইল যে, দানপত্র সহি এবং রেজেষ্ট্রী হইবামাত্র সেই মুহূর্ত হইতে গ্রহীতা মালিক হইল। দাতা আর কোনরূপেই তাহা নাকচ করিতে পারিবেন না। তবে অনেক সময় এমন মামলা হইয়া থাকে, দাতা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, তিনি অসুস্থ, বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন। তাহা ব্যতীত এ ক্ষেত্রে যদি সকল কথা অর্থাৎ রত্নেশ্বর বিমলার গর্ভজাত আমার পুত্র হিসাবে স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয় সোমেশ্বর রায়ের পৌত্র নহে, সে বীরেশ্বরের ঔরস-জাত পুত্র, কেবলমাত্র বিমলার পুত্র চুরির অপরাধ গোপনের জন্য এমত প্রচার করা হইয়াছিল, তাহা হইলে সবই নাকচ হইয়া যাইবে। দৌহিত্র হিসাবে সোমেশ্বর রায়ের উইলসূত্রে সে যে আট আনার মালিক, তাহার মালিকও বীরেশ্বর হইবেন এবং পোষ্যপুত্র হিসাবে যে আট আনা দান করিয়াছেন, তাহাও নাকচ হইবে। সুতরাং চিন্তা করিও না। এ কার্য রত্নেশ্বরও করিবে না। বীরেশ্বরও করিবে না। তাহাতে আমাদের পিতৃদেবের মর্মান্তিক কথা এবং শ্বশুর মহাশয়ের মনোহরা যোগিনী লইয়া কেলেঙ্কারির কথা সমুদয় প্রকাশ হইয়া যাইবে। সমগ্র দেশে রায়বংশের আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না।

এই কথা তোমাকেও প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তুমি বলিয়াছিলে, নিশ্চিন্ত থাক। রত্নেশ্বর এমত করিবে না। যদি করে তাহা হইলেও চিন্তা নাই। কলিকাতার বাটী, সম্পত্তি এবং নগদ কারবারের যে টাকা আছে, তাহা সমুদয় আমি আমাদের এই সন্তানকে দিব। তাহা ব্যতীত আমার পিতামহের আমল হইতে কিছু হীরা জহরতের সঞ্চয় আছে। আমার পিতৃদেব সে সঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে হাত দিই নাই। মধ্যে মধ্যে দু-চারিখানা কিনিয়াছি। পিতৃদেব এ সঞ্চয় দৌহিত্রকে দেন নাই। আমাকেই দিয়াছিলেন। তাহার মূল্যও অন্ততঃ তিন লক্ষ টাকা। ওই সকল জহরতের মূল্য এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিলাতের লর্ডদের এই সকল রত্নরাজিতে ঝোঁক বাড়িয়াছে। এ সমুদয় হইতে আমি আর একটা কীর্তিহাট এস্টেট গড়িয়া তুলিব।

একটি সন্তানের তাহাতে ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু আমার পর বিবাহ করিলে তাহার গর্ভে চার-পাঁচ বা ততোধিক সন্তান জন্মিলে কি করিবে? এবং তাহাদের যিনি জননী হইবেন, তিনিই বা মানিবেন কেন? সন্তানেরাই বা শুনিবে কেন?

তুমি ভাবিও না আমি আমার সন্তানদের স্বার্থহানির কথা চিন্তা করিয়া এ সকল কথা লিখিতেছি। আমি ইহা লিখিতেছি এই বংশ-কলঙ্ক প্রকাশ হইয়া যাইবে আশঙ্কায়।

তুমি সোফিয়াকে লইয়া থাকিও। সোফিয়া বাঈজী হইলেও এতকাল ধরিয়া তোমাকে ভজনা করিয়াছে, তোমার প্রতি তাহার প্রেম অতি গভীর। সে আমার মত নয়। সে তোমাকেই চায়, মুক্তি সে চাহে না। সে আজমীঢ় না গিয়া তোমাকে পাইবার আশা পাইয়া ফিরিয়াছে। সে আমারই মত তোমার সেবা করিবে। সম্ভবতঃ অধিক মাত্রায় করিবে।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। কি আর লিখিব? তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া এ জীবনে

আমার সকল সাধই পূর্ণ হইয়াছে। তুমি ছাড়া আর কাহারও সহিত বিবাহ হইলে—সে আমার বারো বৎসর ব্রতকাল পর্যন্ত বিবাহ না করিয়া থাকিত না। এবং তাহার সংসারে আমার আর স্থান হইত না। এবং ভাগ্যের চক্রান্তে যে সন্দেহ তুমি করিয়াছিলে তাহাই লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া আমার ললাটে কলঙ্ক কালিমা লেপিয়া দিত। রত্নেশ্বরের ভাগ্যেও লাঞ্ছনার অন্ত থাকিত না।

আমার অসংখ্য কোটি প্রণাম গ্রহণ করিও। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিও। আমার অপরাধ মার্জনা করিও।

আমার সন্তান বাঁচিলে—বাঁচিবে বলিয়াই মা বলিয়াছেন, এবং সন্তান কন্যাসন্তান হইবে, তাহাকে তুমি প্রতিপালনের জন্য দাদা এবং বউদিদির হস্তে অর্পণ করিও। রত্নেশ্বরকে দিয়া আবার তাহাকে কাড়িয়া লইয়াছি। দাদার বিবাহ আমিই দিয়াছিলাম। অদ্যাপি তিনি নিঃসন্তান! দাদার মনে ক্ষোভ আছে। তুমি এই সন্তান তাঁহাকেই মানুষ করিতে দিও। তুমি সোফিকে লইয়া কলিকাতায় বাস করিও। রত্নেশ্বর বংশের অভিশাপ ব্যর্থ করিবে বলিয়াই বিশ্বাস করি। রায়বংশ ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

পরমারাধ্য প্রিয়তম স্বামীন, দাসী শ্রীচরণে বিদায় লইতেছে।

ইতি
প্রণতা
ভবানী।

এ-চিঠিখানা রায়বাড়ীতে ছিল না। এ-চিঠি পরে পেয়েছি আমি অন্নপূর্ণা দেবী—রত্নেশ্বর রায়ের সহোদরার কাছে। তার জন্ম ১৮৬২ সালে, ১৯৩৭ সালেও তিনি বেঁচেছিলেন। তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না—তাঁকে দেখিনি আমি। এবং রায়বংশের সঙ্গে তাঁর বিয়ের পর থেকে কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি রাখেননি।

সুলতা—তার মূল কারণ জমিদারী এবং সম্পত্তি।

বিয়ের পর তাঁর সন্তান হতেই, তাঁর শ্বশুরেরা বীরেশ্বর রায়ের যে অর্ধেক অংশ পোষ্যপুত্র রত্নেশ্বরকে দান করেছেন, তার উপর দাবী তুলেছিলেন। বলেছিলেন—কন্যা জন্মাবার পূর্বে বীরেশ্বর পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন তাঁর সন্তান নেই বলে। কিন্তু পরে সন্তান যখন হয়েছে, কন্যাও সন্তান, তার সন্তানেরাই বীরেশ্বরের বিত্তাধিকারী, সুতরাং এই পোষ্যপুত্র গ্রহণ সিদ্ধ নয়, এবং সে-সময় বীরেশ্বর রায় পক্ষাঘাতে অসুস্থ ছিলেন। সে-রোগ তাঁর কখনওই সারেনি। তার প্রমাণ, ভবানী দেবীর মৃত্যুর দেড় বছর পর আবার তিনি পক্ষাঘাতে একেবারেই পঙ্গু এবং স্মৃতি ও বাকশক্তি হারিয়েছিলেন; তার কিছুদিন পরই তাঁর মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় সই-করা দানপত্র এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণ অসিদ্ধ। তা নাকচ হতে বাধ্য।

তোমার বাবা ব্যারিস্টার, তুমি নিজেও আইন মোটামুটি জান। এসব তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে না।

পরে বিমলাকান্তের মধ্যস্থতায় এ-মামলা মেটে। তিনি অন্নপূর্ণাকে ডেকে রত্নেশ্বরের সামনে ভবানী দেবী যে-চিঠি বীরেশ্বর রায়কে কাশী থেকে লিখেছিলেন, তাঁর পালক-পিতা যে-চিঠি

লিখেছিলেন, যে-চিঠি দুখানা নিয়ে এসেছিল ছেদী সিং, সেই চিঠি এবং তার সঙ্গে এই চিঠি দেখিয়ে অন্নপূর্ণাকে নিরস্ত করেছিলেন মামলা থেকে। এবং এই চিঠিখানা তিনি চেয়ে নিয়ে বলেছিলেন—ওই চিঠিখানা আমাকে দিতে হবে। আমি রাখব।

তার সঙ্গে রত্নেশ্বর বোনকে দিয়েছিলেন এক লক্ষ টাকা। আর বিমলাকান্ত দিয়েছিলেন তার নিজের সবকিছু।

অন্নপূর্ণাকে তিনিই মানুষ করেছিলেন। তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন।

এই কথাবার্তার সময়েই ঠাকুরদাস পাল সমস্ত কথা শুনেছিল। এবং এই কথার জোরেই সে রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল, তোমার বংশের সব কুলুজী আমি ফাঁস করে দেব। এবং তার জন্যেই—।

সুলতার বুঝতে বাকি রইল না যে, সুরেশ্বর বলতে চাইছে—তার জন্যই রত্নেশ্বর রায় পিদ্রু গোয়ানকে ইসারা করেছিলেন এবং সেই ইসারার হুকুম শিরোধার্য করে পিদ্রু তাকে ঝগড়া করতে টেনে নিয়ে এসেছিল কাঁসাইয়ের গোয়ানপাড়ার ঘাটে। এবং মুহূর্তে তার লুকানো ছোরাখানা বের করে ঠাকুরদাস পালের পেটখানা ফাঁসিয়ে দিয়েছিল। ঠাকুরদাস পালের পেটের মধ্যে রায়বাড়ীর গুপ্তকথা যা লুকনো ছিল, যা হজম হবার নয়, তা তার চিরে-দেওয়া পেট থেকে রক্তের স্রোতের সঙ্গে বেরিয়ে মাটির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল।

সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরালে। তারপর বললে—এর পর বীরেশ্বর রায়ও একরকম মরা মানুষ। রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—"একবার মাকে হারাইয়া ভ্রান্তির মধ্যে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর আবার তিনি সেই প্রেতই হইলেন! আবার সেই মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছেন। মাতাঠাকুরাণী নাকি সোফিয়াকেই তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে এবং অহরহ তাঁহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছে। মাতুলও তাহাই বলিলেন। বলিলেন—মাতৃদেবী এইরূপই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল তাঁহার নিকট। সোফিয়া বাঈ মুসলমানের কন্যা। পেশায় সে গাঈজী। বহুজন ভজনাই তাহার জীবিকা। সেই সোফিয়া বাঈও পিতৃদেবের আচরণে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। সে পাগলাবাবার কাছে দীক্ষা লইয়া এখন হিন্দুর আচরণেই থাকে। তাহার কর্মগুলি সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করে। কিন্তু পিতৃদেব ( দেবতা বলিতে সঙ্কোচ হয় ) হয় উন্মাদ, নয় জীবনকালেই প্রেতে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার নিকটে যাইতে ইচ্ছা হয় না, আমার ক্রোধ হয়, ঘৃণা হয়, লজ্জাও হয়। আমার দেবীতুল্য মাতৃদেবীর নিন্দা এবং তাঁহাকে প্রকারান্তরে গালিগালাজই করিয়া থাকেন।

বলেন, আমার জীবন সে বিষময় করিয়া দিয়া গিয়াছে। সারাটা জীবন একটা সুন্দরী প্রস্তর নারী-মূর্তিকে আলিঙ্গন করিয়া আমার সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তপস্বিনী-সতী-শাপভ্রষ্টা দেবীকে বিবাহ করিয়া আজ আমার এই অবস্থা। আমি ভালবাসিলাম তাহাকে, সে আত্মসমর্পণ করিল দেবতাকে। আমাকে সারাজীবন ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, জীবনের একটা কণা না দিয়া, আমার হৃদয়ের ক্ষোভের তুষের স্তূপে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া দেবলোকে চলিয়া গেল। আমি তুষানলে দগ্ধ হইতেছি, নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। ইহাই সতীত্বের এবং নারীধর্মের উৎকৃষ্টতম আদর্শ।

সোফিয়া হউক বাঈজী, হউক সে সকলের চক্ষে ঘৃণিতা, পতিতা, হউক সে বিধর্মী, তথাপি সেই আমার সান্ত্বনার উৎস, সেই আমার শান্তি, সেই আমার সব।

সমাজ ইহাতে আপত্তি করিলে আমি সমাজ ছাড়িব। আত্মীয়স্বজন, এমনকি তুমি পুত্র, তুমি আপত্তি করিলে তোমাকেও পরিত্যাগ করিব। আমাকে বলিলেন—তোমার ঘৃণা হয় তুমি আসিয়ো না। ইচ্ছা না হইলে বা লজ্জাবোধ করিলে আমার মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধ করিয়ো না। স্বর্গে মুক্তিতে আমার লোভ নাই, কামনা নাই এবং তোমার মত দেবোত্তরভোগীও আমি নহি যে, আমাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

আমার কলিকাতার সম্পত্তি আছে। ইহা দেবোত্তরের অন্তর্গত নহে, ইহার পত্তন করিয়াছিলেন কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য। তিনি প্রথম যৌবনে মুসলমানীকে বৈষ্ণবী করিয়া ঘর বাঁধিয়াছিলেন, কাহাকেও গ্রাহ্য করেন নাই; আমার পিতা একটা অজাতের মেয়েকে লইয়া তাহাকে যোগিনী বলিয়া জাহির করিয়া প্রকাশ্যে—কীর্তিহাটে রাখিয়াছিলেন। আমি সোফিয়াকে লইয়াই জীবনযাপন করিব, আমি যদৃচ্ছা জীবনযাপন করিব। ইহাতে কাহার কোন কথা শুনিব না। মদ্য আমি পান করিব। চিকিৎসকের কথাও আমি মানিব না। তাহাতে আমার যাহা হয় হইবে। চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন—আবার আমি পঙ্গু হইতে পারি। হইলে যতক্ষণ অর্থ আছে, ততক্ষণ আমার সেবার কোনরূপ অভাব হইবে না। তুমি পুত্র হইয়া আমাকে সদুপদেশ দিতে আসিয়ো না।

তুমি তোমার শ্বশুরের পরামর্শে—তিনি ডেপুটি সাহেব, হাকিম লোক, তাঁহার পরামর্শ আইনানুসারে ভাল, তুমি জমিদারী আইন অনুসারে চালনা করিতেছ; বলিতেছ এ-যুগ নূতন যুগ। উত্তম কথা। তাহাই চল। বলিতেছ—এ-যুগে যাহারা ভদ্র, যাহারা শিক্ষিত, যাহারা অভিজাত, তাহারা আর আগের নিয়মে চলে না। তুমি তাহাই চল।

আমার কাছে আমাকে এরূপভাবে উত্যক্ত করিতে আসিয়ো না। তাহার শ্রাদ্ধে আমি যাইব না। তাহাতে তোমার মাথা হেঁট হইবে তুমি ফিরিয়া যাও।

রত্নেশ্বর রায়ের দারুণ ক্রোধ হয়েছিল। তিনি বীরেশ্বর রায়ের চেয়ে কম ক্রোধী ছিলেন না। তবু তিনি ছিলেন সংযমী এবং ছেলেবেলা থেকে জীবনের শিক্ষাও ছিল অন্যরকম। তাছাড়া জমিদারীতে আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন অভিভাবকের অধীন হয়েছিলেন—যিনি ছিলেন ব্রাহ্মভাবাপন্ন লোক, তারপর পেশায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এবং রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে মিলনের পর যতই আবেগ এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকুন, তাঁর বাল্যকালে বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন, সেটা সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল মাত্র। মায়ের জীবিতকালে সে মুখ বন্ধ গর্তের সাপের মত চাপা ছিল; মায়ের মৃত্যুর পর সুযোগ পাবামাত্র তার বিষ নিশ্বাসে আর মুখে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

তিনি বাপকে মায়ের শ্রাদ্ধে বলতে এসেছিলেন। ভবানী দেবীর মুখাগ্নি করেছিলেন বীরেশ্বর রায়। রত্নেশ্বর তখন কীর্তিহাটে। এবং তখন সরস্বতী-বউ স্বর্ণলতা চার-পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। এবং সন্তান প্রসব করে তিনি মারা যাবেন এ-কথা কেউ ভাবেওনি। চিকিৎসকেরাও

না। প্রসবের তিন-চার দিন পর মারা গেলেন ভবানী দেবী, সুতরাং মৃত্যু আকস্মিক। রত্নেশ্বরের অনুপস্থিতিতে বীরেশ্বর শেষকৃত্য করেছিলেন। দশদিনে অশৌচান্তের সময় রত্নেশ্বর এসে পৌঁচেছেন, একলাই পৌঁচেছেন ; সরস্বতী-বউয়ের বাপ এস-ডি-ও সাহেব ডাক্তারদের পরামর্শমত কন্যাকে তখনকার দিনে ট্রেনে যেতে দেননি। রত্নেশ্বর একলা গিয়েছিলেন। পরে এক বছর পরে প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধের সময় রত্নেশ্বর কীর্তিহাটে চন্দনধেনুসহ দানসাগর ক্রিয়া করে সমারোহ করেছিলেন, সেই শ্রাদ্ধের সময় বাপকে বলতে এসেছিলেন যাবার জন্য। বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—না। তখন তিনি আবার মদ ধরেছেন। এবং এ সম্পর্কে পিতা-পুত্রে কিছু পত্রালাপ হয়েছে। সেদিন বিস্ফোরণ হয়ে গেল। এবং সেইদিনই বীরেশ্বর রায়ের আবার নূতন করে পুরনো ব্যাধি দেখা দিল। শরীর অসুস্থ হল।

এর ছ'মাস পর তিনি মারা গেলেন। তাঁর শয্যার পাশে সোফিয়া আর মহেন্দ্র ছাড়া আর কেউ ছিল না। অবশ্য নিচে এবং বাড়ীতে লোকজন কলকাতার ম্যানেজার থেকে দারোয়ান-টারোয়ান সবই ছিল।

রত্নেশ্বর এসেছিলেন। কিন্তু তিনি এসে উঠেছিলেন তাঁর শ্বশুরের বাড়ীতে জোড়াসাঁকোয়—তার কারণ তিনি এসেছিলেন সস্ত্রীক। স্বর্ণলতার কোলে তখন প্রথম সন্তান। সোফিয়াকে নিয়ে যে-বাড়ীতে বীরেশ্বর রায় বাস করেন, সে-বাড়ীতে তিনি এসে ওঠেননি। সেই সময় থেকেই এ-বাড়ীতে ওঠা বন্ধ করেছিলেন। রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত থেকে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন শ্বশুরের বাড়ীতে। তখন অবশ্য অবস্থা এমন খারাপ ছিল না। ডাক্তার একজন বাড়ীতে মোতায়েন ছিল। হঠাৎ মধ্যরাত্রে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং কয়েক ঘণ্টা পরই মারা যান।

অবস্থা খারাপ হতেই রাত্রে গাড়ী গিয়েছিল। কিন্তু ১৮৬৩ সালের কলকাতা। পথঘাট একালের মত পিচঢালা পথ নয়। এবং জানবাজার থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত বড় রাস্তা মাত্র একটি। চিৎপুর রোড। আর একটা কলেজ স্ট্রীট-কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কিন্তু সেদিক থেকে জোড়াসাঁকো যেতে অনেক আঁকা-বাঁকা অপরিসর রাস্তা এবং সঙ্কীর্ণ গলি। দু পাশে টিমটিমে কেরোসিনের আলো। তাও দূরে-দূরে। সুতরাং পৌঁছুতে দেরী হয়েছিল এবং ডাকাডাকি করে রত্নেশ্বর রায়কে তুলতেও সময় লেগেছিল। তারপরও দেরী হয়েছিল তাঁর বের হতে।

সুলতা, রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে এসব কথা আছে। কিন্তু ঠিক এভাবে নেই। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, মিথ্যা কথা ডায়রীতে লেখেন নি। কিন্তু অন্যত্র যেভাবে তিনি তাঁর মনকে প্রকাশ করেছেন, তা এই ঘটনার ক্ষেত্রে নেই।

শুধু লিখেছেন—"উঠিয়াও একটা কারণে বাহির হইতে বিলম্ব হইল। স্বর্ণলতাকে এই রাত্রে লইয়া যাওয়া ঠিক হইবে কিনা স্থির করিতে বিলম্ব হইল। অবশেষে এই শীতের রাত্রে ছোট ছেলে লইয়া যাওয়া ঠিক উচিতবোধ হইল না, অতএব আমি একাই বাহির হইলাম, বাহির হইবার সময় অঞ্জনা বলিল—আমি যাই। কারণ এ সময় অনেক সাংসারিক মঙ্গলের কাজ থাকে। ও-বাড়ীতে তো এক সেই বাঈ ছাড়া মেয়েছেলে কেউ নাই। সে সব আমিই করিব। ইহা খুবই সমীচীন মনে হইল অগত্যা তাহাকে সঙ্গে লইয়াই সেই শীতের শেষ রাত্রে রওনা হইয়া

যখন জানবাজার আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন আমার পিতা দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ বীরেশ্বর রায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। বড়ই দুঃখবোধ করিলাম। অনুশোচনাও হইল। গত রাত্রে এখানে থাকিলেই হইত। না-হয় ফলটল খাইয়াই থাকিতাম। হায় এমন দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ পুরুষ, বিশালকায় বীরপুরুষ আজ চিরনিস্তব্ধ। আমার নয়ন-যুগল হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। বক্ষের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করিলাম। সেই সমারোহময় পুরুষ আজ নিঃসঙ্গ অবস্থায় মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অথবা ইহাই তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি সংসারে একা থাকিতে চাহিয়াছেন, সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি বিরাগের অন্ত ছিল না, আমি পুত্র আমার সহিত আজ এক বৎসর পত্র ভিন্ন সাক্ষাৎ করেন নাই। আজীবন এক বাঈজীকে লইয়াই জীবনাতিপাত করিলেন। ঈশ্বর মানিতেন না। কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। সুতরাং এবম্প্রকার মৃত্যুই তাঁহার উপযুক্ত এবং বিধাতা কর্তৃক অবধারিত ছিল।"

সুরেশ্বর একটু চুপ করলে। সুলতা বললে—রত্নেশ্বর রায় একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন সুরেশ্বর। একটা সত্যকারের ক্যারেক্টার। অত্যন্ত শক্ত মানুষ!

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ, তা ছিলেন! সে-কথা আমি আমার জবানবন্দীর মধ্যে বারবার বলেছি। সেই কারণেই যে দুটো হত্যা তিনি করিয়েছিলেন, তার অপরাধ বিবেচনা করতে গিয়ে সম্ভ্রমভরে পিছিয়ে এসেছি। মনে-মনে বলেছি, তোমার বিচার অন্য যারা শুনবে, জানবে, তারা যা বলে বলুক, যা করে করুক, আমি শুধু তোমার কাজের জবানবন্দী দিয়েই খালাস।

তবে এক্ষেত্রে, তাঁর ডায়রী থেকে যা পেয়েছি, তার বাইরেও আরও কিছু আছে। সেটা জেনেছিলাম আমি রত্নেশ্বর রায়ের সহোদরা অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে। এক্ষুনি আমি তোমাকে বললাম—ভবানী দেবীর এই পত্রখানা পেয়েছি আমি তাঁরই কাছে। ১৯৩৭ সালেও পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি বেঁচেছিলেন।

১৮৬৩ সাল থেকে কিছুক্ষণের জন্যে ১৯৩৭ সালে এল সুলতা।

১৯৩৭ সালে যে সময় গোপাল সিংয়ের প্রপৌত্র শিবু সিং নামক ভাল ছেলেটি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েও তার বাপের কাছে রায়বাড়ীর অত্যাচারে তার দুর্ধর্ষ এবং প্রবলপ্রতাপ প্রপিতামহ গোপাল সিংয়ের সর্বনাশের এবং চরম অপমানের গল্প শুনে বিপ্লবীর ধর্ম বিসর্জন দিয়ে, দেশের স্বাধীনতার মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে, সরকারী সাক্ষী হয়ে বীরেশ্বর রায়ের প্রপৌত্র, রত্নেশ্বর রায়ের পৌত্র, শক্তিহীন দেউলে জমিদার শিবেশ্বর রায়ের পুত্র—তাদের অঞ্চলের বিপ্লবী গোষ্ঠীর নায়ক অতুলেশ্বর কাকার বিরুদ্ধে এজাহার দিলে এবং নির্দোষ আমার মেজদিদিকে সুদ্ধ ধরিয়ে দিলে, সেই সময়ে এল।

নিশ্চয় মনে আছে তোমার সুলতা যে, মেজদি আমাদের অর্চনাকে বাঁচাতে তাঁর কাছে গচ্ছিত রিভলবারটা নিজে নিয়ে বের করে দিয়ে এই শাস্তিটা নিজে নিয়েছেন। অর্চনা তাতেও নিজেকে সংযত করতে পারে নি; শান্ত নিরীহ বৈষ্ণব প্রকৃতির বিষয়ে অনাসক্ত মানুষ বিমলেশ্বর কাকাকে সুকৌশলে উত্তেজিত করে রায়বংশের রক্তের প্রসুপ্ত প্রচণ্ড ক্রোধকে জাগিয়ে তুলেছিল।

অর্চনা যে কথাটা বিমলেশ্বর কাকাকে বলেছিল, সেকথা তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল যে,

অমোঘ শক্তিতে তা আমি শুনি নি, আমি শুনেছিলাম, বিমলেশ্বর কাকার স্ত্রীর মুখ থেকে, তাতেই আমার বুকেও আগুন জলেছিল। বিমলেশ্বর কাকা বুকের জ্বালায় শিবুকে মারতে গিয়ে ধরা পড়লেন। আমি সেদিন রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী পড়ে যাচ্ছিলাম। সকালের পর ওবাড়ী থেকে যখন বিমলেশ্বর কাকাকে ধরে নিয়ে গেল কোমরে দড়ি বেঁধে, তখন থেকেই পড়তে বসেছিলাম, খাই নি, স্নান করি নি, হুইস্কী স্পর্শ করিনি, খেয়েছিলাম কয়েক কাপ চা। রাত্রি হয়ে গিয়েছিল দশটা। শীতের দিন, কীর্তিহাট গ্রামে রাত্রি দশটা কম নয়। শেয়াল ডেকে গেছে, বিবিমহলের পাশে কাঁসাইয়ের ধারে জঙ্গলে প্যাঁচা ডাকছে। প্যাঁচার ডাক বড় কর্কশ সুলতা। কলকাতার মানুষ তুমি, নিস্তব্ধ রাত্রে পেঁচার ডাক সম্ভবত তুমি শোন নি। বিবি-মহল খুব বড় নয়, কিন্তু ছোটও নয়, বাড়ীটার মধ্যে আমি আর রঘু চাকর। রঘুও কিছুকাল কীর্তিহাটে বাস করে আর রায়বাড়ীর মহলগুলোয় ঘুরে রায়বাড়ীর মেজাজ খানিকটা পেয়েছিল। বিমলেশ্বর কাকার অপমানে সেও সেদিন দুঃখ পেয়েছিল। সেও আমাকে সেদিন খাবার কথা বিশেষ বলে নি। নিজেও খায় নি।

আমি ডায়রী পড়ছিলাম, হঠাৎ চৌদ্দ বাতির টেবিলল্যাম্পটা দপ করে নিভে গেল। সম্ভবত সন্ধ্যেবেলা থেকে জ্বলতে জ্বলতে গরম হয়ে গ্যাস হয়েছিল। রঘুকে আলো জ্বালবার জন্যে ডাকতে গিয়েও ডাকলাম না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলাম। ভাবছিলাম রায়বংশের কথা। রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতেই পড়েছি, ভবানী দেবীর মৃত্যুর কথা। রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে বীরেশ্বর রায়ের ওই তিক্ত কঠিন কথাগুলির কথা। তখনও আমি ভবানী দেবীর ওই চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও জানি না।

কি জানি কেন রত্নেশ্বর রায়ের কঠোরতা আমার এক্ষেত্রে ভাল লাগে নি। তাঁর ডায়রীর শেষ যে লাইনটা পড়েছিলাম, সেটা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। তিনি লিখেছিলেন— "সংসারে ন্যায় এবং নীতিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ন্যায়কে মাথায় করিলে স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা আত্মীয়-স্বজন সকলেই তার অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ন্যায়ের জন্য প্রয়োজনে পিতাপুত্রকে পরিত্যাগ করেন, এমন দৃষ্টান্ত লক্ষ লক্ষ রহিয়াছে। স্ত্রীর অন্যায়ে স্ত্রীকে ত্যাগ এদেশে সাধারণ ঘটনা। পিতাকে লোকে পরিত্যাগ সচরাচর করে না, তাহার কারণ বিষয় শতকরা নিরানব্বুই ক্ষেত্রে পৈত্রিকই হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে রামমোহন রায়ের মত দৃঢ়চেতা পুরুষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তিনি পিতাকে ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার আদর্শের জন্য পিতৃশ্রাদ্ধে বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে অসম্মত হইয়া মাতার সহিত বিরোধ করিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। আমার পিতা চিরদিনই স্বেচ্ছাচারী, কোন ন্যায়, কোন ধর্মকে মান্য করেন না। তিনি বাঈজীকে আমার দেবীতুল্য মাতৃদেবী অপেক্ষা উচ্চে স্থান দেন। আমার মাতাকে অভিশাপ দেন। তাঁহার প্রতি চিরদিনই আমার বিরাগ। মধ্যে বৎসর তিনেকের জন্য মাতার জন্যই তাঁহার অনাচার সহ্য করিয়াছি। কিন্তু মাতৃদেবীর অন্তে তাঁহার প্রতি পূর্ব বিরাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রায়বংশে তিনি অনাচার, ব্যভিচার এবং স্বেচ্ছাচারে, অত্যাচারে সর্বাপেক্ষা কলঙ্কিত পুরুষ। সর্বাপেক্ষা দুর্দান্ত। তিনি আজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দুঃখ আমার হইতেছে। কিন্তু দুঃখ হওয়া বোধহয় উচিত ছিল না। আমাকেই তাঁহার মুখাগ্নি

করিতে হইল। মনে মনে বলিলাম, আমি কামনা করি 'তুমি মুক্তিলাভ কর,' কিন্তু আমি জানি, তোমার কর্মফলে তোমাকে বহু জন্মান্তর এই সকল কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে।"

অন্ধকারে বেদনাহত মন নিয়েই বসেছিলাম।

রঘু বাইরের ঘরে বসে ছিল, সে ঘরের অন্ধকার দেখে ঘরে এসে ঢুকল, আমি বুঝতে পেরে বললাম—থাক আলো জ্বালতে হবে না!

ঠিক এই সময় নিচে থেকে ডাক শুনলাম, সুরেশ্বর! শুয়েছ নাকি?

কণ্ঠস্বর চিনতে পারলাম না। হেঁকে বললাম—কে?

—আমি জগদীশ্বর কাকা।

জগদীশ্বর কাকা? অর্চনার বাবা! খবর পেয়েছি সন্ধ্যার পর ফিরেছেন। এত রাত্রে আমার কাছে এসেছেন জগদীশ্বর কাকা কিসের জন্ম। এসে সমস্ত খবর শুনে আর একটা সর্বনাশ বা ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলেছেন না কি?

আমি তাড়াতাড়ি রঘুকে আলোটা জ্বালতে এবং ডায়রীগুলো সামলে রাখতে বলে বাইরে রঘুর ঘরে যে হ্যারিকেনটা জ্বলছিল, সেটা নিয়ে নেমে গেলাম। দেখলাম, জগদীশ্বর কাকা অর্চনার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বুঝলাম একটা কিছু ঘটেছে। বললাম—এত রাত্রে জগদীশ্বর কাকা?

জগদীশ্বর কাকা বললেন—ওপরে চল বলছি। এসেছি এই সর্বনাশী হারামজাদীর জন্তে।

কোন প্রশ্ন করলাম না সেখানে। কারণ আমার সন্দেহ ছিল, কোন-না-কোন পুলিশের চর কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। বিমলেশ্বর কাকাকে হাতকড়া দিয়ে, কোমরে দড়া বেঁধে গ্রাম ঘুরিয়েই তাদের কাজ তারা শেষ করেছে, এ কথা অন্ততঃ আমার বিশ্বাস হয় নি।

উপরের ঘরে এসেই জগদীশ্বর কাকা অর্চনাকে ছেড়ে দিলেন এবং কঠোর কণ্ঠে বললেন—চুপ করে দাঁড়া হারামজাদী। চু-প করে!

তারপর আমাকে বললেন—তুমি তো শুনেছ সব!

জগদীশ্বর কাকার শরীর থেকে গাঁজার গন্ধ বের হচ্ছিল।

আমি বুঝলাম কি বলছেন তিনি, বললাম—সবই তো আমার চোখের সামনে ঘটেছে। আমি তো ছিলাম!

—ন্যাকা সেজো না হে! বিমলের স্ত্রী, বর্ধমানের বউমা তোমাকে সব বলে নি? হারামজাদী পোড়ারমুখী যা সব বলত বিমলকে, সেসব কথা পুলিশের কাছে বলতে তুমি তাকে বারণ কর নি?

স্বীকার করলাম। বললাম—হ্যাঁ, বলেছিলাম। না-হলে যে আজ ওকেও ধরে নিয়ে যেত জগদীশ্বর কাকা!

—যেতো, আপদ যেতো! আমি বাঁচতাম।

—এসব আপনি কি বলছেন জগদীশ কাকা!

হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন তিনি।—বলছি সাধে! তুমি জান, আমার শালার শালা পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর, তার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করে এসেছি, তারা আসবে, কথা পাকা হবে।

দিনও ঠিক করে এসেছি; এই মাঘ মাসে। এখন হবে কি? করব কি? বলতে পার?

হঠাৎ কান্না থামিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন, বললেন—আর হারামজাদী আমাকে মুখের ওপর বলে কি জান? ওর এতবড় আস্পর্ধা। এতবড় বুকের পাটা, ঘাড়ের ওপর তিনটে মাথা—বলে ওখানে আমি বিয়ে করব না। জোর করলে আমি বলব—আমি এসবের ভেতরে আছি। নয়তো আমি বিষ খাব। নয় গলায় দড়ি দোব।

এসব কথা আমি জানতাম। অর্চনা সেদিন আমায় বলেছিল। আমি বললাম—একটা কথা বলব কাকা?

মুখভঙ্গী করে আমাকে বললেন—তুমি বিয়ের ভার নেবে তো। যা খরচ করতে হয় তুমি করবে! সে কথা ও আমাকে বলেছে।

আমি বললাম—হ্যাঁ, সে কথা আমি বলেছি ওকে। আমি কালই যেতাম আপনার কাছে কথাটা বলবার জন্যে।

জগদীশ কাকা আবার বদলালেন। এবার সংযত অথচ শাসনের স্বরে বললেন—হ্যাঁ। তাই আমি জানতে এসেছি। ও আমাকে বললে। বললে, আমার বিয়ের কথা নিয়ে তোমরা ভেবো না। সুরেশ্বরদা বলেছে আমাকে সে পাত্র ঠিক করে বিয়ে দেবে। যা খরচ হয় সে করবে।

—হ্যাঁ। তা করব আমি। আমি সে কথা আপনার সামনেই বলছি।

—না। সামনে বললে হবে না। আমার পায়ে হাত দিয়ে বল। আমি গাঁজা খাই, মদ খাই, যাই হই, আমি তোমার কাকা, গুরুজন, আমার পায়ে হাত দিয়ে বল। আর তিন সত্যি কর।

তাই বললাম। এবং পায়ে হাত দিয়েও শপথ করলাম। তখন আবার বললেন—শুধু ও বললে হবে না। স্বজাতে, স্বঘরে মানে পালটি ঘরে বিয়ে দিতে হবে। তুমি আধা বেহ্ম, আমি জানি। তুমি যে লেখাপড়া-জানা যার-তার ঘরের ছেলে এনে বলবে এর চেয়ে ভাল পাত্র আর হয় না, সে হবে না।

সুরেশ্বর বললে—তোমাকে কি বলব সুলতা, আমি এই অধঃপতিত রায়বংশের সন্তানটির কথায় রাগ করতেও পারি নি, ঘৃণা করতেও সঙ্কোচ হয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল কাঁদি। এক কোণে অর্চনা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু চোখ দুটো হয়ে উঠেছে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। ধুক ধুক করে জ্বলছে। সে যেন এখনি ক্রোধে, ক্ষোভে ফেটে পড়বে বলে মনে হল।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিশ্রুতি দিলাম। বললাম—তাই হবে!

জগদীশ্বর কাকা বললেন—শোন, এই রায়বংশ সিদ্ধপুরুষের বংশ। অর্চনাকে সবাই বলে, ও হল সতীবউরাণী। এই বংশে ফিরে এসে জন্মেছেন। সতীবউরাণীর বাবা কালীসিদ্ধ মহাসাধক ছিলেন। ওকে সৎ বংশে, সৎ পাত্রে না দিলে সর্বনাশ হবে তোমার।

অর্চনা এবার সত্যই ফেটে পড়ল। চিৎকার করে উঠল, বাবা!

জগদীশ্বর রায় দুরন্ত ক্রোধী; গাঁজা, মদ খেয়ে প্রায় বিকৃতমস্তিষ্ক। তাঁর বাপ, আমার

ঠাকুরদা শিবেশ্বরের সমৃদ্ধি এবং জবরদস্তির আমলে তিনি জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, ছেলেবেলা থেকে দুরন্ত, দুর্দান্ত। এক পুলিশ আর গভর্নমেণ্ট ছাড়া কাউকে গ্রাহ্য করেন না। সেই তিনি পর্যন্ত চমকে উঠলেন তার সে চিৎকারে।

তার দিকে তাকিয়ে তাকে তিনি ধমক দিতে পারলেন না, সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অর্চনা বললে—তুমি এবার থামবে কিনা বল?

অপ্রতিভের মত জগদীশ্বর কাকা বললেন—থামব?

—হ্যাঁ থামবে। এবার তুমি যা বলবে আমি জানি। বিয়েতে যে টাকা সুরেশ্বরদা খরচ করবে, সেই টাকাটা তুমি নিজে চাইবে। বলবে—তার থেকে সুরেশ্বর, টাকাটা তুমি দাও, আমি দেখে-শুনে ভাল পাত্রেই ওর বিয়ে দিই। আমি জানি! তা হবে না। তুমি বাড়ী চল!

আমি বললাম—অর্চনা চুপ কর। এসব কথা বলতে নেই। উনিই বা তা বলবেন কেন?

অর্চনা বলে উঠল—বলবেন। বলবেন। বলবেন! আমি জানি!

জগদীশ্বর কাকা মাথা হেঁট করে রইলেন।

অকস্মাৎ কোন চোরের লুকানো চোরাইমাল বেরিয়ে পড়লে, যেমন তার মুখের চেহারা হয়, ঠিক তাই হয়ে গেল।

অর্চনা বললে—রঘু, তুই আমাকে আলো নিয়ে বড় জেঠাইমার কাছে দিয়ে আয়।

বড় জেঠাইমা—শিবেশ্বরের বড় ছেলে—ধনেশ্বর কাকার স্ত্রী।

খুড়ীমা বিচিত্র মানুষ। আজও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার কদাচিৎ দেখা হয়েছে। তাঁর বড় ছেলে বিচিত্র চরিত্র মধুরভাষী আমার ব্রজদা, ব্রজেশ্বর। এবং তার সেজ ছেলে সেই দানবটি, যে সুখেশ্বর কাকাকে হত্যা করেছিল।

লোকে বলে এই দুই প্রকৃতিই তাঁর মধ্যে আছে। খুব বড় ঘরের কন্যা। পড়েছিলেনও ভালঘরে। ব্রজদার মত মিষ্টি কথা। আবার রাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু একটা বড় গুণ আছে, কেউ আশ্রয় চাইলে সেখানে তিনি আশ্চর্য মানুষ। তাঁর নিজের সন্তানের চেয়েও বড় মমতায় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকেন। জগদীশ্বর কাকা বড় ভাই ধনেশ্বরকেও ভয় করেন না। কিন্তু বড় বউঠাকরুণ—"কি হচ্ছে ঠাকুরপো"! বলে বের হলে, আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সাড়া পেলেই সরে পড়েন!

কথাটা বলেই হনহন করে চলে গেল অর্চনা

* * *

পরের দিন থেকে সুলতা, আমি অর্চনার বিয়ের জন্যেই সবকিছু ফেলে দিলাম। ওই বিয়ের জন্যেই উঠে-পড়ে লাগলাম।

সেদিন আমি বসে চিঠি লিখছিলাম। লিখছিলাম কলকাতায় জানবাজারের ম্যানেজারকে, লিখছিলাম—একজন বিচক্ষণ ঘটক অবিলম্বে যেন পাঠিয়ে দেন এখানে। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এমন সময় খুড়ীমা এলেন, অর্চনাকে সঙ্গে নিয়ে খুড়ীমা আমার সামনে এই প্রথম এলেন বিবিমহলে। ভিতর মহলে আমি অনেকবার গেছি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে কদাচ কখনও। এবং আমাকে দেখবামাত্র সরে যেতেন। কখনও আমি আগে-ভাগে কথা কইলে, সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে চলে যেতেন ভিতর মহলে।

আমি এগিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করে নিয়ে এলাম। প্রণাম করলাম। অন্য সময় তিনি পায়ে হাত দিতে দিতেন না। বলতেন—ছুঁয়ো না বাবা, তোমাদের কাপড়-চোপড় শুদ্ধ নয়, আমি পুজোর কাপড় পরে আছি! মাটিতে প্রণাম কর।

তাঁর পুজোর কাপড় আগে দেখেছিলাম, একখানা অতিজীর্ণ লালপেড়ে গরদের শাড়ী। ব্রজদা বউ নিয়ে মাস ছয়েক আগে যখন এসেছিল, তখন একখানা নতুন দামী গরদের শাড়ী দিয়েছিল, আজ সেইখানা পরে এসেছিলেন।

তাঁকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করলাম মাটিতে হাত দিয়ে। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি বাবা। এবার ব্রজ এসে তোমার অনেক সুখ্যাত করে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রজকে তো আমি জানি চিনি। ও যত মন্দ, তত ভাল। ভালও বাসতে পারে, কিন্তু ওর স্বার্থ যেখানে, সেখানে সে চোর-জোচ্চোর সব। আমি ভেবেছিলাম, তুমি কলকাতায় বড়লোকী করতে, ও তোমার মোসাহেবী করত। তাই প্রশংসা করছে। তুমিও হয় তো রায়বংশের ছেলেদের মত। তোমার বাপ আমার ভাসুর। তার কীর্তিও শুনেছি। তাই 'এলে-গেলে-খেলে-নিলে ভাল আছ, মঙ্গল হোক, এই বলেই কথা সেরেছি। কাল অর্চনা গিয়ে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়ল। বললে আমাকে সব। ন-বউ, বিমলেশ্বর ঠাকুরপোর বউও এসেছিল, ওর কাছেও সব শুনলাম। তার আগে ঘরে পুরে যে মারটা অর্চনাকে মেরেছে সেজঠাকুরপো, তাও শুনেছিলাম। সব শুনে তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি, তুমি দীর্ঘজীবী হও বাবা। যে সঙ্কল্প করেছ, তা তুমি যত শিগগির হয় করে ফেল! পূর্বপুরুষেরা তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

সুলতা, আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম ধনেশ্বর কাকার মত নাটুকে চরিত্র, ভণ্ড তান্ত্রিকের স্ত্রীর এমন কথা শুনে। ইনিই মিথ্যেবাদী, মিষ্টমুখ ব্রজদার মা, ইনিই দৈত্যের মত পশুচরিত্র ছেলেটার মা। এঁকেই সারা রায়বাড়ীতে প্রতিটি জন বলে, মা চামুণ্ডা।

বললাম—আমি এক্ষুনি চিঠি লিখছিলাম খুড়ীমা।

—কোথায় লিখছিলে বাবা? জানাশুনো কেউ?

—না কলকাতায় লিখছি, ওখানকার ম্যানেজারকে, একজন ঘটক পাঠাবার জন্যে।

খুড়ীমা বললেন—তা ভালই করছ বাবা। তাও লেখ। তবে আমি একটি পাত্রের কথা বলতে এসেছি, তুমি চেষ্টা করে দেখ না। জানা ঘর; বলতে গেলে আমাদের আপনার ঘর; তবে বিষয় তো বিষ বাবা। বিষয়ের ঝগড়ায় অতি আপনার হয়েও পর। এক রকম তিনপুরুষ মুখ দেখাদেখি নেই।

শঙ্কিত হয়েই বললাম—বলুন।

শঙ্কা হল সুলতা, যে, রায়বংশের ধারা তারাও আজ মহাকাল প্রভুর গদার ঘায়ে ভগ্ন উরু

দুর্যোধনের মত সংসার দ্বৈপায়ন হ্রদের তটভূমিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। অশ্বত্থমাও নেই এ-যুগে, যে সে পঞ্চ-পাণ্ডবের বংশধরদের মুণ্ড এনে দেবে। হর্ষ বিষাদে দুর্যোধনের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু এ দুর্যোধনদের সবারই মৃত্যু হবে বিষাদে।

খুড়ীমা বললেন—আমার দাদাশ্বশুর রায়বাহাদুরের বোন ছিল জান তো। অন্নপূর্ণা দিদিশাশুড়ী। রায়বাহাদুর তো এ বংশে পুষ্যিপুত্তুর। কিন্তু সতীবউরাণীর কাশীতে গিয়ে কন্যা হল। কন্যা হয়েই মারা গেলেন। সেই কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীর বিয়ে হয়েছিল কলকাতায়। বিয়ের পর শ্বশুররা ছাড়বে কেন? মামলা করলে তারা। দানপত্তর নাকচ হবে। শেষ মিটমাট করে দিলেন বিমলাকান্ত চাটুজ্যেমশায়, রত্নেশ্বর রায়ের ভগ্নীপতি। পঞ্চাশ হাজার টাকা, কলকাতায় জমি আর তাঁর নিজের সম্পত্তি দিয়ে। মামলা মিটল, কিন্তু মানের মামলা মিটল না। ভাই-বোনে সম্পর্কই মুছে গেল। তাই শুধু নয়, অন্নপূর্ণা ঠাকুরুনের স্বামী রাগের বশে আর একটা বিয়ে করলেন। ভাই মানে রায়বাহাদুর তত্ত্ব পাঠালে অন্নপূর্ণা ঠাকুমার শ্বশুররা ফিরিয়ে দিতেন। কখনও আসতে দেন নি। শেষ পর্যন্ত নিজের ছেলে নিয়ে ঠাকরুণ স্বামী-ভিন্ন হয়ে গেলেন। টাকার তাঁর অভাব ছিল না। বাপের বাড়ীর পঞ্চাশ হাজার টাকা। কলকাতায় জমি। সেই অন্নপূর্ণা ঠাকরুণ আজও বেঁচে আছেন। পঁচাত্তর-আশী বছর বয়স। ছেলে নেই। নাতিদের দুজন মারা গিয়েছে। একজন আছে। বড় নাতির একটি ছেলে আছে। বাবা আমার মেয়ে বড় হয়েছে—প্রতিমা। তা আমি চেষ্টা করেছিলাম। ছেলেটি ডাক্তারী পড়ছিল তখন। তা এ বাড়ীর নাম শুনে রাজী তিনি হয়েছিলেন, তাঁর ছেলেরা হয় নি। ওরা মস্ত বড়লোক। জমিদার তো নয়। ওরা সব কেউ উকীল, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ ডেপুটী এই রকম বংশ। তা একবার তার কাছে তুমি নিজে গিয়ে পড় না। টাকা তো তুমি দেবে। আর এ মেয়েটাকে সবাই বলে সতীবউ ঠাকরুন ফিরে এসেছে। যদি ঐ কথাটা তুমি বল তবে হয় তো রাজীও হতে পারেন। অন্নপূর্ণা ঠাকুমাও কথাটা জানেন। হয় তো আগ্রহ করেই নেবেন।

সুরেশ্বর বললে—অন্নপূর্ণা দেবীর নাম আমি বাবার কাছে শুনেছি। আমার বাবা সাহেব মানুষ—মা ছিলেন সে কালের আধুনিকা। তবুও তাঁরা বিজয়ার পর একবার প্রণাম করতে যেতেন। তার কারণ ছিল। অন্নপূর্ণা দেবী আর রত্নেশ্বর রায়ের বড় ছেলে দেবেশ্বর এক বয়সী। মাস কয়েকের ছোট বড়।

অন্নপূর্ণা দেবী মানুষ হয়েছিলেন বিমলাকান্তের কাছে, কাশীতে, আর দেবেশ্বর বড় হয়েছিলেন কলকাতায়। জানবাজারের এই বাড়ীতে রত্নেশ্বর পাকাপোক্ত এস্টাব্লিশমেন্ট করেছিলেন। প্রথম প্রথম জানবাজারের বাড়ীতেই থাকতেন, বছর দুয়েক ছিলেন, ছেলে পড়ত কলকাতার ইস্কুলে, আর তাদের সুখ-দুঃখ দেখবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন ঠাকুরদাস পালকে। লেখাপড়া শেখবার জন্যে সেকালের গ্রাজুয়েট মাস্টার নিযুক্ত করেছিলেন। তার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া শেখাবার ব্যবস্থা, ডন-বৈঠক শেখাবার জন্য ছিল একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। পূজোর ছুটিতে, গরমের ছুটিতে যেতেন কীর্তিহাট। ওদিকে কাশী থেকে আসতেন অন্নপূর্ণাকে নিয়ে সস্ত্রীক বিমলাকান্ত। গোটা একটা মাস কীর্তিহাটের রাজত্বে রাজপুত্র এবং রাজকন্যা—

সহোদর-সহোদরার প্রীতিতে পিসী আর ভাইপো ছুটোছুটি করতেন, হাতী চড়ে বেড়াতেন, পুজোর সময় আশ্বিন-কার্তিক মাসে ভরা কাঁসাইয়ে বজরায় ঘুরতেন। গোয়ানপাড়ায় যেতেন।

দুর্গাপুজোর পর কালীপুজো—রায়বাড়ীর প্রধান উৎসব। সে-উৎসবে—সেকালে তিন-চারদিন উৎসবে—পাঁচ হাজার টাকা খরচ একবারে বাজেটে নির্দিষ্ট করা ছিল। কম কখনও হত না। বরং বেশীই হত। তাছাড়া সরস্বতী-বউরাণী বা রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের অথবা বিমলাকান্তের মানসিক পুজোর খরচ তাঁরা আলাদা দিতেন।

কালীপুজোয় দেবেশ্বর অন্নপূর্ণা পাশাপাশি যাত্রার আসরে বসত। নিয়ম ছিল রায়বংশের যাঁরা, তাঁরা বসতেন চেয়ারে, আর বসতেন অতিথি-অভ্যাগত। রত্নেশ্বর রায়ের শ্বশুরবাড়ীর লোক। জেলার দু-চারজন হাকিম। তার সঙ্গে দারোগা-ইন্সপেক্টর, সব-রেজিস্ট্রার আর দু'-চারজন বন্ধু-বান্ধব। তার মধ্যে অন্নপূর্ণা আর দেবেশ্বর ঠিক মাঝখানে বসতেন দুখানা চেয়ারে।

বিসর্জন ছিল না। পাষাণময়ী কালী। তবু বিসর্জনের রাত্রে বাজি পুড়ত। তারও অঙ্ক কখনও দু'শোর নিচে নামেনি। ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেছে। সেখানেও এইসব অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য একটা চাঁদোয়া হত। তার নিচে বসতেন এইসব লোকেরাই। সেখানেও অন্নপূর্ণা দেবেশ্বরের আসন ছিল সামনের সারিতে পাশাপাশি। আর একটা ঘটনা কয়েক বছরই ঘটেছিল; সেটা ভাই-দ্বিতীয়ার দিন। দেবেশ্বরের বোন ছিল না। রত্নেশ্বরকে বোন হিসেবে ফোঁটা দিতেন অন্নপূর্ণা দেবী। তাই দেখে দেবেশ্বর কাঁদতেন—আমি ফোঁটা নেব।

গ্রাম-সম্পর্কের বোন বের করতে দেরী হয়নি। কিন্তু তা না, দেবেশ্বরের আব্দার—ওই অন্নপিসীর কাছে ফোঁটা নেব।

অন্নপূর্ণাও ফোঁস ফোঁস করে দিতেন—আমি দেবু ভাইপোকে ফোঁটা দেব।

এদের সঙ্গে আর একজন অহরহ ঘুরত সুলতা। তাঁর নাম হল—গোপাল পাল, দেবেশ্বরের ঠাকুরদাস জ্যাঠামশায়ের ছেলে।

তাই খুড়ীমা মানে ধনেশ্বর কাকার স্ত্রী আমাকে বললেন—তুমি নিজে যাও বাবা, তিনি নিজে আজও বেঁচে, তোমার কথা রাখবেন বোধহয়। অর্চনার একখানা ফটো নিয়ে যেয়ো, তাতে কাজ দেবে। তাঁর মায়ের অয়েল পেন্টিং তাঁর কাছে আছে। অর্চনার সঙ্গে মিল দেখলে মন তাঁর নরম হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজছিল। সুলতা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে দশটা। ওদিকের খাবারঘরে টেবিলের উপর বাসনপত্রের ঠুংঠাং শব্দ হচ্ছে। অর্চনার গলা পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত বাসন সাজানো হচ্ছে। খাবার তৈরী হয়ে গেছে।

সুরেশ্বর বললে—এখন এখানেই ছেদ টানতে হবে হয়তো। ১৯৩৭ সালে সেদিন মেজতরফের বড় খুড়ীমার একটা কথা বলেই ছেদটা টানি সুলতা। তাঁকে আমার বড় ভাল লাগল। বললাম—এ বাড়ীতে এলেন খুড়ীমা, কিছু খাবেন না?

হাসলেন তিনি। বললেন—খাব না কেন বাবা। তবে তোমার রঘুর হাতে তো খাব না।

অর্চনা এতক্ষণ আমাদের পানে পিছন ফিরে কাঁসাইয়ের ধারের বারান্দার ঠিক দরজাটার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। সে এবার বললে—আমি চা করে আনব জ্যেঠাইমা।

—তা আন। কিন্তু এত বেলায় চা কেন? সরবৎ করে আন।

—শীতের দিনে সরবৎ খাবে?

—তা হলে চা করেই আন্। তোরাও খাবি।

অর্চনা চলে গেল। খুড়ীমা এবার কথা বন্ধ করে উঠে চারিদিক ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ বললেন—জান বাবা সুরেশ্বর, এই বিবিমহলে আমি আজ প্রায় ত্রিশ বছর আসি নি। এসেছিলাম সেই বিয়ের পর—কনে-বউ আমি তখন, তের পার হয়ে চৌদ্দতে পড়েছি। তখন আর একরকম ছিল। এমন সুন্দর ছিল না। তোমার বাবা আমার ভাসুর। কিন্তু তোমার কাকার বিয়ে আগে হয়েছিল। তোমার বাবা বিয়ে করলেন, ক'রে এখানকার ভেতর মহলে তোমাদের অংশ আর বিবিমহল একরকম নতুন করে গড়লেন। তখন থেকে আর ঢুকি নি।

বলে হাসলেন। সে হাসি ঠিক সহজ হাসি নয়। তার অর্থ ঠিক হাসি নয়। তার মধ্যে অনেক কিছু ছিল।

সুরেশ্বর বললে—আমি ঠিক বুঝিনি। তাই জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম—কেন খুড়ীমা? সঙ্গে সঙ্গে মনেও পড়ল যে, বাবার মৃত্যুর পর যখন প্রথম মায়ের সঙ্গে এসেছিলাম বাবার শ্রাদ্ধ করতে, তখন খুড়ীমা এ বাড়ীতে আসেন নি। তাঁর সঙ্গে মা দেখা করে এসেছিলেন ও-বাড়ীতে গিয়ে, আমিও মার সঙ্গে ছিলাম। শুনেছিলাম মেজঠাকুমা বলেছিলেন—"বড়বউমার কথা ছেড়ে দাও মা, বড় জমিদারবাড়ীর মেয়ে, অবস্থাহীন হয়েছে কিন্তু দম্ভ যায় নি। চব্বিশঘণ্টা দম্ভে ফেটে পড়ছে। মা, ধনেশ্বরকে ভয় করে এবাড়ীর সবাই। জগদীশ্বর তো সারা গাঁয়ের লোকের কাছে বাঘ ভালুকের মত। কিন্তু বড়বউমার কাছে সব জুজু। মন হ'ল তো মা—দেবতা। আর মেজাজ বেগড়াল তো মহিষমর্দ্দিনী!

আমার প্রশ্ন শুনে খুড়ীমা চুপ করে রইলেন। কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আমার বাবা এবং মায়ের অয়েল পেন্টিংটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—এ ছবি তোমার বাবার একটু বেশী বয়সের ছবি। বিয়েই তো করেছিলেন সাতাস বছর পার ক'রে।

বললাম—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, বিশ একুশ বছর বয়সের সে রূপ এতে নেই। এতে ফ্রেঞ্চছাঁট দাড়ি রয়েছে। গোঁফ সুচলো ক'রে পাকানো, যেন ভারিক্কি মানুষ। মায়ের তোমার পূর্ণ যুবতী বয়স। বোধহয় এর থেকে ভালো চেহারা কখনও হয় নি। বিশ একুশ বছরে তোমার বাবার সে রূপ ভোলবার নয় বাবা। আমার ঠাকুমা দেখে বলেছিলেন—এ যে কন্দর্প লো!

. আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি দেখেছিলেন?

সলজ্জ হেসে মাথার কাপড় একটু টেনে দিয়ে খুড়ীমা বললেন—দেখেছি বই কি বাবা। না হলে আর বলছি কি ক'রে? আমার বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন বেড়াতে। উনিই তো আমার বিয়ের ঘটক বাবা।

আমি কৌতুকবোধ ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম সুলতা—তাই নাকি! কই শুনিনি তো?

—শুনবে কি ক'রে বল। একথা তো বেশী কেউ জানত না!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আমার তখন বয়স তেরো চলছে। গোবরডাঙার মুখুজ্জেবাড়ীর দৌহিত্র শরীক হলেন বাপ আর গ'ড়ের বাঁড়ুজ্জেবাড়ীর মেয়ে হলেন আমার মা। দুদিক থেকে সম্পত্তি পেয়ে বাবা আমার কেষ্টবিষ্টু লোক। চাল-চলন একেবারে রাজারাজড়ার মত। আর আমার রূপ ছিল বাবা। তের বছর বয়সে আমার রূপের খ্যাতি রটেছিল। সম্বন্ধ আপনি আসছিল। বাপের বড় আদুরে মেয়ে ছিলাম আমি। রাগলে জ্ঞান থাকত না। আমাদের বাগান ছিল খুব ভাল। সাবু গাছ, হরেক রকমের পাম গাছ, অর্কিড পাতাবাহার থেকে গোলাপ যুঁই বেল, জবা, চামেলী, গন্ধরাজ, চাঁপা—কি গাছ ছিল না! তার মধ্যে গোটা কয়েক মতিয়াবেলা ছিল, তার ফুল হত এই বড় বড় আর কুঁড়িগুলো হত বড় বড় মুক্তোর মত। ঠাকুমা শিবপুজো করাতেন। আমি মতিয়াবেলার কুঁড়ি তুলে মালা গেঁথে পরাতাম। কিন্তু পাড়ার সব গেরস্তঘরে মেয়েরা খুব ভোরে উঠে এসে ফুল চুরি করে নিয়ে পালাত। আমার বাতিক ছিল এদের পাকড়ে খুব বকা-ঝকা করে তারপর মালীকে ডেকে ফুল দিতে বলতাম। তারা নিয়ে যেত। ওটা আমার স্বভাব ছিল। এখনও আছে। কেউ গরীব এসে কাপড় চাইলে প্রথম খানিকটা খুব বকতাম, তারপর তারা যখন চলে যেতে চাইত তখন ডেকে কাপড় দিতাম।

একদিন বাবা, ভোরে উঠে এমনি কতকগুলো মেয়েকে ধরে বকাঝকা করছি, হঠাৎ নজরে পড়ল বাগানের পাঁচীলের ওপার থেকে একখানা হাত কেউ তুলে মার্শাল নীল গোলাপের লতার একটা ডাল আস্তে আস্তে নোয়াচ্ছে। মস্তবড় মার্শাল নীলের লতা। আর ফুলগুলো খুব ভাল।

আমি মালীকে বললাম—দেখেছিস?

সে বললে—হ্যাঁ।

বললাম—আস্তে আস্তে যা। গিয়ে দু হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরবি হাতখানা। তারপর দেখছি আমি। যা।

মালী গিয়ে খপ করে চেপে ধরলে হাতখানা।

তারপর কি কথা হ'ল মালীর সঙ্গে, মালী হাত ছেড়ে দিলে।

আমার রাগ হ'ল, বললাম—হাত যে ছেড়ে দিলি হারামজাদা!

মালী বললে—খুব একজন বড়বাবু দিদিমণি—

—যেই হোক। ফুলচুরি করছে সে চোর। তুই কেন ছাড়লি তাকে?

মালী বললে—বাবু আসছে দিদিমণি। বললে—আরে হাত ছাড়। আমি হাতটা এখুনি টেনে ছাড়িয়ে নিতে পারি। তোমার থেকে আমার জোর বেশী। ছেড়ে দাও, আমি ফুল তুলেছি, তা যখন মালিকের আপত্তি, তখন আমি নিজেই যাচ্ছি তাঁর সামনে। ওই উনি আসছে। ওই ফটকে দাঁড়িয়েছে। বাবা, তোমার বাবাকে দূর থেকে দেখেই আমি হতভম্ব

হয়ে গেলাম। একেবারে সাক্ষাৎ রাজপুত্র। তোমাদের বংশের লম্বা তো সবাই। আর তেমনি রূপ। তখন ফুনফুনে দাড়ি বলে দাড়ি কামান। গোঁফ সত্ত গজিয়েছে, আর যেমন পোশাক তেমনি কেতাদুরস্ত। দারোয়ানকে বলে তিনি ফটকের ভেতরে ঢুকলেন, তাঁর হাতে তিন চারটে মার্শাল নীল গোলাপ।

বাবা, আমার লজ্জার সীমা রইল না, আমি একেবারে দে ছুট; বাড়ীর ভিতরে গিয়ে হাজির। বাড়ীর ঝি-চাকরেরা উঠেছে আর উঠেছেন ঠাকুমা। আমাকে দেখে বললেন—কি লা, এমন হাঁপাচ্ছিস কেন?

—ছুট্টে পালিয়ে এসেছি ঠাকুমা।

—কেন কি হ'ল?

আমি বললাম বাবা। ঠাকুমার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, খুব ভালবাসতেন। এমন সময় মালী এসে বললে—উ বাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি বললাম—যেতে বলে দে।

ঠাকুমা বললেন—না। আমি যাচ্চি দাঁড়া। দেখি নবাবনন্দিনী আমার আবার কাকে কি বলে এলেন। কি ফ্যাসাদ বাধালেন।

ঠাকুমা খিড়কীর দরজা দিয়ে বাগানে গেলেন। আমি দরজার আড়ে লুকিয়ে রইলাম।

একটু থামলেন খুড়ীমা। তারপর হেসে ওই বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন—কি হাসি বাবা। হো-হো-হো ক'রে হেসে একেবারে সারা। তখন ঠাকুমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। ঠাকুমা পরিচয় পেয়েছেন—একেবারে অপ্রস্তুতের শেষ। কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর বড় রায়মশায়ের ছোট ছেলে, বি-এ পাশ করেছে অনার্স নিয়ে। এম-এ পড়ছে। এসেছে গোবরডাঙার মুখুজ্জেবাড়ীতে, এসেছেন শীকারের নেমন্তন্নে। গোবরডাঙার মুখুজ্জেবাড়ীতে শীকারের ধুম ছিল। গোটা বাংলাদেশের লোকে জানে। জ্ঞানদা মুখুজ্জে তখন নতুন উঠেছেন, ভারী নাম। ওর সঙ্গে আলাপ হয়ে গোবরডাঙা এসে ভোরবেলা উঠে একলা বেরিয়ে আমাদের বাগানের ধারে মার্শাল নীলের ঝুঁকেপড়া ডাল নুইয়ে ফুল তুলছিলেন। তাঁকেই আমি মালী দিয়ে পাকড়েছি। কি লজ্জা বল তো! ঠাকুমা এসে আমাকে টেনে ধরে নিয়ে গেলেন, বললেন—এই এনেছি ভাই, এ-বাড়ীর পুলিশসাহেবকে। এ মেয়ে ভাই, পুলিশসাহেব। তা ধরবি তো ধর রাজার ছেলেকে! আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তোমার বাবা খুব হাসলেন। বাবা এলেন। আমাকেই চা জলখাবার আনতে হল। খেয়ে বিদায় নিয়ে এলেন।

তারপর—।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—এরপর বাবা তোমার ঠাকুরদার কাছে এলেন বিয়ের কথা নিয়ে। তোমার ঠাকুরদা তো সাহেবী মেজাজের লোক ছিলেন, বললেন—যোগেশ্বরের বিয়ে এখন তো দেবই না। এম-এ পাশ করার পর ভাবব। আর বিয়ে ও করবে নিজে দেখে। বড়ছেলের বিয়ে দিয়েছি জনাইয়ে। তাতে ছেলে সুখী হয়েছে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর চাপে অন্তরকম হয়ে গেল। যা ঠিক আমার পছন্দ নয়। যোগেশ্বরকে আমি অন্তরকম তৈরী করব।

হয়তো বিলেত পাঠাব। এখন থেকে বিয়ে দিয়ে ওর হাতপা বেঁধে পঙ্গু করে দেব না। আর আমার ইচ্ছে, ওর বউ হয় লেখাপড়া জানা মেয়ে। আপনারা মেয়ে তেরো বছরের হতেই ব্যস্ত হয়েছেন বিয়ে দেবার জন্যে। সুতরাং মতে মিলবে না। আপনারা বড়লোক, মানী লোক, মেয়ে সুন্দরী, আপনারা চেষ্টা করুন, যোগেশ্বরের থেকে ভাল পাত্র মিলবে।

বাবা ফিরে এলেন মুখ ভার ক'রে। ঠাকুমাকে বললেন—তুমি পাঠালে জোর ক'রে, এখন হ'ল তো!

তারপরই বাবা, তোমার বাবা চিঠি দিলেন, তোমার খুড়োমশায়ের সন্ধান দিয়ে। আমার শ্বশুর তখন কীর্তিহাটে দেবোত্তরের ভার নিয়ে রাজত্বি করছেন জমিদারদের বনেদী চালে। তোমার খুড়ো তখন এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে কলকাতায় পড়ছেন। পুজো-আহ্নিকে খুব ঝোঁক। চেহারাতে তিনি তোমার বাপ থেকে উজ্জ্বলই ছিলেন। লিখলেন—আমার খুড়তুতো ভাই আছে, বড়কাকার বড়ছেলে, লেখাপড়া করছে, হিন্দুয়ানীতে ঝোঁক আছে। সুন্দরী কন্যা খুঁজছেন। আপনি যদি পছন্দ মনে করেন তবে চেষ্টা করুন, আমার বিশ্বাস হয়ে যাবে। আমি আমার ভাইকে বলেছি আপনার মেয়ের রূপের কথা। আর ভবিষ্যতে রায়বাড়ীতে সে উপযুক্ত গৃহিণী হতে পারবে।

ঠাকুমা বললেন—তাই কর রমানাথ। আমার বাবার নাম রমানাথ বাড়ুজ্জে। অন্তত রায়বাড়ীর শরীক হয়ে থাক আমাদের মেয়ে। বড়ভাই ফিরিয়ে দিয়েছে, মেজভাইয়ের পুত্রবধূ হয়ে থাক, জেদটা তাতে আমার বজায় থাকবে।

তাই হ'ল—মেজতরফের বড়বউ হয়ে এলাম। আমার টানে তোমার কাকা লেখাপড়া ছেড়ে বাড়ী এসে বসলেন। জুড়ি হাঁকালেন, প্রজাশাসন করলেন, থিয়েটার করলেন, মদ ধরলেন। আমার কোলে দু বছর অন্তর ওই সব ছেলের পাল এল। বড় ব্রজ, তাকে জান; সেজটা যা ক'রেছে তা জান। ওদিকে তোমার বাপের নামে দেশ ছাইল। তবু উনি বলতেন —খবরের কাগজওয়ালা। বাঁধা মাইনের চাকর। মাতাল। ফিরিঙ্গী মেয়ে নিয়ে ঘোরে। তারপর যখন বিয়ে ক'রে এখানে তোমার মাকে নিয়ে এলেন, তখন মেজতরফের দেনা হয়েছে, সম্পত্তি বিক্রী হচ্ছে, কিনছে তোমার বাপ আর জ্যেঠা। বাবা, তখন থেকে আমার রাগ হল। মনে হ'ল আমার সব্বনাশের হেতু ওই তোমার বাপ। সেদিন থেকে বিবিমহল আমি মাড়াই নি। তোমার কথা শুনেছিলাম, মেলা টাকা তোমার। ছবি আঁক। আর টাকা ওড়াও। এখানকার চালচলন তাও ভাল লাগেনি। আমার ছেলেরা, ব্রজ বাদে, সবাই তোমার নামে অনেক কথা বলে। কিন্তু কাল অর্চনা গিয়ে যখন পড়ল আমার পায়ে আর তোমার কথা বললে, তখন চোখ খুলল। ভাবলাম ভালই হয়েছে। ছেলে তো মা বাপ দুয়ের গুণেই হয়। আমার গর্ভে তুমি হলে তুমি এমন হতে না। অন্যরকম হ'তে। তোমার মা লেখাপড়া জানা মেয়ে, বড় উকীলের ভাগ্নী। তার গুণ পেয়েই না তুমি এমনি। আজ অর্চনার বিয়ের সব ভার নিতে চেয়েছ। দেবোত্তরকে বাঁচিয়ে রেখেছ। ছোটমা—আমার শাশুড়ীর জন্যে এত করেছ। ভালই হয়েছে। সারারাত ভেবে সকালে অর্চনাকে বললাম—চলতো সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। কথা বলে আসি। তা মনটা জুড়লো বাবা।

আমি অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে শুনছিলাম—দাঁড়িয়েই রইলাম।

অর্চনা চা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বললেন—পান দেখ দেখি? সুরেশ্বরের এখানে পানের কারবার আছে না—নেই? কলকাতায় মানুষ আজকালকার ছেলে সিগারেট খায়, মদও হয় তো খায় কিন্তু পান তো ওরা খায় না। বলে খুড়ীমা হাসলেন।

অর্চনা বললে—দোক্তা আনতে রঘুকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। পান এখানে আছে। জর্দাও আছে, তা জর্দায় তো তোমার হবে না! সুরোদার সেদিকে ত্রুটি নেই। সায়েবী কেতা থেকে দেশী কেতার বন্দোবস্তের ত্রুটি নেই।

খুড়ীমা বললেন—তা তো এ-বাড়ীর চিরকালের রেওয়াজ মা। আমি যখন প্রথম বউ হয়ে এলায়, তখন গাড়ী ঘোড়া লোকলস্কর, সাহেবী বাসন কাঁটা চামচে, মুসলমানদের বাসন বাবুর্চি সব ছিল। শশুরের আমলের হাতীটাও তখন বেঁচে। তা যা, পান সেজে নিয়ে আয়। যা, দাঁড়াস নে, চা খেয়েই আমার পান চাই। খাওয়ার পর মিষ্টিমুখ থাকলে আমার ন্তাকার আসে।

অর্চনা চলে গেল। খুড়ীমা চা নিয়ে কর গুনে নিবেদন করে নিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন—চমৎকার চা হয়েছে। এমন চা অনেকদিন খাইনি। হঠাৎ হেসে বললেন—আমাদের বাড়ীতে দু পয়সা প্যাকেটের চা, আর একটা পুরনো এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িতে জল গরম হয়—ফুটতে শুরু করলে প্যাকেট শুদ্ধ চা ফেলে দিয়ে ফুটল। তাই নামিয়ে দুধ দিয়ে চিনি দিয়ে পেতলের হাতায় ঘেঁটে চা তৈরী হল। তারপর কাঁসার গেলাসে একগেলাস করে নিয়ে বসল মেয়ে-পুরুষ ছেলেতে বিশ-পঁচিশজন। যেমন গন্ধ তেমনি স্বাদ।

আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না সুলতা, এসব কথার কি উত্তর দেব। শুধু শুনেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু খুড়ীমার সেদিকে গ্রাহ্য ছিল না। তিনি যেন শুধু কথা বলতেই এসেছিলেন এবং আমাকেই বলতে চেয়েছিলেন।

হঠাৎ এবার বলে ফেললেন—আমার হিংসে ছিল বাবা, রাগ ছিল দারুণ রাগ ছিল। দেখ এসব তো আমার হ'তে পারত। তুই তো আমার পেটে হতে পারতিস! তা হ'ল না—বেশ, হ'ল না। আমি লেখাপড়া জানা ছিলাম না, বিবি ছিলাম না। বেশ। কিন্তু ঘটকালী করে আমার কপালে এই এমন একটা মানুষ—

অর্চনা এসে ঢুকল পান হাতে করে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন খুড়ীমা। খুড়ীমা হেসে বললেন—পান, প্রাণটা বাঁচল। এ তো বেশ বড় ঢলকো পান রে! খুব মোটা খিলি করেছিস।

অর্চনার সেই এক উত্তর—তোমার ভাসুরপো একেবারে আমীর গো। পানের সরঞ্জাম, সেই কলকাতার কাটা সুপুরী সুগন্ধি খয়ের কমলানেবুর শুকনো খোসা, খুব সুগন্ধি জরদা, ছোট এলাচ বড় এলাচ সব আছে!

—ছোট এলাচ দিয়েছিস নাকি?

—না। তুমি খাও না আমি জানি। জর্দাও দিই নি।

—আন ৯ জর্দা খাইনে পাইনে বলে রে। নইলে সেকালে কাশী থেকে জর্দা আসত মেজতরফের কর্তার নামে। তাই ভাগ ক'রে দিতেন। এখন কড়া তামাকপাতা আর ফুটো

জোয়ান মৌরী দিয়ে ভেজে নামিয়ে নি। আন জর্দা আন।

এতক্ষণে সুলতা, আমি কথা খুঁজে পেয়ে বাঁচলাম। বললাম—কৌটাটা আপনি নিয়ে যান খুড়ীমা।

—নিয়ে যাব? আমার মুখের দিকে তাকালেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন—দে। তোকে আজ বড় ভাল লাগল রে।

তারপরই চলে গেলেন। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—যা বললাম তার চেষ্টা তুই অবিলম্বে কর বাবা! তোর ঠাকুরদার ওপর অন্নপূর্ণা ঠাকুমার একটা মায়া ছিল। হয় তো তোর কথা রাখলেও রাখতে পারেন। সে ছেলের বিয়ে এখনও হয় নি। এ বাড়ীতে বিয়ে দেবেন না বলে চিঠি লিখেছিলেন অগ্রহায়ণ মাসে। আজ তো মাঘ মাসের ৪ঠা।

* * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, আমি ৬ই মাঘ, দুদিন পর, কলকাতায় এলাম। খুড়ীমার কথাটা আমার মনে ভাল লেগেছিল। অন্নপূর্ণা দেবীকে বছর দুয়েক বিজয়ার পর একবার ক'রে দেখেছি। বাবা-মার সঙ্গে যেতাম। বিজয়ার পর প্রণাম করতে যেতেন। বাবা যখন খুব সাহেব, যখন বিয়ে করেন নি তখন বাবা যেতেন না তাঁর ভয়ে। বিয়ের পর তিনি নিজে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, মাকে গয়না দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। আমি যেবার প্রথম যাই তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। আমাকে দেখে ব'লে উঠেছিলেন—ওরে, এ সে অবিকল আমার দেবুরে। কি সমাদর—আমাকে একশো টাকার নোট দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন—দেখ, সাচ্চা জরী বসানো ভেলভেটের পোশাক কিনে দিস। আর মাথায় একটা পালক দেওয়া পাগড়ি। জানিস, কালীপূজার সময় এই বয়সে দেবু আমার এই পোশাক পরত।

পরের বছর ঠিক তেমনি পোশাক পরে গিছলাম বিজয়ার সময়। তিনি একদৃষ্টে অনেকক্ষণ আমাকে দেখে কেঁদেছিলেন। অবিকল দেবেশ্বর। অবিকল! তারপর আমাকে বলেছিলেন—দেখিস বাবা, সেই রূপ পেয়েছিস, কিন্তু দেবুর মত হ'সনে। খবরদার।

তারপর যাওয়া বন্ধ হয়েছিল। বাবা, ইংরিজী কাগজে খুব কড়া প্রবন্ধ লিখলেন, সেটা ষোল সতেরো সাল, পলিটিকাল মার্ডার আর টেররিজিম নিয়ে প্রবন্ধ। প্রবন্ধ একটা নয়, সে একটা সিরিজ—বোধহয় তিনটেতে সম্পূর্ণ হয়েছিল। তার মধ্যে তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন মার্ডারারদের মন এবং প্রকৃতি। তিনি বলেছিলেন—আসলে এরা মার্ডারার প্রকৃতি নিয়েই জন্মায়; যদি এরা শিক্ষা না পেত, তা হ'লেও তাদের এই দুর্নিবার প্রকৃতি এই পথেই এদের চালাত। সাধারণ মার্ডারের সংখ্যা তো কম নয়। এ শুধু এদেশেই নয়, সব দেশে। শিক্ষা এদের খুঁজিয়েছে একটা 'কজ'—'এ নোবল কজ'। কিন্তু কজ—যা তোমার কাছে নোবল—তা অন্যের কাছে নোবল্ তো নয়ই, সেটা সেই চিরন্তন ক্রাইম। এই ধরনের প্রবন্ধ। তার সঙ্গে তিনি জড়িয়েছিলেন ল'ইয়ার এ্যাডভোকেটদের। বলেছিলেন—যারা এই সব ক্রিমিন্যালদের ব্রিফ নিয়ে কেস ডিফেণ্ড করে তাদের নেচার এ্যানালিসিস করলেও ঠিক এই ক্রিমিন্যাল ইনস্টিংক্ট্ পাওয়া যাবে। এবং তাদের মধ্যে আবার আরও এক গভীর জলের মৎস্য আছে যারা একই সঙ্গে এই ইনস্টিংক্ট এবং তাদের কেরিয়ারের পথ ক্লীয়ার এবং এক্তার করে নেয়—যাতে ক'রে

তারা পায়ে হাঁটার বদলে জুড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে চলতে পারে। সেই হিসেবে কনসিডার দেম গ্রেটার অফেণ্ডারস্ টু দি সোসাইটি এ্যাণ্ড স্টেট। যদিও ম্যাজিকে-মুগ্ধ জনসাধারণের স্তিমিত লজিক অনুযায়ী তারা সেলফলেস গ্রেট মেন এ্যাণ্ড ওয়ার ফ্রন্টের সাপ্লাই এ্যাণ্ড সাপোর্ট লাইনের বিগ হিরোজ ব'লে পরিগণিত হয়।"

তুমি তো জান সুলতা, বাবা আমার গান্ধীজীকে কি ব্যঙ্গোক্তি এবং বক্রোক্তি করেছিলেন! তাঁর এ প্রবন্ধ আমি পড়ি নি, কারণ বয়স তখন আমার ছ' সাত বছর। আমি শুনেছি। অবিশ্বাসও করি না। বাবা হয়তো ঠিক এই ধরনের মানুষ ছিলেন না, তবে ইংরিজী কাগজে গিয়ে নাম করবার জন্যে এই ধরনের স্টাণ্ট লিখেছিলেন। এ বোধকরি ছিল তাঁর রক্তে।

সুলতা বললে—তার কিছুটা তোমার মধ্যেও আছে।

—নিশ্চয় আছে। স্বীকার করব না কেন? নিশ্চয় করি। নইলে বাবার বিরুদ্ধে আমিও তো এগার পেরিয়ে বারো বছর বয়সে ননকো-অপারেশনে পিকেটিং করতে গিয়েছিলাম। যার ধাক্কায় বাবা চাকরি ছাড়লেন। বাবা মিস চন্দ্রিকাকে নিয়ে পালালেন। আমি গোঁড়া হিন্দু হলাম। তারপর বাবা মারা গেলেন, শ্রাদ্ধ করতে এসে কীর্তিহাটের রায়বংশের পরিণতি দেখে তিরিশ সালে জেলে গেলাম। জেল থেকে বণ্ড দিয়ে একমাস আগে বেরিয়ে এসে ইংরিজী কাগজে বিদায় সত্যাগ্রহ লিখলাম। তারপর আর্টিস্ট হলাম। দাড়ি গোঁফ রাখলাম। মা মারা গেলেন। তোমার সঙ্গে আলাপ হল। হঠাৎ কীর্তিহাটে সেটেলমেণ্টের টানে এসে আর একরকম হয়ে গেছি। বলতে গেলে জমিদারী মেজাজ নিয়ে রায়বাড়ীকে কলঙ্কমুক্ত করবার মত দম্ভ নিয়ে এইসব ছবি এঁকেছি। আছে বই কি।

সুলতা রাগ করলে না। হাসলে। বললে—বড় রেগে গেছ তুমি হঠাৎ। কথা শেষ হতে হ'তে হাসিটা জোর হয়ে উঠল। হঠাৎ থেমে বললে—পাত্রাধার তৈল এবং তৈলাধার পাত্র এক সঙ্গে দুইই সত্য—বললে—রাগ করো না।

লজ্জিত হ'ল সুরেশ্বর। বললে—ঠিক বলেছ। মনটা ফুঁসছে। পাত্রে তৈল থাকে, পাত্রের আকার নেয় কিন্তু তৈলও গুণ হারায় না পাত্রও আকার হারায় না। কীর্তিহাটে এসে ইন্টেলেক-চুয়াল আমি এবং জমিদারী আসনে বসে জমিদার বংশধর আমি মিশে গিয়েছি। হয়তো প্রদীপ হয়ে আলো ছড়াতে চেয়েছি কিন্তু কড়াইয়ের তেলে বেগুনের ফালির মত ফুটতে শুরু করেছি।

সুলতা হেসে উঠল আবার। বললে—চমৎকার বলেছ। কিন্তু আমি বলছি—বে-গুণ তুমি নয়। গুণ তোমার কাছে। হঠাৎ রেগে গেছ। কারণটা ঠিক বলতে পারব না।

একটু চুপ করে থেকে সুরেশ্বর আবার বললে—কারণ আমার বাবার ওই প্রবন্ধের স্মৃতি। ওই 'বিদায় সত্যাগ্রহ' চিঠিটার একটা সম্পর্ক আছে। হেরিডিটি ছাড়া কি বলব? তা ছাড়া যা বলতে যাচ্ছি—অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ীতে অর্চনার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যাওয়ার কথা—তার সঙ্গে যোগটা আরও নিবিড়। ওর সঙ্গে আমার বাবার ওই প্রবন্ধটা বের হবার পরই অন্নপূর্ণা দেবী বাবাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। লিখেছিলেন—"তুমি ইংরাজী কাগজে যেসব কথা লিখিয়াছ তাহা শুনিয়া আমি নগেন্দ্রকে পড়িয়া শুনাইতে বলিলাম। সে সমস্তই আমাকে বাংলা করিয়া শুনাইল। ইহাতে তুমি আমাদিগকেও গালি দিয়াছ। আমার ছেলে ভবেন্দ্র উকীল

ছিলেন। আমার স্বামী উকীল ছিলেন। আমার স্বামী আলিপুর বোমার মকদ্দমায় আসামীপক্ষে ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন। আমার ছেলে ভবেন্দ্র এমন অনেক মকদ্দমায় বিনা ফীতে কাজ করিয়া গিয়াছে। সেও আজ নাই। তাহার পুত্র নগেন্দ্রও এমন ওকালতি করিয়া থাকে। আমি তাহাকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিই। ইহার জন্য আশীর্বাদ করি। সুতরাং তুমি আমার বংশকে এমন কি আমাকেও অপমান করিয়াছ। বহু পূর্বেই পিতৃবংশের সহিত সম্পর্ক ত্যাগই করিয়াছি। সে দাদার আমল হইতে। শুধু দেবেশ্বর আমার সমবয়সী—খেলার সঙ্গী ছিল, তাহাকে বাল্যকালে ভাইফোঁটা দিবার জন্য কাঁদিতাম, সেই কারণে সে অনেক কুকার্য করিলেও তাহাকে ত্যাগ করি নাই। অদ্য হইতে তোমাকেও ত্যাগ করিলাম জানিবে। অতঃপর, তুমি বৎসরে একদিন আইস, তাহাও আর আসিবে না।"

বাবা হেসে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এবং আর যাননি কোনদিন। আমিও যাইনি। এবং একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। বাবার মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়নি। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র গিয়েছিল। অন্নপূর্ণা দেবী লোক দিয়ে ঘাটে কামিয়ে উঠবার পর পরবার জন্য নতুন কাপড় পাঠিয়েছিলেন। আর দশ টাকা লৌকিকতা। কিন্তু পত্র দেননি।

মায়ের মৃত্যুর পর ও-বাড়ীতে যাইনি নিমন্ত্রণ করতে। মনটা যেন ভুরু কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বলেছিল—নাঃ। কি লাভ হবে কতকগুলো কটু কথা শুনে!

এবার অর্চনার জন্যে সংকোচ করলাম না। ঠিক করলাম যাব। অন্তত অর্চনার ফটোখানা দেখিয়ে আসব।

খুড়িমা বললেন—উকিল নগেনবাবুর ছেলেটি ভাল। ডাক্তারী পাশ করেছে, বিয়ে করেনি। কারণ, অন্নপূর্ণা দেবীর প্রপৌত্রের জন্য পাত্রী তাঁর পছন্দমত হওয়া চাই।

অর্চনা অবিকল ভবানী দেবীর মত দেখতে, তার উপর সে গৌরী। দেখেছ তো অর্চনাকে। আজও তার কি রূপ! কিন্তু সে সময়ের রূপের আর কিছুই নেই। সে অর্চনার আর কিছুই নেই বিধবা অর্চনার মধ্যে।

ঠিক এই মুহূর্তেই পুরানো কথার ধারায় বাধা দিয়ে আজকের বিধবা অর্চনা এসে ঢুকল। কাঁধে একখানা বড় তোয়ালে। তার বেশী অংশটাই সামনের দিকে ঝুলছে, সে তাতে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল। এবং বললে—রায়বংশের ইতিহাসে বড় বড় রায়দের ছেড়ে সর্বনাশী অর্চনার নাম কেন?—না, তাই বলছ।

সুলতা বললে—না ভাই, হচ্ছিল তোমার সে-কালের রূপের কথা।

—রূপের কথা! একটু হাসলে অর্চনা। তারপর বললে—হ্যাঁ, তা ছিল। কিন্তু ভাই আমার কাল। রূপের জন্যেই বিয়ে হল। বল তো সুরোদা, বিয়েটা না হলে রায় বংশের মহাভারত কি অশুদ্ধ হত? আমি আমার পথ তো ঠিক করে নিয়েছিলাম। আমি হয় মরতাম, নয়তো এত মেয়ে জেলে গেল—যেতাম। সুলতাদির মত দেশের কাজ করে বেড়াতাম।

সুরেশ্বর বললে—তোর বিয়ের কথাই বলছি রে। রায়বংশের মহাভারত তুই যে শুদ্ধ করতে এসেছিস। তোর বিয়ে না হলে সেটা হয় কি করে? অতুলেশ্বরকাকা আজ কংগ্রেসী মাতব্বর। স্বাধীন দেশের মধ্যে কাটা বাংলাদেশে মেদিনীপুর সব থেকে বড় জেলা।

সেখানকার কংগ্রেসীরাই আজ প্রধান। বল না অতুলেশ্বর রায়বংশের মহাভারতে পাণ্ডব কৌরবদের কে? কেউ না! সে যদুবংশের মহানায়ক পার্থসারথির ডানহাত বা বাঁহাত সাত্যকী-টাত্যকীর মত কেউ হয়ে বসে আছে। রায়বংশের মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তার চুকে গেছে। তুই তেমনি ধারা, রায়বংশের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে সুলতার মত প্রমীলা-ট্রমীলা কেউ হত্তিস।

—খুব হয়েছে। কিন্তু এখনকার মত ওঠো। খাবার তৈরি, শীতের দিন, গরম-গরম খেয়ে নাও এখন। পুরনো কাল ছেড়ে নতুন কালে—যে-কালে মহাভারতের হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থ মাটি-ঢাকা পড়েছে, সেইকালে এস। নয়াদিল্লীর কনট সার্কাসের হোটেল-রেস্টুরেন্টের মত খাবার করেছি। তবে মাংস মুর্গীর নয়। ওটা মাপ করতে হবে।

—ব্রজদা কি করছে? তার ভজনটজন শেষ হয়েছে।

—অনেকক্ষণ। বসে বসে মাংস রান্না বাত্‌লাচ্ছিল। ওইটেই ছাড়তে পারলে না ব্রজদা। কি বলছিল জান?

—কি?

—হঠাৎ চুপ করে গেল একসময়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বল, এবার কি করব? ঝোল অনেকটা রয়েছে, অথচ মাংসটা নরম হয়ে গেছে খুব। গলে যাবে হয়তো। উত্তর দিলে না। আবার ডাকলাম, ব্রজদা। ব্রজদা হেসে উঠল। বললাম, হাসছ যে? ব্রজদা বললে—ওরে অর্চি, সন্ধ্যেবেলা থেকে ঠাকুরকে বলছিলাম—ঠাকুর, এবার পথে বের করে দাও। বড় ইচ্ছে সন্ন্যাসী হয়ে শুধু তোমায় নিয়ে থাকি। কিন্তু মজা দেখ—এই এতক্ষণ ধরে ঘ্রাণেন অর্ধভোজন করছি, আর ভাবছি, আঃ, এমনি আহারটি যদি নিত্যি জোটে! হঠাৎ সন্ধ্যের কথাটা মনে পড়ল। ভাবছিলাম, ঠাকুর সব পারে। চোখ-কান-মাথা-হাত-পা সব জব্দ করতে পারে। সবাইকে দমন করতে পারে। কালীয়-নাগকেও পারে, কংসের হাতীকেও পারে। পারে না শুধু মানুষের উদরের সঙ্গে। আরে অন্যে পরে কা কথা, নিজেই ঠাকুর ছেলেবেলায় চুরি করে খেয়েছে, মদ্দ জোয়ান হয়ে ভাত পায়নি, রুটি পায়নি, বিদুরের খুদ খেয়ে—নামই হয়ে গেছে দামোদর।

বলতে বলতে কেঁদে ফেললে অর্চনা।

তোয়ালের খুঁটে চোখ মুছলে। সুলতা বললে—ওটাই মহাভারতের আদি কথা অর্চনাদি। কৌরব-পাণ্ডব, রায়বাড়ী—সব বাড়ীর সব কথার মূলেই ওই কথা। তবে উদর বলব না, বলব অন্ন।

—না। সুলতাদি, কথাটা তোমার নেহাতই পলিটিক্যাল থিয়োরী। ওছাড়া আরও অনেক কিছু আছে।

সুরেশ্বর বললে—চল খেয়েদেয়ে এটার মীমাংসা করব। ওঠো সুলতা।

খাওয়া দাওয়া সেরে এ ঘরে এসে সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—দেখ, আমার জবানবন্দী নেবার বিচারক, তুমি কি এ্যাডজোর্নমেন্ট দিয়ে বাড়ী যাবে—না? রাত্রিও অনেকটা হয়েছে।

সুলতা চুপ করে রইল। ভাবছিল।

—তা হলে আজ না-হয় থাক! গাড়ী বলে দি!

—না। অন্ততঃ অর্চনার ভাগ্যের কথাটা শুনে যাব। উনি—ওকথা বললেন কেন?

—কোন কথা, নিজেকে স্বামীঘাতিনীর কথা?

—হ্যাঁ।

কথাটা অর্চনা বলেছে খাবার সময়। দুপাশে মুখোমুখি হয়ে বসেছিল চারজনে।

টেবিলে নয়, অর্চনা খাবার ব্যবস্থা করেছিল মেঝের উপর আসন পেতে। বলেছিল—টেবিলে বসলে আমার বসা হবে না—তাই মেঝের উপর আসন পেতে সনাতন নিয়মে করলাম। অসুবিধে হবে?

কথাটা সুলতাকেই বলেছিল। এর অর্থ সুলতার বুঝতে দেরী হয় নি। ব্যাপারটা ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার। এবং সেটা তাকে নিয়েই। তবুও ভদ্রতার খাতিরে বলেছিল—না—না—অসুবিধে কিসের? ঠিক আছে। এ বেশ সুন্দর ব্যবস্থা। কিন্তু শেষকালটায় না-বলে পারে নি—আর ছোঁয়াছুঁয়িটা আপনি মানেন—

—না সুলতাদি, তা মানিনে। এই দেখুন—ওপাশে দুখানা আসন—ও দুখানা বড়দা আর সুরোদার জন্যে। আর এদিকে পাশাপাশি আমরা দুজন। আমি মাছ মাংস পেঁয়াজ এগুলো খাইনে, রাত্রে ভাতটাও খাইনে কিন্তু নিরামিষ তরকারী আলু ছেঁচকি-আলুভাজা-পটলভাজা এসব খাই, লুচি রুটির সঙ্গেও খাই মুড়ির সঙ্গেও খাই। হয়তো জানেন না নির্জলা একাদশীও একালে উঠে গেছে। তা নয়, আমার আপত্তি ওই টেবিল। আর ওই চাদর। বুঝলেন না ওটা তাই বরদাস্ত করতে আমি পারিনে। বিধবা বিয়েও আমি সহ্য করতে পারি, সমর্থন করি। অসবর্ণ বিয়ে—এমন কি International কি Inter Communal বিয়েতেও আপত্তি নেই। কি একটা মেয়ে ডাইভোর্স করছে তাও সয়—কিন্তু দুবার তিনবার ডাইভোর্স করে বিয়ে এটা সহ্য করতে পারিনে। ওটাকে আমি ঘেন্না করি। আর ঘেন্না করি cheating কে! ভালবাসার ছলনার চেয়ে পাপ আর হয় না! জানেন আমার লাইফের ট্র্যাজেডিই ওইখানে। আমার স্বামী আমাকে—।

হঠাৎ চুপ করে গেল অর্চনা। কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বসুন—আপনাদের পরিবেশন ক'রে দিয়ে আমি বসে পড়ব আপনার পাশে।

প্রায় অন্ধ ব্রজেশ্বর কালো চশমাটা খুলে রেখে খেতে বসল। তার পাশে সুরেশ্বর।

ব্রজেশ্বর দিনের থেকে রাত্রে দেখতে পায় অপেক্ষাকৃত ভাল। সকালে সূর্যোদয় থেকেই চোখ তার রাঙা হতে শুরু করে। রোদ যত বাড়ে তত যন্ত্রণা বাড়ে। কালো চশমায় আরাম বোধ করে এবং একটু আধটু দেখতেও পায়, রাত্রে যন্ত্রণা কমে—জল পড়া বন্ধ হয়। তখন আলোতে দেখতে পায়।

চশমাটা খুলে রেখে ব্রজেশ্বর বলেছিল—ওরে ভাই, এসব এড়াবি কি ক'রে? সংসারে এ-জন্মের ঋণ ও-জন্মে শোধ করতে হয়। তুই সেই সতীবউরাণী—

অর্চনা বলেছিল—থাম তো! ওই ব'লে ব'লে তোমরা আমাকে পাগল করে দেবে। যত সব বাজে কথা! তোমাদের যত ঝঞ্ঝাটে আমাকে জড়াবার ফন্দী! আমি সতীবউরাণী তাহলে তুমি-টা কে শুনি? আর ওই সুরোদা, ওই বা কে?

ব্রজেশ্বর বলেছিল—রাজাভাই আমার; প্রজাদের কাছে রায়দের ঋণ তো অনেক। শোধ দিতে এসেছে। সে জন্যে মদ খায় নি—বিলাস করে নি—তা ক'রে নিতে এসেছে। অঞ্জনা ঠাকরুনের ঋণ শুধতে এসেছে।

সুরেশ্বর বলেছিল—ব্রজদা, তুমি ভাই একখানা বই লেখ—।

ব্রজেশ্বর হা—হা করে হেসে বললে—দ্বিতীয় ভাগের বানানগুলো আজীবনে দোরস্ত করতে পারিনি—বাংলা পণ্ডিতের কিল খেয়ে রায়বংশে জন্মেও মোটাতে পারি নি। তার উপর ঠাকুর চোখে মেরেছেন। তুমি জানো রাজাভাই—সুপুরুষ ব্রজেশ্বরের চোখের চাউনিতে কি ভেল্কী খেলতো। এখুনি করুণ সজল; রাজা মহারাজাদের সামনে সেই দৃষ্টিতে তাকালে পথল পানি হো যাতা থা। সুন্দরী যুবতীদের দিকে একটু ঢলঢলে উদাস দৃষ্টিতে তাকাতাম, তারা মরমে মরে যেতো। এখন সেই চোখ গেছে, দু চোখে পানি ঝরে। দেখতে পাইনে। তবে আমি বলে যেতে পারি তুমি লিখে নিতে পার। মডার্ন রিয়ালিস্টিক না হোক, লোকে অবাক বনে যাবে।

অর্চনা বলেছিল—আমাকে ব'লো আমি লিখব। সংস্কৃতে এম-এ পাশ করেছি—বানান সব আমি শুদ্ধ ক'রে লিখতে পারব।

—তা হলে ধর—তুই সতীবউরাণী, রাজা ভাইয়ের তিন জন্ম রায়বংশে—প্রথমে কুড়ারাম রায়, তারপর রত্নেশ্বর রায় তারপর রাজাভাই সুরেশ্বর রায়।

সুরেশ্বর বলে উঠল—নিজের কথাটা বল—।

—দাঁড়াও ভেবে দেখি, আমি কে?

অর্চনা বললে—তুমি কে আমি বলব?

—বল?

—তুমি সেই শ্যামাকান্ত—এ জন্মে কাঁদতে এসেছ। মুক্তি তোমার এই জন্মে।

—উঁ-হু, উঁ-হু, উঁহু! শ্যামাকান্ত আমি? বাপস্। আমি হলাম;—আমি হলাম কে?

সুরেশ্বর হেসে বললে—তা হ'লে আমি যতটা দিব্যদৃষ্টি পেয়েছি তাতে দেখছি তাতে তুমিই হলে কুড়ারাম রায়।

অর্চনা বললে—ঠিক, ঠিক, ঠিক! বংশটা প্রতিষ্ঠা করেছিলে—কোন প্রেজুডিস্ ছিল না—সেই মুসলমান মেয়েটার চুল বঁটিতে কেটে গোবর খাইয়ে শুদ্ধ করে নিয়ে ঘর করেছিল, তোমার সঙ্গে মিলবে ব্রজদা—সেই হলে তুমি।

খেতে বসে আলোচনার ধারাটা হাস্য-পরিহাসে এসে পৌঁচেছিল। ব্রজেশ্বর বললে—আচ্ছা সুলতা দেবীকে আপ্যায়ন কর। উনি বলুন। আমরা গেঁয়ো লোক—বকে মরছি গেঁয়ো চোরের মত, উনি শহুরে—ঠিক সেই শহুরে চোরের মত নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছেন—ওঁকে একটু

বাধা দেওয়াও হবে। উনিই বলুন—সেই স্থূল বপু গজরাজের মত দুঃসাহসী, ধীর গতি যিনি নাকি ঝাঁয়-ঝাঁইমার রাজহস্তীস্বরূপে যথেচ্ছ ভ্রমণ করে বিশাল কীর্তিহাট নামক অরণ্য এলাকা দখল করে বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেই মহাশয় ব্যক্তি বা ঐরাবৎ কি এমনি দুর্বল দেহ, শেয়ালের মত ধূর্ত ভীরু যে অহং ব্রজেশ্বর রায়—সে হতে পারি ?

সুলতা হেসে বললেন—শেষকালটায় মিল আছে। তিনিও শেষ বয়সে কালী কালী করেছিলেন, আপনিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ করছেন।

—হা হতোস্মি—এই হল আপনার বিচার ? শহুরে চোরের মত এককথায় ঝুললো আর মলো ? সংসারে শেষ জীবনে কালা কালী বা কেষ্ট কেষ্ট কি শুধু কুড়ারাম রায় করেছিলেন না আমি করছি ! সব পাখীতে মাছ খায় রাজাভাই, ধরা পড়েছে মাছরাঙার মত এই তোমার ব্রজদা।

—কি বললেন—কি বললেন কথাটা ? কি সব পাখীতেই—

—ও—সব পাখীতেই মাছ খায় ধরা পড়েছে মাছরাঙা।

অর্চনা বললে—ওসব আমাদের পাড়াগাঁয়ের প্রবাদ।

ব্রজেশ্বর একখানা ক্রাই তুলে নিয়ে বললে—হয়েছে অর্চনা। আমি হলাম অঞ্জনার বাউণ্ডুলে স্বামী ! সুদর্শন ! আর বিমলেশ্বর কাকা কে জান। ও হ'ল সেই বেটা গোপাল সিং ! বেটা শেষকালে জব্দ হয়ে বীরেশ্বর রায়ের অনুচর হয়েছিল, তীর্থ ক'রে এসেছিল—সে এসেছে এ বংশে তার বাজেয়াপ্তি সম্পত্তি ভোগ করতে। দেখ, সে-জন্মে মেরেছিল নিজের বেটাকে। এ-জন্মে শিবুর হাত কুপিয়ে সে-জন্মের জেল-খাটাটা খাটতে গেল।

অর্চনা বললে—তুমি বড়দা ভুল বললে—তুমি এসেছ খোদ বেদব্যাস, পথ ভুল করে এই রায়বাড়ীর ভাঙাহাটে। সে-জন্মে যা ভোগ করনি, যে-সব পাপ করনি এ-জন্মে করার পর তোমার ভগবান তোমায় চোখে রোগ দিয়ে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছে !

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। তাও হতে পারে। না হলে, তুই সতীবউরাণী এ কথা আমার মত কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে ? হ্যাঁ, দিব্যচক্ষেই দেখছি রে আমি। অর্চি দিব্যচক্ষেই দেখছি। সতীবউরাণীকে সে-জন্মে বীরেশ্বর রায় প্রাণ দিয়েও পান নি। বারো বছর পর সতীবউরাণী ফিরে এসেও ধরা দেন নি। তোকে সেই সতীবউরাণী জেনেই অন্নপূর্ণাঠাকরুণ নিজের একমাত্র নাতির নাতবউ করেছিলেন। তুই এবার প্রাণঢেলে তাকে চাইলি—কিন্তু সে শোধ নিলে গত জন্মের, বছর না ঘুরতে রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা ক'রে শোধ নিয়ে চলে গেল।

সুরেশ্বর বলে উঠল—থাম ব্রজদা। কি সব বলছ ?

ব্রজেশ্বর হেসে বললে—ওই দেখ। রাজাভাই, কাল জমিদারী উচ্ছেদ বিল পাশ হয়েছে। কাল থেকেই তোমাকে আমার রাজাভাই বলা উচিত নয়, তোমারও আমাকে প্রজাদাদা হিসেবে ধমক মারা উচিত নয়। কিন্তু হলে কি হবে ? ও কি ওঠে রে রাজাভাই—না ও ওঠবার। তা বেশ—চুপ করতে বলছ—তা চুপ। চাঁদবিবি নাটক হয়েছিল—তাতে মিয়ানমুণ্ডু আর হাবসী এখলাস্ খাঁ তরোয়াল খুলে লড়ে আর কি, এমন সময় চাঁদ সুলতানা ঢুকল, বললে—মিয়ানমুণ্ডু চুপ। অমনি মিয়ানমুণ্ডু চুপ—ওদিকে এখলাস খাঁ রুখে উঠেছে, কাটে আর কি,

চাঁদ সুলতানা তাকেও বললে, চুপ! তো সেও চুপ হয়ে গেল। তা তুমি রাজাভাই যখন বলছ তখন মিয়ানমুঞ্জু চুপই হয়ে গেল।

কথাটা বলায় কোথায় যে অন্যায় হয়ে গেছে তাতে তার সন্দেহ ছিল না, সে-কথা বুঝতে পেরেই সে এই ধরনের খানিকটা আবোলতাবোল বকে ব্যাপারটা লঘু করে নিতে চেষ্টা করলে। কিন্তু তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে। ব্যাপারটা অর্চনাকে নিয়ে। অর্চনা সুলতার পাশে বসে খাচ্ছিল, হঠাৎ সে বাঁ হাতে কপালটা ধরে ঝুঁকে পড়ল, ঝুঁকে পড়ার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে সকলেই বুঝতে পারলে যে সে নিজের মুখখানিকে ওই ভঙ্গির মধ্যে আড়াল দিতে চাচ্ছে। এবং ডান হাতে সে শুধু খাবার নাড়াচাড়াই করছে, কিন্তু গ্রাস মুখে তুলছে না!

সুলতা বিশেষ কিছু বুঝতে না পারলেও অনুমান করতে কষ্ট হল না যে, এই কথাটায় নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে অর্চনা মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। স্বামীকে মনে পড়েছে।

সেও মাথা হেঁট ক'রে খেতে চেষ্টাই করছিল। সুরেশ্বরও তাই। শুধু অতি স্বল্পদৃষ্টি ব্রজেশ্বর কথাগুলো শেষ করে অকারণে নিজের কথায় ব্যর্থ কৌতুকে খানিকটা হেসে হাতে ধরা ফ্রাইখানা খেতে খেতে বললে—কি চমৎকার ফ্রাই করেছিস অর্চনা! জানিস চিরকুমার সভার সেই ধরে আনা বর ছুটোর "কটলেট কই মশাই কট্‌লেট?" মনে পড়ছে। আমি একবার ওই মৃত্যুঞ্জয়ের পার্ট করেছিলাম! ঠাকুরদা বলেছিলেন—সাবাস্ রে ব্রজ সাবাস্! তুই আমার নাতি না হ'লে তোকে মেডেল দিতাম।

বলে আর একদফা হাসলে এবং গবগব ক'রে খেতে লাগল।

তাতেও কেউ কোন কথা বললে না; প্রায় অন্ধ ব্রজেশ্বর এবার বললে—গানটা মনে আছে? বলেই হাত নেড়ে ভঙ্গি ক'রে গেয়ে উঠল—যাও ঠাকুর, চৈতন চুটকি নিয়া—এস দাড়ী নাড়ি কলিমুদ্দি মিঞা!

সুরেশ্বর এবার বললে—ব্রজদা, কি করছ তুমি?

তার কণ্ঠস্বরে ছিল বিষণ্ণ তিরস্কার, প্রায়ান্ধ ব্রজেশ্বর এবার তার স্পর্শে চমকে উঠে বললে—কেন রাজাভাই? কি—? অর্চি—অর্চি—ওরে অর্চি!

এবার বুঝতে পেরেছে সে। সে আর্তভাবে ডেকে উঠল—অর্চি। অর্চি! ওরে অর্চি! সাড়া দিচ্ছিস না কেন ভাই?

এবার প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করে অর্চনা কোনমতে বললে—কি বড়দা?

—তুই কাঁদছিস?

—না—না!

ব্রজ বলে উঠল—ছি—ছি-ছি। ছি—ছি—ছি! এ আমি কি করলাম। আমি দেখতে পাইনে—। ছি—ছি—ছি! এর থেকে—।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অর্চনা বললে—তুমি ছি ছি ক'র না বড়দা। তোমার কোন অন্যায় হয় নি। কিছু অন্যায় বলনি! আজকের তোমাকে তো আমি চিনি। জানি। তুমি কোনকালে কোন পাপ করেছ তুমি জান। কিন্তু অন্ধ হয়ে চোখ চাওনি—শুধু ভগবানকে

ডাক—তোমার মুখ থেকে সত্যি ছাড়া মিথ্যে বের হবে কেন ? ঠিক বলেছ তুমি। তোমাদের সতীবউরাণীর অপরাধ কি ছিল তা আমি জানি নে। আমি তিনি কিনা তাও বলতে পারব না। তবে তাঁর এক বছরের মধ্যে অকালমৃত্যুর কারণ আমি। বলতে গেলে আমিই স্বামীঘাতিনী। এবং আমাকে দুঃখ দেবার জন্যেই তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন !

এরপর আর খাওয়া যায় না। কেউ খেতে পারে না। প্রথমেই উঠে পড়ল ব্রজেশ্বর !

—ব্রজদা—বড়দা।

—ওরে অর্চি, পেট ভরে গেছে রে। ওরে আর পারব না।

সে যেন আর্তনাদ করে উঠল।

* * *

আধখাওয়া ক'রে উঠে সুলতা এবং সুরেশ্বর সেই কীর্তিহাটের কড়চার ছবির ঘরে এসে বসল। বিষণ্ণতাটুকু যেন কেটেও কাটছে না। সুরেশ্বর যথাসাধ্য স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললে—দেখ, আমার জবানবন্দীর তুমি বিচারক, তুমি কি এ্যাডজোর্নমেণ্ট দিয়ে বাড়ী যাবে—না ? রাত্রিও অনেকটা হয়েছে। দেখ।

সহজ করে কথাগুলি গুছিয়ে বললেও সুরেশ্বরের কণ্ঠের বিষণ্ণতাটুকু চাপা পড়ল না বা মোছা গেল না—রেশটা রয়ে গেল।

সুলতাও চুপ ক'রেই ছিল ; ভাবছিল।

সুরেশ্বর বললে—দেখ, গাড়ী আনতে বলে দিই।

সুলতা এতক্ষণে বললে—না। অন্ততঃ অর্চনার ভাগ্যের কথাটা শুনে যাব। উনি ও কথাটা বললেন কেন ?

—কোন কথাটা ? স্বামীঘাতিনীর কথা ?

—হ্যাঁ।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সুরেশ্বর। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকবার টান দিয়ে বললে—তা হ'লে গোড়া থেকে—মানে যেখানে ছেড়েছি সেখান থেকেই শুরু করি শোন। তা হ'লে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। অন্ততঃ কোন প্রশ্নের ক্যাকড়া বের হবে না।

সুরেশ্বর বললে—বলছিলাম সেই রাত্রির কথা। ১৯৩৭ সালে বিমল কাকাকে এ্যারেস্টের পরের দিন, বড়খুড়ীমা ধনেশ্বর কাকার স্ত্রী মোহনভাডার মেয়ে সকালে অর্চনাকে সঙ্গে করে এসে আমাকে অন্নপূর্ণা মায়ের কাছে যেতে বললেন। তাঁর বড় নাতির একমাত্র ছেলে ডাক্তারী পাশ করে কিসব রিসার্চ করছে। উজ্জ্বল ছেলে। অর্চনার উপযুক্ত পাত্র হবে। খুড়ীমা তাঁর মেয়ের জন্যে চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু সে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন—তবে অর্চনার চেহারাই এ ক্ষেত্রে বড় আশা। সে সতীবউরাণী ভবানীর মত দেখতে। সতীবউরাণী কালো ছিলেন। অর্চনা গৌরাঙ্গী, সুতরাং কঠোর অন্নপূর্ণাঠাকরুন গলতে পারেন।

আমিও তখন বাইরে থেকে বেকার।* না পারি কলকাতায় ফিরতে ; তোমার চিন্তাও আনতে পারি না। কাঁসাই নদীর ঘাটের একটা রক্তমাখা স্থান থেকে কে যেন নিষেধ করে।

এদিকে বিপদের উপর বিপদ। অতুলেশ্বর কাকা—আমার একাধারে মা এবং দিদির মত স্নেহময়ী সঙ্গিনী মেজদি—জেলে। তার উপর অর্চনা।

অন্যদিকে শীত চলে যাচ্ছে, মাঘ মাস, চাষের ক্ষেতের ধান কাটা হয়ে যাচ্ছে। সেটেলমেণ্টের আবার এক নতুন পর্ব আসছে। কিছু বুঝারত তখনও বাকী। তারপর ডিসপিউট দেওয়া কেসগুলির বিচারের জন্যে কোর্ট বসবে।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে। বিষয়ের জন্য কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে পেয়েছি কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের কীর্তিহাটের পাঁচালী ; ঠাকুরের সিন্দুকের মধ্য থেকে সোমেশ্বর রায়ের প্রেম পত্র। এবং ওই যোগিনী আর শ্যামাকান্ত সম্পর্কে পত্র, বীরেশ্বর রায়, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর থাক। বিষয়ের জট ছাড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি রায়বংশের বৃহৎ বটবৃক্ষ।

সে বটবৃক্ষের মূল কাণ্ড মরে গেছে অথচ গাছটা বেঁচে আছে ডাল থেকে নেমে আসা শিকড়গুলোকে কাণ্ড ক'রে নিয়ে।

কখনও দক্ষিণেশ্বর গেছ ? তুমি ব্রাহ্ম বলেই জিজ্ঞাসা করছি। অবশ্য বটানিক্যাল গার্ডেনে বিখ্যাত বটগাছটা দেখেছ, কিন্তু সে গাছটা অতি যত্নে তৈরী। রায়বাড়ীর বংশ বৃক্ষটা ওই দক্ষিণেশ্বরের গাছটার মত। তারই মধ্যে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম দুনিয়া ভুলে গিয়ে। দেখছি এই বংশ বৃক্ষটির শিকড় মাটির তলায় তলায় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে হাজার হাজার মুখ বিস্তার করে। সব রস শুষে চুষে খেয়ে নিয়েছে। কত নতুন গাছকে মেরেছে—

সুলতা বাধা দিয়ে বললে—কথা তুমি বাড়িয়ে ফেলছ সুরেশ্বর। ও সব জানা কথা। প্রজাপীড়নের কথা—কত প্রজাবংশ ধ্বংস করার কথা—কত ঘরবাড়ী সংসার ক্ষেত খামার বন্ধ্যা করে দেওয়ার কথা—জমিদার বংশ, ধনী বংশরূপী বটবৃক্ষেরা যা করেছে কোন ইতিহাসই তার নিখুঁত হিসেব দিতে পারবে না। আজকাল স্টাটিস্টিকসবিদেরা মহেঞ্জদেড়ো হরাপ্পার লোকসংখ্যা যাঁরা বের করছেন ওটা তাঁদের হাতে ছেড়ে দাও। তুমি অর্চনার কথায় এস—তোমার কথায় এস।

সুরেশ্বর বললে—আমি আমার মনটার কথা বোঝাতে চাচ্ছিলাম। আমি তখন আপনার অজ্ঞাতসারে আমার বংশের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছি। বংশ পরিচয় সন্ধানী দীর্ঘকালের প্রবাসী একটি খেয়ালী তরুণ এসে যেমন পড়ো ভিঁটের খোঁজ পেয়ে ভূতগ্রস্তের মত ঘুরে বেড়ায়—রাত্রে শাবল হাতে খুঁড়ে বেড়ায় গুপ্তধনের সন্ধানে—তেমনি অবস্থা আমার। কোথাও দু চারটে পুরনো মোহর মেলে কোথাও মেলে পাথর—যাকে মনে করি দুর্লভ মূল্যবান জহরৎ, কিন্তু ধুয়ে মুছে দেখি মোহরগুলো তামার পয়সা, জহরৎগুলো কাচ। আবার অকস্মাৎ মোহরও মেলে, মণিমুক্তাও মেলে। সারা দিনটা বসে বসে ভাবি আর ভাবি—তেমনি আর কি। এর মধ্যে ওই ডাল থেকে নামা ঝুরির মত লম্বা হয়ে নেমে মাটি ছুঁয়েছি, তারও খেয়াল নেই।

তা থাক ও কথা। ইতিহাসই বলি। গল্প বলব না। কারণ মিথ্যে এর মধ্যে নেই।

অর্চনা আমার পরম প্রিয়পাত্রী, তার সম্পর্কে রায়বংশের প্রচলিত প্রবাদেও অন্তত বারো আনা বিশ্বাস করেছি। তখন আর আমি ইণ্টেলেকচুয়াল নই বলতে পার। শুধু খোলসটাই

আছে ভিতরটা পাল্টে গেছে। কীর্তিহাট ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে হয় না।

তবু নড়লাম। অর্চনার তাগিদে নড়লাম। রঘুকে বললাম—জিনিসপত্র গুছিয়ে নে। কলকাতায় যাব—কাল হবে না—পরশু। ফিরব দিন চারেক কি এক সপ্তাহের মধ্যে। তার বেশী দেরী হবে না।

খবরটা শুনে মোহনডাঙ্গার খুড়ীমা বলে পাঠালেন—পরশু তেরস্পর্শ, পরশু যেতে বারণ করো সুরেশ্বরকে। শুভ কাজে যাচ্ছে।

খবরটা নিজে এসে দিয়ে গেলেন মনোহরপুরের খুড়ীমা মানে অর্চনার মা।

এখানে একটা ফালতু কথা বলি সুলতা। সেটা ওই রায়বাড়ীর এবং বাংলাদেশের বউদের নামের কথা। আগের কালে বড় বড় এবং মধ্যবিত্ত বাড়ীতে বড়দের নামকরণের কথা বলেছি। কাত্যায়নী দেবী ছিলেন রাজকুমারী রাণীবউ, তাঁর পুত্রবধূ ভবানী দেবী ছিলেন সতীবউরাণী। তাঁর পুত্রবধূ স্বর্ণলতা দেবী ছিলেন সরস্বতী বউ। রায়বাহাদুরের তিন ছেলের ছয় বউ। দেবেশ্বরের এক বিবাহ, তাঁর স্ত্রী ছিলেন মানিক বউ; মেজঠাকুরদার তিন বিয়ে—প্রথমার অর্থাৎ ধনেশ্বর জগদীশ্বর সুখেশ্বরের মায়ের নাম ছিল পদ্মবউ, দ্বিতীয়ার নাম ছিল 'গোলাপ বউ' —তারপর তৃতীয়া আমার মেজদিদি যিনি আমার মায়ের থেকে কমবয়সী, গ্রামের গরীব পুরুত ঠাকুরের মেয়ে—তাঁরও একটা ফুলের নাম জুটেছিল কিন্তু সে নাম ধরে ডাকবার কেউ ছিল না বলেই সেটা কায়েম হয় নি—লোকে তাঁকে বলত মেজমা। ওঁদের ছোট ভাইয়ের দুই বিয়ে—প্রথম স্বজাতে স্বঘরে হয়েছিল তাঁর নাম হয়েছিল রত্নবউ। দ্বিতীয়া যিনি তিনি কখনও কীর্তিহাটে আসেন নি। এলাহাবাদের মেয়ে—ব্রাহ্ম ব্যারিষ্টারের শিক্ষিতা মেয়ে—তাঁর নাম আমার খাতায় লেখা আছে মনে নেই। কিন্তু রত্ন, মণি, পদ্ম এসব তাতে ছিল না।

এরপর আমার বাবা জ্যেঠা কাকাদের আমল। আমার নিজের জ্যেঠাইমা যজ্ঞেশ্বর রায়ের স্ত্রী বড় কয়লা ব্যবসাদারের মেয়ে, তাঁর নামকরণ হয়েছিল "সৌরভ বউ"। বাবা বিয়ে করেছিলেন সাতাস বছর বয়সে—আমার মায়ের নাম আগে হলে হয়তো 'গৌরব বউ' বা এমনি একটা কিছু হ'ত। ধনেশ্বরকাকার বিয়ের কথা বলেছি, মোহনডাঙ্গার দৌহিত্র শরীক বাড়ীর মেয়ে যখন এসেছিলেন তখন তিনিও একটা নাম পেয়েছিলেন 'সৌভাগ্য বউ'। জগদীশ্বর কাকার বউ মনোহরপুর জমিদারবাড়ীর মেয়ে, পড়ন্ত জমিদারবাড়ী,—রূপও তাঁর ছিল, তার জন্যই তিনি নাম পেয়েছিলেন—'জ্যোৎস্না বউ'। সুখেশ্বর কাকার বউয়ের আমল থেকে এসব নাম রাখা উঠে গেল। তখন ওঁদের মা 'পদ্মবউ' মারা গেছেন। দ্বিতীয়পক্ষের মেজঠাকুমা গোলাপ বউয়ের কোলে তখন দুই ছেলে এক মেয়ে এসেছে। তিনি বলেছিলেন—নাম আর কত খুঁজবে? দেশেও ওসব নাম রাখা উঠে গেছে, বউদের নাম এখন বাপের বাড়ীর গ্রামের নাম দিয়ে চলছে। বড়-বউমা মোহনডাঙ্গার মেয়ে ও হবে মোহনডাঙ্গার বউ, মেজবউমা মনোহরপুরের মেয়ে ও মনোহরপুরের বউ, সুখেশ্বরের বিয়ে হল 'ওতোরপাড়ায়' ও হবে ওতোরপাড়ার বউ।

তাই মোহনডাঙ্গার মেয়ে সৌভাগ্য বউ নাম পেয়েও হারিয়েছেন—তিনি ঘরে বাইরে মোহনডাঙ্গার বউ;—আমরা সামনে বলি বড় খুড়ীমা—আড়ালে বলি মোহনডাঙ্গার খুড়ীমা।

অর্চনার মা তাই মনোহরপুরের খুড়ীমা—এসে বললেন, বাবা, বড়দি বললেন, পরশু ত্র্যহস্পর্শ। ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা নেই। তুমি হয় তো এসব মানো না তাই বললেন—মেজ তুই বা বলে আয়, এ কাজে ত্র্যহস্পর্শ মাথায় করে না যায়।

আমি সুলতা, এসব মানতাম না তুমি জান—আজও ঠিক যে মানি তা নয়। তবে সেদিন মেনেছিলাম। না-মানলে কি হ'ত তা জানি না। তবে মেনে খুব শুভফল হয়নি। তবে যদি অনিবার্যভাবে এইটেই আমার অর্চনার ভাগ্য ফল হয় তো প্রতিবাদের কিছু নেই।

সেদিন ৬ই মাঘ—ভোরবেলা রওনা হলাম। কলকাতায় বাড়ীতে খবর দিয়ে রেখেছি। কীর্তিহাট থেকে পাঁশকুড়ো স্টেশন কাছে। কাছে মানে পঁচিশ তিরিশ মাইল। পালকির বন্দোবস্ত করেছিলাম। পথে তমলুকে এসে ট্যাক্সি নিলাম। বাস সার্ভিসও আছে এখান থেকে। স্ট্যাণ্ডে পালকি ছেড়ে নেমে ট্যাক্সি ধরব, নামলাম; নেমেই দেখি—গোয়ানপাড়ার হলদীবুড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে কুইনী, আর ওদেরই একজন মধ্য বয়সী লোক। কখনও দেখেছি বলে মনে হল না।

কুইনী কাপড় পরেছে,—সাজগোজের বাহুল্য নেই। কিন্তু সেই ভোরবেলা—সবে তখন আলো ফুটছে—সেই আলোতে বড় মনোরমা মনে হল তাকে। আমাকে দেখেই সে চোখ নামিয়ে নিয়ে হাত জোড় করে বললে, নমস্কার স্যার।

সুলতা—এর আগে তোমার মনে আছে—একদিন সন্ধ্যাবেলায় অর্চনার সঙ্গে এসে আমার হাতে তাদের বাড়ীর দলিল আর কয়েকখানা চিঠি আমাকে দেখতে দিয়ে নীরবে চলে গিয়েছিল। কাঁসাই সে যখন পার হয় তখন তার পিছন দিক থেকে তাকে শিলুটের ছবির মত মনে হয়েছিল। সেদিন তার রূপ যেন ঠিক উল্টো। উজ্জ্বল, সকালের রাঙা আলোর বললাম তো মনোরমার মত মনে হ'ল। এবং—।

সুলতা সহাস্যমুখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে হাসির রেখা বড় বিচিত্র।

সুরেশ্বর তার মুখের দিকে তাকায় নি। সে তাকিয়েছিল তার ছবির সারির দিকে। সে বললে—ওই দেখ, সে ছবিখানা।

সুলতা আগ্রহভরে উঠে গেল, ছবিখানা একটু দূরে ছিল, ক্রমপর্যায়ে ওটা এসে পড়েছে রায় বংশের কড়চার ছবির সারির শেষের দিকে।

ছবিটার পানে সে তাকালে।

সুরেশ্বর ওঠেননি—সে বসে বসেই বললে—দৃষ্টিটা দেখো আমার। এ-দৃষ্টি যৌবনের দৃষ্টি। আমি লুকোইনি।—কিন্তু সেদিন স্বপ্নেও ভাবি নি যে,—।

সুলতা ফিরে এসে বললে—এইটেই জীবনের শুভদৃষ্টি। বলে হাসলে সে। সুরেশ্বর বললে—রাইট। খুব ভাল শব্দ তুমি প্রয়োগ করেছ।—কিন্তু থাক। সে পরের কথা পরে। জীবনে যৌবন দৃষ্টি তো বহুবার বহুরূপসীর রূপে আকৃষ্ট হয়। মনও উতলা হয়। তার উপর ১৯৩৭ সালে তখনও আমি জমিদার। বুড়ো বৃটিশ সিংহের তখনও নখ দাঁত থাবা অটুট আছে। মার খেয়ে সহ্য করে—সে প্রতিশোধে শত্রুকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। চার্চিল প্রাইমমিনিষ্টার তা তো ইতিহাসে মোটা-মোটা অক্ষরে খুদে রেখে গেছেন। ভারতবর্ষের গণ আন্দোলন, টেররিষ্ট

আন্দোলনে বিচলিত সে হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু তখনও হাল ছাড়েনি। তার আশেপাশে যেসব প্রসাদ-ভিক্ষু নেকড়ে হায়েনার দল বসে আছে তারা ইচ্ছে করলে একটা হরিণী বধ করলে বিশেষ আশঙ্কার কারণ ছিল না। সুতরাং ওই দৃষ্টিতে হয়তো আরও কিছু দরকার ছিল। সেটা আমি ফোটাতে পারিনি। বলতে পারব না কেন ? নিজের উপর মমতায় যদি বল, তবে আমি প্রতিবাদ করব না। কিন্তু মন আমার তাতে সায় দেবে না।

সুলতা বললে—তাই মেনে নিলাম। বল। সংসারে দিনেও মানুষের ছায়া পড়ে মাটির উপর, পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে সঙ্গে চলে। রাত্রে কায়াটাই দেহকে ঢেকে নেয়। তুমি বলে যাও না কি হল। তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে।

—ঠিক বলেছ। হিলডা আমাকে সেলাম করে বললে, সালাম হুজুর। আপনি ভি কলকাতা যাচ্ছেন ? আমি ভি যাচ্ছি—কুইনীকে নিয়ে।

—কেন ? হঠাৎ কলকাতা যাচ্ছ কেন ?

—পুছেন হুজুর ইয়ে ছোকরাকে পুছেন।—ই আমাদের আপনা আদমী। কলকাতায় কাম করে, ইখানে কভি কভি আসে—। ওহি কলকাতার মোকামের ভাড়া আদায় করে।

কুইনী তার আগেই মৃদুস্বরে বললে, কলকাতার সেই বাড়ীর ভাড়াটেরা গোলমাল করছে স্যার। ওদের কাছে মাসে মাসে লোক পাঠিয়ে ভাড়া আদায় করত দিদি, এবার তারা বলেছে—ভাড়া দেব কি ? আদালত থেকে কি নোটিশ এসেছে যে, বাড়ী আমার নয়। ভাড়া আমি পাব না।

—সে কি ?

—হ্যাঁ সার !

—কাগজপত্র কিছু পাওনি ?

—না। মুখেই ওরা বলেছে। আর আমার নামেও একটা কি নোটিস হয়েছে, সেটাও ভাড়াটেদের কাছে আছে। দেয়নি।

এতক্ষণে সেই লোকটি কথা বললে—হাঁ হুজুর ! দিলো না আমাকে।—

জিজ্ঞাসা করলাম—কি নাম তোমার ?

—আমার নাম হুজুর, জন চৌধুরী। আমি বাঙালী খৃশ্চান। তবে কুইনীদের সঙ্গে একটা কি রিলেশন আছে। আমি জানি না। তবে ওদের ভালবাসি !

হিলডা রূঢ়স্বরে বলে উঠল—ই কাম সেই হারামী-হ্যারিসের কাম আছে হুজুর ! ওহি হারামজাদ এইসব লটপট লাগা দিহিস ! ওহি সোওয়াইন। কুত্তিকে বাচ্চা।

—চুপ কর দিদি। আগে সেখানে চল, দেখ কি ব্যাপার। তারপর বলো।

হিলডা বললে, পানি আর তেল। এ দুনো কভি মিলে নারে কুইনী। তুই তো পুরা গোয়ান নেহিনা। তু বাঙালী !

সুরেশ্বর বললে, আমি বললাম, সুলতা—তুমিও তো বাঙালী হিলডা। এদেশে এতদিন বাস করছ—গোয়া কখনও দেখনি, পর্টুগালের নামও হয়তো জান না। এখানে বাস করছ, ভাত খাচ্ছ, পানি খাচ্ছ, বাংলা বুলি বলছ, বাঙালী নও কেন ?

হিলডা তবু বললে—নেহি হুজুর, হামি লোক হারমাদদের বেটাবেটী। মুলুক হামাদের গোয়া। উসকো আগে পোর্টুগালসে হামি লোক আসিয়ছলম। হামি জানি বাবু।

আমি আর কথা বাড়াইনি। ট্যাক্সিটা এসে গেল। আমি রঘুকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম।

* * *

কলকাতায় বেলা বারোটার মধ্যেই পৌঁছেছিলাম এবং মোহনডাক্তার খুড়ীমার নির্দেশমত অর্চনার ফটো নিয়ে বিকেল বেলাতেই গেলাম ভবানীপুরে। অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ী।

বাড়ীটা নিশ্চয় চেনা বাড়ী। এককালে এ্যাডভোকেট বি এন মুখার্জি ছিলেন কলকাতার একটা মস্ত নাম। যত বড় উকীল—তত ছিল দয়া। দয়াটার উৎস ছিলেন তাঁর মা অন্নপূর্ণা দেবী। ভবেনবাবু কত বঞ্চিত দরিদ্রের পক্ষ নিয়ে যে বিনা ফীতে লড়েছেন এবং জিতেছেন, তার সংখ্যা নেই। টাকা নিতেন জমিদার ব্যবসাদারের কাছে। জমিদার প্রজার যেসব মকর্দমা হাইকোর্টে আসে সে সবই প্রায় স্বত্বের মকর্দমা। তাতে জমিদার পক্ষের ব্রীফ তিনি নিতেন না। মায়ের বারণ ছিল। তবে জমিদারে জমিদারে, কি জমিদার বাড়ীর পার্টিশন স্যুট-এ তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। তাঁর ছেলে এন, এন, মুখার্জি—তাঁর ছিল ক্রিমিন্যাল প্র্যাক্টিস। অধিকাংশ স্বদেশী মকদ্দমায় তিনি থাকতেন। ফিস নিতেন না। ভবেনবাবু ক্রিমিন্যাল প্রাকটিস করতেন না এবং কোন কেসে তিনি কারুর নিচে কাজ করতেন না, কিন্তু মানিকতলা বোমার কেসে একজন সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। সে তাঁর মায়ের আদেশ। বলেছিলেন—ওরে আমি মেদনিপুর জেলার মেয়ে। ক্ষুদিরাম মেদনীপুরের ছেলে। সেই বাংলা দেশে প্রথম ফাঁসী গেল। এ কেসে ছোট হয়েই তুই থাক। তাতে তোর মান যাবে না। মূল ডিফেন্সের কাজ করলেন সি আর দাশ। সে তো এই নাড়ীর লোক। তাকে তো জানিস। কি লজ্জা ?—

ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছিলাম—অর্চনার এসব কথা তাঁকে বলব কি না। মধ্যে মধ্যে সব চিন্তা ভাবনা ওলোট পালোট করে দিয়ে হঠাৎ ভয় হচ্ছিল, যদি নাম শুনেই অন্নপূর্ণা ঠাকরুণ বলেন, বলে দে আমার দেখা করবার সময় নেই। কি বলবার আছে তা যেন নিচের কাউকে বলে দেয়। কিম্বা নগেনের সঙ্গে দেখা করতে বল।

গাড়ীখানা ময়দানের দিক থেকে হরিশ মুখুজ্জে রোডে ঢুকে খানচারেক বাড়ীর পরেই দাঁড়াল।

পি-জি হস্‌পিটাল থেকে একটু দক্ষিণে,—যে দিকটায় মুরশিদাবাদের এক রাজা বাহাদুরের বাড়ী আছে সেই দিকটায়।

বাড়ীটা সকলেই চেনে। তুমি ব্যারিস্টারের মেয়ে। এ্যাডভোকেট এন, এন, মুখার্জির নাম বোধ হয় জান।

প্রথমেই দেখা হোল নগেনবাবুর সঙ্গে। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। রায়বাড়ীর সৌন্দর্যের স্পর্শও আছে, আবার একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। এঁদের রঙ রায়বংশের মত উজ্জ্বল নয়। এক ধরনের খুব মাজা রঙ আছে শ্যামবর্ণের মধ্যে—এ-রঙ সেই রঙ। রায়বংশের চোখ বড়

এবং একটা প্রখরতা আছে দৃষ্টিতে ; নগেনবাবুর চোখ ছোট নয়, টানা চোখ এবং দৃষ্টির মধ্যে গাম্ভীর্য সত্ত্বেও একটি মাধুর্য আছে।

গাড়ীটা বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢুকে গাড়ীবারান্দার দাঁড়াতেই নগেনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু এগিয়ে এলেন। তিনি দাঁড়িয়েই ছিলেন বারান্দার উপর।

আমি মনে মনে সম্বন্ধ নিয়ে অনেক হিসেব করে গিয়েছিলাম। আসবার সময় গোবরডাঙার খুড়ীমা আর মনোহরপুরের খুড়ীমা আমাকে কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে মাথায় পুষ্প ঠেকিয়ে বলেছিলেন—দেখ্ বাবা, কোনমতে যেন সম্পর্ক ভুল করবিনে। অন্তত অন্নপূর্ণা ঠাকুমার কাছে। বুঝলি? উনি তোর বাবার ঠাকুমা, রায়বাহাদুরের বোন। ওঁর বোধহয় তিন নাতি—নগেনবাবু উকীল, সুরেনবাবু—

ধনেশ্বরকাকা বলেছিলেন—কর্পোরেশনের কাউন্সিলার উনি। কন্ট্রাক্টারি করেন। ছোটর নাম বীরেন; তিনিও কন্ট্রাক্টারি বিজিনেসে আছেন। তাঁকে বোধহয় পাবে না। এঁরা হলেন অন্নপূর্ণা ঠাকুমার নাতি—সম্পর্কে তোমার কাকা। বুঝেছ। ঠাকুমা—তোমার তাহলে প্রপিতামহী—কি বলবে গো তাহলে? অ—সৌরভবউ!

জগদীশকাকা বসেছিলেন চুপচাপ। তিনি সেদিন থেকে একেবারে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। শুনেছিলাম গাঁজা বেশী খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন—ওই ঠাকুমাই বলবে। ঠাকুমা থেকে উপরের সবাই ঠাকুমা।

ধনেশ্বরকাকা বলেছিলেন—যেমন তোমার বুদ্ধি। তার উপর ওই ছাইগুলো চব্বিশঘণ্টা খাচ্ছ।

হয়তো এই নিয়েই ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া একটা বেধে যেত। কিন্তু গোবরডাঙার খুড়ীমা বলেছিলেন—বড়-মা বলিস বুঝলি! বড়-মা!

জগদীশ্বরকাকা বলে উঠেছিলেন—ঠাকুমার মা—বড়-মা—

ধমক দিয়েছিলেন—অবশ্য মৃদুস্বরে মনোহরপুরের খুড়ীমা অর্চনার মা—হ্যাঁ। তাই বলবে। দিদি বলছেন শুনছ না।

—তবে তাই বলুকগে।

তর্কটা ওখানেই শেষ হয়েছিল—আমার বড়-মা কথাটা ভাল লেগেছিল। ভারী মিষ্টি হবে মনে হয়েছিল।

নগেনবাবু আমার কাছে এসে বললেন—আসুন।

আমি টপ করে তাঁকে প্রণাম করে বললাম—আমি আপনার ভাইপো, আমার নাম সুরেশ্বর রায়, ঈশ্বর যোগেশ্বর রায়ের ছেলে।

সবিস্ময়ে তিনি বললেন—তুমি যোগেশ্বরদার ছেলে! তুমি তো আর্টিস্ট শুনেছি। এস, এস, এস। ভেতরে এস।

বাড়ীর ড্রইংরুমে এসে বসলাম। প্রশস্ত হল। দামী ফার্নিচার। সোফা-কৌচের ঢাকাগুলো ধবধবে খদ্দরের। নগেনকাকা-ও খদ্দরের কোঁচানো ধুতি আর আধবাইয়া পরে রয়েছেন।

একটু মিইয়ে গেলাম সুলতা। কারণ, দেখলাম এঁদের বাড়ীতে গান্ধীয়ানাই হোক আর কংগ্রেসীই হোক, বেশ একটু চড়া সুরেই বাঁধা আছে।

বসেই বললেন—অনেককাল তোমাকে দেখিনি হে! ১৯১৬।১৭ সালে সেই যে যোগেশ্বরদা আসা বন্ধ করলে, তারপর আর এল না। তখন তোমাকে দেখেছিলাম। তুমি আসতে। ফুটফুটে ছেলেটি। ঠাকুমা বলতেন—অবিকল আমার দেবু। মানে তোমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়। মায়ের ভাইপো তো উনি!

—আমার মনে আছে।

—মনে আছে? তোমার মেমরী তো খুব শার্প! কিন্তু। এমন চেহারা হল কি করে? রঙটা পুড়ে গেছে। একটা কালচে ছাপ পড়েছে। তারপর একালে, সেই সেকালের মত দাড়ি-গোঁফ।—

—আজ এক বছরের ওপর কীর্তিহাটে রয়েছি—ওখানকার রোদে—

—আজকাল কীর্তিহাটে গেছ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেটেলমেন্ট হচ্ছে, তার টানে যেতে হয়েছে।

—আই সী। হ্যাঁ, আমরাও ক'খানা নোটিশ পেয়েছিলাম—ওখানে কি কি যেন ঠাকুমার বাবা দিয়ে গিয়েছিলেন—। তা আমরা ও ক্লেম করিনি। ওখানে খানিকটা জমি-পুকুর নিয়ে কি করব আমরা।

—আমি সেসব আপনাদের নামে রেকর্ড করিয়েছি।

—করিয়েছ? তোমাদের মেজতরফ রেকর্ড করাতে দিলে?

—তা দেবে বইকি!

—নো-নো-নো। আই নো দেম। দে আর—আই মীন দি হোল ফ্যামিলী অব শিবেশ্বরকাকা; একটু থেমে বললেন—দেখ দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি নাশী। অবশ্য ধনেও তাই তাই হয়। ধন থেকেই সূত্রপাত, দোষগুলো তখনই ধরে, তারপর ধন ফুরিয়ে গেলে দারিদ্র্যের ছোঁয়াচ লাগলে তখন পচতে শুরু করে। সুখেশ্বর মধ্যে মধ্যে সাহায্যের জন্য চিঠি লিখত আমাকে। কিছু কিছু দিয়েছি তখন। তারপর বুঝলাম এটা ওর স্টান্ট। তারপর ধনেশ্বরের ছেলে ব্রজেশ্বর এসেছিল বার-দুই। হি ইজ এ স্নীক।

আমি চুপ করে রইলাম। এবং অনুভব করলাম রায়বংশের প্রতি বিদ্বেষ এঁদের মজ্জাগত বা বংশগত ধারায় পরিণত হয়ে গেছে।

নগেনকাকা এবার বোধহয় অনুভব করলেন—কথাগুলো বলা অন্যায় হয়ে গেছে। তিনি এবার বললেন—থাক ওসব কথা। সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ—অপ্রিয় সত্য সত্য হলেও না বলাই ভাল। এখন কি খবর বল। সব ভালো তো?

বললাম—ভালো নয়। অনেক ঝড়ঝাপ্টা বয়ে গেল।—

—কি? মামলা-মকদ্দমা?

—হ্যাঁ। তবে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে নয়। মেদিনীপুরের কাণ্ড তো জানেন সব। পরপর তিন-তিনটে ম্যাজিস্ট্রেট মার্ডার হল—

—খুব জানি। মেদিনীপুর ওয়েস্ট বেঙ্গলে, রাজস্থানের চিতোর। বাংলাদেশে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম বলি ষোল বছরের ক্ষুদিরাম। ১৯২১ সাল থেকে সারা বাংলায় ইউনিয়ন বোর্ড হল, মেদিনীপুর হতে দেয়নি। কীর্তিহাটে সুখেশ্বর ইউনিয়ন বোর্ড করেছিল। পেডি মার্ডার কেসে বিমল দাশগুপ্তকে প্রসিকিউটর করে হাইকোর্টে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল হয়েছিল। সে-কেসে ডিফেন্সে আমি ছিলাম। কলেজিয়েট ইস্কুলের হেডমাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার হীরালাল দাশগুপ্ত আর নারায়ণ মুখুজ্জেমশায়কে সাক্ষী দিতে কিছুতেই রাজী—রাজী কেন বাধ্য করাতে পারেনি পুলিশ। নমস্য ব্যক্তি তাঁরা। এমন শিক্ষক না হলে এমন ছাত্র হয়!

আমি বললাম—যেন একটা সুযোগ পেলাম, বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই ঝড় এসে বেজেছে কীর্তিহাটের রায়বাড়ীতে।

—বল কি? চমকে উঠলেন নগেনজ্যাঠা। সেই ঝড়? তুমি বাধিয়েছ নাকি? বিদায় সত্যাগ্রহের প্রায়শ্চিত্ত! হাসলেন। তারপর বললেন—কি করেছ? টাকাকড়ি দিয়েছ, সেটা জেনেছে পুলিশ? না, আরও কিছু? কংগ্রেস-ফ্ল্যাগ-ট্ল্যাগ তুলেছ? মিটিং-টিটিংয়ে প্রিজাইড করেছ?

বললাম—না। তার থেকে অনেক বেশী।

—অনেক বেশী?

অতুলেশ্বরের বিবরণ থেকে মেজদির জেল, বিমলেশ্বরকাকার এ্যারেস্ট পর্যন্ত সব বললাম তাঁকে। তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে শুনলেন। ঘন ঘন মুখের ভাব তাঁর বদলাচ্ছিল। অবশ্য অর্চনার নাম একটুখানি উল্লেখ করে ছেড়ে দিলাম। বললাম—জগদীশ্বরকাকার অর্চনা বলে একটি মেয়ে আছে, তাকে শুদ্ধ পুলিশ জড়াতে চেষ্টা করেছিল।

—মানে?

—মানে, মেয়েটি মেজদিকে খুব ভালবাসত। আর বিমলেশ্বরকাকা যখন ঘরে বসে কাঁদতেন আর বলতেন—মা কালী, তুমি তো সাক্ষাৎ বিরাজ করছ, প্রভু রাজরাজেশ্বর; তুমি তো সব দেখছ, তবু তার প্রতিকার করছ না তোমরা? অর্চনা শুনে বলেছিল—ন-কাকা, একটা কথা বলব? তোমাদের মা কালী কি বাদশাহী আমলের তাতারিণী-প্রহরিণী, না রাজরাজেশ্বর তোমাদের দারোয়ান-পাইক যে, তোমাদের হয়ে খাঁড়াচক্র নিয়ে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে ছুটবেন? দাও তো দুবেলা ফুল-জল। আর একথালা করে আতপের ভাত। দাও না, দেখাও। দেখিয়ে নিয়ে নিজেরা খাও। এগুলো যারা বলে, তারা ভক্ত না মাথা, কাপুরুষের দল। প্রতিকার দেবতা করে দেয় না—মানুষকেই করতে হয়। তিনি অভয় দেন, সাহস দেন। এমন করে ঘরে বসে কালী কালী আর কেষ্ট কেষ্ট করে কেঁদো না।

কথাটা চাপা আছে। আছে তাই পুলিশের হাত থেকে বেঁচেছে।

স্তম্ভিতের মত তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন—এমন মেয়ে? রায়বাড়ীতে এতবড় পরিবর্তন ঘটে গেছে? বল কি হে? কিন্তু হাইকোর্ট থেকে ব্যারিস্টার নিয়ে গেলে,

আর আমাকে জানালে না? বল—এখন কি করতে হবে? বিমলেশ্বরের কেসে যেতে হবে?

বললাম—বিমলেশ্বরকাকার কেসে কনভিকশন হবেই। কারণ তিনি অত্যন্ত ধর্মবাতিকগ্রস্ত লোক; কনফেশন তিনি করেছেন, কুকরীখানা বের করে দিয়েছেন। শুধু অর্চনার কোন কথা তিনি বলেন নি। বলবেনও না। এবং যা বলেছেন তা উইদড্রও করবেন না।

—স্ট্রেঞ্জ! একটু চুপ করে থেকে বললেন—তবু আমি যাব। কাগজপত্র এনেছ?

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম—আমি ও কথা নিয়ে আসি নি। আমি একবার বড়মার কাছে এসেছি। অর্চনার সম্বন্ধে কথা বলব।

—মানে?

—মেয়েটির অবিলম্বে বিয়ে দিতে হবে। জগদীশ্বরকাকার শালা রেলে চাকরি করেন, তার এক শালা, সে পুলিশের দারোগা। প্রথমপক্ষের বউ মারা গেছে। ক'টা ছেলে আছে। তার সঙ্গে বিয়ে দেবার সম্বন্ধ করেছেন। কিন্তু অর্চনা জেদ ধরেছে এ বিয়ে সে কিছুতে করবে না। বিষ খাবে। অথচ—

—কি অথচ?

—অথচ আমাদের বাড়ীতে সবাই বলে—অর্চনাই নাকি সতীবউরাণী, মানে বড়মার মা। চেহারাতে অবিকল তাঁর মত। তাই তার কাছে এসেছি একটু পরামর্শ নেব।

ফটোখানা বের করে তাঁর হাতে দিলাম। আমারই তোলা ফটো! ফটো দেখে চমকে উঠলেন নগেন কাকা।

* * *

সুরেশ্বর বললে—এইখানে তোমাকে এই বাড়ীটির একটি পটভূমি দিয়ে রাখি সুলতা। অন্নপূর্ণা দেবীর যে টুকরো টাক্‌রা ছবি পেয়েছ, তাতে তাঁর সম্পর্কে অনায়াসে তাঁর একটা ছবি গড়ে নিতে পার। সে ছবিটা হবে পটভূমিহীন মানুষের ছবি। একান্তভাবে ফটোগ্রাফের মত।

এই বাড়ী তাঁর নিজের তৈরী বাড়ী। তাঁর যে বাড়ীতে বিয়ে হয়েছিল, সে বাড়ীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

মা মারা গিয়েছিলেন তাঁকে তিন বা চার দিনের শিশু রেখে। চিঠিতে লিখে গিয়েছিলেন – এর নাম হবে অন্নপূর্ণা আর একে মানুষ করবার জন্য যেন বিমলাকান্তের স্ত্রীকে দেওয়া হয়। তাঁর সন্তান নেই। রত্নেশ্বরকে দিয়ে আবার তাকে আমরা কেড়ে নিয়েছি।

বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে বলেছি—চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীকে পাবার জন্যে অথবা তাঁকে হারিয়ে প্রায় পাগল হয়েছিলেন। ক্রোধে আক্রোশে বাঈজী—মানে সোফি বাঈকে নিয়ে উন্মত্ত জীবনযাপন করেছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে পেলেন ভবানী দেবীকে; তখন তিনি একরকম অর্ধপঙ্গু। কিন্তু সেবায় যত্নে চিকিৎসায় নিয়ম পালনে ভাল হয়ে উঠলেন আবার।

তার ফল এই অন্নপূর্ণা দেবী। অন্নপূর্ণা দেবী রায়বংশের দ্বিতীয়া কন্যা। প্রথমা ছিলেন

উন্মাদরোগগ্রস্তা বিমলা দেবী। যাঁর জন্যেই বলতে গেলে রায়বংশে বীরেশ্বর রায় পর্যন্ত একটা সর্বনেশে ঝড় বয়ে গেছে। রক্ষা পেয়েছেন ভবানী দেবীর তপস্যায়।

এ ঝড়ের সব বিবরণ মূল কথা রত্নেশ্বর রায়ের পর বোধহয় কেউ জানতে পারে নি। জেনেছিল ঠাকুরদাস পাল। তাকে খুন করিয়ে রত্নেশ্বর নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তবু কি খেয়াল ডায়রীতে লিখে গিয়েছিলেন। শেষের দিকে কথাটা মনে হয়েছিল বলে দপ্তর বেঁধে তার উপর লিখেছিলেন—"আমার চিতায় যেন এগুলি দগ্ধ করা হয়। যে এসব খুলিবে বা পড়িবে তাহার সর্বনাশ হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে।"

সুখেশ্বর রায় এগুলো পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অতি চতুর অতি কুটিল মানুষ। স্বার্থের জন্য সব পারতেন। তিনি এগুলো পড়েছিলেন কিনা জানি না। হয়তো পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি রায়বংশের একটা কামার্ত দৈত্যের হাতে জীবন দিয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রজদা পড়তে গিয়েও পড়েন নি। পড়লাম আমি।

তাই বলছি—বিমলা দেবী যে রায়বংশে কতবড় অশুভের উৎস তা রায়বংশে কেউ জানত না। আর ভবানী দেবীর তপস্যা যে কত বড় কল্যাণ করেছে, তাও কেউ জানে না।

আমি নাস্তিক হয়েও এরই জন্যে আস্তিক হ'তে চেয়েছি। কিন্তু তা পারিনি। আমি না-আস্তিক না-নাস্তিক।

এক একবার মনে হয় ভবানী দেবী বোধহয় রত্নেশ্বরকে দিয়ে ফিরে নেওয়ার অপরাধ সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। আবার মনে হয় ভবানী দেবী বীরেশ্বর রায়ের উপর কন্যার ভার দিয়ে যান নি—স্বামীর উপর বিশ্বাস ছিল না বলে। ভবিষ্যত তিনি অনুমান করেছিলেন।

জীবনের শেষ ক' মাস তিনি কাশীর বাড়ীতে একপ্রান্তের ঘরে এইটে জেনেই একান্তে বাস করতে চেয়েছিলেন। তিনি থাকতেন একেবারে পুবের ঘরে। তারপর ছিল তাঁদের সন্ধ্যার আসরের ঘর। যে-ঘরে সোফিয়া এসে গান শোনাতো। তার ওপাশে ছিল বীরেশ্বর রায়ের ঘর। তারপর তিন চারখানা ঘর একরকম খালি পড়ে থাকত, তারপর ওপ্রান্তে থাকত সোফিয়া বাঈ। বুঝতে পারছ, স্বামীর স্বেচ্ছাচারের পথে কোথাও একটা পর্দার আড়ালও দেন নি।

সত্য যাই হোক, তিনি কন্যাটিকে দিয়ে গিয়েছিলেন বা স্বামীকে শেষ অনুরোধ করেছিলেন, কন্যাটিকে তাঁর নিঃসন্তান ভাই বিমলাকান্তের স্ত্রীকে দেবার জন্য। তাতে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। হয়তো এমন ভয়ও ছিল যে বীরেশ্বর রায় সোফিয়াকেই দেবেন মেয়েকে মানুষ করতে।

অন্নপূর্ণা দেবী পুজোর সময় একবার আসতেন দেশে। বিমলাকান্ত পুজোর ছুটিতে আসতেন। আসতেন শ্যামনগর। ওখানে যে বিষয় তাঁর ছিল এবং লাট শ্যামনগর রাধানগর দিগরের যে জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা তিনি পেতেন তা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ছিল না। রায়-বংশের কীর্তিহাটের তুলনায় সেটা হয়তো পঁচিশ তিরিশ ভাগের এক ভাগ। অবশ্য বীরেশ্বর রায়ের সময়ের কথা বলছি। রত্নেশ্বর রায়ের আমলে কীর্তিহাটের আয় তিন গুণ বেড়েছিল।

শ্যামনগর কেনা হয়েছিল বিমলাকান্তের মাতামহের বিগ্রহের নামে। তখন জমিদারী মুনাফা ছিল চার হাজার টাকা। বিমলাকান্তকে জমিদারী স্বত্ব দিয়ে রত্নেশ্বর রায় সম্পত্তিটা পত্তনী নিতে ভোলেন নি।

একটু থেমে—হেসে সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় এই চার হাজার মুনাফা বিমলাকান্তকে দিয়ে শ্যামনগরের জমির উপর দু-দুবার বৃদ্ধি করে নিজের মুনাফা করেছিলেন ন' হাজার টাকা। অথচ জবরদস্তি বে-আইনী কিছু করেন নি। এবং সেই নিয়েই ঠাকুরদাস পাল, যিনি তাঁকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন, যিনি তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে গোটা পিঠটা পুড়িয়েছিলেন, যাঁকে তিনি দাদা বলতেন—তাঁর সঙ্গে প্রথম বিরোধের সূত্রপাত রত্নেশ্বর রায়ের।

অবশ্য তিনি শ্যামনগরে ইস্কুল এবং ঠাকুরদাস পালের স্মৃতিতে একটা চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারিও করে দিয়েছিলেন। যা সেকালে এই ন' হাজার টাকা মুনাফা থেকেই চলবে বলে চিহ্নিত করা ছিল।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর বিচিত্র চরিত্র। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে তিনি অন্যায় কিছু করেছেন। স্নেহ করুণা দয়া ক্রোধ বিদ্বেষ সবের মধ্যে তাঁর চুলচেরা বিচার ছিল, তাঁর কথা থাক পরে বলব। অন্নপূর্ণা দেবীর কথা বলি।

তের বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ভবানীপুরের মুখুজ্জে পরিবারে। তাঁরা ব্যবসায়ী লোক, ধনী। কলকাতায় অনেক সম্পত্তি। কর্তার নাম ছিল দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর তিন ছেলে—বড় ছেলে নরেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হ'ল। নগদ টাকায় অলঙ্কারে ত্রিশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। বিবাহের সময় রায়বাড়ীর সম্পত্তি নিয়ে একটি কথা তাঁরা তোলেন নি। বছর তিনেক পর অন্নপূর্ণা দেবী ষোল বছর বয়স তখন, প্রথম সন্তানের জননী হলেন। ছেলের জন্মের মাসখানেকের মধ্যেই, শ্বশুর তাঁর দাবী তুললেন—রায়বাড়ীর অর্ধেক অংশের মালিক এই নবজাতক পুত্র। ওই উইল—যে উইল বীরেশ্বর রায় ভাগিনেয় পোষ্যপুত্র রত্নেশ্বরের নামে করে গেছেন তা ক্যানসেল হতে বাধ্য; প্রথম কারণ তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় কোন ক্রিয়া বা দলিল করলে তা সিদ্ধ হয় না। দ্বিতীয় কারণ পরে তাঁর নিজের কন্যাসন্তান হয়েছে, এবং সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তানই তাঁর প্রকৃত পিণ্ডাধিকারী, উত্তরাধিকারী।

মধ্যস্থতার জন্য ছুটে এলেন বিমলাকান্ত। তিনি অন্নপূর্ণাকে ডেকে সমস্ত বিবরণ বললেন এবং রত্নেশ্বর রায় বের ক'রে দিলেন মায়ের শেষ চিঠি।

অন্নপূর্ণা দেবী শুধু প্রশ্ন করলেন—কিন্তু শ্বশুরকে আমি কি বলব বলতে পার? বেশ, কলকাতার সম্পত্তি ছেড়ে দাও আমাকে। বুঝিয়ে বলব।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—না। তা পারব না। আমি সম্পত্তির মালিক নই। আমি রক্ষক। রায়বংশের যা, তা রায়বংশের।

এর উত্তর অন্নপূর্ণা রত্নেশ্বরকে দেন নি, দিয়েছিলেন বিমলাকান্তকে, তাঁকে তিনি ছেলেবেলা থেকে বাবাই বলতেন; বলেছিলেন—বাবা, তাহলে তুমি আমাকে কাশী নিয়ে চল। ও-বাড়ী আমি ঢুকতে পারব না।

বিমলাকান্ত তাকে বুঝিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দেবেন মুখুজ্জের কাছে। এবং নগদ এক লক্ষ

টাকা দিয়ে মিটমাট করতে চেয়েছিলেন।

দেবেনবাবু হেসে বলেছিলেন—ফিরে নিয়ে যান। রত্নেশ্বর রায়কে ফিরে দেবেন। বলবেন —সোজা আঙুলে তোলা দু ফোঁটা ঘি দিয়ে ভাত খাওয়া দেবেন মুখুজ্জের অভ্যেস নেই।

বিমলাকান্ত বলেছিলেন—আমার যা কিছু কাশী কলকাতা এবং শ্যামনগরে, সব আমি লিখে দিচ্ছি।

—আমাকে কি বীরেশ্বর রায়ের শ্রাদ্ধের কাঙালী ভোজনের কাঙালী পেয়েছেন বেইমশাই? না সভায় নিমন্ত্রিত চালকলা-বাঁধা পুরুত পণ্ডিত? আমি বীরেশ্বর রায়ের দৌহিত্রের পিতামহ।

অন্নপূর্ণা দেবী দরজার আড়ালে ছিলেন। তিনি বেরিয়ে এসে শ্বশুরের সামনেই ঘোমটা খুলে বলেছিলেন—বাবা, তুমি বাড়ী যাও।

বিমলাকান্ত মাথা হেঁট করেই উঠে এসেছিলেন এই জানবাজারের বাড়ীতেই। অনেক বোঝাতে চেয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়কে কিন্তু তিনি বলেছিলেন—না। সত্যসত্যই যদি পোষ্যপুত্র হতেন, তা হ'লে এই অর্থেকই নিশ্চয় ছেড়ে দিতেন। কিন্তু তিনি যখন রায়বংশের বংশধর, বীরেশ্বর রায়ের একমাত্র পুত্রসন্তান তখন তা তিনি দেবেন না। তাতে তাঁর জন্মমর্যাদার হানি হবে।

দিন চারেক পর একদিন একখানা পালকীগাড়ী এসে লাগল এই বাড়ীতে। নামলেন অন্নপূর্ণা দেবী।

দেবেন মুখুজ্জে তাঁকে এ-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে চিরদিনের মত! গয়নাগাঁটী এমন কি ছেলে পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছেন এবং ছেলের আবার বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। কারণ, কি-কি মামলার কাগজে তিনি অন্নপূর্ণাকে সই করতে বলেছিলেন, তা তিনি করেন নি।

পরের দিন নরেন্দ্র-জামাই-ছেলেটিকে বুকে ক'রে নিয়ে পায়ে হেঁটে এসে হাজির হয়েছিলেন এ-বাড়ী। ছেলেটিকে অন্নপূর্ণা দেবীর কোলে তুলে দিয়ে আবার ফিরে চলে গিয়েছিলেন।

তার পরদিন থেকে তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। দেবেন মুখুজ্জেমশায় ছেলেকেও ক্ষমা করতে জানতেন না। তাঁর বাক্যবাণ তিনি সহ্য করতে পারেন নি।

অন্নপূর্ণা দেবী বিমলাকান্তের সঙ্গে কাশী গিয়ে ওই সন্তান—ভবেনকে নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলেন। যাবার আগে তিনি গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে। তখন তাঁর প্রকাশ হয়েছে। দেশের মধ্যে যেন একটা নতুন হাওয়া বয়েছে। জানবাজারে পাশেই রাণী রাসমণির বাড়ী। বিমলাকান্ত নিজে একদিন তাঁকে দর্শন করে এসে মুগ্ধ হয়ে বিক্ষুব্ধচিত্ত অন্নপূর্ণাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অন্নপূর্ণা তাঁর মধ্যে যাই দেখে থাকুন, তার ক্ষোভ যেন মিটে গিয়েছিল। তাঁর দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছিল।

পরমহংসদেব হেসে বলেছিলেন—গঙ্গা গঙ্গা—গঙ্গা গড়াচ্ছে রে বেটী, দে—দে ওই জল একফোঁটা দে আমাকে।

অন্নপূর্ণা দেবী দু হাতে চোখের জল মুছে তাঁর পায়ে মাখিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন—ভগীরথ—ভগীরথ হবে তোর ছেলে।—ভগীরথ হবে। অন্নপূর্ণাকে হাত তুলে আশীর্বাদ

করেছিলেন। তিনি সারাজীবন ঠাকুরের নামই জপ করেছেন। সেই তাঁর দীক্ষা।

বিমলাকান্তের সম্পত্তি, তাঁর টাকা যা ছিল তাঁর সব তিনি অন্নপূর্ণাকে দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন। আর নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা, যেটা একটা চিঠিতে বীরেশ্বর রায় কন্যার বিবাহে খরচ করতে বলেছিলেন, সেই টাকাটা নিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা দেবী।

ওটার বেলাতেও তিনি হিসেব-নিকেশ করে নিয়েছিলেন। পঞ্চাশ হাজার টাকার সুদসমেত কষে অঙ্ক স্থির হয়েছিল আশী হাজার। টাকাটা বীরেশ্বর রায়ের চিঠির কাল থেকে সুদে খেটেছে। তার থেকে বাদ দিয়েছিলেন বিবাহের যৌতুক তিরিশ হাজার টাকা।

ছেলেকে উকীল করে হরিশ মুখুজ্জে রোডের এই মোড়ে বাড়ী তৈরী করিয়ে, কলকাতা এসেছিলেন।

অতি কঠিন মেয়ে অন্নপূর্ণা দেবী। অত্যন্ত কঠিন। কলকাতায় এলেও স্বামী বা শ্বশুরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি। দেবেন মুখোপাধ্যায়ের তখন বৃদ্ধাবস্থা, কিন্তু শক্ত মানুষ, তখন বাড়বাড়ন্তও খুব। স্বামী তখন আবার সংসারী, ছেলেমেয়ে হয়েছে। এদিকে বিমলাকান্তের মিতব্যয়ীতা এবং হিসাব করে টাকা খাটানোর গুণে নগদ টাকা সুদে আসলে বেড়ে দেড় লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁচেছে।

দেবেন মুখুজ্জের কানে কথাটা গিয়ে পৌঁচেছিল। তিনি একটা খবর পাঠিয়েছিলেন নাতির কাছে। 'একবার আসবে। দেখা ক'রে যাবে।'

ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। বলে দিয়েছিলেন—একটি উত্তর করে আসবি নে। সব কথায় বলবি—মাকে জিজ্ঞেস ক'রে বলব।

ছেলেও তাই করেছিল। কুশল প্রশ্নের পালা শেষ ক'রে ঠাকুরদা দেবেন মুখুজ্জে বলেছিলেন—কত বড় বাড়ী করেছ?· আমার বাড়ী থেকে বড়?

ভবেন্দ্র বলেছিল—তাই কি হয়, না—পারি?

—তবে?

চুপ ক'রে ছিলেন ভবেন্দ্র। ঠাকুরদা বলেছিলেন—এ বাড়ীতে তোমার ঠাঁই হ'ত না? প্রাকটিস চলত না?

এতেও চুপ করে ছিলেন ভবেন্দ্র। দেবেন মুখুজ্জে বলেছিলেন—যা হয়ে গেছে গেছে। এমন অনেক হয়। আমার যা আছে, তা তোমার কীর্তিহাটের পুষ্যিমামার থেকে কম না। এর দাম অনেক। যাও, এ-বাড়ীতে এস সব নিয়ে। মস্ত 'বড় কারবার আমাদের ল' ডিপার্টমেণ্ট আছে। তা দেখাশোনা কর। প্রাকটিস কর। বুঝলে? ও-বাড়ী একটেরে ময়দানের ধারে। ভাড়া দিয়ে দাও। সাহেব-টায়েবরা এখুনি নেবে।

এবার ভবেন্দ্র বলেছিল—মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বলব।

—মাকে? আচ্ছা! তা হলে উত্তর পাঠাতে হবে না। উত্তর জানি আমি। ষোল বছরের বউ, ঘোমটা কপালে তুলে আমার সামনে এসে বলেছিল—বিমলাকান্তবাবুকে বলেছিল—তুমি উঠে যাও বাবা। আর্জিতে সই করাতে পারি নি।—আচ্ছা এস।

বাপ কথা অল্পই বলেছিলেন। বলেছিলেন—মন দিয়ে কাজকর্ম কর। আমি আশীর্বাদ

করছি।

এর পাঁচ বছর পরেই, দেবেন মুখুজ্জের বয়স তখন পঁয়ষট্টি, রাণীগঞ্জের কয়লাকুঠি কিনে তার সীমানা নিয়ে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর সঙ্গে ফৌজদারী করে আসামী হয়ে গেলেন। কুঠীতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ফায়ারিং-এর হুকুম দিয়েছিলেন, বেঙ্গল কোলের দুজন লোক, ছররায় আহত হয়েছিল। একজন মারা গিয়েছিল।

বর্ধমানে সেসনস কোর্টে মামলা। কাঠগড়ায় দেবেন মুখুজ্জে, তার মেজছেলে এবং ভবেন্দ্রের সৎভাই দাঁড়িয়েছিলেন আসামী হয়ে। বেঙ্গল কোল কোম্পানীর মালিক ইংরেজ। অঢেল টাকা। রাজার জাতের খাতির তাঁদের। দেবেন মুখুজ্জের টাকা কম ছিল না। তিনিও হাইকোর্ট থেকে ব্যারিস্টার এনেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভবেন্দ্র মুখুজ্জে জুনিয়রের কাজ করেছিলেন কিছুদিন। তিনি নিজে থেকে গিয়ে বলেছিলেন—এ কেসে আপনাকে সাহায্য করবার জন্য নিলে আমি সুখী হব।

ব্যারিস্টার বলেছিলেন—তুমি তো এখন নিজে কাজ করছ, নাম হয়েছে, আমার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে যাবে ?

—আমি যেতে চাই।

—ওঁরা যদি না চান ?

—আমি ফীজ দাবী করব না সার।

—কেন ?

যতটা বলা চলে, ততটা বলেছিলেন ভবেন্দ্র। ব্যারিস্টার তার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন—তুমি যাবে। এবং আমি তোমাকে স্কোপ দেব।

মামলাটায় দেবেন মুখুজ্জেরা সেসনসে হেরেছিলেন। বাঙালী জজ সাহেব বাঙালী মেশানো জুরী। ওঁদের কারুর চার-বছর কারুর তিন বছর জেল হয়ে গিয়েছিল।

হাইকোর্টে সেই মামলায় রায় উল্টালো। এবং তাতে পুরো আরগুমেণ্ট করেছিলেন ভবেন্দ্র।

খালাস হয়েছিলেন মুখুজ্জেরা কিন্তু কলিয়ারী হারাতে হয়েছিল। গোটা ব্যবসাটাই প্রায় শেষ হতে বসেছে তখন।

* * *

এই অন্নপূর্ণা দেবী সুলতা। ১৯৩৭ সালেও তিনি বেঁচে, বয়স তখন তার পঁচাত্তর। এখনও এ-বাড়ীর সর্বময়ী তিনি। তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন পরমহংসদেবের কাছে। গোটা বাড়ীটাই বেলুড় মঠের শিষ্য। ভবেনবাবু নিজে স্বামীজী বিবেকানন্দের সঙ্গলাভ করেছেন।

অন্নপূর্ণা দেবীর উপর কথা নেই।

আজও এস্টেট তাঁর নামে। গোটা সংসারের খরচ, খাওয়াপরা, ছেলেদের লেখাপড়া, কাপড়চোপড়, চিকিৎসা এসব তাঁর হাতে। ছেলে ভবেন্দ্র মারা গেছেন পঞ্চাশ বছর বয়সে। নাতিরাও সেই নিয়মে চলে। নাতিদের উপার্জন থেকে একটা ক'রে টাকা তাঁকে দিতে হয়। সেটা জমা হয় এস্টেটে। এখনও নিত্য তরকারি কোটায় বঁটি নিয়ে বসেন। পাশে বসেন তিন

নাতবউয়ের একজন এবং বিধবা বউ। তিনি বলে দেন—এই রান্না হবে, এই কোটো। আলু এত বড় ক'রে কুটো না। দু ভাগ নয় চার ভাগ কর।

সুলতা বললে—দুর্দান্ত মহিলা।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ তা বটে। তিনি খবর পেয়েই আমাকে ডেকে পাঠালেন। নগেন কাকা নিজে উপরে উঠে গিয়ে ঠাকুমায়ের সঙ্গে দেখা করে বললেন—চল, ওপরে চল। ঠাকুমা ডাকছেন।

আমি তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম।

তিনি সেই ফটোটা হাতে দাঁড়িয়ে, দেওয়ালে টাঙানো ভবানী দেবীর অয়েল পেন্টিংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলেন। একবারে যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন।

নগেন কাকা গলার সাড়া দিয়ে ডাকলেন—ঠাকুমা।—

শুনতে পেলেন না তিনি। আবার ডাকলেন নগেন কাকা—ঠাকুমা।

মুখ ফেরালেন তিনি। দেখলুম পুরু চমশার অন্তরাল থেকে দুটি জলের ধারা নেমে এসেছে। তিনি কাঁদছেন।

সুরেশ্বর বললে—অর্চনার ফটোর সঙ্গে নিজের মায়ের অয়েল-পেন্টিংয়ের এমন সাদৃশ্য দেখে এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে, ঘুরে আমাকে দেখে বললেন—এস। তারপর আবার একবার ছবির সঙ্গে ফটোটা মিলিয়ে দেখে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর একটু হাসলেন। সে-হাসির অর্থ ঠিক বুঝলাম না। শুধু হাসি নয়, ঘাড় নাড়লেন, যেন বললেন—হায় হায়। নাতির দিকে একবার চাইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন—এই ফটোর সঙ্গে মেয়েকে একবার মিলিয়ে দেখব, বুঝলে বাবা। যদি ঠিক এমনি হয়, তবে এ-মেয়ে আমি নিলাম।—কার মেয়ে বলছ ?

এমনটা আমি ভাবতে পারিনি। অর্থাৎ এত সহজে এক কথায় ? তারপর বললেন—নগেন ? আমি তো বললাম—তুই—

—ঠাক্‌মা, আজ এ-কথা কেন বলছ ?

—বলছি। তুই হাজার হলেও ছেলের বাপ। বলে আবার একটু হাসলেন। বললেন—দেখ, ভবেনকে বাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে দিইনি। আমিও রাখিনি। কিন্তু ভবেনের বিয়ের সময় তোর মাতাম'-কে বলেছিলাম—তাঁর কাছে যাও। তুই ছেলের বাপ, মনে মনে হবে যে, ঠাক্‌মা-বুড়ী মরেও মরে না—বাহাত্তুরে ধরেছে, একবার আমার মতটাও চাইলে না! তারপর—। কার মেয়ে বললে ?

আমি বললাম—জগদীশ্বরকাকার মেয়ে।

—জগদীশ্বর ? শিবেশ্বরের মেজ ছেলে ? যেটা গাঁজা খায়, মদ খায়, একটা বাঘ মেরেছিল, সেইটের ?

তাঁর মুখ দেখে কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম—আজ্ঞে শুনেছি, খান। আপনার কাছে মিথ্যে কি করে বলব ?

—তাহলে তো টাকা-পয়সা খরচের ক্ষমতাও তার নেই।

—বড়মা, আমি একটা কথা বলব ?

—কি বললি ? বড়মা ? হুঁ। যোগেশ্বর সাহেবের ছেলে হয়ে শিখলি কি করে রে ? এঁ্যা !—কে শিখিয়েছিল—মা ? তা তোর মায়ের শ্রাদ্ধের সময় একবার খবর দিলিনে তুই হারামজাদা ?

চুপ করে রইলাম। কিন্তু ভারী মিষ্টি লাগছিল। বললেন—বল, কি বলবি ?

বললাম—অর্চনার বিয়ের ভার আমি নিয়েছি বড়মা। যা চাইবেন আমি দেব।

—এ-মেয়ের বিয়ের ভার তুই নিয়েছিস ?

—হ্যাঁ বড়মা, টাকার জন্যে মেয়েটিকে একজন দোজবরে পুলিশ দারোগার হাতে দেবার ঠিক করেছিলেন ওর বাবা। আমাকে মেজ-ঠাকুমা জেলে যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন—তুই ওর বিয়ের ভারটা নিস। ভাল ঘর-বর দেখে বিয়ে দিস।

—মেজ-বউমা মানে শিবেশ্বরের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী জেলে গেছে ?

নগেনকাকা বললেন—হ্যাঁ ঠাকুমা, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের কীর্তিহাটের জমিদারী কেল্লার কাটল দিয়ে দেশের হাওয়া ঢুকেছে। মেদিনীপুর তো। অতুলেশ্বর—শিবেশ্বরকাকার দ্বিতীয় পক্ষের ছোট ছেলে, একটা স্বদেশী কেসে ধরা পড়েছে। তার সঙ্গে খুড়ীমা গেছেন। ছেলেটিকে তিনি মানুষ করেছিলেন, সে রিভলবার রাখতে দিয়েছিল মাকে।

—ওরে আর দুখানা আসন দে তো! দাঁড়িয়ে থেকে কোমর ধরেছে। আমি আসনে বসছি—ওরা তো ওপরে বসবে না!—

আসনে বসে আমার কাছে সব শুনে বললেন—আশ্চর্য। বংশের প্রায়শ্চিত্ত করলে শিবেশ্বরের এক ছেলে। যার বড় ছেলে মাতাল, মেজটা গাঁজাল-মাতাল, সেজটা ছিল জোচ্চোর। তার ছোট ছেলে। একটা খবর দিলিনি রে নগেনকে ?—

—না ঠাকুমা। ও খুব বড় ব্যারিস্টার দিয়েছিল।

—তা দিক। তুই যেতিস। আমি খুশি হতাম।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—বস, আমি আসছি। নগেনকাকা বললেন—কাল সকালেই একবার এস। রথীনের সঙ্গে দেখা করে যাবে। তাকে একবার দেখাও হবে, আলাপ করেও যাবে। তার ঘরে তোমার আঁকা একখানা ছবি আছে। তোমার মায়ের শ্রাদ্ধের পর ছবির একজিবিশন করেছিলে, সে দেখতে গিয়েছিল—ইনকগনিটো অবশ্য, আলাপ করেনি। একখানা ছবি সে কিনে এনেছিল।

আমি লজ্জিতও হলাম আবার খুশিও হলাম।

ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর দিক থেকে অন্নপূর্ণা দেবীর রূঢ় কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল—বউমা, তোমারও কি আক্কেল-বুদ্ধি সব গেছে। সব হারিয়েছ ? যোগেশ্বরের ছেলে এসেছে। তুমি একবার বের হলে না। এখনও জলখাবার পাঠাও নি! ছি-ছি-ছি!

—এই তো যাচ্ছি মা! আমি একা যে বাড়ীতে।

—কেন, নাত-বউরা গেল কোথায় ? আমার নগেন্দ্রাণী কোথায় ? বাড়ীর বড়বউ—

—তারা আজ থিয়েটার দেখতে গেছে মা।

—থিয়েটার দেখতে? তারপরই বললেন—ও, হ্যাঁ। আমাকে বলেছিল বটে! হ্যাঁ বলেছিল। সুরেন নিয়ে গেছে তো!—

—হ্যাঁ।

—ওই, আমার আর সব মনে থাকে না। তা' তোমার হল?

—এই যে।

তারপরই পায়ের শব্দ পেলাম। এবং ঘরে এসে ঢুকলেন অন্নপূর্ণা দেবী আর তাঁর বিধবা পুত্রবধূ, সম্পর্কে আমার ঠাকুমা—ভবেন্দ্রনাথের স্ত্রী। থান কাপড় পরা, মাথার চুল ছোট করে কাটা, ছোটোখাটো মানুষটি। এককালে সুন্দরী ছিলেন। পিছনে ঝি, তার হাতে জলের গ্লাস। আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন—ভাল আছ ভাই?

—আমি সসম্ভ্রমে উঠে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন—চিনতে পারছ আমাকে? বললাম—হ্যাঁ। আপনি আমাকে একটা ভারী সুন্দর পুতুল দিয়েছিলেন। মার্বেলের ভেনাস, সেটা ঠাকুমা আমার এখনও আছে।

—আছে? কি বলেছিলাম বলতো?

—বলেছিলেন—এই তোমার মেম-বউ। বড়মা বকেছিলেন।

কথাটায় বাধা দিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। বললেন—থাক।

সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম বাবার কথা। ওঁরা কি ভেবেছিলেন তা বলতে পারব না। পরে বুঝেছিলাম—তা পরেই বলব। একটুখানি স্তব্ধতার পর অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—রথীনের জন্যে এই মেয়ে আমি নিলাম বউমা।

—এতে আর আমি কি বলব?

—নগেনও তাই বলেছে।

—বলবে বইকি। তাছাড়া এতো দেখছি উনিই একেবারে।

—হ্যাঁ। তবে বাপ গরীব হয়ে গেছে। তা এ-ছোড়াটা তো বড়লোকের বেটা বড়লোক, বলছে টাকাকড়ি ওই দেবে। আগের কাল হলে কান মলে দিতুম। শোন—বিয়ের খরচ তুই করবি, বরযাত্রী খাওয়ানো আর পাত্রাভরণ। ওটা তুই দিবি। মেয়ে আমি সাজিয়ে দেব।

আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। মুখ তুলতেই তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়ে হঠাৎ জ্বলে গেলেন। বললেন—হ্যাঁরে, তখন থেকে বলব বলব করে বলতে ভুলছি—কথার পিঠে কথা এসে পড়ছে। বলি একি রে? এই জঙ্গুলে দাড়ি রেখেছিস কেন রে? বাপ রেখেছিল ফ্রেঞ্চকাট, তুই রেখেছিস লম্বা-দাড়ি। একমুখ জঙ্গল। কেন?

তাঁর পুত্রবধূ আমার ঠাকুমা—নগেনবাবুর মা হেসে বললেন—নাতি খুব খেয়ালী মা। ওর যখন যেটা খেয়াল হয়।

—আমি তো জানি গো সব। ওরা খবর রাখে না—আমি খবর রাখি। মহাবীর দারোয়ান এই তো বছর-কয়েক মারা গেছে। মহাবীর তো মধ্যে মধ্যে আসত। দিদি বলত আমাকে। তারপরও খবর নি-। জানবাজারে লোক পাঠাই। কীর্তিহাটে দয়াল আমার

থেকে ছোট। শিবেশ্বরেরও ছোট। কীর্তিহাটে যখন যেতুম কালীপুজোর সময়, তখন তাকে পাঁচ-ছ' বছরের দেখেছি। কলকাতার এ-বাড়ীতে প্রথম প্রথম দয়াল আসত। প্রথম এসেছিল তাঁর মেয়ের বিয়ের সময়; সেকাল তো বিয়ের পণ হয়েছিল বারশো টাকা, তা কীর্তিহাটের বাড়ী থেকে ওকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিল। দেবেশ্বর আড়াইশো, শিবেশ্বর আড়াইশো, রামেশ্বর তো তখন বিলেতে। দয়ালের নিজের ছিল শ-চারেক টাকা; বাকিটার জন্যে আমার কাছে এসেছিল, তখন তো ভবেনের খুব নাম! আমি দয়ালকে আড়াইশো দিয়ে বলেছিলাম—পণ ছাড়াও তো খরচ আছে দয়াল। তা দেখ, দয়াল সে-আমলের লোক তো, মিথ্যে বলতে বাধত, বলেছিল—দিদি মিথ্যে বলব না, সে আমার আছে; মাছ-কাঠ এ পাব তোমাদের বাড়ী থেকেই। আমার অভাব একশো টাকার। আর মেয়ে ইচ্ছে একখানা বালুচরের রেশমী শাড়ীর। তার দাম আর কত। ওই বিশ টাকাতেই খুব ভাল হবে। আমার কাছ থেকে একশো পঁচিশের বেশী নেয়নি।

নগেনবাবুর মা বললেন—আমি তাঁকে দেখেছি মা। কি ভাল গান গাইতেন! আর কি আমুদে লোক ছিলেন—সেই গানটা আমার আজও মনে আছে মা! সেই যে যেবার হাতে জুতো নিয়ে ছাতা মাথায় বোশেখ মাসের দুপুর বেলা এসেছিলেন, দারোয়ান ঢুকতে দিচ্ছিল না—।

হেসে উঠলেন অন্নপূর্ণা দেবী, বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাগ্যে আমি বারান্দায় বেরিয়েছিলুম। হ্যাঁ, আমি বললাম—ওকি, দয়াল জুতো হাতে কেন? বললে—পায়ে ফোস্কা পড়েছে। গান গেয়ে বলেছিল।

—আমার সে-গান আজও মনে আছে। আপনি বললেন—ওকি রে, জুতো হাতে কেন? তো সঙ্গে সঙ্গে গান বেঁধে কেত্তনের সুরে গেয়ে বললেন—

"ভাস্করেন্দ্ব করো, অতীব প্রখরো,
ফোসোকা পড়িল পায়।
দারোয়ানে দ্বার, রুখিয়া হুঙ্কার
ভয়েতে পরাণ যায়!!"

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। তোমার তো খুব মনে আছে বউমা। আমরা খুব হেসেছিলাম। নতুন জুতো কিনে দিতে চেয়েছিলাম, তা চটি ছাড়া নেয়নি। বলেছিল—দিদি, কীর্তিহাটের মাটিতে হাঁটি খালি পায়ে, ফাটা চরণ, এতে কি জুতো সয়—দেবে তো চটি দাও।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা! দয়াল-বৃদ্ধকে দেখেছি, তাঁর কাছে গল্প শুনেছি, তিনি আমার জ্বরের সময় হাত দেখতে এসে সোমেশ্বর রায়ের বজরার আসরের গল্প বলতেন। তাঁর শোনা গল্প। চিরকাল রায়বাড়ীর কাছে কৃতজ্ঞ। যজ্ঞরাম রায়ের স্বাক্ষর করা ছাড়পত্র তাঁর কাছে দেখেছি। এই বিমলেশ্বরকাকার গ্রেপ্তারের দিনও এসে কেঁদে গেছেন, কিন্তু এমন পরিচয় পাইনি। সম্ভবত বয়সের সঙ্গে হারিয়ে গেছে।

তাই সবিস্ময়ে শুনছিলাম, তাঁর আর এক কালের আর এক রূপের কথা!

সেদিন অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—"দয়াল এখনও চিঠি দিলে উত্তর দেয়, তার কাছে খবর

পাই। শিবেশ্বরের আমলে একবার ওর তৃতীয় পক্ষের বিয়ের খবর পেয়ে আমি শিবেশ্বরকে খুব কড়া করে চিঠি লিখেছিলাম। গালাগাল দিয়েছিলাম। লিখেছিলাম—দয়ালের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে, তুমি আবার এই বয়সে দুই পক্ষের ছয়-ছয়টি পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা থাকিতেও আবার বিবাহ করিয়াছ একটা পুরুতের মেয়েকে। পৌত্র হইয়াছে, পৌত্রী হইয়াছে, কয়েকগণ্ডা দৌহিত্র-দৌহিত্রিও হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও এই মতিচ্ছন্ন তোমার কেন হইল তাহা জানি না। রায়বংশকে ভিক্ষুক করিয়া ছাড়িলে তুমি।"

শিবেশ্বর উত্তর দেয়নি। দয়াল দিয়েছিল পত্র। লিখেছিল, 'দিদি আপনি আমার নাম করিয়া মেজ-রায়কে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে আমার আর লাঞ্ছনার বাকি নাই। অতঃপর আপনাকে আমি নিয়মিত সংবাদ দিয়া খবরাদি দিব। আমাকে আপনি পত্র দিবেন না বা মেজ-রায়কে পত্র দিবেন না। তাহা হইলে আমাকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে।' দয়াল আমাকে পত্র দেয়। তোর খবরও আমি জানি! তুই সেটেলমেণ্টে গোচর বাস্তু নাখরাজ দিয়েছিস, তুই গোয়ানদের গোয়ানপাড়া নিষ্কর দিয়েছিস, তাও লিখেছে। লিখেছে—'দিদি যোগেশ্বরের পুত্র এই সময় আসিয়া রায়বংশের সরোবরের পঙ্কোদ্ধার করিয়াছে। চারিদিকে রায়বংশের নাম উজ্জ্বল হইয়াছে নহিলে শিবেশ্বরের সেই দৈত্যের মত পাগল পুত্রের কীর্তির পর রায়বংশ সরোবর নরককুণ্ড আখ্যা পাইয়াছিল।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন অন্নপূর্ণা দেবী। বোধহয় সেই ঘটনা মনে পড়ল তাঁর। তারপর বললেন—সবই কর্মফল আর অদৃষ্ট তাছাড়া আর কি? আমার মাতামহের ওই যন্ত্রণা, ওই তপস্যা সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছিল তাঁর জীবনে। আমি ভাবি কি জানিস? আমি ভাবি—ওই আমার মাতামহের ওই পাপ···ওই শিবেশ্বরের ছেলেটা হয়ে এসেছিল।

এরপর সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও চুপ হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর নগেনবাবু মনে করিয়ে দিলেন সময়ের কথা। বললেন আমাকে। বললেন—রাত্রি তো অনেকটা হয়ে গেল, শীতকাল ৮টা বাজল। তা সুরেশ্বর তুমি আজ এখানেই খেয়েদেয়ে যাও। ঠাকুমা—।

যেন দুঃস্বপ্ন ভঙ্গ হল তাঁর। তিনি বললেন—তাই তো যাবে। এর আর নেমন্তন্ন করতে হবে নাকি? ঘরের ছেলে!

নগেনবাবু আবহাওয়াটা গরম করতেই বোধহয় বললেন—তা আজ ওকে ঘরের ছেলে বললে হবে না ঠাকুমা।

—কেন? কুটুম?

—তাই বা কেন? ও আজ তোমার নাতির বিয়ের সম্বন্ধ এনেছে, দেশজুড়ে কনে দেখে পছন্দ হচ্ছে না যখন, তখন এমন কনে ও এনেছে যে, তুমি যে-মেয়েটি চাচ্ছিলে, ঠিক তাকেই এনেছে। ওকে নেমন্তন্ন কর। খাতির কর।

হঠাৎ দুহাতে আমার গালদুটি চেপে ধরে বললেন অন্নপূর্ণা দেবী—শুধু তাই নয় নগু, এর চেহারা আর আমার দেবুর চেহারা এক, একরকম। ঠিক যেমন এই মেয়েটি—কি নাম—

—অর্চনা। তা বেশ নাম। ভাল নাম। অর্চনা মানে পূজা। বললেন নগেনবাবুর মা।

—হ্যাঁ। অর্চনা আর আমার মায়ের চেহারা যেমন একরকম, ঠিক সেইরকম। ছেলেবেলায় তাই মনে হত। ওকে আমি ভেলভেটের জরিওলা পোষাক-পাগড়ি পরিয়ে সাজিয়ে দেখেছি আর কেঁদেছি।

চোখের জল মুছে বললেন—শোন রে, পিসীর কথা শোন। তুই আমাকে বড়মা বলবিনে। বলবি অন্নপিসী। তা না পারিস তো বলবি বড়পিসী। দেবু কীর্তিহাটে প্রথম মানুষ হয়েছিল, আমাকে পিসীমা বলত না, বলত অন্নপিসী। শোন আজ থাবি তো এখানে নিশ্চয়। কাল সকালে উঠে দাড়ি কামিয়ে ফেলবি। নও আমি তো পুজোয় থাকব ভাই। তুই দাঁড়িয়ে ওর দাড়ি কামিয়ে দেওয়াবি, কেমন? তারপর আমি উঠে ওকে দেখব। তারপর বাড়ি যাবে।

নগেনবাবুর মা বললেন—ও ভারটা আমাকে দিন মা। কিন্তু ওর চুলগুলো? ওই যে লম্বা বাবরী মতন? ওতে কিন্তু ওকে খুব ভাল দেখাচ্ছে।

এরই মধ্যে বাড়ীর যাঁরা থিয়েটারে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরলেন। তাঁদের সঙ্গে অর্থাৎ নগেনবাবুর ভাই সুরেনবাবু এবং বীরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। পরিচয়ে জানলাম—সুরেন-বাবুর স্ত্রী আমার মায়ের পিসতুতো বোন।

পরিবারটিকে বড় ভাল লাগল।

সবশেষে এলেন পাত্র রথীনবাবু। মেডিকেল কলেজের নাম-করা ছাত্র। এই সুন্দর সুপুরুষদের বংশের মধ্যে এই ছেলেটিই যেন সবথেকে উজ্জ্বল এবং পৃথক। চেহারায় পার্থক্য আছে। কথায়-বার্তায় আছে, আচারে-আচরণেও আছে।—

আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন—আপনি এ-বাড়ীতে!

অন্নপূর্ণা দেবী তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে আনিয়েছিলেন। নইলে ডাক্তার রাত্রে চেম্বার এবং নার্সিংহোম থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢোকে। নিচের তলায় তার ঘর। সেখানে বিশেষ রকম বন্দোবস্ত। দরজার সামনে সিঁড়িতে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো থাকে। তাই মাড়িয়ে ঘরে ঢোকেন। পোষাক সব খুলে স্নান করে কাপড়-চোপড় পরে তবে উপরে আসেন।

বেশ একটু অসুখ ও অসুখের সংক্রামকতা সম্পর্কে বাতিল আছে। স্নান করে এলেও ডেটল-জাতীয় ডিস্ইনফেক্‌টেন্টের গন্ধ ওঠে।

আমার উত্তর অন্নপূর্ণা ঠাকুমাই দিলেন। বললেন—তোর জন্তেই এসেছে রে। বসে আছে।

—আমার জন্তে?

এবার আমি বললাম—হ্যাঁ, আপনার জন্তেই।

অন্নপূর্ণা ঠাকুমা বললেন—দেখতো এই ফটোখানা!

—ফটো? কার?

—দেখে বলতো কার?

হেসে সে বললে—একটি মেয়ের।

—হ্যাঁরে হ্যাঁ, বাঘিনীর নয়, গণ্ডারনীর নয়, এতো সবাই জানে।

—তাই তো বলছি।

আমার ভাল লাগল। অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে এমনভাবে কাউকে কথাবার্তা বলতে শুনিনি।

অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—তুই মস্ত ডাঁাদড়।

—বাঁদরও বলতে পার। তোমার কথার উপর কথা কয় কে বল?

—তুই হারামজাদা সে তুই বলিস। দেখতো আমার মায়ের অয়েলপেন্টিংয়ের দিকে তাকিয়ে!

রথীন এবার ভবানী দেবীর অয়লেপেন্টিংয়ের দিকে তাকিয়ে সত্যই বিস্মিত হল। বেশ ভাল করে দেখে যেন মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে বললে—তাই তো! আশ্চর্য মিল তো। অবিকল মিলে যাচ্ছে। বলতুম এটা ওই অয়েলপেন্টিংয়ের ফটো কিন্তু সাজেগোজে মিল নেই, এত গয়না নেই। কার ফটো এ, মামণি?

—তাই তো বলতে বলছি। বল?

রথীন হেসে বললে—মঙ্গলবারের কথায় বলতে—সেটা আমার মনে আছে। মঙ্গলচণ্ডীর আসন টলল, মুকুট নড়ল; মা বললেন—দেখ তো জয়া, দেখ তো বিজয়া খড়ি পেতে, আসন কেন টলে, মুকুট কেন দোলে? অমনি জয়া-বিজয়া গুণেগেঁথে বলতো—মা তোমার ভক্ত বিপদে পড়েছে। আমি তো ঠাকুর নই, দেবতা নই, কি করে বলি বল? তুমিই নয় খড়ি পেতে গুণেগেঁথে বলে দাও—এ-ফটো কার?

—ওই জন্যেই তোকে ভালবাসিরে ছোঁড়া। তোর এসব মুখস্থ। চমৎকার করে বলিস। শোন, এ ফটো হচ্ছে সুরেশ্বরের খুড়তুতো বোনের। শিবেশ্বরের মেজ ছেলে জগদীশ্বর রায়ের বড় মেয়ে। বাপটা গাঁজা খায়, মদ খায়, লোককে মারপিট করে বেড়ায়। তার মেয়ে। একটা দোজবরে দারোগা ধরে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতে যাচ্ছে। সুরেশ্বর এসেছে আমার কাছে। তোর জন্যে।

—আমার জন্যে? মানে আমাকে বিয়ে করতে হবে?

—হ্যাঁ। আমাদের সবারই মত হয়েছে। ইচ্ছে তাই।

—আমাদের বলে লাভ কি? বল তোমার মত হয়েছে। তোমার মায়ের মত দেখতে অমনি তোমার মন গলে গেছে। কেমন?

—তবু তোকে হ্যাঁ বলতে হবে তো।

একটু চুপ করে থেকে রথীন বললে—ভেবে দেখতে সময় দাও মামণি। আমাকে ভেবে দেখতে হবে।

সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। রথীন এক মুহূর্তে আর এক রথীন হয়ে গেল। কণ্ঠস্বর আলাদা, মুখ-চোখ আলাদা, সব আলাদা!

এবং সঙ্গে গম্ভীরকণ্ঠে নগেনবাবু বলে উঠলেন—রথীন!

পিতৃত্বের শাসন, ক্ষোভ, অধিকার একসঙ্গে যেন মিলিত গর্জনে ধ্বনিত হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে। কিন্তু রথীন বিচলিত হল না। সে বললে—বলুন!

নগেনবাবু বললেন—এমন কথা তুমি ঠাকুমাকে বলতে সাহস কর আমাদের সামনে?

রথীন বললে—কথাটা কি অন্যায় বলেছি? আমি বিবাহ করব। আমি ভেবে

দেখব না ?

—ঠাকুমা কথা দিয়েছেন জেনেও তুমি বলছ ভেবে দেখতে হবে ?

নগেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—দাঁড়াও। এ বাড়ীতে বাবার থেকে শুরু করে তোমার ছোটকাকা পর্যন্ত সকলের বিবাহ কখন হবে, কোথায় হবে, সে-সবই স্থির করেছেন উনি, আজ—

অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে রথীন বললে—আজ সে-কাল পাল্টে গেছে বাবা-এই কথাটা আপনি বুঝে দেখবেন না ?

অন্য সকলে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন—নগেনবাবুর মা, রথীনের মা, সুরেনবাবু, ধীরেনবাবু, তাঁদের স্ত্রীরা দুজন। অন্নপূর্ণা দেবী পাথরের মত বসেছিলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখছিলাম রথীনকে।

দেখলাম, অন্নপূর্ণা দেবীর অজ্ঞাতসারে তাঁর বংশধারা গঙ্গা থেকে পদ্মা ভাগীরথীর মত দুভাগে কখন ভাগ হয়ে গেছে, তা তিনি জানতে পারেননি। অথচ দুভাগ হয়ে গেছে নিঃসংশয়ে।

অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—সুরেশ্বর, বাড়ী যা বাবা। এখানে বিয়ে হবে না। তুই খরচ করবি বলছিস, মেয়ে সুন্দরী—পাত্রের অভাব হবে না। তুই বাড়ী যা। তারপর রথীনকে বললেন—আমার ভুল হয়েছে রথীন, তুই স্বাধীন হবার আগে তোর বিয়ে না দেওয়া। আজ তুই স্বাধীন ;

রথীন আর দাঁড়াল না। সে ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেল।

আমি বললাম—খেয়ে যাব বড়মা। আমার খাবার কথা আছে যে।

* * *

বাড়ী ফিরে এলাম এক বিচিত্র মন নিয়ে। অর্চনার বিয়ের ভাবনা আমার মন থেকে তখন যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। আমার মনে শুধু ঘুরছে রথীন ডাক্তারের কথা। আশ্চর্য একটা ছেলে।

তার সে আশ্চর্যরূপ এতকাল ওই অন্নপূর্ণা দেবীর পরমাদরের মধ্যেই লালিত হয়ে স্বচ্ছন্দ-বৃদ্ধিতে বেড়ে উঠেছে। তিনিই তাকে যেন ঢেকে রেখেছিলেন। আজ আমাকে উপলক্ষ্য করেই অকস্মাৎ একমুহূর্তে সে অন্নপূর্ণা দেবীর পরমাদরের সমস্ত আবরণ ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে এসে আপনার চেহারা নিয়ে দাঁড়াল।

জানবাজারে ফিরলাম আমি ওঁদের গাড়ীতে। আমার গাড়ী আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। রাত্রে থাকব কথা হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল কথাটা পাকা করে নিয়ে ফিরব। বাধা উঠবে মনেই করিনি। বাধার মধ্যে বাধা বা অপেক্ষার মধ্যে অপেক্ষা থাকবে—অর্চনাকে হয়তো একবার এনে দেখানোর। কিন্তু সে কোন বাধাই নয়। অর্চনাকে পছন্দ ফটো দেখেই যখন হয়েছে, তখন চোখে দেখলে সে-পছন্দ পরম আগ্রহে পরিণত হবে তাতে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু রথীনকে দেখে তার কথা শুনে তার উপর কোন ক্ষোভ আমার হল না। এ-বাড়ীর ছেলে না-হলে ভাবতাম হয়তো কারুর প্রেমে পড়েছে। হয়তো অসবর্ণ। কিম্বা হয়তো

অতি মডার্ন মেয়ে। বরং উল্টো মনে হল। সেটা হল হঠাৎ—ফিরে আসছি ও-বাড়ী থেকে; গাড়ীটা সারকুলার রোড হয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে ময়দান ভেঙে এসে উঠবে এসপ্ল্যানেডের সুরেন্দ্রনাথ রোড আর চৌরঙ্গীর জংশনে, পথে দেখলাম খণ্ড খণ্ড জটলা এখানে-ওখানে। তার মধ্যে দশ-বারোটি ছেলেকে দেখলাম আহত অবস্থায় গাছতলার আড়াল দিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল, একটা মিটিং ছিল মনুমেণ্টের তলায়। নতুন রিফর্ম আইন প্রবর্তিত হয়েছে, সেই আইনকে বর্জন করবার জন্যই এ-মিটিং করছিল কংগ্রেসের লেফ্‌টিস্টরা।

কংগ্রেসের সে সময়ের অবস্থার কথা আমার থেকে তুমি ভাল জানো সুলতা। হয়তো বা সে মিটিংয়ে তুমিও ছিলে এমন হতে পারে।

কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতা করবার জন্য তরুণ দল, কংগ্রেসের মধ্যেই ছোট ছোট দল হয়েছে। পণ্ডিত নেহরু লেফ্‌টিস্ট, লেফ্‌টিস্টরা তাঁর মুখ চেয়ে থাকে, তবু তিনি দল গড়েননি। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী তখন মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ফিরে এসে তিনিই তখন কংগ্রেসের সভাপতি। বোধহয় এই কারণেই তিনি দল গড়ার দিকে মনোযোগী হননি।

সুভাষচন্দ্র নেহরুর সমান জনপ্রিয়। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের বীজ পুঁতেছেন। কিন্তু তা তখনও বীজ হয়েই আছে। দেখা দেয়নি। তখন—মানে সে-সময়টায় দেশে তিনি ছিলেন না। মাসখানেক পর ফিরলেন। সেদিনও আমি কলকাতায় ছিলাম।

এম এন রায় দল গড়তে উঠেপড়ে লেগেছেন। সব থেকে বেশী দানা বেঁধেছে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি।

কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে। ছাত্র ফেডারেশন গড়ে উঠেছে।

কম্যুনিস্ট পার্টি তখন জন্মেছে কিন্তু অন্য একটা নামের আড়ালে বাল্যলীলা শুরু করেছে। সবল নয়, সুস্থ নয়।

সুলতা হেসে বললে—হ্যাঁ, তখন ওরা ন্যাশনাল ফ্রণ্টের নামে কাজ চালাতো। তাদের ইণ্টারন্যাশানাল এবং এ্যাণ্টিন্যাশনাল চেহারাখানা ওই নামের নামাবলী গায়ে দিয়ে বন্দেমাতরম বলে আওয়াজ দিত। যে মিটিংটার কথা বলছ, তার কথাও মনে পড়ছে। ঠিকই বলেছ আমিও সে মিটিংয়ে ছিলাম। পুলিশ লাঠি চালিয়েছিল।

হেসে সুরেশ্বর বললে—তাহলে আমি ভুল করিনি অনুমানে।

সুলতা বললে—না, তা করনি। গোটা ভারতবর্ষেই তখন সাড়া পড়েছে।

—হ্যাঁ। সেই কারণেই সেদিন আহত অবস্থায় ওদের দেখে আমার মনে হয়েছিল হয়তো বা রথীন কোন দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। বিয়েই হয়তো করবে না। এবং তার দক্ষিণপন্থী বাপ-খুড়োদের, এমনকি অন্নপূর্ণা দেবীকেও সেটা জানতে দেয়নি।

একটু চুপ করে থেকে সুরেশ্বর বললে—অকস্মাৎ যেন আমি বদলে গেলাম সুলতা। রায়বাড়ীর এলাকার বাইরে এই ময়দানে যেন সারা ভারতবর্ষের আবেগ আমার বুকে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা প্রবল ইচ্ছে জেগে উঠল যে, দেব, আমিও ঝাঁপ দেব। প্রায়শ্চিত্ত করব জীবনের। শুধু আমার নয়, আমার বাবার, আমার পূর্বপুরুষদের, ইংরেজ-

আনুগত্যের প্রায়শ্চিত্ত করব। কেন নিজেকে আবদ্ধ করে রাখব এই পচে-যাওয়া জমিদারবংশের জটপাকানো বন্ধনের মধ্যে!

চৌরঙ্গীর মোড়টায় এসে দেখলাম, সেখানটা ফাঁকা। পুলিশ ছাড়া কেউ নেই। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টরা সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার গাড়ীটা থামিয়েও একবার দেখে নিলে আমার চেহারাটা। তারপর গাড়ীটা ছেড়ে দিলে।

গাড়ীটা এসে জানবাজারের এই বাড়ীতে থামল। আমি গাড়ী থেকে নেমে উপরে ঘরের দরজার কড়া নাড়লাম। ভিতর থেকে একজন চাকর দরজা খুলে দিলে। আমি ঘরে ঢুকতে যাব এমন সময় লম্বা বারান্দাটার ওধার থেকে কে আর্ত চীৎকার করে উঠল—বাবুজী—হুজুর হামার রায়হুজুর!

কে? কণ্ঠস্বরটা পরিচিত। এবং পরমুহূর্তেই মনে হল এ তো হিলডার গলা। মনে পড়ে গেল, কাল সে আমি যে-ট্রেনে এসেছি, সেই ট্রেনেই কলকাতা এসেছে। কিন্তু সে এখানে কেন?

থমকে দাঁড়ালাম।

পরমুহূর্তেই এগিয়ে এসে দাঁড়াল কুইনী। খুব আশ্চর্য হইনি। কারণ হিলডার গলার স্বর আগে পেয়েছি। জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার কুইনী?

—বড় বিপদে পড়ে এখানে এসেছি স্যার। রঘু ছিল, সেই এ-বাড়ীতে আমাদের ঢুকতে দিয়েছে। নইলে হয়তো—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—জানি না কি হত? ও-বাড়ীতে দাদিয়া ভাড়াটেদের সঙ্গে ঝগড়া করে যা-তা গালাগাল করেছিল—হ্যারিস ওখানে তালা ভেঙে ঢুকেছে। তারা তাকে ঠেলে ঘর থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। পড়ে গিয়ে দাদিয়ার হাঁটুটা অত্যন্ত জখম হয়েছে। যার সঙ্গে এসেছিলাম, জন চৌধুরী মারপিট শুরু হতেই পালিয়েছে। তাই এখানে এল দাদিয়া। বললে—আর কোথা যাব? একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—আর—। বলতে গিয়ে থেমে গেল কুইনী।

—কি আর?

—ভাড়াটেরা বললে—রায়বাবুরা নোটিশ দিয়েছে—এ-বাড়ী আমাদের। যেন অন্য কাউকে ভাড়া না দেওয়া হয়। শুনলাম, তিন মাসের ভাড়া তারা প্রত্যেককে ছেড়ে দেবে।

—আমরা নোটিশ দিয়েছি? বিস্ময়ের আর সীমা রইল না আমার।

—না স্যার। আপনাদের বড়-তরফের বাবুরা দিয়েছেন নোটিশ।

—আমাদের বড়-তরফ? মানে জ্যাঠামশাই?—যজ্ঞেশ্বর রায়?

—হ্যাঁ। তাঁর নাম আছে। আর হ্যারিসের যে-ঘরটা আমরা বন্ধ করে রেখেছিলাম সেই ঘরটা হ্যারিসকে দিয়ে খুলিয়ে তাকে থাকতে দিয়েছেন বড় রায়বাবুর ছেলেরা। হ্যারিস এখন বলছে—এ-বাড়ী বড় রায়বাবুর। এখানে তারা চিরকাল ভাড়া দিয়ে থাকে। আমার মা-বাবাও ভাড়া দিত। আমার মায়ের বাবাও ভাড়া দিতো—সে তার সাক্ষী। হ্যারিসই কলকাতায় এসে বড় রায়বাবুর কাছে গিয়েছিল। তাঁর অসুখ। তাঁর ছেলে যিনি সেটেলমেণ্টের সময় কীর্তিহাট গিয়েছিলেন, তিনিই হ্যারিসকে নিয়ে এসব করিয়েছেন।

কুইনীর কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। আমি বললাম—বেশ করেছ কুইনী। ভালই করেছ। আমি খুশি হয়েছি। আপনার ভাবতে পেরেছ—এসেছ এখানে—কিন্তু কিছু খেয়েছ?

টপ টপ করে কুইনীর চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল। ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ। দোকান থেকে কিনে এনে খেয়েছি। কিন্তু দাদিয়া বড় জখম হয়েছে। অনেক রক্ত পড়েছে।

আমি বললাম—আজ বড় ক্লান্ত আমি কুইনী। মনও ভাল নেই। কাল শুনব তুমি হিলডাকে বল গিয়ে। কাল শুনব; বুঝে দেখব। তবে বাড়ী তোমার এ আমি জানি। দরকার হলে এ-কথা আমি বলব। আদালতেও বলব।

বলে উপরে উঠে চলে গেলাম আমি।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা সে রাত্রে আদৌ ঘুম হয় নি। আমার মনের মধ্যে পাশাপাশি তিনটে চিন্তার স্রোত বইছিল। ঘুমুতে আমি পারিনি।

একটা স্রোত—অন্নপূর্ণা দেবী বড়মার বাড়ীর ঘটনা এবং ওই রথীন ছেলেটিকে নিয়ে বিচিত্র অনুমান ও কল্পনা। অন্যটি কাল যে-হাওয়াতে ময়দানে নিশ্বাস নিয়ে এসেছিলাম তার চিন্তা। ঘর সংসার বংশ—সমস্ত কিছুর বাইরে যে জগতে ও জীবনের স্রোত বইছে, তার গর্জন। সে রাত্রে এই শেষেরটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে আমাকে কোন মতে স্থির হ'তে দিচ্ছিল না। একটা প্রবল আকর্ষণে যেন টানছিল আমাকে।

আজও পর্যন্ত আমার জানাশোনা জমিদারবংশের মধ্যে দুচার ঘর ছাড়া কেউ এই ভারতের জীবনধারাকে সমর্থন করেন নি। আমি নিজে গিয়ে বও দিয়ে ফিরে এসেছি। বাবা গান্ধীজীকে অনেক মন্দ কথা বলে গেছেন।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। প্রথম বম্বেতে তারপর ১৮৮৬ সালে কলকাতায়। সে সময়ে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় জীবিত। বড় ছেলে দেবেশ্বর রায় তখন তেইশ চব্বিশ বছরের তরুণ। কীর্তিহাটের লোকে বলত বড়কুমার। রত্নেশ্বর রায়ের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—ল্যাণ্ডলর্ড এ্যাসোসিয়েশন থেকেই জন্মেছে। রাজা মহারাজ উপাধিধারী বড় বড় জমিদাররা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে বেশী ছিলেন না। কিন্তু সে কালের যাঁরা এক সঙ্গে জমিদার ধনী এবং শিক্ষা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে উজ্জ্বল রত্ন—তাঁরা এই এ্যাসোসিয়েশনেই ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্তির, কৃষ্ণদাস পাল, রাজা দিগম্বর মিত্তির, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, উত্তরপাড়ার দোর্দাণ্ডপ্রতাপ জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জে এরা এঁর সঙ্গে ছিলেন।

প্রথম কংগ্রেস হবার কথা ছিল পুণায়। ছত্রপতি মহারাজাধিরাজ শিবাজীর লীলাক্ষেত্রে। জানি না এটা তাঁরা সচেতন জাগ্রত বুদ্ধি নিয়ে করেছিলেন কিনা। মিস্টার হিউম—আমরা জানতাম মহামতি হিউম, ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের অনুমতি নিয়েই এর পত্তন করেছিলেন। দেশে তখন একটা জাগরণ এসেছে। বীরেশ্বর রায়ের কাল চলে গেছে। রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুরের কাল তখনও যায় নি কিন্তু পোশাক বদলাচ্ছে। পুণাতে কি একটা এপিডেমিক হয়েছিল বলেই স্থান পরিবর্তন করে প্রথম অধিবেশন হয়েছিল বম্বেতে। বাংলার উমেশ বাড়ুজ্জে—ডব্ল্যু সি ব্যানার্জি হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয় অধিবেশন হল কলকাতায় তাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন জোটের মত সমাদর করে সাহায্য করেছিলেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্তির—শুধু ধনী নন, জমিদারীতে জমিদার নন, নিজে তিনি বিরাট পণ্ডিত, তিনিই ছিলেন কলকাতায় সে কংগ্রেস অধিবেশনে রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান। বম্বের দাদাভাই নওরোজী মূল সভাপতি।

সভাপতি হিসেবে দাদাভাই নওরোজীর নাম প্রস্তাব করেছিল উত্তরপাড়ার জমিদার, যাঁর প্রতাপের ভয়ে প্রজারা কাঁপত, তিনি। তখন তাঁর উনআশী বছর বয়স।

সভাপতি দাদাভাই নওরোজী থেকে বিভিন্ন প্রভিন্সের ডেলিগেটরা মুক্তকণ্ঠে কলকাতার সম্বর্ধনার প্রশংসা করে গিয়েছিলেন।

রায়বাহাদুরের আমলের জমাখরচের খাতায় তিন অঙ্কের একটা চাঁদা খরচ আছে। কিন্তু নিজে তিনি আসতে পারেন নি, তীর্থে যাবার আয়োজন করেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন দেবেশ্বর রায়; তিনি ছিলেন ভলেন্টিয়ার দলের একজন কর্তা। এবং বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

১৮৮৮ সালে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন থেকে কংগ্রেস পৃথক হয়ে গেল। তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হল, স্থায়ী অস্তিত্ব; তার লক্ষ্য হল স্বতন্ত্র; দৃষ্টি জমিদার ধনীদের ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃত হল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন পৃথক হয়ে গেল।

রত্নেশ্বর রায়ের কাগজপত্রের মধ্যে একখানা চিঠির নকল আছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন লিখেছিল ন্যাশনাল কংগ্রেসের সেক্রেটারীকে। দীর্ঘ পত্র। তার কটা লাইন আমি নোট করে রেখেছি সুলতা। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কংগ্রেস সেসনে ডেলিগেট পাঠাবার জন্য অনুরোধের উত্তরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী 'রাজকুমার সর্বাধিকারী' লিখেছিলেন—

'No Political Association of the country, can feel the least hesitation in sending delegates to a conference but they will naturaly shrink from associating themselves with a rival Association, whose mode of action—whose methods and measures—may often be diametrically opposite to those of their own".

এরপর থেকে জমিদার শ্রেণীই একরকম কংগ্রেস থেকে দূরে সরেছে। ছোঁয়াছ বাঁচিয়ে চলেছে। যেটুকু ছিল, তা ছিল একগোছা না-পাকানো সুতোর বাঁধনের মত। তার অর্ধেকগুলো ছিঁড়ে গেল ১৯০৫ সালে, বাকীটা ছিঁড়লো ১৯২১ সালে। সম্পদ যাদের থাকে সুলতা তারা রাষ্ট্রবিপ্লব চায় না; আর সম্পদ যাদের আছে, তাদের বাঁচবার সাধ বড় বেশী। ওই কথাগুলোই তার সাক্ষী।

এর মধ্যেও হয় তো দু' চারজন জমিদারের দুঃসাহসী বা আবেগপ্রবণ ছেলে—কংগ্রেস কেন বোমা-পিস্তলের দলেও ঢুকেছে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে নি কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে জমিদার বাপকে ধরে পুলিশ আপিসে এসে নরেন গোঁসাইয়ের মত এ্যাপ্রুভার হয়েছে।

কিন্তু সেদিন যেন অনুভব করেছিলাম, না—এ আর এক যুগ। অন্ততঃ রায়বংশের পক্ষে। আর এক যুগ বলেই অতুলেশ্বর এই কাজ পেয়েছে, অর্চনা তার সহকারিণী হতে চেষ্টা ক'রেছে।

মেজদি যে মেজদি, তিনিও পেরেছেন।

আমি কেন পারব না ?

উত্তেজনায় মধ্যে মধ্যে উঠে বসেছি সেদিন রাত্রে। সে কতবার তা মনে নেই, তবে অনেক ক'বার তা মনে আছে।

এরই মধ্যে আর এক চিন্তাও এসেছে।

মাঝে মাঝে চীৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। যন্ত্রণাকাতর নারীকণ্ঠের চীৎকার। চেঁচাচ্ছিল —গোয়ান বুড়ী হিলডা।

সত্য বলব তোমার কাছে সুলতা—মধ্যে মধ্যে এমন বিরক্তি বোধ করছিলাম যে ইচ্ছে হচ্ছিল চীৎকার করে ধমক দিই। থামতে বলি। একবার অন্ততঃ মনে হয়েছিল যে দারোয়ানকে বলি—এমন চীৎকার করলে বের করে দে ওকে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল কুইনীকে। কুইনীর সঙ্গে সেই চিঠিগুলো। রত্নেশ্বর রায়ের দানপত্র। রায় এ্যাণ্ড কোম্পানীর চিঠি ভায়লা পিন্‌সকে। তার ছেলেকে পড়বার খরচ দেবার কথা। ভায়লাকে মাসোহারা দেবার কথা। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য আবছা প্রশ্ন। কিন্তু সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছিল কুইনীকে। কুইনীর মধ্যে একটা কি ছিল। যা আমাকে তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট করত।

হয়তো মানুষের দেহের মধ্যে যে অনিবার্য আকর্ষণ থাকে নারীদেহের প্রতি যার জন্ম পরস্পরের দেখা হওয়া মাত্র নারী চঞ্চল হয়ে উঠে মুখ ফেরায়, ঘোমটা টানে, গায়ের কাপড়টা টেনে দেয়; পুরুষ বিস্ফারিত নির্লজ্জ দৃষ্টিতে দেখে প্রতি মুহূর্তে এগুতে চায় জন্তুর মত, কেবল মানুষ বলেই পারে না, সমাজ আছে বলে পারে না, গভর্নমেণ্ট আছে বলে পারে না—এটা তাই।

ভেবে দেখ সুলতা কোন জগৎ থেকে কোন জগতে গিয়ে পড়ছিলাম আমি। কোথায় দেশ-মানুষ, আত্মদান—আবার কোথায় পুরুষ আর নারী—দৃষ্টিতে মোহ, অন্তরে প্রবল আকর্ষণ তার সঙ্গে বংশের একটা অন্যায় সংযোগের রহস্যময় কিছু। তাকে কি বলব বুঝতে পারছি না। বারবার নিজেকে তিরস্কার করেছিলাম সেদিন। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর মধ্যে কিছু কিছু বিচিত্র আত্মবিশ্লেষণ আছে। ডায়রী তিনি বিলুপ্ত করে দেবেন, এই ইচ্ছে তাঁর ছিল। ডায়রীর দপ্তরের উপর লেখা ছিল—এগুলিকে আমার চিতায় পুড়িয়ে দিয়ো। যদিই তা কোন কারণে না হয়, অর্থাৎ যদি শেষসময়ে আমি একথা বলে যেতে না পারি এবং এই লুকানো দপ্তর কারুর চোখে না পড়ে, থেকেই যায়, তবে এ ডায়রী কেউ পড়ো না। যে পড়বে সে ব্রহ্মহত্যার পিতৃহত্যার পাতকগ্রস্ত হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হবে। তার কারণ, শ্যামাকান্তের কাহিনী, সোমেশ্বর রায়ের কাহিনী, বিমলা দেবীর সন্তান চুরির কাহিনী তিনি পৃথিবী থেকে মুছে দিতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে তা হয় না। রায়বাড়ীর ক্ষেত্রে আমিই তাঁর সকল নিষেধ অমান্য করলাম।

আমি পড়েছিলাম সুলতা তোমার জন্যে। ঠাকুরদাস পালের খুনের মধ্যে তিনি কি ভাবে কতখানি জড়িয়েছিলেন তাই জানবার জন্য। এবং বিচার করবার জন্যও বটে। সেই সূত্রে

পেলাম রায়বংশের গোপন করা ইতিহাসের কথা। কি সে গুপ্ত কথা? তাঁর নির্দেশ মানি নি। চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হবে এ কথা বিশ্বাসই করতাম না। আর পিতৃহত্যা ব্রহ্মহত্যার পাপ—এ আমাকে অর্শাবে বলে ভয়ও করি নি, পড়তে পড়তে এই মানুষটিকে ভয় হয়েছে তাঁর কঠোরতার কথা পড়ে, সত্যবাদিতা দেখে, মনের কথা একবিন্দু গোপন করেন নি ডায়রীতে। এবং বিচিত্র রঙে রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সুলতা, কিছুক্ষণ আগে অঞ্জনার সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল একখানি ঘরের মধ্যে—যখন সরস্বতীবউ দ্বিতীয়া কন্যা প্রসবের পর অসুস্থ এবং শোকার্ত, কারণ মেয়েটি মারা গেছে, সেই নিরিবিলিতেও যে সাংঘাতিক কথাগুলি অঞ্জনা বলেছিল এবং তার উত্তরে তাঁর যে স্বরূপটি প্রকাশ করেছিলেন, তা তোমাকে শুনিয়েছি। তোমাকে বলতেই হবে যে, তিনি গোপন কিছু করেন নি, এমন কি নিজের মনের অন্ধকার কোণে নিরন্তর অন্ধকারের মত যে গোপন কামনাটি লুব্ধ পশুর মত দাঁড়িয়েছিল, তাকেও তিনি গোপন করেন নি।

এই রত্নেশ্বর রায়ের আর একদিনের বা দু তিন দিনের ডায়রীর মধ্যে বোধহয়, সারা জীবনটা আকাশের আলোর নিচে পৃথিবীর মত মেলে ধরা আছে। তার মধ্যে দেখেছি এক একটা জায়গা আছে বড় ভয়ঙ্কর। মানুষের সত্য জীবনে যা আছে—গোটা পৃথিবীর কোথাও বোধহয় তা নেই।

টেবিলের উপর থাক-বন্দী ডায়রীগুলি থেকে উপরের সেই খাতাখানা টেনে নিলে—যেখানার মধ্যে থেকে কিছুক্ষণ আগে অঞ্জনা এবং রত্নেশ্বরের কথা কাটাকাটির বিবরণ পড়ে শুনিয়েছিল।

এক চিহ্নিত স্থান খুলে বের করে সুরেশ্বর বললে—ওই ঘটনার তিন মাস পর। অঞ্জনা একদিন সকালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ ডায়রী সেই দিনের ডায়রী।

লিখেছেন—"প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া উঠিয়াই শুনিলাম অঞ্জনা গৃহত্যাগিনী হইয়াছে। এত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম—প্রতি দরজায় তালাচাবীর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, দারোয়ান ছিল, কিন্তু তথাপি সে পলাইয়াছে।

সংবাদটা শুনিয়া মনে হইল মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা আমার মাথার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে। মনে হইতেছে, আমার অন্তর শাল্মলীবৃক্ষ বা বটবৃক্ষের মত এই ঝঞ্ঝার মূল লইয়া অর্ধোৎপাটিত হইয়া ভূতলশায়ী হইতেছে। আমি অবশিষ্ট মূলগুলি দিয়া এবং প্রধান মূলটি দিয়া এখনও কোনরকমে টলায়মন অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছি।

চক্ষে দেখিলাম জীবনের যত অশুভ এবং মন্দবুদ্ধি ও মতি কুটিল সন্দেহ ও আশঙ্কা, জটিল জটপাকানো কামনা এবং ভাবনা—সব আজ এই ঝড়ের আঘাতে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে পঙ্কশায়ী মূলের মত উপরে উঠিয়া শত মুখ বিস্তার করিয়াছে। যত ক্রোধ তত আক্রোশ, নিগূঢ়তম মন্দ মতলব মনের মধ্যে খেলিয়া যাইতে লাগিল। খুন করিতে ইচ্ছা হইল। আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইল।

ক্রমে তাহা হইতে এত ক্রোধ হইল যে-মুখ হাত ধুইতে ধুইতে চৌকীতে বসিয়া প্রস্তরের মত নিশ্চল হইয়া গেলাম! অঞ্জনা পলাইয়াছে? কাহার সহিত পলাইয়াছে? মনে মনে সব

বুঝিতেছি—এই সেই শয়তান, রবিনসন-হত্যাকারী আলফান্সো পিক্রস ; সে রবিনসনকে হত্যা করিয়া এখান হইতে গোয়া এবং গোয়া হইতে পর্তুগাল গিয়াছিল কিন্তু কিছুদিন হইল আবার আসিয়া হাজির হইয়াছে।

আজ পিতৃদেব থাকিলে এবং দেওয়ানজী থাকিলে হয় তো অসমসাহসিক কিছু করা যাইত। আমি ভুল করিয়া তাহাকে একটা চাকরী দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম। দেশে আজ কয় বৎসর নীল লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। দেশের সাধারণ লোকজন উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে। মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী স্বহস্তে ভারত শাসনের ভার লইলেন কিন্তু অদ্যাপি ইংরাজ ব্যবসাদারদের প্রতাপ গেল না। গোটা দেশের শাসনপ্রণালী ও পদ্ধতি তাহারাই স্থির করিতেছে। হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ব্যক্তির যুক্তি-প্রতিবাদ ইহারা গ্রাহ্য করে না ; ফাদার লঙের মত ব্যক্তিকেও জেলে প্রেরণ করে। সুতরাং অনেক প্রকার চিন্তা-বিবেচনা করিয়া, ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই আলফান্সোকে হাতে রাখিবার জন্যই মাসিক একশত টাকা বেতন বন্দুক ইত্যাদির তদ্বির করিতে এবং প্রয়োজন হইলে সাহেব সুবাদের শীকারের ব্যবস্থা করিতে তাহাকে রাখা হইয়াছিল। আলফান্সোকে এখানেই রাখিয়াছিলাম। কারণ ও অঞ্চলের দু চারজন চিনিতেও পারে। লোকটা নাম পাল্টাইয়াছিল। পূর্বে দাড়ি-গোঁফ দুইই ছিল, এখন দাড়ি কামাইয়া ফেলিয়াছে।

সোফিয়া বাঈকে শ্রদ্ধা করি এবং ইহাও বিশ্বাস করি যে, তাহাকে, বেতন দিয়া পিতার মনোরঞ্জনের জন্য বাকী জীবনটার ভার তাহার লইয়াছিলাম বলিয়াই রায়বংশের সকল গোপন কথা কখনও আর প্রকাশ পাইবে না। পিতা গত হইয়াছেন, মাতা স্বর্গে গিয়াছেন—সোফি বাঈকে পাঠাইয়াছি গোয়ালিয়রে। তানসেনের সমাধিস্থল পরিষ্কার করিয়া ধূপ দীপ জ্বালিয়া বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিবে।

আলফান্সোকেও ঠিক সেই কারণেই রাখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম ক্রমশ পোষ মানাইয়া আমাদের গোয়ানপাড়ায় একটা বিবাহ দিয়া বাস করাইব। বাড়ী করিয়া দিব। ঘরসংসার ছেলেপুলে হইলেই লোকটা পোষা সার্কাসের চিতায় পরিণত হইয়া যাইবে। না হয়, তখন কীর্তিহাটের জঙ্গল অঞ্চলে সুন্দরবনের দিকে লোকটাকে পাঠাইয়া দিব, আপনা আপনিই হারাইয়া যাইবে। কিন্তু লোকটা আমার পিঠের উপর ছুরিকাঘাত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সংবাদটা শুনিয়া যেন আমি ক্রোধে ক্ষোভে যন্ত্রণায় উন্মাদ হইয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল—দামিনী ঝি খবরটা আনিয়াছে, তাহার বুকে একটা লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলি—মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা! অঞ্জনা যায় নাই যাইতে পারে না! না—না—পারে না। আমাকে ছাড়িয়া সে—। কিন্তু তাহা পারিলাম না।

ক্রমশঃ উত্তেজনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, উত্তপ্ত রক্ত শীতল হইল, মনে হইল জমিয়া প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছি।

মৃদুস্বরে বলিলাম—পলাইয়াছে? কোথায়? গঙ্গায়—

দামিনী বলিল—সে একখানা চিঠিখানা রাখিয়া গিয়াছে। চিঠিখানা বউরাণীর নিকট রহিয়াছে। তিনি বলিলেন—আপনাকে ডাকিতে।

ঘরে আসিয়া দেখিলাম, দেবুকে লইয়া বসিয়া আছেন মদীয় শাশুড়ী ঠাকুরাণী এবং বিছানায় শুইয়া আছে স্বর্ণলতা।

শাশুড়ীকে দেখিবামাত্র অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইলাম। ইনিই—ইনিই সর্বনাশের একটি হেতু। ইনি, মাস চারেক পূর্বে স্বর্ণলতাকে যখন কীর্তিহাট হইতে কলিকাতা আনা হইয়াছিল, তখন কীর্তিহাটে গিয়া দেবেশ্বরকে অঞ্জনার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

এস ডি ও সাহেবের পত্নী মেমসাহেব, সভ্যা রমণী, তিনি শুনিয়েছিলেন, অঞ্জনা দেবেশ্বরকে অসভ্য কথা শিখাইতে ছিল। শুধু তাঁহাকে দোষ দিয়াই বা লাভ কি? তাহার কথায় আমিও তো সায় দিয়াছিলাম। অঞ্জনাই দেবেশ্বরকে মানুষ করিত। তাহারই অনুগত ছিল সে। তাহার কোল ছাড়া তাহার ঘুম আসিত না। তাহার জন্যই সে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় দেবেশ্বরকে কাঁধে ফেলিয়া পায়চারী করিয়া ঘুমপাড়ানী গান গাহিয়া ফিরিত। মনে পড়িল এই ছড়াটাই সে বেশী গাহিত—"সে যদি তোমার মা হ'ত', ধূলো ঝেড়ে তোমায় কোলে নিতো।"

মাস পাঁচেক আগে শাশুড়ী ঠাকুরণ স্বর্ণলতার অন্তর্বত্নী অবস্থায় শরীর খারাপ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন অঞ্জনা দেবশ্বরকে কি কয়েকটা অশ্লীল কথা বলিয়াছিল—অশ্লীল এই অর্থে যে, হনুমান দম্পতির সঙ্গম দেখিয়া দেবেশ্বর অঞ্জনাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—পিসী দেখ—দেখ কি হইতেছে। অঞ্জনা হাসিয়া ফেলিয়াছিল। এবং ব্যাপারটা তাহাকে অশ্লীলভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছিল—এমন সবাই করে বাবা। স-বা-ই করে। তাহার পরও অনেক কথা। কথাটা শাশুড়ী ঠাকরুণ শুনিয়া স্বর্ণলতাকে বলিয়াছিলেন, স্বর্ণলতা আমাকে বলিয়াছিলেন। এবং শাশুড়ীই জেদ ধরিয়াছিলেন—কলিকাতায় যাইতেছে, সেখানে সাহেববাড়ীর সুদক্ষ আয়া নিযুক্ত করা হউক দেবেশ্বরের জন্য।

কলিকাতায় আসিয়া তাহাই হইয়াছে, সাহেববাড়ীর আয়া আসিয়াছে। দেবেশ্বরেরও তাহাকে বেশ পছন্দ হইয়াছে। তাহার সাজগোছ বিধিব্যবস্থা সত্যই ভাল। অঞ্জনা তাহাতে কাঁদিয়াছিল। তাহার পরই এই সর্বনাশের, রায়বাড়ীতে এই কলঙ্ক লেপনের সূত্রপাত। কখন কি করিয়া সে ওই দুর্দান্ত আলফান্‌সোকে দেখিয়াছিল কি করিয়া যোগাযোগ করিয়াছিল তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। পাঁচ মাস প্রায় কলিকাতা আসা হইয়াছে—অঞ্জনাকে সঙ্গে লইয়াই আসিয়াছি। অঞ্জনার স্বামী একটা ব্রাত্য রমণী লইয়া ব্যভিচারপ্রমত্ত হইয়াছে সুতরাং তাহাকে জোর করিয়াই লইয়া আসিয়াছিলাম।

মাস দুয়েক পরে, অর্থাৎ আজ হইতে তিন মাস পূর্বে প্রথম আমার নজরে আসিল অঞ্জনা আলফান্‌সোর সহিত দূর হইতে হাস্য বিনিময় করে। চোখে পড়িল আমারই। কয়েকদিন হইতে দেখিতেছিলাম—আলফান্‌সো হঠাৎ যেন অতিরিক্ত হাঁকডাক শুরু করিয়াছে এবং দারোয়ান-দের কুস্তীর আখাড়াতেও কুস্তী লড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। পোশাক-পরিচ্ছদেরও বাহার বাড়িয়াছে এবং সে এই বাড়ীতে বেশীক্ষণ কাটাইতেছে। তাহার ডিউটি নামমাত্র—একবার সকালে আসিয়া প্রথমে ঘোড়াগুলাকে দেখে, এবং সেগুলাকে টহল দেওয়ায়। তারপর বন্দুক ও কার্তুজগুলা গুনিয়া দেখিয়া কলিকাতা-দপ্তরের ম্যানেজারকে 'সব ঠিক হ্যায়' বলিয়া সেলাম বাজাইয়া চলিয়া যায়। আবার অপরাহ্নে আসে। তখন কাজ যৎসামান্যই। আর কাজ পড়ে,

কোন গাড়ী কারখানায় গেলে। সেখানে মেরামতের কাজ দেখিয়া আসে। বাড়ীতে মেরামত-যোগ্য হইলে সে নিজেই খুলিয়া তাহা করিয়া ফেলে। তবে আমি তাহা ঠিক পছন্দ করি না। কারণ যত অস্পৃশ্য চর্বির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে কোথা যে কোন স্পর্শদোষ কিভাবে ঘটে তাহা কে বলিতে পারে ?

এবার তাহার এই উল্লাসময় পরিবর্তন দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, আলফান্সো বোধহয় আবার কোর্টশিপ করিতেছে। রবিনসনের কুঠিতে গোয়ানপাড়ায় পিক্রুজের যে একটা সং-বোনকে লইয়া গিয়াছিল—সে মেয়েটা, আলফান্সো পর্তুগালে চলিয়া গেলে অন্য একনজকে বিবাহ করিয়াছে। আলফান্সো পর্তুগালে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু কি কারণে তাহাকে ডাই-ভোর্স করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সেই কারণেই এরূপ ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার দৃষ্টি যে রায়বাড়ীর অন্দর ভেদ করিয়া অঞ্জনার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কেমন করিয়া বুঝিব ? একজন হিন্দু নারী, ব্রাহ্মণকন্যা তাহার এমন মতি হইতে পারে কি করিয়া বুঝিব ? অবশ্য সমাজে গুপ্ত ব্যাধির মত ব্যাধি আছে। ব্যাধি, বড়বাড়ী ছোটবাড়ী বাছে না। বড়বাড়ীর বড় শিক্ষাকেও ব্যর্থ করিয়া নানা অনাচার ঘটায়। কাশীধামে থাকিতে ইহার অজস্র দৃষ্টান্ত দেখিয়া আসিয়াছি। ঘৃণা করিয়াছি। কিন্তু কখনও ভাবি নাই যে এমন কিছু আমার বাড়ীতে ঘটিতে পারে। অন্য জমিদারের বাড়ীতে ঘটে। জমিদার, ব্যবসাদার, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল এ পাপ যেখানে সূচীছিদ্র পথ পায় সেইখানেই প্রবেশ করে।

অন্যে পরে কা-কথা, দেবতাদের গৃহেও ঘটে।

ইন্দ্র গুরুপত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করিয়াছিলেন, অহল্যা পাষাণী হইয়াছিল। চন্দ্র বৃহস্পতি-পত্নী তারাকে হরণ করিয়া লইয়া পলাইয়াছিল। এবং বৃহস্পতি তারাকে চন্দ্রের ঔরসজাত পুত্র বুধ-সহ আবার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তবুও আমার বাড়ীর—আমি রত্নেশ্বর—আমার বাড়ীতে এমন ঘটিবে কল্পনাও করিতে পারি নাই। হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল ব্যাপারটা। প্রথম পিতৃদেবের আমলের চাকর মনিন্দর এবং দারোয়ানদের ঘর হইতে ছেদী সিং ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছিল এবং আমাকে তাহা জ্ঞাত করিলে, আমি ব্যাপারটা আড়াল হইতে স্বচক্ষে লক্ষ করিলাম। দেখিলাম ছাদের আলসের উপর ভর দিয়া সে অন্তরালের একটা গলিতে দাঁড়াইয়া পরস্পরে হাসিতেছে, ইঙ্গিত বিনিময় হইতেছে। ছেদীর নির্দেশমত আমি মেথর নির্গত হইবার গলিপথ ধরিয়া আসিয়া আলফান্সোর পিছনে দাঁড়াইয়াছিলাম। আলফান্সো আমাকে প্রথমটা দেখে নাই কিন্তু আলসে হইতে অঞ্জনা আমাকে দেখিয়াছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অদৃশ্য হইয়াছিল। আলফান্সোকে প্রশ্ন করিতে গিয়াও পারিলাম না।

অঞ্জনার আকস্মিক অন্তর্ধানে হতচকিত আলফান্সো ফিরিয়া আমাকে দেখিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আমি ধর্ ধর্ বলিয়া চীৎকার করিতে পারিলাম না। কারণ, মুহূর্তে কারণটা এমনই বৃহদাকার ও কুৎসিত হইয়া উঠিবে যে—যাহা শুধু অঞ্জনাকে লইয়াই হইবে না, কলিকাতার অভিজাত মহলের কাছে রায়বাড়ীর মাথাই হেঁট হইবে। ওই মেথর চলাচলের পথ ধরিয়াই যেমন চোরের মত গিয়াছিলাম তেমনি চোরের মত ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। সারাদিন

ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই কি করিব? আলফান্সোর উপর নিষ্ঠুর ক্রোধ সত্ত্বেও চুপ করিয়াছিলাম, লোকটা এখনি যদি নীলকর সমাজে গিয়া সব ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া দেয়, তবে সর্বনাশ হইবে।

ইংরেজ জাত অতি ভয়ানক জাত। এমনিতে সে ভদ্র, ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু ইংরাজের এক বিন্দু রক্তের জন্য সে কি না পারে?

ওঃ! সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিয়া শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্রদের, হুমায়ুন বাদশাহের কবর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া, খুনী দরওয়াজায় ফাঁসী দিয়া দেহগুলিরও সৎকার করিতে দেয় নাই। ইহারা সব পারে। কাশীতে বালকদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে দেখিয়াছি। পা কাটা ছেদী আজও আমার চোখের সম্মুখে রহিয়াছে।

ডাকিয়া তিরস্কার করিলাম অঞ্জনাকে। আশ্চর্য! অঞ্জনা সেদিন যে উত্তর দিয়াছিল তাহাতে শুধু স্তম্ভিতই হই নাই। তাহার ঠিক উত্তরও খুঁজিয়া পাই নাই।

শুধু কয়েকদিন ধরিয়াই ভাবিয়াছিলাম—অপরাধ কি আমার?

অপরাধ ধর্ম অনুসারে আমার নিশ্চয় নয়, তবুও নিজেকে অপরাধী না-ভাবিয়া পারি-নাই। হ্যাঁ, অঞ্জনাকে আশ্রয় দিয়া আমার নিজের কাছে আমি রাখিয়াছি। নিজের জন্য রাখিয়াছি। স্বর্ণলতার জন্য ঠিক নহে। তাহাকে প্রশ্রয়ও আমি দিয়াছি। ইহা স্বীকার করি। কিন্তু পাপ অভিপ্রায় আমার ছিল না। তাহার কল্যাণের জন্য রাখিয়াছিলাম এবং আমার তাহাতে আনন্দ বলিয়াও রাখিয়াছিলাম। আমার এই আনন্দ তাহার মনে আশা উদ্রিক্ত করিয়া থাকিবে। হাঁ, ইহা স্বাভাবিক।

অঞ্জনাকে এইজন্যই শাস্তি দিতে পারি নাই।

আলফান্সো সেই দিন হইতে আর আসে নাই। আমি সন্ধানের জন্য গোয়ানপাড়ার পিক্রুজকে লাগাইয়া জানিলাম, সে ভীত হইয়াছে। এবং বলিতেছে—সুযোগ পাইলেই সে কলিকাতা হইতে গোয়া পলাইয়া যাইবে। যাইবার পূর্বে তাহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে —সে নীলকরদের পত্র লিখিয়া রবিনসন বৃত্তান্ত জানাইয়া দিবে। ইহাই অনুমান করিয়াছিলাম।

অবশ্য কলিকাতায় বা বৃটিশ এলাকায় থাকিতে সে ইহা পারিবে না। তাহা হইলে মামলায় তাহাকেই দণ্ডভোগ করিতে হইবে। আমারও হাঙ্গামা কম হইবে না। কিন্তু আমার অর্থ, আমার সম্মান, গভর্ণমেণ্ট ঘরে আমাদের রেকর্ড—এ সমস্তই আমার সহায়। আমার অনুকূলে। আমি তাহাতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হইব।

তথাপি গোয়ানপাড়ার পিক্রুজকে বলিলাম—তাহাকে বলিও, এরূপ করিবার চেষ্টা করিলে একজন ইংরাজকে দিয়াই আমি তাহাকে শেষ করাইব। এবং আমিই তাকে ধরাইয়া দিব। তদপেক্ষা তাহাকে বল—আমি আবার তাহাকে কিছু টাকা দিতে প্রস্তুত আছি। সে চিরদিনের মত বৃটিশ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাউক। প্রস্তাবে সে রাজী হইয়াছিল এবং এ্যাটর্নী বাড়ীতে নগদ টাকা লইয়া এ্যাটর্নীদের তৈরী একখানি কনফেশন পত্রে সই করিয়া দিয়াছে এই পরশু তারিখ।

আর আজ—আজ দেখিতেছি অঞ্জনা নিরুদ্দেশ।

কাহার সহিত নিরুদ্দেশ ইহা কি আমার নিকটেও প্রশ্ন? না, ইহা আমার নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট। বক্ষের অভ্যন্তর যেন আগ্নেয়গিরির মত প্রধূমিত।

শাশুড়ীকে দেখিয়াই আমার সর্বাঙ্গ যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইনি—ইনি—ইনিই অঞ্জনার অন্তর্ধানের প্রথম কারণ। ইনিই। এই কলিকাতার আধাব্রাহ্ম, এস-ডি-ও সাহেবের মেমসাহেব, ইনিই প্রথম কারণ। দেবেশ্বরকে অঞ্জনার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন ইনি। সাহেববাড়ীর আয়া আনাইয়া রাখিয়াছেন ইনিই। ইঁহারা স্বামী এবং স্ত্রী—উভয়ে যত বয়স হইতেছে, ততই বেশী করিয়া সাহেব-মেম হইয়া উঠিতেছেন। আমার শ্বশুরই পরামর্শ দিয়াছিলেন আলফান্সোকে মাহিনা দিয়া রাখিবার জন্ত। হাজার হউক একজন গোয়ানীজ ফিরিঙ্গী, শাদা চামড়া চাকর থাকিবে। শিকার করিবার সময় সাহেবদের মনোরঞ্জন করিবে, তাহা ছাড়া লোকটার মুখ যখন বন্ধ করার প্রয়োজন, তখন তাহাকে নিশ্চয় রাখিবে।

আজ তাহার ফল ফলিল। যাহা হইবার হইয়া গেল। যে পত্রখানি অঞ্জনার শয্যার উপর পাওয়া গিয়াছে, সেই পত্রখানি লইয়া এস-ডি-ও সাহেব-দুহিতা, কীর্তিহাটের বিত্তাবতী বধূঠাকুরাণী বলিলেন—দেখ, অঞ্জনার কীর্তি দেখ।

এস-ডি-ও মেম বলিলেন—আমি জানিতাম, আমি জানিতাম। সেদিন দেবেশ্বরকে যাহা বলিতেছিল, তাহা হইতেই আমি এমনি একটা কিছু অনুমান করিয়াছিলাম। দারুণ ক্রোধে আমি পত্রখানা হাতে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। এবং স্থির করিলাম শ্বশুরকে লিখিব যে, এই ধরনের ঘন ঘন কন্তার বাড়ী আসাটা তাঁহার মেমসাহেবের পক্ষে মর্যাদাহানিকর হইতেছে।

আমি পত্রখানা পড়িলাম—"আমি আলফান্সোর সঙ্গেই যাইতেছি। তোমাদের অনেক খাইয়াছি পরিয়াছি, অনেক দিয়াছ; গহনা কাপড়; আর কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছি, কায়দা-কানুন শিখিয়াছি। এবার কৃশ্চান হইব। ইংরাজী শিখিব। খাঁটি মেমসাহেব হইব। স্বেচ্ছায় যাইতেছি। এবং লাটসাহেবের কাছে জানাইতেছি যে, আমি কৃশ্চান হইতে চাই কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজনেরা বাধা দিতে পারেন বলিয়া হুজুর লর্ডবাহাদুরের শরণাপন্ন হইতেছি।"

সুরেশ্বর বললে—এরপর ডায়রী লিখবার সময় রত্নেশ্বর রায় যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। তখন লিখছেন—"ইচ্ছে হচ্ছে আজই লক্ষ টাকা লাগিলেও খরচ করিয়া আলফান্সোকে হত্যা করাইব। ওই গোয়ানপাড়ার পিক্রুজকে দিয়াই হত্যা করাইব। লোকটাকে কোনমতে মুখ বাঁধিয়া তুলিয়া আনিয়া প্রথমে আঙুল কাটিব, তারপর চোখ দুইটা গালিয়া দিব, তাহার পর জিভটা কাটিয়া দিব। এবং কানেও বধির করিয়া দিব। হত্যা করিব না।"

আবার লিখেছেন—"অঞ্জনাকে পাইলে তাহাকে অন্ত শাস্তি দিব না। তাহাকে টাকা-পয়সা সাজ-পোষাক দিয়া সাজাইয়া গরাণহাটা সোনাগাজি অঞ্চলের বারবনিতা সাজাইয়া বলিব —এই পথ ছাড়া তোমার পরিতৃপ্তি হইবে না। ইহাই তোমার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আমার অভিষেকের দিন একরূপ সংকল্প করিয়া তোমার ভার লইয়াছিলাম। সুতরাং ইহা হউক পাপের পথ, এই পথেই তোমাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া কর্তব্য পালন করিতেছি। তাহার কামার্ত-

তার শাস্তিস্বরূপ তাহাকে বহুভোগ্যা করিয়া ছাড়িয়া দিব। বলিব প্রেতিনী তুমি—এই পিণ্ডেই তোমার তৃপ্তি। তাহাই গ্রহণ কর।"

তারপর আবার লিখেছেন—"ইচ্ছা হইতেছে আলফান্সোকে টাকা দিয়া ওই আলফন্সোভুক্তা স্বৈরিণীকে আনিয়া কীর্তিহাটে সিদ্ধপীঠতলায় বলিদান দিই। এবং মাংস টুকরা টুকরা করিয়া ছড়াইয়া দিই। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, কুক্কুর-শৃগাল, শকুনি-গৃধিনীরা খাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিক।"

ডায়রীতেই আছে—পরপর তিন দিনের ডায়রীতে যা রয়েছে, সে যেন কোন হঠাৎ উন্মাদ হয়ে যাওয়া মানুষের ডায়রী। মধ্যে মধ্যে অজস্র কাটাকুটোর চিহ্ন। তার মধ্যে পেলাম একজন সহিসের পিঠে দশ কোড়া লাগাবার হুকুম দিয়েছিলেন। তিনজন দারোয়ানের জবাব হয়েছিল। কারণ, রায়বাড়ীর দুটো গেটে দু'জন পাহারা ছিল আর একজন হাতার মধ্যে টহল দিয়ে ফিরেছিল। এর মধ্যে থেকেও যখন অঞ্জনা পালিয়েছে, তখন প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব তাদের। কিন্তু তারা কিছু বলতে পারেনি। বলবে কি, জানতেও কিছু পারেনি, কারণ সদর কোন পথে অঞ্জনা অদৃশ্য হয়নি, সে অদৃশ্য হয়েছিল মেথর যাওয়ার গলি-পথটার দরজা খুলে, সেই গলি পথে পথে। এবং এসে আলফান্সোর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল একেবারে রিপন স্ট্রীটের ধারে। এ-পথ তাকে বাত্‌লে দিয়েছিল গোয়ানপাড়ার পিক্রুজের এক চ্যালা গোয়ান। রায়বাহাদুর খুন করিয়েছিলেন একেই।

কিন্তু তারপর এর জন্য যে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত তিনি করেছিলেন সে এক পরমাশ্চর্য সুলতা। পরমাশ্চর্য।

তিনি ডায়েরীতে লিখেছেন—মানুষের মন যখন নিষ্ঠুর আঘাতে আহত হয়, তখন সে স্বর্গমর্ত-রসাতল পরিভ্রমণ করিয়া ফেরে উন্মত্ত কক্ষভ্রষ্ট উল্কার মত। কোথাও সে আশ্রয় পায় না। কোথাও আশ্রয় পাইলেও, সে তাহা লয় না।

একমাত্র আশ্রয় এবং একমাত্র আনন্দ আত্মনির্যাতনে। এইখানেই পরিত্রাণ আছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বহুজনকে বা বিশ্ববাসীকে যাহারা দগ্ধ করে, হত্যা করে, তাহারা দানব বা দেবতা। আমি মনুষ্য। আমি স্থির করিলাম—আমার সর্বাপেক্ষা বিলাসের সামগ্রী তাম্রকূট সেবন আমি ত্যাগ করিব।

সুলতা বললে—কিন্তু দেবতা বা দৈত্যের চেয়েও এ-মানুষ ডেঞ্জারাস।

হেসে সুরেশ্বর বললে—ওখানে আমার কোন বাদ-প্রতিবাদ নেই। কিন্তু যে-কথা থেকে এত কথা বললাম সুলতা; সেইটে বলে নি। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সেই রাত্রে আমার মনও এমনি করে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বা স্বর্গ-মর্ত-রসাতল ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রসাতলে টানছিল হিলডার চীৎকার।

সে কি অমানুষিক গোঙানী।—

ওই গোঙানী শুনে বিরক্তই হচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, হেঁকে দারোয়ানকে বলে দি যে, হিলডাকে বল চুপ করতে, না হলে বেরিয়ে যাক এখান থেকে। এমন করে চ্যাঁচানো চলবে না।

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে মনশ্চক্ষে মনে হচ্ছিল একটি তরুণীর মুখ। আজই ভবানীপুর থেকে ফিরে এসে ওকে দেখেছি। ড্রয়িংরুমে আড়াইশো ওয়াটের বাব জ্বলছিল—তারই পরিপূর্ণ আলোকের মধ্যে দেখেছিলাম কুইনীকে। সেই দিন সকালে, সকালবেলাতেই পাশকুড়ায় তাকে দেখেছিলাম, আবার দেখলাম এই রাত্রে ইলেকট্রিক আলোর সামনে।

আশ্চর্য মমতা হয়েছিল তার উপর। গভীর মমতা।

Poor Girl!

ঈশ্বর জানেন, তিনি সাক্ষী, সুলতা, চিত্ত আমার চকিত হয়নি তা নয় হয়েছিল; কিন্তু সে অত্যন্ত নর্মাল ব্যাপার। কলকাতার রাস্তায় অসংখ্য নারী-পুরুষ চলে পাশাপাশি; ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে; এর মধ্যে যেমন অহরহ একটা মুহূর্তের ভাল লাগায় চকিত তরঙ্গ বর্ষা-রাত্রির জোনাকির মত জ্বলে আর নেভে, নেভে আর জ্বলে, ঠিক তারই মত। তার বেশী কিছু নয়। —না, ভুলই বললাম। কুইনী তো জোনাকীর মত হারিয়ে যাবার কেউ নয়। সে থাকে গোয়ানপাড়ায়। তার মায়ের বাপকে রত্নেশ্বর রায় বাড়ী দান করেছেন। নিশ্চয় কোন দেনা ছিল।

সেসব কথা ভেবেই দারোয়ানকে হেঁকে বলতে পারিনি—হিলডাকে বলে দাও, চীৎকার করতে হলে যেন বাইরে গিয়ে করে। বের করে দাও।

কুইনীর শান্ত শ্রীমতী মুখখানিও মনে পড়েছিল। সেটা যেন পুরনো বন্ধনের সঙ্গে একটা নতুন বন্ধনের মত গর্জাচ্ছিল—

দেবেশ্বর রায়ের চিঠি মনে পড়েছিল।

রত্নেশ্বর রায়ের এলিয়ট রোডের বাড়ী দানপত্রের কথা মনে পড়েছিল। বলেছি তোমাকে, সেদিন রাত্রে ভাবনা-চিন্তা আমার যেন স্বর্গ-মর্ত-রসাতল ঘুরে বেড়াচ্ছিল ধূমকেতুর মত অথবা নতুনকালের প্লেনের মত। কখনও ভাবছিলাম—দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। কখনও ভাবছিলাম—সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়ে রায়বংশের সকল ঋণ শোধ করার কথা। অর্থাৎ চিন্তার প্লেনটা এখুনি ল্যাণ্ড করে আবার রানওয়ে ধরে ওমাথায় গিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছিল। আবার ঘুরে এসে নামছিল। কিন্তু রসাতলের দিকে যখন ওই হিলডাকে উপলক্ষ্য করে কুইনীকে লক্ষ্য করে নেমে যাচ্ছিলাম, তখন যেন ইঞ্জিনটি স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বিকল হয়ে গেছে, একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে।

হ্যাঁ সুলতা, তুমি যা ভাবছ তাই।

কুইনীকে দেখে সেদিন আমি সত্য সত্যই যেন মুগ্ধ এবং মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে আলাপ যখন হয়, তখন তার মধ্যে তোমার শ্রী, তোমার রূপও ছিল। কিন্তু এর চেয়েও বড় ছিল তোমার মনের আকর্ষণ।

কিন্তু কুইনীর আকর্ষণের মধ্যে তার শ্রী-রূপ ছাড়াও একটা কিছুর আকর্ষণ আমাকে আগুনের শিখা যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনি করেই আকর্ষণ করছিল।

সুরেশ্বর যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। হঠাৎ উঠে গিয়ে সে ফ্রি ইস্কুল স্ট্রীটের দিকে কাচের জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তার মনে পড়ে গেছে সেদিনের কথা।

আজ ১৯৫৩ সাল। সেদিন ছিল ১৯৩৭ সাল। সেদিনের চঞ্চলতা যেন আজও তার স্মৃতিকে এবং স্মৃতির সঙ্গে মনকে খানিকটা অস্থির করে তুলেছে। বাইরে নভেম্বরের রাত্রে কলকাতার রাস্তা দোকান আইন সত্ত্বেও জমজমাট রয়েছে। পথে জনতা চলছে। এ-জনতা সারাদিন যারা খাটেখোটে, পেটের ধাক্কায় ফেরে তারা ঠিক নয়। অবশ্য পেটের দায় সব সময়ই আছে। গভীর রাত্রে যে-হতভাগিনী দেহ বিক্রীর আশায় রাস্তার কোন কোণে দাঁড়িয়ে থাকে, সে পেটের দায়েই থাকে। কিন্তু তার থেকেও বেশীসংখ্যক থাকে অন্য একদল মানুষ। যারা রাত্রিকালে জীবনের উন্মত্ত নেশায় পাগলের মত বের হয়। নারীদেহের পর নারীদেহ ভোগ করে যাদের তৃপ্তি হয় না। কেন হয় না তা তারা তো জানেই না। অন্যেও জানে কিনা বলতে পারে না সুরেশ্বর। তবে ব্যাধি বললে মিটে যায় এক কথায়।

আজ তার মনে পড়ল কুইনীকে। সেদিনের কুইনীকে। যার জন্য সেদিন ১৯৩৭ সালের শীতের রাত্রে সে পায়চারি করেছিল এবং পেডি ডগলাস বার্জ মার্ডার কেস, অতুলেশ্বরের কেস, ১৮৮৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে দেবেশ্বর রায়ের অংশগ্রহণ থেকে হিলডার চীৎকারে সে যে কুইনীর চিন্তায় এসে পড়েছিল, সেই কুইনীকে আজ আবার মনে পড়ল। কুইনীর সেই আকর্ষণ আজ তার মনে পড়ছে।

সুলতা প্রশ্ন করলে—কি হল? বস! না, ক্লান্তিবোধ করছ? কিম্বা— ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুলতা উঠে গিয়ে তার পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে ডেকে বলেছিল—সুরেশ্বর—

—সুলতা।

—তাহলে কি—তুমি সেইদিন—সেই—সেই—।

বাধা দিয়ে সুরেশ্বর বললে—না-না-না। ছিঃ। এতখানি ছোট তুমি আমাকে মনে কর না সুলতা!

সেদিন আমি সমস্ত রাত্রি ঘুমুইনি। কিন্তু সে শুধু কুইনীর তাড়না নয়। আরও ছিল। বলেছি তোমাকে। ১৯৩৭ সাল। ১৯৩০ সাল থেকে পেডি ডগলাস বার্জ মার্ডার যেখানে হয়েছে, সেই মেদিনীপুরে তখন থাকতাম আমি। অতুলকাকা ধরা পড়েছে। মেজদিদি অর্চনাকে বাঁচাতে ধরা দিয়েছেন, জেল খাটছেন। বিমলেশ্বরকাকা ওই কাণ্ড করেছেন। আগের দিন রাত্রে অন্নপূর্ণা-মাকে দেখেছি, ফিরবার সময় ময়দানে তখনও জায়গায় জায়গায় লোক জমায়েত দেখেছি। সেদিন কেউ তাই পারে? না, তা নয়। তবে হাঁ, তার আশ্চর্য আকর্ষণ আমি সেদিন অনুভব করেছিলাম। আশ্চর্য! অর্চনা, মেজদি, অতুলেশ্বর, বিমলেশ্বর এরা চারজনে চারদিকে ঘিরে আমাকে বোধহয় বাঁচিয়েছিল সেদিন।

নীচে হিলডা চীৎকার করেছে, আমি ঠিক এইখানে এই কাচঘেরা বারান্দায় পায়চারি করেছি, কখনও দাঁড়িয়ে থেকেছি। ইচ্ছে হয়েছে নীচে যেতে কিন্তু পারিনি। তার কারণ ওই চারজন। এবং আরও একজন—সে হল রঘু চাকর। সে তো আমি না ঘুমুলে ঘুমোয় না। পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল এরা।

যেন বলেছিল—না-না-না। নীচে নেমো না। নামতে গেলে বাকি থাকবে না। নতুন

কাল এসেছে। পাল্টেছি, পাল্টাচ্ছি, রায়বাড়ীর আমরাও পাল্টাচ্ছি। এসময় আর নীচে নেমো না।

কথাগুলো শুনতে বোধহয় তোমার সেন্টিমেন্টাল বা ইমোশনাল মনে হচ্ছে, তা হতে পারে। এবং সত্যও তাই। কিন্তু এই সেন্টিমেন্ট আর ইমোশন এই দুটোই সংসারে অঘটন ঘটায়, চিরকাল ঘটিয়ে আসছে, আজও ঘটাচ্ছে, সেদিনও ঘটিয়েছিল।

কুইনী একলা জেগে বসে আছে, তা যে-কেউ অনুমান করতে পারে। হিলডার ওই চীৎকার এবং যন্ত্রণা দেখে সে নিশ্চয় ঘুমোয়নি।

ভোরবেলার দিকে হিলডার চীৎকার একটু কমে এসেছিল—আমারও একটু তন্দ্রা এসেছিল। রঘু আমাকে ডাকলে।

—লালবাবু!

তন্দ্রা ভেঙে গেল। বললাম—কি? এখন চা খাব না, যা।—

রঘু বললে—না লালবাবু, ওই গোয়ানপাড়ার ওই লেড়কীটি—ওই কুইনী আপনের সাথ দেখা করনেকে মাংছে। হলদী বুড়ীর বহুৎ বেমার।

চমকে উঠলাম। কুইনী?

—হাঁ লালবাবু, ছোকরী কাঁদছে।

—কাঁদছে? কোথায়?

—সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বললে—রাত্রে আরও দু'-দুবার সে বাবুজীর কাছে আসবার জন্যে এসেছিল কিন্তু ডাকতে সাহস করেনি।

আমি চমকে উঠলাম। কুইনী রাত্রে আরও দুবার আসতে গিয়ে ফিরে গেছে? বুকটাও কেমন করে উঠল।

রায়বংশের ছেলে আমি এবং ১৯৫৩ সালে জমিদারী উচ্ছেদের রাত্রে বলছি তোমাকে; কথাটা তুমি দুই অর্থে ধরে নিতে পার। বুকটা চলকে ওঠার হেতু কিছু ছিল না। কারণ, কুইনী কাঁদছিল, তবু রক্ত। রায়বংশের রক্ত সুলতা। অথবা বলতে পার মানুষের রক্তের কীর্তিনাশা ধারা। জান্তব-জীবন থেকে উদ্ধার করতে বহু তপস্যা করে মর্তে গঙ্গা এনেছিলেন ভগীরথ। সাগরের কাছাকাছি এসে গঙ্গা ভুল করে পথ হারাল। মানুষই তাকে ভুল পথে নিয়ে গেল। অথবা বলতে পার, ওইটেই তো স্বাভাবিক ক্রমনিম্নতা। জলের স্বভাববশে ওই পথেই তো যাবার কথা। তাই গিয়েছে। তবে বিষ্ণুপদের মহিমা আছে, সেখান থেকে ঝরা জল; তেমনি মানুষের সাধনারও মহিমা আছে, সেই সাধনার বলে কীর্তিনাশাকে বাঁয়ে সরিয়ে পতিতোদ্ধারিণী সাগরসঙ্গমে গেছেন, মানুষের মনুষ্যত্ব—গত দশ-বারো বছরের যুদ্ধ, কালোবাজার, তারপর স্বাধীনতার পর আমাদের বিজয়াদশমীর দিনের মদ খেয়ে উন্মত্ত উলঙ্গ নৃত্যের মধ্যেও মনুষ্যত্ব কিছুটা থাকে, মরে না, একবারে মরে না। সেদিনও আমার মনুষ্যত্ব ছিল। রায়বংশের রক্ত হলেও তার মধ্যে বেঁচে ছিল।

ঘরের দরজা খুলে দেখলাম কুইনী দাঁড়িয়ে আছে, চোখদুটি রাঙা, বুঝলাম অনেক কেঁদেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে কুইনী?

—বুড়ী দিদিমা—আর বলতে পারলে না।

—কি হল? সারারাত্রি তো চীৎকার করছিল। এই তো কিছুক্ষণ আগেও শুনেছি।

—হ্যাঁ স্তার। কিন্তু হঠাৎ মুখ খুলতে পারছে না—গোঙাচ্ছে। কি রকম হয়ে গেছে।

—চল দেখি। ভয় কি, একটু বেলা হলেই ডাক্তার ডেকে পাঠাচ্ছি। আসবে দেখবে ওষুধ দিলেই ভাল হয়ে যাবে। হাঁটুটা বোধহয় পেকে উঠে থাকবে।

—হ্যাঁ খুব ফুলেছে।

ঠিক এই সময়েই একখানা ঘোড়ার গাড়ী ঢুকল বাড়ীর ফটকের মধ্যে। এই মুহূর্তেই এলেন অন্নপূর্ণা-মা। অবশ্য আমি সঠিক অনুমান করতে পারিনি যে, এ একেবারে খোদ অন্নপূর্ণা-মা এবং রথীন। তবে ভেবেছিলাম, কম্পাস গাড়ী যখন, তখন এ ভবানীপুরের মুখুজ্যেবাড়ীর গাড়ী। হাইকোর্টে ১৯৩৭।৩৮ সালেও এক ঘোড়া দিয়ে টানা পালকিগাড়ীর অনেক ভিড় ছিল। ওদের বাড়ীতে যখন ঢুকি বিকেলবেলা, তখন গাড়ীটা দাঁড়িয়ে ছিল। কাল ঘোড়াটার কপালে সাদা দাগটা ভাল লেগেছিল বলে চেনা হয়ে গিয়েছিল।

গাড়ীটা দাঁড়াল, আমি চমকে উঠলাম। একি, ভিতরে খোদ অন্নপূর্ণা দেবী, বড়-মা? আর ও কে? রথীন?—

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গাড়ীটার পাদানের সামনের অংশটা খুলে দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম—বড়-মা!

চিবুকে হাত দিয়ে হাত মুখে ঠেকিয়ে বড়-মা বললেন—প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কাশী যাব ভোরে উঠে। ও-বাড়ীতে আর থাকব না। মা যে-বাড়ীতে দেহ রেখেছেন, সেই বাড়ীতে দেহ রাখব। ওরে মাঝরাতে দেবু এসে যেন আমাকে ডাকলে। সেই বাঁকা বাঁকা হেসে বললে—হেরে গেলে তো! আমার মত পিসী হারতে হয়। জেতা যায় না গো। আমি উঠে বসে ঝি চাকরদের ডেকে জিনিস গুছাতে বল্লাম—আমি হার মানব না। চলে যাব কাশী।—কিন্তু ভোরবেলা রথীন গোলমাল লাগালে। পায়ে জড়িয়ে ধরে বললে—হ্যাঁ, আমি বিয়ে করব, করব, করব। তুমি বাড়ী ছেড়ে যেয়ো না।

গোলমাল হয়ে গেল সব। তা বললাম—আগে চল তাহলে গঙ্গাস্নান করে আসি রাণী রাসমণির ঘাটে, আর বলে আসি সুরেশ্বরকে।

বলতে বলতে নামলেন তিনি। আমার ঘাড়ের উপর হাতের ভর দিয়ে। আশী বছরের কাছে বয়স কিন্তু বড়-মা বেশ শক্ত ছিলেন। চোখে তাঁর চশমা লাগত না। তাঁর পিছনে পিছনে রথীন। রথীনকে পেয়ে বেঁচে গেলাম। অর্চনার সমস্যার সমাধান তো হলই, হিলডাকেও দেখাতে পারব। সে ডাক্তার।

বড়-মা নেমেই বললেন—তোর মায়ের ঘরে চল। যে-ঘরে তোর মা শেষকালটা থাকতো। আমি শুনেছি, আমি তোদের সব খবর নিই রে, বিশেষ করে দেবুর গুষ্টীর। তোর মা বড় পবিত্রভাবে থাকত। সেই ঘরে চল। বলতে বলতেই তিনি বললেন—এ-মেয়েটি কে রে?

অর্থাৎ কুইনী। সকালের সদ্য-ওঠা রোদটা কুইনীর মুখের উপর পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল। তার রুক্ষ চুলের মধ্যে ঈষৎ পিঙ্গলাভা, রঙের মধ্যে চাপা পর্তুগালের রঙের আভাস, কালো চোখ

এবং সে-চোখদুটি তার বিচিত্র ডাগর, আয়ত, পটলচেরা, হরিণচোখ এ-সবের কোনটা না নয় কিন্তু চোখদুটি আশ্চর্য কালো এবং আশ্চর্য গড়ন, বিশেষ করে চোখের পাতার চুলগুলি। এবং সমস্ত জড়িয়ে একটি বিষণ্ণ মহিমা ফুটে উঠেছিল। নির্বাক হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। আমি দেখতে যাচ্ছিলাম হিলডাকে, তাতে বাধা পড়ল, তাতে তার চোখে-মুখে একটি বিরক্তির রেখা ফুটল না। তার দিকে চোখ পড়া স্বাভাবিকই ছিল। রথীনও তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

আমি বড়-মার কথার উত্তরে বললাম—ওদের বাড়ী এখন একরকম কীর্তিহাট বড়-মা। এখানে এসে বিপদে পড়ে গেছে, দিদিমাকে নিয়ে কাল রাত্রে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—

কথার বাধা দিয়ে বড়-মা বললেন—কাদের মেয়ে গো তুমি—হ্যাঁ মেয়ে?

বিনম্রভাবে নমস্কার করে কুইনী বললে—নমস্কার মা। আমি গোয়ানপাড়ায় ছিলাম। আমি ওদের।—

—গোয়ান? ও মা! গোয়ানরা এখন এইরকম হয়েছে নাকি রে? এঁ্যা? এ যে কলেজে-পড়া মেয়ে-টেয়ের মত! এঁ্যা আগে সেই লম্বা গাউনের মত ঢিলে পা পর্যন্ত জামা পরে ঘুরত—।

হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। বললেন—উঁ? কাউকে যেন কিছু প্রশ্ন করলেন। সম্ভবত নিজেকেই।

কুইনী বললে—আমি ওখানকার মেয়ে নই মা। আমি কলকাতার মেয়ে। তবে গোয়ান-পাড়ার ওরা আমাদের আত্মীয়। খুব আপনজন।—

—তাই বল। কলকাতার মেয়ে তুমি।—ওরে রথীন, চশমাটা দে তো। দেখ তো ওই ভিজে কাপড়ের ঝোলাটার মধ্যে থাকবে। দে তো!

চশমাটা চোখে দিয়ে খুব ভাল করে কুইনীকে দেখতে লাগলেন। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম সুলতা। আমার পাপবোধই বল আর যাই বল মনে হচ্ছিল অন্নপূর্ণা দেবী মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁজছেন—হয়তো বা আমারই স্পর্শের ছাপ বা চিহ্ন কিছু খুঁজছেন।

সেইজন্যে আমিই কৈফিয়ৎ দিলাম নিজে থেকে—মেয়েটির মায়ের দরুণ একটা বাড়ী ছিল কলকাতায়, সে-বাড়ী নাকি আমাদেরই দান-করা ওদের পূর্বপুরুষকে। সেই বাড়ীতে থাকত ওরা। ওর বাবা ছিলেন আমাদের দেশী খৃষ্টান—মুখার্জি; ওর মা ছিলেন গোয়ান মেয়ে। হঠাৎ দুজনেই মারা গেলেন একসঙ্গে বছর-দেড়েক আগে, মেয়েটিকে গোয়ানপাড়ার হিলডা পিত্রুজ বলে একটি বৃদ্ধা মহিলা আছেন—

—হলদী? হলদী?—সে তো আমার থেকে ছোট। তা অবিশ্যি এখন বুড়ী হবে বই কি! হলদী বলতাম আমরা। ছোট্ট মেয়েটা। সে বেঁচে আছে? আরে কালীপুজোর সময় যখন যেতাম, তখন আসত আমাদের কাছে। তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—হ্যাঁ, দাদা একখানা বাড়ী দিয়েছিলেন ভায়লেট বলে একটা মেয়েকে। সে অনেক কাণ্ড। অনেক।—

আমি চুপ করে শুনছিলাম, উনি থামতেই বললাম—ওদের সেই বাড়ী জ্যাঠামশায়ের তরফ

থেকে ও'র ছেলেরা ওদের বেদখল করে দিয়েছে। ভাড়াটেদের কাছে ভাড়া তারা আদায় করছে। খবর পেয়ে হিলডা এসেছিল কুইনীকে নিয়ে। তা কাল ঝগড়া করে হাঁকিয়ে দিয়েছে, হিলডাও গালাগাল করেছিল, তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। গোটা হাঁটুটা জখম হয়ে গেছে। ছাল-চামড়া তো উঠেছেই, আর কি হয়েছে জানি না। কাল ও-বাড়ী থেকে এসে দেখি ওরা কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এখানে এসেছে। ওই নীচের পূবদিককার একখানা ঘরে আছে। বেচারী সারারাত্রি যা চীৎকার করেছে যন্ত্রণায় যে, সে আর বলবার নয়। তাই সকালেই মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল খবরটা বলতে। তা রথীনবাবু এসেছেন ভালই হয়েছে। একবার দেখুন তো ভাই কি হয়েছে।

—টিটেনাস-ফিটেনাস নয় তো? ক'ঘণ্টা হল? মানে চোটটা লেগেছে কখন?

কুইনী এবার বললে—কাল বেলা তিনটের সময়। দিদিমা বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করছিল—রায়বাবু ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন উঠোনের উপর।

বড়-মা ফোঁস করে উঠলেন—রায়বাবু?—কে?—কোন্ রায়বাবু?

কুইনী উত্তর দিলে না, আমি বললাম—প্রণবেশ্বরদা। জ্যাঠামশায়ের ছেলে।

—যজ্ঞেশ্বরের ছোট ছেলেটা—রাস্তার উপর যেটার গাড়ী আটকে কান মলে কাচ্ছি কয়লা-ওলারা গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে দেনার জন্যে গাড়ী কেড়ে নিয়েছে, সেইটে?

আমি চুপ করে রইলাম।

বড়-মা বললেন—তুই যা রথীন, হলদীকে দেখে আয় কি হয়েছে। না, দাঁড়া আমিও যাব। একবার দেখব হলদীকে।

* * *

এই ধরনের সারারাত্রি চীৎকারের জন্য হলদীকে দোষ দেওয়া যায় না। বেচারার হাঁটুটা একেবারে ফুলে এবং পেকে যেন ঢোল হয়ে উঠেছিল। সারারাত্রি চীৎকার করে ভোরবেলা বুড়ী একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে জেগে উঠে আবার চীৎকার শুরু করে দিলে। রথীন দেখতে গেল তার ক্ষতটা, তাতে আতঙ্কিত হয়ে ছোট মেয়ের মত হাউ-মাউ করতে লাগল।

কুইনী তাকে বোঝালে—এমন করে না দিদিমা। ডাক্তারবাবুকে দেখতে হবে তো। কিন্তু সে-কথা শোনে কে? এবার ঘরের ভিতর ঢুকলেন অন্নপূর্ণা-মা। ধমক দিয়ে বললেন—এই হলদী। কচি খুকি নাকি তুই? এঁ্যা! ছেলেবেলার সে-অভ্যেস তোর দেখছি এখনও যায়নি। চুপ কর।

হলদী অন্নপূর্ণা-মাকে দেখে কেমন হয়ে গেল। সবিস্ময়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। এবং চুপ করেই চেয়ে রইল। রথীন হাঁটুর ক্ষতটা বেশ ভাল করেই দেখলে একবার দুবার নাড়লেও, তবু হিলডা যেন তা খেয়ালই করলে না, সে চেয়ে রইল অন্নপূর্ণা-মায়ের মুখের দিকে।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—পছহানতে পারিস?—আঁ? পারছিস না?

হিলডা বললে—মালুম হচ্ছে কি চিনি আপনাকে, লেকিন—

—ঠিক ঠাওর করতে পারছিসনে? না? রায়বাহাদুর হুজুরের আমল মনে পড়ে? এঁ্যা? উঠে বসতে চেষ্টা করলে হিলডা। তার ফলে চাড় পেয়ে হাঁটুর ফুলোর যে-অংশটা আংশিক-

ভাবে পেকেছিল, তা ফেটে গেল। চীৎকার করে উঠল হিলডা।

রথীন বললে—গরম জল করে আন। এখন ধুয়ে দাও। টিংচার-আইডিন থাকলে খানিকটা দিয়ে দাও তাতে। তারপর আমি বরং কম্পাউণ্ডারকে পাঠিয়ে দেব, সে পরিষ্কার করে দিয়ে ড্রেস করে ব্যাণ্ডেজ করে দেবে।

আমি কুইনীকে বললাম—তুমি যাও কুইনী, রঘুকে বল—সে জল গরম করে দেবে। টিংচার আইডিনও থাকতে পারে।

অন্নপূর্ণা-মায়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে হিলডা বললে—পিসী রাণীমাঈ!

—হ্যাঁ। পিসী রাণীমাঈ!

হিলডা বললে—এ হি দেখেন পিসী রাণীমাঈ, আপনের সাদীর সময় হামি আপনেকে নাকের টাপ চেয়েছিলাম, এহি দেখেন—এহি সেই টাপ, হামি আজও খুলে নাই। কুইনীকে বললাম—হামি মরব যখুন, তখুন তু খুলিয়ে লিস। ইটা খুব দামী পাথল বটে।

—হ্যাঁ, ওটা হীরে। হাত দিয়ে নাড়ছিলাম, ওটা পড়ে গেল বাগানে। খুঁজে পাওয়া গেল না। একবেলা পর তুই ওটা খুঁজে পেয়ে আমাকে ফেরৎ দিতে এসেছিলি। আমি বলেছিলাম—তুই ওটা নে। ভায়লা বলে সেই মেয়েটা তোকে সঙ্গে করে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল।

—আপনের সব মনে আছে, আপনের সব মনে আছে। ঠোঁটদুটো তার কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বললে—তব তো আচ্ছা হল পিসী রাণীমায়ী—আপনে বিচার করে দেন। আপনে জানেন। ভায়লাকে নিয়ে গোপাল কলকাত্তা গেল—।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—হ্যাঁ আমি জানি। আমি শুনলাম, দাদা ভায়লার ছেলেকে বাড়ী দিয়ে গিয়েছিলেন। এলিয়ট রোডের বাড়ী। সেই বাড়ী প্রণবেশ্বর কেড়ে নিচ্ছে। আমি শুনেছি।

—হামাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে।

—সেও শুনেছি। চোখে দেখছি। রত্নেশ্বর রায়, ধার্মিক রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুরের স্বর্গসিংহাসন ওল্টাতে ওল্টাতে পড়ছে মাটিতে তাও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তুই ভাবিসনে, আমার ছেলে হাইকোর্টের উকিল, তাকে বলে দেব, সে তোদের হয়ে মামলা করে দেবে হাইকোর্টে। বাড়ী তোদের যাবে কোথায়?

একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন—এই মেয়েটি কে হয় ভায়লার?

—ভায়লার? ভায়লার বেটা পিড্রুজ, ওই পিড্রুজ সাদী করলে এক আংরেজ ফিরিঙ্গী লেড়কীকে। একটা বেটী পয়দা হল। ওহি বেটী সাদী করলে এক দেশী কৃশ্চান মুখুর্জিকে। তারই বেটী এই কুইনী।

—ভায়লার বেটার বেটীর বেটী?

—হাঁ!

—হ্যাঁ। তাই দেখলাম। চোখে-মুখে ভায়লার আদল আছে। ভায়লার রঙ ছিল শাদা। এর রঙে কোন মুখুজ্জেবাড়ীর রঙের ছোপ ধরেছে। কিন্তু চোখদুটো একরকম—নাক-মুখ তাও

মেলে। অঞ্জনা-দিদিকে মনে পড়িয়ে দেয়, চুলগুলোও কোঁকড়া। সেই এক ছাঁচ।

কুইনী দুই হাতে তোয়ালে দিয়ে ধরে ফুটন্ত গরম জলের একটা এ্যালুমিনিয়মের ডেকচি এনে নামালে।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—ওরে বেটী, একবার মুখ তোল তো, দেখি আর একবার ভাল করে।

একটু অবাক হয়ে গেল কুইনী।

ঠিক অ—। বলে থেমে গেলেন অন্নপূর্ণা-মা। তারপর বললেন—ঠিক তেমনি চোখ, তেমনি চুল। আমার বয়স তখন তো কম নয়। আমার ছয়। দেবুরও ছয়। বউদিদির কোলে একটা মেয়ে হয়ে মারা গেছে। আমার তাকে বেশ মনে পড়ে। কাশী থেকে কীর্তিহাটে আসতাম-থাকতাম, দিনরাত দেবু-আমি ছুটোছুটি করতাম—বউদিদি সামলাতে পারত না। সামলাতো ওই—।

চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন—এ-বাড়ী যদি কেড়ে নেয় যজ্ঞেশ্বরের ছেলেরা তবে—। কি বলব তবে? কি বলব?

রথীন বললে—বড়-মা বড়-মা! তুমি উপরে চল। এখানকার ব্যবস্থা সব হচ্ছে, হবে। চল ওপরে চল।

* * *

উপরে অন্নপূর্ণা-মাকে চেয়ারে বসিয়ে তোলা হল। রথীন আর আমি দুপাশে দুজন উঠছিলাম। হঠাৎ রথীন বললে—রাগলে আর তোমার জ্ঞানগম্যি থাকে না বড়-মা।

অন্নপূর্ণা মা বললেন—ওরে হারামজাদা, যেখানে আমি রেগে জ্ঞানগম্যি হারাই, সে হল আমার খাস এলাকা। বুঝলি! সেখানে আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন ও-কথা যে বলবে, তার মুখে পোকা পড়বে। তোদের সংসার-আমার পাতা, আমার মায়ের আশীর্বাদে আর পিসেমশায় বিমলাকান্ত চাটুজ্জের মূলধনে। বুঝলি। নইলে তোদের মূল মুখুজ্জেবংশের পরিণাম তো দেখছিস চোখে। আর এই এ-পাশে এই দেখ সুরেশ্বর; ওদের এতবড় রায়বাড়ী, এত সম্পত্তি, এত চাল, এত চলন, তার পরিণামও দেখছিস। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর আমার ভাই, লোকে বলে তার মত লোক আর হয় না। ধার্মিক, রায়বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, একেবারে কষ্টি-পাথরে নিখাদ সোনা! হায়, হায়, হায়। কি বলব? দেখ, তার বংশের পরিণাম দেখ!

* * *

উপরে মায়ের ঘরে এসে ঘরখানা খানিকটা চোখ বুলিয়ে দেখে বললেন—সুরেশ্বর, রথীন কাল রাজী হয়েছে বিয়ে করতে। বল রে—বল রথীন।—বল, সুরেশ্বরকে কথা দে।

রথীনবাবু বললেন—আমি কথা দিলাম সুরেশ্বরবাবু, অর্চনাকে আমি বিয়ে করব, করব, করব।

আমি বললাম—বড়-মা, তাহলে কখন বিয়েটা হবে? দিন একটা স্থির করে আপনিই দিন। কলকাতা থেকেই বিয়ে দেব—আপনি যেমন বলেছেন। বিয়ের পর কখনও অর্চনাকে কীর্তিহাটে পাঠাতে বলব না। আর জগদীশকাকার সে সামর্থ্যও নেই। তাঁরা মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হলে এ-বাড়ীতে আসবেন, এসে ইচ্ছে হলে মেয়ে-জামাইকে নেমন্তন্ন করে

খাওয়াবেন বা আপনার বাড়ীতে যাবেন। আপনি যা বলেছেন, তাই হবে বড়-মা। আমরা তাই মানব।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দেখ, কাল তুই গিয়েছিলি, তোকে একরকম ফিরিয়েই দিয়েছিলাম। আমি নই—ওই রথীন ফিরিয়ে দিয়েছিল। ভোরবেলা উঠে এসে বললে—বড়-মা, আমাকে মাপ কর তুমি, ওই মেয়েকেই বিয়ে করব আমি। চল তুমি, সুরেশ্বরবাবুর ওখানে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল—একলা যেতে ঠিক আমার পা উঠছে না। তাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ওসব শর্তের কথা যা বলেছিলাম, তা মানবি—ভালই। তবে ওগুলো আমি এক-রকম রাগ করেই বলেছিলাম রে! শর্ত কাল যেগুলো বলেছিলাম, তার কড়াকড়ি এক রাত্রেই হাল্কা হয়ে গেছে। কিন্তু শর্ত আজকে দিচ্ছি তোকে। বিয়ে হবে, মেয়ে আমি সাজিয়ে দেব। তুই বরাভরণটা দিস। আর এই বাড়ীতে বিয়ে হবে—ফুলশয্যের তত্ত্ব কলকাতার একটা বড় ব্যাপার, সেটা ভাল করে করিস। কিন্তু এসব ছাড়া কিংবা এসবের উপরে একটা শর্ত আমি তোকে দিচ্ছি সুরেশ্বর। সেটা তোকে মানতে হবে।

—বলুন বড়-মা, কি মানতে হবে।

—ওই যে নীচে যে-মেয়েটিকে দেখে এলাম, কি নাম?

—কুইনী।—

—হ্যাঁ। কুইনী মুখুজ্জে। ওর বাড়ী কেড়ে নিয়েছে কোন প্যাচপোঁচে ফেলে যজ্ঞেশ্বরের ছেলেরা। ওকে ওর বাড়ী ফিরিয়ে দিতে হবে। মামলা করলে উদ্ধার হয়তো হবে। নিশ্চয় হবে। সাক্ষী তো আমি আজও বেঁচে রয়েছি। দয়াল চোখে অঞ্জনাকে দেখেনি। কিন্তু অঞ্জনার নাম তার কাণ্ডকারখানা, তার জন্তে রায়বাহাদুর একটা গোয়ান ছোঁড়াকে কেটে ভাসিয়ে দিলে এসব দয়াল শুনেছে। জানে।

রথীন অবাক হয়ে শুনছিল—মানে ঠিক বুঝতে পারছিল না। আমি আন্দাজ করছিলাম অন্নপূর্ণা-মা কি বলছেন বা বলতে চাচ্ছেন। আমি তার ডায়রীর এখান-সেখান থেকে পড়েছি, একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত পড়েছি। বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। তবু এইটুকু বিস্ময় বোধ করছিলাম যে, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় অত্যাচারী প্রজাপীড়ক, জটিলবুদ্ধি, মামলাবাজ আইনানুগত্যের মুখোশে মুখ ঢেকে ন্যায়পরায়ণ সেজে ইস্কুল, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক কিছু করেছেন কিন্তু ডায়রীতে মিথ্যে কথা লেখেননি। মধ্যে মধ্যে কথা বাদ দিয়ে গেছেন মাত্র।

অন্নপূর্ণা-মা বলে যাচ্ছিলেন—লোকের কাছে সত্য গোপন থাকে না। অঞ্জনা ছিল সম্পর্কে আমাদের দিদি, দাদার সমবয়সী, তার বিয়ে হয়েছিল এক বাউণ্ডুলের সঙ্গে—

—জানি বড়-মা।

—তুই জানিস?

—জানি।

—কি করে জানলি?

—কাগজ ঘেঁটে, রায়বাহাদুরের ডায়রী পড়ে। আপনার বাবার একখানা খাতা আছে—

সেখানা পড়ে।

একটু চুপ করে থেকে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তাহলে তো জানিস যে, আলফানসো পিড্রুজ বলে সেই খুনে ফিরিঙ্গীটা অঞ্জনাকে নিয়ে পালিয়েছিল। পালিয়েছিল গোয়ায়। সেখানে অঞ্জনা মারা গেল। অঞ্জনার অসুখের সময় আলফানসো চিঠি লিখেছিল দাদাকে—আমার দাদাকে। দাদা টাকা পাঠিয়েছিলেন হিলডার বাবার হাত দিয়ে। হিলডার তখন জন্ম হয়নি। আমারই বয়স তখন দশ—মনে পড়েছে পিড্রুজ অঞ্জনার মেয়ে ভায়লেটকে নিয়ে ফিরে এল কীর্তিহাট। শুনলাম, আলফানসো পাগল হয়ে গেছে। পিড্রুজ মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে এখানে। দাদার নাকি তাই হুকুম ছিল।

ভায়লেট তখন তিন বছরের। বাংলা একটু-আধটু বুঝতো। হয়তো অঞ্জনা শিখিয়েছিল। ভায়লেটের চোখ ছিল ঠিক অঞ্জনাদিদির মত।

তারপর—

অনেকক্ষণই চুপ করে থেকে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তখন দাদার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। বিয়ের পর টাকা নিয়ে সম্পত্তির দাবী ছেড়ে দিয়েছি। আমার শ্বশুর আমাকে একরকম ত্যাগ করেছেন। স্বামী প্রতিবাদ করতে পারেননি। আমি কাশী এসে পিসেমশায়ের মেয়ের মত সংসার পেতে ছেলেকে মানুষ করছি। একদিন খবর শুনলাম, দেবু, দেবেশ্বর তোর ঠাকুরদাদা, বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছে।

সে এই ভায়লার জন্যে। ভায়লেট পিড্রুজের জন্যে।

আমি সে-সময় একবার শ্যামনগর এসেছিলাম। দেবুকে দেখবার জন্যে। দাদাকে বলেও এসেছিলাম—এ দেবুর পাপ নয়। এ তোমার পাপের ফল।

* * *

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দাদা রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল। অন্য কেউ হলে তার ঘাড়ে মাথা থাকত না। ধার্মিক দাদা আমার খুন করাতেন অন্য লোককে দিয়ে, তারপর যে খুন হল, তার ছেলেদের জমি-জেরাত-টাকা দিতেন। আবার খুন করে যে ফাঁসি যেতো, তার মামলায় টাকা খরচ করতেন। তার ছেলে-মেয়েদেরও টাকাকড়ি দিতেন। ঠাকুরদাস পাল এমনি একটা কথা বেফাঁস বলেছিল বলে হিলডার বাবা পিড্রুস তাকে খুন করেছিল। সেসব এই ভায়লা মেয়েটাকে নিয়ে।

একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ হেসে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তবু এমন মানুষ, এমন শক্ত ধার্মিক মানুষ আর হয় না। আমি বললাম—এ তোমার পাপের ফল। দাদা চমকে উঠে বললে—কি বললি অন্নপূর্ণা? এতবড় কথা তুই বললি?

তখন ঠাকুরদাসের পালা শেষ হয়ে গিয়েছে সদ্য সদ্য।

আমি বলেছিলাম—তুমি বীরেশ্বর রায়ের ছেলে, আমি মেয়ে। আমি ঠাকুরদাস পাল নই। তোমার বাড়িতে আমি জল পর্যন্ত খাব না।

গুম হয়ে গেলেন প্রবলপ্রতাপ মহিমান্বিত রায়বাহাদুর। একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—হ্যাঁ, আমি তুই ভাই আর বোন। এ-বাড়ীতে তোর যে অধিকার,

আমার সেই অধিকার। এ-বাড়ীর মান-মর্যাদা তুই আদালতে দাঁড়ালে—

বলেছিলাম—থাক। সে-কথা তুলো না। সেখানে পাপ তুমিও করনি, আমিও এমন কিছু ধর্মের ধ্বজা তুলিনি।

—বেশ, তাহলে বলে যা, এতে তুই আমার পাপটা কোথায় দেখলি ? ঠাকুরদাস কি বলে আমাকে শাসিয়েছিল তুই জানিস ?

অন্নপূর্ণা বলেছিলেন—ঠাকুরদাস মরেছে ছোট মুখে বড় কথা বলে। সে তুমি যা করেছ তাই করেছে। ও যদি পাপ হয়, তবে ও-পাপ না করে তোমার উপায় ছিল না। আমি কাছে থাকলে তোমার কানে কানে বলতাম—দাও, মুখটা একেবারে বন্ধ করে দাও। আমি বলছি, ভারলাকে দেবেশ্বর ভালবেসেছে, একটা কাণ্ড করেছে বলে তুমি লাফাচ্ছ, বলছ—ছেলের মুখদর্শন করব না। তুমি ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা করে দিয়ে কীর্তিহাট এসে বসে আছ। ঠিক কথা। খুব পুণ্যিবানের কথা। কিন্তু কই বলতো অঞ্জনাদিদিকে তো মা-বাবা এখানে ঘড়বাড়ী দিয়ে ওর স্বামীকে শুদ্ধ চাকরি দিয়ে সংসারী করে দিতে চেয়েছিলেন। তুমি সেসব করলে, বাড়ী দিলে, জমি দিলে, ওর বাউণ্ডুলে স্বামীটাকে চাকরি দিলে, কিন্তু অঞ্জনাদিদিকে সে-বাড়ীতে স্বামী নিয়ে সংসার পাততে দিলে না কেন ? তার কোলে দেবুকে দিয়ে তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে—। থাক, তুমি বড়-দাদা, বয়সে অনেক বড়। বাপেরই বয়সী—বাইশ বছরের বড়। সেসব কথা আমার বলা উচিত নয়। বলব না। অঞ্জনা যে চলে গেল, সে তোমার পাপে গেল। আবার সেই পাপের ফল তুমি টাকা-পয়সা খরচ করে গোয়ায় লোক পাঠিয়ে এখানে নিয়ে এলে। চোখের সামনে পুষে রাখলে। এ-পাপ তোমার কর্মফল কিনা ?—বল না, তুমিই বল।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

# কীর্তিহাটের কড়চা

অন্নপূর্ণা-মা সেদিন অর্চনার বিয়ে পাকা করবার সময় সুরেশ্বরকে শর্ত করিয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—শোন, কালকে যা কথা হয়েছে, তাই ঠিক রইল, কন্যাভরণ আমি নেব না। শুধু শাঁখাশাড়ী দিবি। পাত্রকে পাত্রাভরণ দিতে হবে ও যা চাইবে। ছোঁড়ার মোটরগাড়ীতে ঝোঁক, ডাক্তার হয়েছে। একটা মোটরগাড়ী দিস্। আর ঘড়িকড়ি যা দিতে হয় আসর সাজিয়ে দিবি। যোগেশ্বরই একমাত্র টাকা রেখেছিল, জমিয়েছিল, সুদে বাড়িয়েছিল; তার অর্ধেক সে উড়িয়ে দিয়ে গেছে। ধনীদের টাকা রাজা জমিদারের টাকা যাতে যায় তাতেই উড়িয়েছে। তবু ভাল সে অন্ধেক রেখে গেছে। নগেন বলছিল—নাতবউ তোর মায়ের বুদ্ধিতে তা বিষয়-সম্পত্তিতে লগ্নী ক'রে বেড়েছে অনেক। তোর বোন নেই। তুই দিবি। তার সঙ্গে আর একটি শর্ত চাপাব।

সুরেশ্বর বলেছিল—বলুন।

—ওই বাড়ী, যা দাদা দানপত্র করে দিয়ে গিয়েছে অঞ্জনাদি'র মেয়ে ভায়লাকে, যাকে দেবেশ্বর কৃশ্চান হয়ে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপেছিল, তার বাড়ী যদি কেড়ে নেয় রায়বংশের কেউ তাতে চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই সুরেশ্বর।

সুরেশ্বর বলেছিল—ব্যাপারটা যতদূর বুঝছি, তাতে হ্যারিস বলে একটা লোক, সে হল কুইনীর মায়ের সৎমামা—

—তুই বলছিস ভায়লার বেটা পিড্রুজ যে ফিরিঙ্গী মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল, সেই মেয়েটার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর সন্তান?

—হ্যাঁ। সে কিছুদিন আগে কীর্তিহাটে গিয়েছিল। তার দাবী তার মা, মানে কুইনীর মায়ের-মা মরবার সময় কুইনীর মাকে বলেছিল, হ্যারিসকে থাকবার জন্তে একখানা ঘর দিস। লোকটা জঙ্গলে বাস করত, বড়লোকদের শিকারের শখ হলে তাদের বনে নিয়ে গিয়ে শিকারের ব্যবস্থা করে দিত। তার-পর একটা খুনখারাপী করে লোকটার জেল হয় বারো বছর। জেল থেকে ফিরে লোকটা কলকাতায় এসে দেখে কুইনীর মা মরে গেছে, কুইনীকে হিলডা নিয়ে এসেছে কীর্তিহাটে। সে কীর্তিহাটে এসেছিল কুইনীকে নিয়ে কলকাতার বাড়ীতে বাস করবে, কুইনীকে মানুষ করে তুলবে লেখাপড়া শেখাবে। কিন্তু হিলডা লোকটাকে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—ওর মতলবটাই অত্যন্ত বদ মতলব। মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে—।

হ্যারিসকে নিয়ে যা ঘটেছিল তা সে সবই বললে অন্নপূর্ণা-মাকে। এবং দুই আর দুই চারের মত হ্যারিস ও প্রণবেশ্বরের যোগাযোগ ফলটাই অনুমান ক'রে বললে।—হ্যারিসই খুঁজে বের করেছে প্রণবেশ্বরদা'কে। হয়তো বা কীর্তিহাট থেকেই সে ঠিকানা-ফিকানা যোগাড় করে এনেছিল। এসে এই কাণ্ড বাধিয়েছে। তা আপনি বলছেন—আমি বাড়ীটা যদি দরকার হয় তবে না-হয় দাম দিয়েই আবার কুইনীর নামে দলিল করিয়ে দেব। নিশ্চয় করব আমি।

সুধীন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনেই গেল। একটি কথাও বললে না। সে চারিদিক ঘুরে আমার আঁকা ছবিগুলো দেখছিল।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—বিয়ে তা হলে ফাল্গুনেই হবে। তুই আয়োজন কর। কিরে রথীন? বল আর একবার বল!

—আবারও বলতে হবে?

—হবে।

—তা হলে বলছি, আগে একবার তিন সত্যি করেছি আবারও করছি। করব, করব, করব।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—ভাল, তুই একবার ওই মেয়েটিকে ডাক।

—কাকে? কুইনীকে?

—হ্যাঁ।

—এখানে ডাকব?

—বারান্দাতে দাঁড়াতে বল।

কুইনী এসে বারান্দাতে দাঁড়াল, অন্নপূর্ণা-মা তাকে বললেন—তোমার বাপ তো মুখুজ্জে বামুন ছিল?

কুইনী হাসলে, বললে—হ্যাঁ মুখার্জি ছিলেন কিন্তু আমরা কৃশ্চান। আমার বাবার বাবা তাঁর বাবা প্রপিতামহ কৃশ্চান হয়েছিলেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তা হলেও তুমি ভায়লেটের বংশ। আমি এই বাবুকে বলে গেলাম, কোন ভয় নেই তোমার, ও বাড়ী তোমরা নিশ্চয় ফিরে পাবে। ভায়লেটকে আমি চিনতাম।

কুইনী চুপ ক'রে রইল।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—আমি কে জান?

কুইনী বললে—জানি, হিলডাদিদিরা বললে—আপনি কীর্তিহাটের সব থেকে বড় জমিদার রায়বাহাদুরের বোন।

—হ্যাঁ। তোমার মায়ের বাবার মা ভায়লা—ভায়লেটকে আমি তোমার মত দেখেছি। বুঝেছ? তাকে খুব ভালবাসতাম আমি।

কুইনী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা বিনীত আভিজাত্য আছে সুলতা। সে আঘাত সহ্য করে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু হারে না। কারণ যুদ্ধ তো হয় না তার সঙ্গে। সে নিরস্ত্র। তবে হ্যাঁ, অনেক কুম্ভকর্ণ আছে যারা সশস্ত্রনিরস্ত্র বাছে না, চর্বণ করে হাড়গোড় পর্যন্ত শেষ করে দেয়।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—আমি সুরেশ্বরকে বলে দিলাম। তুমি পড়াশোনা কর। রায়বাড়ীর বড় তরফ তোমার পড়ার সমস্ত খরচ যোগাবে। ভায়লেটের ছেলে মিশনারী ইস্কুলে পড়ত? তার খরচ বড় রায় তরফ। দিয়েছে। পিড্রুজ মারা গেলে তোমার মায়ের পড়ার খরচ তাও দিয়েছে। কনভেণ্টে পড়ত বোধ হয়।

কুইনী সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালে এবার। সম্ভবতঃ এত কথা তিনি জানলেন কি ক'রে সেই প্রশ্নটাই তাকে বিস্মিত ক'রে তুলেছিল।

অন্নপূর্ণা-মা রথীনকে সঙ্গে নিয়েই চলে গেলেন।

বিকেলবেলা খবর পেলাম বিশে ফাল্গুন বিয়ের দিন স্থির করছেন অন্নপূর্ণা-মা।

বিশে ফাল্গুনই বিয়ে হয়ে গেল সুলতা। শর্ত আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম সুলতা। শুধু অর্চনার বিবাহের বরপণ বা খরচ সম্পর্কেই নয়, অন্নপূর্ণা-মা কুইনী সম্পর্কে যে শর্ত আমার উপর চাপিয়েছিলেন তাও আমি পালন করেছিলাম।

তার মধ্যে কিছু কথা আছে, কিছু ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, সে কথা না বললে রায়বাড়ীর জবানবন্দী অসম্পূর্ণ থাকবে। এবং অর্চনাকে নিয়ে যা প্রশ্ন করলে তাও ঠিক পরিষ্কার হবে না।

*　　　　*　　　　*

বিয়ে ঠিক হয়েছে বিশে ফাল্গুন। আমি জানবাজারের বাড়ীতে। জগদীশ্বরকাকার গোটা সংসারকে এখানে নিয়ে এসেছি। হিলডা কুইনী ফিরে গেছে কীর্তিহাটে। আমি মেদিনীপুরের মিশনারীদের ইস্কুলে এবং হোস্টেলে কুইনীকে দেবার জন্যে চিঠি লিখেছি। আর বাড়ীখানার জন্য প্রণবেশ্বরদাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। অনুমান আমার সত্য, হ্যারিস এসে প্রণবেশ্বরদাদাকে দিয়ে বন্ধ ঘরখানা খুলিয়ে ঢুকে বসেছে। প্রণবেশ্বরদা হাজার হলেও রায়বাড়ীর ছেলে। বিষয় ব্যাপার বোঝে, হ্যারিসের কথায় কাগজপত্র খুঁজেপেতে পেয়েছে কর্পোরেশনের ট্যাক্সের রসিদ। অবশ্য বেশ ক'বছর আগের রসিদ। তখন তাদের অবস্থা ভালই ছিল। বোধ করি বিশ বছর আগের। তারপর খুঁজে খুঁজে পেয়েছে যে বাড়ীর দানপত্র হওয়া যে-কালে হয়েছে সেই কাল থেকেই কর্পোরেশনের ট্যাক্স বরাবরই দিয়ে আসছে রায়বাড়ীর বড়তরফ।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর এ দায়টা চাপিয়ে রেখে গিয়েছিলেন বড় ছেলে দেবেশ্বরের ঘাড়ে। তাই বরাবর দেওয়া হয়ে আসছে। বিশ বছর আগে যখন বড়তরফের বড়তরফ প্রণবেশ্বর-দাদারা কর্পোরেশনের সব ট্যাক্সই বাকী ফেলতে শুরু করলেন তখন থেকে আমাদের বা আমার তরফ থেকেই জয়েণ্ট প্রপার্টির ট্যাক্স দিয়ে আসা হচ্ছিল। এ বিশ বছরের ট্যাক্স আমরাই দিয়ে এসেছি। হ্যারিসের কাছে হদিসটা পেয়ে প্রণবেশ্বরদা নিজে থেকে গিয়ে ব্যবস্থা ক'রে কর্পোরেশন ট্যাক্স দিয়ে এসেছে এবং একলা তার বাপের অর্থাৎ জ্যাঠামশাই যজ্ঞেশ্বর রায়ের নামে রসিদ কাটিয়ে এনেছে। তার ফল এই। এলিয়ট রোডের বাড়ীখানি লাভ। লাভ না-হোক ক্লেম বটে। ষোল আনা না-হোক আট আনা বটে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরও একটা জিনিসে তার ভরসা ছিল, সেটা আমার মূর্খতা। সেটেলমেণ্টে নগদ হাজার কয়েক টাকা দিয়ে গোয়ানপাড়া চাকরান থেকে পুরো নাখরাজ করে দিয়েছি; কীর্তিহাটে গোচরভূমি আর বসতবাড়ী কুড়ারাম ভটচাজের পাঁচালী দেখিয়ে বিনা খাজনায় ভোগ করতে দিয়েছি, এবং টাকা এখনও আমার লাখ কয়েক ছিল সুতরাং হিলডা এবং কুইনী কেঁদে পড়লে হয়তো আরও কিছু খরচ করতে আমি রাজী না হয়ে পারব না।

প্রণবেশ্বরের হিসাবে ভুল ছিল না। কিন্তু ওদের অদৃষ্ট খারাপ, তার প্যাঁচেই সত্যি অঙ্কও ভুল হয়ে যায়। পাওনার অঙ্কের বাঁদিকে কখন যে একটা ফুটকি বসিয়ে দিয়ে পূর্ণকে ভগ্নাংশ করে দেয় তা গণৎকার বলতে পারে, আমি পারি না। অন্ততঃ তখন তেমনি কপালের পালাই চলছিল।

প্রণবেশ্বরদাদাকে ধরতে চেষ্টা করেও পারছিনে। জগদীশ্বরকাকাকে আনতে চেষ্টা করছি, তাও পারছি না। জগদীশ্বরকাকা স্ত্রীর সঙ্গে অর্চনা এবং অন্য ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছেন, নিজে আসেননি।

কারণ তখন ইলেকশন ক্যাম্পেন চলছে পুরোদমে, এবং ইলেকশন ঠিক সামনে।

মেদিনীপুর। বাংলার পীঠস্থান মেদিনীপুর। সকলেই জানে মেদিনীপুর থেকে কংগ্রেস ক্যাণ্ডিডেট এবং একটি মিস্ট ক্যাণ্ডিডেট ছাড়া কেউ আসবে না। কংগ্রেসের ভিতরে তখন দুটো ভাগ তা তুমি আমার থেকে ভাল জান সুলতা। কিন্তু প্রণবেশ্বরদাদা সেখানে গেছেন, জগদীশ্বরকাকা সেখানে থেকে গেছেন এই ভোটপর্ব থেকে কিছু উপার্জনের প্রত্যাশায়।

আমি সকালবেলায় উঠে বারান্দায় রেলিংয়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি খবরের কাগজের জন্যে। কোথায় কোন বক্তৃতা হল, কে কি বললে, তা জানবার জন্যে মন উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

বিয়ের উদ্যোগের আয়োজন চলছে। খুড়ীমা ম্লান মুখে এসে যখন বলেন—হ্যাঁ বাবা, এটার কি করবে? তখন আর লজ্জার আমার বাকী থাকে না।

আমি বলি—যা বলবেন তাই হবে।

কিন্তু তিনি মাটির দিকে মুখ নামিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন—তাতে যে অনেক খরচ হবে বাবা!

—আমি আপনাদেরই ছেলে! বললে এমন আশ্চর্য হাসেন, যাতে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যেতে হয়।

সেদিন সেই সকালেই মনোহরপুরের খুড়ীমা বলতে এসেছিলেন—প্রণামীর কাপড়ের কথা। দুদিন আগে ওবাড়ী থেকে অন্নপূর্ণা-মা ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে এর জন্যে। সকলকে ঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে খিল বন্ধ করে অন্নপূর্ণা-মা আমাকে বলেছিলেন—শোন সুরো, আজ আমি যা বলছি তা রায়বাড়ীর মেয়ে হয়ে বলছি রে! ভবানীপুরের মুখুজ্জেবাড়ীর বউ না আজ আমি। এরা বড় ছোট রে! সেইজন্যে আমার পেটের ছেলে থেকে—আমার রক্ত দিয়ে এদের তৈরী করে ভেবেছিলাম, যে এরা পাল্টাবে। তা পাল্টায় না রে। দেখ—ক'দিন থেকেই নগেন সুরেন বীরেন এদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে, বউরাও গিয়ে যোগ দিচ্ছে। সে সব কথা কানে আসছে আমার। ছোটলোকের মত কথা রে। কাল নাকি কথা হয়েছে, শুধু কথা কেন, ফর্দও হয়ে গেছে একটা। প্রণামীর কাপড়ের ফর্দ! বুঝলি! চাকরবাকর ঝি ঠাকুর সহিস কোচম্যান এ তো সব আছেই, এগুলো বকশিশ। কিন্তু প্রণামীর দাবী নাকি রথীনের মা বলেছে—আমাদের মানে আমার, মেজবউয়ের, ছোট বউয়ের বাপ-মাদের না দিলে মাথা হেঁট হবে। ওটা তোমরা নিজেরা কিনেই দাও।

সুরেশ্বর, কথাটা আমার বড় গায়ে লেগেছে রে। দেখ, ছেলেদের বলতে পারিনি কিন্তু তোকে বলতে আমার লজ্জা নেই। কেন জানিস? ওরা হল পরগোত্র, ওদের গোত্রে আমি এসে পড়েছিলাম, লাঞ্ছনার অন্ত হয়নি। আমার বাপের টাকায় আর পিসেমশায়ের টাকায় এই বংশ আমি আমার বংশ মনে করেছিলাম। কিন্তু তারাই আজ আমার বাপের বংশের

খেউড় করছে, তা আমার বুকের শেলের মত বিঁধছে। শোন, ফর্দ আমি কাল করে পাঠিয়ে দেব। কাকে কি কাপড় দিতে হবে—গরদ, শান্তিপুরে, কাঁচি, মিলের পেটাই, খদ্দর সব লিখে দেব। বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস তুই দিবি। সর্বোৎকৃষ্ট। শোন, টাকা আমি দেব, কিন্তু কাকপক্ষীতে জানবে না। তুই আর আমি।

আমি শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটু হয়তো উঁচু গলাতেই বলেছিলাম—না বড়মা, খরচ যা লাগে—।

তিনি মুখটা আমার চেপে ধরেছিলেন। জানিসনে সুরো, দেওয়ালের কান আছে। যা বাড়ী যা।

বাড়ী ফিরে সেই মত ফর্দই আমি করিয়েছিলাম। কথাটা কেমন করে যে জগদীশকাকার স্ত্রীর কানে উঠেছিল তা বলতে পারব না, তিনি সকালবেলাতেই অর্চনাকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—একটা কথা বলতে এলাম বাবা।

—কি বলুন খুড়ীমা।

—ওঁরা নাকি যা প্রণামীর কাপড়ের ফর্দ দিয়েছেন তার দাম নাকি আড়াই হাজারের কম হবে না?

সুরেশ্বর বললে—তখনও ১৩৩৭ সাল সুলতা। চালের দর চার টাকার মত, কাপড় কাঁচি ধুতির জোড়া বোধ হয় বারো-চৌদ্দ টাকার বেশী নয়। মানে একখানা ছ'-সাত টাকা। তাতে আড়াই হাজারে কত কাপড় তা বুঝতে পারছ। অবশ্য গরদ কম ছিল না। সব মুর্শিদাবাদী গরদের শাড়ী। তিনি লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হয়েছেন তাতেই।

সুলতা, আমি হেসে বলতে যাচ্ছিলাম—খুড়ীমা, আমার সহোদরা থাকলে তো তার বিয়ের খরচ করতে হত, ভাবুন তাই করছি। জানেন তো, টাকা আমার অনেক জমিয়ে দিয়ে গেছেন আমার মা। এই কালই দেখছিলাম—। কথাটা আর শেষ হল না সুলতা, বড়মা অন্নপূর্ণা দেবীর গাড়ী এসে এ বাড়ী ঢুকল।

আমি ছুটেই নেমে গেলাম। এত সকালে অন্নপূর্ণা-মা কেন এলেন আবার! কি হল? একজন পঁচাত্তর বছর বয়স্কা মহিলা দেহে না-হয় শক্ত আছেন, মনে তো আছেনই, তবুও বয়সের বছরের পরিমাণ তো কম নয়। অনেকের ওটা বেড়েই যায় কিন্তু কমে না বোধহয় কারুরই। গাড়ীটা থামতেই আমি দরজার নিচের অংশটা খুলে দিয়ে পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম—বড়মা।

দেখলাম, বড়মার সামনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছেন দয়াল-ঠাকুরদা।

বড়মা বললেন—তোর কাছেই এসেছি, কাজ আছে।

অন্নপূর্ণা-মা স্থূলকায় ছিলেন না, আবার গুটিয়ে খাটো হয়েও যান-নি, মুখখানা তাঁর বার্ধক্যের রেখার জালে জালে দুর্বোধ্য নয়, দেখলাম রাঙা মুখখানা থমথম করছে। কণ্ঠস্বর ভারী, তার মধ্যে এতটুকু স্নেহ-আবাসের আভাস নেই।

আমি তাড়াতাড়ি দরজার নিচের কাটা দরজাটা খুলে দিলাম। বড়মা হাতখানা বাড়িয়ে

বললেন—ধর আমাকে।

আমার হাত ধরে নেমে বললেন—চল, উপরে তোর মায়ের ঘরে চল। পিছন পিছন দয়াল-ঠাকুরদা নামলেন, অন্নপূর্ণা-মা বললেন—এস দয়াল, তুমি সঙ্গেই এস।

উপরের ঘরে গিয়ে মেঝের উপর কার্পেট আমিই পেতে দিলাম। বড়মা বললেন—দরজা বন্ধ করে দে। জানালাও। যা বলব তা যেন কেউ শুনতে না পায়। বাইরে বলে দে যেন কেউ না আসে। জগদীশ্বরের বউ, অর্চনা এরাও কেউ না।

বলব কি সুলতা, বুকখানা আমার কেঁপে উঠল। ভয় হল এই অলঙ্ঘনীয়া মহিলাটিকে। আবার কি বলবেন?

দয়াল-ঠাকুরদা কেবল বললেন—কেন পিসীমা, এসব বাজে—

—তুই থাম দয়াল! অন্নপূর্ণা-ঠাকুমা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুই মদ খাস সুরেশ্বর?

মনে মনে চমকে গেলাম। কিন্তু বাইরে চমকালাম না। বললাম—খাই বড়মা।

—খাস! আচ্ছা আর একটা কথা বল তো—সেখানে তুই কুইনীকে নিয়ে—। চুপ ক'রে গিয়ে বললেন—তার জন্যেই কি তুই কুইনীর দিদি ছিলতাকে গোয়ানপাড়ার একরকম মালিক করে দিয়েছিস! নাথরাজ করে দিয়েছিস গোয়ানপাড়া?

—না। এর একটাও সত্য নয়। সত্য কেবল ওরা যখন নাথরাজ দাবী করলে—

—সে আমি দয়ালের কাছে শুনেছি। যদুরাম রায়ের নাথরাজের ছাড়পত্র দেখিয়েছিল দয়াল সেই দিন। তুই তাই দেখে গোয়ানপাড়া নাথরাজ ক'রে দিয়েছিলি।

—হ্যাঁ বড়মা। কথাটা ঠিক তাই বটে।

—টাকাও তার জন্যে অনেকগুলো খরচ করেছিস। তারপর তিক্ত হেসে বললেন—ছোট মেজবউমা, মানে শিবেশ্বরের তৃতীয় পক্ষের বউকে ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখিয়ে কলঙ্কভাগিনী করেছিস!

—তোমাকে কে বললে বড়মা?

দয়াল-ঠাকুরদা কাতর কণ্ঠে বললেন—ওঁকে কীর্তিহাট থেকে চিঠি লিখেছে ভাই। সে একখানা মস্ত বেনামী চিঠি।

বড়মা তাঁর গঙ্গাস্নানের ঝোলা থেকে একখানা চিঠি বের ক'রে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন—পড়ে দেখ। চিঠিখানা পেয়েছি পরশু, পেয়েই আমি লোক পাঠিয়ে দয়ালকে আনলাম। দয়াল কখনও মিথ্যে বলবে না আমার কাছে। রায়বাড়ীর সবটাই ফাট ধরেছে, বংশে পচ ধরেছে তা আমি জানি। বেশী পুরনো হলেই তা হয়। রামের অযোধ্যা নেই, বংশ থাকলে তাদের কি দশা হত ভগবান জানেন। পুরাণে আছে যদুবংশ শেষ হয়েছিল মদ খেয়ে নিজেরা মারামারি ক'রে। বাদশাদের বংশ শুনেছি টাঙা চালায়। তাদের মধ্যেও কত পাপ কত পচন কে জানে? আশ্চর্য কিছু নয়। তোর বাপই তো তার চরম ক'রে গেছে। তোকে দেখে ভরসা হয়েছিল। তারপর ওই মেয়েটার ছবি দেখে মনে হয়েছিল সত্যি সত্যিই আমার মা বুঝি ফিরে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যি ফিরেছে রায়বংশে। এ চিঠিতে সব অবস্থ

কথা আছে সুরেশ্বর। জঘন্য কথা। তাই দয়ালকে আনতে পাঠিয়েছিলাম। তার কাছে জানব শুনব। তা সব শুনলাম জানলাম। তুই পড়ে দেখিস। দেখিস্ নয় দেখ। আর বল তো—চিঠিখানার হাতের লেখা তুই চিনিস কিনা? চিঠিখানা যে রায়বাড়ীর কোন কুলাঙ্গারের লেখা তাতে সন্দেহ নেই। অর্চনার বিয়েটা ভেঙে দিতে চায়। আর রাগ আছে তোর ওপর, খুব রাগ, সেটাও এই সব কলঙ্ক রটনা করে মেটাতে চায়। তুই যে নিজে থেকে এত টাকা খরচ করে অর্চনার বিয়ে দিতে চাস তার উপরেও একটা কুৎসিত মতলব চাপিয়েছে।

সুলতা, চিঠিখানা হাতে করে আমি প্রায় পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন একটা কাঁপুনি বেয়ে চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর আক্রোশ, ক্রোধ, প্রতিহিংসাস্পৃহা যা বল তাই। চিঠিখানা খুলতে আমার সাহস হচ্ছিল না। হোক মিথ্যা, হোক অসত্য, কিন্তু কুৎসিত ভয়ঙ্কর কদর্য কিছু কে দেখতে চায় বল!

দয়াল-ঠাকুরদা বললেন—না—না পিসীমা, কেন ওই মিথ্যেকথাভরা মতলববাজি চিঠিখানা পড়তে ওকে বলছ তুমি? না—না। চিঠিখানা তুমি নিয়ে নাও। বুঝলে? পুড়িয়ে দাও। ছাই ক'রে দাও। পিসীমা।

অন্নপূর্ণা-মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সেই ভাল। দে, চিঠিখানা আমাকে ফিরে দে। শুধু লেখাটা দেখে বল—দেখি এ লেখা তুই চিনিস কিনা?

আমি বললাম—না বড়মা, চিঠিখানা আমি পড়ব। পড়তে চাই।

* * *

সেটেলমেন্টের নোটিশ পেয়ে কীর্তিহাটে এসে আমি মহিষের মত পঙ্কপল্বলে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে শুধু নাকের ফুটো দুটি চাগিয়ে প্রমত্ত হয়ে পড়ে আছি, পত্রের বক্তব্য তাই হলেও আসল লক্ষ্য অর্চনার বিয়ে।

"আপনাদের মত বংশ—যাঁহারা বাংলাদেশে এবং কলকাতায় দেশপ্রেমিক, গান্ধীবাদী, মরালিস্ট হিসাবে বিখ্যাত, তাঁহারা যদি এই কন্যার মত কন্যাকে গৃহে বধূ করিয়া লইয়া যান তবে সম্ভবতঃ দশ মাস যাইতে না যাইতেই সন্তান কোলে করিয়া বসিবেন জানিবেন।

এই যে বড়তরফের সুরেশ্বর, যে প্রকৃতপক্ষে রায়বাড়ীর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক, এই সুরেশ্বর কি স্বার্থে দশ বারো পনেরো হাজার টাকা খরচ করিয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছে? এতই উদার সে? এতই মহৎ?

এই ধনীপুত্রটির পিতৃপরিচয় বঙ্গদেশে বিখ্যাত, সুবিদিত। তাঁহার পুত্র এখানে আসিয়া অর্থের উত্তাপে সর্বগ্রাসী অগ্নির মত জ্বলিতেছে এবং যাহা পাইতেছে তাহাই গ্রাস করিতেছে। তাহার সম্পর্ক বিচার নাই। সে সর্বভুকের মত মেজতরফের যুবতী ছোটগিন্নীকে ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখাইয়া কেলেঙ্কারি ছড়াইয়াছে। তাহাকে মাসে মাসে সে নিয়মিত টাকা দিত। এই জেলের সময়েও বহু টাকা সে তাহার জন্য খরচ করিয়াছে। এবং তাহার দ্বারাই সে রায়বংশের কুমারী কন্যাগুলিকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছে। অর্চনার উপরেই তাহার বেশী টান ছিল।

তাহার উপর এখানে আসিলেই বুঝিতে পারিবেন, জানিতে পারিবেন, গোয়ানপাড়ার গোয়ানদের লইয়াও সেই কাণ্ড করিয়া চলিয়াছে সে। দিবারাত্রি মদ্যপান করে এবং ছবি আঁকার ছল করিয়া এখানে সেখানে বসিয়া থাকে। গোয়ানপাড়ার হিলডা বুড়ীর এক সম্পর্কীয় নাতনী আছে, তাহার নাম কুইনী। সেই কুইনীর উপরেও তাহার খুব নজর। খবর লইলে জানিতে পারিবেন, সে তাহাকে মেদিনীপুর মিশনারী ইস্কুলে এবং বোর্ডিংয়ে রাখিয়া শিক্ষিতা মেমসাহেব তৈরী করিয়া লইতেছে।

অর্চনার দায় এখন কাঁধ হইতে না নামাইলে উপায় নাই। বেলেল্লারি হইয়া যাইবে। তাহারই জন্ম তাহাকে আপনাদের পবিত্র বংশের স্কন্ধে চাপাইয়া কুইনীকে লইয়া ভবিষ্যতে স্ফূর্তির তালে আছে।

কুইনীর জন্যও খরচ সে অনেক করিতেছে। খবর লইলেই জানিতে পারিবেন। এলিয়ট রোডের একখানা বাড়ী লইয়া সে প্রায় হাজার সাত-আটেক টাকা তাহার জাঠতুতো ভাই প্রণবেশ্বরকে দিতে রাজী হইয়াছে।

এ সম্পর্কে আরও একটি সংবাদ জানাই, সেদিন ইলেকশনে ভোটের জন্ম কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ···রাজা বাহাদুরের তরফের লোক আসিয়াছিল, তাহাদের তরফের বক্তারা প্রকাশ্যে বলিয়া গেল যে সুরেশ্বরবাবু নিজে আধা কৃশ্চান—ধর্মহীন ব্যক্তি, তাঁহার কথায় তোমরা ভুলিয়ো না। তিনি গোয়ানপাড়ার কুইনী নামক কৃশ্চান মেয়েকে মিশনারী ইস্কুলে রাখিয়া পালিতেছেন।"

* * *

ইলেকশনের সময় আমি যেতে পারিনি কিন্তু আমার তরফের লোকেরা, কর্মচারীরা কংগ্রেসের হয়েই কাজ করছিল। কীর্তিহাটের লোকেদের বলবার কিছু প্রয়োজন ছিল না। সে গোটা দেশেরই প্রায় এক অবস্থা। তবু আমি বলেছিলাম। খান দুই চিঠিও লিখেছিলাম। একটা ছোট নিবেদনপত্র ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে ছিল "বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে যারা অন্ধকারে আলো জেলে পথ চলছে, তাদের পিছনে চল। অন্য পথ নেই।"

কালো ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা শক্ত হাতে ধরা একটা মশালের আলো; তার তলায় ওই দুটো লাইন লিখে এখান থেকে ছাপিয়ে আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তার উত্তরে নাকি এই কথা রাজারা বলেছেন।

তা বলুন। জানি কংগ্রেস—মানে মানুষেরা জিতবে। মানুষ মানে জীবন্ত মানুষ, নতুন মানুষ, পুরনো নয়, পচা নয়। জানি আমি নিজে পচা-বাড়ীর ছেলে। আমি—যোগেশ্বর রায়, সেকালের ইংলিশম্যান স্টেটস্‌ম্যান—ইংরেজ সরকারের মুখপত্রের লেখকের ছেলে আমি। আমি 'বিদায় সত্যাগ্রহ' লিখে বাপের ধারা বজায় রেখেছি। এবং ইংরেজ আছে বলে আজও আছি। আমাকেও যেতে হবে বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজিমের সঙ্গে। বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজিম যাবে। ইউরোপে সে জার্মানীর হিটলারের দুই হাতে দুই গালে চড় খেয়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি কথায় বন্দীশালায় ক্ষেপে-যাওয়া জন্তুকে মান যাও, মান খাও বলে মানাতে চাচ্ছে। কিন্তু যেতে তাকে হবেই। তার সঙ্গেই আমি যাব। তবু আমি ওই ছোট পোস্টার এঁকে ছেপে পাঠিয়ে

দিয়েছিলাম। আমার ভবিষ্যৎ আমিই এঁকেছিলাম।

কিন্তু তাতে নাম আমার ছিল না। তবে পুলিস ঠিক বের করেছিল।

আর জানত শুধু প্রণবেশ্বরদা। যেদিন জানবাজারের বাড়ীতে বসে এই ছবিটা আঁকি, সেইদিনই প্রণবেশ্বরদা এসেছিল এই এলিয়ট রোডের বাড়ী সম্পর্কে কথা বলতে। পাশে বসেছিল। আমাকে বলে গিয়েছিল—কুইনীকে ওব্‌লাইজ করতে চাও তো টাকা কিছু ছাড়। পেটে ক্ষিধে মুখে লজ্জা করা কাজের কথা নয়।

আমি চিঠিখানা থেকে চোখ তুলে তাকালাম। যেন চোখের উপর ভাসছিল প্রণবেশ্বর-দাদার ছবি। দেখছিলাম তাকে।

বললাম—বড়মা, এ-চিঠি লিখেছে প্রণবেশ্বরদা।

—হ্যাঁ।

দয়াল-ঠাকুরদা বললেন—না ভাই, এ-হাতের লেখা আমি চিনি। এ-হাতের লেখা সুখেশ্বরের ছেলে কল্যাণেশ্বরের।

—তা হোক ঠাকুরদা, আমার এই পোস্টারের কথা অন্য কেউ জানে না—জানে শুধু প্রণবেশ্বরদা। সে দেখেছিল ছবিখানা আঁকতে।

বড়মা চুপ করে বসেছিলেন—ভাবছিলেন। হঠাৎ বললেন—তুই যজ্ঞেশ্বরের ঠিকানা জানিস? কাশীতে কোথায় থাকে সে?

আমি বললাম—কাশীতে তো থাকেন না জ্যাঠামশায়। ঠিকানা কাশীর আছে বটে। তবে থাকেন এখানে।

—এখানে—মানে? কলকাতায়?

—না, কলকাতায় ঠিক নয়, থাকেন বরানগরে।

—বরানগরে?

—হ্যাঁ। সেদিন প্রণবেশ্বরদাদা বলে গেলেন। অনেকগুলো বডিওয়ারেণ্ট ঝুলছে, তাই কাশীর ঠিকানাটা রেখে এখানে বরানগরে আছেন। তবে মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে।

—আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারিস?

—ঠিকানা আমাকে বলে গেছেন প্রণবেশ্বরদা। কারণ, টাকা জেঠামশাই নিজে হাতে নেন। এলিয়ট রোডের বাড়ীর ওই মিউনিসিপ্যাল বিলের ভুলের দরুণ যা পাবেন, তা নিজে হাতেই নেবেন। ছেলেদের দেবেন না।

সুরেশ্বর বললে—জ্যাঠামশাই যজ্ঞেশ্বর রায়কে বাল্যকালে দেখেছিলাম। তারপর দীর্ঘকাল বোধহয় বিশ-বাইশ বছর পর দেখলাম অন্নপূর্ণা মায়ের ভাগিদে। বিচিত্র যজ্ঞেশ্বর রায়। মহিমান্বিত রায়বংশের কফিনে পোরা মমি। বরানগরে গঙ্গার ধারে একখানা বড় ফাটলধরা বাড়ীতে থাকতেন তখন। বাড়ীখানা সত্যিই কফিনের মত, আর জ্যেঠামশাই রায়বংশের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মমি। ইনসলভেণ্ট, প্যারালিটিক, দিলদরিয়া লোক, জেদী, উদার, বদমেজাজী, অতিভদ্র, পরস্বাপহারী, দাতা—একসঙ্গে সব। ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা মানুষটা খাট জুড়ে পড়ে ছিলেন।

ভাঙা কাটল ধরা বাড়ী ; সামনের প্রথম এবং প্রধান দরজার দু পাল্লার কব্জায় মরচে ধরেছে, ইস্ক্রুপ খুলে গেছে, বন্ধ আছে ভিতর থেকে—কিন্তু দুটো প্লেট আঁটা আছে দু পাল্লায় ; একটাতে লেখা আছে জ্যেঠাইমার নাম, অন্যটায় লেখা আছে—'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ'।

বাড়ীখানা জ্যেঠাইমার সম্পত্তি। তাঁর বাপের বাড়ীর দিক থেকে পেয়েছিলেন। বন্ধ থাকে জ্যেঠামশায়ের পাওনাদারদের ভয়ে। যেমন তেমন পাওনাদার নয়—দু-দশ বা দুশো পাঁচশো পাওনা নয়, ও হলো দু হাজার পাঁচ হাজার থেকে লাখ দু লাখ পর্যন্ত সুবিস্তৃত এবং পাওনাদারেরাও তেমনি—এ ব্যাঙ্ক ও.ব্যাঙ্ক ; এ কোম্পানী ও কোম্পানী ; যাদের আসল পরিচয় হ'ল খ্যাতিমান মাড়বার রাজস্থানের শেঠেরা ; আজ এই ১৯৫৩ সালে যাঁরা বড় বড় ইংরেজ কোম্পানীর মালিকানি কিনেছেন—তাঁরা। জ্যাঠামশায় তাঁর জীবনে রায়বাড়ীর সমস্ত ইতিহাসটাকেই পুনরাবৃত্তি করেছেন। গড়েছেন ভেঙেছেন, আবার গড়েছেন আবার ভেঙেছেন। শেষ পর্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছেন।

রত্নেশ্বর রায়ের জীবন মাত্র বাহান্ন বছরের জীবন। বাহান্ন বছরে রায়বাড়ীকে নতুন ছাঁচে ঢেলে গড়ে গিয়েছিলেন ; বীরেশ্বর রায়ের আমলে যে সম্পত্তির আয় ছিল কুড়ি হাজার টাকা, তাকে বাড়িয়ে তিনি তুলেছিলেন চল্লিশ হাজার এবং পনের বছর পরে তাকে পঁয়তাল্লিশ হাজারে তুলবার পাকা রাস্তার প্ল্যান তৈরী ক'রে জমি পর্যন্ত প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন।

তুমি রাজনৈতিক কর্মী সুলতা ; তুমি নিশ্চয় জান ভারতেশ্বরী এবং ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে এ আইন প্রচলিত ছিল। পনের বছর অন্তর বৃদ্ধি পাবার হকদার ছিল জমিদারেরা। তার কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। ফসলের দাম বাড়লেই জমিদার তার অংশ বাবদ খাজনা বাড়াতেন। সারাটা জীবনভোর তিনি এ কর্তব্যকর্ম ভোলেননি। এবং কোন সময়েই আপসে করেননি, আদালতে গিয়ে নালিশ করে লড়ে পাওনা আদায় করেছেন অথবা প্রজার সঙ্গে আদালত সাক্ষী রেখে সোলেনামা করেছেন। এ ছাড়া পতিত পুকুর কাটিয়েছেন। নদীর ধারের গ্রামে বন্যা নিবারণের জন্য বাঁধ তৈরী করিয়েছেন। সুতরাং জমির উন্নতি করেছেন বলেও খাজনা বৃদ্ধিতে তাঁর একটা দাবী ছিল। তিনটে এণ্ট্রান্স স্কুল, দুটো চ্যারিটেবিল ডিসপেনসারী করেছিলেন, মেয়েদের প্রাইমারী স্কুল তাও করে গেছেন দুটো। মাইনর ইস্কুল করেছেন আরও কয়েকটা। নিঃসন্দেহে কীর্তিমান পুরুষ। কীর্তিহাট থেকে তমলুক পর্যন্ত কাঁচা পথটা পাকা করেছিলেন ; বহু দরিদ্রকে দান করেছেন ; বহু বুদ্ধিমান ছেলেকে লেখাপড়া শিখতে বৃত্তি দিতেন। এই জানবাজারের বাড়ীতে ওই ওপাশের একতলা ঘরগুলোতে তারা থাকত ; তাদের জন্য রান্নার ব্যবস্থা ছিল, তারা খেয়ে কলেজ যেত।

পত্নীব্রত পুরুষ শ্রীমতী স্বর্ণলতা—যার নাম সরস্বতী বউ—তার মুখের দিক ছাড়া নাকি তিনি অন্য স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকাতেন না।

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—সুলতা, অপবাদ রটনা সম্পর্কে মানুষের একটা দুর্নাম আছে। কিন্তু রায়বাহাদুরের ডায়রী পড়ে আমি বলতে পারি, শুধু অপবাদই নয় ; প্রশংসাবাদ

সম্পর্কেও মানুষ ঠিক তাই।

মানুষের মনই হ'ল ডিফেকটিভ থারমোমিটারের মত। অপবাদ প্রশংসাবাদের উত্তাপ আসলে যাই হোক, ও একশো হলে একশো দুইয়ে গিয়ে পৌছবে। তবে এটা মানতে রাজী আছি যে, অপবাদ আসলে একশো হলে সেটা হয় একশো পাঁচ, আর প্রশংসাবাদ সেখানে আসলে একশো হলে একশো দুই-তিন-এর বেশী ঠেলে না। মানুষ প্রশংসাও করে নিন্দাও করে, তবে নিন্দা একটু বেশী করে।

রায়বাহাদুরের ডায়রীতে অঞ্জনার কথা যা আছে তা তোমাকে পড়ে শুনিয়েছি। এ ছাড়াও কখনও কখনও রায়বাহাদুরের ডায়রীতে গল্পের মত বিচিত্র ঘটনার কথা আছে। অনেকগুলোই মনে আছে—তার দু-একটা বললেই বুঝতে পারবে। হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরায় দুটি সুন্দরী পার্শী মেয়েকে দেখে লিখেছেন—

"অদ্য কীর্তিহাট ফিরিতেছি। গত কয়েকদিন হইতেই রূপ চাক্ষুষ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল। সেদিন দত্তবাড়ীর ছেলের বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া দুইজন অপরূপ সুন্দরী বাঈজীকে দেখিয়া অবধি ভাবিতেছিলাম, ইহাদিগকে কীর্তিহাটে রাজ-রাজেশ্বরের কোন পর্ব উপলক্ষ্যে বায়না করিয়া লইয়া যাইব। তাহা হইলে চক্ষুর তৃষ্ণা মিটাইয়া তাহাদের দেখিবার সুযোগ পাইব। দত্তবাড়ীর বিবাহের নাচ-গানের আসরে রত্নেশ্বর রায় বসিয়া বসিয়া অবশ্যই এই বাঈজীদের রূপ দেখিতে পারেন না। তাহাতে শত্রুজনে অপযশ ঘোষণার প্রশ্রয় পাইবে। এবং মনের মধ্যে যে প্রবৃত্তির বিষবৃক্ষ আছে, তাহার তলদেশে জল-সিঞ্চন করা হইবে। কিন্তু কীর্তিহাটে সম্মুখে রাজরাজেশ্বর জিউ প্রভুকে রাখিয়া তাহাদের দেখিলে রূপের তৃষ্ণা মিটিবে কিন্তু তাহাতে পাপ স্পর্শিতে পারিবে না। এবং কেহ কোন নিন্দার কথাও বলিতে পারিবে না। আমার জীবনের প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু অদ্য হাওড়া স্টেশনে এই পার্শী মহিলা দুটিকে দেখিয়া আমার ভ্রম ভঙ্গ হইল। কি অপরূপ রূপসী এই মেয়ে দুইটি। ইহাদিগকে যুগল তিলোত্তমা বলা চলে। ইহাদের কাছে সেই বাঈজী দুইটি অনেক মলিন। আকাশের চন্দ্রমা এবং পঙ্কপল্লবে তাহার প্রতিবিম্ব এই দুইয়ে যত তফাৎ তত তফাৎ। চক্ষু জুড়াইয়া গেল। হৃদয় ভরিয়া গেল। ঈশ্বরের রূপসৃষ্টির আর শেষ নেই তাহা অনায়াসে এক মুহূর্তে বুঝিতে পারিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিলাম তিনি বুঝাইয়া দিতেছেন যে, রূপ খুঁজিয়ো না, তাহা হইলে আর সারা জীবনে বিশ্রাম পাইবে না, রূপের পর রূপ আসিয়া তোমাকে হাতছানি দিয়া মরীচিকা যেমন করিয়া তৃষ্ণার্ত হরিণ ছুটাইয়া লইয়া চলে মরুভূমির উত্তাপের মধ্যে, তেমনি করিয়া ছুটাইয়া চালবে এবং একদা মৃত্যু মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে সংহার করিবে। সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অপার করুণাও উপলব্ধি করিলাম, তিনি আমার প্রার্থনা যেন স্বকর্ণে শুনিয়া আজ এইভাবে ট্রেনের কামরায় এই রূপসী মেয়ে দুইটিকে দেখাইয়া দিলেন।"

এমন ঘটনা রায়বাহাদুরের জীবনে অজস্র ঘটেছে। তিনি অকপটে ঘটনাগুলি লিখে গেছেন।

কীর্তিহাটের বাড়ীতে যুবতী শ্রীমতী মেয়ে-ঝি রাখা তিনি বন্ধ করে একটা নিয়ম

করেছিলেন।

করেছিলেন অঞ্জনার ঘটনার পর থেকে। রায়বাহাদুরের স্ত্রী সরস্বতী বউ স্বামীগরবিনী এবং আদরিণী ছিলেন, সে গরব সে আদর পরিমাণে এত বেশী যে, তিনি এগুলো গ্রাহ্যই করতেন না। তার কাছে যে ঝি থাকবে সে কুদর্শনা হবে এ তিনি পছন্দ করতে পারতেন না। ঝগড়া করতেন স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তিনি পেরে ওঠেননি। রত্নেশ্বর রায় তাকে তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। সরস্বতী বউ আবার আনতেন রূপসী যুবতী ঝি এবং তাকে স্বামীর চোখের সামনে যেতে দিতেন না। এবং হেসে স্বামীকে বলতেন—কি বাতিক বা? শেষে আমায় না অঁড়াও! ভিতরের তত্ত্বটা তিনি বুঝতেন না।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের বড় নাতি আমার জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায় ঠিক তেমনি মানুষ। পিতামহের মতই পত্নীব্রত ছিলেন। তফাৎ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় কীর্তিতে কীর্তিমান, আর নাতি যজ্ঞেশ্বর রায় ভ্রষ্টকীর্তি। রায়বাহাদুর সম্পত্তিকে বাড়িয়ে গেছেন, বাপের আমলের আরকে চারগুণ করেছেন—আর নাতি যজ্ঞেশ্বর রায় দশের বাঁদিকের একটাকেই মুছে দিয়েছেন। অবশেষে স্ত্রীর পিতৃদত্ত বরানগরের এই পুরনো বাড়ীটায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছেন।

অন্নপূর্ণা দেবী বড় জেদী মানুষ ছিলেন। বেটাছেলে হলে সম্ভবতঃ সম্পত্তির জন্ত মামলা করুন বা না করুন দাদা রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে খুনোখুনির মত একটা কিছু ক'রে বসতেন। মেয়ে বলেই তা করেননি—তার বদলে ত্যাগ ক'রে সব ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন কাশী, পিসেমশাই এবং পালকপিতা বিমলাকান্তের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু ভাইয়ের কাছে আসেননি। রত্নেশ্বর রায়ও আশ্চর্য মানুষ, বীরেশ্বর রায়ের নামে যে সব কলকাতার সম্পত্তি ছিল তাও বোনকে দিতে চান নি। জানবাজারের এই বাড়ীখানা, এখানাও সেই সম্পত্তির মধ্যে খানিকটা শূন্যতা। এগুলো অন্তত অন্নপূর্ণা দেবী ওই শ্যামাকান্তের কলঙ্ক এবং বিমলাদেবীর সন্তান চুরির কেলেঙ্কারিকে সামনে চাল হিসেবে ব্যবহার ক'রে মামলা চালাতে পারতেন, কিন্তু তাও তিনি করেননি।

জমিদারী ব্যবস্থায় ইংরেজ যখন সামন্ততন্ত্রকে পল্টন সিপাহী হাতিয়ার ইত্যাদির হাঙ্গামা থেকে মুক্ত ক'রে হাক্কা-পক্কা এবং পরগণাগুলোকে প্লটে তৌজিতে ভাগ ক'রে ছোট ক'রে দিলে তখন এর প্রভাবে দুটো ফল ফলেছিল; অনেক মধ্যবিত্ত উপরে উঠে জমিদার বনে গিয়ে মামলা-মোকদ্দমায় রক্তারক্তি যুদ্ধের নেশা মিটিয়েছে, জাল-জালিয়াতি করে পাপের শেষ রাখেনি, আবার অনেক ক্ষেত্রে মনকে উঁচুও করেছিল।

রত্নেশ্বর তাঁর জীবনে ছোটতে বড়োতে, দেওয়ানীতে ফৌজদারীতে, মানি স্যুটে, রেন্ট স্যুটে, টাইটেল স্যুটে, সাধারণ ক্রিমিন্যাল কেস এবং সেসনস কেসে মুন্সেফী আদালত এবং ডেপুটি এস-ডি-ও থেকে জজকোর্ট পর্যন্ত আপীল নিয়ে যে মামলামকদ্দমা করেছেন তার সংখ্যা কত হবে জান? আমি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার পর্যন্ত গুনে আর করিনি। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী জীবনে কি বাপের সম্পত্তি কি স্বামীর সম্পত্তির ভাগের জন্ত একটিও মামলা করেন নি।

অন্নপূর্ণাদেবী যদি বীরেশ্বরের পুত্রসন্তান হতেন তবে তিনি যে কি হতেন তা বলতে পারব না। তবে কন্যা হয়েও যে বংশধারাটি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তা সত্যই অসাধারণ। এবং তাঁর নিজের কথা যা বলেছি তোমাকে, তা একবিন্দু বাড়িয়ে বলিনি।

এই অন্নপূর্ণা দেবী এসে দাঁড়ালেন বরানগরে যজ্ঞেশ্বর রায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্র যজ্ঞেশ্বর রায়ের স্ত্রীর পিতৃদত্ত বাড়ীর দরজায়। যজ্ঞেশ্বর রায় তখন সর্বস্বান্ত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ইনসলভেন্সী নিয়েছেন, কিন্তু তবু পাওনাদারের ভয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়। কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। সব ঐশ্বর্যবিলাসই গেছে কিন্তু একজন গুর্খা দারোয়ান তখন পর্যন্ত আছে। সে দরজা আটকালো।

আটকালো বটে, কিন্তু খুব সম্ভ্রমভরেই বললে—বাবুজীর বেমার আছে মাইজী, যানে কো মানা হায়।

অন্নপূর্ণাদেবীর চেহারার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাকে কেউই বোধহয় লঙ্ঘন করতে পারতো না। আমার রূপের প্রশংসা তোমার কাছে করে লাভ নেই। তবে আমাকে দেখে খেলো লোক কেউ ভাববে না নিশ্চয়। দারোয়ান আমার পথ আটকাতে পারতো অন্য ভঙ্গিতে। কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবীর মহিমাকে লঙ্ঘন করা যেতো না।

অন্নপূর্ণাদেবী তাকে ধমকালেন না। তার উপর অসন্তুষ্ট হলেন না। বললেন—তোর তো কথাবার্তার তরিবৎ খুব ভালো রে বাবা!

লোকটা খানিকটা অবাক হয়ে গেল; হয়তো বা অন্নপূর্ণা-মা কি বললেন তা ঠিক ধরতে পারলে না, তবে তার আভাসেই সে ধন্য হয়ে গেল। এমন এক মাঈজী তার কথাবার্তার তারিফ করছেন।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দেখ, আমি তোর বাবুর পিতাজীর ফুফু আছি। বাবুজীর দিদিমা। উনকে দেখনে কো লিয়ে আয়ি হায়, আওর দু-চার বাত ভি হ্যায়। লেকিন উস্‌মে ঝামেলা কুছ নেহি হ্যায়; সমঝা? ভিখ্রীকে বাত ভি নেহি, কুচ মাঙনে কি বাত ভি নেহি। সমঝা? ছোড় দরওয়াজা, মুঝে যানে দো। নেহি তো উপর যাকে বাবুজী সাব কি কহনা কি অন্নপূর্ণা মাঈজী আয়ি হ্যায় ভওয়ানীপুর সে। হাঁ?

বলতে বলতেই সিঁড়ির মাথায় দেখা দিলেন জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা খুব বড় ব্যবসাদার বাড়ীর মেয়ে।

এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন—ঠাকুমা! আপনি!

—হ্যাঁ আমি। যজ্ঞেশ্বরের কাছে এসেছি।

আমিও ছুট ক'রে গিয়ে প্রণাম করলাম জ্যাঠাইমাকে। জ্যাঠাইমা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—সুরেশ্বর!

—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা, আমি।

—দাড়িটাড়ি রেখে এ কি চেহারা করেছিস রে!

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—ওসব আমি সব ব্যবস্থা করব। ওকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছি ও দাড়ি কামাবে।

জীবনে সবেতেই একটা গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ ভূমিকা থাকে সুলতা, সেদিনের গৌরচন্দ্রিকার

সব কথাই বাদ দেব, কেননা তাতে অনেক সময় নেবে।

সেদিন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন খাঁটি এ্যারিস্টোক্র্যাট রায়বংশের মহিলা, বয়স পঁচাত্তর বছর, তিনি দাঁড়ালেন রায়বংশের আর একজন খাঁটি জমিদার ব্যবসাদার তনয়ের সম্মুখে।

ভূমিকা যা তা জ্যাঠাইমার সঙ্গেই শেষ হয়েছিল। জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশায়কে খবর দিয়ে তাঁকে একরকম প্রস্তুত ক'রে দিয়ে তবে অন্নপূর্ণা-মাকে জ্যাঠামশায়ের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত যজ্ঞেশ্বর রায়ের ডান দিকটা পঙ্গু হয়ে গেছে, হাতখানা থেকে পা পর্যন্ত স্নায়ুগুলো সব অবশ হয়েছে, কিন্তু ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত ঠিকই আছে, কথাবার্তাও বলতে পারেন, তবে একটু যেন জড়ানো জড়ানো; বসেছিলেন সে-আমলের প্রকাণ্ড বড় একখানা খাটে। খাটের গদিটা পাশে পাশে ছিঁড়ে ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। উপরে তোশকখানা ছেঁড়া নয় তবে পিটানো, এমন শক্ত যে জমানো তুলোর একখানা তোশক বলা যায়। তার উপর চাদরখানা পুরো তোশকটা ঢাকেনি বলেই দেখা যাচ্ছিল। খাটো চাদরখানা ময়লা চিট, বিবর্ণ। ঠাকুমাকে দেখে হেসেই জ্যাঠামশাই বললেন—এস ঠাকুমা!

থমকে দাঁড়ালেন অন্নপূর্ণা—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলেন পক্ষাঘাতটা কি রকমের, ডান পা-খানা ঢাকা ছিল, ডান হাতখানাও ছিল, সুতরাং ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা দেখে অন্নপূর্ণা-মা বোধহয় পক্ষাঘাতের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বললেন—প্যারালিসিস্ তোর কোনখানে রে হরি?

হরি হল যজ্ঞেশ্বরের ডাকনাম। রত্নেশ্বর রায় যজ্ঞেশ্বর নাম রেখে বলেছিলেন—যজ্ঞেশ্বর—হরি!

যজ্ঞেশ্বর হেসে বললেন—হরি চিরকাল ছলনাময় নয় ঠাকুমা? তা ভাবতে পার, পাওনাদার ফাঁকি দিতে প্যারালিটিক্ সেজে বসে আছি। শুনেছি তোমার দাদা, আমার ঠাকুরদা সাহেবদের ভোজের আসর থেকে পেট কামড়াচ্ছে ব'লে ঘরের ভিতরে শুতে গিয়েছিল। কিন্তু আসলে গিয়েছিল রাধানগরের দেসরকারদের বাড়ীতে ডাকাত ফেলে লোকটাকে ঠ্যাঙাতে আর তার ঘর পোড়াতে। আমি তো তোমাদেরই নাতি। আমি যজ্ঞেশ্বর হরি, ছলনা অবশ্যই করতে পারি। কিন্তু তা নয়। এই দেখ!

ব'লে গায়ে ঢাকা দেওয়া চাদরখানার ভেতর থেকে ডান হাতখানা বহু কষ্টে বের করলেন। হাতখানা কনুইয়ের কাছ থেকে বেঁকে রয়েছে এবং গাছের মরা ডালের মত শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে আসছে। আঙুলগুলোই আগে শুকিয়ে গেছে; যখন বের করছিলেন তখন থরথর ক'রে কাঁপছিল।

বললেন—এই এইটুকু এখন বের করতে পারছি, আগে একেবারেই পারতাম না। কোমর থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত ডান পাখানা অসাড়। নড়ে না। তোমার নাতবউ ঢেকেঢুকে দিয়ে তুলে বসিয়ে দিয়ে যায়, আবার শোবার সময় শুইয়ে দেয়। তোমাদের যজ্ঞেশ্বর হরি ছলনাময় বটে কিন্তু এ অসুখে নয়। তা তুমি হঠাৎ এলে ঠাকুমা—ব্যাপার কি বল তো! সত্যিই তুমি এলিয়ট রোডের বাড়ীখানার জন্তে এসেছ?

অন্নপূর্ণা-মা কথা বলতে পারলেন না, চুপ ক'রে বসে রইলেন মাটির দিকে তাকিয়ে।

জ্যাঠামশাই একটু অপেক্ষা ক'রে বললেন—সুরেশ্বর বাড়ীখানা কিনতে চেয়েছে শুনে খুব আশ্চর্য হইনি। রায়বংশের ছেলে, তার উপর অবস্থা ওর স্বচ্ছল। গোটা রায়বংশটা দেউলে হয়ে গেল, আশ্চর্য টেঁকে রইল যোগেশ্বরের ছেলে। শুনেছি বাপের মত খেয়ালী। বাপ খেয়ালী হলেও অন্যরকমের মানুষ ছিল, জমিদারের ছেলে, বড় ব্যবসাও ছিল আমাদের, কিন্তু যোগেশ্বর লেখাপড়া শিখে খবরের কাগজে চাকরি নিলে। বাবা তাই পছন্দ করলেন। তখন ঠাক্‌মা, ঠিক বুঝতে পারি নি। বাবা তো আমাকে খুব ভাল চোখে দেখতেন না। তাই ভাগের সময় গোটা ব্যবসাটা আমাকে দিয়ে বাড়ী আর নগদ টাকা যোগেশ্বরকে যখন দিলেন তখন আশ্চর্য হলাম। তবে কি জান ঠাক্‌মা, সবই ভাগ্য। আমি ভাগ্যকে মানতাম— আজও মানি। তার জন্যে কবচ মাদুলী গ্রহরত্ন অনেক ধারণ করেছি বোঝাদরুণে। আমার ভাগ্যে কোষ্ঠীতে এই ছিল। তাই হল। কি করব? তা তুমি এ নিয়ে এলে কেন বল তো? সুরেশ্বর কিনতে চায় বুঝি, প্রণবেশ্বরের কাছে শুনেছি আমি, কুইনী বলে যে মেয়েটা এখন বাড়ীর মালিক ছিল—। একটু হেসে চুপ ক'রে গেলেন জ্যাঠামশায়, কিন্তু ইঙ্গিতটা বুঝতে কারুর বাকী রইল না।

এতক্ষণে অন্নপূর্ণা-মা মুখ খুললেন, বললেন—দাদা তোকে খুব ভালবাসতেন। বলতেন— ওরে আমি মরে গেলে লোকে ভাবত আমি আবার ফিরে এসেছি। তুই একেবারে আমার মত। তাই ঠিক। তেমনি কুটিল তেমনি জটিল—সবই তেমনি।

—হ্যাঁ, তা বলতেন। তাঁকে আমার ভালও লাগত। খুব ভাল লাগত। তা খানিকটা বটেও। তাঁর পথেই চলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিচিত্র ভাগ্যের কথা, তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জিতে গেলেন, রায়বাড়ীকে ছোট থেকে বড় ক'রে গেলেন, আর আমি হেরে গেলাম। আমার কোষ্ঠীতে শনির ফল, শনি আমাকে রাজা করেছিল, সে আবার সব কেড়ে নিলে।

—আজেবাজে কথা না বলে আমার কথার জবাব দে তো!

—কি বল?

—এলিয়ট রোডের বাড়ীটার উপর তুই ছোঁ দিলি কেন?

—বাড়ীটা দেখলাম আমাদের—সেই জন্যে। বাড়ীখানা কেনার দলিল পর্যন্ত রয়েছে। দেখ না। বলে নতুন বের করা একখানা কবলার কপি বের ক'রে দিলেন। মাথার বালিশের তলাতেই সেটা ছিল। তার সঙ্গে কতকগুলো কর্পোরেশনের ট্যাক্সের রসিদ। আজও ট্যাক্স দিচ্ছি।

—যজ্ঞেশ্বর!

—ঠাক্‌মা!

—তোর ওই সব কথা-বার্তা তুই ছাড়। সোজা কথা বল। কুইনী বলে মেয়েটির পরিচয় তুই জানিস নে? ন্যাকা সাজিস নে, তোর ঠাকুরদা আমার দাদা, রায়বংশের পুণ্যবান পুরুষকে ঠিক আমি এই কথাই বলেছিলাম। দাদা, তুমি ন্যাকা সেজো না। ভায়লেট

অঞ্জনাদির মেয়ে এ তুমি জানতে না? দাদা ঠিক তোর মতই ন্যাকা সেজেছিল। আমি তিনবার ছি-ছি-ছি বলেছিলাম, তাতে দাদা মাথা হেঁট করেছিল, তুই করছিস নে, তুই আরও পাষণ্ড রে যজ্ঞেশ্বর।

কথাগুলি আমি বুঝতে পারছিলাম সুলতা, আমি অবাক হইনি। লজ্জায় প্রথমটা পিছন ফিরেছিলাম, তারপর ঠিক এই কথার পরই অন্নপূর্ণা-মাকে বলেছিলাম—আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াই মা-মণি! আপনাদের কথা শেষ হোক।

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—না, তুই বস্ সুরেশ্বর। তুইও শোন্। অর্চনার বিয়েতে তোর কাছে কুইনীর বাড়ী ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তটা পণের মধ্যে কেন ধরেছি তুইও শোন। কুইনীকে একখানা বাড়ী আমি আমার টাকায় কিনে দিতে পারি। তাতে আমার দেবুর আত্মা শান্তি পাবে; কিন্তু তাতে দাদার দানপত্র নাকচ হবে, দাদা রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুর স্বর্গ থেকে সিংহাসন সমেত উল্টে পড়বে রে—পড়বে নরকে। তুই চুপ করে আছিস কেন যজ্ঞেশ্বর? রায়বাহাদুর এ বাড়ী দেবুর পাপের জন্য দেয়নি, দিয়েছিল ভায়লেট মেয়েটা অঞ্জনাদির মেয়ে ব'লে। ওকে কিছু দেবার অজুহাত খুঁজছিল দাদা; দেবার জন্যে মনটা অধীর হয়েই ছিল। দেবুর এই ভুলটা হ'তেই সে বাড়ীটা লেখাপড়া করে দিল ভায়লেটকে। এই জানবাজারের বাড়ীতে যেদিন দেবু গুলি খেয়ে মরতে চেয়েছিল বাপের ভয়ে, সেদিন দাদা কলকাতা এসেছিল শুধু আমার সঙ্গে মিটমাট করতে। তখন আমি কোলে এক বছরের ছেলেকে নিয়ে আমার স্বামীকে অনেক কষ্টে রাজী করে জোড়াসাঁকোর জ্যাঠাইমার বাড়ী গিয়ে উঠেছিলাম। তারপর স্বামীকে বললাম—তুমি ফিরে যাও, আমি আর ফিরে যাব না তোমাদের বাড়ী। আমি কাশীতে পিসেমশাইকে চিঠি লিখেছি, তিনি এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি সেখানেই থাকব, তোমাদের অন্নে আর আমার প্রয়োজন নেই। আমার ছেলে বড় হয়ে তার সম্পত্তির জন্য যা করবার করবে। তার অভিভাবক হিসেবে তোমাদের কিছু করতে হবে না। কাশী থেকে মামা মানে পিসেমশাই এলেন, কীর্তিহাট থেকে দাদা এল। এসে জানবাজারের বাড়ীর ফটকে দেখলেন ভায়লাকে। বন্ধ ফটকের সামনে রাস্তার উপর মাথা ঠুকে কাঁদছে—রায়বাবু, মেরি রায়বাবু! মেরি রায়বাবু! দাদার গাড়ী এসে দাঁড়াল। দাদা এখানকার দপ্তরে খবর দিয়েছিল, কিন্তু খবরটা এসে পৌঁছোয়নি। ডাকের গোলমাল হয়েছিল। দাদা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ক'রে একেবারে ঠিক সেই সময়টাতেই এসে হাজির হল। দাদা ভায়লাকে চিনত। ভাল ক'রে চিনত। অঞ্জনার মুখের মত মুখ ছিল বলে চিনত।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় সাধু চরিত্রের লোক। লোকে বলে সাক্ষাৎ শিব। শিবের গায়ের বর্ণ দিনের আলোর থেকেও সাদা। তেমনি স্বচ্ছ এবং শুভ্র নাকি শিবের চরিত্র। কালীর ছোঁয়াচ লাগলেও জানা যায়, বোঝা যায়। যতই গোপন করুক দাদা, অঞ্জনাকে ভালবাসার কথাটা গোপন থাকেনি। আশ্চর্য মানুষ, আশ্চর্য ভালবাসা। আশ্চর্য ধর্ম-পরায়ণতা।

অঞ্জনাকে ভালবেসে শুধু তার স্বামীর কাছ থেকেই ছিনিয়ে নিলে। কাছে কাছে চোখে চোখে রাখলে, কিন্তু সরস্বতী বউয়ের সামনে। তাকে পাহারা রেখে হেসে কথা বলে, রাগ করে, সে রাগ করলে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে একরকম মান ভাঙিয়ে নিজের সাধ মেটালে, কিন্তু অঞ্জনার সাধ তাতে মিটল না। সে একদিন হলদীর বাপ পিড্রুজের দাদা, যে রবিনসনকে খুন করেছিল, তার সঙ্গে পালাল। পালাল—কীট সাহেবকে চিঠি লিখে জানিয়ে কৃশ্চান হয়ে গোয়া পালালো। বছর কয়েক পর অনেক কষ্টে গোয়া থেকে ফিরে এল কলকাতায়; কোলে তার ভায়লেট। দেহে সাতখানা রোগ ধরেছে, যা কিছু গহনাগাঁটি ছিল সব গিয়েছে; রত্নেশ্বর রায় অঞ্জনাকে ভোগ ক'রে স্পর্শ করেননি, কিন্তু তার সর্বাঙ্গ সাজিয়ে গহনা দিয়েছিলেন, পালাবার সময় অঞ্জনা সে সব ফেলে যায়নি। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। পিড্রুজ তার সে সব বেচে খেয়েছে, তারপর কার সঙ্গে ঝগড়ায় ছুরি মারামারি করে ছুরি খেয়ে মরেছে। অঞ্জনা সেকালের বামুনের ঘরের মেয়ে, এগিয়েছিল অনেকদূর, হুগলী জেলার একখানা অজ পাড়াগাঁ থেকে কীর্তিহাট হয়ে কলকাতা, সেখান থেকে পশ্চিম মুখে একেবারে গোয়া পর্যন্ত। তার ওদিকে সমুদ্রে ভাসতে আর সাহস হয়নি, অন্য কাউকে বিয়ে করবার মত দেহেও কিছু ছিল না, আর মনেও ঠিক হয়নি বা মনের মত মানুষ পায়নি। ফিরে এসেছিল কলকাতা। রিপন স্ট্রীট থেকে পার্ক স্ট্রীট এলাকায় গোয়ানীজদের একটা আড্ডা ছিল, সেই আড্ডায় এসে উঠে সাহায্যের জন্যে চিঠি লিখেছিল—একখানা দাদাকে একখানা আমাকে। বলতে গেলে আমার মারফৎ পিসেমশাইকে।

বুঝতে পেরেছ সুলতা, অন্নপূর্ণা-মায়ের পিসেমশাই কে? বিমলাকান্ত। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—আমার বয়স তখন বছর-ন'য়েক হবে। অঞ্জনাদি যখন চলে যায়, তখন আমার বয়স ছিল ছ' বছর। এর তিন বছর পর অঞ্জনা ফিরে চিঠি লিখেছিল আমাকে কাশীতে। চিঠি সাহায্যের জন্য। চিঠিখানা আমার হারায়নি। চিঠিখানা আছে। পিসেমশাইয়ের স্বভাব ছিল বড় গোছালো—বড় পরিচ্ছন্ন মানুষ, চিঠিখানি তিনি রেখে দিয়েছিলেন।

তখন আমার ন'বছর বয়স। চিঠিখানা এল, খামের চিঠি; পিসেমশাই চিঠিখানা খুলে পড়ে আমাকে দিলেন। চিঠিখানা আমার মনে আছে—"মহামহিম মহিমান্বিতা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর নিকট অধিনীর নিবেদন এই যে, এককালে আমি সম্পর্কে আপনার দূরসম্পর্কের দিদি হইতাম, তৎকালে আমার নাম ছিল অঞ্জনা এবং কীর্তিহাটের রায়বাটীতে রায়হুজুর ও রায়গিন্নীর নিকট পরম সমাদরের মধ্যেই বাস করিতাম। এবং কাজকর্ম করিতাম। কিন্তু যাহার ভাগ্য মন্দ হয়, তাহার মতিও সু হইতে কু হয়; কুমতি-দুর্মতি মন্দভাগ্য-মন্দভাগিনীদের ঘাড়ে ভর করিয়া থাকে। আমারও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। সেই দুর্মতিবশত আমি একদা গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া কৃশ্চানধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। ফলে আজ আমার দুঃখ-দুর্দশার অবধি নাই। আমি কৃশ্চান হইয়া রায়হুজুরের কলিকাতাস্থ মোকামের বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘোড়া ও গাড়ী প্রভৃতি দেখিবার জন্য যে পর্টুগীজ, যাহাকে সকলে গোয়ান বলিয়া জানিত ও ভাবিত, তাহাকে বিবাহ করিয়া গোয়া পালাইয়াছিলাম। কিন্তু মদীয় মন্দভাগ্যবশত সে ব্যক্তি মারা গিয়াছে এবং আমি নিরতিশয় দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিপতিত হইয়াছি। দেহেও অনেক

রোগ ঢুকিয়াছে। খুব বেশীদিন সম্ভবত বাঁচিব না। কিন্তু আপাতত চতুর্দিক অন্ধকার নিরীক্ষণ করিতেছি। আমার কোলে একটি বৎসরখানেকের কন্যা। তাহাকেও বাঁচাইবার মত সামর্থ্য নাই। সেইজন্য আপনার নিকট কিছু অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া অত্র পত্রযোগে দরখাস্ত জানাইতেছি। আমার সহস্র অপরাধ, ক্রিশ্চান হইয়াছি, পরপুরুষের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি—ইহা কখনওই মার্জনার যোগ্য নয়। তবুও উদরের জ্বালায় এবং আমার কন্যাকে বাঁচাইবার জন্য লজ্জার মাথা খাইয়া পত্র লিখিলাম। আপনাদের অনেক আছে। আপনার জ্যেষ্ঠ রায়হুজুরকেও পত্রযোগে দরখাস্ত জানাইয়াছি। তিনি দিবেন না জানি, তিনি কঠোর ধার্মিক লোক, তবুও করুণা করিবার সময় তো পাপ বিচার কেহ করে না, পাপীকেই তো করুণা করিতে হয়। ভগবানও পাপীকে দয়া করিয়া থাকেন। সেই হিসাবে তিনি দয়া করিলে করিতে পারেন। আপনি করিবেন বলিয়া ভরসা করিতেছি। এবং দয়া করিয়া রায়হুজুরকেও যদি কিছু লেখেন—আমাকে ক্ষমা করিতে, দয়া করিতে, তবে অধিনীর প্রতি অনেক কৃপা করা হইবেক।"

চিঠিখানা আজও আমার কাছে আছে।

অন্নপূর্ণা-মা একটু থামলেন; বয়স হয়েছিল—এতক্ষণ কথা বলে একটু হাঁপাচ্ছিলেন। থামলেও জ্যাঠামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর রায়ের মুখ যেন পাথরের মুখ। একটি রেখারও তাতে বদল হয়নি।

এই ফাঁকে তিনি বললেন—এসব কথা তুমি যখন বলছ, তখন সত্যি বলেই মানছি ঠাকুমা, কিন্তু আমাকে তুমি বলছ কি?—যা বলছ তাই বল! বাড়ীটা ছেড়ে দিতে বলছ তো!

—হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, তোকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, তুই এত ছোট কাজ করলি কেন?

—ছোট কাজ কি করে হল ঠাকুমা। আইনসঙ্গত না হয়, মামলা করলেই তো বাড়ীটা পাবে।

—দাদা বাড়ীটা দান করে দলিল একখানা করে দিয়েছিল, কিন্তু বাড়ীটার করপোরেশন ট্যাক্স দিয়েছে বরাবর তোদের কলকাতার এস্টেট। পাছে ট্যাক্সের জন্য গোলমালে পড়ে, দিতে না পারে, বিব্রত হয়, তারই জন্য এইরকম করেছিল। তাছাড়া পাছে ওরা কেউ বিক্রী করে দেয়, দেনার দায়ে বাড়ীটাকে জড়িয়ে ফেলে, তাই এই জট পাকিয়েছিল। তুই তার সুযোগ নিয়েছিস।

—বল না, অন্যায় করেছি? কিছু বে-আইনী কিছু করেছি? বল?

—তা করিসনি। কিন্তু তুই তোর বাপকে, তোর ঠাকুরদাদাকে নরকে ডোবাচ্ছিস।

—মা, ঠাকুরদার যে-দায়টা বলছ, সেটা তুমি চাপাচ্ছ দাদার উপর। মায়ের পেটের ভাই নয়, তোমার বাপ পুষ্যিপুত্তুর নি[illegible]কে, তার জন্যে আমার ঠাকুরদার উপর তোমার রাগ এ তো সবাই [illegible] গো। তবে [illegible] বাপের কথা যা বললে, তা অবিশ্যি পাপপুণ্যি স্বর্গ-নরক এস[illegible] মানতে হয় বটে, [illegible] সঙ্গে সঙ্গে এও মানতে হয়, পাপ করলেই তার সাজা আ[illegible] সে-সাজার মাফ নেই [illegible]। তারলা বলে গোবান ফিরিঙ্গী

মেয়েটার সঙ্গ—সে বাড়ী দান করেও হয় না।

—চুপ কর, চুপ কর। ওরে যজ্ঞেশ্বর তুই চুপ কর।—

আর্তনাদ করে উঠলেন অন্নপূর্ণা-মা।

কিন্তু জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায় চুপ করলেন না। তোমার ভাইপো তোমার ছোট ভাইয়ের মত ছিল। তার নিন্দে তোমার সহ্য হচ্ছে না—না? কিন্তু কি করব বল? এ যে তাঁর প্রাপ্য গো। মিথ্যে তুমি অঞ্জনা-কল্পনার ফ্যাচাং তুলে ঠাকুরদার মত দেবচরিত্র ব্যক্তির অপমান করছ।

অন্নপূর্ণা-মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বল্লেন—অবিকল সেই রত্নেশ্বর রায়। অবিকল। ঠিক এমনি করেই নিজের বাপের উপর রাগ করে কথা বলত, তাঁরই ওপর সব দোষ চাপাত। অবিকল! লাখখানেক কি তারও বেশী মামলা দাদা করেছে। তার সব কাগজপত্র যদি থাকে, তবে অন্তত বিশ-পঞ্চাশটা মামলার হয় মামলা দায়েরের আর্জিতে, নয় মামলার জবাবে বলা আছে—বীরেশ্বর রায় মদ্যপান করিয়া বেহুঁশ থাকিতেন, এবং মদ্যপানের ফলে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছিল বলিয়া এমন স্বীকৃতি তিনি দিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে তাঁহার পক্ষাঘাত ঘটিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার কোন স্বীকৃতি বা সহির মূল্য গ্রাহ্য হইতে পারে না।

যজ্ঞেশ্বর রায় হেসে বললেন—ওসব কথা ছাড়ান দাও না ঠাকুমা। তুমি কুইনীর বাড়ীখানা কুইনীকে ফিরিয়ে দিতে চাও। তা বেশ তো, পুরনো কাসুন্দী না ঘেঁটে বাড়ীখানার দামের অর্ধেক টাকা আমাকে দিয়ে একটা না-দাবী লিখিয়ে নাও। চুকে যাক। টাকাটা তুমিও দিচ্ছ না, দেবে সুরেশ্বর। জগদীশ্বরের মেয়েটা ওর গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধেছে। ওর যখন ওগরাতেই হবে তাকে, তখন টাকাটা ওই দেবে।

একটা বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে সুলতা। আমার নিজের গলায় এতখানি ভয়ঙ্কর চড়া সুর বা গর্জন বের হতে পারে, এর আগে তা আমি জানতাম না। গান গাইবার সুকণ্ঠ রায়বংশে আছে। শ্যামাকান্তের দান এই সুকণ্ঠ আর সংগীত-ব্যাকরণে জ্ঞান—এ নিয়েই অনেকে আমরা জন্মেছি, কিন্তু এমন গর্জন এক মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর রায়ের সেই দৈত্যাকৃতি পশুচরিত্র ছেলেটা ছাড়া কারও গলায় বের হতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল—কিছুদিন আগে অন্নপূর্ণা-মায়ের নামে লেখা একখানা বেনামী চিঠির কথা। যে চিঠিতে অজ্ঞাত পত্রলেখক অর্চনার প্রতি আমার স্নেহ-মমতার কুৎসিত ব্যাখ্যা করে অপবাদ দিয়ে সংবাদ দিয়েছিল তাঁকে। বিয়েটা যাতে না হয়, তারই চেষ্টা ছিল তাতে। চকিত কথাটা মনে হতেই আমার ধারণা জন্মেছিল, সে-চিঠি হয় লিখেছিল বা লিখিয়েছিল—।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠেছিলাম পশুর মত—চু-প করুন আপনি!

সে চিৎকারে চমকে উঠেছিলেন যজ্ঞেশ্বর রায়। চমকে উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন, নির্বাক হয়ে। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই আত্মসম্বরণ করে নিয়ে বলেছিলেন—কেন? এমন করে চিৎকার করে উঠলে কেন? একটা জন্তুর মত? এঁ্যা?

আমি বলেছিলাম—সে চিঠি তাহলে আপনি লিখিয়েছিলেন?

একটু চুপ করে থেকে যজ্ঞেশ্বর রায় বলেছিলেন—হ্যাঁ। আমিই শিখিয়েছিলাম একরকম। হ্যাঁ, একরকম আমিই বইকি! প্রণবেশ্বর কীর্তিহাট থেকে এসে বললে—সমস্ত কথা, অতুল-মেজখুড়ীমার বোমা-পিস্তল নিয়ে জেলের কথা। অর্চনার সঙ্গে তোমার মাখামাখির কথা। সব শুনলাম। শুনলাম এবং সন্দেহ হল। এ তো হামেশাই হয়। বড় বড় বাড়ীতে, যে-সব বাড়ীতে বড় সংসার, পোষ্য অনেক হয়, সে সব বাড়ীর মালিকেরা ভোগ করে থাকেন পোষ্যদের বধূ-কন্যাদের। তা করেন। যারা দুবেলা দুমুঠো ভাত পায়, মাথা গুঁজবার একখানা ঘর পায়, বড় বাড়ীর লোক বলে পরিচয় দিতে পায়, তাদের পুরুষ অভিভাবক থাকে না বা থাকলেও বোবা হয়ে থাকে। বাইরে এখানে-ওখানে গালাগাল দেয়। যেখানে কোন লোক থাকে না। এর মধ্যে মালিকপক্ষের ছেলে বা কর্তার নজরে মেয়েরা কেউ পড়লে আর কি রক্ষে থাকে? এই তো আমার শ্বশুরবাড়ীতেই, আগে রেওয়াজ ছিল, মেয়েদের কুলীনের ঘরে বিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাই ঘরে রাখা, কিছু সম্পত্তি দেওয়া। তারপর হত এই তারা যখন একপাল করে ছেলে-মেয়ে বিইয়ে বসত, তখন—।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—থাক। আর বেদ-বেদান্ত আওড়াতে হবে না তোকে যজ্ঞেশ্বর। তুই স্বীকার করলি এই যথেষ্ট।

—কেন, কথাটা মিথ্যে বললাম নাকি? তোমার দাদা রায়বাহাদুরের যে অপবাদ তুমি দিচ্ছ, সেটাই বা কি গো? কলকাতায় ওটা আকছার বড়লোক বাড়ীর কীর্তি। বড় বড় বাড়ীর কেচ্ছা আছে, বড় বাড়ীতে গরীব আত্মীয়ের বউ-বেটী নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরত, এক একখানা গয়না নিয়ে। কর্তা একলা ঘরে বসে বউ দেখতেন আর গয়না দিতেন। তোমার ভাইপো ভায়লাকে নিয়ে এতবড় যে কীর্তি করলে সেটা? সেটাই বা কি? তোমার ভাইপোর মেমসাহেবের ওপর একটা ঝোঁক ছিল। যোগেশ্বরকে লেখাপড়া শেখাবার নামে একজন মেমসাহেব গবর্নেস রেখেছিল, আমার মায়ের চোখ থেকে জলের ধারা-বওয়া আমি ভুলিনি, আমি তাকে চাবুক মেরে তাড়িয়েছিলাম।

বাধা দিয়ে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তুই দিব্যদৃষ্টি মহাপুরুষ রে। তোর সঙ্গে কথা কইতে আসা আমার ভুল হয়েছিল। তোর ঠাকুরদার থেকে তুই সরেস। নির্বাণ তোর এই জন্মেই হবে। শুধু টাকা আর সম্পত্তির মায়াটা থাকবে, আর ওইটেই হবে তোর সিদ্ধির বাণী। ওসব কথা থাক। এখন ওই বাড়ীর জন্যে কি নিবি তাই বল। কেস তো আমি কোর্টে ওঠাতে পারব না, নইলে দেখতাম তুই কতবড় পাষণ্ড! কত তোর টাকার জোর, আর কত তোর জেদ! আমার কপাল! বুঝলি, আমার কপাল! কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে!

একটু চুপ করে থেকে যজ্ঞেশ্বর রায় বলেছিলেন—তা দিয়ো হাজার পাঁচেক।

এবার আমি আর অন্নপূর্ণা-মাকে কথা বলতে দিই নি। বলেছিলাম—টাকাটার বদলে চেক যদি আজই দিয়ে যাই?

—তা দিতে পার। আমি না-দাবী লিখে দেব বলে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, টাকাটার জন্যে রসিদ দিচ্ছি। তবে বেয়ারার চেক দিতে হবে।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—চেক দিয়ে দে সুরেশ্বর। কিন্তু তোর বউয়ের হাতে দেব, তোকে

দেব না। আর একটা প্রতিশ্রুতি করিয়ে নেব।

—প্রতিশ্রুতি! হাসলেন যজ্ঞেশ্বর রায়।

—হ্যাঁ। মিথ্যে বেনামী পত্র লিখে তুই অর্চনার বিয়েতে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিস। এমন কাজ এর পর আর করবি নে।

চুপ করে রইলেন যজ্ঞেশ্বর রায়, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। ফিরে যখন তাকালেন তখন আমি পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলাম সুলতা। দেখলাম, যজ্ঞেশ্বর রায়ের চোখ ছলছল করছে।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—এবার শান্ত কণ্ঠে বললেন—কি বলে এমন কথাটা লিখলি তুই? তোর মনে এতটুকু লাগল না? একবার মনে হল না যে, মেয়েটা তোর বাপের···

—বাবার কথা তুলো না ঠাকুমা। না।

—বেশ তোর কাকা, তিনি তো তোর সঙ্গে কোন অসদ্ভাব করেন নি। শিবেশ্বর! তাছাড়া ঠাকুরদা তোর কাছে দেবতা, এ মেয়ে তো তাঁরই এক নাতি জগদীশ্বরের মেয়ে!

যজ্ঞেশ্বর রায় বললেন—ঠাকুমা, ওটা আমার কেমন একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে। সে আজ থেকে নয়, সেই ছেলেবেলা থেকে। বাল্যবয়স থেকে। তোমাকে বলি। ঠাকুরদা একটা ঝিকে হঠাৎ দেখলেন, তার আগে দেখেন নি। যুবতী ঝি, বছর সতেরো-আঠারো বয়স, তাকে রেখেছেন ঠাকুমা। ওই ঝিটার মা, ঠাকুমার খাস-ঝি ছিল। নাম ছিল কামিনী। কামিনীর মেয়ে যামিনী এ বাড়ীতেই মানুষ হয়েছিল, বারো বছর হতে না হতে তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুরদা। মেয়েটার কপাল; বিধবা হয়ে ফিরে এল ভরাযৌবন নিয়ে। কামিনী খুব করে ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরলে, মা, বাড়ীর এককোণে ওকে একটু ঠাঁই দাও। ঠাকুমা ঠাকুরদার মত জানতেন, তিনি তাকে বাড়ীতে রাখলেন, খুব গোপনে। ঠাকুরদার চোখের সামনে যেতে বারণ ছিল। তা সে যেতো না। কিন্তু হঠাৎ একদিন বিপদ ঘটল; মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হল। মেয়েটার মা জানতে পেরে কেঁদে এসে পড়ল ঠাকুমার কাছে। উপায় কর মা। ছোটবাবু—মানে ছোটকাকা রামেশ্বর···। কথাটা শেষ পর্যন্ত রায় বাহাদুরের কানে উঠল। ঠাকুরদার খেয়াল ছিল না যে, আমি পাশের ঘরেই আছি, আমার বয়স তখন বারো পার হয়ে তেরোয় পড়েছে। ঠাকুরদা তিরস্কার করেছিলেন ঠাকুমাকে। বলেছিলেন—সরস্বতী-বউ, যে ঘরে লক্ষ্মী থাকে, তার ঘরে অলক্ষ্মী চারিদিক থেকে কাঁদতে কাঁদতে এসে আশ্রয় চায়। আশ্রয় দিতে নেই। অন্ততঃ ভোগী যারা, জমিদার যারা, তাদের তো নেই-ই। দিলে কি হয় জান? ওই অলক্ষ্মী রূপসী রূপ ধরে যৌবনের ডালা তুলে ধরে ওই বংশের মালিক, তার বংশধরদের সামনে। ভোগ করলেই অলক্ষ্মীর মনস্কামনা পূর্ণ। ধর্ম পালাল, ধর্মের সঙ্গে ভাগ্য যায়, ভাগ্যের সঙ্গে যশ যায়, যশের সঙ্গে সম্মান যায়। সম্মানের সঙ্গে অধিকার যায়, ক্রমে সব যায়, লক্ষ্মী ছেড়ে পালাল, অলক্ষ্মী তখন দারিদ্র্য দুর্ভাগ্য নিয়ে বংশকে ছারখার করে দেয়। তার উপর তুমি জান না, জান না সরস্বতী-বউ, এ বংশের উপর পূর্বপুরুষের অর্জিত একটা অভিসম্পাত আছে। নিদারুণ অভিসম্পাত। নারীঘটিত পাপ বংশে ঘটবেই, এবং তাতেই সব নষ্ট হবে। আমি এমন কঠোর সংযম করি, পূজা করি, অর্চনা করি, শুধু

এই পাপ থেকে রায়বংশকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তোমরাই তা হতে দিলে না। দেবে না। হল তো। রামেশ্বরকে ডোবালে তো পাপে। ডোবালে তুমি। দয়া করতে গিয়ে পাপের উপকরণ তুমি রামেশ্বরের মুখের সামনে ধরে দিলে। সে নতুন জোয়ান, তার দোষ কি? সে সামনে হরিণী পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে! দেখেও জ্ঞান হল না তোমার? এর আগে দেবেশ্বরকে নিয়ে এত বড় কাণ্ডটা হয়ে গেল, ভায়লা মেয়েটাকে নিয়ে কি করলে সে, তার জন্যে কি করলাম আমি—তা তো জান! ঠাকুরদাস খুন হয়ে গেল। আমি নিজে বিশ্বাস করি নে সরস্বতী-বউ। মেয়েদের সতীত্বে আর পুরুষের সৎ শুদ্ধ থাকায় বিশ্বাস করি নে। থাকতে গেলে আমার মত যারা চব্বিশ ঘণ্টা জেগে থাকে, তারাই পারে। ঘি আর আগুনে এক জায়গায় থাকলেই জ্বলবে। দাউ-দাউ করে জ্বলবে, ঘি শেষ হলে আগুন ছাই চাপা পড়বে।

তারপর ঠাকুমা, কি বলব, আমার অদৃষ্ট, ঠাকুরদা তীর্থে গেলেন, বাবা কীর্তিহাটে এসে থাকলেন, আমরা এলাম, কলকাতায় যোগেশ্বরের জন্যে যে গবর্নেস রাখা হয়েছিল সে এল, বিবিমহলে থাকল, বাবার সঙ্গে একসঙ্গে বেড়াতো, একসঙ্গে চা খেতো। গল্প করত। মা কাঁদত। আমি বুঝতে শিখেছি। আমি শুনেছিলাম মায়ের কাছে, ভায়লেটকে নিয়ে প্রথম বয়সে বাবার কীর্তির কথা। ঠাকুরদার ভয়ে ওকথা কীর্তিহাটে মুখে আনতো না কেউ। গোয়ানরা গান করত—

বড়া বড়া মোকাম কি বড়া কারখানা
উধর মৎ যানা মৎ যানা
শুননা মানা, দেখনা মানা, বাত কহনা মানা
বড়া কারখানা—

পিড্রুর ফাঁসি হয়েছিল, তারই গান বেঁধেছিল ওরা। তবে মা জানতেন, মায়ের কাছে শুনে জেনেছিলেম, নইলে ভায়লেটকে নিয়ে যখন বাবা এসব কাণ্ড করেন, তখন বাবার বিয়েই হয় নি! তাছাড়া মেজকাকার কাছে শুনেছি, ছোটকাকার কাছে শুনেছি। ঠাকুরদা বার বার বলতেন আমাকে, তোমার বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না দাদু। সর্বনাশ হয়ে যাবে। রায়বংশের ওপর দেবরোষ আছে। নারী হতে সর্বনাশ। মনে একটা ভয় হয়েছিল। তত সন্দেহ বেড়েছিল। তারপর যে বাড়ীতে আমার বিয়ে হল, সে বাড়ীতে তখনও আমার বুড়ো দাদাশ্বশুর বেঁচে।

বয়স তখন সত্তোরের কাছে, স্ত্রী মারা গিয়ে খালাস পেয়েছেন; দীর্ঘকাল তিনি পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। পঙ্গু স্ত্রী থাকতেই তাঁর সেবা করত তাঁর পোষ্যা আপন ভাগ্নীর বিধবা মেয়ে। সে সেবা সত্যি-সত্যিই রক্ষিতার সেবা ঠাকুমা। আজ তুমি কথাটা বড় ঘা দিয়ে বললে বলে তোমার কাছে বলছি। এই বুড়োকে কারুর কিছু বলার উপায় ছিল না, তার কারণ এই বুড়োই কয়লাকুঠীতে সামান্য চাকরি করতে গিয়ে সেকালে পাঁচ-ছ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি করেছিল। সমস্ত সম্পত্তির দাম কষতে গেলে কোটির কাছে যাবে। শুধু ঐ মেয়েটিই নয়, ও বাড়ীতে যত পোষ্য দেখেছি, তাদের যাদের রূপ-যৌবন ছিল, সকলকেই ওই দণ্ড দিতে

হয়েছে। দণ্ড দিতে হয়েছে বলছি কেন, তারা গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি বাপ-ভাইয়ের চাকরির জন্তে ওই মাশুল দিয়েছে।

একটু থামলেন যজ্ঞেশ্বর রায়।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—কথাটা তুই বেশী বাড়িয়ে বলছিস যজ্ঞেশ্বর, নইলে কথাটা সত্যি। আমার শ্বশুরবাড়ীতেও ওই হাল ছিল। তারপর পরমহংস দেব প্রকট হলেন, লোকে তাঁকে জানল, চিনল, তাঁর পিছনে স্বামীজী এলেন, তখন দেশের হাল ফিরল।

জ্যাঠামশাই বললেন—না ঠাকুমা, কথাটা ঠিক হল না। পরমহংস দেব এলেন, তাঁর কৃপায় গিরিশ ঘোষ মশায়ের থিয়েটারের মধ্যে থেকেও মতি পাল্টেছিল, কিন্তু জমিদার বড়-লোকের বাড়ীর কারও কোন গতি হয় নি। যা ছিল তাই থেকেছে, তাই রয়েছে। আমাদের বংশে দেবদ্রোহের কথা শুনি, কিন্তু সেটা কি তা জানি নে। জানতে কোন রকমেই পারি নি। শুনি ধর্মসাধনে পাপ, আর সম্পদে পাপ। ঠাকুমা, বহু কর্ম আমি করেছি, দীক্ষা আমি নিয়েছিলাম, সে সব গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিয়েছি, কিছুই আমি মানি নে। তবে এটা জানি, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বামী বিবেকানন্দ হাজার বছরে একজন। বাকী সন্ন্যাসী সাধুগুলো চোর, ভণ্ড, লম্পট। আর ধনীর ছেলেগুলো সব শয়তান, চরিত্রহীন। তারা আবার যখন গরীব হয়, লক্ষ্মী ছাড়ে, তখন শুধু পুরুষের নয়, বাড়ীর বউ-বেটীরও পতন ঘটে। ও পাপ কেউ ঘোচাতে পারে না ঠাকমা। এ দেশে ধর্ম নিয়ে যত মাতামাতি হয়েছে, এত কোথাও হয় নি। মেয়েরা, সে স্বামীকে ভালোবাসুক না-বাসুক, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরেছে। ঈশ্বরকে নিয়ে এত খেলা কেউ কোথাও খেলে নি। বিধবা বিবাহ আইন করেও এদেশে চালানো যায় নি। এত পাপ, এত ভয়ঙ্কর পাপ কোন দেশে—ধর্মের উল্টোপিঠে তার আড়ালের আশ্রয়ে ঘটে নি। আবার একথাও সত্য যে, এত ভালবাসাও কোন দেশে, কোন নারী কোন পুরুষকে বাসে নি। কোন পুরুষ কোন নারীকে বাসে নি। সম্পদেও আমরা পাপ করেছি। এ আমার কথা নয় ঠাকুমা, এ আমার ঠাকুরদাদা তোমার দাদার কথা। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের কথা, আমাকে নিজে মুখে বলতেন এসব কথা। শুনেছি তাঁর নিজের পিতামহ—মানে বিমলাকান্তের বাপ কি এক ভীষণ সাধনা করেছিলেন। তারই পাপ নাকি আমরা ভোগ করছি। রায়বংশে ধর্মের পাপ ধনসম্পদের পাপ একসঙ্গে জমা হয়েছে। আমার মনে অহরহ সন্দেহ হয় ঠাকুমা, এ বংশে ছেলে-মেয়ে কেউ সৎ থাকতে পারে না, সতী থাকতে পারে না। চিরজীবন এই সন্দেহ আমার মনে। তাই আমি প্রণবেশ্বরের কাছে যখন শুনলাম সুরেশ্বরের সঙ্গে জগদীশ্বরের মেয়ের এত মাখামাখি, তখন একটা সন্দেহের সুতো টেনে বের করেছিলাম। তারপর যখন শুনলাম, সুরেশ্বর তার বিয়ের জন্তে এত টাকা খরচ করছে, তখন আমার আর সেটা সন্দেহের সুতো রইল না। মোটা দড়ি হয়ে উঠল। আগেকার আমি, মানে অর্থবান যজ্ঞেশ্বর রায় হলে আমি এ সন্দেহ চিঠি লিখে তোমাকে জানাতাম না। কিন্তু গরীব হয়ে ছোট হয়ে গেছি। মনটা ছোট হয়ে গেছে। কিছু মনে করো না ঠাকমা। অভিসম্পাত দাও, তা দাও। হাজার বার দাও। কিন্তু আমার উপর রাগ করে মন খারাপ করে যেয়ো না।

সুলতা। সুরেশ্বর বললে—এই যজ্ঞেশ্বর রায় আমার জ্যাঠামশাই, যে সন্দেহের দড়ি পাকিয়ে তুলেছিলেন সেদিন, সেই সুতোই কাল হয়েছিল। প্রণবেশ্বর এই সন্দেহের কথা জানিয়েছিল রথীনকে। অর্চনার সঙ্গে রথীনের বিয়ের পর প্রণবেশ্বরের সঙ্গে মাখামাখি একটু বেশী হয়েছিল রথীনের। কেন জান?

অন্নপূর্ণা-মা যে-বাড়ী, যে-বংশ দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিলেন, কোন পাপ প্রবেশ করতে দেবেন না বলে বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেই বংশে পাপই বল আর যাই বল, সুলতা, ব্যভিচারকে কি বলবে, মদ্যপানকে কি বলবে বল? বল? If it is not a sin—তাই মেনে নেব আমি। Sin বলে কিছু নেই। মদ্যপানকেও মেনে নেব। খেলে কোন দোষই নেই। কিসের দোষ? Neither a sin nor a crime. ওটা উনবিংশ শতাব্দীর পিউরিট্যান মুভমেন্টের একটা idea, তাই হল। কিন্তু ব্যভিচার? প্রথমে রথীন ডাক্তার অর্চনাকে বিয়ে করতে অরাজী হয়েছিল বলেছি। কেন শোন, একটি Anglo nurse-কে নিয়ে সে তখনই জড়িয়ে পড়েছিল। সেই মেয়েটির সঙ্গে প্রণবেশ্বরেরও আলাপ ছিল। আলাপটা ঠিক নার্সটির সঙ্গে নয়, তার দিদির সঙ্গে। সেই সূত্রে তারা চিনত পরস্পরকে, কিন্তু আত্মীয় হিসেবে পরিচয় ছিল না। প্রণবেশ্বরদাদা রথীনকে জানত মেডিকেল স্টুডেণ্ট হিসেবে প্রথম, তারপর ডাক্তার হিসেবে। আর রথীন প্রণবেশ্বরকে চিনেছিল প্রথম পেশেণ্ট হিসেবে। নার্স তাকে এবং নিজের দিদিকে স্যালভারসান ইঞ্জেকসন দেওয়াবার জন্য নিয়ে এসেছিল রথীনের কাছে। রথীন তখন সিক্সথ ইয়ারের ছাত্র। তারপর নার্সটির বাড়ীতে দুই ভায়রা-ভাইয়ের মত তাদের দেখা হয়েছে। এবং মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের কাছে পেশেণ্ট হিসেবে এসেছে।

পরিচয় হল বিয়ের পর।

তারপর সুলতা—যজ্ঞেশ্বর রায় যে কাজ করেছিলেন, বিবাহের আগে বিয়ে বন্ধ করবার জন্যে, সেই কাজ প্রণবেশ্বর করলে বিবাহের পরে। জ্যাঠামশাই অপবাদ দিয়েছিলেন অর্চনার নামে। প্রণবেশ্বর এবার অর্চনাকে চিঠি দিয়েছিল রথীনের নামে। তার আর সেই নার্সের একসঙ্গে বসে তোলানো ছবিসমেত প্রমাণসমেত পত্র।

উদ্দেশ্য কি জান সুলতা? উদ্দেশ্য অর্চনার সুখের ঘরে আগুন লাগানো। আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তার ফল এমন হল যে—চুপ করলে সুরেশ্বর।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুরেশ্বর। সুলতাও কোন কথা খুঁজে পেলে না।

অনেকক্ষণ পর সুরেশ্বর বললে—অথচ বিয়ের পর রথীন মোটামুটি নিজেকে শুধরে নিয়েছিল। তা না হলে হয়ত ভাবতাম যে, প্রণবেশ্বরদাদার নারীদেহলোভী মন নার্সটির বড় বোনের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে বা তার প্রতি অরুচি ধরিয়ে নার্সটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

থাক ও কথা এখন, সুলতা। মোটামুটি বলে রাখলাম, এর পর যথাসময়ে যথাক্রমে অর্চনার এ দুর্ভাগ্যের কথা বলব। এখন ও কথা থাক।

এখন যা বলছিলাম তাই বলি।

সেদিন জ্যাঠাইমাকে সাক্ষী রেখে জ্যাঠামশায়ের হাতে পাঁচ হাজার টাকার চেক লিখে

দিয়ে কুইনীর ওই বাড়ীটা খালাস করে এনেছিলাম। এবং ক'দিন পর তার কাছে না-দাবী দলিল করিয়ে নিয়ে আমিও না-দাবী রেজেষ্ট্রী করে দলিল দুখানা দিয়ে এসেছিলাম অন্নপূর্ণা-মা'র হাতে। ওটা কুইনীকে আমি দিই নি। দিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা-মা।

তিনি কীর্তিহাটে যান নি। কুইনীকে আনিয়েছিলেন কলকাতা। ঘটনাটা ঘটেছিল বিয়ের আগেই। কুইনীকে দলিল দুখানা হাতে দিয়ে বাড়ীতে দখল দিয়েই তাকে বলেছিলেন, এই নে তোর বাড়ীর দলিল।

কুইনী বড় শান্ত, না ঠিক বলা হল না, সুলতা, বড় নীরব মেয়ে। কথা বেশী বলে না। নীরবেই সে হাত পেতে দলিল দুখানা নিয়ে বলেছিল, আপনাকে নমস্কার করতে লজ্জা করছে, প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে, করব ?

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—করবি বইকি, আমি খুশী হব রে। ক্রশ্চান হলেও বাঙালী। প্রণাম করা তো শুধু হিঁদুর নিয়ম নয়। এ নিয়ম এই দেশের নিয়ম। যেমন এই শাড়ী পরেছিস। শাড়ী তো সাহেবদের দেশে পরে না।

—পা ছোঁব ?

একটু ভেবে নিয়ে অন্নপূর্ণা-মা পা দুখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ছোঁ!

তাঁর পা-দুখানা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই অন্নপূর্ণা-মা তাঁর হাতখানা কুইনীর মাথার ওপর রেখে আশীর্বাদ করলেন। কি আশীর্বাদ করলেন তিনিই জানেন, তবে দু ফোঁটা জল তাঁর চোখ থেকে টপটপ করে পড়ল।

আমি খুব বিস্মিত হই নি সুলতা। আমি এর কারণ জানতাম। ভেবেছিলাম, কুইনী কিছু বিস্মিত হবে, কিন্তু তাও সে হয় নি।

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—দেখ্, আর একটা কথা তোকে বলব।

—বলুন।

—আমি সুরেশ্বরকে বলেছি, তোর পড়াশোনার খরচ সব ও দেবে। তুই পড়। ওই গোয়ানপাড়ার হলদীদের সঙ্গে থেকে ওদের মত হয়ে যাস নে।

কুইনী মৃদুস্বরে বললে—সে-কথা বাবু দিদিমাকে বলেছেন মা।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—জানি। কিন্তু তুই তো তার উত্তর দিস নি। তুই তো গোয়ান নোস কুইনী। তোর বাবা মুখুজ্জে ছিল। বামুন থেকে ক্রশ্চান হয়েছিল। তোর মা—সে পিড্রুজের মেয়ে নয় কুইনী। পিড্রুজের মা ভায়লা পিড্রুজের মেয়ে, বাপ ছিল পিড্রুজ কিন্তু তার মা ছিল বামুনের মেয়ে। ভায়লার ছেলে তোর মায়ের বাপকে লোকে পিড্রুজ বলেই জানে বটে কিন্তু তা নয় কুইনী, সে-ও হল বামুনের ছেলে। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—মা-বাপ একসঙ্গে মরে গিয়ে হিলডার কাছে গিয়ে পড়েছিস, কিন্তু ওদের মধ্যে থেকে ওরকম হলে তো চলবে না। তোর মায়ের বাপের বংশ খুব বড় বংশ—। চুপ করে গেলেন অন্নপূর্ণা-মা। মুখ ফিরিয়ে নিলেন কুইনীর দিক থেকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কুইনী—কোন উত্তর দিলে না বা দিতে পারলে না। শুধু ঠোঁটদুটি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কুইনী চলে গেলে অন্নপূর্ণা-মা মুখ ফেরালেন আমার দিকে, দেখলাম তাঁর চোখ থেকে দুটি জলের ধারা গড়াচ্ছে।

অন্নপূর্ণা-মাকে আমি যত দেখছিলাম, ততই যেন অভিভূত হচ্ছিলাম। বিশেষ করে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন থেকে। তাই বা কেন সুলতা, সেই যেদিন উনি রথীনকে সঙ্গে করে এনে বিয়েতে রথীনের সম্মতি দেওয়ালেন এবং নিচে দেখলেন কুইনীকে আর হিলডাকে, সেইদিন থেকেই। আমি দেখেই যাচ্ছিলাম আর এইটুকু বুঝছিলাম যে, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে যা আছে, রায় কোম্পানীর সঙ্গে ভায়লেট পিড্রুজের পত্রালাপের মধ্যে যা আছে, দেবেশ্বর রায়ের একখানা চিঠির মধ্যে যা আছে, তার চেয়েও আরও কিছু বেশি জানেন অন্নপূর্ণা-মা।

অনুমান আমার মিথ্যে নয় সুলতা। তিনি তা জানতেন।

যেদিনের কথা বলছিলাম, যেদিন কুইনীকে ওইসব কথা বলছিলেন, সেদিন ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে, অর্চনার বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে ফাল্গুনের শেষে, মার্চের ৮ তারিখে; ওই দলিল ফেরত দেবার জন্যেই অন্নপূর্ণা-মা ওদের আটকে রেখেছিলেন কলকাতায়। পড়ে গিয়ে হিলডার হাঁটুটা শুধু পাকেই নি, একটা স্থায়ী স্প্রেন হয়ে প্রায় খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। তারও চিকিৎসা হচ্ছিল। সেদিন কুইনী কোন কথা বলতে পারলে না, চলে গেল—অন্নপূর্ণা-মা মুখ ফেরালেন, দেখলাম তাঁর চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়েছে। আঁচল দিয়ে মুছে তিনি বললেন—সুরেশ্বর, এ-ভারটাও তুলে নিস রে। মেয়েটাকে পড়িয়ে-শুনিয়ে মানুষ করে দে। এতে তোর সত্যিকারের ধর্ম করা হবে রে। সে-সব কথা তোকে মুখে বলতে পারব না। কথা তো অল্প নয় রে, কথা অনেক। দেখ, কথা এত রে, কথা যদি ইট-কাঠ বা পাথর হত, কিম্বা সব কথা যদি কাগজে লিখে থাকে-থাকে সাজানো হত, তবে গোটা এই হলঘরখানাই ভরে যেত। বুঝলি! বলতে গেলে জীবনে আর কুলোবে না। আমি তোকে একখানা চিঠি দেব—চিঠিখানা দেবুর লেখা। দেবু তোর ঠাকুরদা, দেবেশ্বর রায় সম্পর্কে আমার ভাইপো, আমার সহোদরের ছেলে সে, তুই জানিস। তোর জ্যাঠাও জানে না। বয়সে প্রায় একবয়সী ছিলাম, আমি থাকতাম কাশীতে, সে থাকত কীর্তিহাটে, দুজনে দুজনকে চিঠি লিখতাম। সেকালের ছোট পোস্টকার্ড, তিন-চারটে লাইন লিখতে ফুরিয়ে যেত। তাও আমার কাছে দু-একখানা আছে। সে আমার ছোট ভাইয়ের অধিক ছিল রে। ভাইপো থেকে ভাই, ছোট ভাই বেশী আপন। আমরা বন্ধু ছিলাম। খুব ছোটবেলা কালীপুজোর পরদিন ভাইফোঁটা, আমি পিসেমশাই আর পিসীমার সঙ্গে কাশী থেকে পুজোর সময় শ্যামনগর এসে কীর্তিহাট আসতাম। সে আমার হাতের ফোঁটা নেবার জন্যে কাঁদত। একসঙ্গে খেলা করতাম। দশ বছর বয়স তখন। আমার বিয়ের জন্যে পাত্রের খোঁজ হচ্ছে, দেবু আমাকে বলেছিল—পিসী, তোমার বিয়ের পরই তো আমার বিয়ে হবে। তা তুমি বলে দিয়ো, আমি মেম বিয়ে করব। তার মনের কথা প্রথম বিশ বছর সে আমাকে বরাবর জানিয়েছে; তারপর সে বদলেছিল। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘা খেয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছিল পাথরের মত। তার

একখানা চিঠি আমি তোকে দেব—তুই পড়ে দেখিস। আমার মৃত্যুর আগে ওগুলো ছিঁড়ে ফেলব ঠিক করেছিলাম, তাই করতামও। কিন্তু তোকে পেয়ে মনে হচ্ছে, তুই আমার যেন সেই দেবু। তোকে এই চিঠিখানা দেব, তুই পড়ে দেখিস। তার মধ্যে তার একটা ইচ্ছের কথা আছে। ওরে, সে আমাকে লিখেছিল টাকার জন্যেই। কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের বড় ছেলে দেবেশ্বর রায় আমার কাছে হাজার টাকা ধার চেয়েছিল। এই কুইনীর মায়ের বাপের মা অঞ্জনাদির পেটের মেয়ে ভায়লেটের জন্যে চেয়েছিল। আমি দিই নি।

ইচ্ছে করেই দিই নি। নইলে আমার টাকা ছিল। একটু চুপ করলেন অন্নপূর্ণা-মা। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—টাকা দিলে আর দেবেশ্বরকে কীর্তিহাটের বংশের মধ্যে পেতাম না রে। ও ভায়লেটকে নিয়ে কৃশ্চান হয়ে যেতো। টাকাটা চেয়েছিল—। থাক, যে-চিঠিখানা দেব তোকে, তারই মধ্যেই তুই সব দেখতে পাবি।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন—অথচ এর ভিত্‌টা গেড়ে দিয়েছিল আমার দাদা। রায়বাহাদুর গোঁড়া ধার্মিক রত্নেশ্বর রায়।

* * *

সুরেশ্বর বলতে বলতে থামলে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে—বারোটা বাজতে চলেছে। জিরো আওয়ার। কীর্তিহাটের কড়চাও শেষ হয়ে আসছে। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় আর তাঁর বড়ছেলে দেবেশ্বর রায়ের কথা বললেই শেষ। তারপর আমি আর তার শেষপুরুষ, ছবিতে যে-কড়চা এঁকেছি, তার মধ্যে আমি ছবি নই। আমি জীবন্ত। বিংশ শতাব্দীর মানুষ।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় আর দেবেশ্বর রায়ের কাহিনী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই শেষ। পৃথিবীতে ইংরেজ জাতের দীপ্তমধ্যাহ্ন। বৈশাখের মধ্যাহ্ন। ইংরেজ তখন বৈশাখের সূর্যের মত প্রখর প্রদীপ্ত। তার সেই প্রচণ্ড তেজের উত্তাপে বাংলাদেশে জমিদারেরা সুবর্ণরেখার বালুচরের মত সূর্যের চেয়েও অসহনীয় কিন্তু তবু লোকে তাদের সহ্য করে, দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে, তাদেরই বলে 'মা-বাপ'। বালির মধ্যে সোনার দানা বা কণা সত্যই পাওয়া যেত, খুব বেশি না হলেও, নেহাৎ কম নয়। অনেক। অনেক।

ইস্কুল, হাসপাতাল, চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী যা বাংলাদেশে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছিল, তার বারো আনা দিয়েছে এই জমিদারেরা।

সুলতা এতক্ষণে কথা বললে, বললে—আমি তোমাকে সমর্থন করছি সুরেশ্বর। তার সংখ্যাও মোটামুটি আমার জানা আছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইংরেজ সরকার মোটামুটি জেলাওয়ারি একটা জেলা স্কুল, আর একটা সদর হাসপাতাল দিয়েছে। হয়তো বা দুটো-একটা জেলায় দুটো থাকতে পারে কিন্তু দুটোর বেশি নয়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হবার পূর্বে এই হিসেবে আটাশটা জেলায় গোটা-তিরিশেক ইস্কুল গভর্নমেণ্ট দিয়েছে, হাসপাতালও তাই। কিন্তু পার্টিশনের সময় প্রায় চোদ্দশ' ইস্কুল আমাদের দেশে ছিল। এর কিছু ছিল মিশনারীদের। কিছু গ্রামের লোকের চাঁদায়। শতকরা আশীটাই জমিদারদের

দেওয়া। তার সঙ্গে অনেক কথা আসে, সেসব থাক, আমি ওসব শুনতে আসি নি, আমি তোমার রায়বাড়ীর বা কীর্তিহাটের কড়চা দেখতে এসেছি, শুনতে এসেছি। বলে রাখি, এর মধ্যে আমার সঙ্গে তোমার পুরনো হৃদ্যতার জের অবশ্যই আছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন হৃদয়ের আকর্ষণের জের নেই। তুমি কড়চার কথা বল।

ঢং-ঢং-ঢং শব্দে ঘড়িটা বাজতে শুরু করল।

সুলতা বললে—তোমার অন্নপূর্ণা-মা যে চিঠিখানা তোমাকে দিয়েছিলেন, সেই চিঠিটা থেকে শুরু কর। চিঠিখানা তোমার কাছে আছে ?

—আছে। যা তোমাকে বলেছি, যা আমি ছবিতে এঁকেছি, তা যে সব কাগজ থেকে পেয়েছি, সে সব কাগজ আমার কাছে বড় মূল্যবান দলিল সুলতা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এইসব দলিলের দেনা আমাকে শোধ করতে হবে। লোকে আমাকে পাগল বলে। এই তো কালও রায়বাড়ীর অন্ত জ্ঞাতিরা আমাকে গালাগাল দিয়ে গেলেন এর জন্যে। তা দিন। আমার সংকল্প আমি পালন করব।

সামনের টেবিলে জমা-করা কাগজপত্রের মধ্য থেকে একটা ছোট চন্দনকাঠের বাক্স থেকে সুরেশ্বর একখানা খাম বের করলে। সেই ছোট পোস্টকার্ড ছোট খামের আমলের—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি আঁকা খাম। তার মধ্যে থেকে লাইন-টানা চিঠির কাগজে লেখা চিঠি। চিঠির কাগজখানা গিরিমাটির রঙ ধরেছে এবং কোণগুলো ভেঙে গেছে। ভাঁজে ভাঁজে কাট ধরেছে।

* * *

চিঠিখানার তারিখ ১৮৭৮ সাল, বাংলা ১২৮৫ সাল। কলকাতার জানবাজারের বাড়ী থেকেই চিঠি লিখেছিলেন দেবেশ্বর রায়।

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং, পিসী, মদীয় এই পত্র পাইয়া তুমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হইবে। সম্ভবত মদীয় নাম দেখিয়া আমার উপর তোমার ঘৃণারও উদ্রেক হইতে পারে। কিন্তু নিবেদন করিব এই যে, পত্রখানি তুমি পাঠ করিয়া দেখিয়ো। এ-সংসারে তুমি আমাকে আপন দিদির মত যে-প্রকার স্নেহ কর, তাহা অত্যন্ত দুর্লভ। এমতপ্রকার স্নেহ আমাকে আমার পিতা করেন না, মাতাও করেন না। আমি আজ তাঁহাদের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছি। আমাকে একরূপ ঘরে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।

মদীয় বিবরণ তুমি জান। তুমি শুনিয়াছ। অবশ্য পূর্বে তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া করিলে হয়তো এমতপ্রকার অবস্থা বিপর্যয়ে পতিত হইতে হইত না। তবে তুমি ভায়লা বলিয়া যে-অনাথা মেয়েটি পিড্রুজের বাড়ীতে থাকিত, তাহাকে তুমি দেখিয়াছ। তাহাকে তুমি চেন। মেয়েটা আমা অপেক্ষা বৎসর-দুয়ের ছোট। মেমসাহেবদের মত গায়ের রঙ। সে যে অঞ্জনাপিসীর কন্যা, তাহা আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম।

ইহা কি প্রকারে আমি অবগত হইলাম, তাহা বলিয়াছিলাম কিনা জানি না। তাহাই তোমাকে বলিব। না হইলে তুমি সমস্ত বুঝিতে পারিবে না।

আমার বয়স তখন বৎসর-সাতেক, তোমার তখন বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। জানবাজারের বাড়ীতে তৎকালে ছিলাম। মা তখন প্রসবের জন্ত কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমি দেখিতাম এই ভায়লাকে কোলে করিয়া কলিকাতাবাসী একজন গোয়ান সেরেস্তায় আসিয়া দাঁড়ায় এবং সপ্তাহে কয়েকটি করিয়া টাকা লইয়া যায়।

বাবামশায় আসিলে তিনি লোকটাকে লইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কথা বলেন। আমার খুব কৌতূহল হইত। কারণ ছেলেবেলা হইতেই মেমসাহেব আমার খুব ভাল লাগে। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল—তাহার করিলাম। সে ভাঙা-ভাঙা বাংলায় দুই-চারিটা কথা বলিত। ইংরাজী সে জানিত না। আমি তখন ইংরাজী শিখিয়াছি, মাস্টার আমাকে তখন মুখে-মুখে ওয়ার্ড-বুক মুখস্থ করাইয়াছে। আমি মধ্যে মধ্যে ইংরাজী বলিলে সে দুই হাত নাড়িয়া দিত, বুঝাইয়া দিত জানি না। বলিত, পর্টুগীজ পর্টুগীজ।

একদিবস আমার পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী নিজেদের মধ্যে কলহ করিয়া আমাকে জানাইয়া দিলেন যে, ওই মেয়েটি অঞ্জনাপিসীর কন্তা। গভীর রাত্রিকাল তখন। আমি মায়ের নিকট ছোট একখানি খাটে শুইয়াছিলাম, মায়ের খাটে মা শয়ন করিয়াছিলেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, হঠাৎ মায়ের উচ্চকণ্ঠে আমি জাগিয়া উঠিলাম।

প্রথমেই শুনিলাম—ওই যে ফিরিঙ্গী মেয়েটা কোলে লইয়া গোয়ান ছোঁড়াটা আসে, বল, বল, বল সে-মেয়েটা কে? কার মেয়ে? তুমি উহাকে প্রতি সপ্তাহে দশ টাকা করিয়া দাও কিনা? বল?

বাবামহাশয় যেন একটা চাপা গর্জন করিয়া উঠিলেন। চীৎকার করিও না। যাহা বলিবে আস্তে আস্তে বল। একটা কেলেঙ্কারী করিয়া লাভ হইবে না। দেবেশ্বর জাগিয়া উঠিবে।

বলিয়া তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন—দেবেশ্বর। দেবু। বাপি। আমি আগেই ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম। আমি কোন সাড়া দিলাম না, অন্তরে নিদারুণ ভয় সঞ্চারিত হইল। আমি চুপচাপ পড়িয়া রহিলাম। যেন গাঢ় ঘুমে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

তারপর পিসী যাহা সেদিন শুনিয়াছিলাম, তাহার অর্থ সম্যক অনুধাবন করিতে পারি নাই। কিন্তু কথাগুলি ভুলি নাই। জ্ঞান হইবার বোধশক্তি জন্মিবার পর তাহার অর্থ বুঝিলাম। বুঝিলাম—মা সেদিন ওই ভায়লাকে অঞ্জনার কন্তা বলিয়া জানিলেন। অঞ্জনার প্রতি পিতৃদেবের একটা গোপন লালসা বা অনুরাগ ছিল। কিন্তু তিনি তাহা তাঁহার অন্তরে অন্তরে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। এবং অঞ্জনাকে তাহার দরিদ্র বাউণ্ডুলে স্বামীর নিকট হইতে একরূপ ছিনাইয়া লইয়া নিজেদের কাছে কাছে রাখিয়াছিলেন। এতটা সহ্য করিতে পারে নাই অঞ্জনা। সে আলফান্সো পিড্রুজের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিল। এখন আলফান্সো খুন হইয়াছে। গোয়াতে অঞ্জনাদিদি থাকিতে পারে নাই। এবং শরীরেও রোগ ধরিয়াছিল; সেই কারণে বহু কষ্টেই ওই ভায়লা মেয়েটাকে লইয়া কোনমতে কলিকাতায় আসিয়া ফিরিঙ্গিপাড়ায় যেখানে গোয়ানীজরা থাকে, সেইখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এবং এখানে আসিয়া বাবামহাশয়কে পত্র লিখিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। বাবামহাশয়

সপ্তাহে দশ টাকা হিসাবে বরাদ্দ করিয়াছেন, একসঙ্গে সমস্ত টাকা দেন না, তাহার কারণ একসঙ্গে সমস্ত টাকাটা হাতে পাইলে সবটাই খরচ করিয়া ফেলিবে।

বাবামহাশয় নিষ্ঠুরভাবে বলিলেন— হাঁ বাসিতাম। অঞ্জনাকে ভালবাসিতাম বলিয়াই তাহাকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলাম। তোমার নাম করিয়া তোমার নিকটই রাখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার সহিত কোনপ্রকার গাঢ় সম্পর্ক হইতে দিই নাই, তাহা আমার নিষ্ঠুর চরিত্রবল। আমি অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। অত্যন্ত নিষ্ঠুর আমি। আমি আত্মহত্যা করিতে পারি। আমার আঙুল একটি একটি করিয়া ছেদন করিতে পারি। তাহার জন্যই করি নাই। নতুবা অঞ্জনাকে একখানা বাড়ীতে রক্ষিতা হিসাবে রাখিলে কে আমাকে বাধা দিতে পারিত! তোমার এস-ডি-ও সাহেবপিতারও ক্ষমতা ছিল না।

মা কিছু বলতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবামহাশয় বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, চুপ কর, চুপ কর। বৃথা আস্ফালন করিয়া কোন লাভ হইবে না। রত্নেশ্বর আইনকে লঙ্ঘন করিয়া চলে না। তোমার বাবা আইনের বাহিরে যাইতে পারেন না। তাহা ব্যতীত বাবার উপরে বাবার মত এস-ডি-ও'র উপর ম্যাজিস্ট্রেট, তাহার উপর কমিশনার, তাহার উপর লেফ্‌টেন্যান্ট-গভর্নর আছেন; এদিকে জজকোর্ট আছে, হাইকোর্ট আছে। ইহাদের দিয়াই আমি সহস্র সহস্র দুর্ধর্ষ প্রজাকে পদানত করিয়াছি। বৃদ্ধি লইয়াছি। তাহাদের পায়ের গোলাম করিয়া রাখিয়াছি। তোমার বাবার কাছেই শুনিয়াছি যে, সরকারী মহলে আমার যত সুনাম, তত দুর্নাম। তবুও তাঁহারা আমার প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন না। তেমনি ভাবেই অঞ্জনাকে—। থাক, কথাগুলো উচ্চারণ করিতেও ঘৃণাবোধ হইতেছে। নারীজাতি অতি ঈর্ষাপরায়ণ, অঞ্জনা মরণাপন্ন, তাহার ওই শিশু-কন্যাটি লইয়া নিরাশ্রয়, আমি তাহাকে সামান্য সাহায্য করি, তাহাও তোমার সহ্য হইতেছে না।

পিসী, কথাগুলো আমি কোনদিন ভুলিতে পারি নাই। ইহার পর একদিন সেই গোয়ানটার সঙ্গে চুপি চুপি অঞ্জনাপিসীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। অঞ্জনাপিসীকে চিনিতে খুব কষ্ট হয় নাই, কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছিলাম। অঞ্জনাপিসী খুব আদর করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল—আঃ! কি কপাল, আর কি বিধান। দেবুর সঙ্গে ভায়লার বিবাহ হইবার উপায় নাই। হইলে কি ভালই না হইত।

পিসী, কথাগুলা সে-সময় বোধহয় তোমাকে বলিয়াছিলাম। যেবার অঞ্জনাপিসীর মৃত্যুর পর বাবামহাশয়ের ব্যবস্থায় ভায়লেট গোয়ানপাড়ায় পিড্রুজদের বাড়ীতে আশ্রয় পাইল, পিড্রুজের সংভগ্নী পরিচয়ে এবং তুমি তাহাকে প্রথম দেখিলে সেবার বোধহয় তোমাকে কথাগুলি বলিয়াছিলাম। তোমার হয়তো মনে নাই।

কিন্তু আমার ইহাই সর্বনাশ ঘটাইয়াছে। আমি ভায়লেটকে ভালবাসিয়াছি। সে-ও আমার প্রতি আশ্চর্যরূপে অনুরক্ত। তাহাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না, সে-ও আমাকে ছাড়িয়া বাঁচিবে না। ধর্মমতে বিবাহ না হইলেও, আমরা স্বামী-স্ত্রীই হইয়া গিয়াছি। এবং আশঙ্কা করিতেছি, কিছুদিনের মধ্যে এ-ঘটনা আর লোকচক্ষে অপ্রকাশ থাকিবে না।

তুমি তো বাবামহাশয়কে জান। এ-কথা তিনি জানিতে পারিলে হয় ভায়লেট মরিবে,

নয় আমাকে চরম অপমানে অপমানিত করিয়া দূর করিয়া দিবেন। তাহা আমি চাহি না। আমি ভায়লেটকে লইয়া চলিয়া গিয়া কৃশ্চান হইয়া বিবাহ করিব। এবং দরিদ্র ভাবেই জীবনযাপন আরম্ভ করিব। তবে আমার ভরসা আছে এই যে, যদি আমি কিছু টাকা একসঙ্গে সংগ্রহ করিতে পারি, তবে আমি তাহা হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া উন্নতি করিতে পারিব। মাইকেল মধুসূদন মহাকবি হইয়াছিলেন। আমি হইব না কে বলিতে পারে?

তোমার হাতে টাকা আছে। তুমি তো টাকা পাইয়াছ। আমাকে কয়েক হাজার টাকা ধার দিতে পার পিসী! আমি শোধ দিব, নিশ্চয় শোধ দিব। আমাকে বিশ্বাস কর —আমাকে বিশ্বাস কর। আমাকে বাঁচাইতে পার তুমি, বাঁচাইবে? মায়ের গয়না আমি চুরি করিতে পারি—টাকাও চুরি করিতে পারি। কিন্তু তাহা আমি করিব না। তোমার ভাইপো চোর নয়।

সুরেশ্বর কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভাবলে। পুরানো চিঠিখানার শেষের পাতাটার নীচের দিকটা উপরে ছিল বলে ময়লা একটু বেশী হয়েছিল। চিঠিখানার ওই অংশ থেকে চোখ তুলে বললে—এই অংশটা আমার খুব ভাল লাগে। দেবেশ্বর রায়কে এই অংশ থেকে স্পষ্ট চেনা যায় জানা যায়। কথাগুলো খুব দামী—সেই বয়সে দেবেশ্বর রায় কি করে যে লিখেছিলেন, তা বলতে পারব না। কথাগুলো শোন, শুনলেই বুঝতে পারবে।"

"পিসী আমার ভয় হইতেছে যে, তুমি আমাকে বুঝিবে না, বুঝিতে চাহিবে না। তুমি বাবামহাশয়ের সহোদরা হইলেই ভাল হইত। আশ্চর্য বোধ হয় এই যে, বিমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় দাদামহাশয়ের সন্তান পোষ্যপুত্র সূত্রে বীরেশ্বর রায়ের পুত্র হইয়া অবিকল তাঁহার স্বভাব কিরূপে পাইলেন? তুমি বাবামহাশয়ের অপেক্ষাও জেদী। এই বয়সে একটি সন্তান লইয়া জেদের বশে স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহ হইতে নির্বাসন লইয়া কাশীতে বিমলাকান্ত দাদামহাশয়ের কাছে পালক-পিতার কাছে গিয়া সংসার পাতিয়াছ। পিতৃবংশের সহিত মামলা করিবে না—ইহা তোমার জেদ। জেদ করিয়া তুমি স্বামীকে ছাড়িয়াছ। তাহা ছাড়া সারা দেশের মেয়েরাই এমন যে, জাতের জন্য স্বামী তাহারা অনায়াসে ছাড়িতে পারে। স্বামী কৃশ্চান কি মুসলমান হইল—স্ত্রী জাতের জন্য স্বামীকে ছাড়িল। পুরুষেও পারে। তাহাই করে। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় নবকুমারের প্রথম পক্ষের স্ত্রী পদ্মাবতীর কি অপরাধ বল? জোরপূর্বক তাহাদের বাপ-মায়ের সহিত তাহাকেও মুসলমান হইতে হইল। তাহার জন্য নবকুমার পরিত্যাগ কেন করিবে। কিন্তু ইহাই এ-দেশে হয়। পিসী, ইহাই আমি পারি না। পারিব না। আমার কাছে জাতিধর্ম অপেক্ষাও প্রেম বড়। যাহাকে ভালবাসিয়াছি, তাহাকে ছাড়িতে পারিব না। তাহারই জন্য তোমার নিকট আমি সকাতরে আবেদন করিতেছি। পিসী, এই সাহায্যটুকু তুমি আমাকে কর। তোমার ভাইপো দেবু তোমাদের শিবঠাকুরের মত। সে প্রেমের জন্য প্রিয়তমার জন্য অঙ্গে ছাই মাখিয়া শ্মশানের পোড়াবাঁশ ও চ্যাটাইয়ে ঘর বাঁধিয়া, ভিক্ষা করিয়া থাকিতেও রাজী আছে। কিন্তু এত কষ্ট সহিবে না। অভ্যাস নাই। অভ্যাস করিতে গেলে অকালমৃত্যু ঘটিবে। পিসী, তাহা কি সহ্য করিতে পারিবে? তুমি আমাকে টাকা ধার দাও। আমি তাহা মূলধন করিয়া ব্যবসা করিব, ঘর বাঁধিব।

* * *

শেষের দিকটায় কাব্য একটু বেশী হয়েছে এবং রোমান্টিক হয়ে পড়েছেন। তা হোন, সেটা আমি ধরি নি, কারণ তখন রত্নেশ্বরের বয়স সবে ষোল পার হয়ে সতেরোতে পড়েছে। গ্রামেই হাই ইংলিশ স্কুল ছিল, কিন্তু রায়বাহাদুর ছেলেকে জানবাজারের বাড়ীতে রেখে পড়াতেন। পড়তেন হিন্দু স্কুলে। তাঁর কাছে থাকত গোপাল পাল, ঠাকুরদাস পালের এ-পক্ষের বড় ছেলে। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের বিয়ের ঠিক আগেই বা ঠিক পরেই তাঁরও বিয়ে হয়েছিল রঙলাল ঘোষের পিসীর সঙ্গে। সে-কথা আগেই বলেছি।

১৯৩৭ সাল থেকে আবার পিছিয়ে চল সুলতা। সময়টা ১৮৭৬ সাল। রত্নেশ্বর রায় শ্যামনগরে হাই-ইংলিশ স্কুল স্থাপন করলেন। ১৮৭৬ সালে রত্নেশ্বর রায় হাই-ইংলিশ স্কুল। বিমলাকান্ত তখনও বেঁচে; তিনি বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন—না রত্নেশ্বর, আমি আজও বর্তমান রয়েছি। আমার নামে নয়। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কেন? তাতে কি হল? এই তো কীর্তিহাটের স্কুলের এম-ই স্কুল বাবা থাকতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, নাম দেওয়া হয়েছিল বীরেশ্বর রায় এম-ই স্কুল। তারপর স্কুল এণ্ট্রান্স স্ট্যাণ্ডার্ড হল, তখন তার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে বীরেশ্বর রায় এম-ই এ্যাণ্ড রত্নেশ্বর রায় এচই-ই স্কুল নাম দেওয়া হয়েছে। তাতে অন্যায় হয়েছে বলতে চান? তাছাড়া কর্মের জন্য নিন্দাই বলুন আর প্রশংসাই বলুন, এ-প্রাপ্য হল তার যে সেই কর্ম করে। সে সমাজে বলুন, রাজদ্বারে বলুন, অথবা বিধাতার বিচারালয়েই বলুন। সালটা ওই ১৮৭৮।৭৯ সাল।

এসব কথাই চিঠি মারফৎ চলছিল সুলতা।

বিমলাকান্ত লিখেছিলেন—"তাহা হইলে এ স্কুল তোমার নামেই স্থাপিত হওয়া উচিত, আমার নামে নয়। অথবা শুধু গ্রামের নামেই নামকরণ হওয়া উচিত। শ্যামনগর হাই-ইংলিশ ইস্কুল। কারণ শ্যামনগরের জমিদারী স্বত্ব আমাদের বংশের বা আমার হইলেও ইহার আসল মালিক কীর্তিহাটের রায়বংশ। তাঁহাদের অর্থেই এ লাট আমার নামে ক্রয় করা হইয়াছিল। তৎপর তাহা পত্তনী লইয়াছেন কীর্তিহাটের রায় অর্থাৎ তুমি। এই লাটের বৃদ্ধি লইয়াই একদা দে-সরকারদের সহিত তোমার বিরোধ বাধিয়াছিল। তাহা হইতেই বহু ঘটনা ঘটিয়াছে। রবিনসন সাহেব আসিয়া কুঠী করিতে গিয়া মরিয়াছে। দে-সরকারেরা গিয়াছে। এখন জমিদারী আমার কিন্তু পত্তনীদার হিসাবে খাস দখল তোমার। তুমি এই লাটের মোট আদায় ৫৬০০ টাকার মধ্যে সরকারকে দেয় রাজস্ব ৪০০০ টাকা বাদে ১৬০০ টাকা আমাকে ঠাকুরের সেবায়েত হিসাবে লভ্য প্রদান করিয়া থাক। লাভ তোমাদের এস্টেটের কিছুই নাই আছে লোকসান। আদায় খরচা লোকসান লাগে। লাভ বলিতে শ্যামনগর রাধানগর এবং ঠাকুরপাড়া এবং পাইকপাড়া কয়েকটির খাস দখল বা অধিপতিত্ব। তুমি এই গ্রামের বৃদ্ধির জন্য একদা জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিলে—এবার শ্যামনগরে বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়া সমুদয় মৌজার ডৌল জমার উপর সিকি বৃদ্ধি দাবী করিয়াছ। অর্থাৎ ৫৬০০ টাকার সিকি ১৪০০ টাকা বৃদ্ধি হইবে। ইহার সহিত কিছু খাসদখলী জমি ইত্যাদিও দেওয়া হইবে। ইহা সবই রায় এস্টেটের দান। সুতরাং

ইহাতে কোনপ্রকার কীর্তি স্থাপনের গৌরব বা পুণ্যের দাবী শ্যামনগরের ভট্টাচার্য বংশের নাই। সুতরাং ইহা তোমার নামেই স্থাপন কর। আরও একটা শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করাইয়া দিই। "সর্ব্বত্র জয়মিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম।" তোমার গৌরবেই আমার গৌরব। পিতৃ-পুরুষের গৌরব।

প্রসঙ্গক্রমে লিখি যে ঠাকুরদাস আমাকে এ সম্পর্কে পত্র লিখিয়াছিল। শ্যামনগরে বৃদ্ধির প্রস্তাবে সে খুবই ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এবং তৎসঙ্গে আর ভদ্রজনেরাও আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, আমি যেন ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া এই বৃদ্ধি নিবারণ করি। কিন্তু আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া পত্রাদি লিখিয়াছি। এবং এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে গ্রামের যে কি প্রকার উপকার হইবেক তাহাও বুঝাইয়াছি। তাহারা আমার পত্রের আর উত্তর দেন নাই কিন্তু জানিলাম কথাটা ঠিক তাহারা মানিতে চাহেন নাই। তোমাকে এই বৃদ্ধির জন্য অনেক অর্থাদি ব্যয় করিতে হইয়াছে। প্রায় দুইশত জোতের উপর বৃদ্ধির নালিশ চলিয়াছে হাই-কোর্ট পর্যন্ত। তাহাতে কৃতকার্য হইয়া তুমি মায়-খরচা ডিগ্রী পাইয়াছ। তাহাতে অবশ্যই আমি খুশী হইয়াছি। এ সম্পর্কে ঠাকুরদাস কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। সে আমাকে এই লইয়া একখানা পত্র লিখিয়াছে। পত্রখানায় যে ক্ষোভ আছে তাহা নিশ্চয়ই আমি সমর্থন করিতেছি না। তুমি যেমন তাহার জোতের উপর বৃদ্ধি লইয়াছ তেমনি তাহাকে নিষ্কর দিয়াছ এবং যথেষ্ট করিয়াছ। কিন্তু তাহার একটা কথায় আমার খটকা লাগিয়াছে। আমি সন্দেহ করিতেছি যে, সে কোনরূপে আমার সহিত তোমার এবং ভবানী ভগ্নীর সহিত আমার সম্পর্কের কথা জানে বা জানিতে পারিয়াছে।"

রত্নেশ্বর রায় এ পত্রের কোন উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে ইস্কুলের নাম রেখেছিলেন রত্নেশ্বর রায় হাই-ইংলিশ স্কুল। এবং ঠাকুরদাস পালের নাম আর কোন কিছুতে উল্লেখ পাই নি।

রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে চিঠিটার কথা উল্লেখ আছে। "অদ্য কাশী হইতে পত্র পাইলাম। পিসামহাশয় পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার পত্র পড়িয়া ঠাকুরদাসকে বাজাইয়া দেখিব বলিয়া তাহাকে আনিতে লোক পাঠাইলাম। পিসামহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য হইলে তো ঠাকুরদাসকে—।"

আর কিছু লেখেন নি তিনি। তারপর লিখেছেন—"কথাটা সত্য মনে হইতেছে। ইদানীং ঠাকুরদাস আমাকে নির্জনে পাইলে শ্যামনগরের বৃদ্ধি লইয়া পূর্বের সম্পর্ক ধরিয়া নির্বোধ আমাকে দাদাঠাকুর সম্বোধন করে এবং আমার সহিত বাকযুদ্ধ করিতে সাহসী হয়। আমি সহ্য করি কিন্তু মাত্রা ছাড়াইবার উপক্রম করিলেই কিছু কঠোর কণ্ঠে 'ঠাকুরদাস' বলিয়া ডাকিলেই বা সজোরে গলাঝাড়া শব্দ করিলেই চুপ করিয়া যায়। আমি আঙুল দেখাইয়া বলি—যা বাহিরে যা। সাধারণ লোকের মগজে গোবর থাকে, তোর মগজে মহিষের বিষ্ঠা পোরা আছে। তর্ক করিস না, বাহিরে যা!

সে বাহিরে যায় কিন্তু বারান্দায় বা এমন কোন স্থানে বসিয়া যেন আপন মনেই বলে— "ঘি দিয়া ভাজ নিমের পাত—নিম না ছাড়েন আপন জাত।" অথচ তাহার উদ্দেশ্য কথাটা

আমাকে শোনানো।

যে সব মূর্খেরা ইস্কুলের উপকারিতা বুঝে না, শুধু খাজনা বৃদ্ধিটাকে অপমান বোধ করে, তাহাদের উন্নতিবিধান করিতে ভগবানেরও সাধ্য নাই। ইহারা ইংরাজকে দেখিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িবে। এ দেশী ইংরাজী জানা ব্যক্তিকে ইংরাজের সমকক্ষ ভাবিবে—অথচ নিজেরা কিছুতেই ইংরাজী শিখিবে না। বলিবে—কি বলিতেছেন মহাশয়, আমরা যদি ইংরাজীই শিখিব তবে চাষবাস করিবে কাহারা? আপনাদের ভৃত্যগিরি করিবে কাহারা? কিন্তু আশ্চর্য, প্রজা হিসাবে ইহাদের আর একটা চেহারা আছে। ঠাকুরদাস পালের ঘরে যখন জমিদারের দেওয়া আগুনে স্ত্রীপুত্র পুড়িয়া মরিয়াছিল, সে ছবি আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।"

* * *

এরই মধ্যে ঘটনাটা ঘটল। চতুর্দশী ভায়লেটের প্রেমে পড়লেন দেবেশ্বর। কিন্তু দেবেশ্বরকে আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখলে ঠাকুরদাসের দ্বিতীয়পক্ষের বড় ছেলে গোপাল।

রত্নেশ্বর রায় পত্র লিখে ঠাকুরদাসকে আসবার কথা জানালেন। কিন্তু সে এল না। রত্নেশ্বরের ডায়রীতে আছে—"অন্ত কেহ হইলে ঠাকুরদাস পাল বলিয়া কেহ আর শ্যামনগরে ইহার পর থাকিত না।

ইতিমধ্যেই পিক্রুজ আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছে যে, গোপাল অঞ্জনার কন্যা ভায়লেটকে লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিতেছে। কতদিন হইতে ব্যাপারটা ঘটিয়াছে তাহা সঠিক বলিতে পারিল না, তবে কিছুদিন হইতে অর্থাৎ এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দেবেশ্বরের সঙ্গে সে এখানে আসিয়া এইরূপ কাণ্ড শুরু করিয়াছে। সুতরাং পিক্রুজকে দিয়া অনায়াসে এই ঘটনা লইয়া ঠাকুরদাসের সঙ্গে ঝগড়া বাধিতে পারে। ঠাকুরদাসের সঙ্গে পিক্রুজদের একটা বিবাদ ইতিমধ্যেই জন্মিয়াছে। শ্যামনগরের বৃদ্ধি কোর্ট মারফৎ মামলার রায়ের বলে হইলেও আমাদের কাছারীতে পিক্রুজ এবং তাহার অনুচরেরাই মোতায়েন আছে। কিন্তু না, তাহা করিব না। তাহাতে অধর্ম হইবে। অধর্ম আমি করিব না। পূর্বের সে-সকল দিবস বিগত হইয়াছে, যে-কালে প্রজার ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া চলিত। ইচ্ছামত গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করা চলিত, তাহাদের ঘরের বধূকন্যা জোরপূর্বক হরণ করা মাত্র একটা হুকুমের অপেক্ষা রাখিত। আজ নূতন কাল নূতন আলোক নূতন উত্তাপ অনুভব করিতেছি। দক্ষিণেশ্বর গিয়া আশ্চর্য মানুষ দেখিয়া আসিলাম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। পূর্বে রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের নিকট দীক্ষা লইয়াছি নহিলে এই মহাসাধকের নিকট দীক্ষা লইয়া ধন্য হইতাম। বাংলাদেশের মানুষের বিশেষ করিয়া কলিকাতার যেন একটা নূতন জোয়ার আসিতেছে। তাহা ছাড়া ভায়লেট অঞ্জনার কন্যা।

যাহা হউক দেবেশ্বরকে ডাকিয়া গোপাল সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিলাম। দেবেশ্বর নতমুখে দাঁড়াইয়া শুনিল এবং ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে সাবধান করিয়া দিবে। দেবেশ্বর আমার কুল-উজ্জ্বলকারী পুত্র। যেমন রূপে কন্দর্প কি কুমার কার্তিকেয়, তেমনি গুণে মেধায় অসাধারণ। বাল্যকালে আমার নিজের মেধা ও স্মৃতির কথা স্মরণ করিয়া মনে করিতে সংকোচ নাই যে সে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সকল লজ্জাকর কথাগুলি সে শুনিল—মাথা

হেঁট করিয়াই শুনিল—ক্ষণে ক্ষণে সে লাল হইয়া উঠিতেছিল কিন্তু আমার মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিল না। কোন প্রশ্ন করিল না। হাঁ, ইহাই তো আভিজাত্য। ইহাই তো শীলতা। কিন্তু আমি ভাবিতেছি হতভাগ্য গোপালের কথা।"

ভায়লেটকে রত্নেশ্বর রায় নেপথ্যে থেকে অঞ্জনার কন্যা হিসেবে মানুষ করছিলেন। শেষ জীবনটায় তিনি তাকে অর্থসাহায্য করেই কর্তব্য শেষ করেন নি, তার মৃত্যুকালে গোপনে তার বাড়ীতে গিয়ে ভায়লেটের ভার নিয়ে এসেছিলেন। ভার নিয়ে তাঁর সমস্যা দাঁড়িয়েছিল কি ভাবে ভায়লেটকে মানুষ করবেন? সেই গোয়ানীজ আধাপর্তুগীজটার মত? কিংবা অঞ্জনার মেয়ের মত? আলকানসো পিক্রুজের দেহের গাড়ন গায়ের যা রক্ত তাতে তাকে বারো আনা পর্টুগীজ বলা চলত। এবং তার যা চরিত্র তার যা পেশা তাতেও তাকে হারমাদদের খাঁটি বংশধর বলা যেত। কিন্তু অঞ্জনা বামুনের মেয়ে; সেকালে রত্নেশ্বর রায়ের মত জমিদারপুত্রের মুখে দু'চারটে সরস কথা শুনে আর তার নিজের প্রতি কয়েকটা তারিফ বাক্য শুনে বামনের চাঁদ ধরার সাধ জেগেছিল—নিজে গলে জল হয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রত্নেশ্বরের যে স্পর্শে সে গলতে পারত সে স্পর্শ পায় নি বলেই ক্ষোভের বশে চলে গিয়েছিল ওই দুঃসাহসী আলকানসো পিক্রুজের সঙ্গে। হয়তো সে সেদিন আরও ঘৃণ্য কাউকেও বরণ করতে পারত। কিন্তু তার মোহ বেশীদিন টেঁকে নি। এবং ভাগ্যক্রমে আলকানসোও তার হারমাদি ট্রাডিশনকে উজ্জ্বলতর করে খুন হয়ে তাকে রেহাই দিয়েছিল। অঞ্জনা আবার ফিরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু ফেরা আর সম্ভবপর ছিল না এবং উপায়ও ছিল না। একদিকে সমাজ ছিল কঠোর; আর অন্যদিকে তার নিজেরও ধরেছিল মৃত্যু-রোগ। মৃত্যু আসন্ন বুঝে সে রত্নেশ্বর রায়কে শেষ দেখা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। এবং তা সে পেয়েও ছিল। রত্নেশ্বর রায় ওই পিছন দিকের মেথরদের দরজা দিয়েই ময়লা কাপড়জামা প'রে নিঃশব্দে চোরের মত বেরিয়ে গিয়েছিলেন এই জানবাজারের বাড়ী থেকে। এবং গিয়ে উঠেছিলেন দেশী কৃশ্চানপাড়ায় ওই এলিয়ট রোডের আশেপাশে কোন একটা খোলার বাড়ীতে।

বিস্তৃত বিবরণ লেখেন নি রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে। সে লিখবার মত লোক তিনি ছিলেন না। কঠিন কাঠের মত লোক। কাঠ হলেও বলব রত্নেশ্বর রায় ছিলেন সেকালে চন্দন কাঠ। কিন্তু রক্তচন্দন। অত্যন্ত শক্ত। অনেক ঘষলে তবে রক্তরাঙা কাঠের রস বের হয়।

যাক। অঞ্জনার কাছে বাগ্‌দান করে এসেছিলেন—ভায়লেটকে তিনি এই কলকাতার বাড়ীতে যেন ফেলে না রাখেন। কোন মিশনে না দেন। যাতে ও একেবারে ফিরিঙ্গী কৃশ্চান না হয়ে যায়। অঞ্জনা বলেছিল—দেশে তো অনেক দেশী কৃশ্চান আছে—মুখুজ্জে বাঁড়ুজ্জে চাটুজ্জে—বামুন কৃশ্চান, কায়স্থ কৃশ্চান, বণ্ডি কৃশ্চান আছে তো। তেমনি দেখে একটা বিয়ে দিলে আমি স্বস্তি পাব।

কথা দিয়ে এসেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু কাজটি করা খুব সহজ ছিল না সুলতা। তবু তিনি করেছিলেন যথাসাধ্য। হিলডার বাবা পিক্রুজের সঙ্গে আলকানসোর সম্পর্ক ছিল খুড়ো-ভাইপো। খুব নিকট সম্পর্ক, কিন্তু ওদের সমাজে তো সম্পর্কের মূল্য খুব বেশী নয়। তবে সেখানে রত্নেশ্বর রায়ের দাক্ষিণ্যে মূল্যটা হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত বাস্তব; টাকা আনা

পাই। এবং কীর্তিহাটের গোয়ানপাড়ায় বাড়ী ঘর পর্যন্ত। এবং এই পিক্রুজই ভায়লাকে তার সৎবোন পরিচয় দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গোয়ানপাড়ায়। সেখানে কয়েকটা বছর কাটতে কাটতে ভায়লা যখন বারো-তেরো বছরের হয়ে উঠল, তখন রত্নেশ্বর রায় অকস্মাৎ একদিন মেয়েটাকে দেখলেন। দেখলেন কিশোরী ভায়লার চোখে একটু বিচিত্র দৃষ্টি ফুটছে। এবং গালে যেন একটা লালচে আভা দেখা দিয়েছে। গোয়ানপাড়ায় অন্য রঙ্গিণী মেয়েগুলোর সঙ্গে রঙ্গ ক'রেই ওই কাঁসাইয়ের দহে নেমে জল তোলপাড় ক'রে স্নান করছিল। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বিবি মহলের ছাদে। তামাটে রঙের মেয়েগুলোর মধ্যে উজ্জ্বলতমা কালো কুঞ্চিতকেশিনী ভায়লেটকে চিনতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে। এবার অঞ্জনার কাছে শেষ প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে, দেশী কৃশ্চানের ঘর দেখে।

তাদের সমাজ স্বতন্ত্র, জীবনের ভঙ্গি স্বতন্ত্র। তারা ধর্মে কৃশ্চান কিন্তু তারা ফিরিঙ্গী নয়। তারা ভারতীয় কৃশ্চান। সেকালে বামুন কৃশ্চান কায়স্থ কৃশ্চানের সঙ্গে করণ কারণ করত না। করলেও তা খুব বেশী নয়—বিরল ছিল। ব্রাহ্মদের মধ্যেও তাই।

তবু অর্থের জোর এবং জেদী শক্তিশালী মানুষেরা সব পারে। তার সঙ্গে যদি বুদ্ধি এবং কৌশলের মাথা থাকে তবে লক্ষ্মী সরস্বতী শক্তি একসঙ্গে অঘটন ঘটাতে পারে সুলতা।

রত্নেশ্বর রায়ের তিনই ছিল।

শুধু রত্নেশ্বর রায় কেন গোটা বাংলাদেশে জমিদারদের দিকে তাকিয়ে দেখ, এই কালটা তাদের উজ্জ্বলতম জীবনাধ্যায়। মুঘল আমলের একেবারে মধ্যযুগীয় হালচাল বদলে গিয়ে নতুন হালচাল শুরু হয়েছে। যে হালচালের জন্য ইংরেজ সরকার একটু সচকিত হয়েছেন। সাত-আট বছরের মধ্যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস জন্ম নেবে এইসব বিত্তসম্পত্তিশালী এবং ইংরিজী লেখাপড়া জানা লোকেদের নেতৃত্বে। বিবেকানন্দের পদধ্বনি নেপথ্যে তখন বাজছে। সুতরাং ইংরেজের চকিত না হয়ে উপায় ছিল না। তারা রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে যা করছে—করছে, তার সঙ্গে মিশন ইস্কুলগুলোও কাজ করে যাচ্ছে। শুধু ঈশ্বরের পুত্র জেসাস ক্রাইস্টের অনুগামী ভক্ত তৈরী করছে না, কৃশ্চান ইংরেজ রাজ্যের খুঁটি তৈরী করবার কল্পনা করছে। রত্নেশ্বর রায় মেদিনীপুরের মেয়েদের মিশন ইস্কুলে ভায়লেটকে ভর্তি করবেন ভাবলেন। কিন্তু সেখানে ব্রাত্যদের, বিশেষ করে সাঁওতালদের ভিড় দেখে ওখান থেকে ফিরে এসে ভাবছিলেন কি করবেন?

সেদিনের তাঁর ডায়রীতে আছে—"পিক্রুজকে লইয়া কৃশ্চান মিশন দেখিতে মেদিনীপুর শহরে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে দেখিলাম—যাহাদের কৃশ্চান করিয়া পাদরী সাহেবরা লেখাপড়া শিখাইতেছে তাহাদের অধিকাংশই সাঁওতাল অথবা এদেশে যাহাদের আমরা চুয়ার বলিয়া থাকি তাহারাই। এখানে ভায়লেটকে দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাহাতে মহা অপরাধ হইবে। সুতরাং বহু চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম ইহাদের যে একটি খড়ো গির্জা উহারা খাড়া করিয়াছে, সেইটিকে মেরামতাদি করাইয়া একজন আমাদের দেশী কৃশ্চান পাদরীকে বেতন দিয়া লইয়া আসিব। সে পাদরীর কাজ করিবে এবং একটি পাঠশালাও

করিয়া দিব। সেখানে ছেলেমেয়েরা কিছু কিছু পড়িবে। তাহার দ্বারাই ভায়লেটকে বিশেষ করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করিব। এই পাদরী সাহেবকে দিয়া ভায়লেটকে adopted daughter করাইয়া জাতে উঠাইব।"

সব ব্যবস্থাই অত্যন্ত দ্রুত করে ফেলেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। এবং প্রাথমিক ইস্কুলটির জন্যই তাঁর এতগুলি ইস্কুল—গোটা আষ্টেক মাইনর স্কুলে আংশিক সাহায্য, কীর্তিহাটে শ্যামনগরে দুটো এইচ ই ইস্কুল, কীর্তিহাটে একটা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী করা সার্থক হ'ল। এই প্রাইমারী স্কুলটির দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এবং সেই বৎসরই তিনি হয়েছিলেন রায়বাহাদুর। সেটা ১৮৭৭ সাল। এবং সেই উপলক্ষেই রত্নেশ্বর রায়ের যুবরাজ দেবেশ্বর দেখলেন ভায়লেটকে।

দেবেশ্বরের বয়স তখন পনের বছর। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে কীর্তিহাটে এসেছিলেন বাপের নির্দেশে। সঙ্গে এসেছিল গোপাল।

গোপাল ছিল দেবেশ্বরের সাথী অনুচর—মুখে বলতেন দাদা।

ঠাকুরদাস পাল তার দাদাঠাকুরকে ত্যাগ করেছিল। কমলাকান্ত রত্নেশ্বর হলেন, ঠাকুরদাস তাঁকে ছাড়ল। কিন্তু গোপাল দেবেশ্বরের সঙ্গে থাকল—তাতে আপত্তি করে নি। নিজেও দেবেশ্বরকে প্রাণের তুল্য ভালবাসত।

অনুষ্ঠানটা হয়েছিল সরস্বতী পূজার সময়। সভায় গাঁদাফুলের মালা পরিয়েছিল ভায়লেট। ডায়াসে বসেছিলেন সস্ত্রীক ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট। নিচে দুপাশে দুখানা চেয়ারে সিমেট্রি রেখে বসেছিলেন পিতাপুত্র; একদিকে রত্নেশ্বর রায় অন্যদিকে দেবেশ্বর রায়। এবং তাঁদের সঙ্গে আরও অভ্যাগত সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। তাদের সঙ্গে ছিলেন নবনিযুক্ত বৃদ্ধ বাঙালী পাদরী সাহেব।

গাঁদাফুলের মালা বোঝাই ঝুড়ি নিয়ে পিক্রজ যাচ্ছিল ভায়লেটের সঙ্গে, ভায়লেট তার নির্দেশমত মালা পরিয়ে দিচ্ছিল অতিথিদের গলায়। সবশেষে পালা এল দেবেশ্বরের—শেষ মালাটি ভায়লেট পরিয়ে দিলে দেবেশ্বরকে। সঙ্গে সঙ্গে দেবেশ্বর হলেন শরাহত।

* * *

দেবেশ্বর রায় জীবনে ডায়রী রাখেন নি। জীবনে সেদিনের যে বিবরণটুকুর কথা বললাম সেটুকু দেবেশ্বর রায়ের কোন কিছু থেকে পাই নি। পেয়েছি তাঁর পিতা স্বনামধন্য কীর্তিহাট-সিংহ রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী থেকে। ভায়লেট যখন দেবেশ্বরের গলায় মালা পরায় তখন ভায়লেট নিজেই আড়াল ক'রে দেবেশ্বরকে ঢেকে রেখেছিল। এবং নিজে ভায়লেটও পিছন ফিরে ছিল রত্নেশ্বর রায়ের দিকে, নইলে নিশ্চয় তিনি দুজনের মুখ দেখে ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারতেন। হয়তো সেইদিনই ভায়লেট দেবেশ্বর রায়ের নাগালের অনেক বাইরে চলে যেতো।

চোখেও দেখেন নি কিছু, কানেও দেবেশ্বর সম্পর্কে কোন নিন্দার কথা শোনেন নি। তিনি যে কঠোর নিষ্ঠায় নিজেকে সংযমের শাসনে শাসিত রেখেছিলেন তা অজনার বিবরণেই স্পষ্ট, এ ছাড়াও মধ্যে মধ্যে তাঁর ডায়রীতে যে সব অকারণ আত্মনির্যাতনের বিবরণ পাওয়া

যায় তা পড়ে বিস্মিত হতে হয় এবং সে বিস্ময় একটা ভয়ে পরিণত হয় স্থূলতা, যখন জানতে পারি যে কোন নারীর প্রতি আকর্ষণকে নিঃশেষে মুছে ফেলবার জন্য নিজের অন্তরের কোমলতম অংশের একটুকরো পর্দা ঝামা দিয়ে অথবা উখা দিয়ে ঘষে তুলে দিতেন। তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এবং তার থেকে তিনি সম্পত্তি অর্জনের ব্যাপারে যে কত সুবিধা পেয়েছেন, তার হিসেবও রায়বাড়ীর জবানবন্দীর একটা বড় হিসেব। কিন্তু সে কথা থাক। দেবেশ্বর রায়ের কথা বলি।

দেবেশ্বর রায় ভায়লার দেওয়া মালা কণ্ঠে ধারণ করে শরাহত কুরঙ্গের মত লুটিয়ে পড়লেন। সভা থেকে ফিরে এসে শরীর ভাল নেই বলে শুলেন। ডাক্তার এসে দেখে গেল। বলে গেল সর্দি হয়েছে। বিশেষ কিছু না।

কিন্তু দেবেশ্বর রায়ের গোপালদা বুঝেছিল—তার রাজাভাইয়ের কি হয়েছে। গোপাল দেবেশ্বর থেকে মাস কয়েকের বড় কিন্তু এ সব বিষয়ে দেবেশ্বর থেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। লেখাপড়ার পালাও সে তখন শেষ করেছে। প্রথমটা কীর্তিহাট এইচ ই স্কুলে দেবেশ্বর এবং সে দুজনেই পড়ত, অবশ্য দেবেশ্বর পড়ত উঁচু ক্লাসে; সে পড়ত নিচে। তারপর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতেই ছেলেকে কলকাতার শিক্ষায় শিক্ষিত করতে রত্নেশ্বর রায় দেবেশ্বরকে কলকাতায় পাঠিয়ে গার্জেন টিউটারের তত্ত্বাবধানে রেখে দিলেন। গোপাল কীর্তিহাটে ফেল ক'রে ক'রে চলে গেল শ্যামনগর। মধ্যে মধ্যে পালিয়ে এসে উঠত কলকাতায় জানবাজারের বাড়ীতে তার রাজাভাইয়ের প্রেমের টানে। কলকাতা দেখে বেড়াত। এ বিষয়ে ঠাকুরদাস খুব অসুখী ছিল না বা ছেলের উপর অসন্তুষ্ট ছিল না। তার যত কিছু ক্ষোভ অভিমান সব রত্নেশ্বর রায়ের উপর। দেবেশ্বর তার কাছে ছিল সোনার পুতুলের মত পরম প্রিয়। গোপালের চেয়েও সে বেশী ভালবাসত দেবেশ্বরকে।

দেবেশ্বর ছুটিতে কীর্তিহাট এলে সে এখানে একবার আসত। দেবেশ্বরকে দেখে সমাদর করে বাড়ী ফিরে যেত। রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে দেখা ইচ্ছে করেই করত না। হয়ে গেলে খুব খাতির করে প্রণাম করে চলে যেত। দাদাঠাকুর আর বলত না সে। হুজুরও তার জিভে আসত না। সে বলত—প্রভু।

বলত—প্রভুর শরীর-মেজাজ ভাল আছে? এবং নগদ একটি টাকা সেলামী দিয়ে প্রণাম করত। রত্নেশ্বর রায় গম্ভীরভাবেই জবাব দিতেন। তিনি অবশ্য 'তুই' বলেই কথা বলতেন এবং কাছারীতে রোকা দিতেন—ঠাকুরদাস পালের বিদায়-খরচ। সেটায় প্রতিবারই কাপড়-চাদরের ব্যবস্থা থাকত। ঠাকুরদাস অমান্য করে ফিরিয়ে দিত না, নিত, কিন্তু সে কাপড়-চাদর নিয়ে সে কীর্তিহাটের সীমানা পার হত না; কাউকে না কাউকে বিলিয়ে দিয়ে যেত।

গোপালকে বলত—আমার সোনাবাবার কাছে আছিস, আমি খুশি আছি। এখানে তো কিছু হল না। তা সোনাবাবার কাছে কলকাতায় থেকে চোখোল-মুখোল হ; কিছু-মিছু কর। বুঝলি। এখানকার চাষবাস আছে, সে কুলকম তো এখনও একা আমাকেই কুলোয় না, তার মধ্যে তুই আর মাথা গলিয়ে করবি কি। ওখানে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি, বুঝলি।

*  *  *

বিরোধ বা মান-অভিমান সত্ত্বেও দুই পিতা যেমন পুত্রদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন, পুত্রেরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবেসেছিল এবং পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। গোপাল তখন তরিবৎ করে দেবুভাইকে সিদ্ধির সরবৎ থেকে আরম্ভ করে বছর-খানেক-দেড়েকের মধ্যেই হুইস্কীর গেলাস সোডা মিশিয়ে যথাসময়ে যোগাতে শুরু করেছে। তখন একটা হুইস্কী ছিল O. H. M. S. অন হিজ ম্যাজেস্টিক সার্ভিস। তার বোতল কিনে এনে গোপাল নিজের বাক্সে পুরে রাখত। সকালবেলা থেকে গার্জেন টিউটরের কাছে দেবেশ্বর একরকম ছিলেন, স্কুলে ছিলেন আর একরকম; গার্জেন টিউটারের কাছে যা, তার সঙ্গে একটুখানি আমীরী চাল যোগ হত। রবীন্দ্রনাথের ষোল বছর বয়সের ছবি আছে দেখেছ কিনা জানি না; জরির টুপী, আচকান, পায়জামা-পরা ছবি; সেটা তখন উঠি-উঠি করছে; তার জায়গায় কোঁচানো কাপড়, সিল্কের পাঞ্জাবি চলিত হচ্ছে। সেই পোশাক পরে দেবেশ্বর রায় কম্পাসের বগিগাড়ী অর্থাৎ একঘোড়া-টানা বগিগাড়ীতে স্কুলে যেতেন। বিকেল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আবার গার্জেন টিউটারের অধীনে দেবেশ্বর রায় শান্ত, বুদ্ধিমান, ধীর; স্কুলে ক্লাসের প্রথম দুজনের মধ্যে একজন। টিউটার ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করেন। দশটার পর দেবেশ্বরের ছুটি হয়। দেবেশ্বর কোন একটা রাগিণী ভাঁজতে ভাঁজতে বার্ণিশ করা চটি টানতে টানতে উপরে এসে ঘরে বসে ডাকেন—গোপালদা রে।

—কি রাজাভাই!

—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে গোপালদা।

—আমি ঢেলে রেখে বসে আছি সেই কখন থেকে। নাও, খাও। বলে সোডা মেশানো হুইস্কীর গ্লাস তাঁর হাতে তুলে দেয়। তৃষ্ণার্তের মত সেটা শেষ করে দেবেশ্বর বলেন—আর একটু দে না গোপালদা।

—আরও খাবে? জানাজানি হলে তোমারও বিপদ আমারও বিপদ।

—তা ঠিক। কিন্তু আর একটুখানি। একটু। এই এতটুকু।

এই গোপালদা এবং এই তার রাজাভাই দেবেশ্বর রায়। ছিপছিপে পাতলা, লম্বায় তখনই প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি, সোনার বর্ণ রঙ, তার উপর নীলাভ শিরাগুলো যেন এই সৌন্দর্যের একটা বিচিত্র ইতিবৃত্ত লিখে রেখেছে—হাতের তালু, পায়ের তলা গাঢ় গোলাপী। সে নাকি দেখলেই মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। ঠাকুরদাস পাল ছেলেবেলায় তাঁকে দুই হাতে তুলে ধরে দোলাতো আর বলত—"ও আমার নন্দের ছবি, যে দেখবি সে পাগল হবি।"

সুলতা, আমার মেজদাদু আমাকে প্রথম দেখে বলেছিলেন, তাই তো ভাই, আমায় যে তুমি ধাঁধা ধরালে হে। আমার দাদা তোমার পিতামহ রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন, বাংলাদেশে এমন রূপ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ছাড়া দেখি নি। দাদা আমার তাদের কাছেও ম্লান ছিলেন না।

সেই তরুণ কিশোর দেবেশ্বর রায় ভায়লাকে দেখে শরাহত হল। ভায়লার বয়স তখন তের পার হয়ে চৌদ্দয় পড়েছে। চতুর্দশ বসন্তের একগাছি মালা!

সভা থেকে ফিরে এসে সে শরীর খারাপ বলে শুয়ে পড়ল।

ডাক্তার দেখে বলে গেল—সীজন চেঞ্জের সময় সর্দি লেগেছে। ও কিছু না।

দেবেশ্বর চুপ করে শুয়েছিলেন, তাঁর বাসনা তখন উদ্দাম হয়ে ছুটেছে। লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মত। ভায়লা—ভায়লা—ভায়লা। তার গালের গোলাপী রঙ, কালো চোখ, কোঁকড়ানো কালো চুল কিছুতেই সে ভুলতে পারছিল না।

এক সময় গোপাল এসে ঘরে ঢুকল। দেবেশ্বরের শিয়রের কাছে বসেছিলেন তাঁর মা। গোপাল তাঁকে বললে—আপনি জ্যাঠাইমা এখন যান, আমি বরং রাজাভাইয়ের কাছে বসি।

সরস্বতীঠাকরুণ প্রায় সন্ধ্যে থেকেই বসে আছেন। তিনি বললেন—তাই বস রে তুই। একটু বরং গল্পটল্প কর। তাতে হয়ত ভাল থাকবে। দেবু, আমি যাই, ওঁর খাওয়া-টাওয়াগুলো একবার দেখি।

দেবেশ্বরও তাই যেন খুঁজছিলেন। এ-কথা তিনি বলবেন কাকে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজে এক গোপালদা ছাড়া তো কাউকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন—তাই যাও।

সরস্বতী বউরাণী চলে যেতেই গোপাল দরজার পাল্লাদুটো ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে কাছে এসে খাটের বিছানার উপর কনুইদুটো রেখে ঝুঁকে পড়ে বললে—সায়েবদের জন্যে আনা এক বোতল স্যাম্পেন বাগিয়েছি রাজাভাই। কিন্তু কি হল বল তো?

বলতে লজ্জা পেয়েছিলেন দেবেশ্বর। গোপাল ঘাড় নেড়ে প্রশ্ন করেছিল—ওই ভায়লা?

দুই হাতে গোপালের গলা জড়িয়ে ধরে দেবেশ্বর বলেছিলে—ওকে নইলে আমি বাঁচব না গোপালদা। আমি মরে যাব।

গোপালদার পক্ষে কাজটা দুরূহ হয় নি। সেকালটায় অবশ্য ধনীর পক্ষে মুগ্ধা দরিদ্র-কন্যাকে আয়ত্ত করা কোন বড় অপমানের মধ্যেই গণ্য ছিল না, তবে বর্ণভেদে অর্থাৎ জাতের উঁচু-নীচু ভেদে একটু-আধটু তফাৎ হত। নিশ্চয়ই হত। কিন্তু এছাড়াও আর একটা চিরন্তন ধারা আছে প্রেমের পথে—সেটা হল সনাতন ধারা; যে-ধারায় রাজকন্যার জন্যে রাখাল-ছেলে পাগল হয়, আবার রাজপুত্রকে দেখে ভিক্ষুকের কন্যা লালায়িত হয়ে ওঠে। রাখাল-ছেলে রাজার মেয়েকে বড় পায় না স্থূলতা, তবে রাজার ছেলে কৌতুকবশে ভিক্ষুক-কন্যাকে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে। আবার প্রেমেও পড়ে। সে রাজকন্যেও পড়ে, ভিখিরীর মেয়েও পড়ে।

ভায়লাও প্রেমে পড়েছিল এবং সে-প্রেমও দর্শনমাত্র প্রেম। সুতরাং কাজটা দুরূহ হয় নি গোপালের পক্ষে। তবে গোপালই এটাকে সম্ভবপর করে তুলেছিল, নইলে সে-সাহস বা সে-বুদ্ধি দেবেশ্বর রায়ের ছিল না। তখনও ততখানি শক্ত হয়ে উঠতে পারেননি।

সেটা সহজ এবং সরল করে দিয়েছিল গোপালদা।

স্থূলতা, পল্লীগ্রাম সরল বটে। অচতুরও বটে। শহরের মত জটিল নয় এ-কথা নিশ্চয়, কিন্তু জীবনের বৃন্দাবনে জটিলা-কুটিলা-বৃন্দা সেখানেও আছে। আজও আছে। সেকালে আরও অনেক বেশী ছিল। যে-আমলের কথা বলছি, সে-আমলে ধনী জমিদারদের এবং

উচ্চবর্ণের এসব ক্ষেত্রে অন্যায় করবার একটা বে-আইনী আইন থানার দারোগাদের ঘুষ নেওয়ার মত জানাশোনা ভাবেই চলত ছিল। এতে মনে কেউ কিছু করত না। হয়তো ঘৃণা একটু করত, ঠাট্টা একটু-আধটু করত, বেশী হলে একটা সামাজিক আন্দোলন হত, তাতে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য ব্রাহ্মণকে দিলেই মাপ হয়ে যেত; এবং গ্রামের যারা দুষ্ট দুর্দান্ত প্রকৃতির তাদের হয়তো কিঞ্চিৎ দিতে হত। এটা অবশ্য উচ্চবর্ণের সাধারণজনের পক্ষে। কিন্তু জমিদার বা ধনশক্তির অধিশ্বরের মাপ্ত আলাদা। তাঁর লোকের সঙ্গে বা তাঁর বাড়ীর মুখে কোন রমণী যদি গভীর রাত্রে পথ ধরত, তবে এই দুষ্টেরা সসম্ভ্রমে সরে যেত।

কীর্তিহাটে এটি কিন্তু ছিল না, রত্নেশ্বর রায়ের কঠিন শাসনে। তাঁর হুকুম ছিল চৌকিদার এবং নিজের বাড়ীর বরকন্দাজদের উপর এবং সাধারণ লোকের উপরও বটে যে, যদি এমন ঘটনায় কোন সন্ধান কেউ পায় বা সন্দেহ করে, তবে সে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁকে জানায়। গ্রামের কয়েকটা ব্রাত্য স্বৈরিণী যুবতী যারা এই ধরনের পেশা এবং নেশায় একটু বেশী প্রমত্তা হয়েছে, তাদের তিনি অর্থব্যয় করে নবদ্বীপ পাঠিয়ে দিয়ে গ্রামকে পাপমুক্ত রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁরই গ্রামে, তাঁরই কিশোর কন্দর্পের মত দেবেশ্বর রায়ের সঙ্গে ভায়লেটের মিলনের ব্যবস্থা অনায়াসে করে ফেললে গোপাল। এতটুকু বেগ পেতে হল না। বিচিত্রভাবে সে সমস্ত সমস্যার সরল সহজ ব্যবধান করে দিলে।

খানিকটা ঘুরেফিরে এসে বললে—রাজাদাদা, বেশ একখানা ভাল করে প্রেমপত্র লিখে দাও। তা নইলে সে ভয় খাচ্ছে। আমি বলে পাঠিয়েছিলাম, মেয়েটা শুনে কেঁদেছে। কিন্তু তারপরই বলেছে, উঁহু, উ যদি মিছে করে বলে, বাবুর নাম করে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে—। বুঝেছ? তুমি রাজাদাদা, একখানা চিঠি লেখ। বেশ ভাল করে চিঠি লেখ। আমি ভালবাসি। আমি ভালবাসি। ভায়লা, তোমাকে নইলে আমার দুনিয়া অন্ধকার, আমার বুক হু-হু করছে। এইসব আর কি! তুমি তো লেখাপড়া জান ভাল, আমার মত তো নও। বাগিয়ে লেখ। বুঝেছ! তার আগে দাঁড়াও বোতলটা খুলি, খানিকটা স্যাম্পেন খেয়ে নাও। বুঝেছ। যেন একবারে খুলে যাবে।

সুলতা তার মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে-দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং খানিকটা রুক্ষও বটে। সুদীর্ঘ রায়বংশের জবানবন্দী সে শুনছে দু'দিন ধরে, নির্বিকার ভাবেই শুনে আসছে। কখনও একটু হেসেছে, কখনও দৃষ্টিটা উদাস হয়েছে; কখনও মুখের রেখায় ক্রোধ ফুটে উঠেছে—কপালে কুঞ্চনরেখা জেগেছে এই পর্যন্ত। এই প্রথম তার দৃষ্টি বক্র এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তার থেকে খানিকটা ক্রোধের উত্তাপও অনুভব করা যায়।

সুরেশ্বর সেদিকে লক্ষ্য করে নি। সে বলেই চলেছিল সামনের দেওয়ালের ছবি-গুলোর দিকে চোখ রেখে। যে-ছবিখানার দিকে সে তাকিয়েছিল, সেখানা বন্দুক হাতে দেবেশ্বর রায়ের ছবি। কিন্তু চারদিকে প্যানেল করে অনেকগুলো ছোট ছোট ছবি আঁকা আছে। একটাতে একটা কুঞ্জের মত মনোরম পরিবেশের মধ্যে ভায়লেট এবং দেবেশ্বর পরস্পরে হাত ধরে মুগ্ধ ও মুগ্ধার মত তাকিয়ে আছেন। তারপর সুসজ্জিত ঘরে সোফার উপর দেবেশ্বরের কোলে মাথা রেখে ভায়লেট শুয়ে আছে এবং মুগ্ধার মত তার দিকে

তাকিয়ে আছে। একটাতে দেবেশ্বর একমনে চিঠি লিখছেন। কিন্তু প্রত্যেক ছবিতেই গোপাল পাল উঁকি মারছে।

সুলতা সুরেশ্বরকে বাধা দিয়ে বলে উঠল—তুমি থাম সুরেশ্বর।

তার কণ্ঠস্বর শুনে এবার চমকে উঠল সুরেশ্বর, চকিত এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে সে সুলতার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্নের স্বরেই বললে—কি হল সুলতা?

গম্ভীরভাবেই সুলতা বললে—তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, গোপাল ঘোষ আমার ঠাকুরদার কাকা, তাঁর সম্পর্কে যেভাবে উক্তি করছ, তাতে আমি ঠিক স্বস্তিবোধ করছি না। সেকাল হলে সহ্য হয়তো করতে হত, কিন্তু কাল অনেকটা বদলেছে। কি বলছ এসব তুমি?

কিছুক্ষণ সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে—তোমার কথা শুনে ভারী ভাল লাগল, সুলতা। কথাটা আমার মনে ছিল—ভুলে আমি যাই নি। এবং তাঁর সম্পর্কে বানিয়েও কিছু বলি নি আমি। এ সমস্ত বৃত্তান্ত আমি চিঠিপত্রের মধ্য থেকে সংগ্রহ করেছি।

—চিঠিপত্র? এসব বৃত্তান্ত কে কাকে চিঠিতে লিখেছেন বা লিখতে পারেন সুরেশ্বর?

—তিনি দেবেশ্বর রায়, সুলতা।

—কাকে লিখেছিলেন তিনি এসব কথা?

—তাঁর পিতৃদেব, যিনি সাধারণের কাছে সিংহ ছিলেন, তাঁকেই লিখেছিলেন।

—তাঁর বাবাকে লিখেছিলেন তিনি এইসব কথা?

—হ্যাঁ, সব কথা। তবে অবশ্যই লেখার ভঙ্গিটা একটু স্বতন্ত্র ছিল।

—এ আর কতটা স্বতন্ত্র হতে পারে, সুরেশ্বর?

—অনেক অনেক! সত্যকে যখন নির্ভয়ে কেউ প্রকাশ করে, তখন সেই সত্যই তাকে প্রকাশের ভাষা যুগিয়ে দেয়। এসব চিঠিপত্রের কতক ছিল অন্নপূর্ণা-মার কাছে যা তাঁকে লেখা, এবং কিছু ছিল বিমলাকান্তের কাছে, যা রত্নেশ্বর রায় পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে এবং কতক পেয়েছি এই অভিসন্ধরী আশ্চর্যশৃঙ্খলা এবং সত্যবাদী রত্নেশ্বর রায়ের দপ্তর থেকে। তুমি পড়ে দেখতে পার। তবে যে-ক্ষেত্রে কথাটা তোমার গায়ে বা মনে আঘাত দিয়েছে, সে-ক্ষেত্রে বলার ভঙ্গীর দোষ আমারই হয়েছে। দেবেশ্বর রায় যা লিখেছিলেন, সেইখানটাই তোমাকে আগে শোনাই। তিনি লিখেছেন—"সেই সভাস্থলে ভায়লেট যখন আমার গলদেশে মাল্য পরাইয়া দিল, তখন তাহার গালদুটিতে রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল, চক্ষুদ্বয় আনত হইল, আমার বক্ষাভ্যন্তরে যেন মৃদঙ্গধ্বনির মত ধ্বনি উঠিতেছিল, আমি কম্পিত হইতেছিলাম, সেও কম্পিত হইতেছিল। এবং তখন হইতেই মনে হইল এই ভায়লেটই আমার জন্মজন্মান্তরের স্ত্রী বা প্রিয়তমা; তাহাকে নহিলে আমি বাঁচিব না। তাই বাড়ী আসিয়া উদ্বিগ্ন-উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে অসুস্থের মত শয়ন করিয়া রহিলাম। কোন কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। রায়বংশের উত্তরাধিকারিত্ব নহে, গোটা সংসারের আর কোন জন আমার কেহ নহে। শুধু ওই ভায়লেট। তাহার জন্য আমি সবই ত্যাগ করিতে পারি। ডাক্তার আমার শিয়রে গোপালদাকে বসাইয়া আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিতে গেলেন। গোপালদা এক বোতল স্যাম্পেন চুরি করিয়া সরাইয়াছিল সাহেবদের জন্য আনীত সামগ্রী হইতে; সে আমাকে

তাহাই খাওয়াইল। অন্ত আর কোন কথাই গোপন করিব না, আমি বৎসরখানেক অবধি মদ্যপান করিতেছি। গোপালদা কখনওই কোন অন্যায় আমাকে শিক্ষা দেয় নাই। আমি প্রলুব্ধ হইয়া যে অন্যায় করিতে চাহিয়াছি, তাহাতে সে আমাকে আনন্দিত এবং খুশি করিতে প্রাণপণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছে।

ভায়লেটের ক্ষেত্রেও তাই হইল, আমি স্যাম্পেন পান করিয়া সকল সংকোচ এবং সকল লজ্জা-সম্ভ্রম অতিক্রম করিয়া বলিলাম—গোপালদা, আমি ওই ভায়লেটকে ভালবাসিয়াছি। উহার জন্ম আমার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে; আমার জীবন মিথ্যা মনে হইতেছে। উহাকে না পাইলে আমি বাঁচিব না। আমি আত্মহত্যা করিব।

গোপালদা আমার জন্ম সব করিতে পারে, প্রাণটাও দিতে পারে বলিয়া জানিতাম। সে তৎক্ষণাৎ বলিল—তাহার জন্ম চিন্তা তুমি করিও না, আমি ইহার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতেছি।

পরদিন সকাল হইতে সে বাহির হইল। এবং বেলা দ্বিপ্রহর সময় ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"রাজাদাদা, তোমার পছন্দ আছে, তোমার চক্ষু আছে, তুমি সত্য সত্যই দেবেশ্বর। সে-কন্যাটি অপর গোয়ান-কন্যার মত নহে। এবং সে সত্য সত্যই তোমাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছে। আমি একজন দূতীকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। অর্থের কথায় অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়াছে। সে অর্থ চায় না। সে নিজেকে বিক্রয় করিবে না। একমাত্র ভালবাসার জন্ম নিজেকে সমর্পণ করিবে। কিন্তু সন্দেহ করিতেছে যে, তোমার নাম করিয়া দূতী তাহাকে লইয়া গিয়া অন্য কাহাকেও সমর্পণ করিবে। অথবা তুমি তাহাকে উপভোগের কারণে লইয়া গিয়া কয়েকদিনের পর উচ্ছিষ্টের মত পরিত্যাগ করিবে। তাহা ছাড়া তুমি রাজা, তুমি ব্রাহ্মণ, সে কৃশ্চান গোয়ান, সে দরিদ্র ইত্যাদি। অতএব তুমি তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়া দাও। খুব ভাল করিয়া লেখ। লেখ, তুমি তাহাকে ভালবাস। তুমি তাহাকে জীবনে পরিত্যাগ করিবে না। দেখ জমিদার, ধনীর ছেলেদের কত রক্ষিতা ইত্যাদি থাকে; তোমার ঠাকুরদাদার সোফিয়া বাঈয়ের গল্প তো এখানকার সকল লোকে করে। তাহার কথা শুনিয়া ভায়লেটকে আমি আরও ভালবাসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমের কথা মনে পড়িল। পত্র লিখিতে বসিয়া কয়েকখানা পত্রই ছিঁড়িলাম। মনোমত হইল না। গোপালদা সেই দ্বিপ্রহরেই আমাকে খানিকটা স্যাম্পেন খাওয়াইয়া বলিল—ঘরে বসিয়া লেখ। আমি বাহিরে পাহারা দিতেছি। কেহ আসিলে ঘরে ঢুকিতে দিব না। এই কর্তা বা গিন্নী-মা আসিলে তোমাকে শব্দ করিয়া ইসারা দিব, তুমি তৎক্ষণাৎ বিছানায় শুইয়া পড়িবে, যেন ঘুমাইয়া গিয়াছ। আমি বলিব দেবু-ভাইয়ের মস্তক ধরিয়াছে।"

সুলতার মুখ প্রসন্ন হয়নি। সে অপ্রসন্ন মুখেই সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। সুরেশ্বর বললে—দেখ সুলতা, দেবেশ্বর এবং গোপাল ঘোষের সম্পর্কটা ছিল তাদের নিজস্ব সম্পর্ক এবং তাদের যে কাল সেই অনুযায়ী। আমরা তাদের উত্তরাধিকারী, আমাদের সম্পর্ক আমাদের মত। এখানে আমি জমিদারের ছেলে, একজন ইংরেজ সমর্থনকারী ইংরিজী কাগজের এডিটোরিয়েল স্টাফের অন্তর্ভুক্ত পাকা জার্নালিস্টের ছেলে—একসময় আমি বিদায় সত্যাগ্রহ বলে স্টেটসম্যানের চিঠির কলমে চিঠি লিখেছিলাম; আমার থেকে আজ তোমার মান বেশী, তুমি এম-এ

পাশ, কলেজের প্রফেসর, পলিটিক্যাল পার্টির মেম্বর, তোমাদের পার্টি যদি আগামী ইলেকশনে জেতে, তবে তুমি হয়তো একজন মিনিস্টারও হবে। তখন তুমি যা-হয় করো। কিন্তু এখন আমার জবানবন্দীর এইখানের এইটুকুতে মুখভার করো না। গোপাল পাল, যোব আমি বলছি সে সুলতা, ইচ্ছে করেই না; যা করেছিলেন আমার ঠাকুরদাদার জন্যে, তা অন্য কেউ করেনি বা করে না। সেই জাতের কড়াকড়ির কালে নিজের জাত আর এই দুর্ধর্ষ গোয়ানদের হাতে তার জীবন, সব তিনি বিপন্ন করেছিলেন দেবেশ্বর রায়ের জন্য। সে দেবেশ্বরও গোপন করেননি, আমিও করছিনে। অন্যায় কিছু বললে গায়ে তোমার লাগতে অবশ্যই পারে কিন্তু অন্যায় বাড়াবাড়ি করে লাভ কি? শচীন সেনগুপ্তের সিরাজউদ্দৌলা নাটকে এক জায়গায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা ওয়াটসকে বলছেন—তোমার যা চরিত্র, তাতে তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধার ওপর চড়িয়ে গোটা শহর ঘুরিয়ে বের করে দেওয়া উচিত দেশ থেকে। দেখ, নবাবীকালের অভিনয় হচ্ছে বলে এটা ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজও সহ্য করেছে। স্বাধীনতার পর অবশ্যই আমরা সবাই স্বাধীন সবাই প্রধান—ভারতও জেগেছে, কিন্তু জেগেছে বলে এমন অসহিষ্ণু হয়ো না। আমি তোমাকে বলছি, হলপ করেই বলছি, যা বলব তাতে দেবেশ্বর রায় থেকে গোপাল পাল এবং তাঁর বাপ ঠাকুরদাস পালই বড় হয়ে গেছেন রায়বাবুদের চেয়ে। শুধু চুপ করে শোন।

* * *

দেবেশ্বর রায় পত্র লিখে দিয়েছিলেন গোপালদার হাতে। এবং পরের দিন দিনের বেলা বলেছিলেন—চল আমার সঙ্গে। বন্দুক নাও। শিকার করতে যাচ্ছ। বুঝেছ? ভায়লা আসবে ওই সিদ্ধেশ্বরীতলার জঙ্গলে। ওখানে তো গোয়ানটোয়ানরা কেউ আসে না। কারণ আছে। ওখানে একটা ভাঙা পড়ো বাড়ীর মত আছে, কে একজন তান্ত্রিক থাকত একজন যোগিনী নিয়ে। সেই বাড়ীটা আমি পরিষ্কারঝরিষ্কার করিয়ে রেখেছি ভায়লাকে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের কবচ বলে একটা কবচ পাঠিয়ে দিয়েছি, বলেছি, এই কবচ পরলে কোন ভয় নাই। সে নিয়েছে কবচ, ঠিক আসবে।

সুরেশ্বর হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর ঘাড় নেড়ে হয় আক্ষেপ বা ব্যঙ্গ করে বললে—এ সেই শ্যামাকান্তের ভাঙা ঘর। যে ঘরে 'মনোহরা' যোগিনী বলে ব্রাত্য মেয়েটাকে নিয়ে সে বামাচারী সাধনা বা সাধনার নামে কদাচার ব্যভিচার যা বল তাই করেছিল। এ ঘরে লোকজন ঢুকত না। প্রথম ছিল একটা ছিটেবেড়ার ঘর, তারপর শ্যামাকান্তের পর সোমেশ্বর রায় কিছুদিন ওই মনোহরা মেয়েটাকে নিয়ে ওখানে যেতেন। তখন কাদা দিয়ে পাকা ইট গেঁথে একখানা ঘর তৈরী করিয়েছিলেন। এবং সাধনার শিমুল গাছটির তলাটাও সুন্দর ক'রে দিয়েছিলেন। বীরেশ্বর রায় ঘরখানাকে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করেও পারেন নি। সোমেশ্বর রায়ের যে দলিল তাতে এই ঘর এবং সিদ্ধেশ্বরীতলা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা ছিল। ভবানীর পরিচয় এবং শ্যামাকান্তের জীবনের বিচিত্র কথা জানার পর বীরেশ্বর রায় ওই শিমুলতলা এবং ওই ঘরখানাকে মেরামত করিয়ে শ্যামাকান্তের মৃত্যু দিনে পুজার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেও তিনি দলিলভুক্ত করে তার জন্য আর্থিক সংস্থান

ক'রে দিয়ে গেছেন। সে সংস্থান আজও বজায় আছে। কিন্তু কোন অনুষ্ঠান আজ আর হয় না। তার জন্ম রায়বংশের কেউই চিন্তিত নয়। সিদ্ধেশ্বরীতলার সিদ্ধাসনের কোন গৌরব কোন পবিত্রতাই ছিল না। আমি সেখানে একটা কিছু করে এসেছি। সে যথাসময়ে বলব, সুলতা। এখন সেদিনের কথা শোন। সেই দিন সেই ঘর পরিষ্কার করিয়ে রাখিয়েছিলেন গোপাল পাল। সেই ঘরে তাঁর প্রাণের প্রিয় দেবুভাইয়ের প্রথম বাসরশয্যা হবে।

রত্নেশ্বর রায় সিদ্ধেশ্বরীতলার একটি সংস্কার করেছিলেন। তিনি একটা গণ্ডী এঁকে দিয়েছিলেন চারিদিকে, মধ্যে মধ্যে এক একটা পিলপে গেঁথে দিয়ে ব'লে দিয়েছিলেন এর ভেতরে যেন কোন গোয়ান বা কোন ব্রাত্য প্রবেশ না ক'রে। এর বাইরে একটা জায়গা ছিল সেটা রত্নেশ্বর রায়ই তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন, যেখানে গোয়ানরা বা ব্রাত্যরা ইচ্ছে হলে পুজো বা মানত মানসিকের অর্ঘ্য দিতে পারে।

এই গণ্ডীর মধ্যে ভায়লেটকে আসতে রাজী করা সহজ কথা ছিল না। তার ব্যবস্থা সুকৌশলেই বল আর আপন বিশ্বাসমতই বল—করেছিলেন দেবেশ্বরের গোপালদা। প্রথম পাঠিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরীর কবচ। তাই গলায় ঝুলিয়ে প্রেমমুগ্ধা কিশোরী ভায়লেট—সে এসে দাঁড়িয়েছিল ওই গণ্ডীর প্রান্তে। দেবেশ্বর অপরাহ্নের আগে থেকেই বন্দুক হাতে করে ওই সিদ্ধেশ্বরীতলার জঙ্গলের প্রান্তে প্রান্তে শিকারের ছল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তারপর এক সময় ক্লান্তি অপনোদনের ছলে জুতো খুলে সিদ্ধেশ্বরীতলার গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে বসে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে জীবনের প্রথম প্রিয়া বা নারী যাই বল তার জন্ম প্রতীক্ষা করছিলেন। সূর্য তখন পাটে বসেছে, লগ্ন বলতে গোধূলি লগ্ন, সেই লগ্নে কম্পিত পদক্ষেপে অভিসারিকা ভায়লেট এসে দাঁড়িয়েছিল ওই সীমার প্রান্তভাগে।

দেবেশ্বরও কম্পিত পদক্ষেপে এসে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরেছিলেন। দেবেশ্বর রায়ের গোপালদা দিয়েছিলেন নববিধান। দু'গাছা ফুলের মালা—ওই গাঁদাফুলেরই মালা গেঁথে এনেছিলেন এবং বলেছিলেন— নাও মালাবদল ক'রে বিয়ে ক'রে নাও। আর এই সিদ্ধেশ্বরী মায়ের সিঁদুর ওর সিঁথিতে ছুঁইয়ে দাও। আর ভায়লেটকে বলেছিলেন—তুমি মনে মনে বল—বিয়ে ক'রে আমি হিন্দু হলাম—বল!

বিচিত্র ভাগ্যের বিধান নয়, সুলতা? অন্ততঃ আমার কাছে তাই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শ্যামাকান্তের কর্মফলের চক্রান্ত ওই সিদ্ধগণের পাশে ওই বিকৃত আচারে ধর্মের নাম ক'রে ব্যভিচারের জন্ম সোমেশ্বর রায়ের তৈরী করা ঘরের মধ্যে ব্রাহ্মণ জমিদারসন্তান এবং কৃশ্চান মেয়ে ভায়লা ওইভাবে ধর্মের নাম ক'রেই সমাজ লোকাচার ধর্ম সব কিছুকে লঙ্ঘন করে প্রথম মিলিত হয়েছিল!

—না-না-না। বাধা এখন দিয়ো না। তুমি যা বলবে তা আমি জানি এবং তা আমি মানি। তোমার থেকেও হয়তো আরও বেশী উদার আমি, সুলতা। তোমরা রাজনৈতিক কর্মী, সংসারে লোকেদের সামনে নিজেকে তোমাদের শুদ্ধ পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন চরিত্রবান মানুষ বলে প্রমাণিত করতে হয়। আমি মানি লোকাচার সমাজ ধর্ম এসব থেকেও হৃদয়ের

অকৃত্রিম আকর্ষণ মিলনের আকৃতি অনেক বড়। অনেক বড়। রামী চণ্ডীদাসের মত ভাঙতে পারলে তা স্বর্গীয় হয়। ভাঙেও অনেকে। ভেঙে হয়তো সমাজে থেকে নির্বাসিত হয়ে লোকের দ্বারা বর্জিত হয়ে ধর্মের ধ্বজাধারীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে পথের পাশে প'ড়ে মরে। অনেক সময় পুরুষ অত্যাচার সইতে না পেরে একদিন নারীটিকে পথে ফেলে দিয়ে দাঁতে কুটো ক'রে ফিরে আসে ঘরে। সমাজ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাকে ফিরিয়ে নেয় কিন্তু মেয়েটাকে চলে যেতে হয় হারিয়ে, কোথায় কেউ খোঁজ রাখে না। হয়তো দেহটাকে সম্বল ক'রে পথে নেমে যতদিন দেহটা থাকে ততদিন কোন রকমে খায় দায়, মদ খেয়ে পাগলের মত হাসে দেহব্যবসায়িনীর জীবনযাপন ক'রে। তারপর একদিন মরে এবং সেদিন তারই মত জনকয়েক ভাগ্যহতা হতভাগিনী হরিধ্বনি দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যায় শ্মশানে, পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আসে। মুসলমান বা কৃশ্চান হলে কবরে যায়। তবে মুসলমান এবং কৃশ্চান ধর্মের এখানে নারীর পক্ষে একটা উদারতা আছে, যে উদারতাকে আমি শ্রদ্ধা করি প্রশংসা করি, তার কাছে মাথা নোয়াই। মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির জন্যই নীতি তৈরী করেছে ধর্ম, আত্মাকে ধ্বংস করবার জন্য, মানুষকে হত্যা করবার জন্য নীতি তৈরী হয় নি। এমন নীতি দুর্নীতি, চণ্ডনীতি জীবনে ধ্বংসনীতি।

* * *

—এক গ্লাস জল।

—তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছ সুরেশ্বর। বলে সুলতা ডাকলে—রঘু—রঘু! তোমার বাবুর জন্যে এক গ্লাস জল নিয়ে এস।

সুরেশ্বর তার মাথার লম্বা চুলগুলো পিছন দিকে ঠেলে আঙুল চালাতে চালাতে বললে—তা হয়েছি সুলতা। তুমি আঘাত দিয়েছ আমাকে। হয়তো তুমি বলবে—আঘাত তুমিই আমাকে আগে দিয়েছ, তা হলে বলব—না-না-না। তা দিই নি। নিজে ইচ্ছে করে তুমি নিজের মনে নিজে আঘাত করে আমার নামে অপবাদ দিচ্ছ!

জল নিয়ে এসে যে দাঁড়াল সে রঘু নয়, সে অর্চনা।

—অর্চনা! তুই এখনও জেগে রয়েছিস?

—রয়েছি। পাশের ঘরেই ছিলাম। ওই কুড়ারাম রায়ের পাঁচালীটা পড়ছিলাম। আর তোমাদের কথাও শুনছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবছিলাম, শত দুঃখকষ্ট নানান অভাব নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও ভাঙা বাড়ীতে বাস করত রায়েরা, বাঙলাদেশের জমিদারেরা—তারা কি সবাই তোমার মত এমনি করে পাগল হয়ে গেল? না ফাঁসির আসামীর মত রাত্রি জেগে সেলের মধ্যে বসে আছে!

গ্লাসের জলটা নিঃশেষে পান ক'রে সুরেশ্বর বললে—কে কি করছে তা জানিনে, তবে এইটুকু বলতে পারি যে অধিকাংশ জমিদারই তো আজ দেউলে এবং আজ তারা সবাই প্রায় এ অচলায়তন ভেঙে বেরুতে চায়। অনেক আগেই অনেকজনে এ থেকে বেরিয়ে এসে জীবন-সমুদ্রে নতুন স্টীমলঞ্চ ভাসিয়ে জমিদারী বজরাটাকে গাধাবোটের মত পিছনে বেঁধে দিয়েছেন। আজ যদি শান্তির ব্যাঘাত ঘটে থাকে তবে এঁদেরই ঘরে। নইলে পাড়াগাঁয়ের ছোটখাটো

অসংখ্য জমিদার নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাচ্ছে। তারা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে মুক্ত আলো হাওয়ায় দাঁড়িয়ে বাঁচবে। কিন্তু সে সব কথা থাক। যা বলছিলাম তাই বলি। তুই কি এখানে বসবি অর্চি, না—

—বসলে আপত্তি কি অসুবিধে হবে না তোমাদের ?

—আমার হবে না। আমার যখন হবে না তখন সুলতারও হবে না। কারণ বাধবার কথা সংকোচ হবার কথা যে বলে যে কনফেসার তার। যে শোনে তার নয়।

তারপর সে সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—সুলতা ?

হেসে সুলতা বললে—আমি অনেকক্ষণ আগেই অর্চনাকে বলেছিলাম—আপনিও এসে বসুন না। প্রথম রান্না করতে গেলেন। তারপর—

চুপ ক'রে গেল সুলতা ; মনে পড়ে গেল খেতে বসে কথাপ্রসঙ্গে যে অপ্রিয় কথা উঠে খাওয়ার আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছিল সেই কথাটা।

আবার শুরু করলে সুরেশ্বর, বললে—রায়বংশের অপরাধ আমি খুঁজে খুঁজে জমা করে পাহাড় করেছি। তার মধ্যে জমিদার হিসেবে নালিশ মকদ্দমা সত্য মিথ্যা অনেক ক'রেছি। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর অঙ্ক কষে প্রজাকে ঘায়েল করতেন। জোতদার যখন বড় হয়ে উঠেছে সম্পন্ন হয়ে উঠেছে তখন তাকে ডেকে সমাদর ক'রেছেন, প্রয়োজনমত আরও বড় এবং সম্পন্নতর হবার জন্ম ঋণ দিয়েছেন। খাজনা বাকী ফেলেছেন এবং পরে সব জমে যখন পাহাড় হয়েছে তখন নালিশ ক'রে তার বুকে পাহাড় চাপিয়ে তাকে শেষ করে দিয়েছেন। আবার উল্টোও হয়েছে, যারা ঋণ নেয় নি তাদের কোথায় কার কাছে ঋণ আছে খোঁজ ক'রে হ্যাণ্ডনোট তমসুদ কিনে নালিশ করেছেন। জিতেছেন সর্বত্র তা নয় ; বহু ক্ষেত্রেই হেরেছেন। কিন্তু হেরেও তো তিনি হারতেন না, মুনসেফ কোর্টে হেরে সবজজ কোর্ট জজ কোর্ট সেখান থেকে হাইকোর্টে আপীল করতে করতে এগিয়ে চলেছেন, পিছনে পিছনে প্রজাকে হাঁটতে হয় বাধ্য হয়ে। ক্লান্ত পদক্ষেপে নিঃস্ব এবং রিক্ত অবস্থায় হয়তো হাইকোর্ট থেকেও জয়ধ্বজা বয়ে বাড়ী আসতে আসতে ভেঙে পড়ে গেছে। এমন অনেক অনেক আছে। এদের দেনা শোধ করা আজ আর রায়বংশের কারুর পক্ষে সম্ভবপর নয়। সর্বস্বান্ত হয়েও নয়।

কিন্তু রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর থেকে দেবেশ্বর রায় পর্যন্ত সারাজীবন অবনত মস্তকে ঠাকুরদাস পাল আর গোপালদাস পালের ঋণ ভালবাসা স্বীকার ক'রে গেছেন। আমি তাও জানি এবং তোমার সঙ্গে গোপালদাস ঘোষের সম্পর্কও জানি, সে মনে রেখেই আমার মন্তব্য করে রেখেছি। আজ যদি গোপালদাস ঘোষ এসে আবির্ভূত হন এখানে তবে তোমার কথার প্রতিবাদ করেই বলবেন—তুই জানিস নে সুলতা, দেবু রাজাভাই আমার কি ছিল আর আমি তার কি ছিলাম, সে আমার জন্যে কি ক'রেছে তা তুই জানিস নে। আর দেবু রাজাভাই যে কি মানুষ ছিল তাও তুই জানিস নে। তুই চুপ কর।

সুলতা হেসে বললে—বেশ, তাই মেনে নিলাম। বল তোমার কথা।

—হ্যাঁ দেবেশ্বর রায়, ষোল বছরের দেবেশ্বর রায় বিচিত্রভাবে এই কামাকান্তের সিদ্ধাসনে

সিদ্ধেশ্বরীতলায় যেখানে তিনি তাঁর জীবনের অভিশপ্ত নারীসাধনা আরম্ভ করেছিলেন, সেই-খানেই পাতলেন জীবনের প্রথম বাসর। মিলিত হলেন প্রথম এক কৃশ্চান কুমারীর সঙ্গে। কৃশ্চান কুমারী অঞ্জনার কন্যা। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর অঞ্জনার প্রতি তাঁর গোপন প্রেমের ঋণশোধের অভিপ্রায়ে ক'দিন আগে চার্চের সংস্কার করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন তাকে শিক্ষিত করে তুলবেন বলে! একটি কুমার এবং কুমারীর সে বাসরসন্ধ্যার কথা উহ্য থাক। তা কল্পনা করবারও আমার অধিকার নেই। দেবেশ্বর রায় যে পত্রে এসব কথা নির্ভয়ে দ্বিধাহীনচিত্তে তাঁর বাঘের মত বাপকে খুলে লিখেছেন তাতে শুধু ওই কথাটুকুই আছে।

"সেদিন সন্ধ্যায় গোপালদার ব্যবস্থায় আমরা উভয়ে ওই গৃহের মধ্যে মিলিত হইলাম। এবং ইহার পর অসুখের অজুহাতে যে কয়েকদিনই ওখানে থাকিয়াছি—নিত্যই নিয়মিতভাবে মিলিত হইতাম। গোপালদাদার ব্যবস্থা মত সময়টা পরিবর্তিত হইত, কোনদিন সন্ধ্যায়, কোন দ্বিপ্রহরে—কোনদিন বা গভীর রাত্রে সেখানে যাইতাম। ভায়লেটও আসিত। আমরা সর্বপ্রকারে পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া গভীর ভালবাসায় আবদ্ধ হইলাম।"

*  *  *

ষোল বছরের এক ধনীপুত্র এবং এক চতুর্দশী কৃশ্চান কন্যা। অর্ধশ্বেতাঙ্গিনী দরিদ্র অসহায় অনাথ। অবস্থাবৈগুণ্যে বাংলাদেশের পল্লীতে প্রায় দেশীয় কৃশ্চানদের সঙ্গে বাস করে। কথাটা গোপন ছিল না—থাকবার কথা নয়। কিন্তু দেবেশ্বরের গোপালদা দেবেশ্বরকে এমন ভাবে নিজের আড়ালে ঢেকে রেখেছিলেন যে, যে কানাঘুষোই উঠেছিল ক'দিনে সেটার মধ্যে দেবেশ্বরকে কেউ ধরাছোঁয়ার মধ্যে পায় নি, পেয়েছিল গোপালকেই। কিন্তু গোপালদাসকেও রত্নেশ্বর রায় কম ভালবাসতেন না। তাঁর কাছে সে কম প্রশ্রয় পেতো না।

দেবেশ্বরের সে সঙ্গী ছিল, যা দেবেশ্বর খেয়েছে সেও তাই খেয়েছে, পরার কথাটা ঠিক বলতে পারব না, তবে গোপালদাস সে আমলে যে কাপড়জামা পরেছে তা অন্তত ঠাকুরদাস পালের যোগাবার সাধ্য ছিল না। ঠাকুরদাস রত্নেশ্বর রায়ের ছেলেবেলার আদরে 'ঠাকুরা' তাঁর প্রাণরক্ষাকর্তার ছেলে সে; তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে তাঁর বিবাহের সঙ্গে, তাকে তিনি ভালবাসতেন কিন্তু তাঁর সৎকর্মে বিরুদ্ধাচরণের জন্য তিনি তার উপর বিরূপ হয়েছিলেন। ঠাকুরদাসের 'ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত—নিম না ছাড়েন আপন জাত' এই কটু-কথা তাঁর কানে গিয়েছে, তিনি সহ্য করেছেন। তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সে আসে নি তাও তিনি কিছু বলেন নি। মনের ক্ষোভ মনেই চেপে রেখেছিলেন। কিন্তু তার জন্য গোপালের উপর বিরূপ কোন দিন হন নি তিনি। তার পরিচয় রায়বংশের জমাখরচের খাতার মধ্যে আছে। চিঠিপত্রের মধ্যেও আছে।

বিরূপ হলেন এইবার। পিক্রু এসে জানালে গোপালদাস তাদের পাড়ায় ঘোরাফেরা করে, তার ভাবভঙ্গি দেখে লোকে তার সঙ্গে ভায়লেটের নাম জড়িয়ে পাঁচ কথা বলছে। ভায়লেট পিক্রুজের নিজের কেউ নয়, তবু সে তার সম্পর্কিত কাকা আলফানসোর মেয়ে, তার উপর খোদ রায়হুজুর তার ভার নিয়েছেন তার জন্য এত করছেন। পাদরী সাহেব এনে ইস্কুল বসিয়ে দিলেন, তার পিছনে গোপাল লেগেছে এ নালিশ সে জানিয়ে যাচ্ছে।

কথাটা নিয়ে ভাবছিলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু খুব বেশী কিছু একটা করেন নি, শুধু কলকাতার নায়েবকে লিখে দিয়েছিলেন—"গোপালের উপর কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাহার স্বভাবচরিত্র মন্দ হইতেছে কিনা এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। এবং তাহাকে বলিবেন—এখানে তাহার নামে কিছু মন্দ কথা লোকে আমার নিকট বলিয়াছে। আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই। তবে তাহার সাবধান হওয়া উচিত বলিয়াই আমি তাহাকে নির্দেশ দিতেছি।"

এদিকে নবীন ছুটি প্রাণ পরস্পরের জন্ম ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এত ব্যাকুল যে অদর্শন আর সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু ভায়লেটের করবার কিছু ছিল না। কি করবে সে? সে কাঁদত।

* * *

কলকাতায় দেবেশ্বর রায় কীর্তিহাটের রাজাবাবুর যুবরাজ। বাইরে শান্ত প্রসন্ন কিন্তু জীবনে ক্ষুরের মত ধার, শাণিত তরবারির মত আস্ফালন এবং শক্তি, তিনি সহ্য করবেন কেন?

তিনি একদিন গোপালদাসকে ডেকে বললেন—গোপালদা, তুই হয় ভায়লেটকে এনে দে, নয় বিষ এনে দে। গোপালদা, আমি খেয়ে মরব। আমি ভায়লেটকে ছাড়া থাকতে পারছি না। পারব না।

গোপালদা সঙ্গে সঙ্গেই সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—তার জন্তে কি হয়েছে, দেবু আমার রাজাভাই। এনে আমি তাকে এখুনি দিতে পারি। কাল বল কাল যাব, তিন দিন—তিনদিনের মধ্যে ভায়লা-বউরাণীকে এনে দেব। সে নিশ্চয় আসবে। বলামাত্র আসবে আমি জানি। কিন্তু এখানে এনে রাখবে কোথায় বল? একটা বন্দোবস্ত কর আগে। এ-বাড়ীতে তো রাখা যাবে না, রাজাভাই। এখুনি খবর যাবে দপ্তর থেকে—এখানকার এই আমলা বেটারা বড় বজ্জাত। আমাকে সেদিন খাজাঞ্চী বললে—আমি দশটা টাকা চাইতে গিয়েছিলাম, তোমার রোকা নিয়ে, বললে—দেবুবাবুকে বলগে কিসের জন্ম টাকা চাই লিখে দিতে হবে। আর তুমি এমন করে দেবুবাবুর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা গায়ে গা লাগিয়ে ঘুরো না। কর্তা চিঠি দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

যোল বছরের জমিদার-পুত্র—বুদ্ধিতে, সাহসে অসাধারণ ছিলেন দেবেশ্বর। পরবর্তীকালে তার প্রমাণ তিনি প্রতি পদক্ষেপে রেখে গেছেন এবং যে সময়ের কথা বলছি, তার ক'মাস পরেই পিতাপুত্রে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল, যে-পত্রের মধ্যে এই সমস্ত কথা তিনি খুলে লিখেছেন নির্ভয়ে, তাই তার প্রমাণ। তবুও প্রথমটা গোপালদার প্রশ্নটা দমিয়ে দিয়েছিল দেবেশ্বর রায়কে।

ভায়লেটকে তাঁর ভায়লাকে এনে রাখবেন কোথায়? রাখতে হলে বাড়ী চাই, সুন্দর বাড়ী, খাট চাই, পালঙ্ক চাই, আয়না চাই, আসবাব চাই; ভায়লার জন্ত পোশাক চাই, পরিচ্ছদ চাই, তার কাছে কাজ করবার জন্ত লোক চাই, জন চাই; তাকে সাজাবার জন্ত অলঙ্কার চাই—অনেক কিছু চাই।

সামনে তখন তাঁর পরীক্ষা। এন্ট্রান্স পরীক্ষা। সেই দারুণ চাঞ্চল্যের মধ্যেই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পরীক্ষার পরই এই চিঠি তিনি লিখেছিলেন তাঁর বাল্যসঙ্গিনী পিসী অন্নপূর্ণা দেবীকে। তখন তিনি কাশীতে।

অন্নপূর্ণা দেবী সে-চিঠি পেয়ে ভাইপোকে চিঠির উত্তর দেন নি; একটি লাল-টুকটুকে কনে খুঁজতে শুরু করেছিলেন কাশী অঞ্চলেই। পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা অঞ্চলে তখন বাঙালীরা দলে দলে বাস করেছেন এবং ওসব অঞ্চলে ওঁরাই হয়েছেন প্রধান এবং সরকারী অনুগ্রহে প্রবল। ডাক্তার বাঙালী, উকিল বাঙালী, ডেপুটি বাঙালী, সাব-ডেপুটি বাঙালী। বাঙালীরা তখন আই-সি-এস হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর সুরেন বাঁড়ুজ্জে, রমেশ দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত পাশ করে এসেছেন। বাঙালী তখন ভারতবর্ষে দিগ্বিজয় করছে ইংরিজী বিদ্যে আর ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাদের অনেকজন প্রদেশান্তরে নতুন বটগাছের মত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। কাশীতেই কি বাঙালী তখন কম? কাশী আর বৃন্দাবন —এ-দুটি তীর্থই তো বাঙালীর তীর্থ। কাশীর 'বাংগালী' টোলাকে ভয় এবং খাতির কাশী-ধামের পাণ্ডারাও না করে পারত না। বৃন্দাবনে বাঙালীর খাতির আরও বেশী।

বিশেষ করে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরকে যে খাতির ইংরেজ সরকার দেখিয়েছিল, তা দেখে সারা ভারতবর্ষ চমকে গেছল। রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন ক্লাইভ সাহেবের দেওয়ান। তাঁর পোষ্যপুত্রের ছেলে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর—তিনি ইংরেজের অনুগত ছিলেন কিন্তু তাদের অযথা আনুগত্য দেখান নি। তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং কীর্তির জন্যে ইংরেজ সরকার তাঁকে কে-সি-আই-ই খেতাব দিয়েছিল। তখন তিনি বৃন্দাবনবাসী। গৃহত্যাগ করে চলে এসেছেন বৃন্দাবন। খেতাব নিতে তিনি গেলেন না কলকাতা লাটহেবের দরবারে। লিখলেন—আমি হিন্দু, আমি বানপ্রস্থ নিয়ে বৃন্দাবনে এসেছি, এখান থেকে আর আমার কলকাতা ফেরার উপায় নেই। তাতে আমাকে ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে।

শেষ পর্যন্ত আগ্রায় স্পেশাল দরবার করে লাটসাহেব তাঁকে খেতাব দিয়েছিলেন। আগ্রা নাকি বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের মধ্যে প্রথম বন—'অগ্রবন'। সেখানে পর্যন্ত এসেছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর।

* * *

—কোথেকে কোথায় যাচ্ছ, সুরেশ্বর। বাঙালীর সেকালের মহিমা আমার জানা আছে। তুমি তোমার দেবেশ্বর রায়ের কথা বল।

হেসে সুরেশ্বর বললে—জানা আছে তা জেনেও আমার সন্দেহ হয় সুলতা, জানাটা বেশ মনে মনে তলিয়ে বিচার করে জানা তো! আজকে যারাই স্বাধীন দেশে পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে আছে, তারা সবাই তোমরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, তোমাদের পূর্বপুরুষরা সে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা সেধে আসছে, কোন অনুগ্রহ নেয় নি বা নাও নি। বাড়ীতে কেউ লাঠিতে তেল মাখিয়ে, কেউ গাদা-বন্দুক নিয়ে ইংরেজ তাড়াবার কল্পনা করেছ। আমরা যারা জমিদার-রাজা বা ধনীদের বংশধর, সব অপরাধ আমাদের।

অর্চনা হেসে বললে—সুরোদা, হঠাৎ তুমি যেন মেজাজের ব্যাগাজ হারিয়েছ। বুঝেছি

তুমি কেন সেটা হারিয়েছ।

চুপ করে গেল সুরেশ্বর। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সামনে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সুলতা সবিস্ময়ে দেখলে, সুরেশ্বরের বড় বড় চোখদুটি কানায় কানায় জলে ভরে উঠেছে। সুরেশ্বর চোখের পাতা বন্ধ করতে পারছে না, ভয় হচ্ছে, চোখের পাতার চাপে জল গড়িয়ে ঝরে পড়বে।

—সুরেশ্বর!

—আমি বলছি সুলতাদি। আমি বলি। রায়বাড়ীর এই জবানবন্দীর সবটাই আমি জানি। সুরোদা আর কাউকে বলে নি কিন্তু আমাকে না-বলে পারে নি। আমি জানি।—

অর্চনা বললে—কথাগুলো যা তোমাদের হচ্ছিল, তা ওঘরে বসে আমি শুনছিলাম, আর কুড়ারাম রায়ের পাঁচালীর নকলখানা পড়ছিলাম। আমি ভাবছিলাম। ঠিক এই রকমই ভেবেছিলাম সুলতাদি। অবশ্য তুমি রাগ করবে এটা বুঝতে পারি নি। কারণ এখনও ঠিক যেন মনে ধারণাই করতে পারি না, তুমি কোন রকমে কীর্তিহাটের রায়েদের ভাল-মন্দ তারা যা করেছে তার সঙ্গে জড়ানো আছ। থাকার তো কথা নয়। রায়বাড়ীর কর্তাদের হাত যাদের উপর পড়েছে, তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভেঙে গেছে। তবে কিছু কিছু লোক আছে, যারা সত্যিই খুব বড় হয়েছে। তারা অবশ্য রায়বংশের কাউকে এখন আমলে আনে না।

সুরোদার ঠিক এমন ধরনের কিছু হবে, মানে চঞ্চল হবে, কি ছেলেমানুষের মত কেঁদে-টেঁদে ফেলবে, আমি তা ভেবেছিলাম। এইভাবে যখন ও চঞ্চল হয় তখন খানিকটা পাগলের মত হয়ে যায়। বড়ঠাকুরদা দেবেশ্বর রায়কে ও বড্ড ভালবাসে। তার ঋণ যেটা তার মধ্যে রায়বংশের পুরনো শ্যামাকান্তের ঋণকে আবিষ্কার করেছে। বলে, দেবেশ্বর রায় সে ঋণটা শোধ করতেন, করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা করতে তাঁকে দেন নি; দেন নি আমার দাদাশ্বশুরের মা, দেবেশ্বর রায়ের পিসীমা, সুরোদার অন্নপূর্ণামা, আমি তাঁকে বলতাম—বড়মা।

আমার বিয়ে হবার পর ওই নামেই তাঁকে ডাকতাম। আমার বিয়ে হল, এই জানবাজারের বাড়ী থেকেই বিয়ে হয়েছিল। বড়-জ্যাঠামশাই মানে যজ্ঞেশ্বর রায় আসেন নি, ছেলেরাও কেউ আসে নি, কিন্তু দুপুরবেলার দিকে ট্যাক্সি করে জ্যাঠাইমা এসেছিলেন। সঙ্গে একজন ঝি। একটা আংটি দিয়ে গিয়েছিলেন। এখান থেকে হরিশ মুখুজ্জে রোডের বাড়ীতে বড়মার সঙ্গেও দেখা করে প্রণাম করে গেলেন। বিয়ের মাস দুয়েক পরই বড়মা, আমার অন্নপূর্ণামা অসুখে পড়লেন। যেন এই বিয়েটার অপেক্ষাতেই তিনি ছিলেন। বলতেনও, আমাকে বলতেন—দেখ, তুই গতজন্মে আমাকে জন্ম দিয়েই পালিয়েছিলি। দেখ, সংসারে প্রসব করে সন্তানের সেবা আর ঈশ্বরের সেবা দুই সমান। সে যে না করে তার জীবনে ঋণ থাকে, জন্মান্তরে শোধ করতে হয়। সেই শোধ করতে এসেছিস। নে, বেশ করে সেবা কর; তেল গরম করে এনে পায়ে মালিশ কর, পিঠে মালিশ কর। আমি আর ঝিয়ের কাজ নেব না।

দু মাস পর হঠাৎ জ্বর হল। ঘুসঘুসে জ্বর। আমার স্বামীই দেখছিলেন। বললেন—

কিছু না। হেসে বড়মা বললেন—কিছু না নয় রে, তোর বউয়ের সঙ্গে আমার আর-জন্মের মার সঙ্গে হিসেব-নিকেশের পালা পড়ল। খতেনের খাতা খুলে বসেছে হিসেব-নিকেশওয়ালা। সুদে আসলে এতদিনে সেবা আমার কত পাওনা হয়েছে।

আমার স্বামী এসবে বিশ্বাস করতেন না, সুলতাদি। তিনি নতুন কালের নতুন মানুষ, মানে যেকালে আমার বিয়ে হল ১৯৩৭ সালে, সেকাল থেকেও অনেক পরের কালের মানুষ। -এরা চালাক, এরা চতুর, এরা মুখে বলে এরা যুক্তিবাদী কিন্তু আসলে এরা অবিশ্বাসবাদী, মানে জীবনে কোন বিশ্বাস নেই। যা আজকাল, মানে মহাযুদ্ধের পরে, স্বাধীন ভারতবর্ষে সব মানুষের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ। তিনি লুকিয়ে মদ খেতেন, তিনি···। চুপ করে গেল অর্চনা। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে সামলে নিয়ে সে বললে—এই এমন একটা বাড়ী যা বাইরে থেকে একেবারে আদর্শবাদের মন্দিরের মত মনে হত, সেই বাড়ীর কোণে কোণে এই কালের, এই ধারার তখন শুরু হয়ে গেছে।

যাক গে, যা বলছিলাম বলি। রায়বাড়ীর জবানবন্দী কীর্তিহাটের কড়চা যা সুরোদা ছবিতে এঁকেছে, তার মধ্যে দেবেশ্বর-ঠাকুরদার প্রথম জীবনের সব কথাই জমা ছিল, এই বড়মা, সুরোদার অন্নপূর্ণামা'র কাছে। তিনি নিজে নিজের মৃত্যুর কথা জানতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দিন পনেরো পর চিঠি লিখে ডেকে পাঠালেন সুরোদাকে। আমাকে দিয়েই লেখালেন, এবার আমি যাইব। আমার কাজ শেষ হইয়াছে, আমার মায়ের আসন পাতিয়া দিয়াছি; এবার আমার ডাক আসিয়াছে। আমি যাইব। তোমাকে কিছু বলিবার আছে, তোমাদের বংশের কিছু কাগজপত্র আমার নিকট আছে। তাহা তোমাকে দিতে চাই এবং তোমাকে কিছু বলিতেও চাই। সুরোদা চিঠি পেয়ে এল। বড়মা তার আগে তাঁর সেই পুরনো মেহগনী কাঠের হাতবাক্সের মধ্য থেকে বাণ্ডিল বাঁধা চিঠির তাড়া খুলে বসে বেছে বেছে খান বারো-চৌদ্দ বের করলেন। বললেন—চিঠিতেই সব আছে; এতেই সব পাবি। কিন্তু ঠিক ধরতে পারবি নে। যেসব কথা সামনা-সামনি দেবুর সঙ্গে কি দাদার সঙ্গে হয়েছে, তা তো চিঠির মধ্যে নেই। তার থেকে আমি বলি, তুই শোন। সে অনেক কথা রে!

* * *

সেদিনের কথা আমার চোখের উপর ভাসছে সুতলাদি। কলকাতা পৌঁছেই সুরোদা এসে হাজির হল আমাদের বাড়ীতে। বড়মায়ের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলে—বড়মা!

বড়মা তার দিকে তাকিয়ে বললেন—এসেছিস! আয়। দেখ, ওই কথাগুলি বললেন। তারপর বললেন—আমার ডাক এসেছে। আমি এবার যাব। তাই কথাগুলো তোকে বলে যাচ্ছি, আর এই চিঠিগুলো সেই কথার দলিল, তোকে দিয়ে যাচ্ছি। তোকে মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি রে তোর দেনার কথা, তোর দায়ের কথা, তোর ইচ্ছের কথা।

সুরোদা বুঝতে পারলে না। অবাক হয়ে মুখপানে তাকিয়ে রইল, বড়মায়ের মুখের দিকে।

বড়মা বললেন—কি, কিছু মাথায় ঢুকছে না তোর ?

সুরোদা হেসে বললে—না বড়মা, ঠিক ঢুকছে না। একটু গোলমাল ঠেকছে।

বড়মা বললেন—কই আমাকে রাঙাপিসী বলে ডাক তো! ওরে তুই যখন ছেলেবেলা বাপের সঙ্গে আসতিস, তখন আমার দেখলেই মনে হত, তুই আমার সেই দেবু। আমার গোরা ভাইপো! তাই তোকে ঠিক দেবুর ছেলেবেলার পোশাকের মত পোশাক তৈরী করিয়ে দিয়েছিলাম, তোর বাপকে বলেছিলাম—এই পোশাক পরিয়ে ওকে নিয়ে আসিস আমার কাছে। জ্বর হওয়া অবধি স্বপ্ন দেখছি, তুই এসে বলছিস—রাঙাপিসী, তোমার কাছে আমি যে সব দেনা করেছিলাম, তার হিসেবগুলো আছে, আমাকে বলে দাও। আমিই তোমার দেবু, রাঙাপিসী, গোরা ভাইপো। এই নামটি, গোরা নাম তাকে আমিই দিয়েছিলাম। গোরা মানে, সাহেব গোরা নয়, নবদ্বীপের গোরাচাঁদ।

জানালার ধার থেকে ফিরে এসে বসল সুরেশ্বর। বললে—তুই কথা বাড়িয়ে ফেলছিস অর্চনা। সে আমাকেই বলতে দে।

সুলতা, গোড়াতেই বলেছি এবং এখন অর্চনাও বলেছে, অন্নপূর্ণা মা আমার চেহারার সঙ্গে আমার ঠাকুরদার মিল দেখতে পেতেন। শুধু অন্নপূর্ণা মা কেন, মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর রায়ও বলেছিলেন একথা। রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন আমার দাদা দেবেশ্বর রায়, তুমি তার মত, হয়ত তার থেকেও উজ্জ্বল। মিল যে আছে. সে তাঁর ছবির সঙ্গে মেলালে তুমিও বের করতে পারবে। তার উপর ঘটনাচক্রে জানবাজারের বাড়ীতে হঠাৎ কুইনী এবং হিলডাকে দেখে তাঁর পুরনো কথাগুলো, যেগুলো তিনি ভুলে যেতে বসেছিলেন, সেগুলো নতুন করে মনে পড়েছিল। শুধু মনে পড়া নয়, একটা ধাক্কা যা তিনি সেকালে খেয়েছিলেন, তা আবার নতুন করে তাঁর মনে পড়েছিল।

ঘটনাগুলো বলে যাই, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে, কেন তিনি কুইনীকে দেখে চঞ্চল হয়েছিলেন, কেন তিনি আমাকে বলেছিলেন, কুইনীর বাড়ীখানা তাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে তোকে। কেন তিনি বলেছিলেন—কুইনীকে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনের পথে দাঁড় করিয়ে দিতেই হবে তোকে। এবং কুইনীকেই বা তিনি কেন বলেছিলেন, সুরেশ্বরবাবু তোর পড়ার ব্যবস্থা করবেন। সেই মত পড়াশুনো করবি তুই। বুঝলি ?

অবলীলাক্রমে বলেছিলেন। যেমন করে আপনার নাতি-নাতনী বা তাদের ছেলেমেয়েকে বলা যায় তেমনি করে বলেছিলেন। এমনটা তুমি কখনও অনুভব করেছ কিনা জানি নে, তবে আমি অনুভব করেছি। এই কুইনীর সম্পর্কেই অনুভব করেছি। কিছুক্ষণ আগেই বলেছি, কুইনীকে নিয়ে ওর সৎমামা হ্যারিসের সঙ্গে ঝগড়ার যেদিন বিচার করতে গিয়েছিলাম, তার কদিন পর বিবিমহলে অর্চনার সঙ্গে কুইনী এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং বাড়ীর দলিলটার সঙ্গে দেবেশ্বর রায়ের কখানা চিঠি সে আমাকে দেখতে দিয়েছিল। সে সব চিঠির মধ্যে আসল যা সত্য এবং জীবনের সঙ্গে জীবনের যে আসল সম্পর্ক তার একটা হিসেব ছিল। চিঠিগুলো পড়ে যখন মুখ তুললাম তখন কুইনী নেই। ওদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছিল, সে গোধূলির আলোয় শুকনো কাঁসাইয়ের বালুচর পার হয়ে কুইনী তখন শিলুটের ছবির মত চলে যাচ্ছিল।

সে ছবিটাও আমি এঁকেছি সুলতা। ছবিখানা আমার পরম প্রিয়। এই জবানবন্দীর মধ্যে সেখানার থাকা উচিত ছিল ; কিন্তু নেই। ছবির বিচারে সেইখানাই আমার শ্রেষ্ঠ ছবি। আমার বিচারেই নয়, বিলেতের বিচারেও বটে। কিনতে চেয়েছিল অনেকে, কিন্তু তা আমি দিই নি। ছবিখানা কুইনীই আমার কাছে চেয়ে নিয়েছিল।

এলিয়ট রোডের বাড়ীখানা কেড়ে নেওয়ার খবর পেয়ে যে কথা অন্নপূর্ণামা সেই জ্যাঠামশায়ের বাড়ী যাবার আগে আমাকে বলেছিলেন, তা শুনেছ। সে চিঠিখানাও রয়েছে এখানে। পৃথিবীতে পুরুষ আর নারী নিয়ে চিরকাল, সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে আসছে। বিচিত্র ঘটনা এই যে, যে-কোন পুরুষ যে-কোন নারীকে পেয়ে খুশী নয়, সুখী নয়। সেকালে রাজা-রাজড়াদের ঘরে ধরে আনা এবং বিয়ে করা নারী তো কম থাকতো না ; ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারদের সংখ্যা বাদই দাও, ওটা পৌরাণিক। এই তো সেদিনের ইতিহাস, মুর্শিদাবাদের নবাব সরফরাজ খাঁ'র নাকি সতেরোশো বেগম ছিল। তবু সরফরাজ রাবেয়া বেগমকে বেশী ভালবাসতেন। ভালবাসা একটা বিচিত্র মনের অবস্থা, ও একবার জন্মালে আর মরে না, অনন্ত মূলের মত মানুষের সমস্ত অন্তর জুড়ে মূল বিস্তার করে দেয়। কখনও কখনও অনাবৃষ্টির সময় মনে হয় বুঝি এবার শুকিয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু এক পশলা বৃষ্টি পড়লেই সারা অন্তর জুড়ে তার সবুজ অঙ্কুরের ডগা বেরিয়ে আচ্ছন্ন করে দেয়। এই ভায়লা বা ভায়লেট মেয়েটাকে সেই ভালবাসায় ভালবেসেছিলেন দেবেশ্বর রায়। তাই রাঙাপিসী যিনি তাঁর খেলার সঙ্গী ছিলেন, বড় বোনের মত ছিলেন, প্রিয় সখীর মত ছিলেন, তাঁর কাছে লিখেছিলেন—পিসী, তুমি আমাকে হাজার কয়েক টাকা ধার দাও। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে রাখছি, টাকা আমি শোধ দেব-দেব-দেব।

তখন ঘটনাটা অনেক দূর এগিয়েছে সুলতা। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া তাঁর হয়ে গেছে। এলিয়ট রোডে একটা বাড়ী খাড়া করেছেন। এই বাড়ীটা গোপালদার সঙ্গে পরামর্শ করে করেছেন। জানবাজার থেকে রিপন স্ট্রীট বেশী দূর নয়, তার ওদিকেই এলিয়ট রোড। ফিরিঙ্গী পাড়া। পাড়াটায় যারা বাস করে, তারা খেটে-খুটে খায়, আবার ইংরেজ যখন কলকাতা পত্তন করেছিল, তখন জাহাজে করে পুরুষদের সঙ্গে অনেকে মেয়ে যারা এখানে হোটেল, বারে এবং নানা বৃত্তি করে জীবিকা উপার্জন করত, তাদের অনেকে থাকত, তাছাড়া ক্লাইভের আমল থেকে যেসব নবাব ইংরেজরা হারেম রাখত, তাদের বংশের ছেলেমেয়েরাও অনেকে এদিকপানে ছটকে এসেছিল। লালবাজার, বেন্টিক স্ট্রীট থেকে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট, ওয়েলেসলী হয়ে বেনিয়াপোখরা পর্যন্ত যে সমাজটা, সে সমাজের মধ্যে, এক পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দৌলত আর সাহসে কিছু এদেশী মানুষ, এদেশী সমাজ কোনমতে টিঁকে ছিল। আজও আছে। এখন বিক্রম অবশ্য আমাদের বেশী। সেকুলার স্টেটের সুনাম ক্ষুণ্ণ না করেই বেশী হয়ে উঠেছে।

যাক গে।

এই এলিয়ট রোডের বাড়ীখানা ভাড়া নয়, লিজ নিয়ে ভায়লেটকে এনে রেখেছিলেন দেবেশ্বর রায়। এবং পরমানন্দে মধুযামিনী যাপন শুরু করলেন। দিন-রাত্রি, কীর্তিহাট,

বাপ-মা, বংশ-পরিচয় সব ভুলে এই ষোল বছরের কন্দর্পটি জীবনে বসন্তোৎসব জুড়ে দিলেন। পরীক্ষা হয়ে গেলেও কীর্তিহাট ফিরলেন না।

বার বার পত্র লিখলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু নানান অজুহাতে তিনি যাওয়া ঠেকিয়ে রাখলেন। রত্নেশ্বর রায় তাঁকে বিশ্বাস করলেন।

তখনকার সমাজ এবং বাঙালীর জীবন মনে করলে এটা খুব অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে না সুলতা।

বাঙলাদেশ তখন জাগছে। সব দিক থেকে, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম চার দিক থেকে যেন বারোটা সূর্য উঠছে।

শাস্ত্রমতে বলে, সূর্য হচ্ছেন বারোটি। বারোটি সূর্য বাঙলাদেশে তখন চারিদিকে প্রভাতের আলো ফুটিয়ে উঠতে শুরু করেছে। তার শিক্ষা পাল্টেছে, ধর্মের চেহারা পাল্টেছে, নতুন ধর্ম জেগেছে, মুসলমান আমলে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি এবং চারিদিকে তোলা আকাশ-ছোঁয়া পাঁচিল বাঙালীরা নিজেরাই ভেঙে ফেলেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী তখন ছাপা হয়ে বের হয়েছে। তাতে নবাবনন্দিনী আয়েষা কুমার জগৎসিংহের প্রেমে পড়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কুমার জগৎসিংহের জাত বাঁচাতে বিয়েটা দিতে পারেন নি, কিন্তু সত্যি বলতে, তিলোত্তমা থেকে নবাবনন্দিনী আয়েষাকে অনেক মহীয়সী এবং সম্ভবত রূপসী মনোহারিণী করে সৃষ্টি করেছেন।

ক্রশ্চানধর্মের গতি রোধ হয়ে গেছে; বউবাজারে মা ফিরিঙ্গী কালী পথরোধ করেছেন। এদিকে দক্ষিণেশ্বরে এক প্রায় নিরক্ষর ব্রাহ্মণ এসেছেন, তাঁর আশ্চর্য মহিমা। আশ্চর্য সারল্য। আশ্চর্য প্রেম। অপার ভালবাসা।

ব্রাহ্মধর্মের পর পর থাক হ'তে হ'তে আদি থেকে নববিধান, এবং নববিধান থেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে চেহারা নিয়েছে।

মিউটিনির পরই নীল বিদ্রোহ হয়ে গেছে। সে বিদ্রোহে বাঙালী হারে নি, জিতেছে। হরিশ মুখার্জির জেল হয়েছে। ফাদার লঙেরও জেল হয়েছে, যশোরের মাগুরা গাঁয়ের ঘোষেরা মাগুরায় বসে ছোট সাপ্তাহিক বের করেছিল, সে কাগজ নিয়ে তারা বাগবাজারে এসে বসেছে। বাঙলা কাগজকে এক রাত্রে ইংরিজী কাগজে পরিণত করে লাটসাহেবের উদ্যত রোষের সঙ্গে পাল্লা লড়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ সতেরো-আঠারো বছরের; দ্বিজু রায়, রামানন্দ চাটুজ্জে, আচার্য প্রফুল্ল রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র তখন বাঙলাদেশে অপরিচয়ের মধ্যে বেড়ে উঠছেন। দক্ষিণেশ্বরের যে ব্রাহ্মণের আশ্চর্য তপস্যা-চরিত্র সমগ্র পৃথিবীতে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে, তার মহিমা এবং তপস্যার যিনি ধারক-বাহক—দত্তবাড়ীর নরেন দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, তিনিও তখন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। বছর কয়েক পরেই তিনি তাঁর গুরু, যাঁকে তিনি My Master বলেছেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। এ সময়টা সেই সময়।

বাঙালী সে সময় শুধু ধন-সম্পদ খোঁজে না, বিষয়-বিষয় করে গলি-ঘুঁচিতে ঘোরে-ফেরে না, সে আরও অনেক কিছু খুঁজছে। অনেক প্রশ্নও তার মনে জেগেছে। একদিকে সে

ওল্টাচ্ছে এদেশের পুরনো ইতিহাস, শাস্ত্র, পুঁথি, বেদান্ত, উপনিষদ, অন্যদিকে সে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আস্বাদ নিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস, কবিতা পড়েছে। শুধু রেনল্ডের 'মিষ্ট্রি অব দি কোর্ট অব লণ্ডন' নয়, আরও অনেক পড়েছে, স্কট ডিকেন্স পড়েছে। জীবনে তার নতুন আলোকপাত হয়েছে। দেবেশ্বর রায় বেশ একটু ইংরিজী-ঘেঁষা লোক ছিলেন। তিনি এই অর্ধ-শ্বেতাঙ্গিনী ভায়লেটের কিশোর জীবনের ভালবাসার আকণ্ঠ ডুব দিয়ে তার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে ভাবছিলেন, কিছু টাকা মূলধন পেলে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে মাইকেলের মত একজন কেউ হবেন।

সেই সময়টায় তিনি মাইকেলের মত দাড়ি-গোঁফ রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। এবং খাঁটি সাহেবী পোশাক পরে ভায়লেটকে পাশে বসিয়ে ফিটনে চড়ে বেড়াতেও যেতেন।

সুলতা, অন্নপূর্ণামা সেই রোগশয্যায় আমাকে ডেকে বললেন—দেখ, দেবু তার মৃত্যুর আগে আমার কাছে এসেছিল। বলেছিল—রাঙাপিসী, তুমি আমাকে টাকাটা দাও নি, সে হয়তো আমার ভাল-মন্দ বিচার করতে গেলে ভালই করেছ। কারণ ভায়লেট এমনই অশিক্ষিত ছিল এবং এমনই ওয়াইল্ড ছিল যে, আমি তাকে সহ্য করতে পারতাম না। তাতে এর থেকেও অনেক বেশী যন্ত্রণা আমাকে সইতে হত।

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—তখন দেবু মদ প্রায় সব সময়ই খেত। মনের যাতনায় খেত। তবে হ্যাঁ, বুঝতে কেউ পারত না। দেবুর কথাটা শুনে আমার খুব অনুশোচনা হয়েছিল রে। আমি তাকে বলেছিলাম—দেবু, টাকাটা দিতে আমি পারতাম, কিন্তু তোকে যে চিরকালের জন্যে হারাতাম, দেবু।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—না পিসী, তুমি হারাতে না আমাকে। আমি তোমার সেই দেবুই থাকতাম। তবে হাঁ, বাবা-মা'র সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। সমাজের সঙ্গে হ'ত। তা হ'ত। কিন্তু তা কি আটকানোই গেল রাঙাপিসী? বল, তুমিই বল! গেল! বাবার সঙ্গে প্রতি-পদে ঝগড়া হল। প্রতি পদে। যে মানুষটাকে সারা দেশে বললে, এমন ধার্মিক, সুবিচারক হয় না, তাকে আমি নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ছাড়া কিছু দেখলাম না। একটা অত্যন্ত হিংস্র মানুষ। উঃ রাঙাপিসী, বাবার এই মনে চেপে রাখা প্রতিহিংসা, আর সময় এবং সুযোগ বুঝে আইনের পথে শোধ তোলা এ যে কি ভয়ানক তুমি কল্পনা করতে পারবে না। জান রাঙাপিসী, বাবার পছন্দ করা মেয়ে বলে কাশীর বউকে আমি কোনদিন পছন্দ করতে পারলাম না। এমন ধর্মবাইগ্রস্ত স্বামীতে, দেবতায়, ধর্মে তার অচলা ভক্তি, কোনদিন সে আমার উপর জোর খাটালে না, কোনদিন সে আমার একটা অবিচারের প্রতিবাদ করলে না, না পারলাম তার উপর রাগ করতে, না পারলাম তার উপর ঘেন্না করতে, না পারলাম তাকে ভালবাসতে; পিসী ভালবাসতে গেলে সে ভালবাসা নিলে না, ফেলেও দিলে না, একটু হেসে পাশে সরিয়ে রেখে দিলে। নেড়েচেড়েও দেখলে না।

স্নানিস সে কেঁদে ফেলেছিল সেদিন। অন্নপূর্ণামা বললেন—আমি সেদিনও তাকে বলতে পারলাম না যে, ওরে দেবু, ও ক'নে দাদা পছন্দ করে নি রে, পছন্দ করেছিলাম আমি। আমার বড় ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে; তোর চিঠি পেয়ে আমি তোকে উত্তর দিলাম না,

দাদাকেও বিশেষ কিছু জানালাম না, লিখলাম—আমার সঙ্গে মিটমাটের কথা যা চাহিতেছ, তাহার জন্য কলিকাতা যাইতে লিখিয়াছ; কিন্তু তুমি কাশী এস না কেন? তুমি জমিদার, স্বাধীন মানুষ; আমি মেয়েছেলে, পিসেমশায় ছুটি না পাইলে যাইব কেমন করিয়া এবং মিটমাট দুই পক্ষের মধ্যে বসিয়া করিয়াই বা দিবেন কে!

এরই মধ্যে দেখলাম এই মেয়েকে। দশাশ্বমেধ ঘাটে তার দিদিমার সঙ্গে স্নান করতে এসেছে। ফুটফুটে মেয়েটি। কিন্তু সেই বয়সে কি ধর্মনিষ্ঠা আর কি ভক্তি! পরিচয় নিয়ে জানলুম, দিদিমা নদে জেলার জমিদারবাড়ীর গিন্নী, জমিদার থেকেও ব্যবসায়ে ওদের নামডাক খুব বেশী, অবিশ্যি দেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে মেয়েটি গিন্নীর মেয়ের মেয়ে, মা মারা যাওয়ার পর থেকে দিদিমার কাছে মানুষ হচ্ছে। আমি পরিচয় দিয়ে পিসেমশাইকে নিয়ে কথাবার্তাটা খানিকটা পেড়ে রাখলাম। দাদাকে লিখলাম, "তুমি শিগ্‌গির আসিবে। তুমি এলে মিট-মাটের কথা সব হইবে।"

দাদা আসতে পারলে না। কমিশনার লাট অনেক কথা লিখলে। রায়বাহাদুর খেতাব দেবেন সরকার, তার তদ্বিরের জন্য এখন দেশ ছেড়ে আসা অসম্ভব। অগত্যা আমি কলকাতা গেলাম। দেখলাম স্টেশনে জানবাজারের গাড়ী এসেছে। কিন্তু একজন গোমস্তা ছাড়া কেউ আসে নি। আমার রাগ হল। আমি জানবাজার গেলাম না, গিয়ে উঠলাম জোড়া-সাঁকোর জেঠামশাইয়ের বাড়ী।

সেখানে গিয়ে খবর শুনলাম, দেবেশ্বর বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

অবাক হয়ে গেলাম। দেবু আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বন্দুকের গুলিতে?

উত্তর শুনলাম—হ্যাঁ।

পিসেমশাই বললেন—তাহলে এখানে নয়। ফিরে গিয়ে গাড়ীতে ওঠ মা। চল্ ওখানে চল্। এই জন্যে কেউ স্টেশনে আসে নি।

জানবাজারের বাড়ীতে গিয়ে অন্নপূর্ণা দেবী এবং বিমলাকান্ত পৌঁছে দেখেছিলেন রত্নেশ্বর রায় বড় সাহেবডাক্তারকে বিদায় করছেন। সাহেব তাঁর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে তাঁর ব্রুহাম গাড়ীতে চড়ছেন। বলছেন—রত্নবাবু, It is only luck—only luck—that has saved your boy. Offer your thanks and gratitude to God and God alone. I have not done anything.

অন্নপূর্ণামা বলেছিলেন আমাকে, আমি কাশীতে পিসেমশায়ের কাছে ইংরিজী শিখে-ছিলাম, কিন্তু সাহেবের কথা একবিন্দু বুঝি নি। পা আমার সিঁড়িতে আটকে গেল, আমি উপরে যেতে পারলাম না।

সাহেবকে বিদায় করে দাদা ফিরে এল ঘরের মধ্যে, পিসেমশায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘরের মধ্যে, তিনি বললেন—তাহ'লে ভয়ের কিছু নেই!

গম্ভীরভাবে কীর্তিহাটের রায়রাজা আমার দাদা বললে—না। তবে যা হবার হয়ে গেলেই তো ভাল হত। ভগবান আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতেন, রায়বংশকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করতেন। গুলিটা চালাতে চেয়েছিল বুকে। বন্দুকটার বাঁট মেঝেতে রেখে

নলটা বুকে লাগিয়ে পা দিয়ে ট্রিগার টিপেছে, এখন বন্দুক তো ফায়ারিংয়ের সময় খানিকটা ঝাঁকি দেয়, back push করে, তাইতেই পিছলে গিয়ে গুলীটা বগলের ভিতরে মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে। ছররা হলেও ক্ষতি হ'ত, দু-চারটে এদিক-ওদিক ঢুকতে পারত। এ একেবারে বুলেট। সুতরাং জীবনহানি হয় নি, কেলেঙ্কারিই সার হয়েছে।

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। নড়বার শক্তি তখনও আমার হয় নি। পিসেমশাই বললেন—কি বলছ তুমি রত্নেশ্বর ?

—ঠিক বলছি। আমি বাল্যকাল থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত আপনার কাছে মানুষ হয়েছি। আপনি কি আমাকে এমনিই মমতাহীন পাষণ্ড করে গড়ে তুলেছিলেন যে, নিজের জ্যেষ্ঠ সন্তান, প্রথম সন্তান সম্পর্কে এমনি কথা বলব ? মরাই ওর উচিত ছিল, চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, রায়বংশের দুর্ভাগ্য, সব থেকে বেশী দুর্ভাগ্য আমার যে,—

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল দাদা। বলেছিল—চলুন ওপরে চলুন। এখানে লোকজনে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বাড়ীর গোপন কথা, কি কেলেঙ্কারির কথা সে এক রকম ওরা জেনেছে, তার প্রতিবিধান তো করতে হবে। কিন্তু আমাদের কথাগুলো ওদের শুনতে দিয়ে লাভ কি ?

*　　　　*　　　　*

অন্নপূর্ণামা থাক-থাক করে চিঠিগুলো সাজিয়ে হাতে ধরে বসে কথাগুলি বলছিলেন আমাকে। ঘরের মধ্যে ছিল শুধু অর্চনা, আর কেউ ছিল না। আমি অনেকটাই জানতাম, কিন্তু এমন বিশদভাবে জানতাম না। বাইরেটা দেখে যতটা জানা যায় ততটাই। মর্মকথা নয়।

দাদা জানবাজারের বাড়ীতে সেবার এসে উঠেছিল খবর-টবর না দিয়ে। খবর যা ছিল, তাতে দাদার আসবার কথা একদিন পরে, কিন্তু মেদিনীপুর থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চিঠি দিয়ে একদিন আগে আসতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, চুঁচড়োতে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। সাহেবের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট যাবে, সেটা দেখাবেন। কমিশনার নিজেই ডেকেছেন।

রত্নেশ্বর রায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গেই সকালে রওনা হয়ে হাওড়া পৌছে ওখান থেকেই গিয়েছিলেন চুঁচড়ো। বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের আসন চুঁচড়োতে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করে খুশী মনেই ফিরছিলেন। মনের মধ্যে ক্রোধের আগুন একটা জ্বলছিল। কিন্তু সেটাকেও তিনি লণ্ঠনের ফানুস পরিয়ে আগুন থেকে সুন্দর একটি লণ্ঠন করে তোলা যায় কিনা ভাবছিলেন। সেটা ভায়লেট এবং গোপালকে নিয়ে। ভায়লেট একদা অদৃশ্য হয়েছে কীর্তিহাট থেকে। গোপালই এনেছিল কীর্তিহাট থেকে। এবং দিনকয়েক থেকে একদিন ওই গোয়ানপাড়ারই এক আধবুড়ী গোয়ানবুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে ভায়লেটকে এনে তুলেছে এই এলিয়ট রোডের বাড়ীতে। বাড়ীখানা তখন সন্ত নতুন তৈরী হয়েছে। ঝকঝকে বাড়ী। বাড়ীটা করেছিল একজন খাঁটি সায়েব, যার মতলব ছিল—আর হোমে সে ফিরবে না। সেও এক প্রেমের ব্যাপার। এখানে প্রেমে পড়েছিল, তাই ফিরে যাবে না মতলব করেছিল। সেখানে

পুরানো বিয়ে করা বউ ছেলেমেয়ে ছিল, একে নিয়ে হোমে গেলে জেল খাটতে হবে। কিন্তু তার ভাগ্য, বাড়ী-টাড়ী হল কিন্তু যে-মেয়েটার প্রেমে পড়েছিল, সে মরে গেল হঠাৎ। সায়েব বাড়ীটা বিক্রী করে দিয়ে বিলেত চলে গেল। বাড়ীটা কিনেছিল কলকাতার বাড়ীভাড়া ব্যবসায়ী যারা তাদের একজন। কিন্তু ভাড়া সহজে হচ্ছিল না। বাড়ীটার নাম রটে গিয়েছিল অপয়া—আনলাকী। গোপাল ঘোষ খবর পেয়ে দেবেশ্বর রায়কে খবরটা দিয়েছিল; তরুণ দেবেশ্বর বলেছিলেন—রাবিশ। অপয়া। আনলাকী। ওসব আমি মানি নে গোপালদা। চল, বাড়ীখানা দেখে আসি। পছন্দ হলে ওই বাড়ীই নেব। নতুন বাড়ী, সায়েবী-রুচিতে করা বাড়ী।

তরুণ দেবেশ্বরের দেখবামাত্র ভাল লেগেছিল এবং সেই পথেই বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কথা বলে পাকা করে, ওখান থেকেই গিয়েছিলেন হ্যামিল্টনের বাড়ী। হাতে আংটি ছিল। একটা খুব দামী হীরের আংটি, সেটা পৈতের সময় পেয়েছিলেন; আর একটা আংটি—সেটা বীরেশ্বর রায়ের একটা দামী দুর্লভ নীলার আংটি। সেটা তাঁর আঙুলে শেষদিন পর্যন্ত ছিল। লোকে বারণ করত, এটা পরবেন না। কিন্তু তিনি তা ছাড়েন নি। আংটিটার গল্প ছেলে-বয়স থেকে শুনেছিলেন দেবেশ্বর রায়। এ নীলা সহ্য হলে রাজা হয় মানুষ। এই আংটিটা একদিন বাপের সম্মুখেই খোলা জহরতের বাক্স থেকে হাত-সাফাই করে তুলে নিয়েছিলেন। সেটা পরতেন তিনি। এবং ভায়লেটকে পেয়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল আংটিটা তাঁর সহ্য হয়েছে। হ্যামিল্টনের বাড়ীতে গিয়ে বড় হীরের আংটিটা এবং হীরের বোতাম বিক্রী করেছিলেন, আর এই নীলাটা বন্ধক রেখে টাকা কম পান নি—পেয়েছিলেন দশ হাজারের বেশী।

সেই টাকায় বাড়ী লিজ নিয়ে ফারনিচার কিনে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভায়লেটকে কীর্তিহাট থেকে এনে মধুচন্দ্রিকা যাপন করছেন।

দেবেশ্বর রায় বাপ রত্নেশ্বর রায়কে ভয় করেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে বাপের কঠোর সমালোচক। বাপের কাঠিন্য এবং কঠোরতা তাকে তাঁর অজ্ঞাতসারে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাছাড়া তিনি বেপরোয়া। তিনি গ্রাহ্য কাউকে করেন না। বাপকে পত্রে লেখেন—তখনকার দিনের এ-মিটিং ও-মিটিংয়ের কথা। এবং তার সঙ্গে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের মতের কথাও জানাতেন। যা পড়ে রত্নেশ্বর মৃদু হাসতেন। তাঁর মনে পড়ত তাঁর বাল্যকালের কথা। তিনি যখন নিজেকে কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর দৌহিত্র বলে জানতেন, তখন তিনি নিত্য অভিসম্পাত দিতেন এই বংশটিকে। সোচ্চারে দিতে পারতেন না ভবানী দেবীর জন্য। ভবানী দেবীকেও তিনি তখন নিজের গর্ভধারিণী বলে জানতেন না।

তারপর?

তারপর বিচিত্র ঘটনাচক্রে সব উল্টে-পাল্টে গেল। বীরেশ্বরের পুত্র হিসাবে তিনি আজ কীর্তিহাটের ষোল আনা সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক। তিনি নিজের মত অনুযায়ী বীরেশ্বর রায়ের আমলের ধারাপদ্ধতি সবই পাল্টেছেন। জোরজুলুম, জবরদস্তি, দৈহিক নির্যাতন ক'রে, গ্রাম জ্বালিয়ে, লাঠিবাজী ক'রে প্রজাশাসন তিনি তুলে দিয়েছেন। আজ সবই চলে দেশের প্রচলিত আইনের কাটায়-কাটায়। কারুর সাধ্য নেই যে তাঁকে প্রজাপীড়ক বলে, তবু তিনি

নিজে জানেন, অনুভব করেন আজ কীর্তিহাটের কাছারীকে, কীর্তিহাট এস্টেটের প্রজারা কত বেশী ভয় করে। এ তো সেই তিনিই করেছেন। এবং তার সঙ্গে দেশের আমল—হাল-চাল আইন সাহায্য করেছে।

১৮৫৭ সাল থেকে ভাইকাউন্ট আর্ল ক্যানিং, লর্ড এলগিন, লর্ড লরেন্স, লর্ড মেয়ো, লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড লিটন একের পর এক লাট হয়ে এসে গোটা দেশে কেমন করে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করলে তা দেখেছেন তিনি। শিখেছেন অনেক কিছু। লর্ড লিটন চলে যাবেন, আসবেন লর্ড রিপন। লর্ড লিটনই তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাব মঞ্জুর করেছেন।

ছোট লাটবাহাদুর নিজে তাঁকে 'ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন—"তুমি যে তোমার জমিদারীর মধ্যে নেটিব ক্রশ্চানদের জন্য চার্চ করেছ এবং সেখানে স্কুল ক'রে দিয়েছ তাদের জন্য, এর জন্য তোমাকে আমার ব্যক্তিগত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ-ধরনের উদারতা সত্যই প্রশংসনীয়।"

দেবেশ্বর আজ চিঠিপত্রে যাই লিখুক কলকাতার মিটিং এবং হুজুগ আর ফ্যাশনের নেশার তার বিন্দুমাত্র লেশ থাকবে না, যখন সে রায়বাড়ীর জমিদারীর আসনের স্বাদ পাবে। তার আয়ের স্বাদ, সম্মানের—তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মূলের সন্ধান পাবে। হ্যাঁ, তবে নতুন জীবনে এগুলো ভাল। অন্তত সমাজে, বাইরে পাঁচজনের সামনে ভাল লাগে।

তিনি জানতেন না, দেবেশ্বর নিজের জীবনে কতখানি শিকড় চালিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে দুনিয়ার মাটির উপর। বুঝতেন না তার মতামতের মূল্য কতখানি। এবং মনে তিনি ভাবতেও পারেন নি যে, দেবেশ্বর ষোল বছর বয়সে চৌদ্দ বছরের ভায়লেটের প্রেমে পড়েছে এবং গোপালদার সাহায্যে তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে বাড়ী ভাড়া করে রেখেছে।

রত্নেশ্বর রায়ের অনুমান ছিল এবং কীর্তিহাট অঞ্চলে প্রবল গুজব ছিল যে, গোপালই ভায়লেটকে নিয়ে পালিয়েছে কলকাতায়। রত্নেশ্বর চিঠি লিখেছিলেন কলকাতায়, নায়েবকে —"গোপাল সম্পর্কে এখানে অনেক গুজব রটিয়াছে। সে কলিকাতায় কি করিতেছে বা তাহার সমুদয় বিবরণ আমাকে পত্রপাঠ জানাইবা।" দেবেশ্বরকে লিখেছিলেন—

He is a scoundrel.—The Goans of our Goanpara say that Gopal has eloped with Violet Podros the girl—who you may remember—garlanded us in the meeting and who—happens to be the daughter of one of our women employees in the house—Anjana. You were a mere boy at that time, —she was your nurse—very favourite of yours—you may remember her. She embraced christianity and married a Goanese Christian. Violet is her daughter. You just warn him—and tell him—that he shall have to be a Christian and marry this girl.

* * *

চুঁচড়ো থেকে ফিরে বাড়ী পৌঁছেই রত্নেশ্বর নিচের ওই হলঘরে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রত্যাশা করেছিলেন, দেবেশ্বর সহাস্যমুখে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রণাম করবার জন্য দাঁড়িয়ে

থাকবে বা কাঠের সিঁড়ির উপর, ম্যাটিংয়ে চটির দ্রুত শব্দ তুলে, ছুটে নেমে আসবে।

গম্ভীর রাশভারী মানুষ রত্নেশ্বর রায়। রায়বংশের কাঠামো, তার উপর জীবনের প্রথম দিকটা কাশীর জলে-হাওয়ায়, ঘিয়ে-ময়দায় ল্যাংড়া আম, কাশীর পেয়ারা এবং বাদাম-পেস্তা খেয়ে আর কুস্তি করে, সাঁতার কেটে মজবুত হয়ে গড়ে উঠেছে, চোখের চাউনিতে ছিল একটা তীক্ষ্ণ এবং অবজ্ঞার দৃষ্টি, অল্পেই কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা দেখা দিত। তার সামনে সহজে কেউ মুখ তুলে কথা বলতে পারত না। কিন্তু দেবেশ্বর প্রসন্ন হাসিমুখে তরুণকণ্ঠে উৎসাহের সুরে "বাবা" বলে ডাকলে রত্নেশ্বর আর একরকম হয়ে যেতেন। প্রণাম করতে করতে দুই হাতে তুলে ধরে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। তারপর তার কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে বলতে উপরে উঠে যেতেন এক প্রবীণ ও এক নবীন বন্ধুর মত।

সেদিন তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। দেবেশ্বরের চটির শব্দ উপরে বাজল না, এগিয়ে এল না। তিনি ডাকলেন—দেবু! দেবেশ্বর!

সাড়া মিলল না। এবার তাঁর মধ্য থেকে বেরিয়ে এল কীর্তিহাটের এস্টেটের জমিদার রত্নেশ্বর রায়, যে-রত্নেশ্বর রায় ম্যাজিস্ট্রেটকে অ্যালিবি সাক্ষী রেখে দশ ক্রোশ দূরের রাধানগরের দে-সরকারের ঘর জ্বালিয়ে এসেছেন, দাঁড়িয়ে হুকুম দিয়ে দে-সরকারের হাত ভেঙে দিয়েছেন, যে-রত্নেশ্বর রায়ের অভিষেকের উৎসবের সময় গোপাল সিংয়ের মত দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত খুনে দাঙ্গাবাজকে একদিনে নাগপাশে বেঁধে এনে দাসখত লিখিয়েছেন, সেই জমিদার!

শুধু একটা ধমক। কাউকে উদ্দেশ করে নয়। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—কোথায় দেবেশ্বর?

নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে গিয়েছিল গোটা বাড়ীটা। একটা সূচ পড়লে শোনা যেত।

—কোথায় সে? তারপর দেবেশ্বরের খাস চাকরকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—এই শূয়ার কি বাচ্চা! শুনতে পাচ্ছিস নে?

সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে তার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে বলেছিলেন—কোথায় সে? এই হারামজাদা!

এরপর কথাটা প্রকাশ হতে কতক্ষণ লাগে? প্রকাশ হয়ে পড়েছিল—"বড়বাবু সন্ধ্যে হলেই চলে যান, যেখানে গোপাল থাকে সেখানে। ফেরেন সকালবেলা।"

চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু মুখ থেকে একটি কথাও বের হয় নি। হয়তো মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করে নিয়ে থাকবেন, গোপাল যেখানে থাকে, সেখানে? তাহলে? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল ভায়লেটকে। তাহলে?

কত প্রশ্ন, কত ক্ষোভ, কত ক্রোধ এর সঙ্গে জেগেছিল তার প্রকাশ বাইরে কেউ কিছু দেখে নি। দেখতে পায় নি। এবং রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতেও তার এতটুকু প্রকাশ নেই। তবে গোপন করেন নি ঘটনাটাকে।

রত্নেশ্বরের ১৮৭৮ সালের ডায়রীখানা নিয়ে সুরেশ্বর পড়লে—"বাড়ী পৌঁছিয়া দেবেশ্বরকে দেখিলাম না। সকলকে প্রশ্ন করিলাম। কেহ উত্তর দিল না। নতমুখে মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল। আমার সন্দেহ হইল। এবার ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই শুনিলাম,

এলিয়ট রোডে একখানি বাড়ী ভাড়া বা লিজ লইয়া সেখানেই দেবেশ্বর রাত্রিযাপন করে। গোপালও সেখানে থাকে। সুতরাং ভায়লেট। সে-ও সেখানে থাকে। বাড়ী ভাড়া করিবার সাধ্য গোপালের নাই। সুতরাং এ-কর্মের সকল দায় দেবেশ্বরের। তৎক্ষণাৎ আমি গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলাম—ওসমান! গাড়ী লে আও জলদি! ওসমান! এবং বিক্ষুব্ধ অন্তর লইয়া সম্মুখের বারান্দার পদচারণা করিতে লাগিলাম। গাড়ী আসিতেই তাহাতে আরোহণ করিয়া বলিলাম—ওসমান! ওসমান সেলাম করিয়া কহিল—জী হুজুর।—

—কিসকা নিমক তুম খাতে হো? হামারা?

—জরুর! হামারা বাপ আপনা বাপকে নিমক খায়া, হাম আপকে নিমক খাতা।

—হাঁ। নিমকহারাম যো হোতা হ্যায়—উসকা পর খুদা নারাজ হোতা হ্যায়, জিন্দীগি বরবাদ যাতা হ্যায়। কেয়া, বাত ঠিক হ্যায় কি, নহি?—

—হাঁ হুজুর, ঠিক হ্যায়!

—বাস, চলো, মুঝে, মেরা লড়কা তুমলোগোঁ কা বড়াবাবু, সামকো যাঁহা যাতা হ্যায়, হুঁয়া লে চলো। আউর কোই আদমী উনকা হুঁয়া খবর না দে।—চলো!

এলিয়ট রোডের বাড়ীখানা অধিকাংশ ফিরিঙ্গীপাড়ার বাড়ীর মত একলাই ছিল, কিন্তু দোতলায় একখানা প্রশস্ত ঘর দেবেশ্বর নিজে করে নিয়েছিলেন। হাজার হলেও জমিদারের ছেলে, নিতান্ত একতলায় খুব একটা সুলভ-প্রাপ্যতার মধ্যে থাকতে তাঁর মন চাইত না। নিচে একখানা ঘরে থাকত গোপালদা। একখানা ঘরে থাকত ভায়লেটের সঙ্গে এসেছিল যে গোয়ানীজ মেয়েটি সে; আর বাকিগুলোর কোনটা ছিল বিলিতী কায়দায় ড্রইংরুম, কোনটায় করছিলেন লাইব্রেরী, সেখানে মাস্টার এসে ভায়লেটকে পড়াতো, লেডী করে তুলত।

রত্নেশ্বরের গাড়ী গিয়ে বাড়ীটার সম্মুখে দাঁড়াল। তিনি ফটকটা খুলে থমকে দাঁড়ালেন। অতর্কিতে ঢুকলেন না।

ডাকলেন—বেশ উচ্চকণ্ঠেই ডাকলেন—দেবেশ্বর!

উপরে হাসির শব্দ উঠছিল, বন্ধ হয়ে গেল। নিস্তব্ধ বাড়ীখানা যেন ভয়ার্ত হয়ে গেছে। আবার রত্নেশ্বর ডাকলেন—দেবেশ্বর! এবং এবার গিয়ে সামনের দরজায় ধাক্কা দিলেন।

—দরজা খোল দেবেশ্বর!

উত্তর একটা এল। কিন্তু কথায় নয়। বন্দুকের শব্দে। একটা বন্দুকের শব্দ উঠল দোতলায়।

রত্নেশ্বর চমকে উঠলেন। ডাকলেন—ওসমান! ভাঙো, দরজা ভাঙো।

দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে ওসমানকেই বললেন—ওসমান, কোথায় দেবেশ্বর?

উপর থেকে তখন কাতর আর্ত চীৎকারে বুক ফাটিয়ে ভায়লেট ডাকছে—রাজাবাবু—আমার রাজাবাবু—

উপরের ঘরে এসে দরজার মুখে দাঁড়ালেন রত্নেশ্বর রায়। দেখলেন—দেবেশ্বর চিৎ হয়ে

পড়ে আছে, রক্তের মধ্যে যেন ভাসছে। তার বুকের উপর পড়ে চীৎকার করে কাঁদছে ভায়লেট—রাজাবাবু— My darling—রাজাবাবু—My prince—রাজাবাবু।—

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দেবেশ্বর জানত, বাপ আসবেন দিনে। কিন্তু গাড়ী হাওড়া থেকে দিনেরবেলা ফিরে এসেছিল। বাপ আসেননি, চুঁচড়ো গেছেন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে—এই খবর পেয়েই দেবেশ্বর দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ চলে গিয়েছিল এলিয়ট রোডের বাড়ী; সারাদিনরাত আজ ভায়লেটকে নিয়ে আনন্দ করবে। ভোর ভোর বাড়ী ফিরে এসে ভাল ছেলে সাজবে।

ভাল ছেলে সাজবার ইচ্ছে তার ছিল না। মিথ্যে কথায় তার শুধু অরুচিই ছিল না, ঘেন্না করত সে মিথ্যে কথা বলতে। সে কতবার বলেছে—মিথ্যে কথা বললে নিজের কাছে নিজের মান যায় রাঙাপিসী। যুধিষ্ঠির নাকি ধর্মপুত্র, তার মা কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজের ঔরসে তার জন্ম, সে সত্য গোপন ছিল না, তাই তাতে পাপ ছিল না; নিজে যুধিষ্ঠির সত্যবাদী ছিলেন বলে তাঁর রথ চলত বাতাসের উপর দিয়ে, মাটি থেকে কিছুটা ওপরে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গুরু দ্রোণকে বধ করবার জন্ম তাঁকে দিয়ে বলাতে হল অশ্বত্থামা মরেছে। মরেছিল অশ্বত্থামা হাতী। কৃষ্ণ বললে—'হাতী' কথাটা বলে দরকার কি? বল অশ্বত্থামা মরেছে, তাতেই দ্রোণ শোকার্ত হবে। দুর্বল হবে। যুধিষ্ঠির বললেন—অশ্বত্থামা হত ইতি গজ। ইতি গজ বাক্যটুটি আস্তে বলেছিলেন বলে গোটা কথাটাই মিথ্যের সামিল হল। রথখানা তাঁর চিরদিনের জন্ম মাটিতে নামল। কিন্তু বাবাকে এমন ভয় করে যে, সব গোলমাল হয়ে যায়। বাবার সকল কাজ আমার ভাল লাগে না। মনে হয়, বাবার মত নিষ্ঠুর অহঙ্কারী স্বার্থপর মানুষ আর নেই।

ওই ভয় করে এবং গোলমাল হয়ে যায় বলেই সে ভায়লেটকে বিয়ে করে কৃশ্চান হবে এবং ব্যবসা করে বড় হবে সংকল্প করে আমাকে চিঠি লিখেছিল টাকার জন্ম। নিজের আংটি-বোতাম, হীরে-নীলা বেচে যে-টাকা পেয়েছিল, সে-টাকাটায় বাড়ী কিনে আর সাজিয়ে খরচ করে ফেলে আপসোস হয়েছিল। এত খরচ না করলেই হত। কিন্তু যে দেবেশ্বর কীর্তিহাটের রায়দের উন্নতির চরম সময়ে জন্মেছে এবং রাজা-রাজড়ার ছেলেদের মত মানুষ হয়েছে, সে প্রথম প্রেম করে যে-ঘর বাঁধবে, তাতে টাকা খরচ না করে পারে! পারেনি। খরচ করেছিল। এবং খরচ করে তখন ব্যস্ত হয়েছিল টাকার জন্ম, টাকা নিয়ে সে ব্যবসা করবে। ব্যবসা সে জানত না কিন্তু সাহস তার ছিল।

যাক ওসব কথা, সে আমল বোঝা কঠিন তোদের পক্ষে। তখন ছড়া ছিল—হট্টমালার দেশের ছড়া। হীরে পোড়ানো মাজনে দাঁত ঘষত, মুক্তো-পোড়ানো চুনে পান খেতো; দুধে তারা আঁচাতো। হীরের মাজনটা অতিরঞ্জন কিন্তু বাকিগুলো সব সত্যি। রায়বাড়ীতে জামাই হোক আর বউ হোক—প্রথম খেতো সোনার থালায়। আর আঁচাবার সময় গাড়ুতে যে জল দেওয়া হত, তাতে অর্ধেকটা দুধ মেশানো থাকত। এই অর্চনার বিয়েতে রথীনকে আঁচাতে জল দেওয়া হয়েছিল, তাতেও দু-ঝিনুক দুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রায়বাড়ীর সে-সম্পদ কল্পনা করতে পারবিনে যে। আমার বিয়ে হয়েছিল দশ পার হয়ে এগার বছরে। তখন কীর্তিহাটের লক্ষীর ঘরে বড় বড় লোহার সিন্দুক মেঝেতে গাঁথা ছিল। সেগুলো ভর্তি ছিল টাকা-

সোনাদানায়। তাছাড়া কলকাতার ব্যাঙ্কে ছিল। কোম্পানীর কাগজে ছিল। বউবাজারের বড়ালদের একচেটে ছিল কোম্পানীর কাগজ কেনাবেচার ব্যবসা; রায়বাড়ীর জন্যে বছর বছর কোম্পানীর কাগজ আলাদা করে রেখে দিত তারা। তারা জানতই যে, এ-কাগজ তারা কিনবে।

সেই বংশের বড় ছেলে, কলকাতার সেকালের সমাজে বড় হচ্ছে, মেলামেশা করছে। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে একটা সে-কালের আগুন ছিল রে। ভায়লেটের সঙ্গে প্রেম করে সে দুঃখিত হয়নি, লজ্জিত হয়নি, হয়তো সেদিন এমন হঠাৎ রাত্রিকালে তার বাঘের মত বাবা যদি না হাজির হতেন, তবে সে হয়তো ভেবেচিন্তে একটা বোঝা-পড়া করতে চেষ্টা করত। কিন্তু সে প্রত্যাশা করেনি যে, তার বাবা রত্নেশ্বর রায় এসে এমনভাবে নিজে হাজির হবেন। বাবার গলার আওয়াজ পেয়ে সে চমকে উঠেছিল, ভায়লেট হাসছিল খিলখিল করে, সে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে বলেছিল—চু-প!

ভায়লেট তার দিকে তাকিয়েছিল সভয় বিস্ময়ে। কি হল?

ঠিক সেই মুহূর্তে গোপালদা ছুটে এসে বলেছিল—রাজাভাই, সর্বনাশ হয়েছে। কর্তাবাবু!

আবার ডাক ভেসে এসেছিল—দেবেশ্বর!

এবার গোপাল দুড়দুড় করে নেমে পালাবার সময় বলেছিল—পালিয়ে এস খিড়কীর দরজা দিয়ে।

—ওই মেথর ঢোকে যেদিক দিয়ে?

—নইলে আর পথ নেই।

—তুই যা। তুই পালা। ওই পথ দিয়ে আমি পালাতে পারব না।

—তাহলে? কি করবে?

—আমার যা হয় হবে। তোকে ভাবতে হবে না।

—ভায়লা—?

ভায়লেট উত্তর দেয়নি, দেবেশ্বরকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। দেবেশ্বর বলেছিলেন—আমি বাঁচলে ও বাঁচবে। আমি যদি মরি, তবে যা হয় হবে। ওদিকে তখন নীচে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা পড়ছে। ভেঙে ফেলবে দরজা!

দেবেশ্বরেরও চারিদিক বন্ধ, রত্নেশ্বরের হুকুম শুনতে পাচ্ছেন তিনি—ভেঙে ফেল। তোড় দো। ওদিকের দরজা আটক কর। কোনদিকে পরিত্রাণের কোন পথ নবীন দেবেশ্বরের চোখে পড়েনি, শুধু পড়েছিল বন্দুকটা। একনলা ব্রিজ লোডিং গান্ একটা—দেবেশ্বর নিজের জন্য লাইসেন্স করিয়ে কিনেছিলেন; সেই বন্দুকটাও ওই বাড়ীতেই তিনি রেখেছিলেন। কোন বিপদের ভয় করে রেখেছিলেন—এটা ঠিক নয়, তবে দেবেশ্বর রায় যে-বাড়ীতে তাঁর প্রথম প্রিয়াকে নিয়ে বাস করবেন, সে-বাড়ীর দরজায় সঙীনধারী পাহারাদার থাকবে না এটা তাঁর ঠিক ভাল লাগেনি। তিনি সংগীনওলা বন্দুক এবং তার সঙ্গে পাহারাদারের লাইসেন্সের চেষ্টা করছিলেন গোপনে। সেটা না-হওয়া পর্যন্ত নিজের অতিপ্রিয় এই একনলা বন্দুকটিকে ভায়লেটের শোবার ঘরের কোণে খাড়া করে রেখেছিলেন।

গোপাল ঘোষ চলে যেতেই দেবেশ্বর একবার চারিদিক তাকিয়ে দেখে দেখতে পেয়েছিলেন এই বন্দুকটাকে। তিনি ছুটে গিয়ে বন্দুকটা তুলে নিয়ে তাতে টোটা পুরে শোবার ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর চিঠিতে আছে—"আত্মহত্যা করিবার জন্য সেদিন বন্দুক আমি তুলি নাই। অপমানের হাত হইতে বাঁচিবার জন্যই বন্দুকে টোটা পুরিয়া আমি নিচে নামিয়া যাইতেছিলাম। ইচ্ছা ছিল—যে বেতনভোগী ভৃত্যদিগের পাশবিক বলের উপর নির্ভর করিয়া আপনি আমার বাড়ীতে আমাকে অপমান করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত আমি বুঝাপড়া করিব। আমার দারোয়ান নাই, আপনার আছে, আমি একনলা বন্দুক হাতেই তাহাদিগকে ঠেকাইয়া বলিব—চলিয়া যাও। কিন্তু ভায়লা ভয় খাইল। সে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—আমার রাজাবাবু, না-না-না, এমন তুমি করিও না। না। তাহাকে তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—তবে কি করিব? তুই বল—কি করিব? সে উত্তর দিতে পারে নাই। আমার একটা কথা মনে হইল, বলিলাম—তবে আয় আমরা দুইজনেই মরি। আমি তোকে গুলি করিয়া মারিয়া নিজে আত্মহত্যা করিব কিন্তু সে তাহাতে আরও ভয় পাইয়াছিল। তখন আমার আর আপশোসের সীমা ছিল না। এ কাহাকে আমার জীবনসঙ্গিনী করিয়াছি? এখন মনের মধ্যে আগুন আরও প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠিল। বলিলাম—বেশ, তবে তুই থাক। আমিই মরিব। ইহার পর আর বাবার সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিব না। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা থুত্‌নীর নিচে লাগাইয়া বাঁট্‌টা মাটিতে রাখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু দেখিলাম বন্দুকটা আমার থুত্‌নী অপেক্ষা ছোট; ওদিকে দরজাটা ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমি বন্দুকের নলটাকে বুকে লাগাইয়া পা দিয়া ঘোড়াটা টিপিয়া দিলাম। তাহার পর আর জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আজ আবার বাঁচিয়া উঠিয়া মনে হইতেছে—গলায় লাগাইলাম না কেন! তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকিয়া আপনি অন্নদাতা পিতা আপনার সহিত পত্রে এই ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতে হইত না। আপনি আমাকে একরূপ বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। ভায়লেটের কি হইয়াছে, তাহাকে লইয়া আপনি কি করিয়াছেন, তাহা আমাকে জানাইবার জন্য আপনার নিকট মিনতি করিতেছি। গোপালদাদা কোথায়? তাহার কি করিলেন? আপনি এইসব সংবাদ আমাকে জ্ঞাত করুন। অন্যথায় আমি আর মরিবার চেষ্টা করিব না। এবার আমি বিদ্রোহ করিব। এই বাটী হইতে বাহির হইয়া গিয়া কৃশ্চান মিশনারীদের শরণাপন্ন হইব। সেখান হইতে রক্ষা করিতে আপনি আমাকে পারিবেন না।"

সুরেশ্বর বললে—অন্নপূর্ণা-মা বললেন—চিঠিখানা পুরো এক মাস এক সপ্তাহ পর, যেদিন ব্যাণ্ডেজ খুলে দিলে সাহেব ডাক্তার—সেইদিন সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিঠিখানা লিখছিল, আমি ঘরে ঢুকলাম। বললাম—এ কি! সকালে ব্যাণ্ডেজ কেটেছে বিকেলে চিঠি লিখছিস। কাকে চিঠি লিখছিস দেবু?

আমরা কাশী থেকে এসেছিলাম সেই ঘটনা যেদিন ঘটে, সেইদিন, রাত্রে খবর পেয়ে জোড়াসাঁকোর জেঠামশাইয়ের বাড়ী থেকে জানবাজারের বাড়ীতে এসেছিলাম। সাহেব ডাক্তার দেখে বললে বটে—জখম এমন কিছু নয় রায়বাবু, শুধু বগলের নীচে খানিকটা মাংস

কেটে বেরিয়ে গেছে, সারতে বেশীদিন লাগবে না। তবুও যত্ন আর সাবধানতায় অন্ত ছিল না। কীর্তিহাট থেকে সরস্বতীবউ এসেছিল ; সেবার জন্তে তখন মেম-নার্স পাওয়া যেত, মেম-নার্স এসেছিল। একজন দেশী ডাক্তার চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ীতে থাকত। আমি কাশী চলে যেতে পারিনি। দেবুর ওই অবস্থায় যার জন্তে এসেছিলাম, একটা বিষয়ের মিটমাটের জন্তে তাও হয়নি, আর দেবুর জন্তে যে-মেয়েটির বিয়ের কথা পাকা করতে চেয়েছিলাম তাও হয়নি। আর আমি কাছে থাকলেই দেবু স্বস্তিতে থাকত, শান্তিতে থাকত। উঠে গেলেই চাকর-ঝি যাকে সামনে পেত বলত, রাঙাপিসীকে ডেকে দে।

আমার বদলে বউদি—সরস্বতী-বউ গেলে চোখ বুজে চুপ করে পড়ে থাকত। কথা বলত না।

বউদি বিরক্ত হতেন। বেরিয়ে এসে আমাকে বলতেন—তুই যা অন্নপূর্ণা, আমাকে দেখে মুখ গোঁজ ক'রে চোখ বুঁজল।

আমি গিয়ে বসে ডাকতাম—দেবু! দেবু রে!

বোঁজা চোখ অমনি খুলে যেত, বলত—কোথা গিয়েছিলে ?

—কেন ? কি হল ? শুয়ে ঘুমো না।

—তোমার পায়ে পড়ি রাঙাপিসী, তুমি খবর এনে দাও ভায়লেটের কি হল ? সে কোথায় ? আমি বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি না। He can do anything and everything.

—কি বলছিস ?

—ঠিক বলছি। তোমার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে কি করছে দেখছ না ? স্বায়তঃ ধর্মতঃ সম্পত্তি তোমার। বীরেশ্বর রায়ের ঔরসে ভবানী দেবীর গর্ভে তুমি জন্মেছ ; উনি সোমেশ্বর রায়ের দৌহিত্র, তাকে বীরেশ্বর রায় সন্তান হবে না বলে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন এবং সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়েছিলেন বলে সে-সম্পত্তি তিনি তোমাকে দেবেন না। আমি গল্প শুনেছি—প্রথম যৌবনে ওঁর বিয়েরও আগে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিস সাহেবকে কীর্তিহাটের বাড়ীতে ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন স্টোন পাতবার জন্তে এনে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় নকল অসুখের ভান ক'রে দশ ক্রোশ ঘুরে রাধানগরে দে-সরকারদের বাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন। গোপাল সিং নাম এক ছত্রি প্রজাকে এনে নিষ্ঠুরভাবে শাসন করেছিলেন—

অন্নপূর্ণামা বললেন—কথাগুলো আমার কানেও কটু ঠেকছিল রে। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, না, তুই জানিসনে ঠিক। সে-সব আমার বাবার আমলের কথা, বীরেশ্বর রায়ের আমলের।

—তাও জানি। তাতেও আমার বাবা অংশীদার। তারপরের কথা তুমি জান না রাঙাপিসী। বিয়ে হয়েছে এগার বছর বয়সে, প্রথম কেটেছে তোমার কাশীতে বিমলাকান্ত ঠাকুর্দার কাছে ; আমি এখানে কীর্তিহাটে কলকাতায় আছি, দিনরাত্রি শুনছি, দেশের ধর্মপুরুষ রত্নেশ্বর রায়ের সুনামের কথা, খ্যাতির কথা আর চোখে দেখছি তাঁর আসল চেহারা। আমার দাদামশায় Retired Subdivisional Officer—সিগার মুখে দিয়ে আসেন, তিনি

উপদেশ দিয়ে যান, কি ভাবে কি করা উচিত। কিসে সুনাম হবে। I know them, I know them. আমি বলতে পারব না—এ case-এ তিনি কি পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু দিয়েছেন —তা নিশ্চিত। একটা অনাথা কৃশ্চান মেয়ে যার তিনকুলে কেউ নেই, তাকে কিছু করা কি অসম্ভব?

দেবুর কথাটা আমার খুব বাড়াবাড়ি মনে হত না সুরেশ্বর। সে-আমলে কি এমন কঠিন কাজ। রবিনসন সাহেবের মত একজন ইউরোপীয়ানের বাচ্চাকে খুন করাতে যারা পারে,- তার জন্যে যারা আসর সাজিয়ে নেয়; থানার দারোগাদের টাকা ঢেলে দিয়ে মুখ বন্ধ করতে পারে, তাদের কাছে এটা কি একটা শক্ত কাজ?

আলফান্সো মরেছে, অঞ্জনা মরেছে, তার বেটী, সে রত্নেশ্বর রায়ের ছেলের মন ভুলিয়েছে, জাত-ধর্ম তার যৌবনে রূপের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে—সেখানে মেয়েটাকে—

আমি শিউরে উঠতাম। খোঁজ করবার চেষ্টা করলাম অনেক—অনেককে দিয়ে, কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড সুরেশ্বর, জানবাজারের চাকর-বাকর, মানুষজনের পেটের মধ্যে এই কথাগুলো যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, তারা স্মরণ করতে পারে না; ভায়লেট বলে কাউকে জানে না—নাম কখনও শোনেনি, এমনি তাদের চাউনি, এমনি তাদের মুখের ভাব।

যেন ঠোঁটদুটো সেলাই করে দিয়েছে।

সেদিন চিঠিখানা লিখছিল, লেখা প্রায় শেষ করে এনেছিল, সে চিঠিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—প'ড়ে দেখ!

প'ড়ে শিউরে উঠে বললাম—এই চিঠি তুই দাদাকে দিবি?

—না দিয়ে কি করব পিসী? আমার জন্যে যদি বাবা ভায়লেটকে কি গোপালদাকে চিরদিনের জন্যে সরিয়ে দিয়ে থাকেন, তবে হয়—।

থেমে গেল দেবেশ্বর। তারপর সামলে নিয়ে বললে—আবার আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। এবার আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। এবার আর ভুল হবে না।

ঠিক এই সময়ে সুরেশ্বর, হঠাৎ পাশের ঘরে গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করার শব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম, দেবেশ্বরের মুখখানা যেন শ্বেতপাথরের তৈরী মুখের মত হয়ে গেল।

দাদার গলা। দাদা যে পাশের ঘরে কখন ঢুকেছিলেন, আমরা কেউ দেখিনি, আর বুঝতেও পারিনি।

* * *

সুরেশ্বর বলল—একটু পরিষ্কার করে বলি সুলতা, দোতলার মাঝখানে যে ঘরখানার বাবার আমলে ড্রয়িংরুম ছিল, যে-ঘরখানায় আমার ছবির প্রথম এগজিবিশন হয়েছিল, যে ঘরখানায় বীরেশ্বর রায় থাকতেন তাঁর অসুখের সময়, সেই ঘরে রাখা হয়েছিল দেবেশ্বর রায়কে আর তার পাশের যে-ঘরটা ওদিকে অন্দরের সঙ্গে যুক্ত, যে ঘরে আমার মা মারা গিছলেন, যে ঘরে ভবানী দেবী বসে পূজো করতেন, যে-ঘরে বসে রত্নেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায়কে লেখা ভবানী দেবীর পত্র এবং তার পালক পিতার পত্র পড়ে আত্মপরিচয় জেনেছিলেন, জেনেছিলেন —জেনেছিলেন, তিনি বিমলাকান্তের এবং বিমলা দেবীর সন্তান নন—তিনি বীরেশ্বর রায়

এবং ভবানী দেবীর পুত্র, এ-ঘর সেই ঘর। ভবানী দেবীর পুজোর ঘরই জানবাজারের বাড়ীর লক্ষ্মীর ঘর। ঘরখানার নামই ছিল লক্ষ্মীর ঘর। ওঘরে দেওয়ালে এখনও লোহার সিন্দুক গোঁতা আছে। সে আমলে এই ঘরেই আরও কয়েকটা লোহার সিন্দুক ছিল, তাতে এখানকার লগ্নী-ব্যবসার কাগজপত্র, কোম্পানীর কাগজ থাকে থাকে সাজানো থাকত। রত্নেশ্বর রায় নতুন কোম্পানীর কাগজ কিনে সিন্দুকে তুলে রাখতে এসেছিলেন।

একশো বছর নয়, তবে পঁচাত্তর বছর আগে, এসব কাজ অর্থাৎ সিন্দুক খোলা, টাকা, সোনাদানা, মোহর, জহরত নাড়াচাড়া করার সময় লোকে অনেকটা সন্তর্পণেই করত। ব্যাঙ্ক তখন হয়েছে, তবুও মোহর কিনে কলসীবন্দী করে জমা করা আর কোম্পানীর কাগজ কিনে রাখার চলই ছিল বেশি।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দাদা এখানকার নায়েবকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বাসী দারোয়ানকে দরজায় রেখে অন্দরের দিকের দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছিলেন। এবং কোম্পানীর কাগজ সিন্দুকে রেখে, সিন্দুক বন্ধ করার সময় এঘরে দেবু যে সব কথা আমাকে বলছিল, তা সব শুনেছিলেন। শুধু কিছুক্ষণ শুনেই নায়েবকে বলেছিলেন —তুমি নিচে যাও।

নায়েব নিচে নেমে গেলে তিনি দাঁড়িয়ে দেবুর কথা শুনতে শুনতে আর সহ্য করতে পারেননি, শব্দ করে গলা ঝেড়ে একটা সাড়া দেওয়া অভ্যেস তাঁর ছিল, ঠিক সেই শব্দ করে সাড়া দিয়ে দারোয়ান বচ্চন সিংকে ডেকে বলেছিলেন—"বচ্চন, এই দরওয়াজাটা খোল তো!

ভারী দরজা, মোটা লোহার খিল, তার সঙ্গে হুক, খোলা সহজ নয়। বচ্চন সিং ছিল পালোয়ান, সে অল্পক্ষণেই খুলে ফেলে দরজাটা খুলে দিয়ে পাল্লাদুটা ঠেলে দিলে, আর দাদা বেরিয়ে এসে এ-ঘরে ঢুকলেন।

সুরেশ্বর, সে মূর্তি এখনও মনে পড়ছে আমার। পরনে গরদের ধুতি, গায়ে গরদের চাদর। হাতে লোহার সিন্দুকের চাবির থোলো, পা খালি। লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকেছিলেন বলে এই বেশ আর খালি পা। চোখ মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারা যায় না, শুধু রায়বংশের সোনার মত যে গায়ের রঙ, তাতে যেন খানিকটা সিন্দুর লেগেছে বলে মনে হল।

এসেই প্রথমে নার্সকে বললেন—তুমি একটু বাইরে যাবে?

নার্স বাইরে যেতেই দাদা বললেন—যে-সব কথা তুমি বলেছিলে তোমার রাঙাপিসিকে, তা অন্তত এই নার্সটার সামনে বলা উচিত হয়নি। পিতৃনিন্দা সত্য হলেও করতে নেই। তবুও যদিই কর, তবে বাইরের লোকেদের সামনে করাটা ঠিক নয়।

আর লুকিয়ে কারুর কথা শোনা উচিতও নয়, সে অভ্যাসও আমার নেই, কিন্তু আজ অকস্মাৎ হয়ে গেল, শুনে ফেললাম; সাড়া দিতে ভুলে গেলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলবার মত ঠিক অবস্থা ছিল না আমার।

থাক্ সে কথা। এ আমার ভাগ্য। আমি রায়বংশের ধারাকে নির্মল করবার জন্তে, অভিশাপের ধারা থেকে বাঁচাবার জন্তে যে চেষ্টা করেছি সে মিথ্যে হয়ে গেছে। সে সব কথা থাক। এখন যা জানবার জন্তে ব্যগ্র হয়েছ তাই বলি। এ বাড়ীর কোন লোককে

আমি বিশেষ কিছু জানতে দিইনি। ভায়লেটকে তুমি ভালবেসেছ, তাকে তুমি আমার চোখে ধুলো দিয়ে কীর্তিহাট থেকে নিয়ে এসে এখানে রেখেছিলে, সেখানে গুজব রটেছিল গোপালের নামে। আমি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। গোপাল যদি ঠাকুরদাসের ছেলে না হত, তবে তার ঘাড়ে মাথা থাকত না। ভায়লেট আলফাল্সোর কন্যাই শুধু নয়, সে অঞ্জনার মেয়ে। অঞ্জনার কাছে তার মৃত্যুশয্যায় আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দাদা চুপ করে গেলেন। দাঁতে দাঁত টিপে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল দুটি ধারায়। কিছুক্ষণ পর অজগরের মত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—শোনো, ভায়লেটকে আমি খুন করাইনি, গোপালকে আমি কোন শাস্তি দিইনি। তবু রায়বংশের জাত আর মানটাকে আমাকে বাঁচাতে হবে, তাই অপবাদ গোপালের নামে রয়েছে—রয়েছে। তাকে আমি লোক পাঠিয়ে এইটুকু শুধু বলেছি যে, সে যেন কীর্তিহাট কি শ্যামনগর আর না যায়। তাকে বলেছি, আমি তাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব, সে এখানে ব্যবসা করুক, বিয়ে করুক। আরও টাকার প্রয়োজন হয় তাকে আমি দেব। সে ঠাকুরদাসের ছেলে, সে তোমার অপরাধ রায়বংশের কলঙ্ক মাথায় নিয়েছে। তার অঙ্গ কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। তবে তোমার সঙ্গে আর তার সম্পর্ক থাকবে না।

আর ভায়লেট। ভায়লেট অন্তর্বত্নী—।

বুঝতে পারলে না? অন্তর্বত্নীর অর্থ? অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান হবে তার। তাকে এক মিশনের নিরাপদ আশ্রয়ে আমি রেখেছি। তার যাবতীয় খরচ আমি বহন করব। তোমার বাপকে তুমি বিশ্বাস কর। অন্ততঃ এই কথাটা বিশ্বাস কর। তবে—।

একটু থেকে গম্ভীর গলা আরও গম্ভীর করে তুলে বললেন—তবে তোমার বিবাহ দেব আমি দু-এক মাসের মধ্যেই। বিবাহ তোমাকে করতেই হবে। তার জন্ম তুমি প্রস্তুত থেকো।

বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। নিজেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। খিল—হুক বন্ধ হল একে একে।

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—সুরেশ্বর, তোকে বলব কি, আমরা—মানে আমি আর দেবু দু'জনেই যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। ওই ক'টা কথা রে, তার যে কি ভার আর ওই যে আস্তে গলায় বলা, তার শব্দ যেন আমাদের শুধু বোবা না, কালা সুদ্ধ করে দিলে।

দরজাটা বন্ধ হতে হতে আবার খুলল, আবার। দাদা বললেন—ভায়লেটকে আমি নিরাপদে রেখেছি, তার সন্তান হলে তার ভারও আমি নেব যাব। তোমার পাপ—আমি ক্ষমা কোনমতেই করতাম না; করলাম তার কারণ এ-পাপ তোমার নয়, এ-পাপ রায়বংশে জন্মেছ বলে তার ভাগী হতে বাধ্য হয়েছ; রায়বাড়ীর আশেপাশে সে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে, দরজায় ধাক্কা দিয়ে বেড়িয়েছে। দরজা খোলো—দরজা খোলো। কিন্তু আমি সারাজীবন জেগে থেকে ঢুকতে দিইনি। তুমি জানতে না—অসতর্ক মুহূর্তে সে তোমাকে আশ্রয় চেয়েছে, তুমি ধনীর ছেলে মানীর ছেলে ভূস্বামীর ছেলে, তাকে আশ্রয় দিয়েছ। দিয়ে ফেলেছ। জানতে না। শ্যামাকান্তের অপরাধ—যোগভ্রষ্টতার শাস্তি, সোমেশ্বর রায়ের—বীরেশ্বর রায়ের ধারা আমি রুখতে গিয়েও পারলাম না। অঞ্জনার রূপ ধরে বাড়ী এসে ঢুকেছিল বুঝতে পারিনি।

বলেই চুপ করে গেলেন। দরদর করে চোখ থেকে জল গড়াল। একফোঁটা দু'ফোঁটা নয় রে—ধারা বয়ে গেল। এরই মধ্যে কখন যে সরস্বতী-বউ এসে ঘরে ঢুকেছিলেন, আমরা কেউ জানতে পারিনি; তিনি দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন বারান্দা আগলে; পাছে সেখানে দাঁড়িয়ে কেউ এসব কথা শুনে ফেলে।

হঠাৎ দরজাটা বন্ধ করে তিনি যখন ঘরে এসে ঢুকলেন, তখন আমাদের খেয়াল হল। তিনি এসে স্বামীর হাত ধরে বললেন—করছ কি? এসব হচ্ছে কি বল তো? যা হয়েছে তা হয়েছে, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও যে ছেলেটা বেঁচেছে। বাবা এসেছিলেন, তিনি ফিরে চলে গেলেন, বলে গেলেন—ওবেলা আসবেন। এর মধ্যে আসতে চাইলেন না। বললেন—জমিদারবাড়ীতে রাজাদের বাড়ীতে যে সব কাণ্ড ঘটে, তার তুলনায় এটা আর কি এমন একটা ব্যাপার।—শুধু তোমার জন্যে বললেন—এতখানি কড়াকড়ি ভাল নয়; ও একটু কড়া বেশী। ছেলেটা এত ভয় পেয়েছিল যে সুইসাইড করতে গেছল। চল—মুখ-হাত ধুয়ে সরবৎ খাবে চল।

দাদা যেন এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সরস্বতী-বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন—ওই লক্ষীর ঘরের ভিতর দিয়েই। দরজা বন্ধ করলেন। এদিক থেকে দারোয়ান এসে ঠেলে দেখলে।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম।

আমি দাদার কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিলাম। চোখ মুছে দেবুর মুখের দিকে তাকালাম।—অবাক হয়ে গেলাম সুরেশ্বর। দেখলাম—দেবেশ্বর গুম হয়ে যেন বসে আছে। দাদার মত এমন একজন কড়া মানুষ, যার মুখের দিকে প্রজারা তাকাতে পারত না। তার চোখের জল তাকে যেন এতটুকু ভেজাতে পারেনি। কালা-বোবা সে আমারই মত হয়েছিল কিন্তু সে আমার মত গলেনি।

আমি তাকে ডাকলাম—দেবু!

সে নড়লে না, যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল, যেদিকে তাকিয়েছিল সেইদিকেই তেমনিভাবে তাকিয়ে রইল—শুধু বললে—বল রাঙাপিসী!

তার সেদিনের সেই লেখা চিঠিখানা টেনে নিলাম, সে আপত্তি করলে না; বললাম—এটা ছিঁড়ে দে। ক্ষমা চেয়ে একখানা চিঠি লেখ।

—না।

—না? অবাক হয়ে গেলাম আমি।

—না।

—এরকম চিঠি তুই লিখতে পারবিনে।

—তা লিখব না। যা উত্তর চাচ্ছিলাম—তা পেয়ে গেছি। ভায়লেটকে উনি যখন ভাল জায়গায় রেখেছেন, বলেছেন—আর গোপালদার সম্বন্ধে যা করব বলেছেন, তাতে আমি অবিশ্বাস করব না। তা উনি করবেন। অন্ততঃ লোক দেখিয়েও করবেন। কিন্তু ক্ষমা আমি চাইব না।

আমি চুপ করে রইলাম। দেবু বললে—শুনেছ? এই অবস্থার মধ্যেও বাবা আমার কনে ঠিক করেছে? একটি দশ বছরের খুকী।

—তুই কি বিশ-তিরিশ বছরের বুড়ো? তোর কনে দশ বছরের ছাড়া ক' বছরের হবে? ও-মেয়েকে আমি জানি।

—জান? মেয়েটি ভাল তো? মানে, সইতে পারবে তো আমার মত মানুষকে?

—কেন রে? তুই এমন মন্দ মানুষ কি মস্ত মানুষ এ-কথা তোকে বললে কে?

—নিজেই বলছি। আমাকে বিয়ে যে করবে, সে হয় আমার ভালবাসার জ্বলে মরবে রাঙাপিসী, আমার ভালবাসার উত্তাপ আগুনের মত। নইলে আমার অবহেলায় ফেলে দেওয়া অপছন্দের পোশাকের মত এককোণে পড়ে থাকবে। ধুলোয় পোকা-মাকড়ে ভরে যাবে।

সুরেশ্বর, আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—দেবু, এরকম কথাবার্তা তোর হল কি করে রে? কি করে শিখলি?

—তা জানিনে পিসী, তবে শিখেছি। আপনি কথাবার্তা আসে। ভেতর থেকে যেন কে যুগিয়ে দেয়। সে-কথা থাক। যা বলছি শোন, তুমি বিয়ের সম্বন্ধ করেছ বিয়ে আমি করব। ভালও তাকে বাসতে চেষ্টা করব। ভায়লেটের উপর আমার আকর্ষণ আর নেই। সেদিন ওকে বলেছিলাম—তুই দাঁড়া, তোকে গুলী করি, তারপর নিজে গুলী খেয়ে আত্মহত্যা করব। দুজনে একসঙ্গে মরব দুঃখ থাকবে না। তা দেখলাম—কি ভয়! একসঙ্গে মরতে যে ভয় করে, তার ভালবাসার আবার দাম কি? কানাকড়িও না। হিঁদুর মেয়ে তবু বাধ্য হয়ে বিধবা হয়ে স্বামীর বদলে ঈশ্বর ভজে বাঁচে। কোন মানুষকে আর বিয়ে করে না। এ তো ক্রীশ্চান, আমি বেঁচে আছি তাই, মরলে তো আর কাউকে বিয়ে করে দিব্যি গাধাবোটের মত অন্য স্টীমারের টানে ভেসে চলত। নাঃ—ওকে আর আমার চাইনে—ওকে আমি আর কোনদিন ফিরে দেখব না। হিন্দু মেয়েই ভাল। কিন্তু বাবাকে তুমি বল আমার ভিক্ষেমায়ের সম্পত্তি দেবোত্তর, আমাকে লিখে দিতে। আমি আলাদা হয়ে যাব। বাবার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে হলে আবার আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

সুরেশ্বর বললে—অন্নপূর্ণা-মা এখানেই নিজে মুখে কথা বলা শেষ করেছিলেন। তার কারণ বন্ধ দরজায় টোকা পড়েছিল, টোকা নয়, মৃদু ধাক্কা; আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কে?

বাইরে থেকে উত্তর এসেছিল—আমি রথীন!

অর্চনা মুখ নত করেছিল লজ্জায়; আমি একটু হেসেছিলাম; অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—যা, দোর খুলে দে। বাপ রে বাপ—মালিক এসেছে, ওঠ ওঠ! অর্চনা গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই একরাশ ওষুধের গন্ধ ছড়িয়ে রথীন ঢুকল। হাতে একখানা খাম। হেসে বললে—ক'টা বাজছে ঠিক আছে মা-মণি? নিজের পিতৃবংশের গল্প বলতে গিয়ে বারোটা বাজিয়ে ফেললে যে। আর তো দেখি ক' মিনিট বাকি। ডাক্তার হিসেবে বলতে পারি, রাত বারোটার পর যে একটা বাজে, সেটা সচরাচর কেউ শুনতে পায় না। জন্মান্তর স্মৃতি কারুর থাকে না। তোমার বয়স পঁচাত্তর পার হয়েছে। তবু তুমিই হলে এ-বংশের সব। তোমার উপর কথা বলবার ক্ষমতা তোমার নাতিদের নেই। পুত্রবধূর নেই। অর্চনাকে যা বল, সে-

হিসেবে বাবাও দাবী করে বলছি, ঘুমিয়ে পড়, আর না।—

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—হেসেই বললেন—ওরে, আমার বাবা হওয়া সোজা কথা নয় রে! আমার বাবা ছিলেন সত্যি করে রাজা। বুঝলি—তাঁর জীবনে কলঙ্ক অনেক, মদ খেতেন, তারপর বাঈজী ছিল কিন্তু সে-সব আমার মাকে না-পেয়ে। বুঝলি। অর্চনা-মাকে সেইভাবে আদর করলে বাবা বলব, নইলে না। উঃ—কি এত ওষুদের ঝাঁঝালো গন্ধ রে গায়ে।

—ইথার, স্পিরিট, লাইজল গন্ধওলা ওষুদের কি আর শেষ আছে। এক্ষুনি তো হাত ধুচ্ছিলাম স্পিরিট-লাইজল দিয়ে। ওটা আমার বাতিক। তুমি কিন্তু এখন শোও। এখন—সুরেশ্বরদা, তোমার নামে টেলিগ্রাম এসেছে, জানবাজারের বাড়ী থেকে নিয়ে তোমার রঘুয়া এসেছে। তাই জন্তে আমাকে আসতে হল। নাহলে—

—টেলিগ্রাম?—

—হ্যাঁ, মেদিনীপুর থেকে। আমি খুলেছি—। কে একজন সুধাকর টেলিগ্রাম করেছেন—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বি আর সেন is considering the case of your mejdidi—come sharp.—

* * *

অন্নপূর্ণা-মার সঙ্গে সেই শেষ দেখা আমার। উনি আমার হাতে রেশমী কাপড়ে বাঁধা পুরানো চিঠির বাণ্ডিল একটা দিলেন, বললেন—নিয়ে রাখ, এর মধ্যে সব কথা পাবি। আমার দেবুর কথা। শুনেছি যখন সে মারা যায়, তখন বিকারের ঘোরে কেবলি আমাকে ডেকেছিল রাঙাপিসী রাঙাপিসী, বাবা ভায়লেটকে নর্দমার জলে ডুবিয়ে মেরে দিলেন। ছি-ছি রাঙা-পিসী। তুমি ভুলতে পার? রাঙাপিসী! এর অর্থ অনেক। সে অনেক কথা। তা ওই কাগজের বাণ্ডিলের মধ্যে ছিল। দেবেশ্বর রায়ের রাঙাপিসী অন্নপূর্ণা দেবী সযত্নে সব বাণ্ডিল বেঁধে রেখেছিলেন। হয়তো আমার জন্তই রেখেছিলেন। কারণ, সেই রাত্রে ওই বাণ্ডিল হাতে হরিশ মুখার্জি রোড থেকে জানবাজার ফিরে এসে পরের দিন সকালেই আমি মেদিনীপুর রওনা হয়ে গেলাম মেজদির জন্তে। ম্যাজিস্ট্রেট বি আর সেন এসে মেদিনীপুরে ঝড়ো হাওয়ার মোড় ফিরিয়েছেন। ওখানকার অবস্থা সহজ করে এনেছেন মেলামেশার মধ্য দিয়ে, কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে।

মেদিনীপুরে 'বিদ্যাসাগর হল' তৈরী হচ্ছে। জেলার বড় বড় জমিদার, রাজা উপাধিকারী জমিদার মেদিনীপুরে অনেক, নাড়াজোল ঝাড়গ্রাম, কীর্তিহাটের পাশে গর্গ বাহাদুরেরা, রামগড়ের রাজা—সে একটা লম্বা ফর্দ হয়। তাছাড়া রায়বাহাদুর, রায়সাহেব, জমিদারও আছে। পণ্টনী মেজাজের শাসনতন্ত্রের মধ্যে টাকা আদায় সোজা ব্যাপার। টাকা অনেক উঠেছে।

ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের দুর্দিন এসেছে, তার এম্পায়ারের শ্রেষ্ঠ ভূখণ্ডে; বিরাট মহীরূহের শিকড়ে টান ধরেছে, কট কট করে কাটছে; সঙ্গে সঙ্গে মহীরূহটির প্রশাখা এই জমিদারী-গুলোই আগে শুকিয়ে আসছে; তবু যা আছে, দু-চার-দশটা কাঁচা পাতা, ডালের মধ্যে রস, তাই তখন আদায় করে বা সম্বল করে বাঁচতে চাচ্ছে। মানুষকে ভোলাতে হবে। মানুষ

আর সহজে ভুলবে না। তাই বিদ্যাসাগরের স্মৃতির উপর সৌধ গড়ে শান্তিস্থাপনের ব্যবস্থা। জমিদারেরা সঞ্চিত টাকা থেকে দিচ্ছেন। ধার করেও দিচ্ছেন। না-দিয়ে উপায় কি? যারা দেশের মানুষ, যারা ইংরেজের সঙ্গে লড়ছে, তারাই জমিদারের প্রজা। জমিদারীর বিপক্ষে ফতোয়া বেরিয়ে গেছে। কীর্তিহাটের জমিদারীতে আমি যখ হয়ে আছি। টাকা আমিও দিয়েছি।

সমারোহ করে কাজকর্ম হচ্ছে। ওখানকার উকিলদের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী, তাঁরা একটু একটু করে কাছে এগিয়ে এসেছেন। ওদিকে মার খেয়ে ক্লান্ত মেদিনীপুরের যৌবনশক্তি গাছতলায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছে ১৯৪২ সালের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ তখনও বেঁচে, তিনি আসবেন বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হলের ওপনিংয়ের জন্যে। কলকাতার সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন।

এরই মধ্যে মেদিনীপুর এসে সুধাকর বাবু উকিলের মারফৎ পিটিশন দিয়ে মিস্টার সেনের সঙ্গে ইন্টারভ্যু চাইলাম। পেলাম ইন্টারভ্যু, মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন—ও কেসটার জন্যে অলরেডি আমি রেকমেণ্ড করে দিয়েছি। আশা করছি দিন-দশেকের মধ্যেই একটা উত্তর পাব। মনে হয়, ওঁকে ছেড়েই দেওয়া হবে।

মিস্টার সেনের কাছে আশ্বাস পেয়ে কীর্তিহাট ফিরলাম। আমার জীবনের সব গ্রন্থি সব জট যেন খুলে গেল বলে মনে হল। অর্চনার বিয়ে হয়ে গেছে। তবে—। তবে ফেরবার দিন অর্থাৎ টেলিগ্রাম নিয়ে রথীন যখন অন্নপূর্ণা-মার ঘরে ঢুকল, তখন তার গায়ে ওষুধের তীব্র গন্ধে আমার মনটা কেমন খারাপ হয়েছিল সুলতা।

আমি যে মদ খাই। অনেকদিন খাচ্ছি। খেয়ালী মানুষ, কখনও ছেড়ে দি, খাব না বলে প্রতিজ্ঞা করি, আবার কখনও প্রতিজ্ঞা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ধরি। আমার বাধাবন্ধ নেই। গুরুজন নেই, লজ্জা-সংকোচও নেই। কিন্তু যাদের বাধাবন্ধ আছে, তাদের জানি। তাদের দেখেছি, তাদের চিনি।

১৯৩৭ সাল পার হয়ে ৩৮ সালের কাল চলছে, আমাদের জীবন পাল্টাচ্ছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি সব দিক থেকে। ১৯৩০ সালের 'মাস' মুভমেন্টের পর যে এবার কোন মুভমেণ্ট আসছে তা কেউ জানে না, তবে সেটা যে ১৯৩০ সালের পুনরাবৃত্তি হবে না এটা নিশ্চিত। তবে সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ব্যাকগ্রাউণ্ডে কুইট ইণ্ডিয়া, আজাদ হিন্দ, তার সঙ্গে পিপলস ওয়ারের কল্পনা কেউ ভাবতে পারে না। বড়জোর ভাবে, আর একটা রিফর্ম। শুধু মুসলিম লীগকে রাজী করতে পারলেই হয়। নতুন কালের মানুষেরা স্পষ্ট বলছে—পুরনো কিছু চলবে না। তার সঙ্গে রথীনের মদ খাওয়ার সামঞ্জস্য আছে। তবু মনে দুঃখ পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম অন্নপূর্ণা-মার জন্যে। তিনি বেঁচে থাকতেই এই হল। তা হোক, উনি আর ক'দিন।—এই বলে সান্ত্বনা নিতে গিয়েও নিতে পারিনি। দুঃখ হয়েছিল অর্চনার জন্যে। মেয়েটা বড় ভাল মেয়ে। অন্নপূর্ণা-মার মেজদির কথা রায়বাড়ীর প্রবাদে আমার বিশ্বাস নেই। ভবানী দেবী অর্চনা হয়ে ফিরে আসেননি। সায়েন্স অব হেরিডিটি আছে। চেহারায় এমন মিল বিচিত্রভাবে একবংশে দেখা যায়। চরিত্রেও মিল হয়। অর্চনার সঙ্গে

ভবানী দেবীর চেহারা চরিত্রের ঠিক সেই মিল। মেয়েটা অন্যায় কিছু সহ্য করতে পারবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এদের প্রতিবাদ থাকে—অর্চনারও আছে। রথীনের মদ খাওয়া কি ও সহ্য করতে পারবে? ভেবেছিলাম—ওকে ডেকে বলে দেব, সহ্য করে নিস অর্চনা। ও ডাক্তার মানুষ। একালের ডাক্তার। ১৯৩৮ সালের। দেখ, এককালে বীরেশ্বর রায়ের আমলে প্রবাদ ছিল রায়বাড়ীর ইটগুলো মদে ভিজিয়ে তৈরী করে পোড়ানো হয়েছিল। কীর্তিহাটের মাটি মদ খায়। সে গোটা বাংলা দেশেই। তারপর আবার মোড় ফিরেছিল। তারপর ফের আবার মোড় ফিরেছে রে। তোরা মাথার ঘোমটা টেনে নামিয়ে শুধু স্বাধীন জেনানা হতেই চাচ্ছিসনে, স্বাধীনতা আনবার জন্যে বোমা পিস্তল নিয়েও কারবার শুরু করেছিস। আমি বড়লোকের বাড়ীর পার্টির খবর জানি, মেয়েরা এখন হেল্‌থড্রিংকও করছেন। সুতরাং ও নিয়ে মাথা ঘামাসনে ভাই। লোকটাকে যদি ভালবেসে ফেরাতে পারিস তো ফেরা। নইলে মেনে নে। মনে হয়েছিল মানাতে পারবে অর্চনা।

এরপর জট মেজদিদি। তার জটও খুলে দিচ্ছেন বিধাতা। অথবা ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতে আপনি খুলছে। মেজদিকে কীর্তিহাটের দেবসেবার ভার দিয়ে আমি ছুটি নেব।

ছুটি মানে কীর্তিহাট থেকে ছুটি, রায়বংশের গ্রন্থি খুলে ছুটি। চলে যাব, ঘুরে বেড়াব পৃথিবীময়, টাকা আছে আমার। ঘুরে বেড়াব। দুনিয়াময়। এবং একদিন কোথাও কোনও বিদেশে বা স্বদেশে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকব, একদিন চোখ বুঁজব। এবং এইসব কাহিনী লিখে যে সব ছবিগুলো তখন পর্যন্ত এঁকেছিলাম, সেগুলো তোমার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে এ্যাটর্ণী সলিসিটারকে দিয়ে যাব। আমার ঠাকুরদা দেবেশ্বর রায় তাঁর ছোট ছেলে অর্থাৎ আমার বাবাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁকে তিনি নিজের মনের মত করে গড়তে চেয়েছিলেন। আমার বাবা অর্ধেকটা হয়েছিলেন তাঁর মনের মত, অর্ধেকটা হয়েছিলেন তাঁর মত। তাঁকেও আমার ঠাকুরদা বলে গিয়েছিলেন।

Don't marry,—my boy—একটি স্ত্রীলোক ছাড়া দুনিয়ার সব স্ত্রীলোককে যদি মা ভাবতে পার, বলতে পার, তবেই বিয়ে করো; and try to love her—try to find out that Eternal She—in her. She is in every woman, just awaken her.

যদি চেষ্টা কর তবে নিশ্চয় একদিন ভালবাসা আসবে। পাবে—দেবে। তা যদি না পার, তবে বিয়ে করো না। একা হয়ে থাক। তোমার নিজের মা; fortunately আমার কন্যা নেই, তোমার বোন নেই, সুতরাং তোমার মা ছাড়া সব নারীর কাছেই তুমি সেই চিরন্তন পুরুষ-Eternal He হতে পারবে। কোন অনুতাপ হবে না, কোন পাপ হবে না। শুধু নারীকে জয় করার মত শক্তি তোমার চাই। আর অনুতাপকে মনের ঘরে ঢুকতে দিতে না পারার শক্তি অর্জন করতে হবে তোমাকে।

বাবা আমার সাতাশ বছর পর্যন্ত সে কথা মেনে এসে, সাতাশ বছর বয়সে আমার মাকে বিয়ে করলেন। তারপর ঠাকুরদা যা বললেন তাই হল; অন্য একজন উয়োম্যান মিশ্র রক্তের

লাবণ্যবতী চন্দ্রিকা এল এবং বাবাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

বাবাও চিঠি লিখেছেন মাকে। যখন বম্বে থেকে চন্দ্রিকাকে নিয়ে তিনি ইয়োরোপ চলে যান তখন। লিখেছিলেন, "সুরেশ্বর যেন বিবাহ না করে। আমাদের বংশে অভিশাপ আছে। আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন। কারণ ঠিক জানি না, বলতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি, রায়বংশের ছেলে, তাদের রক্তে মদ্য এবং নারী সম্পর্কে একটা উদ্দাম ধারা আছে। এ হয়তো সকল পুরুষের মধ্যেই থাকা সম্ভব, কিন্তু যাদের এই ধারাটা সম্পত্তি, অর্থ, সম্মানের একটা উঁচু ঢিবি বা পাহাড় বা পর্বত থেকে ঝরে, তখন সেটা জলপ্রপাতের মত সশব্দে ঝরে। একটু হাঁক-ডাক করে' ভাঙাভো করে' এগুলো করে এবং এই সব মায়াময়ী, মোহময়ী যারা তারা এটা পছন্দ করে। সুরোর বেলা এর সম্ভাবনা খুব বেশী। তুমি তার বিয়ে দিয়ো না। সে বিয়ে করতে চাইলে, তাকে বলো বা আমার এই চিঠি দেখিও। তার প্রতি আমার উপদেশ—Don't marry. End our line with you.

কথাটা আমার মনে গেঁথে ছিল। বিয়ে করব নাই স্থির করেছিলাম। হঠাৎ মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে তুমি এলে। তোমার সঙ্গে পরিচয় বিচিত্রভাবে, ব্রজেশ্বরদার সেই শেফালিকে নিয়ে কেমন চট করে একটা কথায় জট পাকিয়ে গেল। তুমি বললে—ওর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার না করলেই পারতেন। যাই হোক, ওরা—ওরাও তো মানুষ। মেয়েছেলে। কথাটা সারাদিন মনে ঘুরল, সন্ধ্যেবেলা ট্যাক্সি করে গিয়ে শেফালির বাড়ী গেলাম, তার দুঃখ মোচন করে ফিরে এলাম সগৌরবে। তারপর একদিন গিয়ে দোরে দোরে যারা দেহের পসরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পেটের অন্নের জন্যে, তাদের টাকা দিয়ে ফিরে এসে তারই গৌরবে তোমার কাছে বিকিয়ে গেলাম। তারপর কীর্তিহাটে এসে পড়লাম, রায়বংশের বিষয় আর কৃতকর্মের ইতিহাসের ঘূর্ণিতে। ডুবেই গেলাম। তোমার হাত ছেড়ে দিলাম। নিজে ডুবতেই লাগলাম। টেনে তোমাকে ধরলে হয়ত তুমিই আমার গলা টিপে ধরবে বলে ভয় হল।

সেদিন ১৯৩৮ সালে, সেদিন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বি আর সেনের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে মনে হল, যেন ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠলাম। এবার ছুটি পাব। ভাবলাম কি জান, ভাবলাম অর্চনার বিয়ে হয়ে গেছে, মেজদি আমার খালাস পাচ্ছেন, এবার আমি খালাস, জমিদারীর দেবোত্তর যেমন আছে, তেমনি থাকবে, সে ওই মেজতরফই আপন গরজে রক্ষা করবে, আমি ব্যক্তিগতভাবে পত্তনী স্বত্ব কিনে-কিনে যে সম্পত্তির মালিক হয়েছি, তা সব বেচে দিয়ে চলে যাব; আর ফিরব না। অন্ততঃ কীর্তিহাটে আর না। কলকাতার জানবাজারের বাড়ী-কলকাতার অন্য সম্পত্তি, তাও সব বিক্রিটিক্রি করে চলে যাব ইয়োরোপ, অথবা আমেরিকা, অথবা প্যাসিফিকের কোন দ্বীপে। সেখানে চাষবাস করব, ছবি আঁকব। আর Enjoy করব life।

আজও আমার মনের মধ্যে সেদিনের সেই স্মৃতি জলজল করছে। মনে হচ্ছে যেন হয়ত বা এইমাত্র ঘটে গেছে। মনে পড়লে সেদিনের সেই হর্ষোন্মাদনের স্পর্শও যেন পাই। বলতে পারি, তোমাকে সেদিন আমার এই কল্পনা 'টু এনজয় লাইফ' 'এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া'—এর

মূলে ছিলে হয়ত তুমি। হয়ত বলছি এই কারণে যে, আমি হলপ করে বলতে পারব না যে সে তুমি। সে একজন নারী! যে নারীর বন্ধনে চাষী বাঁধা আছে, মজুর বাঁধা আছে, গৃহস্থ বাঁধা আছে, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, প্রজা, জমিদার, মহাজন, রাজা-মহারাজা, সম্রাট সবাই বাঁধা আছে; তেমনি একজন নারী। যে বিপ্লবীরা তখন আগুন নিয়ে খেলা করে, ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেয়, তাদের কথা ঠিক জানিনে, বলতে পারব না; মনের গভীরের গভীরে কেউ আছেন কিনা যাকে তারা দেশের পর্যায়ে পুজোর ফুলের মত ঢেলে দিয়ে নির্মাল্য করে দেয়। যাদের বাঁধন কেটে বেরিয়ে গেলে তবে গৌতম পরমবুদ্ধ হন, নিমাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হন, তেমনি একজন্ কেউ ছিল। তার মুখ শিলুটের ছবির মত দেখছিলাম। পিছনে ঝলমল করছে আলো; আর সে আমার ঘরে দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকছে। আমি তাকে ঠিক শিল্যুটের ছবির মত দেখছি।

আমি বসে গভীর চিন্তায় যেন ডুবে ছিলাম। ভাবছিলাম এই সব কথাই। ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকল একটি নয়, ছুটি মেয়ে। শিলুটের মত।

শিল্যুটের মত হতে একজনকে চিনতাম, একজন কুইনী; তাকে একদিন বিবিমহলের ছাদের উপর থেকে এমনি শিলুটের মত দেখেছিলাম। কিন্তু অনেকটা দূরে ছিল বলে ছোট দেখিয়েছিল এর থেকে। আর একজনকে চিনলাম না; অপরিচিতা গাউন পরা একটি মেয়ে। তাদের সঙ্গে হিলডা।

অন্নপূর্ণা-যার কথা নিশ্চয় মনে আছে, তিনি তাঁর সোনাভাইপোর প্রথম প্রণয়ের ফলের বংশোদ্ভূতা এই মেয়েটিকে শুধু আমাকে দিয়ে বাড়ীই ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেননি, তাকে পড়িয়ে কোন দেশী কৃশ্চানের সঙ্গে বিয়ে দেবার অঙ্গীকার আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন। আমি তাকে মেদিনীপুর কৃশ্চান মিশনে ভর্তি করতে গিয়ে ভর্তি করিনি। কারণ সেখানে অধিকাংশই ছিল সাঁওতাল আর চুয়াড়দের মেয়ে। তাদের লেখাপড়া কতদূর কি হয় তা বলতে পারব না, তবে আবহাওয়াটা আমার ঠিক পছন্দ হয়নি। শুধু আমারই বা কেন, বুড়ী হিলডা এসেছিল সঙ্গে, তারও হয়নি। সে বুড়ী হয়েছে, মুখে তার মাকড়শার জালের মত বার্ধক্যের হিজিবিজি রেখা পড়েছে, কিন্তু তার চোখ এবং রঙের মধ্যে একটা পিঙ্গলাভা আছে, যথা আমার মত রঙ, যার গৌরব ওরা এখনও করে। সেটা বরং কুইনীর মধ্যেই নেই, থাকলেও ঈষৎ যৎসামান্য, চোখের তারায় শ্বেত রক্তের একটা ছাপ আছে। হিলডা বলেছিল—না বাবুসাহেব, ই জাগায় নেহি। ইতো সব কালাআদমীর মিশন আছে। না-না-না। আমাদের হারমাদী খুন, হারমাদী ইজ্জৎ, না-না। ইখানে কুইনীকে দিব না।

তার জন্যই তাকে শেষ পর্যন্ত দিয়েছিলাম খড়্গপুরে। ওখানে কৃশ্চান আছে অনেক; এ্যাংলো আছে; রেলওয়ে ইস্কুল আছে, মেয়েদের বোর্ডিং আছে। সেখানেই কুইনীর পড়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। হিলডা খুসী হয়েছিল, কুইনীও খুশী হয়েছিল।

সেদিন কুইনী ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বলেছিল—নমস্কার স্যার!

মনটা যেন আমার চমকে উঠল। শুধু মন কেন, মন দেহ সব। আচমকা কেউ কিছু বললে যেমন চমকে ওঠে মানুষ ঠিক তেমনি। ঠিক তেমনিই, তবু যেন তার সঙ্গে আরও

কিছু ছিল। হ্যাঁ, আরও কিছু। পরে নিজেকে বিশ্লেষণ করেছি, বুঝতে চেষ্টা করেছি তার সত্যস্বরূপ। সে পরে বলছি। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মেয়েটিকে যেন বড় আপনার মনে হল, আমার একান্ত করে নিজস্ব সম্পত্তির মত, হ্যাঁ, সুলতা তাই ঠিক, তাই মনে হল। বুকের ভিতরে রক্ত যেন চলকে উঠল। যে চলকানো কখনো তোমার সঙ্গে ইডেন গার্ডেনস-এ বেড়াতে গিয়েও হয়নি।

কণ্ঠস্বরে তার আভাস ফুটে উঠল, মুখের ভাবে, চোখের দৃষ্টিতেও তার প্রতিভাস ফুটেছিল। বলে উঠলাম—কুইনী!

মেয়েটা থমকে গেল। অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে দৃষ্টি নামিয়ে আমাকে বললে—একটা কাজে এসেছি আপনার কাছে। কোর্টে গিয়েছিলাম, সেখানে শুনলাম আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন, এখুনি ডি-এম-এর সঙ্গে দেখা করে বাসায় এসেছেন। দিদি বললে—

হিলডা সেলাম করে বললে—হ্যাঁ হুজুর, আমি বললাম। উরা শুনতে চায় না। ওদের খুন তেজী আছে, গরম আছে। দরখাস দিতে যাচ্ছিল হুজুর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। হামাদের উখানে হামরা হুজুর কংগিরিসকে ভোট দিলাম না। কংগিরিস ইংরাজ কৃশ্চান লোকের দুষমনি করে। হামি লোক কিরিশ্চান, হামি লোক কংগিরিসকে ভোট দিলাম না।

কুইনী তাকে বাধা দিয়ে বললে—তুমি থাম দিদিয়া। আমি বলছি। মিসেস হাডসন আসুন, আমরা সব বুঝিয়ে বলব। তুমি খুব বেশী বক। থাম একটু।

আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম সুলতা। এই কয়েক মাসের মধ্যেই কুইনী কত পাল্টে গেছে! তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

কংগ্রেসকে ভোট না-দেওয়ার জন্য গোটা কীর্তিহাট গোয়ানদের উপর বিরূপ হয়েছে। তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন জগদীশ্বরকাকা, অর্চনার বাবা আর বিমলেশ্বর-অতুলেশ্বরের ঠিক উপরের বড়ভাই। পরন্তু যাকে আমি হাত মুচড়ে ধরেছিলাম ইতরামির জন্য সে-ই। তার সঙ্গে রঙ্গলাল ঘোষ আছেন। বৃদ্ধ রঙ্গলাল ঘোষ নাকি বলেছেন—ইংরেজ সরকারের সঙ্গে লড়াই হবে, সে বড় লড়াই। সে লড়াই করবেন গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল, বীরেন শাসমল। এখানে গোয়ানদের সঙ্গে লড়ব আমরা।

হিলডা নিজে এসেছিল রঙ্গলালের কাছে। আপনে ঘোষ, এমুন বাত কাহে বললেন?

বুক চাপড়ে রঙ্গলাল বলেছেন—হামারা খুশী। তারপর বলেছেন—এইবার শোধ হবে আমার পিসের খুনের! পিক্রুজের ফাঁসিতে শোধ হয় নাই।

সেই সব খবর খড়্গপুরের কৃশ্চানেরা আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানেরা পেয়েছে, খড়্গপুর কৃশ্চান গার্লস হোস্টেলবাসিনী কুইনীর কাছে এবং গোয়ানপাড়া গিয়ে হিলডাকে এবং কুইনীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেদিনীপুর ডি-এম-এর কাছে দরখাস্ত করতে। একদিকে ১৯৩০-এর সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মণ্ট মুভমেণ্ট, আর পেডি বার্জ ডগলাস মার্ডার করা মেদিনীপুরের প্রচণ্ড ভয়, অন্যদিকে মিলিটারী বুটের খেঁতলানি আর পিউনিটিভ ট্যাক্সের ভারে জর্জরিত মেদিনীপুরে গোয়ানপাড়া থেকে খড়্গপুর অবধি এ্যাংলোদের এবং বিদেশী উপাধিধারী কালো ক্রীশ্চানদের

অবস্থা ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে হেঁটে চলার মত মর্মান্তিক। ভয়ে রাত্রে ঘুম হয় না, দিনে আস্ফালন করে তাড়ির নেশায় প্রমত্তের মত।

১৯৩০ সাল থেকে বাংলা দেশের সে যুদ্ধের কথা ঐতিহাসিক। সে তো বলার প্রয়োজন নেই, তবু আমার জবানবন্দীর সেদিনের এই ঘটনাটির জন্য উল্লেখের প্রয়োজন আছে, মেদিনীপুরের কথা আগে বলেছি, তার সঙ্গে একটা কথা বলা হয় নি, ১৯৩৮ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসেছেন নেতৃত্বের আসনে। সন্থ তিনি তখন বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন, আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী নেতা ডি ভ্যালেরার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। এদিকে নতুন ইলেকশনে গোটা ভারতবর্ষে ইংরেজের শক্তি, অহঙ্কার, রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধিকে চমকে দিয়ে তার সমস্ত প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে কংগ্রেস সব Province-এ ministry form করেছে। পারে নি সিন্ধু আর বাংলায়। মুসলীম লীগের নায়ক জিন্নাসাহেব স্থির করেছিলেন চিরকালের জন্তে চলে যাবেন ইংলণ্ডে। কিন্তু দুটি প্রদেশে দুটি পা রাখবার জায়গা পেয়ে তিনি জিনিসপত্র লগেজের বাঁধনের গিঁট খুলে ফেলেছেন।

মনে একটা ধাক্কা খেলাম। তাকিয়ে ছিলাম কুইনীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম, কুইনী আমার আপনজন নয়?

কুইনী অস্বস্তিবোধ করছিল বোধ হয়। আমার দৃষ্টিতে নিশ্চয় অস্বস্তিকর কিছু ছিল। নিজের দৃষ্টি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, সামনে আমার আয়না ছিল না, আমি আমার দৃষ্টির প্রতিক্রিয়া দেখছিলাম কুইনীর চোখে। কুইনী বললে—দেখুন, নেহাত দিদিমা বললে, সুরেশ্বরবাবু যখন এখানে রয়েছে, তখন আগে তাঁর কাছে যাব। তাঁকে না বলে কিছু করব না, কাউকে কিছু করতে দেব না। নিমকহারামি হবে। তাই ডি-এম-এর কাছে যাবার আগে আপনার কাছে এসেছি। আপনি কি এর প্রতিবিধান করতে পারবেন?

আমি কিছু বলবার আগেই মিসেস হাডসন বললে—Won't you ask us to sit down Babu?

অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম, বসতে বললাম; রঘুয়াকে বললাম—ভাল মিষ্টি আনতে। চা করতে।

অতিথিদের আপ্যায়ন করে বিদায় করলাম। বললাম—আমি তোমাদের ডি-এম-এর কাছে যেতেও বলব না, বারণও করব না। জমিদার হিসেবে আজ আর আমার খাজনা আদায় করে সরকারের প্রাপ্য সরকারী মালখানায় জমা দিয়ে বাকীটা নিজের জন্তে জমানো বা নিজে ভোগ করা ছাড়া আমার করণীয় কিছুই নেই। বড়জোর দু-দশ টাকা চাঁদা দিতে পারি। দেওয়া উচিত বলে মনে করি। তার বেশী কিছু নয়। তবু কীর্তিহাটে গিয়ে একথা বলব আমি। বলব এই পর্যন্ত। যেমন ঠিক তোমাদের বলছি। তার বেশী কিছু নয়।

—বাস। বাস। ওই সে হোয়ে যাবে কুইনী। বস করো। ছোটবাবু রাজাবাবু যখুন বলিয়েছেন, তখন জরুর সব মিটমাট হো যায়ে গা। দরখাস্ত-মরখাস্ত দেনে কা কুছ জরুরৎ নেহি। চল বাবা, ঘর চল।

মিসেস হাডসন কুইনীকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। পরামর্শ করলে। তারপর ফিরে এসে বললে—বেশ তাই হল। আপনি চেষ্টা করে দেখুন। আমরা অপেক্ষা করব তার জন্ত।

ওরা চলে গেল। শুধু হিলডা যাবার সময় বলে গেল—বাবুসাহেব!

—বল হিলডা!

—হামার পর, কুইনীর পর আপনে গোস্‌সা করো না। আপনের পর হামিলোগের কোই নালিশ নেহি, কুছ না!

—না-না হিলডা। তা আমি ভাবিনি।

কাতরভাবে হিলডা বললে—বহুৎ জুলুম করছে বাবু, বহুৎ জুলুম!

—আমি বারণ করব। ওদের অনুরোধ করব। তোমরা ভেবো না।

* * *

সন্ধ্যাবেলা থেকে সেদিন আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে এই রাত্রিটি আমার একটি স্মরণীয় রাত্রি। অবিস্মরণীয়। ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না।

বুঝতে পারলাম ওই কুইনী মেয়েটা আমার সমস্ত দেহ-মনকে এক আশ্চর্য মোহে মোহাচ্ছন্ন করে তুলেছে।

প্রথম মনে হল, এ আমার রক্তের ধারা। রায়বংশের জীবনের অভ্যাস রক্তস্রোতের মধ্যে একটা রোগের বীজাণুর মত মিশে রয়েছে। সংসারে আজও এমন কোন ছাঁকনি তৈরী হয় নি, যা দিয়ে একে ছেঁকে শোধন করা যায়।

রঘুয়াকে ডেকে বললাম—বাজারে যা, এক বোতল হুইস্কী কিনে আন।

রঘুয়া বললে—আছে।

—আছে? অন্নপূর্ণা-মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে শপথ করেছিলাম, মদও আর খাব না। সে আজ ছ-সাত মাস হয়ে গেল! তবু রঘুয়া বলছে, আছে!

রঘুয়া আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বললে—আগেও তো তিন-চার দফে ছোড়া, আওর ফের এক রোজ হুকুম হল কি রঘুয়া লে আয় হুইস্কী! তো' দো-তিন বোতল তখুন বাক্সমে ছিলো, রেখে দিলাম। আনব?

—আন।

—ইখানে? এই রাস্তার সামনা ঘরমে? উপর চলো। হামি থোড়া কুছ খানাকে সঙ্গে সব তৈয়ার করে দি!

বললাম—দে।

রঘু চলে গেল। আমিও উপরের ঘরে পায়চারি করছিলাম, আর ভাবছিলাম, ভাবছিলাম ওই কুইনীর কথা। ওই কিশোরীটির মুখে-চোখে, সকল তনু ঘিরে থাকা একটা আশ্চর্য মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। রায়বংশের স্রোতের মুখে ওই তনুখানিকে যেন একখানি কুমারী তরণীর মত নিজের ভাগ্যের সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

মনে মনে প্রশ্ন করেছিলাম, কই সুলতাকে নিয়ে তো এমন কল্পনা করিনি? কুইনীকে

নিয়ে কেন ?

চট করে মন উত্তর দিয়েছিল, সুলতা তোমার ছায়া উপকূতা নয় ; তোমার অধিকারের মধ্যে সে বাস করে না। তোমার দানের অর্থে সে অন্নে শিক্ষায় দেহ-মনকে পুষ্ট করছে না।

বোধ করি ওর একটা দাবী আছে। আগের কালে এ দাবী ছিল সোচ্চারে ঘোষিত। জীবনে এবং জগতে সব ভ্যালুর মধ্যে সম্পদের ভ্যালু হল প্রত্যক্ষ স্পষ্ট ; ওর স্ট্যাণ্ডার্ড—গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে মাপ করা। তার সঙ্গে শক্তি, রাষ্ট্রশক্তি, মালিকানিশক্তি এক হলে তো রক্ষে থাকে না। আমেদশা আবদালীর ইতিহাসটা পড়া ছিল আমার ভাল করে। অন্তত মনে ছিল। শাহ আবদালার নাকটা বসে গিয়েছিল, সেখানে চিরস্থায়ী একটা ক্ষত ছিল ; ক্ষতটা কুষ্ঠরোগের। সেই আবদালী ষাট বছর বয়সে যখন দিল্লীর রঙমহলে ঢুকল, তখন দিল্লীর বাদশাহ বংশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ষোল-সতেরো কি আঠারো বছরের হজরত বেগমের দেহ-মন দাবী করে বললে—চাই, হজরৎ বেগমের দেহের মনের আমি হকদার।

আমার মনের কামনাও তারই হয়তো অবশেষ। নদীটা শুকিয়ে এসেছে, ১৭৫৭ সাল আর ১৯৩৮ সাল, ১৮১ বছরের মধ্যে। নদীটার উপরে স্রোত নেই, কিন্তু বালির তলে তলে আজও বইছে, আজও বইছে। রত্নেশ্বর রায় অঞ্জনাকে করতলগত করে পাথরের দেবতার মত দৃষ্টিভোগে সন্তুষ্ট ছিলেন ; তাঁর ছেলে দেবেশ্বর রায় ভায়লেটকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন, কৈশোর চাপল্যে। আমি তার পৌত্র, সুরেশ্বর। কুইনীও ওই অঞ্জনার বংশের। আমি তাকে চোরাবালির মত গ্রাস করতে চাচ্ছি।

ঘুরতে ঘুরতে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কিছু চাই। কিছু চাই। মনে পড়ল, অন্নপূর্ণা-মার দেওয়া কাগজের বাণ্ডিলটার কথা। স্যুটকেস খুলে, তাই নিয়ে বসলাম। রঘু বোতল এনে নামিয়ে রাখলে টেবিলের উপর।

সুরেশ্বর বললে—১৯৩৮ সালের সেদিন মার্চের ৩০শে। তারিখটা আমার মনে আছে সুলতা। কীর্তিহাটের রায়বংশের রত্নেশ্বর রায় আর দেবেশ্বর রায়ের পিতাপুত্রের বিস্ময়কর দ্বন্দ্বের কাহিনীর সবটুকু জেনে শেষ করেছিলাম। কড়চা বল জবানবন্দী বল তার উপাদান সংগ্রহ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সারারাত্রি জেগে অন্নপূর্ণা-মা'র দেওয়া কাগজপত্রগুলি পড়ে শেষ করেছিলাম ভোরবেলা পর্যন্ত।

বাপের সঙ্গে দেবেশ্বর রায়ের এই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল শৈশবে। পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই শুরু হয়েছিল। শুরু ক'রে দিয়ে গিয়েছিল অঞ্জনা। অল্প কিছুটা বয়স হতেই দেবেশ্বরের আশ্রয় মায়ের কোল থেকে গিয়ে নির্দিষ্ট হয়েছিল অঞ্জনার কোলে। চার বছর বয়স থেকে ; তখন সরস্বতী বউয়ের গর্ভে এসেছে আর একজন।

সেই সময় অঞ্জনার কাছে শুয়ে সে কাঁদত। অঞ্জনাও মধ্যে মধ্যে কাঁদত। দেবেশ্বর কাঁদতেন মায়ের কোলের জন্য। অঞ্জনা কাঁদত ব্যর্থ জীবনের জন্য। দুজনেই দায়ী করেছিল রত্নেশ্বরকে। রত্নেশ্বরের চরিত্রগৌরবের মধ্যে যাই থাক, সে হীরে মতি পান্না নীলা যাই হোক, তাঁর স্পর্শ, তার দীপ্তি, সবই ছিল বড় রূঢ় উত্তপ্ত। তাঁর কণ্ঠস্বরে সঙ্গীত ছিল। কিন্তু সঙ্গীত সভয়ে বিদায় নিয়েছিল।

এগুলো অস্পষ্ট। প্রথম স্পষ্ট হয়েছে যেদিন অঞ্জনা প্রথম বন্ধ ঘরের মধ্যে রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে সমানে জবাব করেছে। তখন সরস্বতী বউ আঁতুড়ঘরে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা গেছে, প্রসূতি অসুস্থ, চিকিৎসা চলছে। তারই অবসরের মধ্যে রত্নেশ্বর রায় সন্ধান পেয়েছেন অঞ্জনা এবং আ্যালফান্সোর সঙ্গে একটা কিছুর পালা চলেছে। এবং সে পালাটা আছে রত্নেশ্বরের ডায়েরীর মধ্যে সে তুমি শুনেছ। ঘণ্টা দুয়েক আগে ডায়রী থেকে পড়ে শুনিয়েছি। দেবেশ্বর সেটা শুনেছিলেন।

জীবনের প্রায় শেষকালে, তখনও তিনি যুবক, বাংলাদেশের বিদগ্ধ মানুষের সমাজের একজন উজ্জ্বল মানুষ, বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হয়নি—তখন তিনি রাঙাপিসীকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেই চিঠিতে আছে এ-সংবাদটা। রত্নেশ্বর রায়ের পাশের ঘরটাই ছিল দেবেশ্বরের ঘর, এই ঘরেই অঞ্জনা দেবেশ্বরকে নিয়ে থাকতেন। সরস্বতী বউ আঁতুড়ঘরে। বাড়ীর এক প্রান্তে।

অঞ্জনার সঙ্গে কথা বলবার সময় সাবধান হতে ভোলেন নি রত্নেশ্বর। সেদিকে দৃষ্টিহীন বা ভ্রূক্ষেপহীন তিনি ছিলেন না। বাড়ীটার বারান্দার দু মাথায় পাহারা রেখেই কথা বলছিলেন অঞ্জনার সঙ্গে। হুকুম ছিল কেউ যেন না আসে। কিন্তু তাঁরা চার বছরের দেবেশ্বরকে কেউ এর মধ্যে ফেলে নি। ফেলতে পারে নি। হয়তো মনেই হয় নি। দেবেশ্বর ছিলেন মায়ের আঁতুড়ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে, সেখান থেকে এসেছিলেন অঞ্জনার খোঁজে। তাঁকে কেউ আটকায় নি। কিন্তু কিছুটা এসে নিজেই যেন আটকে গিছলেন, বাবার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অঞ্জনা পিসীর কণ্ঠস্বরের পাল্লায় ভয় পেয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। ভয় পেয়েছিলেন অঞ্জনা পিসীর জন্তে। বাবা অঞ্জনা পিসীকে বকছে। অঞ্জনা পিসী সমান উত্তর করছে। এমন কখনও ভাবতে পারেন না তখন দেবেশ্বর।

ঘরের দরজার কোণে দাঁড়িয়ে তিনি যত কেঁদেছিলেন তার সবটাই অঞ্জনা পিসীর জন্তে। আর রাগ হয়েছিল বাবার উপরে।

"এই রাগ তিলে তিলে বৃদ্ধি পাইয়া এক পর্বত সৃষ্টি হইতেছিল রাঙাপিসী। বাল্যকালে তিনি কদাচ আমাকে সমাদর করিয়াছেন। শুধু শিক্ষাই দিয়াছেন। কীর্তিহাটের প্রতিটি ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, তাহাদের সে কি ভয়!

রাঙাপিসী, নিত্য প্রভাত হইতে নানা স্থানের প্রজারা আসিত; তাহারা অগ্রে আসিয়া কাছারিতে সেলামী জমা দিয়া সেরেস্তায় আগমনের কারণ জানাইত, তাহার পর মা কালীর নাটমন্দিরে গিয়া মা কালীকে প্রণাম করিত। রাজরাজেশ্বরকে প্রণাম করিত। তখনও রাধাসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তুমি জান রাঙাপিসী, এই যুগল বিগ্রহ আমার ভিক্ষা-মা ও ভিক্ষা-বাবার। সে কথা পরে বলিব। আগের কথা আগে লিখি।

রাঙাপিসী, কীর্তিহাটের চাউল এবং ধান্তেরও জমাখরচের খাতা আছে; নিত্য প্রায় এক মণ চাউল খরচ হইত দেবোত্তরে। প্রায় একশত জনের খাদ্য! প্রজা কোনদিন পঞ্চাশ, কোনদিন ষাঠ, কোনদিন সত্তর-আশী আসিয়াছে। সকলেই সেলামী দিয়াছে। তাহারা অন্নের মূল্য দিয়া অন্ন গ্রহণ করিয়াছে। তাদের সকলেরই প্রার্থনা এক—হুজুর মা-বাপ;

হুজুর রক্ষা করুন। ডিক্রীর টাকা দিতে হইলে আমাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইবে।

আমার পিতার মুখ যেন প্রস্তরে গঠিত মুখ। তাঁহার এক কথা। "আইন অনুসারে যাহা প্রাপ্য তাহার অতিরিক্ত এক কপর্দক আমার দাবী নহে। ডিক্রীর টাকা ছাড়িতে হইলে একদিন আমাকেও সর্বস্বান্ত হইতে হইবে। সম্পত্তি প্রথমতঃ দেবোত্তর, মালিক দেবতা, দ্বিতীয়তঃ এ সম্পত্তি রায়বংশের আগামী পুরুষদের, ইহাকে আমি কোনক্রমেই ক্ষয় করিতে পারি না। ন্যায্য প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবার অধিকার আমার নাই। কথা কয়টি শেষ হইতে-না-হইতে দারোয়ান তাহাকে বলিত—'উঠো বাহার চলো। উঠো—উঠো।'

দ্বিতীয় জনের ডাক হইত। সেই একই কথা।

পিসী, প্রথম প্রথম মনে একটা ভয় হইত, একটা গভীর শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় জাগ্রত হইয়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিত। তাহার উপর তাঁহার কঠিন চরিত্র। রাঙাপিসী, অঞ্জনা পিসীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়াছিলাম কিন্তু তাহার অর্থ বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম অঞ্জনা পিসী বাবাকে কঠিন কথা বলিল। বাবার শাসন সে গ্রাহ্য করিল না। ইহার পর হঠাৎ সে চলিয়া গেল, লোকে তাহার নিন্দা করিল; "কুলের বাহির হইয়া গিয়াছে" কথাটা শুনিলাম কিন্তু ঠিক বুঝিলাম না, তবে কাজটা অত্যন্ত ঘৃণ্য তাহা বুঝিলাম। বাবার ক্রোধ দেখিলাম। একটা গোয়ান ছোকরা, সে ইহাতে লিপ্ত ছিল। আলফান্সোর সহকারী হিসাবে, ঘোড়া দেখাশোনা করিত, সে কোথায় হারাইয়া গেল। শুনিলাম তাহাকে কাটিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বাবামহাশয়ের হুকুমে। কারণ সে আলফান্সোকে সাহায্য করিয়াছিল। আমার ভয় আরও বাড়িল। মনে হইল, বাবা এত নিষ্ঠুর কেন? তাহার পরই নিজের ভয় হইল। বাবার মত পুণ্যাত্মা ধার্মিক লোক, তাঁহার যে নিষ্ঠুর না হইয়া উপায় নাই। কি করিবেন? পাপীকে দণ্ড তিনি না দিলে কে দিবে! শিহরিয়া উঠিলাম।

কিন্তু একদিন আর মানিতে পারিলাম না। একদিন দেখিলাম, নাটমন্দিরে কালীমায়ের সম্মুখে একজন অর্ধ-উন্মাদিনী যুবতী বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিতেছে। মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই, কেশরাশি এলাইয়া পড়িয়াছে, বক্ষের বস্ত্রও খসিয়া গিয়াছে, ভ্রূক্ষেপ নাই, সে বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। বলিতেছে—এই বিচার? এই বিচার? মানি না, এ-বিচার মানি না, মানব না।

কীর্তিহাটের কাছারিবাড়ী ও ওদিকে নাটমন্দিরের চারিদিকে গোমস্তা, নায়েব, আমলা, পাইক, চাপরাসী, পূজক-পুরোহিত, পরিচারক প্রভৃতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে স্তম্ভিতের মত। এই উন্মাদিনীর ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, জিহ্বার আগলবাঁধ নাই, সে কীর্তিহাটের রত্নেশ্বর রায়কে তিরস্কার—তাই বা কেন, গালিগালাজ করিয়া চলিয়াছে। আমিও অবাক হইয়া বাড়ীর ভিতরের দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম।

এমন সময় বাবামহাশয়ের গলার সাড়া পাওয়া গেল। তিনি তাঁহার খাস কাছারি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—সকলে আপন-আপন কাজে চলিয়া যাও। কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া থাকিবে না।

সে-কণ্ঠস্বর, সে-হুকুমজারীর ভঙ্গি উপেক্ষা করিতে কাহারও সাধ্য ছিল না। সকলেই

চলিয়া গেল। বাহিরে ফটকের সামনে কতকগুলা লোক, তাহারা বাহিরের লোক, দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, তাহারাও সভয়ে প্রস্থান করল। আমিও ভয় পাইয়া পলাইয়া গেলাম। কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল, কান্না পাইতেছিল—আশঙ্কা হইতেছিল যে, এইবার বোধ হয় বাবা ওই হতভাগিনীকে তলোয়ার দিয়া কাটিয়া ফেলিবেন। ওই স্ত্রীলোকটি দরিদ্র বটে কিন্তু নীচজাতীয়া নয়, তাহার আকৃতি ও রূপের মধ্যেই তা পরিস্ফুট ছিল। এবং তাহার আকৃতি ও রূপের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা আমার মত সাত-আট বৎসরের বালকের মনকেও দয়ার্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল। তাই পলাইয়া গিয়াও পলাইতে পারিলাম না। ফিরিয়া গেলাম ছাদের উপর, সেখানে আলসের আড়ালে লুকাইয়া ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলাম ও শুনিতে লাগিলাম। এতক্ষণে দৃষ্টিতে পড়িল যে মেয়েটির সামনে নাটমন্দিরে এক প্রৌঢ় মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া নতদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া আছে। লোকটার মাথা কাটিয়া গিয়াছে। কপালে রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। স্ত্রীলোকটি বাবামহাশয়কে দেখিয়া পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল—বাবু মহাশয় দয়া করুন, বাবুমহাশয় কৃপা করুন। বিবেচনা করিয়া বিচার করুন বাবুমহাশয়।

রাঙাপিসী, আজও আমি স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, ওই উন্মাদিনী মেয়েটির উচ্চ ব্যাকুল কণ্ঠস্বর, তাহার বক্ষের আকুতি-মিনতি আমার বাবামহাশয়ের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল। বাবামহাশয়ও তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে মেয়েটির কণ্ঠস্বর যেন কেহ বন্ধ করিয়া দিল—হাত দুটা দিয়া সে বুক চাপড়াইতে-ছিল, সে হাত দুইটা যেন অবশ হইয়া শুধু যুক্তকর হইয়া রহিল।

বাবামহাশয় বলিলেন—তোদের স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে-নালিশ, তাহা কি মিথ্যা? এই কালীমাতার সম্মুখে তাঁহার নির্মাল্য হাতে লইয়া বলিতে পারিস?

মেয়েটি নীরব হইয়া গেল।

পুরুষটির মাথা আরও নত হইল। বাবামশায় বলিলেন—বল্, সত্য কিনা বল!

পুরুষটি এবার বাবার পায়ে পড়িয়া বলিল—সত্য। কিন্তু হুজুর, আপনি সব শুনিয়া বিচার করিয়া—

বাবামহাশয় সিংহগর্জনে বলিলেন—বাহির হইয়া যা। তুই পাপিষ্ঠ, আর ওটা পাপিষ্ঠা; যা যা, এখুনি বাহির হইয়া যা। আমার মন্দির অপবিত্র হইয়াছে। যাহা বিচার হইয়াছে, তাহা সত্য বিচার হইয়াছে। যা—বাহির হইয়া যা। যা এবং তিন দিনের মধ্যে গ্রাম ছাড়িয়া তোদের চলিয়া যাইতে হইবে।

তাহারা চলিয়া গেল। সে-সময়টা বৈশাখ মাস, বেলা তখন দ্বিপ্রহর, মেয়েটি ও পুরুষটি নতমস্তকে নীরবে বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় মেয়েটি একটি থামের ছায়ায় শায়িত ঘুমন্ত একটি শিশুকে কোলে করিয়া চলিয়া গেল।

এ-বিচারের কারণ শুনিয়া বাবা সম্পর্কে আমার ভয় আরও বাড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল—বাবামহাশয় বিচারক—বিধাতার মূর্তিমন্ত অবতার।

কারণ কি জান?

এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি একজন বিশেষ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যাহারা কন্যা বিক্রয় করে। বিবাহের

সময় কন্যার পিতাকে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। এই প্রৌঢ়টি জল-অচল হিন্দুদের মধ্যে পূজা-অর্চনা ও পৌরোহিত্য করিত। পৈতৃক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিল তিল করিয়া পয়সা জমাইয়া অবস্থা বেশ স্বচ্ছল করিয়া তুলিয়া একদা বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার সাধ করিয়াছিল। এবং একটি আট বৎসরের পিতৃহীনা কন্যাকে প্রায় চারিশত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়া ঘরদুয়ার সাজাইয়া পাতিয়াছিল। সময়টা তখন দুর্ভিক্ষের সময়—মেদিনীপুরে ১৮৬৪ সালে সাইক্লোন ঝড়ের পর দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেই সময় এই লোকটি সমস্ত শ্বশুরবাড়ীর লোকদের বাঁচাইয়াছিল। কন্যাটির মাতা ও ভ্রাতাদের পর্যন্ত স্বগৃহে আনিয়া রাখিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ প্রৌঢ় এইভাবেই প্রায় খেলাঘরের বরকনে খেলা শুরু করিয়া যখন কন্যাটি যৌবনে উপনীত হইল, তখন একদা হতভাগ্য পথের মধ্যে পড়িয়া গিয়া কোমরে আঘাত পাইয়া একেবারে কোমরভাঙা কুব্জ হইয়া গেল, সেই সঙ্গে তাহার পুরুষ-জীবনের সকল শক্তি তিরোহিত হইল।

সুরেশ্বর বললে, সে এক করুণ ইতিহাস—তারই সঙ্গে খানিকটা সামাজিক রুচিতে কুৎসিতও বটে। একালে যদিবা এ-সত্যকে সহ্য করা যায়, সেকালে কোনমতেই তা সহ্য করা যেতো না। এর মধ্যে মানুষের মনের চিরন্তন কামনার যে লজ্জাহীন, ভয়হীন, সঙ্কোচহীন প্রকাশ, তার তুলনা রাবণের চিতার সঙ্গে। সে নাকি কোনকালে নেভে না, চিরকাল জলছে—চিরকাল জ্বলবে।

ওই মেয়েটির মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। তার সঙ্গে ওই হতভাগ্যের বিচিত্র হতাশা—তার রক্ত-জল-করে-অর্জন-করা সম্পদ-সম্পত্তি সে কাকে দিয়ে যাবে। কে তার উপাধি বহন করবে। সেকালে তার সঙ্গে আরও কামনা ছিল—কে তাকে জলপিণ্ড দেবে।

এরপর যে ব্যাপার ঘটল, তা যেমন শ্রুতিকটু, সমাজবিরুদ্ধ, তেমনি এই মায়া-মমতার সংসারে সম্পদ-সম্পত্তির দুনিয়ার চিরন্তন। মহাভারতের কাল থেকে ঘটে আসছে। ব্যাসদেব যে-সাহসের সঙ্গে সেই সত্যকে প্রকাশ করেছেন, তারই নজির তুলে দেবেশ্বর রায় তাঁর রাঙাপিসীকে অনায়াসে ব্যাপারটা জানিয়েছিলেন। লিখেছিলেন—

"রাঙাপিসী, বিষয়ের সংসারে মমতার পৃথিবীতে এ বোধ হয় চিরকাল ঘটিতেছে। ব্যাসদেবের মহাভারতে আছে পঞ্চপাণ্ডবের জন্মকাহিনী। এই হতভাগ্য দম্পতির সেই মতি হইল। এই যুবতীটি স্বামীকে সত্যই ভালবাসিত। স্বামীর সঙ্গে নাকি রাত্রে বসিয়া ক্রন্দন করিত—এসব তাহাদের কে খাইবে? অবশেষে উভয়ে পরামর্শ করিয়া ওই পথই ধরিল। পুরুষটির এক নীচজাতীয়া পালিকা মা ছিল, তাহার মায়ের মৃত্যুর পর সে-ই তাহাকে মানুষ করিয়াছিল; সেই মায়ের গর্ভের এক ছোট ভাই, সে ছিল তাহাদের বাড়ীর কেনা গোলামের মত। ছেলেবেলায় ছিল রাখাল, তাহার পর হইয়াছিল মাহিন্দার, তাহার পর সে তাহাদের জমি চাষ করিত এবং চাকর বলিতে চাকর, ভারবহনকারী পশু বলিতে তাহাই, আবার বন্ধু বলিতে একান্ত আপন বন্ধু ভাই, তা-ও ছিল সে। সব কথাই তাহার সহিত হইত। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া একদা তাহাকেই সমস্ত দুঃখ ব্যক্ত করিল। এই অস্পৃশ্য নীচজাতীয় পুরুষটি

বয়সে এই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের কনিষ্ঠ ছিল এবং আকারে অবয়বে কালো কষ্টি-পাথরে গড়া ভীমাকৃতির তুল্য সুন্দর ছিল। এই মেয়েটির ও তাহার স্বামীর বংশরক্ষা করিবার নিমিত্ত এমনি কৃষ্ণবর্ণ এক পুত্র যথাসময়ে তাহারা পাইয়াছিল। তাহারই বিচার হইয়াছিল। নালিশ আনিয়াছিল—মেয়েটির ভাইয়েরা, পুরুষটির জ্ঞাতিরা। কারণ তাহারা দুইপক্ষই প্রত্যাশা করিয়াছিল—ওই নিঃসন্তান দম্পতির সম্পত্তি তাহারাই পাইবে। জ্ঞাতিদের প্রাপ্য আইনানুসারে। শ্যালকেরা আশা করিয়াছিল, দানপত্র লিখাইয়া লইবে বা তাহাদের সন্তান পোষ্যপুত্র লওয়াইবে।

প্রমাণ ছিল অকাট্য। ওই শিশুটির কৃষ্ণবর্ণ। তাহার উপর ওই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটির স্বীকারোক্তি। কাছারিতে তাহাকে থামে বাঁধিয়া তাহার পিঠ বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিয়া স্বীকার করানো হইয়াছিল। এবং বিচারে হুকুম হইয়াছিল—এই দম্পতিকে ওই সন্তান লইয়া সামান্য অস্থাবর লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, ওই সম্পত্তি ওই গ্রামের গ্রাম্য দেবতাদের দেবোত্তররূপে গণ্য হইবে।

রাঙাপিসী, সেদিন বাল্যকালে বাবামহাশয়কে যেমন বিচারক-বিধাতার অবতার মনে হইয়াছিল, এই রায়কেও ঠিক তদ্রূপ বিধাতার রায় বলিয়া মনে হইয়াছিল।

ইহার পর নয় বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন হইল। আমার মুখ দেখিলেন হুগলী জেলার কায়স্থ জমিদার মিত্র-গোবিন্দপুরের জমিদার শিবদাস মিত্রের তৃতীয় পক্ষের বন্ধ্যাস্ত্রী। কৃষ্ণভামিনী দাসী। এখানেও একটা সমস্যা ছিল। সমস্যা—কৃষ্ণভামিনী দাসীকে অপবাদ দিয়া সম্পত্তি হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিতেছিল শিবদাস মিত্রের ভাগিনেয়। কারণ ভাবী উত্তরাধিকারী সেই। অথচ শিবদাস মিত্র তাঁহার স্বোপার্জিত সম্পত্তি তাহার তৃতীয় পক্ষের যুবতী নিঃসন্তান স্ত্রীকে নির্ব্যূঢ়স্বত্বে উইল করিয়া দিয়াছেন। বারো মাসে বারো হাজার টাকা আয়ের জমিদারী। এবং নগদ অর্থ। কৃষ্ণভামিনী দাসী বাছিয়া বাছিয়া শরণ লইলেন ধার্মিক সাধুপ্রকৃতির খ্যাতিমান ও প্রতাপবান জমিদার রত্নেশ্বর রায়ের। রাঙাপিসী, তোমার জমিদারী শ্যামনগরের পত্তনীদার কীর্তিহাটের রায়বংশ। শ্যামনগর-রাধানগর লইয়া যে বিরাট পর্ব, তাহা তোমার অগোচর নয়। শ্যামনগর হুগলী জেলার অন্তর্গত। চুঁচুড়ায় রায়েদের বাড়ী ছিল একখানা, সেখানে সেরেস্তা ছিল এবং সেখানে রত্নেশ্বর রায় মধ্যে মধ্যে যাইয়া বিশ্রাম করিতেন। গঙ্গার ধারে বাড়ী, তাঁহার প্রিয়স্থান ছিল। এখানেই একদা এই কৃষ্ণভামিনী দাসীর সঙ্গে আমার মাতাঠাকুরাণীর পরিচয় হয়; কৃষ্ণভামিনী দাসী একদিন পাল্কী করিয়া আসিয়া আমার মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আলাপ করিয়া গেলেন, আট বছরের আমাকে সমাদর করিয়া কোলে লইয়া একটি মোহর দিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, আমার কিশোর গোপাল। এবং নিজ বাটীতে রাধাসুন্দরজীউ ঠাকুরের আরতি দেখিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার পর ক্রমে সে-আলাপ গাঢ় হইল। এবং সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আমার পিতার কাছে আসিয়া প্রণতা হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি অনাথা। আপনার নাম-খ্যাতি এ-অঞ্চলে কে না জানে! এ-অবলা-অনাথাকে আপনি রক্ষা করুন।

রাঙাপিসী, কথাগুলি আমার কানে এখনও যেন বাজিতেছে। মাতাঠাকুরাণী, তাঁহার পাশে আমি ভিক্ষা-মায়ের কোলের কাছে, তিনি আমাকে কোলের কাছে লইয়াই দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন।

বাবামহাশয় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—আমি সমস্তই অবগত আছি। দেবেশ্বরের গর্ভধারিণীর নিকটও আপনার কথা শুনিয়াছি। অসহায়কে রক্ষা করা শ্রেষ্ঠ মনুষ্যধর্ম। ইহা যে না করে সে ধর্মে পতিত হয়। আমা হইতে যতদূর হইবে অবশ্যই তাহা করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

কৃষ্ণভামিনী দাসী আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। তাহার পর এক বৎসরের মধ্যে অনেক অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পাইল। তিনি আমাকে বড় ভালবাসিলেন। এবং আমাকে সন্তানরূপে পাইবার বাসনায় আমার উপনয়নের সময় মুখ দেখিলেন। মুখ দেখিবার কালে তিনি আমাকে মূল্যবান হীরার আংটি এবং হীরা-বসানো বোতাম, রূপার বাসন এবং একশত একটি মোহর দিয়াছিলেন।

ভিক্ষা-মা এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না, রাধাসুন্দর ঠাকুরের সম্পত্তি দেবোত্তর ছিল, তাহার সেবায়েৎ-স্বত্ব বলিলেন আমাকে দিবেন। তখন রত্নেশ্বর রায়ের প্রতাপে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায়—তাঁহার নাগপাশের মত কৌশল-জালে এবং অর্ধচন্দ্রবাণের মত ক্ষুরধার বুদ্ধিতে অঘটন ঘটে। সুতরাং কৃষ্ণভামিনী দাসীর স্বামীর জ্ঞাতিবর্গ পিছু হটিল। রত্নেশ্বর রায়ের প্রভাবে এবং কৌশলে সামান্য কিছু সম্পত্তি লইয়া তাহারা সম্পত্তির উপর কৃষ্ণভামিনী দাসীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব স্বীকার করিয়া দলিল করিয়া দিল। এদিকে আমার ভিক্ষা-মা বাবামহাশয়ের সম্পর্কে বেয়ান হইলেন। তাঁহার সামনে ঘোমটা কমাইয়া কপালে চুলের রেখার প্রান্ত পর্যন্ত তুলিলেন। হাস্য-পরিহাস হইতে লাগিল।

বৎসর-তিনেক পর, তখন আমার বয়স বারো বৎসর, সবে জানবাজারের বাড়ীতে থাকিয়া হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করিতেছি। দেশে তখন বর্ধমান ফিবারের প্রকোপ হইয়াছে। কয়েকটা অজন্মায় দুর্ভিক্ষ গিয়াছে, লোক মরিয়াছে। বর্ধমান ফিবার দেশময় ছড়াইয়াছে। রত্নেশ্বর রায় কীর্তিহাটে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুরাতন যেটা ছিল, সেটা একটা সামান্য ব্যাপার। এ-চিকিৎসালয় সত্যই বড় চিকিৎসালয়। তাঁহার নাম তখন দেশে কীর্তিমান লোকেদের প্রথম সারিতে স্থান পাইয়াছে, হঠাৎ কলিকাতায় বসিয়া শুনিলাম আমার ভিক্ষামাতা কৃষ্ণভামিনী দাসী বৃন্দাবনবাসিনী হইয়াছেন। দেশে আর ফিরিবেন না। এবং তিনি তাঁহার স্বামীর উইলসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি রাধাসুন্দরের নামে দেবোত্তর করিয়া, গুজব শুনিলাম, ভিক্ষাপুত্র আমাকেই তাঁহার সেবায়েৎ করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণভামিনী-মা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার কথা তুমি জান, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ, তোমাকেও তিনি তোমার বিবাহের সময় মূল্যবান অলঙ্কার দিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসরখানেকের মধ্যে আমি যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার এতদিনের পৃথিবী সব যেন পাল্টাইয়া গেল। আমি যাহাকে এতদিন দেবতা ভাবিয়াছিলাম, তাহার ছদ্মবেশটা খসিয়া গেল। আমি দেখিলাম, তিনি যাহাই হউন, দেবতা বা দানব, মানব বা অসুর—তিনি হউন

পবিত্র চরিত্রবান, তিনি ত্রিসন্ধ্যা করুন, তিনি জপ করুন, তিনি প্রকাশ্যে দান করুন, তিনি হউন কীর্তিমান, তিনি দয়াহীন, মায়াহীন, ক্ষমাহীন, তিনি দেবস্থলের খড়্গের মত পবিত্র, কিন্তু তাঁহার কর্ম—দেবতার হাড়িকাঠে আবদ্ধ হতভাগ্য মেষ-মহিষ এবং ছাগগুলিকে ছেদন করা। হয়তো এককালে খড়্গ লইয়া শত্রুর সঙ্গে, বিধর্মী বা অধর্মাচারীর সঙ্গে যুদ্ধ করা হইত, কিন্তু এখন তাহা কেহ করে না; সে তাহার রক্তপিপাসার নিবৃত্তি করে, অসহায় পশুগুলিকে ছেদন করিয়া। রাঙাপিসী, আমার ভিক্ষা-মা কৃষ্ণভামিনী স্বেচ্ছায় বৃন্দাবন বাস করেন নাই। রত্নেশ্বর রায় তাঁহাকে সম্পত্তি দেবোত্তর করাইয়া, সে দেবোত্তরের ট্রাস্টি নিজে হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। কেন জান? কৃষ্ণভামিনী দাসী ছিলেন বন্ধ্যা এবং বয়সে পঁচিশ-ত্রিশ, তিনি বেয়াই সম্পর্ক ধরিয়া রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতে গিয়া তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। সে-প্রেম এমনি গাঢ় এবং তাহার ফলে তাঁহার পক্ষে দেহ-কামনা এমনই অসম্বরণীয় হইয়াছিল যে, একদিন সমস্তই সকাতরে নিবেদন করিয়া রত্নেশ্বর রায়ের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রখানিকেই তিনি কৃষ্ণভামিনী দাসীর মৃত্যুবাণ হিসাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে এইভাবে সর্বস্ব দেবোত্তর করাইয়া নিজে সেবায়েত ট্রাস্টি হইয়া তাঁহাকে বধ করিলেন।

রাঙাপিসী, কৃষ্ণভামিনী দাসী কিন্তু নির্বাসিতা হইয়াও নির্বাসিতা হয়েন নাই। তিনি বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিয়া কলিকাতাতেই কৃষ্ণাবাই নামে বাইজীর পেশা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। আমি তাঁহাকে ঘৃণা করি নাই, মা বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছিলাম। তিনি কাঁদিয়াছিলেন। সমস্ত শুনিয়া আমার সেদিন প্রথম আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল।

আর একজন এসব কথা আমাকে বলিয়াছিল। সে-ব্যক্তি শ্যামনগরের ঠাকুরদাস জ্যাঠামশাই!

* * *

সুরেশ্বর থামলে। একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে টান দিয়ে পত্রখানা পত্রের বাণ্ডিলে রেখে দিয়ে বললে—থাক, পত্র থাক। কি হবে তোমার কাছে এত প্রমাণপ্রয়োগ দিয়ে?—প্রয়োজন নেই। মুখেই বলি। রায়বংশের প্রাচীনকালের কথার আর অল্পই বাকি। সামান্য।

তবে একটা কথা বলব। রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে এর একটি ঘটনাও গোপন করা নেই। এবং আশ্চর্যের কথা সুলতা, তিনি এইসব ঘটনা লিখতে গিয়ে অসত্য, অসততা এবং মিথ্যা ও পাপকে, আগুনের অন্ধকারকে দহন করার মত দহন করেছেন। দৃঢ়বিশ্বাস এবং সূক্ষ্মতম বিচারবোধের পরিচয় সেখানে ছত্রে-ছত্রে। এবং নিজের উপরেও শাস্তিবিধান করেছেন।

কৃষ্ণভামিনীর পত্র পেয়ে তিনি তিন দিন উপবাস করেছিলেন। এবং নিজের রূপ ও কান্তির জন্য বার বার আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন, "হাঁ, আমার এই কান্তি ও রূপও ইহার জন্য দায়ী। কি করিয়া অস্বীকার করিব? কিন্তু এই বাক্য শ্রবণে পাপ, চিন্তনে পাপ! পত্রযোগে সেই পাপ আমাকে অর্শিল। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত উপবাসাদি করাই স্থির করিলাম।"

তাছাড়া এই রাধাসুন্দরকে কীর্তিহাটে নিয়ে গিয়ে স্থাপন ক'রে, তার বাৎসরিক এক হাজার টাকা আয় এমন পাকা করে কীর্তি ও কর্মে দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তা থেকে বছরে দশ টাকাও রায়বংশের কোন স্বার্থে লাগেনি। না, স্থূলতা লাগে, কিছু লাগে; লাগে রাধাসুন্দরের অন্নপ্রসাদ। সে-প্রসাদ আগে রায়বংশে গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। আজ আর সে-নিষেধ কেউ মানে না। আর ওই পঙ্গু ব্রাহ্মণটি এবং সেই ব্রাত্য ঔরসজাত সন্তানটিকে বুকে করে বৈশাখের রৌদ্রে যেদিন ওই যুবতীটি আগুনের মত তেতে-ওঠা মেদিনীপুরের লালমাটির পথের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল, সেদিন ডায়রীতে লিখেছেন—"আজ পঙ্ক এবং চন্দন, এই-দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু তাহা পারিতেছি না। নাসারন্ধ্র বলিতেছে পঙ্ক-গন্ধ সহ্য করিতে পারি না, পারি না, পারি না। শ্বাসরোধ করিতেছে। অন্তর বলিতেছে—শ্বাসরোধে মৃত্যু অনিবার্য বিধান। যাহা বিধান, তাহাই বিধাতার নির্দেশ। অঙ্গে পঙ্ক মাখিলে চর্মরোগ হইবে। চর্মরোগও ব্যাধি। কি করিব, কুষ্ঠরোগীকে মমতা করিয়া কোন্ বিধানে আশ্রয় দিব? বুঝিতেছি এই মমতাগুলি মোহ, এই দুঃখগুলি অলীক, মিথ্যা। কি করিব? তাহাকে নির্বাসন দিতে আমি বাধ্য।

তবে এই বারো হাজার টাকা আয় সেকালে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আর চিকিৎসার জন্য। সে-দান কলকাতার মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজও তা বজায় আছে। আজও তা থেকে কিছু উপকার হয়।

তবে একথাও ঠিক নয় যে, এ থেকে নিজের বংশের জন্য তিনি কিছু করেন নি। ধর্ম এবং আইন বিচারমত পাপ বাঁচিয়ে এ সম্পত্তি নিজের নামে পত্তনী এবং দরপত্তনী নিয়ে দশ হাজার টাকার জমিদারীকে বাইশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তিতে পরিণত করেছিলেন। পথ সেই চিরাচরিত পথ।

খাজনা বৃদ্ধি আর পতিত আবাদ।

শেষ বৃদ্ধি হয়েছে রত্নেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর—শিবেশ্বর রায়ের হাতে তখন জমিদারী গেছে। দেবেশ্বর রায়ও সদ্য মারা গেছেন তখন। তারপর পতিত আবাদ থেকে বৃদ্ধির দিকটা অব্যাহত থাকলেও ফসলের মূল্যবৃদ্ধিহেতু বৃদ্ধি—যা ইংরেজের আইন অনুসারে পনের বছর পর পর জমিদারেরা পেতে পারে, তা আর পায় নি রায়েরা।

* * *

সুরেশ্বর পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে টিপে নিভিয়ে দিয়ে বললে, সেসব তথ্য ফ্যাক্টস ফিগারস তুমি ভাল করেই জান আমার চেয়ে। স্বীকার করবে নিশ্চয়। গোটা বাংলাদেশ জুড়েই ওখানে এক হাল। ওকথা থাক, এখন রায়বাড়ীর কথা বলি। পৃথিবীর মানুষের কাছে তোমার মারফৎ আমার জবানবন্দী শেষ করি।

বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ দেবেশ্বরের যেদিন ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়েছিল, সেদিন চিঠি লিখতে বসেছিলেন বাপকে। তখন দেবেশ্বর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছেন, ষোল বছর বয়স পার হয়েছেন, তখন তাঁর মন একটা চেহারা নিয়েছে—যে-চেহারাটা বলতে গেলে

রত্নেশ্বর রায় তাঁর অজ্ঞাতসারে নিজেই গড়ে দিয়েছেন। তবে তাকে শেষ গড়ন দিয়ে গেছে কৃষ্ণাবাই—অর্থাৎ বৃন্দাবন থেকে নিরুদ্দিষ্টা কৃষ্ণভামিনী দাসী আর শ্যামনগরের ঠাকুরদাস পাল, দেবেশ্বরের গোপাল দাদার বাবা, রত্নেশ্বরের বাল্যকালের দোসর, পার্শ্বচর, শ্রেষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী, যা তোমার পছন্দ স্থূলতা সেই বিশেষণই তুমি গ্রহণ কর। তখন তিনি রত্নেশ্বরকে বলেন—"নিম। নিম। নিম। ঘি দিয়ে ভাজো নিমের পাত—নিম না ছাড়ে আপন জাত।" জেঠামণি, হয়তো তুমিও তোমার বাবার মত হবে। কিন্তু শোন শোন— এই সদ্গোপ জেঠা তোমার তোমাদের জন্যে প্রাণ দিতে পারে গো! তা পারে। কিন্তু দুঃখু কি জানো, তোমরা বড় হলেই ফণা তুলে ফোঁস ক'রে ওঠো, উঠে বল—তোরা চোঁড়া—তোরা ঢাঁড়াশ —তোরা সরে যা। তখন সে ফোঁসানি সামলায় কে?

কৃষ্ণাবাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল দেবেশ্বরের, কলকাতার এক বিখ্যাত জমিদার বাড়ীর বিয়ের আসরে। রত্নেশ্বরের চিঠির নির্দেশ মত সামাজিকতা রক্ষা করবার জন্য তাঁকে যেতে হত রায়বাড়ীর তরফ থেকে লৌকিকতা বা উপহার নিয়ে। তখন লৌকিকতারই যুগ ছিল। বড় বড় বাড়ীর রেওয়াজ ছিল তাঁদের থেকে বড় বাড়ীর নিমন্ত্রণে মোহর বা গহনা দেওয়া। হীন অবস্থার বাড়ীর নিমন্ত্রণে নগদ টাকা, দশ বিশ পঞ্চাশ কদাচিৎ একশো টাকা। সেটা নগদ টাকা। বধূর সামনে রাখা পরাতে রেখে দিয়ে, আশীর্বাদ বা প্রণাম করে চলে আসতেন। পাশে যৌতুক বা লৌকিকতা গুনে নিয়ে খাতায় লিখে রাখবার কর্মচারী বসে থাকত। ওদিকে একদিকে খাওয়া-দাওয়ার আসর, অন্যদিকে একটা আসরে চলত সঙ্গীত-নৃত্যের আসর। সঙ্গীতজ্ঞ গুণীরা সামনে বসতেন, ফরমায়েস করতেন; পিছনের লোকেরা আসত যেত; আসত যেত; ক্রমান্বয়েই বদল হত আসনের লোক। এই আসরে তরুণ কন্দর্পের মত দেবেশ্বরের হাত ধরে গৃহকর্তা নিজে সামনের আসনে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—বস গান শোন; খেয়ে তবে যেতে পাবে।

আশপাশের সামনের সারির শ্রোতাদের বলেছিলেন—কীর্তিহাটের রত্নেশ্বর রায়ের বড় ছেলে। গান ওদের রক্তে।

কথাটা সে-কালে কলকাতার ধনী ও গুণীসমাজে সকলেই জানত। জানত এ বংশের সকলেই জন্ম থেকে গানে বোধ নিয়ে জন্মায়, কণ্ঠস্বরও সকলের সুস্বর। এদের বংশে কেউ একজন নাকি গান গেয়ে শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

১৮৭৮।৭৯ সাল। বাংলাদেশে রামপ্রসাদী গান তখন কীর্তনের সঙ্গে প্রায় সমান মর্যাদা পেয়েছে। তান্ত্রিক সাধুদের যুগ সেটা। বীরাচারী বামাচারীদের উপর যত ঘৃণা ইংরাজী শিক্ষিতদের, সাধারণের কাছে তত সমাদর ভক্তিমার্গী শক্তিসাধকদের। রামকৃষ্ণদেব তখন পূর্ণ প্রকাশ করেছেন নিজেকে দক্ষিণেশ্বরে। ইংরিজী শিক্ষিত নরেন দত্ত, থিয়েটারের প্রবর্তক, শেক্সপীয়রভক্ত জি সি তাঁর পায়ে গড়াবেন, তার আয়োজন চলছে।

গৃহস্বামীর কথায় সকলেই ফিরে তাকিয়েছিল এই সুন্দর তরুণটির দিকে। দেবেশ্বর তখন লম্বা ছিপছিপে অসাধারণ সুন্দর কিশোর। লজ্জিত হয়ে তিনি সকলকে নমস্কার ক'রে চেয়ারে বসে, আসরের নায়িকার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

—এ কে? এ কে? এ কে?

হঠাৎ গায়িকা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সেই আসরের উপরই আছাড় খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

দুদিন পর একজন লোক এসে একখানা চিঠি দিয়ে গিয়েছিল দেবেশ্বর রায়কে। লিখেছিলেন—তাঁর ভিক্ষামাতার প্রেতিনী। তার প্রথম পত্রেই ছিল—বাবামণি আত্মহত্যা করিলে মানুষ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমিও প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি।

নিঃসন্তান কায়স্থ কন্যা, তোমার মুখ কেবলমাত্র মা হইবার সাধ মিটাইবার জন্য দেখি নাই, মৃত্যুর পর তোমার হাতের একটু জল পাইব এবং "রৌরব নরক হইতে মুক্তি পাইব বলিয়াও আশা করিয়াছিলাম।"

তারপর এই বিবরণ। বিস্তৃতভাবে তিনি লিখেছিলেন, কোন কথা গোপন করেন নি। লিখেছিলেন—"দোষ আমার আমি তাঁহার রূপেগুণে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার চরণে আপনাকে বিকাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি ফিরাইয়া দিলেই পলাইয়া আসিতাম এবং দূর হইতে তাঁহাকে ভালবাসিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিতাম। কিন্তু তিনি আমাকে পদাঘাতে দূর করিলেন। দেশের ও দশের সম্মুখে অপমানিত করিলেন। তাহা আমার সহ্য হয় নাই। আমি বৃন্দাবন হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলাম আগ্রা। আমার রূপ ছিল এবং গানের গলা ছিল, তাহার সহিত সঞ্চিত কিছু গোপন অর্থ ছিল, আগ্রায় আসিয়া গান শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, তোমার পিতার সহিত এইভাবে একদিন সাক্ষাৎ করিব আশা করিয়া। কিন্তু আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার গোপাল, তুমি আমার মুক্তিদাতা ব্রহ্মচারী, এই পাপিনীর বেশে দেখা হইল তোমার সঙ্গে।"

রাঙাপিসী, এই পত্র পাইয়া আমি তিন দিন ক্রন্দন করিয়াছিলাম। গোপালদাদাকে পাঠাইয়া তাঁহার সন্ধান লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম; দেখা করিয়াছিলাম হাওড়া স্টেশনে, তিনি এই বঙ্গদেশ হইতেই পলাইয়া যাইতেছেন। মা বলিয়া ডাকিয়াছিলাম। তিনি জোর করিয়া আমার পায়ের ধূলা লইয়াছিলেন। সেদিন তিনি আমাকে টাকাও দিতে চাহিয়াছিলেন। একটা ভারী হাতবাক্স লইয়া বলিয়াছিলেন—এইটি তুমি লও।

কিন্তু রায়বংশের দেবেশ্বর তাহা লয় নাই। পিসী, সেদিন যদি বাক্সটা লইতাম, তবে ভায়লেটকে লইয়া সংসার পাতিয়া ব্যবসা করিবার জন্য টাকা ঋণ চাহিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে হইত না। এবং ঠিক এইরূপ পরিণতিটা সম্ভবতঃ হইত না রাঙাপিসী, এই অল্পকালের জীবনে, এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে দেখিলাম অনেক, বুঝিলাম অনেক। স্বর্গ-নরকের হদিস পাই নাই, ভগবানকে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারি নাই। অবিশ্বাস, তাই বা করিতে পারিলাম কই? ধর্ম—যে ধর্ম তোমরা মানিয়া চল তাহাকে মানিতে পারি নাই। তাহাকে মানিতে পারি নাই বাবামহাশয়ের কার্যকলাপের জন্য। মানুষটা পাথর, মানুষটা পাথর! রাঙাপিসী, এই পাথরে আমি মাথা ঠুকিয়া লড়াই করিয়াছি, রক্তাক্ত করিয়াছি মাথাটা। শুধু শেষ কালটায়—রাঙাপিসী—বুঝিতে পারিলাম না। দশদিন শ্রাদ্ধের সময় আসিতে পার নাই। অথবা ইচ্ছা করিয়াই আইস নাই। ছয় মাসে রায়বাহাদুরের উপযুক্ত শ্রাদ্ধ করিব। তুমি আইস।

কলিকাতায় থাকিয়াও তোমার সহিত দেখা করি না, তোমার বাড়ী যাই না, তাহার কারণ, অন্তে না-ঢিহ্নক আমি তোমাকে চিনি। আমি তোমাকে জানি। তুমি রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের যোগ্যা ভগ্নী। তুমি আমাকে মণ্ডপ বলিয়া ঘৃণা করিবে। আমি দেবতা মানি না, ধর্ম মানি না বলিয়া ঘৃণা করিবে। আরও অনেক কারণে ঘৃণা করিবে।

* * *

চিঠিখানার তারিখ ১৮৯৭ সাল। ১৮৯৬ সালে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় মারা গিয়েছিলেন। এগিয়ে এসে পড়েছি। ১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৯৬ সাল আঠারো বছর। এই আঠারো বছর রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় এবং দেবেশ্বর রায়ে নিষ্ঠুর সংগ্রাম চলেছে। এ সংগ্রাম একদিনের জন্ম থামে নি। রত্নেশ্বর রায় পুত্রকে চালাতে চেয়েছিলেন নিজের মতে, নিজের পথে।

সেদিন, মানে, যেদিন রত্নেশ্বর রায় বড় ছেলের অভিযোগের কথা শুনে, লক্ষ্মীর ঘর থেকে চোখের জলের সঙ্গে তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন, অঞ্জনার মেয়েকে আমি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম সংসারজীবনে, সমাজজীবনে। চেয়েছিলেন রেভারেণ্ড কালীমোহন ব্যানার্জি, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আনবেন। এদের মধ্যে ক্রীশ্চিয়ানিটি ভারতবর্ষের স্পর্শ পেয়েছিল, ক্রীশ্চিয়ানিটির সঙ্গে ভারতবর্ষের সাধনার ধারাটি যুক্ত হয়েছিল।

বাংলাদেশের রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে রয়েছে। আর যারা মেমসাহেব বিয়ে করে বা যে মেয়েরা সাহেব বিয়ে ক'রে ওই এলিয়ট রোড, কি খিদিরপুরে পাড়া ফেঁদেছে, যারা নাম পাল্টেছে, বুলি পাল্টেছে, তারাও রয়েছে স্থলতা। তাদের দৃষ্টান্ত সে-কালে আরও কটুভাবে প্রকট ছিল, তারা নিষ্ঠুর অবজ্ঞায় আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করত। তাই যে সম্পর্ক অঞ্জনা ছিঁড়ে চলে গিয়েছিল, সেই সম্পর্ক আবার নতুন করে গড়তে চেয়েছিলেন ভায়লেটকে দেশী ক্রীশ্চানসমাজে বিয়ে দিয়ে।

গোপালকে টাকাও দিয়েছিলেন। পাঁচ হাজার টাকাই দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন দেবশ্বরের হাত দিয়েই। তারপর করেছিলেন দেবেশ্বরের বিবাহের আয়োজন।

রাঙাপিসীর পছন্দ-করা ওই দশ পার হয়ে এগারোয় পা-দেওয়া পিতৃমাতৃহীনা মেয়েটির সঙ্গেই তার বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। মেয়েটির নাম উমা। মাথায় ছোটখাটো, তবে রূপসী বটে। তার সঙ্গে একটু—

থেমে গেল সুরেশ্বর। তারপর বললে—কি বলব স্থলতা? মানে ঠিক বিশেষণটি যেন খুঁজে পাচ্ছি না। প্রগল্‌ভা কথাটা ঠিক হবে না।

অর্চনা হেসে বললে—বড়ঠাকুমা, ছেলেবেলা দিদিমার আদরে অকালে একটু বেশী পেকেছিলেন।

—না, অকালপক্ক কথাটাও খাটবে না। না। বরং প্রিকোসাস বলতে পারা যায়।

—না সুরোদা, প্রিকোসাস শব্দটাও ভাল না, ঠিকও নয়। তার থেকে বরং অকাল-ভারিক্কি বা অকাল গিন্নীবান্নী ভাল। নিজের দিদিমার কাছ থেকে ওটাই শিখে এসেছিলেন। স্বামীর প্রেয়সী হওয়ার চেয়ে বাড়ীর গৃহিণী ছিলেন তিনি বেশী। বেলফুলের মালা গেঁথে

রাধাসুন্দরের এবং রাধারাণীর জন্য নিত্য পাঠাতেন। কিন্তু কোনদিন সন্ধ্যায় বেলকুঁড়ি মালী তুলে দিয়ে যেত, তা নিয়ে মালা গেঁথে নিজের খোঁপায় পরেন নি বা স্বামীকে পরাবার জন্যে আঁচলে লুকিয়ে নিয়ে যান নি।

—ঠিক বলেছিস অর্চি। এ কথাটা এমন ভাবে বলতে আমি কখনও পারতাম না রে! রাঙাপিসীকে যে চিঠি তিনি লিখেছিলেন ওই পিতৃশ্রাদ্ধের সময়, তাতে শ্রীউমার সম্বন্ধে লিখেছেন —"রাঙাপিসী, বয়স তখন ষোল পার হইয়া সতেরোতে পড়িয়াছি, একটি এগারো বছরে পা-দেওয়া কনেই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তখন প্রেম করিয়াছি ভায়লেটের সঙ্গে। সাদা-চামড়ার ক্রীশ্চান মেয়ে, গোয়া হইতে কলিকাতার ফিরিঙ্গীপাড়া হইয়া কীর্তিহাটের গোয়ানপাড়া ফেরত ভায়লেটের সঙ্গে প্রেম করিয়াছি যে উল্লাসের মধ্যে, যে নেশার মধ্যে, তাহা বিবাহিতা এই পত্নীর মধ্যে ছিল না। থাকিবার কথা নয়। তাহার উপর উমার ছিল প্রাচীনকালের মন। সে মনের কাছে আনন্দের চেয়ে পুণ্য ও ধর্মের মূল্য বেশী। ওই বয়সেই সে ব্রতের জন্য স্বচ্ছন্দে উপবাস করিতে পারিত। সারাটা দিনই প্রায় সে কীর্তিহাটের ঠাকুরদের অর্চনার আয়োজনে ব্যস্ত থাকিত, কিন্তু আমার সঙ্গে দুদণ্ড বসিয়া গল্প করিবার অথবা একটি বসন্তকালে পূর্ণিমারাত্রে মুখের দিকে চাহিয়া বসিবার অবকাশ বা আগ্রহ তাহার হয় নাই।

বলিলে বলিত, 'কেমন কথা তোমার? এ সবই তো তোমার জন্যই করি, না 'হরের মায়ের' জন্য করি। 'হরের-মা' কথাটা সে আজও ব্যবহার করে।

তাহার উপর রাঙাপিসী, বিবাহের পর কীর্তিহাটে ছিলাম এবং এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতায় আসিলাম। সর্বত্রই, একলা আমার উপর নহে, আমাদের উভয়ের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য কীর্তিহাটের সংসারটাই কলিকাতায় আসিল।

শিবেশ্বর রামেশ্বরকে লইয়া মাতাঠাকুরাণী আসিলেন। বাবামহাশয় পনের দিন থাকিতেন কীর্তিহাটে, পনের দিন থাকিতেন কলিকাতায়।

একদা একখানা দলিল তৈয়ারী করিয়া আমাকে বলিলেন—সহি কর।

দেখিলাম, এলিয়ট রোডের যে বাড়ীখানা আমি লিজ লইয়াছিলাম, সেখানার মালিকানি স্বত্ব কিনিয়া তিনি ওই বাটী ভায়লেটকে দান করিতেছেন। এবং জানিলাম—ভায়লেটের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে।

জবানবন্দী আমার শেষ হয়ে আসছে—সুরেশ্বর বললে।

ভায়লেটকে অনেক খেসারত দিয়ে, রত্নেশ্বর রায় দেবেশ্বরের সম্মুখ থেকে সরিয়েছিলেন বটে কিন্তু ভায়লেট তার নামে দেবেশ্বরের অন্তিম মুহূর্তে বিকারগ্রস্ত চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দেবেশ্বর রায় বিকারের ঝোঁকে বলেছিলেন, গোপালদা বের ক'রে দে, কেন আনলি ভায়লাকে—বের ক'রে দে! জোর করে বের ক'রে দে, আ, হাসছে দেখ! ইউ গেট আউট আই সে! শাট্ দ্য ডোর। ইউ শাট্ দ্য ডোর!

আমার ব্যাখ্যা কি জান? শ্যামাকান্তের প্রতি সেই মহাশক্তির রোষ। সেই রোষ ভায়লা

হয়ে এসেছিল তাঁর সামনে।

হঠাৎ চুপ করে গেল সুরেশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

সুলতা বললে—হঠাৎ এমন করে, এই যুগে, উনিশশো সালের পঞ্চাশ বছরের পর যখন এ্যাটমিক এজে মানুষ পা দিচ্ছে, তখন এইভাবে ব্যাখ্যা করছ কেন? তুমি তো রিএ্যাকশানারি ছিলে না, হঠাৎ এসব কি? না—এ সব তোমার আর্টের তুলির ছোপ?

অর্চনা মৃদু স্বরে বললে—মধ্যে মধ্যে এই রকম বলে ও—বংশের ঋণ শোধ করতে তুমি বাধ্য।

সুরেশ্বর বললে—নিশ্চয়ই তা বলতে পার তুমি। কিন্তু না। হয়তো বলার ঢঙটা আমার ঠিক হল না। হেরিডিটির থিয়োরি দিয়ে বললে বাহবা দিতে। তা ছাড়া আর একটা কারণ আছে, সেটা হল এই যে, দেবেশ্বর রায় নিজে এই কথাগুলো একরকম লিখে গেছেন মৃত্যুর দিনই। সে লেখা তোমাকে দেখাব আমি।

নইলে জীবনের শেষ বছরটা তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে যাপন করেছিলেন, জীবনে শান্তি খুঁজেছিলেন। প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন কেন, ভালবেসেছিলেন তাঁর উপেক্ষিতা স্ত্রীকে।

স্ত্রী তাঁর সে ভালবাসা নিতে চান নি। বিশ্বাস করেন নি। হয়তো নেবারও শক্তি তাঁর ছিল না, তখন তিনি নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করেছেন দেবতার পায়ে।

দেবেশ্বর তাতে দমেন নি। বলেছিলেন—আমি তোমাকে বিয়ে করেছি, আমাদের ডাইভোর্স নেই; আমার তোমার উপর অখণ্ড অধিকার। দেবতা হোক, দৈত্য হোক, যে হবে সে হোক, তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করে হয় মরব, নয় তোমায় ছিনিয়ে আনব।

এবং তা তিনি এনেছিলেন; পেরেছিলেন তিনি স্ত্রীকে তাঁর অভিমুখিনী করতে। ছেচল্লিশ বছর বয়সে মারা গিছলেন; তাঁর বয়স তখন ছেচল্লিশ, তাঁর স্ত্রীর বয়স চল্লিশ; বড়ছেলে—আমার জ্যাঠামশাইয়ের বয়স তখন সাতাশ, আমার বাবার বয়স পঁচিশ। তখন দেবেশ্বর রায় অহরহ চাইতেন স্ত্রীকে, বলতেন—জীবনে এত শান্তি আছে তা জানতাম না।

আমার ঠাকুমা উমা দেবী বসে হাসতেন।

হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গিয়ে দেবেশ্বর চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, স্ত্রী শঙ্কিত হয়ে উঠে প্রশ্ন করত—কি হল? এ্যাঁ।

দেবেশ্বর বলতেন—এই জীবনেই সব শেষ? তোমাকে আর পাব না? এত ভালবাসা এত প্রেম সব শেষ এই কটা দিনেই?

স্ত্রী বলতেন—শেষ কেন হবে? শেষের মধ্যে অশেষ যিনি, ওই মা—ওঁকে ডাক, ওঁর দয়া হলে, শেষের পরেও আছে।

দেবেশ্বর বলতেন—না। ম্লান বিষণ্ণ হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন—meaningless, life is meaningless উমা!

চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়াতো। তাঁর স্ত্রী হাঁপিয়ে উঠতেন, তিনি নিজে এর উত্তর

জানতেন নিজের বিশ্বাসবোধে, কিন্তু তা বিশ্বাস করাবার ক্ষমতা তো তাঁর ছিল না। তাও দেবেশ্বর রায়কে।

তিনি নাস্তিক ছিলেন চিরজীবন। তিনি মৃত্যুর দিন এই কথাগুলো লিখে গিয়েছেন। "শ্যামাকান্ত মহাশক্তির যে রোষবহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই বহ্নির ক্ষুধার তৃপ্তি আজও হয় নাই। বাবামহাশয় ইহার দহন হইতে বাঁচিয়াছিলেন নিজের পুণ্যে। তবু তাঁহার বুকে নাগিনীর ছোবলের মত ছোবল সে দিয়াছিল কিন্তু দংশন করিতে পারে নাই। আমাকে সে ছাড়িল না, আমি মরিলাম।"

আরও অনেক কথা। যথাসময়ে বলব। এখন হারানো ক্রমটা খুঁজে নিয়ে বলি।

বিয়ের পর সরস্বতী বউরাণী, তিন ছেলে এবং বউকে নিয়ে এসে পাকা হয়ে বসেছিলেন জানবাজারের বাড়ীতে।

দেবেশ্বর ফার্স্ট ডিভিশনে এন্ট্রান্স পাস ক'রে প্রেসিডেন্সীতে এফ. এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন; শিবেশ্বর রামেশ্বর এঁরা তখন একজন চৌদ্দ বছরের, একজন এগার বছরের। কালের বয়স বাড়ে কিনা জানিনে। তবে আমাদের বাড়ে বলে হিসেব একটা রাখি। ১৮৮০ সাল পার হয়েছে। বাংলাদেশের জীবনসমুদ্রে পূর্ণিমার জোয়ার জেগেছে। ইংলিশ চ্যানেলের, মেডিটেরিয়ানের উত্তর কূল ঘেঁষা জোয়ারের সাদা ফেনা মাথায় করে যে ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়ে আমাদের ঘরদোরের সব কিছু ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছিল, আমাদের জীবন-সমুদ্রের ঢেউ সে ঢেউগুলোকে রুখে দিয়েছে। নতুন ব্রাহ্মধর্মের যুক্তিবাদী ধর্ম আর জীবনের প্রসার তখন তাতে আশ্চর্য জোর দিয়েছে। দু'চারজন মুসলমানও নাকি ব্রাহ্ম হয়েছিলেন তখন। ওদিকে দক্ষিণেশ্বরে কলরোল উঠছে। এরই মধ্যে নতুন বিয়ে করে দেবেশ্বর রায় প্রথম দুটো বছর শুধু পড়া আর নতুন বউকে নিয়ে মশগুল হতে চেয়েছিলেন। বউকে জীবন ভ'রে পাওয়া সহজ হয় নি, পান নি; কলকাতায় জানবাজারে বাড়ী হলেও এখানেও কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর চালচলনের এতটুকু এদিক ওদিক হয় নি। বউ সেই নিয়মানুসারে উঠত ভোরবেলা, অন্ধকার থাকতে। এবং নিজের ঝিকে ডেকে নিয়ে (ডাকতে অবশ্য হত না—ঝি উঠে বসেই থাকত) প্রাতঃকৃত্য থেকে স্নান পর্যন্ত সেরে নিয়ে শাশুড়ীর কাছে এসে দাঁড়াতেন, শাশুড়ী বধূকে ভাবীকালের রায়গৃহিণীর ছাঁচে ঢেলে তৈরী করতেন। রান্নাবান্না কি হবে—থেকে শুরু ক'রে, ঝি-চাকরের খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত সব কিছুর উপর দৃষ্টি রাখাই গৃহিণীত্ব। সেই দৃষ্টিই তিনি দিতেন। শ্বশুর এলে তাঁর সেবা এবং তাঁর উপদেশ শোনা ছিল অন্যতম কর্তব্য। এবং তার সঙ্গে আর একটা কর্তব্য ছিল, সেটি গভীর রাত্রিতে শেষবার ঘরে যাবার পূর্ব পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে দেখা না-করা।

প্রথম স্ত্রী যতদিন নিতান্ত বালিকা ছিলেন, ততদিন দেবেশ্বর এটা মেনেছিলেন, তিনি বই নিয়ে পড়ে থাকতেন। বই, বই, বই; পড়া পড়া পড়া! তাঁকেও তখন ছাঁচে ঢালাই চলছে। অথবা নিজেই তিনি নিজেকে গড়ছেন। রায়বংশের আভিজাত্যের ইতিহাসে দেবেশ্বর শ্রেষ্ঠ অভিজাত। চলন ছিল ধীর, কিন্তু দীর্ঘদেহ দেবেশ্বরের পদক্ষেপ ছিল দীর্ঘ। বেশে-ভূষায় শুভ্রতার মহিমা ছিল অক্ষুণ্ণ, অমলিন। কণ্ঠ ছিল গম্ভীর কিন্তু স্বর ছিল মৃদু। পাতলা গোঁফ তখন

বেরুচ্ছে, তা তিনি মোম দিয়ে মেজে সুচালো করতে চাচ্ছেন। গায়ে আতরের গন্ধ থাকত অহরহ। দৃষ্টি ছিল তির্যক, কথা বলতেন বেঁকিয়ে, ঠোঁট দুটিও একটু বেঁকত। নমস্কার করতেন সর্বাগ্রে। ঘৃণা করে তাকালে, যার দিকে তাকাতেন সে যেন মনে মনে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এই দেবেশ্বর রায়—তখন তিনি ১৮।১৯ বছরের নবযুবক, তিনি এই বালিকা স্ত্রীর জন্ম জেগে বসে থাকতেন। বই হাতে। বালিকাবধূ আসত পায়ের তোড়া বাজিয়ে, ঝুম ঝুম শব্দ তুলে। হাতে থাকত পান, নিজের হাতে সাজা। এও তাঁকে শিখিয়েছিলেন তাঁর দিদিমা এবং তাঁর শাশুড়ী। দেবেশ্বর পান দু-খিলি খেয়ে বলতেন—"মালা গাঁথতে পার না? বেলফুলের এত কুঁড়ি!"

বালিকাবধূ শিউরে উঠে বলতেন—বাবা গো, ফুলে পুজো হয়, মা পুজো করেন—

—মা তো এত ফুল নিয়ে পুজো করেন না। ফুল তো গাছেই বাসী হয়।

—তা হোক। কি মনে করবেন বল তো!

এই বলতে বলতেই বালিকাবধূ ঢুলতে আরম্ভ করতেন। এবং আর কয়েক মিনিটের মধ্যে স্বামীর বুকে বা কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে যেতেন।

এইভাবে দু বছর কাটল। বালিকাবধূ কিশোরী হল। "ত্রয়োদশ বসন্তের মালা।" দেবেশ্বর এফ-এ পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে পাস করলেন! দেবেশ্বর প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। এবং বধূর কোলে এল প্রথম সন্তান।

এরই মধ্যে হঠাৎ এল সংঘাত। হঠাৎ সরস্বতী বউরাণী মারা গেলেন। সেই শ্রাদ্ধে শ্যামনগর থেকে কীর্তিহাটের এল ঠাকুরদাস পাল। ঠাকুরদাসের সঙ্গে আর একবার ছিন্ন প্রীতির বন্ধন জোড়া লেগেছিল, দেবেশ্বর রায়ের বিয়ের সময়। সুখী হয়েছিলেন রত্নেশ্বর। সব ভার দিয়েছিলেন ঠাকুরদাসকে। গোপালও এসেছিল বিয়েতে। কিন্তু সে কীর্তিহাট যায় নি। যায় নি গোয়ানদের জন্ম। এবার এল এই শ্রাদ্ধে। তখন সে সেই পাঁচ হাজার টাকা মূলধনে ব্যবসা শুরু ক'রে বিশ-ত্রিশ হাজারের মালিক হয়েছে। হঠাৎ শ্রাদ্ধের পরেই ঠাকুরদাস খুন হয়ে গেল। বচসা করতে করতে পিক্র গোয়ান তার পেটটা ফেড়ে দিলে।

সুরেশ্বর বললে—তার গূঢ় কারণটা রায়বাহাদুরের ডায়রীতে পাই নি সুলতা। পেয়েছি দেবেশ্বর রায় যে চিঠি লিখেছিলেন রাঙা পিসীকে, তার মধ্যে।

"ঠাকুরদাস জ্যাঠামশাই খুন হইলেন; সে খুনের হেতু কে, আমি অথবা গোপালদা তাহা আজও বুঝিতে পারি নাই। তবে খুন পিক্র করিলেও তাহা করাইল কে, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে নাই।"

গোপাল ঘোষ একটা অন্যায় করেছিলেন। দেবেশ্বরও তার ভাগী ছিলেন। গোপাল ঘোষ তখন বিশ-ত্রিশ হাজার টাকার মালিকই হন নি, তিনি তখন ব্রাহ্ম হয়েছেন। একটি মেয়েকে ভালবেসে তাকে বিয়ে করবার জন্ম ব্রাহ্ম হয়েছেন। সে কথাটা তিনি বলেন নি। এবং দেবেশ্বর সেটা জানতেন, তিনিও সেটা বলেন নি। কথাটা হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ল।

রত্নেশ্বর রায় প্রাচীনপন্থী, তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। সে ক্ষোভ তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ। তিনি প্রথম দেবেশ্বরকেই বলেছিলেন—তুমি জান যখন, তখন আমাকে বল নি কেন?

দেবেশ্বর বলেছিলেন—কেন বাবা, গোপালদা এখানে তো ব্রাহ্ম হয়েছে বলে মাথাও উঁচু করে নি। ব্রাহ্মণদের সঙ্গেও খায় নি, খেতেও চায় নি; যেখানে থাকতে দিয়েছেন থেকেছে। কারুর অসম্মানও করে নি।

রায়বাহাদুর বলেছিলেন—সে সদ্‌গোপ হয়ে বৈশ্যকন্যা বিবাহ করেছে। এ-অধর্ম। এর সাজা দেব আমি।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—তার আগে আমাকে সাজা দিতে হবে। কারণ এতে আমি মত দিয়েছিলাম। কাউকে জানাতে বারণ করেছিলাম। এবং এ শ্রাদ্ধেও তাকে আমি আসতে বলেছি বলেই সাহস করে সে এসেছে। বলেই তিনি চলে গিয়েছিলেন, অন্দরে নিজের ঘরে।

দেবেশ্বর লিখেছেন—"বাবা মহাশয়ের আসল ক্রোধটা গোপালদাদার উপর, সে ব্রাহ্ম হইবে কেন? ব্রাহ্মধর্মের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সে তুমি অবগত আছ। আমার উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন—তোমার স্পর্ধা, তুমি এমন কথা বলিতেছ। শাস্ত্রের তুমি কি জান? আমি বলিলাম—কিছুই জানিতে চাহি না। তবে গোপালদাদা কোন অন্যায় করিয়াছে, যে শাস্ত্রে বলিবে, আমি মানিতে পারিব না। তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন। ইহার পরই পিক্র আসিয়া তাঁহার কাছে গোপালদাদার বিরুদ্ধে নালিশ করিল। ভায়লেটকে সে গোয়ানপাড়া হইতে তিন বৎসর পূর্বে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে।"

ঠাকুরদাস ছুটে এসেছিল। তার আগে রটে গেছে যে, পিক্র নালিশ করেছে, গোপালের নামে। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তুই বসে দেখ ঠাকুরদাস। আমার বিচারে বাধা দিস নে। আমি অন্যায় বিচার করব না।

ঠাকুরদাস চিনতেন তার দাদাঠাকুরটিকে, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, তার মানে? গোপাল আমাকে বলেছে, তুমি দেবুবাবুর উপর ক্ষেপেছ। দেখ, তুমি গোপালকে সাজা দাও-দাও, আমি তাকে সাজা দেব, ত্যাজ্যপুত্র করব।

—আমিও দেবেশ্বরকে তাই করব। সম্পত্তি সব দেব বউমাকে। তারও জাত গিয়েছে।

—দাদাঠাকুর! এ সব তুমি কর না।

—না করে আমি পারি না। ধর্মের অপমান হয়েছে, পিক্র নালিশ করেছে।

—ধম্ম-অধম্ম বুঝি না। দেবুবাবা গুলি খেয়ে মরতে চেয়েছিল। প্রাশ্চিত্তির তার হয়ে গিয়েছে। গোপালকে তুমি তখন পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছ। কেন দিয়েছিলে! আর পিক্র? ওকে তুমি শুধোও দিকি, ওর বোনের বিচার কে করবে? সে তো তোমার দেওয়া বাড়ীতে তোমার টাকায় ধেই-ধেই করে নাচছে! বেশ্যে—

পিক্র চিৎকার করে উঠেছিল—ঝুটা বাত। মু সামাল করনা—

—যাঃ বেটা গোয়ান। চেঁচাসনে মেলা।

ধমক দিয়েছিলেন এবার রত্নেশ্বর—ঠা—কু-র-দাস!

—দাদাঠাকুর কার বিচার করবে? বল তো? তোমার বাবা, তার বাবা, তোমার মায়ের বাবা।

—দারোয়ান! দরওয়াজা সব বন্ধ কর, দারোয়ান। ঠাকুরদাস, কি বলছিস! আস্তে

বল। আস্তে।

গলা নামিয়েই বলেছিল ঠাকুরদাস—কিন্তু নিচু গলা হলেও খুব শক্ত গলায় বলেছিল—দেবুবাবাকে নিয়ে যদি কিছু কর—আমি জানি, তুমি পার, সব পার, যে শ্যামনগরকে বাঁচাতে তুমি মরতে গিয়েছিলে, সেই শ্যামনগরের মানুষের টুঁটিতে পা দিয়ে তুমি টাকা বার ক'রে সেই টাকায় ইস্কুল করে দিলে। তুমি সব পার। কিন্তু এ কাজ করলে আমি গাঁয়ে-গাঁয়ে বলে বেড়াব ঢাক বাজিয়ে,—শুধাও তোমাদের জমিদার রত্নেশ্বর রায়কে—, তার মায়ের বাবার নাম কি? জমিদারের আসল মা কে? আসল বাবা কে? তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢেকেছ? উল্টে দেব শাকের ঢাকা। বলব, শুধাও ভায়লা কার বিটি? ওর বাবা যে হোক, মাটা কে?

মনে মনে চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু তার প্রকাশ বাইরে কিছু হয় নি। শুধু বলেছিলেন—চেঁচাস নে ঠাকুরদাস, চেঁচাস নে। যা বলবি আস্তে বল।

ঠাকুরদাস ভেবেছিল, সে জিতেছে। সে আরও স্ফীত হয়ে বলেছিল—আমি সব জানি, তোমাদের ভাই-বুনের ঝগড়ার সময়, যেদিন অন্নপূর্ণাদিদিকে সব কথা বলে চিঠিপত্তর পড়ে শোনাও, সেদিন আমি সব শুনেছি। ওসব কথা তুমি ছাড়ান দাও। দেবুবাবা বড়লোকের ছেলে, তার ওপর এই তোমাদের বংশাবলীর ধারা। একটা শাপ-শাপান্ত আছে। এক পুরুষে তা ক্ষয় না দাদাঠাকুর। অনেক পুরুষ লাগে। আর এ তো একটা ওই জাতের ছুঁড়ি। নিজেদের ভেতরেই দশজনার সঙ্গে রসের খেল্ খেলে, শেষে একজনাকে বিয়ে করে। আজ বিয়ে করে, কালকে ছাড়ে, আবার আর একজনাকে ধরে।

পিক্রু লাফ দিয়ে উঠেছিল আবার—হুজুর!

হুজুর তখন পিক্রুর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন।

হুজুর বলেছিলেন—আমার ছেলের বিচার আমি করতে পারি পিক্রু, কিন্তু ঠাকুরদাসের ছেলের বিচার আমি করতে পারব না।

—ঠাকুরদাস কি বলছে, তার বিচার কর।

—তাও পারব না।

—তবে আমি নিজ জোর সে শোধ নিয়ে লেবে।—

—সে কথা ওকে বল। বোঝাপড়া কর।—

বাস। সঙ্গে সঙ্গে পিক্রু ঠাকুরদাসের টুঁটি চেপে ধরেছিল। ঠাকুরদাস চমকে উঠে গলা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে বলেছিল—আয় শালা—আয়, বাইরে আয়। তুই গোয়ান, আমি গোপ। আয়!

তারপর, ওই কংসাবতীর ঘাটে—।

* * *

সুরেশ্বর চুপ করলে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরিয়ে উঠে গিয়ে দাঁড়ালে একখানা ছবির সামনে।

দেবেশ্বর রায় আর উমা দেবী—তাঁর স্ত্রীর ছবি। ছবিখানায় দুজনের মধ্যে যেন একটা

পাতলা কালো যবনিকার আড়াল পড়ে আছে। সুলতার মনে হল, যেন একটা মূর্তি। নারী-মূর্তি।

সুরেশ্বর ছবিখানা দেখতে দেখতে বললে, দেবেশ্বর রায় সেই দিনই রাত্রে গোপালকে নিয়ে পায়ে হেঁটে চলে এসেছিলেন কীর্তিহাট থেকে। কীর্তিহাট থেকে কলকাতায়। শুধু স্ত্রীকে বলেছিলেন—চল আমার সঙ্গে।

স্ত্রী বলেছিলেন—আমি রায়বাড়ীর বউ, শ্বশুরের অনুমতি না নিয়ে যেতে পারব না।

ব্যাস, সেই অবধি এই আড়াল রয়ে গেল। ধর্ম, দেবতা, রায়বংশের লালসা যা বলবে বলতে পার।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে।

সে ছবিখানার সামনে থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল আর একখানা ছবির সামনে। এ ছবিখানা তার নামকরা ছবি। Indian Madona। একটি কালো মেয়ের কোলে একটি ছেলে। তার পিছনে যে রঙের ব্যাকগ্রাউণ্ড তাতে একটা ক্রুশের ছায়া পড়েছে।

সুলতা বললে—ও ছবিটা তো—?

অর্চনা বললে—হ্যাঁ, কুইনীর ছবি।

ঘড়িতে ঢং-ঢং-ঢং শব্দে তিনটে বাজল। সুরেশ্বর ছবিখানার ধার থেকে সরে এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে জানালা খুলে দিলে। পূর্ব-আকাশে শুকতারাকে দেখা যাচ্ছে।

সুরেশ্বর বললে—রাত্রির তৃতীয় প্রহর পার হল। চতুর্থ প্রহরের সঙ্গে সঙ্গেই আমার জবানবন্দী শেষ হবে। কাল থেকে সাধারণ মানুষ সুরেশ্বর রায়। কীর্তিহাটের জমিদার বংশের সন্তান নয়। কাঠগড়ার ভেতর থেকে বেকসুর খালাসের রায় নিয়ে বেরিয়ে আসব।

জ্বলন্ত সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিলে সে। তারপর বললে—অর্চনা আছিস ভালই হয়েছে। অসঙ্কোচে এক গ্লাস হুইস্কী খেতে পারি। তুই না থাকলে আমার সঙ্কোচ হত। সুলতা, নতুন কালের মেয়ে, রাজনৈতিক চেতনাও প্রখর, কিন্তু তবু Indian moral code খানা ওর কাছে পুরনো হয় নি। ও আমাকে বলেছে খেতে, কিন্তু তা আমি পারি নি। ভাবছিলাম, আর খাবই না। কোন দিনই না। কেননা জমিদারী যখন উঠে গেল, তখন রায়বংশের শেষ অভিজাত পুরুষ হিসেবে মদটা আমার ছেড়েই দেওয়া উচিত। তাতে যদি এবার বেণীর সঙ্গে মাথাটাও যায় তো যাক। এর আগে বহুবার ছেড়েছি, আবার ধরেছি। এবার আর না। সুতরাং শেষ গ্লাসটা খেয়ে নিই। রায়বংশের সাতপুরুষের মধ্যে কুড়ারাম রায় থেকে বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায় পর্যন্ত সবটাই বলেছি। এদিকে আমার খানিকটা এবং আমার বাবার সবটাই সকলের জানা। দেবেশ্বর রায়ের কথা বলছি। মদের গ্লাস হাতে না করে দেবেশ্বর রায়ের কথা বলা যায় না।

সুলতা হেসে বললে—কেন অকারণে তাঁর দোহাই পাড়ছ সুরেশ্বর? তুমি তো নিজে আর্টিস্ট। আর্টের দোহাই দিয়ে নিশ্চয় খেতে পার। লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, অধ্যাপক, ছাত্র এমন কি করেন প্রবাসী কনস্যুলেটে অনেক খদ্দরধারীকেও এ পদার্থ পান করতে দেখা যায়। মন্ত্রীটন্ত্রী যাঁরা, তাঁরা এদেশে যাই করুন, বিদেশে গিয়ে কি করেন বা বাড়ীতে কি করেন, তা

হলপ করে কেউই বলতে পারবে না। স্বাধীনতা আমার পরও যদি মদ খাওয়ার স্বাধীনতা না থাকে তবে সে স্বাধীনতার মূল্য কি বল?

একটু দূরে সেরাজের মাথার উপর রঘু বোতল-গ্লাস-সোডা সব রেখে গিয়েছিল। সুরেশ্বর উঠে গিয়ে খানিকটা হুইস্কী গ্লাসে ঢেলে সোডা মিশিয়ে একটু চুমুক দিয়ে বললে—কুড়ারাম রায় ভটচাজ নবাবী আমলে কারণ করতেন মায় নাম নিয়ে; সোমেশ্বর রায় মদও খেতেন, কারণও করতেন, বীরেশ্বর রায় ইংরেজদের এদেশী নবাবীধরনে মগুপান করতে শুরু করে শেষে উন্মাদের মত খেয়েছেন। ওদিকে শ্যামাকান্ত ভ্রষ্ট তান্ত্রিক—ছিলেন রত্নেশ্বরের মাতৃবংশে। তাঁর বাপও ছিলেন তান্ত্রিক। মগুপান তিনিও করতেন। এতে প্রথম ছেদ টেনেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। শ্যামাকান্তের পুত্রের দিকে বংশধারা বিমলাকান্তে শেষ। পূর্ণচ্ছেদ। কিন্তু রায়বংশে রত্নেশ্বরের পর আবার দেবেশ্বর এসে শুরু করলেন মগুপান। এবং রায়বংশে তিনিই প্রথম রায় অ্যারিস্টোক্র্যাট, যিনি খাঁটি মডার্ন ধরনে, মানে ইংরিজী ধরনে, ইংরেজের মত, খাঁটি বিলিতী মদ খেতে ধরেছিলেন।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে সে বললে—এবং নির্ভীকভাবে খেতে ধরলেন।

কলকাতায় ফিরে এসেই মদ ধরলেন, ফের প্রকাশ্যভাবে।

ওদিকে রত্নেশ্বর রায় পরের দিন সকালে ছেলের খবর শুনলেন। ছেলে চলে গিয়েছে রাত্রে গোপালকে নিয়ে। খবরটা বললেন পুত্রবধূ। নতমুখে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন। নিজে থেকে নয়, ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন শ্বশুর।

রত্নেশ্বর রায় বললেন—তুমি চলে যাও শিবেশ্বর রামেশ্বরকে নিয়ে।

বধূ নতমুখে বললে—আপনাকে ফেলে যাব কেমন করে? মা নেই!

রত্নেশ্বরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসেছিল। বলেছিলেন—তাহলে এখানেই থাক। সম্পত্তি আমি সব তোমার নামে দিয়ে যাব।

বধূ বললে—না।

—বেশ। যে নেবার তাকেই দেব আমি। আমার পৌত্রকে দেব।

অর্থাৎ দেবেশ্বরের প্রথম সন্তান। রত্নেশ্বর ছেলেকে চিঠি লিখলেন, তার কোন উত্তর পেলেন না। পেলেন নোটিশ ধরনের একখানা চিঠি।

"আমার ভিক্ষামায়ের সম্পত্তি আমাকে দিতে আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি।"

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন রত্নেশ্বর রায়। জানালেন, "দলিলের নকল পাঠাইলাম, দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, না পার, আইনজ্ঞ সলিসিটার এটর্নীর বাড়ী গিয়া পরামর্শ লইবে যে, ঐ সম্পত্তি কৃষ্ণভামিনী দাসী রাধাসুন্দরের নামে দেবোত্তর করিয়া ওই দেবোত্তরের ট্রাস্টি করিয়া গিয়াছে সরস্বতী বধূরাণীকে; এবং এই দেবোত্তর সম্পত্তির পত্তনীদার হইতেছেন বিমলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং দরপত্তনীদার হইতেছেন ব্যক্তিগতভাবে রত্নেশ্বর রায়। এ সম্পত্তি কৃষ্ণভামিনী তোমাকে দেন নাই বা দিতে চাহেন নাই।"

এখানেই শেষ করেন নি, সঙ্গে পুত্রবধূ এবং শিবেশ্বর রামেশ্বরকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন দেবেশ্বরকে শান্ত এবং ক্ষান্ত করবার জন্ত। সঙ্গে নিজে এসেছিলেন। ছেলে হেসেছিল।

রত্নেশ্বর পৌঁচেছিলেন অপরাহ্ন বেলায়, তখন সবে কলেজ থেকে ফিরছেন দেবেশ্বর। দেবেশ্বর কিছু বলেন নি, হেসেছিলেন।

বাপ সে হাসির অর্থ বোঝেন নি সেদিন। খেতে বসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছ?

ছেলে উত্তর দেন নি।

বাপ বলেছিলেন—হঠাৎ সম্পত্তির এমন কি প্রয়োজন হল? আমার থেকে পৃথক হতে চাও? স্বাধীনতা?

ছেলে এবারও উত্তর দেন নি। নিরুত্তর পুত্রকে পরাজিত ভেবে পিতা বিজয়ী বীরের মত কীর্তিহাট ফিরেছিলেন। ভার দিয়ে গিয়েছিলেন পুত্রবধূকে।

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—তোমাকে বোধ হয় বলি নি সুলতা এবং তুমিও জান না যে, ঠাকুমা আমার আজও জীবিত। উন্মাদ বলে ডাক্তারেরা। সংস্কৃত দিবারাত্রি শুধু জপই করে যান। কারুর সঙ্গে কথা না, বার্তা না, ডাকলে সাড়া দেন না, আপন মনেই আছেন ঠাকুর নিয়ে। কাউকে যেন চিনতেও পারেন না। চিঠি গেলে পড়েন না, ফেলে দেন। নিজের নাম, পরিচয় সব ভুলে গেছেন। প্রথম কিছুদিন বহরমপুরে রাখা হয়েছিল, তখন এ্যাসাইলাম ছিল ওখানে। তখন আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন। শুধু জপ করতেন আর চীৎকার করতেন—মুক্তি দাও মুক্তি দাও মুক্তি দাও। তারপর ভায়লেণ্ট হয়ে গেলেন। কপাল ঠুকতেন দেওয়ালে। তখন তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বৃন্দাবনে বাড়ী কিনে রাখা হয়। সেখানেই আছেন। বলেন—তপস্যা করছি। স্বামীর মুক্তির জন্ম তপস্যা করছি। নিজের সন্তানদের মুখ দেখেন না। গেলে ক্ষেপে যেতেন শুনেছি। নিজের মনে বেশ থাকেন। তপস্যা করছেন।

আমার ইচ্ছে আছে, আমি এই সব ঋণ শোধ করে একবার যাব। তাঁর সঙ্গে দেখা করব। সম্ভবতঃ আমাকে পরিচয় দিতে হবে না, দেখলেই চিনতে পারবেন। তাঁকে বলব—দাদুর সব দেনা শোধ করেছি আমি। মেজদি এখন সেই বাড়ীতেই থাকেন, অন্যদিকে। এই অর্চনা গিয়েছিল। আমার বাবার মৃত্যু তিনি জানেন না, মায়ের মৃত্যু জানেন না, হয়তো বিয়ের কথাও জানেন না। তবুও আমাকে চিনবেন তিনি। দেবেশ্বর রায়কে তিনি নিশ্চয় ভুলে যান নি।

অর্চনা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

সুরেশ্বর বললে—ইম্পসিবল্।—

একটু পর আবার আরম্ভ করলে—সুলতা, পিতাপুত্রের সে এক আশ্চর্য যুদ্ধ! চিঠিগুলো পড়লে অবাক হয়ে যাবে। কারণ যুদ্ধ হয়েছে শুধু চিঠিতে। যা চিঠিতে হয় নি—এমনি হয়েছে, তা আছে অন্নপূর্ণা-মাকে লেখা চিঠিতে। দেবেশ্বর রায়ের জবানীতে বলা।

* * *

বাপ ছেলেকে শাসিয়ে চলে গেলেন বিজয়গৌরবে। ভাবলেন, ছেলে নিশ্চয় বুঝেছে। কিন্তু দেবেশ্বর ভয়ে বুঝবার মত ছেলে ছিলেন না। রত্নেশ্বর রায় নিজের যৌবনকালটা ভুলে

যান নি, তবে তিনি কথায় কথায় বলতেন—আমার সঙ্গে তোমাদের তুলনা ক'র না। আমি গরীবের ছেলে হিসেবে মানুষ হয়েছিলাম। দেবেশ্বরের প্রেমের কথাটাও স্মরণ করিয়ে দিতেন ইঙ্গিতে, বলতেন—জীবনের প্রথম থেকে ধর্মাচরণের আর ব্রহ্মচর্যের তেজ ছিল আমাদের। যা তোমাদের নেই। তোমরা সাহেব হতে চলেছ।

দেবেশ্বর এর উত্তর দিলেন কাজে।

পড়া ছেড়ে দিলেন। চাকরির খোঁজে বের হলেন। নিজের পায়ে দাঁড়াবেন। নিজের জীবন, নিজের ভবিষ্যৎ, তার সঙ্গে হয়তো জগৎটাকেই নিজের ছাঁচে ফেলে গড়ে নেবেন বলে কল্পনা করেছিলেন।

সুন্দর সুপুরুষ দেবেশ্বরের রূপের কথা বলেছি। তার সঙ্গে ছিল বাকপটুতা, শীলতার ভদ্রতার সম্ভ্রমে, ফলে আনত তরুণ গাছের মত—আবার প্রয়োজন হলে, বক্রতায় বাঁকা তলোয়ারের মত—ধারে ক্ষুরের মত। চলে গেলেন মেদিনীপুর, জমিদারী কোম্পানীর আপিসে। কীর্তিহাটের পরিচয়টা সেখানে সুবিদিত ছিল। চাকরি সহজেই মিলেছিল এবং ভাল চাকরিই মিলেছিল। মাইনেও ভালই দিয়েছিল। জেনারেল ম্যানেজার খুব খুশী হয়েছিল তাঁর কথায়। কীর্তিহাটের রায়বাহাদুরের ছেলে চাকরি চায় শুনে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—তুমি চাকরি করবে? কেন?

—আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজে গড়তে চাই। বাপের পয়সায় বড়লোক হয়ে সুখ আছে, গৌরব নেই। একটা লাকের কথা, একটা হল নিজের শক্তির কথা।

খুব খুশী হয়ে সাহেব তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—এ কথা তো ইণ্ডিয়ানদের মুখে শুনি না! তারা তো লাক্‌কেই সব বলে মানে।

—আমি মানিনে। তা ছাড়া—।

—কি? বল!

—টিরানী (tyranny) আমি পছন্দ করি না, টাইর‍্যাণ্ট হতে আমি চাইনে।

—মানে?

—জমিদারী মানেই tyranny—আমার বাবাকে আমি দেখেছি। যদিও তিনি আইনের পথ ছাড়া হাঁটেন না তবুও তা আইনসম্মত হলেও অত্যন্ত নির্মম নিষ্ঠুর।

—আমাদেরও তো জমিদারীর কাজ।

—আমি আপনার কাছে এসেছি জমিদারীর কাজের জন্য নয়। আপনি কোন Industrial firm-এ আমাকে ঢুকিয়ে দিন। সেখানে আমার পথ আমি করে নেব।

তাই হয়েছিল। সাহেব তাঁকে নিজে সঙ্গে করে বড় সাহেবী ফার্মে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কয়লার খনি, অভ্রের খনির মস্তবড় কারবার। সেখানে জমি-জায়গার স্বত্ব পরীক্ষার কাজ দিয়েছিল তারা। প্রথমেই মাইনে দিয়েছিল একশো পঁচিশ টাকা।

চাকরি নিয়ে, প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে বাড়ী ভাড়া করে স্ত্রীকে বলেছিলেন—চল, এ বাড়ী থেকে চলে যাব আমি। নতুন বাড়ী ভাড়া করেছি।

স্ত্রী জানতেন না যে স্বামী পড়া ছেড়ে চাকরি করছেন। কারণ দশটাতেই বেরিয়ে যেতেন ফিরতেন চারটেতে। ভাইয়াও জানতে পারে নি।

অবাক হয়ে গেলেন স্ত্রী। বললেন—সে কি ?

—হ্যাঁ। আমি চাকরি করছি। বাড়ী ভাড়া করেছি। এ বাড়ীতে আমি থাকব না। আমার সঙ্গে যাও তো চল। নয়তো আমি একলাই যাব। পরের কথা পরে হবে।

স্ত্রী বুঝলেন। তখনকার কালে মেয়েরা একালের মেয়েদের থেকে অনেক অল্পবয়সেই অনেক বেশী বুঝত। তিনি কথাটার মানে বুঝেও বললেন—তুমি বাপের ছেলে। আমি বেটার বউ। আমার অপরাধ তিল হলে তাল হয়। তা ছাড়া রায়বাড়ীর বউ আমি, আমি চঞ্চল হলে আমার অধর্ম হবে। আমি যেতে পারব না শ্বশুরের হুকুম ছাড়া।

দেবেশ্বর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবার। বললেন—যদি আমি বিয়ে করি আবার ?

—সে তো এমনিই করতে পার। কে বাধা দেবে তোমাকে ? সতীন নিয়েই ঘর করব।

—যদি ক্রীশ্চান হয়ে যাই ?

মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এবার ওই ছোট্ট বধূটি বলেছিল—না, তা আমি পারব না।

—সে আমি জানি। বলে চলে গিয়েছিলেন দেবেশ্বর। এবং ওই বাড়ীতে বাস শুরু ক'রে মদ্যপান আরম্ভ করেছিলেন মনের ক্ষোভে। দিনে চাকরি করতেন, বিকেলে বাড়ী ফিরে পোশাক বদলে বেরিয়ে যেতেন; বন্ধুবান্ধব মজলিশ গানবাজনার আসর সেরে বাড়ী ফিরতেন অনেক রাত্রে। চাকর অপেক্ষা ক'রে থাকত। কলকাতার মজলিশে তাঁর তখন বিদগ্ধজন বলে খ্যাতি রটেছিল।

হঠাৎ চিঠি এল। চিঠি নিয়ে এল, জানবাজারের বাড়ী থেকে ছোট ভাই রামেশ্বর। রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন—"তুমি চাকরি লইয়াছ জানিয়া স্তম্ভিত হইলাম। পড়া ছাড়িয়াছ। স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছ। কারণ কি অবিলম্বে জানাইবে। এবং পত্রপাঠ জানবাজারের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবে। পত্র আমাকে শিবেশ্বর লিখিয়াছে, বধূমাতা লেখেন নাই। পত্রসহ গাড়ী লইয়া যাইতে আদেশ দিলাম। এই গাড়ীতেই ফিরিয়া আসিবে।"

দেবেশ্বর গাড়ী ফিরিয়ে দিলেন। শুধু একখানা পত্র রামেশ্বরকে দিলেন, বললেন—বাবাকে যে পত্র লিখবি, তার সঙ্গে এটা পাঠিয়ে দিস। পত্রখানা সংক্ষিপ্ত,—"আমার চাকরি লওয়ার আপনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন কেন বুঝিলাম না। সংসারে যাহার যতই থাক, কাজ করা, উপার্জন করা অগৌরবের নয়। এবং সংসারে যেখানে পৈতৃক অন্নে জীবনধারণ করিলে পদে পদে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, সেখানে নিজের উপার্জিত অন্নে ভাগ্য গঠন করিলে শুধু স্বাধীনতাই অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, পিতার গৌরবও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে করি।"

এক সপ্তাহ পর আবার গাড়ী এসে দাঁড়াল। এবার গাড়ী থেকে নামলেন বধূ। পিছনে ছেলে কোলে নিয়ে ঝি। তার সঙ্গে রামেশ্বর। এবং গাড়ীর ছাদে বোঝাই বাক্স-পেঁটরা। এবং গৃহে গৃহিণীর মতই ঢুকে বললেন—বাবা আমাকে এখানে আসতে বলেছেন।

—এস। কিন্তু আমি যদি ক্রীশ্চান হয়ে থাকি?

—সে তুমি হ'তে পার না।

হাসলেন দেবেশ্বর। শুধু বললেন—এ বাড়ীতে বাবুর্চি রান্না করে।

—সে আমি শুনেছি। জানি। ঠাকুর এক্ষুনি আসছে। বাবুর্চি থাকবে না। আর আমি এখানে থাকব বলে আসি নি, ধরনা দিয়ে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—অ! শুধু এইটুকু বলে দেবেশ্বর স্নানের জন্তে উঠলেন—আপিস যেতে হবে। এবং বাবুর্চির হাতে খেয়ে চলে গেলেন। বিকেলে ফিরে দেখলেন বাবুর্চি নেই। তার বদলে মেদিনীপুরের খাস কীর্তিহাটী চাটুজ্জেপুত্র জলখাবার তৈরী করেছে—লুচি-হালুয়া-ফল-মিষ্টি। কিন্তু তার তরিবৎ অনেক। দেবেশ্বর সন্ধ্যায় স্নান ক'রে প্রসাধন করে বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন বারোটায়। মদ্যপান করেছেন কিন্তু চঞ্চল নন, স্থির, শুধু একটু বেশী গম্ভীর। দেখলেন খাবারের থালা নিয়ে স্ত্রী প্রতীক্ষা করে রয়েছে। পরদিন রাত্রি ছটো। সেদিনও ওই বধূটি খাবারের থালা নিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঢুলছে। পরদিন এলেন দশটায়। এবং এই দশটাই নিয়ম হয়ে গেল। কিন্তু জানবাজার ফিরলেন না।

স্ত্রী রোজ বলেন—আজ ওবাড়ী চল।

—না।

রোজ এই এক কথা, ওই এক উত্তর। অবশেষে একদিন, প্রায় মাসখানেক পর, রাত্রে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। রাত্রি তখন প্রায় ন'টা। বাড়ীতে পুত্রবধূ বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বরকে ঘুম পাড়াচ্ছেন আর বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়ছেন। শ্বশুরকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বললেন—বাবা!

—হ্যাঁ মা! কিন্তু দেবেশ্বর কোথায়?

নতমুখে পুত্রবধূ বললেন—তিনি তো বেরিয়েছেন আপিস থেকে ফিরে—।

—ফিরবে কখন?

চুপ করে রইলেন পুত্রবধূ। রায়বাহাদুর বললেন—হুঁ। তার পর বললেন—রামেশ্বর কোথায়? শিবেশ্বর? ওবাড়ীতে শুনলাম শিবেশ্বর এখানে এসেছে।

—ওরা থিয়েটার দেখতে গেছে।

—থিয়েটার?

চুপ ক'রে রইলেন পুত্রবধূ। রায়বাহাদুর বললেন—এই ঘরে আমার একটা বিছানা করে দাও। রাত্রে আমি এখানেই থাকব। তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—ওঃ অভিশাপ বটে।

এ আসনে তিনি বসেছিলেন রাত্রি ছটো পর্যন্ত। রাত্রি ছটোর সময় সেদিন দেবেশ্বর ফিরেছিলেন। পদক্ষেপ ঈষৎ স্খলিত; কণ্ঠস্বর একটু জড়িত। বললেন—তুমি দরজা খুলছ কেন, চাকর কোথায় গেল।

—চুপ কর। বাবা!

—কে ?

—বাবা। কীর্তিহাট থেকে এসেছেন।

একবার চমকে উঠলেন দেবেশ্বর। তারপর এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন। নাকের ডগায় কপালে গালে লালচে আভা ফেটে পড়ছে। চোখের দৃষ্টি স্বল্প ক্লান্ত, অথবা নেশায় নিমীলিত, পরনে বাহাম্ন ইঞ্চি বহরের ফরাসডাঙার কোঁচানো কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে সেকালের হাল-ফ্যাশনের কিছু বদল হওয়া মুসলমানী আমিরী পাঞ্জাবি, কাঁধে পাটকরা দুধের মত রঙের রেশমী চাদর। গুন গুন ক'রে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরে ঢুকেছিলেন, ফিরছেন বিশিষ্ট একজন ধনীর বাগানবাড়ীর বাঈজীর গানের আসর থেকে। স্ত্রীর কথা শুনে থমকে গিয়ে কপাল কুঁচকে চোখ বুজলেন। মনে হল মনে মনে বলছেন—ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না তাঁর।

স্ত্রী আবার সামনের ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বাবা বসে আছেন।

একবার তাকিয়েও দেখলেন না দেবেশ্বর, শুধু বললেন—অ! তারপর তিনি সতর্ক পদক্ষেপে পা বাড়ালেন দোতলার সিঁড়ির দিকে।

স্ত্রী পিছন থেকে একটু উচ্চকণ্ঠেই ব্যাকুলভাবে বললেন—ওগো, বাবা বসে আছেন, দেখা কর।

এবার দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে ফিরে তাকালেন স্ত্রীর দিকে, বললেন—ভাল। দেখা করব। বলে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির রেলিং ধ'রে উপরে উঠে গেলেন। এবং সামনেই মার্বেল টপ টেবিলের উপর হাত রেখে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। নিয়ম—চাকর এসে চেয়ার এগিয়ে দেবে, তিনি বসবেন, তারপর চাকর জামা জুতো চাদর একে একে খুলে নেবে। চটি এগিয়ে দেবে। ঘাড় হেঁট করে ভাবছেন, কপালে কুঞ্চন-রেখা দেখা দিয়েছে—এ কি! বাবা এমনভাবে আসবেন কেন?

হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠের ডাক শুনে চমকে উঠলেন।—দেবেশ্বর! রত্নেশ্বর নিজেই উঠে এসেছেন, উত্তেজনার মধ্যে চটি জোড়াটা পায়ে না দিয়েই উঠে এসেছেন; দেবেশ্বর আবার চমকে উঠলেন একবার। এটা তিনি আশঙ্কা করেন নি। ঘাড় তুলে দেখে নিলেন একবার, বাপ কত দূরে, তারপর ঘাড় নামালেন। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রণাম করবার চেষ্টাও করলেন না।

—আমি জেগে বসে আছি, আর তুমি আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে এলে?

দেবেশ্বর নীরব। তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলেন।

—আমাকে তুমি এমন ক'রে উপেক্ষা করতে সাহস কর? এতবড় স্পর্ধা! তবু দেবেশ্বর নীরব। এক চুল নড়লেন না। বরং এর আগে একটু-আধটু টলছিলেন, সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেল।

—দেবেশ্বর!

নীরব দেবেশ্বর। রত্নেশ্বর বললেন—কথার উত্তর দাও!

—কাল সকালে উত্তর দেব। আজ আমি সুস্থ নই। বলে জুতো-জামা না ছেড়েই সামনেই শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

—দেবেশ্বর, দরজা খোল, দেবেশ্বর।

দেবেশ্বর উত্তর দিলেন, কিন্তু সরাসরি বাপকে নয়, ডেকে স্ত্রীকে বললেন—মানিক-বউ, বাবার শোবার ব্যবস্থা করে দাও; আমার শরীরটা খারাপ করছে। তুমি একটু শিগ্‌গির এস। আমার সেই গুলী লাগা জায়গাটায় যেন কেমন ব্যথা জাগাচ্ছে। একটু মালিশ দিতে হবে। চাকরটাকে বল। তুমি বাবার ঘুমের ব্যবস্থা কর।

পরদিন বেলা আটটার সময় উঠলেন দেবেশ্বর, দেখলেন রায়বাহাদুর—কীর্তিহাটের একচ্ছত্র অধিপতি রত্নেশ্বর রায়—তাঁর প্রতীক্ষায় গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসে আছেন। স্নান পুজো হয়ে গেছে। পুত্রবধূ ফল কেটে রূপোর রেকাবীতে সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার সঙ্গে কিছু মেওয়া ফল। বাইরে—জানবাজারের জুড়ি, কোচম্যান সহিস; চাকর দারোয়ান। কিন্তু সবাই স্তব্ধ। যেন একটা ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

দেবেশ্বরের খাস চাকর ছিল উপরে। তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেয়েই নিচে নেমে এলেন, এসে বাপকে প্রণাম করে সামনে দাঁড়ালেন। মাথা হেঁট করেই দাঁড়ালেন।

রত্নেশ্বর রায় বললেন—চা খেয়েছ?

ঘাড় নাড়লেন দেবেশ্বর—না।

রত্নেশ্বর বললেন—বউমা চা আন।

পুত্রবধূ চলে গেলেন চা আনতে। রত্নেশ্বর তিরস্কার শুরু করলেন। প্রথমে মৃদুস্বরে, তারপর সে স্বর চড়ল। দেবেশ্বর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। যে মুহূর্তে পুত্রবধূ দরজায় ঢুকলেন, অমনি চুপ করে গেলেন। বধূ চা-খাবার এনে নামিয়ে দিলেন। রায়বাহাদুর বললেন—খাও।

ছেলে নড়ল না। বাপ বললেন—নইলে আমার খাওয়া হয় না। খাবার পড়ে রয়েছে, দেখছ না?

দেবেশ্বর এবার চা ও খাবারে হাত দিলেন। বাপও ইষ্টকে নিবেদন ক'রে ফলের টুকরো মুখে দিয়ে ওবাড়ীর সরকারকে ডেকে বললেন—দারোয়ান চাকরদের বল, এ বাড়ীর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিক। সন্ধ্যেবেলা তক ওবাড়ী যাবে। কাল সকালে কীর্তিহাটে। বড়বাবু, বউমা, খোকার সব জিনিস যাবে কীর্তিহাটে।

এবার দেবেশ্বর বললেন—আমার আপত্তি আছে।

—কারুর আপত্তি আমি মানি না। পুত্র চমকাল না কিন্তু অতর্কিতে এমন ধমকে বধূটি চমকে উঠল।

দেবেশ্বর হাসলেন। বধূটির লজ্জার আর সীমা রইল না। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরের। শ্বশুর হেসে বললেন—এই ক্রোধ রিপুটা আর আমার গেল না। ভূমির অধিকারীত্বের সঙ্গে সম্বন্ধটা নিগূঢ়। ছেলের হাসিকে গ্রাহ্য করলেন না। অর্থও ভুল করলেন, ভাবলেন বিনীত আত্মসমর্পণ। স্ফীতও হলেন। তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হল। সন্ধ্যায় এসে উঠলেন জানবাজারের বাড়ীতে। সেখানে শিবেশ্বর এবং রামেশ্বর অপরাধীর মত ঘরে লুকিয়েছিল। তাদের কয়েকটা কটু কথা বলে রেহাই দিলেন। খুশী হয়েছেন বড়ছেলেকে

আয়ত্ত করেছেন।

কিন্তু কীর্তিহাটে এসে দেখলেন, ভুল তাঁরই। প্রচণ্ড ভুল করেছেন। তিনি অন্ধ।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে যা আছে তাই বলি। আমি তাঁর চেয়ে ভাল ক'রে বলতে পারব না। লিখেছেন—"আমি ভুল করিয়াছি। আমিই অন্ধ, আমিই অন্ধ। দেবেশ্বরের যে লৌহকঠিন অবাধ্যতা এবং জেদকে ভাঙিয়াছি মনে করিয়াছিলাম সেটা ধৃতরাষ্ট্রের ভাঙা লৌহভীমের মত, একটা কৃত্রিম এবং অলীক বস্তু ছাড়া কিছু নয়।"

তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যখন দেবেশ্বর স্বরূপে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। তিনি কীর্তিহাটে এসে, পরদিন থেকেই অন্ন এবং আহার ত্যাগ করলেন। শুধু জল। এবং মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে একখানা মোটা বই নিয়ে বসে রইলেন ইজিচেয়ারে।

কাছারীতে বসে একটা লাটের প্রজাদের সঙ্গে মিটমাটের কথা হচ্ছিল। লাটভুবনপুরের মধ্যে মৌজা খান-দশেক ; দশখানা গ্রামের প্রজাদের সঙ্গে মামলা চলছিল দু বছর। বৃদ্ধির জন্যে মামলা করেছিলেন রায়বাহাদুর। প্রজারা বৃদ্ধি দিতে রাজী ছিল কিন্তু সে টাকায় এক আনা থেকে শুরু করে দু' আনা পর্যন্ত উঠেছিল, তারপর খুঁট পেতে বসেছিল—লড়াই হয় হোক। এর বেশী দেবে না।

রায়বাহাদুরের দাবী ছিল—টাকায় চার আনা এবং প্রত্যেক জোতজমা জরীপ করে দেখে যার জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, তার উপর খাজনা ধার্য।

নতুন কেনা লাট। বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেক। রায়বাহাদুর হুকুম দিয়ে গোমস্তা পাইক উঠিয়ে এনে, কাগজ কেলে দিয়েছিলেন মামলা সেরেস্তায়। সেখান থেকে গাদাবন্দী আর্জি গিয়ে পড়েছিল মুন্সেফী আদালতে। এ-লাটখানা ২৪ পরগণার অন্তর্গত, আলিপুর, সদর সাব-ডিভিশনের এলাকা। দু' বছর লড়ে প্রজারা গড়িয়ে পড়েছে—হুজুর, একটা মিটমাট করে নিন। টাকায় সিকি বৃদ্ধি দিতে গেলে আমরা মরে যাব। এতেই আমরা দু'বছর মামলা করে খায়েল হয়ে পড়েছি। দশখানা গ্রামের মাতব্বর সে প্রায় পঞ্চজন হিসেবে হলে পঞ্চাশ হয় সুলতা, কিন্তু পঞ্চের চেয়ে বেশি এসেছিল, দশ হিসেবে একশো নয়, বিরাশী জন। দেবোত্তরের ভাণ্ডারের খাতায় খরচ লেখা আছে, চালের খরচ। "অত্র লাটভুবনপুরের বিরাশীজন ও অন্যান্য স্থানের ত্রিশজন প্রজা আইসে তাহাদের জন্য মায়ের ভোগ বরাদ্দ ব্যতীত বাড়তি চাউল বরাদ্দ—এক মণ আঠারো সের।"

খাস কাছারী—যে কাছারী-ঘরে অতুলেশ্বর কার্টিজ আর বোমার সরঞ্জাম লুকিয়ে রেখেছিল, সেইটে তখন নতুন তৈরি হয়েছে—সেই ঘরে, ওই কুইন ভিক্টোরিয়ার অয়েল পেন্টিংয়ের নীচে তিনি বসেছিলেন, ফুরসী নলে টান দিচ্ছিলেন এবং মনে মনে প্রজাদের কতটা মাপ করা যায়, সেই কথা ভাবছিলেন। ঠিক সেই সময় তাঁর খাস চাকর এসে পিছনে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে ডেকেছিল—হুজুর!—

চিন্তার মধ্য থেকেই তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—উঁ—। ছোট্ট উঁ।

—এই রোকাখানা। বলে সে একখানা কাগজ তাঁর সামনে এসে ধরেছিল।—কি এটা? বলে রোকাখানা তুলে ধরে পড়েই গভীরতম চিন্তায় ভুরু-কপাল কুঁচকে, ঘাড়টা

একটু ঘুরিয়ে অন্তদিকে তাকিয়েছিলেন পলকহীন দৃষ্টিতে।

খোকাখানার লেখা, পুত্রবধূ লিখেছেন—"আপনার ছেলে সকালবেলা হইতে কাহারও ডাকে সাড়া দিতেছেন না, জল ছাড়া কোন কিছু খাইতেছেন না, সকাল হইতে চা পর্যন্ত খান নাই। শুধু দু গ্লাস জল খাইয়াছেন। আমি কি করিব? কাহাকে বলিব? যাহা হয় আপনি করুন।"

কপালের কুঞ্চনরেখার সারির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এবং দৈর্ঘ্যেও প্রসারিত হচ্ছিল দুই প্রান্তে। নাকের উপরেই ভ্রূর মধ্যে তিনটে রেখা জেগে উঠে ত্রিশূলের মত মনে হচ্ছিল। সব আলোচনা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কে কথা বলবে এ-সময়? হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—আসছি আমি। মণ্ডলদের সব তামাক দিতে বল।

রত্নেশ্বর এসে দেখলেন দেবেশ্বর ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছেন। বাপের পায়ের চটির শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখে উঠে নীরবে দাঁড়ালেন।

রত্নেশ্বর বললেন—তুমি কি আমাকে অপমান করতে বদ্ধপরিকর?

দেবেশ্বর ইজিচেয়ারের পাশে একটা তেপায়া ছিল, সেটার উপর থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে লিখে উত্তর দিলেন—"না। তবে আমারও একটা সম্মান আছে। সে সম্মান বজায় রাখিতে আমি মরিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। আমিও রায়বংশের সন্তান, উত্তরাধিকারী। আমি রায়বাড়ির প্রজা নহি। এবং আপনার প্রতি ভয়, আতঙ্ক সবকিছু—সেদিন শুকি করিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াও বাঁচিয়া উঠিবার পর চলিয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত আমার বয়স ষোড়শ বর্ষ অনেক দিন অতিক্রম করিয়াছে, আমি পুত্রের পিতা হইয়াছি।"

রত্নেশ্বর স্থিরভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ছেলেকে বলেছিলেন—বস।

দেবেশ্বর ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তুমি আমার পুত্র নও? তুমি ভুল করলে আমি তোমাকে শাসন করব না?

লিখেই উত্তর দিয়েছিলেন দেবেশ্বর—"পুত্রেরও স্বাধীনতা আছে। সেও মানুষ। আমার ধারণা আমার ভাল-মন্দ বুঝিবার বয়স হইয়াছে এবং সেমত বিদ্যাবুদ্ধিও আয়ত্ত করিয়াছি। আমার জীবনের ভাল-মন্দ যেমন আপনি বিচার করেন, তেমনি আপনার চরিত্রের ভাল-মন্দ বিচার করিয়া নিজেকে গঠন করিয়াছি। যে-কঠোরভাবে আপনি আত্মনির্যাতন করিয়াছেন, তাহার জন্যই আজ আপনি এমত প্রকার কঠিন ও কঠোর চরিত্র, রূঢ় প্রকৃতি। তাহার সঙ্গে স্বার্থবুদ্ধি জড়িত করিয়া যাহা করিয়াছেন, তাহাকে আপনি ধর্ম বলেন—আমি অধর্ম মনে করি।"

দেবেশ্বরের হাত চেপে ধরে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—স্বার্থবুদ্ধির অপবাদ দিচ্ছ তুমি দেবেশ্বর?

সসম্ভ্রমে হাতখানি টেনে এবার মুখে বলেছিলেন—হাতখানা ছাড়ুন, মুখে এর উত্তর দিতে পারব না আমি। লিখে দিচ্ছি।

ছেলের হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন রত্নেশ্বর। দেবেশ্বর লিখেছিলেন—তার দুটি দৃষ্টান্ত

আমার অন্তরে মর্মান্তিক ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথম আমার ভিক্ষা-মাকে যে-কারণে দেশত্যাগিনী করিয়া নির্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন, সে-কারণ এমন কোন অপরাধ নয়।

মাঝখানেই রত্নেশ্বর বলে উঠেছিলেন—না-না। তুমি জান না। তুমি জান না। সে আমার সর্বনাশ করত। সে আমাদের বংশের অভিসম্পাত, ছলনা করে প্রবেশ করেছিল। সর্বনাশ হয়ে যেত।

দেবেশ্বর লিখলেন, কিন্তু তাহার সম্পত্তি লইলেন কেন?

—তার স্বামীর তাই অভিপ্রায় ছিল। সম্পত্তি দেবোত্তর করা। এবং একজন ভ্রষ্টাচরিত্রার দেবোত্তরের সেবায়েত হবার অধিকার নাই।

—আমি স্বীকার করি না, দেবতার সেবা করিবার অধিকার নাই। পাপী-তাপী-পুণ্যাত্মা-পাপাত্মা সকলেরই অধিকার আছে।

দৃঢ়স্বরে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—না-না। বেশ্যা নিজে দেবতা স্থাপন করে পূজা করতে পারে সে তার। কিন্তু সৎ শুদ্ধ গৃহস্থের স্থাপিত বিগ্রহের সেবায়েত ভ্রষ্টা হলে তার সে অধিকার থাকে না। থাকতে পারে না। যেমন জাতিচ্যুত বা জাত্যন্তরগ্রহণে পৈত্রিক সম্পত্তিতে এমন কি পিতামাতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলাম, সেই রক্ষা দেবেশ্বর, হতভাগিনী মরে বেঁচেছে। নাহলে সে আমাকে বলেছিল, সে তোমার মা, তোমাকে সে কথা বলতে পারব না। তবু ইঙ্গিতে বলি, বলেছিল—সে মুসলমান বা ক্রীশ্চান হয়ে যাবে। ঠাকুর গঙ্গার জলে বিসর্জন দেবে।

দেবেশ্বর লিখে জানিয়েছিলেন, কৃষ্ণভামিনী মরেন নি। বৃন্দাবন থেকে মৃত্যু রটনা করে পালিয়ে এসে বাইজীবৃত্তি অবলম্বন করেছেন।

তিক্ত হেসে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তাও জান তুমি? সেও আমিও জানি, কিন্তু কথাটা বলতে পারি নি তোমাকে।

এবার দেবেশ্বর স্তব্ধ হয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার লিখেছিলেন, শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ রামছবি চক্রবর্তীকে স্ত্রী-পুত্রসহ নির্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন। তাহা নিষ্ঠুরতা নয়?

—মৃত্যু? মৃত্যু নিষ্ঠুরতা নয়? কিন্তু তা নিয়ম। সমাজের মধ্যেও নিয়ম আছে। তার কিছু কিছু নিষ্ঠুর হয়ে থাকে।

এবার যেন পরাজিত হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন দেবেশ্বর। লিখেছিলেন—"আপনি ভ্রান্ত সংস্কারবশে আপনার মাতামহের ভ্রান্তির বা মস্তিষ্কবিকৃতির কলককে বংশগত অভিশম্পাত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এবং নিজেকে যন্ত্রণা দিতেছেন, আমাদিগকেও যন্ত্রণা দিতেছেন।"

সভয়ে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—থাম থাম। তারপর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—তুমি জান?

—জানি। মুখেই বলেছিলেন দেবেশ্বর।

—কে বললে।

এবার আবার কাগজ টেনে লিখে দিয়েছিলেন দেবেশ্বর, যার মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করিবার জন্য আপনি পিরুকে দিয়া খুন করাইলেন। ঠাকুরদাস জ্যাঠামশাই। গুলি লাগিয়া

যখন শয্যাশায়ী ছিলাম, তখন জ্যাঠামশাই কলিকাতা আসিয়াছিলেন; গোপনে তিনিই আমাকে সব বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন ইহাতে তোমার দোষ নাই, দেবু বাবা। তোমার বাবার পিতামহ-মাতামহ দুই দিক হইতে অভিশম্পাত আছে। আমাকে তিনি সাবধান করিবার জন্যই বলিয়াছিলেন। "রায়বংশের নিন্দা করেন নাই।"

—তবে? তবে তুমি কেন আমাকে এই কঠোরতার জন্য দোষারোপ করছ। আমি নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করেছি। অঞ্জনা-কৃষ্ণভামিনী দুটো নারীকে বলতে গেলে, পঙ্কসমুদ্রে ফেলে দিয়েছি, তারা ডুবে গেছে। কেন? রায়বংশকে বাঁচাতে। তুমি মূর্খের মত, পশুর মত প্রলুব্ধ হয়ে সেই অভিশাপের হাতছানিতে ছুটছ।

চুপ করে বসেছিল দেবেশ্বর, উত্তর বোধহয় খুঁজে পান নি। বা যে উত্তর তিনি পরে দিয়েছিলেন, সেটা তখন-তখনই বাপের সম্মুখে লিখে দিতে পারেন নি। দিলে সেটা মুখের উপর জবাব করা হত।

ওদিকে কাছারী থেকে লোক এসেছিল। সময়টা ভর্তি কাছারীর সময়। সকালবেলার প্রথম প্রহর পার হয়ে দ্বিতীয় প্রহরে ঢুকছে দিন। কীর্তিহাটে যারা আসবার জন্য সকালে বা রাত্রি থাকতে যাত্রা করেছে, তারা এসে পৌঁছে গেছে। ওদিকে ডাক এসেছে। মামলা সেরেস্তায় তো দশখানা তৌজির মাতব্বর বসে আছে। এর মধ্যে হরকরা খবর এনেছে, তমলুকের এস-ডি-ও সাহেবের চিঠি নিয়ে একজন লোক এসেছে। রত্নেশ্বর রায় ছেলেকে নীরব দেখে বললেন—ভেবে দেখ। কিন্তু গোটা বাড়ীতে, গোটা গ্রামে একটা সোরগোল তুলে জাহির কর না যে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের পুত্র অবাধ্য। সে তাঁকে অপমান করেছে। রায়বাহাদুর তাই নীরবে হজম করছেন। রত্নেশ্বর রায় বাঘ নয়, শেয়াল হয়ে গেছে ছেলের কাছে।

তমলুকের এস-ডি-ও অর্শে ভুগছিলেন, তার জন্য ওল খেতে বলেছে কবিরাজ এবং স্থানীয় প্রধানেরা, তাই তিনি কীর্তিহাটের রায়বাহাদুরের কাছে পাঠিয়েছেন, কিছু ভাল ওল পাঠিয়ে দিন। এবং তার বাড়ীতে জামাই-মেয়ে এসেছে, তাদের জন্যে একটা বড় মাছ এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন, খুব ভাল মিহি-পাতির মাদুরের কথা।

সেই ব্যবস্থা আগে করলেন। চিঠির উপর হুকুম লিখে পাঠিয়েছিলেন ম্যানেজারের কাছে। ওবেলার মধ্যে লোক যেন জিনিসপত্র নিয়ে তমলুকে পৌঁছয়। এই সব জিনিসের সঙ্গে আরও কিছু জিনিস, বাগানের অকালের আম, মর্তমান কলা, কিছু ভাল ঘি সের পাঁচেক যেন পাঠানো হয়।

তারপর কয়েকটা নালিশ এসেছে প্রজাদের। নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার নালিশ। বিচার মহলের গোমস্তা করেছে, কিন্তু তা ঠিক মনঃপূত হয় নি, আপীল করেছে খোদ হুজুরের কাছে। সে সব দরখাস্তের উপর তারিখ দিয়ে গোমস্তাকে এবং প্রতিপক্ষকে হাজির হবার জন্য হুকুমনামা পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে জমিদারী সেরেস্তার নায়েবকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তারপর ডাকঘরের ডাক দেখতে বসলেন; সাপ্তাহিক কাগজ এসেছে বাংলা-ইংরেজী। বঙ্গবাসী, হিতবাদী, অমৃতবাজার, ইংলিশম্যান—সে সব ঠেলে রেখে সর্বাগ্রে খুললেন একখানা

সরকারী খাম, আসছে কলকাতা থেকে। তিনি নতুন ভাইসরয়কে সেলাম জানাবার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছিলেন, তার জবাব।

জবাব এসেছে, দরখাস্ত ছিজ একনলেজি পেয়েছেন, পরে সুবিধামত সময় ও সুযোগ অবশ্যই দেওয়া হবে। রায়বাহাদুরের নাম ভাইসরয় দপ্তরে অপরিচিত নয়।

শ্বশুর চিঠি দিয়েছেন, তাও উৎসাহজনক। তিনি কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে তদ্বির করছেন। নূতন লাটসাহেব মার্কুইস অব রিপন। লিখেছেন—হঠাৎ খানিকটা অসুবিধা ঘটিয়া গেল, নতুবা নূতন লাট লর্ড রিপন উদার ব্যক্তি। তিনি নিশ্চয় সুবিধা দিতেন। সম্প্রতি আফগানিস্তান লইয়া রাশিয়ার সঙ্গে ইংরেজের যে কাড়াকাড়ি চলিয়াছিল, তাহাতে ইংরেজই জয়ী হইয়াছিল, হঠাৎ সেখানে আবার বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তুমি নিশ্চয়ই কাগজে দেখিয়াছ যে, কাবুলের বৃটিশ এজেন্টকে একদল বিদ্রোহী আফগান সৈন্য হত্যা করিয়াছে। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য লর্ড রবার্টস কাবুল অভিযান করিয়াছেন এবং কাবুল দখল করিয়াছেন। বর্তমানে কাবুলের আমীর শেখ আলিকে অপসারণ করিয়া তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমনকে আমীরের পদে অভিষিক্ত করা হইতেছে। এখন এখানে দারুণ ব্যস্ততা। সুতরাং অন্যরূপ ভাবিবে না। এসব মিটিলেই তোমার ইন্টারভ্যুর সুযোগ মিলিবে। এবং আমি যতটা আঁচ পাইয়াছি, তাহাতে তোমাকে আরও বড় সম্মানে সম্মানিত করিবার কল্পনা আছে। তখনকার ১৮৬৪ সালের Cyclone-এর পর তুমি যে সদাব্রত খুলিয়া লোককে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়াছ, সেবা করিয়াছ, তাহার সরকারী রিপোর্ট দেখিলাম, তোমার ফাইলের মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছে।

"On the whole the death by sickness are estimated to have been equal to those caused by storm and flood making a total of atleast 65,000; exclusive of the tracts not reported upon of all individuals specially amongst the zaminders who live like princes and lords by exacting money from these poor people. Roy Bahadur Ratneswar Roy is the first and foremost man to be named who did more than his best to serve these poor people. He gave them shelter and food, also served with medical help from his charitable dispensary.

সুলতা, চিঠিপত্র সবই তখন ইংরিজীতে। দেবেশ্বরও ইংরিজী ছাড়া লিখতেন না।

যুগটাই ইংরেজের। কিন্তু সে কথা থাক। সেদিন ওই পত্রখানার কল্যাণে লাট ভুবনপুরের প্রজাদের মঙ্গল হয়েছিল। তাদের বৃদ্ধির বোঝার কিছু উপশম হয়েছিল। টাকার এক আনা বৃদ্ধি মাফ হয়ে তিন আনা হয়েছিল।

প্রজারা সানন্দে মেনে নিয়েছিল। কারণ এ কথা সকল লোকে জানে যে, আইনে যা প্রাপ্য হয় তা রায়বাহাদুর মাফ দেন না। এক্ষেত্রে চার আনা বৃদ্ধি তিনি নিশ্চয় পেতেন। কারণ ধান-চালের দর ১৮৭০ সালের পর থেকে এই আশী সাল পর্যন্ত টাকায় দু-তিন আনা বেড়ে গেছে। এবং রায়বাহাদুর যে বিরাট বাঁধ দিয়েছেন বন্যা রোধের জন্য, তাতে ফসলের

উৎপাদন নিশ্চয় বাড়বে।

রায়বাহাদুর হুকুম দিয়েই উঠে গিয়েছিলেন নিজের আপিসঘরে। এ ঘরটা সেই ঘর সুলতা, যেটা থেকে সিন্দুক খুলে পুলিসের দল লাফ মেরে পালিয়ে এসেছিল কাঁকড়া বিছের ভয়ে এবং যে সিন্দুক থেকে পেয়েছিলাম পত্রের দপ্তর, এটা সেই ছোট ঘরখানা। এবং সেই চেয়ার, সেই টেবিল।

সেখানে বসে তিনি চিঠির জবাব লিখতে বসেছিলেন শ্বশুরকে। হঠাৎ কি মনে হয়েছিল, তাঁর খাস চাকরকে ডেকে বলেছিলেন—যা চিঠিখানা বড়বাবুকে দেখিয়ে নিয়ে আয়। বলবি, কর্তাবাবু পড়ে দেখতে বললেন। ইচ্ছে কি ছিল অনুমান করতে পারি, সম্ভবত উদ্ধত পুত্রকে তাঁর কীর্তিকলাপের এ দিকটা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। চাকর ফিরে এল দেবেশ্বরের চিঠি নিয়ে।

দেবেশ্বর তখন প্রায় উন্মাদ। মদ খেয়েছেন। বিলিতী মদ তাঁর বাক্সে লুকানো ছিল, বের করে খেয়েছেন এবং যে কথা বাপের সামনে লিখে দিতে পারেননি, সেই কথা লিখে ওই চাকর মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—এইটে দিস বাবাকে। যখন একলা থাকবেন তখন। দস্তুরমত খামে বন্ধ করে পাঠিয়েছেন। সবিস্ময়ে চিঠিখানা খুলে রত্নেশ্বর রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আবার।

ছেলে লিখেছে—"আপনি ভাবিয়া দেখিতে বলিলেন। আমি এসব কথা অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি। আজও আবার ভাবিলাম। আপনার মতামতের সহিত আমার মতামত কোন প্রকারেই মিলিতেছে না। ইহার জন্য অর্থাৎ আমি স্বাধীন মত পোষণ করি বলিয়া আমি আপনার অবাধ্য নহি। ইহার সহিত বাধ্যতা-অবাধ্যতার কোন সম্পর্ক নাই। আপনি যাহা বিশ্বাস করেন, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। আমি অবাধ্য নহি, আমি আমার স্বাধীন মতে চলিব। আপনি মদ্যপান করেন না, আমি মদ্যপান করি, তাহাতে দোষ দেখি না। এদেশে-ওদেশে বড় বড় লোকে মদ্যপান করিয়াছেন, করেন। আপনি করেন না; তাহাও ভাল। আপনি জীবনে মদ্যপান করেন নাই, তজ্জনিত যে অতৃপ্ত তৃষ্ণা তাহাও বোধহয় আমার অন্তরে রহিয়াছে। আপনি বাল্যজীবনে আমাকে কঠোর সংযম শিক্ষা দিতে সম্ভবতঃ অত্যন্ত দুঃখ দিয়াছেন। শাসন করিয়াছেন। তাহাই আমাকে আপনার পথ ও মতকে আমার নিকট নিষ্ঠুর এবং দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। আমার লালসাকে উগ্র হইতে উগ্রতর করিয়াছে। আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি, অনেক পড়াশুনা করিয়াছি, ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের দর্শন পড়িয়াছি। আপনি এক ভ্রান্ত অভিসম্পাতভীতি দ্বারা ভীত হইয়া নিজের জীবনকে পীড়িত করিয়াছেন, আমাদিগকে পীড়িত করিতেছেন। ইহা মিথ্যা, ইহা ভ্রান্তি, অলীক। পৃথিবীতে যাহারাই ভূমির স্বামীত্ব ভোগ করে, তাহারাই সেই ভূমির শ্রেষ্ঠ ফসল ও ফল ভোগ করে, তাহারাই সেই ভূমিশ্রেষ্ঠ রূপবতী নারীর অধিকার পাইয়া থাকে। রাজাদের, নবাব বাদশাহদের অন্দর ও হারেমভরা নারীকুল তাহার প্রমাণ। পৃথিবীর কোন সমাজ তাহা দমন করিতে পারে না। আমাদের দেশে আজ ইংরাজ এক বিবাহ করে এবং তাহারা শক্তিবলে এ অনাচার দমন করে বলিয়া কিছুটা দমিত হইয়াছে

মাত্র। কোন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভূম্যধিকারীর এই অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই বা হইবে না। আর ওই শাস্ত্রবাক্য "পৃথিবীতে একটি পুরুষের সহিত একটি নারী ব্যতীত অপর সকলের সম্পর্ক মাতৃ-সম্পর্ক বা কন্যা-সম্পর্ক"—ইহা ভুল। ইহা নিতান্তই কাপুরুষের কথা। সংস্কারাচ্ছন্নের কথা। সমাজের দিকে চাহিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আপনি দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন মাতৃসাধকদের। ইহাদের সম্পর্কে কটু কথা বলিতে চাহি না, এই দেশের প্রতি সম্মান রাখিয়াই বলিতেছি যে, তাঁহারা শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং যতই দীর্ঘজীবন হউক তাঁহাদের শিশুত্ব কখনও ঘোচে না, শিশু হইয়াই তাঁহারা মরেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত স্তন্যলালসা মেটে না। তাঁহারা সব নারীকেই মা ভাবিয়া থাকেন ভাবিতে পারেন আমি তাহা পারি না, তাহা পারিব না। ইহা হাস্যকর। ইহাকে সত্যই যদি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করেন বা করিতে পারিতেন তবে নিজে বিবাহ না করিলেই পারিতেন। যদি করিলেন, তবে রায়বংশের শিশুদের শেষ সূতিকাগৃহে করিলেই মিটিয়া যাইত।

ওই ভাব আমার জন্য নহে। আমি পুরুষ। আমি জীবনে চলার পথে একক চলিতে পারিব না। বা একজনের সঙ্গে খুঁটে খুঁট বাঁধিয়া চলিতে পারিব না। আপনাদের শাস্ত্র পুরাতন, অচল। এ যুগের মানুষ তাহা মানিতে পারিবে না।

শৃঙ্খল দিয়া বন্দী করিয়া রাখিতে চান রাখিতে পারেন, আমি শক্তি থাকিলে তাহা ছিন্ন করিব এবং সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।"

সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—সুলতা, দেবেশ্বর যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। কীর্তিহাটের সেবার তাঁর সিংহের মত বাপের সঙ্গে লড়াই করে তাঁর দাবী আদায় করে নিয়ে তবে ছেড়েছিলেন। কিন্তু মুখে কথা হয় নি। সব হয়েছে চিঠিতে। তার মধ্যে কোনটা এক লাইনের চিঠি। শুধু লেখা—

Respected Sir—My answer to your letter—is no.

শেষ চিঠিখানাতে কয়েকটা লাইন আছে তা মারাত্মক। লাইন-কটা আমার মনে গাঁথা আছে। "আপনার উপলব্ধি আপনার নিজস্ব। তাহা আমার নিকট দুর্বোধ্য। তাহা বুঝিতে পারি না। একান্তভাবে অর্থহীন যদি শাস্ত্রবাক্য হয়, তবে সে শাস্ত্র ভীরুর শাস্ত্র। সে শাস্ত্র কুসংস্কারাচ্ছন্নের শাস্ত্র। পৃথিবীতে একমাত্র গর্ভধারিণী জননী এবং নিজের ঔরসজাত কন্যা ও সহোদরা এই তিনটি নারী ব্যতীত অপর সকল নারীর সহিত আমার বিচারে পুরুষের একটি মাত্র সম্পর্ক, নারী তাহার কাছে নারী ছাড়া আর কিছু নহে। আপনি অনেক সাধকদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; দক্ষিণেশ্বর গিয়া রামকৃষ্ণ নামক একজন সাধককে দেখিয়া আসিবার জন্য বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। ইহা আমাদের দেশের এই সকল সাধকদের নিকট এবং সাধারণ মনুষ্যগণের নিকট হয়তো পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি ইহাকে তৃতীয় নয়ন দ্বারা মহাসত্য বলিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের প্রতি সম্মান রাখিয়াই বলিতেছি যে, তাঁহারা শিশু হইয়াই জন্মান ও চিরজীবন শিশুত্ব ঘুচে না, এবং একদা সূতিকাগৃহে শিশুমৃত্যুর মতই মৃত্যুবরণ করেন। আজীবনের মধ্যে ইঁহাদের স্তন্যলালসা আর মেটে না। কিন্তু আমি তাহা ভাবি না। আমার ধারণা এবং এই প্রকৃতির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, আপনার

মাতামহের প্রতি দেবতার অভিশাপকে। তাহাও আমি মানি না। কারণ জন্মান্তর স্বর্গ নরক ইত্যাদি সবই আমার নিকট অলীক কল্পনা।"

*   *   *

সুরেশ্বর বললে—এর পর হার মেনেছিলেন রত্নেশ্বর। দেবেশ্বরকে কলকাতা ফিরে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাপ-বেটায় একটা আপোস হয়েছিল। রত্নেশ্বর দেবেশ্বরের ভিক্টে-মা কৃষ্ণভামিনীর সম্পত্তির দুইয়ের তিন অংশের দাম হিসেবে পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা আর কলকাতার বাড়ী লিখে দিয়ে বলেছিলেন—আমি বিবেচনা করে দেখলাম, ওই সম্পত্তিটা ষোল আনা তোমারই প্রাপ্য হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে যখন আর হবার উপায় নেই এবং তিন ভাগের দু ভাগ তোমার ভাইরা পাবে…তখন তার দাম হিসেবে এটা তোমাকে দিচ্ছি। আমার ইচ্ছায় তুমি সাহেব কোম্পানীর চাকরি ছেড়েছ; এই টাকায় তুমি এখনই ব্যবসা আরম্ভ কর।

আরও কথা হয়েছিল, দেবেশ্বর কথা দিয়েছিলেন—মদ্যপান তিনি সংযতভাবেই করবেন। অসংযতভাবে মদ্যপান স্বাস্থ্যহানি, পাপ না হোক অপরাধ। এবং—

বেদনার্ত হাসি হেসে সুরেশ্বর বললে—এবং নারীর কথাও হয়েছিল। রত্নেশ্বর তাতেও সংকোচবোধ করেন নি। ইঙ্গিতে অনুরোধ করেছিলেন অবশ্য। বলেছিলেন—হাঁ, তুমি এবং সম্পদের যারা অধিকারী তারা, সংসারে নারীর ক্ষেত্রে ভোগী। কুলপতি,সমাজপতিরা বহু-বিবাহ করে থাকেন। রাজারা বহুবিবাহের পরও রক্ষিতা রাখেন। আমাদের আশেপাশে তো দেখছি, রাজ-রাজড়াদের। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন রত্নেশ্বর রায়।

তারপর বলেছিলেন—তবু নিজের ইজ্জত, বংশের মর্যাদা, এসব বজায় রেখেই সব করা উচিত। মদ্যপান করতে হয় ঘরে বসে কর। বাইরে পথে বেরিয়ে মত্ততা কেন প্রকাশ করবে? শুধু তো মর্যাদা ইজ্জত নয়, নিজের নিরাপত্তা আছে, আরও অনেক কিছু আছে।

দেবেশ্বর রায় কোন উত্তর দেয় নি, স্তব্ধ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন—আমি এর উত্তর লিখে পাঠিয়ে দেব।

রত্নেশ্বরই প্রথম প্রস্তাব লিখে পাঠিয়েছিলেন। বাড়ী ভাড়া করে রক্ষিতা রাখার কথা ছিল। বীরেশ্বর রায়ের শেষজীবনে যেমন সোফি বাঈ ছিল। রত্নেশ্বর লিখেছিলেন—"ভায়লেটের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখ বা থাকে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিলে কোনদিন-না-কোনদিন এই গোয়ানপাড়ার গোয়ানরা রায়বাড়ীর দুর্নামের ধ্বজা হইয়া থাকিবে এবং ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলিতে হইবে।"

দেবেশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন—ভায়লেটের প্রতি তাঁর আর কোন আকর্ষণ নেই। সে মোহ তাঁর কেটে গেছে। "এবং এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আপনার সহিত করিবার মত মনের কাঠিন্য আমার আর নাই। আমি আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছি। আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি এমন কোন কর্ম করিব না, যাহাতে আপনাকে লজ্জিত হইতে হইবে।"

এর পর চিঠি এসেছিল, আবার তোমাকে উত্ত্যক্ত করিতেছি। আমার বধূমাতার অবস্থা কি হইবে?

উত্তর গিয়েছিল, "আমি ইতর নহি, তাহার কোন অসম্মান হইবে না।"

এর উত্তরেও প্রশ্ন এসেছিল, "সম্মান তোমার নিকট হইতে তাহার কাম্য নয়। এবং সে যতক্ষণ নিজে অসম্মানের মত কর্ম না করে, ততক্ষণ কাহার সাধ্য তাহাকে অসম্মান করে। আমি অবহেলা, অবজ্ঞার কথা বলিয়াছি। স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীর যাহা প্রাপ্য তাহার সম্পর্কেই প্রশ্ন করিয়াছি।"

দেবেশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন, "বহুজন সমক্ষে শাস্ত্রীয় মন্ত্রপাঠ করিয়া শপথ করিয়া যাহা রক্ষা করিতে পারি নাই, দিব বলিয়া দিতে পারি নাই, আবার আপনার নিকট শপথ করিয়া তাহা দিব বলিয়া কি লাভ হইবে? তবে চেষ্টা আমি করিব। এবং আমি চেষ্টা করিয়া দিতে তাঁহাকে পারিব না, যদি তিনি তাঁহার পাওনা, আমি যেমন আপনার নিকট আদায় করিয়া লইলাম, তেমনি করিয়া আদায় করিয়া লইতে না পারেন।"

এর পর আর প্রশ্ন রত্নেশ্বর করেন নি। শুধু নিজের ডায়রীতে লিখেছিলেন—"ভাগ্য বড়, না পৌরুষ বড়, এ প্রশ্নের সেই একই উত্তর রইল চিরকাল। "ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং।" রায়বংশের ভাগ্য! এই তার কর্মফলের দ্বারা নির্দিষ্ট প্রাপ্য। একটা তীরকে যেমন যে মুখে নিক্ষেপ কর, সে তার গতিতে সেই মুখেই ছোটে, তেমনি করিয়াই ছুটিয়াছে। আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল।

* * *

বিচিত্র চরিত্র দেবেশ্বর রায়; সুলতা, আজ তাঁকে বিচিত্র চরিত্র মনে হয় বটে, কিন্তু সেকালে তিনি ছিলেন 'আলট্রা মডার্ন'। অবিশ্বাসী, নাস্তিক—ইতিবাদের একটি সংজ্ঞাকে তিনি মনুষ্যত্ব বলে মানতেন এই পর্যন্ত। তর্কে-যুক্তিতে ক্ষুরধার, কল্পনাতে তিনি অসম্ভব অবাস্তবকে জীবনে গড়ে তুলতে চান। কলকাতায় এসে খনির জায়গা কিনে খনির মালিক হয়ে বসলেন। জমিদারী তিনি পছন্দ করেন না। বলেন—মনুষ্যত্ববিরোধী। তিনি ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ভারতবর্ষের অন্যতম নির্মাণকর্তা হয়ে ধনকুবের হবেন, এই তাঁর বাসনা। এসব মানুষের মন মাটিতে বিচরণ করে না, আকাশে পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়; না, তার চেয়ে বলব, মাটির বুকের জলীয় বাষ্পের মত আকাশে মেঘ হয়ে ভেসে বেড়ায়, নিচে মাটিতে নামতে হলে হয় জলধারায় নামে, নয় বিদ্যুতের মত পৃথিবীর বুক চিরে নামে। জলধারায় নামার মধ্যেও ঝড় সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনও মানুষের সর্বনাশ করে দিয়ে যায় কখনও দেখা দিয়েও মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, পৃথিবীর ফসল শুকিয়ে মরে; তবে অধিকাংশ সময়ই পৃথিবীতে ফসল বাঁচিয়ে সুফলা করে দিয়ে যায়। দেবেশ্বর ছিলেন, শুধু দেবেশ্বর কেন, সম্পদশালী সম্পত্তিশালী ঘরের ছেলেরা মানুষের এই মেঘের মত। হয় অতিবৃষ্টি, নয় অনাবৃষ্টিতে চিরকাল ধরে মানুষকে ক্লেশ দিচ্ছে। আবার ফসলের জলও দিচ্ছে। কিন্তু পুষ্কর মেঘের সঙ্গে তুলনা হয়, এমন বংশ বাংলাদেশে আমার চোখে একটি। সেটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশ।

জাতবংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং, ওই একটি বংশকেই বলা যায়। দেবেশ্বরকে কিম্বা রায়বাড়ীকে আমি পুষ্কর বংশ বলি না, বলব না। তবে দেবেশ্বর অভিজাত ছিলেন। 'সম্বর্ত' মেঘ বলতে পার।

খনির ব্যবসায়ে অসামান্য সাফল্য এবং কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। রাণীগঞ্জ-গিরিডি ফিল্ড তখন সাহেব কোম্পানীর হাতে, দেবেশ্বর রায় বরাকর থেকে পশ্চিম এলাকার কয়লার জমি সংগ্রহ করে ওদিককার একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন।

এই দেখ, সুলতা! সুরেশ্বর একখানা ছবির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বললে—এই ছবিখানা দেখ!

শাল গায়ে কোঁচানো কাপড়-পরা দেবেশ্বর রায়। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছেন তখন। ওই পোশাকেই আপিস করেন। ইংরেজ ম্যানেজার রেখেছেন। কাপড় পরে ইংরেজ চাকরকে হুকুম করেন। বিলিতী মদ খান। মেমসাহেব অনুগৃহীতা রেখেছেন।

ওদিকে প্যানেলে দেখ—প্রথমেই দেখ রামকৃষ্ণদেবের তিরোধান, ওই দেখ তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ। ওখানে লেখা আছে—উনি বলছেন "মনে রাখিও জন্ম হইতেই তুমি মহামায়ার কাছে উৎসর্গীকৃত।" ওই দেখ—বঙ্কিমচন্দ্র, হাতে আনন্দমঠ, ওখানে লেখা বন্দেমাতরম গান—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং—শস্যশ্যামলাং মাতরম। তারপর দেখ রবীন্দ্রনাথ। ওখানে লিখেছি—"ওরে তুই ওঠ আজি। আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎ-জনে।" ওই দেখ, তারপর কংগ্রেসের অধিবেশন।

দেবেশ্বর রায়ের মুখ দেখ, একসঙ্গে সমস্ত কিছুর প্রতি বক্র এবং ব্যঙ্গ হাস্যভরা দৃষ্টি। সব-কিছুকে অবজ্ঞা করেছেন। শুধু নিজেকে ভেবেছেন সত্য, বাকি সব মিথ্যা। বাপের সঙ্গে, ভাইদের সঙ্গে এমন কি নিজের বড় ছেলের সঙ্গেও মেলে নি তাঁর। এরই মধ্যে তিনি একলা চলেছেন—তিনি। বুকের ভিতর তাঁর রাক্ষসী ক্ষুধা।

এ-ক্ষুধা রায়বংশের তিন ছেলের মধ্যেই ছিল কিন্তু দেবেশ্বর রায়ের ক্ষুধার সঙ্গে কারুর ক্ষুধার তুলনা হয় না। নিত্যনূতনের ক্ষুধা। এবং এ-ক্ষুধার রুচি ছিল তাঁর ভায়লেটের স্বজাতীয়াদের মধ্যে। মিশ্র রক্ত। মিশ্র সৌন্দর্য।

তিনি স্বীকার করতেন--এ তাঁর ভায়লেটের ক্ষুধা। কিন্তু বিচিত্র কথা—জীবনে সেই গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর আর কোনদিন ভায়লেটকে স্মরণ করেন নি। মুখ দেখেন নি। কতদিন ভায়লেট এসে উঁকিঝুঁকি মেরে ফিরে গেছে কিন্তু তিনি সেদিকে দৃষ্টি ফেরান নি। তার কারণ বলতেন—ওকে তো জীবনটাই দিতে চেয়েছিলাম। ওকে সঙ্গে নিয়ে মরতেই চেয়েছিলাম। ও পারলে না। আমি বাঁচতে চাই নি, এ্যাকসিডেণ্টালি বেঁচেছি, ওর মুখ আর দেখে? তবে হ্যাঁ, নিত্যনূতন ফিরিঙ্গী মেয়েদের মধ্যে ওর ক্ষুধাই মেটাতে চাই তা মেটে না। আশ্চর্য লাগে। তবে এটা সেই অভিশাপ-টভিশাপও নয়, আমিও শ্যামাকান্ত নই। পুনর্জন্ম আমি মানি না। এ্যাণ্ড দিস ইজ দি ইটারন্যাল হাঙ্গার অফ ম্যান ফর উয়োম্যান। ম্যান ইজ পলিগেমাস বাই নেচার। বহু ভোগ বা সব ভোগ করব এই তার চিরন্তন বাসনা। আমার মধ্যে এটা খুব প্রবল। তার কারণ আমি জমিদারের ছেলে আমার শরীরে ফিউড্যাল রক্ত এবং হাতে প্রচুর অর্থ আছে এবং আমি একজন জেদী, শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও দুঃসাহসী ব্যক্তি। এবং আমি মিথ্যাবাদী নই, সেইহেতু ইক্সাপনকে আমি ইক্সাপনই বলি। ধর্মের ধাঁধা—নীতি এবং ন্যায়শাস্ত্রের আনরিয়াল রোমাণ্টিক বুলিটুলি আমি পছন্দ করি না।

রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে কিন্তু লিখে গেছেন—এ-পাপ দেবেশ্বরের ইচ্ছাকৃত নহে। ইহা তাহার প্রাক্তন। হয়তো সে-ই পূর্বজন্মে ভ্রষ্টযোগী ছিলেন। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইতে আসিয়াছেন, ভোগ করিতে আসিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছেন। তাহা না হইলে ভায়লেটের প্রতি যত আকর্ষণ তত ঘৃণা কেন হইবে? ভায়লেট যে অঞ্জনার কন্যা, সে কথা অপরে না জানিলেও, আমি তো এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হইতে পারি না।"

এরই মধ্যে নিঃশব্দে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদে যেতেন আমার পিতামহী উমারাণী দেবী। সহৃশক্তির জীবন্ত মূর্তির মত।

রত্নেশ্বর রায় তাঁর এই পুত্রটিকে স্বেচ্ছামত বিচরণের অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, দেবেশ্বর তা কেড়ে আদায় করে নিয়েছিলেন বাপের কাছ থেকে, রত্নেশ্বর তা তাঁকে দিয়েও ছিলেন। ভাবতেন হস্তক্ষেপ করবেন না তিনি। কিন্তু এই পুত্রবধূটির কথা স্মরণ করে হস্তক্ষেপ না করে পারেন নি। এবং এই নিয়ে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ছেলের সঙ্গে লড়াই করেছেন।

শুধু পুত্রবধূর জন্য বললে অন্যায় হবে। রত্নেশ্বর রায়ের প্রিয়তম পুত্র ছিলেন দেবেশ্বর রায়। তার পরিচয় আছে পিতাপুত্রের পত্রগুলির মধ্যে। আর কিছু আছে রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর মধ্যে। এগুলি সবই পেয়েছি আমি। পত্রগুলির মধ্যে বৈষয়িক কর্ম নিয়ে বাদানুবাদ, ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসা এবং কুশল আদানপ্রদানই বেশী, কিন্তু যে একটি সরল আন্তরিকতা নিরাবরণ সত্য ফুটে উঠেছে, সেটি কি করে সম্ভবপর হল, তা ঠিক ধারণা করতে পারিনে আমি।

রত্নেশ্বর রায়ের শরীর ভাঙল তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই। বাপ ছেলেকে লিখলেন—

"এইবার তুমি আসিয়া বিষয়ের ভার গ্রহণ কর। এই দেহে এই ভার বহন করিতে হইলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিতে হইবে আমাকে। আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না।"

দেবেশ্বর লিখলেন—"আপনার হাতের হাল গ্রহণ করার মত যোগ্যতা আমার নাই। তদুপরি আমি জমিদারী কর্মটিকেই ঠিক পছন্দ করি না। গরীবের উপর পীড়নই তো জমিদারী চালানো নয়—এই সকল গ্রাম্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে অহরহ সাহচর্য করিয়া অনেক নীচে নামিতে হয়।"

আর একখানা পত্রে লিখেছেন—"আমি স্বীকার করিতেছি যে, আপনার ব্যক্তি জীবনের আদর্শ আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনেক শ্রেষ্ঠ। স্বাস্থ্য আপনার যাহা দেখিলাম, তাহাতে আপনি আমা অপেক্ষা সমর্থ আছেন। আমার অমিতাচার আছে, আপনার তাহা নাই। আপনি এইসব গ্রাম্য ব্যক্তিদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের নিকট খাজনা লইয়া তাহাদের শাসন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, তাহার সঙ্গে এই সকল মনুষ্যদের জন্য একটি কল্যাণকর কর্মকল্পনা লইয়া কর্ম করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে বাস করিয়াও ইহাদের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তাহা আমি পারিব না।"

"বাপ এর উত্তরে লিখলেন—"আমার মনে হইতেছে যে, তুমি তোমার আসল মত আমার নিকট গোপন করিতেছ। আমি শয্যাশায়ী না হইলেও, আমার এই ক্লান্ত অবস্থায় আমাকে

সাহায্য করা কি তোমার কর্তব্য নয়?"

উত্তরে দেবেশ্বর লিখেছিলেন—"সংসারে কর্তব্যের আর শেষ নাই। সব মান্য করিয়া চলিতে পারে এমত মানুষ আর কয়জন আছে। আমার তো কর্তব্যচ্যুতির শেষ নাই। আমি মদ্যপানে আসক্ত, আরও নানাবিধ দোষ আছে। তাহা ব্যতীত পিতাকে মান্য করিয়া চলা যেখানে কর্তব্য, সেখানে আপনার ও আমার মধ্যে মতান্তর বৃদ্ধি পায়—তাহাকে কি কোনমতে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে? আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, ভয়ও করি। তাহা আন্তরিক। কিন্তু আপনার মতের সহিত আমার মতের পার্থক্যের কথা আপনি জানেন। আপনাকে সাহায্য করিতে গিয়া আপনাকে কষ্ট করা বা আপনার সহিত বিরোধ করিতে আমি চাহি না। তাহা ছাড়াও কথা আছে। শিবেশ্বর আজ উপযুক্ত হইয়াছে, জমিদারী পরিচালনার ব্যাপারে তাহার নেশা আছে, আসক্তি আছে। সে আপনার অধীনে কার্য করিতেছে। তদুপরি সে আপনার পন্থাকেই অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে। ধর্মবিশ্বাসী, দেবদ্বিজে ভক্তি আছে, আমার বিবেচনায় কীর্তিহাটের দেবোত্তর এবং দেবকীর্তি পরিচালনার সেই যোগ্য ব্যক্তি। তাহাকে ঠেলিয়া আমাকে ভার দিলে সে ক্ষুব্ধ হইবে, তাহার ফল ভাল হইবে না। রামেশ্বর বি-এ পাস করিয়া ল লেকচার কমপ্লিট করিয়া এমনি রহিয়াছে এখানে। তাহাকে আপনি মামলা সেরেস্তা এবং আপনার পারসোনাল এস্টেটের ভার দিতে পারেন। আমি এখানে নানান কর্মে জড়িত। সভা-সমিতি এবং কয়েকটা এ্যাসোসিয়েশন গঠন করিয়াছি। এবং বহু যত্নে ও পরিশ্রমে যে খনি-ব্যবসায় আমি গঠন করিয়াছি, বাহির দিক হইতে তাহার সমারোহ এবং প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট মনে হইলেও, সেটা ঠিক নহে। তাহার ভিতরে অনেক জট বাঁধিয়াছে। কয়েকটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এমত অবস্থায় এসব ছাড়িয়া আমার যাওয়ার অর্থ তাহার ধ্বংসসাধন করা।

"পরিশেষে একটা সংবাদ আপনাকে আমার জানানো উচিত। এখানে সেক্রেটারিয়েটে আমার পরিচিত বন্ধুজন আছেন। কয়েকজন ইংরাজও আছেন। আমারও যাতায়াত আছে। আমি খবর পাইয়াছি যে, আপনাকে রাজা টাইটেল দিবার কথা মধ্যে মধ্যে উঠিয়া থাকে। এখন ঘন ঘন উঠিতেছে। আর একটা বড় দান হইলেই ওটা নিশ্চিত হইবে বলিয়া মনে করি।"

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় এবার হার মেনে চিঠি লিখেছিলেন সুলতা। এমনভাবে বীরেশ্বর রায়ও হার মানেন নি তাঁর কাছে। তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখে গেছেন—"আমার পিতা আমার কাছে হার মানেন নাই. আমার মাতৃদেবীর নিকট হার মানিয়াছিলেন। আমিই পুত্রের নিকট পরাজয় মানিলাম। আমার সকল দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

দেবেশ্বর রায়ের চিঠির উত্তরে তিনি লিখলেন—"তোমার পত্র পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। এরূপ পত্রোত্তর আমি প্রত্যাশা করি নাই। তবে ইহাই হয়তো আমার প্রাপ্য, কারণ আমি সমস্ত জীবন ধরিয়া সকলকেই বলপূর্বক নত করিয়াছি, কাহারও নিকট নত হই নাই। এমন কি নিজের পিতৃদেবের নিকটও না। তুমি রাজা খেতাবের খবর দিয়াছ, সে সংবাদ আমার নিকট অগোচরে নাই; কিন্তু রাজা খেতাবের সাধ আমার নাই। জীবনে

যত দান করিয়াছি, স্মরণ করিয়া দেখিতেছি পুণ্যের জন্য কোন দান করি নাই, খ্যাতির জন্য সরকারী খেতাবের জন্য করিয়াছি। স্কুল ডাক্তারখানা প্রভৃতি কীর্তিও তাহারই জন্য। দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, দেবতার নামে দেবোত্তর এস্টেট গড়িবার জন্য; নিজের সংসারের মঙ্গল সাধন করিবেন তিনি সেই জন্য। যে অর্থব্যয় করিয়াছি দানখাতে কীর্তিখাতে তাহা নিজের তহবিল হইতে দিই নাই, প্রজাদের পীড়ন করিয়া আদায় করিয়া দিয়াছি। নিজে কিছু দিই নাই। আজ আমি শঙ্কিত। কেমন একটা শঙ্কা আমাকে যেন মাঝে মাঝে বিহ্বল করিয়া তোলে। তুমি নিজে ব্যবসায় করিয়াছ, উপার্জন করিতেছ, কিন্তু তোমার মধ্যে দেখিতেছি রায়বংশের অভিশাপ যাহা তুমি বিশ্বাস কর না তাহা যেন ফণা তুলিয়া আমাকেই দংশন করিতে চাহিতেছে। তুমি ধর্ম মান না, ঈশ্বর মান না, বলিতে গেলে এদেশের কিছুই মান্য কর না, এমন কি রাজশক্তিকেও না। আমি শুনিয়াছি, হোমরুল প্রভৃতি আন্দোলনের সঙ্গে তুমি যুক্ত। ইহা গর্বের কথাও বটে আবার অনেকটা শঙ্কার কথাও বটে। এবং ইহা আমাদের ঠিক ভারতীয় ধর্ম নহে। আমাদের শাস্ত্রমতে কলিতে যখন ম্লেচ্ছরাই একচ্ছত্রাধিপতি হইবে। এবং সম্রাট ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাহা ব্যতীত এমন শান্তি-শৃঙ্খলা তাহারা স্থাপন করিয়াছে যাহা স্বপ্নাতীত। আজ আমরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া নিরাপদ নিঃশঙ্ক। অথচ তুমি পুরাপুরি ইংরাজীভাবাপন্ন। তবুও তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তুমি শক্তিমান তুমি সাহসী তুমি সত্যবাদী। তুমি ছাড়া অপর কাহারও ভরসা আমি করিতে পারিতেছি না। কিছুদিন শিবেশ্বরের উপর প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। সে মদ্যপান করে না, সে ত্রিসন্ধ্যা করে, দেবদ্বিজে ভক্তি আছে। শাস্ত্রাদি পাঠ করে। সে স্ত্রীতে অনুরক্ত। কিন্তু যত দিন যাইতেছে তত আমার চক্ষু খুলিতেছে; সে মদ্যপান করে না, কিন্তু শুনিতেছি সে গঞ্জিকা সেবন করে অতি গোপনে। সে ত্রিসন্ধ্যা করে দেবদ্বিজে ভক্তি করে, শাস্ত্রপাঠ করে কিন্তু শৃগালের মত ভীরু এবং লোভী; ভোরবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে বিছানায় বসিয়া সেরখানেক সন্দেশ রসগোল্লা ভক্ষণ করে, কারণ সকাল হইতে কিছু না খাইয়া স্নানাদি সারিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া চা-পান করিবে। দেবতার ব্রাহ্মণের জমি বা বিষয় বেনামে মহাজনী করিয়া বন্ধক লয়। শাস্ত্রপাঠ করে কিন্তু স্ত্রীলোক অপেক্ষাও শুচিবাইগ্রস্ত। স্ত্রীতে অনুরক্ত কিন্তু তাহা অপেক্ষাও চরিত্রহীন হইলেও ভাল হইত। কারণ সে স্ত্রী ছাড়িয়া একটা দিনও থাকিতে পারে না। ইহারই মধ্যে তাহার দুই পুত্র এক কন্যা। এখানে একটা থিয়েটার পার্টি করিয়াছে। কতকগুলা অপোগণ্ড ইতর শ্রেণীর বালক লইয়া নাচ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাতে প্রমত্ত রহিয়াছে। কখনও সত্য কথা বলে না, বাক্য দিয়া বাক্য রক্ষা করে না। মামলায় মকদ্দমায় প্রবল আসক্তি। কীর্তিহাট এস্টেটের মামলা সেরেস্তা আমিই বড় করিয়া পত্তন করিয়াছি, কিন্তু বাজীকর, স্বত্ব, করবৃদ্ধি প্রভৃতি জমিদারী-সংক্রান্ত মকদ্দমা ছাড়া মকদ্দমা ছিল না। শিবেশ্বর তাহার সঙ্গে মহাজনী যোগ করিয়াছে। লোকের নিকট হইতে সে হ্যাণ্ডনোট তমসুদ কিনিয়া লইয়া খাতকের নামে নালিশ করে।

তোমার পতনের মধ্যে একটা বড় কিছু পতনের মর্যাদা আছে গুরুত্ব আছে। তাহার অধঃপতন ক্ষুদ্রতায় ঘৃণ্য। সম্প্রতি একজন বাগুকরের কাছে দেবোত্তরের জমি ক্রয় করিয়াছে

স্ত্রীর নামে। শশকের মত ভীরু। কীটপতঙ্গ ব্যাধি সমস্ত কিছুর ভয়ে অস্থির। ডাকাতের ভয়ে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় না। রাজকুমারী রাণী কাত্যায়নী দেবীর আমলের মত দারোয়ানগুলিকে সমস্ত রাত্রি হল্লা করিতে হয়।

রামেশ্বরকেও জান। সে তোমাকে অনুকরণ করিতে চায় কিন্তু তাহার ধীশক্তি নাই এবং সাহসও নাই। দুইবার বি-এ ফেল করিয়া বিলাত যাইতে চায়। ব্যারিস্টার হইয়া আসিবে। সেও মদ্যপান করে, সেও চরিত্রভ্রষ্ট। সর্বাপেক্ষা দুঃখ তাহার যত কুদৃষ্টি রায়বাড়ীতে যাহারা আশ্রিত তাহাদের যুবতী স্ত্রী-কন্যাদের উপর।

আমি অসহায়ের মত দেখিতেছি। দেবশক্তির রোষ অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ কোন এক ব্যক্তি পাইলেও পাইতে পারে কিন্তু বংশের উপর অভিশাপ পতিত হইলে আর রক্ষা নাই। কোন এক পুরুষ পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিলেও বংশ পরিত্রাণ পায় না। অথবা ইহাই কালের অভিপ্রায়। কলি শেষে এমত হইবারই কথা। মানুষের সাত্ত্বিক ভাব বিলুপ্ত হইয়াছে রাজসিক ভাবও বিগত হইতেছে, এক্ষণে তামসিক ভাবই সমস্ত মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিতেছে। মনে হইতেছে, অচিরকালের মধ্যেই এ দেশের অবশিষ্ট অর্ধপাদ পুণ্য তাহাও শেষ হইয়া সবই বিলুপ্ত হইবে। তবুও যে কয়টা দিন বাঁচি তুমি ভার লইলে আমি বড় সুখী হইতাম"—

ছেলে উত্তর দিলেন—সংক্ষিপ্ত উত্তর। "আপনার সহিত চিরকালের মত বিচ্ছেদ হয় ইহা কাহারও কাম্য নয়। এই শঙ্কা আছে বলিয়াই অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতেছি। তবে আপনি যে আশঙ্কা করিয়াছেন বা দেবরোষ দেবী অভিসম্পাত অপ্রাকৃত দৈব বলিয়া যাহা বিশ্বাস করেন, তাহা নিতান্তই সাধারণ প্রাকৃত জাগতিক ঘটনা। ইহা চিরকাল ঘটিতেছে ও ঘটিবে। শাস্ত্রীয় ধারণার ও মন্ত্র-তন্ত্রের ফেরের মধ্যে পড়িয়াই শ্যামাকান্তের ঐরূপ মানসিক বিকৃতি ঘটিয়াছিল নতুবা ইহা তো পৃথিবীতে জীবজগতে অতি সাধারণ ব্যাপার; মনুষ্যকুলের মধ্যেও এমন ঘটনা তো অহরহই ঘটিতেছে। বিশেষ করিয়া বিত্তশালী সম্পদশালী যাহারা তাহাদের মধ্যে এবং যাহারা দেহের শক্তিশে একেবারে দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ, যাহাদের গুণ্ডা বলি, তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা খুবই বুদ্ধিমান, চতুর, বিদ্যাবুদ্ধির শক্তিতে বলীয়ান বলিয়া দেশ ও সমাজের চলিত ধ্যানধারণা হইতে সৃষ্ট নিয়মাদির অলীক গণ্ডী পার হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এমন ঘটনা অনেক ঘটিতেছে। তাঁহারা শ্যামাকান্তের মত পাগল হইয়া যান না। আপনি পিতা আপনার সহিত এসব লইয়া তর্ক আমার সাজে না। অন্ততঃ আমাদের সমাজে সাজে না। তবে আপনি কথাটা লইয়া পত্রে বহুৎ আক্ষেপ করিয়াছেন এবং আপনি এইরূপ ধারণার বদ্ধ সংস্কারে আজীবন ক্লেশ পাইতেছেন বলিয়াই কথাগুলি লিখিলাম। আমার জীবনে আপনার সহিত যে সংঘর্ষ এবং গরমিল তাহাও এই মতভেদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়াই লিখিতে সাহস পাইলাম। পরিশেষে নিবেদন—সম্পত্তিরক্ষার জন্য আমাকে কীর্তিহাটে লইয়া গিয়া বিব্রত করিবেন না বা নিজেও বিব্রত হইবেন না। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

—মধ্যে মধ্যে সংসারে ঘটনা এমনভাবে ঘটে সুলতা; সুরেশ্বর বললে,—যে দেখেশুনে মনে হয় মানুষ যখন কোন সংকল্প করে তাকে ভাঙবার জন্যেই ঘটনাটা কেউ ঘটাবে।

আমাদের কীতিহাটের দয়াল দাদু আজ বেঁচে নেই, ১৩৩৭ সালেও ছিলেন, ১৩৪২ সালের সাইক্লোনের পরই মারা গিছলেন। তিনি বলতেন—ভায়া ভগবানের মত রসিকও কেউ নেই আবার দর্পহারীও কেউ নেই। আন মধ্যে মধ্যে মানুষ যখন আস্ফালন করে তখন তিনি কান পেতে শোনেন আড়ালে দাঁড়িয়ে আর মুচকে মুচকে হাসেন। তারপরই তার ঘটনাচক্রের যে বিরাট কলটি সেই কলের একটি ছোট বোতাম-টোতাম টিপে দেন আর এমন ঘটনা ঘটে যে মানুষের আস্ফালন সংকল্প সব কাচের বাসনের মত আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

—এখানেও যেন দর্পহারী ভগবান কথাটা কান পেতে শুনে হেসেছিলেন। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এল জানবাজারে—"আগামীকাল স্টেশনে গাড়ী রাখ।" রায়বাহাদুর।

সেকালে রায়বাহাদুরেরা খেতাবটাকে বাড়ীতেও ব্যবহার করতেন। গিন্নীরা সাধারণতঃ বলেন, বলতেন—উনি ওঁর; না হয় কর্তা-কর্তার, নয় তো বাবু-বাবুর; রায়বাহাদুর হলে তাঁরাও চাকরবাকর থেকে সবার কাছেই বলেন—রায়বাহাদুর, রায়বাহাদুরের। রায়বাহাদুরের টেলিগ্রামে রায়বাহাদুর লিখে ঠিকানার ঘরে নিজের নামটা লিখতেন।

চমকে উঠেছিলেন দেবেশ্বর রায়। এ কোন সময়ে আসছেন তিনি?—আসবার কারণ তাঁর অনেক ছিল—তখন কলকাতায় নতুন বিডন স্ট্রীটের উত্তরে গোয়াবাগানের কাছ বরাবর এক বিঘে জমির উপর বাড়ী—হুগলকুড়িয়া লেন; পাশে একটা তেলকল, এ হচ্ছে শিবেশ্বর এবং রামেশ্বরের জন্য। তত্ত্ববিধান যা করবার শিবেশ্বর এসে গিয়েই করতেন। রামেশ্বর থাকতেনই জানবাজারে, দাদার ভক্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর উপর খুব ভরসা শিবেশ্বর করতেন না। কিন্তু দেবেশ্বরের পক্ষে সময়টা খুব ভাল ছিল না, অন্তত বাপের সঙ্গে দেখা করবার মত শান্ত এবং স্থির ছিল না মন। তখন কিছুদিন ধরে ব্যবসা বাড়াবার জন্যে নতুন নতুন পিটখাদ কেটে চলেছিলেন, তার মধ্যে কয়েকটা ভুয়ো হয়ে গেল। তিনি হুণ্ডী কেটে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সময় বুঝে হুণ্ডীওয়ালরা চেপে ধরেছে। তিনি বিব্রত। টাকা চাই। সে অনেক টাকা, সে আমলে পাঁচ লাখের কাছাকাছি। তারই জন্য তিনি ছুটোছুটি করছেন কিন্তু বাপকে জানান নি; এ ধরনের বিপদে বাপকে কখনও জানাবেন না এই প্রতিজ্ঞা করেই তিনি নেমেছিলেন স্বাধীন ব্যবসায়।

দেবেশ্বর রায় শুধু জেদী ছিলেন না, তাঁর অনুমান শক্তি ছিল বুদ্ধির সঙ্গে প্রখর, তার উপর ছিল একটা আভিজাত্যবোধ।

সেকালে তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৈতৃক ঋণশোধের একটি আশ্চর্য আভিজাত্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

দেবেশ্বর রায় সেইদিনই সায়েব কোম্পানীকে চারটে কলিয়ারী বেচে হুণ্ডী শোধের ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন; বলতে গেলে ব্যবসা একরকম উঠিয়েই দিলেন; কারণ চালু কলিয়ারী রইল না, থাকবার মধ্যে থাকল মানভূম জেলায় বিস্তীর্ণ পতিত প্রান্তর, তাও বরাকর থেকে এদিকে ঝরিয়া ওদিকে কাতরাস পর্যন্ত ছড়ানো। তাতে কাজ করতেও বহু অর্থ প্রয়োজন। তা হোক তিনি খুশী হলেন। বাপ যেন তাঁকে এই বিব্রত অবস্থায় না দেখেন।

টাকা তাঁর স্ত্রীর ছিল। উমা দেবী বাপ-মায়ের এক কন্যা। মানুষ হয়েছিলেন দিদিমার কাছে। তাঁর সম্পত্তি টাকায় পরিণত ক'রে কোম্পানীর কাগজ করে দিয়েছিলেন দিদিমা, সে কাগজের পরিমাণ কম নয়—দেড় লাখ। সে কাগজ ছিল রত্নেশ্বর রায়ের কাছে। বউ দিয়েছিলেন রাখতে—বাবা এ আপনি রাখুন। আমি কোথায় রাখব।

রত্নেশ্বর রেখেছিলেন। যখন দেবেশ্বর কীর্তিহাট থেকে বাপের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জিতে ফিরে আসেন তখন তিনি তাঁর ভিক্ষে-মা কৃষ্ণভামিনীর সম্পত্তির তিন ভাগের দু ভাগ বাবদ দাম হিসেব ক'রে নিয়েছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর নামের কোম্পানীর কাগজ তিনি নেন নি। তিনি চান নি রত্নেশ্বর দেন নি; এমন কি উল্লেখও করেন নি।

স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে কোথাও বাইরে একটা বিভেদ ছিল না কিন্তু অন্তরে অন্তরে একটা বিরাট পার্থক্যের দুই তীরে তাঁরা বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন নাস্তিক, স্ত্রী ছিলেন ঘোরতর দেবতা-বিশ্বাসী। দেবেশ্বর বাস করতেন ভাবীকালে, স্ত্রী বাস করতেন ভূতকালে; বীরেশ্বর রায়ের স্ত্রী ভবানী দেবীর মত ছিল বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা। স্বামীকে ভয় করতেন তিনি। প্রমত্ত দেবেশ্বর বিছানায় শুতেন স্ত্রী পায়ের তলায় বসে হাত বুলিয়ে দিতেন, এইটুকু না হলে দেবেশ্বরের ঘুম আসতে দেরি হত, এটুকু বড় ভাল লাগত তাঁর, পায়ে স্ত্রীর আলতো হাতের স্পর্শ পাবা মাত্র তাঁর চোখ বুজে যেত, তারপরই হয়তো মিনিটখানেকের মধ্যে নাক ডাকতো তাঁর। তখন উমা দেবী জানালার মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে বসে কাঁদতেন। কোন কোন দিন টের পেয়ে দেবেশ্বর প্রমত্ততার মধ্যেই পুরুষের স্বাভাবিক কামনায় আত্মনিবেদনকারীটিকে টেনে নিতেন আদর করতেন তারপর ঘুমিয়ে যেতেন। স্ত্রীও হয়তো ঘুমিয়ে যেতেন, কিছুক্ষণ পর পাশের খাটে ছেলের সাড়া পেয়ে উঠে যেতেন। সকালবেলা থেকে জীবন আর এক রকম। কায়দা আর কানুনের চাকায় চাকায় দাঁতে দাঁতে লেগে ঘুরে চলত। নিঃশব্দে সে ঘোরা, বিনা সংঘর্ষে সে ঘোরা, দিনের পর রাত্রি আসার মত সে ঘোরা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, তখনও বাংলাদেশে মেয়েদের জীবনে চলছে চরম দুর্ভাগ্য। পুরুষের ক্রীতদাসী, সমাজে বহু সুন্দর বাক্য বহু সম্মানের অভিনয়ের মধ্যে তার আসল স্বরূপ হল কেনাবেচার সামগ্রী। বাপের বুকের বোঝা শ্বশুরের ঘরে নামে লক্ষ্মী হলেও কাজে স্বামীর অনুগ্রহনির্ভরা।

ছেলে বিয়ে করতে যেতো মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেন—কোথায় যাচ্ছ বাবা?

ছেলেকে জবাব দিতে হত—তোমার দাসী আনতে মা।

দেবেশ্বর নিজে এদের দলের ছিলেন না, অন্য মত পোষণ করতেন, কিন্তু কালের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। স্ত্রী লোককে মনোভাবের বলে তাকে ঘরের কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, নিজের মনের অধিকার দেন নি। সেই কারণেই স্ত্রীর টাকা তিনি বাপের কাছ থেকে চেয়ে নেন নি। স্ত্রী যা হয় করবেন অথবা তাঁর অন্তে উত্তরাধিকারীরা যা হয় করবেন, তিনি ছোঁবেন না নেবেন না এই ছিল তাঁর সংকল্প। স্ত্রী নিজে চেয়ে নিয়ে দিলে তিনি হয়তো নিতেন কিন্তু স্ত্রী তো তা দেন নি।

রত্নেশ্বর রায় সেই কোম্পানীর কাগজ নিয়েই দিতে এসেছিলেন এবং নিজে থেকে বাকী টাকা দিয়ে সব মেটানোই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। সে অনুমান করে নিতে দেবেশ্বরের দেরী হয় নি। তাই তিনি একদিনেই কলিয়ারী বেচে দিয়ে প্রশান্তমুখে বাপকে আনতে গিয়েছিলেন হাওড়া স্টেশন।

হাওড়ায় ছেলেকে দেখে রত্নেশ্বর রায়ও ধাঁধাতে পড়েছিলেন। এমন প্রশান্ত মুখ তো তিনি কল্পনা করেন নি।

ছেলে প্রণাম করে জিনিসপত্র গাড়ীর ছাদে চাপিয়ে গাড়ির সামনের সিটে বসে বাপকে প্রশ্ন করেছিলেন—হঠাৎ এমনভাবে এলেন, খবর সব ভাল তো? চিঠি না দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেন!

গাড়ীর ভিতর বসে অন্ধকারের মধ্যেই ছেলের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছিলেন রত্নেশ্বর রায়। বললেন—হ্যাঁ ভাল।

ছেলে আর প্রশ্ন করলেন না। চুপ করে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন—ছগোলকুড়িয়ার বাড়ি সেদিন আমি দেখতে গিছলাম, প্ল্যান আমার ভাল লাগল না। ঘরগুলো—

—ও সব শিবেশ্বর রামেশ্বরের পছন্দ, ওদের বাড়ী ওরা যেমন চায় তেমনি হচ্ছে।

—বাড়ীটা ওখানে না করলেই হত। তেলকলটা কিনছেন তেলকলের জন্যে, ও জায়গাটা রেখে সরে বাড়ী করাই ভাল ছিল।

—থাক ওসব কথা। আমি ওজন্যে আসি নি। আমি হিসেব মেটাতে এসেছি। আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে দিন ফুরিয়ে আসছে। প্রপিতামহ কুড়ারাম রায় দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন, তারপর থেকে পিতামহ সোমেশ্বরের কাল থেকে সবাই আমোদের স্বল্পায়ু। পঞ্চাশ কেউ পার হয় না। তোমাকে এত ক'রে লিখলাম তুমি গেলে না। আমি এলাম তোমার যা বিশেষ কিছু আমার কাছে পাওনা আছে তাই দেবার জন্য।

—পাওনা? আপনার কাছে আমার বিশেষ পাওনা? হাসলেন দেবেশ্বর।

—হ্যাঁ। তোমার ভিক্ষে-মায়ের টাকা তুমি নিয়েছ। আমি দিয়েছি। কিন্তু বউমায়ের পিতৃধন কোম্পানীর কাগজ আমার কাছে গচ্ছিত ছিল, সেটা তুমি চাও নি। তা ছাড়া বউমায়ের দিদিমা বলেছিলেন—ওর বয়স বিশ বছর না হওয়া পর্যন্ত ওর হাতে বা—।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—এমন কি তোমার হাতে দিতেও বারণ করেছিলেন।

আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—কথাটা তোমাকে বলা হয় নি। এ বিয়ের সম্বন্ধ আমি করি নি; কাশীতে পিসেমশাই আর অন্নপূর্ণা এ সম্বন্ধ করেছিল। তখন তুমি গুলির ক্ষতের জন্যে বিছানায় শুয়ে। তোমার কথাটা তাঁর অগোচর ছিল না। সেইজন্যেই বউমার বিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তাকে বা তোমাকে দিতে বারণ করেছিলেন।

দেবেশ্বর সামনের সিটে স্থির হয়ে বসে শুনছিলেন। কোন উত্তর করেন নি।

বাড়ীতে এসে মুখ হাত ধুয়ে খাবার আসনে বসে রত্নেশ্বর পুত্রবধূকে ডেকে কোম্পানীর কাগজগুলি তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—তোমার পৈতৃক ধন মা। তোমার দিদিমা

তোমার বাপের মরিকানী সম্পত্তি বেচে টাকা দিয়ে কোম্পানীর কাগজ করেছিলেন। বিয়ের সময় আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—উমার বিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত এ কাগজ আপনার হাতে রাখবেন। আমি তার থেকেও বেশী দিন রেখেছি। সুদে আসলে জমে দেড় লক্ষের উপর দাম এর এখন। নাও এখন। নাও তুমি। নিয়ে দেবেশ্বরকে দাও। আমি শুনেছি—দেবেশ্বর বিজনেসে লোকসান খেয়েছে। হুণ্ডির দেনায় বিব্রত হয়েছে। টাকা আমি দিতে পারতাম। কিন্তু সম্ভবতঃ দেবেশ্বর তা নেবে না। ভাইদের অজুহাত দেখাবে। সেটা নেহাৎ মিথ্যেও নয়। শিবেশ্বর এমনিতেই বলে আমি পক্ষপাত ক'রে থাকি। দেবেশ্বর এই টাকা তুমি ব্যবসায়ে লাগাও। প্রয়োজন হলে আমি তোমাকে এস্টেট থেকে টাকা ধার হিসেবেও দিতে পারি।

চমকে ঠিক ওঠেন নি দেবেশ্বর, তিনি গোড়াতেই অনুমান করেছিলেন, তবুও কথাটা এইভাবে পাড়বেন এ অনুমান করেন নি। ভেবেছিলেন রত্নেশ্বর নিজের স্বভাব অনুযায়ী উপদেশের ছলে তাঁকে অনেক তিরস্কার ক'রে বলবেন—হুণ্ডির ডিটেলস দাও আমি সব মিটিয়ে দিয়ে তবে যাব।

বধূ কোম্পানীর কাগজগুলি হাতে তুলে না নিয়ে বললে—আপনার ছেলেকেই দিন।

—না মা, তুমি নিজে ওকে দাও, দিয়ে প্রণাম কর।

দেবেশ্বর এতক্ষণে বলেছিলেন—হুণ্ডীর ঝঞ্ঝাট সব মিটে গেছে। আজই আমি মিটিয়ে ফেলেছি।

—মিটিয়ে ফেলেছ? কি ক'রে মেটালে? আমি খবর পেয়েছিলাম—তুমি বিব্রত হয়ে পড়েছ। পাগলের মত ঘুরছ টাকার জন্যে। আমার শরীর খারাপ তবু আমি শুনে স্থির থাকতে পারি নি।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—মিথ্যে শোনেন নি। দুটো দুটো বড় প্রজেক্ট একেবারে ফেল করে গেল—ডাইক বেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এ্যাবণ্ডন করতে হয়েছে। এদিকে পাওনাদারেরা সময় বুঝে চেপে ধরবার চেষ্টা করলে। আমাদের স্বভাব। কিন্তু আমি তাতে দমি নি। তাজিন ল্যাণ্ড যা নিয়েছি তা রেখে চালু কলিয়ারি ক'টা বিক্রী করে দিচ্ছি বেঙ্গল কোলকে—চুক্তি হয়ে গেছে। দলিল হতে বাকী আছে। হুণ্ডীর দায় এখন বেঙ্গল কোলের।

—চালু কলিয়ারিগুলো সব বিক্রী করে দিলে, আমাকে জানালে না?

চুপ ক'রে থাকলেন দেবেশ্বর।

—আমি কি তোমার শত্রু দেবেশ্বর?

দেবেশ্বর তবু নীরব হয়ে রইলেন।

—দেবেশ্বর!

এবার দেবেশ্বর বললেন—না। আপনি জন্মদাতা পিতা। কিন্তু এ ব্যবস্থা আমি আপনার অমতে করেছি। এতে ফেল পড়ে দেনার জন্যে আপনার কাছে গেলে আপনার ছেলের মত কাজ করা হ'ত না।

—বউমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলে ?

ঘাড় নাড়লেন দেবেশ্বর। না।

সঙ্গে সঙ্গে বধূ উমা চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন মাটির উপর আছাড় খেয়ে।

এর পনর দিনের মধ্যে আবার টেলিগ্রাম এল কীর্তিহাট থেকে। রত্নেশ্বর রায় কীর্তিহাট ফিরে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। জর হয়েছে। রত্নেশ্বর রায় টেলিগ্রাম করেছেন—বউমা এবং ছেলেদের নিয়ে এখানে এস, আমি অসুস্থ। ঠিক তার পরের দিন আবার টেলিগ্রাম এল —ফাদারস ইলনেস সিরিয়াস ডিলিরিয়াস কাম ইমিডিয়েটলি—শিবেশ্বর।

এবার ফিরতে হয়েছিল দেবেশ্বরকে। স্ত্রী দুই পুত্র নিয়ে দেবেশ্বর কীর্তিহাটে ফিরেছিলেন বহুকাল পর। অবশ্য দু'একদিনের বা চারদিনের জন্য কয়েকবার এসেছেন এ আসা সে আসা নয় ; এবার এসেছিলেন যেন থাকতে হবে ব'লে। সঙ্গে পনের বছরের বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর এবং ছোট ছেলে যোগেশ্বর তখন তের বছরের। যোগেশ্বরের পর আর সন্তান হয় নি।

রুগ্ন বিকারগ্রস্ত বাপের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম নিজেকে হারালেন দেবেশ্বর। এবং হেরেও গেলেন। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বকছেন—বাবা, বাবা, বাবা! না-না-না। মা কই মা ?—মা ?

—স্বর্ণলতা! সরস্বতী বউ! ছি—ছি! কোথা যে যাও! কেন অঞ্জনাকে বার বার আমার কাছে আসতে দাও। ছি—ছি।—ছি-ছি। তুমি কিছু বোঝ না।—না—না—না।

—দেবেশ্বর এল না ? দেবেশ্বর ? দেবেশ্বর !

টপ্‌টপ্ করে চোখ থেকে জল পড়তে শুরু করেছিল। এই সময় শিবেশ্বর এসে গম্ভীর মুখে তাঁর হাতে একখানা কাগজ দিয়ে বলেছিল—এখানা বাবা কাল লিখে ম্যানেজারের হাতে দিয়েছিলেন। উনি আমাকে দিয়েছেন। কাগজখানা তুমিই রাখ।

জরে পড়ে অবধি রত্নেশ্বর রায় একটা কঠিন কিছুর আশঙ্কা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির প্রৌঢ় ডাক্তার তাঁকে গোড়া থেকেই দেখছিলেন, তাঁকেও তিনি তাঁর আশঙ্কার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা চুলকে বলেছিলেন—কই, তেমন কিছু তো ঠিক মনে হচ্ছে না।

অল্প অল্প জর, শরীর খারাপ ; এই পর্যন্তই—তার বেশী কিছু না। রোজ কাছারী করছিলেন। পাঁচ দিনের দিন জরটা একজরীতে দাঁড়াল, ষষ্ঠ দিনের দিন তিনি সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়ে ডাক্তারকে এবং ম্যানেজারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন একসঙ্গে। ডাক্তারকে বলেছিলেন—কি বুঝছ ?

—আজ্ঞে না, তেমন কিছু নয়, বোধহয় পেট পরিষ্কার নেই—

—তুমি ঠিক ধরতে পারছ না। মেদিনীপুর থেকে সিভিল সার্জেনকে কল দাও। একটু পর বলেছিলেন—না, বেটাদের মুখখানাই লাল আর মুখেই খুব বড়াই। মেদিনীপুরের গোলক ডাক্তারকে কল দাও। বুঝেছ ?

ম্যানেজারকে বলেছিলেন—তুমি এই টেলিগ্রামটা পাঠাও কলকাতায়।

প্রথম টেলিগ্রাম নিজে খসড়া করে দিয়েছিলেন—বউমা এবং ছেলেদের নিয়ে অবিলম্বে

এস, আমি অসুস্থ—রত্নেশ্বর।

ম্যানেজার চলে যাচ্ছিলেন রত্নেশ্বর হঠাৎ তাঁকে ডেকে বলেছিলেন—দাঁড়াও হে। শুনে যাও।

ব'লে একখানা নাম ছাপানো কাগজ টেনে নিয়ে তাতে কিছু লিখে ম্যানেজারের হাতে দিতে গিয়েও দেন নি। কাগজখানাকে সামনে রেখে তার একটা নকল ক'রে নিয়ে বলেছিলেন —"একখানা সদরের উকীলের কাছে পাঠিয়ে দাও। একখানা তোমার হাতে রইল। যদি আমার রোগ কঠিন হয় তা হ'লে এই নির্দেশমত কাজ করবে। বুঝেছ?"

কাগজখানায় লেখা ছিল—"অগ্ন হইতে আমার জীবিতকালের শেষক্ষণ পর্যন্ত রায়বাড়ীর সমুদয় এস্টেট ইত্যাদি সমস্তই আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান দেবেশ্বর রায়ের হুকুমমত এবং তাঁহার সহিসাবুদে চলিতে থাকিবে। ব্যাঙ্কের কার্যাদি বন্ধ থাকিবে। আদায়ী খাজনা ইত্যাদি ও সিন্দুকে মজুত অর্থ হইতে ব্যয়াদি নির্বাহ হইবেক। সিন্দুকে যাহা মজুদ আছে তাহা গত কালকার রোকড়ের হিসাবের মধ্যে দৃষ্ট হইবেক। তাহার পাশে আমি সহি দিয়াছি। ইহাতে অপর কোন ব্যক্তির অর্থাৎ আমার অপর দুই পুত্রের কোন প্রকার আপত্তি চলিবে না। দেবেশ্বরের সকল কৃতকার্য আমার কৃতকার্যের তুল্য বলিয়া গণ্য হইবেক। আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে বিছানায় বসিয়া এই পত্র লিখিলাম এবং ইহার একখণ্ড নকল সদরে আমাদের উকীলের নিকট প্রেরণ করিলাম।

ইতি রত্নেশ্বর রায়।"

শিবেশ্বর সেই কাগজখানি বড় ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—এই উনি নিজে হাতে লিখে ম্যানেজারের হাতে দিয়েছিলেন। ম্যানেজার আমাকে দিলেন পরশু উনি হুঁশ হারাবার পর। পরশু সাত দিন গেছে। মেদিনীপুরের ডাক্তার বলে গেছে জ্বর বিকার।

থেমে থেমে কথা বলছিলেন শিবেশ্বর।

দেবেশ্বর বুঝতে পারছিলেন যে, শিবেশ্বর কান্না চেপে কথা বলছে। কথাটা ঠিক। ভুল তার হয় নি। ক্ষোভে ক্রোধে তাঁর কান্না আসছিল। শিবেশ্বর জানতেন বিশ্বাস করতেন তিনিই পিতার অনুগত এবং প্রিয়তম পুত্র। দেবেশ্বরের চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল এবার।

বত্রিশ দিন পর রত্নেশ্বর রায়ের সেই জ্বরের পর পথ্য করেছিলেন—জ্বর ছেড়েছিল আটাশ দিনের দিন। বিকার কেটেছিল চব্বিশ দিনে।

বিকারের মধ্যে বার বার বলেছেন—দরজা খোল দেবেশ্বর। দেবেশ্বর! বেশ ধমক দিয়ে বলেছেন। কখনও মিনতি করে বলেছেন। তারপর বলেছেন।—ভাঙো দরজা ভাঙো আবদুল—মহাবীর, তোড়ো দরজা।

বিকার যেদিন কাটল সেদিনও ডেকেছিলেন—দেবেশ্বর! দেবেশ্বর কই? পুত্রবধূকে মাথার শিয়রে দেখে চিনতে পেরেছিলেন—বলেছিলেন, বড়বউমা! এপাশে তাকিয়ে দেখে মেজবউমাকে দেখে বলেছিলেন—মেজবউমা! শিবেশ্বরের প্রথমা স্ত্রী ইনি।—

বড় পুত্রবধূ তাড়াতাড়ি মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে ডেকেছিলেন—বাবা!

—মা! তারপরই বলেছিলেন—জোরে বল, কানে ঠিক শুনতে পাচ্ছি না।—

বড়বউমা বলেছিলেন—ছোটবউও রয়েছে; এই যে আমার পাশেই রয়েছে। বলে ছোটবউ অর্থাৎ রামেশ্বরের স্ত্রীকে শ্বশুরের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্বশুর একটু ক্ষীণ হেসে, ঘাড় নেড়ে সন্তোষ প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দু ফোঁটা জল দুই চোখের কোলে জমে উঠেছিল।

বড়বউমা আবার বলেছিলেন—পিসীমা এসেছিলেন কাশী থেকে। পরশু থেকে জ্বর কমতে শুরু করেছে দেখে কলকাতা ফিরে গেছেন। আবার আসবেন। কথা বুঝতে ভুল করেন নি রত্নেশ্বর রায়—সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন—অন্নপূর্ণা এসেছিল!

—কি কষ্ট হচ্ছে বাবা? বোধ হয় চোখের জল দেখেই বড়বউমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কথাটা—

—কষ্ট? বুঝতে পারছি না। একটু ভেবে নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন—বড় দুর্বল মনে হচ্ছে!

—চুপ করে শুয়ে থাকুন। বড় দুর্বলই হয়েছেন যে!

—কদিন হল আজ?

—চব্বিশ দিন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তোমরা কবে এলে?

—আজ আঠার দিন হয়ে গেল বাবা।

—দেবেশ্বর? সে?

—এসেছেন। ওই যে—ওই বারান্দায়, আসছেন বোধ হয়।

সত্যিই বারান্দায় পায়ের শব্দ উঠছিল, সে শব্দ রত্নেশ্বর রায় শুনতে পান নি। দেবেশ্বর শিবেশ্বর রামেশ্বর তিন ভাই—খবর পেয়ে বারান্দা ধরে ঘরে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

বড়বউ ইসারা করে ডেকেছিলেন স্বামীকে—এস।—

দেবেশ্বর দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। রত্নেশ্বর দেবেশ্বরকেই বলেছিলেন—এসেছ?—

দেবেশ্বর চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছিলেন। এর উত্তর দিতে তিনি পারেন নি। খুঁজে পান নি। তবে তিন ভাইয়ের চোখই জলে ভরে উঠেছিল। এরই মধ্যে ডাক্তার এসে পড়ে সবিনয়ে মৃদুস্বরে বলেছিলেন—ওঁর এখন বিশ্রাম দরকার বড়বাবু!

বড়বাবু দেবেশ্বর। দেবেশ্বর বলেছিলেন—হ্যাঁ। নিশ্চয়। তবে ওঁকে বলে যেতে হবে। না হলে—

বড়বউ উমা বলেছিলেন—জোরে বলো একটু—কানে ঠিক শুনতে পাচ্ছেন না।

দেবেশ্বর ঝুঁকে পড়ে বলেছিলেন—ডাক্তার বলছেন আপনার এখন বিশ্রাম দরকার।

রত্নেশ্বর রায় ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলেন, হ্যাঁ।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন—আর কিছু হবে না। হতে দেরি আছে।

বলে গেছে আমাকে।

সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন দেবেশ্বর, তাঁর সঙ্গে অন্য ভাই এবং বউয়েরাও।

রত্নেশ্বর রায় বলেছিলেন—তোমার মা। তোমার মা সারা অসুখটা ওই ঘরে আমার সামনে বসে থেকেছে। এই তো সে গেল। বলে গেল—আমি এবার চল্লাম। এখন আসতে তোমার দেরি আছে কিছুদিন। ভাল হয়ে গেলে এবার।

*   *   *

বত্রিশ দিনের দিন পথ্য পেয়েছিলেন। সেদিন অন্নপূর্ণা দেবী কলকাতা থেকে এসেছিলেন কীর্তিহাট। যাবার সময় তাঁর দেবু ভাইপোকে বলে গিয়েছিলেন—তুই যেন এখনই দাদাকে ফেলে কলকাতা চলে যাস নি দেবু।

দেবেশ্বর হেসেছিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—চলে যাব এটা তোমরা ভাইবোনে ধরেই নিয়েছ পিসী?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্নপূর্ণা বলেছিলেন—হ্যাঁ, দাদা বলছিলেন।

—সে তুমি বলতেই আমি বুঝেছি।

—না, শুধু উনি বলেন নি—আমিও বলছি। আমি তোকে জানি। তোর মত নেমকহারাম আর দুটি নেই। অত্যন্ত স্বার্থপর।

দেবেশ্বর হেসে বলেছিলেন—হ্যাঁ, ওটা আমি মানি। তবে আমার স্বার্থবোধ একটু ভিন্ন রকমের পিসী। স্বার্থ আমার কাছে selfishness যাকে বলে তাও বটে, আবার ওইটের মধ্যেই আমার আসল মানে আসল চেহারা যাকে বলে তাও বটে। তবে এখন যাব না, অন্তত উনি একটু সেরে না ওঠা পর্যন্ত না। এ তোমাকে কথা দিলাম।

কথাটা শুনে খুশী হয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়। ছেলেকে বলেছিলেন—অন্নপূর্ণা আমাকে সব বলেছে। আমি শুনে সুখী হয়েছি। একটা পাওয়ার অব এ্যাটর্নী রেজেষ্ট্রী করে দিতে চাই তোমার নামে। আমাকে তোমরা খালাস দাও। আর—

একটু চুপ করে থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—আমি বাপ তুমি ছেলে। আমি যা চাই তা তুমি জান। কিন্তু তা বলে তাই নিয়ে তোমাকে কষ্ট আমি দেব না, দিতে চাইনে। শুধু আমার অনুরোধ—ভোগকে ব্যভিচার করো না। মদ যদি খাও বা না খেয়ে থাকতে নাই পার—খাওয়ার যদি দোষ আছে মনে নাই হয় তোমার তবে খেয়ো। আমার বাবা খেতেন, পিতামহ খেতেন—তাঁরাও। মানে সোফিয়া বাঈকে আমি মায়ের মতই দেখেছি—শেষ কালটায়। আমার মা—তাঁর হাতেই বাবার সেবার ভার দিয়ে মারা গিয়েছেলেন। কিন্তু ওই মদ যেন তোমাকে না খায়, আর ভোগকে ব্যভিচার করে তুল না।—

দেবেশ্বর খাড়া হয়ে উঠেছিলেন, মুখে কিছু বলেন নি।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—জমিদারী চালাবার ব্যবস্থা তুমি যেমন ভাল বুঝবে করবে—তাতে আমি কোন আপত্তি করব না। একটু সারলেই আমার ইচ্ছে পুরী গিয়ে আশ্বিন মাসটা

থেকে শরীর সেরে, একবার তীর্থও দর্শন করব। ইংরেজের দৌলতে তীর্থভ্রমণে আর কষ্ট নেই —যার যেমন বিত্তের সাধ্য সে তেমনি আরামে যেতে পারে। শিবেশ্বর তোমার কাছে থাকবে, রামেশ্বর এবং ছোট বউমাকে নিয়ে আমি বরং যাব, কি বল ?—

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী থেকে চমৎকার একখানা 'ভারত দর্শন' নামে ভ্রমণবৃত্তান্ত রচিত হতে পারত। সুন্দর বর্ণনা তাঁর। হয়তো ঐরকম ইচ্ছে তাঁর ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে পরিণত হয় নি। পুরীতে মাস দুয়েক থেকে পুরী থেকে, দক্ষিণে মাদ্রাজ হয়ে রামেশ্বরম এবং ফেরবার সময় ভারতের পশ্চিম উপকূল হয়ে দ্বারকা, সেখান থেকে রাজস্থান, পাঞ্জাব, চিতোরগড়, জ্বালামুখী হয়ে কুরুক্ষেত্র, সাবিত্রী, দিল্লী, আগ্রা, বৃন্দাবন এসে সেখানে কিছুদিন থেকে বাড়ী ফিরেছিলেন এক বৎসর পর। এর মধ্যে প্রতিটি স্থানে তাঁর কাছে পত্র গেছে—এক কর্মচারীদের লেখা পত্র ছাড়া অন্য কোন পত্র তিনি খোলেন নি পড়েন নি। এক বৎসর পর যখন তিনি ফিরলেন—তখন তাঁর কাছে শিবেশ্বরের লেখা খামের চিঠি বারো-চৌদ্দখানা, না-খোলা অবস্থায় তাঁর ব্যাগে বন্ধ ছিল। কর্মচারীদের চিঠিতে সংসারের পরিজনদের কুশলেই তিনি তুষ্ট ছিলেন—তার বেশী কিছু চান নি।

যেদিন ফিরেছিলেন সেদিন কীর্তিহাটে উৎসব হয়েছিল।

হাসলে সুরেশ্বর।—

দেবেশ্বর রায় এ উৎসবের পরিকল্পনা করেছিলেন।

সে উৎসব খাঁটি সাহেবী কায়দায়। কাঁসাইয়ের ঘাট পর্যন্ত এসেছিলেন পালকিতে। তারপর কাঁসাইয়ের ঘাট থেকে ল্যাণ্ডো-গাড়ীতে। বাপের অনুপস্থিতিতে এ-গাড়ী এবং এক-জোড়া বাদামী রংয়ের ঘোড়া কিনেছিলেন দেবেশ্বর রায়।

ঘাট থেকে সেই গাড়ীতে চড়িয়ে বাপের সামনের সিটে ছোট দুই ভাইকে বসিয়ে নিজে কোচবক্সে বসে ঘোড়ার রাশ ধরে চালিয়ে গ্রামে ঢুকেছিলেন।

রায়বাহাদুর গাড়ীতে উঠতে গিয়ে পাদানীতে পা রেখে থমকে গিছলেন ; বলেছিলেন—কই যজ্ঞেশ্বর কোথায় ? সে আসে নি ? অসুখ-বিসুখ করে নি তো ?

বড় নাতিকে তিনি প্রাণের তুল্য ভালবাসতেন। বয়স তখন ষোল হয়েছে। তাকে তিনি ওই ঘাটেই প্রত্যাশা করেছিলেন এবং তাকে তাঁর পাশে বসিয়ে নিয়ে যাবেন ভাবছিলেন। দেবেশ্বর বলেছিলেন—না, তাকে আনি নি। কারণ যোগেশ্বর ধনেশ্বর জগদীশ্বর এদের তিনজনকেও তা হলে আনতে হত। ওটা ঠিক আমি পছন্দ করি না। যজ্ঞেশ্বর আসবে আর ওরা বাড়ীতে পড়ে থাকবে—কাঁদবে, সেটা অন্যায় হত।

বলেই তিনি বাপকে অনেকটা হাতে ধরে উঠিয়ে দিয়ে নিজে কোচবক্সে উঠে বসেছিলেন তাঁর রাশের টান পেয়েই ঘোড়া দুটো লাল কাঁকর বিছানো রাস্তার উপর চলতে শুরু করেছিল —ঘাড় বেঁকিয়ে—। দেবেশ্বরের শক্তহাতের টানে ঘাড় বেঁকিয়ে মন্থরগতিতে চলছিল তারা বাধ্য হয়ে।—দ্রুত গেলে রাস্তার দুধারের লোক রায়হুজুরকে দেখতে পাবে না।

এই গাড়ীর জন্যে গ্রামের রাস্তাকে পাকা করতে হয়েছিল। তার উপর ফটক তৈরী করে, দুদিকে কলাগাছ এবং আমের শাখা দেওয়া জলভর্তি কলসী বসিয়ে দিয়েছিলেন—রাস্তার

দুধারে খুঁটি পুতে আমের শাখা ঝুলিয়ে দিয়েই শেষ হয় নি, দুধারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন চাপরাসীদের। তারা বন্দুকের নল উপরদিকে তুলে পর পর যোলটা ফায়ার করে মালিককে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। শুধু গ্রামের লোক নয়—আশেপাশের পাঁচ-সাতখানা গ্রামের লোক রায়বাহাদুরের প্রত্যাবর্তন দেখতে নিজে থেকেই ভিড় করে জমায়েত হয়েছিল কীর্তিহাটে। সেদিনের ভাণ্ডারের খাতায় চালের খরচ দেখেছি কুড়ি মণ। তার অর্থ দু হাজার লোকের খাবার বরাদ্দ। সন্ধ্যার সময় পুড়েছিল বাজদের কারখানা।

রত্নেশ্বর রায় নিজের ডায়রীতে লিখেছেন—'ল্যাণ্ডো গাড়ীতে আরোহণ করিয়া পুষ্পমাল্য শোভিত হইয়া বাঁশ ও ফুলপাতায় নির্মিত তোরণগুলির মধ্য দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম—বন্দুকের ধ্বনি হইতে লাগিল—পথের দুই পার্শ্বে লোকজনেরা ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া আছে—এসব দেখিয়া ভালই লাগিল। বুঝিতে পারিলাম—শ্রীমান দেবেশ্বর এক বৎসরের মধ্যে এস্টেটের ভোল পাল্টাইয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত দারোয়ানদের পোশাক এবং চাপরাস দেওয়া হইয়াছে। মনে হইতেছে ইহা যেন একটি ছোটখাটো রাজ্য এবং আমিই তাহার অধীশ্বর। সমস্ত কিছুর মধ্যে আশ্চর্য একটি শৃঙ্খলা দেখিয়া বড় ভাল লাগিল। দূর হইতে রায়বাড়ীর চিলের ছাদ ও ছাদের আলসেগুলি নীল আকাশের গায়ে গ্রামের গাছপালার শ্যামশোভার ঊর্ধ্বে চিত্রবৎ শুভ্র শোভায় ঝলমল করিতেছে। বুঝিলাম—মদীয় প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে বাড়ীঘর সবই চুনকাম করানো হইয়াছে। জানালা দরজায় রঙ হইয়াছে। গাড়ী আসিয়া রায়জননী মা শ্যামাসুন্দরীর ফটকে দাঁড়াইল। আমি গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে মাটিতে পা দিয়াই বিস্মিত হইয়া গেলাম—। দেখিলাম পুরাতন ফটক নাই—তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া নূতন ফটক তৈয়ারী হইয়াছে। প্রথম প্রবেশপথেই দেখিলাম গোটা জগৎটাই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।"

ফটকটা তৈরী করিয়েছিলেন কুড়ারাম রায় নিজে। ফটকের দুই পাশে দুটো বিরাটকায় প্রহরীর মূর্তি ছিল। পঙ্কচুনের কাজকরা মূর্তিদুটো মজবুদ ছিল খুব—কিন্তু রুচিসম্পন্ন ছিল না। সেকালের নতুন তেলেঙ্গী সিপাইয়ের আদর্শে, খাটো কুর্তা হাঁটু পর্যন্ত বগলস আঁটা, টাইট পেণ্টুলান পরা মূর্তি ছিল। গোল গোল বড় বড় চোখ—তেমনি পাকানো গোঁফ; সে সব আবার রঙ লাগিয়ে মূর্তি দুটোকে আরও ভয়াল করে তোলা হয়েছিল। ছোট ছোট ছেলে-পুলেরা মূর্তি দুটো দেখলে ভয় খেতো; হয়তো বা যেসব গ্রাম্য দরিদ্র প্রজারা মনের দিক থেকে শৈশব বা বাল্যকাল অতিক্রম করে নি—তারাও জমিদার বাড়ী ঢুকবার সময় আতঙ্কিত হয়ে এখানে প্রবেশ করত।

সে দুটোকে ভেঙে ফেলা হয়েছে, তার চিহ্নমাত্র নেই। তার স্থলে দুপাশে দুটো পাথরের সিংহ বসানো হয়েছে। সামনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে থাকা ভঙ্গিতে তৈরী সিংহের মূর্তি দুটো অদ্ভুত। রত্নেশ্বর এ ধরনের বা এ গড়নের পাথরের ছোট ছোট সিংহ উড়িষ্যায় দেখেছেন। এ দুটো দেখতে অবিকল সেই রকম হলেও আকারে বেশ বড়; অন্তত নিচের দিকে হাত তিনেক উঁচু পাথরের থামের উপর বসিয়ে অনেক বেশী উঁচু করে তোলা হয়েছে।

রত্নেশ্বর থমকে দাঁড়ানোর জন্তই সমস্ত কিছু যেন একটা হোঁচোট খেয়ে গেল। শুধু রায়-

বাহাদুর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সিংহ দুটোর দিকে। একবার এটাকে দেখছেন—একবার ওটাকে।

ওদিকে তখন ভিতরে নাটমন্দিরে শাঁখ বাজছে, দুটি সধবা মেয়ে পূর্ণকুম্ভ কাঁখে নিয়ে ফটকের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ম্যানেজার থেকে কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে একদিকে—মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন বাড়ীর মেয়েরা—মানে বড়বউ এবং মেজবউ—তাঁদের পিছনে রায়বাড়ীর অনেক পোষ্য। মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন পুরোহিত; মায়ের পূজক এবং পরিচারকেরা। মিনিট দুয়েক রায়বাহাদুর দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন মূর্তি দুটো। এই দু মিনিট কাল সময়ই যেন অনেক বেশী সময় বলে মনে হয়েছিল সকলের। রায়বাহাদুরের কপালে সারি সারি রেখা জেগে উঠেছে। রত্নেশ্বর রায়ের কপালখানি ছিল প্রশস্ত এবং চিত্তের সামান্য ক্ষোভে বা বিরক্তিতে পাঁচটা সমান্তরাল রেখা জেগে উঠত। চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠত তীক্ষ্ণ। তাঁর অসন্তোষ বুঝতে কারুর বাকী রইল না।—

বড়ছেলে দেবেশ্বর এসে কাছে দাঁড়ালেন, বললেন—ভিতরে চলুন। সকলে অপেক্ষা করছেন।

—এ সিংহ দুটো?

—উড়িষ্যার তৈরী। আপনি তীর্থে বেরিয়ে গেলেন পুরী থেকে—আমি ফিরবার সময় কোনারক ভুবনেশ্বর গিয়েছিলাম। সেখান থেকে স্যাণ্ডস্টোনের সিংহমূর্তি নিয়ে এসে, কলকাতায় সাহেব কোম্পানাকে বরাত দিয়ে, মার্বেলের বড় সাইজের করিয়ে আনিয়েছি। সে মূর্তি দুটো অত্যন্ত খারাপ ছিল, দেখতে ভালগার। এ দুটো ভাল হয় নি?

ছেলের মুখের দিকে তাকালেন রায়বাহাদুর। দেখলেন টকটকে ফরসা রঙ বড় বেশী লাল হয়ে উঠেছে, সম্ভবতঃ এতক্ষণ ওই শক্তিমান ঘোড়া দুটোর রাশ ক'ষে টেনে ধরে এসে পরিশ্রম বেশী হয়ে গেছে। তিনি বললেন—ভাল নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু ও মূর্তি দুটো আমাদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীবাড়ী তৈরী করাবার সময় নিজের পছন্দমত করে তৈরী করিয়েছিলেন তো!

—আছে সে দুটো। গোটাগুটি তুলবার চেষ্টা করিয়েছিলাম, কিন্তু ঠিক পারা যায় নি। কিছু কিছু ভেঙে গেছে; ফেটেও গেছে। হয় তো বা আর কিছুদিনের মধ্যেই আপনা-আপনিই ফাটত—বয়স তো কম হল না—১৭৯৫ সাল আর এটা ১৮৯৬ সাল—একশো এক বছর হয়ে গেল।

—হুঁ। বলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়; তারপর অকস্মাৎ যেন সচেতন হয়ে বলেছিলেন—চল ভিতরে চল। ব'লে পা বাড়িয়েছিলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে চারিদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজতে খুঁজতে ডেকে উঠেছিলেন—দাদু, দাদুরা কই? অর্থাৎ নাতিরা!

দেবেশ্বর বলেছিলেন—মাকে প্রণাম করুন, তারপর সকলে এসে আপনাকে প্রণাম করবে।

রত্নেশ্বর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—দীর্ঘজীবী হও।

অপর সকল নাত্তিরা এসে প্রণাম করলে তাঁকে।—এল না কেবল বড়নাতি। সে শরীর খারাপ বলে ঘরে শুয়েছিল। তার সঙ্গে দেখা করতে ঢুকলেন রত্নেশ্বর রায়—দেবেশ্বর বারান্দায় থমকে দাঁড়ালেন—বললেন—আমি এখন আসছি। দরকার হলে ডেকে পাঠাবেন।

বলেই, চলে গেলেন।

রত্নেশ্বর রায় নাত্তির ঘরে ঢুকলেন।—কি হয়েছে দাদু?

* * *

নাত্তির ঘর থেকে বের হলেন একটু গম্ভীর মুখে—তারপর রায়বাড়ীটার প্রতিটি ঘর ঘুরে দেখে এসে নিজের ঘরে ঢুকলেন। এতক্ষণে প্রথম কথা বললেন—বললেন, আমার ঘরটা তেল-রঙ না করলেই ভাল করতে। সাদার চেয়ে কোন রঙ আমার ভাল লাগে না, আর তেলরঙের একটা গন্ধ আছে। আঃ। ওটা আবার কি? ও, কেরোসিন তেলে চলা পাখা। না-না-না। ওটা বড়বাবুর ঘরে দাও। না—, বড়বাবুর আর মেজবাবুর ঘরে পাখা তো আছে। তা হলে যেখানে হোক দাও। কেরোসিন তেলে চলা পাখার বাতাস গরম হবে—একটা গন্ধ হবে গ্যাসের। আমার টানা পাখা ভাল।

পরের দিন নতুন কাছারী ঘরে এসে বসেই আবার উঠে গেলেন। এসে বসলেন দেবোত্তরের সাবেক কাছারী ঘরে, যেখানে সোমেশ্বর রায় বসতেন; সেখান থেকে উঠে নিজের শোবার ঘরে ইজিচেয়ারে বসে বললেন—এখানেই আমার বসবার জায়গা করতে বল। আর তোমাদের বড়বাবুকে গিয়ে বল, গত বছরের কাগজপত্র একটু দেখতে চাই। জমা-খরচ—রোকড়খানা আর মোটামুটি আয়ব্যয়ের হিসেবটা।

তিনদিন পর দেবেশ্বর এসে পাশে দাঁড়ালেন।

খাতা দেখছিলেন রত্নেশ্বর রায়। মুখ তুলে বললেন—ভাবছিলাম তোমাকে ডাকতে পাঠাব। কয়েকটা খরচের ব্যাপার—

—খাতা সব দেখলেন?

—হ্যাঁ। সবই ঠিক আছে প্রায়। হ্যাঁ, তবে মামলা সেরেস্তায় কয়েকটা ডিগ্রী আদায়ের ব্যাপারে—

—আপনার যদি আপত্তি থাকে তবে ও টাকা আমি পূরণ করে দেব। বোধ হয় হাজার পনের হবে।

—হ্যাঁ। চোদ্দ হাজার পাঁচশো কয়েক টাকা কয়েক আনা কত পাই যেন। না-না। ও তুমি ঠিক করেছ বেশ করেছ।

—হ্যাঁ, মহেশ্বর দাসের উপর তিরিশটা নালিশে আমাদের সুদ আর খরচা নিয়ে বিশ হাজার টাকার ডিগ্রী হয়েছিল। সে শুনেছি উদ্ধত লোক। তা উদ্ধত একটু তো হবেই। বছরে সাড়ে তিন হাজার টাকা খাজনা দেয়, জমি অন্তত দু হাজার বিঘের কাছাকাছি। আমাদের গোমস্তাদের মাইনে দিয়ে সে রাখতে পারে। সে লোক এল কাছারীতে, আমি ডিভিশনাল কমিশনার এবং কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় পায়ের কাছে টাকার তোড়া নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করে হাত জোড় করে বললে

হুঁজুর, আমাকে বাঁচান তো বাঁচি নইলে আমাকে মরতে হবে। স্ত্রীপুত্র নিয়ে ভিক্ষে করতে হবে। আমি কি করব ; বহুলোকের সামনে ব্যাপার ; আমি ভেবে দেখবারও অবকাশ পেলাম না—টাকার তোড়াটা তুলে নিলাম। ব্যাপারটা খানিকটা জানা ছিল—বললাম, আর আমাদের কর্মচারীদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবে না তো ? খাজনা দেব না, নালিশ করে নাও গে—বলবে না তো ? বললে—তা কখনও বলি নি হুঁজুর ; কিন্তু আপনার গোমস্তা—ও তো হুঁজুর আমারই জ্ঞাতি, ওকেও আমিই হুঁজুরদের দরবারে জামীন হয়ে গোমস্তার আমলার কাজে ঢুকিয়েছিলাম। তার পরেতে উন্নতি হল—হুঁজুরদের বিশ্বাসের লোক হল—হয়ে হুঁজুর আমার মাথাতেও পা দিয়ে হাঁটতে চাইলে। চোখ রাঙাতে লাগল। কি করব হুঁজুর, আমি রাগের বশে একদিন, চামড়ার মুখ তো—বলে ফেললাম, নালিশ করে লে গা! বিনা নালিশে দোব না। বলেছিলাম—বলা বটে! আমি টাকার তোড়াটা নিয়ে সেখানেই তাকে খালাস দিয়ে এলাম। তারপর ঠিক এই ধরনের ডিক্রীর খাতক প্রজা অনেক কজন এল। তাদের সব বিভিন্ন-রকম ব্যাপার। সব ক্ষেত্রেই—

চুপ করে গেলেন দেবেশ্বর। কারণ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের সম্পত্তির সারাংশের মত কোন কোন বিশেষ ভূমি বা বাগান বা দীঘির জন্য প্রলুব্ধ হয়েছিলেন নিজে শিবেশ্বর। তা দিতে রাজী না হওয়ার জন্য শিবেশ্বরই সুকৌশলে গোমস্তাদের দিয়ে প্রজার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে নালিশ চাপিয়েছেন তাদের উপর। কথাটা কিন্তু বাপকে মুখে বলতে পারলেন না দেবেশ্বর।

রত্নেশ্বর বললেন—তোমার নোট আছে আমি দেখেছি। এবং বুঝেছি কার কথা বলতে গিয়েও তুমি পার নি। শিবেশ্বরের এই স্বভাব আমার মাথা হেঁট করে। তাই তোমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু—

একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—শিবেশ্বর কটা খরচের কথা বলেছিল,—দেখলাম তোমার নামে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে একবার পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছ—

—খাতা সব দেখেছেন তা হ'লে ?

—হ্যাঁ, দেখেছি। আরও একবার আট হাজার টাকা—

—সেটা আমাদের এস্টেটের তরফ থেকে খবরের কাগজের শেয়ার কিনেছি। আর আমার নামে নেওয়া টাকাটা—ছোট খোকা যোগেশ্বরের গবর্নেসের অপমান করেছিল যজ্ঞেশ্বর, তার দরুন তাকে ক্ষতিপূরণ বলুন, হ্যাঁ, তাই ছাড়া আর কি বলব—তাই দিয়েছি। কিন্তু সে টাকা তো আমি—

গলা পরিষ্কার করার ছলে রত্নেশ্বর একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাতে দেবেশ্বর থামেন নি—তিনি বলেছিলেন—সে টাকা পরে কলকাতা থেকে চেক ভাঙিয়ে এনে তো এস্টেটে জমা দিয়েছি।

রত্নেশ্বর এবার বললেন—কথাটার আলোচনা থাক। আমি সব শুনেছি।

রত্নেশ্বর রায় তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এক বছর। এই এক বছরের মধ্যে দেবেশ্বর এস্টেটের ভার নিয়েছিলেন—কিন্তু কলকাতার বসবাস ছাড়েন নি, ছেলেরা কলকাতার স্কুলে

পড়ে; তিনি আসা যাওয়া করতেন। থাকতেন বিবিমহলে। মেজভাই শিবেশ্বরের স্ত্রী সংসারের গৃহিণী ছিলেন। পুজোর সময় স্কুল আপিস বন্ধ; এই সময় দেবেশ্বর স্ত্রী এবং দুই ছেলেকে নিয়ে কীর্তিহাট এসেছিলেন। সঙ্গে এসেছিল এক মেমসাহেব।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, আমার বাবাকে তিনি ইংরিজী পড়াতেন, আর দেবেশ্বর রায়ের চিঠিপত্র লিখতেন। অন্ততঃ সেই পরিচয়েই মেমসাহেব এসেছিল। কিন্তু ওই পরিচয়টা ছিল নিতান্তই একটা নামাবলীর মত। কীর্তিহাটের সমাজ, বাড়ীর দেবদেবীর পুজার্চনার বাধার চেয়েও শিবেশ্বরের আপত্তি খণ্ডনের জন্যই নামাবলী তিনি পরিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটির আসল পরিচয় গোপন করবার মত সতর্ক মানুষ দেবেশ্বর ছিলেন না। মেয়েটি ছিল তাঁর অনুগৃহীতা। জীবনে দেবেশ্বর রায় অনেক ভুল করে গেছেন; কিন্তু অনুশোচনা কোনো কিছুর জন্যে করেন নি। অনুশোচনা এবার এই ভুলের জন্য করতে হয়েছিল। তিনি তাঁর জমিদারীর ঐশ্বর্য দেখাতে এনেছিলেন শ্বেতাঙ্গিনীটিকে। লর্ড বা আর্ল বা ডিউক অব কীর্তিহাটের কাস্‌ল্ এবং এস্টেটের ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য এনেছিলেন। পুজোর পরই কালীপুজো, সে সময় কীর্তিহাটে উৎসব হয়; সেবার দেবেশ্বর সে উৎসব বাড়িয়েছিলেন। তাছাড়া রেল লাইন হয়ে অবধি রায়বাড়ীর বজরাগুলো প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো মেরামত করিয়ে কাঁসাইয়ের মোহনায় পড়ে, ভাগীরথী ধরে, সুন্দরবনের শোভা দেখাবার কল্পনাও ছিল তাঁর। কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি। ভাবেন নি বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বরের বয়স পনের বছর হয়েছে এবং ঠিক এই পনের বছর বয়সে তিনি নিজে ভায়লেটের প্রেমে পড়ে রত্নেশ্বর রায়ের মত বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

সুলতা, আমার মাতামহী উমা দেবী ছিলেন মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা, তিনি নীরবে সব সহ্য করে যেতেন। স্বামীর যোগ্যা স্ত্রী নন বলে আক্ষেপ ছিল, অভিমান ছিল, অনুচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মত তার সমস্ত স্রোত, গতিবেগ অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত হত; গভীর রাত্রে কাঁদতেন তিনি। তখন স্বামী বিলিতী মদের নেশায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকতেন। বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর এ সব লক্ষ্য করেছিল। এবং তখন তাঁর কানে এসে পৌঁচেছে বাংলা দেশের নতুন আহ্বান।

স্বামী বিবেকানন্দের তখন শিকাগোতে ধর্মসম্মেলনে বিশ্বজয় হয়ে গেছে। ধনীর পুত্র যজ্ঞেশ্বর মুচী-মেথরকে, নির্ধন-দরিদ্রকে ভাই বলতে পারেন নি, কিন্তু সায়েবীয়ানার উপর, মদ্যপানের উপর একটা বিদ্বেষ জন্মেছে। ধর্মের প্রতি একটা অনুরাগ এসেছে। কিন্তু সে অনুরাগ—খানিকটা বাপের আচরণের উপর যে ক্রোধ, সেই ক্রোধ। ক্রোধ এবং ক্ষোভ কিম্বা বলতে পার যজ্ঞেশ্বর রায়ের জীবনের ভিতের পত্তন হয়েছে ওই মাল-মশলায়। নইলে চরিত্রে তিনি বিচিত্র, তার পরিচয় কিছু পেয়েছ; বলেছি অর্চনার বিয়ে প্রসঙ্গে কুইনীর বাড়ী প্রসঙ্গে। এক নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে কুটিল সন্দেহ আর ওই দিকে নিজের চরিত্রের সততার কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া অন্য কোন সততা বল, সততার সাধনা বল কিছু ছিল না। প্রথম যৌবনে অনেক দিন পর্যন্ত মদ খান নি, তারপর তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়ে দীক্ষার দোহাই দিয়ে মদ্যপান করেছেন। কয়লার ব্যবসায়ে একসময় উথলে উঠেছিলেন, বিশেষ করে গত প্রথম মহাযুদ্ধের

সময়, সে-সময় তিনি জাপানে কয়লা সরবরাহ করতেন। অর্ডার পাবার জন্ত জাপানী ফার্মের সাহেবদের নিমন্ত্রণ করতেন বাগানবাড়ীতে। সেখানে নাচগান হত। তিনিই উদ্যোগ করতেন। নারীর রূপ আর তার দেহ, এই দুটোর বিনিময়ে সব কিছুই পেতে পারে মানুষ। কিন্তু সে যজ্ঞেশ্বর রায় ১৯১৪।১৫ সালের যজ্ঞেশ্বর রায়। ১৮৯৪।৯৫ সালে যজ্ঞেশ্বর রায় আদর্শবাদী ছিলেন। দাম্ভিক আদর্শবাদী। জমিদারের ছেলে, দেবেশ্বর রায়ের বড় ছেলে, রত্নেশ্বর রায়ের প্রথম পৌত্র, তাঁর যদি দম্ভ না হবে তো হবে কার? দাম্ভিক যজ্ঞেশ্বর রায় সেদিন বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সে এই শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাটিকে সহ্য করতে পারত না। কিন্তু কলকাতায় কিছু বলবার অবকাশ পেত না। মহিলাটি সকালে একবার আসতেন— যোগেশ্বরকে ইংরিজী শেখাতেন, দেবেশ্বরের কাছে দু-চারখানা চিঠি ডিক্‌টেশন নিতেন, নিয়ে ফিরে যেতেন। দেবেশ্বর রায় তাঁর একটা ভাড়া-করা বাড়ীতে সন্ধ্যার পর গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। মদ্যপান করে গাড়ীতে বেড়ানো ছিল একটা শখ। কোন কোন দিন ডিনার খেয়ে বাড়ী ফিরতেন।

বাড়ীতে স্ত্রী উমা জেগে বসে থাকতেন, একখানি ধর্মগ্রন্থ নিয়ে। পড়েই যেতেন, পড়েই যেতেন। জীবনের কুড়িটা বৎসর ওই একখানি বই-ই তিনি পড়ে গেছেন; কতবার পড়েছেন, তার হিসেব নিজেও রাখেন নি। বইখানি শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ। যজ্ঞেশ্বর রাত্রি এগারটায়-বারোটায় উঠে এসে উঁকি মেরে দেখে যেতেন; মাকে জেগে বই খুলে বসে থাকতে দেখে শুধু বলতেন—এখনও শোও নি মা?

মা বিচিত্র হেসে বলতেন—না রে। ভাগবতের উপাখ্যানটা শেষ করে নিই, তারপর শোব।

যজ্ঞেশ্বর জানতেন: কোন উপাখ্যান পড়ছ জিজ্ঞাসা করলে মাকে বই দেখে তবে বলতে হবে, তাই আর কোন কথা না বলেই চলে যেতেন। ক্রুদ্ধ হতেন বাপের উপর এবং এই বিদেশিনীর উপর। কিন্তু বলতে কিছু পারতেন না। সুযোগ পেলেন এখানে।

সেদিন সকালে বিবিমহলে বসে দেবেশ্বর আর বিদেশিনী বসে চা খাচ্ছিলেন। কীর্তিহাটে এসে অবধি এটা হয়েছিল তাঁর নিত্যকর্ম। মেমসাহেব নিজের চায়ের কাপে চা ঢালছিলেন, দেবেশ্বরের সামনে টেবিলের উপর তাঁর চায়ের কাপে ধোঁয়া উঠছিল, তিনি অপেক্ষা করে-ছিলেন তাঁর প্রিয়পাত্রীর চায়ের জন্ত। হঠাৎ ছোট ছেলে যোগেশ্বর ছুটে এসে ঘরে ঢুকে তাঁর 'আন্টি'র হাত ধরে টেনে বলেছিলেন—আন্টি কাম অ্যাণ্ড সি, আন্টি! এ ভেরী বিগ বীয়ার।

একটা লোক ভালুক নাচাতে এসেছিল, ভালুকটা ছিল খুব বড়, সেইটে সে আন্টিকে দেখাবার আগ্রহে ছুটে এসে তার হাত ধরে টেনেছিল। আন্টিকে যোগেশ্বর ভালবাসত। যজ্ঞেশ্বরের মত তার প্রতি তার বিরাগ ছিল না।

এর পিছনে আরও একটা কারণও ছিল, সেটা দেবেশ্বর রায় বলে গেছেন। এই মহিলাটিকে দেবেশ্বর কেবল যোগেশ্বরের জন্তেই রাখেন নি, দুই ছেলেকেই ইংরিজীতে কথা বলতে শেখাবে বলে রেখেছিলেন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর গোড়া থেকেই ইংরিজীতে কাঁচা ছিলেন,

ইংরিজী তিনি ভালবাসতেন না ; মেমসাহেবও এই অবাধ্য ছাত্রটির ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু যোগেশ্বর ইংরিজী ভালবাসতেন, বলতে পারতেন চমৎকার! শুধু ইংরিজীতেই নয়, অন্ত সব বিষয়েও ভাল ছাত্র ছিলেন। 'আন্টি'কে সে এইজন্তেই ভালবাসত এবং এই জন্তই এত বড় ভালুকটা তাকে দেখাবার জন্তে ছুটে এসে তার হাত ধরে টেনেছিল। সে টানে আন্টির হাতের চায়ের কেটলীটা চায়ের কাপ থেকে সরে এসে তার পোশাকের উপর গড়িয়ে পড়েছিল, খানিকটা পায়ের উপরেও গড়িয়ে পড়েছিল।

আন্টি এটা সহ্য করতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কেটলীটা টেবিলের উপর রেখে যোগেশ্বরের গালে সজোরে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন। চড়ের জোরটা সজোর বলেও তার মাত্রা ঠিক বোঝানো যাবে ; গৌরবর্ণ রঙ রায়বংশে কুড়ারাম রায়েরও আগে থেকে বাসা বেঁধেছে ; যোগেশ্বরের গালের সুন্দর রঙের উপর মেমসাহেবের পাঁচটা আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছিল।

যোগেশ্বর আঘাত যত পেয়েছিলেন, তার থেকে মনে আহত হয়েছিলেন বেশী। তিনি গালে হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিবিমহল থেকে চলে আসছিলেন অন্দরের দিকে ; পথের উপর ওদিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরছিলেন বড় ভাই যজ্ঞেশ্বর। পরস্পরকে দেখে পরস্পরেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। যজ্ঞেশ্বর ঘোড়ার রাশ টেনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হল ? কাঁদছিস কেন রে ?

গালের হাতটা সরিয়ে আঙুলের দাগগুলো দেখিয়ে যোগেশ্বর বলেছিলেন—মারলে।

—কে ?

—আন্টি।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে যজ্ঞেশ্বর তার গালের দাগগুলো দেখে ঘোড়াটার লাগাম পথের ধারে একটা গাছের ডালে আটকে দিয়ে চাবুকটা হাতে করে হন হন করে জুতোর শব্দ তুলে বিবিমহলের ছত্রিঘরের দিকে উঠে গিয়েছিলেন। এবং রক্তচক্ষে মেমসাহেবকে প্রশ্ন করেছিলেন—যোগেশ্বরকে এমন করে মেরেছ কেন ? হোয়াই ?

চমকে গিয়েছিলেন মেমসাহেব। দেবেশ্বরও চমকে ছিলেন। কিন্তু করতে কেউ কিছু পারে নি। যজ্ঞেশ্বর নিজের হাতের চাবুক দিয়ে মেমসাহেবের পিঠে আঘাত করে বলেছিল—এইটে বুড়ো আঙুলের দাগের জন্তে, এইটে তর্জনীর দাগের জন্তে, এইটে মধ্যমার দাগের জন্তে, এইটে—

ততক্ষণে দেবেশ্বর উঠে এসে যজ্ঞেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়েছেন।

যজ্ঞেশ্বর চারবারের বার চাবুকটা তুলে আর নামান নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাবুকটা হাতে নিয়ে পিছন ফিরে যেমন হন হন করে গিয়েছিলেন তেমনিভাবেই চলে এসেছিলেন।

দেবেশ্বর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলেন, যেন পাথর হয়ে গেছেন।

এর পরের ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত। মেমসাহেব বলেছিলেন—তোমাকে এর জন্ত খেসারত দিতে হবে। আমি চলে যাচ্ছি।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—দাঁড়াও। দয়া করে আধ ঘণ্টা সবুর কর। বলেই হুকুম দিয়েছিলেন, কোচম্যানকে বল গাড়ী আনতে। যত তাড়াতাড়ি হয়।

আর একখানা কাগজে স্লিপ লিখে ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়েছিলেন, পাঁচ হাজার টাকা এখুনিই পাঠিয়ে দিন। আমার নিজের নামে খরচ পড়বে। হাওলাত লিখবেন। টাকাটা পরে দেব।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ীতে করে মেমসাহেবকে নিয়ে তিনি কলকাতা রওনা হয়ে গিয়েছেন।

* * *

এ টাকা সেই টাকা। কথাটা শিবেশ্বর তাঁকে পত্রে লিখেছিল, কিন্তু তিনি সে-সব পত্র খোলেন নি। এখানে এসে প্রথম নাতির কাছে শুনেছেন। সেই কারণে যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে যান নি দেবেশ্বর নদীর ঘাট পর্যন্ত এবং যজ্ঞেশ্বরও ঠাকুরদাকে অভ্যর্থনা জানাতে নাট-মন্দিরে নামে নি, আগের রাত্রি থেকে শরীর খারাপের অজুহাতে উপবাস করে শুয়ে ছিল। ঠাকুরদা ঘরে এলে সে কেঁদেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতে শুরু করেও বলতে পারে নি, বলেছিল—বড়কাকা তো তোমাকে লিখেছিল। তুমি তো তার উত্তর পর্যন্ত দাও নি।

ঠাকুরদা বলেছিলেন—চিঠি এক ম্যানেজারের ছাড়া আর কারুর চিঠিই খুলে পড়ি নি আমি। শুধু তোমাদের কুশলেই খুশী ছিলাম ভাই। দেবেশ্বরের বিরুদ্ধে শিবেশ্বরের অভিযোগ, শিবেশ্বরের বিরুদ্ধে দেবেশ্বরের, কি দেবেশ্বরের বিরুদ্ধে তোমার, এ সব পড়ে তীর্থযাত্রার আনন্দ, পুণ্য এসব আমি তেতো করতে চাই নি ভাই। আচ্ছা আমি শুনব সব, শিবেশ্বরের কাছে।

শিবেশ্বর মুখে কিছু বলেন নি, তাঁর লেখা না-খোলা চিঠির ভেতর থেকে সেই চিঠিখানা বের করে হাতে দিয়ে বলেছিলেন,—পড়ে দেখুন।

পড়ে দেখে খাতার খরচটায় একটা চিহ্ন দিয়ে রাখছিলেন রত্নেশ্বর রায়, কিন্তু শিবেশ্বর বলেছিলেন—টাকাটা দাদা কলকাতা থেকে এসেই শোধ করে দিয়েছেন, জমা আছে পরে। তবে আরও টাকা তিনি নিয়েছেন এবং মামলা-সেরেস্তার ডিক্রী দরুণ প্রাপ্য টাকা উনি ছেড়ে দিয়েছেন। তা সব দেখতে পাবেন খাতায়। এবং এ ছাড়া আট হাজার টাকা দিয়ে একখানা বাংলা খবরের কাগজ বের হচ্ছে, তার শেয়ার কিনেছেন। এটাও আপনাকে বিবেচনা করে দেখতে বলি। খবরের কাগজ থেকে লাভ কখনও হয় না। যারা ও থেকে লাভ করতে পারে, তাদের জাত আলাদা। আবার যেসব বড় বড় জমিদার কাগজ বের করে শখ ক'রে, লোকসান দেয়, তাঁরা হলেন বড় বড় জমিদার, জোড়াসাঁকের ঠাকুরবাড়ীর মত বড় তাঁরা।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হুঁ।

* * *

মেমসাহেবের কথাটা তিনি জানেন, শুনেছেন, এই তথ্যটুকু জানিয়ে রত্নেশ্বর রায় বললেন—ও আমি জানি, শুনেছি। ও কথা থাক। ও আলোচনা থাক। কিন্তু—তুমি আট হাজার টাকা দিয়ে খবরের কাগজের শেয়ার কিনেছ কেন?

—আপনার আপত্তি হবে এটা ঠিক বুঝতে পারি নি আমি। আমাদের দেশে ইংরেজ রাজা হয়ে বসে আছে, থাকল, কিন্তু চিরকালের জন্ম নয়। হতেও পারে না। তাছাড়া প্রজারও বলবার কথা থাকতে পারে। থাকতে পারে নয়, থাকেও। আমার এক বন্ধুর

কাগজ, কাগজ ভালই চলে ; হঠাৎ একটা মামলায় পড়েছিল বলেই শেয়ার বিক্রী করলে। সেটা কিনেছি আমি।

—কিন্তু পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় আমরা, জমিদারেরা বন্দোবস্তের শর্ত অনুযায়ী স্বীকার করেছি—

—আমি জানি সে সব। তারপর অনেক কাল চলে গেছে। জমিদারদের অধীনে রায়তদের সঙ্গে সাবেক টেনেন্সী এ্যাক্টের কত বদল হল। জমিদারদের ক্ষমতা কত খর্ব হয়ে গেল। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের পর পত্তনী আইন হল। সুতরাং কোন শর্তই চিরস্থায়ী নয়। তাছাড়া আমার জন্তেই তার পুরনো সাপ্তাহিক কাগজখানা উঠে গেল।

—তার মানে ?

—আমি কয়েকটা লেখা লিখেছিলাম। যার জন্তে তার কাগজ গবর্নমেণ্টের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিল। আমি এখানকার রাজকর্মচারীদের বিশেষ করে ব্যবসাদার ইংরেজদের কঠিন সমালোচনা করেছিলাম। বলতে গেলে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের হুকুমেই দেশ চলে। ইংলিশম্যান স্টেটসম্যান মারফতে হুকুম তৈরী করে। বিলেত থেকে তাই পাস হয়ে আসে। আমাদের কাগজের মধ্যে বেঙ্গলী আর অমৃতবাজার। বেঙ্গলীর সুরেনবাবুর সঙ্গে আমার খুব বনে না। অমৃতবাজারে মতিলালবাবু, শিশিরবাবু আমাকে ভালবাসেন, আমিও শ্রদ্ধা করি ওঁদের, কিন্তু নিজের কাগজ না হলে অন্তত নিজের ইচ্ছেমত লেখা যায় না। আমার কয়লার ব্যবসা আজ এক বছর ধরে এক রকম অচল হয়ে রয়েছে। না থাকলে এস্টেট থেকে টাকা আমি নিতাম না। বেশ আপনার অমত যখন, তখন ও টাকাও আমি ফিরে দেব এস্টেটকে।

রত্নেশ্বর রায় বলেছিলেন—সেইটেই ভাল বলে মনে করি আমি। কারণ শিবেশ্বরের এতে আপত্তি আছে।

এ কথার উত্তর দেন নি দেবেশ্বর, কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে নতদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেছিলেন—তাহলে আমি কালই কলকাতা চলে যাব।

চমকে উঠে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কালই ?

—হ্যাঁ। বিলম্বে তো অকারণ সময় নষ্ট। আমার বিজনেসটা শুধু নামে দাঁড়িয়ে আছে, চালু করা প্রয়োজন। হয়তো কোন ল্যাণ্ড বিক্রী করে দেব, দিয়ে কাগজ বের করব, প্রিণ্টিং প্রেস করব।

—কয়লার জমি বিক্রী করবার আগে আমাকে জানিও।

—আপনি কিনবেন ?

—কিনব।

—বেশ জানাব আমি। বলে উঠে চলে গিয়েছিলেন দেবেশ্বর।

সন্ধ্যার রায়বাহাদুরের চাকর এসে তাঁকে জানিয়েছিল, কর্তা একবার হুজুরকে স্মরণ করেছেন। দেবেশ্বর হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে বসেছিলেন। চাকরটার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন—বল গে, যাচ্ছি। একটু পরে।

কিছুক্ষণ পর দেবেশ্বর এসে সামনে দাঁড়ালেন। রত্নেশ্বর বললেন—বস। একটা কথা

তোমাকে বলা প্রয়োজন। যজ্ঞেশ্বর আমার কাছে এসেছিল। সে আমায় বলে গেছে তোমায় জানাতে যে, সে তোমার সঙ্গে যেতে অনিচ্ছুক।

—অনিচ্ছুক! একটু চুপ করে থেকে বললেন—সে কথা আমাকে বললেই সে পারত।

—পারত। কিন্তু তা করে নি। আমার মনে হয় তাতে সে অন্যায় করে নি। আমি পর নই।

—না, আমি তা বলছি না। তবে তার কোন আশঙ্কার হেতু তো ছিল না, কারণ সে যখন বার্বারাকে চাবুক মেরেছিল, তখন আমি তাকে কিছু বলি নি।

—তা বল নি। তবু তার আশঙ্কা স্বাভাবিক। হয়তো তুমি এর পর তার উপর তুষ্ট থাকবে না।

—বেশ, সে এখানেই থাকতে পারে। আমি উমা আর যোগেশ্বরকে নিয়ে কলকাতায় যাব।

—ওরাও এখানে থাকলে ভাল হয় না?

—ওরাও কি কিছু বলেছে?

—হ্যাঁ, বউমারও ইচ্ছে নয় যে উনি এখান থেকে যান।

—ভাল, আমিই একলাই যাব।

বলে মাথা হেঁট করে বাপের পায়ের ধুলো নিয়ে তিনি উঠে চলে এসেছিলেন এবং কীর্তিহাট থেকে স্টেশন পর্যন্ত কয়েক ক্রোশ পথ তিনি ভোরবেলা উঠে পায়ে হেঁটে চলে এসেছিলেন। চাকরকে বলে এসেছিলেন, তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে কলকাতা ফিরতে। সকালবেলা উঠে খবরটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী জুতিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রায়বাহাদুর। সে গাড়ীও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

রায়বাহাদুর বলেছিলেন—উত্তম।

নাতিদের ডেকে বলেছিলেন—এর জন্ত আমার সম্পত্তির তোমাদের বাবার অংশ তোমাদের দিয়ে যাব। শুধু তাই নয়, তোমাদের তিন ভাগের এক ভাগ পাঁচ আনা ছ গণ্ডা দু কড়া দু ক্রান্তির বদলে ছ আনা দিয়ে যাব। বাৎসরিক ষাট হাজার টাকা আয় হলে এক আনায় প্রায় চার হাজার টাকা হবে; বিশ গুণ পণে তার দাম অন্তত আশী হাজার টাকা।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রায়বাড়ীর এক আনা সম্পত্তির আয় বছরে চার হাজার টাকা, ষোল আনায় চৌষট্টি হাজার টাকা। এর বাইরে আছে বারো বারো চব্বিশ হাজার টাকার দেবোত্তর। জমিদারী মুনাফার একসময় কুড়ি গুণ পণ ছিল স্ট্যাণ্ডার্ড দাম। একেবারে গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ডের মত ফিক্সড। গিনির দামের মত দাম তার বেড়েছে কিন্তু কমে নি কখনও। তবে স্বত্ব পত্তনী বা দরপত্তনী হলে তার দাম কম হত নিশ্চয়। রায়দের সম্পত্তির যে-অংশটা ব্যক্তিগত, তা সবটাই পত্তনী বা দরপত্তনী। জমিদারী বা পত্তনী যেটা মূল স্বত্ব—সেটা দেবতার নামে কেনা, সেটা দেবোত্তর। সেই হিসেবে রত্নেশ্বর রায় বড় নাতিকে যে বললেন—এক আনা অংশ আমি বেশী দেব, তার দাম পনের গুণো দরে হয় ষাট হাজার—দশ গুণো পণে হয় চল্লিশ হাজার; গড় করে নিলে দাঁড়াবে পঞ্চাশ হাজারে। ডি এল রায়ের

শাজাহান নাটকে আগ্রা কেল্লায় বন্দী শাজাহান হিন্দুস্থানের মসনদ আর মুকুটের লোভ দেখিয়েও মহম্মদকে পিতৃদ্রোহী করতে পারেন নি। সেটা নেহাৎ কবি-কল্পনা নাও হতে পারে। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর রায়ের ক্ষেত্রে সেটা কবি-কল্পনা বা অবাস্তব। বাবার সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করে কীর্তিহাটেই থাকতে রাজী হয়েছিলেন। এবং লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বিষয়কর্ম বুঝতে আরম্ভ করেছিলেন দাদুর কাছে।

পিতার কাছে পুত্রের মূল্য আর পুত্রের কাছে পিতার মূল্য ওই পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছে ছোট হয়ে গেল।

দেবেশ্বরের মত দুর্ভাগা আমি দেখি নি। অথবা এমন আত্মকেন্দ্রিক বা আত্মপরায়ণ রায়বংশে কেউ জন্মায় নি।

মাটির উপর মানুষ জন্মেছে বলেই মাটির দাম আছে। মাটি নিয়ে কেনা-বেচা মানুষেই করে। অনেকটা মাটি কোনরকমে দখল করে তাকে হাসিল করে তার দাম বাড়ায়। মানুষেরা এসে বসবাস করে প্রজা হয়। যে-মাটির উপর মানুষ নেই, সে-মাটির দাম নেই, তার নামও কেউ করে না, শোনে না। সেই মাটির দাম যখন মানুষের চেয়ে বেশী হয়ে ওঠে, তখন মাটি ব্যঙ্গ করে হাসে না কিন্তু মানুষের দুঃখ-দুর্গতির বাকি থাকে না।

কথাগুলো আমার নয়, দেবেশ্বর রায়ের। তিনি কথাগুলি বাপকে লিখেছিলেন, লিখেছিলেন—সংসারে লোকে দুঃখের মধ্যেও পরম সুখে থাকে, সংসারের আনন্দে। পিতা পুত্রের মুখ চাহিয়া থাকে, স্বামী স্ত্রীর মুখ চাহিয়া থাকে। আপনি অর্থমূল্যে আমার সব কাড়িয়া লইলেন। রায়বংশের চরম অপরাধ আপনি করিয়া গেলেন। বাল্যকালে আমার মনে পড়ে কালীপুজায় কলিকাতার যাত্রায় নরমেধ যজ্ঞ পালা দেখিয়াছিলাম। তাহাতে পুরাণের কোন রাজা নরকস্থ পিতার মুক্তির জন্ম নরমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্ম একটি অতি-দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে প্রচুর স্বর্ণ দিয়া লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের তিন পুত্র, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় পুত্র বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াও মুখে বলিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্র আমার প্রিয়--দিতে পারিব না, ব্রাহ্মণী কনিষ্ঠপুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, মধ্যম পুত্র পিতামাতার কথোপকথন শুনিয়া অত্যন্ত বেদনার্ত চিত্তে আমাকে তো কেহ চাহে না বলিয়া স্বেচ্ছায় রাজার লোকের নিকট নিজেকে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলন—আমি যাইব, আমার মূল্যের স্বর্ণ আমার পিতা-মাতাকে দান করুন। মনে আছে সে-পালা দেখিয়া শিবেশ্বর ক্রন্দন করিয়াছিল। বলিয়াছিল—আমাকে কেহ ভালবাসে না। আপনি আমাকে কোন মূল্য না দিয়াই আমার স্ত্রী-পুত্র সংসার সব কাড়িয়া লইলেন। মরুভূমি, যেখানে মানুষ বাস করে না, সেখানকার জমির কোন দাম নাই। মাটির দাম মানুষের জন্ম। মানুষই বেচে, মানুষই কেনে। সেই মাটির দাম মানুষের চেয়ে বেশী হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রায়বংশটাই দ্বিতীয়বার অভিশপ্ত হইল। আমি অভিশাপে বিশ্বাস করি না। আপনি করেন বলিয়াই লিখিতেছি। নারীর জন্ম সর্বনাশের অভিশাপ যদি আমা হইতে হয়, তবে সম্পত্তি এবং অর্থের জন্ম রায়বংশ সকল হীন কর্মই করিবে—ইহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। চরম অধঃপতনে নামাইয়া দিলেন। বুকের ভিতরটা

নীরেট পাথরের মত জমিয়া শক্ত হইয়া গেল। ইচ্ছা করিলে আমি মকদ্দমা করিতে পারি বা পারিব। হাইকোর্ট প্রিভি-কাউন্সিল পর্যন্তও চলিতে পারে কিন্তু তাহা আমি করিব না।

রত্নেশ্বর রায় উত্তর দিয়েছিলেন—"আমি তোমার পুত্র অপহরণ করি নাই। তুমি তোমার পিতার বক্ষে শেলাঘাত করিয়া বিরোধ করিয়াছ। অদ্যাবধি শরাঘাত করিতেছ। দেখিয়া তোমার পুত্র শিক্ষা লইয়াছে ; সে আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে মাত্র। আমি স্নেহবশতঃ তাহাকে তোমার আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছি, যতদিন বাঁচিব ততদিন করিব। ষোল বৎসর বয়সে তুমি আমাকে যে-দুঃখ দিয়াছ, তাহা অপেক্ষা সে অধিক দুঃখ দিয়াছে কি ?

উত্তরে এবার একছত্র মাত্র লিখেছিলেন দেবেশ্বর—"আমি আপনার অবাধ্য হইয়া যাহা করিয়াছিলাম, তাহার জন্য আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম—যজ্ঞেশ্বর বলিতে গেলে আমাকেই চাবুক মারিয়াছে। আপনি তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খাড়া করিলেন। এ-বিষয়ে আর আমি কোন পত্রালাপ করিব না। এইখানেই শেষ হইল।"

এরপর তিনি নতুন করে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন দিয়েছিলেন। সেই কয়লার খনির জন্য কেনা জায়গাগুলি পড়েই ছিল, অধিকাংশই যার অযোগ্য মনে হয়েছিল, তারই মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেল উৎকৃষ্ট কয়লার জমি। জায়গাটা বরাকরে। জমিদার কাশিমবাজারের রাজ-এস্টেট। তখনও রাণী স্বর্ণময়ীর আমল। দেবেশ্বর রায় আরও জায়গা সেখানে বন্দোবস্ত নিয়ে দস্তুরমত ক্লাইব স্ট্রীটে আপিস খুলে বসলেন। কালের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার আফিস কোয়ার্টারে বড় বড় বাড়ী উঠেছে, গ্যাসের আলো হয়েছে। কলকাতায় সম্পত্তির দাম বেড়ে গেছে তিনগুণ চারগুণ। দেবেশ্বর কলিয়ারী ডেভেলপমেণ্টের জন্য জানবাজারের বসতবাড়ী বন্ধক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অংশীদার যোগাড় করলেন। ওই বরাকর অঞ্চলের কয়লার খনির কাজে দুপুরুষ ধরে তারা কাজ করে আসছে। পরনে ন-হাতি ধুতি, গায়ে পিরান, কয়লার কুঠীতে প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন গরুরগাড়ীর ঠিকাদার হিসাবে। খনির মুখ থেকে কয়লা রেল-সাইডিংয়ে চালাই করবার জন্য গাড়ীর যোগান দিতেন। তা ক্রমে ক্রমে কয়লাকুঠীর—বিশেষ করে ও অঞ্চলের কয়লাকুঠীর সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাঁদের নিবিড় পরিচয়। কয়লার কুঠীতে বসে থেকে তাঁরা খনি তৈরী করবেন, চালাবেন, কলকাতায় বসে দেবেশ্বর কলকাতার আপিস চালাবেন। এই বন্দোবস্ত করেছিলেন। দেখতে দেখতে বছর-তিনেকের মধ্যে রয় এ্যাণ্ড চক্রবর্তী কোম্পানী কলকাতায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে ওই বরাকর সিমের কয়লার জন্যে।

কয়লার খনির ইতিহাস যদি খুঁজে দেখ সুলতা, তবে দেবেশ্বর রায় আর মহাদেব চক্রবর্তীর নাম খুঁজে তুমি পাবে—তার সঙ্গে পাবে বরাকরের বেগনিয়া সিমের কয়লার উল্লেখ। তার সঙ্গে ঝরিয়ায় পাবে সুরাটায় কলিয়ারীর একটা বিশেষ সিমের নাম। পশ্চিমে এডেন হয়ে বিলেত, এদিকে সিংগাপুর-হংকং পর্যন্ত জাহাজে কয়লা চালান করতে শুরু করেছিলেন। কলকাতার আপিসে সাহেব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রেখেছিলেন—কয়লার কুঠী দেখবার জন্যে সাহেব জেনারেল ম্যানেজার রেখেছিলেন ; কলকাতার বড় বড় ইংরেজ কোম্পানীর আপিসে বড়-সাহেবদের সঙ্গে বন্ধুর মত অন্তরঙ্গতা ছিল—হ্যালো চার্লি বলে হাত বাড়িয়ে দিতেন। তারাও

হেসে সবিস্ময়ে বলত—রয়। হোয়াটস দি নিউজ?

—আই থিঙ্ক ভেরী এনকারেজিং সামথিং; সো আই থট আই শুড কাম টু ইউ মাইসেলফ টু একসটেণ্ড মাই ইনভিটেশন টু এ গার্ডেন পার্টি ইন দি ইভনিং। ইউ মাস্ট কাম।

—গার্ডেন পার্টি! নচ-গার্লস উইল বি দেয়ার?

—সার্টেনলি, গার্লস উইল বি দেয়ার, বাট নট নেটিভ নচ-গার্লস দিস টাইম। এ্যাংলো গার্লস টু কীপ কম্পানি।

এইভাবেই সেকালের সমুদ্রে বাণিজ্য-তরী চলতো সুলভা। শুধু সেকালেই আর এ-দেশেই বা বলি কেন, সব কালেই সব দেশেই বোধ হয় বাণিজ্যতরী এইভাবেই চলে। সে শ্রীমন্ত সদাগরের বাপ ধনপতির আমল থেকে দেবেশ্বরের আমল পর্যন্ত।

দেবেশ্বর রায় বলতেন—শুধু বাণিজ্যতরী নয়, জীবনতরীই চলে এইভাবে। প্রকৃতির হাতছানিতে পুরুষ যেভাবে এসে জোটে, সেইভাবে জীবনের সব চলে। নারী-ভূমি-অর্থ চিরকাল টেনে আনছে। চিরকাল। তার মধ্যে নারীই প্রথম। রামায়ণে সীতা, মহাভারতে দ্রৌপদী, ট্রয়ে হেলেন, চিতোরে পদ্মিনী; দুনিয়ার যত আনটোল্ড, আনরিটন ইতিহাস এবং ইতিকথা খুঁজে দেখ, প্রতি মানুষের জীবনেই এই।

উয়োম্যান ইজ দেয়ার ইন দি ডেপ্থ। তারই জন্ম ইউ ওয়াণ্ট এ হোম। দ্যাট হোম ইজ সুইট, দি সুইটেস্ট প্লেস ইন দি ওয়ার্ল্ড ওনলি ফর হার। ইউ ওয়াণ্ট এ কিংডাম ফর হার। ইউ ওয়াণ্ট টু মেক হার এ কুইন। শী ইজ এ উইচ। সে তোমাকে মুগ্ধ করে তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। আমাদের শাস্ত্রে বলে—প্রকৃতি পুরুষের বুকে চড়ে নাচে। ওয়াণ্ডারফুল দ্যাটস হোয়াই ম্যান ফট উইথ উয়োম্যান। পুরুষ উইথ প্রকৃতি। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই পুরুষ সাধনা করে পলিগেমাস নেচারকে ডেভেলপ করেছে। তার পলিগেমাস নেচার তাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে। মাকড়সার জীবন দেখো। হ্যাভ ইউ সীন এ স্পাইডারস্ লাইফ চার্লি? ট্রাই টু সী। ভেরি ইণ্টারেস্টিং। দি ফিমেল স্পাইডার ইটস্ দি মেল স্পাইডার এ্যাজ সুন এ্যাজ দেয়ার এনজয়মেণ্ট ইজ কমপ্লিট। বাট ম্যান হ্যাজ টেকন রিভেঞ্জ। হি ইজ দি মাস্টার নাও।—তার সঙ্গে সে প্রভুত্ব পেয়েছে মাটির উপর—মেটিরিয়েলসের উপর।

চার্লি সাহেব মস্তবড় সায়েব কোম্পানীর কলকাতা আপিসের জেনারেল ম্যানেজার। ব্যবসাবুদ্ধিতে কয়লাখনির ভালমন্দতে খুব বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু এসব তার মাথায় ঢুকত না। অবাক হয়ে শুনত। হেসে উড়িয়ে দিতেও পারত না। কারণ গার্ডেন পার্টিতে মধ্যে মধ্যে মিস্টার রায় শেক্সপীয়র আবৃত্তি করতেন। গান করতেন প্রতি পার্টিতে। বাংলা, হিন্দী, এমন কি খাঁটি ইংরিজী সুরে ইংরিজী গানও গাইতেন তিনি, শোনাতেন মধ্যে মধ্যে। চার্লি মুগ্ধ হয়ে বলত—এ চার্মিং ম্যান। ওয়াণ্ডারফুল!

সে-আমলের পলিটিক্স্ তা-ও করেছেন। ইংরিজী কাগজে চিঠি লিখতেন ছদ্মনামে। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি।

* * *

কিছুদিন পর বাপ চেষ্টা করেছিলেন ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘোরাতে। কিন্তু ঘোরেন নি

তিনি। রত্নেশ্বর রায় পুত্রবধূকে নিয়ে এসেছিলেন নিজে। আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেবেশ্বর আপিসে খবর পেয়েছিলেন—বাবা এসেছেন বড় পুত্রবধূকে নিয়ে। তিনি আপিস থেকেই উধাও হয়েছিলেন। দিন-চারেক পর পুত্রবধূ বলেছিলেন—বাবা, আপনি ফিরে যান।

—তুমি ?

—আমি থাকব। একটু থেমে থেকে বলেছিলেন—যোগেশ্বরকেও নিয়ে যান। আপনার কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব।

—না মা। তোমায় আমি ফিরিয়েই নিয়ে যাব। আমার হতভাগ্য ছেলে তোমার মর্যাদা বুঝলে না, কিন্তু একদিন এর জন্ত ওকে অনুতাপ করতে হবে।

পুত্রবধূকে নিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন।

খবর পেয়ে দেবেশ্বর রায় বাগানবাড়ীর আসর ভেঙেছিলেন। দিন-তিনেক পর সকালবেলা এসেছিলেন শিবেশ্বর। সকালবেলা ভিন্ন দেবেশ্বরের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা অনিশ্চিত। আপিসে দেখা হতে পারে কিন্তু সেখানে এসব বলা যায় না। তাছাড়া এখানে দেবেশ্বর রায়ের তৃতীয় মেজাজ বের হয়। খাঁটি এক সায়েবী মেজাজ।

মোম দিয়ে মাজা ও পাকানো গোঁফে অকারণে বাঁ হাতের আঙুল অতি সন্তর্পণে বুলিয়ে কপাল কুঁচকে অন্তমনস্ক ভাবে কথা বলতেন। ছোট ছোট দু-চারটে শব্দে গড়া বাক্য। তার বেশী নয়। এবং হঠাৎ টেবিলে রাখা ব্লটিং-প্যাডের কাগজ রেখে কিছু লিখতে শুরু করে দিয়ে বলতেন—এক্সিকিউজ মি প্লিজ! কাম সাম আদার টাইম। কিম্বা আই হ্যাভ নাথিং মোর টু সে। তাই সকালেই গিছলেন শিবেশ্বর।

শিবেশ্বর অনুযোগ করে বলেছিলেন—তুমি এত বড় হৃদয়হীন তা জানতাম না। তুমি বউদির সঙ্গে দেখা করলে না ? বাবার সঙ্গে যা করলে ছিঃ!

চুপ করে থেকেছিলেন দেবেশ্বর। অর্থাৎ অনুযোগ মেনে নিয়েছিলেন, যেটা দেবেশ্বরের পক্ষে অস্বাভাবিক। একটু পর বলেছিলেন—হ্যাঁ, আমি অপরাধী। কিন্তু কি করব ? ছাট টাইর‍্যান্ট—আমাদের বাবার জীবনের যত চেপে রাখা ক্ষুব্ধ প্রকৃতিগুলো উনি আমাকে দিয়ে পৃথিবীতে এনেছেন। হি ইজ রেসপনসিবিল। শিবেশ্বর, উনি বলেন—রায়বংশের উপর অভিশাপ আছে। সেটা আমি মানি নে। কিন্তু এটা মানি যে, ওঁর সাপ্রেসড হাঙ্গার, কৃচ্ছ্রসাধনে চাপা প্রবৃত্তি খোঁচা-খাওয়া সাপের মত আমার বুকে বিষ ঢেলেছে। আমার অপরাধ জানি, তোমার বউদির কাছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় অপরাধ বাবার। আমি ভালবেসেছিলাম ভায়লেটকে। ভায়লেট অঞ্জনাপিসীর মেয়ে। তুমি জান না, আমি জানি। আমাকে অঞ্জনাপিসী ডেকে বলে গিয়েছিল মরবার আগে, দেবু, এই মেয়েটাকে তুই তোর সেবাদাসী করে রাখিস। সাহস থাকে তো বিয়ে করিস রে। ওকে বাঁচাস। নইলে মেয়েটার হাড়ির কপাট ডোমের দুর্গতি হবে। তাই হয়েছে। ওঃ, তার একটা ছেলে হয়েছিল, সেটাকে পড়াতে চেয়েছি, পড়ে নি। চাকরি করে দিয়েছি, সেখানে ক্রিমিন্যালের কাজ করেছে। ভায়লা এখন মাতাল, কুৎসিত, ওঃ শিবেশ্বর! আমি তার জন্তে দায়ী। আমি ভুলতে পারি

না। কিন্তু আসল দাবী স্বাট টাইর‍্যান্ট। কি ক্ষতি হত, বলতে পার, যদি মেয়েটা—

শিবেশ্বর উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছিলেন—এসব কথা কানে শোনাও পাপ দাদা। আমি শুনতে পারব না। একটা খবর দিয়ে যাই। বউদি তোমাকে খালাস দিয়েছেন। ভগবানকে আশ্রয় করেছেন। আমাকে আসবার সময় বললেন—ঠাকুপো, তোমার দাদাকে বলো, আমি ওঁকে খালাস দিলাম। যাতে তিনি আনন্দ পান, তাই যেন করেন। তবে নিজের দেহের যত্ন নেন। আমার দাদাশ্বশুরের রক্ষিতা সোফি বাঈয়ের কথা শুনেছি। উনি যদি কাউকে ভালবাসেন, তবে তাকেই যেন রাখেন। সে যত্নটত্ন করবে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দেবেশ্বর বলেছিলেন—না। তাহলে সেটা হবে বাড়ীর ঝিয়ের সঙ্গে ইল্লিসিট কনেকশন। সে হয় না। ঠাকুরদা সোফি বাঈকে ভালবাসতেন আগে থেকে। তাছাড়া সে কালটা ছিল আলাদা। তখন রাজা বা বড় জায়গীরদারদের বাড়ীর পাশে পোষা রাক্ষীমহল থাকত। সেকাল এটা নয়।

হেসে শিবেশ্বর বলেছিলেন—সে এখনও আছে। নেই কে বললে। তুমি তো কীর্তিহাটে বাস করলে না। আমি বাস করেছি বাবার সঙ্গে; বাবার হয়ে আমাকেই যেতে হয় এখানে-ওখানে নেমন্তন্ন রাখতে। এখনও জায়গীরদারের ছেলে ঘেরা বাগানের মধ্যে, পুকুরের ধারে কৃষ্ণলীলা করে।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—তারা বর্বর, আই হেট দেম। বলতে পার, ষোল বছর বয়সে I was mad after Violet—সুতরাং তফাৎ কি! কিন্তু তফাৎ আছে, I loved her; অঞ্জনা-পিসীর কাছে কথা দিয়েছিলাম। অঞ্জনাপিসী, বলছি তো ওকে আমাকে দিয়ে গিছল।

—বেশ তো তাকেই রাখ।

—না তা হয় না।

—কেন? নার্স সাজিয়ে রেখে দাও।

—না-না-না। সে আর ভাবা যায় না শিবেশ্বর। আমি তো তাকে নিয়ে একসঙ্গে মরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তা পারে নি। তারপর বাবা তাকে আমার দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে পিরুজদের এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন—একটা ছেলে হল। থাক, সে তুমি জান। কিন্তু এটা বোধ হয় জান না, সে ভায়লেট ইজ ওয়ার্স ঘ্যান এ স্ট্রীট গার্ল; ইভন ওয়ার্স দ্যান সোয়ান গার্লস। ছেলেটা বড় হয়েছে। তার লেখাপড়া হয় নি। তাকে চাকরি দিয়েছি, but he is a criminal—a drunkard—sometimes he is violent. সে যদি মায়ের সূত্র ধরে স্বীকৃতি পায় তবে সে আমার বুকে চেপে বসবে। আমার জন্যে আমি ভাবি নে। কিন্তু সে যদি কোন দিন কীর্তিহাটে গিয়ে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের অপমান করে, তাহলে তাকে গুলী করে মারতে হবে, ভায়লেটকে মারতে হবে, নিজে মরতে হবে।

—বেশ তাহলে আর একটা কাজ কর।

—কি?

—আবার তুমি পছন্দ করে বিয়ে কর। সে কথাও বউদি বলে দিয়েছেন। বললেন—বল না ঠাকুরপো, আমি না হয় ভাঁড়ারে খাটব, রান্নাবান্না দেখব, উনি নতুন বিয়ে করে মাথায়

করে রাখুন। ভারতচন্দ্রের ছড়া আউড়ে বললে—গঙ্গা নামে সতী তার তরঙ্গে এমনি,—

—না। তাও হয় না শিবেশ্বর। বিয়ের কাল এখনও যায় নি। চারটে-পাঁচটা-সাতটা বিয়ে করা যায়। কুলীনেরা বিশ-পঁচিশটা আজও করছে। কিন্তু যারা করে তাদের মধ্যে আমি নেই। দেশে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে, কীর্তিহাটে থেকে সেটা ঠিক বুঝতে পার না। এক বিয়ের যুগ আসছে। ব্রাহ্মধর্মের হাওয়া বাঁচিয়ে চল, দেখ নি। তার চেয়েও জোরাল হাওয়া এনে দিয়ে গেল কামারপুকুরের এক প্রায় নিরক্ষর বামুনের ছেলে। তার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপকে চমকে দিয়েছে। আমি ওই রাজার ছেলের মত কেষ্ট সেজে কীর্তিহাটে কাঁসাইয়ের পাড়ে বৃন্দাবন লীলাও করতে পারব না, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শও আঁকড়ে ধরতে পারছি না। I am doomed, শিবেশ্বর। শ্যামাকান্তের উপর যে অভিশাপ তাই হোক, আর না হয় রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের কৃচ্ছ্রসাধনের জ্বালায় জলেপুড়ে মরা প্রবৃত্তি হোক যার জন্যেই হোক, আই এ্যাম লাইক এ শুটিং স্টার। এই জ্বালা নিয়ে আমাকে কীর্তিনাশার জলে ডুবে নিভে যেতে দাও। পাপ-অভিশাপের বোঝা নিয়ে আমাকে ভেসে যেতে দাও, হারিয়ে যেতে দাও।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি।

—এগুলো তাহলে ফিরে নিয়ে যাব ?

—কি ?

—বউদিদির কোম্পানীর কাগজগুলো। তিনি তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন —ওঁর কাজে লাগাতে বলো। এ নিয়ে আমি কি করব ?

ফিরে দেন নি দেবেশ্বর, নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—বলো, নিলাম। আর বলো, আমি যেদিন একলা থাকি, শোবার থাকি শিবেশ্বর, সেদিন আমি বসে-বসে ভাবি, আমি মরে যাচ্ছি কি মরে গেছি, বড়বউ বুকের উপর নীরবে মাথা রেখে পড়ে আছে, আর তার চোখের জলে আমার মরা দেহখানার বুক ভেসে যাচ্ছে। ভাবতে ভাল লাগে, আমার এত অপরাধ সত্ত্বেও সে আমার মরামুখ ধরে বলছে—এ জন্মে পেয়েও পেলাম না, কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরেও যেন পাই তোমাকে। এবার যেন পেতে দিও। ধরা দিয়ো।

চোখ থেকে তাঁর জল গড়িয়ে পড়ছিল। শিবেশ্বর চোখে রুমাল দিয়ে উঠে চলে এসেছিলেন।

এসব কথা আমি ছোট মেজঠাকুমার কাছে শুনেছি সুলতা। মেজঠাকুমা মধ্যে মধ্যে এই গল্প বলে ছোট মেজঠাকুমাকে পতিভক্তি শেখাতেন।

ঘড়িতে ঢং-ঢং করে চারটে বাজল।

সুরেশ্বর বললে—কথা শেষ করি সুলতা। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। তবে শীতের রাত তাই ভরসা।

এরপর হঠাৎ একটা মোড় ফিরল, এর বছর দেড়েক পর। ছোট ছেলে যোগেশ্বর একদিন পালিয়ে এল কীর্তিহাট থেকে। সকালবেলা দেবেশ্বর উঠে শুনলেন, যোগেশ্বর এসে বসে আছে বলবার ঘরে। ছোট ছেলে তাঁর প্রিয় ছিল, তার সঙ্গে রুচির মিল ছিল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলে,

ইংরিজী ভাল আয়ত্ত করেছিল, চমৎকার ইংরিজী বলত, সেই কারণে বেশী ভালবাসতেন।

দেবেশ্বর উঠে কথাটা শুনেই মুখে খানিকটা জল দিয়েই হন-হন করে এসে ঢুকেছিলেন ছেলেকে দেখবার জন্ম। ছেলে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সারারাত্রি জেগে এসেছিল সে। ছেলে তখন অনেক বেড়েছে, ছোট নেই। ষোল বছরে পা দিয়েছে। কিন্তু দেবেশ্বর রায় শুধু সুকুমার লাবণ্যযুক্ত আর সুপুরুষ ছিলেন না, বলশালী পুরুষ ছিলেন, তিনি ছেলেকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন।

ছোট ছেলে যোগেশ্বর সেবার এন্ট্রান্স দেবে। সে পালিয়ে এসেছে, দাদু তাদের দুই ভাইয়ের একসঙ্গে বিয়ের আয়োজন করছেন। কিন্তু সে এখন বিয়ে করবে না। কীর্তিহাটও তার পক্ষে অসহ্য হয়েছে। মা দিন-রাত ঠাকুর নিয়ে আছে আর ভাগবত নিয়ে আছে। আপন মনে কথা বলে। লোকে বলে মাথা খারাপ হয়েছে। দাদা ঠাকুরদার সঙ্গে কাছারী করে। কাকা মামলা-সেরেস্তা দেখে, থিয়েটার করে। কাকীমার বারো মাস অসুখ। সব ভার চাকর আর ঝিয়ের। তার ভাল লাগে নি, সে পালিয়ে এসেছে।

উৎসাহিত হয়েছিলেন দেবেশ্বর রায়। পরের দিনই সমারোহ করে ছেলের পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, স্কুলে নয়, বাড়ীতে; তার জন্ম তিন-তিনজন মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন। আলমারীভর্তি বই এনে ঘর বোঝাই করে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা শান্ত এবং সংযত হয়েছিলেন দেবেশ্বর। রায়বাহাদুরের লোক এসেছিল যোগেশ্বরকে নিতে, কিন্তু দেবেশ্বর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এর পরই বাপের কাছ থেকে পেলেন শেষ আঘাত। সে দিন শিবেশ্বর এসে উপস্থিত হলেন। শিবেশ্বর মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসে, কিন্তু সে ওঠে গোয়াবাগানের বাড়ীতে। রামেশ্বর ল' পড়ে, সেও থাকে ওই বাড়ীতে। কখনও-সখনও আসে সে। কিন্তু শিবেশ্বর আসে না। এবার শিবেশ্বর এল, দেখা করতে; তাতে দেবেশ্বর রায় বিস্মিত হন নি। শুধু ভুরু কুঁচকে উঠেছিল আপনা থেকেই, কিন্তু সেটা পরম বিস্ময়ে পরিণত হল, যখন গাড়ার ভিতর থেকে শিবেশ্বরের পিছন পিছন নামলেন দেবেশ্বরের কয়লার ব্যবসায় পার্টনার। রয় এ্যাণ্ড চক্রবর্তী কোম্পানী কলিয়ারী প্রোপাইটারস ও কোল মারচেন্টদের অংশীদার মহাদেব চক্রবর্তী নিজে।

প্রায়ই আসেন চক্রবর্তী; প্রয়োজনে আসতে হয়। তাঁদেরও বাসা আছে এখানে। কিন্তু এবার শিবেশ্বরের পিছনে পিছনে কেন?

চক্রবর্তী হা-হা করে হেসে উঠে বললেন—কেমন মজাটি হল, দেখেন কেমন? মজা করবার লেগে কিছু বলি নাই আমি। হুঁ।

শিবেশ্বর এবার বললেন—বাবা যজ্ঞেশ্বরের বিয়ের ঠিক করেছেন চক্রবর্তী মশায়ের মেয়ের সঙ্গে।

চক্রবর্তী হা-হা-হা-হা শব্দে হেসে জানবাজারের বাড়ীখানা মুখরিত করে দিয়েছিলেন। রত্নেশ্বর রায় সমস্ত সম্বন্ধ পাকা করে মেয়ের বাপকে পাঠিয়েছেন, ছেলের বাপকে বলবার জন্মে।

বলেছেন—আমার উপর কথা সে বলবে না। তবু একবার বলা উচিত, বলে আসুন।

শিবেশ্বরের সঙ্গে যান আপনি। খানিকটা কৌতুকও হবে।

দেবেশ্বর স্তম্ভিতও হন নি, বিস্মিতও হন নি ; শুধু তাঁর অংশীদার এবং ভাবী বৈবাহিকের হাসির সঙ্গে গলা মিলিয়ে খানিকটা হেসেছিলেন। মত তাঁকে দিতে হয়েছিল। বেয়াইয়ের আরও দাবী ছিল, তাঁর ছোট মেয়ের সঙ্গে যোগেশ্বরের বিয়ে দেওয়ার। কিন্তু সে হয় নি। দেবেশ্বর বলেছিলেন—না-না, এমন কাজ করবেন না। এ ছেলে আমার বিয়ে দেবার মত নয়। বাজে একেবারে বাজে। তাছাড়া দুই ভাইকে দুই মেয়ে দেবেন, তারপর জামাইরা যদি একজন সামনে থেকে একজন পিছন থেকে আক্রমণ করে আপনার দফা-রফা করে, তখন যে আর বাঁচবার পথ থাকবে না। এটার না আছে জমিদারী বুদ্ধি, না আছে ব্যবসাবুদ্ধি, শুধু বই পড়ে। শুধুই বই। হয়ত বউমাকে আদরই করবে না।

শিবেশ্বর মাথা নিচু করে বসেছিলেন। মহাদেব চক্রবর্তী হা-হা করে হেসে ঘর ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। দেবেশ্বর চুপ করে গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। বেয়াইয়ের হাসি শেষ হলে তিনি বলেছিলেন—যজ্ঞেশ্বরের বিয়েতে বাবা মত দিয়েছেন, সেখানে আমার অমতের কোন কারণ নেই।

মহাদেব চক্রবর্তী চলে যাবার পর তিনি বাপকে চিঠি লিখেছিলেন—"আপনি আপনার বড় নাতির বিবাহ শেষ পর্যন্ত একটি বর্বরের গৃহে স্থির করিবেন ইহা আমি ভাবি নাই।"

পিতা উত্তরে লিখেছিলেন—"তোমার ব্যবসা আমি নিরাপদ করিয়া দিলাম। না-হইলে এই চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ তোমার সর্বস্ব উদরসাৎ করিত। মহাদেবের দুইটি কন্যা, ছোটটির সঙ্গে যোগেশ্বরের বিবাহ দিলে ভাল করিতে।"

দেবেশ্বর লিখেছিলেন—"ভারতবর্ষের ইতিহাসে গোলকুণ্ডার কথায় পড়িয়াছি, শাহজাদা ঔরংজীব গোলকুণ্ডার সুলতানের রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য গোলকুণ্ডার সুলতানের এক কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়া পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যচক্র এমনি যে, কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল আবুল হাসান নামক একজন মাতাল চরিত্রহীন মুসলমান যুবকের, গোলকুণ্ডার সিংহাসন সেই ব্যক্তিই পাইয়াছিল। অদৃষ্টে থাকিলে যজ্ঞেশ্বর একলাই চক্রবর্তীর সব কিছুর মালিক হইতে পারিবে। তবে আমি অবগত আছি যে, মহাদেব চক্রবর্তীর দাদা ভোলানাথের এক পুত্রকে সে পোষ্যপুত্র লইয়া সম্পত্তি তাহাকে দিবে। সুতরাং যোগেশ্বরকে অকারণে কয়লার কালী ঘাঁটিয়া লক্ষ্মী সন্ধান করিতে দিব না।"

ছেলের বিয়েতে তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু নিতান্তই নিমন্ত্রিতের মত যাওয়া। আগে থেকে লিখেছিলেন—তিনি বিবিমহলে থাকবেন। কারণ লিখেছিলেন যে, তাঁর খাদ্যাখাদ্যের বিচার আদৌ কড়াকড়ি নয়। রোজই মুরগী খান, অবশ্য মুরগী না হলেও যদি বা চলে, মুরগীর ডিম না হলে চলবে না। এবং একটু নিরালা হলেই ভাল হয়। বিবিমহল তাঁর পছন্দমত স্থান।

রত্নেশ্বর রায় সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন ; এমনভাবে সে ব্যবস্থা করেছিলেন যে, দেবেশ্বর রায় অভিভূত এবং স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিবিমহলে তাঁকে যিনি অভ্যর্থনা করেছিলেন, তিনি রায়বাড়ীর বড় বউঠাকরুণ উমা দেবী। দেবেশ্বর রায়ের চিরউপেক্ষিতা স্ত্রী। বড় ছেলের বিবাহ, শাশুড়ীহীন সংসারে তিনি জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, তিনিই স্বাবত কর্ত্রী ; তিনি সব ফেলে

বিবিমহলে দীর্ঘকাল—পাঁচ বছর পর স্বামীকে অভ্যর্থনা করলেন।

দেবেশ্বর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি?

—হ্যাঁ, আমি।

—বাবার হুকুম বুঝি?

—না। আমার ঠাকুরের হুকুম।

—তোমার ঠাকুর?

—হ্যাঁ, গোবিন্দজী। গোবিন্দজী বললেন যে স্বামীকে দেখ গে আগে।

—তাই বললেন? কথা বলেন নাকি তোমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ বলেন। হাত নেড়ে ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দেন। মনে-মনে, কানে-কানে বলেন।

প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছেন এই ধরিত্রীর মত সহ্যশক্তিশালিনী মেয়েটি। চাকর এই সময় ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। বড়বউ এগিয়ে গিয়ে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—বললাম না, আমাকে ডাকবি, আমি এনে দেব! কেন তুই ডিম ছাড়ালি? আমি ছাড়াব বলি নি?

দেবেশ্বর অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তুমি মুরগীর ডিম নাড়বে, ছোঁবে?

—ছোঁব না? তুমি খাবে, না ছুঁলে কি করে চলবে? ঠাকুর পই-পই করে বলে দিয়েছেন। নিজে হাতে ছাড়িয়ে খেতে দিবি। নিজে হাতে। ঘেন্না করবি নি। হ্যাঁ। বাপ রে! বলেন, স্বামীর কাজ না করলেই পাপ।

দেবেশ্বর স্তব্ধ হয়ে বসেই ছিলেন।

কিছুক্ষণ পর রায়বাহাদুর এসেছিলেন—দেবেশ্বর!

—আজ্ঞে! চমকে উঠে দেবেশ্বর চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। পিতা-পুত্রে সামনা-সামনি দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। ছেলে প্রণাম করেছিল। বাপ নীরবে হাত তুলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন— তোমার উপবাস কষ্ট হবে বলে শিবেশ্বরকে বলেছি নান্দীমুখ করবার জন্য। বুঝেছ?

—হ্যাঁ। ভালই করেছেন।

এর পর মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে রায়বাহাদুর চলে এসেছিলেন।

গভর্নমেন্টের দরবারে রায়বাহাদুর হলে কি হয়, কীর্তিহাটে রত্নেশ্বর রায় রাজা। তাঁর বড়নাতির বিবাহ। উৎসব হয়েছিল বিরাট। বিপুল সমারোহ। আলোতে, বাজীতে, বাজনায়, দানে-ধ্যানে রাজসূয় ব্যাপার, খাওয়ানো-দাওয়ানোতে চোব্যচোষ্য-লেহ্যপেয় ব্যবস্থা। ক্রমাগত অষ্টাহব্যাপী। নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার নিয়ে এলাহি কাণ্ড। অবশ্য পোষ্যপুত্র হিসেবে রত্নেশ্বরের গদীতে চড়ার সময়ের মত নয়। কিন্তু দেবেশ্বর চতুর্থ দিনে বউভাতের পরই চলে এসেছিলেন।

আসবার সময় স্ত্রীকে বলেছিলেন—আমার সঙ্গে চল।

স্ত্রী বলেছিলেন—ওরে বাপ রে, সে কি করে হবে গো! শ্বশুর কি মনে করবেন? তাছাড়া আমার ঠাকুর? ওকে ছেড়ে তো থাকতে পারব না আমি।

—আমাকে পেয়েও থাকতে পারবে না ?

—তা কি করে পারব ? অভ্যাস তো নেই।

—আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব।

—তা নিয়ে যেও না, আমি ভয়ে মরে যাব।

—না। ভয় লাগবে না। আমাকে দেখে তোমার ভয় করে ?

—না। কিন্তু তবু পারব না। ওগো, দয়া করে আমাকে নিয়ে যেও না। আমি যেমন এখানে গোবিন্দজীকে নিয়ে আছি, তেমনি থাকতে দাও। আমি মরে যাব।

তবুও হয়তো জোর করে তাঁকে নিয়ে আসতেন দেবেশ্বর ; তাঁর সংসারী হতে অবজ্ঞাতা স্ত্রীকে ফিরে পেতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, কিন্তু রায়বাহাদুর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। বললেন—তা তো পারব না দেবেশ্বর। এই কুটুম্ব-সজ্জন থাকতে থাকতে বড়বউমা যাবেন, এ শোভা হয় না। লোকে কি বলবে ? তোমার না হয় কাজের ছুতো আছে। তোমার উপরে আমি আছি। ছেলের বিয়ের সব ভার আমার উপর দিয়ে যাচ্ছ—হল, মানালো। কিন্তু তোমার মা নেই, বড়বউমা যাবেন কি বলে ?

চুপ করে রইলেন দেবেশ্বর। একটু পর বললেন—আমি ফিরে আসব নিতে ? চুকে গেলে পর ? এমন কি আমি থেকেও যেতে পারি।

একটু চুপ করে থেকে রত্নেশ্বর রায় বলেছিলেন—তুমি থাকলে আমি খুব খুশি হব এবং তোমার কল্যাণ হবে। হয়তো তোমার সঙ্গে তোমার বাপের এবং ছেলের সঙ্গে একটা আপোস হতে পারে। কিন্তু বউমাকে পাঠাবই এ বলতে পারব না। বউমাকে নিয়ে আমি ফিরে এসেছি। বউমার মাথার গোলমাল হয়েছে বলে লোকে কিন্তু আমি জানি উনি গোবিন্দকে সেবা করে সিদ্ধি পেতে চলেছেন। দেরি নেই। তাঁকে তো পাঠাতে পারব না।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—তাহলে আমি চলে যাই।

—থাকতে যখন পার, তখন থাকাটাই ভাল নয় কি ? তোমার তো অসুবিধা কিছু ঘটছে না। একরকম গুরুর আদরেই তো রাখা হয়েছে। অসুবিধা কিছু ঘটছে তো বল।

মুখ লাল হয়ে উঠেছিল দেবেশ্বরের। এবার তিনি বলেছিলেন—কিছু অসুবিধা আছে। সেটা ইচ্ছে করলেও দূর করতে পারবেন না। সমাগত প্রজাসজ্জনদের প্রহার দেখছি, দেখে যে কষ্ট পাচ্ছি, তা ঠিক সহ্য করা সম্ভবপর নয়।

—মানে ?

—মানে, শুনেছি সমস্ত মহালে নাতির বিয়েতে চাঁদা মাথট নিয়েছেন টাকায় চার আনা। তার উপর তাদের নিমন্ত্রণ করে এনে বউমাকে এবং যজ্ঞেশ্বরকে নাটমন্দিরে বসিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে নজরানা আদায় করলেন। আপনার অর্থের অভাব ছিল না তবু করলেন। এটা ঠিক আমি—।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয় নি সুলতা, কীর্তিহাট থেকে শুধু যোগেশ্বরকে নিয়েই কলকাতা এসে ছদ্মনাম দিয়ে একখানা চিঠি তিনি লিখেছিলেন, সেটা বেরিয়েছিল 'ইংলিশম্যানে'। হেডিং ছিল—"দি ড্রোনস্ অব দি সোসাইটি"। ছদ্মনামটা জানতেন রত্নেশ্বর রায়।

*　　*　　*

এরপর আর পিতাপুত্রে দেখা হয় নি। দেবেশ্বর রায় তাঁর মৃতদেহ দেখেছিলেন।

১৯০০ সাল। নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী শেষ করে টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরীতে পৌঁছেই মারা গেলেন রত্নেশ্বর রায়। খামখেয়ালী দেবেশ্বর রায় এই চার বছরে একটা নতুন পথ ধরেছিলেন। বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বরকে ডেকে কয়লার ব্যবসাতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। এবং নিজে ধীরে ধীরে সরে এসে খানিকটা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন; সেতার, এস্রাজ নিয়ে গান গেয়ে কাটাতেন, কিছুটা পলিটিক্স করেছেন; আর একখানা ভাল কাগজ করবার কল্পনা করেছেন। জীবনে যেন একটা অস্থিরতার মধ্যে পড়েছিলেন তিনি। অস্থির মানুষ চিরকাল। নিত্য প্রতিমুহূর্তে যেখানে মানুষ বদলায়, সেখানে স্থির কি বা কে বল—সুলতা। তবে কিছু কিছু মানুষের অস্থিরতা বড় প্রকট, বড় স্পষ্ট ধরা পড়ে। দেবেশ্বর রায়ের এই সময়ের অস্থিরতা যেন সেই রকম। নইলে ভাবতে পার সুলতা, দেবেশ্বর রায় দক্ষিণেশ্বর যান, বেলুড় মঠে যান। নতুন করে সংস্কৃত পড়েন। কিছুদিন মদ খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। ছোট ছেলেকে আমার বাবা যোগেশ্বর রায়কে অহরহ সঙ্গে রাখতেন। আমার বাবা তখন এনট্রান্স, এফ-এ পাস করে বি-এ পড়ছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। সবই কিছুদিনের জন্যে। কিছুদিন পর আবার পুরনো দেবেশ্বর রায়। মদের নেশায় গালে, কপালে লালচে আভা ফুটে ওঠে—চোখ লালচে এবং অর্ধ নিমীলিত হয়, মৃদু মৃদু হাসেন অথবা ঠোঁট দুটো মিলে ধনুকের মত ব্যঙ্গে বেঁকে যায়। বাড়ী ছেড়ে বাগানে গিয়ে বাসা গাড়তেন।

কারণ একটা ঘটেছিল, ভায়লেট পিক্রুসের ছেলে, যাকে এলিয়ট রোডের বাড়ী দান করেছিলেন, যে রয় এ্যাণ্ড চক্রবর্তী কোম্পানীতে চাকরি করত, সে মারা গেছে। ভায়লা মদ খেয়ে খেয়ে দুর্দান্ত মাতাল হয়ে পড়েছিল, ছেলের মৃত্যুর পর সে মধ্যে মধ্যে এসে এই বাড়ীর ফটকে এসে চেঁচাতো।

—'রয়বাবু! রয়বাবু!'

তার কণ্ঠস্বর কানে এলেই দেবেশ্বর চীৎকার করতেন—দারোয়ান, নিকাল দো, নিকাল দো। You get out—I say. Shut the gate. দারোয়ান। তারপরই চলে যেতেন বাগানবাড়ী।

এরই মধ্যে ১৯০০ সালের ডিসেম্বরে কীর্তিহাটের লোক এল চিঠি নিয়ে।

লিখেছেন শিবেশ্বর—"বাবামহাশয়ের কঠিন অসুখ, পত্রপাঠ আপনি চলিয়া আসিবেন। আপনার নাম করিয়া জ্ঞান হারাইয়াছেন। কলিকাতা লইয়া যাইবার অবস্থা নাই। একজন বড় ডাক্তার লইয়া আসিবেন। গোয়াবাগানে রামেশ্বরকে পত্র দিলাম। বিডন স্ট্রীটে যজ্ঞেশ্বরের নূতন বাটীতেও পত্র গেল। সকলকে লইয়া পত্রপাঠ চলিয়া আসিতে অন্যমত করিবেন না। এবং ইহা যেভাবে ঘটিল, তাহা অতীব দুঃখের কথা, আক্ষেপের কথা। বাবামহাশয় লাট ভবানন্দবাটীর কাছারীতে সেখানকার পুনর্বন্দি সম্পর্কে চাঁদা ধার্য করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে প্রজাদের সহিত মতান্তর ঘটে, প্রজারা সম্মুখে কিছু বলিতে পারে না কিন্তু শীতকালের রাত্রিকালে কাছারীঘরের চালে অগ্নিসংযোগ করে। ভাগ্যক্রমে

বাবামহাশয় নিরাপদে বাহিরে আসেন বটে কিন্তু শীতরাত্রে ঠাণ্ডায় জ্বরভাব হয়। সেই জ্বরভাব লইয়াই তিনি রাগ করিয়া কীর্তিহাট আসিয়াছিলেন ; প্রথমে সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন যে শীঘ্রই সারিয়া যাইবেন। কিন্তু হঠাৎ জ্বর প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।

পুঃ—হরিশ মুখার্জি রোডে অন্নপূর্ণাপিসিমাকে চিঠি দিলাম।"

বিচিত্র সংঘটন, তখন দেবেশ্বর মধুপুরে গেছেন। কলকাতায় নেই। যোগেশ্বর নিজে মধুপুর গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে এনে হাওড়ায় গাড়ী বদল করে কীর্তিহাটে গিয়ে যখন পৌঁছুলেন তখন রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুর কীর্তিহাটের রাজা—দুষ্টের দমনকর্তা, শিষ্টের শাসক বহুকীর্তিতে কীর্তিমান আর বেঁচে নেই, ভোরবেলা মারা গেছেন, শবদেহ নাটমন্দিরে মা-কালীর সম্মুখে রাখা হয়েছে। সকলে অপেক্ষা করে রয়েছেন বড়বাবুর, দেবেশ্বর রায়ের। টেলিগ্রাম এসেছে দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছুবেন, স্টেশনে ষোল বেহারার দুখানা পালকি রাখা হয়েছে।

দেবেশ্বর রায় বেহারাদের বলেছিলেন—মুখ বন্ধ করে যাবি।

—হুজুর, আগের লোকে পথের হাল বলে না দিলে পিছেকার বেহারারা—। চুপ করে গিয়েছিল তারা বড়বাবুর মুখ দেখে।

দেবেশ্বর তাদের বক্তব্য বুঝেছিলেন, আগের বেহারারা পথের অবস্থা না বলে দিলে পিছনের বেহারারা ঠিক চলতে পারবে না। তাদের সামনেটা তো বন্ধ। তিনি বলেছিলেন, তাহলে প্রো হিঁ—হিঁ প্রো হাঁকটা হাঁকবিনে।

শবদেহের পায়ের তলায় বসে দেবেশ্বর রায় গভীর স্বরে বারকয়েক ডাকলেন—বাবা! বাবা! বাবা!—

ডাকতে ডাকতে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছেলেমানুষের মত কেঁদেছিলেন বাবার পায়ের উপর মাথা রেখে।

কেউ সান্ত্বনা দিতে পারে নি। দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী উমা দেবী। তিনি সেদিন দশখানা গ্রামের লোকের সামনে স্বামীর দুই কাঁধ ধরে ডেকে বলেছিলেন—ওঠো। বড়বাবু—বড়বাবু ওঠো! ওগো, বাবা তোমাকে ক্ষমা করে গেছেন। শোন শোন, আমাকে নিজে মুখে বলে গেছেন। নিজে চিঠি লিখে দিয়ে গেছেন তোমাকে দিতে। ওঠো। আমার দিকে চেয়ে দেখ ; তোমার তো অনেক আছে গো, আমার কেবল তুমি, তুমি তাও আমাকে দাও নি। বাবা আমাকে বলতেন, ভয় কি! আমার দিকে চাও। ওঠো। বাবার শেষ কাজ করে এস। এই চিঠিখানা নাও।

চিঠিখানায় ছেলেকে শুধু ক্ষমা করেই যান নি রত্নেশ্বর রায়, ছেলের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। আরও লিখেছিলেন—হয়তো তোমার কথাই ঠিক। মাতামহ শ্যামাকান্তের অভিশাপ লইয়া যে-বিশ্বাসটা আমাদের বংশে একটা ভীতির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হয়তো একটা সংস্কার। তাহা ক্রিয়া করিয়াছে। সম্পদের শক্তির অফুরন্ত তৈলে প্রজ্বলিত অগ্নি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়াছে, তাহাকে আমরা অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি। যাই হোক, ব্যাপারটা মানুষের পক্ষে অপমানকর বটে। পাপ তো বটে। এই পাপচক্র চক্রান্ত সৃষ্টি করিয়া বংশকে পঙ্গু করিতেছে। তুমি ইহা পরিত্যাগ কর। বধূমাতাকে সমাদর কর।

জীবনের স্বাদ পাইবে। শান্তি পাইবে। কল্যাণ হইবে। পিতৃবাক্য অবহেলা করিয়ো না। ভায়লেটের মাসিক বৃত্তি এবং তাহার পুত্রের যে-কল্পাটি আছে, তাহার খরচ যেন বন্ধ না হয়।

পরিশেষে লিখেছিলেন—তুমি মদ্যপানে অভ্যস্ত। অশৌচ অবস্থায় মদ্যপান না করিলে হয়তো স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে। আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।

বিচিত্র বিষণ্ণ একটি হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল।

সুরেশ্বর বললে—এটা অবশ্য আমার কল্পনা, সুলতা। ওই দেখ সেই ছবিখানা। এই দেখ দেবেশ্বরের মুখে সেই বিষণ্ণ বিচিত্র হাসি। প্যানেলে দেখ, বাঁদিকটা কালো অন্ধকারে ঢাকা হতে হতে ফিকে হয়ে লাল হয়েছে, রাত্রির পর প্রভাত হবে, সূর্যোদয় হয় নি, লালচে আভার সবটাই এসে পড়েছে দেবেশ্বরের মুখে। কালো অন্ধকারের মধ্যে নির্বাপিত রত্নেশ্বর রায়ের চিতা। নাইন্টিনথ্ সেঞ্চুরী শেষ হয়ে গেল। দেবেশ্বর নাইনটিয়েথ সেঞ্চুরীর শেষকৃত্য করে ছুফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন। সামনেটা টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরীর একশো বছর। দেবেশ্বরের হাতে তুলি—তিনি রায়বংশে তাঁর জীবনশিল্পের পত্তন করতে চাচ্ছেন। হাতের তুলি কাঁপছে।

অজ্ঞান হয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত রায়বাহাদুর ডায়রী লিখে গেছেন। শেষ কদিনের ডায়রী অদ্ভুত সুলতা। আশ্চর্য লাগে আমার।

যেদিন রাত্রে কাছারীতে আগুন লাগল, তার আগের দিন হতে প্রজারা কাছারী আসা বন্ধ করেছিল। ব্যাপারটা পুলবন্দীর চাঁদা। নদীর ধারে ধারে বন্যা নিবারণের বাঁধ হবে—সরকার সিকি দেবেন প্রজা সিকি দেবে, জমিদার দেবেন অর্ধেক এই নিয়ম। রায়বাহাদুর বলেছেন প্রজা অর্ধেক দেবে। টাকাটা চাঁদা হিসেবে তিনি আদায় নেবেন। প্রজারা বলেছে—এই সেদিন হুজুরের পৌত্রের বিয়েতে আমরা টাকায় সিকি চাঁদা দিয়েছি আর আমরা দিতে পারব না। কয়েকদিন পর বললে দেব না। সেটা অবশ্য তাঁর সামনে নয়। গ্রামে বাইরে বাইরে। রায়বাহাদুর ডেকে প্রশ্ন করলেন—এইরকম কথা শুনছি। এ সত্যি?

কেউ উত্তর দিল না। মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু এর উত্তর না দিলে ছুটি নেই। রায়বাহাদুর উঠতে দিলেন না কাউকে।

শেষ তারা বললে—আজকের দিনটা সময় দিতে আজ্ঞে হয় হুজুর, কাল দিব উত্তর। খানিক শলাপরামর্শ করি।

ছুটি দিলেন রায়বাহাদুর। ডায়রীতে শেষ লাইন লিখেছেন—"দিনে দিনে দেশকালে কি হইতেছে? প্রজারা এই ধরনের বেয়াদপি করিতে সাহস করে।"

পরদিন সকাল থেকে গ্রামের সমস্ত পুরুষেরা অনুপস্থিত। কেউ বাড়ী নেই। সকালবেলা জল খেয়ে তাদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু কেউ এল না। ডিসেম্বর মাস, ভরাভর্তি ধান কাটার সময়, লাট ভবানন্দবাটীর চারখানা মৌজা নদীর ধারে, তার কোন গ্রামের মাঠে একটি লোক নেই। সোনার বর্ণ পাকা ধানে ভরা মাঠে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী উড়ছে, শীতের উত্তুরে বাতাসে রৌদ্রের সঙ্গে রাত্রের শিশিরভেজা নরম ধান, শুকিয়ে উঠছে সঙ্গে সঙ্গে,

গোটা মাঠ জুড়ে একটা মুড়মুড় মুড়মুড় শব্দ উঠছে।

সেইদিনই রায়বাহাদুরের হুকুমে সমস্ত গ্রামের গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া ঘরে বন্ধ রইল। ঘর থেকে বের হতে পেলে না। রাখালেরা ফিরে গেল। গ্রামের রাস্তা সরকারী খালপতিত, জমিদারের জমি, সেখানে বের হতে দেবেন না রায়বাহাদুর। বন্ধ করলেন না পানীয় জল সরকারী পুকুর থেকে। স্নান বন্ধ হল সরকারী পুকুরে। সন্ধোবেলা ঢেঁড়া পড়ল—"কাল সকালবেলা এক প্রহরের মধ্যে প্রত্যেক প্রজা'কে কাছারীতে হাজির হবার জন্য হুকুমজারি করা হচ্ছে। যে-প্রজা হাজির না হবে, তার সরকারী জমি, পুকরিণী এবং গাছপালা যা সরকারী পতিতের উপর থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারের সুবিধা ইত্যাদি বাতিল করা হবে।"

এর পরিণাম অতি ভয়ানক সুলতা। এ যে না দেখেছে সে বুঝবে না। গরু-বাছুর পথে বের হলে খোঁয়াড়ে যায়, ইচ্ছে করলে বউ-বেটী মেয়েছেলে পথে বের হলে ট্রেসপাসার হত সেকালে। পাকা ফসল মাঠে থাকত, মিলিয়ে যেত। আরও অনেক কিছু হত। তার মধ্যে ঘরে আগুন, লাঠিবাজী, ফৌজদারী নেই সুলতা। এ-ব হল আইনসম্মত শাসনবিধি। কিন্তু ততদূর অগ্রসর হতে পারেন নি রত্নেশ্বর রায়। তিনি জানতেন না যে, কাল তাঁর অজ্ঞাতসারে আরও অনেক এগিয়ে গেছে। প্রজাদের সেই কালই সেই রাত্রেই বোধ হয় খুঁচিয়ে জাগিয়ে এগিয়ে দিয়েছিল—"যা, তার চেয়ে আজ রাত্রি পোয়াবার আগেই কাছারীতে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দে। জমিদার বুঝুক তোরাও লড়তে পারিস।"

রত্নেশ্বর রায় তাঁর সেদিনের ডায়রীতে লিখেছেন—রাত্রিতে কাছারীতে আগুন লাগিল। শীতের রাত্রি, প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই। পরে যখন লোক-লস্করের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভাঙিল, তখন তাড়াতাড়ি ঘর খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ঘরখানা জ্বলিতেছে। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তৎপর ক্রুদ্ধ হইলাম। দেখিতে দেখিতে মনে পড়িল আর একবার জমিদার দে সরকার আমাকে ঘরে শিকল দিয়া প্রজা হিসাবে পুড়াইয়া মারিতে চাহিয়াছিল। রক্ষা করিয়াছিল ঠাকুরদাস। ঠাকুরদাসের কথা মনে করিয়া অনুশোচনা হইল। কাঁদিলাম। তাহার পর মনোমধ্যে চিন্তান্তরে উপনীত হইলাম। এবং চমৎকৃত হইয়া গেলাম। এবার প্রজারা জমিদারকে ঘরে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া মারিতে চাহিতেছে। আমার মত জমিদারকেও গ্রাহ্য করিল না। কাল কি এতই বদল হইয়া গেল? ইহার পর? ভবিষ্যতে কি হইবে? জমিদারবর্গের সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে। আমি চিন্তিত হইতেছি রায়বংশের জন্য। আমার অন্তে মদীয় পুত্রদের কি দশা হইবেক। দেবেশ্বর একসঙ্গে আমীর মেজাজের এবং সাহেবী মেজাজের লোক। প্রজাদের সে ঘৃণাও করে, তাহাদের দয়াও করে। শিবেশ্বর মামলাবাজ এবং শক্তি না-থাকা সত্ত্বেও জবরদস্ত জমিদার হতে চায়। রামেশ্বর কলিকাতাবিলাসী ব্রাহ্মঘেঁষা একটা অপদার্থ বিলাসী। যজ্ঞেশ্বরের সম্বন্ধে আশা করিয়াছিলাম, সে বিবাহ করিয়া শ্বশুরদের সংশ্রবে কয়লা ব্যবসায়ী হইয়া গেল। কি করিব অদ্য হইতে তাহাই চিন্তা হইল।

সে-চিন্তার মীমাংসার পূর্বেই তিনি অজ্ঞান হয়ে মারা গিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

লোকে বলেছিল—ইন্দ্রপাত হয়ে গেল।

* * *

দেবেশ্বর মুখারি করে বাড়ী ফিরে কম্বলের শয্যায় বসে ভাইদের বলেছিলেন—আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। শিবেশ্বর ভেবেছিলেন, বড় ভাই মদ খাবেন। বাপ অনুমতি দিয়ে গেছেন তাঁর শেষ চিঠিতে। চাকরকে তিনি ডেকে বলেই গিয়েছিলেন—বড়বাবুকে মাল দিবি কিন্তু যেন বেশী দিসনে। আর দোহাই বাবা, অখাদ্য-কুখাদ্য যা খায়টায় এর সঙ্গে, ধর না মুর্গীর ডিমফিম সেগুলো যেন চাইলেও দিসনে। অন্ততঃ হুকুম করলে বড়মাকে ডেকে দিস। না—বড়মা কি করবে—আমাকে ডেকে দিস অন্তত। খবরটা দিস বুঝলি!

চাকর তাঁর খাস চাকর নিমাই দাস;—সে কলকাতার মতই ট্রে-তে করে বোতল-গ্লাস-সোডা এনে নামিয়ে দিলে।

তাকিয়ে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। নিমাই চাকর তাঁর নিজের তালিম দেওয়া চাকর। সে তাঁর চাউনির অর্থ বোঝে, কথা বলবার জন্যে মুখ খুললে জানতে পারে এবার কিসের হুকুম হবে। সে তাঁর কোঁচকানো ভুরুর দিকে তাকিয়ে সভয়ে বললে—আজ্ঞে মেজবাবু বললেন—; কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দেবেশ্বর বলেছিলেন—নিয়ে যা। ও আর খাব না। আর কোনদিন আনবিনে সামনে। শোন। যদিই ভুলে গিয়ে আনতে বলি, তবে তুই মনে করিয়ে দিস। যা মাণিকবউকে বল—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসবে। অশৌচের সময় তোর হাতে জল পর্যন্ত খেতে পারব না, বুঝলি!

মাণিকবউ অর্থাৎ উমা দেবী জলের গ্লাস নিয়ে এসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—বাবা তো বলে গিছলেন খেতে তোমাকে। ফিরিয়ে দিলে কেন?

দেবেশ্বর বলেছিলেন—আর কখনও খাব না বলে।

—খাবে না? অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন উমা দেবী স্বামীর মুখের দিকে;—আর কখনও খাবে না?

—না।

—তোমাকে আমি বুঝতে পারি না। ভারী ভয় করে।

—বসো।

—বসবার কি উপায় আছে? যাই দেখি, গোবিন্দমন্দিরের কাজকর্ম আমি করি তো, এবার কাউকে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে করাতে হবে।

—কেন? সেবার যজ্ঞেশ্বরের বিয়ের সময় চব্বিশ ঘণ্টা তো আমার কাছেই থাকতে। মুর্গীর ডিম পর্যন্ত নেড়েছ—

—সেবার গোবিন্দ বলেছিলেন।

—এবার—

—না। এবার তো বলেন নি। বরং মুখ শুকিয়ে গেছে গোবিন্দর, বলছেন—বাবা চলে গেলেন আর কি আমার সেই যত্ন করবে এরা মাণিকবউ? তুমি একটু দেখো। বাবাও বলে গেছেন। কি করব বল?

অকস্মাৎ ফেটে পড়েছিলেন দেবেশ্বর।—তা হ'লে আমি কাকে নিয়ে কার সঙ্গে কথা

বলে থাকব বলতে পার ?

বিব্রত হয়ে মাণিকবউ বলেছিলেন—এ কি বিপদে পড়লাম মা ? আমাকে নিয়ে কি করবে তুমি ? না—না—না। তোমার অনেক আছে। বই আছে, গান আছে, তারপরে লোক আছে জন আছে, বিষয় আছে, ব্যাপার আছে, আমার যে গোবিন্দ ছাড়া আর-কেউ নেই—

—না—আমি আছি। আর আমি ওসব চাইনে, আমি তোমাকে চাই। তুমি বলো। যেতে পাবে না তুমি।

—না—না—না। তোমাকে আমার ভয় করে। আর আমি যে আমাকে গোবিন্দকে সঁপে দিয়েছি। তোমাকেই দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি তো নিলে না। পায়ের তলায় পড়ে কাঁদতাম—কই একদিনও তো দেখ নি। বাবা টেনে এনে এখানে গোবিন্দের হাতে দিয়ে বলেছিলেন—মা, এই ওঁর পায়ে নিজেকে ঢেলে দাও। কি করব মা! অপরাধ আমার। বিয়ে তো ও করে নি, আমি জোর করে দিয়েছি। আমি তাই আছি। সেবার গোবিন্দ বলেছিলেন—আমি বিবিমহলে তোমার সেবা করেছিলাম। এবার তো বলেন নি। আমি পারব না।

ঠিক এই মুহূর্তেই দুই ভাই এবং ম্যানেজার এত্তেলা পাঠিয়েছিলেন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলতে তাঁরা আসছেন।

শ্রাদ্ধের কথা প্রায় বাঁধা কথা ছিল সেকালে। দশ দিনে তিলকাঞ্চন সেরে রেখে ছ মাসে সপিণ্ডীকরণের সময় দানসাগর। কিন্তু কথা তা ছাড়াও ছিল। সম্পত্তির কথা। তা ছাড়া আরও একটা বড় কথা তুলেছিলেন শিবেশ্বর। হয়তো সেইটেই রায়বংশের ভবিতব্যের কথা।

শ্রাদ্ধ দানসাগর ছ' মাসে নয়—দশ দিনেই করার কথা হয়েছিল। রামেশ্বর ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত যাবেন। অনুমতি রত্নেশ্বর দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে, প্রয়োজন অনুভব করছিলেন রায়বংশের কারুর বিলেত অন্তত যাওয়া প্রয়োজন, নইলে যেন রায়বংশের সম্মান খর্ব হচ্ছে।

বিষয় তিন ভাগ করে দিয়েই গিয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়। বড় ছেলেকে ছ আনা দিয়ে গিয়েছিলেন পৌত্রদের কাছে প্রতিশ্রুতি মত। এবং নতুন প্রভিশন করে গিয়েছিলেন, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি যা পুত্রেরা পাবে তা থেকে তাঁরা তাঁদের পুত্রদের এক ধর্মান্তর গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন কারণেই বঞ্চিত করতে পারবেন না। সেই মতই ব্যবস্থা হয়েছিল। আদায়পত্র একত্রে হবে। শিবেশ্বর দেখাশুনা করবেন, তার জন্য একটা মাসোহারা পাবেন। মাসে আড়াইশো টাকা, বছরে তিন হাজার।

এর পরই শিবেশ্বর সেই কথা তুলেছিলেন, বাবাকে লাট ভবানন্দবাটীর প্রজারা একরকম পুড়িয়েই মেরেছে। ঘরে আগুন দিয়েছিল। শিকল-তালাও দিয়েছিল। জানালা ভেঙে তিনি বেরিয়েছিলেন। সেই অবস্থায় ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে মরার সঙ্গে পুড়ে মরার তফাৎ কতটুকু। আমি বলি এ পুড়ে পুড়ে মরাই হয়েছে তাঁর। এর প্রতিকার কি হবে ?

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। উত্তর চট্ ক'রে কেউ দিতে পারেন নি।

কিছুক্ষণ পর দেবেশ্বর বলেছিলেন—বাবা কি করতে চেয়েছিলেন ?

—তিনি ঠিক কিছু করেন নি। তবে—

—তবে কি ?

—ভাবছিলেন দেওয়ানীর পথে যাবেন, না ফৌজদারীর পথে যাবেন।

ম্যানেজার বললেন—ফৌজদারীর পথে একালে হাঙ্গামা অনেক, সে থানা থেকে ওপর পর্যন্ত মুখ চাপা দিতে দিতে অনেক বেগ পেতে হয়। তার ওপর কাল এমন পড়েছে যে, প্রজার দোষ এ দেখবেই না লোকে, কিছু হলে আগেভাগেই জমিদারকে দায়ী ক'রে ব'সে থাকবে।

শিবেশ্বর বলেছিলেন—তা ব'লে ভয় ক'রে ব'সে থাকলে দুদিন পর তারা মাথার উপর দিয়ে চলতে শুরু করবে। জমিদারী হয়তো ছেড়ে দিতে হবে।

দেবেশ্বর এবার বলেছিলেন—বাবা ভাবছিলেন কোন্ পথে যাবেন। আমাদের পথের ভাবনা নেই, পথ আমাদের একটি; বাবার মৃত্যুর শোধ। বাবা দেওয়ানীর পথে অবাধ্য দুর্দান্ত প্রজাকে শাসন করবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু আমরা সে ভাবব কি ক'রে ? শোধ তুলতে হলে এ চক্র যারা ক'রেছিল তার লীডার যে তার মাথাটা নিতে হবে। না হলে পিছন থেকে সাপের মত কামড়ে বিষ ঢেলে লুকিয়ে পড়ার মধ্যে আমি নেই। তবে হ্যাঁ, বাবা যদি ক্ষমা ক'রে যেতেন তাহলে আমরা চুপ ক'রে থাকতে পারতাম। অথবা এখনও যদি সে এসে গড়িয়ে পড়ে মাথাটা লুটিয়ে দেয় তবে গলায় খাঁড়া ঠেকিয়ে আমরা ক্ষমা করতে পারি। এই আমার মত। সেইটে হলে আমি খুশী হই। খুন হলে লোকে বলবে—রায়-বাহাদুরকে এমন অপমান বা দুর্দশা কিছু ক'রেছিল যার জন্যে খুন না ক'রে ছেলেদের ঝাল মেটে নি।

* * *

রায়বাড়ীতে এই সর্বনেশে মামলা ঢুকল সুরু হ'ল। এবার মামলা একতরফা নয়। এবার মামলার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল। প্রজারা লড়াই দিলে। ফৌজদারীতে মাঠে লড়াই হল, পথে হল, মোড়ল লোকটা খুন হ'ল, মামলা চলল একটার পর একটা। এক বছর ব'সে রইলেন দেবেশ্বর কীর্তিহাটে। শুধু এই জন্যেই বসে রইলেন। কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। মদ সেই ছেড়েছিলেন আর খান নি। জমিদারী নতুন ধাঁচে চালাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে শিবেশ্বরের সঙ্গে বিরোধ বাধল, তার সঙ্গে যোগ দিলেন বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর। তিনি তখন কলকাতায় ব্যবসা দেখেন শ্বশুরের সঙ্গে। অপবাদ রটল পিতৃহন্তাকে সুকৌশলে ক্ষমা করছেন দেবেশ্বর রায়। মরা বাপের উপর শোধ তুলছেন। তার কারণ তিনি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এসেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে বলতেন—যথেষ্ট হয়েছে, লোকটাকে এবার মাফ কর। অপবাদ শুনে চমকে উঠে চলে এলেন দেবেশ্বর রায়। জমিদারীর ব্যবস্থা করলেন দুভাগে ভাগ ক'রে। প্রথম অবিভাজ্য দেবোত্তর এস্টেট, তার কমন ম্যানেজার করে দিলেন শিবেশ্বর রায়কে। আর দেবোত্তরের অধীনে পত্তনীদার হিসেবে যে ব্যাপারটা বড়, এবং খাস, যা রায়বংশধরদের ব্যক্তিগত, তা ভাগ ক'রে নিয়ে নিজের অংশের মধ্যে পুরনো

কালের আচার্য দেওয়ান ম্যানেজারের পৌত্রকে ম্যানেজার রেখে কলকাতা চলে এলেন। তখন সম্পত্তিতে তাঁর অংশ সাড়ে আট আনা, রামেশ্বর বিলেত যাবার সময় তাঁর অংশের সম্পত্তি নামমাত্র মুনাফা রেখে দরপত্তনী দিয়ে গেছেন। সেটা দু ভাই-ই নিয়েছেন।

কলকাতায় ফিরে এসে নতুন মানুষ দেবেশ্বর প্রথম দিনই আপিস গিয়ে চমকে গেলেন। কলকাতার আপিসে তাঁর ঘরে তাঁর চেয়ারে বসছেন বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বর। রত্নেশ্বর মায়ের মৃত্যুর পর এই কয়েক মাসের মধ্যে পরিবর্তনটা ঘটে গেছে। ব্যবসার পার্টনার মহাদেব চক্রবর্তী যজ্ঞেশ্বরের শ্বশুর, তিনিই নাকি এ ব্যবস্থা করেছেন। আপিসের স্টাফও বদল হয়ে গেছে। সে বেয়ারা পর্যন্ত।

যজ্ঞেশ্বর বাপকে দেখে চমকে উঠেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—পাখা এখানটায় একটু বেশী পাওয়া যায় সেই জন্যে—।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—বসো তুমি। আমি বসব না। আমি চলে যাব ঘণ্টাখানেক পর।

পরদিন এসে চেপে বসে গোটা ব্যবসাটির অবস্থা দেখে তাঁর অংশের প্রাপ্য টাকা বের করে নিয়ে স্বতন্ত্র করে ব্যাঙ্কে মজুত ক'রে বড়ছেলেকে ডেকে বললেন—শোন, কোন বিজনেসের সঙ্গে আর আমি সম্পর্ক রাখব না। ইচ্ছে বিক্রী ক'রে দি, কিন্তু ভেবে দেখলাম—তুমি যখন কাজকর্ম শিখেছ এবং অর্ধেকের অংশীদার চক্রবর্তী যখন তোমার শ্বশুর, তখন ছেড়ে না দিয়ে তোমাকে দেওয়াই ভাল। কি বল?

চুপ ক'রে রইলেন যজ্ঞেশ্বর।

দেবেশ্বর বললেন—একটি শর্তে।

এবার বেশ ধীরভাবেই যজ্ঞেশ্বর বললেন—বলুন।

দেবেশ্বর বললেন—জানবাজারের বাড়ী, ব্যাঙ্কে মজুত এবং কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করা যা টাকাকড়ি আছে, এ সব এখন আমার রইল, আমার অন্তে এ সমস্ত পাবে যোগেশ্বর।

—কীর্তিহাটের সম্পত্তি—

—ওতে তো বাপের ছেলেকে বঞ্চিত করবার অধিকার নেই। সে আমি বলব না। ওতে তোমাদের দুই ভাইয়ের সমান অংশ পাওয়া উচিত, তাই পাবে।

একটু চুপ ক'রে থেকে যজ্ঞেশ্বর বলেছিলেন—বেশ, আমি তাতে সম্মত, শুধু মায়ের কোম্পানীর কাগজের অর্ধেক, যেটা আমি পাব সেটা আমাকে দিন। আপনি যেভাবে ব্যবসার রিজার্ভ ফাণ্ড তুলে নিয়েছেন তাতে ব্যবসা আমি চালাবো কিসে!

—তোমার মা থাকতেই তাঁর টাকাটা নেবে? সে টাকায় আমি কখনও হাত দিই নি।

—মায়ের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। অর্ধোন্মাদ। সে অবশ্য আপনার জন্যেই।

—থাক। তাই পাবে তুমি। দিয়ে দেব।

—আপনি কি রিটায়ার করবেন? না কীর্তিহাটে গিয়ে বসবেন?

—না। আমি এখানেই থাকব। রিটায়ার করা বলতে পার। তবে একটা কিছু অবলম্বন রাখতে হবে তো। ভাবছি বাই-উইকলি ইংরিজী খবরের কাগজ করব। কাগজের

প্রয়োজন আছে। আমার পরে ওটা যোগেশ্বর চালাবে। সে এবার বি-এতে ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। এম-এতেও তেমনি ফল করবে। আমার বড় শখ ছিল, সেটা যোগেশ্বরকে দিয়ে করে যাব।

* * *

সুরেশ্বর বললে—টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরীতে ঢুকে দেবেশ্বর রায় আর বেঁচে থাকেন নি। তারপরের কথা তুমি সবই জান সুলতা। জান না শুধু দেবেশ্বর রায়ের মৃত্যুর কথাটা। তিনি মারা গেলেন কি ভাবে। লোকে জানে জমিদারের ছেলে যে ভাবে মারা যায় সেই ভাবেই মারা গেছেন তিনি। মদ খেয়ে খেয়ে তিনি হঠাৎ একসময় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর জ্ঞান হয় নি। সেকালে বলেছিল—ব্রেন ফিবার; একালে হলে বলত সেরিব্রেল থ্রমবসিস্। সেইটুকু বললেই আমার অতীতকাল শেষ।

* * *

তখন লর্ড কার্জন ইণ্ডিয়ার ভাইসরয়। বোধ করি এত বড় কঠিন ইম্পিরিয়েলিস্ট আর এ্যারোগ্যান্ট ভারতবর্ষ-বিদ্বেষী কেউ আসে নি। অন্তত ভাইসরয় হয়ে আসে নি। চার্চিল সাহেবের আদর্শ পুরুষ লর্ড কার্জন। তার সঙ্গে লর্ড কিচেনার তখন কম্যাণ্ডার চীফ।

স্যার হেনরী ফ্লাওয়ার সেক্রেটারী অব স্টেট। এদের পায়ের চাপে গোটা ভারতবর্ষ মুমূর্ষুর মত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা সেই চিরন্তন মন্ত্র জপছে ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ। রক্ষ মাম্ জগদীশ্বরে। রক্ষ দেবী—মহাদেবী, ত্রাহি! ত্রাহি! ত্রাহি দেবী মহেশ্বরী!

নিরুত্তর আকাশ থেকে উত্তর যা আসে তা মেঘের ডাকের মধ্যে দিয়ে আসে, আকাশ কখনও কথা কয় না। ভারতবর্ষের গলায় ইংরিজী বুটের চাপটা একটু জোরালো করে হেনরী ফ্লাওয়ার নতুন পলিসি ঘোষণা করেছিলেন—

"The Government of India must always abide by the decision of the British Cabinet even when it was regarded by them as injurious to the interest of India".

এবং বাংলাদেশে তখন নতুন প্রাণের সাড়াতে ইংরেজের মুখ ভারী হয়েছে। এমন কি জমিদারদের উপরেও মেজাজ খারাপ। জমিদারেরা পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের পর আর বৃদ্ধি করে খাজনা আদায়ের এজেন্ট বা গোমস্তা থেকে দস্তুরমত বিলেতের লর্ডদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। সুযোগ পেলেই জমিদারদের উপর শাসন চালাচ্ছে। বাঙালী ইংরিজী শিখে ইংরেজের সঙ্গে টোক্কর মেরে চলে। এ তাদের সহ্য হয় না। শাসনযন্ত্রটার স্ক্রু ক্রমাগত টাইট দিতে চাইছে তারা।

দেবেশ্বর রায় এর বিরুদ্ধে লিখবার জন্ত খবরের কাগজ বের করবেন স্থির করেছিলেন। জমিদারীর মোহ তাঁকে বাঁধতে পারে নি, কয়লার ব্যবসায়ের ঐশ্বর্যও তাঁকে ভোলাতে পারে নি। তিনি নতুন জীবনে নতুন কর্মে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন।

ছোটছেলে যোগেশ্বরকে বলেছিলেন—নাই বা পড়লে এম-এ। প্রেস কিনে কাজ শুরু

কর। আমার সঙ্গে লেগে পড়।

সুরেশ্বর বললে—কিন্তু তা হ'ল না।

হঠাৎ বাধা এসে সামনে দাঁড়াল। অলঙ্ঘনীয় বাধা।

বলতে বলতে চঞ্চল হয়ে উঠল সুরেশ্বর। উঠে দাঁড়িয়ে বারকয়েক পায়চারি ক'রে সুরেশ্বর বললে—লোকে বলে এ বাধা রায়বাড়ীর সেই অলঙ্ঘনীয় অভিশাপের বাধা।

সেই ধর্মসাধনার বিকৃত পন্থায় যে অভিশাপ অর্জন করেছিলেন শ্যামাকান্ত, আর যে অভিশাপকে সম্পদের পথে কালনাগিনীকে বুকে ধরার মত ধরেছিলেন সোমেশ্বর রায়—সেই বাধা। নারীর বাধা!

লোকে অন্তত তাই বলে। শিবেশ্বর রায়ও তাই বলেছিলেন, বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর রায়ও তাই বলেছিল। এবং আরও অনেক জনেই তাই বলেছিল। বলেছিল—যে অভিসম্পাতকে রত্নেশ্বর রায় কঠোরভাবে বংশ থেকে বিদায় করেছিলেন, মুছে দিয়েছিলেন, সেই অভিসম্পাতকে দেবেশ্বর রায় ওই যোগিনীসাধনের সিদ্ধাসনের জঙ্গল থেকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এতদিন পর তাকে ছাড়তে গেলে সে ছাড়বে কেন? সে এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল।

দেবেশ্বর রায় ফিরে কলকাতায় এসেছেন শুনে তাঁর সামনে দীর্ঘদিন পরে এসে দাঁড়িয়েছিল ভায়লেট। তখন সে দুর্দান্ত মাতাল; পর পর ডাইভোর্স ক'রে তৃতীয় স্বামী নিয়ে ঘর করছে। ঘর করার অর্থ নিতান্তই একটা অর্থহীন ব্যাপার। এই হতভাগিনী মেয়েটাকে নিয়ে কতকগুলো পেশাদার দালাল শ্রেণীর জীব ব্যবসা করত মদ্য খাদ্য আর আশ্রয় দিয়ে। এলিয়ট রোডের যে বাড়ীটা রত্নেশ্বর রায় ভায়লেটের ছেলে পিক্রসকে দিয়েছিলেন, যাকে লেখাপড়া শেখাবার মাসোহারা দিতেন দেবেশ্বর রায়, সে ছেলের লেখাপড়া হয় নি, শেষ পর্যন্ত তাকে একটা চাকরি দিয়েছিলেন দেবেশ্বর রায় তাঁদের ফার্মে; ওকে তার কাজ ছিল; রায় চক্রবর্তীর কয়লা চালান যেত দেশান্তরে, সে ওকে বোম্বাইয়ের কাজ দেখত, সে ছেলে তখন মরেছে। একমাত্র কন্যাকে কোলে নিয়ে তার স্ত্রী শাশুড়ীকে বাড়ীতে ঢুকতে দিত না। সে বেড়াত পথে পথে। তখনও তার রূপ ছিল, তখনও তার দেহ ছিল; বিবাহের নামে আশ্রয় দিয়ে কয়েকটা পাষণ্ড তাকে ব্যবসার সামগ্রী করে তুলেছিল। প্রথম প্রথম হয়তো ভায়লেটের ভাল লেগেছিল কিন্তু ক্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে খুঁজেছিল একটি নিরাপদ আশ্রয়। অথবা তার অতৃপ্ত কামনা চেয়েছিল তার জীবনের প্রথম ভালবাসার মানুষকে। অথবা অভিশাপ নিজের আসন পাতবার জন্য চেয়েছিল অভিশপ্ত জনকে।

সে-কালে দেবেশ্বরের জীবনের পরিবর্তনের ঠিক মুখেই ভায়লেটের আবির্ভাব নিয়ে গবেষণার আর অন্ত ছিল না সুলতা। ছিল না বলেই তার উল্লেখ করছি।

কিন্তু আসলে প্রথমটা ছিল ব্ল্যাক মেলিংয়ের ব্যাপার। ভায়লেটের একটা মাসোহারা ছিল। সে আমলে সে মাসে চল্লিশ টাকা হিসেবে পেত এ বাড়ীর সেরেস্তার খাজাঞ্চির কাছ থেকে। কিন্তু তার বাড়ী ঢুকবার হুকুম ছিল না। টাকাটা লোক-মারফৎ পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। এবার ভায়লেটের স্বামী তাকে পাঠালে, তুই যা, বল এ টাকায় আমার কুলুচ্ছে না,

আমাকে আরও কিছু দাও। ওই এলিয়ট রোডের বাড়ী থেকে তোকে তাড়িয়ে দিলে তোর বেটার বউ, তুই থাকবি কোথায়? তোকে একটা বাড়ী দিতে বল। এতনা বড়া আদমী—a rich man. I have seen the big house—beautiful horses and couches—he must pay.

ভায়লেট ভয় করত রায়বাবুকে। ভয় করত ভালও বাসত। দুই-ই। তার ঐশ্বর্য, তার জাঁকজমক—কীর্তিহাটের প্রতাপের স্মৃতি তার মনে পড়লে সে বিহ্বল হয়ে পড়ত। সেই রায়বাবু যখন তাকে চিঠি লিখে ভালবাসার কথা জানিয়েছিল তখন তার মনে হয়েছিল যে তার নিশ্বাস বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তরুণ রায়বাবুর বক্ষলগ্না হয়ে তার ভয় সত্ত্বেও সে কেমন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। কেবলই মনে হ'ত রায়বাবু তার রায়বাবু। তার রায়বাবু!—তারপর কলকাতায় এসে কিছুদিনের মধ্যে অনেক কিছু শিখেছিল, অনেক কিছু পেয়েছিল কিন্তু ভয় তবু কাটে নি। সে ভয় আবার প্রচণ্ডতম হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করলে যেদিন রায়বাবু বললে—দাঁড়া তোকে গুলি করি, করে নিজের বুকে গুলি করে দুজনে মরবো।

সে প্রথমটা ভয় পেয়েছিল নিজের মৃত্যুর জন্য। কিন্তু তাকে ঘৃণাভরে সরিয়ে দিয়ে নিজের বুকের কাছে বন্দুকের নল লাগিয়ে রায়বাবু যখন অবলীলাক্রমে বন্দুকের ট্রিগার টেনে দিলে, তখন তার আর আতঙ্কের সীমা ছিল না।

রায়বাবু কি না পারে।

তারপর থেকে সে আর রায়বাবুর সামনে আসে নি। রায়বাবুর জন্যে বুক তার ফেটে যেত তবু সে আসতে সাহস করত না। চৌরঙ্গীর পথে কতদিন রায়বাবুর ফিটন দেখে সে লুকিয়ে পড়েছে। ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসেছে। বুকের ভিতরটায় যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে।

ছেলে মারা গেলে একবার সে এসেছিল, ছুটে এসেছিল ফ্রী স্কুল স্ট্রীট ধ'রে এই বাড়ীর ফটকে, কিন্তু ফটকেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর চোখ মুছতে মুছতে ফিরে গিয়েছিল। সাহস হয় নি। এতকাল পর, তেইশ বছর পর তাকে প্রায় চাবুক মেরে পাঠালে তার নতুন স্বামী মিস্টার জোনস্!

জোনসও তার সঙ্গে এসেছিল প্রথম দিন। এবং রায়বাবুর দেখা পেতে এতটুক ঝামেলা পোয়াতে হয় নি। একেবারে সামনেই পেয়েছিল তাঁকে। দেবেশ্বর রায় বসেছিলেন বাগানের মধ্যে সেই বেদীটার উপর, যে বেদীটার উপর বসে বহুকাল আগে শ্যামাকান্ত স্নানযাত্রার দিন পশ্চিম আকাশে কালো মেঘের উঁকি দেখে মেঘমল্লার গেয়েছিলেন। সেই মার্বেলের বেদীটার উপর ব'সে দেবেশ্বর কথা বলছিলেন যোগেশ্বরের সঙ্গে।

হঠাৎ এসে দাঁড়াল তারা।

—Excuse me, sir—

দেবেশ্বর ফিরে তাকালেন। মুখ তাঁর লাল হয়ে উঠল। ভায়লেট তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে।

দেবেশ্বর ছেলেকে বলেছিলেন—তুমি ভিতরে যাও যোগেশ্বর। হ্যাঁ, আর ফটকের

দারোয়ানটাকে এক্ষুনি ডেকে ডিসমিস্ করে দাও।

যোগেশ্বর চলে গিয়েছিলেন। দেবেশ্বর জোনসকে বলেছিলেন—Yes, what can I do for you, well before that—who are you please.—Good evening sir—my name is Albert jones—and let me introduce Violet Mrs. Jones...

—I see—she is Mrs. Jones now. And then?

হলদে দাঁত মেলে হেসে জোনস বলেছিল—She wants money—Roy Babu, she is your old-friend.

ভায়লেট মুখে কিছু বলে নি, বলতে পারে নি, কিন্তু অজস্রধারায় শুধু কেঁদে ছিল। চোখ দিয়ে বাঁধভাঙা নদীর জলের মত জলের ধারা নেমেছিল।

—কত টাকা চাই?—ভায়লেট?

ভায়লেট উত্তর দিতে পারে নি, সে শুধু কেঁদেই গিয়েছিল। জোনস কিছু বলতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু দেবেশ্বর বলতে দেন নি। বলেছিল—Please Mr. Jones—you please keep quiet. বল ভায়লা কত টাকা চাই—বল।

বলতে ভায়লেট কিছু পারে নি; তা না পারুক দেবেশ্বর নিজেই খাজাঞ্চীকে ডেকে পাঁচশো টাকা নিয়ে ভায়লেটের হাতে দিয়ে বলেছিলেন—নিয়ে যাও। তারপর জোনসকে বলেছিলেন—দেখ মিস্টার জোনস, আর যেন এ বাড়ীর ফটকে ওকে নিয়ে বা একলা মাথা গলাবার চেষ্টা করো না।

ভায়লটকে বলেছিলেন—ভায়লা, তোমার ছেলের মেয়ে তোমার গ্রাণ্ডটার পাঁচ বছরের হল,—তাকে কনভেণ্টে রেখে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়ে আছে।—Don't forget that you are now a Grandma. বুঝতে পারছ আমার কথা?

সেদিন তারা চলে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে এই বাড়ীটার আশেপাশে হঠাৎ বেদনার্ত নারীকণ্ঠের ডাক উঠতে লাগল—

—রায়বাবু। মাই রায়বাবু!

একটা ফিরিঙ্গী মেমসাহেব—আধ-পাগলের মত তার বেশভূষা—অঝোরঝরে কাঁদত আর ডাকত—রায়বাবু—মাই রায়বাবু!

দেবেশ্বর রায় বাইরে বারান্দায় বা বাগানে থাকলে ঘরে গিয়ে ঢুকতেন। হঠাৎ একদিন ছোটছেলেকে ডেকে বললেন—আমার মনে হচ্ছে নেমেসিসের মত একটা কিছু আসছে। আসবার কথাই বটে যোগেশ্বর। তার জন্যে আমি দুঃখিত নই অনুতপ্ত নই। তবে আমার একটা কাজ বাকী আছে। সেটা আমাকে সেরে ফেলতে হবে তার আগে। কাজটা তোমার মায়ের কাছে—তার সঙ্গে কাজ। তোমাকে একটা জিনিস বলে যাই, মাই লাস্ট ওয়ার্ড। তুমি লেখাপড়া শিখেছ। আমি যেটা চেয়েছিলাম নিজে—যেটা আমার সম্পদের জন্যে ঐশ্বর্যের জন্যে, এ্যাণ্ড—আরও কিছুর জন্যে হয় নি—সেটা তোমার হয়েছে। সেই জন্যে তোমাকে আমি নগদ টাকা আর বাড়ী দিয়েছি। তুমি বিজনেস কর, জমিদারী থেকে দূরে

থেকো। এ্যাণ্ড ক্রম উয়োম্যান। বিয়ে ক'রে যদি সংসারী হ'তে পার—সাধারণ মানুষের মত, তা হ'লে বিয়ে করো। নইলে করো না।

যোগেশ্বর শুনেছিলেন অনেক কিছু। এই জানবাজারের বাড়ীতে পুরনো চাকর-বাকর কর্মচারীদের চাপা কথার ফিসফাসের মধ্যে থেকে শুনেছিলেন, জেনেছিলেন। জানতেন তাঁর বাপের জীবন। তিনি চুপ করে ছিলেন। কি উত্তর দেবেন এর।

দেবেশ্বর ক'দিনের মধ্যেই ফিরে এসেছিলেন কীর্তিহাট।

স্ত্রীর কাছে তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন, হাতজোড় করে বলেছিলেন—আমাকে ক্ষমা কর।

স্ত্রী হেসেই সারা হয়েছিলেন। ক্ষমা? কিসের ক্ষমা?—বেটাছেলে আবার মেয়ের কাছে ক্ষমা চায়। তিনি শুনতেই চান নি কোন কথা। আপনার সেই ধরাবাঁধা জীবনের ছকের মধ্যে যথানিয়মে ঘুরেই বেড়িয়েছেন দিনরাত্রি। ভোরে উঠতেন—উঠেই গোবিন্দ-মন্দিরে। ফিরতেন গোবিন্দের ভোগের পর। তারপর অতিথিসেবা। বেলা চারটে পর্যন্ত বসে থাকতেন অতিথির জন্য। তারপর আহার। শুতেন রাত্রি বারোটার সময়।

দেবেশ্বর রায় চুপ করে বসে থাকতেন স্ত্রীর প্রতীক্ষায়।

স্ত্রী এসে তিরস্কার করতেন—এ তোমার কি কাণ্ড, কি ব্যাপার? আমার উপর এ কি অত্যাচার শুরু করলে বল তো! কেন? বেশ তো ছিলে। আমি তো কোন আপত্তি করি নি, বাধা দিই নি।—

দেবেশ্বর কথা বলতেন না—হাসতেন।

এরই মধ্যে রায়বাড়ীতে শিবেশ্বর বাধালেন বিরাট মামলা। রত্নেশ্বর রায়ের কাছারীতে আগুন দেওয়ার প্রতিশোধ নেবার পথ না পেয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন তিনি—এমন সময় একটা খাসপতিতের উপর গোপথের অধিকার নিয়ে ফৌজদারী বেধে গেল। একসঙ্গে গোহত্যা, নরহত্যা দুই হয়ে গেল। ওয়ারেণ্টের ভয়ে শিবেশ্বর আর তাঁর বড়ছেলে ধনেশ্বরকে গা-ঢাকা দিতে হল। দেবেশ্বরকে বাধ্য হয়ে কাছারীতে বসতে হল।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন।

রত্নেশ্বর রায়ের খাস কাছারী—যে-ঘরটায় অতুলেশ্বর পিস্তলের কার্টিজ, বোমার সরঞ্জাম লুকিয়ে রেখেছিল, সেটা রত্নেশ্বর রায় বড়ছেলেকেই দিয়ে গেছেন—সেই কাছারীর বারান্দায় সন্ধ্যার সময় বসেছিলেন দেবেশ্বর রায়।

হঠাৎ প্রচণ্ড চীৎকারে তিনি যেন ফেটে পড়লেন—গেট আউট, গেট আউট আই সে—গেট আউট।

এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা লোকের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ চীৎকার এবং তার পরমুহূর্তেই সে-চীৎকার আর্তনাদের মত ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। না দেখেও সকলে বুঝতে পেরেছিল যে কোন একটা লোক ক্রুদ্ধ চীৎকার করে উঠেই পরমুহূর্তে আর্তনাদ করে ছুটে পালাল। তারপরেই একটি নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকার।

দেবেশ্বর রায়ের চাকর অনন্ত শুধু সাক্ষী ছিল।

দেবেশ্বর রায় সন্ধ্যায় অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিলেন আর আপনমনে শুরু করে

ইংরিজীতে কিছু বলছিলেন। সম্ভবতঃ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। সে আলো আলতে গিয়েছিল ভিতরে। হঠাৎ বড়বাবু চীৎকার করে উঠেছিল—Get out, Get out I say—Get out. তার চেয়ারের ঠেসানের পিছনে ঝুলিয়ে রাখা ছিল তাঁর মালাক্কা বেতের শখের ছড়িটা, সেই ছড়িটা টেনে নিয়ে তিনি আথালি-পাথালি পিট্‌ছিলেন একটা ফিরিঙ্গিকে। লোকটা প্রথমটা গর্জন করে উঠে হাত দিয়ে ধরতে চেষ্টা করেছিল এই ছড়িগাছটা কিন্তু তা পারে নি। না পেরে আর্ত চীৎকার করে ছুটে পালাল। তার সঙ্গে ছিল একটা ফিরিঙ্গী মেয়ে। সে-মেয়েটা কাতর আর্তনাদ করে গড়িয়ে পড়েছিল বারান্দার উপর।

নিমাই এসে পাথরের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওদিকে কাছারীর কর্মচারী ও লোকজন সকলে দূরে স্তব্ধ কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পুরুষটার চীৎকারের সঙ্গে নারী-কণ্ঠের চীৎকার শুনে তারা থমকে গেছে।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। দেবেশ্বর রায় কঠিনস্বরে তাকে উঠতে বলেছিলেন—সে-আদেশ সে অমান্য করতে পারে নি। উঠে মাথা হেঁট করে চলে গিয়েছিল।

দেবেশ্বর রায় ডেকেছিলেন—নিমাই।

মৃদুস্বরে নিমাই বলেছিল—হুজুর।

—যা, উপরে আমার ঘরে বাবার মৃত্যুর পর যে-হুইস্কির বোতলটা তুই আমার সামনে ধরেছিলি, সেটা আলমারিতে রয়েছে। আজ যেন চোখে পড়েছে আমার। সেটা নিয়ে আয়।

—আজ্ঞে!

—যা, সেটা নিয়ে আয়। আর গ্লাস।

দীর্ঘ এক বছরের উপর সময়ের পর আবার সেদিন দেবেশ্বর রায় হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছিলেন।

বাধা কে দেবে? শিবেশ্বর-ধনেশ্বর মামলার ভয়ে কীর্তিহাট থেকে সরে গেছেন। দেবেশ্বরের ছেলেরা কলকাতায়। পারতেন এক স্ত্রী মানিকবউ কিন্তু তিনি সন্ধ্যায় তখন গোবিন্দজীর মন্দিরের বারান্দায় হাতজোড় করে বিগ্রহের মুখের দিকে তাকিয়ে আপনমনে কথা বলছেন, কখনও হাসছেন, কখনও তিরস্কার করছেন। নিমাই তাঁর কাছে গিয়েও ছিল, খবরও দিয়েছিল। কিন্তু তিনি বুঝতেই পারেন নি নিমাইয়ের কথা।

নিমাই বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছিল। বাবুকে ফেলে ঠাকুরবাড়ীতে দাঁড়িয়ে মা-ঠাকরুণকে সমস্ত বুঝিয়ে বলবার মত সময় তার ছিল না। ফিরে এসে নিমাই চমকে উঠেছিল। বাবু কই? হুজুর?

বারান্দা শূন্য, ঘর শূন্য, দেবেশ্বর রায় নেই।

কোথায় গেলেন?

—হুজুর! বড়বাবু!

কাছারী সচকিত হয়ে উঠেছিল। সে কি? কোথায় গেলেন? বড়বাবু, দেবেশ্বর রায়, যিনি পাহাড়ের মত অটল, তিনি কোথায় গেলেন? কোথায় যাবেন। কাছারী থেকে

হারিকেনের আলো হাতে হিন্দুস্থানী চাপরাসীরা ছুটেছিল। দেখতে দেখতে গোটা গ্রামটা সচকিত হয়ে উঠেছিল। তখনকার দিনে রায়বাড়ী কীর্তিহাটে হলেও কীর্তিহাটই ছিল রায়বাড়ীর মধ্যে। রায়বাড়ীর এলাকার বাইরে গ্রামের বসতি সে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তার সঙ্গে রায়বাড়ীর সম্পর্ক ছিল ঘোড়া এবং লাটের সম্পর্ক। তার বেশী কিছু নয়। সম্পর্ক ছিল খাজনা দেওয়া-নেওয়ায়, সম্পর্ক ছিল অনুমতি গ্রহণের; গাছ কাটবে তার অনুমতি, ঘরের ধনিয়াদ কাটবে তার অনুমতি, বিয়ের অনুমতি, শ্রাদ্ধের অনুমতি, তাছাড়া জীবনের প্রতি পদে নানা অনুগ্রহের অনুমতি, দেবার জন্য। তাছাড়া অনুগ্রহ, সে অনেক, সে পদে-পদে, অন্নপ্রাশনে, বিয়েতে, পৈতেতে—মাছ চাই, কাঠ চাই, কন্যাদায়ে অর্থও চাই। পিতৃদায়ে-মাতৃদায়ে—বাঁশ, কাঠ, মাছ, অর্থ চাই। প্রয়োজন হলে বিয়েতে রায়দের গাড়ী চাই। এছাড়া ইদানীং শিবেশ্বর শখের থিয়েটার খুলে বিহারশালরুমে একটা প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন গ্রামের কিছু লোককে। সে অল্প কিছু। আজ কথাটা দেখতে দেখতে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। ছড়িয়ে পড়ল বিচিত্র চেহারা নিয়ে। কে রটালে, কার কল্পনা কেউ জানে না, বললে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে অশরীরী একটা পুরুষ আর একটা নারী, একটা প্রেত আর একটা প্রেতিনী বড়বাবুকে টেনে নিয়ে গেল।

গোটা গ্রামের মানুষের গুঞ্জন একটা কলরব সৃষ্টি করে তুলেছিল। পথে পথে আলো আর মানুষ। মানুষ আর আলো। কংসাবতীর তটভূমির জঙ্গল ভেঙে ভেঙে খোঁজ শুরু হয়েছিল।

—বড়বাবু! হু-জু-র! ব-ড়-বা-বু!

শেষ প্রায় রাত্রি দুপুর নাগাদ দেবেশ্বরকে পাওয়া গিয়েছিল কাঁসাইয়ের গর্ভে বালুচরের উপর। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। দেহের তাপ প্রবল। যেন পুড়ে যাচ্ছে। ধরাধরি করে তুলে এনে তাঁকে শুইয়ে দিয়েছিল তাঁর বিছানায়।

কিছুক্ষণ পর চোখ মেলেছিলেন কিন্তু দৃষ্টি বিহ্বল বিকারগ্রস্ত। চীৎকার করে উঠেছিলেন—গেট আউট, গেট আউট! গেট আউট আই সে। শাট দি ডোর। শাট দি ডোর!

রাত্রি দুপুরের পর মাণিকবউ দেবতাকে শয়ন করিয়ে অন্দরে এসে স্বামীর ওই অবস্থা দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কি হল?

কিন্তু উত্তর শোনেন নি। এসে শিয়রে বসে স্বামীর মাথা কোলে তুলে নিয়ে ডেকেছিলেন—বড়বাবু! বড়বাবু! বড়বাবু গো! বড়বাবু! কথা বল। বড়-বাবু!

কিন্তু বড়বাবুর চেতনা আর ফেরে নি।

ওই এক কথাই তিনি বলেছেন শেষ পর্যন্ত। গেট আউট। আর, শাট দি ডোর।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, জোসেফ ভায়লেটকে নিয়ে কীর্তিহাট পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল সে-কথা নিশ্চয় বলতে হবে না। জোসেফকেই দেবেশ্বর রায় আথালি-পাতালি বেত দিয়ে মেরেছিলেন।

জোসেফ পালিয়েছিল সেই রাত্রেই। তার ভয় হয়েছিল—হয়তো বা তাকে খুন করেই ফেলবে রায়বাবু। গোয়ানেরাও তাই বলেছিল তাকে। সে পালিয়েছিল কিন্তু ভায়লেট

পালায় নি। সে ছিল। রায়বাবুর মৃত্যুর পর ভায়লেট ওই সিদ্ধাসনের জঙ্গলে সেই যোগিনীর ঘরের ভিতর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ওখানটায় কল্কে ফুলের গাছ আছে প্রচুর। কল্কেফুলের বীজ বিষ, ওটা শিখেছিল অবশ্য এখানে এসেই। সে-কথা ভায়লেট ভুলে যায় নি।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, অর্চনাকে দেখে সেদিন আমি অদৃষ্টকে মেনেছিলাম। অর্চনা বিধবার বেশে বসেছিল। আমাকে দেখে কাঁদে নি। পাথরের মূর্তির মত শুকনো চোখে বসেছিল সে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে অর্চনা।

সুরেশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে—তার সঙ্গে সুলতাও। সুরেশ্বর বললে—এত বড় দুঃখ আমি বাবার মৃত্যুসংবাদেও পাই নি। বরং চন্দ্রিকাকে নিয়ে যখন তিনি বাপে থেকে চলে যান, তখন খবর পেয়ে এমনি ধরনের আঘাত পেয়েছিলাম। তবুও সে-আঘাতের পরিমাণ এর থেকে কম। তাতে বাবার মৃত্যু-সংবাদ ছিল না। এতে একসঙ্গে দুটো। যদিও রথীনের মদ খাওয়ার কথা আমি মেদিনীপুর যাবার আগে জেনে গিয়েছিলাম এবং নারীসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কিছুটা সন্দেহও আমার হয়েছিল। একটা নার্স নিয়ে প্রণবেশ্বরদাদার সঙ্গে ওর সঙ্গে ওর আলাপের কথাও আমার কানে এসেছিল। অনুশোচনা আমার তখনই হয়েছিল কিন্তু হাত তো আর কিছু ছিল না। ১৯৩৬-৩৭ সালে হিন্দুর ঘরে ডাইভোর্স দূরের কথা, স্বামীর দুষ্ট চরিত্রের জন্য স্বামী ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের দৃষ্টান্ত দু-চারটের বেশী ছিল না। তাছাড়া কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর মেয়ে। এবং যে-মেয়ে অবিকল তার বৃদ্ধ পিতামহী সতীবউরানীর মত দেখতে। রায়বাড়ীর প্রবীণদের বিশ্বাস—সতীবউরানীর সে-জন্মে ভোগ করে আশ মেটে নি, তাই এ-জন্মে ভোগ করতে এসেছিল।

সতীবউরানীর ভোগ-আকাঙ্ক্ষার ভাগ্য, আর রায়বাড়ীর ভাগ্য। ভরাভর্তি রায়বাড়ী যিনি এসে সারাজীবন তপস্যা করলেন, সারাজীবন সন্ন্যাসিনী সেজে থাকলেন। বাক্সে ভরা রইল বেনারসী শাড়ী, মুরশিদাবাদের গরদের শাড়ী, বালোয়া বিষ্ণুপুরের গরদ তসরের শাড়ী, ঢাকাই বালুচরী ফরাসডাঙা শান্তিপুরের শাড়ীর বোঝা সিন্দুকে তোলা রইল—মণিমুক্তো-হীরে-জহরতের জড়োয়া গহনা, খাঁটি পাকাসোনার ভারী ভারী গহনা—তপস্যা শেষ হলেও আর গায়ে পরলেন না। ফুলেল তেলের বোতল গড়াগড়ি গেল, চুলে মাখলেন না, বিলিতী খাঁটি ফরাসী দেশের সেন্ট-ল্যাভেণ্ডারের বাক্সে শিশি, দামী আতরের পলাকাটা শিশি আলমারিতে সাজানো রইল, কোনদিন মাখলেন না; তিনিই যদি রায়বাড়ীর যে আমলে বেনারসী সিল্ক দূরে থাক, তাঁতের শাড়ীর সাধ মেটে না, এমন কি মিলের শাড়ীও সময় সময় সেলাই দিয়ে পরতে হয়, হাতে সোনার পাত-মোড়া লোহা পিতলের চুড়ি পরতে হয়, সেই আমলে ভোগের জন্য পুনর্জন্ম নিয়ে থাকেন, তবে তার ভাগ্য ছাড়া কাকে দোষ দেব বল?

অর্চনাও সেদিন এ-ঘটনাকে ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিল। আমিও তাই মানতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঠিক যেন পারি নি। দোষটা নিজের ঘাড়ে পড়ছিল। বার বার মনে হয়েছিল, ধনেশ্বরকাকার স্ত্রী অনাইয়ের কাকীমার দেওয়া সন্ধান পেয়ে আমি ছুটে এসেছিলাম, এসে

অন্নপূর্ণা-মাকে পেয়ে তাঁর সাজানো সংসার দেখে ডাক্তার-ছেলেটিকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আর খোঁজ করলাম না। তার সঙ্গে বিয়ে দিলাম। টাকাকড়ির দিক থেকে সুবিধে করতে যাই নি, খরচ আমি অনেক করেছিলাম। এবং এই বিয়ের ব্যাপারটা না ঘটলে অন্নপূর্ণা-মা জানবাজারের বাড়ী আসতেন না। আর কুইনী এবং হলদীকে দেখে আমার পিতামহ তাঁর দেবু-ভাইপোর অপরাধ, তাঁর যৌবনের ভুলের পাপমোচনের কথাও তাঁর মনে হত না। সেটা এমন ভাবে মনে পড়েছিল যে, তিনি এলিয়ট রোডের বাড়ী খালাস করাটা অর্চনার বিয়ের পণের মধ্যে ধার্য করেছিলেন। তাতেও আমি অমত করি নি। বিয়েতে রথীন প্রথম অমত করেছিল, অন্নপূর্ণা-মা জোর করে তাকে রাজী করিয়েছিলেন। যজ্ঞেশ্বর'রার জ্যাঠামশাই আমার স্নেহের অপব্যাখ্যা করে বেনামী চিঠি দিয়েছিলেন, অন্নপূর্ণা-মা তাও অগ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি অগ্রাহ্য না করলেই ভাল করতেন।

হঠাৎ থেমে গেল সুরেশ্বর। তারপর বললে—মাঝখান থেকে একটা কথা বলে নিই সুলতা, কথাটা ১৯৩৭ সালের নয়—কথাটা যুদ্ধের সময়ের ২ছর কয়েক পরের। জ্যাঠামশায় মৃত্যু-শয্যায় তখন। আমাকে ডেকেছিলেন। তাঁর দুই ছেলেই তখন ওয়ার-কণ্ট্রাক্টের নামে যত হীনতম কাজ হতে পারে তা করছে। রোজগার যথেষ্ট করত কিন্তু বাপকে দেখতো না। সে-সময় তিনি নিদারুণ অভাবের মধ্যে পড়ে আমাকে ডেকেছিলেন টাকার জন্যে। সে-সময় পাঁচটা কথার মধ্যে বলেছিলেন—অর্চনা সম্পর্কে বেনামী চিঠি লিখেছিলাম, তার জন্য তখন অনুশোচনা হয় নি, আজ অনুশোচনা হচ্ছে। কিন্তু কি জানিস—আমি তোদের দুজনের যে ভাইবোনের ভালবাসা এটা সহোদর-সহোদরা হলেও আমার মনে সন্দেহ জাগাতো। তাছাড়া আমার একটা রাগ ছিল, আক্রোশ ছিল—কঠিন আক্রোশ। ধনেশ্বর আর জগদীশ্বর দুই ভাই আমার মাকে ঠাকুরবাড়ী ঢুকতে দেয় নি—বলেছিল, তোমার জাত গেছে জ্যাঠাইমা, তুমি ঠাকুরবাড়ী ঢুকো না। আমি তার শোধ নিয়েছিলাম। সেটা আমি ভুলি নি। জমিদারের বাচ্চা আমি, ব্যবসাদার হতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি কিন্তু জাত যায় নি, জাতে সেই গোখরোই আছি—তোরাদার বাঘই আছি, রাগ আমরা ভুলিনে। তবে মেয়েটা সতীবউরানীর মত দেখতে, তাই দুঃখ হয়। আজ হচ্ছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করলে সুরেশ্বর। কিছুক্ষণ পর আবার বললে—ঐ কথাটা আগেও তো বলেছিলেন জ্যাঠামশাই, যখন এলিয়ট রোডের বাড়ীর দরুন পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছে নেন। সেদিন কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করেছিলাম অর্থগৃধ্নুতা। কিন্তু বিধবা অর্চনাকে দেখে সেদিন মনে হল অর্চনার ভাগ্য।

পরের দিন ফিরে এলেন রথীনের বাপ। মানুষটি অসীম ধৈর্যশীল মানুষ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক হতে যেসব ধীর-স্থির মানুষ, আনন্দ-বেদনা-উল্লাস-দুঃখ নিঃশব্দে অভিব্যক্তিহীন মুখে শুকনো চোখে সয়ে গেছেন, তাদেরই দলের মানুষ।

বিবরণ তাঁর কাছে জানলাম, সংক্ষেপে জানালেন তিনি। একান্ত অপরাধীর মতই জানালেন—দেখ সুরেশ্বর, ঠাকুরমা আজ নেই, তিনি খবর পেয়ে বাঁচবেন না এ আমি জানতাম; টেলিগ্রামে খবরটা সেই উদ্দেশ্যেই জানিয়েছিলাম। যদি এই খবরটা শব্দভেদী বাণের মত তাঁর

বুকে বিঁধে প্রাণটা বেরিয়ে যায় তো যাক। তিনি যেন সব খবর না-শোনেন না-জানতে পারেন। অথচ আঘাতটা পান।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—এ ভালই হয়েছে, তিনি সব না-জেনেই চলে গেছেন। জেনেশুনে গেলে সে তাঁর পক্ষে বড় মর্মান্তিক হত। অনেক অহঙ্কার করে তপস্যা করার মত কৃচ্ছ্রসাধন করে তিনি শ্বশুরবাড়ী বাপের বাড়ী দুই কুল ছেড়ে নিজের কুল নিজে গড়ে এই বাড়ীর পত্তন করেছিলেন। ছেলে, নাতি, তারপর তাদের ছেলেদের নিয়ে তাঁর অহংকার ছিল, প্রচণ্ড অহঙ্কার, লক্ষ্মী-সরস্বতী দুজনের চারখানি চরণকমল তাঁর ঘরে অচঞ্চল হয়ে বিরাজ করছে। বলতেন—আলতাপরা চারখানি পা আমি চোখ বুজলে দেখতে পাই—পদ্মের উপর রেখেছেন তাঁরা। কিন্তু তিনি জানতেন না, শুধু রথীন নয়, রথীনের আগে থেকেই এ বাড়ীর ধারা পাল্টেছে। কালের হাওয়ায় সব পাল্টে গেছে। লক্ষ্মীর আটন গেছে, সরস্বতীর পিঁড়ে গেছে ; লক্ষ্মী-সরস্বতীর ভোল পাল্টেছে। এ-বাড়ীর ছেলেদের চরিত্র গেছে। মদ ঢুকেছে, তার সঙ্গে—।

কথাটা এই স্থূলতা যে, রথীনের ছোটকাকা গোপনে মদ খেতেন। রথীন ডাক্তারী পড়তে গিয়ে পড়ার সময় থেকে ভাইনাম গ্যালেসিয়া থেকে শুরু করেছিল। হাসপাতালে নার্সদের কাছে সে নিজে আকর্ষণের মানুষ ছিল—নার্সরাও কেউ কেউ তাকে আকর্ষণ করত।

১৯৩০ সালের পর থেকে কালটা অতিবিচিত্র। তার সংজ্ঞা বা তার স্বরূপ তোমার জানা স্থূলতা। রথীনের কাছে জীবনের চরিত্রের মূল্য কিছু ছিল না। কিন্তু সে-কথা সে সত্য হিসেবে ঘোষণা করে বলে নি কোনদিন—কেউ ভাবলি সে এ-সত্য গোপন করে চলে এসেছে, চালিয়ে এসেছে। কেউ ধরতে পারে নি। সেদিন যানে যেদিন কলকাতা থেকে মেদিনীপুর আসি, সেইদিন শুধু আমি অনেক রকম ওষুধের গন্ধে ঢাকা-দেওয়া মদের গন্ধটাকে তার মুখের পান-জর্দার গন্ধের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করেছিলাম। আমি চিনতাম গন্ধটাকে, তাই আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে খটকাও বেধেছিল—'অর্চনা এটা সইতে পারবে তো ?' জানতে সে পেরেছে এতে সন্দেহ আমার ছিল না, কিন্তু সইতে কতদিন পারবে বা এ নিয়ে তার সঙ্গে এরই মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়েছে কিনা বুঝতে পারি নি।

মেয়েরা দুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্মতা। তাদের প্রকৃতিটাই অন্ধকারের মত, যতই উজ্জ্বল আলো জ্বালো, তার সবটা আলোয় স্পষ্ট হবে না, আলোর ঠিক নিচেটাতেই জমা করে রাখবে আপনার আসল স্বরূপকে।

নারী-প্রকৃতির আদিম স্বরূপ নাকি কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রির অন্ধকারকে একসঙ্গে জমিয়ে তৈরী হয়েছে। ওকে জানা যায় না। নারীও বোধ হয় নিজেকে নিজে জানে না। আয়না না হলে মেয়েদের চলে না, আজকাল ভ্যানিটি ব্যাগে ব্যাগে ছোট আয়না হাতে হাতে ফেরে। অল্প কিছুক্ষণ পর পর আয়না দেখে মুখে তারা পাফ বুলায়। মোহের প্রলেপ বুলিয়ে দেয় প্রলেপের স্তরের উপর। নিজের অন্তরের দিকটা থেকে সে মহারাত্রির মত নিবিড় অন্ধকার। সে জানে না সে কি চায়, সে বোঝে না কেন সে কাঁদে, কেন সে হাসে।

রথীনকে সে মানিয়ে নিতে পারবে? বুঝিয়ে আপন করে নিতে পারবে? আমার সেদিন আপসোস হয়েছিল, আমি অতুলেশ্বরদের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে অর্চনার সম্পর্কের কথাটা গোপন করেছি বলে। বলা আমার উচিত ছিল।

সন্দেহ আমার মিথ্যে হয় নি।

অর্চনার সঙ্গে রথীনের বিরোধ চলছিল এই নিয়ে। অর্চনা প্রকাশ করতেও পারত না— প্রকাশ্যে ঝগড়া করতেও পারত না; ভিতরে ভিতরে গুমরে গুমরে মরত। রথীন ওদিকে একজন এ্যাংলো নার্সের প্রেমে পড়েছিল।

রথীনেরও সন্দেহ ছিল অর্চনার উপর। জ্যাঠামশায়ের বেনামী পত্রের সন্দেহ। প্রণবেশ্বর-দাদার সঙ্গে তার আলাপ ছিল—ওই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়ার আলাপ। রথীনের চেম্বারে পেশেণ্ট হিসেবে আলাপ। তার মধ্য দিয়ে সে একটা সত্য জেনেছিল। জেনেছিল— প্রণবেশ্বর বড় জমিদারবংশের ছেলে, এখন জমিদার থেকে তারা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েছে, তাদের বংশে সাতপুরুষ ধরে এই ট্রাডিশন চলে আসছে। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন ভূষণ, এ-দোষটাও তেমনি তাদের জীবনের আভিজাত্যের পরিচয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে এত টাকা খরচ করে তার সঙ্গে অর্চনার বিয়ে দেওয়ার ভারটা নেওয়ার মধ্যে, আমার স্নেহের মমতার অপব্যাখ্যাও সে করেছিল।

সে নাকি বলেছিল—গেলা গেল না বলে ওগরাতে হল।

তাতে রথীন খুব বিচলিত হয় নি। কারণ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে দিয়ে কালের হাওয়ায় এমন স্তরে সে তখন উঠেছে, যেখানে বিবাহের পূর্ব-জীবনের পতনস্খলনগুলো নিতান্তই আকস্মিক দুর্ঘটনার মত; হয়তো বা আরও লঘু কিছু—পথে পড়ে গিয়ে গায়ে ধুলো-কাদার দাগের মত—ধুয়ে দিলেই মুছে যায়, তার উপরেও যদি কিছু হয়, কেটেকুটে যায় এবং তাতে যদি সৌন্দর্যহানিই ঘটে, তবে প্লাস্টিকসার্জারি আছে, তাতে শুধরে যাবে। এরপরও জীবনের দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে; সে-দিগন্তে নারীও স্বাধীন, পুরুষও স্বাধীন—কেবলমাত্র গৃহের বন্ধন-টুকু স্বীকার করে পরস্পরকে মেনে নিয়ে যার যা খুশি সে তা করে বা করতে পারে। কিন্তু খুব সহজ নয়, এবং সহজ হয়ও নি রথীনের পক্ষে। সে নিজের বেলা হাসপাতালে নার্সিংহোমে নার্সদের সঙ্গে কাজও করেছে, আবার অন্তরঙ্গতার চর্চাও করেছে কিন্তু বাড়ী এসে অর্চনাকে প্রশ্ন করেছে—বল, তোমার জীবনের কথা বলো। স্বীকার করো। আমি তা মেনে নেব। কারণ আমার জীবনেও পতনস্খলন হয়েছে। দু'-চারটে গল্পও বলেছে; এবং পাল্টে বলেছে —এবার তোমার কথা বলো।

অর্চনা বাঁচবার জন্ত আঁকড়ে ধরেছিল অন্নপূর্ণা দেবীকে। অহরহ তাঁর কাছেই থাকত। তিনিও তাঁকে চাইতেন এবং অর্চনা তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল বলে আনন্দের তাঁর সীমাও ছিল না। ভাবতেন—তাঁর মা পুনর্জন্ম নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে এসেছেন তাঁকে যত্ন করতে। তাঁর শৈশবাবস্থায় যে যত্ন তাঁর মায়ের কাছে পাওনা ছিল, সেটা তাঁর মা দিতে এসেছেন তাঁর এই বৃদ্ধ বয়সে। এবং বলতেন—মরে আবার তোর পেটেই ফিরে আসব। এবার খুব যত্ন করিস।

আশী বছর বয়সে অন্নপূর্ণা-মায়ের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছিল, তিনি অর্চনার মুখ বোধ হয় ভাল

করে দেখতে পেতেন না, পেলে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করতেন—হ্যাঁরে অর্চি-মা, কি হয়েছে রে? মুখখানা এমন ধোঁয়াটে আকাশের মত কেন রে?

ব্যাপারটা কিন্তু রথীনের বাপ-মা জানতে পেরেছিলেন। অবশ্য সত্ত সত্ত জেনেছিলেন। ভাবছিলেন কি করবেন? অর্চনা সম্পর্কে তাঁরা খোঁজখবরের বাকি রাখেন নি। এবং অর্চনার সম্পর্কে খোঁজখবর করে সন্তুষ্ট হয়েই নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন যে, এ-মেয়ে নিশ্চয় রথীনকে ফেরাবে।

ফেরাতে হয়তো পারত। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীর জন্যেই তা ঠিক হয় নি। অন্নপূর্ণা দেবী কেড়ে নিয়েছিলেন অর্চনাকে এবং অর্চনাও পালিয়ে এসে তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল রথীনের জোরার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে।

ফাইনাল ইয়ারে প্রথম ওর মা জানতে পেরেছিলেন, মুখে মদের গন্ধ পেয়েছিলেন। কিন্তু এ-যুগটা cleverness-এর যুগ, truth, sincerity এসবই বাতিল হয়ে গেছে সুরেশ্বর। আমরা যারা এগুলোকে মানি, তারা অধিকাংশই লড়াই করে হেরে যাচ্ছি। দু-চারজন, চারজনই বা কোথায়—চোখে তো পড়ছে দুটি মানুষ, বাংলাদেশে অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ আর বাংলার বাইরে মহাত্মা গান্ধী, তাঁরা হেরেও হার মানতে চাচ্ছেন না। চীৎকার করে সত্যের সত্তার জয় ঘোষণা করে যাচ্ছেন। পৃথিবী হয়তো হাসছে। তারা অঙ্ক কষে মাপজোক করা cleverness দিয়ে মানুষের জীবনের গতির মোড় ফেরাতে চাচ্ছে, ফেরাচ্ছেও।

একটু হেসে বলেছিলেন—বলতো, রবীন্দ্রনাথ এখন বিরাট পুরুষ, তাঁর শান্তিনিকেতন তাঁর নিজের হাতে বুকের রক্ত ঢেলে গড়া প্রতিষ্ঠান, সেখানে তাঁর অবর্তমানে অন্তত পরের মানুষ না-আসা পর্যন্ত কালটা চালাবার কেউ আছে!

গান্ধীজী? তাঁর সম্পর্কেও সে কথা সুরেশ্বর। তাঁর পর তাঁর আদর্শ, তাঁর সাধনা অব্যাহত রাখবে কে?

শোকার্ত নগেনবাবু বলেছিলেন—কেউ বলে জওহরলাল, কেউ বলে সুভাষচন্দ্র, কেউ বলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ। একজন বললেন—সকলে মিলে। অঙ্ক কষে ওটা বলা চলে সত্য। বস্তু-জগতে গান্ধীজীর যে কাজ, তা এঁরা চালাতে পারবেন কিন্তু ভাবজগতে তা পারবেন না। তা হয় না। এ কালের পরিবর্তন।

বললাম তো, আমার ছোটভাই মদ ধরেছে। জানতে যখন পারলাম তখন দেরি হয়ে গেছে। বললে—স্বাস্থ্যের জন্য খাই, বড্ড খাটুনি। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখালে।

তারপর রথীন। হেসে রথীনের বাবা বললে—সে ডাক্তারী পড়ত। নানারকম ওষুধের গন্ধ দিয়ে মদের গন্ধ ঢেকে রাখত। তার সঙ্গে বড্ড পান-জর্দা আর সিগারেট। ডিসেকশন করবার সময় গন্ধ লাগে এই অজুহাতে সিগারেট ধরেছিল। আমরা মেনে নিয়েছিলাম। বুঝতে পারি নি—সতর্ক হই নি; ভাবি নি সিগারেট-জর্দা না খেয়েও অনেকে ডিসেকশন করে। কাল এমনি করেই প্রতারণা করে। আমাদের কালে সিগারেটেও দোষ ছিল। আমি, আমার মেজভাই পর্যন্ত খাই নি। মেজ অনেক বয়সে ধরেছে। ছোট তারপর রাত্রে খাওয়ার আগে ঘরে ব্র্যাণ্ডি খায়।

নর-নারীর প্রেম বৈধ-অবৈধ—এ চিরকাল আছে। সংজ্ঞা অবশ্য কালে-কালে পাল্টায়।

কিন্তু একালে সব মিথ্যে হয়ে গেছে। শুনে আশ্চর্য হবে সুরেশ্বর যে রথীন বৌমাকে বিয়ে করার আগেই একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স মেয়েকে বিয়ে করে তাকে বিলেতে মেট্রন ট্রেনিংয়ের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে, টাকা যোগাচ্ছে। এবার সে নিজে পালাচ্ছিল বিলেত। এবং তার জন্যে সে বৌমার গহনা, তার মায়ের গহনা বিক্রী করে হাজার-তিরিশেক টাকা নিয়ে বম্বে পর্যন্ত পৌঁচেছিল। বৌমাই সেটা প্রথম জানতে পেরেছিল। আমরা জানতাম কি কাজে সে বম্বে যাচ্ছে। বৌমা ঠাকুমাকে বললে—ঠাকুমা কপাল চাপড়ে আমাকে ডেকে বললেন—যা গিয়ে দেখ, ধরে নিয়ে আয়। আমি গেলাম। ধরতেও পেরেছিলাম। জাহাজখানা ঠিক দিনে ছাড়ে নি। খুঁজে-পেতে ধরে ওকে নিয়ে এলাম হোটেলে। মাথা হেঁট করেই এল। হঠাৎ বললে—বাথরুম থেকে আসি। ঢুকল; মিনিট-দুই পরেই ফায়ারিং-এর শব্দ।

* * *

বড় আঘাত পেয়েছিলাম সুলতা। নিষ্ঠুর আঘাত। অর্চনাকে সত্যিই নিজের সহোদরার মত ভালবেসেছিলাম। ভাবছিলাম এ কি হল? ভাবছিলাম, এরপর ওর কি হবে? কীর্তিহাটে মেজদিকে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি, সেখান থেকে হিলডা কুইনীকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, তাদের উপর অত্যাচার করছে লোকে, বিশেষ করে ধনেশ্বরকাকার ছেলেরা, সুখেশ্বরকাকার ছেলেরা—তাদের উত্তেজিত করছেন স্বয়ং ধনেশ্বরকাকা, জগদীশ্বরকাকা; আমি কুইনীকে হিলডাকে বলেছি, আমি ফিরে গিয়ে ওদের বুঝিয়ে বলব। যদি তারা আমার কথা শোনে তবে ভাল; যদি না শোনে তবে সেই কথাই তোমাদের জানিয়ে দিয়ে বলব—এবার তোমরা যা-খুশি করতে পার। কিন্তু সেসব মনে করেও কলকাতা থেকে নড়তে আমি পারি নি। এই বাড়ীতে শুধু ঘুরেছি আর ভেবেছি।

এ কি করলাম একটা ভ্রান্ত আবেগবশে! অর্চনার চেহারার সঙ্গে ভবানী দেবীর চেহারার মিল আছে বলে অন্নপূর্ণা-মায়ের নাতির ছেলের হাতে তুলে দিলাম। নিজেও তো বিশ্বাস খানিকটা করেছিলাম ওই কথাটা। অন্যত্র বিয়ে দিলেই তো হতো। জগদীশ্বরকাকা তাঁর সম্বন্ধীর সম্বন্ধীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। সে দ্বিতীয়পক্ষ এবং সাব-ইন্সপেক্টর বলে অর্চনা কেঁদে বলেছিল, আমি মরব বিষ খেয়ে। কিম্বা নিজে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা দেব। বলব সকল কথা খুলে। সুতরাং ভাগ্যকে দোষ দেওয়া ছাড়া আর কাকে দোষ দেব?

এরই মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন জগদীশ্বরকাকা। এলেন সস্ত্রীক। উঠলেন আমার এই বাড়ীতেই। সদ্যবিধবা কন্যার বাড়ীতে উঠতেই ইচ্ছে ছিল তাঁর কিন্তু খুড়ীমা তা হতে দেন নি।

খুড়ীমা এসেছিলেন মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে। কিন্তু জগদীশ্বরকাকা এসেছিলেন রথীনের সম্পত্তির খোঁজখবর নিতে।

রথীনের ইন্সিওরেন্স ছিল কিন্তু সে-পলিসি লণ্ডনবাসিনী স্ত্রীকে দেওয়া ছিল।

জগদীশ্বরকাকা ফিরে এসে আমাকে বললেন—আমার কি সর্বনাশ করেছ তুমি জান?

আমি চুপ করে রইলাম। কি বলব? অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

জগদীশ্বরকাকা বলেছিলেন—তুমি জান রথীন অর্চনাকে বিয়ের আগে একটা ফিরিঙ্গী মেয়েকে—

বলেছিলাম—আপনার মতই সেদিন রথীনের বাবার কাছে শুনেছি। এবং তাঁরাও জেনেছেন রথীনের মৃত্যুর পর।

জগদীশ্বরকাকা চীৎকার করে উঠেছিলেন—খুন করে হাম্ ফাঁসি যায়েগা। হাম জগদীশ্বর রায় হ্যায়। কোইকো খাতির হাম নেহি করতা হ্যায়।

আমি কোন কথাই বলতে পারি নি। প্রতিবাদ দূরের কথা। বরং ভাবছিলাম জগদীশ্বর-কাকা যদি আমার ওপর আঘাত করেন তো নিজের কাছ থেকে গ্লানি হতে পরিত্রাণ পাই। কিন্তু জগদীশ্বরকাকার স্ত্রী প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন—ছি-ছি-ছি! তোমাকে ছি! রায়বংশ! রায়বংশের জয়ধ্বজা! বজ্রাঘাত হয় না তোমাদের জয়ধ্বজার ওপর! কেন ওকে গাল দিচ্ছ? কি করেছে ও? টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, এই ওর অপরাধ?

সুলতা, জগদীশ্বরকাকা চিরদিন খুড়ীমাকে নিষ্ঠুর নির্যাতনে নির্যাতিত করেছেন। নিষ্ঠুর কদর্য ভাষায় গালাগাল করেছেন। দুটো কথা তাঁর মুখে প্রায় লেগেই থাকত। হারামীর বাচ্চা হারামী আর বাঁদীর বেটী বাঁদী। শেষটা অভ্যাস করেছিলেন খুড়ীমার ওপর কথাটা প্রয়োগ করে করে। সেদিন তার একটাও বের হয় নি জগদীশ্বরকাকার মুখ থেকে।

আমার দুই কানের চারিপাশে খুড়ীমার একটা কথা বেজেই চলেছিল—বজ্রাঘাত হয় না তোমাদের জয়ধ্বজার উপর? বজ্রাঘাত হয় না তোমাদের জয়ধ্বজার ওপর? বজ্রাঘাত হয় না তোমাদের জয়ধ্বজার ওপর?

কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে একটু হাসলে সুরেশ্বর। তারপর বললে—জান সুলতা, সেদিন একটা হিসেব করেছিলাম। বিচিত্র হিসেব। হিসেবের শুরু হল—রায়বংশের শুরু থেকে আমি পর্যন্ত সাতপুরুষের মধ্যে জয়ধ্বজা উড়িয়ে সবার সামনে দাঁড়াবার মত কেউ ছিলেন?

হ্যাঁ, জমিদার হিসেবে ছিলেন, কয়েকজনই ছিলেন। খেয়ালী-বিলাসী হিসেবেও ছিলেন। দাতা হিসেবেও ছিলেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে? রত্নেশ্বর রায়কে প্রণাম করে বলেছিলাম—শুধু তুমিই ছিলে। তোমার অত্যাচার তোমার শোষণ-শাসন সত্ত্বেও এক তুমিই ছিলে রায়-বংশের জয়ধ্বজার মানুষ—আর কেউ না। তবে হয়তো একালে তাও নাকচ হয়ে যাবে, কারণ তুমি রায়বংশের আয়কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ষাট হাজার টাকা বৃদ্ধি করেছিলে। কুড়ারাম রায়ের দেবকীর্তির কালও গেছে।

হঠাৎ চিন্তাটা রায়বংশ ছেড়ে গোটা বাংলাদেশের সমস্ত জমিদারবংশ খুঁজতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিন কিন্তু মুহূর্তে মাথাটা নত হয়ে গিয়েছিল।

সুলতা সেটা ১৯৩৮ সাল।

. মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তখনও বেঁচে। অবনীন্দ্রনাথও বেঁচে। কেষ্টনগরের চৌধুরী বংশের প্রমথ চৌধুরী জীবিত। কিন্তু সব প্রাচীন। নূতন কালের উজ্জ্বল মানুষের মধ্যে একজনকেও পাই নি যার কপালে জমিদারবংশের ছাপ মারা আছে। অপরিসীম বিস্ময় বোধ করেছিলাম।

জমিদারবংশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ জন্মালেন কি ক'রে? রাশিয়াতে জন্মেছিলেন 'টলস্টয়'। কাউণ্ট টলস্টয়। ঋষি টলস্টয়।

* * *

সেদিন কোথাও কোন সান্ত্বনা পাই নি সুলতা, হতাশায় আক্ষেপে যেন ভেঙে পড়েছিলাম। দুঃখ যেটা অর্চনার জন্যে অনুভব করেছিলাম, সেইটে—ওই জগদীশকাকার কুৎসিত কথা আর খুড়ীমার এই ক'টা কথা—"বজ্রাঘাত হয় না ওই জয়ধ্বজার উপর" আমাকে যেন পাগল করে তুলেছিল। মনে হয়েছিল—রায়বংশ ধ্বংস হয়ে যাওয়াই ভাল।

আবার মনে হয়েছিল—বাঁচতে হবে। যা হয়েছে তা হয়েছে, আমি বাঁচব। আমি কীর্তিহাটের সব কিছু বিক্রী করে দিয়ে পালিয়ে এসে বাঁচব।

ঠিক এই মুহূর্তে রঘুয়া চাকর এসে বলেছিল—দিদিমণি আইলেন।

—দিদিমণি? চমকে উঠেছিলাম।

—অর্চনা-দিদিমণি!

অর্চনা এসেছে? বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম অর্চনার শ্বশুর তাকে নিয়ে এসেছেন এ-বাড়ী। এসেছেন আমার কাছে। জগদীশ্বরকাকা সকালে দাবী জানিয়ে এসেছিলেন মেয়েকে তিনি বাড়ী নিয়ে যাবেন। রথীনের দরুন যা তার পাওনা তা অর্চনার অভিভাবক হিসেবে তাঁকেই বুঝিয়ে দেওয়া হোক। এবং অর্চনার ভরণপোষণের জন্য মাসিক একটা খোরপোষের ব্যবস্থা করা হোক।

তাই তিনি অর্চনাকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছেন। কারণ এ বিয়ে দিয়েছিলাম আমিই। এবং আমাকে দেখেই তাঁরা আমার খুড়তুতো বোন বলে এবং অর্চনা অবিকল ভবানী দেবীর মত দেখতে বলে বিবাহ দিয়েছিলেন।

রথীনের বাপ বললেন—আমরা বউমার অভিভাবক হিসেবে তোমাকে জানি। জগদীশ্বর রায়কে জানি না। ওঁকে দেখলে এ বিয়ে হ'ত না। উনি যে দাবী জানিয়েছিলেন—বউমাকে সে সম্পর্কে মত জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি কোন উত্তর দেন নি। আমি ওঁকে এনেছি তোমার সামনে ওঁর সঙ্গে কথা বলব। কথা নয় সুরেশ্বর—একটা দলিল করেছি, দেখ।

* * *

দলিলখানা পড়ে আমার মনে পড়েছিল আমার ঠাকুমার কথা। আমার ঠাকুমাকে কীর্তিহাটের ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকতে দেন নি এই জগদীশ্বরকাকা আর তাঁর দাদা ধনেশ্বর-কাকা। কলকাতায় তাঁকে বন্দী করে রেখেছিলেন আমার জ্যাঠামশাই, আমার বাবা প্রতিবাদ করেন নি। করতে পারেন নি দেবোত্তর সম্পত্তির জন্যে। ঠাকুমা কোন রকমে বেরিয়ে পালিয়ে গেলেন বৃন্দাবনে। সেখানে স্বামীর ভিক্ষেয়া, না, তাই বা কেন বলব সুলতা, বলব এক বৃদ্ধা বাঈজীর স্নেহদৃষ্টিতে পড়ে তাঁর আশ্রমে স্থান পেয়েছিলেন। নইলে হয়তো ওই ঘরে বন্দী অবস্থায় মরতেন, না-হয় বৃন্দাবনে একলা পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে ভিক্ষে করতেন। তাঁর পৈতৃক দেড় লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ তাঁর বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বর রায় নিজের নামে নিজেদের নামে এনডোর্স করিয়ে নিয়েছিল। আমার বাবা নীরব ছিলেন,

কিন্তু টাকার ভাগ নিয়েছিলেন।

আর এই ১৯০০ সালের ৩৭ বছর পর কাল এমন পাল্টেছে যে রথীনের বাবা যে দলিল করে এনেছেন তাতে অর্চনার জন্ত মাসিক একশো টাকা মাসোহারা, ত ছাড়া বছরে দুবার দেড়শো করে তিনশো টাকা মোট পনেরশো টাকার ব্যবস্থা করেছেন। তার জন্ত ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়েছেন। কিন্তু সে মূল টাকায় অর্চনার অধিকার থাকবে না। অর্চনার মৃত্যুর পর সে টাকা তাঁর অন্য উত্তরাধিকারীরা পাবে। যদি বর্তমান কালের ধারা অনুযায়ী অর্চনা বিধবা বিবাহ আইন অনুযায়ী বা তিন আইন মতে বিবাহ করে, তবে অর্চনা এককালীন পাঁচ হাজার টাকা পাবে তার সংসার পাতবার জন্ত; অবশ্য তারপর আর মাসোহারার অধিকারিণী সে হবে না।

ইচ্ছানুযায়ী সে পিত্রালয়ে বা হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ীতে থাকতে পারবে বা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্রও থাকতে পারবে সে এবং সেক্ষেত্রে মাসিক তিরিশ টাকা পর্যন্ত বাড়ীভাড়া পেতে পারবে।

আমি বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম তাঁর উদারতা দেখে।

অর্চনার শ্বশুর বলেছিলেন—আমার ইচ্ছে বউমা আমার কাছেই থাকেন, পড়াশোনা করেন; এ অবস্থায় পড়াশোনাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আগে হলে দীক্ষা দিয়ে পুজো-অর্চনার পর ধরানো নিয়ম ছিল—এ যুগে শিক্ষা—। কিন্তু ওঁর কি মত তা উনি বলেন নি।

অর্চনা বরাবর এসে অবধি বসে ছিল পাথরের মূর্তির মত। সে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল —না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বলেছিল—সুলতা, অর্চনা এখানে বসে আছে তাই বলছি নইলে রায়বাড়ীর জবানবন্দীর মধ্যে বাংলার নূতন যুগের শিক্ষিতসমাজের একটি উজ্জ্বল ঘরের লুকানো অন্ধকারের কথা প্রকাশ করতাম না। রায়বংশের ছবির সারির মধ্যে মুখুজ্জেবাড়ীর অন্ধকারের ছবি এখানে টাঙিয়ে দিতাম না।

সেদিন কথাটা অনুমান করতেও পারি নি। অর্চনাকেই দোষ দিয়েছিলাম। এদের বাড়ীটাও পচে গিয়েছিল।

অর্চনা নিজেই এবার বললে—আমি অনুমানে বুঝেছিলাম, ঠিক প্রমাণ তখনও পাই নি। তবে ভুল আমি করি নি। আলোর তলার অন্ধকার নয়—লণ্ঠনের উপরেও অন্ধকার জমে গোটা আলোটাকেই কালিপড়া লালচে আলোয় পরিণত হয়েছিল বাড়ীটা। ছ বছর পর ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের সময় আমার দেওরদের যে চেহারা দেখেছি; সে চেহারার পত্তন ছ বছরের অনেক আগে হয়েছে। ওখানে থাকলে আমার নিষ্কৃতি ছিল না, সে যেন আমার অন্তর আমাকে বলে দিয়েছিল। ও বাড়ীতে থাকতে আমার সাহস হয় নি।

সুরেশ্বর বাধা দিয়ে বললে—থাক ওদের কথা। রায়বাড়ীর জবানবন্দীতে ওইখানেই যানে রথীনের আত্মহত্যা আর অন্নপূর্ণা-মায়ের মৃত্যুর সঙ্গেই ওদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে। ওরা যা হয়েছে তা নিয়ে ওরা আছে। দুনিয়ার অন্তরাত্মা বলে একটা সত্তা আছে। তাতে

আমি বিশ্বাস করি। মাটির বুকের মধ্যে তার উৎস, কিন্তু মানুষের বুকের ভিতরেই সে গঙ্গাধারা হয়ে বয়ে গেছে। আজ সে ধারা কীর্তিনাশা হয়ে সব ভেঙেচুরেই দিক আর ভাগীরথীর মত সে মজেই যাক কাল আবার তার মোড় ফিরবে। নতুন চেহারা নেবে সে। সেই ভরসায় মানুষ বাঁচে। আমিও সেই ভরসায় বেঁচে রয়েছি, জবানবন্দী দিয়ে জমিদার জীবনের পালা শেষ ক'রে নতুন জীবন শুরু করতে চাচ্ছি। এখন জবানবন্দীর কথায় আসি। সুলতা যে কথা অর্চনা বলতে যাচ্ছিল সে বড় মর্মান্তিক। ওর শ্বশুরবাড়ীর কথা। ওর দেওরদের কথা, ওর খুড়শ্বশুরদের কথা। যুদ্ধের সময় ওরা ওয়ার কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিল; সে সময় কণ্ট্রাক্টররা যা করেছে তা বলবার প্রয়োজন নেই। সেটার আঁচ শ্বশুরবাড়ীতে মাস আষ্টেকের মধ্যেই অর্চনা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সে সময় ভয় ছিল না, কারণ তখন অন্নপূর্ণা-মা বেঁচে-ছিলেন আর রথীনও তখন বেঁচে। রথীনের জীবনে পাপপুণ্য ছিল না, ধর্ম-অধর্ম ছিল না। কিন্তু অর্চনার উপর অধিকারের দাবী তার ছিল। বাপকে সে বলেতে বলেছিল—ভুল করেছি রেজেস্ট্রী করে বিয়ে ক'রে, হিন্দুমতে দশটা বিয়েতে বাধা নেই—হিন্দুমতে বিয়ে করলে আমাকে মরতে হ'ত না। মা-মণির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও হয়তো মাফ পেতাম।

যাক—। অর্চনা কীর্তিহাট ফিরল ওর বাবার সঙ্গে; জগদীশকাকা এবং ওর মা ওকে নিয়ে কীর্তিহাট ফিরলেন। আমি তার আগেই কীর্তিহাটে ফিরেছি এবং কীর্তিহাটেই নয়, আশপাশ চারিদিকের মানুষের কাছে রায়বাড়ীর জমিদারীর প্রজার কাছে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছি; হয়েছি গোয়ানদের সমর্থক হিসাবে এবং সেই সূত্রে ইংরেজ সরকারের সমর্থক হিসেবে।

মেদিনীপুরে কুইনী এবং হিলডা এসে অভিযোগ করেছিল—গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে। তারা তাদের উপর কংগ্রেসবিরোধী হিসেবে অত্যাচার করছে। আমি যদি এর প্রতিকার করি তো ভাল, নাহলে তারা মেদিনীপুরের ডি-এম-এর কাছে গিয়ে নালিশ করবে। সেই কারণে কুইনী হিলডা খড়্গপুরের মিসেস হাডসনকে নিয়ে এসেছিল। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, অনুরোধ করেছিলাম মিটমাটের চেষ্টা আমি করব এবং বোধ হয় মিটমাটও হয়ে যাবে; তবে তোমাদের কাছে অনুরোধ—তোমরা অপেক্ষা কর।

অপেক্ষা তারা করেছিল। কুইনী হিলডা মেজদির সঙ্গেই কীর্তিহাট ফিরে গিয়েছিল। আমি চলে এলাম কলকাতায় অর্চনার দুর্ভাগ্যের সংবাদ পেয়ে।

সেই কারণেই আমি অর্চনা এবং জগদীশকাকাদের রেখেই কীর্তিহাট চলে এসেছিলাম। দেখলাম সারা অঞ্চলটার মানুষ ওই গোয়ানদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়ে তাঁদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গোয়ানরা ভীত হয়েছে। কিন্তু নত হয় নি। তারাও প্রতিজ্ঞা করেছে তারা নত হবে না। তারা দেশের মালিক ভারতবর্ষের এম্পায়ারের সঙ্গে স্বধর্মাবলম্বী। কেন তারা নত হবে?

দুটো-চারটে ছোটখাটো ঝগড়াও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আমি কলকাতায় তখন, কুইনী হিলডা আমার প্রতিশ্রুতি পেয়েও তার উপর নির্ভর ক'রে থাকতে পারে নি। গোয়ানদের নেতৃত্ব করেছে কুইনী। ব্যাপারটা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত যায় নি। কিন্তু এস-ডি-ও পর্যন্ত

গিয়েছে এবং এস-ডি-ও সার্কেল অফিসারকে তদন্তের ভার দিয়েছিলেন। জেলাটা মেদিনীপুর, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তাণ্ডব শেষ হয়েছে মাত্র দু বছর আগে। সার্কেল অফিসার পুলিস রক্ষী নিয়ে এসেছিলেন তদন্তে। অভিযোগ এখানকার কংগ্রেসীদের প্ররোচনায় তাদের বয়কট করা হয়েছে এবং নানাভাবে তাদের বিব্রত করা হচ্ছে। তারপর ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে কোন দিন কি অত্যাচার হয়েছে গোয়ানদের ওপর। সে ফিরিস্তি অনেক। শুরু হয়েছে সিদ্ধাসন জঙ্গলে গোয়ানদের প্রবেশাধিকার থেকে। শেষ হয়েছে গোয়ানপাড়ার মেয়েরা এবং ছেলেরা কীর্তিহাটের স্কুলে জায়গা পায় না। এ ছাড়া অভিযোগ হয়েছে রায়বাড়ীর ধনেশ্বরকাকার ছোটছেলে নবযুবক অরুণেশ্বর এবং সুখেশ্বরকাকার ছোটছেলে দীপকেশ্বরের বিরুদ্ধে। তারা এই বয়কটের সুযোগে গোয়ানপাড়ার মেয়েদের উপর ঘৃণ্য অত্যাচার শুরু করেছে।

সাধারণের পক্ষে এসেছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি সেই বৃদ্ধ রঙলাল ঘোষ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন কুইনীকে যে, কোন অন্যায় কীর্তিহাটের লোকে স্বীকার করে না। কীর্তিহাটে থেকে যারা কীর্তিহাটের লোকেদের সমর্থিত প্রার্থীকে সমর্থন করবে না তাদের সঙ্গে কীর্তিহাটের লোকের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ঘরে আগুন তারা লাগাবে না এটা নিশ্চিত কিন্তু তাদের ঘরে আগুন লাগলে নেভাতে যাবে না। তারা কীর্তিহাটের লোকেদের সঙ্গে যদি একধর্মের লোক না-হয় তবে তাদের কীর্তিহাটের লোকের ধর্মস্থানে ঢুকতে দেবে না। প্রয়োজন হলে লেনদেন কাজকারবার সব বন্ধ করে দেবে।

কুইনী বলেছিল—মুসলমানরা কংগ্রেস-বিরোধী—তাদের সঙ্গে এই রকম করতে পারেন? সারওয়ার্দী সাহেবের বাড়ী মেদিনীপুর শহর।

ঝগড়া বেশ দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। অরুণেশ্বর দীপকেশ্বরের অপরাধ ঠিক প্রমাণিত হয় নি। কীর্তিহাটের লোকেরা বলেছে—না—না—না। তাদের চরিত্র বড় ভাল।

সার্কেল অফিসার ফিরে গেছেন। প্রমাণ পান নি।

তারপর কুইনীর নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে হাতেলেখা পোস্টার মেরে কীর্তিহাট গোয়ানপাড়ার দেওয়াল ছেয়ে দিয়েছে কারা।

কুইনীর পড়ার খরচা দেয় কেন সুরেশ্বর রায়? কুইনা নেয় কেন? কুইনীর কলকাতার বাড়ী খালাস করতে টাকা কে দিয়েছে? কেন দিয়েছে?

এই অবস্থায় আমি গিয়ে পৌছুলাম সুলতা।

আমার নায়েব আমাকে সমস্ত কথা বলে বললে—আপনি এ নিয়ে কিছু করবেন না, বলবেন না। ব্যাপারটা সাংঘাতিক হয়ে উঠবে।

ওদিকে ঠাকুরবাড়ীতে মেজদির প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছেন ধনেশ্বরকাকারা। ওখানে শিবেশ্বর রায়ের বংশের লোকেরা জোট বেঁধেছে।

মেজদি যেন বোবা হয়ে গেছেন। হবারই কথা। এগুলো আগে থেকেই তিনি কল্পনা করেছিলেন, আমাকে বলেছিলেন—স্বর্গ-বৈকুণ্ঠ-কৈলাস এ সবের কথা বইয়ে পড়েছি ভাই, গল্পে শুনেছি, যাত্রার দলে থিয়েটারে সাজিয়েগুছিয়ে দেখিয়েছে দেখেছি, যতক্ষণ পড়ি যতক্ষণ

শুনি যতক্ষণ দেখি বেশ লাগে। কিন্তু ভাই পিথিবীতে যেখানে যত ঠাকুর আর ঠাকুরবাড়ী আছে, সেখানে মানুষে যা করে তাই হয়—দেবতার মহিমা কোথাও দেখি নি বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না। রায়বাড়ীর কালীমা, গোবিন্দ, সৌভাগ্য-শিলা সত্যি হলে তারা কি এই পচা মেজতরফের দত্তিগুলোর হুকুমে চলে? ওখানে আর আমি থাকতে পারব না। তার থেকে তুই আমাকে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দে ভাই। আমি বড়দি'র আশ্রমের উঠোন ঝাঁট দিয়ে ভিক্ষে করে খাব।

তিনি এ সব বিষয়ে একটি কথা বলেন নি। ঠাকুরবাড়ী ঢুকতে যান নি। বাড়ীতে ওঠেন নি। উঠেছেন বিবি মহলে।

তিনিও আমাকে বললেন—ভাই, ধোঁয়ানো আগুনে খোঁচা দিস নে ভাই, বাতাস দিস নে, দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে।

আমি ভাবলাম—কি করব?

হঠাৎ বিকেলবেলা কুইনী এল ক'জন গোয়ানকে সঙ্গে ক'রে—আমার সামনে মাথা তুলে সদর্পেই জিজ্ঞাসা করলে—এই আপনার কথার দাম? আমি কথা দিয়েছি, সে তার দাম যাচাই করতে ছাড়বে কেন?

নির্ভীক মেয়েটাকে দেখে খুশী হয়েছিলাম এবং তোমার কাছে গোপন করব না আমার দেহের মধ্যে দেবেশ্বর রায়ের রক্ত সাড়া দিয়ে উঠেছিল। আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

মুখচোখ লাল হয়ে উঠল কুইনীর। সে হিলডাকে বললে—চল দিদিয়া, জবাব পেয়েছি। চল। বাবুজাত—রায়বাহাদুরের জাত আলাদা হয় না। চল।

আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। লজ্জিত হলাম। বললাম—মাফ কর কুইনী। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। আমি কথা দিয়েছি চেষ্টা করব। আবার বলছি সে চেষ্টা আমি করব। আমি কালই বলব সকলকে। ওঁরা না-শুনলে যা ইচ্ছা হয় করো।

১৯৩৮ সালের মে মাস। আমি কীর্তিহাটের জমিদার অর্থসম্পদহীন মেজতরফ নয়; অর্থবল আমার ছিল; কিন্তু সেদিন আমিই গেলাম কীর্তিহাটের রঙলাল ঘোষের বাড়ী।

জমিদার মহাজন ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সকলে সেদিন মানতে বাধ্য ছিল রঙলাল ঘোষকে।

রঙলাল ঘোষ আমার সঙ্গে দেখাই করলেন না। ফিরিয়ে দিলেন, বললেন—শরীর খারাপ, তা ছাড়া সময় নেই। জবাবটা বহন ক'রে এনেছিলেন রঙলাল ঘোষের বড়ছেলে। লোকটি মিষ্টভাষী লোক। তিনি বললেন—"বাবা কি বলবেন? তিনি জানেন আপনি যার জন্যে এসেছেন। ও হবে না। গোয়ানদের সঙ্গে মিটমাট হবে না। আপনিও ও নিয়ে জড়িয়ে থাকবেন না। আর ওই কুইনী মেয়েটার পড়ার খরচা আপনি দেন তাও আর দেবেন না। আপনার বদনাম রটছে। ওদের সঙ্গে থাকলে লোকে ধর্মঘট করবে। খাজনা দেবে না। সঙ্গে সঙ্গে সোসাল বয়কটও করবে।"

আমি মাথা নিচু ক'রে ফিরে এলাম সদগোপপাড়া থেকে রায়বাড়ী। পথে কতকগুলি ছেলে হাততালি দিলে। হঠাৎ একটা নির্জন জায়গায় কে কোথা থেকে বললে—জমিদার! কলিয়ে দেখ জমিদারী। হেসে সুরেশ্বর বললে—এতদিনের রায়বংশের যে ছেলেটি কীর্তিহাটে

উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজ করছিল তার গায়ে তারাই অবহেলা অবজ্ঞা এবং উপেক্ষার কালি মাখিয়ে কালো করে দিল।

তা করুক। আমি অন্যায় করি নি এই জোরটা আমার ছিল। তাই ওখান থেকে চলে আসব সংকল্প করেছি আবার ভেঙেছি, ভেঙে সেখানে ওই কালি মেখেই কালো মুখ নিয়েই থেকেছি দিনের পর দিন। এরই মধ্যে গাঁয়ে ফিরে এলেন জগদীশকাকা অর্চনাকে নিয়ে। এবং কন্যার সম্পদ মাসিক একশো টাকা আয় আর অর্চনার গহনার মূলধন সে প্রায় পনের হাজার টাকার উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে ফিরলেন। অর্চনা তখনও মুহ্যমান।

ঠিক একদিন পর অর্থাৎ পরদিন সকালেই মেজদিদি ওবাড়ী থেকে ফিরে এলেন সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে। দুই চোখ থেকে চোখের জলের ধারায় আর বিরাম ছিল না।

জগদীশ্বরকাকা তাঁর গলা ধরে বাড়ী থেকে বের ক'রে পথের উপর ফেলে দিয়েছেন, চীৎকার ক'রে কুৎসিত ভাষায় তাঁর অপমান করেছেন। জেলে গিয়ে তাঁর জাত গিয়েছে। অজাতের হাতে খেয়েছেন—তাছাড়া আরও অনেক কিছু। অর্চনা প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু মুহূর্তে জগদীশ্বরকাকা তাকে শাসিয়ে বলেছেন—এখনি গিয়ে পুলিসের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ ক'রে তোমাকে ঠেলে দিয়ে আসব শ্রীঘরে।

শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। মেজদি হাতজোড় ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমায় বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দে ভাই। তোর পায়ে ধরছি আমি।

তাই ঠিক করে ফেললাম। মেজদিকে বৃন্দাবনেই দিয়ে আসব। সেই ভাল—শিবেশ্বর রায়ের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী জেল থেকে ফিরে এসে নির্বাসিতা দেবেশ্বর রায়ের স্ত্রীর পাশেই ব্রজধামের রজের উপর জীবনের শেষ আশ্রয় গড়ে তুলুন। আর কোথায় যাবেন ?

গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করা থেকে ভাল। শহরে বাজারে ব্যবসাদার কি চাকরে বড়-লোকের বাড়ীতে দাসী বা রাঁধুনীবৃত্তি থেকে সে ভাল।

যাবার সময় খবর শুনে শুধু অর্চনা এসেছিল। দেখলাম ওর চোখ দুটো ঝক্‌ঝক্ করছে। শোকের মুহ্যমানতা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে—তাই যাও সুরোদা। সেই ভাল। বললাম—ভালো নয় ? জমিদার শিবেশ্বর রায়ের স্ত্রীর অন্যের বাড়ী দাসী বা রাঁধুনী হওয়া থেকে তো ভাল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল অর্চনা। তারপর সুরেশ্বর অর্চনার দিকে তাকিয়ে বললে—তোর মনে আছে অর্চি ?

একটি রেখার মত ক্ষীণ হাসি নিঃশব্দে তার ঠোঁটের দুই প্রান্তে ফুটে উঠল—সেও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—মনে নেই ? নিজের কথাও তো ছিল ওর মধ্যে সুরোদা। আমি তো তখন বুঝতে পেরেছি, বাবা আমার গয়নার টাকার উপর নজর ফেলেছেন। রাত্রে মাকে বলেছেন—গয়নাগুলো বেচে একবন্দ ভাল জমি কিনে ফেলব অর্চির নামে। আর কিছু টাকা নিয়ে তেজারতি করব। আর আমাদের দুঃখ থাকবে না। শুনে সারারাত ঘুমুই নি। ভোরে উঠে তোমার ওখানে বিবিমহলে এলাম। তুমি বললে মেজদিকে বৃন্দাবনে রাখতে যাচ্ছি। আমার মনে পড়েছিল দ্রৌপদীর অজ্ঞাতবাসে সৈরিন্ধ্রী হয়ে চাকরি করার কথা।

সেকালে দাসী হয়েও এঁটো খেতে হয় নি, পায়ে হাত দিতে হয় নি ; তা ছাড়াও কীচকের মত মহাপাষণ্ডের হাত থেকেও বাঁচা সম্ভবপর হয়েছিল। একালে দ্রৌপদীরা মানে রাজা জমিদারবাড়ীর মেয়েরা চাকরি করতে গেলে ওর কোনটা থেকে রেহাই পাবে না। যাও তুমি দিয়ে এস। সেই ভাল। সেইদিনই রওনা হয়েছিলাম।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণাবাঈয়ের আশ্রমে আমার জন্মে পরমতম বিস্ময় আর ধ্রুবতারার মত স্থির আর শেষ নির্দেশ অপেক্ষা করে ছিল তা আমি জানতাম না। কোন ভৃগুজাতকের গুণীনও গণনা করে বলতে পারতেন না ; কোন মানুষ কল্পনা করতে পারতেন না।

আশ্রমে ঢুকতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল।

কত পরিচিতের মত বললেন—এসেছ ?

আমি অবাক হয়ে গিছলাম তাঁকে দেখে। গায়ের রঙটা টক্‌টকে গৌরবর্ণ, ছোটখাটো মাথায়, বেশ মোটাসোটা মানুষটি ; তিনি সুন্দর কি অসুন্দর সে বিচার বোধ হয় কেউ করবে না—দেখলেই মনে হবে আহা কি প্রসন্ন মানুষ।

তিনি আবার বললেন—এসেছ তো অনেক দিন—, এতদিনে। বলতে বলতে থেমে গিয়ে বললেন—দেনাশোধের পালা এবার। নয় ? আমি জানি, আমি জানি। দেনা যে শোধ করতে হবে তোমাকে।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, সেদিন আমি আমার পিতামহীর সামনে বসে তাঁর কথা শুনে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে কি বলব, তিনি যা বলেছিলেন, তাই মনে হয়েছিল ধ্রুবসত্য। মনে হয়েছিল, তিনি দিব্যদৃষ্টি পেয়েছেন, ভবিষ্যৎ যেন দেখতে পাচ্ছেন, প্রত্যক্ষ দর্শন করে বলছেন। মনে হয়েছিল, তিনি আর মানুষ নন। মানুষের দেহেই তিনি দেবতার চেয়েও পবিত্র হয়েছেন, জগতের সব ন্যায়, সব ধর্ম তাঁকে আশ্রয় করে যেন ধন্য হয়ে গেছে।

তিনি বলছিলেন, নাতি, আমার সঙ্গে কথা হয় ঠাকুরের। সে ভাই অনেকদিন থেকে। কীর্তিহাটে মন্দিরে গেলে কথা হতো, এখানে ভাই চব্বিশ ঘণ্টা। আমার আশেপাশে অহরহ ফিরছে, কথা বলছে, বুঝেছ নাতি।

ঘাড় নেড়ে আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ বুঝেছি। মাথার গোলমাল তাঁর অনেকদিন হয়েছে। কিন্তু সে-কথাটা আমলই পায় নি মনের কাছে। আমি দেখলাম, পৃথিবীর সবকিছু আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে তাঁর কাছে। যা ঘটেছে, যা ঘটছে, তার কারণ তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করে ফেলেন। কিছুই অগোচর থাকে না। সব। সেই সর্বঘটে যাঁর অধিষ্ঠান, তাঁর ইচ্ছে। বলেন—ওই তো, মজা লাগাতে সে ওস্তাদ। মহা ওস্তাদ! বিপদে ফেলে মজা দেখে। বিপদেও ফেলে আবার ভরসা করলে পারও করে সেই।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক তখন, ১৯৩৮ সাল, এর ন' বছর পর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। তারও দু বছর আগে এ্যাটমিক যুগ আরম্ভের যুগ। ১৯৪৫ সালে। সেই ১৯৩৮ সালেও তিনি কেমন জান ? মডার্ন ইণ্ডিয়ার মধ্যে আজও যেমন গঙ্গাসাগর মেলায়, পূর্ণকুম্ভে, প্রয়াগে, হরিদ্বারে অতীত ভারতের বিচিত্র রূপ লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে, ঠিক তেমনি। এবং গঙ্গাসাগরে দারুণ শীতে বাংলার মন্ত্রীদের স্নান করার এবং প্রয়াগে কুম্ভে সেণ্টারের

মন্ত্রীদের প্রানের মধ্যে মডার্ন ইণ্ডিয়া যেমন পুরানো ভারতের কাছে সবিস্ময়ে মাথা নত করে আমিও সেদিন তেমনি করে অভিভূত হয়ে তাঁর কথা মেনে নিয়েছিলাম পরম সত্য এবং ধ্রুবসত্য বলে। একবিন্দু সংশয় যেমন তাঁর বলার মধ্যে ছিল না, তেমনি শোনার মধ্যেও আমার এতটুকু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ছিল না।

একটু চুপ করে থেকে আবার সুরেশ্বর একটা সিগারেট ধরিয়ে শুরু করলে, বললে—পরে এ নিয়ে আমি বিচার করেছি, খুঁটিয়ে খতিয়ে দেখেছি। কেবল একটা কথা বা তাঁর একটা ধারণা ছাড়া বাকিগুলির মধ্যে অবিশ্বাসের কিছু ছিলও না।

ঠাকুমা সেই গোড়াতেই আমাকে ডেকেছিলেন—'বড়বাবু' বলে। অর্থাৎ দেবেশ্বর রায়ই জন্মান্তর নিয়ে আমি অর্থাৎ সুরেশ্বর হয়ে জন্মেছি—এই ধারণাটার কথা বলছি। ওটা তিনি ছাড়েন নি। সায়েন্স অব হেরিডিটির কথা মোটামুটি জানি, কিন্তু ভাল ভাবে জানি না, তাঁকে বোঝাতে গিয়েও বোঝাতে পারি নি, আর তিনি তা ঘাড় নেড়ে হেসে উড়িয়েই দিয়েছিলেন। একটি বুলিই ধরেছিলেন—জানি 'বড়বাবু' জানি। এসব আমি অনেকদিন আগে থেকে জানি। তুমি আবার আসবে, তোমাকে আবার নতুন জন্ম নিয়ে রায়বাড়ীতেই আসতে হবে, তোমাকে দেনা শোধ করতে হবে।

সুলতা, তাঁর কথাগুলো আজও আমার কানে বাজছে। বলেছিলেন—বড়বাবু, যত বড় মানুষটা তুমি, তার শতগুণ ভারী দেনার বোঝা তোমার ঘাড়ে। জন্মে জন্মে বোঝা বাড়িয়েই চলেছ, বাড়িয়েই চলেছ; এবার বোঝা নামাও, শোধ করো, দেনার বোঝা শোধ করো।

আমার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বলেছিলেন—আমার কাছে একটা কথা আদায় করেছিলে, তোমার মনে আছে? সেই তুমি মারা গেলে তার ক'দিন আগে! বলেছিলে—বড়বউ, তোমার ঠাকুর ঠিক বলেছেন—দেনার জন্যেই জন্মে জন্মে তোমাকে পেয়েও আমি পাচ্ছিনে। এবার দেনা শোধ করবই। তোমাকে পেতে হবে বড়বউ, প্রাণটা আমার হাহাকার করছে।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। বুঝতে পারছিলাম পাগলের প্রলাপ; কিন্তু তবুও অশ্রদ্ধা করে তাকে অবিশ্বাস করতে পারছিলাম না। উঠে পালিয়ে আসতেও পারছিলাম না। শুধু একটা রুদ্ধ বেদনার আবেগ বুকের মধ্যে আমার উথলে উথলে উঠছিল। ভাবছিলাম—রায়বাড়ীর দেবেশ্বর রায়ের গৃহিণী রত্নেশ্বর রায়ের মহাসমাদরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূই এঁর পরিচয় নয়, এঁর পরিচয় সীতা-সাবিত্রীর মত, এঁকে ধনসম্পদ আর মিথ্যা মর্যাদা-স্ফীত রায়বংশ এইভাবে পরিত্যাগ করেছে। হতভাগ্য রায়বংশ! অথবা রায়বংশের মত সব বংশের ভাগ্যই এই। সে সেই রামায়ণের কাল থেকে। সীতাকে বনবাসেই যেতে হয়, শেষ হয় পাতাল প্রবেশে! সঙ্গে সঙ্গে বংশের লক্ষ্মীও ডুবে যান।

তুমি জান কিনা আমি জানি না, মহারাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে একটা জনপ্রবাদ আছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বাড়ীতে মা ভবানী ছিলেন কন্যারূপা হয়ে। যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্য জামাই রামচন্দ্রকে হত্যা করব বলে স্থির করলেন, রাজ্যের জন্য, মর্যাদার জন্য, তখন নাকি তাঁর

মেয়ের রূপ ধরে মা ভবানী এসে বলেছিলেন—বাবা আমার মুখের দিকে তাকাও—। শক্তি আর অহংকারমত্ত প্রতাপাদিত্য বলেছিল—চলে যা আমার সুমুখ থেকে, তোর মুখ আর দেখব না।—

মা সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের অহংকার আর অধর্ম-উত্তপ্ত বাড়ী ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁর ঝাঁপিটি নিয়ে। গিয়ে উঠেছিলেন ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ী।

ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে গল্পটা একটু অন্যরকম করে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—মা প্রথম ছিলেন হরি হোড়ের বাড়ীতে। তারপর ঠিক ওইভাবেই কন্যাবেশে হোড়মশায়ের কাছে গিয়ে বলেছিলেন—বাবা, আমি আর থাকতে পারছিনে। তোমার জামাই আসছে। হোড় রেগেই ছিলেন মেয়ের ওপর, বলেছিলেন—যা-যা, এখুনি যা।

মা অন্নপূর্ণা গঙ্গা পার হয়ে যাবার সময় ঈশ্বরী পাটনীর কাঠের সেঁউতি সোনা করে দিয়ে আর তার ছেলেরা দুধে-ভাতে থাকবে এই বর দিয়ে মজুমদার-বাড়ী প্রবেশ করেছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের গল্পটা আমাকে বলেছিলেন আমার মেজদিদি, শিবেশ্বরের তৃতীয় পক্ষ পুরুত ভটচাজের কন্যেটি; তিনি কার কাছে এটা শুনেছিলেন তা বলতে পারিনে।

আমি সেদিন আমার ঠাকুমার সামনে বসে সেই গল্পটিই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, রায়বাড়ীর লক্ষ্মী ছিলেন এই বড়-বউটি; তাঁকে উপেক্ষা করলেন সবাই। স্বামী দেবেশ্বর রায়, ছেলেরা—যজ্ঞেশ্বর রায়, যোগেশ্বর রায়, মেজতরফের দেওর শিবেশ্বর রায় থেকে তাঁর ছেলে ধনেশ্বর, জগদীশ্বর সুখেশ্বর—সবাই।

ইনি বুঝি তিনিই। রায়বাড়ীর লক্ষ্মী। ইনি যা বলছেন, বাস্তব বিচারে তা প্রলাপ হলেও প্রলাপ নয়। এই হল সত্যকারের সত্য।

সুলতা, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি কথা ঠাকুমা?

বৃদ্ধা বিরক্ত হয়ে বললেন—দেখ, ওই ভালবাসিনে। ওইসব কথা চাপা দেওয়া। তুমি বল নি আমাকে, বড়বউ তুমি বল, আমাকে তুমি জন্মজন্মান্তরে কামনা করবে। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে? আমি চুপ করেছিলাম। তোমার সে কি জেদ। কি বলব বল, আমি তো সবই জানি। ঠাকুরের সঙ্গে কথা হত, তিনি তো আমাকে সব বলতেন। আমি তাঁকে শুধিয়েছিলাম—এত কষ্ট কেন আমার কপালে লিখলে? ঠাকুর বললেন—এর আগের ক' জন্ম আমাকে ফেলে তুই ওর পেছনে ছুটেছিস। আমি ডেকেছি আসিস নি। এবার ও তোকে ছুঁড়ে ফেলেছে, এবার তুই আমার কাছে এসেছিস, এবার তোর মুক্তি। তোর স্বামীকে সব দিয়েছিলাম। নিলে কই। নেবার মধ্যে নিলে রূপোর তাল, তার রূপের তাল। তাহলে কি বলব? তবু তুমি ছাড় না। তখন বললাম। তুমি বললে, বড়বউ, আজ থেকে জীবনের দেনা শোধ করব। তুমি শুধু এইটুকু বলো ঠাকুরকে—ঠাকুর, মুক্তি আমাকে দিয়ো না, আমাকে তোমার দাসী করে রাখ, যেদিন তার মুক্তি হবে সেইদিন মুক্তি দিয়ো আমাকে। সে ঋণশোধ করবে, কড়াক্রান্তি হিসেব করে, শোধ করবে বলে কথা দিয়েছে আমাকে। দেবেশ্বর রায় আমার সাধের বর—আমার মোহন বড়বাবু, আর যা করবে করুক, মিথ্যে কথা বলে না।—

—সে-সব বলেক'য়ে আজ ভুলে যাচ্ছ বড়বাবু! ছি-ছি-ছি।

মেজদি অবাক হয়ে সব শুনছিলেন, তিনি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বলেছিলেন—তা ও করছে দিদি, তা ও করছে।

—করছে? তবে যে বড়বাবু জিজ্ঞাসা করছ, 'কি কথা ঠাকুমা?'

হেসে বলেছিলেন—আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? তা তুমি তো জান আমি ঠাট্টা বুঝি না। বোকাসোকা মানুষ। বাবাঃ যা ভয় লাগত, কথা তো নয় যেন জেরা। এখন নাতি হয়ে জন্মেছ, ভয় আর ঠিক করে না। ক'টা কথা জিজ্ঞেস করি। করব? আমি বললাম—করুন। জিজ্ঞাসা করলেন—মদ খাও? মাথা হেঁট করে বললাম—খাই ঠাকুমা। বললেন—হুঁ, আমি জানি। বড়বাবু মদ না-খেয়ে থাকবে! বাবাঃ, বড়বাবুর বাপ, বাঘের মত বাপ, তিনি রাগ করে গর্জাচ্ছেন, বড়বাবু টেবিল ধরে টলছেন আর আমাকে বলছেন, বড়বউ, আমার সেই গুলি খাওয়া জায়গাটায় ব্যথা করছে, মালিশ দিয়ে দেবে চল। আর বাবাকে বল, কাল—কাল কথা বলব। আর বিয়ে করেছ? বিয়ে? এবার মেজদি বললেন—না দিদি, বিয়ে করে নি। বললেন—করে নি? তাহলে? বড়বাবু আবার সেই পাপ বাড়াচ্ছ? মা-না ভাই আমার, লক্ষ্মী সোনা আমার, ও-পাপ করো না ভাই। ও মহাপাপ। আমি হাত জোড় করে বললাম—না ঠাকুমা, বিয়ে আমি করি নি। কিন্তু যে-পাপের কথা বলছেন, সে-পাপও আমি করিনে। আমি রায়বংশের অভিশাপের কথা জানি, আজ ছ'পুরুষ পর্যন্ত জমানো পাপের কথা জানি।

—রাশি রাশি পাপ। ওরে নাতি, রায়বংশের পাপ জমা করলে পাহাড়-পর্বত হয় রে—পাহাড়-পর্বত হয়।

হঠাৎ যেন পাল্টে গেলেন ঠাকুমা। কি ভাবনায় যেন ডুবে রইলেন, তারপর যেন অনেকটা সহজ মানুষের মত বললেন—কি নাম তোমার নাতি? হাঁ-হাঁ, সুরেশ্বর। অবিকল তুমি বড়বাবুর মত দেখতে; বড়বাবু শেষকালে কিছুদিন আমাকে ভালবেসেছিলেন। আমি দেবতা দেবতা করতাম, আমাকে বলেছিলেন—দেখ আমি পুরুষমানুষ, তোমাকে আমি বিয়ে করেছি, কেউ যদি তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে আসে, তবে আমি তার সঙ্গে লড়ব, মরব, তার আগে তো ছেড়ে দেব না। সে যদি তোমার গোবিন্দ এসে কেড়ে নেন, তবে আমি তাঁর সঙ্গেও লড়ব। না লড়ে, না মরে তোমাকে আমি ছিনিয়ে নিতে দেব না।

চোখ থেকে তাঁর জল গড়াল। বললেন—দেখ ভাই, তখন কি জানতাম কথাটা এমনি করে ফলবে! তিনি মারা গেলেন। আমাকে ঠাকুর কেমন কৌশল করে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন দেখ। ভাই, আমার ভিক্ষে-শাশুড়ীকে দিয়ে পুরী তৈরী করে এখানে রাখলেন। তা ভাই আমার দশা হল, আমি এসে না পারলাম ঠাকুরকে আত্মসমর্পণ করতে, আর না পারলাম মরতে। দেখ! আঃ, তোমাকে দেখে কত কথা যে মনে পড়ছে। তুমি ভাই অবিকল আমার সেই বড়বাবু। বুঝেছ! বড় আবোলতাবোল যে মনে পড়ছে।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন—হাঁ যা বলছিলাম, শোন ভাই নাতি। রায়বংশের পাপের কথা। বড়বাবু আমাকে বলেছিলেন—বড়বউ, পাপ আমাদের জমা করলে পর্বত হয়,

গঙ্গার বুকে ফেললে গঙ্গার বুক পুরে ওঠে, মজে যায়। আমি হিসেব করে দেখেছি বড়বউ। পাপ শুধু একরকম নয়, যত রকমের পাপ হতে পারে, সব-সব—সব রকম পাপ জমা হয়েছে রায়বাড়ীর পাপ-পুণ্যের সিন্দুকে। পাপের সিন্দুক বোঝাই। দেখ রায়েদের জমিদারীতে পত্তনীতে, দরপত্তনীতে একশো পঁয়ত্রিশখানা গ্রাম। এ-গ্রামের খাজনা বাড়িয়ে তিন ডবল করেছি। একশো পঁয়ত্রিশখানা গ্রামে কমপক্ষে পনের হাজার লোকের বাস, আজ পাঁচপুরুষ ধরে পাঁচ-পনেরং পঁচাত্তর হাজার লোকের মাথার পা দিয়ে হেঁটেছি। পুজো করে ওরা যে লক্ষ্মী ঘরে তুলেছে, সে-লক্ষ্মীর ভাগ নিয়েছি। ঘরে আগুন দিয়েছি। চাবুক মেরেছি। বুকে গাছের গুঁড়ি চাপিয়েছি; থামের সঙ্গে বেঁধেছি। তাঁছাড়া বড়বউ নিজেদের পাপ—মদ খেয়ে নিজের সর্বনাশ করেছি। তোমার মত লক্ষ্মীকে ফেলে কত কদাচার করেছি বড়বউ, ওই ভায়লেট, ওঃ! পাপের কি শেষ আছে বড়বউ? বাবা ভিক্ষেমাকে তাড়ালেন। কেন, না, সে পাপদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছে। অঞ্জনা-পিসীকে, হ্যাঁ একরকম তাকেও তিনি তাড়ালেন। তাছাড়া বাবার মাতামহের পাপ, সে-পাপ তুমি জান না, ভীষণ পাপ, বাবার পিতামহের পাপ, সে-ও ভীষণ পাপ। পাপের বিন্ধ্যপর্বত, মাথা ঠেলে উঠছে—সূর্যের পথ বন্ধ করে দাঁড়াবে একদিন, সেদিন রায়বংশে আর সূর্য উঠবে না, রাত্রি পোয়াবে না। দিনের আলোর মুখ রায়বংশ দেখবে না। হয়তো জন্তু-জানোয়ার হয়ে রাত্রির অন্ধকারে হাঁক মেরে বেড়াবে। তখন এই মানুষেরাই গুলি করে মারবে, ফাঁদ পেতে ধরবে। বড়বাবু আমার হাত ধরে বলেছিল—নাতি, বলেছিল—তোমাকে দুঃখু দিয়ে তোমার চোখের জল দেখে আমার চোখের ঘোর কেটে গেল বড়বউ, আমি দেখতে পাচ্ছি—কত পাপ আজ ঝোলা পাহাড়ের মত মাথার ওপর ঝুলছে। যদি সময় পাই, তবে এই জন্মে এর প্রায়শ্চিত্ত করব, না পেলে কত জন্ম ঘুরতে হবে জানি না। আমি বলেছিলাম—না গো না। ভগবানের নাম কর, শরণ নাও, আগুনে খড় পুড়ে যাওয়ার মত পুড়ে যাবে। তা বড়বাবু হেসে বলেছিলেন—সে যদি তোমার মত পারতাম মাণিকবউ, তবে তো বেঁচে যেতাম। তা যে পারি না। পাপ করব আর হরিনামের ঝোলা নিয়ে জপ করব—আর পাপ ছাই হবে, এত সোজা হলে পাপও মিথ্যে, পুণ্যও মিথ্যে। সত্যি দেনা আর পাওনার মামলা। এতে একদিন না একদিন দেনদারকে হারতেই হয়। কেন জান? মূলধনের অভাব ব'লে। এই যে রাজবাড়ী, জমিদারবাড়ী, নবাববাড়ী, বাদশাবাড়ী এ সব গেছে ওই মূলধনের অভাবে। আমরা তো সামান্য। রামরাজ্য রামের অযোধ্যা, রামের বংশ তাও গেছে, কৃষ্ণের দ্বারকা যদুবংশ তাও গেছে। শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার বিয়ে করেছিলেন। তাদের ছেলে নাতিদের বউ তারাও ছিল—সব নিয়ে লাখ হবে, না—দশ লাখ হবে তার হিসেব বেদব্যাস দেন নি—তবে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের শরে দেহত্যাগ করলেন। রুক্মিণী সত্যভামা সহমৃতা হলেন—বাদবাকী যারা রইল তাদের এসে শবরেরা ব্যাধেরা ধ'রে নিয়ে গেল। ওদিকে সমুদ্রের বানে দ্বারকা ভেসে ডুবে গেল। দিল্লীর বাদশাদের বংশ নাকি রেঙ্গুনে দোকান করে। দিল্লীতে টাঙা চালায়। এই নিয়ম বড়-বউ। দেনা শোধ করতে হয়, পাওনা আদায় করতে পাওনাদার আসে, লাঠি মেরে আদায় করে নিয়ে যায়। এই যে একশো পঁয়ত্রিশখানা গাঁয়ের লোক যাদের কাছে আমরা বাড়তি আদায়

করেছি তারা ছাড়বে মনে করেছ ? ছাড়বে না। আদায় করে নেবে। কি ক'রে নেবে তা জানি না, তবে নেবে। দেনার পাহাড়—সেই পাহাড়ের চূড়া হল ওই ভায়লেট। ও তোমার আর আমার মধ্যে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে পেতে হাত বাড়িয়ে পাই নে। ও এসে দাঁড়ায়।

ঠাকুমা চুপ ক'রে গেলেন। তারপর সে কি কান্না। কাঁদতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর আবার যখন কথা বলতে শুরু করলেন তখন আবার কথার গোলমাল শুরু হ'ল।

সুরেশ্বর বললে—মাঝখানে বেশ সহজ মানুষের মতই কথা বলছিলেন, কোন গোলমাল তো ছিল না। তবে হাঁ, পুরনোকালের মানুষ বাহাত্তর বছর বয়স—তাঁর কথাগুলো তোমার আমার কাছে অন্ধ সংস্কারের কথা মনে হ'তে পারে। সে কথা আলাদা।

এবার বললেন—নাতি, তুমি সেই বড়বাবু। সেই রূপ সেই ধরনের কথাবার্তা—চলাফেরা ঢঙ-ঢাঙ সব সেই। মেজবউ বললে তুমি বিয়ে কর নি, তুমি প্রজাদিগে দয়া করেছ ; বসত সব নাখরাজ করে দিয়েছ—গোচর ছেড়ে দিয়েছ ; গোয়ানদের গোয়ানপাড়া সব শরীকের কাছে কিনে তাদের নিষ্কর করে দিয়েছ ; এই তো দেনা শোধ করছ। তা-ছাড়া ভাই এই যৌবনে তুমি বিয়ে না করে বিবাগী হয়েছ।

হেসে ফেললেন। বুকে হাত দিয়ে বললেন—আমার জন্যে বুঝেছ আমার জন্যে। কিন্তু ভাই, এ জন্মে তো হবে না। এখন মরলে আমার বিয়ের বয়েস হতে তো আরও বিশ বছর গো। এখন তো ষোল-সতেরোর কমে মেয়েদের বিয়েই হয় না। লেখাপড়া শিখতে হবে। তার পরে মনে কর তোমার সঙ্গে প্রেম করতে হবে—না কি না মেজবউ ? এমনি এমনি কি কাপড়ে-চোপড়ে মুড়ে গয়না পরিয়ে কপালে সিঁদুর ঘষে বিয়ের দিন আছে ? নেই। তুমি ভাই এ জন্মটা বিয়ে না-করে দেনা শোধ কর ; সেই ভায়লার বংশের কেউ থাকলে তাকে তুষ্ট ক'রো ভাই, এদিকে আমি মরি। তারপর তুমি এস। তোমারও খুশি আমারও খুশি। বৈকুণ্ঠে তুমি হবে দাস আমি হব দাসী। আর আমাদের জন্ম হবে না। কেমন ?

আমি কোন উত্তর দিই নি—বা দিতে পারি নি সুলতা, বুকের ভেতর কান্নার উচ্ছ্বসিত বর্ষার কাঁসাইকে বাঁধন দিয়ে কোনমতে শুনে যাচ্ছিলাম।

দেবেশ্বর রায়—রায়বংশের মনোহর পুরুষ—যদুবংশের কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদ্যুম্ন, তাঁর স্ত্রী, রায়বাড়ীর মাণিকবউ—তাঁর এই অবস্থা ! তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলাম কি করি নি—একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না সুলতা ; সে আমি বলতে পারব না। আজ তা আমি ঠিক স্মরণ করতে পারব না। তবে হ্যাঁ—এটুকু বলতে পারি একালের ধারা মত, 'রাবিশ' বলে কথাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হা-হা ক'রে হেসে উল্টে পড়তে পারি নি। বলতে পারি কথাগুলো মনের মধ্যে অবিস্মরণীয় হয়ে শিলালিপির মত খোদাই করা হয়ে গিয়েছিল বুকের মধ্যে।

রায়বংশের দেনার পরিমাণ জমা করলে পাহাড় হয়ে ওঠে। ভগবানের নামে বিশ্বাস নেই যে তাঁর নাম করলে শিলা বিগলিত হবে—সগরবংশ উদ্ধারের জন্য গঙ্গার ধারা নেমে এসে উদ্ধার করবে শ্যামাকান্ত চাটুজ্জেকে, সোমেশ্বর রায়কে, রাণী কাত্যায়নীকে, বীরেশ্বর

রায়কে, বিমলা দেবীকে ; তারপর—হ্যাঁ, রত্নেশ্বর রায়ও আছেন তাঁদের মধ্যে, নিশ্চয় আছেন ; সম্ভবতঃ তাঁর পাওনাদারের সংখ্যা বেশী, রায়বাড়ীর আয়কে তিনগুণ বাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কুড়ি হাজারকে ষাট হাজারে তুলেছিলেন। দেবেশ্বর রায়, শিবেশ্বর রায়, তারপর আমার বাবা যোগেশ্বর রায় থেকে দেনা শোধ শুরু হয়েছে। অসংখ্য পাওনাদার অসংখ্য হাজারে হাজারে পাওনাদার যেন মুঠি-বাঁধা হাত তুলে তাঁদের কাছে দাবী করছে—"পাওনা শোধ করো—আমাদের পাওনা ফেলো।"

একটা কথা বিশ্বাস করো সুলতা ; এইসব কথা যখন ঠাকুমা বলছিলেন তখন এ সব যেন তিনি চোখে দেখছিলেন। কয়েকবার বলেও ছিলেন—ভাই, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমি দেখতে পাচ্ছি! পরলোকে রায়বংশের কর্তারা হাতজোড় করে আসামীর মত দাঁড়িয়ে আছেন। সুলতা, মেজদি এতক্ষণ পর্যন্ত অবাক হয়ে শুনছিলেন, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তাঁর বড়জায়ের মুখের দিকে। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে ছবিগুলো দেখতে চেষ্টা করছেন। আমার ঠাকুমা থামতেই তিনি ব্যাকুল হয়ে তাঁর হাত ধরে নাড়া দিয়ে ডেকে বললেন—দিদি!

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তো মেজবউ, মেজঠাকুরপোর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী! এঁ্যা?

—হ্যাঁ দিদি!

সমাদর করে তাঁর মুখে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে ঠাকুমা বললেন—আহারে! কচি বয়েস তোর—তোর এই দশা করে দিয়ে গেল মেজবাবু? না-না-না। মেজবাবু বড় নিষ্ঠুর ছিল রে। দয়া-মায়া তার ছিল না। অন্য দোষ না থাক, মানুষকে পীড়ন আর ওই বুড়োবয়সে তোকে গরীবের মেয়ে পেয়ে বিয়ে করে শেষ অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে যাওয়া—বড় নিষ্ঠুরের কাজ।

—দিদি! অনেক কষ্ট তিনি পেয়েছেন বেঁচে থেকে। অনেক অন্যায়ও করেছেন। আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার—

বাধা দিয়ে ঠাকুমা বললেন—আমার যা করেছিল ঠাকুপো তা আমি ক্ষমা করেছি মেজবউ। সে আমি মাফ্ করেছি। কিন্তু ঠাকুরপো যে বড় বেশী মিথ্যে মামলা করেছে রে! লোকের হ'রেহর্মে নিয়ে যে মনে ভারী সুখ পেত সে।

—খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর দিদি?

—তা হচ্ছে ভাই।

মেজদির চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এসেছিল। বড় ভাল লেগেছিল আমার। হয়তো আমার কথা শুনে তুমি মনে মনে হাসছ। ভাবছ সুরেশ্বরের পাগল ঠাকুমা পটুয়াদের কাছে দেখা এবং শোনা নরকের বর্ণনা আর ছবির কথা বলে যাচ্ছেন, গ্রাম্য পুরুতের মেয়ে মেজদিটি সেই সব কথা ধ্রুবসত্য বলে বিশ্বাস ক'রে কাঁদছে, ভাবপ্রবণ অর্ধশিক্ষিত ধনীর দুলাল সুরেশ্বরও তাই বিশ্বাস করছে ধ্রুবসত্য ব'লে। এ যুগে কথাটা হাসিরই বটে, শুনলে, তুমি তো তুমি, একটা ক্লাস টেনের ছেলেও ব্যঙ্গভরে হাসবে। কিন্তু না, ঠিক তা নয়। ঠাকুমার কথায়

এটা আমি ভাবি নি—যে আমিই দেবেশ্বর রায়, জন্মান্তরে আবার আমি রায়বাড়ীতে এসেছি, সুরেশ্বর রায় নাম নিয়ে জন্মের ঋণ শোধ করতে। এও বিশ্বাস করি নি যে আমার পূর্বপুরুষেরা এক অদৃশ্যলোকে কায়াহীন অস্তিত্ব নিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন আর পঁচাত্তর হাজার থেকে এক লাখ অভিযোগকারীরা চীৎকার করে অবাঙমনসগোচর ঈশ্বর-বিচারকের কাছে দাবী জানাচ্ছে—মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তা দিয়ে ওদের কায়াহীন সত্তার মাংস ছিঁড়ে খাওয়ানো হোক, কি ফাঁসি দেওয়া হোক, কি কের কৃমিকীট করে পৃথিবীর কোন আবর্জনা-স্তূপে ওদের জন্মান্তর নেওয়ার দণ্ড দিয়ে পাঠানো হোক।

না—তা বিশ্বাস আমি করি নি।

তবে ঠাকুমার সে-বিশ্বাসকে আমি মিথ্যাও মনে করতে পারি নি। যা আমার কাছে সত্য নয় তাই যে মিথ্যা—তা আমি মনে করি নে সুলতা। তাই তোমাকে ডেকে তোমার সামনে আমি জবানবন্দী দিচ্ছি। দেখ, ইতিহাসের ধারায় উত্থান-পতনের পিছনে আছে উলঙ্গ শক্তি, তার সঙ্গে ন্যায়নীতি জুড়তে হয়, ন্যায়নীতিকে মূল্য না-দিয়েও বড় বড় অধিনায়কেরা লোককে প্রতারিত করতেই সেটা করে। তার চেয়ে এক কণা বেশী মূল্য তার নেই। কিন্তু লোকে ন্যায়নীতি মানে। লোকের সঙ্গে সঙ্গে জীবন মানে। কত যুগ কত কাল কত জন্মান্তর পার হয়ে মানুষের দেহের মধ্যে জীবন এসে শুধু অমর হ'তেই চায় নি—আরণ্য অন্ধকারের অন্যায় থেকে ন্যায়েও আসতে চেয়েছে। রায়বংশের অন্যায়ের বাঁধনে বাঁধা পড়েই আমি সেটেলমেন্ট উপলক্ষে কীর্তিহাট গিয়ে আর ফিরি নি। প্রথম টের পেলাম ঠাকুরদাস পালের খুনের কথা। খুন করিয়েছেন রত্নেশ্বর রায়; আর ঠাকুরদাস পালের প্রপৌত্রের কন্যা তুমি। চমকে উঠেছিলাম। এবং খুঁজতে লেগেছিলাম রায়বংশের পাপ-পুণ্যের খতিয়ানের খাতা।

সে খাতাও পেয়েছিলাম। ঋণ বেরিয়েছিল বা পাপ বেরিয়েছিল অজস্র, পুঞ্জ পুঞ্জ, পিটিয়ে পিটিয়ে তাকে জমিয়ে এত ভারী তাকে করে তোলা হয়েছে যে গোটা বংশটাই তার ভারে হাঁটু ভেঙে ধুলোয় মুখ গুঁজে পড়েছে। বৃন্দাবনে ঠাকুমার মুখ থেকে যেন গোটা বংশটা আর্তনাদ করে উঠল—ঋণ শোধ করে আমাদের বাঁচাও। আমাদের বাঁচাও। আমাদের বাঁচাও!

যে সব ছবিগুলো আমি আঁকছিলাম সুলতা—সেগুলো যেন ঠাকুমার কাছে ভাষা পেয়ে কথা ক'য়ে উঠল।

পরের দিন আমি বৃন্দাবন থেকে চলে আসব, প্রণাম ক'রে বিদায় নিতে গেলাম ঠাকুমার কাছে, মেজদির কাছে।

মেজদি'কে কিছু টাকা দিলাম—বললাম রাখ মেজদি। দেখ আমি জানি না, ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসাও করি নি—করবার সাহসও নেই যে এখানে ওঁর অধিকার কি? কি আছে ওঁদের? টাকাটা রাখ যদি কখনও কাজে লাগে।

ঠাকুমাকে প্রণাম করতে গেলাম। দেখলাম তিনি যেন অন্য মানুষ। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বললেন—তুমি আমার নাতি, সুরেশ্বর, যোগেশ্বরের ছেলে। যোগেশ্বর তাই করেছিল?

তোমার মাকে দুঃখ দিয়ে ফেলে রেখে কোন একটা বিবি মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিল?

বুঝলাম মেজদির কাছে শুনেছেন। চুপ ক'রে রইলাম। উত্তর কি দেব বল? হঠাৎ কপালে হাত দিয়ে তিনি বললেন—কপাল। রায়বংশের কপাল!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ল তাঁর বুক থেকে। বললেন—যজ্ঞেশ্বর ভায়লার বাড়ীটা কেড়ে নিয়েছিল? তুমি তাকে টাকা দিয়ে বাড়ী উদ্ধার ক'রে—তার কে—যেন—ছেলের মেয়ের মেয়ে—হ্যাঁ, তাই তো বললে—তাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ? তাকে পড়ার খরচ দিচ্ছ?

এবার বললাম, দিয়েছি। অন্নপূর্ণা-মা বললেন, আর আমারও মনে হল—না দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে।

—হ্যাঁ ভাই। খুব অন্যায় হবে। তোমার ঠাকুরদাদা অবিকল তোমার মত দেখতে ভাই। তাঁর সব থেকে বড়-দেনা ওই ভায়লার কাছে। আমার বড়বাবু তার উপর অবিচার করেছিলেন। চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়েকে ডাকলেন, আর একসঙ্গে দু'জনে মরি আয়। কিন্তু সে ভয় খেলে। পারলে না। বড়বাবু তো আলাদা জাতের মানুষ—তিনি গুলী খেয়ে মরতে গেলেন। গুলী খেলেন—পড়েও গেলেন। ভায়লা পালালো গোপাল ঘোষের সঙ্গে। বড়বাবু বাঁচলেন, গুলী বুকে বেঁধে নি। বেঁচে উঠে আর তাকে চোখে দেখলেন না। মেয়েটা সারাজীবন কেঁদে মল; রাস্তার ঝাড়ুদারের হাতের ঝাঁটার মত অবস্থা হল। তবু বড়বাবু তাকে ভালবাসতেন। তার জন্যেই আমি তাঁর ভালবাসা পাই নি। ভায়লাকে দূর করে দিয়ে তাকে খুঁজতেই তিনি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে কাঁসাইয়ের গর্তে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে মারা গেলেন। ভায়লা বিষ খেয়ে মল' সিদ্ধাসনের জঙ্গলে। পরলোকেও মিলতে পারেন নি বড়বাবু। ওরা কিরিশ্চান তো! আঃ বড় দুঃখু! ওদের দেখো। বুঝলে!

দেখব বলে কথা দিয়েই বৃন্দাবন থেকে রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু জানতাম না যে ইতিমধ্যে গোয়ানপাড়া আগুন লেগে পুড়ে গেছে। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। হিলডা মারা গেছে। তার ঘরেই প্রথম আগুন লেগেছিল।

খবরটা পেলাম কলকাতায় পৌঁছে। একখানা চিঠি এসেছিল। লিখেছিল অর্চনা। লিখেছিল—সুরোদা, বৃন্দাবন থেকে এতদিন ফিরেছ বোধ হয়। খুব গুরুতর ব্যাপার এখানে। একসঙ্গে তোমাকে দুখানা চিঠি লিখছি—একখানা বৃন্দাবনে একখানা কলকাতায়। যেখানে পাও। এখানে গোয়ানদের সঙ্গে ঝগড়া চরমে উঠেছিল। এবং তার ফলও ফলে গেল। সে ঝগড়াটার জন্যে তুমি মিনতি জানিয়ে ক'দিন চুপচাপ থাকতে বলে গেলে সেটা চরমে উঠে গেল দিন তিনেকের মধ্যেই। আমার দুঃখ, আমার লজ্জার কারণ এক রকম বলতে গেলে আমি। কলকাতা থেকে ফেরার পর বাবার নতুন চেহারাটা দেখে গেছ—তাপও সয়েছ খানিকটা, বাবার ভয়েই ঠাকুমা বৃন্দাবন পালালেন, সে তুমিও জান; আমিও জানি। বাবার এখন সদাসর্বদাই রুদ্রমূর্তি। তার কারণ আমার টাকা। ও টাকা এখন তার মুঠোয় তিনি সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন সকলকে। আমি তোমার সঙ্গে পালালে ভাল করতাম। ওদিকে জেলখানা থেকে অতুলকাকা গোয়ানদের খবর পেয়ে ওদের বয়কট করতে অর্ডার পাঠিয়েছিলেন। তুমি যাবার পরই অর্ডারটা গোপনে জেলখানা থেকে আসে। গ্রামে খুব কড়াকড়ি

হয়। গোয়ানরা মিটিং ক'রে ঠিক করে যে তারা মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। মুসলীম লীগের প্রটেকশন নেবে। বাবা, এই সুযোগে ওদের এখান থেকে উঠিয়ে দিয়ে আমার টাকায় ওদের জমি কিনবার মতলবে—হঠাৎ খুব কংগ্রেসী হয়ে উঠে ওদের পাড়ায় গিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করে এলেন। তার দিন তিনেক পরেই রাত্রে গোয়ানপাড়ায় আগুন লাগল। গোটা পাড়াটা পুড়ে গেল—মায় গির্জের দু-পাশের রাণীগঞ্জ টালির ছাওয়ানো চাল পর্যন্ত। হিলডা পুড়ে মারা গেছে। এখানে টেনশন খুব বেশী। তুমি চিঠি পাওয়া মাত্র চলে এস, অন্ততঃ আমাকে বাঁচাও। আমি বোধ হয় মরে যাব সুরোদা। গোটা গাঁয়ের লোক এটা চাপাচ্ছে বাবা এবং জ্যাঠামশায়ের ওপর। বলছে কংগ্রেস এ করতে পারে না। এ করেছেন রায়বাবুরা। ধনেশ্বরবাবু জগদীশ্বরবাবু আর সুখেশ্বরবাবুর ছেলেরা। করেছে কমলেশ্বরের সঙ্গীসাথীরা। আমার প্রণাম নাও। ইতি অর্চনা।

সুলতা সেইদিনই রওনা হলাম কীর্তিহাট।

স্টেশনে নেমে শুনলাম জগদীশ্বরকাকা নিজের বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সুরেশ্বর বললে—রায়বাড়ীর জবানবন্দীতে পুরনো কাল শেষ হয়ে গেল সুলতা। দেবেশ্বর রায়ের মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ। যারা বাংলাদেশে প্রথম ইংরিজী শিক্ষা, ইংরিজী সভ্যতা, ইংরিজী আভিজাত্য আমদানি করেছিল তাদের নাম তুমি এক এক ক'রে স্মরণ কর কিম্বা আউড়ে যাও, রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব থেকে প্রত্যেকেই জমিদারীর উপর বংশের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। আবার যাঁরা শুধু দেশকে শুষেছেন, চুষেছেন রক্তপায়ী বাদুড়ের মত তাঁরাও জমিদার ছিলেন। এঁদের আভিজাত্যের কাল, এঁদের গৌরবের কাল, দাপটের কাল মোটা হিসেবে বলতে গেলে ১৯০০ সাল পর্যন্ত। ১৯০১ থেকে নতুন কাল আরম্ভ। সেটার প্রকাশ হয়েছিল ১৯০৫ সালে।

ইংরেজ শাসনে লর্ড কার্জন শেষ অপ্রতিহত-প্রতাপ ভাইসরয়। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের মানুষের কাছে বিনা প্রতিবাদের ভারতেশ্বরী। দেবেশ্বর রায় রায়বাড়ীর শেষ রাজাবাবু। বাংলাদেশে জমিদারদের অপ্রতিহত প্রতাপের কাল—নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী। ১৯০১ সাল থেকে মানুষ জাগতে শুরু করেছে। ব্যবসাদারেরা তাদের থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে; ল্যাণ্ড হোল্ডারস এ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন থেকে দেশী চেম্বার অব কমার্সগুলোর দাম বেড়েছে। উকীল, ডাক্তার, মোক্তার, ব্যারিস্টার, প্রফেসরের কাল শুরু হল। দেবেশ্বর রায়ের উত্তরাধিকারী আমার জেঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায় হয়েছিলেন কলিয়ারী প্রোপ্রাইটার—মস্তবড় খনিমালিক। বাবা হয়েছিলেন জার্নালিস্ট।

একটু চুপ ক'রে থেকে সুরেশ্বর বললে—মানুষ কাল তৈরী করে? না, কাল মানুষ তৈরী করে? হয়তো বা দুটোই সত্যি। নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরীতে বীরেশ্বর রত্নেশ্বর দেবেশ্বর রায়দের মত জমিদার অনেক ছিল। এঁদের থেকে উন্নত আর বেশী কেউ ছিল না। থাকবার মধ্যে একটা আধটা ঠাকুরবাড়ীর মত বাড়ী—মানুষের মধ্যে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত মানুষ ছিলেন জমিদারদের মধ্যে।

বলতে গেলে রায়বাড়ীর জবানবন্দী এখানেই শেষ। কারণ তার পরের কথা—আমার

বাবার কথা, যোগেশ্বর রায়ের কথা, এ শুধু তোমারই জানা কথা নয়, হয়তো এ কালের সকলের জানা কথা। আমার জ্যাঠামশায়ের কথা হয়তো তুমি জান না, কিন্তু বাংলাদেশের যারা বাঙালী ব্যবসাদারদের কথা জানে, তারা যজ্ঞেশ্বর রায়ের কথাও জানে। তার কথা জানলেই বাঙালী ব্যবসাদারের কথা জানা হয়ে যাবে। কিন্তু সেসব কথা থাক সুলতা, দেবেশ্বর রায় পর্বের শেষ কথাটা বলে নি। সেটা আমিও জানতাম না।

শেষ কথা, দেবেশ্বর রায়ের পাগল স্ত্রীর বৃন্দাবনে নির্বাসন। নির্বাসন দিলেন কে জান? দিলেন শিবেশ্বর রায় এবং যজ্ঞেশ্বর রায়। এবং নীরবে মাথা নত ক'রে দেখলেন আমার বাবা বাংলাদেশের বিখ্যাত জার্নালিস্ট যোগেশ্বর রায়।

আমি কথাটা আবছা আবছা শুনেছিলাম। কিন্তু কখনো জিজ্ঞাসা করে ভালভাবে জেনে নিতে সাহস হয় নি। জিজ্ঞাসা করব কাকে? ছেলেবেলা থেকে শুনতাম ঠাকুমা থাকেন বৃন্দাবনে। বাবার কোন ব্যগ্রতা দেখি নি কোন দিন মায়ের জন্যে। মায়ের কাছেও তাঁর কথা কিছু শুনি নি। বাবার মৃত্যুর পর তাঁকে পত্র দিয়ে থাকলে জানবাজারের বাড়ীর ম্যানেজার দিয়ে থাকবেন। তিনি পেয়ে থাকলেও কোন উত্তর দেন নি।

তবে চাপা একটা কথা শুনতাম—ঠাকুমা একবস্ত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। তিনি নাকি স্বামীর মৃত্যুর পর উন্মাদ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। লোকে বলে গোয়ানদের পাড়ায় গিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কেউ বলত, তাদের বাড়ীতে নাকি খেয়েছিলেন। কথাগুলো এলোমেলো কথা। যার জন্য এ বাড়ীর সঙ্গে, তাঁর নিজের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক চুকে গেছে।

* * *

তিনি আজও বেঁচে আছেন। কথাটা কিন্তু কারুরই মনে থাকে না। তাঁর কথাটুকু বললেই রায়বাড়ীর কথা শেষ।

সেদিন তাঁর কথা শুনলাম।

সেদিন মানে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে। তোমার মনে আছে বোধ হয় মেদিনীপুর শহরের সুধাকরবাবু উকীলের টেলিগ্রাম পেয়ে আমি কলকাতা থেকে গিছলাম মেদিনীপুর। তখন মেদিনীপুর খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছে; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছেন মিস্টার বি আর সেন। তিনি মেদিনীপুরের দমননীতির কড়াকড়ি ক্রমশ শিথিল ক'রে আনছেন। মেজঠাকুমার যে জেল হয়েছিল, তার মেয়াদ শেষ হয়েও তিনি খালাস পান নি, জেলগেটেই তাঁকে আটক আইনে আটকে জেলেই রাখা হয়েছিল। মিস্টার সেন তাঁর কেসের ফাইল প'ড়ে তদন্ত করে তাঁকে ছেড়ে দেবেন। উকীল কথাটা জানতে পেরে আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। আমি মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা করে মেজঠাকুমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। এরই মধ্যে কুইনী হিলডা এসেছিল। সঙ্গে খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান কৃশ্চানদের একটি মহিলা। কীর্তিহাটের লোকেদের বিরুদ্ধে, বিশেষ ক'রে রায়বাড়ীর লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছে। তারা কংগ্রেসকে ভোট দেয় নি বলে তাদের উপর অন্যায় জুলুম করছে তারা। অভিযোগ করতে এসেও আমার কথা শুনে হিলডা এসেছিল আমার কাছে। কুইনীর ইচ্ছে

খুব ছিল না, কৃশানদের প্রতিনিধিস্থানীয়া মেয়েটির তো আদৌ ছিল না ইচ্ছে। কিন্তু হিলডার জেদে আসতে হয়েছে। তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছি, কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর, আমাকে কীর্তিহাট ফিরতে দাও। সেখানে লোকেদের সঙ্গে কথা বলে, বুঝে উত্তর দেব। যদি নিবারণ করতে না পারি তবে তোমাদের বলে দেব, তখন তোমরা যা খুশী করবে। কুইনীকে আমিই খড়্গপুর ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি, আমিই তার খরচ দিই। না হ'লে হয়তো কুইনী হিলডার কথা শুনত না। তার পরের দিনের কথা বলছি। পরের দিন সকালেই মেজঠাকুমা মুক্তি পেলেন। তাঁকে নিয়ে এলাম শহরের বাসায়।

শীর্ণ হয়ে গেছেন মেজদি। তাঁর কান্তি যেন মলিন হয়ে গেছে। দৃষ্টিতে একটা উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে। মাথার চুলগুলো কেটে ফেলেছেন। বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি মেজদি! আমি তো তোমার সঙ্গে মাস দুয়েক আগে দেখা করে গেছি, এর মধ্যে তোমার শরীর এমন খারাপ হ'ল কেন?

মেজদি ম্লান হেসে বললে—ওরে, খালাস পাব শুনে দুর্ভাবনায় এমন হয়ে গেছি ভাই।

—দুর্ভাবনা কিসের মেজদি?

—দুর্ভাবনা কিসের? দুর্ভাবনা সব কিছুর ভাই। অন্নের দুর্ভাবনা, বস্ত্রের দুর্ভাবনা, মাথা গুঁজবার ঠাঁইয়ের দুর্ভাবনা—দুর্ভাবনা কিসের নয় তাই বল!

—আমি বেঁচে থাকতে দুর্ভাবনা ভাবছ মেজদি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেজদি বললেন—রায়বাড়ীতে আমার বড়দি—রায়বাড়ীর বড়গিন্নী, তোর ঠাকুমাকে, তার দুই ছেলে থাকতেও বৃন্দাবনে নির্বাসনে যেতে হয়েছে। আজও কেউ তাঁর খোঁজ করে না। তাঁর নিজের পৈতৃক টাকা ছিল। তাই তিনি মান বাঁচিয়ে বৈষ্ণব হয়ে বেঁচে আছেন। আমার যে কিছুই নেই সুরেশ্বর।

আমি বলেছিলাম সুলতা, বলেছিলাম—মেজদি আমি তো আছি।

হেসে মেজদি বলেছিলেন—না। ও ভরসা করতে বলিস নে। মানী মানুষ যারা তাদের পান থেকে চুন খসলেই অপমান হয়। তারা সব দুঃখ সইতে পারে অপমানের দুঃখ সইতে পারে না। জেল-ফেরত সৎমাকে ধনেশ্বর, জগদীশ্বর সহ্য করবে না রে। তোর ঠাকুমা—রায়বাড়ীর বড়বাবুর স্ত্রী মাণিকবউ-এর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল স্বামীর অবহেলায়। তার ওপর স্বামীর এই মৃত্যুতে হয়ে গেলেন উন্মাদ পাগল।

বলতে বলতে থেমে গেল সুরেশ্বর। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—সুলতা, দেবেশ্বর রায় নদীর গর্তে পড়েছিলেন অজ্ঞান হয়ে, লোকজনে অনেক খুঁজেপেতে তাঁকে তুলে নিয়ে এল। আমার ঠাকুমা মাণিকবউ তখন ছিলেন গোবিন্দ মন্দিরে। রাধাগোবিন্দের সামনে সন্ধ্যেবেলা থেকে সে আমলে বারো মাস কথকতা হ'ত; নিযুক্ত কথক ছিল। ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণলীলার কথকতা চলত। মাণিকবউ কথকতা শুনে হাসতেন, কাঁদতেন, কখনও কখনও উঠে গিয়ে গোবিন্দের সামনে গিয়ে হাত মুখ নেড়ে কথা বলতেন। কথকতা শেষ হ'লে নিজের হাতে শয্যা রচনা ক'রে রাধাগোবিন্দকে শয়ান করিয়ে নিজের ঘরে ফিরতেন। সেদিন বড়বাবুর অসুখের খবর নিয়ে মা'ঠাকরুণকে জানাতে গিয়েছিল অনন্ত, কিন্তু সে তাঁর কানে

যায় নি। তিনি শোনেন নি। বার বার বলেছিলেন—যা যা। বড়বাবুকে ঘুমুতে বলগে যা। এখন আমি যেতে পারব না। গেলে ঠাকুর রাগ করবেন। তাতে তারই অমঙ্গল হবে। যা।

অগত্যা কথকতাতেই মধ্যপথে ছেদ টেনেছিলেন কথকঠাকুর। মাণিকবউ ঠাকুরকে শয়ান করিয়ে এসে স্বামীর ওই অবস্থা দেখে আছড়ে পড়েছিলেন স্বামীর বুকে। আর প্রাণ ফাটিয়ে ডেকেছিলেন—বড়বাবু—বড়বাবু গো, বড়বাবু আমি যে এলাম, কথা বল, আমি তোমার মাণিকবউ, কথা বলবে না? বড়বাবু!

সকালবেলা খবর রটেছিল—সিদ্ধাসনের জঙ্গলে ভায়লা বিষ খেয়ে মরেছে।

মাণিকবউ শুনে নাকি হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। না, হল না সুলতা। শুধু তো বোবা নয়, তিনি যেন শুকিয়েও গিয়েছিলেন। চোখের জল শুকিয়েছিল; কণ্ঠের স্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাথরের মূর্তির মত বসেছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে উঠে চলে গিয়েছিলেন স্বামীর বিছানার পাশ থেকে।

দেবেশ্বর রায়কে নিয়ে সকলে যখন ব্যস্ত তখন দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টেনে একটি মেয়ে খিড়কির পথে রায়বাড়ী থেকে বেরিয়ে, কাঁসাই পার হয়ে গিয়ে উঠেছিল সিদ্ধাসনের জঙ্গলে। যেখানে সিদ্ধাসন থেকে খানিকটা দূরে ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়েছিল গোয়ান মেয়েপুরুষেরা, মাঝখানে নামানো ছিল ভায়লেটের মৃতদেহ।

ঘোমটার ভিতর থেকে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন—"সর্ তো রে, সর্ তো একটু দেখি। ওরে সর্ না। এবার দেখতে দে।"

পুরুষেরা তাঁকে কেউ চিনত না, কিন্তু গোয়ান মেয়েরা অনেকে তাঁকে দেখেছে, তারা চিনত, তারা তাঁকে রায়বাড়ীর বড়গিন্নী ব'লে চিনেছিল। তারা সসম্ভ্রমে লোকজন সরিয়ে দিয়ে দেখতে দিয়েছিল ভায়লেটের মৃতদেহ। মৃতদেহের পাশে ব'সে মাণিকবউ তাকে বলেছিলেন—"বেঁচে পাস নি তাই ম'রে পেলি। নয়? আমি কি করব বল? বিশ্বাস কর, আমাকে এরা ধরে এর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। তাকে আমি পাই নি। চেয়েছিলাম পাই নি। তুই পেয়েছিলি—তোকে পেতে দেয় নি। আমার দোষ নেই। তা এবার পেলি, এবার শান্তি হল!"

খবর নিয়ে ছুটে এসেছিল একজন গোয়ান। লোকজন গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছিল, তখন তিনি বদ্ধ পাগল। কিন্তু পাগলামির একমাত্র সূত্র ওই। ওই ভায়লেট।

বাড়ী এসে ধুয়ো ধরেছিলেন—"ভায়লেট সতী হয়েছে। ওকে সতীঘাটে বড়বাবুর সঙ্গে দাহ কর।"

রায়বাড়ীর অন্দরের মধ্যে একেবারে মাঝখানকার ঘরে তাঁকে জোর ক'রে ভিতরে পুরে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। স্বামীকে আর তিনি দেখতে পান নি। কিন্তু শ্রাদ্ধের দিনে বাধালেন হাঙ্গামা। ছেলেদের বললেন—বড়মায়ের শ্রাদ্ধ কর।

ছেলেদের বড়মা মানে, ভায়লেট।

কোন রকমে তাঁকে স্নান করিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে আবার তাঁকে ঘরে বন্ধ করা হয়েছিল,

কিন্তু কখন কোন্ ফাঁকে যে কে দরজা খুলে দিয়েছিল কেউ জানে না ; মাণিকবউ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সটান গিয়ে উঠেছিলেন গোয়ানপাড়ায়। তাঁর হাতে ছিল পুঁটলী-বাঁধা গহনা আর টাকা। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। যখন খোঁজ হল, তখন রাত্রি অনেকটা, লোকজন সমস্ত দিন পরিশ্রম ক'রে ক্লান্ত ; কাঙালীতে কীর্তিহাট ভরে গেছে। লোকের দাওয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি গাছতলায় পর্যন্ত মানুষ শুয়ে আছে, বসে আছে। ঘুরছে ফিরছে কাঁদছে এঁটোকাঁটা চেয়ে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে কোথায় খোঁজ করবে মাণিকবউয়ের! মাণিকবউয়ের গায়ের রঙ গৌরবর্ণ, কিন্তু রাত্রি অন্ধকার, তার মধ্যে তাঁকে চিনে বের করা সম্ভবপর ছিল না। গোয়ানপাড়ার কথাটা কারুর মনে হয় নি।

সকালবেলা খোঁজ হয়েছিল।

গোয়ানেরাই খোঁজ দিয়ে গিয়েছিল। মাণিকবউ গহনার পুঁটলী নিয়ে গোয়ানপাড়ায় গিয়ে ওই গির্জের বারান্দায় বসেছিলেন। সকালে লোকজনদের ডেকে বলেছিলেন—আমি রায়বাড়ীর বড়বউ। তোদের ভায়লা আমার সতীন। বড়বাবু তো ওকেই ভালবাসতেন। তা ভায়লা মল, তার শ্রাদ্ধ হল না। ছেলেদের বললাম—ছেলেরা করলে না। আমি করব শ্রাদ্ধ। তোদের পাদরীকে ডাক, আমার যোগাড়যন্ত্র করে দে। এই নে এই গয়নাগুলো নে, বিক্রী করে আন।

* * *

শিবেশ্বর রায় আত্মগোপন ক'রে ছিলেন, যজ্ঞেশ্বর রায়ও আত্মগোপন করে ছিলেন। খুনের মামলার জন্য তখন ওয়ারেণ্ট বেরিয়ে রয়েছে। শ্রাদ্ধ করেছিলেন যোগেশ্বর রায়, আমার বাবা। এবং মাণিকবউ সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিলেন ধনেশ্বর আর জগদীশ্বর। আমার বাবা থেকে ধনেশ্বরকাকা এক বছরের ছোট। জগদীশ্বরকাকা ধনেশ্বরকাকা থেকে দু বছরের ছোট। একজনের বয়স উনিশ, একজনের বয়স সতেরো। আত্মগোপন ক'রে থেকেও শিবেশ্বর রায় এই সময়ের অপূর্ব সুযোগটি ছাড়েন নি। ধনেশ্বরকাকা এবং জগদীশ্বর-কাকা হঠাৎ একদিন গোবিন্দমন্দিরে মাণিকবউয়ের পথ আটকালেন।

মেজদাদু শিবেশ্বর রায় আত্মগোপন ক'রে ছিলেন এই মেদিনীপুরেই—সেই বাড়ীতে ; যে বাড়ীতে আমি মেজদির অপেক্ষায় বসে ছিলাম ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে। যে বাড়ীতে বসে মেজদির কাছে বসে এই সব কথা শুনছিলাম সেই বাড়ীতেই, আত্মগোপন মানে একটু আড়াল দিয়ে বসবাস করছিলেন। বাইরে Not at home নোটিশ টাঙিয়ে বাস করার মত। তিনি উকীলদের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন, মাণিকবউয়ের এই অপরাধ, এই গহনাগাঁটি নিয়ে গোয়ানপাড়ার গির্জের বারান্দায় পড়ে থাকার জন্যে, তার উপর পাতিত্য দোষ চাপিয়ে, তার ছেলেদের দেবোত্তরের স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা যায় কি না।

উকীল নাকি বলেছিলেন—পাতিত্য চাপানো যায় কিনা সে তো আমি বলতে পারবো না, তবে চাপাতে পারলে, মূল দেবোত্তরের স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা যাবে এটা নিশ্চিত। আর ভেবে দেখুন সেটা ঠিক হবে কিনা। ওই দেবোত্তরের সম্পত্তি পত্তনীদার, দরপত্তনীদার হিসেবে যা ভোগ্ন করেন, তা তো ওদের যাবে না। ভেবে দেখুন ভাল ক'রে, একই মহালে

শরীক হিসেবে থাকবেন। সেখানে ঝগড়া হবে।

তাতে শিবেশ্বর রায় দমেন নি। ছোট-তরফের রামেশ্বর বিলেত গেছে। তার স্ত্রী মারা গেছে এখানে। রামেশ্বর বিলেত থেকে হয় ফিরবে না, নয় মেম বিয়ে ক'রে ফিরবে। সুতরাং শরীক এখন তিন তরফ নয়, দু তরফ। দু তরফের এক তরফ বড়তরফকে পতিত করতে পারলে থাকবেন এক এবং অদ্বিতীয় মেজতরফের কর্তা—তিনি শিবেশ্বর রায়। তিনি তার দুই ছেলেকে ডেকে উপদেশ দিয়ে ব্যবস্থা করলেন।

মন্দিরে ঢুকতে দিয়ো না—বলো পাতিত্য ঘটেছে। গোয়ানপাড়ায় কোথায় ছিলেন কার বাড়ীতে ছিলেন, কে বলতে পারে! কি খেয়েছেন কে জানে?

ধনেশ্বর তখন গোয়ানপাড়ার চোলাই করা মদের স্বাদ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। তখন তিনি উনিশ বছরের নবযুবক। সতের বছরের জগদীশ্বর রায়।

একটু থামল সুরেশ্বর। পাশেই বসেছিল অর্চনা। অর্চনা জগদীশ্বর রায়ের বড় মেয়ে; সম্ভবতঃ বলতে কুণ্ঠাবোধ করছিল।

অর্চনা বললে—থামলে কেন সুরোদা? বাবা জ্যাঠামশায়ের চেয়ে দু বছরের ছোট। তখনও ইস্কুলে পড়েন। রায়বাড়ীর রত্নেশ্বর রায় এইচ ই স্কুলে থার্ড ক্লাসে বছর তিনেক আছেন। তিনি মদ খেতেন রাত্রে, দিনে গন্ধের ভয়ে মদ খেতেন না, স্কুলে যেতে হত, তবে তাঁর বার্ডশাইয়ের ভিতর চরস গাঁজা পোরা থাকত। তিনি তিনটে নেশা করতেন—মদ গাঁজা চরস।

* * *

সুলতা বললে—থাক এসব কথা থাক সুরেশ্বর। আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

সুরেশ্বর বললে—শুনেই তোমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে সুলতা, আর রায়বাড়ীর হতভাগোরা এরই মধ্যে বাস করছে, চীৎকার করছে, সে চীৎকার সেদিন শুনেছ খানিকটা, আবার আমার মত চীৎকারও করছে, পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর ব'লে। শোন—আর খুব বেশী নেই সেকালের কথা। অর্চনা মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—আমি বলছি সুরোদা, তুমি থাম। বলেই সে বলে গেল—

জ্যাঠামশাই মানে ধনেশ্বর আর বাবা সেদিন উন্মাদিনী মাণিকবউয়ের পথ আগলালে।
—যেয়ো না জ্যাঠাইমা—যেতে পাবে না।

চমকে গেলেন মাণিকবউ—যেতে পাব না?

—না, তোমার জাত গেছে।

—কি? কি? কি?

—তো—মা—র জা—ত গে—ছে।

আমার বাবা জগদীশ্বর রায় হাত-পা নেড়ে ভেঙিয়ে কথা বলে সুলতাদি। সে ছেলেবেলা থেকেই। হাত-পা নেড়ে মুখ ভেঙিয়ে সে বললে—সে-দি-ন কি-রি-শ্চা-ন সতীনের শ্রাদ্ধ করতে গয়নার পুঁটলী নিয়ে সারারাত গোয়ানপাড়ায় পড়েছিলে। কোথা খেয়েছিলে? কার বাড়ীতে? তোমার জাত গিয়েছে, দেশশুদ্ধ লোক জানে। হৈ-হৈ উঠছে। দশ

হাজার বাঙালী এসেছিল। কি বলছে তারা শোন গে। ঢুকতে পাবে না তুমি।

তাদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়েছিলেন তিনি। তারপর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিছলেন।

সুরেশ্বর বললে—আশ্চর্য সুলতা, পুরো একদিন অজ্ঞান হয়ে থেকে যখন জ্ঞান হল তখন তিনি যেন বোবা হয়ে গেছেন। মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছেন—বড়বাবু তো তাকে ভালবাসতেন, একরকম বিয়ে করেছিলেন। তো বড়বাবুর জাত যায় নাই ?

তখন বড়-তরফের সঙ্গীন অবস্থা। আমার বাবা যোগেশ্বর রায় ছুটে গেছেন দাদার কাছে। যজ্ঞেশ্বর রায়ের কাছে। যজ্ঞেশ্বর রায়ও শিবেশ্বরের মত কলকাতায় রয়েছেন। নিজের বাড়ীতে থাকেন না, অন্য বাড়ীতে থাকেন। বিডন স্ট্রীটে ওঁর যে বাড়ী ছিল, সেই ঠিক পাশের বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে ওয়ারেণ্ট এ্যাভয়েড করে থাকতেন। তাঁর কাছে গেল ছোটভাই।

যজ্ঞেশ্বর রায় বললেন—মাকে নিয়ে এস কলকাতায়। পাগল সার্টিফিকেট নাও ডাক্তারের কাছে, তারপর একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে বন্ধ করে বেঁধেটেঁধে রেখে দাও। কথাটা বড় চাউর হয়ে গেছে। এ ছাড়া পথ নেই।

বাবা পারেন নি মাকে বেঁধে কলকাতায় আনতে।

জ্যাঠামশাই রাত্রে গিয়ে মাকে নিয়ে এসেছিলেন। তখন মাণিকবউ উন্মাদ নন অথবা উন্মাদরোগের উপসর্গটা পাল্টে গেছে। মধ্যে মধ্যে চীৎকার করেন—ঠাকুর, তুমি এসে বল! সাক্ষী দাও! ঠাকুর!

বাকী সময়টা চুপ ক'রে পড়ে থাকতেন, আর আপন মনে বলতেন—এই তোমার ইচ্ছে, নয়? তোমাকে ভজলে কলঙ্কের ভাগী হতেই হবে? বেশ তাই হোক! হ্যাঁ, আমার জাত গিয়েছে। বড়বাবুকে যখন বিয়ে করেছিলাম তখনই গিয়েছিল। কিন্তু তখন তো শালগ্রাম হয়ে সাক্ষী হয়েছিলে! আপত্তি তো কর নি? কেন?

আবার চেঁচিয়ে উঠতেন—ঠাকুর, এসে বল! সাক্ষী দাও। ঠাকুর!

এরই মধ্যে সুলতা, জ্যাঠামশাই তাঁর কাছ থেকে তাঁর পৈতৃক কোম্পানীর কাগজ সই করিয়ে নিজেদের নামে ট্রান্সফার করিয়ে নিয়েছিলেন। বাবাও তার ভাগ নিয়েছিলেন।

খবর অন্নপূর্ণা-মা পেয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন দেখতে ব্যবস্থা করতে। কিন্তু জ্যাঠামশায় তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বাবাকে দিয়ে তখন চেষ্টা করিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা-মা, তাঁকে এই বাড়ীতে এনে যত্নের মধ্যে রাখতে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু এরই মধ্যে মাণিকবউ একদিন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে পালালেন।

পালালেন—একেবারে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে ভিক্ষা করেই খেতেন প্রথম প্রথম। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক বৃদ্ধা বাঈজীর। আগ্রার কৃষ্ণাবাঈ। বাংলাদেশের চুঁচুড়ার কায়স্থ জমিদারগৃহিণী কৃষ্ণভামিনী। দেবেশ্বরের ভিক্ষামায়ের। তিনি তখন বৃন্দাবন-বাসিনী হয়েছেন। অর্থ ছিল প্রচুর। তিনি নিজের কুঞ্জ করে সেখানে বাস করতেন। দেববিগ্রহ ছিল নিজের। পুজো করতেন।

পাগলীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। মধ্যে মধ্যে পাগলী চীৎকার করে ডাকত—ঠাকুর—সাক্ষী দাও! এসে বল! ঠাকুর!

বাংলা কথা শুনেই তিনি ওঁকে নিয়ে যেতেন নিজের বাড়ীতে, যত্ন ক'রে খাওয়াতেন।

ওঁরই বাড়ীতে একখানা ফটোগ্রাফ ছিল—এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ, ন্যাড়া মাথা খড়ম পায়ে দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী দেবেশ্বর রায়ের। কৃষ্ণভামিনী দাসীর ভিক্ষাপুত্রের।

সেই ছবি দেখে মাণিকবউ হা-হা করে কেঁদে উঠেছিলেন—ও কে? ও কে? ও কে গো?

তারপর চীৎকার ক'রে ডাকতে শুরু করেছিলেন—বড়বাবু! বড়বাবু। বড়বাবু গো! দেখ—দেখ—তোমার মাণিকবউয়ের দুঃখ দেখ!—ভিক্ষা করছি! বড়বাবু! আমাকে সঙ্গে কর! বড়বাবু!

এরপর পাগলীকে আর চিনতে বাকী থাকে নি কৃষ্ণাবাঈয়ের। তিনি তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে মায়ের মত, শাশুড়ীর মত কেঁদেছিলেন কপাল চাপড়ে বুক চাপড়ে। নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন মাণিকবউকে এবং তাঁকে নিজের সন্তানের মত রেখে কলকাতায় চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন—বউমা এখানে রইলেন।

সেই অবধি তিনি সেখানেই আছেন সুলতা। তিনি ভুলে গেছেন তাঁর সন্তান, সংসার, রায়বাড়ী, কীর্তিহাট; আর যজ্ঞেশ্বর রায় যোগেশ্বর রায়ও ভুলে গেছেন তাঁদের মাকে। কেন জান? কৃষ্ণাবাঈয়ের আশ্রয়ে থাকার পর আর তাঁকে মা বলে স্বীকার করলে কীর্তিহাটের দেবোত্তর সম্পত্তিতে অধিকার থাকবে না। শুধু তাই নয় সুলতা, বাংলাদেশের ধনী অভিজাতদের মহলে কৃষ্ণাবাঈয়ের সঙ্গে মায়ের বাস করার অপরাধ অমার্জনীয় অপরাধ। তাঁরা রটিয়ে দিয়েছেন, মা বৃন্দাবনে সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছেন। কোন সম্পর্ক তিনি নিজেই রাখেন না।

তা তিনি রাখেন না। তিনি ভুলে যেতেই চান, কিন্তু ভুলে যেতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে এ দেশের কেউ গেলে তাঁর যত্নের প্রশংসা করেন। আর "বহুমাঈজীর" কথায় ব্রজধামের লোকেরা শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ান।

মেজদি সেদিন রায়বাড়ীর মাণিকবউ, দেবেশ্বরের অবজ্ঞাতা স্ত্রীর কথা বলে বললেন—আমাকে বরং তাঁর কাছে পাঠিয়ে দে ভাই। বাকী দিন ক'টা আমি তাঁর কাছেই কাটাব।

সুলতা, মাণিকবউরাণী সম্পর্কে সেই আমি প্রথম বিস্তৃত বিবরণ শুনলাম; বললেন মেজদি। মেজদি আমার কীর্তিহাটের জীবনে ভাঙা রায়বাড়ীতে আমার মা, আমার সহোদরা বড়দি, আমার রূপসী ঠাকুমা সখি! শুনে আমার সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠল। মনে হল আমার গলাটা কেউ চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চাচ্ছে।

ওঃ—মাকে নির্বাসন দিয়ে দেবোত্তরের অধিকার নিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই আর বাবা। আর এইভাবে অপবাদ দিয়েছিলেন মেজদাদু শিবেশ্বর রায়!

মেজদি বললেন—ভাই, রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে দিয়ে রাজ্যরক্ষা করেছিলেন। তিনি তো ভগবান।

হায় পদ্ম ভগবান! হায় রাজ্য! এ রাজ্যের ভার দায় থেকে আমি কি ক'রে বাঁচব

বলতে পার ঠাকুমা ?—মেজদি ?

মেজদি অবাক হয়ে গিছলেন আমার কথা শুনে।

সুলতা, ঠিক এই সময়ে বেলা তখন ছুটো ; মেজদি জেল থেকে রিলিজড হয়ে বাড়ী এসে পৌচেছিলেন আটটা সাড়ে আটটায় ; তারপর ঠাকুমার কথা শুনতে শুনতে ছুটো বেজে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না, ছুটো বেজে গেছে ; কথায় ছেদ টেনে দিলে বাইসিকিলের ঘণ্টা।

টেলি-গিরাম।

* * *

টেলিগ্রাম—কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এসেছ—কাম ইমিডিয়েটলি ম্যাটার ভেরী সিরিয়াস।

রথীনের কাকা টেলিগ্রাম করেছেন।

কলকাতায় সন্ধ্যাতেই রওনা হলাম সুলতা। মেজদিকে পাঠাতেই হল কীর্তিহাটে। কারণ মেজদি খালাস পেলেও কীর্তিহাটের মধ্যেই তাঁর গন্তব্যের গতিবিধি টেনে দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতায় পৌছুলাম রাত্রে। রাত্রি তখন এগারটা। হাওড়া থেকে বরাবরই গিয়ে উঠেছিলাম হরিশ মুখ র্জি রোডের বাড়ীতে।

গিয়ে দেখলাম তাঁরা অন্নপূর্ণামায়ের শেষকৃত্য করে সেই মাত্র ফিরছেন কেওড়াতলা থেকে।

ভোরবেলা অন্নপূর্ণামা মারা গেছেন। রাত্রি আটটার সময় থেকে হার্ট এ্যাটাক হয়েছিল। সন্ধ্যার সময় বম্বে থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল রথীন আত্মহত্যা করেছে। টেলিগ্রাম করেছিলেন রথীনের বাবা। রথীন এক নার্সকে নিয়ে বিলেত পালাচ্ছিল। রথীনের বাবা অর্চনাকে সঙ্গে নিয়ে তার পিছনে পিছনে ছুটে গিয়েছিলেন তাকে ধরতে—তাকে ফেরাতে। সেখান থেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন—রথীন নেই। আত্মহত্যা করেছে।

খবরটা শোনবামাত্র অন্নপূর্ণামা বুকে হাত দিয়ে 'কি হল' বলে ব'সে পড়েছিলেন। তারপরই অজ্ঞান হয়ে যান। ভোর চারটে নাগাদ দীর্ঘ আশী বছরের জীবনে বোধ হয় কালের হাতে হার মেনে ভোরের নিস্তব্ধতার মধ্যে মুখ লুকিয়ে চলে গেলেন।

কীর্তিহাটে যখন গিয়ে পৌছুলাম সুলতা, তখন কীর্তিহাট অত্যন্ত উত্তপ্ত। ওদিকে গোয়ানপাড়ায় সরকারী তাঁবু ফেলে রিলিফ সেণ্টার খোলা হয়েছে। একটা ছোট পুলিস ক্যাম্প বসে গেছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ; এদিকে কীর্তিহাটে সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের জন্ত নেওয়া বাড়ীগুলোতে একটা বড় দল পুলিস এসে বসেছে—তাদের সঙ্গে আছেন একজন এ-এস-পি। সাধারণ তদন্তের মত একজন ডেপুটিও এসে রয়েছেন তাদের সঙ্গে। অতুলেশ্বর যা করেছিল বা করতে পারত তা তার নিজস্ব পুণ্য। কিন্তু সেই পুণ্যে বিচিত্রভাবে বোধ হয় কালমাহাত্ম্যে রায়বাড়ী এবং কীর্তিহাট পুণ্যবান হয়ে উঠেছিল। সেকালে পুলিস যার উপর অত্যাচার করেছে, এই কারণে সে-ই পুণ্যবান বলে খ্যাতিলাভ করেছে। সে তোমায় অবিদিত

নয়। বিচিত্রভাবে গোয়ান নির্যাতন পর্বে জমিদার-বাড়ী এবং কীর্তিহাটের হিন্দু প্রজারা একসঙ্গে এক দড়িতে বাঁধা পড়ার মত অপরাধে অপরাধী বলে নির্ধারিত হলেও তারা দমে নি; কারণ প্রমাণ ঠিক হাতেনাতে কিছু পাওয়া যায় নি। কীর্তিহাটের কেউই দমে নি। এরই মধ্যে জগদীশ্বরকাকা আত্মহত্যা করেছেন।

গোটা গোয়ানপাড়াটা পুড়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে জীবন্ত পুড়ে মরেছে হিলডা-বুড়ী। চার্চের দুইদিকে দুখানা খড়ের ঘর ছিল—একখানায় ইস্কুল হত, অন্যখানায় থাকতেন পাদরী সাহেব। হিলডা জলন্ত চার্চে ঢুকেছিল মাদার মেরীর ছবিখানা বাঁচাবার জন্যে। গোয়ানপাড়ার লোকে বলে—এর মধ্যে কীর্তিহাটের কংগ্রেসীরা আছে আর রায়-জমিদারেরা। আমরা কংগ্রেসকে ভোট দিই নাই বলে কংগ্রেসওলারা গোসা করে আমাদের এখান থেকে ভাগায়ে দিবে বলেছে, জমিদারবাড়ীর লেড়কা অতুলবাবু ভি কংগ্রেসে আছে। জেল থেকে সে হুকুম ভেজিয়েছে। আর জগদীশবাবু আউর সুখেশ্বরবাবুর লেড়কারা হামাদের ভাগায়কে জমিন কিনে লিবে, এহি মতলবে জবরদস্তি জুলুম লাগাইলে। পহেলে হামাদের গাছ কাটিয়ে লিলে।

এর সঙ্গে আরও অনেক অভিযোগ সুলতা। কমলেশ্বর ওদের খাসী ধরে বিক্রী করে দেয়। ওদের পাড়ার মেয়েদের পিছনে ঘোরে। দু'একজন মেয়ের সঙ্গে তার কলঙ্কের সম্পর্কও আছে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ তারা দিতে পারে। তারা এখানে একটা প্রতিবাদ মিটিং করেছিল। সুরাবর্দী সাহেবের লোক এবং খড়্গাপুরের হাডসন এসেছিল মিটিংয়ে। তাদের উপর কংগ্রেসের লোকে যে অত্যাচার করছে তার প্রতিবাদ করেছিল তারা। সে মিটিংয়ে গোপাল সিং ছত্রির বাড়ীর যে ছেলেটির হাত কুপিয়ে খোঁড়া করে দিয়েছে বিমলেশ্বরকাকা, সেও তাতে বক্তৃতা করেছে। ক্রীশ্চান মুসলমান হিন্দুর মিলিত প্রতিবাদ কম্যুনাল বলা চলবে না। মিটিংয়ে প্রিসাইড করেছিল হিলডা। তার পাশে ছিল কুইনা। এই মিটিংয়ে কমলেশ্বরবাবু আর কীর্তিহাটের কংগ্রেস ভলান্টিয়াররা এসে ঢেলা মেরে মিটিং বরবাদ ক'রে দিতে চেষ্টা করেছিল।

জগদীশ্বরবাবু তাদের পাড়ায় বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে শিকার করবার অছিলায় এসে শাসিয়ে বলেছিলেন, চলে যাও তোমলোগ ইঁয়াসে। দাম দেনেকো লিয়ে তৈয়ার হ্যায় হম। লেকেন হিঁয়া রহনে নেহি দেগা। কভি নেহি!

একটু উল্টোপাল্টা হল সুলতা। আগে জগদীশ্বরকাকার শাসানি, তারপর মিটিং। তার পর ছোটখাটো ব্যাপার। তারপরই একদিন পুড়ে গেল গোয়ানপাড়া। হিডলা পুড়ে মরল। তার ঠিক দুদিন পরই জগদীশ্বরকাকা আত্মহত্যা করলেন।

জগদীশ্বর রায়ের আত্মহত্যা আর হিলডার অগ্নিদাহে মৃত্যু, এবং কংগ্রেসকে ভোট না-দেওয়া এই তিনটেকে জড়িয়ে পুলিস তার দক্ষ এবং শক্ত পাক দিয়ে বেশ একটা মজবুত রশি তৈরী করছিল, যাতে রায়বাড়ীর তরুণ ছেলে কটি থেকে কংগ্রেসের বৃদ্ধ সভাপতি রঙলাল ঘোষ সহ কীর্তিহাটের কয়েকজন মাতব্বরকে এক কেসে একসঙ্গে বেঁধে চালান দেওয়া যায়।

আমাকে আমার ম্যানেজার বললে, আপনি এখানে থাকবেন না বাবু, আপনি কলকাতায় চলে যান। এখানে থাকলে বিপদ হবে। এবার—।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম শেষটা শুনবার জন্তে। মুখের দিকে চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম। বাকীটা সম্ভবতঃ বলার ইচ্ছে ম্যানেজারের ছিল না, তবু সে বললে, এবার মেজতরফকে সেরে দিয়ে যাবে। চষে দেবে পুলিস। গ্রামের লোকও আঙুল বাড়িয়ে সাহায্য করবে না। তার উপর জগদীশ্বরবাবু এবার এলেন যেন সাপের পাঁচ পা দেখে এলেন। অর্চনা বিধবা হল, আপনি তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন—উনি এক পয়সা খরচ করেন নি। সেই মেয়ের টাকা উনি নিজের কাবেজে পেয়ে একেবারে বিলকুল ভুলে বসে ভাবলেন—পুরনো আমলের রায়বাড়ীর দাপট ফিরিয়ে আনবেন। গোয়ানদের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ হয়েছে যেই শুনলেন, অমনি ধরলেন—আমি সোজা করে দিচ্ছি ওদের। হিলডাকে ডেকে বললেন, হিলডা, কিছু কিছু টাকা নিয়ে তোরা এখান থেকে চলে যা। যাদের আবাদী জমি আছে, তাদের দাম আমি দেব। এখানে তোদের থাকা চলবে না। আমি বারণ করলাম, বললাম—বাবু, সুরেশ্বরবাবু আসুন, তিনি বলে গেছেন দু পক্ষকেই। তা আমাকে ধমক দিয়ে বললেন—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে কোথাকার, তুই আমাকে বারণ করতে আসিস ?—

পিছন থেকে রঘু বললে—লালবাবু! অরচি দিদি আসিয়াছে নিচে।

অর্চনা আমাকে চিঠি লিখেছিল, অত্যন্ত বিব্রত হয়ে চিঠি লিখেছিলো এইসবের জন্তে। তারপর জগদীশ্বরকাকা আত্মহত্যা করেছেন। না-হলে আমি এসেই ওর সঙ্গে দেখা করতাম। হয়তো ও-বাড়ীতেই নামতাম।

নিচে নেমে এলাম। দেখলাম অর্চনা চুপ ক'রে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। স্থির নিস্পন্দের মত। নিশ্বাস পড়াও বুঝা যায় না। টেবিলের উপর নতদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবনায় যেন ডুবে আছে। আমি পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি তাও সে বুঝতে পারে নি। আমি ডাকলাম —অর্চনা!

নীরবে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বুঝলাম জগদীশ্বর কাকার আত্মহত্যার আঘাতটা মর্মান্তিক হয়ে ওর বুকে লেগেছে। টেবিলের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল অর্চনা। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—কাঁদিসনে ভাই। কি করবি বল ? এসব দুর্ঘটনা এমনভাবে ঘটে যে যে এক মিনিট কি আধ মিনিট আগেও কেউ বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না।

অর্চনা বললে, সুরোদা, আমার জন্তে সে আত্মহত্যা করলে। আবার বাবা আমার মুখে কালি লেপে দিয়ে—ছি ছি, সুরোদা—আমি যে ছি ছি করে মরে গেলাম! কি করে আমি মুখ দেখাব বলতে পার ? কোথায় যাব বলতে পার ?

ঘটনাটা বিচিত্র সুলতা। অর্চনার অদৃষ্ট নয়, রায়বাড়ীর অদৃষ্ট অথবা কর্মফল যা বল তাই।

গোয়ানপাড়া পোড়া এবং জগদীশ্বরকাকার আত্মহত্যার মধ্যে অপ্রত্যক্ষ যোগ থাকলেও প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ নেই। জগদীশ্বরকাকা গোয়ানদের উপর খুব চীৎকার ঝঙ্কার করেছেন, অনেক শাসনবাক্য প্রয়োগ করেছেন একথা সত্য, কিন্তু আত্মহত্যা তিনি তার জন্তে করেন নি।

অর্চনা বললে—সুরোদা, এ কথা মাকেও বলতে পারি নি, তোমাকে বলছি। তবে মা হয়তো আন্দাজ করেছে। বাবা আমাকে নিয়ে এখানে আসবার পর থেকেই আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। বড় মানুষ। খাওয়া-দাওয়া চাল-চলন সমস্ত কিছুর হাল বদলে দিলেন। বাড়ীতে কাজ করবার চাকর রাখলেন, চাপরাসী রাখলেন; খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, পোশাক-পরিচ্ছদে হঠাৎ যেন সব কিছুর বদল হয়ে গেল। এখানে এসেই আমার কাছে পাঁচশো টাকা চেয়ে নিয়েছিলেন কয়েক বিঘা জমি আমার নামে কিনবেন বলে। সেই টাকা থেকে এসব হচ্ছিল। জমি পরের নয়, জমি খানিকটা পতিত জমি, তাই তিনি আমার নামে চেক কেটে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। আমি এসব জানি, বুঝি—কিন্তু প্রথমটা বুঝতে চাই নি, টাকাটা আমি দিয়েছিলাম। কোন কথা, কোথাকার জমি, কার জমি জিজ্ঞাসা করি নি। ইচ্ছে হয় নি সুরোদা। তবে আপসোস হয়েছিল—কেন ও-বাড়ী থেকে চলে এলাম।

ও বাড়ীর কথা তোমাকে বলি নি সুরোদা, বলতে পারি নি। ওখানে, মানে ও বাড়ীতে ওদের এই পুরুষটা পচে গেছে সুরোদা, একেবারে পচে গেছে। আমাদের মতই পচেছে। তবে শহরের পচন সুরোদা। দেখে ধরা যায় না। সুরোদা—।

অর্চনা এতক্ষণ পাথরের মত বসে শুনেই যাচ্ছিল। সে এবার বাধা দিয়ে বললে—ওদের বাড়ীর কথা তোমার রায়বাড়ীর কথার মধ্যে নাই বা বললে সুরোদা। হয়তো দুনিয়াতে এইটেই সাধারণ নিয়ম সুরোদা। মানুষ ওঠে তপস্যা করে, নামে প্রশংসার মহিমায় অর্থে সামর্থ্যে অসাধারণ হয়ে উঠে বংশ প্রতিষ্ঠা করে যায়। তারপর এক পুরুষ, দু পুরুষ, তিন পুরুষে সব শেষ হয়ে পাঁকের মধ্যে ডুবে যায়। হারিয়ে যায়—আর কেউ খোঁজ করে না। তবে যেখানে যত বড়ত্ব সেইখানেই তত ছোটত্ব সুরোদা; কলকাতা শহর তার এত ঝলমলে সভ্যতা, সেখানে মনুমেন্টের তলায় গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র মানুষকে ডাকছেন, মানুষেরা ছুটে যায় পাগলের মত—ফাঁসিকাঠে ঝোলে, গুলিতে বুক পাতে; আবার সন্ধ্যের পর মানুষের চেহারা পাল্টায়। সে চেহারা তুমি দেখেছ। এবং সবাই জানে। ওদের বাড়ীতেও তাই হয়েছিল সুলতাদি; আমার নিজের দেওর যে সে আমার স্বামীর সব খবর রাখত, রাখত আমাকে বলবার জন্যে। আমার ভয় ছিল তাকে। তাই পালিয়ে এলাম বাবার সঙ্গে। তখন ম্যাট্রিক পাসও করি নি। কালটাও এখন থেকে পনের বছর আগে। তখনও ভালবাসার দাম ছিল, সতীত্বের দাম ছিল আমার কাছে, আর সত্যি কথা বলছি তোমাকে সুলতাদি, আমার স্বামীকে ওই ছ মাসেই প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিলাম।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অর্চনা বললে—বাপের বাড়ী এলাম, এসে আর এক বিপদে পড়লাম। আমার টাকা আমার বিপদ হল। বাবা ওই টাকার উপর দৃষ্টি রেখেই আমাকে কীর্তিহাটে এনেছিলেন। তার জন্যে অনেক চোখের জল ফেলেছিলেন।

পাঁচশো টাকা প্রথম নিয়েছিলেন ক'বিঘে ডাঙ্গা লিখে দিয়ে, সে নিয়ে আমার অভিযোগও ছিল না, আগ্রহও ছিল না, ভাবছিলাম—জীবনটা কাটাব কি করে? কি নিয়ে থাকব? অপেক্ষা করেছিলাম সুরোদাদার, বৃন্দাবন থেকে ফিরলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করব। সংসারে বলতে গেলে একান্ত আপন-জন, আপন সহোদর থেকেও অধিক ছিল ওই। কিন্তু

তার আগেই গোল বেধে গেল।

গোয়ানদের সঙ্গে ঝগড়া একটা কংগ্রেসের চলছিল ভোট দেওয়া নিয়ে। হিন্দুর গ্রামে কংগ্রেস মানেই শত্তকরা নিরেনব্বুইজন। এদিকে সুখেশ্বর কাকার ছেলের সঙ্গে আর একটা ঝগড়া ওদের চলছিল দেনা-পাওয়া নিয়ে। সুখেশ্বরকাকার আমল থেকেই ওঁর নিজের একটা মহাজনী কারবার ছিল। ওঁর পর কল্যাণেশ্বর দাদা প্রকাশ্যেই শুরু করেছিলেন। গোয়ানরা ছিল ওঁদের খাতক। সুখেশ্বরকাকা আগে সোনারুপোর জিনিস রেখে টাকা দিতেন, অনেকে বলত তিনি চুরির মালও সামলাতেন। কিন্তু কল্যাণেশ্বরদা প্রকাশ্যে কারবার ফেঁদে জমি-পুকুর-সম্পত্তি বন্ধক নিয়ে টাকা ধার দিত। বেশী টাকা কাউকে দিত না, কম টাকা চড়া সুদে দেওয়া ছিল তার কারবার। কারবারটা চলছিল ভাল; যাদের কেউ টাকা ধার দেয় না, তাদের টাকা দেওয়ার সুবিধে হল, মহাজন যা খুশী তাই লিখিয়ে নেয়। হঠাৎ সে সময় নতুন আইন হবে শোনা গেল। ফজলল হক সাহেব ডেট সেটেলমেণ্ট বোর্ড আইন তৈরী করছিলেন। কল্যাণেশ্বর দাদা শোনবামাত্র নালিশ করে বসে থাকলেন। আইন পাস হতে হতে ওদের জমি সব নীলেম করিয়ে নেবেন। ডিগ্রীও হয়ে গেল। বাবাকে ডেকে কল্যাণেশ্বরদা বলেছিলেন—জ্যাঠামশায়, অর্চির জন্যে জমি কিনবেন, তা এই ডিগ্রীগুলো কিনে নিন না। ও সবই তো নীলেমে উঠলেই গেল! সে জমি কেনার মতলব মাথায় ঢুকল বাবার! তখন বুঝতে পারি নি আমি। আমার মা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রতিবাদ তিনিও করেন নি। বরং—একটা গভীর নিশ্বাস ফেললে অর্চনা।

সুরেশ্বর বললে—থাক, তুই চুপ কর। আমি বলছি রে। হ্যাঁ, খুড়ীমা জানতেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন—বাবা, অর্চনার ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা তো আর ফেরাবার পথ ছিল না। বিধবা মেয়ে, জীবনটা গোটাই আছে; নগদ টাকা থাকবে না, থাকে না, টাকাটায় জমি কেনা সব থেকে নিরাপদ, থাকবে। আর তা থেকে গোটা সংসারটাই সুখের স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখবে; ছেলেগুলোকে পড়াতে পারা যাবে। আর একটা মেয়ে আছে, তার বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু অর্চনার এতে সায় ছিল না। একবার পাঁচশো টাকা দিয়েছিল। তার দরুন উনি পাঁচ বিঘে ডাঙ্গা জমিও লিখে নিয়েছিলেন। একেবারে ফাঁকি দেন নি।

হঠাৎ অতুল জেলখানা থেকে ওর দলের ছেলেদের কাছে খবর পাঠালে, গোয়ানদের ক্ষমা করো না। কঠিন শাস্তি দাও। নইলে এরপর কীর্তিহাটের লোকদের মান-ইজ্জৎ ওরা রাখবে না। লীগের সঙ্গে জোট বেঁধে বুকে বসে দাড়ি উপড়ে দেবে। ওখান থেকে ভাগিয়ে দাও। উঠে যাক ওখান থেকে। সুরেশ্বরের কথা শুনো না। সে একজন ধনীর শৌখীন খেয়ালী ছেলে। তাকে বলো এটা জমিদারীর ব্যাপার নয়। এবং জমিদারী এতে চলবে না।

তারপরই পুড়ে গেল গোয়ানপাড়া।

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণদা ব্যস্ত হয়ে উঠল, জ্যাঠামশায়, ডিগ্রীগুলো জারী করবার জন্যে এর থেকে ভাল সময় আর হতে পারে না। আমি আর ফেলে রাখব না। আপনি যদি নিতে চান তবে কিনে নিন। আমার চোদ্দটা ডিগ্রীতে পাঁচ হাজার কয়েক টাকার ডিগ্রী। চার হাজারে অর্চিকে, আমি দিতে পারি। দেখুন। নাহলে আমার আরও খদ্দের আছে।

কথাটা ভাঁওতা নয়; গোয়ানদের ঘর পুড়ে গেছে, সরকারী রিলিফ হয়তো মিলবে ঘর করবার জন্ত কিন্তু এ অবস্থায় মামলা লড়ে নীলাম ঠেকানো সম্ভবপর হবে না। এবং আদালতের পেয়াদা নিয়ে কীর্তিহাটের লোকেদের সাহায্যে জমি দখলেও বেগ পেতে হবে না। স্টেট সেটেলমেন্ট আইন পাস হয়ে বোর্ড বসতে বসতে এসব কাজ শেষ হয়ে যাবে। জগদীশ্বরকাকা মেয়েকে এসে বললেন—, কিন্তু কি সংকোচ হল কোথায় সংকোচ হল বলা শক্ত…।

কথাটা অসমাপ্ত রেখে একটু যেন ভেবে দেখলে সুরেশ্বর, তারপর বললে—বলা শক্তই বা বলছি কেন সুলতা, বলা বোধ হয় খুব সোজা; জমিটা কিনে স্বার্থটা সিদ্ধি হবার কথা জগদীশ্বরকাকার নিজের বলেই সংকোচ হয়েছিল তাঁর। নাহলে হবার কথা নয়। যাক সংকোচ তাঁর হল, সংকোচভরেই কথাটা প্রথম বললেন অর্চনাকে। চার হাজার টাকার চেক একখানা লিখে দে। এ সুযোগ গেলে আর চট করে আর মিলবে না মা। কিন্তু অর্চনা দিলে না। হয়তো সংকোচ দেখে সন্দেহ হয়েছিল। কিম্বা গোয়ানদের এই বিপদের মধ্যে ডিক্রীজারী করে তাদের জমিটুকু আত্মসাৎ করবার প্রবৃত্তি হয় নি—এও হতে পারে। সে বললে —না বাবা, ওসব জমিটমিতে আমার কাজ নেই। ও আমি কিনব না।

এক ধরনের বিষণ্ণ হাসি আছে যা কান্নার চেয়েও সকরুণ। সেই হাসি হেসে অর্চনা বললে—আমি বুঝতে পারি নি যে বাবা লোভের এবং জেদের এতখানি বশবর্তী হয়ে পড়েছেন। বুঝলে হয়তো চেকখানা লিখে দিতাম। কি করব আমি টাকা নিয়ে? অন্তত তখন তো তাই ভাবতাম। তখন তো পৃথিবী আমার কাছে অর্থহীন হয়েই গেছে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি নি। বাবা আরও দুবার বলে কেমন যেন চোরের মত ফিরে গেলেন। দুপুর-বেলা নিজের ঘরে বসে আমাকে গাল দিচ্ছিলেন নেশা ক'রে। তার সঙ্গে মাও খোঁচা দিয়ে দু-চারটা কথা বলছিলেন। আমি স্বার্থপর। আমি সুরোদার কুহকে পড়েছি। সুরোদা না বললে আমি কিছু করব না, এমন ধরনের কথার গভীরে কুৎসিত ইঙ্গিতও ছিল। শুনে আমার মাথা কেমন গরম হয়ে গেল। আমি তাঁর ঘরে এসে প্রথম সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বলে ফেললাম—তোমাদের মতলব আমি বুঝেছি। তোমার আমার কল্যাণের জন্ত আমাকে এখানে আনো নি। এখানে আমাকে এনেছ আমার সর্বস্ব শুষে নিতে। কিন্তু সে আমি দেব না। সে আমি বলে দিলাম।

আমি ভাবতে পারি নি সুলতাদি—ওঃ! আমি ভাবতে পারি নি। ওঃ,—একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার অর্চনা বললে—রাত্রে খাবারের সঙ্গে মানে লুচির সঙ্গে সিদ্ধি মিশিয়ে দিয়েছিলেন মা। বাবার পরামর্শমতই দিয়েছিলেন। যাতে আমি অজ্ঞানের মত ঘুমিয়ে পড়ি। কলকাতা থেকে আসবার সময় টাকা রেখেছিলাম ব্যাঙ্কে, আর গয়না রাখবার জন্তে একটা নতুন লোহার সিন্দুক আলমারি এনেছিলাম। সেটা থাকত আমার মাথার শিয়রে। সেদিন খেয়ে উঠে কিছুক্ষণ পরই মনে হল মাথা ঘুরছে যেন, শরীরটা যেন কেমন করছে; তারই মধ্যে এক এক সময় অকারণে হাসতে ইচ্ছে হচ্ছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ এক সময় ঘুম ভাঙল। প্রথমটা বুঝতে পারলাম না কিছু, তারপর মনে

হল কে যেন কি করছে মাথার শিয়রে। হয়তো নেশার ঝোঁকের মধ্যেই চীৎকার করে উঠেছিলাম—কে? কে? কে?

কার একখানা হাত মুহূর্তে আমার মুখের উপর এসে পড়ল। মুখ চেপে ধরে চাপা গলায় বললে—চুপ্! সে গলার আওয়াজ ভয়ঙ্কর।

হাতখানাও অত্যন্ত কঠিন এবং নির্মম। পেষণের যন্ত্রণার মধ্যে বোধ হয় আমার নেশার ঘোর কেটে গিয়েছিল, আমি একটা গন্ধ থেকে চিনতে পেরেছিলাম এ হাত বাবার। গাঁজার গন্ধ উঠছিল। এদিকে এমনভাবে আমার মুখ চাপা পড়েছিল যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, প্রাণপণে ধাক্কা দিয়ে মুখ ছাড়িয়ে চীৎকার করে উঠলাম—বা-বা! বলতে পারব না সুরোদা, এতখানি শক্তি আমার কোথা থেকে এসেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে দুখানা হাত সাঁড়াশীর মত আমার গলার উপর এসে পড়ল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে কার যেন গলা শুনেছিলাম—ওগো, ওগো—।

আর কিছু শুনি নি। জানি না। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমার মুখ মাথা জলে ভিজে গেছে, বিছানা ভিজে গেছে; আর কান্না উঠছে; গোলমাল উঠছে। ও ঘরে বাবা নিজের বন্দুকের নলটা মুখে পুরে ঘোড়া টিপে দিয়েছেন, খুলিটা ফাটিয়ে দমদম বুলেট বেরিয়ে গেছে। তেলোর কাছটা এতখানি জায়গায় একটা গহ্বর সৃষ্টি হয়ে গেছে।

এখানেই শেষ নয় সুলতাদি, কিন্তু সে কথা আমি বলতে পারব না। কোন মেয়েছেলে বলতে পারে না। রায়বাড়ী এত বড় বাড়ী। এত তার মান, এত তার মর্যাদা, এখনও জমিদারী সুরোদার টাকার বাঁধনে আটকে আছে—তার মর্যাদা মান তো বাঁচাতে হবে। তার জন্য হতভাগিনী একটা কন্যাকে বলি যদি দিতেই হয় তো না দিয়ে উপায় কি!

ওঃ! বলে সে দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকলে।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, সম্পদের মধ্যে বিষ আছে। জীবনকে বিষিয়ে দেয়। রায়বাড়ী সেই বিষে একেবারে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। আক্ষেপের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সুরেশ্বর বললে—ধনেশ্বর কাকা, মেজতরফের বড় ছেলে, তিনি ভাইপোদের সঙ্গে পরামর্শ করে রটিয়ে দিলেন, কি জান সুলতা? রটিয়ে দিলেন, অর্চনার ঘরে গভীর রাত্রে সাড়া পেয়ে জগদীশ্বর উঠে এসেছিল বন্দুক হাতে করে। কিন্তু কন্যার কলঙ্ক বংশের কলঙ্ক ঢাকবার জন্যে নিজের ঘরে গিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। অর্চনার মা মুখ টিপে বন্ধ ক'রে রইলেন। প্রতিবাদ করা দূরে থাক, মুখ তুলে মেয়ের দিকে একবার তাকালেন না পর্যন্ত। হয়তো তাকাতে পারলেন না।

সুরেশ্বর বললে—সেদিন দুপুরবেলা বিবিমহলে টেবিলের উপরে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত কথা আমাকে ব'লে অর্চনা বললে—আমি কোথায় যাব, কি করব, কি করে এরপর জনসমাজে মুখ দেখাবো বলতে পার সুরোদা? আমাকে একটা পথ দেখিয়ে দাও।

আমি চুপ ক'রে বসে সামনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম কাঁসাইয়ের ওপারের সিদ্ধাসনের জঙ্গলের দিকে। যে জানালাটার নিচে মধ্যে মধ্যে গোয়ানপাড়ার মেয়েরা এসে খিল

খিল করে হাসত, এবং বিবিমহলের একটু পশ্চিমে কাঁসাইয়ের দহের মধ্যে তারা মৎস্যকন্যার মত সাঁতার দিত, যে জানালাটার ওপাশেই কাঁসাই তীরভূমির লম্বা অর্জুন গাছগুলোর ডালে বসে 'বউ কথা কও' পাখী ডাকত—এটা সেই জানালা। আমি কোন পথই দেখতে পাচ্ছিলাম না। না সুলতা, পাচ্ছিলাম না নয়, পথ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু সে কথা বলতে, অন্ততঃ অর্চনাকে বলতে আমার সাহস ছিল না এবং পূর্ণ-সত্য প্রকাশ করতে হলে নিজের ক্ষুদ্রতাও বলতে হবে; অকপটে স্বীকার করছি, পথ ছিল; দেখতে পাচ্ছিলাম অর্চনার আবার বিবাহের পথ, সেই পথই একমাত্র তার সার্থকতার পথ। কিন্তু আমি জানত'ম অর্চনা সে পথ নেবে না, নিতে পারে না এবং কীর্তিহাটের রায়-বংশের শেষ সমৃদ্ধ এবং সম্পদশালী পুরুষ, আমার জিহ্বা একথা উচ্চারণ করতে পারছিল না; বলবার চেষ্টা করতে গেলে ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের গলা নিজে চেপে ধরি।

অথচ আমি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর মডার্ন জার্নালিস্ট যোগেশ্বর রায়ের ছেলে, আমি নিজে আলট্রামডার্ন আর্টিস্ট সুরেশ্বর রায়। নগ্ন বাস্তবতা যে কি বিচিত্র সত্য তা সেদিন বোধ হয় প্রথম অনুভব করে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জীবনে যাকে জীবনের দাবী বলে অন্তরে অন্তরে মানি, স্বীকার করি, বাইরে তাকে সমাজের দায়ে, বংশমর্যাদার দায়ে স্বীকার করতে পারলাম না। সুলতা, কিছুতেই আমি বলতে পারলাম না অর্চনাকে, অর্চনা তুই আবার বিয়ে কর। বরং মনে করতেই যেন মন কেমন করে উঠেছিল, রায়বাড়ীর বিধবা মেয়ে আবার বিয়ে করবে?

অর্চনা আমাকে আবার প্রশ্ন করলে—বল সুরোদা, বল আমি কি করি এখন! কি করা উচিত?

একটু চুপ করে থেকে বললে—তোমাকে একটা কথা বলি নি সুরোদা, তোমাকে বলি সেটা। আমার ভয় করছে, টাকা-গয়নার জন্যে আমাকে এরা মেরে ফেলতে পারে। কিংবা আমাকে—

চুপ করে গেল অর্চনা।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তোর মিথ্যে কলঙ্ক দেবে?

—তা দিতে পারে। কিন্তু দিয়ে তো কোন লাভ হবে না। টাকাটা তো তাতে পাবে না। হয়তো আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে যেটা মাসোহারা সেটা বন্ধ হতে পারে, কিন্তু যে টাকাটা ইনসিওরেন্সের দরুন পেয়েছি—যে গয়নাগুলো আছে সে তো আমারই থাকবে। লোভ তো ওদের এইগুলোর ওপরেই।

বুঝতে পারলাম না অর্চনা কি বলতে চাচ্ছে। বললাম—কি বলছিস তুই?

অর্চনা শুধু বললে—সুরোদা, মেজকাকার অসাধ্য কর্ম ছিল না। সে সব পারত। দাদু ঠাকুরদের গহনা গালিয়ে বিক্রী করে নিজেদের কতকগুলো পতিত জমি খারাপ জমি বিক্রী দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সবটা করেছিলেন সুখেশ্বরকাকা। উনি তার মধ্যে থেকেও সোনা সরিয়েছিলেন, আর সরিয়েছিলেন দামী পাথর। জানতে পেরেও দাদু কিছু বলতে পারেন নি। কল্যাণেশ্বরদা তার থেকেও ভয়ানক, সে সব পারে। পারে না এমন কাজ নেই। ভয়

আমার ওকেই। নইলে কত অনাথা বিধবা মেয়ে গ্রামের লোকের ভরসায় খুঁড়েঘরে দুঃখ মেহনত করে জীবন কাটিয়ে দেয়। পেটের ভাবনা ছাড়া আর কিছুর ভাবনা তো থাকে না। শুধু কল্যাণেশ্বর দাদা কেন?—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অর্চনা বললে, সুরোদা, আমার সমবয়সী দু মাসের ছোট আমার থেকে জ্যাঠামশায়ের ছেলে অরুণেশ্বর তোমার জ্যাঠার ছেলে প্রণবেশ্বর —এদের কাউকে বিশ্বাস নেই। তুমি জান না সুরোদা, তুমি যেদিন বৃন্দাবন গেছ, তার পাঁচদিন পর প্রণবেশ্বরদা এখানে এসে হাজির হয়েছে। বাবা মারা যাবার ঠিক পরদিন।

আমি শিউরে উঠলাম সুলতা। চোখ দুটো যেন আপনা থেকে বন্ধ হয়ে এল। রায়-বাড়ীর দিকে তাকাতে আমার ভয় করছিল। কথাটা মুখে আনতে আনতে আমার জিভ কুঁকড়ে যায়।

অর্চনা বললে—তোমার যায় কিন্তু সেদিন মানে বাবার মৃত্যুর পরই কথাটা ওদের মনে উঠেই ক্ষান্ত থাকে নি, জিভেও বেরিয়েছিল। আমি গিছলাম ঠাকুরবাড়ী। মনের একান্ত দুঃখে মায়ের কাছে চুপ করে বসেছিলাম, কাছারী ঘরে বসেছিল কল্যাণেশ্বর আর প্রণবেশ্বর দা। ওদের কথা হচ্ছিল। দুজনেই তারা আমার মনোরঞ্জন বা মনোহরণের চেষ্টা করবে। কল্যাণেশ্বর বলছিল—পাপ! হুঁ! তুমিও যেমন ও পাপ নিয়েনবব্ইটা ঘরে। মুসলমান ক্রীশ্চানদের তো দোষই নেই। আর ও তো খারাপ হবেই। সতের-আঠারো বছরে বিধবা হয়ে ও সতী থাকবে! বেশ আছ তুমি। ও এই পয়সা কপালে সুরোর ভাগ্যে আছে।

প্রণবেশ্বরদা উত্তর দিয়েছিলেন—আমার বিশ্বাস, যা হবার তা হয়ে গেছে। বলে হাত-তালি বাজিয়ে হেসে উঠেছিল, তারপর আবার বলেছিল, আমি তো সাফ কথা বলে দিচলাম জামাই ছোকরাকে—রথীনকে। সে বিশ্বাসও করেছিল।

সুরেশ্বর অর্চনাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—সুলতা আমার সেদিন মনে হয়েছিল রায়বংশ ধ্বংস হয়ে যাক। একটা ভূমিকম্প হোক, গোটা রায়বাড়ী থর-থর ক'রে কেঁপে হুড়মুড় ক'রে সব ছেলেপিলে বুড়ো-বুড়ী সব ধ্বংস করে দিক! এদের বেঁচে থাকবার আর কোন অধিকার নেই। আমি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে কথাটা বলতে পারি নি, সেই কথাটাই বলে ফেললাম, বললাম—তুই আজই আমার সঙ্গে এখান থেকে চলে চল অর্চনা. কলকাতায় চল। সেখানে তুই নতুন করে জীবন আরম্ভ কর। পিছনটা মুছে দে। ভুলে যা। আমি বলি—তুই পড়া-শোনা আরম্ভ কর। পরীক্ষা দে। তোর যা বুদ্ধি তাতে তুই পাস করতে পারবি। নিশ্চয় পারবি। তারপর নিজে বিচার করে যা হয় করিস। ইচ্ছে হয় আবার বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতিস। না-হয় যা ভাল লাগবে করবি।

—ছি! অর্চনা আমাকে এমন একটা ছি-কার দিয়েছিল উত্তরে যে সেটা আমাকে সুঁচের মত বিঁধেছিল সুলতা।

আমার রায়বংশে জন্ম সেটা যেন আমাকে চাবুক মেরে মনে করিয়ে দিয়েছিল। সেটা আমি আজও ভুলি নি। ওর কাছে আমি মাথা হেঁট করেই থাকি। আজও ও ওর ওই সত্তাটাকে সত্য করেই তুলে ধরে রেখেছে—রয়েছে। মিথ্যে হতে দেয় নি।

এরই মধ্যে কখন যে বিকেল হয়ে গিয়েছিল সেদিন তা জানতেও পারি নি। জানতে

পারলাম নীচের কোলাহলে।

রঘুরা এসে বললে—গোয়ানপাড়ার গোমেশ, ডিকু, আরও দুজন এসেছে, তারা দেখা করতে চায়। সঙ্গে একজন কনেস্টবল আছে।

গোমেশ, ডিক্রুজ আমার কাছেই কাজ করত। তারা এই ভোটের ঝগড়ার পর থেকেই কীর্তিহাটে ঢুকতে হবে বলে ভয়ে আসে না। এবং ভয় শুধু তাদেরই নয়—আমার ওখানকার নায়েবও আমার জ্ঞাতিদের হয়ে তাদের রাখতে সাহস করে নি।

নিচে নেমে গেলাম। গোমেশ, ডিক্রুজ সেলাম ক'রে বললে—হুজুর দুপুরে ফিরে আসছেন শুনে এসেছি হামিলোক। এরপরই "হামিলোকের বাড়ীঘর সব কিছু পুড়ে গেলো বাবু! ছাই হয়ে গেলো!" বলে গোমেশ হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল। "কিছু বাঁচলো না বাবু, কিছু না।"

ডিক্রুজ বললে—চার্চ পুড়ে গেলো, মেরী মায়ের ছবি ছিলো পুড়ে গেলো। হামি লোককে রায়হুজুর একশো বরিষের নাগচ হল আনলেন। বসাইলেন। বাবু—

আমি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—কি করব বল? আমি থাকলে হয়তো এমনটা হতো না। আমি ছিলাম না এমন হয়ে গেল। বলতে পারব না কার দোষ, কে দায়ী। আর তা বলেও লাভ নেই। যাই হোক, কি করতে পারি ভেবে দেখি। কাল সকালে আমি তোমাদের পাড়ায় যাব। দেখে আসব।

গোমেশ বললে—ভয়কে মারে আপনার নোকরি ছেড়ে দিয়েছি হুজুর। এই গাঁয়ে আমরা ঢুকতে পারি না। কুইনী একঠো চিঠি দিয়েছে আপনাকে। উভি আপনেকে যাবার কথা লিখেছে। আপনে নিজের চোখ্‌সে দেখেন কি হাল হ'ল গোয়ানদের।

কুইনীর চিঠিখানা খুলে পড়ে দেখলাম, সে লিখেছে—"আপনার কথায় নির্ভর ক'রে কি অবস্থা হয়েছে গোয়ানদের এসে দেখে যেতে অনুরোধ করছি। আজই এলে সুখী হব। কারণ আমি কালই চলে যাব খড়্গপুর। তার আগে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া আমার প্রয়োজন। আজই আসতে অনুরোধ করছি। গোয়ানরা অনেকে ঠিক করেছে, তারা তাদের জমি বেচে দিয়ে হয় খড়্গপুর চলে যাবে, নয়তো কলকাতা কি আসানসোল।"

মনটা কেমন ক'রে উঠল সুলতা! চলে যাবে? ওরা এতকাল পরে চলে যাবে এখান থেকে? বিবেচনা ক'রে, বিচার ক'রে দেখলে এইটেই ঠিক যে, তাতেই তাদের মঙ্গল ছিল। তারা এসে পড়ত রেলওয়ে কলোনীতে। তাতে ক্রীশ্চানদের মধ্যে এসে অল্পদিনেই তাদের চেহারা পালটাতো। তারা কারখানায় ঢুকে প্রকাশ পেতো নতুন জীবনে। কিন্তু সে কথা মনেই এলো না। তার বদলে মনে এল—মনে হ'ল, চলে যাবে? না—যেতে দেব না।

অহঙ্কারও হ'ল, ওরা আমার কথা শুনবে। গোয়ানপাড়া আমিই নিষ্কর ক'রে দিয়েছি। আমাকেই ওরা আজও রায়বাবু ব'লে মানে। হিলডা, সেদিনও মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করতে গিয়েও আমি মেদিনীপুরে রয়েছি জেনে আমার কাছে গিয়েছিল।

হিলডা আমার কথা রাখতে গিয়েই এমনভাবে পুড়ে মরল। কুইনীকে মনে পড়ল। কুইনীকে আমিই গড়ে তুলেছি। রায়বাড়ীর বড়তরফের কাছে এত বড় পাওনাদার আর

কেউ নেই। আমার অত্যন্ত আপনার জন। শুধু বড়তরফেরই বা কেন? অঞ্জনা দেবীকে ধরলে সব তরফ দেনদার।

তারই জন্যে, সুলতা, আমার ছবির ধারায় দেখো তুমি অঞ্জনা এবং কুইনীর চেহারা এক-রকম। তফাৎ শুধু কালের মেকআপে। রত্নেশ্বর রায় অঞ্জনাকে ঘর ছাড়িয়ে নিজের কাছে এনে শুধু কোলের কাছে এক অন্ন পঞ্চাশব্যঞ্জন সাজিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু খেতে দেন নি। উপবাসী রেখেছিলেন। আমার পিতামহের আগে দায় তাঁর।

আমি কোন্ কথা আর ভাবলাম না। অর্চনাকে বললাম—অর্চনা, তুই যা এখন ও বাড়ীতে। আমি গোয়ানপাড়া থেকে ফিরে এসে ও বাড়ীতে যাব। খুড়ীমার সঙ্গে কথা বলে তোকে আমি নিয়ে আসব এ বাড়ী।

অর্চনা মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—গোয়ানপাড়া যাবে সুরোদা? এই সন্ধ্যের মুখে?

হেসে বললাম—ভয় নেই কিছু, ভাবিসনে। আমি তো ক্ষতি কারুর করি নি!

—তা কর নি। কিন্তু তোমার ক্ষতি হলে অন্যের অনেক লাভ হতে পারে সুরোদা!

বললাম—না—না—না। এত ভয় পেলে চলবে কেন! আমি শিগ্‌গির ফিরে আসব। গোয়ানদের আমি কথা দিছলাম রে। আমার কথাতেই ওরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ না জানিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিল। আমি বলেছিলাম—আমি চেষ্টা করে দেখি। যদি মেটাতে না পারি, তা হলে যা হয় করবে তোমরা। আমার বিশ্বাস ছিল অর্চনা আমি মেটাতে পারব। ব্রজলাল ঘোষ এখানকার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, তিনি আমাকে ভালবাসেন। খাতির করেন। আমি এখানকার গোচর বাউ নিষ্কর করে দিয়েছি, আমার কথা থাকবে। কিন্তু তার আগেই তোর সর্বনাশের টেলিগ্রাম পেয়ে চলে গেলাম কলকাতা। তারপর বৃন্দাবন। এর মধ্যে আগুন জ্বলে গেছে। আমার একটা দায় আছে ভাই।

সুলতা, হঠাৎ মনে পড়ে গেল বৃন্দাবনের ঠাকুমার কথা। হোন তিনি পাগল, তবু তিনি আমার ঠাকুমা। তাঁর কথাটা আমার কানের পাশে যেন বেজে উঠল।—নাতি, ভারলায় দেনা আগে শোধ করো ভাই। তোমার ঠাকুরদার এত বড় দেনা আর নেই। এ দেনা শোধ না করলে তাঁর মুক্তি নেই।

একালে পরকাল অন্তত শিক্ষিত লোকে মানে না। আমি মানি কিনা জানি না, তবে সেদিন দশ আনা অন্ততঃ মানতাম না। তবু তাঁর কথাটা সেদিন সত্য বলেই মনে হয়েছিল।

অর্চনাকে বললাম—বলব, আরও কথা আছে তোকে বলব। এসে বলব। আমার না গিয়ে উপায় নেই।

কাঁসাই পার হয়ে গোয়ানপাড়া যেতে এবং ফিরে আসতে ঘণ্টাখানেক লাগে, আর ওখানকার কাজ মেটাতে লেগেছিল ঘণ্টাখানেক।

কাজ খুব সংক্ষেপেই সেরে এসেছিলাম। প্রায় দেনদার যেমন পাওনাদারের টাকা দিতে গিয়ে বলে—হিসেবনিকেশ থাক, এই টাকা আমার আছে, এই আমি দিচ্ছি। এতে যদি খালাস দিতে হয় দিন; না-হলে দলিলের পিঠে উশুল দিয়ে লিখে রাখুন; পরে দেখব হিসেব-নিকেশ ক'রে আর কত আপনার পাওনা।

কুইনী প্রত্যাশা করেছিল আমি আসব। পোড়া চার্চটার পাশে একটা টিনের চালা বেঁধে তখন সেখানে থাকে। হিলডার বাড়ীটা একেবারে পুড়ে গেছে। হিলডার বাড়ীই কুইনীর বাড়ী। ওই চালাটার সামনে বসবার একটু ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল। সেইখানেই বসেছিলাম।

গোয়ানপাড়ার লোকেরা ভিড় করে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠেছিলাম। মানুষগুলির দৃষ্টিতে একটা বিরোধের রুক্ষতা যেন ঝিলিক মারছে। একটু অস্বস্তি বোধ না করে পারি নি। এ প্রত্যাশা তো করি নি আমি।

কে একজন বলে উঠল ভিড়ের মধ্যে থেকে—"দেখেন আমাদের হাল দেখেন!"

আমি কুইনীকে কাছে ডেকে বললাম—কুইনী, তুমি ওদের বল যে প্রত্যেক পরিবারকে আমি একশো টাকা হিসেবে সাহায্য দেব। আর তোমাদের চার্চের জন্তে আলাদা পাঁচশো টাকা দেব।

এতে সাধুবাদ উঠল না, জয়ধ্বনি দূরের কথা। চুপ ক'রে রইল সকলে। একজন কেউ বলে উঠল—একশো রূপেয়া সে কি হোবে?

আমি হেসে বললাম—কিন্তু এর জন্তে তো আমার কোন অপরাধ নেই।

—আপনার না থাক, রায়বাবুদের দায় আছে। অতুলবাবু কংগ্রেসী কাম ক'রে জেল গেলো, তব ভি রায়বাড়ীর চাল ছাড়লে না। জেলসে হুকুম পাঠালে কি—গাঁও জালা দেও।

অবাক হয়ে গেলাম, আমি, বললাম—অতুলবাবু হুকুম পাঠিয়েছিল?

—হাঁ অতুলবাবু। আমরা জানি, শুনেছি।

মিসেস হাডসন গম্ভীরভাবে বসেছিল, সে বললে—So we have heard—it is a very strong rumour. we shall try to prove it.

কুইনী বললে—সকলেই তাই বলছে।

বললাম—বলুক। সত্য হলে সেটা অতুলের দায়, আমায় নয়। তবে তোমার দিদিমার ঘর পুড়ে গেছে, সে নিজে পুড়ে মারা গেছে, তার ক্ষতিপূরণ পুরো করব আমি—

বাধা দিয়ে কুইনী বললে—ধন্যবাদ স্যার, কিন্তু সে আমি চাইনে, নেব না। এখানকার লোক আমি নই। আমি বাঙালী ক্রীশ্চান। আমি খড়্গপুর থেকে কলকাতা চলে যাব। কীর্তিহাট থেকে, গোয়ানপাড়া থেকে দূরে থাকতে চাই।

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে বললে—আপনি চার্চটি আগাগোড়া নতুন ক'রে দিন। আমার দিদিমা ওই চার্চের ভিতর মাদার মেরীর ছবি বাঁচাবার জন্তে ঢুকেছিল আর বের হ'তে পারে নি। ওতেই দিদিমার তৃপ্তি হবে।

বললাম—বেশ তাই দেব। আর নিজে আমি ম্যাডোনার ছবি এঁকে দেবো।

তবু লোকে খুব খুশী হয় নি। কেউ একজন পিছন থেকে ব্যঙ্গ ক'রে বলেছিল—

জিমিদার! হিঁরা জিমিদারী যারাতে আসছে। থুক ফেকো একশোও রুপেয়া পর। কি হোবে বাবা—?

মনে মনে একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলাম। কিন্তু কি করব? কোন উপায় ছিল না।

ফেরবার সময় আমার সঙ্গে গোমেশ ডিক্রুজ আসছিল। ওরা আমার কাছে কাজ করত। ওরা সে কৃতজ্ঞতাটুকু ভুলতে পারে নি। বা ওদের প্রত্যাশা তখনও ছিল। ওরা আমার সঙ্গে আসছিল আমাকে পৌঁছে দিতে। কাঁসাইয়ের গর্ভে তখন অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে উপরের দিকে উঠছে। বিস্তীর্ণ বালুময় গর্ভ জুড়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝিরা মুখর হয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে তিনটি মানুষ যেন বোবা হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ এক সময় ডিক্রুজ বললে—নোকর হিসেবে আমাদের বাত্ মনে রাখবেন হুজুর। সব লোককে শ রুপেয়া দিবেন—হামরাদের তো বেশী মিলসা চাই।

না বললাম না। বললাম—আচ্ছা।

ওরা এতক্ষণে মুখর হয়ে উঠতে চাইলে। আবোলতাবোলই বকছিল ওরা। আমি কান দিই নি। আমি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম টাকাটা বোধ হয় মিথ্যেই অপব্যয় করলাম। বংশের দেনাপাওনা বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। নিরর্থক। অর্থই হয় না। কিন্তু এই কথাটা যেন শক্ত এবং সোজা হয়ে ভেঙে পড়া আমার ভার সইতে পারছিল না। বেঁকে যাচ্ছিল। নুয়ে পড়ছিল। আসলে আমি আহত হয়েছিলাম। ওদের এই অকৃতজ্ঞতা আমি প্রত্যাশা করি নি।

হঠাৎ চমকে উঠলাম গোমেশের কণ্ঠস্বরে। ভয়ার্ত কণ্ঠে সে বলে উঠল—বাবুজী অনেক লোক!

বলেই তারা ছুটে পালাল। আমি চমকে উঠে মুখ তুলে দেখলাম কাঁসাইয়ের ঘাটের উপর অনেক কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ নীরব পাথরের মূর্তির মত। জিজ্ঞাসা করলাম—কে?

—আমরা কীর্তিহাটের। আপনার জন্তেই দাঁড়িয়ে আছি।

—আমার জন্তে—

—হ্যাঁ। আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে।

—কেন? কি ব্যাপার?

—গ্রামের বিচার সভা বসেছে পঞ্চায়েতের। রায়বাড়ীর কালীমায়ের নাটমন্দিরে। আসুন আমাদের সঙ্গে।

গিয়ে দেখলুম—সত্যই নাটমন্দিরে গ্রামের লোকেরা জমায়েত হয়েছে। রায়বাড়ীর প্রবীণতম পুরুষ ধনেশ্বর রায় থেকে প্রণবেশ্বর, কল্যাণেশ্বর প্রভৃতিরা একদিকে ব'সে আছে; অন্তদিকে ব'সে আছে দয়াল দাদা থেকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিরা; মাঝখানে বসেছে বৃদ্ধ রঙলাল ঘোষ। পাশে তার উকীল ছেলে।

কংগ্রেসের সভাপতি রঙলাল ঘোষ বিচারক সভাপতি। গ্রামের লোকেরা বিচার প্রার্থনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে আজ কণ্ঠস্বর মিলিয়েছেন রায়বাড়ীর রায়বংশধরেরা।

অভিযুক্ত আমি। সুরেশ্বর রায়। রঙলাল ঘোষ বললেন—আসুন বাবা। বসুন। আপনার বিরুদ্ধে তো অনেক নালিশ গো।

সুরেশ্বর বললে—দপ্ করে যেন আমার মাথায় আগুন জলে উঠেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল চীৎকার করে উঠি। একদিন এই নাটমন্দিরেই ভয়ার্ত মেজদিদির হাত ধরে প্রায় টেনে এনে ধনেশ্বর, প্রণবেশ্বর, কল্যাণেশ্বর সকলের মুখের উপর চীৎকার করে বলেছিলাম, এখানকার মালিক আমি। আমার হুকুম ছাড়া অন্যের অন্যায় হুকুম আমি চলতে দেব না। মেজরায়-গিন্নীর অপমান হলে আমি সহ্য করব না। দিন ঠাকুরমশাই মেজদিকে পুষ্প-চরণোদক দিন।

কথাটা তোমার বোধ হয় মনে পড়বে সুলতা। সম্ভবত আরও মনে আছে সেদিনের কথা, যেদিন সেটেলমেণ্ট সার্কেল অফিসার হরেন ঘোষের সামনে গোচর নিয়ে ধনেশ্বরকাকাদের ঝগড়ার মধ্যে আমি আদিপুরুষ কুড়ারাম রায়ের কড়চার কথা স্মরণ করে বলেছিলাম—কীর্তিহাট বসতবাড়ী আর গোচর নিষ্কর দিয়ে গেছেন কুড়ারাম রায়, তখন ধন্য ধন্য করে উঠেছিলেন এই রঙলাল ঘোষ। সেদিন বলেছিলেন—হ্যাঁ, জমিদারের পুত্র ব্রাহ্মণের ছেলে বটেন বাবা আপনি। নমস্কার বাবা আপনাকে।

মনে পড়ে গেল, রত্নেশ্বর রায় যেদিন নিজের অধিকারে ফিরে এই কালী-মায়ের মন্দিরের বারান্দায় প্রথম কাছারী করেছিলেন, প্রজাদের প্রণাম আর সেলামী নিয়েছিলেন।

মনে পড়ল—তার পরের দিন বীরেশ্বর রায় রত্নেশ্বরকে নিয়ে কাছারীতে বসে পুণ্যাহ উপলক্ষে জমিদারীর সীমানার মধ্যে খেয়াঘাটের ডাক, হাটের ডাক আর মৌজা বীরপুরের মণ্ডলান আদায়ের ডাক করিয়েছিলেন, সেদিনের কথা।

আশ্চর্য সুলতা, জমিদারী নিজে কখনও করি নি। করতেও চাই নি। বরং প্রজারাই অযাচিত ভাবে আমার কাছে বিচারের জন্য এসেছে সময়ে সময়ে। আমি বিব্রত বোধ করেছি। কিন্তু সেদিন—সেদিন তারিখ ছিল ১৯৩৮ সালের মে মাসের শেষ, সেদিন ওই রঙলাল ঘোষের সামনে অভিযুক্ত হিসাবে দাঁড়াবার সময় দেখলাম, রায়বাড়ীর জমিদারত্বের সবটুকু আশ্রয়হারা হয়ে কখন আমার মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করে বলছে—"আমাকে বাঁচাও। আমাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কুড়ারাম ভট্টাচার্য, তারপর সোমেশ্বর রায়, বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায় আমাকে গড়ে গেছেন; তারপর থেকে আমাকে সকলে হাতুড়ি মেরে ভেঙে ভেঙে আসছে, তার মধ্যে আমার মরতেও ভাল লাগছিল কিন্তু এইভাবে আত্মসমর্পণ করে বলিদানের জন্তুর মত মরতে আমার আর লজ্জার শেষ নেই—সীমা নেই।"

রঙলাল ঘোষ হাত দিয়ে সামনের আসরে আমার বসবার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিলেন। আমি ভুরু কুঁচকে খানিকটা ভেবে নিয়ে বললাম—নালিশ আমার বিরুদ্ধে কে করলে আপনার কাছে?

সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক বলে উঠল—আমরা। আমরা গ্রামের লোক। সমস্ত কণ্ঠ ক'টি তরুণ। প্রবীণেরা মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—গ্রামের লোকের অভিযোগ কি, তা আমি জানি না কিন্তু অভিযোগের বিচারের এই আইন, এই ব্যবস্থা কে করলে? বিচার উনি করতে

বসেছেন কিসের বলে?

একসঙ্গে অনেকগুলো হিংস্র মানুষ গর্জন করে উঠল। বললে—আমরা দিয়েছি, আবার কে? গ্রামের লোকেরাই দিয়েছি। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট উনি, উনি ছাড়া বিচার করবেন কে?

রঙলাল ঘোষ এবারও বললেন—অন্যায় কথা হল বাবা, অন্যায় কথা হল। দেখুন, জমিদার হোন, ব্রাহ্মণ হোন, যা হোন—দশকে মানব না বললে চলবে না। দেশে আর দশে তফাৎ নেই বাবা। বিচার মানতে হবে। অভিযোগ শুধু গাঁয়ের লোকে করে নাই বাবা। আপনার বংশের এইসব এঁরাও করেছেন।

মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে একটা কি যেন পাক দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল চীৎকার করে উঠি। বলি—না-না-না!

আমার নীরবতার মধ্যে একজন কে বলে উঠল—উনি গ্রামের লোকের, দেশের লোকের ইচ্ছের বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গে একরকম বিরোধ করেই আজ ওই গোয়ানপাড়ায় গিয়ে তাদের ঘরপিছু একশো টাকা সাহায্য দেব বলে এসেছেন। চার্চকে নতুন করে গড়তে যা খরচ লাগবে দেবেন। ইচ্ছে করে গাঁয়ের অপমান করেছেন উনি। তাছাড়া উনি, গোয়ানরা গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছে, আনতে চাইছে, তাতেও একরকম সায় দিচ্ছেন, সাহায্য করছেন।

—এ তো আপনি করতে পাবেন না বাবা। এ তো হতে পারে না।

আমি বললাম—সুলতা, নিজেকে শক্ত করে নিয়ে শান্তকণ্ঠে বললাম—কে কাকে দান করবে, কেন করবে—এ নিয়ে কারও কোন আপত্তি চলতে পারে বলে আমি মনে করি না ঘোষমশায়। মাফ করবেন, আপনার বিচার আমি মানতে পারলাম না। গোয়ানদের ঘর পুড়েছে, তাদের সাহায্য করাতে যদি আপনাদের সঙ্গে বিরোধ করা হয়, তবে তাই হল। উঠে দাঁড়ালাম আমি।

মুহূর্তে সমবেত কণ্ঠের আওয়াজ উঠল—তাই হল?

সঙ্গে সঙ্গে জনতিনেক বেশ শক্ত-সমর্থ জোয়ান এসে আমাকে রূঢ়স্বরে বললে—বসুন আপনি।

রঙলাল ঘোষ বললেন—মাথা ঠাণ্ডা করুন বাবা, রাগ করে কোন ফল হবে না। মাথা ঠাণ্ডা করে বসুন।

আমি চলে যেতে চাইলাম কিন্তু আমাকে জোর করে ধরে রাখলে ক'জনে। আমি স্তব্ধ হয়ে পাথরের মত দাঁড়ালাম। আমি বসব না, আমি মুখ খুলব না—আমি যেন পাথর হয়ে গেছি। কিংবা বলতে পার রায়বংশের শেষ জমিদার আমি পাথরের মত অটল থাকতে চেষ্টা করলাম।

হঠাৎ মনে হল যেন রায়বাড়ীর পলেস্তার-খসা নোনা-ধরা ইটের ফাঁক থেকে অসম্ভব অবিশ্বাস্য অভিযোগ দাখিল করছে আমার বিরুদ্ধে।

—উনি অহিন্দু, উনি অধার্মিক, উনি টিপিক্যাল জমিদার, এখানে ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি চালিয়ে আমাদের বুকে বাঁশ দিতে এসেছেন। এই গোয়ানদের রায়বাবুরা এনে

বসিয়েছিলেন মহাল শাসনের জন্যে। প্রজা দুরস্ত করবার জন্য। এখন প্রজার আমল—প্রজাদের শাসন করবার জন্যে গোয়ানদের কোলের কাছে টানছেন। উনি জানেন না কিম্বা হয়তো জেনেও বুঝতে চান না যে, এই গোয়ানরা মুসলিম লীগের সঙ্গে দোস্তি করে যখন হিন্দু কীর্তিহাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, সেদিন রায়বাবুদের কালীবাড়ীর গোবিন্দবাড়ীর উপর আক্রমণ হবে সব থেকে আগে। কম্যুনাল রায়ট বাধলে গোয়ানরা রায়বাবুদের সাহায্য করবে না, লীগের পাণ্ডাদের হুকুমে লীগের গুণ্ডাদের হাতে লাঠি, শড়কি যুগিয়ে দেবে।

তাছাড়া পাকা সাতপুরুষের জমিদারনন্দন উনি, ইংরিজীতে বলে ব্লু ব্লাড, তার মধ্যে লাম্পট্যের তৃষ্ণা আকণ্ঠ। এত বয়স পর্যন্ত বিবাহ করেন নি উনি; কেন করেন নি? প্রচুর টাকা আছে, উনি উদারতা দেখিয়ে স্বজন-সেবাপ্রীতি দেখিয়ে টাকা খরচ করেন, মনের এক ধরনের বিলাস চরিতার্থ হয়, প্রশংসা হয়, তার ফাঁকে ফাঁকে ওঁদের মত লোকেরা বাসনা চরিতার্থ করবার সুযোগ করে নেন।

কথাগুলো বলছিলেন রঙলাল ঘোষের উকিল ছেলেটি। আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

—ওই গোয়ানদের পিক্রুস গোয়ান আমার বাবার পিসেমশাই ঠাকুরদাস ঘোষকে খুন করেছিল। লোকে বলে রায়বাহাদুর ইসারা দিয়েছিলেন। গোয়ানদের একটা মেয়েকে নিয়ে এই সুরেশ্বরবাবুরই ঠাকুরদাদা দেবেশ্বর রায়—কেলেঙ্কারির আর বাকি রাখেন নি। শেষ পর্যন্ত ওই গোয়ান মেয়েটার পিছনে পিছনে এসে ওই কাঁসাইয়ের ঘাটে মারা যান। মেয়েটা বিষ খেয়ে মরেছিল। সুরেশ্বরবাবু কুন্তী মেয়েটাকে পড়ার খরচ যোগাচ্ছেন। কেন? লোকে বলে—সকলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন—কি বলে তা বোধ হয় কারুর অজানা নয়।—রায়বংশে এ-দোষ চাঁদের কলঙ্কের মত। শুধু রায়বাবুরাই বা কেন, প্রায় সব জমিদারবংশেই আছে। যেখানে বিষয়, সেইখানে ব্যাভচার। তবে রায়বংশে একটু বেশি এই রকম বলে। সে সেই গোড়া থেকে। রক্ষিতা রাখতেন। জাত মানতেন না। ছোটজাত, বড়জাত বামুন পর্যন্ত—আপনাদের আত্মীয় পর্যন্ত মানতেন না।

* * *

সুলতা, এইরকম একটি রাত্রি আমার জীবনে আর কখনও আসেনি। মনে হচ্ছিল আমি মরে গেছি, আমার আত্মাকে অপরাধী করে হাজির করা হয়েছে ঈশ্বরের আদালতে, সেখানে দেখছি যেন আমার বিচারের জন্ম টেনে এনে হাজির করা হয়েছে আমার পূর্বপুরুষদের। সে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য থেকে আমার বাবা যোগেশ্বর রায় পর্যন্ত। আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হবে তাঁদের জীবনের আচরণ থেকে। আমি যেন দেখছিলাম, হয়তো কল্পনায় দেখেছিলাম, তাঁরা যেন বিস্মিত, বিরক্ত, তার সঙ্গে বিব্রতও বটে। বীরেশ্বর রায় পর্যন্ত ক্ষুব্ধ, তবে বিব্রত নন। রত্নেশ্বর রায় চিন্তা করছেন। সত্যিই কি অপরাধ তিনি করেছেন? পুণ্যের বোঝার চেয়ে কি অন্যায়ের পাপের বোঝাটা ভারী হয়ে উঠল কালের হাওয়ায়? দেবেশ্বর রায় বেদনার্ত, আমার বাবাকে দেখলাম মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছেন। শিবেশ্বর রায়, তিনিও দাঁড়িয়ে আছেন। বীভৎস তাঁর চেহারা। ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে তাঁর হাড়গোড় ভেঙে যে বীভৎস মূর্তি হয়েছিল, ঠিক সেই বীভৎস মূর্তি।

* * *

ঘোষের ছেলে বলেই গেল—শুধু জাত ? এঁরা সম্পর্কসূত্র মানেন না। অন্তত এঁর সম্পর্কে যা শুনছি এবং বাইরে থেকে দেখেশুনে যে-সত্য অনুমান করা যায়, বোঝা যায়, তাতে অনুমান মিথ্যে বলে ঠিক মনে হয় না। এই তো রায়বংশের বাবুরা—কল্যাণবাবু, প্রণববাবু, এমন কি প্রবীণ ধনেশ্বরবাবু বসে রয়েছেন, এই তো আমার পিছনেই মাথা হেঁট করে বসে রয়েছেন—বলুন না, ওঁরা বলুন না ?

ধনেশ্বরকাকা বলে উঠলেন—ছেড়ে দাও না মশাই। ও-কথাটা ছেড়ে দাও না। এখন যার বিচার হচ্ছে, তাই হোক না। গ্রামের লোকের অমতে তাদের উপেক্ষা করে গোয়ানদের এই সাহায্য দিচ্ছেন উনি—

হঠাৎ একটি ছেলে লাফ দিয়ে উঠে আমার সামনে এসে হাতের আস্তিন গুটিয়ে ঘুঁষি পাকিয়ে বললে—বলুন, স্বীকার করুন অন্যায় হয়েছে! আর বলুন দেবেন না টাকা ওদের ?

হঠাৎ যেন আমি আমাকে ফিরে পেলাম। দৃঢ়কণ্ঠে আমি বললাম—না।

—না ? ক্রুদ্ধকণ্ঠে সবিস্ময়ে না শব্দটা জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সে হঠাৎ একটা ঘুঁষি আমার মুখের উপর মেরে বসল। লাগল এই ঠোঁটের ডান কোণে। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটটা কেটে গেল, বেশ গভীর ভাবেই কেটেছিল, মুখের মধ্যে রক্তের স্বাদ অনুভব করলাম। তখন আবার সে ঘুঁষি তুলেছে। সুরেশ্বর রায়ের রায়বংশের কাছে পাওয়া দীর্ঘ সবল দেহখানা শক্ত এবং কঠোর হয়ে উঠল। আমার হাতখানা তার থেকে অনেক লম্বা। শক্ত মুঠিতে তার হাতখানা চেপে ধরে রুখে দিলাম। রঙলাল ঘোষ প্রবীণ মানুষ, সম্ভবত নতুন যুগের মোকাবেলা করা নয় সত্যটাকে স্বীকার করতে পারলেন না। তিনি চীৎকার করে ধমক দিয়ে উঠলেন—এ কি ? এ কি কাণ্ড ? না—না—

কিন্তু তাঁর কথা কে শুনবে ? কেউ গ্রাহ্য করলে না, সভাপতির নির্দেশ,—একদল অল্পবয়সীর দল লাফ দিয়ে উঠে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কে যে কি দিয়ে আঘাত করেছিল তা বলতে পারব না। আমি কিছুক্ষণ—সে বোধ হয় মিনিট-দুয়েক রুখেছিলাম, তার পরই কপালের উপর এসে পড়ল একটা অত্যন্ত কঠিন কিছুর নিষ্ঠুর আঘাত। আমি বুঝতে পারলাম আমি জ্ঞান হারাচ্ছি, বুঝতে পারলাম পড়ে যাচ্ছি, কিন্তু তবু আর্তনাদ করলাম না, কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইলাম না, রায়বাড়ীর নাটমন্দিরের ওপর পড়ে মরতেই চাইলাম—এইটুকু তোমাকে বলতে পারি। কথাটা আমার বিশ্বাস করো। তারপর আর কিছু মনে থাকবার কথা নয়, মনেও নেই।

জ্ঞান যখন হল, তখন আমি বিবিমহলে বিছানায় শুয়ে। আমার মাথার শিয়রে কেউ বসেছিল দেখতে পাই নি। পাশে দাঁড়িয়েছিল চ্যারিটেবল ডিস্পেনসারির ডাক্তার। কাঁসাইয়ের ধারের জানালাটার পাশে চেয়ারে বসেছিলেন একজন পুলিস অফিসার। এদিকে দাঁড়িয়েছিল রঘু। সময়টা ভোরবেলা। তার মানে প্রায় সারাটা রাত্রিই এইভাবে কেটেছে। রাত্রে তমলুক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয় নি। মাথায় আঘাত, চেতনাহীন

অবস্থা, এ অবস্থায় এক পাল্কী ছাড়া অন্য কোন যানে এমন রোগী পাঠানো যায় না। তাই বিবিমহলে এনে ডাক্তারকে ডেকে পুলিসের পাহারায় রাখা হয়েছে।

শুনলাম, কেউ শক্ত একটা কিছু সম্ভবত লোহার শিক দিয়ে মেরেছিল আমার মাথায়, পিছন দিক থেকে মেরেছিল। কানের খুব কাছাকাছি। একটু এ-পাশে হলেই জীবন-সংশয় হত। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই রক্তের ধারা গড়িয়ে এসেছিল। তারপরই সশব্দে পড়ে গিয়েছিলাম।

এতক্ষণে সকলের উত্তেজনার ছুটন্ত ধারার মুখে একটা ধ্বস ছেড়ে খসে পড়ে তার গতি রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

এক মুহূর্তে গোটা আসরটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শুধু রঙলাল ঘোষ চীৎকার করে উঠেছিলেন—কি হল? ওরে কি হল? ওরে মারামারি করিসনে। ওরে!

কেউ প্রশ্ন করে উঠেছিল—মরে গেল নাকি? বাধালি ফ্যাসাদ!

ঘোষের উকিল ছেলে শুধু মাথা ঠিক রেখে ডেকে বলেছি—জল, জল! ওরে জল আন, জল!

কতক লোক পিছু হটে সরে গিয়েছিল। কেউ কেউ চলেও গিয়েছিল। কেউ গিয়েছিল জলের সন্ধানে।

ঠিক এই সময়ে বাড়ীর অন্দরের দরজার মুখ থেকে একটি তীব্র নারী-কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল —ছি-ছি-ছি! এমন করে পচে গেছে! গোটা বংশটা এমনি করে পচে গেছে! ছি-ছি-ছি!

এ-কণ্ঠস্বর, সুলতা, গোবরডাঙার খুড়ীমার। সারাজীবন যিনি মুখ বুজে স্বামীর সঙ্গে ঘর করেছেন আর ঘৃণা করেছেন স্বামীকে, শ্বশুরকে, দেওরদের, সৎ-শাশুড়ীদের, কাকে নয়, রায়বাড়ীর মেজতরফের ইট-কাঠকেও ঘেন্না করেছেন। ধনেশ্বরকাকার স্ত্রী—ব্রজদার মা।

ব্রজদা সেই যে বউ নিয়ে এসেছিল, অতুল ধরা পড়বার সময়—সেই সময় সে যে আমার কি পরিচয় তার মায়ের কাছে দিয়ে গিছল বলতে পারব না, তবে এই আশ্চর্য গোবরডাঙার অহঙ্কৃতা মেয়েটি আমায় ভালবেসে ফেলেছিলেন—ব্রজদার চেয়েও বেশী ভালবেসেছিলেন।

তিনি তাঁর অভ্যাসমত আপন ঘরে বসেছিলেন, অর্চনা খবরটা পেয়ে ছুটে দেখতে এসেছিল কি হচ্ছে! দোতলার টানা বারান্দায় যেখানে বসে রায়বাড়ীর মেয়েরা চিকের আড়াল থেকে নাটমন্দিরে যাত্রা শুনত, বাঈনাচ দেখত, সেইখানে দাঁড়িয়ে কিছুটা দেখেই ছুটে গিয়ে নিজের মায়ের পায়ে মাথা কুটতে লেগেছিল।—এইজন্যে—এইজন্যে নিয়ে এসেছিলে আমাকে? মা হয়ে, বাপ হয়ে তোমরা আমাকে এই কলঙ্ক মুখে মাখিয়ে দিতে এনেছিলে? বাপ আত্মহত্যা করে জুড়িয়েছে। তুমি? তুমি কি করবে? একবার বললে না যে আমার কন্যার কলঙ্ক যে দেয়, তার মাথায় বজ্রাঘাত হোক! পারলে না বলতে?

চীৎকার শুনে বেরিয়ে এসেছিলেন গোবরডাঙার বউ। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হয়েছে রে অর্চনা, অমন করে চেঁচাচ্ছিস?

অর্চনা চীৎকার করে উঠেছিল—কি হয়েছে গিয়ে দেখে আসুন কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে। সুরোদাকে বলি দিচ্ছে। তার বিচার হচ্ছে।

—বিচার? কিসের বিচার? কে বিচার করছে?

—বিচার করছে রঙলাল ঘোষ। নালিশ করেছে গাঁয়ের লোক, তাদের সঙ্গে কল্যাণদা, প্রণবদা, জ্যাঠাইমা কি বলব—সবাই আছে,—তাদের নালিশ হচ্ছে, সুরোদা অনেক টাকা খরচ করে আমার বিয়ে দিয়েছেন; ছি-ছি জ্যাঠাইমা, ছি-ছি-ছি!

কিসে থেকে কি হয় এবং কেমন করে হয়, এ বলা খুব সহজ নয় সুলতা, কখনও কখনও মনে হয় বলাই যায় না। গোবরডাঙার খুড়িমা মুহূর্তে যেন সর্বাঙ্গে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে জলে উঠেছিলেন। অর্চনার হাত ধরে ওই ছি-ছি-ছি বলতে-বলতেই—সারা সিঁড়ি নেমে কাছারীর দরজা পেরিয়ে ঠাকুরবাড়ী ঢুকে সবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

তখন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি। আসর ভেঙেছে। ধনেশ্বরকাকা তাঁকে বাধা দিতে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের কাছে দাঁড়াতে পারেননি। তিনি যত বলেছিলেন—গোবরডাঙার বউ, গোবরডাঙার বউ!—আঃ, করছ কি?

গোবরডাঙার বউ তত বলেছিলেন—তুমি এমন পিশাচ, এমন অমানুষ, ছি-ছি-ছি! দাঁড়িয়ে দেখছ? মিথ্যে নালিশ করছ? ছি-ছি-ছি! এই জন্তে আমার ছেলেগুলো এমন অমানুষ, এমন পশু! ছি-ছি-ছি!—মেজঠাকুরপো গাঁজা খেতো, মদ খেতো, জন্তুর মত রাগ ছিল, তারও লজ্জা ছিল, সেও লজ্জায় আত্মহত্যা করে বেঁচেছে। আর তুমি? ছি-ছি-ছি! কল্যাণেশ্বর অর্চনাকে জড়িয়ে মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে অপবাদ দিচ্ছে, তাই তুমি কানে শুনছ, সায় দিচ্ছ? ছি-ছি-ছি! ওকে তাড়াতে চাও? এই প্রবৃত্তি তোমার? ছি-ছি-ছি!

কথাটা অর্চনার কাছে শোন; তুই বল অর্চনা—আমি দেখি নি সে গোবরডাঙার খুড়িমাকে, তুই দেখেছিস। বল—জীবনে বোধ হয় একবার তিনি ওই মহিমময়ী মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

* * *

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অর্চনা বললে—সেদিন তিনি যেন নিজেকে ফাটিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। আমার কথা শুনে আমার হাত ধরে টেনে নীচে প্রায় হেঁচড়ে নিয়ে এসেছিলেন; মুখে ওই এক বুলি—ছি-ছি-ছি!

তারপর তাঁর সে-মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। নাটমন্দিরে—নাটমন্দির ভরা লোক, হেজাকের আলো জ্বলছিল, তুমি পড়ে রয়েছ, রক্তের দাগগুলো কালো দাগড়া-দাগড়া ছোপের মত দেখাচ্ছিল, তারই মধ্যে জ্যাঠাইমা দাঁড়ালেন—সাদা শাঁখের মত গায়ের রঙ, বড় বড় চোখ, মোটাসোটা মানুষ, মাথার কাপড় পড়ে গেছে গ্রাহ্য নেই; হেজাকের আলোর সামনে দাঁড়িয়ে তিরস্কার করলেন জ্যাঠামশাইকে। সম্ভবত স্বামীর প্রতি জীবনের জমা-করা ঘেন্না, জীবনে সন্তানদের কাছে পাওয়া লজ্জার দুঃখ—সব যেন ফেটে চৌচির হয়ে আছড়ে পড়ল সেদিন সেই নাটমন্দিরে। কি বলেছিলেন সব কথা মনে নেই, বলতে পারব না। তবে একটা কথা মনে আছে। কানের পাশে আমার যেন বেজে উঠছে

এই মুহূর্তে, শুধু এই মুহূর্তেই কেন সুরোদা, যখনই কোনক্রমে জ্যাঠাইমা কি সেই দিনের ঘটনা, কি আমার নিজের ভাগ্যের কথা মনে করি, তখনই কানের পাশে এইভাবেই বেজে ওঠে তাঁর কথাগুলো, আর চোখ বুজলেই দেখতে পাই সেই রাত্রিরের সেই ছবি—হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোয় তেমনি উজ্জ্বল জ্যাঠাইমার মূর্তি, মুখ-চোখ।

ওঃ, বলেছিলেন কথাগুলো যেন বজ্রাঘাতের ধ্বনির মত, চমকে দিয়েছিল সকলকে। আঘাতটা তাঁর নিজের বুকেই বেজেছিল। বলেছিলেন, এইজন্মেই,—এইজন্মেই আমার গর্ভের এতগুলো সন্তান—সবগুলো তার জানোয়ার, জন্তু, প্রেত আর পিশাচ, একটা মানুষ হয় নি। কিন্তু রায়বাড়ীর সব বিষ কি তুমিই খেয়েছিলে? ওঃ, ভাগ্যিস আমার গর্ভে মেয়ে হয় নি! তাহলে তো—। ছি-ছি-ছি!

শেষ পর্যন্ত যে কি হত, কি বলতেন বা করতেন তিনি, তা বলতে পারব না সুলতাদি; ঘটনা বলুন বা যা ঘটেছিল বলুন, তাতে একটা ছেদ পড়ে গেল আর একটা ঘটনা ঘটে। বাইরে পুলিস এসে পড়ল।

ময়না থানায় খবর পাঠিয়েছিল মিসেস হাডসন আর কুইনী। গোমেশ আর ডিক্রুজ সুরোদার কাছেই চাকরি করত, সে জান তুমি; কিন্তু ভোটের ব্যাপার নিয়ে কীর্তিহাটের সঙ্গে গোয়ানপাড়ার ঝগড়া লাগতেই ওদিকে গোয়ানদের পিছনে এসে দাঁড়াল মুসলিম লীগের পাণ্ডা আর খড়্গপুরের মিসেস হাডসন। এদিকে কীর্তিহাটের লোকেদের সঙ্গে সারাদেশ—তার সঙ্গে মহারাজ নলকে বাড়িয়ে দেওয়া কলির শানানো ছুরির মত রায়বাড়ীর কল্যাণদা, প্রণবদা, আমার বাবা, জ্যাঠামশাই, বলতে গেলে এক সুরোদাকে বাদ দিয়ে সবাই।

নল-দময়ন্তীর ব্যাপারটা কলিযুগে ঘটে নি। ঘটলে অন্য রকম ঘটত। কলির শানানো ছুরিখানা দিয়ে কাপড়খানাকে মাঝখানে চিড়ে বাঁধন কেটে পালানোর মত পালাতেন না নল, কলিযুগ হলে দময়ন্তীর বুকে বসিয়ে দিয়ে গোটা কাপড়খানা নিজে নিয়ে পালাতেন।

এখানেও ঝগড়াটা চরমে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম কীর্তিহাটে উঠল গোয়ানদের বয়কট কর ধুয়ো। তারপরই আরম্ভ হল—গাঁয়ে পেলেই ধরে মারো। ডিক্রুজ, গোমেশ পালালো। ওদিকে গোয়ানপাড়ায় দোকান হয়ে গেল তিন-চারটে। তারপরই লাগল আগুন। পুড়ে গেল গোয়ানপাড়া।

গোয়ানপাড়া কংগ্রেস পোড়ায় নি। রঙলাল ঘোষ কিছু জানতেন না। তবে তাঁর উকিল ছেলে জানতেন, তার সঙ্গে জানতেন রায়বাড়ীর কর্তারা। কল্যাণের খাতক ছিল অনেকগুলি, গোয়ান খাতক। অল্প অল্প টাকা সুদে-আসলে বেড়ে বেড়ে তিন-চার গুণ হয়ে বন্ধকী তমসুদে পরিণত হয়েছিল। কল্যাণদা জানতো যে, গোয়ানপাড়া সুরোদা নাখরাজ করে দিলে সেটেলমেণ্টে সে গোয়ানপাড়ার বারো আনা তার। তাই সেদিন যা পেয়েছিল সুরোদার কাছে, তাই নিয়ে সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ নতুন আইন হবার কথা শোনা গেল।

ডেট-সেটেলমেণ্ট বোর্ড হবে। খাতক যত টাকা মূল নিয়েছে, তার বেশী পাবে না। আর তা সহজ কিস্তীবন্দীতে শোধ দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। কল্যাণদার দশ হাজার টাকা

পাওনা, সে-হিসেবে পাঁচ হাজারের কমে দাঁড়াবে। কল্যাণদার চক্রান্তেই ধুয়ো উঠল—গোয়ান তাড়াও, হঠাও।

তার জন্তে লাগল আগুন। পুড়ে ছারখার হয়ে গেল গোয়ানপাড়া। সরকার থেকে সাহায্য এল, রক্ষা করবার জন্তে পুলিস এল, তার উপর এদের হাত ছিল না। কিন্তু সুরেশ্বরদা সাহায্য করায় এরা বসাল বিচারসভা, ওদিকে সেই খবর গোয়ানপাড়ায় পৌছুতেই গোয়ানরা পাঠালে পুলিসে খবর। সুরেশ্বরদাকে এরা অনেকেই বড়লোক বলে খাতির করত। পাড়াটা লাখরাজ করে দেওয়ায় সত্যকার শ্রদ্ধাও অনেকে করত। কিন্তু সেদিনের সে-ব্যাপারটা খাতির কিম্বা শ্রদ্ধার জন্তে তারা করে নি—তারা জেদের বশে করেছিল।

"সুরেশ্বর রায়বাবু তাদের সাহায্য করতে চেয়েছে বলে তাকে ধরে-বেঁধে গ্রামসভা বেঁধে বিচার করছে। এখুনি পুলিস এলে নিজের চোখে দেখতে পাবেন! ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মিলবে। ইয়োরস ফেথফুলি, মিস্ কুইনী মুকুজ্জি এবং মিসেস্ হাডসন। সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্ট গোয়ান এ্যাসোসিয়েশন, কীর্তিহাট, গোয়ানপাড়া।"

অর্চনা বললে—চোখের সামনে দেখছিলাম লোকগুলো চলে যাচ্ছে। নাটমন্দিরের ভিড় পাতলা হচ্ছে। খুব খেয়াল সেদিকে ছিল না। আমি অভিভূতের মত তাকিয়েছিলাম জ্যাঠাইমার দিকে।

জ্যাঠাইমার সে কি মূর্তি!

হঠাৎ কে কাকে বললে—উঠে এস। শুনছ—উঠে এস। পুলিস, পুলিস এসেছে। পুলিস!

রঙলাল ঘোষকে বলছিল তার উকিল ছেলে।

জ্যাঠামশাই, ধনেশ্বর রায়, সুলতাদি, এবার এসে বললেন—থাম, এবার থাম গোবরডাঙার বউ—। পুলিস এসেছে। যাও বাড়ীর ভেতর যাও।

জ্যাঠাইমা যেন বুঝতেই পারলেন না। শুধু তাকিয়ে রইলেন জ্যাঠামশাইয়ের দিকে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

—শুনছ? পুলিস,—পুলিস আসছে।

হঠাৎ জ্যাঠাইমা একটা আর্তনাদ করে দুই হাতে কপাল টিপে ধরে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন। তারপর যেন ঢলে পড়ে গেলেন কালীমায়ের পাট-অঙ্গনে।

ওদিকে অনেকগুলো ভারী জুতোর শব্দ তুলে পুলিস ঘরে ঢুকল।

সুরোদা তখন রক্তাক্ত মাথা নিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে নাটমন্দিরে, নাট-অঙ্গনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন জ্যাঠাইমা। নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন দুই বৃদ্ধ—ধনেশ্বর রায় আর রঙলাল ঘোষ। আর আমি।

একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল; বারকয়েক দপ্ দপ্ করে লাফিয়ে জলে হেজাকবাতিটা নিভে গেল।

'জমিদারীর বিলুপ্তি ঘটল আজ কিন্তু জমিদার রায়বাড়ীর শেষ আলো সেইদিন নিভেছিল সুলতাদি। এ-সত্য দুই চোখ মেলে আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নি। সুরোদাও না।

সুরেশ্বর বললে—তাই ঠিক সুলতা, অর্চনা যা বললে, তাই ঠিক। ওই দিনই রায়বাড়ীর শেষ। অন্ততঃ বংশধারার নাটকে জমিদারী অঙ্কের শেষ। মানুষের বংশধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বংশ হয় না, সে কালের সঙ্গে চলে। শুধু এক-একটা পর্বে ছেদ পড়ে। পাঠান মুঘল সুলতান বাদশা—তার আগে হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা ইতিহাসবিখ্যাত রাজা মহারাজা—তাঁদের বংশ নির্বংশ হয়েছে এমন ভাববার কারণ নেই। খুঁজলে পাওয়া হয় তো যাবে—কোন দোকানদার বা মুটেমজুরের মধ্যে। মানে রাজা মহারাজা বাদশা সুলতান বংশ হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেই বেঁচে থাকে তারা। সুলতানশাহী বাদশাহী চরিত্র বা মেজাজ তাদের থাকে না। তাদের কে মনে রাখে বলো? তাদের কথা কে গল্প করে বলো?—করে না। ভাল লাগে না শুনতে। তাই বলি আমার—বংশে ছেদ পড়ল, শেষ হল। রায়-বংশেও তাই হ'ল। সেদিন যখন প্রজাদের ডেকে আমাকে অপরাধী সাজিয়ে তাদের দিয়েই বিচার করালে আমারই জ্ঞাতিরা, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে রায়বংশের নাটকে যবনিকা পড়ল। এর পর যে বংশধারা রইল—সে নদী নয়— সেগুলোকে নালা বলতে পার।

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—সে সময়ে মানে ১৯৩৮।৪০ সালে সম্ভবতঃ বাংলাদেশে সব জমিদারী বংশেরই অল্পবিস্তর এই দশা হয়েছে। প্রজারা সকলেই বিচার করতে বসুক না বসুক অভিযোগের ফিরিস্তি তৈরী কর্‌ছিল। কিন্তু জমিদারদের তখনও কাঠগড়ায় হাজির করতে পারে নি। জমিদারী আমলের শেষ দৃশ্যের শুরুতেই রায়বংশের পালা সারা হয়ে গেল। যারা টিকে রইল তাদের অধিকাংশই সরকারকে আঁকড়ে ধ'রে টিকে রইল। রায়বংশ তা পারলে না। না পারলেন ধনেশ্বর কাকারা, না পারলেন প্রণবেশ্বর দাদারা এবং সব থেকে স্বচ্ছল অবস্থা ছিল আমার—আমিও পারলাম না তা। এবং সেইদিন রাত্রেই যা করলাম, তাতে আমি সরকারকে স্বীকার করলাম না, স্বীকার করলাম প্রজাদের। হ'ল কি জান?

আমার জ্ঞান হতেই আমার বিছানার সামনে উপবিষ্ট এস আইটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে জ্ঞান হয়েছে আপনার! কেমন মনে হচ্ছে বলুন তো সুরেশ্বরবাবু?

নিজের কপালে হাত দিয়ে ব্যাণ্ডেজটায় হাত বুলিয়ে দেখতে দেখতেই সব মনে পড়ে গিয়েছিল। শুধু বুঝতে পারি নি—পুলিস কোথা থেকে এল এবং কেমন করে এল! প্রশ্নটার উত্তর মিলুক বা না-মিলুক প্রশ্নটা থেকে আরও কতকগুলো ফ্যাকড়া প্রশ্ন বেরিয়ে প্রশ্নটার গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছিল। কেন—পুলিস এল কেন? পুলিস এমন ক'রে বসে কেন? আমাকে ঘিরে রয়েছে কেন? আমাকে অ্যারেস্ট করেছে কিনা—ইত্যাদি—ইত্যাদি। আমি ভাবছিলাম। দারোগাটি আবার প্রশ্ন করলে—সুরেশ্বরবাবু, কি কষ্ট হচ্ছে আপনার?

বোধ করি দারোগার গলার আওয়াজ পেয়েই ওঘর থেকে এ-ঘরে এসে ঢুকলেন আর একজন পুলিস অফিসার—যাকে দেখে খট্ করে গোড়ালি ঠুকে দারোগাবাবু সেলাম দিল।

নতুন আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলেন—জ্ঞান হয়েছে নাকি?

—হ্যাঁ স্যার, চোখ মেলেছেন। কিন্তু সাড়া দেন নি।

নতুন আগন্তুকটি অল্পবয়সী এবং উচ্চপদস্থ অফিসার। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার আর কোন ভয় নেই—আমরা খুব সময়ে এসে পড়েছিলাম। এখন

আপনি সেক। কেমন মনে হচ্ছে বলুন তো?

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবতে ভাবতেই বললাম—ভাল। বিশেষ কষ্ট কিছু নেই—তবে মাথার একটা যন্ত্রণা হচ্ছে।

—ওটা খুব সিরিয়াস নয়। কিন্তু একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে যে আপনাকে। এখন সেটা পারবেন? এখন হলেই ভাল হয়।

পুলিসের কাছে স্টেটমেন্ট! সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সহস্র প্রশ্ন জেগে উঠল। সহস্র প্রশ্নের সবগুলোই রায়বংশ নিয়ে। মনে তো সবই পড়ছিল। ধনেশ্বর কাকা—প্রণবেশ্বরদা—কল্যাণেশ্বর, অর্চনা, সবার কথা মনে পড়ছিল। স্টেটমেন্ট দিতে গেলে কোন্ কথা বাদ দেব? কার কথা বাদ দেব? কেমন করে দেব?

জীবনে যে সাহস বা সত্যবোধ থাকলে ব্যাসদেবের মত মহাভারতের প্রথমেই নিজের জন্মকথা—তাঁর পিতা পরাশরের সঙ্গে মা মৎস্যগন্ধার দেহসংসর্গের কথা—অত্যন্ত সহজে বলা যায় বা বলতে পারে মানুষ, তা আমার সেদিন ছিল না—। রায়বংশের কারুরই ছিল না। সে সত্যবোধকে আড়াল করে বা ভ্রূণহত্যার মত হত্যা ক'রে দাঁড়িয়েছিল জমিদারীর মর্যাদা। ওই জমিদারীর মর্যাদাই রায়দের বংশমর্যাদা, তাছাড়া আর কিছু নয়।

ডি-এস-পি, ভদ্রলোকটি ডি-এস-পি, তিনি আবার ডাকলেন—সুরেশ্বরবাবু!

চোখ বুজেই উত্তর দিলাম—বলুন!

—স্টেটমেন্ট দিতে হবে যে আপনাকে!

—স্টেটমেন্ট!

—হ্যাঁ। কি হয়েছিল? কি করে আঘাত লাগল আপনার কপালে? কে মেরেছিল আপনাকে? আপনাদের বাড়ীর নাটমন্দিরে এত লোকেরা মিলে কি করছিল?

আমার থেকেও বছর ছয়-সাতের ছোট ছিলেন ভদ্রলোক। ১৯৩৮ সালে আমার বয়স আটাশ—তাঁর বয়স তখন সদ্য বিশ পেরিয়েছে। পুলিস লাইনে তখনও পাকেন নি, পাকলে ওইভাবে সমস্ত পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিতেন না।

তিনি বললেন—ময়না থানার গোয়ানপাড়া থেকে দুজন লোক এবং আপনার কর্মচারী আচার্যের চিঠি নিয়ে একজন লোক গিয়ে খবর দেয় যে গ্রামের লোকেরা এবং রায়বাড়ীর অন্ত অন্ত দেউলে-পড়া শরিকেরা মিলে আপনার বিচার সভা বসিয়েছে। গোয়ানপাড়া থেকে মিসেস হাড্‌সন আর মিস কুইনী মুখার্জী চিঠিতে লিখেছিলেন, গোমেশ এবং ডিক্রুজ এরা চোখে দেখেছে—সুরেশ্বর রায়কে কীর্তিহাটের লোকেরা ধরে নিয়ে গেছে তাদের বিচার সভায়। বাবু সুরেশ্বর রায় একজন কাইণ্ড-হার্টেড ইয়ং মডার্ন জমিদার—উইথ নো প্রেজুডিস অব এনি কাইণ্ড। গোয়ানরা ক্রীশ্চান বলে তিনি তাদের ঘৃণা করেন না। গোয়ানদের ঘরবাড়ী পুড়ে যাওয়ার জন্তে তিনি সকল গোয়ানকে সাহায্য করতে চেয়েছেন বলে কীর্তিহাট পিপল তাঁকে বিচার ক'রে সাজা দিতে সংকল্প করেছে এবং সুরেশ্বরবাবুর জ্ঞাতিরা—যারা সুরেশ্বরবাবুর মৃত্যুতে লাভবান হতে পারে তারা—। দে হ্যাভ জয়েনড হ্যাণ্ডস উইথ দি ভিলেজারস। তাকে মেরে ফেলাও অসম্ভব নয়। আপনারা তাড়াতাড়ি এলে তাঁর জীবন

রক্ষা পেতে পারে এবং গোয়ানপাড়া কারা পুড়িয়েছে তার অব্যর্থ প্রমাণও পেতে পারেন পুলিস বিভাগ।

আমরা বলতে গেলে দৌড়ে এসেছি। অফিসাররা সাইকেলে এসেছেন—আর্মড কনেস্টবলস ডবল মার্চ করে এসেছে সারাটা পথ। এসে আপনাকে জীবন্ত অবস্থায় পেয়েছি এইটেই লাক্ বলতে হবে। মাথাটা কেটে গেছে—অনেকখানি রক্ত পড়েছে। লোকজন কেউ নেই। থাকবার মধ্যে ধনেশ্বরবাবু বসে আছেন তাঁর স্ত্রীর মাথা কোলে ক'রে। ভদ্রমহিলা বোধ হয় মারা গেছেন—তাঁর মাথার শিরা ছিঁড়ে গেছে। সেরিব্রেল থ্রম্বসিস। আর বুড়ো রঙলাল ঘোষ। এবং আপনার খুড়তুতো বোন অর্চনা দেবী।

সুরেশ্বর একটু হাসলে। হেসে বললে—সেদিন সর্বপ্রথম বাঁচাতে চেয়েছিলাম অর্চনাকে। তার কথাটা উল্লেখই করি নি। আর রায়বাড়ীর শরিকদের কথা এবং রঙলাল ঘোষের কথা মনে রেখে ওদের বাঁচাবার জন্য গোয়ানদের কথাটাকেই একমাত্র কথা ক'রে তুলে বলেছিলাম—হ্যাঁ, বিচার একটা হচ্ছিল, রায়বাড়ীর শরিকরাই গ্রামের লোকদের ডেকেছিলেন—বিচার করবার জন্যে। আমারই বিচার হচ্ছিল।

কিসের বিচার? কি অপরাধ করেছিলেন আপনি?

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ভেবে নিয়ে বলে ফেললাম,—আমার একটু বেশী মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাচ্ছিল গোয়ানদের সঙ্গে—মানে—'

কি বলব ভেবে পাই নি। তবু একটা লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছিলাম, আন্দাজে আন্দাজে সেই পথেই চলেছিলাম। কথাটা আংশিকভাবে সত্যও বটে। আমার শরিকদের দাবীও ছিল তাই। গোয়ানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যেই হোক আর অন্য অমার্জনীয় কলঙ্কের জন্যই হোক—আমায় ধর্মভ্রষ্ট জাতিচ্যুত ক'রে পতিত করতে পারলেই অন্ততঃ দেবোত্তরের সেবাইতের অধিকার থেকে আমি বঞ্চিত হব। আমি গোয়ানদের কথাটাকে সেই কারণেই আঁকড়ে ধরেছিলাম। তবুও বলতে গিয়ে থামতে হল। সত্যকে খালি মাথায় ধরে নিয়ে অনায়াসে চলা যায়, কিন্তু রাজাগিরি বা জমিদারগিরির পাগড়ী বা তাজের উপর চাপানো যায় না—তাতে ওই তাজ বা পাগড়ী ভেঙে যায় চেপ্টে যায়, অন্ততঃ পাগড়ী তাজ লজ্জিত হয়, লাঞ্ছিত হয়। আমি থেমে গেলাম।

কিন্তু পুলিস অফিসার ছাড়বেন কেন—তিনি যুগিয়ে দিলেন—

—মানে? বলুন—সুরেশ্বরবাবু।

—মানে! মানে তাদের সম্পর্কে কি বলব? বলব আমার কিছু দুর্বলতা আছে!

—দুর্বলতা? I See, কি দুর্বলতা? বলুন!

ভদ্রলোক আমাকে ঠেলে ঠেলে যেন কোণে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যে শক্তিতে আমি নখদাঁত বের করে দাঁড়াতে পারতাম তা আমার ছিল না। আমি বলতে পারতাম সুলতা, বলতে আমি গিয়েওছিলাম আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের ঋণের কথা; বলতে পারতাম আমার ঠাকুমার কথা; অনায়াসে বলতে পারতাম—আমার ঠাকুমা আমাকে বলেছেন—ভাই নাতি, তোমার ঠাকুরদার সব থেকে বড় ঋণ ওই গোয়ানদের কাছে। তাই, তোমার

ঠাকুরদার শ্রাদ্ধের সময় সেই ঋণ শোধ হ'ল না, শোধ করবার কথা কেউ ভাবলে না দেখে আমি গোয়ানপাড়ার গির্জের পাদরীর কাছে—পাড়ার লোকেদের কাছে গিয়েছিলাম—ঋণ শোধ করতে। কিন্তু তাও হয় নি। উপরন্তু আমার জাত গেছে ব'লে আমাকে ঠাকুরবাড়ী ঢুকতে দেয় নি। আমাকে এনে কলকাতায় বন্ধ রেখেছিল। সেখান থেকে আমি বেরিয়ে ভাগ্যক্রমে বৃন্দাবনে এসে গোবিন্দের আশ্রয় পেয়েছি।

বলতে বলতে সুরেশ্বরের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল। সে চুপ করলে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—সুলতা, সেদিনের সে অবস্থা আমি কখনও ভুলব না। ওঃ, কে যেন আমার গলা টিপে ধরলে। সেদিন জানতে পারি নি, বুঝতে পারি নি, তবে আজ বুঝতে পারি, বলতে পারি—গলা টিপে ধরেছিল আমার জমিদারীর ইজ্জৎ; কুড়ারাম ভটচাজ—জমিদার হয়ে রায় খেতাব নিয়েছিলেন। রায়বংশ জমিদারবংশ, রায়বাড়ীর মর্যাদা জমিদারীর মর্যাদা। ব্রাহ্মণের মর্যাদা নয়। বেদব্যাসের মর্যাদা আর পাণ্ডব কৌরবদের মর্যাদা আলাদা সুলতা। বেদব্যাসের পিতৃমাতৃ-পরিচয়ের মধ্যে কোন আবরণ নেই—কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর এবং পাণ্ডবদের সত্যকার পিতৃপরিচয় কানাঘুষোর মধ্যে লোকে বলাবলি করেছে, উচ্চারণ করতে বা এ নিয়ে গবেষণা করতে কারুর সাহস হয় নি।

আজ সত্যকেই তোমার সামনে উদ্ঘাটিত করছি। সেদিনের মত জমিদারী ইজ্জতকে বড় করছি না, সেই সঙ্গে এই সত্যটুকুও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি সুলতা যে এই ইজ্জত মিথ্যা হলেও মূল্যের দিক থেকে কম নয়। খাটো কাপড় কি বল্কল পোশাকের সঙ্গে রাজা জমিদারের পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য বিচার করে দেখ,—প্রমাণ তার প্রত্যক্ষ।

পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের ঋণের কথা বলতে গিয়ে বলতে পারি নি আমি। জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার ভিতর থেকে কেউ যেন বলেছিল—না, তুমি বলো না। ছি!

ডি-এস-পি আবার প্রশ্ন করেছিলেন—সুরেশ্বরবাবু!

আমার মনে পড়ছে কপালের ব্যাণ্ডেজে আমার চাড় পড়েছিল, টনটন করে উঠেছিল কপাল। আমি কপাল কুঁচকে বলেছিলাম—এই দুর্বলতার মানেও আমাকে বলতে হবে?

—তা হবে সুরেশ্বরবাবু। না হ'লে এর মানে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তা যে কিছু কিছু করি নি তা নয়। করেছি। ধনেশ্বরবাবুর একটা স্টেটমেণ্ট আমরা নিয়েছি। এবং সেটাকে আমরা সত্য বলেই মনে করি। তাঁর স্ত্রী শুনলাম ব্রেনে হেমারেজ হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। মৃত বলেই ধরা যায়। এই মুহূর্তে তিনি মিথ্যা বলবেন না। কথাটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম; কারণ তখনও আমি গোবরডাঙার খুড়ীমার খবর জানতাম না। আমি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর তিনি নাটমন্দিরে ঢুকেছিলেন। ডি-এস-পির কথায় বাধা দিয়ে আমি বললাম—একসকিউজ মি সার, কি বলছেন আপনি তা তো বুঝতে পারছি না। কে—কার কথা বলছেন মৃত বলে ধরা যায়?

ডি-এস-পি বললেন—ধনেশ্বরবাবুর স্ত্রী। তিনি এই বিচারের আসরে প্রতিবাদ করবার জন্য বেরিয়ে এসেছিলেন। এবং সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। ডাক্তার দেখেছেন, বলছেন—ব্রেনে কোন শিরা ছিঁড়ে হেমারেজ হচ্ছে। বোধ হয় বাঁচবেন না। বাঁচলেও

প্যারালিটিক হয়ে সেবার ধন হয়ে বেঁচে থাকবেন।

আমার চোখ থেকে জল বেরিয়ে এসেছিল। আমি তাঁর কথাই ভাবছিলাম। কি বিচিত্র পরিচয়ই না রেখে গেলেন ব্রজদার মা! ওঃ!

ডি-এস-পি আমাকে ডাকলেন। বললেন—আমার কাজটা আমি শেষ করে নেব সুরেশ্বরবাবু। যা বলছিলাম আমি—যাঁর স্ত্রী এই মুহূর্তে মৃত্যুশয্যায় তিনি মিথ্যা কথা বলবেন না এইটেই ধরা যায়। ধনেশ্বরবাবু এই মুহূর্তে যা বলেছেন তাকে আমি সত্য বলেই ধরে নিয়েছি।

—কি বলেছেন তিনি না জানলে কি ক'রে এর উত্তর দিতে পারি বলুন!

তিনি বলেছেন—রায়বংশের আপনার লাইনটায় একটা দোষ আছে। সেটা আপনার পিতামহের ছিল, আপনার বাবার ছিল এবং আপনার মধ্যেও সেটা ফুটে উঠছে। অন্যেরা নানারকম অপবাদ যা দিচ্ছে তা সবই মিথ্যে। সেগুলো বিষয় নিয়ে আক্রোশবশে দিচ্ছে। কিন্তু গোয়ানপাড়ার হিলডা পিক্রজের সম্পর্কে নাতনী কুইনী মুখার্জি বলে একটি মেয়েকে আপনি বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তাকে ইস্কুলে পড়াচ্ছেন। তার কলকাতায় একখানা বাড়ী আছে, তা নিয়ে কি গোলমাল হয়েছিল, আপনি অনেক টাকা খরচ করে সে বাড়ী ঝঞ্ঝাটমুক্ত ক'রে দিয়েছেন—

খানিকটা থেমে ডি-এস-পি বললেন—ধনেশ্বরবাবু বললেন—গোয়ানদের মধ্যে কয়েকটা খারাপ মেয়ে আছে, তারা প্রায় ব্রাত্য শ্রেণীর। তাদের সঙ্গে আপনার কোন অপবাদ বা গোপন সম্পর্কের কথা আজও পর্যন্ত তিনি শোনেন নি। এবং বিশ্বাসও করেন না। তবে কুইনী সম্পর্কে কিছু কথা তাঁর কানে এসেছে। সে কুইনীর ছবি এঁকেছে। কুইনী মধ্যে মধ্যে তার বাড়ী বিবিমহলে আসা-যাওয়া করেছে। কল্যাণেশ্বরবাবু বললেন—তিনি হিলডাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ঐসব কি হচ্ছে হিলডা? সুরোবাবুর মতলবটা কি? তাতে সে বলেছিল—সুরোবাবু যে মতলব করবে তাই হাসিল হবে। তুমরা টাকা খরচ করো, এমনি জিমিদার হও, তুমার মতলব ভি হাসিল করবেগা। কুইনী তো সুরোবাবুর ঠাকুরদাদার—

সুলতা, আমার বুকের ভিতর থেকে মুহূর্তে কে যেন কথা বলে উঠেছিল। আমি ডি-এস-পি'কে বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলাম—ইয়েস সার, আমি স্বীকার করছি কুইনী সম্পর্কে আমার উইকনেস আছে। পারসোনাল উইকনেস: আমি তাকে স্নেহ করি।

ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডি-এস-পি বললেন—দোহাই আপনার, প্রিজ কল স্পেড এ স্পেড। ভাইয়ের মত, বোনের মত, প্ল্যাটোনিক ইত্যাদি কথাগুলো বলবেন না। আমাদের পুলিসী শাস্ত্রে এগুলো নেহাতই ফাঁকা কলসীর আওয়াজ।

সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহের মধ্যে রক্ত যেন বিদ্রোহ করে টগবগ ক'রে ফুটে উঠেছিল। আমি উঠে বসে বলেছিলাম—লেট মি ফিনিশ,প্লিজ। আমার কথা ঠিক শেষ হয় নি। তার আগেই আপনি কথা বললেন।

—ও, আই এ্যাম সরি! বলুন কি বলছেন? শেষ করুন। আপনি তাকে স্নেহ করেন—।

বলুন।

—হ্যাঁ, আমি তাকে স্নেহ করি। স্নেহ এবং ভালবাসার তফাৎ খুব বেশী নয়। একটু মাত্র। বয়সে ছোট যাকে ভালবাসি তাকে স্নেহও করি। এবার কুইনী সম্পর্কে আমার ভালবাসার স্বরূপ বা মানে আপনার অভিধান মত করে নিতে পারেন।

—তার সঙ্গে আপনার দেহসম্পর্ক হয়েছে কখনও ?

চমকে উঠেছিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করে বলেছিলাম—না।

—তা হলে ? ইউ স্পেণ্ট সো মাচ মানি অন হার।

আমি হেসে বলেছিলাম—'আমার টাকার অভাব নেই স্যার। একলা মানুষ টাকা ঠিক খরচ করতে পথ পাইনে। জমিদারের ছেলেদের মেজাজ এবং চরিত্র তো জানেন; বিয়ে করি নি, চরিত্রদোষ চলিত অর্থে এখনও নেই। কুইনাকে ভাল লেগেছে তাকে গড়ে তুলছি; পিছনে খরচ করতে ভাল লাগছে। তারপর যা হয় হবে। এই পর্যন্ত বলতে পারি। বেশী আজ আর বলতে পারব না। শরিকরা বিচারসভা ডেকেছিল ওই জন্যে। আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন—আমার মতলবটা কি ? অনেকের মনে—মানে আমাদের শরিকদের ধারণা আমি ওকে বিবাহ পর্যন্ত করতে পারি। দু'একজনের ধারণা—মধ্যে কুইনা আর হিলডা বাড়ীর গোলমালের জন্যে কলকাতা গিয়েছিল, তখন রেজেস্ট্রি-কেজেস্ট্রি করে বিয়ে একটা হয়ে গেছে। এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি হচ্ছিল। আমি ঠিক চিনিনে, একজন আমার সঙ্গে তর্ক করছিল, আমি রাগের বশে তারপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম, ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে পড়ে গেলাম আছাড় খেয়ে, পড়বার সময় শক্ত একটা কিছুতে আঘাত লেগে আমার মাথাটা কেটে গিয়ে থাকবে। আমি মাথায় একটা যন্ত্রণা অনুভব করেছি মাত্র, তার বেশী কিছু বলতে পারব না। জ্ঞান হয়ে দেখছি আমি এখানে শুয়ে আছি।

ডি-এস-পি এতক্ষণে বুঝলেন—কেসটা ফেঁসে গেল। তিনি দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে আমার মুখের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—সুরেশ্বরবাবু!

—বলুন!

—আপনার মাথায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে নি ?

—না। ওটা পড়ে ছিল। আমারই হাতের কাছে ছিল ওটা। আঘাত আমাকে কেউ করে নি।

ডি-এস-পি আর কিছু না বলে চলে গিছলেন রাত্রির মত।

পরের দিন সকালে ডি-এস-পি আবার এসেছিলেন আমার কাছে। তখন গোবরডাঙার খুড়ীমা মারা গেছেন—এ বাড়ীতে কান্নার রোল উঠেছে। আমি বসে আছি মাথা হেঁট ক'রে। চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির ডাক্তার ব্যাণ্ডেজটা আবার ভাল ক'রে বাঁধছে। কপালের ক্ষত থেকে আবার রক্ত পড়তে শুরু হয়েছিল।

ডি-এস-পি উপরে উঠে এসেছিলেন—সঙ্গে তাঁর কুইনী। কুইনীর মুখ-চোখ যেন থমথম করছিল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম আমি। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ড যেন

চঞ্চল অধীর হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ল মেদিনীপুরের বাড়ীতে মাসখানেক আগে কুইনীকে দেখে ঠিক এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। সহস্র নারীর মধ্যে যে নারী এক অজ্ঞাত বিচিত্র কারণে এক বিশেষ পুরুষের কাছে সবচেয়ে বেশী কামনীয়া হয়, রূপের ব্যাকরণের শত ত্রুটি সত্ত্বেও সব থেকে বেশী রমণীয়া হয়, সেই বিচিত্র কারণেই কুইনীকে দেখে আমার চিত্ত আমার দেহের অণুপরমাণু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

কুইনী কিন্তু আমার সামনে দাঁড়িয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠেছিল—আপনাকে আমি ঘৃণা করি, অত্যন্ত ঘৃণা করি। আপনাদের বংশকে আমি জানি। আপনারা অত্যাচারী, শোষক, আপনারা ব্যভিচারী, লম্পট। আপনারা মিথ্যাবাদী প্রতারক। আপনি এই কুমতলবে আমাকে পড়ার খরচ দেন এবং আমার বাড়ীর টাকা দিয়েছেন তা আমি জানতাম না। আমি আপনার টাকা আর নেব না। গোয়ানপাড়ার কোন লোক আপনার সাহায্য নেবে না।

আমি তার মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম। মুগ্ধের মত তাকিয়ে ছিলাম। কুইনীর রূপের স্বরূপ কেমন, সে বিচার অন্যে করতে পারে, আমি পারি না। তাকে দেখলেই সে আমার একান্ত আপনার, কিংবা সে আমার এমনি একটা—এমন একটা ইমোশনাল ধারণা আমাকে যেন আভভূত করে দিত। তা এখনও দেয় সুলতা।

ডি-এস-পি আমাকে সেই পত্র এবং কাগজগুলো দেখিয়েছিলেন, যেগুলো কুইনী একদিন বিবিমহলে অর্চনার সঙ্গে এসে আমাকে দেখিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার মুখে অস্তগামী সূর্যের আলোপড়া তার মুখ আমার মনে পড়েছিল সেদিন। সেদিন কাঁসাই পার হবার সময় কুইনীর ছবিটা দেখাচ্ছিল শিল্যুটের মত, তাও মনে পড়েছিল।

ডি-এস-পি বলেছিলেন—এগুলো দেখেছেন তো আপনি?

বললাম—দেখেছি।

—তা হলে?

—কি তা হলে?

—কোন্‌টা সত্য?

—যদি বলি দুটোই সত্য।

—বলব মিথ্যে বলছেন একটা।

—না। তা মনে করিনে। তবে যা খুশি ধরে নিতে পারেন।

একটু হেসে বলেছিলাম—আপন বলেই ওকে ভালবাসি। এই সত্যটা কেন সত্য হবে না বলুন তো?

সুলতা, এর পরের দিনই জীবন আমার দুদিক থেকে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। দুদিক থেকে কেন, তিন দিক থেকে।

কীর্তিহাটের শরিকদের তরফ থেকে।

কীর্তিহাটের লোকদের তরফ থেকেও।

গোয়ানপাড়ার লোকদের তরফ থেকেও।

কেউ চাইল না আমাকে।

বারো দিন পর, গোবরডাঙার খুড়ীমার শ্রাদ্ধের পর অর্চনাকে নিয়ে আমি কলকাতা চলে এলাম। ব্রজদা টেলিগ্রাম পেয়ে বিহার থেকে এসেছিল মা'র শ্রাদ্ধ করতে। সাহায্য করেছিল ব্রজদা। কীর্তিহাটের জমিদারী জীবনে যবনিকা টেনে দিলাম বলে ঘোষণা করেই কলকাতা এলাম। কয়েকদিন পর বৃন্দাবন গিয়ে নিয়ে এলাম রায়বাড়ীর মেজহুজুর শিবেশ্বর রায়ের কেনা তৃতীয়পক্ষ সেই পুরোহিতকন্যাকে। গিয়ে বললাম—তোমার স্বামীর মেজছেলের কন্যা অর্চনা। তুমি তাকে বাঁচাতে জেলে গেছ। এবার ফিরে চল—তার ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি রেহাই নেব। আমার বাবা অনেক টাকা রেখে গেছেন। আমি তা উড়িয়ে দেব; চলে যাব কলিযুগের স্বর্গে; স্বর্গ বল স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ বল বৈকুণ্ঠ—জীবনের মোক্ষধাম ইয়োরোপ। ইয়োরোপ যাব। তা ছাড়া কি করব? সংসারে সেকালে পয়সা যার থাকত সে কাশী বৃন্দাবন যেত। একালে ইয়োরোপ যায়। আমি ভেবেছিলাম গিয়ে আর ফিরবই না। ওখানেই থেকে যাব।

যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। যাবার আগে তোমাকে কুইনীর ছবিটা প্রেজেণ্ট করেছিলাম মামাতো বোনের মারফৎ। তুমি রিফিউজ করেছিলে। সেটা সেদিন আমার বগলেই ছিল।

ওঃ; ভাগ্যে তুমি ছবিখানা নাও নি সুলতা! কেন জান? ওই ছবিখানা নতুন করে আঁকতে কেমন যেন নার্ভাস হয়ে যেতাম। পারতাম না। মনে হ'ত পারব না। কিছুতেই পারব না।

সুরেশ্বর বললে—ভেবেছিলাম, ইয়োরোপ থেকে ফিরব না। ওখানেই থেকে যাব। আমার বাবা জার্মানীর হাসপাতালে জীবনে ছেদ টেনেছিলেন—আমিও তেমনি ভাবে ছেদ টেনে দেব। তারপর যজ্ঞেশ্বর রায়, তাঁর ছেলেরা এবং শিবেশ্বর রায়ের পতিত বংশের প্রেতেরা কে কি করলে বা করবে তা নিয়ে কোন চিন্তাই করব না। ইয়োরোপে গিয়ে জীবনের অবদমিত সমস্ত বাসনাকে মুক্তি দিয়ে দেব; আমার যা অর্থ আছে—তাই দিয়েই সিংহদ্বার না হোক—একটা বেশ প্রশস্ত ফটক খুলে দেওয়া হবে।

বাসনা আমার ছিল। কারই বা থাকে না! তোমাকে নিয়েই তো বাসনা আমার কম উল্লসিত কম উচ্ছ্বসিত হয় নি। কল্পনা তো অনেক করেছিলাম। কিন্তু এক ঠাকুরদাস পালের রক্তের নদীই তোমাকে আমার নাগাল থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। এবং আশ্চর্যভাবে রায়বংশের গোপন পরিচয় আমার সামনে তার গোপন অপরাধের ফিরিস্তি খুলে দেখিয়ে দিলে দুনিয়ার কাছে আমাদের দেনা কত। এবং সেই দেনার সুদ কি বিচিত্রভাবে প্রকৃতির নিয়মে আমরা আদায় দিচ্ছি, দিতে বাধ্য হচ্ছি!

বাবার শেষ চিঠিখানা যা তিনি মাকে লিখেছিলেন—সেখানা আমার স্যুটকেসেই রাখতাম; যে কথাটা তিনি তার মধ্যে আমাকে বলে গিয়েছিলেন তা আমার মনে অক্ষয় হয়ে ছিল। লিখেছিলেন—"মেয়েদের থেকে যদি দূরে থাকতে না পারে তবে যেন বিয়ে না করে সুরেশ্বর।"

আমি ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের থেকে দূরেই থেকেছি—ভয় ক'রে কিন্তু স্থির নিশ্চয় হতে পারি নি ; বুঝতে পারি নি, মেয়েদের থেকে দূরে থাকতে পারব কিনা।

ভূসম্পত্তির অধিকার—যারা নিজেদের ভূমির বা পৃথিবীর স্বামী মনে করে—তারা জানে না কি অপরাধ করে! কথাটা জানিয়ে গিছলেন রত্নেশ্বর রায়। বলতেন—ভূমি হল পৃথিবী। পৃথিবী মানুষের মা। পৃথিবীর স্বামী যারা হতে যায় বা হয় বলে মনে করে—তাদের অসাধ্য পাপ বোধ হয় পৃথিবীতে হয় না। জীবনে তারা সম্পর্ক বাছে না। এ কথার নজীর পৃথিবীর সব দেশের রাজা-জমিদারের ঘরে আছে। অপরের স্ত্রী হরণ, দরিদ্র আত্মীয়ের স্ত্রী-কন্যা নিয়ে অপবাদ জড়ো করলে পাহাড় হয়। জমিদারবাড়ী বা রাজার রাড়ীতে দরিদ্র আত্মীয় সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে এসে অনেক ক্ষেত্রে বহু উপঢৌকন উপহার নিয়ে ফিরে গেছে—অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্বামী কারুর আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অঞ্জনার মত স্নেহের আবরণে অনুগ্রহ পেয়ে থেকে গেছে ; অঞ্জনার ভাগ্য—বেচারা দৃষ্টি-ভোগের অতিরিক্ত ভোগে লাগে নি বলে নিজেকে গোয়ানীজের ভোগ্যা করে আপনি গড়িয়ে গিয়ে তার পাতায় পড়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—নিজেকে আমি বার বার বহুবার বিশ্লেষণ করেছি, বিচার করেছি। দেখেছি মেজঠাকুমা, অর্চনা সম্পর্কে আমার অপরাধ কতটা! অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলছি—অকপট চিত্তে তোমাকে বলছি, শুধু তোমাকে নয়, দুনিয়াকেই বলছি, না, ওখানে অপরাধ আমার ছিল না। মুসলমান বা ক্রীশ্চান হলে অর্চনা সম্পর্কে কোন মনোভাবেই দোষ থাকত না কিন্তু হিন্দুধর্ম না মেনেও হিন্দু বলেই ও-কামনা কখনও জাগে নি। তবে একটু বেশী রকম সজাগ সতর্ক থেকেছি বরাবর। বুকের দরজায় কামনার করাঘাত হলেই জেগে উঠেছি। রুষ্ট সাড়ায় সাড়া দিয়েছি—ও-দিক থেকে আঘাত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ওইখানেই আমি অনুভব করেছি সুলতা—সম্পদের ঐশ্বর্যের এবং ভূমির অধিকারের কি প্রবল শক্তি! সমুদ্রে পড়েও মানুষ বাঁচে, হয়তো সমুদ্রই তাকে তীরে এনে দেয় কিন্তু সম্পদ ঐশ্বর্যশালীর বাঁধনে ধরা পড়লে তাকে বাঁধনের পীড়নে এলিয়ে পড়তেই হবে। সেখানে কাউকে বাঁচাতে হলে সম্পদশালীকে রাবণের মত অভিশপ্ত করে রাখতে হবে। বাল্মীকি সীতাকে রাবণের কুড়ি হাতের আকর্ষণ থেকে রক্ষা করবার জন্য আগে থেকে নলকুবরকে দিয়ে অভিশাপ দিইয়ে রেখেছিলেন—নারীর অমতে জোর করে নারীধর্ষণ করলে, দশটা মাথা একশো ফাটে ফেটে এক-একটা মাথা দশচির হয়ে যাবে। শুধু সম্পদশালীকেই দোষ দেব না—দরিদ্রকেও দোষ দেব সুলতা। তারা রিক্ত বঞ্চিত বলে তাদের ন্যায়-বিচারে মাফ করবার অধিকার কারও নেই। সে যাঁরা করবেন তাঁরা পলিটিকাল লীডার, খেয়ালী বিধাতা বা ডিক্টেটার। আমি দেখেছি—দরিদ্র পিতামাতা কন্যাকে সম্পদশালীর সামনে এনে ধরে ইচ্ছে করে। দরিদ্র নারী—সেও এসে সম্পদশালীর নজরে পড়তে চায়। কিন্তু সে সব কথা থাক। আমার জবানবন্দীতে আমার কথা বলি। রায়বংশে যে বাসনার স্রোত···সোমেশ্বর থেকে—শ্যামাকান্ত থেকে রায়বংশের জমিদারী আর রূপের দুই কূলের মাঝখান দিয়ে বেয়ে এসেছে—তার বেগ তার স্রোত আমার মধ্যেও ছিল, কিন্তু আমি তার মুখে বাঁধ দিয়েছিলাম।

ইংল্যাণ্ড যাবার আগে ওই দিন রাত্রে ডি এস পি'র কাছে রায়বংশের ইজ্জত মর্যাদা বাঁচাতে

কলঙ্ক নিলাম নিজের মাথায়। কলঙ্ক একতরফা হয় না; কলঙ্ক রটাতে হলে আর একটা তরফের প্রয়োজন হয়। তরফ খুঁজতে গিয়ে আর কাউকে পেলাম না, পেলাম ওই গোয়ানদের; গোয়ানদের মধ্যে ওই কুইনী মেয়েটির সঙ্গে একটা টাকা দেওয়ার সূত্র জড়ানো ছিল। সেই সূত্র ধরে ডি-এস-পি জিজ্ঞাসা করলেন—কুইনীর প্রতি দুর্বলতার স্বরূপটা কি? তার মানেটা কি? আমি কোণঠেসা আসামীর মতই বললাম—প্রেমও এক ধরনের স্নেহ। স্নেহও এক ধরনের প্রেম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর যেন শতমুখ হয়ে সায় দিয়ে উঠল—আমার দেহেও তার ছোঁয়াচ লাগল, কথাটি বলেও ভাল লাগল সুলতা; মনে হল আশ্চর্য একটা সত্যের সাক্ষাৎ পেলাম, সন্ধান পেলাম। জানলাম আমার মধ্যে প্রবল দেহবাসনা এবং নারীহৃদয় কামনা রয়েছে এবং এই মেয়েটিকেই আমি দেহ দিয়ে চাই, মন দিয়ে চাই। একান্তভাবে আপনার করে চাই। আমার জমিদারসত্তা এবং আমার ব্যক্তিসত্তা দুই সত্তা সমান আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছিল তাকে পাবার জন্য।

আমি অনেক ভেবেছি, জাহাজে সারা বে-অব বেঙ্গল, এ্যারেবিয়ান সী, মেডিটেরিয়ান অতিক্রম করবার সময় শুধু এই কথাই ভেবেছি; নিজেকে বিচার করেছি; বলতে পার নিজেকে চিরে চিরে সমস্ত কিছু ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখেছি এবং বুঝেছি।

জমিদারের বা ধনীর ছেলেদের একটা পাপ অভিপ্রায় থাকে—তারা তাদের উপর নির্ভরশীল বা তাদের দ্বারা যারা উপকৃত, অনুগৃহীত তাদের নিজেদের সম্পত্তি মনে করে; বিশেষ করে তাদের মেয়েদের উপর ভোগের অধিকার দাবী করে। আগের কালে দাসীদের দেহমনের অধিকার দাবী করত প্রভুরা।

আর একদিক দিয়ে মানুষের, সেটা সব মানুষেরই সুলতা, একটা ছেলেমানুষী রোমান্টিসিজম আছে—যে রোমান্টিসিজমের জন্ম হয় ছেলেবেলায় রাজপুত্র রাজকন্যা বা রাজপুত্র আর চাষীর মেয়ের প্রেমের গল্প শুনে। অনেক বাধা অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করে মিলন হলেই মন ভরে ওঠে। এইটেকেই বাড়িয়ে নিয়ে গল্প বানাও—দেখবে একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসত, কিন্তু তাদের বিয়ে হল না; সেই দুঃখ তারা মেটাবার জন্য তারা কল্পনা করে এর ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে দেবে।

সুলতা, দেবেশ্বর রায়ের পৌত্র—দেবেশ্বর রায়ের প্রথম প্রিয়া—গোয়ান মেয়ে ভায়লেটের ছেলের দৌহিত্রী—কুইনীকে ভালবাসে—তাকে সে চায় এই কথা সর্বসমক্ষে ব'লে আশ্চর্য তৃপ্তি পেয়েছিলাম। এবং পেতেও তাকে চেয়েছিলাম।

আরও একটা সত্য ছিল। সে সত্য সর্বজনীন কিনা জানি না—তবে রায়বংশে এ সত্যটা স্বীকৃত। এবং এটা রায়বংশের একটা ধারা। আমার বাবা চন্দ্রিকাকে ভালবেসেছিলেন—মিশ্র সৌন্দর্যের জন্য। দেবেশ্বর রায় পিতৃজ আর অঙ্গনার সন্তান ভায়লেটকে ভালবেসেছিলেন। কুইনীর মধ্যেও বোধ হয় আমি তারই আকর্ষণও অনুভব করেছিলাম। এটা বোধ হয় চিরন্তন কামনা মানুষের।

বিলেতে গিয়ে এ আকর্ষণ আমার বাড়ল সুলতা। এবং এই কুইনীর আকর্ষণই আমাকে

ওখানে শ্বেতাঙ্গিনী সমাজে নিজেকে হারিয়ে যেতে দিলে না। একটা ঘটনা ঘটল।

আমার ছবি কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই ছবিগুলো নিয়ে একটা এগজিবিশন হয়েছিল। এই এগজিবিশনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কুইনীর ছবিখানা। বিচিত্র ঘটনা—সুলতা, যে দেখতে এল, সেই এসে থমকে দাঁড়াল কুইনীর ছবির সামনে। অবাক হয়ে দেখলে। বললে—কি সুন্দর!

শুধু ছবি সুন্দর নয়, যার ছবি সেও কত সুন্দর কি সুন্দর! দুখানা ছবি ছিল কুইনীর। একখানাতে কুইনীর কোলে একটি শিশু দিয়ে এঁকেছিলাম 'Indian Madona'—ওদের চার্চের ছবি পুড়ে গিয়েছিল, ছবিখানা ওদের চার্চের জন্যই এঁকেছিলাম—কলকাতায় এসে এবং যে টাকাটা আমি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই টাকার সঙ্গে ছবিখানাও দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু টাকা বা ছবি কিছুই নেয় নি কুইনী। আমি চিঠি লিখেছিলাম, তার উত্তরে সে লিখেছিল—উই আর আনএবেল টু এ্যাকসেপ্ট এনি হেল্প ফ্রম ইউ। থ্যাংকস।

কুইনীর আরও একখানা ছবি আমি এঁকেছিলাম—এ ছবিখানা সেই রক্তসন্ধ্যার আলো মুখে-পড়া কুইনীর ছবি। নাম দিয়েছিলাম 'গোধূলি লগ্ন'।

পাশাপাশি টাঙানো ছিল ছবি দু'খানা। দর্শক খুব বেশী আসে নি, কিন্তু যারাই এসেছিল তারাই ওই ছবি দু'খানার সামনে দাঁড়াত, মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখত এবং প্রশ্ন করত—কত দাম?

প্রথম দিন চমকে উঠেছিলাম—। দাম?

—হ্যাঁ, কত দাম? আমি কিনতে চাই। দাম তো লেখা নেই।

—ও ছবি দু'খানা বিক্রীর জন্য নয়।

—নয়! তাহলে তোমার বাকী ওই রাবিশগুলো কে কিনবে?

উত্তর কি দেব চুপ করেই ছিলাম। উত্তর দিতে পারতাম—বলতে পারতাম, ছবি তুমি বোঝ না তাই বাকীগুলোকে রাবিশ বলছ। ওইগুলোই modern ছবি। কিন্তু তা পারি নি, তার কারণ লোকটির পরিচয় জানতাম, একজন বড় আর্টক্রিটিক। অন্য ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ ছবি দু'খানার দিকে তাকিয়েছিলেন ভদ্রলোক, তারপর বলেছিলেন—দেয়ার ইজ লাইফ ইন দোজ টু; সো লিভিং!

আমি এরপর ছবিদুটোর দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। সত্যিই এক এক সময় মনে হ'ত—সত্যিকারের কুইনী। এখনি হয়তো কথা বলবে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। এগজিবিশন শেষ হল। সব ছবির মধ্যে ওই কুইনীর ছবিরই প্রশংসা হল বেশী। তার মধ্যে "Indian Madona" ছবিটাই বেশী পছন্দ করেছিল। আমি তাকিয়ে থাকতাম আর মধ্যে মধ্যে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতাম—আমার শিরায় শিরায় রক্ত ছুটত দুরন্ত আবেগে। আমি অনুভব করতাম ওই মেয়েটিকে আমি জীবনে চাই।

নারীকে জীবনে পুরুষ চায়, পুরুষ নারীকে চায়। এ-চাওয়া দু'রকম। Man wants woman in life—যে woman-এর বিশেষ পরিচয় নেই; পরিচয় সে woman—তার নারীত্বই তার পরিচয়। এইটেই সাধারণ নিয়ম সুলতা। কিন্তু মানুষ একে আশ্চর্যভাবে বদলে

নিয়েছে—সে চায়—একজন বিশেষ নারীকে। সেটা প্রথমে থাকে নেশা—পরে সেটা হয় ভালবাসা।

কুইনীকে মেদিনীপুরের বাড়ীতে মিসেস হাডসন আর হিলডার সঙ্গে দেখে প্রথম আমার নেশা জেগেছিল। শাড়ী প'রে সে আশ্চর্য যৌবন-মোহময়ী হয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। বোধ হয় বলেছি কথাপ্রসঙ্গে; বলেছি, নারীকে নিয়ে মোহ সেই আমার প্রথম জাগল। তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে যা জাগিয়ে তুলেছিলাম, ছোট একটি গাছকে বড় ক'রে তুলে ফুল ফোটানোর মত ফুল ফোটাতে চেয়েছিলাম—তা সেদিন কুইনীকে দেখবামাত্র জেগে উঠেছিল; ফুল ফোটার কথায় বলব—পাতাহীন ভুঁইচাপার গেঁড়ে থেকে হঠাৎ যেন ডাঁটি বেরিয়েছিল কুঁড়ি নিয়ে। সেই কুঁড়িটি ফুটল বিলেতে ওই ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে নানা অসম্ভব কল্পনা করতাম। ওই কুইনীকে নিয়ে কল্পনা। ভাল লাগত। সারারাতই প্রায় জেগে থাকতাম।

কিছুদিনের মধ্যেই মদের মাত্রা বেড়ে গেল। এবং—। চুপ ক'রে গেল সুরেশ্বর। স্থির দৃষ্টিতে খোলা জানালার ওপারের দিকে তাকিয়ে বললে—সকল সত্যই বলতে বসেছি সুলতা, রায়বংশের কুড়ারাম রায় ভটচাজ থেকে শুরু করে আমার পিতামহ পর্যন্ত পিতৃপুরুষেরা ন্যায় অন্যায় যা করেছেন তা মুক্তকণ্ঠে বলেছি। অন্যায়গুলোই বড় ক'রে তুলে ধরে বলেছি। বলবার কারণ আছে—কারণ পাপগুলো সব মানুষেই করে, এ পাপ মানুষের—কিন্তু তাঁরা পাপগুলো জমিদারীরই বলে ঘোষণা করে করেছেন। আমার বাবার কথা জান। তাই আর বললাম না। এবার আমার কথা বলি। আমার মধ্যে ওই কামনা-বাসনা ওই প্রকৃতি অথবা পাপ বল পাপ, ক্রিমিন্যাল ইনস্টিংক্ট বল তাই, অন্যায় বল অন্যায়, অমার্জনীয় সামাজিক অপরাধ বল তাই—আমার রক্তের মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। আমার পূর্বপুরুষেরা জমিদারীর দৌলতে সামুদ্রিক সরীসৃপের মত যে প্রবৃত্তিকে তাঁদের রক্তের মধ্যে লালন করেছিলেন, পুষ্ট করেছিলেন—যার বীজ মাছের ডিমের মত আমার রক্তে ছিল—তা ফাটল এবং হাঙরের মত হিংস্র স্বভাব নিয়ে সে বেড়ে উঠল।

সারাজীবনই একরকম—একটা সাবধান বাণী আমার কানের কাছে বেজেছিল। আমার বাবার দৃষ্টান্ত আমাকে ভীত করে রেখেছিল—তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কানের কাছে বাজত,—সুরোর যেন বিয়ে দিয়ো না। আমার দৃষ্টান্ত দেখলে। আমাদের বংশের বড় ভয়, মেয়েদের থেকে। বংশগত ব্যাধি এটা।

মায়ের মুখ মনে পড়ত। যেন বিষে নীল হয়ে যাওয়া মুখ। যার জন্য রত্নদার সেকালির বাড়ী গিয়ে ওই দেহব্যবসায়িনীদের দেখে আকৃষ্ট হয়েও দাতা সেজে আত্মরক্ষা করেছি। কীর্তিহাটে গিয়ে অত্যন্ত সতর্ক থেকেছি। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করেছি। সেই ভয় কাটতে লাগল সন্ধ্যার কনে-দেখা আলো-মাখা তরুণী কুইনীর ছবিখানা দেখতে দেখতে। এগজিবিশনের সময় সেই যে ছবিটার মধ্যে নেশার সন্ধান দিয়ে গেল আমাকে সেই আর্ট-ক্রিটিক—সেই নেশা আমাকে পাগল করে দিলে। মদ খেতাম, আর ছবিখানার দিকে

তাকিয়ে থাকতাম। এবং কল্পনা করতাম। যে কল্পনা করতাম তার মধ্যে প্রচণ্ড উন্মাদনা আছে, সে উন্মাদনা মহাভারতে নাগকন্যা উলুপীর জন্ম অর্জুনের সাজে, ইতিহাসে পদ্মিনীর জন্ম আলাউদ্দিন খিলজীর সাজে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে কোন দেশে কারুর পক্ষেই সহজে ঘটে না, এবং আমার মত যে-মানুষ, আধা-জমিদার বা জমিদার থেকে খারিজ তার পক্ষে তো সাজেই না। কিন্তু তবু মন মানল না। এবং তা থেকেই একদিন আমি যেন লালসায় কামনায় উন্মাদ হয়ে উঠলাম।

স্থূলতা—আমি নারী-দেহের জন্ম লালায়িত হলাম। জীবনের অবরুদ্ধ ভোগের প্রবৃত্তি কুইনীর ছবির ইশারাতেই যেন বোতল-খোলা দৈত্যের মত বেরিয়ে এল।

I wanted women in my life. তার পথে কোন বাধা ছিল না, সেই সুদূর শ্বেত দ্বীপে। টাকাও আমার হাতে ছিল প্রচুর। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। টাকাটা যুদ্ধের আগে খুব কম ছিল না। মূল্য তখন তার অনেক ছিল। সেই টাকাটা দুই হাতে মুঠো ভরে নিয়ে নেমে পড়লাম লণ্ডনের নৈশজীবনে।

বন্ধু মিলতে দেরি হয় নি। ভারতীয় বন্ধুই মিলেছিল। তারা ওদেশেই কাজ করে পড়ে; জীবনের শ্লেটে তাদের হাজার হিজিবিজি, কিন্তু সে তারা গ্রাহ্য করে না। তারাও আমার টাকা-পয়সার সাচ্ছল্য দেখে প্রসন্ন উল্লাসেই এগিয়ে এসেছিল। মাস কয়েক প্রায় পাগলের মত ছুটেছি, ছুটতে চেষ্টা করেছি। তারপর হঠাৎ একদিন আমার বংশগত অভিশাপ আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

সকালবেলা ঘরে বসে আছি; ওই কুইনীর ছবির দিকে তাকিয়েই বসে সিগারেটের রিঙ ছাড়ছি আর ভাবছি; ভাবছি, কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছি না, তৃষ্ণা কিছুতেই মিটছে না। বাড়ছে। তার থেকেও কিছু বেশী। কুইনীর জন্যই জীবন-তৃষ্ণা বাড়ছে। সকালবেলা যখন রাত্রির অন্ধকারের ঘোর থাকে না, তখন মাকে মনে পড়ে, ঠাকুমা উমাদেবীকে মনে পড়ে, মেজঠাকুমা মেজদিকে মনে পড়ে, অর্চনাকে মনে পড়ে। বুকের মধ্যে জ্বালা ধরে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আপনার অজ্ঞাতসারে—আঃ—বলে চিৎকার করে উঠি।

আয়নায় নিজের ছবি দেখে ভয় পাই। চোখের কোলে কালি পড়েছে, গোল একটা কালো বেষ্টনীর মধ্যে আমার এই বড় চোখ দুটো যেন ঘোলাটে রঙ ধরেছে; মনে হয়, সোনার গিল্টী-করা প্রদীপটার গিল্টী উঠে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে লোহা; ঘি নেই, সরষের তেলও নেই, জলছে লালচে কেরোসিনে; লালচে আলোর শিখার মাথায় ধোঁয়া উঠছে রাশি-রাশি।

নারীকে তো ভয় নয়, রায়বংশে ভয় বরাবরই নিজেকে। ধর্ম সাধনা আর ভূমির আধিপত্য করতে গিয়ে, নরনারী দেহ-মিলনের মধ্য দিয়ে প্রেমচেতনাটুকুকে বিসর্জন দিয়েছেন, নয়তো প্রকৃতি-শক্তিকে আজ্ঞাবাহিনী ক্রীতদাসীর মত আয়ত্ত করবার জন্ম শ্মশানে যে যজ্ঞ করেছিলেন, তাতেই আহুতি দিয়েছেন। শ্যামাকান্ত মহাপ্রকৃতিকে ভোগ্যা নারীর মত আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন, বীরাচারের সাধনায়। বীরাচারে সিদ্ধ হয়ে তিনি খেলবেন, আর শক্তি তাকে খেলার উপকরণ যোগাবে অথবা নিজেই তার উপকরণ হবে। তিনি তাকে আদিম পুরুষের নারীকে বেঁধে রাখার মত বেঁধে রেখে দেবেন। নারীকে বেঁধে প্রহার করবেন, তবু তাকে

পেলাম না বলে আক্ষেপ করবেন। তারপর সোমেশ্বর থেকে দেবেশ্বর পর্যন্ত, তাই বা কেন, যোগেশ্বর রায় পর্যন্ত এক দশা। তাঁরা ভূমিকে ভোগ করলেন নারীর মত, আর নারীকে ভোগ করলেন ভূমির মত। ভূমিকে কখনও সেবা করলেন না, পূজা করলেন না, আদায় করলেন শুধু কর; আর নারীকে কখনও প্রেম দিলেন না, তার কাছে চাইলেন শুধু সন্তান। ভূমির গণ্ডীর পরিমাপ যত বৃহৎই হোক, কখনও হলেন না তৃপ্ত, কখনও মিটল না ক্ষুধা, নারীর দেহ ভোগ ক'রে কখনও সুখের শেষ পেলেন না, বেছে-বেছে রূপসী নারী এনে অন্তঃপুর সাজিয়ে কখনও মিটল না তৃষ্ণা। একখানা এক একর দেড় একর জমির ধানে যে সব মানুষের সারা বছরের অন্ন জোটে, একটি নারীর প্রেমে যে সব মানুষের তৃষ্ণা মেটে, সে মানুষের দল থেকে পৃথক আমি, স্বতন্ত্র আমি। তারাই সভ্য মানুষ, তারাই দেবত্বের অধিকারী। রায়বংশ ধর্মকে আশ্রয় করে বর্বরতায় ফিরে গেছে, আদিম অন্ধকারে ফিরে গেছে, সম্পদকে আশ্রয় করেও তাই, সেই আদিম অরণ্যযুগে ফিরে গেছে। প্রিয়ার প্রতি যার প্রেম নেই, পৃথিবীর জন্যেই বা তার প্রেম কোথায়?

সে সময় আমি ডায়রী রাখতে চেষ্টা করেছিলাম। রত্নেশ্বর রায়ের মত নয়; বীরেশ্বর রায়ের মত। জীবনের স্মরণীয় দিন ও ঘটনা। মেমোরেবল্ ডে অ্যাণ্ড ইনসিডেন্টস।

প্রথম দিন যেদিন জীবনে প্রথম একটি কন্যা শ্বেতাঙ্গিনীকে নিয়ে সারারাত তার দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসে রইলাম, কিছুতেই তাকে স্পর্শ করতে পারলাম না; কেন পারলাম না, সে সম্পর্কে লেখা আছে—"মদের নেশার মধ্যে নৈশ আবরণী-পরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কেমন হয়ে গেলাম। বিচিত্রভাবে তার মধ্যে অনেককে দেখলাম। দেখলাম না শুধু তাকেই। মেয়েটি আমাকে গালাগাল দিলে, আমার রাগ হয়ে গেল, আমি চিৎকার করে উঠলাম—

Shut up—I say you shut up.

আমার চিৎকারে সে চমকে গিছল। ভয় পেয়েছিল। সারারাত্রির পর সে ঘুম ভেঙে উঠে আমায় তার ঘরের দরজা খুলে দিলে।"

আবার যেদিন সকল ভয়কে অতিক্রম করেছি, সেদিনও আমি চিৎকার করেছি। এবং সেই রাত্রেই চলে আসতে চেয়েছি। সম্ভব হয় নি। সারারাত্রি বসে কাটিয়েছি, প্রথম দিনের মতই।

সব লিখে রেখেছি। সেদিনও সকালে উঠে ডায়রী লেখা শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে কুইনীর ছবি দেখছি, আর ওই সব কথাই ভাবছি, তার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কুইনী যেন ছবির মধ্যে সজীব হয়ে উঠছে, আমাকে ডাকছে। অথচ তার শেষ কথা মনে পড়ছে, আমি ঘৃণা করি আপনাদের। আপনাদের গোটা রায়বাড়ীকে ঘৃণা করি।

এমন সময় হোটেলের পরিচারক একখানা কার্ড নিয়ে আমাকে দিতে এল, একজন কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

দেখলাম—প্রিন্স হারা রে, প্রিন্স অব কীর্টিগাটা। প্রিন্স অ্যাণ্ড এ স্পিরিচুয়াল ম্যান।

মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করে উঠল, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল, একটা আক্রোশ উদ্বেগ বুকের ভিতরে জমে উঠল, পুঞ্জীভূত হয়ে।

প্রিন্স অব কীর্তিহাট। প্রিন্স অব কীর্তিহাট। কে? কে?

প্রিন্স অব কীর্তিহাট নিজেই পরিচয় দিলেন, তাঁর দাদার ছিলেন রাজা আর রে, রামেশ্বর রে। আমাদের রাজা উপাধি বংশগত। নো ওয়ান ক্যান ডিনাই আওয়ার রাজা টাইটল। ইউ সি, কীর্তিহাট ইজ ইন দি প্রভিন্স অব বেঙ্গল। উই আর কিংস এ্যাণ্ড ব্রাহ্মিনস বোথ।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম তার মুখের দিকে। মিল খুঁজছিলাম চেহারায়, রঙ-এ, কাঠামোয়, নাকে-মুখে-চোখে। পাচ্ছিলাম সে মিল। সে বলেই যাচ্ছিল, আমরা বাংলাদেশের প্রাচীনতম অভিজাত বংশ।

You see—since the time of Raja Ballal Sen, আমার পূর্বপুরুষ রাজার chief minister ছিলেন। You see, he was and we also are the worshiper of Godess Shakti. We are তান্ত্রিকস। বল্লাল সেনের পর লক্ষণ সেন রাজা হলেন। He was a staunch Baisnav; আমার পূর্বপুরুষ বার বার রাজাকে বারণ করেছিলেন, এইভাবে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। প্রশ্রয় দিয়ো না।

But he turned a deaf ear to him, never cared to follow his advice; —and you,—you certainly know what happened; only seventeen সতেরোজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে বাংলা দেশ জয় করেছিলেন বক্তিয়ার খিলজী!

অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন প্রিন্স হারা রে; রত্নেশ্বর রায়ের তৃতীয় পুত্র রামেশ্বর রায়ের এক পুত্র। কোন্ পুত্র তা জানি না। রামেশ্বর রায় সুকৌশলে বিষয় বিক্রী করে বিলেতে এসেছিলেন, ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে গিয়ে ব্রাহ্ম হয়ে বিয়ে করেছিলেন এক ব্রাহ্ম মেয়েকে। তাঁরই এক ছেলে। বিলেতে এসে বাস করছে। এসেছিলেন আই-সি-এস পড়তে।

হারা রে বললেন—

I was a very brilliant student. My subject of interest was Sanskrit —great poet Kalidasa was my first attraction, then the greatest of all poems—Veda—then Upanisada.—I learnt two things from this Upanisada, the greatest of all poetries of the world—

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব,
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥
ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং,
বরস্তু বরণীয়ঃ স এব।

আপনি একজন বড় আর্টিস্ট and আমি শুনলাম—A great learned man also —also a very rich man—a Brahmin also, আপনি নিশ্চয় জানেন—I am

sure. নচিকেতা এই কথাগুলি বলেছিল যমকে। And you certainly remember—what মৈত্রেয়ী told to her husband গৌতম, যেনাহং নামৃতস্যাং তেনাহং কিং কুর্যাম।"

I went mad, Mr. Ray—I went mad.—and gave up the idea of apering at the I. C. S. examination, and মিস্টার রে—আমি আমার আত্মাকে দেখতে পেলাম—

—Yes, I could see—I could feel এবং সব সংশয় ছিন্ন হয়ে গেল আমার—

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে
সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মানি
তস্মিন্ দৃষ্টি পরাবরে।
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং
ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ
যদাত্মবিদো বিদুঃ॥
ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥
ব্রহ্মৈ বেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম
পশ্চাদব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

অনর্গল বলে গেলেন হারা রে। সুন্দর কণ্ঠ, প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ, সাদা দাড়ি-গোঁফে হাত বুলোচ্ছিলেন, দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল একটি আনন্দময় স্বপ্ন। আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

ঠিক এই সময়েই এসেছিল আমার একজন রাত্রির সহচর। বিনা কার্ডেই—May I come in !—বলে দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকে হারা রে-কে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—so you have come—এঁ্যা !

প্রিন্স হারা রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চোরের মত সঙ্কুচিত এবং ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছিলেন।

সুরেশ্বর বললে—হরি,—হরেশ্বর রায়, রামেশ্বর রায় আমার কনিষ্ঠ পিতামহ, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ; তার সম্পর্কে বিশেষ পরিচয় আমি পাই নি কীর্তিহাটের দপ্তরের কাগজের মধ্যে। এম-এ, বি-এল পাস করে এস্টেটের আইন বিভাগের দেখাশুনো করতেন।

রায়বাহাদুর কিন্তু তাঁর মতের চেয়ে তাঁর পাটোয়ারী মামলার মুহুরীর মতের বেশী দাম দিতেন; তবে ভালোবাসতেন। ভদ্রলোক ছিলেন রামেশ্বর রায়। অনুকরণ করতেন বড়দাদার কিন্তু সে 'মেটাল' ছিল না তাঁর মধ্যে, সুতরাং সে-ধার বা সে-ঝকমকানি পাবেন কোত্থেকে? বড়দাদার অনুকরণে তিনি ছিলেন বিলাসী—ভদ্রলোক। ইংরিজী এবং ইংরেজের প্রেমমুগ্ধ। তিনিই প্রথম বিলেত এসেছিলেন এবং ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে গিয়ে এলাহাবাদে বসেছিলেন। প্রথমা স্ত্রী যখন মারা গেছেন, একটি কন্যা ছিল সে-স্ত্রীর গর্ভজাত, তার বিয়ে দেওয়ার অজুহাতে দেবোত্তরের অধীনে ব্যক্তিগত পত্তনী-দরপত্তনী এবং জোতজমাগুলোর একের-তিন অংশ তিনি বিক্রী করে দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে গিয়ে বসেছিলেন এলাহাবাদে। এলাহাবাদে তাঁর প্র্যাকটিস জমে নি কিন্তু জীবনে স্বাধীন প্রেমের ক্ষেত্র এবং সুযোগ পেয়েছিলেন। একটি ব্রাহ্ম মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু তাকে বিয়ে করলে সম্পত্তি নিয়ে গোল বাধবে এবং সে বাধাবেন মেজদা অর্থাৎ শিবেশ্বর রায়, তা তিনি জানতেন। তাই বিক্রী করে দিয়েছিলেন বড়ভাইকে, সব বলেই বিক্রী করেছিলেন। মিস্টার আর রে'র এই পুত্রটি সেই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র হারা রে। ছাত্র তিনি ভাল ছিলেন, সংস্কৃতে, ইংরিজীতে ডবল অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছিলেন। বাপ বিলেত পাঠিয়েছিলেন আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু সে-পরীক্ষা তাঁর আর কখনও দেওয়া হয় নি। এখানকার কাগজে ভারতবর্ষের গৌরব প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। ইংরিজী ভাল লিখতেন, তাঁর লেখার তখন দাম হয়েছিল এবং লেখার জন্য হারা রে-র নামও হয়েছিল, দু-চারটে ছোটখাটো আসরে বক্তৃতাও দিতেন তখন। হাইড পার্কেও টুল কাঁধে করে ঘুরেছেন।

তাঁর কেরিয়ারে ভবিষ্যৎ ছিল। ও-দেশে থাকলেও ছিল, এ-দেশে এলে তো কথাই ছিল না; এ-দেশে নেতৃত্বের সব থেকে বড় কোয়ালিফিকেশন হল E. R. মানে ইংল্যাণ্ড রিটার্নড। এদের জন্যে চেয়ার খালি হওয়ার অপেক্ষা করতে হয় না—নতুন চেয়ার তোলা থাকে—এলেই নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রায়বংশের ছেলে হারা রে। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন adultery-র দায়ে।

রায়বংশের ছেলে হারা রে, প্রথম বিয়ে করেছিলেন এক মহৎকুলের কন্যাকে। কোন এক স্যার টাইটেলধারীর আত্মীয়াকে, খাস বিলিতী স্যার এবং ভারতবর্ষের কোন এক প্রভিন্সের এক্স-গভর্নর। তাঁর এই আত্মীয়াটি তাঁর গভর্নরগিরির সময় ভারতবর্ষে এসে দেখে গেছেন এ-দেশ। দেখে গেছেন এ-দেশের যোগী-সন্ন্যাসী, ফকির, ফরচুনটেলার, পুরনো মন্দির, তীর্থস্থল, দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, গোয়ালিয়র ফোর্ট, আগ্রা ফোর্ট থেকে কাশীতে সারনাথ। এবং তার সঙ্গে দেখে গেছেন ইণ্ডিয়ান প্রিন্সদের বাড়ীঘর, বিরাট মহল, যার মধ্যে তাঁরা বাস করেন। আর মনে-মনে প্রেমে পড়ে গেছেন তরুণ গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে, যিনি সদ্যপ্রসূত পুত্র রাহুল এবং সুন্দরী গোপাকে ফেলে নির্বাণ খুঁজতে গিয়েছিলেন।

রায়বাড়ীর রূপবান এবং বিদ্বান বংশধরটির কাছে 'ন বিত্তেন তর্পণীয় মনুষ্যা' এবং 'যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিমকুর্য্যাম্' এই পরমতত্ত্ব শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল আগুনের শিখায় আকৃষ্ট পতঙ্গের মত। বিলেতে তখনও লোকে স্বামী বিবেকানন্দকে ভোলে নি। মেয়েটি

সব থেকে বেশী মুগ্ধ হয়ে গেল, যখন সে এই প্রিন্স হারা রে-র কাছে শুনলে যে, তিনি তাঁর রাজ্য উত্তরাধিকার ত্যাগ করে শুধু ইণ্ডিয়ার এনসেণ্ট কালচারের স্বরূপ এবং মহিমা প্রচারের জন্যই এ-দেশে এসেছেন এবং সারাজীবন তাই করে যাবেন, তাঁর জীবন তিনি উৎসর্গ করেছেন। তরুণী কুমারীটি এই রাজপুত্রটির মধ্যে গৌতমবুদ্ধের নবজন্মকে প্রত্যক্ষ করেছিল। মেয়েটির কিছু পৈতৃক ধন ছিল, সবকিছু নিয়েই তিনিই প্রথম শিষ্যা, সচিব এবং সখিরূপে তাঁকে বরণ করে ধন্য হয়েছিলেন।

সালটা প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পর। যুদ্ধের সময় তিনি ইংল্যাণ্ডেই ছিলেন। এবং কাগজে বৃটনদের জন্য কালীতত্ত্ব বিস্তর্ণ করে লিখতেন—এই সর্বশক্তিময়ী মাতৃশক্তি—Mother the all powerful—ব্যাখ্যা করে লিখতেন—তিনিই ক্রুদ্ধ হয়ে মানুষের অন্তরলোকে ক্রোধকে সঞ্চারিত করেন এবং তখনই গুয়ার বাধে এই পৃথিবীতে।

She is peace—She is anger, She is fire, She is water, She is heat, She is cold, She is the cause of everything—এর ফলে তাঁর খ্যাতি বেড়েছিল যথেষ্ট, শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যাও বাড়ছিল সঙ্গে। হঠাৎ একদা অঘটন ঘটে গেল। ১৯১৯ সালে আর্মিস্টিসের পর। হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর পৈতৃক বাড়ীতে এসে উঠল অভিনেত্রী। সামান্য কদরের অভিনেত্রী কিন্তু অসামান্য প্রখর তার রসনা, কণ্ঠস্বরও তেমনি উচ্চ এবং কর্কশ।

সে দাবী করলে—রে তার স্বামী এবং তার সন্তানকে সে গর্ভে বহন করে বেড়াচ্ছে আর রে তাকে পরিত্যাগ করে এই ব্যভিচারিণী মহিলার গৃহে প্রমোদ-বাসর যাপন করেছেন।

বৃত্তান্ত তার অনেক স্থূলতা। মামলা হল, তাতে তিনি স্টেটমেণ্ট করলেন। বিচিত্র স্টেটমেণ্ট। বললেন—আমি ইণ্ডিয়ান তান্ত্রিক যোগী। আমি মাদার দি অল পাওয়ারফুলের উপাসক, আমার পক্ষে সংসারে কোন কিছুতে বাধা নেই। There is no bar. I deny all bars. তান্ত্রিক-যোগী আমি, আমি এই অ্যাকট্রেসটির মধ্যে এমন এক উয়োম্যানকে দেখতে পেয়েছিলাম, যে সাধনার সময় আমার পাশে বসে থাকলে Mother the all powerful নিশ্চয় দেখা দেবেন। So I accepted her as my wife—আমি তাকে ইণ্ডিয়ান তান্ত্রিক-রীতি অনুসারে বিবাহ করেছি।

জেল হয়ে গেল হারা রে-র। প্রথমা স্ত্রী ডিভোর্সের মকর্দমা করে ডিভোর্স পেলেন। কাগজে কেলেঙ্কারি হতে তিনিই দেন নি। না-হলে বোধ হয় খবরটা আগেই জানা হয়ে থাকত।

তারপর হারা রে জেল থেকে বেরিয়ে আবার একবার সেইণ্ট সাজবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাতে খুব সুবিধে হয় নি। কিন্তু সুবিধে-অসুবিধেতে হারা রে'র কিছু যায়-আসে নি। শিক্ষিত লোক, পণ্ডিত লোকও বলা যায়, তিনি বিচিত্র জীবন যাপন শুরু করলেন। দাড়ি-গোঁফ-চুল রেখে সে এক ভারতীয় তান্ত্রিক সাজলেন। এবং চিটিং-এর জন্য চুরির দায়ে আরও দু'বার জেল খেটেছেন। তা খাটুন, তবুও এখনও তাঁর লেখা কাগজে বের হয়। ভারতবর্ষের ধর্মের উপর তাঁর রচনার আদর করে ওখানকার কাগজওলারা। বিশেষ করে ১৯২১ সালের পর গান্ধীজীর 'অহিংসা'র বিরুদ্ধে তার কতকগুলো রচনার খুবই সমাদর হয়েছিল। লিখেছিলেন নাকি—

This non-violence is Sudra cult in India.* This is for those who are weak—who cannot understand গীতা অর চণ্ডী অর 'ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা কদাচিৎ'—যার বাণী, যিনি কুরুক্ষেত্রে এত রক্তপাত ঘটিয়েছেন, তাঁর নামে নন-ভায়লেন্স অহিংসা এর থেকে হাস্যকর কিছু হয় না। এ নেহাতই কাওয়াডিস অথবা ডীপ পলিটিক্স বা কেউ বলতে পারে 'ভেরী ক্লেভার কামোফ্লেজ'।

এসব পরিচয় আমার ওই রাত্রি-সহচর বন্ধুটি মিস্টার হারা রায়ের সামনেই দিয়ে গেল। হারা রায় স্থির হয়ে শুনলেন। প্রথম যে একটা অপ্রতিভ শঙ্কিত ভাব তাঁর মুখের মধ্যে ফুটে উঠেছিল, ক্রমশঃ সেটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। প্রসন্নমুখে দাড়িতে হাত বুলিয়ে হারা রায় বললেন— জেন্টেলম্যান, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে বলছি—আপনি একটি 'বদ্ধজীব'। আপনার সঙ্গে আর কোন বর্বর জাতির কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ যাদের সঙ্গে জন্তু জানোয়ারের মিল বেশী, তাদের কোন প্রভেদ নেই। আপনি তাত্ত্বিক স্পিরিচুয়ালিজম কিছুই বোঝেন না। হ্যাঁ মহাশয়, আপনি যা ঘটনার বিবরণ দিলেন, তা সত্য অর্থাৎ তা ঘটেছে। কিন্তু ঘটেছে বলেই তা সত্য এমন কথা আমি স্বীকার করি না। বিচারক আমার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝতে পারে নি, সেই জন্য সে জেল দিয়েছে। ইংরেজ বিচারক আজ ভারতবর্ষে সমস্ত পলিটিক্যাল লীডারসকে জেলে দিচ্ছে না? কিন্তু তাই বলে কি তারা গিল্টী? আর দে ক্রিমিন্যাল? বিচার সহজ নয় মহাশয়। দিগ্বিজয়ী আলেকজেন্ডারকে যে প্রশ্ন করেছিল থেসিয়ান রবার তার উত্তর আজও কেউ দিতে পারে নি। গো এ্যাণ্ড আস্ক কাইজার উইলহেল্ম দি সেকেণ্ড—নাউ লিভিং ইন হল্যাণ্ড, আস্ক হিম—আর ইউ গিল্টী স্যার? এ্যাণ্ড ইউ উইল গেট দি আনসার। তিনি নিশ্চয় বলবেন—যুদ্ধে আমি পরাজিত হয়েছি বলেই হয়ত আমাকে দোষী বলতে পার কিন্তু যুদ্ধে আমি জয়ী হলে এ-কথার উত্তর কি হত চিন্তা করে দেখ! হ্যাঁ, আমি যখন মিস মিস্টার রে-র কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি, তখন নিশ্চয় আপনি তাঁর সহচর বা পার্শ্বচর হিসেবে যা বলছেন বলতে পেরেছেন। অন্যথায় নিশ্চয়ই এ-কথা বলতে পারতেন না! পারতেন? অল রাইট, আই ফরগিভ ইউ জেন্টলম্যান, যশু ক্রাইস্ট ইউ আর—দোষ তোমাদের দেব না। ইট ইজ নট ইজি টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মি অর দি গ্রেটনেস অব মাই মিশন। ইয়োর গান্ধী কুড নট আণ্ডারস্টাণ্ড মি। সে আমাকে লিখেছিল—ভারতবর্ষে ফিরে এস। বাট—এখানে ইণ্ডিয়ার ফিলসফি, রিলিজিয়নের গ্রেটনেস না বুঝলে দেশে হাজার মুভমেন্টেও কিছু হবে না। অলরাইট গুড বাই!

দীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়ে তিনি টুপিটি তুলে নিয়ে লম্বা রুক্ষ কাঁচা-পাকা চুলের উপর বসিয়ে পিছন ফিরলেন। মনে মনে সহস্র লজ্জা, লক্ষ বেদনা আমাকে যে কি করে দিয়েছিল, তা বলতে পারব না। কখনও মনে হচ্ছিল—এই মুহূর্তে আমি আত্মহত্যা করি। নইলে হয়তো কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে প্রকাশ করে ফেলব যে, ওই লোকটি আমার পিতৃব্য—কীর্তিহাটের রায়বংশের রামেশ্বর রায়ের পুত্র। তবুও আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। বললাম—ওয়েট প্লিজ এ মিনিট অর টু।

—মি? ইউ আস্ক মি টু ওয়েট?

—ইয়েস স্যার।

—হোয়াট ফর ? ইউ হ্যাভ গট সাম মোর স্ট্রং ওয়ার্ডস ফর মি—

—না। কোন কঠিন কথায় বোধ হয় আপনাকে আঘাত বা লজ্জা দেওয়া যায় না।

হেসে হারা রায় বললেন—ছাটস্ এ কম্‌প্লিমেন্ট। থ্যাঙ্ক য়ু।

—এই সামান্য কিছু সাহায্য আপনি নিয়ে যান। দশ পাউণ্ডের নোট বের করে আমি তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে নোট ক'খানা কেড়ে নিয়ে বললেন – অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। অনেক ধন্যবাদ। টাকার আমার প্রয়োজন ছিল। চলে যেতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—কয়েক মিনিট তোমার সঙ্গে নিরালায় কথা বলতে পাইনে রয় ?

ভাবলাম, হয়তো এবার কোন দুর্বল মুহূর্ত এসেছে এবং সেই দুর্লভ দুর্বল মুহূর্তটি সে অনুতাপ প্রকাশ করবে বা আমার কাছে সজল চোখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, হয়তো বা আরও কিছু টাকাও চাইতে পারে। আমার কাছে এমন একটি মুহূর্ত যত ভয়ের তত প্রলোভনের। ভয়,—হয়তো প্রকাশ করে ফেলব তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। প্রলোভন—সে-ও ওইটেই, হ্যাঁ, ওইটেই, কেবলমাত্র তার উল্টো পিঠটা।—আমি আমার নৈশ সহচরের দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল—ওকে প্রশ্রয় দেবেন না মিস্টার রয়। ডোণ্ট। ও ভয়ানক লোক, নির্লজ্জ ; ধর্মাধর্ম ন্যায়নীতিজ্ঞানবর্জিত একটি ধুরন্ধর শয়তান।—

আমি বাধা দিয়ে বললাম—প্লিজ, প্লিজ। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য। একটু বিরক্তি-ভরেই বলেছিলাম। কারণ, ওই বন্ধুটিও তো হারা রে থেকে উঁচুদরের মানুষ ছিল না। রাত্রির সহচর। রাত্রির লণ্ডনের মোহে তারা লণ্ডনে থেকে গেছে ; উপার্জন করে, সামান্যই করে। রাত্রির লণ্ডনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিতেই চেয়েছিলাম। কীর্তিহাটের জমিদারীর মোহ কেটে গিয়েছে। রায়বংশের মোহও কেটে গেছে। এখানে এসেছিলাম টাকা নিয়ে এই জন্যেই। রক্তের মধ্যে থেকে যেন নির্দেশ পাচ্ছিলাম। তাই এই লোকটির সন্ধান পেয়ে তাকে ডেকে নিয়েছিলাম। টাকা পেতো সে আমার কাছে। সুতরাং তার উপর বিরক্ত হবার আমার অধিকার ছিল।

লোকটিও সরে গিয়েছিল। আমার কাছে প্রত্যাশা তার ফুরোয় নি তখনও। লোকটি চলে গেলে আমি হারা রে-কে প্রশ্ন করেছিলাম—বলুন কি বলবেন ?

—ইয়ং ম্যান, ইয়ং ব্লাড তোমার—হট ব্লাড—। আমি শুনেছি, তুমি নারীক্ষুধাতুর !

আমার মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করে উঠল। আমার খুড়ো, আমার বাবার নিজের খুড়তুতো-ভাই জিজ্ঞাসা করছেন। উনি অবশ্য জানেন না, কিন্তু আমি তো জানি। কিন্তু কি উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না।

—লজ্জা করছ ? নো-নো-নো ! লজ্জার কিছু নেই। নাথিং। তুমি জান না, তুমি বোঝ না ; এটা অবশ্য দুর্ভাগ্য তোমার—ইণ্ডিয়ান এবং বেঙ্গলী হয়ে তুমি এটা বোঝ না। ফেমাস তন্ত্র কাল্ট অব বেঙ্গল।

হঠাৎ থেমে মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি জাতে কি বল তো? বাই কাস্ট—? ব্রাহমিন অর বৈশ্য অর কায়স্থা অর এ শূদ্রা? হোয়াট?

বললাম—ব্রাহমিন।

—ব্রাহমিন? শাক্তা অর এ বৈষ্ণবা?

—কেন জিজ্ঞাসা করছ?

—বুঝেছি ওসব মানো না। ভ্যাটস্ অলরাইট। ঠিক আছে। মানলে যে-কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তা বুঝতে সুবিধা হত। ভাল, সে-কথা বলব না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করব, সত্যিই তুমি হাংরী? দেখ, আমি তোমার ক্ষুধা মেটাতে কিছু সাহায্য করতে পারি। আমার অনেক শিষ্যা আছে। তারা আমার কাছে এই কারণেই আসে। আমি তাদের কবচ-মাদুলী-গোছের কিছু দিয়ে থাকি। তুমি আমার কাছে নিতে পার। রয়, মেনি উয়োমেন আমার লাইফে এসেছে। আমার কোন লজ্জা নেই। তুমি জানলে বুঝতে পৃথিবীতে ম্যান এ্যাণ্ড উয়োম্যান রিলেশনসিপ ছাড়া কিছু নেই। পুরুষ এ্যাণ্ড প্রকৃতি। নাথিং এলস্। ইফ ইউ লাইক, আই ক্যান হেল্প ইউ। থ্রো দ্যাট ননসেন্স ইয়ং ম্যান আউট।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখেই বোধ হয় তিনি বললেন—খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে রয়? কিন্তু আশ্চর্য আদৌ নয়। তোমাদের মনকে ইংরেজেরা ক্রীশ্চানিটি একটা মর্‍্যালিটি শিখিয়েছে, যে-মর্‍্যালিটি তোমরা আজকের এডুকেশনে পাও, যেটা ব্রাহ্ম সোসাইটি প্রচার করেছে এককালে, তার জন্যেই এমন মনে হচ্ছে। নাহলে এতে তো আশ্চর্যের কিছু নেই।

This is the only truth of life.

এবার আমি বললাম—এসব ফিলসফি-স্পিরিচুয়ালিজিম-এর দক্ষিণা তো আমাদের দেশ অনুযায়ী যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য, তার বেশী নয়। কিন্তু যে সাহায্য করতে চাচ্ছেন আমাকে, তার দক্ষিণা ওই যৎকিঞ্চিৎ হলে চলবে, না, বেশী দিতে হবে?

—অবশ্যই বেশী দিতে হবে। আপনি জানেন, আমি বলেছি আপনাকে—আমি ভিক্ষে চাইতে এলেও আমি রাজার ছেলে। ব্লু ব্লাড আছে আমার মধ্যে। আমি সন্ন্যাসী হলেও আমি তাই। এ প্রিন্স। অন্নে আমার হাত ভরে না। আমি তোমাকে সার্ভিস দেব—আমার রেমুনারেশন ওই লোকার রাত্রি সহচরটার সমান নিশ্চয় হবে না। তাছাড়া মিস্টার রয়, তোমাকে ফ্রাঙ্কলি বলি—আমার অনেক দেনা। অনেক। আমার নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে। অহঙ্কারটাকেই বড় করছি না—তোমার করুণার কাছেও আবেদন জানাচ্ছি।

আমি নির্বাক হয়ে রইলাম সুলতা। কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না। দেনাতে ডুবে গেছেন হারা রে। শুধু হারা রে নয়, কীর্তিহাটের রায়বংশের সবাই দেনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে দিন-রাত্রি পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে বলে মনে হল। এ-দেনা শোধ করবার কি কারুর সাধ্যি আছে?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হারা রে বললেন—আচ্ছা, তুমি ভেবে দেখ রয়। আমি আবার

আসব তোমার কাছে।

বলে চলে গেলেন।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। আমার মনে পড়ছে সুলতা, স্পষ্ট মনে পড়ছে সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল পৃথিবীতে কোথাও বুঝি আমার বা রায়বংশের কোন সন্তানের সুস্থ হয়ে থাকবার অধিকার নেই।

এই মুহূর্তে এসে ঢুকেছিল আমার সেই নৈশ অনুচরটি। তার নাম মিস্টার ঘোষ-চৌধুরী। স্মার্ট ইয়ং ম্যান, ডেয়ার-ডেভিল। সে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—রয়—কি হল। মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়ে গেছে তো!

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম, উত্তর দিতে পারলাম না। সে হেসে বললে—সম্ভবতঃ তুমি এবার আমাকে চলে যেতে বলবে। যাব আমি—আই অ্যাম এ স্পোর্ট; আমি তোমাকে ব্ল্যাক-মেল করব না। আমার পাওনাটা শুধু পেলেই হল। তবে এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড অর কমরেড অর গাইড যাই বল, সেই হিসেবেই বলি—ডোণ্ট ট্রাস্ট ভাট ম্যান—ও একটা পাইথন, লেজে জড়িয়ে পাক দিয়ে তোমার হাড়গোড় ভেঙে মাংসের দলা পাকিয়ে ধীরে ধীরে তোমাকে গিলবে।

আমি তাকে বলেছিলাম—ঘোষ-চৌধুরী, তুমি হুইস্কির জন্যে অর্ডার কর, আর দেখ ট্র্যাঙ্কুইলাইজার ট্যাবলেট আছে ওই দেরাজে, আমাকে দাও। আমি সুস্থবোধ করছি না। ওই লোকটা আমাকে অসুস্থ করে দিয়ে গেল।

—তোমাকে কিছু খাইয়েছে? কই এরকম তো কিছু করে বলে তো কখনও শুনি নি। তবে হি নোজ হিপনটিজিম। হিপনটাইজ করে টানে নিজের দিকে। স্পেশালি গার্লস—উইমেন।

—না চৌধুরী, খাওয়ায় নি কিছু। তবে হিপনটিজম বলছ তা হতে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য শক্তি ওর হিপনটিজমের তোমার কাছে আমি ঠিক ভাবে এক্সপ্রেস করতে পারব না। কিন্তু আমার দেহ-মন সবকিছুকে টানছে, প্রবলভাবে টানছে। আমি ওকে ভুলতে পারছি না। অন্য কথা ভাবতে পারছি না। শুধু ওর কথাই মনে ঘুরছে। দাও, আমাকে ট্রাঙ্কুইলাই-আর দাও—ডবল ডোজে দাও। আর হুইস্কি দাও।

চৌধুরী ভিতরের অর্থ বুঝতে পারে নি। সে ভাবছিল হিপনটিজমের কথা। সে তাড়াতাড়ি আমাকে মদের গ্লাস এবং ট্রাঙ্কুইলাইজার ট্যাবলেট দিয়েছিল—আমি ডবল ডোজে খেয়ে শুয়ে ঘুমুতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঘুম সহজে আসে নি।

* * *

শুধু ঘুম নয়, আনন্দ-উল্লাস এ সমস্তই যেন ওই হ্যারা রে আমার অপহরণ করে নিয়েছিল। আমার পিছনে সে যেন অশুভ শনিগ্রহের মত অথবা কলির মত ফিরতে শুরু করেছিল। অথবা রায়বংশের প্রেতাত্মার মত ফিরতে শুরু করেছিল।

ওই ঘটনার ঠিক একদিন পর সে আবার এসেছিল আমার হোটেলে। এবার একা নয়। সঙ্গে একটি সুন্দরী তরুণী।

আশ্চর্য সুলতা, আমি কার্ড পেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি। ঘরে এল সে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। আমার দেহের রক্ত চঞ্চল যেমন হয়ে উঠল, তেমনি একটা নিদারুণ আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে একটা অসহনীয় উদ্বেগের সৃষ্টি করলে।

উইও হলে হার্টের উপর প্রেসার পড়লে যেমন হয়, ঠিক তেমনি। তারিখটা স্মরণীয় তারিখ, থার্ড সেপ্টেম্বর নাইনটিন থার্টি-নাইন। জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরেজ ওয়ার ডিক্লেয়ার করবে, তার আগে, এগারটা পনের মিনিটে প্রাইম-মিনিস্টার মিস্টার চেম্বারলেন রেডিয়োতে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোলাণ্ড অক্রমণ করেছে ভোরবেলা। নেভিল চেম্বারলেনের বক্তৃতা শুনছিলাম আমি। হারা রে ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে মেয়েটি।

বললেন—I have come Mr. Roy. Let me introduce Miss Laura Knight to you—She is more than my own daughter—my disciple, a শিষ্যা of mine. And Laura— this is Mr. Ray—S. Ray—an artist a famous artist—and a very learned man—also a very rich man. You see those two pictures on the wall—one a mother and another a darling. But the girl is the same, you see—this is tantra of India. The Eternal Mother and the Eternal She, they are one and the same.

আমি আর সহ্য করতে পারি নি। আমি বলেছিলাম—will you please stop Mr. Ray!

মিস্টার হারা রে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—You dont like Miss Knight—? She is very intelligent with a very soft and sweet mind—She wanted to work as your secretary.—

আমি বলেছিলাম—বাংলায় বলেছিলাম, দয়া করে আপনি চলে যান—আমি জোড়হাত করছি মিস্টার রে—।

সুলতা, মেয়েটির মুখে যেন রায়বংশের আদল দেখতে পাচ্ছিলাম। থরথর করে কাঁপছিলাম আমি।

—কি হল মিস্টার রায়? আপনি অসুস্থ?

আমি এবার চিৎকার করে বলেছিলাম—Get out I say—get out—

রেডিয়োতে তখনও প্রাইম-মিনিস্টার মিস্টার চেম্বারলেনের বক্তৃতা চলছে। সারা ইংল্যাণ্ডের লোক বোধহয় তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে গেছে। যুদ্ধ! আবার সর্বনাশা যুদ্ধ বাধল।

হারা রে বললেন—কিছু টাকা ওকে দাও রায়, ওকে আমি নিয়ে এসেছি তোমার নাম করে। অনেক প্রত্যাশা করে এসেছে।

—She must get something. Mr. Ray—please.

আমি বললাম—She is your daughter !

চমকে উঠল হারা রে, বললে—কে বললে ?

—ওর মুখ বলছে।

—তোমার দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ রয় কিন্তু She is a good girl—and beautiful also—Is she not ?

এতক্ষণে মেয়েটি কথা বললে—Give me my dues. বলে সে আমার সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লে।

আমি ওদের বিদায় করলাম। মূল্য ভালই দিতে হল। কিন্তু তাতে আমার দুঃখ ছিল না। বরং আসবার সময় ওদের আরও কিছু পাঠিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। হারা রে মিথ্যা কথা বলে নি ; ঋণ তার অনেক, আকণ্ঠ ডুবে আছে বললে মিথ্যা বলা হয় না।

দেশে ফিরবার টিকিটের দাম আর পথ-খরচ রেখে বাকিটা হারা রে-কে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

দেশে ফিরেছিলাম মাসখানেকের মধ্যেই। ও-দেশে থাকতে আর সাহস হয় নি। লোকে বলেছিল—যুদ্ধের ভয়ে পালাচ্ছি কিন্তু তা নয়, আমি পালিয়েছিলাম হারা রে-র ভয়ে এবং তার মেয়ে শম্পা রে-র ভয়ে।

মেয়েটার নাম লরা নাইট নয়। ওর নাম শম্পা রে। ওদের ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে খানিকটা পায়চারি ক'রে সুরেশ্বর যেন দম নিয়ে বললে—সাত পুরুষ ধ'রে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য থেকে সুরেশ্বর রায় পর্যন্ত যত কলঙ্ক রায়বংশ অর্জন করেছে, সুলতা, তার মধ্যে এই হারা রায়ের কলঙ্কের চেয়ে কালো এবং নীরেট অর্থাৎ ওজনে গুরুভার কলঙ্ক আর কেউ অর্জন করে নি।

বলতে-বলতে বলতে পারি নি ; দিনের আলো ফুটছে, লজ্জাবোধ করছিলাম ; কিন্তু না, বলব, না বললে রায়বংশের মুক্তি নেই। খবরটা জেনেছিলাম জাহাজে উঠে। জাহাজে উঠে হঠাৎ দেখা হল একটি মহিলার সঙ্গে। আমি জাহাজে যখন উঠলাম তখন মহিলাটি ডেকের উপর দাঁড়িয়েছিলেন অন্যমনস্ক ভাবে। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। পোশাক দিয়ে বোঝা গেল ভারতবর্ষের মেয়ে ; তার কিছুটা পরিচয় চুলে এবং চোখে আছে ; নইলে রঙ দেখে ধরা যায় না। সাদা পাড়হীন শাড়ী এবং ব্লাউস দেখা যাচ্ছিল বোতাম খোলা ওভারকোটের ফাঁক দিয়ে। বয়স হয়েছে, বয়স চেহারাকে খানিকটা ভারী করে। আমার মনে হল যেন চেনা মুখ। একদিন পর তিনি নিজেই এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে চেনা দিলেন—পরিচয় ঝালিয়ে নিলেন। এবং হারা রে'র কথা তিনিই বললেন।

ইনি অন্য কেউ নয় সুলতা, ইনি সেই 'চন্দ্রিকা'। যাই তিনি করে থাকুন, পরিচয় তাঁর যাই হোক, তিনি আমার মাতৃতুল্যা। প্রথমটা জাহাজে তাঁকে দেখে আমি খুশি হই নি, সন্তুষ্ট হই নি। শুধু ভেবেছিলাম আমার ভাগ্যের কথা। আমি তাঁকে চিনতেও চাই নি কিন্তু তিনি আমাকে চিনলেন। আমি চিনি না বলতে পারলাম না। দেখলাম যেন তিনি

অনেকটা পাল্টে গেছেন। তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে জীবনে নিস্পৃহ এবং উদাসীনা হয়ে উঠেছেন। বাবার মৃত্যুর পর একবার মাত্র দেশে গিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে বাবার কিছু কাগজপত্র মাকে দিয়ে এসেছিলেন। মা আমার সে ধাক্কা সহ্য করতে পারেন নি। তাতেই তিনি মারা গিছলেন। মা'র মৃত্যুখবর কলকাতাতেই পেয়েছিলেন তিনি কিন্তু এরপর আর তিনি ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। এবং ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন এ-দেশে। আবার এতকাল এদেশে কাটিয়ে এবার ইণ্ডিয়ায় ফিরছেন। বহুদিন থেকেই ফিরবেন ইচ্ছা ছিল, এবার এই যুদ্ধ লেগেছে বলে ফিরবার একটা তাগিদ পেয়ে গেছেন।

* * *

তিনি হারা রায়কে চিনতেন। জাহাজে তখন সর্বদাই সবার মনে একটা আতঙ্ক ছাই-চাপা আগুনের মধ্যে চাপা রয়েছে। একটা উত্তাপ অহরহ অনুভব করে। তাই প্রতিটি যাত্রীই সঙ্গী বন্ধু খুঁজে ফেরে, সামান্য অন্তরঙ্গতায় মানুষকে আপনজন ভাবতে চায়। জার্মান ইউ বোট তখন বাহির দরয়ায় বেরিয়ে পড়েছে হাঙরের মত, তবে তার গতিবিধি তখনও উত্তর মাথায় নরওয়ে সুইডেনের উপকূল এবং উত্তর সমুদ্র হয়ে আটলান্টিকের দিকে। একদিকে ফ্রান্স, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডকে রেখে নিচের দিকে তখনও নামে নি। এই অবস্থায় চন্দ্রিকা মালহোত্রা আমার কাছে আসতেন, আমাকে মাই সন বলে ডাকতেন—আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি।

শুধুই বসে পৃথিবীর অবস্থা নিয়ে কথা হ'ত প্রথম প্রথম। এরই ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে আমার বাড়ির কথা আমার ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করতেন।

একদিন প্রশ্ন করলেন—ইউ হ্যাভ নট ম্যারেড ?

বললাম—না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—এইবার বিয়ে কর।

বললাম—না।

বললেন—কেন ?

উত্তর দিতে গিয়েও দিলাম না, দিতে পারলাম না যে বাবা তাঁর শেষ চিঠিতে বলে গেছেন—যেন আমি বিয়ে না করি।

একদিন বললেন—তুমি এতে ভেসে যাবে না ?

বললাম—না। তা মনে করি না। এখনও অন্তত যাই নি।

—মনে কর না ? খুব ভাল। এই জোর যেন শেষ পর্যন্ত রেখো। একটু চুপ করে থেকে বললেন—দেখ, তোমার বাবাকে আমি ইচ্ছে করেই টেনেছিলাম—আমিই অপরাধিনী। তিনি ঠিক ছিলেন না। আই ওয়াজ দি ম্যাগনেট। প্রথমটা কষ্ট পেয়েছিলাম আকর্ষণ করতে। কিন্তু একবার যখন তিনি আমার আকর্ষণে সংসার থেকে ছিঁড়ে বের হলেন তখন সে যেন শুটিং স্টার। তাকে ধ'রে রাখা যায় না—গেল না!

চুপ ক'রে রইলাম।

তিনি এইবার বললেন—তোমার বাবার কাছে তোমাদের বংশের গল্প শুনেছি কিছু কিছু। বলতেন—একটা কি অভিশাপ আছে তোমাদের বংশে। আমি বিশ্বাস করি নি—হেসেছি। পৃথিবীতে ম্যান এ্যাণ্ড উয়োম্যান এদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ নেচার'স ল। একটি পুরুষ একটি নারীকে দেখলেই হি উইল শো হিমসেল্ফ অ্যাণ্ড সি উইল ট্রাই নট টু লুক এ্যাট হিম, বাট সি উইল লুক এ্যাট হিম। তার উপর যেখানে পুরুষের হাতে সম্পদ জমা হয়েছে সেখানে সে জিততে না পারলে কিনবে। কিন্তু তার থেকেও তোমাদের মধ্যে কিছু বেশী আছে। তোমাদের আর একজনকে দেখেছি আমি ইংল্যাণ্ডে। তাকে দেখলে আমার ভয় হয়। একজন বড় পণ্ডিত এবং আশ্চর্য হিপনটিক পাওয়ারের অধিকারী। সম্ভবত সম্পর্কে তোমার খুড়ো—

—আর ইউ স্পীকিং অব হারা রে?

সবিস্ময়ে চন্দ্রিকা বললেন—তুমি জান তাকে? দেখেছ?

বললাম—দেখেছি।

—কতটুকু দেখেছ? কতটুকু জেনেছ? গ্লাস-কেসের মধ্যে কিং কোব্রা দেখা এক কথা সুরেশ্বর, আর মনের মধ্যে তাকে খোলা অবস্থায় দেখা আর এক কথা। তুমি তাকে গ্লাস-কেসের মধ্যে দেখেছ। হয়তো বা তোমার সত্য পরিচয় না জেনে তোমার কাছে তার সেই বহুবার পুনরাবৃত্তি করা মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। বলেছিল—হাজার বছর আগে তার পূর্বপুরুষেরা রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ছিলেন।

বিষণ্ণ হেসে বললাম—হ্যাঁ। বলতে এতটুকু বাধল না।

—বাধে না। ওই পরিচয়টাকে সত্য করে তুলেছে হারা রে। লোকে মিথ্যে জেনেও আবার ওটাকে সত্য বলে মানতে চেষ্টা করছে। তারপর হয়তো উপনিষদের শ্লোক শুনিয়েছে, গীতা শুনিয়েছে—ইয়োরোপীয়ান ফিলজফিতেও পণ্ডিত হারা রে। কিন্তু সে তার পরিচয়ের কতটুকু? বারতিনেক সে জেল খেটেছে—

এবার আমি বললাম—আণ্ট চন্দ্রিকা, মিস মালহোত্রাকে এই নতুন করে পরিচয় হয়ে আণ্ট বলতাম, মিস্ মালহোত্রা বলতে কেমন লাগত; বললাম—আণ্ট চন্দ্রিকা, সে তার মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, যার নাম বলে নরা নাইট; কিন্তু যার আসল নাম শম্পা রায়।

চমকে উঠলেন আণ্ট চন্দ্রিকা। বললেন—দেখেছ তুমি তাকে?

—দেখেছি। তার মুখের মধ্যে রায়বংশের মুখের আদল দেখেছি। একটু চুপ ক'রে থেকে চন্দ্রিকা দেবী আবার বললেন—ওটা তুমি ভুল দেখেছ। অথচ আদল যদি সত্য হয় তবে সেটা এ্যাকসিডেণ্টাল। কিন্তু ট্রুথটা আরও ভয়ঙ্কর।

স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম উত্তরের অপেক্ষায়। চন্দ্রিকা দেবী বললেন—তুমি জান কিনা জানি না—এক সময় এক অ্যাকট্রেসের সঙ্গে অবৈধ প্রেম করেছিল হারা রে এবং তার জন্য জেলে গিয়েছিল।

বললাম—জানি।

চন্দ্রিকা বললেন—লরা নাইটই মেয়েটার আসল নাম। ওকে কোলে নিয়েই ওর মা সত্যবিধবা অবস্থায় হারা রে-র দৃষ্টিতে পড়েছিল এবং প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু—

—কি কিন্তু—?

—মেয়েটার নাম ছেলেবেলায় হারা রে-ই পাল্টে দিয়েছিল। বলত—শম্পা। তারপর এখন লোকে বলে—সে তার মিসট্রেস?

চমকে উঠেছিলাম শুনে।—বলছ কি তুমি?

—সত্য বলছি। ওকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও তোমার কে? কি নাম ওর? লরা নাইট না শম্পা রায়? শয়তানের হাসি হেসে হারা রে বলেছিল—"যা তোমার মনে হবে তাই। তাই মনে করতে পার। অথবা বলতে পার both—আমার ঔরসে ওর জন্ম নয়, কিন্তু তার থেকে বেশী ওকে মেয়ের মত মানুষ করেছি এক সময়। কিন্তু তাতে কি? পৃথিবীতে প্রকৃতি আর পুরুষ ছাড়া কিছু নেই। ম্যান এ্যাণ্ড উয়োম্যান—ইটারনাল হি এ্যাণ্ড সী; সুরেশ্বর আমি ওকে কটু কথা বলে ধমকাতে চেষ্টা করেছিলাম, হারা রে শয়তানের মত হা-হা ক'রে হেসে বলেছিল—তুমি—তুমি বুঝতে পারবে না! বুঝবে না তুমি। রাজাদের ইতিহাসে এ তুমি পাবে, তান্ত্রিকদের তন্ত্রে এর বিধান আছে। আর যদি তুমি মিথ্যে সমাজশাস্ত্রের গণ্ডী পার হতে পার তবে বুঝতে পারবে, এসব মিথ্যে সব মিথ্যে। আমি তান্ত্রিকের বংশ, আমি ভূমির অধিকারীর ছেলে—আই ক্যারি রয়াল এ্যাণ্ড তান্ত্রিক সাধকস ব্লাড ইন মাই ভেনস।" মিস মালহোত্রা বলে যাচ্ছিলেন—আমি শুনতে শুনতে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

মানুষের ইতিহাস একদিকে যত আলোকোজ্জ্বল অন্যদিকে তত অন্ধকার; গাঢ়তম চরমতম অন্ধকার, এ নিয়ে বিতর্ক নেই। কিন্তু তবু মানুষ ওই আলোকোজ্জ্বল দিকটার দিকে তাকিয়েই বেঁচে আছে, সেইটেকেই সে স্বীকার করে। হারা রায়ের মত অন্ধকারকে—।

মনে আছে সুলতা—হারা রায়কে অভিসম্পাত দিতে গিয়ে চমকে উঠেছিলাম; মনে পড়ে গিয়েছিল শ্যামাকান্তকে। ভবানী দেবী রায়বংশে বধূ হয়ে এসেও শ্যামাকান্তের তামস তপস্যার ধারাকে বিশুদ্ধ করতে পারেন নি।

সুলতা, নিজের উপর একটা অবিশ্বাস জন্মে গেল। রাত্রে জাহাজে শুয়ে চোখ বুজলেই ওই অন্ধকার আমাকে চেপে ধরত। আমি ভয় পেতাম।

ডেকে মেয়েদের দেখতাম। জাহাজটায় ভারতীয় যাত্রীর ভিড় বেশী; বেশ কয়েকজন মহিলা যাত্রীও ছিলেন। নিবিঘ্নে সুয়েজ পার হবার পর থেকেই সকলের উল্লাসই বেড়ে গেল। মেয়েদের বেশী। বিলেত থেকে নতুন জাত নিয়ে ফিরছেন তাঁরা। বিলেতের মুক্ত হাওয়ার দমকায় তাঁদের মাথার ঘোমটাই শুধু খসে নি, তাঁরা বেশবাসকে বেশ খানিকটা অসম্বৃত করে উতলা সমুদ্রবাতাসে নতুন যুগের ধ্বজার মত উড়িয়ে ফিরছেন।

আমি ভয়ে কারুর সঙ্গে মিশি নি। মিশতে চাই নি। কেবিনের মধ্যে রঙ তুলি নিয়ে বসে থাকতাম। ছবি আঁকার মধ্যে মগ্ন হতে চাইতাম। কিন্তু ছবি আঁকতে গেলেই মেয়ের মুখ তুলির মুখে ফুটে উঠত।

আমি ভয় পেলাম সুলতা। মনে হল আমার, আর বোধ হয় রায়বংশের বাঁচবার অধিকারই নেই।

দিবালোকের মত স্পষ্ট বুঝতে পারলাম একটা সত্য। শ্যামাকান্ত ধর্মসাধনায় যেখানে পৌঁছুতে চেয়েছিল পৌঁছেছিল, সোমেশ্বর রায় সম্পদের জোরেও সেখানে পৌঁছেছিলেন, আধুনিক শিক্ষাকে আয়ত্ত করে হারা রেও সেইখানে পৌঁছেছেন। ব্রজদা তোষামুদি শিল্প আয়ত্ত করেও সেইখানে পৌঁছুতে চেয়েছিলেন। আমিও ঠিক সেই পথে চলেছি, আমার ছবিতে ফুটে উঠছে নারীর মুখ।

বম্বেতে নেমেছিলাম অত্যন্ত ভীত হয়ে। মনে হয়েছিল মানুষের বংশলতার মধ্যে রায়বংশ সেই প্রথম পুরুষ থেকে এ পর্যন্ত যে পথে হেঁটেছে তাতে তার আর বাঁচবার অধিকার নেই। তাতে ছেদ টানতে হবে। অথবা এই হারা রে'র সত্যকে এবং শ্যামাকান্তের সত্যকে সাহস করে আঁকড়ে ধরে উঁচু গলায় বলতে হবে—"এই সত্যই শ্রেষ্ঠ সত্য বাকী সবই ভ্রান্তি। মায়া। মিথ্যা।"

কিন্তু তা পারি নি। আমার কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে স্বর বের হয় নি, আমার জিভ বাক্যগুলো উচ্চারণ করতে গিয়েও উচ্চারণ করতে পারে নি। আমার মনে পড়ত শ্যামাকান্তের সেই আর্তনাদের কথা। নিজেই নিজের গলা টিপে শ্যামাকান্ত বলত, ছেড়ে দে ছেড়ে দে। বলতে দে! বলতে দে।

* * *

বম্বেতে নেমে মনে হল, কেন এলাম ফিরে?

ইউরোপে যুদ্ধ বেধেছে। হিটলারের বাহিনীর ব্লিৎস ক্রিগের সামনে সমস্ত বাধা ঝড়ের মুখে ধুলোর মত উড়ে যাচ্ছে। ওদিকে পোল্যাণ্ড থেকে বল্‌কান—এদিকে ফ্রান্স থেকে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া পর্যন্ত জ্বলছে। ইংল্যাণ্ডকে মাশুল দিতে হবে। থাকলেই ভাল হ'ত। যেতাম ধুলো হয়ে উড়ে। ইংরেজের পারমানেন্ট সেটেলমেণ্টের প্রসাদপুষ্ট বংশের সন্তান, যুদ্ধেও তো লেগে যেতে পারতাম। বিলেতে অনেক ইংরেজীনবিশ বিলিতি সভ্যতা-মুগ্ধ ভারত-সন্তান যুদ্ধে যোগ দেবার জল্পনা-কল্পনা করছে, তা শুনে এসেছিলাম। আমি তো দু'দিক থেকেই যোগ্য। আমি সত্যাগ্রহকে বিদায় জানিয়ে সকল আগ্রহকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছি, আমার তো স্থান ছিল ওখানেই।

নিজেকে তিরস্কার করেছিলাম সুলতা। এ তুমি ভীরুর মত করলে কি?

বাঁধন-কাটা জীবনের সঙ্গে সুতোকাটা ঘুড়ির কোন তফাৎ নেই। এখান থেকে একটা বাতাসের তোড়ের মুখে গিয়েছিলাম বিলেতের আকাশে, আবার উল্টো বাতাসে ফিরে এলাম ভারতবর্ষে। এসে একটা হোটেলে বসে ভাবতে লাগলাম বাকী জীবনটা কাটাব কি করে?

কাটা ঘুড়ির সঙ্গে যে সুতোটুকু থাকে তা মধ্যে মধ্যে গাছের ডালে, টেলিগ্রাফের তারে আটকে ঘুড়িটাকে বাতাসের ঝাপটা খেতে দেখেছ, তেমনি মনের অবস্থা।

চন্দ্রিকা মালহোত্রার যাবার কথা দিল্লী। উনি বলেছিলেন কোন একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে তিনি নেবেন এবং তার উপর নির্ভর করে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন। সেও যদি

ভাল না লাগে তবে ক্রিশ্চানমিশনে মানুষের সেবার কাজ নিয়ে কাটিয়ে দেবেন। বম্বেতে নেমে আমার মনের অবস্থা দেখে উনি আমাকে ফেলে দিল্লী রওনা হতে পারলেন না। যে হোটেলে আমি ছিলাম সেই হোটেলে থেকে গেলেন। আমার মনের অবস্থা উনি অনুমান করেছিলেন, আমার মদ খাওয়া দেখে।

বম্বেতে হোটেলে একটা দিন অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে সম্ভবতঃ আক্রোশবশেই মদ বেশী পরিমাণে খাচ্ছিলাম। রায়বংশের যে জীবনধারা আমাকে কীর্তিহাট থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে ইংল্যাণ্ড, আবার ইংলাণ্ড থেকে বম্বেতে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে, যার ভয়ে আমি আতঙ্ক দেখি ; মায়ের মরা মুখ ভেসে ওঠে, সেই জীবনধারার জন্যেই যেন আমি পাগল হয়ে উঠছিলাম। আমি জমিদার, রায়বংশের শেষ জমিদার সন্তানের মতই জীবন-যাপন করব। কেন করব না ? আমার অনেক সম্পদ জমে আছে। আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে এসেছি বিলেতে। দেশে ব্যাঙ্কে এখনও লক্ষাধিক টাকা আমার মজুত আছে। আমার বিষয় আছে, কলকাতার বাড়ী আছে। যার মূল্য পাঁচ-ছয় লক্ষের উপর।

লক্ষই হোক আর কোটিই হোক, খরচ ক'রে ফেলতে কতক্ষণ ? তবে খরচ করতে হলে ওই জমিদার বা রাজার ছেলের মত বাঁচতে হবে। ওই বাঁচার মধ্যেই খরচের পথ আছে। এক কথায় দান ক'রে দেওয়া যায়, সেটা আরও সোজা, কিন্তু হিসেবে সোজা হ'লেও কাজে কঠিন। ঠিক করে ফেললাম ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াব, রায়বংশের ছেলের মতই ঘুরে বেড়াব। ভাঙা প্রাসাদ, পুরানো কেল্লা, বিরাট মন্দির, মসজিদ, গুহার অভ্যন্তর দেখে বেড়াব আর তার সঙ্গে নারী আর সুরা। তারপর সর্বস্বান্ত হয়ে লিভার পাকিয়ে মরব ; কেউ জানবে না পরিচয় ; মুদ্দোফরাসে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে ফেলে দেবে। অথবা দেহটাকে চ্যারিটি করে যাব, লিখে রেখে যাব কোন মেডিকেল কলেজে দিয়ে দিতে। সেইটে হবে আমার লাস্ট উইল। এর থেকে ভাল উইল আর অধিকতর নাটকীয় উইল আর কি হতে পারে একজন রায়বংশের সন্তানের পক্ষে বল ?

সে-কাল হ'লে দেহটা দিয়ে যেতাম বিক্রমাদিত্যের মত কোন রাজাকে। বলে যেতাম —মহারাজ এই দেহটা তুমি নিয়ো, চিতায় পুড়িয়ো না, জলে ভাসিয়ে দিয়ো না, কবর দিয়ো না, বুকে বসে তান্ত্রিক তপস্যা করো, তোমার সামনে সাক্ষাৎ পরমাপ্রকৃতি আসবেন। তুমি তাঁর কাছে চেয়ে নিয়ো তোমার ইচ্ছামত বর। কোন্ বর ? অনন্তকাল পরমায়ু, অমরত্ব ? না, তা নিয়ো না।

তবে কি নেবে ? কোন্ বর নেবে ?

শ্যামাকান্ত শেষ পর্যন্ত মা বলে মুক্তি চেয়েছিল। হেরে গিয়েছিল। নিজে মুক্তি নিয়ে বংশের মধ্যে নিজের কামনা রেখে গেছে। সেই কামনা পূর্ণ হবার বর—।

সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠতাম। পারতাম না ওই বর চাইবার কথা উচ্চারণ করতে।

* * *

এতটুকু বাড়িয়ে বলি নি সুলতা।

সমস্ত কথা যথাযথ ভাবে সাজিয়ে পরের পর বলবার মত ক'রে মনে নেই। কারণ সে

সময় প্রায় একটা বছর আমি প্রায় দিনরাত্রি মদ খেয়েছি। ইচ্ছে করেই মদ খেয়েছি তাদের মত ক'রে যারা মদ খেয়ে মরবে বলে সঙ্কল্প ক'রে মদ খায়।

বিষ খেয়ে মরায় খেদ আছে কষ্ট আছে, সব থেকে বেশী আছে গ্লানিকর অপবাদ। কেউ বিষ খেয়ে মরলেই লোকে সন্দেহ করে, জল্পনা-কল্পনা করে যে নিশ্চয় লোকটা কারুর কাছে মর্মান্তিকভাবে আহত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে; অথবা নিশ্চয় এমন কিছু করেছে, যার জন্য সারা সমাজ এবং গভর্নমেন্ট তার বিরোধী হয়ে তাকে সাজা দেবে। সেই সব গ্লানি থেকে এড়াবার জন্য বিষ খেয়েছে।

তার থেকে মদ খেয়ে মরা ভাল। মদ খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে এক ধরনের পাগল উল্লাস আছে, যা বিস্মিত করে দেয় সাধারণ মানুষের ঘৃণাকে, হতবাক করে দেয় কটু অপমানকর বাক্যকে।

মোট কথা কীর্তিহাটে গিয়ে রায়বংশের পূর্ণ পরিচয় জেনে এবং পরিণাম দেখে পরিত্রাণ পাবার জন্য এদেশ থেকে পালিয়েছিলাম ইংল্যাণ্ড। কিন্তু সেখানে গিয়েও পেলাম না, রায়বংশের সম্পদলক্ষ্মী হারা রেংকে কলঙ্কের বোঝা সমেত ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। হারা রে আজ একা নয়, ওই মেয়েটি তার কে তা জানিনে, তাকে নিয়ে নির্লজ্জ ভাবে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে এবং ব্যাধির বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সেখান থেকে পালিয়ে এসে এবার আমি ওই ধারাতেই বাঁচতে চাচ্ছি। যে কটা দিন বাঁচব, সে কটা দিন ওই ট্রাডিশন রেখে বাঁচাই ভাল।

পুরাণে ইন্দ্রপতনের কথা আছে।

রায়বংশের ছেলে মাত্রেই ইন্দ্র। তারা পড়লে যদি ইন্দ্রপতনের মহিমা ভূমিকাকে চমকে না দেয় তো মরেও যে শান্তি পাব না। এবং সে মৃত্যুতে যে চরম লজ্জা।

ইন্দ্রেরা বিলাসের ব্যভিচারের জন্য চিরকাল মুনিঋষির অভিশাপ মাথায় নিয়েছে।

বম্বে থেকে পনেরো দিন পর মন ঠিক করে যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু মিস মালহোত্রা বাধা দিলেন। না, মাই সন, এ তুমি করো না।

বললাম—না, এ ছাড়া আমার আর পথ নেই।

—কিন্তু এ পথ তো তোমার নয়! হলে তুমি হারা রে'র ভয়ে পালিয়ে আসতে না। হারা রে মেয়েদের কাছে ডেঞ্জারাস, হয়তো যারা তাকে জানে না, চেনে না, তাদের কাছে ভয়ঙ্কর কিন্তু তোমার কি ভয় ছিল তার কাছে? কিছু না। ইংল্যাণ্ডে অনায়াসে তাকে এ্যাভয়েড করে আপন সুখের পথে চলতে পারতে। চল ফিরে চল, আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাব। আমার তোমাদের কীর্তিহাট দেখা হয়ে যাবে। তোমার বাবা আমার কাছে তোমাদের কীর্তিহাটের গল্প করতেন। কীর্তিহাট আমার কাছে ড্রীমল্যাণ্ড হয়ে আছে আজও পর্যন্ত। একটা মহলের কথা বলতেন 'বিবিমহল'। ওয়াণ্ডারফুল নাম। জাস্ট লাইক দি মুঘলস রঙমহল। চল।

কিন্তু তা আমি শুনি নি। বলেছিলাম, আমাকে তুমি মাফ কর। আমি স্থির করে ফেলেছি। এবং আই ড্রিঙ্কার উইথ ইউ, এই-ই আমার পথ। একমাত্র পথ। জমিদারের

ছেলে আমি, আমাকে জমিদারের ছেলের মতই বাঁচতে হবে, যদ্দিন বাঁচব এবং মরতে হলেও জমিদারের ছেলের মত মরতে হবে এবং তাই মরব।

—কিন্তু গৌতম-বুদ্ধ কি রাজার ছেলে ছিলেন না? তিনি কি রাজ্য ছেড়ে, সুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়ে—

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলেছিলাম—না, ওই একটা-দুটো ইতিহাসের নাম আমার কাছে অনুগ্রহ করে করো না। বুদ্ধ গৌতম একটা, হয়তো বা ইতিহাসে নাম ওঠে নি এমন সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া রাজা-জমিদারের ছেলে আরও একশো-দুশোও ছিল বা আছে। কিন্তু ওদের উল্টো মানুষের সংখ্যা কোটি দরুনে। আড়াই হাজার বছরে অনেক কোটি। প্লিজ লিভ মি। তুমি তোমার পথে যাও। আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি।

পরের দিনই আমি মিস মালহোত্রাকে এড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। অজন্তা গুহা দেখব এবং সেখান থেকে হায়দ্রাবাদ।

নিজামের হায়দ্রাবাদ।

হায়দ্রাবাদ নিজাম হারেমে ক্ষুধিত পাষাণের সুন্দরীরা জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। হায়দ্রাবাদের চৌক-বাজারে রূপের হাটের জৌলুষে প্রদীপ আপনি জ্বলে ওঠে; সেখানকার গান-বাজনা-নাচের আসরে সেতারের তার আর্তনাদ করে ছিঁড়ে যায় না, তবলার বোলে ভুল হয় না, গানের তাল কাটে না।

১৯৪০ সাল সুলতা! আমার বয়স তখন তিরিশ। বিলেত থেকে এক বছর থেকে ফিরেছি। আমার নিজের রূপের জলুষ তখন কম ছিল না। বম্বেতে নতুন করে সব সরঞ্জাম কিনে নিলাম। কল্পনা ছিল সারাজীবনের সরঞ্জাম যোগাড় করে নিচ্ছি।

রঙ, তুলি, ইজেল ক্যানভাস কিনলাম নতুন করে। শুনে হয়তো তোমার মনে হচ্ছে যে, অজন্তায় গিয়ে পৃথিবীবিখ্যাত ফ্রেস্কোগুলোর নকল করব; কিন্তু না! ওসব তো অনেকে করেছেন। স্বয়ং নন্দলাল বসু করেছেন, অসিত হালদার মশাই করেছেন, আরও অনেকে করেছেন। আমি ওর জন্য এসব সরঞ্জাম কিনি নি। ওসব কিনেছিলাম, অপরূপ রূপসী অবশ্যই দেখতে পাব, তাদের ছবি আঁকব বলে।

আর কিনেছিলাম একটা দামী বেহালা, আর বাঁশের বাঁশী। বাজাব। গান-বাজনার আসরে তেমন গান শুনলে আমি বাজিয়ে সঙ্গত করব।

সুরেশ্বর বললে—সংসারে মানুষের জীবনে কার্যকারণেই হোক বা ভবিতব্যের বিধানেই হোক, যা ঘটবার তার বিপরীত কিছু ঘটানো যায় না। সংকল্প করেও তা ঘটাতে পারে না মানুষ। দু-এক ক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তিশালী মানুষ সংকল্প করে ঘটনার গতিরোধ করে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দাম দাঁড়ায় যৎসামান্য।

আমি সংকল্প করেছিলাম—নিজেকে আমি ভাসিয়ে দেব বা রায়বংশের বড় বড় পুরুষগুলির জীবন যে খাতে প্রবল স্রোতে বয়ে গেছে সেই খাতে সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেব; কোন খালেবিলে বা পঙ্কপল্বলের মধ্যে হারিয়ে যাব।

হারা রায় এবং শম্পা রায়ের বিবরণ আমাকে উন্মাদ করে তুলেছিল এবং মিথ্যে কথা বলব

না, জীবনে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেও যে তীব্র কামনায় উন্মাদের মত রাবণ সীতাকে হরণ করেছে, শিব মোহিনীর পিছনে ত্রিভুবন ছুটেছে সে কামনা আমি অনুভব করি নি। ইংল্যাণ্ডে শম্পা রায়কে দেখে আমার জীবনকামনা তীব্র হল— আমাকে বললে, "তীব্র হও তুমি। মত্ত হও তুমি।"

বম্বেতে এসে কয়েক দিন মদ খেলাম, আর রায়বংশের হিসেবনিকেশ করলাম। এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, তুমিই বা এমন পশুর মত বা ওয়ারেন্টের আসামীর মত এমন ভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? দোহাই তোমার, ছিঁচকে চোর তুমি হয়ো না, দুর্ধর্ষ গুণ্ডা হও। পিতৃপুরুষের পথ ছাড়া তোমার পথ নেই, আর সে পথে পায়ে হেঁটে কোন কিছুর আড়াল দিয়ে চলবার উপায় নেই, ও-পথে রাবণের পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটতে হবে— অথবা রথে চড়ে ছুটতে হবে।—তাই ছোটো।

রঙ-তুলি বেহালা বাঁশী কিনে বম্বে থেকে এলাম হায়দ্রাবাদ। জাঁকজমক করে হায়দ্রাবাদের বড় হোটেলে উঠলাম। হোটেলেই ভালমন্দ সকল পথের পথিকদের পথ দেখাবার জন্যে পথের দিশারী আছে। তাদের বকশিশ দিলাম। সেলাম নিলাম। সব আয়োজনই করলাম কিন্তু ভেসে যেতে পারলাম না, রায়বংশের জীবনস্রোত আমাকে ওই খাতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল না—আরও একটা খাত বেয়ে গিয়েছিল, কীর্তিনাশা পদ্মার প্রবল স্রোতকে পাশে রেখে ভাগীরথীর ধারার মত সেই খাতে আমাকে টেনে নিয়ে গেল।

ভাগীরথী আর কীর্তিনাশা নাম দুটো ব্যবহার করছি বলে ভেবো না নিজেকে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করছি, রায়বংশের মুক্তিদাতা উত্তরপুরুষ বানাচ্ছি নিজেকে। না, তা বানাচ্ছি না। ভাগীরথীর বদলে 'হুগলী নদী' বলব না বলছি তা'হলে।

আমি পারলাম না ভেসে যেতে; ওই উদ্দাম জীবনস্রোত যেন ব্যঙ্গ করে ঢেউয়ের ধাক্কায় ক্ষীণস্রোতা পাশের ছোট শাখাটার মুখের দিকেই ঠেলে দিলে।

একটু থামলে সুরেশ্বর, তারপর বললে—তা ছাড়া সুলতা, তুমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা, তুমি একথা নিশ্চয় মানো যে, মানুষের জীবনের গতি এবং তার পরিণতি শুধু তার ব্যক্তিগত এবং বংশগত ভাগ্যলিপি বা কর্মচক্রেই চলে না; কালের একটা হাওয়া আছে মহিমা আছে। সেটা চিরকাল আছে। ভাগীরথী যেদিন এসেছিলেন এবং সমুদ্রে মিশেছিলেন, সেদিন শুধু অভিশপ্ত সগর-সন্তানেরাই উদ্ধার হয় নি—আরও বহু বহু হয়তো কোটি কোটি পতিত আত্মা উদ্ধার পেয়ে গিয়েছিল পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার জলের মহিমায়। কালের মহিমা বা হাওয়াও সাহায্য করেছিল।

কালটা ১৯৪০ সাল, মার্চ মাস। ইয়োরোপে পোল্যাণ্ডের করিডোর নিয়ে শুরু যে যুদ্ধ তা ধীরে ধীরে ক'মাসে গোটা পোল্যাণ্ডের উপর ভারী রোলারের মত গড়িয়ে চলে এবার দ্রুতবেগে চলতে শুরু করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া অর্ধেক পোল্যাণ্ডের ভাগ নিয়ে ওদিকে ফিনল্যাণ্ড নিয়েছে। এদিকে জার্মানী নরওয়ে দখল করে ফ্রান্সে ঢুকে, ব্লিৎসক্রিগ চালিয়ে ফরাসী এবং ইংরেজ বাহিনীকে ঠেলে নিয়ে চলেছে ইংলিশ চ্যানেলের দিকে। ব্রেনার গিরিবর্তে হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করেছেন।

সারা ভারতবর্ষ থমথম করছে। প্রতীক্ষা করছে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস কোন্ নির্দেশ দেবেন মানুষকে। অন্যদিকে ভারতবর্ষ প্রতীক্ষা করছে সুভাষচন্দ্র কি বলবেন! কংগ্রেসের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহতারা কি বলবেন! কি নির্দেশ আসবে। যে নির্দেশ যিনি দিন, সে নির্দেশ মারবার এবং মরবার হুকুমের চেয়ে কম হলে বুক ভরবে না কারুর। সে সামান্য নিরক্ষর জনেরও না।

সুলতা, এমন সময় যখন আসে তখন এমন একটা হাওয়া বয়—যেটা বৈশাখী দুপুরের হাওয়ার মত আগুনকে দ্বিগুণ করে জ্বালিয়ে তোলে। সে সময়ে সর্বনাশের নেশা লাগে বটে কিন্তু সুরা আর নারী নিয়ে ব্যভিচারের নেশা নয়। সে নেশা ঠিক তার উল্টো নেশা।

হায়দ্রাবাদের একটা ঘটনা বলি। ঘটনাটা শিলালিপির মত অক্ষয় হয়ে আছে বুকে। সুভাষচন্দ্র ১৯৪০ সালের ১৮ই মার্চ রামগড়ে আপোসবিরোধী সম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেই বক্তৃতার কাগজ মদের গ্লাস হাতে করে পাশে সরিয়ে দিয়েছি কিন্তু আশ্চর্য, নেশা জমে নি এবং কখন যে গ্লাসটা নামিয়ে কাগজখানা টেনে নিয়েছি তা খেয়াল করি নি।

ঘণ্টা দুয়েক বসেছিলাম এইভাবে।

কালটাই ছিল সুরা ও নারীর নেশা ছাড়বার ছুটবার কাল; নেশা করব বলে সংকল্প করলেও সে সংকল্প রাখতে পারি নি। তাছাড়া আরও এক ধরনের মানসিক বিভ্রান্তি ঘটত, সেটাও আমার এই জবানবন্দীর মধ্যে বলে যাই।

সেটা শুধু আমার জীবনের সত্যই নয়, গোটা রায়-বংশেরই জীবনসত্য সেটা। মদের নেশার ঘোর বাড়লেই চোখে কেমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটত।

সেদিন হায়দ্রাবাদের হোটেলে নিজেকে সবে প্রস্তুত করে নিচ্ছি; প্রস্তুত অর্থে সুলতা মদের নেশাটাকে বেশ প্রখর করে তুলে মনে মনে ভাবছি রায়বংশের ধুরন্ধর রায়দের কথা; কুড়ারাম রায় ভটচাজের বৈষ্ণবীর কথা, সোমেশ্বরের সেই মনোহারিণী ব্রাহ্মণকন্যার কথা, শ্যামাকান্তকে বর্ষার কাঁসাইয়ে ফেলে দিয়ে যাকে তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন, বিকৃতমস্তিষ্কা কামার্তা মেয়েটা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরত। বিশদ বিবরণ থাক, সবই জান, মোট কথা রায়বংশের রুচি ও রীতিগুলোকে স্মরণ করে নিজেও এই ছাঁচে নিজেকে ফেলব বলে তৈরী হচ্ছি—এমন সময় হোটেলের দালাল এসে সেলাম জানিয়ে দাঁড়াল। বললাম—কি খবর?

সে দুটি বাঈকে নিয়ে এসেছে; অর্থাৎ দেখাতে এনেছে। এরাই নাকি হায়দ্রাবাদের রূপের হাটের সব থেকে সেরা রূপসী পসারিণী, এবং রূপের হাটে রূপ ছাড়া যে গুণের প্রয়োজন সেই গুণের অধিকারিণী—নাচা-গানায় অদ্বিতীয়া; দালাল বললে—ই দোনোকে জুড়ী বাঈ তামাম হায়দ্রাবাদমে নেহি মিলেগী। বললে—ওরা বাইরে বসে আছে, ডাকব ভিতরে?

কেমন সংকোচ বোধ করলাম। মোট কথা, ব্রজদার শেকালির পাড়ায় যে সংকোচ অনুভব করেছিলাম, সেই সংকোচ আড়ষ্ট করলে আমাকে। ব্রজদার শেফালির পাড়াতে তবু তো দয়া করুণা উদারতার বাস্কেট মাথায় করে দয়া চাই করুণা চাই হাঁক দিয়ে আড়ষ্টতা কাটিয়েছিলাম, ব্রাভাডো ছিল, এখানে তার কিছুই পেলাম না এবং নার্ভাস হয়ে বললাম—

"না—ডাকতে হবে না"।

—তা হলে?

—বারান্দায় বসে আছে বলছ?

—হাঁ হুজুর, যেখানে লোকজন এসে বসে।

আমি বললাম, আমি বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে ওদের দেখে আসছি। বুঝেছ?

সে বললে—আপনি কেন সরম করছেন হুজুর। এখানকার হালই এমনই। ওরা ডাকলে হোটেলে আসে। নাচ-গানা এখানে ভাল হয় না কিন্তু—।

সুরেশ্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বাকীটা তুমি বুঝতে পারছ সে কি বলেছিল। বোধ করি হোটেল-জগৎটাতেই এ-রীতি—সেই অন্ধকার কাল থেকে একাল পর্যন্ত সমগৌরবে এবং কালোপযোগী পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে খোলস বদলে বদলে সমান শ্রদ্ধায় চলে আসছে।

ট্রেড-জগৎ বড় বিচিত্র জগৎ; ট্রেডের মধ্যে অনেস্টি আছে এবং অনেস্টিই হল সব থেকে বড় ক্যাপিটাল কিন্তু শুচিবাই এখানে অচল। শুচিবাই চলবে না। অনেস্টির জন্য হোটেলে মেয়েদের আনাগোনা করতে দিতে হয়। না দিয়ে উপায় নেই।

তত্ত্ব আলোচনা থাক। যা ঘটেছিল বলি—আমি তাদের দেখে এলাম। বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়ে দুটি পরস্পরকে ইসারা করে হাসাহাসি করতে লাগল। এবং হাসের সঙ্গে কিছুটা লাজ আপনি তাদের সারা অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ল। ভাল লাগল আমার।

মুসলমানী বাঈজী। একজন কিশোরী; সেই তরুণী এবং অন্যজনের নাম জুলিখা, সে পরিপূর্ণ যুবতী। রবীন্দ্রনাথের 'দে লো সখি দে, পরাইয়ে গলে সাধের বকুল ফুলহার' গানের গায়িকার মত যুবতী। তার মাথার ঝিঁঝি ওড়নাখানা সত্যই বার বার মাথা থেকে খসে পড়ছিল। বার বার সে তুলে নিচ্ছিল কাঁধাচ্ছলে। হঠাৎ কোথায় কোন্ ঘর থেকে কলিংবেল বেজে উঠে আমাকে চমকে দিলে; আমি অপ্রস্তুত হয়ে ঘরে ফিরে এলাম; দালালটাও আমার পিছন পিছন এল এবং আমার সোফার পাশে দাঁড়িয়ে বললে—আব ফরমাইয়ে বাবুসাব। হুকুম তো হো যায় আপকা।

আমি মদের গ্লাস যেটা রেখে গিয়েছিলাম সেটা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললাম—ঠিক হায়। সন্ধ্যার পর যাব, মহফিল হবে।—

—বলুন কাকে চাই!

ভেবে ঠিক করতে পারি নি, রূপ চাই না যৌবন চাই, নাচ চাই না গান চাই—এর তো এক মুহূর্তে মীমাংসা হয় না। যারা মীমাংসা করে নিতে পারে, তারা রূপও চায় না যৌবনও চায় না, গানও চায় না, নাচও চায় না, চায় একটি নারীদেহ। তারাই সংসারে বেশী। সুলতা, আমি বোধ হয় তা নই। রায়বংশে জন্মে যে কেমন করে এমন হয়েছি আমি একথা ভেবে পাইনে। কালের কথা বলেছি, বাবার জীবনের চরমতম ট্র্যাজেডির কথা জান, মায়ের চোখের জল দেখেছি, ধনেশ্বরকাকার দৈত্যের মত ছেলেটার পরিণাম—তাও আমার চোখের

সামনে ঘটল—হয়তো সেই জন্তে এমন আমি। তার উপর আমি আর্টিস্ট—শুধু দেহ নিয়ে আমার মন ভরে না, আমি বোধ হয় রূপ যৌবন গুণ অর্থাৎ নাচগান বিচার করতে চাই। তাই বলেছিলাম—দুজনেই থাকবে মজলিসে। একজন গাইবে, একজন নাচবে।

লোকটা সাবাস সাবাস করে উঠেছিল এবং বড়রকম মক্কেল মনে করে বার বার তসলীম জানিয়েছিল। ফলে রাত্রে ওদের আস্তানায় যে মজলিসের আসর বসেছিল—তাতে জলুষের একটু বাড়াবাড়ি করেছিল। সেটা আমাকে কায়দা করবার জন্য বা গাঁথবার জন্য।

আমার খারাপ লাগে নি।

জীবনে রাজাগিরি, বাদশাগিরি, নেতাগিরি যাই বল না কেন সবই বলতে গেলে 'আবু-হোসেনি' ব্যাপার।

আবুহোসেন নিশ্চয় জান—আরব্য উপন্যাসের গল্প, হারুণ অল রশিদের হুকুমে মসরুর দেউলেপড়া উদার বণিকপুত্রকে রাত্রির মত বাদশা বানিয়ে দিয়েছিল। গিরিশবাবুর একখানা নাটক আছে এই উপাখ্যান নিয়ে। আবুহোসেন সেজেই বসেছিলাম খুশীর সঙ্গে।

গ্রীষ্মকাল। আরব সাগর বা বঙ্গোপসাগরের জলো বাতাসের কলক তখনও নিজাম রাজ্যে এসে পৌছয় নি; গরমের মেজাজ তখন চড়া কিন্তু মুসলমানী আমীরিয়ানার ব্যবস্থায় আরামের আয়োজনের ঘাটতি ছিল না। সে তোমার গোলাপজলের ঝাঁঝরিওয়ালা পিচকারি, গোলাপ-পাশ, বেলকুঁড়ির মালা, সুবাসিত পান, আতর, ঠাণ্ডাই শরবৎ নিয়ে জাফরীকাটা আলসে-ঘেরা খোলা ছাদের উপর আসর বসেছিল একটি খণ্ড স্বপ্নলোকের মত। তার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দান ইলেকট্রিক লাইট ফ্যান।

বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা বীয়ার এবং দামী হুইস্কি। সারেঙ্গীদার তবলচীরা বসেছে গোঁফে তা দিয়ে, গলায় বেলকুঁড়ির মালা দুলিয়ে।

মেয়ে দুটি সেজেগুজে এসে বসল, সঙ্গে সঙ্গে দুটো বড় স্ট্যাণ্ডিং লাইটের সুইচ অন করে দিলে। আমি অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এত রূপ! বা রূপের এত ঐশ্বর্য! রূপকে এমন অপরূপ করা যায়, যা পুরুষের মনকে মুহূর্তে লালসার কামনায় জ্ঞান-কালপাত্র সব ভুলিয়ে দিতে পারে!

সঙ্গীতের যন্ত্রের সুর বাঁধা হচ্ছিল। আমি তাকিয়েছিলাম এই ওদের দিকে। ইংল্যাণ্ডে ঠিক এই ধরনের পরিবেশ হয় নি। এমন করে পুরা সজ্জা করে অপরূপ হয়ে মন ভুলাতে পারে না। অবশ্য হোটেলে নাচ হয়, সেখানে মেয়েরা সেজে আসে। তার মধ্যে তনুদেহের অনাবৃত বিজ্ঞাপন পুরুষকে চঞ্চল করে তোলে। বুকের মধ্যে রক্তধারা বাঁধভাঙা নদীস্রোতের মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার থেকেও ভারতীয় প্রথা যেন বেশী মোহময়ী।

যুবতী মেয়েটি একেবারে গৃহের গৃহিণীর মতই অতিথিসৎকারে তৎপরা হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে প্রথম পানের খিলি এগিয়ে দিলে, তারপর বোতল থেকে ঢেলে গ্লাস পূর্ণ করে সোডা মিশিয়ে একটি পরাতে করে আমার সামনে ধরে দিয়ে উর্দুতে বললে—খেতে হুকুম হোক রাজাবাবু!

আমি গ্লাসটি নিয়ে বললাম—তোমার নাম জুলেখা!

—আমি হুজুরের বাঁদী।

—তোমরা খাবে না?

—হুকুম হলে খাব। কিন্তু হুজুরকে নাচা-গানায় খুশী করতে হবে।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাকে দেখছিলাম। গ্লাসটা শেষ করে নামিয়ে দিলাম—তখন গান সবে শুরু হয়েছে। চোখ বুজে শুনতে লাগলাম। ভাল গায় মেয়েটি। সত্যিকারের ভাল গায়।

এরই মধ্যে ঠুং করে শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি গলার ডাক শুনলাম—বাবুসাব!

চোখ মেলে দেখলাম, তরুণী মেয়েটি গ্লাস ভরে নিয়ে সামনে ধরেছে। আমি হেসে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটি নিলাম। নেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বীরেশ্বর রায়ের কথা। সোফিয়াকে নিয়ে বীরেশ্বর রায় এমনি ভাবেই জানবাজারের বাড়ীতে আসর পাততেন।

মনের মধ্যে যেন একটা আমীরি আমেজ অনুভব করছিলাম। পকেটে হাত দিয়ে আমার টাকার থলিটা নাড়লাম—বকশিশ দেব। গ্লাসটা চুমুক দিয়ে শেষ করে নামিয়ে দিয়ে বললাম—আবার ঢালো!

মেয়েটি ঢালতে লাগল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। মেয়েটি গ্লাসটি আমার হাতে ধরিয়ে দিতেই আমি বললাম, এটা তুমি খাও।

মেয়েটি ফিক করে হাসলে।

তারপর গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে নামিয়ে রেখে আমার সিগারেটের টিন থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে ডান হাতখানা আমার সামনে পেতে বললে, টাকা দাও বাবুজী!

আমি একটু বিস্মিত হলাম। চলে যেতে চায় নাকি?

মেয়েটা বুঝতে পারলে আমার মনের প্রশ্ন। সে বললে—মুজরায়—গানাবাজানায়-নাচনায় আসরে দারু আমরা খাইনে বাবুসাহেব, দারু খাই মহব্বতির আসরে। আমার সঙ্গে মহব্বতি করতে হলে সে অনেক টাকার কারবার বাবুজী। তবে বকশিশ করলে আমরা কিছু কিছু দারু খাই। প্রথমেই তো কিছু বকশিশ করো।

আমি স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হাতখানা পেতে মেয়েটা সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বললে, আমার পাওনা বকশিশ দাও বাবুজী!

মদের নেশার মধ্যে আমি চমকে উঠলাম। আমার মনে পড়ে গেল, আর একজনের কথা, ঠিক এইভাবে সিগারেট টানতে টানতে, আমার সিগারেটের টিন থেকেই সেও সিগারেট নিয়েছিল, বলেছিল—give me my dues.

নবা নাইট ওরফে শম্পা রায়। যাকে দেখে মনে হয়েছিল যেন রায়বংশের মুখের গড়নের সঙ্গে ছাঁচের সঙ্গে একটা মিল আছে। সেও বলেছিল—give me my dues.

ফিরোজা—ফিরোজা মেয়েটার নাম, সে তখনও বলছিল—দাও বাবুজী, আমার পাওনা বকশিশ দাও!

পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে তাকে দিয়ে নিজেই টেনে নিয়ে-

ছিলাম হুইস্কির বোতলটা এবং একটা নতুন গ্লাস।

পর পর বোধ হয় দু'তিন গ্লাস মদ খেয়েছিলাম। মনের মধ্যে কি যেন একটা আতঙ্কের মত পাক খাচ্ছিল—যেন কত উদ্বেগ বুকে জমা হয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে ভারী হয়ে উঠছিল। মনে পড়ছিল রায়বংশের ইতিহাস। যে ইতিহাস আমি সেটেলমেণ্টের সময় গবেষকের মত পড়েছি-জেনেছি। কুড়ারাম ভটচাজ থেকে যোগেশ্বর রায় আমার বাবা পর্যন্ত সকলকে মনে পড়েছে, মেজকাকু শিবেশ্বর রায় এবং তার ছেলে ব্রজেশ্বর আর সেই দৈত্যটাকে মনে পড়েছে আর ভয় পেয়েছি। ক্রমাগত একটা প্রমত্ত উল্লাস নাচতে নাচতে দু হাতে ডাক দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল আর তার পিছনে পিছনে আসছিল একটা ভয়ঙ্কর ছায়া—সে আসছিল দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে।

এরই মধ্যে আমার মদের নেশার প্রভাবে আমার চোখে কি করে যে ওই তরুণী মেয়েটার চেহারা পাল্টে গেল তা আমি জানি না। কিন্তু বিশ্বাস কর—গেল। একেবারে পাল্টে গেল। ফিরোজার পোশাক ছিল সেদিন চুড়িদার পায়জামার উপর পেশোয়াজ কাঁচুলি ওড়না, নাকে গয়না, কানে গয়না, কপালে টিকলির ধুক্‌ধুকি, ঘন মেঘে কালো তৈলচিক্কণ চুলে জরি জড়ানো লম্বা বেণী ; গলায় জড়োয়ার কণ্ঠী। হাতে কঙ্কণ চুড়ি। কিন্তু আমার মনে হল ফিরোজা নয়, এ সেই শম্পা নয়, অবিকল শম্পা নয়—সে কোন থিয়েটারের গ্রীন রুম থেকে পাকা মেকআপ-ম্যানের হাতে হায়দ্রাবাদের নাচওয়ালী সেজে এসেছে।

বার বার মুখের দিকে তাকালাম। কিছুতেই ফিরোজাকে আবিষ্কার করতে পারলাম না। তার এতটুকু সন্ধান মিলল না। শম্পা নয়। অবিকল রায়বাড়ীর ছাঁচের মুখ।

বার বার অস্বীকার করলাম—না, নয় নয় নয়।

স্থিরদৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়েই মনের ভ্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম—অস্বীকার করছিলাম, না—নয় নয় নয়

মেয়েটা তখন ওই যুবতী গাইয়ে মেয়ে জুলেখার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছিল।

আমি ডাকলাম—শোন!

সে মুখ ফেরালে—ফরমাইয়ে।

এবার মনে হল, না—শম্পা নয়—সে মেয়েটা মেমসাহেব। এ এ-দেশের মেয়ে, কিন্তু ফিরোজা নয়। মুখে রায়বাড়ীর ছেলেমেয়ের মুখের ছাপ রয়েছে। অবিকল রয়েছে এতটুকু ভুল হয় নি আমার।

মনে হল—অনেকটা অর্চনার মত দেখতে।

হাঁ, অর্চনার মত।

আমি চোখ বন্ধ করে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললাম—আঃ!

ফিরোজা আমার গায়ে হাত দিয়ে বললে—বাবুজী!

আমি চমকে উঠে সাপ দেখে যেমন সরে যায় তেমনি করে সরে গেলাম। সকলে চমকে উঠল। গানের আসর ভেঙে গেল।

—কি হল—বাবুজী—বাবুজী!

—বুঝ না। পানি। এক গিলাস পানি—

ঠাণ্ডা জল নিয়ে এগিয়ে এল জুলেখা যুবতী মেয়েটি। আশ্চর্য, জুলেখার মুখের চেহারাও যেন পাল্টে গেছে!

তার মুখেও দেখেছিলাম যেন রায়বাড়ীর কোন বধূর মুখ! ছবিতে দেখা মুখ।

আবার মনে হয়েছিল, না। রায়বাড়ীর কর্তাদের কোন অঙ্কগৃহীতার মুখ। ঝপ করে ভেসে উঠেছিল মিস মালহোত্রার মুখ। না। পরমুহূর্তে মনে হয়েছিল—না, তার মত নয়। তবে কারুর মত বটে। তাকে হয়তো চিনিনে। হয়তো সোফিয়া।

আমি আতঙ্কিতের মত উঠে দাঁড়িয়ে দালালটাকে বলেছিলাম—আমার শরীর খুব খারাপ মালুম হচ্ছে, ট্যাক্সি ডাক। আমি হোটেলে ফিরব। দুখানা একশো টাকার নোট দিয়ে বলেছিলাম—জলদি করো। জলদি।

জুলেখা এসে আমার হাত ধরে বলেছিল—বাবুজী, বাবুজী, বাবুজী!

আমি ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠেছিলাম এবং বলেছিলাম—ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, ছোড় দো—মুঝে ছোড় দো। মুঝে ছোড় দো!

আমাকাজের আর্তনাদের প্রতিধ্বনি বোধ হয় আমার কথার মধ্যে ফুটে উঠেছিল সুলতা।

আমি সেই যে হায়দ্রাবাদের জুলেখা বাঈয়ের বাড়ী থেকে পালিয়ে এলাম, তারপর আর জীবনে নারীর জীবন-যৌবন-নীরে অবগাহন করতে ছুটে যাই নি। একটা ভয়, হ্যাঁ, একটা ভয় যেন আমার পা টেনে ধরত। কত সুন্দরী মেয়ে—কেউ আমার রূপে, কেউ আমার শিল্পী-খ্যাতির আকর্ষণে, কেউ আমার অর্থের জন্যে আমাকে আকর্ষণ করেছে, আমিও আকর্ষণ অনুভব করেছি, কিন্তু তবু এগুতে পারি নি। কেমন যেন ভয় পেয়ে এক পা এগিয়ে দু পা পিছিয়ে এসেছি। মনে মনে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি—কেন? এমন হয় কেন? নারীর জীবনস্রোত যৌবনের রূপের খাতে অনন্তকাল বইছে এবং পুরুষেরা দলে দলে ছুটে এসে সেই আদিকাল থেকে এই স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। সেখানে আমি তার তীরের ঘাটে এসে ভয় পেয়ে জলাতঙ্ক রোগীর মত ফিরে যাচ্ছি কেন?

কত রকম মনে হয়েছে। সে-সব কথা থাক। এক-একবার ভেবেছি—কোন মনের ডাক্তারের কাছে যাই। কিন্তু যাই নি। কি হবে গিয়ে, তারা যা বলবে সে আমার অজানা ছিল না।

আমি তো বুঝতেই পারছি—এ আমার ভ্রম—মনের ভ্রম। আমার বাবার জীবন, মায়ের মুখ, মেজদাদু শিবেশ্বর রায়ের পরিণাম—তাঁর দৈত্যের মত পৌত্রটার পরিণতি, চোখে দেখে এবং রায়বাড়ীর দপ্তর ঘেঁটে এ-বংশের নারীজীবন নিয়ে একটা অস্বাভাবিক আসক্তির ইতিহাস পড়ে আমার মনের অবস্থা এমনি হয়েছে। ব্যাধি আমার ওইটেই। রায়বংশের ইতিহাসকে আমাকে ভুলতে হবে। মনের ডাক্তার আমাকে এই কথাই বলবেন তা আমি জানতাম। বলবেন—ভুলে যান। ওসব ভুলে যান। পৃথিবীতে এইটেই চিরকালের নর-নারীর জীবনের ধারা। আপনাদের বংশের প্রতাপ ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, অর্থ ছিল, সম্পত্তি ছিল, স্বাভাবিক ভাবে আপনাদের বংশের পূর্বপুরুষেরা weaker Sex-কে টাকা দিয়ে কিনেছেন, প্রতাপ-

প্রতিপত্তিতে কেড়ে এনেছেন—কেউবা হয়তো পুরানোকালের বিশ্বাসবশে ধর্মসাধনা করে Spiritual Power দিয়ে মেয়েদের আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। অবশ্য এই পাওয়ার কি, তা তাঁরাই জানেন। যখন যেমন যুগ। ফরগেট অল দোজ থিংস। এ-কালে যেমন যুগ সেইভাবে কোন নারীকে জীবনে পাবার চেষ্টা করুন এবং বিশ্বাস করুন, আপনি শুধু আপনার নিজের জন্মে রেসপন্সিব্‌ল, অন্য কারুর জন্যে নয়; এমন কি কাল কি করেছেন, তার জন্মে অনুশোচনা না করে বিগিন লাইফ উইথ এ ক্লীন স্লেট ফ্রম টু ডে এবং তার মধ্যেই দেখবেন আপনি পাপীও নন পুণ্যাত্মাও নন, আপনি একজন গুড সিটিজেন। সহজ মানুষ। এর সবই আমি মানি—এ আমারই কথা সুলতা, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই সুলতা, তা আমি পারি নি। কিছুতেই পারি নি। এর জন্মে যে আমাকে যা বলবে আমি প্রতিবাদ করব না, মেনে নেব।

মনে কেমন একটা সংকল্প জাগল, রায়বাড়ীর অন্য শাখার স্রোত যতদিন চলে চলুক, যতদূর চলে চলুক, দেবেশ্বর রায়ের ছোটছেলে যোগেশ্বর রায়ের জীবন ধরে যে স্রোত এখন সুরেশ্বর রায়ের দেহের খাতে বেয়ে চলেছে, তাকে আমি শেষ করে দেব এবং রায়বাড়ীর সম্পত্তির শক্তিবলটাকেও নিঃশেষিত করে দেব। নানান রকম কল্পনা করতাম, কখনও কল্পনা করতাম গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ করে জমিদারীর মালিকানা তার হাতে দেব—কখনও ভাবতাম সরকারকেই ইস্তফা দিয়ে যাব। মেদিনীপুরে গভর্নমেন্টের খাস জমিদারী অনেক আছে, সেইমত ব্যবস্থা হবে। কখনও ভাবতাম বিক্রী করে দিয়ে সেই টাকায় একটা বড় কিছু করে দিয়ে যাবে। যার থেকে রায়বংশের কোন শাখার কেউ যেন একটুকু পাথের না পায়।

ভেবেছিলাম কোন একটা আশ্রমে চলে যাব। ১৯৪০।৪১ সাল। কালের দিক থেকে একটু বিলম্বিত হলেও, কালটায় আশ্রমবাসী হওয়ার একটা ঝোঁক তখনও বিগত হয় নি। কিন্তু তা-ও পারি নি; কারণ ঈশ্বর ধর্ম-ধ্যান-জপ এ আমার পক্ষে বিষম বস্তু ছিল। কীর্তিহাটে ঠাকুরবাড়ীতে যেতাম চরণোদক খেতাম না, মাথায় নিতাম, বাল্যভোগের প্রসাদ দু-চার দিন খেয়েছি, এ-সবই সত্যি, মিষ্টি ফল আমিই কিনে দিতাম—খেতেও মিষ্ট লাগত, প্রণামও করেছি—তার মধ্যে ভক্তি কিম্বা সত্যবোধ ছিল না সুলতা, যখনই ঠাকুরবাড়ী গেছি, যখনই ঠাকুরদের কথা ভেবেছি তখনই মনে হয়েছে, ওই কালীঠাকুরণটির এবং রাধাসুন্দর-ঠাকুরটির আমি অন্নদাতা পিতা। ওরা একান্তভাবে আমার। তবে মুখে সেটা কোনদিন প্রকাশ করি নি। আমাদের দেশে তো ঠাকুরে ঠাকুরে লড়াই হয়, এবং সে-লড়াই তাঁরা করেন ওই পালক-পিতাদের হুকুমে। বিসর্জনের সময় কার প্রতিমা আগে যাবে এই নিয়ে বড় বড় খুন-জখম এবং খুনের মকর্দমার নজীর পাবে হাইকোর্টে। ছোটতরফ বড়তরফের কালী-প্রতিমারা ছোটবাবু আর বড়বাবুর হুকুমে নদীর দিকে ছুটেছে; এ ওর পথ আগলেছে, ও এর পথ আগলেছে। লড়াই করতে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়েছে। মুসলমানদের তাজিয়া নিয়েও এমন মামলা বছর বছর হয়। সুতরাং ধর্ম বা ধর্মের আখড়ার দিকে আমার আকর্ষণ কিছু ছিল না। ইদানীং অবশ্য অনেক ভোগী মডার্ন সন্ন্যাসীদের আশ্রম হয়েছে, যেখানে তপস্যা থেকে ভোগ বড়, কিন্তু তাদের প্রতিও, আকর্ষণ ছিল না।

আমি চেয়েছিলাম জীবনে মুক্তি। সে-মুক্তি কেমন করে কোন্ পথ ধরে আসবে জানি না, তবে চেয়েছিলাম তাই।

বিশ্লেষণ করে বলতে পার জমিদার বা ধনীপুত্রের আর এক ধরনের মনোবিলাস। আমি অস্বীকার করব না। অনেকটা তাই-ই বটে। সেকেণ্ড ক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করে দক্ষিণ থেকে শুরু করে উত্তরাবর্ত অভিমুখে মুক্তি খুঁজতে খুঁজতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ তাতে ছেদ পড়ল। সময়টা কালীপুজোর পর সম্ভবতঃ রাস-পুর্ণিমার আগের দিন—আমি ছিলাম তখন হরিদ্বারে। হরিদ্বার বড় ভাল লেগেছিল। ভাবছিলাম এই অঞ্চলেই শেষ জীবনটা কাটিয়ে দিলে কেমন হয়। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ লছমনঝোলা পর্যন্ত অঞ্চলটির কোন একটি স্থানে একখানা ঘর বানিয়ে ছবি এঁকে জীবন কাটালে কেমন হয়? হঠাৎ অর্চনার চিঠি এল। কলকাতা থেকে অর্চনা লিখেছে—

সুরোদা,

বৃন্দাবন থেকে খবর দিয়েছে বড়ঠাকুমা, লিখেছেন এবার আমি যাব। লিখেছেন তোমাকেই, লিখেছেন—ভাই, কীর্তিহাটের বড়বাবু আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি রায়দের সঙ্গে বন্ধন কেটে চলে এসে বৃন্দাবনে আমার ভিক্ষে-শাশুড়ীর দাপের অন্নের পিণ্ড গোবিন্দের নাম নিয়ে খেয়ে বেঁচে আছি। ছেলেরা খোঁজ করে নি। আমার বাপের লাখ টাকা ছিল, তা ছেলেরা ঘর ছেড়ে চলে এসেছি বলে নিজেরা নিয়েছে। তাতে ক্ষোভ ছিল না, খেদ ছিল না। তারা ভুলেছিল তাতেও মনে ভাঁটা পড়েছিল—হঠাৎ তুই বার-দুই এসে ঠাকুমা বলে ডেকে নতুন করে রায়বাড়ীর ছেঁড়া বাঁধনে গিঁট বেঁধে বেদনা জাগিয়ে দিয়ে গেলি। মনে পড়ল আমার সব ছিল—স্বামী-পুত্র, বিষয়-বৈভব সব। কিন্তু ভগবান সব কেড়ে নিয়েছিলেন। দেখছি মায়ার বন্ধন কাটে না, কাটতে গেলে প্রহ্লাদের মত হয়ে ওঠে। তাই শেষ সময়ে তুই যদি একবার আসিস, তবে তোকে দেখতে দেখতে চোখ বুজি।

ঠাকুরমার নিজের হাতে লেখা চিঠিখানা আমি নিজের কাছে রেখে দিলাম; সঙ্গে কৃষ্ণভামিনী কুঞ্জের কর্মচারী যে-পত্র লিখেছেন, সেখানা তোমার কাছে পাঠালাম। পড়ে দেখো। এবং আমরা কালই রওনা হচ্ছি বৃন্দাবন। বন্দনার বরকে অথবা আমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হব। ঠাকুরমাও যাচ্ছেন সে নিশ্চয় বুঝতে পারছ। ইতি—

অর্চনা।

* * *

হরিদ্বার থেকে বৃন্দাবন খুব বেশী পথ নয়, সেই দিন রাত্রে রওনা হয়ে ভায়া দিল্লী—পরের দিন দুপুরবেলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। যাওয়ার পথে একটা তাড়া ছিল সুলতা। তাড়া ওই ঠাকুরমার চিঠির কথাগুলি। "হঠাৎ তুই বার-দুই এসে ঠাকুমা বলে ডেকে নতুন করে রায়বাড়ীর ছেঁড়া বাঁধনে গিঁট বেঁধে বেদনা জাগিয়ে দিয়ে গেলি।" ওঁর পৈতৃকধন ছিল—তার মূল্য লাখ টাকার বেশী; সে-ও জ্যেঠামশায় এবং বাবা ওঁর হাত থেকে বের করে নিয়েছিলেন। এই সর্ববঞ্চিতা মহিলাটির বুকভরা ভালবাসা সারাজীবনে মানুষকে দেওয়া হয় নি—দিয়েছেন পাথরের দেবতাকে; এবং নিত্যই দেখেছেন একেলায় দেওয়া তাঁর সে

ভালবাসা পাথরের ঠাকুরের পায়ে দেওয়া ফুলের মত ও-বেলার বাসী হয়ে শুকিয়ে গেছে এবং তাকে ঘর থেকে বের করে বাইরে বিলিয়ে দিয়েছে কিম্বা ফেলে দিয়েছে। সারাটা পথ সেকালের সেই অতিসুন্দর সুপুরুষ বিদগ্ধ দেবেশ্বর রায়কে মনে মনে শুধু তিরস্কারই করেছি।

মথুরায় নামতেই একটি স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি জোয়ান ছেলে এগিয়ে এল—ছেলেটির রঙটা কালো, বেশ কালো নইলে হয়তো অনায়াসে মনে করতাম অর্চনার ভাই, হঠাৎ বড় হয়ে গেছে, চিনতে পারছি না। তার কারণ, ভদ্রলোকের দেহের গঠন যেমন শক্ত বলশালী, তেমনি লম্বা-চওড়া। আমাকে চিনতে তার খুব দেরি লাগে নি, আমার পরনে বাঙালী পোশাক ছিল, আমার ছবিও সে দেখেছে। এসে আমাকে প্রণাম করলে—বললে, আমার নাম ললিত আচার্য। একটু বিস্মিত হলাম। নামটা ঠিক স্মরণ করতে পারলাম না। বিলেতে যখন আমি মদ্যপান করে ভেসে যেতে চাচ্ছি, তখনই অর্চনার চিঠিতে বন্দনার বিয়ের খবর পেয়েছিলাম। নামটা মনে রাখবার মত মানসিক সুস্থতা ছিল না, তবে পাত্রটির অসাধারণ পরিচয় আমার মনে ছিল। ছেলেটির বাপ ইস্কুলমাস্টারী করত, ম্যাট্রিকুলেশন পাস, সামান্য অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, ছেলেটি বি-এ পাস করেছে অনার্স নিয়ে এবং সরকারী চাকরি পেয়েছে; এখন সে সার্কল অফিসার। কীর্তিহাটের জমিদার কল্যাণেশ্বর রায় ধনেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে গোয়ানদের একটা দরখাস্তের তদন্তে এসেছিল। তারপর যাওয়া-আসা সূত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। রায়বাড়ীতে তখনও পাঁচ-সাতটি মেয়ে, তার মধ্যে বিবাহযোগ্যার থেকেও বেশী অরক্ষণীয়া দু-তিনটি। ছেলেটি অবিবাহিত। বন্দনাকে দেখে তার ভাল লেগেছিল। সে নিজেই লোক পাঠিয়ে সম্বন্ধ করে বন্দনাকে বিবাহ করেছে। পণ নেয় নি, যৌতুক চায় নি। অর্চনা নিজেই কিছু যৌতুক আর গহনা দিয়েছে। অর্চনা লিখেছিল—সুরোদা, রায়বাড়ীর মেয়েদের সম্পর্কে একটা অপবাদ আছে যে রায়বাড়ীর মেয়ের কপালে কখনও সুখ হয় না। যে সংসারে যায়, সে সংসার ভেঙে যায়; না গেলে মেয়ের কপাল ভাঙে। একা তো আমার নয়। অন্নপূর্ণা-মাও স্বামী নিয়ে ঘর করতে পান নি। তারপর জ্যাঠামশায়ের মেয়েদের দশা তো জান। তবু মনে হচ্ছে বন্দনার অদৃষ্ট ভাল হবে। বড়-লোকের ঘর নয়; দালানবাড়ী নেই; কোনখানে পাপ-তাপ মাটিতে পুঁতে পাথর চাপা দেওয়া নেই। ছেলেটির নাম ললিত, ললিতের যেমন স্বাস্থ্য তেমনি চরিত্র, তেমনি বিনয় আর লেখাপড়ায় ভারী উজ্জ্বল; সরকারী চাকরি পেয়েছে; বন্দনা সুখী হবে চাকরির জায়গায় জায়গায় ঘুরবে। তবে জ্যাঠামশায় খুঁতখুঁত করছিলেন—ছোটঘর, ছোটঘর ঠিক হবে না, ঠিক হবে না বিয়ে দেওয়া, কিন্তু মা-জ্যাঠাইমা কেউ তাঁর কথা শুনলেন না। ছোটঘর কিসের? বিয়ে হয়ে গেল।

এ-বিবরণটুকু মনে ছিল। তার সঙ্গে আর মনে ছিল বরের উপাধি হল আচার্য। ভদ্রলোক পাদপূরণ করে দিলেন, বললেন—আমি বন্দনাকে বিয়ে করেছি।

মনে পড়ে গেল, অর্চনার চিঠি, সে লিখেছিল বন্দনার বর বা ছোটভাইকে সঙ্গে করে কালই রওনা হব আমরা। আমি তাকে আর একবার ভাল করে দেখে সত্যি-সত্যিই বেশী করে খুশী হয়ে বললাম—কাছেই যমুনার ওপারে বৃন্দাবন, তোমাকে দেখে তো তাই ইচ্ছে

করছে না, তোমাকে ললিত বলে ডাকতে। ইচ্ছে করছে তোমাকে—

ছেলেটি হেসে বলল—মেজদি আমাকে কেলেসোনা বলে নতুন নামকরণ করেছেন বৃন্দাবনে পা দিয়েই।

আমি বললাম—না, কেলেসোনা বলে তোমায় ডাকব না ভাই। ওটা মেজদি বলেছেন—মেজদিকে সাজে। আমি তোমাকে শ্যামসুন্দর বলে ডাকব। ললিতের চেয়ে খারাপ লাগবে না।

ললিত হেসে উঠে বললে—তাই ডাকবেন।

* * *

বৃন্দাবনের গাড়ীতে উঠে ললিত বললে—আপনাকে দেখবার আমার আগ্রহ ছিল দাদা।

আমি চোখ বুজে সিগারেট টানতে টানতে ভাবছিলাম—একেই বলে ভাগ্য। আমি কত খুঁজে, কত অর্থব্যয় করে অর্চনাকে অন্নপূর্ণা-মায়ের নাতির ছেলে রথীনের মত ছেলের হাতে তুলে দিয়েছিলাম কিন্তু তাকে সুখী করতে পারি নি। আর বন্দনার ভাগ্য দেখ, কোথা থেকে এমন একটি গুণবান, সবল স্বাস্থ্যবান, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছেলে পায়ে হেঁটে রায়বাড়ীতে এসে বন্দনাকে নিজে উপযাচক হয়ে বিয়ে করে নিয়ে গেল।

ললিত সারাটা পথ মথুরা থেকে বৃন্দাবন আমায় কি করে যত্ন করবে তা খুঁজে পাচ্ছিল না। আমি হেসে বলেছিলাম—ভাই ললিত, তুমি এত ব্যস্ত হলে তো আমাকে ব্যস্ত-ত্রস্ত এবং তার উপরে কিছু থাকলে তাই হতে হয়। তুমি আমার ভগ্নীপতি, আমি তোমার সম্পর্কে বড় হলেও শ্যালক। যাকে সোজা বাংলায় বলে তালব্য-শ-য়ে আকার ল-য়ে আকার। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তুমি ?

ললিতের মধ্যে একটা সত্যকারের বিনয় ছিল। সে বললে—দেখুন দাদা, রায়বংশে বিয়ে করে আমি খুশী হয়েছি নিশ্চয় কিন্তু কল্যাণবাবু-টাবুকে আমার ভাল লাগে না ; ওরা আমার এমন তোষামোদ করেন সার্কল-অফিসার বলে যে, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়। এক অতুল-কাকা আছেন যাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়। আমি সরকারী কর্মচারী, তিনি জেলখাটা স্বদেশী-করা মানুষ, তবু শ্রদ্ধা করি। গোপনে করি। প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা-খাতির করবার তো উপায় নেই। তার উপর মেদিনীপুর। আর শ্রদ্ধা করি আপনাকে। আগে শুনে শ্রদ্ধা করতাম। আজ দেখে শ্রদ্ধা হচ্ছে।

কি উত্তর দেব ? উত্তর কিছু দিলাম না, চুপ করে চোখ বুজে সিগারেট টানছিলাম।

ললিত একটু চুপ করে থেকে বললে—জানেন, কীর্তিহাটের রায়বংশের এত গল্প আমি ছেলেবেলা থেকে শুনেছি। সে একটা ড্রিমল্যাণ্ড বা ফেয়ারী কিংডামের ব্যাপারের মত। আমার ঠাকুমা বলতেন। তিনি গল্পগুলো শুনেছিলেন তাঁর শাশুড়ীর কাছে। শ্বশুরের কাছে। আমাদের তখন বাড়ী ছিল আপনাদেরই জমিদারীর মধ্যে। তখন আপনাদের বংশের মালিক ছিলেন রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় দি গ্রেট। আমার ঠাকুমা বলতেন—তাঁর ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেতো। বলতেন, আমার শ্বশুর কি একটা অপরাধ করে ফেলেছিলেন ; তারপর এমন ভয় হল যে, আর রায়বাহাদুরের এলাকায় থাকতে সাহস হল

না। তখন আমার ঠাকুরদা তিন মাসের কচি ছেলে। ঠাকুরদার বাবা রায়বাহাদুরের ভয়ে যা জমিজমা ছিল, সব বেচেখুচে স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন গ্রাম থেকে। ঠাকুরদার মা ঠাকুরদাকে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলেন সারা রাস্তাটা। মেদিনীপুর থেকে পালিয়ে এসেছিলেন হাওড়াতে। সালকের দিকে গঙ্গার ধারে ছোট ছিটেবেড়ার ঘর বেঁধে বাস শুরু করেছিলেন।

আমার চোখ দুটো আপনি খুলে গিয়েছিল।

আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আচার্য? কোন্ আচার্য? রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের আমলে তাঁর শাসনের ভয়ে কোন্ আচার্য তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে গ্রাম পরিত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিল?

ললিত বলছিল—আপনাদের বংশের রূপের খ্যাতি শুনেছিলাম। শুনতাম আর সাধ হত আপনাদের দেখতে। আমার ঠাকুরদার বাবাকে রায়বাড়ীর কাছারীতে ডাকা হয়েছিল। ভয়ে তাকে একলা যেতে দেন নি আমার ঠাকুরদা-মা। কচি ছেলে কোলে করে তিনি স্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলেন। কীর্তিহাটের কালীমন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে তিনি স্বামীকে আগলে ছিলেন। আমার ঠাকুরদা খুব কালো ছিলেন, একেবারে নিকষ কালো। ঠাকুমা বলতেন—ব্যবসাবাণিজ্য করে ছেলে আমার খুব বড়লোক হবে, তখন রায়বাড়ীতে বিয়ে দিয়ে সুন্দর বউ আনব। কালো রঙের দুঃখ ঘুচবে।

সে বকেই যাচ্ছিল, বকেই যাচ্ছিল। লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলে, বুদ্ধিমান ছেলে, সরকারী চাকরি করে; তবু আনন্দবিহ্বল ছোটছেলের মত বকেই চলেছে, বকেই চলেছে। সে আনন্দে তার কোন কলুষ ছিল না, কুটিলতা ছিল না। না—একবিন্দু এতটুকু কিছু ছিল না।

আমার মনে পড়ছিল, অন্নপূর্ণা-মায়ের কাছে পাওয়া দেবেশ্বর রায়ের লেখা একখানা চিঠির কথা। যে-চিঠিতে তিনি রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের নিষ্ঠুর চরিত্রের কথা লিখতে গিয়ে দুটি ঘটনার কথা লিখেছিলেন। একটি ঘটনা, কীর্তিহাটের নিকটবর্তী গ্রামের এক পঙ্গু আচার্য ব্রাহ্মণ এবং তাঁর যুবতী স্ত্রী শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল। ক্ষমার অযোগ্য সামাজিক অপরাধের জন্ম রায়বাহাদুর হুকুম করেছিলেন, গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওই মেয়েটির কোলের ছেলেটি কষ্টিপাথরের মত কালো ছিল এবং সবল-সুস্থ ছিল তার স্বাস্থ্য।

এই ললিত আচার্য—আজ রায় রত্নেশ্বর রায়বাহাদুরের প্রপৌত্রী বন্দনাকে বিবাহ করলে, সে কে?

আর একটি ঘটনার কথা লিখেছিলেন। সেটি দেবেশ্বর রায়ের ভিক্ষে-মা, জাতিতে কায়স্থ, বিধবা কৃষ্ণভামিনী দাসীর কথা।

তাঁর অপরাধের জন্ম রায়বাহাদুর তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিতা করেছিলেন। আজ বৃন্দাবনে কৃষ্ণভামিনীর সেবাকুঞ্জে আশ্রয় নিয়ে শেষ শয্যা পেতেছেন রায়বাহাদুরের পরমাদরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, দেবেশ্বর রায়ের পত্নী আমার ঠাকুমা।

ভাবছিলাম, রায়বাড়ীটা কি আজ এই মুহূর্তে ভূমিকম্প হয়ে চুরমার হয়ে মাটির উপর

একটা ইঁট-চুন-সুরকী-ভাঙা কাঠকাঠরায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেল ?

সেদিন মনে-মনে কামনা করেছিলাম—এই মুহূর্তে একটা ভূমিকম্প হোক এবং সেই ভূমিকম্পে কীর্তিহাটের রায়বাড়ী ভেঙে চৌচির হয়ে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যাক। তার মধ্যে রায়বংশধরেরা চাপা পড়ে শেষ হয়ে যাক। ওদের কাজ শেষ হয়েছে। কৃষ্ণভামিনীর দেহ এবং নাচগান বিক্রী করা অর্থে গড়া কৃষ্ণভামিনী সেবাকুঞ্জে দেবেশ্বর রায়ের স্ত্রী শেষশয্যা পেতেছে ; এবং যে ব্রাত্যজনসংসর্গজাত সন্তানের জননী এবং পুরুষত্বহীন জনককে নির্বাসিত করেছিলেন রত্নেশ্বর রায় তারই পৌত্রের সঙ্গে রত্নেশ্বর রায়ের প্রপৌত্রীর বিবাহ হয়, সম্প্রদানের সময় এই ললিতের পা ধরে অর্চনা করে বলা হল, হে বিশিষ্ট বর, তোমাকে কন্যাদান করছি, তুমি গ্রহণ কর। ব্যাস্, আর বাকী কি রইল। সব শেষ হয়ে গেল—এবার ছেদ পড়ে যাক। এবং বেশ একটা টেম্পোর মাথায় পড়ুক, ভূমিকম্প হোক—। কিন্তু তা হল না। কারণ ইচ্ছে করলেই কিছু হয় না। তবে ধাক্কাটা লেগেছিল। প্রথমটা যথেষ্ট লেগেছিল। সামলাতে বেগ পেয়েছিলাম।

অর্চনা বার বার জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হয়েছে সুরোদা ? শরীর খুব খারাপ ? চিঠি-পত্রেও যা লেখ তাও যেন কেমন কেমন, এতকাল পর এলে কিন্তু—। কথা সে খুঁজে পেলে না, একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।

কথাটার জবাব দিতে পারি নি, হাসি দিয়ে অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা বা ঢাকা দেওয়া যায়, মানুষে দিয়েও থাকে, সেদিন আমি তা দিতে পারি নি। সত্য কথাটা বলবার মতও বুকে জোর ছিল না, সুতরাং চুপ ক'রেই ছিলাম। অর্চনা তখনও জানত না আচার্যের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পিতামহের বাপের সঙ্গে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের আসল সংঘর্ষের কথা।

বলতে বলতে থামল সুরেশ্বর। তখন দিনের আলো বেশ ফুটে উঠেছে, দিনের আলো কেন রোদ্দুরও ফুটেছে। নিচে ফ্রী স্কুল ধরে যানবাহন লোকজন চলাচলের বিচিত্র মেশানো-মেশানো সাড়া উঠেছে ; ট্যাক্সির হর্ন, প্রাইভেটের ইলেকট্রিক হর্ন ; ফ্রী স্কুল স্ট্রীট অঞ্চল ফিটনের আড্ডা—ফিটনের ঘণ্টার শব্দ, মধ্যে মাঝে গরু মোষের গাড়ী, রিক্সার ঘণ্টা, ঠেলার হুঁশিয়ারি মানুষে মানুষে সংঘর্ষের কলহের হাঁক একসঙ্গে মিশে চলমানতায় দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠেছে। সুরেশ্বর থামল। বাইরের জানালার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললে—সামলাতে প্রায় একটা বেলা লেগেছিল। ঠাকুমায়ের শেষ প্রায়শ্চিত্ত দেখে এবং শুনে মনের ক্ষোভটা গেল।

তুমি হয়তো জানো—জানো বলেই ধরে নিচ্ছি, জানো না বলে তোমাকে খাটো করব কেন ? আমাদের দেশে হিন্দুসমাজে নানান সংস্কারের মধ্যে মৃত্যুর পূর্বে প্রায়শ্চিত্তের একটা বিধি আছে। মানুষ দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছে, মরণ হচ্ছে না, এমন অবস্থায় মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করে, নারায়ণকে ঘটে হোক শিলারূপে হোক সামনে রেখে জীবনের পাপ স্মরণ করে বলে—"ক্ষময়া ক্রিয়তে পাপং"—যে পাপই করে থাকি সে গুরুই হোক আর লঘুই হোক সে সবই তুমি মার্জনা কর। ক্রিশ্চানদের কনফেশনের সঙ্গে এর একটা মিল আছে।

ঠাকুমা—দেবেশ্বর রায়ের স্ত্রী বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন—অসুখ দেখানোর মত কিছু ছিল

না, ক্রমশ ক্রমশ মৃত্যুর দিকে চলছিলেন কিন্তু গতিটা নেহাতই পিঁপড়ের গতির মত। তাই তিনি এই প্রায়শ্চিত্ত করলেন সেদিন।

আয়োজন হয়েই ছিল কিন্তু সকাল থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে অনুষ্ঠান হয় নি ; তাঁর চেতনা হলে সেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। পুরোহিত এসেছিল কিন্তু ফিরে গিয়েছিল ঠাকুমাকে ঘুমন্ত দেখে। এবং ঠিক হয়েছিল যদি এরই মধ্যে 'কোমা' এসে যায় তবে মেজঠাকুমা বাঁ হাতে বড় ঠাকুমাকে ধ'রে তাঁর হয়ে মন্ত্র পড়বেন, ভোজ্য দান ইত্যাদি যা উৎসর্গ করবার তা তা উৎসর্গ করবেন।

আমি বসে ভাবছিলাম বৃন্দাবনে এই কৃষ্ণভামিনীর কুঞ্জে বসে মদ্যপান আমি করতে পারি কিনা? করলে বাধা কে দেবে? যিনি দিতে পারেন বা পারতেন আমার ঠাকুমা তাঁর একরকম জ্ঞান নেই। হতচেতনের মত ঘুমুচ্ছেন। কিন্তু আমি যেন অধিকার মানে রাইট খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

এসে ডাকলে অর্চনা। এস সুরোদা, ঠাকুমার চেতন হয়েছে, একটু যেন সুস্থ হচ্ছে, বলছেন—প্রায়শ্চিত্ত এখুনি করব। পুরোহিত চলে গেছে, মুস্কিল হয়েছিল কিন্তু বন্দনার বর ললিত বললে—আমি করিয়ে দিচ্ছি দিদি। আমি এককালে বাবার কাছে এসব কাজ শিখে ছিলাম। বাবা ইস্কুলে পণ্ডিতি করতেন আর পুরুতের কাজও করতেন। আমার স্যুটকেসে বইও আছে।

গেলাম। মনের মধ্যে যে একটা অস্বস্তি একটা বেদনা ঘুরপাক খাচ্ছিল এই মুহূর্তে সেটা চরমে উঠল। অথচ আমি আধাইংরেজ যোগেশ্বর রায়ের ছেলে, নিজে একসময় বাবা মাকে এবং আমাকে যে দুঃখ দিয়েছিলেন তার জন্য পৈতের পর কিছু গোঁড়া ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু তা রাখতে পারি নি, কিছু দিন যেতে না যেতেই একেবারে আল্ট্রামডার্ন হয়ে উঠেছিলাম। জাতধর্ম ঈশ্বর পরলোক সব লোককে অবিশ্বাস করে বিলুপ্ত করে দিয়েছি, মানি না। দেবতা দেবলোক যেটুকু মানি সে মানি দেবোত্তর সম্পত্তির জন্য এবং এখনও এদেশে ব্রাহ্মণবংশের রক্তের একটা এ্যারিস্টোক্রেসি আছে তার জন্য, নিজে ইংরেজের দেশে গিয়েছিলাম ইংরেজললনার দেহসরোবরে ডুবে মরতে। কিন্তু মরতে পারি নি। শম্পা রায় নামধারিণী এরার দেহসরণীতে তাকিয়ে ভয় পেয়েছিলাম—মনে হয়েছিল ভয়ঙ্কর অপমৃত্যু উঁকি মারছে।

নরকের ভয় নয়, নরক একালে কেউ মানে না, আমিও মানি না, তবু ওটাকে বড় ভালগার অশ্লীল মনে হয়েছিল তাই পালিয়ে এসেছিলাম। ইউরোপে যুদ্ধ লেগেছে, নাহলে হয়তো ফ্রান্স বা ইটালীতে যেতাম মরণ-সরোবরের সন্ধানে। শেষ পালিয়ে এলাম। সে কি এই দেখতে এলাম?

দেবেশ্বর রায়ের অবহেলিত গৃহিণী মরছেন কৃষ্ণভামিনীর সেবা-কুঞ্জে আর তাঁর মৃত্যুকালে প্রায়শ্চিত্ত করাচ্ছে ললিত আচার্যি। ললিত আচার্যি। অন্নপূর্ণাপিসীকে লেখা দেবেশ্বর রায়ের চিঠিখানা আমার মনে পড়ছে।

নিয়তি বা ভগবানের বিচার এ আমি মানি না। এ তা নয় তাও জানি। এমনটা

নেহাৎই ঘটনাচক্র। এর পিছনে কোন ত্রিকালের বিধাতার প্ল্যানিং নেই। তবে একটা জিনিস আছে সেটা হ'ল এই নিজে না থামলে কেউ রুখতে পারে না। এবং সংসারে পাপকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এলেই তুমি মুক্ত।

অর্চনা বুঝতে পারছিল একটা খোঁচায় আমি অস্বস্তি ভোগ করছি; সেটা কি তা ঠিক ধরতে পারে নি। সে বলেছিল—তোমার কি হয়েছে আমাকে বলবে না?

বললাম—বলব পরে। এখন না। চল এখন। বলে পা বাড়ালাম। এসে দাঁড়ালাম প্রায়শ্চিত্তের জায়গায়। কি বলব তোমাকে সুলতা, এসে দাঁড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখে মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। সত্যি-সত্যিই সে যেন একটি মুক্তিযজ্ঞের আসর পাতা হয়েছে।

ঠাকুমাকে গরদের কাপড় পরিয়েছে—তিনি বসেছেন মেজদিদির উপর দেহের ভার রেখে; ঠাকুমা মানুষটি বরাবরই ছোটখাটো, বয়স হয়ে আরও ছোট হয়ে গেছেন; আর আমার মেজদিদি মাথায় বেশ লম্বা এবং বন্ধ্যা নারী, তাঁর দেহখানির বাঁধুনি বেশ শক্ত, তিনি তাঁকে পিঠের দিকে জড়িয়ে ধরে বসেছেন।

সামনে আসনের উপর বসেছে জামাই ললিত আচার্য। ধবধবে কাচা কোঁচানো ধুতি পরনে, গায়ে সিল্কের চাদর, গাঢ়-শ্যাম গায়ের রঙ, তার উপর সাবানে পরিষ্কার করে কাচা ধবধবে মোটা পৈতে, চোখে চশমা—ছ'ফিট লম্বা সবল স্বাস্থ্যবান যুবা, সোজা মেরুদণ্ড, বসে নিপুণ পুরোহিতের মত সামনে রাখা ভোজ্য এবং দানগুলির পাত্র পরের পর সাজিয়ে রাখছে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ভরাট গলায় সে মন্ত্র উচ্চারণ করাতে শুরু করলে বলুন—কোশাতে—হ্যাঁ।

তখন রায়বাড়ীর বড়বউ কোশাতে হরিতকী ধরে হাতের উপর হাত রেখেছেন। ঠাকুমাকে দেখলাম কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক এঁকেছেন—একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে।

বলুন—ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু! ওঁ তদবিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবিবচক্ষুরাততং —ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু।

গম গম করে উঠল স্থানটি, যেন অনুষ্ঠানটি সজীব প্রাণময় হয়ে উঠল; আশ্চর্য একটা সঙ্গীত যেন সৃষ্টি করলে ললিত তার ভরাট কণ্ঠস্বরের মহিমায় আর তার জিহ্বার অতি পরিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে।

আমি আজও মনে করতে পারছি, চোখের উপর স্পষ্ট ভাসছে সমস্ত; কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অনুষ্ঠানটির প্রভাবে অভিভূত হয়ে গেলাম। পরলোক, স্বর্গ নরক বাদ দাও, আমার মন যেন পবিত্র হয়ে গেল, একটি উদাসীনতা চিত্তকে স্পর্শ করলে, আমার মনের সব উত্তাপ সব ক্ষোভ যেন জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

সেদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন—"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম তুমি সত্যকুলজাত" অংশটুকুও মনে পড়ে নি, শুধু মনে মনে মেনে নিয়েছিলাম এ অব্রাহ্মণ হলে ব্রাহ্মণ আর দেশে সমাজে নেই। মুক্তি যদি এই অনুষ্ঠানে মেলে তবে এই ছেলেটির চেয়ে শুদ্ধ এবং সিদ্ধ পুরোহিত আর দেশে নেই।

ঠিক এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল সুলতা। ঠাকুমা মন্ত্র পড়তে পড়তে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে আমাকে দেখে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চোখের দৃষ্টি বিস্ময়বিস্ফারিত হয়ে গেল,

কপালের কুঞ্চনরেখায় মনের অনুচ্চারিত প্রশ্ন ফুটে উঠল শিলালিপির মত; তারপর কাঁপতে শুরু করলেন।

ললিত তখন ব'লে যাচ্ছিল—ওঁ অদ্য মার্গশীর্ষ মাসি শুক্লে পক্ষে—ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্র—

ললিত একটি একটি ক'রে সংস্কৃত শব্দগুলি উচ্চারণ করছিল, ঠাকুমা একটি একটি ক'রে উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বলার পর তিনি চোখ তুলে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চোখ যেন বিস্ময়বিস্ফারিত, পুরু চশমার ওপাশে চোখ দুটিকে খুব বড় এবং খুব বেশী বিস্ফারিত মনে হচ্ছিল, দন্তহীন মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে গেছে। তিনি একটু একটু কাঁপছেন। মনে হচ্ছে একটা কিছু হয়েছে। সে একটা কিছুর অর্থ, ওই স্থানকালপাত্র বিচার করলে চরম মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়ালাম বুঝি বলে আশঙ্কা হয়। সবাই আমরা সেই আশঙ্কাই করেছিলাম। কি হল?

ললিত একটু ঝুঁকে বললে—বলুন—তিথৌ—।

অর্চনা সামনে হেঁট হয়ে ডাকলে—ঠাকুমা! ঠাকুমা!

পিছন থেকে মেজদিদি বললেন—কর্তাদিদি। দিদি—গায়ে একটু নাড়া দিলেন।—দিদি!

হঠাৎ যেন সচেতন হলেন ঠাকুমা, তাঁর বাঁ হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন—ছাড়, ছাড়। আঃ, ঘোমটা দিতে দে। দেখছিস না বড়বাবু দাঁড়িয়ে। ছাড়।

বড়বাবু মানে দেবেশ্বর রায়। আমরা চমকে উঠেছিলাম। কোথায় কি দেখছেন—কাকে দেখছেন?

মেজদিদি তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বললেন—না—না—উনি বড়বাবু নন। সুরেশ্বর, ও সুরেশ্বর—নাতি আপনার নাতি। বড়দি—!

আমার মনে পড়ে গেল আমি দেখতে আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের মত। আমি নিজে এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে এসে ডাকলাম—ঠাকুমা, আমি সুরেশ্বর!

—সুরেশ্বর? কে সুরেশ্বর!

ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম—মন্ত্র বলুন—প্রায়শ্চিত্ত শেষ করুন!

এবার সম্বিৎ ফিরে পেলেন, বললেন—ও হাঁ, কি বলব?

ললিত বললে—আবার বিষ্ণু স্মরণ করে নিন, আগে বলুন—শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু। নমঃ তদ্বিষ্ণু পরমংপদং—

আর ভুল হল না ঠাকুমায়ের—তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন একটানা। প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে চোখ থেকে জলের দুটি ধারা নেমে এল।

তিন দিন পর মারা গেলেন ঠাকুমা—দেবেশ্বর রায়ের গৃহিণী—উমা দেবী। মারা যাওয়া তাকে বলে না, যেন চোখ বুজে ঘুমোলেন। কেউ ভাবতে পারে নি যে আর তিনি চোখ মেলবেন না। কারণ প্রায়শ্চিত্ত শেষ করে রাত্রি থেকে এমন সহজ আর সুস্থ তিনি হয়ে উঠেছিলেন যে আমরা ভেবেছিলাম তিনি হয়তো নতুন ক'রে বাঁচলেন। নতুন ক'রে বাঁচাই

বটে। কারণ পুরনো কথাগুলো যা তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন—যা কেউ জানত না আমাদের মধ্যে—সেই সব কথা বলতে লাগলেন। হাসলেন। আমাকে ললিতকে সমাদর করলেন; অর্চনাকে দেখে দিদিশাশুড়ী ভবানী দেবীকে স্মরণ করে বললেন—কিন্তু ভাই এমন দুঃখভোগ করবার জন্য তো তাঁর ফেরার কথা নয়। দুঃখ পেয়ে গিয়েছিলেন—সুখ করবার জন্য ফিরে আসবার কথা। তা হ'লে? তা হ'লে কেন এমন হ'ল তোর?

আর সময় পেলেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বলতেন—অবিকল আমার বড়বাবু। তফাৎ বড়বাবুর মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ ছিল। মাথার অ্যালবার্ট তুলে টেরি কাটতেন. আর ভয়ানক বাবু ছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টা আতরের গন্ধে মো মো করত। মনে হচ্ছে তিনিই তুই হয়ে ফিরে এসেছেন নিজের দেনা শোধ করতে। দেনা যে অনেক। দেখ না ভাই নইলে শেষকালটায় আমার মৃত্যুশয্যায় তুই বসে থাকলি কেন? আমার বড় ছেলে—।

জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায়, তাঁর পৈতৃক এক লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ নিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে বাড়ী ছেড়ে বৃন্দাবন এসে ভিক্ষেশাশুড়ী কৃষ্ণভামিনী সেবাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন ব'লে। তিনি আসেন নি। আসতে সম্ভবত লজ্জা পেয়েছিলেন।

তাঁর কথাটা বললেন ঠাকুমা।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আমার মুখের আগুনও তোকেই দিতে হবে। দেনা শোধ রে, দেনা শোধ। শা ভাই এক কাজ করিস। সারাজীবন তো মানুষকে না পেয়ে ভগবান আর দেবতাকে নিয়ে থাকলাম, ভাগবত পুরাণ অনেক পড়েছি। তোদের বংশের দেনাগুলো শোধ করিস। দেনা অনেক অনেক—অনেক। হয় না শোধ জানতেই পারবিনে। তবে যা জানতে পারবি তা শোধ করিস। তোর কাছেই তো শুনেছি দর-পত্তনীতে পত্তনীতে রায়বাড়ীর সব জমিদারী এসে জমা হয়েছে। তুইই তো আসল মালিক। শোধ করিস—

অর্চনা পাশে বসেছিল সে হঠাৎ বলে উঠল—সুরোদা যে জমিদারী সম্পত্তি সব বেচে দেবে ঠিক করেছে।

—বেচে দেবে? চমকে উঠলেন ইলেকট্রিক শক খাওয়া মানুষের মত। বেচে দেবে? কি বেচে দেবে?

—জমিদারী।

—জমিদারী বেচে দেবে?

আমার চোখের দিকে চোখ রেখে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন আমার কাছে। উত্তর দিতে দেরি হয়েছিল আমার; তিনি খানিকটা অধীর হয়েই বলেছিলেন—বেচে দিবি? হাঁ রে! রায়বংশ—আর কথা খুঁজে পান নি।

অর্চনাই বলেছিল—যে সব পাপের কথা বলছ ঠাকুমা তা সুরোদা জানে। পুরনো কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে বের করেছে। ওই জন্যেই বেচে দেবে! জমিদারী রাখতে হলে নানা অন্যায় করতে হয়। বলে প্রজাদের দান করে দেবে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—দেখ, জমিদার রাজা, এরা হল ইন্দ্রদেবতার জাতগোত্র রে। এদের এ না করে উপায় নেই। দেখ না ইন্দ্ররাজা স্বর্গের রাজা ; রাজ্য করতে গিয়ে তাকে কত কি করতে হয়েছে। ভেবে দেখ, ব্রহ্মহত্যা করেছে, নারীহরণ করেছে। মুনিঋষিদের অপমান করেছে ; রাজ্য করতে গেলেই ওসব করে। কিছু করে কিছু করতে হয় ; করেছে ; অভিশাপও খেয়েছে, কত লাঞ্ছনা হয়েছে, হাজারটা চোখ হয়েছে ; প্রায়শ্চিত্ত করেছে ; রাজ্য হারিয়ে আবার রাজ্য পেয়েছে। তা বলে তো বেচে দেয় নি রে! তুই বেচে দিবি ?

ললিত ঠাকুমার কথা শুনে খুব তারিফ ক'রে বলেছিল,—ঠাকুমা বড় চমৎকার কথা বলেছেন দাদা। ভারী চমৎকার! রাজা—সে ইন্দ্র থেকে দৈত্য দানব রাক্ষস মানুষ জন্তু-জানোয়ার যেই হোক তার অত্যাচারী না হয়ে উপায় নেই। কুটিল পথ ছাড়া তার পথ নেই। পৃথিবীতে পূজা সে পৃথক ভাবে পায় না। দশ দিকপালের মধ্যেই যা পাবার পায়। তার বেশী নয়। তবু ইন্দ্রত্বের চেয়ে কাম্য কিছু নেই। শতকরা নিরেনব্বইজন তপস্যা করে ইন্দ্রত্বের জন্য। বড় জোর একজন চায় ভগবান কিম্বা মুক্তি। তাই কেউ তপস্যা করলেই ইন্দ্র তাকে ধ্বংস করতে চায়।

ললিত সংস্কৃতের ভাল ছাত্র, সংস্কৃতে এম-এ পাস করেছিল। সে পুরাণ থেকে ইন্দ্রতত্ত্ব বোঝাতে শুরু করেছিল। সেসব কথা ভুলে গেছি, একটা কথা মনে আছে বলেছিল—এক রাম ছাড়া কোন রাজা প্রজার পরম ভক্তি পান নি। অন্যদের ভয় করেছে, ঘৃণা করেছে, সেলামী নজরানা দিয়েছে, পূজো করে নি দেয় নি। ওই এক রাম ছাড়া। এর জন্য রামকে সীতা বিসর্জন দিয়ে মূল্য দিতে হয়েছিল।

ঠাকুমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—ভেবে দেখিস ভাই। এত বড় রায়বংশের সন্তান তুই—বড় রায়ের পৌত্র, রায়বাহাদুরের প্রপৌত্র, ওরে লোকে তোর বংশাবলীকে কেউ আর গ্রাহ্য করবে না ; দেখলে মাথা নোয়াবে না। ওরে তোকে কীর্তিহাট ছেড়ে পালিয়ে আসতে হবে।

আমার মনে সেদিন যেন একটা কান্নার আবেগ বর্ষার মেঘের মত ফুলে ফুলে উঠছিল। বর্ষণ হয় নি হ'তে দিই নি, বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর জমিদারীর অতি বৃদ্ধা প্রাণপ্রতিমা বলছেন—বেচে দিয়ো না, আমাকে বেচে দিয়ো না।

* * *

চুপ করে গেল সুরেশ্বর। একটু পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিষণ্ণ হেসে বললে—দেখ ছোটবেলা পড়েছিলাম—'বীরবল কথা'—বীরবল ছিলেন দুঃসাহসী যোদ্ধা। এক রাজার রাজ্যে কাজ করতেন। মাইনে নিতেন খুব বেশী। বলেছিলেন—যা কেউ না পারবে তাই সে করবে। রাত্রে রোজ রাজপুরীতে সারারাত্রি জেগে পাহারা দিতেন। হঠাৎ একদিন শুনলেন রাজপুরী থেকে কেউ কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছে। তিনি ভয় পেলেন না, এগিয়ে গেলেন ; দেখলেন একজন সুন্দরী নারী কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছেন। তিনি

তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে মা? কেন কাঁদছ তুমি?

মেয়েটি বললে—আমি রাজলক্ষ্মী, এই রাজাকে আজ পরিত্যাগ ক'রে যেতে হচ্ছে ব'লে কাঁদছি। দীর্ঘকাল একে আশ্রয় ক'রে ছিলাম, রাজাকে বড় ভালবাসতাম স্নেহ করতাম—তাই বুকটা টনটন করছে।

বীরবল জিজ্ঞাসা করলেন—কি অপরাধে রাজাকে ত্যাগ করবে মা?

রাজলক্ষ্মী বললেন—রাজার আজ রাত্রি অবসানে পরমায়ুর শেষ হবে। রাজার যিনি পুত্র তাঁর ভাগ্যে রাজ্য নেই।

বীরবল জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রাজাকে কি কোন উপায়ে বাঁচানো যায় না মা!

—যায়। যদি কেউ শ্মশানে যে মহাকালী আছেন তার ওখানে গিয়ে নিজের মুণ্ড কেটে মায়ের পুজো দেয় তবে রাজা তার পরমায়ু নিয়ে বাঁচতে পারেন।

বীরবল বললেন—মা, তা হলে তুমি ফিরে যাও মা। আমি এই রাজার ভৃত্য। তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে সাধ্য হলে জীবন দিয়ে রক্ষা করাই হল যোদ্ধা ভৃত্যের কর্তব্য। সে কর্তব্য আমি পালন করব মা। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও।

রাজলক্ষ্মী তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন, অন্তঃপুরের দিকে।

ঠিক সেই গল্পের বীরবলের মতই আমি সেদিন ঠাকুমার কাছে সেই আবেগের বশে বলেছিলাম—আমি কথা দিচ্ছি ঠাকুমা, আমি জমিদারী বেচব না। রাখব।

সে প্রতিশ্রুতি সেদিন যার হিসেব জ্ঞান আছে তার কাছে বড় সহজ ছিল না, এ কথা আমার থেকেও বোধ করি তুমি অনেক ভাল করে জান এবং তার ভিতরের কারণ বোঝো। জমিদারীতে জমিদার সেদিন নিতান্তই পুতুল মালিকের মত মালিক হয়েছে।

প্রজারা তখন জমিদারদের থেকে অনেক বেশী শক্তিমান হয়েছে। যে রাষ্ট্র জমিদারী সৃষ্টি করেছিল সেই রাষ্ট্রই সেদিন দুর্বল হয়ে গেছে দেশের মানুষের কাছে, সুতরাং জমিদারদের অবস্থা হয়েছে প্রায় গাছতলায় পড়ে থাকা হাত-পা-ভাঙা নাক-কাটা পাথরের মূর্তির মত, যাদের নেহাত কৃপাবশে কেউ দুটো আতপ এক মুঠো বেলপাতা এক কুশি গঙ্গাজল দিয়ে যায়।

এক বছরের উপর আমি ইংল্যাণ্ডে ছিলাম। ফিরে এসে ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছি জমিদার এবং অভিজাত বংশের যোগ্য একটি জীবনধারার জন্য, তার জন্য বাঈজীপাড়া থেকে শুরু ক'রে হোটেল, বার, সাংস্কৃতিক শিল্পীজীবনের নানা কর্নার খুঁজে বেড়াচ্ছি; অজস্র অর্থব্যয় করছি—এর মধ্যে জানবাজারের নায়েব আচার্যির পত্র পেয়েছি—"এরূপ অর্থব্যয় করিলে আর বৎসর-খানেকের মধ্যেই সঞ্চিত অর্থ ব্যয়িত হইয়া দেনাগ্রস্ত হইবেন। আপনার এইরূপ ব্যয় অন্য দিকে জমিদারী একরূপ দায় ও বোঝার মত হইয়া উঠিয়াছে। কীর্তিহাটের কাছারির সংবাদ এই যে, গত বৎসরের মধ্যে জমিদারীতে একরূপ খাজনা আদায়ই হয় নাই। শুধু আমাদেরই নয়; সকলেরই এক দৃশ্য। অধিকাংশ জমিদারকেই দেনা করিয়া কালেক্টারী রেভেন্যু দাখিল করিতে হইয়াছে। গত বৎসর আমাদের সঞ্চিত তহবিল হইতে কালেক্টারী ও পত্তনী খাজানা দাখিল করিতে কুড়ি হাজার টাকার কিছু বেশী দিতে হইয়াছে। এবং তামাদির মুখে বাকী খাজনার নালিশ করিতে রসুম খরচ দিতে হইয়াছে আট হাজার টাকা।

এ টাকা কতদিনে আদায় হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আপনি এইরূপভাবে দেশান্তরে বিপুল অর্থব্যয় করিয়া ঘুরিয়া না বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া সরেজমিনে সমস্ত দেখিয়া বুঝিয়া একটি নির্দিষ্ট পথে চলিবার ব্যবস্থা করুন। এদিকে যুদ্ধ বাধিয়াছে। অনেকে অনেক রকম বলিতেছে। আপনি সত্বর আসিয়া কার্যভার স্বহস্তে লইলে ভাল হয়।"

চিঠিখানা বৃন্দাবন আসবার দিন পনের আগে পেয়েছিলাম। এবং ভেবেছিলাম ফিরে গিয়ে জমিদারী বিক্রী করে দিয়ে জীবনের সঙ্গে বংশের ইতিহাসের সম্পর্কটা ঘুচিয়ে দেব। কিন্তু সেদিন মৃত্যুশয্যায় ঠাকুমা দেবেশ্বর রায়ের লাঞ্ছিতা গৃহিণী আমার পিতার গর্ভধারিণীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিলাম—না জমিদারী বেচব না। রাখব—রাখবার চেষ্টা করব জমিদারী।

সত্যিই তো, কীর্তিহাটের লোকে দেখে যদি নমস্কার না করে কীর্তিহাট ঢুকব কি করে?

হঠাৎ হেসে ফেলে সুরেশ্বর বললে—কিছু মনে করো না সুলতা, তুমি পলিটিক্স কর—বল তো একবার মিনিস্টার হয়ে দেশের লোকের সেলাম নমস্কার কুড়িয়ে তারপর কি আর মিনিস্টার না হয়ে লোকের কাছে বের হওয়া যায়!

সুলতা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট রুমালখানা বের করে চোখ মুছে বললে—তোমার ঠাকুমার কথা বল। রাজলক্ষ্মী আর ভোটলক্ষ্মীতে এক ক'রে গণ্ডগোল করো না, পাকা সোনা আর গিল্টি এক নয়।

সুরেশ্বর বিষণ্ণ হেসে বললে—ঠাকুমার কথা তোমার ভাল লেগেছে সুলতা?

—প্রশ্নটা নাই বা করলে সুরেশ্বর। তিনি সত্যিই বাংলাদেশের জমিদারলক্ষ্মীর প্রতীক। বাংলাদেশের জমিদারেরা এই লক্ষ্মীর অঙ্গের অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে বাঈজী পুষেছে, জুয়া খেলেছে, এই মাটির ছেলেদের ঘাড়ে বাপ-ছেলে-সম্পর্ক চাপিয়ে তাদের গোলাম করেছে। বল—তাঁর কথা বল।

সুরেশ্বর বললে—তিনি আর এক দিন বেঁচেছিলেন এই কথাবার্তার পর। মৃত্যু হল ভোররাত্রে। সকালবেলা হঠাৎ বললেন—নাতি তুই বিয়ে করবি নে?

বেশ ভাল সেদিন। সকালবেলা উঠে ইষ্ট স্মরণ করে মধু দিয়ে মকরধ্বজ খেয়ে গুন গুন করে নাম করছিলেন, আমি গিয়ে বসলাম। আমাকে হঠাৎ প্রশ্নটা করলেন।

মেজদি ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন, তিনি বললেন—আপনি বলুন দিদি। বাপ-মা চলে গেছেন, একমাত্র তুমিই বলতে পার—বাধ্য করতে পার। বল তুমি।

—বিয়ে কর ভাই।

অর্চনা বলে উঠল—আমি ভেবেছিলাম ঠাকুমা, বিলেত গেল সুরোদা, মেমসাহেব বিয়ে করে ফিরছে। ওমা কোথায়?

—তা করলি নে কেন রে সুরেশ্বর?

হেসে বললাম—তোমার জন্যেই করি নি ঠাকুমা।

—কেন?

—তা হ'লে কি আমার হাতের শ্রাদ্ধের নৈবেদ্য তুমি খুশী মনে নিতে? নিতে পারতে?

—নিতাম। নিশ্চয় নিতাম। বিয়েতে জাত মানতে নেই রে। তুই বিয়ে কর, দেখ

তার সেবা তার হাতে জল আমি খাই কিনা।

সন্ধ্যেবেলা বললেন—কথাটা ডেকে বললেন—সুরেশ্বর, আমার শ্রাদ্ধ তুই করবি তো? যজ্ঞেশ্বর করবে না। সে এলো না। আমার ভিক্ষেশাশুড়ীর আশ্রমে আছি কিনা তাই। করবে না। তুই করবি?

চোখে আমার জল এল। বললাম—আমি যে তারই জন্যে ছুটে এসেছি ঠাকুমা।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—দেখ, মেজঠাকুরপোর ছেলেরা আমাকে গোবিন্দের চত্বরে ঢুকতে দেয় নি। আমি সেই রাত্রে গোয়ানপাড়া গিয়েছিলাম, গির্জের পাদরীর কাছে, ভায়লার শ্রাদ্ধের জন্য টাকা দিতে। সেখানে জল খেয়েছিলাম। বড়বাবুর মৃত্যুর পর আমি মরতে পারি নি, সঙ্গে যেতে পারি নি, কিন্তু ভায়লা পেরেছিল, সে বিষ খেয়ে মরেছিল। সেইজন্যে আমার ইচ্ছে ছিল—বড়বাবুর শ্রাদ্ধ হল, ভায়লার শ্রাদ্ধ করুক ওরা। তা টাকা ওরা নেয় নি। এদিকে এরা আমাকে পতিত বলে মন্দিরে ঢুকতে দিলে না। যজ্ঞেশ্বর পাগল বলে আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখলে। আমার কোম্পানীর কাগজ কেড়ে নিলে। মনে দুঃখ খুব পেয়েছিলাম, তাই পালিয়ে এসেছিলাম বৃন্দাবন। তা আমার বেশী ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ করবি ভাই, ওই কীর্তিহাটে গোবিন্দের নাটমন্দিরে, দানসাগর-টাগর নয়—চারটে ষোড়শ করে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ।

বললাম—করব ঠাকুমা।

তিনি বললেন—সেই ভট্টরায় বামুনদের আনাস যেন। বুঝলি। চাবি দিয়ে ঘটি বাজিয়ে গান গাইবে—'ওগো সুরেশবাবু গো, শ্রবণ কর, তুমি শ্রবণ কর গো। তোমার পুণ্যবতী পিতামহী উমাদেবী বৃন্দাবনে গোবিন্দের রাঙা চরণতলে তাঁর মুখারবিন্দ দেখতে দেখতে দেহত্যাগ করলেন, তারপর ধীরে ধীরে যমুনায় গিয়ে স্নান করে দিব্য নববস্ত্র পরিধান করলেন, ললাটে নাসিকায় তিলক আঁকলেন, বক্ষস্থলে রাধা-গোবিন্দ নাম লিখলেন এবং গোবিন্দমন্দিরে রাধা-গোবিন্দকে দর্শন করে বাহিরে এলেন, সেখানে মকরকেতনে রতিপতির মত দিব্য মনোহরকান্তি তোমার পিতামহ, বড় রায় মহাশয় সমাদর করে বললেন—এস, এস, এস আমার প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী, আমি তোমাকে স্বর্গধাম থেকে নিতে এসেছি—এস—"

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল সুলতা, দু চোখে ধারা বেয়ে নামতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও কেঁদেছিলাম। মেজদি কেঁদেছিলেন হা-হা করে। অর্চনা কেঁদেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার জীবনের সমস্ত অবরুদ্ধ বাসনা অতৃপ্ত কল্পনা সেদিন শ্রাবণের বর্ষণের মত ঝরঝর ধারায় যেন ঝরে পড়েছিল আমাদের সবারই চোখের জলের ধারায়। কিন্তু যখন মারা গেলেন, তখন একটি কথাও বললেন না। কাউকে ডাকলেন না। আমরা কেউ জানতেই পারলাম না; শুধু সকালে উঠে অর্চনা এবং মেজঠাকুমা দেখলেন, ঠাকুমা নেই, তিনি চলে গেছেন।

রায়বংশের ইতিহাস এবার মোহনার মুখে নদীর অবস্থার মত। গোটা জাতটার জীবনে তখন জোয়ার এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে রায়বংশের জীবনস্রোতের মুখে বালির চড়া ঠেলে দিয়েছে; গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে; কোনক্রমে শতধারা হয়ে নালার মত ধারায় দু'-চারটে স্রোত গিয়ে

পড়ছে। বাকি সব মজা বিলের মত কাদায়-জলে থক-থক করছে।

সুতরাং জবানবন্দী এখানেই শেষ হত। আমি সঙ্কল্পমত জমিদারী বিক্রী করে দিয়ে রায়দের বংশতালিকা হতে স্বচ্ছন্দে নাম কাটিয়ে নিজেকে হারিয়ে দিতে পারতাম। সম্পত্তি বিক্রী না করলে রায়বাড়ীর কৃতকর্মের জের থেকে রেহাই নেই। একটা বিচিত্র কথা বলি, সংসারে ধর্মান্তর গ্রহণ করলে বা জাত ফেলে দিয়ে বংশতালিকা থেকে নাম কাটিয়েও রেহাই মেলে না, সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে শরিকদের দায় ঘাড়ে চাপে। কিন্তু সম্পত্তি বিক্রী করে দিলেই তুমি খালাস। সে খালাস আমার আর হল না; হল না ঠাকুমার জন্যে। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, সম্পত্তি বেচব না। অবিশ্যি তাঁকে কথা না দিলেও আমি বেচতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আজও মনে হচ্ছে বিক্রী করাই উচিত ছিল, কিন্তু বেচতে বোধ হয় পারতাম না। সম্পত্তির মমতায় যে-কথা ঠাকুমা বলেছিলেন, সেটা মিথ্যে নয়। ভূমির মত সম্পত্তি নেই। ভূমির উপর অধিকার কায়েম করতে পারলে গাছপালা, ফলফুল, জীবজন্তু থেকে মানুষ পর্যন্ত তার সম্পত্তি হয়।

কথাটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম কীর্তিহাটে ফিরে এসে। না, যা ভাবছ তা নয়। প্রজারা সম্বর্ধনা করে নি, তারা গ্রাহ্যই করে নি বলতে গেলে, শরিক অর্থাৎ রায়বাড়ীর মেজতরফের যাঁরা তখনও সক্রিয়, তাঁরা বিরক্ত হলেন, বিদ্বিষ্ট হলেন, এ আপদ আবার কোত্থেকে এল। গ্রামের প্রধান এবং নায়ক তখন কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট। মানুষেরা তাঁকেই মানে। জমিদারের বিরুদ্ধে একটা উদ্ধত মনোভাব, গর্তের সাপের মত অহরহ উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের মত অনুভব করা যায়। তবু ভাল লাগল। রায়বাড়ীর ইঁট-কাঠ, বাড়ীঘর, পুকুর বাঁধাঘাট, গাছপালা, ক্ষেতখামার—নদীর ওপারে সিদ্ধাসন, জঙ্গলের ওপাশে গোয়ানপাড়া, সবই যেন মনকে ভরে দিলে। যেন আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

শতজনের বিমুখতা এবং অপ্রেমপ্রীতা আমাকে অথবা কীর্তিহাটের প্রকৃতিকে বা রায়বাড়ীকে অপ্রসন্ন করতে পারে নি; অন্ততঃ আমার চোখে দোল-খাওয়া গাছপালা, পাখীর ডাক আমার কানের কাছে বার বার বলেছিল, আমরা তোমার, আমরা তোমার। আমার মন বলেছিল—এসব আমার, এসব আমার!

ঠাকুমা মারা গিয়েছিলেন অগ্রহায়ণ মাসে; প্রথম দশদিনে একটা তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ বৃন্দাবনে করেছিলাম। টেলিগ্রামে জ্যাঠামশাইকে খবর দিয়েছিলাম; কীর্তিহাটে খবর দিয়েছিলাম। প্রথম শ্রাদ্ধ শেষ করে অর্চনা এবং মেজদিকে নিয়ে কলকাতা ফিরেছিলাম। কলকাতায় মাস দুয়েক থেকে ফাল্গুনের প্রথমে কীর্তিহাটে এলাম। এলাম ওই ঠাকুরমাকে দেওয়া আমার কথা রাখবার জন্য। ওখানে গোবিন্দমন্দিরের চত্বরে, যে চত্বরে মেজতরফের ধনেশ্বর রায় এবং জগদীশ্বর রায় ঠাকুমাকে ঢুকতে দেয় নি, সেই চত্বরে ঘটা করে একটি শ্রাদ্ধ আমি করব। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। চারটি ষোড়শ করব, তার মধ্যে একটি রূপোর। এই সব কল্পনা করে কীর্তিহাটে ফিরলাম। নায়েবকে লিখেছিলাম, এখন হয়ত কিছুদিন থাকব ওখানে। সুতরাং ওখানকার বাড়ীঘর মেরামত করবার ব্যবস্থা করবেন এবং বাড়ীর ভিতরটা সবই চুনকাম এবং বাইরেটা রঙ ফেরাবেন। শরিকেরা যদি তাঁদের অংশে রঙ ও চুনকাম

করতে বাধা দেন, তবে তাঁদের অংশ বাদ দিয়ে আমার অংশই করাবেন।

অনুমান করেছিলাম, বাধা কেউ দেবে না। সে অনুমান ষোল আনার মধ্যে একের ছয় মিথ্যে হয়েছিল, বাকী পাঁচের-ছয় ভাগ হয়েছিল সত্যি ; এক ধনেশ্বরকাকা ছাড়া বাকী সকলেই মত দিয়েছিলেন। শুধু ধনেশ্বরকাকা বলেছিলেন, না। আমার অংশ বাদ দিও। রঙের পোঁচড়া আমার অংশে যেন না ঠেকে।

হয়ত জগদীশ্বরকাকা থাকলেও ওঁর সঙ্গে সায় দিতেন ; কারণ ঠাকুমার দরজা আটকাতে দুই ভাই দাঁড়িয়েছিলেন এবং ধনেশ্বরকাকাই বলেছিলেন অপ্রিয় কথাগুলি। সে-কথা ধনেশ্বর-কাকা ভুলতে পারেন নি। এবং আমার টেলিগ্রাম যখন ঠাকুমার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এখানে তাঁর কাছেই পৌঁচেছিল তখন তিনি বলেছিলেন, না, অশৌচ নেব না। নিতে আমি পারি না। কিন্তু নিতে তাঁকে হয়েছিল গোবরডাঙার খুড়ীমার নির্দেশে এবং আরও একজন এ নির্দেশ দিয়েছিল, সে হল অতুলেশ্বর। অতুলেশ্বর সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছে। গোবরডাঙার খুড়ীমা বলেছিলেন—বাতে পঙ্গু হয়েছ, এবার মুখ থেকে পোকা পড়বে ও কথা বললে। কোন মুখে বলছ এ কথা ? অশৌচ নেবে না ?

অশৌচ তিনি নিয়েছিলেন, কিন্তু বাড়ী মেরামতের চুনকামের প্রস্তাবে তাঁকে কেউ নড়াতে পারে নি। গোবরডাঙার খুড়ীমা অনেক অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু ধনেশ্বরকাকা কিছুতে রাজী হন নি। না, তা আমি পারব না, এই হয়েছিল তাঁর বুলি, তখন তিনি ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি বাত। বাতে তখন তিনি পঙ্গু। যৌবনের দুরারোগ্য যৌনব্যাধির পরিণাম।

মনে মনে দুঃখ পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম এই জন্যে যে, ওঁরা যাই করে থাকুন, আমি আজও পর্যন্ত তো ওঁদের সঙ্গে কোন বিরোধ করি নি। তবে কেন প্রত্যাখ্যান করলেন ! ঠকিয়ে বা জবরদস্তি করেও তো অনেক কিছু নিয়েছেন আমার, তবে যখন আমি উপযাচক হয়ে তাঁর অংশের বাড়ী মেরামত করাতে চাইলাম, তখন না বললেন কেন ? সঙ্গে সঙ্গে আবার ভালও লেগেছিল। তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধের এক কুচি সোনার মতই ভাল লেগেছিল।

* * *

বিচিত্র মানুষের মন, আর তার থেকেও বেশী বিচিত্র মানুষের কর্মফেরের জের, এদের নাগপাশ থেকে মানুষের পরিত্রাণ নেই। গ্রামের লোকেদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ঠাকুমার শ্রাদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য বলতে গিয়ে মনে বড় কষ্ট পেলাম।

লোকের বাড়ী বাড়ী যাবার জন্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন নায়েব। বললেন—আগের কালে রায়বাড়ীর ক্রিয়াকর্মে গ্রামে লোকের বাড়ী যাওয়া হত না, ডাকাও হত না ; শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়াতে অধিষ্ঠানের নিমন্ত্রণ করতে যেতেন বাড়ীর পূজুরী আর আহারের নিমন্ত্রণ করতেন ঠাকুরবাড়ীর পরিচারক। পান-সুপুরি-পৈতে দিয়ে বরণের ব্যবস্থা আছে, তা কর্তারা থালাখানা এনে আসরে নামিয়ে দিয়ে বলতেন, ব্রাহ্মণেভ্য নমঃ। বলে চলে যেতেন। আপনার মাতৃশ্রাদ্ধেও তাই হয়েছে। কিন্তু এখন হালচাল পাল্টে গিয়েছে বাবু ; এখন নিজে না গেলে লোকে ঠিক—। অতুলেশ্বর তখন খালাস হয়ে এসেছে, সে দাঁড়িয়েছিল সেখানে,

আমাকে সে প্রায় নির্দেশ দিয়ে কথা বললে। বললে—লোকের বাড়ী বাড়ী যেতে হবে তোমাকে। নাহলে আমি বারণ করব। আমি হেসে বললাম—নিশ্চয় যাব। জমিদার আমি সাজব না। কিন্তু কল্যাণেশ্বর প্রভৃতি রায়বাড়ীর নবীনেরা বললে, দেখ, আমাদের মেজ-তরফে ভাঁটা পড়েছে, আমরা যাই যাই, তুমি যাবে কেন? তুমি সে ইজ্জতটা রাখ। তুমি তো এখানে থাকবে না, সুরোদা! অতুলকার কথা তুমি শুনো না।

মেজদি বললেন—না সুরো, তুই অতুলের কথা শোন।

অর্চনা বললে—না সুরোদা, তুমি যাও।

গোবরডাঙার খুড়ীমা ডেকে বললেন—সুরেশ্বর, তুমি কল্যাণদের কথা শুনো না। তুমি যাও। তোমার পিতামহীর শ্রাদ্ধ, তোমার কর্তব্য, তুমি যাও।

শুধু ব্রাহ্মণবাড়ী নয়, সুলতা—গ্রামের সকল পাড়ায় পাড়ায় প্রধানদের বাড়ীতে বাড়ীতে যেতে হল। রায়বাড়ীর নিমন্ত্রণ বরাবরই পঞ্চগ্রামের-সপ্তগ্রামের, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতারা নিমন্ত্রণ খেয়ে গেছে, কিন্তু সেকালে নিমন্ত্রণ হত পাড়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিমন্ত্রণ ছুঁড়ে দিয়ে; একখানা করে রোকা পাঠাতে হত। লেখা থাকত "অত্র রোকায় রায়বাড়ীর নিমন্ত্রণ জানিবা। রায়বাড়ীতে ‥উপলক্ষ্যে ভূদেব ভোজন হইবেক এবং তৎপর অন্যান্য সকলজনকে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করা হইবেক, উক্ত ভোজনের আসরে তোমাদের পাড়ার সকলকে যায় আগত-স্বগত কুটুম্বজনকে নিমন্ত্রণ জানানো যাইতেছে।"

এবার আর রোকায় নিমন্ত্রণ চলল না, আমাকে যেতে হল। গেলাম পাড়ায় পাড়ায়। ব্রাহ্মণ এবং বর্ধিষ্ণু শূদ্রদের ঘরে ঘরে। তারপর শ্রাদ্ধের আয়োজনের পরামর্শের জন্য সর্বাগ্রে আহ্বান জানাতে হল কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টকে।

সেখানে নিয়ে গেল অতুলেশ্বর।

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট রঞ্জন ঘোষ তখন নেই। মারা গেছেন। তাঁর জায়গায় প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তাঁর উকিল ছেলে। অতুলেশ্বর সেক্রেটারী। গ্রামে সদ্‌গোপদের সংখ্যাধিক্য, সুতরাং প্রেসিডেন্ট তারা ছাড়া কেউ হতে পারে না। রঞ্জন ঘোষের সেই উকিল ছেলেটি দাবী করলেন শ্রাদ্ধ যে রকমই করি, যত খরচই করি, কংগ্রেস কমিটির সামনে একটা সংগ্রাম আসছে, তার জন্য কংগ্রেস ফাণ্ডে টাকা দিতে হবে। সেও দিতে আমি রাজী হলাম, কিন্তু তবু পরিপূর্ণ সহযোগিতা পেলাম না ওদের কাছে। তার কারণ ওই গোয়ানপাড়ার ভায়লেটের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু করবার সংকল্প করেছিলাম। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বেঁকে বসলেন ওই কথায়—না, তা করতে পাবেন না।

ঠাকুমা বলে গিয়েছিলেন তাঁর শ্রাদ্ধের সঙ্গে যেন ভায়লার জন্যে কিছু করি। বলেছিলেন—ওরে, বড়বাবু মারা গেলেন ভায়লার পিছনে ছুটতে গিয়ে। আর বড়বাবু মারা গেলে আমি মরতে পারলাম না, ভায়লা অনায়াসে বিষ খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরল।

ভায়লেট মেয়েটি গলায় কেন দড়ি দিয়েছিল জানি না, তবে আমার ঠাকুমা তার ওই ব্যাখ্যাই করেছিলেন। এবং স্বামীর শ্রাদ্ধের দিনে রাত্রি এক প্রহরের সময় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন গোয়ানপাড়ায় গির্জের পাদরীর কাছে; ভায়লেটের শান্তি হোক, এই তিনি

চেয়েছিলেন। কিন্তু তাও হয় নি, কারণ গভীর রাত্রে কারুর দেখা পান নি। ফলে রায় বাড়ীতে যেজতরক তাঁকে—।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—আমি তাঁর কথায় সংকল্প করেছিলাম, গোয়ানপাড়ায় ভায়লেটের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু করে দেব। আর ভায়লেটের কবরের যদি কোন সন্ধান মেলে, তবে কবরটিতে অন্ততঃ একটা মার্বেল ক্রশ বসিয়ে কবরটি মার্বেল দিয়ে ঢেকে দেব। কিন্তু বাধা পড়ল তিন দিক থেকে। কীর্তিহাটের কংগ্রেস ও গ্রামের তরফ থেকে, রায় বাড়ীর ছেলেদের তরফ থেকে এবং সব থেকে আশ্চর্যের কথা, গোয়ানপাড়া থেকেও এল বাধা।

* * *

ঠাকুমা যদি কীর্তিহাটে তাঁর শ্রাদ্ধ করতে না বলতেন, আর ভায়লেটের স্মৃতির জন্যে কিছু না বলতেন, তবে এইখানে ছেদ টেনে দিয়ে বলতাম,—এই শেষ। কলকাতায় থাকতাম, নায়েব-গোমস্তারা জমিদারী চালাত, হিসেব দিত; আমি নিশ্চিন্ত মনে আজকের দিনটির অপেক্ষা করে থাকতাম। কিন্তু ঠাকুমার শেষ ইচ্ছা পালন করতে গিয়ে প্রথমেই পেলাম বাধা।

কীর্তিহাটের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বললেন—গোয়ানপাড়ায় কিছু করা হবে না। করতে গেলে বাধা পড়বে। গ্রামের লোকে হয়তো খাবে না। আপনাকে ওদের নিয়েই থাকতে হবে।

না খাওয়ার অর্থ ভীষণ। অন্ততঃ আমার ঠাকুমার শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রে। তাহলে যে অপরাধে তাঁকে রাধাসুন্দরের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি, যে অপরাধে তাঁর ছেলে যজ্ঞেশ্বর রায় তাঁর পৈতৃক কোম্পানীর কাগজ তাঁদের নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন, সেই অপরাধ কায়েম হয়ে যাবে।

গোয়ানপাড়ার ক্রীশ্চান বাসিন্দেরা সেই ভোটের সময় থেকে কংগ্রেসবিরোধী—ইংরেজদের সমর্থক হয়েছে প্রকাশ্যে। তাদের সঙ্গে মুসলীম লীগের পাওয়া হাত মিলিয়েছে।

তার সঙ্গে মনে পড়িয়ে দিলে অতুল—তুমি তো একবার ভুগেছ। ভোটের পর গোয়ানপাড়া পুড়িয়ে দিয়েছিল কারা; তুমি তাদের ঘর নতুন করে গড়বার জন্যে সাহায্য করতে চেয়েছিলে, তার জন্য—।

সবটা না বলে অতুল থেমে গেল। জানে তো মনে আমার আছে। শুধু বলে দিলে এবার আবার তার থেকেও কিছু বেশী হবে।

আমি অতুলকে বলেছিলাম—অতুলকাকা, এটাও তো জান যে, সেদিন পুলিস এসে যখন আমাকে রক্তমাখা অবস্থায় পেয়েছিল, তখন আমি যে জবানবন্দী দিয়েছিলাম, তার জন্যেই কীর্তিহাটের গ্রামের কারুর গায়ে আঁচ লাগে নি।

—জানি। কিন্তু সে না করে তোমার উপায় ছিল না। সে করতে তুমি মরালি বাধ্য ছিলে।

—মরালি বাধ্য ছিলাম?

—অন্ততঃ আমি তাই মনে করি।

একটু ভেবে আমি বলেছিলাম—তাই যদি মনে কর অতুলকাকা, তবে আমি আর তোমার বা তোমাদের সাহায্য চাইব না। আমি যা পারি যেমন পারি নিজেই করব। গ্রামের

লোক যা করে করুক।

—বেশ কর।

অতুল চলে গিয়েছিল। মেজদিদি, অর্চনা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অতুল এমন কথা বলতে পারে, তারা তা ভাবতে পারে নি।

সাহস দিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন গোবরডাঙ্গার খুড়ীমা। এবং শেষ শয্যায় শুয়ে ধনেশ্বর রায়। ক'দিনের মধ্যে তিনি ভেবে ভেবে সব চক্ষুলজ্জা, সব মিথ্যে মর্যাদার মোহ ত্যাগ করে নিজের বিগত অন্যায়কে স্বীকার করে নিতে পেরেছিলেন। স্বীকার করেছিলেন—"রাধাসুন্দরের চত্বরে সেদিন উমা দেবীকে ঢুকতে দেই নি, বড়তরফকে দেবোত্তর থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে। কিন্তু বড়তরফের বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বর রায় জটিল বিষয়ী এবং দুর্দান্ত নিষ্ঠুর। তিনি মাকে পাগল বানিয়ে তাঁকে বৃন্দাবনে বনবাসে দিয়ে বিষয়ের মুঠো একটুকু আলগা হতে দেন নি। আমি দোষ স্বীকার করছি। তার প্রায়শ্চিত্ত আমি করে যাব সুরেশ্বর, আমি বিছানায় শুয়ে এই পঙ্গুদশায় যতটা পারি সাহায্য করব।"

গোবরডাঙারখুড়ীমা বলেছিলেন—তুই পিছিয়ে আসিস নে সুরেশ্বর। জ্যাঠা মায়ের শেষ ইচ্ছে তোকে পূর্ণ করতেই হবে। ভায়লেট মেয়েটা তাঁর মরণের খবর পেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছিল, এ ভালবাসা কে অস্বীকার করবে! জ্যাঠাইমার মত সতীসাধ্বী হয় কে? ভায়লেটের ভালবাসার দাম তিনি বুঝবেন না তো বুঝবে কে?

বাধা এল অন্য দিক হতে। গোয়ানদের দিক হতে। তারা বললে—ভায়লেটের কবর তারা ছুঁতে দেবে না। সে কবর যেমন আছে তেমনি থাকবে। চাই নে তার মার্বেলের আবরণ, মার্বেলের ক্রশ। দেবেশ্বর রায়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল এ কথা যে বলবে তার জিভ তারা ছিঁড়ে নেবে।

দিন-সাতেকের মধ্যেই আমার নামে একটা নোটিশ এল। তমলুকের এস-ডি-ও আদেশ জারী করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, গোয়ানপাড়ার কবরস্তানে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় তোমাকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, সেখানে কোন কিছু করবার চেষ্টা যেন না করা হয়। লোকজনসহ সেখানে যেন না যাই।

আমি নায়েবকে বললাম—গোয়ানপাড়ার কে এসেছে নোটিশ জারী করাতে, তাকে ডাকুন।

নায়েব বাইরে গিয়ে ফিরে এসে বললে—ওরা কেউ আসবে না।

আমি নিজে বাইরে গেলাম। দেখলাম আদালতের পিওনের সঙ্গে তিন-চারজন গোয়ান এসেছে। তাদের নাম মনে পড়ল না। ভুলে গেছি বছর দুয়েকের মধ্যে। তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম—দু বছর আগে যখন তোমাদের ঘর পুড়েছিল, তখন তোমাদের টাকা দিয়েছিলাম। আমি তোমাদের অপমান করি নি। ভায়লেটের কবর আমি বাঁধিয়ে দিতে চাই, তোমরা দেবে না। ভাল কথা। কিন্তু ভায়লেটের নামে যদি চার্চে টাকা দিই বা তার নামে একটা কিছু করে দি গোয়ানপাড়ায়, তাহলে তাও কি নেবে না তোমরা?

ওরা চুপ করে রইল। এ-ওর মুখ তাকালে। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলে না। চলে

গেল। বিকেলবেলা বিবিমহলের ঘরে বসেছিলাম, রঘু এসে বললে—সেই মেয়েটি এসেছে। সেই কুইনী বলে মেয়েটি। তার সঙ্গে আছে পাড়ার পাদরী সাহেব।

কুইনী এল যেন জ্বলতে জ্বলতে। প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে। সে বললে—না, গোয়ানপাড়ার কেউ কিছু নেবে না আপনার কাছে। আপনারা বড়লোক, আপনারা লজ্জাহীন, আপনারা অন্ধ, আপনারা অনুভবশক্তিহীন; আপনারা মনে করেন দুনিয়াকে আপনারা কিনে রেখেছেন; জমির জমিদারীস্বত্ব কিনেছেন, সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও কিনেছেন ভেবেছেন। চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, মনে অনুভব করতে পারছেন না যে দিনকাল পাল্টেছে; মানুষ আর আপনাদের হুকুম মানবে না, আপনাদের দেওয়া অপমান সইবে না। কেন আপনি এমন করে অপমান করতে চাইছেন আমার মাতামহের মা লায়লেট পিক্রসকে? কি অধিকার আপনার?

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে সে হাঁফাতে লাগল।

আমি অবাকবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

সুলতা—নারীর প্রতি পুরুষের মোহ যদি পাপ হয় তবে পাপদৃষ্টি দিয়েই আমি তাকিয়েছিলাম তার দিকে। বিলেতে হারা রে এবং লরা নাইট অথবা লম্পা রের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে তরুণী নারীর দিকে মোহ নিয়ে তাকাতে গেলেই কেমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটত আমার; ধীরে ধীরে তার মুখে চোখে রঙে হাসিতে অশ্রুতে রায়বংশের কারুর না কারুর অদল ভেসে উঠত, জীবন আমার শামুকের মত খোলার মধ্যে গুটিয়ে যেত; এই প্রথম কুইনীর সামনে তার ব্যতিক্রম ঘটল।

মনে পড়ল, মেদিনীপুরের বাসায় ওকে দেখে আমার জীবনে সর্বপ্রথম এই মোহময় বাসনা জেগেছিল। প্রথম যৌবনে তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু জীবনের বাসনা এমনভাবে জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হয়ে অজস্র ফেনা মাথায় করে ফুলে-ফেঁপে ওঠে নি। আদিম মৌলিক দেহবাদের প্রথম উচ্ছ্বাস। রায়বংশে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে ধর্ম শক্তি ও সম্পদের লালনে এই দেহবাদ দুর্দান্ত-দুর্দমনীয় হয়ে রক্তের মধ্যে মিশে ছিল, আজ তাতে প্রবল জোয়ার এসেছে। মেদিনীপুর বাসার সেদিনের উচ্ছ্বাসের প্রথম জাগরণ।

এবার দু বছর পরে কুইনী আরও মোহময়ী হয়ে উঠেছে আমার চোখে।

আমার প্রপিতামহ রায়বাহাদুরের অতৃপ্ত কামনা যেন আমার এই কামনার মধ্যে ফুটেছে।

আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের ভায়লেটের প্রতি যে কামার্ততা, তা যেন আমার বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরির মত অগ্ন্যুদগার করছে।

ওকে না পেয়েই জীবন আমার শূন্য হয়ে রয়েছে।

ওর উপর অধিকার রয়েছে। ও আমার। অঞ্জনার মেয়ের বংশের মেয়ে, দেবেশ্বর রায়ের প্রথম ভালবাসার (হোক সে অবৈধ ভালবাসা) ফল, প্রথম সন্তানের দৌহিত্রী। ওকে আমিই লেখাপড়া শিখিয়ে এমন রূপে ফুটিয়েছি, ও আমার। ওকে আমায় পেতেই হবে। মনে পড়ল, গতবার পুলিসের হাত থেকে রায়বংশের সন্তানদের এবং এই গ্রামের লোকেদের, বিশেষ করে রঙলাল ঘোষকে বাঁচাবার জন্য বলেছিলাম—"আমার কুইনীর ওপর

দুর্বলতা আছে।"

সে কথাটা আমি মিথ্যা বলি নি। সে কথা সত্য।

কুইনীকে দেখছিলাম। আর মনে হচ্ছিল—।

থামল সুরেশ্বর। চোখ বুজে মনে মনে কোন ভাবনা বা চিন্তাকে উপভোগ করলে সে, মুখে ক্ষীণ রেখায় একটু হাসি ফুটে উঠল। একবার ঘাড়ও নাড়লে, মনে মনে কোন মধুর চিন্তা উপভোগ করার আনন্দে। তারপর বললে—তুমি গিরিশবাবুর বিল্বমঙ্গল পড়েছ বা অভিনয় দেখেছ সুলতা? আমি পড়েছি, অভিনয়ও দেখেছি এ্যামেচারে। তাতে চিন্তামণির রূপ এবং দেহ-মোহে অন্ধ বিল্বমঙ্গল বাপের শ্রাদ্ধের দিন শ্রাদ্ধ করেই চিন্তামণির বাড়ী রওনা হচ্ছে দুর্যোগ মাথায় করে। তুফানে প্রলয়ঙ্করী নদী, খেয়াঘাটে নৌকা নেই, কিন্তু সে উন্মত্ততার কাছে বাধা নয়। সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কাঠ বলে একটা গলিত শবকে আশ্রয় করে নদী পার হল। বাড়ীর পাঁচিলের গর্তে মুখ ভরানো সাপের লেজ ধরে পাঁচিলে উঠে চিন্তামণির ঘরে এল। চিন্তামণির বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে উঠে সব দেখে বললে—তুমি কি? বিল্বমঙ্গল তার মুখপানেই অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, কোন আক্ষেপ নেই, অন্য কথা নেই, শুধু একটি কথা—"চিন্তামণি, তুমি অতি সুন্দর! তুমি অতি সুন্দর!"

আমি ঠিক সেই ভাবেই কুইনীর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

আশ্চর্য মোহ কুইনীর সর্বাঙ্গে। তার রুক্ষ চুলে, তার রুক্ষ সৌন্দর্যে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মধ্যে ঈষৎ একটা বিদেশী ফ্যাকাসে আভাস। তার আয়ত চোখের পল্লবচ্ছদের মধ্যে ঈষৎ নীলাভা, তবে চোখের তারা কালো নয় পিঙ্গল; তাও আমার কাছে অপরূপ বলে মনে হল।

আমি তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

পুরাণের কাল হলে বলতাম, আমি মদন-বাণ-বিদ্ধ, জর্জরিত। অতি-বাস্তববাদীর ভাষায় আমি তখন আদিম-কামনার আদি মানুষের মতই কামার্ত।

কুইনী আমার সে-দৃষ্টির সম্মুখে কেমন যেন ভীতার্ত হয়ে উঠল, বোধ করি আমার দৃষ্টির উত্তাপ তাকে দগ্ধ করছিল। ভয়ে সে নিজের পাশের দিকে চকিতদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিলে, তার সঙ্গী বৃদ্ধ পাদরী বসে আছেন কিনা। তাঁকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে আমাকেই তিরস্কার করে তাঁকে বললে—উঠে আসুন ফাদার। উনি শুধু অসভ্যই নন, উনি বর্বর। ওঁকে আমি ঘৃণা করি। আই হেট হিম।

আমার দিকে তাকিয়ে বললে—আর আপনি আমাদের এমন করে অপমান করবেন না। ভায়লেটকে পিক্রুজের আত্মাকে শান্তিতে কবরের তলায় ঘুমুতে দিন।

আমি শুধু একটা কথা বলেছিলাম—আমাকে তুমি ভুল বুঝো না কুইনী। তুমি আমার উপর অবিচার করছ। অপমান আমি তোমাদের করি নি। আমার পিতামহ ভায়লেট পিক্রুজকে ভালবাসতেন এবং ভায়লেটও তাঁকে ভালবাসত।

কুইনী দাঁড়ায় নি, শুনতে চায় নি সে এ-কথা, দ্রুতপদে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। এতক্ষণে বৃদ্ধ পাদরী আমাকে বলেছিলেন—কুইনী ঠিক বলেছে সুরেশ্বরবাবু, কেন একটি দুঃখিনী মেয়ের অশান্ত আত্মার গলায় কলঙ্কের মণিহার পরিয়ে তাকে আরও দুঃখ দেবেন, লজ্জা

দেবেন। তাছাড়া আর একটা কথা বলি—। আপনি গোয়ানদের জন্যে অনেক কিছু করেছেন। এই চার্চের জন্য জমি দিয়েছেন, অর্থও দিয়েছেন। তাই আপনার মঙ্গলের জন্যই বলছি, ওরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিছু করতে গেলে হয়তো গোয়ানরা আপনার অনিষ্ট করবে।

* * *

তাতে আমি ভয় পাই নি সুলতা। তখন রায়বংশের রক্ত আমার মধ্যে জেগে উঠেছে। ভয় আমি গোয়ানদেরও পাই নি, কীর্তিহাটের লোকেদেরও পাই নি—আমি ঠাকুমার শ্রাদ্ধে দু'হাত খুলে খরচ করেছিলাম। ব্রাহ্মণদের ভোজন-দক্ষিণা দিয়েছিলাম, দীয়তাং ভুজ্যতাং রব তুলেছিলাম ভোজন আয়োজনে।

তখনও ১৯৪১ সাল সুলতা। জ্যৈষ্ঠ মাস, তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইয়োরোপ-আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ; ফ্রান্স পড়েছে। ডানকার্ক থেকে ইংরেজ কোনও রকমে প্রাণ-মান বাঁচিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যাণ্ডে এসেছে। হিটলার বলকানে ঢুকেছে। আফ্রিকায় নতুন ফ্রন্ট খুলেছে। আবিসিনিয়ায় ইটালীর বাহিনীর সঙ্গে তার শুরু। তখনও ভারতবর্ষে তার আঁচ পৌঁছোয় নি, জিনিসপত্রের বাজারে ধানচালের গোলায় কন্ট্রোল বসে নি; তখনও বাজার সস্তাগণ্ডা, তখনো শ্রাদ্ধে বিবাহে ক্রিয়াকর্মে বাধানিষেধ নেই। আমি প্রচুর আয়োজন করে ঠাকুমার শ্রাদ্ধ সমারোহের সঙ্গে সুসম্পন্ন করলাম।

পরামর্শ টা দিলেন বড়জ্যাঠামশাই।

যজ্ঞেশ্বর রায়। দেবেশ্বর রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র; রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের প্রিয়তম পৌত্র। রায়বংশের মধ্যে নারী সম্পর্কে রত্নেশ্বর রায়ের পর সংযমী পুরুষ। তিনি হাই ব্লাডপ্রেশার নিয়েও এসে শ্রাদ্ধ করে চলে গেলেন। মায়ের শেষকৃত্য করে প্রায়শ্চিত্তই শুধু করলেন না, উমা দেবীর গহনার অর্ধেক ভাগ নিয়ে চলে গেলেন। তিনিই পরামর্শ দিলেন।

বললেন—রায়বাহাদুর বলতেন, যেখানে চামড়ার জুতো চলে না, সেখানে চাঁদির জুতো চালাতে হয়। পথের ধুলোর উপর হাঁটবে, তখন চামড়ার জুতো পরো, মানুষের মাথার উপর দিয়ে হাঁটতে হলে রুপোর জুতো তৈরি করে পরো, দেখবে মানুষগুলো মাথা পেতে দিয়ে বলবে—আমার মাথায় পা রাখুন। টাকা তোমার আছে সুরেশ্বর, তাই খরচ করে তিনি যা বলে গেছেন তাই কর। যখন করতে নেমেছ তখন পিছিয়ো না। টাকায় সব হয়।

তর্ক নিশ্চয় উঠবে। এবং কথাটাও নিশ্চয় সত্য নয়। কিন্তু তখন সত্য মনে হয়েছিল, সত্য হয়েও উঠেছিল। শ্রাদ্ধে কোন বাধা আসে নি। তবে হাঁ, গোয়ানপাড়া নিমন্ত্রণ নেয় নি কিন্তু কিছু দরিদ্র গোয়ানরা গোপনে এসে মিষ্টি খেয়ে গিয়েছিল।

শুধু তাই নয়, সংকল্প যা করেছিলাম তা কোনটা অপূর্ণ থাকে নি, তা রাখি নি আমি। শ্রাদ্ধের পরদিনই কাঙালী-বিদায় কাঙালী-ভোজনের মধ্যে আর একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারীর সঙ্গে দেবেশ্বর রায় হসপিটালের পত্তন করেছিলাম। তাতে উমা দেবীর নামে চারটে বেড। আর একটা বেড ছিল অহিন্দুদের জন্য রিজার্ভড। তাঁর নাম কি হবে তা বলি নি, তবে বুঝতে কারুর বাকি থাকে নি ওই বেডটি

শেষ পর্যন্ত কার নামে হবে। তবু কেউ জিজ্ঞাসা করে নি বা করতে সাহস করে নি।

অতুলেশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিল—এই বেডটা কি—

বলেছিলাম—অহিন্দু ক্রীশ্চান মুসলমানদের জন্তে থাকবে।

—কার নামে হবে ?

—অনুমান করতে তো পেরেছ। কিন্তু ওতে আপত্তি করলে হাসপাতাল আমি এখানে করব না। আশা করি এতে তোমাদের জোর খাটবে না।

অতুলেশ্বর চুপ করেছিল। গোয়ানরা কেউ আসে নি। তবে আলোচনা করেছিল। তাতে তারা অখুশিত্ব প্রকাশ করে নি। খুশি হয়েছে এইটে গোপন করেছিল।

আর একটা মন্দির গড়েছিলাম। গড়েছিলাম সিদ্ধাসনের জঙ্গলে, ছোট একটি মন্দির তৈরী করিয়েছিলাম—পনের ফুট উঁচু মন্দির। যে-ঘরটায় শ্যামাকান্ত মনোহরা যোগিনীকে নিয়ে শক্তিসাধনা করেছিলেন বা শক্তিসাধনার নামে ব্যভিচার করেছিলেন, যে-ঘরে সতেরো বছরের তরুণ কন্দর্পের মত দেবেশ্বর রায় চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরী ভায়লেটের সঙ্গে প্রথম মিলিত হয়েছিলেন, দেবেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর যে-ঘরে চালের কাঠে দড়ি বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল ভায়লেট, সেই ঘরের ভাঙা দেওয়ালগুলোর ভিতে ভিত খুঁড়ে মন্দিরের পত্তন করেছিলাম। সিদ্ধাসনের একটি মার্বেলের বেদী তৈরি করিয়ে দেবার সংকল্প করেছিলাম।

বোধ হয় তোমার মনে আছে, ওই সিদ্ধাসনে পুজো শুধু হিন্দুরাই দিত না, গোয়ানরাও দিত ; হিন্দুরা পাঁঠা বলি দিত বিজয়া-দশমীর দিন—গোয়ানরা নৈর্ঋত কোণে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মুর্গী বলি দিত।

বাতাসা-মণ্ডার পুজা ভোগ দিতে তারা বেদীর কাছে এসে নামিয়ে দিত। ১৯৪১ সাল '৪২ সাল পর্যন্তও দিয়েছে।

৪১ সালে হাসপাতালের সঙ্গে ভিত পত্তন করেছিলাম এবং মনে মনে সংকল্প করেছিলাম—মন্দির সম্পূর্ণ হলে ওই মন্দিরের মেঝেতে বেদীর নীচে একটা মার্বেল ট্যাবলেট বসিয়ে দেব, যাতে লেখা থাকবে—'যে-নারী তাঁর প্রেমাস্পদের মৃত্যুতে বিরহ সহ্য করতে না পেরে এখানে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেছিলেন, তাঁর অক্ষয়স্বর্গ হয়েছে এই সিদ্ধাসনের প্রসাদে।'

মুখে সংকল্প প্রকাশ করি নি। গোড়ায় কেউ বুঝতেও পারে নি।

* * *

এক বছর পর :

১৯৪২ সাল, অক্টোবর মাস। তখন মেদিনীপুর দাউ-দাউ করে জ্বলছে। আগস্ট মুভমেণ্ট আরম্ভ হয়ে পূর্ণ বেগে চলেছে। ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি বাংলা দেশে—সেই বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলায় তখন থানা পুড়ছে, সরকারী আপিস পুড়ছে। বড় বড় বাঁশের ডগায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মেদিনীপুর বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে। সেই সময় এই মন্দিরে কীর্তিহাটের কড়চার রায়বাড়ীর জবানবন্দীর শেষ ঘটনা ঘটল।

ওই মন্দিরেই আমার কাঁধে একজন গোয়ান ছুরি মারলে।

বিচিত্র ঘটনা। আমার জবানবন্দীর শেষ ঘটনা।

রক্তে মন্দিরের মেঝের সাদা মার্বেল লাল হয়ে গেল। এবং তাতেই ধুয়ে গেল দেবেশ্বর রায়ের অপরাধ। তাতেই আমি মুক্তি পেলাম শ্যামাকান্তের অভিশাপ থেকে। তখন বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন আসছে। পরের দিনই মেদিনীপুরের সমুদ্রকূলে তুফান তুলে ঢুকবে। তাতেই ধ্বসে যাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতের মূল পাথরটা, ফেটে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে রায়বাড়ীর তিন-মহলা বাড়ীও ভাঙবে, ফাটবে।

ঘটনাটা ঘটল পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যায়।

১৯৪২ সালের আশ্বিনের দুর্গাপঞ্চমী। আকাশে তখনও মেঘের কোন ঘটা নেই, কোন ইশারা নেই, বঙ্গোপসাগরে কোথায় কোন্ দিগন্তে বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে তা কেউ জানে না, হয়তো প্রকৃতি নিজেও সচেতন নন; শরতের আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা চলেছে; পূজোর ঢাক তখন ভোরবেলা আর সন্ধ্যেবেলা একবার করে বেজে যায়; তাকে ধুমুল দেওয়া বলে। ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরের অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর। আগস্ট মুভমেন্ট আরম্ভ হয়ে গেছে।

ইয়োরোপের যুদ্ধ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিগন্তে ছিটকে এসে পড়েছে। পার্ল হারবার থেকে শুরু করে জাপানীরা হংকং সিঙ্গাপুর কেড়ে নিয়ে গোটা বার্মা মুলুকটাই ছিনিয়ে নিয়েছে। ইংরেজের পল্টন হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে রোজ খেতে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে কোন রকমে ইণ্ডিয়াতে এসে হাঁপ ছেড়েছে। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলও কেড়ে নেবে আন্দাজ করে রিট্রিটের প্ল্যানিং করে ফেলেছে। মেদিনীপুর সমুদ্রকূল অঞ্চলে নৌকো সাইকেল এসব ইংরেজ সরকার কেড়ে নেবার নোটিশ দিয়েছে। এরই মধ্যে কংগ্রেস কুইট ইণ্ডিয়া রেজলুশন নিয়ে বলেছে—"ভারতবর্ষ ছেড়ে তোমরা চলে যাও।" অন্য দিকে বাজারে জিনিসপত্রের দর হু-হু করে চড়তে শুরু করেছে।

বাংলা দেশে কলকাতা থেকে শুরু করে আসাম অঞ্চল পূর্ববঙ্গ জুড়ে ইংরেজ এবং আমেরিকান সৈন্যে ছেয়ে গেছে।

এরই মধ্যে কুইট ইণ্ডিয়া রেজলুশন থেকে আগুন লেগে গেল দেশে। গোটা ভারতবর্ষেই লাগল আগুন কিন্তু বাংলা দেশে মেদিনীপুর জেলা হয়ে ছিল বারুদের গাদা, সেই গাদায় বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

মেদিনীপুরের আত্মার প্রতীক মাতঙ্গিনী হাজরা—তিনি থানা দখল করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা গেলেন। কিন্তু থানার দখল দিয়ে গেলেন সাধারণ মানুষদের হাতে। কীর্তিহাটের দখল নিয়ে বসল কীর্তিহাট কংগ্রেস, কংগ্রেসের সভাপতি রঙলাল মণ্ডলের ছেলে, সেক্রেটারী অতুলেশ্বর রায়।

থানার দারোগা পালিয়েছিল—কনেস্টবলেরাও পালিয়েছিল—একজন এ-এস-আই ধরা পড়ে দেশী সরকারের হাতে অ্যারেস্টেড হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে যারা ইংরেজপক্ষের লোক তারা হয়েছিল নজরবন্দী। তার মধ্যে ছিলাম আমি। আমি জমিদার; আমি এর আগে মেজদির কেসে এবং অতুলেশ্বরের কেসে কংগ্রেসকে সাহায্য করেছি বটে তবুও বার বার

হুকুম অমান্য করেছি। আর নজরবন্দী হল গোটা গোয়ানপাড়ার লোকেরা। যে সব লীগ-পন্থী মুসলমান আনাগোনা করছিল তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিরে গেল আপন আপন নিরাপদ আস্তানায়।

তখন সবে হাসপাতাল তৈরী শেষ হয়েছে; বিছানাপত্র এবং সরঞ্জামও এসেছে কিন্তু অনুষ্ঠান করে উদ্বোধন হয় নি। পুজোর আগেই উদ্বোধনের কথা—উদ্বোধনের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এন এম খানের আসবার কথা। কিন্তু বিপ্লব বল বিপ্লব বিদ্রোহ বল বিদ্রোহ তার আগুন জ্বলবার পরেই আমার উপর পরওয়ানা জারী হল—হাসপাতাল অবিলম্বে খোলা হবে। ওপন করবেন কংগ্রেস সভাপতি।

হাসপাতালের জরুরী প্রয়োজন। আহত হচ্ছে যারা তাদের চিকিৎসা চাই।

তাই হ'ল। আমি সেদিন হাত জোড় করে কংগ্রেস সভাপতিকে আহ্বান করে বললাম—আপনি যে অনুগ্রহ করে এই দেবেশ্বর রায় হাসপাতাল উদ্বোধন করতে সম্মত হয়েছেন তাতে রায়বংশ এবং আমি কৃতকৃতার্থ। আপনি জননায়ক।

জিভে আটকায় নি। সংকোচও বোধ করি নি স্থূলতা। বরং যেন কিছুটা খুশীই হয়েছিলাম। তবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধও করি নি। কারণ এদের দলে আমার স্থান অনেক নিচে এটা মনে করে আড়ষ্ট হয়ে জীবনের ছন্দে সহজ উল্লাস আসবে কি করে বল। তবে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলাম। বিনিময়ে অস্থায়ী স্থানীয় সরকার আমাকে বন্দী করে ঘরে আবদ্ধ রাখে নি বটে তবে নজরবন্দী ক'রে রেখেছিল। গতিবিধি সীমাবদ্ধ ছিল গ্রামের মধ্যে। চিঠি লেখা বারণ ছিল। আরও বাধানিষেধ ছিল কিছু কিছু। আমি এরই মধ্যে চেয়েছিলাম ওপারে সিদ্ধাসনের মন্দিরে যাওয়ার অধিকার।

আমি একটা অজুহাত অনেক খুঁজে খুঁজে বের করেছিলাম। ওই সিদ্ধাসনের মন্দিরে আমি ফ্রেস্কোর মত ছবি আঁকব।

প্রার্থনা আমার মঞ্জুর করেছিলেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। কারণ গোটা গোয়ানপাড়াটা গত দু' বছরের ভোট ঝগড়া থেকে সন্দেহ জন হিসেবে তখন সতর্ক স্বেচ্ছাসৈনিকদের কড়া পাহারায় রয়েছে। এবং আমি নজরবন্দী হলেও বিশেষ সম্মানিত নজরবন্দী। আমার দেওয়া হাসপাতালেই কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের চিকিৎসা হচ্ছে। এমন কি প্রেসিডেন্ট নিজেই ওপনিংয়ের সময় ওই অহিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত বেডটির নামও ঘোষণা করেছেন—ভায়লেট সিক্রুজ বেড। কিন্তু রিজার্ভড রাখার শর্তটি তুলে দিয়েছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে এই জাতিভেদ চলবে না। বলেছেন—হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান ভেদ আমাদের নেই, তারা আমাদেরই আপন লোক। তবে বিশ্বাসঘাতকতা কারুরই বরদাস্ত করা হবে না।

গোয়ানরা বলতে কিছু পারে নি, সাহস করে নি। তারা তখন হেরে গেছে, তখন গোটা পাড়াটাই কড়া পাহারায় বাস করছে। কোন অসম্মান নেই কোন নির্যাতন নেই। তবে বাইরের লোক ভিতরে আসতে পায় না, ভিতরের লোক বাইরে অর্থাৎ গ্রামের বাইরে যেতে পায় না। বাইরে যে কাজ থাক বা বাইরে থেকে যে জিনিসের প্রয়োজন হোক তা করে দেয় বা এনে দেয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা।

এই বিচিত্র অবস্থার মধ্যে নিত্য আমি যেতাম সিদ্ধাসনের নতুন মন্দিরে ছবি আঁকতে। কিন্তু আঁকা হ'ত না। কি আঁকব ভেবে পেতাম না। কল্পনার মধ্যে ক্রমাগত দেবেশ্বর রায় ও ভায়লেট পিক্রুজের ছবি ভেসে উঠত। আঁকতে ইচ্ছে হ'ত দেবেশ্বর এবং ভায়লেটের প্রথম মিলন দৃশ্য এবং ভায়লেটের ও দেবেশ্বর রায়ের মৃত্যুদৃশ্য।

সে ট্যাবলেটটা তখনও বসানো হয় নি। সেটা কলকাতায় বরাত দেওয়া ছিল, এসে পৌঁছয় নি।

আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর—দুর্গাপঞ্চমীর দিন পর্যন্ত নিত্য যেতাম। ছবি আঁকার অজুহাতে, কিন্তু ছবি আঁকতে নয়। যেতাম আমি কুইনীকে দেখতে।

আমার জবানবন্দীতে আমি মিথ্যা বলব না। এর আগেই আমি বলেছি—ঠাকুমার শ্রাদ্ধের সময় যখন কুইনীকে দেখেছিলাম তখন থেকেই আমি তার মোহে আচ্ছন্ন, তার কামনায় আমি প্রমত্ত এবং কায়িক মিলনের কামনার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নিকট এবং নিগূঢ় বলে তার প্রেমেও আমি প্রেমার্ত বলতে দ্বিধা করছি নে।

কুইনী আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বলেছে সে আমাকে ঘৃণা করে, কিন্তু আমি তাতেও তিক্ত হই নি, বিমুখ হয় নি, প্রত্যাখ্যানেও আমি আহত হই নি, তার উপর ক্রুদ্ধ হতে পারি নি। বরং উল্টো হয়েছিল, আমি আরও বেশী করে আকৃষ্ট হয়েছি। নিত্য সে প্রেম, সে কামনা তিলে তিলে বেড়ে সে তিলোত্তমার মত সম্পূর্ণ হয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় আছে।

মন্দির শুরু করবার পর থেকেই আমি কাজ দেখবার অছিলায় নিত্য যেতাম। তখনও আগস্ট মুভমেন্ট আরম্ভ হয় নি। তখনও গোয়ানপাড়া কীর্তিহাটের লোকেদের সঙ্গে রেষারেষি বেধে চলেছে। আমিও তখন জমিদার। স্বাধীন আমার গতিবিধি। প্রয়োজন ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করলে বলব—আমার মত লোকের পক্ষে যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ এমন করে দাঁড়িয়ে থেকে নিজে তদারক করে কাজ করানো আমার স্বভাবের বাইরে, কখনও করাই নি। হিসেবীও আমি নই। বাবা এত প্রচুর রেখে গিয়েছিলেন যে হিসেব আমাকে করতে হ'ত না। প্রায় শেষ করে এনেছি—তবুও ছিল। ঠাকুমার মৃত্যুর পর হাসপাতাল পত্তন করে এখানেই থেকে গেলাম। গিয়েছিলাম যে সব আকর্ষণে তার মধ্যে দুটো আকর্ষণ বড় ছিল—একটা ছিল জমিদারীর জেদের আকর্ষণ আর একটা কুইনীর আকর্ষণ। কুইনীকে দেখতে পাব। তার উপর নেশা ধরে গেছে আমার। জীবন কামনার্ত হয়ে তাকে চাচ্ছে।

আমার চোখে তখন কুইনীর রূপ এক আশ্চর্য রূপ।

কিন্তু কুইনী কাঁসাই পার হয়ে কীর্তিহাটে আসত না। গোয়ানরাও না।

কুইনীর এবং বৃদ্ধ পাদরীটির ব্যবস্থায় ওরা এই কীর্তিহাটের সঙ্গে ভোটের ঝগড়া থেকেই একটা সংগঠন গড়ে তুলছিল। ঠাকুমার শ্রাদ্ধে ভায়লেট পিক্রুজ আর দেবেশ্বর রায়ের সম্পর্ক নিয়ে ঝগড়াটাকে আরও পাকিয়ে তুলে নিজেদের সংগঠনটিকেও শক্ত করে তুলেছিল। কীর্তিহাটে তারা আসত না। এখানকার ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠাতো না।

এখানকার গার্লস স্কুলে মেয়েরা যারা পড়তে আসত, তাদেরও ছাড়িয়ে নিয়ে কুইনী নিজে একটা কোচিং ক্লাস খুলেছিল। এমন কি কীর্তিহাটের দোকানে জিনিসপত্র কেনাও বন্ধ ক'রে গ্রামেই একটা মুদীর এবং একটা ছোটখাটো মনিহারীর দোকান খুলেছিল। এ গ্রামে প্রয়োজন হলে যখন কাউকে আসতে হ'ত তখন দু'তিনজন মিলে আসত। কীর্তিহাটের লোকেরা যেতে হলে পাঁচ-সাতজন মিলে দর্পভরে যেত। গোমেশ ডিক্রুজ আমার বাড়ীর চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। আমি যখন জমিদারীর নেশায় কুইনীর আকর্ষণে ওখানে থাকলাম তখন কলকাতা থেকে দু'জন নেপালী দারোয়ান রেখেছিলাম। কিছুদিন পর আরও একজন ওখানকার দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালকেও রেখেছিলাম। দস্তুরমত জমিদারী আসর সাজিয়ে বসে, ঠাকুমার স্মৃতিরক্ষার কাজটাকে আশ্রয় করে ওখানে কুইনীকে জয় করতে চেয়েছিলাম। এ নেশা সম্ভবতঃ সংসারে সব নারীপুরুষই যৌবনকালের সঙ্গে অল্প হলেও করে থাকে কিন্তু নেশা যাকে ধরে তার আর নিষ্কৃতি থাকে না। মদ অনেকে খায় কিন্তু মদে খাওয়া বলে একটা কথা আছে, মদে যাকে খায় তার যেমন আর নিষ্কৃতি থাকে না এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। নারীকে দেখে পুরুষের ভাল লাগে কিন্তু যে পুরুষ কোন বিশেষ নারীর নেশায় পড়ে তার আর ঘৃণা থাকে না, লজ্জা থাকে না, ভয় থাকে না, তার জন্য সে অপমান গ্রাহ্য করে না, আঘাত গ্রাহ্য করে না, সব কিছুকে মাথায় করে নিয়েও তাকে পেতে চায়। আমি কুইনীকে তেমনি করে চেয়েছিলাম।

ওই দারোয়ানদের একজনকে সঙ্গে ক'রে ওই সিদ্ধাসনের মন্দিরের কাজ দেখতে যেতাম। দেখতে যাবার গুরুত্বের উপর জোর দেবার জন্য উড়িষ্যা থেকে পাথরের কারিগর এনে পাথরের কাজ করাবার প্ল্যান জুড়ে দিয়েছিলাম। এবং ওই মন্দির থেকে একটু সরে লাঠিয়াল বাগদীদের একটা পল্লী বসিয়েছিলাম, জমি দিয়ে, ঘর করবার খরচ দিয়ে, যেন গোয়ানরা মন্দিরটার ক্ষতি না করে, ভেঙে না দেয়।

গোয়ানরা আসত একটা সীমানা অবধি। তারা সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখত। এদের সঙ্গে একবার না একবার কুইনী আসতো। আমি একখানা চেয়ার পেতে বসে থাকতাম এই সময়টুকুর জন্য। কুইনীকে দেখে মন তৃপ্তিতে ভরে যেত। তার দিকেই তাকিয়ে থাকতাম। সে সহ্য করতে পারত না আমার দৃষ্টি, বেশ একটু উত্তপ্ত হয়েই সে চলে যেত। আমার চিত্ত দ্বিগুণ অতৃপ্ত হয়ে উঠত। কিছুদিন সে একেবারেই আসত না। আমি নেশায় অতৃপ্ত মনে সারাক্ষণ বসে থেকে ফিরে আসতাম অপরাহ্নে। রাত্রে ঘুমুতে পারতাম না। মদ্যপান করে ঘরে বসে হয় বাঁশের বাঁশী নয় তো বেহালা নিয়ে সেই ছবির ঘরে বসে সুর তুলতাম। গভীর রাত্রি পর্যন্ত বাজত আমার বাঁশী, অথবা আমার বেহালা। লোকে আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। কারণ আমার মনের কথা আমি ঢেকে রাখি নি আবরণ দিয়ে। আবার জবরদস্তি ক'রে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেও কিছু বলি নি, যার জন্যে লোকে আমাকে শাস্তি দিতে পারে।

বেশ কিছুদিন না আসার পর কুইনী একদিন এল। আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বোধ হয়। ওদের সীমানা রেখার ওপাশে দাঁড়িয়ে বললে—শুনুন!

আমি উঠে গেলাম।

তীব্র ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—আপনি এখানে কেন আসেন? কিসের জন্য?

মন্দির দেখতে আসি বলি নি আমি। আমি বলেছিলাম—আমার ভাল লাগে বলে আসি। স্থানটিকে আমি ভালবাসি। এবং—

—কি?

—থাক সে কথা, অনুক্ত থাক।

—আপনি অতি ইতর। বলে সে চলে যেতে যেতে বলেছিল—আর আসবেন না।

—আমি আসব। আমার কথা সে শোনে নি, সে চলে গিয়েছিল।

কিছুদিন পর অতুল এসে একদিন বললে—সুরেশ্বর, এতকাল পর তুমি সত্যিই জমিদার রায়বংশের ধারা ধরলে। জ্যাঠামশাই দেবেশ্বর রায়ের পাটটা রাখবার জন্য কোমর বেঁধে লাগলে শেষ কালটায়!

বেশ খোসমেজাজে ছিলাম। অর্থাৎ নেশার ঝোঁকে। বললাম—তোমার নীল রক্ত মেউলে হয়ে লাল হয়ে গেছে অতুল খুড়ো। যে-মাথা তাজ পরে সেই মাথা কাটা যায়, তাই বলে তাজ পরতে কেউ ছাড়ে না। দরকার হলে মাথাটা দেব গো।

অতুল বলেছিল—তার দেরি নেই সম্ভবতঃ—কারণ আগস্ট তখন সামনে। আগস্টের প্রথমেই কংগ্রেস কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট রেজলুশন নিলে।

দেখতে দেখতে সারা ভারতবর্ষে আগুন জ্বলল। বাংলাদেশে জ্বলল প্রথম মেদিনীপুরে।

মাতঙ্গিনী হাজরার রক্ত দিয়ে সিক্ত মাটির উপর স্বাধীন ভারতের পতাকাদণ্ড পোঁতা হল। মেদিনীপুরে ব্রিটিশ সরকারের অধিকার উচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পল্টন ডেকে দিয়ে ইংরেজ আবার তাকে কায়েম করতে চেয়েছে, বাইরে দেখানোর মত দখলও একটা নিয়েছিল বটে কিন্তু আর মেদিনীপুরে ঠিক ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হয় নি।

সেই সময়ে মন্দিরের পাথর বসানোর কাজ হচ্ছিল। একটা কথা বলতে ভুলেছি, প্রথম যখন মাপ অনুযায়ী লালচে পাথরের স্ল্যাবগুলি এল তখন একটা বিস্ময়ের সাড়া পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে। পাথর বসাচ্ছে মন্দিরে। আশ্চর্য মন্দির তৈরী হচ্ছে!

গোয়ালপাড়ার লোক আগে এসেছিল। ভিড় করে দাঁড়িয়ে তারা দেখেছিল। কিছুক্ষণ পর অনেকদিন পর এসেছিল কুইনী। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে সে চলে গেল।

পাথরের স্ল্যাবগুলির উপর নক্সার ডিজাইন আমি নিজে করে দিয়েছিলাম। রায়বাড়ীর কথা কীর্তিহাটের কড়চার একটা খসড়া আমি তার মধ্যে ফুটিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু নক্সার মূল ডিজাইনটা ছিল লতার মধ্যে বিকশিত পদ্মের সারি। যদি কোনদিন কীর্তিহাট যাও তুমি দেখে খুশী হবে এ কথা বলতে পারি।

ওই নক্সা যখন দেওয়ালের গায়ে রূপ নিয়েছে, স্ল্যাবগুলি বসানো হয়েছে, তখন একদিন বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ দেখে আমাকে ডাকলে, বললে—শুনুন!

গেলাম। সে বললে—এত সুন্দর মন্দির তৈরী করছেন কেন? কিসের কার মন্দির?

আমি বললাম—উপলক্ষ্য হিসেবে সবাই যা বলে তাই, সিদ্ধাসনের দেবী যোগিনীর মন্দির। যাঁর পুজো হয় বিজয়াদশমীর দিন, বাসন্তীপুজার সময়। আসলে এ মন্দির আমি উৎসর্গ করছি একটি ভালবাসার উদ্দেশে। এখানে একটি তরুণ একটি তরুণীকে প্রথম ভালবেসে মিলিত হয়েছিল, এবং পরে ওই প্রেমাস্পদের মৃত্যুতে মেয়েটি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে তাঁকে পেতে চেয়েছিল। তারই জন্যে এত সুন্দর করে গড়ছি।

স্থিরদৃষ্টিতে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। অনেকক্ষণ। তার আশেপাশে আরও কয়েকজন গোয়ানও ছিল। আমিও আমার আসনে ফিরে গিয়ে বসি নি, বেড়াটা মাঝখানে রেখে সে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ এক সময় সে ভিড় ঠেলে চলে গিয়েছিল।

পরের দিন থেকে আবার সে আসা বন্ধ করেছিল, কিন্তু শুক্ল দ্বিপ্রহরে তাকে দেখতে পেতাম সে গোয়ানপাড়ার ভিতরে তার বাড়ীর জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

যেদিন পাথর বসানো শেষ হল সেদিন আশ্বিনের আকাশ ঝলমল করছিল। পিতৃপক্ষ শেষ হয়েছে। মহালয়া গেছে আগের দিন। মন্দিরের বাইরে ভারা খুলল। ভিতরের কাজও শেষ হয়ে গেছে; সেদিন অনেক লোক এল দেখতে।

আমি খুঁজলাম কুইনীকে। এত লোকের মধ্যে কাউকে যেন আর দেখতেও পেলাম না। অনেক খুঁজে তাকে দেখতে পেলাম ভিড়ের মধ্যে। মন্দিরটাই দেখছিল সে। আমি তাকেই দেখছিলাম। হঠাৎ চোখে চোখ মিলল। সে আমার দিকে তাকালে।

বাড়ী ফিরে এলাম সন্ধ্যাবেলা।

আসবার সময় কাঁসাইয়ের খেয়াঘাটে দাঁড়িয়েছিল গোমেশ। সে হেঁট হয়ে নমস্কার করে বললে—হুজুর। আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

বললাম—কেন? দরকার আছে?

সন্ধ্যার অন্ধকার যার মধ্যে সে আমার হাতে একখানা কাগজ দিলে। তার সঙ্গে গুঁজে দিলে একটা ভাঁজ করা টুকরো কাগজ। বললে—একটা দরখাস্ত দিলাম হুজুর। এবং পুজোর সময় ঝাপড়াচোপড় কিছু হবে না হুজুর!

বাড়ী এসে দরখাস্তখানার চোখ বুলিয়ে টুকরো কাগজটা দেখলাম। খুব সুন্দর ক'রে পিন দিয়ে জুড়ে দেওয়া ছিল। তাতে লেখা ছিল। "মন্দির শেষ হ'ল, এরপর দয়া ক'রে আর এপারে আসবেন না। আমার রিলেটিভরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। আমি পশুর মত অসহায়। আপনার অনিষ্ট করবে।"

আমি উৎফুল্ল উঠেছিলাম সুলতা। ঠিক সেই সময়েই কে ডেকেছিল—সুরেশ্বর!

চমকে উঠেছিলাম। ডাক মেজদিদির। মেজদিদিকে কলকাতায় অর্চনার কাছে রেখে-ছিলাম। তিনি এসেছেন সেদিন। অতুল তাঁদের খবর দিয়েছে—"শ্যামাকান্তের অভিসম্পাত সুরেশ্বরের ঘাড়ে ভর করিয়াছে। সে গোয়ানপাড়ার কুইনী মেয়েটার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

আমি চমকে উঠেছিলাম। সত্যিই কি তাই? পুরুষ নারীর জন্য পাগল হয়, নারী

পুরুষের জন্ম পাগল হয়। দেহসম্ভোগের অন্তহীন অতৃপ্তিতে মানুষ বিকৃতমস্তিষ্ক হয়। আবার মহাপ্রকৃতির অভিসম্পাতে শ্যামাকান্ত ইহকাল পরকাল সব হারিয়ে নিজের গলা টিপে নিজেকে পীড়িত করেন। মাথা কুটে রক্তাক্ত করেন নিজেকে।

আমি কি— হয় তো তাই। কিন্তু ফিরবার শক্তি আমার ছিল না। আমার আপসোসও ছিল না। কুইনীর জন্য ইহকাল হারাতে আমার এতটুকু খেদ ছিল না. আমি সব হারাতে প্রস্তুত ছিলাম। আমার সব সম্পদ। আমার জীবন ব'লে বাড়াবাড়ি করব না। তবে তাও পারতাম। কুইনীর জীবন বিপন্ন হলে তাকে রক্ষা করবার জন্যে সে বিপদের সঙ্গে লড়তে যেতাম, তাতে মৃত্যু হলে মরতাম। কুইনীই যদি সেই প্রকৃতি হয়, রহস্যময়ী হয়, তবে তাকে মা আমি বলব না। তার জন্যে পাগলও হব না।

থাক সুলতা, এখন যা কয়েছিল বলি। তবে—।

তবে—একটা কথা বলে নিই। কুইনীর প্রতি এই আকর্ষণ যে কেন এত প্রমত্ত, তা আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি। ঠিক পুরো বুঝতে পারি নি। শুধু এইটুকু বলতে পারি—তার রূপের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যা আমার পুরুষচিত্তকে প্রমত্ত করে। আর একটা কথা। এটা এর আগে বলেছি। বার বার মনে হত, ও আমাদের—ও আমাদের—আমাদের সম্পর্ক আছে ওর সঙ্গে। মনে পড়ত অঞ্জনাকে, রত্নেশ্বর রায়কে। মনে পড়ত দেবেশ্বর রায় এবং ভায়লেটকে।

* * *

পরদিন সকালে উঠে চা খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। যাব সিদ্ধাসনের মন্দিরে। কিন্তু কাল মন্দিরের কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ঘরে মেজদি, অতুলেশ্বর থেকে ওপারে গোয়ানদের মধ্যে এ নিয়ে একটা সাড়া পড়ে গেছে। এবং সময়টা এমন যে, আজ আর আমার ব্যক্তিগত অধিকার, সম্পত্তিগত অধিকার, কোন অধিকারই আমার স্বাধীন যথেচ্ছ বিচরণের পথ খোলা রাখে নি। আগস্ট মুভমেন্টের প্রথম ঝাপটা চলে গেছে। সাব-ডিভিশন এবং বড় বড় সরকারী এলাকার জায়গাগুলোয় পুলিস মিলিটারীর সাহায্যে আবার শৃঙ্খলা ফিরেছে বটে কিন্তু তার বাইরে অধিকাংশ অঞ্চলেই বিপ্লবী স্বাধীন সরকারের অধিকার কায়েম আছে। অধিকাংশ মানুষ স্বাধীন সরকারের পক্ষে। তারাই তাদের সৈনিক। সরকারী পক্ষের লোক বলে যারা চিহ্নিত, তারা কড়া নজরের মধ্যে বসবাস করছে। তাদের উপর নির্যাতন নেই, কিন্তু তারাই ভয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছে। চোর-ডাকাত প্রভৃতি দুর্ধর্ষ মানুষেরাও স্বাধীন সরকারের অনুগত সৈনিক হিসেবে সৎ হয়েছে এবং বিনিত্র হয়ে কাজ করছে।

আমি জমিদার, সেই হিসেবে এবং একদিন বিদায় সত্যাগ্রহ লিখেছিলাম, সেই হিসেবে তাদের খাতায় দাগী আসামী। আবার মেজদিদির কেসে অতুলেশ্বরের কেসে আমি লড়েছি এবং কীর্তিহাটের কংগ্রেস সভাপতি যেদিন আমার বিচার করবার জন্ম আসামী হিসেবে তলব করেছিলেন, সেদিন পুলিসের কাছে আমি তাঁদের বাঁচিয়ে জবানবন্দী দিয়েছি বলে আমার নামের পাশে, চিত্রগুপ্তের খাতার মত, তাদের ডোসিয়ারে কিছু পুণ্যফলও আছে। আমার হাসপাতাল আমি কংগ্রেস সভাপতিকে দিয়ে ওপন করিয়েছি এবং আজ গোটা হাসপাতালটাই

তাঁদের হাতে দিয়েছি, এটাও আমার একটা পুণ্যফল। তাই আমার এ স্বাধীনতাটুকু ছিল। আজ সকাল থেকে যেন ওখানে না যাই তার একটা সাবধান-বাক্য অতুলেশ্বর উচ্চারণ করে গেছে। গোমেসের হাত দিয়ে সাবধান করে দিয়েছে কুইনী। কিন্তু তাই আমাকে বেশী করে টানলে। কুইনী আমার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েছে। আমি না গিয়ে পারি!

আমি একটু ভেবে রঙ-তুলি একটা ঝোলায় পুরে রওনা হয়ে গেলাম। প্রেসিডেন্টের কাছে ছবি আঁকবার অজুহাতে ওপারে যাবার নতুন অনুমতি নিয়ে চলে গেলাম।

ওপারের ঘাটে যেখানে নামতাম, সেটা গোয়ানপাড়ার সামনে পড়ে। ওখানে নামতেই কতকগুলো মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। তারা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে বললে, বাবু ফের এসেছে আজ!

তারপর ঘটনাটা অতর্কিতেই কতকটা ঘটে গেল। ওখানে থাকবার কিছুক্ষণের মধ্যেই। বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের ভেতর। সেদিন রাজমজুরেরা নেই। থাকবার মধ্যে সঙ্গে আছে একজন দারোয়ান আর আছে যেসব শক্তলোক কাঠিয়াদি-জানা ছোটজাতের হিন্দুদের বাস করিয়েছি তাদের বাড়ীর মেয়েরা। পুরুষেরা চাষের কাজে গেছে। ওদিকে গোয়ানপাড়ায় গোয়ানদের রাগের আগুন সুযোগ পেয়ে জ্বলে উঠেছে।

কেন আসবে বাবু—এই পারে কেন আসবে? তারা জানে কি জন্যে বাবু আসে! তারা আর সইবে না। পাড়ার সব থেকে নওজোয়ান ছোকরাটি এসেছিল হনহন করে। তখন কুইনী এসে বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়েছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তার চোখে-মুখে উত্তেজনা। সে হাঁপাচ্ছিল উত্তেজনায়।

সে বললে—কেন এসেছেন? আবার কেন এসেছেন?

হেসে বললাম—মন্দিরের ভেতরে ছবি আঁকব।

—ছবি?

—হ্যাঁ।

—না। আঁকতে হবে না, পাবেন না আঁকতে, ফিরে যান বাড়ী।

আমি একটু হেসে বললাম—না। বলেই আমি পিছন ফিরলাম, গিয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে পা দিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে—সেই মুহূর্তে ঘটল কাণ্ডটা। বলতে গেলে কয়েকটা নিমেষ ফেলতে যে সময় লাগে, তারই মধ্যে।

প্রথমেই শুনলাম—কুইনী চীৎকার করে বললে—না, না। জন—জন! না।

চমকে পিছন ফিরে দেখলাম একজন জোয়ান গোয়ান। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে প্রায় আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে তার ছুরি। ঠিক সেই মুহূর্তে, তার পিছনে ছুটে এসে তাকে সবলে কোমরে জড়িয়ে ধরলে কুইনী।—না। বলে চীৎকার করে উঠল সে। কুইনী তাকে অনুসরণ করেই ছুটে এসেছে তার পিছন পিছন।

জন তাকে ঝাঁকি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমার উপর ছুরি তুললে। যেটুকু সময় পেয়েছিলাম, তাতেই আমি তাকে আটকাবার জন্য হাত তুললাম, ধরলামও কিন্তু আটকাতে পারলাম না। তবে ছুরিখানা সে আমার বুকে বসাতে পারলে না। হাতখানা চেপে ধরে

ঠেলে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম, তারই ফলে বুকে না বসে আঘাতটা লাগল আমার কাঁধে। ওদিকে মাটি থেকে উঠে কুইনী আবার তাকে জাপটে ধরলে। ইতিমধ্যে আমার দারোয়ান ছুটে এসেছে—একটা গোলমাল উঠেছে। চারিদিক থেকে লোকেরা এসেছে।

এরই মধ্যে আমি যেন কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি শুয়ে আছি হাসপাতালে। আমার শিয়রে বসে আছেন মেজদি। শুনলাম জন ধরা পড়েছে, তাকে হাতে-পায়ে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর তার সাহায্যকারিণী এবং এই ষড়যন্ত্রের নায়িকা হিসেবে কুইনীকেও বন্দিনী করা হয়েছে। তবে সেও জনের ছুরিতে আঘাত পেয়েছে। তার আঘাত লেগেছে বাহুতে। হাসপাতালের ডায়রেক্টের নামে উৎসর্গ করা বেডে তাকে রাখা হয়েছে; জন টি.বি.রোগের পাহারাধীনে।

ওদিকে পরামর্শ চলছে—কেসটা নিয়ে কি করা হবে।—ইংরেজের থানায় পাঠানো হবে? ইংরেজের আদালতে বিচার হবে? ওদিকে গোটা কীর্তিহাটের লোকেরা গোয়ানদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। একবার তারা গোয়ানপাড়া পুড়িয়ে দিয়েছিল। এবার তারা পাড়াটা নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

মেজদিকে বললাম—মেজদি, তুমি অতুলকে বল। অপরাধ ওদের নয়। অপরাধ আমার। ভালবাসা আমার অপরাধ। কুইনীকে আমি ভালবাসি। ওরা তা সইতে পারেনি। কুইনী আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আঘাত পেয়েছে।

ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যা থেকে আকাশে ক্রুদ্ধ সাইক্লোনের নাকাড়া বাজল। সে-সাইক্লোন সপ্তমীর দিন এসেছিল কলকাতায়। মেদিনীপুরে এসেছিল ষষ্ঠীর মধ্যরাত্রে। সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ হয়েছিল উন্মত্ত ঝড়ের প্রলয়ঙ্কর মাতামাতি। সন্ধ্যা থেকে আকাশ নিকষ কালো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। খবর এসেছিল কাঁথির ওদিকে নাকি সৃষ্টি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সমুদ্রের তুফান এসে সব ধুয়ে নিয়ে যাবে। সমুদ্রের ঝড়ের সঙ্গে মেদিনীপুরের পরিচয় সৃষ্টির আদি থেকে। তারা জানে। তারা খবর পাঠায়। তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে খবর পড়তে পারে। সেদিন কংগ্রেস হুকুম দিয়েছিল—গোটা কীর্তিহাটের লোক এসে আশ্রয় নিক রায়বাড়ীর পাকা ইমারতের মধ্যে। ইস্কুল, হাসপাতাল, কাছারী যেখানে যত পাকাবাড়ী আছে, এস সকলে, তার মধ্যে এসে আশ্রয় নাও। আমাকে হুকুম দিয়েছিল বিবিমহলে যেতে।

আমি আমার বেড থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিলাম কুইনীর বেডের ছোট্ট ঘরখানিতে। কুইনী বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। ডাকলাম—কুইনী!

কুইনী মুখ তুলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি তাকে বললাম—ভয় কি? চল, আমার সঙ্গে চল। হাসপাতালে অন্য লোকেরা আসছে। আমার সঙ্গে বিবিমহলে চল—। যাবে না?

—গোয়ানদের কি হবে?

—তারাও এপারে এসে কীর্তিহাটের লোকেদের সঙ্গে রায়বাড়ীতে থাকবে। আমি প্রেসিডেন্টের কাছে নতজানু হয়ে বলব।

সেই ঝড়ের মাতামাতির মধ্যেই আমি সেই আহত অবস্থাতেই তাকে নিয়ে এসে উঠেছিলাম বিবিমহলে।

সত্য কথা বলতে গেলে, সেই আমার কুইনীর সঙ্গে বিবাহ। সেই প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যে ভীতার্ত নির্বাক কুইনীকে আমি সারারাত বুকে জড়িয়ে ধরে বাসর যাপন করেছিলাম। সত্য অর্থে বাসর সুলতা।

মাথার উপর প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের গর্জন একটানা বয়ে চলেছিল। মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছিল। বিবিমহলের নীচের তলায় একটা চোরকুঠরীর কথা বোধ হয় বলেছি। সেটা সেকালের স্ট্রং-রুম। এই ঘরেই ব্রজদা লুকিয়ে রেখেছিল বীরেশ্বর রায়ের এবং দেবেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনার খাতা এবং ডায়েরীগুলো। সেই ঘরের মধ্যে মেঝের ওপর কম্বল পেতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আমি ভয়ার্ত কুইনীকে পাশে নিয়ে একটা কম্বল দুজনে গায়ে জড়িয়ে বসেছিলাম। নির্বাক স্তব্ধ। ঘরের আলো নিভে গিয়েছিল। একটা পাঁচ-ব্যাটারীর টর্চ ছিল, সেটা জ্বেলে বসেছিলাম। আলোর ফোকাসটা পড়েছিল দেওয়ালের গায়ে, আর চারিপাশে একটা আলোকিত আভাস—হ্যাঁ, তা ছাড়া কি বলব? একটা আভাস ফুটে উঠেছিল। তারই মধ্যে, মধ্যে মধ্যে সে আমার বুকের উপর ঘুমে ঢুলে পড়ছিল, কখনও আমি পড়ছিলাম তার উপর; ঘুম ভেঙে গিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটি করে হাসি ফুটে উঠছিল আমার মুখে। দেহসম্ভোগ নয়, পরস্পরের দেহের উত্তাপে একটা নরম নিশ্চিন্ততার আরাম বা আনন্দ যাই বল—তার মধ্যে ডুবেছিলাম। বাংলা কবিতার একটা লাইন মনে পড়ছে—মোহিতলালের নারী কবিতার লাইন।

‘সন্ধান মরিছে বুকে, তখনই সে নবগঙ্গাধান’। এ-মৃত্যুকে মাথায় করে আমাদের মিলন হয়েছিল সুলতা।

* * *

এখানেই যবনিকা ফেলে দিতাম নাটক হলে। অন্ততঃ মানুষের গড়া স্টেজের নাটক হলে। পৃথিবী রঙ্গমঞ্চে যে-নাটক চলে, সে-নাটকে নাটকীয় মুহূর্ত আসে, সংঘাত আসে; যবনিকা পড়ে না, নাটকও শেষ হয় না। নাটক চলে।

পৃথিবীর কীর্তিহাট যে-কোণে, সেই কোণেও রায়বাড়ীর জীবন-নাটকে এই ঘটনার পরও একটা লৌকিক বিবাহ আমাদের হল। সমাজ-মাই এরা তো মানুষের মনের বিবাহকে মানে না—তাদের বিধানমত বিবাহ করিয়ে ছাড়ে—তাই হল।

এই প্রাকৃতিক তাণ্ডবে মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত মনে আছে তোমার—তিনদিন ধরে মেদিনীপুর পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে হাজার হাজার দরুনে লোক মরেছে, হাজারে হাজারে জন্তু-জানোয়ার মরেছে। সমুদ্রের পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস সমস্ত দক্ষিণ উপকূল ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। গাছপালা কুরুক্ষেত্রের অক্ষৌহিণী সেনার মত ধরাশায়ী হয়েছে। গৃহহীন মানুষ জলসিক্ত মাটির বুকের উপরেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এরই মধ্যে ডি-এম বলেছিলেন—ঈশ্বর মেদিনীপুরকে শাস্তি দিয়েছেন।

স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা ক্যাবিনেটের মন্ত্রী তখন। তিনি এসে জনসাধারণের নৌকো কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করায় একজন ডেপুটি বলেছিল—সরকারী প্রয়োজনে নৌকো কেড়ে নেওয়া দরকার হয়েছিল তাই নিয়েছি। অত্যন্ত উদ্ধতভাবে বলেছিল।

কীর্তিহাটেও ওই সরকারী দাপটের ঢেউ এসে লাগল।

দু'দিন পর। রিজার্ভ ফোর্স নিয়ে এসে হাজির হল একজন ইন্সপেক্টার। তার সঙ্গে খড়্গপুরের মিসেস হাডসন এবং একজন অ্যাংলো ভদ্রলোক। অতুল, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মণ্ডল—এঁরা অবশ্য তার আগেই সরে গেছেন। গ্রামের লোকেই সরিয়ে দিয়েছে।

রিজার্ভ ফোর্স প্রথম এসেই কিছু লোককে অ্যারেস্ট করেছিল। মিসেস হাডসন এবং সেই অ্যাংলো ভদ্রলোক এসেছিলেন গোমানদের সাহায্য দিতে। কিন্তু তাদের পেলেন এখানেই। গোমানদেরও আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল গার্লস স্কুলে। তাদের কথায় তারা পুলিসের কাছে নালিশ করলে, জমিদার সুরেশ্বর রায় কুইনীকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কুইনী আটকে রয়েছে বিবিমহলে।

আমি তখন ঘুরে দেখছিলাম রায়বাড়ী। চারিদিক ঘুরে দেখছিলাম।

রায়বাড়ীর তিনটে সিঁড়ি, তিনটে চিলে-কোঠা।

চিলে-কোঠাগুলো সবই ভেঙে গেছে। উত্তরদিকের গোটা আলসে ভেঙেছে।

সব থেকে বড় ক্ষতি হয়েছে—বিভিন্ন সময়ে তৈরী রায়বাড়ীর বিভিন্ন মহলগুলোর জোড়ের মুখে ফাট ধরেছে।

বিবিমহলের সব থেকে যেটা শোভার বস্তু, আরামের স্থান, ছাদের উপর আটকোণা ছবি-ঘর, যেখানে বসে আমি ছবি আঁকতাম, বাঁশী-বেহালা বাজাতাম, যেখানে বসে থাকতেন বীরেশ্বর রায়, সেই ছবি-ঘরখানাও ভেঙে পড়ে গেছে।

ধানের গোলা ভেঙে ধান ছড়িয়ে পড়েছে, ভেসে গেছে। ইন্সপেক্টর কনেস্টবল নিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললে—আপনাকে এ্যারেস্ট করছি। আপনি কুইনী মুখার্জি বলে ক্রীশ্চান মেয়েটিকে—

মিসেস হাডসন পা ঠুকে বলে উঠল—you are a Scoundrel, you have—

এ্যাংলো ভদ্রলোকটি একটা চড় বসিয়ে দিল আমার গালে। প্রস্তুত ছিলাম না আমি। পরমুহূর্তেই আমার রায়-রক্ত সাড়া দিয়ে উঠল—আমি ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার উপরে। কিন্তু তাদের সঙ্গে পারি নি আমি। তারা অনেক। আমি একা। সাহায্যের জন্য কেউ ছিল না।

সাইক্লোন এবং বন্যা-বিধ্বস্ত কীর্তিহাট, মানুষেরা ক্লান্ত, ভেঙে পড়েছে। প্রতিবাদ করবারও কেউ নেই। সাহায্য করতে কে আসবে! আমাকে তারা ধরে বেঁধে ফেললে অপরাধীর মত।

—কোথায় কুইনী?

এবার আমি আত্মসম্বরণ করে বললাম—আমার ঘরে। বিবিমহলে। সে আমার ভাবী স্ত্রী—

কথা বলতে দিলে না আমাকে। অপরাধীর মতই কোমরে বেঁধে টেনে নিয়ে এল বিবিমহলে। কুইনী ছুটে বেরিয়ে এল খবর পেয়ে। আমার কোমরে দড়ি দেখে, আমার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে সে থমকে দাঁড়াল।—কেন ওঁকে বেঁধেছেন? কি করেছেন উনি?

মিসেস হাডসন বললেন—কুইনী তুমি সেফ? তোমার কোন অমর্যাদা—?

কুইনী এক কথায় সব কথার জবাব দিলে—আগে ওঁকে ছেড়ে দিন। উনি আমার ভাবী স্বামী। আমি ওঁকে ভালবাসি।

এ নিয়ে সমস্যা অনেকের কাছে ছিল কিন্তু আমার কাছে ছিল না। কুইনীর কাছেও না।

ওই গোয়ানপাড়ার পাত্রী বুড়ো ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাজ করেছিলেন।

আবার বাড়ীতে মেজদি বলেছিলেন, তাঁরা বিবিমহলে দাঁড়িয়েছিলেন—মেজদি, গোবরডাঙার খুড়িমা, বর্ধমানের খুড়িমা, অর্চনার মা, অন্নদার বোন; মেজদি বলেছিলেন—কুণ্ডিকাটা করবিনে রে? কুইনী তো আসলে মুখুজ্জে। পরে না হয় ক্রীশ্চান হয়েছে।

গোবরডাঙার খুড়িমা একটা বেলপাতায় খানিকটা কালীমায়ের প্রসাদী সিঁদুর বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন—অন্তত এটা দিয়ে দে সুরেশ্বর।

কুইনী তাতে আপত্তি করে নি। একটু হেসেছিল। কালীবাড়ি নারায়ণ-মন্দিরেও সে যেতে চেয়েছিল। অন্তত আগ্রহ ছিল। কিন্তু আবার পথ আটকালে রায়েরা। কল্যাণেশ্বরেরা। এবার কল্যাণেশ্বর একা নয়। গোবরডাঙার খুড়িমাও বলেছিলেন—না, সেটাতে হ্যাঁ বলতে পারব না।

তবে সিদ্ধাসনের নতুন মন্দিরে আমরা দু'জনে প্রণাম করে এসেছিলাম। কেউ আপত্তি করে নি।

ওখান থেকে গোয়ানপাড়ার ওদের গির্জেতে গিয়েছিলাম দু'জনে। সেখান থেকে ফিরে এসে শুনলাম, রায়বাড়ীর শরিকদের জটলা হচ্ছে।

আমি পরের দিন কুইনীকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম। প্রয়োজন নেই। দেবোত্তরের সেবায়েত স্বত্বের একের ষষ্ঠাংশ অংশে আমার প্রয়োজন নেই। আমার ব্যক্তিগত জমিদারী পত্তনী দরপত্তনী স্বত্ব সে কেউ নিতে পারবে না।

যদি পারে তাতেও আমার প্রয়োজন নেই।

না। প্রয়োজন নেই।

গোটা রায়বাড়ীটাই ফেটে হাঁ হয়ে গেছে। ছাদের আলসে ভেঙে পড়েছে। ছাদে জল পড়ছে। বিবিমহলের ছত্রি উড়েছে। এবার পড়বে, ভেঙে পড়বে হুড়মুড় করে।

১৭৯৯ সালে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং তাঁর সুযোগ্য পাটোয়ার কানুনগো—কুড়ারাম রায় ভটচাজ লর্ড কর্নওয়ালিসের হুকুমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করে গিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কালী-মা'র নামে জমিদারী কিনে, সন্তান-সন্ততিদের অন্নপূর্ণার আশীর্বাদে দুধে-ভাতে রেখে হাসিমুখে চোখ বুজেছিলেন—আজ ১৯৪২ সালে আগস্ট মুভমেণ্টের মধ্যে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড় এসে সে জমিদারীর সব কিছু আছড়ে ফেলে মড় মড় করে ভেঙে দিয়ে গেল।

খবর আসতে লাগল—বড় বড় জমিদারবাড়ীর কোথাও ভেঙেছে মাথা, কোথাও ভেঙেছে মাঝখানে। কোথাও ভেঙেছে ভিত থেকে।

এখন এখানে যে মাথা গুঁজে থাকতে চাইবে সে চাপা পড়বে। প্রজারা আর বেগার দেয় না। ইট-কাঠ চাপা পড়লে তাদের ধরে এনে আর ইট-কাঠ সরানো যাবে না। তোমাদের চাপা পড়ে মরতে দেখলে তারা হাততালি দিয়ে হাসবে। পালাও, এখান থেকে পালাও।

## পরিশিষ্ট

চার বছর পর ১৯৫৭ সাল, জুলাই মাস। সন্ধ্যার সময় সুলতা ঘোষ বাসায় ফিরে প্রথমেই টেবিলের উপর রাখা ডাকের কাগজপত্রগুলি নেড়েচেড়ে দেখলে। বেশীর ভাগই কাগজপত্র, সাপ্তাহিক পাক্ষিক পত্র, কিছু ফরেন-এম্বাসী থেকে পাঠানো কাগজ, তাদের প্রচারপত্র। বাকী সব এদেশের। কিছু বিজ্ঞাপন। কিছু বুক পোস্ট। মিটিংয়ের নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা নোটিশ। কয়েকখানা বড় চৌকো দামী খাম সরকারী ফাংশনে নিমন্ত্রণের কার্ড এসেছে। ওগুলিকে ঠেলে রাখতে গিয়ে একখানা এমনি দামী বড় চৌকো খাম তার চোখে পড়ল। সে একটু বিস্মিত হয়ে গেল। খামটার মাথায় লেখা ৺গঙ্গা। অর্থাৎ কারও শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র।

সুলতার জীবন একক জীবন, অধ্যাপনা তার জীবিকা এবং রাজনৈতিক কাজ তার জীবনাদর্শ কিংবা জীবনের নেশা; এমন জীবনে সমাজ ও সংসারের পারিবারিক সুখদুঃখের সঙ্গে বন্ধন তার দুর্বল। মা-বাপ মারা গেছেন বছর তিনেক আগে; ১৯৫৪ সালে। তারপর সে ভাইদের সঙ্গে আলাদা হয়ে বাসা করেছে। তার এই একক জীবনে বান্ধব-বান্ধবীদের ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশন বা কোন তরুণ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী বা রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বিয়ের নিমন্ত্রণ আসে কিন্তু 'ওঁ গঙ্গা' লেখা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ আসে না। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ এক-আধখানা আসে পোস্টকার্ড বা খামের ভিতর কার্ড—তাতে শুধু কালো বর্ডার থাকে—ওঁ গঙ্গা-টঙ্গা থাকে না। ওঁ গঙ্গা লেখা খাম এবং খামখানা বুকপোস্ট নয়; রীতিমত খামের টিকিট মারা মুখবন্ধ পত্র। ভিতরে বোধ হয় ব্যক্তিগত পত্রও আছে ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র ছাড়া।

পত্রখানা হাতে নিয়ে সে ভাবলে কোথা থেকে এল? কার পত্র? কে মারা গেল? টিকিটের উপর পোস্টাল স্ট্যাম্প দেখে বুঝতে চেষ্টা করলে কিন্তু নাম পড়া গেল না। কলকাতার কোন পোস্টাপিস থেকে আসছে না। কলকাতার পোস্টাপিসগুলোর সীলের একটা বিশেষত্ব থাকে। এতে তা নেই।

খুলতে যেন খানিকটা সংকোচ হচ্ছে, পিছিয়ে আসতে চাচ্ছে মন। একটু চুপ ক'রে বসে থেকে সে খুলে ফেললে। কার্ড নয় চিঠি এবং একখানা নয় দু'খানা। অনুমানমত একখানা হাতে লেখা, অন্যখানা ছাপা। ভাঁজের উল্টো পিঠ থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। সে আগে ছাপা চিঠিখানাই খুলে নিচের দিকে তাকিয়ে নিমন্ত্রণকর্তার নামটা পড়ল।

সাবিত্রী রায়। কীর্তিহাট, মেদিনীপুর। কীর্তিহাটের রায় মানে রায়বাড়ী। কিন্তু

সাবিত্রী রায় কে? চোখের দৃষ্টি উপরে তুলতেই তার চোখ নিবদ্ধ হল একটা নামের উপর—সুরেশ্বর রায়।

আমার স্বামী সুরেশ্বর রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে আগামী ২২শে শ্রাবণ ঝুলনপূর্ণিমার দিন তাঁহার ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পারলৌকিক বৃষোৎসর্গ ক্রিয়াদি—আর পড়তে পারলে না সুলতা, হঠাৎ বুকের মধ্যে বর্ষার ফুলে-ওঠা মেঘের মত পুঞ্জিত মেঘ ফুলে ফেঁপে উঠে তার অন্তরলোকটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে।

সুরেশ্বর নেই?

কিন্তু সাবিত্রী দেবী কে? সুরেশ্বর বিয়ে করেছিল কুইনী মুখার্জী বলে একটি ক্রীশ্চান মেয়েকে। গোয়ানপাড়ার ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এবং সে তো সাবিত্রী নয়। তবে নতুন বিয়ে করেছে সুরেশ্বর?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সুলতা। মনে পড়ল চার বছর আগে দুদিন ধরে সেই রায়-বাড়ীর জবানবন্দী শোনার কথা। ১৯৩২-এর সাইক্লোনের রাত্রে সুরেশ্বর এবং কুইনী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল এবং কালী-মায়ের প্রসাদী সিঁদুর রায়বংশের মেয়েদের সামনে কুইনীর সিঁথিতে পরিয়ে দিয়েছিল। এবং কলকাতা চলে এসেছিল ক'দিন পরই। কীর্তিহাটে থাকতে পারে নি, থাকা সম্ভবপর হয় নি। রায়বংশের পুরুষেরা আপত্তি করেছিল। যে-বাড়ীতে পাষাণময়ী কালী প্রতিষ্ঠিতা, রাধাসুন্দর বিগ্রহ এবং রাজরাজেশ্বর সৌভাগ্যশিলা শালগ্রাম অধিষ্ঠিত সে বাড়ীতে এই ধরনের বিবাহ সিদ্ধ নয় এবং কোন ক্রীশ্চান বা ভিন্নজাতীয়া স্ত্রীকে নিয়ে কেউ এই রায়বাড়ী বসবাসেরও অধিকারী নন অথবা সম্পত্তিরও অংশীদার হতে পারেন না কারণ সম্পত্তি সমস্তই দেবোত্তর।

তাই কুইনীকে নিয়ে কলকাতা পালিয়ে এসেছিল সুরেশ্বর। তারপর লেগেছিল ওই বিয়েকে উপলক্ষ করে মামলা প্রকাণ্ড মামলা। সুরেশ্বর বলেছিল—প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়মে রায়বাড়ীকে একদিন হারিয়ে যেতে হবে নগণ্য হয়ে সব মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে হবে। মুঘল বাদশাহদের বংশের ছেলেদের নাকি কুরশীনামা ধ'রে খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ যে টাঙায় চড়ে লোকে তাদের খোঁজে সেই টাঙার টাঙাওয়ালাটি হয়তো বাদশা বংশের। রায়বাড়ীরও সেই পালা শুরু হয়েছে। আমি এরই মধ্যে নিজে থেকে এগিয়ে এসে কিছু দেনা শোধ করতে সংকল্প করেছিলাম বাবার মৃত্যুর পর; মৃত্যুশয্যায় মা-ও আমাকে বলতেন। সেদিনও বলেছেন। সর্বশেষ বলেছিলেন—ঠাকুমা উমা দেবী। তাঁর আশীর্বাদই হোক আর যাই হোক, গোয়ানপাড়ার ক্রীশ্চান মেয়ে কুইনীর রূপের মোহ যখন আমায় টানলে, যখন আমি জমিদারীর অর্থবল নিয়েও তাকে জমিদারের ছেলের মত জয় করে নেবার ভার বুদ্ধি করি নি, তাকে প্রেম দিয়ে জয় ক'রে তার সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বেঁধে কিছু দেনা শোধই করেছিলাম। কিন্তু তা রায়বাড়ীর শরিকেরা মঞ্জুর করলে না। দেবতার দোহাই দিয়ে আদালতে নালিশ করলে—আমার জাত গেছে এ বিয়ে ক'রে, সুতরাং দেব-সেবায় আমার অধিকার নেই। দেবসেবার অধিকার না থাকলে দেবত্র সম্পত্তি পাব না এবং হিন্দু ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের অর্জিত সম্পত্তির একটি কণারও আমি

অধিকারী হতে পারি না। এ দেশের ধর্মাধিকরণের মামলার ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ইতিহাসেও আছে।

সুলতাই তাকে বাধা দিয়েছিল। চোখে দেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সব থেকে বড় কথাটা মনে পড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—ক'বছর আগে যে দেশটা স্বাধীন হতে গিয়ে ধর্মের পর কবন্ধ হয়ে তবে রেহাই পেলে সে দেশে ওর নজীরের আর দরকার নেই সুরেশ্বর। তুমি বল কি হল তারপর ?

হেসে সুরেশ্বর বলেছিল—কি আর ? মামলা, মামলা দায়ের হল, মেদিনীপুরের জজ কোর্টে। আর কীর্তিহাটের পঞ্চগ্রাম সপ্তগ্রামের ব্রাহ্মণ ও হিন্দুসমাজের মাতব্বরদের ডেকে রায়বংশের তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল দু'বছরের মধ্যে মামলা মেদিনীপুর কোর্ট থেকে হাইকোর্টে এসে দাখিল হয়েছিল। এবং এ মামলায় এবার দীর্ঘকাল পর ঘরের কোটরের অন্ধকার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন আমার জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায়।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপৌত্র। যজ্ঞেশ্বর রায় দেবেশ্বরের সামনে তাঁর প্রিয়পাত্রী গবর্নেস মেমসাহেবের পিঠে চাবুক মেরে তাড়িয়েছিলেন। যজ্ঞেশ্বর রায় বাপের কদাচারের বিরোধী ছিলেন। যজ্ঞেশ্বর রায় নিজের মাকে ক্রীশ্চানপাড়ায় ক্রীশ্চানের ঘরে জল খাওয়ার জন্ম পাগল বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁকে বৃন্দাবনে বনবাসিনী করেছিলেন। ভায়লেটের পুত্রের দৌহিত্রী কুইনীকে ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী বিয়ে করায় যে অন্যায় এবং যে অনাচার আমি করলাম বলে তাঁর মনে হল তা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তাছাড়া তখন তিনি অবস্থার দিক দিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। যুদ্ধের কাল, ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যুদ্ধ এসে পড়েছে; বার্মা ফ্রণ্টে 'জয় হিন্দ' ধ্বনি উঠেছে; কলকাতার আকাশে জাপানী বম্বার এসে বম্বিং করে গেছে। ইংরেজ আমেরিকান কাফ্রি নিগ্রো পল্টনে দেশ ছেয়ে গেছে। তার সঙ্গে এসেছে লাখ লাখ টাকার নোট, দেশের হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। সেই সুযোগে জ্যাঠামশাই আবার নেমেছিলেন ব্যবসাতে। তাঁর দুই ছেলে এক অ্যামেরিকান কর্নেলের সুনজরে পড়ে মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট পেয়েছেন যা থেকে রাতারাতি অবস্থা ফিরে গেছে। আবার গাড়ী কিনেছে বাড়ী কিনেছে; সন্ধ্যার অবকাশ বিনোদনের জন্ম ময়দানে ময়দানে নিত্যনতুন বিনোদিনীর সন্ধান ক'রে বেড়ায়। তারাও এসে দাঁড়াল বাপের পিছনে। যজ্ঞেশ্বর রায় কতকগুলো পত্র বের করেছিলেন। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেশ্বর রায় লিখেছিলেন পরস্পরকে। তাতে তাঁর স্বপক্ষে যাবার মত অনেক কিছু ছিল।

সে মামলা ১৯৫৩ সালে সেদিনও মেটে নি। তখনও মামলা চলছিল।

সব মনে পড়ছে সুলতার। ওঃ, সুরেশ্বর নেই! সুরেশ্বর! সুরেশ্বর তার জীবনের প্রথম যৌবনস্বপ্নের রাজপুত্র। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়েই সে এসেছিল। সোনার কাঠি রূপার কাঠি নাড়ানাড়ি করতে করতে সে তার ঘুম ভাঙিয়েছিল।

ফুল তুলে এনে ফেলে দিয়ে বলেছিল—মালা গাঁথ। সে মালা গাঁথলে, সুরেশ্বরও মালা গেঁথেছিল কিন্তু বিনিময় করা হয়ে উঠল না। কোথা থেকে তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল